বঙ্কিম

উপন্যাস সমগ্র

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিম

উপন্যাস সমগ্র

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পেজ নং

আনন্দমঠ

উপক্রমণিকা

অতি বিস্তৃত অরণ্য। অরণ্যমধ্যে অধিকাংশ বৃক্ষই শাল, কিন্তু তদ্ভিন্ন আরও অনেকজাতীয় গাছ আছে। গাছের মাথায় মাথায় পাতায় পাতায় মিশামিশি হইয়া অনন্ত শ্রেণী চলিয়াছে। বিচ্ছেদশূন্য, ছিদ্রশূন্য আলোকপ্রবেশের পথমাত্রশূন্য; এইরূপ পল্লবের অনন্ত সমুদ্র, ক্রোশের পর ক্রোশ, ক্রোশের পর ক্রোশ, পবনে তরঙ্গের উপরে তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে চলিয়াছে। নীচে ঘনান্ধকার। মধ্যাহ্নেও আলোক অস্ফুট , ভয়ানক! তাহার ভিতরে কখন মনুষ্য যায় না। পাতার অনন্ত মর্ম্মর এবং বন্য পশুপক্ষীর রব ভিন্ন অন্য শব্দ তাহার ভিতর শুনা যায় না।

একে এই বিস্তৃত অতি নিবিড় অন্ধতমোময় অরণ্য; তাহাতে রাত্রিকাল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। রাত্রি অতিশয় অন্ধকার কাননের বাহিরেও অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না। কাননের ভিতরে তমোরাশি ভূগর্ভস্থ অন্ধকারের ন্যায়।

পশুপক্ষী একেবারে নিস্তব্ধ। কত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সেই অরণ্যমধ্যে বাস করে। কেহ কোন শব্দ করিতেছে না। বরং সে অন্ধকার অনুভব করা যায়– শব্দময়ী পৃথিবীর সে নিস্তব্ধভাব অনুভব করা যাইতে পারে না।

সেই অন্তশূন্য অরণ্যমধ্যে, সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারময় নিশীথে, সেই অননুভবনীয় নিস্তব্ধ মধ্যে শব্দ হইল, "আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?"

শব্দ হইয়া আবার সে অরণ্যানী নিস্তব্ধে ডুবিয়া গেল; তখন কে বলিবে যে, এ অরণ্যমধ্যে মনুষ্যশব্দ শুনা গিয়াছিল? কিছুকাল পরে আবার শব্দ হইল, আবার সেই নিস্তব্ধ মথিত করিয়া মনুষ্যকণ্ঠ ধ্বনিত হইল, "আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?"

এইরূপ তিন বার সেই অন্ধকারসমুদ্র আলোড়িত হইল। তখন উত্তর হইল, "তোমার পণ কি?"

প্রত্যুত্তরে বলিল, "পণ আমার জীবনসর্ব্বস্ব।"

প্রতিশব্দ হইল, "জীবন তুচ্ছ; সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।"

"আর কি আছে? আর কি দিব?"

তখন উত্তর হইল, "**ভক্তি**।"

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

১১৭৬ সালে গ্রীষ্মকালে এক দিন পদচিহ্ন গ্রামে রৌদ্রের উত্তাপ বড় প্রবল। গ্রামখানি গৃহময়, কিন্তু লোক দেখি না। বাজারে সারি সারি দোকান, হাটে সারি সারি চালা, পল্লীতে পল্লীতে শত শত মৃন্ময় গৃহ, মধ্যে মধ্যে উচ্চ নীচ অট্টালিকা। আজ সব নীরব। বাজারে দোকান বন্ধ, দোকানদার কোথায় পলাইয়াছে ঠিকানা নাই। আজ হাটবার, হাটে হাট লাগে নাই। ভিক্ষার দিন, ভিক্ষুকেরা বাহির হয় নাই। তন্তুবায় তাঁত বন্ধ করিয়া গৃহপ্রান্তে পড়িয়া কাঁদিতেছে, ব্যবসায়ী ব্যবসা ভুলিয়া শিশু ক্রোড়ে করিয়া কাঁদিতেছে, দাতারা দান বন্ধ করিয়াছে, অধ্যাপকে টোল বন্ধ করিয়াছে; শিশুও বুঝি আর সাহস করিয়া কাঁদে না। রাজপথে লোক দেখি না, সরোবরে স্নাতক দেখি না, গৃহদ্বারে মনুষ্য দেখি না, বৃক্ষে পক্ষী দেখি না, গোচারণে গোরু দেখি না, কেবল শ্মশানে শৃগাল-কুক্কুর। এক বৃহৎ অট্টালিকা–তাহার বড় বড় ছড়ওয়ালা থাম দূর হইতে দেখা যায়–সেই গৃহারণ্যমধ্যে শৈলশিখরবৎ শোভা পাইতেছিল। শোভাই বা কি, তাহার দ্বার রুদ্ধ, গৃহ মনুষ্যসমাগমশূন্য, শব্দহীন, বায়ুপ্রবেশের পক্ষেও বিঘ্নময়। তাহার অভ্যন্তরে ঘরের ভিতর মধ্যাহ্নে অন্ধকার, অন্ধকারে নিশীথফুল্লকুসুমযুগলবৎ এক দম্পতি বসিয়া ভাবিতেছে। তাহাদের সম্মুখে মন্বন্তর।

১১৭৪ সালে ফসল ভাল হয় নাই, সুতরাং ১১৭৫ সালে চাল কিছু মহার্ঘ হইল– লোকের ক্লেশ হইল, কিন্তু রাজা রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইল। রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া দরিদ্রেরা এক সন্ধ্যা আহার করিল। ১১৭৫ সালে বর্ষাকালে বেশ বৃষ্টি হইল। লোকে ভাবিল, দেবতা বুঝি কৃপা করিলেন। আনন্দে আবার রাখাল মাঠে গান গায়িল, কৃষকপত্নী আবার রূপার পৈচাঁর জন্য স্বামীর কাছে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। অকস্মাৎ আশ্বিন মাসে দেবতা বিমুখ হইলেন। আশ্বিনে কার্ত্তিকে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পড়িল না, মাঠে ধান্যসকল শুকাইয়া একেবারে খড় হইয়া গেল, যাহার দুই এক কাহন ফলিয়াছিল, রাজপুরুষেরা তাহা সিপাহীর জন্য কিনিয়া রাখিলেন। লোকে আর খাইতে পাইল না। প্রথমে এক সন্ধ্যা উপবাস করিল, তার পর এক সন্ধ্যা আধপেটা করিয়া খাইতে লাগিল, তার পর দুই সন্ধ্যা উপবাস আরম্ভ করিল। যে কিছু চৈত্র ফসল হইল, কাহারও মুখে তাহা কুলাইল না। কিন্তু মহম্মদ রেজা খাঁ রাজস্ব আদায়ের কর্ত্তা, মনে করিল, আমি এই সময়ে সরফরাজ হইব। একেবারে শতকরা দশ টাকা রাজস্ব বাড়াইয়া দিল। বাঙ্গালায় বড় কান্নার কোলাহল পড়িয়া গেল।

লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তার পরে কে ভিক্ষা দেয়!–উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তার পরে রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গোরু বেচিল, লাঙ্গল জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়ী বেচিল। জোত জমা বেচিল। তার পর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর মেয়ে, ছেলে, স্ত্রী কে কিনে? করিদ্দার নাই, সকলেই বেচিতে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল, ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল, আগাছা খাইতে লাগিল। ইতর ও বন্যেরা কুক্কুর, ইন্দুর, বিড়াল খাইতে লাগিল। অনেকে পলাইল, যাহারা পলাইল, তাহারা বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল। যাহারা পলাইল না, তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া, রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।

রোগ সময় পাইল, জ্বর, ওলাউঠা, ক্ষয়, বসন্ত। বিশেষতঃ বসন্তের প্রাদুর্ভাব হইল। গৃহে গৃহে বসন্তে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল দেয়, কে কাহাকে স্পর্শ করে। কেহ কাহার চিকিৎসা করে না; কেহ কাহাকে দেখে না, মরিলে কেহ ফেলে না। অতি রমণীয় বপু অট্টালিকার মধ্যে আপনা আপনি পচে। যে গৃহে একবার বসন্ত প্রবেশ করে, সে গৃহবাসীরা রোগী ফেলিয়া ভয়ে পলায়।

মহেন্দ্র সিংহ পদচিহ্ন গ্রামে বড় ধনবান্–কিন্তু আজ ধনী নির্ধনের এক দর। এই দুঃখপূর্ণ কালে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া তাঁহার আত্মীয়স্বজন, দাসদাসী সকলেই গিয়াছে। কেহ মরিয়াছে, কেহ পলাইয়াছে। সেই বহুপরিবারমধ্যে এখন তাঁহার ভার্য্যা ও তিনি স্বয়ং আর এক শিশুকন্যা। তাঁহাদেরই কথা বলিতেছিলাম।

তাঁহার ভার্য্যা কল্যাণী চিন্তা ত্যাগ করিয়া, গো-শালে গিয়া স্বয়ং গো-দোহন করিলেন। পরে দুগ্ধ তপ্ত করিয়া কন্যাকে খাওয়াইয়া গোরুকে ঘাস-জল দিতে গেলেন। ফিরিয়া আসিলে মহেন্দ্র বলিল, “এরূপে কদিন চলিবে?’

কল্যাণী বলিল, “বড় অধিক দিন নয়। যত দিন চলে; আমি যত দিন পারি চালাই, তার পর তুমি মেয়েটি লইয়া সহরে যাইও।”

মহেন্দ্র। সহরে যদি যাইতে হয়, তবে তোমায় বা কেন এত দুঃখ দিই। চল না এখনই যাই।

পরে দুই জনে অনেক তর্ক বির্তক হইল।

ক। সহরে গেলে কিছু বিশেষ উপকার হইবে কি?

ম। সে স্থান হয়ত এমনি জনশূন্য, প্রাণরক্ষার উপায়শূন্য হইয়াছে।

ক। মুরশিদাবাদ, কাশিমবাজার বা কলিকাতায় গেলে প্রাণরক্ষা হইতে পারিবে। এ স্থান ত্যাগ করা সকল প্রকারে কর্ত্তব্য।

মহেন্দ্র বলিল, “এই বাড়ী বহুকাল হইতে পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত ধনে পরিপূর্ণ; ইহা যে সব চোরে লুঠিয়া লইবে।”

ক। লুঠিতে আসিলে আমরা কি দুই জনে রাখিতে পারিব? প্রাণে না বাঁচিলে ধন ভোগ করিবে কে? চল, এখনও বন্ধ সন্ধ করিয়া যাই। যদি প্রাণে বাঁচি, ফিরিয়া আসিয়া ভোগ করিব।

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি পথ হাঁটিতে পারিবে কি? বেহারা ত সব মরিয়া গিয়াছে, গোরু আছে ত গাড়োয়ান নাই, গাড়োয়ান আছে ত গোরু নাই।”

ক। আমি পথ হাঁটিব, তুমি চিন্তা করিও না।

কল্যাণী মনে মনে স্থির করিলেন যে, না হয় পথে মরিয়া পড়িয়া থাকিব, তবু ত ইহারা দুই জন বাঁচিবে।

পরদিন প্রভাতে দুই জনে কিছু অর্থ সঙ্গে লইয়া, ঘরদ্বারের চাবি বন্ধ করিয়া, গোরুগুলি ছাড়িয়া দিয়া, কন্যাটিকে কোলে লইয়া রাজধানীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে মহেন্দ্র বলিলেন, “পথ অতি দুর্গম। পায়ে পায়ে ডাকাত লুঠেরা ফিরিতেছে, শুধু হাতে যাওয়া উচিত নয়।” এই বলিয়া মহেন্দ্র গৃহে ফিরিয়া আসিয়া বন্দুক, গুলি, বারুদ লইয়া গেলেন।

দেখিয়া কল্যাণী বলিলেন, “যদি অস্ত্রের কথা মনে করিলে, তবে তুমি একবার সুকুমারীকে ধর। আমিও হাতিয়ার লইয়া আসিব।” এই বলিয়া কল্যাণী কন্যাকে মহেন্দ্রের কোলে দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

মহেন্দ্র বলিলেন, “তুমি আবার কি হাতিয়ার লইবে?”

কল্যাণী আসিয়া একটি বিষের ক্ষুদ্র কৌটা বস্ত্রমধ্যে লুকাইল। দুঃখের দিন কপালে কি হয় বলিয়া কল্যাণী পূর্ব্বেই বিষ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলন।

জ্যৈষ্ঠ মাস, দারুণ রৌদ্র, পৃথিবী অগ্নিময়, বায়ুতে আগুন ছড়াইতেছে, আকাশ তপ্ত তামার চাঁদোয়ার মত, পথের ধূলিসকল অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ। কল্যাণী ঘামিতে লাগিল, কখনও বাবলা গাছের ছায়ায়, কখনও খেজুর গাছের ছায়ায় বসিয়া বসিয়া, শুষ্ক পুষ্করিণীর কর্দ্দমময় জল পান করিয়া কত কষ্টে পথ চলিতে লাগিল। মেয়েটি মহেন্দ্রের কোলে—এক একবার মহেন্দ্র মেয়েকে বাতাস দেয়। একবার এক নিবিড় শ্যামলপত্ররঞ্জিত সুগন্ধকুসুমসংযুক্ত লতাবেষ্টিত বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া দুই জনে বিশ্রাম করিল। মহেন্দ্র কল্যাণীর শ্রমসহিষ্ণুতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। বস্ত্র ভিজাইয়া মহেন্দ্র নিকটস্থ পল্বল হইতে জল আনিয়া আপনার ও কল্যাণীর মুখে হাতে পায়ে কপালে সিঞ্চন করিলেন।

কল্যাণী কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু দুই জনে ক্ষুধায় বড় আকুল হইলেন। তাও সহ্য হয়—মেয়েটির ক্ষুধা-তৃষ্ণা সহ্য হয় না। অতএব আবার তাঁহারা পথ বাহিয়া চলিলেন। সেই অগ্নিতরঙ্গ সন্তরণ করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে এক চটীতে পৌঁছিলেন। মহেন্দ্রের মনে মনে বড় আশা ছিল, চটীতে গিয়া স্ত্রী কন্যার মুখে শীতল জল দিতে পারিবেন, প্রাণরক্ষার জন্য মুখে আহার দিতে পারিবেন। কিন্তু কই? চটীতে ত মনুষ্য নাই; বড় বড় ঘর পড়িয়া আছে, মানুষ সকল পলাইয়াছে। মহেন্দ্র ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া স্ত্রী কন্যাকে একটি ঘরের ভিতর শোয়াইলেন। বাহির হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাক হাঁক করিতে লাগিলেন। কাহারও উত্তর পাইলেন না। তখন মহেন্দ্র কল্যাণীকে বলিলেন, "একটু তুমি সাহস করিয়া একা থাক, দেশে যদি গাই থাকে, শ্রীকৃষ্ণ দয়া করুন, আমি দুধ আনিব।" এই বলিয়া একটি মাটির কলসী হাতে করিয়া মহেন্দ্র নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কলসী অনেক পড়িয়া ছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্র চলিয়া গেল। কল্যাণী একা বালিকা লইয়া সেই জনশূন্য স্থানে প্রায় অন্ধকার কুটীলমধ্যে চারি দিক্ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহার মনে মনে বড় ভয় হইতেছিল। কেহ কোথাও নাই, মনুষ্যমাত্রের কোন শব্দ পাওয়া যায় না, কেবল শৃগাল-কুক্কুরের রব। ভাবিতেছিলেন, কেন তাঁহাকে যাইতে দিলাম, না হয় আর কিছুক্ষণ ক্ষুধা-তৃষ্ণা হস্য করিতাম। মনে করিলেন, চারি দিকের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসি। কিন্তু একটি দ্বারেও কপাট বা অর্গল নাই। এইরূপ চারি দিক্ চাহিয়া দেখিতে দেখিতে সম্মুখস্থ দ্বারে একটা কি ছায়ার মত দেখিলেন। মনুষ্যাকৃতি বোধ হয়, কিন্তু মনুষ্যও বোধ হয় না। অতিশয় শুষ্ক, শীর্ণ, অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ, উলঙ্গ, বিকটাকার মনুষ্যের মত কি আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পরে সেই ছায়া যেন একটা হাত তুলিল, অস্থিচর্ম্মবিশিষ্ট, অতি দীর্ঘ, শুষ্ক হস্তের দীর্ঘ শুষ্ক অঙ্গুলি দ্বারা কাহাকে যেন সঙ্কেত করিয়া ডাকিল। কল্যাণীর প্রাণ শুকাইল। তখন সেইরূপ আর একটা ছায়া—শুষ্ক, কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘাকার, উলঙ্গ,—প্রথম ছায়ার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তার পর আর একটা আসিল। তার পর আরও একটা আসিল। কত আসিল, ধীরে ধীরে নিঃশব্দে তাহারা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। সেই প্রায়অন্ধকার গৃহ নিশীথ-শ্মশানের মত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। তখন সেই প্রেতবৎ মূর্ত্তিসকল কল্যাণী এবং তাঁহার কন্যাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কল্যাণী প্রায় মূর্চ্ছিত হইলেন। কৃষ্ণবর্ণ শীর্ণ পুরুষেরা তখন কল্যাণী এবং তাঁহার কন্যাকে ধরিয়া তুলিয়া, গৃহের বাহির করিয়া, মাঠ পার হইয়া এক জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিল।

কিছুক্ষণ পরে মহেন্দ্র কলসী করিয়া দুগ্ধ লইয়া সেইখানে উপস্থিত হইল। দেখিল, কেহ কোথাও নাই, ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিল, কন্যার নাম ধরিয়া, শেষ স্ত্রীর নাম ধরিয়া অনেক ডাকিল; কোন উত্তর, কোন সন্ধান পাইল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যে বনমধ্যে দস্যুরা কল্যাণীকে নামইল, সে বন অতি মনোহর। আলো নাই, শোভা দেখে, এমন চক্ষুও নাই, দরিদ্রের হৃদয়ান্তর্গত সৌন্দর্য্যের ন্যায় সে বনের সৌন্দর্য্য অদৃষ্ট রহিল। দেশে আহার থাকুক বা না থাকুক–বনে ফুল আছে, ফুলের গন্ধে সে অন্ধকারেও আলো বোধ হইতেছিল। মধ্যে পরিষ্কৃত সুকোমল শষ্পাবৃত ভূমিখণ্ডে দস্যুরা কল্যাণী ও তাঁহার কন্যাকে নামাইল। তাহারা তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া বসিল। তখন তাহারা বাদানুবাদ করিতে লাগিল যে, ইহাদিগকে লইয়া কি করা যায়–যে কিছু অলঙ্কার কল্যাণীর সঙ্গে ছিল, তাহা পূর্ব্বেই তাহারা হস্তগত করিয়াছিল। একদল তাহার বিভাগে ব্যতিব্যস্ত। অলঙ্কারগুলি বিভক্ত হইলে, একজন দস্যু বলিল, "আমরা সোণা রূপা লইয়া কি কবির, একখানা গহনা লইয়া কেহ আমাকে এক মুটা চাল দাও, ক্ষুধায় প্রায় যায়–আজ কেবল গাছের পাতা খাইয়া আছি।" একজন এই কথা বলিলে সকলেই সেইরূপ বলিয়া গোল করিতে লাগিল। "চাল দাও," "চাল দাও", "ক্ষুধায় প্রাণ যায়, সোণা রূপা চাহি না।" দলপতি তাহাদিগকে থামাইতে লাগিল, কিন্তু কেহ থামে না, ক্রমে উচ্চ উচ্চ কথা হইতে লাগিল, লাগাগালি হইতে লাগিল, মারামারির উপক্রম। যে, যে অলঙ্কার ভাগে পাইয়াছিল, সে, সে অলঙ্কার রাগে তাহার দলপতির গায়ে ছুঁড়িয়া মারিল। দলপতি দুই এক জনকে মারিল, তখন সকলে দলপতিকে আক্রমণ করিয়া তাহাকে আঘাত করিতে লাগিল। দলপতি অনাহারে শীর্ণ এবং ক্লিষ্ট ছিল, দুই এক আঘাতেই ভূপাতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। তখন ক্ষুধিত, রুষ্ট, উত্তেজিত, জ্ঞানশূন্য দস্যুদলের মধ্যে একজন বলিল, "শৃগাল কুক্কুরের মাংস খাইয়াছি, ক্ষুধায় প্রাণ যায়, এস ভাই আজ এই বেটাকে খাই।" তখন সকলে "জয় কালী!" বলিয়া উচ্চনাদ করিয়া উঠিল। "বম কালী! আজ নরমাংস খাইব!" এই বলিয়া সেই বিশীর্ণদেহ কৃষ্ণকায় প্রেতবৎ মূর্ত্তিসকল অন্ধকারে খলখল হাস্য করিয়া, করতালি দিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল। দলপতির দেহ পোড়াইবার জন্য একজন অগ্নি জ্বালিতে প্রবৃত্ত হইল। শুষ্ক লতা, কাষ্ঠ, তৃণ আহরণ করিয়া চকমকি সোলায় আগুন করিয়া, সেই তৃণকাষ্ঠ জ্বালিয়া দিল। তখন অল্প অল্প অগ্নি জ্বলিতে জ্বলিতে পার্শ্ববর্ত্তী আম্র, জম্বীর, পনস, তাল, তিন্তিড়ী, খর্জ্জুর প্রভৃতি শ্যামল পল্লবরাজি, অল্প অল্প প্রভাসিত হইতে লাগিল। কোথাও পাতা আলোতে জ্বলিতে লাগিল, কোথাও ঘাস উজ্জ্বল হইল। কোথাও অন্ধকার আরও গাঢ় হইল। অগ্নি প্রস্তুত হইলে, একজন মৃত শবের পা ধরিয়া টানিয়া আগুনে ফেলিতে গেল। তখন আর একজন বলিল, "রাখ, রও, রও, যদি মহামাংস খাইয়াই আজ প্রাণ রাখিতে হইবে, তবে এই বুড়ার শুক্‌ন মাংস কেন খাই? আজ যাহা লুঠিয়া আনিয়াছি, তাহাই খাইব, এস, ঐ কচি মেয়েটাকে পোড়াইয়া খাই।" আর একজন বলিল, "যাহা হয় পোড়া বাপু, আর ক্ষুধা সয় না।" তখন সকলে লোলুপ হইয়া যেখানে কল্যাণী কন্যা লইয়া শুইয়া ছিল, সেই দিকে চাহিল। দেখিল যে, সে স্থান শূন্য, কন্যাও নাই, মাতাও নাই। দস্যুদিগের বিবাদের সময় সুযোগ দেখিয়া, কল্যাণী কন্যা কোলে করিয়া, কন্যার মুখে স্তনটি দিয়া, বনমধ্যে পলাইয়াছে। শিকার পলাইয়াছে দেখিয়া মার মার শব্দ করিয়া, সেই প্রেতমূর্ত্তি দস্যুদল চারি দিকে ছুটিল। অবস্থাবিশেষে মনুষ্য হিংস্র জন্তু মাত্র।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বন অত্যন্ত অন্ধকার, কল্যাণী তাহার ভিতর পথ পায় না। বৃক্ষলতাকণ্টকের ঘনবিন্যাসে একে পথ নাই, তাহাতে আবার ঘনান্ধকার। বৃক্ষলতাকণ্টক ভেদ করিয়া

কল্যাণী বনমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। মেয়েটির গায়ে কাঁটা ফুটিতে লাগিল। মেয়েটি মধ্যে মধ্যে কাঁদিতে লাগিল, শুনিয়া দস্যুরা আরও চীৎকার করিতে লাগিল। কল্যাণী এইরূপে রুধিরাক্ত-কলেবর হইয়া অনেক দূর বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে চন্দ্রোদয় হইল। এতক্ষণ কল্যাণীর মনে কিছু ভরসা ছিল যে, অন্ধকারে তাঁহাকে দস্যুরা দেখিতে পাইবে না, কিয়ৎক্ষণ খুঁজিয়া নিরস্ত হইবে; কিন্তু এক্ষণে চন্দ্রোদয় হওয়ায় সে ভসরা গেল। চাঁদ আকাশে উঠিয়া বনের মাথার উপর আলো ঢালিয়া দিল–ভিতরে বনের অন্ধকার, আলোতে ভিজিয়া উঠিল। অন্ধকার উজ্জ্বল হইল। মাঝে মাঝে ছিদ্রের ভিতর দিয়া আলো বনের ভিতর প্রবেশ করিয়া, উঁকি ঝুঁকি মারিতে লাগিল। চাঁদ যত উঁচুতে উঠিতে লাগিল, তত আরও আলো বনে ঢুকিতে লাগিল, অন্ধকারসকল আরও বনের ভিতর লুকাইতে লাগিল। কল্যাণী কন্যা লইয়া আরও বনের ভিতর লুকাইতে লাগিলেন। তখন দস্যুরা আরও চীৎকার করিয়া চারি দিক্ হইতে ছুটিয়া আসিতে লাগিল–কন্যাটি ভয় পাইয়া আরও চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কল্যাণী তখন নিরস্ত হইয়া আর পলায়নের চেষ্টা করিলেন না। এক বৃহৎ বৃক্ষতলে কণ্টকশূন্য তৃণময় স্থানে বসিয়া, কন্যাকে ক্রোড়ে করিয়া কেবল ডাকিতে লাগিলেন, "কোথায় তুমি! যাঁহাকে আমি নিত্য পূজা করি, নিত্য নমস্কার করি, যাঁহার ভরসায় এই বনমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলাম, কোথায় তুমি হে মধুসূদন!" সেই সময়ে ভয়ে, ভক্তির প্রগাঢ়তায়, ক্ষুধা-তৃষ্ণার অবসাদে, কল্যাণী ক্রমে বাহ্যজ্ঞানশূন্য, আভ্যন্তরিক চৈতন্যময় হইয়া শুনিতে লাগিলেন, অন্তরীক্ষে স্বর্গীয় স্বরে গীত হইতেছে–

"হারে মুরারে মধুকৈটভারে।
গোপাল গোবিন্দ্র মুকুন্দ শৌরে।
হারে মুরারে মধুকৈটভারে।"

কল্যাণী বাল্যকালাবধি পুরাণে শুনিয়াছিলেন যে, দেবর্ষি গগনপথে বীণাযন্ত্রে হরিনাম করিতে করিতে ভুবন ভ্রমণ করিয়া থাকেন; তাঁহার মনে সেই কল্পনা জাগরিত হইতে লাগিল। মনে মনে দেখিতে লাগিলেন, শুভ্রশরীর, শুভ্রকেশ, শুভ্রশ্মশ্রু, শুভ্রবসন, মহাশরীর মহামুনি বীণাহস্তে চন্দ্রালোকপ্রদীপ্ত নীলাকাশপথে গায়িতেছেন,–

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

ক্রমে গীত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, আরও স্পষ্ট শুনিতে লাগিলেন,–

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

ক্রমে আরও নিকট–আরও স্পষ্ট–

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

শেষে কল্যাণীর মাথার উপর বনস্থলী প্রতিধ্বনিত করিয়া গীত বাজিল,–

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

কল্যাণী তখন নয়নোন্মীলন করিলেন। সেই অর্দ্ধস্ফুট বনান্ধকারমিশ্রিত চন্দ্ররশ্মিতে দেখিলেন, সম্মুখে সেই শুভ্রশরীর, শুভ্রকেশ, শুভ্রশ্মশ্রু, শুভ্রবসন। ঋষিমূর্ত্তি! অন্যমনে তথাভূতচেতনে কল্যাণী মনে করিলেন, প্রণাম কবির, কিন্তু প্রণাম করিতে পারিলেন না, মাথা নোয়াইতে একেবারে চেতনাশূন্য হইয়া ভূতলশায়িনী হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সেই বনমধ্যে এক প্রকাণ্ড ভূমিখণ্ডে ভগ্নশিলাখণ্ডসকলে পরিবেষ্টিত হইয়া একটি বড় মঠ আছে। পুরাণতত্ত্ববিদেরা দেখিলে বলিতে পারিতেন, ইহা পূর্ব্বকালে বৌদ্ধদিগের বিহার ছিল–তার পরে হিন্দুর মঠ হইয়াছে। অট্টালিকাশ্রেণী দ্বিতল–মধ্যে বহুবিধ দেবমন্দির এবং সম্মুখে নাটমন্দির। সকলই প্রায় প্রাচীরে বেষ্টিত আর বহিঃস্থিত বন্য বৃক্ষশ্রেণী দ্বারা এরূপ আচ্ছন্ন যে, দিনমানে অনতিদূর হইতেও কেহ বুঝিতে পারে না যে, এখানে কোঠা আছে। অট্টালিকাসকল অনেক স্থানেই ভগ্ন, কিন্তু দিনমানে দেখা যায় যে, সকল স্থান সম্প্রতি মেরামত হইয়াছে। দেখিলেই জানা যায় যে, এই গভীর দুর্ভেদ্য অরণ্যমধ্যে মনুষ্য বাস করে। এই মঠের একটি কুঠারীমধ্যে একটা বড় কুঁদো জ্বলিতেছিল, তাহার ভিতর কল্যাণীর প্রথম চৈতন্য হইলে আবার দেখিলেন, সম্মুখে সেই শুভ্রশরীর, শুভ্রবসন, মহাপুরুষ। কল্যাণী বিস্মিতলোচনে আবার চাহিতে লাগিলেন, এখনও স্মৃতি পুনরাগমন করিতেছিল না। তখন মহাপুরুষ বলিলেন, “মা, এ দেবতার ঠাঁই, শঙ্কা করিও না। একটু দুধ আছে–তুমি খাও, তার পর তোমার সহিত কথা কহিব।”

কল্যাণী প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, তার পর ক্রমে ক্রমে মনের কিছু স্থৈর্য্য হইলে, গলায় আঁচল দিয়া সেই মহাত্মাকে একটি প্রণাম করিলেন। তিনি সুমঙ্গল আশীর্ব্বাদ করিয়া, গৃহান্তর হইতে একটি সুগন্ধ মৃৎপাত্র বাহির করিয়া, সেই জ্বলন্ত অগ্নিতে দুগ্ধ উত্তপ্ত করিলেন। দুগ্ধ তপ্ত হইলে কল্যাণীকে তাহা দিয়া বলিলেন, “মা, কন্যাকে কিছু খাওয়াও, আপনি কিছু খাও, তাহার পর কথা কহিব।” কল্যাণী হৃষ্টচিত্তে কন্যাকে দুগ্ধপান করাইতে আরম্ভ করিলেন। তখন সেই পুরুষ “আমি যতক্ষণ না আসি, কোন চিন্তা করিও না” বলিয়া মন্দির হইতে বাহিরে গেলেন। বাহির হইতে কিয়ৎকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, কল্যাণী কন্যাকে দুধ খাওয়ান সমাপন করিয়াছেন বটে, কিন্তু আপনি কিছু খান নাই; দুগ্ধ যেমন ছিল, প্রায় তেমনই আছে, অতি অল্পই ব্যয় হইয়াছে। সেই পুরুষ তখন বলিলেন, “মা, তুমি দুধ খাও নাই, আমি আবার বাহিরে যাইতেছি, তুমি দুধ না খাইলে ফিরিব না।”

সেই ঋষিতুল্য পুরুষ এই বলিয়া যাইতেছিলেন, কল্যাণী আবার তাঁহাকে প্রণাম করিয়া জোড়হাত করিলেন–

বনবাসী বলিলেন, “কি বলিবে?”

তখন কল্যাণী বলিলেন, “আমাকে দুধ খাইতে আজ্ঞা করিবেন না–কোন বাধা আছে। আমি খাইব না।”

তখন বনবাসী অতি করুণস্বরে বলিলেন, “কি বাধা আছে আমাকে বল–আমি বনবাসী ব্রহ্মচারী, তুমি আমার কন্যা, তোমার এমন কি কথা আছে যে, আমাকে বলিবে না? আমি যখন বন হইতে তোমাকে অজ্ঞান অবস্থায় তুলিয়া আনি, তৎকালে তোমাকে অত্যন্ত ক্ষুৎপিপাসাপীড়িতা বোধ হইয়াছিল, তুমি না খাইলে বাঁচিবে কি প্রকারে?”

কল্যাণী তখন গলদশ্রুলোচনে বলিলেন, “আপনি দেবতা, আপনাকে বলিব–আমার স্বামী এ পর্য্যন্ত অভুক্ত আছেন, তাঁহার সাক্ষাৎ না পাইলে, কিম্বা তাঁহার ভোজনসংবাদ না শুনিলে, আমি কি প্রকারে খাইব?”

ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার স্বামী কোথায়?”

কল্যাণী বলিলেন, “তাহা আমি জানি না–তিনি দুধের সন্ধানে বাহির হইলে পর দস্যুরা আমাকে চুরি করিয়া লইয়া আসিয়াছে।” তখন ব্রহ্মচারী একটি একটি করিয়া প্রশ্ন করিয়া, কল্যাণী এবং তাঁহার স্বামীর বৃত্তান্ত সমুদয় অবগত হইলেন। কল্যাণী স্বামীর নাম বলিলেন না, বলিতে পারেন না, কিন্তু আর আর

পরিচয়ের পরে ব্রহ্মচারী বুঝিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমিই মহেন্দ্রের পত্নী?" কল্যাণী নিরুত্তর হইয়া যে অগ্নিতে দুগ্ধ তপ্ত হইয়াছিল, অবনতমুখে তাহাতে কাষ্ঠপ্রদান করিলেন। তখন ব্রহ্মচারী বলিলেন, "তুমি আমার বাক্য পালন কর, দুগ্ধ পান কর, আমি তোমার স্বামীর সংবাদ আনিতেছি। তুমি দুধ না খাইলে আমি যাইব না।" কল্যাণী বলিলেন, "একটু জল এখানে আছে কি?" ব্রহ্মচারী জলকলস দেখাইয়া দিলেন। কল্যাণী অঞ্জলি পাতিলেন, ব্রহ্মচারী অঞ্জলি পুরিয়া জল ঢালিয়া দিলেন। কল্যাণী সেই জলাঞ্জলি ব্রহ্মচারীর পদমূলে লইয়া গিয়া বলিলেন, "আপনি ইহাতে পদরেণু দিন।" ব্রহ্মচারী অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা জল স্পর্শ করিলে কল্যাণী সেই জলাঞ্জলি পান করিলেন এবং বলিলেন, "আমি অমৃত পান করিয়াছি—আর কিছু খাইতে বলিবেন না—স্বামীর সংবাদ না পাইলে আর কিছু খাইব না।" ব্রহ্মচারী তখন বলিলেন, "তুমি নির্ভয়ে এই দেউলমধ্যে অবস্থিতি কর, আমি তোমার স্বামীর সন্ধানে চলিলাম।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাত্রি অনেক। চাঁদ মাথার উপর। পূর্ণচন্দ্র নহে, আলো তত প্রখর নহে। এক অতি বিস্তীর্ণ প্রান্তরের উপর সেই অন্ধকারের ছায়াবিশিষ্ট অস্পষ্ট আলো পড়িয়াছে। সে আলোতে মাঠের এপার ওপার দেখা যাইতেছে না। মাঠে কি আছে, কে আছে, দেখা যাইতেছে না। মাঠ যেন অনন্ত, জনশূন্য, ভয়ের আবাসস্থান বলিয়া বোধ হইতেছে। সেই মাঠ দিয়া মুরশিদাবাদ ও কলিকাতা যাইবার রাস্তা। রাস্তার ধারে একটি ক্ষুদ্র পাহাড়। পাহাড়ের উপর অনেক আম্রাদি বৃক্ষ। গাছের মাথাসকল চাঁদের আলোতে উজ্জ্বল হইয়া সর সর করিয়া কাঁপিতেছে। তাহার ছায়া কালো পাথরের উপর কালো ইহয়া তর তর করিয়া কাঁপিতেছে। ব্রহ্মচারী সেই পাহাড়ের উপর উঠিয়া শিখরে দাঁড়াইয়া স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন—কি শুনিতে লাগিলেন, বলিতে পারি না। সেই অনন্ততুল্য প্রান্তরেও কোন শব্দ নাই—কেবল বৃক্ষাদির মর্ম্মর শব্দ। এক স্থানে পাহাড়ের মূলের নিকটে বড় জঙ্গল। উপরে পাহাড়, নীচে রাজপথ, মধ্যে সেই জঙ্গল। সেখানে কি শব্দ হইল বলিতে পারি না— ব্রহ্মচারী সেই দিকে গেলেন। নিবিড় জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন, সেই বনমধ্যে বৃক্ষরাজির অন্ধকার তলদেশে সারি সারি গাছের নীচে মানুষ বসিয়া আছে। মানুষসকল দীর্ঘাকার, কৃষ্ণকায়, সশস্ত্র, বিটপরিচ্ছেদে নিপতিত জ্যোৎস্নায় তাহাদের মার্জ্জিত আয়ুধসকল জ্বলিতেছে। এমন দুই শত লোক বসিয়া আছে—একটি কথাও কহিতেছে না। ব্রহ্মচারী ধীরে ধীরে তাহাদিগের মধ্যে গিয়া কি একটা ইঙ্গিত করিলেন—কেহ উঠিল না, কেহ কথা কহিল না, কেহ কোন শব্দ করিল না। তিনি সকলের সম্মুখ দিয়া সকলকে দেখিতে দেখিতে গেলেন; অন্ধকারে মুখপানে চাহিয়া নিরীক্ষণ করিতে করিতে গেলেন; যেন কাহাকে খুঁজিতেছেন; পাইতেছেন না। খুঁজিয়া খুঁজিয়া এক জনকে চিনিয়া তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ইঙ্গিত করিলেন। ইঙ্গিত করিতেই সে উঠিল। ব্রহ্মচারী তাহাকে লইয়া দূরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এই ব্যক্তি যুবা পুরুষ— ঘনকৃষ্ণ গুম্ফশ্মশ্রুতে তাহার চন্দ্রবদন আবৃত—সে বলিষ্ঠকায়, অতি সুন্দর পুরুষ। সে গৈরিক বসন পরিধান করিয়াছে— সর্বাঙ্গে চন্দনশোভা। ব্রহ্মচারী তাহাকে বলিলেন, "ভবানন্দ, মহেন্দ্র সিংহের কোন সংবাদ রাখ?"

ভবানন্দ তখন বলিল, "মহেন্দ্র সিংহ আজ প্রাতে স্ত্রী কন্যা লইয়া গৃহত্যাগ করিয়া যাইতেছিল, চটীতে—"

এই পর্যন্ত বলাতে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "চটীতে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা জানি। কে করিল?"

ভবা। গেঁয়ো চাষালোক বোধ হয়। এখন সকল গ্রামের চাষাভূষো পেটের জ্বালায় ডাকাত হইয়াছে। আজকাল কে ডাকাত নয়? আমরা আজ লুটিয়া খাইয়াছি—কোতোয়াল সাহেবের দুই মণ চাউল যাইতেছিল— তাহা গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবের ভোগে লাগাইয়াছি।

ব্রহ্মচারী হাসিয়া বলিলেন, “চোরের হাত হতে আমি তাহার স্ত্রী কন্যাকে উদ্ধার করিয়াছি। এখন তাহাদিগকে মঠে রাখিয়া আসিয়াছি। এখন তোমার উপর ভার যে, মহেন্দ্রকে খুঁজিয়া তাহার স্ত্রী কন্যা তাহার জিম্মা করিয়া দাও। এখানে জীবানন্দ থাকিলে কার্য্যোদ্ধারা হইবে।”

ভবানন্দ স্বীকৃত হইলেন। ব্রহ্মচারী তখন স্থানান্তর গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

চটীতে বসিয়া ভাবিয়া কোন ফলোদয় হইবে না বিবেচনা করিয়া মহেন্দ্র গাত্রোত্থান করিলেন। নগরে গিয়া রাজপুরুষদিগের সহায়তায় স্ত্রী কন্যার অনুসন্ধান করিবেন, এই বিবেচনায় সেই দিকেই চলিলেন। কিছু দূর গিয়া পথিমধ্যে দেখিলেন, কতকগুলি গোরুর গাড়ি ঘেরিয়া অনেকগুলি সিপাহী চলিয়াছে।

১১৭৬ সালে বাঙ্গালা প্রদেশ ইংরেজের শাসনাধীন হয় নাই। ইংরেজ তখন বাঙ্গালার দেওয়ান। তাঁহারা খাজনার টাকা আদায় করিয়া লন, কিন্তু তখনও বাঙ্গালীর প্রাণ সম্পত্তি প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণের কোন ভার লয়েন নাই। তখন টাকা লইবার ভার ইংরেজের, আর প্রাণ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাপিষ্ঠ নরাধম বিশ্বাসহন্তা মনুষ্যকুলকলঙ্ক মীরজাফরের উপর। মীরজাফর আত্মরক্ষায় অক্ষম, বাঙ্গালা রক্ষা করিবে কি প্রকারে? মীরজাফর গুলি খায় ও ঘুমায়। ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেস্‌পাচ লেখে। বাঙ্গালী কাঁদে আর উৎসন্ন যায়।

অতএব বাঙ্গালার কর ইংরেজের প্রাপ্য। কিন্তু শাসনের ভার নবাবের উপর। যেখানে যেখানে ইংরেজেরা আপনাদের প্রাপ্য কর আপনারা আদায় করিতেন, সেখানে তাঁহারা এক এক কলেক্টর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু খাজনা আদায় হইয়া কলিকাতায় যায়। লোক না খাইয়া মরুক, খাজনা আদায় বন্ধ হয় না। তবে তত আদায় হইয়া উঠে নাই–কেন না, মাতা বসুমতী ধন প্রসব না করিলে ধন কেহ গড়িতে পারে না। যাহা হউক, যাহা কিছু আদায় হইয়াছে, তাহা গাড়ি বোঝাই হইয়া সিপাহীর পাহারায় কলিকাতায় কোম্পানির ধনাগারে যাইতেছিল। আজিকার দিনে দস্যুভীতি অতিশয় প্রবল, এজন্য পঞ্চাশ জন সশস্ত্র সিপাহী গাড়ির অগ্রপশ্চাৎ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সঙ্গীন খাড়া করিয়া যাইতেছিল। তাহাদিগকে অধ্যক্ষ একজন গোরা। গোরা সর্ব্বপশ্চাৎ ঘোড়ায় চড়িয়া চলিয়াছিল। রৌদ্রের জন্য দিনে সিপাহীরা পথে চলে না, রাত্রে চলে। চলিতে চলিতে সেই খাজনার পাড়ী ও সৈন্য সামন্তে মহেন্দ্রের পতিরোধ হইল। মহেন্দ্র সিপাহী ও গোরুর গাড়ি কর্ত্তৃক পথ রুদ্ধ দেখিয়া, পাশ দিয়া দাঁড়াইলেন, তথাপি সিপাহীরা তাঁহার গা ঘেঁসিয়া যায় দেখিয়া এবং এ বিবাদের সময় নয় বিবেচনা করিয়া– তিনি পথিপার্শ্বস্থ জঙ্গলের ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন।

তখন এক জন সিপাহী বলিল, “এহি একঠো ডাকু ভাগতা হৈ।” মহেন্দ্রের হাতে বন্দুক দেখিয়া এ বিশ্বাস তাহার দৃঢ় হইল। সে তাড়াইয়া গিয়া মহেন্দ্রের গলা ধরিল এবং “শালা– চোর–” বলিয়াই সহসা এক ঘুষা মারিল ও বন্দুক কাড়িয়া লইল। মহেন্দ্র রিক্ত-হস্তে কেবল ঘুষাটি ফিরাইয়া মারিলেন। মহেন্দ্রের একটু রাগ যে বেশি হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য। ঘুষাটি খাইয়া সিপাহী মহাশয় ঘুরিয়া অচেতন হইয়া রাস্তায় পড়িলেন। তখন তিনি চারি জন সিপাহী আসিয়া মহেন্দ্রকে ধরিয়া জোরে টানিয়া সেনাপতি সাহেবের নিকট লইয়া গেল, এবং সাহেবকে বলিল যে, এই ব্যক্তি একজন সিপাহীকে খুন করিয়াছে। সাহেব পাইপ খাইতেছিলেন, মদের ঝোঁকে একটুখানি বিহ্বল ছিলেন; বলিলেন, “শালাকো পাকড়লেকে সাদি করো।” সিপাহীরা বুঝিতে পারিল না যে, বন্দুকধারী ডাকাতকে তাহারা কি প্রকারে বিবাহ করিবে। কিন্তু নেশা ছুটিলে সাহেবের মত ফিরিবে, বিবাহ করিতে হইবে না, বিবেচনায় তিন চারি জন সিপাহী গাড়ীর গোরুর দড়ি

দিয়া মহেন্দ্রকে হাতে পায়ে বাঁধিয়া গোরুর গাড়ীতে তুলিল। মহেন্দ্র দেখিলেন, এত লোকের সঙ্গে জোর করা বৃথা, জোর করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াই বা কি হইবে? স্ত্রী কন্যার শোকে তখন মহেন্দ্র কাতর, বাঁচিবার কোন ইচ্ছা ছিল না। সিপাহীরা মহেন্দ্রকে উত্তম করিয়া গাড়ীর চাকার সঙ্গে বাঁধিল। পরে সিপাহীরা খাজনা লইয়া যেমন চলিতেছিল, তেমনি মৃদুগম্ভীরপদে চলিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ব্রহ্মচারী আজ্ঞা পাইয়া ভবানন্দ মৃদু মৃদু হরিনাম করিতে করিতে, যে চটীতে মহেন্দ্র বসিয়াছিল, সেই চটীর দিকে চলিলেন। সেইখানেই মহেন্দ্রের সন্ধান পাওয়া সম্ভব বিবেচনা করিলেন।

সে সময়ে ইংরেজের কৃত আধুনিক রাস্তাসকল ছিল না। নগরসকল হইতে কলিকাতায় আসিতে হইলে, মুসলমান সম্রাট্‌নির্ম্মিত অপূর্ব্ব বর্ত্ম দিয়া আসিতে হইত। মহেন্দ্রও পদচিহ্ন হইতে নগর যাইতে দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে যাইতেছিলেন। এই জন্য পথে সিপাহীদিগেরে সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ভবানান্দ তালপাহাড় হইতে যে চটীর দিকে চলিলেন, সেও দক্ষিণ হইতে উত্তর। যাইতে যাইতে কাজে কাজেই অচিরাৎ ধনরক্ষাকারী সিপাহীদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনিও মহেন্দ্রের ন্যায় সিপাহীদিগকে পাশ দিলেন। একে সিপাহীদিগের সহজেই বিশ্বাস ছিল যে, এই চালান লুঠ করিবার জন্য ডাকাইতেরা অবশ্য চেষ্টা করিবে, তাতে আবার পথিমধ্যে এক জন ডাকাইতকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। কাজে কাজেই ভবানন্দকে আবার রাত্রিকালে পাশ দিতে দেখিয়াই তাহাদিগের বিশ্বাস হইল যে, এও আর একজন ডাকাত। অতএব তৎক্ষণাৎ সিপাহীরা তাঁহাকেও ধৃত করিল।

ভবানন্দ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কেন বাপু?"

সিপাহী বলিল, "তোম্ শালা ডাকু হো।"

ভবা। দেখিতে পাইতেছ, গেরুয়াবসন পরা ব্রহ্মচারী আমি, ডাকাত কি এই রকম?

সিপাহী। অনেক শালা ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী ডাকাতি করে। এই বলিয়া সিপাহী ভবানন্দের গলাধাক্কা দিয়া, টানিয়া আনিল। ভবানন্দের চক্ষু সে অন্ধকারে জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু আর কিছু না বলিয়া অতি বিনীতভাবে বলিলেন, "প্রভু কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।"

সিপাহী ভবানন্দের বিনয়ে সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, "লেও শালা, মাথে পরে একঠো মোট লেও।"

এই বলিয়া সিপাহী ভবানন্দের মাথার উপর একটা তল্পি চাপাইয়া দিল। তখন আর এক জন সিপাহী তাহাকে বলিল, "না; পলাবে। আর এক শালাকে যেখানে বেঁধে রেখেছ, এ শালাকেও গাড়ির উপর সেইখানে বেঁধে রাখ।" ভবানন্দের তখন কৌতূহল হইল যে, কাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে দেখিব। তখন ভবানন্দ, মাথার তল্পি ফেলিয়া দিয়া, যে সিপাহী তল্পি মাথায় তুলিয়া দিয়াছিল, তাহার গালে এক চড় মারিলেন। সুতরাং সিপাহী ভবানন্দকেও বাঁধিয়া গাড়ির উপর তুলিয়া মহেন্দ্রের নিকট ফেলিল। ভবানন্দ চিনিলেন যে, মহেন্দ্র সিংহ।

সিপাহীরা পুনরায় অন্যমনস্কে কোলাহল করিতে করিতে চলিল, আর গোরুর গাড়ির চাকার কচকচ শব্দ হইতে লাগিল, তখন ভবানন্দ ধীরে ধীরে কেবল মহেন্দ্র মাত্র শুনিতে পায়, এইরূপ স্বরে বলিলেন, "মহেন্দ্র সিংহ, আমি তোমায় চিনি, তোমার সাহায্যের জন্যই আমি এখানে আসিয়াছি। কে আমি, তাহা এখন

তোমার শুনিবার প্রয়োজন নাই। আমি যাহা বলি, সাবধানে তাহা কর। তোমার হাতের বাঁধনটা গাড়ির চাকার উপর রাখ।”

মহেন্দ্র বিস্মিত হইলেন। কিন্তু বিনা বাক্যব্যয়ে ভবানন্দের কথামত কাজ করিলেন। অন্ধকারে গাড়ির চাকার নিকটে একটুখানি সরিয়া গিয়া, হস্তবন্ধনরজ্জু চাকায় স্পর্শ করাইয়া রাখিলেন। চাকার ঘর্ষণে ক্রমে দড়িটা কাটিয়া গেল। তার পর পায়ের দড়ি ঐরূপ করিয়া কাটিলেন। এইরূপে বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ভবানন্দের পরামর্শে নিশ্চেষ্ট হইয়া গাড়ীর উপরে পড়িয়া রহিলেন। ভবানন্দও সেইরূপ করিয়া বন্ধন ছিন্ন করিলেন। উভয়ে নিস্তব্ধ।

যেখানে সেই জঙ্গলের কাছে রাজপথে দাঁড়াইয়া, ব্রহ্মচারী চারি দিক নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, সেই পথে ইহাদিগের যাইবার পথ। সেই পাহাড়ের নিকট সিপাহীরা পৌঁছিলে দেখিল যে, পাহাড়ের নীচে একটা ঢিপির উপর একটি মানুষ দাঁড়াইয়া আছে। চন্দ্রদীপ্ত নীল আকাশে তাহার কালো শরীর চিত্রিত হইয়াছে দেখিয়া, হাওলদার বলিল, “আরও এক শালা ঐ। উহাকে ধরিয়া আন। মোট বহিবে।” তখন এক জন সিপাহী তাহাকে ধরিতে গেল। সিপাহী ধরিতে যাইতেছে, সে ব্যক্তি স্থির দাঁড়াইয়া আছে–নড়ে না। সিপাহী তাহাকে ধরিল, সে কিছু বলিল না। ধরিয়া তাহাকে হাওলদারের নিকট আনিল, তখনও কিছু বলিল না। হাওলদার বলিলেন, “উহার মাথায় মোট দাও।” সিপাহী তাহার মাথায় মোট দিল, সে মাথায় মোট লইল। তখন হাওলদার পিছন ফিরিয়া, গাড়ির সঙ্গে চলিল। এই সময়ে হঠাৎ একটি পিস্তলের শব্দ হইল, হাওলদার মস্তকে বিদ্ধ হইয়া ভূতলে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। “এই শালা হাওলদারকো মারা” বলিয়া এক জন সিপাহী মুটিয়ার হাত ধরিল। মুটিয়ার হাতে তখনও পিস্তল। মুটিয়া মাথার মোট ফেলিয়া দিয়া পিস্তল উল্টাইয়া ধরিয়া সেই সিপাহীর মাথায় মারিল, সিপাহীর মাথা ভাঙ্গিয়া গেল, সে নিরস্ত হইল। সে সময়ে “হরি! হরি!” হরি!” শব্দ করিয়া দুই শত অস্ত্রধারী লোক আসিয়া সিপাহীদিগকে ঘিরিল। সিপাহীরা তখন সাহেবের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। সাহেবও ডাকাত পড়িয়াছে বিবেচনা করিয়া, সত্বর গাড়ীর কাছে আসিয়া চতুষ্কোণ করিবার আজ্ঞা দিলেন। ইংরেজের নেশা বিপদের সময় থাকে না। তখনই সিপাহীরা চারি দিকে সম্মুখে ফিরিয়া চতুষ্কোণ করিয়া দাঁড়াইল। অধ্যক্ষের পুনর্ব্বার আজ্ঞা পাইয়া তাহারা বন্দুক তুলিয়া ধরিল। এমন সময়ে হঠাৎ সাহেবের কোমর হইতে তাঁহার অসি কে কাড়িয়া লইল। লইয়াই একাঘাতে তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিল। সাহেব ছিন্নশির হইয়া অশ্ব হইতে পড়িয়া গেলে আর তাঁহার ফায়ারের হুকুম দেওয়া হইল না। সকলে দেখিল যে, এক ব্যক্তি গাড়ীর উপর দাঁড়াইয়া তরবারি হস্তে হরি হরি শব্দ করিতেছে এবং “সিপাহী মার, সিপাহী মার”, বলিতেছে। সে ভবানন্দ।

সহসা অধ্যক্ষকে ছিন্নশির দেখিয়া এবং রক্ষার জন্য কাহারও নিকটে আজ্ঞা না পাইয়া সিপাহীরা কিয়ৎক্ষণ ভীত ও নিশ্চেষ্ট হইল। এই অবসরে তেজস্বী দস্যুরা তাহাদিগকে অনেককে হত ও আহত করিয়া, গাড়ীর নিকটে আসিয়া টাকার বাক্সসকল হস্তগত করিল। সিপাহীরা ভগ্নোৎসাহ ও পরাভূত হইয়া পলায়নপর হইল।

তখন যে ব্যক্তি ঢিপির উপর দাঁড়াইয়াছিল, এবং শেষে যুদ্ধের প্রধান নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিল, সে ভবানন্দের নিকট আসিল। উভয়ে তখন আলিঙ্গন করিলে ভবানন্দ বলিলেন, “ভাই জীবানন্দ, সার্থক ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলে।”

জীবানন্দ বলিল, “ভবানন্দ! তোমার নাম সার্থক হউক।” অপহৃত ধন যথাস্থানে লইয়া যাইবার ব্যবস্থাকরণে জীবানন্দ নিযুক্ত হইলেন, তাঁহার অনুচরবর্গ সহিত শীঘ্রই তিনি স্থানান্তরে গেলেন। ভবানন্দ একা দাঁড়াইয়া রহিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্র শকট হইতে নামিয়া এক জন সিপাহীর প্রহরণ কাড়িয়া লইয়া যুদ্ধে যোগ দিবার উদ্যোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু এমন সময়ে তাঁহার স্পষ্টই বোধ হইল যে, ইহারা দস্যু; ধনাপহরণ জন্যই সিপাহীদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি যুদ্ধস্থান হইতে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইলেন। কেন না, দস্যুদের সহায়তা করিলে তাহাদিগকে দুরাচারের ভাগী হইতে হইবে। তখন তিনি তরবারী ফেলিয়া দিয়া ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে ভবানন্দ আসিয়া তাঁহার নিকটে দাঁড়াইল। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, “মহাশয়, আপনি কে?”

ভবানন্দ বলিল, “তোমার তাতে প্রয়োজন কি?’

মহে। আমার কিছু প্রয়োজন আছে। আজ আমি আপনার দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইয়াছি।

ভবা। সে বোধ যে তোমার আছে, এমন বুঝিলাম না– অস্ত্র হাতে করিয়া তফাৎ রহিলে–জমিদারের ছেলে, দুধ ঘির শ্রাদ্ধ করিতে মজবুত– কাজের বেলা হনুমান!

ভবানন্দের কথা ফুরাইতে না ফুরাইতে, মহেন্দ্র ঘৃণার সহিত বলিলেন, “এ যে কুকাজ–ডাকাতি।” ভবানন্দ বলিল, “হউক ডাকাতি, আমরা তোমার কিছু উপকার করিয়াছি। আরও কিছু উপকার করিবার ইচ্ছা রাখি।”

মহেন্দ্র। তোমার আমার কিছু উপকার করিয়াছ বটে, কিন্তু আর কি উপকার করিবে? আর ডাকাতের কাছে এত উপকৃত হওয়ার চেয়ে আমার অনুপকৃত থাকাই ভাল।

ভবা। উপকার গ্রহণ কর না কর, তোমার ইচ্ছা। যদি ইচ্ছা হয়, আমার সঙ্গে আইস। তোমার স্ত্রী কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইব।

মহেন্দ্র ফিরিয়া দাঁড়াইল। বলির, “সে কি?”

ভবানন্দ সে কথার উত্তর না করিয়া চলিল। অগত্যা মহেন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে চলিল–মনে মনে ভাবিতে লাগিল, এরা কি রকম দস্যু?

দশম পরিচ্ছেদ

সেই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে দুই জনে নীরবে প্রান্তর পার হইয়া চলিল। মহেন্দ্র নীরব, শোককাতর গর্ব্বিত, কিছু কৌতূহলী।

ভবানন্দ সহসা ভিন্নমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। সে স্থিরমূর্ত্তি, ধীরপ্রকৃতি সন্ন্যাসী আর নাই; সেই রণনিপুণ বীরমূর্ত্তি– সৈন্যাধক্ষ্যের মুণ্ডঘাতীর মূর্ত্তি আর নাই। এখনই যে গর্ব্বিতভাবে মহেন্দ্রকে তিরস্কার করিতেছিলেন, সে মূর্ত্তি আর নাই। যেন জ্যোৎস্নাময়ী, শান্তি-শালিনী, পৃথিবীর প্রান্তর কানন-নগ-নদীময় শোভা দেখিয়া তাঁহার চিত্তের বিশেষ স্ফূর্ত্তি হইল– সমুদ্র যেন চন্দ্রোদয়ে হাসিল। ভবানন্দ হাস্যমুখ, বাঙ্মায়, প্রিয়সম্ভাষী হইলেন। কথাবার্ত্তার জন্য বড় ব্যগ্র। তখন ভবানন্দ কথোপকথেন অনেক উদ্যম করিলেন, কিন্তু মহেন্দ্র কথা কহিল না। তখন ভবানন্দ নিরুপায় হইয়া আপন মনে গীত আরম্ভ করিলেন,–

“বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং
মলয়জশীতলাম্
শস্যশ্যামলাং

মাতরম্।”*

মহেন্দ্র গীত শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইল, কিছু বুঝিতে পারিল না–সুজলা মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা মাতা কে,–জিজ্ঞাসা করিল, “মাতা কে?”

উত্তর না করিয়া ভবানন্দ গায়িতে লাগিলেন–

“শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্
ফুল্ল-কুসুমিতদ্রুমদলশোভিনীম্,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।”

মহেন্দ্র বলিল, “এ ত দেশ, এ ত মা নয়–”

ভবানন্দ বলিলেন, “আমরা অন্য মা মানি না–জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূতিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই,–স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের কাছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা ময়লজসমীরণশীতলা শস্যশ্যামলা,–”

তখন বুঝিয়া মহেন্দ্র বলিলেন, “তবে আবার গাও।”

ভবানন্দ আবার গায়িলেন,–

“বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং
মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং
মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।
সপ্তকোটীকণ্ঠকলকলনিনাদকরালে,
দ্বিসপ্তকোটীভুজৈর্ধৃতখর-করবালে,
অবলা কেন মা এত বলে।
বহুবলধারিণীং
নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং
মাতরম্।
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি

---

* মল্লার–কাওয়ালী তাল যথা–বন্দে মাতরং ইত্যাদি।

হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী।
কমলা কমল-দলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী
নমামি ত্বাং
নমামি কমলাম্
অমলাং অতুলাম্
সুজলাং সুফলাং
মাতরম্
বন্দে মাতরম্
শ্যামলাং সরলাং
সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীং ভরণীম্
মাতরম্।"

মহেন্দ্র দেখিল, দস্যু গায়িতে গায়িতে কাঁদিতে লাগিল। মহেন্দ্র তখন সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমারা কারা?" ভবানন্দ বলিল, "আমরা সন্তান।"

মহেন্দ্র। সন্তান কি? কার সন্তান?

ভবা। মায়ের সন্তান।

মহেন্দ্র। ভাল–সন্তানে কি চুরি ডাকাতি করিয়া মায়ের পূজা করে? সে কেমন মাতৃভক্তি?

ভবা। আমরা চুরি ডাকাতি করি না।

মহে। এই ত গাড়ী লুঠিলে।

ভবা। সে কি চুরি ডাকাতি? কার টাকা লুঠিলাম?

মহে। কেন? রাজার?

ভবা। রাজার? এই যে টাকাগুলি সে লইবে, এ টাকায় তার কি অধিকার?

মহে। রাজার রাজভোগ।

ভবা। যে রাজা রাজ্য পালন করে না, সে আবার রাজা কি?

মহে। তোমরা সিপাহীর তোপের মুখে কোন্ দিন উড়িয়া যাইবে দেখিতেছি।

ভবা। অনেক শালা সিপাহী দেখিয়াছি–আজিও দেখিলাম।

মহে। ভাল করে দেখ নি, এক দিন দেখিবে।

ভবা। না হয় দেখ্‌লাম, একবার বই ত আর দুবার মরব না।

মহে। তা ইচ্ছা করিয়া মরিয়া কাজ কি?

ভবা। মহেন্দ্র সিংহ, তোমাকে মানুষের মত মানুষ বলিয়া আমার কিছু বোধ ছিল, কিন্তু এখন দেখিলাম, সবাই যা, তুমিও তা। কেবল দুধ ঘির যম। দেখ, সাপ মাটিতে বুক দিয়া হাঁটে, তাহা অপেক্ষা নীচ জীব আমি ত আর দেখি না; সাপের ঘাড়ে পা দিলে সেও ফণা ধরিয়া উঠে। তোমার কি কিছুতেই ধৈর্য্য নষ্ট হয় না? দেখ, যত দেশ আছে,–মগধ, মিথিলা, কাশী, কাঞ্চী, দিল্লী, কাশ্মীর, কোন্ দেশের এমন দুর্দ্দশা, কোন্ দেশে মানুষ খেতে না পেয়ে ঘাস খায়? কাঁটা খায়? উইমাটি খায়? বনের লতা খায়? কোন্ দেশে মানুষ শিয়াল-কুক্কুর খায়, মড়া খায়? কোন্ দেশের মানুষের সিন্দুকে টাকা রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, সিংহাসন শালগ্রাম রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, ঘরে ঝি-বউ রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, ঝি-বউয়ের পেটে ছেলে রেখে সোয়াস্তি নাই? পেট চিরে ছেলে বার করে। সকল দেশের রাজার সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণের সম্বন্ধ; আমাদের মুসলমান রাজা রক্ষা করে কই? ধর্ম্ম গেল, জাতি গেল, মান গেল, কুল গেল, এখন ত প্রাণ পর্য্যন্তও যায়। এ নেশাখোর দেড়েদের না তাড়াইলে আর কি হিন্দুর হিন্দুয়ানী থাকে?

মহে। তাড়াবে কেমন করে?

ভবা। মেরে।

মহে। তুমি একা তাড়াবে? এক চড়ে নাকি?

দস্যু গায়িল :–

“সপ্তকোটীকণ্ঠ-কলকল-নিনাদকরালে!
দ্বিসপ্তকোটীভূজৈর্ধৃতখরকরবালে
অবলা কেন মা এত বলে।”

মহে। কিন্তু দেখিতেছি, তুমি একা।

ভবা। কেন, এখনি ত দু শ লোক দেখিয়াছ।

মহে। তাহারা কি সকলে সন্তান?

ভবা। সকলেই সন্তান।

মহে। আর কত আছে?

ভবা। এমন হাজার হাজার, ক্রমে আরও হবে।

মহে। না হয় দশ বিশ হাজার হল, তাতে কি মুসলমানকে রাজ্যচ্যুত করিতে পারিবে?

ভবা। পলাশীতে ইংরেজের ক জন ফৌজ ছিল?

মহে। ইংরেজ আর বাঙ্গালীতে?

ভবা। নয় কিসে? গায়ের জোরে কত হয়–গায়ে জিয়াদা জোর থাকিলে গোলা কি জিয়াদা ছোটে?

মহে। তবে ইংরেজ মুসলমান এত তফাৎ কেন?

ভবা। ধর, এক ইংরেজ প্রাণ গেলেও পলায় না, মুসলমান গা ঘামিলে পলায়– শরবৎ খুঁজিয়া বেড়ায়– ধর, তারপর ইংরেজদের জিদ আছে–যা ধরে, তা করে, মুসলমানের এলাকাড়ি। টাকার জন্য প্রাণ দেওয়া, তাও সিপাহীরা মাহিয়ানা পায় না। তার পর শেষ কথা সাহস–কামানের গোলা এক জায়গায় বই দশ জায়গায় পড়বে না– সুতরাং একটা গোলা দেখে দুই শত জন পলাইবার দরকার নাই। কিন্তু একটা গোলা দেখিলে মুসলমানের গোষ্ঠীশুদ্ধ পলায়– আর গোষ্ঠীশুদ্ধ গোলা দেখিলে ত একটা ইংরেজ পলায় না।

মহে। তোমাদের এ সব গুণ আছে?

ভবা। না। কিন্তু গুণ গাছ থেকে পড়ে না। অভ্যাস করিতে হয়।

মহে। তোমরা কি অভ্যাস কর?

ভবা। দেখিতেছ না আমরা সন্ন্যাসী? আমাদের সন্ন্যাস এই অভ্যাসের জন্য। কার্য উদ্ধার হইলে– অভ্যাস সম্পূর্ণ হইলে–আমরা আবার গৃহী হইব। আমাদেরও স্ত্রী কন্যা আছে।

মহে। তোমরা সে সকল ত্যাগ করিয়াছ–মায়া কাটাইতে পারিয়াছ?

ভবা। সন্তানকে মিথ্যা কথা কহিতে নাই–তোমার কাছে মিথ্যা বড়াই করিব না। মায়া কাটাইতে পারে কে? যে বলে, আমি মায়া কাটাইয়াছি, হয় তার মায়া কখন ছিল না বা সে মিছা বড়াই করে। আমরা মায়া কাটাই না–আমরা ব্রত রক্ষা করি। তুমি সন্তান হইবে?

মহে। আমরা স্ত্রী কন্যার সংবাদ না পাইলে আমি কিছু বলিতে পারি না।

ভবা। চল, তবে তোমার স্ত্রীকন্যাকে দেখিবে চল।

এই বলিয়া দুই জনে চলিল; ভবানন্দ আবার "বন্দে মাতরম্" গায়িতে লাগিল। মহেন্দ্রের গলা ভাল ছিল, সঙ্গীতে একটু বিদ্যা ও অনুরাগ ছিল–সুতরাং সঙ্গে গায়িল–দেখিল যে, গায়িতে গায়িতে চক্ষে জল আইসে। তখন মহেন্দ্র বলিল, "যদি স্ত্রী কন্যা ত্যাগ না করিতে হয়, তবে এ ব্রত আমাকে গ্রহণ করাও।"

ভবা। এ ব্রত যে গ্রহণ করে, সে স্ত্রী কন্যা পরিত্যাগ করে। তুমি যদি এ ব্রত গ্রহণ কর, তবে স্ত্রী কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা হইবে না। তাহাদিগের রক্ষা হেতু উপযুক্ত বন্দোবস্ত করা যাইবে, কিন্তু ব্রতের সফলতা পর্য্যন্ত তাহাদিগের মুখদর্শন নিষেধ।

মহেন্দ্র। আমি এ ব্রত গ্রহণ করিব না।

একাদশ পরিচ্ছেদ

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। সেই জনহীন কানন,–এতক্ষণ অন্ধকার, শব্দহীন ছিল–এখন আলোকময় –পক্ষিকূজনশব্দিত হইয়া আনন্দময় হইল। সেই আনন্দময় প্রভাতে আনন্দময় কাননে, "আনন্দমঠে", সত্যানন্দ ঠাকুর হরিণচর্ম্মে বসিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতেছেন। কাছে বাসিয়া জীবানন্দ। এমন সময়ে ভবানন্দ মহেন্দ্র সিংহকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রহ্মচারী বিনাবাক্যব্যয়ে সন্ধ্যাহ্নিক করিতে লাগিলেন, কেহ কোন কথা কহিতে সাহস করিল না। পরে সন্ধ্যাহ্নিক সমাপন হইলে, ভবানন্দ, জীবানন্দ উভয়ে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং পদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক বিনীতভাবে উপবেশন করিলেন। তখন সত্যানন্দ ভবানন্দকে ইঙ্গিত করিয়া বাহিরে লইয়া গেলেন। কি কথোপকথন হইল, তাহা আমরা জানি না। তাহার পর উভয়ে মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, ব্রহ্মচারী সকরুণ সহাস্য বদনে

মহেন্দ্রকে বলিলেন, "বাবা, তোমার দুঃখে আমি অত্যন্ত কাতর হইয়াছি, কেবল সেই দীনবন্ধুর কৃপায় তোমার স্ত্রী কন্যাকে কাল রাত্রিতে আমি রক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম।" এই বলিয়া বক্ষচারী কল্যাণীর রক্ষাবৃত্তান্ত বর্ণিত করিলেন। তার পর বলিলেন যে, "চল, তাহারা যেখানে আছে, তোমাকে সেখাই লইয়া যাই।"

এই বলিয়া ব্রহ্মচারী অগ্রে অগ্রে, মহেন্দ্র পশ্চাৎ পশ্চাৎ দেবালয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া মহেন্দ্র দেখিল, অতি বিস্তৃত, অতি উচ্চ প্রকোষ্ঠ। এই নবারুণপ্রফুল্ল প্রাতঃকালে, যখন নিকটস্থ কানন সূর্য্যালোকে হীরকখচিতবৎ জ্বলিতেছে, তখনও সেই বিশাল কক্ষায় প্রায় অন্ধকার। ঘরের ভিতর কি আছে, মহেন্দ্র প্রথমে তাহা দেখিতে পাইল না–দেখিতে দেখিতে, দেখিতে দেখিতে, ক্রমে দেখিতে পাইল, এক প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ মূর্ত্তি, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, কৌস্তুভশোভিতহৃদয়, সম্মুখে সুদর্শনচক্র ঘূর্ণ্যমানপ্রায় স্থাপিত। মধুকৈটভস্বরূপ দুইটি প্রকাণ্ড ছিন্নমস্ত মূর্ত্তি রুধিরপ্লাবিতবৎ চিত্রিত হইয়া সম্মুখে রহিয়াছে। বামে লক্ষ্মী আলুলায়িতকুন্তলা শতদলমালামণ্ডিতা ভয়ত্রস্তার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন। দক্ষিণে সরস্বতী, পুস্তক, বাদ্যযন্ত্র, মূর্ত্তিমান্ রাগ রাগিণী প্রভৃতি পরিবেষ্টিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। বিষ্ণুর অঙ্কোপরি এক মোহিনী মূর্ত্তি– লক্ষ্মী সরস্বতীর অধিক সুন্দরী, লক্ষ্মী সরস্বতীর অধিক ঐশ্বর্য্যান্বিতা। গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, দেব, যক্ষ, রক্ষ তাঁহাকে পূজা করিতেছে। ব্রহ্মচারী অতি গম্ভীর, অতি ভীত স্বরে মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সকল দেখিতে পাইতেছ?" মহেন্দ্র বলিল, পাইতেছি।"

ব্রহ্ম। বিষ্ণুর কোলে কি আছে দেখিয়াছ?

মহে। দেখিয়াছি। কে উনি?

ব্রহ্ম। মা।

মহে। মা কে?

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আমরা যাঁর সন্তান।"

মহেন্দ্র। কে তিনি?

ব্রহ্ম। সময়ে চিনিবে। বলে–বন্দে মাতরম্। এখন চল, দেখিবে চল।

তখন ব্রহ্মচারী মহেন্দ্রকে কক্ষান্তরে লইয়া গেলেন। সেখানে মহেন্দ্র দেখিলেন, এক অপরূপ সর্বাঙ্গসম্পন্না সর্ব্বাভরণভূষিতা জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কে?"

ব্রহ্ম। ম– যা **ছিলেন**।

ম। সে কি?

ব্র। ইনি কুঞ্জর কেশরী প্রভৃতি বন্য পশুসকল পদতলে দলিত করিয়া, বন্য পশুর আবাসস্থানে আপনার পদ্মাসন স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইনি সর্ব্বালঙ্কারপরিভূষিতা হাস্যময়ী সুন্দরী ছিলেন। ইনি বালার্কবর্ণাভা, সকল ঐশ্বর্যশালিনী। ইঁহাকে প্রণাম কর।

মহেন্দ্র ভক্তিভাবে জগদ্বাত্রীরূপিণী মাতৃভূমিকে প্রণাম করিলে পর, ব্রহ্মচারী তাঁহাকে এক অন্ধকার সুরঙ্গ দেখাইয়া বলিলেন, "এই পথে আইস।" ব্রহ্মচারী স্বয়ং আগে আগে চলিলেন। মহেন্দ্র সভয়ে পাছু পাছু চলিলেন। ভূগর্ভস্থ এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কোথা হইতে সামান্য আলো আসিতেছেল। সেই ক্ষীণালোকে এক কালীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন।

ব্রহ্মচারী বলিলেন, “দেখ মা যা **হইয়াছেন**।”

মহেন্দ্র সভয়ে বলিল, “কালী।”

ব্র। কালী– অন্ধকারসমাচ্ছন্না কালিমাময়ী। হৃতসর্ব্বস্বা, এই জন্য নগ্নিকা। আজি দেশে সর্ব্বত্রই শ্মশান-তাই মা কঙ্কালমালিনী। আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন–হায় মা!

ব্রহ্মচারীর চক্ষে দর দর ধারা পড়িতে লাগিল। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, “হাতে খেটক খর্পর কেন?”

ব্রহ্ম। আমরা সন্তান, অস্ত্র মরা হাতে এই দিয়াছি মাত্র-বল, বন্দে মাতরম।

“বন্দে মাতরম” বলিয়া মহেন্দ্র কালীকে প্রণাম করিল। তখন ব্রহ্মচারী বলিলেন, “এই পথে আই।” এই বলিয়া তিনি দ্বিতীয় সুরঙ্গ আরোহণ করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহাদিগের চক্ষে প্রাতঃসূর্য্যের রশ্মিরাশি প্রভাসিত হইল। চারি দিক্ হইতে মধুকণ্ঠ পক্ষিকুল গায়িয়া উঠিল। দেখিলেন, মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত প্রশস্ত মন্দিরের মধ্যে সুবর্ণনির্ম্মিতা দশভুজা প্রতিমা নবারুণকিরণে জ্যোতির্ম্ময়ী হইয়া হাসিতেছে। ব্রহ্মচারী প্রণাম করিয়া বলিলেন–

“এই মা যা **হইবেন**। দশ ভুজ দশ দিকে প্রসারিত– তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত। দিগ্‌ভুজা –” বলিতে বলিতে সত্যানন্দ গদ্গদকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলেন। “দিগ্‌ভুজা–নানাপ্রহরণধারিণী শত্রুবিমর্দ্দিনী–বীরেন্দ্র-পৃষ্ঠবিহারিণী–দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী–বামে বাণী বিদ্যা-বিজ্ঞানদায়িনী–সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গ্রণেশ; এস, আমরা, মাকে উভয়ে প্রণাম করি।” তখন দুই জনে যুক্তকরে উর্দ্ধমুখে এককণ্ঠে ডাকিতে লাগিল,

“সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ-সাধিকে।

শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তু তে ॥”

উভয়ে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলে, মহেন্দ্র গদ্গদকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মার এ মূর্ত্তি কবে দেখিতে পাইব?”

ব্রহ্মচারী বলিলেন, ‘যবে মার সকল সন্তান মাকে মা বলিয়া ডাকিবে, সেই দিন উদি প্রসন্ন হইবেন।’

মহেন্দ্র সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমার স্ত্রী কন্যা কোথায়?”

ব্রহ্ম। চল–দেখিবে চল।

মহেন্দ্র। তাহাদের একবারমাত্র আমি দেখিয়া বিদায় দিব।

ব্রহ্ম। কেন বিদায় দিবে?

ম। আমি এই মহামন্ত্র গ্রহণ করিব।

ব্রহ্ম। কোথায় বিদায় দিবে?

মহেন্দ্র কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, “আমার গৃহে কেহ নাই, আমার আর স্থানও নাই। এ মহামারীর সময় আর কোথায় বা স্থান পাইব?”

ব্রহ্ম। যে পথে এখানে আসিলে, সেই পথে মন্দিরের বাহিরে যাও। মন্দির-দ্বারে তোমার স্ত্রী কন্যাকে দেখিতে পাইবে। কল্যাণী এ পর্য্যন্ত অভুক্তা। যেখানে তাহারা বসিয়া আছে, সেইখানে ভক্ষ্য সামগ্রী পাইবে। তাহাকে ভোজন করাইয়া তোমার যাহা অভিরুচি, তাহা করিও, এক্ষণে আমাদিগের আর কাহারও সাক্ষাৎ

পাইবে না। তোমার মন যদি এইরূপ থাকে, তবে উপযুক্ত সময়ে, তোমাকে দেখা দিব।

তখন অকস্মাৎ কোন পথে ব্রহ্মচারী অন্তর্হিত হইলেন। মহেন্দ্র পূর্ব্বপ্রদৃষ্ট পথে নির্গমনপূর্ব্বক দেখিলেন, নাটমন্দিরে কল্যাণী কন্যা লইয়া বসিয়া আছে।

এদিকে সত্যানন্দ অন্য সুরঙ্গ দিয়া অবতরণপূর্ব্বক এক নিভৃত ভূগর্ভকক্ষায় নামিলেন। সেখানে জীবানন্দ ও ভবানন্দ বসিয়া টাকা গণিয়া থরে থরে সাজাইতেছে। সেই ঘরে স্তূপে স্তূপে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, হীরক, প্রবাল, মুক্তা সজ্জিত রহিয়াছে। গত রাত্রের লুঠের টাকা, ইহারা সাজাইয়া রাখিতেছে। সত্যানন্দ সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "জীবানন্দ! মহেন্দ্র আসিবে। আসিলে সন্তানের বিশেষ উপকার আছে। কেন না, তাহা হইলে উহার পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত অর্থরাশি মার সেবায় অর্পিত হইবে। কিন্তু যত দিন সে কায়মনোবাক্যে মাতৃভক্ত না হয়, তত দিন তাহাকে গ্রহণ করিও না। তোমাদিগের হাতের কাজ সমাপ্ত হইলে তোমরা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উহার অনুসরণ করিও, সময় দেখিলে উহাকে শ্রীবিষ্ণুমণ্ডপে উপস্থিত করিও। আর সময়ে হউক, অসময়ে হউক, উহাদিগের প্রাণরক্ষা করিও। কেন না, যেমন দুষ্টের শাসন সন্তানের ধর্ম্ম, শিষ্টের রক্ষাও সেইরূপ ধর্ম্ম।'

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অনেক দুঃখের পর মহেন্দ্র আর কল্যাণীতে সাক্ষাৎ হইল। কল্যাণী কাঁদিয়া লুটিয়া পড়িল। মহেন্দ্র আরও কাঁদিল। কাঁদাকাটার পর চোখ মুছার ধুম পড়িয়া গেল। যত বার চোখ মুছা যায়, তত বার আবার জল পড়ে। জলপড়া বন্ধ করিবার জন্য কল্যাণী খাবার কথা পাড়িল। ব্রহ্মচারীর অনুচর যে খাবার রাখিয়া গিয়াছে, কল্যাণী মহেন্দ্রকে তাহা খাইতে বলিল। দুর্ভিক্ষের দিন অন্ন ব্যঞ্জন পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই, কিন্তু দেশে যাহা আছে, সন্তানের কাছে তাহা সুলভ। সেই কানন সাধারণ মনুষ্যের অগম্য। যেখানে যে গাছে, যে ফল হয়, উপবাসী মনুষ্যগণ তাহা পাড়িয়া খায়। কিন্তু এই অগম্য অরণ্যের গাছের ফল আর কেহ পায় না। এই জন্য ব্রহ্মচারীর অনুচর বহুতর বন্য ফল ও কিছু দুগ্ধ আনিয়া রাখিয়া যাইতে পারিয়াছিল। সন্ন্যাসী ঠাকুরদের সম্পত্তির মধ্যে কতকগুলি গাই ছিল। কল্যাণীর অনুরোধ মহেন্দ্র প্রথমে কিছু ভোজন করিলেন। তাহার পর ভুক্তাবশেষ কল্যাণী বিরলে বসিয়া কিছু খাইল। দুগ্ধ কন্যাকে কিছু খাওয়াইল, কিছু সঞ্চিত করিয়া রাখিল, আবার খাওয়াইবে। তার পর নিদ্রায় উভয়ে পীড়িত হইলে, উভয়ে শ্রম দূর করিলেন। পরে নিদ্রাভঙ্গের পর উভয়ে আলোচনা করিতে লগিলেন, এখন কোথায় যাই। কল্যাণী বলিল, "বাড়ীতে বিপদ্ বিবেচনা করিয়া গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি, বাড়ীর অপেক্ষা বাহিরে বিপদ্ অধিক। তবে চল, বাড়ীতেই ফিরিয়া যাই।" মহেন্দ্রেরও তাহা অভিপ্রেত। মহেন্দ্রের ইচ্ছা, কল্যাণীকে গৃহে রাখিয়া, কোন প্রকারে এক জন অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া দিয়া, এই পরম রমণীয় অপার্থিক পবিত্রতাযুক্ত মাতৃসেবাব্রত গ্রহণ করেন। অতএব তিনি সহজেই সম্মত হইলেন। তখন দুই জন গতক্লম হইয়া, কন্যা কোলে তুলিয়া পদচিহ্নাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কিন্তু পদচিহ্ন কোন্ পথে যাইতে হইবে, সেই দুর্ভেদ্য অরণ্যানীমধ্যে কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহারা বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, বন হইতে বাহির হইতে পারিলেই পথ পাইবেন। কিন্তু বন হইতে ত বাহির হইবার পথ পাওয়া যায় না। অনেকক্ষণ বনের ভিতর ঘুরিতে লাগিলেন, ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই মঠেই ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন, নির্গমের পথ পাওয়া যায় না। সম্মুখে এক জন বৈষ্ণববেশধারী অপরিচিত ব্রহ্মচারী দাঁড়াইয়া হাসিতেছিল। দেখিয়া মহেন্দ্র রুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোঁসাই, হাস কেন?"

গোঁসাই বলিল, “তোমরা এ বনে প্রবেশ করিলে কি প্রকারে?”

মহেন্দ্র। যে প্রকারে হউক, প্রবেশ করিয়াছি।

গোঁসাই। প্রবেশ করিয়াছ ত বাহির হইতে পারিতেছ না কেন? এই বলিয়া বৈষ্ণব আবার হাসিতে লাগিল।

রুষ্ট হইয়া মহেন্দ্র বলিলেন, “তুমি হাসিতেছ, তুমি বাহির হইতে পার?”

বৈষ্ণব বলিল, “আমার সঙ্গে আইস, আমি পথ দেখাইয়া দিতেছি। তোমরা অবশ্য কোন সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীর সঙ্গে প্রবেশ করিয়া থাকিবে। নচেৎ এ মঠে আসিবার বা বাহির হইবার পথ আর কেহই জানে না।”

শুনিয়া মহেন্দ্র বলিলেন, “আপনি সন্তান?”

বৈষ্ণব বলিল, “হাঁ, আমিও সন্তান, আমার সঙ্গে আইস। তোমাকে পথ দেখাইয়া দিবার জন্যই আমি এখানে দাঁড়াইয়া আছি।”

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার নাম কি?”

বৈষ্ণব বলিল, “আমার নাম ধীরানন্দ গোস্বামী।”

এই বলিয়া ধীরানন্দ অগ্রে অগ্রে চলিল; মহেন্দ্র, কল্যাণী পশ্চাৎ চশ্চাৎ চলিলেন। ধীরানন্দ অতি দুর্গম পথ দিয়া তাঁহাদিগকে বাহির করিয়া দিয়া, একা বনমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিল।

আনন্দারণ্য হইতে তাঁহারা বাহিরে আসিলে কিছু দূরে সবৃক্ষ প্রান্তর আরম্ভ হইল। প্রান্তর এক দিকে রহিল, বনের ধারে ধারে রাজপথ। এক স্থানে অরণ্যমধ্য দিয়া একটি ক্ষুদ্র নদী কলকল শব্দে বহিতেছে। জল অতি পরিষ্কার, নিবিড় মেঘের মত কালো। দুই পাশে শ্যামল শোভাময় নানাজাতীয় বৃক্ষ নদীকে ছায়া করিয়া আছে, নানাজাতীয় পক্ষী বৃক্ষে বসিয়া নানাবিধ রব করিতেছে। সেই রব-সেও মধুর-মধুর নদীর রবের সঙ্গে মিশিল। কল্যাণী নদী তীরে এক বৃক্ষ মূলে বসিলেন, স্বামীকে নিকটে বসিতে বলিলেন, স্বামী বসিলেন, কল্যাণী স্বামীর কোল হইতে কন্যাকে কোলে লইলেন। স্বামীর হাত হাতে লইয়া কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমাকে আজি বড় বিমর্ষ দেখিতেছি! বিপদ্ যাহা, তাহা হইতে উদ্ধার পাইয়াছি–এখন এত বিষাদ কেন?”

মহেন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, “আমি আর আপনার নাহি– আমি কি করিব বুঝিতে পারি না।”

ক। কেন?

মহে। তোমাকে হারাইলে পর আমার যাহা যাহা ঘটিয়াছিল শুন। এই বলিয়া যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, মহেন্দ্র তাহা সবিস্তারে বলিলেন।

কল্যাণী বলিলেন, “আমারও অনেক কষ্ট, অনেক বিপদ্ গিয়াছে। তুমি শুনিয়া কি করিবে? অতিশয় বিপদেও আমার কেমন করে ঘুম আসিয়াছিল, বলিতে পারি না– কিন্তু আমি কাল শেষ রাত্রে ঘুমাইয়াছিলাম। ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। দেখিলাম– কি পূণ্যবলে বলিতে পারি না– আমি এক অপূর্ব্ব স্থানে গিয়াছি। সেখানে মাটি নাই। কেবল আলো, অতি শীতল মেঘভাঙ্গা আলোর মত বড় মধুর আলো। সেখানে মনুষ্য নাই, কেবল আলোময় মূর্ত্তি, সেখানে শব্দ নাই, কেবল অতিদূরে যেন কি মধুর গীতবাদ্য হইতেছে, এমনি একটা শব্দ। সর্ব্বদা যেন নূতন ফুটিয়াছে, এমনি লক্ষ লক্ষ মল্লিকা, মালতী, গন্ধরাজের গন্ধ। সেখানে যেন সকলের উপরে সকলের দর্শনীয় স্থানে কে বসিয়া আছেন, যেন নীল পর্ব্বত অগ্নিপ্রভা হইয়া ভিতরে মন্দ মন্দ জ্বলিতেছে। অগ্নিময় বৃহৎ কিরীট তাঁহার মাথায়। তাঁর যেন চারি হাত। তাঁর দুই দিকে কি, আমি চিনিতে পারিলাম না– বোধ হয় স্ত্রীমূর্ত্তি, কিন্তু এত রূপ, এত জ্যোতিঃ, এত সৌরভ যে, আমি সে দিকে

চাহিলেই বিহ্বল হইতে লাগিলাম; চাহিতে পারিলাম না, দেখিতে পারিলাম না যে কে। যেন সেই চতুর্ভুজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আর এক স্ত্রীমূর্ত্তি। সেও জ্যোতির্ম্ময়ী; কিন্তু চারি দিকে মেঘ, আভা ভাল বাহির হইতেছে না, অস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, অতি শীর্ণা, কিন্তু অতি রূপবতী মর্ম্মপীড়িতা কোন স্ত্রীমূর্ত্তি কাঁদিতেছে। আমাকে যেন সুগন্ধ মন্দ পবন বহিয়া বহিয়া ঢেউ দিতে দিতে, সেই চতুর্ভুজের সিংহাসনতলে আনিয়া ফেলিল। যেন সেই মেঘমণ্ডিতা শীর্ণা স্ত্রী আমাকে দেখাইয়া বলিল, 'এই সে-ইহারই জন্য মহেন্দ্র আমার কোলে আসে না।' তখন যেন এক অতি পরিষ্কার সুমধুর বাঁশীর শব্দের মত শব্দ হইল। সে চতুর্ভুজ যেন আমাকে বলিলেন, 'তুমি স্বামীকে ছাড়িয়া আমার কাছে এস। এই তোমাদের মা, তোমার স্বামী এঁর সেবা করিবে। তুমি স্বামীর কাছে থাকিলে এঁর সেবা হইবে না; তুমি চলিয়া আইস।'– আমি যেন কাঁদিয়া বলিলাম, 'স্বামী ছাড়িয়া আসিব কি প্রকারে।' তখন আবার বাঁশীর শব্দে শব্দ হইল, 'আমি স্বামী, আমি মাতা, আমি পিতা, আমি পুত্র, আমি কন্যা, আমার কাছে এস।' আমি কি বলিলাম মনে নাই। আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।" এই বলিয়া কল্যাণী নীরব হইয়া রহিলেন।

মহেন্দ্র বিস্মিত, স্তম্ভিত, ভীত হইয়া নীরবে রহিলেন। মাথার উপর দোয়েল ঝঙ্কার করিতে লাগিল। পাপিয়া স্বরে আকাশ প্লাবিত করিতে লাগিল। কোকিল দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। "ভৃঙ্গরাজ" কলকণ্ঠে কানন কম্পিত করিতে লাগিল। পদতলে তটিনী মৃদু কল্লোল করিতেছিল। বায়ু বন্য পুষ্পের মৃদু গন্ধ আনিয়া দিতেছিল। কোথাও মধ্যে মধ্যে নদীজলে রৌদ্র ঝিকিমিকি দেখা যাইতেছিল। কোথাও তালপত্র মৃদু পবনে মর্ম্মর শব্দ করিতেছিল। দূরে নীল পর্ব্বতশ্রেণী দেখা যাইতেছিল। দুই জনে অনেকক্ষণ মুগ্ধ হইয়া নীরবে রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে কল্যাণী পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভাবিতেছ?"

মহেন্দ্র। কি করিব, তাহাই ভাবি– স্বপ্ন কেবল বিভীষিকামাত্র, আপনার মনে জন্মিয়া আপনি লয় পায়, জীবনের জলবিম্ব – চল গৃহে যাই।

ক। যেখানে দেবতা তোমাকে যাইতে বলেন, তুমি সেইখানে যাও–এই বলিয়া কল্যাণ্য কন্যাকে স্বামীর কোলে দিলেন।

মহেন্দ্র কন্যা কোলে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর তুমি– তুমি কোথায় যাইবে?"

কল্যাণী দুই হাতে দুই চোখ ঢাকিয়া মাথা টিপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "আমাকেও দেবতা যেখানে যাইতে বলিয়াছেন, আমিও সেইখানে যাইব।"

মহেন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "সে কোথা, কি প্রকারে যাইবে?"

কল্যাণী বিষের কৌটা দেখাইলেন।

মহেন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সে কি? বিষ খাইবে?"

"খাইব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু–" কল্যাণী নীরব হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। মহেন্দ্র তাঁহার মুখ চাহিয়া রহিলেন। প্রতি পলকে বৎসর বোধ হইতে লাগিল। কল্যাণী আর কথা শেষ করিলেন না দেখিয়া মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু বলিয়া কি বলিতেছিলে?"

ক। খাইব মনে করিয়াছিলাম– কিন্তু তোমাকে রাখিয়া–সুকুমারীকে রাখিয়া বৈকুণ্ঠেও আমার যাইতে ইচ্ছা করে না। আমি মরিব না।

এই কথা বলিয়া কল্যাণী বিষের কৌটা মাটিতে রাখিলেন। তখন দুই জনে ভূত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কথোপকথন করিলে লাগিলেন। কথায় কথায় উভয়েই অন্যমনস্ক হইলেন। এই অবকাশে মেয়েটি খেলা করিতে করিতে বিষের কৌটা তুলিয়া লইল। কেহই তাহা দেখিলেন না।

সুকুমারী মনে করিল, এটি বেশ খেলিবার জিনিস। কৌটাটি একবার বাঁ হাতে ধরিয়া দাহিন হাতে বেশ করিয়া চাপড়াইল, তার পর দাহিন হাতে ধরিয়া বাঁ হাতে তাহাকে চাপড়াইল। তার পর দুই হাতে ধরিয়া টানাটানি করিল। সুতরাং কৌটাটি খুলিয়া গেল–বড়িটি পড়িয়া গেল।

বাপের কাপড়ের উপর ছোট গুলিটি পড়িয়া গেল– সুকুমারী তাহা দেখিল, মনে করিল, এও তার একটা খেলিবার জিনিস। কৌটা ফেলিয়া দিয়া থাবা মারিয়া বড়িটি তুলিয়া লইল।

কৌটাটি সুকুমারী কেন গালে দেয় নাই বলিতে পারি না–কিন্তু বড়িটি সম্বন্ধে কালবিলম্ব হইল না। প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্য– সুকুমারী বড়িটি মুখে পুরিল। সেই সময়ে তাহার উপর মার নজর পড়িল।

"কি খাইল! কি খাইল! সর্ব্বনাশ!" কল্যাণী ইহা বলিয়া, কন্যার মুখের ভিতর আঙ্গুল পুরিলেন। তখন উভয়েই দেখিলেন যে, বিষের কৌটা খালি পড়িয়া আছে। সুকুমারী তখন আর একটা খোলা পাইয়াছি মনে করিয়া দাঁত চাপিয়া– সবে গুটিকতক দাঁত উঠিয়াছে–মার মুখপানে চাহিয়া হাসিতে লাগিল। ইতিমধ্যে বোধ হয়, বিষবড়ির স্বাদ মুখে কদর্য্য লাগিয়াছিল; কেন না, কিছু পরে মেয়ে আপনি দাঁত ছাড়িয়া দিল, কল্যাণী বড়ি বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলেন। মেয়ে কাঁদিতে লাগিল।

বটিকা মাটিতে পড়িয়া রহিল। কল্যাণী নদী হইতে আঁচল ভিজাইয়া জল আনিয়া মেয়ের মুখে দিলেন। অতি সকাতরে মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "একটু কি পেটে গেছে?"

মন্দটাই আগে বাপ-মার মনে আসে–যেখানে অধিক ভালবাসা, সেখানে ভয়ই অধিক প্রবল। মহেন্দ্র কখন দেখেন নাই যে, বড়িটা আগে কত বড় ছিল। এখন বড়িটি হাতে লইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "বোধ হয় অনেকটা খাইয়াছে।"

কল্যাণীরও কাজেই সেই বিশ্বাস হইল। অনেকক্ষণ ধরিয়া তিনিও বড়ি হাতে লইয়া নিরীক্ষণ করিলেন। এদিকে, মেয়ে যে দুই এক ঢোক গিলিয়াছিল, তাহারই গুণে কিছু বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইল। কিছু ছটফট করিতে লাগিল– কাঁদিতে লাগিল– শেষ কিছু অবসন্ন হইয়া পড়িল। তখন কল্যাণী স্বামীকে বলিলেন, "আর দেখ কি? যে পথে দেবতায় ডাকিয়াছে, সেই পথে সুকুমারী চলিল– আমাকেও যাইতে হইবে।"

এই বলিয়া কল্যাণী বিষের বড়ি মুখে ফেলিয়া দিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে গিলিয়া ফেলিলেন।

মহেন্দ্র রোদন করিয়া বলিলেন, "কি করিলে–কল্যাণী ও কি করিলে?"

কল্যাণী কিছু উত্তর না করিয়া স্বামীর পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলেন, বলিলেন, "প্রভু, কথা কহিলে কথা বাড়িবে, আমি চলিলাম।"

"কল্যাণী, কি করিলে," বলিয়া মহেন্দ্র চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অতি মৃদুস্বরে কল্যাণী বলিতে লাগিলেন, "আমি ভালই করিয়াছি। ছার স্ত্রীলোকের জন্য পাছে তুমি দেবতার কাজে অযত্ন কর! দেখ, আমি দেববাক্য লঙ্ঘন করিতেছিলাম, তাই আমার মেয়ে গেল। আর অবহেলা করিলে পাছে তুমিও যাও।"

মহেন্দ্র কাঁদিয়া বলিলেন, "তোমায় কোথাও রাখিয়া আসিতাম– আমাদের কাজ সিদ্ধ হইলে আবার তোমাকে লইয়া সুখী হইতাম। কল্যাণী, আমার সব! কেন তুমি এমন কাজ করিলে! যে হাতের জোরে আমি তরবারি ধরিতাম, সেই হাতই ত কাটিলে! তুমি ছাড়া আমি কি!"

কল্যাণী। কোথায় আমায় লইয়া যাইতে–স্থান কোথায় আছে? মা, বাপ, বন্ধুবর্গ, এই দারুণ দুঃসময়ে সকলি ত মরিয়াছে। কার ঘরে স্থান আছে, কোথায় যাইবার পথ আছে, কোথায় লইয়া যাইবে? আমি তোমার গলগ্রহ। আমি মরিলাম ভালই করিলাম। আমায় আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি সেই–সেই আলোকময় লোকে গিয়া আবার তোমার দেখা পাই। এই বলিয়া কল্যাণী আবার স্বামীর পদরেণু গ্রহণ করিয়া মাথায় দিলেন। মহেন্দ্র কোন উত্তর না করিতে পারিয়া আবার

কাঁদিতে লাগিলেন। কল্যাণী আবার বলিলেন,–অতি মৃদু, অতি মধুর, অতি স্নেহময় কণ্ঠ–আবার বলিলেন, “দেখ, দেবতার ইচ্ছা কার সাধ্য লঙ্ঘন করে। আমায় দেবতায় যাইতে আজ্ঞা করিয়াছেন, আমি মনে করিলে কি থাকিতে পারি–আপনি না মরিতাম ত অবশ্য আর কেহ মারিত। আমি মরিয়া ভালই করিলাম। তুমি যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছ, কায়মনোবাক্যে তাহা সিদ্ধ কর, পুণ্য হইবে। আমার তাহাতে স্বর্গলাভ হইবে। দুই জন একত্রে অনন্ত স্বর্গভোগ করিব।”

এদিকে বালিকাটি একবার দুধ তুলিয়া সামলাইল। তাহার পেটে বিষ যে অল্প পরিমাণে গিয়াছিল, তাহা মারাত্মক নহে। কিন্তু সে সময় সে দিকে মহেন্দ্রের মন ছিল না। তিনি কন্যাকে কল্যাণীর কোলে দিয়া উভয়কে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া অবিরত কাঁদিতে লাগিলেন। তখন যেন অরণ্যমধ্য হইতে মৃদু অথচ মেঘগম্ভীর শব্দ শুনা গেল।

“হরে মুরারে মধুকৈটভারে।
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।”

কল্যাণীর তখন বিষ ধরিয়া আসিতেছিল, চেতনা কিছু অপহৃত হইতেছিল; তিনি মোহভরে শুনিলেন, যেন সেই বৈকুণ্ঠে শ্রুত অপূর্ব্ব বংশীধ্বনিতে বাজিতেছে ঃ–

“হরে মুরারে মধুকৈটভারে।
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।”

তখন কল্যাণী অপ্সরোনিন্দিত কণ্ঠে মোহভরে ডাকিতে লাগিলেন,

“হরে মুরারে মধুকৈটভারে।”

মহেন্দ্রকে বলিলেন, “বল,
হরে মুরারে মধুকৈটভারে।”

কাননির্গত মধুর স্বর আর কল্যাণীর মধুর স্বরে বিমুগ্ধ হইয়া কাতরচিত্তে ঈশ্বর মাত্র সহায় মনে করিয়া মহেন্দ্রও ডাকিলেন,

“হরে মুরারে মধুকৈটভারে।”

তখন চারি দিক্ হইতে ধ্বনি হইতে লাগিল,

“হরে মুরারে মধুকৈটভারে।”

তখন যেন গাছের পাখীরাও বলিতে লাগিল,

“হরে মুরারে মধুকৈটভারে।”

নদীর কলকলেও যেন শব্দ হইতে লাগিল,

“হরে মুরারে মধুকৈটভারে।”

তখন মহেন্দ্র শোকতাপ ভুলিয়া গেলেন– উন্মত্ত হইয়া কল্যাণীর সহিত একতানে ডাকিতে লাগিলেন,

“হরে মুরারে মধুকৈটভারে।”

কানন হইতেও যেন তাঁহাদের সঙ্গে একতানে শব্দ হইতে লাগিল,

“হরে মুরারে মধুকৈটভারে।”

কল্যাণীর কণ্ঠ ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল, তবু ডাকিতেছেন,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

তখন ক্রমে ক্রমে কণ্ঠ নিস্তব্ধ হইল, কল্যাণীর মুখে আর শব্দ নাই, চক্ষুঃ নিমীলিত হইল, অঙ্গ শীতল হইল, মহেন্দ্র বুঝিলেন যে, কল্যাণী "হরে মুরারে" ডাকিতে ডাকিতে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। তখন পাগলেন ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কানন বিকম্পিত করিয়া, পশুপক্ষিদিগকে চমকিত করিয়া মহেন্দ্র ডাকিতে লাগিলেন,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

সেই সময়ে কে আসিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, তাঁহার সঙ্গে তেমনি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

তখন সেই অনন্তের মহিমায়, সেই অনন্ত অরণ্যমধ্যে, অনন্তপথগামিনীর শরীরসম্মুখে দুই জনে অনন্তের নাম গীত করিতে লাগিলেন। পশুপক্ষী নীরব, পৃথিবী অপূর্ব্ব শোভাময়ী–এই চরমগীতির উপযুক্ত মন্দির। সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে কোলে লইয়া বসিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

এদিকে রাজধানীতে রাজপথে বড় হুলস্থুল পড়িয়া গেল। রব উঠিল যে, রাজসরকার হইতে কলিকাতায় যে খাজনা চালান যাইতেছিল, সন্ন্যাসীরা তাহা মারিয়া লইয়াছে। তখন রাজাজ্ঞানুসারে সন্ন্যাসী ধরিতে সিপাহী বরকন্দাজ ছুটিতে লাগিল। এখন এই দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রদেশে সে সময়ে প্রকৃত সন্ন্যাসী বড় ছিল না। কেন না, তাহারা ভিক্ষোপজীবি; লোকে আপনি খাইতে পায় না, সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা দিবে কে? অতএব প্রকৃত সন্ন্যাসী যাহারা, তাহারা সকলেই পেটের দায়ে কাশী প্রয়াগাদি অঞ্চলে পলায়ন করিয়াছিল। কেবল সন্তানেরা ইচ্ছানুসারে সন্ন্যাসিবেশ ধারর করিত, প্রয়োজন হইলে পরিত্যাগ করিত। আজ গোলাযোগ দেখিয়া অনেকেই সন্ন্যাসীর বেশ পরিত্যাগ করিল। এজন্য বুভুক্ষু রাজানুচরণবর্গ কোথাও সন্ন্যাসী না পাইয়া কেবল গৃহস্থদিগের হাঁড়ি কলসী ভাঙ্গিয়া উদর অর্দ্ধপূরণপূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইল। কেবল সত্যানন্দ কোন কালে গৈরিকবসন পরিত্যাগ করিতেন না।

সেই কৃষ্ণ কল্লোলিনী ক্ষুদ্র নদীতীরে সেই পথের বৃক্ষতলে নদীতটে কল্যাণী পড়িয়া আছে, মহেন্দ্র ও সত্যানন্দ পরস্পরে আলিঙ্গন করিয়া সাশ্রুলোচনে ঈশ্বরকে ডাকিতেছেন, নজরদ্দী জমাদার সিপাহী লইয়া এমন সময়ে সেইখানে উপস্থিত। একেবারে সত্যানন্দের গলদেশে হস্তার্পণপূর্ব্বক বলিল, "এই শালা সন্ন্যাসী।" আর এক জন অমনি মহেন্দ্রকে ধরিল–কেন না, সে সন্ন্যাসীর সঙ্গী, সে অবশ্য সন্ন্যাসী হইবে। আর এক জন শষ্পোপরি লম্ববান কল্যাণীর মৃতদেহটাও ধরিতে যাইতেছিল। কিন্তু দেখিল যে, একটা স্ত্রীলোকের মৃতদেহ, সন্ন্যাসী না হইলেও হইতে পারে। আর ধরিল না। বালিকাকেও ঐরূপ বিবেচনায় ত্যাগ করিল। পরে তাহারা কোন কথাবার্ত্তা না বলিয়া দুই জনকে বাঁধিয়া লইয়া চলিল। কল্যাণীর মৃতদেহ আর তাহার বালিকা কন্যা বিনা রক্ষকে সেই বৃক্ষমূলে পড়িয়া রহিল।

প্রথমে শোকে অভিভূত এবং ঈশ্বরপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া মহেন্দ্র বিচেতনপ্রায় ছিলেন। কি হইতেছিল, কি হইল বুঝিতে পারেন নাই, বন্ধনের প্রতি কোন আপত্তি করেন নাই, কিন্তু দুই চারি পদ গেলে বুঝিলেন যে, আমাদিগকে বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছে। কল্যাণীর শব পড়িয়া রহিল, সৎকার হইল না, শিশুকন্যা পড়িয়া রহিল, এইক্ষণে তাহাদিগকে হিংস্র জন্তু খাইতে পারে, এই কথা মনোমধ্যে উদয় হইবামাত্র মহেন্দ্র দুইটি হাত পরস্পর হইতে বলে বিশ্লিষ্ট করিলেন, এক টানে

বাঁধন ছিঁড়িয়া গেল। সেই মুহূর্ত্তে এক পদাঘাতে জমাদার সাহেবকে ভূমিশয্যা অবলম্বন করাইয়া এক জন সিপাহীকে আক্রমণ করিতেছিলেন। তখন অপর তিনজন তাঁহাকে তিন দিক্ হইতে ধরিয়া পুনর্ব্বার বিজিত ও নিশ্চেষ্ট করিল। তখন দুঃখে কাতর হইয়া মহেন্দ্র সত্যানন্দ ব্রহ্মচারীকে বলিলেন যে, "আপনি একটু সহায়তা করিলেই এই পাঁচ জন দুরাত্মাকে বধ করিতে পারিতাম।" সত্যানন্দ বলিলেন, "আমার এই প্রাচীন শরীরে বল কি–আমি যাঁহাকে ডাকিতেছিলাম, তিনি ভিন্ন আমার আর বল নাই–তুমি, যাহা অবশ্য ঘটিবে, তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিও না। আমরা এই পাঁচ জনকে পরাভূত করিতে পারিব না। চল, কোথায় লইয়া যায় দেখি। জগদীশ্বর সকল দিক্ রক্ষা করিবেন।" তখন তাঁহারা দুই জনে আর কোন মুক্তির চেষ্টা না করিয়া সিপাহীদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কিছু দূর গিয়া সত্যানন্দ সিপাহীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু, আমি হরিনাম করিয়া থাকি– হরিনাম করার কিছু বাধা আছে?" সত্যানন্দকে ভালমানুষ বলিয়া জমাদারের বোধ হইয়াছিল, সে বলিল, "তুমি হরিনাম কর, তোমায় বারণ করিব না। তুমি বুড়া ব্রহ্মচারী, বোধ হয় তোমার খালাসের হুকুমই হইবে, এই বদমাস ফাঁসি যাইবে।" তখন ব্রহ্মচারী মৃদুস্বরে গান করিতে লাগিলেন–

ধীরসমীরে তটিনীতীরে
বসতি বনে বরনারী।
মা কুরু ধনুর্দ্ধর, গমনবিলম্বন
অতি বিধুরা সুকুমারী ॥
ইত্যাদি।

নগরে পৌঁছিলে তাঁহারা কোতয়ালের নিকট নীত হইলেন। কোতয়াল রাজসরকারে এতালা পাঠাইয়া দিয়া ব্রহ্মচারী ও মহেন্দ্রকে সম্প্রতি ফাটকে রাখিলেন। সে কারাগার অতি ভয়ঙ্কর, যে যাইত, সে প্রায় বাহির হইত না; কেন না, বিচার করিবার লোক ছিল না। ইংরেজের জেল নয়–তখন ইংরেজের বিচার ছিল না। আজ নিয়মের দিন–তখন অনিয়মের দিন। নিয়মের দিনে আর অনিয়মের দিনে তুলনা কর।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

রাত্রি উপস্থিত। কারাগারমধ্যে বদ্ধ সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে বলিলেন, "আজ অতি আনন্দের দিন। কেন না, আমরা কারাগারে বদ্ধ হইয়াছি। বল হরে মুরারে!" মহেন্দ্র কাতর স্বরে বলিলেন, "হরে মুরারে!"

সত্য। কাতর কেন বাপু? তুমি এ মহাব্রত গ্রহণ করিলে এ স্ত্রী কন্যা ত অবশ্য ত্যাগ করিতে। আর ত কোন সম্বন্ধ থাকিত না।

মহে। ত্যাগ এক, যমদণ্ড আর। যে শক্তিতে আমি এ ব্রত গ্রহণ করিতাম, সে শক্তি আমার স্ত্রী কন্যার সঙ্গে গিয়াছে।

সত্য। শক্তি হইবে। আমি শক্তি দিব। মহামন্ত্রে দীক্ষিত হও, মহাব্রত গ্রহণ কর।

মহেন্দ্র বিস্মিত হইলেন, বড় বিশ্বাস করিলেন না; বলিলেন, "আপনি কি প্রকারে জানিলেন? আপনি ত বরাবর আমার সঙ্গে।"

সত্য। আমরা মহাব্রতে দীক্ষিত। দেবতা আমাদিগের প্রতি দয়া করেন। আজি রাত্রেই তুমি এ সংবাদ পাইবে, আজি রাত্রেই তুমি কারাগার হইতে মুক্ত হইবে।

মহেন্দ্র কোন কথা কহিলেন না। সত্যানন্দ বুঝিলেন যে, মহেন্দ্র বিশ্বাস করিতেছেন না। তখন সত্যানন্দ বলিলেন, "বিশ্বাস করিতেছ না–পরীক্ষা করিয়া

দেখ।” এই বলিয়া সত্যানন্দ কারাগারের দ্বার পর্য্যন্ত আসিলেন। কি করিলেন, অন্ধকারে মহেন্দ্র কিছু দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু কাহারও সঙ্গে কথা কহিলেন, ইহা বুঝিলেন। ফিরিয়া আসিলে মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি পরীক্ষা?”

সত্য। তুমি এখনই কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিবে।

এই কথা বলিতে বলিতে কারাগারের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। এক ব্যক্তি ঘরের ভিতর আসিয়া বলিল, “মহেন্দ্র সিংহ কাহার নাম?”

মহেন্দ্র বলিল, “আমার নাম।”

আগন্তুক। বলিল, “তোমার খালাসের হুকুম হইয়াছে– যাইতে পার।”

মহেন্দ্র প্রথমে বিস্মিত হইলেন–পরে মনে করিলেন মিথ্যা কথা। পরীক্ষার্থ বাহির হইলেন। কেহ তাঁহার গতিরোধ করিল না। মহেন্দ্র রাজপথ পর্য্যন্ত চলিয়া গেলেন।

এই অবসরে আগন্তুক সত্যানন্দকে বলিল, “মহারাজ! আপনিও কেন যান না? আমি আপনারই জন্য আসিয়াছি।”

সত্য। তুমি কে? ধীরানন্দ গোঁসাই?

ধীর। আজ্ঞে হাঁ।

সত্য। প্রহরী হইলে কি প্রকারে?

ধীর। ভবানন্দ আমাকে পাঠাইয়াছেন। আমি নগরে আসিয়া আপনারা এই কারাগারে আছেন শুনিয়া এখানে কিছু ধুতুরামিশান সিদ্ধি লইয়া আসিয়াছিলাম। যে খাঁ সাহেব পাহারায় ছিলেন, তিনি তাহা সেবন করিয়া ভূমিশয্যায় নিদ্রিত আছেন। এই জামাজোড়া পাগড়ি বর্শা যাহা আমি পরিয়া আছি, সে তাঁহারই।

সত্য। তুমি উহা পরিয়া নগর হইতে বাহির হইয়া যাও। আমি এরূপে যাইব না।

ধীর। কেন– সে কি?

সত্য। আজ সন্তানের পরীক্ষা।

মহেন্দ্র ফিরিয়া আসিলেন। সত্যানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, “ফিরিলে যে?”

মহেন্দ্র। আপনি নিশ্চিত সিদ্ধ পুরুষ। কিন্তু আমি আপনার সঙ্গ ছাড়িয়া যাইব না।

সত্য। তবে থাক। উভয়েই আজ রাত্রে অন্য প্রকারে মুক্ত হইব।

ধীরানন্দ বাহিরে গেল। সত্যানন্দ ও মহেন্দ্র কারাগারমধ্যে বাস করিতে লাগিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ব্রহ্মচারীর গান অনেকে শুনিয়াছিল। অন্যান্য লোকের মধ্যে জীবানন্দের কাণে সে গান গেল। মহেন্দ্রের অনুবর্ত্তী হইবার তাহার প্রতি আদেশ ছিল, ইহা পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে। পথিমধ্যে একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সে সাত দিন খায় নাই। রাস্তার ধারে পড়িয়া ছিল। তাহার জীবনদান জন্য জীবানন্দ

দণ্ড দুই বিলম্ব করিয়াছিলেন। মাগীকে বাঁচাইয়া তাহাকে অতি কর্দয্য ভাষায় গালি দিতে দিতে (বিলম্বের অপরাধ তার) এখন আসিতেছিলেন। দেখিলেন, প্রভুকে মুসলমানে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে– প্রভু গান গায়িতে গায়িতে চলিয়াছেন–

জীবানন্দ মহাপ্রভু সত্যানন্দের সঙ্কেত সকল বুঝিতেন

"ধীরসমীরে তটিনীতীরে
বসতি বনে বরনারী।"

নদীর ধারে আবার কোন মাগী না খেয়ে পড়িয়া আছে না কি? ভাবিয়া চিন্তিয়া, জীবানন্দ নদীর ধারে ধারে চলিলেন। জীবানন্দ দেখিয়াছিলেন যে, ব্রহ্মচারী স্বয়ং মুসলমান কর্ত্তৃক নীত হইতেছেন। এ স্থলে, ব্রহ্মচারীর উদ্ধারই তাঁহার প্রথম কাজ। কিন্তু জীবানন্দ ভাবিলেন, "এ সঙ্কেতের সে অর্থ নয়। তাঁহার জীবনরক্ষার অপেক্ষাও তাঁহার আজ্ঞাপালন বড়–এই তাঁহার কাছে প্রথম শিখিয়াছি। অতএব তাঁহার আজ্ঞাপালনই করিব।"

নদীর ধারে ধারে জীবানন্দ চলিলেন। যাইতে যাইতে সেই বৃক্ষতলে নদীতীরে দেখিলেন যে, এক স্ত্রীলোকের মৃতদেহ আর এক জীবিতা শিশুকন্যা। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, মহেন্দ্রের স্ত্রী কন্যাকে জীবানন্দ একবারও দেখেন নাই। মনে করিলেন, হইলে হইতে পারে যে, ইহারাই মহেন্দ্রের স্ত্রী কন্যা। কেন না, প্রভুর সঙ্গে মহেন্দ্রকে দেখিলাম। যাহা হউক, মাতা মৃতা, কন্যাটি জীবিতা। আগে ইহার রক্ষাবিধান করা চাই– নহিলে বাঘ ভালুক খাইবে। ভবানন্দ ঠাকুর এইখানেই কোথায় আছেন, তিনি স্ত্রীলোকটির সৎকার করিবেন, এই ভাবিয়া জীবানন্দ বালিকাকে কোলে তুলিয়া লইয়া চলিলেন।

মেয়ে কোলে তুলিয়া জীবানন্দ গোঁসাই সেই নিবিড় জঙ্গলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। জঙ্গল পার হইয়া একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে প্রবেশ করিলেন। গ্রামখানির নাম ভৈরবীপুর। লোকে বলিত ভরুইপুর। ভরুইপুরে কতকগুলি সামান্য লোকের বাস, নিকটে আর বড় গ্রাম নাই, গ্রাম পার হইয়াই আবার জঙ্গল। চারি দিকে জঙ্গল– জঙ্গলের মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম, কিন্তু গ্রামখানি বড় সুন্দর। কোমলতৃণাবৃত গোচারণভূমি, কোমল শ্যামল পল্লবযুক্ত আম, কাঁটাল, জাম, তালের বাগান, মাঝে নীলজলপরিপূর্ণ স্বচ্ছ দীর্ঘিকা। তাহাতে জলে বক, হংস, ডাহুক; তীরে কোকিল, চক্রবাক; কিছু দূরে ময়ূর উচ্চরবে কেকাধ্বনি করিতেছে। গৃহে গৃহে, প্রাঙ্গণে গাভী, গৃহের মধ্য মরাই, কিন্তু আজকাল দুর্ভিক্ষে ধান নাই–কাহারও চালে একটি ময়নার পিঁজরে, কাহারও দেওয়ালে আলিপনা–কাহারও উঠানে শাকের ভূমি। সকলই দুর্ভিক্ষপীড়িত, কৃশ, শীর্ণ, সন্তাপিত। তথাপি এই গ্রামের লোকের একটু শ্রীছাঁদ আছে–জঙ্গলে অনেক রকম মনুষ্যখাদ্য জন্মে, এজন্য জঙ্গল হইতে খাদ্য আহরণ করিয়া সেই গ্রামবাসীরা প্রাণ ও স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারিয়াছিল।

একটি বৃহৎ আম্রকাননমধ্যে একটি ছোট বাড়ী। চারি দিকে মাটির প্রাচীর, চারি দিকে চারিখানি ঘর। গৃহস্থের গোরু আছে, ছাগল আছে, একটা ময়ূর আছে, একটা ময়না আছে, একটা টিয়া আছে। একটা বাঁদর ছিল, কিন্তু সেটাকে আর খাইতে দিতে পারে না বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। একটা ঢেঁকি আছে, বাহিরে খামার আছে, উঠানে লেবুগাছ আছে, গোটাকতক মল্লিকা যুঁইয়ের গাছ আছে, কিন্তু এবার তাতে ফুল নাই। সব ঘরের দাওয়ায় একটা একটা চরকা আছে; কিন্তু বাড়ীতে বড় লোক নাই। জীবানন্দ মেয়ে কোলে করিয়া সেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই জীবানন্দ একটা ঘরের দাওয়ায় উঠিয়া একটা চরকা লইয়া ঘেনর ঘেনর আরম্ভ করিলেন। সে ছোট মেয়েটি কখন চরকার শব্দ শুনে নাই। বিশেষতঃ মা ছাড়া হইয়া অবধি কাঁদিতেছে, চরকার শব্দ শুনিয়া ভয় পাইয়া আরও উচ্চ সপ্তকে উঠিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। তখন ঘরের ভিতর হইতে একটি সতের কি আঠার বৎসরের মেয়ে বাহির হইল। মেয়েটি বাহির হইয়াই দক্ষিণ গণ্ডে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি সন্নিবিষ্ট করিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইল।

“এ কি এ? দাদা চরকা কাটো কেন? মেয়ে কোথা পেলে? দাদা, তোমার মেয়ে হয়েছে না কি– আবার বিয়ে করেছ না কি?”

জীবানন্দ মেয়েটি আনিয়া সেই যুবতীর কোলে দিয়া তাহাকে কিল মারিতে উঠিলেন, বলিলেন, “বাঁদরী, আমার আবার মেয়ে, আমাকে কি হেজিপেঁজি পেলি না কি? ঘরে দুধ আছে?”

তখন সে যুবতী বলিল, “দুধ আছে বই কি, খাবে?”

জীবানন্দ বলিল, “হাঁ খাব।”

তখন সে যুবতী ব্যস্ত হইয়া দুধ জ্বাল দিতে গেল। জীবানন্দ ততক্ষণ চরকা ঘেনর ঘেনর করিতে লাগিলেন। মেয়েটি সেই যুবতীর কোলে গিয়া আর কাঁদে না। মেয়েটি কি ভাবিয়াছিল বলিতে পারি না–বোধ হয় এই যুবতীকে ফুল্লকুসুমতুল্য সুন্দরী দেখিয়া মা মনে করিয়াছিল। বোধ হয় উননের তাপের আঁচ মেয়েটিকে একবার লাগিয়াছিল, তাই সে একবার কাঁদিল। কান্না শুনিবামাত্র জীবানন্দ বলিলেন, “ও নিমি! ও পোড়ারমুখি! ও হনুমানি! তোর এখনও দুধ জ্বাল হলো না?” নিমি বলিল, “হয়েছে।” এই বলিয়া সে পাথর বাটীতে দুধ ঢালিয়া জীবানন্দের নিকট আসিয়া উপস্থিত করিল। জীবানন্দ কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, “ইচ্ছা করে যে, এই তপ্ত দুধের বাটী তোর গায়ে ঢালিয়া দিই–তুই কি মনে করেছিস্ আমি খাব না কি?”

নিমি জিজ্ঞাসা করিল, “তবে কে খাবে?”

জীবা। ঐ মেয়েটি খাবে দেখিছিস্ নে, ঐ মেয়েটিকে দুধ খাওয়া।

নিমি তখন আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া মেয়েকে কোলে শোয়াইয়া ঝিনুক লইয়া তাহাকে দুধ খাওয়াইতে বসিল। সহসা তাহার চক্ষু হইতে ফোঁটাকতক জল পড়িল। তাহার একটি ছেলে হইয়া মরিয়া গিয়াছিল, তাহারই ঐ ঝিনুক ছিল। নিমি তখনই হাত দিয়া জল মুছিয়া হাসিতে হাসিতে জীবানন্দকে জিজ্ঞাসা করিল, “হ্যাঁ দাদা, কার মেয়ে দাদা?”

জীবানন্দ বলিলেন, “তোর কি রে পোড়ারমুখী?”

নিমি বলিল, “আমায় মেয়েটি দেবে?”

জীবানন্দ বলিল, “তুই মেয়ে নিয়ে কি করবি?”

নিমি। আমি মেয়েটিকে দুধ খাওয়াব, কোলে করিব, মানুষ করিব–বল্‌তে বল্‌তে ছাই পোড়ার চক্ষের জল আবার আসে, আবার নিমি হাত দিয়া মুছে, আবার হাসে।

জীবানন্দ বলিল, “তুই নিয়ে কি করবি? তোর কত ছেলে মেয়ে হবে।”

নিমি। তা হয় তবে, এখন এ মেয়েটি দাও, এর পর না হয় নিয়ে যেও।

জীবা। তা নে, নিয়ে মরগে যা। আমি এসে মধ্যে মধ্যে দেখে যাব। উটি কায়েতের মেয়ে, আমি চল্‌লুম এখন–

নিমি। সে কি দাদা, খাবে না! বেলা হয়েছে যে। আমার মাথা খাও, দুটি খেয়ে যাও।

জীবা। তোর মাথা খাব, আবার দুটি খাব? দুই ত পেরে উঠবো না দিদি। মাথা রেখে দুটি ভাত দে।

নিমি তখন মেয়ে কোলে করিয়া ভাত বাড়িতে ব্যতিব্যস্ত হইল।

নিমি পিঁড়ি পাতিয়া জলছড়া দিয়া জায়গা মুছিয়া মল্লিকাফুলের মত পরিষ্কার অন্ন, কাঁচা কলায়ের ডাল, জঙ্গুলে ডুমুরের দালনা, পুকুরের রুইমাছের ঝোল, এবং দুগ্ধ আনিয়া জীবানন্দকে খাইতে দিল। খাইতে বসিয়া জীবানন্দ বলিলেন, "নিমাই দিদি, কে বলে মন্বন্তর? তোদের গাঁয়ে বুঝি মন্বন্তর আসে নি?"

নিমি বলিল, "মন্বন্তর আস্‌বে না কেন, বড় মন্বন্তর, তা দুটি মানুষ, ঘরে যা আছে, লোককে দিই থুই ও আপনারা খাই। আমাদের গাঁয়ে বৃষ্টি হইয়াছিল, মনে নাই?—তুমি যে সেই বরিয়া গেলে, বনে বৃষ্টি হয়। তা আমাদের গাঁয়ে কিছু কিছু ধান হয়েছিল—আর সবাই সহরে বেচে এলো—আমার বেচি নাই।"

জীবানন্দ বলিল, "বোনাই কোথা?"

নিমি ঘাড় হেঁট করিয়া চুপি চুপি বলিল, "সে দুই তিন চাল লইয়া কোথায় বেরিয়েছেন। কে নাকি চাল চেয়েছে।"

এখন জীবানন্দের অদৃষ্টে এরূপ আহার অনেক কাল হয় নাই। জীবানন্দ আর বৃথা বাক্যব্যয় সময় নষ্ট না করিয়া গপ্ গপ্ টপ্ টপ্ সপ্ সপ্ প্রভৃতি নানাবিধ শব্দ করিয়া অতি অল্পকালমধ্যে অন্নব্যঞ্জনাদি শেষ করিলেন। এখন শ্রীমতী নিমাইমণি শুধু আপনার ও স্বামীর জন্য রাধিয়াছিলেন, আপনার ভাতগুলি দাদাকে দিয়াছিলেন, পাথর শূন্য দেখিয়া অপ্রতিভ হইয়া স্বামীর অন্নব্যঞ্জনগুলি আনিয়া ঢালিয়া দিলেন। জীবানন্দ ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সে সকলই উদরনামক বৃহৎ গর্ত্তে প্রেরণ করিলেন। তখন নিমাইমণি বলিল, "দাদা, আর কিছু খানে?"

জীবানন্দ বলিল, "আর কি আছে?"

নিমাইমণি বলিল, "একটা পাকা কাঁটাল আছে।"

নিমাই সে পাকা কাঁটাল আনিয়া দিল— বিশেষ কোন আপত্তি না করিয়া জীবানন্দ গোস্বামী কাঁটালটিকেও সেই ধ্বংসপুরে পাঠাইলেন। তখন নিমাই হাসিয়া বলিল, "দাদা আর কিছু নাই।"

দাদা বলিলেন, "তবে যা। আর এক দিন আসিয়া খাইব।"

অগত্যা নিমাই জীবানন্দকে আঁচাইবার জল দিল। জল দিতে দিতে নিমাই বলিল, "দাদা, আমার একটি কথা রাখবে?"

জীবা। কি?

নিমি। আমার মাথা খাও।

জীবা। কি বল, না পোড়ারমুখী।

নিমি। কথা রাখবে?

জীবা। কি আগে বল্ না।

নিমি। আমার মাথা খাও—পায়ে পড়ি।

জীবা। তোর মাথাও খাই—তুই পায়েও পড়, কিন্তু কি বল্?

নিমাই তখন এক হাতে আর এক হাতের আঙ্গুলগুলি টিপিয়া, ঘাড় হেঁট করিয়া, সেইগুলি নিরীক্ষণ করিয়া, একবার জীবানন্দের মুখপানে চাহিয়া, একবার মাটিপানে চাহিয়া, শেষ মুখ ফুটিয়া বলিল, "একবার বউকে ডাক্‌বো?"

জীবানন্দ আঁচাইবার গাড়ু তুলিয়া নিমির মাথায় মারিতে উদ্যত; বলিলেন, "আমার মেয়ে ফিরিয়ে দে, আর আমি এক দিন চাল দাল ফিরিয়া দিয়া যাইব।

তুই বাঁদরী, তুই পোড়ারমুখী, তুই যা না বলবার, তাই আমাকে বলিস্।”

নিমাই বলিল, “তা হউক, আমি বাঁদরী, আমি পোড়ারমুখী। একবার বউকে ডাক্‌বো?”

জীবা। “আমি চললুম।” এই বলিযা জীবনন্দ হন্ হন্ করিয়া বাহির হইয়া যায়–নিমাই গিয়া দ্বারে দাঁড়াইল, দ্বারের কবাট রুদ্ধ করিয়া, দ্বারে পিঠ দিয়া বলিল, “আগে আমার মেরে ফেল, তবে তুই যাও। বউয়ের সঙ্গে না দেখা করে তুমি যেতে পারবে না।”

জীবানন্দ বলিল, “আমি কত লোক মারিয়া ফেলিয়াছি, তা তুই জানিস্?”

এইবার নিমি রাগ করিল, বলিল, “বড় কীর্ত্তিই করেছ–স্ত্রী ত্যাগ কর্‌বে, লোক মারবে, আমি তোমার ভয় করবো! তুমিও যে বাপের সন্তান, আমিও সেই বাপের সন্তান–লোক মারা যদি বড়াইয়ের কথা হয়, আমায় মেরে বড়াই কর।”

জীবানন্দ হাসিল, “ডেকে নিয়ে আয়–পাপিষ্ঠাকে ডেকে নিয়ে আস্‌বি নিয়ে আয়, কিন্তু দেখ্, ফের যদি এমন কথা বল্‌বি, তোকে কিছু বলি না বলি, সেই শালার ভাই শালাকে মাথা মুড়াইয়া দিয়া ঘোল ঢেলে উল্টা গাধায় চড়িয়ে দেশের বার করে দিব।”

নিমি মনে মনে বলিল, “আমিও ত হলে বাঁচি।” এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে নিমি বাহির হইয়া গেল, নিকটবর্ত্তী এক পর্ণকুটীরে গিয়া প্রবেশ করিল। কুটীরমধ্যে শতগ্রন্থিযুক্ত বসনপরিধানা রুক্ষকেশা এক স্ত্রীলোক বসিয়া চরকা কাটিতেছিল। নিমাই গিয়া বলিল, “বউ শিগ্‌গির, শিগ্‌গির!” বউ বলিল, “শিগ্‌গির কি লো! ঠাকুরজামাই তোকে মেরেছে নাকি, ঘায়ে তেল মাখিয়ে দিতে হবে?”

নিমি। কাছাকাছি বটে, তেল আছে ঘরে?

সে স্ত্রীলোক তৈলের ভাণ্ড বাহির করিয়া দিল। নিমাই ভাণ্ড হইতে তাড়াতাড়ি অঞ্জলি অঞ্জলি তৈল লইয়া সেই স্ত্রীলোকের মাথায় মাখাইয়া দিল। তাড়াতাড়ি একটা চলনসই খোঁপা বাঁধিয়া দিল। তার পর তাহাকে এক কীল মারিয়া বলিল, “তোর সেই ঢাকাই কোথা আছে বল।” সে স্ত্রীলোক কিছু বিস্মিতা হইয়া বলিল, “কি লো, তুই কি খেপেছিস্ না কি?”

নিমাই দুম করিয়া তাহার পিঠে এক কীল মারিল, বলিল, “শাড়ি বের কর।”

রঙ্গ দেখিবার জন্য সে স্ত্রীলোক শাড়িখানি বাহির করিল। রঙ্গ দেখিবার জন্য, কেন না, এত দুঃখেও রঙ্গ দেখিবার যে বৃত্তি, তাহা তাহার হৃদয়ে লুপ্ত হয় নাই। নবীন যৌবন; ফুল্লকমলতুল্য তাহার নববয়সের সৌন্দর্য্য; তৈল নাই,–বেশ নাই–আহার নাই–তবু সেই প্রদীপ্ত, অননুমেয় সৌন্দর্য্য সেই শতগ্রন্থিযুক্ত বসনমধ্যেও প্রস্ফুটিত। বর্ণে ছায়ালোকের চাঞ্চল্য, নয়নে কটাক্ষ, অধরে হাসি, হৃদয়ে ধৈর্য্য। আহার নাই–তবু শরীর লাবণ্যময়, বেশভুষা নাই, তবু সে সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ অভিব্যক্ত। যেমন মেঘমধ্যে বিদ্যুৎ, যেমন মনোমধ্যে প্রতিভা, যেমন জগতের শব্দমধ্যে সঙ্গীত, যেমন মরণের ভিতর সুখ, তেমনি সে রূপরাশিতে অনির্ব্বচনীয় কি ছিল! অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য, অনির্ব্বচনীয় উন্নতভাব, অনির্ব্বচনীয় প্রেম, অনির্ব্বচনীয় ভক্তি। সে হাসিতে হাসিতে (কেহ সে হাসি দেখিল না) হাসিতে হাসিতে সেই ঢাকাই শাড়ি বাহির করিয়া দিল। বলিল, “কি লো নিমি, কি হইবে?” নিমাই বলিল, “তুই পর্‌বি।” সে বলিল, “আমি পরিলে কি হইবে?” তখন নিমাই তাহার কমনীয় কণ্ঠে আপনার কমনীয় বাহু বেষ্টন করিয়া বলিল, “দাদা এসেছে, তোকে যেতে বলেছে!” সে বলিল, “আমায় যেতে বলেছেন! ত ঢাকাই শাড়ি কেন? চল না এমনি যাই।” নিমাই তার গালে এক চড় মারিল– সে নিমাইয়ের কাঁধে হাত দিয়া তাহাকে কুটীরের বাহির করিল। বলিল, “চল, এই ন্যাক্‌ড়া পরিয়া তাঁহাকে দেখিয়া আসি।” কিছুতেই কাপড় বদলাইল না, অগত্য নিমাই রাজি হইল। নিমাই তাহাকে সঙ্গে লইয়া আপনার বাড়ীর দ্বার পর্য্যন্ত

গেল, গিয়া তাহাকে ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া আপনি দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সে স্ত্রীলোকের বয়স প্রায় পঁচিশ বৎসর, কিন্তু দেখিলে নিমাইয়ের অপেক্ষা অধিকবয়স্কা বলিয়া বোধ হয় না। মলিন, গ্রন্থিযুক্ত বসন পরিয়া সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, বোধ হইল যেন, গৃহ আলো হইল। বোধ হইল, পাতায় ঢাকা কোন গাছের কত ফুলের কুঁড়ি ছিল, হঠাৎ ফুটিয়া উঠিল; বোধ হইল যেন, কোথায় গোলাপজলের কার্ব্বা মুখ আঁটা ছিল, কে কার্ব্বা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। যেন কে প্রায় নিবান আগুনে ধূপ ধুনা গুগ্‌গুল ফেলিয়া দিল। সে রূপসী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ স্বামীর অন্বেষণ করিতে লাগিল, প্রথমে ত দেখিতে পাইল না। তার পর দেখিল, গৃহপ্রাঙ্গণে একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষ আছে, আম্রের কাণ্ডে মাথা রাখিয়া জীবানন্দ কাঁদিতেছেন। সেই রূপসী তাঁহার নিকটে গিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার হস্তধারণ করিল। বলি না যে, তাহার চক্ষে জল আসিল না, জগদীশ্বর জানেন যে, তাহার চক্ষে যে স্রোতঃ আসিয়াছিল, বহিলে তাহা জীবানন্দকে ভাসাইয়া দিত; কিন্তু সে তাহা বহিতে দিল না। জীবানন্দের হাত হাতে লইয়া বলিল, "ছি কাঁদিও না; আমি জানি, তুমি আমার জন্য কাঁদিতেছ, আমার জন্য তুমি কাঁদিও না– তুমি যে প্রকারে আমাকে রাখিয়াছ, আমি তাহাতেই সুখী।"

জীবানন্দ মাথা তুলিয়া চক্ষু মুছিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "শান্তি! তোমার এ শতগ্রন্থি মলিন বস্ত্র কেন? তোমার ত খাইবার পরিবার অভাব নাই।"

শান্তি বলিল, "তোমার ধন, তোমারই জন্য আছে। আমি টাকা লইয়া কি করিতে হয়, তাহা জানি না। যখন তুমি আসিবে, যখন তুমি আমাকে আবার গ্রহণ করিবে–"

জীবা। গ্রহণ করিব– শান্তি! আমি কি তোমায় ত্যাগ করিয়াছি?

শান্তি। ত্যাগ নহে– যবে তোমার ব্রত সাঙ্গ হইবে, যবে আবার আমায় ভালবাসিবে–

কথা শেষ না হইতেই জীবানন্দ শান্তিকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, তাহার কাঁধে মাথা রাখিয়া অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া শেষে বলিলেন, "কেন দেখা করিলাম!"

শান্তি। কেন করিলে–তোমার ত ব্রতভঙ্গ করিলে?

জীবা। ব্রতভঙ্গ হউক–প্রায়শ্চিত্ত আছে। তাহার জন্য ভাবি না, কিন্তু তোমায় দেখিয়া ত আর ফিরিয়া যাইতে পারতেছি না। আমি এই জন্য নিমাইকে বলিয়াছিলাম যে, দেখায় কাজ নাই। তোমায় দেখিলে আমি ফিরিতে পারি না। এক দিকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, জগৎসংসার; এক দিকে ব্রত, হোম, যাগ, যজ্ঞ; সবই এক দিকে আর এক দিকে তুমি। একা তুমি। আমি সকল সময় বুঝিতে পারি না যে, কোন্ দিকে ভারি হয়। দেশ ত শান্তি, দেশ লইয়া আমি কি করিব? দেশের এক কাঠা ভুঁই পেলে তোমায় লইয়া আমি স্বর্গ প্রস্তুত করিতে পারি, আমার দেশে কাজ কি? দেশের লোকের দুঃখ,–যে তোমা হেন স্ত্রী পাইয়া ত্যাগ করিল– তাহার অপেক্ষা দেশে আর কে দুঃখী আছে? যে তোমার অঙ্গে শতগ্রন্থি বস্ত্র দেখিল, তাহার অপেক্ষা দরিদ্র দেশে আর কে আছে? আমার সকল ধর্ম্মের সহায় তুমি। সে সহায় যে ত্যাগ করিল, তার কাছে আবার সনাতন ধর্ম্ম কি? আমি কোন্ ধর্ম্মের জন্য দেশে দেশে, বনে বনে, বন্দুক ঘাড়ে করিয়া, প্রাণিহত্যা করিয়া এই পাপের ভার সংগ্রহ করি? পৃথিবী সন্তানদের আয়ত্ত হইবে কি না জানি না; কিন্তু তুমি আমার আয়ত্ত, তুমি পৃথিবীর অপেক্ষা বড়, তুমি

আমার স্বর্গ। চল গৃহে যাই–আর আমি ফিরিব না।

শান্তি কিছু কাল কথা কহিতে পারিল না। তার পর বলিল,– "ছি–তুমি বীর। আমার পৃথিবীতে বড় সুখ যে, আমি বীরপত্নী। তুমি অধম স্ত্রীর জন্য বীরধর্ম্ম ত্যাগ করিবে? তুমি আমায় ভালবাসিও না–আমি সে সুখ চাহি না– কিন্তু তোমার বীরধর্ম্ম কখন ত্যাগ করিও না। দেখ–আমাকে একটা কথা বলিয়া যাও–এ ব্রতভঙ্গের প্রায়শ্চিত কি?"

জীবানন্দ বলিলেন, "প্রায়শ্চিত্ত–দান– উপবাস– ২২ কাহন কড়ি।"

শান্তি ঈষৎ হাসিল। বলিল, "প্রায়শ্চিত্ত কি, তা আমি জানি। এক অপরাধে যে প্রায়শ্চিত্ত–শত অপরাধে কি তাই?"

জীবানন্দ বিস্মিত ও বিষণ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ সকল কথা কেন?"

শান্তি। এক ভিক্ষা আছে। আমার সঙ্গে আবার দেখা না হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিও না।

জীবানন্দ তখন হাসিয়া বলিল, "সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিও। তোমাকে না দেখিয়া আমি মরিব না। মরিবার তত তাড়াতাড়ি নাই। আর আমি এখানে থাকিব না, কিন্তু চোখ ভরিয়া তোমাকে দেখিতে পাইলাম না, এক দিন অবশ্য সে দেখা দেখিব। এক দিন অবশ্য আমাদের মনস্কামনা সফল হইবে। আমি এখন চলিলাম, তুমি আমার এক অনুরোধ রক্ষা করিও। এ বেশভূষা ত্যাগ কর। আমার পৈতৃক ভিটায় গিয়া বাস কর।"

শান্তি জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখন কোথায় যাইবে?"

জীবা। এখন মঠে ব্রহ্মচারীর অনুসন্ধানে যাইব। তিনি যে ভাবে নগরে গিয়াছেন, তাহাতে কিছু চিন্তাযুক্ত হইয়াছি; দেউলে তাঁহার সন্ধান না পাই, নগরে যাইব।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

ভবানন্দ মঠের ভিতর বসিয়া হরিগুণ গান করিতেছিলেন। এমত সময়ে বিষণ্নমুখে জ্ঞানানন্দনামা একজন অতি তেজস্বী সন্তান তাঁহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভবানন্দ বলিলেন, "গোঁসাই, মুখ অত ভারি কেন?"

জ্ঞানানন্দ বলিলেন, "কিছু গোলযোগ বোধ হইতেছে। কালিকার কাণ্ডটার জন্য নেড়েরা গেরুয়া কাপড় দেখিতেছে, আর ধরিতেছে। অপরাপর সন্তানগণ আজ সকলেই গৈরিক বসন ত্যাগ করিয়াছে। কেবল সত্যানন্দ প্রভু গেরুয়া পরিয়া একা নগরাভিমুখে গিয়াছেন। কি জানি, যদি তিনি মুসলমানের হাতে পড়েন।

ভবানন্দ বলিলেন, "তাঁহাকে আটক রাখে, এমন মুসলমান বাঙ্গালায় নাই। ধীরানন্দ তাঁহার পশ্চাদগামী হইয়াছেন জানি। তথাপি আমি একবার নগর বেড়াইয়া আসি। তুমি মঠ রক্ষা করিও।"

এই বলিয়া ভবানন্দ এক নিভৃত কক্ষে গিয়া একটা বড় সিন্দুক হইতে কতকগুলি বস্ত্র বাহির করিলেন। সহসা ভবানন্দের রূপান্তর হইল, গেরুয়া বসনের পরিবর্ত্তে চুড়িদার পায়জামা, মেরজাই, কাবা, মাথায় আমামা, এবং পায়ে নাগরা শোভিত হইল। মুখ হইতে ত্রিপুণ্ড্রাদি চন্দনচিহ্নসকল বিলুপ্ত করিলেন। ভ্রমরকৃষ্ণগুম্ফশ্মশ্রুশোভিত সুন্দর মুখমণ্ডল অপূর্ব্ব শোভা পাইল। তৎকালে তাঁহাকে দেখিয়া মোগলজাতীয় যুবা পুরুষ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

ভবানন্দ এইরূপে মোগল সাজিয়া, সশস্ত্র হইয়া মঠ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সেখান হইতে ক্রোশৈক দূরে দুইটি অতি অনুচ্চ পাহাড় ছিল। সেই পাহাড়ের উপর জঙ্গল উঠিয়াছে। সেই দুইটি পাহাড়ের মধ্যে একটি নিভৃত স্থান ছিল। তথায় অনেকগুলি অশ্ব রক্ষিত হইয়াছিল। মঠবাসীদিগের অশ্বশালা এইখানে। ভবানন্দ তাহার মধ্য হইতে একটি অশ্ব উন্মোচন করিয়া তৎপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক নগরাভিমুখে ধাবমান হইলেন।

যাইতে যাইতে সহসা তাঁহার গতি রোধ হইল। সেই পথিপার্শ্বে কলনাদিনী তরঙ্গিণীর কূলে, গগনভ্রষ্ট নক্ষত্রের ন্যায়, কাদম্বিনীচ্যুত বিদ্যুতের ন্যায়, দীপ্ত স্ত্রীমূর্ত্তি শয়ান দেখিলেন। দেখিলেন, জীবনলক্ষণ কিছু নাই– শূন্য বিষের কৌটা পড়িয়া আছে। ভবানন্দ বিস্মিত, ক্ষুব্ধ, ভীত হইলেন। জীবানন্দের ন্যায়, ভবানন্দও মহেন্দ্রের স্ত্রী-কন্যাকে দেখেন নাই। জীবানন্দ যে সকল কারণে সন্দেহ করিয়াছিলেন যে, এ মহেন্দ্রের স্ত্রীকন্যা হইতে পারে–ভবানন্দের কাছে সে সকল কারণ অনুপস্থিত। তিনি ব্রহ্মচারী ও মহেন্দ্রকে বন্দিভাবে নীত হইতে দেখেন নাই–কন্যাটিও সেখানে নাই। কৌটা দেখিয়া বুঝিলেন, কোন স্ত্রীলোক বিষ খাইয়া মরিয়াছে। ভবানন্দ সেই শবের নিকট বসিলেন, বসিয়া কপোলে কর লগ্ন করিয়া অনেকক্ষণ ভাবিলেন। মাথায়, বগলে, হাতে, পায়ে হাত দিয়া দেখিলেন; অনেক প্রকার অপরের অপরিজ্ঞাত পরীক্ষা করিলেন। তখন মনে মনে বলিলেন, এখনও সময় আছে, কিন্তু বাঁচাইয়া কি করিব। এইরূপ ভবানন্দ অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, চিন্তা করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি বৃক্ষের কতকগুলি পাতা লইয়া আসিলেন। পাতাগুলি হাতে পিষিয়া রস করিয়া সেই শবের ওষ্ঠ দন্ত ভেদ করিয়া অঙ্গুলি দ্বারা কিছু মুখে প্রবেশ করাইয়া দিলেন, পরে নাসিকায় কিছু কিছু রস দিলেন–অঙ্গে সেই রস মাখাইতে লাগিলেন। পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিতে লাগিলেন, মধ্যে মধ্যে নাকের কাছে হাত দিয়া দেখিতে লাগিলেন যে, নিঃশ্বাস বহিতেছে কি না। বোধ হইল, যেন যত্ন বিফল হইতেছে। এইরূপ বহুক্ষণ পরীক্ষা করিতে করিতে ভবানন্দের মুখ কিছু প্রফুল্ল হইল–অঙ্গুলিতে নিশ্বাসের কিছু ক্ষীণ প্রবাহ অনুভব করিলেন। তখন আরও পত্ররস নিষেক করিতে লাগিলেন। ক্রমে নিশ্বাস প্রখরতর বহিতে লাগিল। নাড়ীতে হাত দিয়া ভবানন্দ দেখিলেন নাড়ীর গতি হইয়াছে। শেষে অল্পে অল্পে পূর্ব্বদিকের প্রথম প্রভাতরাগ বিকাশের ন্যায় প্রভাতপদ্মের প্রথমোন্মেষের ন্যায়, প্রথম প্রেমানুভবের ন্যায়, কল্যাণী চক্ষুরুন্মীলন করিতে লাগিলেন। দেখিয়া ভবানন্দ সেই অর্দ্ধজীবিত দেহ অশ্বপৃষ্ঠে তুলিয়া লইয়া দ্রুতবেগে অশ্ব চালাইয়া নগরে গেলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা না হইতেই সন্তানসম্প্রদায় সকলেই জানিতে পারিয়াছিল যে, সত্যানন্দ ব্রহ্মচারী আর মহেন্দ্র, দুই জনে বন্দী হইয়া নগরের কারাগারে আবদ্ধ আছে। তখন একে একে, দুয়ে দুয়ে, দশে দশে, শতে শতে, সন্তানসম্প্রদায় আসিয়া সেই দেবালয়বেষ্টনকারী অরণ্য পরিপূর্ণ করিতে লাগিল। সকলেই সশস্ত্র। নয়নে রোষাগ্নি, মুখে দম্ভ, অধরে প্রতিজ্ঞা। প্রথমে শত, পরে সহস্র, পরে দ্বিসহস্র। এইরূপে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন মঠের দ্বারে দাঁড়াইয়া তরবারিহস্তে জ্ঞানানন্দ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, “আমরা অনেক দিন হইতে মনে করিয়াছি যে, এই বাবুইয়ের বাসা ভাঙ্গিয়া, এই যবনপুরী ছারখার করিয়া, নদীর জলে ফেলিয়া দিব। এই শূয়রের খোঁয়াড় আগুনে পোড়াইয়া মাতা বসুমতীকে আবার পবিত্র করিব। ভাই, আজ সেই দিন আসিয়াছে। আমাদের গুরুর গুরু, পরম গুরু, যিনি অনন্ত-জ্ঞানময়, সর্ব্বদা শুদ্ধাচার, যিনি লোকহিতৈষী, যিনি দেশহিতৈষী, যিনি সনাতন ধর্ম্মের পুনঃ প্রচার জন্য শরীরপাতন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন– যাঁহাকে বিষ্ণুর অবতারস্বরূপ মনে করি, যিনি আমাদের মুক্তির উপায়, তিনি আজ মুসলমানের কারাগারে বন্দী। আমাদের তরবারে কি ধার নাই?” হস্ত প্রসারণ করিয়া জ্ঞানানন্দ বলিলেন, “এই বাহুতে কি বল নাই?”–বক্ষে করাঘাত করিয়া বলিলেন, “এ হৃদয়ে কি সাহস নাই?–ভাই, ডাক, হরে মুরারে মধুকৈটভারে। –যিনি মধুকৈটভ

বিনাশ করিয়াছেন– যিনি হিরণ্যকশিপু, কংস, দন্তবক্র, শিশুপাল প্রভৃতি দুর্জ্জয় অসুরগণের নিধন সাধন করিয়াছেন– যাঁহার চক্রের ঘর্ঘরনির্ঘোষে মৃত্যুঞ্জয় শম্ভুও ভীত হইয়াছিলেন– যিনি অজেয়, রণে জয়দাতা, আমরা তাঁর উপাসক, তাঁর বলে আমাদের বাহুতে অনন্ত বল– তিনি ইচ্ছাময়, ইচ্ছা করিলেই আমাদের রণজয় হইবে। চল, আমরা সেই যবনপুরী ভাঙ্গিয়া ধূলিগুঁড়ি করি। সেই শূকরনিবাস অগ্নিসংস্কৃত করিয়া নদীর জলে ফেলিয়া দিই। সেই বাবুইয়ের বাসা ভাঙ্গিয়া খড় কুটা বাতাসে উড়াইয়া দিই। বল– হরে মুরারে মধুকৈটভারে।”

তখন সেই কানন হইতে অতি ভীষণ নাদে সহস্র সহস্র কণ্ঠে একেবারে শব্দ হইল, “হরে মুরারে মধুকৈটভারে।” সহস্র অসি একেবারে ঝনৎকার শব্দ করিল। সহস্র বল্লম ফলক সহিত ঊর্দ্ধ্বেউত্থিত হইল। সহস্র বাহুর আস্ফোটে বজ্রনিনাদ হইতে লাগিল। সহস্র ঢাল যোদ্ধৃবর্গের কর্কশ পৃষ্ঠে তড়বড় শব্দ করিতে লাগিল। মহাকোলাহলে পশুসকল ভীত হইয়া কানন হইতে পলাইল। পক্ষিসকল ভয়ে উচ্চ রব করিয়া গগনে উঠিয়া আচ্ছন্ন করিল। সেই সময়ে শত শত জয়ঢক্কা একেবারে নিনাদিত হইল। তখন “হরে মুরারে মধুকৈটভারে” বলিয়া কানন হইতে শ্রেণীবদ্ধ সন্তানের দল নির্গত হইতে লাগিল। ধীর, গম্ভীর পদবিক্ষেপে মুখে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে করিতে তাহারা সেই অন্ধকার রাত্রে নগরাভিমুখে চলিল। বস্ত্রের মর্ম্মর শব্দ, অস্ত্রের ঝনঝনা শব্দ, কণ্ঠের অস্ফুট নিনাদ, মধ্যে মধ্যে তুমুল রবে হরিবোল। ধীরে, গম্ভীরে, সরোষে, সতেজে, সেই সন্তানবাহিনী নগরে আসিয়া নগর বিত্রস্ত করিয়া ফেলিল। অকস্মাৎ এই বজ্রাঘাত দেখিয়া নাগরিকেরা কে কোথায় পলাইল, তাহার ঠিকানা নাই। নগররক্ষীরা হতবুদ্ধি হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল।

এদিকে সন্তানেরা প্রথমেই রাজকারাগারে গিয়া, কারাগার ভাঙ্গিয়া রক্ষিবর্গকে মারিয়া ফেলিল। এবং সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে মুক্ত করিয়া মস্তকে তুলিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। তকন অতিশয় হরিবোলের গোলযোগ পড়িয়া গেল। সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে মুক্ত করিয়াই, তাহারা যেখানে মুসলমানের গৃহ দেখিল, আগুন ধরাইয়া দিল। তখন সত্যানন্দ বলিলেন, “ফিরিয়া চল, অনর্থক অনিষ্ট সাধনে প্রয়োজন নাই।” সন্তানদিগের এই সকল দৌরাত্ম্যের সংবাদ পাইয়া দেশের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহাদিগের দমনার্থ এক দল “পরগণা সিপাহী” পাঠাইলেন। তাহাদের কেবল বন্দুক ছিল, এমত নহে, একটা কামানও ছিল। সন্তানেরা তাহাদের আগমন সংবাদ পাইয়া আনন্দকানন হইতে নির্গত হইয়া, যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। কিন্তু লাঠি সড়কি বা বিশ পঁচিশটা বন্দুক কামানের কাছে কি করিবে? সন্তানগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

শান্তির অল্পবয়সে, অতি শৈশবে মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল। যে সকল উপাদানে শান্তির চরিত্র গঠিত, ইহা তাহার মধ্যে একটি প্রধান। তাহার পিতা অধ্যাপক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার গৃহে অন্য স্ত্রীলোক কেহ ছিল না।

কাজেই শান্তির পিতা যখন টোলে ছাত্রদিগকে পড়াইতেন, শান্তি গিয়া তাঁহার কাছে বসিয়া থাকিত। টোলে কতকগুলি ছাত্র বাস করিত; শান্তি অন্য সময়ে তাহাদিগের কাছে বসিয়া খেলা করিত, তাহাদিগের কোলে পিঠে চড়িত; তাহারাও শান্তিকে আদর করিত।

এইরূপ শৈশব নিয়ত পুরুষসাহচর্য্যের প্রথম ফল এই হইল যে, শান্তি মেয়ের মত কাপড় পরিতে শিখিল না, অথবা শিখিয়া পরিত্যাগ করিল। ছেলের মত কোঁচা করিয়া কাপড় পরিতে আরম্ভ করিল, কেহ কখন মেয়ে কাপড় পরাইয়া দিলে, তাহা খুলিয়া ফেলিত, আবার কোঁচা করিয়া পরিত। টোলের ছাত্রেরা খোঁপা বাঁধে না; অতএব শান্তিও কখন খোঁপা বাধিত না–কে বা তার খোঁপা বাঁধিয়া দেয়? টোলের ছাত্রেরা কাঠের চিরুনি দিয়া তাহার চুল আঁচড়াইয়া দিত, চুলগুলো কুণ্ডলী করিয়া শান্তির পিঠে, কাঁধে, বাহুতে ও গালের উপর দুলিত। ছাত্রেরা ফোঁটা করিত, চন্দন মাখিত, শান্তিও ফোঁটা করিত, চন্দন মাখিত। যজ্ঞোপবীত গলায় দিতে পাইত না বলিয়া শান্তি বড় কাঁদিত। কিন্তু সন্ধ্যাহ্নিকের সময়ে ছাত্রদিগের কাছে বসিয়া, তাহাদের অনুকরণ করিতে ছাড়িত না। ছাত্রেরা অধ্যাপকের অবর্ত্তমানে, অশ্লীল সংস্কৃতের দুই চারিটা বুক্‌নি দিয়া, দুই একটি আদিরসাশ্রিত গল্প করিতেন, টিয়া পাখীর মত শান্তি সেগুলিও শিখিল–টিয়া পাখীর মত, তাহার অর্থ কি, তাহা কিছুই জানিত না।

দ্বিতীয় ফল এই হইল যে, শান্তি একটু বড় হইলেই ছাত্রেরা যাহা পড়িত, শান্তিও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে শিখিতে আরম্ভ করিল। ব্যাকরণের এক বর্ণ জানে না, কিন্তু ভট্টি, রঘু, কুমার, নৈষধাদির শ্লোক ব্যাখ্যা সহিত মুখস্থ করিতে লাগিল। দেখিয়া, শুনিয়া শান্তির পিতা "যদ্ভবিষ্যতি তদ্ভবিষ্যতি" বলিয়া শান্তিকে মুগ্ধবোধ আরম্ভ করাইলেন। শান্তি বড় শীঘ্র শীঘ্র শিখিতে লাগিল। অধ্যাপক বিস্মিয়াপন্ন হইলেন। ব্যাকরণের সঙ্গে সঙ্গে দুই একখানা সাহিত্যও পড়াইলেন। তার পর সব গোলমাল হইয়া গেল। পিতার পরলোকপ্রাপ্তি হইল।

তখন শান্তি নিরাশ্রয়। টোল উঠিয়া গেল; ছাত্রেরা চলিয়া গেল; কিন্তু শান্তিকে তাহারা ভালবাসিত– শান্তিকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিল না। একজন তাহাকে দয়া করিয়া আপনার গৃহে লইয়া গেল। ইনিই পশ্চাৎ সন্তানসম্প্রদায়মধ্যে প্রবেশ করিয়া জীবানন্দ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাকে জীবানন্দই বলিতে থাকিব।

তখন জীবানন্দের পিতা মাতা বর্ত্তমান। তাঁহাদিগের নিকট জীবানন্দ কন্যাটির সবিশেষ পরিচয় দিলেন। পিতা মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন এ পরের মেয়ের দায় ভার নেয় কে?" জীবানন্দ বলিলেন, "আমি আনিয়াছি– আমিই দায় ভার গ্রহণ করিব"। পিতা মাতা বলিলেন, "ভালই"। জীবানন্দ অনূঢ়–শান্তির বিবাহবয়স উপস্থিত। অতএব জীবানন্দ তাহাকে বিবাহ করিলেন।

বিবাহের পর সকলেই অনুতাপ করিতে লাগিলেন। সকলেই বুঝিলেন, "কাজটা ভাল হয় নাই।" শান্তি কিছুতেই মেয়ের মত কাপড় পরিল না; কিছুতেই চুল বাঁধিল না। সে বাটীর ভিতর থাকিত না; পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মিলিয়া খেলা করিত। জীবানন্দের বাড়ীর নিটকেই জঙ্গল, শান্তি জঙ্গলের ভিতর একা প্রবেশ করিয়া কোথায় ময়ূর, কোথায় হরিণ, কোথায় দুর্লভ ফুল ফল, এই সকল খুঁজিয়া বেড়াইত। শ্বশুর শাশুড়ী প্রথমে নিষেধ, পরে ভর্ৎসনা, পরে প্রহার করিয়া শেষে ঘরে শিকল দিয়া শান্তিকে কয়েদ রাখিতে আরম্ভ করিল। পীড়াপীড়িতে শান্তি বড় জ্বালাতন হইল। এক দিন দ্বার খোলা পাইয়া শান্তি কাহাকে না বলিয়া গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

জঙ্গলের ভিতর বাছিয়া বাছিয়া ফুল তুলিয়া কাপড় ছোবাইয়া শান্তি বাচ্চা সন্ন্যাসী সাজিল। তখন বাঙ্গালা জুড়িয়া দলে দলে সন্ন্যাসী ফিরিত। শান্তি ভিক্ষা

করিয়া খাইয়া জগন্নাথক্ষেত্রের রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইল। অল্পকালেই সেই পথে এক দল সন্ন্যাসী দেখা দিল। শান্তি তাহাদের সঙ্গে মিশিল।

তখন সন্ন্যাসীরা এখনকার সন্ন্যাসীদের মত ছিল না। তাহারা দলবদ্ধ সুশিক্ষিত, বলিষ্ঠ, যুদ্ধবিশারদ, এবং অন্যান্য গুণে গুণবান্ ছিল। তাহারা সচরাচর এক প্রকার রাজবিদ্রোহী–রাজার রাজস্ব লুটিয়া খাইত। বলিষ্ঠ বালক পাইলেই তাহারা অপহরণ করিত। তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া আপনাদিগের সম্প্রদায়ভুক্ত করিত। এজন্য তাহাদিগকে ছেলেধরা বলিত।

শান্তি বালকসন্ন্যাসীবেশে ইহাদের এক সম্প্রদায়মধ্যে মিশিল। তাহারা প্রথমে তাহার কোমলাঙ্গ দেখিয়া তাহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিল না, কিন্তু শান্তির বুদ্ধির প্রাখর্য্য, চতুরতা, এবং কর্ম্মদক্ষতা দেখিয়া আদর করিয়া দলে লইল। শান্তি তাহাদিগের দলে থাকিয়া ব্যায়াম করিত, অস্ত্রশিক্ষা করিত, অস্ত্রশিক্ষা করিত, এবং পরিশ্রমসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। তাহাদিগের সঙ্গে থাকিয়া অনেক দেশ বিদেশ পর্য্যটন করিল; অনেক লড়াই দেখিল, এবং অনেক কাজ শিখিল।

ক্রমশঃ তাহার যৌবনলক্ষণ দেখা দিল। অনেক সন্ন্যাসী জানিল যে, এ ছদ্মবেশিনী স্ত্রীলোক। কিন্তু সন্ন্যাসীরা সচরাচর জিতেন্দ্রিয়; কেহ কোন কথা কহিল না।

সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে অনেকে পণ্ডিত ছিল। শান্তি সংস্কৃতে কিছু ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছে দেখিয়া, একজন পণ্ডিত সন্ন্যাসী তাহাকে পড়াইতে লাগিলেন। সচরাচর সন্ন্যাসীরা জিতেন্দ্রিয় বলিয়াছি, কিন্তু সকলে নহে। এই পণ্ডিতও নহেন। অথবা তিনি শান্তির অভিনব যৌবনবিকাশজনিত লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার নিপীড়িত হইতে লাগিলেন। শিষ্যাকে আদিরসাশ্রিত কাব্যসকল পড়াইতে আরম্ভ করিলেন, আদিরসাশ্রিত কবিতাগুলির অশ্রাব্য ব্যাখ্যা শুনাইতে লাগিলেন। তাহাতে শান্তির কিছু অপকার না হইয়া কিছু উপকার হইল। লজ্জা কাহাকে বলে, শান্তি তাহা শিখে নাই; তখন স্ত্রীস্বভাবসুলভ লজ্জা আসিয়া আপনি উপস্থিত হইল। পৌরুষ চরিত্রের উপর নির্ম্মল স্ত্রীচরিত্রের অপুর্ব্ব প্রভা আসিয়া পড়িয়া, শান্তির গুণগ্রাম উদ্ভাসিত করিতে লাগিল। শান্তি পড়া ছাড়িয়া দিল।

ব্যাধ যেমন হরিণীর প্রতি ধাবমান হয়, শান্তির অধ্যাপক শান্তিকে দেখিলেই তাহার প্রতি সেইরূপ ধাবমান হইতে লাগিলেন। কিন্ত শান্তি ব্যায়ামাদির দ্বারা পুরুষেরও দুর্লভ বলসঞ্চয় করিয়াছিল, অধ্যাপক নিকটে আসিলেই তাঁহাকে কিল-ঘুষার দ্বারা পূজিত করিত–কীল ঘুষাগুলি সহজ নহে। এক দিন সন্ন্যাসী ঠাকুর শান্তিকে নির্জ্জনে পাইয়া বড় জোর করিয়া শান্তির হাতখানা ধরিলেন, শান্তি ছাড়াইতে পারিল না। কিন্তু সন্ন্যাসীর দুর্ভাগ্যক্রমে হাতখানা শান্তির বাঁ হাত; দাহিন হাতে শান্তি তাহার কপালে এমন জোরে ঘুষা মারিল যে, সন্ন্যাসী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। শান্তি সন্ন্যাসীসম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

শান্তি ভয়শূন্যা। একাই স্বদেশের সন্ধানে যাত্রা করিল। সাহসের ও বাহুবলের প্রভাবে নির্ব্বিঘ্নে চলিল। ভিক্ষা করিয়া অথবা বন্য ফলের দ্বারা উদর পোষণ করিতে করিতে এবং অনেক মারামারিতে জয়ী হইয়া, শ্বশুরালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, শ্বশুর স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। কিন্তু শাশুড়ী তাহাকে গৃহে স্থান দিলেন না,– জাতি যাইবে। শান্তি বাহির হইয়া গেল।

জীবানন্দ বাড়ী ছিলেন। তিনি শান্তির অনুবর্ত্তী হইলেন। পথে শান্তিকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কেন আমার গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিলে? এত দিন কোথায় ছিলে?” শান্তি সকল সত্য বলিল। জীবানন্দ সত্য মিথ্যা চিনিতে পারিতেন। জীবানন্দ শান্তির কথায় বিশ্বাস করিলেন।

অপ্সরাগণের ভ্রূবিলাসযুক্ত কটাক্ষের জ্যোতি লইয়া অতি যত্নে নির্ম্মিত যে সম্মোহন শর, পুষ্পধন্বা তাহা পরিণীত দম্পতির প্রতি অপব্যয় করেন না। ইংরেজ পূর্ণিমার রাত্রে রাজপথে গ্যাস জ্বালে, বাঙ্গালী তেলা মাথায় তেল ঢালিয়া দেয়; মনুষ্যের কথা দূরে থাক, চন্দ্রবেদ, সূর্য্যদেবের পরেও কখন কখন আকাশে উদিত থাকেন, ইন্দ্র সাগরে বৃষ্টি করেন; যে সিন্দুকে টাকা ছাপাছাপি, কুবের সেই সিন্দুকেই টাকা লইয়া যান, যম যার প্রায় সবগুলিকেই গ্রহণ করিয়াছেন, তারই

বাকিটিকে লইয়া যান। কেবল রতিপতির এমন নির্ব্বুদ্ধির কাজ দেখা যায় না। যেখানে গাঁটছড়া বাঁধা হইল–সেখানে আর তিনি পরিশ্রম করেন না, প্রজাপতির উপর সকল ভার দিয়া, যাহার হৃদয়শোণিত পান করিতে পারিবেন, তাহার সন্ধানে যান। কিন্তু আজ বোধ হয় পুষ্পধন্বার কোন কাজ ছিল না– হঠাৎ দুইটা ফুলবাণ অপব্যয় করিলেন একটা আসিয়া জীবানন্দের হৃদয় ভেদ করিল– আর একটা আসিয়া শান্তির বুকে পড়িয়া, প্রথম শান্তিকে জানাইল যে, সে বুক মেয়েমানুষের বুক– বড় নরম জিনিস। নবমেঘনির্ম্মুক্ত প্রথম জলকণা নিষিক্ত পুষ্পকলিকার ন্যায়, শান্তি সহসা ফুটিয়া উঠিয়া, উৎফুল্লনয়নে জীবানন্দের মুখপানে চাহিল।

জীবানন্দ বলিল, "আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিব না। আমি যতক্ষণ না ফিরিয়া আসি, ততক্ষণ তুমি দাঁড়াইয়া থাক"।

শান্তি বলিল, "তুমি ফিরিয়া আসিবে ত"? জীবানন্দ কিছু উত্তর না করিয়া, কোন দিক্ না চাহিয়া, সেই পথিপার্শ্বস্থ নারিকেলকুঞ্জের ছায়ায় শান্তির অধরে অধর দিয়া সুধাপান করিলাম মনে করিয়া, প্রস্থান করিলেন।

মাকে বুঝাইয়া, জীবানন্দ মার কাছে বিদায় লইয়া আসিলেন। ভৈরবপুরে সম্প্রতি তাঁহার ভগিনী নিমাইয়ের বিবাহ হইয়াছিল। ভগিনীপতির সঙ্গে জীবানন্দের একটু সম্প্রীতি জন্মিয়াছিল। জীবানন্দ শান্তিকে লইয়া সেইখানে গেলেন। ভগিনীপতি একটু ভূমি দিল। জীবানন্দ তাহার উপর এক কুটীর নির্ম্মাণ করিলেন। তিনি শান্তিকে লইয়া সেইখানে সুখে বাস করিতে লাগিলেন। স্বামিসহবাসে শান্তির চরিত্রের পৌরুষ দিন দিন বিলীন বা প্রচ্ছন্ন হইয়া আসিল। রমণীর রমণীচরিত্রের নিত্য নবোন্মেষ হইতে লাগিল। সুখস্বপ্নের মত তাঁহাদের জীবন নির্ব্বাহিত হইত; কিন্তু সহসা যে সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইল। জীবানন্দ সত্যানন্দের হাতে পড়িয়া, সন্তানধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক শান্তিকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। পরিত্যাগের পর তাঁহাদের প্রথম সাক্ষাৎ নিমাইয়ের কৌশলে ঘটিল। তাহাই আমি পূর্ব্বপরিচ্ছেদে বর্ণি করিয়াছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জীবানন্দ চলিয়া গেলে পর শান্তি নিমাইয়ের দাওয়ার উপর গিয়া বসিল। নিমাই মেয়ে কোলে করিয়া তাহার নিকটে আসিয়া বসিল। শান্তির চোখে আর জল নাই; শান্তি চোখ মুছিয়াছে, মুখ প্রফুল্ল করিয়াছে,একটু একটু হাতিসেছে। কিছু গম্ভীর, কিছু চিন্তাযুক্ত অন্যমনা। নিমাই বুঝিয়া বলিল, "তবু ত দেখা হলো"।

শান্তি কিছুই উত্তর করিল না। চুপ করিয়া রহিল। নিমাই দেখিল, শান্তি মনের কথা কিছু বলিবে না। শান্তি মনের কথা বলিতে ভালবাসে না, তাহা নিমাই জানিত। সুতরাং নিমাই চেষ্টা করিয়া অন্য কথা পাড়িল– বলিল, "দেখ দেখি বউ কেমন মেয়েটি"।

শান্তি বলিল, "মেয়ে কোথা পেলি– তোর মেয়ে হলো কবে লো"।

নিমা। মরণ আর কি– তুমি যমের বাড়ী যাও– এ যে দাদার মেয়ে?

নিমাই শান্তিকে জ্বালাইবার জন্য এ কথাটা বলে নাই। "দাদার মেয়ে" অর্থাৎ দাদার কাছে যে মেয়েটি পাইয়াছি। শান্তি তাহা বুঝিল না; মনে করিল, নিমাই বুঝি সূচ ফুটাইবার চেষ্টা করিতেছে। অতএব শান্তি উত্তর করিল, "আমি মেয়ের বাপের কথা জিজ্ঞাসা করি নাই– মার কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছি।"

নিমাই উচিত শান্তি পাইয়া অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "কার মেয়ে কি জানি ভাই, দাদা কোথা থেকে কুড়িয়ে মুড়িয়ে এনেছে, তা জিজ্ঞাসা করবার ত অবসর

হলো না! তা এখন মন্বন্তরের দিন, কত লোক ছেলে পিলে পথে ঘাটে ফেলিয়া দিয়া যাইতেছে; আমাদের কাছেই কত মেয়ে ছেলে বেচিতে আনিয়াছিল, তা পরের মেয়ে ছেলে কি আবার নেয়?" (আবার সেই চক্ষে সেইরূপ জল আসিল– নিমি চক্ষের জল মুছিয়া আবার বলিতে লাগিল)

"মেয়েটি দিব্য সুন্দর, নাদুস্ নুদুস্ চাঁদপনা দেখে দাদার কাছে চেয়ে নিয়েছি।"

তার পর শান্তি অনেকক্ষণ ধরিয়া নিমাইয়ের সঙ্গে নানাবিধ কথোপকথন করিল। পরে নিমাইয়ের স্বামী বাড়ী ফিরিয়া আসিল দেখিয়া শান্তি উঠিয়া আপনার কুটীরে গেল। কুটীরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া উননের ভিতর হইতে কতকগুলি ছাই বাহির করিয়া তুলিয়া রাখিল। অবশিষ্ট ছাইয়ের উপর নিজের জন্য যে ভাত রান্না ছিল, তাহা ফেলিয়া দিল। তার পরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া আপনা আপনি বলিল, "এত দিন যাহা মনে করিয়াছিলাম, আজি তাহা করিব। যে আশায় এত দিন করি নাই, তাহা সফল হইয়াছে। সফল কি নিস্ফল– নিস্ফল! এ জীবনই নিস্ফল! যাহা সঙ্কল্প করিয়াছি, তাহা করিব। একবারেও যে প্রায়শ্চিত্ত, শতবারেও তাই।"

এই ভাবিয়া শান্তি ভাতগুলি উননে ফেলিয়া দিল। বন হইতে গাছের ফল পাড়িয়া আনিল। অন্নের পরিবর্ত্তে তাহাই ভোজন করিল। তার পর তাহার যে ঢাকাই শাড়ির উপর নিমাইমণির চোট, তাহা বাহির করিয়া তাহার পাড় ছিঁড়িয়া ফেলিল। বস্ত্রের যেটুকু অবশিষ্ট রহিল, গেরিমাটিতে তাহা বেশ করিয়া রঙ করিল। বস্ত্র রঙ করিতে, শুকাইতে সন্ধ্যা হইল। সন্ধ্যা হইলে দ্বার রুদ্ধ করিয়া অতি চমৎকার ব্যাপারে শান্তি ব্যাপৃত হইল। মাথার রুক্ষ আগুল্‌ফলম্বিত কেশদামের কিয়দংশ কাঁচি দিয়া কাটিয়া পৃথক্ করিয়া রাখিল। অবশিষ্ট যাহা মাথায় রহিল, তাহা বিনাইয়া জটা তৈয়ারি করিল। রুক্ষ কেশ অপূর্ব্ববিন্যাসবিশিষ্ট জটাভারে পরিণত হইল। তার পর সেই গৈরিক বসনখানি অর্দ্ধেক ছিঁড়িয়া ধড়া করিয়া চারু অঙ্গে শান্তি পরিধান করিল। অবশিষ্ট অর্দ্ধেকে হৃদয় আচ্ছাদিত করিল। ঘরে একখানি ক্ষুদ্র দর্পণ ছিল, বহুকালের পর শান্তি সেখানি বাহির করিল; বাহির করিয়া দর্পণে আপনার বেশ আপনি দেখিল। দেখিয়া বলিল, "হায়! কি করিয়া কির।" তখন দর্পণ ফেলিয়া দিয়া, যে চুলগুলি কাটা পড়িয়া ছিল, তাহা লইয়া শ্মশ্রুগুস্ফ রচিত করিল। কিন্তু পরিতে পারিল না। ভাবিল, "ছি! ছি! ছি! তাও কি হয়! সে দিনকাল কি আছে! তবে বুড়ো বেটাকে জব্দ করিবার জন্য, এ তুলিয়া রাখা ভাল।" এই ভাবিয়া শান্তি সেগুলি কাপড়ে বাঁধিয়া রাখিল। তার পর ঘরের ভিতর হইতে এক বৃহৎ হরিণচর্ম্ম বাহির করিয়া, কণ্ঠের উপর গ্রন্থি দিয়া, কণ্ঠ হইতে জানু পর্যন্ত শরীর আবৃত করিল। এইরূপে সজ্জিত হইয়া সেই নূতন সন্ন্যাসী গৃহমধ্যে ধীরে ধীরে চারি দিক্ নিরীক্ষণ করিল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর হইলে শান্তি সেই সন্ন্যাসিবেশে দ্বারোদ্ঘাটন পূর্ব্বক অন্ধকারে একাকিনী গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বনদেবীগণ সেই নিশীথে কাননমধ্যে অপূর্ব্ব গীতধ্বনি শ্রবণ করিল।

গীত* "দড় বড়ি ঘোড়া চড়ি কোথা তুমি যাও রে।"

"সমরে চলিনু আমি হামে না ফিরাও রে।
হরি হরি হরি হরি বলি রণরঙ্গে,
ঝাঁপ দিব প্রাণ আজি সময় তরঙ্গে,
তুমি কার কে তোমার, কেন এসো সঙ্গে,
রমণীতে নাহি সাধ, রণজয় গাও রে।"

---

* রাগিণী বাগীশ্বরী–তাল আড়া।

"পায়ে ধরি প্রাণনাথ আমা ছেড়ে যেও না।"
"ওই শুন বাজে ঘন রণজয় বাজনা।
নাচিছে তুরঙ্গ মোর রণ ক'রে কামনা,
উড়িল আমার মন, ঘরে আর বর না,
রমণীতে নাহি সাধ রণজয় গাও রে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন আনন্দ মঠের ভিতর নির্ভত কক্ষে বসিয়া ভগ্নোৎসাহ সন্তান নায়ক তিনজন কথোপকথন করিতেছিলেন। জীবানন্দ সত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! দেবতা আমাদিগের প্রতি এমন অপ্রসন্ন কেন? কি দোষে আমরা মুসলমানের নিকট পরাভূত হইলাম?"

সত্যানন্দ বলিলেন, "দেবতা অপ্রসন্ন নহেন। যুদ্ধে জয় পরাজয় উভয় আছে। সে দিন আমরা জয়ী হইয়াছিলাম। আর পরাভূত হইয়াছি, শেষ জয়ই জয়। আমার নিশ্চিত ভরসা আছে যে, যিনি এত দিন আমাদিগকে দয়া করিয়াছেন, সেই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বনমালী পুনর্ব্বার দয়া করিবেন। তাঁহার পাদস্পর্শ করিয়া যে মহাব্রতে আমরা ব্রতী হইয়াছি, অবশ্য যে ব্রত আমাদিগকে সাধন করিতে হইবে। বিমুখ হইলে আমরা অনন্ত নরক ভোগ করিব। আমাদের ভাবী মঙ্গলের বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। কিন্তু যেমন দৈবানুগ্রহ ভিন্ন কোন কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে না, তেমনি পুরুষকারও চাই। আমরা যে পরাভূত হইলাম, তাহার কারণ এই যে, আমরা নিরস্ত্র। গোলা গুলি বন্দুক কামানের কাছে লাঠি সোটা বল্লমে কি হইবে? অতএব আমাদিগের পুরুষকারের লাঘব ছিল বলিয়াই এই পরাভব হইয়াছে। এক্ষণে আমাদের কর্ত্তব্য, যাহাতে আমাদিগেরও ঐরূপ অস্ত্রের অপ্রতুল না হয়।"

জীব। সে অতি কঠিন ব্যাপার।

সত্য। কঠিন ব্যাপার জীবানন্দ? সন্তান হইয়া তুমি এমন কথা মুখে আনিলে? সন্তানের পক্ষে কঠিন কাজ আছে কি?

জীব। কি প্রকারে তাহার সংগ্রহ করিব, আজ্ঞা করুন।

সত্য। সংগ্রহের জন্য আমি রাত্রে তীর্থযাত্রা করিব। যত দিন না ফিরিয়া আসি, তত দিন তোমরা কোন গুরুতর ব্যাপারে হস্তক্ষেপণ করিও না। কিন্তু সন্তানদিগের একতা রক্ষা করিও। তাহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদন যোগাইও, এবং মার রণজয়ের জন্য অর্থভাণ্ডার পূর্ণ করিও। এই ভার তোমাদিগের দুই জনেও উপর রহিল।

ভবানন্দ বলিলেন, "তীর্থযাত্রা করিয়া এ সকল সংগ্রহ করিবেন কি প্রকারে? গোলা গুলি বন্দুক কামান কিনিয়া পাঠাইতে বড় গোলমাল হইবে। আর এত পাইবেন বা কোথা, বেচিবে বা কে, আনিবে বা কে?"

সত্য। কিনিয়া আনিয়া আমরা কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে পারিব না। আমি কারিগর পাঠাইয়া দিব, এইখানে প্রস্তুত করিতে হইবে।

জীব। সে কি? এই আনন্দমঠে?

সত্য। তাও কি হয়? ইহার উপায় আমি বহু দিন চিন্তা করিতেছি। ঈশ্বর অদ্য তাহার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। তোমরা বলিতেছিলে, ভগবান্ প্রতিকূল।

আমি দেখিতেছি, তিনি অনুকূল।

ভব। কোথায় কারখানা হইবে?

সত্য। পদচিহ্নে।

জীব। সে কি? সেখানে কি প্রকারে হইবে?

সত্য। নহিলে কি জন্য আমি মহেন্দ্র সিংহকে এ মহাব্রত গ্রহণ করাইবার জন্য এত আকিঞ্চন করিয়াছি?

ভব। মহেন্দ্র কি ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন?

সত্য। ব্রত গ্রহণ করে নাই, করিবে। আজ রাত্রে তাহাকে দীক্ষিত করিব।

জীব। কই, মহেন্দ্র সিংহকে ব্রত গ্রহণ করাইবার জন্য কি আকিঞ্চন হইয়াছে, তাহা আমরা দেখি নাই। তাহার স্ত্রী কন্যার কি অবস্থা হইয়াছে, কোথায় তাহাদিগকে রাখিল? আমি আজ একটি কন্যা নদীতীরে পাইয়া আমার ভগিনীর নিকট রাখিয়া আসিয়াছি। সেই কন্যার নিকট একটি সুন্দরী স্ত্রীলোক মরিয়া পড়িয়া ছিল। সে ত মহেন্দ্রের স্ত্রী কন্যা নয়? আমার তাই বোধ হইয়াছিল।

সত্য। সেই মহেন্দ্রের স্ত্রী কন্যা।

ভবানন্দ চমকিয়া উঠিলেন। তখন তিনি বুঝিলেন যে, যে স্ত্রীলোককে তিনি ঔষধবলে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন, সেই মহেন্দ্রের স্ত্রী কল্যাণী। কিন্তু এক্ষণে কোন কথা প্রকাশ করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না।

জীবানন্দ বলিলেন, "মহেন্দ্রের স্ত্রী মরিল কিসে?"

সত্য। বিষ পান করিয়া।

জীব। কেন বিষ খাইল?

সত্য। ভগবান্ তাহাকে প্রাণত্যাগ করিতে স্বপ্নাদেশ করিয়াছিলেন।

ভব। সে স্বপ্নাদেশ কি সন্তানের কার্য্যোদ্ধারের জন্যই হইয়াছিল?

সত্য। মহেন্দ্রের কাছে সেইরূপই শুনিলাম। এক্ষণে সায়াহ্নকাল উপস্থিত, আমি সায়ংকৃত্যাদি সমাপনে চলিলাম। তৎপরে নূতন সন্তানদিগকে দীক্ষিত করিতে প্রবৃত্ত হইবে।

ভব। সন্তানদিগকে? কেন, মহেন্দ্র ব্যতীত আর কেহ আপনার নিজ শিষ্য হইবার স্পর্দ্ধা রাখে কি?

সত্য। হাঁ, আর একটি নূতন লোক। পূর্ব্বে আমি তাহাকে কখন দেখি নাই। আজি নূতন আমার কাছে আসিয়াছে। সে অতি তরুণবয়স্ক যুবা পুরুষ। আমি তাঁহার আকারেঙ্গিতে ও কথাবার্ত্তায় অতিশয় প্রীত হইয়াছি। খাঁটি সোণা বলিয়া তাহাকে বোধ হইয়াছে। তাহাকে সন্তানের কার্য্য শিক্ষা করাইবার ভার জীবানন্দের প্রতি রহিল। কেন না, জীবানন্দ লোকের চিত্তাকর্ষণে বড় সুদক্ষ। আমি চলিলাম, তোমাদের প্রতি আমার একটি উপদেশ বাকি আছে। অতিশয় মনঃসংযোগপূর্ব্বক তাহা শ্রবণ কর।

তখন উভয়ে যুক্ত-কর হইয়া নিবেদন করিলেন, "আজ্ঞা করুন।"

সত্যানন্দ বলিলেন, “তোমরা দুই জনে যদি কোন অপরাধ করিয়া থাক, অথবা আমি ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বে কর, তবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত আমি না আসিলে করিও না। আমি আসিলে, প্রায়শ্চিত্ত অবশ্য কর্ত্তব্য হইবে।”

এই বলিয়া সত্যানন্দ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ভবানন্দ এবং জীবানন্দ উভয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করিলেন।

ভবানন্দ বলিলেন, “তোমার উপর না কি?”

জীব। বোধ হয়। ভগিনীর বাড়ীতে মহেন্দ্রের কন্যা রাখিতে গিয়াছিলাম।

ভব। তাতে দোষ কি, সেটা ত নিষিদ্ধ নহে, ব্রাহ্মণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছি কি?

জীব। বোধ হয় গরুদেব তাই মনে করেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সায়াহ্নকৃত্য সমাপনান্তে মহেন্দ্রকে ডাকিয়া সত্যানন্দ আদেশ করিলেন, “তোমার কন্যা জীবিত আছে।”

মহে। কোথায় মহারাজ?

সত্য। তুমি আমাকে মহারাজ বলিতেছ কেন?

মহে। সকলেই বলে, তাই। মঠের অধিকারীদিগকে রাজা সম্বোধন করিতে হয়। আমার কন্যা কোথায় মহারাজ?

সত্য। তা শুনিবার আগে, একটা কথার স্বরূপ উত্তর দাও। তুমি সন্তানধর্ম্ম গ্রহণ করিবে?

মহে। তা নিশ্চিত মনে মনে স্থির করিয়াছি।

সত্য। তবে কন্যা কোথায় শুনিতে চাহিও না।

মহে। কেন মহারাজ?

সত্য। যে এ ব্রত গ্রহণ করে, তাহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, স্বজনবর্গ, কাহারও সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিতে নাই। স্ত্রী, পুত্র, কন্যার মুখ দেখিলেও প্রায়শ্চিত্ত আছে। যত দিন না সন্তানের মানস সিদ্ধ হয়, তত দিন তুমি কন্যার মুখ দেখিতে পাইবে না। অতএব যদি সন্তানধর্ম্ম গ্রহণ স্থির হইয়া থাকে, তবে কন্যার সন্ধান জানিয়া কি করিবে? দেখিতে ত পাইবে না।

মহে। এ কঠিন নিয়ম কেন প্রভু?

সত্য। সন্তানের কাজ অতি কঠিন কাজ। যে সর্ব্বত্যাগী, সে ভিন্ন অপর কেহ এ কাজের উপযুক্ত নহে। মায়ারজ্জুতে যাহার চিত্ত বদ্ধ থাকে, লকে বাঁধা ঘুড়ির মত সে কখন মাটি ছাড়িয়া স্বর্গে উঠিতে পারে না।

মহে। মহারাজ, কথা ভাল বুঝিতে পরিলাম না। যে স্ত্রী পুত্রের মুখ দর্শন করে, সে কি কোন গুরুতর কার্য্যের অধিকারী নহে?

সত্য। পুত্র কলত্রের মুখ দেখিলেই আমরা দেবতার কাজ ভুলিয়া যাই। সন্তানধর্ম্মের নিয়ম এই যে, যে দিন প্রয়োজন হইবে, সেই দিন সন্তানকে প্রাণত্যাগ

করিতে হইবে। তোমার কন্যার মুখ মনে পড়িলে তুমি কি তাহাকে রাখিয়া মরিতে পারিবে?

মহে। তাহা না দেখিলেই কি কন্যাকে ভুলিব?

সত্য। না ভুলিতে পার, এ ব্রত গ্রহণ করিও না।

মহে। সন্তানমাত্রেই কি এইরূপ পুত্র কলত্রকে বিস্মৃত হইয়া ব্রত গ্রহণ করিয়াছে? তাহা হইলে সন্তানেরা সংখ্যায় অতি অল্প!

সত্য। সন্তান দ্বিবিধ, দীক্ষিত আর অদীক্ষিত। যাহারা অদীক্ষিত, তাহারা সংসারী বা ভিখারী। তাহারা কেবল যুদ্ধের সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, লুঠের ভাগ বা অন্য পুরস্কার পাইয়া চলিয়া যায়। যাহারা দীক্ষিত, তাহারা সর্ব্বত্যাগী। তাহারাই সম্প্রদায়ের কর্ত্তা। তোমাকে অদীক্ষিত সন্তান হইতে অনুরোধ করি না, যুদ্ধের জন্য লাঠি সড়কিওয়ালা অনেক আছে। দীক্ষিত না হইলে তুমি সম্প্রদায়ের কোন গুরুতর কার্য্যে অধিকারী হইবে না।

মহে। দীক্ষা কি? দীক্ষিত হইতে হইবে কেন? আমি ত ইতিপূর্ব্বেই মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছি।

সত্য। সে মন্ত্র ত্যাগ করিতে হইবে। আমার নিকট পুনর্ব্বার মন্ত্র লইতে হইবে।

মহে। মন্ত্র ত্যাগ করিব কি প্রকারে?

সত্য। আমি সে পদ্ধতি বলিয়া দিতেছি।

মহে। নূতন মন্ত্র লইতে হইবে কেন?

সত্য। সন্তানেরা বৈষ্ণব।

মহে। ইহা বুঝিতে পারি না। সন্তানেরা বৈষ্ণব কেন? বৈষ্ণবের অহিংসাই পরম ধর্ম্ম।

সত্য। সে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব। নাস্তিক বৌদ্ধধর্ম্মের অনুকরণে যে অপ্রকৃত বৈষ্ণবতা উৎপন্ন হইয়াছিল, এ তাহারই লক্ষণ। প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্মের লক্ষণ দুষ্টের দমন, ধরিত্রীর উদ্ধার। কেন না, বিষ্ণুই সংসারের পালনকর্ত্তা। দশ বার শরীর ধারণ করিয়া পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছেন। কেশী, হিরণ্যকশিপু, মধুকৈটভ, মুর, নরক প্রভৃতি দৈত্যগণকে, রাবণাদি রাক্ষসগণকে, কংস, শিশুপাল প্রভৃতি রাজগণকে তিনিই যুদ্ধে ধ্বংস করিয়াছিলেন। তিনিই জেতা, জয়দাতা, পৃথিবীর উদ্ধারকর্ত্তা, আর সন্তানের ইষ্টদেবতা। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম নহে–উহা অর্দ্ধেক ধর্ম্ম মাত্র। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু প্রেমময়– কিন্তু ভগবান কেবল প্রেমময় নহেন– তিনি অনন্তশক্তিময়। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু শুধু প্রেমময়– সন্তানের বিষ্ণু শুধু শক্তিময়। আমরা উভয়েই বৈষ্ণব– কিন্তু উভয়েই অর্দ্ধেক বৈষ্ণব। কথাটা বুঝিলে?

মহে। না। এ যে কেমন নূতন নূতন কথা শুনিতেছি। কাশিমবাজারে একটা পাদরির সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল– সে ঐ রকম কথাসকল বলিল–অর্থাৎ ঈশ্বর প্রেমময়–তোমরা যীশুকে প্রেম কর। এ যে সেই রকম কথা।

সত্য। যে রকম কথা আমাদিগের চতুর্দ্দশ পুরুষ বুঝিয়া আসিতেছেন, সেই রকম কথায় আমি তোমায় বুঝাইতেছি। ঈশ্বর ত্রিগুণাত্মক, তাহা শুনিয়াছ?

মহে। হাঁ। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ–এই তিন গুণ।

সত্য। ভাল। এই তিনটি গুণের পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা। সত্ত্বগুণ হইতে তাঁহার দয়াদাক্ষিণ্যাদ্ধির উৎপত্তি, তাঁহার উপাসনা ভক্তির দ্বারা করিবে। চৈতন্যের সম্প্রদায় তাহা করে। আর রজোগুণ হইতে তাঁহার শক্তির উৎপত্তি; ইহার উপাসনা যুদ্ধের দ্বারা–দেবদ্বষীদিগের নিধন দ্বারা–আমরা তাহা করি। আর তমোগুণ

হইতে ভগবান্ শরীরী– চতুর্ভুজাদি রূপ ইচ্ছাক্রমে ধারণ করিয়াছেন। স্রক্ চন্দনাদি উপহারের দ্বারা সে গুণের পূজা করিতে হয়– সর্ব্বসাধারণে তাহা করে। এখন বুঝিলে?

মহে। বুঝিলাম। সন্তানেরা তবে উপাসকসম্প্রদায় মাত্র?

সত্য। তাই। আমরা রাজ্য চাহি না। কেবল–মুসলমানেরা ভগবানের বিদ্বেষী বলিয়া তাহাদের সবংশে নিপাত করিতে চাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সত্যানন্দ কথাবার্ত্তা সমাপনান্তে মহেন্দ্রের সহিত সেই মঠস্থ দেবালয়াভ্যন্তরে, যেখানে সেই অপূর্ব্ব শোভাময় প্রকাণ্ডাকার চতুর্ভুজ মূর্ত্তি বিরাজিত, তথায় প্রবেশ করিলেন। সেখানে তখন অপূর্ব্ব শোভা। রজত, স্বর্ণ ও রত্নে রঞ্জিত বহুবিধ প্রদীপে মন্দির আলোকিত হইয়াছে। রাশি রাশি পুষ্প, স্তূপাকারে শোভা করিয়া মন্দির আমোদিত করিতেছিল। মন্দিরে আর এক জন উপবেশন করিয়া মৃদু মৃদু "হরে মুরারে" শব্দ করিতেছিল। সত্যানন্দ মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র সে গাত্রোত্থান করিয়া প্রণাম করিল। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি দীক্ষিত হইবে?"

সে বলিল, "আমাকে দয়া করুন।"

তখন তাহাকে ও মহেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া সত্যানন্দ বলিলেন, "তোমার যথাবিধি স্নাত, সংযত, এবং অনশন আছ ত?"

উত্তর। আছি।

সত্য। তোমরা এই ভগবৎসাক্ষাৎ প্রতিজ্ঞা কর। সন্তানধর্ম্মের নিয়মসকল পালন করিবে?

উভয়ে। করিব।

সত্য। যত দিন না মাতার উদ্ধার হয়, তত দিন গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে?

উভ। করিব।

সত্য। মাতা পিতা ত্যাগ করিব?

উভ। কবির।

সত্য। ভ্রাতা, ভগিনী?

উভ। ত্যাগ করিব।

সত্য। দারাসুত?

উভ। ত্যাগ করিব।

সত্য। আত্মীয় স্বজন? দাস দাসী?

উভ। সকলই ত্যাগ করিলাম।

সত্য। ধন– সম্পদ্– ভোগ?

উভ। সকলই পরিত্যাজ্য হইল।

সত্য। ইন্দ্রিয় জয় করিবে? স্ত্রীলোকের সঙ্গে কখন একাসনে বসিবে না?

সভ। বসিব না। ইন্দ্রিয় জয় করিব।

সত্য। ভগবৎসাক্ষাৎকার প্রতিজ্ঞা কর, আপনার জন্য বা স্বজনের জন্য অর্থোপার্জ্জন করিবে না? যাহা উপার্জ্জন করিবে, তাহা বৈষ্ণব ধনাগারে দিবে?

উভ। দিব।

সত্য। সনাতন ধর্ম্মের জন্য স্বয়ং অস্ত্র ধরিয়া যুদ্ধ করিবে?

উভ। করিব।

সত্য। রণে কথন ভঙ্গ দিবে না।

উভ। না।

সত্য। যদি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়?

উভ। জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করিয়া অথবা বিষ পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।

সত্য। আর এক কথা– জাতি। তোমরা কি জাতি? মহেন্দ্র কায়স্থ জাতি। অপরটি কি জাতি?

অপর ব্যক্তি বলিল, “আমি ব্রাহ্মণকুমার।”

সত্য। উত্তম। তোমরা জাতিত্যাগ করিতে পারিবে? সকল সন্তান এক জাতীয়। এ মহাব্রতে ব্রাহ্মণ শূদ্র বিচার নাই। তোমরা কি বল?

উভ। আমরা সে বিচার করিব না। আমরা সকলেই এক মায়ের সন্তান।

সত্য। তবে তোমাদিগকে দীক্ষিত করিব। তোমরা যে সকল প্রতিজ্ঞা করিলে, তাহা ভঙ্গ করিও না। মুরারি স্বয়ং ইহার স্বাক্ষী। যিনি রাবণ, কংস, হিরণ্যকশিপু, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি বিনাশহেতু, যিনি সর্ব্বান্তর্য্যামী, সর্ব্বজয়ী, সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বনিয়ন্তা, যিনি ইন্দ্রের বজ্রে মার্জ্জারের নখে তুল্যরূপে বাস করেন, তিনি প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারীকে বিনষ্ট করিয়া অনন্ত নরকে প্রেরণ করিবেন।

উভ। তথাস্তু।

সত্য। তোমরা গাও “বন্দে মাতরম্।”

উভয়ে সেই নিভৃত মন্দিরমধ্যে মাতৃস্তোত্র গীত করিল। ব্রহ্মচারী তখন তাহাদিগকে যথাবিধি দীক্ষিত করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দীক্ষা সমাপনান্তে সত্যানন্দ, মহেন্দকে অতি নিভৃত স্থানে লইয়া গেলেন। উভয়ে উপবেশন করিলে সত্যানন্দ বলিতে লাগিলেন, “দেখ বৎস! তুমি যে, এই

মহাব্রত গ্রহণ করিলে, ইহাতে ভগবান্ আমাদের প্রতি অনুকূল বিবেচনা করি। তোমার দ্বারা মার সুমহৎ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে। তুমি যত্নে আমার আদেশ শ্রবণ কর। তোমাকে জীবানন্দ, ভবানন্দের সঙ্গে বনে বনে ফিরিয়া যুদ্ধ করিতে বলি না। তুমি পদচিহ্নে ফিরিয়া যাও। স্বধামে থাকিয়াই তোমাকে সন্ন্যাসধর্ম্ম পালন করিতে হইবে।"

মহেন্দ্র শুনিয়া বিস্মিত ও বিমর্ষ হইলেন। কিছু বলিলেন না। ব্রহ্মচারী বলিতে লাগিলেন, "এক্ষণে আমাদিগের আশ্রয় নাই; এমন স্থান নাই যে, প্রবল সেনা আসিয়া আমদিগকে অবরোধ করিলে আমরা খাদ্য সংগ্রহ করিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া দশ দিন নির্ব্বিঘ্নে থাকিব। আমাদিগের গড় নাই। তোমার অট্টালিকা আছে, তোমার গ্রাম তোমার অধিকারে। আমার ইচ্ছা, সেইখানে একটি গড় প্রস্তুত করি। পরিখা প্রাচীরের দ্বারা পদচিহ্ন বেষ্টিত করিয়া মাঝে মাঝে তাহাতে ঘাঁটি বসাইয়া দিলে, আর বাঁধের উপর কামান বসাইয়া দিলে উত্তম গড় প্রস্তুত হইতে পারিবে। তুমি গৃহে গিয়া বাস কর, ক্রমে ক্রমে দুই হাজার সন্তান সেখানে গিয়া উপস্থিত হইবে। তাহাদিগের দ্বারা গড়, ঘাঁটির বাঁধ, এই সকল তৈয়ার করিতে থাকিবে। তুমি সেখানে উত্তম লৌহনির্ম্মিত এক ঘর প্রস্তুত করাইবে। সেখানে সন্তানদিগের অর্থের ভাণ্ডার হইবে। সুবর্ণে পূর্ণ সিন্দুকসকল তোমার কাছে একে একে প্রেরণ করিব। তুমি সেই সকল অর্থের দ্বারা এই সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। আর আমি নানা স্থান হইতে কৃতকর্ম্মা শিল্পিসকল আনাইতেছি। শিল্পিসকল আসিলে তুমি পদচিহ্নে কারখানা স্থাপন করিবে। সেখানে কামান, গোলা, বারুদ, বন্দুক প্রস্তুত করাইবে। এই জন্য তোমাকে গৃহে যাইতে বলিতেছি।"

মহেন্দ্র স্বীকৃত হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্র, সত্যানন্দের পাদবন্দনা করিয়া বিদায় হইলে, তাঁহার সঙ্গে যে দ্বিতীয় শিষ্য সেই দিন দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তিনি আসিয়া সত্যানন্দকে প্রণাম করিলেন। সত্যানন্দ আশীর্ব্বাদ করিয়া কৃষ্ণাজিনের উপর বসিতে অনুমতি করিলেন। পরে অন্যান্য মিষ্ট কথার পর বলিলেন, "কেমন, কৃষ্ণে তোমার গাঢ় ভক্তি আছে কি না?"

শিষ্য বলিল, "কি প্রকারে বলিব? আমি যাহাকে ভক্তি মনে করি, হয়ত সে ভণ্ডামি, নয় ত আত্ম-প্রতারণা।"

সত্যানন্দ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "ভাল বিবেচনা করিয়াছ। যাহাতে ভক্তি দিন দিন প্রগাঢ় হয়, সে অনুষ্ঠান করিও। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার যত্ন সফল হইবে। কেন না, তুমি বয়সে অতি নবীন। বৎস, তোমায় কি বলিয়া ডাকিব, তাহা এ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করি নাই।"

নূতন সন্তান বলিল, "আপনার যাহা অভিরুচি, আমি বৈষ্ণবের দাসানুদাস।"

সত্য। তোমার নবীন বয়স দেখিয়া তোমায় নবীনানন্দ বলিতে ইচ্ছা করে– অতএব এই নাম তুমি গ্রহণ কর। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার পূর্ব্বে কি নাম ছিল? যদি বলিতে কোন বাধা থাকে, তথাপি বলিও। আমার কাছে বলিলে কর্ণান্তের প্রবেশ করিবে না। সন্তান-ধর্ম্মের মর্ম্ম এই যে, যাহা অবাচ্য, তাহাও গুরুর নিকট বলিতে হয়। বলিলে কোন ক্ষতি হয় না।

শিষ্য। আমার নাম শান্তিরাম দেবশর্ম্মা।

সত্য। তোমার নাম শান্তিমণি পাপিষ্ঠা।

এই বলিয়া সত্যানন্দ, শিষ্যের কাল কুচকুচে দেড় হাত লম্বা দাড়ি বাম হাতে জড়াইয়া ধরিয়া এক টান দিলেন। জাল দাড়ি খসিয়া পড়িল।

সত্যানন্দ বলিলেন, "ছি মা! আমার সঙ্গে প্রতারণা—আর যদি আমাকেই ঠকাবে ত এ বয়সে দেড় হাত দাড়ি কেন? আর, দাড়ি খাট করিলেও কণ্ঠের স্বর—ও চোখের চাহনি কি লুকাতে পার? যদি এমন নির্ব্বোধই হইতাম, তবে কি এত বড় কাজে হাত দিতাম?"

শান্তি পোড়ারমুখী তখন দুই চোখ ঢাকা দিয়া কিছুক্ষণ অধোবদনে বসিল। পরক্ষণেই হাত নামাইয়া বুড়োর মুখের উপর বিলোল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "প্রভু দোষই বা কি করিয়াছি। স্ত্রী-বাহুতে কি কখন বল থাকে না?"

সত্য। গোষ্পদে যেমন জল।

শান্তি। সন্তানদিগের বাহুবল আপনি কখন পরীক্ষা করিয়া থাকেন?

সত্য। থাকি।

এই বলিয়া সত্যানন্দ, এই ইস্পাতের ধনুক, আর লোহার কতকটা তার আনিয়া দিলেন, বলিলেন যে, "এই ইস্পাতের ধনুকে এই লোহার তারের গুণ দিতে হয়। গুণের পরিমাণ দুই হাত। গুণ দিতে দিতে ধনুক উঠিয়া পড়ে, যে গুণ দেয়, তাঁকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়। যে গুণ দিতে পারে, সেই প্রকৃত বলবান্।"

শান্তি ধনুক ও তার উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া বলিল, "সকল সন্তান কি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে?"

সত্য। না, ইহা দ্বারা তাহাদিগের বল বুঝিয়াছি মাত্র।

শান্তি। কেহ কি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নাই?

সত্য। চারি জন মাত্র।

শান্তি জিজ্ঞাসা করিব কি, কে কে?

সত্য। নিষেধ কিছু নাই। এক জন আমি।

শান্তি। আর?

সত্য। জীবানন্দ। ভবানন্দ। জ্ঞানানন্দ।

শান্তি। ধনুক লইল, তার লইল, অবহেলে তাহাতে গুণ দিয়া সত্যানন্দের চরণতলে ফেলিয়া দিল।

সত্যানন্দ বিস্মিত, ভীত এবং স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, "এ কি; তুমি দেবী, না মানবী?"

শান্তি করজোড়ে বলিল, "আমি সামান্য মানবী, কিন্তু আমি ব্রহ্মচারিণী।"

সত্য। তাই বা কিসে? তুমি কি বালবিধবা? না, বালবিধবারও এত বল হয় না; কেন না, তাহারা একাহারী।

শান্তি। আমি সধবা।

সত্য। তোমার স্বামী নিরুদ্দিষ্ট?

শান্তি। উদ্দিষ্ট। তাঁহার উদ্দেশ্যেই আসিয়াছি।

সহসা মেঘভাঙ্গা রৌদ্রের ন্যায় স্মৃতি সত্যানন্দের চিত্তকে প্রভাসিত করিল। তিনি বলিলেন, "মনে পড়িয়াছে, জীবানন্দের স্ত্রীর নাম শান্তি। তুমি কি জীবানন্দের ব্রাহ্মণী?"

এবার জটাভারে নবীনানন্দ মুখ ঢাকিল। যেন কতকগুলা হাতীর শুঁড়, রাজীবরাজির উপর পড়িল। সত্যানন্দ বলিতে লাগিলেন, "কেন এ পাপাচার করিতে আসিলে?"

শান্তি সহসা জটাভার পৃষ্ঠে বিক্ষিপ্ত করিয়া উন্নত মুখে বলিল, "পাপাচরণ কি প্রভু? পত্নী স্বামীর অনুসরণ করে, সে কি পাপাচরণ? সন্তানধর্ম্মশাস্ত্র যদি একে পাপাচরণ বলে, তবে সন্তানধর্ম্ম অধর্ম্ম। আমি তাঁহার সহধর্ম্মিণী, তিনি ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত, আমি তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্মাচরণ করিতে আসিয়াছি।"

শান্তির তেজস্বিনী বাণী শুনিয়া, উন্নত গ্রীবা, স্ফীত বক্ষ, কম্পিত অধর এবং উজ্জ্বল অথচ অশ্রুপ্লুত চক্ষু দেখিয়া সত্যানন্দ প্রীত হইলেন। বলিলেন, "তুমি সাধ্বী। কিন্তু দেখ মা, পত্নী কেবল গৃহধর্ম্মেই সহধর্ম্মিণী– বীরধর্ম্মে রমণী কি?"

শান্তি। কোন্ মহাবীর অপত্নীক হইয়া বীর হইয়াছেন? রাম সীতা নহিলে কি বীর হইতেন? অর্জ্জুনের কতগুলি বিবাহ গণনা করুন দেখি। ভীমের যত বল, ততগুলি পত্নী। কত বলিব? আপনাকে বলিতেই বা কেন হইবে?

সত্য। কথা সত্য, কিন্তু রণ-ক্ষেত্রে কোন্ বীর জায়া লইয়া আইসে?

শান্তি। অর্জ্জুন যখন যাদবী সেনার সহিত অন্তরীক্ষ হইতে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কে তাঁহার রথ চালাইয়াছিল? দ্রৌপদী সঙ্গে না থাকিলে, পাণ্ডব কি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যুঝিত?

সত্য। তা হউক, সামান্য মনুষ্যদিগের মন স্ত্রীলোকে আসক্ত এবং কার্য্যে বিরত করে। এই জন্য সন্তানের ব্রতই এই যে, রমণী জাতির সঙ্গে একাসনে উপবেশন করিবে না। জীবানন্দ আমার দক্ষিণ হস্ত। তুমি আমার ডান হাত ভাঙ্গিয়া দিতে আসিয়াছ।

শান্তি। আমি আপনার দক্ষিণ হস্তে বল বাড়াইতে আসিয়াছি। আমি ব্রহ্মচারিণী, প্রভুর কাছে ব্রহ্মচারিণীই থাকিব। আমি কেবল ধর্ম্মাচরণের জন্য আসিয়াছি; স্বামিসন্দর্শনের জন্য নয়। বিরহ-যন্ত্রণায় আমি কাতরা নই। স্বামী যে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, আমি তাহার ভাগিনী কেন হইব না? তাই আসিয়াছি।

সত্য। ভাল, তোমায় দিন কত পরীক্ষা করিয়া দেখি।

শান্তি বলিলেন, "আনন্দমঠে আমি থাকিতে পাইব কি?"

সত্য। আজ আর কোথা যাইবে?

শান্তি। তার পর?

সত্য। "মা ভবানীর মত তোমারও ললাটে আগুন আছে, সন্তানসম্প্রদ্রায় কেন দাহ করিবে? এই বলিয়া, পরে আশীর্ব্বাদ করিয়া সত্যানন্দ শান্তিকে বিদায় করলেন।

শান্তি মনে মনে বলিল, "র বেটা বুড়ো! আমার কপালে আগুন! আমি পোড়াকপালি, না তোর মা পোড়াকপালি?"

বস্তুতঃ সত্যানন্দের সে অভিপ্রায় নহে–চক্ষের বিদ্যুতের কথাই তিনি বলিয়াছিলেন, কিন্তু তা কি বুড়ো বয়সে ছেলে মানুষকে বলা যায়?

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সে রাত্রি শান্তি মঠে থাকিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। অতএব ঘর খুঁজিতে লাগিলেন। অনেক ঘর খালি পড়িয়া আছে। গোবর্দ্ধন নামে এক জন পরিচারক–সেও ক্ষুদ্রদরের সন্তান–প্রদীপ হাতে করিয়া ঘর দেখাইয়া বেড়াইতে লাগিল। কোনটাই শান্তির পছন্দ হইল না। হতাশ হইয়া গোবর্দ্ধন ফিরিয়া সত্যানন্দের কাছে শান্তিকে লইয়া চলিল।

শান্তি বলিল, "ভাই সন্তান, এই দিকে যে কয়টা ঘর রহিল, এ ত দেখা হইল না?"

গোবর্দ্ধন বলিল, "ও সব খুব ভাল ঘর বটে, কিন্তু ও সকলে লোক আছে।"

শান্তি। কারা আছে?

গোব। বড় বড় সেনাপতি আছে।

শান্তি। বড় বড় সেনাপতি কে?

গোব। ভবানন্দ, জীবানন্দ, ধীরানন্দ, জ্ঞানানন্দ। আনন্দমঠ আনন্দময়।

শান্তি। ঘরগুলো দেখি চল না।

গোবর্দ্ধন শান্তিকে প্রথমে ধীরানন্দের ঘরে লইয়া গেল। ধীরানন্দ মহাভারতের দ্রোণপর্ব্ব পড়িতেছিলেন। অভিমন্যু কি প্রকারে সপ্ত রথীর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাতেই মন নিবিষ্ট– তিনি কথা কহিলেন না। শান্তি সেখান হইতে বিনা বাক্যব্যয়ে চলিয়া গেল।

শান্তি পরে ভবানন্দের ঘরে প্রবেশ করিল। ভবানন্দ তখন ঊর্দ্ধ্ব দৃষ্টি হইয়া, একখানা মুখ ভাবিতেছিলেন। কাহার মুখ, তাহা জানি না, কিন্তু মুখখানা বড় সুন্দর, কৃষ্ণ কুঞ্চিত সুগন্ধি অলকরাশি আকর্ণপ্রসারি ভ্রূযুগের উপর পড়িয়া আছে। মধ্যে অনিন্দ্য ত্রিকোণ ললাটদেশ মৃত্যুর করাল কাল ছায়ার গাহমান হইয়াছে। যেন সেখানে মৃত্যু ও মৃত্যুঞ্জয় দ্বন্দ্ব করিতেছে। নয়ন মুদ্রিত, ভ্রূযুগ স্থির, ওষ্ঠ নীল, গণ্ড পাণ্ডুর, নাসা শীতল, বক্ষ উন্নত, বায়ু বসন বিক্ষিপ্ত করিতেছে। তার পর যেমন করিয়া শরন্মেঘ-বিলুপ্ত চন্দ্রমা ক্রমে ক্রমে মেঘদল উদ্ভাসিত করিয়া, আপনার সৌন্দর্য্য বিকশিত করে, যেমন করিয়া প্রভাতসূর্য্য তরঙ্গাকৃত মেঘমালাকে ক্রমে ক্রমে সুবর্ণীকৃত করিয়া আপনি প্রদীপ্ত হয়, দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করে, স্থল জল কীটপতঙ্গ প্রফুল্ল করে, তেমনি সেই শবদেহে জীবনের শোভার সঞ্চার হইতেছিল। আহা কি শোভা! ভবানন্দ তাই ভাবিতেছিল, সেও কথা কহিল না। কল্যাণীর রূপে তাহার হৃদয় কাতর হইয়াছিল, শান্তির রূপের উপর সে দৃষ্টিপাত করিল না।

শান্তি তখন গৃহান্তরে গেল। জিজ্ঞাসা করিল, "এটা কার ঘর?"

গোবর্দ্ধন বলিল, "জীবানন্দ ঠাকুরের।"

শান্তি। সে আবার কে? কৈ, কেউ ত এখানে নেই।

গোব। কোথায় গিয়াছেন, এখনি আসিবেন।

শান্তি। এই ঘরটি সকলের ভাল।

গোব। তা এ ঘরটা তা হবে না।

শান্তি। কেন?

গোব। জীবানন্দ ঠাকুর এখানে থাকেন।

শান্তি। তিনি না হয় আর একটা ঘর খুঁজে নিন।

গোব। তা কি হয়? যিনি এ ঘরে আছেন, তিনি কর্ত্তা বললেই হয়, যা করেন তাই হয়।

শান্তি। আচ্ছা তুমি যাও, আমি স্থান না পাই, গাছতলায় থাকিব।

এই বলিয়া গোবর্দ্ধনকে বিদায় দিয়া শান্তি সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া জীবানন্দের অধিকৃত কৃষ্ণাজিন বিস্তারণ পূর্ব্বক, প্রদীপটি উজ্জ্বল করিয়া লইয়া, জীবানন্দের একখানি পুথি লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে জীবানন্দ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শান্তির পুরুষবেশ, তথাপি দেখিবামাত্র জীবানন্দ তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। বলিলেন, "এ কি এ? শান্তি?"

শান্তি ধীরে ধীরে পুথিখানি রাখিয়া, জীবানন্দের মুখপানে চাহিয়া বলিল, "শান্তি কে মহাশয়?"

জীবানন্দ অবাক–শেষ বলিলেন, "শান্তি কে মহাশয়? কেন, তুমি শান্তি নও?"

শান্তি ঘৃণার সহিত বলিল, "আমি নবীনানন্দ গোস্বামী।" এই কথা বলিয়া সে আবার পুথি পড়িতে মন দিল।

জীবানন্দ উচ্চ হাস্য করিলেন, বলিলেন, "এ নূতন রঙ্গ বটে। তারপর নবীনানন্দ, এখানে কি মনে ক'রে এসেছ?"

শান্তি বলিল, "ভদ্রলোকের মধ্যে এই রীতি প্রচলিত আছে যে, প্রথম আলাপে 'আপনি' 'মহাশয়' ইত্যাদি সম্বোধন করিতে হয়। আমিও আপনাকে অসম্মান কথা কহিতেছি না,– তবে আপনি কেন আমাকে তুমি তুমি করিতেছেন?"

"যে আজ্ঞে" বলিয়া জীবানন্দ গলায় কাপড় দিয়া জোড়হাত করিয়া বলিল, "এক্ষণে বিনীতভাবে ভৃত্যের নিবেদন, কি জন্য ভরুইপুর হইতে, এ দীনভবনে মহাশয়ের শুভাগমন হইয়াছে, আজ্ঞা করুন।"

শান্তি অতি গম্ভীরভাবে বলিল, "ব্যঙ্গেরও প্রয়োজন দেখিতেছি না। ভরুইপুর আমি চিনি না। আমি সন্তানধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আসিয়া, আজ দীক্ষিত হইয়াছি।"

জী। আ সর্ব্বনাশ! সত্য না কি?

শা। সর্ব্বনাশ কেন? আপনিও দীক্ষিত।

জী। তুমি যে স্ত্রীলোক!

শা। সে কি? এমন কথা কোথা পাইলেন?

জী। আমার বিশ্বাস ছিল, আমার ব্রাহ্মণী স্ত্রীজাতীয়।

শা। ব্রাহ্মণী? আছে না কি?

জী। ছিল ত জানি।

শা। আপনার বিশ্বাস যে, আমি আপনার ব্রাহ্মণী?

জীবানন্দ আবার জোরহাত করিয়া গলায় কাপড় দিয়া অতি বিনীতভাবে বলিল, “আজ্ঞে হাঁ মহাশয়!”

শা। যদি এমন হাসির কথা আপনার মনে উদয় হইয়া থাকে, তবে আপনার কর্ত্তব্য কি বলুন দেখি?

জী। আপনার গাত্রাবরণখানি বলপূর্ব্বক গ্রহণান্তর অধরসুধা পান।

শা। এ আপনার দুষ্টবুদ্ধি অথবা গঞ্জিকার প্রতি অসাধারণ ভক্তির পরিচয় মাত্র। আপনি দীক্ষাকালে শপথ করিয়াছেন যে, স্ত্রীলোকের সঙ্গে একাসনে উপবেশন করিবেন না। যদি আমাকে স্ত্রীলোক বলিয়া আপনার বিশ্বাস হইয়া থাকে–এমন সর্পে রজ্জু ভ্রম অনেকেরই হয়–তবে আপনার উচিত যে, পৃথক্ আসনে উপবেশন করেন। আমার সঙ্গে আপনার আলাপও অকর্ত্তব্য।

এই বলিয়া শান্তি পুনরপি পুস্তকে মন দিল। পরাস্ত হইয়া জীবানন্দ পৃথক্ শয্যা রচনা করিয়া শয়ন করিলেন।

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

কাল ৭৬ সাল ঈশ্বরকৃপায় শেষ হইল। বাঙ্গালার ছয় আনা রকম মনুষ্যকে,–কত কোটী তা কে জানে,–যমপুরে প্রেরণ করাইয়া সেই দুর্ব্বৎসর নিজে কালগ্রাসে পতিত হইল। ৭৭ সালে ঈশ্বর সুপ্রসন্ন হইলেন। সুবৃষ্টি হইল, পৃথিবী শস্যশালিনী হইল, যাহারা বাঁচিয়া ছিল, তাহারা পেট ভরিয়া খাইল। অনেকে অনাহারে বা অল্পাহারে রুগ্ন হইয়াছিল, পূর্ণ আহার একেবারে সহ্য করিতে পারিল না। অনেকে তাহাতেই মরিল। পৃথিবী শস্যশালিনী, কিন্তু জনশূন্যা। গ্রামে গ্রামে খালি বাড়ী পড়িয়া পশুগণের বিশ্রামভূমি এবং প্রেতভয়ের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রামে গ্রামে শত শত উর্ব্বর ভূমিখণ্ডসকল অকর্ষিত, অনুৎপাদক হইয়া পড়িয়া রহিল, অথবা জঙ্গলে পুরিয়া গেল। দেশ জঙ্গলে পূর্ণ হইল। যেখানে হাস্যময় শ্যামল শস্যরাশি বিরাজ করিত, যেখানে অসংখ্য গো মহিষাদি বিচরণ করিত, যে সকল উদ্যান গ্রাম্য যুবক যুবতীর প্রমোদভূমি ছিল, সে সকল ক্রমে ঘোরতর জঙ্গল হইতে লাগিল। এক বৎসর, দুই বৎসর, তিন বৎসর গেল। জঙ্গল বাড়িতে লাগিল। যে স্থান মনুষ্যের সুখের স্থান ছিল, সেখানে নরমাংসলোলুপ ব্যাঘ্র আসিয়া হরণাদির প্রতি ধাবমান হইতে লাগিল। যেখানে সুন্দরীর দল অলক্তাঙ্কিতচরণে চরণভূষণ ধ্বনিত করিতে করিতে, বয়স্যার সঙ্গে ব্যঙ্গ করিতে করিতে, উচ্চ হাসি হাসিতে হাসিতে যাইত, সেইখানে ভল্লূকে বিবর প্রস্তুত করিয়া শাবকাদি লালন পালন করিতে লাগিল। যেখানে শিশুসকল নবীন বয়সে সন্ধ্যাকালের মল্লিকাকুসুমতুল্য উৎফুল্ল হইয়া হৃদয়তৃপ্তিকর হাস্য হাসিত, সেইখানে আজি যূথে যূথে বন্য হস্তিসকল মদমত্ত হইয়া, বৃক্ষের কাণ্ডসকল বিদীর্ণ করিতে লাগিল। যেখানে দুর্গোৎসব হইত, সেখানে শৃগালের বিবর, দোলমঞ্চে পেচকের আশ্রয়, নাটমন্দিরে বিষধর সর্পসকল দিবসে ভেকের অন্বেষণ করে। বাঙ্গালায় শস্য জন্মে, খাইবার লোক নাই; বিক্রেয় জন্মে, কিনিবার লোক নাই; চাষার চাষ করে, টাকা পায়

না–জমীদারের খাজনা দিতে পারে না; জমীদারের রাজার খাজনা দিতে পরে না; রাজা জমীদারী কাড়িয়া লওয়ায় জমীদারসম্প্রদায় সর্ব্বহৃত হইয়া দরিদ্র হইতে লাগিল। বসুমতী বহুপ্রসবিনী হইলেন, তবু আর ধন জন্মে না। কাহারও ঘরে ধন নাই। যে যাহার পায় কাড়িয়া খায়। চোর ডাকাতেরা মাথা তুলিল, সাধু ভীত হইয়া ঘরে মধ্যে লুকাইল।

এদিকে সন্তানসম্প্রদায় নিত্য সচন্দন তুলসীদলে বিষ্ণুপাদপদ্ম পূজা করে, যার ঘরে বন্দুক পিস্তল আছে, কাড়িয়া আনে। ভবানন্দ বলিয়া দিয়াছিলেন, "ভাই! যদি এক দিকে এক ঘর মণিমাণিক্য হীরক প্রবালাদি দেখ, আর এক দিকে একটা ভাঙ্গা বন্দুক দেখ, মণিমাণিক্য হীরক প্রবালাদি ছাড়িয়া ভাঙ্গা বন্দুকটি লইয়া আসিবে।"

তার পর, তাহারা গ্রামে গ্রামে চর পাঠাইতে লাগিল। চর গ্রামে গিয়া যেখানে হিন্দু দেখ, বলে, ভাই বিষ্ণুপূজা করবি? এই বলিয়া ২০/২৫ জন জড় করিয়া, মুসলমানের গ্রামে আসিয়া পড়িয়া মুসলমানদের ঘরে আগুন দেয়। মুসলমানেরা প্রাণরক্ষায় ব্যতিব্যস্ত হয়, সন্তানেরা তাহাদের সর্ব্বস্ব লুঠ করিয়া নূতন বিষ্ণুভক্তদিগকে বিতরণ করে। লুঠের ভাগ পাইয়া গ্রাম্য লোকে প্রীত হইলে বিষ্ণুমন্দিরে আনিয়া বিগ্রহের পাদস্পর্শ করাইয়া তাহাদিগকে সন্তান করে। লোকে দেখিল, সন্তানত্বে বিলক্ষণ লাভ আছে। বিশেষ মুসলমানরাজ্যের অরাজকতায় ও অশাসনে সকলে মুসলমানের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দুধর্ম্মের বিলোপে অনেক হিন্দুই হিন্দু স্থাপনের জন্য আগ্রহচিত্ত ছিল। অতএব দিনে দিনে সন্তানসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দিনে দিনে শত শত, মাসে মাসে সহস্র সহস্র সন্তান আসিয়া ভবানন্দ জীবানন্দের পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া, দলবদ্ধ হইয়া দিগ্‌দিগন্তের মুসলমানকে শাসন করিতে বাহির হইতে লাগিল। যেখানে রাজপুরুষ পায়, ধরিয়া মারপিট করে, কখন প্রাণবধ করে, যেখানে সরকারী টাকা পায়, লুঠিয়া ঘরে আনে, যেখানে মুসলমানের গ্রাম পায়, দগ্ধ করিয়া ভস্মাবশেষ করে। স্থানীয় রাজপুরুষগণ তখন সন্তানদিগের শাসনার্থে ভূরি ভূরি সৈন্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু এখন সন্তানেরা দলবদ্ধ শস্ত্রযুক্ত এবং মহাদম্ভশালী। তাহাদিগের দর্পের সম্মুখে মুসলমান সৈন্য অগ্রসর হইতে পারে না। যদি অগ্রসর হয়, অমিতবলে সন্তানেরা তাহাদিগের উপর পড়িয়া তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়া হরিধ্বনি করিতে থাকে। যদি কখনও কোন সন্তানেরা দলকে যবনসৈনিকেরা পরাস্ত করে, তখনই আর একদল সন্তান কোথা হইতে আসিয়া বিজেতাদিগের মাথা কাটিয়া ফেলিয়া দিয়া হরি হরি বলিতে বলিতে চলিয়া যায়। এই সময়ে প্রথিতনামা, ভারতীয় ইংরেজকুলের প্রাতঃসূর্য্য ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ সাহেব ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরেল। কলিকাতায় বসিয়া লোহার শিকল গড়িয়া তিন মনে মনে বিচার করিলেন যে, এই শিকলে আমি সদ্বীপা সসাগরা ভারতভূমিকে বাঁধিব। একদিন জগদীশ্বর সিংহাসনে বসিয়া নিঃসন্দেহে বলিয়াছিলেন, তথাস্তু। কিন্তু সে দিন এখন দূরে। আজিকার দিনে সন্তানদিগের ভীষণ হরিধ্বনিতে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ বিকম্পিত হইলেন।

ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ প্রথমে ফৌজদারী সৈন্যের দ্বারা বিদ্রোহী নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ফৌজদারী সিপাহীর এমনি অবস্থা হইয়াছিল যে, তাহারা কোন বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের মুখেও হরিনাম শুনিলে পলায়ন করিত। অতএব নিরুপায় দেখিয়া ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ কাপ্তেন টমাস নামক একজন সুদক্ষ সৈনিককে অধিনায়ক করিয়া এক দল কোম্পানির সৈন্য বিদ্রোহ নিবারণ জন্য প্রেরণ করিলেন।

কাপ্তেন টমাস পৌঁছিয়া বিদ্রোহ নিবারণের অতি উত্তম বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। রাজার সৈন্য ও জমীদারদিগের সৈন্য চাহিয়া লইয়া, কোম্পানির সুশিক্ষিত সদস্ত্রযুক্ত অত্যন্ত বলিষ্ঠ দেশী বিদেশী সৈন্যের সঙ্গে মিলাইলেন। পরে সেই মিলিত সৈন্য দলে দলে বিভক্ত করিয়া, সে সকলের আধিপত্যে উপযুক্ত

যোদ্ধৃবর্গকে নিযুক্ত করিলেন। পরে সেই সকল যোদ্ধৃবর্গকে দেশ ভাগ করিয়া দিলেন; বলিয়া দিলেন, তুমি অমুক প্রদেশে জেলিয়ার মত জাল দিয়া ছাঁকিতে ছাঁকিতে যাইবে। যেখানে বিদ্রোহী দেখিবে, পিপীলিকার মত তাহার প্রাণ সংহার করিবে। কোম্পানির সৈনিকেরা কেহ গাঁজা, কেহ রম মারিয়া বন্দুক সঙ্গীন চড়াইয়া সন্তানবধে ধাবিত হইল। কিন্তু সন্তানেরা এখন অসংখ্য অজেয়, কাপ্তেন টমাসের চাষার কাস্তের নিকট শস্যের মত কর্ত্তিত হইতে লাগিল। হরি হরি ধ্বনিতে কাপ্তেন টমাসের কর্ণ বধির হইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তখন কোম্পানির অনেক রেশমের কুঠি ছিল। শিবগ্রামে ঐরূপ এক কুঠি ছিল। ডনিওয়ার্থ সাহেব সেই কুঠির ফ্যাক্টর অর্থাৎ অধ্যক্ষ ছিলেন। তখনকার কুঠিসকলের রক্ষার জন্য সুব্যবস্থা ছিল। ডনিওয়ার্থ সাহেব সেই জন্য কোন প্রকারে প্রাণ রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রীকন্যাদিগকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং তিনি স্বয়ংও সন্তানদিগের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। সেই প্রদেশে এই সময়ে কাপ্তেন টমাস সাহেব দুটি চারি দল ফৌজ লইয়া তশরিফ আনিয়াছিলেন। এখন কতকগুলা চোয়াড় হাড়ি, ডোম, বাগ্‌দী, বুনো সন্তানদিগের উৎসাহ দেখিয়া পরদ্রব্যাপহরণে উৎসাহী হইয়াছিল। তাহারা কাপ্তেন টমাসের রসদ আক্রমণ করিল। কাপ্তেন টমাসের সৈন্যের জন্য গাড়ি গাড়ি বোঝাই হইয়া উত্তম ঘি, ময়দা, মুরগী, চাল যাইতেছিল—দেখিয়া ডোম বাগ্‌দীর দল লোভ সম্বরণ করিতে পারে নাই। তাহারা গিয়া গাড়ি আক্রমণ করিল, কিন্তু কাপ্তেন টমাসের সিপাহীদের হস্তস্থিত বন্দুকের দুই চারিটা গুঁতা খাইয়া ফিরিয়া আসিল। কাপ্তেন টমাস তৎক্ষণেই কলিকাতায় রিপোর্ট পাঠাইলেন যে, আজ ১৫৭ জন সিপাহী লইয়া ১৪,৭০০ বিদ্রোহী পরাজয় করা গিয়াছে। বিদ্রোহীদিগের মধ্যে ২১৫৩ জন মরিয়াছে, আর ১২৩৩ জন আহত হইয়াছে। ৭ জন বন্দী হইয়াছে। কেবল শেষ কথাটি সত্য। কাপ্তেন টমাস, দ্বিতীয় ব্লেনহিম বা রসবাকের যুদ্ধ জয় করিয়াছি মনে করিয়া গোঁপ দাড়ি চুমরাইয়া নির্ভয়ে ইতঃস্তত বেড়াইতে লাগিলেন। এবং ডনিওয়ার্থ সাহেবকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন যে, আর কি, এক্ষণে বিদ্রোহ নিবারণ হইয়াছে, তুমি স্ত্রী পুত্রদিগকে কলিকাতা হইতে লইয়া আইস। ডনিওয়ার্থ সাহেব বলিলেন, "তা হইবে, আনি দশ দিন এখানে থাকুন, দেশ আর একটু স্থির হউক, স্ত্রী পুত্র লইয়া আসিব।"ডনিওয়ার্থ সাহেবের ঘরে পালা মাটন মুরগী ছিল। পনীরও তাঁহার ঘরে অতি উত্তম ছিল। নানাবিধ বন্য পক্ষী তাঁহার টেবিলের মোবা সম্পাদন করিত। শ্মশ্রুমান্ বাবুর্চীটি দ্বিতীয় দ্রৌপদী, সুতরাং বিনা বাক্যব্যয়ে কাপ্তেন টমাস সেইখানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এদিকে ভবানন্দ মনে মনে গর গর করিতেছে; ভাবিতেছে, কবে এই কাপ্তেন টমাস সাহেব বাহাদুরের মাথাটি কাটিয়া, দ্বিতীয় সম্বরারি বলিয়া উপাধি ধারণ করিবে। ইংরেজ যে ভারতবর্ষের উদ্ধারসাধনের জন্য আসিয়াছিল, সন্তানেরা তাহা তখন বুঝে নাই। কি প্রকারে বুঝিবে? কাপ্তেন টমাসের সমসাময়িক ইংরেজরাও তাহা জানিতেন না। তখন কেবল বিধাতার মনে মনেই এ কথা ছিল। ভবানন্দ ভাবিতেছিলেন, এ অসুরের বংশ এক দিনে নিপাত করিব; সকলে জমা হউক, একটু অসতর্ক হউক, আমরা এখন একটু তফাৎ থাকি। সুতরাং তাহারা একটু তফাৎ রহিল। কাপ্তেন টমাস সাহেব নিষ্কণ্টক হইয়া দ্রোপদীর গুণগ্রহণে মনোযোগ দিলেন।

সাহেব বাহাদুর শিকার বড় ভালবাসেন, মধ্যে মধ্যে শিবগ্রামের নিকটবর্ত্তী অরণ্যে মৃগয়ায় বাহির হইতেন। এক দিন ডনিওয়ার্থ সাহেবের সঙ্গে অশ্বারোহণে

কতকগুলি শিকারী লইয়া কাপ্তেন টমাস শিকারে বাহির হইয়াছিলেন। বলিতে কি, টমাস সাহেব অসমসাহসিক, বলবীর্য্যে ইংরেজ-জাতির মধ্যেও অতুল্য সেই নিবিড় অরণ্য ব্যাঘ্র, মহিষ, ভল্লূকাদিতে অতিশয় ভয়ানক। বহু দূর আসিয়া শিকারীরা আর যাইতে অস্বীকৃত হইল, বলিল, ভিতরে আর পথ নাই, আমরা আর যাইতে পারিব না। ডনিওয়ার্থ সাহেবও সেই অরণ্যমধ্যে এমন ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্রের হাতে পড়িয়াছিলেন যে, তিনিও আর যাইতে অনিচ্ছুক হইলেন। তাঁহারা সকলে ফিরিতে চাহিলেন। কাপ্তেন টমাস বলিলেন, “তোমরা ফেরো, আমি ফিরিব না।” এই বলিয়া কাপ্তেন সাহেব নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বস্তুতঃ অরণ্যমধ্যে পথ ছিল না। অশ্ব প্রবেশ করিতে পারিল না। কিন্তু সাহেব ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া, কাঁধে বন্দুক লইয়া একা অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ ব্যাঘ্রের অন্বেষণ করিতে করিতে ব্যাঘ্র দেখিলেন না। কি দেখিলেন? এক বৃহৎ বৃক্ষতলে প্রস্ফুটিত ফুল্লকুসুমযুক্ত লতাগুল্মাদিতে বেষ্টিত হইয়া বসিয়া ও কে? এই নবীন সন্ন্যাসী, রূপে বন আলো করিয়াছে। প্রস্ফুটিত ফুল যেন সেই স্বর্গীয় বপুর সংসর্গে অধিকতর সুগন্ধযুক্ত হইয়াছে। কাপ্তেন টমাস সাহেব বিস্মিত হইলেন, বিস্ময়ের পরেই তাঁহার ক্রোধ উপস্থিত হইল। কাপ্তেন সাহেব দেশী ভাষা বিলক্ষণ জানিতেন, বলিলেন, “টুমি কে?”

সন্ন্যাসী বলিল, “আমি সন্ন্যাসী।”

কাপ্তেন বলিলেন, “টুমি রণঠণফ ।”

সন্ন্যাসী। সে কি?

কাপ্তেন। হামি টোমায় গুলি করিয়া মাড়িব।

সন্ন্যাসী। মার।

কাপ্তেন একটু মনে সন্দেহ করিতেছিলেন যে, গুলি মারিবেন কি না, এমন সময় বিদ্যুদ্বেগে সেই নবীন সন্ন্যাসী তাঁহার উপর পড়িয়া তাঁহার হাত হইতে বন্দুক কাড়িয়া লইল। সন্ন্যাসী বক্ষাবরণচর্ম্ম খুলিয়া ফেলিয়া দিল। এক টানে জটা খুলিয়া ফেলিল; কাপ্তেন টমাস সাহেব দেখিলেন, অপূর্ব্ব সুন্দরী স্ত্রীমূর্ত্তি। সুন্দরী হাসিতে হাসিতে বলিল, “সাহেব, আমি স্ত্রীলোক, কাহাকেও আঘাত করি না। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, হিন্দু-মোছলমানে মারামারি হইতেছে, তোমরা মাঝখানে কেন? আপনার ঘরে ফিরিয়া যাও।”

সাহেব। টুমি কে?

শান্তি। দেখিতেছ সন্ন্যাসিনী। যাঁহাদের সঙ্গে লড়াই করিতে আসিয়াছ, তাঁহাদের কাহারও স্ত্রী।

সাহেব। টুমি হামারা গোড়ে* ঠাকিব?

শান্তি। কি? তোমার উপপত্নীস্বরূপ?

সাহেব। ইষ্ট্রির মট ঠাকিয়ে পাড়, লেগেন সাদি হইব না।

শান্তি। আমারও একটা জিজ্ঞাসা আছে; আমাদের ঘরে একটা রূপী বাঁদর ছিল, সেটা সম্প্রতি মরে গেছে; কোটর খালি পড়ে আছে। কোমরে ছেকল দেবো, তুমি সেই কোটরে থাকবে? আমাদের বাগানে বেশ মর্ত্তমান বলা হয়।

---

* ঘরে।

সাহেব। টুমি বড় যধরর্ধণঢ ষমবটভ আছে, টোমার ডমলরটথণ এ আমি খুসি আছি। টুমি আমার গোড়ে চল। টোমাড় স্বামী যুড্ডে মরিয়া যাইব। টখন টোমার কি হইব?

শান্তি। তবে তোমার আমার একটা কথা থাক। যুদ্ধ ত দুদিন চারি দিনে হইবেই। যদি তুমি জেত, তবে আমি তোমার উপপত্নী হইয়া থাকিব স্বীকার করিতেছি, যদি বাঁচিয়া থাকি। আর আমরা যদি জিতি, তবে তুমি আসিয়া, আমাদের কোটরে বাঁদর সেজে কলা খাবে ত?

সাহেব। কলা খাইটে উট্টম জিনিস। এখন আছে?

শান্তি। নে, তোর বন্দুক নে। এমন বুনো জেতের সঙ্গেও কেউ কথা কয়!

শান্তি বন্দুক ফেলিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শান্তি সাহেবকে ত্যাগ করিয়া হরিণীর ন্যায় ক্ষিপ্রচরণে বনমধ্যে কোথায় প্রবিষ্ট হইল। সাহেব কিছু পরে শুনিতে পাইলেন, স্ত্রীকণ্ঠে গীত হইতেছে,–

এ যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে?
হরে মুরারে! হরে মুরারে!

আবার কোথায় সারঙ্গের মধুর নিক্কণে বাজিল তাই;–

এ যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে?
হরে মুরারে! হরে মুরারে!

তাহার সঙ্গে পুরুষকণ্ঠ মিলিয়া গীত হইল–

এ যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে?
হরে মুরারে! হরে মুরারে!

তিন স্বরে এক হইয়া গানে বনের লতাসকল কাঁপাইয়া তুলিল। শান্তি গাইতে গাইতে চলিল,–

“এ যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে?
হরে মুরারে! হরে মুরারে!
জলেতে তুফান হয়েছে
আমার নূতন তরী ভাস্‌ল সুখে,
মাঝিতে হাল ধরেছে,
হরে মুরারে! হরে মুরারে!
ভেঙ্গে বালির বাঁধ, পুরাই মনের সাধ,
জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটেছে রাখিবে কে?
হরে মুরারে! হরে মুরারে!”

সারঙ্গে ঐ বাজিতেছিল,–

জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটেছে রাখিবে কে?

হরে মুরারে! হরে মুরারে!

যেখানে অতি নিবিড় বন, ভিতরে কি আছে, বাহির হইতে একবারে অদৃশ্য, শান্তি তাহারই মধ্যে প্রবেশ করিল। সেইখানে সেই শাখাপল্লবরাশির মধ্যে লুক্কায়িত একটি ক্ষুদ্র কুটীর আছে। ডালের বাঁধন, পাতার ছাওয়া, কাটের মেজে, তার উপর মাটির ঢালা। তাহারই ভিতরে লতাদ্বার মোচন করিয়া শান্তি প্রবেশ করিল। সেখানে জীবানন্দ বসিয়া সারঙ্গ বাজাইতেছিলেন।

জীবানন্দ শান্তিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত দিনের পর জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটেছে কি?"

শান্তিও হাসিয়া উত্তর করিল, "নালা ডোবায় কি জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটে?"

জীবানন্দ বিষণ্ন হইয়া বলিলেন, "দেখ শান্তি! এক দিন আমার ব্রতভঙ্গ হওয়ায় আমার প্রাণ ত উৎসর্গই হইয়াছে। যে পাপ, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে। এত দিন এ প্রায়শ্চিত্ত করিতাম, কেবল তোমার অনুরোধেই করি নাই। কিন্তু একটা ঘোরতর যুদ্ধের আর বিলম্ব নাই। সেই যুদ্ধের ক্ষেত্রে, আমার সে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। এ প্রাণ পরিত্যাগ করিতেই হইবে। আমার মরিবার দিন–

শান্তি আর বলিতে না দিয়া বলিল, "আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী, সহধর্ম্মিনী, ধর্ম্মে সহায়। তুমি অতিশয় গুরুতর ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছ। সেই ধর্ম্মের সহায়তার জন্যই আমি গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। দুই জন একত্র সেই ধর্ম্মাচরণ করিব বলিয়া গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়া বনে বাস করিতেছি। তোমার ধর্ম্মবৃদ্ধি করিব। ধর্ম্মপত্নী হইয়া, তোমার ধর্ম্মের বিঘ্ন করিব কেন? বিবাহ ইহকালের জন্য, এবং বিবাহ পরকালের জন্য। ইহকালের জন্য যে বিবাহ, মনে কর, তাহা আমাদের হয় নাই। আমাদের বিবাহ কেবল পরকালের জন্য। পরকালে দ্বিগুণ ফল ফলিবে। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের কথা কেন? তুমি কি পাপ করিয়াছ? তোমার প্রতিজ্ঞা, স্ত্রীলোকের সঙ্গে একাসনে বসিবে না। কৈ, কোন দিন ত একাসনে বসো নাই। প্রায়শ্চিত্ত কেন? হায় প্রভু! তুমিই আমার গুরু, আমি কি তোমায় ধর্ম্ম শিখাইব? তুমি বীর, আমি তোমায় বীরব্রত শিখাইব?"

জীবানন্দ আহ্লাদে গদ্গদ হইয়া বলিলেন, "শিখাইলে ত?"

শান্তি প্রফুল্লচিত্তে বলিতে লাগিল, "আরও দেখ গোঁসাই, ইহকালেই কি আমাদের বিবাহ নিষ্ফল? তুমি আমায় ভালবাস, আমি তোমায় ভালবাসি, ইহা অপেক্ষা ইহকালে আর কি গুরুতর ফল আছে? বল "বন্দে মাতরম্" তখন দুই জনে গলা মিলাইয়া "বন্দে মাতরম্" গায়িল।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভবানন্দ গোস্বামী একদা নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রশস্ত রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া একটা অন্ধকার গলির ভিতর প্রবেশ করিলেন। গলির দুই পার্শ্বে উচ্চ অট্টালিকাশ্রেণী; সূর্য্যদেব মধ্যাহ্নে এক একবার গলির ভিতর উঁকি মারেন মাত্র। তৎপরে অন্ধকারেরই অধিকার। গলির পাশের একটি দোতালা বাড়ীতে ভবানন্দ ঠাকুর প্রবেশ করিলেন। নিম্নতলে একটি ঘরে যেখানে অর্দ্ধবয়স্ক একটি স্ত্রীলোক পাক করিতেছিল, সেইখানে গিয়া ভবানন্দ মহাপ্রভু দর্শন দিলেন। স্ত্রীলোকটি অর্দ্ধবয়স্কা, মোটা সোটা, কালো কালো, ঠেঁটি পরা, কপালে উল্কি, সীমান্তপ্রদেশে কেশদাম চূড়াকারে শোভা করিতেছে। ঠন্ ঠন্ করিয়া হাঁড়ির কানায় ভাতের কাটি বাজিতেছে, ফর্ ফর্ করিয়া অলকদামের কেশগুচ্ছ উড়িতেছে, গল্ গল্ করিয়া মাগী আপনা আপনি বকিতেছে, আর তার মুখভঙ্গীতে তাহার মাথার চূড়ার নানা প্রকার টলুনি টালুনির বিকাশ হইতেছে। এমন সময় ভবানন্দ মহাপ্রভু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "ঠাক্রুণ দিদি, প্রাতঃপ্রণাম!"

ঠাক্‌রুণ দিদি ভবানন্দকে দেখিয়া, শশব্যস্তে বস্ত্রাদি সামলাইতে লাগিলেন। মস্তকের মোহন চূড়া খুলিয়া ফেলিবেন ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সুবিধা হইল না; কেন না, সক্‌ড়ি হাত। নিষেকমসৃণ সেই চিকুরজাল– হায়! তাহাতে পূজার সময় একটি বকফুল পড়িয়াছিল!– বস্ত্রাঞ্চলে ঢাকিতে যত্ন করিলেন; বস্ত্রাঞ্চল তাহা ঢাকিতে সক্ষম হইল না; কেন না, ঠাক্‌রুণটি একখানি পাঁচ হাত কাপড় পরিয়াছিলেন। সেই পাঁচ হাত কাপড় প্রথমে গুরুভারপ্রণত উদরদেশ বেষ্টন করিয়া আসিতে প্রায় নিঃশেষ হইয়া পড়িয়াছিল, তার পর দুঃসহ ভারগ্রস্ত হৃদয়মণ্ডলেরও কিছু আব্‌রু পর্দ্দা রক্ষা করিতে হইয়াছে। শেষে ঘাড়ে পৌঁছিয়া বস্ত্রাঞ্চল জবাব দিল। কাণের উপর উঠিয়া বলিল, আর যাইতে পারি না। অগত্যা পরমব্রীড়াবতী গৌরী ঠাকুরাণী কথিত বস্ত্রাঞ্চলকে কাণের কাছে ধরিয়া রাখিলেন। এবং ভবিষ্যতে আট হাত কাপড় কিনিবার জন্য মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বলিলেন, “কে, গোঁসাই ঠাকুর? এস এস! আমায় আবার প্রাতঃপ্রণাম কেন ভাই?”

ভব। তুমি ঠান্‌দিদি যে!

গৌরী। আদর ক’রে বল বলিয়া। তোমরা হলে গোঁসাই মানুষ, দেবতা! তা করেছ করেছ, বেঁচে থাক। তা করিলেও করিতে পার, হাজার হোক আমি বয়সে বড়।

এখন ভবানন্দের, অপেক্ষা গৌরী দেবী মহাশয়া বছর পঁচিশের বড়, কিন্তু সুচতুর ভবানন্দ উত্তর করিলেন, “সে কি ঠান্‌দিদি! রসের মানুষ দেখে ঠান্‌দিদি বলি। নইলে যখন হিসাব হয়েছিল, তুমি আমায় চেয়ে ছয় বছরের ছোট হইয়াছিলে, মনে নাই? আমাদের বৈষ্ণবের সকল রকম আছে জান, আমার মনে মনে ইচ্ছা, মঠধারী ব্রহ্মচারীকে বলিয়া তোমায় সাঙ্গা করে ফেলি। সেই কথাটাই বলতে এসেছি।”

গৌরী। সে কি কথা, ছি! অমন কথা কি বল্‌তে আছে! আমরা হলেম বিধবা।

ভব। তবে সাঙ্গা হবে না?

গৌরী। তা ভাই, যা জান তা কর। তোমরা হলে পণ্ডিত, আমরা মেয়েমানুষ, কি বুঝি? তা, কবে হবে?

ভবানন্দ অতিকষ্টে হাস্যসংবরণ করিয়া বলিলেন, “সেই ব্রহ্মচারীটার সঙ্গে একবার দেখা হইলেই হয়। আর– সে কেমন আছে?”

গৌরী বিষণ্ন হইল। মনে মনে সন্দেহ করিল, সাঙ্গার কথাটা তবে বুঝি তামাশা। বলিল, “আছে আর কেমন, যেমন থাকে।”

ভবা। তুমি গিয়া একবার দেখিয়া আইস কেমন আছে, বলিয়া আইস, আমি আসিয়াছি একবার সাক্ষাৎ করিব।

গৌরী দেবী তখন ভাতের কাটি ফেলিয়া, হাত ধুইয়া, বড় বড় ধাপের সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া, দোতালার উপর উঠিতে লাগিল। একটি ঘরে ছেঁড়া মাদুরের উপর বসিয়া এক অপূর্ব্ব সুন্দরী। কিন্তু সৌন্দর্য্যের উপর একটা ঘোরতর ছায়া আছে। মধ্যাহ্নে কূলপরিপ্লাবিনী প্রসন্নসলিলা বিপুলজলকল্লোলিনী স্রোতস্বতীর বক্ষের উপর অতি নিবিড় মেঘের ছায়ার ন্যায় কিসের ছায়া আছে। নারীহৃদয়ে তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হইতেছে, তীরে কুসুমিত তরুকুল বায়ুভরে হেলিতেছে, ঘন পুষ্পভরে নমিতেছে, অট্টালিকাশ্রেণীও শোভিতেছে। তরণীশ্রেণী-তাড়নে জল আন্দোলিত হইতেছে। কাল মধ্যাহ্নে, তবু সেই কাদম্বিনীনিবিড় কালো ছায়ায় সকল শোভাই কালিমাময়। এও তাই। সেই পূর্ব্বের মত চারু চিক্কণ চঞ্চল নিবিড় অলকদাম, পূর্ব্বের মত সেই প্রশস্ত পরিপূর্ণ ললাটভূমে পূর্ব্বমত অতুল তুলিকালিখিত ভ্রূধনু, পূর্ব্বের মত বিস্ফারিত সজল উজ্জ্বল কৃষ্ণতার বৃহচ্চক্ষু, তত কটাক্ষময় নয়, তত লোলতা নাই, কিছু নম্র। অধরে তেমনি রাগরঙ্গ, হৃদয় তেমনি শ্বাসানুগামী পূর্ণতায় ঢল ঢল, বাহু তেমনি বনলতাদুষ্প্রাপ্য কোমলতাযুক্ত। কিন্তু আজ সে দীপ্তি নাই, সে উজ্জ্বলতা নাই, সে প্রখরতা নাই, সে চঞ্চলতা নাই, সে রস নাই। বলিতে কি, বুঝি সে যৌবন নাই। আছে কেবল সে সৌন্দর্য্য আর সে মাধুর্য্য। নূতন হইয়াছে ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য। ইঁহাকে পূর্ব্বে দেখিলে মনে হইত, মনুষ্যলোকে

অতুলনীয়া সুন্দরী, এখন দেখিলে বোধ হয়, ইনি দেবলোকে শাপগ্রস্তা দেবী। ইঁহার চারি পার্শ্বে দুই তিনখানা তুলটের পুথি পড়িয়া আছে। দেওয়ালের গায়ে হরিনামের মালা টাঙ্গান আছে, আর মধ্যে মধ্যে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রার পট, কালিয়দমন, নননারীকুঞ্জর, বস্ত্রহরণ, গোবর্দ্ধনধারণ প্রভৃতি ব্রজলীলার চিত্র রঞ্জিত আছে। চিত্রগুলির নীচে লেখা আছে, "চিত্র না বিচিত্র?" সেই গৃহমধ্যে ভবানন্দ প্রবেশ করিলেন।

ভবানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন কল্যাণি, শারীরিক মঙ্গল ত?"

কল্যাণী। এ প্রশ্ন কি আপনি ত্যাগ করিবেন না? আমার শারীরিক মঙ্গলে আপনারই কি ইষ্ট, আর আমারই বা কি ইষ্ট?

ভব। যে বৃক্ষ রোপণ করে, সে তাহাতে নিত্য জল দেয়। গাছ বাড়িলেই তাহার সুখ। তোমার মৃত দেহে আমি জীবন রোপণ করিয়াছিলাম, বাড়িতেছে কি না, জিজ্ঞাসা করিব না কেন?

ক। বিষবৃক্ষের কি ক্ষয় আছে?

ভব। জীবন কি বিষ?

ক। না হলে অমৃত ঢালিয়া আমি তাহা ধ্বংস করিতে চাহিয়াছিলাম কেন?

ভব। সে অনেক দিন জিজ্ঞাসা করিব মনে ছিল, সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই। কে তোমার জীবন বিষময় করিয়াছিল?

কল্যাণী স্থিরভাবে উত্তর করিলেন, "আমার জীবন কেহ বিষময় করে নাই। জীবনই বিষময়। আমার জীবন বিষময়, আপনার জীবন বিষময়, সকলের জীবন বিষময়।"

ভব। সত্য কল্যাণী, আমার জীবন বিষময়। যে দিন অবধি–তোমার ব্যাকরণ শেষ হইয়াছে?

ক। না।

ভব। অভিধান?

ক। ভাল লাগে না।

ভব। বিদ্যা অর্জ্জনে কিছু আগ্রহ দেখিয়াছিলাম এখন এ অশ্রদ্ধা কেন?

ক। আপনার মত পণ্ডিতও যখন মহাপাপিষ্ঠ, তখন লেখাপড়া না করাই ভাল। আমার স্বামীর সংবাদ কি প্রভু?

ভব। বার বার সে সংবাদ কেন জিজ্ঞাসা কর? তিনি ত তোমার পক্ষে মৃত।

ক। আমি তাঁর পক্ষে মৃত,তিনি আমার পক্ষে নন।

ভব। তিনি তোমার পক্ষে মৃতবৎ হইবেন বলিয়াই ত তুমি মরিলে বার বার সে কথা কেন কল্যাণি?

ক। মরিলে কি সম্বন্ধ যায়? তিনি কেমন আছেন?

ভব। ভাল আছেন।

ক। কোথায় আছেন পদচিহ্নে?

ভব। সেইখানেই আছে।

ক। কি কাজ করিতেছেন?

ভব। যাহা করিতেছিলেন। দুর্গনির্ম্মাণ, অস্ত্রনির্ম্মাণ। তাঁহারই নির্ম্মিত অস্ত্রে সহস্র সহস্র সন্তান সজ্জিত হইয়াছে। তাঁহার কল্যাণে কামান, বন্দুক, গোলা, গুলি, বারুদের আমাদের আর অভাব নাই। সন্তানমধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ। তিনি আমাদিগকে মহৎ উপকার করিতেছেন। তিনি আমাদিগের দক্ষিণ বাহু।

ক। আমি প্রাণত্যাগ না করিলে কি এত হইত? যার বুকে কাদাপোরা কলসী বাঁধা, সে কি ভবসমুদ্রে সাঁতার দিতে পারে? যার পায়ে লোহার শিকল, সে কি দৌড়ায়? কেন সন্ন্যাসী, তুমি এ ছার জীবন রাখিয়াছিলে।

ভব। স্ত্রী সহধর্ম্মিণী, ধর্ম্মের সহায়।

ক। ছোট ছোট ধর্ম্মে। বড় বড় ধর্ম্মে কণ্টক। আমি বিষকণ্টকের দ্বারা তাঁহার অধর্ম্মকণ্টক উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। ছি! দুরাচার পামর ব্রহ্মচারী! এ প্রাণ তুমি ফিরিয়া দিলে কেন?

ভব। ভাল, যা দিয়াছি, তা না হয় আমারই আছে। কল্যাণি! যে প্রাণ তোমায় দিয়াছি, তাহা কি তুমি আমায় দিতে পার?

ক। আপনি কিছু সংবাদ রাখেন কি, আমার সুকুমারী কেমন আছে?

ভব। অনেক দিন সে সংবাদ পাই নাই। জীবানন্দ অনেক দিন সে দিকে যান নাই।

ক। সে সংবাদ কি আমায় আনাইয়া দিতে পারেন না? স্বামীই আমার ত্যাজ্য, বাঁচিলাম ত কন্যা কেন ত্যাগ করিব? এখনও সুকুমারীকে পাইলে এ জীবনে কিছু সুখ সম্ভাবিত হয়। কিন্তু আমার জন্য আপনি কেন এত করিবেন?

ভব। করিব কল্যাণি। তোমার কন্যা আনিয়া দিব। কিন্তু তার পর?

ক। তার পর কি ঠাকুর?

ভব। স্বামী?

ক। ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্যাগ করিয়াছি।

ভব। যদি তার ব্রত সম্পূর্ণ হয়?

ক। তবে তাঁরই হইব। আমি যে বাঁচিয়া আছি, তিনি কি জানেন?

ভব। না।

ক। আপনার সঙ্গে কি তাঁহার সাক্ষাৎ হয় না?

ভব। হয়।

ক। আমার কথা কিছু বলেন না?

ভব। না, যে স্ত্রী মরিয়া গিয়াছে, তাহার সঙ্গে স্বামীর আর সম্বন্ধ কি?

ক। কি বলিতেছেন?

ভব। তুমি আবার বিবাহ করিতে পার, তোমার পুনর্জ্জন্ম হইয়াছে।

ক। আমার কন্যা আনিয়া দাও।

ভব। দিব, তুমি আবার বিবাহ করিতে পার।

ক। তোমার সঙ্গে নাকি?

ভব। বিবাহ করিবে?

ক। তোমার সঙ্গে নাকি?

ভব। যদি তাই হয়?

ক। সন্তানধর্ম্ম কোথায় থাকিবে?

ভব। অতল জলে।

ক। পরকাল?

ভব। অতর জলে।

ক। এই মহাব্রত? এই ভবানন্দ নাম?

ভব। অতল জলে।

ক। কিসের জন্য এ সব অতল জলে ডুবাইবে?

ভব। তোমার জন্য। দেখ, মনুষ্য হউন, ঋষি হউন, সিদ্ধ হউন, দেবতা হউন, চিত্ত অবশ; সন্তানধর্ম্ম আমার প্রাণ, কিন্তু আজ প্রথম বলি, তুমিই আমার প্রাণাধিক প্রাণ। যে দিন তোমার প্রাণদান করিয়াছিলাম, সেই দিন হইতে আমি তোমার পদমূলে বিক্রীত। আমি জানিতাম না যে, সংসারে এ রূপরাশি আছে। এমন রূপরাশি আমি কখন চক্ষে দেখিব জানিলে, কখন সন্তানধর্ম্ম গ্রহণ করিতাম না। এ ধর্ম্ম এ আগুনে পুড়িয়া ছাই হয়। ধর্ম্ম পুড়িয়া গিয়াছে, প্রাণ আছে। আজি চারি বৎসর প্রাণও পুড়িতেছে, আর থাকে না! দাহ! কল্যাণি দাহ! জ্বালা! কিন্তু জ্বলিবে যে ইন্ধন, তাহা আর নাই। প্রাণ যায়। চারি বৎসর সহ্য করিয়াছি, আর পারিলাম না। তুমি আমার হইবে?

ক। তোমারই মুখে শুনিয়াছি যে, সন্তানধর্ম্মের এই এক নিয়ম যে, যে ইন্দ্রিয়পরবশ হয়, তার প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু। এ কথা কি সত্য?

ভব। এ কথা সত্য।

ক। তবে তোমার প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু ?

ভব। আমার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু।

ক। আমি তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ করিলে, তুমি মরিবে?

ভব। নিশ্চিত মরিব।

ক। আর যদি মনস্কামনা সিদ্ধ না করি?

ভব। তথাপি মৃত্যু আমার প্রায়শ্চিত্ত; কেন না, আমার চিত্ত ইন্দ্রিয়ের বশ হইয়াছে।

ক। আমি তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ করিব না। তুমি কবে মরিবে?

ভব। আগামী যুদ্ধে।

ক। তবে তুমি বিদায় হও। আমার কন্যা পাঠাইয়া দিবে কি?

ভবানন্দ সাশ্রুলোচনে বলিল, “দিব।আমি মরিয়া গেলে আমায় মনে রাখিবে কি?”

কল্যাণী বলিল, “রাখিব। ব্রতচ্যুত অধর্ম্মী বলিয়া মনে রাখিব।”

ভবানন্দ বিদায় হইল, কল্যাণী পুথি পড়িতে বসিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভবানন্দ ভাবিতে ভাবিতে মঠে চলিলেন। যাইতে যাইতে রাত্রি হইল। পথে একাকী যাইতেছিলেন। বনমধ্যে একাকী প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, বনমধ্যে আর এক ব্যক্তি তাঁহার আগে আগে যাইতেছে। ভবানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে হে যাও?”

অগ্রগামী ব্যক্তি বলিল, “জিজ্ঞাসা করিতে জানিলে উত্তর দিই– আমি পথিক।”

ভব। বন্দে।

অগ্রগামী ব্যক্তি বলিল, “মাতরম্।”

ভব। আমি ভবানন্দ গোস্বামী।

অগ্রগামী। আমি ধীরানন্দ।

ভব। ধীরানন্দ, কোথায় গিয়াছিলে?

ধীর। আপনারই সন্ধানে।

ভব। কেন?

ধীর। একটা কথা বলিতে।

ভব। কি কথা?

ধীর। নির্জ্জনে বক্তব্য।

ভব। এইখানেই বল না, এ অতি নির্জ্জন স্থান।

ধীর। আপনি নগরে গিয়াছিলেন?

ভব। হাঁ।

ধীর। গৌরী দেবীর গৃহে?

ভব। তুমিও নগরে গিয়াছিলে নাকি?

ধীর। সেখানে একটি পরমাসুন্দরী যুবতী বাস করে?

ভবানন্দ কিছু বিস্মিত, কিছু ভীত হইলেন, বলিলেন, “এ সকল কি কথা?”

ধীর। আপনি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন?

ভব। তার পর?

ধীর। আপনি সেই কামিনীর প্রতি অতিশয় অনুরক্ত।

ভব।(কিছু ভাবিয়া) ধীরানন্দ, কেন এত সন্ধান লইলে? দেখ ধীরানন্দ, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সকলই সত্য। তুমি ভিন্ন আর কয় জন এ কথা জানে?

ধীর। আর কেহ না।

ভব। তবে তোমাকে বধ করিলেই আমি কলঙ্ক হইতে মুক্ত হইতে পারি?

ধীর। পার।

ভব। আইস, তবে এই বিজন স্থানে দুই জনে যুদ্ধ করি। হয় তোমাকে বধ করিয়া আমি নিষ্কণ্টক হই, নয় তুমি আমাকে বধ করিয়া আমার সকল জ্বালা নির্ব্বাণ কর। অস্ত্র আছে?

ধীর। আছে– শুধু হাতে কার সাধ্য তোমার সঙ্গে এ সকল কথা কয়। যুদ্ধই যদি তোমার মত হয়, তবে অবশ্য করিব। সন্তানে সন্তানে বিরোধ নিষিদ্ধ। কিন্ত আত্মরক্ষার জন্য কাহারও সঙ্গে বিরোধ নিষিদ্ধ নহে। কিন্তু যাহা বলিবার জন্য আমি তোমাকে খুঁজিতেছিলাম, তাহা সবটা শুনিয়া যুদ্ধ করিলে ভাল হয় না?

ভব। ক্ষতি কি– বল না।

ভবানন্দ তরবারি নিষ্কাশিত করিয়া ধীরানন্দের স্কন্ধে স্থাপিত করিলেন। ধীরানন্দ না পলায়।

ধীর। আমি এই বলিতেছিলাম– তুমি কল্যাণীকে বিবাহ কর–

ভব। কল্যাণী, তাও জান?

ধীর। বিবাহ কর না কেন?

ভব। তাহার যে স্বামী আছে।

ধীর। বৈষ্ণবের সেরূপ বিবাহ হয়।

ভব। সে নেড়া বৈরাগীর– সন্তানের নহে। সন্তানের বিবাহই নাই।

ধীর। সন্তান-ধর্ম্ম কি অপরিহার্য্য–তোমার যে প্রাণ যায়। ছি! ছি! আমার কাঁধ যে কাটিয়া গেল! (বাস্তবিক এবার ধীরানন্দের স্কন্ধ হইতে রক্ত পড়িতেছিল।)

ভব। তুমি কি অভিপ্রায়ে আমাকে অধর্ম্মে মতি দিতে আসিয়াছ? অবশ্য তোমার কোন স্বার্থ আছে।

ধীর। তাহাও বলিবার ইচ্ছা আছে– তরবারি বসাইও না–বলিতেছি। এই সন্তানধর্ম্মে আমার হাড় জরজর হইয়াছে, আমি ইহা পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীপুত্রের মুখ দেখিয়া দিনপাত করিবার জন্য বড় উতলা হইয়াছি। আমি এ সন্তানধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব। কিন্তু আমার কি বাড়ী গিয়া বসিবার যো আছে? বিদ্রোহী বলিয়া

আমাকে অনেকে চিনে। ঘরে গিয়া বসিলেই হয় রাজপুরুষে মাথা কাটিয়া লইয়া যাইবে, নয় সন্তানেরাই বিশ্বাসঘাতী বলিয়া মারিয়া ফেলিয়া চলিয়া যাইবে। এই জন্য তোমাকে আমার পথে লইয়া যাইতে চাই।

ভব। কেন, আমায় কেন?

ধীর। সেইটি আসল কথা। এই সন্তানসেনা তোমার আজ্ঞাধীন–সত্যানন্দ এখন এখানে নাই, তুমি ইহার নায়ক। তুমি এই সেনা লইয়া যুদ্ধ কর, তোমার জয় হইবে, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস ।যুদ্ধে জয় হইলে তুমি কেন স্বনামে রাজ্য স্থাপন কর না, সেনা ত তোমার আজ্ঞাকারী। তুমি রাজা হও–কল্যাণী তোমার মন্দোদরী হউক, আমি তোমার অনুচর হইয়া স্ত্রীপুত্রের মুখাবলোকন করিয়া দিনপাত করি, আর আশীর্ব্বাদ করি। সন্তানধর্ম্ম অতল জলে ডুবাইয়া দাও।

ভবানন্দ, ধীরানন্দের স্কন্ধ হইতে তরবারি ধীরে ধীরে নামাইলেন। বলিলেন, "ধীরানন্দ, যুদ্ধ কর, তোমায় বধ করিব। আমি ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়া থাকিব, কিন্তু বিশ্বাসহন্তা নই। তুমি আমাকে বিশ্বাসঘাতক হইতে পরামর্শ দিয়াছ। নিজেও বিশ্বাসঘাতক, তোমাকে মারিলে ব্রহ্মহত্যা হয় না। তোমাকে মারিব।" ধীরানন্দ কথা শেষ হইতে না হইতেই ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। ভবানন্দ তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন না। ভবানন্দ কিছুক্ষণ অন্যমনা ছিলেন, যখন খুঁজিলেন, তখন আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মঠে না গিয়া ভবানন্দ গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই জঙ্গলমধ্যে এক স্থানে এক প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ আছে। ভগ্নাবশিষ্ট ইষ্টকাদির উপর, লতাগুল্মকণ্টকাদি অতিশয় নিবিড়ভাবে জন্মিয়াছে। সেখানে অসংখ্য সর্পের বাস। ভগ্ন প্রকোষ্ঠের মধ্যে একটি অপেক্ষাকৃত অভগ্ন ও পরিষ্কৃত ছিল, ভবানন্দ গিয়া তাহার উপরে উপবেশন করিলেন। উপবেশন করিয়া ভবানন্দ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

রজনী ঘোর তমোময়ী। তাহাতে সেই অরণ্য অতি বিস্তৃত, একবারে জনশূন্য, অতিশয় নিবিড়, বৃক্ষলতা, দুর্ভেদ্য, বন্য পশুরও গমনাগমনের বিরোধী। বিশাল জনশূন্য, অন্ধকার, দুর্ভেদ্য, নীরব! রবের মধ্যে দূরে ব্যাঘ্রের হুঙ্কার অথবা অন্য শ্বাপদের ক্ষুধা, ভীতি বা আস্ফালনের বিকট শব্দ। কদাচিৎ কোন বৃহৎ পক্ষীর পক্ষকম্পন, কদাচিৎ তাড়িত এবং তাড়নকারী, বধ্য এবং বধকারী পশুদিগের দ্রুতগমন-শব্দ। সেই বিজনে অন্ধকার ভগ্ন অট্টালিকার উপর বসিয়া একা ভবানন্দ। তাঁহার পক্ষে তখন যেন পৃথিবী নাই, অথবা কেবল ভয়ের উপাদানময়ী হইয়া আছেন। সেই সময়ে ভবানন্দ কপালে হাত দিয়া ভাবিতেছিলেন; স্পন্দ নাই, বিশ্বাস নাই , ভয় নাই, অতি প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন। মনে মনে বলিতেছিলেন, "যাহা ভবিতব্য, তাহা অবশ্য হইবে। আমি ভাগীরথীজলতরঙ্গসমীপে ক্ষুদ্র গজের মত ইন্দ্রিয়স্রোতে ভাসিয়া গেলাম, ইহাই আমার দুঃখ। এই মুহূর্ত্তে দেহের ধ্বংস হইতে পারে– দেহের ধ্বংসেই ইন্দ্রিয়ের ধ্বংস– আমি সেই ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইলাম? আমার মরণ শ্রেয়। ধর্ম্মত্যাগী? ছি! মরিব!" এমন সময়ে পেচক মাথার উপর গম্ভীর শব্দ করিল। ভবানন্দ তখন মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "ও কি শব্দ? কাণে যেন গেল, যম আমায় ডাকিতেছে। আমি জানি না–কে শব্দ করিল, কে আমায় ডাকিল, কে আমায় বিধি দিল, কে মরিতে বলিল! পুণ্যময়ি অনন্তে! তুমি শব্দময়ী, কিন্তু তোমার শব্দের ত মর্ম্ম আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আমায় ধর্ম্মে মতি দাও, আমায় পাপ হইতে নিরত কর। ধর্ম্মে–হে গুরুদেব! ধর্ম্মে যেন আমার মতি থাকে!"

তখন সেই ভীষণ কাননমধ্য হইতে অতি মধুর অথচ গম্ভীর, মর্ম্মভেদী মনুষ্যকণ্ঠ শ্রুত হইল; কে বলিল, “ধর্ম্মে তোমার মতি থাকিবে–আশীর্ব্বাদ করিলাম।”

ভবানন্দের শরীরে রোমাঞ্চ হইল। “এ কি এ ? এ যে গুরুদেবের কণ্ঠ। মহারাজ, কোথায় আপনি! এ সময়ে দাসকে দর্শন দিন।”

কিন্তু কেহ দর্শন দিল না–কেহ উত্তর করিল না। ভবানন্দ পুনঃ পুনঃ ডাকিলেন–উত্তর পাইলেন না। এদিক্ ওদিক্ খুঁজিলেন–কোথাও কেহ নাই।

যখন রজনী প্রভাতে প্রাতঃসূর্য্য উদিত হইয়া বৃহৎ অরণ্যের শিরঃস্থ শ্যামল পত্ররাশিতে প্রতিবাসিত হইতেছিল, তখন ভবানন্দ মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কর্ণে প্রবেশ করিল–“হরে মুরারে! হরে মুরারে!” চিনিলেন– সত্যানন্দের কণ্ঠ। বুঝিলেন, প্রভু প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

জীবানন্দ কুটীর হইতে বাহির হইয়া গেলে পর, শান্তিদেবী আবার সারঙ্গ লইয়া মৃদু মৃদু রবে গীত করিতে লাগিলেন–

“প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্
কেশব ধৃতমীনশরীর
জয় জগদীশ হরে।”

গোস্বামিবিরচিত মধুর স্তোত্র যখন শান্তিদেবীকণ্ঠনিঃসৃত হইয়া, রাগ-তাল-লয়-সম্পূর্ণ হইয়া, সেই অনন্ত কাননের অনন্ত নীরবতা বিদীর্ণ করিয়া, পূর্ণ জলোচ্ছ্বাসের সময়ে বসন্তানিলতাড়িত তরঙ্গভঙ্গের ন্যায় মধুর হইয়া আসিল, তখন তিনি গায়িলেন–

“নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্
সদয়-হৃদয় দর্শিতপশুঘাতম্
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর
জয় জগদীশ হরে।”

তখন বাহির হইতে কে অতি গম্ভীর রবে গায়িল, গম্ভীর মেঘগর্জ্জনবৎ তানে গায়িল,–

“ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালম্
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্
কেশব ধৃতকল্কিশরীর
জয় জগদীশ হরে।”

শান্তি ভক্তিভাবে প্রণত হইয়া সত্যানন্দের পদধূলি গ্রহণ করিল; বলিল, “প্রভো, আমি এমন কি ভাগ্য করিয়াছি যে, আপনার শ্রীপাদপদ্ম এখানে দর্শন পাই–আজ্ঞা করুন, আমাকে কি করিতে হইবে।” বলিয়া সারঙ্গে সুর দিয়া শান্তি আবার গাইল,–

“তব চরণপ্রণতা বয়মিতি ভাবয় কুরু কুশলং প্রণতেষু।”

সত্যানন্দ বলিলেন, “মা, তোমার কুশলই হইবে।”

শান্তি। কিসে ঠাকুর–তোমার ত আজ্ঞা আছে আমার বৈধব্য!

সত্য। তোমারে আমি চিনিতাম না। মা! দড়ির জোর না বুঝিয়া আমি জেয়াদা টানিয়াছি, তুমি আমার অপেক্ষা জ্ঞানী, ইহার উপায় তুমি কর, জীবানন্দকে বলিও না যে, আমি সকল জানি। তোমার প্রলোভনে তিনি জীবন রক্ষা করিতে পারেন, এতদিন করিতেছেন। তাহা হইলে আমার কার্য্যোদ্ধার হইতে পারে।

সেই বিশাল নীল উৎফুল্ল লোচনে নিদাঘকাদম্বিনীবিরাজিত বিদ্যুত্তুল্য ঘোর রোষকটাক্ষ হইল। শান্তি বলিল, "কি ঠাকুর! আমি আর আমার স্বামী এক আত্মা, যাহা যাহা তোমার সঙ্গে কথোপকথন হইল, সবই বলিব। মরিতে হয় তিনি মরিবেন, আমার ক্ষতি কি? আমি ত সঙ্গে সঙ্গে মরিব। তাঁর স্বর্গ আছে, মনে কর কি, আমার স্বর্গ নই?"

ব্রহ্মচারী বলিলেন যে, "আমি কখন হারি নাই, আজ তোমার কাছে হারিলাম। মা, আমি তোমার পুত্র, সন্তানকে স্নেহ কর, জীবানন্দের প্রাণরক্ষা কর, আপনার প্রাণরক্ষা কর, আমার কার্য্যোদ্ধার হইবে।"

বিজলী হাসিল। শান্তি বলিল, "আমার স্বামীর ধর্ম্ম আমার স্বামীর হাতে; আমি তাঁহাকে ধর্ম্ম হইতে বিরত করিবার কে? ইহলোকে স্ত্রীর পতি দেবতা, কিন্তু পরলোকে সবারই ধর্ম্ম দেবতা–আমার কাছে আমার পতি বড়, তার অপেক্ষা আমার ধর্ম্ম বড়. তার অপেক্ষা আমার কাছে আমার স্বামীর ধর্ম্ম বড়। আমার ধর্ম্মে আমার যে দিন ইচ্ছা জলাঞ্জলি দিতে পারি; আমার স্বামীর ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিব? মহারাজ! তোমার কথায় আমার স্বামী মরিতে হয়, মরিবেন, আমি বারণ করিব না।"

ব্রহ্মচারী তখন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "মা, এ ঘোর ব্রতে বলিদান আছে। আমাদের সকলকেই বলি পড়িতে হইবে। আমি মরিব, জীবানন্দ, ভবানন্দ, সবাই মরিবে, বোধ হয়, মা, তুমিও মরিবে; কিন্তু দেখ, কাজ করিয়া মরিতে হইবে, বিনা কার্য্যে কি মরা ভাল?–আমি কেবল দেশকে মা বলিয়াছি, আর কাহাকেও মা বলি নাই; কেন না, সেই সুজলা সুফলা ধরণী ভিন্ন আমরা অনন্যমাতৃক। আর তোমাকে মা বলিলাম, তুমি মা হইয়া সন্তানের কাজ কর, যাহাতে কার্য্যোদ্ধার হয়, তাহা করিও, জীবানন্দের প্রাণরক্ষা করিও, তোমার প্রাণরক্ষা করিও।"

এই বলিয়া সত্যানন্দ "হরে মরারে মধুকৈটভারে" গায়িতে গায়িতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ক্রমে সন্তানসম্প্রদায়মধ্যে সংবাদ প্রচারিত হইল যে, সত্যানন্দ আসিয়াছেন, সন্তানদিগের সঙ্গে কি কথা কহিবেন, এই বলিয়া তিনি সকলকে আহ্বান করিয়াছেন। তখন দলে দলে সন্তানসম্প্রদায় নদীতীরে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। জ্যোৎস্নারাত্রিতে নদীসৈকতপার্শ্বে বৃহৎ কাননমধ্যে আম্র, পনস, তাল, তিন্তিড়ী, অশ্বত্থ, বেল, বট, শাল্মলী প্রভৃতি বৃক্ষাদিরঞ্জিত মহাগহনে দশ সহস্র সন্তান সমবেত হইল। তখন সকলেই পরস্পরের মুখে সত্যানন্দের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মহা কোলাহলধ্বনি করিতে লাগিল। সত্যানন্দ কি জন্য কোথায় গিয়াছিলেন, তাহা সাধারণে জানিত না। প্রবাদ এই যে, তিনি সন্তানদিগের মঙ্গলকামানায় তপস্যার্থ হিমালয়ে প্রস্থান করিয়াছিলেন। আজ সকলে কাণাকাণি করিতে লাগিল, "মহারাজের তপঃসিদ্ধি হইয়াছে– আমাদের রাজ্য হইবে।" তখন বড় কোলাহল হইতে লাগিল। কেহ চীৎকার করিতে লাগিল, "মার, মার, নেড়ে মার।" কেহ বলিল, "জয় জয়! মহারাজকি জয়।" কেহ গায়িল, "হরে মরারে মধুকৈটভারে!" কেহ গায়িল, "বন্দে মাতরম্!" কেহ বলে–"ভাই, এমন দিন কি হইবে, তুচ্ছ বাঙ্গালি হইয়া রণক্ষেত্রে এ শরীরপাত করিব?" কেহ বলে,

“ভাই, এমন দিন কি হইবে, মসজিদ ভাঙ্গিয়া রাধামাধবের মন্দির গড়িব?” কেহ বলে, “ভাই এমন দিন কি হইবে, আপনার ধন আপনি খাইব?” দশ সহস্র নরকণ্ঠের কল কল রব, মধুর বায়ুসন্তাড়িত বৃক্ষপত্ররাশির মর্ম্মর, সৈকতবাহিনী তরঙ্গিণীর মৃদু মৃদু তর তর রব, নীল আকাশে চন্দ্র, তারা, শ্বেত মেঘরাশি, শ্যামল ধরণীতলে হরিৎ কানন, স্বচ্ছ নদী, শ্বেত সৈকত, ফুল্ল কুসুমদাম। আর মধ্যে মধ্যে সেই সর্ব্বজনমনোরম “বন্দে মাতরম্!” সত্যানন্দ আসিয়া সেই সমবেত সন্তানমণ্ডলীর মধ্যে দাঁড়াইলেন। তখন সেই দশ সহস্র সন্তানমস্তক বৃক্ষবিচ্ছেদপতিত চন্দ্রকিরণে প্রভাসিত হইয়া শ্যামল তৃণভূমে প্রণত হইল। অতি উচ্চস্বরে অশ্রুপূর্ণলোচনে উভয় বাহু ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া সত্যানন্দ বলিলেন, “শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, বনমালী, বৈকুণ্ঠনাথ, যিনি কেশিমথন, মধুমুরনরকমর্দ্দন, লোকপালন, তিনি তোমাদের মঙ্গল করুন, তিনি তোমাদের বাহুতে বল দিন, মনে ভক্তি দিন, ধর্ম্মে মতি দিন, তোমরা একবার তাঁহার মহিমা গীত কর।” তখন সেই সহস্র কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে গীত হইতে লাগিল,–

“জয় জগদীশ হরে!
প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্
কেশব ধৃতমীনশরীর
জয় জগদীশ হরে।”

সত্যানন্দ তাহাদিগকে পুনরায় আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, “হে সন্তানগণ, তোমাদের সঙ্গে আজ আমার বিশেষ কথা আছে। টমাসনামা একজন বিধর্ম্মী দূরাত্মা বহুতর সন্তান নষ্ট করিয়াছে। আজ রাত্রে আমরা তাহাকে সসৈন্যে বধ করিব। জগদীশ্বরের আজ্ঞা–তোমরা কি বল?”

ভীষণ হরিধ্বনিতে কানন বিদীর্ণ করিল। “এখনই মারিব–কোথায় তারা, দেখাইয়া দিবে চল!” “মার! মার! শত্রু মার!” ইত্যাদি শব্দ দূরস্থ শৈলে প্রতিধ্বনিত হইল। তখন সত্যানন্দ বলিলেন, “সে জন্য আমাদিগকে একটু ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে হইবে। শত্রুদের কামান আছে–কামান ব্যতীত তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ সম্ভবে না। বিশেষ তাহারা বড় বীরজাতি। পদচিহ্নের দুর্গ হইতে ১৭টি কামান আসিতেছে–কামান পৌঁছিলে আমরা যুদ্ধযাত্রা করিব। ঐ দেখ, প্রভাত হইতেছে–বেলা চারি দণ্ড হইলেই– ও কি ও–”

“গুডুম্–গুডুম্–গুম্!” অকস্মাৎ চারি দিকে বিশাল কাননে তোপের আওয়াজ হইতে লাগিল। তোপ ইংরেজের। জালনিবদ্ধ মীনদলবৎ কাপ্তেন টমাস সন্তানসম্প্রদায়কে এই আম্রকাননে ঘিরিয়া বধ করিবার উদ্যোগ করিয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদ

“গুডুম্ গুডুম্ গুম্।” ইংরেজের কামান ডাকিল। সেই শব্দ বিশাল কানন কম্পিত করিয়া প্রতিধ্বনিত হইল, “গুডুম্ গুডুম্ গুম্।” নদীর বাঁকে বাঁকে ফিরিয়া সেই ধ্বনি দূরস্থ আকাশপ্রান্ত হইতে প্রতিক্ষিপ্ত হইল, “গুডুম্ গুডুম্ গুম্!” নদীপারে দূরস্থ কাননান্তরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই ধ্বনি আবার ডাকিতে লাগিল, “গুডুম্ গুডুম্ গুম্!” সত্যানন্দ আদেশ করিলেন, “তোমরা দেখ, কিসের তোপ।” কয়েক জন সন্তান তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহণ করিয়া দেখিতে ছুটিল, কিন্তু তাহারা কানন হইতে বাহির হইয়া কিছু দূর গেলেই শ্রাবণের ধারার ন্যায় গোলা তাহাদের উপর বৃষ্টি হইল, তাহারা অশ্বসহিত আহত হইয়া সকলেই প্রাণত্যাগ করিল। দূর

হইতে সত্যানন্দ তাহা দেখিলেন। বলিলেন, "উচ্চ বৃক্ষে উঠ, দেখ কি।" তিনি বলিবার অগ্রেই জীবানন্দ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া প্রভাতকিরণে দেখিতেছিলেন, তিনি বৃক্ষের উপরিস্থ শাখা ইহতে ডাকিয়া বলিলেন, "তোপ ইংরেজের। সত্যানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "অশ্বারোহী, না পদাতি?"

জীব। দুই আছে।

সত্যা। কত?

জীব। আন্দাজ করিতে পারিতেছি না, এখনও বনের আড়াল হইতে বাহির হইতেছে।

সত্যা। গোরা আছে? না কেবল সিপাহী?

জীব। গোরা আছে।

তখন সত্যানন্দ জীবানন্দকে বলিলেন, "তুমি গাছ হইতে নাম।"

জীবানন্দ গাছ হইতে নামিলেন।

সত্যানন্দ বলিলেন, "দশ হাজার সন্তান উপস্থিত আছে; কি করিতে পার দেখ। তুমি আজ সেনাপতি।" জীবানন্দ সশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া উল্লম্ফনে অশ্বে আরোহণ করিলেন। একবার নবীনানন্দ গোস্বামীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া নয়নেঙ্গিতে কি বলিলেন, কেহ তাহা বুঝিতে পারিল না। নবীনানন্দ নয়নেঙ্গিতে কি উত্তর করিল, তাহাও কেহ বুঝির না, কেবল তারা দুই জনেই মনে মনে বুঝিল যে, হয়ত এ জন্মের মত এই বিদায়। তখন নবীনানন্দ দক্ষিণ বাহু উত্তোলন করিয়া সকলকে বলিলেন, "ভাই! এই সময় গাও "জয় জগদীশ হরে!" তখন সেই দশ সহস্র সন্তান এককণ্ঠে নদী কানন আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া, তোপের শব্দ ডুবাইয়া দিয়া, সহস্র সহস্র বাহু উত্তোলন করিয়া গায়িল,–

"জয় জগদীশ হরে
ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালম্।"

এমন সময়ে সেই ইংরেজের গোলাবৃষ্টি আসিয়া কাননমধ্যে সন্তানসম্প্রদায়ের উপর পড়িতে লাগিল। কেহ গায়িতে গায়িতে ছিন্নমস্তক ছিন্নবাহু ছিন্নহৃদপিণ্ড হইয়া পড়িল, তথাপি কেহ গীত বন্ধ করিল না, সকলে গায়িতে লাগিল, "জয় জগদীশ হরে!" গীত সমাপ্ত হইলে সকলেই একেবারে নিস্তব্ধ হইল। সেই নিবিড় কানন, সেই নদীসৈকত, সেই অনন্ত বিজন একেবারে গম্ভীর নীরবে নিবিষ্ট হইল; কেবল সেই অতি ভয়ানক কামানের ধ্বনি আর দূরশ্রুত গোরার সমবেত অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা ও পদধ্বনি।

তখন সত্যানন্দ সেই গভীর নিস্তব্ধতামধ্যে অতি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "জগদীশ হরি তোমাদিকে কৃপা করিবেন–তোপ কত দূর?"

উপর হইতে এক জন বলিল, "এই কাননে অতি নিকটে, একখানা ছোট মাঠ পার মাত্র!"

সত্যানন্দ বলিল, "কে তুমি?"

উপর হইতে উত্তর হইল, "আমি নবীনানন্দ।"

তখন সত্যানন্দ বলিলেন, "তোমরা দশ সহস্র সন্তান, আজ তোমাদেরই জয় হইবে, তোপ কাড়িয়া লও।" তখন অগ্রবর্ত্তী অশ্বারোহী বলিলেন, "আইস।"

সেই দশ সহস্র সন্তান–অশ্ব ও পদাতি, অতিবেগে জীবানন্দের অনুবর্ত্তী হইল। পদাতির স্কন্ধে বন্দুক, কটীতে তরবারি, হস্তে বল্লম। কানন হইতে নিষ্ক্রান্ত

হইবামাত্র, সেই অজস্র গোলাবৃষ্টি পড়িয়া তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। বহুতর সন্তান বিনা যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া ভূমিশাহী হইল। এক জন জীবানন্দকে বলিল, “জীবানন্দ, অনর্থক প্রাণিহত্যায় কাজ কি?”

জীবানন্দ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন ভবানন্দ–জীবানন্দ উত্তর করিলেন, “কি করিতে বল।”

ভব। বনের ভিতর থাকিয়া বৃক্ষের আশ্রয় হইতে আপনাদিগের প্রাণরক্ষা করি–তোপের মুখে, পরিষ্কার মাঠে, বিনা তোপে এ সন্তানসৈন্য এক দণ্ড টিকিবে না; কিন্তু ঝোপের ভিতর থাকিয়া অনেকক্ষণ যুদ্ধ করা যাইতে পারিবে।

জীব। তুমি সত্য কথা বলিয়াছ, কিন্তু প্রভু আজ্ঞা করিয়াছেন, তোপ কাড়িয়া লইতে হইবে, অতএব আমরা তোপ কাড়িয়া লইতে যাইব।

ভব। কার সাধ্য তোপ কাড়ে? কিন্তু যদি যেতেই হবে, তবে তুমি নিরস্ত হও, আমি যাইতেছি।

জীব। তা হবে না–ভবানন্দ! আজ আমার মরিবার দিন।

ভব। আজ আমার মরিবার দিন।

জীব। আমার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

ভব। তুমি নিষ্পাপশরীর–তোমার প্রায়শ্চিত্ত নাই। আমার চিত্ত কলুষিত–আমাকেই মরিতে হইবে–তুমি থাক, আমি যাই।

জীব। ভবানন্দ! তোমার কি পাপ, তাহা আমি জানি না। কিন্তু তুমি থাকিলে সন্তানের কার্য্যোদ্ধার হইবে। আমি যাই।

ভবানন্দ নীরব হইয়া শেষে বলিলেন, “মরিবার প্রয়োজন হয় আজই মরিব, যে দিন মরিবার প্রয়োজন হইবে, সেই দিন মরিব, মৃত্যুর পক্ষে আবার কালাকাল কি?”

জীব। তবে এসো।

এই কথার পর ভবানন্দ সকলের অগ্রবর্ত্তী হইলেন। তখন দলে দলে, ঝাঁকে ঝাঁকে গোলা পড়িয়া সন্তানসৈন্য খণ্ড বিখণ্ড করিতেছে, ছিঁড়িয়া চিরিতেছে, উল্টাইয়া ফেলিয়া দিতেছে, তাহার উপর শত্রুর বন্দুকওয়ালা সিপাহী সৈন্য অব্যর্থ লক্ষ্যে সারি সারি সন্তানদলকে ভূমে পাড়িয়া ফেলিতেছে। এমন সময়ে ভবানন্দ বলিলেন, “এই তরঙ্গে আজ সন্তানকে ঝাঁপ দিতে হইবে–কে পার ভাই? এই সময় গাও বন্দে মাতরম্!” তখন উচ্চ নিনাদে মেঘমল্লার রাগে সেই সহস্রকণ্ঠ সন্তানসেনা তোপের তালে গায়িল, “বন্দে মাতরম্।”

দশম পরিচ্ছেদ

সেই দশ সহস্র সন্তান “বন্দে মাতরম্” গায়িতে গায়িতে বল্লম উন্নত করিয়া অতি দ্রুতবেগে তোপশ্রেণীর উপর গিয়া পড়িল। গোলাবৃষ্টিতে খণ্ড বিখণ্ড বিদীর্ণ উৎপতিত অত্যন্ত বিশৃঙ্খল হইয়া গেল, তথাপি সন্তানসৈন্য ফেরে না। সেই সময়ে কাপ্তেন টমাসের আজ্ঞায় এক দল সিপাহী বন্দুকে সঙ্গীন চড়াইয়া প্রবলবেগে সন্তানদিগের দক্ষিণ পার্শ্বে আক্রমণ করিল। তখন দুই দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া সন্তানেরা একেবারে নিরাশ হইল। মুহূর্ত্তে শত শত সন্তান বিনষ্ট হইতে লাগিল। তখন জীবানন্দ বলিলেন, “ভবানন্দ, তোমারই কথা ঠিক, আর বৈষ্ণববধ্বংসের প্রয়োজন নাই; ধীরে ধীরে ফিরি।”

ভব। এখন ফিরিবে কি প্রকারে? এখন যে পিছন ফিরিবে, সেই মরিবে।

জীব। সম্মুখে ও দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে আক্রমণ হইতেছে। বাম পার্শ্বে কেহই নাই, চল, অল্পে অল্পে ঘুরিয়া বাম দিক্ দিয়া বেড়িয়া সরিয়া যাই।

ভব। সরিয়া কোথায় যাইবে? সেখানে যে নদী– নূতন বর্ষায় নদী যে অতি প্রবল হইয়াছে। তুমি ইংরেজের গোলা হইতে পলাইয়া এই সন্তানসেনা নদীর জলে ডুবাইবে?

জীব। নদীর উপর একটা পুল আছে, আমার স্মরণ হইতেছে।

ভব। এই দশ সহস্র সেনা সেই পুলের উপর দিয়া পার করিতে গেলে এত ভিড় হইবে যে, বোধ হয়, একটা তোপেই অবলীলাক্রমে সমুদয় সন্তানসেনা ধ্বংস করিতে পারিবে।

জীব। এই কর্ম্ম কর, অল্পসংখ্যক সেনা তুমি সঙ্গে রাখ, এই যুদ্ধে তুমি যে সাহস ও চাতুর্য্য দেখাইলে– তোমার অসাধ্য কাজ নাই। তুমি সেই অল্পসংখ্যক সন্তান লইয়া সম্মুখ রক্ষা কর। আমি তোমার সেনার অন্তরালে অবশিষ্ট সন্তানগণকে পুল পার করিয়া লইয়া যাই, তোমার সঙ্গে যাহারা রহিল, তাহারা নিশ্চিত বিনষ্ট হইবে, আমার সঙ্গে যাহা রহিল, তাহা বাঁচিলে বাঁচিতে পারিবে।

ভব। আচ্ছা, আমি তাহা করিতেছি।

তখন ভবানন্দ দুই সহস্র সন্তান লইয়া পুনর্ব্বার "বন্দে মাতরম্" শব্দ উত্থিত করিয়া ঘোর উৎসাহসহকারে ইংরেজের গোলন্দাজসৈন্য আক্রমণ করিলেন, সেইখানে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল, কিন্তু তোপের মুখে সেই ক্ষুদ্র সন্তানসেনা কতক্ষণ টিকে? ধানকাটার মত তাহাদিগকে গোলন্দাজেরা ভূমিশায়ী করিতে লাগিল।

এই অবসরে জীবানন্দ অবশিষ্ট সন্তানসেনার মুখ ঈষৎ ফিরাইয়া বাম ভাগে কানন বেড়িয়া ধীরে ধীরে চলিলেন। কাপ্তেন টমাসের এক জন সহযোগী লেপ্টেনাণ্ট ওয়াট্সন্ দূর হইতে দেখিলেন যে, এক সম্প্রদায় সন্তান ধীরে ধীরে পলাইতেছে, তখন তিনিক দল ফৌজদারী সিপাহী, এক দল পরগণা সিপাহী লইয়া জীবানন্দের অনুবর্ত্তী হইলেন।

ইহা কাপ্তেন টমাস দেখিতে পাইলেন। সন্তান-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধান ভাগ পলাইতেছে দেখিয়া তিনি কাপ্তেন হে নামা এক জন সহযোগীকে বলিলেন যে, "আমি দুই চারি শত সিপাহী লইয়া এই উপস্থিত ভগ্নবিদ্রোহীদিগকে নিহত করিতেছি, তুমি তোপগুলি ও অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া উহাদের প্রতি ধাবমান হও, বাম দিক্ দিয়া লেপ্টেনাণ্ট ওয়াট্সন্ যাইতেছেন, দক্ষিণ দিক্ দিয়া তুমি যাও। আর দেখ, আগে গিয়া পুলের মুখ বন্ধ করিতে হইবে; তাহা হইলে তিন দিক্ হইতে উহাদিগকে বেষ্টিত করিয়া জালের পাখীর মত মারিতে পারিব। উহারা দ্রুতপদ দেশী ফৌজ, সর্ব্বাপেক্ষা পলায়নেই সুদক্ষ, অতএব তুমি উহাদিগকে সহজে ধরিতে পারিবে না, তুমি অশ্বারোহীদিগকে একটু ঘুর পথে আড়াল দিয়া গিয়া পুলের মুখে দাঁড়াইতে বল, তাহা এহইলে কর্ম্ম সিদ্ধ হইবে।" কাপ্তেন হে তাহাই করিল।

"অতিদর্পে হতা লঙ্কা।" কাপ্তেন টমাস সন্তানদিগকে অতিশয় ঘৃণা করিয়া দুই শত মাত্র পদাতিক ভবানন্দের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য রাখিয়া, আর সকল হের সঙ্গে পাঠাইলেন। চতুর ভবানন্দ যখন দেখিলেন, ইংরেজের তোপ সকলই গেল, সৈন্য সব গেল, যাহা অল্পই রহিল, তাহা সহজেই বধ্য, তখন তিনি নিজ হতাবশিষ্ট দলকে ডাকিয়া বলিলেন যে, "এই কয়জনকে নিহত করিয়া জীবানন্দের সাহায্যে আমাকে যাইতে হইবে। আর একবার তোমরা 'জয় জগদীশ হরে' বল।" তখন

সেই অল্পসংখ্যক সন্তানসেনা “জয় জগদীশ হরে” বলিয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় কাপ্তেন শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতেছিল। ভবানন্দ বলিলেন, “কাপ্তেন সাহেব, তোমায় মারিব না, ইংরেজ আমাদিগের শত্রু নহে। কেন তুমি মুসলমানের সহায় হইয়া আসিয়াছ? আইস– তোমার প্রাণদান দিলাম, আপাততঃ তুমি বন্দী। ইংরেজের জয় হউক, আমরা তোমাদের সুহৃদ।” কাপ্তেন টমাস তখন ভবানন্দকে বধ করিবার জন্য সঙ্গীন সহিত একটা বন্দুক উঠাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ভবানন্দ তাহাকে বাঘের মত ধরিয়াছিলেন, কাপ্তেন টমাস নড়িতে পারিল না। তখন ভবানন্দ অনুচরবর্গকে বলিলেন যে, “ইহাকে বাঁধ।” দুই তিন জন সন্তান আসিয়া কাপ্তেন টমাসকে বাঁধিল। ভবানন্দ বলিলেন, “ইহাকে একটা ঘোড়ার উপর তুলিয়া লও; চল, উহাকে লইয়া আমরা জীবানন্দ গোস্বামীর আনুকূল্যে যাই।”

তখন সেই অল্পসংখ্যক সন্তানগণ কাপ্তেন টমাসকে ঘোড়ায় বাঁধিয়া লইয়া “বন্দে মাতরম্” গায়িতে গায়িতে লেপ্টেনাণ্ট ওয়াট্‌সন্‌কে লক্ষ্য করিয়া ছুটিল।

জীবানন্দের সন্তানসেনা ভগ্নোদ্যম, তাহারা পলায়নে উদ্যত। জীবানন্দ ও ধীরানন্দ তাহাদিগকে বুঝাইয়া সংযত রাখিলেন, কিন্তু সকলকে পারিলেন না, কতকগুলি পলাইয়া আম্রকাননে আশ্রয় লইল। অবশিষ্ট সেনা জীবানন্দ ও ধীরানন্দ পুলের মুখে লইয়া গেলেন। কিন্তু সেইখানে হে ও ওয়াট্‌সন্ তাহাদিগকে দুই দিক্ হইতে ঘিরিল। আর রক্ষা নাই।

একাদশ পরিচ্ছেদ

এই সময়ে টমাসের তোপগুলি দক্ষিণে আসিয়া পৌঁছিল। তখন সন্তানের দল একেবারে ছিন্নভিন্ন হইল, কেহ বাঁচিবার আর কোন আশা রহিল না। সন্তানেরা যে যেখানে পাইল, পলাইতে লাগিল। জীবানন্দ ধীরানন্দ তাহাদিগকে সংযত এবং একত্রিত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কিছুতেই পারিলেন না। সেই সময় উচ্চৈঃশব্দ হইল, “পুলে যাও, পুলে যাও! ও পারে যাও। নহিলে নদীতে ডুবিয়া মরিবে, ধীরে ধীরে ইংরেজসেনার দিকে মুখ রাখিয়া পুলে যাও।”

জীবানন্দ চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে ভবানন্দ। ভবানন্দ বলিলেন, “জীবানন্দ, পুলে লইয়া যাও, রক্ষা নাই।” তখন ধীরে ধীরে পিছে হঠিতে হঠিতে সন্তানসেনা পুলের পারে চলিল। কিন্তু পুল পাইয়া বহুসংখ্যক সন্তান একেবারে পুলের ভিতর প্রবেশ করায় ইংরেজের তোপ সুযোগ পাইল। পুল একেবারে ঝাঁটাইতে লাগিল। সন্তানের দল বিনষ্ট হইতে লাগিল। ভবানন্দ জীবানন্দ ধীরানন্দ একত্র। একটা তোপের দৌরাত্ম্যে ভয়ানক সন্তানক্ষয় হইতেছিল। ভবানন্দ বলিলেন, “জীবানন্দ, ধীরানন্দ, এস–তরবারি ঘুরাইয়া আমরা তিন জন এই তোপটা দখল করি।” তখন তিন জনে তরবারি ঘুরাইয়া সেই তোপের নিকটবর্ত্তী গোলন্দাজ সেনা বধ করিলেন। তখন আর আর সন্তানগণ তাহাদের সাহায্যে আসিল। তোপটা ভবানন্দের দখল হইল। তোপ দখল করিয়া ভবানন্দ তাহার উপর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। করতালি দিয়া বলিলেন, “বল বন্দে মাতরম্।” সকলে গায়িল, “বন্দে মাতরম্।” ভবানন্দ বলিলেন, “জীবানন্দ, এই তোপ ঘুরাইয়া বেটাদের লুচির ময়দা তৈয়ার করি।” সন্তানেরা সকলে ধরিয়া তোপ ঘুরাইল। তখন তোপ উচ্চনাদে বৈষ্ণবের কর্ণে যেন হরি হরি শব্দে ডাকিতে লাগিল। বহুতর সিপাহী তাহাতে মরিতে লাগিল। ভবানন্দ সেই তোপ টানিয়া আনিয়া পুলের মুখে স্থাপন করিয়া বলিলেন, “তোমরা দুই জনে সন্তানসেনা সারি দিয়া পুল পার করিয়া লইয়া যাও, আমি একা এই ব্যূহমুখ রক্ষা করিব– তোপ চালাইবার জন্য আমার কাছে জন কয় গোলন্দাজ দিয়া যাও।” কুড়ি জন বাছা বাছা সন্তান ভবানন্দের কাছে রহিল।

তখন অসংখ্য সন্তান পুল পার হইয়া জীবানন্দ ও ধীরানন্দের আজ্ঞাক্রমে সারি দিয়া পরপারে যাইতে লাগিল। একা ভবানন্দ কুড়ি জন সন্তানের সাহায্যে

সেই এক কামানে বহুতর সেনা নিহত করিতে লাগিলেন–কিন্তু যবনসেনা জলোচ্ছ্বাসোত্থিত তরঙ্গের ন্যায়! তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ!–ভবানন্দকে সংবেষ্টিত, উৎপীড়িত, নিমগ্নের ন্যায় করিয়া তুলিল। ভবানন্দ অশ্রান্ত, অজেয়, নির্ভীক–কামানের শব্দে শব্দে কতই সেনা বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। যবন বাত্যাপীড়িত তরঙ্গাভিঘাতের ন্যায় তাঁহার উপর আক্রমণ করিতে লাগিল, কিন্তু কুড়ি জন সন্তান, তোপ লইয়া পুলের মুখ বন্ধ করিয়া রহিল। তাহারা মরিয়াও মরে না– যবন পুলে ঢুকিতে পায় না। সে বীরেরা অজেয়, সে জীবন অবিনশ্বর। অবসর পাইয়া দলে দলে সন্তানসেনা অপর পারে গেল। আর কিছুকাল পুল রক্ষা করিতে পারিলেই সন্তানেরা সকলেই পুলের পারে যায়– এমন সময় কোথা হইতে নূতন তোপ ডাকিল– "গুড়ুম্ গুড়ুম্ বুম্ বুম্।" উভয় দল কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া চাহিয়া দেখিল–কোথায় আবার কামান! দেখিল, বনের ভিতর হইতে কতকগুলি কামান দেশী গোলন্দাজ কর্ত্তৃক চালিয়া হইয়া নির্গত হইতেছে। নির্গত হইয়া সেই বিরাট কামানের শ্রেণী সপ্তদশ মুখে ধূম উদ্গীর্ণ করিয়া হে সাহেবের দলের উপর অগ্নিবৃষ্টি করিল। ঘোর শব্দে বন নদ গিরি সকলই প্রতিধ্বনিত হইল। সমস্ত দিনের রণে ক্লান্ত যবনসেনা প্রাণভয়ে শিহরিল। অগ্নিবৃষ্টিতে তৈলঙ্গী, মুসলমান, হিন্দুস্থানী, পলায়ন করিতে লাগিল। কেবল দুই চারি জন গোরা খাড়া দাঁড়াইয়া মরিতে লাগিল।

ভবানন্দ রঙ্গ দেখিতেছিলেন। ভবানন্দ বলিলেন, "ভাই, নেড়ে ভাঙ্গিতেছে, চল একবার উহাদিগকে আক্রমণ করি।" তখন পিপীলিকাস্রোতবৎ সন্তানের দল নূতন উৎসাহে পুল পারে ফিরিয়া আসিয়া যবনদিগকে আক্রমণ করিতে ধাবমান হইল। অকস্মাৎ তাহারা যবনের উপর পড়িল। যবন যুদ্ধের আর অবকাশ পাইল না– যেমন ভাগীরথীতরঙ্গ সেই দম্ভকারী বৃহৎ পর্ব্বতাকার মত্ত হস্তীকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল, সন্তানেরা তেমনি যবনদিগকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। যবনেরা দেখিল, পিছনে ভবানন্দের পদাতিক সেনা, সম্মুখে মহেন্দ্রের কামান। তখন হে সাহেবের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল। আর কিছু টিকিল না– বল, বীর্য্য, সাহস, কৌশল, শিক্ষা, দম্ভ, সকলই ভাসিয়া গেল। ফৌজদারী, বাদশাহী, ইংরেজী, দেশী, বিলাতী, কালা, গোরা সৈন্য নিপতিত হইয়া ভূতলশায়ী হইল। বিধর্ম্মীর দল পলাইল। মার মার শব্দে জীবানন্দ, ভবানন্দ, ধীরানন্দ, বিধর্ম্মী সেনার পশ্চাতে ধাবমান হইলেন। তাহাদের তোপ সন্তানেরা কাড়িয়া লইল, বহুতর ইংরেজ সিপাহী নিহত হইল। সর্ব্বনাশ হইল দেখিয়া কাপ্তেন হে ও ওয়াট্‌সন্ ভবানন্দের নিকট বলিয়া পাঠাইল, "আমরা সকলে তোমাদিগের নিকট বন্দী হইতেছি, আর প্রাণিহত্যা করিও না।" জীবানন্দ ভবানন্দের মুখপানে চাহিলেন। ভবানন্দ মনে মনে বলিলেন, "তা হইবে না, আমায় যে আজ মরিতে হইবে।" তখন ভবানন্দ উচ্চৈঃস্বরে হস্তোত্তোলন করিয়া হরিবোল দিয়া বলিলেন, "মার মার।"

আর এক প্রাণী বাঁচিল না–শেষ এক স্থানে ২০/৩০ জন গোরা সৈন্য একত্রিত হইয়া আত্মসমর্পণে কৃতনিশ্চয় হইল, অতি ঘোরতর রণ করিতে লাগিল। জীবানন্দ বলিলেন, "ভবানন্দ, আমাদের রণজয় হইয়াছে, আর কাজ নাই, এই কয় জন ব্যতীত আর জীবিত নাই। উহাদিগকে প্রাণ দান দিয়া চল আমরা ফিরিয়া যাই।" ভবানন্দ বলিলেন, "এক জন জীবিত থাকিতে ভবানন্দ ফিরিবে না– জীবানন্দ, তোমায় দিব্য দিয়া বলিতেছি যে, তুমি তফাতে দাঁড়াইয়া দেখ, একা আমি এই কয় জন ইংরেজকে নিহত করি।"

কাপ্তেন টমাস অশ্বপৃষ্ঠে নিবদ্ধ ছিল। ভবানন্দ আজ্ঞা ছিলেন, "উহাকে আমার সম্মুখে রাখ, আগে ঐ বেটা মরিবে, তবে ত আমি মরিব।"

কাপ্তেন টমাস বাঙ্গালা বুঝিত, বুঝিয়া ইংরেজসেনাকে বলিল, "ইংরেজ! আমি ত মরিয়াছি, প্রাচীন ইংলণ্ডের নাম তোমরা রক্ষা করিও, তোমাদিগকে খ্রীষ্টের দিব্য দিতেছি, আগে আমাকে মার, তার পর এই বিদ্রোহীদিগকে মার।"

ভোঁ করিয়া একটি বুলেট ছুটিল, এক জন আইরিস্‌ম্যান কাপ্তেন টমাসকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুঁড়িয়াছিল ললাটে বিদ্ধ হইয়া কাপ্তেন টমাস প্রাণত্যাগ করিল। ভবানন্দ তখন ডাকিয়া বলিলেন, “আমার ব্রহ্মাস্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে, কে এমন পার্থ বৃকোদর নকুল সহদেব আছে যে, এ সময় আমাকে রক্ষা করিবে! দেখ, বাণাহত ব্যাঘ্রের ন্যায় গোরা আমার উপর ঝুঁকিয়াছে। আমি মরিবার জন্য আসিয়াছি; আমার সঙ্গে মরিতে চাও, এমন সন্তান কেহ আছে?”

আগে ধীরানন্দ অগ্রসর হইল, পিছে জীবানন্দ–সঙ্গে সঙ্গে আর ১০। ১৫।২০।৫০ জন সন্তান আসিল।ভবানন্দ ধীরানন্দকে দেখিয়া বলিলেন, “তুমিও যে, আমাদের সঙ্গে মরিতে আসিলে।”

ধীর। “কেন, মরা কি কাহারও ইজারা মহল না কি?” এই বলিতে বলিতে ধীরানন্দ এক জন গোরাকে আহত করিলেন।

ভব। তা নয়। কিন্তু মরিলে ত স্ত্রীপুত্রের মুখাবলোকন করিয়া দিনপাত করিতে পারিবে না!

ধীর। কালিকার কথা বলিতেছ? এখনও বুঝ নাই? (ধীরানন্দ আহত গোরাকে বধ করিলেন)

ভব। না– (এই সময়ে এক জন গোরার আঘাতে ভবানন্দের দক্ষিণ বাহু ছিন্ন হইল।)

ধীর। আমার সাধ্য কি যে, তোমার ন্যায় পবিত্রাত্মাকে সে সকল কথা বলি। আমি সত্যানন্দের প্রেরিত চর হইয়া গিয়াছিলাম।

ভব। সে কি? মহারাজের আমার প্রতি অবিশ্বাস? (ভবানন্দ তখন এক হাতে যুদ্ধ করিতেছিলেন) ধীরানন্দ তাঁহাকে রক্ষা করতে করিতে বলিলেন, “কল্যাণীর সঙ্গে তোমার যে সকল কথা হইয়াছিল, তাহা তিনি স্বকর্ণে শুনিয়াছিলেন।”

ভব। কি প্রকারে?

ধীর। তিনি তখন স্বয়ং সেখানে ছিলেন। সাবধান থাকিও। (ভবানন্দ এক জন গোরা কর্ত্তৃক আহত হইয়া তাহাকে প্রত্যাহত করিলেন।) তিনি কল্যাণীকে গীতা পড়াইতেছিলেন, এমত সময়ে তুমি আসিলে। সাবধান! (ভবানন্দের বাম বাহুও ছিন্ন হইল।)

ভব। আমার মৃত্যুসংবাদ তাঁহাকে দিও! বলিও, আমি অবিশ্বাসী নহি।

ধীরানন্দ বাষ্পপূর্ণলোচনে যুদ্ধ করিতে করিতে বলিলেন, “তাহা তিনি জানেন। কালি রাত্রের আশীর্ব্বাদবাক্য মনে কর। আর আমাকে বলিয়া দিয়াছেন, ‘ভবানন্দের কাছে থাকিও, আজ সে মরিবে। মৃত্যুকালে তাহাকে বলিও, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, পরলোকে তাহার বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হইবে’।”

ভবানন্দ বলিলেন, “সন্তানের জয় হউক, ভাই! আমার মৃত্যুকালে একবার ‘বন্দে মাতরম্‌’ শুনাও দেখি!”

তখন ধীরানন্দের আজ্ঞাক্রমে যুদ্ধোন্মত্ত সকল সন্তান মহাতেজে “বন্দে মাতরম্‌” গায়িল। তাহাতে তাহাদিগের বাহুতে দ্বিগুণ বলসঞ্চার হইয়া উঠিল। সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্তে অবশিষ্ট গোরাগণ নিহত হইল! রণক্ষেত্রে আর শত্রু রহিল না।

সেই মুহূর্ত্তে ভবানন্দ মুখে “বন্দে মাতরম্‌” গায়িতে গায়িতে, মনে বিষ্ণুপদ ধ্যান করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিলেন।

হায়! রমণীরূপলাবণ্য! ইহসংসারে তোমাকেই ধিক্‌।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

রণজয়ের পর, অজয়তীরে সত্যানন্দকে ঘিরিয়া বিজয়ী বীরবর্গ নানা উৎসব করিতে লাগিল। কেবল সত্যানন্দ বিমর্ষ, ভবানন্দের জন্য।

এতক্ষণ বৈষ্ণবদিগের রণবাদ্য অধীক ছিল না, কিন্তু সেই সময় কোথা হইতে সহস্র সহস্র কাড়া নাগরা, ঢাক ঢোল, কাঁসি সানাই, তূরী ভেরী, রামশিঙ্গা, দামামা আসিয়া জুটিল। জয়সূচক বাদ্যে কানন প্রান্তর নদীসকল শব্দ ও প্রতিধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এইরূপে সন্তানগণ অনেকক্ষণ ধরিয়া নানারূপ উৎসব করিলে পর সত্যানন্দ বলিলেন, "জগদীশ্বর আজ কৃপা করিয়াছেন, সন্তানধর্ম্মের জয় হইয়াছে, কিন্তু এক কাজ বাকি আছে। যাহারা আমাদিগের সঙ্গে উৎসব করিতে পাইল না, যাহারা আমাদের উৎসবের জন্য প্রাণ দিয়াছে, তাহাদিগকে ভুলিলে চলিবে না। যাহারা রণক্ষেত্রে নিহত হইয়া পড়িয়া আছে, চল যাই, আমরা গিয়া তাহাদিগের সৎকার করি; বিশেষ যে মহাত্মা আমাদিগের জন্য এই রণজয় করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, চল– মহান্ উৎসব করিয়া সেই ভবানন্দের সৎকার করি।" তখন নন্তানদল "বন্দে মাতরম্" বলিতে বলিতে নিহতদিগের সৎকারে চলিল। বহু লোক একত্রিত হইয়া হরিবোল দিতে দিতে ভারে ভারে চন্দনকাষ্ঠ বহিয়া আনিয়া ভবানন্দের চিতা রচনা করিল, এবং তাহাতে ভবানন্দকে শায়িত করিয়া অগ্নি জ্বালিত করিয়া, চিতা বেড়িয়া বেড়িয়া "হরে মুরারে" গায়িতে লাগিল। ইহারা বিষ্ণুভক্ত, বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত নহে, অতএব দাহ করে।

কাননমধ্যে তৎপরে কেবল সত্যানন্দ, জীবানন্দ, মহেন্দ্র, নবীনানন্দ ও ধীরানন্দ আসীন; গোপনে পাঁচ জনে পরামর্শ করিতেছেন। সত্যানন্দ বলিলেন, "এত দিন যে জন্য আমরা সর্ব্বধর্ম্ম সর্ব্বসুখ ত্যাগ করিয়াছিলাম, সেই ব্রত সফল হইয়াছে, এ প্রদেশে যবন সেনা আর নাই, যাহা অবশিষ্ট আছে, এক দণ্ড আমাদিগের নিকট টিকিবে না, তোমরা এখন কি পরামর্শ দাও?"

জীবানন্দ বলিলেন, "চলুন, এই সময়ে গিয়া রাজধানী অধিকার করি।"

সত্য। আমারও সেই মত।

ধীরানন্দ। সৈন্য কোথায়?

জীব। কেন, এই সৈন্য?

ধীর। এই সৈন্য কই? কাহাকে দেখিতে পাইতেছেন?

জীব। স্থানে স্থানে সব বিশ্রাম করিতেছে, ডঙ্কা দিলে অবশ্য পাওয়া যাইবে।

ধীর। এক জনকেও পাইবেন না।

সত্য। কেন?

ধীর। সবাই লুঠিতে বাহির হইয়াছে। গ্রামসকল এখন অরক্ষিত। মুসলমানের গ্রাম আর রেশমের কুঠি লুঠিয়া সকলে ঘরে যাইবে। এখন কাহাকেও পাইবেন না। আমি খুঁজিয়া আসিয়াছি।

সত্যানন্দ বিষণ্ন হইলেন, বলিলেন, "যাই হউক, এ প্রদেশ সমস্ত আমাদের অধিকৃত হইল। এখানে আর কেহ নাই যে, আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়। অতএব বরেন্দ্রভূমিতে তোমরা সন্তানরাজ্য প্রচার কর। প্রজাদিগের নিকট হইতে কর আদায় কর এবং নগর অধিকার করিবার জনা সেনা সংগ্রহ কর। হিন্দুর রাজ্য হইয়াছে শুনিলে, বহুতর সেনা সন্তানের নিশান উড়াইবে।"

তখন জীবানন্দ প্রভৃতি সত্যানন্দকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আমরা প্রণাম করিতেছি–হে মহারাজাধিরাজ! আজ্ঞা হয় ত আমরা এই কাননেই আপনার

সিংহাসন স্থাপিত করি।”

সত্যানন্দ তাঁহার জীবনে এই প্রথম কোপ প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, “ছি! আমায় কি শূন্য কুম্ভ মনে কর? আমরা কেহ রাজা নহি– আমরা সন্ন্যাসী। এখন দেশের রাজা বৈকুণ্ঠনাথ স্বয়ং। নগর অধিকার হইলে, যাহার শিরে তোমাদিগের ইচ্ছা হয়, রাজমুকুট পরাইও কিন্তু ইহা নিশ্চিত জানিও যে, আমি এই ব্রহ্মচর্য্য ভিন্ন আর কোন আশ্রমই স্বীকার করিব না। এক্ষণে তোমরা স্ব স্ব কর্ম্মে যাও।”

তখন চারি জনে ব্রহ্মচারীকে প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। সত্যানন্দ তখন অন্যের অলক্ষিতে ইঙ্গিত করিয়া মহেন্দ্রকে রাখিলেন। আর তিন জন চলিয়া গেলেন, মহেন্দ্র রহিলেন। সত্যানন্দ তখন মহেন্দ্রকে বলিলেন, “তোমরা সকলে বিষ্ণুমণ্ডপে শপথ করিয়া সন্তানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলে। ভবানন্দ ও জীবানন্দ দুই জনেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছে, ভবানন্দ আজ তাহার স্বীকৃত প্রায়শ্চিত্ত করিল, আমার সর্ব্বদা ভয়, কোন্ দিন জীবানন্দ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া দেহ বিসর্জ্জন করে। কিন্তু আমার এক ভরসা আছে, কোন নিগূঢ় কারণে সে এক্ষণে মরিতে পারিবে না। তুমি একা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছ। এক্ষণে সন্তানের কার্য্যোদ্ধার হইয়াছে, এখন আবার সংসারী হইতে পার।”

মহেন্দ্রের চক্ষে দরদরিত ধারা বহিল। মহেন্দ্র বলিলেন, “ঠাকুর, সংসারী হইব কাহাকে লইয়া? স্ত্রী ত আত্মঘাতিনী হইয়াছেন, আর কন্যা কোথায় যে, তা ত জানি না, কোথায় বা সন্ধান পাইব? আপনি বলিয়াছেন, জীবিত আছে। ইহাই জানি, আর কিছু জানি না।”

সত্যানন্দ তখন নবীনানন্দকে ডাকিয়া মহেন্দ্রকে বলিলেন, “ইনি নবীনানন্দ গোস্বামী– অতি পবিত্রচেতা, আমার প্রিয়শিষ্য। ইনি তোমার কন্যার সন্ধান বলিয়া দিবেন।” এই বলিয়া সত্যানন্দ শান্তিকে কিছু ইঙ্গিত করিলেন। শান্তি তাহা বুঝিয়া প্রণাম করিয়া বিদায় হয়, তখন মহেন্দ্র বলিলেন, “কোথায় তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে?”

শান্তি বলিল, “আমার আশ্রমে আসুন।” এই বলিয়া শান্তি আগে আগে চলিল।

তখন মহেন্দ্র ব্রহ্মচারীর পাদবন্দনা করিয়া বিদায় হইলেন এবং শান্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তখন অনেক রাত্রি হইয়াছে। তথাপি শান্তি বিশ্রাম না করিয়া নগরাভিমুখে যাত্রা করিল।

সকলে চলিয়া গেলে ব্রহ্মচারী, একা ভূমে প্রণত হইয়া মাটিতে মস্তক স্থাপন করিয়া মনে মনে জগদীশ্বরের ধ্যান করিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিল। এমন সময়ে কে আসিয়া তাঁহার মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিল, “আমি আসিয়াছি।”

ব্রহ্মচারী উঠিয়া চমকিত হইয়া অতি ব্যগ্রভাবে বলিলেন, “আপনি আসিয়াছেন? কেন?” যে আসিয়াছিল সে বলিল, “দিন পূর্ণ হইয়াছে।” ব্রহ্মচারী বলিলেন, “হে প্রভু! আজ ক্ষমা করুন! আগামী মাঘী পূর্ণিমায় আমি আপনার আজ্ঞা পালন করিব।”

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

সেই রজনীতে হরিধ্বনিতে সে প্রদেশভূমি পরিপূর্ণা হইল। সন্তানেরা দলে দলে যেখানে সেখানে উচ্চৈঃস্বরে কেহ "বন্দে মাতরম্" কেহ "জগদীশ হরে" বলিয়া গাইয়া বেড়াইতে লাগিল। কেহ শত্রুসেনার অস্ত্র, কেহ বস্ত্র অপহরণ করিতে লাগিল। কেহ মৃতদেহের মুখে পদাঘাত, কেহ অন্য প্রকার উপদ্রব করিতে লাগিল। কেহ গ্রামাভিমুখে, কেহ নগরাভিমুখে ধাবমান হইয়া, পথিক বা গৃহস্থকে ধরিয়া বলে, "বল বন্দে মাতরম্", নহিলে মারিয়া ফেলিব। কেহ ময়রার দোকান লুঠিয়া খায়, কেহ গোয়ালার বাড়ী গিয়া হাঁড়ি পাড়িয়া দধিতে চুমুক মারে, কেহ বলে, "আমরা ব্রজগোপ আসিয়াছি, গোপিনী কই?" সেই এক রাত্রের মধ্যে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে মহাকোলাহল পড়িয়া গেল। সকলে বলিল, "মুসলমান পরাভূত হইয়াছে, দেশ আবার হিন্দুর হইয়াছে। সকলে একবার মুক্তকণ্ঠে হরি হরি বল।" গ্রাম্য লোকেরা মুসলমান দেখিলেই তাড়াইয়া মারিতে যায়। কেহ কেহ সেই রাত্রে দলবদ্ধ হইয়া মুসলমানদিগের পাড়ায় গিয়া তাহাদের ঘরে আগুন দিয়া সর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইতে লাগিল। অনেক যবন নিহত হইল, অনেক মুসলমান দাড়ি ফেলিয়া গায়ে মৃত্তিকা মাখিয়া হরিনাম করিতে আরম্ভ করিল, জিজ্ঞাসা করিলে, বলিতে লাগিল, "মুই হেঁদু।"

দলে দলে ত্রস্ত মুসলমানেরা নগরাভিমুখে ধাবিত হইল। চারি দিকে রাজপুরুষেরা ছুটিল, অবশিষ্ট সিপাহী সুসজ্জিত হইয়া নগররক্ষার্থে শ্রেণীবদ্ধ হইল। নগরের গড়ের ঘাটে ঘাটে প্রকোষ্ঠসকলে রক্ষকবর্গ সশস্ত্রে অতি সাবধানে দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত হইল। সমস্ত লোক সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া কি হয় কি হয় চিন্তা করিতে লাগিল। হিন্দুরা বলিতে লাগিল, "আসুক, সন্ন্যাসীরা আসুক, মা দুর্গা করুন, হিন্দুর অদৃষ্টে সেই দিন হউক।" মুসলমানেরা বলিতে লাগিল, "আল্লা আকবার! এত্না রোজের পর কোরাণসরিফ, বেবাক্ কি ঝুঁটো হলো; মোরা যে পাঁচু ওয়াক্ত নমাজ করি, তা এই তেলককাটা হেঁদুর দল ফতে কর্‌তে নারলাম। দুনিয়া সব ফাঁকি।" এইরূপে কেহ ক্রন্দন, কেহ হাস্য করিয়া সকলেই ঘোরতর আগ্রহের সহিত রাত্রি কাটাইতে লাগিল।

এ সকল কথা কল্যাণীর কাণে গেল– আবালবৃদ্ধবনিতা কাহারও অবিদিত ছিল না। কল্যাণী মনে মনে বলিল, "জয় জগদীশ্বর! আজি তোমার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে। আজ আমি স্বামিসন্দর্শনে যাত্রা করিব। হে মধুসূদন! আজ আমার সহায় হও!"

গভীর রাত্রে কল্যাণী শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া, একা খিড়কির দ্বার খুলিয়া এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া, কাহাকে কোথাও না দেখিয়া, ধীরে ধীরে নিঃশব্দে গৌরীদেবীর পুরী হইতে রাজপথে নিষ্ক্রান্ত হইল। মনে মনে ইষ্টদেবতা স্মরণ করিয়া বলিল, "দেখ ঠাকুর, আজ যেন পদচিহ্নে তাঁর সাক্ষাৎ পাই।"

কল্যাণী নগরের ঘাঁটিতে আসিয়া উপস্থিত। পাহারাওয়ালা বলিল, "কে যায়?" কল্যাণী ভীতস্বরে বলিল, "আমি স্ত্রীলোক।" পাহারাওয়ালা বলিল, "যাবার হুকুম নাই।" কথা দফাদারের কাণে গেল। দফাদার বলিল, "বাহিরে যাইবার নিষেধ নাই, ভিতরে আসিবার নিষেধ।" শুনিয়া পাহারাওয়ালা কল্যাণীকে বলিল, "যাও মায়ি, যাবার মানা নাই, লেকেন আজকা রাতমে বড় আফত, কেয়া জানে মায়ি তোমার কি হোবে, তুমি কি ডেকেতের হাতে গির্‌বে, কি খানায় পড়িয়া মরিয়ে যাবে, সো তো হাম কিছু জানি না, আজকা রাত মায়ি, তুমি বাহার না যাবে।"

কল্যাণী বলিল, "বাবা আমি ভিখারিণী–আমার এক কড়া কপর্দ্দক নাই, আমায় ডাকাতে কিছু বলিবে না।"

পাহারাওয়ালা বলিল, "বয়স আছে, মায়ি বয়স আছে, দুনিয়ামে ওহি তো জেওরাত হ্যায়! বল্‌কে হামি ডেকেত হতে পারে।" কল্যাণী দেখিল বড় বিপদ্, কিছু কথা না কহিয়া, ধীরে ধীরে ঘাঁটি এড়াইয়া চলিয়া গেল। পাহারাওয়ালা দেখিল, মায়ি, রসিকতাটা বুঝিল না, তখন মনের দুঃখে গাঁজায় দম মারিয়া ঝিঝিট

খাম্বাজে সোরির টপ্পা ধরিল। কল্যাণী চলিয়া গেল।

সে রাত্রে পথে দলে দলে পথিক; কেহ মার মার শব্দ করিতেছে, কেহ পালাও পালাও শব্দ করিতেছে, কেহ কান্দিতেছে; কেহ হাসিতেছে, যে যাহাকে দেখিতেছে, সে তাহাকে ধরিতে যাইতেছে। কল্যাণী অতিশয় কষ্টে পড়িল। পথ মনে নাই, কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবার যো নাই, সকলে রণোন্মুখ। কেবল লুকাইয়া লুকাইয়া অন্ধকারে পথ চলিতে হইতেছে। লুকাইয়া লুকাইয়া যাইতেও এক দল অতি উদ্ধত উন্মত্ত বিদ্রোহীর হাতে সে পড়িয়া গেল। তাহারা ঘোর চীৎকার করিয়া তাঁহাকে ধরিতে আসিল। কল্যাণী তখন ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়া জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিল। সেখানেও সঙ্গে সঙ্গে দুই এক জন দস্যু তাঁহার পশ্চাতে ধাবিত হইল। এক জন গিয়া তাঁহার অঞ্চল ধরিল, বলিল, "তবে চাঁদ।" সেই সময়ে আর এক জন অকস্মাৎ আসিয়া অত্যাচারকারী পুরুষকে এক ঘা লাঠি মারিল। সে আহত হইয়া পাছু হটিয়া গেল। এই ব্যক্তির সন্ন্যাসীর বেশ– কৃষ্ণাজিনে বক্ষ আবৃত, বয়স অতি অল্প। সে কল্যাণীকে বলিল, "তুমি ভয় করিও না, আমার সঙ্গে আইস– কোথায় যাইবে?"

ক। পদচিহ্নে।

আগন্তুক বিস্মিত ও চমকিত হইল, বলিল, "সে কি, পদচিহ্নে?" এই বলিয়া আগন্তুক কল্যাণীর দুই স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিয়া মুখপানে সেই অন্ধকারে অতি যত্নের সহিত নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

কল্যাণী অকস্মাৎ পুরুষস্পর্শে রোমাঞ্চিত, ভীত, ক্ষুব্ধ, বিস্মিত, অশ্রুবিপ্লুত হইল–এমন সাধ্য নাই যে পলায়ন করে, ভীতিবিহ্বলা হইয়া গিয়াছিল। আগন্তুকের নিরীক্ষণ শেষ হইলে সে বলিল, "হরে মুরারে! চিনেছি যে, তুমি পোড়ারমুখী কল্যাণী!"

কল্যাণী ভীতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে?"

আগন্তুক বলিল, "আমি তোমার দাসানুদাস–হে সুন্দরি! আমার প্রতি প্রসন্ন হও।"

কল্যাণী অতি দ্রুতবেগে সেখান হইতে সরিয়া গিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিল, "এই অপমান করিবার জন্যই কি আপনি আমাকে রক্ষা করিলেন? দেখিতেছি ব্রহ্মচারীর বেশ, ব্রহ্মচারীর কি এই ধর্ম্ম? আমি আজ নিঃসহায়, নহিলে তোমার মুখে আমি নাথি মারিতাম।"

ব্রহ্মচারী বলিল, "অয়ি স্মিতবদনে! আমি বহুদিবসাবধি, তোমার ঐ বরবপুর স্পর্শ কামনা করিতেছি।" এই বলিয়া ব্রহ্মচারী দ্রুতবেগে ধাবমান হইয়া কল্যাণীকে ধরিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিল। তখন কল্যাণী খিল খিল করিয়া হাসিল, বলিল, "ও পোড়া কাপাল! আগে বলতে হয় ভাই যে, আমারও ঐ দশা।" শান্তি বলিল, "ভাই, মহেন্দ্রের খোঁজে চলিয়াছ?"

কল্যাণী বলিল, "তুমি কে? তুমি যে সব জান দেখিতেছি।"

শান্তি বলিল, "আমি ব্রহ্মচারী– সন্তানসেনার অধিনায়ক–ঘোরতর বীরপুরুষ! আমি সব জানি! আজ পথে সিপাহী আর সন্তানের যে দৌরাত্ম্য, তুমি আজ পদচিহ্নে যাইতে পারিবে না।"

কল্যাণী কাঁদিতে লাগিল।

শান্তি চোখ ঘুরাইয়া বলিল, "ভয় কি? আমরা নয়নবাণে সহস্র শত্রু বধ করি। চল পদচিহ্নে যাই।"

কল্যাণী এরূপ বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকের সহায়তা পাইয়া যেন হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইল। বলিল, "তুমি যেখানে লইয়া যাইবে, সেইখানেই যাইব।"

শান্তি তখন তাহাকে সঙ্গে করিয়া বন্য পথে লইয়া চলিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যখন শান্তি আপন আশ্রম ত্যাগ করিয়া গভীর রাত্রে নগরাভিমুখে যাত্রা করে, তখন জীবানন্দ আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন। শান্তি জীবানন্দকে বলিল, "আমি নগরে চলিলাম। মহেন্দ্রের স্ত্রীকে লইয়া আসিব। তুমি মহেন্দ্রকে বলিয়া রাখ যে, উহার স্ত্রী আছে।"

জীবানন্দ ভবানন্দের কাছে কল্যাণীর জীবনরক্ষা বৃত্তান্ত সকল অবগত হইয়াছিলেন–এবং তাঁহার বর্ত্তমান বাসস্থানও সর্ব্বস্থান-বিচারিণী শান্তির কাছে শুনিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে সকল মহেন্দ্রকে শুনাইতে লাগিলেন।

মহেন্দ্র প্রথমে বিশ্বাস করিলেন না। শেষে আনন্দে অভিভূত হইয়া মুগ্ধপ্রায় হইলেন।

সেই রজনী প্রভাতে শান্তির সাহায্যে মহেন্দ্রের সঙ্গে কল্যাণীর সাক্ষাৎ হইল। নিস্তব্ধ কাননমধ্যে, ঘনবিন্যস্ত শালতরুশ্রেণীর অন্ধকার ছায়ামধ্যে, পশু পক্ষী ভগ্ননিদ্র হইবার পূর্ব্বে, তাহাদিগের পরস্পরের দর্শনলাভ হইল। সাক্ষী কেবল সেই নীলগগনবিহারী ম্লানকিরণ আকাশের নক্ষত্রচয়, আর সেই নিষ্কম্প অনন্ত শালতরুশ্রেণী। দূরে কোন শিলাসংঘর্ষণনাদিনী, মধুরকল্লোলিনী, সংকীর্ণা নদীর তর তর শব্দ, কোথাও প্রাচীনসমুদিত ঊষামুকুটজ্যোতিঃ সন্দর্শনে আহ্লাদিত এক কোকিলের রব।

বেলা এক প্রহর হইল। সেখানে শান্তি জীবানন্দ আসিয়া দেখা দিলেন। কল্যাণী শান্তিকে বলিল, "আমরা আপনার কাছে বিনামূল্যে বিক্রীত। আমাদের কন্যাটি সন্ধান বলিয়া দিয়া এ উপকার সম্পূর্ণ করুন।"

শান্তি জীবানন্দের মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, "আমি ঘুমাইব। অষ্টপ্রহরের মধ্যে বসি নাই–দুই রাত্রি ঘুমাই নাই–আমি যাই পুরুষ!"

কল্যাণী ঈষৎ হাসিল। জীবানন্দ মহেন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "সে ভার আমার উপর রহিল। আপনার পদচিহ্নে গমন করুন–সেইখানে কন্যাকে পাইবেন।"

জীবানন্দ ভরুইপুরে নিমাইয়ের নিকট হইতে মেয়ে আনিতে গেলেন–কাজটা বড় সহজ বোধ হইল না।

তখন নিমাই প্রথমে ঢোক গিলিল, একবার এদিক্ ওদিক্ চাহিল। তার পর একবার তার ঠোঁট ফুলিল। তার পর সে কাঁদিয়া ফেলিল। তারপর বলিল, "আমি মেয়ে দিব না।"

নিমাই, গোল হাতখানির উল্টাপিঠ চোখে দিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া চক্ষু মুছিলে পর জীবানন্দ বলিলেন, "তা দিদি কাঁদ কেন, এমন দূরও ত নয়–তাদের বাড়ী তুমি না হয় গেলে, মধ্যে মধ্যে দেখে এলে।"

নিমাই ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "তা তোমাদের মেয়ে তোমরা নিয়ে যাও না কেন? আমার কি ?" নিমাই এই বলিয়া সুকুমারীকে আনিয়া রাগ করিয়া দুম

করিয়া জীবানন্দের কাছে ফেলিয়া দিয়া পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিল। সুতরাং জীবানন্দ তখন আর কিছু না বলিয়া এদিক্ ওদিক্ বাজে কথা কহিতে লাগিলেন। কিন্তু নিমাইয়ের রাগ পড়িল না। নিমাই উঠিয়া গিয়া সুকুমারীর কাপড়ের বোচকা, অলঙ্কারের বাক্স, চুলের দড়ি, খেলার পুতুল ঝুপঝাপ করিয়া আনিয়া জীবানন্দের সম্মুখে ফেলিয়া দিতে লাগিল। সুকুমারী সে সকল আপনি গুছাইতে লাগিল। সে নিমাইকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "হাঁ মা–কোথায় যাব মা?" নিমাইয়ের আর সহ্য হইল না। নিমাই তখন সুকুকে কোলে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পদচিহ্নে নূতন দুর্গমধ্যে, আজ সুখে সমবেত, মহেন্দ্র, কল্যাণী, জীবানন্দ, শান্তি, নিমাই, নিমাইয়ের স্বামী, সুকুমারী। সকলে সুখে সম্মিলিত। শান্তি নবীনানন্দের বেশে আসিয়াছিল। কল্যাণীকে যে রাত্রে আপন কুটীরে আনে, সেই রাত্রে বারণ করিয়াছিল যে, নবীনানন্দ যে স্ত্রীলোক, এ কথা কল্যাণী স্বামীর সাক্ষাতে প্রকাশ না করেন। একদিন কল্যাণী তাহাকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া পাছাইলেন। নবীনানন্দ অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিল। ভৃত্যগণ বারণ করিল, শুনিল না।

শান্তি কল্যাণীর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ডাকিয়াছ কেন?"

ক। পুরুষ সাজিয়া কত দিন থাকিবে? দেখা হয় না,–কথা কহিতেও পাই না। আমার স্বামীর সাক্ষাতে তোমায় প্রকাশ করিতে হইবে।

নবীনানন্দ বড় চিন্তিত হইয়া রহিলেন, অনেকক্ষণ কথা কহিলেন না। শেষে বলিলেন, "তাহাতে অনেক বিঘ্ন কল্যাণি!"

দুই জনে সেই কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। এদিকে যে ভৃত্যবর্গ নবীনানন্দ অন্তঃপুরে প্রবেশ নিষেধ করিয়াছিল, তাহারা গিয়া মহেন্দ্রকে সংবাদ দিল যে, নবীনানন্দ জোর করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল, নিষেধ মানিল না। কৌতূহলী হইয়া মহেন্দ্রও অন্তঃপুরে গেলেন।

কল্যাণীর শয়নঘরে গিয়া দেখিলেন যে, নবীনানন্দ গৃহমধ্যে দাঁড়াইয়া আছে, কল্যাণী তাঁহার গায়ে হাত দিয়া বাঘছালের গ্রন্থি খুলিয়া দিতেছেন। মহেন্দ্র অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন–অতিশয় রুষ্ট হইলেন।

নবীনানন্দ তাঁহাকে দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "কি গোঁসাই। সন্তানে সন্তানে অবিশ্বাস?"

মহেন্দ্র বলিলেন, "ভবানন্দ ঠাকুর কি বিশ্বাসী ছিলেন?"

নবীনানন্দ চোখ ঘুরাইয়া বলিল, "কল্যাণী কি ভবানন্দের গায়ে হাত দিয়া বাঘছাল খুলিয়া দিত?" বলিতে বলিতে শান্তি কল্যাণীর হাত টিপিয়া ধরিল, বাঘছাল খুলিতে দিল না।

ম। তাতে কি।

ন। আমাকে অবিশ্বাস করিতে পারেন–কল্যাণীকে অবিশ্বাস করেন কোন্ হিসেবে?

এবার মহেন্দ্র বড় অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, "কই, কিসে অবিশ্বাস করিলাম?"

ন। নহিলে আমার পিছু পিছু অন্তঃপুরে আসিয়া উপস্থিত কেন?

ম। কল্যাণীর সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল; তাই আসিয়াছি।

ন। তবে এখন যান। কল্যাণীর সঙ্গে আমারও কিছু কথা আছে। আপনি সরিয়া যান, আমি আগে কথা কই। আপনার ঘর বাড়ী, আপনি সর্ব্বদা আসিতে পারেন, আমি কষ্টে একবার আসিয়াছি।

মহেন্দ্র বোকা হইয়া রহিলেন। কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। এ সকল কথা ত অপরাধীর কথাবার্ত্তার মত নহে। কল্যাণীরও ভাব বিচিত্র। সেও ত অবিশ্বাসিনীর মত পলাইল না, ভীতা হইল না, লজ্জিতা নহে–কিছুই না, বরং মৃদু মৃদু হাসিতেছে। আর কল্যাণী–যে সেই বৃক্ষতলে অনায়াসে বিষ ভোজন করিয়াছিল– সে কি অপরাধিনী হইতে পারে? মহেন্দ্র এই সকল ভাবিতেছেন, এমত সময়ে অভাগিনী শান্তি, মহেন্দ্রের দুরবস্থা দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া কল্যাণীর প্রতি এক বিলোল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। সহসা তখন অন্ধকার ঘুচিল–মহেন্দ্র দেখিলেন, এ যে রমণীকটাক্ষ। সাহসে ভর করিয়া, নবীনানন্দের দাড়ি ধরিয়া মহেন্দ্র এক টান দিলেন– কৃত্রিম দাড়ি গোঁপ খসিয়া আসিল। সেই সময়ে অবসর পাইয়া কল্যাণী বাঘছালের গ্রন্থি খুলিয়া ফেলিল–বাঘছালও খসিয়া পড়িল। ধরা পড়িয়া শান্তি অবনতমুখী হইয়া রহিল।

মহেন্দ্র তখন শান্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

শা। শ্রীমান্ নবীনানন্দ গোস্বামী।

ম। সে ত জুয়াচুরি; তুমি স্ত্রীলোক?

শা। এখন কাজে কাজেই।

ম। তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি– তুমি স্ত্রীলোক হইয়া সর্ব্বদা জীবানন্দ ঠাকুরের সহবাস কর কেন?

শা। সে কথা আপনাকে নাই বলিলাম।

ম। তুমি যে স্ত্রীলোক, জীবানন্দ ঠাকুর তা কি জানেন?

শা। জানেন।

শুনিয়া, বিশুদ্ধাত্মা মহেন্দ্র অতিশয় বিষণ্ন হইলেন। দেখিয়া কল্যাণী আর থাকিতে পারিল না; বলিল, "ইনি জীবানন্দ গোস্বামীর ধর্ম্মপত্নী শান্তিদেবী।"

মুহূর্ত্ত জন্য মহেন্দ্রের মুখ প্রফুল্ল হইল। আবার সে মুখ অন্ধকারে ঢাকিল। কল্যাণী বুঝিল বলিল, "ইনি ব্রহ্মচারিণী।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উত্তর বাঙ্গালা মুসলমানের হাতছাড়া হইয়াছে। মুসলমান কেহই এ কথা মানেন না–মনকে চোখ ঠারেন–বলেন, কতকগুলা লুঠেড়াতে বড় দৌরাত্ম্য করিতেছে–শাসন করিতেছি। এইরূপ কত কাল যাইত বলা যায় না; কিন্তু এই সময়ে ভগবানের নিয়োগে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ কলিকাতার গভর্ণর জেনারেল। ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ মনকে চোখ ঠারিবার লোক নহেন–তাঁর সে বিদ্যা থাকিলে আজ ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কোথায় থাকিত? অগৌণে সন্তানশাসনার্থে ুটনমর ঋঢষটরদ্র নামা দ্বিতীয় সেনাপতি নূতন সেনা লইয়া উপস্থিত হইলেন।

এড্ওয়ার্ড্স্ দেখিলেন যে, এ ইউরোপীয় যুদ্ধ নহে। শত্রুদিগের সেনা নাই, নগর নাই, রাজধানী নাই, দুর্গ নাই, অথচ সকলই তাহাদের অধীন। যে দিন

যেখানে ব্রিটিশ সেনার শিবির, সেই দিনের জন্য সে স্থান ব্রিটিশ সেনার অধীন– তার পর দিন ব্রিটিশ সেনা চলিয়া গেল ত অমনি চারি দিকে "বন্দে মাতরম্" গীত হইতে লাগিল। সাহেব খুঁজিয়া পান না, কোথা হইতে ইহারা পিপীলিকার মত এক এক রাত্রে নির্গত হইয়া, যে গ্রাম ইংরেজের বশীভূত হয়, তাহা দাহ করিয়া যায়, অথবা অল্পসংখ্যক ব্রিটিশ সেনা পাইলে তৎক্ষণাৎ সংহার করে। অনুসন্ধান করিতে করিতে সাহেব জানিলেন যে, পদচিহ্নে ইহারা দুর্গনির্ম্মাণ করিয়া, সেইখানে আপনাদিগের অস্ত্রাগার ও ধনাগার রক্ষা করিতেছে। অতএব সেই দুর্গ অধিকার করা বিধেয় বলিয়া স্থির করিলেন।

চরের দ্বারা তিনি সংবাদ লইতে লাগিলেন যে, পদচিহ্নে কত সন্তান থাকে। যে সংবাদ পাইলেন, তাহাতে তিনি সহসা দুর্গ আক্রমণ করা বিধেয় বিবেচনা করিলেন না। মনে মনে এক অপূর্ব্ব কৌশল উদ্ভাবন করিলেন।

মাঘী পূর্ণিমা সম্মুখে উপস্থিত। তাঁহার শিবিরের অদূরবর্ত্তী নদীতীরে একটা মেলা হইবে। এবার মেলায় বড় ঘটা। সহজে মেলায় লক্ষ লোকের সমাগম হইয়া থাকে। এবার বৈষ্ণবের রাজ্য হইয়াছে, বৈষ্ণবেরা মেলায় আসিয়া বড় জাঁক করিবে সংকল্প করিয়াছে। অতএব যাবতীয় সন্তানগণ পূর্ণিমার দিন মেলায় একত্র সমাগম হইবে, এমন সম্ভাবনা। মেজর এড্ওয়ার্ড্স্ বিবেচনা করিলেন যে, পদচিহ্নের রক্ষকেরাও সকলেই মেলায় আসিবার সম্ভাবনা। সেই সময়েই সহসা পদচিহ্নে গিয়া দুর্গ অধিকৃত করিবেন।

এই অভিপ্রায় করিয়া, মেজর রটনা করিলেন যে, তিনি মেলা আক্রমণ করিবেন। এক ঠাঁই সকল বৈষ্ণব পাইয়া এক দিনে শত্রু নিঃশেষ করিবেন। বৈষ্ণবের মেলা হইতে দিবেন না।

এ সংবাদ গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হইল। তখন যেখানে যে সন্তানসম্প্রদায়ভুক্ত ছিল, সে তৎক্ষণাৎ অস্ত্র গ্রহণ করিয়া মেলা রক্ষার জন্য ধাবিত হইল। সকল সন্তানই নদীতীরে আসিয়া মাঘী পূর্ণিমায় মিলিত হইল। মেজর সাহেব যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহাই ঠিক হইল। ইংরেজের সৌভাগ্যক্রমে মহেন্দ্রও ফাঁদে পা দিলেন, মহেন্দ্র পদচিহ্নের দুর্গে অল্প মাত্র সৈন্য রাখিয়া অধিকাংশ সৈন্য লইয়া মেলায় যাত্রা করিলেন।

এ সকল কথা হইবার আগেই জীবানন্দ ও শান্তি পদচিহ্ন হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। তখন যুদ্ধের কোন কথা হয় নাই, যুদ্ধে তাঁহাদের মন ছিল না। মাঘী পূর্ণিমায়, পূণ্যদিনে, শুভক্ষণে, পবিত্র জলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন, ইহাই তাঁহাদের অভিসন্ধি। কিন্তু পথে যাইতে যাইতে তাহারা শুনিলেন যে, মেলায় সমবেত সন্তানদিগের সঙ্গে ইংরেজ সৈন্যের মহাযুদ্ধ হইবে। তখন জীবানন্দ বলিলেন, "তবে যুদ্ধেই মরিব, শীঘ্র চল।"

তাঁহারা শীঘ্র শীঘ্র চলিলেন। পদ এক স্থানে একটা টিলার উপর দিয়া গিয়াছে। টিলায় উঠিয়া বীরদম্পতি দেখিতে পাইলেন যে, নিম্নে কিছু দূরে ইংরেজশিবির। শান্তি বলিল, "মরার কথা এখন থাক্– বল 'বন্দে মাতরম্'।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তখন দুই জনে কাণে কাণে কি পরামর্শ করিলেন। পরামর্শ করিয়া জীবানন্দ এক বনে লুকাইলেন। শান্তি আর এক বনে প্রবেশ করিয়া এক অদ্ভুত রহস্যে প্রবৃত্ত হইল।

শান্তি মরিতে যাইতেছিল, কিন্তু মৃত্যুকালে স্ত্রীবেশ ধরিবে, ইহা স্থির করিয়াছিল। তাহার এ পুরুষবেশ জুয়াচুরি, মহেন্দ্র বলিয়াছে। জুয়াচুরি করিতে করিতে

মরা হইবে না। সুতরাং ঝাঁপি টেপারিটি সঙ্গে আনিয়াছিলেন। তাহাতে তাহার সজ্জাসকল থাকিত। এখন নবীনানন্দ ঝাঁপি টেপারি খুলিয়া বেশপরিবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইল।

চিকণ রকম রসকলির উপর খয়েরের টিপ কাটিয়া তৎকালপ্রচলিত ফুরফুরে কোঁকড়া কোঁকড়া কতকগুলি ঝাপটার গোছায় চাঁদমুখখানি ঢাকিয়া, শান্তি একটি সারঙ্গ হস্তে বৈষ্ণবীবেশে ইংরেজশিবিরে দর্শন দিল। দেখিয়া ভ্রমরকৃষ্ণশ্মশ্রুযুক্ত সিপাহীরা বড় মাতিয়া গেল। কেহ টপ্পা, কেহ গজল, কেহ শ্যামাবিষয়, কেহ কৃষ্ণবিষয় ফরমাস করিয়া শুনিল। কেহ চাল দিল, কেহ ডাল দিল, কেহ মিষ্টি দিল, কেহ পয়সা দিল, কেহ সিকি দিল। বৈষ্ণবী তখন শিবিরের অবস্থা স্বচক্ষে সবিশেষ দেখিয়া চলিয়া যায়; সিপাহীরা জিজ্ঞাসা করিল, "আবার কবে আসিবে?" বৈষ্ণবী বলিল, "তা জানি না, আমার বাড়ী ঢের দূর।" সিপাহীরা জিজ্ঞাসা করিল, "কত দূর?" বৈষ্ণবী বলিল, "আমার বাড়ী পদচিহ্নে।" এখন সেই দিন মেজর সাহেব পদচিহ্নের কিছু খবর লইতেছিলেন। একজন সিপাহী তাহা জানিত। বৈষ্ণবীকে ডাকিয়া কাপ্তেন সাহেবের কাছে লইয়া গেল। কাপ্তেন সাহেব তাহাকে মেজর সাহেবের কাছে লইয়া গেল। মেজর সাহেবের কাছে গিয়া বৈষ্ণবী মধুর হাসি হাসিয়া, মর্ম্মভেদী কটাক্ষে সাহেবের মাথা ঘুরাইয়া দিয়া, খঞ্জনীতে আঘাত করিয়া গান ধরিল–

" ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালম্।"

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "টোমাড় বাড়ী কোঠা বিবি?"

বৈষ্ণবী বলিল, "আমি বিবি নই, বৈষ্ণবী। বাড়ী পদচিহ্নে।"

সাহেব। ঘণফর্ফ দর্ট ধ্র টেেধভ– টেেধভ ধ্র র্ধ? হুঁয়া একটো গর হ্যায়?

বৈষ্ণবী বলিল, "ঘর? – কত ঘর আছে।"

সাহেব। গর নেই, –গর নেই,– গর,– গর–

শান্তি। সাহেব, তোমার মনের কথা বুঝেছি। গড়?

সাহেব। ইয়েস্ ইয়েস্, গর! গর! – হ্যায়?

শান্তি। গড় আছে। ভারি কেল্লা।

সাহেব। কেট্টে আড্মি?

শান্তি। গড়ে কত লোক থাকে? বিশ পঞ্চাশ হাজার।

সাহেব। নন্সেন্স। একটো কেল্লেমে ডো চার হাজার রহে শক্তা। হুঁয়া পর আবি হ্যায়? ইয়া নিকেল গিয়া?

শান্তি। আবার নেকলাবে কোথা?

সাহেব। মেলামে–টোম কব আয়া হ্যায় হুঁয়াসে?

শান্তি। কাল এসেছি সায়েব।

সাহেব। ও লোক আজ নিকেল গিয়া হোগা।

শান্তি মনে মনে ভাবিতেছিল যে, "তোমার বাপের শ্রাদ্ধের চাল যদি আমি না চড়াই, তবে আমার রসকলি কাটাই বৃথা। কতক্ষণে শিয়ালে তোমার মুণ্ড খাবে

আমি দেখ্‌বো।” প্রকাশ্যে বলিল, “তা সাহেব, হতে পারে, আজ বেরিয়ে গেলে যেতে পারে। অত খবর আমি জানি না, বৈষ্ণবী মানুষ, গান গেয়ে ভিক্ষা শিক্ষা করে খাই, অত খবর রাখি নে। বকে বকে গলা শুকিয়ে উঠ্‌লো, পয়সাটা সিকেটা দাও–উঠে চলে যাই। আর ভাল করে বখ্‌শিশ দাও ত না হয় পরশু এসে বলে যাব।”

সাহেব ঝনাৎ করিয়া একটা নগদ টাকা ফেলিয়া দিয়া বলিল, “পরশু নেহি বিবি!”

শান্তি বলিল, “দূর বেটা! বৈষ্ণবী বল্‌, বিবি কি?”

এড্‌ওয়ার্ড্‌স্‌। পরশু নেহি, আজ রাৎকো হাম্‌কো খবর মিল্‌না চাহিয়ে।

শান্তি। বন্দুক মাথায় দিয়ে সরাপ টেনে সরষের তেল নাকে দিয়ে ঘুমো। আজ আমি দশ কোশ রাস্তা যাব– আস্‌বো– ওঁকে খবর এনে দেব! ছুঁচো বেটা কোথাকার।

এড। ছুঁচো ব্যাটা কেস্কা কয়তা হ্যায়?

শান্তি। যে বড় বীর–ভারি জাঁদরেল।

এড্‌। ঐরণর্ট ঐণভণরটফ হাম হো শক্তা হ্যায়–ক্লাইবকা মাফিক। লেকেন আজ হাম্‌কো খবর মিল্‌নে চাহিয়ে। শও রূপেয়া বখ্‌শিশ দেঙ্গে।

শান্তি। শই দাও আর হাজার দাও, বিশ ক্রোশ এ দুখানা ঠেঙ্গে হবে না।

এড্‌। ঘোড়ে পর।

শান্তি। ঘোড়ায় চড়ুতে জানলে আর তোমার তাঁবুতে এসে সারেঙ্গ বাজিয়ে ভিক্ষে করি?

এড্‌। গদী পর লে যায়েগা।

শান্তি। কোলে বসিয়ে নিয়ে যাবে? আমার লজ্জা নাই?

এড্‌। ক্যা মুস্কিল, পান্‌শো রূপেয়া দেঙ্গে।

শান্তি। কে যাবে, তুমি নিজে যাবে?

সাহেব তখন অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান লিণ্ড্‌লে নামক একজন যুবা এন্‌সাইনকে দেখাইয়া তাঁহাকে বলিলেন, “লিণ্ড্‌লে, তুমি যাবে?” লিণ্ড্‌লে শান্তির রূপযৌবন দেখিয়া বলিল, “আহ্লাদপূর্ব্বক।”

তখন ভারি একটা আরবী ঘোড়া সজ্জিত হইয়া আসিলে লিণ্ড্‌লেও তৈয়ার হইল। শান্তিকে ধরিয়া ঘোড়ায় তুলিতে গেল। শান্তি বলিল, “ছি, এত লোকের মাঝখানে? আমার কি আর কিছু লজ্জা নাই! আগে চল ছাউনি ছাড়াই।”

লিণ্ড্‌লে ঘোড়ায় চড়িল। ঘোড়া ধীরে ধীরে হাঁটাইয়া চলিল। শান্তি পশ্চাৎ পশ্চাৎ হাঁটিয়া চলিল। এইরূপে তাহারা শিবিরের বাহিরে আসিল।

শিবিরের বাহিরে আসিলে নির্জ্জন প্রান্তর পাইয়া, শান্তি লিণ্ড্‌লের পায়ের উপর পা দিয়া এক লাফে ঘোড়ায় চড়িল। লিণ্ড্‌লে হাসিয়া বলিল, “তুমি যে পাকা ঘোড়্‌সওয়ারী।”

শান্তি বলিল, “আমরা এমন পাকা ঘোড়সওয়ার যে, তোমার সঙ্গে চড়িতে লজ্জা করে। ছি! রেকাব পায়ে দিকে ঘোড়ায় চড়!”

একবার বড়াই করিবার জন্য লিণ্ডলে রেকাব হইতে পা লইল। শান্তি অমনি নির্ব্বোধ ইংরেজের গলদেশে হস্তার্পণ করিয়া ঘোড়া হইতে ফেলিয়া দিল। শান্তি তখন অশ্বপৃষ্ঠে রীতিমত আসন গ্রহণ করিয়া, ঘোড়ার পেটে মলের ঘা মারিয়া, বায়ুবেগে আরবীকে ছুটাইয়া দিল। শান্তি চারি বৎসর সন্তানসৈন্যের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া অশ্বারোহণবিদ্যাও শিখিয়াছিল। তা না শিখিলে জীবানন্দের সঙ্গে কি বাস করিতে পারিত? লিণ্ড্লে পা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া রহিলেন। শান্তি বায়ুবেগে অশ্বপৃষ্ঠে চলিল।

যে বনে জীবানন্দ লুকাইয়াছিলেন, শান্তি সেইখানে গিয়া জীবানন্দকে সকল সংবাদ অবগত করাইল। জীবানন্দ বলিলেন, "তবে আমি শীঘ্র গিয়া মহেন্দ্রকে সতর্ক করি। তুমি মেলায় গিয়া সত্যানন্দকে খবর দাও। তুমি ঘোড়ায় যাও– প্রভু যেন শীঘ্র সংবাদ পান।" তখন দুই জনে দুই দিকে ধাবিত হইল। বলা বৃথা শান্তি আবার নবীনানন্দ হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এড্ওয়ার্ড্স্ পাকা ইংরেজ। ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে তাহার লোক ছিল। শীঘ্র তাহার নিকটে খবর পৌঁছিল যে, সেই বৈষ্ণবীটা লিণ্ড্লে সাহেবকে ফেলিয়া দিয়া আপনি ঘোড়ায় চড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। শুনিয়াই এড্ওয়ার্ড্স্ বলিলেন, "ইভ ধবয মত ওর্টটভ! ওঁরধপর্ণ দর্ণ ণর্ভ্র."

তখন ঠক্ ঠক্ খটাখট্ তাম্বুর খোঁটায় মুগুরের ঘা পড়িতে লাগিল। মেঘরচিত অমরাবতীর ন্যায় বস্ত্রনগরী অন্তর্হিতা হইল। মাল গাড়িতে বোঝাই হইল। মানুষ ঘোড়ায় অথবা আপনার পায়ে। হিন্দু মুসলমান মাদরাজী গোরা বন্দুক ঘাড়ে মস্‌মস্ করিয়া চলিল। কামানের গাড়ি ঘড়োর ঘড়োর করিতে করিতে চলিল।

এদিকে মহেন্দ্র সন্তানসেনা লইয়া ক্রমে মেলার পথে অগ্রসর। সেই দিন বৈকালে মহেন্দ্র ভাবিল, বেলা পড়িয়া আসিল, শিবিরসংস্থাপন করা যাক।

তখন শিবিরসংস্থাপন উচিত বোধ হইল। বৈষ্ণবের তাঁবু নাই। গাছতলায় গুণ চট বা কাঁথা পাতিয়া শয়ন করে। একটু হরিচরণামৃত খাইয়া রাত্রিযাপন করে। ক্ষুধা যেটুকু বাকি থাকে, স্বপ্নে বৈষ্ণবী ঠাকুরাণীর অধরামৃত পান করিয়া পরিপূরণ করে। শিবিরোপযোগী নিকটে একটি স্থান ছিল। একটা বড় বাগান–আম কাঁটাল বাবলা তেঁতুল। মহেন্দ্র আজ্ঞা দিলেন, "এইখানেই শিবির কর।" তারই পাশে একটা টিলা ছিল, উঠিতে বড় বন্ধুর, মহেন্দ্র একবার ভাবিলেন, এ পাহাড়ের উপর শিবির করিলেও হয়। স্থানটা দেখিয়া আসিবেন মনে করিলেন।

এই ভাবিয়া মহেন্দ্র অশ্বে আরোহণ করিয়া ধীরে ধীরে টিলার উপর উঠিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কিছু দূর উঠিলে পর এক যুবা যোদ্ধা বৈষ্ণবসেনামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বলিল, "চল, টিলায় চড়।" নিকটে যাহারা ছিল, তাহারা বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন?"

যোদ্ধা এক মৃত্তিকাস্তূপের উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "চল এই জ্যোৎস্নারাত্রে ঐ পর্ব্বতশিখরে, নূতন বসন্তের নূতন ফুলের গন্ধ শুঁকিতে শুঁকিতে আজ আমাদের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে।" সন্তানেরা দেখিল, সেনাপতি জীবানন্দ।

তখন "হরে মুরারে" উচ্চ শব্দ করিয়া যাবতীয় সন্তানসেনা বল্লমে ভর করিয়া উঁচু হইয়া উঠিল; এবং সেই সেনা জীবানন্দের অনুকরণ পূর্ব্বক বেগে টিলার উপর আরোহণ করিতে লাগিল। একজন সজ্জিত অশ্ব আনিয়া জীবানন্দকে দিল। দূর হইতে মহেন্দ্র দেখিয়া বিস্মিত হইল। ভাবিল, এ কি এ? না বলিতে ইহারা

আসে কেন?

এই ভাবিয়া মহেন্দ্র ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া চাবুকের ঘায়ে ধোঁয়া উড়াইয়া দিয়া পর্ব্বত অবতরণ করিতে লাগিলেন। সন্তানবাহিনীর অগ্রবর্ত্তী জীবানন্দের সাক্ষাৎ পাইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ আবার কি আনন্দ?"

জীবানন্দ হাসিয়া বলিলেন, "আজ বড় আনন্দ। টিলার ওপিঠে এড্‌ওয়ার্ড্‌স্ সাহেব। যে আগে উপরে উঠ্‌বে, তারই জিত।"

তখন জীবানন্দ সন্তানসৈন্যের প্রতি ডাকিয়া বলিলেন, "চেন তোমরা! আমি জীবানন্দ গোস্বামী। সহস্র শত্রুর প্রাণবধ করিয়াছি।"

তুমুল নিনাদে কানন প্রান্তর সব ধ্বনিত করিয়া শব্দ হইল, "চিনি আমরা!" তুমি জীবানন্দ গোস্বামী।"

জীব। বল "হরে মুরারে।"

কানন প্রান্তর সহস্র সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হইল "হরে মুরারে।"

জীব। টিলার ওপিঠে শত্রু। আজ এই স্তূপশিখরে, এই নীলাম্বরী যামিনী সাক্ষাৎকার, সন্তানেরা রণ করিবে! দ্রুত আইস, যে আগে শিখরে উঠিবে, সেই জিতিবে। বল, "বন্দে মাতরম্।"

তখন কানন প্রান্তরে ধ্বনিত করিয়া গীতধ্বনি উঠিল, "বন্দে মাতরম্।" ধীরে ধীরে সন্তানসেনা পর্ব্বতশিখর আরোহণ করিতে লাগিল; কিন্তু তাহারা সহসা সভয়ে দেখিল, মহেন্দ্র সিংহ অতি দ্রুতবেগে স্তূপ হইতে অবতরণ করিতে করিতে তূর্য্যনিনাদ করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে শিখরদেশে নীলাকাশপটে কামানশ্রেণী সহিত, ইংরেজের গোলন্দাজ সেনা শোভিত হইয়াছে। উচ্চৈঃস্বরে বৈষ্ণবী সেনা গায়িল,–

"তুমি বিদ্যা তুমি ভক্তি,
তুমি মা বাহুতে শক্তি
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।"

কিন্তু ইংরেজের কামানের গুড়ুম গুড়ুম গুম্ শব্দে সে মহাগীতিশব্দ ভাসিয়া গেল। শত শত সন্তান হত আহত হইয়া, অশ্ব শস্ত্র সহিত, টিলার উপর শুইল। আবার গুড়ুম্ গুম্, দধীচির অস্থিকে ব্যঙ্গ করিয়া, সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গকে তুচ্ছ করিয়া, ইংরেজের বজ্র গড়াইতে লাগিল। চাষার কর্ত্তনীসম্মুখে সুপক্ব ধান্যের ন্যায় সন্তানসেনা খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া ধরাশায়ী হইতে লাগিল। বৃথায় জীবানন্দ, বৃথায় মহেন্দ্র যত্ন করিতে লাগিলেন। পতনশীল শিলারাশির ন্যায় সন্তানসেনা টিলা হইতে ফিরিতে লাগিল। কে কোথায় পলায় ঠিকানা নাই। তখন একেবারে সকলের বিনাশসাধনের জন্য "হুর্‌রে! হুর্‌রে!" শব্দ করিতে করিতে গোরার পল্টন টিলা হইতে নামিল। সঙ্গীন উঁচু করিয়া অতি দ্রুতবেগে, পর্ব্বতবিমুক্ত বিশালতটিনীপ্রপাতবৎ দুর্দ্দমনীয় অলঙ্ঘ্য অজেয় ব্রিটিশসেনা, পলায়নপর সন্তানসেনার পশ্চাৎ ধাবিত হইল। জীবানন্দ একবার মাত্র মহেন্দ্রের সাক্ষাৎ পাইয়া বলিলেন, "আজ শেষ। এস এইখানে মরি।"

মহেন্দ্র বলিলেন, "মরিলে যদি রণজয় হইত, তবে মরিতাম। বৃথা মৃত্যু বীরের ধর্ম্ম নহে।"

জীব। "আমি বৃথাই মরিব। তবু যুদ্ধে মরিব।" তখন পাছু ফিরিয়া উচ্চৈঃস্বরে জীবানন্দ ডাকিলেন, "কে হরিনাম করিতে করিতে মরিতে চাও, আমার সঙ্গে আইস।"

অনেকে অগ্রসর হইল। জীবানন্দ বলিলেন, "অমন নহে। হরিসাক্ষাৎ শপথ কর, জীবন্তে ফিরিবে না।"

যাহারা আগু হইয়াছিল, তাহারা পিছাইল। জীবানন্দ বলিলেন, "কেহ আসিবে না? তবে আমি একাই চলিলাম।"

জীবানন্দ অশ্বপৃষ্ঠে উঁচু হইয়া বহুদূরে পশ্চাৎস্থিত মহেন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভাই! নবীনানন্দকে বলিও, আমি চলিলাম। লোকান্তরে সাক্ষাৎ হইবে।"

এই বলিয়া সেই বীরপুরুষ লৌহবৃষ্টিমধ্যে বেগে অশ্বচালন করিলেন। বাম হস্তে বল্লম, দক্ষিণে বন্দুক, মুখে "হরে মুরারে! হরে মুরারে!" যুদ্ধের সম্ভাবনা নাই, এ সাহসে কোন ফল নাই–তথাপি "হরে মুরারে! হরে মুরারে!" গায়িতে গায়িতে জীবানন্দ শত্রুব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পলায়নপর সন্তানদিগকে মহেন্দ্র ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, একবার তোমরা ফিরিয়া জীবানন্দ গোঁসাইকে দেখ। দেখিলে মরিবে না।"

ফিরিয়া কতকগুলি সন্তান জীবানন্দের অমানুষী কীর্ত্তি দেখিল। প্রথমে বিস্মিত হইল, তার পর বলিল, "জীবানন্দ মরিতে জানে, আমরা জানি না? চল, জীবানন্দের সঙ্গে আমরাও বৈকুণ্ঠে যাই।"

এই কথা শুনিয়া, কতকগুলি সন্তান ফিরিল। তাহাদের দেখাদেখি, আর কতকগুলি ফিরিল, তাহাদের দেখাদেখি, আরও কতকগুলি ফিরিল। বড় একটা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। জীবানন্দ শত্রুব্যূহে প্রবেশ করিয়াছিলেন; সন্তানেরা আর কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

এদিকে সমস্ত রণক্ষেত্র হইতে সন্তানগণ দেখিতে পাইল যে, কতক সন্তানেরা আবার ফিরিতেছে। সকলেই মনে করিল, সন্তানের জয় হইয়াছে; সন্তান শত্রুকে তাড়াইয়া যাইতেছে। তখন সমস্ত সন্তানসৈন্য "মার মার" শব্দে ফিরিয়া ইংরেজসৈন্যের উপর ধাবিত হইল।

এদিকে ইংরেজসেনার মধ্যে একটা ভারি হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সিপাহীরা যুদ্ধে আর যত্ন না করিয়া দুই পাশ দিয়া পলাইতেছে; গোরারাও ফিরিয়া সঙ্গীন খাড়া করিয়া শিবিরাভিমুখে ধাবমান হইতেছে। ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া মহেন্দ্র দেখিলেন, টিলার শিখরে অসংখ্যা সন্তানসেনা দেখা যাইতেছে। তাহারা বীরদর্পে অবতরণ করিয়া ইংরেজসেনা আক্রমণ করিতেছে। তখন ডাকিয়া সন্তানগণকে বলিলেন, "সন্তানগণ! ঐ দেখ, শিখরে প্রভু সত্যানন্দ গোস্বামীর ধ্বজা দেখা যাইতেছে। আজ স্বয়ং মুরারি মধুকৈটভনিসূদন কংশকেশি-বিনাশন রণে অবতীর্ণ, লক্ষ সন্তান স্তূপপৃষ্ঠে। বল হরে মুরারে! হরে মুরারে! উঠ! মুসলমানের বুকে পিঠে চাপিয়া মার! লক্ষ সন্তান টিলার পিঠে।"

তখন হরে মুরারের ভীষণ ধ্বনিতে কানন প্রান্তর মথিত হইতে লাগিল। সকল সন্তান মাভৈঃ মাভৈঃ রবে ললিততালধ্বনিসম্বলিত অস্ত্রের ঝঞ্ঝনায় সর্ব্বজীব বিমোহিত করিল। তেজে মহেন্দ্রের বাহিনী উপরে আরোহণ করিতে লাগিল। শিলাপ্রতিঘাতপ্রতিপ্রেরিত নির্ঝরিণীবৎ রাজসেনা বিলোড়িত, স্তম্ভিত, ভীত হইল, সেই সময়ে পঞ্চবিংশতি সহস্র সন্তানসেনা লইয়া সত্যানন্দ ব্রহ্মচারী শিখর হইতে, সমুদ্রপ্রপাতবৎ তাহাদের উপর বিক্ষিপ্ত হইলেন। তুমুল যুদ্ধ হইল।

যেমন দুই খণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরের সঙ্ঘর্ষে ক্ষুদ্র মক্ষিকা নিষ্পেষিত হইয়া যায়, তেমনি দুই সন্তানসেনা সঙ্ঘর্ষে সেই বিশাল রাজসৈন্য নিষ্পেষিত হইল।

ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের কাছে সংবাদ লইয়া যায়, এমন লোক রহিল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পূর্ণিমার রাত্রি!–সেই ভীষণ রণক্ষেত্র এখন স্থির। সেই ঘোড়ার দড়বড়ি, বন্দুকের কড়কড়ি, কামানের গুম্ গুম্– সর্ব্বব্যাপী ধূম, আর কিছুই নাই। কেহ হুর্‌রে বলিতেছে না–কেহ হরিধ্বনি করিতেছে না। শব্দ করিতেছে– কেবল শৃগাল, কুক্কুর, গৃধিনী। সর্ব্বোপরি আহত ব্যক্তির ক্ষণিক আর্ত্তনাদ। কেহ ছিন্নহস্ত, কেহ

ভগ্নমস্তক, কাহারও পা ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও পঞ্জর বিদ্ধ হইয়াছে, কেহ ঘোড়ার নীচে পড়িয়াছে। কেহ ডাকিতেছে “মা!” কেহ ডাকিতেছে, “বাপ!” কেহ চায় জল, কাহারও কামনা মৃত্যু। বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, ইংরেজ, মুসলমান একত্র জড়াজড়ি; জীবন্তে মৃতে, মনুষ্যে অশ্বে, মিশামিশি ঠেসাঠেসি হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সেই মাঘ মাসের পূর্ণিমার রাত্রে, দারুণ শীতে, উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে রণভূমি অতি ভয়ঙ্কর দেখাইতেছিল। সেখানে আসিতে কাহারও সাহস হয় না।

কাহারও সাহস হয় না, কিন্তু নিশীথকালে এক রমণী সেই অগম্য রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছিল। একটি মশাল জ্বালিয়া সেই শবরাশির মধ্যে সে কি খুঁজিতেছিল। প্রত্যেক মৃতদেহের মুখের কাছে মশাল লইয়া মুখ দেখিয়া, আবার অন্য শবের কাছে মশাল লইয়া যাইতেছিল। কোথায়, কোন নরদেহ মৃত অশ্বের নীচে পড়িয়াছে; সেখানে যুবতী, মশাল মাটিতে রাখিয়া, অশ্বটি দুই হাতে সরাইয়া নরদেহ উদ্ধার করিতেছিল। তার পর যখন দেখিতে পায় যে, যাকে খুঁজিতেছি, সে নয়, তখন মশাল তুলিয়া সরিয়া যায়। এইরূপ অনুসন্ধান করিয়া, যুবতী সকল মাঠ ফিরিল– যা খুঁজে, তা কোথাও পাইল না। তখন মশাল ফেলিয়া, সেই শবরাশিপূর্ণ রুধিরাক্ত ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। সেডড শান্তি; জীবানন্দের দেহ খুঁজিতেছিল।

শান্তি লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, এমন সময়ে এক অতি মধুর সকরুণধ্বনি তাহার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। কে যেন বলিতেছে, “উঠ মা! কাঁদিও না।” শান্তি চাহিয়া দেখিল–দেখিল, সম্মুখে জ্যোৎস্নালোকে দাঁড়াইয়া, এক অপূর্ব্বদৃশ্য প্রকাণ্ডাকার জটাজূটধারী মহাপুরুষ।

শান্তি উঠিয়া দাঁড়াইল। যিনি আসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, “কাঁদিও না মা! জীবানন্দের দেহ আমি খুঁজিয়া দিতেছি, তুমি আমার সঙ্গে আইস।”

তখন সেই পুরুষ শান্তিকে রণক্ষেত্রের মধ্যস্থলে লইয়া গেলেন; সেখানে অসংখ্য শবরাশি উপর্য্যুপরি পড়িয়াছে। শান্তি তাহা সকল নাড়িতে পারে নাই। সেই শবরাশি নাড়িয়া, সেই মহাবলবান্ পুরুষ এক মৃতদেহ বাহির করিলেন। শান্তি চিনিল, সেই জীবানন্দের দেহ। সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, রুধিরে পরিপ্লুত। শান্তি সামান্যা স্ত্রীলোকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

আবার তিনি বলিলেন, “কাঁদিও না মা! জীবানন্দ কি মরিয়াছে? স্থির হইয়া উহার দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখ। আগে নাড়ী দেখ।”

শান্তি শবের নাড়ী টিপিয়া দেখিল, কিছুমাত্র গতি নাই। সেই পুরুষ বলিলেন, “বুকে হাত দিয়া দেখ।”

যেখানে হৃৎপিণ্ড, শান্তি সেইখানে হাত দিয়া দেখিল, কিছুমাত্র গতি নাই; সব শীতল।

সেই পুরুষ আবার বলিলেন, “নাকের কাছে হাত দিয়া দেখ– কিছুমাত্র নিঃশ্বাস বহিতেছে কি?”

শান্তি দেখিল, কিছুমাত্র না।

সেই পুরুষ বলিলেন, “আবার দেখ, মুখের ভিতর আঙ্গুল দিয়া দেখ– কিছুমাত্র উষ্ণতা আছে কি না?” শান্তি আঙ্গুল দিয়া দেখিয়া বলিল, “বুঝিতে পারিতেছি না।” শান্তি আশামুগ্ধ হইয়াছিল।

মহাপুরুষ, বাম হস্তে জীবানন্দের দেহ স্পর্শ করিলেন। বলিলেন, “তুমি ভয়ে হতাশ হইয়াছ! তাই বুঝিতে পারিতেছ না– শরীরে কিছু তাপ এখনও আছে বোধ হইতেছে। আবার দেখ দেখি।”

শান্তি তখন আবার নাড়ী দেখিল, কিছু গতি আছে। বিস্মিত হইয়া হৃৎপিণ্ডের উপরে হাত রাখিল– একটু ধক্ ধক্ করিতেছে! নাকের আগে আঙ্গুলি রাখিল– একটু নিঃশ্বাস বহিতেছে! মুখের ভিতর অল্প উষ্ণতা পাওয়া গেল। শান্তি বিস্মিত হইয়া বলিল, “প্রাণ ছিল কি? না আবার আসিয়াছে?”

তিনি বলিলেন, "তাও কি মা! তুমি উহাকে বহিয়া পুষ্করিণীতে আনিতে পারিবে? আমি চিকিৎসক, উহার চিকিৎসা করিব।"

শান্তি অনায়াসে জীবানন্দকে কোলে তুলিয়া পুকুরের দিকে লইয়া চলিল। চিকিৎসক বলিলেন, "তুমি ইহাকে পুকুরে লইয়া গিয়া, রক্তসকল ধুইয়া দাও। আমি ঔষধ লইয়া যাইতেছি।"

শান্তি জীবানন্দকে পুষ্করিণীতীরে লইয়া গিয়া রক্ত ধৌত করিল। তখনই চিকিৎসক বন্য লতা পাতার প্রলেপ লইয়া আসিয়া সকল ক্ষতমুখে দিলেন, তার পর, বারংবার জীবানন্দের সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইলেন। তখন জীবানন্দ এক দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল। শান্তির মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "যুদ্ধে কার জয় হইল?"

শান্তি বলিল, "তোমারই জয়। এই মহাত্মাকে প্রণাম কর।"

তখন উভয়ে দেখিল, কেহ কোথাও নাই! কাহাকে প্রণাম করিবে?

নিকটে বিজয়ী সন্তানসেনার বিষম কোলাহল শুনা যাইতেছিল, কিন্তু শান্তি বা জীবানন্দ কেহই উঠিল না–সেই পূর্ণচন্দ্রের কিরণে সমুজ্জ্বল পুষ্করিণীর সোপানে বসিয়া রহিল। জীবানন্দের শরীর ঔষধের গুণে, অতি অল্প সময়েই সুস্থ হইয়া আসিল। তিনি বলিলেন, "শান্তি! সেই চিকিৎসকের ঔষুধের আশ্চর্য্য গুণ! আমার শরীরে আর কোন বেদনা বা গ্লানি নাই–এখন কোথায় যাইবে চল। ঐ সন্তানসেনার জয়ের উৎসবের গোল শুনা যাইতেছে।"

শান্তি বলিল, "আর ওখানে না। মার কার্য্যোদ্ধার হইয়াছে– এ দেশ সন্তানের হইয়াছে। আমরা রাজ্যের ভাগ চাহি না– এখন আর কি করিতে যাইব?"

জী। যা কাড়িয়া লইয়াছি, তা বাহুবলে রাখিতে হইবে।

শা। রাখিবার জন্য মহেন্দ্র আছেন, সত্যানন্দ স্বয়ং আছেন। তুমি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সন্তানধর্ম্মের জন্য দেহত্যাগ করিয়াছিলে; এ পুনঃপ্রাপ্ত দেহে সন্তানের আর কোন অধিকার নাই। আমরা সন্তানের পক্ষে মরিয়াছি। এখন আমাদের দেখিলে সন্তানেরা বলিবে, "জীবানন্দ যুদ্ধের সময় প্রায়শ্চিত্তভয়ে লুকাইয়াছিল, জয় হইয়াছে দেখিয়া রাজ্যের ভাগ লইতে আসিয়াছে।"

জী। সে কি শান্তি? লোকের অপবাদভয়ে আপনার কাজ ছাড়িব? আমার কাজ মাতৃসেবা, যে যা বলুক না কেন, আমি মাতৃসেবাই করিব?

শা। তাহাতে তোমার আর অধিকার নাই–কেন না, তোমার দেহ মাতৃসেবার জন্য পরিত্যাগ করিয়াছ। যদি আবার মার সেবা করিতে পাইলে, তবে তোমার প্রায়শ্চিত্ত কি হইল। মাতৃসেবায় বঞ্চিত হওয়াই এ প্রায়শ্চিত্তের প্রধান অংশ। নহিলে শুধু তুচ্ছ প্রাণ পরিত্যাগ কি বড় একটা ভারি কাজ?

জী। শান্তি! তুমিই সার বুঝিতে পার। আমি এ প্রায়শ্চিত্ত অসম্পূর্ণ রাখিব না। আমার সুখ সন্তানধর্ম্মে– সে সুখে আমাকে বঞ্চিত করিব। কিন্তু যাইব কোথায়? মাতৃসেবা ত্যাগ করিয়া, গৃহে গিয়া ত সুখভোগ করা হইবে না।

শা। তা কি আমি বলিতেছি? ছি! আমরা আর গৃহী নহি; এমনই দুই জনে সন্ন্যাসীই থাকিব– চিরব্রহ্মচর্য্য পালন করিব। চল, এখন গিয়া আমরা দেশে দেশে তীর্থদর্শন করিয়া বেড়াই।

জী। তার পর?

শা। তার পর– হিমালয়ের উপর কুটীর প্রস্তুত করিয়া, দুই জনে দেবতার আরাধনা করিব–যাতে মার মঙ্গল হয়, সেই বর মাগিব।

তখন দুই জনে উঠিয়া, হাত ধরাধরি করিয়া জ্যোৎস্নাময় নিশীথে অনন্তে অন্তর্হিত হইল।

হায়! আবার আসিবে কি মা! জীবানন্দের ন্যায় পুত্র, শান্তির ন্যায় কন্যা, আবার গর্ভে ধরিবে কি?

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সত্যানন্দ ঠাকুর রণক্ষেত্র হইতে কাহাকে কিছু না বলিয়া আনন্দমঠে চলিয়া আসিলেন। সেখানে গভীর রাত্রে, বিষ্ণুমণ্ডপে বসিয়া ধ্যানে প্রবৃত্ত। এমত সময়ে সেই চিকিৎসক সেখানে আসিয়া দেখা দিলেন। দেখিয়া, সত্যানন্দ উঠিয়া প্রণাম করিলেন।

চিকিৎসক বলিলেন, "সত্যানন্দ, আজ মাঘী পূর্ণিমা।"

সত্য। চলুন– আমি প্রস্তুত। কিন্তু হে মহাত্মন্! –আমার এক সন্দেহ ভঞ্জন করুন। আমি যে মুহূর্ত্তে যুদ্ধজয় করিয়া সনাতনধর্ম্ম নিষ্কণ্টক করিলাম–সেই সময়েই আমার প্রতি এ প্রত্যাখ্যানের আদেশ কেন হইল?

যিনি আসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "তোমার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে, মুসলমানরাজ্য ধ্বংস হইয়াছে। আর তোমার এখন কোন কার্য্য নাই। অনর্থক প্রাণিহত্যার প্রয়োজন নাই।"

সত্য। মুসলমানরাজ্য ধ্বংস হইয়াছে, কিন্তু হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হয় নাই–এখনও কলিকাতায় ইংরেজ প্রবল।

তিনি। হিন্দুরাজ্য এখন স্থাপিত হইবে না– তুমি থাকিলে এখন অনর্থক নরহত্যা হইবে। অতএব চল।

শুনিয়া সত্যানন্দ তীব্র মর্ম্মপীড়ায় কাতর হইলেন। বলিলেন, "হে প্রভু! যদি হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হইবে না, তবে কে রাজা হইবে? আবার কি মুসলমান রাজা হইবে?"

তিনি বলিলেন, "না, এখন ইংরেজ রাজা হইবে।"

সত্যানন্দের দুই চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল। তিনি উপরিস্থিতা, মাতৃরূপা, জন্মভূমি প্রতিমার দিকে ফিরিয়া জোড়হাতে বাষ্পনিরুদ্ধস্বরে বলিতে লাগিলেন, "হায় মা! তোমার উদ্ধার করিতে পারিলাম না–আবার তুমি ম্লেচ্ছের হাতে পড়িবে। সন্তানের অপরাধ লইও না। হায় মা! কেন আজ রণক্ষেত্রে আমার মৃত্যু হইল না!"

চিকিৎসক বলিলেন, "সত্যানন্দ কাতর হইও না। তুমি বুদ্ধির ভ্রমক্রমে দস্যুবৃত্তির দ্বারা ধন সংগ্রহ করিয়া রণজয় করিয়াছ। পাপের কখন পবিত্র ফল হয় না। অতএব তোমরা দেশের উদ্ধার করিতে পারিবে না। আর যাহা হইবে, তাহা ভালই হইবে। ইংরেজ রাজা না হইলে সনাতনধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। মহাপুরুষেরা যেরূপ বুঝিয়াছেন, এ কথা আমি তোমাকে সেইরূপ বুঝাই। মনোযোগ দিয়া শুন। তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা সনাতনধর্ম্ম নহে, সে একটা লৌকিক অপকৃষ্ট ধর্ম্ম; তাহার প্রভাবে প্রকৃত সনাতনধর্ম্ম– ম্লেচ্ছেরা যাহাকে হিন্দুধর্ম্ম বলে–তাহা লোপ পাইয়াছে। প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম জ্ঞানাত্মক, কর্ম্মাত্মক নহে। সেই জ্ঞান দুই প্রকার, বহির্ব্বিষয়ক ও অন্তর্ব্বিষয়ক। অন্তর্ব্বিষয়ক যে জ্ঞান, সে-ই সনাতনধর্ম্মের প্রধান ভাগ। কিন্তু বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অন্তর্ব্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। স্থূল কি, তাহা না জানিলে, সূক্ষ্ম কি, তাহা জানা যায় না। এখন এদেশে অনেক দিন হইতে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে–কাজেই প্রকৃত সনাতনধর্ম্মও লোপ পাইয়াছে। সনাতনধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিতে গেলে, আগে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞানের প্রচার করা আবশ্যক। এখন এদেশে

বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান নাই–শিখায় এমন লোক নাই; আমরা লোকশিক্ষায় পটু নহি। অতএব ভিন্ন দেশ হইতে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান আনিতে হইবে। ইংরেজ বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব। ইংরেজী শিক্ষায় এদেশীয় লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে। তখন সনাতনধর্ম্ম প্রচারে আর বিঘ্ন থাকিবে না। তখন প্রকৃত ধর্ম্ম আপনা আপনি পুনরুদ্দীপ্ত হইবে। যত দিন না তা হয়, যত দিন না হিন্দু আবার জ্ঞানবান্, গুণবান্ আর বলবান্ হয়, তত দিন ইংরেজরাজ্য অক্ষয় থাকিবে। ইংরেজরাজ্য প্রজা সুখী হইবে– নিষ্কণ্টকে ধর্ম্মাচরণ করিবে। অতএব হে বুদ্ধিমান্–ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া আমার অনুসরণ কর।”

সত্যানন্দ বলিলেন, “হে মহাত্মন্! যদি ইংরেজকে রাজা করাই আপনাদের অভিপ্রায়, যদি এ সময়ে ইংরেজের রাজ্যই দেশের পক্ষে মঙ্গলকর, তবে আমাদিগকে এই নৃশংস যুদ্ধকার্য্যে কেন নিযুক্ত করিয়াছিলেন?”

মহাপুরুষ বলিলেন, “ইংরেজ এক্ষণে বণিক্–অর্থসংগ্রহেই মন, রাজ্যশাসনের ভার লইতে চাহে না। এই সন্তানবিদ্রোহের কারণে, তাহারা রাজ্যশাসনের ভার লইতে বাধ্য হইবে; কেন না, রাজ্যশাসন ব্যতীত অর্থসংগ্রহ হইবে না। ইংরেজ রাজ্যে অভিষিক্ত হইবে বলিয়াই সন্তানবিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে আইস–জ্ঞানলাভ করিয়া তুমি স্বয়ং সকল কথা বুঝিতে পারিবে।”

সত্যানন্দ। হে মহাত্মন্! আমি জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা রাখি না–জ্ঞানে আমার কাজ নাই–আমি যে ব্রতে ব্রতী হইয়াছি, ইহাই পালন করিব। আশীর্ব্বাদ করুন, আমার মাতৃভক্তি অচলা হউক।

মহাপুরুষ। ব্রত সফল হইয়াছে–মার মঙ্গল সাধন করিয়াছ–ইংরেজরাজ্য স্থাপিত করিয়াছ। যুদ্ধবিগ্রহ পরিত্যাগ কর, লোকে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত হউক, পৃথিবী শস্যশালিনী হউন, লোকের শ্রীবৃদ্ধি হউক।

সত্যানন্দের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। তিনি বলিলেন, “শত্রুশোণিতে সিক্ত করিয়া মাতাকে শস্যশালিনী করিব।”

মহাপুরুষ। শত্রু কে? শত্রু আর নাই। ইংরেজ মিত্ররাজা। আর ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে শেষ জয়ী হয়, এমন শক্তিও কাহারও নাই।

সত্যানন্দ। না থাকে, এইখানে এই মাতৃপ্রতিমাসম্মুখে দেহত্যাগ করিব।

মহাপুরুষ। অজ্ঞানে? চল, জ্ঞানলাভ করিবে চল। হিমালয়শিখরে মাতৃমন্দির আছে, সেইখান হইতে মাতৃমূর্ত্তি দেখাইব।

এই বলিয়া মহাপুরুষ সত্যানন্দের হাত ধরিলেন। কি অপূর্ব্ব শোভা! সেই গম্ভীর বিষ্ণুমন্দিরে প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ মূর্ত্তির সম্মুখে, ক্ষীণালোকে সেই মহাপ্রতিভাপূর্ণ দুই পুরুষ মূর্ত্তি শোভিত–একে অন্যের হাত ধরিয়াছেন। কে কাহাকে ধরিয়াছে? জ্ঞান আসিয়া ভক্তিকে ধরিয়াছে–ধর্ম্ম আসিয়া কর্ম্মকে ধরিয়াছে; বিসর্জ্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে ধরিয়াছে; কল্যাণী আসিয়া শান্তিকে ধরিয়াছে। এই সত্যানন্দ শান্তি; এই মহাপুরুষ কল্যাণী। সত্যানন্দ প্রতিষ্ঠা, মহাপুরুষ বিসর্জ্জন।
বিসর্জ্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল।

বিষবৃক্ষ

প্রথম পরিচ্ছেদ : নগেন্দ্রের নৌকাযাত্রা

নগেন্দ্র দত্ত নৌকারোহণে যাইতেছিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাস, তুফানের সময়; ভার্য্যা সূর্য্যমুখী মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, দেখিও নৌকা সাবধানে লইয়া যাইও, তুফান দেখিলে লাগাইও। ঝড়ের সময় কখন নৌকায় থাকিও না। নগেন্দ্র স্বীকৃত হইয়া নৌকারোহণ করিয়াছিলেন, নহিলে সূর্য্যমুখী ছাড়িয়া দেন না। কলিকাতায় না গেলেও নহে, অনেক কাজ ছিল।

নগেন্দ্রনাথ মহাধনবান্ ব্যক্তি, জমিদার। তাঁহার বাসস্থান গোবিন্দপুর। যে জেলায় সেই গ্রাম, তাহার নাম গোপন রাখিয়া, হরিপুর বলিয়া তাহার বর্ণন করিব। নগেন্দ্র বাবু যুবা পুরুষ, বয়ঃক্রম ত্রিংশৎ বর্ষমাত্র। নগেন্দ্রনাথ আপনার বজরায় যাইতেছিলেন। প্রথম দুই এক দিন নির্ব্বিঘ্নে গেল। নগেন্দ্র দেখিতে দেখিতে গেলেন, নদীর জল অবিরল চল্ চল্ চলিতেছে—ছুটিতেছে—বাতাসে নাচিতেছে—রৌদ্রে হাসিতেছে—আবর্ত্তে ডাকিতেছে। জল অশ্রান্ত—অনন্ত—ক্রীড়াময়। জলের ধারে তীরে তীরে মাঠে মাঠে রাখালেরা গোরু চরাইতেছে, কেহ বা বৃক্ষের তলায় বসিয়া গান করিতেছে, কেহ বা তামাকু খাইতেছে, কেহ বা মারামারি করিতেছে, কেহ কেহ ভুজা খাইতেছে। কৃষকে লাঙ্গল চষিতেছে, গোরু ঠেঙ্গাইতেছে, গোরুকে মানুষের অধিক করিয়া গালি দিতেছে, কৃষাণকেও কিছু কিছু ভাগ দিতেছে। ঘাটে ঘাটে কৃষকের মহিষীরাও কলসী, ছেঁড়া কাঁথা, পচা মাদুর, রূপার তাবিজ, নাকছাবি, পিতলের পৈঁচে, দুই মাসের ময়লা পরিধেয় বস্ত্র, মসীনিন্দিত গায়ের বর্ণ, রুক্ষ কেশ লইয়া বিরাজ করিতেছেন। তাহার মধ্যে কোন সুন্দরী মাথায় কাদা মাখিয়া মাথা ঘসিতেছেন। কেহ ছেলে ঠেঙ্গাইতেছেন, কেহ কোন অনুদ্দিষ্টা, অব্যক্তনাম্নী, প্রতিবাসিনীর সঙ্গে উদ্দেশে কোন্দল করিতেছেন, কেহ কাষ্ঠে কাপড় আছড়াইতেছেন। কোন কোন ভদ্রগ্রামের ঘাটে কুলকামিনীরা ঘাট আলো করিতেছেন। প্রাচীনারা বক্তৃতা করিতেছেন—মধ্যবয়স্কারা শিবপূজা করিতেছেন—যুবতীরা ঘোমটা দিয়া ডুব দিতেছেন—আর বালক বালিকারা চেঁচাইতেছে, কাদা মাখিতেছে, পূজার ফুল কুড়াইতেছে, সাঁতার দিতেছে, সকলের গায়ে জল দিতেছে, কখন কখন ধ্যানে মগ্না মুদ্রিতনয়না কোন গৃহিণীর সম্মুখস্থ কাদার শিব লইয়া পলাইতেছে। ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা নিরীহ ভালমানুষের মত আপন মনে গঙ্গাস্তব পড়িতেছেন, পূজা করিতেছেন, এক একবার আকণ্ঠনিমজ্জিতা কোন যুবতীর প্রতি অলক্ষ্যে চাহিয়া লইতেছেন। আকাশে সাদা মেঘ রৌদ্রতপ্ত হইয়া ছুটিতেছে, তাহার নীচে কৃষ্ণবিন্দুবৎ পাখী উড়িতেছে, নারিকেল গাছে চিল বসিয়া, রাজমন্ত্রীর মত চারিদিক্ দেখিতেছে, কাহার কিসে ছোঁ মারিবে। বক ছোট লোক, কাদা ঘাঁটিয়া বেড়াইতেছে। ডাহুক রসিক লোক, ডুব মারিতেছে। আর আর পাখী হাল্কা লোক, কেবল উড়িয়া বেড়াইতেছে। হাটুরিয়া নৌকা হটর হটর করিয়া যাইতেছে—আপনার প্রয়োজনে। খেয়া নৌকা গজেন্দ্রগমনে যাইতেছে,—পরের প্রয়োজনে। বোঝাই নৌকা যাইতেছে না,—তাহাদের প্রভুর প্রয়োজন মাত্র।

নগেন্দ্র প্রথম দুই এক দিন দেখিতে দেখিতে গেলেন। পরে এক দিন আকাশে মেঘ উঠিল, মেঘ আকাশ ঢাকিল, নদীর জল কালো হইল, গাছের মাথা কটা

হইল, মেঘের কোলে বক উড়িল, নদী নিস্পন্দ হইল। নগেন্দ্র নাবিকদিগকে আজ্ঞা করিলেন, "নৌকাটা কিনারায় বাঁধিও।" রহমত মোল্লা মাঝি তখন নেমাজ করিতেছিল, কথার উত্তর দিল না। রহমত আর কখন মাঝিগিরি করে নাই—তাহার নানার খালা মাঝির মেয়ে ছিল, তিনি সেই গর্ব্বে মাঝিগিরির উমেদার হইয়াছিলেন, কপালক্রমে সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন। রহমত হাঁকে ডাকে খাটো নন, নেমাজ সমাপ্ত হইলে বাবুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ভয় কি, হুজুর! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।" রহমত মোল্লার এত সাহসের কারণ এই যে, কিনারা অতি নিকট, অবিলম্বেই কিনারায় নৌকা লাগিল। তখন নাবিকেরা নামিয়া নৌকা কাছি করিল।

বোধ হয়, রহমত মোল্লার সঙ্গে দেবতার কিছু বিবাদ ছিল, ঝড় কিছু গুরুতর বেগে আসিল। ঝড় আগে আসিল। ঝড় ক্ষণেক কাল গাছপালার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করিয়া সহোদর বৃষ্টিকে ডাকিয়া আনিল। তখন দুই ভাই বড় মাতামাতি আরম্ভ করিল। ভাই বৃষ্টি, ভাই ঝড়ের কাঁধে চড়িয়া উড়িতে লাগিল। দুই ভাই গাছের মাথা ধরিয়া নোয়ায়, ডাল ভাঙ্গে, লতা ছেঁড়ে, ফুল লোপে, নদীর জল উড়ায়, নানা উৎপাত করে। এক ভাই রহমত মোল্লার টুপি উড়াইয়া লইয়া গেল, আর এক ভাই তাহার দাড়িতে প্রস্রবণের সৃজন করিল। দাঁড়ীরা পাল মুড়ি দিয়া বসিল। বাবু সব সাসী ফেলিয়া দিলেন। ভৃত্যেরা নৌকাসজ্জা সকল রক্ষা করিতে লাগিল। নগেন্দ্র বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। নৌকা হইতে ঝড়ের ভয়ে নামিলে নাবিকেরা কাপুরুষ মনে করিবে—না নামিলে সূর্য্যমুখীর কাছে মিথ্যাবাদী হইতে হয়। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিবেন, "তাহাতেই বা ক্ষতি কি?" আমরা জানি না, কিন্তু নগেন্দ্র ক্ষতি বিবেচনা করিতেছিলেন। এমত সময়ে রহমত মোল্লা স্বয়ং বলিল যে, "হুজুর, পুরাতন কাছি, কি জানি কি হয়, ঝড় বড় বাড়িল, নৌকা হইতে নামিলে ভাল হইত।" সুতরাং নগেন্দ্র নামিলেন।

নিরাশ্রয়ে, নদীতীরে ঝড় বৃষ্টিতে দাঁড়ান কাহারও সুসাধ্য নহে। বিশেষ সন্ধ্যা হইল, ঝড় থামিল না, সুতরাং আশ্রয়ানুসন্ধানে যাওয়া কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া নগেন্দ্র গ্রামাভিমুখে চলিলেন। নদীতীর হইতে গ্রাম কিছু দূরবর্ত্তী; নগেন্দ্র পদব্রজে কর্দ্দমময় পথে চলিলেন। বৃষ্টি থামিল, ঝড়ও অল্পমাত্র রহিল, কিন্তু আকাশ মেঘপরিপূর্ণ; সুতরাং রাত্রে আবার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। নগেন্দ্র চলিলেন, ফিরিলেন না।

আকাশে মেঘাড়ম্বরকারণ রাত্রি প্রদোষকালেই ঘনান্ধতমোময়ী হইল। গ্রাম, গৃহ, প্রান্তর, পথ, নদী, কিছুই লক্ষ্য হয় না। কেবল বনবিটপী সকল, সহস্র সহস্র খদ্যোতমালা-পরিমণ্ডিত হইয়া হীরকখচিত কৃত্রিম বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। কেবলমাত্র গর্জ্জনবিরত শ্বেতকৃষ্ণাভ মেঘমালার মধ্যে হ্রস্বদীপ্তি সৌদামিনী মধ্যে মধ্যে চমকিতেছিল— স্ত্রীলোকের ক্রোধ একেবারে হ্রাস প্রাপ্ত হয় না। কেবলমাত্র নববারিসমাগমপ্রফুল্ল ভেকেরা উৎসব করিতেছিল। ঝিল্লীরব মনোযোগপূর্ব্বক লক্ষ্য করিলে শুনা যায়, রাবণের চিতার ন্যায় অশ্রান্ত রব করিতেছে, কিন্তু বিশেষ মনোযোগ না করিলে লক্ষ্য হয় না। শব্দের মধ্যে বৃক্ষাগ্র হইতে বৃক্ষপত্রের উপর বর্ষাবশিষ্ট বারিবিন্দুর পতনশব্দ, বৃক্ষতলস্থ বর্ষাজলে পত্রচ্যুত জলবিন্দুপতনশব্দ, পথিস্থ অনিঃসৃত জলে শৃগালের পদসঞ্চারণশব্দ, কদাচিৎ বৃক্ষারূঢ় পক্ষীর আর্দ্র পক্ষের জলমোচনার্থ পক্ষবিধূননশব্দ। মধ্যে মধ্যে শমিতপ্রায় বায়ুর ক্ষণিক গর্জ্জন, তৎসঙ্গে বৃক্ষপত্রচ্যুত বারিবিন্দু সকলের এককালীন পতনশব্দ। ক্রমে নগেন্দ্র দূরে একটা আলো দেখিতে পাইলেন। জলপ্লাবিত ভূমি অতিক্রম করিয়া, বৃক্ষচ্যুত বারি কর্ত্তৃক সিক্ত হইয়া, বৃক্ষতলস্থ শৃগালের ভীতি বিধান করিয়া, নগেন্দ্র সেই আলোকাভিমুখে চলিলেন। বহু কষ্টে আলোকসন্নিধি উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, এক ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীন বাসগৃহ হইতে আলো নির্গত হইতেছে। গৃহের দ্বার মুক্ত। নগেন্দ্র ভৃত্যকে বাহিরে রাখিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, গৃহের অবস্থা ভয়ানক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : দীপনির্ব্বাণ

গৃহটি নিতান্ত সামান্য নহে। কিন্তু এখন তাহাতে সম্পদ্লক্ষণ কিছুই নাই। প্রকোষ্ঠ সকল ভগ্ন, মলিন, মনুষ্য-সমাগম-চিহ্ন-বিরহিত। কেবলমাত্র পেচক, মূষিক ও নানাবিধ কীটপতঙ্গাদি-সমাকীর্ণ। একটিমাত্র কক্ষে আলো জ্বলিতেছিল। সেই কক্ষমধ্যে নগেন্দ্র প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, কক্ষমধ্যে মনুষ্য জীবনোপযোগী দুই একটা সামগ্রী আছে মাত্র। কিন্তু সে সকল সামগ্রী দারিদ্র্যব্যঞ্জক। দুই একটা হাঁড়ি—একটা ভাঙ্গা উনান—তিন চারিখান তৈজস—ইহাই গৃহালঙ্কার। দেওয়ালে কালি, কোণে ঝুল; চারিদিকে আরসুলা, মাকড়সা, টিকটিকি, ইন্দুর বেড়াইতেছে। এক ছিন্ন শয্যায় এক জন প্রাচীন শয়ন করিয়া আছেন। দেখিয়া বোধ হয় তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত। চক্ষু ম্লান, নিশ্বাস প্রখর, ওষ্ঠ কম্পিত। শয্যাপার্শ্বে গৃহচ্যুত ইষ্টকখণ্ডের উপর একটি মৃন্ময় প্রদীপ, তাহাতে তৈলাভাব; শয্যোপরিস্থ জীবন প্রদীপেও তাহাই। আর শয্যাপার্শ্বেও আর এক প্রদীপ ছিল,—এক অনিন্দিতগৌরকান্তি স্নিগ্ধজ্যোতির্ম্ময়রূপিণী বালিকা।

তৈলহীন প্রদীপের জ্যোতিঃ অপ্রখর বলিয়াই হউক, অথবা গৃহবাসী দুই জন আশু ভাবী বিরহের চিন্তায় প্রগাঢ়তর বিমনা থাকার কারণেই হউক, নগেন্দ্রের প্রবেশকালে কেহই তাঁহাকে দেখিল না। তখন নগেন্দ্র দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া সেই প্রাচীনের মুখনির্গত চরমকালিক দুঃখের কথা সকল শুনিতে লাগিলেন। এই দুই জন, প্রাচীন এবং বালিকা, এই বহুলোকপূর্ণ লোকালয়ে নিঃসহায়। এক দিন ইহাদিগের সম্পদ্ ছিল; লোক জন, দাস দাসী, সহায় সৌষ্ঠব সব ছিল। কিন্তু চঞ্চলা কমলার কৃপার সঙ্গে সঙ্গে একে একে সকলই গিয়াছিল। সদ্যঃসমাগত দারিদ্র্যের পীড়নে পুত্রকন্যার মুখমণ্ডল, হিমনিষিক্ত পদ্মবৎ দিন দিন ম্লান দেখিয়া, অগ্রেই গৃহিণী নদী-সৈকতশয্যায় শয়ন করিলেন। আর সকল তারাগুলিও সেই চাঁদের সঙ্গে সঙ্গে নিবিল। এক বংশধর পুত্র, মাতার চক্ষের মণি, পিতার বার্দ্ধক্যের ভরসা, সেও পিতৃসমক্ষে চিতারোহণ করিল। কেহ রহিল না, কেবল প্রাচীন আর এই লোকমনোমোহিনী বালিকা, সেই বিজনবনবেষ্টিত ভগ্ন গৃহে বাস করিতে লাগিল। পরস্পরে পরস্পরের একমাত্র উপায়। কুন্দনন্দিনী বিবাহের বয়স অতিক্রম করিয়াছিল, কিন্তু কুন্দ পিতার অন্ধের যষ্টি, এই সংসারবন্ধনের এখন একমাত্র গ্রন্থি; বৃদ্ধ প্রাণ ধরিয়া তাহাকে পরহস্তে সমর্পণ করিতে পারিলেন না। "আর কিছু দিন যাক্,—কুন্দকে বিলাইয়া দিয়া কোথায় থাকিব? কি লইয়া থাকিব?" বিবাহের কথা মনে হইলে বৃদ্ধ এইরূপ ভাবিতেন। এ কথা তাঁহার মনে হইত না যে, যে দিন তাঁহার ডাক পড়িবে, সে দিন কুন্দকে কোথায় রাখিয়া যাইবেন। আজি অকস্মাৎ যমদূত আসিয়া শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইল। তিনি ত চলিলেন। কুন্দনন্দিনী কালি কোথায় দাঁড়াইবে?

এই গভীর অনিবার্য্য যন্ত্রণা মুমূর্ষুর প্রতি নিশ্বাসে ব্যক্ত হইতেছিল। অবিরল মুদ্রিতোন্মুখনেত্রে বারিধারা পড়িতেছিল। আর শিরোদেশে প্রস্তরময়ী মূর্ত্তির ন্যায় সেই ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা স্থিরদৃষ্টে মৃত্যুমেঘাচ্ছন্ন পিতৃমুখপ্রতি চাহিয়াছিল। আপনা ভুলিয়া, কালি কোথা যাইবে তাহা ভুলিয়া, কেবল গমনোন্মুখের মুখপ্রতি চাহিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধের বাক্যস্ফূর্ত্তি অস্পষ্টতর হইতে লাগিল। নিশ্বাস কণ্ঠাগত হইল, চক্ষু নিস্তেজ হইল; ব্যথিতপ্রাণ ব্যথা হইতে নিষ্কৃতি পাইল। সেই নিভৃত কক্ষে, স্তিমিত প্রদীপে, কুন্দনন্দিনী একাকিনী পিতার মৃতদেহ ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া রহিলেন। নিশা ঘনান্ধকারাবৃতা; বাহিরে এখনও বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছিল, বৃক্ষপত্রে তাহার শব্দ হইতেছিল, বায়ু রহিয়া রহিয়া গর্জ্জন করিতেছিল, ভগ্ন গৃহের কবাট সকল শব্দিত হইতেছিল। গৃহমধ্যে নির্ব্বাণোন্মুখ চঞ্চল ক্ষীণ প্রদীপালোক, ক্ষণে ক্ষণে শবমুখে পড়িয়া আবার ক্ষণে ক্ষণে অন্ধকারবৎ হইতেছিল। সে প্রদীপে অনেকক্ষণ তৈলসেক হয় নাই। এই সময়ে দুই চারি বার উজ্জ্বলতর হইয়া প্রদীপ নিবিয়া গেল।

তখন নগেন্দ্র নিঃশব্দপদসঞ্চারে গৃহদ্বার হইতে অপসৃত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ছায়া পূর্ব্বগামিনী

নিশীথ সময়। ভগ্ন গৃহমধ্যে কুন্দনন্দিনী ও তাহার পিতার শব। কুন্দ ডাকিল, "বাবা।" কেহ উত্তর দিল না। কুন্দ একবার মনে করিল, পিতা ঘুমাইলেন, আবার মনে করিল, বুঝি মৃত্যু—কুন্দ সে কথা স্পষ্ট মুখে আনিতে পারিল না। শেষে, কুন্দ আর ডাকিতেও পারিল না, ভাবিতেও পারিল না। অন্ধকারে ব্যজনহস্তে যেখানে তাহার পিতা জীবিতাবস্থায় শয়ান ছিলেন, এক্ষণে যেখানে তাঁহার শব পড়িয়াছিল, সেইখানেই বায়ুসঞ্চালন করিতে লাগিল। নিদ্রাই শেষে স্থির করিল, কেন না, মরিলে কুন্দের দশা কি হইবে? দিবারাত্রি জাগরণে এবং এক্ষণকার ক্লেশে বালিকার তন্দ্রা আসিল। কুন্দনন্দিনী রাত্রি দিবা জাগিয়া পিতৃসেবা করিয়াছিল। নিদ্রাকর্ষণ হইলে কুন্দনন্দিনী তালবৃন্তহস্তে সেই অনাবৃত কঠিন শীতল হর্ম্ম্যতলে আপন মৃণালনিন্দিত বাহুপরি মস্তক রক্ষা করিয়া নিদ্রা গেল।
তখন কুন্দনন্দিনী স্বপ্ন দেখিল। দেখিল, যেন রাত্রি অতি পরিষ্কার জ্যোৎস্নাময়ী। আকাশ উজ্জ্বল নীল, সেই প্রভাময় নীল আকাশমণ্ডলে যেন বৃহচ্চন্দ্রমণ্ডলের বিকাশ হইয়াছে। এত বড় চন্দ্রমণ্ডল কুন্দ কখন দেখে নাই। তাহার দীপ্তিও অতিশয় ভাস্বর, অথচ নয়নস্নিগ্ধকর। কিন্তু সেই রমণীয় প্রকাণ্ড চন্দ্রমণ্ডলমধ্যে চন্দ্র নাই; তৎপরিবর্ত্তে কুন্দ মণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী এক অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী দৈবী মূর্ত্তি দেখিল। সেই জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিসনাথ চন্দ্রমণ্ডল যেন উচ্চ গগন পরিত্যাগ করিয়া, ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে নীচে নামিতেছিল। ক্রমে সেই চন্দ্রমণ্ডল, সহস্র শীতলরশ্মি স্ফুরিত করিয়া, কুন্দনন্দিনীর মস্তকের উপর আসিল। তখন কুন্দ দেখিল যে, সেই মণ্ডলমধ্যশোভিনী, আলোকময়ী, কিরীট-কুণ্ডলাদি-ভূষণালঙ্কৃতা মূর্ত্তি স্ত্রীলোকের আকৃতিবিশিষ্টা। রমণীয় কারুণ্যপরিপূর্ণ মুখমণ্ডল; স্নেহপরিপূর্ণ হাস্য অধরে স্ফুরিত হইতেছে। তখন কুন্দ সভয়ে সানন্দে চিনিল যে, সেই করুণাময়ী তাহার বহুকাল-মৃতা প্রসূতির অবয়ব ধারণ করিয়াছে। আলোকময়ী সস্নেহাননে কুন্দকে ভূতল হইতে উত্থিতা করিয়া ক্রোড়ে লইলেন। এবং মাতৃহীনা কুন্দ বহুকাল পরে "মা" কথা মুখে আনিয়া যেন চরিতার্থ হইল। পরে জ্যোতির্ম্মণ্ডলমধ্যস্থা কুন্দের মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "বাছা! তুই বিস্তর দুঃখ পাইয়াছিস্। আমি জানিতেছি যে, বিস্তর দুঃখ পাইবি। তোর এই বালিকা বয়ঃ, এই কুসুমকোমল শরীর, তোর শরীরে সে দুঃখ সহিবে না। অতএব তুই আর এখানে থাকিস্ না। পৃথিবী ত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে আয়।" কুন্দ যেন ইহাতে উত্তর করিল যে, "কোথায় যাইব?" তখন কুন্দের জননী ঊর্দ্ধে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ দ্বারা উজ্জ্বল প্রজ্বলিত নক্ষত্রলোক দেখাইয়া দিয়া বলিলেন যে, "ঐ দেশ।" কুন্দ তখন যেন বহুদূরবর্ত্তী বেলাবিহীন অনন্তসাগরপারস্থবৎ অপরিজ্ঞাত নক্ষত্রলোক দৃষ্টি করিয়া কহিল, "আমি অত দূর যাইতে পারিব না, আমার বল নাই।" তখন ইহা শুনিয়া জননীর কারুণ্য-প্রফুল্ল অথচ গম্ভীর মুখমণ্ডলে ঈষৎ অনাহ্লাদজনিতবৎ ভ্রূকুটি বিকাশ হইল, এবং তিনি মৃদুগম্ভীর স্বরে কহিলেন, "বাছা, যাহা তোমার ইচ্ছা তাহা কর। কিন্তু আমার সঙ্গে আসিলে ভাল করিতে। ইহার পর তুমি ঐ নক্ষত্রলোকপ্রতি চাহিয়া তথায় আসিবার জন্য কাতর হইবে। আমি আর একবার তোমাকে দেখা দিব। যখন তুমি মনঃপীড়ায় ধূল্যবলুণ্ঠিতা হইয়া, আমাকে মনে করিয়া, আমার কাছে আসিবার জন্য কাঁদিবে, তখন আমি আবার দেখা দিব, তখন আমার সঙ্গে আসিও। এখন তুমি আমার অঙ্গুলিসঙ্কেতনীতনয়নে আকাশপ্রান্তে চাহিয়া দেখ। আমি তোমাকে দুইটি মনুষ্যমূর্ত্তি দেখাইতেছি। এই দুই মনুষ্যই ইহলোকে তোমার শুভাশুভের কারণ হইবে। যদি পার, তবে ইহাদিগকে দেখিলে বিষধরবৎ প্রত্যাখ্যান করিও। তাহারা যে পথে যাইবে, সে পথে যাইও না।"
তখন জ্যোতির্ম্ময়ী, অঙ্গুলিসঙ্কেতদ্বারা গগনোপান্ত দেখাইলেন। কুন্দ তৎসঙ্কেতানুসারে দেখিল, নীল গগনপটে এক দেবনিন্দিত পুরুষমূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে। তাঁহার উন্নত, প্রশস্ত, প্রশান্ত ললাট; সরল, সকরুণ কটাক্ষ; তাঁহার মরালবৎ দীর্ঘ ঈষৎ বঙ্কিম গ্রীবা এবং অন্যান্য মহাপুরুষলক্ষণ দেখিয়া কাহারও বিশ্বাস হইতে পারে না যে, ইহা হইতে আশঙ্কা সম্ভবে। তখন ক্রমে ক্রমে সে প্রতিমূর্ত্তি জলবুদ্বুদবৎ গগনপটে বিলীন হইলে, জননী কুন্দকে কহিলেন, "ইহার দেবকান্ত

রূপ দেখিয়া ভুলিও না। ইনি মহদাশয় হইলেও, তোমার অমঙ্গলের কারণ। অতএব বিষধরবোধে ইহাকে ত্যাগ করিও।" পরে আলোকময়ী পুনশ্চ "ঐ দেখ" বলিয়া গগনপ্রান্তে নির্দ্দেশ করিলে, কুন্দ দ্বিতীয় মূর্ত্তি আকাশের নীলপটে চিত্রিত দেখিল। কিন্তু এবার পুরুষমূর্ত্তি নহে। কুন্দ তথায় এক উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী, পদ্মপলাশনয়নী যুবতী দেখিল। তাহাকে দেখিয়াও কুন্দ ভীতা হইল না। জননী কহিলেন, "এই শ্যামাঙ্গী নারীবেশে রাক্ষসী। ইহাকে দেখিলে পলায়ন করিও।" ইহা বলিতে বলিতে সহসা আকাশ অন্ধকারময় হইল, বৃহচ্চন্দ্রমণ্ডল আকাশে অন্তর্হিত হইল এবং তৎসহিত তন্মধ্যসংবর্ত্তিনী তেজোময়ীও অন্তর্হিতা হইলেন। তখন কুন্দের নিদ্রাভঙ্গ হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : এই সেই

নগেন্দ্র গ্রামমধ্যে গমন করিলেন। শুনিলেন, গ্রামের নাম ঝুমঝুমপুর। তাঁহার অনুরোধে এবং আনুকূল্যে গ্রামস্থ কেহ কেহ আসিয়া মৃতের সৎকারের আয়োজন করিতে লাগিল। একজন প্রতিবেশিনী কুন্দনন্দিনীর নিকটে রহিল। কুন্দ যখন দেখিল যে, তাঁহার পিতাকে সৎকারের জন্য লইয়া গেল, তখন তাঁহার মৃত্যুসম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া, অবিরত রোদন করিতে লাগিল।

প্রভাতে প্রতিবেশিনী আপন গৃহকার্য্যে গেল। কুন্দনন্দিনীর সান্ত্বনার্থ আপন কন্যা চাঁপাকে পাঠাইয়া দিল। চাঁপা কুন্দের সমবয়স্কা এবং সঙ্গিনী। চাঁপা আসিয়া কুন্দের সঙ্গে নানাবিধ কথা কহিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। কিন্তু দেখিল যে, কুন্দ কোন কথাই শুনিতেছে না, রোদন করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে প্রত্যাশাপন্নবৎ আকাশপানে চাহিয়া দেখিতেছে। চাঁপা কৌতূহলপ্রযুক্ত জিজ্ঞাসা করিল, "এক শ বার আকাশপানে চাহিয়া কি দেখিতেছ?"

কুন্দ তখন কহিল, "আকাশ থেকে কাল মা আসিয়াছিলেন। তিনি আমাকে ডাকিলেন, 'আমার সঙ্গে আয়।' আমার কেমন দুর্ব্বুদ্ধি হইল, আমি ভয় পাইলাম, মার সঙ্গে গেলাম না। এখন ভাবিতেছি, কেন গেলাম না। এখন আর যদি তিনি আসেন, আমি যাই। তাই ঘন ঘন আকাশপানে চাহিয়া দেখিতেছি।"

চাঁপা কহিল, "হাঁ! মরা মানুষ নাকি আবার আসিয়া থাকে?"

তখন কুন্দ স্বপ্নবৃত্তান্ত সকল বলিল। শুনিয়া চাঁপা বিস্মিতা হইয়া কহিল, "সেই আকাশের গায়ে যে পুরুষ আর মেয়ে মানুষ দেখিয়াছিলে, তাহাদের চেন?"

কুন্দ। না; তাহাদের আর কখন দেখি নাই। সেই পুরুষের মত সুন্দর পুরুষ যেন কোথাও নাই। এমন রূপ কখনও দেখি নাই।

এদিকে নগেন্দ্র প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া গ্রামস্থ সকলকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই মৃত ব্যক্তির কন্যার কি হইবে? সে কোথায় থাকিবে? তাহার কে আছে?" ইহাতে সকলেই উত্তর করিল যে, "উহার থাকিবার স্থান নাই, উহার কেহ নাই।" তখন নগেন্দ্র কহিলেন, "তবে তোমরা কেহ উহাকে গ্রহণ কর। উহার বিবাহ দিও। তাহার ব্যয় আমি দিব। আর যতদিন সে তোমাদের বাটীতে থাকিবে, ততদিন আমি তাহার ভরণপোষণের ব্যয়ের জন্য মাসিক কিছু টাকা দিব।"

নগেন্দ্র যদি নগদ টাকা ফেলিয়া দিতেন, তাহা হইলে অনেকে তাঁহার কথায় স্বীকৃত হইতে পারিত। পরে নগেন্দ্র চলিয়া গেলে কুন্দকে বিদায় করিয়া দিত, অথবা দাসীবৃত্তিতে নিযুক্ত করিত। কিন্তু নগেন্দ্র সেরূপ মূঢ়তার কার্য্য করিলেন না। সুতরাং নগদ টাকা না দেখিয়া কেহই তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিল না।

তখন নগেন্দ্রকে নিরুপায় দেখিয়া একজন বলিল, "শ্যামবাজারে ইহার এক মাসীর বাড়ী আছে। বিনোদ ঘোষ ইহার মেসো। আপনি কলিকাতায় যাইতেছেন,

যদি ইহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া সেইখানে রাখিয়া আসেন, তবেই এই কায়স্থকন্যার উপায় হয়, এবং আপনারও স্বজাতির কাজ করা হয়।"
অগত্যা নগেন্দ্র এই কথায় স্বীকৃত হইলেন। এবং কুন্দক এই কথা বলিবার জন্য তাহাকে ডাকিতে পাঠাইলেন। চাঁপা কুন্দকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল। আসিতে আসিতে দূর হইতে নগেন্দ্রকে দেখিয়া, কুন্দ অকস্মাৎ স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইল। তাহার পর আর পা সরিল না। সে বিস্ময়োৎফুল্ললোচন বিমূঢ়ার ন্যায় নগেন্দ্রের প্রতি চাহিয়া রহিল।
চাঁপা কহিল, "ও কি, দাঁড়ালি যে?"
কুন্দ অঙ্গুলিনির্দ্দেশের দ্বারা দেখাইয়া কহিল, "এই সেই।"
চাঁপা কহিল, "এই কে?" কুন্দ কহিল, "যাহাকে মা কাল রাত্রে আকাশের গায়ে দেখাইয়াছিলেন।"
তখন চাঁপাও বিস্মিতা ও শঙ্কিতা হইয়া দাঁড়াইল। বালিকারা অগ্রসর হইতে হইতে সঙ্কুচিতা হইল দেখিয়া, নগেন্দ্র তাহাদিগের নিকট আসিলেন এবং কুন্দকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিলেন। কুন্দ কোন উত্তর করিতে পারিল না; কেবল বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে নগেন্দ্রের প্রতি চাহিয়া রহিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : অনেক প্রকারের কথা

অগত্যা নগেন্দ্রনাথ কুন্দকে কলিকাতায় আত্মসমভিব্যাহারে লইয়া আসিলেন। প্রথমে তাহার মেসো বিনোদ ঘোষের অনেক সন্ধান করিলেন। শ্যামবাজারে বিনোদ ঘোষ নামে কাহাকেও পাওয়া গেল না। এক বিনোদ দাস পাওয়া গেল—সে সম্বন্ধ অস্বীকার করিল। সুতরাং কুন্দ নগেন্দ্রের গলায় পড়িল।
নগেন্দ্রের এক সহোদরা ভগিনী ছিলেন। তিনি নগেন্দ্রের অনুজা। তাঁহার নাম কমলমণি। তাঁহার শ্বশুরালয় কলিকাতায়। শ্রীশচন্দ্র মিত্র তাঁহার স্বামী। শ্রীশ বাবু প্লণ্ডর ফেয়ারলির বাড়ীর মুৎসুদ্দি। হৌস বড় ভারি—শ্রীশচন্দ্র বড় ধনবান্। নগেন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ সম্প্রীতি। কুন্দনন্দিনীকে নগেন্দ্র সেইখানে লইয়া গেলেন। কমলকে ডাকিয়া কুন্দের সবিশেষ পরিচয় দিলেন।
কমলের বয়স অষ্টাদশ বৎসর। মুখাবয়ব নগেন্দ্রের ন্যায়। ভ্রাতা ভগিনী উভয়েই পরম সুন্দর। কিন্তু কমলের সৌন্দর্য্যগৌরবের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যার খ্যাতিও ছিল। নগেন্দ্রের পিতা মিস্ টেম্পল নাম্নী একজন শিক্ষাদাত্রী নিযুক্ত করিয়া কমলমণিকে এবং সূর্য্যমুখীকে বিশেষ যত্নে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। কমলের শ্বশ্রূ বর্ত্তমান। কিন্তু তিনি শ্রীশচন্দ্রের পৈতৃক বাসস্থানেই থাকিতেন। কলিকাতায় কমলই গৃহিণী।
নগেন্দ্র কুন্দের পরিচয় দিয়া কহিলেন, "এখন তুমি ইহাকে না রাখিলে আর রাখিবার স্থান নাই। পরে আমি যখন বাড়ী যাইব—উহাকে গোবিন্দপুরে লইয়া যাইব।"
কমল বড় দুষ্ট। নগেন্দ্র এই কথা বলিয়া পশ্চাৎ ফিরিলেই কমল কুন্দকে কোলে তুলিয়া লইয়া দৌড়িলেন। একটা টবে কতকটা অনতিতপ্ত জল ছিল, অকস্মাৎ কুন্দকে তাহার ভিতরে ফেলিলেন। কুন্দ মহাভীতা হইল। কমল তখন হাসিতে হাসিতে স্নিগ্ধ সৌরভযুক্ত সোপ্ হস্তে লইয়া স্বয়ং তাহার গাত্র ধৌত করিতে আরম্ভ করিলেন। একজন পরিচারিকা, স্বয়ং কমলকে এরূপ কাজে ব্যাপৃতা দেখিয়া তাড়াতাড়ি "আমি দিতেছি, আমি দিতেছি" বলিয়া দৌড়িয়া আসিতেছিল—কমল সেই তপ্ত জল ছিটাইয়া পরিচারিকার গায়ে দিলেন, পরিচারিকা পলাইল।

কমল স্বহস্তে কুন্দকে মার্জ্জিত এবং স্নাত করাইলে—কুন্দ শিশিরধৌত পদ্মবৎ শোভা পাইতে লাগিল। তখন কমল তাহাকে শ্বেত চারু বস্ত্র পরাইয়া, গন্ধতৈল সহিত তাহার কেশরচনা করিয়া দিলেন, এবং কতকগুলি অলঙ্কার পরাইয়া দিয়া বলিলেন, "যা, এখন দাদাবাবুকে প্রণাম করিয়া আয়। আর দেখিস্—যেন এ বাড়ীর বাবুকে প্রণাম করে ফেলিস্ না—এ বাড়ীর বাবু দেখিলেই বিয়ে করে ফেলিবে।"

নগেন্দ্রনাথ, কুন্দের সকল কথা সূর্য্যমুখীকে লিখিলেন। হরদেব ঘোষাল নামে তাঁহার এক প্রিয় সুহৃৎ দূরদেশে বাস করিতেন—নগেন্দ্র তাঁহাকেও পত্র লেখার কালে কুন্দনন্দিনীর কথা বলিলেন, যথা—

"বল দেখি, কোন্ বয়সে স্ত্রীলোক সুন্দরী? তুমি বলিবে, চল্লিশ পরে, কেন না, তোমার ব্রাহ্মণীর আরও দুই এক বৎসর হইয়াছে। কুন্দ নামে যে কন্যার পরিচয় দিলাম—তাহার বয়স তের বৎসর। তাহাকে দেখিয়া বোধ হয় যে, এই সৌন্দর্য্যের সময়। প্রথম যৌবনসঞ্চারের অব্যবহিত পূর্ব্বেই যেরূপ মাধুর্য্য এবং সরলতা থাকে, পরে তত থাকে না। এই কুন্দের সরলতা চমৎকার; সে কিছুই বুঝে না। আজিও রাস্তার বালকদিগের সহিত খেলা করিতে ছুটে; আবার বারণ করিলেই ভীতা হইয়া প্রতিনিবৃত্তা হয়। কমল তাহাকে লেখাপড়া শিখাইতেছে। কমল বলে, লেখাপড়ায় তাহার দিব্য বুদ্ধি। কিন্তু অন্য কোন কথাই বুঝে না। বলিলে বৃহৎ নীল দুইটি চক্ষু—চক্ষু দুইটি শরতের পদ্মের মত সর্ব্বদাই স্বচ্ছ জলে ভাসিতেছে—সেই দুইটি চক্ষু আমার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া চাহিয়া থাকে; কিছু বলে না—আমি সে চক্ষু দেখিতে দেখিতে অন্যমনস্ক হই, আর বুঝাইতে পারি না। তুমি আমার মতিস্থৈর্য্যের এই পরিচয় শুনিয়া হাসিবে, বিশেষ তুমি বাতিকের গুণে গাছ কয় চুল পাকাইয়া ব্যঙ্গ করিবার পরওয়ানা হাসিল করিয়াছ; কিন্তু যদি তোমাকে সেই দুইটি চক্ষুর সম্মুখে দাঁড় করাইতে পারি, তবে তোমারও মতিস্থৈর্য্যের পরিচয় পাই। চক্ষু দুইটি যে কিরূপ, তাহা আমি এ পর্য্যন্ত স্থির করিতে পারিলাম না। তাহা দুইবার এক রকম দেখিলাম না; আমার বোধ হয়, যেন এ পৃথিবীর সে চোখ নয়; এ পৃথিবীর সামগ্রী যেন ভাল করিয়া দেখে না; অন্তরীক্ষে যেন কি দেখিয়া তাহাতে নিযুক্ত আছে। কুন্দ যে নির্দ্দোষ সুন্দরী, তাহা নহে। অনেকের সঙ্গে তুলনায় তাহার মুখাবয়ব অপেক্ষাকৃত অপ্রশংসনীয় বোধ হয়, অথচ আমার বোধ হয়, এমন সুন্দরী কখনও দেখি নাই। বোধ হয় যেন কুন্দনন্দিনীতে পৃথিবী ছাড়া কিছু আছে, রক্ত মাংসের যেন গঠন নয়; যেন চন্দ্রকর কি পুষ্পসৌরভকে শরীরী করিয়া তাহাকে গড়িয়াছে। তাহার সঙ্গে তুলনা করিবার সামগ্রী হঠাৎ মনে হয় না। অতুল্য পদার্থটি, তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ শান্তভাবব্যক্তি—যদি, স্বচ্ছ সরোবরে শরচ্চন্দ্রের কিরণসম্পাতে যে ভাবব্যক্তি, তাহা বিশেষ করিয়া দেখ, তবে ইহার সাদৃশ্য কতক অনুভূত করিতে পারিবে। তুলনার অন্য সামগ্রী পাইলাম না।"

নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, কিছুদিন পরে তাহার উত্তর আসিল। উত্তর এইরূপ—দাসী শ্রীচরণে কি অপরাধ করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কলিকাতায় যদি তোমার এত দিন থাকিতে হইবে, তবে আমি কেনই বা নিকটে গিয়া পদসেবা না করি? এ বিষয়ে আমার বিশেষ মিনতি; হুকুম পাইলেই ছুটিব।

"একটি বালিকা কুড়াইয়া পাইয়া কি আমাকে ভুলিলে? অনেক জিনিষের কাঁচারই আদর। নারিকেলের ডাবই শীতল। এ অধম স্ত্রীজাতিও বুঝি কেবল কাঁচামিটে? নহিলে বালিকাটি পাইয়া আমায় ভুলিবে কেন?"

"তামাসা যাউক, তুমি কি মেয়েটিকে একেবারে স্বত্ব ত্যাগ করিয়া বিলাইয়া দিয়াছ? নহিলে আমি সেটি তোমার কাছে ভিক্ষা করিয়া লইতাম। মেয়েটিতে আমার কাজ আছে। তুমি কোন সামগ্রী পাইলে তাহাতে আমার অধিকার হওয়াই উচিত, কিন্তু আজি কালি দেখিতেছি, তোমার ভগিনীরই পূরা অধিকার।"

"মেয়েটিতে কি কাজ? আমি তারাচরণের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিব। তারাচরণের জন্য একটি ভাল মেয়ে আমি কত খুঁজিতেছি তা ত জান। যদি একটি ভাল

মেয়ে বিধাতা মিলাইয়াছেন, তবে আমাকে নিরাশ করিও না। কমল যদি ছাড়িয়া দেয়, তবে কুন্দনন্দিনীকে আসিবার সময়ে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিও। আমি কমলকেও অনুরোধ করিয়া লিখিলাম। আমি গহনা গড়াইতে ও বিবাহের আর আর উদ্যোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কলিকাতায় বিলম্ব করিও না, কলিকাতায় না কি ছয় মাস থাকিলে মনুষ্য ভেড়া হয়। আর যদি কুন্দকে স্বয়ং বিবাহ করিবার অভিপ্রায় করিয়া থাক, তবে বল, আমি বরণডালা সাজাইতে বসি।”

তারাচরণ কে, তাহা পরে প্রকাশ করিব। কিন্তু সে যেই হউক, সূর্য্যমুখীর প্রস্তাবে নগেন্দ্র এবং কমলমণি উভয়ে সম্মত হইলেন। সুতরাং স্থির হইল যে, নগেন্দ্র যখন বাড়ী যাইবেন, তখন কুন্দকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন। সকলে আহ্লাদপূর্ব্বক সম্মত হইয়াছিলেন, কমলও কুন্দের জন্য কিছু গহনা গড়াইতে দিলেন।

কিন্তু মনুষ্য ত চিরান্ধ! কয়েক বৎসর পরে এমত এক দিন আসিল, যখন কমলমণি ও নগেন্দ্র ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া কপালে করাঘাত করিয়া ভাবিলেন যে, কি কুক্ষণে কুন্দনন্দিনীকে পাইয়াছিলাম! কি কুক্ষণে সূর্য্যমুখীর পত্রে সম্মত হইয়াছিলাম।

এখন কমলমণি, সূর্য্যমুখী, নগেন্দ্র, তিন জনে মিলিত হইয়া বিষবীজ রোপণ করিলেন। পরে তিন জনেই হাহাকার করিবেন।

এখন বজরা সাজাইয়া, নগেন্দ্র কুন্দকে লইয়া গোবিন্দপুরে যাত্রা করিলেন।

কুন্দ স্বপ্ন প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল। নগেন্দ্রের সঙ্গে যাত্রাকালে একবার তাহা স্মরণপথে আসিল। কিন্তু নগেন্দ্রের কারুণ্যপূর্ণ মুখকান্তি এবং লোকবৎসল চরিত্র মনে করিয়া কুন্দ কিছুতেই বিশ্বাস করিল না যে, ইহা হইতে তাহার অনিষ্ট হইবে। অথবা কেহ কেহ এমন পতঙ্গবৃত্ত যে, জ্বলন্ত বহ্নিরাশি দেখিয়াও তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : তারাচরণ

কবি কালিদাসের এক মালিনী ছিল, ফুল যোগাইত। কালিদাস দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ফুলের দাম দিতে পারিতেন না–তৎপরিবর্ত্তে স্বরচিত কাব্যগুলিন মালিনীকে পড়িয়া শুনাইতেন। একদিন মালিনীর পুকুরে একটি অপূর্ব্ব পদ্ম ফুটিয়াছিল, মালিনী তাহা আনিয়া কালিদাসকে উপহার দিল। কবি তাহার পুরস্কারস্বরূপ মেঘদূত পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেন। মেঘদূত কাব্য রসের সাগর, কিন্তু সকলেই জানেন যে, তাহার প্রথম কবিতা কয়টি কিছু নীরস। মালিনীর ভাল লাগিল না–সে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া চলিল। কবি জিজ্ঞাসা করিলেন, “মালিনী সখি! চলিলে যে!”

মালিনী বলিল, “তোমার কবিতায় রস কই?”

কবি। মালিনী! তুমি কখন স্বর্গে যাইতে পারিবে না।

মালিনী। কেন?

কবি। স্বর্গের সিঁড়ি আছে। লক্ষযোজন সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া স্বর্গে উঠিতে হয়। আমার এই মেঘদূতকাব্য–স্বর্গেরও সিঁড়ি আছে–এই নীরস কবিতাগুলিন সেই সিঁড়ি। তুমি এই সামান্য সিঁড়ি ভাঙ্গিতে পারিলে না–তবে লক্ষযোজন সিঁড়ি ভাঙ্গিবে কি প্রকারে?

মালিনী তখন ব্রহ্মশাপে স্বর্গ হারাইবার ভয়ে ভীতা হইয়া, আদ্যোপান্ত মেঘদূত শ্রবণ করিল। শ্রবণান্তে প্রীতা হইয়া, পরদিন মদনমোহিনী নামে বিচিত্রা মালা গাঁথিয়া আনিয়া কবিশিরে পরাইয়া গেল।

আমার এই সামান্য কাব্য স্বর্গও নয়—ইহার লক্ষযোজন সিঁড়িও নাই। রসও অল্প, সিঁড়িও ছোট। এই নীরস পরিচ্ছেদ কয়টি সেই সিঁড়ি। যদি পাঠকশ্রেণীমধ্যে কেহ মালিনীচরিত্র থাকেন, তবে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিই যে, তিনি এ সিঁড়ি না ভাঙ্গিলে সে রসমধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারিবেন না।

সূর্য্যমুখীর পিত্রালয় কোন্নগর। তাঁহার পিতা একজন ভদ্র কায়স্থ; কলিকাতায় কোন হৌসে কেশিয়ারি করিতেন। সূর্য্যমুখী তাঁহার একমাত্র সন্তান। শিশুকালে শ্রীমতী নামে এক বিধবা কায়স্থকন্যা দাসীভাবে তাঁহার গৃহে থাকিয়া সূর্য্যমুখীকে লালনপালন করিত। শ্রীমতীর একটি শিশুসন্তান ছিল, তাহারই নাম তারাচরণ। সে সূর্য্যমুখীর সমবয়স্ক। সূর্য্যমুখী তাহার সহিত বাল্যকালে খেলা করিতেন এবং বাল্যসখিত্ব প্রযুক্ত তাহার প্রতি তাঁহার ভ্রাতৃবৎ স্নেহ জন্মিয়াছিল।

শ্রীমতী বিশেষ রূপবতী ছিল, সুতরাং অচিরাৎ বিপদে পতিত হইল। গ্রামস্থ একজন দুশ্চরিত্র ধনী ব্যক্তির চক্ষে পড়িয়া সে সূর্য্যমুখীর পিতার গৃহ ত্যাগ করিয়া গেল। কোথায় গেল, তাহা কেহ বিশেষ জানিতে পারিল না। কিন্তু শ্রীমতী আর ফিরিয়া আসিল না।

শ্রীমতী, তারাচরণকে ফেলিয়া গিয়াছিল। তারাচরণ সূর্য্যমুখীর পিতৃগৃহে রহিল। সূর্য্যমুখীর পিতা অতি দয়ালুচিত্ত ছিলেন। তিনি ঐ অনাথ বালককে আত্মসন্তানবৎ প্রতিপালন করিলেন এবং তাহাকে দাসত্বাদি কোন হীনবৃত্তিতে প্রবর্ত্তিত না করিয়া, লেখাপড়া শিক্ষায় নিযুক্ত করিলেন। তারাচরণ এক অবৈতনিক মিশনারি স্কুলে ইংরেজী শিখিতে লাগিল।

পরে সূর্য্যমুখীর বিবাহ হইল। তাহার কয়েক বৎসর পরে তাঁহার পিতার পরলোক হইল। তখন তারাচরণ এক প্রকার মোটামুটি ইংরেজী শিখিয়াছিলেন, কিন্তু কোন কর্ম্মকার্য্যে সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সূর্য্যমুখীর পিতৃপরলোকের পর নিরাশ্রয় হইয়া, তিনি সূর্য্যমুখীর কাছে গেলেন। সূর্য্যমুখী, নগেন্দ্রকে প্রবৃত্তি দিয়া গ্রামে একটি স্কুল সংস্থাপিত করাইলেন। তারাচরণ তাহাতে মাষ্টার নিযুক্ত হইলেন। এক্ষণে গ্রাণ্ট ইন্ এডের প্রভাবে, গ্রামে গ্রামে তেড়িকাটা, টপ্পাবাজ নিরীহ ভালমানুষ মাষ্টার বাবুরা বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু তৎকালে সচরাচর “মাষ্টার বাবু” দেখা যাইত না। সুতরাং তারাচরণ একজন গ্রাম্য দেবতার মধ্যে হইয়া উঠিলেন। বিশেষতঃ তিনি citizen of the world এবং Spectator পড়িয়াছিলেন, এবং তিন বুক জিওমেট্রি তাঁহার পঠিত থাকার কথাও বাজারে রাষ্ট্র ছিল। এই সকল গুণে তিনি দেবীপুরনিবাসী জমীদার দেবেন্দ্র বাবুর ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইলেন, এবং বাবুর পারিষদমধ্যে গণ্য হইলেন। সমাজে তারাচরণ বিধবাবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা এবং পৌত্তলিকবিদ্বেষাদি সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়া, প্রতি সপ্তাহে পাঠ করিতেন, এবং “হে পরমকারুণিক পরমেশ্বর!” এই বলিয়া আরম্ভ করিয়া দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা করিতেন। তাহার কোনটা বা তত্ত্ববোধিনী হইতে নকল করিয়া লইতেন, কোনটা বা স্কুলের পণ্ডিতের দ্বারা লেখাইয়া লইতেন। মুখে সর্ব্বদা বলিতেন, “তোমরা ইট-পাটখেলের পূজা ছাড়, খুড়ী জ্যেঠাইয়ের বিবাহ দাও, মেয়েদের লেখাপড়া শিখাও, তাহাদের পিঁজরায় পুরিয়া রাখ কেন? মেয়েদের বাহির কর।” স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এতটা লিবরালিটির একটা বিশেষ কারণ ছিল, তাঁহার নিজের গৃহ স্ত্রীলোকশূন্য। এ পর্য্যন্ত তাঁহার বিবাহ হয় নাই; সূর্য্যমুখী তাঁহার বিবাহের জন্য অনেক যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মাতার কুলত্যাগের কথা গোবিন্দপুরে প্রচার হওয়ায় কোন ভদ্র কায়স্থ তাঁহাকে কন্যা দিতে সম্মত হয় নাই। অনেক ইতর কায়স্থের কালো কুৎসিত কন্যা পাওয়া গেল। কিন্তু সূর্য্যমুখী তারাচরণকে ভ্রাতৃবৎ ভাবিতেন, কি প্রকারে ইতর লোকের কন্যাকে ভাইজ বলিবেন, এই ভাবিয়া তাহাতে সম্মত হন নাই। কোন ভদ্র কায়স্থের সুরূপা কন্যার সন্ধানে ছিলেন, এমত কালে নগেন্দ্রের পত্রে কুন্দনন্দিনীর রূপগুণের কথা জানিয়া তাহারই সঙ্গে তারাচরণের বিবাহ দিবেন, স্থির করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : পদ্মপলাশলোচনে! তুমি কে?

কুন্দ, নগেন্দ্র দত্তের সঙ্গে গোবিন্দপুরে আসিল। কুন্দ, নগেন্দ্রের বাড়ী দেখিয়া অবাক্ হইল। এত বড় বাড়ী সে কখনও দেখে নাই। তাহার বাহিরে তিন মহল ভিতরে তিন মহল। এক একটি মহল, এক একটি বৃহৎ পুরী। প্রথমে, সে সদর মহল, তাহাতে এক লোহার ফটক দিয়া প্রবেশ করিতে হয়, তাহার চতুষ্পার্শ্বে বিচিত্র উচ্চ লোহার রেইল। ফটক দিয়া তৃণশূন্য, প্রশস্ত, রক্তবর্ণ, সুনির্ম্মিত পথে যাইতে হয়। পথের দুই পার্শ্বে, গোগণের মনোরঞ্জন, কোমল নবতৃণবিশিষ্ট দুই খণ্ড ভূমি। তাহাতে মধ্যে মধ্যে মণ্ডলাকারে রোপিত, সকুসুম পুষ্পবৃক্ষসকল বিচিত্র পুষ্পপল্লবে শোভা পাইতেছে। সম্মুখে বড় উচ্চ দেড়তলা বৈঠকখানা! অতি প্রশস্ত সোপানারোহণ করিয়া তাহাতে উঠিতে হয়। তাহার বারেণ্ডায় বড় বড় মোটা ফ্লটেড থাম; হর্ম্ম্যতল মর্ম্মরপ্রস্তরাবৃত। আলিশার উপরে, মধ্যস্থলে এক মৃন্ময় বিশাল সিংহ জটা লম্বিত করিয়া, লোল জিহবা বাহির করিয়াছে। এইটি নগেন্দ্রের বৈঠকখানা। তৃণপুষ্পময় ভূমিখণ্ডদ্বয়ের দুই পার্শ্বে, অর্থাৎ বামে ও দক্ষিণে দুই সারি একতলা কোঠা। এক সারিতে দপ্তরখানা ও কাছারি। আর এক সারিতে তোষাখানা এবং ভৃত্যবর্গের বাসস্থান। ফটকের দুই পার্শ্বে দ্বাররক্ষকদিগের থাকিবার ঘর। এই প্রথম মহলের নাম "কাছারি বাড়ী।" উহার পার্শ্বে "পূজার বাড়ী।" পূজার বাড়ীতে রীতিমত বড় পূজার দালান; আর তিন পার্শ্বে প্রথামত দোতালা চক বা চত্বর। মধ্যে বড় উঠান। এ মহলে কেহ বাস করে না। দুর্গোৎসবের সময়ে বড় ধুমধাম হয়, কিন্তু এখন উঠানে টালির পাশ দিয়া ঘাস গজাইতেছে। দালান, দরদালান, পায়রায় পূরিয়া পড়িয়াছে, কুঠারি সকল আসবাবে ভরা,—চাবি বন্ধ। তাহার পাশে ঠাকুরবাড়ী। সেখানে বিচিত্র দেবমন্দির, সুন্দর প্রস্তরবিশিষ্ট "নাটমন্দির", তিন পাশে দেবতাদিগের পাকশালা, পূজারীদিগের থাকিবার ঘর এবং অতিথিশালা। সে মহলে লোকের অভাব নাই। গলায় মালা চন্দনতিলকবিশিষ্ট পূজারীর দল, পাচকের দল; কেহ ফুলের সাজি লইয়া আসিতেছে, কেহ ঠাকুর স্নান করাইতেছে, কেহ ঘণ্টা নাড়িতেছে, কেহ বকাবকি করিতেছে, কেহ চন্দন ঘসিতেছে, কেহ পাক করিতেছে। দাসদাসীরা কেহ জলের ভার আনিতেছে, কেহ ঘর ধুইতেছে, কেহ চাল ধুইয়া আনিতেছে, কেহ ব্রাহ্মণদিগের সঙ্গে কলহ করিতেছে। অতিথিশালায় কোথাও ভস্মমাখা সন্ন্যাসী ঠাকুর জটা এলাইয়া, চিত হইয়া শুইয়া আছেন। কোথাও ঊর্দ্ধবাহু এক হাত উচ্চ করিয়া, দত্তবাড়ীর দাসীমহলে ঔষধ বিতরণ করিতেছেন। কোথাও শ্বেতশ্মশ্রুবিশিষ্ট গৈরিকবসনধারী ব্রহ্মচারী রুদ্রাক্ষমালা দোলাইয়া, নাগরী অক্ষরে হাতে লেখা ভগবদগীতা পাঠ করিতেছেন। কোথাও, কোন উদরপরায়ণ "সাধু" ঘি ময়দার পরিমাণ লইয়াও, গণ্ডগোল বাধাইতেছে। কোথাও বৈরাগীর দল শুষ্ক কণ্ঠে তুলসীর মালা আঁটিয়া, কপাল জুড়িয়া, তিলক করিয়া মৃদঙ্গ বাজাইতেছে, মাথায় আর্কফলা নাড়িতেছে, এবং নাসিকা দোলাইয়া "কথা কইতে যে পেলেম না—দাদা বলাই সঙ্গে ছিল—কথা কইতে যে" বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছে। কোথাও, বৈষ্ণবীরা বৈরাগিরঞ্জন রসকলি কাটিয়া, খঞ্জনীর তালে "মধ্যে কানের" কি "গোবিন্দ অধিকারীর" গীত গায়িতেছে। কোথাও কিশোরবয়স্কা নবীনা বৈষ্ণবী প্রাচীনার সঙ্গে গায়িতেছে, কোথাও অর্দ্ধবয়সী বুড়া বৈরাগীর সঙ্গে গলা মিলাইতেছে। নাটমন্দিরের মাঝখানে পাড়ার নিষ্কর্ম্মা ছেলেরা লড়াই, ঝগড়া, মারামারি করিতেছে এবং পরস্পর মাতাপিতার উদ্দেশে নানা প্রকার সুসভ্য গালাগালি করিতেছে। এই তিন মহল সদর। এই তিন মহলের পশ্চাতে তিন মহল অন্দর। কাছারি বাড়ীর পশ্চাতে যে অন্দর মহল, তাহা নগেন্দ্রের নিজ ব্যবহার্য্য। তন্মধ্যে কেবল তিনি, তাঁহার ভার্য্যা ও তাঁহাদের নিজ পরিচর্য্যায় নিযুক্ত দাসীরা থাকিত। এবং তাঁহাদের নিজ ব্যবহার্য্য দ্রব্যসামগ্রী থাকিত। এই মহল নূতন, নগেন্দ্রের নিজের প্রস্তুত; এবং তাহার নির্ম্মাণ অতি পরিপাটি। তাহার পাশে পূজার বাড়ীর পশ্চাতে সাবেক অন্দর। তাহা পুরাতন, কুনির্ম্মিত; ঘর সকল অনুচ্চ, ক্ষুদ্র এবং অপরিষ্কৃত। এই পুরী বহুসংখ্যক আত্মীয়কুটুম্ব-কন্যা, মাসী, মাসীত ভগিনী, পিসী, পিসীত ভগিনী, বিধবা মাসী, সধবা ভাগিনেয়ী, পিসীত ভাইয়ের স্ত্রী, মাসীত ভাইয়ের মেয়ে, ইত্যাদি নানাবিধ কুটুম্বিনীতে কাকসমাকুল বটবৃক্ষের ন্যায় রাত্রি দিবা কল কল করিত। এবং অনুক্ষণ নানা প্রকার চীৎকার, হাস্য পরিহাস, কলহ, কুতর্ক, গল্প, পরনিন্দা, বালকের হুড়াহুড়ি, বালিকার রোদন, "জল আন" "কাপড় দে" "ভাত রাঁধলে না" "ছেলে খায় নাই" "দুধ কই" ইত্যাদি শব্দে

সংক্ষুব্ধ সাগরবৎ শব্দিত হইত। তাহার পাশে ঠাকুরবাড়ীর পশ্চাতে রন্ধনশালা। সেখানে আরো জাঁক। কোথাও কোন পাচিকা ভাতের হাঁড়িতে জ্বাল দিয়া পা গোট করিয়া, প্রতিবাসীনীর সঙ্গে তাঁহার ছেলের বিবাহের ঘটার গল্প করিতেছেন। কোন পাচিকা বা কাঁচা কাঠে ফুঁ দিতে দিতে ধুঁয়ায় বিগলিতাশ্রুলোচনা হইয়া, বাড়ীর গোমস্তার নিন্দা করিতেছেন, এবং সে যে টাকা চুরি করিবার মানসেই ভিজা কাঠ কাটাইয়াছে, তদ্বিষয়ে বহুবিধ প্রমাণ প্রয়োগ করিতেছেন। কোন সুন্দরী তপ্ত তৈলে মাছ দিয়া চক্ষু মুদিয়া, দশনাবলী বিকট করিয়া, মুখভঙ্গি করিয়া আছেন, কেন না, তপ্ত তৈল ছিটকাইয়া তাহার গায়ে লাগিয়াছে, কেহ বা স্নানকালে বহুতৈলাক্ত, অসংযমিত কেশরাশি চূড়ার আকারে সীমন্তদেশে বাঁধিয়া ডালে কাটি দিতেছেন—যেন রাখাল, পাঁচনীহস্তে গোরু ঠেঙ্গাইতেছে। কোথাও বা বড় বঁটি পাতিয়া বামী, ক্ষেমী, গোপালের মা, নেপালের মা, লাউ, কুমড়া, বার্ত্তাকু, পটল, শাক কুটিতেছে; তাতে ঘস্ ঘস্ কচ্ কচ্ শব্দ হইতেছে, মুখে পাড়ার নিন্দা, মুনিবের নিন্দা, পরস্পরকে গালাগালি করিতেছে। এবং গোলাপী অল্প বয়সে বিধবা হইল, চাঁদির স্বামী বড় মাতাল, কৈলাসীর জামাইয়ের বড় চাকরি হইয়াছে—সে দারোগার মুহুরী; গোপালে উড়ের যাত্রার মত পৃথিবীতে এমন আর কিছুই নাই, পার্ব্বতীর ছেলের মত দুষ্ট ছেলে আর বিশ্ববাঙ্গালায় নাই, ইংরেজরা না কি রাবণের বংশ, ভগীরথ গঙ্গা এনেছেন, ভট্টাচায্যিদের মেয়ের উপপতি শ্যাম বিশ্বাস, এইরূপ নানা বিষয়ের সমালোচন হইতেছে। কোন কৃষ্ণবর্ণা স্থূলাঙ্গী, প্রাঙ্গণে এক মহাস্ত্ররূপী বঁটি, ছাইয়ের উপর সংস্থাপিত করিয়া মৎস্যজাতির সদ্যঃপ্রাণসংহার করিতেছেন, চিলেরা বিপুলাঙ্গীর শরীরগৌরব এবং হস্তলাঘব দেখিয়া ভয়ে আগু হইতেছে না, কিন্তু দুই একবার ছোঁ মারিতেও ছাড়িতেছে না! কোন পক্বকেশ জল আনিতেছে, কোন ভীমদশনা বাটনা বাটিতেছে। কোথাও বা ভাণ্ডারমধ্যে, দাসী, পাচিকা এবং ভাণ্ডারের রক্ষাকারিণী এই তিন জনে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত। ভাণ্ডারকর্ত্রী তর্ক করিতেছেন যে, যে ঘৃত দিয়াছি, তাহাই ন্যায্য খরচ—পাচিকা তর্ক করিতেছে যে, ন্যায্য খরচে কুলাইবে কি প্রকারে? দাসী তর্ক করিতেছে যে, যদি ভাণ্ডারের চাবি খোলা থাকে, তাহা হইলে আমরা কোনরূপে কুলাইয়া দিতে পারি। ভাতের উমেদারীতে অনেকগুলি ছেলে মেয়ে, কাঙ্গালী, কুক্কুর বসিয়া আছে। বিড়ালেরা উমেদারী করে না—তাহারা অবকাশমতে "দোষভাবে পরগৃহে প্রবেশ" করত বিনা অনুমতিতেই খাদ্য লইয়া যাইতেছে। কোথাও অনধিকারপ্রবিষ্টা কোন গাভী লাউয়ের খোলা, বেগুনের ও পটলের বোঁটা এবং কলার পাত অমৃতবোধে চক্ষু বুজিয়া চর্ব্বণ করিতেছে।

এই তিন মহল অন্দরমহলের পর, পুষ্পোদ্যান। পুষ্পোদ্যান পরে, নীলমেঘ- খণ্ডতুল্য প্রশস্ত দীর্ঘিকা। দীর্ঘিকা প্রাচীরবেষ্টিত। ভিতর বাটীর তিন মহল ও পুষ্পোদ্যানের মধ্যে খিড়কীর পথ। তাহার দুই মুখে দুই দ্বার। সেই দুই খিড়কী। ঐ পথ দিয়া অন্দরের তিন মহলেই প্রবেশ করা যায়।

বাড়ীর বাহিরে আস্তাবল, হাতিশালা, কুকুরের ঘর, গোশালা, চিড়িয়াখানা ইত্যাদি স্থান ছিল।

কুন্দনন্দিনী, বিস্মিত নেত্রে নগেন্দ্রের অপরিমিত ঐশ্বর্য্য দেখিতে দেখিতে শিবিকারোহণে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। সে সূর্য্যমুখীর নিকটে আনীত হইয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিল। সূর্য্যমুখী আশীর্ব্বাদ করিলেন।

নগেন্দ্রসঙ্গে, স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষরূপের সাদৃশ্য অনুভূত করিয়া, কুন্দনন্দিনীর মনে মনে এমত সন্দেহ জন্মিয়াছিল যে, তাঁহার পত্নী অবশ্য তৎপরদৃষ্টা স্ত্রীমূর্ত্তির সদৃশরূপা হইবেন; কিন্তু সূর্য্যমুখীকে দেখিয়া সে সন্দেহ দূর হইল। কুন্দ দেখিল যে, সূর্য্যমুখী আকাশপটে দৃষ্টা নারীর ন্যায় শ্যামাঙ্গী নহে। সূর্য্যমুখী পূর্ণচন্দ্রতুল্য তপ্তকাঞ্চনবর্ণা। তাঁহার চক্ষু সুন্দর বটে , কিন্তু কুন্দ যে প্রকৃতির চক্ষু স্বপ্নে দেখিয়াছিল, এ সে চক্ষু নহে। সূর্য্যমুখীর চক্ষু সুদীর্ঘ, অপলকস্পর্শী ভ্রূযুগসমাশ্রিত, কমনীয় বঙ্কিমপল্লবরেখার মধ্যস্থ, স্থূলকৃষ্ণতারাসনাথ, মণ্ডলাংশের আকারে ঈষৎ স্ফীত, উজ্জ্বল অথচ মন্দগতিবিশিষ্ট। স্বপ্নদৃষ্টা শ্যামাঙ্গীর চক্ষুর এরূপ অলৌকিক মনোহারিত্ব ছিল না। সূর্য্যমুখীর অবয়বও সেরূপ নহে। স্বপ্নদৃষ্টা খর্ব্বাকৃতি, সূর্য্যমুখীর আকার কিঞ্চিৎ দীর্ঘ, বাতান্দোলিত লতার ন্যায় সৌন্দর্য্যভরে দুলিতেছে।

স্বপ্নদৃষ্টা স্ত্রীমূর্ত্তি সুন্দরী, কিন্তু সূর্য্যমুখী তাহার অপেক্ষা শতগুণে সুন্দরী। আর স্বপ্নদৃষ্টার বয়স বিংশতির অধিক বোধ হয় নাই—সূর্য্যমুখীর বয়স প্রায় ষড়্বিংশতি। সূর্য্যমুখীর সঙ্গে সেই মূর্ত্তির কোন সাদৃশ্য নাই দেখিয়া, কুন্দ স্বচ্ছন্দচিত্ত হইল।

সূর্য্যমুখী কুন্দকে সাদরসম্ভাষণ করিয়া, তাঁহার পরিচর্য্যার্থ দাসীদিগকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন। এবং তন্মধ্যে যে প্রধানা, তাহাকে কহিলেন, যে, "এই কুন্দের সঙ্গে আমি তারাচরণের বিবাহ দিব। অতএব ইহাকে তুমি আমার ভাইজের মত যত্ন করিবে।"

দাসী স্বীকৃতা হইল। কুন্দকে সে সঙ্গে করিয়া কক্ষান্তরে লইয়া চলিল। কুন্দ এতক্ষণে তাহার প্রতি চাহিয়া দেখিল। দেখিয়া, কুন্দের শরীর কণ্টকিত এবং আপাদমস্তক স্বেদাক্ত হইল। যে স্ত্রীমূর্ত্তি কুন্দ স্বপ্নে মাতার অঙ্গুলিনির্দ্দেশক্রমে আকাশপটে দেখিয়াছিল, এই দাসীই সেই পদ্মপলাশলোচনা শ্যামাঙ্গী!

কুন্দ ভীতিবিহ্বলা হইয়া, মৃদুনিক্ষিপ্ত শ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে গা?"

দাসী কহিল, "আমার নাম হীরা।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ : পাঠক মহাশয়ের বড় রাগের কারণ

এইখানে পাঠক মহাশয় বড় বিরক্ত হইবেন। আখ্যায়িকাগ্রন্থের প্রথা আছে যে, বিবাহটা শেষে হয়; আমরা আগেই কুন্দনন্দিনীর বিবাহ দিতে বসিলাম। আরও চিরকালের প্রথা আছে যে, নায়িকার সঙ্গে যাহার পরিণয় হয়, সে পরম সুন্দর হইবে, সর্ব্বগুণে ভূষিত, বড় বীরপুরুষ হইবে, এবং নায়িকার প্রণয়ে ঢল ঢল করিবে। গরিব তারাচরণের ত এ সকল কিছুই নাই—সৌন্দর্য্যের মধ্যে তামাটে বর্ণ, আর খাঁদা নাক—বীর্য্য কেবল স্কুলের ছেলেমহলে প্রকাশ—আর প্রণয়ের বিষয়টা কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে তাঁহার কত দূর ছিল, বলিতে পারি না, কিন্তু একটা পোষা বানরীর সঙ্গে একটু একটু ছিল।

সে যাহা হউক, কুন্দনন্দিনীকে নগেন্দ্র বাটী লইয়া আসিলে তারাচরণের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইল। তারাচরণ সুন্দরী স্ত্রী ঘরে লইয়া গেলেন। কিন্তু সুন্দরী স্ত্রী লইয়া, তিনি এক বিপদে পড়িলেন। পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিবে যে, তারাচরণের স্ত্রীশিক্ষা ও জেনানা ভাঙ্গার প্রবন্ধসকল প্রায় দেবেন্দ্র বাবুর বৈঠকখানাতেই পড়া হইত। তৎসম্বন্ধে তর্কবিতর্ক কালে মাষ্টার সর্ব্বদাই দম্ভ করিয়া বলিতেন যে, "কখন যদি আমার সময় হয়, তবে এ বিষয়ে প্রথম রিফরম্ করার দৃষ্টান্ত দেখাইব। আমার বিবাহ হইলে আমার স্ত্রীকে সকলের সম্মুখে বাহির করিব।" এখন ত বিবাহ হইল—কুন্দনন্দিনীর সৌন্দর্য্যের খ্যাতি ইয়ার মহলে প্রচারিত হইল। সকলে প্রাচীন গীত কোট করিয়া বলিল, "কোথা রহিল সে পণ?" দেবেন্দ্র বলিলেন, "কই হে, তুমিও কি ওল্ড্ ফুল্দের দলে? স্ত্রীর সহিত আমাদের আলাপ করিয়া দাও না কেন?" তারাচরণ বড় লজ্জিত হইলেন। দেবেন্দ্র বাবুর অনুরোধ ও বাক্যযন্ত্রণা এড়াইতে পারিলেন না। দেবেন্দ্রের সঙ্গে কুন্দনন্দিনীর সাক্ষাৎ করাইতে সম্মত হইলেন। কিন্তু ভয় পাছে সূর্য্যমুখী শুনিয়া রাগ করে। এইমত টালমাটাল করিয়া বৎসরাবধি গেল। তাহার পর আর টালমাটালে চলে না দেখিয়া, বাড়ী মেরামতের ওজর করিয়া কুন্দকে নগেন্দ্রের গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। বাড়ী মেরামত হইল। আবার আনিতে হইল। তখন দেবেন্দ্র এক দিন স্বয়ং দলবলে তারাচরণের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। এবং তারাচরণকে মিথ্যা দাম্ভিকতার জন্য ব্যঙ্গ করিতে লাগিলেন। তখন অগত্যা তারাচরণ কুন্দনন্দিনীকে সাজাইয়া আনিয়া দেবেন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করিয়া দিলেন। কুন্দনন্দিনী দেবেন্দ্রের সঙ্গে কি আলাপ করিল? ক্ষণকাল ঘোম্টা দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া কাঁদিয়া পলাইয়া গেল। কিন্তু দেবেন্দ্র তাঁহার নবযৌবনসঞ্চারের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। সে শোভা আর ভুলিলেন না।

ইহার কিছু দিন পরে দেবেন্দ্রের বাটীতে কোন ক্রিয়া উপস্থিত। তাঁহার বাটী হইতে একটি বালিকা কুন্দকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিল। কিন্তু সূর্য্যমুখী তাহা শুনিতে পাইয়া নিমন্ত্রণে যাওয়া নিষেধ করিলেন। সুতরাং যাওয়া হইল না।

ইহার পর আর একবার দেবেন্দ্র, তারাচরণের গৃহে আসিয়া, কুন্দের সঙ্গে পুনরালাপ করিয়া গেলেন। লোকমুখে, সূর্য্যমুখী তাহাও শুনিলেন। শুনিয়া তারাচরণকে এমত ভর্ৎসনা করিলেন যে, সেই পর্য্যন্ত কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে দেবেন্দ্রের আলাপ বন্ধ হইল।

বিবাহের পর এইরূপে তিন বৎসর কাল কাটিল। তাহার পর—কুন্দনন্দিনী বিধবা হইলেন। জ্বরবিকারে তারাচরণের মৃত্যু হইল। সূর্য্যমুখী কুন্দকে আপন বাড়ীতে আনিয়া রাখিলেন। তারাচরণকে যে বাড়ী করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা বেচিয়া কুন্দকে কাগজ করিয়া দিলেন।

পাঠক মহাশয় বড় বিরক্ত হইলেন সত্য, কিন্তু এত দূরে আখ্যায়িকা আরম্ভ হইল। এত দূরে বিষবৃক্ষের বীজ বপন হইল।

নবম পরিচ্ছেদ : হরিদাসী বৈষ্ণবী

বিধবা কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রের গৃহে কিছু দিন কালাতিপাত করিল। একদিন মধ্যাহ্নের পর পৌরস্ত্রীরা সকলে মিলিত হইয়া পুরাতন অন্তঃপুরে বসিয়াছিল। ঈশ্বরকৃপায় তাহারা অনেকগুলি, সকলে স্ব স্ব মনোমত গ্রাম্যস্ত্রীসুলভ কার্য্যে ব্যাপৃতা ছিল। তাহাদের মধ্যে অনতীতবাল্যা কুমারী হইতে পলিতকেশা বর্ষীয়সী পর্য্যন্ত সকলেই ছিল। কেহ চুল বাঁধাইতেছিল, কেহ চুল বাঁধিয়া দিতেছিল, কেহ মাথা দেখাইতেছিল, কেহ মাথা দেখিতেছিল, এবং "উঁ উঁ" করিয়া উকুন মারিতেছিল, কেহ পাকা চুল তুলাইতেছিল, কেহ ধান্যহস্তে তাহা তুলিতেছিল। কোন সুন্দরী স্বীয় বালকের জন্য বিচিত্র কাঁথা শিয়াইতেছিলেন; কেহ বালককে স্তন্যপান করাইতেছিলেন। কোন সুন্দরী চুলের দড়ি বিনাইতেছিলেন, কেহ ছেলে ঠেঙ্গাইতেছিলেন, ছেলে মুখব্যাদান করিয়া তিনগ্রামে সপ্তসুরে রোদন করিতেছিল । কোন রূপসী কার্পেট বুনিতেছিলেন; কেহ থাবা পাতিয়া তাহা দেখিতেছিলেন। কোন চিত্রকুশলা কাহারও বিবাহের কথা মনে করিয়া পিঁড়িতে আলেপনা দিতেছিলেন, কোন সদ্গ্রন্থরসগ্রাহিণী বিদ্যাবতী দাশুরায়ের পাঁচালী পড়িতেছিলেন। কোন বর্ষীয়সী পুত্রের নিন্দা করিয়া শ্রোত্রীবর্গের কর্ণ পরিতৃপ্ত করিতেছিলেন, কোন রসিকা যুবতী অর্দ্ধস্ফুটস্বরে স্বামীর রসিকতার বিবরণ সখীদের কাণে কাণে বলিয়া বিরহিণীর মনোবেদনা বাড়াইতেছিলেন। কেহ গৃহিণীর নিন্দা, কেহ কর্ত্তার নিন্দা, কেহ প্রতিবাসীদিগের নিন্দা করিতেছিলেন; অনেকেই আত্মপ্রশংসা করিতেছিলেন। যিনি সূর্য্যমুখী কর্ত্তৃক প্রাতে নিজবুদ্ধিহীনতার জন্য মৃদুভর্ৎসিতা হইয়াছিলেন, তিনি আপনার বুদ্ধির অসাধারণ প্রাখর্য্যের অনেক উদাহরণ প্রয়োগ করিতেছিলেন; যাঁহার রন্ধনে প্রায় লবণ সমান হয় না, তিনি আপনার পাকনৈপুণ্যসম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিতেছিলেন। যাঁহার স্বামী গ্রামের মধ্যে গণ্ডমূর্খ, তিনি সেই স্বামীর অলৌকিক পাণ্ডিত্য কীর্ত্তন করিয়া সঙ্গিনীকে বিস্মিতা করিতেছিলেন। যাঁহার পুত্রকন্যাগুলি এক একটি কৃষ্ণবর্ণ মাংসপিণ্ড, তিনি রত্নগর্ভা বলিয়া আস্ফালন করিতেছিলেন। সূর্য্যমুখী এ সভায় ছিলেন না। তিনি কিছু গর্ব্বিতা, এ সকল সম্প্রদায়ে বড় বসিতেন না এবং তিনি থাকিলে অন্য সকলের আমোদের বিঘ্ন হইত। সকলেই তাঁহাকে ভয় করিত; তাঁহার নিকট মন খুলিয়া সকল কথা চলিত না। কিন্তু কুন্দনন্দিনী এক্ষণে এই সম্প্রদায়েই থাকিত; এখনও ছিল। সে একটি বালককে তাহার মাতার অনুরোধে ক, খ, শিখাইতেছিল। কুন্দ বলিয়া দিতেছিল, তাহার ছাত্র অন্য বালকের করস্থ সন্দেশের প্রতি হাঁ করিয়া চাহিয়াছিল; সুতরাং তাহার বিশেষ বিদ্যালাভ হইতেছিল। এমত সময়ে সেই নারীসভামণ্ডলে "জয় রাধে!" বলিয়া এক বৈষ্ণবী আসিয়া দাঁড়াইল।

নগেন্দ্রের ঠাকুরবাড়ীতে নিত্য অতিথিসেবা হইত, এবং তদ্ব্যতীত সেইখানেই প্রতি রবিবারে তণ্ডুলাদি বিতরণ হইত, ইহা ভিন্ন ভিক্ষার্থ বৈষ্ণবী কি কেহ অন্তঃপুরে আসিতে পাইত না। এই জন্য অন্তঃপুরমধ্যে "জয় রাধে" "শুনিয়া এক জন পুরবাসিনী বলিতেছিল, "কে রে মাগী বাড়ীর ভিতর? ঠাকুরবাড়ী যা!" কিন্তু এই কথা বলিতে বলিতে সে মুখ ফিরাইয়া বৈষ্ণবীকে দেখিয়া কথা আর সমাপ্ত করিল না। তৎপরিবর্ত্তে বলিল, "ও মা! এ আবার কোন্ বৈষ্ণবী গো!"

সকলেই বিস্মিত হইয়া দেখিল যে, বৈষ্ণবী যুবতী, তাহার শরীরে আর রূপ ধরে না। সেই বহুসুন্দরীশোভিত রমণীমণ্ডলেও, কুন্দনন্দিনী ব্যতীত তাহা হইতে সমধিক রূপবতী কেহই নহে। তাহার স্ফুরিত বিম্বাধর, সুগঠিত নাসা, বিস্ফারিত ফুল্লেন্দীবরতুল্য চক্ষু, চিত্ররেখাবৎ ভ্রূযুগ, নিটোল ললাট, বাহুযুগের মৃণালবৎ গঠন এবং চম্পকদামবৎ বর্ণ, রমণীকুলদুর্ল্লভ। কিন্তু সেখানে যদি কেহ সৌন্দর্য্যের সদ্বিচারক থাকিত, তবে সে বলিত যে, বৈষ্ণবীর গঠনে কিছু লালিত্যের অভাব। চলন ফেরন এ সকলও পৌরুষ।

বৈষ্ণবীর নাকে রসকলি, মাথায় টেড়ি কাটা, পরণে কালাপেড়ে সিমলার ধুতি, হাতে একটি খঞ্জনী। হাতে পিত্তলের বালা, এবং তাহার উপরে জলতরঙ্গ চুড়ি।

স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এক জন বয়োজ্যেষ্ঠা কহিল, "হ্যাঁ গা, তুমি কে গা?"

বৈষ্ণবী কহিল, "আমার নাম হরিদাসী বৈষ্ণবী। মা ঠাকুরাণীরা গান শুন্‌বে?"

তখন "শুন্‌বো গো শুন্‌বো!" এই ধ্বনি চারিদিকে আবালবৃদ্ধার কণ্ঠ হইতে বাহির হইতে লাগিল। তখন খঞ্জনী হাতে বৈষ্ণবী উঠিয়া গিয়া ঠাকুরাণীদিগের কাছে বসিল। সে যেখানে বসিল, সেইখানে কুন্দ ছেলে পড়াইতেছিল। কুন্দ অত্যন্ত গীতপ্রিয়, বৈষ্ণবী গান করিবে শুনিয়া, সে তাহার আর একটু সন্নিকটে আসিল। তাহার ছাত্র সেই অবকাশে উঠিয়া গিয়া সন্দেশভোজী বালকের হাত হইতে সন্দেশ কাড়িয়া লইয়া আপনি ভক্ষণ করিল।

বৈষ্ণবী জিজ্ঞাসা করিল, "কি গায়িব?" তখন শ্রোত্রীগণ নানাবিধ ফরমায়েস আরম্ভ করিলেন; কেহ চাহিলেন, "গোবিন্দ অধিকারী'–কেহ "গোপালে উড়ে।" যিনি দাশরথির পাঁচালী পড়িতেছিলেন, তিনি তাহাই কামনা করিলেন। দুই একজন প্রাচীনা কৃষ্ণবিষয় হুকুম করিলেন। তাহারই টীকা করিতে গিয়া মধ্যবয়সীরা "সখীসংবাদ" এবং "বিরহ" বলিয়া মতভেদ প্রচার করিলেন। কেহ চাহিলেন, ''গোষ্ঠ"–কোন লজ্জাহীনা যুবতী বলিল, "নিধুর টপ্পা গাইতে হয় ত গাও–নহিলে শুনিব না।" একটি অস্ফুটবাচা বালিকা বৈষ্ণবীকে শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে গাইয়া দিল, "তোলা দাস্‌নে দাস্‌নে দাস্‌নে দূতি।"

বৈষ্ণবী সকলের হুকুম শুনিয়া কুন্দের প্রতি বিদ্যুদ্দামতুল্য এক কটাক্ষ করিয়া কহিল, "হ্যাঁ গা–তুমি কিছু ফরমাস করিলে না?" কুন্দ তখন লজ্জাবনতমুখী হইয়া অল্প একটু হাসিল, কিছু উত্তর করিল না। কিন্তু তখনই একজন বয়স্যার কাণে কাণে কহিল, "কীর্ত্তন গাইতে বল না?"

বয়স্যা তখন কহিল, "ওগো কুন্দ কীর্ত্তন করিতে বলিতেছে গো!" তাহা শুনিয়া বৈষ্ণবী কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিল। সকলের কথা টালিয়া বৈষ্ণবী তাহার কথা রাখিল দেখিয়া কুন্দ বড় লজ্জিতা হইল।

হরিদাসী বৈষ্ণবী প্রথমে খঞ্জনীতে দুই একবার মৃদু মৃদু যেন ক্রীড়াচ্ছলে অঙ্গুলি প্রহার করিল। পরে আপন কণ্ঠমধ্যে অতি মৃদু মৃদু নববসন্তপ্রেরিতা এক ভ্রমরীর গুঞ্জনবৎ সুরের আলাপ করিতে লাগিল–যেন লজ্জাশীলা বালিকা স্বামীর নিকট প্রথম প্রেমব্যক্তি জন্য মুখ ফুটাইতেছে। পরে অকস্মাৎ সেই ক্ষুদ্রপ্রাণ খঞ্জনী হইতে বাদ্যবিদ্যাবিশারদের অঙ্গুলিজনিত শব্দের ন্যায় মেঘগম্ভীর শব্দ বাহির হইল, এবং তৎসঙ্গে শ্রোত্রীদিগের শরীর কণ্টকিত করিয়া, অপ্সরোনিন্দিত কণ্ঠগীতিধ্বনি সমুত্থিত হইল। তখন রমণীমণ্ডল বিস্মিত, বিমোহিতচিত্তে শুনিল যে, সেই বৈষ্ণবীর অতুলিত কণ্ঠ, অট্টালিকা পরিপূর্ণ করিয়া আকাশমার্গে উঠিল। মূঢ়া পৌরস্ত্রীগণ সেই গানের পারিপাট্য কি বুঝিবে? বোদ্ধা থাকিলে বুঝিত যে, এই সর্ব্বাঙ্গীণতাললয়স্বরপরিশুদ্ধ গান, কেবল সুকণ্ঠের কার্য্য নহে। বৈষ্ণবী যেই

হউক, সে সঙ্গীতবিদ্যায় অসাধারণ সুশিক্ষিত এবং অল্পবয়সে তাহার পারদর্শী।
বৈষ্ণবী গীত সমাপন করিলে, পৌরস্ত্রীগণ তাহাকে গায়িবার জন্য পুনশ্চ অনুরোধ করিল। তখন হরিদাসী সতৃষ্ণবিলোলনেত্রে কুন্দনন্দিনীর মুখপানে চাহিয়া পুনশ্চ কীর্ত্তন আরম্ভ করিল,

শ্রীমুখপঙ্কজ–দেখ্‌বো বলে হে,
তাই এসেছিলাম এ গোকুলে।
আমায় স্থান দিও রাই চরণতলে।
মানের দায়ে তুই মানিনী,
তাই সেজেছি বিদেশিনী,
এখন বাঁচাও রাধে কথা কোয়ে,
ঘরে যাই হে চরণ ছুঁয়ে।
দেখ্‌বো তোমায় নয়ন ভরে,
তাই বাজাই বাঁশী ঘরে ঘরে।
যখন রাধে বলে বাজে বাঁশী,
তখন নয়নজলে আপনি ভাসি।
তুমি যদি না চাও ফিরে,
তবে যাব সেই যমুনাতীরে,
ভাঙ্গ্‌বো বাঁশী তেজ্‌বো প্রাণ,
এই বেলা তোর ভাঙ্গুক মান।
ব্রজের সুখ রাই দিয়ে জলে,
বিকাইনু পদতলে,
এখন চরণনূপুর বেঁধে গলে,
পশিব যমুনা-জলে।’

গীত সমাপ্ত হইলে বৈষ্ণবী কুন্দনন্দিনীর মুখপ্রতি চাহিয়া বলিল,“গীত গাইয়া আমার মুখ শুকাইতেছে। আমায় একটু জল দাও।”
কুন্দ পাত্রে করিয়া জল আনিল। বৈষ্ণবী কহিল, “তোমাদিগের পাত্র আমি ছুঁইব না। আসিয়া আমার হাতে ঢালিয়া দাও, আমি জাতি বৈষ্ণবী নহি।”
ইহাতে বুঝাইল, বৈষ্ণবী পূর্ব্বে কোন অপবিত্রজাতীয়া ছিল, এক্ষণে বৈষ্ণবী হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া কুন্দ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ জল ফেলিবার যে স্থান, সেইখানে গেল। যেখানে অন্য স্ত্রীলোকেরা বসিয়া রহিল, সেখান হইতে ঐ স্থান এরূপ ব্যবধান যে, তথায় মৃদু মৃদু কথা কহিলে কেহ শুনিতে পায় না। সেই

স্থানে গিয়া কুন্দ বৈষ্ণবীর হাতে জল ঢালিয়া দিতে লাগিল, বৈষ্ণবী হাত মুখ ধুইতে লাগিল। ধুইতে ধুইতে অন্যের অশ্রুতস্বরে বৈষ্ণবী মৃদু মৃদু বলিতে লাগিল, "তুমি নাকি গা কুন্দ?"

কুন্দ বিস্মিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন গা?"

বৈ। তোমার শাশুড়ীকে কখন দেখিয়াছ?

কু। না।

কুন্দ শুনিয়াছিল যে, তাহার শাশুড়ী ভ্রষ্টা হইয়া দেশত্যাগিনী হইয়াছিল।

বৈ। তোমার শাশুড়ী এখানে আসিয়াছেন। তিনি আমার বাড়ীতে আছেন, তোমাকে একবার দেখ্‌বার জন্য বড়ই কাঁদিতেছেন—আহা! হাজার হোক্ শাশুড়ী। সে ত আর এখানে আসিয়া তোমাদের গিন্নীর কাছে সে পোড়ার মুখ দেখাতে পারবে না—তা তুমি একবার কেন আমার সঙ্গে গিয়ে তাকে দেখা দিয়ে এস না?

কুন্দ সরলা হইলেও, বুঝিল যে, সে শাশুড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধ স্বীকারই অকর্ত্তব্য। অতএব বৈষ্ণবীর কথায় কেবল ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিল।

কিন্তু বৈষ্ণবী ছাড়ে না—পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা করিতে লাগিল। তখন কুন্দ কহিল, "আমি গিন্নীকে না বলিয়া যাইতে পারিব না।"

হরিদাসী মানা করিল। বলিল, "গিন্নীকে বলিও না। যাইতে দিবে না। হয়ত তোমার শাশুড়ীকে আনিতে পাঠাইবে। তাহা হইলে তোমার শাশুড়ী দেশছাড়া হইয়া পালাইবে।"

বৈষ্ণবী যতই দার্ঢ্য প্রকাশ করুক, কুন্দ কিছুতেই সূর্য্যমুখীর অনুমতি ব্যতীত যাইতে সম্মত হইল না। তখন অগত্যা হরিদাসী বলিল, "আচ্ছা তবে তুমি গিন্নীকে ভাল করিয়া বলিয়া রেখ। আমি আর একদিন আসিয়া লইয়া যাইব; কিন্তু দেখো, ভাল করিয়া বলো; আর একটু কাঁদাকাটা করিও, নহিলে হইবে না।"

কুন্দ ইহাতে স্বীকৃত হইল না, কিন্তু বৈষ্ণবীকে হাঁ কি না, কিছু বলিল না। তখন হরিদাসী হস্তমুখপ্রক্ষালন সমাপ্ত করিয়া অন্য সকলের কাছে ফিরিয়া আসিয়া পুরস্কার চাহিল। এমত সময়ে সেইখানে সূর্য্যমুখী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বাজে কথা একেবারে বন্ধ হইল, অল্পবয়স্কারা সকলেই একটা একটা কাজ লইয়া বসিল।

সূর্য্যমুখী হরিদাসীকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "তুমি কে গা?" তখন নগেন্দ্রের এক মামী কহিলেন, "ও একজন বৈষ্ণবী, গান করিতে এসেছে। গান যে সুন্দর গায়! এমন গান কখন শুনিনে মা। তুমি একটি শুনিবে? গা ত গা হরিদাসি! একটি ঠাকুরণ বিষয় গা!"

হরিদাসী এক অপূর্ব্ব শ্যামাবিষয় গাইলে সূর্য্যমুখী তাহাতে মোহিতা ও প্রীতা হইয়া বৈষ্ণবীকে পুরস্কারপূর্ব্বক বিদায় করিলেন।

বৈষ্ণবী প্রণাম করিয়া এবং কুন্দের প্রতি আর একবার দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বিদায় লইল। সূর্য্যমুখী চক্ষের আড়ালে গেলেই সে খঞ্জনীতে মৃদু মৃদু খেমটা বাজাইয়া মৃদু মৃদু গাইতে গাইতে গেল,

"আয় রে চাঁদের কণা।
তোরে খেতে দিব ফুলের মধু, পরতে দিব সোণা।
আতর দিব শিশি ভোরে,
গোলাপ দিব কার্ব্বা করে,

আর আপনি সেজে বাটা ভোরে,
দিব পানের দোনা।”

বৈষ্ণবী গেলে স্ত্রীলোকেরা অনেকক্ষণ কেবল বৈষ্ণবীর প্রসঙ্গ লইয়াই রহিল। প্রথমে তাহার বড় সুখ্যাতি আরম্ভ হইল। পরে ক্রমে একটু খুঁত বাহির হইতে লাগিল। বিরাজ বলিল, “তা হৌক, কিন্তু নাকটা একটু চাপা।” তখন বামা বলিল, “রঙ্গটা বাপু বড় ফেঁকাশে।” তখন চন্দ্রমুখী বলিল, “চুলগুলো যেন শণের দড়ি।” তখন চাঁপা বলিল, “কপালটা একটু উঁচু।” কমলা বলিল, “ঠোঁট দুখানা পুরু।” হারাণী বলিল, “গড়নটা বড় কাট কাট।” প্রমদা বলিল, “মাগীর বুকের কাছটা যেন যাত্রার সখীদের মত; দেখে ঘৃণা করে।” এইরূপে সুন্দরী বৈষ্ণবী শীঘ্রই অদ্বিতীয় কুৎসিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। তখন ললিতা বলিল, “ তা দেখিতে যেমন হউক, মাগী গায় ভাল।” তাহাতেও নিস্তার নাই। চন্দ্রমুখী বলিল, “তাই বা কি, মাগীর গলা মোটা।” মুক্তকেশী বলিল, “ঠিক বলেছ—মাগী যেন ষাঁড় ডাকে।” অনঙ্গ বলিল, “মাগী গান জানে না, একটাও দাশুরায়ের গান গায়িতে পারিল না।” কনক বলিল, “মাগীর তালবোধ নাই।” ক্রমে প্রতিপন্ন হইল যে, হরিদাসী বৈষ্ণবী কেবল যে যার পর নাই কুৎসিতা, এমন নহে—তাহার গানও যার পর নাই মন্দ।

দশম পরিচ্ছেদ : বাবু

হরিদাসী বৈষ্ণবী দত্তদিগের গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেবীপুরের দিকে গেল। দেবীপুরে বিচিত্র লৌহরেইলপরিবেষ্টিত এক পুষ্পোদ্যান আছে। তন্মধ্যে নানাবিধ ফল পুষ্পের বৃক্ষ, মধ্যে পুষ্করিণী, তাহার উপরে বৈঠকখানা। হরিদাসী সেই পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিল। এবং বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া এক নিভৃত কক্ষে গিয়া বেশ পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হইল। অকস্মাৎ সেই নিবিড় কেশদামরচিতকবরী মস্তকচ্যুত হইয়া পড়িল, সে ত পরচুলা মাত্র। বক্ষঃ হইতে স্তনযুগল খসিল—তাহা বস্ত্রনির্ম্মিত। বৈষ্ণবী পিত্তলের বালা ও জলতরঙ্গ চুড়ি খুলিয়া ফেলিল—রসকলি ধুইল। তখন উপযুক্ত পরিচ্ছদ পরিধানানন্তর, বৈষ্ণবীর স্ত্রীবেশ ঘুচিয়া, এক অপূর্ব্ব সুন্দর যুবাপুরুষ দাঁড়াইল। যুবার বয়স পঞ্চবিংশ বৎসর, কিন্তু ভাগ্যক্রমে মুখমণ্ডলে রোমাবলীর চিহ্নমাত্র ছিল না। মুখ এবং গঠন কিশোরবয়স্কের ন্যায়। কান্তি পরম সুন্দর। এই যুবাপুরুষ দেবেন্দ্র বাবু। পূর্ব্বেই তাঁহার কিছু পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

দেবেন্দ্র এবং নগেন্দ্র উভয়েই এক বংশসম্ভূত; কিন্তু বংশের উভয় শাখার মধ্যে পুরুষানুক্রমে বিবাদ চলিতেছে। এমন কি দেবীপুরের বাবুদিগের সঙ্গে গোবিন্দপুরের বাবুদিগের মুখের আলাপ পর্য্যন্ত ছিল না। পুরুষানুক্রমে দুই শাখায় মোকদ্দমা চলিতেছে। শেষে এক বড় মোকদ্দমায় নগেন্দ্রের পিতামহ দেবেন্দ্রের পিতামহকে পরাজিত করায় দেবীপুরের বাবুরা একেবারে হীনবল হইয়া পড়িলেন। ডিক্রীজারিতে তাঁহাদের সর্ব্বস্ব গেল—গোবিন্দপুরের বাবুরা তাঁহাদের তালুক সকল কিনিয়া লইলেন। সেই অবধি দেবীপুর হ্রস্বতেজা, গোবিন্দপুর বর্দ্ধিতশ্রী হইতে লাগিল। উভয় বংশে আর কখনও মিল হইল না। দেবেন্দ্রের পিতা ক্ষুণ্নধনগৌরব পুনর্বর্দ্ধিত করিবার জন্য এক উপায় করিলেন। গণেশ বাবু নামে আর একজন জমিদার হরিপুর জেলার মধ্যে বাস করিতেন। তাঁহার একমাত্র অপত্য হৈমবতী। দেবেন্দ্রের সঙ্গে হৈমবতীর বিবাহ দিলেন। হৈমবতীর অনেক গুণ—সে কুরূপা, মুখরা, অপ্রিয়বাদিনী, আত্মপরায়ণা। যখন দেবেন্দ্রের সহিত তাহার বিবাহ হইল, তখন পর্য্যন্ত দেবেন্দ্রের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক। লেখাপড়ায় তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল, এবং প্রকৃতিও সুধীর ও সত্যনিষ্ঠ ছিল। কিন্তু সেই পরিণয় তাঁহার কাল হইল। যখন দেবেন্দ্র উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, তখন দেখিলেন যে, ভার্য্যার গুণে গৃহে তাঁহার কোনও সুখেরই আশা নাই। বয়োগুণে

তাঁহার রূপতৃষ্ণা জন্মিল, কিন্তু আত্মগৃহে তাহা ত নিবারণ হইল না। বয়োগুণে দম্পতিপ্রণয়াকাঙ্ক্ষা জন্মিল—কিন্তু অপ্রিয়বাদিনী হৈমবতীকে দেখিবামাত্র সে আকাঙ্ক্ষা দূর হইত। সুখ দূরে থাকুক—দেবেন্দ্র দেখিলেন যে, হৈমবতীর রসনাবর্ষিত বিষের জ্বালায় গৃহে তিষ্ঠানও ভার। এক দিন হৈমবতী দেবেন্দ্রকে এক কদর্য্য কটুবাক্য কহিল; দেবেন্দ্র অনেক সহিয়াছিলেন—আর সহিলেন না। হৈমবতীর কেশাকর্ষণ করিয়া তাহাকে পদাঘাত করিলেন। এবং সেই দিন হইতে গৃহত্যাগ করিয়া পুষ্পোদ্যানমধ্যে তাঁহার বাসোপযোগী গৃহ প্রস্তুতের অনুমতি দিয়া কলিকাতায় গেলেন। ইতিপূর্ব্বেই দেবেন্দ্রের পিতার পরলোকগমন হইয়াছিল। সুতরাং দেবেন্দ্র এক্ষণে স্বাধীন। কলিকাতায় পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া দেবেন্দ্র অতৃপ্তবিলাসতৃষ্ণা নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। তজ্জনিত যে কিছু স্বচিত্তের অপ্রসাদ জন্মিত, তাহা ভূরি ভূরি সুরাভিসিঞ্চনে ধৌত করিতে যত্ন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাহার আর আবশ্যকতা রহিল না—পাপেই চিত্তের প্রসাদ জন্মিতে লাগিল। কিছু কাল পরে বাবুগিরিতে বিলক্ষণ সুশিক্ষিত হইয়া দেবেন্দ্র দেশে ফিরিয়া আসিলেন, এবং তথায় নূতন উপবনগৃহে আপন আবাস সংস্থাপন করিয়া বাবুগিরিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কলিকাতা হইতে দেবেন্দ্র অনেক প্রকার ঢং শিখিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি দেবীপুরে প্রত্যাগমন করিয়া রিফর্মর্ বলিয়া আত্মপরিচয় দিলেন। প্রথমেই এক ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত করিলেন। তারাচরণ প্রভৃতি অনেক ব্রাহ্ম জুটিল; বক্তৃতার আর সীমা রহিল না। একটা ফিমেল স্কুলের জন্যও মধ্যে মধ্যে আড়ম্বর করিতে লাগিলেন, কিন্তু কাজে বড় বেশী করিতে পারিলেন না। বিধবাবিবাহে বড় উৎসাহ। এমন কি, দুই চারিটা কাওরা তিওরের বিধবা মেয়ের বিবাহ দিয়া ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু সে বরকন্যার গুণে। জেনানারূপ কারাগারের শিকল ভাঙ্গার বিষয় তারাচরণের সঙ্গে তাঁহারা এক মত—উভয়েই বলিতেন মেয়েদের বাহির কর। এ বিষয়ে দেবেন্দ্র বাবু বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন—কিন্তু সে বাহির করার অর্থবিশেষে।

দেবেন্দ্র গোবিন্দপুর হইতে প্রত্যাগমনের পর, বৈষ্ণবীবেশ ত্যাগ করিয়া নিজমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক পাশের কামরায় আসিয়া বসিলেন। একজন ভৃত্য শ্রমহারী তামাকু প্রস্তুত করিয়া আলবলা আনিয়া সম্মুখে দিল; দেবেন্দ্র কিছু কাল সেই সর্ব্বশ্রমসংহারিণী তামাকুদেবীর সেবা করিলেন। যে এই মহাদেবীর প্রসাদসুখভোগ না করিয়াছে, সে মনুষ্যই নহে। সে সর্ব্বলোকচিত্তরঞ্জিনি বিশ্ববিমোহিনি! তোমাতে যেন আমাদের ভক্তি অচলা থাকে। তোমার বাহন আলবলা, হুঁক্কা, গুড়গুড়ি প্রভৃতি দেবকন্যারা সর্ব্বদাই যেন আমাদের নয়নপথে বিরাজ করেন, দৃষ্টিমাত্রেই মোক্ষলাভ করিব। হে হুঁক্কে! হে আলবলে! হে কুণ্ডলাকৃতধূমরাশিসমুদগারিণি! হে ফণিনীনিন্দিতদীর্ঘনলসংসর্পিণি! হে রজতকিরীটমণ্ডিতশিরোদেশসুশোভিনি! কিবা তোমার কিরীটবিস্রস্ত ঝালর ঝলমলায়মান! কিবা শৃঙ্খলাঙ্গুরীয় সম্ভূষিতবঙ্কাগ্রভাগ মুখনলের শোভা! কিবা তোমার কিরীটবিস্রস্ত ঝালর ঝলমলায়মান! কিবা তোমার গর্ভস্থ শীতলাম্বুরাশির গভীর নিনাদ! হে বিশ্বরমে! তুমি বিশ্বজনশ্রমহারিণী, অলসজনপ্রতিপালিনী, ভার্য্যাভর্ৎসিতজনচিত্তবিকারবিনাশিনী, প্রভুভীতজনসাহসপ্রদায়িনী! মূঢ়ে তোমার মহিমা কি জানিবে? তুমি শোকপ্রাপ্ত জনকে প্রবোধ দাও, ভয়প্রাপ্ত জনকে ভরসা দাও, বুদ্ধিভ্রষ্ট জনকে বুদ্ধি দাও, কোপযুক্ত জনকে শান্তি প্রদান কর। হে বরদে! হে সর্ব্বসুখপ্রদায়িনি! তুমি যেন আমার ঘরে অক্ষয় হইয়া বিরাজ কর। তোমার সুগন্ধ দিনে দিনে বাড়ুক! তোমার গর্ভস্থ জলকল্লোল মেঘগর্জ্জনবৎ ধ্বনিত হইতে থাকুক! তোমার মুখনলের সহিত আমার অধরৌষ্ঠের যেন তিলেক বিচ্ছেদ না হয়।

ভোগাসক্ত দেবেন্দ্র যথেচ্ছা এই মহাদেবীর প্রসাদভোগ করিলেন—কিন্তু তাহাতে পরিতৃপ্তি জন্মিল না। পরে অন্যা মহাশক্তির অর্চ্চনার উদ্যোগ হইল। তখন ভৃত্যহস্তে, তৃণপটাবৃতা বোতলবাহিনীর আবির্ভাব হইল। তখন সেই অমল শ্বেত সুবিস্তৃত শয্যার উপরে, রজতানুকৃতাসনে সান্ধ্যগগনশোভিরক্তাম্বুদতুল্যবর্ণবিশিষ্টা দ্রবময়ী মহাদেবী, ডেকাণ্টর নামে আসুরিক ঘটে সংস্থাপিতা হইলেন। কট গ্লাসের কোষা পড়িল; প্লেটেড্ জগ্ তাম্রকুণ্ড হইল; এবং পাকশালা হইতে এক

কৃষ্ণকুর্চ্চ পুরোহিত হট্‌ওয়াটার-প্লেট নামক দিব্য পুষ্পপাত্রে রোষ্ট্‌ মটন্‌ এবং কট্‌লেট, নামক সুগন্ধ কুসুমরাশি রাখিয়া গেল। তখন দেবেন্দ্র দত্ত, যথাশাস্ত্র ভক্তিভাবে, দেবীর পূজা করিতে বসিলেন।

পরে তানপুরা, তবলা, সেতার প্রভৃতি সমেত গায়ক বাদক দল আসিল। তাহারা পূজার প্রয়োজনীয় সঙ্গীতোৎসব সম্পন্ন করিয়া গেল।

সর্ব্বশেষে দেবেন্দ্রের সমবয়স্ক, সুশীতলকান্তি এক যুবাপুরুষ আসিয়া বসিলেন। ইনি দেবেন্দ্রের মাতুলপুত্র সুরেন্দ্র; গুণে সর্ব্বাংশে দেবেন্দ্রের বিপরীত। ইঁহার স্বভাবগুণে দেবেন্দ্রও ইঁহাকে ভালবাসিতেন। দেবেন্দ্র, ইঁহার ভিন্ন, সংসারে আর কাহারও কথার বাধ্য নহেন। সুরেন্দ্র প্রত্যহ রাত্রে একবার দেবেন্দ্রের সংবাদ লইতে আসিতেন। কিন্তু মদ্যাদির ভয়ে অধিকক্ষণ বসিতেন না। সকলে উঠিয়া গেলে, সুরেন্দ্র দেবেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ তোমার শরীর কিরূপ আছে?"

দে। "শরীরং ব্যাধিমন্দিরং।"

সু। বিশেষ তোমার। আজি জ্বর জানিতে পারিয়াছিলে?

দে। না।

সু। আর যকৃতের সেই ব্যথাটা?

দে। পূর্ব্বমত আছে।

সু। তবে এখন এসব স্থগিত রাখিলে ভাল হয় না?

দে। কি—মদ খাওয়া? কত দিন বলিবে? ও আমার সাথের সাথী।

সু। সাথের সাথী কেন? সঙ্গে আসে নাই—সঙ্গেও যাইবে না। অনেকে ত্যাগ করিয়াছে—তুমিও ত্যাগ করিবে না কেন?

দে। আমি কি সুখের জন্য ত্যাগ করিব? যাহারা ত্যাগ করে, তাহাদের জন্য সুখ আছে—সেই ভরসায় ত্যাগ করে। আমার আর কোন সুখই নাই।

সু। তবু বাঁচিবার আশায়, প্রাণের আকাঙ্ক্ষায় ত্যাগ কর।

দে। যাহাদের বাঁচিয়া সুখ, তাহারা বাঁচিবার আশায় মদ ছাড়ুক। আমার বাঁচিয়া কি লাভ?

সুরেন্দ্রের চক্ষু বাষ্পাকুল হইল। তখন বন্ধুস্নেহে পরিপূর্ণ হইয়া কহিলেন, "তবে আমাদের অনুরোধে ত্যাগ কর।"

দেবেন্দ্রের চক্ষে জল আসিল। দেবেন্দ্র বলিল, "আমাকে যে সৎপথে যাইতে অনুরোধ করে, তুমি ভিন্ন এমন আর কেহ নাই। যদি কখন আমি ত্যাগ করি, সে তোমারই অনুরোধে করিব। আর—"

সু। আর কি?

দে। আর যদি কখন আমার স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ কর্ণে শুনি—তবে মদ ছাড়িব। নচেৎ এখন মরি বাঁচি সমান কথা।

সুরেন্দ্র সজলনয়নে, মনোমধ্যে হৈমবতীকে শত শত গালাগালি দিতে দিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ : সূর্য্যমুখীর প্রত্র

“প্রাণাধিকা শ্রীমতী কমলমণি দাসী চিরায়ুষ্মতীষু।
আর তোমাকে আশীর্ব্বাদ পাঠ লিখিতে লজ্জা করে। এখন তুমিও একজন হইয়া উঠিয়াছ—এক ঘরের গৃহিণী। তা যাহাই হউক, আমি তোমাকে আমার কনিষ্ঠা ভগিনী ভিন্ন আর কিছুই বলিয়া ভাবিতে পারিতেছি না। তোমাকে মানুষ করিয়াছি। প্রথম “ক খ” লিখাই, কিন্তু তোমার হাতের অক্ষর দেখিয়া, আমার এ হিজিবিজি তোমার কাছে পাঠাইতে লজ্জা করে। তা লজ্জা করিয়া কি করিব? আমাদিগের দিনকাল গিয়াছে। দিনকাল থাকিলে আমার এমন দশা হইবে কেন?
 কি দশা? এ কথা কাহাকে বলিবার নহে,—বলিতে দুঃখও হয়, লজ্জাও করে। কিন্তু অন্তঃকরণের ভিতর যে কষ্ট, তাহা কাহাকে না বলিলেও সহ্য হয় না। আর কাহাকে বলিব? তুমি আমার প্রাণের ভগিনী—তুমি ভিন্ন আর আমাকে কেহ ভালবাসে না। আর তোমার ভাইয়ের কথা তোমা ভিন্ন পরের কাছেও বলিতে পারি না।
আমি আপনার চিতা আপনি সাজাইয়াছি। কুন্দনন্দিনী যদি না খাইয়া মরিত, তাহাতে আমার কি ক্ষতি ছিল? পরমেশ্বর এত লোকের উপায় করিতেছেন, তাহার কি উপায় করিতেন না? আমি কেন আপনা খাইয়া তাহাকে ঘরে আনিলাম?
তুমি সে হতভাগিনীকে যখন দেখিয়াছিলে, তখন সে বালিকা । এখন তাহার বয়স ১৭/১৮ বৎসর হইয়াছে। সে যে সুন্দরী, তাহা স্বীকার করিতেছি। সেই সৌন্দর্য্যই আমার কাল হইয়াছে।
পৃথিবীতে যদি আমার কোন সুখ থাকে, তবে সে স্বামী; পৃথিবীতে যদি আমার কোন চিন্তা থাকে, তবে সে স্বামী; পৃথিবীতে যদি আমার কোন কিছু সম্পত্তি থাকে, তবে সে স্বামী; সেই স্বামী, কুন্দনন্দিনী আমার হৃদয় হইতে কাড়িয়া লইতেছে। পৃথিবীতে আমার যদি কোন অভিলাষ থাকে, তবে সে স্বামীর স্নেহ। সেই স্বামীর স্নেহে কুন্দনন্দিনী আমাকে বঞ্চিত করিতেছে।
তোমার সহোদরকে মন্দ বলিও না। আমি তাঁহার নিন্দা করিতেছি না। তিনি ধর্ম্মাত্মা, শত্রুতেও তাঁহার চরিত্রের কলঙ্ক এখনও করিতে পারে না। আমি প্রত্যহ দেখিতে পাই, তিনি প্রাণপণে আপনার চিত্তকে বশ করিতেছেন। যে দিকে কুন্দনন্দিনী থাকে, সাধ্যানুসারে কখন সেদিকে নয়ন ফিরান না। নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে তাহার নাম মুখে আনেন না। এমন কি, তাহার প্রতি কর্কশ ব্যবহারও করিয়া থাকেন। তাহাকে বিনা দোষে ভর্ৎসনা করিতেও শুনিয়াছি।
তবে কেন আমি এত হাবড়হাটি লিখিয়া মরি? পুরুষে এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে বুঝান বড় ভার হইত; কিন্তু তুমি মেয়ে মানুষ, এতক্ষণে বুঝিয়াছি। যদি কুন্দনন্দিনী অন্য স্ত্রীলোকের মত তাঁহার চক্ষে সামান্য হইত, তবে তিনি কেন তাহার প্রতি না চাহিবার জন্য ব্যস্ত হইবেন? তাহার নাম মুখে না আনিবার জন্য কেন এত যত্নশীল হইবেন? কুন্দনন্দিনীর জন্য তিনি আপনার নিকট আপনি অপরাধী হইয়াছেন। এ জন্য কখন কখন তাহার প্রতি অকারণ ভর্ৎসনা করেন। সে রাগ তাহার উপর নহে—আপনার উপর। সে ভর্ৎসনা তাহাকে নহে, আপনাকে। আমি ইহা বুঝিতে পারি। আমি এতকাল পর্য্যন্ত অনন্যব্রত হইয়া, অন্তরে বাহিরে কেবল তাঁহাকেই দেখিলাম—তাঁহার ছায়া দেখিলে তাহার মনের কথা বলিতে পারি—তিনি আমাকে কি লুকাইবেন? কখন কখন অন্যমনে তাঁহার চক্ষু এদিক্ ওদিক্ চাহে কাহার সন্ধানে, তাহা কি আমি বুঝিতে পারি না? দেখিলে আবার ব্যস্ত হইয়া চক্ষু ফিরাইয়া লয়েন কেন, তাহা কি বুঝিতে পারি না? কাহার কণ্ঠের শব্দ শুনিবার জন্য, আহারের সময়, গ্রাস হাতে করিয়াও কাণ তুলিয়া থাকেন, তাহা কি বুঝিতে পারি না? হাতের ভাত হাতে থাকে, কি মুখে দিতে কি মুখে দেন, তবু কাণ তুলিয়া থাকেন,—কেন? আবার কুন্দের স্বর কাণে গেলে তখনই বড় জোরে হাপুস হাপুস করিয়া ভাত খাইতে আরম্ভ করেন কেন, তা কি বুঝিতে পারি না? আমার প্রাণাধিক সর্ব্বদা প্রসন্নবদন—এখন এত অন্যমনাঃ কেন? কথা বলিলে কথা কাণে না তুলিয়া, অন্যমনে উত্তর দেন, ‘হুঁ’;—আমি যদি রাগ করিয়া বলি,

"আমি শীঘ্র মরি" তিনি না শুনিয়া বলেন, 'হুঁ'; এত অন্যমনাঃ কেন? জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, "মোকদ্দমার জ্বালায়।" আমি জানি, মোকদ্দমার কথা তাঁহার মনে স্থান পায় না। যখন মোকদ্দমার কথা বলেন, তখন হাসিয়া হাসিয়া কথা বলেন। আর এক কথা—এক দিন পাড়ার প্রাচীনার দল কুন্দের কথা কহিতেছিল, তাহার বাল্যবৈধব্য অনাথিনীত্ব এই সকল লইয়া তাহার জন্য দুঃখ করিতেছিল। তোমার সহোদর সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি অন্তরাল হইতে দেখিলাম, তাঁর চক্ষু জলে পূরিয়া গেল—তিনি সহসা দ্রুতবেগে সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।
এখন একজন নূতন দাসী রাখিয়াছি। তাহার নাম কুমুদ। বাবু তাহাকে কুমুদ বলিয়া ডাকেন। কখন কখন কুমুদ বলিয়া ডাকিতে কুন্দ বলিয়া ফেলেন। আর কত অপ্রতিভ হন! অপ্রতিভ কেন?
এ কথা বলিতে পারিব না যে, তিনি আমাকে অযত্ন বা অনাদর করেন। বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক যত্ন, অধিক আদর করেন। ইহার কারণ বুঝিতে পারি। তিনি আপনার মনে আমার নিকট অপরাধী। কিন্তু ইহাও বুঝিতে পারি যে, আমি তাঁহার মনে স্থান পাই না। যত্ন এক, ভালবাসা আর, ইহার মধ্যে প্রভেদ কি—আমরা স্ত্রীলোক সহজেই বুঝিতে পারি।
আর একটা হাসির কথা। ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে না কি বড় পণ্ডিত আছেন তিনি আবার একখানি বিধবাবিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে? এখন বৈঠকখানায় ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ আসিলে সেই গ্রন্থ লইয়া বড় তর্কবির্তক হয়। সে দিন ন্যায়-কচকচি ঠাকুর, মা সরস্বতীর সাক্ষাৎ বরপুত্র, বিধবাবিবাহের পক্ষে তর্ক করিয়া বাবুর নিকট হইতে টোল মেরামতের জন্য দশটি টাকা লইয়া যায়। তাহার পরদিন সার্ব্বভৌম ঠাকুর বিধবাবিবাহের প্রতিবাদ করেন। তাঁহার কন্যার বিবাহের জন্য আমি পাঁচ ভরি সোনার বালা গড়াইয়া দিয়াছি। আর কেহ বড় বিধবাবিবাহের দিকে নয়।
আপনার দুঃখের কথা লইয়া তোমাকে অনেকক্ষণ জ্বালাতন করিয়াছি। তুমি না জানি কত বিরক্ত হইবে? কিন্তু কি করি ভাই—তোমাকে মনের দুঃখ না বলিয়া কাহাকে বলিব? আমার কথা এখনও ফুরায় নাই—কিন্তু তোমার মুখ চেয়ে আজ ক্ষান্ত হইলাম। এ সকল কথা কাহাকেও বলিও না। আমার মাথার দিব্য, জামাই বাবুকেও এ পত্র দেখাইও না।
তুমি কি আমাদিগকে দেখিতে আসিবে না? এই সময় একবার আসিও, তোমাকে পাইলে অনেক ক্লেশ নিবারণ হইবে।
তোমার ছেলের সংবাদ ও জামাই বাবুর সংবাদ শীঘ্র লিখিবে। ইতি।

সূর্য্যমুখী।

পুনশ্চ। আর এক কথা—পাপ বিদায় করিতে পারিলেই বাঁচি। কোথায় বিদায় করি?
তুমি নিতে পার? না ভয় করে?'
কমল প্রত্যুত্তরে লিখিলেন,—
"তুমি পাগল হইয়াছ। নচেৎ তুমি স্বামীর হৃদয়প্রতি অবিশ্বাসিনী হইবে কেন? স্বামীর প্রতি বিশ্বাস হারাইও না। আর যদি নিতান্তই সে বিশ্বাস না রাখিতে পার—তবে দীঘির জলে ডুবিয়া মর। আমি কমলমণি তর্কসিদ্ধান্ত ব্যবস্থা দিতেছি, তুমি দড়ি কলসী লইয়া জলে ডুবিয়া মরিতে পার। স্বামীর প্রতি যাহার বিশ্বাস রহিল না—তাহার মরাই মঙ্গল।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : অঙ্কুর

দিন কয় মধ্যে, ক্রমে ক্রমে নগেন্দ্রের সকল চরিত্র পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। নির্ম্মল আকাশে মেঘ দেখা দিল—নিদাঘকালের প্রদোষাকাশের মত, অকস্মাৎ সে চরিত্র মেঘাবৃত হইতে লাগিল। দেখিয়া সূর্য্যমুখী গোপনে আপনার অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন।

সূর্য্যমুখী ভাবিলেন, "আমি কমলের কথা শুনিব। স্বামীর চিত্তপ্রতি কেন অবিশ্বাসিনী হইব? তাঁহার চিত্ত অচলপর্ব্বত—আমিই ভ্রান্ত বোধ হয়। তাঁহার কোন ব্যামোহ হইয়া থাকিবে।" সূর্য্যমুখী বালির বাঁধ বাঁধিল।

বাড়ীতে একটি ছোট রকম ডাক্তার ছিল। সূর্য্যমুখী গৃহিণী। অন্তরালে থাকিয়া সকলের সঙ্গেই কথা কহিতেন। বারেণ্ডার পাশে এক চিক থাকিত; চিকের পশ্চাতে সূর্য্যমুখী থাকিতেন। বারেণ্ডায় সম্বোধিত ব্যক্তি থাকিত; মধ্যে এক দাসী থাকিত; তাহার মুখে সূর্য্যমুখী কথা কহিতেন। এইরূপে, সূর্য্যমুখী ডাক্তারের সঙ্গে কথা কহিতেন। সূর্য্যমুখী তাহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবুর অসুখ হইয়াছে ঔষুধ দাও না কেন?"

ডাক্তার। কি অসুখ, তাহা ত আমি জানি না। আমি ত অসুখের কোন কথা শুনি নাই।

সু। বাবু কিছু বলেন নাই?

ডা। না—কি অসুখ?

সু। কি অসুখ, তাহা তুমি ডাক্তার, তুমি জান না—আমি জানি?

ডাক্তার সুতরাং অপ্রতিভ হইল। "আমি গিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি," এই বলিয়া ডাক্তার প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেছিল, সূর্য্যমুখী তাহাকে ফিরাইলেন, বলিলেন, "বাবুকে কিছু জিজ্ঞাসা করিও না—ঔষধ দাও।"

ডাক্তার ভাবিল, মন্দ চিকিৎসা নহে। "যে আজ্ঞা, ঔষুধের ভাবনা কি," বলিয়া পলায়ন করিল। পরে ডিস্পেন্সরিতে গিয়া একটু সোডা, একটু পোর্ট ওয়াইন, একটু সিরপফেরিমিউরেটিস, একটু মাথা মুণ্ড মিশাইয়া, শিশি পুরিয়া, টিকিট মারিয়া প্রত্যহ দুই বার সেবনের ব্যবস্থা লিখিয়া দিল। সূর্য্যমুখী ঔষধ খাওয়াইতে গেলেন; নগেন্দ্র শিশি হাতে লইয়া পড়িয়া দেখিয়া একটা বিড়ালকে ছুঁড়িয়া মারিলেন—বিড়াল পলাইয়া গেল—ঔষধ তাহার ল্যাজ দিয়া গড়াইয়া পড়িতে পড়িতে গেল।

সূর্য্যমুখী বলিলেন, "ঔষধ না খাও—তোমার কি অসুখ, আমাকে বল।"

নগেন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কি অসুখ?"

সূর্য্যমুখী বলিলেন, "তোমার শরীর দেখ দেখি, কি হইয়াছে?" এই বলিয়া সূর্য্যমুখী একখানি দর্পণ আনিয়া নিকটে ধরিলেন। নগেন্দ্র তাঁহার হাত হইতে দর্পণ লইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত করিলেন। দর্পণ চূর্ণ হইয়া গেল।

সূর্য্যমুখীর চক্ষু দিয়া জল পড়িল। দেখিয়া নগেন্দ্র চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া উঠিয়া গেলেন। বহির্ব্বাটী গিয়া একজন ভৃত্যকে বিনাপরাধে প্রহার করিলেন। সে প্রহার সূর্য্যমুখীর অঙ্গে বাজিল।

ইতিপূর্ব্বে নগেন্দ্র অত্যন্ত শীতলস্বভাব ছিলেন। এখন কথায় কথায় রাগ।

শুধু রাগ নয়। একদিন, রাত্রে আহারের সময় অতীত হইয়া গেল, তথাপি নগেন্দ্র অন্তঃপুরে আসিলেন না। সূর্য্যমুখী প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছেন। অনেক রাত্রি হইল। অনেক রাত্রে নগেন্দ্র আসিলেন; সূর্য্যমুখী দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। নগেন্দ্রের মুখ আরক্ত, চক্ষু আরক্ত, নগেন্দ্র মদ্যপান করিয়াছেন। নগেন্দ্র কখন মদ্যপান করিতেন না। দেখিয়া সূর্য্যমুখী বিস্মিতা হইলেন।

সেই অবধি প্রত্যহ এইরূপ হইতে লাগিল। একদিন সূর্য্যমুখী, নগেন্দ্রের দুইটি চরণে হাত দিয়া, গলদশ্রু কোনরূপে রুদ্ধ করিয়া, অনেক অনুনয় করিলেন; বলিলেন, "কেবল আমার অনুরোধে ইহা ত্যাগ কর।" নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দোষ?"

জিজ্ঞাসার ভাবেই উত্তর নিবারণ হইল। তথাপি সূর্য্যমুখী উত্তর করিলেন, "দোষ কি, তাহা ত আমি জানি না। তুমি যাহা জান না, তাহা আমিও জানি না। কেবল আমার অনুরোধ।"

নগেন্দ্র প্রত্যুত্তর করিলেন, "সূর্য্যমুখী, আমি মাতাল, মাতালকে শ্রদ্ধা হয়, আমাকে শ্রদ্ধা করিও। নচেৎ আবশ্যক করে না।"

সূর্য্যমুখী ঘরের বাইরে গেলেন। ভৃত্যের প্রহার পর্য্যন্ত নগেন্দ্রের সম্মুখে আর চক্ষের জল ফেলিবেন না, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন।

দেওয়ানজী বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, "মা ঠাকুরাণীকে বলিও—বিষয় গেল, আর থাকে না।"

''কেন?"

"বাবু কিছু দেখেন না। সদর মফস্বলের আমলারা যাহা ইচ্ছা ত্যাগ করিতেছে। কর্ত্তার অমনোযোগে আমাকে কেহ মানে না।" শুনিয়া সূর্য্যমুখী বলিলেন, "যাহার বিষয়, তিনি রাখেন, থাকিবে। না হয়, গেল গেলই।"

ইতিপূর্ব্বে নগেন্দ্র সকলই স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিতেন।

একদিন তিন চারি হাজার প্রজা নগেন্দ্রের কাছারির দরওয়াজায় জোড়হাত করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। " দোহাই হুজুর—নাএব গোমস্তার দৌরাত্ম্যে আর বাঁচি না। সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইল। আপনি না রাখিলে কে রাখে?"

নগেন্দ্র হুকুম দিলেন, "সব হাঁকায় দাও।"

ইতিপূর্ব্বে তাঁহার একজন গোমস্তা একজন প্রজাকে মারিয়া একটি টাকা লইয়াছিল। নগেন্দ্র গোমস্তার বেতন হইতে দশটি টাকা লইয়া প্রজাকে দিয়াছিলেন।

হরদেব ঘোষাল নগেন্দ্রকে লিখিলেন, "তোমার কি হইয়াছে? তুমি কি করিতেছ? আমি কিছু ভাবিয়া পাই নাই। তোমার ত পত্র পাইই না। যদি পাই, ত সে ছত্র দুই, তাহার মানে মাথা মুণ্ড, কিছুই না। তাতে কোন কথাই থাকে না। তুমি কি আমার উপর রাগ করিয়াছ? তা বল না কেন? মোকদ্দমা হারিয়াছ? তাই বা বল না কেন? আর কিছু বল না বল, শারীরিক ভাল আছ কি না বল।"

নগেন্দ্র উত্তর লিখিলেন, "আমার উপর রাগ করিও না—আমি অধঃপাতে যাইতেছি।"

হরদেব বড় বিজ্ঞ। পত্র পড়িয়া মনে করিলেন, "কি এ? অর্থচিন্তা? বন্ধুবিচ্ছেদ? দেবেন্দ্র দত্ত। না, এ প্রেম?"

কমলমণি সূর্য্যমুখীর আর একখানি পত্র পাইলেন, তাহার শেষ এই "একবার এসো! কমলমণি! ভগিনি! তুমি বই আর আমার সুহৃদ কেহ নাই। একবার এসো!"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : মহাসমর

কমলমণির আসন টলিল। আর তিনি থাকিতে পারিলেন না। কমলমণি রমণীরত্ন। অমনি স্বামীর কাছে গেলেন।

শ্রীশচন্দ্র অন্তঃপুরে বসিয়া, আপিসের আয়ব্যয়ের হিসাব কিতাব দেখিতেছিলেন। তাঁহার পাশে, বিছানায় বসিয়া, এক বৎসরের পুত্র সতীশচন্দ্র ইংরেজি সংবাদপত্রখানি অধিকার করিয়া ছিলেন। সতীশচন্দ্র সংবাদপত্রখানি প্রথমে ভোজনের চেষ্টা দেখিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া এক্ষণে পাতিয়া বসিয়াছিল।

কমলমণি স্বামীর নিকটে গিয়া গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া, ভূমিষ্ঠা হইয়া প্রণাম করিলেন। এবং করজোড় করিয়া কহিলেন, "সেলাম পৌঁছে মহারাজ।" (ইতিপূর্ব্বে বাড়ীতে গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা হইয়া গিয়াছিল।)

শ্রীশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, " আবার শশা চুরি নাকি?"

ক। শশা কাঁকুড় নয়। এবার বড় ভারি জিনিস চুরি গিয়াছে।

শ্রী। কোথায় কি চুরি হলো?

ক। গোবিন্দপুরে চুরি হয়েছে। দাদাবাবুর একটি সোনার কৌটায় এক কড়া কাণা কড়ি ছিল, তাই কে নিয়া গিয়াছে।

শ্রীশ বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, "তোমার দাদাবাবুর সোনার কৌটা ত সূর্য্যমুখী—কাণা কড়িটি কি?"

ক। সূর্য্যমুখীর বুদ্ধিখানি।

শ্রীশচন্দ্র বলিলেন, তাই "লোকে বলে যে, যে খেলে, সে কাণা কড়িতে খেলে। সূর্য্যমুখী ঐ কাণা কড়িতেই তোমার ভাইকে কিনে রেখেছে—আর তোমার এতটা বুদ্ধি থাকিতেও ভাই—" কমলমণি শ্রীশচন্দ্রের মুখ টিপিয়া ধরিলেন। ছাড়িয়া দিলে শ্রীশ বলিলেন, "তা কাণা কড়িটি চুরি করলে কে?"

ক। তা ত জানি না—কিন্তু তার পত্র পড়িয়া বুঝিলাম যে, সে কাণা কড়িটি খোওয়া গিয়াছে—নহিলে মাগী এমন পত্র লিখিবে কেন?

শ্রী। পত্রখানি দেখিতে পাই?

কমলমণি শ্রীশচন্দ্রের হাতে সূর্য্যমুখীর পত্র দিয়া কহিলেন, "এই পড়। সূর্য্যমুখী তোমাকে এ সকল কথা বলিতে মানা করিয়াছে—কিন্তু যতক্ষণ তোমাকে সব না বলিতেছি, ততক্ষণ আমার প্রাণ খাবি খেতেছে। তোমাকে পত্র না পড়াইলে আহার নিদ্রা হইবে না—ঘুরণী রোগই বা উপস্থিত হয়।"

শ্রীশচন্দ্র পত্র হস্তে লইয়া চিন্তা করিয়া বলিলেন, "যখন তোমাকে নিষেধ করিয়াছে, তখন আমি এ পত্র দেখিব না। কথাটা কি, তা শুনিতেও চাহিব না। এখন করিতে হইবে কি, তাই বল।"

ক। করতে হবে এই—সূর্য্যমুখীর বুদ্ধিটুকু গিয়াছে, তার একটু বুদ্ধি চাই। বুদ্ধি দেয় এমন লোক আর কে আছে—বুদ্ধি যা কিছু আছে, তা সতীশ বাবুর। তাই সতীশ বাবুকে একবার গোবিন্দপুর যেতে তার মামী লিখে পাঠিয়েছে।

সতীশ বাবু ততক্ষণ একটা ফুলদানী ফুলসমেত উল্টাইয়া ফেলিয়াছিলেন, এবং তৎপরে দোয়াতের উপর নজর করিতেছিলেন। দেখিয়া শ্রীশচন্দ্র কহিলেন, "উপযুক্ত বুদ্ধিদাতা বটে। তা যাহা হোক, এতক্ষণে বুঝিলাম—ভাজের বাড়ী মশায়ের নিমন্ত্রণ। সতীশকে যেতে হলেই সুতরাং কমলমণিও যাবে। তা সূর্য্যমুখীর

কাণা কড়িটি না হারালে আর এমন কথা লিখিবে কেন?”
ক। শুধু কি তাই? সতীশের নিমন্ত্রণ; আমার নিমন্ত্রণ আর তোমার নিমন্ত্রণ।
শ্রী। আমার নিমন্ত্রণ কেন?
ক। আমি বুঝি একা যাব? আমাদের সঙ্গে গাড়ু গামছা নিয়ে যায় কে?
শ্রী। সূর্য্যমুখীর বড় অন্যায়। শুধু গাড়ু গামছা বহিবার জন্য যদি ঠাকুরজামাইকে দরকার হয়, তবে আমি দুদিনের জন্য একটা ঠাকুরজামাই দেখিয়ে দিতে পারি।
কমলমণির বড় রাগ হইল। সে ভ্রূকুটি করিল, শ্রীশকে ভেঙ্গাইল, এবং শ্রীশচন্দ্র যে কাগজখানায় লিখিতেছিল, তাই ছিঁড়িয়া ফেলিল। শ্রীশ হাসিয়া বলিল, “তা লাগতে এসো কেন?”
কমলমণি কৃত্রিম কোপসহকারে কহিল, “আমার খুসি, লাগবো।”
শ্রীশচন্দ্রও কৃত্রিম কোপসহকারে কহিলেন, “আমার খুসি, লাগবো।”
তখন কোপযুক্তা কমলমণি শ্রীশকে একটি কিল দেখাইল। কুন্দদন্তে অধর টিপিয়া ছোট হাতে একটি ছোট কিল দেখাইল।
কিল দেখিয়া, শ্রীশচন্দ্র কমলমণির খোঁপা খুলিয়া দিলেন। এখন বর্দ্ধিতরোষা কমলমণি, শ্রীশচন্দ্রের দোয়াতের কালি পিকদানিতে ঢালিয়া ফেলিয়া দিল।
রাগে শ্রীশচন্দ্র দ্রুতগতিতে ধাবমান হইয়া কমলমণির মুখচুম্বন করিলেন। রাগে কমলমণিও অধীরা হইয়া শ্রীশচন্দ্রের মুখচুম্বন করিল। দেখিয়া সতীশচন্দ্রের বড় প্রীতি জন্মিল। তিনি জানিতেন যে, মুখচুম্বন তাঁহার ইজারা মহল। অতএব তাহার ছড়াছড়ি দেখিয়া রাজভাগ আদায়ের অভিলাষে মার জানু ধরিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন; এবং উভয়েরই মুখপানে চাহিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসির লহর তুলিলেন। সে হাসি কমলমণির কর্ণে কি মধুর বাজিল! কমলমণি তখন সতীশকে ক্রোড়ে উঠাইয়া লইয়া ভূরি ভূরি মুখচুম্বন করিল। পরে শ্রীশচন্দ্র কমলের ক্রোড় হইতে তাহাকে লইলেন এবং ভূরি ভূরি মুখচুম্বন করিলেন। সতীশ বাবু এইরূপে রাজভাগ আদায় করিয়া যথাকালে অবতরণ করিলেন, এবং পিতার সুবর্ণময় পেন্‌সিল্‌টি দেখিতে পাইয়া অপহরণমানসে ধাবমান হইলেন। পরে হস্তগত করিয়া উপাদেয় ভোজ্য বিবেচনায় পেন্‌সিল্‌টি মুখে দিয়া লেহন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে ভগদত্ত এবং অর্জ্জুনে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ভগদত্ত অর্জ্জুন প্রতি অনিবার্য্য বৈষ্ণবাস্ত্র নিক্ষেপ করেন; অর্জ্জুনকে তন্নিবারণে অক্ষম জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বক্ষঃ পাতিয়া সেই অস্ত্র গ্রহণ করিয়া তাহার শমতা করেন। সেইরূপ, কমলমণি ও শ্রীশচন্দ্রের এই বিষম যুদ্ধে, সতীশচন্দ্র মহাস্ত্র সকল আপন বদনমণ্ডলে গ্রহণ করায় যুদ্ধের সমতা হইল। কিন্তু ইহাদের এইরূপ সন্ধিবিগ্রহ বাদলের বৃষ্টির মত—দণ্ডে দণ্ডে হইত, দণ্ডে দণ্ডে যাইত।
শ্রীশচন্দ্র তখন কহিলেন, “তা সত্য সত্যই কি তোমার গোবিন্দপুরে যেতে হবে? আমি একা থাকিব কি প্রকারে?”
ক। তোমায় যেন আমি একা থাকিতে সাধতেছি। আমিও যাব, তুমিও যাবে। তা যাও, সকাল সকাল আপিস সারিয়া আইস, আর দেরি কর ত, সতীশে আমাতে দু-দিকে দুই জনে কাঁদতে বসবো।
শ্রী। আমি যাই কি প্রকারে? আমাদের এই তিসি কিনিবার সময়। তুমি তবে একা যাও।
ক। আয়, সতীশ! আয় আমরা দু-জনে দুই দিকে কাঁদতে বসি।
মার আদরের ডাক সতীশের কাণে গেল—সতীশ অমনি পেন্‌সিল্‌ভোজন ত্যাগ করিয়া লহর তুলিয়া আহ্লাদের হাসি হাসিল, সুতরাং কমলের এবার কাঁদা হলো

না। তৎপরিবর্ত্তে সতীশের মুখচুম্বন করিলেন,–দেখাদেখি শ্রীশও তাহাই করিলেন। সতীশ আপনার বাহাদুরি দেখাইয়া আর এক লহর তুলিয়া হাসিল। এই সকল বৃহৎ ব্যাপার সমাধা হইলে কমল আবার কহিলেন, "এখন কি হুকুম হয়?"

শ্রী। তুমি যাও, মানা করি না, কিন্তু তিসির মরসুমটায় আমি কি প্রকারে যাই?

শুনিয়া কমলমণি মুখ ফিরাইয়া মানে বসিলেন। আর কথা কহেন না।

শ্রীশচন্দ্রের কলমে একটু কালি ছিল। শ্রীশ সেই কলম লইয়া পশ্চাৎ হইতে গিয়া কমলের কপালে একটি টিপ কাটিয়া দিলেন।

তখন কমল হাসিয়া বলিলেন, "প্রাণাধিক, আমি তোমায় কত ভালবাসি।" এই বলিয়া, কমল শ্রীশচন্দ্রের স্কন্ধ বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া, তাঁহার মুখচুম্বন করিলেন, সুতরাং টিপের কালি, সমুদায়টাই শ্রীশের গালে লাগিয়া রহিল।

এইরূপে এবারকার যুদ্ধে জয় হইলে পর, কমল বলিলেন, "যদি তুমি একান্তই যাইবে না, তবে আমার যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দাও।"

শ্রী। ফিরিবে কবে?

ক। জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? তুমি যদি গেলে না, তবে আমি কয় দিন থাকিতে পারিব?

শ্রীশচন্দ্র কমলমণিকে গোবিন্দপুরে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু আমরা নিশ্চিত সংবাদ রাখি যে, সেবার শ্রীশচন্দ্রের সাহেবেরা তিসির কাজে বড় লাভ করিতে পারেন নাই। হৌসের কর্ম্মচারীরা আমাদিগের নিকট গোপনে বলিয়াছে যে, সে শ্রীশবাবুরই দোষ। তিনি ঐ সময়টা কাজকর্ম্মে বড় মন দেন নাই। কেবল ঘরে বসিয়া কড়ি গুণিতেন! এ কথা শ্রীশচন্দ্র একদিন শুনিয়া বলিলেন, "হবেই তো! আমি তখন লক্ষ্মীছাড়া হইয়াছিলাম।" শ্রোতারা শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল, "ছি! বড় স্ত্রৈণ!" কথাটা শ্রীশের কাণে গেল। তিনি শুনিয়া হৃষ্টমনে ভৃত্যদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে, ভাল করিয়া আহারের উদ্যোগ কর। বাবুরা আজ এখানে আহার করিবেন।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ : ধরা পড়িল

গোবিন্দপুরে দত্তদিগের বাড়ীতে যেন অন্ধকারে একটা ফুল ফুটিল। কমলমণির হাসিমুখ দেখিয়া সূর্য্যমুখীরও চক্ষের জল শুকাইল। কমলমণি বাড়ীতে পা দিয়াই সূর্য্যমুখীর চুলের গোছা লইয়া বসিয়া গেলেন। অনেক দিন সূর্য্যমুখী কেশরচনা করেন নাই। কমলমণি বলিলেন, "দুটো ফুল গুঁজিয়া দিব?" সূর্য্যমুখী তাঁহার গাল টিপিয়া ধরিলেন। "না! না!" বলিয়া কমলমণি লুকাইয়া দুইটা ফুল দিয়া দিলেন। লোক আসিলে বলিলেন, "দেখেছ, মাগী বুড়া বয়সে মাথায় ফুল পরে।"

আলোকময়ীর আলো নগেন্দ্রের মুখমণ্ডলের মেঘেও ঢাকা পড়িল না। নগেন্দ্রকে দেখিয়াই কমলমণি ঢিপ করিয়া প্রণাম করিল। নগেন্দ্র বলিলেন, "কমল কোথা থেকে?" কমল মুখ নত করিয়া, নিরীহ ভাল মানুষের মত বলিলেন, "আজ্ঞে, খোকা ধরিয়া আনিল।" নগেন্দ্র বলিলেন, "বটে! মার পাজিকে!" এই বলিয়া খোকাকে কোলে লইয়া দণ্ডস্বরূপ তাহার মুখচুম্বন করিলেন। খোকা কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহার গায়ে লাল দিল, আর গোঁপ ধরিয়া টানিল।

কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে কমলমণির ঐরূপ আলাপ হইল–"ওলো কুঁদী,–কুঁদী মুদী দুঁদী,–ভাল আছিস ত কুঁদী?"

কুঁদী অবাক্ হইয়া রহিল। কিছুকাল ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, "আছি।"

“আছি দিদি—আমায় দিদি বলবি—না বলিস্ ত ঘুমিয়া থাকিবি আর তোর চুলে আগুন ধরিয়ে দিব। আর নহিলে গায়ে আরসুলো ছাড়িয়া দিব।”

কুন্দ দিদি বলিতে আরম্ভ করিল। যখন কলিকাতায় কুন্দ কমলের কাছে থাকিত, তখন কমলকে কিছু বলিত না। বড় কথাও কহিত না। কিন্তু কমলের যে প্রকৃতি চিরপ্রেমময়ী, তাহাতে সে তখন হইতেই তাঁহাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মধ্যে কয় বৎসর অদর্শনে কতক কতক ভুলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে কমলের স্বভাবগুণে, কুন্দের স্বভাবগুণে, সেই ভালবাসা নূতন হইয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

প্রণয় গাঢ় হইল। এদিকে কমলমণি স্বামীর গৃহে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন; সূর্য্যমুখী বলিলেন, “না, ভাই! আর দু-দিন থাক! তুমি গেলে আমি আর বাঁচিব না। তোমার কাছে সকল কথা বলাও সোয়াস্তি।”

কমল বলিলেন, “তোমার কাজ না করিয়া যাইব না।” সূর্য্যমুখী বলিলেন, “আমার কাজ কি করিবে?” কমলমণি মুখে বলিলেন, “তোমার শ্রাদ্ধ,” মনে বলিলেন, “তোমার কণ্টকোদ্ধার।”

কুন্দনন্দিনী কমলের যাওয়ার কথা শুনিয়া আপনার ঘরে গিয়া লুকাইয়া কাঁদিল, কমলমণি লুকাইয়া লুকাইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেল। কুন্দনন্দিনী বালিশে মাথা দিয়া কাঁদিতেছে, কমলমণি তাহার চুল বাঁধিতে বসিল। চুল বাঁধা কমলের একটা রোগ।

চুল বাঁধা সমাপ্ত হইলে, কুন্দের মাথা তুলিয়া, কমল তাহার মস্তক আপনার কোলে রাখিলেন। অঞ্চল দিয়া তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিলেন। এই সব কাজ শেষ করিয়া, শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কুঁদী, কাঁদিতেছিলি কেন?”

কুন্দ বলিল, “তুমি যাবে কেন?”

কমলমণি একটু হাসিলেন। কিন্তু ফোঁটা দুই চক্ষের জল সে হাসি মানিল না—না বলিয়া কহিয়া তাহারা কমলমণির গণ্ড বহিয়া হাসির উপর আসিয়া পড়িল। রৌদ্রের উপর বৃষ্টি হইল।

কমলমণি বলিলেন, “তাতে কাঁদিস কেন?”

কুন্দ। তুমিই আমায় ভালবাস।

কম। কেন—আর কেহ কি ভালবাসে না?

কুন্দ চুপ করিয়া রহিল।

কম। কে ভালবাসে না? গিন্নী ভালবাসে না—না? আমায় লুকুস্ নে।

কুন্দ নীরব।

কমল দাদাবাবু ভালবাসে না?

কুন্দ নীরব।

কমল বলিলেন, “যদি আমি তোমায় ভালবাসি—আর তুমি আমায় ভালবাস, তবে কেন আমার সঙ্গে চল না?”

কুন্দ তথাপি কিছু বলিল না। কমল বলিলেন, “যাবে?” কুন্দ ঘাড় নাড়িল। “যাব না।” কমলের প্রফুল্ল মুখ গম্ভীর হইল।

তখন কমলমণি সস্নেহে কুন্দনন্দিনীর মস্তক বক্ষে তুলিয়া লইয়া ধারণ করিলেন, এবং সস্নেহে তাহার গণ্ডদেশ গ্রহণ করিয়া কহিলেন, “কুন্দ, সত্য বলিবি?”

কুন্দ বলিল, “কি?”

কমল বলিলেন, “যা জিজ্ঞাসা করিব? আমি তোর দিদি—আমার কাছে লুকুস্ নে—আমি কাহারও কাছে বলিব না।” কমল মনে মনে রাখিলেন, “যদি বলি ত রাজমন্ত্রী শ্রীশবাবুকে। আর খোকার কাণে কাণে।”

কুন্দ বলিলেন, “কি বল?”

ক। তুই দাদাবাবুকে বড় ভালবাসিস্।—না?

কুন্দ উত্তর দিল না। কমলমণির হৃদয়মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

কমল বলিলেন, “বুঝেছি—মরিয়াছ। মর তাতে ক্ষতি নাই—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনেকে মরে যে?”

কুন্দনন্দিনী মস্তক উত্তোলন করিয়া কমলের মুখপ্রতি স্থিরদৃষ্টি করিয়া রহিল। কমলমণি প্রশ্ন বুঝিলেন। বলিলেন, “পোড়ারমুখী চোখের মাথা খেয়েছ? দেখিতে পাও না যে”—মুখের কথা মুখে রহিল—তখন ঘুরিয়া কুন্দের উন্নত মস্তক আবার কমলমণির বক্ষের উপর পড়িল। কুন্দনন্দিনীর অশ্রুজলে কমলমণির হৃদয় প্লাবিত হইল। কুন্দনন্দিনী অনেকক্ষণ নীরবে কাঁদিল—বালিকার ন্যায় বিবশা হইয়া কাঁদিল। সে কাঁদিল, আবার পরের চক্ষের জলে তাহার চুল ভিজিয়া গেল। ভালবাসা কাহাকে বলে, সোণার কমল তাহা জানিত। অন্তঃকরণের অন্তঃকরণ মধ্যে কুন্দনন্দিনীর দঃখে দুঃখী, সুখে সুখী হইল। কুন্দনন্দিনীর চক্ষু মুছাইয়া কহিল, “কুন্দ!”

কুন্দ আবার মাথা তুলিয়া চাহিল।

কম। আমার সঙ্গে চল।

কুন্দের চক্ষে আবার জল পড়িতে লাগিল। কমল বলিল, “নহিলে নয়।—সোণার সংসার ছারখার গেল।”

কুন্দ কাঁদিতে লাগিল। কমল বলিলেন, “যাবি? মনে করিয়া দেখ?—”

কুন্দ অনেকক্ষণ পরে চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, “যাব।”

অনেকক্ষণ পরে কেন? তাহা কমল বুঝিল। বুঝিল যে, কুন্দনন্দিনী পরের মঙ্গলমন্দিরে আপনার প্রাণের প্রাণ বলি দিল। নগেন্দ্রের মঙ্গলার্থ, সূর্য্যমুখীর মঙ্গলার্থ, নগেন্দ্রকে ভুলিতে স্বীকৃত হইল। সেই জন্য অনেকক্ষণ লাগিল। আপনার মঙ্গল? কমল বুঝিয়াছিলেন যে, কুন্দনন্দিনী আপনার মঙ্গল বুঝিতে পারে না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ : হীরা

এমত সময়ে হরিদাসী বৈষ্ণবী আসিয়া গান করিল।

“কাঁটা বনে তুল্‌তে গেলাম কলঙ্কের ফুল,
গো সখি কাল কলঙ্কেরি ফুল।
মাথায় পর্‌লেম মালা গেঁথে, কাণে পরলেম দুল।

সখি কলঙ্কেরি ফুল।”

এ দিন সূর্য্যমুখী উপস্থিত। তিনি কমলকে গান শুনিতে ডাকিতে পাঠাইলেন। কমল কুন্দকে সঙ্গে করিয়া গান শুনিতে আসিলেন। বৈষ্ণবী গায়িতে লাগিল।

“মরি মরব্ কাঁটা ফুটে,
ফুলের মধু খাব লুটে,
খুঁজে বেড়াই কোথায় ফুটে,
নবীন মুকুল।”

কমলমণি ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিলেন, “বৈষ্ণবী দিদি–তোমার মুখে ছাই পড়ুক–আর তুমি মর। আর কি গান জান না?”

হরিদাসী বলিল, “কেন?” কমলের আরও রাগ বাড়িল; বলিলেন, “কেন? একটা বাবলার ডাল আন ত রে–কাঁটাফোটা কত সুখ মাগীকে দেখিয়ে দিই।”

সূর্য্যমুখী মৃদুভাবে হরিদাসীকে বলিলেন, “ও সব গান আমাদের ভাল লাগে না।–গৃহস্থবাড়ী ভাল গান গাও।”

হরিদাসী বলিল, “আচ্ছা।” বলিয়া গায়িতে আরম্ভ করিল,

“স্মৃতিশাস্ত্র পড়ব আমি ভট্টাচার্য্যের পায়ে ধোরে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম শিখে নিব, কোন্ বেটী বা নিন্দে করে —”

কমল ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, “গিন্নী মশাই–তোমার প্রবৃত্তি হয়, তোমার বৈষ্ণবীর গান তুমিই শোন, আমি চলিলাম।” এই বলিয়া কমল চলিয়া গেলেন–সূর্য্যমুখীও মুখ অপ্রসন্ন করিয়া উঠিয়া গেলেন। আর আর স্ত্রীলোকেরা আপন আপন প্রবৃত্তি মতে কেহ উঠিয়া গেল, কেহ রহিল; কুন্দনন্দিনী রহিল। তাহার কারণ, কুন্দনন্দিনী গানের মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারে নাই–বড় শুনেও নাই–অন্যমনে ছিল, এই জন্য যেখানকার সেইখানে রহিল। হরিদাসী তখন আর গান করিল না। এদিক্ সেদিক্, বাজে কথা আরম্ভ করিল। গান আর হইল না দেখিয়া আর সকলে উঠিয়া গেল। কুন্দ কেবল উঠিল না–চরণে তাহার গতিশক্তি ছিল কি না সন্দেহ। তখন কুন্দকে বিরলে পাইয়া হরিদাসী তাহাকে অনেক কথা বলিল। কুন্দ কতক বা শুনিল, কতক বা শুনিল না।

সূর্য্যমুখী ইহা সকলই দূর হইতে দেখিতেছিলেন। যখন উভয়ে গাঢ় মনঃসংযোগের সহিত কথাবার্ত্তা হওয়ার চিহ্ন দেখিলেন, তখন সূর্য্যমুখী কমলকে ডাকিয়া দেখাইলেন। কমল বলিল, “ কি তা? কথা কহিতেছে কহুক না। মেয়ে বই ত আর পুরুষ না।”

সূর্য্য। মেয়ে কি পুরুষ তার ঠিক কি?

কমল বিস্মিত হইয়া বলিলেন, “সে কি?”

সূর্য্য। আমার বোধ হয় কোন ছদ্মবেশী পুরুষ। তাহা এখনই জানিব–কিন্তু কুন্দ কি পাপিষ্ঠা।

“রসো। আমি একটা বাবলার ডাল আনি। মিন্সেকে কাঁটা ফোটার সুখটো দেখাই।” এই বলিয়া কমল বাবলার ডালের সন্ধানে গেলেন। পথে সতীশের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল–সতীশ মামীর সিন্দুরকৌটা অধিকার করিয়া বসিয়া ছিলেন–এবং সিন্দূর লইয়া আপনার গালে, নাকে, দাড়িতে, বুকে, পেটে বিলক্ষণ করিয়া অঙ্গরাগ করিতেছিলেন–দেখিয়া কমল, বৈষ্ণবী, বাবলার ডাল, কুন্দনন্দিনী প্রভৃতি সব ভুলিয়া গেলেন।

তখন সূর্য্যমুখী হীরা দাসীকে ডাকাইলেন।

হীরার নাম একবার উল্লেখ হইয়াছে। তাহার কিছু বিশেষ পরিচয় আবশ্যক।
নগেন্দ্র এবং তাঁহার পিতার বিশেষ যত্ন ছিল যে, গৃহের পরিচারিকারা বিশেষ সৎস্বভাব বিশিষ্টা হয়। এই অভিপ্রায়ে উভয়েই পর্য্যাপ্ত বেতনদান স্বীকার করিয়া, একটু ভদ্রঘরের স্ত্রীলোকগণকে দাসীত্বে নিযুক্ত করিতে চেষ্টা পাইতেন। তাঁহাদিগের গৃহে পরিচারিকা সুখে ও সম্মানে থাকিত, সুতরাং অনেক দারিদ্র্যগ্রস্ত ভদ্রলোকের কন্যারা তাঁহাদের দাসীবৃত্তি স্বীকার করিত। এই প্রকার যাহারা ছিল, তাহাদের মধ্যে হীরা প্রধানা। অনেকগুলি পরিচারিকা কায়স্থকন্যা—হীরাও কায়স্থ। নগেন্দ্রের পিতা হীরার মাতামহীকে গ্রামান্তর হইতে আনয়ন করেন। প্রথমে তাহার মাতামহীই পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়াছিল—হীরা তখন বালিকা, মাতামহীর সঙ্গে আসিয়াছিল। পরে হীরা সমর্থা হইলে প্রাচীনা দাসীবৃত্তি ত্যাগ করিয়া আপন সঞ্চিত ধনে একটি সামান্য গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া গোবিন্দপুরে বাস করিল—হীরা দত্তগৃহে চাকরি করিতে প্রবৃত্ত হইল।
এক্ষণে হীরার বয়স বিংশতি বৎসর। বয়সে সে প্রায় অন্যান্য দাসীগণ অপেক্ষা কনিষ্ঠা। তাহার বুদ্ধির প্রভাবে এবং চরিত্রগুণে সে দাসীমধ্যে শ্রেষ্ঠা বলিয়া গণিত হইয়াছিল।
হীরা বাল্যবিধবা বলিয়া গোবিন্দপুরে পরিচিতা। কেহ কখন তাহার স্বামীর কোন প্রসঙ্গ শুনে নাই। কিন্তু হীরার চরিত্রেও কেহ কোন কলঙ্ক শুনে নাই। তবে হীরা অত্যন্ত মুখরা, সধবার ন্যায় বেশবিন্যাস করিত, এবং বেশবিন্যাসে বিশেষ প্রীতা ছিল।
হীরা আবার সুন্দরী—উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী, পদ্মপলাশলোচনা। দেখিতে খর্ব্বাকৃতা; মুখখানি যেন মেঘঢাকা চাঁদ; চুলগুলি যেন সাপ ফণা ধরিয়া ঝুলিয়া রহিয়াছে। হীরা আড়ালে ব'সে গান করে; দাসীতে দাসীতে ঝগ্‌ড়া বাধাইয়া তামাসা দেখে; পাচিকাকে অন্ধকারে ভয় দেখায়; ছেলেদের বিবাহের আবদার করিতে শিখাইয়া দেয়; কাহাকে নিদ্রিত দেখিলে চুণ কালি দিয়া সং সাজায়।
কিন্তু হীরার অনেক দোষ। তাহা ক্রমে জানা যাইবে। আপাততঃ বলিয়া রাখি, হীরা আতর গোলাপ দেখিলেই চুরি করে।
সূর্য্যমুখী হীরাকে ডাকিয়া কহিলেন, "ঐ বৈষ্ণবীকে চিনিস?"
হীরা। না। আমি কখন পাড়ার বাহির হই না—আমি বৈষ্ণবী ভিখারী কিসে চিনিব? ঠাকুরবাড়ীর মাগীদের ডেকে জিজ্ঞাসা কর না। করুণা কি শীতলা জানিতে পারে।
সূর্য্য। এ ঠাকুরবাড়ীর বৈষ্ণবী নয়। এ বৈষ্ণবী কে, তোকে জান্‌তে হবে। এ বৈষ্ণবীই বা কে, আর বাড়ীই বা কোথায়? আর কুন্দের সঙ্গে এত ভাবই বা কেন? এই সকল কথা যদি ঠিক জেনে এসে বলিতে পারিস্, তবে তোকে নূতন বারাণসী পরাইয়া সং দেখিতে পাঠাইয়া দিব।
নূতন বারাণসীর কথা শুনিয়া হীরার পাঁচ হাত বুক হইল, জিজ্ঞাসা করিল, "কখন জানিতে যেতে হবে?"
সূ। তোর যখন খুসি। কিন্তু এখনও ওর পাছু পাছু না গেলে ঠিকানা পাবি না।
হীরা। আচ্ছা।
সূ। কিন্তু দেখিস্ যেন বৈষ্ণবী কিছু বুঝিতে না পারে। আর কেহ কিছু বুঝিতে না পারে।
এমত সময়ে কমল ফিরিয়া আসিল। সূর্য্যমুখী তাঁহাকে পরামর্শের কথা সব বলিলেন। শুনিয়া কমল খুসি হইলেন। হীরাকে বলিলেন, "আর পারিস্ ত মাগীকে দুটো বাবলার কাঁটা ফুটিয়ে দিয়ে আসিস!"

হীরা বলিল, " সব পারিব, কিন্তু শুধু বারাণসী নিব না।"
সূ। কি নিবি?
কমল বলিল, " ও একটি বর চায়। ওর একটি বিয়ে দাও।"
সূ। আচ্ছা, তাই হবে–জামাই বাবুকে মনে ধরে? বল তা হলে কমল সম্বন্ধ করে।
হী। তবে দেখবো। কিন্তু আমার মনের মত ঘরে একটি বর আছে।
সূ। কে লো?
হী। যম।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ : "না"

সেই দিন প্রদোষকালে উদ্যানমধ্যস্থ বাপীতটে বসিয়া কুন্দনন্দিনী। এই দীর্ঘিকা অতি সুবিস্তৃতা; তাহার জল অতি পরিষ্কার এবং সর্ব্বদা নীলপ্রভ। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, এই পুষ্করিণীর পশ্চাতে পুষ্পোদ্যান। পুষ্পোদ্যানমধ্যে এক শ্বেতপ্রস্তররচিত লতামণ্ডপ ছিল। সেই লতামণ্ডপের সম্মুখেই পুষ্করিণীতে অবতরণ করিবার সোপান। সোপান প্রস্তরবৎ ইষ্টকে নির্ম্মিত, অতি প্রশস্ত এবং পরিষ্কার। তাহার দুই ধারে, দুইটি বহুকালের বড় বকুল গাছ। সেই বকুলের তলায়, সোপানের উপরে কুন্দনন্দিনী, অন্ধকার প্রদোষে একাকিনী বসিয়া স্বচ্ছ সরোবরহৃদয়ে প্রতিফলিত নক্ষত্রাদিসহিত আকাশপ্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। কোথাও কতকগুলি লাল ফুল অন্ধকারে অস্পষ্ট লক্ষ্য হইতেছিল। দীর্ঘিকার অপর তিন পার্শ্বে, আম্র, কাঁটাল, জাম, লেবু, লিচু, নারিকেল, কুল, বেল প্রভৃতি ফলবান্ ফলের গাছ, ঘনশ্রেণীবদ্ধ হইয়া অন্ধকারে অসমশীর্ষ প্রাচীরবৎ দৃষ্ট হইতেছিল। কদাচিৎ তাহার শাখায় বসিয়া মাচাড় পাখী বিকট রব করিয়া নিঃশব্দে সরোবরকে শব্দিত করিতেছিল। শীতল বায়ু, সরোবর পার হইয়া ইন্দীবরকোরককে ঈষন্মাত্র বিধৃত করিয়া, আকাশচিত্রকে স্বল্পমাত্র কম্পিত করিয়া কুন্দনন্দিনীর শিরঃস্থ বকুলপত্রমালায় মর্ম্মর শব্দ করিতেছিল এবং নিদাঘপ্রস্ফুটিত বকুল পুষ্পের গন্ধ চারিদিকে বিকীর্ণ করিতেছিল। বকুল পুষ্প সকল নিঃশব্দে কুন্দনন্দিনীর অঙ্গে এবং চারিদিকে ঝরিয়া পড়িতেছিল। পশ্চাৎ হইতে অসংখ্য মল্লিকা, যূথিকা এবং কামিনীর সুগন্ধ আসিতেছিল। চারিদিকে, অন্ধকারে, খদ্যোতমালা স্বচ্ছ বারির উপর উঠিতেছিল, পড়িতেছিল, ফুটিতেছিল, নিবিতেছিল। দুই একটা বাদুড় ডাকিতেছে–দুই একটা শৃগাল অন্য পশু তাড়াইবার তাহাদিগের যে শব্দ, সেই শব্দ করিতেছে–দুই একখানা মেঘ আকাশে পথ হারাইয়া বেড়াইতেছে–দুই একটা তারা মনের দুঃখে খসিয়া পড়িতেছে। কুন্দনন্দিনী মনের দুঃখে ভাবিতেছেন। কি ভাবনা ভাবিতেছেন? এইরূপ;–"ভাল, সবাই আগে মলো–মা মলো, দাদা মলো, বাবা মলো, আমি মলেম না কেন? যদি না মলেম ত এখানে এলাম কেন? ভাল, মানুষ কি মরিয়া নক্ষত্র হয়? পিতার পরলোকযাত্রার রাত্রে কুন্দ যে স্বপ্ন দেখিয়াছিল, কুন্দের আর তাহা কিছুই মনে ছিল না; কখনও মনে হইত না, এখনও তাহা মনে হইল না। কেবল অভ্যাসমাত্র মনে আসিল। এইমাত্র মনে হইল, যেন সে কবে মাতাকে স্বপ্নে দেখিয়াছিল, তাহার মা যেন, তাহাকে নক্ষত্র হইতে বলিয়াছেন। কুন্দ ভাবিতে লাগিল, "ভাল, মানুষ মরিলে কি নক্ষত্র হয়? তা হলে ত বাবা, মা, সবাই নক্ষত্র হইয়াছেন? তবে তাঁরা কোন্ নক্ষত্রগুলি? ঐটি? না ঐটি ? কোন্টি কে? কেমন করিয়া জানিব? তা যেটিই যিনি হউন, আমায় ত দেখতে পেতেছেন? আমি যে এত কাঁদি–তা দূর হউক, ও আর ভাবি না–বড় কান্না পায়। কেঁদে কি হবে? আমার ত কপালে কান্নাই আছে–নহিলে মা–আবার ঐ কথা! দূর হউক–ভাল, মরিলে হয় না? কেমন করিয়া? জলে

ডুবিয়া? বেশ ত! মরিলে নক্ষত্র হব–তা হলে হব ত? দেখিতে পাব–রোজ রোজ দেখিতে পাব–কাকে? কাকে, মুখে বলিতে পারি নে কি? আচ্ছা, নাম মুখে আনিতে পারি নে কেন? এখন ত কেহ নাই–কেহ শুনিতে পাবে না। একবার মুখে আনিব? কেহ নাই–মনের সাধে নাম করি। ন–নগ–নগেন্দ্র! নগেন্দ্র, নগেন্দ্র, নগেন্দ্র, নগেন্দ্র, নগেন্দ্র নগেন্দ্র। নগেন্দ্র, আমার নগেন্দ্র! আলো! আমার নগেন্দ্র? আমি কে? সূর্য্যমুখীর নগেন্দ্র! কতই নাম করিতেছি–হলেম কি? আচ্ছা–সূর্য্যমুখীর সঙ্গে বিয়ে না হয়ে যদি আমার সঙ্গে হতো–দূর হউক–ডুবেই মরি। আচ্ছা, যেন, এখন ডুবিলাম– কাল ভেসে উঠবো–তবে সবাই শুনবে, শুনে নগেন্দ্র–নগেন্দ্র!–নগেন্দ্র! নগেন্দ্র! আবার বলি–নগেন্দ্র নগেন্দ্র নগেন্দ্র!–নগেন্দ্র শুনে কি বলিবেন? ডুবে মরা হবে না–ফুলে পড়িয়া থাকিব–দেখিতে রাক্ষসীর মত হব। যদি তিনি দেখেন? বিষ খেয়ে ত মরিতে পারি? কি বিষ খাব? বিষ কোথা পাব–কে আমায় এনে দিবে? দিলে যেন–মরিতে পারিব কি? পারি–কিন্তু আজি না–একবার আকাঙ্ক্ষা ভরিয়া মনে করি–তিনি আমায় ভালবাসেন। কমল কি কথাটি বলতে বলতে বলিল না? সে ঐ কথাই। আচ্ছা, সে কথা কি সত্য?–কিন্তু কমল জানিবে কিসে? আমি পোড়ারমুখী জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। ভালবাসেন? কিসে ভালবাসেন? কি দেখে ভালবাসেন, রূপ না গুণ? রূপ–দেখি?" (এই কহিয়া কালামুখী স্বচ্ছ সরোবরে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিতে গেল, কিন্তু কিছুই দেখিতে না পাইয়া আবার পূর্ব্বস্থানে আসিয়া বলিল)" দূর হউক, যা নয় তা ভাবি কেন? আমার চেয়ে সূর্য্যমুখী সুন্দর; আমার চেয়ে হরমণি সুন্দর; বিশু সুন্দর; মুক্ত সুন্দর; চন্দ্র সুন্দর, প্রসন্ন সুন্দর; বামা সুন্দর; প্রমদা সুন্দর; আমার চেয়ে হীরা দাসীও সুন্দরী। হীরাও আমার চেয়ে সুন্দর? হাঁ; শ্যামবর্ণ হলে কি হয়–মুখ আমার চেয়ে সুন্দর। তা রূপ ত গোল্লাই গেল–গুণ কি? আচ্ছা দেখি। দেখি ভেবে,–কই! মনে ত হয় না। কে জানে। কিন্তু মরা হবে না, ঐ কথা ভাবি। মিছে কথা! তা মিছে কথাই ভাবি। মিছে কথাকে সত্য বলিয়া ভাবি। কিন্তু কলিকাতায় যেতে হবে যে, তা ত যেতে পারিব না; দেখিতে পাব না যে। আমি যেতে পারব না–পারব না–পারব না। তা না গিয়াই বা কি করি? যদি কমলের কথা সত্য হয়, তবে ত যারা আমার জন্য এত করেছে, তাহাদের ত সর্ব্বনাশ করিতেছি। সূর্য্যমুখীর মনে কিছু হয়েছে বুঝিতে পারি। সত্যই হউক, মিথ্যাই হউক, কাজে কাজেই আমায় যেতে হবে। তা পারিব না। তাই ডুবে মরি। মরিবই মরিব। বাবা গো! তুমি কি আমাকে ডুবিয়া মরিবার জন্য রাখিয়া গিয়াছিলে;–"

কুন্দ তখন দুই চক্ষে হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিল। সহসা অন্ধকার গৃহে প্রদীপ জ্বালার ন্যায়, কুন্দের সেই স্বপ্ন-বৃত্তান্ত সুস্পষ্ট মনে পড়িল। কুন্দ তখন বিদ্যুৎস্পৃষ্টার ন্যায় গাত্রোত্থান করিল। "আমি সকল ভুলিয়া গিয়াছি–আমি কেন ভুলিলাম? মা আমাকে দেখা দিয়াছিলেন–মা আমার কপালের লিখন জানিতে পারিয়া আমায় ঐ নক্ষত্রলোকে যাইতে বলিয়াছিলেন–আমি কেন তাঁর কথা শুনলেম না–আমি কেন গেলাম না!–আমি কেন মলেম না! আমি এখনও বিলম্ব করিতেছি কেন? আমি এখনও মরিতেছি না কেন? আমি এখনই মরিব।"এই ভাবিয়া কুন্দ ধীরে ধীরে সেই সরোবরসোপান অবতরণ আরম্ভ করিল। কুন্দ নিতান্ত অবলা–নিতান্ত ভীরুস্বভাবসম্পন্না–প্রতি পদার্পণে ভয় পাইতেছিল–প্রতি পদার্পণে তাহার অঙ্গ শিহরিতেছিল। তথাপি অস্খলিতসংকল্পে সে মাতার আজ্ঞাপালনার্থ ধীরে ধীরে যাইতেছিল। এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে অতি ধীরে ধীরে তাহার পৃষ্ঠে অঙ্গুলিস্পর্শ করিল। বলিল, "কুন্দ!" কুন্দ দেখিল–সে অন্ধকারে দেখিবামাত্র চিনিল–নগেন্দ্র। কুন্দের সে দিন আর মরা হলো না।

আর নগেন্দ্র! এই কি তোমার এত কালের সুচরিত্র? এই কি তোমার এত কালের শিক্ষা? এই কি সূর্য্যমুখীর প্রাণপণ প্রণয়ের প্রতিফল! ছি! ছি! দেখ, তুমি চোর! চোরের অপেক্ষাও হীন। চোর সূর্য্যমুখীর কি করিত? তাহার গহনা চুরি করিত, অর্থহানি করিত, কিন্তু তুমি তাহার প্রাণহানি করিতে আসিয়াছ। চোরকে সূর্য্যমুখী কখন কিছু দেয় নাই; তবু সে চুরি করিলে চোর হয়। আর সূর্য্যমুখী তোমাকে সর্ব্বস্ব দিয়াছে–তবু তুমি চোরের অধিক চুরি করিতে আসিয়াছ! নগেন্দ্র, তুমি

মরিলেই ভাল হয়। যদি সাহস থাকে, তবে তুমি গিয়া ডুবিয়া মর।

আর ছি! ছি! কুন্দনন্দিনী! তুমি চোরের স্পর্শে কাঁপিলে কেন? ছি! ছি! কুন্দনন্দিনী—চোরের কথা শুনিয়া তোমার গায়ে কাঁটা দিল কেন? কুন্দনন্দিনী!—দেখ, পুষ্করিণীর জল পরিষ্কার, সুশীতল, সুবাসিত—বায়ুর হিল্লোলে তাহার নীচে তারা কাঁপিতেছে। ডুবিবে? ডুবিয়া মর না? কুন্দনন্দিনী মরিতে চাহে না।

চোর বলিল, "কুন্দ! কলিকাতায় যাইবে?"

কুন্দ কথা কহিল না—চক্ষু মুছিল—কথা কহিল না।

চোর বলিল, "কুন্দ! ইচ্ছাপূর্ব্বক যাইতেছ?"

ইচ্ছাপূর্ব্বক! হরি! হরি! কুন্দ আবার চক্ষু মুছিল—কথা কহিল না।

"কুন্দ—কাঁদিতেছে কেন?" কুন্দ এবার কাঁদিয়া ফেলিল। তখন নগেন্দ্র বলিতে লাগিলেন, "শুন কুন্দ! আমি বহু কষ্টে এত দিন সহ্য করিয়াছিলাম, কিন্তু আর পারিলাম না। কি কষ্টে যে বাঁচিয়া আছি, তাহা বলিতে পারি না। আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আপনি ক্ষত বিক্ষত হইয়াছি। ইতর হইয়াছি, মদ খাই। আর পারি না। তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারি না। শুন, কুন্দ! এখন বিধবাবিবাহ চলিত হইতেছে—আমি তোমাকে বিবাহ করিব। তুমি বলিলেই বিবাহ করি।"

কুন্দ এবার কথা কহিল। বলিল, "না।"

আবার নগেন্দ্র বলিলেন, "কেন, কুন্দ! বিধবার বিবাহ কি অশাস্ত্র?" কুন্দ আবার বলিল, "না।"

নগেন্দ্র বলিল, "তবে না কেন? বল বল—বল—আমার গৃহিণী হইবে কি না? আমায় ভালবাসিবে কি না?

কুন্দ বলিল "না?"

তখন নগেন্দ্র যেন সহস্রমুখে অপরিমিত প্রেমপরিপূর্ণ মর্ম্মভেদী কত কথা বলিলেন। কুন্দ বলিল, "না।"

তখন নগেন্দ্র চাহিয়া দেখিলেন, পুষ্করিণী নির্ম্মল সুশীতল—কুসুম-বাস-সুবাসিত— পবনহিল্লোলে তন্মধ্যে তারা কাঁপিতেছে—ভাবিলেন, "উহার মধ্যে শয়ন কেমন?"

অন্তরীক্ষে যেন কুন্দ বলিতে লাগিল, "না।" বিধবার বিবাহ শাস্ত্রে আছে। তাহার জন্য নয়। তবে কুন্দ ডুবিয়া মরিল না কেন? স্বচ্ছ বারি—শীতল জল—নীচে নক্ষত্র নাচিতেছে—কুন্দ ডুবিয়া মরিল না কেন?

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ : যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ

হরিদাসী বৈষ্ণবী উপবনগৃহে আসিয়া হঠাৎ দেবেন্দ্রবাবু হইয়া বসিল। পাশে এক দিকে আলবোলা। বিচিত্র রৌপ্যশৃঙ্খলদলমালাময়ী, কলকল-কল্লোলনিনাদিনী, আলবোলা সুন্দরী দীর্ঘ ওষ্ঠ চুম্বনার্থ বাড়াইয়া দিলেন—মাথার উপর সোহাগের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। আর একদিকে স্ফটিকপাত্রে, হেমাঙ্গী এক্‌শাকুমারী টল টল করিতে লাগিলেন। সম্মুখে, ভোক্তার ভোজনপাত্রের নিকট উপবিষ্ট গৃহমার্জ্জারের মত, একজন চাটুকার প্রসাদাকাঙ্ক্ষায় নাক বাড়াইয়া বসিলেন, হুঁক্কা বলিতেছে," দেখ! দেখ! মুখ বাড়াইয়া আছি। ছি! ছি! মুখ বাড়াইয়া আছি!" এক্‌শাকুমারী বলিতেছে, "আগে আমায় আদর কর!" দেখ, আমি কেমন রাঙ্গা! ছি ছি! আগে

আমায় খাও!” প্রসাদাকাঙ্ক্ষীর নাক বলিতেছে, “আমি যার, তাকে একটু দিও।” দেবেন্দ্র সকলের মন রাখিলেন। আলবোলার মুখচুম্বন করিলেন—তাহার প্রেম ধুঁয়াইয়া উঠিতে লাগিল। এক্‌শানন্দিনীকে উদরস্থ করিলেন, সে ক্রমে মাথায় উঠিতে লাগিল। গৃহমার্জ্জার মহাশয়ের নাককে পরিতুষ্ট করিলেন—নাক দুই চারি গেলাসের পর ডাকিতে আরম্ভ করিল। ভৃত্যেরা নাসিকাধিকারীকে “গুরুমহাশয় গুরুমহাশয়” করিয়া স্থানান্তরে রাখিয়া আসিল।

তখন সুরেন্দ্র আসিয়া দেবেন্দ্রের কাছে বসিলেন এবং তাঁহার শারীরিক কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর বলিলেন, “আবার আজি তুমি কোথায় গিয়াছিলে?”

দে। ইহারই মধ্যে তোমার কাণে গিয়াছে?

সু। এই তোমার আর একটি ভ্রম। তুমি মনে কর, সব তুমি লুকিয়ে কর—কেহ জানিতে পারে না, কিন্তু পাড়ায় পাড়ায় ঢাক বাজে।

দে। দোহাই ধর্ম্ম! আমি কাহাকেও লুকাইতে চাহি না—কোন্ শালাকে লুকাইব?

সু। সেও একটা বাহাদুরী মনে করিও না। তোমার যদি একটু লজ্জা থাকিত, তাহা হইলে আমাদেরও একটু ভরসা থাকিত। লজ্জা থাকিলে আর তুমি বৈষ্ণবী সেজে গ্রামে গ্রামে ঢলাতে যাও?

দে। কিন্তু কেমন রসের বৈষ্ণবী, দাদা? রসকলিটি দেখে, ঘুরে পড় নি ত?

সু। আমি সে পোড়ারমুখ দেখি নাই, দেখিলে দুই চাবুকে বৈষ্ণবীর বৈষ্ণবী যাত্রা ঘুচিয়ে দিতাম।

পরে দেবেন্দ্রের হস্ত হইতে মদ্যপাত্র কাড়িয়া লইয়া সুরেন্দ্র বলিতে লাগিলেন, “এখন একটু বন্ধ করিয়া, জ্ঞান থাকিতে থাকিতে, দুটো কথা শুন। তার পর গিলো।”

দে। বল, দাদা! আজ যে বড় চটাচটা দেখি—হৈমবতীর বাতাস গায়ে লেগেছে নাকি?

সুরেন্দ্র দুর্ম্মুখের কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, “বৈষ্ণবী সেজেছিলে কার সর্ব্বনাশ করবার জন্য?”

দে। তা কি জান না? মনে নাই, তারা মাষ্টারের বিয়ে হয়েছিল এক দেবকন্যার সঙ্গে? দুই দেবকন্যা এখন বিধবা হয়ে ও গাঁয়ের দত্তবাড়ী রেঁধে খায়। তাই তাকে দেখতে গিয়েছিলাম।

সু। কেন, এত দুর্বৃত্তিতেও তৃপ্তি জন্মিল না যে, সে অনাথা বালিকাকে অধঃপাতে দিতে হবে! দেখ দেবেন্দ্র, তুমি এত বড় পাপিষ্ঠ, এত বড় নৃশংস, এমন অত্যাচারী যে, বোধ হয়, আর আমরা তোমার সহবাস করিতে পারি না।

সুরেন্দ্র এরূপ দার্ঢ্য সহকারে এই কথা বলিলেন যে, দেবেন্দ্র নিস্তব্ধ হইলেন। পরে দেবেন্দ্র গাম্ভীর্য্যসহকারে কহিলেন, “তুমি আমার উপর রাগ করিও না। আমার চিত্ত আমার বশ নহে। আমি সকল ত্যাগ করিতে পারি, এই স্ত্রীলোকের আশা ত্যাগ করিতে পারি না। যে দিন প্রথম তাহাকে তারাচরণের গৃহে দেখিয়াছি, সেই দিন অবধি আমি তাহার সৌন্দর্য্যে অভিভূত হইয়া আছি। আমার চক্ষে এত সৌন্দর্য্য আর কোথাও নাই। জ্বরে যেমন তৃষ্ণা রোগীকে দগ্ধ করে, সেই অবধি উহার জন্য লালসা আমাকে সেইরূপ দগ্ধ করিতেছে। সেই অবধি আমি উহাকে দেখিবার জন্য কত কৌশল করিতেছি, তাহা বলিতে পারি না। এ পর্য্যন্ত পারি নাই—শেষে এই বৈষ্ণবী-সজ্জা ধরিয়াছি। তোমার কোন আশঙ্কা নাই—সে স্ত্রীলোক অত্যন্ত সাধ্বী!”

সু। তবে যাও কেন?

দে। কেবল তাহাকে দেখিবার জন্য। তাহাকে দেখিয়া, তাহার সঙ্গে কথা কহিয়া, তাহাকে গান শুনাইয়া আমার যে কি পর্য্যন্ত তৃপ্তি হয়, তাহা বলিতে পারি না।

সু। তোমাকে আমি সত্য বলিতেছি—উপহাস করিতেছি না। তুমি যদি এই দুষ্প্রবৃত্তি ত্যাগ না করিবে—তুমি যদি সে পথে আর যাইবে—তবে আমার সঙ্গে তোমার আলাপ এই পর্য্যন্ত বন্ধ। আমিও তোমার শত্রু হইব।

দে। তুমি আমার একমাত্র সুহৃদ্ । আমি অর্দ্ধেক বিষয় ছাড়িতে পারি, তবু তোমাকে ছাড়িতে পারি না। কিন্তু তোমাকে যদি ছাড়িতে হয়, সেও স্বীকার, তবু আমি কুন্দনন্দিনীকে দেখিবার আশা ছাড়িতে পারিব না।

সু। তবে তাহাই হউক। তোমার সঙ্গে আমার এই পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ।

এই বলিয়া সুরেন্দ্র দুঃখিত চিত্তে উঠিয়া গেলেন। দেবেন্দ্র একমাত্র বন্ধুবিচ্ছেদে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া কিয়ৎকাল বিমর্ষভাবে বসিয়া রহিলেন। শেষ ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, "দূর হউক! এ সংসারে কে কার! আমিই আমার!" এই বলিয়া পাত্র পূর্ণ করিয়া ব্র্যাণ্ডি পান করিলেন। তাহার বশে আশু চিত্তপ্রফুল্লতা জন্মিল। তখন দেবেন্দ্র, শুইয়া পড়িয়া, চক্ষু মুদিয়া গান ধরিলেন।

"আমার নাম হীরা মালিনী।
আমি থাকি রাধার কুঞ্জে, কুব্জা আমার ননদিনী।
রাবণ বলে চন্দ্রাবলি,
তুমি আমার কমল কলি,
শুনে কীচক মেরে কৃষ্ণ,
উদ্ধারিল যাজ্ঞসেনী!"

তখন পারিষদেরা সকলে উঠিয়া গিয়াছিল, দেবেন্দ্র নৌকাশূন্য নদীবক্ষঃস্থিত ভেলার ন্যায় একা বসিয়া রসের তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতেছিলেন। রোগরূপ তিমি মকরাদি এখন জলের ভিতর লুকাইয়াছিল—এখন কেবল মন্দ পবন আর চাঁদের আলো! এমন সময়ে জানালার দিকে কি একটা খড় খড় শব্দ হইল—কে যেন খড়খড়ি তুলিয়া দেখিতেছিল—হঠাৎ ফেলিয়া দিল। দেবেন্দ্র বোধ হয়, মনে মনে কাহারও প্রতীক্ষা করিতেছিলেন—বলিলেন, "কে খড়খড়ি চুরি করে?" কোন উত্তর না পাইয়া জানেলা দিয়া দেখিলেন—দেখিতে পাইলেন, এক জন স্ত্রীলোক পলায়। স্ত্রীলোক পলায় দেখিয়া দেবেন্দ্র জানেলা খুলিয়া লাফাইয়া পড়িয়া, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ টলিতে টলিতে ছুটিলেন।

স্ত্রীলোক অনায়াসে পলাইলে পলাইতে পারিত, কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক পলাইল না, কি অন্ধকারে ফুলবাগানের মাঝে পথ হারাইল, তাহা বলা যায় না। দেবেন্দ্র তাহাকে ধরিয়া অন্ধকারে তাহার মুখপানে চাহিয়া চিনিতে পারিলেন না। চুপি চুপি মদের ঝোঁকে বলিলেন, "বাবা! কোন্ গাছ থেকে?" পরে তাহাকে ঘরের ভিতর টানিয়া আনিয়া একবার এক দিকে আবার আর এক দিকে আলো ধরিয়া দেখিয়া, সেইরূপ স্বরে বলিলেন, "তুমি কাদের পেত্নী গা?" শেষে কিছু স্থির করিতে না পারিয়া বলিলেন, "পারলেম না বাপ! আজ ফিরে যাও, অমাবস্যায় লুচি পাঁঠা দিয়ে পূঁজো দেব—আজ একটু কেবল ব্র্যাণ্ডি খেয়ে যাও," এই বলিয়া মদ্যপ স্ত্রীলোকটিকে বৈঠকখানায় বসাইয়া, মদের গেলাস তাহার হাতে দিল।

স্ত্রীলোকটি তাহা গ্রহণ না করিয়া নামাইয়া রাখিল।

তখন মাতাল আলোটা স্ত্রীলোকের মুখের কাছে লইয়া গেল। এদিক্ ওদিক্ চারিদিক্ আলোটা ফিরাইয়া ফিরাইয়া গম্ভীরভাবে তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া, শেষ হঠাৎ আলোটা ফেলিয়া দিয়া গান ধরিল, "তুমি কে বট হে, তোমায় চেন চেন করি–কোথায়ও দেখেছি হে।"
তখন সে স্ত্রীলোক ধরা পড়িয়াছি ভাবিয়া বলিল, "আমি হীরা।"
"Hurrah! Three Cheers for হীরা !" বলিয়া মাতাল লাফাইয়া উঠিল। তখন আবার ভূমিষ্ঠ হইয়া হীরাকে প্রণাম করিয়া গ্লাস-হস্তে স্তব করিতে আরম্ভ করিল;–

"নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী বটবৃক্ষেষু ছায়ারুপেণ সংস্থিতা —
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী দত্তগৃহেষু হীরারূপেণ সংস্থিতা —
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী পুকুরঘাটেষু চুপড়িহস্তেন সংস্থিতা —
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী ঘরদ্বারেষু ঝাঁটাহস্তেন সংস্থিতা —
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী মম গৃহেষু পেত্নীরূপেণ সংস্থিতা —
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

"তার পর–মালিনী মাসি!–কি মনে ক'রে?"
হীরা ইতিপূর্ব্বে বৈষ্ণবীর সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া দিনমানে জানিয়া গিয়াছিল যে, হরিদাসী বৈষ্ণবী ও দেবেন্দ্র বাবু একই ব্যক্তি। কিন্তু কেন দেবেন্দ্র বৈষ্ণবী-বেশে দত্তগৃহে যাতায়াত করিতেছে? এ কথা জানা সহজ নহে। হীরা মনে মনে অত্যন্ত দুঃসাহসিক সঙ্কল্প করিয়া, এই সময়ে স্বয়ং দেবেন্দ্রের গৃহে আসিল। সে গোপনে উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিয়া জানেলার কাছে দাঁড়াইয়া দেবেন্দ্রের কথাবার্ত্তা শুনিয়াছিল। সুরেন্দ্রের সঙ্গে দেবেন্দ্রের কথোপকথন অন্তরাল হইতে শুনিয়া হীরা সিদ্ধমনস্কাম হইয়া ফিরিয়া যাইতেছিল, যাইবার সময় অসাবধানে খড়্খড়ি ফেলিয়া দিয়াছিল–ইহাতেই গোল বাধিল।
এখন হীরা পলাইবার জন্য ব্যস্ত। দেবেন্দ্র তাহার হাতে আবার মদের গেলাস দিল। হীরা বলিল, "আপনি খান।" বলিবামাত্র দেবেন্দ্র তাহা গলাধঃকরণ করিলেন। সেই গেলাস দেবেন্দ্রের পূর্ণ মাত্রা হইল–দুই একবার ঢুলিয়া–দেবেন্দ্র শুইয়া পড়িলেন। হীরা তখন উঠিয়া পলাইল। দেবেন্দ্র তখন ঝিম্‌কিনি মারিয়া গাইতে লাগিল;–

"বয়স তাহার বছর ষোল,
দেখতে শুনতে কালো কালো,
পিলে অগ্রমাসে মোলো,

আমি তখন খানায় পোড়ে।”

সে রাত্রে হীরা আর দত্তবাড়ীতে গেল না, আপন গৃহে গিয়া শয়ন করিয়া রহিল। পরদিন প্রাতে গিয়া সূর্য্যমুখীর নিকট দেবেন্দ্রের সংবাদ বলিল। দেবেন্দ্র কুন্দের জন্য বৈষ্ণবী সাজিয়া যাতায়াত করে। কুন্দ যে নির্দ্দোষী, তাহা হীরাও বলিল না, সূর্য্যমুখীও বুঝিলেন না। হীরা কেন সে কথা লুকাইল—পাঠক তাহা ক্রমে বুঝিতে পারিবেন। সূর্য্যমুখী দেখিয়াছিলেন, কুন্দ বৈষ্ণবীর সঙ্গে চুপি চুপি কথা কহিতেছে—সুতরাং সূর্য্যমুখী তাহাকে দোষী মনে করিলেন। হীরার কথা শুনিয়া সূর্য্যমুখীর নীলোৎপললোচন রাঙ্গা হইয়া উঠিল। তাঁহার কপালে শিরা স্থূলতা প্রাপ্ত হইয়া প্রকটিত হইল। কমলও সকল শুনিলেন। কুন্দকে সূর্য্যমুখী ডাকাইলেন। সে আসিলে পরে বলিলেন, “কুন্দ! হরিদাসী বৈষ্ণবী কে, আমরা চিনিয়াছি। আমরা জানিয়াছি যে, সে তোর কে। তুই যা তা জানিলাম! আমরা এমন স্ত্রীলোককে বাড়িতে স্থান দিই না। তুই বাড়ী হইতে এখনই দূর হ। নহিলে হীরা তোকে ঝাঁটা মারিয়া তাড়াইবে।”

কুন্দের গা কাঁপিতে লাগিল। কমল দেখিলেন যে, সে পড়িয়া যায়। কমল তাহাকে ধরিয়া শয়নগৃহে লইয়া গেলেন। শয়নগৃহে থাকিয়া আদর করিয়া সান্ত্বনা করিলেন এবং বলিলেন, “ ও মাগী যাহা বলে বলুক; আমি উহার একটি কথাও বিশ্বাস করি না।”

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ : অনাথিনী

গভীর রাত্রে গৃহস্থ সকলে নিদ্রিত হইলে কুন্দনন্দিনী শয়নাগারের দ্বার খুলিয়া বাহির হইল। এক বসনে সূর্য্যমুখীর গৃহ ত্যাগ করিয়া গেল। সেই গভীর রাত্রে এক বসনে সপ্তদশবর্ষীয়া, অনাথিনী সংসারসমুদ্রে একাকিনী ঝাঁপ দিল।

রাত্রি অত্যন্ত অন্ধকার । অল্প অল্প মেঘ করিয়াছে, কোথায় পথ?

কে বলিয়া দিবে, কোথায় পথ? কুন্দনন্দিনী কখন দত্তদিগের বাটীর বাহির হয় নাই। কোন্ দিকে কোথায় যাইবার পথ, তাহা জানে না। আর কোথাই বা যাইবে?

অট্টালিকার বৃহৎ অন্ধকারময় কায়া, আকাশের গায়ে লাগিয়া রহিয়াছে—সেই অন্ধকার বেষ্টন করিয়া কুন্দনন্দিনী বেড়াইতে লাগিল। মানস, একবার নগেন্দ্রনাথের শয়নকক্ষের বাতায়নপথের আলো দেখিয়া যায়। একবার সেই আলো দেখিয়া চক্ষু জুড়াইয়া যাইবে।

তাঁহার শয়নাগার চিনিত—ফিরিতে ফিরিতে তাহা দেখিতে পাইল—বাতায়নপথে আলো দেখা যাইতেছে। কবাট খোলা—সাসি বন্ধ—অন্ধকারমধ্যে তিনটি জানেলা জ্বলিতেছে। তাহার উপর পতঙ্গজাতি উড়িয়া উড়িয়া পড়িতেছে। আলো দেখিয়া উড়িয়া পড়িতেছে, কিন্তু রুদ্ধপথে প্রবেশ করিতে না পারিয়া কাচে ঠেকিয়া ফিরিয়া যাইতেছে। কুন্দনন্দিনী এই ক্ষুদ্র পতঙ্গদিগের জন্য হৃদয়মধ্যে পীড়িতা হইল।

কুন্দনন্দিনী মুগ্ধলোচনে সেই গবাক্ষপথ—প্রেরিত আলোক দেখিতে লাগিল—সে আলো ছাড়িয়া যাইতে পারিল না। শয়নগারের সম্মুখে কতকগুলি ঝাউগাছ ছিল—কন্দুনন্দিনী তাহার তলায় গবাক্ষ প্রতি সম্মুখ করিয়া বসিল। রাত্রি অন্ধকার, চারি দিক্ অন্ধকার, গাছে গাছে খদ্যোতের চাক্‌চিক্য সহস্রে সহস্রে ফুটিতেছে, মুদিতেছে; মুদিতেছে, ফুটিতেছে। আকাশে কালো মেঘের পশ্চাতে কালো মেঘ ছুটিতেছে—তাহার পশ্চাতে আরও কালো মেঘ ছুটিতেছে—তৎপশ্চাতে আরও কালো। আকাশে দুই একটি নক্ষত্র মাত্র, কখনও মেঘে ডুবিতেছে, কখনও ভাসিতেছে। বাড়ীর চারি দিকে ঝাউগাছের শ্রেণী, সেই মেঘময় আকাশে মাথা তুলিয়া

নিশাচর পিশাচের মত দাঁড়াইয়া আছে। বায়ুর স্পর্শে সেই করালবদনা নিশীথিনী-অঙ্গে থাকিয়া, তাহারা আপন আপন পৈশাচী ভাষায় কুন্দনন্দিনীর মাথার উপর কথা কহিতেছে। পিশাচেরাও করাল রাত্রির ভয়ে, অল্প শব্দে কথা কহিতেছে। কদাচিৎ বায়ুর সঞ্চালনে গবাক্ষের মুক্ত কবাট প্রাচীরে বারেক মাত্র আঘাত করিয়া শব্দ করিতেছে। কালপেঁচা সৌধোপরি বসিয়া ডাকিতেছে। কদাচিৎ একটা কুক্কুর অন্য পশু দেখিয়া সম্মুখ দিয়া অতি দ্রুতবেগে ছুটিতেছে। কদাচিৎ ঝাউয়ের পল্লব অথবা ফল খসিয়া পড়িতেছে। দূরে নারিকেল বৃক্ষের অন্ধকার শিরোভাগ অন্ধকারে মন্দ মন্দ হেলিতেছে; দূর হইতে তালবৃক্ষের পত্রের তর তর মর্ম্মর শব্দ কর্ণে আসিতেছে; সর্ব্বোপরি সেই বাতায়নশ্রেণীর উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে—আর পতঙ্গদল ফিরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে, কুন্দনন্দিনী সেই দিকে চাহিয়া রহিল। ধীরে ধীরে একটি গবাক্ষের সাসী খুলিল। এক মনুষ্যমূর্ত্তি আলোকপটে চিত্রিত হইল। হরি! হরি! সে নগেন্দ্রের মূর্ত্তি। নগেন্দ্র—নগেন্দ্র! যদি ঐ ঝাউতলার অন্ধকারের মধ্যে ক্ষুদ্র কুন্দ কুসুমটি দেখিতে পাইতে! যদি তোমাকে গবাক্ষপথে দেখিয়া তাহার হৃদয়াঘাতের শব্দ—দুপ! দুপ! শব্দ—যদি সে শব্দ শুনিতে পাইতে! যদি জানিতে পারিতে যে, তুমি আবার এখনই সরিয়া অদৃশ্য হইবে, এই ভয়ে তাহার দেখার সুখ হইতেছে না! নগেন্দ্র! দীপের দিকে পশ্চাৎ করিয়া দাঁড়াইয়াছ—একবার দীপন সম্মুখে করিয়া দাঁড়াও! তুমি দাঁড়াও, সরিও না—কুন্দ বড় দুঃখিনী। দাঁড়াও—তাহা হইলে, সেই পুষ্করিণীর স্বচ্ছ শীতল বারি—তাহার তলে নক্ষত্রচ্ছায়া—তাহার আর মনে পড়িবে না।

ঐ শুন! কালপেঁচা ডাকিল! তুমি সরিয়া যাইবে, আর কুন্দনন্দিনীর ভয় করিবে! দেখিলে বিদ্যুৎ! তুমি সরিও না—কুন্দনন্দিনীর ভয় করিবে! ঐ দেখ, আবার কালো মেঘ পবনে চাপিয়া যে যুদ্ধে ছুটিতেছে। ঝড় বৃষ্টি হইবে। কুন্দকে কে আশ্রয় দিবে?

দেখ, তুমি গবাক্ষ মুক্ত করিয়াছ, ঝাঁকে ঝাঁকে পতঙ্গ আসিয়া তোমার শর্য্যাগৃহে প্রবেশ করিতেছে। কুন্দ মনে করিতেছে, কি পুণ্য করিলে পতঙ্গজন্ম হয়। কুন্দ! পতঙ্গ যে পুড়িয়া মরে! কুন্দ তাই চায়। মনে করিতেছে,"আমি পুড়িলাম—মরিলাম না কেন?"

নগেন্দ্র সাসী বন্ধ করিয়া সরিয়া গেলেন। নির্দ্দয়! ইহাতে কি ক্ষতি! না, তোমার রাত্রি জাগিয়া কাজ নাই—নিদ্রা যাও—শরীর অসুস্থ হইবে। কুন্দনন্দিনী মরে, মরুক। তোমার মাথা না ধরে, কুন্দনন্দিনীর কামনা এই।

এখন আলোকময় গবাক্ষ যেন অন্ধকার হইল। চাহিয়া, চাহিয়া, চক্ষের জল মুছিয়া কুন্দনন্দিনী উঠিল। সম্মুখে যে পথ পাইল—সেই পথে চলিল। কোথায় চলিল? নিশাচর পিশাচ ঝাউগাছেরা সর্ সর্ শব্দ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাও?" তালগাছেরা তর্ তর্ শব্দ করিয়া বলিল, "কোথায় যাও।" পেচক গম্ভীর নাদে বলিল, "কোথায় যাও?" উজ্জ্বল গবাক্ষশ্রেণী বলিতে লাগিল, "যায় যাউক—আমরা আর নগেন্দ্র দেখাইব না।" তবু কুন্দনন্দিনী—নির্ব্বোধ কুন্দনন্দিনী ফিরিয়া ফিরিয়া সেই দিকে চাহিতে লাগিল।

কুন্দ চলিল, চলিল—কেবল চলিল। আকাশে আরও মেঘ ছুটিতে লাগিল—মেঘ সকল একত্র হইয়া আকাশেও রাত্রি করিল—বিদ্যুৎ হাসিল—আবার হাসিল—আবার! বায়ু গর্জ্জিল, মেঘ গর্জ্জিল—বায়ুতে মেঘেতে একত্র হইয়া গর্জ্জিল। আকাশ আর রাত্রি একত্র হইয়া গর্জ্জিল। কুন্দ! কোথায় যাইবে?

ঝড় উঠিল। প্রথমে শব্দ, পরে ধূলি উঠিল, পরে গাছের পাতা ছিঁড়িয়া লইয়া বায়ু স্বয়ং আসিল! শেষে পিট্ পিট্!—পট্!—হু হু! বৃষ্টি আসিল। কুন্দ! কোথায় যাইবে?

বিদ্যুতের আলোকে পথিপার্শ্বে কুন্দ একটা সামান্য গৃহ দেখিল। গৃহের চতুষ্পার্শে মৃৎপ্রাচীর; মৃৎপ্রাচীরের ছোট চাল! কুন্দনন্দিনী আসিয়া তাহার আশ্রয়ে, দ্বারের নিকটে বসিল। দ্বারে পিঠ রাখিয়া বসিল। দ্বার পিঠের স্পর্শে শব্দিত হইল। গৃহস্থ সজাগ, দ্বারের শব্দ তাহার কাণে গেল। গৃহস্থ মনে করিল, ঝড়; কিন্তু তাহার

দ্বারে একটা কুক্কুর শয়ন করিয়া থাকে—সেটা উঠিয়া ডাকিতে লাগিল। গৃহস্থ তখন ভয় পাইল। আশঙ্কায় দ্বার খুলিয়া দেখিতে আইল। দেখিল, আশ্রয়হীনা স্ত্রীলোকমাত্র। জিজ্ঞাসা করিল, " কে গা তুমি?"

কুন্দ কথা কহিল না।

"কে রে, মাগি?"

কুন্দ বলিল, " বৃষ্টির জন্য দাঁড়াইয়াছি।"

গৃহস্থ ব্যগ্রভাবে বলিল, "কি? কি? কি? আবার বল ত?"

কুন্দ বলিল, " বৃষ্টির জন্য দাঁড়াইয়াছি।"

গৃহস্থ বলিল, "ও গলা যে চিনি। বটে? ঘরের ভিতর এস ত।"

গৃহস্থ কুন্দকে ঘরের ভিতর লইয়া গেল। আগুন করিয়া আলো জ্বালিল। কুন্দ তখন দেখিল—হীরা।

হীরা বলিল, "বুঝিয়াছি, তিরস্কারে পলাইয়াছ। ভয় নাই। আমি কাহারও সাক্ষাতে বলিব না। আমার এইখানে দুই দিন থাক।"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ : হীরার রাগ

হীরার বাড়ী প্রাচীর আঁটা। দুইটি ঝর্‌ঝোরে মেটে ঘর। তাহাতে আলেপনা—পদ্ম আঁকা—পাখী আঁকা—ঠাকুর আঁকা। উঠান নিকান—এক পাশে রাঙ্গা শাক, তার কাছে দোপাটি, মল্লিকা, গোলাপ ফুল। বাবুর বাড়ীর মালী আপনি আসিয়া চারা আনিয়া ফুলগাছ পুতিয়া দিয়া গিয়াছিল—হীরা চাহিলে, চাই কি বাগান শুদ্ধই উহার বাড়ী তুলিয়া দিয়া যায়। মালীর লাভের মধ্যে এই, হীরা আপন হাতে তামাকু সাজিয়া দেয়। হীরা, কালো—চুড়ি পরা হাতখানিতে হুঁক্কা ধরিয়া মালীর হাতে দেয়, মালী বাড়ী গিয়া রাত্রে তাই ভাবে।

হীরার বাড়ী হীরার আয়ী থাকে, আর হীরা। এক ঘরে আয়ী, এক ঘরে হীরা শোয়। হীরা কুন্দকে আপনার কাছে বিছানা করিয়া রাত্রে শুয়াইল। কুন্দ শুইল—ঘুমাইল না। পরদিন তাহাকে সেইখানে রাখিল। বলিল, "আজি কালি দুই দিন থাক; দেখ, রাগ না পড়ে, পরে যেখানে ইচ্ছা, সেইখানে যাইও।" কুন্দ রহিল। কুন্দের ইচ্ছানুসারে তাহাকে লুকাইয়া রাখিল। ঘরে চাবি দিল, আয়ী না দেখে। পরে বাবুর বাড়ীতে কাজে গেল। দুই প্রহর বেলায় আয়ী যখন স্নানে যায়, হীরা তখন আসিয়া কুন্দকে স্নানাহার করাইল। আবার চাবি দিয়া চলিয়া গেল। রাত্রে আসিয়া চাবি খুলিয়া উভয়ে শয্যা রচনা করিল।

"টিট্—কিট্—খিট্—খিটি—খাট্" বাহির দুয়ারের শিকল সাবধানে নড়িল। হীরা বিস্মিত হইল। একজনমাত্র কখনও কখনও রাত্রে শিকল নাড়ে। সে বাবুর বাড়ীর দ্বারবান্, রাত ভিত ডাকিতে আসিয়া শিকল নাড়ে। কিন্তু তাহার হাতে শিকল অমন মধুর বলে না, তাহার হাতে শিকল নাড়িলে, বলে, "কট কট কটাঃ তোর মাথা মুণ্ড উঠা! কড়ু কড়ু কড়াং! খিল খোল নয় ভাঙ্গি ঠ্যাং।" তা ত শিকল বলিল না। এ শিকল বলিতেছে, "কিট্ কিট্ কিটি! দেখি কেমন আমার হীরেটি? খিট খাট্ ছন্! উঠলো আমার হীরামন্—! ঠিট্ ঠিট্ ঠিটি্ ঠিনিক্—আয় রে আমার হীরা মাণিক।" হীরা উঠিয়া দেখিতে গেল; বাহির দুয়ার খুলিয়া দেখিল, স্ত্রীলোক। প্রথমে চিনিতে পারিল না, পরেই চিনিল—"কে ও গঙ্গাজল! এ কি ভাগ্য!" হীরার গঙ্গাজল মালতী গোয়ালিনী। মালতী গোয়ালিনীর বাড়ী দেবীপুর—দেবেন্দ্র বাবুর

বাড়ীর কাছে—বড় রসিকা স্ত্রীলোক। বয়স বৎসর ত্রিশ বত্রিশ, সাড়ী পরা, হাতে রুলি, মুখে পানের রাগ। মালতী গোয়ালিনী প্রায় গৌরাঙ্গী—একটু রৌদ্রপোড়া—মুখে রাঙ্গা রাঙ্গা দাগ, নাক, খাঁদা—কপালে উল্কি। কসে তামাকুপোড়া টেপা আছে। মালতী গোয়ালিনী দেবেন্দ্র বাবুর দাসী নহে—আশ্রিতাও নহে—অথচ তাঁহার বড় অনুগত—অনেক ফরমায়েস—যাহা অন্যের অসাধ্য, তাহা মালতী সিদ্ধ করে। মালতীকে দেখিয়া চতুরা হীরা বলিল, " ভাই গঙ্গাজল! অন্তিম কালে যেন তোমায় পাই! কিন্তু এখন কেন?"

গঙ্গাজল চুপি চুপি বলিল, "তোকে দেবেন্দ্র বাবু ডেকেছে।"

হীরা কাদা মাখে, হাসিয়া বলিল, "তুই কিছু পাবি নাকি?"

মালতী দুই অঙ্গুলের দ্বারা হীরাকে মারিল, বলিল, "মরণ আর কি! তোর মনের কথা তুই জানিস্! এখন চ।"

হীরা ইহাই চায়। কুন্দকে বলিল, "আমার বাবুর বাড়ী যেতে হলো—ডাকিতে এসেছে! কে জানে কেন?" বলিয়া প্রদীপ নিবাইল এবং অন্ধকারে কৌশলে বেশভুষা করিয়া মালতীর সঙ্গে যাত্রা করিল। দুই জনে অন্ধকারে গলা মিলাইয়া—

"মনের মতন রতন পেলে যতন করি তায়
সাগর ছেঁচে তুলবো নাগর পতন করে কায়ঃ"

ইতি গীত গায়িতে গায়িতে চলিল।

দেবেন্দ্রের বৈঠকখানায় হীরা একা গেল। দেবেন্দ্র দেবীর আরাধনা করিতেছিলেন, কিন্তু আজি সরু কাটিতেছিলেন। জ্ঞান টন্‌টনে! হীরার সঙ্গে আজ অন্য প্রকার সম্ভাষণ করিলেন। স্তবস্তুতি কিছুই নাই। বলিলেন, "হীরে, সে দিন আমি অধিক মদ খাইয়া তোমার কথার মর্ম্ম কিছুই গ্রহণ করিতে পারি নাই। কেন আসিয়াছিলে? সেই কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইয়াছি।"

হী। কেবল আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলাম।

দেবেন্দ্র হাসিলেন। বলিলেন, "তুমি বড় বুদ্ধিমতী। ভাগ্যক্রমে নগেন্দ্র বাবু তোমার মত দাসী পেয়েছেন। বুঝিলাম তুমি হরিদাসী বৈষ্ণবীর তত্ত্বে এসেছিলে। আমার মনের কথা জানিতে এসেছিলে। কেন আমি বৈষ্ণবী সাজি, কেন দত্তবাড়ী যাই, এই কথা জানিতে আসিয়াছিলে। তাহা একপ্রকার জানিয়াও গিয়াছ। আমিও তোমার কাছে সে কথা লুকাইব না। তুমি প্রভুর কাজ করিয়া প্রভুর কাছে পুরস্কার পাইয়াছ, সন্দেহ নাই। এখন আমার একটি কাজ কর, আমিও পুরস্কার করিব।"

মহাপাপে নিমগ্ন যাহাদিগের চরিত্র, তাহাদিগের সকল কথা স্পষ্ট করিয়া লেখা বড় কষ্টকর। দেবেন্দ্র, হীরাকে বহুল অর্থের লোভ প্রদর্শন করিয়া, কুন্দকে বিক্রয় করিতে বলিলেন। শুনিয়া ক্রোধে হীরার পদ্মপলাশ চক্ষু রক্তময় হইল—কর্ণরন্ধ্রে অগ্নিবৃষ্টি হইল। হীরা গাত্রোত্থান করিয়া কহিল, "মহাশয়! আমি দাসী বলিয়া এরূপ কথা বলিলেন। ইহার উত্তর আমি দিতে পারিব না। আমার মুনিবকে বলিব। তিনি ইহার উপযুক্ত উত্তর দিবেন।"

এই বলিয়া হীরা বেগে প্রস্থান করিল। দেবেন্দ্র ক্ষণেককাল অপ্রতিভ এবং ভগ্নোৎসাহ হইয়া নীরব হইয়াছিলেন। পরে প্রাণ ভরিয়া দুই গ্লাস ব্র্যাণ্ডি পান করিলেন। তখন প্রকৃতিস্থ হইয়া মৃদু মৃদু গান গায়িলেন।

“এসেছিল বক্‌না গোরু পর-গোয়ালে জাব্‌না খেতে–”

বিংশ পরিচ্ছেদ : হীরার দ্বেষ

প্রাতে উঠিয়া হীরা কাজে গেল। দত্তের বাড়ীতে দুই দিন পর্য্যন্ত বড় গোল, কুন্দকে পাওয়া যায় না। বাড়ীর সকলেই জানিল যে, সে রাগ করিয়া গিয়াছে, পাড়াপ্রতিবাসীরা কেহ জানিল, কেহ জানিল না। নগেন্দ্র শুনিলেন যে, কুন্দ গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছে–কেন গিয়াছে, কেহ তাহা শুনাইল না। নগেন্দ্র ভাবিলেন, আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা শুনিয়া, কুন্দ আমার গৃহে আর থাকা অনুচিত বলিয়া চলিয়া গিয়াছে। যদি তাই, তবে কমলের সঙ্গে গেল না কেন? নগেন্দ্রের মুখ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া রহিল। কেহ তাঁহার নিকটে আসিতে সাহস করিল না। সূর্য্যমুখীর কি দোষ, তাহা কিছু জানিলেন না, কিন্তু সূর্য্যমুখীর সঙ্গে আলাপ বন্ধ করিলেন। গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় কুন্দনন্দিনীর সন্ধানার্থ স্ত্রীলোক চর পাঠাইলেন।

সূর্য্যমুখী রাগে বা ঈর্ষ্যার বশীভূত হইয়া, যাহাই বলুন, কুন্দের পলায়ন শুনিয়া অতিশয় কাতর হইলেন। বিশেষ কমলমণি বুঝাইয়া দিলেন যে, দেবেন্দ্র যাহা বলিয়াছিল, তাহা কদাচ বিশ্বাসযোগ্য নহে। কেন না, দেবেন্দ্রের সহিত গুপ্ত প্রণয় থাকিলে, কখন অপ্রচার থাকিত না। আর কুন্দের যেরূপ স্বভাব, তাহাতে কদাচ ইহা সম্ভব বোধ হয় না। দেবেন্দ্র মাতাল, মদের মুখে মিথ্যা বড়াই করিয়াছে। সূর্য্যমুখী এ সকল কথা বুঝিলেন, এজন্য অনুতাপ কিছু গুরুতর হইল। তাহাতে আবার স্বামীর বিরাগে আরও মর্ম্মব্যথা পাইলেন। শত বার কুন্দকে গালি দিতে লাগিলেন, সহস্র বার আপনাকে গালি দিলেন। তিনিও কুন্দের সন্ধানে লোক পাঠাইলেন।

কমল কলিকাতায় যাওয়া স্থগিত করিলেন। কমল কাহাকেও গালি দিলেন না–সূর্য্যমুখীকেও অনুমাত্র তিরস্কার করিলেন না। কমল গলা হইতে কণ্ঠহার খুলিয়া লইয়া গৃহস্থ সকলকে দেখাইয়া বলিলেন, “যে কুন্দকে আনিয়া দিবে, তাহাকে এই হার দিব।”

পাপ হীরা এই সব দেখে শুনে, কিন্তু কিছু বলে না। কমলের হার দেখিয়া এক একবার লোভ হইয়াছিল–কিন্তু সে লোভ সম্বরণ করিল। দ্বিতীয় দিন কাজ করিয়া দুই প্রহরের সময়ে, আয়ীর স্নানের সময় বুঝিয়া, কুন্দকে খাওয়াইল। পরে রাত্রে আসিয়া উভয়ে শয্যারচনা করিয়া শয়ন করিল। কুন্দ বা হীরা কেহই নিদ্রা গেল না–কুন্দ আপনার মনের দুঃখে জাগিয়া রহিল। হীরা আপন মনের সুখ-দুঃখে জাগিয়া রহিল। সেও কুন্দের ন্যায় বিছানায় শুইয়া চিন্তা করিতেছিল। যাহা চিন্তা করিতেছিল, তাহা মুখে অবাচ্য–অতি গোপন।

ও হীরে! ছি! ছি! হীরে! মুখখানি ত দেখিতে মন্দ নয়–বয়সও নবীন, তবে হৃদয়মধ্যে এত খলকপট কেন? কেন? বিধাতা তাহাকে ফাঁকি দিল কেন? বিধাতা তাহাকে ফাঁকি দিয়াছে, সেও সকলকে ফাঁকি দিতে চায়। হীরাকে সূর্য্যমুখীর আসনে বসাইলে, হীরার কি খলকপট থাকিত? হীরা বলে, “না।” হীরাকে হীরার আসনে বসাইয়াছে বলিয়াই হীরা, হীরা। লোক বলে, “সকলই দুষ্টের দোষ।” দুষ্ট বলে, “আমি ভাল মানুষ হইতাম–কিন্তু লোকের দোষে দুষ্ট হইয়াছি।” লোকে বলে, “পাঁচ কেন সাত হইল না?” পাঁচ বলে, “আমি সাত হইতাম–কিন্তু দুই আর পাঁচে সাত–বিধাতা, অথবা বিধাতার সৃষ্ট লোক যদি আমাকে আর দুই দিত, তা হইলেই আমি সাত হইতাম।” হীরা তাহাই ভাবিতেছিল।

হীরা ভাবিতেছিল–“এখন কি করি?” পরমেশ্বর যদি সুবিধা করিয়া দিয়াছেন, তবে আপনার দোষে সব নষ্ট না হয়। এদিকে যদি কুন্দকে দত্তের বাড়ী ফিরিয়া

লইয়া যাই, তবে কমল হার দিবে, গৃহিণীও কিছু দিবেন—বাবুকেই কি ছাড়িব? আর যদি এদিকে কুন্দকে দেবেন্দ্র বাবুর হাতে দিই, তা হলে অনেক টাকা নগদ পাই। কিন্তু সে ত প্রাণ থাকিতে পারিব না। আচ্ছা, দেবেন্দ্র কুন্দকে কি এত সুন্দরী দেখেছে? আমরা গতর খাটিয়ে খাই, আমরা যদি ভাল খাই, ভাল পরি, পটের বিবির মত ঘরে তোলা থাকি, তা হলে আমরাও অমন হতে পারি। আর এটা মিন্‌মিনে ঘ্যান্‌ঘেনে, প্যান্‌পেনে, সে দেবেন্দ্র বাবুর মর্ম্ম বুঝিবে কি? পাঁক নইলে পদ্মফুল ফুটে না, আর কুন্দ নইলে দেবেন্দ্র বাবুর মনোহরণ হয় না! তা যার কপালে যা, আমি রাগ করি কেন? রাগ করি কেন? হাঃ কপাল! আর মনকে চোখ ঠার্‌য়ে কি হবে? ভালবাসার কথা শুনিলে হাসিতাম। বলিতাম, ও সব মুখের কথা, লোকে একটা প্রবাদ আছে মাত্র। এখন আর ত হাসিব না। মনে করিয়াছিলাম, যে ভালবাসে, সে বাসুক, আমি ত কখনও কাহাকে ভালবাসিব না। ঠাকুর বল্লে, রহ, তোরে মজা দেখাচ্ছি। শেষে বেগারের দৌলতে গঙ্গাস্নান। পরের চোর ধরতে গিয়ে আপনার প্রাণটা চুরি গেল! কি মুখখানি! কি গড়ন! কি গলা! অন্য মানুষের কি এমন আছে? আবার মিন্সে আমায় বলে, কুন্দকে এনে দে! আর বলতে লোক পেলেন না। মারি মিন্সের নাকে এক কিল। আহা, তার নাকে কিল মেরেও সুখ। দূর হোক, ও সব কথা যাক্। ও পথেও ধর্ম্মের কাঁটা। এ জন্মের সুখ দুঃখ অনেক কাল ঠাকুরকে দিয়াছি। তাই বলিয়া কুন্দকে দেবেন্দ্রের হাতে দিতে পারিব না। সে কথা মনে হলেও গা জ্বালা করে; বরং কুন্দ যাহাতে কখনও তার হাতে না পড়ে তাই করিব। কি করিলে তাহা হয়? কুন্দ যেখানে ছিল, সেইখানে থাকিলেই তার হাতছাড়া। সেই বৈষ্ণবীই সাজুক, আর বাসদেবই সাজুক, সে বাড়ীর ভিতর দন্তস্ফুট হইবে না। তবে সেইখানে কুন্দকে ফিরিয়া রাখিয়া আসাই মত। কিন্তু কুন্দ যাইবে না—আর সে বাড়ীমুখো হইবার মত নাই। কিন্তু যদি সবাই মিলে 'বাপু বাছা' বলে লইয়া যায়, তবে যাইতেও পারে। আর একটা আমার মনের কথা আছে, ঈশ্বর তাহা কি করবেন? সূর্য্যমুখীর থোঁতা মুখ ভোঁতা হবে? দেবতা করিলে হতেও পারে। আচ্ছা, সূর্য্যমুখীর উপর আমার এত রাগই বা কেন? সে ত কখন আমার কিছু মন্দ করে নাই; বরং ভালই বাসে, ভালই করে। তবে রাগ কেন? তা কি হীরা জানে না? হীরা না জানে কি? কেন, বলবো? সূর্য্যমুখী সুখী, আমি দুঃখী, এই জন্য আমার রাগ। সে বড়, আমি ছোট,—সে মুনিব, আমি বাঁদী। সুতরাং তার উপরে আমার বড় রাগ। যদি বল, ঈশ্বর তাকে বড় করিয়াছেন, তার দোষ কি? আমি তার হিংসা করি কেন? তাতে আমি বলি, ঈশ্বর আমাকে হিংসুকে করেছেন, আমারই বা দোষ কি? তা, আমি খানখা তার মন্দ করিতে চাই না, কিন্তু যদি তার মন্দ করিলে আমার ভাল হয়, তবে না করি কেন? আপনার ভাল কে না করে? তা, হিসাব করিয়া দেখি, কিসে কি হয়। এখন, আমার হলো কিছু টাকার দরকার, আর দাসীপনা পারি না। টাকা আসিবে কোথা থেকে? দত্তবাড়ী বই আর টাকা কোথা? তা দত্তবাড়ীর টাকা নেবার ফিকির এই,—সবাই জানে যে, কুন্দের উপর নগেন্দ্র বাবুর চোখ পড়েছে—বাবু এখন কুন্দমন্ত্রের উপাসক। বড়মানুষ লোক, মনে করিলেই পারে। পারে না কেবল সূর্য্যমুখীর জন্য। যদি দুজনে একটা চটাচটি হয়, তা হলে আর বড় সূর্য্যমুখীর খাতির করবে না। এখন যাতে একটু চটাচটি হয়, সেইটে আমায় করিতে হবে।

"তা হলেই বাবু ষোড়শোপচারে কুন্দের পূজা আরম্ভ করিবেন। এখন কুন্দ হলো বোকা মেয়ে, আমি হলেম সেয়ানা মেয়ে; আমি কুন্দকে শীঘ্র বশ করিতে পারিব। এরই মধ্যে তাহার অনেক যোগাড় হয়ে রয়েছে। মনে করলে, কুন্দকে যা ইচ্ছা করি, তাই করাতে পারি। আর যদি বাবু কুন্দের পূজা আরম্ভ করেন, তবে তিনি হবেন কুন্দের আজ্ঞাকারী। কুন্দকে করবো আমার আজ্ঞাকারী। সুতরাং পূজার ছোলাটা কলাটা আমিও পাব। যদি আর দাসীপনা করিতে না হয়, এমনটা হয়, তা হলেই আমার হলো। দেখি, দুর্গা কি করেন। নগেন্দ্রকে কুন্দনন্দিনী দিব। কিন্তু হঠাৎ না। আগে কিছু দিন লুকিয়ে রেখে দেখি। প্রেমের পাক বিচ্ছেদে। বিচ্ছেদে বাবুর ভালবাসাটা পেকে আসবে। সেই সময়ে কুন্দকে বাহির করিয়া দিব। তাতে যদি সূর্য্যমুখীর কপাল না ভাঙ্গে, তবে তার বড় জোর কপাল। তত দিন আমি বসে বসে কুন্দকে উঠ্ বস্ করান মক্‌শ করাই। আগে আয়ীকে কামারঘাটা পাঠাইয়া দিই, নহিলে কুন্দকে আর লুকিয়ে রাখা যায় না।"

এইরূপ কল্পনা করিয়া পাপিষ্ঠ হীরা সেইরূপ আচরণে প্রবৃত্ত হইল। ছল করিয়া আয়ীকে কামারঘাটা গ্রামে কুটুম্ববাড়ী পাঠাইয়া দিল এবং কুন্দকে অতি সঙ্গোপনে আপন বাড়ীতে রাখিল। কুন্দ, তাহার যত্ন ও সহৃদয়তা দেখিয়া ভাবিতে লাগিল, "হীরার মত মানুষ আর নাই। কমলও আমায় এত ভালবাসে না।"

একবিংশ পরিচ্ছেদ : হীরার কলহ-বিষবৃক্ষের মুকুল

তা ত হলো। কুন্দ বশ হবে! কিন্তু সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের দুই চক্ষের বিষ না হলে ত কিছুতেই কিছু হবে না। গোড়ার কাজ সেই। হীরা এক্ষণে তাহাদের অভিন্ন হৃদয় ভিন্ন করিবার চেষ্টায় রহিল।

এক দিন প্রভাত হইলে পাপ হীরা মুনিব-বাড়ী আসিয়া গৃহকার্য্যে প্রবৃত্তা হইল। কৌশল্যানাম্নী আর একজন পরিচারিকা দত্তগৃহে কাজ করিত, এবং হীরা প্রধানা বলিয়া ও প্রভুপত্নীর প্রসাদপুরস্কারভাগিনী বলিয়া তাহার হিংসা করিত। হীরা তাহাকে বলিল, "কুশি দিদি! আজ আমার গা কেমন কেমন করতেছে, তুই আমার কাজগুলি কর্ না?" কৌশল্যা হীরাকে ভয় করিত, অগত্যা স্বীকৃত হইয়া বলিল, "তা করিব বৈ কি। সকলেরই ভাই শরীরের ভাল মন্দ আছে—তা এক মুনিবের চাকর–করিব না?" হীরার ইচ্ছা ছিল যে, কৌশল্যা যে উত্তর দিউক না, তাহাতেই ছল ধরিয়া কলহ করিবে। অতএব তখন মস্তক হেলাইয়া, তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া কহিল, "কি লা কুশি–তোর যে বড় আস্পর্দ্ধা দেখতে পাই? তুই গালি দিস্।" কৌশল্যা চমৎকৃত হইয়া বলিল, "আ মরি! আমি কখন গালি দিলাম?"

হীরা। আ মলো! আবার বলে কখন গাল দিলাম? কেন শরীরের ভাল মন্দ কি লা? আমি কি মরতে বসেছি না কি? আমাকে শরীরের ভাল মন্দ দেখাবেন, আবার লোকে বোলবে, উনি আশীর্ব্বাদ করলেন! তোর শরীরের ভাল মন্দ হউক।

কৌ। হয় হউক। তা বন্ রাগ করিস্ কেন? মরিতে ত হবেই এক দিন–যম ত আর তোকেও ভুলবে না, আমাকেও ভুলবে না।

হীরা। তোমাকে যেন প্রাতর্ব্বাক্যে কখনও না ভোলে। তুমি আমার হিংসায় মর! তুমি যেন হিংসাতেই মর! শীগ্গির অল্লাই যাও, নিপাত যাও, নিপাত যাও, নিপাত যাও! তুমি যেন দুটি চক্ষের মাথা খাও!

কৌশল্যা আর সহ্য করিতে পারিল না। তখন কৌশল্যাও আরম্ভ করিল, "তুমি দুটি চক্ষের মাথা খাও! তুমি নিপাত যাও! তোমায় যেন যম না ভোলে! পোড়ারমুখি! আবাগি! শতেক খোয়ারি!" কোন্দল-বিদ্যায় হীরার অপেক্ষা কৌশল্যা পটুতরা। সুতরাং হীরা পাটকেলটি খাইল।

হীরা তখন প্রভুপত্নীর নিকট নালিশ করিতে চলিল। যাইবার সময়ে যদি হীরার মুখ কেহ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিত, তবে দেখিতে পাইত যে, হীরার ক্রোধলক্ষণ কিছুই নাই, বরং অধরপ্রান্তে একটু হাসি আছে। হীরা সূর্য্যমুখীর নিকট যখন গিয়া উপস্থিত হইল, তখন বিলক্ষণ ক্রোধলক্ষণ–এবং সে প্রথমেই স্ত্রীলোকের ঈশ্বরদত্ত অস্ত্র ছাড়িল অর্থাৎ কাঁদিয়া দেশ ভাসাইল।

সূর্য্যমুখী নালিশী আর্‌জি মোলাহেজা করিয়া, বিহিত বিচার করিলেন। দেখিলেন, হীরারই দোষ। তথাপি হীরার অনুরোধে কৌশল্যাকে যৎকিঞ্চিৎ অনুযোগ করিলেন। হীরা তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বলিল, "ও মাগীকে ছাড়াইয়া দাও, নহিলে আমি থাকিব না।"

তখন সূর্য্যমুখী হীরার উপর বিরক্ত হইলেন। বলিলেন, "হীরা তোর বড় আদর বাড়িয়াছে! তুই আগে দিলি গাল–দোষ সব তোর–আবার তোর কথায় ওকে ছাড়াইব? আমি এমন অন্যায় করিতে পারিব না–তোর যাইতে ইচ্ছা হয়, যা, আমি থাকিতে বলি না।"

হীরা ইহাই চায়। তখন “আচ্ছা, চল্লেম” বলিয়া হীরা চক্ষের জলে মুখ ভাসাইতে ভাসাইতে বহির্ব্বাটীতে বাবুর নিকট গিয়া উপস্থিত হইল।
বাবু বৈঠকখানায় একা ছিলেন—এখন একাই থাকিতেন। হীরা কাঁদিতেছে দেখিয়া নগেন্দ্র বলিলেন, “হীরে , “কাঁদিতেছিস্, কেন?”
হীরা। আমার মাহিনা পত্র হিসাব করিয়া দিতে হুকুম করুন।
ন। (সবিস্ময়ে সে কি? কি হয়েছে?)
হী। আমার জবাব হয়েছে। মা ঠাকুরাণী আমাকে জবাব দিয়েছেন।
ন। কি করেছিস্ তুই?
হী। কুশি আমাকে গালি দিয়াছিল—আমি নালিশ করিয়াছিলাম—তিনি তার কথায় বিশ্বাস করিয়া আমাকে জবাব দিলেন।
নগেন্দ্র মাথা নাড়িয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “সে কাজের কথা নয়, হীরে, আসল কথা কি বল।”
হীরা তখন ঋজু হইয়া বলিল, “আসল কথা, আমি থাকিব না।”
ন। কেন?
হী। মা ঠাকুরাণীর মুখ বড় এলোমেলো হয়েছে—কারে কখন কি বলেন, ঠিক নাই।
নগেন্দ্র ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তীব্রস্বরে বলিলেন, “সে কি?”
হীরা যাহা বলিতে আসিয়াছিল, তাহা এইবার বলিল, “সেদিন কুন্দঠাকুরাণীকে কি না বলিয়াছিলেন। শুনিয়া কুন্দঠাকুরাণী দেশত্যাগী হয়েছেন। আমাদের ভয়, পাছে আমাদের সেইরূপ কোন্ দিন কি বলেন,—আমরা তাহলে বাঁচিব না। তাই আগে হইতে সরিতেছি।”
ন। সে কি কথা?
হী। আপনার সাক্ষাতে লজ্জায় তা আমি বলিতে পারি না।
শুনিয়া নগেন্দ্রের ললাট অন্ধকার হইল। তিনি হীরাকে বলিলেন, “আজ বাড়ী যা। কাল ডাকাব।”
হীরার মনস্কাম সিদ্ধ হইল। সে এই জন্য কৌশল্যার সঙ্গে বচসা সৃজন করিয়াছিল।
নগেন্দ্র উঠিয়া সূর্য্যমুখীর নিকটে গেলেন। হীরা পা টিপিয়া টিপিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেল।
সূর্য্যমুখীকে নিভৃতে লইয়া গিয়া নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি হীরাকে বিদায় দিয়াছ?” সূর্য্যমুখী বলিলেন, “দিয়াছি।” অনন্তর হীরা ও কৌশল্যার বৃত্তান্ত সবিশেষ বিবৃত করিলেন। শুনিয়া নগেন্দ্র বলিলেন, “মরুক, তুমি কুন্দনন্দিনীকে কি বলিয়াছিলে?”
নগেন্দ্র দেখিলেন, সূর্য্যমুখীর মুখ শুকাইল। সূর্য্যমুখী অস্ফুটস্বরে বলিলেন, “কি বলিয়াছিলাম?”
ন। কোন দুর্ব্বাক্য?
সূর্য্যমুখী কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে যাহা বলা উচিত, তাহাই বলিলেন, বলিলেন, “তুমি আমার সর্ব্বস্ব। তুমি আমার ইহকাল, তুমি আমার পরকাল। তোমার কাছে কেন আমি লুকাইব? কখনও কোন কথা তোমার কাছে লুকাই নাই, আজ কেন এক জন পরের কথা তোমার কাছে লুকাইব? আমি কুন্দকে কুকথা বলিয়াছিলাম। পাছে তুমি রাগ কর বলিয়া তোমার কাছে ভরসা করিয়া বলি নাই। অপরাধ মার্জ্জনা করিও আমি সকল বলিতেছি।”

তখন সূর্য্যমুখী হরিদাসী বৈষ্ণবীর পরিচয় হইতে কুন্দনন্দিনীর তিরস্কার পর্য্যন্ত অকপটে সকল বিবৃত করিলেন। বলিয়া, শেষ কহিলেন, "আমি কুন্দনন্দিনীকে তাড়াইয়া আপনার মরমে আপনি মরিয়া আছি। দেশে দেশে তাহার তত্ত্বে লোক পাঠাইয়াছি। যদি সন্ধান পাইতাম, ফিরাইয়া আনিতাম। আমার অপরাধ লইও না।"

নগেন্দ্র তখন বলিলেন, "তোমার বিশেষ অপরাধ নাই, তুমি যেরূপ কুন্দের কলঙ্ক শুনিয়াছিলে, তাহাতে কোন্ ভদ্রলোকের স্ত্রী তাকে মিষ্ট কথা বলিবে, কি ঘরে স্থান দিবে? কিন্তু একবার ভাবিলে ভাল হইত যে, কথাটা সত্য কি না?"

সূর্য্য। তখন সে কথা ভাবি নাই। এখন ভাবিতেছি।

ন। ভাবিলে না কেন?

সূর্য্য। আমার মনের ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল। বলিতে বলিতে সূর্য্যমুখী—পতিপ্রাণা সাধ্বী—নগেন্দ্রের চরণপ্রান্তে ভূতলে উপবেশন করিলেন, এবং নগেন্দ্রের উভয় চরণ দুই হস্তে গ্রহণ করিয়া নয়নজলে সিক্ত করিলেন। তখন মুখ তুলিয়া বলিলেন, "প্রাণাধিক তুমি। কোন কথা এ পাপ মনের ভিতর থাকিতে তোমার কাছে লুকাইব না। আমার অপরাধ লইবে না?"

নগেন্দ্র বলিলেন, "তোমায় বলিতে হইবে না। আমি জানি, তুমি সন্দেহ করিয়াছিলে যে, আমি কুন্দনন্দিনীতে অনুরক্ত।"

সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের যুগল চরণে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আবার সেই শিশিরসিক্ত—কমলতুল্য ক্লিষ্ট মুখমণ্ডল উন্নত করিয়া, সর্ব্বদুঃখাপহারী স্বামীমুখপ্রতি চাহিয়া বলিলেন, "কি বলিব তোমায়? আমি যে দুঃখ পাইয়াছি, তাহা কি তোমায় বলিতে পারি? মরিলে পাছে তোমার দুঃখ বাড়ে, এই জন্য মরি নাই। নহিলে যখন জানিয়াছিলাম, অন্যা তোমার হৃদয়ভাগিনী—আমি তখন মরিতে চাহিয়াছিলাম। মুখের মরা নহে—যেমন সকলে মরিতে চাহে, তেমন মরা নহে; আমি যথার্থ আন্তরিক অপকটে মরিতে চাহিয়াছিলাম। আমার অপরাধ লইও না।"

নগেন্দ্র অনেকক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া, শেষ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "সূর্য্যমুখী! অপরাধ সকলই আমার। তোমার অপরাধ কিছুই নাই। আমি যথার্থ তোমার নিকট বিশ্বাসহন্তা। যথার্থই আমি তোমাকে ভুলিয়া কুন্দনন্দিনীতে—কি বলিব? আমি যে যন্ত্রণা পাইয়াছি, যে যন্ত্রণা পাইতেছি, তাহা তোমাকে কি বলিব? তুমি মনে করিয়াছ, আমি চিত্ত দমনের চেষ্টা করি নাই; এমত ভাবিও না। আমি যত আমাকে তিরস্কার করিয়াছি, তুমি কখনও তত তিরস্কার করিবে না। আমি পাপাত্মা—আমার চিত্ত বশ হইল না।"

সূর্য্যমুখী আর সহ্য করিতে পারিলেন না, জোড়হাত করিয়া কাতরস্বরে বলিলেন, "যাহা তোমার মনে থাকে, থাক্—আমার কাছে আর বলিও না। তোমার প্রতি কথায় আমার বুকে শেল বিঁধিতেছে।—আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহা ঘটিয়াছে—আর শুনিতে চাহি না। এ সকল আমার অশ্রাব্য।"

"না। তা নয়, সূর্য্যমুখি! আরও শুনিতে হইবে। যদি কথা পাড়িলে, তবে মনের কথা ব্যক্ত করিয়া বলি—কেন না, অনেক দিন হইতে বলি বলি করিতেছি। আমি এ সংসার ত্যাগ করিব। মরিব না—কিন্তু দেশান্তরে যাইব। বাড়ী ঘর সংসারে আর সুখ নাই। তোমাতে আমার আর সুখ নাই। আমি তোমার অযোগ্য স্বামী। আমি আর কাছে থাকিয়া তোমাকে ক্লেশ দিব না। কুন্দনন্দিনীকে সন্ধান করিয়া আমি দেশ-দেশান্তরে ফিরিব। তুমি এ গৃহে গৃহিণী থাক। মনে মনে ভাবিও তুমি বিধবা—যাহার স্বামী এরূপ পামর, সে বিধবা নয় ত কি? কিন্তু আমি পামর হই আর যাই হই, তোমাকে প্রবঞ্চনা করিব না। আমি অন্যাগতপ্রাণ হইয়াছি—সে কথা তোমাকে স্পষ্ট বলিব; এখন আমি দেশত্যাগ করিয়া চলিলাম। যদি কুন্দনন্দিনীকে ভুলিতে পারি, তবে আবার আসিব! নচেৎ তোমার সঙ্গে এই সাক্ষাৎ!"

এই শেলসম কথা শুনিয়া সূর্য্যমুখী কি বলিবেন? কয়েক মুহূর্ত প্রস্তরময়ী মূর্ত্তিবৎ পৃথিবীপানে চাহিয়া রহিলেন। পরে সেই ভূতলে অধোমুখে শুইয়া পড়িলেন। মাটিতে মুখ লুকাইয়া সূর্য্যমুখী—কাঁদিলেন কি? হত্যাকারী ব্যাঘ্র যেরূপ হত জীবের যন্ত্রণা দেখে, নগেন্দ্র, সেইরূপ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন। মনে মনে বলিতেছিলেন, "সেই ত মরিতে হইবে—তার আজ কাল কি? জগদীশ্বরের ইচ্ছা,—আমি কি করিব? আমি কি মনে করিলে ইহার প্রতিকার করিতে পারি? আমি মরিতে পারি, কিন্তু তাহাতে সূর্য্যমুখী বাঁচিবে?"

না; নগেন্দ্র! তুমি মরিলে সূর্য্যমুখী বাঁচিবে না, কিন্তু তোমার মরাই ভাল ছিল।

দণ্ডেক পরে সূর্য্যমুখী উঠিয়া বসিলেন। আবার স্বামীর পায়ে ধরিয়া বলিলেন, "এক ভিক্ষা।"

ন। কি?

সু। আর এক মাস মাত্র গৃহে থাক। ইতিমধ্যে যদি কুন্দনন্দিনীকে না পাওয়া যায়, তবে তুমি দেশত্যাগ করিও। আমি মানা করিব না।

নগেন্দ্র মৌনভাবে বাহির হইয়া গেলেন। মনে মনে আর এক মাস থাকিতে স্বীকার করিলেন। সূর্য্যমুখীও তাহা বুঝিলেন। তিনি গমনশীল নগেন্দ্রের মূর্ত্তিপ্রতি চাহিয়াছিলেন। সূর্য্যমুখী মনে মনে বলিতেছিলেন, "আমার সর্ব্বস্ব ধন! তোমার পায়ের কাঁটাটি তুলিবার জন্য প্রাণ দিতে পারি। তুমি পাপ সূর্য্যমুখীর জন্য দেশত্যাগী হইবে? তুমি বড়, না আমি বড়?"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ : চোরের উপর বাটপাড়ি

হীরা দাসীর চাকরী গেল, কিন্তু দত্তবাড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধ ঘুচিল না। সে বাড়ীর সংবাদের জন্য হীরা সর্ব্বদা ব্যস্ত। সেখানকার লোক পাইলে ধরিয়া বসাইয়া গল্প ফাঁদে। কথার ছলে সূর্য্যমুখীর প্রতি নগেন্দ্রের কি ভাব, তাহা জানিয়া লয়। যে দিন কাহারও সাক্ষাৎ না পায়, সেদিন ছল করিয়া বাবুদের বাড়ীতেই আসিয়া বসে। দাসীমহলে পাঁচ রকম কথা পাড়িয়া অভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়া চলিয়া যায়।

এইরূপে কিছু দিন গেল। কিন্তু এক দিন একটি গোলযোগ উপস্থিত হইবার সম্ভবনা হইয়া উঠিল।—

দেবেন্দ্রের নিকট হীরার পরিচয়াবধি, হীরার বাড়ী মালতী গোয়ালিনীর কিছু ঘন ঘন যাতায়াত হইতে লাগিল। মালতী দেখিল, তাহাতে হীরা বড় সন্তুষ্টা নহে। আরও দেখিল, একটি ঘর প্রায় বন্ধ থাকে। সে ঘরে, হীরার বুদ্ধির প্রাখর্য্য হেতু, বাহির হইতে শিকল এবং তাহাতে তালা চাবি আঁটা থাকিত, কিন্তু এক দিন অকস্মাৎ মালতী আসিয়া দেখিল, তালা চাবি দেওয়া হয় নাই। মালতী হঠাৎ শিকল খুলিয়া দুয়ার ঠেলিয়া দেখিল। দেখিল, ঘর ভিতর হইতে বন্ধ। তখন সে বুঝিল, ইহার ভিতর মানুষ থাকে।

মালতী হীরাকে কিছু বলিল না, কিন্তু মনে মনে ভাবিতে লাগিল—মানুষটা কে? প্রথমে ভাবিল, পুরুষ মানুষ। কিন্তু কে কার কে, মালতী সকলই ত জানিত—এ কথা সে বড় মনে স্থান দিল না। শেষে তাহার মনে মনে সন্দেহ হইল—কুন্দই বা এখানে আছে। কুন্দের নিরুদ্দেশ হওয়ার কথা মালতী সকলই শুনিয়াছিল। এখন সন্দেহভঞ্জনার্থ শীঘ্র সদুপায় করিল। হীরা বাবুদিগের বাড়ী হইতে একটি হরিণশিশু আনিয়াছিল। সেটি বড় চঞ্চল বলিয়া বাঁধাই থাকিত। এক দিন মালতী তাহাকে আহার করাইতেছিল। আহার করাইতে করাইতে হীরার অলক্ষ্যে তাহার বন্ধন খুলিয়া দিল। হরিণশিশু মুক্ত হইবামাত্র বেগে বাহিরে পলায়ন করিল।

দেখিল, হীরা ধরিবার জন্য তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেল।
হীরা যখন ছুটিয়া যায়, মালতী তখন ব্যগ্রস্বরে ডাকিতে লাগিল, "হীরে! ও হীরে ! ও গঙ্গাজল!" হীরা দূরে গেলে মালতী আছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল, "ও মা! আমার গঙ্গাজল এমন হলো কেন?" এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কুন্দের দ্বারে ঘা মারিয়া কাতর স্বরে বলিতে লাগিল, "কুন্দ ঠাকরুণ! কুন্দ! শীঘ্র বাহির হও! গঙ্গাজল কেমন হয়েছে। "সুতরাং কুন্দ ব্যস্ত হইয়া দ্বার খুলিল। মালতী তাহাকে দেখিয়া হি হি করিয়া হাসিয়া পলাইল।
কুন্দ দ্বার রুদ্ধ করিল। পাছে হীরা তিরস্কার করে বলিয়া হীরাকে কিছু বলিল না।
মালতী গিয়া দেবেন্দ্রকে সন্ধান বলিল। দেবেন্দ্র স্থির করিলেন, স্বয়ং হীরার বাড়ী গিয়া এস্পার কি ওস্পার, যা হয় একটা করিয়া আসিবেন। কিন্তু সে দিন একটা "পার্টি" ছিল—সুতরাং জুটিতে পারিলেন না। পর দিন যাইবেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ : পিঞ্জরের পাখী

কুন্দ এখন পিঞ্জরের পাখী—"সতত চঞ্চল।" দুইটি ভিন্নদিগভিমুখগামিনী স্রোতস্বতী পরস্পরে প্রতিহত হইলে স্রোতোবেগে বাড়িয়াই উঠে। কুন্দের হৃদয়ে তাহাই হইল। এদিকে মহালজ্জা—অপমান—তিরস্কার—মুখ দেখাইবার উপায় নাই—সূর্য্যমুখী ত বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু সেই লজ্জাস্রোতের উপরে প্রণয়স্রোত আসিয়া পড়িল। পরস্পর প্রতিঘাতে প্রণয়প্রবাহই বাড়িয়া উঠিল। বড় নদীতে ছোট নদী ডুবিয়া গেল। সূর্য্যমুখীকৃত অপমান ক্রমে বিলুপ্ত হইতে লাগিল। সূর্য্যমুখী আর মনে স্থান পাইলেন না—নগেন্দ্রই সর্ব্বত্র। ক্রমে কুন্দ ভাবিতে লাগিল, "আমি কেন সে গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিলাম? দুটো কথায় আমার কি ক্ষতি হইয়াছিল? আামি ত নগেন্দ্রকে দেখিতাম। এখন যে একবারও দেখিতে পাই না। তা আমি কি আবার ফিরে সে বাড়ীতে যাব? তা যদি আমাকে তাড়াইয়া না দেয়, তবে আমি যাই। কিন্তু পাছে আবার তাড়াইয়া দেয়?" কুন্দনন্দিনী দিবানিশি মনোমধ্যে এই চিন্তা করিত। দত্তগৃহে প্রত্যাগমন কর্ত্তব্য কি না, এ বিচার আর বড় করিত না—সেটা দুই চারি দিনে স্থির সিদ্ধান্ত হইল যে, যাওয়াই কর্ত্তব্য—নহিলে প্রাণ যায়। তবে গেলে সূর্য্যমুখী পুনশ্চ দূরীকৃত করিবে কি না, ইহাই বিবেচ্য হইল। শেষে কুন্দের এমনই দুদ্দর্শা হইল যে, সে সিদ্ধান্ত করিল, সূর্য্যমুখী দূরীকৃতই করুক আর যাই করুক, যাওয়াই স্থির।
কিন্তু কি বলিয়া কুন্দ আবার গিয়া সে গৃহ-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইবে? একা ত যাইতে বড় লজ্জা করে—তবে হীরা যদি সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়, তা হলে যাওয়া হয়। কিন্তু হীরাকে মুখ ফুটিয়া বলিতে বড় লজ্জা করিতে লাগিল। মুখ ফুটিয়া বলিতেও পারিল না।
হৃদয়ও আর প্রাণাধিকের অদর্শন সহ্য করিতে পারে না। এক দিন দুই চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে কুন্দ শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিল। হীরা তখন নিদ্রিত। নিঃশব্দে কুন্দ দ্বারোদঘাটন করিয়া বাটীর বাহির হইল। কৃষ্ণপক্ষাবশেষে ক্ষীণচন্দ্র আকাশপ্রান্তে সাগরে নিক্ষিপ্তা বালিকা সুন্দরীর ন্যায় ভাসিতেছিল। বৃক্ষান্তরাল মধ্যে রাশি রাশি অন্ধকার লুকাইয়াছিল। অতি মন্দ শীতল বায়ুতে পথিপার্শ্বস্থ সরোবরের পদ্মপত্রশৈবালাদিসমাচ্ছন্ন জলের বীচিবিক্ষেপ হইতেছিল না। অস্পষ্টলক্ষ্য বৃক্ষাগ্রভাগ সকলের উপর নিবিড় নীল আকাশ শোভা পাইতেছিল। কুক্কুরেরা পথিপার্শ্বে নিদ্রা যাইতেছিল। প্রকৃতি স্নিগ্ধগাম্ভীর্য্যময়ী হইয়া শোভা পাইতেছিল। কুন্দ পথ অনুমান করিয়া দত্তগৃহাভিমুখে সন্দেহমন্দপদে চলিল। যাইবার আর কিছুই অভিপ্রায় নহে—যদি কোন সুযোগে একবার নগেন্দ্রকে দেখিতে পায়। দত্তগৃহে ফিরিয়া যাওয়া ত ঘটিতেছে না—যবে ঘটিবে, তবে ঘটিবে—ইতিমধ্যে এক দিন লুকাইয়া দেখিয়া আসিলে ক্ষতি কি? কিন্তু লুকাইয়া দেখিবে কখন? কি প্রকারে?

কুন্দ ভাবিয়া ভাবিয়া এই স্থির করিয়াছিল যে, রাত্রি থাকিতে দত্তদিগের গৃহসন্নিধানে গিয়া চারি দিকে বেড়াইব—কোন সুযোগে নগেন্দ্রকে বাতায়নে, কি প্রাসাদে, উদ্যানে, কি পথে দেখিতে পাইব। নগেন্দ্র প্রভাতে উঠিয়া থাকেন, কুন্দ তাঁহাকে দেখিতে পাইলেও পাইতে পারে। দেখিয়াই অমনি কুন্দ ফিরিয়া আসিবে। মনে মনে এইরূপ কল্পনা করিয়া কুন্দ শেষরাত্রে নগেন্দ্রের গৃহাভিমুখে চলিল। অট্টালিকাসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেখিল, তখন রাত্রি প্রভাত হইতে কিছু বিলম্ব আছে। কুন্দ পথপানে চাহিয়া দেখিল—নগেন্দ্র কোথাও নাই—ছাদপানে চাহিল, সেখানেও নগেন্দ্র নাই—বাতায়নেও নগেন্দ্র নাই। কুন্দ ভাবিল, এখনও তিনি বুঝি উঠেন নাই—উঠিবার সময় হয় নাই। প্রভাত হউক—আমি ঝাউতলায় বসি। কুন্দ ঝাউতলায় বসিল। ঝাউতলা বড় অন্ধকার। দুই একটি ঝাউয়ের ফল কি পল্লব মুট মুট করিয়া নীরমধ্যে খসিয়া পড়িতেছিল। মাথার উপরে বৃক্ষস্থ পক্ষীরা পাখা ঝাড়া দিতেছিল। অট্টালিকারক্ষক দ্বারবান্‌দিগের দ্বারা দ্বারোদ্ঘাটনের ও অবরোধের শব্দ মধ্যে মধ্যে শুনা যাইতেছিল। শেষ উষাসমাগমসূচক শীতল বায়ু বহিল।

তখন পাপিয়া স্বরলহরীতে আকাশ ভাসাইয়া মাথার উপর দিয়া ডাকিয়া গেল। কিছু পরে ঝাউগাছে কোকিল ডাকিল। শেষে সকল পক্ষী মিলিয়া গণ্ডগোল করিতে লাগিল। তখন কুন্দের ভরসা নিবিতে লাগিল—আর ত ঝাউতলায় বসিয়া থাকিতে পারে না, প্রভাত হইল—কেহ দেখিতে পাইবে। তখন প্রত্যাবর্ত্তনার্থে কুন্দ গাত্রোত্থান করিল। এক আশা মনে বড় প্রবলা হইল। অন্তঃপুরসংলগ্ন যে পুষ্পোদ্যান আছে—নগেন্দ্র প্রাতে উঠিয়া কোন কোন দিন সেইখানে বায়ুসেবন করিয়া থাকেন। হয়তো নগেন্দ্র এতক্ষণ সেইখানে পদচারণ করিতেছেন। একবার সে স্থান না দেখিয়া কুন্দ ফিরিতে পারিল না। কিন্তু সে উদ্যান প্রাচীরবেষ্টিত! খিড়কীর দ্বার মুক্ত না হইলে তাহার মধ্যে প্রবেশের পথ নাই। বাহির হইতেও তাহা দেখা যায় না। খিড়কীর দ্বার মুক্ত কি রুদ্ধ, ইহা দেখিবার জন্য কুন্দ সেই দিকে গেল।

দেখিল, দ্বার মুক্ত। কুন্দ সাহসে ভর করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। এবং উদ্যানপ্রান্তে ধীরে ধীরে আসিয়া এক বকুলবৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইল।

উদ্যানটি ঘন বৃক্ষলতাগুল্মরাজিপরিবৃত। বৃক্ষশ্রেণীমধ্যে প্রস্তররচিত সুন্দর পথ, স্থানে স্থানে শ্বেত, রক্ত , নীল, পীতবর্ণ, বহু কুসুমরাশিতে বৃক্ষাদি মণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে—তদুপরি প্রভাতমধুলুব্ধ মক্ষিকাসকল দলে দলে ভ্রমিতেছে, বসিতেছে, উড়িতেছে—গুন্ গুন্ শব্দ করিতেছে। এবং মনুষ্যের চরিত্রের অনুকরণ করিয়া একটা একটা বিশেষ মধুযুক্ত ফুলের উপর পালে পালে ঝুঁকিতেছে। বিচিত্রবর্ণ অতি ক্ষুদ্র পক্ষিগণ প্রস্ফুটিত পুষ্পগুচ্ছোপরি বৃক্ষফলবৎ আরোহণ করিয়া পুষ্পরসপান করিতেছে, কাহারও কণ্ঠ হইতে সপ্তস্বর সংমিলিত ধ্বনি নির্গত হইতেছে। প্রভাতবায়ুর মন্দ হিল্লোলে পুষ্পভারাবনত ক্ষুদ্র শাখা দুলিতেছে—পুষ্পহীন শাখাসকল দুলিতেছে না; কেন না, তাহারা নম্র নহে। কোকিল মহাশয় বকুলের ঝোপের মধ্যে কালবর্ণ লুকাইয়া গলা-বাজিতে সকলকে জিতিতেছেন। উদ্যানমধ্যস্থলে, একটি শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত লতামণ্ডপ। তাহা অবলম্বন করিয়া নানাবিধ লতা পুষ্পধারণ করিয়া রহিয়াছে এবংতাহার ধারে মৃত্তিকাধারে রোপিত সপুষ্প গুল্ম সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

কন্দুনন্দিনী বকুলান্তরাল হইতে উদ্যানমধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া নগেন্দ্রের দীর্ঘায়ত দেবমূর্ত্তি দেখিতে পাইল না। লতামণ্ডপ মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল যে, তাহার প্রস্তরনির্ম্মিত স্নিগ্ধ হর্ম্ম্যোপরি কেহ শয়ন করিয়া রহিয়াছে, কুন্দনন্দিনীর বোধ হইল, সেই নগেন্দ্র। ভাল করিয়া দেখিবার জন্য সে ধীরে ধীরে বৃক্ষের অন্তরালে অন্তরালে থাকিয়া অগ্রবর্ত্তিনী হইতে লাগিল। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময়ে লতামণ্ডপস্থ ব্যক্তি গাত্রোত্থান করিয়া বাহির হইল। হতভাগিনী কুন্দ দেখিল যে, সে নগেন্দ্র নহে, সূর্য্যমুখী।

কুন্দ তখন ভীতা হইয়া এক প্রস্ফুটিতা কামিনীর অন্তরালে দাঁড়াইল। ভয়ে অগ্রসর হইতেপারিলনা—পশ্চাদপসৃতও হইতে পারিল না। দেখিতে লাগিল, সূর্য্যমুখী

উদ্যানমধ্যে পুষ্প চয়ন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। যেখানে কুন্দ লুকাইয়া আছে, সূর্য্যমুখী ক্রমে সেই দিকে আসিতে লাগিলেন। কুন্দ দেখিল যে, ধরা পড়িলাম। শেষে সূর্য্যমুখী কুন্দকে দেখিতে পাইলেন। দূর হইতে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কে গা?"

কুন্দ ভয়ে নীরব হইয়া রহিল—পা সরিল না। সূর্য্যমুখী তখন নিকটে আসিলেন—দেখিলেন—চিনিলেন যে, কুন্দ। বিস্মিতা হইয়া কহিলেন, "কে, কুন্দ না কি?"

কুন্দ তখনও উত্তর করিতে পারিল না। সূর্য্যমুখী কুন্দের হাত ধরিলেন। বলিলেন, "কুন্দ! এসো—দিদি এসো! আর আমি তোমায় কিছু বলিব না।"

এই বলিয়া সূর্য্যমুখী হস্ত ধরিয়া কুন্দনন্দিনীকে অন্তঃপুরমধ্যে লইয়া গেলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ : অবতরণ

সেই দিন রাত্রে দেবেন্দ্র দত্ত একাকী ছদ্মবেশে, সুরারঞ্জিত হইয়া কুন্দনন্দিনীর অনুসন্ধানে হীরার বাড়ীতে দর্শন দিলেন। এ ঘর ও ঘর খুঁজিয়া দেখিলেন, কুন্দ নাই। হীরা মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল। দেবেন্দ্র রুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাসিস্ কেন?"

হীরা বলিল, "তোমার দুঃখ দেখে। পিঁজরার পাখী পলাইয়াছে—আমার খানাতল্লাসী করিলে পাইবে না।"

তখন দেবেন্দ্রর প্রশ্নে হীরা যাহা যাহা জানিত, আদ্যোপ্রান্ত কহিল। শেষে কহিল,"প্রভাতে তাহাকে না দেখিয়া অনেক খুঁজিলাম, খুঁজিতে খুঁজিতে বাবুদের বাড়ীতে দেখিলাম—এবার বড় আদর।"

দেবেন্দ্র হতাশ্বাস হইয়া ফিরিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু মনের সন্দেহ মিটিল না। ইচ্ছা, আর একটু বসিয়া ভাবগতিক বুঝিয়া যান। আকাশে একটু কাণা মেঘ ছিল, দেখিয়া বলিলেন, "বুঝি বৃষ্টি এলো।" অনন্তর ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। হীরার ইচ্ছা, দেবেন্দ্র একটু বসেন—কিন্তু সে স্ত্রীলোক—একাকিনী থাকে—তাহাতে রাত্রি—বসিতে বলিতে পারিল না। তাহা হইলে অধঃপাতের সোপানে আর এক পদ নামিতে হয়, তাহাও তাহার কপালে ছিল। দেবেন্দ্র বলিলেন, "তোমার ঘরে ছাতি আছে?"

হীরার ঘরে ছাতি ছিল না। দেবেন্দ্র বলিলেন, "তোমার এখানে একটু বসিয়া জলটা দেখিয়া গেলে কেহ কিছু মনে করিবে?"

হীরা বলিল, "মনে করিবে না কেন? কিন্তু যাহা দোষ, আপনি রাত্রে আমার বাড়ী আসাতেই তাহা ঘটিয়াছে।"

দে। তবে বসিতে পারি।

হীরা উত্তর করিল না। দেবেন্দ্র বসিলেন।

তখন হীরা তক্তপোষের উপর অতি পরিষ্কার শয্যা রচনা করিয়া দেবেন্দ্রকে বসাইল। এবং সিন্দুক হইতে একটি ক্ষুদ্র রূপাবাঁধা হুঁক্কা বাহির করিল। স্বহস্তে তাহাতে শীতল জল পুরিয়া মিঠাকড়া তামাকু সাজিয়া, পাতার নল করিয়া দিল।

দেবেন্দ্র পকেট হইতে একটি ব্র্যাণ্ডি ফ্লাস্ক বাহির করিয়া, বিনা জলে পান করিলেন, এবং রাগযুক্ত হইলে দেখিলেন, হীরার চক্ষু বড় সুন্দর। বস্তুতঃ সে চক্ষু সুন্দর। চক্ষু বৃহৎ, নিবিড় কৃষ্ণতার, প্রদীপ্ত এবং বিলোলকটাক্ষ।

দেবেন্দ্র হীরাকে বলিলেন, "তোমার দিব্য চক্ষু!" হীরা মৃদু হাসিল। দেবেন্দ্র দেখিলেন, এক কোণে একখানা ভাঙ্গা বেহালা পড়িয়া আছে। দেবেন্দ্র গুন্ গুন্ করিয়া

গান করিতে করিতে সেই বেহালা আনিয়া তাহাতে ছড়ি দিলেন। বেহালা ঘাঁকর ঘোঁকর করিতে লাগিল। দেবেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,"এ বেহালা কোথায় পাইলে?"
হীরা কহিল, "একজন ভিখারীর কাছে কিনিয়াছিলাম।" দেবেন্দ্র বেহালা হস্তে লইয়া একপ্রকার চলনসই করিয়া লইলেন এবং তাহার সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া, মধুর স্বরে মধুর ভাবযুক্ত মধুর পদ মধুরভাবে গায়িলেন। হীরার চক্ষু আরও জ্বলিতে লাগিল। ক্ষণকালজন্য হীরার সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতি জন্মিল। সে যে হীরা, এই যে দেবেন্দ্র, তাহা ভুলিয়া গেল। মনে করিতেছিল, ইনি স্বামী–আমি, পত্নী। মনে করিতেছিল, বিধাতা দুই জনকে পরস্পরের জন্য সৃজন করিয়া, বহুকাল হইতে মিলিত করিয়াছেন, বহুকাল হইতে যেন উভয়ের প্রণয়সুখে উভয়ে সুখী। এই মোহে অভিভূত হীরার মনের কথা মুখে ব্যক্ত হইল। দেবেন্দ্র হীরার মুখে অর্দ্ধব্যক্তস্বরে শুনিলেন যে, হীরা দেবেন্দ্রকে মনে মনে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে।
কথা ব্যক্ত হইবার পর হীরার চৈতন্য হইল, মস্তক ঘুরিয়া উঠিল। তখন সে উন্মত্তের ন্যায় আকুল হইয়া দেবেন্দ্রকে কহিল, "আপনি শীঘ্র আমার ঘর হইতে যান।"
দেবেন্দ্র বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "সে কি, হীরা?"
হীরা। আপনি শীঘ্র যান–নহিলে আমি চলিলাম।
দে। সে কি, তাড়াইয়া দিতেছ কেন?
হী। আপনি যান–নহিলে আমি লোক ডাকিব–আপনি কেন আমার সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছিলেন?"
হীরা তখন উন্মাদিনীর ন্যায় বিবশা।
দে। একেই বলে স্ত্রীচরিত্র!
হীরা রাগিল–বলিল, "স্ত্রীচরিত্র?" স্ত্রীচরিত্র মন্দ নহে। তোমাদিগের ন্যায় পুরুষের চরিত্রই অতি মন্দ। তোমাদের ধর্ম্মজ্ঞান নাই–পরের ভাল মন্দ বোধ নাই–কেবল আপনার সুখ খুঁজিয়া বেড়াও–কেবল কিসে কোন স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ করিবে, সেই চেষ্টায় ফের। নহিলে কেন তুমি আমার বাড়ীতে বসিলে? আমার সর্ব্বনাশ করিবে, তোমার কি এ অভিপ্রায় ছিল না? তুমি আমাকে কুলটা ভাবিয়াছিলে, নহিলে কোন্ সাহসে বসিবে? কিন্তু আমি কুলটা নহি। আমরা দুঃখী লোক, গতর খাটাইয়া খাই–কুলটা হইবার আমাদের অবকাশ নাই–বড়মানুষের বউ হইলে কি হইতাম, বলিতে পারি না।" দেবেন্দ্র ভ্রূভঙ্গি করিলেন। দেখিয়া হীরা প্রীতা হইল। পরে উন্নমিতাননে দেবেন্দ্রের প্রতি স্থিরদৃষ্টি করিয়া কোমলতর স্বরে কহিতে লাগিল, "প্রভু, আমি আপনার রূপগুণ দেখিয়া পাগল হইয়াছি। কিন্তু আমাকে কুলটা বিবেচনা করিবেন না। আমি আপনাকে দেখিলেই সুখী হই। এজন্য আপনি আমার ঘরে বসিতে চাহিলে বারণ করিতে পারি নাই–কিন্তু অবলা স্ত্রীজাতি–আমি বারণ করিতে পারি নাই বলিয়া কি আপনার বসা উচিত হইয়াছে? আপনি মহাপাপিষ্ঠ, এই ছলে ঘরে প্রবেশ করিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এখনি আপনি এখান হইতে যান।"
দেবেন্দ্র আর এক ঢোক পান করিয়া বলিলেন, "ভাল, ভাল! হীরে, তুমি ভাল বক্তৃতা করিয়াছ। আমাদের ব্রাহ্মসমাজে এক দিন বক্তৃতা দিবে?"
হীরা এই উপহাসে মর্ম্মপীড়িতা হইয়া, রোষকাতরস্বরে কহিল, "আমি আপনার উপহাসের যোগ্য নই–আপনাকে অতি অধম লোকে ভালবাসিলেও, তাহার ভালবাসা লইয়া তামাসা করা ভাল নয়। আমি ধার্ম্মিক নহি, ধর্ম্ম বুঝি না–ধর্ম্মে আমার মন নাই। তবে যে আমি কুলটা নই বলিয়া স্পর্দ্ধা করিলাম, তাহার কারণ

এই, আমার মনে মনে প্রতিজ্ঞা আছে, আপনার ভালবাসার লোভে পড়িয়া কলঙ্ক কিনিব না। যদি আপনি আমাকে একটুকুও ভালবাসিতেন, তাহা হইলে আমি এ প্রতিজ্ঞা করিতাম না—আমার ধর্ম্মজ্ঞান নাই, ধর্ম্মে ভক্তি নাই—আমি আপনার ভালবাসার তুলনায় কলঙ্ককে তৃণজ্ঞান করি। কিন্তু আপনি ভালবাসেন না—সেখানে কি সুখের জন্য কলঙ্ক কিনিব? কিসের লোভে আমার গৌরব ছাড়িব? আপনি যুবতী স্ত্রী হাতে পাইলে কখনও ছাড়েন না, এজন্য আমার পূজা গ্রহণ করিলেও করিতে পারেন, কিন্তু কালে আমাকে হয়ত ভুলিয়া যাইবেন, নয়ত যদি মনে রাখেন, তবে আমার কথা লইয়া দলবলের কাছে উপহাস করিবেন—এমন স্থানে কেন আমি আপনার বাঁদী হইব? কিন্তু যে দিন আপনি আমাকে ভালবাসিবেন, সেই দিন আপনার দাসী হইয়া চরণসেবা করিব?"

দেবেন্দ্র হীরার মুখে এই তিন প্রকার কথা শুনিলেন। তাহার চিত্তের অবস্থা বুঝিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, "আমি তোমাকে চিনিলাম, এখন কলে নাচাইতে পারিব। যেদিন মনে করিব, সেই দিন তোমার দ্বারা কার্য্যোদ্ধার করিব।" এই ভাবিয়া চলিয়া গেলেন।

দেবেন্দ্র হীরার সম্পূর্ণ পরিচয় পান নাই।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ : খোস্ খবর

বেলা দুই প্রহর। শ্রীশ বাবু আপিসে বাহির হইয়াছেন। বাটীর লোক জন সব আহারান্তে নিদ্রা যাইতেছে। বৈঠকখানার চাবি বন্ধ। একটা দোআঁসলা গোছ টেরিয়র বৈঠকখানার বাহিরে, পাপোসের উপর, পায়ের ভিতর মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছে। অবকাশ পাইয়া কোন প্রেমময়ী চাকরাণী কোন রসিক চাকরের নিকট বসিয়া গোপনে তামাকু খাইতেছে, আর ফিস্ ফিস্ করিয়া বকিতেছে। কমলমণি শয্যাগৃহে বসিয়া পা ছড়াইয়া সূচী-হস্তে কার্পেট তুলিতেছেন—কেশ বেশ একটু একটু আলু থালু—কোথায় কেহ নাই, কেবল কাছে সতীশ বাবু বসিয়া মুখে অনেক প্রকার শব্দ করিতেছেন, এবং বুকে লাল ফেলিতেছেন। সতীশ বাবু প্রথমে মাতার নিকট হইতে উলগুলি অপহরণ করিবার যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু পাহারা বড় কড়াকড় দেখিয়া, একটি মৃন্ময় ব্যাঘ্রের মুণ্ডলেহনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দূরে একটা বিড়াল, থাবা পাতিয়া বসিয়া, উভয়কে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। তাহার ভাব অতি গম্ভীর; মুখে বিশেষ বিজ্ঞতার লক্ষণ; এবং চিত্ত চাঞ্চল্যশূন্য। বোধ হয় বিড়াল ভাবিতেছিল, "মানুষের দশা অতি ভয়ানক, সর্ব্বদা কার্পেটতোলা, পুতুল-খেলা প্রভৃতি তুচ্ছ কাজে ইহাদের মন নিবিষ্ট, ধর্ম্ম-কর্ম্মে মতি নাই, বিড়ালজাতির আহার যোগাইবার মন নাই, অতএব ইহাদের পরকালে কি হইবে?" অন্যত্র একটা টিক্‌টিকি প্রাচীরাবলম্বন করিয়া ঊর্দ্ধমুখে একটি মক্ষিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিল। সেও মক্ষিকাজাতির দুশ্চরিত্রের কথা মনে মনে আন্দোলন করিতেছিল, সন্দেহ নাই। একটি প্রজাপতি উড়িয়া বেড়াইতেছিল, সতীশ বাবু যেখানে বসিয়া সন্দেশ ভোজন করিয়াছিলেন, ঝাঁকে ঝাঁকে সেখানে মাছি বসিতেছিল—পিপীলিকারাও সার দিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

ক্ষণকাল পরে, টিক্‌টিকি মক্ষিকাকে হস্তগত করিতে না পারিয়া অন্য দিকে সরিয়া গেল। বিড়ালও মনুষ্যচরিত্র পরিবর্ত্তনের কোন লক্ষণ সম্প্রতি উপস্থিত না দেখিয়া, হাই তুলিয়া, ধীরে ধীরে অন্যত্র চলিয়া গেল। প্রজাপতি উড়িয়া বাহির হইয়া গেল। কমলমণিও বিরক্ত হইয়া কার্পেট রাখিলেন এবং সতু বাবুর সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন।

কমলমণি বলিলেন, "অ, সতু বাবু, মানুষে আপিসে যায় কেন বলিতে পার?" সতু বাবু বলিলেন "ইলি—লি—ব্লি।"

ক। সতু বাবু, কখনও আপিসে যেও না।

সতু বলিল, “হাম্!”
কমলমণি বলিলেন “ তোমার হাম্ করার ভাবনা কি? তোমার হাম্ করার জন্য আপিসে যেতে হবে না। আপিসে যেও না—আপিসে গেলে বৌ দুপুরবেলা বসে বসে কাঁদবে।”
সতু বাবু বৌ কথাটা বুঝিলেন : কেন না, কমলমণি সর্ব্বদা তাঁহাকে ভয় দেখাইতেন যে, বৌ আসিয়া মারিবে। সতু বাবু, এবার উত্তর করিলেন, বৌ—মাবে!”
কমল বলিলেন, “মনে থাকে যেন। আপিসে গেলে বৌ মারিবে।”
এইরূপ কথোপকথন কতক্ষণ চলিতে পারিত, তাহা বলা যায় না; কেন না, এই সময়ে একজন দাসী ঘুমে চোখ মুছিতে মুছিতে আসিয়া একখানি পত্র আনিয়া কমলের হাতে দিল। কমল দেখিলেন, সূর্য্যমুখীর পত্র। খুলিয়া পড়িলেন। পড়িয়া আবার পড়িলেন। আবার পড়িয়া বিষণ্ন মনে মৌনী হইয়া বসিলেন। পত্র এইরূপ :—
“প্রিয়তমে! তুমি কলিকাতায় গিয়া পর্য্যন্ত আমাদের ভুলিয়া গিয়াছ—নহিলে একখানি বই পত্র লিখিলে না কেন? তোমার সংবাদের জন্য আমি সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকি, জান না?”
“তুমি কুন্দনন্দিনীর কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে। তাহাকে পাওয়া গিয়াছে—শুনিয়া সুখী হইবে —ষষ্ঠীদেবতার পূজা দিও। তাহা ছাড়া আরও একটা খোস্ খবর আছে—কুন্দের সঙ্গে আমার স্বামীর বিবাহ হইবে। এ বিবাহে আমিই ঘটক। বিধবাবিবাহ শাস্ত্রে আছে—তবে দোষ কি? দুই এক দিনের মধ্যে বিবাহ হইবে। তুমি আসিয়া জুটিতে পারিবে না—নচেৎ তোমাকে নিমন্ত্রণ করিতাম। পার যদি , তবে ফুলশয্যার সময়ে আসিও। কেন না, তোমাকে দেখিতে বড় সাধ হইয়াছে।”
কমলমণি পত্রের কিছুই অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। ভাবিয়া চিন্তিয়া সতীশ বাবুকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। সতীশ ততক্ষণ সম্মুখে একখানা বাঙ্গালা কেতাব পাইয়া তাহার কোণ খাইতেছিল। কমলমণি তাহাকে পত্রখানি পড়িয়া শুনাইলেন—জিজ্ঞাসা করিলেন,“এর মানে কি, বল দেখি, সতু বাবু?’ সতু বাবু রস বুঝিলেন, মাতার হাতের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া কমলমণির নাসিকা-ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। সুতরাং কমলমণি সূর্য্যমুখীকে ভুলিয়া গেলেন। সতু বাবুর নাসিকা-ভোজন সমাপ্ত হইলে, কমলমণি আবার সূর্য্যমুখীর পত্র পড়িতে লাগিলেন। মনে মনে বলিলেন, এ সতু বাবুর কর্ম্ম নয়, এ আমার সেই মন্ত্রীটি নহিলে হইবে না। মন্ত্রীর আপিস কি ফুরায় না? সতু বাবু, আজ এস আমরা রাগ করিয়া থাকি।”
যথাসময়ে মন্ত্রিবর শ্রীশচন্দ্র আপিস হইতে আসিয়া ধড়া চূড়া ছাড়িলেন। কমলমণি তাঁহাকে জল খাওয়াইয়া, শেষে সতীশকে লইয়া রাগ করিয়া গিয়া খাটের উপর শুইলেন। শ্রীশচন্দ্র রাগ দেখিয়া, হাসিতে হাসিতে হুঁক্কা লইয়া দূরে কৌচের উপর গিয়া বসিলেন। হুঁক্কাকে সাক্ষী করিয়া বলিলেন, “হে হুঁকে! তুমি পেটে ধর গঙ্গাজল, মাথায় ধর আগুন! তুমি! সাক্ষী, যারা আমার উপর রাগ করেছে, তারা এখনি আমার সঙ্গে কথা কবে—কবে—কবে! নহিলে আমি তোমার মাথায় আগুন দিয়া এইখানে বসিয়া দশ ছিলিম তামাক পোড়াব!” শুনিয়া, কমলমণি উঠিয়া বসিয়া, মুধুর কোপে, নীলোৎপলতুল্য চক্ষু ঘুরাইয়া বলিলেন, “আবার দশ ছিলিম তামাক মানে না। এক ছিলিমের টানের জ্বালায় আমি একটি কথা কইতে পাই না—আবার দশ ছিলিম তামাক খায়—আমি আর কি ভেসে এয়েছি!” এই বলিয়া শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিলেন, এবং হুঁক্কা হইতে ছিলিম তুলিয়া লইয়া সাগ্নিক তামাক-ঠাকুরকে বিসর্জ্জন দিলেন।
এইরূপে কমলমণির দুর্জ্জয় মান ভঞ্জন হইলে, তিনি মানের কারণের পরিচয় দিয়া সূর্য্যমুখীর পত্র পড়িতে দিলেন এবং বলিলেন, “ইহার অর্থ করিয়া দাও, তা নহিলে আজ মন্ত্রিবরের মাহিয়ানা কাটিব।”

শ্রীশ। বরং আগাম মাহিয়ানা দাও—অর্থ করিব।

কমলমণি শ্রীশচন্দ্রের মুখের কাছে মুখ আনিলেন, শ্রীশচন্দ্র মাহিয়ানা আদায় করিলেন। তখন পত্র পড়িয়া বলিলেন, "এটা তামাসা!"

কম। কোন্‌টা তামাসা? তোমার কথাটা, না পত্রখানা?

শ্রীশ। পত্রখানা।

কম। আজি মন্ত্রিমশাইকে ডিস্‌চার্জ করিব। ঘটে এ বুদ্ধিটুকুও নাই? মেয়েমানুষে কি এমন তামাসা মুখে আনিতে পারে?

শ্রীশ। তবে যা তামাসা কোরে পারে না, তা সত্য সত্য পারে?

কম। প্রাণের দায়ে পারে। আমার বোধ হয়, এ সত্য।

শ্রীশ। সে কি? সত্য, সত্য?

কম। মিথ্যা বলি ত কমলমণির মাথা খাই।

শ্রীশচন্দ্র কমলের গাল টিপিয়া দিলেন। কমল বলিলেন, "আচ্ছা মিথ্যা বলি ত কমলমণির সতীনের মাথা খাই?"

শ্রীশ। তা হলে কেবল উপবাস করিতে হইবে।

কম। ভাল, কারু মাথা নাই খেলেম—এখন বিধাতা বুঝি সূর্য্যমুখীর মাথা খায়। দাদা বুঝি জোর করে বিয়ে কর্‌তেছে?

শ্রীশচন্দ্র বিমনা হইলেন। বলিলেন, "আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। নগেন্দ্রকে পত্র লিখিব? কি বল?"

কমলমিণ তাহাতে সম্মত হইলেন। শ্রীশচন্দ্র ব্যঙ্গ করিয়া পত্র লিখিলেন। নগেন্দ্র প্রত্যুত্তরে যাহা লিখিলেন, তাহা এই;—

ভাই! আমাকে ঘৃণা করিও না—অথবা সে ভিক্ষাতেই বা কাজ কি? ঘৃণাস্পদকে অবশ্য ঘৃণা করিবে। আমি এ বিবাহ করিব। যদি পৃথিবীর সকলে আমাকে ত্যাগ করে, তথাপি আমি বিবাহ করিব। নচেৎ আমি উন্মাদগ্রস্ত হইব—তাহার বড় বাকীও নাই।

"এ কথা বলার পর আর বোধ হয় কিছু বলিবার আবশ্যক করে না। তোমরাও বোধ হয় ইহার পর আমাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য কোন কথা বলিবে না। যদি বল, তবে আমিও তর্ক করিতে প্রস্তুত আছি।

"যদি কেহ বলে যে, বিধবাবিবাহ হিন্দুধর্ম্মবিরুদ্ধ, তাহাকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবন্ধ পড়িতে দিই। যেখানে তাদৃশ শাস্ত্রবিশারদ মহামহোপাধ্যায় বলেন যে, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত, তখন কে ইহা অশাস্ত্র বলিবে? আর যদি বল, শাস্ত্রসম্মত হইলেও ইহা সমাজসম্মত নহে, আমি এ বিবাহ করিলে সমাজচ্যুত হইব, তাহার উত্তর; এ গোবিন্দপুরে আমাকে সমাজচ্যুত করে কার সাধ্য? সেখানে আমিই সমাজ, সেখানে আমার আবার সমাজচ্যুতি কি? তথাপি আমি তোমাদিগের মনোরক্ষার্থে এ বিবাহ গোপন রাখিব—আপাততঃ কেহ জানিবে না।

"তুমি এ সকল আপত্তি করিবে না। তুমি বলিবে, দুই বিবাহ নীতি-বিরুদ্ধ কাজ। ভাই, কিসে জানিলে ইহা নীতি-বিরুদ্ধ কাজ? তুমি এ কথা ইংরেজের কাছে শিখিয়াছ, নচেৎ ভারতবর্ষে এ কথা ছিল না। কিন্তু ইংরেজরা কি অভ্রান্ত? যিহুদার বিধি আছে বলিয়া ইংরেজদিগের এ সংস্কার—কিন্তু তুমি আমি যিহুদী বিধি ঈশ্বরবাক্য বলিয়া মানি না। তবে কি হেতুতে এক পুরুষের দুই বিবাহ নীতি-বিরুদ্ধ বলিব?

"তুমি বলিবে, যদি এক পুরুষের দুই স্ত্রী হইতে পারে, তবে এক স্ত্রীর দুই স্বামী হয় না কেন? উত্তর—এক স্ত্রীর দুই স্বামী হইলে অনেক অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা;

এক পুরুষের দুই বিবাহে তাহার সম্ভাবনা নাই। এক স্ত্রীর দুই স্বামী হইলে সন্তানের পিতৃনিরূপণ হয় না—পিতাই সন্তানের পলানকর্ত্তা—তাহার অনিশ্চয়ে সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা জন্মিতে পারে। কিন্তু পুরুষের দুই বিবাহ সন্তানের মাতার অনিশ্চয়তা জন্মে না। ইত্যাদি আরও অনেক কথা বলা যাইতে পারে।
যাহা অধিকাংশ লোকের অনিষ্টকারক, তাহাই নীতি-বিরুদ্ধ। তুমি যদি পুরুষের দুই বিবাহ নীতি-বিরুদ্ধ বিবেচনা কর, তবে দেখাও যে, ইহা অধিকাংশ লোকের অনিষ্টকর।
গৃহে কলহাদির কথা বলিয়া আমাকে যুক্তি দিবে। আমি একটা যুক্তির কথা বলিব। আমি নিঃসন্তান। আমি মরিয়া গেলে, আমার পিতৃকুলের নাম লুপ্ত হইবে। আমি এ বিবাহ করিলে সন্তান হইবার সম্ভাবনা—ইহা কি অযুক্তি?
'শেষ আপত্তি—সূর্য্যমুখী। স্নেহময়ী পত্নীর সপত্নীকণ্টক করি কেন? উত্তর—সূর্য্যমুখী এ বিবাহে দুঃখিতা নহেন। তিনিই বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন—তিনিই ইহাতে আমাকে প্রবৃত্ত করিয়াছেন—তিনিই ইহাতে উদ্যোগী। তবে আর কাহার আপত্তি?
"তবে কোন্ কারণে আমার এই বিবাহ নিন্দনীয়?"

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ : কাহার আপত্তি

কমলমণি পত্র পড়িয়া বলিলেন, "কোন্ কারণে নিন্দনীয়? জগদীশ্বর জানেন। কিন্তু কি ভ্রম! পুরুষে বুঝি কিছুই বুঝে না। যা হোক, মন্ত্রিবর আপনি সজ্জা করুন। আমাদিগের গোবিন্দপুরে যাইতে হইবে।"
শ্রীশ। তুমি কি বিবাহ বন্ধ করিতে পারিবে?
কমল। না পারি, দাদার সম্মুখে মরিব।
শ্রীশ। তা পারিবে না। তবে নূতন ভাইজের নাক কাটিয়া আনিতে পারিবে। চল, সেই উদ্দেশ্যে যাই।
তখন উভয়ে গোবিন্দপুর যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। পরদিন প্রাতে তাঁহারা নৌকারোহণে গৌবিন্দপুর যাত্রা করিলেন। যথাকালে তথায় উপস্থিত হইলেন।
বাটীতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই দাসীদিগের এবং পল্লীস্থ স্ত্রীলোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল, অনেকেই কমলমণিকে নৌকা হইতে লইতে আসিল। বিবাহ হইয়া গিয়াছে কি না, জানিবার জন্য তাঁহার ও তাঁহার স্বামীর নিতান্ত ব্যগ্রতা জন্মিয়াছিল, কিন্তু দুই জনের কেহই এ কথা কাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন না—এ লজ্জার কথা কি প্রকারে অপর লোককে মুখ ফুটিয়া জিজ্ঞাসা করেন?
অতি ব্যস্তে কমলমণি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন; এবার সতীশ যে পশ্চাতে পড়িয়া রহিল, তাহা ভুলিয়া গেলেন। বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া, স্পষ্ট স্বরে, সাহসশূন্য হইয়া দাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "সূর্য্যমুখী কোথায়?" মনে ভয়, পাছে কেহ বলিয়া ফেলে যে, বিবাহ হইয়া গিয়াছে—পাছে কেহ বলিয়া ফেলে সূর্য্যমুখী মরিয়াছে।
দাসীরা বলিয়া দিল, সূর্য্যমুখী শয়নগৃহে আছেন। কমলমণি ছুটিয়া শয়নগৃহে গেলেন।

প্রবেশ করিয়া প্রথমে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। মুহূর্ত্তকাল ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিলেন। শেষে দেখিতে পাইলেন, ঘরের কোণে, এক রুদ্ধ গবাক্ষসন্নিধানে, অধোবদনে একটি স্ত্রীলোক বসিয়া আছে। কমলমণি তাহার মুখ দেখিতে পাইলেন না; কিন্তু চিনিলেন যে সূর্য্যমুখী। পরে সূর্য্যমুখী তাহার পদধ্বনি পাইয়া উঠিয়া কাছে আসিলেন। সূর্য্যমুখীকে দেখিয়া কমলমণি, বিবাহ হইয়াছে কি না, ইহা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না—সূর্য্যমুখীর কাঁধের হাড় উঠিয়া পড়িয়াছে—নবদেবদারুতুল্য সূর্য্যমুখীর দেহতরু ধনুকের মত ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, সুর্য্যমুখীর প্রফুল্ল পদ্মপলাশ চক্ষু কোটরে পড়িয়াছে—সূর্য্যমুখীর পদ্মমুখ দীর্ঘাকৃতি হইয়াছে। কমলমণি বুঝিলেন যে, বিবাহ হইয়া গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে হলো?" সূর্য্যমুখী সেইরূপ মৃদুস্বরে বলিলেন, "কাল।"

তখন দুই জনে সেইখানে বসিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন—কেহ কিছু বলিলেন না। সূর্য্যমুখী কমলের কোলে মাথা লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন,—কমলমণির চক্ষের জল তাঁহার বক্ষে ও কেশের উপর পড়িতে লাগিল।

তখন নগেন্দ্র বৈঠকখানায় বসিয়া কি ভাবিতেছিলেন? ভাবিতেছিলেন, "কুন্দনন্দিনী! কুন্দ আমার! কুন্দ আমার স্ত্রী! কুন্দ! কুন্দ! কুন্দ! সে আমার!" কাছে শ্রীশচন্দ্র আসিয়া বসিয়াছিলেন—ভাল করিয়া তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে পারিতেছিলেন না। এক একবার মনে পড়িতেছিল, "সূর্য্যমুখী উদ্যোগী হইয়া বিবাহ দিয়াছে—তবে আমার এ সুখে আর কাহার আপত্তি।"

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ : সূর্য্যমুখী ও কমলমণি

যখন প্রদোষে, উভয়ে উভয়ের নিকট স্পষ্ট করিয়া কথা কহিতে সমর্থ হইলেন, তখন সূর্য্যমুখী কমলমণির কাছে নগেন্দ্র ও কুন্দনন্দিনীর বিবাহবৃত্তান্তের আমূল পরিচয় দিলেন। শুনিয়া কমলমণি বিস্মিতা হইয়া বলিলেন, "এ বিবাহ তোমার যত্নেই হইয়াছে—কেন তুমি আপনার মৃত্যুর উদ্যোগ আপনি করিলে?"

সূর্য্যমুখী হাসিয়া বলিলেন, "আমি কে?" মৃদু ক্ষীণ হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন,—বৃষ্টির পর আকাশপ্রান্তে ছিন্ন মেঘে যেমন বিদ্যুৎ হয়, সেইরূপ হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আমি কে? একবার তোমার ভাইকে দেখিয়া আইস—সে মুখভরা আহ্লাদ দেখিয়া আইস,—তখন জানিবে, তিনি আজ কত সুখে সুখী। তাঁহার এত সুখ যদি আমি চক্ষে দেখিলাম, তবে কি আমার জীবন সার্থক হইল না? কোন্ সুখের আশায় তাঁকে অসুখী রাখিব? যাঁহার এক দণ্ডের অসুখ দেখিলে মরিতে ইচ্ছা করে, দেখিলাম দিবারাত্র তাঁর মর্ম্মান্তিক অসুখ—তিনি সকল সুখ বিসর্জ্জন দিয়া দেশত্যাগী হইবার উদ্যোগ করিলেন—তবে আমার সুখ কি রহিল? বলিলাম, "প্রভু! তোমার সুখই আমার সুখ—তুমি কুন্দকে বিবাহ কর—আমি সুখী হইব—তাই বিবাহ করিয়াছেন।"

কমল। আর, তুমি সুখী হইয়াছ?

সূর্য্য। আবার আমার কথা কেন জিজ্ঞাসা কর, আমি কে? যদি কখনও স্বামীর পায়ে কাঁকর ফুটিয়াছে দেখিয়াছি, তখনই মনে হইয়াছে যে, আমি ঐখানে বুক পাতিয়া দিই নাই কেন, স্বামী আমার বুকের উপর পা রাখিয়া যাইতেন।

বলিয়া সূর্য্যমুখী ক্ষণকাল নীরবে রহিলেন—তাঁহার চক্ষের জলে বসন ভিজিয়া গেল—পরে সহসা মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কমল, কোন্ দেশে মেয়ে হলে মেরে ফেলে?"

কমল মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন, "মেয়ে হলেই কি হয়? যার যেমন কপাল, তার তেমনি ঘটে।"

সূ। আমার কপালের চেয়ে কার কপাল ভাল? কে এমন ভাগ্যবতী? কে এমন স্বামী পেয়েছে? রূপ, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ্—সে সকলও তুচ্ছ কথা—এত গুণ কার স্বামীর? আমার কপাল, জোর কপাল—তবে কেন এমন হইল?

কমল। এও কপাল।

সূ। তবে এ জ্বালায় মন পোড়ে কেন?

কমল। তুমি স্বামীর আজিকার আহ্লাদপূর্ণ মুখ দেখিয়া সুখী—তথাপি বলিতেছ, এ জ্বালায় মন পোড়ে কেন? দুই কথাই কি সত্য?

সূ। দুই কথাই সত্য। আমি তাঁর সুখে সুখী—কিন্তু আমায় যে তিনি পায়ে ঠেলিলেন, আমায় পায়ে ঠেলিয়াছেন বলিয়াই তাঁর এত আহ্লাদ!—

সূর্য্যমুখী আর বলিতে পারিলেন না, কণ্ঠ রুদ্ধ হইল—চক্ষু ভাসিয়া গেল, কিন্তু সূর্য্যমুখীর অসমাপ্ত কথার মর্ম্ম কমলমণি সম্পূর্ণ বুঝিয়াছিলেন। বলিলেন, “তোমায় পায়ে ঠেলেছেন বলে তোমার অন্তর্দ্দাহ হতেছে। তবে কেন বল, “আমি কে?” তোমার অন্তঃকরণের আধখানা আজও আমিতে ভরা; নহিলে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াও অনুতাপ করিবে কেন?

সূ। অনুতাপ করি না। ভালই করিয়াছি, ইহাতে আমার কোন সংশয় নাই। কিন্তু মরণে ত যন্ত্রণা আছেই। আমার মরণই ভাল বলিয়া, আপনার হাতে আপনি মরিলাম। কিন্তু তাই বলিয়া মরণের সময়ে কি তোমার কাছে কাঁদিব না?

সূর্য্যমুখী কাঁদিলেন। কমল তাঁহার মাথা আপন হৃদয়ে আনিয়া হাত দিয়া ধরিয়া রাখিলেন। কথায় সকল কথা ব্যক্ত হইতেছিল না—কিন্তু অন্তরে অন্তরে কথোপকথন হইতেছিল। অন্তরে অন্তরে কমলমণি বুঝিতেছিলেন যে, সূর্য্যমুখী কত দুঃখী। অন্তরে অন্তরে সূর্য্যমুখী বুঝিয়াছিলেন যে, কমলমণি তাঁহার দুঃখ বুঝিতেছেন।

উভয়ে রোদন সম্বরণ করিয়া চক্ষু মুছিলেন। সূর্য্যমুখী তখন আপনার কথা ত্যাগ করিয়া, অন্যান্য কথা পাড়িলেন। সতীশচন্দ্রকে আনাইয়া আদর করিলেন, এবং তাহার সঙ্গে কথোপকথন করিলেন। কমলের সঙ্গে, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সতীশ শ্রীশচন্দ্রের কথা কহিলেন। সতীশচন্দ্রের বিদ্যাশিক্ষা, বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে অনেক সুখের কথার আলোচনা হইল। এইরূপ গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত উভয়ে কথোপকথন করিয়া সূর্য্যমুখী কমলকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিলেন এবং সতীশচন্দ্রকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিলেন। উভয়কে বিদায় দিবার কালে সূর্য্যমুখীর চক্ষের জল আবার অসম্বরণীয় হইল। রোদন করিতে করিতে তিনি সতীশকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, “বাবা! আশীর্ব্বাদ করি, যেন তোমার মামার মত অক্ষয় গুণে গুণবান্ হও। ইহার বড় আশীর্ব্বাদ আমি আর জানি না।”

সূর্য্যমুখী স্বাভাবিক মৃদুস্বরে কথা কহিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার কণ্ঠস্বরের ভঙ্গীতে কমলমণি চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন, “বউ! তোমার মনে কি হইতেছে—কি? বল না?”

সূ। কিছু না।

কম। আমার কাছে লুকাইও না।

সূ। তোমার কাছে লুকাইবার আমার কোন কথাই নাই।

কমল তখন সচ্ছন্দচিত্তে শয়নমন্দিরে গেলেন। কিন্তু সূর্য্যমুখীর একটি লুকাইবার কথা ছিল। তাহা কমল প্রাতে জানিতে পারিলেন। প্রাতে সূর্য্যমুখীর সন্ধানে তাঁহার শয্যাগৃহে গিয়া দেখিলেন, সূর্য্যমুখী তথায় নাই, কিন্তু অভুক্ত শয্যার উপরে একখানি পত্র পড়িয়া আছে। পত্র দেখিয়াই কমলমণির মাথা ঘুরিয়া গেল—পত্র

পড়িতে হইল না—না পড়িয়াই সকল বুঝিলেন। বুঝিলেন, সূর্য্যমুখী পলায়ন করিয়াছেন। পত্র খুলিয়া পড়িতে ইচ্ছা হইল না—তাহা করতলে বিমর্দ্দিত করিলেন। কপালে করাঘাত করিয়া শয্যায় বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন, "আমি পাগল। নচেৎ কাল ঘরে যাইবার সময়ে বুঝিয়াও বুঝিলাম না কেন?" সতীশ নিকেট দাঁড়াইয়াছিল; মার কপালে করাঘাত ও রোদন দেখিয়া সেও কাঁদিতে লাগিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ : আশীর্ব্বাদ-পত্র

শোকের প্রথম বেগ সম্বরণ হইলে, কমলমণি পত্র খুলিয়া পড়িলেন। পত্রখানির শিরোনামায় তাঁহারই নাম। পত্র এইরূপ;—

"যে দিন স্বামীর মুখে শুনিলাম যে, আমাতে আর তাঁর কিছুমাত্র সুখ নাই, তিনি কুন্দনন্দিনীর জন্য উন্মাদগ্রস্ত হইবেন, অথবা প্রাণত্যাগ করিবেন, সেই দিনেই মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম, যদি কুন্দনন্দিনীকে আবার কখনও পাই, তবে তাহার হাতে স্বামীকে সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে সুখী করিব। কুন্দনন্দিনীকে স্বামী দান করিয়া আপনি গৃহত্যাগ করিয়া যাইব; কেন না, আমার স্বামী কুন্দনন্দিনীর হইলেন, ইহা চক্ষে দেখিতে পারিব না। এখন কুন্দনন্দিনীকে পুনর্ব্বার পাইয়া তাহাকে স্বামী দান করিলাম। আপনিও গৃহত্যাগ করিয়া চলিলাম।

"কালি বিবাহ হইবার পরেই আমি রাত্রে গৃহত্যাগ করিয়া যাইতাম। কিন্তু স্বামীর যে সুখের কামনায় আপনার প্রাণ আপনি বধ করিলাম, সে সুখ দুই এক দিন চক্ষে দেখিয়া যাইবার সাধ ছিল। আর তোমাকে আর একবার দেখিয়া যাইব সাধ ছিল। তোমাকে আসিতে লিখিয়াছিলাম—তুমি অবশ্য আসিবে, জানিতাম। এখন উভয় সাধ পরিপূর্ণ হইয়াছে। আমার যিনি প্রাণাধিক, তিনি সুখী হইয়াছেন ইহা দেখিয়াছি, তোমার নিকট বিদায় লইয়াছি। আমি এখন চলিলাম।

"তুমি যখন এই পত্র পাইবে, তখন আমি অনেক দূর যাইব। তোমাকে যে বলিয়া আসিলাম না, তাহার কারণ এই যে, তা হইলে তুমি আসিতে দিতে না। এখন তোমাদের কাছে আমার এই ভিক্ষা যে, তোমরা আমার সন্ধান করিও না।

"আর যে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, এমত ভরসা নাই। কুন্দনন্দিনী থাকিতে আমি আর এ দেশে আসিব না—এবং আমার সন্ধানও পাইবে না। আমি এখন পথের কাঙ্গালিনী হইলাম—ভিখারিণীবেশে দেশে দেশে ফিরিব—ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিব—আমাকে কে চিনিবে? আমি টাকা কড়ি সঙ্গে লইলে লইতে পারিতাম, কিন্তু প্রবৃত্তি হইল না। আমার স্বামী আমি ত্যাগ করিয়া চলিলাম—সোণা-রূপা সঙ্গে লইয়া যাইব?

..."তুমি আমার একটি কাজ করিও। আমার স্বামীর চরণে কোটি কোটি প্রণাম জানাইও। আমি তাঁহাকে পত্র লিখিয়া যাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাম না। চক্ষের জলে অক্ষর দেখিতে পাইলাম না—কাগজ ভিজিয়া নষ্ট হইল। কাগজ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আবার লিখিলাম—আবার ছিঁড়িলাম—আবার ছিঁড়িলাম—কিন্তু আমার বলিবার যে কথা আছে, তাহা কোন পত্রেই বলিতে পারিলাম না। কথা বলিতে পারিলাম না বলিয়া, তাঁহাকে পত্র লেখা হইল না। তুমি যেমন করিয়া ভাল বিবেচনা কর, তেমনি করিয়া আমার এ সংবাদ তাঁহাকে দিও। তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিও যে, তাঁহার উপর রাগ করিয়া আমি দেশান্তরে চলিলাম না। তাঁহার উপর আমার রাগ নাই; কখনও তাঁহার উপর রাগ করি নাই, কখনও করিব না। যাঁহাকে মনে হইলেই আহ্লাদ হয়, তাঁহার উপর কি রাগ হয়? তাঁহার উপর যে অচলা ভক্তি, তাহাই রহিল, যত দিন না মাটিতে এ মাটি মিশে, তত দিন থাকিবে। কেন না, তাঁহার সহস্র গুণ আমি কখন ভুলিতে পারিব না। এতগুণ কাহারও নাই। এত গুণ কাহারও নাই বলিয়াই আমি তাঁহার দাসী। এক দোষে যদি তাঁহার সহস্র গুণ ভুলিতে পারিতাম, তবে আমি তাঁহার দাসী

হইবার যোগ্য নহি। তাঁহার নিকট আমি জন্মের মত বিদায় লইলাম। জন্মের মত স্বামীর কাছে বিদায় লইলাম। ইহাতেই জানিতে পারিবে যে, আমি কত দুঃখে সর্ব্বত্যাগিনী হইতেছি।

"তোমার কাছে জন্মের মত বিদায় হইলাম, আশীর্ব্বাদ করি, তোমার স্বামী পুত্র দীর্ঘজীবী হউক, তুমি চিরসুখী হও। আরও আশীর্ব্বাদ করি যে, যে দিন তুমি স্বামীর প্রেমে বঞ্চিত হইবে, সেই দিন যেন তোমার আয়ুঃশেষ হয়। আমায় এ আশীর্ব্বাদ কেহ করে নাই।"

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ : বিষবৃক্ষ কি?

যে বিষবৃক্ষের বীজ বপন হইতে ফলোৎপত্তি এবং ফলভোগ পর্য্যন্ত ব্যাখ্যানে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা সকলেরই গৃহপ্রাঙ্গণে রোপিত আছে। রিপুর প্রাবল্য ইহার বীজ; ঘটনাধীনে তাহা সকল ক্ষেত্রে উপ্ত হইয়া থাকে। কেহই এমন মনুষ্য নাই যে, তাঁহার চিত্ত রাগদ্বেষকাম ক্রোধাদির অস্পৃশ্য। জ্ঞানী ব্যক্তিরাও ঘটনাধীনে সেই সকল রিপুকর্ত্তৃক বিচলিত হইয়া থাকেন। কিন্তু মনুষ্যে মনুষ্যে প্রভেদ এই যে, কেহ আপন উচ্ছলিত মনোবৃত্তি সকল সংযত করিতে পারেন এবং সংযত করিয়া থাকেন, সেই ব্যক্তি মহাত্মা; কেহ বা আপন চিত্ত সংযত করে না, তাহারই জন্য বিষবৃক্ষের বীজ উপ্ত হয়। চিত্তসংযমের অভাবই ইহার অঙ্কুর, তাহাতেই এ বৃক্ষের বৃদ্ধি। এই বৃক্ষ মহাতেজস্বী; একবার ইহার পুষ্টি হইলে, আর নাশ নাই। এবং ইহার শোভা অতিশয় নয়নপ্রীতিকর; দূর হইতে ইহার বিবিধবর্ণ পল্লব ও সমুৎফুল্ল মুকুলদাম দেখিতে অতি রমণীয়। কিন্তু ইহার ফল বিষময়; যে খায়, সেই মরে।

ক্ষেত্রভেদে, বিষবৃক্ষে নানা ফল ফলে। পাত্রবিশেষে, বিষবৃক্ষে রোগশোকাদি নানাবিধ ফল।চিত্তসংযমপক্ষেপ্রথমতঃচিত্তসংযমে প্রবৃত্তি; দ্বিতীয়তঃ চিত্তসংযমের শক্তি আবশ্যক। ইহার মধ্যে শক্তি প্রকৃতিজন্যা; প্রবৃত্তি শিক্ষ্যাজন্যা। প্রকৃতিও শিক্ষার উপর নির্ভর করে। সুতরাং চিত্তসংযমপক্ষে শিক্ষাই মূল। কিন্তু গুরুপদেশকে কেবল শিক্ষা বলিতেছি না, অন্তঃকরণের পক্ষে দুঃখভোগই প্রধান শিক্ষা।

নগেন্দ্রের এ শিক্ষা কখনও হয় নাই। জগদীশ্বর তাঁহাকে সকল সুখের অধিপতি করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। কান্ত রূপ; অতুল ঐশ্বর্য্য; নীরোগ শরীর ; সর্ব্বব্যাপিনী বিদ্যা, সুশীল চরিত্র; স্নেহময়ী সাধ্বী স্ত্রী; এ সকল এক জনের ভাগ্যে প্রায় ঘটে না। নগেন্দ্রের এ সকলই ঘটিয়াছিল। প্রধানপক্ষে; নগেন্দ্র নিজ চরিত্রগুণেই চিরকাল সুখী; তিনি সত্যবাদী, অথচ প্রিয়ংবদ; পরোপকারী, অথচ ন্যায়নিষ্ঠ; দাতা, অথচ মিতব্যয়ী; স্নেহশীল, অথচ কর্ত্তব্য কর্ম্মে স্থিরসঙ্কল্প। পিতা, মাতা, বর্ত্তমান থাকিতে তাঁহাদিগের নিতান্ত ভক্ত এবং প্রিয়কারী ছিলেন, ভার্য্যার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত ছিলেন; বন্ধুর হিতকারী, ভৃত্যের প্রতি কৃপাবান্; অনুগতের প্রতিপালক; শত্রুর প্রতি বিবাদশূন্য। তিনি পরামর্শে বিজ্ঞ; কার্য্যে সরল; আলাপে নম্র; রহস্যে বাঙ্ময়। এরূপ চরিত্রের পুরস্কারই অবিচ্ছিন্ন সুখ;–নগেন্দ্রের আশৈশব তাহাই ঘটিয়াছিল। তাঁহার দেশে সম্মান, বিদেশে যশঃ অনুগত ভৃত্য; প্রজাগণের সন্নিধানে ভক্তি; সূর্য্যমুখীর নিকট অবিচলিত, অপরিমিত, অকলুষিত স্নেহরাশি। যদি তাঁহার কপালে এত সুখ না ঘটিত, তবে তিনি কখনও এত দুঃখী হইতেন না।

দুঃখী না হইলে লোভে পড়িতে হয় না। যাহার যাহাতে অভাব, তাহার তাহাতেই লোভ। কুন্দনন্দিনীকে লুব্ধলোচনে দেখিবার পূর্ব্বে নগেন্দ্র কখনও লোভে পড়েন নাই; কেন না, কখনও কিছুরই অভাব জানিতে পারেন নাই। সুতরাং লোভ সম্বরণ করিবার জন্য যে মানসিক অভ্যাস বা শিক্ষা আবশ্যক, তাহা তাঁহার হয় নাই। এই জন্যই তিনি চিত্ত সংযমে প্রবৃত্ত হইয়াও সক্ষম হইলেন না। অবিচ্ছিন্ন সুখ, দুঃখের মূল; পূর্ব্বগামী দুঃখ ব্যতীত স্থায়ী সুখ জন্মে না।

নগেন্দ্রের যে দোষ নাই, এমত বলি না। তাঁহার দোষ গুরুতর; প্রায়শ্চিত্তও গুরুতর আরম্ভ হইল!

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ : অন্বেষণ

বলা বাহুল্য যে, যখন সূর্য্যমুখীর পলায়নের সংবাদ গৃহমধ্যে রাষ্ট্র হইল, তখন তাঁহার অন্বেষণে লোক পাঠাইবার বড় তাড়াতাড়ি পড়িয়া গেল। নগেন্দ্র চারি দিকে লোক পাঠাইলেন, শ্রীশচন্দ্র লোক পাঠাইলেন, কমলমণি চারি দিকে লোক পাঠাইলেন। বড় বড় দাসীরা জলের কলসী ফেলিয়া ছুটিল; হিন্দুস্থানী দ্বারবানেরা বাঁশের লাঠি হাতে করিয়া, তুলভরা ফরাশীর ছিটের মেরজাই গায়ে দিয়া, মস্‌মস্‌ করিয়া নাগরা জুতার শব্দ করিয়া চলিল—খান্‌সামারা গামছা কাঁধে, গোট কাঁকালে, মাঠাকুরাণীকে ফিরাতে চলিল। কতকগুলি আত্মীয় লোক গাড়ি লইয়া বড় রাস্তায় গেল। গ্রামস্থ লোক মাঠে ঘাটে খুঁজিয়া দেখিতে লাগিল; কোথাও বা গাছতলায় কমিটি করিয়া তামাকু পোড়াইতে লাগিল। ভদ্রলোকেরাও বারোইয়ারির আটচালায়, শিবের মন্দিরের রকে, ন্যায়কচ্‌কচি ঠাকুরের টোলে এবং অন্যান্য তথাবিধ স্থানে বসিয়া ঘোঁট করিতে লাগিলেন। মাগী-ছাগী স্নানের ঘাটগুলাকে ছোট আদালত করিয়া তুলিল। বালকমহলে ঘোর পর্ব্বাহ বাঁধিয়া গেল; অনেক ছেলে ভরসা করিতে লাগিল, পাঠশালার ছুটি হইবে।

প্রথমে শ্রীশচন্দ্র, নগেন্দ্র এবং কমলকে ভরসা দিতে লাগিলেন, "তিনি কখনও পথ হাঁটেন নাই—কত দূর যাইবেন? এক পোওয়া আধ ক্রোশ পথ গিয়া কোথাও বসিয়া আছেন, এখনই সন্ধান পাইব।" কিন্তু যখন দুই তিন ঘণ্টা অতীত হইল, অথচ সূর্যমুখীর কোন সংবাদ পাওয়া গেল না, তখন নগেন্দ্র স্বয়ং তাহার সন্ধানে বাহির হইলেন। কিছুক্ষণ রৌদ্রে পুড়িয়া মনে করিলেন, "আমি খুঁজিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু হয়ত সূর্য্যমুখীকে এতক্ষণ বাড়ী আনিয়াছে।" এই বলিয়া ফিরিলেন। বাড়ী আসিয়া দেখিলেন, সূর্য্যমুখীর কোন সংবাদ নাই। আবার বাহির হইলেন। আবার ফিরিয়া বাড়ী আসিলেন, এইরূপ দিনমান গেল।

বস্তুতঃ শ্রীশচন্দ্র যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সত্য। সূর্য্যমুখী কখনও পদব্রজে বাটীর বাহির হয়েন নাই। কতদূর যাইবেন? বাটী হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে একটা পুষ্করিণীর ধারে আম্রবাগানে শয়ন করিয়াছিলেন। একজন খানসামা, যে অন্তঃপুরে যাতায়াত করিত, সেই সন্ধান করিতে করিতে সেইখানে আসিয়া তাঁহাকে দেখিল। চিনিয়া বলিল, "আজ্ঞে, আসুন!"

সূর্য্যমুখী কোন উত্তর করিলেন না। সে আবার বলিল, "আজ্ঞে! আসুন! বাড়ীতে সকলে বড় ব্যস্ত হইয়াছেন।" সূর্য্যমুখী তখন ক্রোধভরে কহিলেন, "আমাকে ফিরাইবার তুই কে?" খানসামা ভীত হইল। তথাপি সে দাঁড়াইয়া রহিল। সূর্য্যমুখী তাহাকে কহিলেন, "তুই যদি এখানে দাঁড়াইবি, তবে এই পুষ্করিণীর জলে আমি ডুবিয়া মরিব।"

খানসামা কিছু করিতে না পারিয়া দ্রুত গিয়া নগেন্দ্রকে সংবাদ দিল। নদেন্দ্র শিবিকা লইয়া স্বয়ং সেইখানে আসিলেন। কিন্তু তখন আর সূর্য্যমুখীকে সেখানে পাইলেন না। নিকটে অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কিছুই হইল না।

সূর্য্যমুখী সেখান হইতে উঠিয়া গিয়া এক বনে বসিয়াছিলেন। সেখানে এক বুড়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। বুড়ী কাঠ কুড়াইতে আসিয়াছিল—কিন্তু সূর্য্যমুখীর সন্ধান দিতে পারিলে ইনাম পাওয়া যাইতে পারে, অতএব সেও সন্ধানে ছিল। সূর্য্যমুখীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যা গা, তুমি কি আমাদের মা ঠাকুরাণী গা?"

সূর্য্যমুখী বলিলেন, "না বাছা!"

বুড়ী বলিল, “হাঁ, তুমি আমাদের মা ঠাকুরাণী।”
সূর্যমুখী বলিলেন, “ তোমাদের মা ঠাকুরাণী কে গা?”
বুড়ী বলিল, “বাবুদের বাড়ীর বউ গা।”
সূর্য্যমুখী বলিলেন,“আমার গায়ে কি সোণা দানা আছে যে, আমি বাবুদের বাড়ীর বউ?”
বুড়ী ভাবিল, “তাও ত বটে?”
সে তখন কাঠ কুড়াইতে কুড়াইতে অন্য বনে গেল।
দিনমান এইরূপে বৃথায় গেল। রাত্রেও কোন ফললাভ হইল না। তৎপরদিন ও তৎপরদিনও কার্য্যসিদ্ধি হইল না–অথচ অনুসন্ধানেরও ত্রুটি হইল না। পুরুষ অনুসন্ধানকারীরা প্রায় কেহই সূর্য্যমুখীকে চিনিত না–তাহারা অনেক কাঙ্গাল গরীব ধরিয়া আনিয়া নগেন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত করিল। শেষে ভদ্রলোকের মেয়েছেলেদের একা পথে ঘাটে স্নান করিতে যাওয়া দায় ঘটিল। একা দেখিলেই নগেন্দ্রের নেমকহালাল হিন্দুস্থানীরা “মা ঠাকুরাণী” বলিয়া পাছু লাগিত এবং স্নান বন্ধ করিয়া অকস্মাৎ পাল্কী, বেহারা আনিয়া উপস্থিত করিত। অনেকে কখন পাল্কী চড়ে নাই, সুবিধা পাইয়া বিনা ব্যয়ে পাল্কী চড়িয়া লইল।
শ্রীশচন্দ্র আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। কলিকাতায় গিয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। কমলমণি, গোবিন্দপুরে থাকিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

একত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ : সকল সুখেরই সীমা আছে

কুন্দনন্দিনী যে সুখের আশা করিতে কখন ভরসা করেন নাই, তাঁহার সে সুখ হইয়াছিল। তিনি নগেন্দ্রের স্ত্রী হইয়াছিলেন। যে দিন বিবাহ হইল, কুন্দনন্দিনী মনে করিলেন, এ সুখের সীমা নাই, পরিমাণ নাই। তাহার পর সূর্য্যমুখী পলায়ন করিলেন। তখন মনে পরিতাপ হইল–মনে করিলেন, “সূর্য্যমুখী আমাকে অসময়ে রক্ষা করিয়াছিল–নহিলে আমি কোথায় যাইতাম–কিন্তু আজি সে আমার জন্য গৃহত্যাগী হইল। আমি সুখী না হইয়া মরিলে ভাল ছিল।” দেখিলেন, সুখের সীমা আছে।
প্রদোষে নগেন্দ্র শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন–কুন্দনন্দিনী শিয়রে বসিয়া ব্যজন করিতেছেন। উভয়ে নীরবে আছেন। এটি সুলক্ষণ নহে; আর কেহ নাই–অথচ দুই জনেই নীরব–সম্পূর্ণ সুখ থাকিলে এরূপ ঘটে না।
কিন্তু সূর্য্যমুখীর পলায়ন অবধি ইহাদের সম্পূর্ণ সুখ কোথায়? কুন্দনন্দিনী সর্ব্বদা মনে ভাবিতেন, “কি করিলে, আবার যেমন ছিল, তেমনি হয়।” আজিকার দিন, এই সময়, কুন্দনন্দিনী মুখ ফুটিয়া এ কথাটি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি করিলে যেমন ছিল তেমনি হয়?”
নগেন্দ্র বিরক্তির সহিত বলিলেন, “যেমন ছিল, তেমনি হয়? তোমাকে বিবাহ করিয়াছি বলিয়া কি তোমার অনুতাপ হইয়াছে?”
কুন্দনন্দিনী ব্যথা পাইলেন। বলিলেন, “তুমি আমাকে বিবাহ করিয়া যে সুখী করিয়াছ–তাহা আমি কখনও আশা করি নাই। আমি তাহা বলি না–আমি বলিতেছিলাম যে, কি করিলে সূর্য্যমুখী ফিরিয়া আসে।”
নগেন্দ্র বলিলেন, “ঐ কথাটি তুমি মুখে আনিও না। তোমার মুখে সূর্য্যমুখীর নাম শুনিলে আমার অন্তর্দ্দাহ হয়–তোমারই জন্য সূর্য্যমুখী আমাকে ত্যাগ করিয়া

গেল।”

ইহা কুন্দনন্দিনী জানিতেন—কিন্তু নগেন্দ্রের ইহা বলাতে কুন্দনন্দিনী ব্যথিত হইলেন। ভাবিলেন, “এটি কি তিরস্কার? আমার ভাগ্য মন্দ—কিন্তু আমি ত কোন দোষ করি নাই। সূর্য্যমুখীই ত এ বিবাহ দিয়াছে।” কুন্দ আর কোন কথা না কহিয়া ব্যজনে রত হইলেন। কুন্দনন্দিনীকে অনেকক্ষণ নীরব দেখিয়া নগেন্দ্র বলিলেন, “কথা কহিতেছ না কেন? রাগ করিয়াছ?” কুন্দ কহিলেন, “না।”

ন। কেবল একটি ছোট্টো ‘‘না’’ বলিয়া আবার চুপ করিলেন। তুমি কি আমায় আর ভালবাস না?

কু। বাসি বই কি?

ন। “বাসি বই কি?” এ যে বালক—ভুলান কথা। কুন্দ, বোধ হয়, তুমি আমায় কখন ভালবাসিতে না।

কু। বরাবর বাসি।

নগেন্দ্র বুঝিয়াও বুঝিলেন না যে, এ সুর্য্যমুখী নয়। সূর্য্যমুখীর ভালবাসা যে কুন্দনন্দিনীতে ছিল না—তাহা নহে—কিন্তু কুন্দ কথা জানিতেন না। তিনি বালিকা, ভীরুস্বভাব, কথা জানেন না, আর কি বলবেন? কিন্তু নগেন্দ্র তাহা বুঝিলেন না, বলিলেন, “আমাকে সূর্য্যমুখী বরাবর ভালবাসিত। বানরের গলায় মুক্তার হার সহিবে কেন?—লোহার শিকলই ভাল।”

এবার কুন্দনন্দিনী রোদন সংবরণ করিতে পারিলেন না। ধীরে ধীরে উঠিয়া বাহিরে গেলেন। এমন কেহ ছিল না যে, তাঁহার কাছে রোদন করেন। কমলমণি আসা পর্য্যন্ত কুন্দ তাঁহার কাছে যান নাই—কুন্দনন্দিনী, আপনাকে এ বিবাহের প্রধান অপরাধিনী বোধ করিয়া লজ্জায় তাঁহার কাছে মুখ দেখাইতে পারেন নাই। কিন্তু আজিকার মর্ম্মপীড়া, সহৃদয়া স্নেহময়ী কমলমণির সাক্ষাতে বলিতে ইচ্ছা করিলেন। সে দিন, প্রণয়ের নৈরাশ্যের সময় কমলমণি তাঁহার দুঃখে দুঃখী হইয়া, তাঁহাকে কোলে লইয়া চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়াছিলেন—সেই দিন মনে করিয়া তাঁহার কাছে কাঁদিতে গেলেন। কমলমণি কুন্দনন্দিনীকে দেখিয়া অপ্রসন্ন হইলেন—কুন্দকে কাছে আসিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, কিছু বলিলেন না। কুন্দ তাঁহার কাছে আসিয়া বসিয়া, কাঁদিতে লাগিলেন। কমলমণি কিছু বলিলেন না; জিজ্ঞাসাও করিলেন না, কি হইয়াছে। সুতরাং কুন্দনন্দিনী আপনা আপনি চুপ করিলেন। কমল তখন বলিলেন, “আমার কাজ আছে।” অনন্তর উঠিয়া গেলেন।

কুন্দনন্দিনী দেখিলেন, সকল সুখেরই সীমা আছে।

দ্বাত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ : বিষবৃক্ষের ফল

(হরদেব ঘোষালের প্রতি নগেন্দ্র দত্তের পত্র)

তুমি লিখিয়াছ যে, আমি এ পৃথিবীতে যত কাজ করিয়াছি, তাহার মধ্যে কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করা সর্ব্বাপেক্ষা ভ্রান্তিমূলক কাজ। ইহা আমি স্বীকার করি। আমি এই কাজ করিয়া সূর্য্যমুখীকে হারাইলাম। সূর্য্যমুখীকে পত্নীভাবে পাওয়া বড় জোর কপালের কাজ। সকলেই মাটি খোঁড়ে, কোহিনুর এক জনের কপালেই উঠে। সূর্য্যমুখী সেই কোহিনুর। কুন্দনন্দিনী কোন্ গুণে তাঁহার স্থান পূর্ণ করিবে?

তবে কুন্দনন্দিনীকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিয়াছিলাম কেন? ভ্রান্তি, ভ্রান্তি! এখন চেতনা হইয়াছে। কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল মরিবার জন্য। আমারও মরিবার জন্য এ মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে। এখন সূর্য্যমুখীকে কোথায় পাইব?

আমি কেন কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করিয়াছিলাম? আমি কি তাহাকে ভালবাসিতাম? ভালবাসিতাম বই কি—তাহার জন্য উন্মাদগ্রস্ত হইতে বসিয়াছিলাম—প্রাণ বাহির হইতেছিল। কিন্তু এখন বুঝিতেছি, সে কেবল চোখের ভালবাসা। নহিলে আজি পনের দিবসমাত্র বিবাহ করিয়াছি—এখনই বলিব কেন, "আমি তাহাকে ভালবাসিতাম?" ভালবাসিতাম কেন? এখনও ভালবাসি—কিন্তু আমার সূর্য্যমুখী কোথায় গেল? অনেক কথা লিখিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু আজ আর পারিলাম না। বড় কষ্ট হইতেছে। ইতি।

(হরদেব ঘোষালের উত্তর)

আমি তোমার মন বুঝিয়াছি। কুন্দনন্দিনীকে ভালবাসিতে না, এমত নহে, এখনও ভালবাস; কিন্তু সে যে কেবল চোখের ভালবাসা, ইহা যথার্থ বলিয়াছ। সূর্য্যমুখীর প্রতি তোমার গাঢ় স্নেহ—কেবল দুই দিনের জন্য কুন্দনন্দিনীর ছায়ায় তাহা আবৃত হইয়াছিল। এখন সূর্য্যমুখীকে হারাইয়া তাহা বুঝিয়াছ। যতক্ষণ সূর্য্যদেব অনাচ্ছন্ন থাকেন, ততক্ষণ তাঁহার কিরণে সন্তাপিত হই, মেঘ ভাল লাগে। কিন্তু সূর্য্য অস্ত গেলে বুঝিতে পারি, সূর্য্যদেবই সংসারের চক্ষু। সূর্য্য বিনা সংসার আঁধার।

তুমি আপনার হৃদয় না বুঝিতে পারিয়া এমন গুরুতর ভ্রান্তিমূলক কাজ করিয়াছ—ইহার জন্য আর তিরস্কার করিব না—কেন না, তুমি যে ভ্রমে পড়িয়াছিলে, আপনা হইতে তাহার অপনোদন বড় কঠিন। মনের অনেকগুলি ভাব আছে, তাহার সকলকেই লোকে ভালবাসা বলে। কিন্তু চিত্তের যে অবস্থায়, অন্যের সুখের জন্য আমরা আত্মসুখ বিসর্জ্জন করিতে স্বতঃপ্রস্তুত হই, তাহাকে প্রকৃত ভালবাসা বলা যায়। "স্বতঃপ্রস্তুত হই," অর্থাৎ ধর্ম্মজ্ঞান বা পুণ্যাকাঙ্ক্ষায় নহে। সুতরাং রূপবতীর রূপভোগলালসা, ভালবাসা নহে। যেমন ক্ষুধাতুরের ক্ষুধাকে অন্নের প্রতি প্রণয় বলিতে পারি না, তেমনি কামাতুরের চিত্তচাঞ্চল্যকে রূপবতীর প্রতি ভালবাসা বলিতে পারি না। সেই চিত্তচাঞ্চল্যকেই আর্য্যকবিরা মদনশরজ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যে বৃত্তির কল্পিত অবতার বসন্তসহায় হইয়া, মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে গিয়াছিলেন, যাঁহার প্রাসাদে কবির বর্ণনার মৃগেরা মৃগীদিগের গাত্রে গাত্রকণ্ডুয়ন করিতেছে, করিগণ করিণীদিগকে পদ্মমৃণাল ভাঙ্গিয়া দিতেছে, সে এই রূপজ মোহমাত্র। এ বৃত্তিও জগদীশ্বরপ্রেরিতা; ইহা দ্বারাও সংসারের ইষ্টসাধন হইয়া থাকে, এবং ইহা সর্ব্বজীবমুগ্ধকারী। কালিদাস, বাইরণ, জয়দেব ইহার কবি;—বিদ্যাসুন্দর ইহার ভেঙ্গান। কিন্তু ইহা প্রণয় নহে। প্রেম বুদ্ধিবৃত্তিমূলক। প্রণয়াস্পদ ব্যক্তির গুণসকল যখন বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা পরিগৃহীতা হয়, হৃদয় সেই সকল গুণে মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রতি সমাকৃস্ট এবং সঞ্চালিত হয়, তখন সেই গুণাধারের সংসর্গলিপ্সা, এবং তৎপ্রতি ভক্তি জন্মে। ইহার ফল, সহৃদয়তা এবং পরিণামে আত্মবিস্মৃতি ও আত্মবিসর্জ্জন। এই যথার্থ প্রণয়; সেক্ষপীয়র, বাল্মীকি, শ্রীমদ্ভাগবতকার ইহার কবি। ইহা রূপে জন্মে না। প্রথমে বুদ্ধিদ্বারা গুণগ্রহণ, গুণগ্রহণের পর আসঙ্গলিপ্সা; আসঙ্গলিপ্সা সফল হইলে সংসর্গ, সংসর্গফলে প্রণয়, প্রণয়ে আত্মবিসর্জ্জন। আমি ইহাকেই ভালবাসা বলি। নিতান্ত পক্ষে স্ত্রীপুরুষের ভালবাসা, আমার বিবেচনায় এইরূপ। আমার বোধ হয়, অন্য ভালবাসারও মূল এইরূপ; তবে স্নেহ এক কারণে উপস্থিত হয় না। কিন্তু সকল কারণই বুদ্ধিবৃত্তিমূলক। নিতান্ত পক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক কারণজাত স্নেহ ভিন্ন স্থায়ী হয় না। রূপজ মোহ তাহা নহে। রূপদর্শনজনিত যে সকল চিত্তবিকৃতি, তাহার তীক্ষ্ণতা পৌনঃপুন্যে হ্রস্ব হয়। অর্থাৎ পৌনঃপুন্যে পরিতৃপ্তি জন্মে। গুণজনিতের পরিতৃপ্তি নাই। কেন না, রূপ এক—প্রত্যহই তাহার এক প্রকারই বিকাশ, গুণ নিত্য নূতন নূতন ক্রিয়ায়

নূতন নূতন হইয়া প্রকাশ পায়। রূপেও প্রণয় জন্মে, গুণেও প্রণয় জন্মে—কেন না, উভয়ের দ্বারা আসঙ্গলিপ্সা জন্মে। যদি উভয় একত্রিত হয়, তবে প্রণয় শীঘ্র জন্মে; কিন্তু একবার প্রণয়সংসর্গ ফল বদ্ধমূল হইলে, রূপ থাকা না থাকা সমান। রূপবান্ ও কুৎসিতের প্রতি স্নেহ ইহার নিত্য উদাহরণস্থল।
গুণজনিত প্রণয় চিরস্থায়ী বটে—কিন্তু গুণ চিনিতে দিন লাগে। এই জন্য সে প্রণয় একেবারে হঠাৎ বলবান্ হয় না—ক্রমে সঞ্চারিত হয়। কিন্তু রূপজ মোহ এককালীন সম্পূর্ণ বলবান্ হইবে। তাহার প্রথম বল এমন দুর্দ্দমনীয় হয় যে অন্য সকল বৃত্তি তদ্দ্বারা উচ্ছিন্ন হয়। এই মোহ কি—এই স্থায়ী প্রণয় কি না—ইহা জানিবার শক্তি থাকে না। অনন্তকালস্থায়ী প্রণয় বলিয়া তাহাকে বিবেচনা হয়। তোমার তাহাই বিবেচনা হইয়াছিল—এই মোহের প্রথম বলে সূর্য্যমুখীর প্রতি তোমার যে, স্থায়ী প্রেম, তাহা তোমার চক্ষে অদৃশ্য হইয়াছিল। এই তোমার ভ্রান্তি। এ ভ্রান্তি মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। অতএব তোমাকে তিরস্কার করিব না। বরং পরামর্শ দিই, ইহাতেই সুখী হইবার চেষ্টা কর।
তুমি নিরাশ হইও না। সূর্য্যমুখী অবশ্য পুনরাগমণ করিবেন—তোমাকে না দেখিয়া তিনি কত কাল থাকিবেন? যতদিন না আসেন, তুমি কুন্দনন্দিনীকে স্নেহ করিও। তোমার পত্রাদিতে যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে বোধ হইয়াছে তিনিও গুণহীনা নহেন। রূপজ মোহ দূর হইলে, কালে স্থায়ী প্রেমের সঞ্চার হইবে। তাহা হইলে তাঁহাকে লইয়াই সুখী হইতে পারিবে। এবং যদি তোমার জ্যেষ্ঠা ভার্য্যার সাক্ষাৎ আর না পাও, তবে তাঁহাকে ভুলিতেও পারিবে। বিশেষ কনিষ্ঠা তোমাকে ভালবাসেন। ভালবাসায় কখন অযত্ন করিবে না; কেন না, ভালবাসাতেই মানুষের একমাত্র নির্ম্মল এবং অবিনশ্বর সুখ। ভালবাসাই মনুষ্যজাতির উন্নতির শেষ উপায়—মনুষ্যমাত্রে পরস্পরে ভালবাসিলে আর মনুষ্যকৃত অনিষ্ট পৃথিবীতে থাকিবে না।

(নগেন্দ্রনাথের প্রত্যুত্তর)

তোমার পত্র পাইয়া, মানসিক ক্লেশের কারণ, এ পর্য্যন্ত উত্তর দিই নাই। তুমি যাহা লিখিয়াছ, তাহা সকলই বুঝিয়াছি এবং তোমার পরামর্শই যে সৎপরামর্শ তাহাও জানি। কিন্তু গৃহে মনঃস্থির করিতে পারি না। এক মাস হইল, আমার সূর্য্যমুখী আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, আর তাঁহার কোন সংবাদ পাইলাম না। তিনি যে পথে গিয়াছেন, আমিও সেই পথে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছি। আমিও গৃহত্যাগ করিব। দেশে দেশে তাঁহার সন্ধান করিয়া বেড়াইব! তাঁহাকে পাই, লইয়া গৃহে আসিব; নচেৎ আর আসিব না। কুন্দনন্দিনীকে লইয়া আর গৃহে থাকিতে পারি না। সে চক্ষুঃশূল হইয়াছে। তাহার দোষ নাই—দোষ আমারই—কিন্তু আমি তাঁহার মুখদর্শন আর সহ্য করিতে পারি না। আগে কিছু বলিতাম না—এখন নিত্য ভর্ৎসনা করি—সে কাঁদো—আমি কি করিব? আমি চলিলাম, শীঘ্র তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া অন্যত্র যাইব। ইতি।
নগেন্দ্রনাথ যেরূপ লিখিয়াছিলেন, সেইরূপই করিলেন। বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেওয়ানের উপরই ন্যস্ত করিয়া অচিরাৎ গৃহত্যাগ করিয়া পর্য্যটনে যাত্রা করিলেন। কমলমণি অগ্রেই কলিকাতায় গিয়াছিলেন। সুতরাং এ আখ্যায়িকার লিখিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কুন্দনন্দিনী একাই দত্তদিগের অন্তঃপুরে রহিলেন, আর হীরা দাসী তাহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রহিল।
দত্তদিগের সেই সুবিস্তৃতা পুরী অন্ধকার হইল। যেমন বহুদীপসমুজ্জল বহুলোকসমাকীর্ণ, গীতধ্বনিপূর্ণ নাট্যশালা নাট্যরঙ্গ সমাপন হইলে পর, অন্ধকার, জলশূন্য, নীরব হয়; এই মহাপুরী সূর্য্যমুখীনগেন্দ্রকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, সেইরূপ আঁধার হইল। যেমন বালক, চিত্রিত পুত্তলি লইয়া একদিন ক্রীড়া করিয়া, পুতুল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দেয়, পুতুল মাটিতে পড়িয়া থাকে, তাহার উপর মাটি পড়ে, তৃণাদি জন্মিতে থাকে; তেমনি কুন্দনন্দিনী, ভগ্ন পুতুলের ন্যায় নগেন্দ্র কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত

হইয়া একাকিনী সেই বিস্তৃতা পুরীমধ্যে অযত্নে পড়িয়া রহিলেন। যেমন দাবানলে বনদাহকালীন শাবকসহিত পক্ষিনীড় দগ্ধ হইলে, পক্ষিণী আহার লইয়া আসিয়া দেখে, বৃক্ষ নাই, বাসা নাই, শাবক নাই; তখন বিহঙ্গী নীড়ান্বেষণে উচ্চ কাতরোক্তি করিতে করিতে সেই দগ্ধ বনের উপরে মণ্ডলে মণ্ডলে ঘুরিয়া বেড়ায়, নগেন্দ্র সেইরূপ সূর্য্যমুখীর সন্ধানে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। যেমন অনন্তসাগরে অতলজলে মণিখণ্ড ডুবিলে আর দেখা যায় না, সূর্য্যমুখী তেমনি দুষ্প্রাপণীয়া হইলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ : ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ

কার্পাসবস্ত্রমধ্যস্থ তপ্ত অঙ্গারের ন্যায়, দেবেন্দ্রের নিরূপম মূর্ত্তি হীরার অন্তঃকরণকে স্তরে স্তরে দগ্ধ করিতেছিল। অনেক বার হীরার ধর্ম্মভীতি এবং লোকলজ্জা, প্রণয়বেগে ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইল ; কিন্তু দেবেন্দ্রের স্নেহহীন ইন্দ্রিয়পর চরিত্র মনে পড়াতে আবার তাহা বদ্ধমূল হইল। হীরা চিত্তসংযমে বিলক্ষণ ক্ষমতাশালিনী এবং সেই ক্ষমতা ছিল বলিয়াই, সে বিশেষ ধর্ম্মভীতা না হইয়াও এ পর্য্যন্ত সতীত্বধর্ম্ম সহজেই রক্ষা করিয়াছিল। সেই ক্ষমতাপ্রভাবেই, সে দেবেন্দ্রের প্রতি প্রবলানুরাগ অপাত্রন্যস্ত জানিয়া সহজেই শমিত করিয়া রাখিতে পারিল। বরং চিত্তসংযমের সদুপায়স্বরূপ হীরা স্থির করিল যে, পুনর্ব্বার দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিবে। পরগৃহের গৃহকর্ম্মাদিতে অনুদিন নিরত থাকিলে, সে অন্য মনে এই বিফলানুরাগের বৃশ্চিকদংশনস্বরূপ জ্বালা ভুলিতে পারিবে। নগেন্দ্র যখন কুন্দনন্দিনীকে গোবিন্দপুরে রাখিয়া পর্য্যটনে যাত্রা করিলেন, তখন হীরা ভূতপূর্ব্ব আনুগত্যের বলে দাসীত্ব ভিক্ষা করিল। কুন্দের অভিপ্রায় জানিয়া নগেন্দ্র হীরাকে কুন্দনন্দিনীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রাখিয়া গেলেন।

হীরার পুনর্ব্বার দাসীবৃত্তি স্বীকার করার আর একটি কারণ ছিল। হীরা পূর্ব্বে অর্থাদি কামনায়, কুন্দকে নগেন্দ্রের ভবিষ্যৎ প্রিয়তমা মনে করিয়া স্বীয় বশীভূত করিবার জন্য যত্ন পাইয়াছিল। ভাবিয়াছিল, নগেন্দ্রের অর্থ কুন্দের হস্তগত হইবে, কুন্দের হস্তগত অর্থ হীরার হইবে। এক্ষণে সেই কুন্দ নগেন্দ্রের গৃহিণী হইল। অর্থসম্বন্ধে কুন্দের কোন বিশেষ আধিপত্য জন্মিল না, কিন্তু এখন সে কথা হীরারও মনে স্থান পাইল না। হীরার অর্থে আর মন ছিল না, মন থাকিলেও কুন্দ হইতে লব্ধ অর্থ বিষতুল্য বোধ হইত।

হীরা, আপন নিষ্ফল প্রণয়যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিত, কিন্তু কুন্দনন্দিনীর প্রতি দেবেন্দ্রের অনুরাগ সহ্য করিতে পারিল না। যখন হীরা শুনিল যে, নগেন্দ্র বিদেশ পরিভ্রমণে যাত্রা করিবেন, কুন্দনন্দিনী গৃহে গৃহিণী হইয়া থাকিবেন, তখন হরিদাসী বৈষ্ণবীকে স্মরণে হীরার মহাভয়সঞ্চার হইল। হীরা, হরিদাসী বৈষ্ণবীর যাতায়াতের পথে কাঁটা দিবার জন্য প্রহরী হইয়া আসিল।

হীরা কুন্দনন্দিনীর মঙ্গলকামনা করিয়া এরূপ অভিসন্ধি করে নাই। হীরা ঈর্ষ্যাবশতঃ কুন্দের উপর এরূপ জাতক্রোধ হইয়াছিল যে, তাহার মঙ্গলচিন্তা দূরে থাকুক, কুন্দের নিপাত দৃষ্টি করিলে পরমাহ্লাদিত হইত। পাছে কুন্দের সঙ্গে দেবেন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়, এইরূপ ঈর্ষ্যাজাত ভয়েই হীরা নগেন্দ্রের পত্নীকে প্রহরাতে রাখিল। হীরা দাসী, কুন্দের এক যন্ত্রণার মূল হইয়া উঠিল। কুন্দ দেখিল, হীরার সে যত্ন, মমতা বা প্রিয়বাদিনীত্ব নাই। দেখিল যে, হীরা দাসী হইয়া তাহার প্রতি সর্ব্বদা অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে এবং তিরস্কৃত ও অপমানিত করে। কুন্দ নিতান্ত শান্তস্বভাব; হীরার আচরণে নিতান্ত পীড়িতা হইয়াও কখনও তাহাকে কিছু বলিত না। কুন্দ শীতল প্রকৃতি, হীরা উগ্রপ্রকৃতি। এজন্য কুন্দ প্রভুপত্নী হইয়াও দাসীর নিকট দাসীর মত থাকিতে লাগিল, হীরা দাসী হইয়াও প্রভুপত্নীর প্রভু হইয়া বসিল।

পুরবাসিনীরা কখনও কখনও কুন্দের যন্ত্রণা দেখিয়া হীরাকে তিরস্কার করিত, কিন্তু বাঙ্ময়ী হীরার নিকট তাল ফাঁদিতে পারিত না। দেওয়ানজী, এ সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া, হীরাকে বলিলেন, "তুমি দূর হও। তোমাকে জবাব দিলাম।" শুনিয়া হীরা রোষবিস্ফারিতলোচনে দেওয়ানজীকে কহিল, "তুমি জবাব দিবার কে? আমাকে মুনিব রাখিয়া গিয়াছে। মুনিবের কথা নহিলে আমি যাইব না। আমাকে জবাব দিবার তোমার যে ক্ষমতা, তোমাকে জবাব দিবার আমারও সে ক্ষমতা।" শুনিয়া দেওয়ানজী অপমানভয়ে দ্বিতীয় বাক্যব্যয় করিলেন না। হীরা আপন জোরেই রহিল। সূর্য্যমুখী নহিলে কেহ হীরাকে শাসিত করিতে পারিত না।

এক দিন নগেন্দ্র বিদেশ যাত্রা করিলে পর হীরা একাকিনী অন্তঃপুরসন্নিহিত পুষ্পোদ্যানে লতামণ্ডপে শয়ন করিয়াছিল। নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখী পরিত্যাগ করা অবধি সে সকল লতামণ্ডপ হীরারই অধিকারগত হইয়াছিল। তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। আকাশে প্রায় পূর্ণচন্দ্র শোভা করিতেছে। উদ্যানের ভাস্বর বৃক্ষপাত্র তৎকিরণমালা প্রতিফলিত হইতেছে। লতাপল্লবরন্ধ্রমধ্য হইতে অপসৃত হইয়া চন্দ্রকিরণ শ্বেতপ্রস্তরময় হর্ম্ম্যতলে পতিত হইয়াছে এবং সমীপস্থ দীর্ঘিকার প্রদোষবায়ুসন্তাড়িত স্বচ্ছ জলের উপর নাচিতেছে। উদ্যানপুষ্পের সৌরভে আকাশ উন্মাদকর হইয়াছিল। এমত সময় হীরা অকস্মাৎ লতামণ্ডপমধ্যে পুরুষমূর্তি দেখিতে পাইল। চাহিয়া দেখিল যে, সে দেবেন্দ্র। অদ্য দেবেন্দ্র ছদ্মবেশী নহেন, নিজবেশেই আসিয়াছেন।

হীরা বিস্মিত হইয়া কহিল, "আপনার এ অতি দুঃসাহস। কেহ দেখিতে পাইলে আপনি মারা পড়িবেন।"

দেবেন্দ্র বলিলেন, "যেখানে হীরা আছে, সেখানে আমার ভয় কি?" এই বলিয়া দেবেন্দ্র হীরার পার্শ্বে বসিলেন। হীরা চরিতার্থ হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে কহিল, "কেন এখানে এসেছেন। যার আশায় এসেছেন, তার দেখা পাইবেন না।"

"তা ত পাইয়াছি। আমি তোমারই আশায় এসেছি।"

হীরা লুব্ধ চাটুকারের কপটালাপে প্রতারিত না হইয়া হাসিল এবং কহিল, "আমার কপাল যে এত প্রসন্ন হইয়াছে, তা ত জানি না। যাহা হউক, যদি আমার ভাগ্যই ফিরিয়াছে, তবে যেখানে নিষ্কণ্টকে বসিয়া আপনাকে দেখিয়া মনে তৃপ্তি হইবে, এমন স্থানে যাই চলুন। এখানে অনেক বিঘ্ন।"

দেবেন্দ্র বলিলেন, "কোথায় যাইব?"

হীরা বলিল, "যেখানে কোন ভয় নাই। আপনার সেই নিকুঞ্জ বনে চলুন।"

দে। তুমি আমার জন্য কোন ভয় করিও না।

হীরা। যদি আপনার জন্য ভয় না থাকে, আমার জন্য ভয় করিতে হয়। আমাকে আপনার কাছে কেহ দেখিলে, আমার দশা কি হইবে?

দেবেন্দ্র সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন, "তবে চল। তোমাদের নূতন গৃহিণীর সঙ্গে আলাপটা একবার ঝালিয়ে গেলে হয় না?"

হীরা এই কথা শুনিয়া দেবেন্দ্রের প্রতি ঈর্ষ্যানলজ্বলিত কটাক্ষ করিল, দেবেন্দ্র অস্পষ্টা-লোকে ভাল দেখিতে পাইলেন না। হীরা কহিল, "তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবেন কি প্রকারে?"

দেবেন্দ্র বিনীতভাবে কহিলেন, "তুমি কৃপা করিলে সকলই হয়।"

হীরা কহিল, "তবে এইখানে আপনি সতর্ক হইয়া বসিয়া থাকুন, আমি তাঁহাকে ডাকিয়া আনিতেছি।"

এই বলিয়া হীরা লতামণ্ডপ হইতে বাহির হইল। কিয়দ্দূর আসিয়া এক বৃক্ষান্তরালে বসিল এবং তখন তাঁহার কণ্ঠরুদ্ধ নয়নবারি দরবিগলিত হইয়া বহিতে লাগিল। পরে গাত্রোত্থান করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল, কিন্তু কুন্দনন্দিনীর কাছে গেল না। বাহিরে গিয়া দ্বাররক্ষকদিগকে কহিল, "তোমরা শীঘ্র আইস,

ফুলবাগানে চোর আসিয়াছে।”
তখন দোবে, চোবে পাঁড়ে এবং তেওয়ারি পাকা বাঁশের লাঠি হাতে করিয়া অন্তঃপুরমধ্য দিয়া ফুলবাগানের দিকে ছুটিল। দেবেন্দ্র দূর হইতে তাহাদের নাগরা জুতার শব্দ শুনিয়া, দূর হইতে কালো কালো গালপাট্টা দেখিতে পাইয়া, লতামণ্ডপ হইতে লাফ দিয়া বেগে পলায়ন করিল। তেওয়ারি গোষ্ঠী কিছু দূর পশ্চাদ্ধাবিত হইল। তাহারা দেবেন্দ্রকে ধরিতে পারিয়াও ধরিল না। কিন্তু দেবেন্দ্র কিঞ্চিৎ পুরস্কৃত না হইয়া গেলেন না। পাকা বাঁশের লাঠির আস্বাদ তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কি না, আমরা নিশ্চিত জানি না, কিন্তু দ্বারবান্ কর্ত্তৃক “শ্বশুরা” “শালা” প্রভৃতি প্রিয়সম্বন্ধসূচক নানা মিষ্ট সম্বোধনের দ্বারা অভিহিত হইয়াছিলেন, এমত আমরা শুনিয়াছি। এবং তাঁহার ভৃত্য একদিন তাঁহার প্রসাদী ব্র্যাণ্ডি খাইয়া পরদিবস আপন উপপত্নীর নিকট গল্প করিয়াছিল যে, “আজ বাবুকে তেল মাখাইবার সময়ে দেখি যে, তাঁহার পিঠে একটা কালশিরা দাগ।”
দেবেন্দ্র গৃহে গিয়া দুই বিষয়ে স্থিরকল্প হইলেন। প্রথম, হীরা থাকিতে তিনি আর দত্তবাড়ি যাইবেন না। দ্বিতীয়, হীরাকে ইহার প্রতিফল দিবেন। পরিণামে তিনি হীরাকে গুরুতর প্রতিফল প্রদান করিলেন। হীরার লঘুপাপে গুরুদণ্ড হইল। হীরা এমত গুরুতর শাস্তি প্রাপ্ত হইল যে, তাহা দেখিয়া শেষে দেবেন্দ্রেরও পাষাণহৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছিল। তাহা বিস্তারে বর্ণনীয় নহে; পরে সংক্ষেপে বলিব।

চতুস্ত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ : পথিপার্শ্বে

বর্ষাকাল। বড় দুর্দ্দিন। সমস্ত দিন বৃষ্টি হইয়াছে। একবারও সূর্য্যোদয় হয় নাই। আকাশ মেঘে ঢাকা। কাশী যাইবার পাকা রাস্তার ঘুটিঙ্গের উপর একটু একটু পিছল হইয়াছে। পথে প্রায় লোক নাই—ভিজিয়া ভিজিয়া কে পথ চলে ? একজন মাত্র পথিক পথ চলিতেছিল। পথিকের ব্রহ্মচারীর বেশ। গৈরিকবর্ণ বস্ত্র পরা—গলায় রুদ্রাক্ষ—কপালে চন্দনরেখা— জটার আড়ম্বর কিছু নাই, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশ কতক কতক শ্বেতবর্ণ। এক হাতে গোলপাতার ছাতা, অপর হাতে তৈজস—ব্রহ্মচারী ভিজিতে ভিজিতে চলিয়াছেন। একে ত দিনেই অন্ধকার, তাহাতে আবার পথে রাত্রি হইল—অমনি পৃথিবী মসীময়ী হইল—পথিক কোথায় পথ, কোথায় অপথ, কিছু অনুভব করিতে পারিলেন না। তথাপি পথিক পথ অতিবাহিত করিয়া চলিলেন—কেন না, তিনি সংসারত্যাগী, ব্রহ্মচারী। যে সংসারত্যাগী, তাহার অন্ধকার, আলো, কুপথ, সুপথ সব সমান।
রাত্রি অনেক হইল। ধরণী মসীময়ী—আকাশের মুখে কৃষ্ণাবগুণ্ঠন। বৃক্ষগণের শিরোমালা কেবল গাঢ়তর অন্ধকারের স্তূপস্বরূপ লক্ষিত হইতেছে। সেই বৃক্ষশিরোমালার বিচ্ছেদে মাত্র পথের রেখা অনুভূত হইতেছে। বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছে। এক একবার বিদ্যুৎ হইতেছে—সে আলোর অপেক্ষা আঁধার ভাল। অন্ধকারে ক্ষণিক বিদ্যুদালোকে সৃষ্টি যেমন ভীষণ দেখায়, অন্ধকারে তত নয়।
‘মা গো!”
অন্ধকারে যাইতে যাইতে বক্ষচারী অকস্মাৎ পথিমধ্যে এই শব্দসূচক দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনিতে পাইলেন। শব্দ অলৌকিক—কিন্তু তথাপি মনুষ্যকণ্ঠনিঃসৃত বলিয়া নিশ্চিত বোধ হইল। শব্দ অতি মৃদু, অথচ অতিশয় ব্যথাব্যঞ্জক বলিয়া বোধ হইল। ব্রহ্মচারী পথে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। কতক্ষণে আবার বিদ্যুৎ হইবে—সেই প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঘন ঘন বিদ্যুৎ হইতেছিল। বিদ্যুৎ হইলে পথিক দেখিলেন, পথিপার্শ্বে কি একটা পড়িয়া আছে। এটা কি মনুষ্য? পথিক তাহাই

বিবেচনা করিলেন। কিন্তু আর একবার বিদ্যুতের অপেক্ষা করিলেন। দ্বিতীয় বার বিদ্যুতে স্থির করিলেন, মনুষ্য বটে। তখন পথিক ডাকিয়া বলিলেন, "কে তুমি পথে পড়িয়া আছ?"
কেহ কোন উত্তর দিলেন না। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—এবার অস্ফুট কাতরোক্তি আবার মুহূর্ত্তজন্য কর্ণে প্রবেশ করিল। তখন ব্রহ্মচারী ছত্র, তৈজস ভূতলেত রাখিয়া, সেই স্থান লক্ষ্য করিয়া ইতস্ততঃ হস্তপ্রসারণ করিতে লাগিলেন। অচিরাৎ কোমল মনুষ্যদেহে করস্পর্শ হইল। "কে গা তুমি?" শিরোদেশে হাত দিয়া কবরী স্পর্শ করিলেন। "দুর্গে! এ যে স্ত্রীলোক!"
তখন ব্রহ্মচারী উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া মুমূর্ষু অথবা অচেতন স্ত্রীলোকটিকে, দুই হস্ত দ্বারা কোলে তুলিলেন। ছত্র তৈজস পথে পড়িয়া রহিল। ব্রহ্মচারী পথ ত্যাগ করিয়া সেই অন্ধকারে মাঠ ভাঙ্গিয়া গ্রামাভিমুখে চলিলেন। ব্রহ্মচারী এ প্রদেশের পথ ঘাট গ্রাম বিলক্ষণ জানিতেন। শরীর বলিষ্ঠ নহে, তথাপি শিশুসন্তানবৎ সেই মরণোন্মুখীকে কোলে করিয়া এই দুর্গম পথ ভাঙ্গিয়া চলিলেন। যাহারা পরোপকারী, পরপ্রেমে বলবান্; তাহারা কখনও শারীরিক বলের অভাব জানিতে পারে না।
গ্রামের প্রান্তভাগে ব্রহ্মচারী এক পর্ণকুটীর প্রাপ্ত হইলেন। নিঃসঙ্গ স্ত্রীলোককে ক্রোড়ে লইয়া সেই কুটীরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। ডাকিলেন, "বাছা হর, ঘরে আছ গা? কুটীরমধ্য হইতে একজন স্ত্রীলোক কহিল, "এ যে ঠাকুরের গলা শুনিতে পাই। ঠাকুর কবে এলেন?"
ব্রহ্মচারী। এই আসছি। শীঘ্র দ্বার খোল—আমি বড় বিপদ্‌গ্রস্ত।
হরমণি কুটীরের দ্বার মোচন করিল। ব্রহ্মচারী তখন তাহাকে প্রদীপ জ্বালিতে বলিয়া দিয়া, আস্তে আস্তে স্ত্রীলোকটিকে গৃহমধ্যে মাটির উপর শোয়াইলেন। হর দীপ জ্বালিত করিল, তাহা মুমূর্ষুর মুখের কাছে আনিয়া উভয়ে তাঁহাকে বিশেষ করিয়া দেখিলেন।
দেখিলেন, স্ত্রীলোকটি প্রাচীনা নহে। কিন্তু এখন তাহার শরীরের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তাহার বয়স অনুভব করা যায় না। তাহার শরীর অত্যন্ত শীর্ণ—সাংঘাতিক পীড়ার লক্ষণযুক্ত। সময়বিশেষে তাহার সৌন্দর্য্য ছিল—এমত হইলেও হইতে পারে; কিন্তু এখন সৌন্দর্য্য কিছুমাত্র নাই। আর্দ্র বস্ত্র অত্যন্ত মলিন;—এবং শত স্থানে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন। আলুলালিত আর্দ্র কেশ চিররুক্ষ। চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট। এখন সে চক্ষু নিমীলিত। নিশ্বাস বহিতেছে—কিন্তু সংজ্ঞা নাই। বোধ হইল যেন মৃত্যু নিকট।
হরমণি জিজ্ঞাসা করিল, "একে কোথায় পেলেন?"
ব্রহ্মচারী সবিশেষ পরিচয় দিয়া বলিলেন,"ইহার মৃত্যু নিকট দেখিতেছি। কিন্তু তাপ সেক করিলে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে। আমি যেমন বলি, তাই করিয়া দেখ।"
তখন হরমণি ব্রহ্মচারীর আদেশমত, তাহাকে আর্দ্র বস্ত্রের পরিবর্ত্তে আপনার একখানি শুষ্ক বস্ত্র কৌশলে পরাইল। শুষ্ক বস্ত্রের দ্বারা তাহার অঙ্গের এবং কেশের জল মুছাইল। পরে অগ্নি প্রস্তুত করিয়া তাপ দিতে লাগিল। ব্রহ্মচারী বলিলেন, "বোধ হয়, অনেকক্ষণ অবধি অনাহারে আছে। যদি ঘরে দুধ থাকে, তবে একটু একটু করে দুধ খাওয়াইবার চেষ্টা দেখ।"
হরমণির গোরু ছিল—ঘরে দুধও ছিল। দুধ তপ্ত করিয়া অল্প অল্প করিয়া স্ত্রীলোকটিকে পান করাইতে লাগিল। স্ত্রীলোক তাহা পান করিল। উদরে দুগ্ধ প্রবেশ করিলে সে চক্ষু উন্মীলিত করিল। দেখিয়া হরমণি জিজ্ঞাসা করিল, "মা, তুমি কোথা থেকে আসিতেছিলে গা?"

সংজ্ঞালব্ধ স্ত্রীলোক কহিল, “আমি কোথা?”
ব্রহ্মচারী কহিলেন, “তোমাকে পথে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখিয়া এখানে আনিয়াছি। তুমি কোথা যাইবে?”
স্ত্রীলোক বলিল, “অনেক দূর।”
হরমণি। তোমার হাতে রুলি রয়েছে। তুমি সধবা?
পীড়িতা ভ্রূভঙ্গী করিল। হরমণি অপ্রতিভ হইল।
ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাছা, তোমায় কি বলিয়া ডাকিব? তোমার নাম কি?”
অনাথিনী কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, “আমার নাম সূর্য্যমুখী।”

পঞ্চত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ : আশাপথে

সূর্য্যমুখীর বাঁচিবার আশা ছিল না। ব্রহ্মচারী তাঁহার পীড়ার লক্ষণ বুঝিতে না পারিয়া পরদিন প্রাতে গ্রামস্থ বৈদ্যকে ডাকাইলেন।
রামকৃষ্ণ রায় বড় বিজ্ঞ। বৈদ্যশাস্ত্রে বড় পণ্ডিত। চিকিৎসাতে গ্রামে তাঁহার বিশেষ যশঃ ছিল। তিনি পীড়ার লক্ষণ দেখিয়া বলিলেন, “ইহার কাস রোগ। তাহার উপর জ্বর হইতেছে। পীড়া সাঙ্ঘাতিক বটে। তবে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারেন।”
এ সকল কথা সূর্য্যমুখীর অসাক্ষাতে হইল। বৈদ্য ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন—অনাথিনী দেখিয়া পারিতোষিকের কথাটি রামকৃষ্ণ রায় উত্থাপন করিলেন না। রামকৃষ্ণ রায় অর্থপিশাচ ছিলেন না। বৈদ্য বিদায় হইলে, ব্রহ্মচারী হরমণিকে কার্য্যান্তরে প্রেরণ করিয়া, বিশেষ কথোপকথনের জন্য সূর্য্যমুখীর নিকট বসিলেন।
সূর্য্যমুখী বলিলেন, “ঠাকুর! আপনি আমার জন্য এত যত্ন করিতেছেন কেন? আমার জন্য ক্লেশের প্রয়োজন নাই।”
ব্রহ্ম। আমার ক্লেশ কি? এই আমার কার্য্য। আমার কেহ নাই। আমি ব্রহ্মচারী। পরোপকার আমার ধর্ম্ম। আজ যদি তোমার কাজে নিযুক্ত না থাকিতাম, তবে তোমার মত অন্য কাহারও কাজে থাকিতাম।
সূর্য্য। তবে, আমাকে রাখিয়া, আপনি অন্য কাহারও উপকারে নিযুক্ত হউন। আপনি অন্যের উপকার করিতে পারিবেন—আমার আপনি উপকার করিতে পারিবেন না।
ব্রহ্ম। কেন?
সূর্য্য। বাঁচিলে আমার উপকার নাই। মরাই আমার মঙ্গল। কাল রাত্রে যখন পথে পড়িয়াছিলাম—তখন নিতান্ত আশা করিয়াছিলাম যে, মরিব। আপনি কেন আমাকে বাঁচাইলেন।
ব্রহ্ম। তোমার এত কি দুঃখ, তাহা আমি জানি না—কিন্তু দুঃখ যতই হউক না কেন, আত্মহত্যা মহাপাপ। কদাচ আত্মহত্যা করিও না। আত্মহত্যা পরহত্যাতুল্য পাপ।
সূর্য্য। আমি আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করি নাই। আমার মৃত্যু আপনি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল—এই জন্য ভরসা করিতেছিলাম। কিন্তু মরণেও আমার আনন্দ

নাই।
"মরণে আনন্দ নাই,"এই কথা বলিতে সূর্য্যমুখীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। চক্ষু দিয়া জল পড়িল।
ব্রহ্মচারী কহিলেন, "যত বার মরিবার কথা হইল, তত বার তোমার চক্ষে জল পড়িল, দেখিলাম। অথচ তুমি মরিতে চাহ। মা, আমি তোমার সন্তান সদৃশ। আমাকে পুত্র বিবেচনা করিয়া মনের বাসনা ব্যক্ত করিয়া বল। যদি তোমার দুঃখনিবারণের কোন উপায় থাকে, আমি তাহা করিব। এই কথা বলিব বলিয়াই হরমণিকে বিদায় দিয়া, নির্জ্জনে তোমার কাছে আসিয়া বসিয়াছি। কথাবার্ত্তায় বুঝিতেছি, তুমি বিশেষ ভদ্রঘরের কন্যা হইবে। তোমার যে উৎকট মনঃপীড়া আছে, তাহাও বুঝিতেছি। কেন তাহা আমার সাক্ষাতে বলিবে না? আমাকে সন্তান মনে করিয়া বল।"
সূর্য্যমুখী সজললোচনে কহিলেন, "এখন মরিতে বসিয়াছি—লজ্জাই বা এ সময়ে কেন করি? আর আমার মনোদুঃখ কিছুই নয়—কেবল মরিবার সময় যে স্বামীর মুখ দেখিতে পাইলাম না, এই দুঃখ। মরণেই আমার সুখ—কিন্তু যদি তাঁহাকে না দেখিয়া মরিলাম, তবে মরণেও দুঃখ। যদি এ সময়ে একবার তাঁহাকে দেখিতে পাই, তবে মরণেই আমার সুখ।"
ব্রহ্মচারীও চক্ষু মুছিলেন। বলিলেন, "তোমার স্বামী কোথায়? এখন তোমাকে তাঁহার কাছে লইয়া যাইবার উপায় নাই। কিন্তু তিনি যদি, সংবাদ দিলে, এখানে আসিতে পারেন, তবে আমি তাঁহাকে পত্রের দ্বারা সংবাদ দিই।"
সূর্য্যমুখীর রোগক্লিষ্ট মুখে হর্ষবিকাশ হইল। তখন আবার ভগ্নোৎসাহ হইয়া কহিলেন, "তিনি আসিলে আসিতে পারেন, কিন্তু আসিবেন কি না, জানি না। আমি তাঁহার কাছে গুরুতর অপরাধে অপরাধী—তবে তিনি আমার পক্ষে দয়াময়—ক্ষমা করিলেও করিতে পারেন। কিন্তু তিনি অনেক দূরে আছেন—আমি তত দিন বাঁচিব কি?"
ব্র। কত দূরে সে?
সূ। হরিপুর জেলা।
ব্র। বাঁচিবে।
এই বলিয়া ব্রহ্মচারী কাগজ কলম লইয়া অসিলেন, এবং সূর্য্যমুখীর কথামত নিম্নলিখিত মত পত্র লিখিলেন।—
"আমি মহাশয়ের নিকট পরিচিত নহি। আমি ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে আছি। আপনি কে তাহাও আমি জানি না। কেবল এইমাত্র জানি যে, শ্রীমতী সূর্য্যমুখী দাসী আপনার ভার্য্যা। তিনি এই মধুপুর গ্রামে সঙ্কটাপন্ন রোগগ্রস্ত হইয়া হরমণি বৈষ্ণবীর বাড়ীতে আছেন। তাঁহার চিকিৎসা হইতেছে—কিন্তু বাঁচিবার আকার নহে। এই সংবাদ দিবার জন্য আপনাকে এ পত্র লিখিলাম। তাহার মানস, মৃত্যুকালে একবার আপনাকে দর্শন করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। যদি তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করিতে পারেন, তবে একবার এই স্থানে আসিবেন। আমি ইঁহাকে মাতৃসম্বোধন করি। পুত্রস্বরূপ তাঁহার অনুমতিক্রমে এই পত্র লিখিলাম। তাঁহার নিজের লিখিবার শক্তি নাই।
"যদি আসা মত হয়, তবে রাণীগঞ্জের পথে আসিবেন, রাণীগঞ্জে অনুসন্ধান করিয়া শ্রীমাণ মাধবচন্দ্র গোস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন। তাঁহাকে আমার নাম করিয়া বলিলে, তিনি সঙ্গে লোক দিবেন। তাহা হইলে মধুপুর খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে না।
"আসিতে হয় ত,শীঘ্র আসিবেন, আসিতে বিলম্ব হইলে, অভীষ্টসিদ্ধ হইবে না। ইতি শ্রীশিবপ্রসাদ শর্ম্মা।"

পত্র লিখিয়া ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কাহার নামে শিরোনাম দিব?”
সূর্য্যমুখী বলিলেন, “হরমণি আসিলে বলিব।”
হরমণি আসিলে নগেন্দ্রনাথ দত্তের নামে শিরোনাম দিয়া ব্রহ্মচারী পত্রখানি নিকটস্থ ডাকঘরে দিতে গেলেন।
ব্রহ্মচারী যখন পত্র লইয়া ডাকে দিতে গেলেন, তখন সূর্য্যমুখী সজলনয়নে, যুক্তকরে, উর্দ্ধমুখে, জগদীশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে ভিক্ষা করিলেন, “হে পরমেশ্বর ! যদি তুমি সত্য হও, আমার যদি পতিভক্তি থাকে, তবে যেন এই পত্রখানি সফল হয়। আমি চিরকাল স্বামীর চরণ ভিন্ন কিছুই জানি না—ইহাতে যদি পুণ্য থাকে, তবে সে পুণ্যের ফলে আমি স্বর্গ চাহি না। কেবল এই চাই , যন মৃত্যুকালে স্বামীর মুখ দেখিয়া মরি।”
কিন্তু পত্র ত নগেন্দ্রের নিকট পৌছিল না। পত্র যখন গোবিন্দপুরে পৌঁছিল, তাহার অনেক পূর্ব্বে নগেন্দ্র দেশপর্য্যটনে যাত্রা করিয়াছিলেন। হরকরা পত্র বাড়ীর দরওয়ানের কাছে দিয়া গেল।
দেওয়ানের প্রতি নগেন্দ্রের আদেশ ছিল যে, আমি যখন যেখানে পৌঁছিব, তখন সেইখান হইতে পত্র লিখিব। আমার আজ্ঞা পাইলে সেইখানে আমার নামের পত্রগুলি পাঠাইয়া দিবে। ইতিপূর্ব্বেই নগেন্দ্র পাটনা হইতে পত্র লিখিয়াছিলেন যে, “আমি নৌকাপথে কাশীযাত্রা করিলাম। কাশী পৌঁছিলে পত্র লিখিব। আমার পত্র পাইলে, সেখানে আমার পত্রাদি পাঠাইবে।” দেওয়ান সেই সংবাদের প্রতীক্ষায় ব্রহ্মচারীর পত্র বাক্সমধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিলেন।
যথাসময়ে নগেন্দ্র কাশীধামে আসিলেন। আসিয়া দেওয়ানকে সংবাদ দিলেন। তখন দেওয়ান অন্যান্য পত্রের সঙ্গে শিবপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর পত্র পাঠাইলেন। নগেন্দ্র পত্র পাইয়া মর্ম্মাবগত হইয়া, অঙ্গুলিদ্বারা কপাল টিপিয়া ধরিয়া কাতরে কহিলেন, “জগদীশ্বর! মুহূর্ত্তজন্য আমার চেতনা রাখ।” জগদীশ্বরের চরণে সে বাক্য পৌঁছিল; মুহূর্ত্তজন্য নগেন্দ্রের চেতনা রহিল, কর্ম্মাধ্যক্ষকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন, “আজ রাত্রেই আমি রাণীগঞ্জ যাত্রা করিব—সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও তুমি তাহার বন্দোবস্ত কর।”
কর্ম্মাধ্যক্ষ বন্দোবস্ত করিতে গেল। নগেন্দ্র তখন ভূতলে ধূলির উপর শয়ন করিয়া অচেতন হইলেন।
সেই রাত্রে নগেন্দ্র কাশী পশ্চাতে করিলেন। ভুবনসুন্দরী বারাণসি, কোন্ সুখী জন এমন শারদ রাত্রে তৃপ্তলোচনে তোমাকে পশ্চাৎ করিয়া আসিতে পারে? নিশা চন্দ্রহীনা, আকাশে সহস্র সহস্র নক্ষত্র জ্বলিতেছে—গঙ্গাহৃদয়ে তরণীর উপর দাঁড়াইয়া যে দিকে চাও, সেই দিকে আকাশে নক্ষত্র!—অনন্তত তেজে অনন্তকাল হইতে জ্বলিতেছে—অবিরত জ্বলিতেছে, বিরাম নাই। ভূতলে দ্বিতীয় আকাশ!—নীলাম্বরবৎ স্থিরনীল তরঙ্গিনীহৃদয়; তীরে, সোপানে এবং অনন্ত পর্ব্বতশ্রেণীবৎ অট্টালিকায় সহস্র আলোক জ্বলিতেছে। প্রাসাদ পরে প্রাসাদ, তৎপরে প্রাসাদ, এইরূপ আলোকরাজিশোভিত অনন্ত প্রাসাদশ্রেণী। আবার সমুদয় সেই স্বচ্ছ নদীনীরে প্রতিবিম্বিত—আকাশ, নগর, নদী,—সকলই জ্যোতির্ব্বিন্দুময়। দেখিয়া নগেন্দ্র চক্ষু মুছিলেন। পৃথিবীর সৌন্দর্য্য তাঁহার আজ সহ্য হইল না। নগেন্দ্র বুঝিয়াছিলেন যে, শিবপ্রসাদের পত্র অনেক দিনের পর পৌঁছিয়াছে—এখন সূর্য্যমুখী কোথায়?

ষট্‌ত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ : হীরার বিষবৃক্ষ মুকুলিত

যে দিন পাঁড়ে গোষ্ঠী পাকা বাঁশের লাঠি হাতে করিয়া দেবেন্দ্রকে তাড়াইয়া দিয়াছিল, সে দিন হীরা মনে মনে বড় হাসিয়াছিল। কিন্তু তাহার পরে তাহাকে অনেক

পশ্চাত্তাপ করিতে হইল। হীরা মনে মনে ভাবিতে লাগিল, “আমি তাঁহাকে অপমানিত করিয়া ভাল করি নাই। তিনি না জানি মনে মনে আমার উপর কত রাগ করিয়াছেন। একে ত আমি তাঁহার মনের মধ্যে স্থান পাই নাই; এখন আমার সকল ভরসা দূর হইল।”

দেবেন্দ্রও আপন খলতাজনিত হীরার দণ্ডবিধানের মনস্কামসিদ্ধির অভিলাষ সম্পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মালতী দ্বারা হীরাকে ডাকাইলেন। হীরা দুই এক দিন ইতস্ততঃ করিয়া শেষে আসিল। দেবেন্দ্র কিছুমাত্র রোষ প্রকাশ করিলেন না—ভূতপূর্ব্ব ঘটনার কোন উল্লেখ করিতে দিলেন না। সে সকল কথা ত্যাগ করিয়া তাহার সহিত মিষ্টালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন ঊর্ণনাভ মক্ষিকার জন্য জাল পাতে, হীরার জন্য তেমনি দেবেন্দ্র জাল পাতিতে লাগিলেন। লুব্ধাশয়া হীরা-মক্ষিকা সহজেই সেই জালে পড়িল। সে দেবেন্দ্রের মধুরালাপে মুগ্ধ এবং তাহার কৈতববাদে প্রতারিত হইল। মনে করিল, ইহাই প্রণয়; দেবেন্দ্র তাহার প্রণয়ী। হীরা চতুরা, কিন্তু এখানে তাহার বুদ্ধি ফলোপধায়িনী হইল না। প্রাচীন কবিগণ যে শক্তিকে জিতেন্দ্রিয় মৃত্যুঞ্জয়ের সমাধিভঙ্গে ক্ষমতাশালিনী বলিয়া কীর্ত্তিত করিয়াছেন, সেই শক্তির প্রভাবে হীরার বুদ্ধি লোপ হইল।

দেবেন্দ্র সে সকল কথা ত্যাগ করিয়া, তানপুরা লইলেন এবং সুরাপানসমুৎসাহিত হইয়া গীতারম্ভ করিলেন। তখন দৈবকণ্ঠ কৃতবিদ্যা দেবেন্দ্র এরূপ সুধাময় সঙ্গীতলহরী সৃজন করিলেন যে, হীরা শ্রুতিমাত্রাত্মক হইয়া একেবারে বিমোহিতা হইল। তখন তাহার হৃদয় চঞ্চল, মন দেবেন্দ্রপ্রেমবিদ্রাবিত হইল। তখন তাহার চক্ষে দেবেন্দ্র সর্ব্বসংসারসুন্দর, সর্ব্বার্থসার, রমণীর সর্ব্বাদরণীয় বলিয়া বোধ হইল। হীরার চক্ষে প্রেমবিমুক্ত অশ্রুধারা বহিল।

দেবেন্দ্র তানপুরা রাখিয়া, সযত্নে আপন বসনাগ্রভাবে হীরার অশ্রুবারি মুছাইয়া দিলেন। হীরার শরীর পুলককণ্টকিত হইল। তখন দেবেন্দ্র, সুরাপানোদ্দীপ্ত হইয়া, এরূপ হাস্যপরিহাস্‌সংযুক্ত সরস সম্ভাষণ আরম্ভ করিলেন, কখনও বা এরূপ প্রণয়ীর অনুরূপ স্নেহসিক্ত, অস্পষ্টালঙ্কারবচনে আলাপ করিতে লাগিলেন যে, জ্ঞানহীনা, অপরিমার্জ্জিতবাগ্‌বুদ্ধি হীরা মনে করিল, এই স্বর্গ-সুখ। হীরা ত কখনও এমন কথা শুনে নাই। হীরা যদি বিমলচিত্ত হইত, এবং তাহার বুদ্ধি সৎসংসর্গপরিমার্জ্জিত হইত, তবে সে মনে করিত, এই নরক। পরে প্রেমের কথা পড়িল—প্রেম কাহাকে বলে, দেবেন্দ্র তাহা কিছুই কখন হৃদয়ঙ্গত করেন নাই—বরং হীরা জানিয়াছিল—কিন্তু দেবেন্দ্র তদ্বিষয়ে প্রাচীন কবিদিগের চর্ব্বিতচর্ব্বণে বিলক্ষণ পটু। দেবেন্দ্রের মুখে প্রেমের অনির্ব্বচনীয় মহিমাকীর্ত্তন শুনিয়া হীরা দেবেন্দ্রকে অমানুষিকচিত্তসম্পন্ন মনে করিল—স্বয়ং আপাদকবরী প্রেমরসার্দ্রা হইল। তখন আবার দেবেন্দ্র প্রথমবসন্তপ্রেরিত একমাত্র ভ্রমরঝঙ্কারবৎ গুন্ গুন্ স্বরে, সঙ্গীতোদ্যম করিলেন। হীরা দুর্দ্দমনীয় প্রণয়স্ফূর্তিপ্রযুক্ত সেই সুরের সঙ্গে আপনার কামিনীসুলভ কলকণ্ঠধ্বনি মিলাইতে লাগিল। দেবেন্দ্র হীরাকে গায়িতে অনুরোধ করিলেন। তখন হীরা প্রেমার্দ্রচিত্তে, সুরারাগরঞ্জিত কমলনেত্র বিস্ফারিত করিয়া, চিত্রিতবৎ ভ্রূযুগবিলাসে মুখমণ্ডল প্রফুল্ল করিয়া প্রস্ফুটস্বরে সঙ্গীতারম্ভ করিল। চিত্তস্ফূর্ত্তিবশতঃ তাহার কণ্ঠে উচ্চস্বর উঠিল। হীরা যাহা গায়িল, তাহা প্রেমবাক্য —প্রেমভিক্ষায় পরিপূর্ণ।

তখন সেই পাপমণ্ডপে বসিয়া পাপান্তঃকরণ দুই জনে, পাপাভিলাষবশীভূত হইয়া চিরপাপরূপ চিরপ্রেম পরস্পরের নিকট প্রতিশ্রুত হইল। হীরা চিত্ত সংযম করিতে জানিত, কিন্তু তাহাতে তাহার প্রবৃত্তি ছিল না বলিয়া, সহজে পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখে প্রবেশ করিল। দেবেন্দ্রকে অপ্রণয়ী জানিয়া চিত্তসংযমে প্রবৃত্তি হইয়াছিল, তাহাও অল্পদূরমাত্র; কিন্তু যতদূর অভিলাষ করিয়াছিল, তত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছিল। দেবেন্দ্রকে অঙ্কাগত প্রাপ্ত হইয়া, হাসিতে হাসিতে তাহার কাছে প্রেম স্বীকার করিয়াও, অবলীলাক্রমে তাহাকে বিমুখ করিয়াছিল। আবার সেই পুষ্পগত কীটানুরূপ হৃদয়বেধকারী অনুরাগকে কেবল পরগৃহে কার্য্য উপলক্ষ করিয়া শমিত করিয়াছিল। কিন্তু যখন তাহার বিবেচনা হইল যে, দেবেন্দ্র প্রণয়শালী, তখন আর তাহার চিত্তদমনে প্রবৃত্তি রহিল না। এই অপ্রবৃত্তি হেতু বিষবৃক্ষে তাহার ভোগ্য ফল ফলিল।

লোকে বলে, ইহলোকে পাপের দণ্ড দেখা যায় না। ইহা সত্য হউক বা না হউক—তুমি দেখিবে না যে, চিত্তসংযমে অপ্রবৃত্ত অব্যক্তি ইহলোকে বিষবৃক্ষের ফলভোগ করিল না।

সপ্তত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ : সূর্য্যমুখীর সংবাদ

বর্ষা গেল। শরৎকাল আসিল। শরৎকালও যায়। মাঠের জল শুকাইল। ধান সকল ফুলিয়া উঠিতেছে। পুষ্করিণীর পদ্ম ফুরাইয়া আসিল। প্রাতঃকালে বৃক্ষপল্লব হইতে শিশির ঝরিতে থাকে। সন্ধ্যাকালে মাঠে মাঠে ধূমাকার হয়। এমত কালে কার্ত্তিক মাসের এক দিন প্রাতঃকালে মধুপুরের রাস্তার উপরে একখান পাল্কী আসিল। পল্লীগ্রামে পাল্কী দেখিয়া দেশের ছেলে, খেলা ফেলে পাল্কীর ধারে কাতার দিয়া দাঁড়াইল। গ্রামের ঝি বউ মাগী ছাগী জলের কলসী কাঁকে নিয়া একটু তফাৎ দাঁড়াইল—কাঁকের কলসী কাঁকেই রহিল—অবাক্ হইয়া পাল্কী দেখিতে লাগিল। বউগুলি ঘোমটার ভিতর হইতে চোখ বাহির করিয়া দেখিতে লাগিল—আর আর স্ত্রীলোকেরা ফেল্ ফেল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। চাষারা কার্ত্তিক মাসে ধান কাটিতেছিল—ধান ফেলিয়া, হাতে কাস্তে, মাথায় পাগড়ী, হাঁ করিয়া পাল্কী দেখিতে লাগিল। গ্রামের মণ্ডল মাতব্বরলোকে অমনি কমিটিতে বসিয়া গেল। পাল্কীর ভিতর হইতে একটা বুটওয়ালা পা বাহির হইয়াছিল। সকলেই সিদ্ধান্ত করিল, সাহেব আসিয়াছে—ছেলেরা ধ্রুব জানিত, বৌ আসিয়াছে।

পাল্কীর ভিতর হইতে নগেন্দ্রনাথ বাহির হইলেন। অমনি তাঁহাকে পাঁচ সাত জনে সেলাম করিল—কেন না, তাহার পেণ্টলুন পরা; টুঁপি মাথায় ছিল! কেহ ভাবিল, দারোগা; কেহ ভাবিল, বরকন্দাজ সাহেব আসিয়াছেন।

দর্শকদিগের মধ্যে প্রাচীন এক ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া নগেন্দ্র শিবপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি নিশ্চিত জানিত, এখনই কোন খুনি মামলার সুরতহাল হইবে—অতএব সত্য উত্তর দেওয়া ভাল নয়। সে বলিল, "আজ্ঞে, আমি মশাই ছেলে মানুষ—আমি অত জানি না।" নগেন্দ্র দেখিলেন, একজন ভদ্রলোকের সাক্ষাৎ না পাইলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না। গ্রামে অনেক ভদ্রলোকের বসতিও ছিল। নগেন্দ্রনাথ তখন একজন বিশিষ্টলোকের বাড়ীতে গেলেন। সে গৃহের স্বামী রামকৃষ্ণ রায় কবিরাজ। রামকৃষ্ণ রায়, একজন বাবু আসিয়াছেন দেখিয়া, যত্ন করিয়া একখান চেয়ারের উপর নগেন্দ্রকে বসাইলেন। নগেন্দ্র ব্রহ্মচারীর সংবাদ তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন। রামকৃষ্ণ রায় বলিলেন, "ব্রহ্মচারী ঠাকুর এখানে নাই।" নগেন্দ্র বড় বিষণ্ণ হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কোথায় গিয়াছেন?"

উত্তর। তাহা বলিয়া যান নাই। কোথায় গিয়াছেন, তাহা আমরা জানি না। বিশেষ তিনি এক স্থানে স্থায়ী নহেন; সর্ব্বদা নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়া বেড়ান।

নগেন্দ্র। কবে আসিবেন, তাহা কেহ জানে?

রামকৃষ্ণ। তাঁহার কাছে আমার নিজেরও কিছু আবশ্যক আছে। এজন্য আমি সে কথারও তদন্ত করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি যে কবে আসিবেন, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

নগেন্দ্র বড় বিষণ্ণ হইলেন। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কতদিন এখান হইতে গিয়াছেন?"

রামকৃষ্ণ। তিনি শ্রাবণ মাসে এখানে আসিয়াছেন। ভাদ্র মাসে গিয়াছেন।

নগেন্দ্র। ভাল, এ গ্রামে হরমণি বৈষ্ণবীর বাড়ী কোথায় আমাকে কেহ দেখাইয়া দিতে পারেন?
রামকৃষ্ণ। হরমণির ঘর পথের ধারেই ছিল। কিন্তু এখন আর সে ঘর নাই। সে ঘর আগুন লাগিয়া পুড়িয়া গিয়াছে।
নগেন্দ্র আপনার কপাল টিপিয়া ধরিলেন। ক্ষীণতর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরমণি কোথায় আছে?"
রামকৃষ্ণ। তাহাও কেহ বলিতে পারে না। যে রাত্রে তাহার ঘরে আগুন লাগে, সেই অবধি সে কোথায় পলাইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ এমনও বলে যে, সে আপনার ঘরে আপনি আগুন দিয়া পলাইয়াছে।
নগেন্দ্র ভগ্নস্বর হইয়া কহিলেন, "তাহার ঘরে কোন স্ত্রীলোক থাকিত?"
রামকৃষ্ণ রায় কহিলেন, "না; কেবল শ্রাবণ মাস হইতে একটি বিদেশী স্ত্রীলোক পীড়িতা হইয়া আসিয়া তাহার বাড়ীতে ছিল। সেটিকে ব্রহ্মচারী কোথা হইতে আনিয়া তাহার বাড়ীতে রাখিয়াছিলেন। শুনিয়াছিলাম, তাহার নাম সূর্য্যমুখী। স্ত্রীলোকটি কাসরোগগ্রস্ত ছিল—আমিই তাহার চিকিৎসা করি।প্রায় আরোগ্য করিয়া তুলিয়াছিলাম—এমন সময়ে—"
নগেন্দ্র হাঁপাইতে হাঁপাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন সময়ে কি—?"
রামকৃষ্ণ বলিলেন, "এমন সময়ে হরবৈষ্ণবীর গৃহদাহে ঐ স্ত্রীলোকটি পুড়িয়া মরিল!"
নগেন্দ্রনাথ চৌকি হইতে পড়িয়া গেলেন। মস্তকে দারুণ আঘাত পাইলেন। সেই আঘাতে মূর্চ্ছিত হইলেন। কবিরাজ তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন।
বাঁচিতে কে চাহে? এ সংসার বিষময়। বিষবৃক্ষ সকলেরই গৃহপ্রাঙ্গণে। কে ভালবাসিতে চাহে?

অষ্টত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ : এত দিনে সব ফুরাইল!

এত দিনে সব ফুরাইল। সন্ধ্যাকালে যখন নগেন্দ্র দত্ত মধুপুর হইতে পাল্কীতে উঠিলেন, তখন এই কথা মনে মনে বলিলেন, "আমার এত দিনে সব ফুরাইল।" কি ফুরাইল? সুখ? তা ত যে দিন সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই দিনই ফুরাইয়াছিল। তবে এখন ফুরাইল কি? আশা। যত দিন মানুষের আশা থাকে, তত দিন কিছুই ফুরায় না, আশা ফুরাইলে সব ফুরাইল!
নগেন্দ্রের আজ সব ফুরাইল। সেই জন্য তিনি গোবিন্দপুর চলিলেন। গোবিন্দপুরে গৃহে বাস করিতে চলিলেন না; গৃহধর্ম্মের নিকট জন্মের শোধ বিদায় লইতে চলিলেন। সে অনেক কাজ। বিষয়-আশয়ের বিলি ব্যবস্থা করিতে হইবে। জমীদারী ভদ্রাসনবাড়ী এবং অপরাপর স্বোপার্জ্জিত স্থাবর সম্পত্তি ভাগিনেয় সতীশচন্দ্রকে দানপত্রের দ্বারা লিখিয়া দিবেন—সে লেখাপড়া উকীলের বাড়ী নহিলে হইবে না। অস্থাবর সম্পত্তি সকল কমলমণিকে দান করিবেন—সে সকল গুছাইয়া কলিকাতায় তাঁহার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিতে হইবে। কিছুমাত্র কাগজ আপনার সঙ্গে রাখিবেন—যে কয় বৎসর তিনি জীবিত থাকেন, সেই কয় বৎসর তাহাতেই তাঁহার নিজব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। কুন্দনন্দিনীকে কমলমণির নিকটে পাঠাইবেন। বিষয়-আশয়ের আয়ব্যয়ের কাগজপত্রসকল শ্রীশচন্দ্রকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। আর সূর্য্যমুখী যে খাটে শুইতেন, সেই খাটে শুইয়া একবার কাঁদবেন। সূর্য্যমুখীর অলঙ্কারগুলি লইয়া আসিবেন। সেগুলি কমলমণিকে দিবেন না—আপনার সঙ্গে রাখিবেন। যেখানে যাবেন, সঙ্গে লইয়া যাবেন। পরে যখন সময় উপস্থিত হইবে, তখন সেইগুলি দেখিতে দেখিতে মরিবেন। এই সকল

আবশ্যক কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া, নগেন্দ্র জন্মের শোধ ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার দেশপর্য্যটন করিবেন। আর যত দিন বাঁচিবেন, পৃথিবীর কোথাও এক কোণে লুকাইয়া থাকিয়া দিনযাপন করিবেন।
শিবিকারোহণে এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নগেন্দ্র চলিলেন। শিবিকাদ্বার মুক্ত, রাত্রি কার্ত্তিকী জ্যোৎস্নাময়ী; আকাশে তারা; বাতাসে রাজপথিপার্শ্বস্থ টেলিগ্রাফের তার ধ্বনিত হইতেছিল। সে রাত্রে নগেন্দ্রের চক্ষে একটি তারাও সুন্দর বোধ হইল না। জ্যোৎস্না অত্যন্ত কর্কশ বোধ হইতে লাগিল। দৃষ্ট পদার্থমাত্রই চক্ষুঃশূল বলিয়া বোধ হইল। পৃথিবী অত্যন্ত নৃশংস। সুখের দিনে যে শোভা ধারণ করিয়া মনোহরণ করিয়াছিল, আজি সেই শোভা বিকাশ করে কেন? যে দীর্ঘতৃণে চন্দ্রকিরণ প্রতিবিম্বিত হইলে হৃদয় স্নিগ্ধ হইত, আজি সে দীর্ঘতৃণ তেমনি সমুজ্জ্বল কেন? আজিও আকাশ তেমনি নীল, মেঘ তেমনি শ্বেত, নক্ষত্র তেমনি উজ্জ্বল, বায়ু তেমনি ক্রীড়াশীল! পশুগণ তেমনি বিচরণ করিতেছে; মনুষ্য তেমনি হাস্য পরিহাসে রত; পৃথিবী তেমনি অনন্তগামিনী; সংসারস্রোতঃ তেমনি অপ্রতিহত। জগতের দয়াশূন্যতা আর সহ্য হয় না। কেন পৃথিবী বিদীর্ণা হইয়া নগেন্দ্রকে শিবিকাসমেত গ্রাস করিল না?
নগেন্দ্র ভাবিয়া দেখিলেন, সব তাঁরই দোষ। তাঁহার তেত্রিশ বৎসরমাত্র বয়ঃক্রম হইয়াছে। ইহারই মধ্যে তাঁহার সব ফুরাইল। অথচ জগদীশ্বর তাঁহাকে যাহা দিয়াছিলেন, তাহার কিছুই ফুরাইবার নহে। যাহাতে যাহাতে মনুষ্য সুখী, সে সব তাঁহাকে ঈশ্বর যে পরিমাণে দিয়াছিলেন, সে পরিমাণে প্রায় কাহাকেও দেন না। ধন, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ্, মান এ সকল ভূমিষ্ঠ হইয়াই অসাধারণ পরিমাণে পাইয়াছিলেন। বুদ্ধি নহিলে এ সকলে সুখ হয় না—তাহাতে বিধাতা কার্পণ্য করেন নাই। শিক্ষায় পিতা-মাতা ত্রুটি করেন নাই—তাঁহার তুল্য সুশিক্ষিত কে? রূপ, বল, স্বাস্থ্য, প্রণয়শীলতা, তাহাও ত প্রকৃতি তাঁহাকে অমিতহস্তে দিয়াছেন; ইহার অপেক্ষাও যে ধন দুর্লভ; যে একমাত্র সামগ্রী এ সংসারে অমূল্য—অশেষ প্রণয়শালিনী স্বাধ্বী ভার্য্যা—ইহাও তাঁহার প্রসন্ন কপালে ঘটিয়াছিল। সুখের সামগ্রী পৃথিবীতে এত আর কাহার ছিল? আজি এত অসুখী পৃথিবীতে কে? আজি যদি তাঁহার সর্ব্বস্ব দিলে—ধন, সম্পদ্, মান রূপ, যৌবন, বিদ্যা, বুদ্ধি, সব দিলে, তিনি আপন শিবিকার একজন বাহকের সঙ্গে অবস্থাপরিবর্ত্তন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে স্বর্গসুখ মনে করিতেন। বাহক কি? ভাবিলেন, "এই দেশের রাজকারাগারে এমন কে নরঘ্নপাপী আছে যে, আমার অপেক্ষা সুখী নয়? আমা হতে পবিত্র নয়? তারা ত অপরকে হত করিয়াছে, আমি সূর্য্যমুখীকে বধ করিয়াছি। আমি ইন্দ্রিয়দমন করিলে সূর্য্যমুখী বিদেশে আসিয়া কুটীরদাহে মরিবে কেন? আমি সূর্য্যমুখীর বধকারী—কে এমন পিতৃঘ্ন মাতৃঘ্ন, পুত্রঘ্ন আছে যে, আমার অপেক্ষা গুরুতর পাপী? সূর্য্যমুখী কি কেবল আমার স্ত্রী? সূর্য্যমুখী আমার—সব সম্বন্ধে স্ত্রী। সৌহার্দ্দে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্য্যায় দাসী। আমার সূর্য্যমুখী—কাহার এমন ছিল? সংসারে সহায়, গৃহে লক্ষ্মী, হৃদয়ে ধর্ম্ম, কণ্ঠে অলঙ্কার। আমার নয়নের তারা, হৃদয়ের শোণিত, দেহের জীবন, জীবনের সর্ব্বস্ব! আমার প্রমোদে হর্ষ, বিষাদে শান্তি, চিন্তায় বুদ্ধি, কার্য্যে উৎসাহ! আর এমন সংসারে কি আছে? আমার দর্শনে আলোক, শ্রবণে সঙ্গীত, নিশ্বাসে বায়ু, স্পর্শে জগৎ। আমার বর্ত্তমানের সুখ, অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যতের আশা, পরলোকের পুণ্য! আমি শূকর, রত্ন চিনিব কেন?
হঠাৎ তাঁহার স্মরণ হইল যে, তিনি সুখে শিবিকারোহণে যাইতেছেন, সূর্য্যমুখী পথ হাঁটিয়া হাঁটিয়া পীড়িতা হইয়াছিলেন। অমনি নগেন্দ্র শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে চলিলেন। বাহকেরা শূন্য শিবিকা পশ্চাৎ পশ্চাৎ আনিতে লাগিল। প্রাতে যে বাজারে আসিলেন, সেইখানে শিবিকা ত্যাগ করিয়া বাহকদিগকে বিদায় দিলেন। অবশিষ্ট পথ পদব্রজে অতিবাহিত করিবেন।
তখন মনে করিলেন, "এ জীবন এই সূর্য্যমুখীর বধের প্রায়শ্চিত্তে উৎসর্গ করিব। কি প্রায়শ্চিত্ত? সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়া যে সকল সুখে বঞ্চিতা

হইয়াছিলেন—আমি সে সকল সুখভোগ ত্যাগ করিব। ঐশ্বর্য্য, সম্পদ্, দাসদাসী, বন্ধুবান্ধবের আর কোন সংস্রব রাখিব না। সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়া অবধি যে সকল ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন, আমি সেই সকল ক্লেশ ভোগ করিব। যে দিন গোবিন্দপুর হইতে যাত্রা করিব, সেই দিন হইতে আমার গমন পদব্রজে, ভোজন কদন্ন, শয়ন বৃক্ষতলে বা পর্ণকুটীরে। আর কি প্রায়শ্চিত্ত? যেখানে যেখানে অনাথা স্ত্রীলোক দেখিব, সেইখানে প্রাণ দিয়া তাহার উপকার করিব। যে অর্থ নিজব্যয়ার্থ রাখিলাম, সেই অর্থে আপনার প্রাণধারণ মাত্র করিয়া অবশিষ্ট সহায়হীনা স্ত্রীলোকদিগের সেবার্থে ব্যয় করিব। যে সম্পত্তি স্বত্ব ত্যাগ করিয়া সতীশকে দিব, তাহারও অর্দ্ধাংশ আমার যাবজ্জীবন সতীশ সহায়হীনা স্ত্রীলোকদিগের সাহায্যার্থ ব্যয় করিবে, ইহাও দানপত্রে লিখিয়া দিব। প্রায়শ্চিত্ত! পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত হয়। দুঃখের ত প্রায়শ্চিত্ত নাই। দুঃখের প্রায়শ্চিত্ত কেবল মৃত্যু। মরিলেই দুঃখ যায়। সে প্রায়শ্চিত্ত না করি কেন?” তখন চক্ষু হস্তে আবৃত করিয়া, জগদীশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া নগেন্দ্রনাথ মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করিলেন।

ঊনচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ : সব ফুরাইল, যন্ত্রণা ফুরায় না

রাত্রি প্রহরেকের সময়ে শ্রীশচন্দ্র একাকী বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন, এমত সময়—পদব্রজে নগেন্দ্র সেইখানে উপস্থিত হইয়া, স্বহস্তবাহিত কান্‌বাস্ ব্যাগ্ দূরে নিক্ষিপ্ত করিলেন। ব্যাগ্ রাখিয়া নীরবে একখানা চেয়ারের উপর বসিলেন।

শ্রীশচন্দ্র তাঁহার ক্লিষ্ট, মলিন মুখকান্তি দেখিয়া ভীত হইলেন; কি জিজ্ঞাসা করিবেন, কিছু বুঝিতে পারিলেন না। শ্রীশচন্দ্র জানিতেন যে, কাশীতে নগেন্দ্র ব্রহ্মচারীর পত্র পাইয়াছিলেন এবং পত্র পাইয়া, মধুপুর যাত্রা করিয়াছিলেন। এ সকল কথা শ্রীশচন্দ্রকে লিখিয়া নগেন্দ্র কাশী হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। এখন নগেন্দ্র আপনা হইতে কোন কথা বলিলেন না দেখিয়া, শ্রীশচন্দ্র নগেন্দ্রের নিকট গিয়া বসিলেন এবং তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, “ভাই নগেন্দ্র, তোমাকে নীরবে দেখিয়া আমি বড় ব্যস্ত হইয়াছি। তুমি মধুপুর যাও নাই?”

নগেন্দ্র এই মাত্র বলিলেন, “গিয়াছিলাম!”

শ্রীশচন্দ্র ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “ব্রহ্মচারীর সাক্ষাৎ পাও নাই?”

নগেন্দ্র। না।

শ্রীশ। সূর্য্যমুখীর কোন সংবাদ পাইলে? কোথায় তিনি?

নগেন্দ্র ঊর্দ্ধে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, “স্বর্গে!”

শ্রীশচন্দ্র নীরব হইলেন। নগেন্দ্রও নীরব হইয়া মুখাবনত করিয়া রহিলেন। ক্ষণেক পরে মুখ তুলিয়া বলিলেন, “তুমি স্বর্গ মান না—আমি মানি।”

শ্রীশচন্দ্র জানিতেন, পূর্ব্বে নগেন্দ্র স্বর্গ মানিতেন না; বুঝিলেন যে, এখন মানেন। বুঝিলেন যে, এ স্বর্গ প্রেম ও বাসনার সৃষ্টি। “সূর্য্যমুখী কোথাও নাই” এ কথা সহ্য হয় না—“সূর্য্যমুখী স্বর্গে আছেন”—এ চিন্তায় অনেক সুখ।

উভয়ে নীরব হইয়া বসিয়া রহিলেন। শ্রীশচন্দ্র জানিতেন যে, সান্ত্বনার কথার সময় এ নয়। তখন পরের কথা বিষবোধ হইবে। পরের সংসর্গও বিষ। এই বুঝিয়া, শ্রীশচন্দ্র, নগেন্দ্রের শয্যাদি করাইবার উদ্যোগে উঠিলেন। আহারের কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না; মনে মনে করিলেন, সে ভার কমলকে দিবেন।

কমল শুনিলেন, সূর্য্যমুখী নাই। তখন আর তিনি কোন ভারই লইলেন না। সতীশকে একা ফেলিয়া, কমলমণি সে রাত্রের মত অদৃশ্য হইলেন।
কমলমণি ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া, আলুলায়িত কুন্তলে কাঁদিতেছেন দেখিয়া, দাসী সেইখানে সতীশচন্দ্রকে ছাড়িয়া দিয়া, সরিয়া আসিল। সতীশচন্দ্র মাতাকে ধূলিধূসরা, নীরবে রোদনপরায়ণা দেখিয়া, প্রথমে নীরবে, নিকটে বসিয়া রহিল। পরে মাতার চিবুকে ক্ষুদ্র কুসুমনিন্দিত অঙ্গুলি দিয়া, মুখ তুলিয়া দেখিতে যত্ন করিল। কমলমণি মুখ তুলিলেন, কিন্তু কথা কহিলেন না। সতীশ তখন মাতার প্রসন্নতার আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার মুখচুম্বন করিল। কমলমণি, সতীশের অঙ্গে হস্তপ্রদান করিয়া আদর করিলেন, কিন্তু মুখচুম্বন করিলেন না, কথাও কহিলেন না। তখন সতীশ মাতার কণ্ঠে হস্ত দিয়া, মাতার ক্রোড়ে শয়ন করিয়া রোদন করিল। সে বালক-হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া, বিধাতা ভিন্ন কে সে বালক-রোদনের কারণ নির্ণয় করিবে?
শ্রীশচন্দ্র অগত্যা আপন বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া, কিঞ্চিৎ খাদ্য লইয়া আপনি নগেন্দ্রের সম্মুখে রাখিলেন। নগেন্দ্র বলিলেন, "উহার আবশ্যক নাই—কিন্তু তুমি বসো। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে—তাহা বলিতেই এখানে আসিয়াছি।"
তখন নগেন্দ্র, রামকৃষ্ণ রায়ের কাছে যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন, সকল শ্রীশচন্দ্রের নিকট বিবৃত করিলেন। তাহার পর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যাহা যাহা কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা সকল বলিলেন।
শ্রীশচন্দ্র বলিলেন, "ব্রহ্মচারীর সঙ্গে পথে তোমার সাক্ষাৎ হয় নাই, ইহা আশ্চর্য্য। কেন না, গতকল্য কলিকাতা হইতে তোমার সন্ধানে তিনি মধুপুর যাত্রা করিয়াছেন।"
নগেন্দ্র। সে কি? তুমি ব্রহ্মচারীর সন্ধান কি প্রকারে পাইলে?
শ্রীশ। তিনি অতি মহৎ ব্যক্তি। তোমার পত্রের উত্তর না পাইয়া, তিনি তোমার সন্ধান করিতে স্বয়ং গোবিন্দপুর আসিয়াছিলেন। গোবিন্দপুরেও তোমায় পাইলেন না, কিন্তু শুনিলেন যে, তাঁহার পত্র কাশীতে প্রেরিত হইবে। সেখানে তুমি পত্র পইবে। অতএব আর ব্যস্ত না হইয়া এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি পুরুষোত্তম যাত্রা করেন। সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তোমার সন্ধানার্থ পুনশ্চ গোবিন্দপুর গিয়াছিলেন। সেখানে তোমার কোন সংবাদ পাইলেন না—শুনিলেন, আমার কাছে তোমার সংবাদ পাইবেন। আমার কাছে আসিলেন। পরশ্ব দিন আমার কাছে আসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে তোমার পত্র দেখাইলাম। তিনি তখন মধুপুরে তোমার সাক্ষাৎ পাইবার ভরসায় কালি গিয়াছেন। কালি রাত্রে রাণীগঞ্জে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা ছিল।
নগেন্দ্র। আমি কালি রাণীগঞ্জে ছিলাম না। সূর্য্যমুখীর কথা তিনি তোমাকে কিছু বলিয়াছিলেন?
শ্রীশ। সে সকল কালি বলিব।
নগেন্দ্র। তুমি মনে করিতেছ, শুনিয়া আমার ক্লেশবৃদ্ধি হইবে। এ ক্লেশের আর বৃদ্ধি নাই। তুমি বল।
তখন শ্রীশচন্দ্র ব্রহ্মচারীর নিকট শ্রুত তাঁহার সহিত সূর্য্যমুখীর সঙ্গে পথে সাক্ষাতের কথা, পীড়ার কথা এবং চিকিৎসা ও অপেক্ষাকৃত আরোগ্য লাভের কথা বলিলেন। অনেক বাদ দিয়া বলিলেন,—সূর্য্যমুখী কত দুঃখ পাইয়াছিলেন, সে সকল বলিলেন না।
শুনিয়া, নগ্রেন্দ্র গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। শ্রীশচন্দ্র সঙ্গে যাইতেছিলেন, কিন্তু নগেন্দ্র বিরক্ত হইয়া নিষেধ করিলেন। পথে পথে নগেন্দ্র রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত পাগলের মত বেড়াইলেন। ইচ্ছা, জনস্রোতোমধ্যে আত্মবিস্মৃতি লাভ করেন। কিন্তু জনস্রোত তখন মন্দীভূত হইয়াছিল—আর আত্মবিস্মৃতি কে লাভ করিতে পারে? তখন পুনর্ব্বার শ্রীশচন্দ্রের গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীশচন্দ্র আবার নিকটে বসিলেন। নগেন্দ্র বলিলেন, "আরও কথা আছে। তিনি কোথায় গিয়াছিলেন,

কি করিয়াছিলেন, তাহা ব্রহ্মচারী অবশ্য তাঁহার নিকট শুনিয়া থাকিবেন। ব্রহ্মচারী তোমাকে বলিয়াছেন কি?"
শ্রীশ। আজি আর সে সকল কথায় কাজ কি? আজ শ্রান্ত আছ, বিশ্রাম কর।
নগেন্দ্র, ভ্রূকুটী করিয়া মহাপুরুষ কণ্ঠে কহিলেন,"বল।" শ্রীশচন্দ্র নগেন্দ্রের মুখপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন, নগেন্দ্র পাগলের মত হইয়াছেন; বিদ্যুৎগর্ভ মেঘের মত তাঁহার মুখ কালিময় হইয়াছে। ভীত হইয়া শ্রীশচন্দ্র বলিলেন, "বলিতেছি।" নগেন্দ্রের মুখ প্রসন্ন হইল; শ্রীশচন্দ্র সংক্ষেপে বলিলেন, "গবিন্দপুর হইতে সূর্য্যমুখী স্থলপথে অল্প অল্প করিয়া প্রথমে পদব্রজে এই দিকে আসিয়াছিলেন।"
নগেন্দ্র। প্রত্যহ কত পথ চলিতেন?
শ্রীশ। এক ক্রোশ দেড় ক্রোশ।
নগেন্দ্র। তিনি ত একটি পয়সাও লইয়া বাড়ী হইতে যান নাই–দিনপাত হইত কিসে?
শ্রীশ। কোন দিন উপবাস–কোন দিন ভিক্ষা–তুমি পাগল!!
এই বলিয়া শ্রীশচন্দ্র নগেন্দ্রকে তাড়না করিলেন। কেন না, নগেন্দ্র আপনার হস্তদ্বারা আপনার কণ্ঠরোধ করিতেছেন, দেখিতে পাইলেন। বলিলেন, "মরিলে কি সূর্য্যমুখীকে পাইবে?" এই বলিয়া নগেন্দ্রের হস্ত লইয়া আপনার হস্তমধ্যে রাখিলেন। নগেন্দ্র বলিলেন, "বল।"
শ্রীশ। তুমি স্থির হইয়া না শুনিলে আমি আর বলিব না।
কিন্তু শ্রীশচন্দ্রের কথা আর নগেন্দ্রের কর্ণে প্রবেশ করিল না। তাঁহার চেতনা বিলুপ্ত হইয়াছিল। নগেন্দ্র মুদ্রিতনয়নে স্বর্গারূঢ়া সূর্য্যমুখীর রূপ ধ্যান করিতেছিলেন। দেখিতেছিলেন, তিনি রত্নসিংহাসনে রাজরাণী হইয়া বসিয়া আছেন; চারি দিক্ হইতে শীতল সুগন্ধময় পবন তাঁহার অলকদাম দুলাইতেছে; চারি দিকে পুষ্পনির্ম্মিত বিহঙ্গগণ উড়িয়া বীণারবে গান করিতেছে। দেখিলেন, তাঁহার পদতলে শত শত কোকনদ ফুটিয়া রহিয়াছে; তাঁহার সিংহাসনচন্দ্রাতপে শত চন্দ্র জ্বলিতেছে; চারি পার্শ্বে শত শত নক্ষত্র জ্বলিতেছে। দেখিলেন, নগেন্দ্র স্বয়ং এক অন্ধকারপূর্ণ স্থানে পড়িয়া আছেন; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বেদনা; অসুরে তাঁহাকে বেত্রাঘাত করিতেছে; সূর্য্যমুখী অঙ্গুলিসঙ্কেতে তাহাদিগকে নিষেধ করিতেছেন।
অনেক যত্নে শ্রীশচন্দ্র নগেন্দ্রের চেতনাবিধান করিলেন। চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া নগেন্দ্র উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, "সূর্য্যমুখী! প্রাণাধিকে! কোথায় তুমি?" চীৎকার শুনিয়া শ্রীশচন্দ্র স্তম্ভিত এবং ভীত হইয়া নীরবে বসিলেন। ক্রমে নগেন্দ্র স্বভাবে পুনঃস্থাপিত হইয়া বলিলেন, "বল।"
শ্রীশচন্দ্র ভীত হইয়া বলিলেন, "আর কি বলিব?"
নগেন্দ্র। বল, নহিলে আমি এখনই প্রাণত্যাগ করিব।
ভীত শ্রীশচন্দ্র পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, "সূর্য্যমুখী অধিক দিন এরূপ কষ্ট পান নাই। একজন ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ সপরিবারে কাশী যাইতেছিলেন। তিনি কলিকাতা পর্য্যন্ত নৌকাপথে আসিতেছিলেন, একদিন নদীকূলে সূর্য্যমুখী বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়াছিলেন; ব্রাহ্মণেরা সেইখানে পাক করিতে উঠিয়াছিলেন। গৃহিণীর সহিত সূর্য্যমুখীর আলাপ হয়। সূর্য্যমুখীর অবস্থা দেখিয়া এবং চরিত্রে প্রীতা হইয়া ব্রাহ্মণগৃহিণী তাঁহাকে নৌকায় তুলিয়া লইলেন। সূর্য্যমুখী তাঁহার সাক্ষাতে বলিয়াছিলেন যে 'তিনিও কাশী যাইবেন।"
নগেন্দ্র। সে ব্রাহ্মণের নাম কি? বাটী কোথায়?

নগেন্দ্র মনে মনে কি প্রতিজ্ঞা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহার পর?"
শ্রীশ। ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁহার পরিবারস্থার ন্যায় সূর্য্যমুখী বর্হি পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। কলিকাতা পর্য্যন্ত নৌকায়, কলিকাতা হইতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত রেলে, রাণীগঞ্জ হইতে বুলক্‌ট্রেনে গিয়াছিলেন; এ পর্য্যন্ত হাঁটিয়া ক্লেশ পান নাই।
নগেন্দ্র। তার পর কি ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বিদায় দিল?
শ্রীশ। না; সূর্য্যমুখী আপনি বিদায় লইলেন। তিনি আর কাশী গেলেন না। কত দিন তোমাকে না দেখিয়া থাকিবেন। তোমাকে দেখিবার মানসে বর্হি হইতে পদব্রজে ফিরিলেন।
কথা বলিতে শ্রীশচন্দ্রের চক্ষে জল আসিল। তিনি নগেন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন। শ্রীশচন্দ্রের চক্ষের জলে নগেন্দ্রের বিশেষ উপকার হইল। তিনি শ্রীশচন্দ্রের কণ্ঠলগ্ন হইয়া তাঁহার কাঁধে মাথা রাখিয়া রোদন করিলেন। শ্রীশচন্দ্রের বাটী আসিয়া এ পর্য্যন্ত নগেন্দ্র রোদন করেন নাই—তাঁহার শোক রোদনের অতীত। এখন রুদ্ধ শোকপ্রবাহ বেগে বহিল। নগেন্দ্র শ্রীশচন্দ্রের স্কন্ধে মুখ রাখিয়া বালকের মত বহুক্ষণ রোদন করিলেন। উহাতে যন্ত্রণার অনেক উপশম হইল। যে শোকে রোদন নাই, সে যমের দূত।
নগেন্দ্র কিছু শান্ত হইলে শ্রীশচন্দ্র বলিলেন, "এসব কথায় আজ আর আবশ্যক নাই।"
নগেন্দ্র বলিলেন, "আর বলিবেই বা কি? অবশিষ্ট যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা ত চক্ষে দেখিতে পাইতেছি। বর্হি হইতে তিনি একাকিনী পদব্রজে মধুপুরে আসিয়াছিলেন। পথ হাঁটার পরিশ্রমে, অনাহারে, রৌদ্র-বৃষ্টিতে, নিরাশ্রয়ে আর মনের ক্লেশে সূর্য্যমুখী রোগগ্রস্ত হইয়া মরিবার জন্য পথে পড়িয়াছিলেন।"
শ্রীশচন্দ্র নীরব হইয়া রহিলেন। পরে কহিলেন,"ভাই, বৃথা কেন আর সে কথা ভাব? তোমার দোষ কিছুই নাই। তুমি তাঁর অমতে বা অবাধ্য হইয়া কিছুই কর নাই। যাহা আত্মদোষে ঘটে নাই, তার জন্য অনুতাপ বুদ্ধিমানে করে না।"
নগেন্দ্রনাথ বুঝিলেন না। তিনি জানিতেন, তাঁরই সকল দোষ; তিনি কেন বিষবৃক্ষের বীজ হৃদয় হইতে উচ্ছিন্ন করেন নাই?

চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ : হীরার বিষবৃক্ষের ফল

হীরা মহারত্ন কপর্দ্দকের বিনিময়ে বিক্রয় করিল। ধর্ম্ম চিরকষ্টে রক্ষিত হয়, কিন্তু এক দিনের অসাবধানতায় বিনষ্ট হয়। হীরার তাহাই হইল। যে ধনের লোভে হীরা এই মহারত্ন বিক্রয় করিল, সে এক কড়া কাণা কড়ি। কেন না, দেবেন্দ্রের প্রেম বন্যার জলের মত; যেমন পঙ্কিল, তেমনি ক্ষণিক। তিন দিনে বন্যার জল সরিয়া গেল, হীরাকে কাদায় বসাইয়া রাখিয়া গেল। যেমন কোন কোন কৃপণ অথচ যশোলিপ্সু ব্যক্তি বহুকালাবধি প্রাণপণে সঞ্চিতার্থ রক্ষা করিয়া, পুত্রোদ্বাহ বা অন্য উৎসব উপলক্ষে এক দিনের সুখের জন্য ব্যয় করিয়া ফেলে, হীরা তেমনি এত দিন যত্নে ধর্ম্মরক্ষা করিয়া, একদিনের সুখের জন্য তাহা নষ্ট করিয়া উৎসৃষ্টার্থ কৃপণের ন্যায় চিরানুশোচনার পথে দণ্ডায়মান হইল। ক্রীড়াশীল বালক কর্ত্তৃক অল্পোপভুক্ত অপক্ব চুতফলের ন্যায়, হীরা দেবেন্দ্রকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে, প্রথমে হৃদয়ে দারুণ ব্যথা পাইল। কিন্তু কেবল পরিত্যক্ত নহে—সে দেবেন্দ্রের দ্বারা যেরূপ অপমানিত ও মর্ম্মপীড়িত হইয়াছিল, তাহা স্ত্রীলোকমধ্যে অতি অধমারও অসহ্য।

যখন, দেখা সাক্ষাতের শেষ দিনে হীরা দেবেন্দ্রের চরণাবলুণ্ঠিত হইয়া বলিয়াছিল যে, “দাসীরে পরিত্যাগ করিও না।” তখন দেবেন্দ্র তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, “আমি কেবল কুন্দনন্দিনীর লোভে তোমাকে এত দূর সম্মানিত করিয়াছিলাম—যদি কুন্দের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করাইতে পার, তবেই তোমার সঙ্গে আমার আলাপ থাকিবে— নচেৎ এই পর্য্যন্ত। তুমি যেমন গর্ব্বিতা, তেমনি আমি তোমাকে প্রতিফল দিলাম; এখন তুমি এই কলঙ্কের ডালি মাথায় লইয়া গৃহে যাও।” হীরা ক্রোধে অন্ধকার দেখিতে লাগিল। যখন তাহার মস্তক স্থির হইল, তখন সে দেবেন্দ্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, ভ্রূকুটী কুটিল করিয়া, চক্ষু আরক্ত করিয়া যেন, শতমুখে দেবেন্দ্রকে তিরস্কার করিল। মুখরা, পাপিষ্ঠা স্ত্রীলোকেই যেরূপ তিরস্কার করিতে জানে, সেইরূপ তিরস্কার করিল। তাহাতে দেবেন্দ্রের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। তিনি হীরাকে পদাঘাত করিয়া প্রমোদোদ্যান হইতে বিদায় করিলেন। হীরা পাপিষ্ঠা—দেবেন্দ্র পাপিষ্ঠ এবং পশু। এইরূপ উভয়ের চিরপ্রেমের প্রতিশ্রুতি সফল হইয়া পরিণত হইল।

হীরা পদাহত হইয়া গৃহে গেল না। গোবিন্দপুরে এক জন চাণ্ডাল চিকিৎসা ব্যবসায় করিত। সে কেবল চাণ্ডালাদি ইতর জাতির চিকিৎসা করিত। চিকিৎসা বা ঔষধ কিছুই জানিত না—কেবল বিষবড়ির সাহায্যে লোকের প্রাণসংহার করিত। হীরা জানিত যে, সে বিষবড়ি প্রস্তুত করার জন্য উদ্ভিজ বিষ, খনিজ বিষ, সর্পবিষাদি নানা প্রকার সদ্যঃপ্রাণাপহারী বিষ সংগ্রহ করিয়া রাখিত। হীরা সেই রাত্রে তাঁহার ঘরে গিয়া তাহাকে ডাকিয়া গোপনে বলিল যে, “একটা শিয়ালে রোজ আমার হাঁড়ি খাইয়া যায়। আমি সেই শিয়ালটাকে না মারিলে তিষ্ঠিতে পারি না। মনে করিয়াছি, ভাতের সঙ্গে বিষ মিশাইয়া রাখিব—সে আজি হাঁড়ি খাইতে আসিলে বিষ খাইয়া মরিবে। তোমার কাছে অনেক বিষ আছে; সদ্যঃপ্রাণ নষ্ট হয়, এমন বিষ আমাকে বিক্রয় করিতে পার?”

চাণ্ডাল শিয়ালের গল্পে বিশ্বাস করিল না। বলিল, “আমার কাছে যাহা চাহ, তাহা আছে; কিন্তু আমি তাহা বিক্রয় করিতে পারি না। আমি বিষ বিক্রয় করিয়াছি, জানিলে আমাকে পুলিসে ধরিবে।”

হীরা কহিল, “তোমার কোন চিন্তা নাই। তুমি যে বিক্রয় করিয়াছ, ইহা কেহ জানিবে না—আমি ইষ্টদেবতা আর গঙ্গার দিব্য করিয়া বলিতেছি। দুইটা শিয়াল মরে, এতটা বিষ আমাকে দাও, আমি তোমাকে পঞ্চাশ টাকা দিব।”

চাণ্ডাল নিশ্চিত মনে বুঝিল যে, এ কাহার প্রাণবিনাশ করিবে। কিন্তু পঞ্চাশ টাকার লোভ সংবরণ করিতে পারিল না। বিষবিক্রয়ে স্বীকৃত হইল। হীরা গৃহ হইতে টাকা আনিয়া চাণ্ডালকে দিল। চাণ্ডাল তীব্র মানুষঘাতী হলাহল কাগজে মুড়িয়া হীরাকে দিল। হীরা গমনকালে কহিল, “দেখিও, এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না— তাহা হইলে আমাদের উভয়েরই অমঙ্গল।”

চাণ্ডাল কহিল, ‘মা! আমি তোমাকে চিনিও না।” হীরা তখন নিঃশঙ্ক হইয়া গৃহে গমন করিল।

গৃহে গিয়া, বিষের মোড়ক হস্তে করিয়া অনেক রোদন করিল। পরে চক্ষু মুছিয়া মনে মনে কহিল, “আমি কি দোষে বিষ খাইয়া মরিব? যে আমাকে মারিল, আমি তাহাকে না মারিয়া আপনি মরিব কেন? এ বিষ আমি খাইব না। যে আমার এ দশা করিয়াছে, হয় সেই ইহা খাইবে, নহিলে তাহার প্রেয়সী কুন্দনন্দিনী ইহা ভক্ষণ করিবে। ইহাদের এক জনকে মারিয়া, পরে মরিতে হয় মরিব।”

একচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ : হীরা আয়ি

"হীরার আয়ি বুড়ী।
গোবরের ঝুড়ি।
হাঁটে গুড়ি গুড়ি।
দাঁতে ভাঙ্গে নুড়ি।
কাঁঠাল খায় দেড় বুড়ি।"

হীরার আয়ি লাঠি ধরিয়া গুড়ি গুড়ি যাইতেছিল, পশ্চাৎ পশ্চাৎ বালকের পাল, এই অপূর্ব্ব কবিতাটি পাঠ করিতে করিতে করতালি দিতে দিতে এবং নাচিতে নাচিতে চলিয়াছিল।

এই কবিতাতে কোন বিশেষ নিন্দার কথা ছিল কি না, সন্দেহ–কিন্তু হীরার আয়ি বিলক্ষণ কোপাবিষ্ট হইয়াছিল। সে বালকদিগকে যমের বাড়ী যাইতে অনুজ্ঞা প্রদান করিতেছিল– এবং তাহাদিগের পিতৃপুরুষের আহারাদির বড় অন্যায় ব্যবস্থা করিতেছিল। এইরূপ প্রায় প্রত্যহই হইত।

নগেন্দ্রের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া হীরার আয়ি বালকদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইল। দ্বারবান্দিগের ভ্রমরকৃষ্ণ শ্মশ্রুরাজি দেখিয়া তাহারা রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইল। পলায়নকালে কোন বালক বলিল;–

"রামচরণ দোবে,
সন্ধ্যাবেলা শোবে,
চোর এলে কোথায় পালাবে?"

কেহ বলিল;–

"রাম দীন পাঁড়ে,
বেড়ায় লাঠি ঘাড়ে,
চোর দেখ্‌লে দৌড় মারে পুকুরের পাড়ে।"

কেহ বলিল;–

"লালচাঁদ সিং,
নাচে তিড়িং মিড়িং,
ডালরুটির যম, কিন্তু কাজে ঘোড়ার ডিম।"

বালকেরা দ্বারবান্দিগের দ্বারা নানাবিধ অভিধান ছাড়া শব্দে অভিহিত হইয়া পলায়ন করিল।

হীরার আয়ি লাঠি ঠক্ ঠক্ করিয়া নগেন্দ্রের বাড়ীর ডাক্তারখানায় উপস্থিত হইল। ডাক্তারকে দেখিয়া চিনিয়া বুড়ী কহিল, "হাঁ বাবা–ডাক্তার বাবা কোথা গা?" ডাক্তার কহিলেন, "আমিই ত ডাক্তার।" বুড়ী কহিল, "আর বাবা, চোকে দেখতে পাইনে–বয়স হ'ল পাঁচ সাত গণ্ডা কি এক পোনই হয়–আমার দুঃখের কথা বলিব কি–একটি বেটা ছিল, তা যমকে দিলাম–এখন একটি নাতিনী ছিল, তারও–" বলিয়া বুড়ী হাঁউ–মাউ–খাঁউ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে তোর?"

বুড়ী সে কথার উত্তর না দিয়া আপনার জীবনচরিত আখ্যাত করিতে আরম্ভ করিল এবং অনেক কাঁদাকাটার পর তাহার সমাপ্ত করিলে, ডাক্তারকে আবার জিজ্ঞাসা করিতে হইল, "এখন তুই চাহিস্ কি? তোর কি হইয়াছে?"

বুড়ী তখন পুনর্ব্বার আপন জীবনচরিতের অপূর্ব্ব কাহিনী আরম্ভ করিতেছিল, কিন্তু ডাক্তার বড় বিরক্ত হওয়ায় তাহা পরিত্যাগ করিয়া হীরার ও হীরার মাতার ও হীরার পিতার ও হীরার স্বামীর জীবনচরিত আখ্যান আরম্ভ করিল। ডাক্তার বহু কষ্টে তাহার মর্ম্মার্থ বুঝিলেন—কেন না, তাহাতে আত্মপরিচয় ও রোদনের বিশেষ বাহুল্য।

মর্ম্মার্থ এই যে, বুড়ী হীরার জন্য একটু ঔষধ চাহে। রোগ, বাতিক। হীরা গর্ভে থাকা কালে, তাহার মাতা উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছিল। সে সেই অবস্থায় কিছু কাল থাকিয়া সেই অবস্থাতেই মরে। হীরা বাল্যকাল হইতে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী—তাহাতে কখনও মাতৃব্যাধির কোন লক্ষণ দৃষ্ট হয় নাই, কিন্তু আজিকালি বুড়ীর কিছু সন্দেহ হইয়াছে। হীরা এখন কখনও কখনও একা হাসে—একা কাঁদে, কখনও বা ঘরে দ্বার দিয়া নাচে। কখনও চীৎকার করে। কখনও মূর্চ্ছা যায়। বুড়ী ডাক্তারের কাছে ইহার ঔষধ চাহিল।

ডাক্তার চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তোর নাতিনীর হিস্টীরিয়া হইয়াছে।"

বুড়ী জিজ্ঞাসা করিল, "তা বাবা! ইষ্টিরসের ঔষধ নাই?"

ডাক্তার বলিলেন, "ঔষধ আছে বই কি। উহাকে খুব গরম রাখিস্ আর এই কাষ্ট-অয়েলটুকু লইয়া যা, ঐকাল প্রাতে খাওয়াইস্। পরে অন্য ঔষধ দিব।" ডাক্তার বাবুর বিদ্যাটা ঐ রকম।

বুড়ী কাষ্টর-অয়েলের শিশি হাতে, লাঠি ঠক্ ঠক্ করিয়া চলিল। পথে এক জন প্রতিবাসিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি গো হীরের আয়ি , তোমার হাতে ও কি?"

হীরার আয়ি কহিল যে, "হীরের ইষ্টিরস হয়েছে, তাই ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম, সে একটু কেষ্টরস দিয়াছে। তা হাঁ গা, কেষ্টরসে কি ইষ্টিরস ভাল হয়?"

প্রতিবাসিনী অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, "তা হবেও বা। কেষ্টই ত সকলের ইষ্টি। তা তাঁর অনুগ্রহে ইষ্টিরস ভাল হইতে পারে। আচ্ছা, হীরার আয়ি, তোর নাতিনীর এত রস হয়েছে কোথা থেকে?" হীরার আয়ি অনেক ভাবিয়া বলিল, "বয়সদোষে অমন হয়।"

প্রতিবাসিনী কহিল,"একটু কৈলে বাছুরের চোনা খাইয়ে দিও। শুনিয়াছি, তাহাতে বড় রস পরিপাক পায়।"

বুড়ী বাড়ী গেলে, তাঁহার মনে পড়িল যে, ডাক্তার গরমে রাখার কথা বলিয়াছে। বুড়ী হীরার সম্মুখে এক কড়া আগুন আনিয়া উপস্থিত করিল। হীরা বলিল, "মর! আগুন কেন?"

বুড়ী বলিল, "ডাক্তার তোকে গরম করতে বলেছে।"

দ্বিচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ : অন্ধকার পুরী-অন্ধকার জীবন

গোবিন্দপুরে দত্তদিগের বৃহৎ অট্টালিকা, ছয় মহল বাড়ী—নগেন্দ্র সূর্য্যমুখী বিনা সব অন্ধকার। কাছারি বাড়ীতে আমলারা বসে, অন্তঃপুরে কেবল কুন্দনন্দিনী, নিত্য প্রতিপাল্য কুটুম্বিনীদিগের সহিত বাস করে। কিন্তু চন্দ্র বিনা রোহিণীতে আকাশের কি অন্ধকার যায়? কোণে কোণে মাকড়সার জাল—ঘরে ঘরে ধুলার রাশি, কার্ণিসে কার্ণিসে পায়রার বাসা, কড়িতে কড়িতে চড়ুই। বাগানে শুক্না পাতার রাশি, পুকুরেতে পানা। উঠানেতে শিয়ালা, ফুল বাগানে জঙ্গল, ভাণ্ডার ঘরে ইন্দুর। জিনিসপত্র ঘেরাটোপে ঢাকা। অনেকেতেই ছাতা ধরেছে। অনেক ইন্দুরে কেটেছে। ছুঁচা, বিছা, বাদুড়, চামচিকে অন্ধকারে অন্ধকার দিবারাত্র বেড়াইতেছে। সূর্য্যমুখীর পোষা পাখীগুলোকে প্রায় বিড়ালে ভক্ষণ করিয়াছে। কোথাও কোথাও ভোজনাবশিষ্ট পাখাগুলি পড়িয়া আছে। হাঁসগুলা শৃগালে মারিয়াছে। ময়ূরগুলা বুনো হইয়া গিয়াছে। গোরুগুলার হাড় উঠিয়াছে—আর দুধ দেয় না। নগেন্দ্রের কুকুরগুলোর স্ফূর্তি নাই—খেলা নাই, ডাক নাই—বাঁধাই থাকে। কোনটা মরিয়া গিয়াছে—কোনটা ক্ষেপিয়া গিয়াছে, কোনটা পলাইয়া গিয়াছে। ঘোড়াগুলার নানা রোগ—অথবা নীরোগেই রোগ। আস্তাবলে যেখানে সেখানে খড় কুটা, শুক্না পাতা, ঘাস, ধুলা আর পায়রার পালক। ঘোড়া সকল ঘাস-দানা কখনও পায়, কখনও পায় না। সহিসেরা প্রায় আস্তাবলমুখ হয় না; সহিস্নীমহলেই থাকে। অট্টালিকার কোথাও আলিশা ভাঙ্গিয়াছে, কোথাও জমাট খসিয়াছে; কোথাও সাসী, কোথাও খড়খড়ি, কোথাও রেলিং টুটিয়াছে। মেটিঙ্গের উপর বৃষ্টির জল, দেয়ালের পেন্টের উপর বসুধারা, বুককেশের উপর কুমীরপোকার বাসা, ঝাড়ের ফানুসের উপর চড়ুইয়ের বাসার খড় কুটা। গৃহে লক্ষ্মী নাই। লক্ষ্মী বিনা বৈকুণ্ঠও লক্ষ্মীছাড়া হয়।

যে উদ্যানে মালী নাই, ঘাসে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে; সেখানে যেমন কখনও একটি গোলাপ কি একটি স্থলপদ্ম ফুটে, এই গৃহমধ্যে তেমনি একা কুন্দনন্দিনী বাস করিতেছিল। যেমন আর পাঁচজন খাইত, পরিত, কুন্দও তাই। যদি কেহ তাকে গৃহিণী ভাবিয়া কোন কথা কহিত, কুন্দ ভাবিত, আমায় তামাসা করিতেছে। দেওয়ানজি যদি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইতেন, ভয়ে কুন্দের বুক দুড়ু দুড়ু করিত। বাস্তবিক কুন্দ দেওয়ানজিকে বড় ভয় করিত। ইহার একটি কারণও ছিল। নগেন্দ্র কুন্দকে পত্র লিখিতেন না; সুতরাং নগেন্দ্র দেনওয়ানজিকে যে পত্রগুলি লিখিতেন, কুন্দ তাহাই চাহিয়া আনিয়া পড়িত। পড়িয়া, আর ফিরাইয়া দিত না—সেইগুলি পাঠ তাহার সন্ধ্যাগায়ত্রী হইয়াছিল। সর্ব্বদা ভয়, পাছে দেওয়ান পত্রগুলি ফিরাইয়া চায়। এই ভয়ে দেওয়ানের নাম শুনিলেই কুন্দের মুখ শুকাইত। দেওয়ান হীরার কাছে এ কথা জানিয়াছিলেন। পত্রগুলি আর চাহিতেন না। আপনি তাহার নকল রাখিয়া কুন্দকে পড়িতে দিতেন।

বাস্তবিক সূর্য্যমুখী যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন—কুন্দ কি পাইতেছে না? সূর্য্যমুখী স্বামীকে ভালবাসিতেন—কুন্দ কি বাসে না? সেই ক্ষুদ্র হৃদয়খানির মধ্যে অপরিমিত প্রেম! প্রকাশের শক্তি নাই বলিয়া, তাহা বিরুদ্ধ বায়ুর ন্যায় সতত কুন্দের সে হৃদয়ে আঘাত করিত। বিবাহের অগ্রে, বাল্যকালাবধি কুন্দ নগেন্দ্রকে ভালবাসিয়াছিল—কাহাকেও বলে নাই, কেহ জানিতে পারে নাই। নগেন্দ্রকে পাইবার কোন বাসনা করে নাই—আশাও করে নাই, আপনার নৈরাশ্য আপনি সহ্য করিত। তাকে আকাশের চাঁদ ধরিয়া হাতে দিল। তার পর-এখন কোথায় সে চাঁদ? কি দোষে তাকে নগেন্দ্র পায়ে ঠেলিয়াছেন? কুন্দ এই কথা রাত্রিদিন ভাবে, রাত্রিদিন কাঁদে। ভাল, নগেন্দ্র তাই ভালবাসুন—তাকে ভালবাসিবেন, কুন্দের এমন কি ভাগ্য—একবার কুন্দ তাঁকে দেখিতে পায় না কেন? শুধু তাই কি? তিনি ভাবেন, কুন্দই এই বিপত্তির মূল, সকলেই ভাবে, কুন্দই অনর্থের মূল। কুন্দ ভাবে, কি দোষে আমি সকল অনর্থের মূল?

কুক্ষণে নগেন্দ্র কুন্দকে বিবাহ করিয়াছিলেন। যেমন উপাস বৃক্ষের তলায় সে বসে, সেই মরে, তেমনি এই বিবাহের ছায়া যাহাকে স্পর্শ করিয়াছে, সেই মরিয়াছে।

আবার কুন্দ ভাবিত, "সূর্য্যমুখীর এই দশা আমা হতে হইল। সূর্য্যমুখী আমাকে রক্ষা করিয়াছিল—আমাকে ভগিনীর ন্যায় ভালবাসিত—তাহাকে পথের কাঙ্গালী

করিলাম; আমার মত অভাগিনী কি আর আছে? আমি মরিলাম না কেন? এখন মরি না কেন।" আবার ভাবিত, "এখন মরিব না। তিনি আসুন–তাঁকে আর একবার দেখি–তিনি কি আর আসিবেন না?" কুন্দ সূর্য্যমুখীর মৃত্যুসংবাদ পায় নাই। তাই মনে মনে বলিত, "এখন শুধু শুধু মরিয়া কি হইবে। যদি সূর্য্যমুখী ফিরিয়া আসে, তবে মরিব। আর তার সুখের পথে কাঁটা হব না।"

ত্রিচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ : প্রত্যাগমন

কলিকাতার আবশ্যকীয় কার্য্য সমাপ্ত হইল। দানপত্র লিখিত হইল। তাহাতে ব্রহ্মচারীর এবং অজ্ঞাতনাম ব্রাহ্মণের পুরস্কারের বিশেষ বিধি রহিল। তাহা হরিপুরে রেজেষ্ট্রী হইবে, এই কারণে দানপত্র সঙ্গে করিয়া নগেন্দ্র গোবিন্দ্রপুরে গেলেন। শ্রীশচন্দ্রকে যথোচিত যানে অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়া গেলেন। শ্রীশচন্দ্র তাঁহাকে দানপত্রাদির ব্যবস্থা, এবং পদব্রজে গমন ইত্যাদি কার্য্য হইতে বিরত করিবার জন্য অনেক যত্ন করিলেন, কিন্তু সে যত্ন নিষ্ফল হইল। অগত্যা তিনি নদীপন্থায় তাঁহার অনুগামী হইলেন। মন্ত্রীছাড়া হইলে কমলমণির চলে না, সুতরাং তিনিও বিনা জিজ্ঞাসাবাদে সতীশকে লইয়া শ্রীশচন্দ্রের নৌকায় গিয়া উঠিলেন।

কমলমণি আগে গোবিন্দপুরে আসিলেন, দেখিয়া কুন্দনন্দিনীর বোধ হইল, আবার আকাশে একটি তারা উঠিল। যে অবধি সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, সেই অবধি কুন্দনন্দিনীর উপর কমলমণির দুর্জ্জয় ক্রোধ; মুখ দেখিতেন না। কিন্তু এবার আসিয়া কুন্দনন্দিনীর শুষ্ক মূর্ত্তি দেখিয়া কমলমণির রাগ দূর হইল–দুঃখ হইল। তিনি কুন্দনন্দিনীকে প্রফুল্লিত করিবার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন, নগেন্দ্র আসিতেছেন, সংবাদ দিয়া কুন্দের মুখে হাসি দেখিলেন। সূর্য্যমুখীর মৃত্যুসংবাদ দিতে কাজে কাজেই হইল। শুনিয়া কুন্দ কাঁদিল। এ কথা শুনিয়া, এ গ্রন্থের অনেক সুন্দরীপাঠকারিণী মনে মনে হাসিবেন; আর বলিবেন, "মাছ মরেছে, বেরাল কাঁদে।'' কিন্তু কুন্দ বড় নির্ব্বোধ। সতিন মরিলে যে হাসিতে হয়, সেটা তার মোটা বুদ্ধিতে আসে নাই। বোকা মেয়ে, সতিনের জন্যও একটু কাঁদিল। আর তুমি ঠাকুরাণি! তুমি যে হেসে হেসে বলতেছ, "মাছ মরেছে, বেরাল কাঁদে"-তোমার সতিন মরিলে তুমি যদি একটু কাঁদ, তা হইলে আমি বড় তোমার উপর খুসী হব।

কমলমণি কুন্দকে শান্ত করিলেন। কমলমণি নিজে শান্ত হইয়াছিলেন। প্রথম প্রথম কমল অনেক কাঁদিয়াছিলেন–তার পরে ভাবিলেন,"কাঁদিয়া কি করিব? আমি কাঁদিলে শ্রীশচন্দ্র অসুখী হন–আমি কাঁদিলে সতীশ কাঁদে–কাঁদিলে ত সূর্য্যমুখী ফিরিবে না; তবে কেন এদের কাঁদাই? আমি কখন সূর্য্যমুখীকে ভুলিব না; কিন্তু আমি হাসিলে যদি সতীশ হাসে, তবে কেন হাসব না?" এই ভাবিয়া কমলমণি রোদন ত্যাগ করিয়া আবার সেই কমলমণি হইলেন।

কমলমণি শ্রীশচন্দ্রকে বলিলেন, "এ বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী ত বৈকুণ্ঠ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। তাই বোলে দাদা বাবু বৈকুণ্ঠে এসে কি বটপত্রে শোবেন?"

শ্রীশচন্দ্র বলিলেন, "এসো, আমরা সব পরিষ্কার করি।"

অমনি শ্রীশচন্দ্র, রাজা, মজুর, ফরাস, মালী, যেখানে যাহার প্রয়োজন, সেখানে তাহাকে নিযুক্ত করিলেন। এদিকে কমলমণির দৌরাত্ম্যে ছুঁচা, বাদুড়, চামচিকে মহলে বড় কিচি মিচি পড়িয়া গেল; পায়রাগুলা "বকম বকম" করিয়া এ কার্ণিশ ও কার্ণিশ করিয়া বেড়াইতে লাগিল, চুড়ইগুলা পলাইতে ব্যাকুল–যেখানে সাসী বন্ধ, সেখানে দ্বার খোলা মনে করিয়া ঠোঁটে কাচ লাগিয়া ঘুরিয়া পড়িতে লাগিল; পরিচারিকারা ঝাঁটা হাতে জনে জনে দিকে দিকে দিগ্বিজয়ে ছুটিল। অচিরাৎ

অট্টালিকা আবার প্রসন্ন হইয়া হাসিতে লাগিল।

পরিশেষে নগেন্দ্র আসিয়া পঁহুছিলেন। তখন সন্ধ্যাকাল। যেমন নদী, প্রথম জলোচ্ছ্বাসকালে অত্যন্ত বেগবতী, কিন্তু জোয়ার পূরিলে গভীর জল শান্তভাব ধারণ করে, তেমনি নগেন্দ্রের সম্পূর্ণ শোক-প্রবাহ এক্ষণে গম্ভীর শান্তিরূপে পরিণত হইয়াছিল। যে দুঃখ, তাহা কিছুই কমে নাই; কিন্তু অধৈর্য্যের হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল। তিনি স্থিরভাবে পৌরবর্গের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিলেন, সকলকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। কাহারও সাক্ষাতে তিনি সূর্য্যমুখীর প্রসঙ্গ করিলেন না—কিন্তু তাঁহার ধীরভাব দেখিয়া সকলেই তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইল। প্রাচীন ভৃত্যেরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া গিয়া আপনা আপনি রোদন করিল। নগেন্দ্র কেবল একজনকে মনঃপীড়া দিলেন। চিরদুঃখিনী কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন না।

চতুশ্চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ : স্তিমিত প্রদীপে

নগেন্দ্রনাথের আদেশমত পরিচারিকারা সূর্য্যমুখীর শয্যাগৃহে তাঁহার শয্যা প্রস্তুত করিয়াছিল। শুনিয়া কমলমণি ঘাড় নাড়িলেন।

নিশীথকালে পৌরজন সকলে সুষুপ্ত হইলে নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীর শয্যাগৃহে শয়ন করিতে গেলেন। শয়ন করিতে না—রোদন করিতে। সূর্য্যমুখীর শয্যাগৃহ অতি প্রশস্ত এবং মনোহর; উহা নগেন্দ্রের সকল সুখের মন্দির; এই জন্য তাহা যত্ন করিয়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ঘরটি প্রশস্ত এবং উচ্চ, হর্ম্ম্যতল শ্বেতকৃষ্ণ মর্ম্মর-প্রস্তরে রচিত। কক্ষপ্রাচীরে নীল পিঙ্গল লোহিত লতা-পল্লব-ফল-পুষ্পাদি চিত্রিত; তদুপরি বসিয়া নানাবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিহঙ্গসকল ফল ভক্ষণ করিতেছে, লেখা আছে। একপাশে বহুমূল্য দারুনির্ম্মিত হস্তিদন্তখচিত কারুকার্য্যবিশিষ্ট পর্য্যঙ্ক, আর এক পাশে বিচিত্র বস্ত্রমণ্ডিত নানাবিধ কাষ্ঠাসন এবং বৃহদ্দর্পণ প্রভৃতি গৃহসজ্জার বস্তু বিস্তর ছিল। কয়খানি চিত্র কক্ষপ্রাচীর হইতে বিলম্বিত ছিল। চিত্রগুলি বিলাতী নহে। সূর্য্যমুখী নগেন্দ্র উভয়ে মিলিত হইয়া চিত্রের বিষয় মনোনীত করিয়া এক দেশী চিত্রকরের দ্বারা চিত্রিত করাইয়াছিলেন। দেশী চিত্রকর এক জন ইংরেজের শিষ্য; লিখিয়াছিল ভাল। নগেন্দ্র তাহা মহামূল্য ফ্রেম দিয়া শয্যাগৃহে রাখিয়াছিলেন। একখানি চিত্র কুমারসম্ভব হইতে নীত। মহাদেব পর্ব্বতশিখরে বেদির উপর বসিয়া তপশ্চরণ করিতেছেন। লতাগৃহদ্বারে নন্দী, বামপ্রকোষ্ঠার্পিতহেমবেত্র—মুখে এক অঙ্গুলি দিয়া কাকনশব্দ নিবারণ করিতেছেন। কানন স্থির—ভ্রমরেরা পাতার ভিতর লুকাইয়াছে—মৃগেরা শয়ন করিয়া আছে। সেই কালে হরধ্যানভঙ্গের জন্য মদনের অধিষ্ঠান। সঙ্গে সঙ্গে বসন্তের উদয়। অগ্রে বসন্তপুষ্পাভরণময়ী পার্ব্বতী মহাদেবকে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন। উমা যখন শম্ভুসম্মুখে প্রণামজন্য নত হইতেছেন, এক জানু ভূমিস্পৃষ্ট করিয়াছেন, আর এক জানু ভূমিস্পর্শ করিতেছে, স্কন্ধসহিত মস্তক নমিত হইয়াছে, সেই অবস্থা চিত্রে চিত্রিতা। মস্তক নমিতা হওয়াতে অলকবন্ধ হইতে দুই একটি কর্ণবিলম্বী কুরুবক কুসুম খসিয়া পড়িতেছে; বক্ষ হইতে বসন ঈষৎ স্রস্ত হইতেছে, দূর হইতে মন্মথ সেই সময়ে, বসন্তপ্রফুল্লবনমধ্যে অর্দ্ধলুক্কায়িত হইয়া এক জানু ভূমিতে রাখিয়া, চারু ধনু চক্রাকার করিয়া, পুষ্পধনুতে পুষ্পশর সংযোজিত করিতেছেন। আর এক চিত্রে শ্রীরাম জানকী লইয়া লঙ্কা হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন; উভয়ে এক রত্নমণ্ডিত বিমানে বসিয়া, শূন্যমার্গে চলিতেছেন। শ্রীরাম জানকীর স্কন্ধে এক হস্ত রাখিয়া, আর এক হস্তের অঙ্গুলির দ্বারা নিম্নে পৃথিবীর শোভা দেখাইতেছেন। বিমানচতুষ্পার্শ্বে নানাবর্ণের মেঘ,—নীল, লোহিত,—শ্বেত-ধূমতরঙ্গোৎক্ষেপ করিয়া বেড়াইতেছে। নিম্নে আবার বিশাল নীল সমুদ্রে তরঙ্গভঙ্গ হইতেছে,—সূর্য্যকরে তরঙ্গসকল হীরকরাশির মত জ্বলিতেছে। এক পারে অতিদূরে "সৌধকিরীটিনী লঙ্কা—" তাহার প্রাসাদাবলীর স্বর্ণমণ্ডিত চূড়া সকল সূর্য্যকরে জ্বলিতেছে। অপর পারে শ্যামশোভাময়ী, "তমালতালীবনরাজিনীলা" সমুদ্রবেলা।

মধ্যে শূন্যে হংসশ্রেণী সকল উড়িয়া যাইতেছে। আর এক চিত্রে, অর্জ্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিয়া রথে তুলিয়াছেন। রথ শূন্যপথে মেঘমধ্যে পথ করিয়া চলিয়াছে, পশ্চাৎ অগণিত যাদবী সেনা ধাবিত হইতেছে, দূরে তাহাদিগের পতাকাশ্রেণী এবং রজোজনিত মেঘ দেখা যাইতেছে। সুভদ্রা স্বয়ং সারথি হইয়া রথ চালাইতেছেন। অশ্বেরা মুখামুখি করিয়া, পদক্ষেপে মেঘ সকল চূর্ণ করিতেছে; সুভদ্রা আপন সারথ্যনৈপুণ্যে প্রীতা হইয়া মুখ ফিরাইয়া অর্জ্জুনের প্রতি বক্রদৃষ্টি করিতেছেন; কুন্দদন্তে আপন অধর দংশন করিয়া টিপি টিপি হাসিতেছেন; রথবেগজনিত পবনে তাঁহার অলক সকল উড়িতেছে—দুই এক গুচ্ছ কেশ স্বেদবিজড়িত হইয়া কপালে চক্রাকারে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। আর একখানি চিত্রে, সাগরিকাবেশে রত্নাবলী, পরিষ্কার নক্ষত্রালোকে বালতমালতলে, উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে যাইতেছেন। তমালশাখা হইতে একটি উজ্জ্বল পুষ্পময়ী লতা বিলম্বিত হইয়াছে, রত্নাবলী এক হস্তে সেই লতার অগ্রভাগ লইয়া গলদেশে পরাইতেছেন, আর এক হস্তে চক্ষের জল মুছিতেছেন; লতাপুষ্প সকল তাঁহার কেশদামের উপর অপূর্ব্ব শোভা করিয়া রহিয়াছে। আর একখানি চিত্রে, শকুন্তলা দুষ্মন্তকে দেখিবার জন্য চরণ হইতে কাল্পনিক কুশাঙ্কুর মুক্ত করিতেছেন—অনসূয়া প্রিয়ম্বদা হাসিতেছে—শকুন্তলা ক্রোধে ও লজ্জায় মুখ তুলিতেছেন না—দুষ্মন্তের দিকে চাহিতেও পারিতেছেন না—যাইতেও পারিতেছেন না। আর এক চিত্রে, রণসজ্জিত হইয়া সিংহশাবকতূল্য প্রতাপশালী কুমার অভিমন্যু উত্তরার নিকট যুদ্ধযাত্রার জন্য বিদায় লইতেছেন—উত্তরা যুদ্ধে যাইতে দিবেন না বলিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া আপনি দ্বারে দাঁড়াইয়াছেন। অভিমন্যু তাঁহার ভয় দেখিয়া হাসিতেছেন, আর কেমন করিয়া অবলীলাক্রমে ব্যূহভেদ করিবেন, তাহা মাটিতে তরবারির অগ্রভাগের দ্বারা অঙ্কিত করিয়া দেখাইতেছেন। উত্তরা তাহা কিছুই দেখিতেছেন না। চক্ষে দুই হস্ত দিয়া কাঁদিতেছেন। আর একখানি চিত্রে সত্যভামার তুলাব্রত চিত্রিত হইয়াছে। বিস্তৃত প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাঙ্গণ, তাহার পাশে উচ্চ সৌধপরিশোভিত রাজপুরী স্বর্ণচূড়ার সহিত দীপ্তি পাইতেছে। প্রাঙ্গণমধ্যে এক অত্যুচ্চ রজতনির্ম্মিত তুলাযন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। তাহার এক দিকে ভর করিয়া, বিদ্যুদ্দীপ্ত নীরদখণ্ডবৎ নানালঙ্কারভূষিত প্রৌঢ়বয়স্ক দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ বসিয়াছেন। তুলাযন্ত্রের সেই ভাগ ভূমিস্পর্শ করিতেছে; আর এক দিকে নানারত্নাদিসহিত সুবর্ণরাশি স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে, তথাপি তুলাযন্ত্রের সেই ভাগ উর্দ্ধোত্থিত হইতেছে না। তুলাপার্শ্বে, সত্যভামা; সত্যভামা পৌঢ়বয়স্কা, সুন্দরী, উন্নতদেহবিশিষ্টা, পুষ্টকান্তিমতী, নানাভরণভূষিতা, পঙ্কজলোচনা; কিন্তু তুলাযন্ত্রের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মুখ শুকাইয়াছে। তিনি অঙ্গের অলঙ্কার খুলিয়া তুলায় ফেলিতেছেন, হস্তের চম্পকোপম অঙ্গুলির দ্বারা কর্ণবিলম্বী রত্নভূষা খুলিতেছেন, লজ্জায় কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম হইতেছে, দুঃখে চক্ষে জল আসিয়াছে, ক্রোধে নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইতেছে, অধর দংশন করিতেছেন; এই অবস্থায় চিত্রকর তাঁহাকে লিখিয়াছেন। পশ্চাতে দাঁড়াইয়া, স্বর্ণপ্রতিমারূপিণী রুক্সিণী দেখিতেছেন। তাঁহারও মুখ বিমর্ষ। তিনিও আপনার অঙ্গের অলঙ্কার খুলিয়া সভ্যভামাকে দিতেছেন। কিন্তু তাঁহার চক্ষু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি; তিনি স্বামিপ্রতি অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিয়া, ঈষন্মাত্র অধরপ্রান্তে হাসি হাসিতেছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেই হাসিতে সপত্নীর আনন্দ সম্পূর্ণ দেখিতে পাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের মুখ গম্ভীর, স্থির, যেন কিছুই জানেন না; কিন্তু তিনি অপাঙ্গে রুক্সিণীর প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন, সে কটাক্ষেও একটু হাসি আছে। মধ্যে শুভ্রবসন শুভ্রকান্তি দেবর্ষি নারদ; তিনি বড় আনন্দিতের ন্যায় সকল দেখিতেছেন, বাতাসে তাঁহার উত্তরীয় এবং শ্মশ্রু উড়িতেছে। চারি দিকে বহুসংখ্যক পৌরবর্গ নানা প্রকার বেশভূষা ধারণ করিয়া আলো করিয়া রহিয়াছে। বহুসংখ্যক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ আসিয়াছে। কত কত পুররক্ষিগণ গোল থামাইতেছে। এই চিত্রের নীচে সূর্য্যমুখী স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছেন, "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। স্বামীর সঙ্গে, সোণা রূপার তুলা?"

নগেন্দ্র যখন কক্ষমধ্যে একাকী প্রবেশ করিলেন, তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছিল। রাত্রি অতি ভয়ানক। সন্ধ্যার পর হইতে অল্প অল্প বৃষ্টি হইয়াছিল এবং বাতাস উঠিয়াছিল। এক্ষণে ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টি হইতেছিল, বায়ু প্রচণ্ড বেগ ধারণ করিয়াছিল। গৃহের কবাট যেখানে যেখানে মুক্ত ছিল, সেইখানে সেইখানে

বজ্রতুল্যশব্দে তাহার প্রতিঘাত হইতেছিল। সাসী সকল ঝনঝন শব্দে শব্দিত হইতেছিল। নগেন্দ্র শয্যাগৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। তখন বাত্যানিনাদ মন্দীভূত হইল। খাটের পার্শ্বে আর একটি দ্বার খোলা ছিল—সে দ্বার দিয়া বাতাস আসিতেছিল না, সে দ্বার মুক্ত রহিল।

নগেন্দ্র শয্যাগৃহে প্রবেশ করিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া একখানি সোফার উপর উপবেশন করিলেন। নগেন্দ্র তাহাতে বসিয়া কত যে কাঁদিলেন, তাহা কেহ জানিল না। কতবার সূর্য্যমুখীর সঙ্গে মুখামুখি করিয়া সেই সোফার উপর বসিয়া কত সুখের কথা বলিয়াছিলেন।

নগেন্দ্র ভূয়োভূয়ঃ সেই অচেতন আসনকে চুম্বনালিঙ্গন করিলেন। আবার মুখ তুলিয়া সূর্য্যমুখীর প্রিয় চিত্রগুলির প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। গৃহে উজ্জ্বল দীপ জ্বলিতেছিল—তাহার চঞ্চল রশ্মিতে সেই সকল চিত্রপুত্তলি সজীব দেখাইতেছিল। প্রতি চিত্রে নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীকে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে পড়িল যে, উমার কুসুমসজ্জা দেখিয়া সূর্য্যমুখী এক দিন আপনি ফুল পরিতে সাধ করিয়াছিলেন। তাহাতে নগেন্দ্র আপনি উদ্যান হইতে পুষ্প চয়ন করিয়া আনিয়া স্বহস্তে সূর্য্যমুখীকে কুসুমময়ী সাজাইয়াছিলেন। তাহাতে সূর্য্যমুখী যে কত সুখী হইয়াছিলেন—কোন্ রমণী রত্নময়ী সাজিয়া তত সুখী হয়? আর এক দিন সুভদ্রার সারথ্য দেখিয়া সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের গাড়ি হাঁকাইবার সাধ করিয়াছিলেন। পত্নীবৎসল নগেন্দ্র তখনই একখানি ক্ষুদ্র যানে দুইটি ছোট ছোট বর্ম্মা জুড়িয়া অন্তঃপুরের উদ্যানমধ্যে সূর্য্যমুখীর সারথ্যজন্য আনিলেন। উভয়ে তাহাতে আরোহণ করিলেন। সূর্য্যমুখী বল্গা ধরিলেন। অশ্বেরা আপনি চলিল। দেখিয়া, সূর্য্যমুখী সুভদ্রার মত নগেন্দ্রের দিকে মুখ ফিরাইয়া দংশিতাধরে টিপি টিপি হাসিতে লাগিলেন। এই অবকাশে অশ্বেরা ফটক নিকটে দেখিয়া একবার গাড়ি লইয়া বাহির হইয়া সদর রাস্তায় গেল। তখন সূর্য্যমুখী লোকলজ্জায় ম্রিয়মাণা হইয়া ঘোমটা টানিতে লাগিলেন। তাঁহার দুর্দ্দশা দেখিয়া নগেন্দ্র নিজ হস্তে বল্গা ধারণ করিয়া গাড়ি অন্তঃপুরে ফিরাইয়া আনিলেন। এবং উভয়ে অবতরণ করিয়া কত হাসি হাসিলেন। শয্যাগৃহে আসিয়া সূর্য্যমুখী সুভদ্রার চিত্রকে একটি কিল দেখাইয়া বলিলেন, “তুই, সর্ব্বনাশীই ত যত আপদের গোড়া।” নগেন্দ্র ইহা মনে করিয়া কত কাঁদিলেন। আর যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া গাত্রোত্থান করিয়া পদচারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যে দিকে চাহেন—সেই দিকেই সূর্য্যমুখীর চিহ্ন। দেয়ালে চিত্রকর যে লতা লিখিয়াছিল—সূর্য্যমুখী তাহার অনুকরণমানসে একটি লতা লিখিয়াছিলেন। তাহা তেমনি বিদ্যমান রহিয়াছে। এক দিন দোলে, সূর্য্যমুখী স্বামীকে কুঙ্কুম ফেলিয়া মারিয়াছিলেন—কুঙ্কুম নগেন্দ্রকে না লাগিয়া দেয়ালে লাগিয়াছিল। আজিও আবীরের চিহ্ন রহিয়াছে। গৃহ প্রস্তুত হইলে সূর্য্যমুখী এক স্থানে স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন।

‘১৯১০ সম্বৎসরে।
ইষ্টদেবতা
স্বামীর স্থাপনা জন্য
এই মন্দির
তাঁহার দাসী সূর্য্যমুখী
কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত হইল।’

নগেন্দ্র ইহা পড়িলেন। নগেন্দ্র কতবার পড়িলেন—পড়িয়া আকাঙ্ক্ষা পূরে না—চক্ষের জলে দৃষ্টি পুনঃ পুনঃ লোপ হইতে লাগিল—চক্ষু মুছিয়া মুছিয়া পড়িতে লাগিলেন। পড়িতে পড়িতে দেখিলেন, ক্রমে আলোক ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। ফিরিয়া দেখিলেন, দীপ নির্ব্বাণোন্মুখ। তখন নগেন্দ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, শয্যায়

শয়ন করিতে গেলেন। শয্যায় উপবেশন করিবামাত্র অকস্মাৎ প্রবলবেগে বর্দ্ধিত হইয়া ঝটিকা ধাবিত হইল; চারি দিকে কবাটতাড়নের শব্দ হইতে লাগিল। সেই সময়ে, শূন্যতৈল দীপ প্রায় নির্ব্বাণ হইল—অল্পমাত্র খদ্যোতের ন্যায় আলো রহিল। সেই অন্ধকারতুল্য আলোতে এক অদ্ভুত ব্যাপার তাঁহার দৃষ্টিপথে আসিল। বঞ্ঝাবাতের শব্দে চমকিত হইয়া, খাটের পাশে যে দ্বার মুক্ত ছিল, সেই দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। সেই মুক্তদ্বারপথে, ক্ষীণালোকে, এক ছায়াতুল্য মূর্ত্তি দেখিলেন। ছায়া স্ত্রীরূপিণী, কিন্তু আরও যাহা দেখিলেন, তাহাতে নগেন্দ্রের শরীর কণ্টকিত এবং হস্তপদাদি কম্পিত হইল। স্ত্রীরূপিণী মূর্ত্তি সূর্য্যমুখীর অবয়ববিশিষ্টা। নগেন্দ্র যেমন চিনিলেন যে, এ সূর্য্যমুখীর ছায়া—অমনি পর্য্যঙ্ক হইতে ভূতলে পড়িয়া ছায়াপ্রতি ধাবমান হইতে গেলেন। ছায়া অদৃশ হইল। সেই সময়ে আলো নিবিল। তখন নগেন্দ্র চীৎকার করিয়া ভূতলে পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

পঞ্চচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ : ছায়া

যখন নগেন্দ্রের চৈতন্যপ্রাপ্তি হইল, তখনও শয্যাগৃহে নিবিড়ান্ধকার। ক্রমে ক্রমে তাঁহার সংজ্ঞা পুনঃসঞ্চিত হইতে লাগিল। যখন মূর্চ্ছার কথা সকল স্মরণ হইল, তখন বিস্ময়ের উপর আরও বিস্ময় জন্মিল। তিনি ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তবে তাঁহার শিরোদেশে উপাধান কোথা হইতে আসিল? আবার এক সন্দেহ—এ কি বালিশ?' বালিশ স্পর্শ করিয়া দেখিলেন—এ ত বালিশ নহে। কোন মনুষ্যের ঊরুদেশ। কোমলতায় বোধ হইল, স্ত্রীলোকের ঊরুদেশ। কে আসিয়া মূর্চ্ছিত অবস্থায় তাঁহার মাথা তুলিয়া ঊরুতে রাখিয়াছে? এ কি কুন্দনন্দিনী? সন্দেহ ভঞ্জনার্থে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?" তখন শিরোরক্ষাকারিণী কোন উত্তর দিল না—কেবল দুই তিন বিন্দু উষ্ণ বারি নগেন্দ্রের কপোলদেশে পড়িল। নগেন্দ্র বুঝিলেন, যেই হউক, সে কাঁদিতেছে। উত্তর না পাইয়া নগেন্দ্র তাহার অঙ্গস্পর্শ করিলেন। তখন অকস্মাৎ নগেন্দ্র বুদ্ধিভ্রষ্ট হইলেন, তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল। তিনি নিশ্চেষ্ট জড়ের মত ক্ষণকাল পড়িয়া রহিলেন। পরে ধীরে ধীরে রুদ্ধনিশ্বাসে রমণীর ঊরুদেশ হইতে মাথা তুলিয়া বসিলেন।

এখন ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছিল। আকাশে আর মেঘ ছিল না—পূর্ব্ব দিকে প্রভাতোদয় হইতেছিল। বাহিরে বিলক্ষণ আলোক প্রকাশ পাইয়াছিল—গৃহমধ্যেও আলোকরন্ধ্র দিয়া অল্প অল্প আলোক আসিতেছিল। নগেন্দ্র উঠিয়া বসিয়া দেখিলেন যে, রমণী গাত্রোত্থান করিল—ধীরে ধীরে দ্বারোদ্দেশে চলিল। নগেন্দ্র তখন অনুভব করিলেন, এ ত কুন্দনন্দিনী নহে। তখন এমন আলো নাই যে, মানুষ চিনিতে পারা যায়। কিন্তু আকার ও ভঙ্গী কতক কতক উপলব্ধ হইল। আকার ও ভঙ্গী নগেন্দ্র মুহূর্ত্তকাল বিলক্ষণ করিয়া দেখিলেন। দেখিয়া, সেই দণ্ডায়মানা স্ত্রীমূর্ত্তির পদতলে পতিত হইলেন। কাতরস্বরে অশ্রুপরিপূর্ণ লোচনে বলিলেন, "দেবীই হও, আর মানুষই হও, তোমার পায়ে পড়িতেছি, আমার সঙ্গে একবার কথা কও। নচেৎ আমি মরিব।"

রমণী কি বলিল, কপালদোষে নগেন্দ্র তাহা বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু কথার শব্দ যেমন নগেন্দ্রের কর্ণে প্রবেশ করিল, অমনি তিনি তীরবৎ দাঁড়াইয়া উঠিলেন। এবং দণ্ডায়মান স্ত্রীলোককে বক্ষে ধারণ করিতে গেলেন। কিন্তু তখন মন, শরীর দুই মোহে আচ্ছন্ন হইয়াছে—পুনর্ব্বার বৃক্ষচ্যুত বল্লীবৎ সেই মোহিনীর পদপ্রান্তে পড়িয়া গেলেন। আর কথা কহিলেন না।

রমণী আবার ঊরুদেশে মস্তক তুলিয়া লইয়া বসিয়া রহিলেন। যখন নগেন্দ্র মোহ বা নিদ্রা হইতে উত্থিত হইলেন, তখন দিনোদয় হইতেছে। গৃহমধ্যে আলো। গৃহপার্শ্বে উদ্যানমধ্যে বৃক্ষে বৃক্ষে পক্ষিগণ কলরব করিতেছে। শিরঃস্থ আলোকপন্থা হইতে বালসূর্য্যের কিরণ গৃহমধ্যে পতিত হইতেছে। তখনও নগেন্দ্র

দেখিলেন, কাহার ঊরুদেশে তাঁহার মস্তক রহিয়াছে। চক্ষু না চাহিয়া বলিলেন, "কুন্দ" তুমি কখন আসিলে? আমি আজ সমস্ত রাত্রি সূর্য্যমুখীকে স্বপ্ন দেখিয়াছি। স্বপ্নে দেখিতেছিলাম, সূর্য্যমুখীর কোলে মাথা দিয়া আছি? তুমি যদি সূর্য্যমুখী হইতে পারিতে, তবে কি সুখ হইত!" রমণী বলিল, "সেই পোড়ারমুখীকে দেখিলে যদি তুমি অত সুখী হও, তবে আমি সেই পোড়ারমুখীই হইলাম।"

নগেন্দ্র চাহিয়া দেখিলেন। চমকিয়া উঠিয়া বসিলেন। চক্ষু মুছিলেন। আবার চাহিলেন। মাথা ধরিয়া বসিয়া রহিলেন। আবার চক্ষু মুছিয়া চাহিয়া দেখিলেন। তখন পুনশ্চ মুখাবনত করিয়া মৃদু মৃদু আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "আমি কি পাগল হইলাম—না, সূর্য্যমুখী বাঁচিয়া আছেন? শেষে এই কি কপালে ছিল? আমি পাগল হইলাম!" এই বলিয়া নগেন্দ্র ধরাশায়ী হইয়া বাহুমধ্যে চক্ষু লুকাইয়া আবার কাঁদিতে লাগিলেন।

এবার রমণী তাঁহার পদযুগল ধরিলেন। তাঁহার পদযুগলে মুখাবৃত করিয়া, তাহা অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিলেন। বলিলেন, "উঠ, উঠ! আমার জীবনসর্ব্বস্ব! মাটি ছাড়িয়া উঠিয়া বসো। আমি যে এত দুঃখ সহিয়াছি, আজ আমার সকল দুঃখের শেষ হইল। উঠ, উঠ! আমি মরি নাই। আবার তোমার পদসেবা করিতে আসিয়াছি।"

আর কি ভ্রম থাকে? তখন নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। এবং তাঁহার বক্ষে মস্তক রাখিয়া, বিনা বাক্যে অবিশ্রান্ত রোদন করিতে লাগিলেন। তখন উভয়ে উভয়ের স্কন্ধে মস্তক ন্যস্ত করিয়া কত রোদন করিলেন। কেহ কোন কথা বলিলেন না—কত রোদন করিলেন। রোদনে কি সুখ!

ষট্চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ : পূর্ব্ববৃত্তান্ত

যথাসময়ে সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের কৌতূহল নিবারণ করিলেন। বলিলেন, "আমি মরি নাই—কবিরাজ যে আমার মরার কথা বলিয়াছিলেন—সে মিথ্যা কথা। কবিরাজ জানেন না। আমি তাঁহার চিকিৎসায় সবল হইলে, তোমাকে দেখিবার জন্য গোবিন্দপুরে আসিবার কারণ নিতান্ত কাতর হইলাম। ব্রহ্মচারীকে ব্যতিব্যস্ত করিলাম। শেষে তিনি আমাকে গোবিন্দপুর লইয়া আসিতে সম্মত হইলেন। এক দিন সন্ধ্যার পর আহারাদি করিয়া তাঁহার সঙ্গে গোবিন্দপুরে আসিবার জন্য যাত্রা করিলাম। এখানে আসিয়া শুনিলাম যে, তুমি দেশে নাই। ব্রহ্মচারী আমাকে এখান হইতে তিন ক্রোশ দূরে, এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আপন কন্যা পরিচয়ে রাখিয়া, তোমার উদ্দেশ্যে গেলেন। তিনি প্রথমে কলিকাতায় গিয়া শ্রীশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। শ্রীশচন্দ্রের নিকট শুনিলেন, তুমি মধুপুরে আসিতেছ। ইহা শুনিয়া তিনি আবার মধুপুরে গেলেন। মধুপুরে জানিলেন যে, যে দিন আমরা হরমণির বাটী হইতে আসি, সেই দিনেই তাহার গৃহদাহ হইয়াছিল। হরমণি গৃহমধ্যে পুড়িয়া মরিয়াছিল। প্রাতে লোকে দগ্ধ দেহ দেখিয়া চিনিতে পারে নাই। তাহারা সিদ্ধান্ত করিল যে, এ গৃহে দুইটি স্ত্রীলোক থাকিত; তাহার একটি মরিয়া গিয়াছে—আর একটি নাই। তবে বোধ হয়, একটি পলাইয়া বাঁচিয়াছে—আর একটি পুড়িয়া মরিয়াছে। যে পলাইয়াছে, সেই সবল ছিল, যে রুগ্ন, সে পলাইতে পারে নাই। এইরূপে তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিল যে, হরমণি পলাইয়াছে, আমি মরিয়াছি। যাহা প্রথমে অনুমান মাত্র ছিল, তাহা জনরবে ক্রমে নিশ্চিত বলিয়া প্রচার হইল। রামকৃষ্ণ সেই কথা শুনিয়া তোমাকে বলিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী এই সকল অবগত হইয়া আরও শুনিলেন যে, তুমি মধুপুরে গিয়াছিলে এবং আমার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া এই দিকে আসিয়াছ। তিনি অমনি ব্যস্ত হইয়া তোমার সন্ধানে ফিরিলেন। কালি বৈকালে তিনি প্রতাপপুরে পৌঁছিয়াছেন, আমিও শুনিয়াছিলাম যে, তুমি দুই একদিন মধ্যে বাটী আসিবে। সেই প্রত্যাশায় আমি পরশ্ব এখানে আসিয়াছিলাম। এখন আর তিন ক্রোশ পথ হাঁটিতে ক্লেশ হয় না—পথ হাঁটিতে

শিখিয়াছি। পরশ্ব তোমার আসা হয় নাই, শুনিয়া, ফিরিয়া গেলাম, আবার কাল ব্রহ্মচারীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর গোবিন্দপুরে আসিলাম। যখন এখানে পৌঁছিলাম, তখন এক প্রহর রাত্রি। দেখিলাম, তখনও খিড়কি দুয়ার খোলা। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম—কেহ আমাকে দেখিল না। সিঁড়ির নীচে লুকাইয়া রহিলাম। পরে সকলে শুইলে সিঁড়িতে উঠিলাম। মনে ভাবিলাম, তুমি অবশ্য এই ঘরে শয়ন করিয়া আছ। দেখিলাম, এই দুয়ার খোলা। দুয়ারে উঁকি মারিয়া দেখিলাম—তুমি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছ। বড় সাধ হইল, তোমার পায়ে লুটাইয়া পড়ি—কিন্তু আবার কত ভয় হইল—তোমার কাছে যে অপরাধ করিয়াছি—তুমি যদি ক্ষমা না কর? আমি ত তোমাকে কেবল দেখিয়াই তৃপ্ত। কপাটের আড়াল হইতে দেখিলাম; ভাবিলাম, এই সময়ে দেখা দিই। দেখা দিবার জন্য আসিতেছিলাম—কিন্তু দুয়ারে আমাকে দেখিয়াই তুমি অচেতন হইলে। সেই অবধি কোলে লইয়া বসিয়া আছি। এ সুখ যে আমার কপালে হইবে, তাহা জানিতাম না। কিন্তু ছি! তুমি আমায় ভালবাস না। তুমি আমার গায়ে হাত দিয়াও আমাকে চিনিতে পার নাই—আমি তোমার গায়ের বাতাস পাইলেই চিনিতে পারি।"

সপ্তচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ : সরলা এবং সর্পী

যখন শয়নাগারে সুখসাগরে ভাসিতে ভাসিতে নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখী এই প্রাণস্নিগ্ধকর কথোপকথন করিতেছিলেন, তখন সেই গৃহের অংশান্তরে এক প্রাণসংহারক কথোপকথন হইতেছিল। কিন্তু তৎপূর্ব্বে, পূর্ব্বরাত্রের কথা বলা আবশ্যক।

বাটী আসিয়া নগেন্দ্র কুন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন না। কুন্দ আপন শয়নাগারে উপাধানে মুখ ন্যস্ত করিয়া সমস্ত রাত্রি রোদন করিল। কেবল বালিকাসুলভ রোদন নহে—মর্ম্মান্তিক পীড়িত হইয়া রোদন করিল। যদি কেহ কাহাকে বাল্যকালে অকপটে আত্মসমর্পণ করিয়া, যেখানে অমূল্য হৃদয় দিয়াছিল, সেখানে তাহার বিনিময়ে কেবল তাচ্ছল্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তবে সেই এই রোদনের মর্ম্মচ্ছেদকতা অনুভব করিবে। তখন কুন্দ পরিতাপ করিতে লাগিল যে, "কেন আমি স্বামিদর্শনলালসায় প্রাণ রাখিয়াছিলাম।" আরও ভাবিল যে, "এখন আর কোন্ সুখের আশায় প্রাণ রাখি?"

সমস্ত রাত্রি জাগরণ এবং রোদনের পর প্রভাতকালে কুন্দের তন্দ্রা আসিল। কুন্দ তন্দ্রাভিভূত হইয়া দ্বিতীয়বার লোমহর্ষণ স্বপ্ন দেখিল।

দেখিল, চারি বৎসর পূর্ব্বে পিতৃভবনে পিতার মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে শয়নকালে, যে জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি তাহার মাতার রূপ ধারণ করিয়া, স্বপ্নাবির্ভূতা হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই আলোকময়ী প্রশান্তমূর্ত্তি আবার কুন্দের মস্তকোপরি অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু এবার তিনি বিশুদ্ধ শুভ্র, চন্দ্রমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিণী নহেন। এক অতি নিবিড় বর্ষণোন্মুখ নীল নীরদমধ্যে আরোহণ করিয়া অবতরণ করিতেছেন। তাঁহার চতুষ্পার্শে অন্ধকারময় কৃষ্ণবাষ্পের তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত হইতেছে, সেই অন্ধকার মধ্যে এক মনুষ্যমূর্ত্তি অল্প অল্প হাসিতেছে। তন্মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে সৌদামিনী প্রভাসিত হইতেছে। কুন্দ সভয়ে দেখিল যে, ঐ হাস্যনিরত বদনমণ্ডল, হীরার মুখানুরূপ। আরও দেখিল, মাতার করুণাময়ী কান্তি এক্ষণে গম্ভীরভাবাপন্ন। মাতা কহিলেন, "কুন্দ, তখন আমার কথা শুনিলে না, আমার সঙ্গে আসিলে না—এখন দুঃখ দেখিলে ত?"

কুন্দ রোদন করিল।

তখন মাতা পুনরপি কহিলেন, "বলিয়াছিলাম আর একবার আসিব; তাই আবার আসিলাম। এখন যদি সংসারসুখে পরিতৃপ্তি জন্মিয়া থাকে, তবে আমার সঙ্গে চল।"

তখন কুন্দ কাঁদিয়া কহিল, “মা, তুমি আমাকে সঙ্গে লইয়া চল। আমি আর এখানে থাকিতে চাহি না।”
ইহা শুনিয়া মাতা প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, “তবে আইস।” এই বলিয়া তেজোময়ী অন্তর্হিতা হইলেন। নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, কুন্দ স্বপ্ন স্মরণ করিয়া দেবতার নিকট ভিক্ষা চাহিল যে, “এবার আমার স্বপ্ন সফল হউক!”
প্রাতঃকালে হীরা কুন্দের পরিচর্য্যার্থে সেই গৃহে প্রবেশ করিল। দেখিল, কুন্দ কাঁদিতেছে।
কমলমণির আসা অবধি হীরা কুন্দের নিকট বিনীতভাবে ধারণ করিয়াছিল। নগেন্দ্র আসিতেছেন, এই সংবাদই ইহার কারণ। পূর্ব্বপুরুষব্যবহারের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বরং হীরা, পূর্ব্বাপেক্ষাও কুন্দের প্রিয়বাদিনী ও আজ্ঞাকারিণী হইয়াছিল। অন্য কেহ এই কাপট্য সহজেই বুঝিতে পারিত–কিন্তু কুন্দ অসামান্য সরলা এবং আশুসন্তুষ্টা–সুতরাং হীরার এই নূতন প্রিয়কারিতায় প্রীতা ব্যতীত সন্দেহবিশিষ্টা হয় নাই। অতএব, এখন কুন্দ হীরাকে পূর্ব্বমত বিশ্বাসভাগিনী বিবেচনা করিত। কোন কালেই রুক্ষভাষিণী ভিন্ন অবিশ্বাসভাগিনী মনে করে নাই।
হীরা জিজ্ঞাসা করিল, “মা ঠাকুরাণি, কাঁদিতেছ কেন?”
কুন্দ কথা কহিল না। হীরার মুখপ্রতি চাহিয়া দেখিল। হীরা দেখিল, কুন্দের চক্ষু ফুলিয়াছে, বালিশ ভিজিয়াছে। হীরা কহিল, “এ কি? সমস্ত রাত্রিই কেঁদেছ নাকি? কেন, বাবু কিছু বলেছেন?”
কুন্দ বলিল, “কিছু না।”
এই বলিয়া আবার সংবর্দ্ধিতবেগে রোদন করিতে লাগিল। হীরা দেখিল, কোন বিশেষ ব্যাপারে ঘটিয়াছে। কুন্দের ক্লেশ দেখিয়া আনন্দে তাহার হৃদয় ভাসিয়া গেল। মুখ ম্লান করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “বাবু বাড়ী আসিয়া তোমার সঙ্গে কি কথাবার্ত্তা কহিলেন? আমরা দাসী, আমাদের কাছে তা বলিতে হয়।”
কুন্দ কহিল, “কোন কথাবার্ত্তা বলেন নাই।”
হীরা বিস্মিতা হইয়া কহিল, “সে কি, মা! এত দিনের পর দেখা হলো! কোন কথাই বলিলেন না?”
কুন্দ কহিল, “আমার সঙ্গে দেখা হয় নাই।”
এই কথা বলিতে কুন্দের রোদন অসংবরণীয় হইল।
হীরা মনে মনে বড় প্রীতা হইল। হাসিয়া বলিল, “ছি, মা, এতে কি কাঁদিতে হয়? কত লোকের কত বড় বড় দুঃখ মাথার উপর দিয়া গেল–আর তুমি একটু দেখা করার বিলম্বজন্য কাঁদিতেছ?”
“বড় বড় দুঃখ” আবার কি প্রকারে, কুন্দ তাহা কিছুই বুঝিতে পারিল না। হীরা তখন বলিতে লাগিল, “আমার মত যদি তোমাকে সহিতে হইত–তবে এত দিনে তুমি আত্মহত্যা করিতে।”
“আত্মহত্যা,” এই মহা অমঙ্গলজনক শব্দ কুন্দনন্দিনীর কাণে দারুণ বাজিল। সে শিহরিয়া উঠিয়া বসিল। রাত্রিকালে অনেক বার সে আত্মহত্যার কথা ভাবিয়াছিল, হীরার মুখে সেই কথা শুনিয়া নরাঙ্কিতের ন্যায় বোধ হইল।
হীরা বলিতে লাগিল, “তবে আমার দুঃখের কথা বলি শুন। আমিও একজনকে আপনার প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসিতাম। সে আমার স্বামী নহে–কিন্তু যে পাপ করিয়াছি, তাহা মুনিবের কাছে লুকাইলে বা কি হইবে–স্পষ্ট স্বীকার করাই ভাল।”

এই লজ্জাহীন কথা কুন্দের কর্ণে প্রবেশও করিল না। তাহার কাণে সেই "আত্মহত্যা" শব্দ বাজিতেছিল। যেন ভূতে তাহার কাণে কাণে বলিতেছিল, "তুমি আত্মঘাতিনী হইতে পারিবে; এ যন্ত্রণা সহা ভাল, না মরা ভাল?"
হীরা বলিতে লাগিল, "সে আমার স্বামী নহে; কিন্তু আমি তাহাকে লক্ষ স্বামীর অপেক্ষা ভালবাসিতাম। সে আমাকে ভালবাসিত না; আমি জানিতাম যে, সে আমাকে ভালবাসিত না। এবং আমার অপেক্ষা শতগুণে নির্গুণ আর এক পাপিষ্ঠাকে ভালবাসিত।" ইহা বলিয়া হীরা নতনয়না কুন্দের প্রতি একবার অতি তীব্র কোপকটাক্ষ করিল, পরে বলিতে লাগিল, "আমি ইহা জানিয়া তাহার দিকে ঘেঁসিলাম না, কিন্তু একদিন আমাদের উভয়েরই দুর্বুদ্ধি হইল।" এইরূপে আরম্ভ করিয়া, হীরা সংক্ষেপে কুন্দের নিকট আপনার দারুণ ব্যথার পরিচয় দিল। কাহারও নাম ব্যক্ত করিল না; দেবেন্দ্রের নাম, কুন্দের নাম উভয়েই অব্যক্ত রহিল। এমত কোন কথা বলিল না যে তদ্দারা, কে হীরার প্রণয়ী, কে বা সেই প্রণয়িনী প্রণয়িনীর, তাহা অনুভূত হইতে পারে। আর সকল কথা সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়া বলিল। শেষে পদাঘাতের কথা বলিয়া কহিল, "বল দেখি, তাহাতে আমি কি করিলাম?"
কুন্দ জিজ্ঞাসা করিল, "কি করিলে?" হীরা হাত মুখ নাড়িয়া বলিতে লাগিল, "আমি তখনই চাঁড়াল কবিরাজের বাড়ীতে গেলাম। তাহার নিকট এমন সব বিষ আছে যে, খাইবামাত্র মানুষ মরিয়া যায়।"
কুন্দ ধীরতার সহিত, মৃদুতার সহিত, কহিল, "তার পর?"
হীরা কহিল, "আমি বিষ খাইয়া মরিব বলিয়া বিষ কিনিয়াছিলাম, কিন্তু শেষে ভাবিলাম যে, পরের জন্য আমি মরিব কেন? ইহা ভাবিয়া বিষ কৌটায় পূরিয়া বাক্সতে তুলিয়া রাখিয়াছি।"
এই বলিয়া হীরা কক্ষান্তর হইতে তাহার বাক্স আনিল। সে বাক্সটি হীরা মুনিববাড়ীর প্রসাদ, পুরস্কার এবং অপহরণের দ্রব্য লুকাইবার জন্য সেইখানে রাখিত। হীরা সেই বাক্সতে নিজক্রীত বিষের মোড়ক রাখিয়াছিল। বাক্স খুলিয়া হীরা কৌটার মধ্যে বিষের মোড়ক কুন্দকে দেখাইল। আমিষলোলুপ মার্জ্জারবৎ কুন্দ তাহার প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিল। হীরা তখন যেন অন্যমনবশতঃ বাক্স বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়া, কুন্দকে প্রবোধ দিতে লাগিল। এমত সময় অকস্মাৎ সেই প্রাতঃকালে নগেন্দ্রের পুরীমধ্যে মঙ্গলজনক শঙ্খ এবং হুলুধ্বনি উঠিল। বিস্মিত হইয়া হীরা ছুটিয়া দেখিতে গেল। মন্দভাগিনী কুন্দনন্দিনী সেই অবকাশে কৌটা হইতে বিষের মোড়ক চুরি করিল।

অষ্টচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ : কুন্দের কার্য্যতৎপরতা

হীরা আসিয়া শঙ্খধ্বনির যে কারণ দেখিল, প্রথম তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না। দেখিল, একটা বৃহৎ ঘরের ভিতর গৃহস্থ যাবতীয় স্ত্রীলোক, বালক এবং বালিকা সকলে মিলিয়া কাহাকে মণ্ডলাকারে বেড়িয়া মহাকলরব করিতেছে। যাহাকে বেড়িয়া তাহারা কোলাহল করিতেছে—সে স্ত্রীলোক—হীরা কেবল তারা কেশরাশি দেখিতে পাইল। হীরা দেখিল, সেই কেশরাশি কৌশল্যাদি পরিচারিকাগণ সুস্নিগ্ধ তৈলনিষিক্ত করিয়া, কেশরঞ্জিনীর দ্বারা রঞ্জিত করিতেছে। যাহারা তাহাকে মণ্ডলাকারে বেড়িয়া আছে, তাহারা কেহ হাসিতেছে, কেহ কাঁদিতেছে, কেহ বকিতেছে, কেহ আশীর্ব্বচন কহিতেছে। বালক বালিকারা নাচিতেছে, গায়িতেছে, এবং করতালি দিতেছে। সকলকে বেড়িয়া বেড়িয়া কমলমণি শাঁক বাজাইতেছেন ও হুলু দিতেছেন, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে হাসিতেছেন—এবং কখন

কখন এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া, এক একবার নৃত্য করিতেছেন।
দেখিয়া হীরা বিস্মিত হইল। হীরা মণ্ডলমধ্যে গলা বাড়াইয়া উঁকি মারিয়া দেখিল। দেখিয়া বিস্ময়বিহ্বল হইল। দেখিল যে, সূর্য্যমুখী হর্ম্ম্যতলে বসিয়া, সুধাময় সস্নেহ হাসি হাসিতেছেন। কৌশল্যাদি তাঁহার রুক্ষ কেশভার কুসুম-সুবাসিত তৈলসিক্ত করিতেছে। কেহ বা তাহা রঞ্জিত করিতেছে; কেহ বা আর্দ্র গাত্রম্রক্ষণীর দ্বারা তাহার গাত্র পরিমার্জ্জিত করিতেছে। কেহ বা তাঁহার পূর্ব্বপরিত্যক্ত অলঙ্কার সকল পরাইতেছে। সূর্য্যমুখী সকলের সঙ্গে মধুর কথা কহিতেছেন—কিন্তু লজ্জিতা, একটু একটু অপরাধিনী হইয়া মধুর হাসি হাসিতেছেন। তাঁহার গণ্ডে স্নেহমুক্ত অশ্রু পড়িতেছে।
সূর্য্যমুখী মরিয়াছিলেন, তিনি আসিয়া আবার গৃহমধ্যে বিরাজ করিতেছেন, মধুর হাসি হাসিতেছেন, ইহা দেখিয়াও হীরার হঠাৎ বিশ্বাস হইল না। হীরা অস্ফুটস্বরে একজন পৌরস্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গা, কে গা?"
কথা কৌশল্যার কাণে গেল। কৌশল্যা কহিল, "চেন না, নেকি? আমাদের ঘরের লক্ষ্মী আর তোমার যম।" কৌশল্যা এত দিন হীরার ভয়ে চোরের মত ছিল, আজি দিন পাইয়া ভালমতে চোখ ঘুরাইয়া লইল।
বেশবিন্যাস সমাপ্ত হইলে এবং সকলের সঙ্গে আলাপ কুশল শেষ হইলে, সূর্য্যমুখী কমলের কাণে কাণে বলিলেন, "তোমায় আমায় একবার কুন্দকে দেখিয়া আসি। সে আমার কাছে কোন দোষ করে নাই বা তাহার উপর আমার রাগ নাই। সে আমার এখন কনিষ্ঠা ভগিনী।"
কেবল কমল ও সূর্য্যমুখী কুন্দের সম্ভাষণে গেলেন।
অনেকক্ষণ তাঁহাদের বিলম্ব হইল। শেষে কমলমণি ভয়নিক্লিষ্টবদনে কুন্দের ঘর হইতে বাহির হইলেন। এবং অতিব্যস্তে নগেন্দ্রকে ডাকিতে পাঠাইলেন। নগেন্দ্র আসিলে, বধূরা ডাকিতেছে বলিয়া তাঁহাকে কুন্দের ঘর দেখাইয়া দিলেন। নগেন্দ্র তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দ্বারে সূর্য্যমুখীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। সূর্য্যমুখী রোদন করিতেছিলেন। নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে?"
সূর্য্যমুখী বলিলেন, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আমি এত দিনে জানিলাম, আমার কপালে একদিনেরও সুখ নাই—নতুবা আমি আবার সুখী হইবামাত্রই এমন সর্ব্বনাশ হইবে কেন?"
নগেন্দ্র ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে?"
সূর্য্যমুখী পুনরপি রোদন করিয়া কহিলেন, "কুন্দকে আমি বালিকাবয়স হইতেই মানুষ করিয়াছি; এখন সে আমার ছোট ভগিনী, বহিনের ন্যায় তাহাকে আদর করিব সাধ করিয়া আসিয়াছিলাম। আমার সে সাধে ছাই পড়িল। কুন্দ বিষপান করিয়াছে।"
নগেন্দ্র। সে কি ?
সূ। তুমি তাহার কাছে থাক—আমি ডাক্তার বৈদ্য আনাইতেছি।
এই বলিয়া সূর্য্যমুখী নিষ্ক্রান্ত হইলেন। নগেন্দ্র একাকী কুন্দনন্দিনীর নিকটে গেলেন।
নগেন্দ্র প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কুন্দনন্দিনীর মুখে কালিমা ব্যাপ্ত হইয়াছে। চক্ষু তেজোহীন হইয়াছে, শরীর অবসন্ন হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

ঊনপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ : এত দিনে মুখ ফুটিল

কুন্দনন্দিনী খাটের বাজুতে মাথা রাখিয়া, ভূতলে বসিয়াছিল—নগেন্দ্রকে নিকটে আসিতে দেখিয়া তাহার চক্ষুর জল আপনি উছলিয়া উঠিল। নগেন্দ্র নিকটে দাঁড়াইলে, কুন্দ ছিন্ন বল্লীবৎ তাঁহার পদপ্রান্তে মাথা লুটাইয়া পড়িল। নগেন্দ্র গদগদকণ্ঠে কহিলেন, "এ কি এ কুন্দ! তুমি কি দোষে ত্যাগ করিয়া যাইতেছ?"

কুন্দ কখন স্বামীর কথার উত্তর করিত না—আজি সে অন্তিমকালে মুক্তকণ্ঠে স্বামীর সঙ্গে কথা কহিল—বলিল, "তুমি কি দোষে আমাকে ত্যাগ করিয়াছ?"

নগেন্দ্র তখন নিরুত্তর হইয়া, অধোবদনে কুন্দনন্দিনীর নিকটে বসিলেন। কুন্দ তখন আবার কহিল, "কাল যদি তুমি আসিয়া এমনি করিয়া একবার কুন্দ বলিয়া ডাকিতে—কাল যদি একবার আমার নিকটে এমনি করিয়া বসিতে—তবে আমি মরিতাম না। আমি অল্প দিন মাত্র তোমাকে পাইয়াছি—তোমাকে দেখিয়া আমার আজিও তৃপ্তি হয় নাই। আমি মরিতাম না।"

এই প্রীতিপূর্ণ শেলসম কথা শুনিয়া নগেন্দ্র জানুর উপর ললাট রক্ষা করিয়া, নীরবে রহিলেন।

তখন কুন্দ আবার কহিল—কুন্দ আজি বড় মুখরা, সে আর ত স্বামীর সঙ্গে কথা কহিবার দিন পাইবে না—কুন্দ কহিল, "ছি! তুমি অমন করিয়া নীরব হইয়া থাকিও না। আমি তোমার হাসিমুখ দেখিতে দেখিতে যদি না মরিলাম—তবে আমার মরণেও সুখ নাই।"

সূর্য্যমুখীও এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন; অন্তকালে সবাই সমান।

নগেন্দ্র তখন মর্ম্মপীড়িত হইয়া কাতরস্বরে কহিলেন, "কেন তুমি এমন কাজ করিলে? তুমি আমায় একবার কেন ডাকিলে না?"

কুন্দ, বিলয়ভূয়িষ্ঠ জলদান্তর্ব্বর্ত্তিণী বিদ্যুতের ন্যায় মৃদুমধুর দিব্য হাসি হাসিয়া কহিল, "তাহা ভাবিও না। যাহা বলিলাম, তাহা কেবল মনের আবেগে বলিয়াছি। তোমার আসিবার আগেই আমি মন স্থির করিয়াছিলাম যে, তোমাকে দেখিয়া মরিব। মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম যে, দিদি যদি কখনও ফিরিয়া আসেন, তবে তাঁহার কাছে তোমাকে রাখিয়া আমি মরিব—আর তাঁহার সুখের পথে কাঁটা হইয়া থাকিব না। আমি মরিব বলিয়াই স্থির করিয়াছিলাম—তবে তোমাকে দেখিলে আমার মরিতে ইচ্ছে করে না।"

নগেন্দ্র কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। আজি তিনি বালিকা অবাক্‌পটু কুন্দনন্দিনীর নিকট নিরুত্তর হইলেন।

কুন্দ ক্ষণকাল নীরব হইয়া রহিল। তাহার কথা কহিবার শক্তি অপনীত হইতেছিল। মৃত্যু তাহাকে অধিকৃত করিতেছিল।

নগেন্দ্র তখন, সেই মৃত্যুচ্ছায়ান্ধকারম্লান মুখমণ্ডলের স্নেহপ্রফুল্লতা দেখিতেছিলেন। তাহার সেই আধিক্লিষ্ট মুখে মন্দবিদ্যুন্নিন্দিত যে হাসি তখন দেখিয়াছিলেন, নগেন্দ্রের প্রাচীন বয়স পর্য্যন্ত তাহা হৃদয়ে অঙ্কিত ছিল।

কুন্দ আবার কিছুকাল বিশ্রামলাভ করিয়া, অপরিতৃপ্তের ন্যায় পুনরপি ক্লিষ্টনিশ্বাস, সহকারে কহিতে লাগিল, "আমার কথা কহিবার তৃষ্ণা নিবারণ হইল না—আমি তোমাকে দেবতা বলিয়া জানিতাম—সাহস করিয়া কখনও মুখ ফুটিয়া কথা কহি নাই। আমার সাধ মিটিল না—আমার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছে—আমার মুখ শুকাইতেছে—জিব টানিতেছে—আমার আর বিলম্ব নাই।" এই বলিয়া কুন্দ, পর্য্যঙ্কাবলম্বন ত্যাগ করিয়া, ভূমে শয়ন করিয়া, নগেন্দ্রের অঙ্গে মাথা রাখিল এবং নয়ন মুদ্রিত করিয়া নীরব হইল।

ডাক্তার আসিল। দেখিয়া শুনিয়া ঔষধ দিল না—আর ভরসা নাই দেখিয়া ম্লানমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

পরে সময় আসন্ন বুঝিয়া, কুন্দ সূর্য্যমুখী ও কমলমণিকে দেখিতে চাহিল। তাঁহারা উভয়ে আসিলে, কুন্দ তাঁহাদের পদধূলি গ্রহণ করিল। তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিলেন।

তখন কুন্দনন্দিনী স্বামীর পদযুগলমধ্যে মুখ লুকাইল। তাহাকে নীরব দেখিয়া দুই জনে আবার উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। কিন্তু কুন্দ আর কথা কহিল না। ক্রমে ক্রমে চৈতন্যভ্রষ্টা হইয়া স্বামীর চরণমধ্যে মুখ রাখিয়া, নবীন যৌবনে কুন্দনন্দিনী প্রাণত্যাগ করিল। অপরিস্ফুট কুন্দকুসুম শুকাইল।
প্রথম রোদন সংবরণ করিয়া সূর্য্যমুখী মৃতা সপত্নী প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "ভাগ্যবতি! তোমার মত প্রসন্ন অদৃষ্ট আমার হউক। আমি যেন এইরূপে স্বামীর চরণে মাথা রাখিয়া প্রাণত্যাগ করি।"
এই বলিয়া সূর্য্যমুখী রোরুদ্যমান স্বামীর হস্তধারণ করিয়া স্থানান্তরে লইয়া গেলেন। পরে নগেন্দ্র ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক কুন্দকে নদীতীরে লইয়া যথাবিধি সৎকারের সহিত, সেই অতুল স্বর্ণপ্রতিমা বিসর্জ্জন করিয়া আসিলেন।

পঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ : সমাপ্তি

কুন্দনন্দিনীর বিয়োগের পর সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল যে, কুন্দনন্দিনী বিষ কোথায় পাইল। তখন সকলেই সন্দেহ করিল যে, হীরার এ কাজ। তখন হীরাকে না দেখিয়া, নগেন্দ্র তাহাকে ডাকিতে পাঠাইলেন। হীরার সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। কুন্দনন্দিনীর মৃত্যুকাল হইতে হীরা অদৃশ্যা হইয়াছিল। সেই অবধি আর কেহ সে দেশে হীরাকে দেখিতে পাইল না। গোবিন্দপুরে হীরার নাম লোপ হইল। এক বার মাত্র বৎসরেক পরে, সে দেবেন্দ্রকে দেখা দিয়াছিল।
তখন দেবেন্দ্রের রোপিত বিষবৃক্ষের ফল ফলিয়াছিল। সে অতি কদর্য্য রোগগ্রস্ত হইয়াছিল। তদুপরি, মদ্যসেবার বিরতি না হওয়ায় রোগ দুর্নিবার্য্য হইল। দেবেন্দ্র মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিল। কুন্দনন্দিনীর মৃত্যুর পরে বৎসরেক মধ্যে দেবেন্দ্রেরও মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল। মরিবার দুই চারি দিন পূর্ব্বে সে গৃহমধ্যে রুগ্নশয্যায় উত্থানশক্তিরহিত হইয়া শয়ন করিয়া আছে—এমত সময় তাহার গৃহদ্বারে বড় গোল উঠিল। দেবেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "কি?" ভৃত্যেরা কহিল যে, "একজন পাগ্‌লী আপনাকে দেখিতে চাহিতেছে। বারণ মানে না।" দেবেন্দ্র অনুমতি করিল, "আসুক।"
উন্মাদিনী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। দেবেন্দ্র দেখিল যে, সে একজন অতি দীনভাবাপন্ন স্ত্রীলোক। তাহার উন্মাদের লক্ষণ বিশেষ কিছু বুঝিতে পারিল না—কিন্তু অতি দীনা ভিখারিণী বলিয়া বোধ করিল। তাহার বয়স অল্প এবং পূর্ব্বলাবণ্যের চিহ্নসকল বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে তাহার অত্যন্ত দুর্দ্দশা। তাহার বসন অতি মলিন, শতধা ছিন্ন, শতগ্রন্থিবিশিষ্ট এবং এত অল্পায়ত যে, তাহা জানুর নীচে পড়ে নাই, এবং তদ্দ্বারা পৃষ্ঠ ও মস্তক আবৃত হয় নাই। তাহার কেশ রুক্ষ, অবেণীবদ্ধ ধূলিধূসরিত—কদাচিৎ বা জটাযুক্ত। তাহার তৈলবিহীন অঙ্গে খড়ি উঠিতেছিল এবং কাদা পড়িয়াছিল।
ভিখারিণী দেবেন্দ্রের নিকট আসিয়া এরূপ তীব্রদৃষ্টি করিতে লাগিল যে, তখন দেবেন্দ্র বুঝিল, ভৃত্যদিগের কথাই সত্য— এ কোন উন্মাদিনী।
উন্মাদিনী অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "আমায় চিনিতে পারিলে না? আমি হীরা।"
দেবেন্দ্র তখন চিনিল যে, হীরা। চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার এমন দশা কে করিল?"
হীরা রোষপ্রদীপ্ত কটাক্ষে অধর দংশন করিয়া মুষ্টিবদ্ধহস্তে দেবেন্দ্রকে মারিতে আসিল। পরে স্থির হইয়া কহিল, "তুমি আবার জিজ্ঞাসা কর—আমার এমন দশা কে করিল? আমার এ দশা তুমিই করিয়াছ। এখন চিনিতেছ না—কিন্তু এক দিন আমায় খোসামোদ করিয়াছিলে। এখন তোমার মনে পড়ে না, কিন্তু এক দিন এই

ঘরে বসিয়া আমার এই পা ধরিয়া (এই বলিয়া হীরা খাটের উপর পা রাখিল) গাহিয়াছিলে—

“স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারং।”

এইরূপ কত কথা মনে করাইয়া দিয়া, উন্মাদিনী বলিতে লাগিল, “যে দিন তুমি আমাকে উৎকৃষ্ট করিয়া নাথি মারিয়া তাড়াইলে, সেই দিন হইতেই আমি পাগল হইয়াছি। আমি আপনি বিষ খাইতে গিয়াছিলাম—একটা আহ্লাদের কথা মনে পড়িল—সে বিষ আপনি না খাইয়া তোমাকে কি তোমার কুন্দকে খাওয়াইব। সেই ভরসায় কয় দিন কোন মতে আমার পীড়া লুকাইয়া রাখিলাম—আমার এ রোগ কখন আসে, কখন যায়। যখন আমি উন্মত্ত হইতাম, তখন আমি ঘরে পড়িয়া থাকিতাম; যখন ভাল থাকিতাম, তখন কাজকর্ম্ম করিতাম। শেষে তোমার কুন্দকে বিষ খাওয়াইয়া মনের দুঃখ মিটাইলাম; তাহার মৃত্যু দেখিয়া অবধি আমার রোগ বাড়িল। আর লুকাইতে পারিব না—দেখিয়া দেশত্যাগ করিয়া গেলাম। আর আমার অন্ন হইল না—পাগলকে কে অন্ন দিবে? সেই অবধি ভিক্ষা করি—যখন ভাল থাকি, ভিক্ষা করি; যখন রোগ চাপে, তখন গাছতলায় পড়িয়া থাকি। এখন তোমার মরণ নিকট শুনিয়া একবার আহ্লাদ করিয়া তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। আশীর্ব্বাদ করি, নরকেও যেন তোমার স্থান না হয়।”

এই বলিয়া উন্মাদিনী উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। দেবেন্দ্র ভীত হইয়া শয্যার অপর পার্শ্বে গেল। হীরা তখন নাচিতে নাচিতে ঘরের বাহির হইয়া গায়িতে লাগিল,

“স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারং।”

সেই অবধি দেবেন্দ্রের মৃত্যুশয্যা কণ্টকময় হইল। মৃত্যুর অল্প পূর্ব্বেই জ্বরকালীন প্রলাপে দেবেন্দ্র কেবল বলিয়াছিল, “পদপল্লবমুদারং,” “পদপল্লবমুদারং।”
দেবেন্দ্রের মৃত্যুর পর, কত দিন তাহার উদ্যানমধ্যে নিশীথ সময়ে রক্ষকে ভীতচিত্তে শুনিয়াছে যে, স্ত্রীলোক গায়িতেছে—

“স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারং।”

আমরা বিষবৃক্ষ সমাপ্ত করিলাম। ভরসা করি, ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে।

চন্দ্রশেখর

উপক্রমণিকা

প্রথম পরিচ্ছেদ : বালক বালিকা

ভাগীরথীতীরে, আম্রকাননে বসিয়া একটি বাক ভাগীরথীর সান্ধ্য জলকল্লোল শ্রবণ করিতেছিল। তাহার পদতলে, নবদূর্ব্বাশয্যায় শয়ন করিয়া, একটি ক্ষুদ্র বালিকা, নীরবে তাহার মুখপানে চাহিয়াছিল—চাহিয়া, চাহিয়া, চাহিয়া, আকাশ নদী বৃক্ষ দেখিয়া, আবার সেই মুখপানে চাহিয়া রহিল। বালকের নাম প্রতাপ—বালিকার নাম শৈবলিনী। শৈবলিনী তখন সাত আট বৎসরের বালিকা—প্রতাপ কিশোরবয়স্ক।

মাথার উপরে, শব্দতরঙ্গে আকাশমণ্ডল ভাসাইয়া, পাপিয়া ডাকিয়া গেল। শৈবলিনী, তাহার অনুকরণ করিয়া, গঙ্গাকূলবিরাজী আম্রকানন কম্পিত করিতে লাগিল। গঙ্গার তর তর রব সে ব্যঙ্গ সঙ্গীত সঙ্গে মিলাইয়া গেল।

বালিকা, ক্ষুদ্র করপল্লবে, তদ্বৎ সুকুমার বন্য কুসুম চয়ন করিয়া মালা গাঁথিয়া, বালকের গলায় পরাইল; আবার খুলিয়া লইয়া আপন কবরীতে পরাইল, আবার খুলিয়া বালকের গলায় পরাইল। স্থির হইল না—কে মালা পরিবে; নিকটে হৃষ্টা পুষ্টা একটি গাই চরিতেছে দেখিয়া শৈবলিনী বিবাদের মালা তাহার শৃঙ্গে পরাইয়া আসিল; তখন বিবাদ মিটিল। এইরূপ ইহাদের সর্ব্বদা হইত। তখন বা মালার বিনিময়ে, বালক নীড় হইতে পক্ষিশাবক পাড়িয়া দিত, আম্রের সময়ে সুপক্ব আম্র পাড়িয়া দিত।

সন্ধ্যার কোমল আকাশে তারা উঠিলে, উভয়ে তারা গণিতে বসিল। কে আগে দেখিয়াছে? কোন্‌টি আগে উঠিয়াছে? তুমি কয়টা দেখিতে পাইতেছ? চারিটা? আমি পাঁচটা দেখিতেছি। ঐ একটা, ঐ একটা, ঐ একটা, ঐ একটা, ঐ একটা। মিথ্যা কথা। শৈবলিনী তিনটা বৈ দেখিতেছে না।

নৌকা গণ। কয়খান নৌকা যাইতেছে বল দেখি? ষোলখানা? বাজি রাখ, আঠারখানা। শৈবলিনী গণিতে জানিত না, একবার গণিয়া নয়খানা হইল, আর একবার গণিয়া একুশখানা হইল। তার পর গণনা ছাড়িয়া, উভয়ে একাগ্রচিত্তে একখানি নৌকার প্রতি দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখিল। নৌকায় কে আছে—কোথা যাইবে—কোথা হইতে আসিল? দাঁড়ের জলে কেমন সোণা জ্বলিতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ডুবিল বা কে, উঠিল বা কে

এইরূপে ভালবাসা জন্মিল। প্রণয় বলিতে হয় বল, না বলিতে হয়, না বল। ষোল বৎসরের নায়ক—আট বৎসরের নায়িকা। বালকের ন্যায় কেহ ভালবাসিতে জানে না।

বাল্যকালের ভালাবাসায় বুঝি কিছু অভিসম্পাত আছে। যাহাদের বাল্যকালে ভালবাসিয়াছ, তাহাদের কয় জনের সঙ্গে যৌবনে দেখা সাক্ষাৎ হয়? কয় জন বাঁচিয়া থাকে? কয় জন ভালবাসার যোগ্য থাকে? বার্দ্ধক্যে বাল্যপ্রণয়ের স্মৃতিমাত্র থাকে, আর সকল বিলুপ্ত হয়। কিন্তু সেই স্মৃতি কত মধুর!

বালকমাত্রেই কোন সময়ে না কোন সময়ে অনুভূত করিয়াছে যে, ঐ বালিকার মুখমণ্ডল অতি মধুর। উহার চক্ষে কোন বোধাতীত গুণ আছে। খেলা ছাড়িয়া কতবার তাহার মুখপানে চাহিয়া দেখিয়াছে—তাহার পথের ধারে, অন্তরালে দাঁড়াইয়া কত বার তাহাকে দেখিয়াছে। কখন বুঝিতে পারে নাই, অথচ ভালবাসিয়াছে। তাহার পর সেই মধুর মুখ—সেই সরল কটাক্ষ—কোথায় কালপ্রভাবে ভাসিয়া গিয়াছে। তাহার জন্য পৃথিবী খুঁজিয়া দেখি—কেবল স্মৃতি মাত্র আছে। বাল্যপ্রণয়ে কোন অভিসম্পাত আছে।

শৈবলিনী মনে মনে জানিত, প্রতাপের সঙ্গে আমার বিবাহ হইবে। প্রতাপ জানিত, বিবাহ হইবে না। শৈবলিনী প্রতাপের জ্ঞাতিকন্যা। সম্বন্ধ দূর বটে, কিন্তু জ্ঞাতি। শৈবলিনীর এই প্রথম হিসাবে ভুল।

শৈবলিনী দরিদ্রের কন্যা। কেহ ছিল না, কেবল মাতা। তাহাদের কিছু ছিল না, কেবল একখানি কুটীর—আর শৈবলিনীর রূপরাশি। প্রতাপও দরিদ্র।

শৈবলিনী বাড়িতে লাগিল—সৌন্দর্য্যের ষোল কলা পূরিতে লাগিল—কিন্তু বিবাহ হয় না। বিবাহের ব্যয় আছে—কে ব্যয় করে? সে অরণ্যমধ্যে সন্ধান করিয়া কে সে রূপরাশি অমূল্য বলিয়া তুলিয়া লইয়া আসিবে?

পরে শৈবলিনীর জ্ঞাত জন্মিতে লাগিল। বুঝিল যে, প্রতাপ ভিন্ন পৃথিবীতে সুখ নাই। বুঝিল, এ জন্মে প্রতাপকে পাইবার সম্ভাবনা নাই।

দুই জনে পরামর্শ করিতে লাগিল। অনেক দিন ধরিয়া পরামর্শ করিল। গোপনে গোপনে পরামর্শ করে, কেহ জানিতে পারে না। পরামর্শ ঠিক হইল, দুই জনে গঙ্গাস্নানে গেল। গঙ্গায় অনেকে সাঁতার দিতেছিল। প্রতাপ বলিল, "আয় শৈবলিনি! সাঁতার দিই।" দুই জনে সাঁতার দিতে আরম্ভ করিল। সন্তরণে দুই জনেই পটু, তেমন সাঁতদর দিতে গ্রামের কোন ছেলে পারিত না। বর্ষাকালে—কূলে কূলে গঙ্গার জল—জল দুলিয়া দুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া, ছুটিয়া ছুটিয়া যাইতেছে। দুইজনে সেই জলরাশি ভিন্ন করিয়া, মথিত করিয়া, উৎক্ষিপ্ত করিয়া, সাঁতার দিয়া চলিল। ফেনচক্রমধ্যে, সুন্দর নবীন বপুর্দ্বয়, রজতাঙ্গুরীয়মধ্যে রত্নযুগলের ন্যায় শোভিতে লাগিল।

সাঁতার দিতে দিতে ইহারা অনেক দূর গেল দেখিয়া ঘাটে যাহারা ছিল, তাহারা ডাকিয়া ফিরিতে বলিল। তাহারা শুনিল না—চলিল। আবার সকলে ডাকিল—তিরস্কার করিল—গালি দিল—দুই জনের কেহ শুনিল না—চলিল। অনেক দূরে গিয়া প্রতাপ বলিল, "শৈবলিনি, এই আমাদের বিয়ে।"

শৈবলিনী বলিল, "আর কেন—এইখানেই।"

প্রতাপ ডুবিল।

শৈবলিনী ডুবিল না। সেই সময়ে শৈবলিনীর ভয় হইল। মনে ভাবিল—কেন মরিব? প্রতাপ আমার কে? আমার ভয় করে, আমি মরিতে পারিব না। শৈবলিনী ডুবিল না—ফিরিল। সন্তরণ করিয়া কূলে ফিরিয়া আসিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বর মিলিল

যেখানে প্রতাপ ডুবিয়াছিল, তাহার অনতিদূরে একখানি পান্‌সি বাহিয়া যাইতেছিল, নৌকারোহী এক জন দেখিল—প্রতাপ ডুবিল। সে লাফ দিয়া জলে পড়িল। নৌকারোহী—চন্দ্রশেখর শর্ম্মা।

চন্দ্রশেখর সন্তরণ করিয়া, প্রতাপকে ধরিয়া নৌকায় উঠাইলেন। তাহাকে নৌকায় লইয়া তীরে নৌকা লাগাইলেন। সঙ্গে করিয়া প্রতাপকে তার গৃহে রাখিতে গেলেন।

প্রতাপের মাতা ছাড়িল ন। চন্দ্রশেখরের পদপ্রান্তে পতিত হইয়া, সে দিন তাঁহাকে আতিথ্য স্বীকার করাইল। চন্দ্রশেখর ভিতরের কথা কিছু জানিলেন না।

শৈবলিনী আর প্রতাপকে মুখ দেখাইল না। কিন্তু চন্দ্রশেখর তাহাকে দেখিলেন—দেখিয়া বিমুগ্ধ হইলেন।

চন্দ্রশেখর তখন নিজে একটু বিপদ্গ্রস্ত। তিনি বত্রিশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছিলেন। তিনি গৃহস্থ, অথচ সংসারী নহেন। এ পর্য্যন্ত দারপরিগ্রহ করেন নাই, দারপরিগ্রহে জ্ঞানোপার্জ্জনের বিঘ্ন ঘটে বলিয়া তাহাতে নিতান্ত নিরুৎসাহী ছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি বৎসরাধিক কাল গত হইল, তাঁহার মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল। তাহাতে দারপরিগ্রহ না করাই জ্ঞানার্জ্জনের বিঘ্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। প্রথমতঃ, স্বহস্তে পাক করিতে হয়, তাহাতে অনেক সময় যায়; অধ্যয়ন অধ্যাপনার বিঘ্ন ঘটে। দ্বিতীয়তঃ, দেবসেবা আছে, ঘরে শালগ্রাম আছেন। তৎসম্বন্ধীয় কার্য্য স্বহস্তে করিতে হয়, তাহাতে কালাপহৃত হয়—দেবতার সেবার সুশৃঙ্খলা ঘটে না—গৃহধর্ম্মের বিশৃঙ্খলা ঘটে—এমন কি, সকল দিন আহারের ব্যবস্থা হইয়া উঠে না। পুস্তকাদি হারাইয়া যায়, খুঁজিয়া পান না। প্রাপ্ত অর্থ কোথায় রাখেন, কাহাকে দেন, মনে থাকে না। খরচ নাই, অথচ অর্থে কুলায় না। চন্দ্রশেখর ভাবিলেন, বিবাহ করিলে কোন কোন দিকে সুবিধা হইতে পারে।

কিন্তু চন্দ্রশেখর স্থির করিলেন, যদি বিবাহ করি, তবে সুন্দরী বিবাহ করা হইবে না। কেন না, সুন্দরীর দ্বারা মন মুগ্ধ হইবার সম্ভাবনা। সংসার-বন্ধনে মুগ্ধ হওয়া হইবে না।

মনের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন শৈবলিনীর সঙ্গে চন্দ্রশেখরের সক্ষাৎ হইল। শৈবলিনীকে দেখিয়া সংযমীর ব্রত ভঙ্গ হইল। ভাবিয়া, চিন্তিয়া কিছু ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে চন্দ্রশেখর আপনি ঘটক হইয়া শৈবলিনীকে বিবাহ করিলেন। সৌন্দর্য্যের মোহে কে না মুগ্ধ হয়?

এই বিবাহের আট বৎসর পরে এই আখ্যায়িকা আরম্ভ হইতেছে।

প্রথম খণ্ড

পাপীয়সী

প্রথম পরিচ্ছেদ : দলনী বেগম

সুবে বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার অধিপতি নবাব আলিজা মীরকাসেম খাঁ মুঙ্গেরের দুর্গে বসতি করেন। দুর্গমধ্যে, অন্তঃপুরে, রঙ্গমহলে, এক স্থানে বড় শোভা। রাত্রির প্রথম প্রহর এখনও অতীত হয় নাই। প্রকোষ্ঠমধ্যে, সুরঞ্জিত হর্ম্ম্যতলে, সুকোমল গালিচা পাতা। রজতদীপে গন্ধ তৈলে জ্বালিত আলোক জ্বলিতেছে। সুগন্ধ কুসুমদামের ঘ্রাণে গৃহ পরিপূরিত হইয়াছে। কিঙ্খাবের বালিশে একটি ক্ষুদ্র মস্তক বিন্যস্ত করিয়া একটি ক্ষুদ্রকায়া বালিকাকৃতি যুবতী শয়ন করিয়া গুলেস্তাঁ পড়িবার জন্য যত্ন পাইতেছে। যুবতী সপ্তদশবর্ষীয়া, কিন্তু খর্ব্বাকৃতা, বালিকার ন্যায় সুকুমার। গুলেস্তাঁ পড়িতেছে, এক একবার উঠিয়া চাহিয়া দেখিতেছে, এবং আপন মনে কতই কি বলিতেছে। কখন বলিতেছে, "এখনও এলেন না কেন?" আবার বলিতেছে, "কেন আসিবেন? হাজার দাসীর মধ্যে আমি এক জন দাসীমাত্র, আমার জন্য এত দূর আসিবেন কেন?" বালিকা আবার গুলেস্তাঁ পড়িতে প্রবৃত্ত হইল। আবার অল্প দূর পড়িয়াই বলিল, "ভাল লাগে না। ভাল, নাই আসুন, আমাকে স্মরণ করিলেই ত আমি যাই। তা আমাকে মনে পড়িবে কেন? আমি হাজার দাসীর মধ্যে এক জন বৈ ত নই।" আবার গুলেস্তাঁ পড়িতে আরম্ভ করিল, আবার পুস্তক ফেলিল, বলিল, "ভাল, ঈশ্বর কেন এমন করেন? এক জন কেন আর এক জনের পথ চেয়ে পড়িয়া থাকে? যদি তাই ঈশ্বরের ইচ্ছা, তবে যে যাকে পায়, সে তাকেই চায় না কেন? যাকে না পায়, তাকে চায় কেন? আমি লতা হইয়া শালবৃক্ষে উঠিতে চাই কেন?" তখন যুবতী পুস্তক ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিল। নির্দ্দোষগঠন ক্ষুদ্র মস্তকে লম্বিত ভুজঙ্গরাশি-তুল্য নিবিড় কুঞ্চিত কেশভার দুলিল—স্বর্ণরচিত সুগন্ধ-বিকীর্ণকারী উজ্জ্বল উত্তরীয় দুলিল—তাহার অঙ্গসঞ্চালন মাত্র গৃহমধ্যে যেন রূপের তরঙ্গ উঠিল। অগাধ সলিলে যেমন চাঞ্চল্য মাত্রে তরঙ্গ উঠে, তেমনি তরঙ্গ উঠিল।

তখন, সুন্দরী এক ক্ষুদ্র বীণা লইয়া তাহাতে ঝঙ্কার দিল এবং ধীরে ধীরে, অতি মৃদুস্বরে গীত আরম্ভ করিল—যেন শ্রোতার ভয়ে ভীতা হইয়া গায়িতেছে। এমত সময়ে, নিকটস্থ প্রহরীর অভিবাদন-শব্দ এবং বাহকদিগের পদধ্বনি তাহার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। বালিকা চমকিয়া উঠিয়া, ব্যস্ত হইয়া দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, নবাবের তাঞ্জাম। নবাব মীরকাসেম আলি খাঁ তাঞ্জাম হইতে অবরতণপূর্ব্বক, এই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

নবাব আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "দলনী বিবি, কি গীত গায়িতেছিলে?" যুবতীর নাম, বোধ হয়, দৌলতউন্নেসা। নবাব তাহাকে সংক্ষেপার্থ "দলনী" বলিতেন। এজন্য পৌরজন সকলেই "দলনী বেগম" বা "দলনী বিবি" বলিত।

দলনী লজ্জাবনতমুখী হইয়া রহিল। দলনীর দুর্ভাগ্যক্রমে নবাব বলিলেন, "তুমি যাহা গায়িতেছিলে, গাও—আমি শুনিব।"

তখন মহাগোলযোগ বাধিল। তখন বীণার তার অবাধ্য হইল—কিছুতেই সুর বাঁধে না। বীণা ফেলিয়া দলনী বেহালা লইল, বেহালাও বেসুরা বলিতে লাগিল, বোধ হইল। নবাব বলিলেন, "হইয়াছে, তুমি উহার সঙ্গে গাও।" তাহাতে দলনীর মনে হইল যেন, নবাব মনে করিয়াছেন, দলনীর সুরবোধ নাই। তার পর,—তার পর, দলনীর মুখ ফুটিল না! দলনী মুখ ফুটাইতে কত চেষ্টা করিল, কিছুতেই মুখ কথা শুনিল না—কিছুতেই ফুটিল না! মুখ ফোটে ফোটে, ফোটে না। মেঘাচ্ছন্ন দিনে স্থলকমলিনীর ন্যায়, মুখ যেন ফোটে ফোটে, তবু ফোটে না। ভীরুস্বভাব কবির, কবিতা-কুসুমের ন্যায়, মুখ যেন ফোটে ফোটে, তবু ফোটে না। মানিনী স্ত্রীলোকের মানকালীন কণ্ঠাগত প্রণয়সম্বোধনের ন্যায়, ফোটে ফোটে, তবু ফোটে না।

তখন দলনী সহসা বীণা ত্যাগ করিয়া বলিল, "আমি গায়িব না।"

নবাব বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? রাগ না কি?"

দ। কলিকাতার ইংরেজেরা যে বাজনা বাজাইয়া গীত গায়, তাহাই একটি আনাইয়া দেন, তবেই আপনার সমুখে পুনর্ব্বার গীত গায়িব, নহিলে আর গায়িব না।

মীরকাসেম হাসিয়া বলিলেন, "যদি সে পথে কাঁটা না পড়ে, তবে অবশ্য দিব।"

দ। কাঁটা পড়িবে কেন?

নবাব দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "বুঝি তাহাদিগের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয়। কেন, তুমি সে সকল কথা শুন নাই?"

"শুনিয়াছি" বলিয়া দলনী নীরব হইল। মীরকাসেম জিজ্ঞাসা করিলেন, "দলনী বিবি, অন্যমনা হইয়া কি ভাবিতেছ?"

দলনী বলিল, "আপনি এক দিন বলিয়াছিলেন যে, যে ইংরেজদিগের সঙ্গে বিবাদ করিবে, সেই হারিবে—তবে কেন আপনি তাহাদিগের সঙ্গে বিবাদ করিতে চাহেন?—আমি বালিকা, দাসী, এ সকল কথা আমার বলা নিতান্ত অন্যায়, কিন্তু বলিবার একটি অধিকার আছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ভালবাসেন।"

নবাব বলিলেন, "সে কথা সত্য দলনী,—আমি তোমাকে ভালবাসি। তোমাকে যেমন ভালবাসি, আমি কখন স্ত্রীজাতিকে এরূপ ভালবাসি নাই, বা বাসিব বলিয়া মনে করি নাই।"

দলনীর শরীর কণ্টকিত হইল। দলনী অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিল—তাহার চক্ষে জল পড়িল। চক্ষের জল মুছিয়া বলিল, "যদি জানেন, যে ইংরেজের বিরোধী হইবে, সেই হারিবে, তবে কেন তাহাদিগের সঙ্গে বিবাদ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন?"

মীরকাসেম কিঞ্চিৎ মৃদুতরস্বরে কহিলেন, "আমার আর উপায় নাই। তুমি নিতান্ত আমারই, এই জন্য তোমার সাক্ষাতে বলিতেছি—আমি নিশ্চিত জানি, এ বিবাদে আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইব, হয়ত প্রাণে নষ্ট হইব। তবে কেন যুদ্ধ করিতে চাই? ইংরেজরা যে আচরণ করিতেছেন, তাহাতে তাঁহারাই রাজা, আমি রাজা নই। যে রাজ্যে আমি রাজা নই, সে রাজ্যে আমার প্রয়োজন? কেবল তাহাই নহে। তাঁহারা বলেন, 'রাজা আমরা, কিন্তু প্রজাপীড়নের ভার তোমার উপর। তুমি আমাদিগের হইয়া প্রজাপীড়ন কর।' কেন আমি তাহা করিব? যদি প্রজার হিতার্থ রাজ্য করিতে না পারিলাম, তবে সে রাজ্য ত্যাগ করিব—অনর্থক কেন পাপ ও কলঙ্কের ভাগী হইব? আমি সেরাজউদ্দৌলা নহি—বা মীরজাফরও নহি।"

দলনী মনে মনে বাঙ্গালার অধীশ্বরের শত শত প্রশংসা করিল। বলিল, "প্রাণেশ্বর! আপনি যাহা বলিলেন, তাহাতে আমি কি বলিব? কিন্তু আমার একটি ভিক্ষা আছে। আপনি স্বয়ং যুদ্ধে যাইবেন না।"

মীরকা। এ বিষয়ে কি বাঙ্গালার নবাবের কর্ত্তব্য যে, স্ত্রীলোকের পরামর্শ শুনে? না বালিকার কর্ত্তব্য যে, এ বিষয়ে পরামর্শ দেয়?

দলনী অপ্রতিভ হইল, ক্ষুণ্ন হইল। বলিল, "আমি না বুঝিয়া বলিয়াছি, অপরাধ মার্জ্জনা করুন। স্ত্রীলোকের মন সহজে বুঝে না বলিয়াই এ সকল কথা বলিয়াছি। কিন্তু আর একটি ভিক্ষা চাই।"

"কি?"

"আপনি আমাকে যুদ্ধে সঙ্গে লইয়া যাইবেন?"

"কেন, তুমি যুদ্ধ করিবে না কি? বল, গুর্‌গণ খাঁকে বরতরফ করিয়া তোমায় বাহাল করি!"

দলনী আবার অপ্রতিভ হইল, কথা কহিতে পারিল না। মীরকাসেম তখন সস্নেহভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন যাইতে যাও?"

"আপনার সঙ্গে থাকিব বলিয়া।" মীরকাসেম অস্বীকৃত হইলেন। কিছুতেই সম্মত হইলেন না।

দলনী তখন ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "জাঁহাপনা! আপনি গণিতে জানেন; বলুন দেখি, আমি যুদ্ধের সময় কোথায় থাকিব?"

মীরকাসেম হাসিয়া বলিলেন, "তবে কলমদান দাও।"

দলনীর আজ্ঞাক্রমে পরিচারিকা সুবর্ণনির্ম্মিত কলমদান আনিয়া দিল।

মীরকাসেম হিন্দুদিগের নিকট জ্যোতিষ শিক্ষা করিয়াছিলেন। শিক্ষামত অঙ্গ পাতিয়া দেখিলেন। কিছুক্ষণ পরে, কাগজ দূরে নিক্ষেপ করিয়া, বিমর্ষ হইয়া বসিলেন। দলনী জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেখিলেন?"

মীরকাসেম বলিলেন, "যাহা দেখিলাম, তাহা অত্যন্ত বিস্ময়কর। তুমি শুনিও না।"

নবাব তখনই বাহিরে আসিয়া মীরমুন্‌সীকে ডাকাইয়া আজ্ঞা দিলেন, "মুরশিদাবাদে একজন হিন্দু কর্ম্মচারীকে পরওয়ানা দাও যে, মুরশিদাবাদের অনতিদূরে বেদগ্রাম নামে স্থান আছে—তথায় চন্দ্রশেখর নামে এক বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ বাস করে—সে আমাকে গণনা শিখাইয়াছিল—তাহাকে ডাকাইয়া গণাইতে হইবে যে, যদি সম্প্রতি ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ হয়, তবে যুদ্ধকালে এবং যুদ্ধ-পরে, দলনী বেগম কোথায় থাকিবে?"

মীরমুন্‌সী তাহাই করিল। চন্দ্রশেখরকে মুরশিদাবাদে আনিতে লোক পাঠাইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ভীমা পুষ্করিণী

ভীমা নামে বৃহৎ পুষ্করিণীর চারি ধারে, ঘন তালগাছের সারি। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের হেমাভ রৌদ্র পুষ্করিণীর কাল জলে পড়িয়াছে; কাল জলে রৌদ্রের সঙ্গে, তালগাছের কাল ছায়া সকল অঙ্কিত হইয়াছে। একটি ঘাটের পাশে, কয়েকটি লতামণ্ডিত ক্ষুদ্র বৃক্ষ, লতায় লতায় একত্র গ্রথিত হইয়া, জল পর্য্যন্ত শাখা লম্বিত করিয়া দিয়া, জলবিহারিণী কুলকামিনীগণকে আবৃত করিয়া রাখিত। সেই আবৃত অল্পান্ধকারমধ্যে শৈবলিনী এবং সুন্দরী ধাতুকলসীহস্তে জলের সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছিল।

যুবতীর সঙ্গে জলের ক্রীড়া কি? তাহা আমরা বুঝি না, আমরা জল নই। যিনি কখন রূপ দেখিয়া গলিয়া জল হইয়াছে, তিনিই বলিতে পারিবেন। তিনিই বলিতে পারিবেন, কেমন করিয়া জল কলসীতাড়নে তরঙ্গ তুলিয়া, বাহুবিলম্বিত অলঙ্কার শিঞ্জিতের তালে, তালে তালে নাচে। হৃদয়োপরে গ্রথিত জলজপুষ্পের মালা দোলাইয়া, সেই তালে তালে নাচে। সন্তরণকুতূহলী ক্ষুদ্র বিহঙ্গমটিকে দোলাইয়া, সেই তালে তালে নাচে। যুবতীকে বেড়িয়া বেড়িয়া তাহার বাহুতে, কণ্ঠে, স্কন্ধে, হৃদয়ে উঁকিঝুঁকি মারিয়া, জল তরঙ্গ তুলিয়া, তালে তালে নাচে। আবার যুবতী কেমন কলসী ভাসাইয়া দিয়া, মৃদুবায়ুর হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়া, চিবুক পর্য্যন্ত জলে ডুবাইয়া, বিম্বাধরে জলস্পৃষ্ট করে, বক্ত্রমধ্যে তাহাকে প্রেরণ করে; সূর্য্যাভিমুখে প্রতিপ্রেরণ করে; জল পতনকালে বিম্বে বিম্বে শত সূর্য্য ধারণ করিয়া যুবতীকে উপহার দেয়। যুবতীর হস্তপদসঞ্চালনে জল ফোয়ারা কাটিয়া নাচিয়া উঠে, জলেরও হিল্লোলে যুবতীর হৃদয় নৃত্য করে। দুই সমান। জল চঞ্চল; এই ভুবনচাঞ্চল্যবিধায়িনীদিগের হৃদয়ও চঞ্চল। জলে দাগ বসে না, যুবতীর হৃদয়ে বসে কি?

পুষ্করিণীর শ্যাম জলে স্বর্ণ রৌদ্র ক্রমে মিলাইয়া মিলাইয়া দেখিতে দেখিতে সব শ্যাম হইল—কেবল তালগাছের অগ্রভাগ স্বর্ণপতাকার ন্যায় জ্বলিতে লাগিল।

সুন্দরী বলিল, "ভাই, সন্ধ্যা হইল, আর এখানে না। চল বাড়ি যাই।"

শৈবলিনী। কেহ নাই, ভাই, চুপি চুপি একটি গান গা না।

সু। দূর হ! পাপ! ঘরে চ!

শৈ। ঘরে যাব না লো সই!

আমার মদনমোহন আসচে ওই।
হায়! যাব না লো সই!

সু। মরণ আর কি? মদনমোহন ত ঘরে বোসে, সেইখানে চল্ না।

শৈ। তাঁরে বল গিয়া, তোমার মদনমোহিনী, ভীমার জল শীতল দেখিয়া ডুবিয়া মরিয়াছে।

সু। নে এখন রঙ্গ রাখ্। রাত হলো—আমি আর দাঁড়াইতে পারি না। আবার আজ ক্ষেমির মা বলছিল, এদিকে একটা গোরা এয়েছে।

শৈ। তাতে তোমার আমার ভয় কি?

সু। আ মলো, তুই বলিস্ কি? ওঠ, নহিলে আমি চলিলাম।

শৈ। আমি উঠবো না—তুই যা।

সুন্দরী রাগ করিয়া কলসী পূর্ণ করিয়া কূলে উঠিল। পূনর্ব্বার শৈবলিনীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "হাঁ লো, সত্য সত্য তুই কি এই সন্ধ্যেবেলা একা পুকুরঘাটে থাকিবি না কি?"

শৈবলিনী কোন উত্তর করিল না; অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল। অঙ্গুলিনির্দ্দেশানুসারে সুন্দরী দেখিল, পুষ্করিণীর অপর পারে, এক তালবৃক্ষতলে, সর্ব্বনাশ! সুন্দরী আর কথা না কহিয়া কক্ষ হইতে কলস ভূমে নিক্ষিপ্ত করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। পিত্তল কলস, গড়াইতে গড়াইতে ঢক ঢক শব্দে উদরস্থ জল উদ্‌গীর্ণ করিতে করিতে, পুনর্ব্বার বাপীজলমধ্যে প্রবেশ করিল।

সুন্দরী তালবৃক্ষতলে একটি ইংরেজ দেখিতে পাইয়াছিল।

ইংরেজকে দেখিয়া শৈবলিনী হেলিল না—দুলিল না—জল হইতে উঠিল না। কেবল বক্ষঃ পর্য্যন্ত জলমধ্যে নিমজ্জন করিয়া আর্দ্র বসনে কবরী সমেত মস্তকের অর্দ্ধভাগ মাত্র আবৃত করিয়া প্রফুল্লরাজীববৎ জলমধ্যে বসিয়া রহিল। মেঘমধ্যে, অচলা সৌদামিনী হাসিল—ভীমার সেই শ্যামতরঙ্গে এই স্বর্ণকমল ফুটিল।

সুন্দরী পলাইয়া গেল, কেহ নাই দেখিয়া ইংরেজ ধীরে ধীরে তালগাছের অন্তরালে অন্তরালে থাকিয়া, ঘাটের নিকটে আসিল।

ইংরেজ, দেখিতে অল্পবয়স্ক বটে। গুম্ফ বা শ্মশ্রু কিছুই ছিল না। কেশ ঈষৎ কৃষবর্ণ; চক্ষুও ইংরেজের পক্ষে কৃষ্ণাভ। পরিচ্ছদের বড় জাঁক জমক, এবং চেন্ অঙ্গুরীয় প্রভৃতি অলঙ্কারের কিছু পারিপাট্য ছিল।

ইংরেজ ধীরে ধীরে ঘাটে আসিয়া, জলের নিকটে আসিয়া, বলিল, "I come again, fair lady."

শৈবলিনী বলিল, "আমি ও ছাই বুঝিতে পারি না।"

"Oh—ay—that nasty gibberish—I must speak it I suppose. হম্ again আয়া হ্যায়।"

শৈব। কেন? যমের বাড়ীর কি এই পথ?

ইংরেজ না বুঝিতে পারিয়া কহিল, "কিয়া বোল্‌তা হ্যায়?"

শৈ। বলি, যম কি তোমায় ভুলিয়া গিয়াছে?

ইংরেজ। যম! John you mean? হম্ জন নহি, হম্ লরেন্স।

শৈ। ভাল, একটা ইংরেজি কথা শিখিলাম, লরেন্স অর্থে বাঁদর।

সেই সন্ধ্যাকালে শৈবলিনীর কাছে লরেন্স ফষ্টর কতকগুলি দেশী গালি খাইয়া স্বস্থানে ফিরিয়া গেল। লরেন্স ফষ্টর, পুষ্করিণীর পাহাড় হইতে অবতরণ করিয়া আম্রবৃক্ষতল হইতে অশ্বমোচন করিয়া, তৎপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক টিবিয়ট নদীর তীরস্থ পর্ব্বতপ্রতিধ্বনি সহিত শ্রুত গীতি স্মরণ করিতে করিতে চলিলেন। এক একবার মনে হইতে লাগিল, “সেই শীতল দেশের তুষাররাশির সদৃশ যে মেরি ফষ্টরের প্রণয়ে বাল্যকালে অভিভূত হইয়াছিলাম, এখন সে স্বপ্নের মত। দেশভেদে কি রুচিভেদ জন্মে? তুষারময়ী মেরি কি শিখারূপিণী উষ্ণ দেশের সুন্দরীর তুলনীয়া? বলিতে পারি না।”

ফষ্টর চলিয়া গেলে শৈবলিনী ধীরে ধীরে জলকলস পূর্ণ করিয়া কুম্ভকক্ষে বসন্তপবনারূঢ় মেঘবৎ মন্দপদে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। যথাস্থানে জল রাখিয়া শয্যাগৃহে প্রবেশ করিল।

তথায় শৈবলিনীর স্বামী চন্দ্রশেখর কম্বলাসনে উপবেশন করিয়া, নামাবলীতে কটিদেশের সহিত উভয় জানু বন্ধন করিয়া মৃৎপ্রদীপ সম্মুখে, তুলটে হাতে-লেখা পুতি পড়িতেছিলেন। আমরা যখনকার কথা বলিতেছি, তাহার পর এক শত দশ বৎসর অতীত হইয়াছে।

চন্দ্রশেখরের বয়ঃক্রম প্রায় চত্বারিংশৎ বর্ষ। তাঁহার আকার দীর্ঘ; তদুপযোগী বলিষ্ঠ গঠন। মস্তক বৃহৎ, ললাট প্রশস্ত, তদুপরি চন্দন-রেখা।

শৈবলিনী গৃহপ্রবেশকালে মনে মনে ভাবিতেছিলেন, ‘যখন ইনি জিজ্ঞাসা করিবেন, কেন এত রাত্র হইল, তখন কি বলিব?’ কিন্তু শৈবলিনী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, চন্দ্রশেখর কিছু বলিলেন না। তখন তিনি ব্রহ্মসূত্রের সূত্রবিশেষের অর্থসংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন। শৈবলিনী হাসিয়া উঠিল।

তখন চন্দ্রশেখর চাহিয়া দেখিলেন, বলিলেন, “আজি এত অসময়ে বিদ্যুৎ কেন?”

শৈবলিনী বলিল, “আমি ভাবিতেছি, না জানি আমায় তুমি কত বকিবে!”

চন্দ্র। কেন বকিব?

শৈ। আমার পুকুরঘাট হইতে আসিতে বিলম্ব হইয়াছে, তাই।

চন্দ্র। বটেও ত—এখন এলে না কি? বিলম্ব হইল কেন?

শৈ। একটা গোরা আসিয়াছিল। তা, সুন্দরী ঠাকুরঝি তখন ডাঙ্গায় ছিল, আমায় ফেলিয়া দৌড়িয়া পলাইয়া আসিল। আমি জলে ছিলাম, ভয়ে উঠিতে পারিলাম না। ভয়ে একগলা জলে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। সেটা গেলে তবে উঠিয়া আসিলাম।

চন্দ্রশেখর অন্যমনে বলিলেন, “আর আসিও না” এই বলিয়া আবার শাঙ্কর ভাষ্যে মনোনিবেশ করিলেন।

রাত্রি অত্যন্ত গভীরা হইল। তখনও চন্দ্রশেখর, প্রমা, মায়া, স্ফোট, অপৌরুষেয়ত্ব ইত্যাদি তর্কে নিবিষ্ট। শৈবলিনী প্রথামত স্বামীর অন্ন ব্যঞ্জন তাঁহার নিকট রক্ষা করিয়া, আপনি আহারাদি করিয়া পাশ্বর্স্থ শয্যোপরি নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন। এ বিষয়ে চন্দ্রশেখরের অনুমতি ছিল—অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তিনি বিদ্যালোচনা করিতেন, অল্প রাত্রে আহার করিয়া শয়ন করিতে পারিতেন না।

সহসা সৌধোপরি হইতে পেচকের গম্ভীর কণ্ঠ শ্রুত হইল। তখন চন্দ্রশেখর অনেক রাত্রি হইয়াছে বুঝিয়া, পুতি বাঁধিলেন। সে সকল যথাস্থানে রক্ষা করিয়া, আলস্যবশতঃ দণ্ডায়মান হইলেন। মুক্ত বাতায়নপথে কৌমুদীপ্রফুল্ল প্রকৃতির শোভার প্রতি দৃষ্টি পড়িল। বাতায়নপথে সমাগত চন্দ্রকিরণ সুপ্ত সুন্দরী শৈবলিনীর মুখে নিপতিত হইয়াছে। চন্দ্রশেখর প্রফুল্লচিত্তে দেখিলেন, তাঁহার গৃহসরোবরে চন্দ্রের আলোতে পদ্ম ফুটিয়াছে! তিনি দাঁড়াইয়া, দাঁড়াইয়া, দাঁড়াইয়া, বহুক্ষণ ধরিয়া প্রীতিবিস্ফারিত নেত্রে, শৈবলিনীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, চিত্রিত ধনুঃখণ্ডবৎ নিবিড়কৃষ্ণ ভ্রূযুগতলে, মুদ্রিত

পদ্মকোরকসদৃশ, লোচন-পদ্ম দুটি মুদিয়া রহিয়াছে;—সেই প্রশস্ত নয়নপল্লবে, সুকোমলা সমগামিনী রেখা দেখিলেন। দেখিলেন, ক্ষুদ্র কোমল করপল্লব নিদ্রাবেশে কপোলে ন্যস্ত হইয়াছে—যেন কুসুমরাশির উপরে কে কুসুমরাশি ঢালিয়া রাখিয়াছে। মুখমণ্ডলে করসংস্থাপনের কারণে, সুকুমার রসপূর্ণ তাম্বলরাগরক্ত ওষ্ঠাধর ঈষদ্ভিন্ন করিয়া, মুক্তাসদৃশ দন্তশ্রেণী কিঞ্চিন্মাত্র দেখা দিতেছে। একবার যেন, কি সুখ-স্বপ্ন দেখিয়া সুপ্তা শৈবলিনী ঈষৎ হাসিল—যেন একবার জ্যোৎস্নার উপর বিদ্যুৎ হইল। আবার সেই মুখমণ্ডল পুর্ব্ববৎ সুষুপ্তিসুস্থির হইল। সেই বিলাস-চাঞ্চল্য-শূন্য, সুষুপ্তিসুস্থির বিংশতিবর্ষীয়া যুবতীর প্রফুল্ল মুখমণ্ডল দেখিয়া চন্দ্রশেখরের চক্ষে অশ্রু বহিল।

চন্দ্রশেখর, শৈবলিনীর সুষুপ্তিসুস্থির মুখমণ্ডলের সুন্দর কান্তি দেখিয়া অশ্রুমোচন করিলেন। ভাবিলেন, “হায়! কেন আমি ইহাকে বিবাহ করিয়াছি। এ কুসুম রাজমুকুটে শোভা পাইত—শাস্ত্রানুশীলনে ব্যস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কুটীরে এ রত্ন আনিলাম কেন? আনিয়া আমি সুখী হইয়াছি, সন্দেহ নাই। কিন্তু শৈবলিনীর তাহাতে কি সুখ? আমার যে বয়স, তাহাতে আমার প্রতি শৈবলিনীর অনুরাগ অসম্ভব—অথবা আমার প্রণয়ে তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষা নিবারণের সম্ভাবনা নাই। বিশেষ, আমি ত সর্ব্বদা আমার গ্রন্থ লইয়া বিব্রত; আমি শৈবলিনীর সুখ কখন ভাবি? আমার গ্রন্থগুলি তুলিয়া পাড়িয়া, এমন নবযুবতীর কি সুখ? আমি নিতান্ত আত্মসুখপরায়ণ—সেই জন্যই ইহাকে বিবাহ করিতে প্রবৃত্তি হইয়াছিল। এক্ষণে আমি কি করিব? এই ক্লেশসঞ্চিত পুস্তকরাশি জলে ফেলিয়া দিয়া আসিয়া রমণীমুখপদ্ম কি এ জন্মের সারভূত করিব? ছি, ছি, তাহা পারিব না। তবে কি এই নিরপরাধিনী শৈবলিনী আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে? এই সুকুমার কুসুমকে কি অতৃপ্ত যৌবনতাপে দগ্ধ করিবার জন্যই বৃন্তচ্যুত করিয়াছিলাম?”

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে চন্দ্রশেখর আহার করিতে ভুলিয়া গেলেন। পরদিন প্রাতে মীর মুন্‌সীর নিকট হইতে সম্বাদ আসিল, চন্দ্রশেখরকে মুরশিদাবাদ যাইতে হইবে। নবাবের কাজ আছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : লরেন্স ফষ্টর

বেদগ্রামের অতি নিকটে পুরন্দরপুর নামক গ্রামে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রেশমের একটি ক্ষুদ্র কুঠি ছিল। লরেন্স ফষ্টর তথাকার ফ্যাক্টর বা কুঠিয়াল। লরেন্স অল্প বয়সে মেরি ফষ্টরের প্রণয়াকাঙ্ক্ষায় হতাশ্বাস হইয়া, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চাকরি স্বীকার করিয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। এখনকার ইংরেজদিগের ভারতবর্ষে আসিলে যেমন নানাবিধ শারীরিক/ রোগ জন্মে, তখন বাঙ্গালার বাতাসে ইংরেজদিগের অর্থাপহরণ রোগ জন্মিত। ফষ্টর অল্পকালেই সে রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং মেরির প্রতিমা তাঁহার মন হইতে দূর হইল। একদা তিনি প্রয়োজনবশতঃ বেদগ্রামে গিয়াছিলেন—ভীমা পুষ্করিণীর জলে প্রফুল্ল পদ্মস্বরূপা শৈবলিনী তাঁহার নয়ন-পথে পড়িল। শৈবলিনী গোরা দেখিয়া পলাইয়া গেল, কিন্তু ফষ্টর ভাবিতে ভাবিতে কুঠিতে ফিরিয়া গেলেন। ফষ্টর ভাবিয়া ভাবিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, কটা চক্ষের অপেক্ষা কাল চক্ষু ভাল, এবং কটা চুলের অপেক্ষা কাল চুল ভাল। অকস্মাৎ তাঁহার স্মরণ হইল যে, সংসার-সমুদ্রে স্ত্রীলোক তরুণী স্বরূপ— সকলেরই সে আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য—যে সকল ইংরেজ এদেশে আসিয়া পুরোহিতকে ফাঁকি দিয়া, বাঙ্গালি সুন্দরীকে এ সংসার সহায় বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহারা মন্দ করেন না। অনেক বাঙ্গালির মেয়ে, ধনলোভে ইংরেজ ভজিয়াছে,—শৈবলিনী কী ভজিবে না? ফষ্টর কুঠির কারকুন্‌কে সঙ্গে করিয়া আবার বেদগ্রামে আসিয়া বনমধ্যে লুকাইয়া রহিলেন। কারকুন্ শৈবলিনীকে দেখিল—তাহার গৃহ দেখিয়া আসিল।

বাঙ্গালির ছেলে মাত্রেই জুজু নামে ভয় পায়, কিন্তু এক একটি এমন নষ্ট বালক আছে যে, জুজু দেখিতে চাহে। শৈবলিনীর সেই দশা ঘটিল। শৈবলিনী,

প্রথম প্রথম তৎকালের প্রচলিত প্রথানুসারে, ফষ্টরকে দেখিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইত। পরে কেহ তাহাকে বলিল, “ইংরেজেরা মনুষ্য ধরিয়া সদ্য ভোজন করে না—ইংরেজ অতি আশ্চর্য্য জন্তু—একদিন চাহিয়া দেখিও।” শৈবলিনী চাহিয়া দেখিল—দেখিল, ইংরেজ তাহাকে ধরিয়া সদ্য ভোজন করিল না। সেই অবধি শৈবলিনী ফষ্টরকে দেখিয়া পলাইত না—ক্রমে তাঁহার সহিত কথা কহিতেও সাহস করিয়াছিল। তাহাও পাঠক জানেন।

অশুভক্ষণে শৈবলিনী ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। অশুভক্ষণে চন্দ্রশেখর তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। শৈবলিনী যাহা, তাহা ক্রমে বলিব; কিন্তু সে যাই হউক, ফষ্টরের যত্ন বিফল হইল।

পরে অকস্মাৎ কলিকাতা হইতে ফষ্টরের প্রতি আজ্ঞা প্রচার হইল যে, “পুরন্দরপুরের কুঠিতে অন্য ব্যক্তি নিযুক্ত হইয়াছে, তুমি শীঘ্র কলিকাতায় আসিবে। তোমাকে কোন বিশেষ কর্ম্মে নিযুক্ত করা যাইবে।” যিনি কুঠিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তিনি এই আজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ফষ্টরকে সদ্যই কলিকাতা যাত্রা করিতে হইল।

শৈবলিনীর রূপ ফষ্টরের চিত্ত অধিকার করিয়াছিল। দেখিলেন, শৈবলিনীর আশা ত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। এই সময়ে যে সকল ইংরেজ বাঙ্গালায় বাস করিতেন, তাঁহারা দুইটি মাত্র কার্য্যে অক্ষম ছিলেন। তাঁহারা লোভসম্বরণে অক্ষম, এবং পরাভব স্বীকারে অক্ষম। তাঁহারা কখনই স্বীকার করিতেন না যে, এ কার্য্য পারিলাম না—নিরস্ত হওয়াই ভাল। এবং তাঁহারা কখনই স্বীকার করিতেন না যে, কার্য্যে অধর্ম্ম আছে, অতএব অকর্ত্তব্য। যাঁহারা ভারতবর্ষে প্রথম ব্রিটেনীয় রাজ্য সংস্থাপন করেন, তাঁহাদিগের ন্যায় ক্ষমতাশালী এবং স্বেচ্ছাচারী মনুষ্য সম্প্রদায় ভূমণ্ডলে কখন দেখা দেয় নাই।

লরেন্স ফষ্টর সেই প্রকৃতির লোক। তিনি লোভ সম্বরণ করিলেন না—বঙ্গীয় ইংরেজদিগের মধ্যে তখন ধর্ম্মশব্দ লুপ্ত হইয়াছিল। তিনি সাধ্যাসাধ্যও বিবেচনা করিলেন না। মনে মনে বলিলেন, “Now or never!”

এই ভাবিয়া, যে দিন কলিকাতায় যাত্রা করিবেন, তাহার পূর্ব্বরাত্রে সন্ধ্যার পর শিবিকা, বাহক, কুঠির কয়জন বরকন্দাজ লইয়া সশস্ত্র বেদগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সেই রাত্রে বেদগ্রামবাসীরা সভয়ে শুনিল যে, চন্দ্রশেখরের গৃহে ডাকাইতি হইতেছে। চন্দ্রশেখর সে দিন গৃহে ছিলেন না, মুরশিদাবাদ হইতে রাজকর্ম্মচারীর সাদর নিমন্ত্রণ-পত্র প্রাপ্ত হইয়া তথায় গিয়াছিলেন—অদ্যাপি প্রত্যাগমন করেন নাই। গ্রামবাসীরা চীৎকার, কোলাহল, বন্দুকের শব্দ এবং রোদনধ্বনি শুনিয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল যে, চন্দ্রশেখরের বাড়ী ডাকাইতি হইতেছে—অনেক মশালের আলো। কেহ অগ্রসর হইল না। তাহারা দূরে দাঁড়াইয়া দেখিল যে, বাড়ী লুঠিয়া ডাকাইতেরা একে একে নির্গত হইল। বিস্মিত হইয়া দেখিল যে, কয়েক জন বাহকে একখানি শিবিকা স্কন্ধে করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইল। শিবিকার দ্বার রুদ্ধ—সঙ্গে পুরন্দরপুরের কুঠির সাহেব! দেখিয়া সকলে সভয়ে নিস্তব্ধ হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

দস্যুগণ চলিয়া গেলে প্রতিবাসীরা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, দেখিল, দ্রব্য সামগ্রী বড় অধিক অপহৃত হয় নাই—অধিকাংশই আছে। কিন্তু শৈবলিনী নাই। কেহ কেহ বলিল, “সে কোথায় লুকাইয়াছে, এখনই আসিবে। প্রাচীনেরা বলিল, ‘আর আসিবে না—আসিলেও চন্দ্রশেখর তাহাকে আর ঘরে লইবে না। যে পাল্‌কী দেখিলে, ঐ পাল্‌কীর মধ্যে সে গিয়াছে।”

যাহারা প্রত্যাশা করিতেছিল যে, শৈবলিনী আবার ফিরিয়া আসিবে, তাহারা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, শেষে বসিল। বসিয়া বসিয়া, নিদ্রায় ঢুলিতে লাগিল। ঢুলিয়া ঢুলিয়া, বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেল। শৈবলিনী আসিল না!

সুন্দরী নামে যে যুবতীকে আমরা প্রথম পরিচিতা করিয়াছি, সেই সকলের শেষে উঠিয়া গেল। সুন্দরী চন্দ্রশেখরের প্রতিবাসিনীর কন্যা, সম্বন্ধে তাঁহার

ভগিনী, শৈবলিনীর সখী। আবার তাহার কথা উল্লেখ করিতে হইবে বলিয়া এ স্থলে এ পরিচয় দিলাম।

সুন্দরী বসিয়া বসিয়া, প্রভাতে গৃহে গেল। গৃহে গিয়া কাঁদিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : নাপিতানী

ফষ্টর স্বয়ং শিবিকাসমভিব্যাহারে লইয়া দূরবর্ত্তিনী ভাগীরথীর তীর পর্য্যন্ত আসিলেন। সেখানে নৌকা সুসজ্জিত ছিল। শৈবলিনীকে নৌকায় তুলিলেন। নৌকায় হিন্দু দাস দাসী এবং প্রহরী নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এখন আবার হিন্দু দাস দাসী কেন?

ফষ্টর নিজে অন্য যানে কলিকাতায় গেলেন। তাঁহাকে শীঘ্র যাইতে হইবে—বড় নৌকায় বাতাস ঠেলিতে ঠেলিতে সপ্তাহে কলিকাতায় যাওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। শৈবলিনীর জন্য স্ত্রীলোকের আরোহণোপযোগী যানের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া তিনি যানান্তরে কলিকাতায় গেলেন। এমত শঙ্কা ছিল না যে, তিনি স্বয়ং শৈবলিনীর নৌকার সঙ্গে না থাকিলে, কেহ নৌকা আক্রমণ করিয়া শৈবলিনীর উদ্ধার করিবে। ইংরেজের নৌকা শুনিলে কেহ নিকটে আসিবে না। শৈবলিনীর নৌকা মুঙ্গেরে যাইতে বলিয়া গেলেন। প্রভাতবাতোত্থিত ক্ষুদ্র তরঙ্গমালার উপর আরোহণ করিয়া শৈবলিনীর সুবিস্তৃতা তরণী উত্তরাভিমুখে চলিল—মৃদুনাদী বীচিশ্রেণী তর তর শব্দে নৌকাতলে প্রহত হইতে লাগিল। তোমরা অন্য শঠ, প্রবঞ্চক, ধূর্ত্তকে যত পার বিশ্বাস করিও, কিন্তু প্রভাতবায়ুকে বিশ্বাস করিও না। প্রভাতবায়ু বড় মধুর;—চোরের মত পা টিপি টিপি আসিয়া, এখানে পদ্মটি, ওখানে যূথিকাদাম, সেখানে সুগন্ধি বকুলের শাখা লইয়া ধীরে ধীরে ক্রীড়া করে—কাহাকে গন্ধ আনিয়া দেয়, কাহারও নৈশ অঙ্গগ্লানি হরণ করে, কাহারও চিন্তাসন্তপ্ত ললাট স্নিগ্ধ করে, যুবতীর অলকরাজি দেখিলে তাহাতে অল্প ফুৎকার দিয়া পলাইয়া যায়। তুমি নৌকারোহী—দেখিতেছ এই ক্রীড়াশীল মধুরপ্রকৃতি প্রভাতবায়ু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালায় নদীকে সুসজ্জিতা করিতেছে; আকাশস্থ দুই একখানা অল্প কাল মেঘকে সরাইয়া রাখিয়া আকাশকে পরিষ্কার করিতেছে, তীরস্থ বৃক্ষগুলিকে মৃদু মৃদু নাচাইতেছে, স্নানাবগাহননিরতা কামিনীগণের সঙ্গে একটু একটু মিষ্ট রহস্য করিতেছে—নৌকার তলে প্রবেশ করিয়া তোমার কাণের কাছে মধুর সংগীত করিতেছে। তুমি মনে করিলে বায়ু বড় ধীরপ্রকৃতি,—বড় গম্ভীরস্বভাব, বড় আড়ম্বরশূন্য—আবার সদানন্দ! সংসারে যদি সকলই এমন হয় ত কি না হয়! দে নৌকা খুলিয়া দে! রৌদ্র উঠিল—তুমি দেখিলে যে বীচিরাজির উপরে রৌদ্র জ্বলিতেছে, সেগুলি পূর্ব্বাপেক্ষা একটু বড় বড় হইয়াছে—রাজহংসগণ তাহার উপর নাচিয়া নাচিয়া চলিতেছে; গাত্রমার্জ্জনে অন্যমনা সুন্দরীদিগের মৃৎকলসী তাহার উপর স্থির থাকিতেছে না, বড় নাচিতেছে; কখন কখন ঢেউগুলা স্পর্দ্ধা করিয়া সুন্দরীদিগের কাঁধে চড়িয়া বসিতেছে; আর যিনি তীরে উঠিয়াছেন, তাঁহার চরণপ্রান্তে আছাড়িয়া পড়িতেছে—মাথা কুটিতেছে—বুঝি বলিতেছে—"দেহি পদপল্লবমুদারং!" নিতান্ত পক্ষে পায়ের একটু অলক্তক-রাগ ধুইয়া লইয়া অঙ্গে মাখিতেছে। ক্রমে দেখিবে, বায়ুর ডাক একটু একটু বাড়িতেছে, আর সে জয়দেবের কবিতার মত কাণে মিলাইয়া যায় না, আর সে ভৈরবী রাগিণীতে কাণের কাছে মৃদু বীণা বাজাইতেছে না। ক্রমে দেখিবে, বায়ুর বড় গর্জ্জন বাড়িল—বড় হুহুঙ্কারের ঘটা; তরঙ্গ সকল হঠাৎ ফুলিয়া উঠিয়া, মাথা নাড়িয়া আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল, অন্ধকার করিল। প্রতিকূল বায়ু নৌকার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল—নৌকার মুখ ধরিয়া জলের উপর আছড়াইতে লাগিল—কখন বা মুখ ফিরাইয়া দিল—তুমি ভাব বুঝিয়া পবনদেবকে প্রণাম করিয়া, নৌকা তীরে রাখিলে।

শৈবলিনীর নৌকার দশা ঠিক এইরূপ ঘটিল। অল্প বেলা হইলেই বায়ু প্রবল হইল। বড় নৌকা, প্রতিকূল বায়ুতে আর চলিল না। রক্ষকেরা ভদ্রহাটির ঘাটে নৌকা রাখিল।

ক্ষণকাল পরে নৌকার কাছে, এক নাপিতানী—আসিল। নাপিতানী সধবা, খাটো রাঙ্গাপোড়া সাড়ীপরা—সাড়ীর রাঙ্গা দেওয়া আঁচলা আছে—হাতে আলতার চুপড়ী। নাপিতানী নৌকার উপর অনেক কাল কাল দাড়ী দেখিয়া ঘোম্‌টা টানিয়া দিয়াছিল। দাড়ীর অধিকারিগণ অবাক্ হইয়া নাপিতানীকে দেখিতেছিল।

একটা চরে শৈবলিনীর পাক হইতেছিল—এখনও হিন্দুয়ানি আছে—একজন ব্রাহ্মণ পাক করিতেছিল। একদিনে কিছু বিবি সাজা যায় না। ফষ্টর জানিতেন যে, শৈবলিনী যদি না পলায়, অথবা প্রাণত্যাগ না করে, তবে সে অবশ্য একদিন টেবিলে বসিয়া যবনের কৃত পাক, উপাদেয় বলিয়া ভোজন করিবে। কিন্তু এখনই তাড়াতাড়ি কি? এখন তাড়াতাড়ি করিলে সকল দিক্ নষ্ট হইবে। এই ভাবিয়া ফষ্টর ভৃত্যদিগের পরামর্শমতে শৈবলিনীর সঙ্গে ব্রাহ্মণ দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ পাক করিতেছিল, নিকটে একজন দাসী দাঁড়াইয়া উদ্যোগ করিয়া দিতেছিল। নাপিতানী সেই দাসীর কাছে গেল, বলিল, "হাঁ গা—তোমরা কোথা থেকে আসচ গা?"

চাকরাণী রাগ করিল—বিশেষ সে ইংরেজের বেতন খায়—বলিল, "তোর তা কি রে মাগী! আমরা হিল্লী, দিল্লী, মক্কা থেকে আসচি।"

নাপিতানী অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "বলি তা নয়, বলি আমরা নাপিত—তোমাদের নৌকায় যদি মেয়ে ছেলে কেহ কামায় তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

চাকরাণী একটু নরম হইল। বলিল, "আচ্ছা জিজ্ঞাসা করিয়া আসি।" এই বলিয়া সে শৈবলিনীকে জিজ্ঞাসা করিতে গেল যে, তিনি আল্‌তা পরিবেন কি না। যে কারণেই হউক, শৈবলিনী অন্যমনা হইবার উপায় চিন্তা করিতেছিলেন, বলিলেন, "আল্‌তা পরিব।" তখন রক্ষকদিগের অনুমতি লইয়া, দাসী নাপিতানীকে নৌকার ভিতর পাঠাইয়া দিল। সে স্বয়ং পূর্ব্বমত পাকশালার নিকট নিযুক্ত রহিল।

নাপিতানী শৈবলিনীকে দেখিয়া আর একটু ঘোম্‌টা টানিয়া দিল। এবং তাঁহার একটি চরণ লইয়া আল্‌তা পরাইতে লাগিল। শৈবলিনী কিয়ৎকাল নাপিতানীকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন। দেখিয়া দেখিয়া বলিলেন, "নাপিতানী, তোমার বাড়ী কোথা?"

নাপিতানী কথা কহিল না। শৈবলিনী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "নাপিতানী, তোমার নাম কি?"

তথাপি উত্তর পাইলেন না।

"নাপিতানী, তুমি কাঁদচ?"

নাপিতানী মৃদু স্বরে বলিল, "না।"

"হাঁ কাঁদচ।" বলিয়া শৈবলিনী নাপিতানীর অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া দিলেন। নাপিতানী বাস্তবিক কাঁদিতেছিল। অবগুণ্ঠন মুক্ত হইলে নাপিতানী একটু হাসিল।

শৈবলিনী বলিলেন, "আমি আসতে মাত্র চিনেছি। আমার কাছে ঘোম্‌টা! মরণ আর কি? তা এখানে এলি কোথা হতে?"

নাপিতানী আর কেহ নহে—সুন্দরী ঠাকুরঝি। সুন্দরী চক্ষের জল মুছিয়া কহিল, "শীঘ্র যাও! আমার এই সাড়ী পর, ছাড়িয়া দিতেছি। এই আল্‌তার চুপড়ী নাও। ঘোম্‌টা দিয়া নৌকা হইতে চলিয়া যাও।"

শৈবলিনী বিমনা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এলে কেমন করে?"

সু। কোথা হইতে আসিলাম—কেমন করিয়া আসিলাম—সে পরিচয়, দিন পাই ত এর পর দিব। তোমার সন্ধানে এখানে আসিয়াছি। লোকে বলিল, পাল্কী গঙ্গার পথে গিয়াছে। আমিও প্রাতে উঠিয়া কাহাকে কিছু না বলিয়া, হাঁটিয়া গঙ্গাতীরে আসিলাম। লোকে বলিল, বজরা উত্তরমুখে গিয়াছে। অনেক দূর, পা ব্যথা হইয়া গেল। তখন নৌকা ভাড়া করিয়া তোমার পাছে পাছে আসিয়াছি। তোমার বড় নৌকা—চলে না, আমার ছোট নৌকা, তাই শীঘ্র আসিয়া ধরিয়াছি।

শৈ। একলা এলি কেমন করে?

সুন্দরীর মুখে আসিল, "তুই কালামুখী সাহেবের পাল্কী চড়ে এলি কেমন করে?" কিন্তু অসময় বুঝিয়া সে কথা বলিল না। বলিল, "একলা আসি নাই। আমার স্বামী আমার সঙ্গে আছেন। আমাদের ডিঙ্গী একটু দূরে রাখিয়া, আমি নাপিতানী সাজিয়া আসিয়াছি।"

শৈ। তার পর?

সু। তার পর তুমি আমার এই সাড়ী পর, এই আল্তার চুপড়ী নাও, ঘোম্টা দিয়া নৌকা হইতে নামিয়া চলিয়া যাও, কেহ চিনিতে পারিবে না। তীরে তীরে যাইবে। ডিঙ্গীতে আমার স্বামীকে দেখিবে। নন্দাই বলিয়া লজ্জা করিও না—ডিঙ্গীতে উঠিয়া বসিও। তুমি গেলেই ডিঙ্গী খুলিয়া দিয়া তোমায় বাড়ী লইয়া যাইবেন।

শৈবলিনী অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার পর তোমার দশা?"

সু। আমার জন্যে ভাবিও না। বাঙ্গালায় এমন ইংরেজ আসে নাই যে, সুন্দরী বামনীকে নৌকায় পুরিয়া রাখিতে পারে। আমরা ব্রাহ্মণের কন্যা, ব্রাহ্মণের স্ত্রী; আমরা মনে দৃঢ় থাকিলে পৃথিবীতে আমাদের বিপদ্ নাই। তুমি যাও, যে প্রকারে হয়, আমি রাত্রি মধ্যে বাড়ী যাইব। বিপত্তিভঞ্জন মুধসূদন আমার ভরসা। তুমি আর বিলম্ব করিও না—তোমার নন্দাইয়ের এখনও আহার হয় নাই। আজ হবে কি না, তাও বলিতে পারি না।

শৈ। ভাল, আমি যেন গেলেম। গেলে, সেখানে আমায় ঘরে নেবেন কি?

সু। ইল—লো! কেন নেবেন না? না নেওয়াটা প'ড়ে রয়েছে আর কি?

শৈ। দেখ—ইংরেজে আমায় কেড়ে এনেছে—আর কি আমার জাতি আছে?

সুন্দরী বিস্মিতা হইয়া শৈবলিনীর মুখপানে চাহিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। শৈবলিনীর প্রতি মর্ম্মভেদী তীব্রদৃষ্টি করিতে লাগিল—ওষধিস্পৃষ্ট বিষধরের ন্যায় গর্ব্বিতা শৈবলিনী মুখ নত করিল। সুন্দরী কিঞ্চিৎ পরুষভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "সত্য কথা বলিবি?"

শৈ। বলিব।

সু। এই গঙ্গার উপর?

শৈ। বলিব। তোমার জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই, অমনি বলিতেছি। সাহেবের সঙ্গে আমার এ পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ হয় নাই। আমাকে গ্রহণ করিলে আমার স্বামী ধর্ম্মে পতিত হইবেন না।

সু। তবে তোমার স্বামী যে তোমাকে গ্রহণ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ করিও না। তিনি ধর্ম্মাত্মা অধর্ম্ম করিবেন না, তবে আর মিছা কথায় সময় নষ্ট করিও না।

শৈবলিনী একটু নীরব হইয়া রহিল। একটু কাঁদিল, চক্ষের জল মুছিয়া বলিল, "আমি যাইব—আমার স্বামীও আমায় গ্রহণ করিবেন, কিন্তু আমার কলঙ্ক কি কখন ঘুচিবে?"

সুন্দরী কোন উত্তর করিল না। শৈবলিনী বলিতে লাগিল, "ইহার পর পাড়ার ছোট মেয়েগুলা আমাকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিবে কি না যে, ঐ উহাকে ইংরেজে লইয়া গিয়াছিল? ঈশ্বর না করুন, কিন্তু যদি কখন আমার পুত্রসন্তান হয়, তবে তাহার অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রণ করিলে কে আমার বাড়ী খাইতে আসিবে? যদি কখন কন্যা হয়, তবে তাহার সঙ্গে কোন্ সুব্রাহ্মণ পুত্রের বিবাহ দিবে? আমি যে স্বধর্ম্মে আছি, এখন ফিরিয়া গেলে, কেই বা তাহা বিশ্বাস করিবে? আমি

ঘরে ফিরিয়া গিয়া কি প্রকারে মুখ দেখাইব?”

সুন্দরী বলিল, “যাহা অদৃষ্টে ছিল, তাহা ঘটিয়াছে—সে ত আর কিছুতেই ফিরিবে না। কিছু ক্লেশ চিরকালই ভোগ করিতে হইবে। তথাপি আপনার ঘরে থাকিবে।”

শৈ। কি সুখে? কোন্ সুখের আশায় এত কষ্ট সহ্য করিবার জন্য ঘরে ফিরিয়া যাইব? ন পিতা, ন মাতা, ন বন্ধু,—

সু। কেন, স্বামী? এ নারীজন্ম আর কাহার জন্য?

শৈ। সব ত জান—

সু। জানি। জানি যে পৃথিবীতে যত পাপিষ্ঠা আছে, তোমার মত পাপিষ্ঠা কেহ নাই। যে স্বামীর মত স্বামী জগতে দুর্লভ, তাঁহার স্নেহে তোমার মন ওঠে না। কি না, বালকে যেমন খেলাঘরের পুতুলকে আদর করে, তিনি স্ত্রীকে সেরূপ আদর করিতে জানেন না। কি না, বিধাতা তাঁকে সং গড়িয়া, রাঙ্গ্‌তা দিয়া সাজান নাই—মানুষ করিয়াছেন। তিনি ধর্ম্মাত্মা, পণ্ডিত, তুমি পাপিষ্ঠা; তাঁহাকে তোমার মনে ধরিতে কেন? তুমি অন্ধের অধিক অন্ধ, তাই বুঝিতে পার না যে, তোমার স্বামী তোমায় যেরূপ ভালবাসেন, নারীজন্মে সেরূপ ভালবাসা দুর্লভ—অনেক পুণ্যফলে এমন স্বামীর কাছে তুমি এমন ভালবাসা পেয়েছিলে। তা যাক্, সে কথা দূর হৌক্—এখনকার সে কথা নয়। তিনি নাই ভালবাসুন, তবু তাঁর চরণসেবা করিয়া কাল কাটাইতে পারিলেই তোমার জীবন সার্থক! আর বিলম্ব করিতেছে কেন? আমার রাগ হইতেছে।

শৈ। দেখ, গৃহে থাকিতে মনে ভাবিতাম, যদি পিতৃমাতৃকুলে কাহারও অনুসন্ধান পাই, তবে তাহার গৃহে গিয়া থাকি।—নচেৎ কাশী গিয়া ভিক্ষা করিয়া খাইব।—নচেৎ জলে ডুবিয়া মরিব। এখন মুঙ্গের যাইতেছি। যাই, দেখি মুঙ্গের কেমন। দেখি, রাজধানীতে ভিক্ষা মেলে কি না। মরিতে হয়, না হয় মরিব।—মরণ ত হাতেই আছে। এখন আমার মরণ বই আর উপায় কি? কিন্তু মরি আর বাঁচি, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আর ঘরে ফিরিব না। তুমি অনর্থক আমার জন্য এত ক্লেশ করিলে—ফিরিয়া যাও। আমি যাইব না। মনে করিও, আমি মরিয়াছি। আমি মরিব, তাহা নিশ্চয় জানিও! তুমি যাও।

তখন সুন্দরী আর কিছু বলিল না। রোদন সম্বরণ করিয়া গাত্রোত্থান করিল, বলিল, “ভরসা করি, তুমি শীঘ্র মরিবে! দেবতার কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, যেন মরিতে তোমার সাহস হয়! মুঙ্গেরে যাইবার পূর্ব্বেই যেন তোমার মৃত্যু হয়! ঝড়ে হোক্, তুফানে হোক্, নৌকা ডুবিয়া হোক্, মুঙ্গেরে পৌঁছিবার পূর্ব্বে যেন তোমার মৃত্যু হয়।”

এই বলিয়া, সুন্দরী নৌকামধ্য হইতে নিষ্ক্রান্তা হইয়া, আল্‌তার চুপড়ী জলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া স্বামীর নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : চন্দ্রশেখরের প্রত্যাগমন

চন্দ্রশেখর ভবিষ্যৎ গণিয়া দেখিলেন। দেখিয়া রাজকর্ম্মচারীকে বলিলেন, “মহাশয়, আপনি নবাবকে জানাইবেন, আমি গণিতে পারিলাম না।”

রাজকর্ম্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন মহাশয়?”

চন্দ্রশেখর বলিলেন, “সকল কথা গণনায় স্থির হয় না। যদি হইত, তবে মনুষ্য সর্ব্বজ্ঞ হইত। বিশেষ, জ্যোতিষে আমি অপারদর্শী।”

রাজপুরুষ বলিলেন, “অথবা রাজার অপ্রিয় সম্বাদ বুদ্ধিমান্ লোকে প্রকাশ করে না। যাহাই হউক, আপনি যেমন বলিলেন, আমি সেইরূপ রাজসমীপে

নিবেদন করিব।”

চন্দ্রশেখর বিদায় হইলেন। রাজকর্ম্মচারী তাঁহার পাথেয় দিতে সাহস করিলেন না। চন্দ্রশেখর ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিত, কিন্তু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নহেন—ভিক্ষা গ্রহণ করেন না।—কাহারও কাছে দান গ্রহণ করেন না।

গৃহে ফিরিয়া আসিতে দূর হইতে চন্দ্রশেখর নিজ গৃহ দেখিতে পাইলেন। দেখিবামাত্র তাঁহার মনে আহ্লাদের সঞ্চার হইল। চন্দ্রশেখর তত্ত্বজ্ঞ, তত্ত্বজিজ্ঞাসু। আপনাপনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন, বিদেশ হইতে আগমনকালে স্বগৃহ দেখিয়া হৃদয়ে আহ্লাদের সঞ্চার হয় কেন? আমি কি এত দিন আহার নিদ্রার কষ্ট পাইয়াছি? গৃহে গেলে বিদেশ অপেক্ষা কি সুখে সুখী হইব? এ বয়সে আমাকে গুরুতর মোহ-বন্ধে পড়িতে হইয়াছে, সন্দেহ নাই। ঐ গৃহমধ্যে আমার প্রেয়সী ভার্য্যা বাস করেন, এই জন্য আমার এ আহ্লাদ? এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকলই ব্রহ্ম। যদি তাই, তবে কাহারও প্রতি প্রেমাধিক্য—কাহারও প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে কেন? সকলই ত সেই সচ্চিদানন্দ! আমার যে তল্পী লইয়া আসিতেছে, তাহার প্রতি একবারও ফিরিয়া চাহিতে ইচ্ছা হইতেছে না কেন? আর সেই উৎফুল্লকমলাননার মুখপদ্ম দেখিবার জন্য এত কাতর হইয়াছি কেন? আমি ভগবদ্বাক্যে অশ্রদ্ধা করি না, কিন্তু আমি দারুণ মোহজালে জড়িত হইতেছি। এ মোহজাল কাটিতেও ইচ্ছা করে না—যদি অনন্তকাল বাঁচি, তবে অনন্তকাল এই মোহে আচ্ছন্ন থাকিতে বাসনা করিব। কতক্ষণে আবার শৈবলিনীকে দেখিব?

অকস্মাৎ চন্দ্রশেখরের মনে অত্যন্ত ভয়সঞ্চার হইল। যদি বাড়ি গিয়া শৈবলিনীকে না দেখিতে পাই? কেন দেখিতে পাইব না? যদি পীড়া হইয়া থাকে? পীড়া ত সকলেরই হয়—আরাম হইবে। চন্দ্রশেখর ভাবিলেন, পীড়ার কথা মনে হওয়াতে এত অসুখ হইতেছে কেন? কাহার না পীড়া হয়? তবে যদি কোন কঠিন পীড়া হইয়া থাকে? চন্দ্রশেখর দ্রুত চলিলেন। যদি পীড়া হইয়া থাকে, ঈশ্বর শৈবলিনীকে আরাম করিবেন, স্বস্ত্যয়ন করিব। যদি পীড়া ভাল না হয়! চন্দ্রশেখরের চক্ষে জল আসিল। ভাবিলেন, ভগবান্, আমায় এ বয়সে এ রত্ন দিয়া আবার বঞ্চিত করিবেন! তাহারই বা বিচিত্র কি—আমি কি তাঁহার এতই অনুগৃহীত যে, তিনি আমার কপালে সুখ বই দুঃখ বিধান করিবেন না? হয়ত ঘোরতর দুঃখ আমার কপালে আছে। যদি গিয়া দেখি, শৈবলিনী নাই?—যদি গিয়া শুনি যে, শৈবলিনী উৎকট রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছে? তাহা হইলে আমি বাঁচিব না। চন্দ্রশেখর অতি দ্রুতপদে চলিলেন। পল্লীমধ্যে পহুঁছিয়া দেখিলেন, প্রতিবাসীরা তাঁহার মুখপ্রতি অতি-গম্ভীর ভাবে চাহিয়া দেখিতেছে—চন্দ্রশেখর সে চাহনির অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। বালকেরা তাঁহাকে দেখিয়া চুপি চুপি হাসিল। কেহ কেহ দূরে থাকিয়া তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। প্রাচীনেরা তাঁহাকে দেখিয়া, পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল। চন্দ্রশেখর বিস্মিত হইলেন—ভীত হইলেন—অন্যমনা হইলেন—কোন দিকে না চাহিয়া আপন গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দ্বার রুদ্ধ। বাহির হইতে দ্বার ঠেলিলে ভৃত্য বহির্ব্বাটীর দ্বার খুলিয়া দিল। চন্দ্রশেখরকে দেখিয়া, ভৃত্য কাঁদিয়া উঠিল! চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হয়েছে?” ভৃত্য কিছু উত্তর না করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

চন্দ্রশেখর মনে মনে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিলেন। দেখিলেন, উঠানে ঝাঁট পড়ে নাই,—চণ্ডীমণ্ডপে ধূলা। স্থানে স্থানে পোড়া মশাল—স্থানে স্থানে কবাট ভাঙ্গা। চন্দ্রশেখর অন্তঃপুরেমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সকল ঘরের দ্বার বাহির হইতে বন্ধ। দেখিলেন, পরিচারিকা, তাঁহাকে দেখিয়া, সরিয়া গেল। শুনিতে পাইলেন, সে বাটীর বাহির গিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন চন্দ্রশেখর, প্রাঙ্গণমধ্যে দাঁড়াইয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে বিকৃতকণ্ঠে ডাকিলেন, “শৈবলিনি।”

কেহ উত্তর দিল না; চন্দ্রশেখরের বিকৃত কণ্ঠ শুনিয়া রুদ্যমানা পরিচারিকাও নিস্তব্ধ হইল।

চন্দ্রশেখর আবার ডাকিলেন। গৃহমধ্যে ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল—কেহ উত্তর দিল না।

ততক্ষণ শৈবলিনীর চিত্রিত তরণীর উপর গঙ্গাম্বুসঞ্চারী মৃদু-পবন-হিল্লোলে, ইংরেজের লাল নিশান উড়িতেছিল—মাঝিরা সারি গায়িতেছিল।

*   *   *   *

চন্দ্রশেখর সকল শুনিলেন।

তখন, চন্দ্রশেখর সযত্নে গৃহপ্রতিষ্ঠিত শালগ্রাম-শিলা সুন্দরীর পিতৃগৃহে রাখিয়া আসিলেন। তৈজস, বস্ত্র প্রভৃতি গার্হস্থ্য দ্রব্যজাত দরিদ্র প্রতিবাসীদিগের ডাকিয়া বিতরণ করিলেন। সায়াহ্নকাল পর্যন্ত এই সকল কার্য্য করিলেন। সায়াহ্নকালে আপনার অধীত, অধ্যয়নীয়, শোণিততুল্য প্রিয় গ্রন্থগুলি সকল একে একে আনিয়া একত্রিত করিলেন। একে একে প্রাঙ্গণমধ্যে সাজাইলেন—সাজাইতে সাজাইতে এক একবার কোনখানি খুলিলেন—আবার না পড়িয়াই তাহা বাঁধিলেন—সকলগুলি প্রাঙ্গণে রাশীকৃত করিয়া সাজাইলেন। সাজাইয়া, তাহাতে অগ্নিপ্রদান করিলেন।

অগ্নি জ্বলিল। পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ ক্রমে ক্রমে সকলই ধরিয়া উঠিল; মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর প্রভৃতি স্মৃতি; ন্যায়, বেদান্ত, সাংখ্যা প্রভৃতি দর্শন; কল্পসূত্র, আরণ্যক, উপনিষদ্ একে একে সকলই অগ্নিস্পৃষ্ট হইয়া জ্বলিতে লাগিল। বহুযত্নসংগৃহীত, বহুকাল হইতে অধীত সেই অমূল্য গ্রন্থরাশি ভস্মাবশেষ হইয়া গেল।

রাত্রি এক প্রহরে গ্রন্থদাহ সমাপন করিয়া, চন্দ্রশেখর উত্তরীয় মাত্র গ্রহণ করিয়া ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া গেলেন। কোথায় গেলেন, কেহ জানিল না—কেহ জিজ্ঞাসা করিল না।

দ্বিতীয় খণ্ড

পাপ

প্রথম পরিচ্ছেদ: কুল্‌সম্

"না, চিড়িয়া নাচিবে না। তুই এখন তোর গল্প বল্।"

দলনী, বেগম, এই বলিয়া, যে ময়ূরটা নাচিল না, তাহার পুচ্ছ ধরিয়া টানিল। আপনার হস্তের হীরকজড়িত বলয় খুলিয়া আর একটা ময়ূরের গলায় পরাইয়া দিল; একটা মুখর কাকাতুয়ার মুখে চোখে গোলাবের পিচকারী দিল। কাকাতুয়া "বাঁদী" বলিয়া গালি দিল। এ গালি দলনী স্বয়ং কাকাতুয়াকে শিখাইয়াছিল।

নিকটে এক জন পরিচারিকা পক্ষীদিগকে নাচাইবার চেষ্টা দেখিতেছিল, তাহাকেই দলনী বলিল, "এখন তোর গল্প বল্।"

কুল্‌সম্ কহিল, "গল্প আর কি? হাতিয়ার বোঝাই দুইখানা কিস্তি ঘাটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাতে এক জন ইংরেজ চড়ন্দার; সেই দুই কিস্তি আটক হইয়াছে। আলি ইব্রাহিম খাঁ বলেন যে, নৌকা ছাড়িয়া যাও। উহা আটক করিলেই খামকা ইংরেজের সঙ্গে লড়াই বাধিবে। গুর্‌গণ খাঁ বলেন, লড়াই বাধে বাধুক। নৌকা ছাড়িব না।"

দ। হাতিয়ার কোথায় যাইতেছে?

কু। আজিমাবাদের* কুঠিতে যাইতেছে। লড়াই বাধে ত আগে সেইখানে বাধিবে। সেখান হইতে ইংরেজরা হঠাৎ বেদখল না হয় বলিয়া সেথা হাতিয়ার পাঠাইতেছে। এই কথা ত কেল্লার মধ্যে রাষ্ট্র।

দ। তা গুর্‌গণ খাঁ আটক করিতে চাহে কেন?

কু। বলে, সেখানে এত হাতিয়ার জমিলে লড়াই ফতে করা ভার হইবে। শত্রুকে বাড়িতে দেওয়া ভাল নহে। আলি হিব্রাহিম খাঁ বলেন যে, আমরা যাহাই করি না কেন, ইংরেজকে লড়াইয়ে কখন জিতিতে পারিব না। অতএব আমাদের লড়াই না করাই স্থির। তবে নৌকা আটক করিয়া কেন লড়াই বাধাই? ফলে সে সত্য কথা। ইংরেজের হাতে রক্ষা নাই। বুঝি নবাব সেরাজউদৌলার কাণ্ড আবার ঘটে!

দলনী অনেকক্ষণ চিন্তিত হইয়া রহিল।

পরে কহিল, "কুল্‌সম্, তুই একটি দুঃসাহসের কাজ করিতে পারিস্?"

কু। কি? ইলিস মাছ খেতে হবে, না ঠাণ্ড জলে নাইতে হবে?

দ। দূর। তামাসা নহে। টের পেলে পর আলিজা তোকে আমাকে হাতীর দুই পায়ের তলে ফেলে দিবেন।

কু। টের পেলে ত? অত আতর গোলাব সোণা রূপা চুরি করিলাম, কই কেহ ত টের পেল না! আমার মনে বোধ হয়, পুরুষ মানুষের চক্ষু কেবল মাথার শোভার্থ—তাহাতে দেখিতে পায় না। কৈ, পুরুষে মেয়ে মানুষের চাতুরী কখন টের পাইল, এমত ত দেখিলাম না।

দ। দূর। আমি খোজা খান্‌সামাদের কথা বলি না। নবাব আলিজা অন্য পুরুষের মত নহেন। তিনি না জানিতে পারেন কি?

কু। আমি না লুকাইতে পারি কি? কি করিতে হইবে?

দ। একবার গুর্‌গণ খাঁর কাছে একখানি পত্র পাঠাইতে হইবে।

কুল্‌সম্ বিস্ময়ে নীরব হইল। দলনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলিস্?"

কু। পত্র কে দিবে?

দ। আমি।

কু। সে কি? তুমি কি পাগল হইয়াছ?

দ। প্রায়।

উভয়ে নীরব হইয়া বসিয়া রহিল। তাহাদিগকে নীরব দেখিয়া ময়ূর দুইটা আপন আপন বাসযষ্টিতে আরোহণ করিল। কাকাতুয়া অনর্থক চীৎকার আরম্ভ করিল। অন্যান্য পক্ষীরা আহারে মন দিল!

কিছুক্ষণ পরে কুল্‌সম্ বলিল, "কাজ অতি সামান্য। এক জন খোজাকে কিছু দিলেই সে এখনই পত্র দিয়া আসিবে। কিন্তু এ কাজ বড় শক্ত। নবাব জানিতে পারিলে উভয়ে মরিব। যা হোক, তোমার কর্ম্ম তুমিই জান। আমি দাসী। পত্র দাও—আর কিছু নগদ দাও।"

---

* পাটনা।

পরে কুল্‌সম্‌ পত্র লইয়া গেল। এই পত্রকে সূত্র করিয়া বিধাতা দলনী ও শৈবলিনীর অদৃষ্ট একত্র গাঁথিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : গুর্‌গণ খাঁ

যাহার কাছে দলনীর পত্র গেল, তাহার নাম গুর্‌গণ খাঁ।

এই সময় বাঙ্গালায় যে সকল রাজপুরুষ নিযুক্ত ছিলেন, তন্মধ্যে গুর্‌গণ খাঁ এক জন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তিনি জাতিতে আর্‌মাণি; ইস্পাহান তাঁহার জন্মস্থান; কথিত আছে যে, তিনি পূর্ব্বে বস্ত্রবিক্রেতা ছিলেন। কিন্তু অসাধারণ গুণবিশিষ্ট এবং প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তিনি অল্পকালমধ্যে প্রধান সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হইলেন। কেবল তাহাই নহে, সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হইয়া, তিনি নূতন গোলন্দাজ সেনার সৃষ্টি করেন। ইউরোপীয় প্রথানুসারে তাহাদিগকে সুশিক্ষিত এবং সুসজ্জিত করিলেন, কামান বন্দুক যাহা প্রস্তুত করাইলেন, তাহা ইউরোপ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট হইতে লাগিল; তাঁহার গোলন্দাজ সেনা সর্ব্বপ্রকারে ইংরেজের গোলন্দাজদিগের তুল্য হইয়া উঠিল। মীরকাসেমের এমত ভরসা ছিল যে, তিনি গুর্‌গণ খাঁর সহায়তায় ইংরেজদিগকে পরাভূত করিতে পারিবেন। গুর্‌গণ খাঁর আধিপত্যও এতদনুরূপ হইয়া উঠিল; তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত মীরকাসেম কোন কর্ম্ম করিতেন না; তাঁহার পরামর্শের বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিলে মীরকাসেম তাহা শুনিতেন না। ফলতঃ গুর্‌গণ খাঁ একটি ক্ষুদ্র নবাব হইয়া উঠিলেন। মুসলমান কার্য্যাধ্যক্ষেরা সুতরাং বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর, কিন্তু গুর্‌গণ খাঁ শয়ন করেন নাই। একাকী দীপালোকে কতকগুলি পত্র পড়িতেছিলেন। সেগুলি কলিকাতাস্থ্‌ কয়েক জন আরমাণির পত্র। পত্র পাঠ করিয়া, গুর্‌গণ খাঁ ভৃত্যকে ডাকিলেন। চোপদার আসিয়া দাঁড়াইল, গুর্‌গণ খাঁ কহিলেন, "সব দ্বার খোলা আছে?"

চোপ্‌দার কহিল, "আছে।"

গুর্‌। যদি কেহ এখন আমার নিকট আইসে—তবে কেহ তাহাকে বাধা দিবে না—বা জিজ্ঞাসা করিবে না, তুমি কে। এ কথা বুঝাইয়া দিয়াছ?

চোপ্‌দার কহিল, "হুকুম তামিল হইয়াছে।"

গুর্‌। আচ্ছা, তুমি তফাতে থাক।

তখন গুর্‌গণ খাঁ পত্রাদি বাঁধিয়া উপযুক্ত স্থানে লুক্কায়িত করিলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "এখন কোন্‌ পথে যাই? এই ভারতবর্ষ এখন সমুদ্রবিশেষ—যে যত ডুব দিতে পারিবে, সে তত রত্ন কুড়াইবে। তীরে বসিয়া ঢেউ গণিলে কি হইবে? দেখ, আমি গজে মাপিয়া কাপড় বেচিতাম—এখন আমার ভয়ে ভারতবর্ষ অস্থির। আমিই বাঙ্গালার কর্ত্তা। আমি বাঙ্গালার কর্ত্তা? কে কর্ত্তা? কর্ত্তা ইংরেজ ব্যাপারী—তাহাদের গোলাম মীরকাসেম; আমি মীরকাসেমের গোলাম—আমি কর্ত্তার গোলামের গোলাম! বড় উচ্চপদ! আমি বাঙ্গালার কর্ত্তা না হই কেন? কে আমার তোপের কাছে দাঁড়াইতে পারে? ইংরেজ! একবার পেলে হয়। কিন্তু ইংরেজকে দেশ হইতে দূর না করিলে, আমি কর্ত্তা হইতে পারিব না। আমি বাঙ্গলার অধিপতি হইতে চাহি—মীরকাসেমকে গ্রাহ্য করি না—যে দিন মনে করিব, সেই দিন উহাকে মস্‌নদ হইতে টানিয়া ফেলিয়া দিব। সে কেবল আমার উচ্চপদে আরোহণের সোপান—এখন ছাদে উঠিয়াছি—মই ফেলিয়া দিতে পারি। কণ্টক কেবল পাপ ইংরেজ। তাহারা আমাকে হস্তগত করিতে চাহে—আমি তাহাদিগকে হস্তগত করিতে চাহি। তাহারা হস্তগত হইবে না। অতএব আমি তাদের তাড়াইব। এখন মীরকাসেম মস্‌নদে থাক; তাহার সহায় হইয়া বাঙ্গালা হইতে ইংরেজ নাম লোপ করিব। সেই জন্যই উদ্যোগ করিয়া

যুদ্ধ বাধাইতেছি। পশ্চাৎ মীরকাসেমকে বিদায় দিব। এই পথই সুপথ। কিন্তু আজি হঠাৎ এ পত্র পাইলাম কেন? এ বালিকা এমন দুঃসাহসিক কাজে প্রবৃত্ত হইল কেন?”

বলিতে বলিতে যাহার কথা ভাবিতেছিলেন, সে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। গুর্‌গণ খাঁ তাহাকে পৃথক্ আসনে বসাইলেন। সে দলনী বেগম।

গুর্‌গণ খাঁ বলিলেন, “আজি অনেক দিনের পর তোমাকে দেখিয়া বড় আহ্লাদিত হইলাম। তুমি নবাবের অন্তঃপুরে প্রবেশ করা অবধি আর তোমাকে দেখি নাই। কিন্তু তুমি এ দুঃসাহসিক কর্ম্ম কেন করিলে?”

দলনী বলিল, “দুঃসাহসিক কিসে?”

গুর্‌গণ খাঁ কহিল, “তুমি নবাবের বেগম হইয়া রাত্রে গোপনে একাকিনী চুরি করিয়া আমার নিকট আসিয়াছ, ইহা নবাব জানিতে পারিলে তোমাকে আমাকে—দুই জনকেই বধ করিবেন।”

দ। যদি তিনি জানিতেই পারেন, তখন আপনাতে আমাতে যে সম্বন্ধ, তাহা প্রকাশ করিব। তাহা হইলে রাগ করিবার আর কোন কারণ থাকিবে না।

গুর্। তুমি বালিকা, তাই এমত ভরসা করিতেছ! এত দিন আমরা এ সম্বন্ধ প্রকাশ করি নাই। তুমি যে আমাকে চেন, বা আমি যে তোমাকে চিনি, এ কথা এ পর্য্যন্ত আমরা কেহই প্রকাশ করি নাই—এখন বিপদে পড়িয়া প্রকাশ করিলে কে বিশ্বাস করিবে? বলিবে, এ কেবল বাঁচিবার উপায়। তুমি আসিয়া ভাল কর নাই।

দ। নবাব জানিবার সম্ভাবনা কি? পাহারাওয়ালা সকল আপনার আজ্ঞাকারী—আপনার প্রদত্ত নিদর্শন দেখিয়া তাহারা আমাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে আমি আসিয়াছি—ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ হইবে এ কথা কি সত্য?

গুর্। এ কথা তুমি দুর্গে বসিয়া শুনিতে পাও না?

দ। পাই। কেল্লার মধ্যে রাষ্ট্র যে, ইংরেজের সঙ্গে নিশ্চিত যুদ্ধ উপস্থিত। এবং আপনিই এ যুদ্ধ উপস্থিত করিয়াছেন। কেন?

গুর্। তুমি বালিকা, তাহা কি প্রকারে বুঝিবে?

দ। আমি বালিকার মত কথা কহিতেছি? না, বালিকার ন্যায় কাজ করিয়া থাকি? আমাকে যেখানে আত্মসহায়স্বরূপ নবাবের অন্তঃপুরে স্থাপন করিয়াছেন, সেখানে বালিকা বলিয়া অগ্রাহ্য করিলে কি হইবে?

গুর্। হউক। ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে তোমার আমার ক্ষতি কি। হয়, হউক না।

দ। আপনারা কি জয়ী হইতে পারিবেন?

গুর্। আমাদের জয়েরই সম্ভাবনা।

দ। এ পর্য্যন্ত ইংরেজকে কে জিতিয়াছে?

গুর্। ইংরেজেরা কয় জন গুর্‌গণ খাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছে?

দ। সেরাজউদ্দৌলা তাহাই মনে করিয়াছিলেন। যাক—আমি স্ত্রীলোক, আমার মন যাহা বুঝে, আমি তাই বিশ্বাস করি। আমার মনে হইতেছে যে, কোন মতেই আমরা ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইব না। এ যুদ্ধে আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে। অতএব আমি মিনতি করিতে আসিয়াছি, আপনি এ যুদ্ধে প্রবৃত্তি দিবেন না।

গুর্। এ সকল কর্ম্মে স্ত্রীলোকের পরামর্শ অগ্রাহ্য।

দ। "আমার পরামর্শ গ্রাহ্য করিতে হইবে। আমায় আপনি রক্ষা করুন। আমি চারি দিক্ অন্ধকার দেখিতেছি।" বলিয়া, দলনী রোদন করিতে লাগিল।

গুর্‌গণ খাঁ বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "তুমি কাঁদ কেন? না হয় মীরকাসেম সিংহাসনচ্যুত হইলেন, আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া দেশে লইয়া যাইব।"

ক্রোধে দলনীর চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। সক্রোধে তিনি বলিলেন, "তুমি কি বিস্মৃত হইতেছ যে, মীরকাসেম আমার স্বামী?"

গুর্‌গণ খাঁ কিঞ্চিৎ বিস্মিত, কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "না, বিস্মৃত হই নাই। কিন্তু স্বামী কাহারও চিরকাল থাকে না। এক স্বামী গেলে আর স্বামী হইতে পারে। আমার ভরসা আছে, তুমি এক দিন ভারতবর্ষের দ্বিতীয় নুরজাহান হইবে।"

দলীন ক্রোধে কম্পিতা হইয়া গাত্রোত্থান করিয়া উঠিল। গলদশ্রু নিরুদ্ধ করিয়া, লোচনযুগল বিস্ফারিত করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিতে লাগিল,—"তুমি নিপাত যাও! অশুভক্ষণে আমি তোমার ভগিনী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম—অশুভক্ষণে আমি তোমার সহায়তায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলাম। স্ত্রীলোকের যে স্নেহ, দয়া, ধর্ম্ম আছে, তাহা তুমি জান না। যদি তুমি এই যুদ্ধের পরামর্শ হইতে নিবৃত্ত হও, ভালই; নহিলে আজি হইতে তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নাই। সম্বন্ধ নাই কেন? আজি হইতে তোমার সঙ্গে আমার শত্রুসম্বন্ধ। আমি জানিব যে, তুমিই আমার পরম শত্রু। তুমি জানিও, আমি তোমার পরম শত্রু। এই রাজান্তঃপুরে আমি তোমার পরম শত্রু রহিলাম।"

এই বলিয়া দলনী বেগম বেগে পুরী হইতে বহির্গতা হইয়া গেলেন।

দলনী বাহির হইলে গুর্‌গণ খাঁ চিন্তা করিতে লাগিলেন। বুঝিলেন যে, দলনী আর এক্ষণে তাঁহার নহে, সে মীরকাসেমের হইয়াছে। ভ্রাতা বলিয়া তাহাকে স্নেহ করিলে করিতে পারে, কিন্তু সে মীরকাসেমের প্রতি অধিকতর স্নেহবতী। ভ্রাতাকে স্বামীর অমঙ্গলার্থী বলিয়া যখন বুঝিয়াছে বা বুঝিবে, তখন স্বামীর মঙ্গলার্থ ভ্রাতার অমঙ্গল করিতে পারে। অতএব আর উহাকে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। গুর্‌গণ খাঁ ভৃত্যকে ডাকিলেন।

একজন শস্ত্রবাহক উপস্থিত হইল। গুর্‌গণ খাঁ তাঁহার দ্বারা আজ্ঞা পাঠাইলেন, দলনীকে প্রহরীরা যেন দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে না দেয়।

অশ্বারোহণে দূত আগে দূর্গদ্বারে পৌঁছিল, দলনী যথাকালে দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, তাঁহার প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

শুনিয়া দলনী ক্রমে ক্রমে, ছিন্নবল্লীবৎ, ভূতলে বসিয়া বড়িলেন। চক্ষু দিয়া ধারা বহিতে লাগিল। বলিলেন, "ভাই, আমার দাঁড়াইবার স্থান রাখিলে না।"

কুল্‌সম্ বলিল, "ফিরিয়া সেনাপতির গৃহে চল।"

দলনী বলিল, "তুমি যাও। গঙ্গার তরঙ্গমধ্যে আমার স্থান হইবে।"

সেই অন্ধকারে রাত্রে, রাজপথে দাঁড়াইয়া দলনী কাঁদিতে লাগিল। মাথার উপরে নক্ষত্র জ্বলিতেছিল—বৃক্ষ হইতে প্রস্ফুট কুসুমের গন্ধ আসিতেছিল—ঈষৎ পবনহিল্লোলে অন্ধকারাবৃত বৃক্ষপত্রসকল মর্ম্মরিত হইতেছিল। দলনী কাঁদিয়া বলিল, "কুল্‌সম!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : দলনীর কি হইল

একমাত্র পরিচারিকা সঙ্গে, নিশাকালে রাজমহিষী, রাজপথে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। কুল্‌সম্ জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি করিবেন?"

দলনী চক্ষু মুছিয়া বলিল, "আইস, এই বৃক্ষতলে দাঁড়াই, প্রভাত হউক।"

কু। এখানে প্রভাত হইলে, আমরা ধরা পড়িব।

দ। তাহাতে ভয় কি? আমি কোন্ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি যে, আমি ভয় করিব?”

কু। আমরা চোরের মত পুরীত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। কেন আসিয়াছি, তা তুমিই জান। কিন্তু লোকে কি মনে করিবে, নবাবই বা কি মনে করিবেন, তাহা ভাবিয়া দেখ।

দ। যাহাই মনে করুন, ঈশ্বর আমার বিচারকর্ত্তা—আমি অন্য বিচার মানি না। না হয় মরিব, ক্ষতি কি?

কু। কিন্তু এখানে দাঁড়াইয়া কোন্ কার্য্য সিদ্ধ হইবে?

দ। এখানে দাঁড়াইয়া ধরা পড়িব—সেই উদ্দেশ্যেই এখানে দাঁড়াইব। ধৃত হওয়াই আমার কামনা। যে ধৃত করিবে, সে আমাকে কোথায় লইয়া যাইবে?

কু। দরবারে।

দ। প্রভুর কাছে? আমি সেইখানেই যাইতে চাই। অন্যত্র আমার যাইবার স্থান নাই। তিনি যদি আমার বধের আজ্ঞা দেন, তথাপি মরিবার কালে তাঁহাকে বলিতে পাইব যে, আমি নিরপরাধিনী। বরং চল, আমরা দুর্গদ্বারে গিয়া বসিয়া থাকি—সেইখানে শীঘ্র ধরা পড়িব।

এই সময়ে উভয়ে সভয়ে দেখিল, অন্ধকারে এক দীর্ঘাকার পুরুষ-মূর্ত্তি গঙ্গাতীরাভিমুখে যাইতেছে। তাহারা বৃক্ষতলস্থ অন্ধকারমধ্যে গিয়া লুকাইল। পুনশ্চ সভয়ে দেখিল, দীর্ঘাকার পুরুষ, গঙ্গার পথ পরিত্যাগ করিয়া সেই আশ্রয়-বৃক্ষের অভিমুখে আসিতে লাগিল। দেখিয়া স্ত্রীলোক দুইটি আরও অন্ধকারমধ্যে লুকাইল।

দীর্ঘাকার পুরুষ সেইখানে আসিল। বলিল, “এখানে তোমরা কে?” এই কথা বলিয়া, সে যেন আপনা আপনি, মৃদুতর স্বরে বলিল, “আমার মত পথে পথে নিশা জাগরণ করে, এমন হতভাগা কে আছে?”

দীর্ঘাকার পুরুষ দেখিয়া, স্ত্রীলোকদিগের ভয় জন্মিয়াছিল, কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে ভয় দূর হইল। কণ্ঠ অতি মধুর—দুঃখ এবং দয়ায় পরিপূর্ণ। কুল্‌সম্ বলিল, “আমরা স্ত্রীলোক, আপনি কে?” পুরুষ কহিলেন, “আমরা? তোমরা কয় জন?”

কু। আমরা দুই জন মাত্র।

পু। এ রাত্রে এখানে কি করিতেছ?

তখন দলনী বলিল, “আমরা হতভাগিনী—আমাদের দুঃখের কথা শুনিয়া আপনার কি হইবে?”

শুনিয়া আগন্তুক বলিলেন, “অতি সামান্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক লোকের উপকার হইয়া থাকে, তোমরা যদি বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া থাক—সাধ্যানুসারে আমি তোমাদের উপকার করিব।”

দ। আমাদের উপকার প্রায় অসাধ্য—‘আপনি কে?’

আগন্তুক কহিলেন, “আমি সামান্য ব্যক্তি—দরিদ্র ব্রাহ্মণ মাত্র। ব্রহ্মচারী।”

দ। আপনি যেই হউন, আপনার কথা শুনিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করিতেছে। যে ডুবিয়া মরিতেছে, সে অবলম্বনের যোগ্যতা অযোগ্যত্য বিচার করে না। কিন্তু যদি আমাদিগের বিপদ্ শুনিতে চান, তবে রাজপথ হইতে দূরে চলুন। রাত্রে কে কোথায় আছে বলা যায় না। আমাদের কথা সকলের সাক্ষাতে বলিবার নহে।

তখন ব্রহ্মচারী বলিলেন, “তবে তোমরা আমার সঙ্গে আইস।” এই বলিয়া দলনী ও কুল্‌সম্‌কে সঙ্গে করিয়া নগরাভিমুখে চলিলেন। এক ক্ষুদ্র গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, দ্বারে করাঘাত করিয়া “রামচরণ” বলিয়া ডাকিলেন। রামচরণ আসিয়া দ্বার মুক্ত করিয়া দিল। ব্রহ্মচারী তাহাকে আলো জ্বালিতে আজ্ঞা করিলেন।

রামচরণ প্রদীপ জ্বালিয়া, ব্রহ্মচারীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিল। ব্রহ্মচারী তখন রামচরণকে বলিলেন, “তুমি গিয়া শয়ন কর।” শুনিয়া রামচরণ একবার দলনী ও কুল্‌সমের প্রতি দৃষ্টি করিয়া চলিয়া গেল। বলা বাহুল্য যে, রামচরণ সে রাত্রে আর নিদ্রা যাইতে পারিল না। ঠাকুরজী, এত রাত্রে দুই জন যুবতী স্ত্রীলোক লইয়া আসিলেন কেন? এই ভাবনা তাহার প্রবল হইল। ব্রহ্মচারীকে রামচরণ দেবতা মনে করিত—তাঁহাকে জিতেন্দ্রিয় বলিয়াই জানিত—সে বিশ্বাসের খর্ব্বতা হইল না। শেষে রামচরণ সিদ্ধান্ত করিল, “বোধ হয়, এই দুই জন স্ত্রীলোক সম্প্রতি বিধবা হইয়াছে—ইহাদিগকে সহমরণের প্রবৃত্তি দিবার জন্যই ঠাকুরজী ইহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়াছে—কি জ্বালা, এ কথাটা এতক্ষণ বুঝিতে পারিতেছিলাম না।”

ব্রহ্মচারী একটা আসনে উপবেশন করিলেন—স্ত্রীলোকেরা ভূম্যাসনে উপবেশন করিলেন। প্রথমে দলনী আত্মপরিচয় দিলেন। পরে দলনী রাত্রের ঘটনা সকল অকপটে বিবৃত করিলেন।

শুনিয়া ব্রহ্মচারী মনে মনে ভাবিলেন, “ভবিতব্য কে খণ্ডাইতে পারে? যাহা ঘটিবার তাহা অবশ্য ঘটিবে। তাই বলিয়া পুরুষকারকে অবহেলা করা কর্ত্তব্য নহে। যাহা কর্ত্তব্য, তাহা অবশ্য করিব।”

হায়! ব্রহ্মচারী ঠাকুর। গ্রন্থগুলি কেন পোড়াইলে? সব গ্রন্থ ভস্ম হয়, হৃদয়-গ্রন্থ ত ভস্ম হয় না। ব্রহ্মচারী দলনীকে বলিলেন, “আমার পরামর্শ এই যে, আপনি অকস্মাৎ নাবাবের সম্মুখে উপস্থিত হইবেন না। প্রথমে, পত্রের দ্বারা তাঁহাকে সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত করুন। যদি আপনার প্রতি তাঁহার স্নেহ থাকে, তবে অবশ্য আপনার কথায় তিনি বিশ্বাস করিবেন। পরে তাঁহার আজ্ঞা পাইলে সম্মুখে উপস্থিত হইবেন।”

দ। পত্র লইয়া যাইবে কে?

ব্র। আমি পাঠাইয়া দিব।

তখন দলনী কাগজ কলম চাহিলেন। ব্রহ্মচারী রামচরণকে আবার উঠাইলেন। রামচরণ কাগজ কলম ইত্যাদি আনিয়া রাখিয়া গেল। দলনী পত্র লিখিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মচারী ততক্ষণ বলিতে লাগিলেন, “এ গৃহ আমার নহে; কিন্তু যতক্ষণ না রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হন, ততক্ষণ এইখানেই থাকুন—কেহ জানিতে পারিবে না, বা কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবে না।”

অগত্যা স্ত্রীলোকেরা তাহা স্বীকার করিল। লিপি সমাপ্ত হইলে, দলনী তাহা ব্রহ্মচারীর হস্তে দিলেন। স্ত্রীলোকদিগের অবস্থিতি বিষয়ে রামচরণকে উপযুক্ত উপদেশ দিয়া ব্রহ্মচারী লিপি লইয়া চলিয়া গেলেন।

মুঙ্গেরের যে সকল রাজকর্ম্মচারী হিন্দু, ব্রহ্মচারী তাঁহাদিগের নিকট বিলক্ষণ পরিচিত ছিলেন। মুসলমানেও তাঁহাকে চিনিত। সুতরাং সকল কর্ম্মচারীই তাঁহাকে মানিত।

মুন্সী রামগোবিন্দ রায়, ব্রহ্মচারীকে বিশেষ ভক্তি করিতেন। ব্রহ্মচারী সূর্য্যোদয়ের পর মুঙ্গেরের দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন; এবং রামগোবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া দলনীর পত্র তাঁহার হস্তে দিলেন। বলিলেন, “আমার নাম করিও না; এক ব্রাহ্মণ পত্র আনিয়াছে, এই কথা বলিও।” মুন্সী বলিলেন, “আপনি উত্তরের

জন্য কাল আসিবেন।” কাহার পত্র তাহা মুন্সী কিছুই জানিলেন না। ব্রহ্মচারী পুনর্ব্বার, পূর্ব্ববর্ণিত গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। দলনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, “কল্য উত্তর আসিবে। কোন প্রকারে অদ্য কাল যাপন কর।”

রামচরণ প্রভাতে আসিয়া দেখিল, সহমরণের কোন উদ্যোগ নাই।

এই গৃহের উপরিভাগে অপর এক ব্যক্তি শয়ন করিয়া আছেন। এই স্থানে তাঁহার কিছু পরিচয় দিতে হইল। তাঁহার চরিত্র লিখিতে লিখিতে শৈবলিনী-কলুষিতা আমার এই লেখনী পুণ্যময়ী হইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : প্রতাপ

সুন্দরী বড় রাগ করিয়াই শৈবলিনীর বজরা হইতে চলিয়া আসিয়াছিল। সমস্ত পথ স্বামীর নিকটে শৈবলিনীকে গালি দিতে দিতে আসিয়াছিল। কখন “অভাগী,” কখন “পোড়ারমুখী,” কখন “চুলোমুখী” ইত্যাদি প্রিয় সম্বোধনে শৈবলিনীকে অভিহিত করিয়া স্বামীর কৌতুক বর্দ্ধন করিতে করিতে আসিয়াছিল। ঘরে আসিয়া অনেক কাঁদিয়াছিল। তার পর চন্দ্রশেখর আসিয়া দেশত্যাগী হইয়া গেলেন। তার পর কিছু দিন অমনি অমনি গেল। শৈবলিনীর বা চন্দ্রশেখরের কোন সম্বাদ পাওয়া গেল না। তখন সুন্দরী ঢাকাই শাটী পরিয়া গহনা পরিতে বসিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সুন্দরী চন্দ্রশেখরের প্রতিবাসী-কন্যা এবং সম্বন্ধে ভগিনী। তাঁহার পিতা নিতান্ত অসঙ্গতিশালী নহেন। সুন্দরী সচরাচর পিত্রালয়ে থাকিতেন। তাঁহার স্বামী শ্রীনাথ, প্রকৃত ঘরজামাই না হইয়াও কখন কখন শ্বশুরবাড়ী আসিয়া থাকিতেন। শৈবলিনীর বিপদ্‌কালে যে শ্রীনাথ বেদগ্রামে ছিলেন, তাহার পরিচয় পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। সুন্দরীই বাড়ীর গৃহিণী। তাঁহার মাতা রুগ্ন এবং অকর্ম্মণ্য। সুন্দরীর আর এক কনিষ্ঠা ভগিনী ছিল; তাঁহার নাম রূপসী। রূপসী শ্বশুরবাড়ীতেই থাকিত।

সুন্দরী ঢাকাই শাটী পরিয়া অলঙ্কার সন্নিবেশপূর্ব্বক পিতাকে বলিল, “আমি রূপসীকে দেখিতে যাইব—তাহার বিষয়ে বড় কুস্বপ্ন দেখিয়াছি।” সুন্দরীর পিতা কৃষ্ণকমল চক্রবর্ত্তী কন্যার বশীভূত, একটু আধটু আপত্তি করিয়া সম্মত হইলেন। সুন্দরী, রূপসীর শ্বশুরালয়ে গেলেন—শ্রীনাথ স্বগৃহে গেলেন।

রূপসীর স্বামী কে? সেই প্রতাপ! শৈবলিনীকে বিবাহ করিলে, প্রতিবাসীপুত্র প্রতাপকে চন্দ্রশেখর সর্ব্বদা দেখিতে পাইতেন। চন্দ্রশেখর প্রতাপের চরিত্রে অত্যন্ত প্রীত হইলেন। সুন্দরীর ভগিনী রূপসী বয়ঃস্থা হইলে তাহার সঙ্গে প্রতাপের বিবাহ ঘটাইলেন। কেবল তাহাই নহে। চন্দ্রশেখর, কাসেম আলী খাঁর শিক্ষাদাতা; তাঁহার কাছে বিশেষ প্রতিপন্ন। চন্দ্রশেখর, নবাবের সরকারে প্রতাপের চাকরী করিয়া দিলেন। প্রতাপ স্বীয় গুণে দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। এক্ষণে প্রতাপ জমীদার। তাঁহার বৃহৎ অট্টালিকা—এবং দেশবিখ্যাত নাম। সুন্দরীর শিবিকা তাঁহার পুরীমধ্যে প্রবেশ করিল। রূপসী তাঁহাকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া, সাদরে গৃহে লইয়া গেল। প্রতাপ আসিয়া শ্যালীকে রহস্যসম্ভাষণ করিলেন।

পরে অবকাশমতে প্রতাপ, সুন্দরীকে বেদগ্রামের সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। অন্যান্য কথার পর চন্দ্রশেখরের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

সুন্দরী বলিলেন, “আমি সেই কথা বলিতেই আসিয়াছি, বলি শুন।”

এই বলিয়া সুন্দরী চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীর নির্ব্বাসন-বৃত্তান্ত সবিস্তারে বিবৃত করিলেন। শুনিয়া, প্রতাপ বিস্মিত এবং স্তব্ধ হইলেন।

কিঞ্চিৎ পরে মাথা তুলিয়া, প্রতাপ কিছু রুক্ষভাবে সুন্দরীকে বলিলেন, “এত দিন আমাকে এ কথা বলিয়া পাঠাও নাই কেন?”

সু। কেন, তোমাকে বলিয়া কি হইবে?

প্র। কি হইবে? তুমি স্ত্রীলোক, তোমার কাছে বড়াই করিব না। আমাকে বলিয়া পাঠাইলে কিছু উপকার হইতে পারিত।

সু। তুমি উপকার করিব কি না, তা জানিব কি প্রকারে?

প্র। কেন, তুমি কি জান না—আমার সর্ব্বস্ব চন্দ্রশেখর হইতে?

সু। জানি। কিন্তু শুনিয়াছি, লোকে বড়মানুষ হইলে পূর্ব্বকথা ভুলিয়া যায়।

প্রতাপ ক্রুদ্ধ হইয়া, অধীর এবং বাক্যশূন্য হইয়া উঠিয়া গেলেন। রাগ দেখিয়া সুন্দরীর বড় আহ্লাদ হইল।

পরদিন প্রতাপ এক পাচক ও এক ভৃত্য মাত্র সঙ্গে লইয়া মুঙ্গেরে যাত্রা করিলেন। ভৃত্যের নাম রামচরণ। প্রতাপ কোথায় গেলেন, প্রকাশ করিয়া গেলেন না। কেবল রূসসীকে বলিয়া গেলেন, "আমি চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীর সন্ধান করিতে চলিলাম; সন্ধান না করিয়া ফিরিব না।"

যে গৃহে ব্রহ্মচারী দলনীকে রাখিয়া গেলেন, মুঙ্গেরে সেই প্রতাপের বাসা।

সুন্দরী কিছু দিন ভগিনীর নিকটে থাকিয়া আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া, শৈবলিনীকে গালি দিল। প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে, সুন্দরী, রূপসীর নিকট প্রমাণ করিতে বসিত যে, শৈবলিনীর তুল্য পাপিষ্ঠা, হতভাগিনী আর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে নাই। এক দিন রূপসী বলিল, "তা ত সত্য, তবে তুমি তার জন্য দৌড়াদৌড়ি করিয়া মরিতেছ কেন?"

সুন্দরী বলিল, "তাঁর মুণ্ডপাত করিব ব'লে—তাঁকে যমের বাড়ী পাঠাব ব'লে—তাঁর মুখে আগুন দিব ব'লে" ইত্যাদি ইত্যাদি।

রূপসী বলিল, "দিদি, তুই বড় কুঁদুলী!"

সুন্দরী উত্তর করিল, "সেই ত আমায় কুঁদুলী করেছে।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : গঙ্গাতীরে

কলিকাতার কৌন্সিল স্থির করিয়াছিলেন, নবাবের সঙ্গে যুদ্ধ করিব। সম্প্রতি আজিমাবাদের কুঠিতে কিছু অস্ত্র পাঠান অবশ্যক। সেই জন্য এক নৌকা বোঝাই দিলেন।

আজিমাবাদের অধ্যক্ষ ইলিস্ সাহেবকে কিছু গুপ্ত উপদেশ প্রেরণ আবশ্যক হইল। আমিয়ট্ সাহেব নবাবের সঙ্গে গোলযোগ মিটাইবার জন্য মুঙ্গেরে আছেন—সেখানে তিনি কি করিতেছেন, কি বুঝিলেন, তাহা না জানিয়াও ইলিস্‌কে কোন প্রকার অবধারিত উপদেশ দেওয়া যায় না। অতএব একজন চতুর কর্ম্মচারীকে তথায় পাঠান আবশ্যক হইল। সে আমিয়টের সঙ্গে সাক্ষাত করিয়া, তাঁহার উপদেশ লইয়া ইলিসের নিকট যাইবে, এবং কলিকাতার কৌন্সিলের অভিপ্রায় ও আমিয়টের অভিপ্রায় তাঁহাকে বুঝাইয়া দিবে।

এই সকল কার্য্যের জন্য গভর্নর বান্সিটার্ট ফষ্টরকে পুরন্দরপুর হইতে আনিলেন। তিনি অস্ত্রের নৌকা রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া লইয়া যাইবেন, এবং আমিয়টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পাটনা যাইবেন। সুতরাং ফষ্টরকে কলিকাতায় আসিয়াই পশ্চিম যাত্রা করিতে হইল। তিনি এ সকল বৃত্তান্তের সম্বাদ পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন, এজন্য শৈবলিনীকে অগ্রেই মুঙ্গের পাঠাইয়াছিলেন। ফষ্টর পথিমধ্যে শৈবলিনীকে ধরিলেন।

ফষ্টর অস্ত্রের নৌকা এবং শৈবলিনীর সহিত মুঙ্গের আসিয়া তীরে নৌকা বাঁধিলেন। আমিয়টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিদায় লইলেন, কিন্তু এমত সময়ে গুর্‌গণ খাঁ নৌকা আটক করিলেন। তিনি আমিয়টের সঙ্গে নবাবের বাদানুবাদ উপস্থিত হইল। অদ্য আমিয়টের সঙ্গে ফষ্টরের এই কথা স্থির হইল যে, যদি নবাব নৌকা ছাড়িয়া দেন ভালই; নচেৎ কাল প্রাতে ফষ্টর অস্ত্রের নৌকা ফেলিয়া পাটনায় চলিয়া যাইবেন।

ফষ্টরের দুইখানি নৌকা মুঙ্গেরের ঘাটে বাঁধা। একখানি দেশী ভড়—আকারে বড় বৃহৎ—আর একখানি বজরা। ভড়ের উপর কয়েক জন নবাবের সিপাহী পাহারা দিতেছে। তীরেও কয়েক জন সিপাহী। এইখানিতে অস্ত্র বোঝাই—এইখানিই গুর্‌গণ খাঁ আটক করিতে চাহেন।

বজরাখানিতে অস্ত্র বোঝাই নহে। সেখানি ভড় হইতে হাত পঞ্চাশ দূরে আছে। সেখানে কেহ নবাবের পাহারা নাই। ছাদের উপর একজন "তেলিঙ্গা" নামক ইংরেজদিগের সিপাহী বসিয়া নৌকা রক্ষণ করিতেছিল।

রাত্রি সার্দ্ধ-দ্বিপ্রহর। অন্ধকার রাত্র, কিন্তু পরিষ্কার। বজরার পাহারাওয়ালারা একবার উঠিতেছে, একবার বসিতেছে, একবার ঢুলিতেছে। তীরে একটা কসাড় বন ছিল। তাহার অন্তরালে থাকিয়া এক ব্যক্তি কাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। নিরীক্ষণকারী স্বয়ং প্রতাপ রায়।

প্রতাপ রায় দেখিলেন, প্রহরী ঢুলিতেছে। তখন প্রতাপ রায় আসিয়া ধীরে ধীরে জলে নামিলেন। প্রহরী জলের শব্দ পাইয়া ঢুলিতে ঢুলিতে জিজ্ঞাসা করিল, 'হুকুম্‌দার?" প্রতাপ রায় উত্তর করিলেন না। প্রহরী ঢুলিতে লাগিল। নৌকার ভিতরে ফষ্টর সতর্ক হইয়া জাগিয়া ছিলেন। তিনিও প্রহরীর বাক্য শুনিয়া, বজরার মধ্য হইতে ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিলেন। দেখিলেন, একজন জলে স্নান করিতে নামিয়াছে।

এমত সময়ে কসাড় বন হইতে অকস্মাৎ বন্দুকের শব্দ হইল। বজরার প্রহরী গুলির দ্বারা আহত হইয়া জলে পড়িয়া গেল। প্রতাপ তখন যেখানে নৌকার অন্ধকার ছায়া পড়িয়াছিল, সেইখানে আসিয়া ওষ্ঠ পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রহিলেন।

বন্দুকের শব্দ হইবামাত্র, ভড়ের সিপাহীরা "কিয়া হৈ রে?" বলিয়া গোলযোগ করিয়া উঠিল। নৌকার অপরাপর লোক জাগরিত হইল। ফষ্টর বন্দুক হাতে করিয়া বাহির হইলেন।

লরেন্স ফষ্টর বাহিরে আসিয়া চারি দিক্ ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, তাঁহার "তেলিঙ্গা" প্রহরী অন্তর্হিত হইয়াছে—নক্ষত্রালোকে দেখিলেন, তাহার মৃতদেহ ভাসিতেছে। প্রথমে মনে করিলেন, নবাবের সিপাহীরা মারিয়াছে—কিন্তু তখনই কসাড় বনের দিকে অল্প ধূমরেখা দেখিলেন। আরও দেখিলেন, তাঁহার সঙ্গের দ্বিতীয় নৌকার লোক সকল বৃত্তান্ত কি জানিবার জন্য দৌড়িয়া আসিতেছে। আকাশে নক্ষত্র জ্বলিতেছে; নগরমধ্যে আলো জ্বলিতেছে—গঙ্গাকূলে শত শত বৃহত্তরণী-শ্রেণী, অন্ধকারে নিদ্রিতা রাক্ষসীর মত নিশ্চেষ্ট রহিয়াছে—কল কল রবে অনন্তপ্রবাহিণী গঙ্গা ধাবিতা হইতেছেন। সেই স্রোতে প্রহরীর শব ভাসিয়া যাইতেছে। পলকমধ্যে ফষ্টর সকল দেখিলেন।

কসাড় বনের উপর ঈষত্তরল ধূমরেখা দেখিয়া, ফষ্টর স্বহস্তস্থিত বন্দুক উত্তোলন করিয়া সেই বনের দিকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। ফষ্টর বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে, এই বনান্তরালে লুক্কায়িত শত্রু আছে। ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, যে শত্রু অদৃশ্য থাকিয়া প্রহরীকে নিপাত করিয়াছিল, সে এখনই তাঁহাকেও নিপাত করিতে পারে। কিন্তু তিনি পলাসীর যুদ্ধের পর ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন; দেশী লোকে যে ইংরাজকে লক্ষ্য করিবে, এ কথা তিনি মনে স্থান দিলেন না। বিশেষ ইংরেজ হইয়া যে দেশী শত্রুকে ভয় করিবে—তাহার মৃত্যু ভাল। এই ভাবিয়া তিনি সেইখানে দাঁড়াইয়া বন্দুক উত্তোলন করিয়াছিলেন—কিন্তু তন্মুহূর্তে কসাড় বনের ভিতর অগ্নি-শিখা জ্বলিয়া উঠিল—আবার বন্দুকের শব্দ হইল—ফষ্টর মস্তকে আহত হইয়া, প্রহরীর ন্যায়, গঙ্গাস্রোতোমধ্যে পতিত হইলেন। তাঁহার হস্তস্থিত বন্দুক সশব্দে নৌকার উপরেই পড়িল।

প্রতাপ সেই সময়ে, কটি হইতে ছুরিকা নিষ্কোষিত করিয়া, বজরার বন্ধনরজ্জু সকল কাটিলেন। সেখানে জল অল্প, স্রোতঃ মন্দ বলিয়া নাবিকেরা নঙ্গর ফেলে নাই। ফেলিলেও লঘুহস্ত, বলবান্ প্রতাপের বিশেষ বিঘ্ন ঘটিত না। প্রতাপ এক লাফ দিয়া বজরার উপর উঠিলেন।

এই ঘটনাগুলি বর্ণনায় যে সময় লাগিয়াছে, তাহার শতাংশ সময় মধ্যেই সে সকল সম্পন্ন হইয়াছিল। প্রহরীর পতন, ফষ্টরের বাহিরে আসা, তাঁহার পতন, এবং প্রতাপের নৌকারোহণ, এই সকলে যে সময় লাগিয়াছিল, ততক্ষণে দ্বিতীয় নৌকার লোকেরা বজরার নিকটে আসিতে পারে নাই। কিন্তু তাহারাও আসিল।

আসিয়া দেখিল, নৌকা প্রতাপের কৌশলে বাহির জলে গিয়াছে। একজন সাঁতার দিয়া নৌকা ধরিতে আসিল, প্রতাপ একটা লগি তুলিয়া তাহার মস্তকে মারিলেন। সে ফিরিয়া গেল। আর কেহ অগ্রসর হইল না। সেই লগিতে জলতল স্পৃষ্ট করিয়া প্রতাপ অবার নৌকা ঠেলিলেন। নৌকা ঘুরিয়া গভীর স্রোতোমধ্যে পড়িয়া বেগে পূর্ব্বাভিমুখে ছুটিল।

লগি হাতে প্রতাপ ফিরিয়া দেখিলেন, আর একজন "তেলিঙ্গা" সিপাহী নৌকার ছাদের উপর জানু পাতিয়া, বসিয়া বন্দুক উঠাইতেছে। প্রতাপ লগি ফিরাইয়া সিপাহীর হাতের উপর মারিলেন; তাহার হাত অবশ হইল—বন্দুক পড়িয়া গেল। প্রতাপ সেই বন্দুক তুলিয়া লইলেন। ফষ্টরের হস্তচ্যুত বন্দুকও তুলিয়া লইলেন। তখন তিনি নৌকাস্থিত সকলকে বলিলেন, "শুন, আমার নাম প্রতাপ রায়। নবাবও আমাকে ভয় করেন। এই দুই বন্দুক আর লগির বাড়ী—বোধ হয়, তোমাদের কয়জনকে একেলাই মারিতে পারি। তোমরা যদি আমার কথা শুন, তবে কাহাকেও কিছু বলিব না। আমি হালে যাইতেছি, দাঁড়ীরা সকলে দাঁড় ধরুক। আর আর সকলে যেখানে যে আছ, সেইখানে থাক। নড়িলেই মরিবে—নচেৎ শঙ্কা নাই।"

এই বলিয়া প্রতাপ রায় দাঁড়ীদিগকে এক একটা লগির খোঁচা দিয়া উঠাইয়া দিলেন। তাহারা ভয়ে জড় সড় হইয়া দাঁড় ধরিল। প্রতাপ রায় গিয়া নৌকার হাল ধরিলেন। কেহ আর কিছু বলিল না। নৌকা দ্রুতবেগে চলিল। ভড়ের উপর হইতে দুই একটা বন্দুক হইল, কিন্তু কাহাকে লক্ষ্য করিতে হইবে, নক্ষত্রালোকে তাহা কিছু কেহ অবধারিত করিতে না পারাতে সে শব্দ তখই নিবারিত হইল।

তখন ভড় হইতে জন কয়েক লোক বন্দুক লইয়া এক ডিঙ্গিতে উঠিয়া, বজরা ধরিতে আসিল। প্রতাপ প্রথমে কিছু বলিলেন না। তাহারা নিকটে আসিলে, দুইটি বন্দুকই তাহাদিগের উপর লক্ষ্য করিয়া ছাড়িলেন। দুই জন লোক আহত হইল। অবশিষ্ট লোক ভীত হইয়া, ডিঙ্গী ফিরাইয়া পলায়ন করিল।

কসাড় বনে লুক্কায়িত রামচরণ, প্রতাপকে নিষ্কণ্টক দেখিয়া এবং ভড়ের সিপাহীগণ কসাড়বন খুঁজিতে আসিতেছে দেখিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : বজ্রাঘাত

সেই নৈশ-গঙ্গাবিচারিণী তরণী মধ্যে নিদ্রা হইতে জাগিল—শৈবলিনী।

বজরার মধ্যে দুইটি কামরা—একটিতে ফষ্টর ছিলেন, আর একটিতে শৈবলিনী এবং তাহার দাসী। শৈবলিনী এখনও বিবি সাজে নাই—পরণে কালাপেড়ে সাড়ী, হাতে বালা, পায়ে মল—সঙ্গে সেই পুরন্দরপুরের দাসী পার্ব্বতী। শৈবলিনী নিদ্রিত ছিল—শৈবলিনী স্বপ্ন দেখিতেছিল—সেই ভীমা পুষ্করিণীর চারি পাশে জলসংস্পর্শপ্রার্থিশাখারাজিতে বাপীতীর অন্ধকারের রেখাযুক্ত—শৈবলিনী যেন তাহাতে পদ্ম হইয়া মুখ ভাসাইয়া রহিয়াছে। সরোবরের প্রান্তে যেন এক সুবর্ণনির্ম্মিত রাজহংস বেড়াইতেছে—তীরে একটা শ্বেত শূকর বেড়াইতেছে। রাজহংস দেখিয়া, তাহাকে ধরিবার জন্য শৈবলিনী যেন উৎসুক হইয়াছে; কিন্তু রাজহংস তাহার দিক্ ইহতে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতেছে। শূকর শৈবলিনীপদ্মকে ধরিবার জন্য ফিরিয়া বেড়াইতেছে, রাজহংসের মুখ দেখা যাইতেছে না,

কিন্তু শূকরের মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন, ফষ্টরের মুখের মত। শৈবলিনী রাজহংসকে ধরিতে যাইতে চায়, কিন্তু চরণ মৃণাল হইয়া জলতলে বদ্ধ হইয়াছে—তাহার গতিশক্তি রহিত। এদিকে শূকর বলিতেছে, “আমার কাছে আইস, আমি হাঁস ধরিয়া দিব।” প্রথম বন্দুকের শব্দে শৈবলিনীর নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল—তাহার পর প্রহরীর জলে পড়িবার শব্দ শুনিল। অসম্পূর্ণ—ভগ্ন নিদ্রার আবেশে কিছুকাল বুঝিতে পারিল না। সেই রাজহংস—সেই শূকর মনে পড়িতে লাগিল। যখন আবার বন্দুকের শব্দ হইল, এবং বড় গণ্ডগোল হইয়া উঠিল, তখন তাহার সম্পূর্ণ নিদ্রাভঙ্গ হইল। বাহিরের কামরায় আসিয়া দ্বার হইতে একবার দেখিল—কিছু বুঝিতে পারিল না। আবার ভিতরে আসিল। ভিতরে আলো জ্বলিতেছিল। পার্ব্বতীও উঠিয়াছিল। শৈবলিনী পার্ব্বতীকে জিজ্ঞাসা করিল, “কি হইতেছে, কিছু বুঝিতে পারিতেছ?”

পা। কিছু না। লোকের কথায় বোধ হইতেছে, নৌকায় ডাকাত পড়িয়াছে—সাহেবকে মারিয়া ফেলিয়াছে। আমাদেরই পাপের ফল।

শৈ। সাহেবকে মারিয়াছে, তাতে আমাদের পাপের ফল কি? সাহেবেরই পাপেল ফল।

পা। ডাকাত পড়িয়াছে—বিপদ্ আমাদেরই।

শৈ। কি বিপদ্? এক ডাকাতের সঙ্গে ছিলাম, না হয় আর এক ডাকাতের সঙ্গে যাইব। যদি গোরা ডাকাতের হাত এড়াইয়া কালা ডাকাতের হাতে পড়ি, তবে মন্দ কি?

এই বলিয়া, শৈবলিনী ক্ষুদ্র মস্তক হইতে পৃষ্ঠোপরি বিলম্বিত বেণী আন্দোলিত করিয়া, একটু হাসিয়া, ক্ষুদ্র পালঙ্কের উপর গিয়া বসিল। পার্ব্বতী বলিল, “এ সময়ে তোমার হাসি আমার সহ্য হয় না।”

শৈবলিনী বলিল, “অসহ্য হয়, গঙ্গায় জল আছে, ডুবিয়া মর। আমার হাসির সময় উপস্থিত হইয়াছে, আমি হাসিব। একজন ডাকাতকে ডাকিয়া আন না, একটু জিজ্ঞাসা পড়া করি।”

পার্ব্বতী রাগ করিয়া বলিল, “ডাকিতে হইবে না; তাহারা আপনারাই আসিবে।”

কিন্তু চারি দণ্ডকাল পর্য্যন্ত অতিবাহিত হইল, ডাকাত কেহ আসিল না। শৈবলিনী তখন দুঃখিত হইয়া বলিল, “আমাদের কি কপাল! ডাকাতেরাও ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে না।” পার্ব্বতী কাঁপিতেছিল।

অনেকক্ষণ পরে নৌকা আসিয়া এক চরে লাগিল। নৌকা সেইখানে কিছুক্ষণ লাগিয়া রহিল, পরে, তথায় কয়েক জন লাঠিয়াল এক শিবিকা লইয়া উপস্থিত হইল। অগ্রে অগ্রে রামচরণ।

শিবিকা, বাহকেরা চরের উপর রাখিল। রামচরণ বজরায় উঠিয়া প্রতাপের কাছে গেল। পরে প্রতাপের উপদেশ পাইয়া সে কামরার ভিতর প্রবেশ করিল। প্রথমে সে পার্ব্বতীর মুখপ্রতি চাহিয়া শেষে শৈবলিনীকে দেখিল। শৈবলিনীকে বলিল, “আপনি নামুন।”

শৈবলিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কে,—কোথায় যাইবে?”

রামচরণ বলিল, “আমি আপনার চাকর। কোন চিন্তা নাই—আমার সঙ্গে আসুন। সাহেব মরিয়াছে।”

শৈবলিনী নিঃশব্দে গাত্রোত্থান করিয়া রামচরণের সঙ্গে আসিলেন। রামচরণের সঙ্গে সঙ্গে নৌকা হইতে নামিলেন। পার্ব্বতী সঙ্গে যাইতেছিল—রামচরণ তাহাকে নিষেধ করিল। পার্ব্বতী ভয়ে নৌকার মধ্যেই রহিল, রামচরণ শৈবলিনীকে শিবিকামধ্যে প্রবেশ করিতে বলিলে, শৈবলিনী শিবিকারূঢ়া হইলেন। রামচরণ শিবিকা সঙ্গে প্রতাপের গৃহে গেল।

তখনও দলনী এবং কুল্‌সম্‌ সেই গৃহে বাস করিতেছিল। তাহাদিগের নিদ্রা ভঙ্গ হইবে বলিয়া যেখানে তাহারা ছিল, সেখানে শৈবলিনীকে লইয়া গেল না। উপরে লইয়া গিয়া তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে বলিয়া রামচরণ আলো জ্বালিয়া রাখিয়া, শৈবলিনীকে প্রণাম করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া বিদায় হইল।

শৈবলিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কাহার বাড়ী?" রামচরণ সে কথা কাণে তুলিল না।

রামচরণ আপনার বুদ্ধি খরচ করিয়া শৈবলিনীকে প্রতাপের গৃহে আনিয়া তুলিল, প্রতাপের সেরূপ অনুমতি ছিল না। তিনি রামচরণকে বলিয়া দিয়াছিলেন, পাল্কী জগৎশেঠের গৃহে লইয়া যাও। রামচরণ পথে ভাবিল—"এ রাত্রে জগৎশেঠের ফটক খোলা পাইব কি না? দ্বারবানেরা প্রবেশ করিতে দিবে কি না? জিজ্ঞাসিলে কি পরিচয় দিব? পরিচয় দিয়া কি আমি খুনে বলিয়া ধরা পড়িব? সে সকলে কাজ নাই; এখন বাসায় যাওয়াই ভাল।" এই ভাবিয়া সে পাল্কী বাসায় আনিল।

এদিকে প্রতাপ, পাল্কী চলিয়া গেল দেখিয়া, নৌকা হইতে নামিলেন। পূর্ব্বেই সকলে তাঁহার হাতের বন্দুক দেখিয়া, নিস্তব্ধ হইয়াছিল—এখন তাঁহার লাঠিয়াল সহায় দেখিয়া কেহ কিছু বলিল না। প্রতাপ নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া আত্মগৃহাভিমুখে চলিলেন। তিনি গৃহদ্বারে আসিয়া দ্বার ঠেলিলে, রামচরণ দ্বার মোচন করিল। রামচরণ যে তাঁহার আজ্ঞার বিপরীত কার্য্য করিয়াছে, তাহা গৃহে আসিয়াই রামচরণের নিকট শুনিলেন। শুনিয়া কিছু বিরক্ত হইলেন। বলিলেন, "এখনও তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া জগৎশেঠের গৃহে লইয়া যাও। ডাকিয়া লইয়া আইস।"

রামচরণ আসিয়া দেখিল,—লোকে শুনিয়া বিস্মিত হইবে—শৈবলিনী নিদ্রা যাইতেছেন। এ অবস্থায় নিদ্রা সম্ভবে না। সম্ভবে কি না, তাহা আমরা জানি না,—আমরা যেমন ঘটিয়াছে, তেমনি লিখিতেছি। রামচরণ শৈবলিনীকে জাগরিতা না করিয়া প্রতাপের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "তিনি ঘুমাইতেছেন—ঘুম ভাঙ্গাইব কি?" শুনিয়া প্রতাপ বিস্মিত হইল—মনে মনে বলির, চাণক্য পণ্ডিত লিখিতে ভুলিয়াছেন; নিদ্রা স্ত্রীলোকের যোল গুণ। প্রকাশ্যে বলিলেন, "এত পীড়াপীড়িতে প্রয়োজন নাই। তুমিও ঘুমাও—পরিশ্রমের একশেষ হইয়াছে। আমিও এখন একটু বিশ্রাম করিব।"

রামচরণ বিশ্রাম করিতে গেল। তখনও কিছু রাত্রি আছে। গৃহ—গৃহের বাহিরে নগরী—সর্ব্বত্র শব্দহীন, অন্ধকার। প্রতাপ একাকী নিঃশব্দে উপরে উঠিলেন। আপন শয়নকক্ষাভিমুখে চলিলেন। তথায় উপনীত হইয়া দ্বার মুক্ত করিলেন—দেখিলেন, পালঙ্কে শয়ানা শৈবলিনী। রামচরণ বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিল যে, প্রতাপের শয্যাগৃহেই সে শৈবলিনীকে রাখিয়া আসিয়াছে।

প্রতাপ জ্বালিত প্রদীপালোকে দেখিলেন যে, শ্বেত শয্যার উপর কে নির্ম্মল প্রস্ফুটিত কুসুমরাশি ঢালিয়া রাখিয়াছে। যেন বর্ষাকালে গঙ্গার স্থির শ্বেত-বারি বিস্তারের উপর কে প্রফুল্ল-শ্বেত-পদ্ম-রাশি ভাসাইয়া দিয়াছে। মনোমোহিনী স্থির শোভা! দেখিয়া প্রতাপ সহসা চক্ষু ফিরাইতে পারিলেন না। সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, বা ইন্দ্রিয়-বশ্যতা প্রযুক্ত যে, তাঁহার চক্ষু ফিরিল না এমত নহে—কেবল অন্যমন বশতঃ তিনি বিমুগ্ধের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। অনেক দিনের কথা তাঁহার মনে পড়িল—অকস্মাৎ স্মৃতি-সাগর মথিত হইয়া তরঙ্গের উপর তরঙ্গ প্রহত হইতে লাগিল।

শৈবলিনী নিদ্রা যান নাই—চক্ষু মুদিয়া আপনার অবস্থা চিন্তা করিতেছিলেন। চক্ষু নিমীলিত দেখিয়া, রামচরণ সিদ্ধান্ত করিয়াছিল যে, শৈবলিনী নিদ্রিতা। গাঢ় চিন্তাবশতঃ প্রতাপের প্রথম প্রবেশের পদধ্বনি শৈবলিনী শুনিতে পান নাই। প্রতাপ বন্দুকটি হাতে করিয়া উপরে আসিয়াছিলেন। এখন বন্দুকটি দেয়ালে ঠেস দিয়া রাখিলেন। কিছু অন্যমনা হইয়াছিলেন—সাবধানে বন্দুকটি রাখা হয় নাই; বন্দুকটি রাখিতে পড়িয়া গেল। সেই শব্দে শৈবলিনী চক্ষু চাহিলেন—প্রতাপকে দেখিতে পাইলেন। শৈবলিনী চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিলেন। তখন শৈবলিনী উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "এ কি এ? কে তুমি?"

এই বলিয়া শৈবলিনী পালঙ্কে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

প্রতাপ জল আনিয়া, মূর্চ্ছিতা শৈবলিনীর মুখমণ্ডলে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন—সে মুখ শিশির-নিষিক্ত-পদ্মের মত শোভা পাইতে লাগিল। জল, কেশগুচ্ছ সকল আর্দ্র করিয়া, কেশগুচ্ছসকল ঋজু করিয়া, ঝরিতে লাগিল—কেশ, পদ্মবলম্বী শৈবালবৎ শোভা পাইতে লাগিল।

অচিরাৎ শৈবলিনী সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইল। প্রতাপ দাঁড়াইলেন। শৈবলিনী স্থিরভাবে বলিলেন, "কে তুমি? প্রতাপ? না , কোন দেবতা ছলনা করিতে আসিয়াছ?"

প্রতাপ বলিলেন, "আমি প্রতাপ।"

শৈ। একবার নৌকায় বোধ হইয়াছিল, যেন তোমার কণ্ঠ কাণে প্রবেশ করিল। কিন্তু তখনই বুঝিলাম যে, সে ভ্রান্তি। আমি স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে জাগিয়াছিলাম, সেই কারণে ভ্রান্তি মনে করিলাম।

এই বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শৈবলিনী নীরব হইয়া রহিলেন। শৈবলিনী সম্পূর্ণরূপে সুস্থিরা হইয়াছেন দেখিয়া প্রতাপ বিনাবাক্যব্যয়ে গমনোদ্যত হইলেন। শৈবলিনী বলিলেন, "যাইও না।"

প্রতাপ বলিলেন, "আমার এই বাসা।"

শৈবলিনী বস্তুতঃ সুস্থিরা হন নাই। হৃদয়মধ্যে অগ্নি জ্বলিতেছিল—তাঁহার নখ পর্য্যন্ত কাঁপিতেছিল—সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়াছিল। তিনি, আর একটু নীরব থাকিয়া, ধৈর্য্য সংগ্রহ করিয়া পুনরপি বলিলেন, "আমাকে এখানে কে আনিল?"

প্র। আমরাই আনিয়াছি।

শৈ। আমরাই? আমরা কে?

প্র। আমি আর আমার চাকর।

শৈ। কেন তোমরা এখানে আনিলে? তোমাদের কি প্রয়োজন?

প্রতাপ অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন, বলিলেন, "তোমার মত পাপিষ্ঠার মুখ দর্শন করিতে নাই। তোমাকে ম্লেচ্ছের হাত হইতে উদ্ধার করিলাম,—আবার তুমি জিজ্ঞাসা কর, এখানে কেন আনিলে?"

শৈবলিনী ক্রোধ দেখিয়া ক্রোধ করিলেন না—বিনীত ভাবে, প্রায় বাষ্পগদ্গদ হইয়া বলিলেন, "যদি ম্লেচ্ছের ঘরে থাকা আমার এত দুর্ভাগ্য মনে করিয়াছিলে—তবে আমাকে সেইখানে মারিয়া ফেলিলে না কেন? তোমাদের হাতে ত বন্দুক ছিল।"

প্রতাপ অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তাও করিতাম—কেবল স্ত্রীহত্যার ভয়ে করি নাই; কিন্তু তোমার মরণই ভাল।"

শৈবলিনী কাঁদিল। পরে রোদন সম্বরণ করিয়া বলিল,—"আমার মরাই ভাল—কিন্তু অন্যে যাহা বলে বলুক—তুমি আমায় এ কথা বলিও না। আমার এ দুর্দ্দশা কাহা হতে? তোমা হতে। কে আমার জীবন অন্ধকারময় করিয়াছে? তুমি। কাহার জন্য সুখের আশায় নিরাশ হইয়া কুপথ সুপথ জ্ঞানশূন্য হইয়াছি? তোমার জন্য। কাহার জন্য দুঃখিনী হইয়াছি? তোমার জন্য। কাহার জন্য আমি গৃহধর্ম্মে মন রাখিতে পারিলাম না? তোমারই জন্য। তুমি আমায় গালি দিও না।"

প্রতাপ বলিলেন, "তুমি পাপিষ্ঠা, তাই তোমায় গালি দিই। আমার দোষ! ঈশ্বর জানেন, আমি কোন দোষে দোষী নহি। ঈশ্বর জানেন, ইদানীং আমি তোমাকে সর্প মনে করিয়া, ভয়ে তোমার পথ ছাড়িয়া থাকিতাম। তোমার বিষের ভয়ে আমি বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলাম। তোমার নিজের হৃদয়ের দোষ—তোমার প্রবৃত্তির দোষ! তুমি পাপিষ্ঠা, তাই আমার দোষ দাও। আমি তোমার কি করিয়াছি?"

শৈবলিনী গর্জ্জিয়া উঠিল—বলিল, "তুমি কি করিয়াছ? কেন তুমি, তোমার ঐ অতুল্য দেবমূর্ত্তি লইয়া আবার আমায় দেখা দিয়াছিলে? আমার স্ফুটনোন্মুখ যৌবনকালে, ও রূপের জ্যোতি কেন আমার সম্মুখে জ্বালিয়াছিলে? যাহা একবার ভুলিয়াছিলাম, আবার কেন তাহা উদ্দীপ্ত করিয়াছিলে? আমি কেন তোমাকে দেখিয়াছিলাম? দেখিয়াছিলাম ত তোমাকে পাইলাম না কেন? না পাইলাম ত মরিলাম না কেন? তুমি কি জান না, তোমারই রূপ ধ্যান করিয়া গৃহ আমার অরণ্য হইয়াছিল? তুমি কি জান না যে, তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে যদি কখন তোমায় পাইতে পারি, এই আশায় গৃহত্যাগিনী হইয়াছি? নহিলে ফষ্টর আমার কে?"

শুনিয়া, প্রতাপের মাথায় বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল—তিনি বৃশ্চিকদষ্টের ন্যায় পীড়িত হইয়া, সে স্থান হইতে বেগে পলায়ন করিলেন।

সেই সময়ে বহির্দ্ধারে একটা বড় গোল উপস্থিত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : গল্‌ষ্টন ও জন্‌সন্‌

রামচরণ নৌকা হইতে শৈবলিনীকে লইয়া উঠিয়া গেলে, এবং প্রতাপ নৌকা পরিত্যাগ করিয়া গেলে, যে তেলিঙ্গা সিপাহী প্রতাপের আঘাতে অবসন্নহস্ত হইয়া ছাদের উপরে বসিয়াছিল, সে ধীরে ধীরে তটের উপর উঠিল। উঠিয়া যে পথে শৈবলিনীর শিবিকা গিয়াছে, সেই পথে চলিল। অতিদূরে থাকিয়া শিবিকা লক্ষ্য করিয়া, তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল। সে জাতিতে মুসলমান। তাহার নাম বকাউল্লা খাঁ। ক্লাইবের সঙ্গে প্রথম যে সেনা বঙ্গদেশে আসিয়াছিল, তাহারা মান্দ্রাজ হইতে আসিয়াছিল বলিয়া, ইংরেজদিগের দেশী সৈনিকগণকে তখন বাঙ্গালাতে তেলিঙ্গা বলিত; কিন্তু এক্ষণে অনেক হিন্দুস্থানী হিন্দু ও মুসলমান ইংরেজসেনা-ভুক্ত হইয়াছিল। বকাউল্লার নিবাস, গাজিপুরের নিকট।

বকাউল্লা শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষ্যে থাকিয়া, প্রতাপের বাসা পর্য্যন্ত আসিল। দেখিল যে, শৈবলিনী প্রতাপের গৃহে প্রবেশ করিল। বকাউল্লা তখন আমিয়ট সাহেবের কুঠিতে গেল।

বকাউল্লা তথায় আসিয়া দেখিল, কুঠিতে একটা বড় গোল পড়িয়া গিয়াছে। বজরার বৃত্তান্ত আমিয়ট সকল শুনিয়াছেন। শুনিল, আমিয়ট সাহেব বলিয়াছেন যে, যে অদ্য রাত্রেই অত্যাচারীদিগের সন্ধান করিয়া দিতে পারিবে, আমিয়ট সাহেব তাহাকে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক দিবেন। বকাউল্লা তখন আমিয়ট সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল—তাঁহাকে সবিশেষ বৃত্তান্ত বলিল,—বলিল যে, "আমি সেই দস্যুর গৃহ দেখাইয়া দিতে পারি।" আমিয়ট সাহেবের মুখ প্রফুল্ল হইল—কুঞ্চিত ভ্রূ ঋজু হইল—তিনি চারি জন সিপাহী এবং একজন নাএককে বকাউল্লার সঙ্গে যাইতে অনুমতি করিলেন। বলিলেন যে, দুরাত্মাদিগকে ধরিয়া এখনই আমার নিকটে লইয়া আইস। বকাউল্লা কহিল, "তবে দুই জন ইংরেজ সঙ্গে দিউন—প্রতাপ রায় সাক্ষাৎ শয়তান—এ দেশীয় লোক তাহাকে ধরিতে পারিবে না।"

গল্‌ষ্টন ও জন্‌সন্‌ নামক দুই জন ইংরেজ আমিয়টের আজ্ঞামত বকাউল্লার সঙ্গে সশস্ত্রে চলিলেন।

গমনকালে গল্‌ষ্টন্‌ বকাউল্লাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি সে বাড়ীর মধ্যে কখন গিয়াছিলে?"

বকাউল্লা বলিল, "না।"

গল্‌ষ্টন্‌ জন্‌সন্‌কে বলিলেন, "তবে বাতি ও দেশলাইও লও। হিন্দু তেল পোড়ায় না—খরচ হইবে।"

জন্‌সন্‌ পকেটে বাতি দীপশলাকা গ্রহণ করিলেন।

তাঁহারা তখন, ইংরেজদিগের রণ-যাত্রার গভীর পদবিক্ষেপে রাজপথ বহিয়া চলিলেন। কেহ কথা কহিল না। পশ্চাতে পশ্চাতে চারি জন সিপাহী, নাএক ও বকাউল্লা চলিল। নগরপ্রহরিগণ পথে তাঁহাদিগকে দেখিয়া, ভীত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। গল্‌ষ্টন্ ও জন্‌সন্ সিপাহী লইয়া প্রতাপের বাসার সম্মুখে নিঃশব্দে আসিয়া, দ্বারে ধীরে ধীরে করাঘাত করিলেন। রামচরণ উঠিয়া দ্বার খুলিতে আসিল।

রামচরণ অদ্বিতীয় ভৃত্য। পা টিপিতে, গা টিপিতে, তৈল মাখাইতে সুশিক্ষিতহস্ত। বস্ত্রকুঞ্চনে, অঙ্গরাগকরণে, বড় পটু। রামচরণের মত ফরাশ নাই—তাহার মত দ্রব্যক্রেতা দুর্লভ। কিন্তু এ সকল সামান্য গুণ। রামচরণ লাঠিবাজিতে মুরশিদাবাদ প্রদেশে প্রসিদ্ধ—অনেক হিন্দু ও যবন তাহার হস্তের গুণে ধরাশয়ন করিয়াছিল। বন্দুকে রামচরণ কেমন অভ্রান্তলক্ষ্য এবং ক্ষিপ্রহস্ত, তাহার পরিচয় ফষ্টরের শোণিতে গঙ্গাজলে লিখিত হইয়াছিল।

কিন্তু এ সকল অপেক্ষা রামচরণের আর একটি সময়োপযোগী গুণ ছিল—ধূর্ত্ততা। রামচরণ শৃগালের মত ধূর্ত্ত। অথচ অদ্বিতীয় প্রভুভক্ত এবং বিশ্বাসী।

রামরচণ দ্বার খুলিতে আসিয়া ভাবিল, "এখন দুয়ারে ঘা দেয় কে? ঠাকুর মশায়? বোধ হয়; কিন্তু যা হোক একটা কাণ্ড করিয়া আসিয়াছি—রাত্রিকালে না দেখিয়া দুয়ার খোলা হইবে না।"

এই ভাবিয়া রামচরণ নিঃশব্দে আসিয়া কিয়ৎক্ষণ দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া শব্দ শুনিতে লাগিল। শুনিল, দুই জনে অস্ফুটস্বরে একটা বিকৃত ভাষায় কথা কহিতেছে—রামচরণ তাহাকে "ইণ্ডিল মিণ্ডিল" বলিত—এখনকার লোকে বলে, ইংরেজি। রামরচণ মনে মনে বলিল, "রসো, বাবা! দুয়ার খুলি ত বন্দুক হাতে করিয়া—ইণ্ডিল মিণ্ডিলে যে বিশ্বাস করে, সে শ্যালা।"

রামচরণ আরও ভাবিল, "বুঝি একটা বন্দুকের কাজ নয়, কর্ত্তাকেও ডাকি।" এই ভাবিয়া রামচরণ প্রতাপকে ডাকিবার অভিপ্রায়ে দ্বার হইতে ফিরিল।

এই সময়ে ইংরেজদিগেরও ধৈর্য্য ফুরাইল। জন্‌সন্ বলিল, "অপেক্ষা কেন, লাথি মার, ভারতবর্ষীয় কবাট ইংরেজি লাথিতে টিকিবে না।"

গল্‌ষ্টন্ লাথি মারিল। দ্বার, খড় খড়, ছড় ছড়, ঝন ঝন করিয়া উঠিল। রামচরণ দৌড়িল। শব্দ প্রতাপের কাণে গেল। প্রতাপ উপর হইতে সোপান অবতরণ করিতে লাগিলেন। সে বার কবাট ভাঙ্গিল না।

পরে জন্‌সন্ লাথি মারিল। কবাট ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল।

"এইরূপে ব্রিটিশ পদাঘাতে সকল ভারতবর্ষ ভাঙ্গিয়া পড়ুক।" বলিয়া ইংরেজেরা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সিপাহিগণ প্রবেশ করিল।

সিঁড়িতে রামচরণের সঙ্গে প্রতাপের সাক্ষাৎ হইল। রামচরণ চুপি চুপি প্রতাপকে বলিল, "অন্ধকারে লুকাও—ইংরেজ আসিয়াছে—বোধ হয় আম্‌বাতের কুঠি থেকে।" রামচরণ আমিয়টের পরিবর্ত্তে আমবাত বলিত।

প্র। ভয় কি?

রা। আট জন লোক।

প্র। আপনি লুকাইয়া থাকিব—আর এই বাড়ীতে যে কয় জন স্ত্রীলোক আছে, তাহাদের দশা কি হইবে! তুমি আমার বন্দুক লইয়া আইস।

রামচরণ যদি ইংরেজদিগের বিশেষ পরিচয় জানিত, তবে প্রতাপকে কখনই লুকাইতে বলিত না। তাহারা যতক্ষণ কথোপকথন করিতেছিল, ততক্ষণে সহসা গৃহ আলোকে পূর্ণ হইল। জন্‌সন্ জ্বালিত বর্ত্তিকা একজন সিপাহীর হস্তে দিলেন। বর্ত্তিকার আলোকে ইংরেজেরা দেখিল, সিঁড়ির উপর দুই জন লোক দাঁড়াইয়া আছে। জন্‌সন্ বকাউল্লাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, এই?"

বকাউল্লা ঠিক চিনিতে পারিল না। অন্ধকার রাত্রে সে প্রতাপ ও রামচরণকে দেখিয়াছিল—সুতরাং ভাল চিনিতে পারিল না। কিন্তু তাহার ভগ্ন হস্তের যাতনা

অসহ্য হইয়াছিল—যে কেহ তাহার দায়ে দায়ী। বকাউল্লা বলিল, "হাঁ, ইহারাই বটে।"

তখন ব্যাঘ্রের মত লাফ দিয়া ইংরেজেরা সিঁড়ির উপর উঠিল। সিপাহীরা পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিল দেখিয়া, রামচরণ ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রতাপের বন্দুক আনিতে উপরে উঠিতে লাগিল।

জন্‌সন্ তাহা দেখিলেন, নিজ হস্তের পিস্তল উঠাইয়া রামচরণকে লক্ষ্য করিলেন। রামচরণ, চরণে আহত হইয়া, চলিবার শক্তি রহিত হইয়া বসিয়া পড়িল।

প্রতাপ নিরস্ত্র, পলায়নে অনিচ্ছুক এবং পলায়নে রামচরণের যে দশা ঘটিল, তাহাও দেখিলেন। প্রতাপ ইংরেজদিগকে স্থিরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে? কেন আসিয়াছ?" গল্‌ষ্টন্ প্রতাপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

প্রতাপ বলিলেন, "আমি প্রতাপ রায়।"

সে নাম বকাউল্লার মনে ছিল। বজরার উপরে বন্দুক হাতে প্রতাপ গর্ব্বভরে বলিয়াছিলেন, "শুন, আমার নাম প্রতাপ রায়।" বকাউল্লা বলিল, "জুনাব, এই ব্যক্তি সরদার।"

জন্‌সন্, প্রতাপের এক হাত ধরিল, গল্‌ষ্টন্ আর এক হাত ধরিল। প্রতাপ দেখিলেন, বলপ্রকাশ অনর্থক। নিঃশব্দে সকল সহ্য করিলেন। নাএকের হাতে হাতকড়ি ছিল, প্রতাপের হাতে লাগাইয়া দিল। গল্‌ষ্টন পতিত রামচরণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওটা?" জন্‌সন্ দুই জন সিপাহীকে আজ্ঞা দিলেন যে, "উহাকে লইয়া আইস!" দুই জন সিপাহী রামচরণকে টানিয়া লইয়া চলিল।

এই সকল গোলযোগ শুনিয়া দলনী ও কুল্‌সম্ জাগ্রত হইয়া মহা ভয় পাইয়াছিল। তাহারা কক্ষদ্বার ঈষন্মুক্ত করিয়া এই সকল দেখিতেছিল। সিঁড়ির পাশে তাহাদের শয়নগৃহ।

যখন ইংরেজেরা, প্রতাপ ও রামচরণকে লইয়া নামিতেছিলেন, তখন সিপাহীরা করস্থ দীপের আলোক, অকস্মাৎ ঈষন্মুক্ত দ্বারপথে, দলনীর নীলমণিপ্রভ চক্ষুর উপর পড়িল। বকাউল্লা সে চক্ষু দেখিতে পাইল। দেখিয়াই বলিল, "ফষ্টর সাহেবের বিবি!" গল্‌ষ্টন্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যও ত! কোথায়?"

বকাউল্লা পূর্ব্বকথিত দ্বার দেখাইয়া কহিল, "ঐ ঘরে।"

জন্‌সন্ ও গল্‌ষ্টন্ ঐ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দলনী এবং কুল্‌সম্‌কে দেখিয়া বলিলেন, "তোমরা আমাদের সঙ্গে আইস।"

দলনী ও কুল্‌সম্ মহা ভীতা এবং লুপ্তবুদ্ধি হইয়া তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

সেই গৃহমধ্যে শৈবলিনীই একা রহিল। শৈবলিনীও সকল দেখিয়াছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : পাপের বিচিত্র গতি

যেমন যবনকন্যারা অল্প দ্বার খুলিয়া, আপনাদিগের শয়নগৃহ হইতে দেখিতেছিল, শৈবলিনীও সেইরূপ দেখিতেছিল। তিন জনই স্ত্রীলোক, সুতরাং স্ত্রীজাতিসুলভ কুতূহলে তিন জনেই পীড়িতা; তিন জনেই ভয়ে কাতরা; ভয়ের স্বধর্ম্ম ভয়ানক বস্তুর দর্শন পুনঃ পুনঃ কামনা করে। শৈবলিনীও আদ্যোপ্রান্ত দেখিল। সকলে চলিয়া গেলে, গৃহমধ্যে আপনাকে একাকিনী দেখিয়া শয্যোপরি বসিয়া শৈবলিনী চিন্তা করিতে লাগিল।

ভাবিল, "এখন কি করি? একা, তাহাতে আমার ভয় কি? পৃথিবীতে আমার ভয় নাই। মৃত্যুর অপেক্ষা বিপদ্ নাই। যে স্বয়ং অহরহ মৃত্যুর কামনা করে,

তাহার কিসের ভয়? কেন আমার সেই মৃত্যু হয় না? আত্মহত্যা বড় সহজ—সহজই বা কিসে? এত দিন জলে বাস করিলাম, কই এক দিনও ত ডুবিয়া মরিতে পারিলাম না। রাত্রে যখন সকলে ঘুমাইত, ধীরে ধীরে নৌকার বাহিরে আসিয়া, জলে ঝাঁপ দিলে কে ধরিত? ধরিত—নৌকায় পাহারা থাকিত। কিন্তু আমিও ত কোন উদ্যোগ করি না। মরিতে বাসনা, কিন্তু মরিবার কোন উদ্যোগ করি নাই।—তখনও আমার আশা ছিল—আশা থাকিতে মানুষে মরিতে পরে না। কিন্তু আজ? আজ মরিবার দিন বটে। তবে প্রতাপকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে—প্রতাপের কি হয়, তাহা না জানিয়া মরিতে পারিব না। প্রতাপের কি হয়? যা হৌক না, আমার কি? প্রতাপ আমার কে? আমি তাহার চক্ষে পাপিষ্ঠা—সে আমার কে? কে, তাহা জানি না—সে শৈবলিনী-পতঙ্গের জ্বলন্ত বহ্নি—সে এই সংসার-প্রান্তরে আমার পক্ষে নিদাঘের প্রথম বিদ্যুৎ—সে আমার মৃত্যু। আমি কেন গৃহত্যাগ করিলাম, ম্লেচ্ছের সঙ্গে আসিলাম? কেন সুন্দরীর সঙ্গে ফিরিলাম না?"

শৈবলিনী আপনার কপালে করাঘাত করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। বেদগ্রামের সেই গৃহ মনে পড়িল। যেখানে প্রাচীরপার্শ্বে, শৈবলিনী স্বহস্তে করবীর বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিল—সেই করবীর সর্ব্বোচ্চ শাখা প্রাচীর অতিক্রম করিয়া রক্তপুষ্প ধারণ করিয়া, নীলাকাশকে আকাঙ্ক্ষা করিয়া দুলিত, কখন তাহাতে ভ্রমর বা ক্ষুদ্র পক্ষী আসিয়া বসিত, তাহা মনে পড়িল। তুলসী-মঞ্চ—তাহার চারি পার্শ্বে পরিষ্কৃত, সুমার্জ্জিত ভূমি, গৃহপালিত মার্জ্জার, পিঞ্জরে স্ফুটবাক্ পক্ষী, গৃহপার্শ্বে সুস্বাদু আম্রের উচ্চ বৃক্ষ—সকল স্মরণপটে চিত্রিত হইতে লাগিল। কত কি মনে পড়িল! কত সুন্দর, সুনীল, মেঘশূন্য আকাশ, শৈবলিনী ছাদে বসিয়া দেখিতেন। কত সুগন্ধ প্রস্ফুটিত ধবল কুসুম, পরিষ্কার জলসিক্ত করিয়া, চন্দ্রশেখরের পূজার জন্য পুষ্পপাত্র ভরিয়া রাখিয়া দিতেন; কত স্নিগ্ধ, মন্দ, সুগন্ধি বায়ু, ভীমাতটে সেবন করিতেন; জলে কত ক্ষুদ্র তরঙ্গে স্ফাটিক বিক্ষেপ দেখিতেন, তাহার তীরে কত কোকিল ডাকিত। শৈবলিনী আবার নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভাবিতে লাগিল, "মনে করিয়াছিলাম, গৃহের বাহির হইলেই প্রতাপকে দেখিব; মনে করিয়াছিলাম, আবার পুরন্দরপুরের কুঠিতে ফিরিয়া যাইব—প্রতাপের গৃহ এবং পুরন্দরপুর নিকট; কুঠির বাতায়নে বসিয়া কটাক্ষ-জাল পাতিয়া প্রতাপপক্ষীকে ধরিব। সুবিধা বুঝিলে সেখান হইতে ফিরিঙ্গীকে ফাঁকি দিয়া পলাইয়া যাইব—গিয়া প্রতাপের পদতলে লুটাইয়া পড়িব। আমি পিঞ্জরের পাখী, সংসারের গতি কিছুই জানিতাম না। জানিতাম না যে, মনুষ্যে গড়ে, বিধাতা ভাঙ্গে; জানিতাম না যে, ইংরেজের পিঞ্জর লোহার পিঞ্জর—আমার সাধ্য কি ভাঙ্গি। অনর্থক কলঙ্ক কিনিলাম, জাতি হারাইলাম, পরকাল নষ্ট করিলাম।" পাপিষ্ঠা শৈবলিনীর এ কথা মনে পড়িল না যে, পাপের অনর্থকতা আর সার্থকতা কি? বরং অনর্থকতাই ভাল। কিন্তু একদিন সে এ কথা বুঝিবে; একদিন প্রায়শ্চিত্ত জন্য সে অস্থি পর্য্যন্ত সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইবে। সে আশা না থাকিলে, আমরা এ পাপ চিত্রের অবতারণা করিতাম না। পরে সে ভাবিতে লাগিল, "পরকাল? সে ত যে দিন প্রতাপকে দেখিয়াছি, সেই দিন গিয়াছে। যিনি অন্তর্যামী, তিনি সেই দিনেই আমার কপালে নরক লিখিয়াছেন। ইহকালেও আমার নরক হইয়াছে—আমার মনই নরক—নহিলে এত দুঃখ পাইলাম কেন? নহিলে দুই চক্ষের বিষ ফিরিঙ্গীর সঙ্গে এত কাল বেড়াইলাম কেন? শুধু কি তাই, বোধ হয়, যাহা কিছু আমার ভাল, তাহাতেই অগ্নি লাগে। বোধ হয়, আমারই জন্য প্রতাপ এই বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছে,—আমি কেন মরিলাম না?"

শৈবলিনী আবার কাঁদিতে লাগিল। ক্ষণেক পরে চক্ষু মুছিল। ভ্রূ কুঞ্চিত করিল; অধর দংশন করিল; ক্ষণকাল জন্য তাহার প্রফুল্ল রাজীবতুল্য মুখ, রুষ্ট সর্পের চক্রের ভীমকান্তি শোভা ধারণ করিল। সে আবার বলিল, "মরিলাম না কেন?" শৈবলিনী সহসা কটি হইতে একটি "গেঁজে" বাহির করিল। তন্মধ্যে তীক্ষ্ণধার ক্ষুদ্র ছুরিকা ছিল। শৈবলিনী ছুরিকা গ্রহণ করিল। তাহার ফলক নিষ্কোষিত করিয়া, অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা তৎসহিত ক্রীড়া করিতে লাগিল। বলিল, "বৃথা কি এ ছুরি সংগ্রহ করিয়াছিলাম? কেন এত দিন এ ছুরি আমার এ পোড়া বুকে বসাই নাই? কেন,—কেবল আশায় মজিয়া। এখন?" এই বলিয়া শৈবলিনী ছুরিকাগ্রভাগ হৃদয়ে স্থাপিত করিল। ছুরি সেই ভাবে রহিল। শৈবলিনী ভাবিতে লাগিল, "আর এক দিন ছুরি এইরূপে নিদ্রিত ফষ্টরের বুকের উপর ধরিয়াছিলাম। সে দিন তাহাকে মারি নাই, সাহস হয় নাই; আজিও আত্মহত্যায় সাহস হইতেছে না। এই ছুরির ভয়ে দুরন্ত ইংরেজও বশ হইয়াছিল—সে বুঝিয়াছিল যে, সে আমার

কামরায় প্রবেশ করিলে, এই ছুরিতে হয় সে মরিবে, নয় আমি মরিব। দুরন্ত ইংরেজ ইহার ভয়ে বশ হইয়াছিল,—আমার এ দুরন্ত হৃদয় ইহার ভয়ে বশ হইল না। মরিব? না—আজ নহে। মরি, ত সেই বেদগ্রামে গিয়া মরিব। সুন্দরীকে বলিব যে, আমার জাতি নাই, কুল নাই, কিন্তু এক পাপে আমি পাপিষ্ঠা নহি। তার পর মরিব।—আর তিনি—যিনি আমার স্বামী—তাঁহাকে কি বলিয়া মরিব? কথা ত মনে করিতে পারি না। মনে করিলে বোধ হয়, আমাকে শত সহস্র বৃশ্চিক দংশন করে—শিরায় শিরায় আগুন জ্বলে। আমি তাঁহার যোগ্যা নহি, বলিয়া আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। তাতে কি তাঁর কোন ক্লেশ হইয়াছে? তিনি কি দুঃখ করিয়াছেন? না—আমি তাঁহার কেহ নহি। পুঁতিই তাঁহার সব। তিনি আমারা জন্য দুঃখ করিবেন না। একবার নিতান্ত সাধ হয়, এই কথাটি আমাকে কেহ আসিয়া বলে—তিনি কেমন আছেন, কি করিতেছেন। তাঁহাকে আমি কখন ভালবাসি নাই—কখন ভালবাসিতে পারিব না—তথাপি তাঁহার মনে যদি কোন ক্লেশ দিয়া থাকি, তবে আমার পাপের ভরা আরও ভারি হইল। আর একটি কথা তাঁহাকে বলিতে সাধ করে,—কিন্তু ফষ্টর মরিয়া গিয়াছে, কে কথার আর সাক্ষী কে? আমার কথায় সে বিশ্বাস করিবে?" শৈবলিনী শয়ন করিল। শয়ন করিয়া, সেইরূপ চিন্তাভিভূত রহিল। প্রভাতকালে তাহার নিদ্রা আসিল—নিদ্রায় নানাবিধ কুস্বপ্ন দেখিল। যখন তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিল, তখন বেলা হইয়াছে—মুক্ত গবাক্ষপথে গৃহমধ্যে রৌদ্র প্রবেশ করিয়াছে। শৈবলিনী চক্ষুরুন্মীলন করিল। চক্ষুরুন্মীলন করিয়া সম্মুখে যাহা দেখিল, তাহাতে বিস্মিত, ভীত, স্তম্ভিত হইল! দেখিল, চন্দ্রশেখর।

তৃতীয় খণ্ড

পুণ্যের স্পর্শ

প্রথম পরিচ্ছেদ : রমানন্দ স্বামী

মুঙ্গেরের এক মঠে, একজন পরমহংস কিয়দ্দিবস বসতি করিতেছিলেন। তাঁহার নাম রমানন্দ স্বামী। সেই ব্রহ্মচারী তাঁহার সঙ্গে বিনীত ভাবে কথোপকথন করিতেছিলেন। অনেকে জানিতেন, রমানন্দ স্বামী সিদ্ধপুরুষ। তিনি অদ্বিতীয় জ্ঞানী বটে। প্রবাদ ছিল যে, ভারতবর্ষের লুপ্ত দর্শন বিজ্ঞান সকল তিনিই জানিতেন। তিনি বলিতেছিলেন, "শুন, বৎস চন্দ্রশেখর! যে সকল বিদ্যা উপার্জ্জন করিলে, সাবধানে প্রয়োগ করিও। আর কদাপি সন্তাপকে হৃদয়ে স্থান দিও না। কেন না, দুঃখ বলিয়া একটা স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। সুখ দুঃখতুল্য বা বিজ্ঞের কাছে একই। যদি প্রভেদ কর, তবে যাহারা পূণ্যাত্মা বা সুখী বলিয়া খ্যাত, তাহাদের চিরদুঃখী বলিতে হয়।"

এই বলিয়া রমানন্দ স্বামী প্রথমে, যযাতি, হরিশ্চন্দ্র, দশরথ প্রভৃতি প্রাচীন রাজগণের কিঞ্চিৎ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। শ্রীরামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, নলরাজা প্রভৃতির কিঞ্চিৎ উল্লেক করিলেন। দেখাইলেন, সার্ব্বভৌম মহাপুণ্যাত্মা রাজগণ চিরদুঃখী—কদাচিৎ সুখী। পরে, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতির কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিলেন—দেখাইলেন, তাঁহারাও দুঃখী। দানবপীড়িত, অভিশপ্ত ইন্দ্রাদি দেবতার উল্লেখ করিলেন—দেখাইলেন, সুরলোকও দুঃখপূর্ণ। শেষে, মনোমোহিনী

বাক্‌শক্তির দৈবাবতারণা করিয়া, অনন্ত, অপরিজ্ঞেয়, বিধাতৃহৃদয়মধ্যে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। দেখাইলেন যে, যিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি এই দুঃখময় অনন্ত সংসারের অনন্ত দুঃখরাশি অনাদি অনন্ত কালাবধি হৃদয়মধ্যে অবশ্য অনুভূত করেন। যিনি দয়াময়, তিনি কি সেই দুঃখরাশি অনুভূত করিয়া দুঃখিত হন না? তবে দয়াময়, কিসে? দুঃখের সঙ্গে দয়ার নিত্য সম্বন্ধ—দুঃখ না হইলে দয়ার সঞ্চার কোথায়? যিনি দয়াময়, তিনি অনন্ত সংসারের অনন্ত দুঃখে অনন্ত কাল দুঃখী—নচেৎ তিনি দয়াময় নহেন। যদি বল, তিনি নির্ব্বিকার, তাঁহার দুঃখ কি? উত্তর এই যে, যিনি নির্ব্বিকার, তিনি সৃষ্টিস্থিতিসংহারে স্পৃহাশূন্য—তাঁহাকে স্রষ্টা বিধাতা বলিয়া মানি না। যদি কেহ স্রষ্টা বিধাতা থাকেন, তবে তাঁহাকে নির্ব্বিকার বলিতে পারি না—তিনি দুঃখময়। কিন্তু তাহাও হইতে পারে না; কেন না, তিনি নিত্যানন্দ। অতএব দুঃখ বলিয়া কিছু নাই, ইহাই সিদ্ধ।

রমানন্দ স্বামী বলিতে লাগিলেন, "আর যদি দুঃখের অস্তিত্বই স্বীকার কর, তবে এই সর্ব্বব্যাপী দুঃখ নিবারণের উপায় কি নাই? উপায় নাই; তবে যদি সকলে সকলের দুঃখ নিবারণের জন্য নিযুক্ত থাকে, তবে অবশ্য নিবারণ হইতে পারে। দেখ, বিধাতা স্বয়ং অহরহ সৃষ্টির দুঃখ নিবারণে নিযুক্ত। সংসারের সেই দুঃখনিবৃত্তিতে ঐশিক দুঃখের ও নিবারণ হয়। দেবগণ জীবদুঃখ-নিবারণে নিযুক্ত—তাহাতেই দৈব সুখ। নচেৎ ইন্দ্রিয়াদির বিকারশূন্য দেবতার অন্য সুখ নাই।" পরে ঋষিগণের লোকহিতৈষিকা কীর্ত্তন করিয়া ভীষ্মাদি বীরগণের পরোপকারিতার বর্ণন করিলেন। দেখাইলেন, যেই পরোপকারী, সেই সুখী, অন্য কেহ সুখী নহে। তখন রমানন্দ স্বামী শতমুখে পরোপকার ধর্ম্মের গুণকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। ধর্ম্মশাস্ত্র, বেদ, পুরাণেতিহাস প্রভৃতি মন্থন করিযা অনর্গল ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রযুক্ত করিতে লাগিলেন। শব্দসাগর মন্থন করিয়া শত শত মহার্থ শ্রবণমনোহর, বাক্যপরম্পরা কুসুমমালাবৎ গ্রন্থন করিতে লাগিলেন—সাহিত্য-ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া, সারবতী, রসপূর্ণা, সদলঙ্কারবিশিষ্টা কবিতানিচয় বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বোপরি, আপনার অকৃত্রিম ধর্ম্মানুরাগের মোহময়ী প্রতিভান্বিতা ছায়া বিস্তারিত করিলেন। তাঁহার সুকণ্ঠনির্গত, উচ্চারণকৌশলযুক্ত সেই অপূর্ব্ব বাক্য সকল চন্দ্রশেখরের কর্ণে তূর্য্যনাদবৎ ধ্বনিত হইতে লাগিল। সে বাক্যসকল কখন মেঘগর্জ্জনবৎ গম্ভীর শব্দে শব্দিত হইতে লাগিল—কখন বীণানিক্কণবৎ মধুর বোধ হইতে লাগিল! ব্রহ্মচারী বিস্মিত, মোহিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। তিনি গাত্রোত্থান করিয়া রমানন্দ স্বামীর পদরেণু গ্রহণ করিলেন। বলিলেন, "গুরুদেব! আজি হইতে আমি আপনার নিকট এ মন্ত্র গ্রহণ করিলাম।"

রমানন্দ স্বামী চন্দ্রশেখরকে আলিঙ্গন করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : নূতন পরিচয়

এদিকে যথাসময়ে, ব্রহ্মচারিদত্ত পত্র নবাবের নিকট পেশ হইল। নবাব জানিলেন, সেখানে দলনী আছেন। তাঁহাকে ও কুল্‌সম্‌কে লইয়া যাইবার জন্য প্রতাপ রায়ের বাসায় শিবিকা প্রেরিত হইল।

তখন বেলা হইয়াছে। তখন সে গৃহে শৈবলিনী ভিন্ন আর কেহই ছিল না। তাঁহাকে দেখিয়া নবাবের অনুচরেরা বেগম বলিয়া স্থির করিল।

শৈবলিনী শুনিল, তাঁহাকে কেল্লায় যাইতে হইবে। অকস্মাৎ তাঁহার মনে এক দুরভিসন্ধি উপস্থিত হইল। কবিগণ আশার প্রশংসায় মুগ্ধ হন। আশা, সংসারের অনেক সুখের কারণ বটে, কিন্তু আশাই দুঃখের মূল। যত পাপ কৃত হয়, সকলই লাভের আশায়। কেবল, সৎকার্য্য কোন আশায় কৃত হয় না। যাঁহারা স্বর্গের আশায় সৎকার্য্য করেন, তাঁহাদের কার্য্যকে সৎকার্য্য বলিতে পারি না। আশায় মুগ্ধ হইয়া শৈবলিনী, আপত্তি না করিয়া, শিবিকারোহণ করিল।

খোজা, শৈবলিনীকে দুর্গে আনিয়া, অন্তঃপুরে নবাবের নিকটে লইয়া গেল। নবাব দেখিলেন, এ ত দলনী নহে। আরও দেখিলেন, দলনীও এরূপ আশ্চর্য্য সুন্দরী নহে। আরও দেখিলেন যে, এরূপ লোকবিমোহিনী তাঁহার অন্তঃপুরে কেহই নাই।

নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

শৈ। আমি ব্রাহ্মণকন্যা।

ন। তুমি আসিলে কেন?

শৈ। রাজভৃত্যগণ আমাকে লইয়া আসিল।

ন। তোমাকে বেগম বলিয়া আনিয়াছে। বেগম আসিলেন না কেন?

শৈ। তিনি সেখানে নাই।

ন। তিনি তবে কোথায়?

যখন গল্‌ষ্টন ও জন্‌সন্ দলনী ও কুল্‌সম্‌কে প্রতাপের গৃহ হইতে লইয়া যায়, শৈবলিনী তাহা দেখিয়াছিলেন। তাহারা কে, তাহা তিনি জানিতেন না। মনে করিয়াছিলেন, চাকরাণী বা নর্ত্তকী। কিন্তু যখন নবাবের ভৃত্য তাঁহাকে বলিল যে, নবাবের বেগম প্রতাপের গৃহে ছিল, এবং তাঁহাকে সেই বেগম মনে করিয়া নবাব লইতে পাঠাইয়াছেন, তখনই শৈবলিনী বুঝিয়াছিলেন যে, বেগমকেই ইংরেজেরা ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। শৈবলিনী ভাবিতেছিল।

নবাব শৈবলিনীকে নিরুত্তর দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি তাঁহাকে দেখিয়াছ?"

শৈ। দেখিয়াছি।

ন। কোথায় দেখিলে?

শৈ। যেখানে আমরা কাল রাত্রে ছিলাম।

ন। সে কোথায়? প্রতাপ রায়ের বাসায়?

শৈ। আজ্ঞা হাঁ।

ন। বেগম সেখান হইতে কোথায় গিয়াছেন, জান?

শৈ। দুই জন ইংরেজ তাঁহাদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

ন। কি বলিলে?

শৈবলিনী পূর্ব্বপ্রদত্ত উত্তর পুনরুক্ত করিলেন। নবাব মৌনী হইয়া রহিলেন। অধর দংশন করিয়া, শ্মশ্রু উৎপাটন করিলেন। গুর্‌গণ খাঁকে ডাকিতে আদেশ করিলেন। শৈবলিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ইংরেজ বেগমকে ধরিয়া লইয়া গেল, জান?"

শৈ। না।

ন। প্রতাপ তখন কোথায় ছিল?

শৈ। তাঁহাকেও উহারা সেই সঙ্গে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

ন। তাহার বাসায় আর কোন লোক ছিল?

শৈ। একজন চাকর ছিল, তাঁহাকেও ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

নবাব আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন, তাঁহাদের ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, জান?”

শৈবলিনী এতক্ষণ সত্য বলিতেছিল, এখন মিথ্যা আরম্ভ করিল। বলিল, “না।”

ন। প্রতাপ কে? তাহার বাড়ী কোথায়?

শৈবলিনী প্রতাপের সত্য পরিচয় দিল।

ন। এখানে কি করিতে আসিয়াছিল?

শৈ। সরকারে চাকরি করিবেন বলিয়া।

ন। তোমার কে হয়?

শৈ। আমার স্বামী।

ন। তোমার না কি?

শৈ। রূপসী।

অনায়াসে শৈবলিনী এই উত্তর দিল। পাপিষ্ঠা এই কথা বলিবার জন্যই আসিয়াছিল।

নবাব বলিলেন, “আচ্ছা, তুমি এখন গৃহে যাও।”

শৈবলিনী বলিল, “আমার গৃহ কোথা— কোথা যাইব?”

নবাব নিস্তব্ধ হইলেন। পরক্ষণে বলিলেন, “তবে তুমি কোথায় যাইবে?”

শৈ। আমার স্বামীর কাছে। আমার স্বামীর কাছে পাঠাইয়া দিন। আপনি রাজা, আপনার কাছে নালিশ করিতেছি;—আমার স্বামীকে ইংরেজ ধরিয়া লইয়া গিয়াছে; হয়, আমার স্বামীকে মুক্ত করিয়া দিন, নচেৎ আমাকে তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দিন। যদি আপনি অবজ্ঞা করিয়া, ইহার উপায় না করেন, তবে এইখানে আপনার সম্মুখে আমি মরিব। সেই জন্য এখানে আসিয়াছি।

সংবাদ আসিল, গুর্‌গণ খাঁ হাজির। নবাব, শৈবলিনীকে বলিলেন, “আচ্ছা, তুমি এইখানে অপেক্ষা কর। আমি আসিতেছি।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : নূতন পথ

নবাব গুরগণ খাঁকে, অন্যান্য সংবাদ জিজ্ঞাসা করিযা কহিলেন, “ইংরেজদিগের সঙ্গে বিবাদ করাই শ্রেয়ঃ হইতেছে। আমার বিবেচনায় বিবাদের পূর্ব্বে আমিয়টাকে অবরুদ্ধ করা কর্ত্তব্য; কেন না, আমিয়ট আমার পরম শত্রু। কি বল?”

গুরগণ খাঁ কহিলেন, “যুদ্ধে আমি সকল সময়েই প্রস্তুত। কিন্তু দূত অস্পর্শনীয়। দূতের পীড়ন করিলে, বিশ্বাসঘাতক বলিয়া আমাদের নিন্দা হইবে।—আর—”

নবাব। আমিয়ট কালি রাত্রে এই সহর মধ্যে এক ব্যক্তির গৃহ আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। যে আমার অধিকারে থাকিয়া অপরাধ

করে, সে দূত হইলেও আমি কেন তাহার দণ্ডবিধান না করিব?

গুর্‌। যদি সে এরূপ করিয়া থাকে, তবে সে দণ্ডযোগ্য। কিন্তু তাহাকে কি প্রকারে ধৃত করিব?

নবাব। এখনই তাহার বাসস্থানে সিপাহী ও কামান পাঠাইয়া দাও। তাহাকে সদলে ধরিয়া লইয়া আসুক।

গুর্‌। তাহারা এ সহরে নাই। অদ্য দুই প্রহরে চলিয়া গিয়াছে।

নবাব। সে কি! বিনা এত্তেলায়?

গুর্‌। এত্তেলা দিবার জন্য হে নামক এক জনকে রাখিয়া গিয়াছে।

নবাব। এরূপ হঠাৎ, বিনা অনুমতিতে পলায়নের কারণ কি? ইহাতে আমার সহিত অসৌজন্য হইল, তাহা জানিয়াই করিয়াছে।

গুর্‌। তাহাদের হাতিয়ারের নৌকার চড়ন্দার ইংরেজকে কে কাল রাত্রে খুন করিয়াছে। আমিয়ট বলে, আমাদের লোকে খুন করিয়াছে। সেই জন্য রাগ করিয়া গিয়াছে। বলে, এখানে থাকিলে জীবন অনিশ্চিত।

নবাব। কে খুন করিয়াছে শুনিয়াছ?

গুর্‌। প্রতাপ রায় নামক এক ব্যক্তি।

নবাব। আচ্ছা করিয়াছে। তাহার দেখা পাইলে খেলোয়াৎ দিব। প্রতাপ রায় কোথায়?

গুর্‌। তাহাদিগের সকলকে বাঁধিয়া সঙ্গে করিয়া গিয়াছে। সঙ্গে লইয়া গিয়াছে কি আজিমাবাদ পাঠাইয়াছে, ঠিক শুনি নাই।

নবাব। এতক্ষণ আমাকে এ সকল সম্বাদ দাও নাই কেন?

গুর্‌। আমি এই মাত্র শুনিলাম।

এ কথাটি মিথ্যা। গুর্‌গণ খাঁ আদ্যোপান্ত সকল জানিতেন, তাঁহার অনভিমতে আমিয়ট কদাপি মুঙ্গের ত্যাগ করিতে পারিতেন না। কিন্তু গুর্‌গণ খাঁর দুইটি উদ্দেশ্য ছিল—প্রথম, দলনী মুঙ্গেরের বাহির হইলেই ভাল; দ্বিতীয়, আমিয়ট একটু হস্তগত থাকা ভাল, ভবিষ্যতে তাহার দ্বারা উপকার ঘটিতে পারিবে।

নবাব, গুর্‌গণ খাঁকে বিদায় দিলেন। গুর্‌গণ খাঁ যখন যান, নবাব, তাঁহার প্রতি বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সে দৃষ্টির অর্থ এই, "যত দিন না যুদ্ধ সমাপ্ত হয়, তত দিন তোমায় কিছু বলিব না—যুদ্ধকালে তুমি আমার প্রধান অস্ত্র। তার পর দলনী বেগমের ঋণ তোমার শোণিতে পরিশোধ করিব।"

নবাব তাহার পর মীর মুন্সীকে ডাকিয়া আদেশ প্রচার করিলেন যে, মুরশিদাবাদে মহম্মদ তকি খাঁর নামে পরওয়ানা পাঠাও যে, যখন আমিয়টের নৌকা মুরশিদাবাদে উপনীত হইবে, তখন তাহাকে ধরিয়া আবদ্ধ করে, এবং তাহার সঙ্গের বন্দিগণকে মুক্ত করিয়া, হুজুরে প্রেরণ করে। স্পষ্ট যুদ্ধ না করিয়া কলে কৌশলে ধরিতে হইবে, ইহাও লিখিয়া দিও। পরওয়ানা তটপথে বাহকের হাতে যাউক—অগ্রে পঁহুছিবে।

নবাব অন্তঃপুরে প্রত্যাগমন করিয়া আবার শৈবলিনীকে ডাকাইলেন। বলিলেন, "এক্ষণে তোমার স্বামীকে মুক্ত করা হইল না। ইংরেজেরা তাহাদিগকে লইয়া কলিকাতায় যাত্রা করিয়াছে। মুরশিদাবাদে হুকুম পাঠাইলাম, সেখানে তাহাদিগকে ধরিবে। তুমি এখন—"

শৈবলিনী হাত যোড় করিয়া কহিল, "বাচাল স্ত্রীলোককে মার্জ্জনা করুন—এখন লোক পাঠাইলে ধরা যায় না কি?"

নবাব। ইংরেজদিগকে ধরা অল্প লোকের কর্ম্ম নহে। অধিক লোক সশস্ত্রে পাঠাইতে হইলে, বড় নৌকা চাই। ধরিতে ধরিতে তাহারা মুরশিদাবাদ পৌঁছিবে। বিশেষ যুদ্ধের উদ্যোগ দেখিয়া, কি জানি যদি ইংরেজেরা আগে বন্দীদিগকে মারিয়া ফেলে। মুরশিদাবাদে সুচতুর কর্ম্মচারী সকল আছে, তাহারা কলে কৌশলে

ধরিবে।

শৈবলিনী বুঝিল যে, তাঁহার সুন্দর মুখখানিতে অনেক উপকার হইয়াছে। নবাব তাঁহার সুন্দর মুখখানি দেখিয়া, তাঁহার সকল কথা বিশ্বাস করিয়াছেন, এবং তাঁহার প্রতি বিশেষ দয়া প্রকাশ করিতেছেন। নহিলে এত কথা বুঝাইয়া বলিলেন কেন? শৈবলিনী সাহস পাইয়া আবার হাত যোড় করিল। বলিল, "যদি এ অনাথাকে এত দয়া করিয়াছেন, তবে আর একটি ভিক্ষা মার্জ্জনা করুন। আমার স্বামীর উদ্ধার অতি সহজ—তিনি স্বয়ং বীরপুরুষ। তাঁহার হাতে অস্ত্র থাকিলে তাঁহাকে ইংরেজ কয়েদ করিতে পারিত না—তিনি যদি এখন হাতিয়ার পান, তবে তাঁহাকে কেহ কয়েদ রাখিতে পারিবে না। যদি কেহ তাঁহাকে অস্ত্র দিয়া আসিতে পারে, তবে তিনি স্বয়ং মুক্ত হইতে পারিবেন, সঙ্গীদিগকে মুক্ত করিতে পারিবেন।"

নবাব হাসিলেন, বলিলেন, "তুমি বালিকা, ইংরেজ কি, তাহা জান না। কে তাঁহাকে সে ইংরেজের নৌকায় উঠিয়া অস্ত্র দিয়া আসিবে?"

শৈবলিনী মুখ নত করিয়া, অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "যদি হুকুম হয়, যদি নৌকা পাই, তবে আমিই যাইব।"

নবাব উচ্চহাস্য করিলেন। হাসি শুনিয়া শৈবলিনী ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, বলিল, "প্রভু! না পারি আমি মরিব—তাহাতে কাহারও ক্ষতি নাই। কিন্তু যদি পারি, তবে আমারও কার্য্যসিদ্ধি হইবে, আপনারও কার্য্যসিদ্ধি হইবে।"

নবাব শৈবলিনীর কুঞ্চিত ভ্রূশোভিত মুখমণ্ডল দেখিয়া বুঝিলেন, এ সামান্যা স্ত্রীলোক নহে। ভাবিলেন, "মরে মরুক, আমার ক্ষতি কি? যদি পারে ভালই—নহিলে মুরশিদাবাদে মহম্মদ তকি কার্য্যসিদ্ধি করিবে।" শৈবলিনীকে বলিলেন, "তুমি কি একাই যাইবে?"

শৈ। স্ত্রীলোক, একা যাইতে পারিব না। যদি দয়া করেন, তবে একজন দাসী, একজন রক্ষক, আজ্ঞা করিয়া দিন।

নবাব, চিন্তা করিয়া মসীবুদ্দীন নামে এক জন বিশ্বাসী, বলিষ্ঠ এবং সাহসী খোজাকে ডাকাইলেন। সে আসিয়া প্রণত হইল, নবাব তাহাকে বলিলেন, "এই স্ত্রীলোককে সঙ্গে লও। এবং এক জন হিন্দু বাঁদী সঙ্গে লও। ইনি যে হাতিয়ার লইতে বলেন, তাহাও লও। নৌকার দারোগার নিকট হইতে একখানি দ্রুতগ্রামী ছিপ লও। এই সকল লইয়া, এইক্ষণেই মুরশিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা কর।"

মসীবুদ্দীন জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ কার্য্য উদ্ধার করিতে হইবে?"

নবাব। ইনি যাহা বলিবেন, তাহাই করিবে। বেগমদিগের মত ইঁহাকে মান্য করিবে। যদি দলনী বেগমের সাক্ষাৎ পাও, সঙ্গে লইয়া আসিবে।

পরে উভয়ে নবাবকে যথারীতি অভিবাদন করিয়া, বিদায় লইল। খোজা যেরূপ করিল, শৈবলিনী দেখিয়া, দেখিয়া, সেইরূপ মাটি ছুঁইয়া পিছু হঁটিয়া সেলাম করিল। নবাব হাসিলেন।

নবাব গমনকালে বলিলেন, "বিবি, স্মরণ রাখিও। কখন যদি মুস্কিলে পড়, তবে মীরকাসেমের কাছে আসিও।"

শৈবলিনী পুনর্ব্বার সেলাম করিল। মনে মনে বলিল, "আসিব বৈ কি? হয়ত রূপসীর সঙ্গে স্বামী লইয়া দরবার করিবার জন্য তোমার কাছে আসিব।"

মসীবুদ্দীন পরিচারিকা ও নৌকা সংগ্রহ করিল। এবং শৈবলিনীর কথামত বন্দুক, গুলি, বারুদ, পিস্তল, তরবারি ও ছুরি সংগ্রহ করিল। মুসীবুদ্দীন সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না যে, এ সকল কি হইবে। মনে মনে কহিল যে, এ দোসরা চাঁদ সুলতানা।

সেই রাত্রেই তাহারা নৌকারোহণ করিয়া যাত্রা করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : কাঁদে

জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে। গঙ্গার দুই পার্শ্বে বহুদূরবিস্তৃত বালুকাময় চর। চন্দ্রকরে, সিকতা-শ্রেণী অধিকতর ধবলশ্রী ধরিয়াছে; গঙ্গার জল, চন্দ্রকরে প্রগাঢ়তর নীলিমা প্রাপ্ত হইয়াছে। গঙ্গা জল ঘন নীল—তটারূঢ় বনরাজী ঘনশ্যাম, উপরে আকাশ রত্নখচিত নীল। এরূপ সময়ে বিস্তৃতি জ্ঞানে কখন কখন মন চঞ্চল হইয়া উঠে। নদী অনন্ত; যত দূর দেখিতেছি, নদীর অন্ত দেখিতেছি না, মানবাদৃষ্টের ন্যায় অস্পষ্ট দৃষ্ট ভবিষ্যতে মিশাইয়াছে। নীচে নদী অনন্ত; পার্শ্বে বালুকাভূমি অনন্ত; তীরে বৃক্ষশ্রেণী অনন্ত; উপরে আকাশ অনন্ত; তন্মধ্যে তারকামালা অনন্তসংখ্যক। এমন সময়ে কোন্ মনুষ্য আপনাকে গণনা করে? এই যে নদীর উপকূলে যে বালুকাভূমে তরণীর শ্রেণী বাঁধা রহিয়াছে, তাহার বালুকাকণার অপেক্ষা মনুষ্যের গৌরব কি?

এই তরণীশ্রেণীর মধ্যে একখানি বড় বজরা আছে—তাহার উপরে সিপাহীর পাহারা। সিপাহীদ্বয়, গঠিত মূর্ত্তির ন্যায়, বন্দুক স্কন্ধে করিয়া স্থির দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ভিতরে, স্নিগ্ধ স্ফটিক-দীপের আলোকে নানাবিধ মহার্ঘ আসন, শয্যা, চিত্র, পুত্তল প্রভৃতি শোভা পাইতেছে। ভিতরে কয়জন সাহেব। দুই জনে সতরঞ্চ খেলিতেছেন। এক জন সুরাপান করিতেছেন, ও পড়িতেছেন। এক জন বাদ্যবাদন করিতেছেন।

অকস্মাৎ সকলে চমকিয়া উঠিলেন। সেই নৈশ নীরব বিদীর্ণ করিয়া, সহসা বিকট ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল।

আমিয়ট সাহেব জন্‌সন্‌কে কিস্তি দিতে দিতে বলিলেন, "ও কি ও?"

জন্‌সন্ বলিলেন, "কার কিস্তি মাত হইয়াছে।"

ক্রন্দন বিকটতর হইল। ধ্বনি বিকট নহে; কিন্তু সেই জলভূমির নীরব প্রান্তরমধ্যে এই নিশীথ ক্রন্দন বিকট শুনাইতে লাগিল।

আমিয়ট খেলা ফেলিয়া উঠিলেন। বাহিরে আসিয়া চারিদিক্ দেখিলেন। কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। দেখিলেন, নিকটে কোথাও শ্মশান নাই। সৈকতভূমের মধ্যভাগ শব্দ আসিতেছে।

আমিয়ট নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন। ধ্বনির অনুসরণ করিয়া চলিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন, সেই বালুকাপ্রান্তরমধ্যে একাকী কেহ বসিয়া আছে।

আমিয়ট নিকটে গেলেন। দেখিলেন, একটি স্ত্রীলোক উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছে।

আমিয়ট হিন্দী ভাল জানিতেন না। স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি? কেন কাঁদিতেছ?" স্ত্রীলোকটি তাঁহার হিন্দী কিছুই বুঝিতে পারিল না, কেবল উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

আমিয়ট পুনঃ পুনঃ তাঁহার কথার কোন উত্তর না পাইয়া হস্তেঙ্গিতের দ্বারা তাহাকে সঙ্গে আসিতে বলিলেন। রমণী উঠিল। আমিয়ট অগ্রসর হইলেন। নমণী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিল। এ আর কেহ নহে—পাপিষ্ঠা শৈবলিনী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : হাসে

বজরার ভিতরে আসিয়া আমিয়ট গল্‌ষ্টন্‌কে বলিলেন, "এই স্ত্রীলোক একাকিনী চরে বসিয়া কাঁদিতেছিল। ও আমার কথা বুঝে না, আমি উহার কথা বুঝি না। তুমি উহাকে জিজ্ঞাসা কর।"

গল্‌ষ্টন্ প্রায় আমিয়টের মত পণ্ডিত; কিন্তু ইংরেজ মহলে হিন্দিতে তাঁহার বড় পশার। গল্‌ষ্টন্ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?"

শৈবলিনী কথা কহিল না, কাঁদিতে লাগিল।

গ। কেন কাঁদিতেছ?

শৈবলিনী তথাপি কথা কহিল না—কাঁদিতে লাগিল।

গ। তোমার বাড়ী কোথায়?

শৈবলিনী পূর্ব্ববৎ।

গ। তুমি এখানে কেন আসিয়াছ?

শৈবলিনী তদ্রূপ।

গল্‌ষ্টন্ হার মানিল। কোন কথার উত্তর দিল না দেখিয়া ইংরেজেরা শৈবলিনীকে বিদায় দিলেন। শৈবলিনী সে কথাও বুঝিল না—নড়িল না—দাঁড়াইয়া রহিল।

আমিয়ট বলিলেন, "এ আমাদিগের কথা বুঝে না—আমরা উহার কথা বুঝি না। পোষাক দেখিয়া বোধ, হইতেছে, ও বাঙ্গালির মেয়ে। এক জন বাঙ্গালিকে ডাকিয়া উহাকে জিজ্ঞাসা করিতে বল।"

সাহেবের খানসামারা প্রায় সকলেই বাঙ্গালি মুসলমান। আমিয়ট তাহাদিগের এক জনকে ডাকিয়া কথা কহিতে বলিলেন।

খানসামা জিজ্ঞাসা করিল,"কাঁদিতেছ কেন?"

শৈবলিনী পাগলের হাসি হাসিল। খানসামা সাহেবদিগকে বলিল, "পাগল।"

সাহেবেরা বলিলেন, "উহাকে জিজ্ঞাসা কর, কি চায়?"

খানসামা জিজ্ঞাসা করিল। শৈবলিনী বলিল, "ক্ষিদে পেয়েছে।"

খানসামা সাহেবদিগকে বুঝাইয়া দিল। আমিয়ট বলিলেন, "উহাকে কিছু খাইতে দাও।"

খানসামা অতি হৃষ্টচিত্তে শৈবলিনীকে বাবর্চিখানার নৌকায় লইয়া গেল। হৃষ্টচিত্তে, কেন না শৈবলিনী, পরমা সুন্দরী। শৈবলিনী কিছুই খাইল না। খানসামা বলিল, "খাও না।" শৈবলিনী বলিল, "ব্রাহ্মণের মেয়ে; তোমাদের ছোঁওয়া খাব কেন?"

খানসামা গিয়া সাহেবদিগকে এ কথা বলিল। আমিয়ট সাহেব বলিলেন, "কোন নৌকায় কোন ব্রাহ্মণ নাই?"

খানসামা বলিল, "এক জন সিপাহী ব্রাহ্মণ আছে। আর কয়েদী এক জন ব্রাহ্মণ আছে।"

সাহেব বলিলেন, "যদি কাহারও ভাত থাকে দিতে বল।"

খানসামা শৈবলিনীকে লইয়া প্রথমে সিপাহীদের কাছে গেল। সিপাহীদের নিকট কিছুই ছিল না। তখন খানসামা, যে নৌকায় সেই ব্রাহ্মণ কয়েদী ছিল, শৈবলিনীকে সেই নৌকায় লইয়া গেল।

ব্রাহ্মণ কয়েদী, প্রতাপ রায়। একখানি ক্ষুদ্র পান্‌সীতে, একা প্রতাপ। বাহিরে, আগে পিছে সান্ত্রীর পাহারা। নৌকার মধ্যে অন্ধকার।

খানসামা বলিল, "ওগো ঠাকুর!" প্রতাপ বলিল, "কেন?"

খা। তোমার হাঁড়িতে ভাত আছে?

প্র। কেন?

খা। একটি ব্রাহ্মণের মেয়ে উপবাসী আছে। দুটি দিতে পার?

প্রতাপেরও ভাত ছিল না। কিন্তু প্রতাপ তাহা স্বীকার করিলেন না।

বলিলেন, "পারি। আমার হাতের হাতকড়ি খুলিয়া দিতে বল।"

খানসামা সান্ত্রীকে প্রতাপের হাতকড়ি খুলিয়া দিতে বলিল। সান্ত্রী বলিল, "হুকুম দেওয়াও।"

খানসামা হুকুম করাইতে গেল। পরের জন্য এত জল বেড়াবেড়ি কে করে? বিশেষ পীরবক্স সাহেবের খানসামা; কখন ইচ্ছাপূর্ব্বক পরের উপকার করে না। পৃথিবীতে যত প্রকার মনুষ্য আছে, ইংরেজদিগের মুসলমান খানসামা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। কিন্তু এখানে পীরবক্সের একটু স্বার্থ ছিল। সে মনে করিয়াছিল, এ স্ত্রীলোকটার খাওয়া দাওয়া হইলে ইহাকে একবার খানসামা মহলে লইয়া গিয়া বসাইব। পীরবক্স শৈবলিনীকে আহার করাইয়া বাধ্য করিবার জন্য ব্যস্ত হইল। প্রতাপের নৌকায় শৈবলিনী বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল—খানসামা হুকুম করাইতে আমিয়ট সাহেবের নিকট গেল। শৈবলিনী অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র। বিশেষ সুন্দর মুখের অধিকারী যদি যুবতী স্ত্রী হয়, তবে সে মুখ অমোঘ অস্ত্র। আমিয়ট দেখিয়াছিলেন যে এই "জেন্টু" স্ত্রীলোকটি নিরুপমা রূপবতী—তাহাতে আবার পাগল শুনিয়া একটু দয়াও হইয়াছিল। আমিয়ট জমাদ্দার দ্বারা প্রতাপের হাতকড়ি খুলিয়া দিবার এবং শৈবলিনীকে প্রতাপের নৌকার ভিতর প্রবেশ করিতে দিবার অনুমতি পাঠাইলেন।

খানসামা আলো আনিয়া দিল। সান্ত্রী প্রতাপের হাতকড়ি খুলিয়া দিল। খানসামাকে সেই নৌকার উপর আসিতে নিষেধ করিয়া প্রতাপ আলো লইয়া মিছামিছি ভাত বাড়িতে বসিলেন। অভিপ্রায় পলায়ন।

শৈবলিনী নৌকার ভিতরে প্রবেশ করিল। সান্ত্রীরা দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছিল—নৌকার ভিতর দেখিতে পাইতেছিল না। শৈবলিনী ভিতরে প্রবেশ করিয়া, প্রতাপের সম্মুখে গিয়া অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া বসিলেন।

প্রতাপের বিস্ময় অপনীত হইলে, দেখিলেন, "শৈবলিনী অধর দংশন করিতেছে, মুখ ঈষৎ হর্ষপ্রফুল্ল,—মুখমণ্ডল স্থিরপ্রতিজ্ঞার চিহ্নযুক্ত। প্রতাপ মানিল, এ বাঘের যোগ্য বাঘিনী বটে।

শৈবলিনী অতিলঘুস্বরে, কাণে কাণে বলিল, "হাত ধোও—আমি কি ভাতের কাঙ্গাল?"

প্রতাপ হাত ধুইল। সেই সময়ে শৈবলিনী কাণে কাণে বলিল, "এখন পলাও। বাঁক ফিরিয়া যে ছিপ আছে, সে তোমার জন্য।"

প্রতাপ সেইরূপ স্বরে বলিল, "আগে তুমি যাও, নচেৎ তুমি বিপদে পড়িবে।"

শৈ। এই বেলা পলাও। হাতকড়ি দিলে আর আর পলাইতে পারিবে না। এই বেলা জলে ঝাঁপ দাও। বিলম্ব করিও না। একদিন আমার বুদ্ধিতে চল। আমি পাগল—জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িব। তুমি আমাকে বাঁচাইবার জন্য জলে ঝাঁপ দাও।

এই বলিয়া শৈবলিনী উচ্চৈর্হাস্য করিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমি ভাত খাইব না।" তখনি আবার ক্রন্দন করিতে করিতে বাহির হইয়া বলিল, "আমাকে মুসলমানের ভাত খাওয়াইয়াছে—আমার জাত গেল—মা গঙ্গা ধরিও।" এই বলিয়া শৈবলিনী গঙ্গার স্রোতে ঝাঁপ দিয়া পড়িল।

"কি হইল? কি হইল?" বলিয়া প্রতাপ চীৎকার করিতে করিতে নৌকা হইতে বাহির হইল। সান্ত্রী সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিষেধ করিতে যাইতেছিল। "হারামজাদা! স্ত্রীলোক ডুবিয়া মরে, তুমি দাঁড়াইয়া দেখিতেছ?" এই বলিয়া প্রতাপ সিপাহীকে এক পদাঘাত করিলেন। সেই এক পদাঘাতে সিপাহী পান্সী

হইতে পড়িয়া গেল। তীরের দিকে সিপাহী পড়িল। “স্ত্রীলোককে রক্ষা কর” বলিয়া প্রতাপ অপর দিকে জলে ঝাঁপ দিলেন। সন্তরণপটু শৈবলিনী আগে আগে সাঁতার দিয়া চলিল। প্রতাপ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সন্তরণ করিয়া চলিলেন।

“কয়েদী ভাগিল” বলিয়া পশ্চাতের সান্ত্রী ডাকিল। এবং প্রতাপকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক উঠাইল। তখন প্রতাপ সাঁতার দিতেছেন।

প্রতাপ ডাকিয়া বলিলেন, “ভয় নাই—পলাই নাই। এই স্ত্রীলোকটাকে উঠাইব—সম্মুখে স্ত্রীহত্যা কি প্রকারে দেখিব? তুই বাপু হিন্দু—বুঝিয়া ব্রহ্মহত্যা করিস্।”

সিপাহী বন্দুক নত করিল।

এই সময়ে শৈবলিনী সর্ব্বশেষের নৌকার নিকট দিয়া সন্তরণ করিয়া যাইতেছিল। সেখানি দেখিয়া শৈবলিনী অকস্মাৎ চমকিয়া উঠিল। দেখিল যে, যে নৌকায় শৈবলিনী লরন্স ফষ্টরের সঙ্গে বাস করিয়াছিল, এ সেই নৌকা।

শৈবলিনী কম্পিতা হইয়া ক্ষণকাল তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল, তাহার ছাদে জ্যোৎস্নার আলোকে, ক্ষুদ্র পালঙ্কের উপর একটি সাহেব অর্দ্ধশয়ানাবস্থায় রহিয়াছে। উজ্জ্বল চন্দ্ররশ্মি তাহার মুখমণ্ডলে পড়িয়াছে। শৈবলিনী চীৎকার শব্দ করিল—দেখিল, পালঙ্কে লরেন্স ফষ্টর।

লরেন্স ফষ্টরও সন্তরণকারিণীর প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে চিনিল—শৈবলিনী। লরেন্স ফষ্টরও চীৎকার করিয়া বলিল, “পাকড়ো! পাকড়ো! হামারা বিবি!” ফষ্টর শীর্ণ, রুগ্ন, দুর্ব্বল, শয্যাগত, উত্থানশক্তিরহিত।

ফষ্টরের শব্দ শুনিয়া চারি পাঁচ জন শৈবলিনীকে ধরিবার জন্য জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। প্রতাপ তখন তাহাদিগের অনেক আগে। তাহারা প্রতাপকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, “পাকড়ো! পাকড়ো! ফষ্টর সাহাব ইনাম দেগা।” প্রতাপ মনে মনে বলিল, “ফষ্টর সাহেবকে আমিও একবার ইনাম দিয়াছি—ইচ্ছা আছে আর একবার দিব।” প্রকাশ্যে ডাকিয়া বলিল, “আমি ধরিতেছি—তোমরা উঠ।”

এই কথায় বিশ্বাস করিয়া সকলে ফিরিল। ফষ্টর বুঝে নাই যে, অগ্রবর্ত্তী ব্যক্তি প্রতাপ। ফষ্টরের মস্তিষ্ক তখনও নীরোগ হয় নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : অগাধ জলে সাঁতার

দুই জনে সাঁতারিয়া, অনেক দূর গেল। কি মনোহর দৃশ্য! কি সুখের সাগরে সাঁতার! এই অনন্ত দেশব্যাপিনী, বিশালহৃদয়া, ক্ষুদ্রবীচিমালিনী, নীলিমাময়ী তটিনীর বক্ষে, চন্দ্রকরসাগর মধ্যে ভাসিতে ভাসিতে, সেই ঊর্দ্ধস্থ অনন্ত নীলসাগরে দৃষ্টি পড়িল! তখন প্রতাপ মনে করিল, কেনই বা মনুষ্য-অদৃষ্টে ঐ সমুদ্রে সাঁতার নাই? কেনই বা মানুষে ঐ মেঘের তরঙ্গ ভাঙ্গিতে পারে না? কি পূণ্য করিলে ঐ সমুদ্রে সন্তরণকারী জীব হইতে পারি? সাঁতার? কি ছার ক্ষুদ্র পার্থিব নদীতে সাঁতার? জন্মিয়া অবধি এই দুরন্ত কাল-সমুদ্রে সাঁতার দিতেছি? তরঙ্গ ঠেলিয়া তরঙ্গের উপর ফেলিতেছি—তৃণবৎ তরঙ্গে তরঙ্গে বেড়াইতেছি—আবার সাঁতার কি? শৈবলিনী ভাবিল, এ জলের ত তল আছে,—আমি যে অতল জলে ভাসিতেছি।

তুমি গ্রাহ্য কর, না কর, তাই বলিয়া ত জড় প্রকৃতি ছাড়ে না—সৌন্দর্য্য ত লুকাইয়া রয় না। তুমি যে সমুদ্রে সাঁতার দেও না কেন, জল-নীলিমার মাধুর্য্য বিকৃত হয় না—ক্ষুদ্র বীচির মালা ছিঁড়ে না—তারা তেমনি জ্বলে—তীরে বৃক্ষ তেমনি দোলে, জলে চাঁদের আলো তেমনি খেলে। জড় প্রকৃতির দৌরাত্ম্য! স্নেহময়ী মাতার ন্যায়, সকল সময়েই আদর করিতে চায়।

এ সকল কেবল প্রতাপের চক্ষে। শৈবলিনীর চক্ষে নহে। শৈবলিনী নৌকার উপর যে রুগ্ন, শীর্ণ, শ্বেত মুখমণ্ডল দেখিয়াছিল, তাহার মনে কেবল তাহাই জাগিতেছিল। শৈবলিনী কলের পুত্তলির ন্যায় সাঁতার দিতেছিল। কিন্তু শ্রান্তি নাই। উভয়ে সন্তরণ-পটু। সন্তরণে প্রতাপের আনন্দ-সাগর উছলিয়া উঠিতেছিল।

প্রতাপ ডাকিল, "শৈবলিনী—শৈ!"

শৈবলিনী চমকিয়া উঠিল—হৃদয় কম্পিত হইল। বাল্যকালে প্রতাপ তাহাকে "শৈ" বা "সই" বলিয়া ডাকিত। আবার প্রিয় সম্বোধন করিল। কত কালে পরে! বৎসরে কি কালের মাপ! ভাবে ও অভাবে কালের মাপ। শৈবলিনী যত বৎসর সই শব্দ শুনে নাই, শৈবলিনীর সেই এক মন্বন্তর। এখন শুনিয়া শৈবলিনী সেই অনন্ত জলরাশিমধ্যে চক্ষু মুদিল। মনে মনে চন্দ্রতারাকে সাক্ষী করিল। চক্ষু মুদিয়া বলিল, "প্রতাপ! আজিও এ মরা গঙ্গায় চাঁদের আলো কেন?"

প্রতাপ বলিল, "চাঁদের? না। সূর্য্য উঠিয়াছে।—শৈ! আর ভয় নাই। কেহ তাড়াইয়া আসিতেছে না।"

শৈ। তবে চল তীরে উঠি।

প্র। শৈ!

শৈ। কি?

প্র। মনে পড়ে?

শৈ। কি?

প্র। আর এক দিন এমনি সাঁতার দিয়াছিলাম।

শৈবলিনী উত্তর দিল না। এক খণ্ড বৃহৎ কাষ্ঠ ভাসিয়া যাইতেছিল; শৈবলিনী তাহা ধরিল। প্রতাপকে বলিল, "ধর, ভর সহিবে। বিশ্রাম কর।" প্রতাপ কাষ্ঠ ধরিল। বলিল, "মনে পড়ে? তুমি ডুবিতে পারিলে না—আমি ডুবিলাম?" শৈবলিনী বলিল, "মনে পড়ে। তুমি যদি আবার সেই নাম ধরিয়া আজ না ডাকিতে, তবে আজ তার শোধ দিতাম। কেন ডাকিলে?"

প্র। তবে মনে আছে যে, আমি মনে করিলে ডুবিতে পারি?

শৈবলিনী শঙ্কিতা হইয়া বলিল, "কেন প্রতাপ? চল তীরে উঠি।"

প্র। আমি উঠিব না। আজি মরিব।

প্রতাপ কাষ্ঠ ছাড়িল।

শৈ। কেন, প্রতাপ?

প্র। তামাসা নয়—নিশ্চিত ডুবিব—তোমার হাত।

শৈ। কি চাও, প্রতাপ? যা বল তাই করিব।

প্র। একটি শপথ কর, তবে আমি উঠিব।

শৈ। কি শপথ প্রতাপ?

শৈবলিনী কাষ্ঠ ছাড়িয়া দিল। তাহার চক্ষে, তারা সব নিবিয়া গেল। চন্দ্র কপিশ বর্ণ ধারণ করিল। নীল জল অগ্নির মত জ্বলিতে লাগিল। ফষ্টর আসিয়া যেন সম্মুখে তরবারি হস্তে দাঁড়াইল। শৈবলিনী রুদ্ধনিশ্বাসে বলিল, "কি শপথ, প্রতাপ?"

উভয়ে পাশাপাশি কাষ্ঠ ছাড়িয়া সাঁতার দিতেছিল। গঙ্গার কলকল চলচল জলভঙ্গরবমধ্যে এই ভয়ঙ্কর কথা হইতেছিল। চারি পাশে প্রক্ষিপ্ত বারিকণা-মধ্যে চন্দ্র হাসিতেছিল। জড়প্রকৃতির দৌরাত্ম্য!

"কি শপথ প্রতাপ?"

প্র। এই গঙ্গার জলে—

শৈ। আমার গঙ্গা কি?

প্র। তবে ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া বল—

শৈ। আমার ধর্ম্মই বা কোথায়?

প্র। তবে আমার শপথ?

শৈ। কাছে আইস—হাত দাও।

প্রতাপ নিকটে গিয়া, বহুকাল পরে শৈবলিনীর হাত ধরিল। দুই জনের সাঁতার দেওয়া ভার হইল। আবার উভয়ে কাষ্ঠ ধরিল।

শৈবলিনী বলিল, "এখন যে কথা বল, শপথ করিয়া বলিতে পারি—কত কাল পরে, প্রতাপ?"

প্র। আমার শপথ কর, নহিলে ডুবিব। কিসের জন্য প্রাণ? কে সাধ করিয়া এ পাপ জীবনের ভার সহিতে চায়? চাঁদের আলোয় এই স্থির গঙ্গার মাঝে যদি এ বোঝা নামাইতে পারি, তবে তার চেয়ে আর সুখ কি?

উপরে চন্দ্র হাসিতেছিল।

শৈবলিনী বলিল, "তোমার শপথ—কি বলিব?"

প্র। শপথ কর, আমাকে স্পর্শ করিয়া শপথ কর—আমার মরণ বাঁচন শুভাশুভের তুমি দায়ী—

শৈ। তোমার শপথ—তুমি যা বলিবে, ইহজন্মে তাহাই আমার স্থির।

প্রতাপ অতি ভয়ানক শপথের কথা বলিল। সে শপথ শৈবলিনীর পক্ষে অতিশয় কঠিন, অতিশয় রুক্ষ, তাহার পালন অসাধ্য, প্রাণান্তকর; শৈবলিনী শপথ করিতে পারিল না। বলিল, "এ সংসারে আমার মত দুঃখী কে আছে, প্রতাপ?"

প্র। আমি!

শৈ। তোমার ঐশ্বর্য্য আছে—বল আছে—কীর্ত্তি আছে—বন্ধু আছে—ভরসা আছে—রূপসী আছে—আমার কি আছে প্রতাপ?

প্র। কিছু না— আইস তবে দুই জনে ডুবি।

শৈবলিনী কিছুক্ষণ চিন্তা করিল। চিন্তার ফলে, তাহার জীবন-নদীতে প্রথম বিপরীত তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হইল। "আমি মরি তাহাতে ক্ষতি কি? কিন্তু আমার জন্য প্রতাপ মরিবে কেন?" প্রকাশ্যে বলিল, "তীরে চল।"

প্রতাপ অবলম্বন ত্যাগ করিয়া ডুবিল।

তখনও প্রতাপের হাতে শৈবলিনীর হাত ছিল। শৈবলিনী টানিল। প্রতাপ উঠিল।

শৈ। আমি শপথ করিব। কিন্তু তুমি একবার ভাবিয়া দেখ। আমার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইতেছ। আমি তোমাকে চাই না। তোমার চিন্তা কেন ছাড়িব?

প্রতাপ হাত ছাড়িল। শৈবলিনী আবার ধরিল। তখন অতি গম্ভীর, স্পষ্টশ্রুত, অথচ বাষ্পবিকৃত স্বরে শৈবলিনী কথা কহিতে লাগিল—বলিল, "প্রতাপ, হাত চাপিয়া ধর। প্রতাপ, শুন, তোমায় স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি—তোমার মরণ বাঁচন শুভাশুভ আমার দায়। শুন, তোমার শপথ। আজি হইতে তোমাকে ভুলিব। আজি হইতে আমার সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি! আজি হইতে আমি মনকে দমন করিব। আজি হইতে শৈবলিনী মরিল।"

শৈবলিনী প্রতাপের হাত ছাড়িয়া দিল। কাষ্ঠ ছাড়িয়া দিল।

প্রতাপ গদগদ কণ্ঠে বলিল, "চল, তীরে উঠি।"

উভয়ে গিয়া তীরে উঠিল।

পদব্রজে গিয়া বাঁক ফিরিল। ছিপ নিকটে ছিল উভয়ে তাহাতে উঠিয়া ছিপ খুলিয়া দিল। উভয়ের মধ্যে কেহই জানিত না যে, রমানন্দ স্বামী তাহাদিগকে বিশেষ অভিনিবেশের সহিত লক্ষ্য করিতেছেন।

এদিকে ইংরেজের লোক তখন মনে করিল, কয়েদী পলাইল। তাহারা পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। কিন্তু ছিপ শীঘ্র অদৃশ্য হইল।

রূপসীর সঙ্গে মোকদ্দমায় আরজি পেশ না হইতেই শৈবলিনীর হার হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : রামচরণের মুক্তি

প্রতাপ যদি পলাইল, তবে রামচরণের মুক্তি সহজেই ঘটিল। রামচরণ ইংরেজের নৌকায় বন্দিভাবে ছিল না। তাহারই গুলিতে যে ফষ্টরের আঘাত ও সান্ত্রীর নিপাত ঘটিয়াছিল, তাহা কেহ জানিত না। তাহাকে সামান্য ভৃত্য বিবেচনা করিয়া আমিয়ট মুঙ্গের হইতে যাত্রাকালে ছাড়িয়া দিলেন। বলিলেন, "তোমার মুনিব বড় বদ্‌জাত, উহাকে আমরা সাজা দিব, কিন্তু তোমাতে আমাদের প্রয়োজন নাই। তুমি যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার।" শুনিয়া রামচরণ সেলাম করিয়া যুক্তকরে বলিল, "আমি চাষা গোয়ালা—কথা জানি না—রাগ করিবেন না —আমার সঙ্গে আপনাদের কি কোন সম্পর্ক আছে?"

আমিয়টকে কেহ কথা বুঝাইয়া দিলে, আমিয়ট জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

রা। নহিলে আমার সঙ্গে তামাসা করিবে কেন?

আমিয়ট। কি তামাসা?

রা। আমার পা ভাঙ্গিয়া দিয়া, যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইতে বলায়, বুঝায় যে আমি আপনাদের বাড়ী বিবাহ করিয়াছি। আমি গোয়ালার ছেলে, ইংরেজের ভগিনী বিবাহ করিলে আমার জাত যাবে।

দ্বিভাষী আমিয়টকে কথা বুঝাইয়া দিলেও তিনি কিছু বুঝিতে পারিলেন না। মনে ভাবিলেন, এ বুঝি এক প্রকার এদেশী খোশামোদ। মনে করিলেন, যেমন নেটিবেরা খোশামোদ করিয়া "মা বাপ" "ভাই" এইরূপ সম্বন্ধসূচক শব্দ ব্যবহার করে, রামচরণ সেইরূপ খোশামোদ করিয়া তাঁহাকে সম্বন্ধী বলিতেছে। আমিয়ট নিতান্ত অপ্রসন্ন হইলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন,"তুমি চাও কি?"

রামচরণ বলিল, "আমার পা জোড়া দিয়া দিতে হুকুম হউক।

আমিয়ট হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা তুমি কিছু দিন আমাদিগের সঙ্গে থাক, ঔষধ দিব।"

রামচরণ তাহাই চায়। প্রতাপ বন্দী হইয়া চলিলেন, রামচরণ তাঁহার সঙ্গে থাকিতে চায়। সুতরাং রামচরণ ইচ্ছাপূর্ব্বক আমিয়টের সঙ্গে চলিল। সে কয়েদ রহিল না।

যে রাত্রে প্রতাপ পলায়ন করিল, সেই রাত্রে রামচরণ কাহাকে কিছু না বলিয়া নৌকা হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। গমনকালে রামচরণ অস্ফুট স্বরে ইণ্ডিলমিণ্ডিলের পিতৃমাতৃভগিনী সম্বন্ধে অনেক নিন্দাসূচক কথা বলিতে বলিতে গেল। পা জোড়া লাগিয়াছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : পর্ব্বতোপরে

আজি রাত্রে আকাশে চাঁদ উঠিল না। মেঘ আসিয়া চন্দ্র, নক্ষত্র, নীহারিকা, নীলিমা, সকল ঢাকিল। মেঘ, ছিদ্রশূন্য, অনন্তবিস্তারী, জলপূর্ণতার জন্য ধূমবর্ণ;—তাহার তলে অনন্ত অন্ধকার; গাঢ়, অনন্ত, সর্ব্বাবরণকারী অন্ধকার; তাহাতে নদী, সৈকত, উপকূল, উপকুলস্থ গিরিশ্রেণী সকল ঢাকিয়াছে। সেই অন্ধকারে শৈবলিন গিরির উপত্যকায় একাকিনী।

শেষ রাত্রে ছিপ পশ্চাদ্ধাবিত ইংরেজদিগের অনুচরদিগকে দূরে রাখিয়া তীরে লাগিয়াছিল—বড় বড় নদীর তীরে নিভৃত স্থানের অভাব নাই—সেইরূপ একটি নিভৃত স্থানে ছিপ লাহাইয়াছিল। সেই সময়ে, শৈবলিনী, অলক্ষ্যে ছিপ হইতে পলাইয়াছিল। এবার শৈবলিনী অসদভিপ্রায়ে পলায়ন করে নাই। যে ভয়ে দহ্যমান অরণ্য হইতে অরণ্যচর জীব পলায়ন করে শৈবলিনী সেই ভয়ে প্রতাপের সংসর্গ হইতে পলায়ন করিয়াছিল। প্রাণভয়ে শৈবলিনী, সুখ সৌন্দর্য্য প্রণয়াদি পরিপূর্ণ সংসার হইতে পলাইল। সুখ, সৌন্দর্য্য, প্রণয়, প্রতাপ, এ সকলে শৈবলিনীর আর অধিকার নাই—আশা নাই—আকাঙ্ক্ষাও পরিহার্য্য—নিকটে থাকিলে কে আকাঙ্ক্ষা পরিহার করিতে পারে? মরুভুমে থাকিলে কোন্ তৃষিত পথিক, সুশীতল স্বচ্ছ সুবাসিত বারি দেখিয়া পান না করিয়া থাকিতে পারে? ভিক্টর হ্যূগো সমুদ্রতলবাসী রাক্ষসস্বভাব ভয়ঙ্কর পুরুভুজের বর্ণনা করিয়াছেন, লোভে বা আকাঙ্ক্ষাকে সেই জীবের স্বভাবসম্পন্ন বলিয়া বোধ হয়। ইহা অতি স্বচ্ছ স্ফাটিকনিন্দিত জলমধ্যে বাস করে, ইহার বাসগৃহতলে মৃদুল জ্যোতিঃপ্রফুল্ল চারু গৈরিকাদি ঈষৎ জ্বলিতে থাকে; ইহার গৃহে কত মহামূল্য মুক্তা প্রবালাদি কিরণ প্রচার করে; কিন্তু ইহা মনুষ্যের শোণিত পান করে; যে ইহার গৃহসৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া তথায় গমন করে, এই শতবাহু রাক্ষস, ক্রমে এক একটি হস্ত প্রসারিত করিয়া তাহাকে ধরে, ধরিলে আর কেহ ছাড়াইতে পারে না। শত হস্তে সহস্র গ্রন্থিতে জড়াইয়া ধরে; তখন রাক্ষস, শোণিতাশোষক সহস্র মুখ হতভাগ্য মনুষ্যের অঙ্গে স্থাপন করিয়া তাহার শোণিত শোষণ করিতে থাকে।

শৈবলিনী যুদ্ধে আপনাকে অক্ষম বিবেচনা করিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। মনে তাহার ভয় ছিল, প্রতাপ তাহার পলায়ন-বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেই, তাহার সন্ধান করিবে। এ জন্য নিকটে কোথাও অবস্থিতি না করিয়া যত দূর পারিল, তত দূর চলিল। ভারতবর্ষের কটিবন্ধস্বরূপ যে গিরিশ্রেণী, অদূরে তাহা দেখিতে পাইল। গিরি আরোহণ করিলে পাছে অনুসন্ধানপ্রবৃত্ত কেহ তাহাকে পায়, এজন্য দিবাভাগে গিরি আরোহণে প্রবৃত্ত হইল না। বনমধ্যে লুকাইয়া রহিল। সমস্ত দিন অনাহারে গেল। সায়াহ্নকাল অতীত হইল, প্রথম অন্ধকার, পরে জ্যোৎস্না উঠিবে। শৈবলিনী অন্ধকারে, গিরি আরোহণ আরম্ভ করিল। অন্ধকারে শিলাখণ্ড সকলের আঘাতে পদদ্বয় ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল; ক্ষুদ্র লতাগুল্মমধ্যে পথ পাওয়া যায় না; তাহার কণ্টকে ভগ্ন শাখাগ্রভাগ্রে, বা মূলাবশেষের অগ্রভাগে, হস্তপদাদি সকল ছিঁড়িয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল।

তাহাতে শৈবলিনীর দুঃখ হইল না। স্বেচ্ছাক্রমে শৈবলিনী এ প্রায়শ্চিত্তে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। স্বেচ্ছাক্রমে শৈবলিনী সুখময় সংসার ত্যাগ করিয়া, এ ভীষণ

কণ্টকময়, হিংস্রকজন্তুপরিবৃত পার্ব্বত্যারণ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। এত কাল ঘোরতর পাপে নিমগ্ন হইয়াছিল—এখন দুঃখভোগ করিলে কি সে পাপের কোন উপশম হইবে?

অতএব ক্ষতবিক্ষতচরণে, শোণিতাক্ত কলেবরে, ক্ষুধার্ত্ত পিপাসাপীড়িত হইয়া শৈবলিনী গিরি আরোহণ করিতে লাগিল। পথ নাই—লতা গুল্ম এবং শিলারাশির মধ্যে দিনেও পথ পাওয়া যায় না—এক্ষণে অন্ধকার। অতএব শৈবলিনী বহু কষ্টে অল্পদূর মাত্র আরোহণ করিল।

এমত সময়ে ঘোরতর মেঘাড়ম্বর করিয়া আসিল। রন্ধ্রশূন্য, ছেদশূন্য, অনন্তবিস্তৃত কৃষ্ণাবরণে আকাশের মুখ আঁটিয়া দিল। অন্ধকারের উপর অন্ধকার নামিয়া, গিরিশ্রেণী, তলস্থ বনরাজি, দূরস্থ নদী, সকল ঢাকিয়া ফেলিল। জগৎ অন্ধকারমাত্রাত্মক—শৈবলিনীর বোধ হইতে লাগিল, জগতে প্রস্তর, কণ্টক, এবং অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই নাই। আর পর্ব্বতারোহণ-চেষ্টা বৃথা—শৈবলিনী হতাশ হইয়া সেই কণ্টকবনে উপবেশন করিল।

আকাশের মধ্যস্থল হইতে সীমান্ত পর্য্যন্ত, সীমান্ত হইতে মধ্যস্থল পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল। অতি ভয়ঙ্কর। সঙ্গে সঙ্গে অতি গম্ভীর মেঘগর্জ্জন আরম্ভ হইল। শৈবলিনী বুঝিল, বিষম নৈদাঘ বাত্যা সেই অদ্রিসানুদেশে প্রধাবিত হইবে। ক্ষতি কি? এই পর্ব্বতাঙ্গ হইতে অনেক বৃক্ষ, শাখা, পত্র, পুষ্পাদি স্থানচ্যুত হইয়া বিনষ্ট হইবে—শৈবলিনীর কপালে কি সে সুখ ঘটিবে না?

অঙ্গে কিসের শীতল স্পর্শ অনুভূত হইল। এক বিন্দু বৃষ্টি। ফোঁটা, ফোঁটা, ফোঁটা! তার পর দিগন্তব্যাপী গর্জ্জন। সে গর্জ্জন, বৃষ্টির, বায়ুর এবং মেঘের; তৎসঙ্গে কোথাও বৃক্ষশাখাভঙ্গের শব্দ, কোথাও ভীত পশুর চীৎকার, কোথাও স্থানচ্যুত উপলখণ্ডের অবতরণশব্দ। দূরে গঙ্গার ক্ষিপ্ত তরঙ্গমালার কোলাহল। অবনত মস্তকে পার্ব্বতীয় প্রস্তরাসনে, শৈবলিনী বসিয়া—মাথার উপর শীতল জলরাশি বর্ষণ হইতেছে। অঙ্গের উপর বৃক্ষ লতা গুল্মাদির শাখা সকল বায়ুতাড়িত হইয়া প্রহত হইতেছে, আবার উঠিতেছে, আবার প্রহত হইতেছে। শিখরাভিমুখ হইতে জলপ্রবাহ বিষম বেগে আসিয়া শৈবলিনীর ঊরুদেশে পর্য্যন্ত ডুবাইয়া ছুটিতেছে।

তুমি জড় প্রকৃতি! তোমায় কোটি কোটি কোটি প্রণাম! তোমার দয়া নাই, মমতা নাই, স্নেহ নাই,—জীবের প্রাণনাশে সঙ্কোচ নাই, তুমি অশেষ ক্লেশের জননী—অথচ তোমা হইতে সব পাইতেছি—তুমি সর্ব্বসুখের আকর, সর্ব্বমঙ্গলময়ী, সর্ব্বার্থসাধিকা, সর্ব্বকামনাপূর্ণকারিণী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী! তোমাকে নমস্কার। হে মহাভয়ঙ্করি নানরূপরঙ্গিণি! কালি তুমি ললাটে চাঁদের টিপ পরিয়া, মস্তকে নক্ষত্রকিরীট ধরিয়া, ভুবন-মোহন হাসি হাসিয়া, ভুবন মোহিয়াছ। গঙ্গার ক্ষুদ্রোর্ম্মিতে পুষ্পমালা গাঁথিয়া পুষ্পে পুষ্পে চন্দ্র ঝুলাইয়াছ; সৈকত-বালুকায় কত কোটি কোটি হীরক জ্বালিয়াছ; গঙ্গার হৃদয়ে নীলিমা ঢালিয়া দিয়া, তাতে কত সুখে যুবক যুবতীকে ভাসাইয়াছিলে! যেন কত আদর জান—কত আদর করিয়াছিলে। আজি এ কি? তুমি অবিশ্বাসযোগ্য সর্ব্বনাশিনী। কেন জীব লইয়া তুমি ক্রীড়া কর, তাহা জানি না—তোমার বুদ্ধি নাই, জ্ঞান নাই, চেতনা নাই—কিন্তু তুমি সর্ব্বময়ী, সর্ব্বকর্ত্রী, সর্ব্বনাশিনী এবং সর্ব্বশক্তিময়ী। তুমি ঐশী মায়া, তুমি ঈশ্বরের কীর্ত্তি, তুমিই অজেয়। তোমাকে কোটি কোটি কোটি প্রণাম।

অনেক পরে বৃষ্টি থামিল—ঝড় থামিল না—কেবল মন্দীভূত হইল মাত্র। অন্ধকার যেন গাঢ়তর হইল। শৈবলিনী বুঝিল যে, জলসিক্ত পিচ্ছিল পর্ব্বতে আরোহণ অবতরণ উভয়ই অসাধ্য। শৈবলিনী সেইখানে বসিয়া শীতে কাঁপিতে লাগিল। তখন তাহার গার্হস্থ্য-সুখপূর্ণ বেদগ্রামে পতিগৃহ স্মরণ হইতেছিল। মনে হইতেছিল যে, যদি আর একবার সে সুখাগার দেখিয়া মরিতে পারি, তবুও সুখে মরিব। কিন্তু তাহা দূরে থাকুক—বুঝি আর সূর্য্যোদয়ও দেখিতে পাইব না। পুনঃ পুনঃ যে মৃত্যুকে ডাকিয়াছি, অদ্য সে নিকট। এমত সময়ে সেই মনুষ্যশূন্য পর্ব্বতে, সেই অগম্য বনমধ্যে, সেই মহাঘোর অন্ধকারে, কোন মনুষ্য শৈবলিনীর গায়ে হাত দিল।

শৈবলিনী প্রথমে মনে করিল, কোন বন্য পশু। শৈবলিনী সরিয়া বসিল। কিন্তু আবার সেই হস্তস্পর্শ—স্পষ্ট মনুষ্যহস্তের স্পর্শ—অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। শৈবলিনী ভয়বিকৃত কণ্ঠে বলিল, “তুমি কে? দেবতা না মনুষ্য?” মনুষ্য হইতে শৈবলিনীর ভয় নাই—কিন্তু দেবতা হইতে ভয় আছে; কেন না, দেবতা দণ্ডবিধাতা।

কেহ কোন উত্তর দিল না। কিন্তু শৈবলিনী বুঝিল যে, মনুষ্য হউক, দেবতা হউক, তাহাকে দুই হাত দিয়া ধরিতেছে। শৈবলিনী উষ্ণ নিশ্বাসস্পর্শ স্কন্ধদেশে অনুভূত করিল। দেখিল, এক ভুজ শৈবলিনীর পৃষ্ঠদেশে স্থাপিত হইল—আর এক হস্তে শৈবলিনীর দুই পদ একত্রিত করিয়া বেড়িয়া ধরিল। শৈবলিনী দেখিল, তাহাকে উঠাইতেছে। শৈবলিনী একটু চীৎকার করিল—বুঝিল যে, মনুষ্য হউক, দেবতা হউক, তাহাকে ভুজোপরি উত্থিত করিয়া কোথায় লইয়া যায়। কিয়ৎক্ষণ পরে অনুভূত হইল যে, সে শৈবলিনীকে ক্রোড়ে লইয়া সাবধানে পর্ব্বতারোহণ করিতেছে। শৈবলিনী ভাবিল যে, এ যেই হউক, লরেন্স ফষ্টর নহে।

চতুর্থ খণ্ড

প্রায়শ্চিত্ত

প্রথম পরিচ্ছেদ : প্রতাপ কি করিলেন

প্রতাপ জমীদার, এবং প্রতাপ দস্যু। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ের অনেক জমীদারই দস্যু ছিলেন। ডারুইন বলেন, মানবজাতি বানরদিগের প্রপৌত্র। এ কথায় যদি কেহ রাগ না করিয়া থাকেন, তবে পূর্ব্বপুরুষগণের এই অখ্যাতি শুনিয়া, বোধ হয়, কোন জমীদার আমাদের উপর রাগ করিবেন না। বাস্তবিক দস্যুবংশে জন্ম অগৌরবের কথা বলিয়া বোধ হয় না; কেন না, অন্যত্র দেখিতে পাই, অনেক দস্যুবংশজাতই গৌরবে প্রধান। তৈমুরলঙ্গ নামে বিখ্যাত দস্যুর পরপুরুষেরাই বংশমর্য্যাদায় পৃথিবীমধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডে যাঁহারা বংশমর্য্যাদার বিশেষ গর্ব্ব করিতে চাহেন, তাঁহারা নর্ম্মান্ বা স্কন্দেনেবিয় নাবিক দস্যুদিগের বংশোদ্ভব বলিয়া আত্মপরিচয় দেন। প্রাচীন ভারতে কুরুবংশেরই বিশেষ মর্য্যাদা ছিল; তাঁহারা গোচোর; বিরাটের উত্তরগোগৃহে গোরু চুরি করিতে গিয়াছিলেন। দুই এক বাঙ্গালি জমীদারের এরূপ কিঞ্চিৎ বংশমর্য্যাদা আছে।

তবে অন্যান্য প্রাচীন জমীদারের সঙ্গে প্রতাপের দস্যুতার কিছু প্রভেদ ছিল। আত্মসম্পত্তি রক্ষার জন্য বা দুর্দ্দান্ত শত্রুর দমন জন্যই প্রতাপ দস্যুদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। অনর্থক পরস্বাপহরণ বা পরপীড়ন জন্য করিতেন না; এমন কি, দুর্ব্বল বা পীড়িত ব্যক্তিকে রক্ষা করিয়া পরোপকার জন্যই দস্যুতা করিতেন। প্রতাপ আবার সেই পথে গমনোদ্যত হইলেন।

যে রাত্রে শৈবলিনী ছিপ ত্যাগ করিয়া পলাইল, সেই রাত্রিপ্রভাতে প্রতাপ, নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া রামচরণ আসিয়াছে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন; কিন্তু শৈবলিনীকে না দেখিয়া চিন্তিত হইলেন; কিছুকাল তাহার প্রতীক্ষা করিয়া, তাহাকে না দেখিয়া তাহার অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। গঙ্গাতীরে অনুসন্ধান করিলেন, পাইলেন না। অনেক বেলা হইল। প্রতাপ নিরাশ হইয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, শৈবলিনী ডুবিয়া মরিয়াছে। প্রতাপ জানিতেন, এখন তাহার ডুবিয়া মরা

অসম্ভব নহে।

প্রতাপ প্রথমে মনে করিলেন, "আমিই শৈবলিনীর মৃত্যুর কারণ।" কিন্তু ইহাও ভাবিলেন, "আমার দোষ কি। আমি ধর্ম্ম ভিন্ন অধর্ম্মপথে যাই নাই। শৈবলিনী যে জন্য মরিয়াছে, তাহা আমার নিবার্য্য কারণ নহে।" অতএব প্রতাপ নিজের উপর রাগ করিবার কারণ পাইলেন না। চন্দ্রশেখরের উপর কিছু রাগ করিলেন—চন্দ্রশেখর কেন শৈবলিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন? রূপসীর উপর একটু রাগ করিলেন, কেন শৈবলিনীর সঙ্গে প্রতাপের বিবাহ না হইয়া, রূপসীর সঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল? সুন্দরীর উপর আরও একটু রাগ করিলেন—সুন্দরী তাঁহাকে না পাঠাইলে, প্রতাপের সঙ্গে শৈবলিনীর গঙ্গাসন্তরণ ঘটিত না, শৈবলিনীও মরিত না। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা লরেন্স ফষ্টরের উপর রাগ হইল—সে শৈবলিনীকে গৃহত্যাগিনী না করিলে এ সকল কিছুই ঘটিত না। ইংরেজ জাতি বাঙ্গালায় না আসিলে, শৈবলিনী লরেন্স ফষ্টরের হাতে পড়িত না। অতএব ইংরেজ জাতির উপরও প্রতাপের অনিবার্য্য ক্রোধ জন্মিল। প্রতাপ সিদ্ধান্ত করিলেন, ফষ্টরকে আবার ধৃত করিয়া, বধ করিয়া, এবার অগ্নিসৎকার করিতে হইবে—নহিলে সে আবার বাঁচিবে—গোর দিলে মাটি ফুঁড়িয়া উঠিতে পারে। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই করিলেন যে, ইংরেজ জাতিকে বাঙ্গালা হইতে উচ্ছেদ করা কর্ত্তব্য; কেন না, ইহাদিগের মধ্যে অনেক ফষ্টর আছে।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, প্রতাপ সেই ছিপে মুঙ্গেরে ফিরিয়া গেলেন।

প্রতাপ দুর্গমধ্যে গেলেন। দেখিলেন, ইংরেজের সঙ্গে নবাবের যুদ্ধ হইবে, তাহার উদ্যোগের বড় ধুম পড়িয়া গিয়াছে।

প্রতাপের আহ্লাদ হইল। মনে ভাবিলেন, নবাব কি এই অসুরদিগকে বাঙ্গালা হইতে তাড়াইতে পারিবেন না? ফষ্টর কি ধৃত হইবে না?

তার পর মনে ভাবিলেন, যাহারা যেমন শক্তি, তাহার কর্ত্তব্য এ কার্য্যে নবাবের সাহায্য করে! কাষ্ঠবিড়ালেও সমুদ্র বাঁধিতে পারে।

তার পর মনে ভাবিলেন, আমা হইতে কি কোন সাহায্য হইতে পারে না? আমি কি করিতে পারি?

তার পর মনে ভাবিলেন, আমার সৈন্য নাই, কেবল লাঠিয়াল আছে—দুস্য আছে। তাহাদিগের দ্বারা কোন্ কার্য্য হইতে পারে?

ভাবিলেন, আর কোন কার্য্য না হউক, লুঠপাঠ হইতে পারে। যে গ্রামে ইংরেজের সাহায্য করিবে, সে গ্রাম লুঠ করিতে পারিব। যেখানে দেখিব, ইংরেজের রশদ লইয়া যাইতেছে, সেইখানে রশদ লুঠ করিব। যেখানে দেখিব, ইংরেজের দ্রব্য সামগ্রী যাইতেছে, সেইখানে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিব। ইহা করিলেও নবাবের অনেক উপকার করিতে পারিব। সম্মুখ সংগ্রামে যে জয়, তাহা বিপক্ষ বিনাশের সামান্য উপায় মাত্র। সৈন্যের পৃষ্ঠরোধ, এবং খাদ্যাহরণের ব্যাঘাত, প্রধান উপায়। যত দূর পারি, তত দূর তাহা করিব।

তার পর ভাবিলেন, আমি কেন এত করিব? করিব, তাহার অনেক কারণ আছে। প্রথম, ইংরেজ চন্দ্রশেখরের সর্ব্বনাশ করিয়াছে; দ্বিতীয়, শৈবলিনী মরিয়াছে; তৃতীয়, আমাকে কয়েদ রাখিয়াছিল; চতুর্থ, এইরূপ অনিষ্ট আর আর লোকেরও করিয়াছে ও করিতে পারে; পঞ্চম, নবাবের এ উপকার করিতে পারিলে দুই একখানা বড় বড় পরগণা পাইতে পারিব।

অতএব আমি ইহা করিব।

প্রতাপ তখন অমাত্যবর্গের খোশামোদ করিয়া নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। নবাবের সঙ্গে তাঁহার কি কি কথা হইল, তাহা অপ্রকাশ রহিল। নবাবের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তিনি স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অনেক দিনের পর, তাঁহারা স্বদেশ আগমনে রূপসীর গুরুতর চিন্তা দূর হইল, কিন্তু রূপসী শৈবলিনীর মৃত্যুর সম্বাদ শুনিয়া দুঃখিত হইল। প্রতাপ আসিয়াছেন শুনিয়া সুন্দরী তাঁহাকে দেখিতে আসিল। সুন্দরী শৈবলিনীর মৃত্যুসম্বাদ শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিতা হইল, কিন্তু বলিল, "যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। কিন্তু শৈবলিনী

এখন সুখী হইল। তাহার বাঁচা অপেক্ষা মরাই যে সুখের, তা আর কোন্ মুখে না বলিব?”

প্রতাপ রূপসী ও সুন্দরীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর, পুনর্ব্বার গৃহত্যাগ করিয়া গেলেন। অচিরাৎ দেশে দেশে রাষ্ট্র হইল যে, মুঙ্গের হইতে কাটোয়া পর্য্যন্ত যাবতীয় দস্যু ও লাঠিয়াল দলবদ্ধ হইতেছে, প্রতাপ রায় তাহাদিগকে দলবদ্ধ করিতেছে।

শুনিয়া গুর্‌গণ খাঁ চিন্তাযুক্ত হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : শৈবলিনী কি করিল

মহান্ধকারময় পর্ব্বতগুহা—পৃষ্ঠচ্ছেদী উপলশয্যায় শুইয়া শিবলিনী। মহাকায় পুরুষ, শৈবলিনীকে তথায় ফেলিয়া দিয়া গিয়াছেন। ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে—কিন্তু গুহামধ্যে অন্ধকার—কেবল অন্ধকার—অন্ধকারে ঘোরতর নিঃশব্দ। নয়ন মুদিলে অন্ধকার—চক্ষু চাহিলে তেমনই অন্ধকার। নিঃশব্দ—কেবল কোথাও পর্ব্বতস্থ রন্ধ্রপথে বিন্দু বিন্দু বারি গুহাতলস্থ শিলার উপর পড়িয়া, ক্ষণে ক্ষণে টিপ্ টাপ্ শব্দ করিতেছে। আর যেন কোন জীব, মনুষ্য কি পশু—কে জানে? সেই গুহামধ্যে নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে।

এতক্ষণে শৈবলিনী ভয়ের বশীভূতা হইলেন। ভয়? তাহাও নহে। মনুষ্যের স্থিরবুদ্ধিতার সীমা আছে—শৈবলিনী সেই সীমা অতিক্রম করিয়াছিলেন। শৈবলিনীর ভয় নাই—কেন না, জীবন তাঁহার পক্ষে অবহনীয়, অসহনীয় ভার হইয়া উঠিয়াছিল—ফেলিতে পারিলেই ভাল। বাকি যাহা—সুখ, ধর্ম্ম, জাতি, কুল, মান, সকলই গিয়াছিল—আর যাইবে কি? কিসের ভয়?

কিন্তু শৈবলিনী আশৈশব, চিরকাল যে আশা হৃদয়মধ্যে সযত্নে, সঙ্গোপনে পালিত করিয়াছিল সেই দিন বা তাহার পূর্ব্বেই, তাহার উচ্ছেদ করিয়াছিল; যাহার জন্য সর্ব্বত্যাগিনী হইয়াছিল, এক্ষণে তাহাও ত্যাগ করিয়াছে; চিত্ত নিতান্ত বিকল, নিতান্ত বলশূন্য। আবার প্রায় দুই দিন অনশন, তাহাতে পথশ্রান্তি, পর্ব্বতারোহণশ্রান্তি; বাত্যাবৃষ্টিজনিত পীড়াভোগ; শরীরও নিতান্ত বিকল, নিতান্ত বলশূন্য; তাহার পর এই ভীষণ দৈব ব্যাপার—দৈব বলিয়াই শৈবলিনীর বোধ হইল—মানবচিত্ত আর কতক্ষণ প্রকৃতিস্থ থাকে? দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িল, মন ভাঙ্গিয়া পড়িল—শৈবলিনী অপহৃতচেতনা হইয়া অর্দ্ধনিদ্রাভিভূত, অর্দ্ধজাগ্রতাবস্থায় রহিল। গুহাতলস্থ উপলখণ্ড সকলে পৃষ্ঠদেশ ব্যথিত হইতেছিল।

সম্পূর্ণরূপে চৈতন্য বিলুপ্ত হইলে, শৈবলিনী দেখিল, সম্মুখে এক অনন্তবিস্তৃতা নদী। কিন্তু নদীতে জল নাই—দূ-কূল প্লাবিত করিয়া রুধিরের স্রোতঃ বহিতেছে। তাহাতে অস্থি, গলিত নরদেহ, নৃমুণ্ড, কঙ্গালাদি ভাসিতেছে। কুম্ভীরাকৃত জীব সকল চর্ম্ম—মাংসাদি-বর্জ্জিত—কেবল অস্থি, ও বৃহৎ, ভীষণ, উজ্জ্বল চক্ষুর্দ্বয়বিশিষ্ট—ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া সেই সকল গলিত শব ধরিয়া খাইতেছে। শৈবলিনী দেখিল যে, যে মহাকায় পুরুষ তাহাকে পর্ব্বত হইতে ধৃত করিয়া আনিয়াছে, সেই আবার তাহাকে ধৃত করিয়া সেই নদীতীরে আনিয়া বসাইল। সে প্রদেশে রৌদ্র নাই, জ্যোৎস্না নাই, তারা নাই, মেঘ নাই, আলোক মাত্র নাই—অথচ অন্ধকার নাই। সকলই দেখা যাইতেছে—কিন্তু অস্পষ্ট। রুধিরের নদী, গলিত শব, স্রোতোবাহিত কঙ্কালমালা, অস্থিময় কুম্ভীরগণ, সকলই ভীষণান্ধকারে দেখা যাইতেছে। নদীতীরে বালুকা নাই—তৎপরিবর্ত্তে লৌহসূচী সকল অগ্রভাগ ঊর্দ্ধ করিয়া রহিয়াছে। শৈবলিনীকে মহাকায় পুরুষ সেইখানে বসাইয়া নদী পার হইতে বলিলেন। পারের কোন উপায় নেই। নৌকা নাই, সেতু নাই। মহাকায় পুরুষ বলিলেন, সাঁতার দিয়া পার হ, তুই সাঁতার জানিস্—গঙ্গায়, প্রতাপের সঙ্গে অনেক সাঁতার দিয়াছিস্। শৈবলিনী এই রুধিরের নদীতে কি প্রকারে সাঁতার দিবে? মহাকায় পুরুষ তখন হস্তস্থিত বেত্র প্রহার

জন্য উত্থিত করিলেন। শৈবলিনী সভয়ে দেখিল যে, সেই বেত্র জ্বলন্ত লোহিত লৌহনির্ম্মিত। শৈবলিনীর বিলম্ব দেখিয়া, মহাকায় পুরুষ শৈবলিনীর পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিতে লাগিলেন। শৈবলিনী প্রহারে দগ্ধ হইতে লাগিল। শৈবলিনী প্রহার সহ্য করিতে না পারিয়া রুধিরের নদীতে ঝাঁপ দিল। অমনি অস্থিময় কুম্ভীর সকল তাহাকে ধরিতে আসিল, কিন্তু ধরিল না। শৈবলিনী সাঁতার দিয়া চলিল; রুধিরস্রোতঃ বদনমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। মহাকায় পুরুষ তাহার সঙ্গে সঙ্গে রুধিরস্রোতের উপর দিয়া পদব্রজে চলিলেন—ডুবিলেন না। মধ্যে মধ্যে পূতিগন্ধবিশিষ্ট গলিত শব ভাসিয়া আসিয়া শৈবলিনীর গাত্রে লাগিতে লাগিল। এইরূপে শৈবলিনী পরপারে উপস্থিত হইল। সেখানে কূলে উঠিয়া চাহিয়া দেখিয়া, "রক্ষা কর! রক্ষা কর!" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। সম্মুখে যাহা দেখিল, তাহার সীমা নাই, আকার নাই, বর্ণ নাই, নাম নাই। তথায় আলোক অতি ক্ষীণ, কিন্তু এতাদৃশ উত্তপ্ত যে, তাহা চক্ষে প্রবেশ মাত্র শৈবলিনীর চক্ষু বিদীর্ণ হইতে লাগিল—বিষসংযোগে যেরূপ জ্বালা সম্ভব, চক্ষে সেইরূপ জ্বালা ধরিল। নাসিকায় এরূপ ভয়ানক পূতিগন্ধ প্রবেশ করিল যে, শৈবলিনী নাসিকা আবৃত করিয়াও উন্মত্তার ন্যায় হইল। কর্ণের, অতি কঠোর, কর্কশ, ভয়াবহ শব্দ সকল এককালে প্রবেশ করিতে লাগিল—হৃদয়-বিদারক আর্ত্তনাদ, পৈশাচিক হাস্য, বিকট হুঙ্কার, পর্ব্বতবিদারণ, অশনিপতন, শিলাঘর্ষণ, জলকল্লোল, অগ্নিসর্জ্জন, মুমূর্ষুর ক্রন্দন, সকলই এককালে শ্রবণ বিদীর্ণ করিতে লাগিল। সম্মুখ হইতে ক্ষণে ক্ষণে ভীমনাদে এরূপ প্রচণ্ড বায়ু বহিতে লাগিল যে, তাহাতে শৈবলিনীকে অগ্নিশিখার ন্যায় দগ্ধ করিতে লাগিল—কখন বা শীতে শতসহস্র ছুরিকাঘাতের ন্যায় অঙ্গ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিল। শৈবলিনী ডাকিতে লাগিল, "প্রাণ যায়! রক্ষা কর!" তখন অসহ্য পূতিগন্ধবিশিষ্ট এক বৃহৎ কদর্য্য কীট আসিয়া শৈবলিনীর মুখে প্রবেশ করিতে প্রবৃত্ত হইল। শৈবলিনী তখন চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "রক্ষা কর! এ নরক! এখান হইতে উদ্ধারের কি উপায় নাই?"

মহাকায় পুরুষ বলিলেন, "আছে।" স্বপ্নাবস্থায় আত্মকৃত চীৎকারে শৈবলিনীর মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইল। কিন্তু তখনও ভ্রান্তি যায় নাই—পৃষ্ঠে প্রস্তর ফুটিতেছে। শৈবলিনী ভ্রান্তিবশে জাগ্রতেও ডাকিয়া বলিল, "আমার কি হবে! আমার উদ্ধারে কি উপায় নাই?"

গুহামধ্য হইতে গম্ভীর শব্দ হইল, "আছে।"

এ কি এ? শৈবলিনী কি সত্য সত্যই নরকে? শৈবলিনী বিস্মিত, বিমুগ্ধ, ভীতচিত্তে জিজ্ঞাসা করিল, "কি উপায়?"

গুহামধ্যে হইতে উত্তর হইল, "দ্বাদশবার্ষিক ব্রত অবলম্বন কর।"

এ কি দৈববাণী? শৈবলিনী কাতর হইয়া বলিতে লাগিল, "কি সে ব্রত? কে আমায় শিখাইবে?"

উত্তর—আমি শিখাইব।

শৈ। তুমি কে?

উত্তর—ব্রত গ্রহণ কর।

শৈ। কি করিব?

উত্তর—তোমার ও চীনবাস ত্যাগ করিয়া, আমি যে বসন দিই, তাই পর। হাত বাড়াও।

শৈবলিনী হাত বাড়াইল। প্রসারিত হস্তের উপর এক খণ্ড বস্ত্র স্থাপিত হইল। শৈবলিনী তাহা পরিধান করিয়া, পূর্ব্ববস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আর কি করিব?"

উত্তর—তোমার শ্বশুরালয় কোথায়?

শৈ। বেদগ্রাম। সেখানে কি যাইতে হইবে?

উত্তর—হাঁ—গিয়া গ্রামপ্রান্তে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিবে।

শৈ। আর?

উত্তর—ভূতলে শয়ন করিবে।

শৈ। আর?

উত্তর—ফলমূলপত্র ভিন্ন ভোজন করিবে না। একবার ভিন্ন খাইবে না।

শৈ। আর?

উত্তর—জটাধারণ করিবে।

শৈ। আর?

উত্তর—একবার মাত্র দিনান্তে গ্রামে ভিক্ষার্থ প্রবেশ করিবে। ভিক্ষাকালে গ্রামে গ্রামে আপনার পাপ কীর্ত্তন করিবে।

শৈ। আমার পাপ যে বলিবার নয়! আর কি প্রায়শ্চিত্ত নাই?

উত্তর—আছে।

শৈ। কি?

উত্তর—মরণ।

শৈ। ব্রত গ্রহণ করিলাম—আপনি কে?

শৈবলিনী কোন উত্তর পাইল না। তখন শৈবলিনী সকাতরে পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি যেই হউন, জানিতে চাহি না। পর্ব্বতের দেবতা মনে করিয়া আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি। আপনি আর একটি কথার উত্তর করুন, আমার স্বামী কোথায়?"

উত্তর—কেন?

শৈ। আর কি তাঁহার দর্শন পাইব না?

উত্তর—তোমার প্রায়শ্চিত্ত সমাপ্ত হইলে পাইবে।

শৈ। দ্বাদশ বৎসর পরে।

উত্তর—দ্বাদশ বৎসর পরে।

শৈ। এ প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিয়া কত দিন বাঁচিব? যদি দ্বাদশ বৎসর মধ্যে মরিয়া যাই?

উত্তর—তবে মৃত্যুকালে সাক্ষাৎ পাইবে।

শৈ। কোন উপায়েই কি তৎপূর্ব্বে সাক্ষাত পাইব না? আপনি দেবতা, অবশ্য জানেন।

উত্তর—যদি এখন তাঁহাকে দেখিতে চাও, তবে সপ্তাহকাল দিবারাত্র এই গুহামধ্যে একাকিনী বাস কর। এই সপ্তাহ, দিনরাত্র কেবল স্বামীকে মনোমধ্যে চিন্তা কর—অন্য কোন চিন্তাকে মনোমধ্যে স্থান দিও না। এই সাত দিন, কেবল একবার সন্ধ্যাকালে নির্গত ফলমূলাহরণ করিও; তাহাতে পরিতোষজনক ভোজন করিও না—যেন ক্ষুধানিবারণ না হয়। কোন মনুষ্যের নিকট যাইও না—বা কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলেও কথা কহিও না। যদি এই অন্ধকার গুহায় সপ্তাহ

অবস্থিতি করিয়া, সরল চিত্তে অবিরত অনন্যমন হইয়া কেবল স্বামীর ধ্যান কর, তবে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বাতাস উঠিল

শৈবলিনী তাহাই করিল—সপ্তদিবস গুহা হইতে বাহির হইল না—কেবল এক একবার দিনান্তে ফলমূলান্বেষণে বাহির হইত। সাত দিন মনুষ্যের সঙ্গে আলাপ করিল না। প্রায় অনশনে, সেই বিকটান্ধকারে অনন্যেন্দ্রিয়বৃত্তি হইয়া স্বামীর চিন্তা করিতে লাগিল—কিছু দেখিতে পায় না, কিছু শুনিতে পায় না, কিছু স্পর্শ করিতে পায় না। ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ—মন নিরুদ্ধ—সর্ব্বত্র স্বামী। স্বামী চিত্তবৃত্তিসমূহের একমাত্র অবলম্বন হইল। অন্ধকারে আর কিছু দেখিতে পায় না—সাত দিন সাত রাত কেবল স্বামীমুখ দেখিল। ভীম নীরবে আর কিছু শুনিতে পায় না—কেবল স্বামীর জ্ঞানপরিপূর্ণ, স্নেহবিচলিত, বাক্যালাপ শুনিতে পাইল—ঘ্রাণেন্দ্রিয় কেবলমাত্র তাঁহার পুষ্পপাত্রের পুষ্পরাশির গন্ধ পাইতে লাগিল—ত্বক্ কেবল চন্দ্রশেখরের আদরের স্পর্শ অনুভূত করিতে লাগিল। আশা আর কিছুতে নাই—আর কিছুতে ছিল না, স্বামিসন্দর্শন কামনাতেই রহিল। স্মৃতি কেবল শ্মশ্রুশোভিত, প্রশস্ত ললাটপ্রমুখ বদনমণ্ডলের চতুঃপার্শ্বে ঘুরিতে লাগিল—কণ্টকে ছিন্নপক্ষ ভ্রমরী যেমন দুলর্ভ সুগন্ধিপুষ্পবৃক্ষতলে কষ্টে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, তেমনই ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। যে এ ব্রতের পরামর্শ দিয়াছিল, সে মনুষ্যচিত্তের সর্ব্বাংশদর্শী সন্দেহ নাই। নির্জ্জন, নীরব, অন্ধকার, মনুষ্যসন্দর্শনরহিত, তাহাতে আবার শরীর ক্লিষ্ট ক্ষুধাপীড়িত; চিত্ত অন্যচিন্তাশূন্য; এমন সময়ে যে বিষয়ে চিত্ত স্থির করা যায়, তাহাই জপ করিতে করিতে চিত্ত তন্ময় উঠে। এই অবস্থায়, অবসন্ন শরীরে, অবসন্ন মনে, একাগ্রচিত্তে, স্বামীর ধ্যান করিতে করিতে শৈবলিনী বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়া উঠিল।

বিকৃতি? না দিব্য চক্ষু? শৈবলিনী দেখিল—অন্তরের ভিতর অন্তর হইতে দিব্য চক্ষু চাহিয়া, শৈবলিনী দেখিল, এ কি রূপ! এই দীর্ঘ শালতরুনিন্দিত, সুভুজবিশিষ্ট, সুন্দরগঠন, সুকুমারে বলময় এ দেহ যে রূপের শিখর! এই যে ললাট—প্রশস্ত, চন্দনচর্চ্চিত, চিন্তারেখাবিশিষ্ট—এ যে সরস্বতীর শয্যা, ইন্দ্রের রণভূমি, মদনের সুখকুঞ্জ, লক্ষ্মীর সিংহাসন! ইহার কাছে প্রতাপ? ছি! ছি! সমুদ্রের কাছে গঙ্গা! ঐ যে নয়ন—জ্বলিতেছে, হাসিতেছে, ফিরিতেছে, ভাসিতেছে—দীর্ঘ, বিস্ফারিত, তীব্রজ্যোতিঃ, স্থির, স্নেহময়, করুণাময়, ঈষৎরঙ্গপ্রিয়, সর্ব্বত্র তত্ত্বজিজ্ঞাসু—ইহার কাছে কি প্রতাপের চক্ষু? কেন আমি ভুলিলাম—কেন মজিলাম—কেন মরিলাম! এই যে সুন্দর, সুকুমার, বলিষ্ঠ দেহ—নবপত্রশোভিত শালতরু,—মাধবীজড়িত দেবদারু, কুসুমপরিব্যাপ্ত পর্ব্বত, অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য অর্দ্ধেক শক্তি—আধ চন্দ্র আধ ভানু—আধ গৌরী আধ শঙ্কর—আধ রাধা আধ শ্যাম—আধ আশা আধ ভয়—আধ জ্যোতিঃ আধ ছায়া—আধ বহ্নি আধ ধূম—কিসের প্রতাপ? কেন না দেখিলাম—কেন মজিলাম—কেন মরিলাম! সেই যে ভাষা—পরিষ্কৃত, পরিস্ফুট, হাস্যপ্রদীপ্ত, ব্যঙ্গরঞ্জিত, স্নেহপরিপ্লুত, মৃদু, মধুর, পরিশুদ্ধ—কিসের প্রতাপ? কেন মজিলাম—কেন মরিলাম—কেন কূল হারাইলাম? সেই যে হাসি—ঐ পুষ্পপাত্রস্থিত মল্লিকারাশিতুল্য, মেঘমণ্ডলে বিদ্যুত্তুল্য, দুর্ব্বৎসরে দুর্গোৎসবতুল্য, আমার সুখস্বপ্নতুল্য—কেন দেখিলাম না, কেন মজিলাম, কেন মরিলাম, কেন বুঝিলাম না? সেই যে ভালবাসা সমুদ্রতুল্য—অপার, অপরিমেয়, অতলস্পর্শ, আপনার বলে আপনি চঞ্চল—প্রশান্তভাবে স্থির, গম্ভীর, মাধুর্য্যময়—চাঞ্চল্যে কূলপ্লাবী, তরঙ্গভঙ্গভীষণ, অগম্য, অজেয়, ভয়ঙ্কর,—কেন বুঝিলাম না, কেন হৃদয়ে তুলিলাম না—কেন আপনা খাইয়া প্রাণ দিলাম না! কে আমি? তাঁহার কি যোগ্য—বালিকা, অজ্ঞান,—অনক্ষর, অসৎ, তাঁহার মহিমাজ্ঞানে অশক্ত, তাঁহার কাছে আমি কে? সমুদ্রে শম্বুক, কুসুমে কীট, চন্দ্রে কলঙ্ক, চরণে রেণুকণা—তাঁর কাছে আমি কে? জীবনে কুস্বপ্ন, হৃদয়ে বিস্মৃতি, সুখে বিঘ্ন, আশায় অবিশ্বাস—তাঁর কাছে আমি কে? সরোবরে কর্দ্দম, মৃণালে কণ্টক, পবনে ধূলি, অনলে পতঙ্গ! আমি মজিলাম—মরিলাম না কেন?

যে বলিয়াছিল, এইরূপে স্বামিধ্যান কর, সে অনন্ত মানবহৃদয়-সমুদ্রের কাণ্ডারী—সব জানে। জানে যে, এই মন্ত্রে চিরপ্রবাহিত নদী অন্য খাদে চালান যায়,—জানে যে, এ বজ্রে পাহাড় ভাঙ্গে, এ গণ্ডূষে সমুদ্র শুষ্ক হয়, এ মন্ত্রে বায়ু স্তম্ভিত হয়। শৈবলিনীর চিত্তে চিরপ্রবাহিত নদী ফিরিল, পাহাড় ভাঙ্গিল, সমুদ্র শোষিল, বায়ু স্তম্ভিত হইল। শৈবলিনী প্রতাপকে ভুলিয়া চন্দ্রশেখরকে ভালবাসিল।

মনুষ্যের ইন্দ্রিয়ের পথ রোধ কর—ইন্দ্রিয় বিলুপ্ত কর—মনকে বাঁধ,—বাঁধিয়া একটি পথে ছাড়িয়া দাও—অন্য পথ বন্ধ কর—মনের শক্তি অপহৃত কর—মন কি করিবে? সেই এক পথে যাইবে—তাহাতে স্থির হইবে—তাহাতে মজিবে। শৈবলিনী পঞ্চম দিবসে আহরিত ফল মূল খাইল না—ষষ্ঠ দিবসে ফল মূল আহরণে গেল না—সপ্তম দিবসে প্রাতে ভাবিল, স্বামিদর্শন পাই না পাই—অদ্য মরিব। সপ্তম রাত্রে মনে করিল, হৃদয়মধ্যে পদ্মফুল ফুটিয়াছে—তাহতে চন্দ্রশেখর যোগাসনে বসিয়া আছেন—শৈবলিনী ভ্রমর হইয়া পাদপদ্মে গুণগুণ করিতেছে।

সপ্তম রাত্রে সেই অন্ধকার নীরব শিলাককর্শ গুহামধ্যে, একাকী, স্বামিধ্যান করিতে করিতে শৈবলিনী চেতনা হারাইল। সে নানা বিষয় স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। কখন দেখিল, সে ভয়ঙ্কর নরকে ডুবিয়াছে, অগণিত, শতহস্তপরিমিত, সর্পগণ অযুত ফণা বিস্তার করিয়া, শৈবলিনীকে জড়াইয়া ধরিতেছে; অযুত মুণ্ডে মুখব্যাদান করিয়া শৈবলিনীকে গিলিতে আসিতেছে, সকলের মিলিত নিশ্বাসে প্রবল বাত্যার ন্যায় শব্দ হইতেছে। চন্দ্রশেখর আসিয়া, এক বৃহৎ সর্পের ফণায় চরণ স্থাপন করিয়া দাঁড়াইলেন; তখন সর্প সকল বন্যার জলের ন্যায় সরিয়া গেল। কখন দেখিল, এক অনন্ত কুণ্ডে পর্ব্বতাকার অগ্নি জ্বলিতেছে। আকাশে তাহার শিখা উঠিতেছে; শৈবলিনী তাহার মধ্যে দগ্ধ হইতেছে; এমত সময়ে চন্দ্রশেখর আসিয়া সেই অগ্নিপর্ব্বতমধ্যে এক গণ্ডূল জল নিক্ষেপ করিলেন, অমনি অগ্নিরাশি নিবিয়া গেল; শীতল পবন বহিল, কুণ্ডমধ্যে স্বচ্ছসলিলা তরতরবাহিনী নদী বহিল, তীরে কুসুম সকল বিকশিত হইল, নদীজলে বড় বড় পদ্মফুল ফুটিল—চন্দ্রশেখর তাহার উপর দাঁড়াইয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন। কখন দেখিল, এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র আসিয়া শৈবলিনীকে মুখে করিয়া তুলিয়া পর্ব্বতে লইয়া যাইতেছে; চন্দ্রশেখর আসিয়া পূজার পুষ্পপাত্র হইতে একটি পুষ্প লইয়া ব্যাঘ্রকে ফেলিয়া মারিলেন, ব্যাঘ্র তখনই ভিন্নশিরা হইয়া প্রাণত্যাগ করিল, শৈবলিনী দেখিল, তাহার মুখ ফষ্টরের মুখের ন্যায়।

রাত্রিশেষে শৈবলিনী দেখিলেন, শৈবলিনীর মৃত্যু হইয়াছে অথচ জ্ঞান আছে। দেখিলেন, পিশাচে তাহার দেহ লইয়া অন্ধকারে শূন্যপথে উড়িতেছে। দেখিলেন, কত কৃষ্ণমেঘের সমুদ্র, কত বিদ্যুদগ্নিরাশি পার হইয়া তাহার কেশ ধরিয়া উড়াইয়া লইয়া যাইতেছে। কত গগনবাসী অপ্সরা কিন্নরাদি মেঘতরঙ্গ মধ্য হইতে মুখমণ্ডল উত্থিত করিয়া, শৈবলিনীকে দেখিয়া হাসিতেছে। দেখিলেন, কত গগনচারিণী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী স্বর্ণ-মেঘে আরোহণ করিয়া, স্বর্ণকলেবর বিদ্যুতের মালায় ভূষিত করিয়া, কৃষ্ণকেশাবৃত ললাটে তারার মালা গ্রথিত করিয়া বেড়াইতেছে,—শৈবলিনীর পাপময় দেহস্পৃষ্ট পবনস্পর্শে তাহাদের জ্যোতিঃ নিবিয়া যাইতেছে। কত গগনচারিণী ভৈরবী রাক্ষসী, অন্ধকারবৎ শরীর প্রকাণ্ড অন্ধকার মেঘের উপর হেলাইয়া ভীম বাত্যায় ঘুরিয়া ক্রীড়া করিতেছে,—শৈবলিনীর পূতিগন্ধবিশিষ্ট মৃতদেহ দেখিয়া তাহাদের মুখের জল পড়িতেছে, তাহারা হাঁ করিয়া আহার করিতে আসিতেছে। দেখিলেন, কত দেব দেবীর বিমানের, কৃষ্ণতাশূন্যা উজ্জ্বলালোকময়ী ছায়া মেঘের উপর পড়িয়াছে; পাছে পাপিষ্ঠা শৈবলিনীশবের ছায়া বিমানের পবিত্র ছায়ায় লাগিলে শৈবলিনীর পাপক্ষয় হয়, এই ভয়ে তাঁহারা বিমান সরাইয়া লইতেছেন। দেখিলেন, নক্ষত্রসুন্দরীগণ নীলাম্বরমধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুখগুলি বাহির করিয়া সকলে কিরণময় অঙ্গুলির দ্বারা পরস্পরকে শৈবলিনীর সব দেখাইতেছে—বলিতেছে—"দেখ, ভগিনি, দেখ, ভগিনি, দেখ, মনুষ্য-কীটের মধ্যে আবার অসতী আছে!" কোন তারা শিহরিয়া চক্ষু বুজিতেছে; কোন তারা লজ্জায় মেঘে মুখ ঢাকিতেছে; কোন তারা অসতীর নাম শুনিয়া ভয়ে নিবিয়া যাইতেছে। পিশাচেরা শৈবলিনীকে লইয়া ঊর্দ্ধে উঠিতেছে, তার পর আরও ঊর্দ্ধে, আরও মেঘ, আরও তারা পার হইয়া আরও ঊর্দ্ধে উঠিয়া সেইখান হইতে শৈবলিনীর দেহ নরককুণ্ডে নিক্ষেপ করিবে বলিয়া

উঠিতেছে। যেখানে উঠিল, সেখানে অন্ধকার, শীত,—মেঘ নাই, তারা নাই, আলো নাই, বায়ু নাই, শব্দ নাই। শব্দ নাই—কিন্তু অকস্মাৎ অতি দূরে অধঃ হইতে অতি ভীম কলকল ঘরঘর শব্দ শুনা যাইতে লাগিল—যেন অতিদূরে, অধোভাগে, শত সহস্র সমুদ্র এককালে গর্জ্জিতেছে। পিশাচেরা বলিল, ঐ নরকের কোলাহল শুনা যাইতেছে, এইখান হইতে শব ফেলিয়া দাও। এই বলিয়া পিশাচেরা শৈবলিনীর মস্তকে পদাঘাত করিয়া শব ফেলিয়া দিল। শৈবলিনী ঘুরিতে ঘুরিতে, ঘুরিতে ঘুরিতে, পড়িতে লাগিল। ক্রমে ঘূর্ণগতি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, অবশেষে কুম্ভকারের চক্রের ন্যায় ঘুরিতে লাগিল। শবের মুখে, নাসিকায়, রক্তবমন হইতে লাগিল। ক্রমে নরকের গর্জ্জন নিকটে শুনা যাইতে লাগিল, পূতিগন্ধ বাড়িতে লাগিল—অকস্মাৎ সজ্ঞানমৃতা শৈবলিনী দূরে নরক দেখিতে পাইল। তাহার পরেই তাহার চক্ষু অন্ধ, কর্ণ বধির হইল, তখন সে মনে মনে চন্দ্রশেখরের ধ্যান করিতে লাগিল, মনে মনে ডাকিতে লাগিল—"কোথায় তুমি, স্বামী! কোথায় প্রভু! স্ত্রীজাতির জীবনসহায়, আরাধনার দেবতা, সর্ব্বে সর্ব্বমঙ্গল! কোথায় তুমি চন্দ্রশেখর! তোমায় চরণারবিন্দে সহস্র, সহস্র, সহস্র, সহস্র প্রণাম! আমায় রক্ষা কর। তোমার নিকটে অপরাধ করিয়া, আমি এই নরককুণ্ডে পতিত হইতেছি—তুমি রক্ষা না করিলে কোন দেবতায় আমায় রক্ষা করিতে পারে না—আমায় রক্ষা কর। তুমি আমায় রক্ষা কর, প্রসন্ন হও, এইখানে আসিয়া চরণযুগল আমার মস্তকে তুলিয়া দাও, তাহা হইলেই আমি নরক হইতে উদ্ধার পাইব।"

তখন, অন্ধ, বধির, মৃতা শৈবলিনীর বোধ হইতে লাগিল যে, কে তাহাকে কোলে করিয়া বসাইল—তাঁহার অঙ্গের সৌরভে দিক্ পুরিল। সেই দুরন্ত নরক-রব সহসা অন্তর্হিত হইল, পূতিগন্ধের পরিবর্ত্তে কুসুমগন্ধ ছুটিল। সহসা শৈবলিনীর বধিরতা ঘুচিল—চক্ষু আবার দর্শনক্ষম হইল—সহসা শৈবলিনীর বোধ হইল—এ মৃত্যু নহে, জীবন; এ স্বপ্ন নহে, প্রকৃত। শৈবলিনী চেতনাপ্রাপ্ত হইল।

চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিল, গুহামধ্যে অল্প আলোক প্রবেশ করিয়াছে; বাহিরে পক্ষীর প্রভাতকূজন শুনা যাইতেছে—কিন্তু এ কি এ? কাহার অঙ্কে তাঁহার মাথা রহিয়াছে—কাহার মুখমণ্ডল, তাঁহার মস্তকোপরে, গগনোদিত পূর্ণচন্দ্রবৎ এ প্রভাতান্ধকারকে আলোক বিকীর্ণ করিতেছে? শৈবলিনী চিনিলেন, চন্দ্রশেখর—ব্রহ্মচারী-বেশে চন্দ্রশেখর!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : নৌকা ডুবিল

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "শৈবলিনী!"

শৈবলিনী উঠিয়া বসিল, চন্দ্রশেখরের মুখপানে চাহিল, মাথা ঘুরিল; শৈবলিনী পড়িয়া গেল; মুখ চন্দ্রশেখরের চরণে ঘর্ষিত হইল। চন্দ্রশেখর তাহাকে ধরিয়া তুলিলেন। তুলিয়া আপন শরীরের উপর ভর করিয়া শৈবলিনীকে বসাইলেন।

শৈবলিনী কাঁদিতে লাগিল, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে, চন্দ্রশেখরের চরণে পুনঃ পতিত হইয়া বলিল, "এখন আমার দশা কি হইবে!"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "তুমি আমাকে দেখিতে চাহিয়াছিলে কেন?"

শৈবলিনী চক্ষু মুছিল, রোদন স্ববরণ করিল—স্থির হইয়া বলিতে লাগিল, "বোধ হয় আমি আর অল্প দিন বাঁচিব।" শৈবলিনী শিহরিল—স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাপার মনে পড়িল—ক্ষণেক কপালে হাত দিয়া, নীরব থাকিয়া আবার বলিতে লাগিল, "অল্প দিন বাঁচিব—মরিবার আগে তোমাকে একবার দেখিতে সাধ হইয়াছিল। এ কথায় কে বিশ্বাস করিবে? কেন বিশ্বাস করিবে? যে ভ্রষ্টা হইয়া স্বামী ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, তাহার আবার স্বামী দেখিতে সাধ কি?"

শৈবলিনী কাতরতার বিকট হাসি হাসিল।

চন্দ্র। তোমার কথায় অবিশ্বাস নাই—আমি জানি যে, তোমাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিয়াছিল।

শৈ। সে মিথ্যা কথা। আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক ফষ্টরের সঙ্গে চলিয়া আসিয়াছিলাম। ডাকাইতির পূর্ব্বে ফষ্টর আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছিল।

চন্দ্রশেখর অধোবদন হইলেন। ধীরে ধীরে শৈবলিনীকে পুনরপি শুয়াইলেন; ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিলেন, গমনোন্মুখ হইয়া, মৃদুমধুর স্বরে বলিলেন, "শৈবলিনী, দ্বাদশ বৎসর প্রায়শ্চিত্ত কর। উভয়ে বাঁচিয়া থাকি, তবে প্রায়শ্চিত্তান্তে আবার সাক্ষাৎ হইবে। এক্ষণে এই পর্য্যন্ত।"

শৈবলিনী হাতযোড় করিল;—বলিল, "আর একবার বসো! বোধ হয়, প্রায়শ্চিত্ত আমার অদৃষ্টে নাই।" আবার সেই স্বপ্ন মনে পড়িল—"বসো—তোমায়—ক্ষণেক দেখি।"

চন্দ্রশেখর বসিলেন।

শৈবলিনী জিজ্ঞাসা করিল, "আত্মহত্যায় পাপ আছে কি?" শৈবলিনী স্থিরদৃষ্টে চন্দ্রশেখরের প্রতি চাহিয়াছিল, তাঁহার প্রফুল্ল নয়নপদ্ম জলে ভাসিতেছিল।

চন্দ্র। আছে। কেন মরিতে চাও?

শৈবলিনী শিহরিল। বলিল, "মরিতে পারিব না—সেই নরকে পড়িব।"

চন্দ্র। প্রায়শ্চিত্ত করিলে নরক হইতে উদ্ধার হইবে।

শৈ। এ মনোনরক হইতে উদ্ধারের প্রায়শ্চিত্ত কি?

চন্দ্র। সে কি?

শৈ।এ পর্ব্বতে দেবতারা আসিয়া থাকেন। তাঁহারা আমাকে কি করিয়াছেন বলিতে পারি না—আমি রাত্রিদিন নরক-স্বপ্ন দেখি।

চন্দ্রশেখর দেখিলেন, শৈবলিনীর দৃষ্টি গুহাপ্রান্তে স্থাপিত হইয়াছে—যেন দূরে কিছু দেখিতেছে। দেখিলেন, তাহার শীর্ণ বদনমণ্ডল বিশুষ্ক হইল—চক্ষুঃ বিস্ফারিত, পলকরহিত হইল—নাসারন্ধ্র সঙ্কুচিত, বিস্ফারিত হইতে লাগিল—শরীর কণ্টকিত হইল—কাঁপিতে লাগিল।

চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দেখিতেছ?"

শৈবলিনী কথা কহিলে না, পূর্ব্ববৎ চাহিয়া রহিল। চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ভয় পাইতেছ?"

শৈবলিনী প্রস্তরবৎ।

চন্দ্রশেখর বিস্মিত হইলেন—অনেকক্ষণ নীরব হইয়া শৈবলিনীর মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অকস্মাৎ শৈবলিনী বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল, "প্রভু! রক্ষা কর! রক্ষা কর! তুমি আমার স্বামী! তুমি না রাখিলে কে রাখে?"

শৈবলিনী মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িল।

চন্দ্রশেখর নিকটস্থ নির্ঝর হইতে জল আনিয়া শৈবলিনীর মুখে সিঞ্চন করিলেন। উত্তরীয়ের দ্বারা ব্যজন করিলেন। কিছুকাল পরে শৈবলিনী চেতনাপ্রাপ্ত হইল। শৈবলিনী উঠিয়া বসিল। নীরবে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "কি দেখিতেছিলে?"

শৈ। সেই নরক।

চন্দ্রশেখর দেখিলেন, জীবনেই শৈবলিনীর নরকভোগ আরম্ভ হইয়াছে। শৈবলিনী ক্ষণ পরে বলিল, "আমি মরিতে পারিব না—আমার ঘোরতর নরকের ভয়

হইয়াছে। মরিলেই নরকে যাইব। আমাকে বাঁচিতেই হইবে। কিন্তু একাকিনী, আমি দ্বাদশ বৎসর কি প্রকারে বাঁচিব? আমি চেতনে অচেতনে কেবল নরক দেখিতেছি।"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "চিন্তা নাই—উপবাসে এবং মানসিক ক্লেশে, এ সকল উপস্থিত হইয়াছে। বৈদ্যেরা ইহাকে বায়ুবেগে বলেন। তুমি বেদগ্রামে গিয়া গ্রামপ্রান্তে কুটীর নির্ম্মাণ কর। সেখানে সুন্দরী আসিয়া তোমার তত্ত্বাবধারণ করিবেন—চিকিৎসা করিতে পারিবেন।"

সহসা শৈবলিনী চক্ষু মুদিল—দেখিল, গুহাপ্রান্তে সুন্দরী দাঁড়াইয়া, প্রস্তরে উৎকীর্ণা—অঙ্গুলি তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দেখিল, সুন্দরী অতি দীর্ঘাকৃতা ক্রমে তালবৃক্ষপরিমিতা হইল, অতি ভয়ঙ্করী! দেখিল সেই গুহাপ্রান্তে সহসা নরক সৃষ্ট হইল—সেই পূতিগন্ধ, সেই ভয়ঙ্কর অগ্নিগর্জ্জন, সেই উত্তাপ, সেই শীত, সেই সর্পারণ্য, সেই কদর্য্য কীটরাশিতে গগন অন্ধকার! দেখিল, সেই নরকে পিশাচেরা কণ্টকের রজ্জুহস্তে, বৃশ্চিকের বেত্রহস্তে নামিল—রজ্জুতে শৈবলিনীকে বাঁধিয়া, বৃশ্চিকবেত্রে প্রহার করিতে করিতে লইয়া চলিল; তালবৃক্ষপরিমিতা প্রস্তরময়ী সুন্দরী হস্তোত্তোলন করিয়া তাহাদিগকে বলিতে লাগিল—"মার্! মার্! আমি বারণ করিয়াছিলাম! আমি নৌকা হইতে ফিরাইতে গিয়াছিলাম, শুনে নাই! মার্! মার্! যত পারিস্ মার্! আমি উহার পাপের সাক্ষী! মার্! মার্!" শৈবলিনী যুক্তকরে, উন্নত আননে, সজল-নয়নে সুন্দরীকে মিনতি করিতেছে, সুন্দরী শুনিতেছে না; কেবল ডাকিতেছে, "মার্! মার্!" অসতীকে মার্! আমি সতী, ও অসতী! মার্! মার্!" শৈবলিনী, আবার সেইরূপ দৃষ্টিস্থির লোচন বিস্ফারিত করিয়া বিশুষ্ক মুখে, স্তম্ভিতের ন্যায় রহিল। চন্দ্রশেখর চিন্তিত হইলেন—বুঝিলেন, লক্ষণ ভাল নহে। বলিলেন, "শৈবলিনি! আমার সঙ্গে আইস!"

প্রথমে শৈবলিনী শুনতে পাইল না। পরে চন্দ্রশেখর, তাহার অঙ্গে হস্তার্পণ করিয়া দুই তিন বার সঞ্চালিত করিয়া ডাকিতে লাগিলেন, বলিতে লাগিলেন, "আমার সঙ্গে আইস।"

সহসা শৈবলিনী দাঁড়াইয়া উঠিল, অতি ভীতস্বরে বলির, "চল, চল, চল, শীঘ্র চল, শীঘ্র চল, এখান হইতে শীঘ্র চল!" বলিয়াই, বিলম্ব না করিয়া, গুহাদ্বারাভিমুখে ছুটিল, চন্দ্রশেখরের প্রতীক্ষা না করিয়া দ্রুতপদে চলিল। দ্রুত চলিতে, গুহার অস্পষ্ট আলোকে পদে শিলাখণ্ড বাজিল, পদস্খলিত হইয়া শৈবলিনী ভূপতিতা হইল। আর শব্দ নাই চন্দ্রশেখর দেখিলেন, শৈবলিনী আবার মূর্চ্ছিতা হইয়াছে।

তখন চন্দ্রশেখর, তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া গুহা হইতে বাহির হইয়া, যথায় পর্ব্বতাঙ্গ হইতে অতি ক্ষীণা নির্ঝরিণী নিঃশব্দে জলোদ্গার করিতেছিল—তথায় আনিলেন—মুখে জলসেক করাতে এবং অনাবৃত স্থানের অনবরুদ্ধ বায়ুস্পর্শে শৈবলিনী সংজ্ঞালাভ করিয়া চক্ষু চাহিল—বলিল, "আমি কোথায় আসিয়াছি?"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "আমি তোমাকে বাহিরে আনিয়াছি?"

শৈবলিনী শিহরিল—আবার ভীতা হইল। বলিল, "তুমি কে?" চন্দ্রশেখরও ভীত হইলেন। বলিলেন, "কেন এরূপ করিতেছ? আমি যে তোমার স্বামী—চিনিতে পারিতেছ না কেন?"

শৈবলিনী হা হা করিয়া হাসিল, বলিল,

"স্বামী আমার সোণার মাছি বেড়ায় ফুলে ফুলে;
তেকাটাতে এলে, সখা, বুঝি পথ ভুলে?

তুমি কি লরেন্স ফষ্টর?"

চন্দ্রশেখর দেখিলেন যে, যে দেবীর প্রভাতেই এই মনুষ্যদেহ সুন্দর, তিনি শৈবলিনীকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন—বিকট উন্মাদ আসিয়া তাঁহার সুবর্ণমন্দির

অধিকার করিতেছে। চন্দ্রশেখর রোদন করিলেন। অতি মৃদুস্বরে, কত আদরে আবার ডাকিলেন, "শৈবলিনী!"

শৈবলিনী আবার হাসিল, বলিল, "শৈবলিনী কে? রসো রসো! একটি মেয়ে ছিল, তার নাম শৈবলিনী, আর একটি ছেলে ছিল, তার নাম প্রতাপ। এক দিন রাত্রে ছেলেটি সাপ হয়ে বনে গেল; মেয়েটি ব্যাঙ্ হয়ে বনে গেল। সাপটি ব্যাঙ্টিকে গিলিয়া ফেলিল। আমি স্বচক্ষে দেখেছি। হাঁ গা সাহেব! তুমি কি লরেন্স ফষ্টর?"

চন্দ্রশেখর গদ্গদকণ্ঠে সকাতরে ডাকিলেন, "গুরুদেব! এ কি করিলে? এ কি করিলে?"

শৈবলিনী গীত গাইল,

"কি করিলে প্রাণসখী, মনচোরে ধরিয়ে,
ভাসিল পীরিতি-নদী দুই কূল ভরিয়ে,"

বলিতে লাগিল, "মনচোর কে? চন্দ্রশেখর। ধরিল কাকে? চন্দ্রশেখরকে। ভাসিল কে? চন্দ্রশেখর। দুই কূল কি? জানি না। তুমি চন্দ্রশেখরকে চেন?"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "আমিই চন্দ্রশেখর।"

শৈবলিনী ব্যাঘ্রীর ন্যায় ঝাঁপ দিয়া চন্দ্রশেখরের কণ্ঠলগ্ন হইল—কোন কথা না বলিয়া, কাঁদিতে লাগিল—কত কাঁদিল—তাহার অশ্রুজলে চন্দ্রশেখরের পৃষ্ঠ, কণ্ঠ, বক্ষ, বস্ত্র, বাহু প্লাবিত হইল। চন্দ্রশেখরও কাঁদিলেন। শৈবলিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "আমি তোমার সঙ্গে যাইব।"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "চল।"

শৈবলিনী বলিল, "আমাকে মারিবে না!"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "না।"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চন্দ্রশেখর গাত্রোত্থান করিলেন। শৈবলিনীও উঠিল। চন্দ্রশেখর বিষণ্ণবদনে চলিলেন—উন্মাদিনী পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল—কখন হাসিতে লাগিল—কখন কাঁদিতে লাগিল—কখন গায়িতে লাগিল।

পঞ্চম খণ্ড

প্রচ্ছাদন

প্রথম পরিচ্ছেদ : আমিয়টের পরিণাম

মুরশিদাবাদে আসিয়া, ইংরেজের নৌকাসকল পৌঁছিল। মীরকাসেমের নায়েব মহম্মদ তকি খাঁর নিকট সম্বাদ আসিল যে, আমিয়ট পৌঁছিয়াছে।

মহাসমারোহের সহিত আসিয়া মহম্মদ তকি আমিয়টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। আমিয়ট আপ্যায়িত হইলেন। মহম্মদ তকি খাঁ পরিশেষে আমিয়টকে আহারার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। আমিয়ট অগত্যা স্বীকার করিলেন, কিন্তু প্রফুল্লমনে নহে। এদিকে মহম্মদ তকি, দূরে অলক্ষিতরূপে প্রহরী নিযুক্ত করিলেন—ইংরেজের নৌকা খুলিয়া না যায়।

মহম্মদ তকি চলিয়া গেলে, ইংরেজেরা পরামর্শ করিতে লাগিলেন যে, নিমন্ত্রণে যাওয়া কর্ত্তব্য কি না। গল্‌ষ্টন্ ও জন্‌সন্ এই মত ব্যক্ত করিলেন যে, ভয় কাহাকে বলে, তাহা ইংরেজ জানে না, জানাও কর্ত্তব্য নহে। সুতরাং নিমন্ত্রণে যাইতে হইবে। আমিয়ট বলিলেন, যখন ইহাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছি, এবং অসদ্ভাব যতদূর হইতে হয় হইয়াছে, তখন আবার ইহাদিগের সঙ্গে আহার ব্যবহার কি? আমিয়ট স্থির করিলেন, নিমন্ত্রণে যাইবেন না।

এদিকে যে নৌকায় দলনী ও কুল্‌সুম্ বন্দিস্বরূপে সংরক্ষিতা ছিলেন, সে নৌকাতেও নিমন্ত্রণের সম্বাদ পৌঁছিল। দলনী ও কুল্‌সম্ কাণে কাণে কথা কহিতে লাগিল। দলনী বলিল, “কুল্‌সম্—শুনিতেছ? বুঝি মুক্তি নিকট।”

কু। কেন?

দ। তুই যেন কিছুই বুঝিস্ না; যাহারা নবাবের বেগমকে কয়েদ করিয়া আনিয়াছে—তাহাদের যে নবাবের পক্ষ হইতে সাদর নিমন্ত্রণ হইয়াছে, ইহার ভিতর গূঢ় অর্থ আছে। বুঝি আজি ইংরেজ মরিবে।

কু। তাতে কি তোমার আহ্লাদ হইয়াছে?

দ। নহে কেন? একটা রক্তারক্তি না হইলেই ভাল হয়। কিন্তু যাহারা আমাকে অনর্থক কয়েদ করিয়া আনিয়াছে, তাহারা মরিলে যদি আমরা মুক্তি পাই, তাহাতে আমার আহ্লাদ বৈ নাই।

কু। কিন্তু মুক্তির জন্য এত ব্যস্ত কেন? আমাদের আটক রাখা ভিন্ন ইহাদের আর কোন অভিসন্ধি দেখা যায় না। আমাদের উপর আর কোন দৌরাত্ম্য করিতেছে না। কেবল আটক। আমরা স্ত্রীজাতি, যেখানে যাইব সেইখানেই আটক।

দলনী বড় রাগ করিল। বলিল, “আপন ঘরে আটক থাকিলেও আমি দলনী বেগম, ইংরেজের নৌকায় আমি বাঁদী। তোর সঙ্গে কথা কহিতে ইচ্ছা করে না। আমাদের কেন আটক করিয়া রাখিয়াছে, বলিতে পারিস্?”

কু। তা ত বলিয়াই রাখিয়াছে। মুঙ্গেরে যেমন হে সাহেব ইংরেজের জামিন হইয়া আটক আছে, আমরাও তেমনি নবাবের জামিন হইয়া ইংরেজের কাছে আটক আছি। হে সাহেবকে ছাড়িয়া দিলেই আমাদিগকে ছাড়িয়া দিবে। হে সাহেবের কোন অনিষ্ট ঘটিলেই আমাদেরও অনিষ্ট ঘটিবে; নহিলে ভয় কি?

দলনী আরও রাগিল, বলিল, “আমি তোর হে সাহেবকে চিনি না, তোর ইংরেজের গোঁড়ামি শুনিতে চাহি না। ছাড়িয়া দিলেও তুই বুঝি যাইবি না?”

কুল্‌সম্ রাগ না করিয়া হাসিয়া বলিল, “যদি আমি না যাই, তবে তুমি কি আমাকে ছাড়িয়া যাও?”

দলনীর রাগ বাড়িতে লাগিল, বলিল, “তাও কি সাধ না কি?”

কুল্‌সম্ গম্ভীরভাবে বলিল, “কপালের লিখন কি বলিতে পারি?”

দলনী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া, বড় জোরে একটা ছোট কিল উঠাইল। কিন্তু কিলটি আপাততঃ পুঁজি করিয়া রাখিল—ছাড়িল না। দলনী আপন কর্ণের নিকট সেই কিলটি উত্থিত করিয়া—কৃষ্ণকেশগুচ্ছ সংস্পর্শে যে কর্ণ, সভ্রমর প্রস্ফুট কুসুমবৎ শোভা পাইতেছিল, তাহার নিকট কমল-কোরক তুল্য বদ্ধ মুষ্টি স্থির করিয়া, বলিল, “তোকে আমিয়ট দুই দিন কেন ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিল, সত্য কথা বল্ ত?”

কু। সত্য কথা ত বলিয়াছি, তোমার কোন কষ্ট হইতেছে কি না—তাহাই জানিবার জন্য। সাহেবদিগের ইচ্ছা, যত দিন আমরা ইংরেজের নৌকায় থাকি, সুখে স্বচ্ছন্দে থাকি। জগদীশ্বর করুন, ইংরেজ আমাদের না ছাড়ে।

দলনী কিল আরও উচ্চ করিয়া তুলিয়া বলিল, “জগদীশ্বর করুন তুমি শীঘ্র মর।”

কু। ইংরেজ ছাড়িলে, আমরা ফের নবাবের হাতে পড়িব। নবাব তোমাকে ক্ষমা করিলে করিতে পারেন, কিন্তু আমায় ক্ষমা করিবেন না, ইহা নিশ্চিত বুঝিতে পারি। আমার এমন মনে হয় যে, যদি কোথায় আশ্রয় পাই, তবে আর নবাবের হুজুরে হাজির হইব না।

দলনী রাগ ত্যাগ করিয়া গদ্গদকণ্ঠে বলিল, “আমি অনন্যগতি। মরিতে হয়, তাঁহারই চরণে পতিত হইয়া মরিব।”

এদিকে আমিয়ট আপনার আজ্ঞাধীন সিপাহীগণকে সজ্জিত হইতে বলিলেন। জন্‌সন্‌ বলিলেন, “এখানে আমরা তত বলবান্‌ নহি—রেসিডেন্সির নিকট নৌকা লইয়া গেলে হয় না?”

আমিয়ট বলিলেন, “যেদিন, একজন ইংরেজ দেশী লোকের ভয়ে পলাইবে, সেই দিন ভারতবর্ষে ইংরেজ সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা বিলুপ্ত হইবে। এখান হইতে নৌকা খুলিলেই মুসলমান বুঝিবে যে, আমরা ভয়ে পলাইলাম। দাঁড়াইয়া মরিব সেও ভাল, তথাপি ভয় পাইয়া পলাইব না। কিন্তু ফষ্টর পীড়িত। শত্রুহস্তে মরিতে অক্ষম—অতএব তাহাকে রেসিডেন্সিতে যাইতে অনুমতি কর। তাহার নৌকায় বেগম ও দ্বিতীয় স্ত্রীলোকটিকে উঠাইয়া দাও। এবং দুইজন সিপাই সঙ্গে দাও। বিবাদের স্থানে উহাদের থাকা অনাবশ্যক।”

সিপাহীগণ সজ্জিত হইলে, আমিয়টের আজ্ঞানুসারে নৌকার মধ্যে সকলে প্রচ্ছন্ন হইয়া বসিল ঝাঁপের বেড়ার নৌকায় সহজেই ছিদ্র পাওয়া যায়, প্রত্যেক সিপাহী এক এক ছিদ্রের নিকটে বন্দুক লইয়া বসিল। আমিয়টের আজ্ঞানুসারে দলনী ও কুল্‌সম্‌ ফষ্টরের নৌকায় উঠিল। দুই জন সিপাহী সঙ্গে ফষ্টর নৌকা খুলিয়া গেল। দেখিয়া মহম্মদ তকির প্রহরীরা তাঁহাকে সম্বাদ দিতে গেল।

এ সম্বাদ শুনিয়া এবং ইংরেজদিগের আসিবার সময় অতীত হইল দেখিয়া, মহম্মদ তকি, ইংরেজদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিবার জন্য দূত পাঠাইলেন। আমিয়ট উত্তর করিলেন যে, কারণবশতঃ তাঁহারা নৌকা হইতে উঠিতে অনিচ্ছুক।

দূত নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া কিছু দূরে আসিয়া, একটা ফাঁকা আওয়াজ করিল। সেই শব্দের সঙ্গে, তীর হইতে দশ বারটা বন্দুকের শব্দ হইল। আমিয়ট দেখিলেন, নৌকার উপর গুলিবর্ষণ হইতেছে এবং স্থানে স্থানে নৌকার ভিতর গুলি প্রবেশ করিতেছে।

তখন ইংরেজ সিপাহীরাও উত্তর দিল। উভয় পক্ষে, উভয়কে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছাড়াতে শব্দে বড় হুলস্থুল পড়িল। কিন্তু উভয় পক্ষই প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত। মুসলমানেরা তীরস্থ গৃহাদির অন্তরালে লুক্কায়িত; ইংরেজ এবং তাহাদিগের সিপাহীগণ নৌকামধ্যে লুক্কায়িত। এরূপ যুদ্ধে বারুদ খরচ ভিন্ন অন্য ফলের আশু কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না।

তখন, মুসলমানেরা আশ্রয় ত্যাগ করিয়া, তরবারি ও বর্শা হস্তে চীৎকার করিয়া আমিয়টের নৌকাভিমুখে ধাবিত হইল। দেখিয়া স্থিরপ্রতিজ্ঞ ইংরেজের ভীত হইল না।

স্থির চিত্তে, নৌকামধ্য হইতে দ্রুতাবতরণপ্রবৃত্ত মুসলমানদিগকে লক্ষ্য করিয়া আমিয়ট, গল্‌ষ্টন ও জন্‌সন্‌ স্বহস্তে বন্দুক লইয়া অব্যর্থ সন্ধানে প্রতি বারে এক এক জনে এক এক জন যবনকে বালুকাশায়ী করিতে লাগিলেন।

কিন্তু যেরূপ তরঙ্গের উপর তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হয়, সেইরূপ যবনশ্রেণীর উপর যবনশ্রেণী নামিতে লাগিল। তখন আমিয়ট বলিলেন, “আর আমাদিগের রক্ষার

কোন উপায় নাই। আইস আমরা বিধর্ম্মী নিপাত করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করি।”

ততক্ষণে মুসলমানেরা গিয়া আমিয়টের নৌকায় উঠিল। তিন জন ইংরেজ এক হইয়া এককালীন আওয়াজ করিলেন। ত্রিশূলবিভিন্নের ন্যায় নৌকারূঢ় যবনশ্রেণী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া নৌকা হইতে জলে পড়িল।

আরও মুসলমান নৌকায় উপর উঠিল। আরও কতকগুলো মুসলমান মুদ্গরাদি লইয়া নৌকার তলে আঘাত করিতে লাগিল। নৌকার তলদেশ ভগ্ন হইয়া যাওয়ায়, কল কল শব্দে তরণী জলপূর্ণ হইতে লাগিল।

আমিয়ট সঙ্গীদিগকে বলিলেন, “গোমেষাদির ন্যায় জলে ডুবিয়া মরিব কেন? বাহিরে আইস, বীরের ন্যায় অস্ত্রহস্তে মরি।”

তখন তরবারি হস্তে তিন জন ইংরেজ অকুতোভয়ে, সেই অগণিত যবনগণের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। একজন যবন, আমিয়টকে সেলাম করিয়া বলিল, “কেন মরিবেন? আমাদিগের সঙ্গে আসুন।”

আমিয়ট বলিলেন, “মরিব। আমরা আজি এখানে মরিলে, ভারতবর্ষে যে আগুন জ্বলিবে, তাহাতে মুসলমান রাজ্য ধ্বংস হইবে। আমাদের রক্তে ভূমি ভিজিলে তৃতীয় জর্জ্জের রাজপতাকা তাহাতে সহজে রোপিত হইবে।”

“তবে মর।” এই বলিয়া পাঠান তরবারির আঘাতে আমিয়টের মুণ্ড চিরিয়া ফেলিল। দেখিয়া ক্ষিপ্রহস্তে গল্‌ষ্টন সেই পাঠানের মুণ্ড স্কন্ধচ্যুত করিলেন।

তখন দশ বার জন যবনে গল্‌ষ্টনকে ঘেরিয়া প্রহার করিতে লাগিল। এবং অচিরাৎ বহু লোকের প্রহারে আহত হইয়া গল্‌ষ্টন ও জন্‌সন্‌ উভয়েই প্রাণত্যাগ করিয়া নৌকার উপর শুইলেন।

তৎপূর্ব্বেই ফষ্টর নৌকা খুলিয়া গিয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আবার সেই

যখন রামচরণের গুলি খাইয়া লরেন্স ফষ্টর গঙ্গার জলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তখন প্রতাপ বজরা খুলিয়া গেলে পর, হাতিয়ারের নৌকার মাঝিরা জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া, ফষ্টরের দেহের সন্ধান করিয়া উঠিয়াছিল; সেই নৌকার পাশ দিয়াই ফষ্টরের দেহ ভাসিয়া যাইতেছিল। তাহারা ফষ্টরকে উঠাইয়া নৌকায় রাখিয়া আমিয়টকে সম্বাদ দিয়াছিল।

আমিয়ট সেই নৌকার উপর আসিলেন। দেখিলেন, ফষ্টর অচেতন, কিন্তু প্রাণ নির্গত হয় নাই। মস্তিস্ক ক্ষত হইয়াছিল বলিয়া চেতনা বিনষ্ট হইয়াছিল। ফষ্টরের মরিবারই অধিক সম্ভাবনা, কিন্তু বাঁচিলেও বাঁচিতে পারেন। আমিয়ট চিকিৎসা জানিতেন, রীতিমত তাঁহার চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। বকাউল্লাহর প্রদত্ত সন্ধান মতে, ফষ্টরের নৌকা খুঁজিয়া ঘাটে আনিলেন। যখন আমিয়ট মুঙ্গের হইতে যাত্রা করেন, তখন মৃতবৎ ফষ্টরকে সেই নৌকায় তুলিয়া আনিলেন।

ফষ্টরের পরমায়ু ছিল—সে চিকিৎসায় বাঁচিল। আবার পরমায়ু ছিল, মুরশিদাবাদে মুসলমান-হস্তে বাঁচিল। কিন্তু এখন সে রুগ্ন—বলহীন—তেজোহীন,—আর সে সাহস—সে দম্ভ নাই। এক্ষণে সে প্রাণভয়ে ভীত, প্রাণভয়ে পলাইতেছিল। মস্তিষ্কের আঘাত জন্য, বুদ্ধিও কিঞ্চিৎ বিকৃত হইয়াছিল।

ফষ্টর দ্রুত নৌকা চালাইতেছিল—তথাপি ভয়, পাছে মুসলমান পশ্চাদ্ধাবিত হয়। প্রথমে সে কাশিমবাজারের রেসিডেন্সিতে আশ্রয় লইবে মনে করিয়াছিল—তাহাতে ভয় হইল, পাছে মুসলমান গিয়া রেসিডেন্সি আক্রমণ করে। সুতরাং সে অভিপ্রায় ত্যাগ করিল। এ স্থলে ফষ্টর যথার্থ অনুমান করিয়াছিল।

মুসলমানেরা অচিরাৎ কাশিমবাজারে গিয়া রেসিডেন্সি আক্রমণ করিয়া তাহা লুঠ করিল।

ফষ্টর দ্রুতবেগে কাশিমবাজার, ফরাসডাঙ্গা, সৈদাবাদ, রাঙ্গামাটি ছাড়াইয়া গেল। তথাপি ভয় যায় না। যে কোন নৌকা পশ্চাতে আইসে, মনে করে, যবনের নৌকা আসিতেছে। দেখিল, একখানি ক্ষুদ্র নৌকা কোন মতেই সঙ্গ ছাড়িল না।

ফষ্টর তখন রক্ষার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। ভ্রান্ত বুদ্ধিতে নানা কথা মনে আসিতে লাগিল। একবার মনে করিল যে, নৌকা ছাড়িয়া তীরে উঠিয়া পলাই। আবার ভাবিল, পলাইতে পারিব না—আমার সে বল নাই। আবার ভাবিল, জলে ডুবি—আবার ভাবিল, জলে ডুবিলে বাঁচিলাম কই। আবার ভাবিল যে, এই দুইটা স্ত্রীলোককে জলে ফেলিয়া নৌকা হাল্কা করি—নৌকা আরও শীঘ্র যাইবে।

অকস্মাৎ তাহার এক কুবুদ্ধি উপস্থিত হইল। এই স্ত্রীলোকদিগের জন্য যবনেরা তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছে, ইহা তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল। দলনী যে নবাবের বেগম, তাহা সে শুনিয়াছিল—মনে ভাবিল, বেগমের জন্যই মুসলমানেরা ইংরেজের নৌকা আক্রমণ করিয়াছে। অতএব বেগমকে ছাড়িয়া দিলে আর কোন গোল থাকিবে না। সে স্থির করিল যে, দলনীকে নামাইয়া দিবে।

দলনীকে বলিল, "ঐ একখানি ক্ষুদ্র নৌকা আমাদের পাছু পাছু আসিতেছে দেখিতেছ?"

দলনী বলিল, "দেখিতেছি।"

ফ। উহা তোমাদের লোকের নৌকা,—তোমাকে কাড়িয়া লইবার জন্য আসিতেছে।

এরূপ মনে করিবার কোন কারণ ছিল? কিছুই না, কেবল ফষ্টরের বিকৃত বুদ্ধিই ইহার কারণ,—সে রজ্জুতে সর্প দেখিল। দলনী যদি বিবেচনা করিয়া দেখিত, তাহা হইলে এ কথায় সন্দেহ করিত। কিন্তু যে যাহার জন্য ব্যাকুল হয়, সে তাহার নামেই মুগ্ধ হয়, আশায় অন্ধ হইয়া বিচারে পরাঙ্মুখ হয়। দলনী আশায় মুগ্ধ হইয়া সে কথায় বিশ্বাস করিল—বলিল, "তবে কেন ঐ নৌকায় আমাদের উঠাইয়া দাও না। তোমাকে অনেক টাকা দিব।"

ফ। আমি তাহা পারিব না। উহারা আমার নৌকা ধরিতে পারিলে আমাকে মারিয়া ফেলিবে।

দ। আমি বারণ করিব।

ফ। তোমার কথা শুনিবে না। তোমাদের দেশের লোক স্ত্রীলোকের কথা গ্রাহ্য করে না।

দলনী তখন ব্যাকুলতাবশতঃ জ্ঞান হারাইল—ভাল মন্দ ভাবিয়া দেখিল না। যদি ইহা নিজামতের নৌকা না হয়, তবে কি হইবে, তাহা ভাবিল না; এ নৌকা যে, নিজামতের নহে, সে কথা তাহার মনে আসিল না। ব্যাকুলতাবশতঃ আপনাকে বিপদে নিক্ষেপ করিল, বলিল, "তবে আমাদের তীরে নামাইয়া দিয়া তুমি চলিয়া যাও।"

ফষ্টর সানন্দে সম্মত হইল। নৌকা তীরে লাগাইতে হুকুম দিল।

কুলসম্ বলিল, "আমি নামিব না। আমি নবাবের হাতে পড়িলে, আমার কপালে কি আছে, বলিতে পারি না। আমি সাহেবের সঙ্গে কলিকাতায় যাইব—সেখানে আমার জানা শুনা লোক আছে।"

দলনী বলিল, "তোর কোন চিন্তা নাই। যদি আমি বাঁচি, তবে তোকেও বাঁচাইব।"

কুল্‌সম্। তুমি বাঁচিলে ত?

কুল্‌সম্ কিছুতেই নামিতে রাজি হইল না। দলনী তাহাকে অনেক বিনয় করিল—সে কিছুতেই শুনিল না। ফষ্টর কুল্‌সম্‌কে বলিল, "কি জানি, যদি তোমার

জন্য নৌকা পিছু পিছু আইসে। তুমিও নাম।”

কুল্‌সম্‌ বলিল, “যদি আমাকে ছাড়, তবে আমি ঐ নৌকায় উঠিয়া, যাহাতে নৌকাওয়ালারা তোমার সঙ্গ না ছাড়ে, তাহাই করিব।”

ফষ্টর ভয় পাইয়া আর কিছু বলিল না—দলনী কুল্‌সমের জন্য চক্ষের জল ফেলিয়া নৌকা হইতে উঠিল। ফষ্টর নৌকা খুলিয়া চলিয়া গেল। তখন সূর্য্যাস্তের অল্পমাত্র বিলম্ব আছে।

ফষ্টরের নৌকা ক্রমে দৃষ্টির বাহির হইল। যে ক্ষুদ্র তরণীকে নিজামতের নৌকা ভাবিয়া ফষ্টর দলনীকে নামাইয়া দিয়াছিল, সে নৌকাও নিকটে আসিল। প্রতি ক্ষণে দলনী মনে করিতে লাগিল যে, নৌকা এইবার তাঁহাকে তুলিয়া লইবার জন্য ভিড়িবে; কিন্তু নৌকা ভিড়িল না। তখন তাহাকে দেখিতে পাইয়াছে কি না, এই সন্দেহে দলনী অঞ্চল ঊর্দ্ধোত্থিত করিয়া আন্দোলিত করিতে লাগিল। তথাপি নৌকা ফিরিল না। বাহিয়া বাহির হইয়া গেল। তখন বিদ্যুচ্চমকের ন্যায় দলনীর চমক হইল—এ নৌকা নিজামতের কিসে সিদ্ধান্ত করিলাম! অপরের নৌকা হইতেও পারে! দলনী তখন ক্ষিপ্তার ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে সেই নৌকার নাবিকদিগকে ডাকিতে লাগিল। “এ নৌকায় হইবে না” বলিয়া তাহারা চলিয়া গেল।

দলনীর মাথায় বজ্রাঘাত পড়িল। ফষ্টরের নৌকা তখন দৃষ্টির অতীত হইয়াছিল—তথাপি সে কূলে কূলে দৌড়িল, তাহা ধরিতে পারিবে বলিয়া দলনী কূলে কূলে দৌড়িল। কিন্তু বহুদূরে দৌড়িয়া নৌকা ধরিতে পারিল না। পূর্ব্বেই সন্ধ্যা হইয়াছিল—এক্ষণে অন্ধকার হইল। গঙ্গার উপরে আর কিছু দেখা যায় না—অন্ধকারে কেবল বর্ষার নববারি-প্রবাহের কলকল ধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল। তখন হতাশ হইয়া দলনী, উন্মূলিত ক্ষুদ্র বৃক্ষের ন্যায় বসিয়া পড়িল।

ক্ষণকাল পরে দলনী, আর গঙ্গাগর্ভমধ্যে বসিয়া কোন ফল নাই বিবেচনা করিয়া গাত্রোত্থান করিয়া, ধীরে ধীরে উপরে উঠিল। অন্ধকারে উঠিবার পথ দেখা যায় না। দুই একবার পড়িয়া উঠিল। উঠিয়া ক্ষীণ নক্ষত্রালোকে, চারি দিক্‌ চাহিয়া দেখিল। দেখিল, কোন দিকে কোন গ্রামের কোন চিহ্ন নাই—কেবল অনন্ত প্রান্তর, আর সেই কলনাদিনী নদী; মনুষ্যের ত কথাই নাই—কোন দিকে আলো দেখা যায় না—গ্রাম দেখা যায় না—বৃক্ষ দেখা যায় না—পথ দেখা যায় না—শৃগাল কুক্কুর ভিন্ন কোন জন্তু দেখা যায় না—কলনাদিনী নদী-প্রবাহে নক্ষত্র নাচিতেছে দেখা যায়। দলনী মৃত্যু নিশ্চয় করিল।

সেইখানে প্রান্তরমধ্যে নদীর অনতিদূরে দলনী বসিল। নিকটে ঝিল্লী রব করিতে লাগিল—নিকটেই শৃগাল ডাকিতে লাগিল। রাত্রি ক্রমে গভীরা হইল—অন্ধকার ক্রমে ভীমতর হইল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে, দলনী মহা ভয় পাইয়া দেখিল, সেই প্রান্তরমধ্যে, এক দীর্ঘকার পুরুষ একা বিচরণ করিতেছে। দীর্ঘাকৃত পুরুষ, বিনা বাক্যে দলনীর পার্শ্বে আসিয়া বসিল।

আবার সেই! এই দীর্ঘাকৃত পুরুষ শৈবলিনীকে তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে অন্ধকারে পর্ব্বতারোহণ করিয়াছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : নৃত্যগীত

মুঙ্গেরে প্রশস্ত অট্টালিকামধ্যে স্বরূপচন্দ জগৎশেঠ এবং মাহতাবচন্দ জগৎশেঠ দুই ভাই বাস করিতেছিলেন। তথায় নিশীথে সহস্র প্রদীপ জ্বলিতেছিল। তথায় শ্বেতমর্ম্মরবিন্যাসশীতল মণ্ডপমধ্যে, নর্ত্তকীর রত্নাভরণ হইতে সেই অসংখ্য দীপমালারশ্মি প্রতিফলিত হইতেছিল। জলে জল বাঁধে—আর উজ্জ্বলেই উজ্জ্বল বাঁধে। দীপরশ্মি, উজ্জ্বল প্রস্তরস্তম্ভে—উজ্জ্বল স্বর্ণ-মুক্তা-খচিত মসনদে, উজ্জ্বল হীরকাদি খচিত গন্ধপাত্রে, শেঠদিগের কণ্ঠবিলম্বিত স্থূলোজ্জ্বল মুক্তাহারে,—আর নর্ত্তকীর প্রকোষ্ঠ, কণ্ঠ, কেশ এবং কর্ণের আভরণে জ্বলিতেছিল। তাহার সঙ্গে মধুর গীতশব্দ উঠিয়া উজ্জ্বল মধুরে মিশাইতেছিল। উজ্জ্বলে মধুরে মিশিতেছিল! যখন নৈশ

নীলাকাশে চন্দ্রোদয় হয়, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে; যখন সুন্দরীর সজল নীলেন্দীবর লোচনে বিদ্যুচ্চকিত কটাক্ষ বিক্ষিপ্ত হয়, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে; যখন স্বচ্ছ নীল সরোবরশায়িনী উন্মোষোন্মুখী নলিনীর দলরাজি, বালসূর্য্যের হেমোজ্জ্বল কিরণে বিভিন্ন হইতে থাকে, নীল জলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঊর্ম্মিমালার উপরে দীর্ঘ রশ্মি সকল নিপতিত হইয়া পদ্মপত্রস্থ জলবিন্দুকে জ্বালিয়া দিয়া, জলচর বিহঙ্গকুলের কল কণ্ঠ বাজাইয়া দিয়া, জলপদ্মের ওষ্ঠাধর খুলিয়া দেখিয়া যায়, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে; আর যখন তোমার গৃহিণীর পাদপদ্মে, ডায়মনকাটা মল-ভানু লুটাইতে থাকে, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে। যখন সন্ধ্যাকালে, গগনমণ্ডলে, সূর্য্যতেজ ডুবিয়া যাইতেছে দেখিয়া নীলিমা তাহাকে ধরিতে ধরিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়ায়, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে,—আর যখন, তোমার গৃহিণী কর্ণাভরণ দোলাইয়া, তিরস্কার করিতে করিতে তোমার পশ্চাদ্ধাবিত হন, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে। যখন চন্দ্রকিরণ-প্রদীপ্ত গঙ্গাজলে বায়ু-প্রপীড়নে সফেন তরঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হইয়া চাঁদের আলোতে জ্বলিতে থাকে, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে—আর যখন স্পার্ক্লিংশ্যাম্পেন তরঙ্গ তুলিয়া স্ফটিকপাত্রে জ্বলিতে থাকে, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে। যখন জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে দক্ষিণ বায়ু মিলে, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে—আর যখন সন্দেশময় ফলাহারের পাতে, রজত মুদ্রা দক্ষিণা মিলে, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে। যখন প্রাতঃসূর্য্য-কিরণে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বসন্তের কোকিল ডাকিতে থাকে, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে—আর যখন প্রদীপমালার আলোকে রত্নাভরণে ভূষিত হইয়া, রমণী সঙ্গীত করে, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে।

উজ্জ্বলে মধুরে মিশিল—কিন্তু শেঠদিগের অন্তঃকরণে তাহার কিছুই মিশিল না। তাঁহাদের অন্তঃকরণে মিশিল, গুর্‌গণ খাঁ।

বাঙ্গালা রাজ্যে সমরাগ্নি এক্ষণে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কলিকাতার অনুমতি পাইবার পূর্ব্বেই পাটনার এলিস্ সাহেব পাটনার দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি দুর্গ অধিকার করেন, কিন্তু মুঙ্গের হইতে মুসলমান সৈন্য প্রেরিত হইয়া, পাটনাস্থিত মুসলমান সৈন্যের সহিত একত্রিত হইয়া, পাটনা পূর্নব্বার মীরকাসেমের অধিকারে লইয়া আইসে। এলিস্ প্রভৃতি পাটনাস্থিত ইংরেজেরা মুসলমানদিগের হস্তে পতিত হইয়া, মুঙ্গেরে বন্দিভাবে আনীত হয়েন। এক্ষণে উভয় পক্ষে প্রকৃতভাবে রণসজ্জা করিতেছিলেন। শেঠদিগের সহিত গুর্‌গণ খাঁ সেই বিষয়ে কথোপকথন করিতেছিলেন। নৃত্য গীত উপলক্ষ মাত্র—জগৎশেঠেরা বা গুর্‌গণ খাঁ কেহই তাহা শুনিতেছিলেন না। সকলে যাহা করে, তাঁহারাও তাহাই করিতেছিলেন। শুনিবার জন্য কে কবে সঙ্গীতের অবতারণা করায়?

গুর্‌গণ খাঁর মনস্কামনা সিদ্ধ হইল—তিনি মনে করিলেন যে, উভয় পক্ষ বিবাদ করিয়া ক্ষীণবল হইলে, তিনি উভয় পক্ষকে পরাজিত করিয়া স্বয়ং বাঙ্গালার অধীশ্বর হইবেন। কিন্তু সে অভিলাষ-সিদ্ধির পক্ষে প্রথম আবশ্যক যে, সেনাগণ তাঁহারই বাধ্য থাকে। সেনাগণ অর্থ ভিন্ন বশীভূত হইবে না—শেঠকুবেরগণ সহায় না হইলে অর্থ সংগ্রহ হয় না। অতএব শেঠদিগের সঙ্গে পরামর্শ গুর্‌গণ খাঁর পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

এদিকে, কাসেম আলি খাঁ বিলক্ষণ জানিতেন যে, যে পক্ষকে এই কুবেরযুগল অনুগ্রহ করিবেন, সেই পক্ষ জয়ী হইবে। জগৎশেঠেরা যে মনে মনে তাঁহার অহিতাকাঙ্ক্ষী, তাহাও তিনি বুঝিয়াছিলেন : কেন না, তিনি তাহাদিগের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেন নাই। সন্দেহবশতঃ তাহাদিগকে মুঙ্গেরে বন্দিস্বরূপ রাখিয়াছিলেন। তাহারা সুযোগ পাইলেই তাঁহার বিপক্ষের সঙ্গে মিলিত হইবে, ইহা স্থির করিয়া তিনি শেঠদিগকে দূর্গমধ্যে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে ছিলেন। শেঠেরা তাহা জানিতে পারিয়াছিল। এ পর্য্যন্ত তাহারা ভয়প্রযুক্ত মীরকাসেমের প্রতিকূলে কোন আচরণ করে নাই; কিন্তু এক্ষণে অন্যথা রক্ষার উপায় না দেখিয়া, গুর্‌গণ খাঁর সঙ্গে মিলিল। মীরকাসেমের নিপাত উভয়ের উদ্দেশ্য।

কিন্তু বিনা কারণে জগৎশেঠদিগের সঙ্গে গুর্‌গণ খাঁ দেখাসাক্ষাৎ করিলে, নবাব সন্দেহযুক্ত হইতে পারেন বিবেচনায়, জগৎশেঠেরা এই উৎসবের সৃজন করিয়া, গুর্‌গণ এবং অন্যান্য রাজামাত্যবর্গকে নিমন্ত্রিত করিয়াছিলেন।

গুর্‌গণ খাঁ নবাবের অনুমতি লইয়া আসিয়াছিলেন। এবং অন্যান্য অমাত্যগণ হইতে পৃথক্ বসিয়াছিলেন। জগৎশেঠেরা যেমন সকলের নিকট আসিয়া এক

একবার আলাপ করিতেছিলেন—গুর্‌গণ খাঁর সঙ্গে সেইরূপ মাত্র—অধিকক্ষণ অবস্থিতি করিতেছিলেন না। কিন্তু কথাবার্ত্তা অন্যের অশ্রাব্য স্বরে হইতেছিল। কথোপকথন এইরূপ—

গুর্‌গণ খাঁ বলিতেছেন, "আপনাদের সঙ্গে আমি একটি কুঠি খুলিব—আপনারা বখরাদার হইতে স্বীকার আছেন?"

মাহতাবচন্দ। কি মতলব?

গুর্। মুঙ্গেরের বড় কুঠি বন্ধ করিবার জন্য।

মাহ। স্বীকৃত আছি—এরূপ একটা নূতন কারবার না আরম্ভ করিলে আমাদের আর কোন উপায় দেখি না।

গুর্‌গণ খাঁ বলিলেন, "যদি আপনারা স্বীকৃত হয়েন, তবে টাকার আঞ্জামটা আপনাদিগের করিতে হইবে—আমি শারীরিক পরিশ্রম করিব।"

সেই সময়ে মনিয়া বাই নিকটে আসিয়া সনদী খেয়াল গাইল—"শিখে হো জল ভালা।" ইত্যাদি। শুনিয়া মাহতাব হাসিয়া বলিলেন, "কাকে বলে? যাক্—আমরা রাজি আছি—আমাদের মূলধন সুদে আসলে বজায় থাকিলেই হইল—কোন দায়ে না ঠেকি।"

এইরূপে এক দিকে, বাইজি কেদার, হাম্বির, ছায়ানট ইত্যাদি রাগ ঝাড়িতে লাগিল, আর এক দিকে, গুর্‌গণ খাঁ ও জগৎশেঠ রূপেয়া, নোক্‌সান, দর্শনী প্রভৃতি ছেঁদো কথায় আপনাদিগের পরামর্শ স্থির করিতে লাগিলেন। কথাবার্ত্তা স্থির হইলে গুর্‌গণ বলিতে লাগিলেন, "একজন নূতন বণিক্ কুঠি খুলিতেছে, কিছু শুনিয়েছেন?"

মাহ। না—দেশী না বিলাতী?

গুর্। দেশী।

মাহ। কোথায়?

গুর্। মুঙ্গের হইতে মুরশিদাবাদ পর্য্যন্ত সকল স্থানে। যেখানে পাহাড়, যেখানে জঙ্গল, যেখানে মাঠ, সেইখানে তাহার কুঠি বসিতেছে।

মাহ্। ধনী কেমন?

গুর্। এখনও বড় ভারী ধনী নয়—কিন্তু কি হয় বলা যায় না।

মাহ। কার সঙ্গে তাহার লেনদেন?

গুর্। মুঙ্গেরের বড় কুঠির সঙ্গে।

মাহ। হিন্দু না মুসলমান?

গুর্। হিন্দু।

মাহ। নাম কি?

গুর্। প্রতাপ রায়।

মাহ। বাড়ী কোথায়?

গুর্। মুরশিদাবাদের নিকট।

মাহ। নাম শুনিয়াছি—সে সামান্য লোক।

গুর্। অতি ভয়ানক লোক।

মাহ। কেন সে হঠাৎ এ প্রকার করিতেছে?

গুর্। কলিকাতার বড় কুঠির উপর রাগ।

মাহ। তাহাকে হস্তগত করিতে হইবে—সে কিসের বশ?

গুর্ কেন সে এ কার্য্যে প্রবৃত্ত, তাহা না জানিলে বলা যায় না। যদি অর্থলোভে বেতনভোগী হইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়া থাকে, তবে তাহাকে কিনিতে কতক্ষণ? জমীজমা তালুক মুলুকও দিতে পারি। কিন্তু যদি ভিতরে আর কিছু থাকে?

মাহ। আর কি থাকিতে পারে? কিসে প্রতাপ রায় এত মাতিল?

বাইজি সে সময়ে গায়িতেছিল, "গোরে গোরে মুখ পরা বেশর শোহে।"

মাহতাবচন্দ বলিলেন, "তাই কি? কার গোরা মুখ?"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : দলনী কি করিল

মহাকায় পুরুষ দলনীর পাশে আসিয়া বসিল।

দলনী কাঁদিতেছিল, ভয় পাইয়া রোদন সম্বরণ করিল, নিস্পন্দ হইয়া রহিল। আগন্তুকও নিঃশব্দে রহিল।

যতক্ষণ এই ব্যাপার ঘটিতেছিল, ততক্ষণ অন্যত্র দলনীর আর এক সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইতেছিল।

মহম্মদ তকির প্রতি গুপ্ত আদেশ ছিল যে, ইংরেজদিগের নৌকা হইতে দলনী বেগমকে হস্তগত করিয়া মুঙ্গেরে পাঠাইবে। মহম্মদ তকি বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, ইংরেজেরা বন্দী বা হত হইলে, বেগম কাজে কাজেই তাঁহার হস্তগতা হইবেন। সুতরাং অনুচরবর্গকে বেগম সম্বন্ধে কোন বিশেষ উপদেশ প্রদান করা অবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। পরে যখন মহম্মদ তকি দেখিলেন, নিহত ইংরেজদিগের নৌকায় বেগম নাই, তখন তিনি বুঝিলেন যে, বিষম বিপদ্ উপস্থিত। তাঁহার শৈথিল্যে বা অমনোযোগে নবাব রুষ্ট হইয়া, কি উৎপাত উপস্থিত করিবেন তাহা বলা যায় না। এই আশঙ্কায় ভীত হইয়া, মহম্মদ তকি সাহসে ভর করিয়া নবাবকে বঞ্চনা করিবার কল্পনা করিলেন। লোকপরম্পরায় তখন শুনা যাইতেছিল যে, যুদ্ধ আরম্ভ হইলেই ইংরেজেরা মীরজাফরকে কারামুক্ত করিয়া পুনর্ব্বার মস্‌নদে বসাইবেন। যদি ইংরেজেরা যুদ্ধজয়ী হয়েন, তবে মীরকাসেম এ প্রবঞ্চনা শেষে জানিতে পারিলেও কোন ক্ষতি হইবে না। আপাততঃ বাঁচিতে পারিলেই অনেক লাভ। পরে যদিই মীরকাসেম জয়ী হয়েন, তবে তিনি যাহাতে প্রকৃত ঘটনা কখন না জানিতে পারেন, এমত উপায় করা যাইতে পারে। আপাততঃ কোন কঠিন আজ্ঞা না আসে। এইরূপ দুরভিসন্ধি করিয়া তকি এই রাত্রে নবাবের সমীপে মিথ্যাকথাপরিপূর্ণ এই আরজি পাঠাইতেছিলেন।

মহম্মদ তকি নবাবকে লিখিলেন যে, বেগমকে আমিয়টের নৌকায় পাওয়া গিয়াছে। তকি তাঁহাকে আনিয়া যথাসম্মানপূর্ব্বক কেল্লার মধ্যে রাখিয়াছেন। কিন্তু বিশেষ আদেশ ব্যতীত তাঁহাকে হজুরে পাঠাইতে পারিতেছেন না। ইংরেজদিগের সঙ্গী খানসামা, নাবিক, সিপাহী প্রভৃতি যাহার জীবিত আছে, তাহাদের সকলের প্রমুখাৎ শুনিয়াছেন যে, বেগম আমিয়টের উপপত্নীস্বরূপ নৌকায় বাস করিতেন। উভয়ে এক শয্যায় শয়ন করিতেন। বেগম স্বয়ং সকল কথা স্বীকার করিতেছেন। তিনি এক্ষণে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছেন। তিনি মুঙ্গেরে যাইতে অসম্মত। বলেন, "আমাকে ছাড়িয়া দাও। আমি কলিকাতায় দিয়া আমিয়ট সাহেবের

সুহৃদ্‌গণের নিকট বাস করিব। যদি না ছাড়িয়া দাও, তবে আমি পলাইয়া যাইব। যদি মুঙ্গেরে পাঠাও, তবে আত্মহত্যা করিব।” এমত অবস্থায় তাঁহাকে মুঙ্গেরে পাঠাইবেন, কি এখানে রাখিবেন, কি ছাড়িয়া দিবেন, তদ্বিষয়ে আজ্ঞার প্রত্যাশায় রহিলেন। আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে তদনুসারে কার্য্য করিবেন। তকি এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন।

অশ্বারোহী দূত সেই রাত্রেই এই পত্র লইয়া মুঙ্গেরে যাত্রা করিল।

কেহ কেহ বলে, দূরবর্ত্তী অজ্ঞাত অমঙ্গল ঘটনাও আমাদিগের মন জানিতে পারে। এ কথা যে সত্য, এমত নহে; কিন্তু যে, মুহূর্ত্তে মুরশিদাবাদ হইতে অশ্বারোহী দূত, দলনীবিষয়ক পত্র লইয়া মুঙ্গেরে যাত্রা করিল, সেই মুহূর্ত্তে দলনীর শরীর রোমাঞ্চিত হইল। সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার পার্শ্বস্থ বলিষ্ঠ পুরুষ, প্রথম কথা কহিল। তাঁহার কণ্ঠস্বর হউক, অমঙ্গলসূচনায় হউক, যাহাতে হউক, সেই মুহূর্ত্তে দলনীর শরীর কণ্টকিত হইল।

পার্শ্ববর্ত্তী পুরুষ বলিল,“তোমায় চিনি। তুমি দলনী বেগম।”

দলনী শিহরিল।

পার্শ্বস্থ পুরুষ পুনরপি কহিল, “জানি, তুমি এই বিজন স্থানে দুরাত্মা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছ।”

দলনীর চক্ষের প্রবাহ আবার ছুটিল। আগন্তুক কহিল, “এক্ষণে তুমি কোথা যাইবে?”

সহসা দলনীর ভয় দূর হইয়াছিল। ভয় বিনাশের দলনী বিশেষ কারণ পাইয়াছিল। দলনী কাঁদিল। প্রশ্নকর্ত্তা প্রশ্ন পুনরুক্ত করিলেন। দলনী বলিল, “যাইব কোথায়? আমার যাইবার স্থান নাই। এক যাইবার স্থান আছে—কিন্তু সে অনেক দূর। কে আমাকে সেখানে সঙ্গে লইয়া যাইবে?’

আগন্তুক বলিলেন, “তুমি নবাবের নিকটে যাইবার বাসনা পরিত্যাগ কর।”

দলনী উৎকণ্ঠিতা, বিস্মিতা হইয়া বলিলেন, “কেন?”

“অমঙ্গল ঘটিবে।”

দলনী শিহরিল বলিল, “ঘটুক। সেই বৈ আর আমার স্থান নাই। অন্যত্র মঙ্গলাপেক্ষা স্বামীর কাছে অমঙ্গলও ভাল।”

“তবে উঠ। আমি তোমাকে মুরশিদাবাদে মহম্মদ তকির নিকট রাখিয়া আসি। মহম্মদ তকি তোমাকে মুঙ্গেরে পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু আমার কথা শুন। এক্ষণে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। নবাব স্বীয় পৌরজনকে রুহিদাসের গড়ে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। তুমি সেখানে যাইও না।”

“আমার কপালে যাই থাকুক, আমি যাইব।”

“তোমার কপালে মুঙ্গের দর্শন নাই।”

দলনী চিন্তিত হইল। বলিল, “ভবিতব্য কে জানে? চলুন, আপনার সঙ্গে আমি মুরশিদাবাদ যাইব। যতক্ষণ প্রাণ আছে, নবাবকে দেখিবার আশা ছাড়িব না।”

আগন্তুক বলিলেন, “তাহা জানি। আইস।”

দুই জনে অন্ধকার রাত্রে মুরশিদাবাদে চলিল। দলনী-পতঙ্গ বহ্নিমুখবিবিক্ষু হইল।

ষষ্ঠ খণ্ড

সিদ্ধি

প্রথম পরিচ্ছেদ : পূর্ব্বকথা

পূর্ব্বকথা যাহা বলি নাই, এক্ষণে সংক্ষেপে বলিব। চন্দ্রশেখরই যে পূর্ব্বকথিত ব্রহ্মচারী, তাহা জানা গিয়াছে।

যেদিন আমিয়ট, ফষ্টরের সহিত, মুঙ্গের হইতে যাত্রা করিলেন, সেই দিন সন্ধান করিতে করিতে রমানন্দ স্বামী জানিলেন যে, ফষ্টর ও দলনীবেগম প্রভৃতি একত্রে আমিয়টের সঙ্গে গিয়াছেন। গঙ্গাতীরে গিয়া চন্দ্রশেখরের সাক্ষাৎ পাইলেন। তাঁহাকে এ সম্বাদ অবগত করাইলেন, বলিলেন, "এখানে তোমার আর থাকিবার প্রয়োজন কি—কিছুই না। তুমি স্বদেশে প্রত্যাগমন কর। শৈবলিনীকে আমি কাশী পাঠাইব। তুমি যে পরহিতব্রত গ্রহণ করিয়াছ, অদ্য হইতে তাহার কার্য্য কর। এই যবনকন্যা ধর্ম্মিষ্ঠা, এক্ষণে বিপদে পতিত হইয়াছে, তুমি ইহার পশ্চাদনুসরণ কর; যখনই পারিবে, ইহার উদ্ধারের উপায় করিও। প্রতাপও তোমার আত্মীয় ও উপকারী, তোমার জন্যই এ দুর্দ্দশাগ্রস্ত; তাহাকে এ সময়ে ত্যাগ করিতে পারিবে না। তাহাদের অনুসরণ কর।" চন্দ্রশেখর নবাবের নিকট সম্বাদ দিতে চাহিলেন, রমানন্দ স্বামী নিষেধ করিলেন, বলিলেন, "আমি সেখানে সম্বাদ দেওয়াইব।" চন্দ্রশেখর গুরুর আদেশে, অগত্যা, একখানি ক্ষুদ্র নৌকা লইয়া আমিয়টের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। রমানন্দ স্বামীও সেই অবধি, শৈবলিনীকে কাশী পাঠাইবার উদ্যোগে উপযুক্ত শিষ্যের সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন অকস্মাৎ জানিলেন যে, শৈবলিনী পৃথক্ নৌকা লইয়া ইংরেজের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। রমানন্দ স্বামী বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। এ পাপিষ্ঠা কাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল, ফষ্টরের না চন্দ্রশেখরের? রমানন্দ স্বামী, মনে মনে ভাবিলেন, "বুঝি চন্দ্রশেখরের জন্য আবার আমাকে সাংসারিক ব্যাপারে লিপ্ত হইতে হইল।" এই ভাবিয়া তিনিও সেই পথে চলিলেন।

রমানন্দ স্বামী, চিরকাল পদব্রজে দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়াছেন,—উৎকৃষ্ট পরিব্রাজক। তিনি তটপন্থে, পদব্রজে, শীঘ্রই শৈবলিনীকে পশ্চাৎ করিয়া আসিলেন; বিশেষ তিনি আহার নিদ্রার বশীভূত নহেন, অভ্যাসগুণে সে সকলকে বশীভূত করিয়াছিলেন। ক্রমে আসিয়া চন্দ্রশেখরকে ধরিলেন। চন্দ্রশেখর তীরে রমানন্দ স্বামীকে দেখিয়া, তথায় আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

রমানন্দ স্বামী বলিলেন, "একবার, নবদ্বীপে, অধ্যাপকদিগের সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য বঙ্গদেশে যাইব, অভিলাষ করিয়াছি; চল তোমার সঙ্গে যাই।" এই বলিয়া রমানন্দ স্বামী চন্দ্রশেখরের নৌকায় উঠিলেন।

ইংরেজের বহর দেখিয়া তাঁহারা ক্ষুদ্র তরণী নিভৃতে রাখিয়া তীরে উঠিলেন। দেখিলেন, শৈবলিনীর নৌকা আসিয়াও, নিভৃতে রহিল; তাঁহারা দুই জনে তীরে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া সকল দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, প্রতাপ শৈবলিনী সাঁতার দিয়া পলাইল। দেখিলেন, তাহারা নৌকায় উঠিয়া পলাইল। তখন তাঁহারাও নৌকায় উঠিয়া তাহাদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। তাহারা নৌকা লাগাইল, দেখিয়া তাঁহারাও কিছু দূরে নৌকা লাগাইলেন। রমানন্দ স্বামী অনন্তবুদ্ধিশালী,—চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, "সাঁতার দিবার সময় প্রতাপ ও শৈবলিনীতে কি কথোপকথন হইতেছিল, কিছু শুনিতে পাইয়াছিলে?"

চ। না।

র। তবে, অদ্য রাত্রে নিদ্রা যাইও না। উহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখ।

উভয়ে জাগিয়া রহিলেন। দেখিলেন শেষ রাত্রে শৈবলিনী নৌকা হইতে উঠিয়া গেল। ক্রমে তীরবনমধ্যে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইল। প্রভাত হয়, তথাপি ফিরিল না। তখন রমানন্দ স্বামী চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, “কিছু বুঝিতে পারিতেছি না, ইহার মনে কি আছে। চল, উহার অনুসরণ করি।”

তখন উভয়ে সতর্কভাবে শৈবলিনীর অনুসরণ করিলেন। সন্ধ্যার পর মেঘাড়ম্বর দেখিয়া রমানন্দ স্বামী বলিলেন, “তোমার বাহুতে বল কত?”

চন্দ্রশেখর, হাসিয়া, একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর এক হস্তে তুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

রমানন্দ স্বামী বলিলেন, “উত্তম। শৈবলিনীর নিকটে গিয়া অন্তরালে বসিয়া থাক, শৈবলিনী আগতপ্রায় বাত্যায় সাহায্য না পাইলে স্ত্রীহত্যা হইবে। নিকটে এক গুহা আছে। আমি তাহার পথ চিনি। আমি যখন বলিব, তখন তুমি শৈবলিনকে ক্রোড়ে লইয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিও।”

চ। এখনই ঘোরতর অন্ধকার হইবে, পথ দেখিব কি প্রকারে?

র। আমি নিকটেই থাকিব। আমার এই দণ্ডাগ্রভাগ তোমার মুষ্টিমধ্যে দিব। অপর ভাগ আমার হস্তে থাকিবে।

শৈবলিনীকে গুহায় রাখিয়া, চন্দ্রশেখর বাহিরে আসিলে, রমানন্দ স্বামী মনে মনে ভাবিলেন, “আমি এতকাল সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলাম, সর্ব্বপ্রকার মনুষ্যের সহিত আলাপ করিলাম, কিন্তু সকলই বৃথা! এই বালিকার মনের কথা বুঝিতে পারিলাম না! এ সমুদ্রের কি তল নাই?” এই ভাবিয়া চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, “নিকটে এক পার্ব্বত্য মঠ আছে, সেইখানে অদ্য গিয়া বিশ্রাম কর। শৈবলিনীর পক্ষে যৎকর্ত্তব্য সাধিত হইলে তুমি পুনরপি যবনীর অনুসরণ করিবে। মনে জানিও, পরহিত ভিন্ন তোমার ব্রত নাই। শৈবলিনীর জন্য চিন্তা করিও না, আমি এখানে রহিলাম। কিন্তু তুমি আমার অনুমতি ব্যতীত শৈবলিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না। তুমি যদি আমার মতে কার্য্য কর, তবে শৈবলিনীর পরমোপকার হইতে পারে।”

এই কথার পর চন্দ্রশেখর বিদায় লইলেন। রমানন্দ স্বামী তাহার পর, অন্ধকারে, অলেক্ষ্য, গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তাহার পর যাহা ঘটিল, পাঠক, সকলই জানেন।

উন্মাদগ্রস্ত শৈবরিনীকে চন্দ্রশেখর সেই মঠে রমানন্দ স্বামীকে নিকটে লইয়া গেলেন। কাঁদিয়া বলিলেন, “গুরুদেব! এ কি করিলে?”

রমানন্দ স্বামী, শৈবলিনীর অবস্থা সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, “ভালই হইয়াছে। চিন্তা করিও না। তুমি এইখানে দুই এক দিন বিশ্রাম কর। পরে ইহাকে সঙ্গে করিয়া স্বদেশ লইয়া যাও। যে গৃহে ইনি বাস করিতেন, সেই গৃহে ইহাকে রাখিও। যাঁহারা ইহার সঙ্গী ছিলেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা ইহার কাছে থাকিতে অনুরোধ করিও। প্রতাপকেও সেখানে মধ্যে মধ্যে আসিতে বলিও। আমি পশ্চাৎ যাইতেছি।”

গুরুর আদেশ মত চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে গৃহে আনিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : হুকুম

ইংরেজের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মীরকাসেমের অধঃপতন আরম্ভ হইল। মীরকাসেম প্রথমেই কাটোয়ার যুদ্ধে হারিলেন। তাহার পর গুর্‌গণ খাঁর অবিশ্বাসিতা প্রকাশ পাইতে লাগিল। নবাবের যে ভরসা ছিল, সে ভরসা নির্ব্বাণ হইল। নবাবের এই সময়ে বুদ্ধির বিকৃতি জন্মিতে লাগিল। বন্দী ইংরেজদিগকে বধ করিবার মানস করিলেন। অন্যান্য সকলের প্রতি অহিতাচরণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মহম্মদ তকির প্রেরিত দলনীর সম্বাদ পৌঁছিল। জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি

পড়িল। ইংরেজেরা অবিশ্বাসী হইয়াছে—সেনাপতি অবিশ্বাসী বোধ হইতেছে—রাজ্যলক্ষ্মী বিশ্বাসঘাতিনী—আবার দলনীও বিশ্বাসঘাতিনী? আর সহিল না। মীরকাসেম মহম্মদ তকিকে লিখিলেন, "দলনীকে এখানে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। তাহাকে সেইখানে বিষপান করাইয়া বধ করিও।"

মহম্মদ তকি স্বহস্তে বিষের পাত্র লইয়া দলনীর নিকটে গেল। মহম্মদ তকিকে তাঁহার নিকটে দেখিয়া দলনী বিস্মিতা হইলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "এ কি খাঁ সাহেব! আমাকে বেইজ্জৎ করিতেছেন কেন?"

মহম্মদ তকি কপালে করাঘাত করিয়া কহিল, "কপাল! নবাব আপনার প্রতি অপ্রসন্ন।"

দলনী হাসিয়া বলিলেন, "আপনাকে কে বলিল?"

মহম্মদ তকি বলিলেন, "না বিশ্বাস করেন, পরওয়ানা দেখুন।"

দ। তবে আপনি পরওয়ানা পড়িতে পারেন নাই।

মহম্মদ তকি দলনীকে নবাবের সহিমোহরের পরওয়ানা পড়িতে দিলেন। দলনী পরওয়ানা পড়িয়া, হাসিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। বলিলেন, "এ জাল। আমার সঙ্গে এ রহস্য কেন? মরিবে সেই জন্য?

মহ। আপনি ভীতা হইবেন না। আমি আপনাকে রক্ষা করিতে পারি।

দ। ও হো! তোমার কিছু মতলব আছে! তুমি জাল পরওয়ানা লইয়া আমাকে ভয় দেখাইতে আসিয়াছ?

মহ। তবে শুনুন। আমি নবাবকে লিখিয়াছিলাম যে, আপনি আমিয়টের নৌকায় তাহার উপপত্নীস্বরূপ ছিলেন, সেই জন্য এই হুকুম আসিয়াছে।

শুনিয়া দলনী ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন। স্থিরবারিশালিনী ললাট-গঙ্গার তরঙ্গ উঠিল—ভ্রূধনুতে চিন্তা-গুণ দিল—মহম্মদ তকি মনে মনে প্রমাদ গণিল। দলনী বলিলেন, "কেন লিখিয়াছিলে?" মহম্মদ তকি আনুপূর্ব্বিক আদ্যোপান্ত সকল কথা বলিল।

তখন দলনী বলিলেন, "দেখি, পরওয়ানা আবার দেখি।"

মহম্মদ তকি পরওয়ানা আবার দলনীর হস্তে দিল। দলনী বিশেষ করিয়া দেখিলেন, যথার্থ বটে। জাল নহে, "কই বিষ?"

"কই বিষ?" শুনিয়া মুহম্মদ তকি বিস্মিত হইল। বলিল, "বিষ কেন?"

দ। পরওয়ানায় কি হুকুম আছে?

মহা। আপনারে বিষপান করাইতে।

দ। তবে কই বিষ?

মহ। আপনি বিষপান করিবেন না কি?

দ। আমার রাজার হুকুম আমি কেন পালন করিব না?

মহম্মদ তকি মর্ম্মের ভিতর লজ্জায় মরিয়া গেল। বলিল, "যাহা হইয়াছে, হইয়াছে। আপনাকে বিষপান করিতে হইবে না। আমি ইহার উপায় করিব।"

দলনীর চক্ষু হইতে ক্রোধে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। সেই ক্ষুদ্র দেহ উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া দলনী বলিলেন, "যে তোমার মত পাপিষ্ঠের কাছে প্রাণদান গ্রহণ করে, সে তোমার অপেক্ষাও অধম—বিষ আন।"

মহম্মদ তকি দলনীকে দেখিতে লাগিল। সুন্দরী—নবীনা—সবে মাত্র যৌবন-বর্ষায় রূপের নদী পুরিয়া উঠিতেছে—ভরা বসন্তে অঙ্গ-মুকুল সব ফুটিয়া

উঠিয়াছে। বসন্ত বর্ষায় একত্রে মিশিয়াছে। যাকে দেখিতেছি—সে দুঃখে ফাটিতেছে—কিন্তু আমার দেখিয়া কত সুখ! জগদীশ্বর! দুঃখ এত সুন্দর করিয়াছ কেন? এই যে কাতরা বালিকা—বাত্যাতাড়িত, প্রস্ফুটিত কুসুম—তরঙ্গোৎপীড়িতা প্রমোদ-নৌকা—ইহাকে লইয়া কি করিব—কোথায় রাখিব? সয়তান আসিয়া তকির কাণে কাণে বলিল, "হৃদয়-মধ্যে।"

তকি বলিল, "শুন সুন্দরী—আমাকে ভজ—বিষ খাইতে হইবে না।"

শুনিয়া দলনী—লিখিতে লজ্জা করে—মহম্মদ তকিকে পদাঘাত করিলেন।

মহম্মদ তকির বিষ দান করা হইল না—মহম্মদ তকি দলনীর প্রতি, অর্দ্ধদৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে ধীরে, ধীরে, ফিরিয়া গেল।

তখন দলনী মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন—"ও রাজরাজেশ্বর! শাহানশাহা! বাদশাহের বাদশাহ! এ গরীব দাসীর উপর কি হুকুম দিয়াছ! বিষ খাইব? তুমি হুকুম দিলে, কেন খাইব না! তোমার আদরই আমার অমৃত—তোমার ক্রোধই আমার বিষ—তুমি যখন রাগ করিয়াছ—তখন আমি বিষ পান করিয়াছি। ইহার অপেক্ষা বিষে কি অধিক যন্ত্রণা! হে রাজাধিরাজ—জগতের আলো—অনাথার ভরসা —পৃথিবীপতি—ঈশ্বরের প্রতিনিধি—দয়ার সাগর—কোথায় রহিলে? আমি তোমার আদেশে হাসিতে হাসিতে বিষপান করিব—কিন্তু তুমি দাঁড়াইয়া দেখিলে না—এই আমার দুঃখ।"

করিমন নামে একজন পরিচারিকা দলনী বেগমের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল। তাহাকে ডাকিয়া, দলনী আপনার অবশিষ্ট অলঙ্কার তাহার হস্তে দিলেন। বলিলেন, "লুকাইয়া হকিমের নিকট হইতে আমাকে এমত ঔষধ আনিয়া দাও, যেন আমার নিদ্রা আসে—সে নিদ্রা আর না ভাঙ্গে। মূল্য এই অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া দিও। বাকি যাহা থাকে, তুমি লইও।"

করিমন, দলনীর অশ্রুপূর্ণ চক্ষু দেখিয়া বুঝিল। প্রথমে সে সম্মত হইল না—দলনী পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা করিতে লাগিলেন। শেষে মূর্খ লুব্ধ স্ত্রীলোক, অধিক অর্থের লোভে, স্বীকৃত হইল।

হকিম ঔষধ দিল। মহম্মদ তকির নিকট হরকরা আসিয়া গোপনে সম্বাদ দিল,—"করিমন বাঁদি আজ এই মাত্র হকিম মেরজা হবীবের নিকট হইতে বিষ ক্রয় করিয়া আনিয়াছে।"

মহম্মদ তকি করিমনকে ধরিলেন। করিমন স্বীকার করিল। বলিল, "বিষ দলনী বেগমকে দিয়াছি।"

মহম্মদ তকি শুনিয়াই দলনীর নিকট আসিলেন। দেখিলেন, দলনী আসনে ঊর্দ্ধমুখে, ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে, যুক্তকরে বসিয়া আছে—বিস্তারিত পদ্মপলাশ চক্ষু হইতে জলধারার পর জলধারা গণ্ড বাহিয়া বস্ত্রে আসিয়া পড়িতেছে—সম্মুখে শূন্য পাত্র পড়িয়া আছে—দলনী বিষপান করিয়াছে।

মহম্মদ তকি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কিসের পাত্র পড়িয়া আছে?"

দলনী বলিলেন, "ও বিষ। আমি তোমার মত নিমকহারাম নহি—প্রভুর আজ্ঞা পালন করিয়া থাকি। তোমার উচিত—অবশিষ্ট পান করিয়া আমার সঙ্গে আইস।"

মহম্মদ তকি নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। দলনী ধীরে, ধীরে, শয়ন করিল। চক্ষু বুজিল। সব অন্ধকার হইল। দলনী চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : সম্রাট্ ও বরাট

মীরকাসেমের সেনা কাটোয়ার রণক্ষেত্রে পরাভূত হইয়া হঠিয়া আসিয়াছিল। ভাঙ্গা কপাল গিরিয়ার ক্ষেত্রে আবার ভাঙ্গিল—আবার যবনসেনা, ইংরেজের বাহুবলে, বায়ুর নিকট ধূলিরাশির ন্যায় তাড়িত হইয়া ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। ধ্বংসাবশিষ্ট সৈন্যগণ আসিয়া উদয়নালায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। তথায় চতুঃপার্শ্বে খাদ প্রস্তুত করিয়া যবনেরা ইংরেজ সৈন্যের গতিরোধ করিতেছিলেন।

মীরকাসেম স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিলে, সৈয়দ আমির হোসেন, একদা জানাইল যে, একজন বন্দী তাঁহার দর্শনার্থ বিশেষ কাতর। তাহার কোন বিশেষ নিবেদন আছে—হুজুরে নহিলে তাহা প্রকাশ করিবে না।

মীরকাসেম জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কে?"

আমীর হোসেন বলিলেন, "একজন স্ত্রীলোক—কলিকাতা হইতে আসিয়াছে। ওয়ারন্ হষ্টিং সাহেব পত্র লিখিয়া তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। সে বাস্তবিক বন্দী নহে। যুদ্ধের পূর্ব্বের পত্র বলিয়া অধীন তাহা গ্রহণ করিয়াছে। অপরাধ হইয়া থাকে, গোলাম হাজির আছে।" এই বলিয়া আমীর হোসেন পত্র পড়িয়া নবাবকে শুনাইলেন।

ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ লিখিয়াছিলেন, "এ স্ত্রীলোক কে, তাহা আমি চিনি না, সে নিতান্ত কাতর হইয়া আমার নিকটে আসিয়া মিনতি করিল যে, কলিকাতায় সে নিঃসহায়, আমি যদি দয়া করিয়া নবাবের নিকট পাঠাইয়া দিই, তবে সে রক্ষা পায়। আপনাদিগের সঙ্গে আমাদিগের যুদ্ধ উপিস্থিত হইতেছে, কিন্তু আমাদের জাতি স্ত্রীলোকের সঙ্গে বিবাদ করে না। এ জন্য ইহাকে আপনার নিকট পাঠাইলাম। ভালমন্দ কিছু জানি না।"

নবাব পত্র শুনিয়া, স্ত্রীলোককে সম্মুখে আনিতে অনুমতি দিলেন। সৈয়দ আমীর হোসেন বাহিরে গিয়া ঐ স্ত্রীলোককে সঙ্গে করিয়া আনিলেন—নবাব দেখিলেন—কুল্‌সম্।

নবাব রুষ্ট হইয়া তাহাকে বলিলেন, "তুই কি চাহিস বাঁদী—মরিবি—?"

কুল্‌সম্ নবাবের প্রতি স্থির দৃষ্টি করিয়া কহিল, "নবাব! তোমার বেগম কোথায়! দলনী বিবি কোথায়!" আমীর হোসেন কুল্‌সমের বাক্যপ্রণালী দেখিয়া ভীত হইল এবং নবাবকে অভিবাদন করিয়া সরিয়া গেল।

মীরকাসেম বলিলেন, "যেখানে সেই পাপিষ্ঠা, তুমিও সেইখানে শীঘ্র যাইবে।"

কুল্‌সম্ বলিল, "আমিও, আপনিও। তাই আপনার কাছে আসিয়াছি। পথে শুনিলাম, লোকে রটাইতেছে, দলনী বেগম আত্মহত্যা করিয়াছে। সত্য কি?"

নবাব। আত্মহত্যা! রাজদণ্ডে সে মরিয়াছে। তুই তাহার দুষ্কর্ম্মের সহায়—তুই কুক্কুরের দ্বারা ভুক্ত হইবি—

কুল্‌সম্ আছড়াইয়া পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—এবং যাহা মুখে আসিল, তাহা বলিয়া নবাবকে গালি দিতে আরম্ভ করিল। শুনিয়া চারি দিক্ হইতে সৈনিক, ওমরাহ, ভৃত্য, রক্ষক প্রভৃতি আসিয়া পড়িল—একজন কুল্‌সমের চুল ধরিয়া তুলিতে গেল। নবাব নিষেধ করিলেন—তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন। সে সরিয়া গেল। তখন কুল্‌সম্ বলিতে লাগিল, "আপনারা সকলে আসিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। আমি এক অপূর্ব্ব কাহিনী বলিব, শুনুন। আমার এক্ষণেই বধাজ্ঞা হইবে—আমি মরিলে আর কেহ তাহা শুনিতে পাইবে না। এই সময় শুনুন।"

"শুনুন, সুবে বাঙ্গালা বেহারের, মীরকাসেম নামে, এক মুর্খ নবাব আছে। দলনী নামে তাহার বেগম ছিল। সে নবাবের সেনাপতি গুর্‌গণ খাঁর ভগিনী।"

শুনিয়া কেহ আর কুল্‌সমরে উপর আক্রমণ করিল না। সকলেই পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল—সকলেরই কৌতূহল বাড়িতে লাগিল। নবাবও কিছু বলিলেন না—কুল্‌সম্ বলিতে লাগিল, "গুর্‌গণ খাঁ ও দৌলত উন্নেছা ইস্পাহান হইতে পরামর্শ করিয়া জীবিকান্বেষণে বাঙ্গালায় আসে। দলনী যখন

মীরকাসেমের গৃহে বাঁদীস্বরূপ প্রবেশ করে, তখন উভয়ে উভয়ের উপকারার্থ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।”

কুল্‌সম্‌ তাহার পরে, যে রাত্রে তাহারা দুই জনে গুর্‌গণ খাঁর ভবনে গমন করে, তদ্বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলিল। গুর্‌গণ খাঁর সঙ্গে যে সকল কথাবার্ত্তা হয়, তাহা দলনীর মুখে শুনিয়াছিল, তাহাও বলিল। তৎপরে, প্রত্যাবর্ত্তন, আর নিষেধ, ব্রহ্মচারীর সাহায্য, প্রতাপের গৃহে অবস্থিতি, ইংরেজগণকৃত আক্রমণ এবং শৈবলিনীভ্রমে দলনীরে হরণ, নৌকায় কারাবাস, আমিয়ট প্রভৃতির মৃত্যু, ফষ্টরের সহিত তাহাদিগের পলায়ন, শেষে দলনীকে গঙ্গাতীরে ফষ্টরকৃত পরিত্যাগ, এ সকল বলিয়া শেষে বলিতে লাগিল, “আমার স্কন্ধে সেই সময় সয়তান চাপিয়াছিল সন্দেহ নাই, নহিলে আমি সে সময়ে বেগমকে কেন পরিত্যাগ করিব? আমি সেই পাপিষ্ঠ ফিরিঙ্গীর দুঃখ দেখিয়া তাহার প্রতি—মনে করিয়াছিলাম—সে কথা যাউক। মনে করিয়াছিলাম, নিজামতের নৌকা পশ্চাৎ আসিতেছে—বেগমকে তুলিয়া লইবে—নহিলে আমি তাঁহাকে ছাড়িব কেন? কিন্তু তাহার যোগ্য শাস্তি আমি পাইয়াছি—বেগমকে পশ্চাৎ করিয়াই আমি কাতর হইয়া ফষ্টরকে সাধিয়াছি যে, আমাকেও নামাইয়া দাও—সে নামাইয়া দেয় নাই। কলিকাতায় গিয়া যাহাকে দেখিয়াছি—তাহাকেই সাধিয়াছি যে, আমাকে পাঠাইয়া দাও—কেহ কিছু বলে না। শুনিলাম, হেষ্টিং সাহেব বড় দয়ালু—তাঁহার কাছে কাঁদিয়া গিয়া তাঁহার পায়ে ধরিলাম—তাঁহারই কৃপায় আসিয়াছি। এখন তোমার আমার বধের উদ্যোগ কর—আমার আর বাঁচিতে ইচ্ছা নাই।”

এই বলিয়া কুল্‌সম্‌ কাঁদিতে লাগিল।

বহুমূল্য সিংহাসনে, শত শত রশ্মি-প্রতিঘাতি রত্নরাজির উপরে বসিয়া, বাঙ্গালার নবাব,—অধোবদনে। এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের রাজদণ্ড তাঁহার হস্ত হইতে ত স্খলিত হইয়া পড়িতেছে—বহু যত্নেও ত রহিল না। কিন্তু যে অজেয় রাজ্য, বিনা যত্নে থাকিত—সে কোথায় গেল! তিনি কুসুম ত্যাগ করিয়া কণ্টকে যত্ন করিয়াছেন—কুল্‌সম্‌ সত্যই বলিয়াছে—বাঙ্গালার নবাব মূর্খ।

নবাব ওমরাহদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “তোমরা শুন, এ রাজ্য আমার রক্ষণীয় নহে। এই বাঁদী যাহা বলিল, তাহা সত্য—বাঙ্গালার নবাব মূর্খ। তোমরা পার, সুবা রক্ষা কর, আমি চলিলাম। আমি রুহিদাসের গড়ে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে লুকাইয়া থাকিব, অথবা ফকিরি গ্রহণ করিব”—বলিতে বলিতে নবাবের বলিষ্ঠ শরীর, প্রবাহমধ্যে রোপিত বংশখণ্ডের ন্যায় কাঁপিতেছিল—চক্ষের জল সম্বরণ করিয়া মীরকাসেম বলিতে লাগিলেন, “শুন বন্ধুবর্গ! যদি আমাকে সেরাজউদৌল্লার ন্যায়, ইংরেজ বা তাহাদের অনুচর মারিয়া ফেলে, তবে তোমাদের কাছে আমার এই ভিক্ষা, সেই দলনীর কবরের কাছে আমার কবর দিও। আর আমি কথা কহিতে পারি না—এখন যাও। কিন্তু তোমরা আমার এক আজ্ঞা পালন কর—আমি সেই তকি খাঁকে একবার দেখিব—

আলি হিব্রাহিম খাঁ?”

হিব্রাহিম খাঁ উত্তর দিলেন। নবাব বলিলেন, “তোমার ন্যায় আমার বন্ধু জগতে নাই—তোমার কাছে আমার ভিক্ষা—তকি খাঁকে আমার কাছে লইয়া আইস।”

হিব্রাহিম খাঁ অভিবাদন করিয়া, তাম্বুর বাহিরে গিয়া অশ্বারোহণ করিলেন।

নবাব তখন বলিলেন, “আর কেহ আমার উপকার করিবে?”

সকলেই যোড়হাত করিয়া হুকুম চাহিল। নবাব বলিলেন, “কেহ সেই ফষ্টরকে আনিতে পার?”

আমীর হোসেন বলিলেন, “সে কোথায় আছে, আমি তাহার সন্ধান করিতে কলিকাতায় চলিলাম।”

নবাব ভাবিয়া বলিলেন, “আর সেই শৈবলিনী কে? তাহাকে কেহ আনিতে পারিবে?”

মহম্মদ ইর্‌ফান যুক্তকরে নিবেদন করিল, “অবশ্য এত দিন সে দেশে আসিয়া থাকিবে, আমি তাহাকে লইয়া আসিতেছি।” এই বলিয়া মহম্মদ ইর্‌ফান বিদায় হইল।

তাহার পরে নবাব বলিলেন, “যে ব্রহ্মচারী মুঙ্গেরে বেগমকে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন, তাঁহার কেহ সন্ধান করিতে পারে?”

মুহম্মদ ইর্‌ফান বলিল, “হুকুম হইলে শৈবলিনীর সন্ধানের পর ব্রহ্মচারীর উদ্দেশে মুঙ্গের যাইতে পারি।”

শেষ কাসেম আলি বলিলেন, “গুর্‌গণ খাঁ কত দূর?”

অমাত্যবর্গ বলিলেন, “তিনি ফৌজ লইয়া উদয়নালায় আসিতেছেন শুনিয়াছি—কিন্তু এখনও পৌঁছেন নাই।” নবাব মৃদু মৃদু বলিতে লাগিলেন, “ফৌজ! ফৌজ! কাহার ফৌজ!”

একজন কে চুপি চুপি বলিলেন, “তাঁরি!”

অমাত্যবর্গ বিদায় হইলেন। তখন নবাব রত্নসিংহাসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন, হীরকখচিত উষ্ণীষ দূরে নিক্ষেপ করিলেন—মুক্তার হার কণ্ঠ হইতে ছিঁড়িয়া ফেলিলেন—রত্নখচিত বেশ অঙ্গ হইতে দূর করিলেন।—তখন নবাব ভূমিতে অবলুণ্ঠিত হইয়া ‘দলনী! দলনী!’ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

এ সংসারে নবাবি এইরূপ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : জন্ ষ্ট্যালকার্ট

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে প্রকাশ পাইয়াছে যে, কুল্‌সমের সঙ্গে ওয়ারেন হেস্টিংস্ সাহেবের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কুল্‌সম্ আত্মবিবরণ সবিস্তারে কহিতে গিয়া, ফষ্টরের কার্য্য সকলের সবিশেষ পরিচয় দিল।

ইতিহাসে ওয়ারেন হেষ্টিংস পরপীড়ক বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। কর্ম্মঠ লোক কর্ত্তব্যানুরোধে অনেক সময়ে পরপীড়ক হইয়া উঠে। যাঁহার উপর রাজ্যরক্ষার ভার, তিনি স্বয়ং দয়ালু এবং ন্যায়পর হইলেও রাজ্য রক্ষার্থ পরপীড়ন করিতে বাধ্য হন। যেখানে দুই এক জনের উপর অত্যাচার করিলে, সমুদয় রাজ্যের উপকার হয়, সেখানে তাঁহারা মনে করেন যে, সে অত্যাচার কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ যাঁহারা ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের ন্যায় সাম্রাজ্য-সংস্থাপনে সক্ষম, তাঁহারা যে দয়ালু এবং ন্যায়নিষ্ঠ নহেন, ইহা কখনও সম্ভব নহে। যাঁহারা প্রকৃতিতে দয়া এবং ন্যায়পরতা নাই—তাঁহার দ্বারা রাজ্য-স্থাপনাদি মহৎ কার্য্য হইতে পারে না—কেন না, তাঁহার প্রকৃতি উন্নত নহে—ক্ষুদ্র। এ সকল ক্ষুদ্রচেতার কাজ নহে।

ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ দয়ালু ও ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন। তখন তিনি গবর্ণর হন নাই। কুল্‌সম্‌কে বিদায় করিয়া তিনি ফষ্টরের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিলেন, ফষ্টর পীড়িত। প্রথমে তাঁহার চিকিৎসা করাইলেন। ফষ্টর উৎকৃষ্ট চিকিৎসকের চিকিৎসায় শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিল।

তাহার পরে, তাহার অপরাধের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ভীত হইয়া, ফষ্টর তাঁহার নিকট অপরাধ স্বীকার করিল। ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ কৌন্সিলে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া ফষ্টরকে পদচ্যুত করিলেন। হেষ্টিংসের ইচ্ছা ছিল যে, ফষ্টরকে বিচারালয়ে উপস্থিত করেন; কিন্তু সাক্ষীদিগের কোন সন্ধান নাই, এবং ফষ্টরও নিজকার্য্যের অনেক ফলভোগ করিয়াছে, এই ভাবিয়া তাহাতে বিরত হইলেন।

ফষ্টর তাহা বুঝিল না। ফষ্টর অত্যন্ত ক্ষুদ্রাশয়। সে মনে করিল, তাহার লঘুপাপে গুরুদণ্ড হইয়াছে। সে ক্ষুদ্রাশয়, অপরাধী ভৃত্যদিগের স্বভাবানুসারে

পূর্ব্বপ্রভুদিগের প্রতি বিশেষ কোপাবিষ্ট হইল। তাহাদিগের বৈরিতাসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইল।

ডাইস্ সম্বর নামে এক জন সুইস্ বা জার্ম্মান মীরকাসেমের সেনাদলমধ্যে সৈনিক-কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। এই ব্যক্তি সমরু নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। উদয়নালায় যবন-শিবিরে সমরু সৈন্য লইয়া উপস্থিত ছিল। ফষ্টর উদয়নালায় তাহার নিকট আসিল। প্রথমে কৌশলে সমরুর নিকট দূত প্রেরণ করিল। সমরু মনে ভাবিল, ইহার দ্বারা ইংরেজদিগের গুপ্ত মন্ত্রণা সকল জানিতে পারিব। সমরু ফষ্টরকে গ্রহণ করিল। ফষ্টর আপন নাম গোপন করিয়া, জন্ ষ্ট্যালকার্ট বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়া সমরুর শিবিরে প্রবেশ করিল। যখন আমীর হোসেন ফষ্টরের অনুসন্ধানে নিযুক্ত, তখন লরেন্স ফষ্টর সমরুর তাম্বুতে।

আমীর হোসেন, কুলসম্‌কে যথাযোগ্য স্থানে রাখিয়া, ফষ্টরের অনুসন্ধানে নির্গত হইলেন। অনুচরবর্গের নিকট শুনিলেন যে, এক আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটিয়াছে, একজন ইংরেজ আসিয়া মুসলমান সৈন্যভুক্ত হইয়াছে। সে সমরুর শিবিরে আছে। আমীর হোসেন সমরুর শিবিরে গেলেন।

যখন আমীর হোসেন সমরুর তাম্বুতে প্রবেশ করিলেন, তখন সমরু ও ফষ্টর একত্রে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। আমীর হোসেন আসন গ্রহণ করিলে সমরু জন ষ্ট্যালকার্ট বলিয়া তাঁহার নিকট ফষ্টরের পরিচয় দিলেন। আমীর হোসেন ষ্ট্যালকার্টের সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন।

আমীর হোসেন, অন্যান্য কথার পর ষ্ট্যালকার্টকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লরেন্স ফষ্টর নামক একজন ইংরেজকে আপনি চিনেন?"

ফষ্টরের মুখ রক্তবর্ণ হইয়া গেল। সে মৃত্তিকাপানে দৃষ্টি করিয়া কিঞ্চিৎ বিকৃতকণ্ঠে কহিল, "লরেন্স ফষ্টর? কই—না।"

আমীর হোসেন, পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কখন তাহার নাম শুনিয়াছেন।" ফষ্টর কিছু বিলম্ব করিয়া উত্তর করিল,—লরেন্স ফষ্টর—হাঁ—কই? না।"

আমীর হোসেন আর কিছু বলিলেন না, অন্যান্য কথা কহিতে লাগিলেন। কিন্তু দেখিলেন, ষ্ট্যালকার্ট আর ভাল করিয়া কথা কহিতেছে না। দুই এক বার উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিল। আমীর হোসেন অনুরোধ করিয়া তাহাকে বসাইলেন। আমীর হোসেনের মনে মনে হইতেছিল যে, এ ফষ্টরের কথা জানে, কিন্তু বলিতেছে না।

ফষ্টর কিয়ৎক্ষণ পরে আপনার টুপি লইয়া মাথায় দিয়া বসিল। আমীর হোসেন জানিতেন যে, এটি ইংরেজদিগের নিয়মবহির্ভূত কাজ। আরও, যখন ফষ্টর টুপি মাথায় দিতে যায়, তখন তাহার শিরস্থ কেশশূন্য আঘাত-চিহ্নের উপর দৃষ্টি পড়িল। ষ্ট্যালকার্ট কি আঘাত চিহ্ন ঢাকিবার জন্য টুপি মাথায় দিল!

আমির হোসেন বিদায় হইলেন। আপন শিবিরে আসিয়া কুল্‌সম্‌কে ডাকিলেন; তাহাকে বলিলেন, "আমার সঙ্গে আয়।" কুল্‌সম্ তাঁহার সঙ্গে গেল।

কুল্‌সম্‌কে সঙ্গে লইয়া আমীর হোসেন পুনর্ব্বার সমরুর তাম্বুতে উপস্থিত হইলেন। কুল্‌সম্ বাহিরে রহিল। ফষ্টর তখনও সমরুর তাম্বুতে বসিয়াছিল। আমীর হোসেন সমরুকে বলিলেন, "যদি আপনার অনুমতি হয়, তবে আমার একজন বাঁদী আসিয়া আপনাকে সেলাম করে। বিশেষ কার্য্য আছে।"

সমরু অনুমতি দিলেন। ফষ্টরের হৃৎকম্প হইল—সে গাত্রোত্থান করিল। আমীর হোসেন হাসিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে বসাইলেন। কুল্‌সম্‌কে ডাকিলেন। কুল্‌সম্ আসিল। ফষ্টরকে দেখিয়া নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইল।

আমীর হোসেন কুল্‌সম্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে এ?"

কুল্‌সম্ বলিল, "লরেন্স ফষ্টর।"

আমীর হোসেন ফষ্টরের হাত ধরিলেন। ফষ্টর বলিল, "আমি কি করিয়াছি?"

আমীর হোসেন তাহার কথার উত্তর না দিয়া সমরুকে বলিলেন, "সাহেব! ইহার গ্রেপ্তারীর জন্য নবাব নাজিমের অনুমতি আছে। আপনি আমার সঙ্গে সিপাহী দিন, ইহাকে লইয়া চলুক।"

সমরু বিস্মিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৃত্তান্ত কি?"

আমীর হোসেন বলিলেন, "পশ্চাৎ বলিব।" সমরু সঙ্গে প্রহরী দিলেন, আমীর হোসেন ফষ্টরকে বাঁধিয়া লইয়া গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : আবার বেদগ্রামে

বহুকষ্টে চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে স্বদেশে লইয়া আসিয়াছিলেন।

বহুকাল পরে আবার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সে গৃহ তখন অরণ্যাধিক ভীষণ হইয়া আছে। চালে প্রায় খড় নাই—প্রায় ঝড়ে উড়িয়া গিয়াছে; কোথায় বা চাল পড়িয়া গিয়াছে—গোরুতে খড় খাইয়া গিয়াছে—বাঁশ বাঁকারি পাড়ার লোকে পোড়াইতে লইয়া গিয়াছে। উঠানে নিবিড় জঙ্গল হইয়াছে—উরগজাতি নির্ভয়ে তন্মধ্যে ভ্রমণ করিতেছে। ঘরের কবাট সকল চোরে খুলিয়া লইয়া গিয়াছে। ঘর খোলা—ঘরে দ্রব্যসামগ্রী কিছুই নাই, কতক চোরে লইয়া গিয়াছে—কতক সুন্দরী আপন গৃহে লইয়া গিয়া তুলিয়া রাখিয়াছে। ঘরে বৃষ্টি প্রবেশ করিয়া জল বসিয়াছে। কোথাও পচিয়াছে, কোথাও ছাতা ধরিয়াছে। ইন্দুর, আরসুলা, বাদুড় পালে পালে বেড়াইতেছে। চন্দ্রশেখর, শৈবলিনীর হাত ধরিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

নিরীক্ষণ করিলেন যে, ঐখানে দাঁড়াইয়া, পুস্তকরাশি ভস্ম করিয়াছিলেন। চন্দ্রশেখর ডাকিলেন, "শৈবলিনী!"

শৈবলিনী কথা কহিল না; কক্ষদ্বারে বসিয়া পূর্ব্বস্বপ্নদৃষ্ট করবীর প্রতি নিরীক্ষণ করিতেছিল। চন্দ্রশেখর যত কথা কহিলেন, কোন কথার উত্তর দিল না—বিস্ফারিতলোচনে চারি দিক্ দেখিতেছিল—একটু একটু টিপি টিপি হাসিতেছিল—একবার স্পষ্ট হাসিয়া অঙ্গুলির দ্বারা কি দেখাইল।

এদিকে পল্লীমধ্যে রাষ্ট্র হইল—চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে লইয়া আসিয়াছেন। অনেকে দেখিতে আসিতেছিল। সুন্দরী সর্ব্বাগ্রে আসিল।

সুন্দরী শৈবলিনীর ক্ষিপ্তাবস্থার কথা কিছু শুনে নাই। প্রথমে আসিয়া চন্দ্রশেখরকে প্রণাম করিল। দেখিল, চন্দ্রশেখরের ব্রহ্মচারীর বেশ। শৈবলিনীর প্রতি চাহিয়া বলিল, "তা, ওকে এনেছ, বেশ করেছ। প্রায়শ্চিত্ত করিলেই হইল।"

কিন্তু সুন্দরী দেখিয়া বিস্মিত হইল যে, চন্দ্রশেখর রহিয়াছে, তবু শৈবলিনী সরিলও না, ঘোমটাও টানিল না, বরং সুন্দরীর পানে চাহিয়া খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল। সুন্দরী ভাবিল, "এ বুঝি ইংরেজি ধরণ, শৈবলিনী ইংরেজের সংসর্গে শিখিয়া আসিয়াছে!" এই ভাবিয়া, শৈবলিনীর কাছে গিয়া বসিল—একটু তফাৎ রহিল, কাপড়ে কাপড়ে না ঠেকে। হাসিয়া শৈবলিনীকে বলিল, "কি লা! চিনতে পারিস্?"

শৈবলিনী বলিল, "পারি—তুই পার্ব্বতী।"

সুন্দরী বলিল, "মরণ আর কি, তিন দিনে ভুলে গেলি?"

শৈবলিনী বলিল, "ভুলব কেন লো—সেই যে তুই আমার ভাত ছুঁয়ে ফেলেছিলি বলিয়া, আমি তোকে মেরে গুড়া নাড়া কল্লুম। পার্ব্বতী দিদি একটি গীত গা না?

আমার মরম কথা তাই লো তাই।
আমার শ্যামের বামে কই সে রাই?
আমার মেঘের কোলে কই সে চাঁদ?

মিছে লো পেতেছি পিরীতি-ফাঁদ।

কিছু ঠিক পাই নে পার্ব্বতী দিদি—কে যেন নেই—কে যেন ছিল, সে যেন নেই—কে যেন আসবে, সে যেন আসে না—কোথা যেন এয়েছি, সেখানে যেন, আসি নাই—কাকে যেন খুঁজি, তাকে যেন চিনি না।”

সুন্দরী বিস্মিতা হইল—চন্দ্রশেখরের মুখপানে চাহিল—চন্দ্রশেখর সুন্দরীকে কাছে ডাকিলেন। সুন্দরী নিকটে আসিলে তাহার কর্ণে বলিলেন, “পাগল হইয়া গিয়াছে।”

সুন্দরী তখন বুঝিল। কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। সুন্দরীর চক্ষু প্রথমে চক্‌চকে হইল, তার পরে পাতার কোলে ভিজা ভিজা হইয়া উঠিল, শেষ জলবিন্দু ঝরিল—সুন্দরী কাঁদিতে লাগিল। স্ত্রীজাতিই সংসারের রত্ন! এই সুন্দরী আর এক দিন কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিযাছিল, শৈবলিনী যেন নৌকাসহিত জলমগ্ন হইয়া মরে। আজি সুন্দরীর ন্যায় শৈবলিনীর জন্য কেহ কাতর নহে।

সুন্দরী আসিয়া ধীরে ধীরে, চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে শৈবলিনীর কাছে বসিল—ধীরে ধীরে কথা কহিতে লাগিল—ধীরে ধীরে পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইতে লাগিল—শৈবলিনী কিছু স্মরণ করিতে পারিল না। শৈবলিনীর স্মৃতির বিলোপ ঘটে নাই—তাহা হইলে পার্ব্বতী নাম মনে পড়িবে কেন? কিন্তু প্রকৃত কথা মনে পড়ে না—বিকৃত হইয়া, বিপরীতে বিপরীত সংলগ্ন হইয়া মনে আসে। সুন্দরীকে মনে ছিল, কিন্তু সুন্দরীকে চিনিতে পারিল না।

সুন্দরী, প্রথমে চন্দ্রশেখরকে আপনাদিগের গৃহে স্নানাহারের জন্য পাঠাইলেন; পরে সেই ভগ্ন গৃহ শৈবলিনীর বাসোপযোগী করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে ক্রমে, প্রতিবাসিনীরা একে আসিয়া তাঁহার সাহায্যে প্রবৃত্ত হইল; আবশ্যক সামগ্রী সকল আসিয়া পড়িতে লাগিল।

এদিকে প্রতাপ মুঙ্গের হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, লাঠিয়াল সকলকে যথাস্থানে সমাবেশ করিয়া, একবার গৃহে আসিয়াছিলেন। গৃহে আসিয়া শুনিলেন, চন্দ্রশেখর গৃহে আসিয়াছেন। ত্বরায় তাঁহারে দেখিতে বেগগ্রামে আসিলেন।

সেই দিন রমানন্দ স্বামীও সেই স্থানে পূর্ব্বে আসিয়া দর্শন দিলেন। আহ্লাদ সহকারে সুন্দরী শুনিলেন যে, রমানন্দ স্বামীর উপদেশানুসারে, চন্দ্রশেখরের ঔষধ প্রয়োগ করিবেন! ঔষধ প্রয়োগের শুভ লগ্ন অবধারিত হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : যোগবল না Psychic Force?

ঔষধ কি, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু ইহা সেবন করাইবার জন্য, চন্দ্রশেখর বিশেষরূপে আত্মশুদ্ধি করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি সহজে জিতেন্দ্রিয়, ক্ষুৎপিপাসাদি শারীরিক বৃত্তি সকল অন্যাপেক্ষা তিনি বশীভূত করিয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে তাহার উপরে কঠোর অনশন-ব্রত আচরণ করিয়া আসিয়াছিলেন। মনকে কয় দিন হইতে ঈশ্বরের ধ্যানে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন—পারমার্থিক চিন্তা ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা মনে স্থান পায় নাই।

অবধারিত কালে চন্দ্রশেখর ঔষধ প্রয়োগার্থ উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। শৈবলিনীর জন্য, শয্যা রচনা করিতে বলিলেন; সুন্দরীর নিযুক্তা পরিচারিকা শয্যা রচনা করিয়া দিল।

চন্দ্রশেখর তখন সেই শয্যায় শৈবলিনীকে শুয়াইতে অনুমতি করিলেন। সুন্দরী শৈবলিনীকে ধরিয়া বলপূর্ব্বক শয়ন করাইল—শৈবলিনী সহজে কথা শুনে না। সুন্দরী গৃহে গিয়া স্নান করিবে—প্রত্যহ করে।

চন্দ্রশেখর তখন সকলকে বলিলেন, "তোমরা একবার বাহিরে যাও। আমি ডাকিবামাত্র আসিও।"

সকলে বাহিরে গেলে, চন্দ্রশেখর করস্থ ঔষধপাত্র মাটিতে রাখিলেন। শৈবলিনীকে বলিলেন, "উঠিয়া বস দেখি।"

শৈবলিনী, মৃদু মৃদু গীত গায়িতে লাগিল—উঠিল না। চন্দ্রশেখর স্থিরদৃষ্টিতে তাহার নয়নের প্রতি নয়ন স্থাপিত করিয়া ধীরে ধীরে গণ্ডূষ গণ্ডূষ করিয়া এক পাত্র হইতে ঔষধ খাওয়াইতে লাগিলেন। রমানন্দ স্বামী বলিয়াছিলেন, "ঔষধ আর কিছু নহে, কমণ্ডলুস্থিত জলমাত্র।" চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ইহাতে কি হইবে?" স্বামী বলিয়াছিলেন, "কন্যা ইহাতে যোগবল পাইবে।"

তখন চন্দ্রশেখর তাহার ললাট, চক্ষু প্রভৃতির নিকট নানা প্রকার বক্রগতিতে হস্ত সঞ্চালন করিয়া ঝাড়াইতে লাগিলেন। এইরূপ কিছুক্ষণ করিতে করিতে শৈবলিনীর চক্ষু বুজিয়া আসিল, অচিরাৎ শৈবলিনী ঢুলিয়া পড়িল—ঘোর নিদ্রাভিভূত হইল।

তখন চন্দ্রশেখর ডাকিলেন, "শৈবলিনি!"

শৈবলিনী, নিদ্রাবস্থায় বলিল, "আজ্ঞে।"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "আমি কে?"

শৈবলিনী পূর্ব্ববৎ নিদ্রিতা—কহিল, "আমার স্বামী।"

চ। তুমি কে?

শৈ। শৈবলিনী।

চ। এ কোন্ স্থান?

শৈ। বেদগ্রাম—আপনার গৃহ।

চ। বাহিরে কে কে আছে?

শৈ। প্রতাপ ও সুন্দরী এবং অন্যান্য ব্যক্তি।

চ। তুমি এখান হইতে গিয়াছিলে কেন?

শৈ। ফষ্টর সাহেব লইয়া গিয়াছিল বলিয়া।

চ। এ সকল কথা এত দিন তোমার মনে পড়ে নাই কেন?

শৈ। মনে ছিল—ঠিক করিয়া বলিতে পারিতেছিলাম না।

চ। কেন?

শৈ। আমি পাগল হইয়াছি।

চ। সত্য সত্য, কাপট্য আছে?

শৈ। সত্য সত্য, কাপট্য নাই।

চ। তবে এখন?

শৈ। এখন এ যে স্বপ্ন—আপনার গুণে জ্ঞানলাভ করিয়াছি।

চ। তবে সত্য কথা বলিবে?

শৈ। বলিব।

চ। তুমি ফষ্টরের সঙ্গে গেলে কেন?

শৈ। প্রতাপের জন্য।

চন্দ্রশেখর চমকিয়া উঠিলেন—সহস্রচক্ষে বিগত ঘটনা সকল পুর্নর্দ্দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রতাপ কি তোমার জার?"

শৈ। ছি! ছি!

চ। তবে কি?

শৈ। এক বোঁটায় আমরা দুইটি ফুল, এক বনমধ্যে ফুটিয়াছিলাম—ছিঁড়িয়া পৃথক করিয়াছিলেন কেন?

চন্দ্রশেখর অতি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার অপরিসীম বুদ্ধিতে কিছু লুক্কায়িত রহিল না। জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে দিন প্রতাপ ম্লেচ্ছের নৌকা হইতে পলাইল, সে দিনে, গঙ্গার সাঁতার মনে পড়ে?"

শৈ। পড়ে।

চ। কি কি কথা হইয়াছিল?

শৈবলিনী সংক্ষেপে আনুপূর্ব্বিক বলিল। শুনিয়া চন্দ্রশেখর মনে মনে প্রতাপকে অনেক সাধুবাদ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে তুমি ফষ্টরের সঙ্গে বাস করিলে কেন?"

শৈ। বাস মাত্র। যদি পুরন্দরপুরে গেলে প্রতাপকে পাই, এই ভরসায়।

চ। বাস মাত্র—তবে কি তুমি স্বাধ্বী?

শৈ। প্রতাপকে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম—এজন্য আমি সাধ্বী নহি—মহাপাপিষ্ঠা।

চ। নচেৎ?

শৈ। নচেৎ সম্পূর্ণ সতী।

চ। ফষ্টর সম্বন্ধে?

শৈ। কায়মনোবাক্যে।

চন্দ্রশেখর খর খর দৃষ্টি করিয়া, হস্ত সঞ্চালন করিয়া কহিলেন, "সত্য বল।"

নিদ্রিতা যুবতী ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, বলিল, "সত্যই বলিয়াছি।"

চন্দ্রশেখর আবার নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, বলিলেন, "তবে ব্রাহ্মণকন্যা হইয়া জাতিভ্রষ্টা হইতে গেলে কেন?"

শৈ। আপনি সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী। বলুন আমি জাতিভ্রষ্টা কি না। আমি তাহার অন্ন খাই নাই—তাহার স্পৃষ্ট জলও খাই নাই। প্রত্যহ স্বহস্তে পাক করিয়া খাইয়াছি—হিন্দু পরিচারিকায় আয়োজন করিয়া দিয়াছে। এক নৌকায় বাস করিয়াছি বটে—কিন্তু গঙ্গার উপর।

চন্দ্রশেখর অধোবদন হইয়া বসিলেন;—অনেক ভাবিলেন—বলিতে লাগিলেন, "হায়! হায়! কি কুকর্ম্ম করিয়াছি—স্ত্রীহত্যা করিতে বসিয়াছিলাম।" ক্ষণেক

পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ সকল কথা কাহাকেও বল নাই কেন?”

শৈ। আমার কথায় কে বিশ্বাস করিবে?

চ। এ সকল কথা কে জানে?

শৈ। ফষ্টর আর পার্ব্বতী।

চ। পার্ব্বতী কোথায়?

শৈ। মাসাবধি হইল মুঙ্গেরে মরিয়া গিয়াছে।

চ। ফষ্টর কোথায়?

শৈ। উদয়নালায়, নবাবের শিবিরে।

চন্দ্রশেখর কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার রোগের কি প্রতিকার হইবে—বুঝিতে পার?”

শৈ। আপনার যোগবল আমাকে দিয়াছেন—তৎপ্রসাদ জানিতে পারিতেছি—আপনার শ্রীচরণকৃপায়, আপনার ঔষধে আরোগ্যলাভ করিব।

চ। আরোগ্য লাভ করিলে, কোথা যাইতে ইচ্ছা কর?

শৈ। যদি বিষ পাই ত খাই—কিন্তু নরকের ভয় করে।

চ। মরিতে চাও কেন?

শৈ। এ সংসারে আমার স্থান কোথায়?

চ। কেন, আমার গৃহে?

শৈ। আপনি আর গ্রহণ করিবেন?

চ। যদি করি?

শৈ। তবে কায়মনে আপনার পদসেবা করি। কিন্তু আপনি কলঙ্কী হইবেন।

এই সময়ে দুরে অশ্বের পদশব্দ শুনা গেল। চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমার যোগবল নাই—রমানন্দ স্বামীর যোগবল পাইয়াছ,—বল ও কিসের শব্দ?”

শৈ। ঘোড়ার পায়ের শব্দ।

চ। কে আসিতেছে?

শৈ। মহম্মদ ইর্‌ফান্—নবাবের সৈনিক।

চ। কেন আসিতেছে?

শৈ। আমাকে লইয়া যাইতে—নবাব আমাকে দেখিতে চাহিয়াছেন।

চ। ফষ্টর সেখানে গেলে পরে তোমাকে দেখিতে চাহিয়াছেন, না তৎপূর্ব্বে?

শৈ। দুই জনকে আনিতে এক সময় আদেশ করেন।

চ। কোন চিন্তা নাই, নিদ্রা যাও।

এই বলিয়া চন্দ্রশেখর সকলকে ডাকিলেন। তাহারা আসিলে বলিলেন যে, “এ নিদ্রা যাইতেছে, নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, এই পাত্রস্থ ঔষধ খাওয়াইও। সম্প্রতি, নবাবের সৈনিক আসিতেছে—কল্য শৈবলিনীকে লইয়া যাইবে। তোমরা সঙ্গে যাইও।”

সকলে বিস্মিত ও ভীত হইল। চন্দ্রশেখরকে জিজ্ঞাসা করিল, “কেন ইহাকে নবাবের নিকট লইয়া যাইবে?”

চন্দ্রশেখর বলিলেন, “এখনই শুনিবে, চিন্তা নাই।”

মহম্মদ ইর্‌ফান্‌ আসিলে, প্রতাপ তাঁহার অভ্যর্থনায় নিযুক্ত হইলেন। চন্দ্রশেখর আদ্যোপান্ত সকল কথা রমানন্দ স্বামীর কাছে গোপনে নিবেদিত করিলেন। রমানন্দ স্বামী বলিলেন, “আগামী কল্য আমাদের দুই জনকেই নবাবের দরবারে উপস্থিত থাকিতে হইবে।”

সপ্তম পরিচ্ছেদ : দরবারে

বৃহৎ তাম্বুর মধ্যে, বার দিয়া বাঙ্গালার শেষ রাজা বসিয়াছিলেন—শেষ রাজা, কেন না, মীরকাসেমের পর যাঁহারা বাঙ্গালার নবাব নাম ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহ রাজত্ব করেন নাই।

বার দিয়া, মুক্তাপ্রবালরজতকাঞ্চনশোভিত উচ্চাসনে, নবাব কাসেম আলি খাঁ, মুক্তাহীরামণ্ডিত হইয়া শিরোদেশে উষ্ণীষোপরে উজ্জ্বলতম সূর্য্যপ্রভ হীরকখণ্ড রঞ্জিত করিয়া, দরবারে বসিয়াছেন। পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, ভৃত্যবর্গ যুক্তহস্তে দণ্ডায়মান—অমাত্যবর্গ অনুমতি পাইয়া জানুর দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া, নীরবে বসিয়া আছেন। নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘বন্দিগণ উপস্থিত?”

মহম্মদ ইর্‌ফান্‌ বলিলেন, “সকলেই উপস্থিত।” নবাব, প্রথমে লরেন্স ফষ্টরকে আনিতে বলিলেন।

লরেন্স ফষ্টর আনিত হইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কে?”

লরেন্স ফষ্টর বুঝিয়াছিলেন যে, এবার নিস্তার নাই। এত কালের পর ভাবিলেন, “এত কাল ইংরেজ নামে কালি দিয়াছি—এক্ষণে ইংরেজের মত মরিব।”

“আমার নাম লরেন্স ফষ্টর।”

নবাব। তুমি কোন্‌ জাতি?

ফষ্টর। ইংরেজ।

ন। ইংরেজ আমার শত্রু—তুমি শত্রু হইয়া আমার শিবিরে কেন আসিয়াছিলে?

ফ। আসিয়াছিলাম, সে জন্য আপনার যাহা অভিরুচি হয়, করুন—আমি আপনার হাতে পাড়িয়াছি। কেন আসিয়াছিলাম, তাহা জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই—জিজ্ঞাসা করিলেও কোন উত্তর পাইবেন না।

নবাব ক্রুদ্ধ না হইয়া হাসিলেন, বলিলেন, “জানিলাম, তুমি ভয়শূন্য। সত্য কথা বলিতে পারিবে?”

ফ। ইংরেজ কখন মিথ্যা কথা বলে না।

ন। বটে? তবে দেখা যাউক। কে বলিয়াছিল যে, চন্দ্রশেখর উপস্থিত আছেন? থাকেন তবে তাঁহাকে আন।

মহম্মদ ইর্‌ফান্‌ চন্দ্রশেখরকে আনিলেন। নবাব চন্দ্রশেখরকে দেখিয়া কহিলেন, “ইঁহাকে চেন?”

ফ। নাম শুনিয়াছি—চিনি না।

ন। ভাল। বাঁদী কুল্‌সম্‌ কোথায়?

কুল্‌সম্‌ও আসিল।

নবাব ফষ্টরকে কহিলেন, “এই বাঁদীকে চেন?”

ফ। চিনি।

না। কে এ?

ফ। আপনার দাসী।

ন। মহম্মদ তকিকে আন।

তখন মহম্মদ ইর্‌ফান, তকি খাঁকে বদ্ধাবস্থায় আনীত করিলেন।

তকি খাঁ এত দিন ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, কোন্‌ পক্ষে যাই; এই জন্য শত্রুপক্ষে আজিও মিলিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহাকে অবিশ্বাসী জানিয়া নবাবের সেনাপতিগণ চক্ষে চক্ষে রাখিয়াছিলেন। আলি হিব্রাহিম্‌ খাঁ অনায়াসে তাঁহাকে বাঁধিয়া আনিয়াছিলেন।

নবাব তকি খাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া বলিলেন, “কুল্‌সম্‌! বল, তুমি মুঙ্গের হইতে কি প্রকারে কলিকাতায় গিয়াছিলে।”

কুলসম্‌, আনুপূর্ব্বিক সকল বলিল। দলনী বেগমের বৃত্তান্ত সকল বলিল। বলিয়া যোড়হস্তে, সজলনয়নে, উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, “জাঁহাপনা! আমি এই আম দরবারে, এই পাপিষ্ঠ, স্ত্রীঘাতক মহম্মদ তকির নামে নালিশ করিতেছি, গ্রহণ করুন! সে আমার প্রভুপত্নীর নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়া, আমার প্রভুকে মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিয়া, সংসারের স্ত্রীরত্নসার দলনী বেগমকে পিপীলিকাবৎ অকাতরে হত্যা করিয়াছে—জাঁহাপনা! পিপীলিকাবৎ এই নরাধমকে অকাতরে হত্যা করুন।”

মহম্মদ তকি রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, “মিথ্যা কথা—তোমার সাক্ষী কে?”

কুল্‌সম্‌, বিস্ফারিতলোচনে, গর্জ্জন করিয়া বলিল, “আমার সাক্ষী! উপরে চাহিয়া দেখ—আমার সাক্ষী জগদীশ্বর! আপনার বুকের উপর হাত দে—আমার সাক্ষী তুই। যদি আর কাহারও কথার প্রয়োজন থাকে, এই ফিরিঙ্গীকে জিজ্ঞাসা কর।”

ন। কেমন, ফিরিঙ্গী, এই বাঁদী যাহা যাহা বলিতেছে, তাহা কি সত্য? তুমিও ত আমিয়টের সঙ্গে ছিলে—ইংরেজ সত্য ভিন্ন বলে না।

ফষ্টর যাহা জানিত, স্বরূপ বলিল। তাহাতে সকলেই বুঝিল, দলনী অনিন্দনীয়া। তকি অধোবদন হইয়া রহিল।

তখন, চন্দ্রশেখর কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বলিলেন, “ধর্ম্মবতার! বাঁদীর কথা যে সত্য, আমিও তাহার একজন সাক্ষী। আমি সেই ব্রহ্মচারী।”

কুল্‌সম্‌ তখন চিনিল। বলিল, “ইনিই বটে।”

তখন চন্দ্রশেখর বলিতে লাগিলেন, “রাজন্‌, যদি এই ফিরিঙ্গী সত্যবাদী হয়, তবে উহাকে আর দুই একটা প্রশ্ন করুন।”

নবাব বুঝিলেন,—বলিলেন, ‘তুমিই প্রশ্ন কর—দ্বিভাষীতে বুঝাইয়া দিবে।”

চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি বলিয়াছ চন্দ্রশেখর নাম শুনিয়াছ—আমি সেই চন্দ্রশেখর। তুমি তাহার—”

চন্দ্রশেখরের কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে ফষ্টর বলিল, “আপনি কষ্ট পাইবেন না। আমি স্বাধীন—মরণ ভয় করি না। এখানে কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া না

দেওয়া আমার ইচ্ছা। আমি আপনার কোন প্রশ্নের উত্তর দিব না।"

নবাব অনুমতি করিলেন, "তবে শৈবলিনীকে আন।"

শৈবলিনী আনীতা হইল। ফষ্টর প্রথমে শৈবলিনীকে চিনিতে পারিল না—শৈবলিনী রুগ্না, শীর্ণা, মলিনা,—জীর্ণ সঙ্কীর্ণ বাসপরিহিতা—অরঞ্জিতকুন্তলা—ধূলিধূসরা। গায়ে খড়ি—মাথায় ধূলি,—চুল আলুথালু—মুখে পাগলের হাসি—চক্ষে পাগলের জিজ্ঞাসাব্যঞ্জক দৃষ্টি। ফষ্টর শিহরিল।

নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহাকে চেন?"

ফ। চিনি।

ন। এ কে?

ফ। শৈবলিনী,—চন্দ্রশেখরের পত্নী।

ন। তুমি চিনিলে কি প্রকারে?

ফ। আপনার অভিপ্রায়ে যে দণ্ড থাক—অনুমতি করুন। —আমি উত্তর দিব না।

ন। আমার অভিপ্রায়, কুক্কুরদংশনে তোমার মৃত্যু হইবে।

ফষ্টরের মুখ বিশুষ্ক হইল—হস্ত পদ কাঁপিতে লাগিল। কিছুক্ষণে ধৈর্য্য প্রাপ্ত হইল—বলিল, "আমার মৃত্যুই যদি আপনার অভিপ্রেত হয়—অন্য প্রকার মৃত্যু আজ্ঞা করুন।"

ন। না। এ দেশে একটি প্রাচীন দণ্ডের কিম্বদন্তী আছে। অপরাধীকে কটি পর্য্যন্ত মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত করে—তাহার পরে তাহাকে দংশনার্থ শিক্ষিত কুক্কুর নিযুক্ত করে। কুক্কুরে দংশন করিলে, ক্ষতমুখে লবণ বৃষ্টি করে। কুক্কুরেরা মাংসভোজনে পরিতৃপ্ত হইলে চলিয়া যায়, অর্দ্ধভক্ষিত অপরাধী অর্দ্ধমৃত হইয়া প্রোথিত থাকে—কুক্কুরদিগের ক্ষুধা হইলে তাহারা আবার আসিয়া অবশিষ্ট মাংস খায়। তোমার ও তকি খাঁর প্রতি সেই মৃত্যুর বিধান করিলাম।

বন্ধনযুক্ত তকি খাঁ আর্ত্ত পশুর ন্যায় বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। ফষ্টর জানু পাতিয়া, ভূমে বসিয়া, যুক্তকরে, ঊর্দ্ধনয়নে জগদীশ্বরকে ডাকিতে লাগিল—মনে মনে বলিতে লাগিল, "আমি কখন তোমাকে ডাকি নাই, কখন তোমাকে ভাবি নাই, চিরকাল পাপই করিয়াছি! তুমি যে আছ, তাহা কখন মনে পড়ে নাই। কিন্তু আজি আমি নিঃসহায় বলিয়া, তোমাকে ডাকিতেছি—হে নিরুপায়ের উপায়—অগতির গতি! আমার রক্ষা কর।"

কেহ বিস্মিত হইও না। যে ঈশ্বরকে না মানে, সেও বিপদে পড়িলে তাঁহাকে ডাকে—ভক্তিভাবে ডাকে। ফষ্টরও ডাকিল।

নয়ন বিনত করিতে ফষ্টরের দৃষ্টি তাম্বুর বাহিরে পড়িল। সহসা দেখিল, এক জটাজূটধারী, রক্তবস্ত্রপরিহিত, শ্বেতশ্মশ্রুবিভূষিত, বিভূতিরঞ্জিত পুরুষ, দাঁড়াইয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন। ফষ্টর সেই চক্ষু প্রতি স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল—ক্রমে তাহার চিত্ত দৃষ্টির বশীভূত হইল! ক্রমে চক্ষু বিনত করিল—যেন দারুণ নিদ্রায় তাহার শরীর অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল যেন, সেই জটাজূটধারী পুরুষের ওষ্ঠাধর বিচলিত হইতেছে—যেন তিনি কি বলিতেছেন। ক্রমে সজলজলদগম্ভীর কণ্ঠধ্বনি যেন তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। ফষ্টর শুনিল যেন কেহ বলিতেছে, "আমি তোকে কুক্কুরের দণ্ড হইতে উদ্ধার করিব। আমার কথার উত্তর দে। তুই কি শৈবলিনীর জার?"

ফষ্টর একবার সেই ধূলিধূসরিতা উন্মাদিনী প্রতি দৃষ্টি করিল—বলিল, "না।"

সকলেই শুনিল, “না, আমি শৈবলিনীর জার নহি।”

সেই বজ্রগম্ভীর শব্দে পুনর্ব্বার প্রশ্ন হইল। নবাব প্রশ্ন করিলেন কি চন্দ্রশেখর, কি কে করিল, ফষ্টর তাহা বুঝিতে পারিল না—কেবল শুনিল যে, গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন হইল যে, “তবে শৈবলিনী তোমার নৌকায় ছিল কেন?”

ফষ্টর উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, “আমি শৈবলিনীর রূপে মুগ্ধ হইয়া, তাহাকে গৃহ হইতে হরণ করিয়াছিলাম। আমার নৌকায় রাখিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম যে, সে আমার প্রতি আসক্ত। কিন্তু দেখিলাম যে, তাহা নহে, সে আমার শত্রু। নৌকায় প্রথম সাক্ষাতেই সে ছুরিকা নির্গত করিয়া আমাকে বলিল, ‘তুমি যদি আমার কামরায় আসিবে, তবে এই ছুরিতে দুজনেই মরিব। আমি তোমার মাতৃতুল্য।’ আমি তাহার নিকট যাইতে পারি নাই। কখন তাহাকে স্পর্শ করি নাই।” সকলে এ কথা শুনিল।

চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই শৈবলিনীকে তুমি কি প্রকারে ম্লেচ্ছের অন্ন খাওয়াইলে?”

ফষ্টর কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, “একদিনও আমার অন্ন বা আমার স্পৃষ্ট অন্ন সে খায় নাই। সে নিজে রাঁধিত।”

প্রশ্ন। কি রাঁধিত?

ফষ্টর। কেবল চাউল—অন্নের সঙ্গে দুগ্ধ ভিন্ন আর কিছু খাইত না।

প্রশ্ন। জল?

ফ। গঙ্গা হইতে আপনি তুলিত।

এমত সময়ে সহসা—শব্দ হইল, “ধুরুম্ ধুরুম ধুম্ বুম্!”

নবাব বলিলেন, “ও কি ও?”

ইর্‌ফান্ কাতর স্বরে বলিল, “আর কি? ইংরেজের কামান। তাহারা শিবির আক্রমণ করিয়াছে।”

সহসা তাম্বা হইতে লোক ঠেলিয়া বাহির হইতে লাগিল। “দুড়ুম্ দুড়ুম্ দুম্” আবার কামান গর্জ্জিতে লাগিল। আবার! বহুতর কামান একত্রে শব্দ করিতে লাগিল—ভীম নাদ লম্ফে লম্ফে নিকটে আসিতে লাগিল—রণবাদ্য বাজিল—চারি দিক্ হইতে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। অশ্বের পদাঘাত, অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা—সৈনিকের জয়ধ্বনি, সমুদ্রতরঙ্গবৎ গর্জ্জিয়া উঠিল—ধূমরাশিতে গগন প্রচ্ছন্ন হইলে—দিগন্ত ব্যাপ্ত হইল। সুষুপ্তিকালে যেন জলোচ্ছ্বাসে উছলিয়া, ক্ষুব্ধ সাগর আসিয়া বেড়িল।

সহসা নবাবের অমাত্যবর্গ, এবং ভৃত্যগণ, ঠেলাঠেলি করিয়া তাম্বুর বাহিরে গেল—কেহ সমরাভিমুখে—কেহ পলায়নে। কুল্‌সম্, চন্দ্রশেখর, শৈবলিনী ও ফষ্টর ইহারাও বাহির হইল। তাম্বুমধ্যে একা নবাব ও বন্দী তকি বসিয়া রহিলেন।

সেই সময়ে কামানের গোলা আসিয়া তাম্বুর মধ্যে পড়িতে লাগিল। নবাব সেই সময়ে স্বীয় কটিবন্ধ হইতে অসি নিষ্কোষিত করিয়া, তকির বক্ষে স্বহস্তে বিদ্ধ করিলেন। তকি মরিল। নবাব তাম্বুর বাহিরে গেলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : যুদ্ধক্ষেত্র

শৈবলিনীকে লইয়া বাহিরে আসিয়া চন্দ্রশেখর দেখিলেন, রমানন্দ স্বামী দাঁড়াইয়া আছেন। স্বামী বলিলেন, "চন্দ্রশেখর। অতঃপর কি করিবে?"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "এক্ষণে, শৈবলিনীর প্রাণরক্ষা করি কি প্রকারে? চারি দিকে গোলা বৃষ্টি হইতেছে। চারি দিক ধূমে অন্ধকার—কোথায় যাইব?"

রমানন্দ স্বামী বলিলেন, "চিন্তা নাই—দেখিতেছ না, কোন্ দিকে যবনসেনাগণ পলায়ন করিতেছে? যেখানে যুদ্ধারম্ভেই পলায়ন, সেখানে আর রণজয়ের সম্ভাবনা কি? এই ইংরেজ জাতি অতিশয় ভাগ্যবান্—বলবান্—এবং কৌশলময় দেখিতেছি—বোধ হয় ইহারা এক দিন সমস্ত ভারতবর্ষ অধিকৃত করিবে। চল আমরা পলায়নপরায়ণ যবনদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী হই। তোমার আমার জন্য চিন্তা নাই, কিন্তু এই বধূর জন্য চিন্তা।"

তিন জনে পলায়নোদ্যত যবন-সেনার পশ্চাদ্গামী হইলেন। অকস্মাৎ দেখিলেন, সম্মুখে এক দল সুসজ্জিত অস্ত্রধারী হিন্দুসেনা—রণমত্ত হইয়া দৃঢ় পর্ব্বতরন্ধ্র-পথে নির্গত হইয়া ইংরেজরণে সম্মুখীন হইতে যাইতেছে। মধ্যে, তাহাদিগের নায়ক, অশ্বারোহণে। সকলেই দেখিয়া চিনিলেন যে, প্রতাপ! এ দুর্জ্জয় রণে তুমি কেন? ফের।"

"আমি আপনাদিগের সন্ধানেই আসিতেছিলাম। চলুন,নির্ব্বিঘ্ন স্থানে আপনাদিগকে রাখিয়া আসি।"

এই বলিয়া প্রতাপ, তিন জনকে নিজ ক্ষুদ্র সেনাদলের মধ্যস্থানে স্থাপিত করিয়া ফিরিয়া চলিলেন। তিনি পর্ব্বতমালামধ্যস্থ নির্গমন পথ সকল সবিশেষ অবগত ছিলেন। অবিলম্বে তাঁহাদিগকে, সমর-ক্ষেত্র হইতে দূরে লইয়া গেলেন। গমনকালে চন্দ্রশেখরের নিকট, দরবারে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা সবিস্তারে শুনিলেন। তৎপরে চন্দ্রশেখর প্রতাপকে বলিলেন, "প্রতাপ, তুমি ধন্য, তুমি যাহা জান, আমিও তাহা জানি।"

প্রতাপ বিস্মিত হইয়া চন্দ্রশেখরের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

চন্দ্রশেখর বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে বলিলেন, "এক্ষণে জানিলাম যে, ইনি নিষ্পাপ। যদি লোকরঞ্জনার্থ কোন প্রায়শ্চিত করিতে হয়, তবে তাহা করিব। করিয়া ইঁহাকে গৃহে লইব। কিন্তু সুখ আর আমার কপালে হইবে না।"

প্র। কেন, স্বামীর ঔষধে কোন ফল দর্শে নাই?

চ। এ পর্য্যন্ত নহে।

প্রতাপ বিমর্ষ হইলেন। তাঁহারও চক্ষে জল আসিল। শৈবলিনী অবগুণ্ঠন মধ্য হইতে তাহা দেখিতেছিল—শৈবলিনী একটু সরিয়া গিয়া, হস্তেঙ্গিতের দ্বারা প্রতাপকে ডাকিল—প্রতাপ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, তাহার নিকটে গেলেন। শৈবলিনী অন্যের অশ্রাব্য স্বরে প্রতাপকে বলিল, "আমার একটা কথা কাণে কাণে শুনিবে; আমি দূষণীয় কিছুই বলিব না।"

প্রতাপ বিস্মিত হইলেন; বলিলেন, "তোমার বাতুলতা কি কৃত্রিম?"

শৈ। এক্ষণে বটে। আজি প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়া অপধি সকল কথা বুঝিতে পারিতেছি। আমি কি সত্য সত্যই পাগল হইয়াছিলাম?

প্রতাপের মুখ প্রফুল্ল হইল। শৈবলিনী, তাঁহার মনের কথা বুঝিতে পারিয়া ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "চুপ। এক্ষণে কিছু বলিও না। আমি নিজেই সকল বলিব—কিন্তু তোমার অনুমতিসাপেক্ষ।"

প্র। আমার অনুমতি কেন?

শৈ। স্বামী যদি আমায় পূনর্ব্বার গ্রহণ করেন, তবে মনের পাপ আবার লুকাইয়া রাখিয়া, তাঁহার প্রণয়ভাগিনী হওয়া কি উচিত হয়?

প্র। কি করিতে চাও?

শৈ। পূর্ব্বকথা সকল তাঁহাকে বলিয়া, ক্ষমা চাহিব।

প্রতাপ চিন্তা করিলেন, বলিলেন, “বলিও! আশীর্ব্বাদ করি, তুমি এবার সুখী হও।” এই বলিয়া প্রতাপ নীরবে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

শৈ। আমি সুখী হইব না। তুমি থাকিতে আমার সুখ নাই—

প্র। সে কি শৈবলিনী?

শৈ। যত দিন তুমি এ পৃথিবীতে থাকিবে, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না। স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি অসার; কত দিন বশে থাকিবে জানি না। এজন্মে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না।

প্রতাপ আর উত্তর করিলেন না। দ্রুতপদে অশ্বারোহণ করিয়া, অশ্বে কশাঘাতপূর্ব্বক সমরক্ষেত্রাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তাঁহার সৈন্যগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল।

গমনকালে চন্দ্রশেখর ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোথা যাও।”

প্রতাপ বলিলেন, “যুদ্ধে।”

চন্দ্রশেখর ব্যগ্রভাবে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, “যাইও না। যাইও না। ইংরেজের যুদ্ধে রক্ষা নাই।”

প্রতাপ বলিলেন, “ফষ্টর এখনও জীবিত আছে, তাহার বধে চলিলাম।”

চন্দ্রশেখর দ্রুতবেগে আসিয়া প্রতাপের অশ্বের বল্‌গা ধরিলেন। বলিলেন, “ফষ্টরের বধে কাজ কি ভাই? যে দুষ্ট, ভগবান্ তাহার দণ্ডবিধান করিবেন। তুমি আমি কি দণ্ডের কর্ত্তা? যে অধম, সেই শত্রুর প্রতিহিংসা করে; যে উত্তম, সে শত্রুকে ক্ষমা করে।”

প্রতাপ বিস্মিত, পুলকিত হইলেন। এরূপ মহতী উক্তি তিনি কখন লোকমুখে শ্রবণ করেন নাই। অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, চন্দ্রশেখরের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। বলিলেন, “আপনিই মনুষ্যমধ্যে ধন্য। আমি ফষ্টরকে কিছু বলিব না।”

এই বলিয়া প্রতাপ পুনরপি অশ্বারোহণ করিয়া, যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে চলিলেন। চন্দ্রশেখর বলিলেন, “প্রতাপ, তবে আবার যুদ্ধেক্ষেত্রে যাও কেন?”

প্রতাপ, মুখ ফিরাইয়া অতি কোমল, অতি মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন, “আমার প্রয়োজন আছে।” এই বলিয়া অশ্বে কশাঘাত করিয়া অতি দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন।

সেই হাসি দেখিয়া, রমানন্দ স্বামী উদ্বিগ্ন হইলেন। চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, “তুমি বধূকে লইয়া গৃহে যাও। আমি গঙ্গাস্নানে যাইব। দুই এক দিন পরে সাক্ষাৎ হইবে।”

চন্দ্রশেখর বলিলেন, “আমি প্রতাপের জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইতেছি।” রমানন্দ স্বামী বলিলেন, “আমি তাঁহার তত্ত্ব লইয়া যাইতেছি।”

এই বলিয়া রমানন্দ স্বামী, চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীকে বিদায় করিয়া দিয়া যুদ্ধক্ষেত্রভিমুখে চলিলেন। সেই ধূমময়, আহতের আর্ত্তচীৎকারে ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে, প্রতাপকে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, কোথাও শবের উপর শব স্তূপাকৃত হইয়াছে—কেহ মৃত, কেহ অর্দ্ধমৃত, কাহারও অঙ্গ ছিন্ন, কাহারও বক্ষ বিদ্ধ, কেহ “জল! জল!” করিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে—কেহ মাতা, ভ্রাতা, পিতা বন্ধু প্রভৃতির নাম করিয়া ডাকিতেছে। রমানন্দ স্বামী সেই সকল শবের মধ্যে প্রতাপের অনুসন্ধান করিলেন, পাইলেন না। দেখিলেন, কত অশ্বারোহী রুধিরাক্ত কলেবরে, আহত অশ্বের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অস্ত্র শস্ত্র ফেলিয়া পলাইতেছে, অশ্বপদে কত হতভাগ্য আহত যোদ্ধৃবর্গ দলিত হইয়া বিনষ্ট হইতেছে। তাহাদিগের মধ্যে প্রতাপের সন্ধান করিলেন, পাইলেন না।

দেখিলেন, কত পদাতিক, রিক্তহস্তে উর্দ্ধশ্বাসে, রক্তপ্লাবিত হইয়া পালাইতেছে, তাহাদিগের মধ্যে প্রতাপের অনুসন্ধান করিলেন, পাইলেন না। শ্রান্ত হইয়া রমানন্দ স্বামী এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। সেইখান দিয়া একজন সিপাহী পলাইতেছিল। রমানন্দ স্বামী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা সকলেই পলাইতেছ—তবে যুদ্ধ করিল কে?"

সিপাহী বলিল, "কেহ নহে। কেবল এক হিন্দু বড় যুদ্ধ করিয়াছে।"

স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কোথা?" সিপাহী বলিল, "গড়ের সম্মুখে দেখুন।" এই বলিয়া সিপাহী পলাইল।

রমানন্দ স্বামী গড়ের দিকে গেলেন। দেখিলেন, যুদ্ধ নাই, কয়েক জন ইংরেজ ও হিন্দুর মৃতুদেহ একত্রে স্তূপাকৃত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। স্বামী তাহার মধ্যে প্রতাপের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পতিত হিন্দুদিগের মধ্যে কেহ গভীর কাতরোক্তি করিল। রমানন্দ স্বামী তাহাকে টানিয়া বাহির করিলেন, দেখিলেন, সেই প্রতাপ! আহত, মৃতপ্রায়, এখনও জীবিত।

রমানন্দ স্বামী জল আনিয়া তাহার মুখে দিলেন। প্রতাপ তাঁহাকে চিনিয়া প্রণামের জন্য, হস্তোত্তোলন করিতে উদ্যোগ করিলেন, কিন্তু পারিলেন না।

স্বামী বলিলেন, "আমি অমনিই আশীর্ব্বাদ করিতেছি, আরোগ্য লাভ কর।"

প্রতাপ কষ্টে বলিলেন, "আরোগ্য? আরোগ্যের আর বড় বিলম্ব নাই। আপনার পদরেণু আমার মাথায় দিন।"

রমানন্দ স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমরা নিষেধ করিয়াছিলাম, কেন এ দুর্জ্জয় রণে আসিলে? শৈবলিনীর কথায় কি এরূপ করিয়াছ?"

প্রতাপ বলিল, "আপনি, কেন এরূপ আজও করিতেছেন?"

স্বামী বলিলেন, "যখন তুমি শৈবলিনীর সঙ্গে কথা কহিতেছিলে, তখন তাঁহার আকারেঙ্গিত দেখিয়া বোধ হইয়াছিল যে, সে আর উন্মাদগ্রস্তা নহে। এবং বোধ হয়, তোমাকে একেবারে বিস্মৃত হয় নাই।" প্রতাপ বলিলেন, "শৈবলিনী বলিয়াছিল যে, এ পৃথিবীতে আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ না হয়। আমি বুঝিলাম, আমি জীবিত থাকিতে শৈবলিনী বা চন্দ্রশেখরের সুখের সম্ভাবনা নাই। যাহারা আমার পরম প্রীতির পাত্র, যাহারা আমার পরমোপকারী, তাহাদিগের সুখের কণ্টকস্বরূপ এ জীবন আমার রাখা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিলাম। তাই আপনাদিগের নিষেধ সত্ত্বেও এ সমরক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিতে আসিয়াছিলাম। আমি থাকিলে, শৈবলিনীর চিত্ত, কখন না কখন বিচলিত হইবার সম্ভাবনা। অতএব আমি চলিলাম।"

রমানন্দ স্বামীর চক্ষে জল আসিল; আর কেহ কখন রমানন্দ স্বামীর চক্ষে জল দেখে নাই। তিনি বলিলেন, "এ সংসারে তুমিই যথার্থ পরহিতব্রতধারী। আমরা ভণ্ডমাত্র। তুমি পরলোকে অনন্ত অক্ষয় স্বর্গভোগ করিবে সন্দেহ নাই।"

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া, রমানন্দ স্বামী বলিতে লাগিলেন, "শুন বৎস! আমি তোমার অন্তঃকরণ বুঝিয়াছি। ব্রহ্মাণ্ডজয় তোমার এই ইন্দ্রিয়জয়ের তুল্য হইতে পারে না—তুমি শৈবলিনীকে ভালবাসিতে?"

সুপ্ত সিংহ যেন জাগিয়া উঠিল। সেই শবাকার প্রতাপ, বলিষ্ঠ, চঞ্চল, উন্মত্তবৎ হুহুঙ্কার করিয়া উঠিল—বলিল, "কি বুঝিবে, তুমি সন্ন্যাসী! এ জগতে মনুষ্য কে আছে যে, আমার এ ভালবাসা বুঝিবে! কে বুঝিবে, আজি এই ষোড়শ বৎসর, আমি শৈবলিনীকে কত ভালবাসিয়াছি। পাপচিত্তে আমি তাহার প্রতি অনুরক্ত নহি—আমার ভালবাসার নাম—জীবনবিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা। শিরে শিরে, শোণিতে শোণিতে, অস্থিতে অস্থিতে, আমার এই অনুরাগ অহোরাত্র বিচরণ করিয়াছে। কখন মানুষে তাহা জানিতে পারে নাই—মানুষে তাহা জানিতে পারিত না—এই মৃত্যুকালে আপনি কথা তুলিলেন কেন? এ জন্মে এ অনুরাগে মঙ্গল নাই বলিয়া, এ দেহ পরিত্যাগ করিলাম। আমার মন কলুষিত হইয়াছে—কি জানি শৈবলিনীর হৃদয়ে আবার কি হইবে? আমার মৃত্যু ভিন্ন ইহার উপায়

নাই—এই জন্য মরিলাম। আপনি এই গুপ্ত তত্ত্ব শুনিলেন—আপনি জ্ঞানী, আপনি শাস্ত্রদর্শী—আপনি বলুন, আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত? আমি কি জগদীশ্বরের কাছে দোষী? যদি দোষ হইয়া থাকে, এ প্রায়শ্চিত্তে কি তাহার মোচন হইবে না?”

রমানন্দ স্বামী বলিলেন, “তাহা জানি না। মানুষের জ্ঞান এখানে অসমর্থ; শাস্ত্র এখানে মূক। তুমি যে লোকে যাইতেছ, সেই লোকেশ্বর ভিন্ন এ কথার কেহ উত্তর দিতে পারিবে না। তবে, ইহাই বলিতে পারি, ইন্দ্রিয়জয়ে যদি পূর্ণ থাকে, তবে অনন্ত স্বর্গ তোমারই। যদি চিত্তসংযমে পূর্ণ্য থাকে, তবে দেবতারাও তোমার তুল্য পূণ্যবান্ নহেন। যদি পরোপকারে স্বর্গ থাকে, তবে দধীচির অপেক্ষাও তুমি স্বর্গের অধিকার। প্রার্থনা করি, জন্মান্তরে যেন তোমার মত ইন্দ্রিয়জয়ী হই।”

রমানন্দ স্বামী নীরব হইলেন। ধীরে ধীরে প্রতাপের প্রাণ বিমুক্ত হইল। তৃণ-শয্যায়, অনিন্দ্যজ্যোতিঃ স্বর্ণতরু পড়িয়া রহিল।

তবে যাও, প্রতাপ, অনন্তধামে। যাও, যেখানে ইন্দ্রিয়জয়ে কষ্ট নাই, রূপে মোহ নাই, প্রণয়ে পাপ নাই, সেইখানে যাও! যেখানে, রূপ অনন্ত, প্রণয় অনন্ত, সুখ অনন্ত, সুখে অনন্ত পুণ্য, সেইখানে যাও। যেখানে পরের দুঃখ পরে জানে, পরের ধর্ম্ম পরে রাখে, পরের জয় পরে গায়, পরের জন্য পরকে মরিতে হয় না, সেই মহৈশ্বর্য্যময় লোকে যাও! লক্ষ শৈবলিনী পদপ্রান্তে পাইলেও, ভালবাসিতে চাহিবে না।

দেবী চৌধুরাণী

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

“ও পি—ও পিপি—ও প্রফুল্ল—ও পোড়ারমুখী।”

“যাই মা।”

মা ডাকিল—মেয়ে কাছে আসিল। বলিল, “কেন মা?”

মা বলিল, “যা না—ঘোষেদের বাড়ী থেকে একটা বেগুন চেয়ে নিয়ে আয় না।”

প্রফুল্লমুখী বলিল, “আমি পারিব না। আমার চাইতে লজ্জা করে।”

মা। তবে খাবি কি? আজ ঘরে যে কিছু নেই।

প্র। তা শুধু ভাত খাব। রোজ রোজ চেয়ে খাব কেন গা?

মা। যেমন অদৃষ্ট ক'রে এসেছিলি। কাঙ্গাল গরিবের চাইতে লজ্জা কি?

প্রফুল্ল কথা কহিল না। মা বলিল, “তুই তবে ভাত চড়াইয়া দে, আমি কিছু তরকারির চেষ্টায় যাই।”

প্রফুল্ল বলিল, “আমার মাথা খাও, আর চাইতে যাইও না। ঘরে চাল আছে, নুন আছে, গাছে কাঁচা লঙ্কা আছে—মেয়ে মানুষের তাই ঢের।”

অগত্যা প্রফুল্লের মাতা সম্মত হইল। ভাতের জল চড়াইয়াছিল, মা চাল ধুইতে গেল। চাল ধুইবার জন্য ধুচুনি হাতে করিয়া মাতা গালে হাত দিল। বলিল, “চাল কই?” প্রফুল্লকে দেখাইল, আধ মুটা চাউল আছে মাত্র—তাহা একজনেরও আধপেটা হইবে না।

মা ধুচুনি হাতে করিয়া বাহির হইল। প্রফুল্ল বলিল, “কোথা যাও?”

মা। চাল ধার করিয়া আনি—নইলে শুধু ভাতই কপালে জোটে কই?

প্র। আমরা লোকের কত চাল ধারি—শোধ দিতে পারি না—তুমি আর চাল ধার করিও না।

মা। আবাগীর মেয়ে, খাবি কি? ঘরে যে একটি পয়সা নাই।

প্র। উপস্ করিব।

মা। উপস্ করিয়া কয় দিন বাঁচিবি?

প্র। না হয় মরিব।

মা। আমি মরিলে যা হয় করিস; তুই উপস্ করিয়া মরিবি, আমি চক্ষে দেখিতে পারিব না। যেমন করিয়া পারি, ভিক্ষা করিয়া তোকে খাওয়াইব।

প্র। ভিক্ষাই বা কেন করিতে হইবে? একদিনের উপবাসে মানুষ মরে না। এসো না, মায়ে ঝিয়ে আজ পৈতে তুলি। কাল বেচিয়া কড়ি করিব।

মা। সূতা কই?

প্র। কেন, চরকা আছে।

মা। পাঁজ কই?

তখন প্রফুল্লমুখী অধোবদনে রোদন করিতে লাগিল। মা ধুচুনি হাতে আবার চাউল ধার করিয়া আনিতে চলিল, তখন প্রফুল্ল মার হাত হইতে ধুচুনি কাড়িয়া লইয়া তফাতে রাখিল। বলিল, "মা, আমি কেন চেয়ে ধার ক'রে খাব—আমার ত সব আছে?"

মা চক্ষের জল মুছাইয়া বলিল, "সবই ত আছে মা—কপালে ঘটিল কৈ?"

প্র। কেন ঘটে না মা—আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে, শ্বশুরের অন্ন থাকিতে আমি খাইতে পাইব না?

মা। এই অভাগীর পেটে হয়েছিলে, এই অপরাধ—আর তোমার কপাল। নহিলে তোমার অন্ন খায় কে?

প্র। শোন মা, আমি আজ মন ঠিক করিয়াছি—শ্বশুরের অন্ন কপালে জোটে, তবে খাইব—নইলে আর খাইব না। তুমি চেয়ে চিন্তে যে প্রকারে পার, আনিয়া খাও। খাইয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া শ্বশুরবাড়ী রাখিয়া আইস।

মা। সে কি মা! তাও কি হয়?

প্র। কেন হয় না মা?

মা। না নিতে এলে কি শ্বশুরবাড়ী যেতে আছে?

প্র। পরের বাড়ী চেয়ে খেতে আছে, আর না নিতে এলে আপনার শ্বশুরবাড়ী যেতে নেই?

মা। তারা যে কখনও তোমার নাম করে না।

প্র। না করুক—তাতে আমার অপমান নাই। যাহাদের উপর আমার ভরণপোষণের ভার, তাহাদের কাছে অন্নের ভিক্ষা করিতে আমার অপমান নাই। আপনার ধন আপনি চাহিয়া খাইব—তাহাতে আমার লজ্জা কি?

মা চুপ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রফুল্ল বলিল, "তোমাকে একা রাখিয়া আমি যাইতে চাহিতাম না—আমার দুঃখ ঘুচিলে তোমারও দুঃখ কমিবে, এই ভরসায় যাইতে চাহিতেছি।"

মাতে মেয়েতে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। মা বুঝিল যে, মেয়ের পরামর্শই ঠিক। তখন মা, যে কয়টি চাউল ছিল, তাহা রাঁধিল। কিন্তু প্রফুল্ল কিছুতেই খাইল না। কাজেই তাহার মাতাও খাইল না। তখন বলিল, "তবে আর বেলা কাটাইয়া কি হইবে? অনেক পথ।"

তাহার মাতা বলিল, "আয় তোর চুলটা বাঁধিয়া দিই।"

প্রফুল্ল বলিল, “না, থাক্।”
মা ভাবিল, “থাক্। আমার মেয়েকে সাজাইতে হয় না।”
মেয়ে ভাবিল, “থাক্। সেজে গুজে কি ভুলাইতে যাইব? ছি!”
তখন দুই জনে মলিন বেশে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বরেন্দ্রভূমে ভূতনাথ নামে গ্রাম; সেইখানে প্রফুল্লমুখীর শ্বশুরালয়। প্রফুল্লের দশা যেমন হউক, তাহার শ্বশুর হরবল্লভবাবু খুব বড়মানুষ লোক। তাঁহার অনেক জমিদারী আছে, দোতালা বৈঠকখানা, ঠাকুরবাড়ী, নাটমন্দির, দপ্তরখানা, খিড়কিতে বাগান, পুকুর প্রাচীরে বেড়া। সে স্থান প্রফুল্লমুখীর পিত্রালয় হইতে ছয় ক্রোশ। ছয় ক্রোশ পথ হাঁটিয়া মাতা ও কন্যা অনশনে বেলা তৃতীয় প্রহরের সময়ে সে ধনীর গৃহে প্রবেশ করিলেন।

প্রবেশকালে প্রফুল্লের মার পা উঠে না। প্রফুল্ল কাঙ্গালের মেয়ে বলিয়া যে হরবল্লভবাবু তাঁহাকে ঘৃণা করিতেন, তাহা নহে। বিবাহের পরে একটা গোল হইয়াছিল। হরবল্লভ কাঙ্গাল দেখিয়াও ছেলের বিবাহ দিয়াছিলেন। মেয়েটি পরমসুন্দরী, তেমন মেয়ে আর কোথাও পাইলেন না, তাই সেখানে বিবাহ দিয়াছিলেন। এদিকে প্রফুল্লের মা, কন্যা বড়মানুষের ঘরে পড়িল, এই উৎসাহে সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া বিবাহ দিয়াছিলেন। সেই বিবাহতেই—তাঁর যাহা কিছু ছিল, ভস্ম হইয়া গেল। সেই অবধি এই অন্নের কাঙ্গাল। কিন্তু অদৃষ্টক্রমে সে সাধের বিবাহে বিপরীত ফল ফলিল। সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও—সর্ব্বস্বই তার কত টাকা?—সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও সে বিধবা স্ত্রীলোক সকল দিক্ কুলান করিতে পারিল না। বরযাত্রীদিগের লুচি মণ্ডায়, দেশ কাল পাত্র বিবেচনায়, উত্তম ফলাহার করাইল। কিন্তু কন্যাযাত্রীগণের কেবল চিঁড়া দই। ইহাতে প্রতিবাসী কন্যাযাত্রেরা অপমান বোধ করিলেন। তাঁহারা খাইলেন না—উঠিয়া গেলেন। ইহাতে প্রফুল্লের মার সঙ্গে তাঁহাদের কোন্দল বাধিল; প্রফুল্লের মা বড় গালি দিল। প্রতিবাসীরা একটা বড় রকম শোধ লইল।

পাকস্পর্শের দিন হরবল্লভ বেহাইনের প্রতিবাসী সকলকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাহারা কেহ গেল না—একজন লোক দিয়া বলিয়া পাঠাইল যে, যে কুলটা, জাতিভ্রষ্ট, তাহার সঙ্গে হরবল্লভবাবুর কুটুম্বতা করিতে হয় করুন,—বড়মানুষের সব শোভা পায়, কিন্তু আমরা কাঙ্গাল গরিব, জাতই আমাদের সম্বল—আমরা জাতিভ্রষ্টার কন্যার পাকস্পর্শে জলগ্রহণ করিব না। সমবেত সভামধ্যে এই কথা প্রচার হইল। প্রফুল্লের মা একা বিধবা, মেয়েটি লইয়া ঘরে থাকে—তখন বয়সও যায় নাই—কথা অসম্ভব বোধ হইল না, বিশেষ, হরবল্লভের মনে হইল যে, বিবাহের রাত্রে প্রতিবাসীরা বিবাহ বাড়ীতে খায় নাই। প্রতিবাসীরা মিথ্যা বলিবে কেন? হরবল্লভ বিশ্বাস করিলেন। সভার সকলেই বিশ্বাস করিল। নিমন্ত্রিত সকলেই ভোজন করিল বটে—কিন্তু কেহই নববধূর স্পৃষ্ট ভোজ্য খাইল না। পরদিন হরবল্লভ বধূকে মাত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। সেই অবধি প্রফুল্ল ও তাহার মাতা তাঁহার পরিত্যাজ্য হইল। সেই অবধি আর কখন তাহাদের সংবাদ লইলেন না; পুত্রকে লইতেও দিলেন না। পুত্রের অন্য বিবাহ দিলেন। প্রফুল্লের মা দুই একবার কিছু সামগ্রী পাঠাইয়া দিয়াছিল, হরবল্লভ তাহা ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। তাই আজ সে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে প্রফুল্লের মার পা কাঁপিতেছিল।

কিন্তু যখন আসা হইয়াছে, তখন আর ফেরা যায় না। কন্যা ও মাতা সাহসে ভর করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। তখন কর্ত্তা অন্তঃপুরমধ্যে অপরাহ্নিক নিদ্রার সুখে অভিভূত। গৃহিণী—অর্থাৎ প্রফুল্লের শাশুড়ী, পা ছড়াইয়া পাকা চুল তুলাইতেছিলেন। এমন সময়ে, সেখানে প্রফুল্ল ও তাহার মা উপস্থিত হইল। প্রফুল্ল মুখে আধ হাত ঘোমটা টানিয়া দিয়াছিল। তাহার বয়স এখন আঠার বৎসর।

গিন্নী ইহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন, "তোমরা কে গা?"

প্রফুল্লের মা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কি বলিয়াই বা পরিচয় দিব?"

গিন্নী। কেন—পরিচয় আবার কি বলিয়া দেয়?

প্রফুল্লের মা। আমরা কুটুম্ব।

গিন্নী। কুটুম্ব? কে কুটুম্ব গা?

সেখানে তারার মা বলিয়া একজন চাকরাণী কাজ করিতেছিল। সে দুই একবার প্রফুল্লদিগের বাড়ী গিয়াছিল—প্রথম বিবাহের পরেই। সে বলিল, ওগো, চিনেছি গো! "ওগো চিনেছি! কে! বেহান?"

(সে কালে পরিচারিকারা গৃহিণীর সম্বন্ধ ধরিত।)

গিন্নী। বেহান? কোন্ বেহান?

তারার মা। দুর্গাপুরের বেহান গো—তোমার বড় ছেলের বড় শাশুড়ী।

গিন্নী বুঝিলেন। মুখটা অপ্রসন্ন হইল। বলিলেন, "বসো।"

বেহান বসিল—প্রফুল্ল দাঁড়াইয়া রহিল। গিন্নী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ মেয়েটি কে গা?"

প্রফুল্লের মা বলিল, "তোমার বড় বউ।"

গিন্নী বিমর্ষ হইয়া কিছু কাল চুপ করিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, "তোমরা কোথায় এসেছিলে?"

প্রফুল্লের মা। তোমার বাড়ীতেই এসেছি।

গিন্নী। কেন গা?

প্র, মা। কেন, আমার মেয়েকে কি শ্বশুরবাড়ীতে আসিতে নাই?

গিন্নী। আসিতে থাকিবে না কেন? শ্বশুর শাশুড়ী যখন আনিবে, তখন আসিবে। ভাল মানুষের মেয়েছেলে কি গায়ে প'ড়ে আসে?

প্র, মা। শ্বশুর শাশুড়ী যদি সাত জন্মে নাম না করে?

গিন্নী। নামই যদি না করে—তবে আসা কেন?

প্র, মা। খাওয়ায় কে? আমি বিধবা অনাথিনী, তোমার বেটার বউকে আমি খাওয়াই কোথা থেকে?

গিন্নী। যদি খাওয়াইতেই পারিবে না, তবে পেটে ধরেছিলে কেন?

প্র, মা। তুমি কি খাওয়া পরা হিসাব করিয়া বেটা পেটে ধরেছিলে? তা হলে সেই সঙ্গে বেটার বউয়ের খোরাক-পোষাকটা ধরিয়া নিতে পার নাই?

গিন্নী। আ মলো! মাগী বাড়ী ব'য়ে কোঁদল করতে এসেছে দেখি যে?

প্র, মা। না, কোঁদল করিতে আসি নাই। তোমার বউ একা আস্‌তে পারে না, তাই রাখিতে সঙ্গে আসিয়াছি। এখন তোমার বউ পৌঁছিয়াছে, আমি চলিলাম।

এই বলিয়া প্রফুল্লের মা বাটীর বাহির হইয়া চলিয়া গেল। অভাগীর তখনও আহার হয় নাই।

মা গেল, কিন্তু প্রফুল্ল গেল না। যেমন ঘোমটা দেওয়া ছিল, তেমনই ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শাশুড়ী বলিল, "তোমার মা গেল, তুমিও যাও।"

প্রফুল্ল নড়ে না।

গিন্নী। নড় না যে?

প্রফুল্ল নড়ে না।

গিন্নী। কি জ্বালা! আবার কি তোমার সঙ্গে একটা লোক দিতে হবে না কি?

এবার প্রফুল্ল মুখের ঘোমটা খুলিল; চাঁদপানা মুখ, চক্ষে দর দর ধারা বহিতেছে। শাশুড়ী মনে মনে ভাবিলেন, "আহা! এমন চাঁদপানা বৌ নিয়ে ঘর কর্‌তে পেলেম না!" মন একটু নরম হলো।

প্রফুল্ল অতি অস্ফুটস্বরে বলিল, "আমি যাইব বলিয়া আসি নাই।"

গিন্নী। তা কি করিব মা—আমার কি অসাধ যে, তোমায় নিয়ে ঘর করি? লোকে পাঁচ কথা বলে—একঘরে কর্‌বে বলে, কাজেই তোমায় ত্যাগ কর্‌তে হয়েছে।

প্রফুল্ল। মা, একঘরে হবার ভয়ে কে কবে সন্তান ত্যাগ করেছে? আমি কি তোমার সন্তান নই?

শাশুড়ীর মন আরও নরম হলো। বলিলেন, "কি করব মা, জেতের ভয়।"

প্রফুল্ল পূর্ব্ববৎ অস্ফুটস্বরে বলিল, "হলেম যেন আমি অজাতি—কত শূদ্র তোমার ঘরে দাসীপনা করিতেছে—আমি তোমার ঘরে দাসীপনা করিতে দোষ কি?"

গিন্নী আর যুঝিতে পারিলেন না। বলিলেন, "তা মেয়েটি লক্ষ্মী, রূপেও বটে, কথায়ও বটে। তা যাই দেখি কর্ত্তার কাছে, তিনি কি বলেন। তুমি এখানে বসো মা, বসো।"

প্রফুল্ল তখন চাপিয়া বসিল। সেই সময়ে, একটি কপাটের আড়াল হইতে একটি চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকা—সেও সুন্দরী, মুখে আড়ঘোমটা—সে প্রফুল্লকে হাতছানি দিয়া ডাকিল। প্রফুল্ল ভাবিল, এ আবার কি? উঠিয়া বালিকার কাছে গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যখন গৃহিণী ঠাকুরাণী হেলিতে দুলিতে হাতের বাউটির খিল খুঁটিতে খুঁটিতে কর্ত্তা মহাশয়ের নিকেতনে সমুপস্থিতা, তখন কর্ত্তা মহাশয়ের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে; হাতে মুখে জল দেওয়া হইয়াছে—হাত মুখ মোছা হইতেছে। দেখিয়া, কর্ত্তার মনটা কাদা করিয়া ছানিয়া লইবার জন্য গৃহিণী ঠাকুরাণী বলিলেন, "কে ঘুম ভাঙ্গাইল? আমি এত ক'রে বারণ করি, তবু কেউ শোনে না।"

কর্ত্তা মহাশয় মনে মনে বলিলেন, "ঘুম ভাঙ্গাইবার আঁধি তুমি নিজে—আজ বুঝি কি দরকার আছে?" প্রকাশ্যে বলিলেন, "কেউ ঘুম ভাঙ্গায় নাই। বেশ ঘুমাইয়াছি—কথাটা কি?"

গিন্নী মুখখানা হাসি-ভরাভরা করিয়া বলিলেন, "আজ একটা কাণ্ড হয়েছে। তাই বল্‌তে এসেছি।"

এইরূপ ভূমিকা করিয়া এবং একটু একটু নথ ও বাউটি নাড়া দিয়া—কেন না, বয়স এখনও পঁয়তাল্লিশ বৎসর মাত্র—গৃহিণী, প্রফুল্ল ও তার মাতার আগমন

ও কথোপকথন বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বলিলেন। বধূর চাঁদপানা মুখ ও মিষ্ট কথাগুলি মনে করিয়া, প্রফুল্লের দিকে অনেক টানিয়া বলিলেন। কিন্তু মন্ত্র তন্ত্র কিছুই খাটিল না। কর্ত্তার মুখ বৈশাখের মেঘের মত অন্ধকার হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "এত বড় স্পর্দ্ধা! সেই বাগ্দী বেটী আমার বাড়ীতে ঢোকে? এখনই ঝাঁটা মেরে বিদায় কর।"

গিন্নী বলিলেন, "ছি! ছি! অমন কথা কি বল্‌তে আছে—হাজার হোক্ বেটার বউ—আর বাগ্দীর মেয়ে বা কিরূপে হলো? লোকে বল্‌লেই কি হয়?"

গিন্নী ঠাকুরণ হার কাত নিয়ে খেল্‌তে বসেছেন—কাজে কাজেই এই রকম বদ রঙ্গ চালাইতে লাগিলেন। কিছুতেই কিছু হইল না। "বাগ্দী বেটীকে ঝাঁটা মেরে বিদায় কর।" এই হুকুমই বহাল রহিল।

গিন্নী শেষে রাগ করিয়া বলিলেন, "ঝাঁটা মারিতে হয়, তুমি মার; আমি আর তোমার ঘরকন্নার কথায় থাকিব না।" এই বলিয়া গিন্নী রাগে গর্ গর্ করিয়া বাহিরে আসিলেন। যেখানে প্রফুল্লকে রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেইখানে আসিয়া দেখিলেন, প্রফুল্ল সেখানে নাই।

প্রফুল্ল কোথায় গিয়াছে, তাহা পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে। একখানা কপাটের আড়াল হইতে ঘোমটা দিয়ে একটি চৌদ্দ বছরের মেয়ে তাকে হাতছানি দিয়া ডাকিয়াছিল। প্রফুল্ল সেখানে গেল। প্রফুল্ল সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র বালিকা দ্বার রুদ্ধ করিল।

প্রফুল্ল বলিল, "দ্বার দিলে কেন?"

মেয়েটি বলিল, "কেউ না আসে। তোমার সঙ্গে দুটো কথা কব, তাই।"

প্রফুল্ল বলিল, "তোমার নাম কি ভাই?"

সে বলিল, "আমার নাম সাগর, ভাই।"

প্র। তুমি কে, ভাই?

সা। আমি, ভাই, তোমার সতীন।

প্র। তুমি আমায় চেন নাকি?

সা। এই যে আমি কপাটের আড়াল থেকে সব শুনিলাম।

প্র। তবে তুমিই ঘরণী গৃহিণী—

সা। দুর, তা কেন? পোড়া কপাল আর কি—আমি কেন সে হ'তে গেলেম? আমার কি তেমনই দাঁত উঁচু, না আমি তত কালো?

প্র। সে কি—কার দাঁত উঁচু?

সা। কেন? যে ঘরণী গৃহিণী।

প্র। সে আবার কে?

সা। জান না? তুমি কেমন ক'রেই বা জানবে? কখন ত এসো নি, আমাদের আর এক সতীন আছে জান না?

প্র। আমি ত আমি ছাড়া আর এক বিয়ের কথাই জানি—আমি মনে করিয়াছিলাম, সেই তুমি।

সা। না। সে সেই,—আমার ত তিন বছর হলো বিয়ে হয়েছে।

প্র। সে বুঝি বড় কুৎসিত?

সা। রূপ দেখে আমার কান্না পায়!

প্র। তাই বুঝি আবার তোমায় বিবাহ করেছে ?

সা। না, তা নয়। তোমাকে বলি, কারও সাক্ষাতে ব'লো না। (সাগর বড় চুপি চুপি কথা কহিতে লাগিল) আমার বাপের ঢের টাকা আছে। আমি বাপের এক সন্তান। তাই সেই টাকার জন্য—

প্র। বুঝেছি, আর বলিতে হবে না। তা তুমি সুন্দরী। যে কুৎসিত, সে ঘরণী গৃহিণী হলো কিসে?

সা। আমি বাপের একটি সন্তান, আমাকে পাঠায় না; আর আমার বাপের সঙ্গে আমার শ্বশুরের সঙ্গে বড় বনে না। তাই আমি এখানে কখন থাকি না। কাজে কর্ম্মে কখন আনে। এই দুই চারি দিন এসেছি, আবার শীঘ্র যাব।

প্রফুল্ল দেখিল যে, সাগর দিব্য মেয়ে—সতীন বলিয়া ইহার উপর রাগ হয় না। প্রফুল্ল বলিল, "আমায় ডাক্‌লে কেন?"

সা। তুমি কিছু খাবে?

প্রফুল্ল হাসিল, বলিল, "কেন, এখন খাব কেন?"

সা। তোমার মুখ শুক্‌নো, তুমি অনেক পথ এসেছ, তোমার তৃষ্ণা পেয়েছে। কেউ তোমায় কিছু খেতে বল্‌লেন না। তাই তোমাকে ডেকেছি।

প্রফুল্ল তখনও পর্য্যন্ত কিছু খায় নাই। পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। কিন্তু উত্তর করিল, "শাশুড়ী গেছেন শ্বশুরের কাছে মন বুঝ্‌তে। আমার অদৃষ্টে কি হয়, তা না জেনে আমি এখানে কিছু খাব না। ঝাঁটা খেতে হয় ত তাই খাব, আর কিছু খাব না।"

সা। না না, এদের কিছু তোমার খেয়ে কাজ নাই। আমার বাপের বাড়ীর সন্দেশ আছে—বেশ সন্দেশ!

এই বলিয়া সাগর কতকগুলা সন্দেশ আনিয়া প্রফুল্লের মুখে গুঁজিয়া দিতে লাগিল। অগত্যা প্রফুল্ল কিছু খাইল। সাগর শীতল জল দিল, পান করিয়া প্রফুল্ল শরীর স্নিগ্ধ করিল। তখন প্রফুল্ল বলিল, "আমি শীতল হইলাম, কিন্তু আমার মা না খাইয়া মরিয়া যাইবে।"

সা। তোমার মা কোথায় গেলেন?

প্র। কি জানি? বোধ হয়, পথে দাঁড়াইয়া আছেন।

সা। এক কাজ কর্‌ব?

প্র। কি?

সা। ব্রহ্ম ঠানদিদিকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেব?

প্র। তিনি কে?

সা। ঠাকুরের সম্পর্কে পিসী—এই সংসারে থাকেন।

প্র। তিনি কি কর্‌বেন?

সা। তোমার মাকে খাওয়াবেন দাওয়াবেন।

প্র। মা এ বাড়ীতে কিছু খাবেন না।

সা। দুর! তাই কি বল্‌ছি? কোন বামুন-বাড়ীতে।

প্র। যা হয় কর, মার কষ্ট আর সহ্য হয় না।

সাগর চকিতের মত ব্রহ্মঠাকুরাণীর কাছে যাইয়া সব বুঝাইয়া বলিল। ব্রহ্মঠাকুরাণী বলিল, “মা, তাই ত! গৃহস্থবাড়ী উপবাসী থাকিবেন! অকল্যাণ হবে যে।” ব্রহ্ম প্রফুল্লের মার সন্ধানে বাহির হইল। সাগর ফিরিয়া আসিয়া প্রফুল্লকে সংবাদ দিল। প্রফুল্ল বলিল, “এখন ভাই, যে গল্প করিতেছিলে, সেই গল্প কর।”

সা। গল্প আর কি? আমি ত এখানে থাকি না—থাক্‌তে পাবও না। আমার অদৃষ্ট মাটির আঁবের মত—তাকে তোলা থাক্‌ব, দেবতার ভোগে কখন লাগিব না। তা, তুমি এয়েচ, যেমন করে পার, থাক। আমরা কেউ সেই কালপেঁচাটাকে দেখিতে পারি না।

প্র। থাক্‌ব বলেই ত এসেছি। থাকতে পেলে ত হয়।

সা। তা দেখ, শ্বশুরের যদি মত না হয়, তবে এখনই চলে যেও না।

প্র। না গিয়া কি করিব? আর কি জন্য থাকিব? থাকি, যদি—

সা। যদি কি?

প্র। যদি তুমি আমার জন্ম সার্থক করাইতে পার।

সা। সে কিসে হবে ভাই?

প্রফুল্ল ঈষৎ হাসিল। তখনই হাসি নিবিয়া গেল, চক্ষে জল পড়িল। বলিল, “বুঝ নাই ভাই?”

সাগর তখন বুঝিল। একটু ভাবিয়া, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “তুমি সন্ধ্যার পর এই ঘরে আসিয়া বসিয়া থাকিও। দিনের বেলা ত আর দেখা হবে না।”

পাঠক স্মরণ রাখিবেন, আমরা এখনকার লজ্জাহীনা নব্যাদিগের কথা লিখিতেছি না। আমাদের গল্পের তারিখ এক শত বৎসর পূর্ব্বে। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেও যুবতীরা কখন দিনমানে স্বামীদর্শন পাইতেন না।

প্রফুল্ল বলিল, “কপালে কি হয় তাহা আগে জানিয়া আসি। তার পর তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব। কপালে যাই থাকে, একবার স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া যাইব। তিনি কি বলেন, শুনিয়া যাইব।”

এই বলিয়া প্রফুল্ল বাহিরে আসিল। দেখিল, তাহার শাশুড়ী তাহার তল্লাস করিতেছেন। প্রফুল্লকে দেখিয়া গিন্নী বলিলেন, “কোথা ছিলে মা?”

প্র। বাড়ী-ঘর দেখিতেছিলাম।

গিন্নী। আহা! তোমারই বাড়ী-ঘর—বাছা—তা কি কর্‌ব? তোমার শ্বশুর কিছুতেই মত করেন না।

প্রফুল্লের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। কাঁদিল না—চুপ করিয়া রহিল। শাশুড়ীর বড় দয়া হইল। গিন্নী মনে মনে কল্পনা করিলেন—আর একবার নথনাড়া দিয়া দেখিব। কিন্তু সে কথা প্রকাশ করিলেন না—কেবল বলিলেন, “আজ আর কোথায় যাইবে? আজ এইখানে থাক। কাল সকালে যেও।”

প্রফুল্ল মাথা তুলিয়া বলিল, “তা থাকিব—একটা কথা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিও। আমার মা চরকা কাটিয়া খায়, তাহাতে একজন মানুষের এক বেলা আহার কুলায় না। জিজ্ঞাসা করিও—আমি কি করিয়া খাইব? আমি বাগ্দীই হই—মুচিই হই—তাঁহার পুত্রবধূ। তাহার পুত্রবধূ কি করিয়া দিনপাত করিবে?”

শাশুড়ী বলিল, “অবশ্য বলিব।” তার পর প্রফুল্ল উঠিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পর সেই ঘরে সাগর ও প্রফুল্ল, দুইজনে দ্বার রুদ্ধ করিয়া চুপি চুপি কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, এমন সময়ে কে আসিয়া কপাটে ঘা দিল। সাগর জিজ্ঞাসা করিল, "কে গো?"

"আমি গো।"

সাগর প্রফুল্লের গা টিপিয়া চুপি চুপি বলিল,"কথা ক'স্‌নে; সেই কালপেঁচাটা এসেছে।"

প্র। সতীন?

সা। হ্যাঁ—চুপ!

যে আসিয়াছিল, সে বলিল, "কে গা ঘরে, কথা ক'স্‌নে কেন? যেন সাগর বোয়ের গলা শুনলাম না?"

সা। তুমি কে গা—যেন নাপিত বোয়ের গলা শুনিলাম না?

"আঃ মরণ আর কি! আমি কি নাপিত বোয়ের মতন?"

সা। কে তবে তুমি?

"তোর সতীন! সতীন! সতীন! নাম নয়ান বৌ।"

(বউটির নাম—নয়নতারা—লোকে তাহাকে "নয়ান বৌ" বলিত—সাগরকে "সাগর বৌ" বলিত।)

সাগর তখন কৃত্রিম ব্যস্ততার সহিত বলিল, "কে! দিদি! বালাই, তুমি কেন নাপিত বৌয়ের মতন হতে যাবে? সে যে একটু ফরসা।"

নয়ন। মরণ আর কি—আমি কি তার চেয়েও কালো? তা সতীন এমনই বটে—তবু যদি চৌদ্দ বছরের না হতিস্‌!

সা। তা চৌদ্দ বছর হলো ত কি হলো—তুমি সতের—তোমার চেয়ে আমার রূপও আছে, যৌবনও আছে।

ন। রূপ যৌবন নিয়ে বাপের বাড়ীতে বসে বসে ধুয়ে খাস্‌। আমার যেমন মরণ নাই, তাই তোর কাছে কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে এলেম।

সা। কি কথা, দিদি?

ন। তুই দোরই খুল্‌লি নে, তার কথা কব কি? সন্ধ্যে রাত্রে দোর দিয়েছিস্‌ কেন লা?

সা। আমি ভাই লুকিয়ে দুটো সন্দেশ খাচ্চি। তুমি কি খাও না?

ন। তা খা খা। (নয়ন নিজে সন্দেশ বড় ভালবাসিত) বলি, জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম কি, আবার একজন এয়েছে না কি?

সা। আবার একজন কি? স্বামী?

ন। মরণ আর কি! তাও কি হয়?

সা। হ'লে ভাল হতো—দুই জনে ভাগ করিয়া নিতাম। তোমার ভাগে নূতনটা দিতাম।

ন। ছি! ছি! ও সব কথা কি মুখে আনে?

সা। মনে?

ন। তুই আমায় যা ইচ্ছা তাই বলিবি কেন?

সা। তা ভাই, কি জিজ্ঞাসা কর্‌বে, না বুঝাইয়া বলিলে, কেমন করিয়া উত্তর দিই?

ন। বলি, গিন্নীর না কি আর একটি বউ এয়েছে?

সা। কে বউ?

ন। সেই মুচি বউ।

সা। মুচি? কই, শুনি নে ত।

ন। মুচি, না হয় বাগ্দী?

সা। তাও শুনি নে।

ন। শোন নি—আমাদের একজন বাগ্দী সতীন আছে।

সা। কই? না।

ন। তুই বড় দুষ্ট। সেই যে, প্রথম যে বিয়ে।

সা। সে ত বামনের মেয়ে।

ন। হ্যাঁ, বামনের মেয়ে! তা হলে আর নিয়ে ঘর করে না?

সা। কাল যদি তোমায় বিদায় দিয়ে, আমায় নিয়ে ঘর করে, তুমি কি বাগ্দীর মেয়ে হবে?

ন। তুই আমায় গাল দিবি কেন লা, পোড়ারমুখী?

সা। তুই আর এক জনকে গাল দিচ্ছিস্ কেন্ লা, পোড়ারমুখী?

ন। মর্‌গে যা—আমি ঠাকুরুণকে গিয়া বলিয়া দিই, তুই বড় মানুষের মেয়ে ব'লে আমায় যা ইচ্ছে তাই বলিস্।

এই বলিয়া নয়নতারা ওরফে কালপেঁচা ঝমর ঝমর করিয়া ফিরিয়া যায়—তখন সাগর দেখিল প্রমাদ! ডাকিল, "না, দিদি, ফের ফের। ঘাট হয়েছে, দিদি, ফের! এই দোর খুলিতেছি।"

নয়নতারা রাগিয়াছিল—ফিরিবার বড় মত ছিল না। কিন্তু ঘরের ভিতর দ্বার দিয়া সাগর কত সন্দেশ খাইতেছে, ইহা দেখিবার একটু ইচ্ছা ছিল, তাই ফিরিল। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিল—সন্দেশ নহে—আর একজন লোক আছে। জিজ্ঞাসা করিল, "এ আবার কে?"

সা। প্রফুল্ল।

ন। সে আবার কে?

সা। মুচি বৌ।

ন। এই সুন্দর?

সা। তোমার চেয়ে নয়।

ন। নে, আর জ্বালাস্ নে। তোর চেয়ে ত নয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এদিকে কর্ত্তা মহাশয় এক প্রহর রাত্রে গৃহমধ্যে ভোজনার্থ আসিলেন। গৃহিণী ব্যজনহস্তে ভোজন-পাত্রের নিকট শোভমানা—ভাতে মাছি নাই—তবু নারীধর্ম্মের পালনার্থ মাছি তাড়াইতে হইবে। হায়! কোন্ পাপিষ্ঠ নরাধমেরা এ পরম রমণীয় ধর্ম্ম লোপ করিতেছে? গৃহিণীর পাঁচ জন দাসী আছে—কিন্তু স্বামিসেবা—আর কার সাধ্য করিতে আসে? যে পাপিষ্ঠেরা এ ধর্ম্মের লোপ করিতেছে, হে আকাশ! তাহাদের মাথার জন্য কি তোমার বজ্র নাই?

কর্ত্তা আহার করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাগ্দী বেটী গিয়াছে কি?"

গৃহিণী মাছি তাড়াইয়া নথ নাড়িয়া বলিলেন, "রাত্রে আবার সে কোথা যাবে? রাত্রে একটা অতিথ এলে তুমি তাড়াও না—আর আমি বৌটাকে রাত্রে তাড়িয়ে দেব?"

কর্ত্তা। অতিথ হয়, অতিথশালায় যাক না? এখানে কেন?

গিন্নী। আমি তাড়াতে পার্ব না, আমি ত বলেছি। তাড়াতে হয়, তুমি তাড়াও। বড় সুন্দর বৌ কিন্তু—

কর্ত্তা। বাগ্দীর ঘরে অমন দুটো একটা সুন্দর হয়। তা আমি তাড়াচ্চি। ব্রজকে ডাক্ ত রে।

ব্রজ, কর্ত্তার ছেলের নাম। একজন চাকরাণী ব্রজেশ্বরকে ডাকিয়া আনিল। ব্রজেশ্বরের বয়স একুশ বাইশ; অনিন্দ্যসুন্দর পুরুষ,—পিতার কাছে বিনীতভাবে আসিয়া দাঁড়াইল—কথা কহিতে সাহস নাই।

দেখিয়া হরবল্লভ বলিলেন, "বাপু, তোমার তিন সংসার মনে আছে?"

ব্রজ চুপ করিয়া রহিল।

"প্রথম বিবাহ মনে হয়—সে একটা বাগ্দীর মেয়ে?"

ব্রজ নীরব—বাপের সাক্ষাতে বাইশ বছরের ছেলে—হীরার ধার হইলেও সে কালে কথা কহিত না—এখন যত বড় মূর্খ ছেলে, তত বড় লম্বা স্পীচ্ ঝাড়ে।

কর্ত্তা বলিতে লাগিলেন, "সে বাগ্দী বেটী—আজ এখানে এসেছে—জোর করে থাক্‌বে, তা তোমার গর্ভধারিণীকে বল্‌লেম যে, ঝাঁটা মেরে তাড়াও। মেয়েমানুষ মেয়েমানুষের গায়ে হাত কি দিতে পারে? এ তোমার কাজ। তোমারই অধিকার—আর কেহ স্পর্শ করিতে পারে না। তুমি আজ রাত্রে তাকে ঝাঁটা মেরে তাড়াইয়া দিবে। নহিলে আমার ঘুম হইবে না।"

গিন্নী বলিলেন, "ছি! বাবা, মেয়েমানুষের গায়ে হাত তুল না। ও'র কথা রাখিতেই হইবে, আমার কথা কিছু চল্‌বে না? তা যা কর, ভাল কথায় বিদায় করিও।"

ব্রজ বাপের কথায় উত্তর দিল, "যে আজ্ঞা।" মার কথায় উত্তর দিল, "ভাল।"

এই বলিয়া ব্রজেশ্বর একটু দাঁড়াইল। সেই অবকাশে গৃহিণী কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যে বৌকে তাড়াবে—বৌ খাবে কি করিয়া?"

কর্ত্তা বলিলেন, "যা খুসি করুক—চুরি করুক, ডাকাতি করুক—ভিক্ষা করুক।"

গৃহিণী ব্রজেশ্বরকে বলিয়া দিলেন, "তাড়াইবার সময়ে বৌমাকে এই কথা বলিও। সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল।"

ব্রজেশ্বর পিতার নিকট হইতে বিদায় হইয়া ব্রহ্মঠাকুরাণীর নিকুঞ্জে গিয়া দর্শন দিলেন। দেখিলেন, ব্রহ্মঠাকুরাণী তদগতচিত্তে মালা জপ করিতেছেন, আর

মশা তাড়াইতেছেন। ব্রজেশ্বর বলিলেন, "ঠাকুরমা।"

ব্রহ্ম। কেন, ভাই?

ব্রজ। আজ না কি নূতন খবর?

ব্রহ্ম। কি নূতন? সাগর আমার চরকাটা ভেঙ্গে দিয়েছে তাই? তা ছেলেমানুষ, দিয়েছে দিয়েছে। চরকা কাট্‌তে তার সাধ গিয়েছিল—

ব্রজ। তা নয় তা নয়—বলি আজ না কি—

ব্রহ্ম। সাগরকে কিছু বলিও না। তোমরা বেঁচে থাক, আমার কত চরকা হবে। তবে বুড়ো মানুষ—

ব্রজ। বলি আমার কথাটা শুন্‌বে?

ব্রহ্ম। বুড়ো মানুষ, কবে আছি কবে নাই, দুটো পৈতে তুলে বামুনকে দিই বই ত নয়। তা যাক্ গে—

ব্রজ। আমার কথাটা শোন, নইলে তোমার যত চরকা হবে, সব আমিই ভেঙ্গে দেব।

ব্রহ্ম। কি বলেছ? চরকার কথা নয়?

ব্রজ। তা নয়—আমার দুইটি ব্রাহ্মণী আছে জান ত?

ব্রহ্ম। ব্রাহ্মণী? মা মা মা! যেমন ব্রাহ্মণী নয়ান বৌ, তেমনি ব্রাহ্মণী সাগর বৌ—আমার হাড়টা খেলে—কেবল রূপকথা বল—রূপকথা বল—রূপকথা বল! ভাই, এত রূপকথা পাব কোথা?

ব্রজ। রূপকথা থাক—

ব্রহ্ম। তুমি যেন বললে থাক্, তারা ছাড়ে কই? শেষে সেই বিহঙ্গমা বিহঙ্গমীর কথা বলিলাম। বিহঙ্গমা বিহঙ্গমীর কথা জান? বলি শোন। এক বনে বড় একটা শিমূলগাছে এক বিহঙ্গমা বিহঙ্গমী থাকে—

ব্রজ। সর্ব্বনাশ! ঠাকুরমা, কর কি? এখন রূপকথা! আমার কথা শোন।

ব্রহ্ম। তোমার আবার কথা কি? আমি বলি, রূপকথা শুনিতেই এয়েছ—তোমাদের ত আর কাজ নাই?

ব্রজেশ্বর মনে মনে ভাবিল,"কবে বুড়ীদের প্রাপ্তি হবে।" প্রকাশ্যে বলিল, "আমার দুইটি ব্রাহ্মণী—আর একটি বাগ্‌দিনী। বাগ্‌দিনীটি না কি আজ এয়েছে?"

ব্রহ্ম। বালাই বালাই—বাগ্‌দিনী কেন? সে বামনের মেয়ে।

ব্রজ। এয়েছে?

ব্রহ্ম। হাঁ।

ব্রজ। কোথায়? একবার দেখা হয় না?

ব্রহ্ম। হাঁ। আমি দেখা করিয়ে দিয়ে তোমার বাপ-মার দু'চক্ষের বিষ হই! তার চেয়ে বিহঙ্গমা বিহঙ্গমীর কথা শোন।

ব্রজ। ভয় নাই—বাপ-মা আমাকে ডাকাইয়া বলিয়াছেন—তাকে তাড়াইয়া দাও। তা দেখা না পেলে, তাড়াইয়া দিব কি প্রকারে? তুমি ঠাকুরমা, তোমার কাছে সন্ধানের জন্য আসিয়াছি।

ব্রহ্ম। ভাই, আমি বুড়ো মানুষ—কৃষ্ণনাম জপ করি, আর আলো চাল খাই। রূপকথা শোন ত বল্‌তে পারি। বাগ্দীর কথাতেও নাই, বামনীর কথাতেও

নাই।

ব্রজ। হায়! বুড়ো বয়সে কবে তুমি ডাকাতের হাতে পড়িবে!

ব্রহ্ম। অমন কথা বলিস্ নে,—বড় ডাকাতের ভয়! কি, দেখা কর্‌বি?

ব্রজ। তা নহিলে কি তোমার মালাজপা দেখ্‌তে এসেছি?

ব্রহ্ম। সাগর বৌয়ের কাছে যা।

ব্রজ। সতীনে কি সতীনকে দেখায়?

ব্রহ্ম। তুই যা না। সাগর তোকে ডেকেছে, ঘরে গিয়ে বসে আছে। অমন মেয়ে আর হয় না।

ব্রজ। চরকা ভেঙ্গেছে ব'লে? নয়ানকে বলে দেব—সে যেন একটা চরকা ভেঙ্গে দেয়।

ব্রহ্ম। হাঁ—সাগরে, আর নয়ানে! যা যা!

ব্রজ। গেলে বাগ্‌দিনী দেখতে পাব?

ব্রহ্ম। বুড়ীর কথাটাই শোন্ না; কি জ্বালাতেই পড়লেম গা? আমার মালা জপা হলো না। তোর ঠাকুরদাদার তেষট্টিটা বিয়ে ছিল—কিন্তু চৌদ্দ বছরই হোক্—আর চুয়াত্তর বছরই হোক্—কই, কেউ ডাকলে ত কখন “না” বলিত না।

ব্রজ। ঠাকুরদাদার অক্ষয় স্বর্গ হৌক্—আমি চৌদ্দ বছরের সন্ধানে চলিলাম। ফিরিয়া আসিয়া চুয়াত্তর বছরের সন্ধান লইব কি?

ব্রহ্ম। যা যা যা! আমার মালা জপা ঘুরে গেল। আমি নয়নতারাকে বলে দিব, তুই বড় চেঙ্গড়া হয়েছিস্।

ব্রজ। ব'লে দিও। খুসী হ'য়ে দুটো ছোলা ভাজা পাঠিয়ে দেবে।

এই বলিয়া ব্রজেশ্বর সাগরের সন্ধানে প্রস্থান করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সাগর শ্বশুরবাড়ী আসিয়া দুইটি ঘর পাইয়াছিল, একটি নীচে, একটি উপরে।

নীচের ঘরে বসিয়া সাগর পান সাজিত, সমবয়স্কদিগের সঙ্গে খেলা করিত, কি গল্প করিত। উপরের ঘরে রাত্রে শুইত; দিনমানে নিদ্রা আসিলে সেই ঘরে গিয়া দ্বার দিত। অতএব ব্রজেশ্বর ব্রহ্মঠাকুরাণীর উপকথার জ্বালা এড়াইয়া সেই উপরের ঘরে গেলেন।

সেখানে সাগর নাই—কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে আর একজন কে আছে। অনুভবে বুঝিলেন, এই সেই প্রথমা স্ত্রী।

বড় গোল বাধিল। দুইজনে সম্বন্ধ বড় নিকট—স্ত্রী পুরুষ—পরস্পরের অর্দ্ধাঙ্গ, পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কিন্তু কখনও দেখা নাই। কখনও কথা নাই। কি বলিয়া কথা আরম্ভ হইবে? কে আগে কথা কহিবে? বিশেষ একজন তাড়াইতে আসিয়াছে, আর একজন তাড়া খাইতে আসিয়াছে। আমরা প্রাচীনা পাঠিকাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, কথাটা কি রকমে আরম্ভ হওয়া উচিত ছিল?

উচিত যাই হউক—উচিতমত কিছুই হইল না। প্রথম দুইজনের একজনও অনেকক্ষণ কথা কহিল না। শেষে প্রফুল্ল অল্প, অল্পমাত্র হাসিয়া, গলায় কাপড়

দিয়া ব্রজেশ্বরের পায়ের গোড়ায় আসিয়া ঢিপ করিয়া এক প্রণাম করিল।

ব্রজেশ্বর বাপের মত নহে। প্রণাম গ্রহণ করিয়া অপ্রতিভ হইয়া বাহু ধরিয়া প্রফুল্লকে উঠাইয়া পালঙ্কে বসাইল। বসাইয়া আপনি কাছে বসিল।

প্রফুল্লের মুখে একটু ঘোমটা ছিল—সে কালের মেয়েরা এ কালের মেয়েদের মত নহে—ধিক্ এ কাল! তা সে ঘোমটাটুকু, প্রফুল্লকে ধরিয়া বসাইবার সময়ে সরিয়া গেল। ব্রজেশ্বর দেখিল যে, প্রফুল্ল কাঁদিতেছে। ব্রজেশ্বর না বুঝিয়া সুঝিয়া—আ ছি! ছি! ছি! বাইশ বছর বয়সেই ধিক্! ব্রজেশ্বর না বুঝিয়া সুঝিয়া, না ভাবিয়া চিন্তিয়া, যেখানে বড় ডব্‌ডবে চোখের নীচে দিয়া এক ফোঁটা জল গড়াইয়া আসিতেছিল—সেই স্থানে আ! ছি! ছি!—ব্রজেশ্বর হঠাৎ চুম্বন করিলেন। গ্রন্থকার প্রাচীন—লিখিতে লজ্জা নাই—কিন্তু ভরসা করি, মার্জ্জিতরুচি নবীন পাঠক এইখানে এ বই পড়া বন্ধ করিবেন।

যখন ব্রজেশ্বর এই ঘোরতর অশ্লীলতা-দোষে নিজে দূষিত হইতেছিলেন, এবং গ্রন্থকারকে সেই দোষে দূষিত করিবার কারণ হইতেছিলেন—যখন নির্ব্বোধ প্রফুল্ল মনে মনে ভাবিতেছিল যে, বুঝি এই মুখচুম্বনের মত পবিত্র পুণ্যময় কর্ম্ম ইহজগতে কখনও কেহ করে নাই, সেই সময়ে দ্বারে কে মুখ বাড়াইল। মুখখানা বুঝি অল্প একটু হাসিয়াছিল—কি যার মুখ, তার হাতের গহনার বুঝি একটু শব্দ হইয়াছিল—তাই ব্রজেশ্বরের কান সে দিকে গেল। ব্রজেশ্বর সে দিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, মুখখানা বড় সুন্দর। কালো কুচকুচে কোঁকড়া কোঁক্‌ড়া ঝাপটায় বেড়া—তখন মেয়েরা ঝাপটা রাখিত—তার পর একটু ঘোমটা টানা—ঘোমটার ভিতর দুইটা পদ্ম—পলাশ চক্ষু ও দুইখানা পাতলা রাঙ্গা ঠোঁট মিঠে মিঠে হাসিতেছে। ব্রজেশ্বর দেখিলেন, মুখখানা সাগরের। সাগর, স্বামীকে একটা চাবি ও কুলুপ দেখাইল। সাগর ছেলেমানুষ, স্বামীর সঙ্গে জিয়াদা কথা কয় না। ব্রজ কিছু বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু বুঝিতে বড় বিলম্বও হইল না। সাগর বাহির হইতে কপাট টানিয়া দিল, শিকল লাগাইয়া, কুলুপের চাবি ফিরাইয়া বন্ধ করিয়া দুড়ু দুড়ু করিয়া ছুটিয়া পলাইল। ব্রজেশ্বর, কুলুপ পড়িল শুনিতে পাইয়া, "কি কর, সাগর! কি কর, সাগর!" বলিয়া চেঁচাইল। সাগর কিছুতেই কান না দিয়া দুড়ু দুড়ু ঝম্ ঝম্ করিয়া ছুটিয়া একেবারে ব্রহ্মঠাকুরাণীর বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

ব্রহ্মঠাকুরাণী বলিলেন, "কি লা সাগর বৌ? কি হয়েছে? এখানে এসে শুলি যে?"

সাগর কথা কয় না।

ব্রহ্ম। তোকে ব্রজ তাড়িয়ে দিয়েছে না কি?

সা। তা নইলে আর তোমার আশ্রমে আসি? আজ তোমার কাছে শোব।

ব্রহ্ম। তা শো শো! এখনই আবার ডাক্‌বে এখন! আহা! তোর ঠাকুরদাদা এমন বার মাস ত্রিশ দিন আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে। আবার তখনই ডেকেছে—আমি আরও রাগ করে যেতাম না—তা মেয়েমানুষের প্রাণ ভাই! থাকতেও পারিতাম না। এক দিন হলো কি—

সা। ঠান্‌দিদি, একটা রূপকথা বল না।

ব্র। কোন্‌টা বল্‌বো, বিহঙ্গম বিহঙ্গমীর কথা বল্‌বো? একলা শুন্‌বি, তা নূতন বৌটা কোথায়? তাকে ডাক্ না—দুজনে শুন্‌বি।

সা। সে কোথা, আমি এখন খুঁজিতে পারি না। আমি একাই শুন্‌বো। তুমি বল।

ব্রহ্মঠাকুরাণী তখন সাগরের কাছে শুইয়া বিহঙ্গমের গল্প আরম্ভ করিলেন। সাগর তাহার আরম্ভ হইতে না হইতেই ঘুমাইয়া পড়িল। ব্রহ্মঠাকুরাণী সে সংবাদ অনবগত, দুই চারি দণ্ড গল্প চালাইলেন; পরে যখন জানিতে পারিলেন, শ্রোত্রী নিদ্রামগ্ন, তখন দুঃখিতচিত্তে মাঝখানেই গল্প সমাপ্ত করিলেন।

পরদিন প্রভাত হইতে না হইতেই সাগর আসিয়া ঘরের কুলুপ খুলিয়া দিয়া গেল। তারপর কাহাকে কিছু না বলিয়া ব্রহ্মঠাকুরাণীর ভাঙ্গা চরকা লইয়া, সেই

নিদ্রামগ্না বর্ষীয়সীর কানের কাছে ঘেনর ঘেনর করিতে লাগিল।

"কটাশ—ঝনাৎ" করিয়া কুলুপ শিকল খোলার শব্দ হইল—প্রফুল্ল ও ব্রজেশ্বর তাহা শুনিল। প্রফুল্ল বসিয়াছিল—উঠিয়া দাঁড়াইল,—বলিল, সাগর শিকল খুলিয়াছে, আমি চলিলাম। স্ত্রী বলিয়া স্বীকার কর না কর, দাসী বলিয়া মনে রাখিও।"

ব্র। এখন যাইও না। আমি একবার কর্ত্তাকে বলিয়া দেখিব।

প্র। বলিলে কি তাঁর মন ফিরিবে?

ব্র। না ফিরুক, আমার কাজ আমায় করিতে হইবে। অকারণে তোমায় ত্যাগ করিয়া, আমি কি অধর্ম্মে পতিত হইব?

প্র। তুমি আমায় ত্যাগ কর নাই—গ্রহণ করিয়াছ। আমাকে একদিনের জন্য শয্যার পাশে ঠাঁই দিয়াছ—আমার সেই ঢের। তোমার কাছে ভিক্ষা করিতেছি, আমার মত দুঃখিনীর জন্য বাপের সঙ্গে তুমি বিবাদ করিও না। তাতে আমি সুখী হইব না।

ব্র। নিতান্ত পক্ষে, তিনি যাহাতে তোমার খোরপোশ পাঠাইয়া দেন, তা আমায় করিতে হইবে।

প্র। তিনি আমায় ত্যাগ করিয়াছেন, আমি তাঁর কাছে ভিক্ষা লইব না। তোমার নিজের যদি কিছু থাকে, তবে তোমার কাছে ভিক্ষা লইব।

ব্র। আমার কিছুই নাই, কেবল আমার এই আঙ্গটিটি আছে। এখন এইটি লইয়া যাও। আপাততঃ ইহার মূল্যে কতক দুঃখ নিবারণ হইবে। তার পর যাহাতে আমি দুই পয়সা রোজগার করিতে পারি, সেই চেষ্টা করিব। যেমন করিয়া পারি, আমি তোমার ভরণ-পোষণ করিব।

এই বলিয়া ব্রজেশ্বর আপনার অঙ্গুলি হইতে বহুমূল্য হীরকাঙ্গুরীয় উন্মোচন করিয়া প্রফুল্লকে দিল। প্রফুল্ল আপনার আঙ্গুলে আঙ্গটিটি পরাইতে পরাইতে বলিল, "যদি তুমি আমাকে ভুলিয়া যাও?"

ব্র। সকলকে ভুলিব—তোমায় কখনও ভুলিব না।

প্র। যদি এর পর চিনিতে না পার?

ব্র। ও মুখ কখনও ভুলিব না।

প্র। আমি এ আঙ্গটিটি বেচিব না। না খাইয়া মরিয়া যাইব, তবু কখন বেচিব না। যখন তুমি আমাকে না চিনিতে পারিবে, তখন তোমাকে এই আঙ্গটি দেখাইব। ইহাতে কি লেখা আছে?

ব্র। আমার নাম খোদা আছে।

দুই জনে অশ্রুজলে নিষিক্ত হইয়া পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল।

প্রফুল্ল নীচে আসিলে সাগর ও নয়ানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। পোড়ারমুখী নয়ান বলিল, "দিদি কাল রাত্রে কোথায় শুইয়াছিলি?"

প্র। ভাই, কেহ তীর্থ করিলে সে কথা আপনার মুখে বলে না।

ন। সে আবার কি?

সাগর। বুঝতে পারিস্ নে? কাল উনি আমাকে তাড়াইয়া আমার পালঙ্কে বিষ্ণুর লক্ষ্মী হইয়াছিলেন। মিন্সে আবার সোহাগ ক'রে আঙ্গটি দিয়েছে।

সাগর নয়ানকে প্রফুল্লের হাতে ব্রজেশ্বরের আঙ্গটি দেখাইল। দেখিয়া নয়নতারা হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া গেল। বলিল, "দিদি, ঠাকুর তোমার কথার কি উত্তর দিয়াছেন, শুনেছ?"

প্রফুল্লের সে কথা আর মনে ছিল না, সে ব্রজেশ্বরের আদর পাইয়াছিল। প্রফুল্ল জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথার উত্তর?"

ন। তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, কি করিয়া খাইবে?

প্র। তার আর উত্তর কি?

ন। ঠাকুর বলিয়াছেন, চুরি-ডাকাতি করিয়া খাইতে বলিও।

"দেখা যাবে," বলিয়া প্রফুল্ল বিদায় হইল।

প্রফুল্ল আর কাহারও সঙ্গে কথা কহিল না। একেবারে বাহিরে খিড়কিদ্বার পার হইল। সাগর পিছু পিছু গেল। প্রফুল্ল তাহাকে বলিল, "আমি ভাই, আজ চলিলাম। এ বাড়ীতে আর আসিব না। তুমি বাপের বাড়ী গেলে, সেখানে তোমার সঙ্গে দেখা হইবে।"

সা। তুমি আমার বাপের বাড়ী চেন?

প্র। না চিনি, চিনিয়া যাইব।

সা। তুমি আমার বাপের বাড়ী যাবে?

প্র। আমার আর লজ্জা কি?

সা। তোমার মা তোমার সঙ্গে দেখা করিবেন বলিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

বাগানের দ্বারের কাছে যথার্থ প্রফুল্লের মা দাঁড়াইয়া ছিল। সাগর দেখাইয়া দিল। প্রফুল্ল মার কাছে গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রফুল্ল ও প্রফুল্লের মা বাড়ী আসিল। প্রফুল্লের মার যাতায়াতে বড় শারীরিক কষ্ট গিয়াছে—মানসিক কষ্ট ততোধিক। সকল সময় সব সয় না। ফিরিয়া আসিয়া প্রফুল্লের মা জ্বরে পড়িল। প্রথমে জ্বর অল্প, কিন্তু বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে, বামনের ঘরের মেয়ে—তাতে বিধবা, প্রফুল্লের মা জ্বরকে জ্বর বলিয়া মানিল না। তারই উপর দুবেলা স্নান, জুটিলে আহার, পূর্ব্বমত চলিল। প্রতিবাসীরা দয়া করিয়া কখনও কিছু দিত, তাইতে আহার চলিত। ক্রমে জ্বর অতিশয় বৃদ্ধি পাইল—শেষে প্রফুল্লের মা শয্যাগত হইল। সে কালে সেই সকল গ্রাম্য প্রদেশে চিকিৎসাপত্র বড় ছিল না—বিধবারা প্রায়ই ঔষধ খাইত না—বিশেষ প্রফুল্লের এমন লোক নাই যে, কবিরাজ ডাকে। কবিরাজও দেশে না থাকারই মধ্যে। জ্বর বাড়িল—বিকার প্রাপ্ত হইল, শেষে প্রফুল্লের মা সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হইলেন।

পাড়ার পাঁচজন, যাহারা তাহার অমূলক কলঙ্ক রটাইয়াছিল, তাহারাই আসিয়া প্রফুল্লের মার সৎকার করিল। বাঙ্গালীরা এ সময় শত্রুতা রাখে না। বাঙ্গালী জাতির সে গুণ আছে।

প্রফুল্ল একা। পাড়ার পাঁচজন আসিয়া বলিল, "তোমাকে চতুর্থের শ্রাদ্ধ করিতে হইবে।" প্রফুল্ল বলিল, "ইচ্ছা, পিণ্ডদান করি—কিন্তু কোথায় কি পাইব?" পাড়ার পাঁচজন বলিল, "তোমায় কিছু করিতে হইবে না—আমরা সব করিয়া লইতেছি।" কেহ কিছু নগদ দিল, কেহ কিছু সামগ্রী দিল, এইরূপ করিয়া শ্রাদ্ধ ও ব্রাহ্মণ-ভোজনের উদ্যোগ হইল। প্রতিবাসীরা আপনারাই সকল উদ্যোগ করিয়া লইল।

একজন প্রতিবাসী বলিল, "একটা কথা মনে হইতেছে। তোমার মার শ্রাদ্ধে তোমার শ্বশুরকে নিমন্ত্রণ করা উচিত কি না?"

প্রফুল্ল বলিল, "কে নিমন্ত্রণ করিতে যাইবে?"

দুইজন পাড়ার মাতব্বর লোক অগ্রসর হইল। সকল কাজে তাহারাই আগু হয়—তাদের সেই রোগ। প্রফুল্ল বলিল, "তোমরাই আমাদের কলঙ্ক রটাইয়া সে ঘর ঘুচাইয়াছ।"

তাহারা বলিল, "সে কথা আর মনে করিও না। আমরা সে কথা সারিয়া লইব। তুমি এখন অনাথা বালিকা–তোমার সঙ্গে আর আমাদের কোন বিবাদ নাই।"

প্রফুল্ল সম্মত হইল। দুই জন হরবল্লভকে নিমন্ত্রণ করিতে গেল। হরবল্লভ বলিলেন, "কি ঠাকুর! তোমরাই বিহাইনকে জাতিভ্রষ্টা বলিয়া তাকে একঘ'রে করেছিলে—আবার তোমাদেরই মুখে এই কথা?"

ব্রাহ্মণেরা বলিল, "সে কি জানেন—অমন পাড়াপড়শীতে গোলযোগ হয়—সেটা কোন কাজের কথা নয়।"

হরবল্লভ বিষয়ী লোক—ভাবিলেন, "এ সব জুয়াচুরি। এ বেটারা বাগ্দী বেটীর কাছে টাকা খাইয়াছে। ভাল, বাগ্দী বেটী টাকা পাইল কোথা?" অতএব হরবল্লভ নিমন্ত্রণের কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। তাঁহার মন প্রফুল্লের প্রতি বরং আরও নিষ্ঠুর ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল।

ব্রজেশ্বর এ সকল শুনিল। মনে করিল, "এক দিন রাত্রে লুকাইয়া গিয়া প্রফুল্লকে দেখিয়া আসিব। সেই রাত্রেই ফিরিব।"

প্রতিবাসীরা নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। প্রফুল্ল যথারীতি মাতৃশ্রাদ্ধ করিয়া প্রতিবাসীদিগের সাহায্যে ব্রাহ্মণ-ভোজন সম্পন্ন করিল। ব্রজেশ্বর যাইবার সময় খুঁজিতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ফুলমণি নাপিতানীর বাস প্রফুল্লের বাসের নিকট। মাতৃহীন হইয়া অবধি প্রফুল্ল একা গৃহে বাস করে। প্রফুল্ল সুন্দরী, যুবতী, রাত্রে একা বাস করে, তাহাতে ভয়ও আছে, কলঙ্ক আছে। কাছে শুইবার জন্য রাত্রে একজন স্ত্রীলোক চাই। ফুলমণিকে এ জন্য প্রফুল্ল অনুরোধ করিয়াছিল। ফুলমণি বিধবা; তার এক বিধবা ভগিনী ভিন্ন কেহ নাই। আর তারা দুই বোনেই প্রফুল্লের মার অনুগত ছিল। এই জন্য প্রফুল্ল ফুলমণিকে অনুরোধ করে, আর ফুলমণিও সহজে স্বীকার করে। অতএব যে দিন প্রফুল্লের মা মরিয়াছিল, সেই দিন অবধি প্রফুল্লের বাড়ীতে ফুলমণি প্রতিদিন সন্ধ্যার পর আসিয়া শোয়।

তবে ফুলমণি কি চরিত্রের লোক, তাহা ছেলেমানুষ প্রফুল্ল সবিশেষ জানিত না। ফুলমণি প্রফুল্লের অপেক্ষা বয়সে দশ বছরের বড়। দেখিতে শুনিতে মন্দ নয়, বেশভূষায় একটু পারিপাট্য রাখিত। একে ইতর জাতির মেয়ে, তাতে বালবিধবা; চরিত্রটা বড় সে খাঁটি রাখিতে পারে নাই। গ্রামের জমিদার পরাণ চৌধুরী। তাঁহার একজন গোমস্তা দুর্লভ চক্রবর্ত্তী ঐ গ্রামে আসিয়া মধ্যে মধ্যে কাছারি করিত। লোকে বলিত, ফুলমণি দুর্লভের বিশেষ অনুগৃহীতা—অথবা দুর্লভ তাহার অনুগৃহীত। এ সকল কথা প্রফুল্ল একেবারে যে কখনও শুনে নাই—তা নয়; কিন্তু কি করে—আর কেহ আপনার ঘর দ্বার ফেলিয়া প্রফুল্লের কাছে আসিয়া শুইতে চাহে না। বিশেষ প্রফুল্ল মনে করিল, "সে মন্দ হোক, আমি না মন্দ হইলে আমায় কে মন্দ করিবে?"

অতএব ফুলমণি দুই চারি দিন আসিয়া প্রফুল্লের ঘরে শুইল। শ্রাদ্ধের পরদিন ফুলমণি একটু দেরি করিয়া আসিতেছিল। পথে একটা আমগাছের তলায়, একটা বন আছে, আসিবার সময় ফুলমণি সেই বনে প্রবেশ করিল। সে বনের ভিতর একজন পুরুষ দাঁড়াইয়াছিল। বলাবাহুল্য যে, সে সেই দুর্লভচন্দ্র।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় কৃতাভিসারা, তাম্বুলরাগরক্তাধরা, রাঙ্গাপেড়ে শাড়িপরা, হাসিতে মুখভরা ফুলমণিকে দেখিয়া বলিলেন, "কেমন, আজ?"

ফুলমণি বলিলেন,"হাঁ, আজই বেশ। তুমি রাত্রি দুপুরের সময় পাল্কি নিয়ে এসো—দুয়ারে টোকা মেরো। আমি দুয়ার খুলিয়া দিব। কিন্তু দেখো, গোল না

হয়।”

দুর্ল্লভ। তার ভয় নাই। কিন্তু সে ত গোল কর্‌বে না?

ফুলমণি। তার একটা ব্যবস্থা কর্‌তে হবে। আমি আস্তে আস্তে দোরটি খুল্‌ব, তুমি আস্তে আস্তে, সে ঘুমিয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে তার মুখটি কাপড় দিয়া চাপিয়া বাঁধিয়া ফেলিবে। তারপর চেঁচায় কার বাপের সাধ্য!

দুর্ল্লভ। তা অমন জোর করে নিয়ে গেলে কয়দিন থাকিবে?

ফুল। একবার নিয়ে যেতে পার্‌লেই হলো। যার তিন কুলে কেউ নেই, যে অন্নের কাঙ্গাল, সে খেতে পাবে, কাপড় পাবে, গয়না পাবে, টাকা পাবে, সোহাগ পাবে—সে আবার থাক্‌বে না? সে ভার আমার—আমি যেন গয়না টাকার ভাগ পাই।

এইরূপ কথাবার্ত্তা সমাপ্ত হইলে, দুর্ল্লভ স্বস্থানে গেল—ফুলমণি প্রফুল্লের কাছে গেল। প্রফুল্ল এ সর্ব্বনাশের কথা কিছুই জানিতে পারে নাই। সে মার কথা ভাবিতে ভাবিতে শয়ন করিল। মার জন্য যেমন কাঁদে, তেমনি কাঁদিল; কাঁদিয়া যেমন রোজ ঘুমায়, তেমনি ঘুমাইল। দুই প্রহরে দুর্ল্লভ আসিয়া দ্বারে টোকা মারিল। ফুলমণি দ্বার খুলিল। দুর্ল্লভ প্রফুল্লের মুখ বাঁধিয়া ধরাধরি করিয়া পাল্কিতে তুলিল। বাহকেরা নিঃশব্দে তাহাকে পরাণবাবু জমিদারের বিহার মন্দিরে লইয়া চলিল। বলাবাহুল্য, ফুলমণি সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

ইহার অর্দ্ধদণ্ড পরে ব্রজেশ্বর সেই শূন্য গৃহে প্রফুল্লের সন্ধানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রজেশ্বর সকলকে লুকাইয়া রাত্রে পলাইয়া আসিয়াছে। হায়! কোথাও কেহ নাই।

প্রফুল্লকে লইয়া বাহকেরা নিঃশব্দে চলিল বলিয়াছি; কেহ মনে না করেন—এটা ভ্রম-প্রমাদ! বাহকের প্রকৃতি শব্দ করা। কিন্তু এবার শব্দ করার পক্ষে তাহাদের প্রতি নিষেধ ছিল। শব্দ করিলে গোলযোগ হইবে; তাছাড়া আর একটা কথা ছিল। ব্রহ্মাঠাকুরাণীর মুখে শুনা গিয়াছে, বড় ডাকাতের ভয়। বাস্তবিক এরূপ ভয়ানক দস্যুভীতি কখনও কোন দেশে হইয়াছিল কি না সন্দেহ। তখন দেশ অরাজক। মুসলমানের রাজ্য গিয়াছে; ইংরেজের রাজ্য ভাল করিয়া পত্তন হয় নাই—হইতেছে মাত্র। তাতে আবার বছর কত হইল, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর দেশ ছারখার করিয়া গিয়াছে। তার পর আবার দেবী সিংহের ইজারা। পৃথিবীর ও পারে ওয়েষ্ট্‌ মিনষ্টর হলে দাঁড়াইয়া এদ্‌মন্দ্‌ বর্ক্‌ সেই সেই দেবী সিংহকে অমর করিয়া গিয়াছেন। পর্ব্বতোদ্গীর্ণ অগ্নিশিখাবৎ জ্বালাময় বাক্যস্রোতে বর্ক, দেবী সিংহের দুর্বিষহ অত্যাচার অনন্তকালসমীপে পাঠাইয়াছেন। তাঁহার নিজমুখে সে দৈববাণীতুল্য বাক্যপরম্পরা শুনিয়া শোকে অনেক স্ত্রীলোক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল—আজিও শত বৎসর পরে সেই বক্তৃতা পড়িতে গেলে শরীর রোমাঞ্চিত এবং হৃদয় উন্মত্ত হয়। সেই ভয়ানক অত্যাচার বরেন্দ্র-ভূমি ডুবাইয়া দিয়াছিল। অনেকেই কেবল খাইতে পায় না নয়, গৃহে পর্য্যন্ত বাস করিতে পায় না। যাহাদের খাইবার নাই, তাহারা পরের কাড়িয়া খায়। কাজেই এখন গ্রামে গ্রামে দলে দলে চোর ডাকাত। কাহার সাধ্য শাসন করে? গুড্‌ল্যাড্‌ সাহেব রঙ্গপুরের প্রথম কালেক্টর। ফৌজদারী তাঁহারই জিম্মা। তিনি দলে দলে সিপাহী ডাকাত ধরিতে পাঠাইতে লাগিলেন। সিপাহীরা কিছুই করিতে পারিল না।

অতএব দুর্ল্লভের ভয়, তিনি ডাকাতি করিয়া প্রফুল্লকে লইয়া যাইতেছেন, আবার তার উপর ডাকাতে না ডাকাতি করে। পাল্কি দেখিয়া ডাকাতের আসা সম্ভব। সেই ভয়ে বেহারারা নিঃশব্দ। গোলমাল হইবে বলিয়া সঙ্গে আর অপর লোকজনও নাই, কেবল দুর্ল্লভ নিজে আর ফুলমণি। এইরূপে তাহারা ভয়ে ভয়ে চারি ক্রোশ ছাড়াইল।

তার পর বড় ভারি জঙ্গল আরম্ভ হইল। বেহারারা সভয়ে দেখিল, দুই জন মানুষ সম্মুখে আসিতেছে। রাত্রিকাল—কেবল নক্ষত্রালোকে পথ দেখা যাইতেছে।

সুতরাং তাহাদের অবয়ব অস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। বেহারারা দেখিল, যেন কালান্তক যমের মত দুই মূর্ত্তি আসিতেছে। একজন বেহারা অপরদিগকে বলিল, “মানুষ দুটোকে সন্দেহ হয়।” অপর আর একজন বলিল, “রাত্রে যখন বেড়াচ্চে, তখন কি আর ভাল মানুষ।”

তৃতীয় বাহক বলিল, “মানুষ দুটো ভারি জোয়ান।”

৪র্থ। হাতে লাঠি দেখ্‌ছি না?

১ম। চক্রবর্ত্তী মশাই কি বলেন? আর তো এগোনো যায় না—ডাকাতের হাতে প্রাণটা যাবে?

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, “তাই ত, বড় বিপদ দেখি যে! যা ভেবেছিলেম, তাই হলো!”

এমন সময়ে, যে দুই ব্যক্তি আসিতেছিল, তাহারা পথে লোক দেখিয়া হাঁকিল, “কোন্ হ্যায় রে?”

বেহারারা অমনি পাল্কি মাটিতে ফেলিয়া দিয়া “বাবা গো” শব্দ করিয়া একেবারে জঙ্গলের ভিতর পলাইল। দেখিয়া দুর্লভ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও সেই পথাবলম্বী হইলেন। তখন ফুলমণি “আমার ফেলে কোথা যাও?” বলিয়া তার পাছু পাছু ছুটিল।

যে দুই জন আসিতেছিল—যাহারা এই দশ জন মনুষ্যের ভয়ের কারণ—তাহারা পথিক মাত্র। দুইজন হিন্দুস্থানী দিনাজপুরের রাজসরকারের চাকরির চেষ্টায় যাইতেছে। রাত্রিপ্রভাত নিকট দেখিয়া সকালে সকালে পথ চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বেহারারা পলাইল দেখিয়া তাহারা একবার খুব হাসিল। তাহার পর আপনাদের গন্তব্য পথে চলিয়া গেল। কিন্তু বেহারারা, আর ফুলমণি ও চক্রবর্ত্তী মহাশয় আর পাছু ফিরিয়া চাহিল না।

প্রফুল্ল পাল্কিতে উঠিয়াই মুখের বাঁধন স্বহস্তে খুলিয়া ফেলিয়াছিল। রাত্রি দুই প্রহরে চিৎকার করিয়া কি হইবে বলিয়া চীৎকার করে নাই; চীৎকার শুনিতে পাইলেই বা কে ডাকাতের সম্মুখে আসিবে! প্রথমে ভয়ে প্রফুল্ল কিছু আত্মবিস্মৃত হইয়াছিল, কিন্তু এখন প্রফুল্ল স্পষ্ট বুঝিল যে, সাহস না করিলে মুক্তির কোন উপায় নাই। যখন বেহারারা পাল্কি ফেলিয়া পলাইল, তখন প্রফুল্ল বুঝিল—আর একটা কি নূতন বিপদ্। ধীরে ধীরে পাল্কির কপাট খুলিল। অল্প মুখ বাড়াইয়া দেখিল, দুই জন মনুষ্য আসিতেছে। তখন প্রফুল্ল ধীরে ধীরে কপাট বন্ধ করিল; যে অল্প ফাঁক রহিল, তাহা দিয়া প্রফুল্ল দেখিল, মনুষ্য দুই জন চলিয়া গেল। তখন প্রফুল্ল পাল্কি হইতে বাহির হইল—দেখিল, কেহ কোথাও নাই।

প্রফুল্ল ভাবিল, যাহারা আমাকে চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছিল, তাহারা অবশ্য ফিরিবে। অতএব যদি পথ ধরিয়া যাই, তবে ধরা পড়িতে পারি। তার চেয়ে এখন জঙ্গলের ভিতর লুকাইয়া থাকি। তার পর, দিন হইলে যা হয় করিব।

এই ভাবিয়া প্রফুল্ল জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিল। ভাগ্যক্রমে যে দিকে বেহারারা পলাইয়াছিল, সে দিকে যায় নাই। সুতরাং কাহারও সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল না। প্রফুল্ল জঙ্গলের ভিতর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অল্পক্ষণ পরেই প্রভাত হইল।

প্রভাত হইলে প্রফুল্ল বনের ভিতর এদিক্ ওদিক্ বেড়াইতে লাগিল। পথে বাহির হইতে এখনও সাহস হয় না। দেখিল, এক জায়গায় একটা পথের অস্পষ্ট রেখা বনের ভিতরের দিকে গিয়াছে। যখন পথের রেখা এদিকে গিয়াছে, তখন অবশ্য এদিকে মানুষের বাস আছে। প্রফুল্ল সেই পথে চলিল। বাড়ী ফিরিয়া যাইতে ভয়, পাছে বাড়ী হইতে আবার তাকে ডাকাইতে ধরিয়া আনে। বাঘ-ভালুকে খায়, সেও ভাল, আর ডাকাইতের হাতে না পড়িতে হয়।

পথের রেখা ধরিয়া প্রফুল্ল অনেক দূর গেল—বেলা দশ দণ্ড হইল, তবু গ্রাম পাইল না। শেষে পথের রেখা বিলুপ্ত হইল—আর পথ পায় না। কিন্তু দুই একখানা পুরাতন ইট দেখিতে পাইল। ভরসা পাইল। মনে করিল, যদি ইট আছে, তবে অবশ্য নিকটে মনুষ্যালয় আছে।

যাইতে যাইতে ইটের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। জঙ্গল দুর্ভেদ্য হইয়া উঠিল। শেষে প্রফুল্ল দেখিল। নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে এক বৃহৎ অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ

রহিয়াছে। প্রফুল্ল ইষ্টকস্তূপের উপর আরোহণ করিয়া চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিল। দেখিল, এখনও দুইচারিটা ঘর অভগ্ন আছে। মনে করিল, এখানে মানুষ থাকিলেও থাকিতে পারে। প্রফুল্ল সেই সকল ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে গেল। দেখিল, সকল ঘরের দ্বার খোলা—মনুষ্য নাই। অথচ মনুষ্য-বাসের চিহ্নও কিছু কিছু আছে। ক্ষণপরে প্রফুল্ল কোন বুড়া মানুষের কাতরানি শুনিতে পাইল। শব্দ লক্ষ্য করিয়া প্রফুল্ল এক কুঠরীমধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল, সেখানে এক বুড়া শুইয়া কাতরাইতেছে। বুড়ার শীর্ণ দেহ, শুষ্ক ওষ্ঠ, চক্ষু কোটরাগত, ঘন শ্বাস। প্রফুল্ল বুঝিল, ইহার মৃত্যু নিকট। প্রফুল্ল তাহার শয্যার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

বুড়া প্রায় শুষ্ককণ্ঠে বলিল : "মা, তুমি কে? তুমি কি কোন দেবতা, মৃত্যুকালে আমার উদ্ধারের জন্য আসিলে?"

প্রফুল্ল বলিল, "আমি অনাথা। পথ ভুলিয়া এখানে আসিয়াছি। তুমিও দেখিতেছি অনাথ—তোমার কোন উপকার করিতে পারি?"

বুড়া বলিল, "অনেক উপকার এ সময়ে করিতে পার। জয় নন্দদুলাল! এ সময়ে মনুষ্যের মুখ দেখিতে পাইলাম। পিপাসায় প্রাণ যায়—একটু জল দাও।"

প্রফুল্ল দেখিল, বুড়ার ঘরে জল-কলসী আছে, কলসীতে জল আছে; জলপাত্র আছে। কেবল দিবার লোক নাই। প্রফুল্ল জল আনিয়া বুড়াকে খাওয়াইল।

বুড়া জল পান করিয়া কিছু সুস্থির হইল। প্রফুল্ল এই অরণ্যমধ্যে মুমূর্ষু বৃদ্ধকে একাকী এই অবস্থায় দেখিয়া বড় কৌতূহলী হইল। কিন্তু বুড়া তখন অধিক কথা কহিতে পারে না। প্রফুল্ল সুতরাং তাহার সবিশেষ পরিচয় পাইল না। বুড়া যে কয়টি কথা বলিল, তাহার মর্ম্মার্থ এই :—

বুড়া বৈষ্ণব। তাহার কেহ নাই, কেবল এক বৈষ্ণবী ছিল। বৈষ্ণবী বুড়াকে মুমূর্ষু দেখিয়া তাহার দ্রব্যসামগ্রী যাহা ছিল, তাহা লইয়া পলাইয়াছে। বুড়া বৈষ্ণব—তাহার দাহ হইবে না। বুড়ার কবর হয়—এই ইচ্ছা। বুড়ার কথামত, বৈষ্ণবী বাড়ীর উঠানে তাহার একটি কবর কাটিয়া রাখিয়া দিয়াছে। হয়ত শাবল কোদালি সেইখানে পড়িয়া আছে। বুড়া এখন প্রফুল্লের কাছে এই ভিক্ষা চাহিল যে, "আমি মরিলে সেই কবরে আমাকে টানিয়া ফেলিয়া দিয়া মাটি চাপা দিও।"

প্রফুল্ল স্বীকৃত হইল। তারপর বুড়া বলিতে লাগিল, "আমার কিছু টাকা পোঁতা আছে। বৈষ্ণবী সে সন্ধান জানিত না—তাহা হইলে, না লইয়া পালাইত না। সে টাকাগুলি কাহাকে না দিয়া গেলে আমার প্রাণ বাহির হইবে না। যদি কাহাকে না দিয়া মরি, তবে যক্ষ হইয়া টাকার কাছে ঘুরিয়া বেড়াইব—আমার গতি হইবে না। বৈষ্ণবীকে সেই টাকা দিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু সে ত পলাইয়াছে। আর কোন্ মনুষ্যের সাক্ষাৎ পাইব? তাই তোমাকেই সেই টাকাগুলি দিয়া যাইতেছি। আমার বিছানার নীচে একখানা চৌকা তক্তা পাতা আছে। সেই তক্তাখানি তুলিবে। একটা সুরঙ্গ দেখিতে পাইবে। বরাবর সিঁড়ি আছে। সেই সিঁড়ি দিয়া নামিবে—ভয় নাই—আলো লইয়া যাইবে। নীচে মাটির ভিতর এমনি একটা ঘর দেখিবে। সে ঘরের বায়ুকোণে খুজিঁও—টাকা পাইবে।"

প্রফুল্ল বুড়ার শুশ্রূষায় নিযুক্তা রহিল। বুড়া বলিল, "এই বাড়ীতে গোহাল আছে—গোহালে গোরু আছে। গোহাল হইতে যদি দুধ দুইয়া আনিতে পার, তবে একটু আনিয়া আমাকে দাও, একটু আপনি খাও।"

প্রফুল্ল তাহাই করিল—দুধ আনিবার সময় দেখিয়া আসিল—কবর কাটা—সেখানে কোদালি শাবল পড়িয়া আছে।

অপরাহ্নে বুড়ার প্রাণবিয়োগ হইল। প্রফুল্ল তাহাকে তুলিল—বুড়া শীর্ণকায়; সুতরাং লঘু; প্রফুল্লের বল যথেষ্ট! প্রফুল্ল তাহাকে লইয়া গিয়া, কবরে শুয়াইয়া মাটি চাপা দিল। পরে নিকটস্থ কূপে স্নান করিয়া ভিজা কাপড় আধখানা পরিয়া রোদ্রে শুকাইল। তার পরে কোদালি শাবল লইয়া বুড়ার টাকার সন্ধানে চলিল। বুড়া তাহাকে টাকা দিয়া গিয়াছে—সুতরাং লইতে কোন বাধা আছে, মনে করিল না। প্রফুল্ল দীন-দুঃখিনী।

নবম পরিচ্ছেদ

প্রফুল্ল বুড়াকে সমাধি-মন্দিরে প্রোথিত করিবার পূর্ব্বেই তাহার শয্যা তুলিয়া বনে ফেলিয়া দিয়াছিল—দেখিয়াছিল যে, শয্যার নীচে যথার্থই একখানি চৌকা

তক্তা, দীর্ঘে প্রস্থে তিন হাত হইবে, মেঝেতে বসান আছে। এখন শাবল আনিয়া, তাহার চাড়ে তক্তা উঠাইল—অন্ধকার গহ্বর দেখা দিল। ক্রমে অন্ধকারে প্রফুল্ল দেখিল নামিবার একটা সিঁড়ি আছে বটে।

জঙ্গলে কাঠের অভাব নাই। কিছু কাঠের চেলা উঠানে পড়িয়াছিল। প্রফুল্ল তাহা বহিয়া আনিয়া কতকগুলো গহ্বরমধ্যে নিক্ষেপ করিল। তাহার পর অনুসন্ধান করিতে লাগিল—চক্‌মকি দিয়াশলাই আছে কি না। বুড়া মানুষ—অবশ্য তামাক খাইত। সার ওয়ালটর রালের আবিষ্ক্রিয়ার পর, কোন্ বুড়া তামাকু ব্যতীত এ ছার, এ নশ্বর, এ নীরস, এ দুর্ব্বিষহ জীবন শেষ করিতে পারিয়াছে?—আমি গ্রন্থকার মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে, যদি এমন বুড়া কেহ ছিল, তবে তাহার মরা ভাল হয় নাই—তার আর কিছু দিন থাকিয়া এই পৃথিবীর দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করাই উচিত ছিল। খুঁজিতে খুঁজিতে প্রফুল্ল চক্‌মকি, সোলা, দিয়াশলাই, সব পাইল। তখন প্রফুল্ল গোহাল উঁচাইয়া বিচালি লইয়া আসিল। চক্‌মকির আগুনে বিচালি জ্বালিয়া সেই সরু সিঁড়িতে পাতালে নামিল। শাবল কোদালি আগে নীচে ফেলিয়া দিয়াছিল। দেখিল দিব্য একটি ঘর। বায়ুকোণ—বায়ুকোণ আগে ঠিক করিল। তার পর যে সব কাঠ ফেলিয়া দিয়াছিল,তাহা বিচালির আগুনে জ্বালিল। উপরে মুক্ত পথ দিয়া ধুঁয়া বাহির হইয়া যাইতে লাগিল। ঘর আলো হইল। সেইখানে প্রফুল্ল খুঁড়িতে আরম্ভ করিল।

খুঁড়িতে খুঁড়িতে “ঠং” করিয়া শব্দ হইল। প্রফুল্লের শরীর রোমাঞ্চিত হইল—বুঝিল, ঘটি কি ঘড়ার গায়ে শাবল ঠেকিয়াছে। কিন্তু কোথা হইতে কার ধন এখানে আসিল, তার পরিচয় আগে দিই।

বুড়ার নাম কৃষ্ণগোবিন্দ দাস। কৃষ্ণগোবিন্দ কায়স্থের সন্তান। সে স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিত, কিন্তু অনেক বয়সে একটা সুন্দরী বৈষ্ণবীর হাতে পড়িয়া, রসকলি ও খঞ্জনিতে চিত্ত বিক্রীত করিয়া, ভেক লইয়া বৈষ্ণবীর সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবন প্রয়াণ করিল। এখন শ্রীবৃন্দাবন গিয়া কৃষ্ণগোবিন্দের বৈষ্ণবী ঠাকুরাণী, সেখানকার বৈষ্ণবদিগের মধুর জয়দেব-গীতি, শ্রীমদ্ভাগবতে পাণ্ডিত্য, আর নধর গড়ন দেখিয়া, তৎপাদপদ্মনিকর সেবনপূর্ব্বক পুণ্যসঞ্চয়ে মন দিল। দেখিয়া কৃষ্ণগোবিন্দ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবী লইয়া বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিলেন। কৃষ্ণগোবিন্দ তখন গরিব; বিষয়কর্ম্মের অন্বেষণে মুর্শিদাবাদে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণগোবিন্দের চাকরি জুটিল। কিন্তু তাঁহার বৈষ্ণবী যে বড় সুন্দরী, নবাবমহলে সে সংবাদ পৌঁছিল। একজন হাব্‌সী খোজা বৈষ্ণবীকে বেগম করিবার অভিপ্রায়ে তাহার নিকেতনে যাতায়াত করিতে লাগিল। বৈষ্ণবী লোভে পড়িয়া রাজি হইল। আবার বেগোছ দেখিয়া, কৃষ্ণগোবিন্দ বাবাজী, বৈষ্ণবী লইয়া সেখান হইতে পলায়ন করিলেন। কিন্তু কোথায় যান? কৃষ্ণগোবিন্দ মনে করিলেন, এ অমূল্য ধন লইয়া লোকালয়ে বাস অনুচিত। কে কোন্ দিন কাড়িয়া লইবে। তখন বাবাজী বৈষ্ণবীকে পদ্মাপার লইয়া আসিয়া, একটা নিভৃত স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পর্য্যটন করিতে করিতে এই ভগ্ন অট্টালিকায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, লোকের চক্ষু হইতে তাঁর অমূল্য রত্ন লুকাইয়া রাখিবার স্থান বটে। এখানে যম ভিন্ন আর কাহারও সন্ধান রাখিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব তাহারা সেইখানে রহিল। বাবাজী সপ্তাহে সপ্তাহে হাটে গিয়া বাজার করিয়া আনেন। বৈষ্ণবীকে কোথাও বাহির হইতে দেন না।

একদিন কৃষ্ণগোবিন্দ একটা নীচের ঘরে চুলা কাটিতেছিল,—মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে একটা সেকেলে—তখনকার পক্ষেও সেকেলে মোহর পাওয়া গেল। কৃষ্ণগোবিন্দ সেখানে আরও খুঁড়িল। এক ভাঁড় টাকা পাইল।

এই টাকাগুলি না পাইলে কৃষ্ণগোবিন্দের দিন চলা ভার হইত। এক্ষণে স্বচ্ছন্দে দিনপাত হইতে লাগিল। কিন্তু কৃষ্ণগোবিন্দের এক নূতন জ্বালা হইল। টাকা পাইয়া তাহার স্মরণ হইল যে, এই রকম পুরাতন বাড়ীতে অনেকে অনেক ধন মাটির ভিতর পাইয়াছে। কৃষ্ণগোবিন্দের দৃঢ় বিশ্বাস হইল, এখানে আরও টাকা আছে। সেই অবধি কৃষ্ণগোবিন্দ অনুদিন প্রোথিত ধনের সন্ধান করিতে লাগিল। খুঁজিতে খুঁজিতে অনেক সুরঙ্গ, মাটির নীচে অনেক চোর-কুঠরি বাহির হইল। কৃষ্ণগোবিন্দ বাতিকগ্রস্তের ন্যায় সেই সকল স্থানে অনুসন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু কিছু পাইল না। এক বৎসর এইরূপ ঘুরিয়া ঘুরিয়া কৃষ্ণগোবিন্দ কিছু শান্ত

হইল। কিন্তু তথাপি মধ্যে মধ্যে নীচের চোর-কুঠরিতে গিয়া সন্ধান করিত। একদিন দেখিল, এক অন্ধকার ঘরে, এক কোণে একটা কি চকচক করিতেছে। দৌড়িয়া গিয়া তাহা তুলিল—দেখিল, মোহর! ইঁদুরে মাটি তুলিয়াছিল, সেই মাটির সঙ্গে উহা উঠিয়াছিল।

কৃষ্ণগোবিন্দ তখন কিছু করিল না, হাটবারের অপেক্ষা করিতে লাগিল। এবার হাটবারে বৈষ্ণবীকে বলিল, "আমার বড় অসুখ করিয়াছে, তুমি হাট করিতে যাও।" বৈষ্ণবী সকালে হাট করিতে গেল। বাবাজী বুঝিলেন, বৈষ্ণবী একদিন ছুটি পাইয়াছে, শীঘ্র ফিরিবে না। কৃষ্ণগোবিন্দ সেই অবকাশে সেই কোণ খুঁড়িতে লাগিল। সেখানে কুড়ি ঘড়া ধন বাহির হইল।

পূর্ব্বকালে উত্তর-বাঙ্গালায়, নীলধ্বজবংশীয় প্রবলপরাক্রান্ত রাজগণ রাজ্য করিতেন। সে বংশে শেষ রাজা নীলাম্বর দেব। নীলাম্বরের অনেক রাজধানী ছিল—অনেক নগরে অনেক রাজভবন ছিল। এই একটি রাজভবন। এখানে বৎসরে দুই এক সপ্তাহ বাস করিতেন। গৌড়ের বাদশাহ একদা উত্তর-বাঙ্গালা জয় করিবার ইচ্ছায় নীলাম্বরের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। নীলাম্বর বিবেচনা করিলেন যে, কি জানি, যদি পাঠানেরা রাজধানী আক্রমণ করিয়া অধিকার করে, তবে পূর্ব্বপুরুষদিগের সঞ্চিত ধনরাশি তাহাদের হস্তগত হইবে। আগে সাবধান হওয়া ভাল। এই বিবেচনা করিয়া যুদ্ধের পূর্ব্বে নীলাম্বর অতি সঙ্গোপনে রাজভাণ্ডার হইতে ধন সকল এইখানে আনিলেন। স্বহস্তে তাহা মাটিতে পুঁতিয়া রাখিলেন। আর কেহ জানিল না যে, কোথায় ধন রহিল। যুদ্ধে নীলাম্বর বন্দী হইলেন। পাঠান-সেনাপতি তাঁহাকে গৌড়ে চালান করিল। তারপর আর তাঁহাকে মনুষ্যলোকে কেহ দেখে নাই। তাঁহার শেষ কি হইল, কেহ জানে না। তিনি আর কখনও দেশে ফেরেন নাই। সেই অবধি তাঁহার ধনরাশি সেইখানে পোঁতা রহিল। সেই ধনরাশি কৃষ্ণগোবিন্দ পাইল। সুবর্ণ, হীরক,মুক্তা, অন্য রত্ন অসংখ্য—অগণ্য, কেহ স্থির করিতে পারে না কত। কৃষ্ণগোবিন্দ কুড়ি ঘড়া এইরূপ ধন পাইল।

কৃষ্ণগোবিন্দ ঘড়াগুলি সাবধানে পুঁতিয়া রাখিল। বৈষ্ণবীকে এক দিনের তরেও এ ধনের কথা কিছুই জানিতে দিল না। কৃষ্ণগোবিন্দ অতিশয় কৃপণ, ইহা হইতে একটি মোহর লইয়াও কখনও খরচ করিল না। এ ধন গায়ের রক্তের মত বোধ করিত। সেই ভাঁড়ের টাকাতেই কায়ক্লেশে দিন চালাইতে লাগিল। সেই ধন এখন প্রফুল্ল পাইল। ঘড়াগুলি বেশ করিয়া পুঁতিয়া রাখিয়া আসিয়া প্রফুল্ল শয়ন করিল। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর, সেই বিচালির বিছানায় প্রফুল্ল শীঘ্রই নিদ্রায় অভিভূত হইল।

দশম পরিচ্ছেদ

এখন একটু ফুলমণির কথা বলি। ফুলমণি নাপিতানী হরিণীর ন্যায় বাছিয়া বাছিয়া কাছিয়া দ্রুতপদ জীবে প্রাণ-সমর্পণ করিয়াছিল। ডাকাইতের ভয়ে দুর্লভচন্দ্র আগে আগে পলাইলেন, ফুলমণি পাছু পাছু ছুটিয়া গেল। কিন্তু দুর্লভের এমনই পলাইবার রোখ্ যে, তিনি পশ্চাদ্ধাবিতা প্রণয়িনীর কাছে নিতান্ত দুর্লভ হইলেন। ফুলমণি যত ডাকে, "ওগো দাঁড়াও গো! আমায় ফেলে যেও না গো!" দুর্লভচন্দ্র তত ডাকে, "ও বাবা গো! ঐ এলো গো!" কাঁটাবনের ভিতর দিয়া, পগার লাফাইয়া, কাদা ভাঙ্গিয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে দুর্লভ ছোটে—হায়! কাছা খুলিয়া গিয়াছে, এক পায়ের নাগরা জুতা কোথায় পড়িয়া গিয়াছে, চাদরখানা একটা কাঁটা-বনে বিঁধিয়া তাঁহার বীরত্বের নিশানস্বরূপ বাতাসে উড়িতেছে। তখন ফুলমণি সুন্দরী হাঁকিল, "ও অধঃপেতে মিন্‌সে—ওরে মেয়েমানুষকে ভুলিয়ে এনে—এমনি ক'রে কি ডাকাতের হাতে সঁপে দিয়ে যেতে হয়রে মিন্‌সে?" শুনিয়া দুর্লভচন্দ্র ভাবিলেন, তবে নিশ্চিত ইহাকে ডাকাইতে ধরিয়াছে। অতএব দুর্লভচন্দ্র বিনাবাক্যব্যয়ে আরও বেগে ধাবমান হইলেন। ফুলমণি ডাকিল, "ও অধঃপেতে—ও পোড়ার মুখো—ও আঁটকুড়ীর পুত—ও হাবাতে—ও ড্যাক্‌রা—ও বিটলে।" ততক্ষণ দুর্লভ অদৃশ্য হইল। কাজেই ফুলমণিও গলাবাজি ক্ষান্ত দিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। রোদনকালে দুর্লভের মাতা-পিতার প্রতি নানাবিধ দোষারোপ করিতে

লাগিল।

এদিকে ফুলমণি দেখিল, কই—ডাকাইতেরা ত কেহ আসিল না। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া ভাবিল—কান্না বন্ধ করিল। শেষ দেখিল, না ডাকাইত আসে—না দুর্লভচন্দ্র দেখা দেয়। তখন জঙ্গল হইতে বাহির হইবার পথ খুঁজিতে লাগিল। তাহার ন্যায় চতুরার পক্ষে পথ পাওয়া বড় কঠিন হইল না। সহজেই বাহির হইয়া সে রাজপথে উপস্থিত হইল। কোথাও কেহ নাই দেখিয়া, সে গৃহাভিমুখে ফিরিল। দুর্লভের উপর তখন বড় রাগ।

অনেক বেলা হইলে ফুলমণি ঘরে পৌঁছিল। দেখিল, তাহার ভগিনী অলকমণি ঘরে নাই, স্নানে গিয়াছে। ফুলমণি কাহাকে কিছু না বলিয়া কপাট ভেজাইয়া শয়ন করিল। রাত্রে নিদ্রা হয় নাই—ফুলমণি শুইবামাত্র ঘুমাইয়া পড়িল।

তাহার দিদি আসিয়া তাহাকে উঠাইল—জিজ্ঞাসা করিল, "কি লা, তুই এখন এলি?"

ফুলমণি বলিল, "কেন, আমি কোথায় গিয়াছিলাম?"

অলকমণি। কোথায় আর যাবি? বামুনদের বাড়ী শুতে গিয়েছিলি, তা এত বেলা অবধি এলি না, তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি।

ফুল। তুই চোখের মাথা খেয়েছিস তার কি হবে? ভোরের বেলা তোর সমুখ দিয়ে এসে শুলেম—দেখিস নে?

অলকমণি বলিল, "সে কি বোন? আমি তোর বেলা দেখে তিনবার বামুনদের বাড়ী গিয়ে তোকে খুঁজে এলাম। তা তোকেও দেখ্‌লাম না—কাকেও দেখ্‌লাম না। হ্যাঁ লা! প্রফুল্ল আজ কোথা গেছে লা?

ফুল। (শিহরিয়া) চুপ্ কর! দিদি চুপ্! ও কথা মুখে আনিস্ না।

অল। (সভয়ে) কেন, কি হয়েছে?

ফুল। সে কথা বল্‌তে নাই।

অল। কেন লা?

ফুল। আমরা ছোট লোক—আমাদের দেবতা বামুনের কথায় কাজ কি, বোন?

অল। সে কি? প্রফুল্ল কি করেছে?

ফুল। প্রফুল্ল কি আর আছে?

অল। (পুনশ্চ সভয়ে) সে কি? কি বলিস্?

ফুল। (অতি অস্ফুটস্বরে) কারও সাক্ষাতে বলিস্ নে—কাল তার মা এসে তাকে নিয়ে গেছে।

ভগিনী। অ্যাঁ!

অলকমণির গা থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ফুলমণি তখন এক আষাঢ়ে গল্প ফাঁদিল। ফুলমণি প্রফুল্লের বিছানায় রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময়ে তার মাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিল। ক্ষণপরেই ঘরের ভিতর একটা ভারি ঝড় উঠিল—তার পর আর কেহ কোথাও নাই। ফুলমণি মূর্চ্ছিতা হইয়া, দাঁতকপাটি লাগিয়া পড়িয়া রহিল। ইত্যাদি ইত্যাদি। ফুলমণি উপন্যাসের উপসংহারকালে দিদিকে বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিল, "এ সকল কথা কাহারও সাক্ষাতে বলিস্ না—দেখিস, আমার মাথা খাস্।"

দিদি বলিলেন, "না গো! এ কথা কি বলা যায়?" কিন্তু কথিতা দিদি মহাশয়া তখনই চাল ধুইবার ছলে ধুচুনি হাতে পল্লী-পরিভ্রমণে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং

ঘরে ঘরে উপন্যাসটি সালঙ্কার ব্যাখ্যা করিয়া, সকলকে সাবধান করিয়া দিলেন যে, দেখ, এ কথা প্রচার না হয়। কাজেই ইহা শীঘ্র প্রচারিত হইয়া রূপান্তরে প্রফুল্লের শ্বশুরবাড়ী গেল। রূপান্তর কিরূপ? পরে বলিব।

একাদশ পরিচ্ছেদ

প্রভাতে উঠিয়া প্রফুল্ল ভাবিল, "এখন কি করি? কোথায় যাই? এ নিবিড় জঙ্গল ত থাকিবার স্থান নয়, এখানে একা থাকিব কি প্রকারে? যাই বা কোথায়? বাড়ী ফিরিয়া যাইব? আবার ডাকাইতে ধরিয়া লইয়া যাইবে। আর যেখানে যাই, এ ধনগুলি লইয়া যাই কি প্রকারে? লোক দিয়া বহিয়া লইয়া গেলে, জানাজানি হবে, চোর-ডাকাইতে কাড়িয়া লইবে। লোকই বা পাইব কোথায়? যাহাকে পাইব, তাহাকেই বা বিশ্বাস কি? আমাকে মারিয়া ফেলিয়া টাকাগুলি কাড়িয়া লইতে কতক্ষণ? এ ধনের রাশির লোভ কে সম্বরণ করিবে?"

প্রফুল্ল অনেক বেলা অবধি ভাবিল। শেষে সিদ্ধান্ত এই হইল, "অদৃষ্টে যাহাই হৌক, দারিদ্র্য-দুঃখ আর সহ্য করিতে পারিব না। এইখানেই থাকিব। আমার পক্ষে দুর্গাপুরে আর এ জঙ্গলে তফাৎ কি? সেখানেও আমাকে ডাকাইতে ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল, এখানেও না হয় তাই করিবে।"

এইরূপ মনস্থির করিয়া প্রফুল্ল গৃহ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। ঘর-দ্বার পরিষ্কার করিল। গোরুর সেবা করিল। শেষ, রন্ধনের উদ্যোগ। রাঁধিবে কি? হাঁড়ি, কাঠ, চাল, দাল,—সকলেরই অভাব। প্রফুল্ল একটি মোহর লইয়া হাটের সন্ধানে বাহির হইল। প্রফুল্লের যে সাহস অলৌকিক, তাহার পরিচয় অনেক দেওয়া হইয়াছে।

এ জঙ্গলে হাট কোথায়? প্রফুল্ল ভাবিল, "সন্ধান করিয়া লইব।" জঙ্গলে পথের রেখা আছে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রফুল্ল সেই রেখা ধরিয়া চলিল।

যাইতে যাইতে নিবিড় জঙ্গলের ভিতর একটি ব্রাহ্মণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। ব্রাহ্মণের গায়ে নামাবলি, কপালে ফোঁটা, মাথা কামান। ব্রাহ্মণ দেখিতে গৌরবর্ণ, অতিশয় সুপুরুষ, বয়স বড় বেশী নয়। ব্রাহ্মণ প্রফুল্লকে দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইল। বলিল, "কোথা যাইবে, মা?"

প্র। আমি হাটে যাইব।

ব্রাহ্মণ। এ দিকে হাটের পথ কোথা?

প্র। তবে কোন্ দিকে?

ব্রা। তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?

প্র। এ জঙ্গল হইতেই।

ব্রা। এ জঙ্গলে তোমার বাস?

প্র। হাঁ।

ব্রা। তবে তুমি হাটের পথ চেন না?

প্র। আমি নূতন আসিয়াছি।

ব্রা। এ বনে কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক আসে না। তুমি কেন আসিলে?

প্র। আমাকে হাটের পথ বলিয়া দিন।

ব্রা। হাট এক বেলার পথ। তুমি একা যাইতে পারিবে না। চোর-ডাকাইতের বড় ভয়। তোমার আর কে আছে?

প্র। আর কেহ নাই।

ব্রাহ্মণ অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রফুল্লের মুখপানে চাহিয়া দেখিল। মনে মনে বলিল, "এ বালিকা সকল সুলক্ষণযুক্তা। ভাল, দেখা যাউক, ব্যাপারটা কি?" প্রকাশ্যে বলিল, "তুমি একা হাটে যাইও না। বিপদে পড়িবে। এইখানে আমার একখানা দোকান আছে। যদি ইচ্ছা হয়, তবে সেখান হইতে চাল দাল কিনিতে পার।"

প্রফুল্ল বলিল, "সেই হলে ভাল হয়। কিন্তু আপনাকে ত ব্রাহ্মণপণ্ডিতের মত দেখিতেছি।"

ব্রা। ব্রাহ্মণপণ্ডিত অনেক রকমের আছে। বাছা! তুমি আমার সঙ্গে এস।

এই বলিয়া ব্রাহ্মণ প্রফুল্লকে সঙ্গে করিয়া আরও নিবিড়তর জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রফুল্লের একটু একটু ভয় করিতে লাগিল, কিন্তু এ বনে কোথায় বা ভয় নাই? দেখিল, সেখানে একখানি কুটীর আছে—তালাচাবি বন্ধ, কেহ নাই। ব্রাহ্মণ তালাচাবি খুলিল। প্রফুল্ল দেখিল,—দোকান নয়, তবে হাঁড়ি, কলসী, চাল, দাল, নুন, তেল, যথেষ্ট আছে। ব্রাহ্মণ বলিল, "তুমি যাহা একা বহিয়া লইয়া যাইতে পার, লইয়া যাও।"

প্রফুল্ল যাহা পারিল, তাহা লইল। জিজ্ঞাসা করিল, "দাম কত দিতে হইবে?"

ব্রা। এক আনা।

প্র। আমার নিকট পয়সা নাই।

ব্রা। টাকা আছে? দাও, ভাঙ্গাইয়া দিতেছি।

প্র। আমার কাছে টাকাও নাই।

ব্রা। তবে কি নিয়া হাটে যাইতেছিলে?

প্র। একটি মোহর আছে।

ব্রা। দেখি।

প্রফুল্ল মোহর দেখাইল। ব্রাহ্মণ তাহা দেখিয়া ফিরাইয়া দিল; বলিল, "মোহর ভাঙ্গাইয়া দিই, এত টাকা আমার কাছে নাই। চল, তোমার সঙ্গে তোমার ঘরে যাই, তুমি সেইখানে আমাকে পয়সা দিও।"

প্র। ঘরেও আমার পয়সা নাই।

ব্রা। সবই মোহর! তা হৌক, চল, তোমার ঘর চিনিয়া আসি। যখন তোমার হাতে পয়সা হইবে, তখন আমায় দিও। আমি গিয়া নিয়া আসিব।

এখন "সবই মোহর" কথাটা প্রফুল্লের কানে ভাল লাগিল না। প্রফুল্ল বুঝিল যে, এ চতুর ব্রাহ্মণ বুঝিয়াছে যে, প্রফুল্লের অনেক মোহর আছে। আর সেই লোভেই তাহার বাড়ী দেখিতে যাইতে চাহিতেছে। প্রফুল্ল জিনিসপত্র যাহা লইয়াছিল, তাহা রাখিল। বলিল, "আমাকে হাটেই যাইতে হইবে। আমার কাপড়-চোপড়ের বরাৎ আছে।"

ব্রাহ্মণ হাসিল। বলিল, "মা! মনে করিতেছ, আমি তোমার বাড়ী চিনিয়া আসিলে, তোমার মোহরগুলি চুরি করিয়া লইব? তা তুমি কি মনে করিয়াছ, হাটে গেলেই আমাকে এড়াইতে পারিবে? আমি তোমার সঙ্গ না ছাড়িলে তুমি ছাড়িবে কি প্রকারে?

সর্ব্বনাশ! প্রফুল্লের গা কাঁপিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণ বলিল, "তোমার সঙ্গে আমি প্রতারণা করিব না।—আমাকে ব্রাহ্মণপণ্ডিত মনে কর, আর যাই মনে কর, আমি ডাকাইতের সর্দ্দার। আমার

নাম—ভবানী পাঠক।”

প্রফুল্ল স্পন্দহীন। ভবানী পাঠকের নাম সে দুর্গাপুরেও শুনিয়াছিল। ভবানী পাঠক বিখ্যাত দস্যু। তাহার ভয়ে বরেন্দ্রভূমি কম্পমান। প্রফুল্লের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

ভবানী বলিল, “বিশ্বাস না হয়, প্রত্যক্ষ দেখ।”

এই বলিয়া ভবানী ঘরের ভিতর হইতে একটা নাগরা বা দামামা বাহির করিয়া তাহাতে গোটাকতক ঘা দিল। মুহূর্ত্তমধ্যে জন পঞ্চাশ ষাট কালান্তক যমের মত জওয়ান লাঠি সড়কি লইয়া উপস্থিত হইল। তাহারা ভবানীকে জিজ্ঞাসা করিল, “কি আজ্ঞা হয়?”

ভবানী বলিল, “এই বালিকাকে তোমরা চিনিয়া রাখ। ইহাকে আমি মা বলিয়াছি। ইহাকে তোমরা সকলে মা বলিবে এবং মার মত দেখিবে। তোমরা ইহার কোন অনিষ্ট করিবে না, আর কাহাকেও করিতে দিবে না। এখন তোমরা বিদায় হও।” এই বলিবামাত্র সেই দস্যুদল মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তর্হিত হইল।

প্রফুল্ল বড় বিস্মিত হইল। প্রফুল্ল স্থিরবুদ্ধিঃ একেবারেই বুঝিল যে, ইহার শরণাগত হওয়া ভিন্ন আর উপায় নাই। বলিল, “চলুন, আপনাকে আমার বাড়ী দেখাইতেছি।”

প্রফুল্ল দ্রব্যসামগ্রী যাহা রাখিয়াছিল, তাহা আবার লইল। সে আগে চলিল, ভবানী পাঠক পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। তাহারা সেই ভাঙ্গা বাড়ীতে উপস্থিত হইল। বোঝা নামাইয়া ভবানী ঠাকুরকে বসিতে, প্রফুল্ল একখানা ছেঁড়া কুশাসন দিল। বৈরাগীর একখানি ছেঁড়া কুশাসন ছিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ভবানী পাঠক বলিল, “এই ভাঙ্গা বাড়ীতে তুমি মোহর পাইয়াছ?”

প্র। আজ্ঞা হাঁ।

ভ। কত?

প্র। অনেক।

ভ। ঠিক বল কত? ভাঁড়াভাঁড়ি করিলে আমার লোক আসিয়া বাড়ী খুঁজিয়া দেখিবে।

প্র। কুড়ি ঘড়া।

ভ। এ ধন লইয়া তুমি কি করিবে?

প্র। দেশে লইয়া যাইব।

ভ। রাখিতে পারিবে?

প্র। আপনি সাহায্য করিলে পারি।

ভ। এই বনে আমার পূর্ণ অধিকার। এই বনের বাহিরে আমার তেমন ক্ষমতা নাই। এ বনের বাহিরে ধন লইয়া গেলে, আমি রাখিতে পারিব না।

প্র। তবে আমি এই বনেই এই ধন লইয়া থাকিব। আপনি রক্ষা করিবেন?

ভ। করিব। কিন্তু তুমি এত ধন লইয়া কি করিবে?

প্র। লোকে ঐশ্বর্য্য লইয়া কি করে?

ভ। ভোগ করে।

প্র। আমিও ভোগ করিব।

ভবানী ঠাকুর "হোঃ হোঃ!" করিয়া হাসিয়া উঠিল। প্রফুল্ল অপ্রতিভ হইল। দেখিয়া ভবানী বলিল, "মা! বোকা মেয়ের মত কথাটা বলিলে, তাই হাসিলাম। তোমার ত কেহই নাই বলিয়াছ, তুমি কাকে নিয়া এ ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবে? একা কি ঐশ্বর্য্য ভোগ হয়?"

প্রফুল্ল অধোবদন হইল। ভবানী বলিতে লাগিল, "শোন। লোকে ঐশ্বর্য্য লইয়া, কেহ ভোগ করে, কেহ পুণ্যসঞ্চয় করে, কেহ নরকের পথ সাফ করে। তোমার ভোগ করিবার যো নাই। কেন না, তোমার কেহ নাই। তুমি পুণ্যসঞ্চয় করিতে পার, না হয় নরকের পথ সাফ করিতে পার। কোন্‌টা করিবে?"

প্রফুল্ল বড় সাহসী। বলিল, "এ সকল কথা ত ডাকাইতের সর্দ্দারের মত নহে।"

ব্রা। নাঃ আমি কেবল ডাকাইতের সর্দ্দার নহি। তোমার কাছে আর আমি ডাকাইতের সর্দ্দার নহি, তোমাকে আমি মা বলিয়াছি, সুতরাং আমি এক্ষণে তোমার পক্ষে ভাল যা, তাই বলিব। ধনের ভোগ তোমার হইতে পারে না—কেন না, তোমার কেহ নাই। তবে এই ধনের দ্বারা বিস্তর পাপ, অথবা বিস্তর পুণ্য সঞ্চয় করিতে পার। কোন্ পথে যাইতে চাও?"

প্র। যদি বলি, পাপই করিব?

ব্রা। আমি তাহা হইলে, লোক দিয়া, তোমার ধন তোমার সঙ্গে দিয়া তোমাকে এ বনের বাহির করিয়া দিব। এ বনে আমার অনুচর এমন অনেক আছে যে, তোমার এই ধনের লোভে, তোমার সঙ্গে পাপাচরণ করিতে সম্মত হইবে। অতএব তোমার সে মতি হইলে, আমি তোমাকে এই দণ্ডে এখান হইতে বিদায় করিতে বাধ্য। এ বন আমারই।

প্র। লোক দিয়া আমার ধন আমার সঙ্গে পাঠাইয়া দেন, তবে সে আমার পক্ষে ক্ষতি কি?

ভ। রাখিতে পারিবে কি? তোমার রূপ আছে, যৌবন আছে, যদিও ডাকাইতের হাতে উদ্ধার পাও—কিন্তু রূপ যৌবনের হাতে উদ্ধার পাইবে না। পাপের লালসা না ফুরাইতে ফুরাইতে ধন ফুরাইবে। যতই কেন ধন থাক্ না, শেষ করিলে শেষ হইতে বিস্তর দিন লাগে না। তার পর, মা?

প্র। তার পর কি?

ভ। নরকের পথ সাফ। লালসা আছে, কিন্তু লালসাপরিতৃপ্তির উপায় নাই—সেই নরকের পরিষ্কার পথ। পুণ্য সঞ্চয় করিবে?

প্র। বাবা! আমি গৃহস্থের মেয়ে, কখনও পাপ জানি না। আমি কেন পাপের পথে যাইব? আমি বড় কাঙ্গাল—আমার অন্নবস্ত্র জুটিলেই ঢের, আমি ধন চাই না—দিনপাত হইলেই হইল। এ ধন তুমি সব নাও—আমি নিষ্পাপে যাতে এক মুঠো অন্ন পাই, তাই ব্যবস্থা করিয়া দাও।"

ভবানী মনে মনে প্রফুল্লকে ধন্যবাদ করিল। প্রকাশ্যে বলিল, "ধন তোমার। আমি লইব না।"

প্রফুল্ল বিস্মিত হইল। মনের ভাব বুঝিয়া ভবানী বলিল, "তুমি ভাবিতেছ, ডাকাইতি করে, পরের ধন কাড়িয়া খায়, আবার এ রকম ভাণ করে কেন? সে কথা তোমায় এখন বলিবার প্রয়োজন নাই। তবে তুমি যদি পাপাচরণে প্রবৃত্ত হও, তবে তোমার এ ধন লুঠ করিয়া লইলেও লইতে পারি। এখন এ ধন লইব না। তোমাকে আবার জিজ্ঞাসা করিতেছি—এ ধন লইয়া তুমি কি করিবে?"

প্র। আপনি দেখিতেছি জ্ঞানী, আপনি আমায় শিখাইয়া দিন, ধন লইয়া কি করিব।

ভ। শিখাইতে পাঁচ-সাত বৎসর লাগিবে। যদি শেখ, আমি শিখাইতে পারি। এই পাঁচ সাত বৎসর তুমি ধন স্পর্শ করিবে না। তোমার ভরণপোষণের কোন কষ্ট হইবে না। তোমার খাইবার পরিবার জন্য যাহা যাহা আবশ্যক, তাহা আমি পাঠাইয়া দিব। কিন্তু আমি যাহা বলিব, তাহাতে দ্বিরুক্তি না করিয়া মানিতে হইবে। কেমন, স্বীকৃত আছ?

প্র। বাস করিব কোথায়?

ভ। এইখানে। ভাঙ্গা চোরা একটু একটু মেরামত করিয়া দিব।

প্র। এইখানে একা বাস করিব?

ভ। না, আমি দুইজন স্ত্রীলোক পাঠাইয়া দিব। তাহারা তোমার কাছে থাকিবে। কোন ভয় করিও না। এ বনে আমি কর্ত্তা। আমি থাকিতে তোমার কোন অনিষ্ট ঘটিবে না।

প্র। আপনি কিরূপে শিখাইবেন।

ভ। তুমি লিখিতে পড়িতে জান?

প্র। না।

ভ। তবে প্রথমে লেখাপড়া শিখাইব।

প্রফুল্ল স্বীকৃত হইল। এ অরণ্যমধ্যে একজন সহায় পাইয়া সে আহ্লাদিত হইল।

ভবানী ঠাকুর বিদায় হইয়া সেই ভগ্ন অট্টালিকার বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, এক ব্যক্তি তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহার বলিষ্ঠ গঠন, চৌগোঁপ্পা ও ছাঁটা গালপাট্টা আছে। ভবানী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “রঙ্গরাজ। এখানে কেন?”

রঙ্গরাজ বলিল, “আপনার সন্ধানে। আপনি এখানে কেন?”

ভ। যা এত দিন সন্ধান করিতেছিলাম, তাহা পাইয়াছি।

রঙ্গ। রাজা?

ভ। রাণী।

রঙ্গ। রাজা রাণী আর খুঁজিতে হইবে না। ইংরেজ রাজা হইতেছে। কলিকাতায় না কি হষ্টিন* বলিয়া একজন ইংরেজ ভাল রাজ্য ফাঁদিয়াছে।

ভ। আমি সে রকম রাজা খুঁজি না। আমি খুঁজি যা, তা ত তুমি জান।

রঙ্গ। এখন পাইয়াছেন কি?

ভ। সে সামগ্রী পাইবার নয়, তৈয়ার করিয়া লইতে হইবে। জগদীশ্বর লোহা সৃষ্টি করেন, মানুষে কাটারি গড়িয়া লয়। ইস্পাত ভাল পাইয়াছি; এখন পাঁচ সাত বৎসর ধরিয়া গড়িতে শাণিতে হইবে। দেখিও এই বাড়ীতে আমি ভিন্ন আর কোন পুরুষমানুষ না প্রবেশ করিতে পারে। মেয়েটি যুবতী এবং সুন্দরী।

রঙ্গ। যে আজ্ঞা। সম্প্রতি ইজারাদারের লোক রঞ্জনপুর লুঠিয়াছে। তাই আপনাকে খুঁজিতেছি।

ভ। চল, তবে আমরা ইজারাদারের কাছারি লুঠিয়া, গ্রামের লোকের ধন গ্রামের লোককে দিয়া আসি। গ্রামের লোক আনুকূল্য করিবে?

রঙ্গ। বোধ হয় করিতে পারে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ভবানী ঠাকুর অঙ্গীকার মত দুইজন স্ত্রীলোক পাঠাইয়া দিলেন। একজন হাটে ঘাটে যাইবে, আর একজন প্রফুল্লের কাছে অনুক্ষণ থাকিবে। দুই জন দুই রকমের। যে হাটে ঘাটে যাইবে, তাহার নাম গোব্‌রার মা, বয়স তিয়াত্তর বছর, কালো আর কালা। যদি একেবারে কানে না শুনিত, ক্ষতি ছিল না, কোনমতে ইশারা ইঙ্গিতে চলিত; কিন্তু এ তা নয়। কোন কোন কথা কখন কখন শুনিতে পায়, কখন কোন কথা শুনিতে পায় না। এ রকম হইলে বড় গণ্ডগোল বাধে।

যে কাছে থাকিবার জন্য আসিয়াছিল, সে সম্পূর্ণরূপে ভিন্নপ্রকৃতির স্ত্রীলোক। বয়সে প্রফুল্লের অপেক্ষা পাঁচ সাত বৎসরের বড় হইবে। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ—বর্ষাকালের কচি পাতার মত রঙ। রূপ উছলিয়া পড়িতেছে।

দুইজনে একত্র আসিল—যেন পূর্ণিমা অমাবস্যার হাত ধরিয়াছে। গোব্‌রার মা প্রফুল্লকে প্রণাম করিল। প্রফুল্ল জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি গা?"

গোব্‌রার মা শুনিতে পাইল না; অপরা বলিল, "ও একটু কালা—ওকে সবাই গোব্‌রার মা বলে।"

প্র। গোব্‌রার মা! তোমার কয়টি ছেলে গা?

গোব্‌রার মা। আমি ছিলেম আর কোথায়? বাড়ীতে ছিলেম।

প্র। তুমি কি জেতের মেয়ে?

গোব্‌রার মা। যেতে আস্‌তে খুব পার্‌ব। যেখানে বলিবে, সেইখানে যাব।

প্র। বলি, তুমি কি লোক?

গোব্‌রার মা। আর তোমার লোকে কাজ কি মা! আমি একাই তোমার সব কাজ করে দেব। কেবল দুই একটা কাজ পার্‌ব না।

প্র। পার্‌বে না, কি?

গোব্‌রার মার কাণ ফুটিল। বলিল, "পার্‌ব না, কি? এই জল তুলতে পার্‌ব না। আমার কাঁকালে জোর নাই। আর কাপড়চোপড় কাচা—তা না হয় মা, তুমিই করো।"

প্র। আর সব পার্‌বে ত?

গো-মা। বাসনটাসনগুলো মাজা—তাও না হয় তুমি আপনিই কর্‌লে।

প্র। তাও পারবে না; তবে পার্‌বে কি?

গো-মা। আর এমন কিছু না—এই ঘর ঝোঁটোন, ঘর নিকোন, এটাও বড় পারি নে।

প্র। পার্‌বে কি?

গো-মা। আর যা বল। সল্‌তে পাকাব, জল গড়িয়ে দেব, আমার এঁটো পাতা ফেল্‌বো—আর আসল কাজ যা যা, তা কর্‌ব—হাট কর্‌ব।

প্র। বেসাতির হিসাবটা দিতে পার্‌বে?

---

* Warren Hestings.

গো-মা। তা মা, আমি বুড়ো মানুষ, হালা কালা, আমি কি অত পারি! তবে কড়িপাতি যা দেবে, তা সব খরচ করে আস্‌ব—তুমি বল্‌তে পাবে না যে, আমার এই খরচটা হলো না।

প্র। বাছা, তোমার মত গুণের লোক পাওয়া ভার।

গো-মা। তা মা, যা বল, তোমার আপনার গুণে বল।

প্রফুল্ল অপরাকে তখন বলিল, "তোমার নাম কি গা?"

নবাগতা সুন্দরী বলিল, "তা ভাই, জানি না।"

প্রফুল্ল হাসিয়া বলিল, "সে কি; বাপ-মায় কি নাম রাখে নাই?"

সুন্দরী বলিল, "রাখাই সম্ভব। কিন্তু আমি সবিশেষ অবগত নহি।"

প্র। সে কি গো?

সুন্দরী। জ্ঞান হইবার আগে হইতে আমি বাপ-মার কাছছাড়া। ছেলেবেলায় আমায় ছেলেধরায় চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিল।

প্র। বটে। তা তারাও ত একটা নাম রেখেছিল?

সুন্দরী। নানা রকম।

প্র। কি কি?

সুন্দরী। পোড়ারমুখী, লক্ষ্মীছাড়ী, হতভাগী, চুলোমুখী।

এতক্ষণ গোব্‌রার মা আবার কান হারাইয়াছিল। এই কয়টা সদ্যশ্রুত গুণবাচকশব্দে শ্রুতি জাগরিত হইল। সে বলিল, "যে আমায় পোড়ারমুখী বলে, সেই পোড়ারমুখী, যে আমায় চুলোমুখী বলে, সেই চুলোমুখী, যে আমায় আঁটকুড়ী বলে, সেই আঁটকুড়ী"—

সুন্দরী। (হাসিয়া) আঁটকুড়ী বলি নাই, বাছা!

গো-মা। তুই আঁটকুড়ী বলিলেও বলেছিস্‌, না বলিলেও বলেছিস্‌—কেন বল্‌বি লা?

প্রফুল্ল হাসিয়া বলিল, "তোমাকে বল্‌চে না গো—ও আমাকে বল্‌চে।"

তখন নিঃশ্বাস ফেলিয়া গোব্‌রার মা বলিল, "ও কপাল! আমাকে না? তা বলুক মা, বলুক, তুমি রাগ ক'রো না। ও বামনীর মুখটা বড় কদুষ্যি। তা বাছা! রাগ কর্‌তে নেই।" গোব্‌রার মার মুখে এইরূপ আত্মপক্ষে বীররস ও পক্ষান্তরে শান্তিরসের অবতারণা শুনিয়া যুবতীদ্বয় প্রীতা হইলেন। প্রফুল্ল অপরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বামনী? তা আমাকে এতক্ষণ বল নাই? আমার প্রণাম করা হয় নাই।" প্রফুল্ল প্রণাম করিল।

বয়স্যা আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল, "আমি বামনের মেয়ে বটে—এইরূপ শুনিয়াছি—কিন্তু বামনী নই।"

প্র। সে কি?

বয়স্যা। বামন জোটে নাই।

প্র। বিবাহ হয় নাই? সে কি?

বয়স্যা। ছেলেধরার কি বিয়ে দেয়?

প্র। চিরকাল তুমি ছেলেধরার ঘরে?

বয়স্যা। না, ছেলেধরায় এক রাজার বাড়ী বেচে এয়েছিল।

প্র। রাজারা বিয়ে দিল না?

বয়স্যা। রাজপুত্র ইচ্ছুক ছিলেন—কিন্তু বিবাহটা গান্ধর্বমত।

প্র। নিজে পাত্র বুঝি?

বয়স্যা। তাও কয়-দিনের জন্য বলিতে পারি না।

প্র। তার পর?

বয়স্যা। রকম দেখিয়া পলায়ন করিলাম।

তার পর।

বয়স্যা। রাজমহিষী কিছু গহনা দিয়াছিলেন, গহনা সমেত পলাইয়াছিলাম। সুতরাং ডাকাইতের হাতে পড়িলাম। সে ডাকাইতের দলপতি ভবানী ঠাকুর, তিনি আমার কাহিনী শুনিয়া আমার গহনা লইলেন না, বরং আরও কিছু দিলেন। আপনার গৃহে আমায় আশ্রয় দিলেন। আমি তাঁহার কন্যা, তিনি আমার পিতা। তিনিও আমাকে এক প্রকারে সম্প্রদান করিয়াছেন।

প্র। এক প্রকার কি?

বয়স্যা। সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে।

প্র। সে কি রকম?

বয়স্যা। রূপ, যৌবন, প্রাণ।

প্র। তিনিই তোমার স্বামী?

বয়স্যা। হাঁ—কেন না, যিনি সম্পূর্ণরূপে আমার অধিকারী, তিনিই আমার স্বামী।

প্রফুল্ল দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, “বলিতে পারি না। কখন স্বামী দেখ নাই, তাই বলিতেছ—স্বামী দেখিলে কখন শ্রীকৃষ্ণে মন উঠিত না।”

মূর্খ ব্রজেশ্বর এত জানিত না।

বয়স্যা বলিল, “শ্রীকৃষ্ণে সকল মেয়েরই মন উঠিতে পারে; কেন না, তাঁর রূপ অনন্ত, যৌবন অনন্ত, ঐশ্বর্য্য অনন্ত, গুণ অনন্ত।”

এ যুবতী ভবানী ঠাকুরের চেলা, কিন্তু প্রফুল্ল নিরক্ষর—এ কথার উত্তর দিতে পারিল না। হিন্দুধর্ম্মপ্রণেতারা উত্তর জানিতেন। ঈশ্বর অনন্ত জানি। কিন্তু অনন্তকে ক্ষুদ্র হৃদয়পিঞ্জরে পুরিতে পারি না। সান্তকে পারি। তাই অনন্ত জগদীশ্বর, হিন্দুর হৃৎপিঞ্জরে সান্ত শ্রীকৃষ্ণ; স্বামী আরও পরিষ্কাররূপে সান্ত। এই জন্য প্রেম পবিত্র হইলে, স্বামী ঈশ্বরে আরোহণের প্রথম সোপান। তাই হিন্দুর মেয়ের পতিই দেবতা। অন্য সব সমাজ, হিন্দুসমাজের কাছে এ অংশে নিকৃষ্ট।

প্রফুল্ল মূর্খ মেয়ে, কিছু বুঝিতে পারিল না। বলিল, “আমি অত কথা ভাই, বুঝিতে পারি না। তোমার নামটি কি, এখনও ত বলিলে না?”

বয়স্যা বলিল, “ভবানী ঠাকুর নাম রাখিয়াছেন নিশি, আমি দিবার বহিন নিশি। দিবাকে একদিন আলাপ করিতে লইয়া আসিব। কিন্তু যা বলিতেছিলাম, শোন। ঈশ্বরই পরমস্বামী। স্ত্রীলোকের পতিই দেবতা, শ্রীকৃষ্ণ সকলের দেবতা। দুটো দেবতা কেন, ভাই? দুই ঈশ্বর? এ ক্ষুদ্র প্রাণের ক্ষুদ্র ভক্তিটুকুকে দুই ভাগ

করিলে কতটুকু থাকে?”

প্র। দুর! মেয়েমানুষের ভক্তির কি শেষ আছে?

নিশি। মেয়েমানুষের ভালবাসার শেষ নাই। ভক্তি এক, ভালবাসা আর।

প্র। আমি তা আজও জানিতে পারি নাই। আমার দুই নূতন।

প্রফুল্লের চক্ষু দিয়া ঝর-ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। নিশি বলিল, “বুঝিয়াছি বোন্—তুমি অনেক দুঃখ পাইয়াছ।” তখন নিশি প্রফুল্লের গলা জড়াইয়া ধরিয়া তার চক্ষের জল মুছাইল। বলিল, “এত জানিতাম না।” নিশি তখন বুঝিল, ঈশ্বর-ভক্তির প্রথম সোপান পতি-ভক্তি।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

যে রাত্রে দুর্লভ চক্রবর্ত্তী প্রফুল্লকে তাহার মাতার বাড়ী হইতে ধরিয়া লইয়া যায়, দৈবগতিকে ব্রজেশ্বর সেই রাত্রেই প্রফুল্লের বাসস্থানে দুর্গাপুরে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ব্রজেশ্বরের একটি ঘোড়া ছিল, ঘোড়ায় চড়িতে ব্রজেশ্বর খুব মজ্‌বুত। যখন বাড়ীর সকলে ঘুমাইল, ব্রজেশ্বর গোপনে সেই অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অন্ধকারে দুর্গাপুরে প্রস্থান করিলেন। যখন তিনি প্রফুল্লের কুটীরে উপস্থিত হইলেন, তখন সে ভবন জনশূন্য, অন্ধকারময়। প্রফুল্লকে দস্যুতে লইয়া গিয়াছে। সেই রাত্রে ব্রজেশ্বর পাড়াপড়শী কাহাকেও পাইলেন না যে, জিজ্ঞাসা করেন।

ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে না দেখিতে পাইয়া মনে করিল যে, প্রফুল্ল একা থাকিতে না পারিয়া কোন কুটুম্ববাড়ী গিয়াছে। ব্রজেশ্বর অপেক্ষা করিতে পারিল না। বাপের ভয়, রাত্রিমধ্যেই ফিরিয়া আসিল। তার পর কিছু দিন গেল। হরবল্লভের সংসার যেমন চলিতেছিল, তেমনি চলিতে লাগিল। সকলে খায় দায় বেড়ায়—সংসারের কাজ করে। ব্রজেশ্বরের দিন কেবল ঠিক সে রকম যায় না। হঠাৎ কেহ কিছু বুঝিল না—জানিল না। প্রথমে মা জানিল। গৃহিণী দেখিল, ছেলের পাতে দুধের বাটিতে দুধ পড়িয়া থাকে, মাছের মুড়ার কেবল কণ্ঠার মাছটাই ভুক্ত হয়, “রান্না ভাল হয় নাই” বলিয়া, ব্রজ ব্যঞ্জন ঠেলিয়া রাখে। মা মনে করিলেন, ছেলের মন্দাগ্নি হইয়াছে। প্রথমে জারক লেবু প্রভৃতি টোট্‌কার ব্যবস্থা করিলেন, তার পর কবিরাজ ডাকিবার কথা হইল। ব্রজ হাসিয়া উড়াইয়া দিল। মাকে ব্রজ হাসিয়া উড়াইয়া দিল, কিন্তু ব্রহ্মঠাকুরাণীকে পারিল না। বুড়ী ব্রজেশ্বরকে একদিন একা পাইয়া চাপিয়া ধরিল।

“হ্যাঁ রে ব্রজ, তুই আর নয়ানবৌয়ের মুখ দেখিস্ না কেন?”

ব্রজ হাসিয়া বলিল, “মুখখানি একে অমাবস্যার রাত্রি, তাতে মেঘ ঝড় ছাড়া নেই—দেখিতে বড় সাধ নেই।”

ব্রহ্ম। তা মরুক গে, সে নয়ান্‌বৌ বুঝবে—তুই খাস্ নে কেন?

ব্রজ। তুমি যে রাঁধ!

ব্রহ্ম। আমি ত চিরকালই এমনি রাঁধি।

ব্রজ। আজকাল হাত পেকেছে।

ব্রহ্ম। দুধও বুঝি আমি রাঁধি? সেটাও কি রান্নার দোষ?

ব্রজ। গরুগুলোর দুধ বিগ্‌ড়ে গিয়াছে।

ব্রহ্ম। তুই হাঁ করে রাতদিন ভাবিস্ কি?

ব্রজ। কবে তোমায় গঙ্গায় নিয়ে যাব।

ব্রহ্ম। আর তোর বড়াইয়ে কাজ নাই। মুখে অমন অনেকে বলে! শেষে এই নিমগাছের তলায় আমায় গঙ্গায় দিবি—তুলসী গাছটাও দেখতে পাব না! তা তুই ভাব না যা হয়—কিন্তু তুই আমার গঙ্গা ভেবে ভেবে এত রোগা হ'য়ে গেলি কেন?

ব্রজ। ওটা কি কম ভাবনা?

ব্রহ্ম। কাল নাইতে গিয়ে রানায় ব'সে কি, ভাই, ভাব্‌ছিলি? চোখ দিয়ে জল পড়্‌ছিল কেন?

ব্রজ। ভাব্‌ছিলাম যে, স্নান করেই তোমার রান্না খেতে হবে। সেই দুঃখে চোখে জল এসেছিল।

ব্রহ্ম। সাগর এসে রেঁধে দিবে? তা হলে খেতে পারবি ত?

ব্রজ। কেন, সাগর ত রোজ রাঁধিত? খেলা-ঘরে যাও নি কোনও দিন? ধুলা-চড়চড়ি, কাদার সুক্ত, ইটের ঘণ্ট—একদিন আপনি খেয়ে দেখ না? তার পর আমায় খেতে ব'লো।

ব্রহ্ম। প্রফুল্ল এসে রেঁধে দিবে?

যেমন পথে কেহ প্রদীপ লইয়া যখন চলিয়া যায়, তখন পথিপার্শ্বস্থ অন্ধকার ঘরের উপর সেই আলো পড়িলে, ঘর একবার হাসিয়া আবার তখনই আঁধার হয়, প্রফুল্লের নামে ব্রজেশ্বরের মুখ তেমনই হইল। ব্রজ উত্তর করিল, "বাগ্দী যে।"

ব্রহ্ম। বাগ্দী না। সবাই জানে, সে মিছে কথা। তোমার বাপের কেবল সমাজের ভয়। ছেলের চেয়ে কিছু সমাজ বড় নয়। কথাটা কি আবার পাড়্‌ব?

ব্রজ। না, আমার জন্য সমাজে আমার বাপের অপমান হবে—তাও কি হয়?

সে দিন আর বেশী কথা হইল না। ব্রহ্মঠাকুরাণীও সবটুকু বুঝিতে পারিলেন না। কথাটা বড় সোজা নয়। প্রফুল্লের রূপ অতুলনীয়—একে ত রূপেই সে ব্রজেশ্বরের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, আবার সেই এক দিনেই ব্রজেশ্বর দেখিয়াছিলেন, প্রফুল্লের বাহির অপেক্ষা ভিতর আরও সুন্দর, আরও মধুর। যদি প্রফুল্ল—বিবাহিতা স্ত্রী—স্বাধিকারপ্রাপ্ত হইয়া নয়নতারার মত কাছে থাকিত, তবে এই উন্মাদকর মোহ সুস্নিগ্ধ স্নেহে পরিণত হইত। রূপের মোহ কাটিয়া যাইত, গুণের মোহ থাকিয়া যাইত। কিন্তু তা হইল না। প্রফুল্ল-বিদ্যুৎ একবার চমকাইয়া, চিরকালের জন্য অন্ধকারে মিশিল, সেই জন্য সেই মোহ সহস্র গুণে বল পাইল। কিন্তু এ ত গেল সোজা কথা। কঠিন এই যে, ইহার উপর দারুণ করুণা। সেই সোনার প্রতিমাকে তাহার অধিকারে বঞ্চিত করিয়া, অপমান করিয়া, মিথ্যা অপবাদ দিয়া, চিরকাল জন্য বহিষ্কৃত করিয়া দিতে হইয়াছে। সে এখন অন্নের কাঙ্গাল। বুঝি না খাইয়া মরিয়া যাইবে! যখন সেই প্রগাঢ় অনুরাগের উপর এই গভীর করুণা—তখন মাত্রা পূর্ণ। ব্রজেশ্বরের হৃদয় প্রফুল্লময়—আর কিছুরই স্থান নাই। বুড়ী এত কথাও বুঝিল না।

কিছুদিন পরে ফুলমণি নাপিতানীর প্রচারিত প্রফুল্লের তিরোধান-বৃত্তান্ত হরবল্লভের গৃহে পৌঁছিল। গল্প মুখে মুখে বদল হইতে হইতে চলে। সংবাদটা এখানে এইরূপ আকারে পৌঁছিল যে, প্রফুল্ল বাত-শ্লেষ্ম-বিকারে মরিয়াছে—মৃত্যুর পূর্ব্বে তার মরা মাকে দেখিতে পাইয়াছিল। ব্রজেশ্বরও শুনিল।

হরবল্লভ শৌচ স্নান করিলেন, কিন্তু শ্রাদ্ধাদি নিষেধ করিলেন। বলিলেন, "বাগ্দীর শ্রাদ্ধ বামনে করিবে?" নয়নতারাও স্নান করিল—মাথা মুছিয়া বলিল, "একটা পাপ গেল—আর একটার জন্য নাওয়াটা নাইতে পার্‌লেই শরীর জুড়ায়।" কিছু দিন গেল। ক্রমে ক্রমে শুকাইয়া শুকাইয়া, ব্রজেশ্বর বিছানা লইল। রোগ এমন কিছু নয়, একটু একটু জ্বর হয় মাত্র, কিন্তু ব্রজ নির্জ্জীব, শয্যাগত। বৈদ্য দেখিল। ঔষধপত্রে কিছু হইল না—রোগ বৃদ্ধি পাইল। শেষ ব্রজেশ্বর বাঁচে না বাঁচে।

আসল কথা আর বড় লুকান রহিল না। প্রথমে বুড়ী বুঝিয়াছিল, তার পর গিন্নী বুঝিলেন। এ সকল কথা মেয়েরাই আগে বুঝে। গিন্নী বুঝিলেই, কাজেই কর্ত্তা বুঝিলেন। তখন হরবল্লভের বুকে শেল বিঁধিল। হরবল্লভ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ছি! ছি! কি করিয়াছি! আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারিয়াছি!" গিন্নী প্রতিজ্ঞা করিলেন, "ছেলে না বাঁচিলে আমি বিষ খাইব।" হরবল্লভ প্রতিজ্ঞা করিলেন, "এবার দেবতা ব্রজেশ্বরকে বাঁচাইলে, আর আমি তার মন না বুঝিয়া কোন কাজ করিব না।"

ব্রজেশ্বর বাঁচিল। ক্রমে আরোগ্যলাভ করিতে লাগিল—ক্রমে শয্যা ত্যাগ করিল। একদিন, হরবল্লভের পিতার সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ উপস্থিত। হরবল্লভ শ্রাদ্ধ করিতেছেন, ব্রজেশ্বর সেখানে কোন কার্য্যোপলক্ষে উপস্থিত আছেন। তিনি শুনিলেন, শ্রাদ্ধান্তে পুরোহিত মন্ত্র পড়াইলেন—

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

কথাটি ব্রজেশ্বর কণ্ঠস্থ করিলেন। প্রফুল্লের জন্য যখন বড় কান্না আসিত, তখন মনকে প্রবোধ দিবার জন্য বলিতেন—

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

এইরূপে ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে ভুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ব্রজেশ্বরের পিতাই যে প্রফুল্লের মৃত্যুর কারণ, সেই কথা মনে পড়িলেই ব্রজেশ্বর ভাবিতেন—

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।"

প্রফুল্ল গেল, কিন্তু পিতার প্রতি তবুও ব্রজেশ্বরের ভক্তি অচলা রহিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

প্রফুল্লের শিক্ষা আরম্ভ হইল। নিশি ঠাকুরাণী, রাজার ঘরে থাকিয়া, পরে ভবানী ঠাকুরের কাছে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন—বর্ণশিক্ষা, হস্তলিপি, কিঞ্চিৎ শুভঙ্করী আঁক প্রফুল্ল তাঁহার কাছে শিখিল। তার পর পাঠক ঠাকুর নিজে অধ্যাপকের আসন গ্রহণ করিলেন। প্রথমে ব্যাকরণ আরম্ভ করাইলেন। আরম্ভ করাইয়া দুই চারিদিন পড়াইয়া অধ্যাপক বিস্মিত হইলেন। প্রফুল্লের বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ, শিখিবার ইচ্ছা অতি প্রবল—প্রফুল্ল বড় শীঘ্র শিখিতে লাগিল। তাহার পরিশ্রমে নিশিও বিস্মিতা হইল। প্রফুল্লের রন্ধন, ভোজন, শয়ন সব নামমাত্র, কেবল, "সু ঔ জস্, অম্ ঔ শস্" ইত্যাদিতে মন। নিশি বুঝিল যে, প্রফুল্ল সেই "দুই নূতনকে" ভুলিবার জন্য অনন্যচিত্ত হইয়া বিদ্যাশিক্ষার চেষ্টা করিতেছে। ব্যাকরণ কয়েক মাসে অধিকৃত হইল। তার পর প্রফুল্ল ভট্টিকাব্য জলের মত সাঁতার দিয়া পার হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে অভিধান অধিকৃত হইল। রঘু, কুমার, নৈষধ, শকুন্তলা প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ অবাধে অতিক্রান্ত হইল। তখন আচার্য্য একটু সংখ্যা, একটু বেদান্ত এবং একটু ন্যায় শিখাইলেন। এ সকল অল্প অল্প মাত্র। এই সকল দর্শনে ভূমিকা করিয়া, প্রফুল্লকে সবিস্তার যোগশাস্ত্রাধ্যয়নে নিযুক্ত করিলেন; এবং সর্ব্বশেষে সর্ব্বগ্রন্থশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভবদগীতা অধীত করাইলেন। পাঁচ বৎসরে শিক্ষা সম্পূর্ণ হইল।

এদিকে প্রফুল্লের ভিন্ন প্রকার শিক্ষাও তিনি ব্যবস্থা করিতে নিযুক্ত রহিলেন। গোব্‌রার মা কিছু কাজ করে না, কেবল হাট করে—সেটাও ভবানী ঠাকুরের ইঙ্গিতে। নিশিও বড় সাহায্য করে না, কাজেই প্রফুল্লকে সকল কাজ করিতে হয়। তাহাতে প্রফুল্লের কষ্ট নাই—মাতার গৃহেও সকল কাজ নিজে করিতে হইত। প্রথম বৎসর তাহার আহারের জন্য ভবানী ঠাকুর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—মোটা চাউল, সৈন্ধব, ঘি ও কাঁচকলা। আর কিছুই না। নিশির জন্য তাই। প্রফুল্লের তাহাতেও কোন কষ্ট হইল না। মার ঘরে সকল দিন এত জুটিত না। তবে প্রফুল্ল এক বিষয়ে ভবানী ঠাকুরের অবাধ্য হইল। একাদশীর দিন সে জোর করিয়া

মাছ খাইত—গোব্‌রার মা হাট হইতে মাছ না আনিলে, প্রফুল্ল খানা, ডোবা, বিল, খালে আপনি ছাঁকা দিয়া মাছ ধরিত; সুতরাং গোব্‌রার মা হাট হইতে একাদশীতে মাছ আনিতে আর আপত্তি করিত না।

দ্বিতীয় বৎসরে নিশির আহারের ব্যবস্থা পূর্ব্বমত রহিল। কিন্তু প্রফুল্লের পক্ষে কেবল নুন লঙ্কা ভাত আর একাদশীতে মাছ। তাহাতে প্রফুল্ল কোন আপত্তি করিল না।

তৃতীয় বৎসরে নিশির প্রতি আদেশ হইল, তুমি ছানা, সন্দেশ, ঘৃত, মাখন, ক্ষীর, ননী, ফল, মূল, অন্ন, ব্যঞ্জন উত্তমরূপে খাইবে; কিন্তু প্রফুল্লের নুন লঙ্কা ভাত। দুইজনে একত্র বসিয়া খাইবে। খাইবার সময়ে প্রফুল্ল ও নিশি দুই জনে বসিয়া হাসিত। নিশি ভাল সামগ্রী বড় খাইত না—গোব্‌রার মাকে দিত। এই পরীক্ষাতেও প্রফুল্ল উত্তীর্ণ হইল।

চতুর্থ বৎসরে প্রফুল্লের প্রতি উপাদেয় ভোজ্য খাইতে আদেশ হইল। প্রফুল্ল তাহা খাইল।

পঞ্চম বৎসরে তাহার প্রতি যথেচ্ছ ভোজনের উপদেশ হইল। প্রফুল্ল প্রথম বৎসরের মত খাইল।

শয়ন, বসন, স্নান, নিদ্রা সম্বন্ধে এতদনুরূপ অভ্যাসে ভবানী ঠাকুর শিষ্যাকে নিযুক্ত করিলেন। পরিধানে প্রথম বৎসরে চারিখানা কাপড়। দ্বিতীয় বৎসরে দুইখানা। তৃতীয় বৎসরে গ্রীষ্মকালে একখানা মোটা গড়া, অঙ্গে শুকাইতে হয়, শীতকালে একখানি ঢাকাই মলমল, অঙ্গে শুকাইয়া লইতে হয়। চতুর্থ বৎসরে পাট কাপড়, ঢাকাই কল্কাদার শান্তিপুরে। প্রফুল্ল সে সকল ছিঁড়িয়া খাটো করিয়া লইয়া পরিত। পঞ্চম বৎসরে বেশ ইচ্ছামত। প্রফুল্ল মোটা গড়াই বহাল রাখিল। মধ্যে মধ্যে ক্ষারে কাচিয়া লইত।

কেশবিন্যাস সম্বন্ধেও ঐরূপ। প্রথম বৎসরে তৈল নিষেধ, চুল রুক্ষ বাঁধিতে হইত। দ্বিতীয় বৎসরে চুল বাঁধাও নিষেধ। দিনরাত্র রুক্ষ চুলের রাশি আলুলায়িত থাকিত। তৃতীয় বৎসরে ভবানী ঠাকুরের আদেশ অনুসারে সে মাথা মুড়াইল। চতুর্থ বৎসরে নূতন চুল হইল; ভবানী ঠাকুর আদেশ করিলেন, "কেশ গন্ধ-তৈল দ্বারা নিষিক্ত করিয়া সর্ব্বদা রঞ্জিত করিবে।" পঞ্চম বৎসরে স্বেচ্ছাচার আদেশ করিলেন। প্রফুল্ল, পঞ্চম বৎসরে চুলে হাতও দিল না।

প্রথম বৎসরে তূলার তোষকে তুলার বালিশে প্রফুল্ল শুইল। দ্বিতীয় বৎসরে বিচালির বালিশ, বিচালির বিছানা। তৃতীয় বৎসরে ভূমি-শয্যা। চতুর্থ বৎসরে কোমল দুগ্ধফেননিভ শয্যা। পঞ্চম বৎসরে স্বেচ্ছাচার। পঞ্চম বৎসরে প্রফুল্ল যেখানে পাইত, সেখানে শুইত।

প্রথম বৎসরে ত্রিযাম নিদ্রা। দ্বিতীয় বৎসরে দ্বিযাম। তৃতীয় বৎসরে দুই দিন অন্তর রাত্রিজাগরণ। চতুর্থ বৎসরে তন্দ্রা আসিলেই নিদ্রা। পঞ্চম বৎসরে স্বেচ্ছাচার। প্রফুল্ল রাত জাগিয়া পড়িত ও পুঁথি নকল করিত।

প্রফুল্ল জল, বাতাস, রৌদ্র, আগুন সম্বন্ধেও শরীরকে সহিষ্ণু করিতে লাগিল। ভবানী ঠাকুর প্রফুল্লের প্রতি আর একটি শিক্ষার আদেশ করিলেন, তাহা বলিতে লজ্জা করিতেছে; কিন্তু না বলিলেও কথা অসম্পূর্ণ থাকে। দ্বিতীয় বৎসরে ভবানী ঠাকুর বলিলেন, "বাছা, একটু মল্লযুদ্ধ শিখিতে হইবে।" প্রফুল্ল লজ্জায় মুখ নত করিল, বলিল, "ঠাকুর আর যা বলেন, তা শিখিব, এটি পারিব না।"

ভ। এটি নইলে নয়।

প্র। সে কি ঠাকুর! স্ত্রীলোক মল্লযুদ্ধ শিখিয়া কি করিবে?

ভ। ইন্দ্রিয়জয়ের জন্য। দুর্ব্বল শরীর ইন্দ্রিয়জয় করিতে পারে না। ব্যায়াম ভিন্ন ইন্দ্রিয়জয় নাই।

প্র। কে আমাকে মল্লযুদ্ধ শিখাইবে? পুরুষ মানুষের কাছে আমি মল্লযুদ্ধ শিখিতে পারিব না।

ভ। নিশি শিখাইবে। নিশি ছেলেধরার মেয়ে। তারা বলিষ্ঠ বালক বালিকা ভিন্ন দলে রাখে না।* তাহাদের সম্প্রদায়ে থাকিয়া নিশি বাল্যকালে ব্যায়াম শিখিয়াছিল। আমি এ সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া নিশিকে তোমার কাছে পাঠাইয়াছি।

প্রফুল্ল চারি বৎসর ধরিয়া মল্লযুদ্ধ শিখিল।

প্রথম বৎসর ভবানী ঠাকুর প্রফুল্লের বাড়ীতে কোন পুরুষকে যাইতে দিতেন না বা তাহাকে বাড়ীর বাহিরে কোন পুরুষের সঙ্গে আলাপ করিতে দিতেন না। দ্বিতীয় বৎসরে আলাপ পক্ষে নিষেধ রহিত করিলেন। কিন্তু তাহার বাড়ীতে কোন পুরুষকে যাইতে দিতেন না। পরে তৃতীয় বৎসরে যখন প্রফুল্ল মাথা মুড়াইল, তখন ভবানী ঠাকুর বাছা বাছা শিষ্য সঙ্গে লইয়া প্রফুল্লের নিকট যাইতেন—প্রফুল্ল নেড়া মাথায়, অবনত মুখে তাহাদের সঙ্গে শাস্ত্রীয় আলাপ করিত। চতুর্থ বৎসরে ভবানী নিজ অনুচরদিগের মধ্যে বাছা বাছা লাঠিয়াল লইয়া আসিতেন; প্রফুল্লকে তাহাদের সহিত মল্লযুদ্ধ করিতে বলিলেন। প্রফুল্ল তাঁহার সম্মুখে তাহাদের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করিত। পঞ্চম বৎসরে কোন বিধি-নিষেধ রহিল না। প্রয়োজনমত প্রফুল্ল পুরুষদিগের সঙ্গে আলাপ করিত, নিষ্প্রয়োজনে করিত না। যখন প্রফুল্ল পুরুষমানুষদিগের সঙ্গে আলাপ করিত, তখন তাহাদিগকে আপনার পুত্র মনে করিয়া কথা কহিত।

এই মত নানারূপ পরীক্ষা ও অভ্যাসের দ্বারা অতুল সম্পত্তির অধিকারিণী প্রফুল্লকে ভবানী ঠাকুর ঐশ্বর্য্যভোগের যোগ্য পাত্রী করিতে চেষ্টা করিলেন। পাঁচ বৎসরে সকল শিক্ষা শেষ হইল।

একাদশীর দিনে মাছ ছাড়া আর একটি বিষয়ে মাত্র প্রফুল্ল ভবানী ঠাকুরের অবাধ্য হইল। আপনার পরিচয় কিছু দিল না। ভবানী ঠাকুর জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াও কিছু জানিতে পারিলেন না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

পাঁচ বৎসরে অধ্যাপনা সমাপ্ত করিয়া, ভবানী ঠাকুর প্রফুল্লকে বলিলেন, পাঁচ বৎসর হইল, "তোমার শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। আজ সমাপ্ত হইল। এখন তোমার হস্তগত ধন, তোমার ইচ্ছামত ব্যয় করিও—আমি নিষেধ করিব না। আমি পরামর্শ দিব—ইচ্ছা হয় গ্রহণ করিও। আহার আমি আর যোগাইব না,—তুমি আপনি আপনার দিনপাতের উপায় করিবে। কয়টি কথা বলিয়া দিই। কথাগুলি অনেকবার বলিয়াছি,—আর একবার বলি। "এখন তুমি কোন্ পথ অবলম্বন করিবে?"

প্রফুল্ল বলিল, "কর্ম্ম করিব, জ্ঞান আমার মত অসিদ্ধের জন্য নহে।"

ভবানী বলিল, "ভাল ভাল, শুনিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু কর্ম্ম, অসক্ত হইয়া করিতে হইবে। মনে আছে ত, ভগবান্ বলিয়াছেন—

"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরণ্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥"

এখন অনাসক্তি কি? তাহা জান। ইহার প্রথম লক্ষণ, ইন্দ্রিয়-সংযম। এই পাঁচ বৎসর ধরিয়া তোমাকে তাহা শিখাইয়াছি, এখন আর বেশী বলিতে হইবে না। দ্বিতীয় লক্ষণ, নিরহঙ্কার। নিরহঙ্কার ব্যতীত ধর্ম্মাচরণ নাই। ভগবান্ বলিয়াছেন—

"প্রকৃতে, ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥"

ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা যে সকল কর্ম্ম কৃত তাহা আমি করিলাম, এই জ্ঞানই অহঙ্কার। যে কাজই কর, তোমার গুণে তাহা হইল, কখনও তাহা মনে করিবে না। করিলে পুণ্য কর্ম্ম অকর্ম্মাত্ব প্রাপ্ত হয়। তার পর তৃতীয় লক্ষণ এই যে, সর্ব্ব-কর্ম্ম-ফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিবে। ভগবান্ বলিয়াছেন—

“যৎ করোষি, যদশ্নাসি, যজ্জুহোষি দদাসি যৎ
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুস্ব মদর্পণম্ ॥”

এখন বল দেখি মা, তোমার এই ধনরাশি লইয়া তুমি কি করিবে?

প্র। যখন আমার সকল কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলাম, তখন আমার এই ধনও শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলাম।

ভ। সব?

প্র। সব।

ভ। ঠিক তাহা হইলে কর্ম্ম অনাসক্ত হইবে না। আপনার আহারের জন্য যদি তোমাকে চেষ্টিতে হইতে হয়, তাহা হইলে আসক্তি জন্মিবে। অতএব তোমাকে হয় ভিক্ষাবৃত্ত হইতে হইবে, নয় এই ধন হইতেই দেহ রক্ষা করিতে হইবে। ভিক্ষাতেও আসক্তি আছে। অতএব এই ধন হইতে আপনার দেহরক্ষা করিবে। আর সব শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ কর। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ—পাদপদ্মে এ ধন পৌঁছিবে কি প্রকারে?

প্র। শিখিয়াছি, তিনি সর্ব্বভূতস্থিত। অতএব সর্ব্বভূতে এ ধন বিতরণ করিব।

ভ। ভাল ভাল। ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—

“যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥
সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোহর্জ্জুনে।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥”*

কিন্তু এই সর্ব্বভূতসংক্রামক দানের জন্য অনেক কষ্ট, অনেক শ্রমের প্রয়োজন। তাহা তুমি পারিবে?

প্র। এত দিন কি শিখিলাম?

ভ। সে কষ্টের কথা বলিতেছি না। কখন কখন কিছু দোকানদারি চাই। কিছু বেশ বিন্যাস, কিছু ভোগবিলাসের ঠাট প্রয়োজন হইবে। সে বড় কষ্ট। তাহা সহিতে পারিবে?

প্র। সে কি রকম?

ভ। শোন। আমি ত ডাকাইতি করি। তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

প্র। আমার কাছে শ্রীকৃষ্ণের যে ধন আছে, কিছু আপনার কাছে থাক্। এই ধন লইয়া ধর্ম্মচারণে প্রবৃত্ত থাকুন। দুষ্কর্ম্ম হইতে ক্ষান্ত হউন।

ভ। ধনে আমারও কোন প্রয়োজন নাই। ধনও আমার যথেষ্ট আছে। আমি ধনের জন্য ডাকাইতি করি না।

প্র। তবে কি?

ভ। আমি রাজত্ব করি।

প্র। ডাকাইতি কি রকম রাজত্ব?

ভ। যাহার হাতে রাজদণ্ড, সেই রাজা।

প্র। রাজার হাতে রাজদণ্ড।

ভ। এ দেশে রাজা নাই। মুসলমান লোপ পাইয়াছে। ইংরেজ সম্প্রতি ঢুকিতেছে—তাহারা রাজ্য শাসন করিতে জানেও না, করেও না। আমি দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করি।

প্র। ডাকাইতি করিয়া?

ভ। শুন, বুঝাইয়া দিতেছি।

ভবানী ঠাকুর বলিতে লাগিলেন, প্রফুল্ল শুনিতে লাগিল।

ভবানী, ওজস্বী বাক্যপরম্পরার সংযোগে দেশের দুরবস্থা বর্ণনা করিলেন, ভূম্যধিকারীর দুর্ব্বিষহ দৌরাত্ম্য বর্ণনা করিলেন, কাছারির কর্ম্মচারীরা বাকিদারের ঘরবাড়ী লুঠ করে, লুকান ধনের তল্লাসে ঘর ভাঙ্গিয়া, মেঝ্যা খুঁড়িয়া দেখে, পাইলে এক গুণের জায়গায় সহস্র গুণ লইয়া যায়, না পাইলে মারে, বাঁধে, কয়েদ করে, পোড়ায়, কুড়ুল মারে, ঘর জ্বালাইয়া দেয়, প্রাণবধ করে। সিংহাসন হইতে শালগ্রাম ফেলিয়া দেয়, শিশুর পা ধরিয়া আছাড় মারে, যুবকের বুকে বাঁশ দিয়া দলে, বৃদ্ধের চোখের ভিতর পিঁপড়ে, নাভিতে পতঙ্গ পুরিয়া বাঁধিয়া রাখে। যুবতীকে কাছারিতে লইয়া গিয়া সর্ব্বসমক্ষে উলঙ্গ করে, মারে, স্তন কাটিয়া ফেলে, স্ত্রীজাতির যে শেষ অপমান, চরম বিপদ্, সর্ব্বসমক্ষেই তাহা প্রাপ্ত করায়। এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার প্রাচীন কবির ন্যায় অত্যুন্নত শব্দচ্ছটাবিন্যাসে বিবৃত করিয়া ভবানী ঠাকুর বলিলেন, "এই দুরাত্মদিগের আমিই দণ্ড দিই। অনাথা দুর্ব্বলকে রক্ষা করি। কি প্রকারে করি, তাহা তুমি দুই দিন সঙ্গে থাকিয়া দেখিবে?"

প্রফুল্লের হৃদয় প্রজাবর্গের দুঃখের কাহিনী শুনিয়া গলিয়া গিয়াছিল। সে ভবানী ঠাকুরকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ করিল। বলিল, "আমি সঙ্গে যাইব। ধনব্যয়ে যদি আমার এখন অধিকার হইয়াছে, তবে আমি কিছু ধন সঙ্গে লইয়া যাইব। দুঃখীদিগকে দিয়া আসিব।"

ভ। এই কাজে দোকানদারি চাই, বলিতেছিলাম। যদি আমার সঙ্গে যাও, কিছু কিছু ঠাট সাজাইতে হইবে, সন্ন্যাসিনীবেশে এ কাজ সিদ্ধ হইবে না।

প্র। কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়াছি। কর্ম্ম তাঁহার, আমার নহে। কর্ম্মোদ্ধারের জন্য যে সুখ দুঃখ, তাহা আমার নহে, তাঁরই। তাঁর কর্ম্মের জন্য যাহা করিতে হয়, করিব।

ভবানী ঠাকুরের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। তিনি যখন ডাকাইতিতে সদলে বাহির হইলেন, প্রফুল্ল ধনের ঘড়া লইয়া তাঁহার সঙ্গে চলিল। নিশিও সঙ্গে গেল।

ভবানী ঠাকুরের অভিসন্ধি যাহাই হৌক, তাঁহার একখানি শাণিত অস্ত্রের প্রয়োজন ছিল। তাই প্রফুল্লকে পাঁচ বৎসর ধরিয়া শাণ দিয়া, তীক্ষ্ণধার অস্ত্র করিয়া লইয়াছিলেন। পুরুষ হইলেই ভাল হইত, কিন্তু প্রফুল্লের মত নানাগুণযুক্ত পুরুষ পাওয়া যায় নাই—বিশেষ এত ধন কোন পুরুষের নাই। ধনের ধার বড় ধার। তবে ভবানী ঠাকুরের একটা বড় ভুল হইয়াছিল—প্রফুল্ল একাদশীর দিন জোর করিয়া মাছ খাইত, এ কথাটা আর একটু তলাইয়া বুঝিলে ভাল হইত। যাহা হৌক, এখন আমরা প্রফুল্লকে জীবনতরঙ্গে ভাসাইয়া দিয়া আরও পাঁচ বৎসর ঘুমাই, প্রফুল্লের অন্য শিক্ষা হইয়াছে। কর্ম্মশিক্ষা হয় নাই। এই পাঁচ বৎসর ধরিয়া কর্ম্মশিক্ষা হৌক।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

পাঁচে পাঁচে দশ বৎসর অতীত হইয়া গেল। যে দিন প্রফুল্লকে বাগ্দীর মেয়ে বলিয়া হরবল্লভ তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, সে দিন হইতে দশ বৎসর হইয়া গিয়াছে। এই দশ বৎসর হরবল্লভ রায়ের পক্ষে বড় ভাল গেল না। দেশের দুর্দ্দশার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইজারাদার দেবী সিংহের অত্যাচার, তার উপরে ডাকাইতের অত্যাচার। একবার হরবল্লভের তালুক হইতে টাকা চালান আসিতেছিল, ডাকাইতে তাহা লুঠিয়া লইল। সেবার দেবী সিংহের খাজনা দেওয়া হইল না। দেবী সিংহ একখানা তালুক বেচিয়া লইল। দেবী সিংহের বেচিয়া লওয়ার প্রথা মন্দ ছিল না। হেষ্টিংস্ সাহেব ও গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের কৃপায় সকল সরকারী কর্ম্মচারী দেবী সিংহের আজ্ঞাবহ; বেচাকেনা সম্বন্ধে সে যাহা মনে করিত, তাহাই হইত। হরবল্লভের দশ হাজার টাকার মূল্যের তালুকখানা আড়াই শত টাকায় দেবী সিংহ নিজে কিনিয়া লইলেন। তাহাতে বাকী খাজনা কিছুই পরিশোধ হইল না, দেনার জের চলিল। দেবী সিংহের পীড়াপীড়িতে, কয়েদের আশঙ্কায়, হরবল্লভ আর একটা সম্পত্তি বন্ধক দিয়া ঋণ পরিশোধ করিলেন। এই সকল কারণে আয় বড় কমিয়া আসিল। কিন্তু ব্যয় কিছুই কমিল না—বুনিয়াদি চাল খাটো করা যায় না। সকল লোকেরই প্রায় এমন না এমন একদিন উপস্থিত হয়, যখন লক্ষ্মী আসিয়া বলেন, "হয় সাবেক চাল ছাড়, নয় আমায় ছাড়।" অনেকেই উত্তর দেন, "মা! তোমায় ছাড়িলাম, চাল ছাড়িতে পারি না।" হরবল্লভ তাহারই একজন। দোল-দুর্গোৎসব, ক্রিয়া-কর্ম্ম, দান-ধ্যান, লাঠালাঠি পূর্ব্বমতই হইতে লাগিল—বরং ডাকাইতে চালান লুঠিয়া লওয়া অবধি লাঠিয়ালের খরচটা কিছু বাড়িয়াছিল। খরচ আর কুলায় না। কিস্তি কিস্তি সরকারী খাজনা বাকি পড়িতে লাগিল। বিষয় আশয় যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহাও বিক্রয় হইয়া যায়, আর থাকে না। দেনার উপর দেনা হইল, সুদে আসল ছাপাইয়া উঠিল—টাকা আর ধার পাওয়া যায় না।

এদিকে দেবী সিংহের পাওনা প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা বাকি পড়িল। হরবল্লভ কিছুতেই টাকা দিতে পারেন না—শেষ হরবল্লভ রায়কে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পরওয়ানা বাহির হইল। তখনকার গ্রেপ্তারি পরওয়ানার জন্য বড় আইন-কানুন খুঁজিতে হইত না, তখন ইংরেজের আইন হয় নাই। সব তখন বে-আইন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বড় ধুম পড়িয়াছে। ব্রজেশ্বর শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছেন। কোন্ শ্বশুরবাড়ী তাহা বলাবাহুল্য। সাগরের বাপের বাড়ী। তখনকার দিনে একটা জামাই আসা বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। তাতে আবার ব্রজেশ্বর শ্বশুরবাড়ী সচরাচর আসে না। পুকুরে পুকুরে, মাছমহলে ভারি হুটাহুটি, ছুটাছুটি পড়িয়া গেল। জেলের দৌরাত্ম্যে প্রাণ আর রক্ষা হয় না। জেলে-মাগীদের হাঁটাহাঁটিতে পুকুরে জল কালী হইয়া যাইতে লাগিল। মাছ চুরির আশায় ছেলেরা পাঠশালা ছাড়িয়া দিল। দই, দুধ, ননী, ছানা, সর, মাখনের ফরমাইসের জ্বালায় গোয়ালার মাথা বেঠিক্ হইয়া উঠিল; সে কখনও এক সের জল মিশাইতে তিন সের মিশাইয়া ফেলে, তিন সের মিশাইতে এক সের মিশাইয়া বসে। কাপড়ের ব্যাপারীর কাপড়ের মোট লইয়া যাতায়াত করিতে করিতে পায় ব্যথা হইয়া গেল; কাহারও পছন্দ হয় না, কোন্ ধুতি চাদর কে জামাইকে দিবে। পাড়ার মেয়েমহলে বড় হাঙ্গামা পড়িল। যাহার যাহার গহনা আছে, তারা সে সকল সারাইতে, মাজিতে, ঘষিতে, নূতন করিয়া গাঁথাইতে লাগিল। যাহাদের গহনা নাই, তাহারা চুড়ি কিনিয়া, শাঁখা কিনিয়া, সোণা-রূপা চাহিয়া চিন্তিয়া এক রকম বেশভূষার যোগাড় করিয়া রাখিল—নহিলে

জামাই দেখিতে যাওয়া হয় না। যাঁহাদের রসিকতার জন্য পসার আছে—তাঁহারা দুই চারিটা প্রাচীন তামাশা মনে মনে ঝালাইয়া রাখিলেন; যাহাদের পসার নাই, তাহারা চোরাই মাল পাচার করিবার চেষ্টায় রহিল। কথার তামাশা পরে হবে—খাবার তামাশা আগে। তাহার জন্য ঘরে ঘরে কমিটি বসিয়া গেল। বহুতর কৃত্রিম আহার্য্য, পানীয়, ফল-মূল প্রস্তুত হইতে লাগিল। মধুর অধরগুলি মধুর হাসিতে ও সাধের মিশিতে ভরিয়া যাইতে লাগিল।

কিন্তু যার জন্য এত উদ্যোগ, তার মনে সুখ নাই। ব্রজেশ্বর আমোদ আহ্লাদের জন্য শ্বশুরালয়ে আসেন নাই। বাপের গ্রেপ্তারি পরওয়ানা বাহির হইয়াছে—রক্ষার উপায় নাই। কেহ টাকা ধার দেয় না। শ্বশুরের টাকা আছে—শ্বশুর ধার দিলে দিতে পারে, তাই ব্রজেশ্বর শ্বশুরের কাছে আসিয়াছেন।

শ্বশুর বলিলেন, "বাপু হে, আমার যে টাকা, সে তোমারই জন্য আছে—আমার আর কে আছে, বল? কিন্তু টাকাগুলি যত দিন আমার হাতে আছে, তত দিন আছে,—তোমার বাপকে দিলে কি আর থাক্‌বে? মহাজনে খাইবে। অতএব কেন আপনার ধন আপনি নষ্ট করিতে চাও?"

ব্রজেশ্বর বলিল, "হৌক—আমি ধনের প্রত্যাশী নই—আমার বাপকে বাঁচান আমার প্রথম কাজ।"

শ্বশুর রুক্ষভাবে বলিলেন, "তোমার বাপ বাঁচিলে আমার মেয়ের কি? আমার মেয়ের টাকা থাকিলে দুঃখ ঘুচিবে—শ্বশুর বাঁচিলে দুঃখ ঘুচিবে না।"

কড়া কথায় ব্রজেশ্বরের বড় রাগ হইল। ব্রজেশ্বর বলিলেন, "তবে আপনার মেয়ে টাকা লইয়া থাকুক। বুঝিয়াছি, জামাইয়ে আপনার কোন প্রয়োজন নাই। আমি জন্মের মত বিদায় হইলাম।"

তখন সাগরের পিতা দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া ব্রজেশ্বরকে বিস্তর তিরস্কার করিলেন। ব্রজেশ্বর কড়া কড়া উত্তর দিল। কাজেই ব্রজেশ্বর তল্পিতল্পা বাঁধিতে লাগিল। শুনিয়া, সাগরের মাথায় বজ্রাঘাত হইল।

সাগরের মা জামাইকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। জামাইকে অনেক বুঝাইলেন। জামাইয়ের রাগ পড়িল না। তার পর সাগরের পালা।

বধূ শ্বশুরবাড়ী আসিলে দিবসে স্বামীর সাক্ষাৎ পাওয়া সেকালে যতটা দুরূহ ছিল, পিত্রালয়ে ততটা নয়। সাগরের সঙ্গে নিভৃতে ব্রজেশ্বরের সাক্ষাৎ হইল। সাগর ব্রজেশ্বরের পায় পড়িল, বলিল, "আর এক দিন থাক—আমি ত কোন অপরাধ করি নাই?"

ব্রজেশ্বরের তখন বড় রাগ ছিল—রাগে পা টানিয়া লইলেন। রাগের সময় শারীরিক ক্রিয়া সকল বড় জোরে জোরে হয়, আর হাত-পায়ের গতিও ঠিক অভিমতরূপ হয় না। একটা করিতে বিকৃতি জন্য আর একটা হইয়া পড়ে। সেই কারণে, আর কতকটা সাগরের ব্যস্ততার কারণ, পা সরাইয়া লইতে প্রমাদ ঘটিল। পা একটু জোরে সাগরের গায়ে লাগিল। সাগর মনে করিল, স্বামী রাগ করিয়া আমাকে লাথি মারিলেন। সাগর স্বামীর পা ছাড়িয়া দিয়া কুপিত ফণিনীর ন্যায় দাঁড়াইয়া উঠিল। বলিল, "কি? আমায় লাথি মারিলে?"

বাস্তবিক ব্রজেশ্বরের লাথি মারিবার ইচ্ছা ছিল না,—তাই বলিলেই মিটিয়া যাইত। কিন্তু একে রাগের সময়, আবার সাগর চোখ-মুখ ঘুরাইয়া দাঁড়াইল,—ব্রজেশ্বরের রাগ বাড়িয়া গেল। বলিলেন, "যদি মারিয়াই থাকি? তুমি না হয় বড়মানুষের মেয়ে, কিন্তু পা আমার—তোমার বড়মানুষ বাপও এ পা একদিন পূজা করিয়াছিলেন।"

সাগর রাগে জ্ঞান হারাইল। বলিল, "ঝক্‌মারি করিয়াছিলেন। আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করিব।"

ব্র। পাল্‌টে লাথি মারবে না কি?

সা। আমি তত অধম নহি। কিন্তু আমি যদি ব্রাহ্মণের মেয়ে হই, তবে তুমি আমার পা—

সাগরের কথা ফুরাইতে না ফুরাইতে পিছনের জানালা হইতে কে বলিল, "আমার পা কোলে লইয়া, চাকরের মত টিপিয়া দিবে।"

সাগরের মুখে সেই রকম কি কথা আসিতেছিল। সাগর না ভাবিয়া চিন্তিয়া, পিছন ফিরিয়া না দেখিয়া, রাগের মাথায় সেই কথাই বলিল, "আমার পা কোলে লইয়া চাকরের মত টিপিয়া দিবে।"

ব্রজেশ্বরও রাগে সপ্তমে চড়িয়া কোন দিকে না চাহিয়া বলিল, "আমারও সেই কথা। যত দিন আমি তোমার পা টিপিয়া না দিই, তত দিন আমিও তোমার মুখ দেখিব না। যদি আমার এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়, তবে আমি অব্রাহ্মণ।"

তখন রাগে রাগে তিনটা হইয়া ফুলিয়া ব্রজেশ্বর চলিয়া গেল। সাগর পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিল। এমন সময়ে সাগর যে ঘরে বসিয়া কাঁদিতেছিল, সেই ঘরে একজন পরিচারিকা, ব্রজেশ্বর গেলে পর সাগরের কি অবস্থা হইয়াছে, ইহা দেখিবার অভিপ্রায়ে ভিতরে প্রবেশ করিল, ছুতানতা করিয়া দুই একটা কাজ করিতে লাগিল। তখন সাগরের মনে পড়িল যে, জানালা হইতে কে কথা কহিয়াছিল, সাগর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই জানেলা হইতে কথা কহিয়াছিলি?"

সে বলিল, "কই না?"

সাগর বলিল, "তবে কে জানেলায় দেখ্ ত।"

তখন সাক্ষাৎ ভগবতীর মত রূপবতী ও তেজস্বিনী একজন স্ত্রীলোক ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। সে বলিল, "জানালায় আমি ছিলাম।"

সাগর জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে গা?"

তখন সে স্ত্রীলোক বলিল, "তোমরা কি কেউ আমায় চেন না।"

সাগর বলিল— "না—কে তুমি?" তখন সেই স্ত্রীলোক উত্তর করিল, "আমি দেবী চৌধুরাণী।"

পরিচারিকার হাতে পানের বাটা ছিল, ঝন্ ঝন্ করিয়া পড়িয়া গেল। সেও কাঁপিতে কাঁপিতে আঁ—আঁ—আঁ—আঁ শব্দ করিতে করিতে বসিয়া পড়িল। কাঁকালের কাপড় খসিয়া পড়িল।

দেবী চৌধুরাণী তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল, "চুপ রহো, হারামজাদি! খাড়া রহো!"

পরিচারিকা কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। সাগরেরও গায়ে ঘাম দিতেছিল। সাগরের মুখেও কথা ফুটিল না। যে নাম তাহাদের কাণে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা ছেলে বুড়ো কে না শুনিয়াছিল? সে নাম অতি ভয়ানক।

কিন্তু সাগর আবার ক্ষণেক পরে হাসিয়া উঠিল। তখন দেবী চৌধুরাণীও হাসিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বর্ষাকাল। রাত্রি জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্না এমন বড় উজ্জ্বল নয়, বড় মধুর, একটু অন্ধকারমাখা—পৃথিবীর স্বপ্নময় আবরণের মত। ত্রিস্রোতা নদী বর্ষাকালের জলপ্লাবনে কূলে কূলে পরিপূর্ণ। চন্দ্রের কিরণ সেই তীব্রগতি নদীজলের স্রোতের উপর—স্রোতে, আবর্ত্তে, কদাচিৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে জ্বলিতেছে। কোথাও জল একটু ফুটিয়া উঠিতেছে—সেখানে একটু চিকিমিকি, কোথাও চরে ঠেকিয়া ক্ষুদ্র বীচিভঙ্গ হইতেছে, সেখানে একটু ঝিকিমিকি। তীরে গাছের গোড়ায় জল আসিয়া লাগিয়াছে—গাছের ছায়া পড়িয়া সেখানে জল বড় অন্ধকার; অন্ধকারে গাছের ফুল, ফল, পাতা বাহিয়া তীব্র স্রোত চলিতেছে; তীরে ঠেকিয়া জল একটু তর-তর কল-কল পত-পত শব্দ করিতেছে—কিন্তু সে আঁধারে আঁধারে। আঁধারে, আঁধারে, সে বিশাল জলধারা সমুদ্রানুসন্ধানে পক্ষিণীর বেগে ছুটিয়াছে। কূলে কূলে অসংখ্য কল-কল শব্দ আবর্ত্তের ঘোর গর্জ্জন, প্রতিহত স্রোতের তেমনি গর্জ্জন; সর্ব্বশুদ্ধ একটা গম্ভীর গগনব্যাপী শব্দ উঠিতেছে।

সেই ত্রিস্রোতার উপরে, কূলের অনতিদূরে একখানি বজরা বাঁধা আছে। বজরার অনতিদূরে একটা বড় তেঁতুলগাছের ছায়ায়, অন্ধকারে আর একখানি নৌকা আছে—তাহার কথা পরে বলিব, আগে বজরার কথা বলি। বজরাখানি নানাবর্ণে চিত্রিত; তাহাতে কত রকম মুরদ আঁকা আছে। তাহার পিতলের হাতল ডাণ্ডা প্রভৃতিতে রূপার গিল্‌টি। গলুইয়ে একটা হাঙ্গরের মুখ—সেটাও গিল্‌টি করা। সর্ব্বত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, উজ্জ্বল, আবার নিস্তব্ধ। নাবিকেরা এক পাশে বাঁশের উপর পাল ঢাকা দিয়া শুইয়া আছে; কেহ জাগিয়া থাকার চিহ্ন নাই। কেবল বজরার ছাদের উপর—একজন মানুষ। অপূর্ব্ব দৃশ্য!

ছাদের উপর একখানি ছোট গালিচা পাতা। গালিচাখানি দুই আঙ্গুল পুরু—বড় কোমল, নানাবিধ চিত্রে চিত্রিত। গালিচার উপর বসিয়া একজন স্ত্রীলোক। তাহার বয়স অনুমান করা ভার—পঁচিশ বৎসরের নীচে তেমন পূর্ণায়ত দেহ দেখা যায় না; পঁচিশ বৎসরের উপর তেমন যৌবনের লাবণ্য কোথাও পাওয়া যায় না। বয়স যাই হউক—সে স্ত্রীলোক পরম সুন্দরী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এ সুন্দরী কৃশাঙ্গী নহে—অথচ স্থূলাঙ্গী বলিলেই ইহার নিন্দা হইবে। বস্তুতঃ ইহার অবয়ব সর্ব্বত্র ষোল কলা সম্পূর্ণ—আজি ত্রিস্রোতা যেমন কূলে কূলে পুরিয়াছে, ইহারও শরীর তেমনই কূলে কূলে পুরিয়াছে। তার উপর বিলক্ষণ উন্নত দেহ। দেহ তেমন উন্নত বলিয়াই স্থূলাঙ্গী বলিতে পারিলাম না। যৌবন-বর্ষার চারি পোয়া বন্যার জল, সে কমনীয় আধারে ধরিয়াছে—ছাপায় নাই। কিন্তু জল কূলে কূলে পুরিয়া টল-টল করিতেছে—অস্থির হইয়াছে। জল অস্থির, কিন্তু নদী অস্থির নহে; নিস্তরঙ্গ। লাবণ্য চঞ্চল কিন্তু সে লাবণ্যময়ী চঞ্চলা নহে—নির্ব্বিকার। সে শান্ত, গম্ভীর, মধুর, অথচ আনন্দময়ী; সেই জ্যোৎস্নাময়ী নদীর অনুষঙ্গিনী। সেই নদীর মত, সেই সুন্দরীও বড় সুসজ্জিতা। এখন ঢাকাই কাপড়ের তত মর্য্যাদা নাই—কিন্তু এক শত বৎসর আগে কাপড়ও ভাল হইত। উপযুক্ত মর্য্যাদাও ছিল। ইহার পরিধানে একখানি পরিষ্কার মিহি ঢাকাই, তাতে জরির ফুল। তাহার ভিতর হীরা-মুক্তা-খচিত কাঁচলি ঝক্‌মক্ করিতেছে। হীরা, পান্না, মতি, সোণায় সেই পরিপূর্ণ দেহ মণ্ডিত; জ্যোৎস্নার আলোকে বড় ঝক্‌মক্ করিতেছে। নদীর জলে যেমন চিকিমিকি—এই শরীরেও তাই। জ্যোৎস্নাপুলকিত স্থির নদীজলের মত—সেই শুভ্র বসন; আর জলে মাঝে মাঝে যেমন জ্যোৎস্নার চিকিমিকি চিকিমিকি—শুভ্র বসনের মাঝে মাঝে তেমনি হীরা, মুক্তা, মতির, চিকিমিকি। আবার নদীর যেমন তীরবর্ত্তী বনচ্ছায়া, ইহারও তেমনি অন্ধকার কেশরাশি আলুলায়িত হইয়া অঙ্গের উপর পড়িয়াছে। কোঁকড়াইয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া, ফিরিয়া ফিরিয়া, গোছায় গোছায় কেশ পৃষ্ঠে, অংসে, বাহুতে, বক্ষে পড়িয়াছে; তার মসৃণ কোমল প্রভার উপর চাঁদের আলো খেলা করিতেছে; তাহার সুগন্ধি চূর্ণ গন্ধে গগন পরিপূরিত হইয়াছে। এক ছড়া যুঁই ফুলের গড়ে সেই কেশরাজি সংবেষ্টন করিতেছে।

ছাদের উপর গালিচা পাতিয়া, সেই বহুরত্নমণ্ডিতা রূপবতী মূর্ত্তিমতী সরস্বতীর ন্যায় বীণাবাদনে নিযুক্তা। চন্দ্রের আলোয় জ্যোৎস্নার মত বর্ণ মিশিয়াছে; তাহার সঙ্গে সেই মৃদুমধুর বীণার ধ্বনিও মিশিতেছে—যেমন জলে জলে চন্দ্রের কিরণ খেলিতেছে, যেমন এ সুন্দরীর অলঙ্কারে চাঁদের আলো খেলিতেছে, এ বন্যকুসুম-সুগন্ধি কৌমুদীস্নাত বায়ুস্তর সকলে সেই বীণার শব্দ তেমনি খেলিতেছিল। ঝম্ ঝম্ ছন্ ছন্ ঝনন্ ঝনন্ ছনন্ ছনন্ দম্ দম্ দ্রিম্ দ্রিম্ বলিয়া বীণে কত কি বাজিতেছিল, তাহা আমি বলিতে পারি না। বীণা কখন কাঁদে, কখন রাগিয়া উঠে, কখন নাচে, কখন আদর করে, কখন গর্জ্জিয়া উঠে—বাজিয়ে টিপি টিপি হাসে। ঝিঁঝিট, খাম্বাজ, সিন্ধু—কত মিঠে রাগিণী বাজিল—কেদার, হাম্বীর, বেহাগ—কত গম্ভীর রাগিণী বাজিল—কানাড়া, সাহানা, বাগীশ্বরী কত—জাঁকাল রাগিণী বাজিল—নাদ, কুসুমের মালার মত নদীকল্লোল-স্রোতে ভাসিয়া গেল। তার পর দুই একটা পরদা উঠাইয়া নামাইয়া লইয়া, সহসা নূতন উৎসাহে উন্মুখী হইয়া, সে বিদ্যাবতী ঝন্ ঝন্ করিয়া বীণের তারে বড় বড় ঘা দিল। কাণের পিপুলপাত দুলিয়া উঠিল—মাথায় সাপের মত চুলের গোছা সব নড়িয়া উঠিল—বীণে নটরাগিণী বাজিতে লাগিল। তখন যাহারা পাল মুড়ি দিয়া এক প্রান্তে নিঃশব্দে নিদ্রিতবৎ শুইয়াছিল, তাহার মধ্যে একজন উঠিয়া আসিয়া নিঃশব্দে সুন্দরীর নিকটে দাঁড়াইল।

এ ব্যক্তি পুরুষ। সে দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠগঠন; ভারি রকমের এক জোড়া চৌগোঁপ্পা আছে। গলায় যজ্ঞোপবীত। সে নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে?"

সেই স্ত্রীলোক বলিল, "দেখিতে পাইতেছ না?"

পুরুষ বলিল, "কিছু না। আসিতেছে কি?"

গালিচার উপর একটা ছোট দূরবীন পড়িয়াছিল। দূরবীন তখন ভারতবর্ষে নূতন আমদানী হইতেছিল। দূরবীন লইয়া সুন্দরী ঐ ব্যক্তির হাতে দিল—কিছু বলিল না। সে দূরবীন চক্ষে দিয়া নদীর সকল দিক নিরীক্ষণ করিল। শেষ এক স্থানে আর একখানি বজরা দেখিতে পাইয়া বলিল, "দেখিয়াছি——টেকের মাথায়—ঐ কি?"

উ। এ নদীতে আজকাল আর কোন বজরা আসিবার কথা নাই।

পুরুষ পুনর্ব্বার দূরবীন দিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

যুবতী বীণা বাজাইতে বাজাইতে বলিল, "রঙ্গরাজ!"

রঙ্গরাজ উত্তর করিল, "আজ্ঞা?"

"দেখ কি?"

"কয় জন লোক আছে, তাই দেখি।"

"কয় জন?"

"ঠিক ঠাওর পাই না। বেশী নয়। খুলিব?"

"খোল—ছিপ। আঁধারে আঁধারে নিঃশব্দে উজাইয়া যাও।" তখন রঙ্গরাজ ডাকিয়া বলিল, "ছিপ খোল।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বে বলিয়াছি, বজরার কাছে তেঁতুলগাছের ছায়ায় আর একখানি নৌকা অন্ধকারে লুকাইয়াছিল। সেখানি ছিপ—ষাট হাত লম্বা, তিন হাতের বেশী চৌড়া নয়। তাহাতে প্রায় পঞ্চাশ জন মানুষ গাদাগাদি হইয়া শুইয়াছিল। রঙ্গরাজের সঙ্কেত শুনিবামাত্র সেই পঞ্চাশ জন একবারে উঠিয়া বসিল। বাঁশের চেলা তুলিয়া সকলেই এক একগাছা সড়কি ও এক একখানা ছোট ঢাল বাহির করিল। হাতিয়ার কেহ হাতে রাখিল না—সবাই আপনার নিকট চেলার উপর সাজাইয়া রাখিল। রাখিয়া সকলেই এক একখানা "বোটে" হাতে করিয়া বসিল।

নিঃশব্দে ছিপ খুলিয়া, তাহারা বজরায় আসিয়া লাগাইল। রঙ্গরাজ তখন নিজ পঞ্চ হাতিয়ার বাঁধিয়া উহার উপর উঠিল। সেই সময়ে যুবতী তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "রঙ্গরাজ, আগে যাহা বলিয়া দিয়াছি, মনে থাকে যেন।"

"মনে আছে" বলিয়া রঙ্গরাজ ছিপে উঠিল। ছিপ নিঃশব্দে তীরে তীরে উজাইয়া চলিল। এদিকে যে বজরা রঙ্গরাজ দূরবীনে দেখিয়াছিল, তাহা নদী বাহিয়া খরস্রোতে তীব্রবেগে আসিতেছিল। ছিপকে বড় বেশী উজাইতে হইল না। বজরা নিকট হইলে, ছিপ তীর ছাড়িয়া বজরার দিকে ধাবমান হইল। পঞ্চাশখানা

বোটে, কিন্তু শব্দ নাই।

এখন, সেই বজরার ছাদের উপরে আটজন হিন্দুস্থানী রক্ষক ছিল। এত লোক সঙ্গে না করিয়া তখনকার দিনে কেহ রাত্রিকালে নৌকা খুলিতে সাহস করিত না। আট জনের মধ্যে, দুই জন হাতিয়ারবন্ধ হইয়া, মাথায় লাল পাগড়ি বাঁধিয়া ছাদের উপর বসিয়াছিল—আর ছয় জন মধুর দক্ষিণ বাতাসে চাঁদের আলোতে কাল দাড়ি ছড়াইয়া, সুনিদ্রায় অভিভূত ছিল! যাহারা, পাহারায় ছিল, তাহাদের মধ্যে একজন দেখিল—ছিপ বজরার দিকে আসিতেছে। সে দস্তুরমত হাঁকিল, "ছিপ তফাৎ!"

রঙ্গরাজ উত্তর করিল, "তোর দরকার হয়, তুই তফাৎ যা।"

প্রহরী দেখিল, বোগোছ। ভয় দেখাইবার জন্য বন্দুকে একটা ফাঁকা আওয়াজ করিল! রঙ্গরাজ বুঝিল। ফাঁকা আওয়াজ। হাসিয়া বলিল, "কি পাঁড়ে ঠাকুর? একটা ছর্‌রাও নাই? ধার দিব?"

এই বলিয়া রঙ্গরাজ সেই প্রহরীর মাথা লক্ষ্য করিয়া বন্দুক উঠাইল। তার পর বন্দুক নামাইয়া বলিল, তোমায় এবার মারিব না। এবার তোমার লাল পাগড়ি উড়াইব।" এই কথা বলিতে বলিতে রঙ্গরাজ বন্দুক রাখিয়া তীর ধনু লইয়া সজোরে তীর ত্যাগ করিল। প্রহরীর মাথার লাল পাগড়ি উড়িয়া গেল। প্রহরী "রাম রাম!" শব্দ করিতে লাগিল।

বলিতে বলিতে ছিপ আসিয়া বজরার পিছনে লাগিল। অমনি দশ বার জন লোক ছিপ হইতে হাতিয়ার সমেত বজরার উপর উঠিয়া পড়িল। যে ছয় জন হিন্দুস্থানী নিদ্রিত ছিল, তাহারা বন্দুকের আওয়াজে জাগরিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ঘুমের ঘোরে হাতিয়ার হাতড়াইতে তাহাদের দিন গেল। ক্ষিপ্রহস্তে আক্রমণকারীরা তাহাদিগকে নিমেষমধ্যে বাঁধিয়া ফেলিল। যে দুই জন আগে হইতে জাগ্রত ছিল, তাহারা লড়াই করিল, কিন্তু সে অল্পক্ষণ মাত্র। আক্রমণকারীরা সংখ্যায় অধিক, শীঘ্র তাহাদিগকে পরাস্ত ও নিরস্ত্র করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। তখন ছিপের লোক বজরার ভিতর প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। বজরার দ্বার বন্ধ।

ভিতরে ব্রজেশ্বর। তিনি শ্বশুরবাড়ি হইতে বাড়ী যাইতেছিলেন। পথে এই বিপদ। এ কেবল তাঁহার সাহসের ফল। অন্য কেহ সাহস করিয়া রাত্রে বজরা খুলিত না।

রঙ্গরাজ কপাটে করাঘাত করিয়া বলিল, "মহাশয়! দ্বার খুলুন।"

ভিতর হইতে সদ্যোনিদ্রোত্থিত ব্রজেশ্বর উত্তর করিল, "কে? এত গোল কিসের?"

রঙ্গরাজ বলিল, "গোল কিছুই না—বজরায় ডাকাইত পড়িয়াছে।"

ব্রজেশ্বর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া পরে ডাকিতে লাগিল, "পাড়ে! তেওয়ারি! রামসিং!"

রামসিং ছাদের উপর হইতে বলিল, "ধর্ম্মাবতার! শালা লোক্ সব্ কোইকো বাঁধ্‌কে রাক্‌খা।"

ব্রজেশ্বর ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "শুনিয়া বড় দুঃখিত হইলাম। তোমাদের মত বীরপুরুষদের ডাল রুটি খাইতে না দিয়া বাঁধিয়া ফেলিয়াছে! ডাকাইতের এ বড় ভ্রম। ভাবনা করিও না—কাল ডাল রুটির বরাদ্দ বাড়াইয়া দিব।"

শুনিয়া রঙ্গরাজও ঈষৎ হাসিল। বলিল, "আমারও সেই মত; এখন দ্বার খুলিবেন বোধ হয়।"

ব্রজেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?"

রঙ্গরাজ। আমি একজন ডাকাইত মাত্র। দ্বার খোলেন এই ভিক্ষা।

"কেন দ্বার খুলিব?"

রঙ্গরাজ। আপনার সর্ব্বস্ব লুটপাট করিব।

ব্রজেশ্বর বলিল, "কেন? আমাকে কি হিন্দুস্থানী ভেড়ীওয়ালা পাইলে? আমার হাতে দোনলা বন্দুক আছে—তৈয়ার, যে প্রথম কামরায় প্রবেশ করিবে, নিশ্চয় তাহার প্রাণ লইব।"

রঙ্গরাজ। একজন প্রবেশ করিব না—কয় জনকে মারিবেন? আপনিও ব্রাহ্মণ—আমিও ব্রাহ্মণ। এক তরফ ব্রহ্মহত্যা হইবে। মিছামিছি ব্রহ্মহত্যায় কাজ কি?

ব্রজেশ্বর বলিল, "সে পাপটা না হয় আমিই স্বীকার করিব।"

এই কথা ফুরাইতে না ফুরাইতে মড়ু মড়ু শব্দ হইল। বজরার পাশের দিকের একখানা কপাট ভাঙ্গিয়া একজন ডাকাইত কামরার ভিতর প্রবেশ করিল দেখিয়া, ব্রজেশ্বর হাতের বন্দুক ফিরাইয়া তাহার মাথায় মারিল। দস্যু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। এই সময়ে রঙ্গরাজ বাহিরের কপাটে জোরে দুই বার পদাঘাত করিল। কপাট ভাঙ্গিয়া গেল। রঙ্গরাজ কামরার ভিতর প্রবেশ করিল। ব্রজেশ্বর আবার বন্দুক ফিরাইয়া ধরিয়া, রঙ্গরাজকে লক্ষ্য করিতেছিলেন, এমন সময়ে রঙ্গরাজ তাঁহার হাত হইতে বন্দুক কাড়িয়া লইল। দুই জনেই তুল্য বলশালী, তবে রঙ্গরাজ অধিকতর ক্ষিপ্রহস্ত। ব্রজেশ্বর ভাল করিয়া ধরিতে না ধরিতে, রঙ্গরাজ বন্দুক কাড়িয়া লইল। ব্রজেশ্বর তখন দৃঢ়তর মুষ্টিবদ্ধ করিয়া সমুদয় বলের সহিত রঙ্গরাজের মাথায় এক ঘুষি তুলিল। রঙ্গরাজ ঘুষিটা হাতে ধরিয়া ফেলিল। বজরার এক দিকে অনেক অস্ত্র ঝুলান ছিল। এই সময়ে ব্রজেশ্বর ক্ষিপ্রহস্তে তাহার মধ্য হইতে একখানা তীক্ষ্ণধার তরবারি লইয়া আসিয়া বলিল, "দেখ ঠাকুর, ব্রহ্মহত্যায় আমার ভয় নাই।" এই বলিয়া রঙ্গরাজকে কাটিতে ব্রজেশ্বর তরবারি উঠাইল। সেই সময়ে আর চারি পাঁচ জন দস্যু মুক্তদ্বারে কামরার ভিতর প্রবেশ করিয়া, তাহার উপর পড়িল। উত্থিত তরবারি হাত হইতে কাড়িয়া লইল। দুই জনে দুই হাত চাপিয়া ধরিল—একজন দড়ি লইয়া ব্রজেশ্বরকে বলিল, "বাঁধিতে হইবে কি?" তখন ব্রজেশ্বর বলিল, "বাঁধিও না। আমি পরাজয় স্বীকার করিলাম। কি চাও বল—আমি দিতেছি।"

রঙ্গরাজ বলিল, "আপনার যাহা কিছু আছে, সব লইয়া যাইব। কিছু ছাড়িয়া দিতে পারিতাম—কিন্তু যে কিল তুলিয়াছিলেন—আমার মাথায় লাগিলে মাথা ভাঙ্গিয়া যাইত—এক পয়সাও ছাড়িব না।"

ব্রজেশ্বর বলিল, "যাহা বজরায় আছে—সব লইয়া যাও, এখন আর আপত্তি করিব না।"

ব্রজেশ্বর এ কথা বলিবার পূর্ব্বেই দস্যুরা জিনিসপত্র বজরা হইতে ছিপে তুলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এখন প্রায় পঁচিশ জন লোক বজরায় উঠিয়াছিল। জিনিসপত্র বজরায় বিশেষ কিছু ছিল না, কেবল পরিধেয় বস্ত্রাদি, পূজার সামগ্রী, এইরূপ মাত্র। মুহূর্তমধ্যে তাহারা সেই সকল দ্রব্য ছিপে তুলিয়া ফেলিল। তখন আরোহী রঙ্গরাজকে বলিল, "সব জিনিস লইয়াছ—আর কেন দিক্ কর, এখন স্বস্থানে যাও।"

রঙ্গরাজ উত্তর করিল, "যাইতেছি। কিন্তু আপনাকেও আমাদের সঙ্গে যাইতে হইবে।"

ব্র। সে কি? আমি কোথায় যাইব?

রঙ্গ। আমাদের রাণীর কাছে।

ব্র। তোমাদের আবার রাণী কে?

রঙ্গ। আমাদের রাজরাণী।

ব্র। তিনি আবার কে? ডাকাইতের রাজরাণী ত কখন শুনি নাই।

রঙ্গ। দেবী রাণীর নাম কখনও শুনেন নাই?

ব্র। ও হো! তোমরা দেবী চৌধুরাণীর দল?

রঙ্গ। দলাদলি আবার কি? আমরা রাণীজির কার্‌পর্‌দাজ।

ব্র। যেমন রাণী, তেমন কার্‌পর্‌দাজ! তা, আমাকে রাণী দর্শনে যাইতে হইবে কেন? আমাকে কয়েদ রাখিয়া কিছু আদায় করিবে, এই অভিপ্রায়?

রঙ্গ। কাজেই। বজরায় ত কিছু পাইলাম না। আপনাকে আটক করিলে যদি কিছু পাওয়া যায়।

ব্র। আমারও যাইবার ইচ্ছা হইতেছে—তোমাদের রাজরাণী একটা দেখবার জিনিস শুনিয়াছি। তিনি না কি যুবতী?

রঙ্গ। তিনি আমাদের মা—সন্তানে মার বয়সের হিসাব রাখে না।

ব্র। শুনিয়াছি বড় রূপবতী।

রঙ্গ। আমাদের মা ভগবতীর তুল্য।

ব্র। চল, তবে ভগবতী-দর্শনে যাই।

এই বলিয়া, ব্রজেশ্বর রঙ্গরাজের সঙ্গে কামরার বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন যে, বজরার মাঝিমাল্লা সকলে ভয়ে জলে পড়িয়া কাছি ধরিয়া ভাসিয়া আছে। ব্রজেশ্বর তাহাদিগকে বলিলেন, "এখন তোমরা বজরায় উঠিতে পার—ভয় নাই। উঠিয়া আল্লার নাম নাও। তোমাদের জান ও মান ও দৌলত ও ইজ্জৎ সব বজায় আছে! তোমরা বড় হুঁশিয়ার!"

মাঝিরা তখন একে একে বজরায় উঠিতে লাগিল। ব্রজেশ্বর রঙ্গরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন আমার দ্বারবান্‌দের বাঁধন খুলিয়া দিতে পারি কি?"

রঙ্গরাজ বলিল, "আপত্তি নাই। উহারা যদি হাত খোলা পাইয়া আমাদের উপর আক্রমণ করে, তখনই আমরা আপনার মাথা কাটিয়া ফেলিব। ইহা উহাদের বুঝাইয়া দিন।"

ব্রজেশ্বর দ্বারবান্‌দিগকে সেইরূপ বুঝাইয়া দিলেন। আর ভরসা দিলেন যে, তাহারা যেরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে শীঘ্রই তাহাদের ডালরুটির বরাদ্দ বাড়িবে। তখন ব্রজেশ্বর ভৃত্যবর্গকে আদেশ করিলেন যে, "তোমরা নিঃশঙ্কচিত্তে এইখানে বজরা লইয়া থাক। কোথাও যাইও না বা কিছু করিও না। আমি শীঘ্র ফিরিয়া আসিতেছি।" এই বলিয়া তিনি রঙ্গরাজের সঙ্গে ছিপে উঠিলেন। ছিপের নাবিকেরা "দেবী রাণী—কি জয়" হাঁকিল—ছিপ বাহিয়া চলিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ব্রজেশ্বর যাইতে যাইতে রঙ্গরাজকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে কত দূর লইয়া যাইবে—তোমার রাণীজি কোথায় থাকেন?"

রঙ্গ। ঐ বজরা দেখিতেছ না? ঐ বজরা তাঁর।

ব্রজ। ও বজরা? আমি মনে করিয়াছিলাম, ওখানা ইংরেজের জাহাজ—রঙ্গপুর লুটতে আসিয়াছে। তা অত বড় বজরা কেন?

রঙ্গ। রাণীকে রাণীর মত থাকিতে হয়। উহাতে সাতটা কামরা আছে।

ব্র। এত কামরায় কে থাকে?

রঙ্গ। একটায় দরবার। একটায় রাণীমার শয়নঘর। একটায় চাকরাণীরা থাকে। একটায় স্নান হয়। একটায় পাক হয়। একটা ফাটক। বোধ হয়, আপনাকে আজ সেই কামরায় থাকিতে হইবে।

এই কথোপকথন হইতে হইতে ছিপ আসিয়া বজরার পাশে ভিড়িল। দেবী রাণী ওরফে দেবী চৌধুরাণী তখন আর ছাদের উপর নাই। যতক্ষণ তাহার লোকে ডাকাইতি করিতেছিল দেবী ততক্ষণ ছাদের উপর বসিয়া, জ্যোৎস্নালোকে বীণা বাজাইতেছিল। তখন বাজনাটা বড় ভাল হইতেছিল না—বেসুর, বেতাল, কি বাজিতে কি বাজে—দেবী অন্যমনা হইতেছিল। তার পরে যাই ছিপ ফিরিল, দেবী অমনি নামিয়া কামরার ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল।

এদিকে রঙ্গরাজ ছিপ হইতে কামরার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল, "রাণীজি-কি জয়" বলিল। দ্বারে রেশমী পর্দ্দা ফেলা আছে—ভিতর দেখা যায় না। ভিতর হইতে দেবী জিজ্ঞাসা করিল, "কি সংবাদ?"

রঙ্গ। সব মঙ্গল।

দেবী। তোমাদের কেহ জখম হইয়াছে?

রঙ্গ। কেহ না।

দেবী। তাহাদের কেহ খুন হইয়াছে?

রঙ্গ। কেহ না—আপনার আজ্ঞামত কাজ হইয়াছে।

দেবী। তাহাদের কেহ জখম হইয়াছে?

রঙ্গ। দুইটি হিন্দুস্থানী দুই একটা আঁচড় খেয়েছে। কাঁটা ফোটার মত।

দেবী। মাল?

রঙ্গ। সব আনিয়াছি। মাল এমন কিছু ছিল না।

দেবী। বাবু?

রঙ্গ। বাবুকে ধরিয়া আনিয়াছি।

দেবী। হাজির কর।

রঙ্গরাজ তখন ব্রজেশ্বরকে ইঙ্গিত করিল। ব্রজেশ্বর ছিপ হইতে উঠিয়া আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল।

দেবী জিজ্ঞাসা করিল,"আপনি কে?" দেবীর যেন বিষম লাগিয়াছে—গলার আওয়াজটা বড় সাফ নয়।

ব্রজেশ্বর যেরূপ লোক, পাঠক এতক্ষণে বুঝিয়াছেন বোধ হয়। ভয় কাহাকে বলে, তাহা তিনি বালককাল হইতে জানেন না। যে দেবী চৌধুরাণীর নামে উত্তর-বাঙ্গালা কাঁপিত, তাহার কাছে আসিয়া ব্রজেশ্বরের হাসি পাইল। মনে ভাবিলেন, "মেয়েমানুষকে পুরুষে ভয় করে, এ ত কখনও শুনি নাই। মেয়েমানুষ ত পুরুষের বাঁদী।" হাসিয়া ব্রজেশ্বর দেবীর কথায় উত্তর দিলেন, "পরিচয় লইয়া কি হইবে? আমার ধনের সঙ্গে আপনাদিগের সম্বন্ধ, তাহা পাইয়াছেন—নামে ত টাকা হইবে না।"

দেবী। হইবে বৈ কি? আপনি কি দরের লোক, তাহা জানিলে টাকার ঠিকানা হইবে। (তবু গলাটা ধরা ধরা)

ব্রজ। সেই জন্যই কি আমাকে ধরিয়া আনিয়াছেন?

দেবী। নহিলে আপনাকে আমরা আনিতাম না।

দেবী পর্দ্দার আড়ালে, কেহ দেখিল না যে, দেবী এই কথা বলিবার সময় চোখ মুছিল।

ব্রজ। আমি যদি বলি, আমার নাম দুঃখিরাম চক্রবর্ত্তী, আপনি বিশ্বাস করিবেন কি?

দেবী। না।

ব্রজ। তবে জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি?

দেবী। আপনি বলেন কি না, দেখিবার জন্য।

ব্রজ। আমার নাম কৃষ্ণগোবিন্দ ঘোষাল।

দেবী। না।

ব্রজ। দয়ারাম বক্সী।

দেবী। তাও না।

ব্রজ। ব্রজেশ্বর রায়।

দেবী। হইতে পারে।

এই সময়ে দেবীর কাছে আর একজন স্ত্রীলোক নিঃশব্দে আসিয়া বসিল। বলিল, "গলাটা ধরে গেছে যে?"

দেবীর চক্ষের জল আর থাকিল না—বর্ষাকালের ফুটন্ত ফুলের ভিতর যেমন বৃষ্টির জল পোরা থাকে, ডাল নাড়া দিলেই জল ছড়্ ছড়্ করিয়া পড়িয়া যায়, দেবীর চোখে তেমনি জল পোরা ছিল, ডাল নাড়া দিতেই ঝর্ ঝর্ করিয়া পড়িয়া গেল। দেবী তখন ঐ স্ত্রীলোককে কাণে কাণে বলিল, "আমি আর এ রঙ্গ করিতে পারি না। তুই কথা ক। সব জানিস্ ত?"

এই বলিয়া দেবী সে কামরা হইতে উঠিয়া অন্য কামরায় গেল। ঐ স্ত্রীলোকটি দেবীর আসন গ্রহণ করিয়া, ব্রজেশ্বরের সহিত কথা কহিতে লাগিল। এই স্ত্রীলোকের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় আছে—ইনি সেই বামনশূন্য বামনী—নিশি ঠাকুরাণী।

নিশি বলিল, "এইবার ঠিক্ বলেছ—তোমার নাম ব্রজেশ্বর রায়।"

ব্রজেশ্বরের একটু গোল বাঁধিল। পর্দ্দার আড়ালে কিছুই দেখিতে পাইতেছিলেন না—কিন্তু কথার আওয়াজে সন্দেহ হইল যে, যে কথা কহিতেছিল, এ সে বুঝি নয়। তার আওয়াজটা বড় মিঠে লাগিতেছিল—এ বুঝি তত মিঠে নয়। যাই হউক, কথার উত্তরে ব্রজেশ্বর বলিলেন, "যদি আমার পরিচয় জানেন, তবে এই বেলা দরটা চুকাইয়া লউন—আমি স্বস্থানে চলিয়া যাই। কি দরে আমাকে ছাড়িবেন?"

নিশি। এক কড়া কাণা কড়ি। সঙ্গে আছে কি? থাকে যদি, দিয়া চলিয়া যান।

ব্রজ। আপাততঃ সঙ্গে নাই।

নিশি। বজরা হইতে আনিয়া দিন।

ব্রজ। বজরাতে যাহা ছিল, তাহা আপনার অনুচরেরা লইয়া আসিয়াছে। আর এক কড়া কাণা কড়িও নাই।

নিশি। মাঝিদের কাছে ধার করিয়া আনুন।

ব্রজ। মাঝিরাও কাণা কড়ি রাখে না।

নিশি। তবে যত দিন না আপনার উপযুক্ত মূল্য আনাইয়া দিতে পারেন, তত দিন কয়েদ থাকুন।

ব্রজেশ্বর তার পর শুনিলেন, কামরার ভিতরে আর একজন কে—কণ্ঠে সেও বোধহয় স্ত্রীলোক—দেবীকে বলিতেছে, "রাণীজি! যদি এক কড়া কাণা কড়িই এই মানুষটার দর হয়, তবে আমি এক কড়া কাণা কড়ি দিতেছি। আমার কাছে উহাকে বিক্রি করুন।"

ব্রজেশ্বর শুনিলেন, রাণী উত্তর করিল, "ক্ষতি কি? কিন্তু মানুষটা নিয়ে তুমি কি করিবে? ব্রাহ্মণ জল তুলিতে, কাঠ কাটিতে পারিবে না।"

ব্রজেশ্বর প্রত্যুত্তরও শুনিলেন,—রমণী বলিল, "আমার রাঁধিবার ব্রাহ্মণ নাই। আমাকে রাঁধিয়া দিবে।"

তখন নিশি ব্রজেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "শুনিলেন,—আপনি বিক্রি হইলেন—আমি কাণা কড়ি পাইয়াছি। যে আপনাকে কিনিল, আপনি তাহার সঙ্গে যান, রাঁধিতে হইবে।"

ব্রজেশ্বর বলিল, "কই তিনি।"

নিশি। স্ত্রীলোক—বাহিরে যাইবে না, আপনি ভিতরে আসুন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ব্রজেশ্বর অনুমতি পাইয়া, পর্দ্দা তুলিয়া, কামরার ভিতরে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিল, ব্রজেশ্বর তাহাতে বিস্মিত হইল। কামরার কাষ্ঠের দেওয়াল, বিচিত্র চারুচিত্রিত। যেমন আশ্বিন মাসে ভক্ত জনে দশভুজা প্রতিমা পূজা করিবার মানসে প্রতিমার চাল চিত্রিত করায়—এ তেমনি চিত্র। শুম্ভনিশুম্ভের যুদ্ধ; মহিষাসুরের যুদ্ধ; দশ অবতার; অষ্ট নায়িকা; সপ্ত মাতৃকা; দশ মহাবিদ্যা; কৈলাস; বৃন্দাবন; লঙ্কা; ইন্দ্রালয়; নবনারী-কুঞ্জর; বস্ত্রহরণ; সকলই চিত্রিত। সেই কামরায় চারি আঙ্গুল পুরু গালিচা পাতা, তাহাতেও কত চিত্র। তার উপর কত উচ্চ মসনদ—মখমলের কামদার বিছানা, তিন দিকে সেইরূপ বালিশ; সোণার আতরদার, তারই গোলাব পাশ, সোণার বাটা, সোণার পুষ্পপাত্র—তাহাতে রাশীকৃত সুগন্ধি ফুল; সোণার আলবোলা; পোরজরের সট্‌কা—সোণার মুখনলে মতির থোপ দুলিতেছে—তাহাতে মৃগনাভি সুগন্ধি তামাকু সাজা আছে। দুই পাশে দুই রূপার ঝাড়, তাহাতে বহুসংখ্যক সুগন্ধি দীপ রূপার পরীর মাথার উপর জ্বলিতেছে; উপরের ছাদ হইতে একটি ছোট দীপ সোণার শিকলে লট্‌কান আছে। চারি কোণে চারিটি রূপার পুতুল, চারিটি বাতি হাতে করিয়া ধরিয়া আছে।—মসনদের উপর একজন স্ত্রীলোক শুইয়া আছে—তাহার মুখের উপর একখানা বড় মিহি জরির বুটাদার ঢাকাই রুমাল ফেলা আছে। মুখ ভাল দেখা যাইতেছে না—কিন্তু তপ্তকাঞ্চন-গৌরবর্ণ—আর কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ অনুভূত হইতেছে; কাণের গহনা কাপড়ের ভিতর হইতে জ্বলিতেছে—তার অপেক্ষা বিস্তৃত চক্ষের তীব্র কটাক্ষ আরও ঝলসিতেছে। স্ত্রীলোকটি শুইয়া আছে—ঘুমায় নাই।

ব্রজেশ্বর দরবার-কামরায় প্রবেশ করিয়া শয়ানা সুন্দরীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাণীজিকে কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিব?"

সুন্দরী উত্তর করিল, "আমি রাণীজি নই।"

ব্রজেশ্বর দেখিল, এতক্ষণ ব্রজেশ্বর যাহার সঙ্গে কথা কহিতেছিল, এ তাহার গলার আওয়াজ নহে। অথচ তার আওয়াজ হইতে পারে; কেন না, বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, এ স্ত্রীলোক কণ্ঠ বিকৃত করিয়া কথা কহিতেছে। মনে করিল, বুঝি দেবী চৌধুরাণী হরবোলা, মায়াবিনী—এত কুহক না জানিলে মেয়েমানুষ হইয়া ডাকাইতি করে? প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করিল, "এই যে তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতেছিলাম—তিনি কোথায়?"

সুন্দরী বলিল, "তোমাকে আসিতে অনুমতি দিয়া, তিনি শুইতে গিয়াছেন। রাণীতে তোমার কি প্রয়োজন?"
ব্র। তুমি কে?
সুন্দরী। তোমার মুনিব।
ব্র। আমার মুনিব?
সুন্দরী। জান না, এই মাত্র তোমাকে এক কড়া কাণা কড়ি দিয়া কিনিয়াছি?
ব্র। সত্য বটে। তা তোমাকেই বা কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিব?
সুন্দরী। আশীর্ব্বাদের রকম আছে না কি?
ব্র। স্ত্রীলোকের পক্ষে আছে। সধবাকে এক রকম আশীর্ব্বাদ করিতে হয়,—বিধবাকে অন্যরূপ। পুত্রবতীকে—
সুন্দরী। আমাকে "শিগ্‌গির মর্" বলিয়া আশীর্ব্বাদ কর।
ব্র। সে আশীর্ব্বাদ আমি কাহাকেও করি না—তোমার এক-শ তিন বছর পরমায়ু হৌক।
সুন্দরী। আমার বয়স পঁচিশ বৎসর। আটাত্তর বৎসর ধরিয়া তুমি আমার ভাত রাঁধিবে?
ব্র। আগে এক দিন ত রাঁধি। খেতে পার ত, না হয় আটাত্তর বৎসর রাঁধিব।
সুন্দরী। তবে বসো—কেমন রাঁধিতে জান, পরিচয় দাও।
ব্রজেশ্বর তখন সেই কোমল গালিচার উপর বসিল। সুন্দরী জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি?
ব্র। তা ত তোমরা সকলেই জান, দেখিতেছি। আমার নাম ব্রজেশ্বর। তোমার নাম কি? গলা অত মোটা করিয়া কথা কহিতেছ কেন? তুমি কি চেনা মানুষ?
সুন্দরী। আমি তোমার মুনিব—আমাকে "আপনি" "মশাই" আর "আজ্ঞে" বলিবে।
ব্র। আজ্ঞে, তাই হইবে। আপনার নাম?
সুন্দরী। আমার নাম পাঁচকড়ি। কিন্তু তুমি আমার ভৃত্য, আমার নাম ধরিতে পারিবে না। বরং বল ত আমিও তোমার নাম ধরিব না।
ব্র। তবে কি বলিয়া ডাকিলে আমি "আজ্ঞা" বলিব?
পাঁচকড়ি। আমি "রামধন" বলিয়া তোমাকে ডাকিব। তুমি আমাকে 'মুনিব ঠাকুরণ' বলিও। এখন তোমার পরিচয় দাও—বাড়ী কোথায়?
ব্র। এক কড়ায় কিনিয়াছ—অত পরিচয়ের প্রয়োজন কি?
পাঁচ। ভাল, সে কথা নাই বলিলে। রঙ্গরাজকে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিব। রাঢ়ী, না বারেন্দ্র, না বৈদিক?
ব্র। হাতের ভাত ত খাইবেন—যাই হই না।
পাঁচ। তুমি যদি আমার স্বশ্রেণী না হও—তাহা হইলে তোমাকে অন্য কাজ দিব।
ব্র। অন্য কি কাজ?
পাঁচ। জল তুলিবে, কাঠ কাটিবে—কাজের অভাব কি!
ব্র। আমি রাঢ়ী।

পাঁচ। তবে তোমায় জল তুলিতে, কাঠ কাটিতে হইবে—আমি বারেন্দ্র। তুমি রাঢ়ী—কুলীন, না বংশজ?

ব্র। এ কথা ত বিবাহের সম্বন্ধের জন্যই প্রয়োজন হয়। সম্বন্ধ জুটিবে কি? আমি কৃতদার।

পাঁচ। কৃতদার? কয় সংসার করিয়াছেন?

ব্র। জল তুলিতে হয়—জল তুলিব—অত পরিচয় দিব না।

তখন পাঁচকড়ি দেবী রাণীকে ডাকিয়া বলিল, "রাণীজি! বামুণ ঠাকুর বড় অবাধ্য। কথার উত্তর দেয় না।"

নিশি অপর কক্ষ হইতে উত্তর করিল, "বেত লাগাও।"

তখন দেবীর এক পরিচারিকা সপাং করিয়া একগাছা লিক্‌লিকে সরু বেত পাঁচকড়ির বিছানায় ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। পাঁচকড়ি বেত পাইয়া ঢাকাই রুমালের ভিতর মধুর অধর চারু দন্তে টিপিয়া বিছানায় বার দুই বেতগাছা আছড়াইল। ব্রজেশ্বরকে বলিল, "দেখিয়াছ?"

ব্রজেশ্বর হাসিল। বলিল, "আপনারা সব পারেন। কি বলিতে হইবে বলিতেছি।"

পাঁচ। তোমার পরিচয় চাই না—পরিচয় লইয়া কি হইবে? তোমার রান্না ত খাইব না। তুমি আর কি কাজ করিতে পার, বল?

ব্র। হুকুম করুন।

পাঁচ। জল তুলিতে জান?

ব্র। না।

পাঁচ। কাঠ কাটিতে জান?

ব্র। না।

পাঁচ। বাজার করিতে জান?

ব্র। মোটামুটি রকম।

পাঁচ। মোটামুটিতে চলিবে না। বাতাস করিতে জান?

ব্র। পারি।

পাঁচ। আচ্ছা, এই চামর নাও, বাতাস কর।

ব্রজেশ্বর চামর লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। পাঁচকড়ি বলিল, "আচ্ছা, একটা কাজ জান? পা টিপিতে জান?"

ব্রজেশ্বরের দুরদৃষ্ট, তিনি পাঁচকড়িকে মুখরা দেখিয়া, একটি ছোট রকমের রসিকতা করিতে গেলেন। এই দস্যুনেত্রীদিগের কোন রকমে খুশি করিয়া মুক্তি লাভ করেন, সে অভিপ্রায়ও ছিল। অতএব পাঁচকড়ির কথার উত্তরে বলিলেন, "তোমাদের মত সুন্দরীর পা টিপিব, সে ত ভাগ্য—"

"তবে একবার টেপ না" বলিয়া অমনি পাঁচকড়ি আল্‌তাপরা রাঙ্গা পাখানি ব্রজেশ্বরের ঊরুর উপর তুলিয়া দিল।

ব্রজেশ্বর নাচার—আপনি পা টেপার নিমন্ত্রণ লইয়াছেন, কি করেন। ব্রজেশ্বর কাজেই দুই হাতে পা টিপিতে আরম্ভ করিলেন। মনে করিলেন, "এ কাজটা ভাল হইতেছে না, ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। এখন উদ্ধার পেলে বাঁচি।"

তখন দুষ্টা পাঁচকড়ি ডাকিল, "রাণীজি! একবার এদিকে আসুন।"

দেবী আসিতেছে, ব্রজেশ্বর পায়ের শব্দ পাইল। পা নামাইয়া দিল। পাঁচকড়ি হাসিয়া বলিল, "সে কি? পিছাও কেন?" পাঁচকড়ি সহজ গলায় কথা কহিতেছিল। ব্রজেশ্বর বড় বিস্মিত হইলেন,—"সে কি? এ গলা ত চেনা গলাই বটে।" সাহস করিয়া ব্রজেশ্বর পাঁচকড়ির মুখঢাকা রুমালখানা খুলিয়া লইলেন। পাঁচকড়ি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ব্রজেশ্বর বিস্মিত হইয়া বলিল, "সে কি? এ কি? তুমি—তুমি সাগর?

পাঁচকড়ি বলিল, "আমি সাগর। গঙ্গা নই—যমুনা নই—বিল নই—খাল নই—সাক্ষাৎ সাগর। তোমার বড় অভাগ্য—না? যখন পরের স্ত্রী মনে করিয়াছিলে, তখন বড় আহ্লাদ করিয়া পা টিপিতেছিলে, আর যখন ঘরের স্ত্রী হইয়া পা টিপিতে বলিয়াছিলাম, তখন রাগে গর্গর্ করিয়া চলিয়া গেলে। যাক্, এখন আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইয়াছে। তুমি আমার পা টিপিয়াছ। এখন আমার মুখপানে চাহিয়া দেখিতে পার, আমায় ত্যাগ কর, আর পায়ে রাখ— এখন জানিলে, আমি যথার্থ বাহ্মণের মেয়ে।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ব্রজেশ্বর কিয়ৎক্ষণ বিহ্বল হইয়া রহিল। শেষে জিজ্ঞাসা করিল, "সাগর! তুমি এখানে কেন?" সাগর বলিল, "সাগরের স্বামী! তুমিই বা এখানে কেন?"

ব্র। তাই কি? আমি কয়েদী, তুমিও কি কয়েদী? আমাকে ধরিয়া আনিয়াছে। তোমাকেও কি ধরিয়া আনিয়াছে?

সাগর। আমি কয়েদী নই, আমাকে কেহ ধরিয়া আনে নাই। আমি ইচ্ছাক্রমে দেবী রাণীর সাহায্য লইয়াছি। তোমাকে দিয়া আমার পা টিপাইব বলিয়া দেবী রাণীর রাজ্যে বাস করিতেছি।

তখন নিশি আসিল। ব্রজেশ্বর তাহার বস্ত্রালঙ্কারে জাঁকজমক দেখিয়া মনে করিল, "এই দেবী চৌধুরাণী।" ব্রজেশ্বর সম্ভ্রম রাখিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। নিশি বলিল, "স্ত্রীলোক ডাকাইত হইলেও তাহার অত সম্মান করিতে নাই—আপনি বসুন। এখন শুনিলেন, কেন আপনার বজরায় আমরা ডাকাইতি করিয়াছি? এখন সাগরের পণ উদ্ধার হইয়াছে; এখন আপনাতে আর আমাদের প্রয়োজন নাই, আপনি আপনার নৌকায় ফিরিয়া যাইলে কেহ আটক করিবে না। আপনার জিনিসপত্র এক কপর্দ্দক কেহ লইবে না, সব আপনার বজরায় ফিরিয়া পাঠাইয়া দিতেছি। কিন্তু এই একটা কপর্দ্দক—এই পোড়ারমুখী সাগর, ইহার কি হইবে? এ কি বাপের বাড়ী ফিরিয়া যাইবে? ইহাকে আপনি লইয়া যাইবেন কি? মনে করুন, আপনি উহার এক কড়ার কেনা গোলাম।"

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! ব্রজেশ্বর বিহ্বল হইল। তবে ডাকাইতি সব মিথ্যা, এরা ডাকাইত নয়! ব্রজেশ্বর ক্ষণেক ভাবিল, ভাবিয়া শেষে বলিল, "তোমরা আমায় বোকা বানাইলে। আমি মনে করিয়াছিলাম, দেবী চৌধুরাণীর দলে আমার বজরায় ডাকাইতি করিয়াছে।"

তখন নিশি বলিল, "সত্য সত্যই দেবী চৌধুরাণীর এই বজরা। দেবী রাণী সত্য সত্যই ডাকাইতি করেন,"—কথা শেষ হইতে না হইতেই ব্রজেশ্বর বলিল, "দেবী রাণী সত্য সত্যই ডাকাইতি করেন—তবে আপনি কি দেবী রাণী নন?"

নিশি। আমি দেবী নই। আপনি যদি রাণীজিকে দেখিতে চান তিনি দর্শন দিলেও দিতে পারেন। কিন্তু যা বলিতেছিলাম, তা আগে শুনুন। আমরা সত্য সত্যই ডাকাইতি করি, কিন্তু আপনার উপর ডাকাইতি করিবার আর কোন উদ্দেশ্য নাই, কেবল সাগরের প্রতিজ্ঞা রক্ষা। এখন সাগর বাড়ী যায় কি প্রকারে? প্রতিজ্ঞা ত রক্ষা হইল।

ব্র। আসিল কি প্রকারে?

নিশি। রাণীজির সঙ্গে।

ব্র। আমিও ত সাগরের পিত্রালয়ে গিয়াছিলাম—সেখান হইতেই আসিতেছি। কই, সেখানে ত রাণীজিকে দেখি নাই?

নিশি। রাণীজি আপনার পরে সেখানে গিয়াছিলেন।

ব্র। তবে ইহার মধ্যে এখানে আসিলেন কি প্রকারে?

নিশি। আমাদের ছিপ দেখিয়াছেন ত? পঞ্চাশ বোটে।

ব্র। তবে আপনারাই কেন ছিপে করিয়া সাগরকে রাখিয়া আসুন না?

নিশি। তাতে একটা বাধা আছে। সাগর কাহাকে না বলিয়া রাণীর সঙ্গে আসিয়াছে—এজন্য অন্য লোকের সঙ্গে ফিরিয়া গেলে, সবাই জিজ্ঞাসা করিবে, কোথায় গিয়াছিলে? আপনার সঙ্গে ফিরিয়া গেলে উত্তরের ভাবনা নাই।

ব্র। ভাল, তাই হইবে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া ছিপ হুকুম করিয়া দিন।

"দিতেছি," বলিয়া নিশি সেখান হইতে সরিয়া গেল।

তখন সাগরকে নির্জ্জনে পাইয়া ব্রজেশ্বর বলিল, "সাগর! তুমি কেন এমন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে?"

মুখে অঞ্চল দিয়া—এবার ঢাকাই রুমাল নহে—কাপড়ের যেখানটা হাতে উঠিল, সেইখানটা মুখে ঢাকা দিয়া সাগর কাঁদিল—সেই মুখরা সাগর টিপিয়া টিপিয়া, কাঁপিয়া কাঁপিয়া, চুপি চুপি ভারি কান্না কাঁদিল। চুপি চুপি—পাছে দেবী শোনে।

কান্না থামিলে ব্রজেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, "সাগর! তুমি আমায় ডাকিলে না কেন? ডাকিলেই সব মিটিয়া যাইত।"

সাগর কষ্টে রোদন সংবরণ করিয়া চক্ষু মুছিয়া বলিল, "কপালের ভোগ, কিন্তু আমি নাই ডাকিয়াছি—তুমিই বা আসিলে না কেন?"

ব্র। তুমি আমায় তাড়াইয়া দিয়াছিলে—না ডাকিলে যাই কি বলিয়া?

এই সকল কথাবার্তা যথাশাস্ত্র সমাপন হইলে, ব্রজেশ্বর বলিল, "সাগর! তুমি ডাকাইতের সঙ্গে কেন আসিলে?"

সাগর বলিল, "দেবী—সম্বন্ধে আমার ভগিনী হয়, পূর্ব্বে জানাশুনা ছিল। তুমি চলিয়া আসিলে, সে গিয়া আমার বাপের বাড়ী উপস্থিত হইল। আমি কাঁদিতেছি দেখিয়া সে বলিল, "কাঁদ কেন ভাই—তোমার শ্যামচাঁদকে আমি বেঁধে এনে দিব। আমার সঙ্গে দুই দিনের তরে এসো।" তাই আমি আসিলাম। দেবীকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিবার আমার বিশেষ কারণ আছে। তোমার সঙ্গে আমি পলাইয়া চলিলাম, এই কথা আমি চাকরাণীকে বলিয়া আসিয়াছি। তোমার জন্য এই সব আলবোলা, সট্‌কা প্রভৃতি সাজাইয়া রাখিয়াছি—একবার তামাক টামাক খাও, তার পর যেও।"

ব্রজেশ্বর বলিলেন, "কই, যে মালিক, সে ত কিছু বলে না।"

তখন সাগর দেবীকে বলিল, "এখন আপনি ছিপ হুকুম করিলেই যাই।"

নিশি। ছিপ তোমারই। কিন্তু দেখ, তুমি রাণীর বোনাই—কুটুম্বকে স্বস্থানে পাইয়া আমরা আদর করিলাম না—কেবল অপমানই করিলাম, এ বড় দুঃখ থাকে। আমরা ডাকাইত বলিয়া আমাদের কি হিন্দুয়ানি নাই?

ব্র। কি করিতে বলেন?

নিশি। প্রথমে উঠিয়া ভাল হইয়া বসো।

নিশি মসনদ দেখাইয়া দিল। ব্রজেশ্বর শুধু গালিচায় বসিয়াছিল। বলিল, “কেন আমি বেশ্ বসিয়া আছি।”

তখন নিশি সাগরকে বলিল, “ভাই তোমার সামগ্রী তুমি তুলিয়া বসাও। জান, আমরা পরের দ্রব্য ছুঁই না।” হাসিয়া বলিল, “সোণা-রূপা ছাড়া।”

ব্র। তবে আমি কি পিতল-কাঁসার দলে পড়িলাম?

নিশি। আমি ত তা মনে করি—পুরুষমানুষ স্ত্রীলোকের তৈজসের মধ্যে। না থাকিলে ঘর সংসার চলে না—তাই রাখিতে হয়। কথায় কথায় সক্ড়ি হয়—মাজিয়া ঘষিয়া ধুইয়া, ঘরে তুলিতে নিত্য প্রাণ বাহির হইয়া যায়। নে ভাই সাগর, তোর ঘটি-বাটি তফাৎ কর—কি জানি যদি সক্ড়ি হয়।

ব্র। একে ত পিতল কাঁসা—তার মধ্যে আবার ঘটি বাটি! ঘড়াটা গাড়ুটার মধ্যে গণ্য হইবারও যোগ্য নই?

নিশি। আমি ভাই বৈষ্ণবী, তৈজসের ধার ধারি না—আমাদের দৌড় মালসা পর্য্যন্ত। তৈজসের খবর সাগরকে জিজ্ঞাসা কর।

সাগর। আমি ঠিক কথা জানি। পুরুষমানুষ তৈজসের মধ্যে কলসী। সদাই অন্তঃশূন্য—আমরা যাই গুণবতী, তাই জল পুরিয়া পূর্ণকুম্ভ করিয়া রাখি।

নিশি বলিল, “ঠিক বলিয়াছিস্—তাই মেয়েমানুষে এ জিনিস গলায় বাঁধিয়া সংসার-সমুদ্রে ডুবিয়া মরে।—নে ভাই, তোর কলসী, কলসী-পিঁড়ির উপর তুলিয়া রাখ্।”

ব্র। কলসী মানে মানে আপনি পিঁড়ির উপর উঠিতেছে।

এই কথা বলিয়া ব্রজেশ্বর আপনি মসনদের উপর উঠিয়া বসিল। হঠাৎ দুই দিক হইতে দুই জন পরিচারিকা—সুন্দরী যুবতী, বহুমূল্য বসন-ভূষণ-ভূষিতা—দুইটা সোণা-বাঁধা চামর হাতে করিয়া ব্রজেশ্বরের দুই পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। আজ্ঞা না পাইয়াও তাহারা ব্যজন করিতে লাগিল। নিশি তখন সাগরকে বলিল, “যা, এখন তোর স্বামীর জন্য আপন হাতে তামাকু সাজিয়া লইয়া আয়।”

সাগর ক্ষিপ্রহস্তে সোণার আলবোলার উপর হইতে কলিকা লইয়া গিয়া, শীঘ্র মৃগনাভি সুগন্ধি তামাকু সাজিয়া আনিল। আলবোলায় চড়াইয়া দিল। ব্রজেশ্বর বলিলেন, “আমাকে একটা হুঁকায় নল করিয়া তামাকু দাও।”

নিশি বলিল, “কোন শঙ্কা নাই—ঐ আলবোলা উৎসৃষ্ট নয়। কেহ কখন উহাতে তামাকু খায় নাই। আমরা কেহ তামাকু খাই না।”

ব্র। সে কি? তবে এ আলবোলা কেন?

নিশি। দেবীর রাণীগিরির দোকানদারি—

ব্র। তা হৌক—আমি যখন আসিলাম, তখন যে তামাকু সাজা ছিল—কে খাইতেছিল?

নিশি। কেহ না—সাজাও দোকানদারি—

ঐ আলবোলা সেই দিন বাহির হইয়াছে—ঐ তামাকু সেই দিন কেনা হইয়া আসিয়াছে—সাগরের স্বামী আসিবে বলিয়া। ব্রজেশ্বর মুখনলটি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন—অভুক্ত বোধ হয়। তখন ব্রজেশ্বর ধূমপানের অনির্ব্বচনীয় সুখে মগ্ন হইলেন। নিশি তখন সাগরকে বলিল, “তুই পোড়ারমুখী, আর দাঁড়াইয়া কি করিস্—পুরুষমানুষে হুকার নল মুখে করিলে আর কি স্ত্রী পরিবারকে মনে ঠাঁই দেয়? যা, তুই গোটাকতক পান সাজিয়া আন। দেখিস্—আপন হাতে পান সাজিয়া আনিস্—পরের সাজা আনিস্ না—পারিস্ যদি একটু ওষুধ করিস্।”

সাগর বলিল, “আপন হাতেই সাজা আছে—ওষুধ জানিলে আমার এমন দশা হইবে কেন?”

এই বলিয়া সাগর চন্দন কর্পূর চুয়া গোলাপে সুগন্ধি পানের রাশি সোণার বাটা পুরিয়া আনিল। তখন নিশি বলিল, “তোর স্বামীকে অনেক বকেছিস্ কিছু

জলখাবার নিয়ে আয়।”

ব্রজেশ্বরের মুখ শুকাইল, “সর্ব্বনাশ! এত রাত্রে জলখাবার! ঐটি মাফ করিও।”

কিন্তু কেহ তাহার কথা শুনিল না—সাগর বড় তাড়াতাড়ি আর এক কামরায় ঝাঁট দিয়া, জলের হাতে মুছিয়া, একখানা বড় ভারি পুরু আসন পাতিয়া চারি-পাঁচখানা রূপার থালে সামগ্রী সাজাইয়া ফেলিল। স্বর্ণ-পাত্রে উত্তম সুগন্ধি শীতল জল রাখিয়া দিল। জানিতে পারিয়া নিশি ব্রজেশ্বরকে বলিল, “ঠাঁই হইয়াছে—উঠ।” ব্রজেশ্বর উঁকি মারিয়া দেখিয়া, নিশির কাছে জোড়হাত করিল। বলিল, “ডাকাইতি করিয়া ধরিয়া আনিয়া কয়েদ করিয়াছ—সে অত্যাচার সহিয়াছে—কিন্তু এত রাত্রে এ অত্যাচার সহিবে না—দোহাই।”

স্ত্রীলোকেরা মার্জ্জনা করিল না। ব্রজেশ্বর অগত্যা কিছু খাইল। সাগর তখন নিশিকে বলিল, “ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে কিছু দক্ষিণা দিতে হয়।” নিশি বলিল, “দক্ষিণা রাণী স্বয়ং দিবেন। এসো ভাই, রাণী দেখিবে এসো।” এই বলিয়া নিশি ব্রজেশ্বরকে আর এক কামরায় সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নিশি ব্রজেশ্বরকে সঙ্গে করিয়া দেবীর শয্যাগৃহে লইয়া গেল। ব্রজেশ্বর দেখিলেন, শয়নঘর দরবার কামরার মত অপূর্ব্ব সজ্জায় সজ্জিত। বেশীর ভাগ, একখানা সুবর্ণমণ্ডিত মুক্তার ঝালরযুক্ত ক্ষুদ্র পালঙ্ক আছে। কিন্তু ব্রজেশ্বরের সে সকল দিকে চক্ষু ছিল না। এত ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী প্রথিতনাম্নী দেবীকে দেখিবেন। দেখিলেন, কামরার ভিতর অনাবৃত কাষ্ঠের উপর বসিয়া অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী একটি স্ত্রীলোক। নিশি ও সাগরে, ব্রজেশ্বর যে চাঞ্চল্যময়তা দেখিয়াছিলেন, ইহাতে তাহার কিছুই নাই। এ স্থিরা, ধীরা—নিম্নদৃষ্টি, লজ্জাবনতমুখী। নিশি ও সাগর, বিশেষতঃ নিশি সর্ব্বাঙ্গে রত্নালঙ্কারমণ্ডিতা, বহুমূল্য বসনে আবৃতা,—কিন্তু ইহার তা কিছুই নাই। দেবী ব্রজেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাতের ভরসায় বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হইয়াছিলেন, ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। কিন্তু সাক্ষাতের সময় উপস্থিত হইলে, দেবী সে সকলই ত্যাগ করিয়া সামান্য বস্ত্র পরিয়া, হাতে কেবল একখানি মাত্র সামান্য অলঙ্কার রাখিয়া ব্রজেশ্বরের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। প্রথমে নিশির বুদ্ধিতে দেবী ভ্রমে পড়িয়াছিল; শেষে বুঝিতে পারিয়া আপনা আপনি তিরস্কার করিয়াছিল; “ছি! ছি! ছি! কি করিয়াছি! ঐশ্বর্য্যের ফাঁদ পাতিয়াছি!” তাই এ বেশ পরিবর্ত্তন।

ব্রজেশ্বরকে পৌঁছাইয়া দিয়া নিশি চলিয়া গেল। ব্রজেশ্বর প্রবেশ করিল, দেবী গাত্রোত্থান করিয়া ব্রজেশ্বরকে প্রণাম করিল। দেখিয়া ব্রজেশ্বর আরও বিস্মিত হইল—কই, আর কেহ ত প্রণাম করে নাই? দেবী তখন ব্রজেশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াইল—ব্রজেশ্বর দেখিল, যথার্থ দেবীমূর্ত্তি! এমন আর কখন দেখিয়াছে কি? হ্যাঁ, ব্রজ আর একবার এমনই দেখিয়াছিল। সে আরও মধুর,—কেননা, দেবীমূর্ত্তি তখন বালিকার মূর্ত্তি—ব্রজেশ্বরের তখন প্রথম যৌবন। হায়! এ যদি সেই হইত! এ মুখ দেখিয়া, ব্রজেশ্বরের সে মুখ মনে পড়িল, কিন্তু দেখিলেন, এ মুখ সে মুখ নহে। তার কি কিছুই এতে নাই? আছে বৈ কি—কিছু আছে। ব্রজেশ্বর তাই অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল। সে ত অনেক দিন মরিয়া গিয়াছে—তবে মানুষে মানুষে কখন কখন এমন সাদৃশ্য থাকে যে, একজনকে দেখিলে আর এক জনকে মনে পড়ে। এ তাই না ব্রজ?

ব্রজ তাই মনে করিল। কিন্তু সেই সাদৃশ্যেই হৃদয় ভরিয়া গেল—ব্রজের চক্ষে জল আসিল, পড়িল না। তাই দেবী সে জল দেখিতে পাইল না। দেখিতে পাইলে আজ একটা কাণ্ডকারখানা হইয়া যাইত। দুইখানা মেঘেই বৈদ্যুতি ভরা।

প্রণাম করিয়া, নিম্ননয়নে দেবী বলিতে লাগিল, “আমি আপনাকে আজ জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া বড় কষ্ট দিয়াছি। কেন এমন কুকর্ম্ম করিয়াছি,

শুনিয়াছেন। আমার অপরাধ লইবেন না।”

ব্রজেশ্বর বলিলেন, “আমার উপকারই করিয়াছেন।” বেশী কথা বলিবার ব্রজেশ্বরের শক্তি নাই।

দেবী আরও বলিল, “আপনি আমার এখানে দয়া করিয়া জলগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে আমার বড় মর্য্যাদা বাড়িয়াছে। আপনি কুলীন—আপনারও মর্য্যাদা রাখা আমার কর্ত্তব্য। আপনি আমার কুটুম্ব। যাহা মর্য্যাদাস্বরূপ আমি আপনাকে দিতেছি, তাহা গ্রহণ করুন।”

ব্র। স্ত্রীর মত কোন্ ধন? আপনি তাই আমাকে দিয়াছেন। ইহার বেশী আর কি দিবেন?

ও ব্রজেশ্বর! কি বলিলে? স্ত্রীর মত ধন আর নাই? তবে বাপ-বেটায় মিলিয়া প্রফুল্লকে তাড়াইয়া দিয়াছিলে কেন?

পালঙ্কের পাশে একটি রূপার কলসী ছিল—তাহা টানিয়া বাহির করিয়া দেবী ব্রজেশ্বরের নিকটে রাখিল, বলিল, “ইহাই গ্রহণ করিতে হইবে।”

ব্রজ। আপনার বজরায় এত সোণা-রূপার ছড়াছড়ি যে, এই কলসীটা নিতে আপত্তি করিলে, সাগর আমায় বকিবে। কিন্তু একটা কথা আছে—

কথাটা কি—দেবী বুঝিল, বলিল, “আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, এ চুরি ডাকাইতির নহে। আমার নিজের কিছু সঙ্গতি আছে—শুনিয়া থাকিবেন। অতএব গ্রহণপক্ষে কোন সংশয় করিবেন না।”

ব্রজেশ্বর সম্মত হইল—কুলীনের ছেলের আর অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যের “বিদায়” বা “মর্য্যাদা” গ্রহণে লজ্জা ছিল না—এখনও বোধ হয় নাই। কলসীটা বড় ভারী ঠেকিল, ব্রজেশ্বর সহজে তুলিতে পারিলেন না। বলিলেন,“এ কি এ? কলসীটা নিরেট না কি?”

দেবী। টানিবার সময়ে উহার ভিতর শব্দ হইয়াছিল—নিরেট সম্ভবে না।

ব্র। তাই ত? এতে কি আছে?

কলসীতে ব্রজেশ্বর হাত পুরিয়া তুলিল—মোহর। কলসী মোহরে পরিপূর্ণ।

ব্র। এগুলি কিসে ঢালিয়া রাখিব?

দেবী। ঢালিয়া রাখিবেন কেন? এগুলি সমস্তই আপনাকে দিয়াছি।

ব্র। কি?

দেবী। কেন?

ব্র। কত মোহর আছে?

দেবী। তেত্রিশ শ।

ব্র। তেত্রিশ শ মোহরে পঞ্চাশ হাজার টাকার উপর। সাগর আপনাকে টাকার কথা বলিয়াছে?

দেবী। সাগরের মুখে শুনিয়াছি, আপনার পঞ্চাশ হাজার টাকার বিশেষ প্রয়োজন।

ব্র। তাই দিতেছেন?

দেবী। টাকা আমার নহে, আমার দান করিবার অধিকার নাই। টাকা দেবতার, দেবত্র আমার জিম্মা। আমি আমার দেবত্র সম্পত্তি হইতে আপনাকে এই টাকা কর্জ্জ দিতেছি।

ব্র। আমার এ টাকার নিতান্ত প্রয়োজন পড়িয়াছে—বোধ হয়, চুরি-ডাকাতি করিয়াও যদি আমি এ টাকা সংগ্রহ করি, তাহা হইলেও অধর্ম্ম হয় না; কেন না,

এ টাকা নহিলে আমার বাপের জাতি রক্ষা হয় না। আমি এ টাকা লইব। কিন্তু কবে পরিশোধ করিতে হইবে?

দেবী। দেবতার সম্পত্তি, দেবতা পাইলেই হইল। আমার মৃত্যুসংবাদ শুনিলে পর ঐ টাকার আসল আর এক মোহর সুদ দেবসেবায় ব্যয় করিবেন।

ব্র। সে আমারই ব্যয় করা হইবে। সে আপনাকে ফাঁকি দেওয়া হইবে। আমি ইহাতে স্বীকৃত নহি।

দেবী। আপনার যেরূপ ইচ্ছা, সেইরূপে পরিশোধ করিবেন।

ব্র। আমার টাকা জুটিলে আপনাকে পাঠাইয়া দিব।

দেবী। আপনার লোক কেহ আমার কাছে আসিবে না, আসিতেও পারিবে না।

ব্র। আমি নিজে টাকা লইয়া আসিব।

দেবী। কোথায় আসিবেন? আমি এক স্থানে থাকি না।

ব্র। যেখানে বলিয়া দিবেন।

দেবী। দিন ঠিক করিয়া বলিলে, আমি স্থান ঠিক করিয়া বলিতে পারি।

ব্র। আমি মাঘ ফাল্গুনে টাকা সংগ্রহ করিতে পারিব। কিন্তু একটু বেশী করিয়া সময় লওয়া ভাল। বৈশাখ মাসে টাকা দিব।

দেবী। তবে বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমীর রাত্রে এই ঘাটেই টাকা আনিবেন। সপ্তমীর চন্দ্রাস্ত পর্য্যন্ত আমি এখানে থাকিব। সপ্তমীর চন্দ্রাস্তের পর আসিলে আমার দেখা পাইবেন না।

ব্রজেশ্বর স্বীকৃত হইলেন। তখন দেবী পরিচারিকাদিগকে আজ্ঞা দিলেন, মোহরের ঘড়া ছিপে উঠাইয়া দিয়া আইসে। পরিচারিকারা ঘড়া ছিপে লইয়া গেল। ব্রজেশ্বরও দেবীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ছিপে যাইতেছিলেন। তখন দেবী নিষেধ করিয়া বলিলেন, "আর একটা কথা বাকী আছে। এ ত কর্জ্জ দিলাম—মর্য্যাদা দিলাম কই?"

ব্র। কলসীটা মর্য্যাদা।

দেবী। আপনার যোগ্য মর্য্যাদা নহে। যথাযথ মর্য্যাদা রাখিব।

এই বলিয়া দেবী আপনার আঙ্গুল হইতে একটা আঙ্গটি খুলিল। ব্রজেশ্বর তাহা গ্রহণ করিবার জন্য সহাস্য বদনে হাত পাতিলেন। দেবী হাতের উপর আঙ্গটি ফেলিয়া দিল না—ব্রজেশ্বরের হাতখানি ধরিল—আপনি আঙ্গটি পরাইয়া দিবে।

ব্রজেশ্বর জিতেন্দ্রিয়, কিন্তু মনের ভিতর কি একটা গোলমাল হইয়া গেল, জিতেন্দ্রিয় ব্রজেশ্বর তাহা বুঝিতে পারিল না। শরীরে কাঁটা দিল—ভিতরে যেন অমৃতস্রোত ছুটিল। জিতেন্দ্রিয় ব্রজেশ্বর; হাতটা সরাইয়া লইতে ভুলিয়া গেল। বিধাতা এক এক সময়ে এমনই বাদ সাধেন যে, সময়ে আপন কাজ ভুলিয়া যাইতে হয়।

তা, দেবী সেই মানসিক গোলযোগের সময় ব্রজেশ্বরের আঙ্গুলে ধীরে ধীরে আঙ্গটি পরাইতে লাগিল। সেই সময়ে ফোঁটা দুই তপ্ত জল ব্রজেশ্বরের হাতের উপর পড়িল। ব্রজেশ্বর দেখিলেন, দেবীর মুখ চোখের জলে ভাসিয়া যাইতেছে। কি রকম কি হইল, বলিতে পারি না, ব্রজেশ্বর ত জিতেন্দ্রিয়—কিন্তু মনের ভিতর কি একটা গোল বাঁধিয়াছিল— সেই আর একখানা মুখ মনে পড়িল—বুঝি, সে মুখে সেই রাত্রে এমনই অশ্রুধারা বহিয়াছিল—সে চোখের জল মোছানটাও বুঝি মনে পড়িল; এই সেই, সেই এই, কি এমনই একটা কি গোলমাল বাঁধিয়া গেল। ব্রজেশ্বর কিছু না বুঝিয়া—কেন জানি না—দেবীর কাঁধে হাত রাখিল,

অপর হাতে ধরিয়া মুখখানি তুলিয়া ধরিল—বুঝি মুখখানা প্রফুল্লের মত দেখিল। বিবশ বিহ্বল হইয়া সেই অশ্রুনিষিক্ত বিম্বাধরে—আ ছি ছি! ব্রজেশ্বর! আবার!

তখন ব্রজেশ্বরের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কি করিলাম! এ কি প্রফুল্ল? সে যে দশ বৎসর মরিয়াছে! ব্রজেশ্বর উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়া একেবারে ছিপে গিয়ে উঠিল। সাগরকে সঙ্গে লইয়াও গেল না। সাগর "ধর! ধর! আসামী পলায়!" বলিয়া, পিছু পিছু ছুটিয়া গিয়া ছিপে উঠিল। ছিপ খুলিয়া ব্রজেশ্বরকে ও ব্রজেশ্বরের দুই রত্নাধার—একটি সাগর আর একটি কলসী—ব্রজেশ্বরের নৌকায় পৌঁছাইয়া দিল।

এদিকে নিশি আসিয়া দেবীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, দেবী নৌকার তক্তার উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছে। নিশি তাহাকে উঠাইয়া বসাইল—চোখের জল মুছাইয়া দিল—সুস্থির করিল। তখন নিশি বলিল, "এই কি মা, তোমার নিষ্কাম ধর্ম্ম? এই কি সন্ন্যাস? ভগবদ্বাক্য কোথায় মা, এখন?"

দেবী চুপ করিয়া রহিল। নিশি বলিল, "ও সকল ব্রত মেয়েমানুষের নহে। যদি মেয়েকে ও পথে যেতে হয়, তবে আমার মত হইতে হইবে। আমাকে কাঁদাইবার জন্য ব্রজেশ্বর নাই। আমার ব্রজেশ্বর বৈকুণ্ঠেশ্বর একই।"

দেবী চক্ষু মুছিয়া বলিল, "তুমি যমের বাড়ী যাও।"

নিশি। আপত্তি ছিল না। কিন্তু আমার উপর যমের অধিকার নাই। তুমি সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া ঘরে যাও।

দেবী। সে পথ খোলা থাকিলে; আমি এ পথে আসিতাম না। এখন বজরা খুলিয়া দিতে বল। চার পাল উঠাও।

তখন সেই জাহাজের মত বজরা চারিখানা পাল তুলিয়া পক্ষিণীর মত উড়িয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

ব্রজেশ্বর আপনার নৌকায় আসিয়া গম্ভীর হইয়া বসিল। সাগরের সঙ্গে কথা কহে না। দেখিল, দেবীর বজরা পাল তুলিয়া পক্ষিণীর মত উড়িয়া গেল। তখন ব্রজেশ্বর সাগরকে জিজ্ঞাসা করিল, "বজরা কোথায় গেল?"

সাগর বলিল, "তা দেবী ভিন্ন আর কেহ জানে না। সে সকল কথা দেবী আর কাহাকেও বলে না।"

ব্র। দেবী কে?

সা। দেবী দেবী।

ব্র। তোমার কে হয়?

সা। ভগিনী।

ব্র। কি রকম ভগিনী?

সা। জ্ঞাতি।

ব্রজেশ্বর আবার চুপ করিল। মাঝিদিগকে ডাকিয়া বলিল, "তোমরা বড় বজরার সঙ্গে যাইতে পার?" মাঝিরা বলিল, "সাধ্য কি! ও নক্ষত্রের মত ছুটিয়াছে।" ব্রজেশ্বর আবার চুপ করিল। সাগর ঘুমাইয়া পড়িল।

প্রভাত হইল, ব্রজেশ্বর বজরা খুলিয়া চলিল।

সূর্য্যোদয় হইলে, সাগর আসিয়া ব্রজেশ্বরের কাছে বসিল। ব্রজেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, "দেবী কি ডাকাতি করে?"

সা। তোমার কি বোধ হয়?

ব্র। ডাকাতির সমান ত সব দেখিলাম—ডাকাতি করিলে করিতে পারে, তাও দেখিলাম। তবু বিশ্বাস হয় না যে, ডাকাতি করে।

সা। তবু কেন বিশ্বাস হয় না।

ব্র। কে জানে। ডাকাতি না করিলেই বা এত ধন কোথায় পাইল?

সা। কেহ বলে, দেবী দেবতার বরে এত ধন পাইয়াছে; কেহ বলে, মাটির ভিতর পোঁতা টাকা পাইয়াছে; কেহ বলে, দেবী সোণা করিতে জানে।

ব্র। দেবী কি বলে?

সা। দেবী বলে, এক কড়াও আমার নয়, সব পরের।

ব্র। পরের ধন এত পাইল কোথায়?

সা। তা কি জানি।

ব্র। পরের ধন হ'লে অত আমিরি করে? পরে কিছু বলে না?

সা। দেবী কিছু আমিরি করে না। খুঁদ খায়, মাটিতে শোয়, গড়া পরে। কাল যা দেখ্‌লে, সে সকল তোমার আমার জন্য মাত্র, কেবল দোকানদারি। তোমার হাতে ও কি?

সাগর ব্রজেশ্বরের আঙ্গুলে নূতন আঙ্গটি দেখিল।

ব্রজেশ্বর বলিল, "কাল দেবীর নৌকায় জলযোগ করিয়াছিলাম বলিয়া, দেবী আমাকে এই আঙ্গটি মর্যাদা দিয়াছে।"

সা। দেখি।

ব্রজেশ্বর আঙ্গটি খুলিয়া দেখিতে দিল। সাগর হাতে লইয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিল। বলিল, "ইহাতে দেবী চৌধুরাণীর নাম লেখা আছে।"

ব্র। কই?

সা। ভিতরে—ফারসীতে।

ব্র। (পড়িয়া) এ কি এ? এ যে আমার নাম—আমার আঙ্গটি? সাগর! তোমাকে আমার দিব্য, যদি তুমি আমার কাছে সত্য না কও। আমায় বল, দেবী কে?

সা। তুমি চিনিতে পার নাই, সে কি আমার দোষ? আমি ত এক দণ্ডে চিনিয়াছিলাম।

ব্র। কে! কে! দেবী কে?

সা। প্রফুল্ল।

আর ব্রজেশ্বর কথা কহিল না। সাগর দেখিল, প্রথমে ব্রজেশ্বরের শরীরে কাঁটা দিয়া উঠিল, তার পর একটা অনির্ব্বচনীয় আহ্লাদের চিহ্ন—উচ্ছলিত সুখের তরঙ্গ শরীরে দেখা দিল। মুখ প্রভাময়, নয়ন উজ্জ্বল অথচ জলপ্লাবিত, দেহ উন্নত, কান্তি স্ফূর্ত্তিময়ী। তার পরই আবার সাগর দেখিল, সব যেন নিবিয়া গেল; বড় ঘোরতর বিষাদ আসিয়া যেন সেই প্রভাময় কান্তি অধিকার করিল। ব্রজেশ্বর বাক্যশূন্য, স্পন্দনহীন, নিমেষশূন্য। ক্রমে সাগরের মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া ব্রজেশ্বর চক্ষু মুদিল। দেহ অবসন্ন হইল; ব্রজেশ্বর সাগরের কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল। সাগর কাতর হইয়া অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করিল। কিছুই উত্তর পাইল না; একবার ব্রজেশ্বর বলিল, "প্রফুল্ল ডাকাত! ছি!"

দশম পরিচ্ছেদ

ব্রজেশ্বর ও সাগরকে বিদায় দিয়া দেবী চৌধুরাণী—হায়! কোথায় গেল দেবী? কই সে বেশভূষা, ঢাকাই শাড়ি, সোণাদানা, হীরা মুক্তা পান্না—সব কোথায় গেল? দেবী সব ছাড়িয়াছে—সব একেবারে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। দেবী কেবল একখানা গড়া পরিয়াছে—হাতে কেবল একগাছা কড়। দেবী নৌকার এক পাশে বজরার শুধু তক্তার উপর একখানা চট পাতিয়া শয়ন করিল। ঘুমাইল কি না, জানি না।

প্রভাতে বজরা বাঞ্ছিত স্থানে আসিয়া লাগিয়াছে দেখিয়া, দেবী নদীর জলে নামিয়া স্নান করিল। স্নান করিয়া ভিজা কাপড়েই রহিল—সেই চটের মত মোটা শাড়ি। কপাল ও বুক গঙ্গামৃত্তিকায় চর্চ্চিত করিল—রুক্ষ, ভিজা চুল এলাইয়া দিল—তখন দেবীর যে সৌন্দর্য্য বাহির হইল, গত রাত্রির বেশভূষা, জাঁকজমক, হীরা মতি চাঁদনি বা রাণীগিরিতে তাহা দেখা যায় নাই। কাল দেবীকে রত্নাভরণে রাজারাণীর মত দেখাইয়াছিল—আজ গঙ্গামৃত্তিকার সজ্জায় দেবতার মত দেখাইতেছে। যে সুন্দর, সে মাটি ছাড়িয়া হীরা পরে কেন?

দেবী এই অনুপম বেশে একজন মাত্র স্ত্রীলোক সমভিব্যাহারে লইয়া তীরে তীরে চলিল—বজরায় উঠিল না। এরূপ অনেক দূর গিয়া একটা জঙ্গলে প্রবেশ করিল। আমরা কথায় কথায় জঙ্গলের কথা বলিতেছি—কথায় কথায় ডাকাইতের কথা বলিতেছি—ইহাতে পাঠক মনে করিবেন না, আমরা কিছুমাত্র অত্যুক্তি করিতেছি, অথবা জঙ্গল বা ডাকাইত ভালবাসি। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে সে দেশ জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এখনও অনেক স্থানে ভয়ানক জঙ্গল—কতক কতক আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। আর ডাকাইতের ত কথাই নাই। পাঠকের স্মরণ থাকে যেন যে, ভারতবর্ষকে ডাকাইত শাসন করিতে মার্কুইস্ অব হেষ্টিংস্‌কে যত বড় যুদ্ধোদ্যম করিতে হইয়াছিল, পঞ্জাবের লড়াইয়ের পূর্ব্বে আর কখন তত করিতে হয় নাই। এ সকল অরাজকতার সময়ে ডাকাইতিই ক্ষমতাশালী লোকের ব্যবসা ছিল। যাহারা দুর্ব্বল বা গণ্ডমূর্খ তাহারাই "ভাল মানুষ" হইত। ডাকাইতিতে তখন কোন নিন্দা বা লজ্জা ছিল না।

দেবী জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিয়াও অনেক দূর গেল। একটা গাছের তলায় পৌঁছিয়া পরিচারিকাকে বলিল, "দিবা, তুই এখানে বস্। আমি আসিতেছি। এ বনে বাঘভালুক বড় অল্প। আসিলেও তোর ভয় নাই। লোক পাহারায় আছে।" এই বলিয়া দেবী সেখান হইতে আরও গাঢ়তর জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিল। অতি নিবিড় জঙ্গলের ভিতর একটা সুরঙ্গ। পাথরের সিঁড়ি আছে। যেখানে নামিতে হয়, সেখানে অন্ধকার—পাথরের ঘর। পূর্ব্বকালে বোধ হয় দেবালয় ছিল—এক্ষণে কাল সহকারে চারি পাশে মাটি পড়িয়া গিয়াছে। কাজেই তাহাতে নামিবার সিঁড়ি গড়িবার প্রয়োজন হইয়াছে। দেবী অন্ধকারে সিঁড়িতে নামিল।

সেই ভূগর্ভস্থ মন্দিরে মিট্-মিট্ করিয়া একটা প্রদীপ জ্বলিতেছিল। তার আলোতে এক শিবলিঙ্গ দেখা গেল। এক ব্রাহ্মণ সেই শিবলিঙ্গের সম্মুখে বসিয়া তাহার পূজা করিতেছিল। দেবী শিবলিঙ্গকে প্রণাম করিয়া, ব্রাহ্মণের কিছু দূরে বসিলেন। দেখিয়া ব্রাহ্মণ পূজা সমাপনপূর্ব্বক, আচমন করিয়া দেবীর সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন।

ব্রাহ্মণ বলিল, "মা! কাল রাত্রে তুমি কি করিয়াছ? তুমি কি ডাকাইতি করিয়াছ না কি?"

দেবী বলিল, "আপনার কি বিশ্বাস হয়?"

ব্রাহ্মণ বলিল, "কি জানি?"

ব্রাহ্মণ আর কেহই নহে; আমাদের পূর্ব্বপরিচিত ভবানী ঠাকুর।

দেবী বলিল, "কি জানি কি, ঠাকুর? আপনি কি আমায় জানেন না? দশ বৎসর আজ এ দস্যুদলের সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইলাম। লোকে জানে, যত ডাকাইতি হয়,

সব আমিই করি। তথাপি এক দিনের জন্য এ কাজ আমা হইতে হয় নাই—তা আপনি বেশ জানেন। তবু বলিলেন,“কি জানি?”

ভবানী। রাগ কর কেন? আমরা যে অভিপ্রায়ে ডাকাইতি করি, তা মন্দ কাজ বলিয়া আমরা জানি না। তাহা হইলে, এক দিনের তরেও ঐ কাজ করিতাম না। তুমিও এ কাজ মন্দ মনে কর না, বোধ হয়—কেন না, তাহা হইলে এ দশ বৎসর—

দেবী। সে বিষয়ে আমার মত ফিরিতেছে। আমি আপনার কথায় এত দিন ভুলিয়াছিলাম—আর ভুলিব না। পরদ্রব্য কাড়িয়া লওয়া মন্দ কাজ নয় ত মহাপাতক কি? আপনাদের সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধই রাখিব না।

ভবানী। সে কি? যা এত দিন বুঝাইয়া দিয়াছি, তাই কি আবার তোমায় বুঝাইতে হইবে? যদি আমি এ সকল ডাকাইতির ধনের এক কপর্দ্দক গ্রহণ করিতাম, তবে মহাপাতক বটে। কিন্তু তুমি ত জান যে, কেবল পরকে দিবার জন্য ডাকাইতি করি। যে ধার্ম্মিক যে সৎপথে থাকিয়া ধন উপার্জ্জন করে, যাহার ধনহানি হইলে ভরণপোষণের কষ্ট হইবে, রঙ্গরাজ কি আমি কখন তাহাদের এক পয়সাও লই নাই। যে জুয়াচোর, দাগাবাজ, পরের ধন কাড়িয়া বা ফাঁকি দিয়া লইয়াছে, আমরা তাহাদের উপর ডাকাইতি করি। করিয়া এক পয়সাও লই না, যাহার ধন বঞ্চকেরা লইয়াছিল, তাহাকেই ডাকিয়া দিই। এ সকল কি তুমি জান না? দেশ অরাজক, দেশে রাজশাসন নাই, দুষ্টের দমন নাই, যে যার পায়, কাড়িয়া খায়। আমরা তাই তোমায় রাণী করিয়া, রাজশাসন চালাইতেছি। তোমার নামে আমরা দুষ্টের দমন করি, শিষ্টের পালন করি। এ কি অধর্ম্ম?

দেবী। রাজা রাণী যাকে করিবেন, সেই হইতে পারিবে। আমাকে অব্যাহতি দিন্—আমার এ রাণীগিরিতে আর চিত্ত নাই।

ভবানী। আর কাহাকেও এ রাজ্য সাজে না। আর কাহারও অতুল ঐশ্বর্য নাই—তোমার ধনদানে সকলেই তোমার বশ।

দেবী। আমার যে ধন আছে, সকলই আমি আপনাকে দিতেছি। আমি ঐ টাকা যেরূপে খরচ করিতাম, আপনিও সেইরূপে করিবেন। আমি কাশী গিয়া বাস করিব; মানস করিয়াছি।

ভবানী। কেবল তোমার ধনেই কি সকলে তোমার বশ? তুমি রূপে যথার্থ রাজরাণী—গুণে যথার্থ রাজরাণী। অনেকে তোমাকে সাক্ষাৎ ভগবতী বলিয়া জানে—কেন না, তুমি সন্ন্যাসিনী, মার মত পরের মঙ্গল কামনা কর, অকাতরে ধন দান কর, আবার ভগবতীর মত রূপবতী। তাই আমরা তোমার নামে এ রাজ্য শাসন করি—নহিলে আমাদের কে মানিত?

দেবী। তাই লোকে আমাকে ডাকাইতনী বলিয়া জানে—এ অখ্যাতি মরিলেও যাবে না।

ভবানী। অখ্যাতি কি? এ বরেন্দ্রভূমে আজি কালি কে এমন আছে যে, এ নামে লজ্জিত? কিন্তু সে কথা যাক্—ধর্ম্মাচরণে সুখ্যাতি অখ্যাতি খুঁজিবার দরকার কি? খ্যাতির কামনা করিলেই কর্ম্ম আর নিষ্কাম হইল কৈ? তুমি যদি অখ্যাতির ভয় কর, তবে তুমি আপনার খুঁজিলে, পরের ভাবিলে না। আত্মবিসর্জন হইল কৈ?

দেবী। আপনাকে আমি তর্কে আঁটিয়া উঠিতে পারিব না—আপনি মহামহোপাধ্যায়—আমার স্ত্রীবুদ্ধিতে যাহা আসিতেছে, তাই বলিতেছি—আমি এ রাণীগিরি হইতে অবসর হইতে চাই। আমার এ আর ভাল লাগে না।

ভবানী। যদি ভাল লাগে না—তবে কালি রঙ্গরাজকে ডাকাইতি করিতে পাঠাইয়াছিলে কেন? কথা যে আমার অবিদিত নাই, তাহা বলা বেশীর ভাগ।

দেবী। কথা যদি অবিদিত নাই, তবে অবশ্য এটাও জানেন যে, কাল রঙ্গরাজ ডাকাইতি করে নাই—ডাকাইতির ভাণ করিয়াছিল মাত্র।

ভবানী। কেন? তা আমি জানি না, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।

দেবী। একটা লোককে ধরিয়া আনিবার জন্য।

ভ। লোকটা কে?

দেবীর মুখে নামটা একটু বাধ বাধ করিল—কিন্তু নাম না করিলেও নয়—ভবানীর সঙ্গে প্রতারণা চলিবে না। অতএব অগত্যা দেবী বলিল, "তার নাম ব্রজেশ্বর রায়।"

ভ। আমি তাকে বিলক্ষণ চিনি। তাকে তোমার কি প্রয়োজন?

দেবী। কিছু দিবার প্রয়োজন ছিল। তার বাপ ইজারাদারের হাতে কয়েদ যায়। কিছু দিয়া ব্রাহ্মণের জাতিরক্ষা করিয়াছি।

ভ। ভাল কর নাই। হরবল্লভ রায় অতি পাষণ্ড। খামকা আপনার বেহাইনের জাতি মারিয়াছিল—তার জাতি যাওয়াই ভাল ছিল।

দেবী শিহরিল। বলিল, "সে কি রকম?"

ভ। তার একটা পুত্রবধূর কেহ ছিল না, কেবল বিধবা মা ছিল। হরবল্লভ সেই গরিবের বাগ্দী অপবাদ দিয়া বউটাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিল। দুঃখে বউটার মা মরিয়া গেল।

দেবী। আর বউটা?

ভ। শুনিয়াছি, খাইতে না পাইয়া মরিয়া গিয়াছে।

দেবী। আমাদের সে সব কথায় কাজ কি? আমরা পরহিত-ব্রত নিয়েছি, যার দুঃখ দেখিব, তারই দুঃখ মোচন করিব।

ভ। ক্ষতি নাই। কিন্তু সম্প্রতি অনেকগুলি লোক দারিদ্র্যগ্রস্ত—ইজারাদারের দৌরাত্ম্যে সব্বর্স্ব গিয়াছে। এখন কিছু কিছু পাইলেই, তাহারা আহার করিয়া গায়ে বল পায়। গায়ে বল পাইলেই তাহারা লাঠিবাজি করিয়া আপন আপন স্বত্ব উদ্ধার করিতে পারে। শীঘ্র একদিন দরবার করিয়া তাহাদিগের রক্ষা কর।

দে। তবে প্রচার করুন যে, এইখানেই আগামী সোমবার দরবার হইবে।

ভ। না। এখানে আর তোমার থাকা হইবে না। ইংরেজ সন্ধান পাইয়াছে, তুমি এখন এই প্রদেশে আছ। এবার পাঁচ শত সিপাহী লইয়া তোমার সন্ধানে আসিতেছে। অতএব এখানে দরবার হইবে না। বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে দরবার হইবে, প্রচার করিয়াছি। সোমবার দিন অবধারিত করিয়াছি। সে জঙ্গলে সিপাহী যাইতে সাহস করিবে না—করিলে মারা পড়িবে। ইচ্ছামত টাকা সঙ্গে লইয়া আজি বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে যাত্রা কর।

দে। এবার চলিলাম। কিন্তু আর আমি এ কাজ করিব কি না সন্দেহ। ইহাতে আর আমার মন নাই।

এই বলিয়া দেবী উঠিল। আবার জঙ্গল ভাঙ্গিয়া বজরায় গিয়া উঠিল। বজরায় উঠিয়া রঙ্গরাজকে ডাকিয়া চুপি চুপি এই উপদেশ দিল, "আগামী সোমবার বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে দরবার হইবে। এই দণ্ডে বজরা খোল—সেইখানেই চল—বর্কন্দাজদিগের সংবাদ দাও, দেবীগড় হইয়া যাও—টাকা লইয়া যাইতে হইবে। সঙ্গে অধিক টাকা নাই।"

তখন মুহূর্ত্ত মধ্যে বজরার মাস্তুলের উপর তিন-চারিখানা ছোট-বড় সাদা পাল বাতাসে ফুলিতে লাগিল; ছিপখানা বজরার সামনে আসিয়া বজরার সঙ্গে বাঁধা হইল। তাহাতে ষাট জন জোয়ান বোটে লইয়া বসিয়া, "রাণীজি-কি-জয়" বলিয়া বাহিতে আরম্ভ করিল—সেই জাহাজের মত বজরা তখন তীরবেগে ছুটিল। এদিকে দেখা গেল, বহুসংখ্যক পথিক বা হাটুরিয়া লোকের মত লোক, নদীতীরে জঙ্গলের ভিতর দিয়া বজরার সঙ্গে দৌড়াইয়া যাইতেছে। তাহাদের হাতে কেবল এক এক লাঠি মাত্র—কিন্তু বজরার ভিতর বিস্তর ঢাল, সড়কি, বন্দুক আছে। ইহারা দেবীর "বর্কন্দাজ সৈন্য।"

সব ঠিক দেখিয়া দেবী স্বহস্তে আপনার শাকান্ন পাকের জন্য হাঁড়িশালায় গেল। হায়! দেবী!—তোমার এ কিরূপ সন্ন্যাস!

একাদশ পরিচ্ছেদ

সোমবারে প্রাতঃসূর্য্যপ্রভাসিত নিবিড় কাননাভ্যন্তরে দেবী রাণীর "দরবার" বা "এজ্‌লাস্"। সে এজ্‌লাসে কোন মোকদ্দমা মামলা হইত না। রাজকার্য্যের মধ্যে কেবল একটা কাজ হইত—অকাতরে দান।

নিবিড় জঙ্গল—কিন্তু তাহার ভিতর প্রায় তিন শত বিঘা জমি সাফ হইয়াছে। সাফ হইয়াছে, কিন্তু বড় বড় গাছ কাটা হয় নাই—তাহার ছায়ায় লোক দাঁড়াইবে। সেই পরিষ্কার ভূমিখণ্ডে প্রায় দশ হাজার লোক জমিয়াছে—তাহারই মাঝখানে দেবী রাণীর এজ্‌লাস্। একটা বড় সামিয়ানা গাছের ডালে ডালে বাঁধিয়া টাঙ্গান হইয়াছে। তার নীচে বড় বড় মোটা মোটা রূপার ডাণ্ডার উপর একখানা কিংখাপের চাঁদওয়া টাঙ্গান—তাতে মতির ঝালর। তাহার ভিতর চন্দনকাষ্ঠের বেদী। বেদীর উপর বড় পুরু গালিচা পাতা। গালিচার উপর একখানা ছোট রকম রূপার সিংহাসন। সিংহাসনের উপর মসনদ পাতা—তাহাতেও মুক্তার ঝালর। দেবীর বেশভূষার আজ বিশেষ জাঁক। শাড়ি পরা। শাড়িখানায় ফুলের মাঝে মাঝে এক একখানা হীরা। অঙ্গ রত্নে খচিত—কদাচিৎ মধ্যে মধ্যে অঙ্গের উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দেখা যাইতেছে। গলায় এত মতির হার যে, বুকের আর বস্ত্র পর্য্যন্ত দেখা যায় না। মাথায় রত্নময় মুকুট। দেবী আজ শরৎকালে প্রকৃত দেবীপ্রতিমার মত সাজিয়াছে। এ সব দেবীর রাণীগিরি। দুই পাশে চারিজন সুসজ্জিতা যুবতী স্বর্ণদণ্ড চামর লইয়া বাতাস দিতেছে। পাশে ও সম্মুখে বহুসংখ্যক চোপদার ও আশাবর্দার বড় জাঁকের পোশাক করিয়া, বড় বড় রূপার আশা ঘাড়ে করিয়া খাড়া হইয়াছে। সকলের উপর জাঁক, বর্‌কন্দাজের সারি। প্রায় পাঁচ শত বরকন্দাজ দেবীর সিংহাসনের দুই পাশে সার দিয়া দাঁড়াইল। সকলেই সুসজ্জিত—লাল পাগ্‌ড়ি, লাল আঙ্গরাখা, লাল ধুতি মালকোচা মারা, পায়ে লাল নাগরা, হাতে ঢাল সড়্‌কি। চারি দিকে লাল নিশান পোঁতা।

দেবী সিংহাসনে আসীন হইল। সেই দশ হাজার লোকে একবার "দেবী রাণী কি জয়" বলিয়া জয়ধ্বনি করিল। তারপর দশ জন সুসজ্জিত যুবা অগ্রসর হইয়া মধুর কণ্ঠে দেবীর স্তুতিগান করিল। তারপর সেই দশ সহস্র দরিদ্রের মধ্য হইতে এক একজন করিয়া ভিক্ষার্থীদিগকে দেবীর সিংহাসনসমীপে রঙ্গরাজ আনিতে লাগিল। তাহারা সম্মুখে আসিয়া ভক্তিভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। যে বয়োজ্যেষ্ঠ ও ব্রাহ্মণ, সেও প্রণাম করিল—কেন না, অনেকের বিশ্বাস ছিল যে, দেবী ভগবতীর অংশ, লোকের উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণা। সেই জন্য কেহ কখনও তাঁর সন্ধান ইংরেজের নিকট বলিত না, অথবা তাঁহার গ্রেপ্তারির সহায়তা করিত না। দেবী সকলকে মধুর ভাষায় সম্বোধন করিয়া, তাহাদের নিজ নিজ অবস্থার পরিচয় লইলেন। পরিচয় লইয়া, যাহার যেমন অবস্থা, তাহাকে সেইরূপ দান করিতে লাগিলেন। নিকটে টাকাপোরা ঘড়া সব সাজান ছিল।

এইরূপ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দেবী দরিদ্রগণকে দান করিলেন। সন্ধ্যা অতীত হইয়া এক প্রহর রাত্রি হইল। তখন দান শেষ হইল। তখন পর্য্যন্ত দেবী জলগ্রহণ করেন নাই। দেবীর ডাকাইতি এইরূপ—অন্য ডাকাইতি নাই।

কিছু দিন মধ্যে রঙ্গপুরে গুড্‌ল্যাড্ সাহেবের কাছে সংবাদ পৌঁছিল যে, বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলমধ্যে দেবী চৌধুরাণীর ডাকাইতের দল জমায়ৎবস্ত হইয়াছে—ডাকাইতের সংখ্যা নাই। ইহাও রটিল যে, অনেক ডাকাইত রাশি রাশি অর্থ লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিতেছে—অতএব তাহারা অনেক ডাকাইতি করিয়াছে সন্দেহ নাই। যাহারা দেবীর নিকট দান পাইয়া ঘরে অর্থ লইয়া আসিয়াছিল, তাহারা সব মুনকির—বলে, টাকা কোথা? ইহার কারণ, ভয় আছে, টাকার কথা শুনিলেই ইজারাদারের পাইক সব কাড়িয়া লইয়া যাইবে। অথচ তাহারা খরচ-পত্র করিতে লাগিল—সুতরাং সকল লোকেরই বিশ্বাস হইল যে,

দেবী চৌধুরাণী এবার ভারী রকম লুঠিতেছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

যথাকালে পিতৃসমীপে উপস্থিত হইয়া ব্রজেশ্বর তাঁর পদবন্দনা করিলেন।

হরবল্লভ অন্যান্য কথার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, “আসল সংবাদ কি? টাকার কি হইয়াছে?”

ব্রজেশ্বর বলিলেন যে, “তাঁহার শ্বশুর টাকা দিতে পারেন নাই।” হরবল্লভের মাথায় বজ্রাঘাত হইল—হরবল্লভ চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তবে টাকা পাও নাই?”

“আমার শ্বশুর টাকা দিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু আর এক স্থানে টাকা পাইয়াছি—”

হরবল্লভ। পেয়েছ? তা আমায় এতক্ষণ বল নাই? দুর্গা, বাঁচলেম্!

ব্র। টাকাটা যে স্থানে পাইয়াছি, তাহাতে সে গ্রহণ করা উচিত কি না, বলা যায় না।

হর। কে দিল?

ব্রজেশ্বর অধোবদনে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, “তার নামটা মনে আসচে না—সেই যে মেয়ে ডাকাইত একজন আছে?”

হর। কে, দেবী চৌধুরাণী?

ব্র। সেই।

হর। তার কাছে টাকা পাইলে কি প্রকারে?

ব্রজেশ্বরের প্রাচীন নীতিশাস্ত্রে লেখে যে, এখানে বাপের কাছে ভাঁড়াভাঁড়িতে দোষ নাই। ব্রজ বলিল, “ও টাকাটা একটু সুযোগে পাওয়া গিয়াছে।”

হর। বদ্ লোকের টাকা! লেখাপড়া কি রকম হইয়াছে?

ব্র। একটু সুযোগে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া লেখাপড়া করিতে হয় নাই।

বাপ আর এ বিষয়ে বেশী খোঁচাখুঁচি করিয়া জিজ্ঞাসা না করে, এ অভিপ্রায়ে ব্রজেশ্বর তখনই কথাটা চাপা দিয়া বলিল, “পাপের ধন যে গ্রহণ করে, সেও পাপের ভাগী হয়। তাই ও টাকাটা লওয়া আমার তেমন মত নয়।”

হরবল্লভ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, “টাকা নেব না ত ফাটকে যাব না কি? টাকা ধার নেব, তার আবার পাপের টাকা পুণ্যের টাকা কি? আর জপতপের টাকাই বা কার কাছে পাব? সে আপত্তি করে কাজ নাই। কিন্তু আসল আপত্তি এই যে, ডাকাইতের টাকা, তাতে আবার লেখাপড়া করে নাই—ভয় হয়, পাছে দেরী হ’লে বাড়ী-ঘর লুটপাট করিয়া লইয়া যায়।”

ব্রজেশ্বর চুপ করিয়া রহিল।

হর। তা টাকার মিয়াদ কত দিন?

ব্র। আগামী বৈশাখ মাসের শুক্লা সপ্তমীর চন্দ্রাস্ত পর্য্যন্ত।

হর। তা সে হোলো ডাকাইত। দেখা দেয় না। কোথা তার দেখা পাওয়া যাবে যে, টাকা পাঠাইয়া দিব?

ব্র। ঐ দিন সন্ধ্যার পর সে সন্ধানপুরে কালসাজির ঘাটে বজরায় থাকিবে। সেইখানে টাকা পৌঁছাইলেই হইবে।

হরবল্লভ বলিলেন, "তা সেই দিন সেইখানেই টাকা পাঠাইয়া দেওয়া যাইবে।"

ব্রজেশ্বর বিদায় হইলেন। হরবল্লভ তখন মনে মনে বুদ্ধি খাটাইয়া কথাটা ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখিলেন। শেষে স্থির করিলেন, "হাঁঃ, সে বেটীর আবার টাকা শোধ দিতে যাবে! বেটীকে সিপাহী এনে ধরিয়ে দিলেই সব গোল মিটে যাবে। বৈশাখী সপ্তমীর দিন সন্ধ্যার পর কাপ্তেন সাহেব পল্টন শুদ্ধ তার বজরায় না উঠে—ত আমার নাম হরবল্লভই নয়। তাকে আর আমার কাছে টাকা নিতে হবে না।"

হরবল্লভ এই পুণ্যময় অভিসন্ধিটা আপনার মনে মনেই রাখিলেন—ব্রজেশ্বরকে বিশ্বাস করিয়া বলিলেন না।

এদিকে সাগর আসিয়া ব্রহ্মঠাকুরাণীর কাছে গিয়া গল্প করিল যে, ব্রজেশ্বর একটা রাজরাণীর বজরায় গিয়া, তাকে বিবাহ করিয়া আসিয়াছে,—সাগর অনেক মানা করিয়াছিল, তাহা শুনে নাই। মাগী জেতে কৈবর্ত্ত—আর তার দুইটা বিবাহ আছে—সুতরাং ব্রজেশ্বরের জাতি গিয়াছে, সুতরাং সাগর আর ব্রজেশ্বরের পাত্রাবিশিষ্ট ভোজন করিবে না, ইহা স্থির প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। ব্রহ্মঠাকুরাণী এ সকল কথা ব্রজেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করায় ব্রজেশ্বর অপরাধ স্বীকার করিয়া বলিল, "রাণীজি জাত্যংশে ভাল—আমার পিতৃঠাকুরের পিসী হয়। আর বিয়ে,—তা আমারও তিনটা, তারও তিনটা।"

ব্রহ্মঠাকুরাণী বুঝিল, কথাটা মিথ্যা; কিন্তু সাগরের মতলব যে, ব্রহ্মঠাকুরাণী এ গল্পটা নয়নতারার কাছে করে। সে বিষয়ে তিলার্দ্ধ বিলম্ব হইল না। নয়নতারা একে সাগরকে দেখিয়া জ্বলিয়াছিল, আবার শুনিল যে, স্বামী একটা বুড়া কন্যে বিবাহ করিয়াছে। নয়নতারা একেবারে আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল। সুতরাং কিছুদিন ব্রজেশ্বর নয়নতারার কাছে ঘেঁষিতে পারিলেন না—সাগরের ইজারা-মহল হইয়া রহিলেন।

সাগরের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। কিন্তু নয়নতারা বড় গোল বাঁধাইল—শেষে গিন্নীর কাছে গিয়া নালিশ করিল। গিন্নী বলিলেন, "তুমি বাছা, পাগল মেয়ে। বামুনের ছেলে কি কৈবর্ত্ত বিয়ে করে গা? তোমাকে সবাই ক্ষেপায়, তুমিও ক্ষেপ।"

নয়ান বৌ তবু বুঝিল না। বলিল, "যদি সত্য সত্যই বিয়ে হয়ে থাকে?" গিন্নী বলিলেন, "যদি সত্যিই হয়, তবে বৌ বরণ করে ঘরে তুলব। বেটার বৌ ত আর ফেল্‌তে পার্‌ব না।"

এই সময়ে ব্রজেশ্বর আসিল, নয়ান বৌ অবশ্য পলাইয়া গেল। ব্রজেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, "মা, কি বলছিলে গা?"

গিন্নী বলিলেন, "এই বল্‌ছিলাম যে, তুই যদি আবার বিয়ে করিস্‌, তবে আবার বৌ বরণ করে ঘরে তুলি।"

ব্রজেশ্বর অন্যমনা হইল, কিছু উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল।

প্রদোষকালে গিন্নী ঠাকুরাণী কর্ত্তা মহাশয়কে বাতাস করিতে করিতে, ভর্ত্তৃচরণে এই কথা নিবেদন করিলেন। কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মনটা কি?"

গিন্নী। আমি ভাবি কি যে, সাগর বৌ ঘর করে না। নয়ান বৌ ছেলের যোগ্য বৌ নয়। তা যদি একটি ভাল দেখে ব্রজ বিয়ে করে সংসার ধর্ম্ম করে, আমার সুখ হয়।

কর্ত্তা। তা ছেলের যদি সে রকম বোঝ, তা আমায় বলিও। আমি ঘটক ডেকে ভাল দেখে সম্বন্ধ করব।

গিন্নী। আচ্ছা, আমি মন বুঝিয়া দেখিব।

মন বুঝিবার ভার ব্রহ্মঠাকুরাণীর উপর পড়িল। ব্রহ্মঠাকুরাণী অনেক বিরহসন্তপ্ত এবং বিবাহ-প্রয়াসী রাজপুত্রের উপকথা ব্রজকে শুনাইলেন, কিন্তু ব্রজের মন তাহাতে কিছু বোঝা গেল না। তখন ব্রহ্মঠাকুরাণী স্পষ্ট জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন। কিছুই খবর পাইলেন না। ব্রজেশ্বর কেবল বলিল, "বাপ-মা যে আজ্ঞা

করিবেন, আমি তাই পালন করিব।”

কথাটার আর বড় উচ্চবাচ্য হইল না।

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

বৈশাখী শুক্লা সপ্তমী আসিল, কিন্তু দেবী রাণীর ঋণ পরিশোধের কোন উদ্যোগ হইল না। হরবল্লভ এক্ষণে অঋণী, মনে করিলে অনায়াসে অর্থ সংগ্রহ করিয়া দেবীর ঋণ পরিশোধ করিতে পারিতেন, কিন্তু সে দিকে মন দিলেন না। তাঁহাকে এ বিষয়ে নিতান্ত নিশ্চেষ্ট দেখিয়া ব্রজেশ্বর দুইচারিবার এ কথা উত্থাপন করিলেন, কিন্তু হরবল্লভ তাঁহাকে স্তোকবাক্যে নিবৃত্ত করিলেন। এদিকে বৈশাখ মাসের শুক্লা সপ্তমী প্রায়াগতা—দুই চারি দিন আছে মাত্র। তখন ব্রজেশ্বর পিতাকে টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। হরবল্লভ বলিলেন, “ভাল, ব্যস্ত হইও না। আমি টাকার সন্ধানে চলিলাম। ষষ্ঠীর দিন ফিরিব।” হরবল্লভ শিবিকারোহণে পাচক ব্রাহ্মণ, ভৃত্য ও দুই জন লাঠিয়াল (পাইক) সঙ্গে লইয়া গৃহ হইতে যাত্রা করিলেন।

হরবল্লভ টাকার চেষ্টায় গেলেন বটে, কিন্তু সে আর এক রকম। তিনি বরাবর রঙ্গপুর গিয়া কালেক্টর সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। তখন কালেক্টরই শান্তিরক্ষক ছিলেন। হরবল্লভ তাহাকে বলিলেন, “আমার সঙ্গে সিপাহী দিউন, আমি দেবী চৌধুরাণীকে ধরাইয়া দিব। ধরাইয়া দিতে পারিলে আমাকে কি পুরস্কার দিবেন বলুন।”

শুনিয়া সাহেব আনন্দিত হইলেন। তিনি জানিতেন যে, দেবী চৌধুরাণী দস্যুদিগের নেত্রী। তাহাকে ধরিতে পারিলে আর সকলে ধরা পড়িবে। তিনি দেবীকে ধরিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কোন মতে সফল হইতে পারেন নাই। অতএব হরবল্লভ সেই ভয়ঙ্করী রাক্ষসীকে ধরাইয়া দিবে শুনিয়া সাহেব সন্তুষ্ট হইলেন। পুরস্কার দিতে স্বীকৃত হইলেন। হরবল্লভ বলিলেন, “আমার সঙ্গে পাঁচ শত সিপাহী পাঠাইতে হুকুম হউক।” সাহেব সিপাহীর হুকুম দিলেন। হরবল্লভকে সঙ্গে করিয়া লেফ্‌টেনান্ট্ ব্রেনান্ সিপাহী লইয়া দেবীকে ধরিতে চলিলেন।

হরবল্লভ ব্রজেশ্বরের নিকট সবিশেষ শুনিয়াছিলেন, ঠিক সে ঘাটে দেবীকে পাওয়া যাইবে। সম্ভবতঃ দেবী বজরাতেই থাকিবে। লেফ্‌টেনান্ট্ ব্রেনান্ সেই জন্য কতক ফৌজ লইয়া ছিপে চলিলেন। এইরূপ পাঁচখানি ছিপ ভাঁটি দিয়া দেবীর বজরা ঘেরাও করিতে চলিল। এদিকে লেফ্‌টেনান্ট্ সাহেব আর কতক সিপাহী সৈন্য লুক্কায়িত ভাবে, বন দিয়া তটপন্থে পাঠাইলেন। যেখানে দেবীর বজরা থাকিবে, হরবল্লভ বলিয়া দিল; সেইখানে তীরবর্ত্তী বনমধ্যে ফৌজ লুকাইয়া রাখিলেন, যদি দেবী ছিপের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তটপথে পলাইবার চেষ্টা করে, তবে তাহাকে এই ফৌজের দ্বারা ঘেরাও করিয়া ধরিলেন। আরও এক পলাইবার পথ ছিল—ছিপগুলি ভাঁটি দিয়া আসিবে, দূর হইতে ছিপ দেখিতে পাইলে দেবী ভাঁটি দিয়া পলাইতে পারে, অতএব, লেফ্‌টেন্যান্ট্ ব্রেনান্ অবশিষ্ট সিপাহীগুলিকে দুই ক্রোশ ভাঁটিতে পাঠাইলেন, তাহাদিগের থাকিবার জন্য এমন একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন যে, সেখানে ত্রিস্রোতা নদী এই শুকার সময়ে সহজে হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। সিপাহীরা সেখানে তীরে লুকাইয়া থাকিবে, বজরা দেখিলেই জলে আসিয়া তাহা ঘেরাও করিবে।

সন্ন্যাসিনী রমণীকে ধরিবার জন্য এইরূপ ঘোরতর আড়ম্বর হইল। কিন্তু কর্তৃপক্ষেরা এ আড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন মনে করেন নাই। দেবী সন্ন্যাসিনী হউক আর নাই হউক, তাহার আজ্ঞাধীন হাজার যোদ্ধা আছে, সাহেবরা জানিতেন। এই যোদ্ধাদিগের নাম "বর্কন্দাজ।" অনেক সময়ে কোম্পানীর সিপাহীদিগকে এই বর্কন্দাজদিগের লাঠির চোটে পলাইতে হইয়াছিল, এইরূপ প্রবাদ। হায় লাঠি! তোমার দিন গিয়াছে! তুমি ছার বাঁশের বংশ বটে, কিন্তু শিক্ষিত হস্তে পড়িলে তুমি না পারিতে, এমন কাজ নাই। তুমি কত তরবারি দুই টুক্‌রা করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ, কত ঢাল খাঁড়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছ—হায়! বন্দুক আর সঙ্গীন তোমার প্রহারে যোদ্ধার হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছে। যোদ্ধা ভাঙ্গা হাত লইয়া পলাইয়াছে। লাঠি! তুমি বাঙ্গালায় আব্রু পর্দ্দা রাখিতে, মান রাখিতে, ধান রাখিতে, ধন রাখিতে, জন রাখিতে, সবার মন রাখিতে। মুসলমান তোমার ভয়ে ত্রস্ত ছিল, ডাকাইত তোমার জ্বালায় ব্যস্ত ছিল, নীলকর তোমার ভয়ে নিরস্ত ছিল। তুমি তখনকার পীনাল কোড ছিলে—তুমি পীনাল কোডের মত দুষ্টের দমন করিতে; পীনাল কোডের মত শিষ্টেরও দমন করিতে এবং পীনাল কোডের মত রামের অপরাধে শ্যামের মাথা ভাঙ্গিতে। তবে পীনাল কোডের উপর তোমার এই সর্দারি ছিল যে, তোমার উপর আপীল চলিত না। হায়! এখন তোমার সে মহিমা গিয়াছে! পীনাল কোড তোমাকে তাড়াইয়া তোমার আসন গ্রহণ করিয়াছে—সমাজ-শাসন-ভার তোমার হাত হইতে তার হাতে গিয়াছে। তুমি, লাঠি! আর লাঠি নও, বংশখণ্ড মাত্র—ছড়িত্ব প্রাপ্ত হইয়া শৃগাল-কুক্কুর-ভীত! বাবুবর্গের হাতে শোভা কর; কুক্কুর ডাকিলেই সে ননীর হাতগুলি হইতে খসিয়া পড়ে। তোমার সে মহিমা আর নাই। শুনিতে পাই, সেকালে তুমি না কি উত্তম ঔষধ ছিলে—মানসিক ব্যাধির উত্তম চিকিৎসকদিগের মুখে শুনিতে পাই, "মূর্খস্য লাঠ্যৌষধং।" এখন মূর্খের ঔষধ "বাপু" "বাছা"—তাহাতেও রোগ ভাল হয় না। তোমার সগোত্র সপিণ্ডগণের মধ্যে অনেকেরই গুণ এই দুনিয়াতে জাজ্বল্যমান। ইস্তক আড়া বাঁকারি খুঁটি খোঁটা লাগায়েৎ শ্রীনন্দনন্দনের মোহন বংশী, সকলেরই গুণ বুঝি—কিন্তু লাঠি! তোমার মত কেহ না। তুমি আর নাই—গিয়াছ। ভরসা করি, তোমার অক্ষয় স্বর্গ হইয়াছে; তুমি ইন্দ্রলোকে গিয়া নন্দনকাননের পুষ্পভারাবনত পারিজাত বৃক্ষ-শাখার ঠেক্‌নো হইয়া আছ, দেবকন্যারা তোমার ঘায় কল্পবৃক্ষ হইতে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষরূপ ফল সকল পাড়িয়া লইতেছে। এক আধটা ফল যেন পৃথিবীতে গড়াইয়া পড়ে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যার লাঠির ভয়ে এত সিপাহীর সমাগম, তার কাছে একখানি লাঠিও ছিল না। নিকটে একটি লাঠিয়ালও ছিল না। দেবী সেই ঘাটে—যে ঘাটে বজরা আসিয়া বাঁধিয়া ব্রজেশ্বরকে বন্দী করিয়া আনিয়াছিল, সেই ঘাটে। সবে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে মাত্র। সেই বজরা তেমনই সাজান—সব ঠিক্ সে রকম নয়। সে ছিপখানি সেখানে নাই—তাহাতে যে পঞ্চাশ জন লাঠিয়াল ছিল, তাহারা নাই। তার পর বজরার উপরেও একটি পুরুষমানুষ নাই—মাঝি মাল্লা, রঙ্গরাজ প্রভৃতি কেহ নাই। কিন্তু বজরার মাস্তুল উঠান—চারিখান পাল তোলা আছে—বাতাসের অভাবে পাল মাস্তুলে জড়ান পড়িয়া আছে। বজরার নোঙ্গরও ফেলা নহে, কেবল দুগাছা কাছিতে তীরে খোঁটায় বাঁধা আছে।

তৃতীয়, দেবী নিজে তেমন রত্নাভরণভূষিতা মহার্ঘবস্ত্রপরিহিতা নয়, কিন্তু আর এক প্রকারে শোভা আছে। ললাট, গণ্ড, বাহু, হৃদয়, সর্ব্বাঙ্গ সুগন্ধি চন্দনে চর্চ্চিত; চন্দনচর্চ্চিত ললাট বেষ্টন করিয়া সুগন্ধি পুষ্পের মালা শিরোদেশের বিশেষ শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। হাতে ফুলের বালা। অন্য অলঙ্কার একখানিও নাই। পরণে সেই মোটা শাড়ি।

আর, আজ দেবী একা ছাদের উপর বসিয়া নহে, কাছে আর দুই জন স্ত্রীলোক বসিয়া। একজন নিশি, অপর দিবা। এই তিন জনে যে কথাটা হইতেছিল, তাহার মাঝখান হইতে বলিলেও ক্ষতি নাই।

দিবা বলিতেছিল—দিবা অশিক্ষিতা, ইহা পাঠকের স্মরণ রাখা উচিত—বলিতেছিল, "হাঁঃ পরমেশ্বরকে না কি আবার প্রত্যক্ষ দেখা যায়?"

প্রফুল্ল বলিল, "না, প্রত্যক্ষ দেখা যায় না। কিন্তু আমি প্রত্যক্ষ দেখার কথা বলিতেছিলাম না—আমি প্রত্যক্ষ করার কথা বলিতেছিলাম। প্রত্যক্ষ ছয় রকম। তুমি যে প্রত্যক্ষ দেখার কথা কহিতেছিলে, সে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ—চক্ষের প্রত্যক্ষ। আমার গলার আওয়াজ তুমি শুনিতে পাইতেছ—আমার গলার আওয়াজ তোমার শ্রবণ প্রত্যক্ষ, অর্থাৎ কাণের প্রত্যক্ষের বিষয় হইতেছে। আমার হাতের ফুলের গন্ধ তোমার নাকে যাইতেছে কি?"

দিবা। যাইতেছে।

দেবী। ওটা তোমার ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষ হইতেছে। আর আমি যদি তোমার গালে এক চড় মারি, তাহা হইলে তুমি আমার হাতকে প্রত্যক্ষ করিবে—সেটা ত্বাচ প্রত্যক্ষ। আর এখনি নিশি যদি তোমার মাথা খায়, তাহা হইলে, তোমার মগজটা তার রাসন প্রত্যক্ষ হইবে।

দিবা। মন্দ প্রত্যক্ষ হইবে না। কিন্তু পরমেশ্বরকে দেখাও যায় না, শোনাও যায় না, শোঁকাও যায় না, ছোঁয়াও যায় না, খাওয়াও যায় না। তাঁকে প্রত্যক্ষ করিব কি প্রকারে?

নিশি। এ ত গেল পাঁচ রকম প্রত্যক্ষ। ছয় রকম প্রত্যক্ষের কথা বলিয়াছি; কেন না, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, রসনা ও ত্বক্ ছাড়া আর একটা জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে, জান না?

দিবা। কি দাঁত?

নিশি। দূর হ্ (পোড়ারমুখী)! ইচ্ছা করে, কিল মেরে তোর সে ইন্দ্রিয়ের পাটিকে পাটি ভেঙ্গে দিই।

দেবী। (হাসিতে হাসিতে) চক্ষুরাদি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় হস্তাপদাদি পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়, আর ইন্দ্রিয়াধিপতি মনঃ উভয়েন্দ্রিয় অর্থাৎ মনঃ জ্ঞানেন্দ্রিয় বটে, কর্ম্মেন্দ্রিয়ও বটে। মনঃ জ্ঞানেন্দ্রিয় বলিয়া মনের দ্বারাও প্রত্যক্ষ আছে। ইহাকে মানস প্রত্যক্ষ বলে। ঈশ্বর মানস প্রত্যক্ষের বিষয়।

নিশি। "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ- প্রমাণাভাবাৎ।"

যিনি সাংখ্যপ্রবচনসূত্র ও ভাষ্য পড়িয়াছেন, তিনি নিশির এই ব্যঙ্গোক্তির মর্ম্ম বুঝিবেন। নিশি প্রফুল্লের এক প্রকার সহাধ্যায়িনী ছিল।

প্রফুল্ল উত্তর করিল, "সূত্রকারস্যোভয়েন্দ্রিয়শূন্যত্বাৎ—ন তু প্রমাণাভাবাৎ।"

দিবা। রেখে দাও তোমার হাবাৎ মাবাৎ—আমি ত পরমেশ্বরকে কখন মনের ভিতর দেখিতে পাই নাই।

প্রফুল্ল। আবার দেখা? চাক্ষুষ প্রত্যক্ষই দেখা—অন্য কোন প্রত্যক্ষ দেখা নয়;—মানস প্রত্যক্ষও দেখা নয়। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয়—রূপ বহির্ব্বিষয়; মানস প্রত্যক্ষের বিষয়—অন্তর্ব্বিষয়। মনের দ্বারা ঈশ্বর প্রত্যক্ষ হইতে পারেন। ঈশ্বরকে দেখা যায় না।

দিবা। কই? আমি ত ঈশ্বরকে কখনও মনের ভিতর কোন রকম প্রত্যক্ষ করি নাই?

প্রফুল্ল। মানুষের স্বাভাবিক প্রত্যক্ষশক্তি অল্প—সাহায্য বা অবলম্বন ব্যতীত সকল বস্তু প্রত্যক্ষ করিতে পারে না।

দিবা। প্রত্যক্ষের জন্য আবার সাহায্য কি রকম? দেখ, এই নদী, জল, গাছ, পালা, নক্ষত্র, সকলই আমি বিনা সাহায্যে দেখিতে পাইতেছি।

"সকলই নয়। ইহার একটি উদাহরণ দিব?" বলিয়া প্রফুল্ল হাসিল।

হাসির রকমটা দেখিয়া নিশি জিজ্ঞাসা করিল, "কি?"

প্রফুল্ল বলিতে লাগিল, "ইংরেজের সিপাহী আমাকে আজ ধরিতে আসিতেছে জান?

দিবা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "তা ত জানি।"

প্রফুল্ল। সিপাহী প্রত্যক্ষ করিয়াছ?

দিবা। না। কিন্তু আসিলে প্রত্যক্ষ করিব।

প্র। আমি বলিতেছি, আসিয়াছে, কিন্তু বিনা সাহায্যে প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছি না। এই সাহায্য গ্রহণ কর।

এই বলিয়া প্রফুল্ল দিবার হাতে দূরবীক্ষণ দিল। ঠিক্ যে দিকে দেখিতে হইবে, দেখাইয়া দিল। দিবা দেখিল।

দেবী জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেখিলে?"

দিবা। একখানা ছিপ। উহাতে অনেক মানুষ দেখিতেছি বটে।

দেবী। উহাতে সিপাহী আছে। আর একখানা দেখ।

এরূপে দেবী দিবাকে পাঁচখানা ছিপ নানা স্থানে দেখাইল। নিশিও দেখিল। নিশি জিজ্ঞাসা করিল, "ছিপগুলি চরে লাগাইয়া আছে দেখিতেছি। আমাদের ধরিতে আসিয়াছে, কিন্তু আমাদের কাছে না আসিয়া ছিপ তীরে লাগাইয়া আছে কেন?"

দেবী। বোধহয়, ডাঙ্গা-পথে যে সকল সিপাহী আসিবে, তাহারা আসিয়া পৌঁছে নাই। ছিপের সিপাহী তাহাদের অপেক্ষায় আছে। ডাঙ্গার সিপাহী আসিবার আগে, ছিপের সিপাহী আগু হইলে, আমি ডাঙ্গা-পথে পলাইতে পারি, এই শঙ্কায় উহারা আগু হইতেছে না।

দিবা। কিন্তু আমরা ত উহাদের দেখিতে পাইতেছি; মনে করিলেই ত পলাইতে পারি।

দেবী। ওরা তা জানে না। ওরা জানে না যে, আমরা দূরবীন রাখি।

নিশি। ভগিনি! প্রাণে বাঁচিলে এক দিন না এক দিন স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবেক। আজ ডাঙ্গায় উঠিয়া প্রাণরক্ষা করিবে চল। এখনও যদি ডাঙ্গায় সিপাহী আসে নাই, তবে ডাঙ্গা-পথে এখন প্রাণরক্ষার উপায় আছে।

দেবী। যদি প্রাণের জন্য আমি এত কাতর হইব, তবে আমি সকল সংবাদ জানিয়া শুনিয়া এখানে আসিলাম কেন? আসিলাম যদি, তবে লোকজন সবাইকে বিদায় দিলাম কেন? আমার হাজার বর্‌কন্দাজ আছে—তাহাদের সকলকে অন্য স্থানে পাঠাইলাম কেন?

দিবা। আমরা আগে যদি জানিতাম, তাহা হইলে তোমায় এমন কর্ম্ম করিতে দিতাম না।

দেবী। তোমার সাধ্য কি, দিবা! যা আমি স্থির করিয়াছি, তা অবশ্য করিব। আজ স্বামী-দর্শন করিব, স্বামীর অনুমতি লইয়া জন্মান্তরে তাঁহাকে কামনা করিয়া প্রাণ সমর্পণ করিব। তোমরা আমার কথা শুনিও, দিবা নিশি! আমার স্বামী যখন ফিরিয়া যাইবেন, তখন তাঁহার নৌকায় উঠিয়া তাঁহার সঙ্গে চলিয়া যাইও। আমি একা ধরা দিব, আমি একা ফাঁসি যাব। সেই জন্যই বজরা হইতে আর সকলকে বিদায় দিয়াছি। তোমরা তখন গেলে না। কিন্তু আমায় এই ভিক্ষা দাও—আমার স্বামীর নৌকায় উঠিয়া পলায়ন করিও।

নিশি। ধড়ে প্রাণ থাকিতে তোমায় ছাড়িব না। মরিতে হয়, একত্র মরিব।

প্র। ও সকল কথা এখন থাক্—যাহা বলিতেছিলাম, তা বলিয়া শেষ করি। যাহা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছিলাম না, তা যেমন দূরবীক্ষণের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করিলে, তেমন ঈশ্বরকে মানস প্রত্যক্ষ করিতে দূরবীন চাই।

দিবা। মনের আবার দূরবীন কি?

প্র। যোগ।

দিবা। কি—সেই ন্যাস, প্রাণায়াম, কুম্ভক, বুজরুকি, ভেল্কি—

প্র। তাকে আমি যোগ বলি না। যোগ অভ্যাস মাত্র। কিন্তু সকল অভ্যাসই যোগ নয়। তুমি যদি দুধ ঘি খাইতে অভ্যাস কর, তাকে যোগ বলিব না। তিনটি অভ্যাসকেই যোগ বলি।

দিবা। কি কি তিনটি?

প্র। জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি। জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ।

ততক্ষণ নিশি দূরবীন লইয়া এদিক্ ওদিক দেখিতেছিল। দেখিতে দেখিতে বলিল, "সম্প্রতি উপস্থিত গোলযোগ।"

প্র। সে আবার কি? আবার গোলযোগ কি?

নিশি। একখানা পান্সি আসিতেছে। বুঝি ইংরেজের চর।

প্রফুল্ল নিশির হাত হইতে দূরবীন লইয়া পান্সি দেখিল। বলিল, "এই আমার সুযোগ। তিনিই আসিতেছেন। তোমরা নীচে যাও।"

দিবা ও নিশি ছাদ হইতে নামিয়া কামরার ভিতর গেল। পান্সি ক্রমে বাহিয়া আসিয়া বজরার গায়ে লাগিল। সেই পান্সিতে—ব্রজেশ্বর। ব্রজেশ্বর লাফাইয়া বজরায় উঠিয়া, পান্সি তফাতে বাঁধিয়া রাখিতে হুকুম দিলেন। পান্সিওয়ালা তাহাই করিল।

ব্রজেশ্বর নিকটে আসিলে প্রফুল্ল উঠিয়া দাঁড়াইয়া আনত মস্তকে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল। পরে উভয়ে বসিলে, ব্রজেশ্বর বলিল, "আজ টাকা আনিতে পারি নাই, দুই চারি দিনে দিতে পারিব বোধ হয়। দুই চারি দিনের পরে কবে কোথায় তোমার সঙ্গে দেখা হইবে, সেটা জানা চাই।"

ও ছি! ছি! ব্রজেশ্বর! দশ বছরের পর প্রফুল্লের সঙ্গে এই কি কথা?

দেবী উত্তর করিল, "আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হইবে না—" বলিতে বলিতে দেবীর গলাটা বুজিয়া আসিল—দেবী একবার চোখ মুছিল—"আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না, কিন্তু আমার ঋণ শুধিবার অন্য উপায় আছে। যখন সুবিধা হইবে, ঐ টাকা গরীব-দুঃখীকে বিলাইয়া দিবেন—তাহা হইলে আমি পাইব।"

ব্রজেশ্বর দেবীর হাত ধরিল। বলিল, "প্রফুল্ল! তোমার টাকা—"

ছাই টাকা! কথা শেষ হইল না—মুখের কথা মুখে রহিল। যেমনি ব্রজেশ্বর "প্রফুল্ল" বলিয়া ডাকিয়া হাত ধরিয়াছে, অমনি প্রফুল্লের দশ বছরের বাঁধা বাঁধ ভাঙ্গিয়া, চোখের জলের স্রোত ছুটিল। ব্রজেশ্বরের ছাই টাকার কথা সে স্রোতে কোথায় ভাসিয়া গেল। তেজস্বিনী দেবী রাণী ছেলেমানুষের মত বড় কান্নাটা কাঁদিল। ব্রজেশ্বর ততক্ষণ বড় বিপন্ন হইলেন। তাঁর মনে মনে বোধ আছে যে, এ পাপীয়সী ডাকাইতি করিয়া খায়, এর জন্য এক ফোঁটাও চোখের জল ফেলা হবে না। কিন্তু চোখের জল, অত বিধি ব্যবস্থা অবগত নয়, তারা অনাহূত আসায় ব্রজেশ্বরের চোখ ভরিয়া গেল। ব্রজেশ্বর মনে করিলেন, হাত উঠাইয়া চোখ মুছিলেই ধরা পড়িব। কাজেই চোখ মোছা হইল না। চোখ যখন মোছা হইল না, তখন পুকুর ছাপাইল—গাল বাহিয়া ধারা চলিল—প্রফুল্লের হাতে পড়িল।

তখন বালির বাঁধটা ভাঙ্গিয়া গেল। ব্রজেশ্বর মনে করিয়া আসিয়াছিলেন যে, প্রফুল্লকে ডাকাইতি করার জন্য ভারী রকম তিরস্কার করিবেন, পাপীয়সী বলিবেন—আরও দুই-চারিটা লম্বা চৌড়া কথা বলিয়া আবার একবার জন্মের মত ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন। কিন্তু কেঁদে যার হাত ভিজিয়ে দিলেন, তার উপর কি আর লম্বা চৌড়া কথা হয়?

তখন চক্ষু মুছিয়া ব্রজেশ্বর বলিল, "দেখ প্রফুল্ল, তোমার টাকা আমার টাকা—তার পরিশোধের জন্য আমি কেন কাতর হব? কিন্তু আমি বড় কাতরই

হইয়াছি। আমি আজ দশ বৎসর কেবল তোমাকেই ভাবিয়াছি। আমার আর দুই স্ত্রী আছে—আমি তাহাদিগকে এ দশ বৎসর স্ত্রী মনে করি নাই; তোমাকেই স্ত্রী জানি। কেন, তা বুঝি তোমায় আমি বুঝাইতে পারিব না। শুনিয়াছিলাম, তুমি নাই। কিন্তু আমার পক্ষে তুমি ছিলে। আমি তার পরও মনে জানিতাম, তুমিই আমার স্ত্রী—মনে আর কাহারও স্থান ছিল না। বল্‌ব না মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু বলাতেও ক্ষতি নাই—তুমি মরিয়াছ শুনিয়া, আমিও মরিতে বসিয়াছিলাম। এখন মনে হয়, মরিলেই ভাল হইত; তুমি মরিলে ভাল হইত—না মরিয়াছিলে ত আমি মরিলেই ভাল হইত। এখন যাহা শুনিয়াছি, বুঝিয়াছি, তা শুনিতে হইত না, বুঝিতে হইত না। আজ দশ বৎসরের হারান ধন তোমায় পাইয়াছি, আমার স্বর্গসুখের অপেক্ষা অধিক সুখ হইত। তা না হয়ে প্রফুল্ল, আজ তোমায় পাইয়া মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা।" তার পর একবার থামিয়া একটু ঢোক গিলিয়া, মাথা টিপিয়া ধরিয়া ব্রজেশ্বর বলিল, "মনের মন্দিরের ভিতর সোনার প্রতিমা গড়িয়া রাখিয়াছিলাম—আমার সেই প্রফুল্ল—মুখে আসে না—সেই প্রফুল্লের এই বৃত্তি!"

প্রফুল্ল বলিল, "কি? ডাকাইতি করি?"

ব্র। কর না কি?

ইহার উত্তরে প্রফুল্ল একটা কথা বলিতে পারিত। যখন ব্রজেশ্বরের পিতা প্রফুল্লকে জন্মের মত ত্যাগ করিয়া গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দেয়, তখন প্রফুল্ল কাতর হইয়া শ্বশুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আমি অন্নের কাঙ্গাল, তোমরা তাড়াইয়া দিলে—আমি কি করিয়া খাইব?" তাহাতে শ্বশুর উত্তর দিয়াছিলেন, "চুরি-ডাকাইতি করিয়া খাইও।" প্রফুল্ল মেধাবিনী—সে কথা ভুলে নাই। ভুলিবার কথাও নহে। আজ ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে ডাকাইত বলিয়া এই ভর্ৎসনা করিল; আজ প্রফুল্লের সেই উত্তর ছিল। প্রফুল্লের এই উত্তর ছিল, "আমি ডাকাইত বটে—তা এখন এত ভর্ৎসনা কেন? তোমরাই ত চুরি-ডাকাইতি করিয়া খাইতে বলিয়াছিলে। আমি গুরুজনের আজ্ঞা পালন করিতেছি।" এ উত্তর সম্বরণ করাই যথার্থ পুণ্য। প্রফুল্ল সে পুণ্য সঞ্চয় করিল,—সে কথা মুখেও আনিল না। প্রফুল্ল স্বামীর কাছে হাত জোড় করিয়া এই উত্তর দিল। বলিল, "আমি ডাকাইত নই। আমি তোমার কাছে শপথ করিতেছি, আমি কখন ডাকাইতি করি নাই। কখন ডাকাইতির এক কড়া লই নাই। তুমি আমার দেবতা। আমি অন্য দেবতার অর্চ্চনা করিতে শিখিতেছিলাম—শিখিতে পারি নাই; তুমি সব দেবতার স্থান অধিকার করিয়াছ—তুমিই একমাত্র আমার দেবতা। আমি তোমার কাছে শপথ করিতেছি—আমি ডাকাইত নই। তবে জানি, লোকে আমাকে ডাকাইত বলে। কেন বলে, তাও জানি? সেই কথা তোমাকে আমার কাছে শুনিতে হইবে। সেই কথা শুনাইব বলিয়াই আজ এখানে আসিয়াছি। আজ না শুনিলে, আর শুনা হইবে না। শোন, আমি বলি।"

তখন যে দিন প্রফুল্ল শ্বশুরালয় হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল, সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত আপনার কাহিনী সকলই অকপটে বলিল। শুনিয়া ব্রজেশ্বর বিস্মিত, লজ্জিত, অতিশয় আহ্লাদিত, আর মহামহিমময়ী স্ত্রীর সমীপে কিছু ভীত হইলেন। প্রফুল্ল সমাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমার এ কথাগুলিতে বিশ্বাস করিলে কি?"

অবিশ্বাসের জায়গা ছিল না—প্রফুল্লের প্রতি কথা ব্রজেশ্বরের হাড়ে হাড়ে বসিয়াছিল। ব্রজেশ্বর উত্তর করিতে পারিল না—কিন্তু তাহার আনন্দপূর্ণ কান্তি দেখিয়া প্রফুল্ল বুঝিল, বিশ্বাস হইয়াছে। তখন প্রফুল্ল বলিতে লাগিল, "এখন পায়ের ধূলা দিয়া এ জন্মের মত আমায় বিদায় দাও। আর এখানে বিলম্ব করিও না—সম্মুখে কোন বিঘ্ন আছে। তোমায় এই দশ বৎসরের পর পাইয়া এখনই উপযাচিকা হইয়া বিদায় দিতেছি; ইহাতেই বুঝিবে যে, বিঘ্ন বড় সামান্য নহে। আমার দুইটি সখী এই নৌকায় আছে। তাহারা বড় গুণবতী, আমিও তাহাদের বড় ভালবাসি। তোমার নৌকায় তাহাদের লইয়া যাও। বাড়ী পৌঁছিয়া, তারা যেখানে যাইতে চায়, সেইখানে পাঠাইয়া দিও। আমায় যেমন মনে রাখিয়াছিলে, তেমনি মনে রাখিও, সাগর যেন আমায় না ভুলে।"

ব্রজেশ্বর ক্ষণেক কাল নীরবে ভাবিল। পরে বলিল, “আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, প্রফুল্ল! আমায় বুঝাইয়া দাও। তোমার এত লোক—কেহ নাই! বজরার মাঝিরা পর্য্যন্ত নাই! কেবল দুইটি স্ত্রীলোক আছে, তাদেরও বিদায় করিতে চাহিতেছে। সম্মুখে বিঘ্ন বলিতেছ—আমাকে থাকিতে নিষেধ করিতেছ। আর এ জন্মে সাক্ষাৎ হইবে না বলিতেছ। এ সব কি? সম্মুখে কি বিঘ্ন আমাকে না বলিলে, আমি যাইব না। বিঘ্ন কি, শুনিলেও যাইব কি না, তাও বলিতে পারি না।”

প্রফুল্ল। সে সব কথা তোমার শুনিবার নয়।

ব্র। তবে আমি কি তোমার কেহ নই?

এমন সময় দুম্ করিয়া একটা বন্দুকের শব্দ হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দুম্ করিয়া একটা বন্দুকের শব্দ হইল—ব্রজেশ্বরের মুখের কথা মুখে রহিল, দুইজনে চমকিয়া সম্মুখে চাহিয়া দেখিল—দেখিল, দূরে পাঁচখানা ছিপ আসিতেছে, বটিয়ার তাড়নে জল চাঁদের আলোয় জ্বলিতেছে। দেখিতে দেখিতে দেখা গেল, পাঁচখানা ছিল সিপাহী-ভরা। ডাঙ্গা-পথের সিপাহীরা আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তারই সঙ্কেত বন্দুকের শব্দ। শুনিয়াই পাঁচখানা ছিপ খুলিয়াছিল। দেখিয়া প্রফুল্ল বলিল, “আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিও না। শীঘ্র আপনার পান্সিতে উঠিয়া চলিয়া যাও।”

ব্র। কেন? এ ছিপগুলো কিসের? বন্দুক কিসের?

প্র। না শুনিলে যাইবে না?

ব্র। কোন মতেই না।

প্র। এ ছিপে কোম্পানীর সিপাহী আছে। এ বন্দুক ডাঙ্গা হইতে কোম্পানির সিপাহী আওয়াজ করিল।

ব্র। কেন এত সিপাহী এদিকে আসিতেছে? তোমাকে ধরিবার জন্য?

প্রফুল্ল চুপ করিয়া রহিল। ব্রজেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার কথায় বোধ হইতেছে, তুমি পূর্ব্ব হইতে এই সংবাদ জানিতে।”

প্র। জানিতাম—আমার চর সর্ব্বত্র আছে।

ব্র। এ ঘাটে আসিয়া জানিয়াছ, না আগে জানিয়াছ?

প্র। আগে জানিয়াছিলাম।

ব্র। তবে, জানিয়া শুনিয়া এখানে আসিলে কেন?

প্র। তোমাকে আর একবার দেখিব বলিয়া।

ব্র। তোমার লোকজন কোথায়?

প্র। বিদায় দিয়াছি। তারা কেন আমার জন্য মরিবে?

ব্র। নিশ্চিত ধরা দিবে, স্থির করিয়াছ?

প্র। আর বাঁচিয়া কি হইবে? তোমার দেখা পাইলাম, তোমাকে মনের কথা বলিলাম, তুমি আমায় ভালবাস, তাহা শুনিলাম। আমার যে কিছু ধন ছিল, তাহাও বিলাইয়া শেষ করিয়াছি। আর এখন বাঁচিয়া কোন্ কাজ করিব বা কোন্ সাধ মিটাইব? আর বাঁচিব কেন?

ব্র। বাঁচিয়া, আমার ঘরে গিয়া, আমার ঘর করিবে।

প্র। সত্য বলিতেছ?

ব্র। তুমি আমার কাছে শপথ করিয়াছ, আমিও তোমার কাছে শথ করিতেছি। আজ যদি তুমি প্রাণ রাখ, আমি তোমাকে আমার ঘরণী গৃহিণী করিব।

প্র। আমার শ্বশুর কি বলিবেন?

ব্র। আমার বাপের সঙ্গে আমি বোঝাপড়া করিব।

প্র। হায়! এ কথা কাল শুনি নাই কেন?

ব্র। কাল শুনিলে কি হইত?

প্র। তাহা হইলে কার সাধ্য আজ আমায় ধরে?

ব্র। এখন?

প্র। এখন আর উপায় নাই। তোমার পান্সি ডাক—নিশি ও দিবাকে লইয়া শীঘ্র যাও।

ব্রজেশ্বর আপনার পান্সি ডাকিল। পান্সিওয়ালা নিকটে আসিলে, ব্রজেশ্বর বলিল, "তোরা শীঘ্র পলা, ঐ কোম্পানীর সিপাহীর ছিপ আসিতেছে; তোদের দেখিলে উহারা বেগার ধরিবে। শীঘ্র পলা, আমি যাইব না, এইখানে থাকিব।"

পান্সির মাঝি মহাশয়, আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, তৎক্ষণাৎ পান্সি খুলিয়া প্রস্থান করিলেন। ব্রজেশ্বর চেনা লোক, টাকার ভাবনা নাই।

পান্সি চলিয়া গেল দেখিয়া, প্রফুল্ল বলিল, "তুমি গেলে না?"

ব্র। কেন, তুমি মরিতে জান, আমি জানি না? তুমি আমার স্ত্রী—আমি তোমায় শতবার ত্যাগ করিতে পারি। কিন্তু আমি তোমার স্বামী—বিপদে আমিই ধর্ম্মতঃ তোমার রক্ষাকর্ত্তা। আমি রক্ষা করিতে পারিব না—তাই বলিয়া কি বিপদ্‌কালে তোমাকে ত্যাগ করিয়া যাইব?

"তবে কাজেই আমি স্বীকার করিলাম, প্রাণরক্ষার যদি কোন উপায় হয়, তা আমি করিব।" এই বলিতে বলিতে প্রফুল্ল আকাশপ্রান্তে দৃষ্টিপাত করিল। যাহা দেখিল, তাহাতে যেন কিছু ভরসা হইল। আবার তখনই নির্ভরসা হইয়া বলিল, "কিন্তু আমার প্রাণ-রক্ষায় আর এক অমঙ্গল আছে।"

ব্র। কি?

প্র। এ কথা তোমায় বলিব না মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন আর না বলিলে নয়। এই সিপাহীদের সঙ্গে আমার শ্বশুর আছেন। আমি ধরা না পড়িলে তাঁর বিপদ্ ঘটিলেও ঘটিতে পারে।

ব্রজেশ্বর শিহরিল—মাথায় করাঘাত করিল। বলিল, "তিনিই কি গোইন্দা?"

প্রফুল্ল চুপ করিয়া রহিল। ব্রজেশ্বরের বুঝিতে কিছু বাকি রহিল না। এখানে আজিকার রাত্রে যে দেবী চৌধুরাণীর সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে, এ কথা হরবল্লভ ব্রজেশ্বরের কাছে শুনিয়াছিলেন। ব্রজেশ্বর আর কাহারও কাছে এ কথা বলেন নাই; দেবীরও যে গূঢ় মন্ত্রণা, আর কাহারও জানিবার সম্ভাবনা নাই। বিশেষ দেবী এ ঘাটে আসিবার আগেই কোম্পানীর সিপাহী রঙ্গপুর হইতে যাত্রা করিয়াছিল, সন্দেহ নাই; নহিলে ইহারই মধ্যে পৌঁছিত না। আর ইতিপূর্ব্বেই হরবল্লভ কোথায় যাইতেছেন, কাহারও কাছে প্রকাশ না করিয়া দূরযাত্রা করিয়াছেন, আজও ফেরেন নাই। কথাটা বুঝিতে দেরী হইল না। তাই হরবল্লভ টাকা পরিশোধের কোন উদ্যোগ করেন নাই। তথাপি ব্রজেশ্বর ভুলিলেন না যে,

“পিতা ধর্ম্মঃ, পিতা স্বর্গঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ ॥ ”

ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে বলিলেন, “আমি মরি কোন ক্ষতি নাই। তুমি মরিলে, আমার মরার অধিক হইবে, কিন্তু আমি দেখিতে আসিব না। তোমার আত্মরক্ষার আগে, আমার ছার প্রাণ রাখিবার আগে, আমার পিতাকে রক্ষা করিতে হইবে।”

প্র। সে জন্য চিন্তা নাই। আমার রক্ষা হইবে না, অতএব তাঁর কোন ভয় নাই। তিনি তোমায় রক্ষা করিলে করিতে পারিবেন। তবে ইহাও তোমার মনস্তুষ্টির জন্য আমি স্বীকার করিতেছি যে, তাঁর অমঙ্গল সম্ভাবনা থাকিতে, আমি আত্মরক্ষার কোন উপায় করিব না। তুমি বলিলেও করিতাম না, না বলিলেও করিতাম না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকিও।

এই কথা দেবী আন্তরিক বলিয়াছিল। হরবল্লভ প্রফুল্লের সর্ব্বনাশ করিয়াছিল, হরবল্লভ এখন দেবীর সর্ব্বনাশ করিতে নিযুক্ত। তবু দেবী তার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিনী। কেন না, প্রফুল্ল নিষ্কাম। যার ধর্ম্ম নিষ্কাম, সে কার মঙ্গল খুঁজিলাম, তত্ত্ব রাখে না। মঙ্গল হইলেই হইল।

কিন্তু এ সময়ে তীরবর্ত্তী অরণ্যমধ্য হইতে গভীর তূর্য্যধ্বনি হইল। দুইজনেই চমকিয়া উঠিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দেবী ডাকিল, “নিশি!”

নিশি ছাদের উপর আসিল।

দেবী। কার ভেরী ঐ?

নিশি। যেন দাড়ি বাবাজীর বলিয়া বোধ হয়।

দেবী রঙ্গরাজের?

নিশি। সেই রকম।

দেবী। সে কি? আমি রঙ্গরাজকে প্রাতে দেবীগড় পাঠাইয়াছি।

নিশি। বোধ হয়, পথ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে।

দেবী। রঙ্গরাজকে ডাক।

ব্রজেশ্বর বলিল, “ভেরীর আওয়াজ অনেক দূর হইতে হইয়াছে। এখান হইতে ডাকিলে ডাক শুনিতে পাইবে না। আমি নামিয়া গিয়া ভেরীওয়ালাকে খুঁজিয়া আনিতেছি।”

দেবী বলিল, “কিছু করিতে হইবে না। তুমি একটু নীচে গিয়া নিশির কৌশল দেখ।”

নিশি ও ব্রজ নীচে আসিল। নিশি নীচে গিয়া এক বাঁশী বাহির করিল। নিশি গীত বাদ্যে বড় পটু, সে শিক্ষাটা রাজবাড়ীতে হইয়াছিল। নিশিই দেবীর বীণার ওস্তাদ। নিশি বাঁশীতে ফুঁ দিয়া মল্লারে তান মারিল। অনতিবিলম্বে রঙ্গরাজ বজরায় আসিয়া উঠিয়া দেবীকে আশীর্ব্বাদ করিল।

এই সময়ে ব্রজেশ্বর নিশিকে বলিল, “তুমি ছাদে যাও। তোমার কাছে কেহ বোধ হয়, কথা লুকাইবে না। কি কথা হয়, শুনিয়া আসিয়া আমাকে সব

বলিও।”

নিশি স্বীকৃত হইয়া কামরার বাহির হইল—বাহির হইয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া ব্রজেশ্বরকে বলিল, “আপনি একটু বাহিরে আসিয়া দেখুন।”

ব্রজেশ্বর মুখ বাড়াইয়া দেখিল। দেখিতে পাইল, জঙ্গলের ভিতর হইতে অগণিত মনুষ্য বাহির হইতেছে। নিশিকে জিজ্ঞাসা করিল, “উহারা কারা? সিপাই?”

নিশি বলিল, “বোধ হয় উহারা বর্‌কন্দাজ। রঙ্গরাজ আনিয়া থাকিবে।”

দেবীও সেই মনুষ্যশ্রেণী দেখিতেছিল, এমন সময়ে রঙ্গরাজ আসিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। দেবী জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি এখানে কেন, রঙ্গরাজ?”

রঙ্গরাজ প্রথমে কোন উত্তর করিল না। দেবী পুনরপি বলিল, “আমি সকালে তোমাকে দেবীগড় পাঠাইয়াছিলাম। সেখানে যাও নাই কেন? আমার কথা অমান্য করিয়াছ কেন?”

রঙ্গ। আমি দেবীগড় যাইতেছিলাম—পথে ঠাকুরজির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল।

দেবী। ভবানী ঠাকুর?

রঙ্গ। তাঁর কাছে শুনিলাম, কোম্পানীর সিপাহী আপনাকে ধরিতে আসিতেছে। তাই আমরা দুইজনে বর্‌কন্দাজ সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসিয়াছি। বর্‌কন্দাজ জঙ্গলে লুকাইয়া রাখিয়া আমি তীরে বসিয়াছিলাম। ছিপ আসিতেছে দেখিয়া আমি ভেরী বাজাইয়া সঙ্কেত করিয়াছি।

দেবী। ও জঙ্গলেও সিপাহী আছে?

রঙ্গ। তাহাদের আমরা ঘেরিয়া ফেলিয়াছি।

দেবী। ঠাকুরজি কোথায়?

রঙ্গ। ঐ বর্‌কন্দাজ লইয়া বাহির হইতেছেন।

দেবী। তোমরা কত বর্‌কন্দাজ আনিয়াছ?

রঙ্গ। প্রায় হাজার হইবে।

দেবী। সিপাহী কত?

রঙ্গ। শুনিয়াছি। পাঁচ শ।

দেবী। এই পনের শ লোকের লড়াই হইলে, মরিবে কত?

রঙ্গ। তা দুই চারি শ মরিলেও মরিতে পারে।

দেবী। ঠাকুরজিকে গিয়া বল—তুমিও শোন যে, তোমাদের এই আচরণে আমি আজ মর্ম্মান্তিক মনঃপীড়া পাইলাম।

রঙ্গ। কেন, মা?

দেবী। একটা মেয়েমানুষের প্রাণের জন্য এত লোক তোমরা মরিবার বাসনা করিয়াছ—তোমাদের কি কিছু ধর্ম্মজ্ঞান নাই? আমার পরমায়ু শেষ হইয়া থাকে, আমি একা মরিব—আমার জন্য চারি শ লোক কেন মরিবে? আমায় কি তোমরা এমন অপদার্থ ভাবিয়াছ যে, আমি এত লোকের প্রাণ নষ্ট করিয়া আপনার প্রাণ বাঁচাইব?

রঙ্গ। আপনি বাঁচিলে অনেক লোকের প্রাণরক্ষা হইবে।

দেবী রাগে, ঘৃণায় অধীর হইয়া বলিল, "ছি!" সেই ধিক্কারে রঙ্গরাজ অধোবদন হইল—মনে করিল, "পৃথিবী দ্বিধা হউক, আমি প্রবেশ করি।"

দেবী তখন বিস্ফারিত নয়নে, ঘৃণাস্ফুরিত কম্পিতাধরে বলিতে লাগিল, "শোন, রঙ্গরাজ! ঠাকুরজিকে গিয়া বল, এই মুহূর্তে বর্‌কন্দাজ সকল ফিরাইয়া লইয়া যাউন। তিলার্দ্ধ বিলম্ব হইলে, আমি এই জলে ঝাঁপ দিয়া মরিব, তোমরা কেহ রাখিতে পারিবে না।"

রঙ্গরাজ এতটুকু হইয়া গেল। বলিল, "আমি চলিলাম। ঠাকুরজিকে এই সকল কথা জানাইব। তিনি যাহা ভাল বুঝিবেন, তাহা করিবেন। আমি উভয়েরই আজ্ঞাকারী।"

রঙ্গরাজ চলিয়া গেল। নিশি ছাদে দাঁড়াইয়া সব শুনিয়াছিল। রঙ্গরাজ গেলে, সে দেবীকে বলিল, "ভাল, তোমার প্রাণ লইয়া তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে পার, কাহারও নিষেধ করিবার অধিকার নাই। কিন্তু আজ তোমার সঙ্গে তোমার স্বামী—তাঁর জন্যেও ভাবিলে না?"

দেবী। ভাবিয়াছি ভগিনি! ভাবিয়া কিছু করিতে পারি নাই। জগদীশ্বর মাত্র ভরসা। যা হইবার, হইবে। কিন্তু যাহা হউক নিশি—এক কথা সার। আমার স্বামীর প্রাণ বাঁচাইবার জন্য এত লোকের প্রাণ নষ্ট করিবার আমার কোন অধিকার নাই। আমার স্বামী আমার বড় আদরের—তাদের কে?

নিশি মনে মনে দেবীকে ধন্য ধন্য বলিল। ভাবিল, "এই সার্থক নিষ্কাম ধর্ম্ম শিখিয়াছিল। ইহার সঙ্গে মরিয়াও সুখ।"

নিশি গিয়া, সকল কথা ব্রজেশ্বরকে শুনাইল। ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে আর আপনার স্ত্রী বলিয়া ভাবিতে পারিল না; মনে মনে বলিল, "যথার্থ দেবীই বটে। আমি নরাধম! আমি আবার ইহাকে ডাকাইত বলিয়া ভর্ৎসনা করিতে গিয়াছিলাম।"

এদিকে পাঁচ দিক্ হইতে পাঁচখানা ছিপ আসিয়া বজরার অতি নিকটবর্ত্তী হইল। প্রফুল্ল সেদিকে দৃকপাতও করিল না, প্রস্তরময়ী মূর্ত্তির মত নিস্পন্দ শরীরে ছাদের উপরে বসিয়া রহিল। প্রফুল্ল ছিপ দেখিতেছিল না—বর্‌কন্দাজ দেখিতেছিল না। দূর আকাশপ্রান্তে তাহার দৃষ্টি। আকাশপ্রান্তে একখানা ছোট মেঘ, অনেকক্ষণ হইতে দেখা দিয়াছিল। প্রফুল্ল তাই দেখিতেছিল। দেখিতে দেখিতে বোধ হইল, যেন সেখানা একটু বাড়িল; তখন "জয় জগদীশ্বর!" বলিয়া প্রফুল্ল ছাদ হইতে নামিল।

প্রফুল্লকে ভিতরে আসিতে দেখিয়া, নিশি জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি করিবে?"

প্রফুল্ল বলিল, "আমার স্বামীকে বাঁচাইব।"

নিশি। আর তুমি?

দেবী। আমার কথা আর জিজ্ঞাসা করিও না। আমি যাহা বলি, যাহা করি, এখন তাহাতে বড় সাবধানে মনোযোগ দাও। তোমার আমার অদৃষ্টে যাই হৌক, আমার স্বামীকে বাঁচাইতে হইবে, দিবাকে বাঁচাইতে হইবে, শ্বশুরকে বাঁচাইতে হইবে।

এই বলিয়া দেবী একটা শাক লইয়া ফুঁ দিল। নিশি বলিল, "তবু ভাল।"

দেবী বলিল, "ভাল কি মন্দ, বিবেচনা করিয়া দেখ। যাহা যাহা করিতে হইবে, তোমাকে বলিয়া দিতেছি। তোমার উপর সব নির্ভর।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পিপীলিকাশ্রেণীবৎ বর্‌কন্দাজের দল ত্রিস্রোতার তীর-বন সকল হইতে বাহির হইতে লাগিল। মাথায় লাল পাগড়ি, মালকোঁচামারা খালি পা—জলে লড়াই করিতে হইবে বলিয়া কেহ জুতা আনে নাই। সবার হাতে ঢাল-সড়কি—কাহারও কাহারও বন্দুক আছে—কিন্তু বন্দুকের ভাগ অল্প। সকলেরই পিঠে লাঠি

বাঁধা—এই বাঙ্গালার জাতীয় হাতিয়ার। বাঙ্গালী ইহার প্রকৃত ব্যবহার জানিত; লাঠি ছাড়িয়াই বাঙ্গালী নির্জ্জীব হইয়াছে।

বর্‌কন্দাজেরা দেখিল, ছিপ্‌গুলি প্রায় আসিয়া পড়িয়াছে—বজরা ঘেরিবে! বর্‌কন্দাজ দৌড়াইল—"রাণীজি-কি জয়" বলিয়া তাহারাও বজরা ঘেরিতে চলিল। তাহারা আসিয়া আগে বজরা ঘেরিল—ছিপ তাহাদের ঘেরিল। আর যে সময়ে শাঁক বাজিল, ঠিক সেই সময়ে জন কত বরক্‌ন্দাজ আসিয়া বজরার উপর উঠিল। তাহারা বজরার মাঝি-মাল্লা-নৌকার কাজ করে, আবশ্যকমত লাঠি-সড়কিও চালায়। তাহারা আপাততঃ লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হইবার কোন ইচ্ছা দেখাইল না। দাঁড়ে হালে, পালের রসি ধরিয়া, লগি ধরিয়া, যাহার যে স্থান, সেইখানে বসিল। আরও অনেক বর্‌কন্দাজ বজরায় উঠিল। তিন চারি শ বর্‌কন্দাজ তীরে রহিল—সেইখান হইতে ছিপের উপর সড়কি চালাইতে লাগিল। কতক সিপাহী ছিপ হইতে নামিয়া, বন্দুকে সঙ্গীন চড়াইয়া তাহাদের আক্রমণ করিল। যে বর্‌কন্দাজেরা বজরা ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, অবশিষ্ট সিপাহীরা তাহাদের উপর পড়িল। সর্ব্বত্র হাতাহাতি লড়াই হইতে লাগিল। তখন মারামারি, কাটাকাটি, চেঁচাচেচি, বন্দুকের হুড়মুড়, লাঠির ঠক্‌ঠকি, ভারি হুলস্থূল পড়িয়া গেল; কেহ কাহারও কথা শুনিতে পায় না—কেহ কোন স্থানে স্থির হইতে পারে না।

দূর হইতে লড়াই হইলে সিপাহীর কাছে লাঠিয়ালেরা অধিকক্ষণ টিকিত না—কেন না, দূরে লাঠি চলে না। কিন্তু ছিপের উপর থাকিতে হওয়ায় সিপাহীদের বড় অসুবিধা হইল। যাহারা তীরে উঠিয়া যুদ্ধ করিতেছিল, সে সিপাহীরা লাঠিয়ালদিগকে সঙ্গীনের মুখে হটাইতে লাগিল, কিন্তু যাহারা জলে লড়াই করিতেছিল, তাহারা বর্‌কন্দাজদিগের লাঠিসড়কিতে হাত পা বা মাথা ভাঙ্গিয়া কাবু হইতে লাগিল।

প্রফুল্ল নীচে আসিবার অল্পমাত্র পরেই এই ব্যাপার আরম্ভ হইল। প্রফুল্ল মনে করিল, "হয় ভবানী ঠাকুরের কাছে আমার কথা পৌঁছে নাই—নয় তিনি আমার কথা রাখিলেন না; মনে করিয়াছেন, আমি মরিতে পারিব না। ভাল, আমার কাজটাই তিনি দেখুন।"

দেবীর রাণীগিরিতে গুটিকতক চমৎকার গুণ জন্মিয়াছিল। তার একটি এই যে, যে সামগ্রীর কোন প্রকার প্রয়োজন হইতে পারে, তাহা আগে গুছাইয়া হাতের কাছে রাখিতেন। এ গুণের পরিচয় অনেক পাওয়া গিয়াছে। দেবী এখন হাতের কাছেই পাইলেন—একটি সাদা নিশান। সাদা নিশানটি বাহিরে লইয়া গিয়া স্বহস্তে উঁচু করিয়া ধরিলেন।

সেই নিশান দেখাইবামাত্র লড়াই একেবারে বন্ধ হইল। যে যেখানে ছিল, সে সেইখানেই হাতিয়ার ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ঝড়-তুফান যেন হঠাৎ থামিয়া গেল, প্রমত্ত সাগর যেন অকস্মাৎ প্রশান্ত হ্রদে পরিণত হইল।

দেবী দেখিল, পাশে ব্রজেশ্বর। এই যুদ্ধের সময়ে দেবীকে বাহিরে আসিতে দেখিয়া, ব্রজেশ্বরও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল। দেবী তাহাকে বলিল, "তুমি এই নিশান এইরূপ ধরিয়া থাক। আমি ভিতরে গিয়া নিশি ও দিবার সঙ্গে একটা পরামর্শ আঁটিব। রঙ্গরাজ যদি এখানে আসে, তাহাকে বলিও, সে দরওয়াজা হইতে আমার হুকুম লয়।"

এই বলিয়া দেবী ব্রজেশ্বরের হাতে নিশান দিয়া চলিয়া গেল। ব্রজেশ্বর নিশান তুলিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ইতিমধ্যে সেখানে রঙ্গরাজ আসিয়া উপস্থিত হইল। রঙ্গরাজ ব্রজেশ্বরের হাতে সাদা নিশান দেখিয়া, চোখ ঘুরাইয়া বলিল, "তুমি কার হুকুমে সাদা নিশান দেখাইলে?"

ব্রজ। রাণীজির হুকুম।

রঙ্গ। রাণীজির হুকুম? তুমি কে?

ব্রজ। চিনিতে পার না?

রঙ্গরাজ একটু নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "চিনিয়াছি। তুমি ব্রজেশ্বরবাবু? এখানে কি মনে করে? বাপ-বেটায় এক কাজে না কি? কেহ একে বাঁধ।"

রঙ্গরাজের ধারণা হইল যে, হরবল্লভের ন্যায় দেবীকে ধরাইয়া দিবার জন্যই ব্রজেশ্বর কোন ছলে বজরায় প্রবেশ করিয়াছে। তাহার আজ্ঞা পাইয়া দুইজন ব্রজেশ্বরকে বাঁধিতে আসিল। ব্রজেশ্বর কোন আপত্তি করিলেন না, বলিলেন, "আমায় বাঁধ, তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু একটা কথা বুঝাইয়া দাও। সাদা নিশান দেখিয়াই দুই দলে যুদ্ধ বন্ধ করিল কেন?"

রঙ্গরাজ বলিল, "কচি খোকা আর কি? জান না, সাদা নিশান দেখাইলে ইংরেজের আর যুদ্ধ করিতে নাই?"

ব্র। তা আমি জানিতাম না। তা আমি জানিয়াই করি, আর না জানিয়াই করি, রাণীজির হুকুম মত সাদা নিশান দেখাইয়াছি কি না, তুমি না হয় জিজ্ঞাসা করিয়া আইস। আর তোমায়ও আজ্ঞা আছে যে, তুমি দরওয়াজা হইতে রাণীজির হুকুম লইবে।

রঙ্গরাজ বরাবর কামরার দরজায় গেল। কামরার দরওয়াজা বন্ধ আছে দেখিয়া বাহির হইতে ডাকিল, "রাণী মা!"

ভিতর হইতে উত্তর, "কে, রঙ্গরাজ?"

রঙ্গ। আজ্ঞা হাঁ—একটা সাদা নিশান আমাদের বজরা হইতে দেখান হইয়াছে—লড়াই সেই জন্য বন্ধ আছে।

ভিতর হইতে—"সে আমারই হুকুম মত হইয়াছে। এখন তুমি ঐ সাদা নিশান লইয়া লেফ্‌টেনান্ট্‌ সাহেবের কাছে যাও। গিয়া বল যে, লড়াইয়ে প্রয়োজন নাই, আমি ধরা দিব।"

রঙ্গ। আমার শরীর থাকিতে তাহা কিছুতেই হইবে না।

দেবী। শরীরপাত করিয়াও আমায় রক্ষা করিতে পারিবে না।

রঙ্গ। তথাপি শরীরপাত করিব।

দেবী। শোন, মূর্খের মত গোল করিও না। তোমরা প্রাণ দিয়া আমায় বাঁচাইতে পারিবে না—এ সিপাহীর বন্দুকের কাছে লাঠি সোঁটা কি করিবে?

রঙ্গ। কি না করিবে?

দেবী। যাই করুক—আর এক বিন্দু রক্তপাত হইবার আগে আমি প্রাণ দিব,—বাহিরে গিয়া গুলির মুখে দাঁড়াইব—রাখিতে পারিবে না। বরং এখন আমি ধরা দিলে পলাইবার ভরসা রহিল। বরং এক্ষণে আপন আপন প্রাণ রাখিয়া সুবিধা মত যাহাতে আমি বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারি, সে চেষ্টা করিও। আমার অনেক টাকা আছে। কোম্পানীর লোক সকল অর্থের বশ—আমার পলাইবার ভাবনা কি?

দেবী মুহূর্ত্ত জন্যও মনে করেন নাই যে, ঘুষ দিয়া তিনি পলাইবেন। সে রকম পলাইবার ইচ্ছাও ছিল না। এ কেবল রঙ্গরাজকে ভুলাইতেছিলেন। তাঁর মনের ভিতর যে গভীর কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছিল, রঙ্গরাজের বুঝিবার সাধ্য ছিল না—সুতরাং রঙ্গরাজকে তাহা বুঝাইলেন না। সরলভাবে ইংরেজকে ধরা দিবেন, ইহা স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, ইংরেজ আপনার বুদ্ধিতে সব খোয়াইবে। ইহাও স্থির করিয়াছিলেন যে, শত্রুর কোন অনিষ্ট করিবেন না, বরং শত্রুকে সতর্ক করিয়া দিবেন। তবে স্বামী, শ্বশুর, সখীদিগের উদ্ধারের জন্য যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহাও করিবেন; যাহা যাহা হইবে, দেবী যেন দর্পণের ভিতর সকল দেখিতে পাইতেছিলেন।

রঙ্গরাজ বলিল, "যাহা দিয়া কোম্পানীর লোক বশ করিবেন, তাহা ত বজরাতেই আছে। আপনি ধরা দিলে, ইংরেজ বজরাও লইবে।"

দেবী। সেইটি নিষেধ করিও। বলিও যে, আমি ধরা দিব, কিন্তু বজরা দিব না; বজরায় যাহা আছে, তাহার কিছুই দিব না। বজরায় যাহারা আছে, তাহাদের কাহাকেও তিনি ধরিতে পারিবেন না। এই নিয়মে আমি ধরা দিতে রাজি।

রঙ্গ। ইংরেজ যদি না শুনে, যদি বজরা লুঠিতে আসে।

দেবী। বারণ করিও—বজরায় না আসে, বজরা না স্পর্শ করে। বলিও যে, তাহা করিলে ইংরেজের বিপদ্ ঘটিবে। বজরায় আসিলে আমি ধরা দিব না। যে মুহূর্ত্তে ইংরেজ বজরায় উঠিবে, সেই দণ্ডে আবার যুদ্ধ আরম্ভ জানিবেন। আমার কথায় তিনি স্বীকৃত হইলে, তাঁহাদের কাহাকে এখানে আসিতে হইবে না। আমি নিজে তাঁহার ছিপে যাইব।

রঙ্গরাজ বুঝিল, ভিতরে একটা কি গভীর কৌশল আছে। দৌত্যে স্বীকৃত হইল। তখন দেবী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভবানী ঠাকুর কোথায়?"

রঙ্গ। তিনি তীরে বর্‌কন্দাজ লইয়া যুদ্ধ করিতেছেন। আমার কথা শোনেন নাই। বোধ করি, এখনও সেইখানে আছেন।

দেবী। আগে তাঁর কাছে যাও। সব বর্‌কন্দাজ লইয়া নদীর তীরে তীরে স্বস্থানে যাইতে বল। বলিও যে, আমার বজরার লোকগুলি রাখিয়া গেলেই যথেষ্ট হইবে। আর বলিও যে, আমার রক্ষার জন্য আর যুদ্ধের প্রয়োজন নাই—আমার রক্ষার জন্য ভগবান্ উপায় করিয়াছেন। ইহাতে যদি তিনি আপত্তি করেন, আকাশ পানে চাহিয়া দেখিতে বলিও—তিনি বুঝিতে পারিবেন।

রঙ্গরাজ তখন স্বয়ং আকাশ পানে চাহিয়া দেখিল—দেখিল, বৈশাখী নবীন নীরদমালায় গগন অন্ধকার হইয়াছে।

রঙ্গরাজ বলিল, "মা! আর একটা আজ্ঞার প্রার্থনা করি। হরবল্লভ রায় আজিকার গোইন্দা। তার ছেলে ব্রজেশ্বরকে নৌকায় দেখিলাম। অভিপ্রায়টা মন্দ, সন্দেহ নাই। তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে চাহি।"

শুনিয়া নিশি ও দিবা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। দেবী বলিল, "বাঁধিও না। এখন গোপনে ছাদের উপর বসিয়া থাকিতে বল। পরে যখন দিবা নামিতে হুকুম দিবে, তখন নামিবেন।"

আজ্ঞামত রঙ্গরাজ আগে ব্রজেশ্বরকে ছাদে বসাইল। তার পর ভবানী ঠাকুরের কাছে গেল, এবং দেবী যাহা বলিতে বলিয়াছিলেন, তাহা বলিল। রঙ্গরাজ মেঘ দেখাইল—ভবানী দেখিল। ভবানী আর আপত্তি না করিয়া, তীরের ও জলের বর্‌কন্দাজ সকল জমা করিয়া লইয়া, ত্রিস্রোতার তীরে তীরে স্বস্থানে যাইবার উদ্যোগ করিল।

এদিকে দিবা ও নিশি, এই অবসরে বাহিরে আসিয়া, বর্‌কন্দাজবেশী দাঁড়ী-মাঝিদিগকে চুপি চুপি কি বলিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এদিকে ভবানী ঠাকুরকে বিদায় দিয়া, রঙ্গরাজ সাদা নিশান হাতে করিয়া, জলে নামিয়া লেফ্‌টেনান্ট্ সাহেবের ছিপে গিয়া উঠিল। সাদা নিশান হাতে দেখিয়া কেহ কিছু বলিল না। সে ছিপে উঠিলে, সাহেব তাহাকে বলিলেন, "তোমরা সাদা নিশান দেখাইয়াছ, ধরা দিবে?"

রঙ্গ। আমরা ধরা দিব কি? যাঁহাকে ধরিতে আসিয়াছেন, তিনিই ধরা দিবেন, সেই কথা বলিতে আসিয়াছি।

সাহেব। দেবী চৌধুরাণী ধরা দিবেন?

রঙ্গ। দিবেন। তাই বলিতে আমাকে পাঠাইয়াছেন।

সা। আর তোমরা?

রঙ্গ। আমরা কারা?

সা। দেবী চৌধুরাণীর দল।

রঙ্গ। আমরা ধরা দিব না।

সা। আমি দলশুদ্ধ ধরিতে আসিয়াছি।

রঙ্গ। এই দল কারা? কি প্রকারে এই হাজার বর্‌কন্দাজের মধ্যে দল বেদল চিনিবেন?

যখন রঙ্গরাজ এই কথা বলিল, তখন ভবানী ঠাকুর বর্‌কন্দাজ সৈন্য লইয়া চলিয়া যান নাই। যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। সাহেব বলিল, "এই হাজার বর্‌কন্দাজ সবাই ডাকাইত; কেন না, উহারা ডাকাইতের হইয়া সরকারের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে।"

রঙ্গরাজ। উহারা যুদ্ধ করিবে না, চলিয়া যাইতেছে দেখুন।

সাহেব দেখিলেন, বর্‌কন্দাজ সৈন্য পলাইবার উদ্যোগ করিতেছে। সাহেব তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "কি! তোমরা সাদা নিশানের ভান করিয়া পলাইতেছ?"

রঙ্গরাজ। সাহেব, ধরিলে কবে যে পলাইলাম? এখনও কেহ পলায় নাই। পার, ধর। সাদা নিশান ফেলিয়া দিতেছি।

এই বলিয়া রঙ্গরাজ সাদা নিশান ফেলিয়া দিল। কিন্তু সিপাহীরা সাহেবের আজ্ঞা না পাইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল।

সাহেব ভাবিতেছিলেন, উহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হওয়া বৃথা। পিছু ছুটিতে ছুটিতে উহারা নিবিড় জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিবে। একে রাত্রিকাল, তাহাতে মেঘাড়ম্বর, জঙ্গলে ঘোর অন্ধকার সন্দেহ নাই। আমার সিপাহীরা পথ চেনে না, বর্‌কন্দাজেরা পথ চেনে। সুতরাং তাহাদের ধরা সিপাহীর সাধ্য নহে।" কাজেই সাহেব সে অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিলেন। বলিলেন, "যাক্, উহাদের চাই না। যে কথা হইতেছিল, তাই হৌক, তোমরা সকলে ধরা দিবে?"

রঙ্গ। একজনও না। কেবল দেবী রাণী।

সাহেব। পীষ্! এখন আর লড়াই করিবে কে? এই যে কয়জন, তাহারা কি আর পাঁচ শ সিপাহীর সঙ্গে লড়াই করিতে পারিবে? তোমার বর্‌কন্দাজ সৈনা ত জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিল, দেখিতেছি।

রঙ্গরাজ দেখিল, বাস্তবিক ভবানী ঠাকুরের সেনা জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিল।

রঙ্গরাজ বলিল, "আমি অত জানি না। আমায় আমাদের প্রভু যা বলিয়াছেন, তাহাই বলিতেছি! বজরা পাইবেন না, বজরার যে ধন তাহা পাইবেন না, আমাদের কাহাকেও পাইবেন না। কেবল দেবী রাণীকে পাইবেন।"

সা। কেন?

রঙ্গ। তা জানি না।

সা। জান আর নাই জান, বজরা এখন আমার, আমি উহা দখল করিব।

রঙ্গ। সাহেব, বজরাতে উঠিও না, বজরা ছুঁইও না, বিপদ্ ঘটিবে।

সা। পুঃ! পাঁচ শ সিপাহী লইয়া তোমাদের জন্য দুই চারি লোকের কাছে বিপদ্!

এই বলিয়া সাহেব সাদা নিশান ফেলিয়া দিলেন। সিপাহীদের হুকুম দিলেন, "বজরা ঘেরাও কর।"

সিপাহীরা পাঁচখানা ছিপ সমেত বজরা ঘেরিয়া ফেলিল। তখন সাহেব বলিলেন, "বজরার উপর উঠিয়া বর্‌কন্দাজদিগের অস্ত্র কাড়িয়া লও।"

এ হুকুম সাহেব উচ্চৈঃস্বরে দিলেন। কথা দেবীর কাণে গেল। দেবীও বজরার ভিতর হইতে উচ্চৈঃস্বরে হুকুম দিলেন, "বজরায় যাহার যাহার হাতে হাতিয়ার আছে, সব জলে ফেলিয়া দাও।"

শুনিবামাত্র, বজরায় যাহার যাহার হাতে অস্ত্র ছিল, সব জলে ফেলিয়া দিল। রঙ্গরাজও আপনার অস্ত্র সকল জলে ফেলিয়া দিল। দেখিয়া সাহেব সন্তুষ্ট হইলেন, বলিলেন, "চল, এখন বজরায় গিয়া দেখি, কি আছে।"

রঙ্গ। সাহেব, আপনি জোর করিয়া বজরায় যাইতেছেন, আমার দোষ নাই।

সা। তোমার আবার দোষ কি?

এই বলিয়া সাহেব একজন মাত্র সিপাহী লইয়া সশস্ত্রে বজরায় উঠিলেন। এটা বিশেষ সাহসের কাজ নহে; কেন না, বজরার উপর যে কয়জন লোক ছিল, তাহারা সকলেই অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছে। সাহেব বুঝেন নাই যে, দেবীর স্থিরবুদ্ধিই শাণিত মহাস্ত্র; তার অন্য অস্ত্রের প্রয়োজন নাই।

সাহেব রঙ্গরাজের সঙ্গে কামরার দরজায় আসিলেন। দ্বার তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইল। উভয়ে ভিতরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে দুই জনেই বিস্মিত হইলেন।

দেখিলেন, যে দিন প্রথম ব্রজেশ্বর বন্দী হইয়া এই ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সে দিন যেমন ইহার মনোহর সজ্জা, আজিও সেইরূপ; দেয়ালে তেমনি চারু চিত্র। তেমনি সুন্দর গালিচা পাতা। তেমনি আতরদান, গোলাবপাশ, তেমনি সোণার পুষ্পপাত্রে ফুল ভরা, সোণার আলবোলায় তেমনি মৃগনাভিগন্ধি তামাকু সাজা। তেমনি রূপার পুতুল, রূপার ঝাড়, সোণার শিকলে দোলান সোণার প্রদীপ। কিন্তু আজ একটা মসনদ নয়—দুইটা। দুইটা মসনদের উপর সুবর্ণমণ্ডিত উপাধানে দেহ রক্ষা করিয়া দুইটি সুন্দরী রহিয়াছে। তাহাদের পরিধানে মহার্ঘ বস্ত্র, সর্ব্বাঙ্গে মহামূল্য রত্নভূষা। সাহেব তাদের চেনে না—রঙ্গরাজ চিনিল। চিনিল যে, একজন নিশি—আর একজন দিবা।

সাহেবের জন্য একখানা রূপার চৌকি রাখা হইয়াছিল, সাহেব তাহাতে বসিলেন। রঙ্গরাজ খুঁজিতে লাগিলেন, দেবী কোথা? দেখিলেন, কামরার এক ধারে দেবীর সহজ বেশে দেবী দাঁড়াইয়া আছে, গড়া পরা, কেবল কড় হাতে, এলোচুল, কোন বেশভূষা নাই।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে দেবী চৌধুরাণী? কাহার সঙ্গে কথা কহিব?"

নিশি বলিল, "আমার সঙ্গে কথা কহিবেন। আমি দেবী।"

দিবা হাসিল, বলিল, "ইংরেজ দেখিয়া রঙ্গ করিতেছিস্? এ কি রঙ্গের সময়। লেফ্‌টেনান্ট সাহেব! আমার এ ভগিনী কিছু রঙ্গ-তামাশা ভালবাসে, কিন্তু এ তার সময় নয়। আপনি আমার সঙ্গে কথা কহিবেন—আমি দেবী চৌধুরাণী।"

নিশি বলিল, "আ মরণ! তুই কি আমার জন্য ফাঁসি যেতে চাস্ না কি?" সাহেবের দিকে ফিরিয়া নিশি বলিল, "সাহেব, ও আমার ভগিনী—বোধ হয়, স্নেহবশতঃ আমাকে রক্ষা করিবার জন্য আপনাকে প্রতারণা করিতেছে। কিন্তু কেমন করিয়া মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিয়া, বহিনের প্রাণদণ্ড করিয়া, আপনার প্রাণ রক্ষা করিব? প্রাণ অতি তুচ্ছ, আমরা বাঙ্গালীর মেয়ে, অক্লেশে ত্যাগ করিতে পারি। চলুন, আমাকে কোথায় লইয়া যাইবেন, যাইতেছি। আমিই দেবী রাণী।"

দিবা বলিল, "সাহেব! তোমার যিশুখ্রীষ্টের দিব্য, তুমি যদি নিরপরাধিনীকে ধরিয়া লইয়া যাও। আমি দেবী।"

সাহেব বিরক্ত হইয়া রঙ্গরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি তামাশা? কে দেবী চৌধুরাণী, তুমি যথার্থ বলিবে?"

রঙ্গরাজ কিছু বুঝিল না, কেবল অনুভব করিল যে, ভিতরে একটা কি কৌশল আছে। অতএব বুদ্ধি খাটাইয়া সে নিশিকে দেখাইয়া, হাতজোড় করিয়া বলিল,

"হুজুর! এ-ই যথার্থ দেবী রাণী।"

তখন দেবী প্রথম কথা কহিল। বলিল, "আমার ইহাতে কথা কহা বড় দোষ। কিন্তু কি জানি, এর পর মিছা কথা ধরা পড়িলে, যদি সকলে মারা যায়, তাই বলিতেছি, এ ব্যক্তি যাহা বলিতেছে, তাহা সত্য নহে।" পরে নিশিকে দেখাইয়া বলিল, "এ দেবী নহে। যে উহাকে দেবী বলিয়া পরিচয় দিতেছে, সে রাণীজিকে মা বলে, রাণীজিকে মার মত ভক্তি করে, এই জন্য সে রাণীজিকে বাঁচাইবার জন্য অন্য ব্যক্তিকে নিশান দিতেছে।"

তখন সাহেব দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবী তবে কে?"

দেবী বলিল, "আমি দেবী।"

দেবী এই কথা বলিলে নিশিতে, দিবাতে, রঙ্গরাজে ও দেবীতে বড় গণ্ডগোল বাধিয়া গেল। নিশি বলে, "আমি দেবী।" দিবা বলে, "আমি দেবী," রঙ্গরাজ নিশিকে বলে, "এই দেবী," দেবী বলে, "আমি দেবী।" বড় গোলমাল।

তখন লেফ্‌টেনান্ট্‌ সাহেব মনে করিলেন, এ ফেরেরবাজির একটা চূড়ান্ত করা উচিত। বলিলেন, "তোমাদের দুই জনের মধ্যে একজন দেবী চৌধুরাণী বটে। ওটা চাকরাণী, ওটা দেবী নহে। এই দুই জনের মধ্যে কে সে পাপিষ্ঠা, তাহা তোমরা চাতুরী করিয়া আমাকে জানিতে দিতেছ না। কিন্তু তাহাতে তোমাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে না। আমি এখন দুই জনকেই ধরিয়া লইয়া যাইব। ইহার পর প্রমাণের দ্বারা যে দেবী চৌধুরাণী বলিয়া সাব্যস্ত হইবে, সেই ফাঁসি যাইবে। যদি প্রমাণের দ্বারা এ কথা পরিষ্কার না হয়, তবে দুই জনেই ফাঁসি যাইবে।"

তখন নিশি ও দিবা দুই জনেই বলিল, "এত গোলযোগে কাজ কি? আপনার সঙ্গে কি গোইন্দা নাই? যদি গোইন্দা থাকে, তবে তাহাকে ডাকাইলেই ত সে বলিয়া দিতে পারিবে,—কে যথার্থ দেবী চৌধুরাণী।"

হরবল্লভকে বজরায় আনিবে, দেবীর এই প্রধান উদ্দেশ্য। হরবল্লভের রক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া, দেবী আত্মরক্ষার উপায় করিবে না, ইহা স্থির। তাঁহাকে বজরায় না আনিতে পারিলে হরবল্লভের রক্ষার নিশ্চয়তা হয় না।

সাহেব মনে করিলেন, "এ পরামর্শ মন্দ নহে।" তখন তাঁহার সঙ্গে যে সিপাহী আসিয়াছিল, তাহাকে বলিলেন, "গোইন্দাকে ডাক।" সিপাহী এক ছিপের একজন জমাদ্দার সাহেবকে ডাকিয়া বলিল, "গোইন্দাকে ডাক।" তখন গোইন্দাকে ডাকাডাকির গোল পড়িয়া গেল। গোইন্দা কোথায়, গোইন্দা কে, তাহা কেহই জানে না, কেবল চারিদিকে ডাকাডাকি করে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বস্তুতঃ হরবল্লভ রায় মহাশয় যুদ্ধক্ষেত্রেই উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু সে ইচ্ছাপূর্ব্বক নহে, ঘটনাধীন। প্রথমে বড় ঘেঁষেন নাই। "শৃঙ্গিণাং শস্ত্রপাণিনাং" ইত্যাদি চাণক্যপ্রদত্ত সদুপদেশ স্মরণ করিয়া তিনি সিপাহীদিগের ছিপে উঠেন নাই। একখানা পৃথক্‌ ডিঙ্গিতে থাকিয়া, লেফ্‌টেনান্ট্‌ সাহেবকে বজরা দেখাইয়া দিয়া, অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে পলাইয়া গিয়া ডিঙ্গি ও প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। তার পর দেখিলেন, আকাশে বড় ঘনঘটা। মনে করিলেন, ঝড় উঠিবে ও এখনই আমার ডিঙ্গি ডুবিয়া যাইবে, টাকার লোভে আসিয়া আমি প্রাণ হারাইব—আমার সৎকারও হইবে না। তখন রায় মহাশয় ডিঙ্গি হইতে তীরে অবতরণ করিলেন। কিন্তু তীরে সেখানে কেহ কোথাও নাই দেখিয়া বড় ভয় হইল। সাপের ভয়, বাঘের ভয়, চোর ডাকাইতের ভয়, ভূতেরও ভয়। হরবল্লভের মনে হইল, কেন এমন ঝক্‌মারি করিতে আসিয়াছিলাম। হরবল্লভের কান্না আসিল।

এমন সময়ে হঠাৎ বন্দুকের হুড়মুড়ি, সিপাহী বর্কন্দাজের হৈ হৈ শব্দ সব বন্ধ হইয়া গেল। হরবল্লভের বোধ হইল, অবশ্য সিপাহীর জয় হইয়াছে, ডাকাইত মাগী ধরা পড়িয়াছে, নহিলে লড়াই বন্ধ হইবে কেন? তখন হরবল্লভ ভরসা পাইয়া যুদ্ধস্থানে যাইতে অগ্রসর হইলেন। তবে এ রাত্রিকালে, এ অন্ধকারে, এ বন জঙ্গলের মাঝে অগ্রসর হন কিরূপে? ডিঙ্গির মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ বাপু মাঝি,—বলি, ওদিকে যাওয়া যায় কিরূপে বল্‌তে পার?"

মাঝি বলিল, "যাওয়ার ভাবনা কি? ডিঙ্গিতে উঠুন না, নিয়ে যাচ্ছি। সিপাহীরা মারবে ধরবে না ত? আবার যদি লড়াই বাধে?"

হর। সিপাহীরা আমাদের কিছু বলিবে না। লড়াই আর বাধিবে না—ডাকাইত ধরা পড়েছে। কিন্তু যে রকম মেঘ করেছে, এখনই ঝড় উঠ্‌বে—ডিঙ্গিতে উঠি কিরূপে?

মাঝি বলিল, "ঝড়ে ডিঙ্গি কখন ডুবে না।"

হরবল্লভ প্রথমে সে সকল কথায় বিশ্বাস করিলেন না—শেষ অগত্যা ডিঙ্গিতে উঠিলেন। মাঝিকে উপদেশ দিলেন, কেনারায় কেনারায় ডিঙ্গি লইয়া যাইবে। মাঝি তাহাই করিল। শীঘ্র আসিয়া ডিঙ্গি বজরায় লাগিল। হরবল্লভ সিপাহীদের সঙ্কেতবাক্য জানিতেন, সুতরাং সিপাহীরা আপত্তি করিল না। সেই সময়ে "গোইন্দা! গোইন্দা!" করিয়া ডাকাডাকি হইতেছিল। হরবল্লভ বজরায় উঠিয়া সম্মুখস্থ আরদালির সিপাহীকে বলিল, "গোইন্দাকে খুঁজিতেছে? আমি গোইন্দা?"

সিপাহী বলিল, "তোমাকে কাপ্তেন সাহেব তলব করিয়াছেন।"

হর। কোথায় তিনি?

সিপা। কামরার ভিতর। তুমি কামরার ভিতর যাও।

হরবল্লভ আসিতেছে জানিতে পারিয়া দেবী প্রস্থানের উদ্যোগ দেখিল। "কাপ্তেন সাহেবের জন্য কিছু জলযোগের উদ্যোগ দেখি" বলিয়া ভিতরের কামরায় চলিয়া গেল।

এদিকে হরবল্লভ কামরার দিকে গেলেন। কামরার দ্বারে উপস্থিত হইয়া কামরার সজ্জা ও ঐশ্বর্য্য, দিবা ও নিশির রূপ ও সজ্জা দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। সাহেবকে সেলাম্ করিতে গিয়া, ভুলিয়া নিশিকে সেলাম্ করিয়া ফেলিলেন। হাসিয়া নিশি কহিল, "বন্দেগী খাঁ সাহেব! মেজাজ্ সরিফ?"

শুনিয়া দিবা বলিল, "বন্দেগী খাঁ সাহেব! আমায় একটা কুর্ণিশ হলো না—আমি হলেম এদের রাণী।"

সাহেব হরবল্লভকে বলিলেন, "ইহারা ফেরেব্ করিয়া দুইজনেই বলিতেছে, "আমি দেবী চৌধুরাণী।" কে দেবী চৌধুরাণী, তাহার ঠিকানা না হওয়ায়, আমি তোমাকে ডাকিয়াছি। কে দেবী?"

হরবল্লভ বড় প্রমাদে পড়িলেন। ঊর্দ্ধ চতুর্দ্দশ পুরুষের ভিতর কখনও দেবীকে দেখেন নাই। কি করেন, ভাবিয়া চিন্তিয়া নিশিকে দেখাইয়া দিলেন। নিশি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। অপ্রতিভ হইয়া, "ভুল হইয়াছে" বলিয়া হরবল্লভ দিবাকে দেখাইলেন। দিবা লহর তুলিয়া হাসিল। বিষণ্ন মনে হরবল্লভ আবার নিশিকে দেখাইল। সাহেব তখন গরম হইয়া উঠিয়া হরবল্লভকে বলিলেন, "টোম্ বড্‌জাট, শূওর! তোম্ পছান্‌টে নেহি?"

তখন দিবা বলিল, "সাহেব, রাগ করিবেন না। উনি চেনেন না। উ'হার ছেলে চেনে। উহার ছেলে বজরার ছাদে বসিয়া আছে, তাহাকে আনুন—সে চিনিবে।"

হরবল্লভ আকাশ হইতে পড়িল, বলিল, "আমার ছেলে!"

দিবা। এইরূপ শুনি।

হর। ব্রজেশ্বর?

দিবা। তিনিই।

হর। কোথা।

দিবা। ছাদে।

হর। ব্রজ এখানে কেন?

দিবা। তিনি বলিবেন।

সাহেব হুকুম দিলেন,“তাঁহাকে আন।”

দিবা রঙ্গরাজকে ইঙ্গিত করিল। তখন রঙ্গরাজ ছাদে গিয়া ব্রজেশ্বরকে বলিল, “চল, দিবা ঠাকুরাণীর হুকুম।”

ব্রজেশ্বর নামিয়া কামরার ভিতর আসিল। দেবীর হুকুম আগেই প্রচার হইয়াছিল, দিবার হুকুম পাইলেই ব্রজেশ্বর ছাদ হইতে নামিবে। এমনই দেবীর বন্দোবস্ত।

সাহেব ব্রজেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি দেবী চৌধুরাণীকে চেন?”

ব্রজ। চিনি।

সাহেব। এখানে দেবী আছে?

ব্র। না।

সাহেব তখন রাগান্ধ হইয়া বলিলেন, “সে কি, ইহারা দুইজনের একজনও দেবী চৌধুরাণী নয়?”

ব্র। এরা তার দাসী।

সা। এঃ! তুমি দেবীকে চেন?

ব্র। বিলক্ষণ চিনি।

সা। যদি এরা কেহ দেবী না হয়, তবে দেবী অবশ্য এ বজরার কোথাও লুকাইয়া আছে। বোধ হয়, দেবী সেই চাকরাণীটা। আমি বজরা তল্লাশি করিতেছি—তুমি নিশানদিহি করিবে, আইস।

ব্র। সাহেব, তোমার বজরা তল্লাশ করিতে হয়, কর—আমি নিশানদিহি করিব কেন?

সাহেব বিস্মিত হইয়া গর্জ্জিয়া বলিল, “কেও বদ্‌জাত্? তোম্ গোইন্দা নেহি?”

“নেহি।” বলিয়া ব্রজেশ্বর সাহেবের গালে বিরাশী সিক্কার এক চপেটাঘাত করিল।

করিলে কি? করিলে কি? সর্ব্বনাশ করিলে?” বলিয়া, হরবল্লভ কাঁদিয়া উঠিল।

“হুজুর! তুফান উঠা।” বলিয়া বাহির হইতে জমাদ্দার হাঁকিল।

সোঁ সোঁ করিয়া আকাশপ্রান্ত হইতে ভয়ঙ্কর বেগে বায়ু গর্জ্জন করিয়া আসিতেছে শুনা গেল।

কামরার ভিতর হইতে ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তে—যে মুহূর্ত্তে সাহেবের গালে ব্রজেশ্বরের চড় পড়িল—ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আবার শাঁক বাজিল। এবার দুই ফুঁ।

বজরার নোঙ্গর ফেলা ছিল না—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, খোঁটায় কাছি বাঁধা ছিল, খোঁটার কাছে দুই জন নাবিক বসিয়াছিল। যেমন শাঁক বাজিল, অমনি তাহারা কাছি ছাড়িয়া দিয়া লাফাইয়া বজরায় উঠিল। তীরের উপর যে সিপাহীরা বজরা ঘেরাও করিয়াছিল, তাহারা উহাদিগকে মারিবার জন্য সঙ্গীন উঠাইল—কিন্তু তাহাদের হাতের বন্দুক হাতেই রহিল, পলক ফেলিতে না ফেলিতে একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড হইয়া গেল। দেবীর কৌশলে এক পলক মধ্যে সেই পাঁচ শত কোম্পানীর সিপাহী পরাস্ত হইল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রথমাবধিই বজরায় চারিখানা পাল খাটান ছিল। বলিয়াছি যে, মধ্যে নিশি ও দিবা আসিয়া, নাবিকদিগকে কি উপদেশ দিয়া গিয়াছিল। সেই উপদেশ অনুসারেই খোঁটার কাছে লোক বসিয়াছিল। আর সেই উপদেশ অনুসারে পালের কাছির কাছে চারি জন নাবিক বসিয়াছিল। শাঁকের শব্দ শুনিবা মাত্র তাহারা পালের কাছি সকল টানিয়া ধরিল। মাঝি হাল আঁটিয়া ধরিল। অমনি সেই প্রচণ্ড বেগশালী ঝাটকা আসিয়া চারিখানা পালে লাগিল। বজরা ঘুরিল—যে দুই জন সিপাহী সঙ্গীন তুলিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গীন উঁচু হইয়া রহিল—বজরার মুখ পঞ্চাশ হাত তফাতে গেল। বজরা ঘুরিল—তারপর ঝড়ের বেগে পালভরা বজরা কাত হইল, প্রায় ডুবে। লিখিতে এতক্ষণ লাগিল—কিন্তু এতখানা ঘটিল এক নিমিষ মধ্যে। সাহেব ব্রজেশ্বরের চড়ের প্রত্যুত্তরে ঘুষি উঠাইয়াছেন মাত্র, ইহারই মধ্যে এতখানা সব হইয়া গেল। তাঁহারও হাতের ঘুষি হাতে রহিল, যেমন বজরা কাত হইল, অমনি সাহেব টলিয়া মুষ্টিবদ্ধ হস্তে দিবা সুন্দরীর পাদমূলে পতিত হইলেন। ব্রজেশ্বর খোদ সাহেবের ঘাড়ের উপর পড়িয়া গেল—এবং রঙ্গরাজ তাহার উপর পড়িয়া গেল। হরবল্লভ প্রথমে নিশিঠাকুরাণীর ঘাড়ের উপর পড়িয়াছিলেন, পরে সেখান হইতে পদচ্যুত হইয়া গড়াইতে গড়াইতে রঙ্গরাজের নাগরা জুতায় আটকাইয়া গেলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, "নৌকাখানা ডুবিয়া গিয়াছে, আমরা সকলে মরিয়া গিয়াছি, এখন আর দুর্গানাম জপিয়া কি হইবে!"

কিন্তু নৌকা ডুবিল না—কাত হইয়া আবার সোজা হইয়া বাতাসে পিছন করিয়া বিদ্যুদ্বেগে ছুটিল। যাহারা পড়িয়া গিয়াছিল, তাহারা আবার খাড়া হইয়া দাঁড়াইল—সাহেব আবার ঘুষি তুলিলেন। কিন্তু সাহেবের ফৌজ যাহারা জলে দাঁড়াইয়াছিল, বজরা তাহাদের ঘাড়ের উপর দিয়া চলিয়া গেল। অনেকে জলে ডুবিয়া প্রাণরক্ষা করিল; কেহ দূর হইতে বজরা ঘুরিতেছে দেখিতে পাইয়া, পলাইয়া বাঁচিল; কেহ বা আহত হইল, কেহ মরিল না। ছিপগুলি বজরার নীচে পড়িয়া ডুবিয়া গেল—জল সেখানে এমন বেশী নহে—স্রোত বড় নাই—সুতরাং সকলেই বাঁচিল। কিন্তু বজরা আর কেহ দেখিতে পাইল না। নক্ষত্রবেগে উড়িয়া বজরা কোথায় ঝড়ের সঙ্গে মিশিয়া চলিল, কেহ আর দেখিতে পাইল না। সিপাহী সেনা ছিন্নভিন্ন হইল। দেবী তাহাদের পরাস্ত করিয়া পাল উড়াইয়া চলিল, লেফ্‌টেনান্ট্‌ সাহেব ও হরবল্লভ দেবীর নিকট বন্দী হইল। নিমেষমধ্যে যুদ্ধ জয় হইল। দেবী তাই আকাশ দেখাইয়া বলিয়াছিল, "আমার রক্ষার উপায় ভগবান্‌ করিতেছেন।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বজরা জলের রাশি ভাঙ্গিয়া, দুলিতে দুলিতে নক্ষত্র-বেগে ছুটিল। শব্দ ভয়ানক। বজরার মুখে কৃষ্ণ তরঙ্গরাশির গর্জ্জন ভয়ানক—ঝড়ের শব্দ ভয়ানক। কিন্তু নৌকার গঠন অনুপম, নাবিকদিগের দক্ষতা ও শিক্ষা প্রসিদ্ধ। নৌকা এই ঝড়ের মুখে চারিখানা পাল দিয়া নির্ব্বিঘ্নে চলিল। আরোহিবর্গ যাঁহারা প্রথমে কুষ্মাণ্ডাকারে গড়াগড়ি দিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে স্বপদস্থ হইলেন, হরবল্লভ রায় মহাশয় অঙ্গুষ্ঠে যজ্ঞোপবীত জড়িত করিয়া দুর্গানাম জপিতে আরম্ভ করিলেন, আবার না ডুবি। লেফ্‌টেনান্ট্‌ সাহেব সেই মুলতবী ঘুষিটা আবার পুনর্জ্জীবিত করিবার চেষ্টায় হস্তোত্তোলন করিলেন, অমনি ব্রজেশ্বর তাঁর হাতখানা ধরিয়া ফেলিল। হরবল্লভ ছেলেকে ভর্ৎসনা করিলেন। বলিলেন "ও কি কর, ইংরেজের গায়ে হাত তোল?"

ব্রজেশ্বর বলিল, “আমি ইংরেজের গায়ে হাত তুলেছি, না ইংরেজ আমার গায়ে হাত তুলিতেছে।”

হরবল্লভ সাহেবকে বলিলেন, “হুজুর! ও ছেলেমানুষ, আজও বুদ্ধিশুদ্ধি হয় নি, আপনি ওর অপরাধ লইবেন না। মাফ করুন।”

সাহেব বলিলেন, “ও বড় বদ্‌মাস। তবে যদি আমার কাছে ও জোড়হাত করিয়া মাফ চায়, তবে আমি মাফ করিতে পারি।”

হরবল্লভ। ব্রজ, তাই কর। জোড়হাত করিয়া সাহেবকে বল, “আমায় মাফ করুন।”

ব্রজেশ্বর। সাহেব, আমরা হিন্দু, পিতার আজ্ঞা আমরা কখনও লঙ্ঘন করি না। আমি আপনার কাছে জোড়হাত করিয়া ভিক্ষা করিতেছি, আমাকে মাফ করুন।

সাহেব ব্রজেশ্বরের পিতৃভক্তি দেখিয়া প্রসন্ন হইয়া ব্রজেশ্বরকে ক্ষমা করিলেন, আর ব্রজেশ্বরের হাত লইয়া আচ্ছা করিয়া নাড়িয়া দিলেন। ব্রজেশ্বরের চতুর্দ্দশ পুরুষের মধ্যে কখন জানে না, সেক্‌হ্যাণ্ড কাকে বলে—সুতরাং ব্রজেশ্বর একটু ভেকা হইয়া রহিল। মনে করিল, “কি জানি, যদি আবার বাঁধে। এই ভাবিয়া ব্রজেশ্বর বাহিরে গিয়া বসিল। কেবল ঝড়,—বৃষ্টি হয় নাই,—ভিজিতে হইল না।”

রঙ্গরাজ বাহিরে আসিয়া, কামরার দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া দ্বারে পিঠ দিয়া বসিল—দুই দিকের পাহারায়। বিশেষ, এ সময়ে বাহিরে একটু সতর্ক থাকা ভাল, বজরা বড় তীব্রবেগে যাইতেছে, হঠাৎ বিপদ্ ঘটাও বিচিত্র নহে।

দিবা উঠিয়া দেবীর কাছে গেল—পুরুষ মহলে এখন আর প্রয়োজন নাই। নিশি উঠিল না—তার কিছু মতলব ছিল। সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত—সুতরাং অগাধ সাহস।

সাহেব জাঁকিয়া আবার রূপার চৌকিতে বসিলেন, ভাবিতে লাগিলেন, “ডাকাইতের হাত হইতে কিরূপে মুক্ত হইব? যাহাকে ধরিতে আসিয়াছিলাম, তাহারই কাছে ধরা পড়িলাম—স্ত্রীলোকের কাছে পরাজিত হইলাম, ইংরেজ মহলে আর কি বলিয়া মুখ দেখাইব? আমার না ফিরিয়া যাওয়াই ভাল।”

হরবল্লভ আর বসিবার স্থান না পাইয়া নিশি সুন্দরীর মসনদের কাছে বসিলেন। দেখিয়া নিশি বলিল, “আপনি একটু নিদ্রা যাবেন?”

হর। আজ কি আর নিদ্রা হয়?

নিশি। আজ না হইলে ত আর হইল না।

হর। সে কি?

নিশি। আবার ঘুমাইবার দিন কবে পাইবেন?

হর। কেন?

নিশি। আপনি দেবী চৌধুরাণীকে ধরাইয়া দিতে আসিয়াছিলেন?

হর। তা—তা—কি জান—

নিশি। ধরা পড়িলে দেবীর কি হইত, জান?

হর। আ—এমন কি—

নিশি। এমন কিছু নয়, ফাঁসি!

হর। তা—না—এই—তা কি জান—

নিশি। দেবী তোমার কোন অনিষ্ট করে নাই, বরং ভারী উপকার করিয়াছিল—যখন তোমার জাতি যায়, প্রাণ যায়, তখন তোমায় পঞ্চাশ হাজার টাকা নগদ দিয়া, তোমায় রক্ষা করিয়াছিল। তার প্রত্যুপকারে তুমি তাহাকে ফাঁসি দিবার চেষ্টায় ছিলে। তোমার যোগ্য কি দণ্ড বল দেখি?

হরবল্লভ চুপ করিয়া রহিল।

নিশি বলিতে লাগিল, "তাই বলিতেছিলাম, এই বেলা ঘুমাইয়া লও—আর রাত্রের মুখ দেখিবে না। নৌকা কোথায় যাইতেছে বল দেখি?"

হরবল্লভের কথা কহিবার শক্তি নাই।

নিশি বলিতে লাগিল, "ডাকিনীর শ্মশান বলিয়া এক প্রকাণ্ড শ্মশান আছে। আমরা যাদের প্রাণে মারি, তাদের সেইখানে লইয়া গিয়া মারি। বজরা এখন সেইখানে যাইতেছে। সেইখানে পৌঁছিলে সাহেব ফাঁসি যাইবে, রাণীজির হুকুম হইয়া গিয়াছে। আর তোমায় কি হুকুম হইয়াছে, জান?"

হরবল্লভ কাঁদিতে লাগিল—জোড়হাত করিয়া বলিল, "আমায় রক্ষা কর।"

নিশি বলিল, "তোমায় রক্ষা করিবে, এমন পাষণ্ড পামর কে আছে? তোমায় শূলে দিবার হুকুম হইয়াছে।"

হরবল্লভ ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ঝড়ের শব্দ বড় প্রবল; সে কান্নার শব্দ ব্রজেশ্বর শুনিতে পাইল না—দেবীও না। সাহেব শুনিল। সাহেব কথাগুলা শুনিতে পায় নাই—কান্না শুনিতে পাইল। সাহেব ধমকাইল "রোও মৎ—উল্লুক। মর্‌না এক রোজ আল্‌বৎ হ্যায়।"

সে কথা কাণে না তুলিয়া, নিশির কাছে জোড়হাত করিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কাঁদিতে লাগিল। বলিল, "হ্যাঁ গা! আমায় কি কেউ রক্ষা করিতে পারে না গা?"

নিশি। তোমার মত নরাধমকে বাঁচাইয়া কে পাতকগ্রস্ত হইবে। আমাদের রাণী দয়াময়ী, কিন্তু তোমার জন্য কেহই তাঁর কাছে দয়ার ভিক্ষা করিব না।

হর। আমি লক্ষ টাকা দিব।

নিশি। মুখে আনিতে লজ্জা করে না। পঞ্চাশ হাজার টাকার জন্য এই কৃতঘ্নের কাজ করিয়াছ—আবার লক্ষ টাকা হাঁক?

হর। আমাকে যা বলিবে, তাই করিব।

নিশি। তোমার মত লোকের দ্বারা কোন্ কাজ হয় যে, তুমি, যা বলিব, তাই করিবে?

হর। অতি ক্ষুদ্রের দ্বারাও উপকার হয়—ওগো, কি করিতে হইবে বল, আমি প্রাণপণ করিয়া করিব—আমায় বাঁচাও।

নিশি। (ভাবিতে ভাবিতে) তোমার দ্বারাও আমার একটা উপকার হইলে হইতে পারে—তা তোমার মত লোকের দ্বারা সে উপকার না হওয়াই ভাল।

হর। তোমার কাছে হাতজোড় করিতেছি—তোমার হাতে ধরিতেছি—

হরবল্লভ বিহ্বল—নিশি ঠাকুরাণীর বাঁউড়ী পরা গোলগাল হাতখানি প্রায় ধরিয়া ফেলিয়াছিল আর কি! চতুরা নিশি আগে হাত সরাইয়া লইল—বলিল, "সাবধান! ও হাত শ্রীকৃষ্ণের গৃহীত। কিন্তু তোমার হাতে পায়ে ধরিয়া কাজ নাই—তুমি যদি এতই কাতর হইয়াছ, তবে তুমি যাতে রক্ষা পাও, আমি তা করিতে রাজি হইতেছি। কিন্তু তোমায় যা বলিব, তা যে তুমি করিবে, এ বিশ্বাস হয় না। তুমি জুয়াচোর, কৃতঘ্ন, পামর, গোইন্দাগিরি কর—তোমার কথায় বিশ্বাস কি?"

হর। যে দিব্য বল, সেই দিব্য করিতেছি।

নিশি। তোমার আবার দিব্য? কি দিব্য করিবে?

হর। গঙ্গাজল তামা তুলসীও দাও—আমি স্পর্শ করিয়া দিব্য করিতেছি।

নিশি। ব্রজেশ্বরের মাথায় হাত দিয়া দিব্য করিতে পার?

হরবল্লভ গর্জ্জিয়া উঠিল। বলিল, "তোমাদের যা ইচ্ছা, তাহা কর। আমি তা পারিব না।" কিন্তু এ তেজ ক্ষণিকমাত্র। হরবল্লভ আবার তখনই হাত কচ্‌লাইতে লাগিল—বলিল, "আর যে দিব্য বল, সেই দিব্য করিব রক্ষা কর।"

নিশি। আচ্ছা, দিব্য করিতে হইবে না—তুমি আমাদের হাতে আছ। শোন, আমি বড় কুলীনের মেয়ে। আমাদের ঘরে পাত্র জোটা ভার। আমার একটি পাত্র জুটিয়াছিল, (পাঠক জানেন, সব মিথ্যা) কিন্তু আমার ছোট বহিনের জুটিল না। আজিও তাহার বিবাহ হয় নাই।

হর। বয়স কত হইয়াছে?

নিশি। পঁচিশ ত্রিশ।

হর। কুলীনের মেয়ে অমন অনেক থাকে।

নিশি। থাকে, কিন্তু আর তার বিবাহ না হইলে অঘরে পড়িবে, এমন গতিক হইয়াছে। তুমি আমার বাপের পালটি ঘর। তুমি যদি আমার ভগিনীকে বিবাহ কর, আমার বাপের কুল থাকে। আমিও এই কথা বলিয়া রাণীজির কাছে তোমার প্রাণ ভিক্ষা করিয়া লই।

হরবল্লভের মাথার উপর হইতে পাহাড় নামিয়া গেল। আর একটা বিবাহ বৈ ত নয়—সেটা কুলীনের পক্ষে শক্ত কাজ নয়—তা যত বড় মেয়েই হৌক না কেন! নিশি যে উত্তরের প্রত্যাশা করিয়াছিল, হরবল্লভ ঠিক সেই উত্তর দিল, বলিল, "এ আর বড় কথা কি? কুলীনের কুল রাখা কুলীনেরই কাজ। তবে একটা কথা এই, আমি বুড়া হইয়াছি, আমার আর বিবাহের বয়স নাই। আমার ছেলে বিবাহ করিলে হয় না?"

নিশি। তিনি রাজি হবেন?

হর। আমি বলিলেই হইবে।

নিশি। তবে আপনি কাল প্রাতে সেই আজ্ঞা দিয়া যাইবেন। তাহা হইলে, আমি পাল্কি বেহারা আনিয়া আপনাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিব। আপনি আগে গিয়া বৌভাতের উদ্যোগ করিবেন। আমরা বরের বিবাহ দিয়া বৌ সঙ্গে পাঠাইয়া দিব।

হরবল্লভ হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইল—কোথায় শূলে যায়—কোথায় বৌভাতের ঘটা। হরবল্লভের আর দেরি সয় না। বলিল, "তবে তুমি গিয়া রাণীজিকে এ সকল কথা জানাও।"

নিশি বলিল, "চলিলাম"। নিশি দ্বিতীয় কামরার ভিতর প্রবেশ করিল।

নিশি গেলে, সাহেব হরবল্লভকে জিজ্ঞাসা করিল, "স্ত্রীলোকটা তোমাকে কি বলিতেছিল?"

হর। এমন কিছুই না।

সাহেব। কাঁদিতেছিলে কেন?

হর। কই? কাঁদি নাই।

সাহেব। বাঙ্গালী এমনই মিথ্যাবাদী বটে।

নিশি ভিতরে আসিলে দেবী জিজ্ঞাসা করিল, "আমার শ্বশুরের সঙ্গে এত কি কথা কহিতেছিলে?"

নিশি। দেখিলাম, যদি তোমার শাশুড়ীগিরিতে বহাল হইতে পারি।

দেবী। নিশি ঠাকুরাণী! তোমার মন প্রাণ, জীবন যৌবন সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়াছ—কেবল জুয়াচুরিটুকু নয়। সেটুকু নিজের ব্যবহারের জন্য রাখিয়াছ।

নিশি। দেবতাকে ভাল সামগ্রীই দিতে হয়। মন্দ সামগ্রী কি দিতে আছে?

দেবী। তুমি নরকে পচিয়া মরিবে।

নবম পরিচ্ছেদ

ঝড় থামিল; নৌকাও থামিল। দেবী বজরার জানেলা হইতে দেখিতে পাইলেন, প্রভাত হইতেছে। বলিলেন, "নিশি! আজ সুপ্রভাত!"

নিশি বলিল, আমি আজ সুপ্রভাত!

দিবা। তুমি অবসান, আমি সুপ্রভাত!

নিশি। যে দিন আমার অবসান হইবে, সেই দিনই আমি সুপ্রভাত বলিব। এ অন্ধকারের অবসান নাই। আজ বুঝিলাম, দেবী চৌধুরাণীর সুপ্রভাত—কেন না, আজ দেবী চৌধুরাণীর অবসান।

দিবা। ও কি কথা লো পোড়ারমুখী?

নিশি। কথা ভাল। দেবী মরিয়াছে। প্রফুল্ল শ্বশুরবাড়ী চলিল।

দেবী। তার এখন দেরী ঢের। যা বলি, কর দেখি। বজরা বাঁধিতে বল দেখি।

নিশি হুকুম জারি করিল—মাঝিরা তীরে লাগাইয়া বজরা বাঁধিল। তার পর দেবী বলিল, "রঙ্গরাজকে জিজ্ঞাসা কর, কোথায় আসিয়াছি? রঙ্গপুর কত দূর? ভূতনাথ কত দূর?"

রঙ্গরাজ জিজ্ঞাসায় বলিল, "এক রাত্রে চারি দিনের পথ আসিয়াছে। রঙ্গপুর এখান হইতে অনেক দিনের পথ। ডাঙ্গা-পথে ভূতনাথে এক দিনে যাওয়া যাইতে পারে।"

"পাল্কি বেহারা পাওয়া যাইবে?"

"আমি চেষ্টা করিলে সব পাওয়া যাইবে।"

দেবী নিশিকে বলিল, "তবে আমার শ্বশুরকে স্নানাহ্নিকে নামাইয়া দাও।"

দিবা। এত তাড়াতাড়ি কেন?

নিশি। শ্বশুরের ছেলে সমস্ত রাত্রি বাহিরে বসিয়া আছে, মনে নাই? বাছাধন সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় আসিতে পারিতেছে না, দেখিতেছ না?

এই বলিয়া নিশি রঙ্গরাজকে ডাকিয়া হরবল্লভের সাক্ষাতে বলিল, "সাহেবটাকে ফাঁসি দিতে হইবে। ব্রাহ্মণটাকে এখন শূলে দিয়া কাজ নাই। উহাকে পাহারাবন্দী করিয়া স্নানাহ্নিকে পাঠাইয়া দাও"।

হরবল্লভ বলিলেন, "আমার উপর হুকুম কিছু হইয়াছে?"

নিশি চোখ টিপিয়া বলিল, "আমার প্রার্থনা মঞ্জুর হইয়াছে। তুমি স্নানাহ্নিক করিয়া আইস।"

নিশি রঙ্গরাজের কাণে কাণে বলিল, "পাহারা মানে জল-আচরণী ভৃত্য।" রঙ্গরাজ সেইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া হরবল্লভকে স্নানাহ্নিকে নামাইয়া দিল।

তখন দেবী নিশিকে বলিল, "সাহেবটাকে ছাড়িয়া দিতে বল। সাহেবকে রঙ্গপুরে ফিরিয়া যাইতে বল। রঙ্গপুর অনেক দূর, এক শত মোহর উহাকে পথ খরচ দাও, নহিলে এত পথ যাইবে কি প্রকারে?"

নিশি শত স্বর্ণ লইয়া গিয়া রঙ্গরাজকে দিল, আর কাণে কাণে উপদেশ দিল। উপদেশে দেবী যাহা বলিয়াছিল, তাহা ছাড়া আরও কিছু ছিল।

রঙ্গরাজ তখন দুই জন বর্‌কন্দাজ লইয়া আসিয়া সাহেবকে ধরিল। বলিল, "উঠ।"

সাহেব। কোথা যাইতে হইবে?

রঙ্গ। তুমি কয়েদী—জিজ্ঞাসা করিবার কে?

সাহেব বাক্যব্যয় না করিয়া রঙ্গরাজের পিছু পিছু দুইজন বর্‌কন্দাজের মাঝে চলিল। যে ঘাটে হরবল্লভ স্নান করিতেছিলেন, সেই ঘাট দিয়া তাহারা যায়।

হরবল্লভ জিজ্ঞাসা করিল, "সাহেবকে কোথায় লইয়া যাইতেছ?"

রঙ্গরাজ বলিল, "এ জঙ্গলে।"

হর। কেন?

রঙ্গ। জঙ্গলের ভিতর গিয়া উহাকে ফাঁসি দিব।

হরবল্লভের গা কাঁপিল। সে সন্ধ্যা-আহ্নিকের সব মন্ত্র ভুলিয়া গেল। সন্ধ্যাহ্নিক ভাল হইল না।

রঙ্গরাজ জঙ্গলে সাহেবকে লইয়া গিয়া বলিল, "আমরা কাহাকে ফাঁসি দিই না। তুমি ঘরের ছেলে ঘরে যাও, আমাদের পিছনে আর লেগো না। তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম।"

সাহেব প্রথমে বিস্ময়াপন্ন হইল—তারপর ভাবিল, ইংরেজকে ফাঁসি দেয়, বাঙ্গালীর এত কি ভরসা?

তার পর রঙ্গরাজ বলিল, "সাহেব! রঙ্গপুর অনেক পথ, যাবে কি প্রকারে?"

সাহেব। যে প্রকারে পারি।

রঙ্গ। নৌকা ভাড়া কর, নয় গ্রামে গিয়া ঘোড়া কেন—নয় পাল্কি কর। তোমাকে আমাদের রাণী এক শত মোহর পথখরচ দিয়াছেন।

রঙ্গরাজ মোহর গণিয়া দিতে লাগিল। সাহেব পাঁচ খান মোহর লইয়া আর লইল না। বলিল, "ইহাতেই যথেষ্ট হইবে। এ আমি কর্জ্জ লইলাম।"

রঙ্গরাজ। আচ্ছা, আমরা যদি তোমার কাছে আদায় কর্‌তে যাই ত শোধ দিও। আর তোমার সিপাহী যদি কেহ জখম হইয়া থাকে, তবে তাহাকে পাঠাইয়া দিও। যদি কেহ মরিয়া থাকে, তবে তাদের ওয়ারেশকে পাঠাইয়া দিও।

সাহেব। কেন?

রঙ্গ। এমন অবস্থায় রাণী কিছু কিছু দান করিয়া থাকেন।

সাহেব বিশ্বাস করিল না। ভাল মন্দ কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল।

রঙ্গরাজ তখন পাল্কি বেহারার সন্ধানে গেল। তার প্রতি সেই আদেশও ছিল।

দশম পরিচ্ছেদ

এদিকে পথ সাফ দেখিয়া, ব্রজেশ্বর ধীরে ধীরে দেবীর কাছে আসিয়া বসিলেন।

দেবী বলিল, "ভাল হইল, দেখা দিলে। তোমার কথা ভিন্ন আজিকার কাজ হয় না। তুমি প্রাণ রাখিতে হুকুম দিয়াছিলে, তাই প্রাণ রাখিয়াছি। দেবী মরিয়াছে, দেবী চৌধুরাণী আর নাই। কিন্তু প্রফুল্ল এখনও আছে। প্রফুল্ল থাকিবে, না দেবীর সঙ্গে যাইবে?"

ব্রজেশ্বর আদর করিয়া প্রফুল্লের মুখচুম্বন করিল, বলিল, "তুমি আমার ঘরে চল, ঘর আলো হইবে। তুমি না যাও—আমি যাইব না।"

প্রফুল্ল। আমি ঘরে গেলে আমার শ্বশুর কি বলিবেন?

ব্র। সে ভার আমার। তুমি উদ্যোগ করিয়া তাঁকে আগে পাঠাইয়া দাও। আমরা পশ্চাৎ যাইব।

প্র। পাল্কি বেহারা আনিতে গিয়াছে।

পাল্কি বেহারা শীঘ্রই আসিল। হরবল্লভও সন্ধ্যাহ্নিক সংক্ষেপে সারিয়া বজরায় আসিয়া উঠিলেন। দেখিলেন, নিশি ঠাকুরাণী ক্ষীর, ছানা, মাখন ও উত্তম সুপক্ক আম্র, কদলী প্রভৃতি ফল তাঁহার জলযোগের জন্য সাজাইতেছে। নিশি অনুনয় বিনয় করিয়া, তাঁহাকে জলযোগে বসাইল। বলিল, "এখন আপনি আমার কুটম্ব হইলেন; জলযোগ না করিয়া যাইতে পারিবেন না।"

হরবল্লভ জলযোগে না বসিয়া বলিল, "ব্রজেশ্বর কোথায়? কাল রাত্রে বাহিরে উঠিয়া গেল—আর তাকে দেখি নাই।"

নিশি। তিনি আমার ভগিনীপতি হইবেন—তাঁর জন্য ভাবিবেন না। তিনি এইখানেই আছেন—আপনি জলযোগে বসুন; আমি তাঁহাকে ডাকিয়া দিতেছি। সেই কথাটা তাঁকে বলিয়া যাউন।

হরবল্লভ জলযোগে বসিল। নিশি ব্রজেশ্বরকে ডাকিয়া আনিল। ভিতরের কামরা হইতে ব্রজেশ্বর বাহির হইল দেখিয়া উভয়ে কিছু অপ্রতিভ হইলেন। হরবল্লভ ভাবিলেন, আমার চাঁদপানা ছেলে দেখে, ডাকিনী বেটীরা ভুলে গিয়েছে। ভালই।

ব্রজেশ্বরকে হরবল্লভ বলিলেন, "বাপু হে, তুমি যে এখানে কি প্রকারে আসিলে, আমি ত তা এখনও কিছু বুঝিতে পারি নাই। তা যাক, সে এখনকার কথা নয়, সে কথা পরে হবে। এক্ষণে আমি একটু অনুরোধে পড়েছি—তা অনুরোধটা রাখিতে হইবে। এই ঠাকুরাণীটি সৎকুলীনের মেয়ে—ওঁর বাপ আমাদের পালটি—তা' ওঁর একটি অবিবাহিতা ভগিনী আছে—পাত্র পাওয়া যায় না—কুল যায়। তা কুলীনের কুলরক্ষা কুলীনেরই কাজ—মুটে মজুরের ত কাজ নয়। আর তুমিও পুনর্ব্বার সংসার কর, সেটাও আমার ইচ্ছা বটে, তোমার গর্ভধারিণীরও ইচ্ছা বটে। বিশেষ বড় বউমাটির পরলোকের পর থেকে আমরা কিছু এ বিষয়ে কাতর আছি। তাই বল্‌ছিলাম, যখন অনুরোধে পড়া গেছে, তখন এ কর্ত্তব্যই হয়েছে। আমি অনুমতি করিতেছি, তুমি এঁর ভগিনীকে বিবাহ কর।"

ব্রজেশ্বর মোটের উপর বলিল, "যে আজ্ঞা।"

নিশির বড় হাসি পাইল, কিন্তু হাসিল না। হরবল্লভ বলিতে লাগিলেন, "তা আমার পাল্কি বেহারা এসেছে, আমি আগে গিয়া বৌভাতের উদ্যোগ করি। তুমি যথাশাস্ত্র বিবাহ করে বৌ নিয়ে বাড়ী যেও।"

ব্র। যে আজ্ঞা।

হর। তা তোমায় আর বলিব কি, তুমি ছেলেমানুষ নও—কুল, শীল, জাতি, মর্য্যাদা, সব আপনি দেখে শুনে বিবাহ করবে। (পরে একটু আওয়াজ খাটো

করিয়া বলিতে লাগিলেন) আর আমাদের যেটা ন্যায্য পাওনা গণ্ডা, তাও ত জান?

ব্রজ। যে আজ্ঞা।

হরবল্লভ জলযোগ সমাপন করিয়া বিদায় হইলেন। ব্রজ ও নিশি তাঁহার পদধূলি লইল। তিনি পাল্কিতে চড়িয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া দুর্গানাম করিয়া প্রাণ পাইলেন। ভাবিলেন, ছেলেটি ডাকিনী বেটাদের হাতে রহিল—তা ভয় নাই। ছেলে আপনার পথ চিনিয়াছে। চাঁদমুখের সর্ব্বত্র জয়।'

হরবল্লভ চলিয়া গেলে, ব্রজেশ্বর নিশিকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ আবার কি ছল? তোমার ছোট বোন্ কে?"

নিশি। চেন না? তার নাম প্রফুল্ল।

ব্রজ। ওহো! বুঝিয়াছি। কি রকমে এ সম্বন্ধে কর্ত্তাকে রাজি করিলে?

নিশি। মেয়েমানুষের অনেক রকম আছে। ছোট বোনের শাশুড়ী হইতে নাই, নহিলে আরও একটা সম্বন্ধে তাঁকে রাজি করিতে পারিতাম।

দিবা রাগিয়া উঠিয়া বলিল, "তুমি শীগ্‌গির মর। লজ্জা সরম কিছুই নাই। পুরুষমানুষের সঙ্গে কি অমন করে কথা কহিতে হয়?"

নিশি। কে আবার পুরুষমানুষ? ব্রজেশ্বর? কাল দেখা গিয়াছে—কে পুরুষ, কে মেয়ে।

ব্র। আজিও দেখিব। তুমি মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষের মত মোটা বুদ্ধির কাজ করিয়াছ। কাজটা ভাল হয় নাই।

নিশি। সে আবার কি?

ব্র। বাপের সঙ্গে কি প্রবঞ্চনা চলে? বাপের চোখে ধূলা দিয়া, মিছে কথা বহাল রাখিয়া আমি স্ত্রী লইয়া সংসার করিব? যদি বাপকে ঠকাইলাম, তবে পৃথিবীতে কার কাছে জুয়াচুরি করিতে আমার আটকাইবে?

নিশি অপ্রতিভ হইল, মনে মনে স্বীকার করিল, ব্রজেশ্বর পুরুষ বটে। কেবল লাঠিবাজিতে পুরুষ হয় না, নিশি তা বুঝিল। বলিল, "এখন উপায়?"

ব্র। উপায় আছে। চল, প্রফুল্লকে লইয়া ঘরে যাই। সেখানে গিয়া বাপকে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিব। লুকোচুরি হইবে না।

নিশি। তা হইলে তোমার বাপ কি দেবী চৌধুরাণীকে বাড়ীতে উঠিতে দিবেন?

দেবী বলিল, "দেবী চৌধুরাণী কে? দেবী চৌধুরাণী মরিয়াছে, তার নাম এ পৃথিবীতে মুখেও আনিও না। প্রফুল্লের কথা বল।"

নিশি। প্রফুল্লকেই কি তিনি ঘরে স্থান দিবেন?

ব্র। আমি ত বলিয়াছি যে, সে ভার আমার।

প্রফুল্ল সন্তুষ্ট হইল। বুঝিয়াছিল যে, ব্রজেশ্বরের ভার বহিবার ক্ষমতা না থাকিলে, সে ভার লইবার লোক নহে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

তখন ভূতনাথে যাইবার উদ্যোগ আরম্ভ হইল। রঙ্গরাজকে সেইখান হইতে বিদায় দিবার কথা স্থির হইল। কেন না, ব্রজেশ্বরের দ্বারবানেরা একদিন তাহার লাঠি খাইয়াছিল, যদি দেখিতে পায়, তবে চিনিবে। রঙ্গরাজকে ডাকিয়া সকল কথা বুঝাইয়া দেওয়া হইল, কতক নিশি বুঝাইল, কতক প্রফুল্ল নিজে বুঝাইল। রঙ্গরাজ কাঁদিল—বলিল "মা, আমাদিগকে ত্যাগ করিবেন, তা ত কখনও জানিতাম না। সকলে মিলিয়া রঙ্গরাজকে সান্ত্বনা করিল। দেবীগড়ে প্রফুল্লের ঘর-বাড়ী, দেবসেবা, দেবত্র সম্পত্তি ছিল। সে সকল প্রফুল্ল রঙ্গরাজকে দিলেন, বলিলেন, "সেইখানে গিয়া বাস কর। দেবতার ভোগ হয়, প্রসাদ খাইয়া দিনপাত করিও।

আর কখনও লাঠি ধরিও না। তোমরা যাকে পরোপকার বল, সে বস্তুতঃ পরপীড়ন। ঠেঙ্গা লাঠির দ্বারা পরোপকার হয় না। দুষ্টের দমন রাজা না করেন, ঈশ্বর করিবেন—তুমি আমি কে? শিষ্টের পালনের ভার লইও—কিন্তু দুষ্টের দমনের ভার ঈশ্বরের উপর রাখিও। এই সকল কথাগুলি আমার পক্ষ হইতে ভবানী ঠাকুরকেও বলিও; তাঁকে আমার কোটি কোটি প্রণাম জানাইও।”

রঙ্গরাজ কাঁদিতে কাঁদিতে বিদায় হইল। দিবা ও নিশি সঙ্গে সঙ্গে ভূতনাথের ঘাটে পর্য্যন্ত চলিল। সেই বজরায় ফিরিয়া তাহারা দেবীগড়ে গিয়া বাস করিবে, প্রসাদ খাইবে, আর ‘হরিনাম’ করিবে। বজরায় দেবীর রাণীগিরির আসবাব সব ছিল, পাঠক দেখিয়াছেন। তাহার মূল্য অনেক টাকা। প্রফুল্ল সব দিবা ও নিশিকে দিলেন। বলিলেন, “এ সকল বেচিয়া যাহা হইবে, তাহার মধ্যে তোমাদের যাহা প্রয়োজন, ব্যয় করিবে; বাকী দরিদ্রকে দিবে। এ সকল আমার কিছুই নয়—আমি ইহার কিছুই লইব না।” এই বলিয়া প্রফুল্ল আপনার বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারগুলি নিশি ও দিবাকে দিলেন।

নিশি বলিল, “মা! নিরাভরণে শ্বশুরবাড়ী উঠিবে?”

প্রফুল্ল ব্রজেশ্বরকে দেখাইয়া দিয়া বলিল, “স্ত্রীলোকের এই আভরণ সকলের ভাল। আর আভরণে কাজ কি মা?”

নিশি বলিল, “আজ তুমি প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাইতেছ; আমি আজ তোমাকে কিছু যৌতুক দিয়া আশীর্ব্বাদ করিব। তুমি মানা করিও না, “এই আমার শেষের সাধ—সাধ মিটাইতে দাও।”

এই বলিয়া নিশি কতকগুলি বহুমূল্যে রত্নালঙ্কারে প্রফুল্লকে সাজাইতে লাগিল। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, নিশি যখন এক রাজমহিষীর কাছে থাকিত, রাজমহিষী তাহাকে অনেক অলঙ্কার দিয়াছিলেন। এ সেই গহনা। দেবী তাহাকে নূতন গহনা দিয়াছিলেন বলিয়া সেগুলি নিশি পরিত না। এক্ষণে দেবীকে নিরাভরণা দেখিয়া সেইগুলি পরাইল। তার পর আর কোন কাজ নাই; কাজেই তিনজনে কাঁদিতে বসিল। নিশি গহনা পরাইবার সময়েই সুর তুলিয়াছিল; দিবা তৎক্ষণাৎ পোঁ ধরিলেন। তার পর পোঁ সানাই ছাপাইয়া উঠিল। প্রফুল্লও কাঁদিল—না কাঁদিবার কথা কি? তিনজনের আন্তরিক ভালবাসা ছিল; কিন্তু প্রফুল্লের মন আহ্লাদে ভরা, কাজেই প্রফুল্ল অনেক নরম গেল। নিশিও দেখিল যে, প্রফুল্লের মন সুখে ভরা; নিশিও সে সুখে সুখী হইল, কান্নায় সেও একটু নরম গেল। সে বিষয়ে যাহার যে ত্রুটি হইল, দিবা ঠাকুরাণী তাহা সারিয়া লইলেন।

যথাকালে বজরা ভূতনাথের ঘাটে পৌঁছাইল। সেইখানে দিবা ও নিশির পায়ের ধূলা লইয়া, প্রফুল্ল তাহাদিগের কাছে বিদায় লইল। তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে সেই বজরায় ফিরিয়া যথাকালে দেবীগড়ে পৌঁছিল, দাঁড়ী মাঝি বর্‌কন্দাজের বেতন হিসাব করিয়া দিয়া, তাহাদের জবাব দিল। বজরাখানি রাখা অকর্ত্তব্য—চেনা বজরা। প্রফুল্ল বলিয়া দিয়াছিল, “উহা রাখিও না।” নিশি বজরাখানাকে চেলা করিয়া দুই বৎসর ধরিয়া পোড়াইল।

এই চেলা কাঠের উপঢৌকন দিয়া পাঠক নিশি ঠাকুরাণীর কাছে বিদায় লউন। অনুপযুক্ত হইবে না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ভূতনাথের ঘাটে প্রফুল্লের বজরা ভিড়িবামাত্র, কে জানে কোথা দিয়া; গ্রামময় রাষ্ট্র হইল যে, ব্রজেশ্বর আবার একটা বিয়ে করে এনেছে; বড় না কি ধেড়ে বৌ। সুতরাং ছেলে বুড়ো, কাণা খোঁড়া যে যেখানে ছিল, সব বৌ দেখিতে ছুটিল। যে রাঁধিতেছিল, সে হাঁড়ি ফেলিয়া ছুটিল; যে মাছ কুটিতেছিল সে মাছে চুপড়ি চাপা দিয়া ছুটিল; যে স্নান করিতেছিল, সে ভিজে কাপড়ে ছুটিল। যে খাইতে বসিয়াছিল, তার আধপেটা বৈ খাওয়া হইল না। যে কোন্দল করিতেছিল, শত্রুপক্ষের সঙ্গে হঠাৎ তার মিল হইয়া গেল। যে মাগী ছেলে ঠেঙ্গাইতেছিল, তার ছেলে সে যাত্রা বাঁচিয়া গেল, মার কোলে উঠিয়া ধেড়ে বৌ দেখিতে চলিল। কাহারও

স্বামী আহারে বসিয়াছেন, পাতে ডাল তরকারি পড়িয়াছে, মাছের ঝোল পড়ে নাই, এমন সময়ে বৌয়ের খবর আসিল, আর তাঁর কপালে সে দিন মাছের ঝোল হইল না। এইমাত্র বুড়ী নাতিনীর সঙ্গে কাজিয়া করিতেছিল যে, "আমার হাত ধরিয়া না নিয়া গেলে, আমি কেমন করে পুকুরঘাটে যাই?" এমন সময় গোল হইল—বৌ এসেছে, অমনি নাতিনী আয়ি ফেলিয়া বৌ দেখিতে গেল, আয়িও কোন রকমে সেইখানে উপস্থিত। এক যুবতী মার কাছে তিরস্কার খাইয়া শপথ করিতেছিলেন যে, তিনি কখন বাহির হন না, এমন সময়ে বৌ আসার সংবাদ পৌঁছিল, শপথটা সম্পূর্ণ হইল না; যুবতী বৌয়ের বাড়ীর দিকে ছুটিলেন। মা শিশু ফেলিয়া ছুটিল, শিশু মার পিছু পিছু কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিল। ভাশুর, স্বামী, বসিয়া আছে, ভ্রাতৃবধূ মানিল না, ঘোমটা টানিয়া সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। ছুটিতে যুবতীদের কাপড় খসিয়া পড়ে, আঁটিয়া পরিবার অবকাশ নাই। চুল খুলিয়া পড়ে, জড়াইবার অবকাশ নাই। সামলাইতে কোথাকার কাপড় কোথায় টানেন, তারও বড় ঠিক নাই। হুলস্থুল পড়িয়া গেল। লজ্জায় লজ্জাদেবী পলায়ন করিলেন।

বর-কন্যা আসিয়া পিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়াছে, গিন্নী বরণ করিতেছেন। বৌয়ের মুখ দেখিবার জন্য লোকে ঝুঁকিয়াছে, কিন্তু বৌ বৌগিরির চাল ছাড়ে না, দেড় হাত ঘোমটা টানিয়া রাখিয়াছে, কেহ মুখ দেখিতে পায় না। শাশুড়ী বরণ করিবার সময়ে একবার ঘোমটা খুলিয়া বধূর মুখ দেখিলেন। একটু চমকিয়া উঠিলেন, আর কিছু বলিলেন না, কেবল বলিলেন, "বেশ বউ।" তাঁর চোখে একটু জল আসিল।

বরণ হইয়া গেলে বধূ ঘরে তুলিয়া শাশুড়ী সমবেত প্রতিবাসিনীদিগকে বলিলেন, "মা! আমার বেটা-বউ অনেক দূর থেকে আসিতেছে, ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর। আমি এখন ওদের খাওয়াই দাওয়াই। ঘরের বউ ত ঘরেই রহিল, তোমরা নিত্য দেখ্‌বে, এখন ঘরে যাও, খাও দাও গিয়া।"

গিন্নীর এই বাক্যে অপ্রসন্ন হইয়া নিন্দা করিতে করিতে প্রতিবাসিনীরা ঘরে গেল। দোষ গিন্নীর, কিন্তু নিন্দাটা বধূরই অধিক হইল; কেন না, বড় কেহ মুখ দেখিতে পায় নাই। ধেড়ে মেয়ে বলিয়া সকলেই ঘৃণা প্রকাশ করিল। আবার সকলেই বলিল, "কুলীনের ঘরে অমন ঢের হয়।" তখন যে যেখানে কুলীনের ঘরে বুড় বৌ দেখিয়াছে, তার গল্প করিতে লাগিল। গোবিন্দ মুখুয্যা পঞ্চান্ন বৎসরের একটা মেয়ে বিয়ে করিয়াছিল, হরি চাটুয্যা সত্তর বৎসরের এক কুমারী ঘরে আনিয়াছিলেন, মনু বাঁড়ুয্যা একটি প্রাচীনার অন্তর্জ্জলে তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই সকল আখ্যায়িকা সালঙ্কারে পথিমধ্যে ব্যাখ্যাত হইতে লাগিল। এইরূপ আন্দোলন করিয়া ক্রমে গ্রাম ঠাণ্ডা হইল।

গোলমাল মিটিয়া গেল; গিন্নী বিরলে ব্রজেশ্বরকে ডাকিলেন। ব্রজ আসিয়া বলিল, "কি মা?"

গিন্নী। বাবা, এ বৌ কোথা পেলে, বাবা?

ব্রজ। এ নূতন বিয়ে নয়, মা!

গিন্নী। বাবা, এ হারাধন আবার কোথায় পেলে, বাবা?

গিন্নীর চোখে জল পড়িতেছিল।

ব্রজ। মা, বিধাতা দয়া করিয়া আবার দিয়াছেন। এখন মা, তুমি বাবাকে কিছু বলিও না। নির্জ্জনে পাইলে আমি সকলই তাঁর সাক্ষাতে প্রকাশ করিব।

গিন্নী। তোমাকে কিছু বলিতে হইবে না, বাপ, আমিই সব বলিব। বৌভাতটা হইয়া যাক্। তুমি কিছু ভাবিও না। এখন কাহারও কাছে কিছু বলিও না।

ব্রজেশ্বর স্বীকৃত হইল। এ কঠিন কাজের ভার মা লইলেন। ব্রজ বাঁচিল। কাহাকে কিছু বলিল না।

পাকস্পর্শ নির্ব্বিঘ্নে হইয়া গেল। বড় ঘটা পটা কিছু হইল না, কেবল জনকতক আত্মীয়স্বজন ও কুটুম্ব নিমন্ত্রণ করিয়া হরবল্লভ কার্য্য সমাধা করিলেন।

পাকস্পর্শের পর গিন্নী আসল কথাটা হরবল্লভকে ভাঙ্গিয়া বলিলেন। বলিলেন যে, "এ নূতন বিয়ে নয়—সেই বড় বউ।"

হরবল্লভ চমকিয়া উঠিল—সুপ্ত ব্যাঘ্রকে কে যেন বাণে বিঁধিল। “অ্যাঁ, সেই বড় বউ—কে বল্লে।”

গিন্নী। আমি চিনেছি। আর ব্রজও আমাকে বলিয়াছে।

হর। সে যে দশ বৎসর হলো ম’রে গেছে।

গিন্নী। মরা মানুষেও কখন ফিরে থাকে?

হর। এত দিন সে মেয়ে কোথায় কার কাছে ছিল?

গিন্নী। তা আমি ব্রজেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করি নাই। জিজ্ঞাসাও করিব না। ব্রজ যখন ঘরে আনিয়াছে, তখন না বুঝিয়া সুঝিয়া আনে নাই।

হর। আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি।

গিন্নী। আমার মাথা খাও, তুমি একটি কথাও কহিও না। তুমি একবার কথা কহিয়াছিলে, তার ফলে আমার ছেলে আমি হারাইতে বসিয়াছিলাম। আমার একটি ছেলে। আমার মাথা খাও, তুমি একটা কথা কহিও না। যদি তুমি কোন কথা কহিবে, তবে আমি গলায় দড়ি দিব।

হরবল্লভ এতটুকু হইয়া গেলেন। একটি কথাও কহিলেন না। কেবল বলিলেন, “তবে লোকের কাছে নূতন বিয়ের কথাটাই প্রচার থাক।”

গিন্নী বলিলেন, “তাই থাকিবে।”

সময়ান্তরে গিন্নী ব্রজেশ্বরকে সুসংবাদ জানাইলেন। বলিলেন, “আমি তাঁকে বলিয়াছিলাম। তিনি কোন কথা কহিবেন না। সে সব কথার আর কোন উচ্চবাচ্যে কাজ নাই।”

ব্রজ হৃষ্টচিত্তে প্রফুল্লকে খবর দিল।

আমরা স্বীকার করি, গিন্নী এবার বড় গিন্নীপনা করিয়াছেন। যে সংসারের গিন্নী গিন্নীপনা জানে, সে সংসারে কারও মনঃপীড়া থাকে না। মাঝিতে হাল ধরিতে জানিলে নৌকার ভয় কি?

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

প্রফুল্ল সাগরকে দেখিতে চাহিল। ব্রজেশ্বরের ইঙ্গিত পাইয়া গিন্নী সাগরকে আনিতে পাঠাইলেন। গিন্নীরও সাধ, তিনটি বৌ একত্র করেন।

যে লোক সাগরকে আনিতে গিয়াছিল, তাহার মুখে সাগর শুনিল, স্বামী আর একটা বিবাহ করিয়া আনিয়াছেন—বুড়ো মেয়ে। সাগরের বড় ঘৃণা হইল। “ছি! বুড়ো মেয়ে।” বড় রাগ হইল, “আবার বিয়ে?—আমরা কি স্ত্রী নই?” দুঃখ হইল, “হায়! বিধাতা কেন আমায় দুঃখীর মেয়ে করেন নাই—আমি কাছে থাকিতে পারিলে, তিনি হয় ত আর বিয়ে করিতেন না।”

এইরূপ রুষ্ট ও ক্ষুণ্নভাবে সাগর শ্বশুরবাড়ী আসিল। আসিয়াই প্রথমে নয়ান বৌয়ের কাছে গেল। নয়ান বৌ, সাগরের দুই চক্ষের বিষ; সাগর বৌ, নয়ানেরও তাই। কিন্তু আজ দুইজন এক, দুই জনের এক বিপদ। তাই ভাবিয়া সাগর আগে নয়নতারার কাছে গেল।

সাপকে হাঁড়ির ভিতর পুরিলে, সে যেমন গর্জ্জিতে থাকে, প্রফুল্ল আসা অবধি নয়নতারা সেইরূপ করিতেছিল। একবার মাত্র ব্রজেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল—গালির চোটে ব্রজেশ্বর পলাইল, আর আসিল না। প্রফুল্লও ভাব করিতে গিয়াছিল, কিন্তু তারও সেই দশা ঘটিল। স্বামী সপত্নী দূরে থাক, পাড়াপ্রতিবাসীও সে কয়দিন নয়নতারার কাছে ঘেঁষিতে পারে নাই। নয়নতারার কতকগুলি ছেলে-মেয়ে হইয়াছিল। তাদেরই বিপদ্ বেশী। এ কয় দিন মার

খাইতে খাইতে তাদের প্রাণ বাহির হইয়া গেল।

সেই দেবীর শ্রীমন্দিরে প্রথম সাগর গিয়া দেখা দিলেন। দেখিয়া নয়নতারা বলিল, “এসো এসো! তুমি বাকী থাক কেন? আর ভাগীদার কেউ আছে?”

সাগর। কি! আবার না কি বিয়ে করেছে?

নয়ন। কে জানে, বিয়ে কি নিকে, তার খবর আমি কি জানি?

সাগর। বামনের মেয়ের কি আবার নিকে হয়?

নয়ন। বামন, কি শূদ্র, কি মুসলমান, তা কি আমি দেখ্‌তে গেছি?

সাগর। অমন কথাগুলো মুখে এনো না। আপনার জাত বাঁচিয়ে সবাই কথা কয়।

নয়ন। যার ঘরে অত বড় কনে বৌ এলো, তার আবার জাত কি?

সাগর। কত বড় মেয়ে? আমাদের বয়স হবে?

নয়ন। তোর মার বয়সী।

সাগর। চুল পেকেছে?

নয়ন। চুল না পাকলে আর রাত্রি দিন বুড়ো মাগী ঘোম্‌টা টেনে বেড়ায়?

সা। দাঁত পড়েছে?

ন। চুল পাক্‌লো, দাঁত আর পড়ে নি?

সা। তবে স্বামীর চেয়ে বয়সে বড় বল?

ন। তবে শুন্‌চিস্‌ কি?

সা। তাও কি হয়?

ন। কুলীনের ঘরে এ সব হয়।

সা। দেখতে কেমন?

ন। রূপের ধ্বজা! যেন গালফুলো গোবিন্দের মা।

সা। যে বিয়ে করেছে, তাকে কিছু বল নি?

ন। দেখ্‌তে পাই কি? দেখ্‌তে পেলে হয়! মুড়ো ঝাঁটা তুলে রেখেছি।

সা। আমি তবে সে সোণার প্রতিমাখানা দেখে আসি।

ন। যা, জন্ম সার্থক করগে, যা।

নূতন সপত্নীকে খুঁজিয়া, সাগর তাহাকে পুকুর ঘাটে ধরিল। প্রফুল্ল পিছন ফিরিয়া বাসন মাজিতেছিল। সাগর পিছনে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “হ্যাঁ গা, তুমি আমাদের নূতন বৌ?”

কে, সাগর এয়েছ? বলিয়া নূতন বৌ সমুখ ফিরিল।

সাগর দেখিল, "কে। বিস্ময়াপন্না হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দেবী রাণী?"

প্রফুল্ল বলিল, "চুপ্! দেবী মরিয়া গিয়াছে।"

সা। প্রফুল্ল?

প্র। প্রফুল্লও মরিয়াছে।

সা। কে তবে তুমি?

প্র। আমি নূতন বৌ।

সা। কেমন ক'রে কি হলো, আমায় সব বল দেখি।

প্র। এখানে বলিবার জায়গা নয়। আমি একটি ঘর পাইয়াছি, সেইখানে চল, সব বলিব।

দুই জনে দ্বার বন্ধ করিয়া, বিরলে বসিয়া কথোপকথন হইল। প্রফুল্ল সাগরকে সব বুঝাইয়া বলিল। শুনিয়া সাগর জিজ্ঞাসা করিল, "এখন গৃহস্থালিতে কি মন টিকিবে? রূপার সিংহাসনে বসিয়া, হীরার মুকুট পরিয়া, রাণীগিরির পর কি বাসনমাজা, ঘরঝাঁট দেওয়া ভাল লাগিবে? যোগশাস্ত্রের পর কি ব্রহ্মঠাকুরাণীর রূপকথা ভাল লাগিবে? যার হুকুমে দুই হাজার লোক খাটিত, এখন হারির মা, পারির মার হুকুম-বর্‌দারি কি তার ভাল লাগিবে?

প্র। ভাল লাগিবে বলিয়াই আসিয়াছি। এই ধর্ম্মই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম; রাজত্ব স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম নয়। কঠিন ধর্ম্মও এই সংসারধর্ম্ম; ইহার অপেক্ষা কোন যোগই কঠিন নয়। দেখ, কতকগুলি নিরক্ষর, স্বার্থপর, অনভিজ্ঞ লোক লইয়া আমাদের নিত্য ব্যবহার করিতে হয়। ইহাদের কারও কোন কষ্ট না হয়, সকলে সুখী হয়, সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। এর চেয়ে কোন্ সন্ন্যাস কঠিন? এর চেয়ে কোন্ পুণ্য বড় পুণ্য? আমি এই সন্ন্যাস করিব।

সা। তবে কিছু দিন আমি তোমার কাছে থাকিয়া তোমার চেলা হইব।

যখন সাগরের সঙ্গে প্রফুল্লের এই কথা হইতেছিল, তখন ব্রহ্মঠাকুরাণীর কাছে ব্রজেশ্বর ভোজনে বসিয়াছিলেন। ব্রহ্মঠাকুরাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেজ, এখন কেমন রাঁধি?"

ব্রজেশ্বরের সেই দশ বছরের কথা মনে পড়িল। কথাগুলি মূল্যবান্—তাই দুই জনেরই মনে ছিল।

ব্রজ বলিল, "বেশ্।"

ব্রহ্ম। এখন গোরুর দুধ কেমন? বেগড়ায় কি?

ব্রজ। বেশ্ দুধ।

ব্রহ্ম। কই, দশ বৎসর হলো—আমায় ত গঙ্গায় দিলি না।

ব্রজ। ভুলে গিছিলেম।

ব্রহ্ম। তুই আমায় গঙ্গায় দিস্ নে। তুই বাগ্দী হয়েছিস্।

ব্রজ। ঠান্‌দিদি! চুপ। ও কথা না।

ব্রহ্ম। তা দিস, পারিস ত গঙ্গায় দিস্। আমি আর কথা কব না। কিন্তু ভাই, কেউ যেন আমার চরকা-টরকা ভাঙ্গে না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

কয়েক মাস থাকিয়া সাগর দেখিল, প্রফুল্ল যাহা বলিয়াছিল, তাহা করিল। সংসারের সকলকে সুখী করিল। শাশুড়ী প্রফুল্ল হইতে এত সুখী যে, প্রফুল্লের হাতে সমস্ত সংসারের ভার দিয়া, তিনি কেবল সাগরের ছেলে কোলে করিয়া বেড়াইতেন। ক্রমে শ্বশুরও প্রফুল্লের গুণ বুঝিলেন। শেষ প্রফুল্ল যে কাজ না করিত, সে কাজ তাঁর ভাল লাগিত না। শ্বশুর-শাশুড়ী প্রফুল্লকে না জিজ্ঞাসা করিয়া কোন কাজ করিত না, তাহার বুদ্ধিবিবেচনার উপর তাহাদের এতটাই শ্রদ্ধা হইল। ব্রহ্মঠাকুরাণীও রান্নাঘরের কর্তৃত্ব প্রফুল্লকে ছাড়িয়া দিলেন। বুড়ী আর বড় রাঁধিতে পারে না, তিন বৌ রাঁধে; কিন্তু যে দিন প্রফুল্ল দুই একখানা না রাঁধিত, সে দিন কাহারও অন্ন-ব্যঞ্জন ভাল লাগিত না। যাহার ভোজনের কাছে প্রফুল্ল না দাঁড়াইত, সে মনে করিত, আধপেটা খাইলাম। শেষ নয়ান বৌও বশীভূত হইল। আর প্রফুল্লের সঙ্গে কোন্দল করিতে আসিত না। বরং প্রফুল্লের ভয়ে আর কাহারও সঙ্গে কোন্দল করিতে সাহস করিত না। প্রফুল্লের পরামর্শ ভিন্ন কোন কাজ করিত না। দেখিল, নয়নতারার ছেলেগুলিকে প্রফুল্ল যেমন যত্ন করে, নয়নতারা তেমন পারে না। নয়নতারা প্রফুল্লের হাতে ছেলেগুলি সমর্পণ করিয়া নিশ্চিত হইল। সাগর বাপের বাড়ী অধিক দিন থাকিতে পারিল না—আবার আসিল। প্রফুল্লের কাছে থাকিলে সে যেমন সুখী হইত, এত আর কোথাও হইত না।

এ সকল অন্যের পক্ষে আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু প্রফুল্লের পক্ষে আশ্চর্য্য নহে। কেন না, প্রফুল্ল নিষ্কাম ধর্ম্ম অভ্যাস করিয়াছিল। প্রফুল্ল সংসারে আসিয়াই যথার্থ সন্ন্যাসিনী হইয়াছিল। তার কোন কামনা ছিল না—কেবল কাজ খুঁজিত। কামনা অর্থে আপনার সুখ খোঁজা—কাজ অর্থে পরের সুখ খোঁজা। প্রফুল্ল নিষ্কাম অথচ কর্ম্মপরায়ণ, তাই প্রফুল্ল যথার্থ সন্ন্যাসিনী। তাই প্রফুল্ল যাহা স্পর্শ করিত, তাই সোণা হইত। প্রফুল্ল ভবানী ঠাকুরের শাণিত অস্ত্র—সংসার-গ্রন্থি অনায়াসে বিচ্ছিন্ন করিল। অথচ কেহই হরবল্লভের গৃহে জানিতে পারিল না যে, প্রফুল্ল এমন শাণিত অস্ত্র। সে যে অদ্বিতীয় মহামহোপাধ্যায়ের শিষ্যা—নিজে পরম পণ্ডিত—সে কথা দূরে থাক, কেহ জানিল না যে, তাহার অক্ষর-পরিচয়ও আছে। গৃহধর্ম্মে বিদ্যা প্রকাশের প্রয়োজন নাই। গৃহধর্ম্ম বিদ্বানেই সুসম্পন্ন করিতে পারে বটে, কিন্তু বিদ্যা প্রকাশের স্থান সে নয়। যেখানে বিদ্যা প্রকাশের স্থান নহে, সেখানে যাহার বিদ্যা প্রকাশ পায়, সেই মূর্খ। যাহার বিদ্যা প্রকাশ পায় না, সেই যথার্থ পণ্ডিত।

প্রফুল্লের যাহা কিছু বিবাদ, সে ব্রজেশ্বরের সঙ্গে। প্রফুল্ল বলিত, "আমি একা তোমার স্ত্রী নহি। তুমি যেমন আমার, তেমনি সাগরের, তেমনি নয়ন বৌয়ের। আমি একা তোমায় ভোগ-দখল করিব না। স্ত্রীলোকের পতি দেবতা; তোমাকে ওরা পূজা করিতে পায় না কেন?" ব্রজেশ্বর তা শুনিত না। ব্রজেশ্বরের হৃদয় কেবল প্রফুল্লময়। প্রফুল্ল বলিত, "আমায় যেমন ভালবাস, উহাদিগকেও তেমনি ভাল না বাসিলে, আমার উপর তোমার ভালবাসা সম্পূর্ণ হইল না। ওরাও আমি।" ব্রজেশ্বর তা বুঝিত না।

প্রফুল্লের বিষয়বুদ্ধি, বুদ্ধির প্রাখর্য্য ও সদ্বিবেচনার গুণে, সংসারের বিষয়কর্ম্মও তাহার হাতে আসিল। তালুক মুলুকের কাজ বাহিরে হইত বটে, কিন্তু একটু কিছু বিবেচনার কথা উঠিলে কর্ত্তা আসিয়া গিন্নীকে বলিতেন, "নূতন বৌমাকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, তিনি কি বলেন?" প্রফুল্লের পরামর্শে সব কাজ হইতে লাগিল বলিয়া, দিন দিন লক্ষ্মী শ্রী বাড়িতে লাগিল। শেষ যথাকালে ধন জন ও সর্ব্বসুখে পরিব্রত হইয়া হরবল্লভ পরলোক গমন করিলেন।

বিষয় ব্রজেশ্বরের হইল। প্রফুল্লের গুণে ব্রজেশ্বরের নূতন তালুক মুলুক হইয়া হাতে অনেক নগদ টাকা জমিল। তখন প্রফুল্ল বলিল, "আমার সেই পঞ্চাশ হাজার টাকা কর্জ্জ শোধ কর।"

ব্র। কেন, তুমি টাকা লইয়া কি করিবে?

প্র। আমি কিছু করিব না। কিন্তু টাকা আমার নয়—শ্রীকৃষ্ণের;—কাঙ্গাল গরিবের। কাঙ্গাল গরিবকে দিতে হইবে।

ব্র। কি প্রকারে?

প্র। পঞ্চাশ হাজার টাকায় এক অতিথিশালা কর।

ব্রজেশ্বর তাই করিল। অতিথিশালা মধ্যে এক অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া অতিথিশালার নাম দিল "দেবীনিবাস।"

যথাকালে, পুত্র-পৌত্রে সমাবৃত হইয়া প্রফুল্ল স্বর্গারোহণ করিল। দেশের লোক সকলেই বলিল, "আমরা মাতৃহীন হইলাম।"

রঙ্গরাজ, দিবা ও নিশি দেবীগড়ে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রসাদভোজনে জীবন নির্ব্বাহ করিয়া পরলোক গমন করিলেন। ভবানী ঠাকুরের অদৃষ্টে সেরূপ ঘটিল না।

ইংরেজ রাজ্য শাসনের ভার গ্রহণ করিল। রাজ্য সুশাসিত হইল। সুতরাং ভবানী ঠাকুরের কাজ ফুরাইল। দুষ্টের দমন রাজাই করিতে লাগিল। ভবানী ঠাকুর ডাকাইতি বন্ধ করিল।

তখন ভবানী ঠাকুর মনে করিল, "আমার প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন।" এই ভাবিয়া ভবানী ঠাকুর ইংরেজকে ধরা দিলেন, সকল ডাকাইতি একবার করিলেন, দণ্ডের প্রার্থনা করিলেন। ইংরেজ হুকুম দিল, "যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে বাস।" ভবানী পাঠক প্রফুল্লচিত্তে দ্বীপান্তরে গেল।

* * * *

এখন এসো, প্রফুল্ল! একবার লোকালয়ে দাঁড়াও—আমরা তোমায় দেখি। একবার এই সমাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বল দেখি, "আমি নূতন নহি, আমি পুরাতন। আমি সেই বাক্যমাত্র; কতবার আসিয়াছি, তোমরা আমায় ভুলিয়া গিয়াছ, তাই আবার আসিলাম—

"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

দুর্গেশনন্দিনী

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ দেবমন্দির

৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন। দিনমণি অস্তাচলগমনোদ্যোগী দেখিয়া অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। কেন না, সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রান্তর; কি জানি, যদি কালধর্ম্মে প্রদোষকালে প্রবল ঝটিকা বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তবে সেই প্রান্তরে, নিরাশ্রয়ে যৎপরোনাস্তি পীড়িত হইতে হইবে। প্রান্তর পার হইতে না হইতেই সূর্য্যাস্ত হইল; ক্রমে নৈশ গগন নীলনীরদমালায় আবৃত হইতে লাগিল। নিশারম্ভেই এমন ঘোরতর অন্ধকার দিগন্তসংস্থিত হইল যে, অশ্বচালনা অতি কঠিন বোধ হইতে লাগিল। পান্থ কেবল বিদ্যুদ্দীপ্তিপ্রদর্শিত পথে কোন মতে চলিতে লাগিলেন।

অল্পকাল মধ্যে মহারবে নৈদাঘ ঝটিকা প্রধাবিত হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বৃষ্টিধারা পড়িতে লাগিল। ঘোটকারূঢ় ব্যক্তি গন্তব্য পথের আর কিছুমাত্র স্থিরতা পাইলেন না। অশ্ব-বল্গা শ্লথ করাতে অশ্ব যথেচ্ছ গমন করিতে লাগিল। এইরূপ কিয়দ্দূর গমন করিলে ঘোটকচরণে কোন কঠিন দ্রব্যসংঘাতে ঘোটকের পদঙ্খলন হইল। ঐ সময়ে একবার বিদ্যুৎ প্রকাশ হওয়াতে পথিক সম্মুখে প্রকাণ্ড ধবলাকার কোন পদার্থ চকিতমাত্র দেখিতে পাইলেন। ঐ ধবলাকার স্তূপ অট্টালিকা হইবে, এই বিবেচনায় অশ্বারোহী লাফ দিয়া ভূতলে অবতরণ করিলেন। অবতরণমাত্র জানিতে পারিলেন যে, প্রস্তরনির্ম্মিত সোপানাবলীর সংস্রবে ঘোটকের চরণ স্খলিত হইয়াছিল; অতএব নিকটে আশ্রয়-স্থান আছে জানিয়া, অশ্বকে ছাড়িয়া দিলেন। নিজে অন্ধকারে সাবধানে সোপানমার্গে পদক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অচিরাৎ তাড়িতালোকে জানিতে পারিলেন যে, সম্মুখস্থ অট্টালিকা এক দেবমন্দির। কৌশলে মন্দিরের ক্ষুদ্র দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে দ্বার রুদ্ধ; হস্তমার্জ্জনে জানিলেন, দ্বার বহির্দ্দিক হইতে রুদ্ধ হয় নাই। এই জনহীন প্রান্তরস্থিত মন্দিরে এমন সময়ে কে ভিতর হইতে অর্গল আবদ্ধ করিল, এই চিন্তায় পথিক কিঞ্চিৎ বিস্মিত ও কৌতূহলাবিষ্ট হইলেন। মস্তকোপরি প্রবল বেগে ধারাপাত হইতেছিল, সুতরাং যে কোন ব্যক্তি দেবালয়-মধ্য-বাসী হউক, পথিক দ্বারে ভূয়োভূয়ঃ বলদর্পিত করাঘাত করিতে লাগিলেন, কেহই দ্বারোন্মোচন করিতে আসিল না। ইচ্ছা, পদাঘাতে কবাট মুক্ত করেন, কিন্তু দেবালয়ের পাছে অমর্য্যাদা হয়, এই আশঙ্কায় পথিক তত দূর করিলেন না; তথাপি তিনি কবাটে যে দারুণ করপ্রহার করিতেছিলেন, কাষ্ঠের কবাট তাহা অধিকক্ষণ সহিতে পারিল না, অল্পকালেই অর্গলচ্যুত হইল। দ্বার খুলিয়া যাইবামাত্র যুবা যেমন মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, অমনই মন্দিরমধ্যে অস্ফুট চীৎকারধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল ও তন্মুহূর্ত্তে মুক্ত দ্বারপথে ঝটিকাবেগ প্রবাহিত হওয়াতে তথা যে ক্ষীণ প্রদীপ জ্বলিতেছিল, তাহা নিবিয়া গেল। মন্দিরমধ্যে মনুষ্যই বা কে আছে, দেবই বা কি মূর্ত্তি, প্রবেষ্টা তাহার কিছুই দেখিতে পাইলেন না। আপনার অবস্থা এইরূপ দেখিয়া নির্ভীক যুবা পুরুষ কেবল ঈষৎ হাস্য করিয়া, প্রথমতঃ

ভক্তিভাবে মন্দিরমধ্যস্থ অদৃশ্য দেবমূর্ত্তির উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। পরে গাত্রোত্থান করিয়া অন্ধকারমধ্যে ডাকিয়া কহিলেন, “মন্দিরমধ্যে কে আছ?” কেহই প্রশ্নের উত্তর করিল না; কিন্তু অলঙ্কারঝঙ্কারশব্দ কর্ণে প্রবেশ করিল। পথিক তখন বৃথা বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া বৃষ্টিধারা ও ঝটিকার প্রবেশ রোধার্থ দ্বার যোজিত করিলেন, এবং ভগ্নার্গলের পরিবর্ত্তে আত্মশরীর দ্বারে নিবিষ্ট করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, “যে কেহ মন্দিরমধ্যে থাক, শ্রবণ কর; এই আমি সশস্ত্র দ্বারদেশে বসিলাম, আমার বিশ্রামের বিঘ্ন করিও না। বিঘ্ন করিলে, যদি পুরুষ হও, তবে ফলভোগ করিবে; আর যদি স্ত্রীলোক হও, তবে নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাও, রাজপুত-হস্তে অসিচর্ম্ম থাকিতে তোমাদিগের পদে কুশাঙ্কুরও বিঁধিবে না।

“আপনি কে ?” বামাস্বরে মন্দিরমধ্য হইতে এই প্রশ্ন হইল। শুনিয়া সবিস্ময়ে পথিক উত্তর করিলেন, “স্বরে বুঝিতেছি, এ প্রশ্ন কোন সুন্দরী করিলেন। আমার পরিচয়ে আপনার কি হইবে?”

মন্দিরমধ্য হইতে উত্তর হইল, “আমরা বড় ভীত হইয়াছি।”

যুবক তখন কহিলেন, “আমি যেই হই, আমাদিগের আত্মপরিচয় আপনারা দিবার রীতি নাই। কিন্তু আমি উপস্থিত থাকিতে অবলাজাতির কোন প্রকার বিঘ্নের আশঙ্কা নাই।”

রমণী উত্তর করিল, “আপনার কথা শুনিয়া আমার সাহস হইল, এতক্ষণ আমরা ভয়ে মৃতপ্রায় ছিলাম। এখনও আমার সহচরী অর্দ্ধমূর্চ্ছিতা রহিয়াছেন। আমরা সায়াহ্নকালে এই শৈলেশ্বর শিবপূজার জন্য আসিয়াছিলাম। পরে ঝড় আসিলে, আমাদিগের বাহক দাস-দাসীগণ আমাদিগকে ফেলিয়া কোথায় গিয়াছে, বলিতে পারি না।”

যুবক কহিলেন, “চিন্তা করিবেন না, আপনারা বিশ্রাম করুন, কাল প্রাতে আমি আপনাদিগকে গৃহে রাখিয়া আসিব।” রমণী কহিল, “শৈলেশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।”

অর্দ্ধরাত্রে ঝটিকা বৃষ্টি নিবারণ হইলে, যুবক কহিলেন, “আপনারা এইখানে কিছুকাল কোনরূপে সাহসে ভর করিয়া থাকুন। আমি একটা প্রদীপ সংগ্রহের জন্য নিকটবর্ত্তী গ্রামে যাই।”

এই কথা শুনিয়া যিনি কথা কহিতেছিলেন, তিনি কহিলেন, “মহাশয়, গ্রাম পর্য্যন্ত যাইতে হইবে না। এই মন্দিরের রক্ষক একজন ভৃত্য অতি নিকটেই বসতি করে; জ্যোৎস্না প্রকাশ হইয়াছে, মন্দিরের বাহির হইতে তাহার কুটীর দেখিতে পাইবেন। সে ব্যক্তি একাকী প্রান্তরমধ্যে বাস করিয়া থাকে, এজন্য সে গৃহে সর্ব্বদা অগ্নি জ্বালিবার সামগ্রী রাখে।”

যুবক এই কথানুসারে মন্দিরের বাহিরে আসিয়া জ্যোৎস্নার আলোকে দেবালয়রক্ষকের গৃহ দেখিতে পাইলেন। গৃহদ্বারে গমন করিয়া তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিলেন। মন্দিররক্ষক ভয়প্রযুক্ত দ্বারোদ্ঘাটন না করিয়া, প্রথমে অন্তরাল হইতে কে আসিয়াছে দেখিতে লাগিল। বিশেষ পর্য্যবেক্ষণে পথিকের কোন দস্যুলক্ষণ দৃষ্ট হইল না; বিশেষতঃ তৎস্বীকৃত অর্থের লোভ সম্বরণ করা তাহার পক্ষে কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল। সাত পাঁচ ভাবিয়া মন্দিররক্ষক দ্বার খুলিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া দিল।

পান্থ প্রদীপ আনিয়া দেখিলেন, মন্দিরমধ্যে শ্বেত-প্রস্তর-নির্ম্মিত শিবমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। সেই মূর্ত্তির পশ্চাদ্ভাগে দুইজন মাত্র কামিনী। যিনি নবীনা, তিনি দীপ দেখিবামাত্র সাবগুণ্ঠনে নম্রমুখী হইয়া বসিলেন। পরন্তু তাঁহার অনাবৃত প্রকোষ্ঠে হীরকমণ্ডিত চূড় এবং বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত পরিচ্ছদ. তদুপরি রত্নাভরণপারিপাট্য দেখিয়া পান্থ নিঃসন্দেহে জানিতে পারিলেন যে, এই নবীনা হীনবংশসম্ভূতা নহে। দ্বিতীয়া রমণীর পরিচ্ছদের অপেক্ষাকৃত হীনার্ঘতায় পথিক বিবেচনা করিলেন যে, ইনি নবীনার সহচারিণী দাসী হইবেন; অথচ সচরাচর দাসীর অপেক্ষা সম্পন্না। বয়ঃক্রম পঞ্চত্রিংশৎ বর্ষ বোধ হইল। সহজেই যুবা

পুরুষের উপলব্ধি হইল যে, বয়োজ্যেষ্ঠারই সহিত তাঁহার কথোপকথন হইতেছিল। তিনি সবিস্ময়ে ইহাও পর্য্যবেক্ষণ করিলেন যে, তদুভয় মধ্যে কাহারও পরিচ্ছদ এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় নহে, উভয়েই পশ্চিমদেশীয়, অর্থাৎ হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকের বেশধারিণী। যুবক মন্দিরাভ্যন্তরে উপযুক্ত স্থানে প্রদীপ স্থাপন করিয়া রমণীদিগের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তখন তাঁহার শরীরোপরি দীপরশ্মি-সমূহ প্রপতিত হইলে, রমণীরা দেখিলেন যে, পথিকের বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি বৎসরের কিঞ্চিন্মাত্র অধিক হইবে; শরীর এতাদৃশ দীর্ঘ যে অন্যের তাদৃশ দৈর্ঘ্য অসৌষ্ঠবের কারণ হইত। কিন্তু যুবকের বক্ষোবিশালতা এবং সর্ব্বাঙ্গের প্রচুরায়ত গঠনগুণে সে দৈর্ঘ্য অলৌকিক শ্রীসম্পাদক হইয়াছে। প্রাবৃটসম্ভূত নবদুর্ব্বাদলতুল্য, অথবা তদধিক মনোজ্ঞ কান্তি; বসন্তপ্রসূত নবপত্রাবলীতুল্য বর্ণোপরি কবচাদি রাজপুত জাতির পরিচ্ছদ শোভা করিতেছিল, কটিদেশে কটিবন্ধে কোষসম্বন্ধ অসি, দীর্ঘ করে দীর্ঘ বর্শা ছিল; মস্তকে উষ্ণীষ, তদুপরি একখণ্ড হীরক; কর্ণে মুক্তাসহিত কুণ্ডল; কণ্ঠে রত্নহার।

পরস্পর সন্দর্শনে উভয় পক্ষই পরস্পরের পরিচয়ের জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইলেন, কিন্তু কেহই প্রথমে পরিচয় জিজ্ঞাসার অভদ্রতা স্বীকার করিতে সহসা ইচ্ছুক হইলেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ আলাপ

প্রথমে যুবক নিজ কৌতূহলপরবশতা প্রকাশ করিলেন। বয়োজ্যেষ্ঠাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "অনুভবে বুঝিতেছি, আপনারা ভাগ্যবানের পুরস্ত্রী, পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে সঙ্কোচ হইতেছে; কিন্তু আমার পরিচয় দেওয়ার পক্ষে যে প্রতিবন্ধক, আপনাদের সে প্রতিবন্ধক না থাকিতে পারে, এজন্য জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিতেছি।"

জ্যেষ্ঠা কহিলেন, "স্ত্রীলোকের পরিচয়ই বা কি? যাহারা কুলোপাধি ধারণ করিতে পারে না, তাহারা কি বলিয়া পরিচয় দিবে? গোপনে বাস করা যাহাদিগের ধর্ম্ম, তাহারা কি বলিয়া আত্মপ্রকাশ করিবে ? যে দিন বিধাতা স্ত্রীলোককে স্বামীর নাম মুখে আনিতে নিষেধ করিয়াছেন, সেই দিন আত্মপরিচয়ের পথও বন্ধ করিয়াছেন।"

যুবক এ কথার উত্তর করিলেন না। তাঁহার মন অন্য দিকে ছিল। নবীনা রমণী ক্রমে ক্রমে অবগুণ্ঠনের কিয়দংশ অপসৃত করিয়া সহচরীর পশ্চাদ্ভাগ হইতে অনিমেষচক্ষুতে যুবকের প্রতি দৃষ্টি করিতেছিলেন। কথোপকথন মধ্যে অকস্মাৎ পথিকেরও সেই দিকে দৃষ্টিপাত হইল; আর দৃষ্টি ফিরিল না; তাঁহার বোধ হইল, যেন তাদৃশ অলৌকিক রূপরাশি আর কখন দেখিতে পাইবেন না। যুবতীর চক্ষুর্দ্বয়ের সহিত পথিকের চক্ষু সংমিলিত হইল। যুবতী অমনি লোচনযুগল বিনত করিলেন। সহচরী বাক্যের উত্তর না পাইয়া পথিকের মুখপানে চাহিলেন। কোন্ দিকে তাঁহার দৃষ্টি, তাহাও নিরীক্ষণ করিলেন, এবং সমভিব্যাহারিণী যে যুবক প্রতি সতৃষ্ণনয়নে চাহিতেছিলেন, তাহা জানিতে পারিয়া, নবীনার কানে কানে কহিলেন, "কি লো! শিবসাক্ষাৎ স্বয়ম্বরা হবি না কি?"

নবীনা, সহচরীকে অঙ্গুলিনিপীড়িত করিয়া তদ্রূপ মৃদুস্বরে কহিল, "তুমি নিপাত যাও।" চতুরা সহচারিণী এই দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন যে, যে লক্ষণ দেখিতেছি, পাছে এই অপরিচিত যুবা পুরুষের তেজঃপুঞ্জ কান্তি দেখিয়া আমার হস্তসমর্পিতা এই বালিকা মন্মথশরজালে বিদ্ধ হয়; তবে আর কিছু হউক না হউক, ইহার মনের সুখ চিরকালের জন্য নষ্ট হইবে, অতএব সে পথ এখনই রুদ্ধ করা আবশ্যক। কিরূপেই বা এ অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়? যদি ইঙ্গিতে বা ছলনাক্রমে যুবককে স্থানান্তরে প্রেরণ করিতে পারি, তবে তাহা কর্ত্তব্য বটে, এই ভাবিয়া নারী-স্বভাবসিদ্ধ চতুরতার সহিত কহিলেন, "মহাশয়! স্ত্রীলোকের সুনাম এমনই অপদার্থ বস্তু যে, বাতাসের ভর সহে না। আজিকার এ প্রবল ঝড়ে রক্ষা পাওয়া দুষ্কর, অতএব এক্ষণে ঝড় থামিয়াছে, দেখি যদি আমরা পদব্রজে বাটী

গমন করিতে পারি।”
যুবা পুরুষ উত্তর করিলেন, “যদি একান্ত এ নিশীথে আপনারা পদব্রজে যাইবেন, তবে আমি আপনাদিগকে রাখিয়া আসিতেছি। এক্ষণে আকাশ পরিষ্কার হইয়াছে, আমি এতক্ষণ নিজস্থানে যাত্রা করিতাম, কিন্তু আপনার সখীর সদৃশ রূপসীকে বিনা রক্ষকে রাখিয়া যাইব না বলিয়াই এখন এ স্থানে আছি।”
কামিনী উত্তর করিল, “আপনি আমাদিগের প্রতি যেরূপ দয়া প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে পাছে আমাদিগকে অকৃতজ্ঞ মনে করেন, এজন্যই সকল কথা ব্যক্ত করিয়া বলিতে পারিতেছি না। মহাশয়! স্ত্রীলোকের মন্দ কপালের কথা আপনার সাক্ষাতে আর কি বলিব। আমরা সহজে অবিশ্বাসিনী; আপনি আমাদিগকে রাখিয়া আসিলে আমাদিগের সৌভাগ্য, কিন্তু যখন আমার প্রভু—এই কন্যার পিতা—ইহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তুমি এ রাত্রে কাহার সঙ্গে আসিয়াছ, তখন ইনি কি উত্তর করিবেন ?”
যুবক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, “এই উত্তর করিবেন যে, আমি মহারাজ মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহের সঙ্গে আসিয়াছি।”
যদি তন্মুহূর্ত্তে মন্দিরমধ্যে বজ্রপতন হইত, তাহা হইলেও মন্দিরবাসিনী স্ত্রীলোকেরা অধিকতর চমকিত হইয়া উঠিতেন না। উভয়েই অমনি গাত্রোত্থান করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। কনিষ্ঠা শিবলিঙ্গের পশ্চাতে সরিয়া গেলেন। বাগ্‌বিদগ্ধা বয়োধিকা গলদেশে অঞ্চল দিয়া দণ্ডবৎ হইলেন; অঞ্জলিবদ্ধকরে কহিলেন, “যুবরাজ! না জানিয়া সহস্র অপরাধ করিয়াছি, অবোধ স্ত্রীলোকদিগকে নিজগুণে মার্জ্জনা করিবেন।”
যুবরাজ হাসিয়া কহিলেন, “এ সকল গুরুতর অপরাধের ক্ষমা নাই। তবে ক্ষমা করি, যদি পরিচয় দাও, পরিচয় না দিলে অবশ্য সমুচিত দণ্ড দিব।”
নরম কথায় রসিকার সকল সময়েই সাহস হয়; রমণী ঈষৎ হাসিয়া কহিল, “কি দণ্ড, আজ্ঞা হউক, স্বীকৃত আছি।”
জগৎসিংহ হাসিয়া কহিলেন, “সঙ্গে গিয়া তোমাদের বাটী রাখিয়া আসিব।”
সহচরী দেখিলেন, বিষম সঙ্কট। কোন বিশেষ কারণে তিনি নবীনার পরিচয় দিল্লীশ্বরের সেনাপতির নিকট দিতে সম্মতা ছিলেন না; তিনি যে তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া রাখিয়া আসিবেন, ইহাতে আরও ক্ষতি, সে ত পরিচয়ের অধিক; অতএব সহচরী অধোবদনে রহিলেন।
এমন সময়ে মন্দিরের অনতিদূরে বহুতর অশ্বের পদধ্বনি হইল; রাজপুত্র অতি ব্যস্ত হইয়া মন্দিরের বাহিরে যাইয়া দেখিলেন যে, প্রায় শত অশ্বারোহী সৈন্য যাইতেছে। তাহাদিগের পরিচ্ছদ দৃষ্টিমাত্র জানিতে পারিলেন যে, তাহারা তাঁহারই রাজপুত সেনা। ইতিপূর্ব্বে যুবরাজ যুদ্ধসম্বন্ধীয় কার্য্য সম্পাদনে বিষ্ণুপুর অঞ্চলে যাইয়া, ত্বরিত একশত অশ্বারোহী সেনা লইয়া পিতৃসমক্ষে যাইতেছিলেন। অপরাহ্নে সমভিব্যাহারিগণের অগ্রসর হইয়া আসিয়াছেন; পশ্চাৎ তাহারা এক পথে, তিনি অন্য পথে যাওয়াতে, তিনি একাকী প্রান্তরমধ্যে ঝটিকা বৃষ্টিতে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাহাদিগকে পুনর্ব্বার দেখিতে পাইলেন, এবং সেনাগণ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছে কি না, জানিবার জন্য কহিলেন, “দিল্লীশ্বরের জয় হউক।” এই কথা কহিবামাত্র একজন অশ্বারোহী তাঁহার নিকট আসিল। যুবরাজ তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, “ধরমসিংহ, আমি ঝড় বৃষ্টির কারণে এখানে অপেক্ষা করিতেছিলাম।”
ধরমসিংহ নতভাবে প্রণাম করিয়া কহিল, “আমরা যুবরাজের বহু অনুসন্ধান করিয়া এখানে আসিয়াছি, অশ্বকে এই বটবৃক্ষের নিকটে পাইয়া আনিয়াছি।”
জগৎসিংহ বলিলেন, “অশ্ব লইয়া তুমি এইখানে অপেক্ষা কর, আর দুইজনকে নিকটস্থ কোন গ্রাম হইতে শিবিকা ও তদুপযুক্ত বাহক আনিতে পাঠাও, অবশিষ্ট সেনাগণকে অগ্রসর হইতে বল।”
ধরমসিংহ এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইল, কিন্তু প্রভুর আজ্ঞায় প্রশ্ন অনাবশ্যক জানিয়া, যে আজ্ঞা বলিয়া সৈন্যদিগকে যুবরাজের অভিপ্রায় জানাইল। সৈন্যমধ্যে কেহ কেহ শিবিকার বার্ত্তা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া অপরকে কহিল,, “আজ যে বড় নূতন পদ্ধতি।” কেহ বা উত্তর করিল, “না হবে কেন?

মহারাজ রাজপুতপতির শত শত মহিষী।”
এদিকে যুবরাজের অনুপস্থিতিকালে অবসর পাইয়া অবগুণ্ঠন মোচনপূর্ব্বক সুন্দরী সহচরীকে কহিল, “বিমল, রাজপুত্রকে পরিচয় দিতে তুমি অসম্মত কেন ?”
বিমলা কহিল, “সে কথার উত্তর আমি তোমার পিতার কাছে দিব; এক্ষণে আবার এ কিসের গোলযোগ শুনিতে পাই ?”
নবীনা কহিল, “বোধ করি, রাজপুত্রের কোন সৈন্যাদি তাঁহার অনুসন্ধানে আসিয়া থাকিবে; যেখানে স্বয়ং যুবরাজ রহিয়াছেন, সেখানে চিন্তা কর কেন ?
যে অশ্বারোহিগণ শিবিকাবাহকাদির অন্বেষণে গমন করিয়াছিল, তাহারা প্রত্যাগমন করিবার পূর্ব্বেই, যে বাহক ও রক্ষিবর্গ স্ত্রীদিগকে রাখিয়া বৃষ্টির সময়ে গ্রামমধ্যে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল, তাহারা ফিরিয়া আসিল। দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিয়া জগৎসিংহ মন্দিরমধ্যে পুনঃপ্রবেশপূর্ব্বক পরিচারিকাকে কহিলেন, “কয়েকজন অস্ত্রধারী ব্যক্তির সহিত বাহকগণ শিবিকা লইয়া আসিতেছে, উহারা তোমাদিগের লোক কি না, বাহিরে আসিয়া দেখ।” বিমলা মন্দিরদ্বারে দাঁড়াইয়া দেখিল যে, তাহারা তাহাদিগের রক্ষিগণ বটে।
রাজকুমার কহিলেন, “তবে আমি আর এখানে দাঁড়াইব না; আমার সহিত ইহাদিগের সাক্ষাতে অনিষ্ট ঘটিতে পারে। অতএব আমি চলিলাম। শৈলেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি, তোমরা নির্ব্বিঘ্নে বাটী উপনীত হও; তোমাদিগের নিকট এই প্রার্থনা করি যে, আমার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এ কথা সপ্তাহমধ্যে প্রকাশ করিও না; বিস্মৃত হইও না, বরং স্মরণার্থ এই সামান্য বস্তু নিকটে রাখ। আর আমি তোমার প্রভুকন্যার যে পরিচয় পাইলাম না, এই কথাই আমার হৃদয়ে স্মরণার্থ চিহ্নস্বরূপ রহিল।” এই বলিয়া উষ্ণীষ হইতে মুক্তাহার লইয়া বিমলার মস্তকে স্থাপন করিলেন। বিমলা মহার্ঘ রত্নহার কেশপাশে ধরিয়া রাজকুমারকে বিনীতভাবে প্রণাম করিয়া কহিল, “যুবরাজ, আমি যে পরিচয় দিলাম না, ইহাতে আমাকে অপরাধিনী ভাবিবেন না, ইহার অবশ্য উপযুক্ত কারণ আছে। যদি আপনি এ বিষয়ে নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া থাকেন, তবে অদ্য হইতে পক্ষান্তরে আপনার সহিত কোথায় সাক্ষাৎ হইতে পারিবে, বলিয়া দিন।”
জগৎসিংহ কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, “অদ্য হইতে পক্ষান্তরে রাত্রিকালে এই মন্দির মধ্যেই আমার সাক্ষাৎ পাইবে। এই স্থলে দেখা না পাও—সাক্ষাৎ হইল না।”
“দেবতা আপনাকে রক্ষা করুন” বলিয়া বিমলা পুনর্ব্বার প্রণতা হইল। রাজকুমার পুনর্ব্বার অনিবার্য্য তৃষ্ণাকাতর লোচনে যুবতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, লম্ফ দিয়া অশ্বারোহণপূর্ব্বক চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ মোগল পাঠান

নিশীথকালে জগৎসিংহ শৈলেশ্বরের মন্দির হইতে যাত্রা করিলেন। আপাততঃ তাঁহার অনুগমনে অথবা মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী মনোমোহিনীর সংবাদ কথনে পাঠক মহাশয়দিগের কৌতূহল নিবারণ করিতে পারিলাম না। জগৎসিংহ রাজপুত, কি প্রয়োজনে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন, কেনই বা প্রান্তরমধ্যে একাকী গমন করিতেছিলেন, তৎপরিচয় উপলক্ষে এই সময়ের বঙ্গদেশ সম্বন্ধীয় রাজকীয় ঘটনা কতক কতক সংক্ষেপে বিবৃত করিতে হইল। অতএব এই পরিচ্ছেদ ইতিবৃত্তসম্পর্কীয়। পাঠকবর্গ একান্ত অধীর হইলে ইহা ত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু গ্রন্থকারের পরামর্শ এই যে, অধৈর্য্য ভাল নহে।
প্রথমে বঙ্গদেশে বখ্‌তিয়ার খিলিজি মহম্মদীয় জয়ধ্বজা সংস্থাপিত করিলে পর, মুসলমানেরা অবাধে কয়েক শতাব্দী তদ্রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। ৯৭২ হেঃ অব্দে সুবিখ্যাত সুলতান বাবর, রণক্ষেত্রে দিল্লীর বাদশাহ ইব্রাহিম লোদীকে পরাভূত করিয়া, তৎসিংহাসনে আরোহণ করেন; কিন্তু তৎকালেই বঙ্গদেশ

তৈমুরলঙ্গবংশীয়দিগের দণ্ডাধীন হয় নাই।
যতদিন না মোগল সম্রাট্‌দিগের কুলতিলক আক্‌বরের অভ্যুদয় হয়, ততদিন এ দেশে স্বাধীন পাঠান রাজগণ রাজত্ব করিতেছিলেন। কুক্ষণে নির্ব্বোধ দাউদ খাঁ সুপ্ত সিংহের অঙ্গে হস্তক্ষেপণ করিলেন; আত্মকর্ম্মফলে আক্‌বরের সেনাপতি মনাইম খাঁ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া রাজ্যভ্রষ্ট হইলেন। দাউদ ৯৮২ হেঃ অব্দে সগণে উড়িষ্যায় পলায়ন করিলেন; বঙ্গরাজ্য মোগল ভূপালের কর-কবলিত হইল। পাঠানেরা উৎকলে সংস্থাপিত হইলে, তথা হইতে তাহাদিগের উচ্ছেদ করা মোগলদিগের কষ্টসাধ্য হইল। ৯৮৬ অব্দে দিল্লীশ্বরের প্রতিনিধি খাঁ জাঁহা খাঁ পাঠানদিগকে দ্বিতীয় বার পরাজিত করিয়া উৎকল দেশ নিজ প্রভুর দণ্ডাধীন করিলেন। ইহার পর আর এক দারুণ উপদ্রব উপস্থিত হইয়াছিল। আকবর শাহ কর্ত্তৃক বঙ্গদেশের রাজকর আদায়ের যে নূতন প্রণালী সংস্থাপিত হইল, তাহাতে জায়গীরদার প্রভৃতি ভূম্যধিকারিগণের গুরুতর অসন্তুষ্টি জন্মিল। তাঁহারা নিজ নিজ পূর্ব্বাধিপত্য রক্ষার্থ খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন। অতি দুর্দ্দম্য রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হওয়াতে, সময় পাইয়া উড়িষ্যার পাঠানেরা পুনর্ব্বার মস্তক উন্নত করিল ও কতলু খাঁ নামক এক পাঠানকে আধিপত্যে বরণ করিয়া পুনরপি উড়িষ্যা স্বকরগ্রস্ত করিল। মেদিনীপুরও তাহাদের অধিকারভূক্ত হইল।
কর্ম্মঠ রাজপ্রতিনিধি খাঁ আজিম, তৎপরে শাহবাজ খাঁ, কেহই শত্রুবিজিত দেশ পুনরুদ্ধার করিতে পারিলেন না। পরিশেষে এই আয়াসসাধ্য কার্য্যোদ্ধার জন্য একজন হিন্দু যোদ্ধা প্রেরিত হইলেন।
মহামতি আক্‌বর তাঁহার পূর্ব্বগামী সম্রাট্‌দিগের হইতে সর্ব্বাংশে বিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে বিশেষ প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে, এতদ্দেশীয় রাজকার্য্য সম্পাদনে এতদ্দেশীয় লোকই বিশেষ পটু—বিদেশীয়েরা তাদৃশ নহে; আর যুদ্ধে বা রাজ্যশাসনে রাজপুতগণ দক্ষাগ্রগণ্য। অতএব তিনি সর্ব্বদা এতদ্দেশীয়, বিশেষতঃ রাজপুতগণকে গুরুতর রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতেন।
আখ্যায়িকাবর্ণিত কালে যে সকল রাজপুত উচ্চপদাভিষিক্ত ছিলেন, তন্মধ্যে মানসিংহ একজন প্রধান। তিনি স্বয়ং আক্‌বরের পুত্র সেলিমের শ্যালক। আজিম খাঁ ও শাহবাজ খাঁ উৎকলজয়ে অক্ষম হইলে, আক্‌বর এই মহাত্মাকে বঙ্গ ও বেহারের শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইলেন।
৯৯৬ সালে মানসিংহ পাটনা নগরীতে উপনীত হইয়া প্রথমে অপরাপর উপদ্রবের শান্তি করিলেন। পরবৎসরে উৎকলবিজিগীষু হইয়া তদভিমুখে যাত্রা করিলেন। মানসিংহ প্রথমে পাটনায় উপস্থিত হইলে পর, নিজে তন্নগরীতে অবস্থিতি করিবার অভিপ্রায় করিয়া বঙ্গপ্রদেশ শাসন জন্য সৈদ খাঁকে নিজ প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন। সৈদ খাঁ এই ভারপ্রাপ্ত হইয়া বঙ্গদেশের তৎকালিন রাজধানী তণ্ডা নগরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এক্ষণে রণাশায় যাত্রা করিয়া মানসিংহ প্রতিনিধিকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। সৈদ খাঁকে লিখিলেন যে, তিনি বর্দ্ধমানে তাঁহার সহিত সসৈন্য মিলিত হইতে চাহেন।
বর্দ্ধমানে উপনীত হইয়া রাজা দেখিলেন যে, সৈদ খাঁ আসেন নাই, কেবলমাত্র দূত দ্বারা এই সংবাদ পাঠাইয়াছেন যে, সৈন্যাদি সংগ্রহ করিতে তাঁহার বিস্তর বিলম্ব সম্ভাবনা, এমন কি, তাঁহার সৈন্যসজ্জা করিয়া যাইতে বর্ষাকাল উপস্থিত হইবে; অতএব রাজা মানসিংহ আপাততঃ বর্ষা শেষ পর্য্যন্ত শিবির সংস্থাপন করিয়া থাকিলে তিনি বর্ষাপ্রভাতে সেনা সমভিব্যাহারে রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইবেন। রাজা মানসিংহ অগত্যা তৎপরামর্শানুবর্ত্তী হইয়া দারুকেশ্বরতীরে শিবির সংস্থাপিত করিলেন। তথায় সৈদ খাঁর প্রতীক্ষায় রহিলেন।
তথায় অবস্থিতিকালে লোকমুখে রাজা সংবাদ পাইলেন যে, কতলু খাঁ তাঁহার আলস্য দেখিয়া সাহসিক হইয়াছে, সেই সাহসে মান্দারণের অনতিদূর মধ্যে সসৈন্যে আসিয়া দেশ লুঠ করিতেছে। রাজা উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া, শত্রুবল কোথায়, কি অভিপ্রায়ে আসিয়াছে, কি করিতেছে, এই সকল সংবাদ নিশ্চয় জানিবার জন্য তাঁহার একজন প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষকে প্রেরণ করা উচিত বিবেচনা করিলেন। মানসিংহের সহিত তাঁহার প্রিয়তম পুত্র জগৎসিংহ যুদ্ধে আসিয়াছিলেন। জগৎসিংহ এই

দুঃসাহসিক কার্য্যের ভার লইতে সোৎসুক জানিয়া, রাজা তাঁহাকেই শতেক অশ্বারোহী সেনা সমভিব্যাহারে শত্রু শিবিরোদ্দেশে প্রেরণ করিলেন। রাজকুমার কার্য্য সিদ্ধ করিয়া, অচিরাৎ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। যৎকালে কার্য্য সমাধা করিয়া শিবিরে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তখন প্রান্তরমধ্যে পাঠক মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ নবীন সেনাপতি

শৈলেশ্বর-মন্দির হইতে যাত্রা করিয়া জগৎসিংহ পিতৃশিবিরে উপস্থিত হইলে পর, মহারাজ মানসিংহ পুত্রপ্রমুখাৎ অবগত হইলেন যে, প্রায় পঞ্চাশৎ সহস্র পাঠান সেনা ধরপুর গ্রামের নিকট শিবির সংস্থাপন করিয়া নিকটস্থ গ্রামসকল লুঠ করিতেছে, এবং স্থানে স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ বা অধিকার করিয়া তদাশ্রয়ে এক প্রকার নির্ব্বিঘ্নে আছে। মানসিংহ দেখিলেন যে, পাঠানদিগের দুবৃত্তির আশু দমন নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে, কিন্তু এই কার্য্য অতি দুঃসাধ্য। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরুপণ জন্য সমভিব্যাহারী সেনাপতিগণকে একত্র করিয়া এই সকল বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন এবং কহিলেন, “দিনে দিনে গ্রাম গ্রাম, পরগণা পরগণা দিলীশ্বরের হস্তস্খলিত হইতেছে, এক্ষণে পাঠানদিগকে শাসিত না করিলেই নয়, কিন্তু কি প্রকারেই বা তাহাদিগের শাসন হয় ? তাহারা আমাদিগের অপেক্ষা সংখ্যায় বলবান্; তাহাতে আবার দুর্গশ্রেণীর আশ্রয়ে থাকিয়া যুদ্ধ করিবে; যুদ্ধে পরাজিত করিলেও তাহাদিগকে বিনষ্ট বা স্থানচ্যুত করিতে পারিব না; সহজেই দুর্গমধ্যে নিরাপদ্ হইতে পারিবে। কিন্তু সকলে বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি রণে আমাদিগকে বিজিত হইতে হয়, তবে শত্রুর অধিকারমধ্যে নিরাশ্রয়ে একেবারে বিনষ্ট হইতে হইবে। এরূপ অন্যায় সাহসে ভর করিয়া দিল্লীশ্বরের এত অধিক সেনানাশের সম্ভাবনা জন্মান, এবং উড়িষ্যাজয়ের আশা একেবারে লোপ করা, আমার বিবেচনায় অনুচিত হইতেছে; সৈদ খাঁর প্রতীক্ষা করাই উচিত হইতেছে; অথচ বৈরিশাসনের আশু কোন উপায় করাও আবশ্যক হইতেছে। তোমরা কি পরামর্শ দাও?

বৃদ্ধ সেনাপতিগণ সকলে একমত হইয়া এই পরামর্শ স্থির করিলেন যে, আপাততঃ সৈদ খাঁর প্রতীক্ষায় থাকাই কর্ত্তব্য। রাজা মানসিংহ কহিলেন, “আমি অভিপ্রায় করিতেছি যে, সমুদায় সৈন্যনাশের সম্ভাবনা না রাখিয়া কেবল অল্পসংখ্যক সেনা কোন দক্ষ সেনাপতির সহিত শত্রুসমক্ষে প্রেরণ করি।”

একজন প্রাচীন মোগল সৈনিক কহিলেন, “মহারাজ! যথা তাবৎ সেনা পাঠাইতেও আশঙ্কা, তথা অল্পসংখ্যক সেনার দ্বারা কোন্ কার্য্য সাধন হইবে ?”

মানসিংহ কহিলেন, “অল্প সেনা সম্মুখ রণে অগ্রসর হইতে পাঠাইতে চাহিতেছি না। ক্ষুদ্র বল অস্পষ্ট থাকিয়া গ্রামপীড়নাসক্ত পাঠানদিগের সামান্য দলসকল কতক দমনে রাখিতে পারিবে।”

তখন মোগল কহিল, “মহারাজ! নিশ্চিত কালগ্রাসে কোন্ সেনাপতি যাইবে ?”

মানসিংহ ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিলেন, “কি! এত রাজপুত ও মোগল মধ্যে মৃত্যুকে ভয় করে না, এমন কি কেহই নাই ?”

এই কথা শ্রুতিমাত্র পাঁচ-সাত জন মোগল ও রাজপুত গাত্রোত্থান করিয়া কহিল, “মহারাজ ! দাসেরা যাইতে প্রস্তুত আছে।” জগৎসিংহও তথায় উপস্থিত ছিলেন; তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ; সকলের পশ্চাতে থাকিয়া কহিলেন, “অনুমতি হইলে এ দাসও দিল্লীশ্বরের কার্যসাধনে যত্ন করে।”

রাজা মানসিংহ সস্মিতবদনে কহিলেন, “না হবে কেন ? আজ জানিলাম যে, মোগল রাজপুত নাম লোপের বিলম্ব আছে। তোমরা সকলেই এ দুষ্কর কার্য্যে প্রস্তুত, এখন কাহাকে রাখিয়া কাহাকে পাঠাই ?”

একজন পারিষদ সহাস্যে কহিল, “মহারাজ! অনেকে যে, এ কার্য্যে উদ্যত হইয়াছেন, সে ভালই হইয়াছে। এই উপলক্ষে সেনাব্যয়ের অল্পতা করিতে পারিবেন।

যিনি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র সেনা লইয়া যাইতে স্বীকৃত হয়েন, তাঁহাকেই রাজকার্য্য সাধনের ভার দিউন।"
রাজা কহিলেন, "এ উত্তম পরামর্শ।" পরে প্রথম উদ্যমকারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কত সংখ্যক সেনা লইয়া যাইতে ইচ্ছা কর ?" সেনাপতি কহিলেন, "পঞ্চদশ সহস্র পদাতিবলে রাজকার্য্য উদ্ধার করিব।"
রাজা কহিলেন, "এ শিবির হইতে পঞ্চদশ সহস্র ভগ্ন করিলে অধিক থাকে না। কোন্ বীর দশ সহস্র লইয়া যুদ্ধে যাত্রা করিতে চাহে ?"
সেনাপতিগণ নীরব হইয়া রহিলেন। পরিশেষে রাজার প্রিয়পাত্র যশোবন্তসিংহ নামক রাজপুত যোদ্ধা রাজাদেশ পালন করিতে অনুমতি প্রার্থিত হইলেন। রাজা হৃষ্টচিত্তে সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। কুমার জগৎসিংহ তাঁহার দৃষ্টির অভিলাষী হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, তৎপ্রতি রাজার দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র তিনি বিনীতভাবে কহিলেন, "মহারাজ! রাজপ্রসাদ হইলে এ দাস পঞ্চ সহস্র সহায়ে কতলু খাঁকে সুবর্ণরেখাপারে রাখিয়া আইসে!"
রাজা মানসিংহ অবাক্ হইলেন। সেনাপতিগণ কানাকানি করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পরে রাজা কহিলেন, "পুত্র! আমি জানি যে, তুমি রাজপুতকুলের গরিমা; কিন্তু তুমি অন্যায় সাহস করিতেছ!"
জগৎসিংহ বদ্ধাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, "যদি প্রতিজ্ঞাপালন না করিয়া বাদশাহের সেনাবল অপচয় করি, তবে রাজদণ্ডে দণ্ডনীয় হইব।"
রাজা মানসিংহ কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আমি তোমার রাজপুতকুলধর্ম্ম প্রতিপালনের ব্যাঘাত করিব না; তুমিই এ কার্য্যে যাত্রা কর।"
এই বলিয়া রাজকুমারকে বাষ্পাকুললোচনে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বিদায় করিলেন। সেনাপতিগণ স্ব স্ব শিবিরে গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ গড় মান্দারণ

যে পথে বিষ্ণুপুর প্রদেশ হইতে জগৎসিংহ জাহানাবাদে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, সেই পথের চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। তাঁহার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে মান্দারণ গ্রাম। মান্দারণ এক্ষণে ক্ষুদ্র গ্রাম, কিন্তু তৎকালে ইহা সৌষ্ঠবশালী নগর ছিল। যে রমণীদিগের সহিত জগৎসিংহের মন্দির-মধ্যে সাক্ষাৎ হয়, তাঁহারা মন্দির হইতে যাত্রা করিয়া এই গ্রামাভিমুখে গমন করেন।
গড় মান্দারণে কয়েকটি প্রাচীন দুর্গ ছিল, এই জন্যই তাহার নাম গড় মান্দারণ হইয়া থাকিবে। নগরমধ্যে আমোদর নদী প্রবাহিত; এক স্থানে নদীর গতি এতাদৃশ বক্রতা প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, তদ্দারা পার্শ্বস্থ এক খণ্ড ত্রিকোণ ভূমির দুই দিক্ বেষ্টিত হইয়াছিল; তৃতীয় দিকে মানবহস্তনিখাত এক গড় ছিল; এই ত্রিকোণ ভূমিখণ্ডের অগ্রদেশে যথায় নদীর বক্রগতি আরম্ভ হইয়াছে, তথায় এক বৃহৎ দুর্গ জল হইতে আকাশপথে উত্থান করিয়া বিরাজমান ছিল। অট্টালিকা আমূলশিরঃপর্য্যন্ত কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত; দুই দিকে প্রবল নদীপ্রবাহ দুর্গমূল প্রহত করিত। অদ্যাপি পর্য্যটক গড় মান্দারণ গ্রামে এই আয়াসলজ্ঘ্য দুর্গের বিশাল স্তূপ দেখিতে পাইবেন; দুর্গের নিম্নভাগমাত্র এক্ষণে বর্ত্তমান আছে, অট্টালিকা কালের করাল স্পর্শে ধূলিরাশি হইয়া গিয়াছে; তদুপরি তিন্তিড়ী, মাধবী প্রভৃতি বৃক্ষ ও লতাসকল কাননাকারে বহুতর ভুজঙ্গ ভল্লুকাদি হিংস্র পশুগণকে আশ্রয় দিতেছে। নদীপারে অপর কয়েকটা দুর্গ ছিল।
বাঙ্গালার পাঠান সম্রাট্‌দিগের শিরোভূষণ হোসেন শাহার বিখ্যাত সেনাপতি ইস্‌মাইল গাজি এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু কালক্রমে জয়ধরসিংহ নামে একজন হিন্দু সৈনিক ইহা জায়গীর পান। এক্ষণে বীরেন্দ্রসিংহনামা জয়ধরসিংহের একজন উত্তরপুরুষ এখানে বসতি করিতেন।
যৌবনকালে বীরেন্দ্রসিংহের পিতার সহিত সম্প্রীতি ছিল না। বীরেন্দ্রসিংহ স্বভাবতঃ দাম্ভিক এবং অধীর ছিলেন, পিতার আদেশ কদাচিৎ প্রতিপালন করিতেন,

এজন্য পিতাপুত্রে সর্ব্বদা বিবাদ বচসা হইত। পুত্রের বিবাহার্থ বৃদ্ধ ভূস্বামী নিকটস্থ স্বজাতীয় অপর কোন ভূস্বামিকন্যার সহিত সম্বন্ধ স্থির করিলেন। কন্যার পিতা পুত্রহীন, এজন্য এই বিবাহে বীরেন্দ্রের সম্পত্তিবৃদ্ধির সম্ভাবনা; কন্যাও সুন্দরী বটে, সুতরাং এমত সম্বন্ধ বৃদ্ধের বিবেচনায় অতি আদরণীয় বোধ হইল: তিনি বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বীরেন্দ্র সে সম্বন্ধে আদর না করিয়া নিজ পল্লীস্থ এক পতিপুত্রহীনা দরিদ্রা রমণীর দুহিতাকে গোপনে বিবাহ করিয়া আবার বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। বৃদ্ধ রোষপরবশ হইয়া পুত্রকে গৃহ-বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন; যুবা পিতৃগৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া যোদ্ধৃবৃত্তি অবলম্বন করণাশায় দিল্লী যাত্রা করিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী তৎকালে অন্তঃসত্ত্বা, এজন্য তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতে পারিলেন না। তিনি মাতৃকুটীরে রহিলেন।

এদিকে পুত্র দেশান্তর যাইলে পর বৃদ্ধ ভূস্বামীর অন্তঃকরণে পুত্র-বিচ্ছেদে মনঃপীড়ার সঞ্চার হইতে লাগিল; গতানুশোচনার পরবশ হইয়া পুত্রের সংবাদ আনয়নে যত্নবান্ হইলেন; কিন্তু যত্নে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। পুত্রকে পুনরায়ন করিতে না পারিয়া তৎপরিবর্ত্তে পুত্রবধুকে দরিদ্রার গৃহ হইতে সাদরে নিজালয়ে আনিলেন। উপযুক্ত কালে বীরেন্দ্রসিংহের পত্নী এক কন্যা প্রসব করিলেন। কিছু দিন পরে কন্যার প্রসূতির পরলোক প্রাপ্তি হইল।

বীরেন্দ্র দিল্লীতে উপনীত হইয়া মোগল সম্রাটের আজ্ঞাকারী রাজপুতসেনা -মধ্যে যোদ্ধৃত্বে বৃত হইলেন; অল্পকালে নিজগুণে উচ্চপদস্থ হইতে পারিলেন। বীরেন্দ্রসিংহ কয়েক বৎসরে ধন ও যশ সঞ্চার করিয়া পিতার লোকান্তরসংবাদ পাইলেন। আর এক্ষণে বিদেশ পর্য্যটন বা পরাধীনবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। বীরেন্দ্রের সহিত দিল্লী হইতে অনেকানেক সহচর আসিয়াছিল। তন্মধ্যে জনৈক পরিচারিকা আর এক পরমহংস ছিলেন। এই আখ্যায়িকার এই দুই জনের পরিচয় আবশ্যক হইবেক। পরিচারিকার নাম বিমলা, পরমহংসের নাম অভিরাম স্বামী।

বিমলা গৃহমধ্যে গৃহকর্ম্মে বিশেষতঃ বীরেন্দ্রের কন্যার লালনপালন ও রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত থাকিতেন, তদ্ব্যতীত দুর্গমধ্যে বিমলার অবস্থিতি করার অন্য কারণ লক্ষিত হইত না, সুতরাং তাঁহাকে দাসী বলিতে বাধ্য হইয়াছি; কিন্তু বিমলাতে দাসীর লক্ষণ কিছুই ছিল না। গৃহিণী যাদৃশী মান্যা, বিমলা পৌরগণের নিকটে প্রায় তাদৃশী মান্যা ছিলেন; পৌর-জন সকলেই তাঁহার বাধ্য ছিল। মুখশ্রী দেখিলে বোধ হইত যে, বিমলা যৌবনে পরমা সুন্দরী ছিলেন। প্রভাতে চন্দ্রাস্তের ন্যায় সে রূপের প্রতিভা এ বয়সেও ছিল। গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ নামে অভিরাম স্বামীর একজন শিষ্য ছিলেন, তাঁহার অলঙ্কারশাস্ত্রে যত ব্যুৎপত্তি থাকুক বা না থাকুক, রসিকতা প্রকাশ করার তৃষ্ণাটা বড় প্রবল ছিল। তিনি বিমলাকে দেখিয়া বলিতেন, "'দাই যেন ভাণ্ডস্থ ঘৃত; মদন-আগুন যত শীতল হইতেছে, দেহখানি ততই জমাট বাঁধিতেছে।" এইখানে বলা উচিত, যে দিন গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ এইরূপ রসিকতা করিয়া ফেলিলেন, সেই দিন অবধি বিমলা তাঁহার নাম রাখিলেন—"রসিকরাজ রসোপাধ্যায়"।

আকারেঙ্গিত ব্যতীত বিমলার সভ্যতা ও বাগ্‌বৈদগ্ধ এমন প্রসিদ্ধ ছিল যে, তাহা সামান্যা পরিচারিকার সম্ভবে না। অনেকে এরূপ বলিতেন যে, বিমলা বহুকাল মোগল সম্রাটের পুরবাসিনী ছিলেন। এ কথা সত্য, কি মিথ্যা, তাহা বিমলাই জানিতেন, কিন্তু কখন সে বিষয়ের কোন প্রসঙ্গ করিতেন না।

বিমলা বিধবা, কি সধবা ? কে জানে ? তিনি অলঙ্কার পরিতেন, একাদশী করিতেন না। সধবার ন্যায় সকল আচরণ করিতেন।

দুর্গেশনন্দিনী তিলোত্তমাকে বিমলা যে আন্তরিক স্নেহ করিতেন, তাহার পরিচয় মন্দিরমধ্যে দেওয়া গিয়াছে। তিলোত্তমাও বিমলার তদ্রূপ অনুরাগিণী ছিলেন। বীরেন্দ্রসিংহের অপর সমভিব্যাহারী অভিরাম স্বামী সর্ব্বদা দুর্গমধ্যে থাকিতেন না। মধ্যে মধ্যে দেশপর্য্যটনে গমন করিতেন। দুই এক মাস গড় মান্দারণে, দুই এক মাস বিদেশ পরিভ্রমণে যাপন করিতেন। পুরবাসী ও অপরাপর লোকের এইরূপ প্রতীতি ছিল যে, অভিরাম স্বামী বীরেন্দ্রসিংহের দীক্ষাগুরু; বীরেন্দ্রসিংহ তাঁহাকে যেরূপ সম্মান এবং আদর করিতেন, তাহাতে সেইরূপই সম্ভাবনা। এমন কি, সাংসারিক যাবতীয় কার্য্য অভিরাম স্বামীর পরামর্শ ব্যতীত করিতেন না ও গুরুদত্ত পরামর্শও প্রায় সতত সফল হইত। বস্তুতঃ অভিরাম স্বামী বহুদর্শী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্না ছিলেন; আরও নিজ ব্রতধর্ম্মে, সাংসারিক অধিকাংশ বিষয়ে রিপু

সংযত করা অভ্যাস করিয়াছিলেন; প্রয়োজন মতে রাগক্ষোভাদি দমন করিয়া স্থির চিত্তে বিষয়ালোচনা করিতে পারিতেন। সে স্থলে যে অধীর দাম্ভিক বীরেন্দ্রসিংহের অভিসন্ধি অপেক্ষা তাঁহার পরামর্শ ফলপ্রদ হইবে, আশ্চর্য্য কি ?
বিমলা ও অভিরাম স্বামী ভিন্ন আশমানি নাম্নী একজন দাসী বীরেন্দ্রসিংহের সঙ্গে আসিয়াছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ অভিরাম স্বামীর মন্ত্রণা

তিলোত্তমা ও বিমলা শৈলেশ্বরের মন্দির হইতে নির্ব্বিঘ্নে দুর্গে প্রত্যাগমন করিলেন। প্রত্যাগমনের তিন চারি দিবস পরে বীরেন্দ্রসিংহ নিজ দেওয়ানখানায় মসনদে বসিয়া আছেন, এমন সময় অভিরাম স্বামী তথায় উপস্থিত হইলেন। বীরেন্দ্রসিংহ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক দণ্ডবৎ হইলেন; অভিরাম স্বামী বীরেন্দ্রের হস্তদত্ত কুশাসনোপরি উপবিষ্ট হইলেন, অনুমতিক্রমে বীরেন্দ্র পুনরুপবেশন করিলেন। অভিরাম স্বামী কহিলেন, “বীরেন্দ্র! অদ্য তোমার সহিত কোন বিশেষ কথা আছে।”
বীরেন্দ্রসিংহ কহিলেন, “আজ্ঞা করুন।”
অভিরাম স্বামী কহিলেন, “এক্ষণে মোগল পাঠানের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত।”
বী। হাঁ; কোন বিশেষ গুরুতর ঘটনা উপস্থিত হওয়াই সম্ভব।
অ। সম্ভব-এক্ষণে কি কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছ ?
বীরেন্দ্র সদর্পে উত্তর করিলেন, “শত্রু উপস্থিত হইলে ‘বাহুবলে পরাঙ্মুখ করিব।”
পরমহংস অধিকতর মৃদুভাবে কহিলেন, “বীরেন্দ্র! এ তোমার তুল্য বীরের উপযুক্ত প্রত্যুত্তর; কিন্তু কথা এই যে, কেবল বীরত্বে জয়লাভ নাই; যথারীতি সন্ধিবিগ্রহ করিলেই জয়লাভ। তুমি নিজে বীরাগ্রগণ্য; কিন্তু তোমার সেনা সহস্রাধিক নহে; কোন্ যোদ্ধা সহস্রেক সেনা লইয়া শতগুণ সেনা বিমুখ করিতে পারে ? মোগল পাঠান উভয় পক্ষই সেনা বলে তোমার অপেক্ষা শতগুণে বলবান্; এক পক্ষের সাহায্য ব্যতীত অপর পক্ষের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইতে পারিবে না। এ কথায় রুষ্ট হইও না, স্থিরচিত্তে বিবেচনা কর। আরও কথা এই যে, দুই পক্ষেরই সহিত শত্রুভাবে প্রয়োজন কি ? শত্রু ত মন্দ; দুই শত্রুর অপেক্ষা এক শত্রু ভাল না ? অতএব আমার বিবেচনায় পক্ষাবলম্বন করাই উচিত।”
বীরেন্দ্র বহুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন, “কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিতে অনুমতি করেন ?”
অভিরাম স্বামী উত্তর করিলেন, “যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ,—যে পক্ষ অবলম্বন করিলে অধর্ম্ম নাই, সেই পক্ষে যাও, রাজবিদ্রোহিতা মহাপাপ, রাজপক্ষ অবলম্বন কর।”
বীরেন্দ্র পুনর্ব্বার ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিলেন, “রাজা কে ? মোগল পাঠান উভয়েই রাজত্ব লইয়া বিবাদ।”
অভিরাম স্বামী উত্তর করিলেন, “যিনি করগ্রাহী, তিনিই রাজা।”
বী। আকবর শাহা?
অ। অবশ্য।
এই কথায় বীরেন্দ্রসিংহ অপ্রসন্ন মুখভঙ্গী করিলেন; ক্রমে চক্ষু আরক্তবর্ণ হইল; অভিরাম স্বামী আকারেঙ্গিত দেখিয়া কহিলেন, “বীরেন্দ্র! ক্রোধ সংবরণ কর,

আমি তোমাকে দিল্লীশ্বরের অনুগত হইতে বলিয়াছি; মানসিংহের আনুগত্য করিতে বলি নাই।”

বীরেন্দ্রসিংহ দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া পরমহংসকে দেখাইলেন; দক্ষিণ হস্তের উপর বাম হস্তের অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, “ও পাদপদ্মের আশীর্ব্বাদে এই হস্ত মানসিংহের রক্তে প্লাবিত করিব।”

অভিরাম স্বামী কহিলেন, “স্থির হও; রাগান্ধ হইয়া আত্মকার্য্য নষ্ট করিও না; মানসিংহের পূর্ব্বকৃত অপরাধের অবশ্য দণ্ড করিও, কিন্তু আকবর শাহের সহিত যুদ্ধে কার্য্য কি ?”

বীরেন্দ্র সক্রোধে কহিতে লাগিলেন, “আকবর শাহের পক্ষ হইলে কোন্ সেনাপতির অধীন হইয়া যুদ্ধ করিতে হইবে ? কোন্ যোদ্ধার সাহায্য করিতে হইবে ? কাহার আনুগত্য করিতে হইবে? মানসিংহের। গুরুদেব! এ দেহ বর্ত্তমানে এ কার্য্য বীরেন্দ্রসিংহ হইতে হইবে না।”

অভিরাম স্বামী বিষণ্ন হইয়া নীরব হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তবে কি পাঠানের সহায়তা করা তোমার শ্রেয়ঃ হইল ?”

বীরেন্দ্র উত্তর করিলেন, “পক্ষাপক্ষ প্রভেদ করা কি শ্রেয় ?”

অ। হাঁ, পক্ষাপক্ষ প্রভেদ করা শ্রেয়ঃ।

বী। তবে আমার পাঠান-সহকারী হওয়া শ্রেয়ঃ।

অভিরাম স্বামী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পুনরায় নীরব হইলেন; চক্ষে তাঁহার বারিবিন্দু উপস্থিত হইল। দেখিয়া বীরেন্দ্রসিংহ যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, “গুরো! ক্ষমা করুন; আমি না জানিয়া কি অপরাধ করিলাম আজ্ঞা করুন।”

অভিরাম স্বামী উত্তরীয় বস্ত্রে চক্ষু পরিষ্কার করিয়া কহিলেন, “শ্রবণ কর, আমি কয়েক দিবস পর্য্যন্ত জ্যোতিষী-গণনায় নিযুক্ত আছি, তোমা অপেক্ষা তোমার কন্যা আমার স্নেহের পাত্রী, ইহা তুমি অবগত আছ; স্বভাবতঃ তৎসম্বন্ধেই বহুবিধ গণনা করিলাম।” বীরেন্দ্রসিংহের মুখ বিশুষ্ক হইল; আগ্রহ সহকারে পরমহংসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “গণনায় কি দেখিলেন ?” পরমহংস কহিলেন, “দেখিলাম যে, মোগল সেনাপতি হইতে তিলোত্তমার মহৎ অমঙ্গল।” বীরেন্দ্রসিংহের মুখ কৃষ্ণবর্ণ হইল। অভিরাম স্বামী কহিতে লাগিলেন, “মোগলেরা বিপক্ষ হইলেই তৎকর্ত্তৃক তিলোত্তমার অমঙ্গল সম্ভবে; স্বপক্ষ হইলে সম্ভবে না, এজন্যই আমি তোমাকে মোগল পক্ষে প্রবৃত্তি লওয়াইতেছিলাম। এই কথা ব্যক্ত করিয়া তোমাকে মনঃপীড়া দিতে আমার ইচ্ছা ছিল না; মনুষ্যযত্ন বিফল; বুঝি ললাটলিপি অবশ্য ঘটিবে, নহিলে তুমি এত স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইবে কেন ?”

বীরেন্দ্রসিংহ মৌন হইয়া থাকিলেন। অভিরাম স্বামী কহিলেন, “বীরেন্দ্র, দ্বারে কতলু খাঁর দূত দণ্ডায়মান; আমি তাহাকে দেখিয়াই তোমার নিকট আসিয়াছি, আমার নিষেধক্রমেই দৌবারিকেরা এ পর্য্যন্ত তাহাকে তোমার সম্মুখে আসিতে দেয় নাই। এক্ষণে আমার বক্তব্য সমাপন হইয়াছে, দূতকে আহ্বান করিয়া উচিত প্রত্যুত্তর দাও।” বীরেন্দ্রসিংহ নিশ্বাসসহকারে মস্তকোত্তোলন করিয়া কহিলেন, “গুরুদেব! যতদিন তিলোত্তমাকে না দেখিয়াছিলাম, ততদিন কন্যা বলিয়া তাহাকে স্মরণও করিতাম না; এক্ষণে তিলোত্তমা ব্যতীত আর আমার সংসারে কেহই নাই; আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলাম; অদ্যাবধি ভূতপূর্ব্ব বিসর্জ্জন দিলাম; মানসিংহের অনুগামী হইব; দৌবারিক দূতকে আনয়ন করুক।”

আজ্ঞামতে দৌবারিক দূতকে আনয়ন করিল। দূত কতলু খাঁর পত্র প্রদান করিল। পত্রের মর্ম্ম এই যে, বীরেন্দ্রসিংহ এক সহস্র অশ্বারোহী সেনা আর পঞ্চ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পাঠান শিবিরে প্রেরণ করুন, নচেৎ কতলু খাঁ বিংশতি সহস্র সেনা গড় মান্দারণে প্রেরণ করিবেন।

বীরেন্দ্রসিংহ পত্র পাঠ করিয়া কহিলেন, “দূত! তোমার প্রভুকে কহিও, তিনিই সেনা প্রেরণ করুন।” দূত নতশির হইয়া প্রস্থান করিল।

সকল কথা অন্তরালে থাকিয়া বিমলা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ অসাবধানতা

দুর্গের যে ভাগে দুর্গমূল বিধৌত করিয়া আমাদের নদী কলকল রবে প্রবহণ করে, সেই অংশে এক কক্ষবাতায়নে বসিয়া তিলোত্তমা নদীজলাবর্ত্ত নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। সায়াহ্নকাল উপস্থিত, পশ্চিমগগনে অস্তাচলগত দিনমণির ম্লান কিরণে যে সকল মেঘ কাঞ্চনকান্তি ধারণ করিয়াছিল, তৎসহিত নীলাম্বরপ্রতিবিম্ব স্রোতস্বতীজলমধ্যে কম্পিত হইতেছিল; নদীপারস্থিত উচ্চ অট্টালিকা এবং দীর্ঘ তরুবর সকল বিমলাকাশপটে চিত্রবৎ দেখাইতেছিল; দুর্গমধ্যে ময়ূর সারসাদি কলনাদি পক্ষিগণ প্রফুল্লচিত্তে রব করিতেছিল; কোথাও রজনীর উদয়ে নীড়ান্বেষণে ব্যস্ত বিহঙ্গম নীলাম্বর-তলে বিনা শব্দে উড়িতেছিল; আম্রকানন দোলাইয়া আমোদর-স্পর্শ-শীতল নৈদাঘ বায়ু তিলোত্তমার অলককুন্তল অথবা অংসারূঢ় চারুবাস কম্পিত করিতেছিল।

তিলোত্তমা সুন্দরী। পাঠক! কখন কিশোর বয়সে কোন স্থিরা, ধীরা, কোমল-প্রকৃতি কিশোরীর নবসঞ্চারিত লাবণ্য প্রেমচক্ষুতে দেখিয়াছেন ? একবার মাত্র দেখিয়া চিরজীবন মধ্যে যাহার মাধুর্য্য বিস্মৃত হইতে পারেন নাই; কৈশোরে, যৌবনে, প্রগল্‌ভ বয়সে, কার্য্যে, বিশ্রামে, জাগ্রতে, নিদ্রায়, পুনঃ পুনঃ যে মনোমোহিনী মূর্ত্তি স্মরণ-পথে স্বপ্নবৎ যাতায়াত করে, অথচ তৎসম্বন্ধে কখনও চিত্তমালিন্যজনক লালসা জন্মায় না, এমন তরুণী দেখিয়াছেন ? যদি দেখিয়া থাকেন, তবেই তিলোত্তমার অবয়ব মনোমধ্যে স্বরূপ অনুভূত করিতে পারিবেন। যে মূর্ত্তি সৌন্দর্য্যপ্রভাপ্রাচুর্য্যে মন প্রদীপ্ত করে, যে মূর্ত্তি লীলালাবণ্যাদির পারিপাট্যে হৃদয়মধ্যে বিষধরদন্ত রোপিত করে, এ সে মূর্ত্তি নহে; যে মূর্ত্তি কোমলতা, মাধুর্য্যাদি গুণে চিত্তের সন্তুষ্টি জন্মায়, এ সেই মূর্ত্তি। যে মূর্ত্তি সন্ধ্যাসমীরণ-কম্পিতা বসন্তলতার ন্যায় স্মৃতিমধ্যে দুলিতে থাকে, এ সেই মূর্ত্তি।

তিলোত্তমার বয়স ষোড়শ বৎসর, সুতরাং তাঁহার দেহায়তন প্রগল্‌ভবয়সী রমণীদিগের ন্যায় অদ্যাপি সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। দেহায়তনে ও মুখাবয়বে কিঞ্চিৎ বালিকাভাব ছিল। সুগঠিত সুগোল ললাট, অপ্রশস্ত নহে, অথচ অতিপ্রশস্তও নহে, নিশীথ-কৌমুদীদীপ্ত নদীর ন্যায় প্রশান্তভাব-প্রকাশক; তৎপার্শ্বে অতি নিবিড়-বর্ণ কুঞ্চিতালককেশ সকল ভ্রূযুগে, কপোলে, গণ্ডে, অংসে, উরসে আসিয়া পড়িয়াছে; মস্তকের পশ্চাদ্ভাগের অন্ধকারময় কেশরাশি সুবিন্যস্ত মুক্তাহারে গ্রথিত রহিয়াছে; ললাটতলে ভ্রূযুগ সুবঙ্কিম, নিবিড়-বর্ণ, চিত্রকরলিখিতবৎ হইয়াও কিঞ্চিৎ অধিক সূক্ষ্মাকার; আর এক সূতা স্থূল হইলে নির্দ্দোষ হইত। পাঠক কি চঞ্চল চক্ষু ভালবাস ? তবে তিলোত্তমা তোমার মনোরঞ্জিনী হইতে পারিবে না। তিলোত্তমার চক্ষু অতি শান্ত; তাহাতে "'বিদ্যুদ্দামস্ফুরণ-চকিত" কটাক্ষ নিক্ষেপ হইত না। চক্ষু দুটি অতি প্রশস্ত, অতি সুঠাম, অতি শান্তজ্যোতিঃ। আর চক্ষুর বর্ণ, ঊষাকালে সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, চন্দ্রাস্তের সময়ে আকাশের যে কোমল নীলবর্ণ প্রকাশ পায়, সেইরূপ; সেই প্রশস্ত পরিষ্কার চক্ষে যখন তিলোত্তমা দৃষ্টি করিতেন, তখন তাহাতে কিছুমাত্র কুটিলতা থাকিত না; তিলোত্তমা অপাঙ্গে অর্দ্ধদৃষ্টি করিতে জানিতেন না, দৃষ্টিতে কেবল স্পষ্টতা আর সরলতা; দৃষ্টির সরলতাও বটে, মনের সরলতাও বটে; তবে যদি তাঁহার পানে কেহ চাহিয়া দেখিত, তবে তৎক্ষণাৎ কোমল পল্লব দুখানি পড়িয়া যাইত; তিলোত্তমা তখন ধরাতল ভিন্ন অন্যত্র দৃষ্টি করিতেন না। ওষ্ঠাধর দুইখানি গোলাবী, রসে টলমল করিত; ছোট ছোট, একটু ঘুরান, একটু ফুলান, একটু হাসি হাসি; সে ওষ্ঠাধরে যদি একবার হাসি দেখিতে তবে যোগী হও, মুনি হও, যুবা হও, বৃদ্ধ হও, আর ভুলিতে পারিতে না। অথচ সে হাসিতে সরলতা ও বালিকাভাব ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।

তিলোত্তমার শরীর সুগঠন হইয়াও পূর্ণায়ত ছিল না; বয়সের নবীনতা প্রযুক্তই হউক বা শরীরের স্বাভাবিক গঠনের জন্যই হউক, এই সুন্দর দেহে ক্ষীণতা ব্যতীত

স্থূলতাগুণ ছিল না। অথচ তন্বীর শরীরমধ্যে সকল স্থানই সুগোল আর সুললিত। সুগোল প্রকোষ্ঠে রত্নবলয়; সুগোল বাহুতে হীরকমণ্ডিত তাড়; সুগোল অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয়; সুগোল উরুতে মেখলা; সুগঠন অংসোপরে স্বর্ণহার, সুগঠন কণ্ঠে রত্নকণ্ঠী; সর্ব্বত্রের গঠন সুন্দর।
তিলোত্তমা একাকিনী কক্ষবাতায়নে বসিয়া কি করিতেছেন ? সায়াহ্নগগনের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন ? তাহা হইলে ভূতলে চক্ষু কেন ? নদীতীরজ কুসুমসুবাসিত বায়ু সেবন করিতেছেন ? তাহা হইলে ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম হইবে কেন ? মুখের এক পার্শ্ব ব্যতীত ত বায়ু লাগিতেছে না। গোচারণ দেখিতেছেন ? তাও নয়, গাভীসকল ত ক্রমে ক্রমে গৃহে আসিল; কোকিল-রব শুনিতেছেন? তবে মুখ এত ম্লান কেন ? তিলোত্তমা কিছুই দেখিতেছেন না, শুনিতেছেন না, চিন্তা করিতেছেন।
দাসীতে প্রদীপ জ্বালিয়া আনিল। তিলোত্তমা চিন্তা ত্যাগ করিয়া একখানা পুস্তক লইয়া প্রদীপের কাছে বসিলেন। তিলোত্তমা পড়িতে জানিতেন; অভিরাম স্বামীর নিকট সংস্কৃত পড়িতে শিখিয়াছিলেন। পুস্তকখানি কাদম্বরী। কিয়ৎক্ষণ পড়িয়া বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কাদম্বরী পরিত্যাগ করিলেন। আর একখানা পুস্তক আনিলেন; সুবন্ধুকৃত বাসবদত্তা; কখন পড়েন, কখন ভাবেন, আর বার পড়েন; আর বার অন্যমনে ভাবেন; বাসবদত্তাও ভাল লাগিল না। তাহা ত্যাগ করিয়া গীতগোবিন্দ পড়িতে লাগিলেন; গীতগোবিন্দ কিছুক্ষণ ভাল লাগিল, পড়িতে পড়িতে সলজ্জ ঈষৎ হাসি হাসিয়া পুস্তক নিক্ষেপ করিলেন। পরে নিষ্কর্ম্মা হইয়া শয্যার উপর বসিয়া রহিলেন। নিকটে একটা লেখনী ও মসীপাত্র ছিল; অন্যমনে তাহা লইয়া পালঙ্কের কাষ্ঠে এ ও তা "ক" "স" "ম" ঘর, দ্বার, গাছ, মানুষ ইত্যাদি লিখিতে লাগিলেন; ক্রমে ক্রমে খাটের এক বাজু কালির চিহ্নে পরিপূর্ণ হইল; যখন আর স্থান নাই, তখন সে বিষয়ে চেতনা হইল। নিজ কার্য্য দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন; আবার কি লিখিয়াছেন, তাহা হাসিতে হাসিতে পড়িতে লাগিলেন। কি লিখিয়াছেন ? "বাসবদত্তা", "মহাশ্বেতা," "ক," "ঈ," "ই," "প," একটা বৃক্ষ, সেজুতির শিব, "গীতগোবিন্দ," "বিমলা," লতা, পাতা, হিজি, বিজি, গড়- সর্ব্বনাশ, আর কি লিখিয়াছেন?—
"কুমার জগৎসিংহ"।
লজ্জায় তিলোত্তমার মুখ রক্তবর্ণ হইল। নির্ব্বুদ্ধি! ঘরে কে আছে যে লজ্জা ?
"কুমার জগৎসিংহ।" তিলোত্তমা দুইবার, তিনবার, বহুবার পাঠ করিলেন; দ্বারের দিকে চাহেন আর পাঠ করেন; পুনর্ব্বার চাহেন আর পাঠ করেন, যেন চোর চুরি করিতেছে।
বড় অধিকক্ষণ পাঠ করিতে সাহস হইল না, কেহ আসিয়া দেখিতে পাইবে। অতি ব্যস্তে জল আনিয়া লিপি ধৌত করিলেন; ধৌত করিয়া মনঃপূত হইল না; বস্ত্র দিয়া উত্তম করিয়া মুছিলেন; আবার পড়িয়া দেখিলেন, কালির চিহ্ন মাত্র নাই; তথাপি বোধ হইল, যেন এখনও পড়া যায়; আবার জল আনিয়া ধুইলেন, আবার বস্ত্র দিয়া মুছিলেন, তথাপি বোধ হইতে লাগিল, যেন লেখা রহিয়াছে— *"কুমার জগৎসিংহ"*।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ বিমলার মন্ত্রণা

বিমলা অভিরাম স্বামীর কুটীরমধ্যে দণ্ডায়মান আছেন। অভিরাম স্বামী ভূমির উপর যোগাসনে বসিয়াছেন। জগৎসিংহের সহিত যে প্রকারে বিমলা ও তিলোত্তমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, বিমলা তাহা আদ্যোপান্ত অভিরাম স্বামীর নিকট বর্ণন করিতেছিলেন; বর্ণনা সমাপ্ত করিয়া কহিলেন, "আজ চতুর্দ্দশ দিবস; কাল পক্ষ পূর্ণ হইবেক।" অভিরাম স্বামী কহিলেন, "এক্ষণে কি স্থির করিয়াছ ?"

বিমলা উত্তর করিলেন, “উচিত পরামর্শ জন্যই আপনার কাছে আসিয়াছি।”
স্বামী কহিলেন, “উত্তম, আমার পরামর্শ এই যে, এ বিষয়ে আর মনে স্থান দিও না।”
বিমলা অতি বিষণ্ন বদনে নীরব হইয়া রহিলেন। অভিরাম স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, “বিষণ্ন হইলে কেন?”
বিমলা কহিলেন, “তিলোত্তমার কি উপায় হইবে ?”
অভিরাম স্বামী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন ? তিলোত্তমার মনে কি অনুরাগ সঞ্চার হইয়াছে ?”
বিমলা কিয়ৎকাল নীরবে থাকিয়া কহিলেন, “আপনাকে কত কহিব! আমি আজ চৌদ্দ দিন অহোরাত্র তিলোত্তমার ভাবগতিক বিলক্ষণ করিয়া দেখিতেছি, আমার মনে এমন বোধ হইয়াছে যে, তিলোত্তমার মনোমধ্যে অতি প্রগাঢ় অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছে।”
পরমহংস ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, “তোমরা স্ত্রীলোক; মনোমধ্যে অনুরাগের লক্ষণ দেখিলেই গাঢ় অনুরাগ বিবেচনা কর। বিমলে, তিলোত্তমার মনের সুখের জন্য চিন্তিত হইও না; বালিকা-স্বভাববশতঃই প্রথম দর্শনে মনশ্চাঞ্চল্য হইয়াছে; এ বিষয়ে কোন কথাবার্ত্তা উত্থাপন না হইলেই শীঘ্র জগৎসিংহকে বিস্মৃত হইবে।”
বিমলা কহিল, “না না, প্রভু, সে লক্ষণ নয়। পক্ষমধ্যে তিলোত্তমার স্বভাব পরিবর্ত্তন হইয়াছে! তিলোত্তমা আমার সঙ্গে কি বয়স্যাদিগের সঙ্গে সেরূপ দিবারাত্র হাসিয়া কথা কহে না; তিলোত্তমা আর প্রায় কথা কয় না; তিলোত্তমার পুস্তকসকল পালঙ্কের নীচে পড়িয়া পচিতেছে; তিলোত্তমার ফুলগাছসকল জলাভাবে শুষ্ক হইল; তিলোত্তমার পাখীগুলিতে আর সে যত্ন নাই; তিলোত্তমা নিজে আহার করে না; রাত্রে নিদ্রা যায় না; তিলোত্তমা বেশভূষা করে না; তিলোত্তমা কখন চিন্তা করে না, এক্ষণে দিবানিশি অন্যমনে থাকে। তিলোত্তমার মুখে কালিমা পড়িয়াছে।”
অভিরাম স্বামী শুনিয়া নিস্তব্ধ রহিলেন। ক্ষণেক পরে কহিলেন, “আমার বোধ ছিল যে, দর্শনমাত্র গাঢ় অনুরাগ জন্মিতে পারে না; তবে স্ত্রীচরিত্র, বিশেষতঃ বালিকাচরিত্র, ঈশ্বরই জানেন। কিন্তু কি করিবে ? বীরেন্দ্র এ সম্বন্ধে সম্মত হইবে না।”
বিমলা কহিল, “আমি সেই আশঙ্কায় এ পর্য্যন্ত ইহার কোন উল্লেখ করি নাই, মন্দিরমধ্যেও জগৎসিংহকে পরিচয় দিই নাই। কিন্তু এক্ষণে যদি সিংহ মহাশয়”,—এই কথা বলিতে বিমলার মুখের কিঞ্চিৎ ভাবান্তর হইল—“এক্ষণে যদি সিংহ মহাশয় মানসিংহের সহিত মিত্রতা করিলেন, তবে জগৎসিংহকে জামাতা করিতে হানি কি ?”
অ । মানসিংহই বা সম্মত হইবে কেন ?
বি। না হয়, যুবরাজ স্বাধীন।
অ। জগৎসিংহই বা বীরেন্দ্রসিংহের কন্যাকে বিবাহ করিবে কেন ?
বি। জাতিকুলের দোষ কোন পক্ষেই নাই, জয়ধরসিংহের পূর্ব্বপুরুষেরাও যদুবংশীয়।
অ। যদুবংশীয় কন্যা মুসলমানের শ্যালকপুত্রের বধূ হইবে ?
বিমলা উদাসীনের প্রতি স্থিরদৃষ্টি করিয়া কহিল, “না হইবেই বা কেন, যদুবংশের কোন্ কুল ঘৃণ্য?”
এই কথা বলিবামাত্র ক্রোধে পরমহংসের চক্ষু হইতে অগ্নি স্ফুরিত হইতে লাগিল; কঠোর স্বরে কহিলেন, “পাপীয়সি! নিজ হতভাগ্য বিস্মৃত হও নাই ? দূর হও!”

নবম পরিচ্ছেদ ঃ কুলতিলক

জগৎসিংহ পিতৃচরণ হইতে সসৈন্য বিদায় হইয়া যে যে কার্য্য করিলেন, তাহাতে পাঠান সৈন্যমধ্যে মহাভীতি প্রচার হইল। কুমার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, পঞ্চ সহস্র সেনা লইয়া তিনি কতলু খাঁর পঞ্চাশৎ সহস্রকে সুবর্ণরেখা পার করিয়া দিবেন, যদিও এ পর্য্যন্ত তত দূর কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা দেখাইতে পারেন নাই, তথাপি তিনি শিবির হইতে আসিয়া দুই সপ্তাহে যে পর্য্যন্ত যোদ্ধৃপতিত্ব গুণের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া মানসিংহ কহিয়াছিলেন, "বুঝি, আমার কুমার হইতে রাজপুত নামের পূর্ব্বগৌরব পুনরুদ্দীপ্ত হইবে।"
জগৎসিংহ উত্তমরূপে জানিতেন, পঞ্চ সহস্র সেনা লইয়া পঞ্চাশৎ সহস্রকে সম্মুখসংগ্রামে বিমুখ করা কোন রূপেই সম্ভব নহে, বরং পরাজয় বা মৃত্যুই নিশ্চয়। অতএব সম্মুখসংগ্রামের চেষ্টায় না থাকিয়া, যাহাতে সম্মুখসংগ্রাম না হয়, এমন প্রকার রণপ্রণালী অবলম্বন করিলেন। তিনি নিজ সামান্যসংখ্যক সেনা সর্ব্বদা অতি গোপনে লুক্কায়িত রাখিতেন, নিবিড় বনমধ্যে বা ঐ প্রদেশে সমুদ্র-তরঙ্গবৎ কোথাও নিম্ন, কোথাও উচ্চ যে সকল ভূমি আছে, তন্মধ্যে এমন স্থানে শিবির করিতেন যে, পার্শ্ববর্ত্তী উচ্চ ভূমিখণ্ড সকলের অন্তরালে, অতি নিকট হইতেও কেহ তাঁহার সেনা দেখিতে পাইত না। এইরূপ গোপন ভাবে থাকিয়া, যখন কোথাও স্বল্পসংখ্যক পাঠান সেনার সন্ধান পাইতেন, তরঙ্গপ্রপাতবৎ বেগে তদুপরি সসৈন্য পতিত হইয়া তাহা একেবারে নিঃশেষ করিতেন। তাঁহার বহুসংখ্যক চর ছিল; তাহারা ফলমূল মৎস্যাদি বিক্রেতা বা ভিক্ষুক উদাসীন ব্রাহ্মণ বৈদ্যাদির বেশে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া, পাঠান-সেনার গতিবিধির সন্ধান আনিয়া দিত। জগৎসিংহ সংবাদ পাইবামাত্র অতি সাবধানে অথচ দ্রুতগতি এমন স্থানে গিয়া সৈন্য সংস্থাপন করিতেন যে, যেন আগন্তুক পাঠান-সেনার উপরে সুকৌশলে এবং অপূর্ব্বদৃষ্ট হইয়া আক্রমণ করিতে পারেন। যদি পাঠান-সেনা অধিকসংখ্যক হইত, তবে জগৎসিংহ তাহাদিগকে আক্রমণ করার কোন স্পষ্ট উদ্যম করিতেন না; কেন না, তিনি জানিতেন, তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থায় এক যুদ্ধে পরাজয় হইলে সকল নষ্ট হইবে। তখন কেবল পাঠান-সেনা চলিয়া গেলে সাবধানে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া তাহাদিগের আহারীয় দ্রব্য, অশ্ব, কামান ইত্যাদি অপহরণ করিয়া লইয়া চলিয়া আসিতেন। আর যদি পাঠান-সেনা প্রবল না হইয়া স্বল্পসংখ্যক হইত, তবে যতক্ষণে সেনা নিজ মনোমত স্থান পর্য্যন্ত না আসিত, সে পর্য্যন্ত স্থির হইয়া গোপনীয় স্থানে থাকিতেন; পরে সময় বুঝিয়া, ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় চীৎকার শব্দে ধাবমান হইয়া হতভাগ্য পাঠানদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতেন। সে অবস্থায় পাঠানেরা শত্রুর নিকটস্থিতি অবগত থাকিত না; সুতরাং রণ জন্য প্রস্তুত থাকিত না। অকস্মাৎ শত্রুপ্রবাহমুখে পতিত হইয়া প্রায় বিনা যুদ্ধে প্রাণ হারাইত।

এইরূপে বহুতর পাঠান-সৈন্য নিপাত হইল। পাঠানেরা অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইল, এবং সম্মুখসংগ্রামে জগৎসিংহের সৈন্য বিনষ্ট করিবার জন্য বিশেষ সযত্ন হইল। কিন্তু জগৎসিংহের সৈন্য কোথায় থাকে, কোন সন্ধান পাওয়া যায় না; কেবল যমদূতের ন্যায় পাঠান-সেনার মৃত্যুকালে একবার দেখা দিয়া মৃত্যুকার্য সম্পাদন করিয়া অন্তর্ধান করে। জগৎসিংহ কৌশলময়; তিনি পঞ্চ সহস্র সেনা সর্ব্বদা একত্র রাখিতেন না, কোথায় সহস্র, কোথায় পঞ্চ শত, কোথায় দ্বিশত, কোথায় দ্বিসহস্র এইরূপে ভাগে ভাগে, যখন যথায় যেরূপ শত্রু সন্ধান পাইতেন, তখন সেইরূপ পাঠাইতেন; কার্য্য সম্পাদন হইলে আর তথায় রাখিতেন না। কখন্ কোন্‌খানে রাজপুত আছে, কোন্‌খানে নাই, পাঠানেরা কিছুই স্থির করিতে পারিত না। কতলু খাঁর নিকট প্রত্যহই সেনানাশের সংবাদ আসিত। প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে, সকল সময়েই অমঙ্গল সংবাদ আসিত। ফলে যে কার্য্যেই হউক না, পাঠান-সেনার অল্প সংখ্যায় দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হওয়া দুঃসাধ্য হইল। লুঠপাট একেবারে বন্ধ হইল; সেনাসকল দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইল; অধিকন্তু আহার আহরণ করা সুকঠিন হইয়া উঠিল। শত্রুপীড়িত প্রদেশ এইরূপ সুশাসিত হওয়ার সংবাদ

পাইয়া মহারাজ মানসিংহ পুত্রকে এই পত্র লিখিলেন,
“কুলতিলক! তোমা হইতে রাজ্যাধিকার পাঠানশূন্য হইবে জানিলাম, অতএব তোমার সাহায্যার্থে আর দশ সহস্র সেনা পাঠাইলাম।”
যুবরাজ প্রত্যুত্তর লিখিলেন,—
“মহারাজের যেরূপ অভিপ্রায়; আর সেনা আইসে ভাল; নচেৎ ও শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে এ দাস পঞ্চ সহস্রে ক্ষত্রকুলোচিত প্রতিজ্ঞাপালন করিবেক।”
কুমার বীরমদে মত্ত হইয়া অবাধে রণজয় করিতে লাগিলেন। শৈলেশ্বর! তোমার মন্দিরমধ্যে যে সুন্দরীর সরল দৃষ্টিতে এই যোদ্ধা পরাভূত হইয়াছিলেন, সে সুন্দরীকে সেনা-কোলাহল মধ্যে কি তাঁহার একবারও মনে পড়ে নাই ? যদি না পড়িয়া থাকে, তবে জগৎসিংহ তোমারই ন্যায় পাষাণ।

দশম পরিচ্ছেদঃ মন্ত্রণার পর উদ্যোগ

যে দিবস অভিরাম স্বামী বিমলার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দেন, তাহার পরদিন প্রদোষকালে বিমলা নিজ কক্ষে বসিয়া বেশভূষা করিতেছিলেন। পঞ্চত্রিংশৎ বর্ষীয়ার বেশভূষা? কেনই বা না করিবে ? বয়সে কি যৌবন যায় ? যৌবন যায় রূপে আর মনে; যার রূপ নাই, সে বিংশতি বয়সেও বৃদ্ধা; যার রূপ আছে, সে সকল বয়সেই যুবতী। যার মনে রস নাই, সে চিরকাল প্রবীণ; যার রস আছে, সে চিরকাল নবীন। বিমলার আজও রূপে শরীর ঢলঢল করিতেছে, রসে মন টলটল করিতেছে। বয়সে আরও রসের পরিপাক; পাঠক মহাশয়ের যদি কিঞ্চিৎ বয়স হইয়া থাকে, তবে এ কথা অবশ্য স্বীকার করিবেন।
কে বিমলার সে তাম্বুলরাগরক্ত ওষ্ঠাধর দেখিয়া বলিবে, এ যুবতী নয় ? তাহার কজ্জলনিবিড় প্রশস্ত লোচনের চকিত কটাক্ষ দেখিয়া কে বলিবে যে, এ চতুর্ব্বিংশতির পরপারে পড়িয়াছে ? কি চক্ষু! সুদীর্ঘ; চঞ্চল, আবেশময়। কোন কোন প্রগল্ভ-যৌবনা কামিনীর চক্ষু দেখিবামাত্র মনোমধ্যে বোধ হয় যে, এই রমণী দর্পিতা; এ রমণী সুখলালসাপরিপূর্ণা। বিমলার চক্ষু সেইরূপ। আমি নিশ্চিত পাঠক মহাশয়কে বলিতেছি, বিমলা যুবতী, স্থিরযৌবনা বলিলেও বলা যায়। তাঁহার সে চম্পকবর্ণ ত্বকের কোমলতা দেখিলে কে বলিবে যে, ষোড়শী তাঁহার অপেক্ষা কোমলা ? যে একটি অতি ক্ষুদ্র গুচ্ছ অলককেশ কুঞ্চিত হইয়া কর্ণমূল হইতে অসাবধানে কপোলদেশে পড়িয়াছে, কে দেখিয়া বলিবে যে, যুবতীর কপোলে যুবতীর কেশ পড়ে নাই ? পাঠক! মনশ্চক্ষু উন্মীলন কর; যেখানে বসিয়া দর্পণ সম্মুখে বিমলা কেশবিন্যাস করিতেছে, তাহা দেখ; বিপুল কেশগুচ্ছ বাম করে লইয়া, সম্মুখে রাখিয়া যে প্রকারে তাহাতে চিরণী দিতেছে, দেখ; নিজ যৌবনভাব দেখিয়া টিপি টিপি যে হাসিতেছে, তাহা দেখ; মধ্যে মধ্যে বীণানিন্দিত মধুর স্বরে যে মৃদু মৃদু সঙ্গীত করিতেছে, তাহা শ্রবণ কর; দেখিয়া শুনিয়া বল, বিমলা অপেক্ষা কোন্ নবীনা তোমার মনোমোহিনী ?
বিমলা কেশ বিন্যস্ত করিয়া কবরী বন্ধন করিলেন না; পৃষ্ঠদেশে বেণী লম্বিত করিলেন। গন্ধবারিসিক্ত রুমালে মুখ পরিষ্কার করিলেন; গোলাপপূগকর্পূরপূর্ণ তাম্বুলে পুনর্ব্বার ওষ্ঠাধার রঞ্জন করিলেন; মুক্তাভূষিত কাঁচলি লইয়া বক্ষে দিলেন; সর্ব্বাঙ্গে কনকরত্নভূষা পরিধান করিলেন; আবার কি ভাবিয়া তাহার কিয়দংশ পরিত্যাগ করিলেন; বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত বসন পরিলেন; মুক্তা-শোভিত পাদুকা গ্রহণ করিলেন; এবং সুবিন্যস্ত চিকুরে যুবরাজদত্ত বহুমূল্য মুক্তাহার রোপিত করিলেন।
বিমলা বেশ করিয়া তিলোত্তমার কক্ষে গমন করিলেন। তিলোত্তমা দেখিবামাত্র বিস্ময়াপন্ন হইলেন; হাসিয়া কহিলেন, “এ কি বিমলা! এ বেশ কেন ?”
বিমলা কহিলেন, “তোর সে কথায় কাজ কি ?”

তি। সত্য বল না, কোথায় যাবে ?
বি। আমি যে কোথাায় যাব, তোমাকে কে বলিল ?
তিলোত্তমা অপ্রতিভ হইলেন। বিমলা তাঁহার লজ্জা দেখিয়া সকরুণ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "আমি অনেক দূর যাব।"
তিলোত্তমার মুখ প্রফুল্ল পদ্মের ন্যায় হর্ষবিকসিত হইল। মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা যাবে ?"
বিমলা সেইরূপ মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "আন্দাজ কর না ?"
তিলোত্তমা তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।
বিমলা তখন তাঁহার হস্তধারণ করিয়া, "শুন দেখি" বলিয়া গবাক্ষের নিকট লইয়া গেলেন। তথায় কাণে কাণে কহিলেন, "আমি শৈলেশ্বর-মন্দিরে যাব; তথায় কোন রাজপুত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইবে।"
তিলোত্তমার শরীর রোমাঞ্চিত হইল। কিছুই উত্তর করিলেন না।
বিমলা বলিতে লাগিলেন, "অভিরাম ঠাকুরের সঙ্গে আমার কথা হইয়াছিল, ঠাকুরের বিবেচনায় জগৎসিংহের সহিত তোমার বিবাহ হইতে পারে না। তোমার বাপ কোন মতে সম্মত হইবেন না। তাঁর সাক্ষাতে এ কথা পাড়িলে ঝাঁটা লাথি না খাই ত বিস্তর।"
"তবে কেন"—তিলোত্তমা অধোবদনে, অস্ফুটস্বরে, পৃথিবী পানে চাহিয়া এই দুইটি কথা বলিলেন, "তবে কেন ?"
বি। কেন ? আমি রাজপুত্রের নিকট স্বীকার করিয়া আসিয়াছিলাম, আজ রাত্রে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরিচয় দিব। শুধু পরিচয় পাইলে কি হইবে ? এখন ত পরিচয় দিই, তার পর তাঁহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য তিনি করিবেন। রাজপুত্র যদি তোমাতে অনুরক্ত হন—
তিলোত্তমা তাঁহাকে আর বলিতে না দিয়া মুখে বস্ত্র দিয়া কহিলেন, "তোমার কথা শুনিয়া লজ্জা করে; তুমি যেখানে ইচ্ছা, সেখানে যাও না কেন, আমার কথা কাহাকে বলিও না, আর আমার কাছে কাহারও কথা বলিও না।"
বিমলা পুনর্ব্বার হাসিয়া কহিলেন, "তবে এ বালিকা-বয়সে এ সমুদ্রে ঝাঁপ দিলে কেন?"
তিলোত্তমা কহিলেন, "তুই যা! আমি আর তোর কোন কথা শুনিব না।"
বি। তবে আমি মন্দিরে যাব না।
তি। আমি কি কোথাও যেতে বারণ করিতেছি? যেখানে ইচ্ছা, সেখানে যাও না।
বিমলা হাসিতে লাগিলেন; কহিলেন, "তবে আমি যাইব না।"
তিলোত্তমা পুনরায় অধোমুখী হইয়া কহিলেন, "যাও।" বিমলা আবার হাসিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কহিলেন, "আমি চলিলাম; আমি যতক্ষণ না আসি, ততক্ষণ নিদ্রা যাইও না।"
তিলোত্তমাও ঈষৎ হাসিলেন; সে হাসির অর্থ এই যে, "নিদ্রা আসিবে কেন ?" বিমলা তাহা বুঝিতে পারিলেন। গমনকালে বিমলা এক হস্ত তিলোত্তমার অংসদেশে ন্যস্ত করিয়া, অপর হস্তে তাঁহার চিবুক গ্রহণ করিলেন; এবং কিয়ৎক্ষণ তাঁহার সরল প্রেমপবিত্র মুখ প্রতি দৃষ্টি করিয়া সস্নেহে চুম্বন করিলেন। তিলোত্তমা দেখিতে পাইলেন, যখন বিমলা চলিয়া যান, তখন তাঁহার চক্ষে এক বিন্দু বারি রহিয়াছে।
কক্ষদ্বারে আশমানি আসিয়া বিমলাকে কহিল, "কর্ত্তা তোমাকে ডাকিতেছেন।"

তিলোত্তমা শুনিতে পাইয়া, আসিয়া কাণে কাণে কহিলেন, “বেশ ত্যাগ করিয়া যাও।”
বিমলা কহিলেন, “ভয় নাই।”
বিমলা বীরেন্দ্রসিংহের শয়নকক্ষে গেলেন। তথায় বীরেন্দ্রসিংহ শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। এক দাসী পদসেবা, অন্যে ব্যজন করিতেছিল। পালঙ্কের নিকট উপস্থিত হইয়া বিমলা কহিলেন, “আমার প্রতি কি আজ্ঞা?”
বীরেন্দ্রসিংহ মস্তকোত্তোলন করিয়া চমৎকৃত হইলেন; বলিলেন, “বিমলা, তুমি কর্ম্মান্তরে যাইবে না কি?”
বিমলা কহিলেন, “আজ্ঞা। আমার প্রতি কি আজ্ঞা ছিল?”
বী। তিলোত্তমা কেমন আছে? শরীর অসুস্থ ছিল, ভাল হইয়াছে?
বি। ভাল হইয়াছে।
বী। তুমি আমাকে ক্ষণেক ব্যজন কর, আশমানি তিলোত্তমাকে আমার নিকট ডাকিয়া আনুক।
ব্যজনকারিণী দাসী ব্যজন রাখিয়া গেল।
বিমলা আশমানিকে বাহিরে দাঁড়াইতে ইঙ্গিত করিলেন। বীরেন্দ্র অপর দাসীকে কহিলেন, “লচমণি, তুই আমার জন্য পান তৈয়ার করিয়া আন।” পদসেবাকারিণী চলিয়া গেল।
বী। বিমলা, তোমার আজ এ বেশ কেন?
বি। আমার প্রয়োজন আছে।
বী। কি প্রয়োজন আছে আমি শুনিব।
বি। “তবে শুনুন” বলিতে বলিতে বিমলা মন্মথশয্যারূপী চক্ষুর্দ্বয়ে বীরেন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, “তবে শুনুন, আমি এখন অভিসারে গমন করিব।”
বী। যমের সঙ্গে না কি?
বি। কেন, মানুষের সঙ্গে কি হইতে নাই?
বী। সে মানুষ আজিও জন্মে নাই।
বি। একজন ছাড়া।
এই বলিয়া বিমলা বেগে প্রস্থান করিল।

একাদশ পরিচ্ছেদঃ আশমানির দৌত্য

এদিকে বিমলার ইঙ্গিতমত আশমানি গৃহের বাহিরে আসিয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল। বিমলা আসিয়া তাহাকে কহিলেন, “আশমান্, তোমার সঙ্গে কোন বিশেষ গোপনীয় কথা আছে।”
আশমানি কহিল, “বেশভূষা দেখিয়া আমিও ভাবিতেছিলাম, আজ কি একটা কাণ্ড।”

বিমলা কহিলেন, “আমি আজ কোন প্রয়োজনে অধিক দূরে যাইব। এ রাত্রে একাকিনী যাইতে পারিব না; তুমি ছাড়া আর কাহাকেও বিশ্বাস করিয়া সঙ্গে লইতে পারিব না; তোমাকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে।”
আশমানি জিজ্ঞাসা করিল, “কোথা যাবে?”
বিমলা কহিলেন, “আশমানি, তুমি ত সেকালে এত কথা জিজ্ঞাসা করিতে না?”
আশমানি কিছু অপ্রতিভ হইয়া কহিল, “তবে তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি কতকগুলা কাজ সারিয়া আসি।”
বিমলা কহিলেন, “আর একটা কথা আছে; মনে কর, যদি তোমার সঙ্গে আজ সেকালের কোন লোকের দেখা হয়, তবে কি তোমাকে সে চিনিতে পারিবে?”
আশমানি বিস্মিতা হইয়া কহিল, “সে কি?”
বিমলা কহিলেন, “মনে কর, যদি কুমার জগৎসিংহের সহিত দেখা হয়?”
আশমানি অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া গদগদ স্বরে কহিল, “এমন দিন কি হবে?”
বিমলা কহিলেন, “হইতেও পারে।”
আশমানি কহিল, “কুমার চিনিতে পারিবেন বৈ কি।”
বিমলা কহিলেন, “তবে তোমার যাওয়া হইবে না, আর কাহাকে লইয়া যাই,—একাও ত যাইতে পারি না।”
আশমানি কহিল, “কুমার দেখিব মনে বড়ই সাধ হইতেছে।”
বিমলা কহিলেন, “মনের সাধ মনে থাক; এখন আমি কি করি?”
বিমলা চিন্তা করিতে লাগিলেন। আশমানি অকস্মাৎ মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল। বিমলা কহিলেন, “মর্! আপনা আপনি হেসে মরিস কেন?”
আশমানি কহিল, “মনে মনে ভাবিতেছিলাম, বলি আমার সোনার চাঁদ দিগ্‌গজকে তোমার সঙ্গে পাঠাইলে কি হয়?”
বিমলা হাসিয়া উল্লাসে কহিলেন, “সেই কথাই ভাল; রসিকরাজকেই সঙ্গে লইব।”
আশমানি বিস্মিত হইয়া কহিল, “সে কি, আমি যে তামাসা করিতেছিলাম!”
বিমলা কহিলেন, “তামাসা না, বোকা বামুনকে আমার অবিশ্বাস নাই। অন্ধের দিন রাত্রি নাই, ও ত কিছুই বুঝিতে পারিবে না, সুতরাং ওকে অবিশ্বাস নাই। তবে বামুন যেতে চাবে না।”
আশমানি হাসিয়া কহিল, “সে ভার আমার; আমি তাহাকে সঙ্গে করিয়া নিয়া আসিতেছি, তুমি ফটকের সম্মুখে একটু অপেক্ষা করিও।”
এই বলিয়া আশমানি হাসিতে হাসিতে দুর্গমধ্যস্থ একটি ক্ষুদ্র কুটীরাভিমুখে চলিল।
অভিরাম স্বামীর শিষ্য গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ ইতিপূর্ব্বেই পাঠক মহাশয়ের নিকট একবার পরিচিত হইয়াছেন। যে হেতুতে বিমলা তাঁহার রসিকরাজ নাম রাখিয়াছিলেন, তাহাও পাঠক মহাশয় অবগত আছেন। সেই মহাপুরুষ এই কুটীরের অধিকারী। দিগ্‌গজ মহাশয় দৈর্ঘ্যে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাত হইবেন, প্রস্থে বড় জোর আধ হাত তিন আঙ্গুল। পা দুইখানি কাঁকাল হইতে মাটি পর্য্যন্ত মাপিলে চৌদ্দপুয়া চারি হাত হইবেক; প্রস্থে রলা কাষ্ঠের পরিমাণ। বর্ণ দোয়াতের কালি; বোধ হয়, অগ্নি কাষ্ঠভ্রমে পা দুখানি ভক্ষণ করিতে বসিয়াছিলেন, কিছুমাত্র রস না পাইয়া অর্দ্ধেক অঙ্গার করিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন। দিগ্‌গজ মহাশয় অধিক দৈর্ঘ্যবশতঃ একটু একটু কুজো; অবয়বের মধ্যে নাসিকা প্রবল, শরীরে মাংসাভাব সেইখানেই সংশোধন হইয়াছে। মাথাটি বেহারা-কামান, কামান চুলগুলি যাহা

আছে তাহা ছোট ছোট, আবার হাত দিলে সূচ ফুটে। আর্ক-ফলার ঘটাটা জাঁকাল রকম।

গজপতি, ‘বিদ্যাদিগ্‌গজ’ উপাধি সাধ করিয়া পান নাই। বুদ্ধিখানা অতি তীক্ষ্ণ। বাল্যকালে চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ আরম্ভ করিয়াছিলেন, সাড়ে সাত মাসে “সহর্ণে র্ঘঃ” সূত্রটি ব্যাখ্যা শুদ্ধ মুখস্থ হয়! ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অনুগ্রহে আর দশজনের গোলে হরিবোলে পঞ্চদশ বৎসর পাঠ করিয়া শব্দকাণ্ড শেষ করিলেন। পরে অন্য কাণ্ড আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে অধ্যাপক ভাবিলেন, “দেখি দেখি কাণ্ডখানাই কি? শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বল দেখি বাপু, রাম শব্দের উত্তর অম্ করিলে কি হয়?” ছাত্র অনেক ভাবিয়া উত্তর করিলেন, “রামকান্ত।” অধ্যাপক কহিলেন, “বাপু, তোমার বিদ্যা হইয়াছে; তুমি এক্ষণে গৃহে যাও, তোমার এখানকার পাঠ সাঙ্গ হইয়াছে; আমার আর বিদ্যা নাই যে তোমাকে দান করিব।”

গজপতি অতি সাহঙ্কার-চিত্ত হইয়া কহিলেন, “আমার এক নিবেদন—আমার উপাধি?”

অধ্যাপক কহিলেন, “বাপু, তুমি যে বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছ, তোমার নূতন উপাধি আবশ্যক, তুমি ‘বিদ্যাদিগ্‌গজ’ উপাধি গ্রহণ কর।”

দিগ্‌গজ হৃষ্টচিত্তে গুরুপদে প্রণাম করিয়া গৃহে চলিলেন।

গৃহে আসিয়া দিগ্‌গজ পণ্ডিত মনে মনে ভাবিলেন, “ব্যাকরণাদিতে ত কৃতবিদ্যা হইলাম। এক্ষণে কিঞ্চিৎ স্মৃতি পাঠ করা আবশ্যক। শুনিয়াছি, অভিরাম স্বামী বড় পণ্ডিত, তিনি ব্যতীত আমাকে শিক্ষা দেয়, এমন লোক আর নাই, অতএব তাঁহার নিকটে গিয়া কিছু স্মৃতি শিক্ষা করা উচিত।” এই স্থির করিয়া দিগ্‌গজ দুর্গমধ্যে অধিষ্ঠান করিলেন। অভিরাম স্বামী অনেককে শিক্ষা দিতেন; কাহারও প্রতি বিরক্ত ছিলেন না। দিগ্‌গজ কিছু শিখুক বা না শিখুক, অভিরাম স্বামী তাহাকে পাঠ দিতেন।

গজপতি ঠাকুর কেবল বৈয়াকরণ আর স্মার্ত্ত নহেন; একটু আলঙ্কারিক, একটু একটু রসিক, ঘৃতভাণ্ড তাহার পরিচয়ের স্থল। তাঁহার রসিকতার আড়ম্বরটা কিছু আশমানির প্রতি গুরুতর হইত; তাহার কিছু গূঢ় তাৎপর্য্যও ছিল। গজপতি মনে করিতেন, “আমার তুল্য ব্যক্তির ভারতে কেবল লীলা করিতে আসা; এই আমার শ্রীবৃন্দাবন; আশমানি আমার রাধিকা।” আশমানিও রসিকা; মদনমোহন পাইয়া বানর-পোষার সাধ মিটাইয়া লইত। বিমলাও সন্ধান পাইয়া কখনও বানর নাচাইতে যাইতেন। দিগ্‌গজ মনে করিতেন, “এই আমার চন্দ্রাবলী জুটিয়াছে; না হবে কেন ? যে ঘৃতভাণ্ড ঝাড়িয়াছি; ভাগ্যে বিমলা জানে না, ওটি আমার শোনা কথা।”

দ্বাদশ পরিচ্ছেদঃ আশমানির অভিসার

দিগ্‌গজ গজপতির মনোমোহিনী আশমানি কিরূপ রূপবতী, জানিতে পাঠক মহাশয়ের কৌতূহল জন্মিয়াছে সন্দেহ নাই। অতএব তাঁহার সাধ পুরাইব। কিন্তু স্ত্রীলোকের রূপবর্ণন-বিষয়ে গ্রন্থকারগণ যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া থাকেন, আমার সদৃশ অকিঞ্চন জনের তৎপদ্ধতি বহির্ভূত হওয়া অতি ধৃষ্টতার বিষয়। অতএব, প্রথমে মঙ্গলাচরণ করা কর্ত্তব্য।

হে বাগ্‌দেবি! হে কমলাসনে! শরদিন্দুনিভাননে! অমলকমল-দলনিন্দিত-চরণ-ভক্তজন-বৎসলে! আমাকে সেই চরণকমলের ছায়া দান কর; আমি আশমানির রূপ বর্ণন করিব। হে অরবিন্দানন-সুন্দরীকুল-গর্ব্ব-খর্ব্বকারিণি! হে বিশাল রসাল দীর্ঘ-সমাস-পটল-সৃষ্টিকারিণি! এবার পদনখের এক পার্শ্বে স্থান দাও, আমি রূপ বর্ণন করিব। সমাস-পটল, সন্ধি-বেগুন, উপমা-কাঁচাকলার চড়চড়ি রাঁধিয়া এই খিচুড়ি তোমায় ভোগ দিব। হে পণ্ডিতকুলেপ্সিত-পয়ঃপ্রস্রবিণি! হে মূর্খজনপ্রতি ক্ব চিৎ কৃপাকারিণি! হে অঙ্গুলি-কণ্ডুয়ন-বিষমবিকার-সমুৎপাদিনি! হে বটতলা-বিদ্যাপ্রদীপ-তৈলপ্রদায়িনি! আমার বুদ্ধির প্রদীপ একবার উজ্জ্বল করিয়া দিয়া যাও।

মা! তোমার দুই রূপ; যে রূপে তুমি কালিদাসকে বরপ্রদা হইয়াছিলে, যে প্রকৃতির প্রভাবে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, শকুন্তলা জন্মিয়াছিল, যে প্রকৃতির ধ্যান করিয়া বাল্মীকি রামায়ণ, ভবভূতি উত্তরচরিত, ভারবি কিরাতার্জ্জুনীয় রচনা করিয়াছিলেন, সে রূপে আমার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া পীড়া জন্মাইও না; যে মূর্ত্তি ভাবিয়া শ্রীহর্ষ নৈষধ লিখিয়াছিলেন, যে প্রকৃতিপ্রসাদে ভারতচন্দ্র বিদ্যার অপূর্ব্ব রূপবর্ণন করিয়া বঙ্গদেশের মনোমোহন করিয়াছেন, যাহার প্রসাদে দাসরথি রায়ের জন্ম, যে মূর্ত্তিতে আজও বটতলা আলো করিতেছ, সেই মূর্ত্তিতে একবার আমার স্কন্ধে আবির্ভূত হও, আমি আশমানির রূপ বর্ণন করি।
আশমানির বেণীর শোভা ফণিনীর ন্যায়; ফণিনী সেই তাপে মনে ভাবিল, যদি বেণীর কাছে পরাস্ত হইলাম, তবে আর এ দেহ লোকের কাছে লইয়া বেড়াইবার প্রয়োজনটা কি! আমি গর্ত্তে যাই। এই ভাবিয়া সাপ গর্ত্তের ভিতর গেলেন। ব্রহ্মা দেখিলেন প্রমাদ; সাপ গর্ত্তে গেলেন, মানুষ দংশন করে কে? এই ভাবিয়া তিনি সাপকে ল্যাজ ধরিয়া টানিয়া বাহির করিলেন, সাপ বাহিরে আসিয়া, আবার মুখ দেখাইতে হইল, এই ক্ষোভে মাথা কুটিতে লাগিল, মাথা কুটিতে কুটিতে মাথা চেপ্টা হইয়া গেল, সেই অবধি সাপের ফণা হইয়াছে। আশমানির মুখচন্দ্র অধিক সুন্দর, সুতরাং চন্দ্রদেব উদিত হইতে না পারিয়া ব্রহ্মার নিকট নালিশ করিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, ভয় নাই, তুমি গিয়া উদিত হও, আজি হইতে স্ত্রীলোকদিগের মুখ আবৃত হইবে; সেই অবধি ঘোমটার সৃষ্টি। নয়ন দুটি যেন খঞ্জন, পাছে পাখী ডানা বাহির করিয়া উড়িয়া পলায়, এই জন্য বিধাতা পল্লবরূপ পিঁজরার কবাট করিয়া দিয়াছেন। নাসিকা গরুড়ের নাসার ন্যায় মহাবিশাল; দেখিয়া গরুড় আশঙ্কায় বৃক্ষারোহণ করিল, সেই অবধি পক্ষিকুল বৃক্ষের উপরেই থাকে। কারণান্তরে দাড়িম্ব বঙ্গদেশ ছাড়িয়া পাটনা অঞ্চলে পলাইয়া রহিলেন; আর হস্তী কুম্ভ লইয়া ব্রহ্মদেশে পলাইলেন; বাকি ছিলেন ধবলগিরি, তিনি দেখিলেন যে, আমার চূড়া কতই বা উচ্চ, আড়াই ক্রোশ বই ত নয়, এ চূড়া অন্যূন তিন ক্রোশ হইবেক; এই ভাবিতে ভাবিতে ধবলগিরির মাথা গরম হইয়া উঠিল, বরফ ঢালিতে লাগিলেন, তিনি সেই অবধি মাথায় বরফ দিয়া বসিয়া আছেন।
কপালের লিখন দোষে আশমানি বিধবা! আশমানি দিগ্‌গজের কুটীরে আসিয়া দেখিল যে, কুটীরের দ্বার রুদ্ধ, ভিতরে প্রদীপ জ্বলিতেছে। ডাকিল, "ও ঠাকুর!"
কেউ উত্তর দিল না।
"বলি ও গোঁসাই!"
উত্তর নাই।
"মর্ বিট্‌লে কি করিতেছ? ও রসিকরাজ রসোপাধ্যায় প্রভু!"
উত্তর নাই।
আশমানি কুটীরের দ্বারের ছিদ্র দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল, ব্রাহ্মণ আহারে বসিয়াছে, এই জন্য কথা নাই, কথা কহিলে ব্রাহ্মণের আহার হয় না। আশমানি ভাবিল, "ইহার আবার নিষ্ঠা; দেখি দেখি, কথা কহিয়া আবার খায় কি না।"
"বলি ও রসিকরাজ!"
উত্তর নাই।
"ও রসরাজ!"
উত্তর। "হুম।"
বামুন ভাত গালে করিয়া উত্তর দিতেছে, ও ত কথা হলো না।—এই ভাবিয়া আশমানি কহিল, "ও রসমাণিক!"
উত্তর। "হুম।"

আ। বলি কথাই কও না, খেও এর পরে।
উত্তর। "হ-উ-উম্!"
আ। বটে, বামুন হইয়া এই কাজ—আমি স্বামিঠাকুরকে বলে দেব, ঘরের ভিতর কে ও ?
ব্রাহ্মণ সশঙ্কচিত্তে শূন্য ঘরের চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কেহ নাই দেখিয়া পুনর্ব্বার আহার করিতে লাগিল।
আশমানি বলিল, "ও মাগি যে জেতে চাঁড়াল! আমি যে চিনি!"
দিগ্‌গজের মুখ শুকাইল। বলিল, "কে চাঁড়াল ? ছুঁয়া পড়েনি ত ?"
আশমানি আবার কহিল, "ও, আবার খাও যে ? কথা কহিয়া আবার খাও ?"
দি। কই, কখন কথা কহিলাম ?
আশমানি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, "এই ত কহিলে।"
দি। বটে, বটে, বটে, তবে আর খাওয়া হইল না।
আ। হাঁ ত; উঠে আমায় দ্বার খুলে দাও।
আশমানি ছিদ্র হইতে দেখিতেছিল, ব্রাহ্মণ যথার্থই অন্নত্যাগ করিয়া উঠে। কহিল, "না, না, ও কয়টি ভাত খাইয়া উঠিও।"
দি। না, আর খাওয়া হইবে না, কথা কহিয়াছি।
আ। সে কি ? না খাও ত আমার মাথা খাও।
দি। রাধে মাধব! কথা কহিলে কি আর আহার করিতে আছে ?
আ। বটে তবে আমি চলিলাম; তোমার সঙ্গে আমার অনেক মনের কথা ছিল, কিছুই বলা হইল না। আমি চলিলাম।
দি। না, না, আশমান! তুমি রাগ করিও না; আমি এই খাইতেছি।
ব্রাহ্মণ আবার খাইতে লাগিল; দুই তিন গ্রাস আহার করিবামাত্র আশমানি কহিল, "উঠ, হইয়াছে; দ্বার খোল।"
দি। এই কটা ভাত খাই।
আ। এ যে পেট আর ভরে না; উঠ, নহিলে কথা কহিয়া ভাত খাইয়াছ, বলিয়া দিব।
দি। আঃ নাও; এই উঠিলাম।
ব্রাহ্মণ অতি ক্ষুণ্নমনে অন্নত্যাগ করিয়া, গণ্ডূষ করিয়া উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদঃ আশমানির প্রেম

দ্বার খুলিলে আশমানি গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র দিগ্‌গজের হৃদ্বোধ হইল যে, প্রণয়িনী আসিয়াছেন, ইহার সরস অভ্যর্থনা করা চাই, অতএব হস্ত উত্তোলন করিয়া কহিলেন, "ওঁ আয়াহি বরদে দেবি!"

আশমানি কহিল, “এটি যে বড় সরস কবিতা, কোথা পাইলে ?”
দি। তোমার জন্য এটি আজ রচনা করিয়া রাখিয়াছি।
আ। সাধ করিয়া কি তোমায় রসিকরাজ বলেছি ?
দি। সুন্দরি! তুমি বইস; আমি হস্ত প্রক্ষালন করি।
আশমানি মনে মনে কহিল, “আলোপ্পেয়ে! তুমি হাত ধোবে ? আমি তোমাকে ঐ এঁটো আবার খাওয়াব।”
প্রকাশ্যে কহিল, “সে কি, হাত ধোও যে, ভাত খাও না।”
গজপতি কহিলেন, “কি কথা, ভোজন করিয়া উঠিয়াছি, আবার ভাত খাব কিরূপে?”
আ। কেন, তোমার ভাত রহিয়াছে যে ? উপবাস করিবে ?
দিগ্‌গজ কিছু ক্ষুণ্ন হইয়া কহিলেন, “কি করি, তুমি তাড়াতাড়ি করিলে।” এই বলিয়া সতৃষ্ণনয়নে অন্নপানে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।
আশমানি কহিল, “তবে আবার খাইতে হইবে।”
দি। রাধে মাধব! গণ্ডূষ করিয়াছি, গাত্রোত্থান করিয়াছি, আবার খাইব ?
“হাঁ, খাইবে বই কি। আমারই উৎসৃষ্ট খাইবে।” এই বলিয়া আশমানি ভোজনপাত্র হইতে এক গ্রাস অন্ন লইয়া আপনি খাইল।
ব্রাহ্মণ অবাক্ হইয়া রহিলেন।
আশমানি উৎসৃষ্ট অন্ন ভোজনপাত্রে রাখিয়া কহিল, “খাও।”
ব্রাহ্মণের বাঙ্‌নিষ্পত্তি নাই।
আ। খাও, শোন, কাহাকে বলিবে না যে, তুমি আমার উৎসৃষ্ট খাইয়াছ। কেহ না জানিতে পারিলে দোষ কি ?
দি। তাও কি হয় ?
কিন্তু দিগ্‌গজের উদরমধ্যে অগ্নিদেব প্রচণ্ড জ্বালায় জ্বলিতেছিলেন। দিগ্‌গজ মনে মনে কহিতেছিলেন যে, আশমানি যেমন সুন্দর হউক না কেন, পৃথিবী ইহাকে গ্রাস করুন, আমি গোপনে ইহার উৎসৃষ্টাবশেষ ভোজন করিয়া দহ্যমান উদর শীতল করি।
আশমানি ভাব বুঝিয়া বলিল, “খাও—না খাও, একবার পাতের কাছে বসো।”
দি। কেন ? তাতে কি হইবে ?
আ। আমার সাধ। তুমি কি আমার একটা সাধ পুরাইতে পার না ?
দিগ্‌গজ বলিলেন, “শুধু পাতের কাছে বসিতে কি ? তাহাতে কোন দোষ নাই। তোমার কথা রাখিলাম।” এই বলিয়া দিগ্‌গজ পণ্ডিত আশমানির কথায় পাতের কাছে গিয়া বসিলেন। উদরে ক্ষুধা, কোলে অন্ন, অথচ খাইতে পারিতেছেন না—দিগ্‌গজের চক্ষে জল আসিল।
আশমানি বলিল, “““শূদ্রের উৎসৃষ্ট ব্রাহ্মণ ছুঁলে কি হয় ?”
পণ্ডিত বলিলেন, “নাইতে হয়।”
আ। তুমি আমায় কেমন ভালবাস, আজ বুঝিয়া পড়িয়া তবে আমি যাব। তুমি আমার কথায় এই রাত্রে নাইতে পার ?

দিগ্‌গজ মহাশয় ক্ষুদ্র চক্ষু রসে অর্দ্ধ মুদ্রিত করিয়া দীর্ঘ নাসিকা বাঁকাইয়া মধুর হাসি আকর্ণ হাসিয়া বলিলেন, “তার কথা কি ? এখনই নাইতে পারি।”
আশমানি বলিল, “আমার ইচ্ছা হইয়াছে তোমার পাতে প্রসাদ পাইব! তুমি আপন হাতে আমাকে দুইটি ভাত মাখিয়া দাও।”
দিগ্‌গজ বলিল, “তার আশ্চর্য কি ? স্নানেই শুচি।” এই বলিয়া উৎসৃষ্টাবশেষ একত্রিত করিয়া মাখিতে লাগিল।
আশমানি বলিল, আমি একটি উপকথা বলি শুন। যতক্ষণ আমি উপকথা বলিব, ততক্ষণ তুমি ভাত মাখিবে, নইলে আমি খাইব না।”
দি। আচ্ছা।
আশমানি এক রাজা আর তাহার দুয়ো শুয়ো দুই রাণীর গল্প আরম্ভ করিল। দিগ্‌গজ হাঁ করিয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া শুনিতে লাগিল—আর ভাত মাখিতে লাগিল।
শুনিতে শুনিতে দিগ্‌গজের মন আশমানির গল্পে ডুবিয়া গেল—আশমানির হাসি, চাহনি ও নথের মাঝখানে আটকাইয়া রহিল। ভাত মাখা বন্ধ হইল—পাতে হাত লাগিয়া রহিল—কিন্তু ক্ষুধার যাতনাটা আছে। যখন আশমানির গল্প বড় জমিয়া আসিল—দিগ্‌গজের মন তাহাতে বড়ই নিবিষ্ট হইল—তখন দিগ্‌গজের হাত বিশ্বাসঘাতকতা করিল। পাত্রস্থ হাত, নিকটস্থ মাখা ভাতের গ্রাস তুলিয়া চুপি চুপি দিগ্‌গজের মুখে লইয়া গেল। মুখ হাঁ করিয়া তাহা গ্রহণ করিল। দন্ত বিনা আপত্তিতে তাহা চর্ব্বণ করিতে আরম্ভ করিল। রসনা তাহা গলাধঃকরণ করাইল। নিরীহ দিগ্‌গজের কোন সাড়া ছিল না। দেখিয়া আশমানি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, “তবে রে বিট্‌লে—আমার এঁটো না কি খাবি নে ?”
তখন দিগ্‌গজের চেতনা হইল। তাড়াতাড়ি আর এক গ্রাস মুখে দিয়া গিলিতে গিলিতে এঁটো হাতে আশমানির পায়ে জড়াইয়া পড়িল। চর্ব্বণ করিতে করিতে কাঁদিয়া বলিল, “আমায় রাখ; আশমান! কাহাকেও বলিও না।”

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদঃ দিগ্‌গজহরণ

এমন সময় বিমলা আসিয়া, বাহির হইতে দ্বার নাড়িল। বিমলা পার্শ্বদ্বার হইতে অলক্ষ্যে সকল দেখিতেছিল। দ্বারের শব্দ শুনিয়া দিগ্‌গজের মুখ শুকাইল।
আশমানি বলিল, “কি সর্বনাশ, বিমলা আসিতেছে—লুকোও লুকোও।”
দিগ্‌গজ ঠাকুর কাঁদিয়া কহিল, “কোথায় লুকাইব ?”
আশমানি বলিল, “ঐ অন্ধকার কোণে একটা কেলে-হাঁড়ি মাথায় দিয়া বসো গিয়া—অন্ধকারে ঠাওর পাইবে না।” দিগ্‌গজ তাহাই করিতে গেল—আশমানির বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় বিস্মিত হইল। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাড়াতাড়িতে ব্রাহ্মণ একটা অড়হর ডালের হাঁড়ি পাড়িয়া মাথায় দিল—তাহাতে আধ হাঁড়ি রাঁধা অড়হর ডাল ছিল—দিগ্‌গজ যেমন হাঁড়ি উল্‌টাইয়া মাথায় দিবেন, অমনি মস্তক হইতে অড়হর ডালের শতধারা বহিল—টিকি দিয়া অড়হর ডালের স্রোত নামিল—স্কন্ধ, বক্ষ, পৃষ্ঠ ও বাহু হইতে অড়হর ডালের ধারা, পর্ব্বত হইতে ভূতলগামিনী নদীসকলের ন্যায় তরঙ্গে তরঙ্গে নামিতে লাগিল; উচ্চ নাসিকা অড়হরের প্রস্রবণবিশিষ্ট গিরিশৃঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। এই সময়ে বিমলা গৃহ প্রবেশ করিয়া দিগ্‌গজের শোভারাশি সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। দিগ্‌গজ বিমলাকে দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল। দেখিয়া বিমলার দয়া হইল। বিমলা বলিলেন, “কাঁদিও না। তুমি যদি এই অবশিষ্ট ভাতগুলি খাও, তবে আমরা কাহারও সাক্ষাতে এ সকল কথা বলিব না।”

ব্রাহ্মণ তখন প্রফুল্ল হইল; প্রফুল্ল বদনে পুনশ্চ আহারে বসিল—ইচ্ছা, অঙ্গের অড়হর ডালটুকুও মুছিয়া লয়, কিন্তু তাহা পারিল না, কিংবা সাহস করিল না। আশমানির জন্য যে ভাত মাখিয়াছিল, তাহা খাইল। বিনষ্ট অড়হরের জন্য অনেক পরিতাপ করিল। আহার সমাপনান্তে আশমানি তাহাকে স্নান করাইল। পরে ব্রাহ্মণ স্থির হইলে বিমলা কহিলেন, "রসিক! একটা বড় ভারি কথা আছে।"

রসিক কহিলেন, "কি ?"

বি। তুমি আমাদের ভালবাস ?

দি। বাসি নে ?

বি। দুই জনকেই ?

দি। দুইজনকেই।

বি। যা বলি, তা পারিবে ?

দি। পারিব না ?

বি। এখনই ?

দি। এখনই।

বি। এই দণ্ডে ?

দি। এই দণ্ডে।

বি। আমরা দুজনে কেন এসেছি জান ?

দি। না।

আশমানি কহিল, "আমরা তোমার সঙ্গে পলাইয়া যাব।"

ব্রাহ্মণ অবাক্ হইয়া হাঁ করিয়া রহিলেন। বিমলা কষ্টে উচ্চ হাসি সম্বরণ করিলেন। কহিলেন, "কথা কও না যে ?"

"অ্যাঁ, অ্যাঁ, তা তা তা তা"—বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইয়া উঠিল না।

আশমানি কহিল, "তবে কি পারিবে না ?"

"অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ, তা তা—স্বামিঠাকুরকে বলিয়া আসি।"

বিমলা কহিলেন, "স্বামিঠাকুরকে আবার বলবে কি ? এ কি তোমার মাতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত যে স্বামিঠাকুরের কাছে ব্যবস্থা নিতে যাবে ?"

দি। না, না, তা যাব না; তা কবে যেতে হবে ?

বি। কবে? এখনই চল, দেখিতেছ না, আমি গহনাপত্র লইয়া বাহির হইয়াছি।

দি। এখনই ?

বি। এখনই না ত কি ? নহিলে বল, আমরা অন্য লোকের তল্লাস করি।

গজপতি আর থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন, "চল, যাইতেছি।"

বিমলা বলিলেন, “দোছোট লও।”
দিগ্‌গজ নামাবলী গায়ে দিলেন। বিমলা অগ্রে, ব্রাহ্মণ পশ্চাতে যাত্রা করেন, এমন সময়ে দিগ্‌গজ বলিলেন, “সুন্দরি!”
বি। কি ?
দি। আবার আসিবে কবে ?
বি। আসিব কি আবার ? একেবারে চলিলাম।
হাসিতে দিগ্‌গজের মুখ পরিপূর্ণ হইল, বলিলেন, “তৈজসপত্র রহিল যে।”
বি। ও সব তোমায় কিনে দিব।
ব্রাহ্মণ কিছু ক্ষুণ্ন হইলেন; কি করেন, স্ত্রীলোকেরা মনে করিবে, আমাদের ভালবাসে না, অভাব পক্ষে বলিলেন, “খুঙ্গীপতি?”
বিমলা বলিলেন, “শীঘ্র লও।”
বিদ্যাদিগ্‌গজের সবে দুখানি পুতি,—ব্যাকরণ আর একখানি স্মৃতি। ব্যাকরণখানি হস্তে লইয়া বলিলেন, “এখানিতে কাজই বা কি, এ ত আমার কণ্ঠে আছে।” এই বলিয়া কেবল স্মৃতিখানি খুঙ্গীর মধ্যে লইলেন। ‘দুর্গা শ্রীহরি’ বলিয়া বিমলা ও আশমানির সহিত যাত্রা করিলেন।
আশমানি কহিল, “তোমরা আগু হও, আমি পশ্চাৎ যাইতেছি।”
এই বলিয়া আশমানি গৃহে গেল, বিমলা ও গজপতি একত্র চলিলেন। অন্ধকারে উভয়ে অলক্ষ্য থাকিয়া দুর্গদ্বারের বাহির হইলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দিগ্‌গজ কহিলেন, “কই, আশমানি আসিল না ?”
বিমলা কহিলেন, “সে বুঝি আসিতে পারিল না। আবার তাকে কেন ?”
রসিকরাজ নীরব হইয়া রহিলেন। ক্ষণেক পরে নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, “তৈজসপত্র।”

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদঃ দিগ্‌গজের সাহস

বিমলা দ্রুতপাদবিক্ষেপে শীঘ্র মান্দারণ পশ্চাৎ করিলেন। নিশা অত্যন্ত অন্ধকার, নক্ষত্রালোকে সাবধানে চলিতে লাগিলেন। প্রান্তরপথে প্রবেশ করিয়া বিমলা কিঞ্চিৎ শঙ্কান্বিতা হইলেন; সমভিব্যাহারী নিঃশব্দে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছেন, বাক্যব্যয়ও নাই। এমন সময়ে মনুষ্যের কণ্ঠস্বর শুনিলে কিছু সাহস হয়, শুনিতে ইচ্ছাও করে। এই জন্য বিমলা গজপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “রসিকরতন! কি ভাবিতেছ ?”
রসিকরতন বলিলেন, “বলি তৈজসপত্রগুলো!”
বিমলা উত্তর না দিয়া, মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিলেন।
ক্ষণেক কাল পরে, বিমলা আবার কথা কহিলেন, “দিগ্‌গজ, তুমি ভূতের ভয় কর?”
“রাম! রাম! রাম! রামনাম বল” বলিয়া দিগ্‌গজ বিমলার পশ্চাতে দুই হাত সরিয়া আসিলেন।
একে পায়, আরে চায়। বিমলা কহিলেন, “এ পথে বড় ভূতের দৌরাত্ম্য।” দিগ্‌গজ আসিয়া বিমলার অঞ্চল ধরিলেন। বিমলা বলিতে লাগিলেন, “আমরা সেদিন

শৈলেশ্বরের পূজা দিয়া আসিতেছিলাম, পথের মধ্যে বটতলায় দেখি যে, এক বিকটাকার মূর্ত্তি!”
অঞ্চলের তাড়নায় বিমলা জানিতে পারিলেন যে, ব্রাহ্মণ থরহরি কাঁপিতেছে; বুঝিলেন যে, আর অধিক বাড়াবাড়ি করিলে ব্রাহ্মণের গতিশক্তি রহিত হইবে। অতএব ক্ষান্ত হইয়া কহিলেন, “রসিকরাজ! তুমি গাইতে জান ?”
রসিক পুরুষ কে কোথায় সঙ্গীতে অপটু ? দিগ্‌গজ বলিলেন, “জানি বৈ কি।”
বিমলা বলিলেন, “একটি গীত গাও দেখি!”
দিগ্‌গজ আরম্ভ করিলেন,
“এ হুম্-উ, হুম-
সই, কি ক্ষণে দেখিলাম শ্যামে কদম্বেরি ডালে।”
পথের ধারে একটা গাভী শয়ন করিয়া রোমন্থন করিতেছিল, অলৌকিক শব্দ শুনিয়া বেগে পলায়ন করিল।
রসিকের গীত চলিতে লাগিল।

“সেই দিন পুড়িল কপাল মোর—
কালি দিলাম কুলে।
মাথায় চূড়া, হাতে বাঁশী কথা কয় হাসি হাসি;
বলে ও গোয়ালা মাসী—কলসী দিব ফেলে।”

দিগ্‌গজের আর গান হইল না; হঠাৎ তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয় একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল; অমৃতময়, মানসোন্মাদকর, অপ্সরোহস্তস্থিত বীণাশব্দবৎ মধুর সঙ্গীতধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। বিমলা নিজে পূর্ণস্বরে সঙ্গীত আরম্ভ করিয়াছিলেন।
নিস্তব্ধ প্রান্তরমধ্যে নৈশ গগন ব্যাপিয়া সেই সপ্তস্বরপরিপূর্ণ ধ্বনি উঠিতে লাগিল। শীতল নৈদাঘ পবনে ধ্বনি আরোহণ করিয়া চলিল।
দিগ্‌গজ নিশ্বাস রহিত করিয়া শুনিতে লাগিলেন। যখন বিমলা সমাপ্ত করিলেন, তখন গজপতি কহিলেন, “আবার।”
বি। আবার কি ?
দি। আবার একটি গাও।
বি। কি গায়িব ?
দি। একটি বাঙ্‌লা গাও।
“গায়িতেছি” বলিয়া বিমলা পুনর্ব্বার সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন।
গীত গায়িতে গায়িতে বিমলা জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার অঞ্চলে বিষম টান পড়িয়াছে; পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, গজপতি একেবারে তাঁহার গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছেন, প্রাণপণে তাঁহার অঞ্চল ধরিয়াছেন। বিমলা বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, “কি হইয়াছে ? আবার ভূত না কি ?”
ব্রাহ্মণের বাক্য সরে না। কেবল অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন, “ঐ।”
বিমলা নিস্তব্ধ হইয়া সেই দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ঘন ঘন প্রবল নিশ্বাসশব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, এবং নির্দ্দিষ্ট দিকে পথপার্শ্বে একটা পদার্থ

দেখিতে পাইলেন।
সাহসে নির্ভর করিয়া নিকটে গিয়া বিমলা দেখিলেন, একটি সুগঠন সুসজ্জীভূত অশ্ব মৃত্যুযাতনায় পড়িয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে।
বিমলা পথ বাহন করিতে লাগিলেন। সুসজ্জীভূত সৈনিক অশ্ব পথিমধ্যে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখিয়া তিনি চিন্তমগ্ন হইলেন। অনেকক্ষণ কথা কহিলেন না। প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ অতিবাহিত করিলে, গজপতি আবার তাঁহার অঞ্চল ধরিয়া টানিলেন।
বিমলা বলিলেন, "কি ?"
গজপতি একটি দ্রব্য লইয়া দেখাইলেন। বিমলা দেখিয়া বলিলেন, "এ সিপাহির পাগড়ি।" বিমলা পুনর্ব্বার চিন্তায় মগ্ন হইলেন, আপনা আপনি কহিতে লাগিলেন, "যারই ঘোড়া, তারই পাগড়ি ? না, এ ত পদাতিকের পাগড়ি।"
কিয়ৎক্ষণ পরে চন্দ্রোদয় হইল। বিমলা অধিকতর অন্যমনা হইলেন। অনেকক্ষণ পরে গজপতি সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুন্দরি, আর কথা কহ না যে ?"
বিমলা কহিলেন, "পথে কিছু চিহ্ন দেখিতেছ ?"
গজপতি বিশেষ মনোযোগের সহিত পথ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া কহিলেন, "দেখিতেছি, অনেক ঘোড়ার পায়ের চিহ্ন।"
বি। বুদ্ধিমান্—কিছু বুঝিতে পারিলে ?
দি। না।
বি। ওখানে মরা ঘোড়া, সেখানে সিপাহির পাগড়ি, এখানে এত ঘোড়ার পায়ের চিহ্ন, এতে কিছু বুঝিতে পারিলে না ?—কারেই বা বলি!
দি। কি ?
বি। এখনই বহুতর সেনা এই পথে গিয়াছে।
গজপতি ভীত হইয়া কহিলেন, "তবে একটু আস্তে হাঁট; তারা খুব আগু হইয়া যাক।"
বিমলা হাস্য করিয়া বলিলেন, "মূর্খ! তাহারা আগু হইবে কি ? কোন্ দিকে ঘোড়ার খুরের সম্মুখ, দেখিতেছ না ? এ সেনা গড় মান্দারণে গিয়াছে" বলিয়া বিমলা বিমর্ষ হইয়া রহিলেন।
অচিরাৎ শৈলেশ্বরের মন্দিরের ধবল শ্রী নিকটে দেখিতে পাইলেন। বিমলা ভাবিলেন যে, রাজপুত্রের সহিত ব্রাহ্মণের সাক্ষাতের কোন প্রয়োজন নাই; বরং তাহাতে অনিষ্ট আছে। অতএব কি প্রকারে তাহাকে বিদায় দিবেন, চিন্তা করিতেছিলেন। গজপতি নিজেই তাহার সূচনা করিয়া দিলেন।
ব্রাহ্মণ পুনর্ব্বার বিমলার পৃষ্ঠের নিকট আসিয়া অঞ্চল ধরিয়াছেন; বিমলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার কি?"
ব্রাহ্মণ অস্ফুট স্বরে কহিলেন, "সে কত দূর ?"
বি। কি কত দূর ?
দি। সেই বটগাছ ?
বি। কোন্ বটগাছ ?
দি। যেখানে তোমরা সেদিন দেখেছিলে ?

বি। কি দেখেছিলাম ?
দি। রাত্রিকালে নাম করিতে নাই।
বিমলা বুঝিতে পারিয়া সুযোগ পাইলেন।
গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “ইঃ!”
ব্রাহ্মণ অধিকতর ভীত হইয়া কহিলেন, “কি গা ?”
বিমলা অস্ফুট স্বরে শৈলেশ্বরনিকটস্থ বটবৃক্ষের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, “সে ঐ বটতলা।”
দিগ্‌গজ আর নড়িলেন না; গতিশক্তিরহিত, অশ্বত্থপত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন।
বিমলা বলিলেন, “আইস।”
ব্রাহ্মণ কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন, “আমি আর যাইতে পারিব না।”
বিমলা কহিলেন, “আমারও ভয় করিতেছে।”
ব্রাহ্মণ এই শুনিয়া পা ফিরাইয়া পলায়নোদ্যত হইলেন।
বিমলা বৃক্ষপানে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, বৃক্ষমূলে একটা ধবলাকার কি পদার্থ রহিয়াছে। তিনি জানিতেন যে, বৃক্ষমূলে শৈলেশ্বরের ষাঁড় শুইয়া থাকে; কিন্তু গজপতিকে কহিলেন, “গজপতি! ইষ্টদেবের নাম জপ; বৃক্ষমূলে কি দেখিতেছ ?”
“ও গো— বাবা গো—” বলিয়াই দিগ্‌গজ একেবারে চম্পট। দীর্ঘ দীর্ঘ চরণ—তিলার্দ্ধ মধ্যে অর্দ্ধ ক্রোশ পার হইয়া গেলেন।
বিমলা গজপতির স্বভাব জানিতেন; অতএব বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি একেবারে দুর্গ-দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইবেন।
বিমলা তখন নিশ্চিন্ত হইয়া মন্দিরাভিমুখে চলিলেন।
বিমলা সকল দিক ভাবিয়া আসিয়াছিলেন, কেবল একদিক ভাবিয়া আইসেন নাই; রাজপুত্র মন্দিরে আসিয়াছেন কি ? মনে এইরূপ সন্দেহ জন্মিলে বিমলার বিষম ক্লেশ হইল। মনে করিয়া দেখিলেন যে, রাজপুত্র আসার নিশ্চিত কথা কিছুই বলেন নাই; কেবল বলিয়াছিলেন যে, “এইখানে আমার সাক্ষাৎ পাইবে; এখানে না দেখা পাও, তবে সাক্ষাৎ হইল না।” তবে ত না আসারও সম্ভাবনা।
যদি না আসিয়া থাকেন, তবে এত ক্লেশ বৃথা হইল। বিমলা বিষণ্ন হইয়া আপনা আপনি কহিতে লাগিলেন, “এ কথা আগে কেন ভাবি নাই ? ব্রাহ্মণকেই বা কেন তাড়াইলাম ? একাকিনী এ রাত্রে কি প্রকারে ফিরিয়া যাইব! শৈলেশ্বর! তোমার ইচ্ছা!”
বটবৃক্ষতল দিয়া শৈলেশ্বর-মন্দিরে উঠিতে হয়। বিমলা বৃক্ষতল দিয়া যাইতে দেখিলেন যে, তথায় ষণ্ড নাই; বৃক্ষমূলে যে ধবল পদার্থ দেখিয়াছিলেন, তাহা আর তথায় নাই। বিমলা কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন; ষণ্ড কোথাও উঠিয়া গেলে প্রান্তর মধ্যে দেখা যাইত।
বিমলা বৃক্ষমূলের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিপাত করিলেন; বোধ হইল, যেন বৃক্ষের পশ্চাদ্দিকস্থ কোন মনুষ্যের ধবল পরিচ্ছদের অংশমাত্র দেখিতে পাইলেন, সাতিশয় চঞ্চলপদে মন্দিরাভিমুখে চলিলেন; সবলে কবাট করতাড়িত করিলেন।
কবাট বন্ধ। ভিতর হইতে গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন হইল, “কে ?”
শূন্য মন্দিরমধ্য হইতে গম্ভীর স্বরে প্রতিধ্বনি হইল, “কে ?”

বিমলা প্রাণপণে সাহসে ভর করিয়া কহিলেন “পথ-শ্রান্ত স্ত্রীলোক।”
কবাট মুক্ত হইল।
দেখিলেন, মন্দিরমধ্যে প্রদীপ জ্বলিতেছে, সম্মুখে কৃপাণকোষ-হস্তে এক দীর্ঘাকার পুরুষ দণ্ডায়মান। বিমলা দেখিয়া চিনিলেন, কুমার জগৎসিংহ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদঃ শৈলেশ্বর সাক্ষাৎ

বিমলা মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমে বসিয়া একটু স্থির হইলেন। পরে নতভাবে শৈলেশ্বরকে প্রণাম করিয়া যুবরাজকে প্রণাম করিলেন। কিয়ৎক্ষণ উভয়েই নীরব হইয়া রহিলেন, কে কি বলিয়া আপন মনোগত ভাব ব্যক্ত করিবেন ? উভয়েরই সঙ্কট। কি বলিয়া প্রথমে কথা কহিবেন ?
বিমলা এ বিষয়ের সন্ধিবিগ্রহে পণ্ডিতা, ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, “যুবরাজ! আজ শৈলেশ্বরের অনুগ্রহে আপনার দর্শন পাইলাম, একাকিনী এ রাত্রে প্রান্তরমধ্যে আসিতে ভীতা হইয়াছিলাম, এক্ষণে মন্দিরমধ্যে আপনার দর্শনে সাহস পাইলাম।”
যুবরাজ কহিলেন, “তোমাদিগের মঙ্গল ত ?”
বিমলার অভিপ্রায়, প্রথমে জানেন—রাজকুমার যথার্থ তিলোত্তমাতে অনুরক্ত কি না, পশ্চাৎ অন্য কথা কহিবেন। এই ভাবিয়া বলিলেন, “যাহাতে মঙ্গল হয় সেই প্রার্থনাতেই শৈলেশ্বরের পূজা করিতে আসিয়াছি। এক্ষণে বুঝিলাম, আপনার পূজাতেই শৈলেশ্বর পরিতৃপ্ত আছেন, আমার পূজা গ্রহণ করিবেন না, অনুমতি হয় ত প্রতিগমন করি।”
যুব। যাও। একাকিনী তোমার যাওয়া উচিত হয় না, আমি তোমাকে রাখিয়া আসি।
বিমলা দেখিলেন যে, রাজপুত্র, যাবজ্জীবন কেবল অস্ত্র শিক্ষা করেন নাই। বিমলা উত্তর করিলেন, “একাকিনী যাওয়া অনুচিত কেন ?”
যুব। পথে নানা ভীতি আছে।
বি। তবে আমি মহারাজ মানসিংহের নিকটে যাইব।
রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন ?”
বি। কেন ? তাঁহার কাছে নালিশ আছে। তিনি যে সেনাপতি নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহা কর্তৃক আমাদিগের পথের ভয় দূর হয় না। তিনি শত্রুনিপাতে অক্ষম।
রাজপুত্র সহাস্যে উত্তর করিলেন, “সেনাপতি উত্তর করিবেন যে, শত্রুনিপাত দেবের অসাধ্য, মনুষ্য কোন্ ছার! উদাহরণ, স্বয়ং মহাদেব তপোবনে মন্মথ শত্রুকে ভস্মরাশি করিয়াছিলেন; অদ্য পক্ষমাত্র হইল, সেই মন্মথ তাঁহার এই মন্দিরমধ্যেই বড় দৌরাত্ম্য করিয়াছে।”
বিমলা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, “এত দৌরাত্ম্য কাহার প্রতি হইয়াছে ?”
যুবরাজ কহিলেন, “সেনাপতির প্রতিই হইয়াছে।”
বিমলা কহিলেন, “মহারাজ এমন অসম্ভব কথা বিশ্বাস করিবেন কেন ?
যুব। আমার সাক্ষী আছে।
বি। মহাশয়, এমন সাক্ষী কে ?

যুব। সুচরিত্রে—

রাজপুত্রের বাক্য শেষ না হইতে হইতে বিমলা কহিলেন, “দাসী অতি কুচরিত্রা। আমাকে বিমলা বলিয়া ডাকিবেন।”

রাজপুত্র বলিলেন, “বিমলাই তাহার সাক্ষী।”

বি। বিমলা এমত সাক্ষ্য দিবে না।

যুব। সম্ভব বটে; যে ব্যক্তি পক্ষমধ্যে আত্মপ্রতিশ্রুতি বিস্মৃতা হয়, সে কি সত্য সাক্ষ্য দিয়া থাকে?

বি। মহাশয়! কি প্রতিশ্রুত ছিলাম, স্মরণ করাইয়া দিন।

যুব। তোমার সখীর পরিচয়।

বিমলা সহসা ব্যঙ্গপ্রিয়তা ত্যাগ করিলেন; গম্ভীরভাবে কহিলেন, “যুবরাজ! পরিচয় দিতে সঙ্কোচ হয়। পরিচয় পাইয়া আপনি যদি অসুখী হন ?”

রাজপুত্র কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন; তাঁহার ব্যঙ্গাসক্ত ভাব দূর হইল; চিন্তা করিয়া বলিলেন, “বিমলে! যথার্থ পরিচয়ে কি আমার অসুখের কারণ আছে ?”

বিমলা কহিলেন, “আছে।”

রাজপুত্র পুনরায় চিন্তামগ্ন হইলেন; ক্ষণ পরে কহিলেন, “যাহাই হউক, তুমি আমার মানস সফল কর; আমি যে অসহ্য উৎকণ্ঠা সহ্য করিতেছি, তাহার অপেক্ষা আর কিছুই অধিক অসুখের হইতে পারে না। তুমি যে শঙ্কা করিতেছ, যদি তাহা সত্য হয়, তবে সেও এ যন্ত্রণার অপেক্ষা ভাল; অন্তঃকরণকে প্রবোধ দিবার একটা কথা পাই। বিমলে! আমি কেবল কৌতূহলী হইয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসি নাই; কৌতূহলী হইবার আমার এক্ষণে অবকাশ নাই; অদ্য মাসার্দ্ধমধ্যে অশ্বপৃষ্ঠ ব্যতীত অন্য শয্যায় বিশ্রাম করি নাই। আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে বলিয়াই আসিয়াছি।”

বিমলা এই কথা শুনিবার জন্যই এত উদ্যম করিতেছিলেন। আরও কিছু শুনিবার জন্য কহিলেন, “যুবরাজ! আপনি রাজনীতিতে বিচক্ষণ, বিবেচনা করিয়া দেখুন, এ যুদ্ধকালে কি আপনার দুষ্প্রাপ্য রমণীতে মনোনিবেশ করা উচিত ? উভয়ের মঙ্গলহেতু বলিতেছি, আপনি আমার সখীকে বিস্মৃত হইতে যত্ন করুন; যুদ্ধের উৎসাহে অবশ্য কৃতকার্য্য হইবেন।”

যুবরাজের অধরে মনস্তাপ-ব্যঞ্জক হাস্য প্রকটিত হইল; তিনি কহিলেন, “কাহাকে বিস্মৃত হইব ? তোমার সখীর রূপ একবার দর্শনেই আমার হৃদয়মধ্যে গম্ভীরতর অঙ্কিত হইয়াছে, এ হৃদয় দগ্ধ না হইলে তাহা আর মিলায় না। লোকে আমার হৃদয় পাষাণ বলিয়া থাকে, পাষাণে যে মূর্ত্তি অঙ্কিত হয়, পাষাণ নষ্ট না হইলে তাহা আর মিলায় না। যুদ্ধের কথা কি বলিতেছ, বিমলে! আমি তোমার সখীকে দেখিয়া অবধি কেবল যুদ্ধেই নিযুক্ত আছি। কি রণক্ষেত্রে—কি শিবিরে, এক পল সে মুখ ভুলিতে পারি নাই; যখন মস্তকচ্ছেদ করিতে পাঠান খড়্গ তুলিয়াছে, তখন মরিলে সে মুখ যে আর দেখিতে পাইব না, একবার ভিন্ন আর দেখা হইল না, সেই কথাই আগে মনে পড়িয়াছে। বিমলে! কোথা গেলে তোমার সখীকে দেখিতে পাইব ?”

বিমলা আর শুনিয়া কি করিবেন! বলিলেন, “গড় মান্দারণে আমার সখীর দেখা পাইবেন। তিলোত্তমা সুন্দরী বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা।”

জগৎসিংহের বোধ হইল যেন, তাঁহাকে কালসর্প দংশন করিল। তরবারে ভর করিয়া অধোমুখে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, “তোমারই কথা সত্য হইল। তিলোত্তমা আমার হইবে না। আমি যুদ্ধক্ষেত্রে চলিলাম; শত্রুরক্তে আমার সুখাভিলাষ বিসর্জ্জন দিব।”

বিমলা রাজপুত্রের কাতরতা দেখিয়া বলিলেন, “যুবরাজ! স্নেহের যদি পুরস্কার থাকিত,; তবে আপনি তিলোত্তমা লাভ করিবার যোগ্য। একেবারেই বা কেন নিরাশ হন? আজ বিধি বৈরী, কাল বিধি সদয় হইতে পারেন।”

আশা মধুরভাষিণী। অতি দুর্দ্দিনে মনুষ্য-শ্রবণে মৃদু মৃদু কহিয়া থাকে, "মেঘ ঝড় চিরস্থায়ী নহে, কেন দুঃখিত হও ? আমার কথা শুন।" বিমলার মুখে আশা কথা কহিল, "কেন দুঃখিত হও? আমার কথা শুন।"
জগৎসিংহ আশার কথা শুনিলেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা কে বলিতে পারে ? বিধাতার লিপি কে অগ্রে পাঠ করিতে পারে ? এ সংসারে অঘটনীয় কি আছে ? এ সংসারে কোন্ অঘটনীয় ঘটনা না ঘটিয়াছে?
রাজপুত্র আশার কথা শুনিলেন।
কহিলেন, "যাহাই হউক, অদ্য আমার মন অত্যন্ত অস্থির হইয়াছে; কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা অদৃষ্টে থাকে পশ্চাৎ ঘটিবে; বিধাতার লিপি কে খণ্ডাইবে ? এখন কেবল আমার মন ব্যক্ত করিয়া কহিতে পারি। এই শৈলেশ্বর সাক্ষাৎ সত্য করিতেছি যে, তিলোত্তমা ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভালবাসিব না। তোমার কাছে আমার এই ভিক্ষা যে, তুমি আমার সকল কথা তোমার সখীর সাক্ষাতে কহিও; আর কহিও যে, আমি কেবল একবার মাত্র তাঁহার দর্শনের ভিখারী, দ্বিতীয়বার আর এ ভিক্ষা করিব না, স্বীকার করিতেছি।"
বিমলার মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল। তিনি কহিলেন, "আমার সখীর প্রত্যুত্তর মহাশয় কি প্রকারে পাইবেন ?"
যুবরাজ কহিলেন, "তোমাকে বারংবার ক্লেশ দিতে পারি না, কিন্তু যদি তুমি পুনর্ব্বার এই মন্দিরে আমার সহিত সাক্ষাৎ কর, তবে তোমার নিকট বিক্রীত থাকিব। জগৎসিংহ হইতে কখন না কখন প্রত্যুপকার হইতে পারিবে।"
বিমলা কহিলেন, "যুবরাজ, আমি আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী; কিন্তু একাকিনী রাত্রে এ পথে আসিতে অত্যন্ত ভয় পাই, অঙ্গীকার পালন না করিলেই নয়, এইজন্যই আজ আসিয়াছি। এক্ষণে এ প্রদেশ শত্রুব্যস্ত হইয়াছে; পুনর্ব্বার আসিতে বড় ভয় পাইব।"
রাজপুত্র ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিলেন, "তুমি যদি হানি বিবেচনা না কর, তবে আমি তোমার সহিত গড় মান্দারণে যাই। আমি তথায় উপযুক্ত স্থানে অপেক্ষা করিব, তুমি আমাকে সংবাদ আনিয়া দিও।"
বিমলা হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, "তবে চলুন।"
উভয়ে মন্দির হইতে নির্গত হইতে যান, এমন সময়ে মন্দিরের বাহিরে সাবধান-ন্যস্ত মনুষ্য-পদ-বিক্ষেপের শব্দ হইল। রাজপুত্র কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া, বিমলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কেহ সমভিব্যাহারী আছে ?"
বিমলা কহিলেন, "না।"
"তবে কার পদধ্বনি হইল ? আমার আশঙ্কা হইতেছে, কেহ অন্তরাল হইতে আমাদিগের কথোপকথন শুনিয়াছে।"
এই বলিয়া রাজপুত্র বাহিরে আসিয়া মন্দিরের চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করিয়া দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদঃ বীরপঞ্চমী

উভয়ে শৈলেশ্বর প্রণাম করিয়া, সশঙ্কচিত্তে গড় মান্দারণ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিঞ্চিৎ নীরবে গেলেন। কিছু দূর গিয়া রাজকুমার প্রথমে কথা কহিলেন, "বিমলে, আমার এক বিষয়ে কৌতূহল আছে। তুমি শুনিয়া কি বলিবে বলিতে পারি না।"

বিমলা কহিলেন, "কি ?"
যুব। আমার মনে প্রতীতি জন্মিয়াছে, তুমি কদাপি পরিচারিকা নও।
বিমলা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "এ সন্দেহ আপনার মনে কেন জন্মিল ?
যুব। বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা যে অম্বরপতির পুত্রবধূ হইতে পারেন না, তাহার বিশেষ কারণ আছে। সে অতি গুহ্য বৃত্তান্ত; তুমি পরিচারিকা হইলে সে গুহ্য কাহিনী কি প্রকারে জানিবে ?
বিমলা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। কিঞ্চিৎ কাতরস্বরে কহিলেন, "আপনি যথার্থ অনুভব করিয়াছেন; আমি পরিচারিকা নহি। অদৃষ্টক্রমে পরিচারিকার ন্যায় আছি। অদৃষ্টকেই বা কেন দোষি? আমার অদৃষ্ট মন্দ নহে!"
রাজকুমার বুঝিলেন যে, এই কথায় বিমলার মনোমধ্যে পরিতাপ উদয় হইয়াছে; অতএব তৎসম্বন্ধে আর কিছু বলিলেন না। বিমলা স্বতঃ কহিলেন, "যুবরাজ, আপনার নিকট পরিচয় দিব; কিন্তু এক্ষণে নয়। ও কি শব্দ ? পশ্চাৎ কেহ আসিতেছে ?"
এই সময়ে পশ্চাৎ পশ্চাৎ মনুষ্যের পদধ্বনি স্পষ্ট শ্রূত হইল। এমন বোধ হইল, যেন দুইজন মনুষ্য কাণে কাণে কথা কহিতেছে। তখন মন্দির হইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ অতিক্রম হইয়াছিল। রাজপুত্র কহিলেন, "আমার অত্যন্ত সন্দেহ হইতেছে, আমি দেখিয়া আসি।"
এই বলিয়া রাজপুত্র কিছু পথ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন এবং পথের পার্শ্বেও অনুসন্ধান করিলেন; কোথাও মনুষ্য দেখিতে পাইলেন না। প্রত্যাগমন করিয়া বিমলাকে কহিলেন, "আমার সন্দেহ হইতেছে, কেহ আমাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছে। সাবধানে কথা কহা ভাল!"
এখন উভয়ে অতি মৃদুস্বরে কথা কহিতে কহিতে চলিলেন। ক্রমে গড় মান্দারণ গ্রামে প্রবেশ করিয়া দুর্গসম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এক্ষণে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিবে কি প্রকারে ? এত রাত্রে অবশ্য ফটক বন্ধ হইয়া থাকিবে।"
বিমলা কহিলেন, "চিন্তা করিবেন না, আমি তাহার উপায় স্থির করিয়াই বাটী হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম।"
রাজপুত্র হাস্য করিয়া কহিলেন, "লুকান পথ আছে?"
বিমলাও হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন, "যেখানে চোর, সেইখানেই সিঁধ।"
ক্ষণকাল পরে পুনর্ব্বার রাজপুত্র কহিলেন, "বিমলা, এক্ষণে আর আমার যাইবার প্রয়োজন নাই। আমি দুর্গপার্শ্বস্থ এই আম্রকানন মধ্যে তোমার অপেক্ষা করিব, তুমি আমার হইয়া অকপটে তোমার সখীকে মিনতি করিও; পক্ষ পরে হয়, মাস পরে হয়, আর একবার আমি তাঁহাকে দেখিয়া চক্ষু জুড়াইব।"
বিমলা কহিলেন, "এ আম্রকাননও নির্জ্জন স্থান নহে, আপনি আমার সঙ্গে আসুন।"
যুব। কত দূর যাইব?
বি। দুর্গমধ্যে চলুন।
রাজকুমার কিঞ্চিৎ ভাবিয়া কহিলেন, "বিমলা, এ উচিত হয় না। দুর্গ-স্বামীর অনুমতি ব্যতীত আমি দুর্গমধ্যে যাইব না।"
বিমলা কহিলেন, "চিন্তা কি ?"
রাজকুমার গর্ব্বিত বচনে কহিলেন, "রাজপুত্রেরা কোন স্থানে যাইতে চিন্তা করে না। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ, অম্বরপতির পুত্রের কি উচিত যে, দুর্গ-স্বামীর অজ্ঞাতে চোরের ন্যায় দুর্গপ্রবেশ করে ?"

বিমলা কহিলেন, “আমি আপনাকে ডাকিয়া লইয়া যাইতেছি।”
রাজকুমার কহিলেন, “মনে করিও না যে, আমি তোমাকে পরিচারিকা জ্ঞানে অবজ্ঞা করিতেছি। কিন্তু বল দেখি, দুর্গমধ্যে আমাকে আহ্বান করিয়া লইয়া যাইবার তোমার কি অধিকার?”
বিমলাও ক্ষণেককাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, “আমার কি অধিকার, তাহা না শুনিলে আপনি যাইবেন না?”
উত্তর—“কদাপি যাইব না।”
বিমলা তখন রাজপুত্রের কর্ণে লোল হইয়া একটি কথা বলিলেন।
রাজপুত্র কহিলেন, “চলুন।”
বিমলা কহিলেন, “যুবরাজ, আমি দাসী, দাসীকে ‘চল’ বলিবেন।”
যুবরাজ বলিলেন, “তাই হউক।”
যে রাজপথ অতিবাহিত করিয়া বিমলা যুবরাজকে লইয়া যাইতেছিলেন, সে পথে দুর্গদ্বারে যাইতে হয়। দুর্গের পার্শ্বে আম্রকানন; সিংহদ্বার হইতে কানন অদৃশ্য। ঐ পথ হইতে যথা আমোদর অন্তঃপুরপশ্চাৎ প্রবাহিত আছে, সে দিকে যাইতে হইলে এই আম্রকানন মধ্য দিয়া যাইতে হয়। বিমলা এক্ষণে রাজবর্ত্ম ত্যাগ করিয়া রাজপুত্র সঙ্গে এই আম্রকাননে প্রবেশ করিলেন।
আম্রকানন প্রবেশাবধি, উভয়ে পুনর্ব্বার সেইরূপ শুষ্কপর্ণভঙ্গ সহিত মনুষ্য-পদধ্বনির ন্যায় শব্দ শুনিতে পাইলেন।
বিমলা কহিলেন, “আবার!”
রাজপুত্র কহিলেন, “তুমি পুনরপি ক্ষণেক দাঁড়াও, আমি দেখিয়া আসি।”
রাজপুত্র অসি নিষ্কোষিত করিয়া যে দিকে শব্দ হইতেছিল, সেই দিকে গেলেন; কিন্তু কিছু দেখিতে পাইলেন না। আম্রকাননতলে নানা প্রকার আরণ্য লতাদির সমৃদ্ধিতে এমন বন হইয়াছিল এবং বৃক্ষাদির ছায়াতে রাত্রে কাননমধ্যে এমন অন্ধকার হইয়াছিল যে, রাজপুত্র যেখানে যান, তাহার অগ্রে অধিক দূর দেখিতে পান না। রাজপুত্র এমনও বিবেচনা করিলেন যে, পশুর পদচারণে শুষ্কপত্রভঙ্গশব্দ শুনিয়া থাকিবেন। যাহাই হউক, সন্দেহ নিঃশেষ করা উচিত বিবেচনা করিয়া, রাজকুমার অসিহস্তে আম্রবৃক্ষের উপর উঠিলেন। বৃক্ষের অগ্রভাগে আরোহণ করিয়া ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিতে করিতে, দেখিতে পাইলেন যে, এক বৃহৎ আম্রবৃক্ষের তিমিরাবৃত শাখাসমষ্টিমধ্যে দুইজন মনুষ্য বসিয়া আছে; তাহাদিগের উষ্ণীষে চন্দ্ররশ্মি পড়িয়াছে, কেবল তাহাই দেখা যাইতেছিল; অবয়ব ছায়ায় লুক্কায়িত ছিল। রাজপুত্র উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, উষ্ণীষ মস্তকে মনুষ্য বটে, তাহার সন্দেহ নাই। তিনি উত্তমরূপে বৃক্ষটি লক্ষিত করিয়া রাখিলেন যে, পুনরায় আসিলে না ভ্রম হয়। পরে ধীরে ধীরে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া নিঃশব্দে বিমলার নিকট আসিলেন। যাহা দেখিলেন, তাহা বিমলার নিকট বর্ণন করিয়া কহিলেন, “এ সময়ে যদি দুইটা বর্শা থাকিত!”
বিমলা কহিলেন, “বর্শা লইয়া কি করিবেন ?”
জ। তাহা হইলে ইহারা কে, জানিতে পারিতাম; লক্ষণ ভাল বোধ হইতেছে না। উষ্ণীষ দেখিয়া বোধ হইতেছে, দুরাত্মা পাঠানেরা কোন মন্দ অভিপ্রায়ে আমাদের সঙ্গ লইয়াছে।
তৎক্ষণাৎ বিমলার পথপার্শ্বস্থ মৃত অশ্ব, উষ্ণীষ আর অশ্বসৈন্যের পদচিহ্ন স্মরণ হইল। তিনি কহিলেন, “আপনি তবে এখানে অপেক্ষা করুন; আমি পলকমধ্যে

দুর্গ হইতে বর্শা আনিতেছি।”
এই বলিয়া বিমলা ঝটিতি দুর্গমূলে গেলেন। যে কক্ষে বসিয়া সেই রাত্রি প্রদোষে কেশবিন্যাস করিয়াছিলেন, তাহার নীচের কক্ষের একটি গবাক্ষ আম্রকাননের দিকে ছিল। বিমলা অঞ্চল হইতে একটি চাবি বাহির করিয়া ঐ কলে ফিরাইলেন; পশ্চাৎ জানালার গরাদে ধরিয়া দেয়ালের দিকে টান দিলেন; শিল্পকৌশলের গুণে কবাট; চৌকাট, গরাদে সকল সমেত দেয়ালের মধ্যে এক রন্ধ্রে প্রবেশ করিল, বিমলার কক্ষমধ্যে প্রবেশ জন্য পথ মুক্ত হইল। বিমলা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেয়ালের মধ্য হইতে জানালার চৌকাঠ ধরিয়া টানিলেন; জানালা বাহির হইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বস্থানে স্থির হইল ; কবাটের ভিতর দিকে পূর্ব্ববৎ গা-চাবির কল ছিল, বিমলা অঞ্চলের চাবি লইয়া ঐ কলে লাগাইলেন। জানালা নিজ স্থানে দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হইল, বাহির হইতে উদঘাটিত হইবার সম্ভাবনা রহিল না।
বিমলা অতি দ্রুতবেগে দুর্গের শেলেখানায় গেলেন। শেলেখানায় প্রহরীকে কহিলেন, “আমি তোমার নিকট যাহা চাহি,তুমি কাহারও সাক্ষাৎ বলিও না। আমাকে দুইটা বর্শা দাও—আবার আনিয়া দিব”।
প্রহরী চমৎকৃত হইল। কহিল, “মা, তুমি বর্শা লইয়া কি করিবে ?”
প্রত্যুৎপন্নমতি বিমলা কহিলেন, “আজ আমার বীরপঞ্চমীর ব্রত, ব্রত করিলে বীর পুত্র হয়; তাহাতে রাত্রে অস্ত্র পূজা করিতে হয়; আমি পুত্র কামনা করি, কাহারও সাক্ষাৎ প্রকাশ করিও না।”
প্রহরীকে যেরূপ বুঝাইল, সেও সেইরূপ বুঝিল। দুর্গস্থ সকল ভৃত্য বিমলার আজ্ঞাকারী ছিল; সুতরাং দ্বিতীয় কথা না কহিয়া দুইটা শাণিত বর্শা দিল।
বিমলা বর্শা লইয়া পূর্ব্ববেগে গবাক্ষের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া পূর্ব্ববৎ ভিতর হইতে জানালা খুলিলেন,, এবং বর্শা সহিত নির্গত ইহয়া জগৎসিংহের নিকটে গেলেন।
ব্যস্ততা প্রযুক্তই হউক, বা নিকটেই থাকিবেন এবং তৎক্ষণেই প্রত্যাগমন করিবেন, এই বিশ্বাসজনিত নিশ্চিন্তভাব প্রযুক্তই হউক, বিমলা বহির্গমনকালে জালরন্ধ্রপথ পূর্ব্ববৎ অবরুদ্ধ করিয়া যান নাই। ইহাতে প্রমাদ ঘটনার এক কারণ উপস্থিত হইল। জানালার অতি নিকটে এক আম্রবৃক্ষ ছিল, তাহার অন্তরালে এক শস্ত্রধারী পুরুষ দণ্ডায়মান ছিল; সে বিমলার এই ভ্রম দেখিতে পাইল। বিমলা যতক্ষণ না দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিলেন, ততক্ষণ শস্ত্রপাণি পুরুষ বৃক্ষের অন্তরালে রহিল; বিমলা দৃষ্টির অগোচর হইলেই সে ব্যক্তি বৃক্ষমূলে শব্দশীল চর্ম্মপাদুকা ত্যাগ করিয়া শনৈঃ শনৈঃ পাদবিক্ষেপে গবাক্ষসন্নিধানে আসিল। প্রথমে গবাক্ষের মুক্তপথে কক্ষমধ্যে দৃষ্টিপাত করিল, কক্ষমধ্যে কেহ নাই দেখিয়া, নিঃশব্দে প্রবেশ করিল। পরে সেই কক্ষের দ্বার দিয়া অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিল।
এদিকে রাজপুত্র বিমলার নিকট বর্শা পাইয়া পূর্ব্ববৎ বৃক্ষারোহণ করিলেন এবং পূর্ব্বলক্ষিত বৃক্ষে দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন যে, এক্ষণে একটিমাত্র উষ্ণীষ দেখা যাইতেছে, দ্বিতীয় ব্যক্তি তথায় নাই; রাজপুত্র একটি বর্শা বাম করে রাখিয়া, দ্বিতীয় বর্শা দক্ষিণ করে গ্রহণপূর্ব্বক, বৃক্ষস্থ উষ্ণীষ লক্ষ্য করিলেন। পরে বিশাল বাহুবল সহযোগে বর্শা নিক্ষেপ করিলেন। তৎক্ষণাৎ প্রথমে বৃক্ষপল্লবের প্রবল মর্ম্মর শব্দ, তৎপরেই ভূতলে গুরু পদার্থের পতন শব্দ হইল; উষ্ণীষ আর বৃক্ষে নাই। রাজপুত্র বুঝিলেন যে, তাঁহার অব্যর্থ সন্ধানে উষ্ণীষধারী বৃক্ষশাখাচ্যুত ইহয়া ভূতলে পড়িয়াছে।
জগৎসিংহ দ্রুতগতি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া, যথা আহত ব্যক্তি পতিত হইয়াছে,তথা গেলেন; দেখিলেন যে, একজন সৈনিক-বেশধারী সশস্ত্র মুসলমান মৃতবৎ পতিত হইয়া রহিয়াছে। বর্শা তাহার চক্ষুর পার্শ্বে বিদ্ধ হইয়াছে।
রাজপুত্র মৃতবৎ দেহ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, একেবারে প্রাণবিয়োগ হইয়াছে। বর্শা চক্ষুর পার্শ্বে বিদ্ধ হইয়া তাহার মস্তিষ্ক ভেদ করিয়াছে। মৃত ব্যক্তির কবচমধ্যে একখানি পত্র ছিল; তাহার অল্পভাগ বাহির হইয়াছিল। জগৎসিংহ ঐ পত্র লইয়া জ্যোৎস্নায় আনিয়া পাঠ করিলেন। তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল—

"কতলু খাঁর আজ্ঞানুবর্ত্তিগণ এই লিপি দৃষ্টিমাত্র লিপিকাবাহকের আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে।"
কতলু খাঁ।"

বিমলা কেবল শব্দ শুনিতেছিলেন মাত্র, সবিশেষ কিছুই জানিতে পারেন নাই। রাজকুমার তাঁহার নিকটে আসিয়া সবিশেষ বিবৃত করিলেন। বিমলা শুনিয়া কহিলেন, "যুবরাজ! আমি এত জানিলে কখন আপনাকে বর্শা দিতাম না। আমি মহাপাতকিনী; আজ যে কর্ম্ম করিলাম, বহুকালেও ইহার প্রায়শ্চিত্ত হইবে না।"
যুবরাজ কহিলেন, "শত্রুবধে ক্ষোভ কি ? শত্রুবধ ধর্ম্মে আছে।"
বিমলা কহিলেন, যোদ্ধায় এমত বিবেচনা করুক। আমরা স্ত্রীজাতি।
ক্ষণপরে বিমলা কহিলেন, "রাজকুমার, আর বিলম্বে অনিষ্ট আছে। দুর্গে চলুন, আমি দ্বার খুলিয়া রাখিয়া আসিয়াছি।"
উভয়ে দ্রুতগতি দুর্গমূলে আসিয়া প্রথমে বিমলা, পশ্চাৎ রাজপুত্র প্রবেশ করিলেন। প্রবেশকালে রাজপুত্রের হৃৎকম্প ও পদকম্প হইল। শত সহস্র সেনার সমীপে যাঁহার মস্তকের একটি কেশও স্থানভ্রষ্ট হয় নাই, তাঁহার এ সুখের আলয়ে প্রবেশ করিতে হৃৎকম্প কেন ?
বিমলা পূর্ব্ববৎ গবাক্ষদ্বার রুদ্ধ করিলেন; পরে রাজপুত্রকে নিজ শয়নাগারে লইয়া গিয়া কহিলেন, "আমি আসিতেছি, আপনাকে ক্ষণেক এই পালঙ্কের উপর বসিতে হইবেক। যদি অন্য চিন্তা না থাকে, তবে ভাবিয়া দেখুন যে, ভগবানের আসন বটপত্র মাত্র।"
বিমলা প্রস্থান করিয়া ক্ষণপরেই নিকটস্থ কক্ষের দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন, "যুবরাজ! এই দিকে আসিয়া একটা নিবেদন শুনুন।"
যুবরাজের হৃদয় আবার কাঁপে, তিনি পালঙ্ক হইতে উঠিয়া কক্ষান্তরমধ্যে বিমলার নিকট গেলেন।
বিমলা তৎক্ষণাৎ বিদ্যুতের ন্যায় তথা হইতে সরিয়া গেলেন; যুবরাজ দেখিলেন, সুবাসিত কক্ষ; রজতপ্রদীপ জ্বলিতেছে; কক্ষপ্রান্তে অবগুণ্ঠনবতী রমণী,—সে তিলোত্তমা!

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ঃ চতুরে চতুরে

বিমলা আসিয়া নিজ কক্ষে পালঙ্কের উপর বসিলেন। বিমলার মুখ অতি হর্ষপ্রফুল্ল; তিনি গতিকে মনোরথ সিদ্ধ করিয়াছেন। কক্ষমধ্যে প্রদীপ জ্বলিতেছে; সম্মুখে মুকুর; বেশভূষা যেরূপ প্রদোষকালে ছিল, সেইরূপই রহিয়াছে; বিমলা দর্পণাভ্যন্তরে মুহূর্ত্তজন্য নিজ প্রতিমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিলেন। প্রদোষকালে যেরূপ কুটিল-কেশবিন্যাস করিয়াছিলেন, তাহা সেইরূপ রহিয়াছে; বিশাল লোচনমূলে সেইরূপ কজ্জলপ্রভা; অধরে সেইরূপ তাম্বুলরাগ; সেইরূপ কর্ণাভরণ পীবরাংসসংসক্ত হইয়া দুলিতেছে। বিমলা উপাধানে পৃষ্ঠ রাখিয়া অর্দ্ধশয়ন ,অর্দ্ধ উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন; বিমলা মুকুরে নিজ-লাবণ্য দেখিয়া হাস্য করিলেন। বিমলা এই ভাবিয়া হাসিলেন যে, দিগ্‌গজ পণ্ডিত নিতান্ত নিষ্কারণে গৃহত্যাগী হইতে চাহেন নাই।
বিমলা জগৎসিংহের পুনরাগমন প্রতীক্ষা করিয়া আছেন, এমত সময়ে আম্রকাননমধ্যে গম্ভীর তূর্য্যনিনাদ হইল। বিমলা চমকিয়া উঠিলেন এবং ভীতা হইলেন; সিংহদ্বার ব্যতীত আম্রকাননে কখনই তূর্য্যধ্বনি হইয়া থাকে না, এত রাত্রেই বা তূর্য্যধ্বনি কেন হয় ? বিশেষ সেই রাত্রে মন্দিরে গমনকালে ও প্রত্যাগমনকালে যাহা যাহা দেখিয়াছেন, তৎসমুদয় স্মরণ হইল। বিমলার তৎক্ষণাৎবিবেচনা হইল, এ তূর্য্যধ্বনি কোন অমঙ্গল ঘটনার পূর্ব্বলক্ষণ। অতএব সশঙ্কচিত্তে তিনি

বাতায়ন- সন্নিধানে গিয়া আম্রকানন প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। কাননমধ্যে বিশেষ কিছুই দেখিতে পাইলেন না। বিমলা ব্যস্তচিত্তে নিজ কক্ষ হইতে নির্গত হইলেন; যে শ্রেণীতে তাঁহার কক্ষ, তৎপরেই প্রাঙ্গণ; প্রাঙ্গণপরেই আর এক কক্ষশ্রেণী ; সেই শ্রেণীতে প্রাসাদোপরি উঠিবার সোপান আছে। বিমলা কক্ষত্যাগপূর্ব্বক সেই সোপানাবলী আরোহণ করিয়া ছাদের উপর উঠিলেন ; ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; তথাপি কাননের গভীর ছায়ান্ধকার জন্য কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। বিমলা দ্বিগুণ উদ্বিগ্নচিত্তে ছাদের আলিসার নিকটে গেলেন ; তদুপরি বক্ষঃস্থাপনপূর্ব্বক মুখ নত করিয়া দুর্গমূল পর্য্যন্ত দেখিতে লাগিলেন; কিছুই দেখিতে পাইলেন না। শ্যামোজ্জ্বল শাখাপল্লব সকল স্নিগ্ধ চন্দ্রকরে প্লাবিত ; কখন কখন সুমন্দ পবনান্দোলনে পিঙ্গলবর্ণ দেখাইতেছিল ; কাননতলে ঘোরান্ধকার, কোথাও কোথাও শাখাপত্রাদির বিচ্ছেদে চন্দ্রালোক পতিত হইয়াছে; আমোদরের স্থিরাম্বু-মধ্যে নীলাম্বর, চন্দ্র ও তারা সহিত প্রতিবিম্বিত; দূরে, অপরপারস্থিত অট্টালিকাসকলের গগনস্পর্শী মূর্ত্তি, কোথাও বা তৎপ্রাসাদস্থিত প্রহরীর অবয়ব। এতদ্ব্যতীত আর কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। বিমলা বিষণ্ন মনে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে উদ্যত হইলেন, এমন সময়ে তাঁহার অকস্মাৎ বোধ হইল, যেন কেহ পশ্চাৎ হইতে তাঁহার পৃষ্ঠদেশ অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিল । বিমলা চমকিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, একজন সশস্ত্র অজ্ঞাত পুরুষ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বিমলা চিত্রার্পিত পুত্তলীবৎ নিস্পন্দ হইলেন।

শস্ত্রধারী কহিল, "চীৎকার করিও না। সুন্দরীর মুখে চীৎকার ভাল শুনায় না।"

যে ব্যক্তি অকস্মাৎ এইরূপ বিমলাকে বিহ্বল করিল, তাহার পরিচ্ছদ পাঠানজাতীয় সৈনিক পুরুষদিগের ন্যায়। পরিচ্ছদের পারিপাট্য ও মহার্ঘ গুণ দেখিয়া অনায়াসে প্রতীতি হইতে পারিত, এ ব্যক্তি কোন মহৎপদাভিষিক্ত। অদ্যাপি তাহার বয়স ত্রিংশতের অধিক হয় নাই; কান্তি সাতিশয় শ্রীমান্, তাঁহার প্রশস্ত ললাটোপরি যে উষ্ণীষ সংস্থাপিত ছিল, তাহাতে এক খণ্ড মহার্ঘ হীরক শোভিত ছিল। বিমলার যদি তৎক্ষণে মনের স্থিরতা থাকিত, তবে বুঝিতে পারিতেন যে, স্বয়ং জগৎসিংহের সহিত তুলনায় এ ব্যক্তি নিতান্ত ন্যূন হইবেন না ; জগৎসিংহের সদৃশ দীর্ঘায়ত বা বিশালোরস্ক নহেন, কিন্তু তৎসদৃশ বীরত্বব্যঞ্জক সুন্দরকান্তি; তদধিক সুকুমার দেহ। তাঁহার বহুমূল্য কটিবন্ধে প্রবালজড়িত কোষমধ্যে দামাস্ক ছুরিকা ছিল; হস্তে নিষ্কোষিত তরবার। অন্য প্রহরণ ছিল না।

সৈনিক পুরুষ কহিলেন, "চীৎকার করিও না। চীৎকার করিলে তোমার বিপদ্ ঘটিবে।"

প্রত্যুৎপন্নবুদ্ধিশালিনী বিমলা ক্ষণকাল মাত্র বিহ্বলা ছিলেন; শস্ত্রধারীর দ্বিরুক্তিতে তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন। বিমলার পশ্চাতেই ছাদের শেষ, সম্মুখেই সশস্ত্র যোদ্ধা; ছাদ হইতে বিমলাকে নীচে ফেলিয়া দেওয়াও কঠিন নহে। বুঝিয়া সুবুদ্ধি বিমলা কহিলেন, "কে তুমি ?"

সৈনিক কহিলেন, "আমার পরিচয়ে তোমার কি হইবে ?"

বিমলা কহিলেন, "তুমি কি জন্য এ দুর্গমধ্যে আসিয়াছ ? চোরেরা শূলে যায়, তুমি কি শোন নাই ?"

সৈনিক। সুন্দরি! আমি চোর নই।

বি। তুমি কি প্রকারে দুর্গমধ্যে আসিলে ?

সৈ। তোমারই অনুকম্পায়। তুমি যখন জানালা খুলিয়া রাখিয়াছিলে, তখন প্রবেশ করিয়াছিলাম; তোমারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ এ ছাদে আসিয়াছি।

বিমলা কপালে করাঘাত করিলেন। পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে ?"

সৈনিক কহিল, "তোমার নিকট এক্ষণে পরিচয় দিলেই বা হানি কি ? আমি পাঠান।"

বি। এ ত পরিচয় হইল না; জানিলাম যে, জাতিতে পাঠান,—কে তুমি ?

সৈ। ঈশ্বরেচ্ছায়, এ দীনের নাম ওসমান খাঁ।

বি। ওসমান খাঁ কে, আমি চিনি না!
সৈ। ওসমান খাঁ, কতলু খার সেনাপতি।
বিমলার শরীর কম্পান্বিত হইতে লাগিল। ইচ্ছা— কোনরূপে পলায়ন করিয়া বীরেন্দ্রসিংহকে সংবাদ করেন; কিন্তু তাহার কিছুমাত্র উপায় ছিল না। সম্মুখে সেনাপতি গতিরোধ করিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। অনন্যগতি হইয়া বিমলা এই বিবেচনা করিলেন যে, এক্ষণে সেনাপতিকে যতক্ষণ কথাবার্ত্তায় নিযুক্ত রাখিতে পারেন,ততক্ষণ অবকাশ। পশ্চাৎ দুর্গপ্রাসাদস্থ কোন প্রহরী সেদিকে আসিলেও আসিতে পারে, অতএব পুনরপি কথোপকথন আরম্ভ করিলেন, “আপনি কেন এ দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন ?”
ওসমান খাঁ উত্তর করিলেন, “আমরা বীরেন্দ্রসিংহকে অনুনয় করিয়া দূত প্রেরণ করিয়াছিলাম । প্রত্যুত্তরে তিনি কহিয়াছেন যে, তোমরা পার, সসৈন্য দুর্গে আসিও।”
বিমলা কহিলেন, “বুঝিলাম, দুর্গাধিপতি আপনাদিগের সহিত মৈত্রী না করিয়া, মোগলের পক্ষ হইয়াছে বলিয়া আপনি দুর্গ অধিকার করিতে আসিয়াছেন। কিন্তু আপনি একক দেখিতেছি?”
ওস। আপাততঃ আমি একক ।
বিমলা কহিলেন, “সেই জন্যই বোধ করি, শঙ্কা প্রযুক্ত আমাকে যাইতে দিতেছেন না।”
ভীরুতা অপবাদে পাঠান সেনাপতি বিরক্ত হইয়া, তাঁহার গতি মুক্ত করিয়া সাহস প্রকাশ করিলেও করিতে পারেন, এই দুরাশাতেই বিমলা এই কথা বলিলেন।
ওসমান খাঁ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, “সুন্দরি! তোমার নিকট কেবল তোমার কটাক্ষকে শঙ্কা করিতে হয়, আমার সে শঙ্কাও বড় নাই। তোমার নিকট ভিক্ষা আছে।”
বিমলা কৌতূহলিনী হইয়া ওসমান খাঁর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। ওসমান খাঁ কহিলেন, “তোমার ওড়নার অঞ্চলে যে জানালার চাবি আছে, তাহা আমাকে দান করিয়া বাধিত কর। তোমার অঙ্গস্পর্শ করিয়া অবমাননা করিতে সঙ্কোচ করি।”
গবাক্ষের চাবি যে, সেনাপতির অভীষ্টসিদ্ধি পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা বুঝিতে বিমলার ন্যায় চতুরার অধিককাল অপেক্ষা করে না। বুঝিতে পারিয়া বিমলা দেখিলেন, ইহার উপায় নাই। যে বলে লইতে পারে, তাহার যাচঞা করা ব্যঙ্গ করা মাত্র। চাবি না দিলে সেনাপতি এখনই বলে লইবেক। অপর কেহ তৎক্ষণাৎ চাবি ফেলিয়া দিত সন্দেহ নাই; কিন্তু চতুরা বিমলা কহিলেন, “মহাশয়! আমি ইচ্ছাক্রমে চাবি না দিলে আপনি কি প্রকারে লইবেন ?”
এই বলিতে বলিতে বিমলা অঙ্গ হইতে ওড়না খুলিয়া হস্তে লইলেন। ওসমানের চক্ষু ওড়নার দিকে; তিনি উত্তর করিলেন, “ইচ্ছাক্রমে না দিলে তোমার অঙ্গ-স্পর্শ - সুখ লাভ করিব।”
“করুন” বলিয়া বিমলা হস্তস্থিত বস্ত্র আম্রকাননে নিক্ষেপ করিলেন। ওসমানের চক্ষু ওড়নার প্রতি ছিল; যেই বিমলা নিক্ষেপ করিয়াছেন, ওসমান অমনি সঙ্গে সঙ্গে হস্ত প্রসারণ করিয়া উড্ডীয়মান বস্ত্র ধরিলেন।
ওসমান খাঁ ওড়না হস্তগত করিয়া এক হস্তে বিমলার হস্ত বজ্রমুষ্টিতে ধরিলেন, দন্ত দ্বারা ওড়না ধরিয়া দ্বিতীয় হস্তে চাবি খুলিয়া নিজ কটিবন্ধে রাখিলেন। পরে যাহা করিলেন, তাহাতে বিমলার মুখ শুকাইল। ওসমান বিমলাকে এক শত সেলাম করিয়া যোড়হাতে বলিলেন, “মাফ করিবেন।” এই বলিয়া ওড়না লইয়া তদ্দ্বারা বিমলার দুই হস্ত আলিসার সহিত দৃঢ়বদ্ধ করিলেন। বিমলা কহিলেন “এ কি ?”

ওসমান কহিলেন, “প্রেমের ফাঁস।”
বি। এ দুষ্কর্মের ফল আপনি অচিরাৎ পাইবেন!
ওসমান বিমলাকে তদবস্থায় রাখিয়া চলিয়া গেলেন। বিমলা চীৎকার করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছু ফলোদয় হইল না। কেহ শুনিতে পাইল না।
ওসমান পূর্ব্বপথে অবতরণ করিয়া পুনর্ব্বার বিমলার কক্ষের নীচের কক্ষে গেলেন। তথায় বিমলার ন্যায় জানালার চাবি ফিরাইয়া জানালা দেয়ালের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। পথ মুক্ত হইলে ওসমান মৃদু মৃদু শিশ্ দিতে লাগিলেন। তচ্ছ্রবণমাত্রেই বৃক্ষান্তরাল হইতে এক জন পাদুকাশূন্য যোদ্ধা গবাক্ষ নিকটে আসিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। সে ব্যক্তি প্রবেশ করিলে অপর এক ব্যক্তি আসিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে বহুসংখ্যক পাঠান সেনা নিঃশব্দে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। শেষে যে ব্যক্তি গবাক্ষ নিকটে আসিল, ওসমান তাহাকে কহিলেন, “আর না, তোমরা বাহিরে থাক; আমার পূর্ব্বকথিত সঙ্কেতধ্বনি শুনিলে তোমরা বাহির হইতে দুর্গ আক্রমণ করিও; এই কথা তুমি তাজ খাঁকে বলিও। ”
সে ব্যক্তি ফিরিয়া গেল। ওসমান লব্ধপ্রবেশ সেনা লইয়া পুনরপি নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে প্রাসাদারোহণ করিলেন; যে ছাদে বিমলা বন্ধন-দশায় বসিয়া আছেন, সেই ছাদ দিয়া গমনকালে কহিলেন, এই স্ত্রীলোকটি বড় বুদ্ধিমতী ; ইহাকে কদাপি বিশ্বাস নাই; রহিম সেখ! তুমি ইহার নিকট প্রহরী থাক; যদি পলায়নের চেষ্টা বা কাহারও সহিত কথা কহিতে উদ্যোগ করে, কি উচ্চ কথা কয়, তবে স্ত্রীবধে ঘৃণা করিও না।”
“যে আজ্ঞা, ” বলিয়া রহিম তথায় প্রহরী রহিল। পাঠান সেনা ছাদে ছাদে দুর্গের অন্য দিকে চলিয়া গেল।

উনবিংশ পরিচ্ছেদঃ প্রেমিকে প্রেমিকে

বিমলা যখন দেখিলেন যে, চতুর ওসমান অন্যত্র গেলেন, তখন তিনি ভরসা পাইলেন যে, কৌশলে মুক্তি পাইতে পারিবেন। শীঘ্র তাহার উপায় চেষ্টা করিতে লাগিলেন।
প্রহরী কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিলে বিমলা তাহার সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। প্রহরী হউক, আর যমদূতই হউক, সুন্দরী রমণীর সহিত কে ইচ্ছাপূর্ব্বক কথোপকথন না করে ? বিমলা প্রথমে এ ও সে নানাপ্রকার সামান্য বিষয়ক কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। ক্রমে প্রহরীর নামধাম গৃহকর্ম্ম সুখদুঃখ বিষয়ক নানা পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। প্রহরী নিজ সম্বন্ধে বিমলার এতদূর পর্য্যন্ত ঔৎসুক্য দেখিয়া বড়ই প্রীত হইল। বিমলাও সুযোগ দেখিয়া ক্রমে ক্রমে নিজ তূণ হইতে শাণিত অস্ত্র সকল বাহির করিতে লাগিলেন। একে বিমলার অমৃতময় রসালাপ, তাহাতে আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই বিশাল চক্ষুর অব্যর্থ কটাক্ষসন্ধান, প্রহরী একেবারে গলিয়া গেল। যখন বিমলা প্রহরীর ভঙ্গীভাবে দেখিলেন যে, তাহার অধঃপাতে যাইবার সময় হইয়া আসিয়াছে, তখন মৃদু মৃদু স্বরে কহিলেন, “আমার কেমন ভয় করিতেছে, সেখজী, তুমি আমার কাছে বসো না।”
প্রহরী চরিতার্থ হইয়া বিমলার পার্শ্বে বসিল। ক্ষণকাল অন্য কথোপকথনের পর বিমলা দেখিলেন যে, ঔষধ ধরিয়াছে। প্রহরী নিকটে বসিয়া অবধি ঘন ঘন তাঁহার পানে দৃষ্টিপাত করিতেছে। তখন বলিলেন, “সেখজী, তুমি বড় ঘামিতেছ; একবার আমার বন্ধন খুলিয়া দাও যদি, তবে আমি তোমাকে বাতাস করি, পরে আবার বাঁধিয়া দিও।
সেখজীর কপালে ঘর্ম্মবিন্দুও ছিল না, কিন্তু বিমলা অবশ্য ঘর্ম্ম না দেখিলে কেন বলিবে? আর এ হাতের বাতাস কার ভাগ্যে ঘটে ? এই ভাবিয়া প্রহরী তখনই

বন্ধন খুলিয়া দিল।
বিমলা কিয়ৎক্ষণ ওড়না দ্বারা প্রহরীকে বাতাস দিয়া স্বচ্ছন্দে ওড়না নিজ অঙ্গে পরিধান করিলেন। পুনর্ব্বন্ধনের নামও করিতে প্রহরীর মুখ ফুটিল না। তাহার বিশেষ কারণও ছিল; ওড়নার বন্ধনরজ্জুত্ব দশা ঘুচিয়া যখন তাহা বিমলার অঙ্গে শোভিত হইল, তখন তাঁহার লাবণ্য আরও প্রদীপ্ত হইল; যে লাবণ্য মুকুরে দেখিয়া বিমলা আপনা আপনি হাসিয়াছিলেন, সেই লাবণ্য দেখিয়া প্রহরী নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।
বিমলা কহিলেন, "সেখজী, তোমার স্ত্রী তোমাকে কি ভালবাসে না ?
সেখজী কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া কহিল, "কেন ?"
বিমলা কহিলেন, "ভালবাসিলে এ বসন্তকালে (তখন ঘোর গ্রীষ্ম ,বর্ষা আগত) কোন্ প্রাণে তোমা হেন স্বামীকে ছাড়িয়া আছে ?
সেখজী এক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।
বিমলার তূণ হইতে অনর্গল অস্ত্র বাহির হইতে লাগিল। "সেখজী! বলিতে লজ্জা করে, কিন্তু তুমি যদি আমার স্বামী হইতে, তবে আমি কখন তোমাকে যুদ্ধে আসিতে দিতাম না। "
প্রহরী আবার নিশ্বাস ছাড়িল । বিমলা কহিতে লাগিলেন"আহা! তুমি যদি আমার স্বামী হতে!"
বিমলাও এই বলিয়া একটি ছোট রকম নিশ্বাস ছাড়িলেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে নিজ তীক্ষ্ণ-কুটিল-কটাক্ষ বিসর্জ্জন করিলেন; প্রহরীর মাথা ঘুরিয়া গেল। সে ক্রমে ক্রমে সরিয়া সরিয়া বিমলার আরও নিকটে আসিয়া বসিল, বিমলাও আর একটু তাহার দিকে সরিয়া বসিলেন।
বিমলা প্রহরীর করে কোমল কর-পল্লব স্থাপন করিলেন। প্রহরী হতবুদ্ধি হইয়া উঠিল।
বিমলা কহিতে লাগিলেন, "বলিতে লজ্জা করে, কিন্তু তুমি যদি রণজয় করিয়া যাও, তবে আমাকে কি তোমার মনে থাকিবে ?"
প্র। তোমাকে মনে থাকিবে না ?
বি। মনের কথা তোমাকে বলিব ?
প্র। বল না—বল।
বি। না, বলিব না, তুমি কি বলিবে ?
প্র। না না—বল আমাকে ভৃত্য বলিয়া জানিও ।
বি। আমার মনে বড় ইচ্ছা হইতেছে, এ পাপ স্বামীর মুখে কালি দিয়া তোমার সঙ্গে চলিয়া যাই।
আবার সেই কটাক্ষ— প্রহরী আহ্লাদে নাচিয়া উঠিল।
প্র। যাবে ?
দিগ্‌গজের মত পণ্ডিত অনেক আছে!
বিমলা কহিলেন, লইয়া যাও ত যাই!"
প্র। তোমাকে লইয়া যাইব না ? তোমার দাস হইয়া থাকিব।
"তোমার এ ভালবাসার পুরস্কার কি দিব ? "ইহাই গ্রহণ কর।"

এই বলিয়া বিমলা কণ্ঠস্থ স্বর্ণহার প্রহরীর কণ্ঠে পরাইলেন, প্রহরী সশরীরে স্বর্গে গেল। বিমলা কহিতে লাগিলেন, "আমাদের শাস্ত্রে বলে, একের মালা অন্যের গলায় দিলে বিবাহ হয়।"
হাসিতে প্রহরীর কালো দাড়ির অন্ধকারমধ্য হইতে দাঁত বাহির হইয়া পড়িল; বলিল, "তবে ত তোমার সাথে আমার সাদি হইল।"
"হইল বই আর কি!" বিমলা ক্ষণেক কাল নিস্তব্ধে চিন্তামগ্নের ন্যায় রহিলেন। প্রহরী কহিল, "কি ভাবিতেছ?"
বি। ভাবিতেছি, আর কপালে বুঝি সুখ নাই, তোমরা দুর্গজয় করিয়া যাইতে পারিবে না।
প্রহরী সদর্পে কহিল, "তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই, এতক্ষণ জয় হইল।"
বিমলা কহিলেন "উহু" ইহার এক গোপন কথা আছে।"
প্রহরী কহিল, "কি" ?
বি। তোমাকে সে কথা বলিয়া দিই, যদি তুমি কোনরূপে দুর্গজয় করাইতে পার। প্রহরী হাঁ করিয়া শুনিতে লাগিল; বিমলা কথা বলিতে সঙ্কোচ করিতে লগিলেন। প্রহরী ব্যস্ত হইয়া কহিল, "ব্যাপার কি" ?
বিমলা কহিলেন, "তোমরা জান না, এই দুর্গপার্শ্বে জগৎসিংহ দশ সহস্র সেনা লইয়া বসিয়া আছে। তোমরা আজ গোপনে আসিবে জানিয়া, সে আগে আসিয়া বসিয়া আছে; এখন কিছু করিবে না, তোমরা দুর্গজয় করিয়া যখন নিশ্চিন্ত থাকিবে তখন আসিয়া ঘেরাও করিবে। "
প্রহরী ক্ষণকাল অবাক্ হইয়া রহিল; পরে বলিল,"সে কি "?
বি। এই কথা, দুর্গস্থ সকলেই জানে; আমরাও শুনিয়াছি।
প্রহরী আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া কহিল, "জান্! আজ তুমি আমাকে বড়লোক করিলে; আমি এখনই গিয়া সেনাপতিকে বলিয়া আসি, এমন জরুরি খবর দিলে শিরোপা পাইব, তুমি এইখানে বসো , আমি শীঘ্র আসিতেছি।
প্রহরীর মনে বিমলার প্রতি তিলার্দ্ধ সন্দেহ ছিল না।
বিমলা বলিলেন, "তুমি আসিবে ত ?"
প্র। আসিব বই কি, এই আসিলাম।
বি। আমাকে ভুলিবে না ?
প্র। না—না।
বি। দেখ, মাথা খাও।
"চিন্তা কি ?" বলিয়া প্রহরী উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গেল।
যেই প্রহরী অদৃশ্য হইল, অমনি বিমলাও উঠিয়া পলাইলেন। ওসমানের কথা যথার্থ, "বিমলার কটাক্ষকেই ভয়।"

বিংশ পরিচ্ছেদ ঃ প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে

বিমুক্তি লাভ করিয়া বিমলার প্রথম কার্য্য বীরেন্দ্রসিংহকে সংবাদ দান। উর্দ্ধশ্বাসে বীরেন্দ্রের শয়নকক্ষাবিমুখে ধাবমানা হইলেন।

অর্দ্ধপথ যাইতে না যাইতেই "আল্লা—ল্লা—হো" পাঠান সেনার চীৎকারধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল।
"এ কি পাঠান সেনার জয়ধ্বনি !" বলিয়া বিমলা ব্যাকুলিত হইলেন। ক্রমে অতিশয় কোলাহল শ্রবণ করিতে পাইলেন;—বিমলা বুঝিলেন, দুর্গবাসীরা জাগরিত হইয়াছে।
ব্যস্ত হইয়া বীরেন্দ্রসিংহের শয়নকক্ষে গমন করিয়া দেখেন যে, কক্ষমধ্যেও অত্যন্ত কোলাহল; পাঠান সেনা দ্বার ভগ্ন করিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে; বিমলা উঁকি মারিয়া দেখিলেন যে, বীরেন্দ্রসিংহের মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ, হস্তে নিষ্কোষিত অসি, অঙ্গে রুধিরধারা। তিনি উন্মত্তের ন্যায় অসি ঘূর্ণিত করিতেছেন। তাঁহার যুদ্ধোদ্যম বিফল হইল; একজন মহাবল পাঠানের দীর্ঘ তরবারির আঘাতে বীরেন্দ্রের অসি হস্তচ্যুত হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইল; বীরেন্দ্রসিংহ বন্দী হইলেন।
বিমলা দেখিয়া শুনিয়া হতাশ হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এখনও তিলোত্তমাকে রক্ষা করিবার সময় আছে। বিমলা তাহার কাছে দৌড়িয়া গেলেন। পথিমধ্যে দেখিলেন, তিলোত্তমার কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করা দুঃসাধ্য; সর্ব্বত্র পাঠান সেনা ব্যাপিয়াছে। পাঠানদিগের যে দুর্গজয় হইয়াছে,তাহাতে আর সংশয় নাই।
বিমলা দেখিলেন, তিলোত্তমার ঘরে যাইতে পাঠান সেনার হস্তে পড়িতে হয়। তিনি তখন ফিরিলেন। কাতর হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি করিয়া জগৎসিংহ আর তিলোত্তমাকে এই বিপত্তিকালে সংবাদ দিবেন। বিমলা একটা কক্ষমধ্যে দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে কয়েক জন সৈনিক অন্য ঘর লুঠ করিয়া, সেই ঘর লুঠিতে আসিতেছে দেখিতে পাইলেন। বিমলা অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া ব্যস্তে কক্ষস্থ একটা সিন্দুকের পার্শ্বে লুকাইলেন। সৈনিকেরা আসিয়া ঐ কক্ষস্থ দ্রব্যজাত লুঠ করিতে লাগিলেন। বিমলা দেখিলেন, নিস্তার নাই, লুঠেরা সকল যখন ঐ সিন্দুক খুলিতে আসিবে, তখন তাঁহাকে অবশ্য ধৃত করিবে। বিমলা সাহসে নির্ভর করিয়া কিঞ্চিৎ কাল অপেক্ষা করিলেন, এবং সিন্দুকপার্শ্ব হইতে সাবধানে সেনাগণ কি করিতেছে দেখিতে লাগিলেন। বিমলার অতুল সাহস; বিপৎকালে সাহস বৃদ্ধি হইল। যখন দেখিলেন যে, সেনাগণ নিজ নিজ দস্যুবৃত্তিতে ব্যাপৃত হইয়াছে, তখন নিঃশব্দপদবিক্ষেপে সিন্দুকপার্শ্ব হইতে নির্গত হইয়া পলায়ন করিলেন। সেনাগণ লুঠে ব্যস্ত, তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। বিমলা প্রায় কক্ষদ্বার পশ্চাৎ করেন, এমন সময়ে একজন সৈনিক আসিয়া পশ্চাৎ হইতে তাঁহার হস্ত ধারণ করিল। বিমলা ফিরিয়া দেখিলেন, রহিম সেখ! সে বলিয়া উঠিল, "তবে পলাতক? আর কোথায় পলাবে ?"
দ্বিতীয়বার রহিমের করকবলিত হওয়াতে বিমলার মুখ শুকাইয়া গেল; কিন্তু সে ক্ষণকালমাত্র; তেজস্বিনী বুদ্ধির প্রভাবে তখনই মুখ আবার হর্ষোৎফুল্ল হইল। বিমলা মনে মনে কহিলেন, "ইহারই দ্বারা স্বকর্ম্ম উদ্ধার করিব।" তাহার কথার প্রত্যুত্তরে কহিলেন, "চুপ কর, আস্তে, বাহিরে আইস।"
এই বলিয়া বিমলা রহিম সেখের হস্ত ধরিয়া বাহিরে টানিয়া আনিলেন; রহিমও ইচ্ছাপূর্ব্বক আসিল। বিমলা তাহাকে নির্জ্জনে পাইয়া বলিলেন, "ছি ছি ছি! তোমার এমন কর্ম্ম! আমাকে রাখিয়া তুমি কোথায় গিয়াছিলে ? আমি তোমাকে না তল্লাস করিয়াছি এমন স্থান নাই!" বিমলা আবার সেই কটাক্ষ সেখজীর প্রতি নিক্ষেপ করিলেন।
সেখজীর গোসা দূর হইল; বলিল, "আমি সেনাপতিকে জগৎসিংহের সংবাদ দিবার জন্য তল্লাস করিয়া বেড়াইতেছিলাম, সেনাপতির নাগাল না পাইয়া তোমার তল্লাসে ফিরিয়া আসিলাম, তোমাকে ছাদে না দেখিয়া নানা স্থানে তল্লাস করিয়া বেড়াইতেছি।"
বিমলা কহিলেন, "আমি তোমার বিলম্ব দেখিয়া মনে করিলাম, তুমি আমাকে ভুলিয়া গেলে,এজন্য তোমার তল্লাসে আসিয়াছিলাম। এখন আর বিলম্বে কাজ কি ? তোমাদের দুর্গ অধিকার হইয়াছে; এই সময় পলাইবার উদ্যোগ দেখা ভাল।"
রহিম কহিল, "আজ না , কাল প্রাতে, আমি না বলিয়া কি প্রকারে যাইব ? কাল প্রাতে সেনাপতির নিকট বিদায় লইয়া যাইব।"
বিমলা কহিলেন, "তবে চল, এই বেলা আমার অলঙ্কারাদি যাহা আছে, হস্তগত করিয়া রাখি; নচেৎ আর কোন সিপাহি লুঠ করিয়া লইবে।"

সৈনিক কহিল, “চল।” রহিমকে সমভিব্যাহারে লইবার তাৎপর্য্য এই যে, সে বিমলাকে অন্য সৈনিকের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে। বিমলার সতর্কতা অচিরাৎ প্রমাণীকৃত হইল। তাহারা কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতেই আর এক দল অপহরণাসক্ত সেনার সম্মুখে পড়িল। বিমলাকে দেখিবামাত্র তাহারা কোলাহল করিয়া উঠিল, “ও রে, বড় শিকার মিলেছে রে!”

রহিম বলিল, “আপন আপন কর্ম্ম কর ভাই সব, এ দিকে নজর করিও না।”

সেনাগণ ভাব বুঝিয়া ক্ষান্ত হইল। একজন কহিল, “রহিম! তোমার ভাগ্য ভাল। এখন নবাব মুখের গ্রাস না কাড়িয়া লয়।”

রহিম ও বিমলা চলিয়া গেল। বিমলা রহিমকে নিজ শয়নকক্ষের নীচের কক্ষে লইয়া গিয়া কহিলেন, “এই আমার নীচের ঘর; এই ঘরের যে যে সামগ্রী লইতে ইচ্ছা হয়, সংগ্রহ কর; ইহার উপরে আমার শুইবার ঘর, আমি তথা হইতে অলঙ্কারাদি লইয়া শীঘ্র আসিতেছি।” এই বলিয়া তাহাকে এক গোছা চাবি ফেলিয়া দিলেন।

রহিম কক্ষে দ্রব্য সামগ্রী প্রচুর দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে সিন্দুক পেটারা খুলিতে লাগিল। বিমলার প্রতি তার তিলার্দ্ধ অবিশ্বাস রহিল না। বিমলা কক্ষ হইতে বাহির হইয়াই ঘরের বহির্দ্দিকে শৃঙ্খল বদ্ধ করিয়া কুলুপ দিলেন। রহিম কক্ষমধ্যে বন্দী হইয়া রহিল।

বিমলা তখন উর্দ্ধশ্বাসে উপরের ঘরে গেলেন। বিমলা ও তিলোত্তমার প্রকোষ্ঠ দুর্গের প্রান্তভাগে; সেখানে এ পর্য্যন্ত অত্যাচারকারী সেনা আইসে নাই; তিলোত্তমা ও জগৎসিংহ কোলাহলও শুনিতে পাইয়াছেন কি না সন্দেহ। বিমলা অকস্মাৎ তিলোত্তমার কক্ষমধ্যে প্রবেশ না করিয়া কৌতূহল প্রযুক্ত দ্বারমধ্যস্থ এক ক্ষুদ্র রন্ধ্র হইতে গোপনে তিলোত্তমার ও রাজকুমারের ভাব দেখিতে লাগিলেন। যাহার যে স্বভাব! এ সময়েও বিমলার কৌতূহল। যাহা দেখিলেন, তাহাতে কিছু বিস্মিত হইলেন।

তিলোত্তমা পালঙ্কে বসিয়া আছেন, জগৎসিংহ নিকটে দাঁড়াইয়া নীরবে তাঁহার মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছেন। তিলোত্তমা রোদন করিতেছেন; জগৎসিংহ চক্ষু মুছিতেছেন।

বিমলা ভাবিলেন, “এ বুঝি বিদায়ের রোদন।”

একবিংশ পরিচ্ছেদঃ খড়্গে খড়্গে

বিমলাকে দেখিয়া জগৎসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিসের কোলাহল ?”

বিমলা কহিলেন, “পাঠানের জয়ধ্বনি। শীঘ্র উপায় করুন; শত্রু আর তিলার্দ্ধ মাত্রে এ ঘরের মধ্যে আসিবে।”

জগৎসিংহ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, “বীরেন্দ্রসিংহ কি করিতেছেন ?”

বিমলা কহিলেন, “তিনি শত্রুহস্তে বন্দী হইয়াছেন।”

তিলোত্তমার কণ্ঠ হইতে অস্ফুট চীৎকার নির্গত হইল; তিনি পালঙ্কে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

জগৎসিংহ বিশুষ্কমুখ হইয়া বিমলাকে কহিলেন, “দেখ দেখ, তিলোত্তমাকে দেখ।”

বিমলা তৎক্ষণাৎ গোলাবপাশ হইতে গোলাব লইয়া তিলোত্তমার মুখে কণ্ঠে কপোলে সিঞ্চন করিলেন, এবং কাতর চিত্তে ব্যজন করিতে লাগিলেন।

শত্রু-কোলাহল আরও নিকট হইল; বিমলা প্রায় রোদন করিতে করিতে কহিলেন, “ঐ আসিতেছে!—রাজপুত্র! কি হইবে ?”

জগৎসিংহের চক্ষুঃ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। কহিলেন, “একা কি করিতে পারি ? তবে তোমার সখীর রক্ষার্থে প্রাণত্যাগ করিব।”
শত্রুর ভীমনাদ আরও নিকটবর্ত্তী হইল। অস্ত্রের ঝঞ্ঝনাও শুনা যাইতে লাগিল। বিমলা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, “তিলোত্তমা! এ সময়ে কেন তুমি অচেতন হইলে ? তোমাকে কি প্রকারে রক্ষা করিব ?”
তিলোত্তমা চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। বিমলা কহিলেন, “তিলোত্তমার জ্ঞান হইতেছে; রাজকুমার! রাজকুমার! এখনও তিলোত্তমাকে বাঁচাও।”
রাজকুমার কহিলেন, “এ ঘরের মধ্যে থাকিলে কার সাধ্য রক্ষা করে! এখনও যদি ঘর হইতে বাহির হইতে পারিতে, তবে আমি তোমাদিগকে দুর্গের বাহিরে লইয়া যাইতে পারিলেও পারিতাম; কিন্তু তিলোত্তমার ত গতিশক্তি নাই। বিমলে! ঐ পাঠান সিঁড়িতে উঠিতেছে। আমি অগ্রে প্রাণ দিবই, কিন্তু পরিতাপ যে, প্রাণ দিয়াও তোমাদের বাঁচাইতে পারিলাম না।”
বিমলা পলকমধ্যে তিলোত্তমাকে ক্রোড়ে তুলিয়া কহিলেন, “তবে চলুন; আমি তিলোত্তমাকে লইয়া যাইতেছি।”
বিমলা আর জগৎসিংহ তিন লম্ফে কক্ষদ্বারে আসিলেন। চারি জন পাঠান সৈনিকও সেই সময়ে বেগে ধাবমান হইয়া কক্ষদ্বারে আসিয়া পড়িল। জগৎসিংহ কহিলেন, “বিমলা, আর হইল না, আমার পশ্চাৎ আইস।”
পাঠানেরা শিকার সম্মুখে পাইয়া “আল্লা—ল্লা—হো” চীৎকার করিয়া, পিশাচের ন্যায় লাফাইতে লাগিল। কটিস্থিত অস্ত্রে ঝঞ্ঝনা বাজিয়া উঠিল। সেই চীৎকার শেষ হইতে না হইতেই জগৎসিংহের অসি একজন পাঠানের হৃদয়ে আমূল সমারোপিত হইল। ভীম চীৎকার করিতে করিতে পাঠান প্রাণত্যাগ করিল। পাঠানের বক্ষঃ হইতে অসি তুলিবার পূর্ব্বেই আর একজন পাঠানের বর্শাফলক জগৎসিংহের গ্রীবাদেশে আসিয়া পড়িল; বর্শা পড়িতে না পড়িতেই বিদ্যুদ্বৎ হস্তচালনা দ্বারা কুমার সেই বর্শা বাম করে ধৃত করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ সেই বর্শারই প্রতিঘাতে বর্শানিক্ষেপীকে ভূমিশায়ী করিলেন। বাকি দুই জন পাঠান নিমেষমধ্যে এককালে জগৎসিংহের মস্তক লক্ষ্য করিয়া অসি প্রহার করিল; জগৎসিংহ পলক ফেলিতে অবকাশ না লইয়া দক্ষিণ হস্তস্থ অসির আঘাতে একজনের অসি সহিত প্রকোষ্ঠচ্ছেদ করিয়া ভূতলে ফেলিলেন; দ্বিতীয়ের প্রহার নিবারণ করিতে পারিলেন না; অসি মস্তকে লাগিল না বটে, কিন্তু স্কন্ধদেশে দারুণ আঘাত পাইলেন। কুমার আঘাত পাইয়া যন্ত্রণায় ব্যাধশরস্পৃষ্ট ব্যাঘ্রের ন্যায় দ্বিগুণ প্রচণ্ড হইলেন; পাঠান অসি তুলিয়া পুনরাঘাতের উদ্যম করিতে না করিতেই কুমার, দুই হস্তে দৃঢ়তর মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ভীষণ অসি ধারণ পূর্ব্বক লাফ দিয়া আঘাতকারী পাঠানের মস্তকে মারিলেন, উষ্ণীষ সহিত পাঠানের মস্তক দুই খণ্ড হইয়া পড়িল। কিন্তু এই অবসরে যে সৈনিকের হস্তচ্ছেদ হইয়াছিল, সে বাম হস্তে কটি হইতে তীক্ষ্ণ ছুরিকা নির্গত করিয়া রাজপুত্র-শরীর লক্ষ্য করিল; যেমন রাজপুত্রের উল্লম্ফোত্থিত শরীর ভূতলে অবতরণ করিতেছিল, অমনি সেই ছুরিকা রাজপুত্রের বিশাল বাহুমধ্যে গভীর বিধিয়া গেল। রাজপুত্র সে আঘাত সূচীবেধ মাত্র জ্ঞান করিয়া পাঠানের কটিদেশে পর্ব্বতপাতবৎ পদাঘাত করিলেন, যবন দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। রাজপুত্র বেগে ধাবমান হইয়া তাহার শিরশ্চেদ করিতে উদ্যত হইতেছিলেন, এমন সময়ে ভীমনাদে “আল্লা—ল্লা—হো” শব্দ করিয়া অগণিত পাঠানসেনাস্রোত কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। রাজপুত্র দেখিলেন, যুদ্ধ করা কেবল মরণের কারণ।
রাজপুত্রের অঙ্গ রুধিরে প্লাবিত হইতেছে; রুধিরোৎসর্গে ক্রমে দেহ ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে।
তিলোত্তমা এখনও বিচেতন হইয়া বিমলার ক্রোড়ে রহিয়াছেন।
বিমলা তিলোত্তমাকে ক্রোড়ে করিয়া কাঁদিতেছেন; তাঁহারও বস্ত্র রাজপুত্রের রক্তে আর্দ্র হইয়াছে।
কক্ষ পাঠান সেনায় পরিপূর্ণ হইল।

রাজপুত্র এবার অসির উপর ভর করিয়া নিশ্বাস ছাড়িলেন। একজন পাঠান কহিল, “রে নফর! অস্ত্র ত্যাগ কর্; তোরে প্রাণে মারিব না।” নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নিতে যেন কেহ ঘৃতাহুতি দিল। অগ্নিশিখাবৎ লম্ফ দিয়া কুমার দাম্ভিক পাঠানের মস্তকচ্ছেদ করিয়া নিজ চরণতলে পাড়িলেন। অসি ঘুরাইয়া ডাকিয়া কহিলেন, “যবন, রাজপুতেরা কি প্রকারে প্রাণত্যাগ করে দেখ্।”

অনন্তর বিদ্যুদ্বৎ কুমারের অসি চমকিতে লাগিল। রাজপুত্র দেখিলেন যে, একাকী আর যুদ্ধ হইতে পারে না; কেবল যত পারেন শত্রুনিপাত করিয়া প্রাণত্যাগ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য হইল। এই অভিপ্রায়ে শত্রুতরঙ্গের মধ্যস্থলে পড়িয়া বজ্রমুষ্টিতে দুই হস্তে অসি-ধারণপূর্ব্বক সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। আর আত্মরক্ষার দিকে কিছুমাত্র মনোযোগ রহিল না; কেবল অজস্র আঘাত করিতে লাগিলেন। এক, দুই, তিন,—প্রতি আঘাতেই হয় কোন পাঠান ধরাশায়ী, নচেৎ কাহারও অঙ্গচ্ছেদ হইতে লাগিল। রাজপুত্রের অঙ্গে চতুর্দ্দিক হইতে বৃষ্টিধারাবৎ অস্ত্রাঘাত হইতে লাগিল। আর হস্ত চলে না, ক্রমে ভূরি ভূরি আঘাতে শরীর হইতে রক্তপ্রবাহ নির্গত হইয়া বাহু ক্ষীণ হইয়া আসিল; মস্তক ঘুরিতে লাগিল; চক্ষে ধূমাকার দেখিতে লাগিলেন; কর্ণে অস্পষ্ট কোলাহল মাত্র প্রবেশ করিতে লাগিল।

“রাজপুত্রকে কেহ প্রাণে বধ করিও না, জীবিতাবস্থায় ব্যাঘ্রকে পিঞ্জরবদ্ধ করিতে হইবে।”

এই কথার পর আর কোন কথা রাজপুত্র শুনিতে পাইলেন না; ওসমান খাঁ এই কথা বলিয়াছিলেন।

রাজপুত্রের বাহুযুগল শিথিল হইয়া লম্বমান হইয়া পড়িল; বলহীন মুষ্টি হইতে অসি ঝঞ্ঝনা-সহকারে ভূতলে পড়িয়া গেল; রাজপুত্রও বিচেতন হইয়া স্বকরনিহত এক পাঠানের মৃতদেহের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বিংশতি পাঠান রাজপুত্রের উষ্ণীষের রত্ন অপহরণ করিতে ধাবমান হইল। ওসমান বজ্রগম্ভীরস্বরে কহিলেন, “কেহ রাজপুত্রকে স্পর্শ করিও না।”

সকলে বিরত হইল। ওসমান খাঁ ও অপর একজন সৈনিক তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া পালঙ্কের উপর উঠাইয়া শয়ন করাইলেন। জগৎসিংহ চারি দণ্ড পূর্ব্বে তিলার্দ্ধ জন্য আশা করিয়াছিলেন যে, তিলোত্তমাকে বিবাহ করিয়া এক দিন সেই পালঙ্কে তিলোত্তমার সহিত বিরাজ করিবেন,—সে পালঙ্ক তাঁহার মৃত্যু-শয্যা প্রায় হইল।

জগৎসিংহকে শয়ন করাইয়া ওসমান খাঁ সৈনিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “স্ত্রীলোকেরা কই?”

ওসমান, বিমলা ও তিলোত্তমাকে দেখিতে পাইলেন না। যখন দ্বিতীয়বার সেনাপ্রবাহ কক্ষমধ্যে প্রধাবিত হয়, তখন বিমলা ভবিষ্যৎ বুঝিতে পারিয়াছিলেন; উপায়ান্তর বিরহে পালঙ্কতলে তিলোত্তমাকে লইয়া লুক্কায়িত হইয়াছিলেন, কেহ তাহা দেখে নাই। ওসমান তাঁহাদিগকে না দেখিতে পাইয়া কহিলেন, “স্ত্রীলোকেরা কোথায়, তোমরা তাবৎ দুর্গমধ্যে অন্বেষণ কর! বাঁদী ভয়ানক বুদ্ধিমতী; সে যদি পলায়, তবে আমার মন নিশ্চিন্ত থাকিবেক না। কিন্তু সাবধান! বীরেন্দ্রের কন্যার প্রতি যেন কোন অত্যাচার না হয়।”

সেনাগণ কতক কতক দুর্গের অন্যান্য ভাগ অন্বেষণ করিতে গেল। দুই একজন কক্ষমধ্যে অনুসন্ধান করিতে লাগিল। একজন অন্য এক দিক দেখিয়া আলো লইয়া পালঙ্ক-তলমধ্যে দৃষ্টিপাত করিল। যাহা সন্ধান করিতেছিল, তাহা দেখিতে পাইয়া কহিল, “এইখানেই আছে।”

ওসমানের মুখ হর্ষ-প্রফুল্ল হইল। কহিলেন, “তোমরা বাহিরে আইস, কোন চিন্তা নাই।”

বিমলা অগ্রে বাহির হইয়া তিলোত্তমাকে বাহিরে আনিয়া বসাইলেন। তখন তিলোত্তমার চৈতন্য হইতেছে—বসিতে পারিলেন। ধীরে ধীরে বিমলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমরা কোথায় আসিয়াছি?”

বিমলা কাণে কাণে কহিলেন, “কোন চিন্তা নাই, অবগুণ্ঠন দিয়া বসো।”

যে ব্যক্তি অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছিল, সে ওসমানকে কহিল, “জুনাব্! গোলাম খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে।”

ওসমান কহিল, “তুমি পুরস্কার প্রার্থনা করিতেছ ? তোমার নাম কি ?”
সে কহিল, “গোলামের নাম করিম্‌বক্স, কিন্তু করিম্‌বক্স বলিলে কেহ চেনে না। আমি পূর্ব্বে মোগল-সৈন্য ছিলাম, এজন্য সকলে রহস্যে আমাকে মোগল-সেনাপতি বলিয়া ডাকে।”
বিমলা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। অভিরাম স্বামীর জ্যোতির্গণনা তাঁহার স্মরণ হইল।
ওসমান কহিলেন, “আচ্ছা, স্মরণ থাকিবে।”

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ আয়েষা

জগৎসিংহ যখন চক্ষুরুন্মীলন করিলেন, তখন দেখিলেন যে, তিনি সুরম্য হর্ম্ম্যমধ্যে পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া আছেন। যে ঘরে তিনি শয়ন করিয়া আছেন, তথায় যে আর কখন আসিয়াছিলেন, এমত বোধ হইল না; কক্ষটি অতি প্রশস্ত, অতি সুশোভিত; প্রস্তরনির্ম্মিত হর্ম্ম্যতল, পাদস্পর্শসুখজনক গালিচায় আবৃত; তদুপরি গোলাবপাশ প্রভৃতি স্বর্ণ রৌপ্য গজদন্তাদি নানা মহার্ঘবস্তু-নির্ম্মিত সামগ্রী রহিয়াছে; কক্ষদ্বারে বা গবাক্ষে নীল পর্দ্দা আছে; এজন্য দিবসের আলোক অতি স্নিগ্ধ হইয়া কক্ষে প্রবেশ করিতেছে; কক্ষ নানাবিধ স্নিগ্ধ সৌগন্ধে আমোদিত হইয়াছে।
কক্ষমধ্যে নীরব, যেন কেহই নাই। একজন কিঙ্করী সুবাসিত বারিসিক্ত ব্যজনহস্তে রাজপুত্রকে নিঃশব্দে বাতাস দিতেছে, অপরা একজন কিঙ্করী কিছুদূরে বাক্‌শক্তিবিহীনা চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মানা আছে। যে দ্বিরদ-দন্ত-খচিত পালঙ্কে রাজপুত্র শয়ন করিয়া আছেন, তাহার উপরে রাজপুত্রের পার্শ্বে বসিয়া একটি স্ত্রীলোক; তাঁহার অঙ্গের ক্ষতসকলে সাবধানহস্তে কি ঔষধ লেপন করিতেছে। হর্ম্ম্যতলে গালিচার উপরে উত্তম পরিচ্ছদবিশিষ্ট একজন পাঠান বসিয়া তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেছে ও একখানি পারসী পুস্তক দৃষ্টি করিতেছে। কেহই কোন কথা কহিতেছে না বা শব্দ করিতেছে না।
রাজপুত্র চক্ষুরুন্মীলন করিয়া কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। পাশ ফিরিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তিলার্দ্ধ সরিতে পারিলেন না; সর্ব্বাঙ্গে দারুণ বেদনা।
পর্য্যঙ্কে যে স্ত্রীলোক বসিয়াছিল, সে রাজপুত্রের উদ্যম দেখিয়া অতি মৃদু বীণাবৎ মধুর স্বরে কহিল, “স্থির থাকুন, চঞ্চল হইবেন না।”
রাজপুত্র ক্ষীণস্বরে কহিলেন, “আমি কোথায় ?”
সেই মধুর স্বরে উত্তর হইল, “কথা কহিবেন না, আপনি উত্তম স্থানে আছেন। চিন্তা করিবেন না, কথা কহিবেন না।”
রাজপুত্র পুনশ্চ অতি ক্ষীণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বেলা কত ?”
মধুরভাষিণী পুনরপি অস্ফুট বচনে কহিল, “অপরাহ্ণ। আপনি স্থির হউন, কথা কহিলে আরোগ্য পাইতে পারিবেন না। আপনি চুপ না করিলে আমরা উঠিয়া যাইব।”
রাজপুত্র কষ্টে কহিলেন, “আর একটি কথা; তুমি কে ?”

রমণী কহিল, “আয়েষা।”

রাজপুত্র নিস্তব্ধ হইয়া আয়েষার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আর কোথাও কি ইহাকে দেখিয়াছেন ? না; আর কখন দেখেন নাই; সে বিষয় নিশ্চিত প্রতীতি হইল।

আয়েষার বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বৎসর হইবেক। আয়েষা দেখিতে পরমা সুন্দরী, কিন্তু সে রীতির সৌন্দর্য্য দুই চারি শব্দে সেরূপ প্রকটিত করা দুঃসাধ্য। তিলোত্তমাও পরম রূপবতী, কিন্তু আয়েষার সৌন্দর্য্য সে রীতির নহে; স্থিরযৌবনা বিমলারও এ কাল পর্য্যন্ত রূপের ছটা লোক-মনোমোহিনী ছিল; আয়েষার রূপরাশি তদনুরূপও নহে। কোন কোন তরুণীর সৌন্দর্য্য বাসন্তী মল্লিকার ন্যায়; নবস্ফুট, ব্রীড়াসঙ্কুচিত, কোমল, নির্ম্মল, পরিমলময়। তিলোত্তমার সৌন্দর্য্য সেইরূপ। কোন রমণীর রূপ অপরাহ্নের স্থলপদ্মের ন্যায়; নির্ব্বাস, মুদিতোন্মুখ, শুষ্কপল্লব, অথচ সুশোভিত, অধিক বিকসিত, অধিক প্রভাবিশিষ্ট, মধুপরিপূর্ণ। বিমলা সেইরূপ সুন্দরী। আয়েষার সৌন্দর্য্য নব-রবিকর-ফুল্ল জলনলিনীর ন্যায়; সুবিকাশিত, সুবাসিত, রসপরিপূর্ণ, রৌদ্রপ্রদীপ্ত; না সঙ্কুচিত, না বিশুষ্ক; কোমল, অথচ প্রোজ্জ্বল; পূর্ণ দলরাজি হইতে রৌদ্র প্রতিফলিত হইতেছে, অথচ মুখে হাসি ধরে না। পাঠক মহাশয়, “রূপের আলো” কখন দেখিয়াছেন ? না দেখিয়া থাকেন, শুনিয়া থাকিবেন। অনেক সুন্দরী রূপে “দশ দিক্ আলো” করে। শুনা যায়, অনেকের পুত্রবধূ “ঘর আলো” করিয়া থাকেন। ব্রজধামে আর নিশুম্ভের যুদ্ধে কালো রূপেও আলো হইয়াছিল। বস্তুতঃ পাঠক মহাশয় বুঝিয়াছেন, “রূপের আলো” কাহাকে বলে? বিমলা রূপে আলো করিতেন, কিন্তু সে প্রদীপের আলোর মত; একটু একটু মিট্‌মিটে, তেল চাই, নহিলে জ্বলে না; গৃহকার্য্যে চলে; নিয়ে ঘর কর, ভাত রান্ধ, বিছানা পাড়, সব চলিবে, কিন্তু স্পর্শ করিলে পুড়িয়া মরিতে হয়। তিলোত্তমাও রূপে আলো করিতেন—সে বালেন্দু-জ্যোতির ন্যায়; সুবিমল, সুমধুর, সুশীতল; কিন্তু তাহাতে গৃহকার্য্য হয় না, তত প্রখর নয়, এবং দূরনিঃসৃত। আয়েষাও রূপে আলো করিতেন, কিন্তু সে পূর্ব্বাহ্নিক সূর্য্যরশ্মির ন্যায়; প্রদীপ্ত, প্রভাময়, অথচ যাহাতে পড়ে, তাহাই হাসিতে থাকে।

যেমন উদ্যানমধ্যে পদ্মফুল, এ আখ্যায়িকা মধ্যে তেমনই আয়েষা; এজন্য তাঁহার অবয়ব পাঠক মহাশয়ের ধ্যান-প্রাপ্য করিতে চাহি। যদি চিত্রকর হইতাম, যদি এইখানে তুলি ধরিতে পারিতাম, যদি সে বর্ণ ফলাইতে পারিতাম; না চম্পক, না রক্ত, না শ্বেতপদ্মকোরক, অথচ তিনই মিশ্রিত,এমত বর্ণ ফলাইতে পারিতাম; যদি সে কপাল তেমনই নিটোল করিয়া আঁকিতে পারিতাম, নিটোল অথচ বিস্তীর্ণ, মন্মথের রঙ্গভূমি-স্বরূপ করিয়া লিখিতে পারিতাম; তাহার উপরে তেমনই সুবঙ্কিম কেশের সীমা-রেখা দিতে পারিতাম। সে রেখা তেমনই পরিষ্কার, তেমনই কপালের গোলাকৃতির অনুগামিনী করিয়া আকর্ণ টানিতে পারিতাম; কর্ণের উপরে সে রেখা তেমনই করিয়া ঘুরাইয়া দিতে পারিতাম; যদি তেমনই কালো রেশমের মত কেশগুলি লিখিতে পারিতাম, কেশমধ্যে তেমনই করিয়া কপাল হইতে সিঁতি কাটিয়া দিতে পারিতাম—তেমনই পরিষ্কার, তেমনই সূক্ষ্ম; যদি তেমনই করিয়া কেশ রঞ্জিত করিয়া দিতে পারিতাম; যদি তেমনই করিয়া লোল কবরী বাঁধিয়া দিতে পারিতাম; যদি সে অতি নিবিড় ভ্রূযুগ আঁকিয়া দেখাইতে পারিতাম; প্রথমে যথায় দুটি ভ্রূ পরস্পর সংযোগাশয়ী হইয়াও মিলিত হয় নাই, তথা হইতে যেখানে যেমন বর্দ্ধিতায়তন হইয়া মধ্যস্থলে না আসিতে আসিতেই যেরূপ স্থূলরেখ হইয়াছিল, পরে আবার যেমন ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্মাকারে কেশবিন্যাসরেখার নিকটে গিয়া সূচ্যগ্রবৎ সমাপ্ত হইয়াছিল, তাহা যদি দেখাইতে পারিতাম; যদি সেই বিদ্যুদগ্নিপূর্ণ মেঘবৎ, চঞ্চল, কোমল, চক্ষুঃপল্লব লিখিতে পারিতাম; যদি সে নয়নযুগলের বিস্তৃত আয়তন লিখিতে পারিতাম; তাহার উপরিপল্লব ও অধঃপল্লবের সুন্দর বঙ্ক ভঙ্গী, সে চক্ষুর নীলালক্তকপ্রভা, তাহার ভ্রমরকৃষ্ণ স্থূল তারা লিখিতে পারিতাম; যদি সে গর্ব্ববিস্ফারিত রন্ধ্রসমেত সুনাসা, সে রসময় ওষ্ঠাধর, সে কবরীস্পৃষ্ট প্রস্তরশ্বেত গ্রীবা, সে কর্ণাভরণস্পর্শপ্রার্থী পীবরাংস, সে স্থূল কোমল রত্নালঙ্কার খচিত বাহু, যে অঙ্গুলিতে রত্নাঙ্গুরীয় হীনভাস হইয়াছে, সে অঙ্গুলি, সে পদ্মারক্ত, কোমল করপল্লব, সে মুক্তাহার-প্রভানিন্দী পীবরোন্নত বক্ষঃ, সে ঈষদ্দীর্ঘ বপুর মনোমোহন ভঙ্গী, যদি সকলই লিখিতে পারিতাম, তথাপি তুলি স্পর্শ করিতাম না। আয়েষার সৌন্দর্য্যসার, সে সমুদ্রের

কৌস্তুভরত্ন, তাহার ধীর কটাক্ষ! সন্ধ্যাসমীরণকম্পিত নীলোৎপলতুল্য ধীর মধুর কটাক্ষ! কি প্রকারে লিখিব ?
রাজপুত্র আয়েষার প্রতি অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার তিলোত্তমাকে মনে পড়িল। স্মৃতিমাত্র হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল, শিরাসমূহমধ্যে রক্তস্রোতঃ প্রবল বেগে প্রধাবিত হইল, গভীর ক্ষত হইতে পুনর্ব্বার রক্ত-প্রবাহ ছুটিল; রাজপুত্র পুনর্ব্বার বিচেতন হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।
খট্টারূঢ়া সুন্দরী তৎক্ষণাৎ ত্রস্তে গাত্রোত্থান করিলেন। যে ব্যক্তি গালিচায় বসিয়া পুস্তক পাঠ করিতেছিল, সে মধ্যে মধ্যে পুস্তক হইতে চক্ষু তুলিয়া সপ্রেম দৃষ্টিতে আয়েষাকে নিরীক্ষণ করিতেছিল; এমন কি, যুবতী পালঙ্ক হইতে উঠিলে তাহার যে কর্ণাভরণ দুলিতে লাগিল, পাঠান তাহাই অনেকক্ষণ অপরিতৃপ্তলোচনে দেখিতে লাগিল। আয়েষা গাত্রোত্থান করিয়া ধীরে ধীরে পাঠানের নিকট গমনপূর্ব্বক তাহার কাণে কাণে কহিলেন, "ওসমান, শীঘ্র হাকিমের নিকট লোক পাঠাও।"
দুর্গজেতা ওসমান খাঁ-ই গালিচায় বসিয়াছিলেন। আয়েষার কথা শুনিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন।
আয়েষা, একটা রূপার সেপায়ার উপরে যে পাত্র ছিল, তাহা হইতে একটু জলবৎ দ্রব্য লইয়া পুনর্মূর্চ্ছাগত রাজপুত্রের কপালে মুখে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন।
ওসমান খাঁ অচিরাৎ হাকিম লইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। হাকিম অনেক যত্নে রক্তস্রাব নিবারণ করিলেন, এবং নানাবিধ ঔষধ আয়েষার নিকট দিয়া মৃদু মৃদু স্বরে সেবনের ব্যবস্থা উপদেশ করিলেন।
আয়েষা কাণে কাণে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন অবস্থা দেখিতেছেন ?"
হাকিম কহিলেন, "জ্বর অতি ভয়ঙ্কর।"
হাকিম বিদায় লইয়া প্রতিগমন করেন, তখন ওসমান তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া দ্বারদেশে তাঁহাকে মৃদুস্বরে কহিলেন, "রক্ষা পাইবে ?"
হাকিম কহিলেন, "আকার নহে; পুনর্ব্বার যাতনা হইলে আমাকে ডাকিবেন।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ কুসুমের মধ্যে পাষাণ

সেই দিবস অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আয়েষা ও ওসমান জগৎসিংহের নিকট বসিয়া রহিলেন। জগৎসিংহের কখন চেতনা হইতেছে, কখন মূর্চ্ছা হইতেছে; হাকিম অনেকবার আসিয়া দেখিয়া গেলেন। আয়েষা অবিশ্রান্তা হইয়া কুমারের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। যখন দ্বিতীয় প্রহর, তখন একজন পরিচারিকা আসিয়া আয়েষাকে কহিল যে, বেগম তাঁহাকে স্মরণ করিয়াছেন।
"যাইতেছি" বলিয়া আয়েষা গাত্রোত্থান করিলেন। ওসমানও গাত্রোত্থান করিলেন। আয়েষা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমিও উঠিলে ?"
ওসমান কহিলেন, "রাত্রি হইয়াছে, চল তোমাকে রাখিয়া আসি।"
আয়েষা দাসদাসীদিগকে সতর্ক থাকিতে আদেশ করিয়া মাতৃগৃহ অভিমুখে চলিলেন। পথে ওসমান জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি আজ বেগমের নিকটে থাকিবে ?"
আয়েষা কহিলেন, "না, আমি আবার রাজপুত্রের নিকট প্রত্যাগমন করিব।"
ওসমান কহিলেন, "আয়েষা! তোমার গুণের সীমা দিতে পারি না; তুমি এই পরম শত্রুকে যে যত্ন করিয়া শুশ্রূষা করিতেছ, ভগিনী ভ্রাতার জন্য এমন করে না।

তুমি উহার প্রাণদান করিতেছ।”
আয়েষা ভুবনমোহন মুখে একটু হাসি হাসিয়া কহিলেন, “ওসমান! আমি ত স্বভাবতঃ রমণী; পীড়িতদের সেবা আমার পরম ধর্ম্ম; না করিলে দোষ, করিলে প্রশংসা নাই; কিন্তু তোমার কি ? যে তোমার পরম বৈরী, রণক্ষেত্রে তোমার দর্পহারী প্রতিযোগী, স্বহস্তে যাহার এ দশা ঘটাইয়াছ, তুমি যে অনুদিন নিজে ব্যস্ত থাকিয়া তাহার সেবা করাইতেছ, তাহার আরোগ্যসাধন করাইতেছ, ইহাতে তুমিই যথার্থ প্রশংসাভাজন।”
ওসমান কিঞ্চিৎ অপ্রতিভের ন্যায় হইয়া কহিলেন, “তুমি, আয়েষা, আপনার সুন্দর স্বভাবের মত সকলকে দেখ। আমার অভিপ্রায় তত ভাল নহে। তুমি দেখিতেছ না, জগৎসিংহ প্রাণ পাইলে আমাদিগের কত লাভ ? রাজপুত্রের এক্ষণে মৃত্যু হইলে আমাদিগের কি হইবে ? রণক্ষেত্রে মানসিংহ জগৎসিংহের ন্যূন নহে, একজন যোদ্ধার পরিবর্ত্তে আর একজন যোদ্ধা আসিবে। কিন্তু যদি জগৎসিংহ জীবিত থাকিয়া আমাদিগের হস্তে কারারুদ্ধ থাকে, তবে মানসিংহকে হাতে পাইলাম; সে প্রিয় পুত্রের মুক্তির জন্য অবশ্য আমাদিগের মঙ্গলজনক সন্ধি করিবে; আক্‌বরও এতাদৃশ দক্ষ সেনাপতিকে পুনঃপ্রাপ্ত হইবার জন্য অবশ্য সন্ধির পক্ষে মনোযোগী হইতে পারিবে; আর যদি জগৎসিংহকে আমাদিগের সদ্ব্যবহার দ্বারা বাধ্য করিতে পারি, তবে সেও আমাদিগের মনোমত সন্ধিবন্ধন পক্ষে অনুরোধ কি যত্ন করিতে পারে; তাহার যত্ন নিতান্ত নিষ্ফল হইবে না। নিতান্ত কিছু ফল না দর্শে, তবে জগৎসিংহের স্বাধীনতার মূল্যস্বরূপ মানসিংহের নিকট বিস্তর ধনও পাইতে পারিব। সম্মুখ সংগ্রামে এক দিন জয়ী হওয়ার অপেক্ষাও জগৎসিংহের জীবনে আমাদিগের উপকার।”
ওসমান এই সকল আলোচনা করিয়া রাজপুত্রের পুনর্জীবনে যত্নবান হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই; কিন্তু আর কিছুও ছিল। কাহারও কাহারও অভ্যাস আছে যে, পাছে লোকে দয়ালু চিত্ত বলে, এই লজ্জার আশঙ্কায় কাঠিন্য প্রকাশ করেন; এবং দয়াশীলতা নারী-স্বভাব-সিদ্ধ বলিয়া উপহাস করিতে করিতে পরোপকার করেন। লোকে জিজ্ঞাসিলে বলেন, ইহাতে আমার বড় প্রয়োজন আছে। আয়েষা বিলক্ষণ জানিতেন, ওসমান তাহারই একজন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “ওসমান! সকলেই যেন তোমার মত স্বার্থপরতায় দূরদর্শী হয়। তাহা হইলে আর ধর্ম্মে কাজ নাই।”
ওসমান কিঞ্চিৎকাল ইতস্ততঃ করিয়া মৃদুতরস্বরে কহিলেন, “আমি যে পরম স্বার্থপর, তাহার আর এক প্রমাণ দিতেছি।”
আয়েষা নিজ সবিদ্যুৎ মেঘতুল্য চক্ষুঃ ওসমানের বদনের প্রতি স্থির করিলেন।
ওসমান কহিলেন, “আমি আশা-লতা ধরিয়া আছি, আর কত কাল তাহার তলে জলসিঞ্চন করিব ?”
আয়েষার মুখশ্রী গম্ভীর হইল। ওসমান এ ভাবান্তরেও নূতন সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন। আয়েষা কহিলেন, “ওসমান! ভাই বহিন বলিয়া তোমার সঙ্গে বসি দাঁড়াই। বাড়াবাড়ি করিলে, তোমার সাক্ষাতে বাহির হইব না।”
ওসমানের হর্ষোৎফুল্ল মুখ মলিন হইয়া গেল। কহিলেন, “ঐ কথা চিরকাল! সৃষ্টিকর্ত্তা! এ কুসুমের দেহমধ্যে তুমি কি পাষাণের হৃদয় গড়িয়া রাখিয়াছ ?”
ওসমান আয়েষাকে মাতৃগৃহ পর্য্যন্ত রাখিয়া আসিয়া বিষণ্ন মনে নিজ আবাসমন্দির মধ্যে প্রত্যাগমন করিলেন।
আর জগৎসিংহ?
বিষম জ্বর-বিকারে অচেতন শয্যাশায়ী হইয়া রহিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ তুমি না তিলোত্তমা ?

পরদিন প্রদোষকালে জগৎসিংহের অবস্থান-কক্ষে আয়েষা, ওসমান, আর চিকিৎসক পূর্ব্ববৎ নিঃশব্দে বসিয়া আছেন; আয়েষা পালঙ্কে বসিয়া স্বহস্তে ব্যঞ্জনাদি করিতেছেন; চিকিৎসক ঘন ঘন জগৎসিংহের নাড়ী দেখিতেছেন; জগৎসিংহ অচেতন; চিকিৎসক কহিয়াছেন, সেই রাত্রে জ্বর ত্যাগের সময়ে জগৎসিংহের লয় হইবার সম্ভাবনা, যদি সে সময় শুধরাইয়া যান, তবে আর চিন্তা থাকিবে না, নিশ্চিত রক্ষা পাইবেন। জ্বর-বিশ্রামের সময় আগত, এই জন্য সকলেই বিশেষ ব্যগ্র; চিকিৎসক মুহুর্ম্মুহুঃ নাড়ী দেখিতেছেন, "নাড়ী ক্ষীণ," "আরও ক্ষীণ",—"কিঞ্চিৎ সবল", ইত্যাদি মুহূর্ম্মুহুঃ অস্ফুটশব্দে বলিতেছেন। সহসা চিকিৎসকের মুখ কালিমাপ্রাপ্ত হইল। বলিলেন, "সময় আগত।"

আয়েষা ও ওসমান নিস্পন্দ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। হকিম নাড়ী ধরিয়া রহিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে চিকিৎসক কহিলেন, "গতিক মন্দ।" আয়েষার মুখ আরও ম্লান হইল। হঠাৎ জগৎসিংহের মুখে বিকট ভঙ্গী উপস্থিত হইল; মুখ শ্বেতবর্ণ হইয়া আসিল; হস্তে দৃঢ়মুষ্টি বাঁধিল; চক্ষে অলৌকিক স্পন্দন হইতে লাগিল; আয়েষা বুঝিলেন, কৃতান্তের গ্রাস পূর্ণ হইতে আর বিলম্ব নাই। চিকিৎসক হস্তস্থিত পাত্রে ঔষধ লইয়া বসিয়াছিলেন; এরূপ লক্ষণ দেখিবামাত্রই অঙ্গুলি দ্বারা রোগীর মুখব্যাদান করাইয়া ঐ ঔষধ পান করাইলেন। ঔষধ ওষ্ঠোপ্রান্ত হইতে নির্গত হইয়া পড়িল; কিঞ্চিৎ উদরে গেল। উদরে প্রবেশমাত্রই রোগীর দেহের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল; ক্রমে মুখের বিকট ভঙ্গী দূরে গিয়া কান্তি স্থির হইল, বর্ণের অস্বাভাবিক শ্বেতভাব বিনষ্ট হইয়া ক্রমে রক্তসঞ্চার হইতে লাগিল; হস্তের মুষ্টি শিথিল হইল; চক্ষু স্থির হইয়া পুনর্ব্বার মুদ্রিত হইল। হকিম অত্যন্ত মনোনিবেশপূর্ব্বক নাড়ী দেখিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ দেখিয়া সহর্ষে কহিলেন, "আর চিন্তা নাই; রক্ষা পাইয়াছেন।"

ওসমান জিজ্ঞাসা করিলেন, "জ্বরত্যাগ হইয়াছে?"

ভিষক্ কহিলেন, "হইয়াছে।"

আয়েষা ও ওসমান উভয়েরই মুখ প্রফুল্ল হইল। ভিষক্ কহিলেন, "এখন আর কোন চিন্তা নাই, আমার বসিয়া থাকার প্রয়োজন করে না; এই ঔষধ দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত ঘড়ী ঘড়ী খাওয়াইবেন।" এই বলিয়া ভিষক্ প্রস্থান করিলেন। ওসমান আর দুই চারি দণ্ড বসিয়া নিজ আবাসগৃহে গেলেন। আয়েষা পূর্ব্ববৎ পালঙ্কে বসিয়া ঔষধাদি সেবন করাইতে লাগিলেন।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে রাজকুমার নয়ন উন্মীলন করিলেন। প্রথমেই আয়েষার সুখপ্রফুল্ল মুখ দেখিতে পাইলেন। চক্ষুর কটাক্ষভাব দেখিয়া আয়েষার বোধ হইল, যেন তাঁহার বুদ্ধির ভ্রম জন্মিতেছে, যেন তিনি কিছু স্মরণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু যত্ন বিফল হইতেছে। অনেকক্ষণ পরে আয়েষার প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "আমি কোথায়?" দুই দিবসের পর রাজপুত্র এই প্রথম কথা কহিলেন।

আয়েষা কহিলেন, "কতলু খাঁর দুর্গে।"

রাজপুত্র আবার পূর্ব্ববৎ স্মরণ করিতে লাগিলেন, অনেকক্ষণ পরে কহিলেন, "আমি কেন এখানে?"

আয়েষা প্রথমে নিরুত্তর হইয়া রহিলেন; পরে কহিলেন, "আপনি পীড়িত।"

রাজপুত্র ভাবিতে ভাবিতে মস্তক আন্দোলন করিয়া কহিলেন, "না না, আমি বন্দী হইয়াছি।"

এই কথা বলিতে রাজপুত্রের মুখের ভাবান্তর হইল।

আয়েষা উত্তর করিলেন না; দেখিলেন, রাজপুত্রের স্মৃতিক্ষমতা পুনরুদ্দীপ্ত হইতেছে।

ক্ষণপরে রাজপুত্র পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

“আমি আয়েষা।”
“আয়েষা কে?”
“কতলু খাঁর কন্যা।”
রাজপুত্র আবার ক্ষণকাল নিস্তব্ধ রহিলেন; এককালে অধিকক্ষণ কথা কহিতে শক্তি নাই। কিয়ৎক্ষণ নীরবে বিশ্রাম লাভ করিয়া কহিলেন, “আমি কয়দিন এখানে আছি ?”
“চারি দিন।”
“গড় মান্দারণ অদ্যাপি তোমাদিগের অধিকারে আছে ?”
“আছে।”
জগৎসিংহ আবার কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া কহিলেন, “বীরেন্দ্রসিংহের কি হইয়াছে?”
“বীরেন্দ্রসিংহ কারাগারে আবদ্ধ আছেন, অদ্য তাঁহার বিচার হইবে।”
জগৎসিংহের মলিন মুখ আরও মলিন হইল। জিজ্ঞাসা করিলেন, “আর তার পৌরবর্গ কি অবস্থায় আছে?”
আয়েষা উদ্বিগ্না হইলেন। কহিলেন, “সকল কথা আমি অবগত নহি।”
রাজপুত্র আপনা আপনি কি বলিলেন। একটি নাম তাঁহার কণ্ঠনির্গত হইল, আয়েষা তাহা শুনিতে পাইলেন, “তিলোত্তমা।”
আয়েষা ধীরে ধীরে উঠিয়া পাত্র হইতে ভিষক্‌দত্ত সুস্বাদু ঔষধ আনিতে গেলেন; রাজপুত্র তাঁহার দোদুল্যমান কর্ণাভরণসংযুক্ত অলৌকিক দেহমহিমা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আয়েশা ঔষধ আনিলেন; রাজপুত্র তাহা পান করিয়া কহিলেন, “আমি পীড়ার মোহে স্বপ্নে দেখিতাম, স্বর্গীয় দেবকন্যা আমার শিয়রে বসিয়া শুশ্রূষা করিতেছেন, সে তুমি, না তিলোত্তমা ?”
আয়েষা কহিলেন, “আপনি তিলোত্তমাকে স্বপ্ন দেখিয়া থাকিবেন।”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ অবগুণ্ঠনবতী

দুর্গজয়ের দুই দিবস পরে, বেলা প্রহরেকের সময় কতলু খাঁ নিজ দুর্গমধ্যে দরবারে বসিয়াছেন। দুই দিকে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পরিষদ্‌গণ দণ্ডায়মান আছে। সম্মুখস্থ ভূমিখণ্ডে বহু সহস্র লোক নিঃশব্দে রহিয়াছে। অদ্য বীরেন্দ্রসিংহের দণ্ড হইবে।
কয়েকজন শস্ত্রপাণি প্রহরী বীরেন্দ্রসিংহকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দরবারে আনীত করিল। বীরেন্দ্রসিংহের মূর্তি রক্তবর্ণ, কিন্তু তাহাতে ভীতিচিহ্ন কিছুমাত্র নাই। প্রদীপ্ত চক্ষুঃ হইতে অগ্নিকণা বিস্ফুরিত হইতেছিল; নাসিকারন্ধ্র বর্দ্ধিতায়তন হইয়া কম্পিত হইতেছিল। দন্তে অধর দংশন করিতেছিলেন। কতলু খাঁর সম্মুখে আনীত হইলে, কতলু খাঁ বীরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বীরেন্দ্রসিংহ! তোমার অপরাধের দণ্ড করিব। তুমি কি জন্য আমার বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিলে ?”
বীরেন্দ্রসিংহ নিজ লোহিত-মূর্ত্তি-প্রকটিত ক্রোধ সংবরণ করিয়া কহিলেন, “তোমার বিরুদ্ধে কোন্ কর্ম্ম করিয়াছি, তাহা অগ্রে আমাকে বল।”
একজন পারিষদ্ কহিল, “বিনীতভাবে কথা কহ।”

কতলু খাঁ বলিলেন, “কি জন্য আমার আদেশমত, আমাকে অর্থ আর সেনা পাঠাইতে অসম্মত হইয়াছিলে?”
বীরেন্দ্রসিংহ অকুতোভয়ে কহিলেন, “তুমি রাজবিদ্রোহী দস্যু; তোমাকে কেন অর্থ দিব? তোমায় কি জন্য সেনা দিব ?”
দ্রষ্টবর্গ দেখিলেন, বীরেন্দ্র আপন মুণ্ড আপনি ছেদনে উদ্যত হইয়াছেন।
কতলু খাঁর ক্রোধে কলেবর কম্পিত হইয়া উঠিল। তিনি সহসা ক্রোধ সংবরণ করিবার ক্ষমতা অভ্যাসসিদ্ধ করিয়াছিলেন; এজন্য কতক স্থিরভাবে কহিলেন, “তুমি আমার অধিকারে বসতি করিয়া, কেন মোগলের সহিত মিলন করিয়াছিলে ?”
বীরেন্দ্র কহিলেন, “তোমার অধিকার কোথা ?”
কতলু খাঁ আরও কুপিত হইয়া কহিলেন, “শোন্ দূরাত্মা! নিজ কর্ম্মোচিত ফল পাইবি। এখনও তোর জীবনের আশা ছিল, কিন্তু তুই নির্ব্বোধ, নিজ দর্পে আপন বধের উদ্যোগ করিতেছিস।”
বীরেন্দ্রসিংহ সগর্ব্বে হাস্য করিলেন; কহিলেন, “কতলু খাঁ—আমি তোমার কাছে যখন শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছি, তখন দয়ার প্রত্যাশা করিয়া আসি নাই। তোমার তুল্য শত্রুর দয়ায় যার জীবন রক্ষা,—তাহার জীবনে প্রয়োজন ? তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতাম; কিন্তু আমার পবিত্র কুলে কালি দিয়াছ; তুমি আমার প্রাণের অধিক ধনকে—”
বীরেন্দ্রসিংহ আর বলিতে পারিলেন না; স্বর বদ্ধ হইয়া গেল, চক্ষুঃ বাষ্পাকুল হইল; নির্ভীক গর্ব্বিত বীরেন্দ্রসিংহ অধোবদন হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।
কতলু খাঁ স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর; এতদূর নিষ্ঠুর যে, পরপীড়ায় তাঁহার উল্লাস জন্মিত। দাম্ভিক বৈরীর ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল। কহিলেন, “বীরেন্দ্রসিংহ! তুমি কি আমার নিকট কিছু যাচ্ঞা করিবে না? বিবেচনা করিয়া দেখ, তোমার সময় নিকট।”
যে দুঃসহ সন্তাপাগ্নিতে বীরেন্দ্রের হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল, রোদন করিয়া তাহার কিঞ্চিৎ সমতা হইল। পূর্ব্বাপেক্ষা স্থিরভাবে উত্তর করিলেন, “আর কিছুই চাহি না, কেবল এই ভিক্ষা যে, আমার বধ-কার্য্য শীঘ্র সমাপ্ত কর।”
ক। তাহাই হইবে, আর কিছু ?
উত্তর, “এ জন্মে আর কিছু না।”
ক। মৃত্যুকালে তোমার কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিবে না ?
এই প্রশ্ন শুনিয়া দ্রষ্টৃবর্গ পরিতাপে নিঃশব্দ হইল, বীরেন্দ্রের চক্ষে আবার উজ্জ্বলাগ্নি জ্বলিতে লাগিল।
“যদি আমার কন্যা তোমার গৃহে জীবিতা থাকে, তবে সাক্ষাৎ করিব না। যদি মরিয়া থাকে, লইয়া আইস, কোলে করিয়া মরিব।”
দ্রষ্টৃবর্গ একেবারে নীরব, অগণিত লোক এতাদৃশ গভীর নিস্তব্ধ যে, সূচীপাত হইলে শব্দ শুনা যাইত। নবাবের ইঙ্গিত পাইয়া, রক্ষিবর্গ বীরেন্দ্রসিংহকে বধ্যভূমিতে লইয়া চলিল। তথায় উপনীত হইবার কিছু পূর্ব্বে একজন মুসলমান বীরেন্দ্রের কাণে কাণে কি কহিল; বীরেন্দ্র তাহা কিছু বুঝিতে পারিলেন না। মুসলমান তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিল। বীরেন্দ্র ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনে ঐ পত্র খুলিয়া দেখিলেন যে, বিমলার হস্তের লেখা। বীরেন্দ্র ঘোর বিরক্তির সহিত লিপি মর্দ্দিত করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। লিপি-বাহক লিপি তুলিয়া লইয়া গেল। নিকটস্থ কোন দর্শক বীরেন্দ্রের এই কর্ম্ম দেখিয়া অপরকে অনুচ্চৈঃস্বরে কহিল, “বুঝি কন্যার পত্র ?”
কথা বীরেন্দ্রের কাণে গেল। সেই দিকে ফিরিয়া কহিলেন, “কে বলে আমার কন্যা? আমার কন্যা নাই।”

পত্রবাহক পত্র লইয়া গেল। রক্ষিবর্গকে কহিয়া গেল, "আমি যতক্ষণ প্রত্যাগমন না করি, ততক্ষণ বিলম্ব করিও।"
রক্ষিগণ কহিল, "যে আজ্ঞা প্রভো!"
স্বয়ং ওসমান পত্রবাহক; এই জন্য রক্ষিবর্গ প্রভু সম্বোধন করিল।
ওসমান লিপিহস্তে অন্তঃপুর প্রাচীর-মধ্যে গেলেন; তথায় এক বকুল-বৃক্ষের অন্তরালে এক অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোক দণ্ডায়মানা আছে। ওসমান তাহার সন্নিধানে গিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বিবৃত করিলেন। অবগুণ্ঠনবতী কহিলেন, "আপনাকে বহু ক্লেশ দিতেছি, কিন্তু আপনা হইতেই আমাদের এ দশা ঘটিয়াছে। আপনাকে আমার এ কার্য্য সাধন করিতে হইবে।"
ওসমান নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।
অবগুণ্ঠবতী মনঃপীড়া-বিকম্পিত স্বরে কহিতে লাগিলেন, "না করেন—না করুন, আমরা এক্ষণে অনাথা; কিন্তু জগদীশ্বর আছেন!"
ওসমান কহিলেন, "মা! তুমি জান না যে, কি কঠিন কর্ম্মে আমায় নিযুক্ত করিতেছ। কতলু খাঁ জানিতে পারিলে আমার প্রাণান্ত করিবে।"
স্ত্রী কহিল, "কতলু খাঁ ? আমাকে কেন প্রবঞ্চনা কর ? কতলু খাঁর সাধ্য নাই যে, তোমার কেশ স্পর্শ করে।"
ও। কতলু খাঁকে চেন না।—কিন্তু চল, আমি তোমাকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাইব।
ওসমানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অবগুণ্ঠনবতী বধ্যভূমিতে গিয়া নিস্তব্ধে দণ্ডায়মানা হইলেন। বীরেন্দ্রসিংহ তাঁহাকে না দেখিয়া একজন ভিখারীর বেশধারী ব্রাহ্মণের সহিত কথা কহিতেছিলেন। অবগুণ্ঠনবতী অবগুণ্ঠনমধ্য হইতে দেখিলেন, ভিখারী অভিরাম স্বামী।
বীরেন্দ্র অভিরাম স্বামীকে কহিলেন, "গুরুদেব! তবে বিদায় হইলাম। আমি আর আপনাকে কি বলিয়া যাইব ? ইহলোকে আমার কিছু প্রার্থনীয় নাই; কাহার জন্য প্রার্থনা করিব?"
অভিরাম স্বামী অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা পশ্চাদ্বর্ত্তিনী অবগুণ্ঠনবতীকে দেখাইলেন। বীরেন্দ্রসিংহ সেই দিকে মুখ ফিরাইলেন; অমনি রমণী অবগুণ্ঠন দূরে নিক্ষেপ করিয়া বীরেন্দ্রের শৃঙ্খলাবদ্ধ পদতলে অবলুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। বীরেন্দ্র গদগদ স্বরে ডাকিলেন, "বিমলা!"
"স্বামী! প্রভু! প্রাণেশ্বর!" বলিতে বলিতে উন্মাদিনীর ন্যায় অধিকতর উচ্চৈঃস্বরে বিমলা কহিতে লাগিলেন, "আজ আমি জগৎসমীপে বলিব, কে নিবারণ করিবে ? স্বামী! কণ্ঠরত্ন! কোথা যাও! আমাদের কোথা রাখিয়া যাও!"
বীরেন্দ্রসিংহের চক্ষে দরদর অশ্রুধারা পতিত হইতে লাগিল। হস্ত ধরিয়া বিমলাকে বলিলেন, "বিমলা! প্রিয়তমে! এ সময়ে কেন আমায় রোদন করাও! শত্রুরা দেখিলে আমায় মরণে ভীত মনে করিবে।"
বিমলা নিস্তব্ধ হইলেন। বীরেন্দ্র পুনর্ব্বার কহিলেন, "বিমলে! আমি যাই, তোমরা আমার পশ্চাৎ আইস।"
বিমলা কহিলেন, "যাইব।"
আর কেহ না শুনিতে পায় এমত স্বরে কহিতে লাগিলেন, "যাইব, কিন্তু আগে এ যন্ত্রণার প্রতিশোধ করিব।"
নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপবৎ বীরেন্দ্রের মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল—কহিলেন, "পারিবে ?"
বিমলা দক্ষিণ হস্তে অঙ্গুলি দিয়া কহিলেন, "এই হস্তে! এই হস্তের স্বর্ণ ত্যাগ করিলাম; আর কাজ কি!" বলিয়া কঙ্কণাদি খুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "শাণিত লৌহ ভিন্ন এ হস্তে অলঙ্কার আর ধরিব না।"

বীরেন্দ্র হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, “তুমি পারিবে, জগদীশ্বর তোমার মনস্কামনা সফল করুন।”
জল্লাদ ডাকিয়া কহিল, “আর বিলম্ব করিতে পারি না।”
বীরেন্দ্র বিমলাকে কহিলেন, “আর কি ? তুমি এখন যাও।”
বিমলা কহিলেন, “না, আমার সম্মুখেই আমার বৈধব্য ঘটুক। তোমার রুধিরে মনের সঙ্কোচ বিসর্জ্জন করিব।” বিমলার স্বর ভয়ঙ্কর স্থির।
“তাহাই হউক” বলিয়া বীরেন্দ্রসিংহ জল্লাদকে ইঙ্গিত করিলেন। বিমলা দেখিতে পাইলেন, উর্দ্ধোত্থিত কুঠার সূর্য্যতেজে প্রদীপ্ত হইল; তাঁহার নয়নপল্লব মুহূর্ত্ত জন্য আপনি মুদ্রিত হইল; পুনরুন্মীলন করিয়া দেখেন, বীরেন্দ্রসিংহের ছিন্ন শির রুধির-সিক্ত ধূলিতে অবলুণ্ঠন করিতেছে।
বিমলা প্রস্তর-মূর্ত্তিবৎ দণ্ডায়মানা রহিলেন, মস্তকের একটি কেশ বাতাসে দুলিতেছে না। এক বিন্দু অশ্রু পড়িতেছে না। চক্ষুর পলক নাই, একদৃষ্টে ছিন্ন শির প্রতি চাহিয়া আছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ বিধবা

তিলোত্তমা কোথায় ? পিতৃহীনা, অনাথিনী বালিকা কোথায় ? বিমলাই বা কোথায়? কোথা হইতে বিমলা স্বামীর বধ্যভূমিতে আসিয়া দর্শন দিয়াছিলেন ? তাহার পরই আবার কোথায় গেলেন?
কেন বীরেন্দ্রসিংহ মৃত্যুকালে প্রিয়তমা কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না ? কেনই বা নামমাত্রে হুতাশনবৎ প্রদীপ্ত হইয়াছিলেন ? কেন বলিয়াছেন, “আমার কন্যা নাই ?”
কেন বিমলার পত্র বিনা পাঠে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন ?
কেন ? কতলু খাঁর প্রতি বীরেন্দ্রের তিরস্কার স্মরণ করিয়া দেখ, কি ভয়ানক ব্যাপার ঘটিয়াছে।
“পবিত্র কুলে কালি পড়িয়াছে” এই কথা বলিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যাঘ্র গর্জ্জন করিয়াছিল।
তিলোত্তমা আর বিমলা কোথায়, জিজ্ঞাসা কর ? কতলু খাঁর উপপত্নীদিগের আবাসগৃহে সন্ধান কর, দেখা পাইবে।
সংসারের এই গতি! অদৃষ্টচক্রের এমনি নিদারুণ আবর্ত্তন! রূপ, যৌবন, সরলতা, অমলতা, সকলই নেমির পেষণে দলিত হইয়া যায়!
কতলু খাঁর এই নিয়ম ছিল যে, কোন দুর্গ বা গ্রাম জয় হইলে, তন্মধ্যে কোন উৎকৃষ্ট সুন্দরী যদি বন্দী হইত, তবে সে তাঁহার আত্মসেবার জন্য প্রেরিত হইত। গড় মান্দারণ জয়ের পরদিবস, কতলু খাঁ তথায় উপনীত হইয়া বন্দীদিগের প্রতি যথা-বিহিত বিধান ও ভবিষ্যতে দুর্গের রক্ষণাবেক্ষণ পক্ষে সৈন্য নিয়োজন ইত্যাদি বিষয়ে নিযুক্ত হইলেন। বন্দীদিগের মধ্যে বিমলা ও তিলোত্তমাকে দেখিবামাত্র নিজ বিলাসগৃহ সাজাইবার জন্য তাহাদিগকে পাঠাইলেন। তৎপরে অন্যান্য কার্য্যে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। এমন শ্রুত ছিলেন যে, রাজপুত সেনা জগৎসিংহের বন্ধন শুনিয়া নিকটে কোথাও আক্রমণের উদ্যোগে আছে; অতএব তাহাদিগকে পরাঙ্মুখ করিবার জন্য উচিত ব্যবস্থা বিধানাদিতে ব্যাপৃত ছিলেন, এজন্য এ পর্য্যন্ত কতলু খাঁ নূতন দাসীদিগের সঙ্গসুখলাভ করিতে অবকাশ পান নাই।
বিমলা ও তিলোত্তমা পৃথক পৃথক কক্ষে রক্ষিত হইয়াছিলেন। তথায় পিতৃহীনা নবীনার ধূলি-ধূসরা দেহলতা ধরাতলে পড়িয়া আছে, পাঠক! তথায় নেত্রপাত

করিয়া কাজ নাই। কাজ কি ? তিলোত্তমা প্রতি কে আর এখন নেত্রপাত করিতেছে ? মধূদয়ে নববল্লরী যখন মন্দ-বায়ু হিল্লোলে বিধূত হইতে থাকে, কে না তখন সুবাসাশয়ে সাদরে তাহার কাছে দণ্ডায়মান হয় ? আর যখন নৈদাঘ ঝটিকাতে অবলম্বিত বৃক্ষ সহিত সে ভূতলশায়িনী হয়, তখন উন্মূলিত পদার্থরাশি মধ্যে বৃক্ষ ছাড়িয়া কে লতা দৃষ্টি করে ? কাঠুরিয়ারা কাঠ কাটিয়া লইয়া যায়, লতাকে পদতলে দলিত করে মাত্র।

চল, তিলোত্তমাকে রাখিয়া অন্যত্র যাই। যথায় চঞ্চলা, চতুরা, রসপ্রিয়া, রসিকা বিমলার পরিবর্ত্তে গম্ভীরা, অনুতাপিতা, মলিনা বিধবা চক্ষে অঞ্চল দিয়া বসিয়া আছে, তথায় যাই।

এই কি বিমলা ? তাহার সে কেশবিন্যাস নাই। মাথায় ধূলিরাশি; সে কারুকার্য্য-খচিত ওড়না নাই; সে রত্ন-খচিত কাঁচলি নাই; বসন বড় মলিন। পরিধানে জীর্ণ, ক্ষুদ্র বসন। সে অলঙ্কার-ভার কোথায় ? সে অংসসংস্পর্শলোভী কর্ণাভরণ কোথায় ? চক্ষু ফুলিয়াছে কেন ? সে কটাক্ষ কই ? কপালে ক্ষত কেন ? রুধির যে বাহিত হইতেছে!

বিমলা ওসমানের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

ওসমান পাঠানকুলতিলক। যুদ্ধ তাঁহার স্বার্থসাধন ও নিজ ব্যবসায় এবং ধর্ম্ম; সুতরাং যুদ্ধজয়ার্থ ওসমান কোন কার্য্যেই সঙ্কোচ করিতেন না। কিন্তু যুদ্ধ প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে পরাজিত পক্ষের প্রতি কদাচিৎ নিষ্প্রয়োজনে তিলার্দ্ধ অত্যাচার করিতে দিতেন না। যদি কতলু খাঁ স্বয়ং বিমলা, তিলোত্তমার অদৃষ্টে এ দারুণ বিধান না করিতেন, তবে ওসমানের কৃপায় তাঁহারা কদাচ বন্দী থাকিতেন না। তাঁহারই অনুকম্পায় স্বামীর মৃত্যুকালে বিমলা তৎসাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন। পরে যখন ওসমান জানিতে পারিলেন যে, বিমলা বীরেন্দ্রসিংহের স্ত্রী, তখন তাঁহার দয়ার্দ্র চিত্ত আরও আর্দ্রীভূত হইল। ওসমান কতলু খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র,* এজন্য অন্তঃপুরেও কোথাও তাঁহার গমনে বারণ ছিল না, ইহা পূর্ব্বেই দৃষ্ট হইয়াছে। যে বিহারগৃহে কতলু খাঁর উপপত্নীসমূহ থাকিত, সে স্থলে কতলু খাঁর পুত্রেরাও যাইতে পারিতেন না, ওসমানও নহে। কিন্তু ওসমান কতলু খাঁর দক্ষিণ হস্ত, ওসমানের বাহুবলেই তিনি আমোদর তীর পর্য্যন্ত উৎকল অধিকার করিয়াছিলেন। সুতরাং পৌরজন প্রায় কতলু খাঁর যাদৃশ, ওসমানের তাদৃশ বাধ্য ছিল। এজন্যই অদ্য প্রাতে বিমলার প্রার্থনানুসারে, চরমকালে তাঁহার স্বামিসন্দর্শন ঘটিয়াছিল।

বৈধব্য-ঘটনার দুই দিবস পরে বিমলার যে কিছু অলঙ্কারাদি অবশিষ্ট ছিল, তৎসমুদায় লইয়া তিনি কতলু খাঁর নিয়োজিত দাসীকে দিলেন। দাসী কহিল, "আমায় কি আজ্ঞা করিতেছেন ?"

বিমলা কহিলেন, তুমি যেরূপ কাল ওসমানের নিকট গিয়াছিলে, সেইরূপ আর একবার যাও; কহিও যে, আমি তাঁহার নিকট আর একবার সাক্ষাতের প্রার্থিতা; বলিও এই শেষ, আর তৃতীয়বার ভিক্ষা করিব না।"

দাসী সেইরূপ করিল। ওসমান বলিয়া পাঠাইলেন, "সে মহাল মধ্যে আমার যাতায়াতে উভয়েরই সঙ্কট; তাঁহাকে আমার আবাসমন্দিরে আসিতে কহিও।"

বিমলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি যাই কি প্রকারে ?" দাসী কহিল, "তিনি কহিয়াছেন যে, তিনি তাহার উপায় করিয়া দিবেন।"

সন্ধ্যার পর আয়েষার একজন দাসী আসিয়া অন্তঃপুররক্ষী খোজাদিগের সহিত কি কথাবার্ত্তা কহিয়া বিমলাকে সমভিব্যাহারে করিয়া ওসমানের নিকট লইয়া গেল।

ওসমান কহিলেন, "আর তোমার কোন অংশে উপকার করিতে পারি?" বিমলা কহিলেন, "অতি সামান্য কথামাত্র; রাজপুতকুমার জগৎসিংহ কি জীবিত আছে

☐ ইতিহাসে লেখে পুত্র

?”
ও। জীবিত আছেন।
বি। স্বাধীন আছেন কি বন্দী হইয়াছেন ?
ও। বন্দী বটে, কিন্তু আপাততঃ কারাগারে নহে। তাঁহার অঙ্গের অস্ত্রক্ষতের হেতু পীড়িত হইয়া শয্যাগত আছেন। কতলু খাঁর অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে অন্তঃপুরেই রাখিয়াছি। সেখানে বিশেষ যত্ন হইবে বলিয়া রাখিয়াছি।
বিমলা শুনিয়া বলিলেন, “এ অভাগিনীদের সম্পর্কমাত্রেই অমঙ্গল ঘটিয়াছে। সে সকল দেবতাকৃত। এক্ষণে যদি রাজপুত্র পুনর্জ্জীবিত হয়েন, তবে তাঁহার আরোগ্যপ্রাপ্তির পর, এই পত্রখানি তাঁহাকে দিবেন; আপাততঃ আপনার নিকট রাখিবেন। এইমাত্র আমার ভিক্ষা।”
ওসমান লিপি প্রত্যর্পণ করিয়া কহিলেন, “ইহা আমার অনুচিত কার্য্য; রাজপুত্র যে অবস্থাতেই থাকুন, তিনি বন্দী বলিয়া গণ্য। বন্দীদিগের নিকট কোন লিপি আমরা নিজে পাঠ না করিয়া যাইতে দেওয়া অবৈধ, এবং আমার প্রভুর আদেশবিরুদ্ধ।”
বিমলা কহিলেন, “এ লিপির মধ্যে আপনাদিগের অনিষ্টকারক কোন কথাই নাই; সুতরাং অবৈধ কার্য্য হইবে না। আর প্রভুর আদেশ? আপনি আপন প্রভু।”
ওসমান কহিলেন, “অন্যান্য বিষয়ে আমি পিতৃব্যের আদেশবিরুদ্ধ আচরণ কখন করিতে পারি; কিন্তু এ সকল বিষয়ে নহে। আপনি যখন কহিতেছেন যে, এই লিপিমধ্যে বিরুদ্ধ কথা নাই, তখন সেইরূপই আমার প্রতীতি হইতেছে, কিন্তু এ বিষয়ে নিয়ম ভঙ্গ করিতে পারি না। আমা হইতে এ কার্য্য হইবে না।”
বিমলা ক্ষুণ্ন হইয়া কহিলেন, “তবে আপনি পাঠ করিয়াই দিবেন।”
ওসমান লিপি গ্রহণ করিয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ বিমলার পত্র

“যুবরাজ! আমি প্রতিশ্রুত ছিলাম যে, একদিন আপনার পরিচয় দিব। এখন তাহার সময় উপস্থিত হইয়াছে।
ভরসা করিয়াছিলাম, আমার তিলোত্তমা অম্বরের সিংহাসনারূঢ়া হইলে পরিচয় দিব। সে সকল আশা-ভরসা নির্ম্মূল হইয়াছে। বোধ করি যে, কিছু দিন মধ্যে শুনিতে পাইবেন, এ পৃথিবীতে তিলোত্তমা কেহ নাই, বিমলা কেহ নাই। আমাদিগের পরমায়ু শেষ হইয়াছে।
এই জন্যই এখন আপনাকে এ পত্র লিখিতেছি। আমি মহাপাপীয়সী, বহুবিধ অবৈধ কার্য্য করিয়াছি, আমি মরিলে লোকে নিন্দা করিবে, কত মত কদর্য্য কথা বলিবে, কে তখন আমার ঘৃণিত নাম হইতে কলঙ্কের কালি মুছাইয়া তুলিবে ? এমন সুহৃদ্ কে আছে?
এক সুহৃদ্ আছেন, তিনি অচিরাৎ লোকালয় ত্যাগ করিয়া তপস্যায় প্রস্থান করিবেন। অভিরাম স্বামী হইতে দাসীর কার্য্যোদ্ধার হইবে না। রাজকুমার! এক দিনের তরেও আমি ভরসা করিয়াছিলাম, আমি আপনার আত্মীয়জনমধ্যে গণ্য হইব। একদিনের তরে আপনি আমার আত্মীয়জনের কর্ম্ম করুন। কাহাকেই বা এ কথা বলিতেছি ? অভাগিনীদের মন্দ ভাগ্য অগ্নিশিখাবৎ, যে বন্ধু নিকটে ছিলেন, তাঁহাকেও স্পর্শ করিয়াছে। যাহাই হউক, দাসীর এই ভিক্ষা স্মরণ রাখিবেন। যখন লোকে বলিবে বিমলা কুলটা ছিল, দাসী বেশে গণিকা ছিল, তখন কহিবেন, বিমলা নীচ-জাতি-সম্ভবা, বিমলা মন্দভাগিনী, বিমলা দুঃশাসিত রসনা-দোষে শত অপরাধে অপরাধিনী; কিন্তু বিমলা গণিকা নহে। যিনি এখন স্বর্গে গমন করিয়াছেন, তিনি বিমলার অদৃষ্ট-প্রসাদে যথাশাস্ত্র তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিমলা এক দিনের তরে নিজ প্রভুর নিকটে বিশ্বাসঘাতিনী নহে।

এতদিন একথা প্রকাশ ছিল না, আজ কে বিশ্বাস করিবে ? কেনই বা পত্নী হইয়া দাসীবৎ ছিলাম, তাহা শ্রবণ করুন—

গড় মান্দারণের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে শশিশেখর ভট্টাচার্য্যের বাস। শশিশেখর কোন সম্পন্ন ব্রাহ্মণের পুত্র; যৌবনকালে যথারীতি বিদ্যাধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু অধ্যয়নে স্বভাবদোষ দূর হয় না। জগদীশ্বর শশিশেখরকে সর্ব্বপ্রকার গুণ দান করিয়াও এক দোষ প্রবল করিয়া দিয়াছিলেন, সে যৌবনকালের প্রবল দোষ।

গড় মান্দারণে জয়ধরসিংহের কোন অনুচরের বংশে একটি পতিবিরহিণী রমণী ছিল। তাহার সৌন্দর্য্য অলৌকিক। তাহার স্বামী রাজসেনামধ্যে সিপাহী ছিল, এজন্য বহুদিন দেশত্যাগী। সেই সুন্দরী শশিশেখরের নয়নপথের পথিক হইল। অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার ঔরসে পতিবিরহিতার গর্ভসঞ্চার হইল।

অগ্নি আর পাপ অধিক দিন গোপনে থাকে না। শশিশেখরের দুষ্কৃতি তাঁহার পিতৃকর্ণে উঠিল। পুত্র-কৃত পরকুল-কলঙ্ক অপনীত করিবার জন্য শশিশেখরের পিতা সংবাদ লিখিয়া গর্ভবতীর স্বামীকে ত্বরিত গৃহে আনাইলেন। অপরাধী পুত্রকে বহুবিধ ভর্ৎসনা করিলেন। কলঙ্কিত হইয়া শশিশেখর দেশত্যাগী হইলেন।

শশিশেখর পিতৃ-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কাশীধামে যাত্রা করিলেন, তথায় কোন সর্ব্ববিৎ দণ্ডীর বিদ্যার খ্যাতি শ্রুত হইয়া, তাঁহার নিকট অধ্যয়নারম্ভ করিলেন। বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ; দর্শনাদিতে অত্যন্ত সুপটু হইলেন, জ্যোতিষে অদ্বিতীয় মহামহোপাধ্যায় হইয়া উঠিলেন। অধ্যাপক অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন।

শশিশেখর একজন শূদ্রীর গৃহের নিকটে বাস করিতেন। শূদ্রীর এক নবযুবতী কন্যা ছিল। ব্রাহ্মণে ভক্তিপ্রযুক্ত যুবতী আহারীয় আয়োজন প্রভৃতি শশিশেখরের গৃহ-কার্য্য সম্পাদন করিয়া দিত। মাতৃপিতৃদুষ্কৃতিভারে আবরণ নিক্ষেপ করাই কর্ত্তব্য। অধিক কি কহিব, শূদ্রী কন্যার গর্ভে শশিশেখরের ঔরসে এ অভাগিনীর জন্ম হইল।

শ্রবণমাত্র অধ্যাপক ছাত্রকে কহিলেন, 'শিষ্য! আমার নিকট দুষ্কর্ম্মান্বিতের অধ্যয়ন হইতে পারে না। তুমি আর কাশীধামে মুখ দেখাইও না।'

শশিশেখর লজ্জিত হইয়া কাশীধাম হইতে প্রস্থান করিলেন।

মাতাকে মাতামহ দুশ্চারিণী বলিয়া গৃহ-বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

দুঃখিনী মাতা আমাকে লইয়া এক কুটীরে রহিলেন। কায়িক পরিশ্রম দ্বারা জীবনধারণ করিতেন; কেহ দুঃখিনীর প্রতি ফিরিয়া চাহিত না। পিতারও কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। কয়েক বৎসর পরে, শীতকালে একজন আঢ্য পাঠান বঙ্গদেশ হইতে দিল্লী নগরে গমনকালে কাশীধাম দিয়া যান। অধিক রাত্রিতে নগরে উপস্থিত হইয়া রাত্রিতে থাকিবার স্থান পান না; তাঁহার সঙ্গে বিবি ও একটি নবকুমার। তাঁহারা মাতার কুটীরসন্নিধানে আসিয়া কুটীরমধ্যে নিশাযাপনের প্রার্থনা জানাইয়া কহিলেন, 'এ রাত্রে হিন্দুপল্লীমধ্যে কেহ আমাকে স্থান দিল না। এখন আমরা এ বালকটিকে লইয়া আর কোথা যাইব ? ইহার হিম সহ্য হইবে না। আমার সহিত অধিক লোক জন নাই, কুটীরমধ্যে অনায়াসে স্থান হইবে। আমি তোমাকে যথেষ্ট পুরস্কার করিব।' বস্তুতঃ পাঠান বিশেষ প্রয়োজনে ত্বরিতগমনে দিল্লী যাইতেছিলেন; তাঁহার সহিত একমাত্র ভৃত্য ছিল। মাতা দরিদ্রও বটে; সদয়চিত্তও বটে; ধনলোভেই হউক বা বালকের প্রতি দয়া করিয়াই হউক, পাঠানকে কুটীরমধ্যে স্থান দিলেন। পাঠান স-স্ত্রী সন্তান নিশাযাপনার্থ কুটীরের এক ভাগে প্রদীপ জ্বালিয়া শয়ন করিল—দ্বিতীয় ভাগে আমরা শয়ন করিলাম।

ঐ সময়ে কাশীধামে অত্যন্ত বালকচোরের ভয় প্রবল হইয়াছিল। আমি তখন ছয় বৎসরের বালিকামাত্র, আমি সকল স্মরণ করিয়া বলিতে পারি না। মাতার নিকটে যেরূপ যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাই বলিতেছি।

নিশীথে প্রদীপ জ্বলিতেছিল; একজন চোর পর্ণকুটীর মধ্যে সিঁদ দিয়া পাঠানের বালকটি অপহরণ করিয়া যাইতেছিল; আমার তখন নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল; আমি চোরের কার্য্য দেখিতে পাইয়াছিলাম। চোর বালক লইয়া যায় দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিলাম। আমার চীৎকারে সকলেরই নিদ্রাভঙ্গ হইল।

পাঠানের স্ত্রী দেখিলেন, বালক শয্যায় নাই। একেবারে আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন। চোর তখন বালক লইয়া শয্যাতলে লুক্কায়িত হইয়াছিল। পাঠান তাহার কেশাকর্ষণ করিয়া আনিয়া বালক কাড়িয়া লইলেন। চোর বিস্তর অনুনয় বিনয় করাতে অসি দ্বারা কর্ণচ্ছেদ মাত্র করিয়া বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।”

এই পর্য্যন্ত লিপি পাঠ করিয়া ওসমান অন্যমনে চিন্তা করিতে করিতে বিমলাকে কহিলেন, “তোমার কখন কি অন্য কোন নাম ছিল না ?”

বিমলা কহিলেন, “ছিল, সে যাবনিক নাম বলিয়া পিতা নাম পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।”

“কি সে নাম ? মাহরু ?”

বিমলা বিস্মিত হইয়া কহিলেন, “আপনি কি প্রকারে জানিলেন ?”

ওসমান কহিলেন, “আমিই সেই অপহৃত বালক।”

বিমলা বিস্মিত হইলেন। ওসমান পুনর্ব্বার পাঠ করিতে লাগিলেন।

“পরদিন প্রাতে পাঠান বিদায় কালে মাতাকে কহিলেন, “তোমার কন্যা আমার যে উপকার করিয়াছে, এক্ষণে তাহার প্রত্যুপকার করি, এমত সাধ্য নাই; কিন্তু তোমার যে কিছুতে অভিলাষ থাকে আমাকে কহ; আমি দিল্লী যাইতেছি, তথা হইতে আমি তোমার অভীষ্ট বস্তু পাঠাইয়া দিব। অর্থ চাহ, তাহাও পাঠাইয়া দিব।’

মাতা কহিলেন, ‘আমার ধনে প্রয়োজন নাই। আমি নিজ কায়িক পরিশ্রম দ্বারা স্বচ্ছন্দে দিন গুজরান করি, তবে যদি বাদশাহের নিকট আপনার প্রতিপত্তি থাকে,—’

এই সমস্ত কথা হইতে না হইতে পাঠান কহিলেন, ‘যথেষ্ট আছে। আমি রাজদরবারে তোমার উপকার করিতে পারি।’

মাতা কহিলেন, ‘তবে এই বালিকার পিতার অনুসন্ধান করাইয়া আমাকে সংবাদ দিবেন।’

পাঠান প্রতিশ্রুত হইয়া গেলেন। মাতার হস্তে স্বর্ণমুদ্রা দিলেন; মাতা তাহা গ্রহণ করিলেন না। পাঠান নিজ প্রতিশ্রুতি অনুসারে রাজপুরুষদিগকে পিতার অনুসন্ধানে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু অনুসন্ধান পাওয়া গেল না।

ইহার চতুর্দ্দশ বৎসর পরে রাজপুরুষেরা পিতার সন্ধান পাইয়া পূর্ব্ব-প্রচারিত রাজাজ্ঞানুসারে মাতাকে সংবাদলিপি পাঠাইলেন। পিতা দিল্লীতে ছিলেন। শশিশেখর ভট্টাচার্য্য নাম ত্যাগ করিয়া অভিরাম স্বামী নাম ধারণ করিয়াছিলেন। যখন এই সংবাদ আসিল, তখন মাতা স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। মন্ত্রপূতি ব্যতীত যাহার পাণিগ্রহণ হইয়াছে, তাহার যদি স্বর্গারোহণে অধিকার থাকে, তবে মাতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন সন্দেহ নাই।

পিতৃসংবাদ পাইলে আর কাশীধামে আমার মন তিষ্ঠিল না। সংসার মধ্যে কেবল আমার পিতা বর্ত্তমান ছিলেন; তিনি যদি দিল্লীতে, তবে আমি আর কাহার জন্য কাশীতে থাকি, এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি একাকিনী পিতৃদর্শনে যাত্রা করিলাম। পিতা আমার গমনে প্রথমে রুষ্ট হইলেন, কিন্তু আমি বহুতর রোদন করায় আমাকে তাঁহার সেবার্থ নিকটে থাকিতে অনুমতি করিলেন। মাহরু নাম পরিবর্ত্তন করিয়া বিমলা নাম রাখিলেন। আমি পিত্রালয়ে থাকিয়া পিতার সেবায় বিধিমতে মনোভিনিবেশ করিলাম; তাঁহার যাহাতে তুষ্টি জন্মে, তাহাতে যত্ন করিতে লাগিলাম। স্বার্থসিদ্ধি কিম্বা পিতার স্নেহের আকাঙ্খায় এইরূপ করিতাম, তাহা নহে; বস্তুতঃ পিতৃসেবায় আমার আন্তরিক আনন্দ জন্মিত; পিতা ব্যতীত আমার আর কেহ ছিল না। মনে করিতাম, পিতৃসেবা অপেক্ষা আর সুখ সংসারে নাই। পিতাও আমার ভক্তি দেখিয়াই হউক বা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ গুণবশতঃই হউক, আমাকে স্নেহ করিতে লাগিলেন। স্নেহ সমুদ্রমুখী নদীর ন্যায়; যত প্রবাহিত হয়, তত বর্দ্ধিত হইতে থাকে। যখন আমার সুখবাসর প্রভাত হইল, তখন জানিতে পারিয়াছিলাম যে, পিতা আমাকে কত ভালবাসিতেন।’

সপ্তম পরিচ্ছেদঃ বিমলার পত্র সমাপ্ত

"আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, গড় মান্দারণের কোন দরিদ্রা রমণী আমার পিতার ঔরসে গর্ভবতী হয়েন। আমার মাতার যেরূপ অদৃষ্টলিপির ফল, ইহারও তদ্রূপ ঘটিয়াছিল। ইহার গর্ভেও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে, এবং কন্যার মাতা অচিরাৎ বিধবা হইলে, তিনি আমার মাতার ন্যায়, নিজ কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া কন্যা প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। বিধাতার এমত নিয়ম নহে যে, যেমন আকর, তদুপযুক্ত সামগ্রীরই উৎপত্তি হইবে। পর্ব্বতের পাষাণেও কোমল কুসুমলতা জন্মে; অন্ধকার খনিমধ্যেও উজ্জ্বল রত্ন জন্মে। দরিদ্রের ঘরেও অদ্ভুত সুন্দরী কন্যা জন্মিল। বিধবার কন্যা গড় মান্দারণ গ্রামের মধ্যে প্রসিদ্ধ সুন্দরী বলিয়া পরিগণিতা হইতে লাগিলেন। কালে সকলেরই লয়; কালে বিধবার কলঙ্কেরও লয় হইল। বিধবার সুন্দরী কন্যা যে জারজা, এ কথা অনেকে বিস্মৃত হইল। অনেকে জানিত না। দুর্গমধ্যে প্রায় এ কথা কেহই জানিত না। আর অধিক কি বলিব ? সেই সুন্দরী তিলোত্তমার গর্ভধারিণী হইলেন।

তিলোত্তমা যখন মাতৃগর্ভে, তখন এই বিবাহ কারণেই আমার জীবনমধ্যে প্রধান ঘটনা ঘটিল। সেই সময়ে এক দিন পিতা তাঁহার জামাতাকে সমভিব্যাহারে করিয়া আশ্রমে আসিলেন। আমার নিকট মন্ত্রশিষ্য বলিয়া পরিচয় দিলেন, স্বর্গীয় প্রভুর নিকট প্রকৃত পরিচয় পাইলাম।

যে অবধি তাঁহাকে দেখিলাম, সেই অবধি আপন চিত্ত পরের হইল। কিন্তু কি বলিয়াই বা সে সব কথা আপনাকে বলি ? বীরেন্দ্রসিংহ বিবাহ ভিন্ন আমাকে লাভ করিতে পারিবেন না বুঝিলেন। পিতাও সকল বৃত্তান্ত অনুভবে জানিতে পারিলেন; একদিন উভয়ে এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, অন্তরাল হইতে শুনিতে পাইলাম।

পিতা কহিলেন, 'আমি বিমলাকে ত্যাগ করিয়া কোথাও থাকিতে পারিব না। কিন্তু বিমলা যদি তোমার ধর্ম্মপত্নী হয়, তবে আমি তোমার নিকটে থাকিব। আর যদি তোমার সে অভিপ্রায় না থাকে—'

পিতার কথা সমাপ্ত না হইতে হইতেই স্বর্গীয় দেব কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইয়া কহিলেন, 'ঠাকুর! শূদ্রী- কন্যাকে কি প্রকারে বিবাহ করিব ?

পিতা শ্লেষ করিয়া কহিলেন, 'জারজা কন্যাকে বিবাহ করিলে কি প্রকারে?'

প্রাণেশ্বর কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন, 'যখন বিবাহ করিয়াছিলাম, তখন জানিতাম না যে, সে জারজা। জানিয়া শুনিয়া শূদ্রীকে কি প্রকারে বিবাহ করিব ? আর আপনার জ্যেষ্ঠা কন্যা জারজা হইলেও শূদ্রী নহে।'

পিতা কহিলেন, 'তুমি বিবাহে অস্বীকৃত হইলে, উত্তম । তোমার যাতায়াতে বিমলার অনিষ্ট ঘটিতেছে, তোমার আর এ আশ্রমে আসিবার প্রয়োজন করে না। তোমার গৃহেই আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবেক।'

সে অবধিই তিনি কিয়দ্দিবস যাতায়াত ত্যাগ করিলেন। আমি চাতকির ন্যায় প্রতিদিবস তাঁহার আগমন প্রত্যাশা করিতাম; কিন্তু কিছু কাল আশা নিষ্ফল হইতে লাগিল। বোধ করি, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। পুনর্ব্বার পূর্ব্বমত যাতায়াত করিতে লাগিলেন। এজন্য পুনর্ব্বার তাঁহার দর্শন পাইয়া আর তত লজ্জাশীলা রহিলাম না। পিতা তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। একদিন আমাকে ডাকিয়া কহিলেন, আমি অনাশ্রম-ব্রত-ধর্ম অবলম্বন করিয়াছি; চিরদিন আমার কন্যার সহবাস ঘটিবেক না। আমি স্থানে স্থানে পর্য্যটন করিতে যাইব, তুমি তখন কোথায় থাকিবে?'

আমি পিতার বিরহাশঙ্কায় অত্যন্ত কাতর হইয়া রোদন করিতে লাগিলাম। কহিলাম, 'আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাইব। না হয়, যেরূপ কাশীধামে একাকিনী

ছিলাম, এখানেও সেইরূপ থাকিব।’

পিতা কহিলেন, ‘না বিমলে! আমি তদপেক্ষা উত্তম সঙ্কল্প করিয়াছি। আমার অনবস্থানকালে তোমার সুরক্ষক বিধান করিব। তুমি মহারাজ মানসিংহের নবোঢ়া মহিষীর সাহচর্য্যে নিযুক্ত থাকিবে।”

আমি কাঁদিয়া কহিলাম, ‘তুমি আমাকে পারিত্যাগ করিও না।’ ‘পিতা কহিলেন, ‘না, আমি এক্ষণে কোথাও যাইব না। তুমি এখন মানসিংহের গৃহে যাও। আমি এখানেই রহিলাম; প্রত্যহই তোমাকে দেখিয়া আসিব। তুমি তথায় কিরূপ থাক, তাহা বুঝিয়া কর্ত্তব্য বিধান করিব।’

যুবরাজ! আমি তোমাদিগের গৃহে পুরাঙ্গনা হইলাম। কৌশলে পিতা আমাকে নিজ জামাতার চক্ষুঃপথ হইতে দূর করিলেন।

যুবরাজ! আমি তোমার পিতৃভবনে অনেক দিন পৌরস্ত্রী হইয়া ছিলাম; কিন্তু তুমি আমাকে চেন না। তুমি তখন দশমবর্ষীয় বালক মাত্র; অম্বরের রাজবাটীতে মাতৃ- সন্নিধানে থাকিতে, আমি তোমার (নবোঢ়া) বিমাতার সাহচর্য্যে দিল্লীতে নিযুক্ত থাকিতাম। কুসুমের মালার তুল্য মহারাজ মানসিংহের কণ্ঠে অগণিতসংখ্যা রমণীরাজি গ্রথিত থাকিত; তুমি কি তোমার বিমাতা সকলকেই চিনিতে? যোধপুরসম্ভূতা ঊর্ম্মিলা দেবীকে তোমার স্মরণ হইবে? ঊর্ম্মিলার গুণ তোমার নিকট কত পরিচয় দিব ? তিনি আমাকে সহচারিণী দাসী বলিয়া জানিতেন না; আমাকে প্রাণাধিকা সহোদরা ভগিনীর ন্যায় জানিতেন। তিনি আমাকে সযত্নে নানা বিদ্যা শিখাইবার পদবীতে আরুঢ় করিয়া দিলেন। তাঁহারই অনুকম্পায় শিল্পকার্য্যাদি শিখিলাম। তাঁহারই মনোরঞ্জনার্থে নৃত্যগীত শিখিলাম। তিনি আমাকে স্বয়ং লেখাপড়া শিখাইলেন। এই যে কদক্ষরসম্বদ্ধ পত্রী তোমার নিকট পাঠাইতে সক্ষম হইতেছি, ইহা কেবল তোমার বিমাতা ঊর্ম্মিলা দেবীর অনুকম্পায়।

সখী ঊর্ম্মিলার কৃপায় আরও গুরুতর লাভ হইল। তিনি নিজ প্রীতিচক্ষে আমাকে যেমন দেখিতেন, মহারাজের নিকট সেইরূপ পরিচয় দিতেন। আমার সঙ্গীতাদিতে কিঞ্চিৎ ক্ষমতা জন্মিয়াছিল; তদ্দর্শন শ্রবণেও মহারাজের প্রীতি জন্মিত। যে কারণেই হউক, মহারাজ মানসিংহ আমাকে নিজ পরিবারস্থার ন্যায় ভাবিতেন। তিনি আমার পিতাকে ভক্তি করিতেন; পিতা সর্ব্বদা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেন।

ঊর্ম্মিলা দেবীর নিকট আমি সর্ব্বাংশে সুখী ছিলাম। কেবল এক মাত্র পরিতাপ যে, যাঁহার জন্য ধর্ম্ম ভিন্ন সর্ব্বত্যাগী হইতে প্রস্তুত ছিলাম, তাঁহার দর্শন পাইতাম না। তিনিই কি আমাকে বিস্মৃত হইয়াছিলেন ? তাহা নহে। যুবরাজ! আশমানি নাম্নী পরিচারিকাকে কি আপনার স্মরণ হয় ? হইতেও পারে। আশমানির সহিত আমার বিশেষ সম্প্রীতি ঘটিল; আমি তাহাকে প্রভুর সংবাদ আনিতে পাঠাইলাম। সে তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে আমার সংবাদ দিয়া আসিল। প্রত্যুত্তরে তিনি আমাকে কত কথা কহিয়া পাঠাইলেন, তাহা কি বলিব ? আমি আশমানির হস্তে তাঁহাকে পত্র লিখিয়া পাঠাইলাম, তিনিও তাহার প্রত্যুত্তর পাঠাইলেন। পুনঃপুনঃ ঐরূপ ঘটিতে লাগিল। এই প্রকার অদর্শনেও পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিলাম।

এই প্রণালীতে তিন বৎসর কাটিয়া গেল। যখন তিন বৎসরের বিচ্ছেদেও পরস্পর বিস্মৃত হইলাম না, তখন উভয়েই বুঝিলাম যে, এ প্রণয় শৈবালপুষ্পের ন্যায় কেবল উপরে ভাসমান নহে, পদ্মের ন্যায় ভিতরে বদ্ধমূল। কি কারণে বলিতে পারি না, এই সময়ে তাঁহার ধৈর্য্যাবশেষ হইল। একদিন তিনি বিপরীত ঘটাইলেন। নিশাকালে একাকিনী শয়নকক্ষে শয়ন করিয়াছিলাম, অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইলে স্তিমিত দীপালোকে দেখিলাম, শিওরে একজন মনুষ্য।

মধুর শব্দে আমার কর্ণরন্ধ্রে এই বাক্য প্রবেশ করিল যে, “প্রাণেশ্বরী! ভয় পাইও না। আমি তোমারই একান্ত দাস।”

আমি কি উত্তর দিব? তিন বৎসরের পর সাক্ষাৎ । সকল কথা ভুলিয়া গেলাম—তাঁহার কণ্ঠলগ্ন হইয়া রোদন করিতে লাগিলাম। শীঘ্র মরিব, তাই আর আমার লজ্জা নাই—সকল কথা বলিতে পারিতেছি।

যখন আমার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল, তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘তুমি কেমন করিয়া এ পুরীর মধ্যে আসিলে?’
তিনি কহিলেন, আশমানিকে জিজ্ঞাসা কর; তাহার সমভিব্যাহারে বারিবাহক দাস সাজিয়া পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম; সেই পর্য্যন্ত লুক্কায়িত আছি।’
আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এখন ?’
তিনি কহিলেন, আর কি ? তুমি যাহা কর।’
আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম, কি করি ? কোন্ দিক রাখি ? চিত্ত যে দিকে লয় , সেই দিকে মতি হইতে লাগিল। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অকস্মাৎ আমার শয়নকক্ষের দ্বার মুক্ত হইয়া গেল। সম্মুখে দেখি, মহারাজ মানসিংহ!’
বিস্তারে আবশ্যক কি? বীরেন্দ্রসিংহ কারাগারে আবদ্ধ হইলেন। মহারাজ এরূপ প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহাকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিবেন। আমার হৃদয়মধ্যে কিরূপ হইতে লাগিল, তাহা বোধ করি বুঝিতে পারিবেন। আমি কান্দিয়া উর্ম্মিলা দেবীর পদতলে পড়িলাম, আত্মদোষ সকল ব্যক্ত করিলাম; সকল দোষ আপনার স্কন্ধে স্বীকার করিয়া লইলাম। পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহারও চরণে লুণ্ঠিত হইলাম। মহারাজ তাঁহাকে ভক্তি করেন; তাঁহাকে গুরুবৎ শ্রদ্ধা করেন; অবশ্য তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিবেন। কহিলাম, ‘আপনার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে স্মরণ করুন।’ বোধ করি, পিতা মহারাজের সহিত একত্র যুক্তি করিয়াছিলেন। তিনি আমার রোদনে কর্ণপাতও করিলেন না। রুষ্ট হইয়া কহিলেন, ‘পাপীয়সি! তুই একেবারে লজ্জা ত্যাগ করিয়াছিস!
উর্ম্মিলা দেবী আমার প্রাণরক্ষার্থ মহারাজের নিকট বহুবিধ কহিলেন, মহারাজ কহিলেন , ‘আমি তবে চোরকে মুক্ত করি, সে যদি বিমলাকে বিবাহ করে।’
আমি তখন মহারাজের অভিসন্ধি বুঝিয়া নিঃশব্দ হইলাম। প্রাণেশ্বর মহারাজের বাক্যে বিষম রুষ্ট হইয়া কহিলেন, ‘আমি যাবজ্জীবন কারাগারে থাকিব, সেও ভাল; প্রাণদণ্ড নিব, সেও ভাল; তথাপি শূদ্রী কন্যাকে কখন বিবাহ করিব না। আপনি হিন্দু হইয়া কি প্রকারে এমন অনুরোধ করিতেছেন ?
মহারাজ কহিলেন, ‘যখন আমার ভগিনীকে শাহজাদা সেলিমের সহিত বিবাহ দিতে পারিয়াছি,তখন তোমাকে ব্রাহ্মণকন্যা বিবাহ করিতে অনুরোধ করিব, বিচিত্র কি ?
তথাপি তিনি সম্মত হইলেন না। বরং কহিলেন, ‘ মহারাজ যাহা হইবার, তাহা হইল। আমাকে মুক্তি দিউন, আমি বিমলার আর কখনও নাম করিব না।’
মহারাজ কহিলেন, ‘তাহা হইলে তুমি যে অপরাধ করিয়াছ, তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইল কই ? তুমি বিমলাকে ত্যাগ করিবে, অন্য জনে তাহাকে কলঙ্কিনী বলিয়া ঘৃণা করিয়া স্পর্শ করিবে না।’
তথাপি আশু তাঁহার বিবাহে মতি হইল না। পরিশেষে যখন আর কারাগার-যন্ত্রণা সহ্য হইল না, তখন অগত্যা অর্দ্ধসম্মত হইয়া কহিলেন, ‘বিমলা যদি আমার গৃহে পরিচারিকা হইয়া থাকিতে পারে, বিবাহের কথা আমার জীবিতকালে কখন উত্থাপন না করে, আমার ধর্ম্মপত্নী বলিয়া কখন পরিচয় না দেয়, তবে শূদ্রীকে বিবাহ করি, নচেৎ নহে।’
আমি বিপুল পুলকসহকারে তাহাই স্বীকার করিলাম। আমি ধন গৌরব পরিচয়াদির জন্য কাতর ছিলাম না। পিতা এবং মহারাজ উভয়েই সম্মত হইলেন। আমি দাসীবেশে রাজভবন হইতে নিজ ভর্ত্তৃভবনে আসিলাম।
অনিচ্ছায়, পরবল-পীড়ায় তিনি আমাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এমন অবস্থায় বিবাহ করিলে কে স্ত্রীকে আদর করিতে পারে ? বিবাহের পরে প্রভু আমাকে বিষ দেখিতে লাগিলেন। পূর্ব্বের প্রণয় তৎকালে একেবারে দূর হইল। মহারাজ মানসিংহকৃত অপমান সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া আমাকে তিরস্কার করিতেন, সে তিরস্কারও আমার আদর বোধ হইত। এইরূপে কিছুকাল গেল; কিন্তু সে সকল পরিচয়েই বা প্রয়োজন কি ? আমার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, অন্য কথা আবশ্যক নহে।

কালে আমি পুনর্ব্বার স্বামিপ্রণয়ভাগিনী হইয়াছিলাম, কিন্তু অম্বরপতির প্রতি তাঁহার পূর্ব্ববৎ বিষদৃষ্টি রহিল। কপালের লিখন! নচেৎ এ সব ঘটিবে কেন ?
আমার পরিচয় দেওয়া শেষ হইল। কেবল আত্মপ্রতিশ্রুতি উদ্ধার করাই আমার উদ্দেশ্য নহে। অনেকে মনে করে, আমি কুলধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিয়া গড় মান্দারণের অধিপতির নিকট ছিলাম। আমার লোকান্তর হইলে, নাম হইতে সে কালি আপনি মুছাইবেন, এই ভরসাতেই আপনাকে এত লিখিলাম।
এই পত্রে কেবল আত্মবিবরণই লিখিলাম। যাহার সংবাদ জন্য আপনি চঞ্চলচিত্ত, তাহার নামোল্লেখও করিলাম না। মনে করুন, সে নাম এ পৃথিবীতে লোপ হইয়াছে। তিলোত্তমা বলিয়া যে কেহ কখন ছিল, তাহা বিস্মৃত হউন।—" ওসমান লিপিপাঠ সমাপ্ত করিয়া কহিলেন, "মা! আপনি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, আমি আপনার প্রত্যুপকার করিব।"
বিমলা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "আর আমার পৃথিবীতে উপকার কি আছে? তুমি আমার কি উপকার করিবে? তবে এক উপকার—"
ওসমান কহিলেন , " আমি তাহাই সাধন করিব।"
বিমলার চক্ষুঃ প্রোজ্জ্বল হইল, কহিলেন, ওসমান! কি কহিতেছ ? এ দগ্ধ হৃদয়কে আর কেন প্রবঞ্চনা কর?
ওসমান হস্ত হইতে একটি অঙ্গুরীয় মুক্ত করিয়া কহিলেন, "এই অঙ্গুরীয় গ্রহণ কর, দুই একদিন মধ্যে কিছু সাধন হইবে না। কতলু খাঁর জন্মদিন আগত প্রায়, সে দিবস বড় উৎসব হইয়া থাকে। প্রহরিগণ আমোদে মত্ত থাকে। সেই দিবস আমি তোমাকে উদ্ধার করিব। তুমি সেই দিবস নিশীথে অন্তঃপুরদ্বারে আসিও; যদি তথায় কেহ তোমাকে এইরূপ দ্বিতীয় অঙ্গুরীয় দৃষ্ট করায়, তবে তুমি তাহার সঙ্গে বাহিরে আসিও; ভরসা করি, নিষ্কণ্টক আসিতে পারিবে। তবে জগদীশ্বরের ইচ্ছা।"
বিমলা কহিলেন, "জগদীশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন, আমি অধিক কি বলিব"।
বিমলা রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া আর কথা কহিতে পারিলেন না।
বিমলা ওসমানকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় লইবেন, এমন সময়ে ওসমান কহিলেন, এক কথা সাবধান করিয়া দিই। একাকিনী আসিবেন। আপনার সঙ্গে কেহ সঙ্গিনী থাকিলে কার্য্যসিদ্ধ হইবে না, বরং প্রমাদ ঘটিবে।"
বিমলা বুঝিতে পারিলেন যে, ওসমান তিলোত্তমাকে সঙ্গে আনিতে নিষেধ করিতেছেন। মনে মনে ভাবিলেন, "ভাল, দুইজন না যাইতে পারি, তিলোত্তমা একাই আসিবে।"
বিমলা বিদায় হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদঃ আরোগ্য

দিন যায়। তুমি যাহা ইচ্ছা তাহা কর, দিন যাবে, রবে না। যে অবস্থায় ইচ্ছা, সে অবস্থায় থাক, দিন যাবে , রবে না। পথিক! বড় দারুণ ঝটিকা বৃষ্টিতে পতিত হইয়াছ? উচ্চ রবে শিরোপরি ঘনগর্জ্জন হইতেছে? বৃষ্টিতে প্লাবিত হইতেছ ? অনাবৃত শরীর করকাভিঘাত হইতেছে? আশ্রয় পাইতেছ না ? ক্ষণেক ধৈর্য্য ধর, এ দিন যাবে— রবে না! ক্ষণেক অপেক্ষা কর ; দুর্দ্দিন ঘুচিবে, সুদিন হইবে; ভানূদয় হইবে; কালি পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর।
কাহার না দিন যায় ? কাহার দুঃখ স্থায়ী করিবার জন্য দিন বসিয়া থাকে ? তবে কেন রোদন কর ?
কার দিন গেল না ? তিলোত্তমা ধুলায় পড়িয়া আছে , তবু দিন যাইতেছে।

বিমলার হৃৎপদ্মে প্রতিহিংসা- কালফণী বসতি করিয়া সর্ব্বশরীর বিষে জর্জ্জর করিতেছে; এ মুহূর্ত্ত তাহার দংশন অসহ্য ; এক দিনে কত মুহূর্ত্ত ! তথাপি দিন কি গেল না?

কতলু খাঁ মস্‌নদে; শত্রুজয়ী : সুখে দিন যাইতেছে। দিন যাইতেছে, রহে না।

জগৎসিংহ রুগ্নশয্যায় ; রোগীর দিন কত দীর্ঘ , কে না জানে ? তথাপি দিন গেল!

দিন গেল। দিনে দিনে জগৎসিংহের আরোগ্য জন্মিতে লাগিল। একেবারে যমদণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া রাজপুত্র দিনে দিনে নিরাপদ হইতে লাগিলেন। প্রথমে শরীরের গ্লানি দূর; পরে আহার; পরে বল; শেষে চিন্তা।

প্রথম চিন্তা—তিলোত্তমা কোথায় ? রাজপুত্র যত আরোগ্য পাইতে লাগিলেন, তত সংবর্দ্ধিত ব্যাকুলতার সহিত সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; কেহ তুষ্টিজনক উত্তর দিল না। আয়েষা জানেন না; ওসমান বলেন না; দাসদাসী জানে না, কি ইঙ্গিত মতে বলে না। রাজপুত্র কণ্টকশয্যাশায়ীর ন্যায় চঞ্চল হইলেন।

দ্বিতীয় চিন্তা —নিজ ভবিষ্যৎ। "কি হইবে" অকস্মাৎ এ প্রশ্নের কে উত্তর দিতে পারে?

রাজপুত্র দেখিলেন, তিনি বন্দী। করুণহৃদয় ওসমান ও আয়েষার অনুকম্পায় তিনি কারাগারের বিনিময়ে সুসজ্জিত, সুবাসিত শয়নকক্ষে বসতি করিতেছেন; দাসদাসী তাঁহার সেবা করিতেছে; যখন যাহা প্রয়োজন , তাহা ইচ্ছা-ব্যক্তির পূর্ব্বেই পাইতেছেন; আয়েষা সহোদরাধিক স্নেহের সহিত তাঁহার যত্ন করিতেছেন; তথাপি দ্বারে প্রহরী ; স্বর্ণপিঞ্জরবাসী সুরস পানীয়ে পরিতৃপ্ত বিহঙ্গমের ন্যায় রুদ্ধ আছেন। কবে মুক্তিপ্রাপ্ত হইবেন? মুক্তিপ্রাপ্তির কি সম্ভাবনা ? তাঁহার সেনা সকল কোথায় ? সেনাপতিশূন্য হইয়া তাহাদের কি দশা হইল ?

তৃতীয় চিন্তা—আয়েষা ।এ চমৎকারিণী, পরহিত মূর্ত্তিমতী, কেমন করিয়া এই মৃন্ময় পৃথিবীতে অবতরণ করিল ?

জগৎসিংহ দেখিলেন, আয়েষার বিরাম নাই, শ্রান্তিবোধ নাই, অবহেলা নাই। রাত্রিদিন রোগীর শুশ্রূষা করিতেছেন। যতিদন না রাজপুত্র নীরোগ হইলেন, ততদিন তিনি প্রত্যহ প্রভাতে দেখিতেন, প্রভাতসূর্য্যরূপিনী কুসুম-দাম হস্তে করিয়া লাবণ্যময় পদ-বিক্ষেপে নিঃশব্দে আগমন করিতেছেন। প্রতিদিন দেখিতেন, যতক্ষণ স্নানাদি কার্য্যের সময় অতীত না হইয়া যায়, ততক্ষণ আয়েষা সে কক্ষ ত্যাগ করিতেন না। প্রতিদিন দেখিতেন, ক্ষণকাল পরেই প্রত্যাগমন করিয়া কেবল নিতান্ত প্রয়োজনবশতঃ গাত্রোত্থান করিতেন; যতক্ষণ না তাহার জননী বেগম তাঁহার নিকট কিঙ্করী পাঠাইতেন, ততক্ষণ তাঁহার সেবায় ক্ষান্ত হইতেন না।

কে রূগ্ন-শয্যায় না শয়ন করিয়াছেন ? যদি কাহারও রুগ্নশয্যার শিওরে বসিয়া মনোমোহিনী রমণী ব্যজন করিয়া থাকে, তবে সেই জানে রোগেও সুখ।

পাঠক! তুমি জগৎসিংহের অবস্থা প্রত্যক্ষীভূত করিতে চাহ ? তবে মনে মনে সেই শয্যায় শয়ন কর, শরীরে ব্যাধিযন্ত্রণা অনুভূত কর; স্মরণ কর যে, শত্রুমধ্যে বন্দী হইয়া আছ; তার পর সেই সুবাসিত, সুসজ্জিত, সুস্নিগ্ধ শয়নকক্ষ মনে কর। শয্যায় শয়ন করিয়া তুমি দ্বারপানে চাহিয়া আছ; অকস্মাৎ তোমার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল; এই শত্রুপুরীমধ্যে যে তোমাকে সহোদরের ন্যায় যত্ন করে, সেই আসিতেছে। সে আবার রমণী, যুবতী, পূর্ণবিকসিত পদ্ম! অমনই শয়ন করিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া আছ; দেখ কি মূর্ত্তি! ঈষৎ- ঈষৎ মাত্র দীর্ঘ আয়তন, তদুপযুক্ত গঠন, মহামহিম দেবী-প্রতিমা স্বরূপ! প্রকৃতি-নিয়মিত রাজ্ঞী স্বরূপ! দেখ কি ললিত পাদবিক্ষেপ! গজেন্দ্রগমন শুনিয়াছ ? সে কি? মরালগমন বল? ঐ পাদবিক্ষেপ দেখ; সুরের লয়, বাদ্যে হয়; ঐ পাদবিক্ষেপের লয়, তোমার হৃদয় মধ্যে হইতেছে। হস্তে ঐ কুসুমদাম দেখ, হস্তপ্রভায় কুসুম মলিন হইয়াছে দেখিয়াছ? কণ্ঠের প্রভায় স্বর্ণহার দীপ্তিহীন হইয়াছে দেখিয়াছ ? তোমার চক্ষুর পলক পড়ে না কেন ? দেখিয়াছ কি সুন্দর গ্রীবাভঙ্গী ? দেখিয়াছ প্রস্তরধবল গ্রীবার উপর কেমন নিবিড় কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ পড়িয়াছে? দেখিয়াছ তৎপার্শ্বে কেমন কর্ণভূষা দুলিতেছে ? মস্তকের ঈষৎ—ঈষৎ মাত্র বঙ্কিম ভঙ্গী দেখিয়াছ ? ও কেবল ঈষৎ দৈর্ঘ্যহেতু। অত একদৃষ্টিতে চাহিতেছ কেন ? আয়েষা কি মনে করিবে ?

যতদিন জগৎসিংহের রোগের শুশ্রূষা আবশ্যকতা হইল, ততদিন পর্য্যন্ত আয়েষা প্রত্যহ এইরূপ অনবরত তাহাতে নিযুক্ত রহিলেন। ক্রমে যেমন রাজপুত্রের রোগের উপশম হইতে লাগিল, তেমনই আয়েষারও যাতায়াত কমিতে লাগিল; যখন রাজপুত্রের রোগ নিঃশেষ হইল, তখন আয়েষার জগৎসিংহের নিকট যাতায়াত প্রায় একেবারে শেষ হইল; কদাচিৎ দুই একবার আসিতেন। যেমন শীতার্ত ব্যক্তির অঙ্গ হইতে ক্রমে ক্রমে বেলাধিক্যে রৌদ্র সরিয়া যায়, আয়েষা সেইরূপ ক্রমে ক্রমে জগৎসিংহ হইতে আরোগ্য কালে সরিয়া যাইতে লাগিলেন।

একদিন গৃহমধ্যে অপরাহ্নে জগৎসিংহ গবাক্ষে দাঁড়াইয়া দুর্গের বাহিরে দৃষ্টিপাত করিতেছেন; কত লোক অবাধে নিজ নিজ ঈপ্সিত বা প্রয়োজনীয় স্থানে যাতায়াত করিতেছে, রাজপুত্র দুঃখিত হইয়া তাহাদিগের অবস্থার সহিত আত্মাবস্থা তুলনা করিতেছিলেন। এক স্থানে কয়েকজন লোক মণ্ডলীকৃত হইয়া কোন ব্যক্তি বা বস্তু বেষ্টন পূর্ব্বক দাড়াইয়াছিল। রাজপুত্রের তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত হইল। বুঝিতে পারিলেন যে, লোকগুলি কোন আমোদে নিযুক্ত আছে, মন দিয়া কিছু শুনিতেছে। মধ্যস্থ ব্যক্তি কে, বা বস্তুটি কি, তাহা কুমার দেখিতে পাইতেছিলেন না। কিছু কৌতূহল জন্মিল। কিয়ৎক্ষণ পরে কয়েকজন শ্রোতা চলিয়া গেলে কুমারের কৌতূহল নিবারণ হইল; দেখিতে পাইলেন, মণ্ডলীমধ্যে এক ব্যক্তি একখানা পুতির ন্যায় কয়েকখণ্ড পত্র লইয়া তাহা হইতে কি পড়িয়া শুনাইতেছে। আবৃত্তিকর্ত্তার আকার দেখিয়া রাজকুমারের কিছু কৌতুক জন্মিল। তাঁহাকে মনুষ্য বলিলেও বলা যায়, বজ্রাঘাতে পত্রভ্রষ্ট মধ্যমাকার তালগাছ বলিলেও বলা যায়। প্রায় সেইরূপ দীর্ঘ, প্রস্থেও তদ্রূপ; তবে তালগাছে কখন তাদৃশ গুরু নাসিকাভার ন্যস্ত হয় না। আকারেঙ্গিতে উভয়ই সমান; পুতি পড়িতে পড়িতে পাঠক যে হাত নাড়া , মাথা নাড়া দিতেছিলেন, রাজকুমার তাহা অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে ওসমান গৃহমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পরস্পর অভিবাদনের পর ওসমান কহিলেন, ”আপনি গবাক্ষে অন্যমনস্ক হইয়া কি দেখিতেছিলেন ?”

জগৎসিংহ কহিলেন, “সরল কাষ্ঠবিশেষ । দেখিলে দেখিতে পাইবেন।”

ওসমান দেখিয়া কহিলেন, “রাজপুত্র, উহাকে কখন দেখেন নাই ?”

রাজপুত্র কহিলেন, “না।”

ওসমান কহিলেন, “ও আপনাদিগের ব্রাহ্মণ। কথাবার্ত্তায় বড় সরস; ও ব্যক্তিকে গড় মান্দারণে দেখিয়াছিলাম।”

রাজকুমার অন্তঃকরণে চিন্তিত হইলেন। গড় মান্দারণে ছিল? তবে এ ব্যক্তি কি তিলোত্তমার কোন সংবাদ বলিতে পারিবে না ?

এই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, “মহাশয়, উহার নাম কি ?”

ওসমান চিন্তা করিয়া কহিলেন, “উহার নামটি কিছু কঠিন, হঠাৎ স্মরণ হয় না, গনপত? না;—গনপত—গজপত—না; গজপত কি ?‘

গজপত ? গজপত এদেশীয় নাম নহে, অথচ দেখিতেছি, ও ব্যক্তি বাঙ্গালী?”

“বাঙ্গালী বটে, ভট্টাচার্য্য। উহার একটা উপাধি আছে, এলেম্-এলেম্ কি ?”

“মহাশয়! বাঙ্গালীর উপাধিতে ‘এলেম্’ শব্দ ব্যবহার হয় না। এলেম্‌কে বাঙ্গালায় বিদ্যা কহে। বিদ্যাভূষণ বা বিদ্যাবাগীশ হইবে।”

“হাঁ হাঁ বিদ্যা কি একটা,—রসুন, বাঙ্গালায় হস্তীকে কি বলে বলুন দেখি?”

“হস্তী।”

“আর?”

“করী, দন্তী, বারণ, নাগ, গজ—”

“হাঁ হাঁ, স্মরণ হইয়াছে; উহার নাম গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ।”
“বিদ্যাদিগগ্‌জ! চমৎকার উপাধি! যেমন নাম, তেমনই উপাধি। উহার সহিত আলাপ করিতে বড় কৌতূহল জন্মিতেছে।”
ওসমান খাঁ একটু একটু গজপতির কথাবার্ত্তা শুনিয়াছিলেন; বিবেচনা করিলেন, ইহার সহিত কথোপকথনে ক্ষতি হইতে পারে না। কহিলেন, “ক্ষতি কি ?”
উভয়ে নিকটস্থ বাহিরের ঘরে গিয়া ভৃত্যদ্বারা গজপতিকে আহ্বান করিয়া আনিলেন।

নবম পরিচ্ছেদঃ দিগ্‌গজ সংবাদ

ভৃত্যসঙ্গে গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলে রাজকুমার জিজ্ঞাসিলেন, “আপনি ব্রাহ্মণ?”
দিগ্‌গজ হস্তভঙ্গী সহিত কহিলেন,
“যাবৎ মেরৌ স্থিতা দেবা যাবদ্ গঙ্গা মহীতলে,
অসারে খলু সংসারে সারং শ্বশুরমন্দিরং।”
জগৎসিংহ হাস্য সংবরণ করিয়া প্রণাম করিলেন। গজপতি আশীর্ব্বাদ করিলেন, “খোদা খাঁ বাবুজীকে ভাল রাখুন।”
রাজপুত্র কহিলেন, “মহাশয়, আমি মুসলমান নহি, আমি হিন্দু।”
দিগ্‌গজ মনে করিলেন, “বেটা যবন, আমাকে ফাঁকি দিতেছে; কি একটা মতলব আছে; নহিলে আমাকে ডাকিবে কেন ?” ভয়ে বিষণ্নবদনে কহিলেন, “খাঁ বাবুজী, আমি আপনাকে চিনি; আপনার অন্নে প্রতিপালন, আমায় কিছু বলিবেন না, আপনার শ্রীচরণের দাস আমি।”
জগৎসিংহ দেখিলেন, ইহাও এক বিঘ্ন। কহিলেন, “মহাশয়, আপনি ব্রাহ্মণ; আমি রাজপুত, আপনি এরূপ কহিবেন না; আপনার নাম গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ ?”
দিগ্‌গজ ভাবিলেন, “ঐ গো! নাম জানে! কি বিপদে ফেলিবে ?” করযোড়ে কহিলেন, “দোহাই সেখজীর। আমি গরিব! আপনার পায়ে পড়ি।”
জগৎসিংহ দেখিলেন, ব্রাহ্মণ যেরূপ ভীত হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টতঃ উহার নিকট কোন কার্য্যসিদ্ধি হইবে না। অতএব বিষয়ান্তরে কথা কহিবার জন্য কহিলেন, “আপনার হাতে ও কি পুতি?”
“আজ্ঞা এ মাণিকপীরের পুতি!”
“ব্রাহ্মণের হাতে মাণিকপীরের পুতি!”
“আজ্ঞা,—আজ্ঞা, আমি ব্রাহ্মণ ছিলাম, এখন ত আর ব্রাহ্মণ নই।”
রাজকুমার বিস্ময়াপন্ন হইলেন, বিরক্তও হইলেন। কহিলেন, “সে কি ? আপনি গড় মান্দারণে থাকিতেন না?”
দিগ্‌গজ ভাবিলেন, “এই সর্ব্বনাশ করিল! আমি বীরেন্দ্রসিংহের দুর্গে থাকিতাম, টের পেয়েছে! বীরেন্দ্রসিংহের যে দশা করিয়াছে আমারও তাই করিবে।” ব্রাহ্মণ ত্রাসে কাঁদিয়া ফেলিল। রাজকুমার কহিলেন, “ও কি ও!”
দিগ্‌গজ হাত কচলাইতে কচলাইতে কহিলেন, “দোহাই খাঁ বাবা! আমায় মের না বাবা!” আমি তোমার গোলাম বাবা! তোমার গোলাম বাবা!”
“তুমি কি বাতুল হইয়াছ ?”
“না বাবা! আমি তোমারই দাস বাবা! আমি তোমারই বাবা!”

জগৎসিংহ অগত্যা ব্রাহ্মণকে সুস্থিত করিবার জন্য কহিলেন, "তোমার কোন চিন্তা নাই, তুমি একটু মাণিকপীরের পুতি পড়, আমি শুনি।"
ব্রাহ্মণ মাণিকপীরের পুতি লইয়া সুর করিয়া পড়িতে লাগিল। যেরূপ যাত্রার বালক অধিকারীর কানমলা খাইয়া গীত গায়, দিগ্‌গজ পণ্ডিতের সেই দশা হইল।
ক্ষণেক পরে রাজকুমার পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ব্রাহ্মণ হইয়া মাণিকপীরের পুতি পড়িতেছিলেন কেন ?"
ব্রাহ্মণ সুর থামাইয়া কহিল, "আমি মোছলমান হইয়াছি।"
রাজপুত্র কহিলেন, "সে কি ?" গজপতি কহিলেন, "যখন মোছলমান বাবুরা গড়ে এলেন, তখন আমাকে কহিলেন যে, আয় বামন্ তোর জাতি মারিব। এই বলিয়া তাঁহারা আমাকে ধরিয়া লইয়া মুরগির পালো রাঁধিয়া খাওয়াইলেন।"
"পালো কি?"
দিগ্‌গজ কহিলেন, "আতপ চাউল ঘৃতের পাক।"
রাজপুত্র বুঝিলেন পদার্থটা কি। কহিলেন, "বলিয়া যাও!"
"তারপর আমাকে বলিলেন, 'তুই মোছলমান হইয়াছিস; সেই অবধি আমি মোছলমান।"
রাজপুত্র এই অবসরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর আর সকলের কি হইয়াছে ?"
"আর আর ব্রাহ্মণ অনেকেই ঐরূপ মোছলমান হইয়াছে।"
রাজপুত্র ওসমানের মুখপানে দৃষ্টি করিলেন। ওসমান রাজপুত্রকৃত নির্ব্বাক্ তিরস্কার বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "রাজপুত্র ইহাতে দোষ কি ? মোছলমানের বিবেচনায় মহম্মদীয় ধর্ম্মই সত্য ধর্ম্ম; বলে হউক, ছলে হউক, সত্যধর্ম্ম প্রচারে আমাদের মতে অধর্ম্ম নাই, ধর্ম্ম আছে।"
রাজপুত্র উত্তর না করিয়া বিদ্যাদিগ্‌গজকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, "বিদ্যাদিগ্‌গজ মহাশয়!"
"আজ্ঞা এখন সেখ দিগ্‌গজ।"
"আচ্ছা তাই; সেখজী, গড়ের আর কাহারও সংবাদ জানেন না ?"
ওসমান রাজপুত্রের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন। দিগ্‌গজ কহিলেন, "আর অভিরাম স্বামী পলায়ন করিয়াছেন।"
রাজপুত্র বুঝিলেন, নির্ব্বোধকে স্পষ্ট স্পষ্ট জিজ্ঞাসা না করিলে কিছুই শুনিতে পাইবেন না। কহিলেন, "বীরেন্দ্রসিংহের কি হইয়াছে ?"
ব্রাহ্মণ কহিলেন, "নবাব কতলু খাঁ তাঁহাকে কাটিয়া ফেলিয়াছেন!"
রাজপুত্রের মুখ রক্তিমবর্ণ হইল। ওসমানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি ?" এ ব্রাহ্মণ অলীক কথা কহিতেছে?"
ওসমান গম্ভীরভাবে কহিলেন, "নবাব বিচার করিয়া রাজবিদ্রোহী জ্ঞানে প্রাণদণ্ড করিয়াছেন।"
রাজপুত্রের চক্ষুতে অগ্নি প্রোজ্জ্বল হইল।
ওসমানকে জিজ্ঞাসিলেন, "আর একটা নিবেদন করিতে পারি কি ? কার্য্য কি আপনার অভিমতে হইয়াছে?"
ওসমান কহিলেন, "আমার পরামর্শের বিরুদ্ধে।"
রাজকুমার বহুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। ওসমান সুসময় পাইয়া দিগ্‌গজকে কহিলেন, "তুমি এখন বিদায় হইতে পার।"
দিগ্‌গজ গাত্রোত্থান করিয়া চলিয়া যায়, কুমার তাঁহার হস্তধারণপূর্ব্বক নিবারণ করিয়া কহিলেন, "আর এক কথা জিজ্ঞাসা; বিমলা কোথায় ?"

ব্রাহ্মণ নিশ্বাস ত্যাগ করিল, একটু রোদনও করিল। কহিল, "বিমলা এখন নবাবের উপপত্নী।"
রাজকুমার বিদ্যুদ্দৃষ্টিতে ওসমানের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "এও সত্য ?"
ওসমান কোন উত্তর না করিয়া ব্রাহ্মণকে কহিলেন, "তুমি আর কি করিতেছ ? চলিয়া যাও।"
রাজপুত্র ব্রাহ্মণের হস্ত দৃঢ়তর ধারণ করিলেন, যাইবার শক্তি নাই। কহিলেন, "আর এক মুহূর্ত্ত রহ; আর একটা কথা মাত্র।" তাঁহার আরক্ত লোচন হইতে দ্বিগুণতর অগ্নিবিস্ফুরণ হইতেছিল, "আর একটা কথা। তিলোত্তমা?"
ব্রাহ্মণ উত্তর করিল, "তিলোত্তমা নবাবের উপপত্নী হইয়াছে। দাস দাসী লইয়া তাহারা স্বচ্ছন্দে আছে।"
রাজকুমার বেগে ব্রাহ্মণের হস্ত নিক্ষেপ করিলেন, ব্রাহ্মণ পড়িতে পড়িতে রহিল।
ওসমান লজ্জিত হইয়া মৃদুভাবে কহিলেন, "আমি সেনাপতি মাত্র।"
রাজপুত্র উত্তর করিলেন, "আপনি পিশাচের সেনাপতি।"

দশম পরিচ্ছেদঃ প্রতিমা বিসর্জ্জন

বলা বাহুল্য যে, জগৎসিংহের সে রাত্রে নিদ্রা আসিল না। শয্যা অগ্নিবিকীর্ণবৎ, হৃদয়মধ্যে অগ্নি জ্বলিতেছে। যে তিলোত্তমা মরিলে জগৎসিংহ পৃথিবী শূন্য দেখিতেন, এখন সে তিলোত্তমা প্রাণত্যাগ করিল না কেন, ইহাই পরিতাপের বিষয় হইল।
সে কি ? তিলোত্তমা মরিল না কেন ? কুসুমকুমার দেহ, মাধুর্য্যময় কোমলালোকে বেষ্টিত যে দেহ, যে দিকে জগৎসিংহ নয়ন ফিরান, সেই দিকে মানসিক দর্শনে দেখিতে পান, সে দেহ শ্মশানমৃত্তিকা হইবে? এই পৃথিবী—অসীম পৃথিবীতে কোথাও সে দেহের চিহ্ন থাকিবে না ? যখন এইরূপ চিন্তা করেন, জগৎসিংহের চক্ষুতে দর দর বারিধারা পড়িতে থাকে; অমনই আবার দুরাত্মা কতলু খাঁর বিহারমন্দিরের স্মৃতি হৃদয়মধ্যে বিদ্যুদ্বৎ চমকিত হয়, সেই কুসুমসুকুমার বপু পাপিষ্ঠ পাঠানের অঙ্কন্যস্ত দেখিতে পান, আবার দারুণাগ্নিতে হৃদয় জ্বলিতে থাকে।
তিলোত্তমা তাঁহার হৃদয়-মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী দেবীমূর্ত্তি।
সেই তিলোত্তমা পাঠানভবনে!
সেই তিলোত্তমা কতলু খাঁর উপপত্নী!
আর কি সে মূর্ত্তি রাজপুতে আরাধনা করে ?
সে প্রতিমা স্বহস্তে স্থানচ্যুত করিতে সঙ্কোচ না করা কি রাজপুতের কুলোচিত ?
সে প্রতিমা জগৎসিংহের হৃদয়মধ্যে বদ্ধমূল হইয়াছিল, তাহাকে উন্মুলিত করিতে মূলাধার হৃদয়ও বিদীর্ণ হইবে। কেমন করিয়া চিরকালের জন্য সে মোহিনী মূর্ত্তি বিস্মৃত হইবেন ? সে কি হয় ? যতদিন মেধা থাকিবে, যতদিন অস্থি-মজ্জা-শোণিত-নির্ম্মিত দেহ থাকিবে, ততদিন সে হৃদয়েশ্বরী হইয়া বিরাজ করিবে।
এই সকল উৎকট চিন্তায় রাজপুত্রের মনের স্থিরতা দূরে থাকুক, বুদ্ধিরও অপভ্রংশ হইতে লাগিল, স্মৃতির বিশৃঙ্খলা হইতে লাগিল; নিশাশেষেও দুই করে মস্তক ধারণ করিয়া বসিয়া আছেন, মস্তিস্ক ঘুরিতেছে, কিছুই আলোচনা করিবার আর শক্তি নাই।
একভাবে বহুক্ষণ বসিয়া জগৎসিংহের অঙ্গবেদনা করিতে লাগিল; মানসিক যন্ত্রণার প্রগাঢ়তায় শরীরে জ্বরের ন্যায় সন্তাপ জন্মিল, জগৎসিংহ বাতায়নসন্নিধানে

গিয়া দাঁড়াইলেন।
শীতল নৈদাঘ বায়ু আসিয়া জগৎসিংহের ললাট স্পর্শ করিল। নিশা অন্ধকার; আকাশ অনিবিড় মেঘাবৃত; নক্ষত্রাবলী দেখা যাইতেছে না, কদাচিৎ সচল মেঘখণ্ডের আবরণাভ্যন্তরে কোন ক্ষীণ তারা দেখা যাইতেছে; দূরস্থ বৃক্ষশ্রেণী অন্ধকারে পরস্পর মিশ্রিত হইয়া তমোময় প্রাচীরবৎ আকাশতলে রহিয়াছে, নিকটস্থ বৃক্ষে বৃক্ষে খদ্যোতমালা হীরকচূর্ণবৎ জ্বলিতেছে; সম্মুখস্থ এক তড়াগে আকাশ বৃক্ষাদির প্রতিবিম্ব অন্ধকারে অস্পষ্টরূপ স্থিত রহিয়াছে।
মেঘস্পৃষ্ট শীতল নৈশ বায়ুসংলগ্নে জগৎসিংহের কিঞ্চিৎ দৈহিক সন্তাপ দূর হইল। তিনি বাতায়নে হস্তরক্ষাপূর্ব্বক তদুপরি মস্তক ন্যস্ত করিয়া দাঁড়াইলেন। উন্নিদ্রায় বহুক্ষণাবধি উৎকট মানসিক যন্ত্রণা সহনে অবসন্ন হইয়াছিলেন; এক্ষণে স্নিগ্ধ বায়ুস্পর্শে কিঞ্চিৎ চিন্তাবিরত হইলেন, একটু অন্যমনস্ক হইলেন। এতক্ষণ যে ছুরিকা সঞ্চালনে হৃদয় বিদ্ধ হইতেছিল, এক্ষণে তাহা দূর হইয়া অপেক্ষাকৃত তীক্ষ্ণতাশূন্য নৈরাশ্য মনোমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। আশা ত্যাগ করাই অধিক ক্লেশ; একবার মনোমধ্যে নৈরাশ্য স্থিরতর হইলে আর তত ক্লেশকর হয় না । অস্ত্রাঘাতই সমধিক ক্লেশকর; তাহার পর যে ক্ষত হয়, তাহার যন্ত্রণা স্থায়ী বটে, কিন্তু তত উৎকট নহে। জগৎসিংহ নিরাশার মৃদুতর যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। অন্ধকার নক্ষত্রহীন গগন প্রতি চাহিয়া, এক্ষণে নিজ হৃদয়াকাশও যে তদ্রূপ অন্ধকার নক্ষত্রহীন হইল, সজল চক্ষুতে তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। ভূতপূর্ব্ব সকল মৃদুভাবে স্মরণ পথে আসিতে লাগিল; বাল্যকাল, কৈশোর-প্রমোদ, সকল মনে পড়িতে লাগিল; জগৎসিংহের চিত্ত তাহাতে মগ্ন হইল; ক্রমে অধিক অন্যমনস্ক হইতে লাগিলেন, ক্রমে অধিক শরীর শীতল হইতে লাগিল; ক্লান্তিবশে চেতনাপহরণ হইতে লাগিল; বাতায়ন অবলম্বন করিয়া জগৎসিংহের তন্দ্রা আসিল। নিদ্রিতাবস্থায় রাজকুমার স্বপ্ন দেখিলেন; গুরুতর যন্ত্রণাজনক স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন; নিদ্রিত বদনে ভ্রূকুটি হইতে লাগিল; মুখে উৎকট ক্লেশব্যঞ্জক ভঙ্গী হইতে লাগিল; অধর কম্পিত, বিচলিত হইতে লাগিল; ললাট ঘর্ম্মাক্ত হইতে লাগিল; করে দৃঢ়মুষ্টি বদ্ধ হইল।
চমকের সহিত নিদ্রাভঙ্গ হইল; অতি ব্যস্তে কুমার কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিতে লাগিলেন; কতক্ষণ এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন, তাহা নিশ্চিত বলা সুকঠিন; যখন প্রাতঃসূর্য্যকরে হর্ম্ম্য-প্রকার দীপ্ত হইতেছিল, তখন জগৎসিংহ হর্ম্ম্যতলে বিনা শয্যায়, বিনা উপাধানে লম্বমান হইয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন।
ওসমান আসিয়া তাঁহাকে উঠাইলেন। রাজপুত্র নিদ্রোত্থিত হইলে, ওসমান তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিলেন। রাজপুত্র পত্র হস্তে লইয়া নিরুত্তরে ওসমানের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। ওসমান বুঝিলেন, রাজপুত্র আত্ম বিহ্বল হইয়াছেন। অতএব এক্ষণে প্রয়োজনীয় কথোপকথন হইতে পারিবে না, বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, “রাজপুত্র! আপনার ভূশয্যার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে আমার কৌতূহল নাই। এই পত্র-প্রেরিকার নিকট আমি প্রতিশ্রুত ছিলাম যে, এই পত্র আপনাকে দিব; যে কারণে এতদিন এই পত্র আপনাকে দিই নাই, সে কারণ দূর হইয়াছে। আপনি সকল জ্ঞাত হইয়াছেন। অতএব পত্র আপনার নিকট রাখিয়া চলিলাম, আপনি অবসরমতে পাঠ করিবেন; অপরাহ্নে আমি পুনর্ব্বার আসিব। প্রত্যুত্তর দিতে চাহেন, তাহাও লইয়া লেখিকার নিকট প্রেরণ করিতে পারিব।”
এই বলিয়া ওসমান রাজপুত্রের নিকট পত্র রাখিয়া প্রস্থান করিলেন।
রাজপুত্র একাকী বসিয়া সম্পূর্ণ সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলে, বিমলার পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া অগ্নি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে নিক্ষেপ করিলেন। যতক্ষণ পত্রখানি জ্বলিতে লাগিল, ততক্ষণ তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। যখন পত্র নিঃশেষ দগ্ধ হইয়া গেল, তখন আপনা আপনি কহিতে লাগিলেন, “স্মৃতিচিহ্ন অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া নিঃশেষ করিতে পারিলাম, স্মৃতিও ত সন্তাপে পুড়িতেছে, নিঃশেষ হয় না কেন?”
জগৎসিংহ রীতিমত প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলেন। পুজাহ্নিক শেষ করিয়া ভক্তিভাবে ইষ্টদেবকে প্রণাম করিলেন; পরে করযোড়ে উর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া কহিতে

লাগিলেন, “গুরুদেব! দাসকে ত্যাগ করিবেন না। আমি রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করিব; ক্ষত্রকুলোচিত কার্য্য করিব; ও পাদপদ্মের প্রসাদ ভিক্ষা করি। বিধর্ম্মীর উপপত্নীকে এ চিত্ত হইতে দূর করিব; তাহাতে শরীর পতন হয়, অন্তকালে তোমাকে পাইব। মনুষ্যের যাহা সাধ্য তাহা করিতেছি, মনুষ্যের যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিব। দেখ গুরুদেব! তুমি অন্তর্যামী, অন্তস্থল পর্য্যন্ত দৃষ্টি করিয়া দেখ, আর আমি তিলোত্তমার প্রণয়প্রার্থী নহি, আর আমি তাহার দর্শনাভিলাষী নহি, কেবল কাল ভূতপূর্ব্বস্মৃতি অনুক্ষণ হৃদয় দগ্ধ করিতেছে। আকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জ্জন দিয়াছি, স্মৃতিলোপ কি হইবে না ? গুরুদেব! ও পদপ্রসাদ ভিক্ষা করি। নচেৎ স্মরণের যন্ত্রণা সহ্য হয় না।”

প্রতিমা বিসর্জ্জন হইল।

তিলোত্তমা তখন ধূলিশয্যায় কি স্বপ্ন দেখিতেছিল ? এ ঘোর অন্ধকারে, যে এক নক্ষত্র প্রতি সে চাহিয়াছিল, সেও তাহাকে আর করবিতরণ করিবে না। এ ঘোর ঝটিকায় যে লতায় প্রাণ বাঁধিয়াছিল, তাহা ছিঁড়িল; যে ভেলায় বুক দিয়া সমুদ্র পার হইতেছিল, সে ভেলা ডুবিল।

একাদশ পরিচ্ছেদঃ গৃহান্তর

অপরাহ্নে কথামত ওসমান রাজপুত্র সমক্ষে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, “যুবরাজ! প্রত্যুত্তর পাঠাইবার অভিপ্রায় হইয়াছে কি ?”

যুবরাজ প্রত্যুত্তর লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, পত্র হস্তে লইয়া ওসমানকে দিলেন। ওসমান লিপি হস্তে লইয়া কহিলেন, “আপনি অপরাধ লইবেন না; আমাদের পদ্ধতি আছে, দুর্গবাসী কেহ কাহাকে পত্র প্রেরণ করিলে, দুর্গ-রক্ষকেরা পত্র পাঠ না করিয়া পাঠান না।”

যুবরাজ কিঞ্চিৎ বিষণ্ন হইয়া কহিলেন, “এ ত বলা বাহুল্য। আপনি পত্র খুলিয়া পড়ুন; অভিপ্রায় হয় পাঠাইয়া দিবেন।”

ওসমান পত্র খুলিয়া পাঠ করিলেন। তাহাতে এই মাত্র লেখা ছিল—

“মন্দভাগিনি! আমি তোমার অনুরোধ বিস্মৃত হইব না। কিন্তু তুমি যদি পতিব্রতা হও, তবে শীঘ্র পতিপথাবলম্বন করিয়া আত্মকলঙ্ক লোপ করিবে।
জগৎসিংহ।”

ওসমান পত্র পাঠ করিয়া কহিলেন, “রাজপুত্র! আপনার হৃদয় অতি কঠিন।”

রাজপুত্র নীরস হইয়া কহিলেন, “পাঠান অপেক্ষা নহে।”

ওসমানের মুখ একটু আরক্ত হইল। কিঞ্চিৎ কর্কশ ভঙ্গীতে কহিলেন, “বোধ করি, পাঠান সর্ব্বাংশে আপনার সহিত অভদ্রতা না করিয়া থাকিবে।”

রাজপুত্র কুপিতও হইলেন, লজ্জিতও হইলেন। এবং কহিলেন, “না মহাশয়! আমি নিজের কথা কহিতেছি না। আপনি আমার প্রতি সর্ব্বাংশে দয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এবং বন্দী করিয়াও প্রাণদান দিয়াছেন; সেনা-হন্তা শত্রুর সাংঘাতিক পীড়ার শমতা করাইয়াছেন—যে ব্যক্তি কারাবাসে শৃঙ্খলবদ্ধ থাকিবে, তাহাকে প্রমোদাগারে বাস করাইতেছেন। আর অধিক কি করিবেন ? কিন্তু আমি বলি কি,—আপনাদের ভদ্রতাজালে জড়িত হইতেছি; এ সুখের পরিণাম কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। আমি বন্দী হই, আমাকে কারাগারে স্থান দিন, এ দয়ার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করুন। আর যদি বন্দী না হই, তবে আমাকে এ হেমপিঞ্জরে আবদ্ধ রাখার প্রয়োজন কি ?”

ওসমান স্থিরচিত্তে উত্তর করিলেন, “রাজপুত্র! অশুভের জন্য ব্যস্ত কেন ? অমঙ্গলকে ডাকিতে হয় না, আপনিই আইসে।”

রাজপুত্র গর্ব্বিত বচনে কহিলেন, “আপনার এ কুসুমশয্যা ছাড়িয়া কারাগারের শিলাশয্যায় শয়ন করা রাজপুতেরা অমঙ্গল বলিয়া গণে না।”

ওসমান কহিলেন, "শিলাশয্যা যদি অমঙ্গলের চরম হইত, তবে ক্ষতি কি ?"
রাজপুত্র ওসমান প্রতি তীব্র দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "যদি কতলু খাঁকে সমুচিত দণ্ড দিতে না পারিলাম, তবে মরণেই বা ক্ষতি কি ?"
ওসমান কহিলেন, "যুবরাজ! সাবধান! পাঠানের যে কথা সেই কাজ!"
রাজপুত্র হাস্য করিয়া কহিলেন, "সেনাপতি, আপনি যদি আমাকে ভয় প্রদর্শন করিতে আসিয়া থাকেন, তবে যত্ন বিফল জ্ঞান করুন।"
ওসমান কহিলেন, "রাজপুত্র, আমরা পরস্পর সন্নিধানে এরূপ পরিচিত আছি যে, মিথ্যা বাগাড়ম্বর কাহারও উদ্দেশ্য হইতে পারে না। আমি আপনার নিকট বিশেষ কার্য্যসিদ্ধির জন্য আসিয়াছি।"
জগৎসিংহ কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন। কহিলেন, "অনুমতি করুন।"
ওসমান কহিলেন, "আমি এক্ষণে যে প্রস্তাব করিব, তাহা কতলু খাঁর আদেশমত করিতেছি জানিবেন।"
জ। উত্তম।
ও। শ্রবণ করুন। রাজপুত পাঠানের যুদ্ধে উভয় কুল ক্ষয় হইতেছে।
রাজপুত্র কহিলেন, "পাঠানকুল ক্ষয় করাই যুদ্ধের উদ্দেশ্য।"
ওসমান কহিলেন, "সত্য বটে, কিন্তু উভয় কুল নিপাত ব্যতীত একের উচ্ছেদ কত দূর সম্ভাবনা, তাহাও দেখিতে পাইতেছেন। গড় মান্দারণ-জেতৃগণ নিতান্ত বলহীন নহে দেখিয়াছেন।"
জগৎসিংহ ঈষন্মাত্র সহাস্য হইয়া কহিলেন, "তাঁহারা কৌশলময় বটেন।"
ওসমান কহিতে লাগিলেন, "যাহাই হউক, আত্মগরিমা আমার উদ্দেশ্য নহে। মোগল সম্রাটের সহিত চিরদিন বিবাদ করিয়া পাঠানের উৎকলে তিষ্ঠান সুখের হইবে না।" কিন্তু মোগল সম্রাটও পাঠানদিগকে কদাচ নিজকরতলস্থ করিতে পারিবেন না। আমার কথা আত্মশ্লাঘা বিবেচনা করিবেন না। আপনি ত রাজনীতিজ্ঞ বটেন, ভাবিয়া দেখুন, দিল্লী হইতে উৎকল কতদূর। দিল্লীশ্বর যেন মানসিংহের বাহুবলে এবার পাঠান জয় করিলেন; কিন্তু কত দিন তাঁহার জয়-পতাকা এ দেশে উড়িবে? মহারাজ মানসিংহ সসৈন্য পশ্চাৎ হইবেন, আর উৎকলে দিল্লীশ্বরের অধিকার লোপ হইবে। ইতিপূর্ব্বেও ত আকবর শাহা উৎকল জয় করিয়াছেন, কিন্তু কত দিন তথাকার করগ্রাহী ছিলেন ? এবারও জয় করিলে, এবারও তাহা ঘটিবে। না হয় আবার সৈন্য প্রেরণ করিবেন; আবার উৎকল জয় করুন, আবার পাঠান স্বাধীন হইবে। পাঠানেরা বাঙ্গালী নহে; কখনও অধীনতা স্বীকার করে না; একজন মাত্র জীবিত থাকিতে কখন করিবেও না; ইহা নিশ্চিত কহিলাম। তবে আর রাজপুত পাঠানের শোণিতে পৃথিবী প্লাবিত করিয়া কাজ কি?"
জগৎসিংহ কহিলেন, "আপনি কিরূপ করিতে বলেন ?"
ওসমান কহিলেন, "আমি কিছুই বলিতেছি না। আমার প্রভু সন্ধি করিতে বলেন।"
জ। কিরূপ সন্ধি ?
ও। উভয় পক্ষেই কিঞ্চিৎ লাঘব স্বীকার করুন। নবাব কতলু খাঁ বাহুবলে বঙ্গদেশের যে অংশ জয় করিয়াছেন, তাহা ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন। আকবর শাহও উড়িষ্যার স্বত্ব ত্যাগ করিয়া সৈন্য লইয়া যাউন, আর ভবিষ্যতে আক্রমণ করিতে ক্ষান্ত থাকুন। ইহাতে বাদশাহের কোন ক্ষতি নাই; বরং পাঠানের ক্ষতি। আমরা যাহা ক্লেশে হস্তগত করিয়াছি, তাহা ত্যাগ করিতেছি; আকবর শাহ যাহা হস্তগত করিতে পারেন নাই, তাহাই ত্যাগ করিতেছেন।

রাজকুমার শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “উত্তম কথা; কিন্তু এ সকল প্রস্তাব আমার নিকট কেন? সন্ধিবিগ্রহের কর্ত্তা মহারাজ মানসিংহ; তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করুন।”
ওসমান কহিলেন, “মহারাজের নিকট দূত প্রেরণ করা হইয়াছিল; দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার নিকট কে রটনা করিয়াছে যে, পাঠানেরা মহাশয়ের প্রাণহানি করিয়াছে। মহারাজ সেই শোকে ও ক্রোধে সন্ধির নামও শ্রবণ করিলেন না; দূতের কথায় বিশ্বাস করিলেন না; যদি মহাশয় স্বয়ং সন্ধির প্রস্তাবকর্ত্তা হয়েন, তবে তিনি সম্মত হইতে পারিবেন।”
রাজপুত্র ওসমানের প্রতি পুনর্ব্বার স্থিরদৃষ্টি করিয়া কহিলেন, “সকল কথা পরিষ্কার করিয়া বলুন। আমার হস্তাক্ষর প্রেরণ করিলেও মহারাজের প্রতীতি জন্মিবার সম্ভাবনা। তবে আমাকে স্বয়ং যাইতে কেন কহিতেছেন?”
ও। তাহার কারণ এই যে, মহারাজ মানসিংহ স্বয়ং আমাদিগের অবস্থা সম্পূর্ণ অবগত নহেন; আপনার নিকট প্রকৃত বলবত্তা জানিতে পারিবেন। আর মহাশয়ের অনুরোধে বিশেষ কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা; লিপি দ্বারা সেরূপ নহে। সন্ধির আশু এক ফল হইবে যে, আপনি পুনর্ব্বার কারামুক্ত হইবেন। সুতরাং নবাব কতলু খাঁ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আপনি এ সন্ধিতে অবশ্য অনুরোধ করিবেন।
জ। আমি পিতৃসন্নিধানে যাইতে অস্বীকৃত নহি।
ও। শুনিয়া সুখী হইলাম; কিন্তু আরও এক নিবেদন আছে। আপনি যদি ঐরূপ সন্ধি সম্পাদন করিতে না পারেন, তবে আবার এ দুর্গমধ্যে প্রত্যাগমন করিতে অঙ্গীকার করিয়া যাউন।
জ। আমি অঙ্গীকার করিলেই যে প্রত্যাগমন করিব, তাহার নিশ্চয় কি ?
ওসমান হাসিয়া কহিলেন, “তাহা নিশ্চয় বটে। রাজপুতের বাক্য যে লঙ্ঘন হয় না, তাহা সকলেই জানে।”
রাজপুত্র সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, “আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে, পিতার সহিত সাক্ষাৎ পরেই একাকী দুর্গে প্রত্যাগমন করিব।”
ও। আর কোন বিষয়ও স্বীকার করুন; তাহা হইলেই আমরা বিশেষ বাধিত হই।—আপনি যে মহারাজের সাক্ষাৎ লাভ করিলে আমাদিগের বাসনানুযায়ী সন্ধির উদ্যোগী হইবেন, তাহাও স্বীকার করিয়া যাউন।
রাজপুত্র কহিলেন, “সেনাপতি মহাশয়! এ অঙ্গীকার করিতে পারিলাম না। দিল্লীর সম্রাট আমাদিগকে পাঠানজয়ে নিযুক্ত করিয়াছেন, পাঠান জয়ই করিব। সন্ধি করিতে নিযুক্ত করেন নাই, সন্ধি করিব না। কিম্বা সে অনুরোধও করিব না।”
ওসমানের মুখভঙ্গীতে সন্তোষ অথচ ক্ষোভ উভয়ই প্রকাশ হইল; কহিলেন, “যুবরাজ! আপনি রাজপুতের ন্যায় উত্তর দিয়াছেন, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখুন, আপনার মুক্তির আর অন্য উপায় নাই।”
জ। আমার মুক্তিতে দিল্লীশ্বরের কি ? রাজপুতকুলেও অনেক রাজপুত্র আছে।
ওসমান কাতর হইয়া কহিলেন, “যুবরাজ! আমার পরামর্শ শুনুন, এ অভিপ্রায় ত্যাগ করুন।”
জ। কেন মহাশয় ?
ও। রাজপুত্র! স্পষ্ট কথা কহিতেছি, আপনার দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হইবে বলিয়াই নবাব সাহেব আপনাকে এ পর্য্যন্ত আদরে রাখিয়াছিলেন; আপনি যদি তাহাতে বক্র হয়েন, তবে আপনার সমূহ পীড়া ঘটাইবেন।

জ। আবার ভয় প্রদর্শন! এইমাত্র আমি কারাবাসের প্রার্থনা আপনাকে জানাইয়াছি।
ও। যুবরাজ! কেবল কারাবাসেই যদি নবাব তৃপ্ত হয়েন, তবে মঙ্গল জানিবেন।
যুবরাজ ভ্রূভঙ্গী করিলেন। কহিলেন, "না হয় বীরেন্দ্রসিংহের রক্তস্রোতঃ বৃদ্ধি করাইব।" চক্ষু হইতে তাঁহার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল।
ওসমান কহিলেন, "আমি বিদায় হইলাম। আমার কার্য্য আমি করিলাম, কতলু খাঁর আদেশ অন্য দূতমুখে শ্রবণ করিবেন।"
কিছু পরে কথিত দূত আগমন করিল। সে ব্যক্তি সৈনিক পুরুষের বেশধারী, সাধারণ পদাতিক অপেক্ষা কিছু উচ্চপদস্থ সৈনিকের ন্যায়। তাহার সমভিব্যাহারী আর চারিজন অস্ত্রধারী পদাতিক ছিল। রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কার্য্য কি?"
সৈনিক কহিল, "আপনার বাসগৃহ পরিবর্ত্তন করিতে হইবেক।"
"আমি প্রস্তুত আছি, চল" বলিয়া রাজপুত্র দূতের অনুগামী হইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদঃ অলৌকিক আভরণ

মহোৎসব উপস্থিত। অদ্য কতলু খাঁর জন্মদিন। দিবসে রঙ্গ, নৃত্য, দান, আহার, পান ইত্যাদিতে সকলেই ব্যাপৃত ছিল। রাত্রিতে ততোধিক। এইমাত্র সায়াহ্নকাল উত্তীর্ণ হইয়াছে; দুর্গমধ্যে আলোকময়; সৈনিক, সিপাহী, ওমরাহ, ভৃত্য, পৌরবর্গ, ভিক্ষুক, মদ্যপ, নট, নর্ত্তকী, গায়ক, গায়িকা, বাদক, ঐন্দ্রজালিক, পুষ্পবিক্রেতা, গন্ধবিক্রেতা, তাম্বুলবিক্রেতা, আহারীয়বিক্রেতা, শিল্পকার্য্যোৎপন্নদ্রব্যজাতবিক্রেতা, এই সকলে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ। যথায় যাও, তথায় কেবল দীপমালা, গীতবাদ্য, গন্ধবারি, পান, পুষ্প, বাজি, বেশ্যা। অন্তঃপুরমধ্যেও কতক কতক ঐরূপ। নবাবের বিহারগৃহ অপেক্ষাকৃত স্থিরতর, কিন্তু অপেক্ষাকৃত প্রমোদময়। কক্ষে কক্ষে রজতদীপ, স্ফটিকদীপ, গন্ধদীপ স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোক বর্ষণ করিতেছে; সুগন্ধি কুসুমদাম পুষ্পাধারে, স্তম্ভে, শয্যায়, আসনে, আর পুরবাসিনীদিগের অঙ্গে বিরাজ করিতেছে; বায়ু আর গোলাবের গন্ধের ভার গ্রহণ করিতে পারে না; অগণিত দাসীবর্গ কেহ বা হৈমকার্য্যখচিত বসন, কেহ বা ইচ্ছামত নীল, লোহিত, শ্যামল, পাটলাদি বর্ণের চীনবাস পরিধান করিয়া অঙ্গের স্বর্ণালঙ্কার প্রতি দীপের আলোকে উজ্জ্বল করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। তাহারা যাঁহাদিগের দাসী, সে সুন্দরীরা কক্ষে কক্ষে বসিয়া মহাযত্নে বেশ বিন্যাস করিতেছিলেন। আজ নবাব প্রমোদমন্দিরে আসিয়া সকলকেই লইয়া প্রমোদ করিবেন; নৃত্যগীত হইবে। যাহার যাহা অভীষ্ট সে তাহা সিদ্ধ করিয়া লইবে। কেহ আজ ভ্রাতার চাকরি করিয়া দিবেন আশায় মাথায় চিরুণী জোরে দিতেছিলেন। অপরা, দাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া লইবেন ভাবিয়া অলকগুচ্ছ বক্ষ পর্য্যন্ত নামাইয়া দিলেন। কাহারও নবপ্রসূত পুত্রের দানস্বরূপ কিছু সম্পত্তি হস্তগত করা অভিলাষ, এজন্য গণ্ডে রক্তিমাবিকাশ করিবার অভিপ্রায়ে ঘর্ষণ করিতে করিতে রুধির বাহির করিলেন, কেহ বা নবাবের কোন প্রেয়সী ললনার নবপ্রাপ্ত রত্নালঙ্কারের অনুরূপ অলঙ্কার কামনায় চক্ষুর নীচে আকর্ণ কজ্জল লেপন করিলেন। কোন চণ্ডীকে বসন পরাইতে দাসী পেশোয়াজ মাড়াইয়া ফেলিল; চণ্ডী তাহার গালে একটা চাপড় মারিলেন। কোন প্রগল্‌ভার বয়োমাহাত্ম্যে কেশরাশির ভার ক্রমে শিথিলমূল হইয়া আসিতেছিল, কেশবিন্যাসকালে দাসী চিরুণী দিতে কতকটি চুল চিরুণীর সঙ্গে উঠিয়া আসিল; দেখিয়া কেশাধিকারিণী দরবিগলিত চক্ষুতে উচ্চরবে কাঁদিতে লাগিলেন।
কুসুমবনে স্থলপদ্মবৎ, বিহঙ্গকুলে কলাপীবৎ এক সুন্দরী বেশবিন্যাস সমাপন করিয়া, কক্ষে কক্ষে ভ্রমণ করিতেছিলেন। অদ্য কাহারও কোথাও যাইতে বাধা ছিল না। যেখানকার যে সৌন্দর্য্য, বিধাতা সে সুন্দরীকে তাহা দিয়াছেন; যে স্থানের যে অলঙ্কার, কতলু খাঁ তাহা দিয়াছিল; তথাপি সে রমণীর মুখ-মধ্যে কিছুমাত্র

সৌন্দর্য্য-গর্ব্ব বা অলঙ্কার-গর্ব্বচিহ্ন ছিল না। আমোদ, হাসি, কিছুই ছিল না। মুখকান্তি গম্ভীর, স্থির; চক্ষুতে কঠোর জ্বালা।
বিমলা এইরূপ পুরীমধ্যে স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া এক সুসজ্জীভূত গৃহে প্রবেশ করিলেন, প্রবেশানন্তর দ্বার অর্গলবদ্ধ করিলেন। এ উৎসবের দিনেও সে কক্ষমধ্যে একটিমাত্র ক্ষীণালোক জ্বলিতেছিল। কক্ষের এক প্রান্তভাগে একখানি পালঙ্ক ছিল। সেই পালঙ্কে আপদমস্তক শয্যোত্তরচ্ছদে আবৃত হইয়া কেহ শয়ন করিয়াছিল।
বিমলা পালঙ্কের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "আমি আসিয়াছি।"
শয়ান ব্যক্তি চমকিতের ন্যায় মুখের আবরণ দূর করিল। বিমলাকে চিনিতে পারিয়া, শয্যোত্তরচ্ছদ ত্যাগ করিয়া, গাত্রোত্থান করিয়া বসিল, কোন উত্তর করিল না।
বিমলা পুনরপি কহিলেন, "তিলোত্তমা! আমি আসিয়াছি।"
তিলোত্তমা তথাপি কোন উত্তর করিলেন না। স্থিরদৃষ্টিতে বিমলার মুখ প্রতি চাহিয়া রহিলেন।
তিলোত্তমা আর ব্রীড়াবিবশা বালিকা নহে। তদ্দণ্ডে তাঁহাকে সেই ক্ষীণালোকে দেখিলে বোধ হইত যে, দশ বৎসর পরিমাণ বয়োবৃদ্ধি হইয়াছে। দেহ অত্যন্ত শীর্ণ; মুখ মলিন। পরিধানে একখানি সঙ্কীর্ণায়তন বাস। অবিন্যস্ত কেশভারে ধূলিরাশি জড়িত হইয়া রহিয়াছে। অঙ্গে অলঙ্কারের লেশ নাই; কেবল পূর্ব্বে যে অলঙ্কার পরিধান করিতেন, তাহার চিহ্ন রহিয়াছে মাত্র।
বিমলা পুনরপি কহিলেন, "আমি আসিব বলিয়াছিলাম—আসিয়াছি। কথা কহিতেছ না কেন?"
তিলোত্তমা কহিলেন, "যে কথা ছিল, তাহা সকল কহিয়াছি, আর কি কহিব ?"
বিমলা তিলোত্তমার স্বরে বুঝিতে পারিলেন যে, তিলোত্তমা রোদন করিতেছিলেন; মস্তকে হস্ত দিয়া তাঁহার মুখ তুলিয়া দেখিলেন, চক্ষুর জলে মুখ প্লাবিত রহিয়াছে; অঞ্চল স্পর্শ করিয়া দেখিলেন, অঞ্চল সম্পূর্ণ আর্দ্র। যে উপাধানে মাথা রাখিয়া তিলোত্তমা শয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে হাত দিয়া দেখিলেন, তাহাও প্লাবিত। বিমলা কহিলেন, "এমন দিবানিশি কাঁদিলে শরীর কয়দিন বহিবে ?"
তিলোত্তমা আগ্রহসহকারে কহিলেন, "বহিয়া কাজ কি ? এতদিন বহিল কেন, এই মনস্তাপ।"
বিমলা নিরুত্তর হইলেন। তিনিও রোদন করিতে লাগিলেন।
কিয়ৎক্ষণ পর বিমলা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "এখন আজিকার উপায়?"
তিলোত্তমা অসন্তোষের সহিত বিমলার অলঙ্কারাদির দিকে পুনর্ব্বার চক্ষুঃপাত করিয়া কহিলেন, "উপায়ের প্রয়োজন কি ?"
বিমলা কহিলেন, "বাছা, তাচ্ছিল্য করিও না; আজও কি কতলু খাঁকে বিশেষ জান না? আপনার অবকাশ অভাবেও বটে, আমাদিগের শোক নিবারণার্থ অবকাশ দেওয়ার অভিলাষেও বটে, এ পর্য্যন্ত দুরাত্মা আমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছে; আজ পর্য্যন্ত আমাদিগের অবসরের যে সীমা, পূর্ব্বেই বলিয়া দিয়াছে। সুতরাং আজ আমাদিগকে নৃত্যশালায় না দেখিলে না জানি কি প্রমাদ ঘটাইবে।"
তিলোত্তমা কহিলেন, "আবার প্রমাদ কি ?"
বিমলা কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া কহিলেন, "তিলোত্তমা, একবারে নিরাশ হও কেন ? এখনও আমাদিগের প্রাণ আছে, ধর্ম্ম আছে; যত দিন প্রাণ আছে, তত দিন ধর্ম্ম রাখিব।"
তিলোত্তমা তখন কহিলেন, "তবে মা! এই সকল অলঙ্কার খুলিয়া ফেল; তুমি অলঙ্কার পরিয়াছ, আমার চক্ষুঃশূল হইয়াছে।"

বিমলা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, “বাছা, আমার সকল আভরণ না দেখিয়া আমাকে তিরস্কার করিও না।”
এই বলিয়া বিমলা নিজ পরিধেয় বাসমধ্যে লুক্কায়িত এক তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বাহির করিলেন; দীপপ্রভায় তাহার শাণিত ফলক বিদ্যুদ্বৎ চমকিয়া উঠিল। তিলোত্তমা বিস্মিতা ও বিশুষ্কমুখী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ কোথায় পাইলে ?”
বিমলা কহিলেন, “কাল হইতে অন্তঃপুরমধ্যে একজন নূতন দাসী আসিয়াছে দেখিয়াছ?”
তি। দেখিয়াছি—আশমানি আসিয়াছে।
বি। আশমানির দ্বারা ইহা অভিরাম স্বামীর নিকট হইতে আনাইয়াছি।
তিলোত্তমা নিঃশব্দ হইয়া রহিলেন; তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল। ক্ষণেক পরে বিমলা জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি এ বেশ অদ্য ত্যাগ করিবে না ?”
তিলোত্তমা কহিলেন, “না।”
বি। নৃত্যগীতাদিতে যাইবে না ?
তি। না।
বি। তাহাতেও নিস্তার পাইবে না।
তিলোত্তমা কাঁদিতে লাগিলেন। বিমলা কহিলেন, “স্থির হইয়া শুন, আমি তোমার নিস্কৃতির উপায় করিয়াছি।” তিলোত্তমা আগ্রহসহকারে বিমলার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। বিমলা তিলোত্তমার হস্তে ওসমানের অঙ্গুরীয় দিয়া কহিলেন, “এই অঙ্গুরীয় ধর; নৃত্যগৃহে যাইও না; অৰ্দ্ধরাত্রের এ দিকে উৎসব সম্পূর্ণ হইবেক না; সে পর্য্যন্ত আমি পাঠানকে নিবৃত্ত রাখিতে পারিব। আমি যে তোমার বিমাতা, তাহা সে জানিয়াছে, তুমি আমার সাক্ষাতে আসিতে পারিবে না, এই ছলে নৃত্যগীত সমাধা পর্য্যন্ত তাহার দর্শন-বাঞ্ছা ক্ষান্ত রাখিতে পারিব। অৰ্দ্ধরাত্রে অন্তঃপুরদ্বারে যাইও, তথায় আর একব্যক্তি তোমাকে এইরূপ আর এক অঙ্গুরীয় দেখাইবে। তুমি নির্ভয়ে তাহার সঙ্গে গমন করিও, যেখানে লইয়া যাইতে বলিবে, সে তোমাকে তথা লইয়া যাইবে। তুমি তাহাকে অভিরাম স্বামীর কুটীরে লইয়া যাইতে কহিও।”
তিলোত্তমা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন; বিস্ময়ে হউক বা আহ্লাদে হউক, কিয়ৎক্ষণ কথা কহিতে পারিলেন না, পরে কহিলেন, “এ বৃত্তান্ত কি ? এ অঙ্গুরীয় তোমাকে কে দিল ?”
বিমলা কহিলেন, “সে সকল বিস্তর কথা; অন্য সময়ে অবকাশ মত কহিব। এক্ষণে নিঃসঙ্কোচচিত্তে, যাহা বলিলাম, তাহা করিও।”
তিলোত্তমা কহিলেন, “তোমার কি গতি হইবে ? তুমি কি প্রকারে বাহির হইবে ?”
বিমলা কহিলেন, “আমার জন্য চিন্তা করিও না। আমি অন্য উপায়ে বাহির হইয়া কাল প্রাতে তোমার সহিত মিলিত হইব।”
এই বলিয়া বিমলা তিলোত্তমাকে প্রবোধ দিলেন; কিন্তু তিনি যে তিলোত্তমার জন্য নিজ মুক্তিপথ রোধ করিলেন, তাহা তিলোত্তমা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অনেক দিন তিলোত্তমার মুখে হর্ষবিকাশ হয় নাই; বিমলার কথা শুনিয়া তিলোত্তমার মুখ আজ হর্ষোৎফুল্ল হইল।
বিমলা দেখিয়া অন্তরে পুলকপূর্ণ হইলেন। বাষ্পগদ্গদস্বরে কহিলেন, “তবে আমি চলিলাম।”
তিলোত্তমা কিঞ্চিৎ সঙ্কোচের সহিত কহিলেন, “দেখিতেছি, তুমি দুর্গের সকল সংবাদ পাইয়াছ, আমাদিগের আত্মীয়বর্গ কোথায় ? কে কেমন আছে বলিয়া যাও।”

বিমলা দেখিলেন, এ বিপদ্‌সাগরেও জগৎসিংহ তিলোত্তমার মনোমধ্যে জাগিতেছেন। বিমলা রাজপুত্রের নিষ্ঠুর পত্র পাইয়াছেন, তাহাতে তিলোত্তমার নামও নাই; এ কথা তিলোত্তমা শুনিলে কেবল দগ্ধের উপর দগ্ধ হইবেন মাত্র; অতএব সে সকল কথা কিছুমাত্র না বলিয়া উত্তর করিলেন, "জগৎসিংহ এই দুর্গমধ্যেই আছেন; তিনি শারীরিক কুশলে আছেন।"

তিলোত্তমা নীরব হইয়া রহিলেন।

বিমলা চক্ষুঃ মুছিতে মুছিতে তথা হইতে গমন করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদঃ অঙ্গুরীয় প্রদর্শন

বিমলা গমন করিলে পর, একাকিনী কক্ষমধ্যে বসিয়া তিলোত্তমা যে সকল চিন্তা করিতেছিলেন, তাহা সুখদুঃখ উভয়েরই কারণ। পাপাত্মার পিঞ্জর হইতে যে আশু মুক্তি পাইবার সম্ভাবনা হইয়াছে, এ কথা মুহুর্মুহুঃ মনে পড়িতে লাগিল; কিন্তু কেবল এই কথাই নহে, বিমলা যে তাঁহাকে প্রাণাধিক স্নেহ করেন, বিমলা হইতেই যে তাঁহার উদ্ধার হইবার উপায় হইল, ইহা পুনঃ পুনঃ মনোমধ্যে আন্দোলন করিয়া দ্বিগুণ সুখী হইতে লাগিলেন। আবার ভাবিতে লাগিলেন, "মুক্ত হইলেই বা কোথা যাইব ? আর কি পিতৃগৃহ আছে ?" তিলোত্তমা আবার কাঁদিতে লাগিলেন। সকল চিন্তার সমতা করিয়া আর এক চিন্তা মনোমধ্যে প্রদীপ্ত হইতে লাগিল। "রাজকুমার তবে কুশলে আছেন ? কোথায় আছেন ? কি ভাবে আছেন ? তিনি কি বন্দী ?" এই ভাবিতে ভাবিতে তিলোত্তমা বাষ্পাকুললোচনা হইতে লাগিলেন। "হা অদৃষ্ট! রাজপুত্র আমারই জন্য বন্দী। তাঁহার চরণে প্রাণ দিলেও কি ইহার শোধ হইবে? আমি তাহার জন্য কি করিব ?" আবার ভাবিতে লাগিলেন, "তিনি কি কারাগারে আছেন ? কেমন সে কারাগার ? সেখানে কি আর কেহই যাইতে পারে না? তিনি কারাগারে বসিয়া কি ভাবিতেছেন ? তিলোত্তমা কি তাঁহার মনে পড়িতেছে ? পড়িতেছে বই কি ? আমিই যে তাঁহার এ যন্ত্রণার মূল! না জানি, মনে মনে আমাকে কত কটু বলিতেছেন!" আবার ভাবিতেছেন, "সে কি ? আমি এ কথা কেন ভাবি! তিনি কি কাহাকেও কটু বলেন? তা নয়, তবে এই আশঙ্কা, যদি আমাকে ভুলিয়া গিয়া থাকেন। কি যদি আমি যবনগৃহবাসিনী হইয়াছি বলিয়া ঘৃণায় আমাকে আর মনোমধ্যে স্থান না দেন।" আবার ভাবেন, "না না—তা কেন করিবেন; তিনিও যেমন দুর্গমধ্যে বন্দী, আমিও তেমনই বন্দীমাত্র; তবে কেন ঘৃণা করিবেন ? তবু যদি করেন, তবে আমি তাঁর পায়ে ধরিয়া বুঝাইব। বুঝিবেন না ? বুঝিবেন বই কি। না বুঝেন, তাঁহার সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিব। আগে আগুনে পরীক্ষা হইত; কলিতে তাহা হয় না; না হউক, আমি না হয় তাঁহার সম্মুখে আগুনে প্রাণত্যাগই করিব!" আবার ভাবেন, "কবেই বা তাঁহার দেখা পাইব ? কেমন করিয়া তিনি মুক্ত হইবেন ? আমি মুক্ত হইলে কি কার্য্য সিদ্ধ হইল? এ অঙ্গুরীয় বিমাতা কোথা পাইলেন ? তাঁহার মুক্তির জন্য এ কৌশল হয় না ? এ অঙ্গুরীয় তাঁহার নিকট পাঠাইলে হয় না ? কে আমাকে লইতে আসিবে ? তাহার দ্বারা কি কোন উপায় হইতে পারিবে না? ভাল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব, কি বলে। একবার সাক্ষাৎও কি পাইতে পারিব না ?" আবার ভাবেন, "কেমন করিয়াই বা সাক্ষাৎ করিতে চাহিব ? সাক্ষাৎ হইলেই বা কি বলিয়াই কথা কহিব ? কি কথা বলিয়াই বা মনের জ্বালা জুড়াইব ?"

তিলোত্তমা অবিরত চিন্তা করিতে লাগিলেন।

একজন পরিচারিকা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। তিলোত্তমা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাত্রি কত?"

দাসী কহিল, "দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে।" তিলোত্তমা দাসীর বহির্গমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দাসী প্রয়োজন সমাপন করিয়া চলিয়া গেল, তিলোত্তমা

বিমলা-প্রদত্ত অঙ্গুরীয় লইয়া কক্ষমধ্য হইতে যাত্রা করিলেন। তখন আবার মনে আশঙ্কা হইতে লাগিল। পা কাঁপে, হৃদয় কাঁপে, মুখ শুকায়; একপদে অগ্রসর একপদে পশ্চাৎ হইতে লাগিলেন। ক্রমে সাহসে ভর করিয়া অন্তঃপুরদ্বার পর্য্যন্ত গেলেন। পৌরবর্গ খোজা হাব্‌সী প্রভৃতি সকলেই প্রমোদে ব্যস্ত; কেহ তাঁহাকে দেখিল না; দেখিলেও তৎপ্রতি মনোযোগ করিল না; কিন্তু তিলোত্তমার বোধ হইতে লাগিল যেন সকলেই তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছে। কোনক্রমে অন্তঃপুরদ্বার পর্য্যন্ত আসিলেন; তথায় প্রহরিগণ আনন্দে উন্মত্ত। কেহ নিদ্রিত, কেহ জাগ্রতে অচেতন, কেহ অর্দ্ধচেতন। কেহ তাঁহাকে লক্ষ্য করিল না। একজন মাত্র দ্বারে দণ্ডায়মান ছিল; সেও প্রহরীর বেশধারী। সে তিলোত্তমাকে দেখিয়া কহিল, "আপনার হাতে আঙ্গ্‌টি আছে ?"

তিলোত্তমা সভয়ে বিমলাদত্ত অঙ্গুরীয় দেখাইলেন। প্রহরিবেশী উত্তমরূপে সেই অঙ্গুরীয় নিরীক্ষণ করিয়া নিজ হস্তস্থ অঙ্গুরীয় তিলোত্তমাকে দেখাইল। পরে কহিল, "আমার সঙ্গে আসুন, কোন চিন্তা নাই।"

তিলোত্তমা চঞ্চল চিত্তে প্রহরীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। অন্তঃপুরদ্বারে প্রহরিগণ যেরূপ শিথিলভাবাপন্ন, সর্ব্বত্র প্রহরিগণ প্রায় সেইরূপ। বিশেষ অদ্য রাত্রে অবারিত দ্বার, কেহই কোন কথা কহিল না। প্রহরী তিলোত্তমাকে লইয়া নানা দ্বার, নানা প্রকোষ্ঠ, নানা প্রাঙ্গণভূমি অতিক্রম করিয়া আসিতে লাগিল। পরিশেষে দুর্গপ্রান্তে ফটকে আসিয়া কহিল, "এক্ষণে কোথায় যাইবেন, আজ্ঞা করুন, লইয়া যাই।"

বিমলা কি বলিয়া দিয়াছিলেন, তাহা তিলোত্তমার স্মরণ হইল না। আগে জগৎসিংহকে স্মরণ হইল। ইচ্ছা, প্রহরীকে কহেন, "যথায় রাজপুত্র আছেন, তথায় লইয়া চল।" কিন্তু পূর্ব্বশত্রু লজ্জা আসিয়া বৈর সাধিল। কথা মুখে বাঁধিয়া আসিল। প্রহরী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় লইয়া যাইব ?"

তিলোত্তমা কিছুই বলিতে পারিলেন না; যেন জ্ঞানশূন্যা হইলেন, আপনা আপনিই হৃৎকম্প হইতে লাগিল। নয়নে দেখিতে, কর্ণে শুনিতে পান না; মুখ হইতে কি কথা বাহির হইল, তাহাও কিছু জানিতে পারিলেন না; প্রহরীর কর্ণে অর্দ্ধস্পষ্ট "জগৎসিংহ" শব্দটি প্রবেশ করিল।

প্রহরী কহিল, "জগৎসিংহ এক্ষণে কারাগারে আবদ্ধ আছেন, সে অন্যের অগম্য। কিন্তু আমার প্রতি এমন আজ্ঞা আছে যে, আপনি যথায় যাইতে চাহিবেন, তথায় লইয়া যাইব, আসুন।"

প্রহরী দুর্গমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিল। তিলোত্তমা কি করিতেছেন, কোথায় যাইতেছেন, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কলের পুত্তলীর ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে ফিরিলেন; সেইভাবে তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। প্রহরী কারাগারদ্বারে গমন করিয়া দেখিল যে, অন্যত্র প্রহরিগণ যেরূপ প্রমোদাসক্ত হইয়া নিজ নিজ কার্য্যে শৈথিল্য করিতেছে, এখানে সেরূপ নহে, সকলেই স্ব স্ব স্থানে সতর্ক আছে। একজনকে জিজ্ঞাসা করিল, "রাজপুত্র কোন্ স্থানে আছেন ?" সে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা দেখাইয়া দিল। অঙ্গুরীয়বাহক প্রহরী কারাগার-রক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিল, "বন্দী এক্ষণে নিদ্রিত না জাগরিত আছেন ?" কারাগার-রক্ষী কক্ষদ্বার পর্য্যন্ত গমন করিয়া প্রত্যাগমনপূর্ব্বক কহিল, "বন্দীর উত্তর পাইয়াছি, জাগিয়া আছে।"

অঙ্গুরীয়বাহক প্রহরী রক্ষীকে কহিল, "আমাকে ও কক্ষের দ্বার খুলিয়া দাও, এই স্ত্রীলোক সাক্ষাৎ করিতে যাইবেক।"

রক্ষী চমৎকৃত হইয়া কহিল, "সে কি! এমত হুকুম নাই, তুমি কি জান না?"

অঙ্গুরীয়বাহক কারাগারের প্রহরীকে ওসমানের সাঙ্কেতিক অঙ্গুরীয় দেখাইল। সে তৎক্ষণাৎ নতশির হইয়া কক্ষের দ্বারোদঘাটন করিয়া দিল।

রাজকুমার কক্ষমধ্যে এক সামান্য চৌপায়ার উপর শয়ন করিয়া ছিলেন। দ্বারোদঘাটন শব্দ শুনিয়া কৌতূহলপ্রযুক্ত দ্বারপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। তিলোত্তমা বাহির দিকে দ্বারের নিকট আসিয়া আর আসিতে পারিলেন না। আবার পা চলে না; দ্বারপার্শ্বে কবাট ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অঙ্গুরীয়বাহক তিলোত্তমাকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে অনিচ্ছুক দেখিয়া কহিল, "এ কি? আপনি এখানে বিলম্ব করেন কেন ?" তথাপি তিলোত্তমার পা উঠিল না।

প্রহরী পুনর্ব্বার কহিল, “না যান, তবে প্রত্যাগমন করুন। এ দাঁড়াইবার স্থান নহে।”
তিলোত্তমা প্রত্যাগমন করিতে উদ্যত হইলেন। আবার সেদিকেও পা সরে না। কি করেন! প্রহরী ব্যস্ত হইল। ভাবিতে ভাবিতে আপনার অজ্ঞাতসারে তিলোত্তমা এক পা অগ্রসর হইলেন। তিলোত্তমা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।
কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া রাজপুত্রের দর্শনমাত্র আবার তিলোত্তমার গতিশক্তি রহিত হইল, আবার দ্বারপার্শ্বে প্রাচীর অবলম্বনে অধোমুখে দাঁড়াইলেন।
রাজপুত্র প্রথমে তিলোত্তমাকে চিনিতে পারিলেন না। স্ত্রীলোক দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। রমণী প্রাচীর ধরিয়া আধোমুখে দাঁড়াইল, নিকটে আইসে না, দেখিয়া আরও বিস্ময়াপন্ন হইলেন। শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দ্বারের নিকটে আসিলেন। নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, চিনিতে পারিলেন।
তিলার্দ্ধ জন্য নয়নে নয়নে মিলিত হইল। তৎক্ষণাৎ তিলোত্তমার চক্ষু অমনই পৃথিবীপানে নামিল; কিন্তু শরীর ঈষৎ সম্মুখে হেলিল, যেন রাজপুত্রের চরণতলে পতিত হইবেন।
রাজপুত্র কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ সরিয়া দাঁড়াইলেন; অমনই তিলোত্তমার দেহ মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্তম্ভিত হইয়া স্থির রহিল। ক্ষণপ্রস্ফুটিত হৃৎপদ্ম সঙ্গে সঙ্গে শুকাইয়া উঠিল। রাজপুত্র কথা কহিলেন, “বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা ?”
তিলোত্তমার হৃদয়ে শেল বিন্ধিল। “বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা ?” এখনকার কি এই সম্বোধন ? জগৎসিংহ কি তিলোত্তমার নামও ভুলিয়া গিয়াছেন ? উভয়েই ক্ষণেক নীরব হইয়া রহিলেন। পুনর্ব্বার রাজপুত্র কথা কহিলেন, “এখানে কি অভিপ্রায়ে ?”
“এখানে কি অভিপ্রায়ে!” কি প্রশ্ন! তিলোত্তমার মস্তক ঘুরিতে লাগিল; চারিদিকে কক্ষ, শয্যা, প্রদীপ, প্রাচীর সকলেই যেন ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল; অবলম্বনার্থ প্রাচীরে মস্তক দিয়া দাঁড়াইলেন।
রাজপুত্র অনেকক্ষণ প্রত্যুত্তর প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়া রহিলেন; কে প্রত্যুত্তর দিবে? প্রত্যুত্তরের সম্ভাবনা না দেখিয়া কহিলেন, “তুমি যন্ত্রণা পাইতেছ, ফিরিয়া যাও, পূর্ব্বকথা বিস্মৃত হও।”
তিলোত্তমার আর ভ্রম রহিল না, অকস্মাৎ বৃক্ষচ্যুত বল্লীবৎ ভূতলে পতিত হইলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ ঃ মোহ

জগৎসিংহ আনত হইয়া দেখিলেন, তিলোত্তমার স্পন্দ নাই। নিজ বস্ত্র দ্বারা ব্যজন করিতে লাগিলেন, তথাপি তাঁহার কোন সংজ্ঞাচিহ্ন না দেখিয়া প্রহরীকে ডাকিলেন।
তিলোত্তমার সঙ্গী তাঁহার নিকটে আসিল। জগৎসিংহ তাঁহাকে কহিলেন, “ইনি অকস্মাৎ মূর্চ্ছিতা হইয়াছেন। কে ইহার সঙ্গে আসিয়াছে। তাহাকে আসিয়া শুশ্রূষা করিতে বল।”
প্রহরী কহিল, “কেবল আমিই সঙ্গে আসিয়াছি।” রাজপুত্র বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, “তুমি?”
প্রহরী কহিল, “আর কেহ আইসে নাই।”
“তবে কি উপায় হইবে ? কোন পৌরদাসীকে সংবাদ কর।”
প্রহরী চলিল। রাজপুত্র আবার তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, “শোন, অপর কাহাকে সংবাদ দিলে গোলযোগ হইবে। আর আজ রাত্রে কেই বা প্রমোদ ত্যাগ করিয়া

ইহার সাহায্যে আসিবে?”
প্রহরী কহিল, “সেও বটে। আর কাহাকেই বা প্রহরীরা কারাগারে প্রবেশ করিতে দিবে ? অন্য অন্য লোককে কারাগারে আনিতে আমার সাহস হয় না।”
রাজপুত্র কহিলেন, “তবে কি করিব ? ইহার একমাত্র উপায় আছে; তুমি ঝটিতি দাসীর দ্বারা নবাবপুত্রীর নিকট এ কথার সংবাদ কর।”
প্রহরী দ্রুতবেগে তদভিপ্রায়ে চলিল। রাজপুত্র সাধ্যমত তিলোত্তমার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তখন রাজপুত্র মনে কি ভাবিতেছিলেন, কে বলিবে ? চক্ষুতে জল আসিয়াছিল কি না কে বলিবে ?
রাজকুমার একাকী কারাগারে তিলোত্তমাকে লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেন। যদি আয়েষার নিকট সংবাদ যাইতে না পারে, যদি আয়েষা কোন উপায় করিতে না পারেন, তবে কি হইবে ?
তিলোত্তমার ক্রমে অল্প অল্প চেতনা হইতে লাগিল। সেই ক্ষণেই মুক্ত দ্বারপথে জগৎসিংহ দেখিতে পাইলেন যে, প্রহরীর সঙ্গে দুইটি স্ত্রীলোক আসিতেছে, একজন অবগুণ্ঠনবতী। দূর হইতেই, অবগুণ্ঠনবতীর উন্নত শরীর, সঙ্গীতমধুর-পদবিন্যাস, লাবণ্যময় গ্রীবাভঙ্গী দেখিয়া রাজপুত্র জানিতে পারিলেন যে, দাসী সঙ্গে আয়েষা স্বয়ং আসিতেছেন, আর যেন সঙ্গে সঙ্গে ভরসা আসিতেছে।
আয়েষা ও দাসী প্রহরীর সঙ্গে কারাগার-দ্বারে আসিলে, দ্বাররক্ষক, অঙ্গুরীয়বাহক প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিল, “ইহাদেরও যাইতে দিতে হইবে কি ?”
অঙ্গুরীয়বাহক কহিল, “তুমি জান—আমি জানি না।” রক্ষী কহিল, “উত্তম।” এই বলিয়া স্ত্রীলোকদিগকে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল। নিষেধ শুনিয়া আয়েষা মুখের অবগুণ্ঠন মুক্ত করিয়া কহিলেন, “প্রহরী! আমাকে প্রবেশ করিতে দাও; যদি ইহাতে তোমার প্রতি কোন মন্দ ঘটে, আমার দোষ দিও।”
প্রহরী আয়েষাকে চিনিত না। কিন্তু দাসী চুপি চুপি পরিচয় দিল। প্রহরী বিস্মিত হইয়া অভিবাদন করিল এবং করযোড়ে কহিল, “দীনের অপরাধ মার্জ্জনা হয়, আপনার কোথাও যাইতে নিষেধ নাই।”
আয়েষা কারাগার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সে সময়ে তিনি হাসিতেছিলেন না, কিন্তু মুখ স্বতঃ সহাস্য; বোধ হইল হাসিতেছেন। কারাগারের শ্রী ফিরিল; কাহারও বোধ রহিল না যে, এ কারাগার।
আয়েষা রাজপুত্রকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, “রাজপুত্র! এ কি সংবাদ ?”
রাজপুত্র কি উত্তর করিবেন ? উত্তর না করিয়া অঙ্গুলিনির্দ্দেশে ভূতলশায়িনী তিলোত্তমাকে দেখাইয়া দিলেন।
আয়েষা তিলোত্তমাকে নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “ইনি কে ?”
রাজপুত্র সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন, “বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা।”
আয়েষা তিলোত্তমাকে কোলে করিয়া বসিলেন। আর কেহ কোনরূপ সঙ্কোচ করিতে পারিত; সাত পাঁচ ভাবিত; আয়েষা একেবারে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন।
আয়েষা যাহা করিতেন, তাহাই সুন্দর দেখাইত; সকল কার্য্য সুন্দর করিয়া করিতে পারিতেন। যখন তিলোত্তমাকে ক্রোড়ে লইয়া বসিলেন, জগৎসিংহ আর দাসী উভয়েই মনে মনে ভাবিলেন, কি সুন্দর!”
দাসীর হস্ত দিয়া আয়েষা গোলাব সরবত প্রভৃতি আনিয়াছিলেন; তিলোত্তমাকে তৎসমুদায় সেবন ও সেচন করাইতে লাগিলেন। দাসী ব্যজন করিতে লাগিল, পূর্ব্বে তিলোত্তমার চেতনা হইয়া আসিতেছিল; এক্ষণে আয়েষার শুশ্রূষায় সম্পূর্ণরূপে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া উঠিলেন।
চারি দিক চাহিবামাত্র পূর্ব্বকথা মনে পড়িল; তৎক্ষণাৎ তিলোত্তমা কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু এ রাত্রির শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে শীর্ণ

তনু অবসন্ন হইয়া আসিয়াছিল; যাইতে পারিলেন না, পূর্ব্বকথা স্মরণ হইবামাত্র মস্তক ঘূর্ণিত হইয়া অমনি আবার বসিয়া পড়িলেন। আয়েষা তাঁহার হস্ত ধরিয়া কহিলেন, "ভগিনি! তুমি কেন ব্যস্ত হইতেছ ? তুমি এক্ষণে অতি দুর্ব্বল, আমার গৃহে গিয়া বিশ্রাম করিবে চল, পরে তোমার যখন ইচ্ছা তখন অভিপ্রেত স্থানে তোমাকে পাঠাইয়া দিব।"

তিলোত্তমা উত্তর করিলেন না।

আয়েষা প্রহরীর নিকট, সে যতদূর জানে, সকলই শুনিয়াছিলেন, অতএব তিলোত্তমার মনে সন্দেহ আশঙ্কা করিয়া কহিলেন, "আমাকে অবিশ্বাস করিতেছ কেন ? আমি তোমার শত্রুকন্যা বটে, কিন্তু তাই বলিয়া আমাকে অবিশ্বাসিনী বিবেচনা করিও না। আমা হইতে কোন কথা প্রকাশ হইবে না। রাত্রি অবসান হইতে না হইতে যেখানে যাইবে, সেইখানে দাসী দিয়া পাঠাইয়া দিব। কেহ কোন কথা প্রকাশ করিবে না।"

এই কথা আয়েষা এমন সুমিষ্টস্বরে কহিলেন যে, তিলোত্তমার তৎপ্রতি কিছুমাত্র অবিশ্বাস হইল না। বিশেষ এক্ষণে চলিতেও আর পারেন না, জগৎসিংহের নিকট বসিয়াও থাকিতে পারেন না, সুতরাং স্বীকৃতা হইলেন। আয়েষা কহিলেন, "তুমি ত চলিতে পারিবে না। এই দাসীর উপর শরীরের ভর রাখিয়া চল।"

তিলোত্তমা দাসীর স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া তদবলম্বনে ধীরে ধীরে চলিলেন। আয়েষাও রাজপুত্রের নিকট বিদায় হয়েন; রাজপুত্র তাঁহার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন, যেন কিছু বলিবেন। আয়েষা ভাব বুঝিতে পারিয়া দাসীকে কহিলেন, "তুমি ইহাকে আমার শয়নাগারে বসাইয়া পুনর্ব্বার আসিয়া আমাকে লইয়া যাইও।"

দাসী তিলোত্তমাকে লইয়া চলিল।

জগৎসিংহ মনে মনে কহিলেন, "তোমায় আমায় এই দেখা শুনা।" গম্ভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নিঃশব্দ হইয়া রহিলেন। যতক্ষণ তিলোত্তমাকে দ্বারপথে দেখা গেল, ততক্ষণ তৎপ্রতি চাহিয়া রহিলেন।

তিলোত্তমাও ভাবিতেছিলেন, "আমার এই দেখা শুনা।" যতক্ষণ দৃষ্টিপথে ছিলেন ততক্ষণ ফিরিয়া চাহিলেন না। যখন ফিরিয়া চাহিলেন, তখন আর জগৎসিংহকে দেখা গেল না।

অঙ্গুরীয়বাহক তিলোত্তমার নিকটে আসিয়া কহিল, "তবে আমি বিদায় হই ?"

তিলোত্তমা উত্তর দিলেন না। দাসী কহিল, "হাঁ।" প্রহরী কহিল, "তবে আপনার নিকট যে সাঙ্কেতিক অঙ্গুরীয় আছে ফিরাইয়া দিউন।"

তিলোত্তমা অঙ্গুরীয় লইয়া প্রহরীকে দিলেন। প্রহরী বিদায় হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদঃ মুক্তকণ্ঠ

তিলোত্তমা ও দাসী কক্ষমধ্য হইতে গমন করিলে আয়েষা শয্যার উপর আসিয়া বসিলেন; তথায় আর বসিবার আসন ছিল না; জগৎসিংহ নিকটে দাঁড়াইলেন। আয়েষা কবরী হইতে একটি গোলাব খসাইয়া তাহার দলগুলি নখে ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে কহিলেন, "রাজকুমার, ভাবে বোধ হইতেছে যে, আপনি আমাকে কি বলিবেন। আমা হইতে যদি কোন কর্ম্মসিদ্ধ হইতে পারে, তবে বলিতে সঙ্কোচ করিবেন না; আমি আপনার কার্য্য করিতে পরম সুখী হইব।"

রাজকুমার কহিলেন, "নবাবপুত্রি, এক্ষণে আমার কিছুরই বিশেষ প্রয়োজন নাই। সে জন্য আপনার সাক্ষাতের অভিলাষী ছিলাম না। আমার এই কথা যে, আমি যে দশাপন্ন হইয়াছি, ইহাতে আপনার সহিত পুনর্ব্বার দেখা হইবে, এমন ভরসা করি না, বোধ করি এই শেষ দেখা। আপনার কাছে যে ঋণে বদ্ধ আছি, তাহা

কথায় প্রতিশোধ কি করিব? আর কার্য্যেও কখন যে তাহার প্রতিশোধ করিব, সে অদৃষ্টের ভরসা করি না। তবে এই ভিক্ষা যে, যদি কখন সাধ্য হয়, যদি কখন অন্য দিন হয়, তবে আমার প্রতি কোন আজ্ঞা করিতে সঙ্কোচ করিবেন না।”

জগৎসিংহের স্বর এতাদৃশ সকাতর, নৈরাশ্যব্যঞ্জক যে, তাহাতে আয়েষাও ক্লিষ্ট হইলেন; আয়েষা কহিলেন, “আপনি এত নির্ভরসা হইতেছেন কেন ? এক দিনের অমঙ্গল পর দিনে থাকে না।”

জগৎসিংহ কহিলেন, “আমি নির্ভরসা হই নাই, কিন্তু আমার আর ভরসা করিতে ইচ্ছা করে না। এ জীবন ত্যাগ করিতে ব্যতীত আর ধারণ করিতে ইচ্ছা করে না। এ কারাগার ত্যাগ করিতে বাসনা করি না। আমার মনের সকল দুঃখ আপনি জানেন না, আমি জানাইতেও পারি না।”

যে করুণ স্বরে রাজপুত্র কথা কহিলেন, তাহাতে আয়েষা বিস্মিত হইলেন, অধিকতর কাতর হইলেন। তখন আর নবাবপুত্রী-ভাব রহিল না; দূরতা রহিল না; স্নেহময়ী রমণী, রমণীর ন্যায় যত্নে, কোমল করপল্লবে রাজপুত্রের কর ধারণ করিলেন, আবার তখনই তাঁহার হস্ত ত্যাগ করিয়া, রাজপুত্রের মুখপানে উর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া কহিলেন, “কুমার! এ দারুণ দুঃখ তোমার হৃদয়মধ্যে কেন ? আমাকে পর জ্ঞান করিও না। যদি সাহস দাও, তবে বলি,— বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা কি—”

আয়েষার কথা শেষ হইতে না হইতেই রাজকুমার কহিলেন, “ও কথায় আর কাজ কি! সে স্বপ্ন ভঙ্গ হইয়াছে।”

আয়েষা নীরবে রহিলেন; জগৎসিংহও নীরবে রহিলেন, উভয়ে বহুক্ষণ নীরবে রহিলেন; আয়েষা তাঁহার উপর মুখ অবনত করিয়া রহিলেন।

রাজপুত্র অকস্মাৎ শিহরিয়া উঠিলেন; তাঁহার করপল্লবে কবোষ্ণ বারিবিন্দু পড়িল। জগৎসিংহ দৃষ্টি নিম্ন করিয়া আয়েষার মুখপদ্ম নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, আয়েষা কাঁদিতেছেন; উজ্জ্বল গণ্ডস্থলে দর দর ধারা বহিতেছে।

রাজপুত্র বিস্মিত হইয়া কহিলেন, “এ কি আয়েষা ? তুমি কাঁদিতেছ ?”

আয়েষা কোন উত্তর না করিয়া ধীরে ধীরে গোলাপ ফুলটি নিঃশেষে ছিন্ন করিলেন। পুষ্প শত খণ্ড হইলে কহিলেন, “যুবরাজ! আজ যে তোমার নিকট এভাবে বিদায় লইব, তাহা মনে ছিল না। আমি অনেক সহ্য করিতে পারি, কিন্তু কারাগারে তোমাকে একাকী যে এ মনঃপীড়ার যন্ত্রণা ভোগ করিতে রাখিয়া যাইব, তাহা পারিতেছি না। জগৎসিংহ! তুমি আমার সঙ্গে বাহিরে আইস; অশ্বশালায় অশ্ব আছে, দিব; অদ্য রাত্রেই নিজ শিবিরে যাইও।”

তদ্দণ্ডে যদি ইষ্টদেবী ভবানী সশরীরে আসিয়া বরপ্রদা হইতেন, তথাপি রাজপুত্র অধিক চমৎকৃত হইতে পারিতেন না। রাজপুত্র প্রথমে উত্তর করিতে পারিলেন না। আয়েষা পুনর্ব্বার কহিলেন, “জগৎসিংহ! রাজকুমার! এস।”

জগৎসিংহ অনেকক্ষণ পরে কহিলেন, “আয়েষা! তুমি আমাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া দিবে ?”

আয়েষা কহিলেন, “এই দণ্ডে।”

রা। তোমার পিতার অজ্ঞাতে ?

আ। সে জন্য চিন্তা করিও না, তুমি শিবিরে গেলে—আমি তাঁহাকে জানাইব।

“প্রহরীরা যাইতে দিবে কেন ?”

আয়েষা কণ্ঠ হইতে রত্নকণ্ঠী ছিঁড়িয়া দেখাইয়া কহিলেন, “এই পুরস্কার লোভে প্রহরী পথ ছাড়িয়া দিবে।”

রাজপুত্র পুনর্ব্বার কহিলেন, “একথা প্রকাশ হইলে তুমি তোমার পিতার নিকট যন্ত্রণা পাইবে।”

“তাতে ক্ষতি কি ?”

"আয়েষা! আমি যাইব না।"
আয়েষার মুখ শুষ্ক হইল। ক্ষুণ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ?"
রা। তোমার নিকট প্রাণ পর্য্যন্ত পাইয়াছি, তোমার যাহাতে যন্ত্রণা হইবে, তাহা আমি কদাচ করিব না।
আয়েষা প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "নিশ্চিত যাইবে না ?"
রাজকুমার কহিলেন, "তুমি একাকিনী যাও।"
আয়েষা পুনর্ব্বার নীরব হইয়া রহিলেন। আবার চক্ষে দর দর ধারা বিগলিত হইতে লাগিল; আয়েষা কষ্টে অশ্রুসংবরণ করিতে লাগিলেন।
রাজপুত্র আয়েষার নিঃশব্দ রোদন দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। কহিলেন, "আয়েষা! রোদন করিতেছ কেন?"
আয়েষা কথা কহিলেন না। রাজপুত্র আবার কহিলেন, "আয়েষা! আমার অনুরোধ রাখ, রোদনের কারণ যদি প্রকাশ্য হয়, তবে আমার নিকট প্রকাশ কর। যদি আমার প্রাণদান করিলে তোমার নীরব রোদনের কারণ নিরাকরণ হয়, তাহা আমি করিব। আমি যে বন্দিত্ব স্বীকার করিলাম, কেবল ইহাতেই কখনও আয়েষার চক্ষে জল আইসে নাই। তোমার পিতার কারাগারে আমার ন্যায় অনেক বন্দী কষ্ট পাইয়াছে।"
আয়েষা আশু রাজপুত্রের কথায় উত্তর না করিয়া অশ্রুজল অঞ্চলে মুছিলেন। ক্ষণেক নীরব নিস্পন্দ থাকিয়া কহিলেন "রাজপুত্র! আমি আর কাঁদিব না।"
রাজপুত্র প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া কিছু ক্ষুণ্ন হইলেন। উভয়ে আবার নীরবে মুখ অবনত করিয়া রহিলেন।
প্রকোষ্ঠ-প্রাকারে আর এক ব্যক্তির ছায়া পড়িল; কেহ তাহা দেখিতে পাইলেন না। তৃতীয় ব্যক্তি আসিয়া উভয়ের নিকটে দাঁড়াইল, তথাপি দেখিতে পাইলেন না। ক্ষণেক স্তম্ভের ন্যায় স্থির দাঁড়াইয়া, পরে ক্রোধ-কম্পিত স্বরে আগন্তুক কহিল, "নবাবপুত্রি! এ উত্তম।"
উভয়ে মুখ তুলিয়া দেখিলেন,—ওসমান।
ওসমান তাঁহার অনুচর অঙ্গুরীয়বাহকের নিকট সবিশেষ অবগত হইয়া আয়েষার সন্ধানে আসিয়াছিলেন। রাজপুত্র, ওসমানকে সে স্থলে দেখিয়া আয়েষার জন্য শঙ্কান্বিত হইলেন, পাছে আয়েষা, ওসমান বা কতলু খাঁর নিকট তিরস্কৃতা বা অপমানিতা হন। ওসমান যে ক্রোধপ্রকাশক স্বরে ব্যঙ্গোক্তি করিলেন, তাহাতে সেইরূপ সম্ভাবনা বোধ হইল। ব্যঙ্গোক্তি শুনিবামাত্র আয়েষা ওসমানের কথার অভিপ্রায় নিঃশেষ বুঝিতে পারিলেন। মুহূর্ত্তমাত্র তাঁহার মুখ রক্তবর্ণ হইল। আর কোন অধৈর্য্যের চিহ্ন প্রকাশ পাইল না। স্থির স্বরে উত্তর করিলেন, "কি উত্তম, ওসমান ?"
ওসমান পূর্ব্ববৎ ভঙ্গীতে কহিলেন, "নিশীথে একাকিনী বন্দিসহবাস নবাবপুত্রীর পক্ষে উত্তম। বন্দীর জন্য নিশীথে কারাগারে অনিয়ম প্রবেশও উত্তম।"
আয়েষার পবিত্র চিত্তে এ তিরস্কার সহনাতীত হইল। ওসমানের মুখপানে চাহিয়া উত্তর করিলেন। সেরূপ গর্ব্বিত স্বর ওসমান কখন আয়েষার কণ্ঠে শুনেন নাই।
আয়েষা কহিলেন, "এ নিশীথে একাকিনী কারাগার মধ্যে আসিয়া এই বন্দীর সহিত আলাপ করা, আমার ইচ্ছা। আমার কর্ম্ম উত্তম কি অধম, সে কথায় তোমার প্রয়োজন নাই।"
ওসমান বিস্মিত হইলেন, বিস্মিতের অধিক ক্রুদ্ধ হইলেন; কহিলেন, "প্রয়োজন আছে কিনা, কাল প্রাতে নবাবের মুখে শুনিবে।"
আয়েষা পূর্ব্ববৎ কহিলেন, "যখন পিতা আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি তখন তাহার উত্তর দিব। তোমার চিন্তা নাই।"
ওসমানও পূর্ব্ববৎ ব্যঙ্গ করিয়া কহিলেন, "আর যদি আমি জিজ্ঞাসা করি?"
আয়েষা দাঁড়াইয়া উঠিলেন। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্ববৎ স্থিরদৃষ্টিতে ওসমানের প্রতি নিরীক্ষণ করিলেন; তাঁহার বিশাল লোচন আরও যেন বর্দ্ধিতায়তন হইল। মুখ-পদ্ম

যেন অধিকতর প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। ভ্রমরকৃষ্ণ অলকাবলীর সহিত শিরোদেশ ঈষৎ এক দিকে হেলিল; হৃদয় তরঙ্গান্দোলিত নিবিড় শৈবালজালবৎ উৎকম্পিত হইতে লাগিল; অতি পরিষ্কার স্বরে আয়েষা কহিলেন, "ওসমান, যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর, তবে আমার উত্তর এই যে, এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর।"

যদি তম্মুহূর্ত্তে কক্ষমধ্যে বজ্রপতন হইত, তবে রাজপুত কি পাঠান অধিকতর চমকিত হইতে পারিতেন না। রাজপুত্রের মনে অন্ধকার-মধ্যে যেন কেহ প্রদীপ জ্বালিয়া দিল। আয়েষার নীরব রোদন এখন তিনি বুঝিতে পারিলেন। ওসমান কতক কতক ঘুণাক্ষরে পূর্ব্বেই এরূপ সন্দেহ করিয়াছিলেন, এবং সেই জন্যই আয়েষার প্রতি এরূপ তিরস্কার করিতেছিলেন, কিন্তু আয়েষা তাঁহার সম্মুখেই মুক্তকণ্ঠে কথা ব্যক্ত করিবেন, ইহা তাঁহার স্বপ্নেরও অগোচর। ওসমান নিরুত্তর হইয়া রহিলেন।

আয়েষা পুনরপি কহিতে লাগিলেন, "শুন, ওসমান, আবার বলি, এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর,—যাবজ্জীবন অন্য কেহ আমার হৃদয়ে স্থান পাইবে না। কাল যদি বধ্যভূমি ইহার শোণিতে আর্দ্র হয়—" বলিতে বলিতে আয়েষা শিহরিয়া উঠিলেন; "তথাপি দেখিবে, হৃদয়-মন্দিরে ইহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া অন্তকাল পর্য্যন্ত আরাধনা করিব। এই মুহূর্ত্তের পর যদি আর চিরন্তন ইহার সঙ্গে দেখা না হয়, কাল যদি ইনি মুক্ত হইয়া শত মহিলার মধ্যবর্ত্তী হন, আয়েষার নামে ধিক্কার করেন, তথাপি আমি ইহার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী দাসী রহিব। আরও শুন; মনে কর এতক্ষণ একাকিনী কি কথা বলিতেছিলাম? বলিতেছিলাম, আমি দৌবারিকগণকে বাক্যে পারি, ধনে পারি বশীভূত করিয়া দিব; পিতার অশ্বশালা হইতে অশ্ব দিব; বন্দী পিতৃশিবিরে এখনই চলিয়া যাউন। বন্দী নিজে পলায়নে অস্বীকৃত হইলেন। নচেৎ তুমি এতক্ষণ ইহার নখাগ্রও দেখিতে পাইতে না।"

আয়েষা আবার অশ্রুজল মুছিলেন। কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া অন্য প্রকার স্বরে কহিতে লাগিলেন, "ওসমান, এ সকল কথা বলিয়া তোমাকে ক্লেশ দিতেছি, অপরাধ ক্ষমা কর। তুমি আমায় স্নেহ কর, আমি তোমায় স্নেহ করি; এ আমার অনুচিত। কিন্তু তুমি আজি আয়েষাকে অবিশ্বাসিনী ভাবিয়াছ। আয়েষা অন্য যে অপরাধ করুক, অবিশ্বাসিনী নহে। আয়েষা যে কর্ম্ম করে, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারে। এখন তোমার সাক্ষাৎ বলিলাম, প্রয়োজন হয়, কাল পিতার সমক্ষে বলিব।"

পরে জগৎসিংহের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "রাজপুত্র, তুমিও অপরাধ ক্ষমা কর। যদি ওসমান আজ আমাকে মনঃপীড়িত না করিতেন, তবে এ দগ্ধ হৃদয়ের তাপ কখনও তোমার নিকট প্রকাশ পাইত না, কখনও মনুষ্যকর্ণগোচর হইত না।"

রাজপুত্র নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন; অন্তঃকরণ সন্তাপে দগ্ধ হইতেছিল।

ওসমানও কথা কহিলেন না। আয়েষা আবার বলিতে লাগিলেন, "ওসমান, আবার বলি যদি দোষ করিয়া থাকি, দোষ মার্জ্জনা করিও। আমি তোমার পূর্ব্ববৎ স্নেহপরায়ণা ভগিনী; ভগিনী বলিয়া তুমিও পূর্ব্বস্নেহের লাঘব করিও না। কপালের দোষে সন্তাপ-সাগরে ঝাঁপ দিয়াছি, ভ্রাতৃস্নেহে নিরাশ করিয়া আমায় অতল জলে ডুবাইও না।"

এই বলিয়া সুন্দরী দাসীর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা না করিয়া একাকিনী বহির্গতা হইলেন। ওসমান কিয়ৎক্ষণ বিহ্বলের ন্যায় বিনা বাক্যে থাকিয়া, নিজ মন্দিরে প্রস্থান করিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদঃ দাসী চরণে

সেই রজনীতে কতলু খাঁর বিলাস-গৃহমধ্যে নৃত্য হইতেছিল। তথায় অপরা নর্ত্তকী কেহ ছিল না—বা অপর শ্রোতা কেহ ছিল না। জন্মদিনোপলক্ষে মোগল

সম্রাটেরা যেরূপ পরিষদমণ্ডলী মধ্যে আমোদ-পরায়ণ থাকিতেন, কতলু খাঁর সেরূপ ছিল না। কতলু খাঁর চিত্ত একান্ত আত্মসুখরত, ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অভিলাষী। অদ্য রাত্রে তিনি একাকী নিজ বিলাস-গৃহনিবাসিনীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া তাহাদিগের নৃত্যগীত কৌতুকে মত্ত ছিলেন। খোজাগণ ব্যতীত অন্য পুরুষ তথায় আসিবার অনুমতি ছিল না। রমণীগণ কেহ নাচিতেছে, কেহ গাহিতেছে, কেহ বাদ্য করিতেছে; অপর সকলে কতলু খাঁকে বেষ্টন করিয়া শুনিতেছে।

ইন্দ্রিয়মুগ্ধকর সামগ্রী সকলই তথায় প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান। কক্ষমধ্যে প্রবেশ কর; প্রবেশ করিবামাত্র অবিরত সিঞ্চিত গন্ধবারির স্নিগ্ধ ঘ্রাণে আপাদমস্তক শীতল হয়। অগণিত রজত দ্বিরদরদ স্ফাটিক শামাদানের তীব্রোজ্জ্বল জ্বালায় নয়ন ঝলসিতেছিল; অপরিমিত পুষ্পরাশি কোথাও মালাকারে, কোথাও স্তূপাকারে, কোথাও স্তবকাকারে, কোথাও রমণী-কেশপাশে, কোথাও রমণীকণ্ঠে, স্নিগ্ধতর প্রভা প্রকাশিত করিতেছে। কাহার পুষ্পব্যজন, কাহারও পুষ্প আভরণ; কেহ বা অন্যের প্রতি পুষ্পক্ষেপণী প্রেরণ করিতেছে; পুষ্পের সৌরভ; সুরভি বারির সৌরভ; সুগন্ধ দীপের সৌরভ; গন্ধদ্রব্যমার্জ্জিত বিলাসিনীগণের অঙ্গের সৌরভ; পুরীমধ্যে সর্ব্বত্র সৌরভে ব্যাপ্ত। প্রদীপের দীপ্তি, পুষ্পের দীপ্তি, রমণীগণের রত্নালঙ্কারের দীপ্তি, সর্ব্বোপরি ঘন ঘন কটাক্ষ-বর্ষিণী কামিনী মণ্ডলীর উজ্জ্বল নয়নদীপ্তি। সপ্তসুরসম্মিলিত মধুর বীণাদি বাদ্যের ধ্বনি আকাশ ব্যাপিয়া উঠিতেছে, তদধিক পরিষ্কার মধুরনিনাদিনী রমণীকণ্ঠগীতি তাহার সহিত মিশিয়া উঠিতেছে; সঙ্গে সঙ্গে তাললয়মিলিত পাদবিক্ষেপে নর্ত্তকীর অলঙ্কারশিঞ্জিত শব্দ মনোমুগ্ধ করিতেছে।

ঐ দেখ পাঠক! যেন পদ্মবনে হংসী সমীরণোত্থিত তরঙ্গহিল্লোলে নাচিতেছে; প্রফুল্ল পদ্মমুখী সবে ঘেরিয়া রহিয়াছে। দেখ, দেখ, ঐ যে সুন্দরী নীলাম্বরপরিধানা, ঐ যার নীল বাস স্বর্ণতারাবলীতে খচিত, দেখ! ঐ যে দেখিতেছ, সুন্দরী সীমন্তপার্শ্বে হীরকতারা ধারণ করিয়াছে, দেখিয়াছ উহার কি সুন্দর ললাট! প্রশান্ত, প্রশস্ত, পরিষ্কার; এ ললাটে কি বিধাতা বিলাসগৃহ লিখিয়াছিলেন ? ঐ যে শ্যামা পুষ্পাভরণা, দেখিয়াছ উহা কেমন পুষ্পাভরণ সাজিয়াছে ? নারীদেহ শোভার জন্যই পুষ্প-সৃজন হইয়াছিল। ঐ যে দেখিতেছ সম্পূর্ণ, মৃদুরক্ত, ওষ্ঠাধর যার; যে ওষ্ঠাধর ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া রহিয়াছে, দেখ, উহার সুচিক্কণ নীল বাস ফুটিয়া কেমন বর্ণপ্রভা বাহির হইতেছে; যেন নির্ম্মল নীলাম্বুমধ্যে পূর্ণচন্দ্রালোক দেখা যাইতেছে। এই যে সুন্দরী মরালনিন্দিত গ্রীবাভঙ্গী করিয়া হাসিয়া হাসিয়া কথা কহিতেছে, দেখিয়াছ উহার কেমন কর্ণের কুণ্ডল দুলিতেছে ? কে তুমি সুকেশি সুন্দরী ? কেন উরঃপর্য্যন্ত কুঞ্চিতালক-রাশি লম্বিত করিয়া দিয়াছ? পদ্মবৃক্ষে কেমন করিয়া কালফণিনী জড়ায়, তাহাই কি দেখাইতেছ ?

আর, তুমি কে সুন্দরী, যে কতলু খাঁর পার্শ্বে বসিয়া হেমপাত্রে সুরা ঢালিতেছ ? কে তুমি, যে সকল রাখিয়া তোমার পূর্ণলাবণ্য দেহপ্রতি কতলু খাঁ ঘন ঘন সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছে ? কে তুমি অব্যর্থ কটাক্ষে কতলু খাঁর হৃদয় ভেদ করিতেছ ? ও মধুর কটাক্ষ চিনি; তুমি বিমলা। অত সুরা ঢালিতেছ কেন ? ঢাল, ঢাল, আরও ঢাল, বসন মধ্যে ছুরিকা আছে ত ? আছে বই কি। তবে অত হাসিতেছ কিরূপে ? কতলু খাঁ তোমার মুখপানে চাহিতেছে। ও কি ? কটাক্ষ! ও কি, আবার কি! ঐ দেখ, সুরাস্বাদপ্রমত্ত যবনকে ক্ষিপ্ত করিলে। এই কৌশলেই বুঝি সকলকে বর্জ্জিত করিয়া কতলু খাঁর প্রেয়সী হইয়া বসিয়াছ? না হবে কেন, যে হাসি, যে অঙ্গভঙ্গী, সে সরস কথারহস্য, যে কটাক্ষ! আবার সরাব! কতলু খাঁ, সাবধান! কতলু খাঁ কি করিবে! যে চাহনি চাহিয়া বিমলা হাতে সুরাপাত্র দিতেছে! ও কি ধ্বনি? এ কে গায় ? এ কি মানুষের গান, না সুররমণী গায় ? বিমলা গায়িকাদিগের সহিত গায়িতেছে। কি সুর! কি ধ্বনি! কি লয়! কতলু খাঁ, এ কি ? মন কোথায় তোমার ? কি দেখিতেছ ? সমে সমে হাসিয়া কটাক্ষ করিতেছে; ছুরির অধিক তোমার হৃদয়ে বসাইতেছে, তাহাই দেখিতেছ ? অমনি কটাক্ষে প্রাণহরণ করে, আবার সঙ্গীতের সন্ধিসম্বন্ধ কটাক্ষ! আরও দেখিয়াছ কটাক্ষের সঙ্গে আবার অল্প মস্তক-দোলন? দেখিয়াছ, সঙ্গে সঙ্গে কেমন কর্ণাভরণ দুলিতেছে ? হাঁ। আবার সুরা ঢাল, দে মদ দে, এ কি! এ কি! বিমলা উঠিয়া নাচিতেছে। কি সুন্দর! কিবা ভঙ্গী! দে মদ! কি অঙ্গ! কি গঠন! কতলু খাঁ! জাঁহাপনা! স্থির হও! স্থির! উঃ! কতলুর শরীরে অগ্নি জ্বলিতে লাগিল। পিয়ালা! আহা! দে পিয়ালা! মেরি পিয়ারী! আবার কি ? এর উপর হাসি, এর উপর কটাক্ষ ? সরাব! দে সরাব!

কতলু খাঁ উন্মত্ত হইল। বিমলাকে ডাকিয়া কহিল, "তুমি কোথা, প্রিয়তমে!"
বিমলা কতলু খাঁর স্কন্ধে এক বাহু দিয়া কহিলেন, "দাসী শ্রীচরণে।"—অপর করে ছুরিকা—
তৎক্ষণাৎ ভয়ঙ্কার চীৎকার ধ্বনি করিয়া বিমলাকে কতলু খাঁ দূরে নিক্ষেপ করিল; এবং যেই নিক্ষেপ করিল, অমনি আপনিও ধরাতলশায়ী হইল। বিমলা তাহার বক্ষঃস্থলে আমূল তীক্ষ্ণ ছুরিকা বসাইয়া দিয়াছিলেন।
"পিশাচী—সয়তানী!" কতলু খাঁ এই কথা বলিয়া চীৎকার করিল। "পিশাচী নহি—সয়তানী নহি—বীরেন্দ্রসিংহের বিধবা স্ত্রী।" এই বলিয়া বিমলা কক্ষ হইতে দ্রুতবেগে পলায়ন করিলেন।
কতলু খাঁর বাঙ্‌নিষ্পত্তি-ক্ষমতা ঝটিতি রহিত হইয়া আসিতে লাগিল। তথাপি সাধ্যমত চীৎকার করিতে লাগিল। বিবিরা যথাসাধ্য চীৎকার করিতে লাগিল। বিমলাও চীৎকার করিতে করিতে ছুটিলেন। কক্ষান্তরে গিয়া কথোপকথন শব্দ পাইলেন। বিমলা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিলেন। এক কক্ষ পরে দেখেন, তথায় প্রহরী ও খোজাগণ রহিয়াছে। চীৎকার শুনিয়া ও বিমলার ত্রস্ত ভাব দেখিয়া তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে?"
প্রত্যুৎপন্নমতি বিমলা কহিলেন, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে। শীঘ্র যাও, কক্ষমধ্যে মোগল প্রবেশ করিয়াছে, বুঝি নবাবকে খুন করিল।"
প্রহরী ও খোজাগণ ঊর্দ্ধশ্বাসে কক্ষাভিমুখে ছুটিল। বিমলাও ঊর্দ্ধশ্বাসে অন্তঃপুর দ্বারাভিমুখে পলায়ন করিলেন। দ্বারে প্রহরী প্রমোদক্লান্ত হইয়া নিদ্রা যাইতেছিল, বিমলা বিনা বিঘ্নে দ্বার অতিক্রম করিলেন। দেখিলেন, সর্ব্বত্রই প্রায় ঐরূপ, অবাধে দৌড়িতে লাগিলেন। বাহির ফটকে দেখিলেন, প্রহরিগণ জাগরিত। একজন বিমলাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে ও, কোথা যাও?"
তখন অন্তঃপুরমধ্যে মহা কোলাহল উঠিয়াছে, সকল লোক জাগিয়া সেই দিকে ছুটিতেছিল, বিমলা কহিলেন, "বসিয়া কি করিতেছ, গোলযোগ শুনিতেছ না ?"
প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের গোলযোগ ?"
বিমলা কহিলেন, "অন্তপুরে সর্ব্বনাশ হইতেছে, নবাবের প্রতি আক্রমণ হইয়াছে।"
প্রহরিগণ ফটক ফেলিয়া দৌড়িল; বিমলা নির্ব্বিঘ্নে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। বিমলা ফটক হইতে কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন যে, একজন পুরুষ এক বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া আছেন। দৃষ্টিমাত্র বিমলা তাঁহাকে অভিরাম স্বামী বলিয়া চিনিতে পারিলেন। বিমলা তাঁহার নিকট যাইবামাত্র অভিরাম স্বামী কহিলেন, "আমি বড়ই উদ্বিগ্ন হইতেছিলাম; দুর্গমধ্যে কোলাহল কিসের?"
বিমলা উত্তর করিলেন, "আমি বৈধব্য যন্ত্রণার প্রতিশোধ করিয়া আসিয়াছি। এখানে আর অধিক কথায় কাজ নাই, শীঘ্র আশ্রমে চলুন; পরে সবিশেষ নিবেদিব। তিলোত্তমা আশ্রমে গিয়াছে ত ?"
অভিরাম স্বামী কহিলেন, "তিলোত্তমা অগ্রে অগ্রে আশমানির সহিত যাইতেছে, শীঘ্র সাক্ষাৎ হইবেক।"
এই বলিয়া উভয়ে দ্রুতবেগে চলিলেন। অচিরাৎ কুটীরমধ্যে উপনীত ইহয়া দেখিলেন, ক্ষণপূর্ব্বেই আয়েষার অনুগ্রহে তিলোত্তমা আশমানির সঙ্গে তথায় আসিয়াছেন। তিলোত্তমা অভিরাম স্বামীর পদযুগলে প্রণত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অভিরাম স্বামী তাঁহাকে স্থির করিয়া কহিতে লাগিলেন, "ঈশ্বরেচ্ছায় তোমরা দুরাত্মার হস্ত হইতে মুক্ত হইলে, এখন আর তিলার্দ্ধ এদেশে তিষ্ঠান নহে। যবনেরা সন্ধান পাইলে এবারে প্রাণে মারিয়া প্রভুর মৃত্যুশোক নিবারণ করিবে। আমরা অদ্য রাত্রিতে এ স্থান ত্যাগ করিয়া যাই চল।"
সকলেই এ পরামর্শে সম্মত হইলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদঃ অন্তিম কাল

বিমলার পলায়নের ক্ষণমাত্র পরেই একজন কর্ম্মচারী অতিব্যস্তে জগৎসিংহের কারাগারমধ্যে আসিয়া কহিল, “যুবরাজ! নবাব সাহেবের মৃত্যুকাল উপস্থিত, তিনি আপনাকে স্মরণ করিয়াছেন।”

যুবরাজ চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, “সে কি!”

রাজপুরুষ কহিলেন, “অন্তঃপুরমধ্যে শত্রু প্রবেশ করিয়া নবাব সাহেবকে আঘাত করিয়া পলায়ন করিয়াছে। এখনও প্রাণত্যাগ হয় নাই, কিন্তু আর বিলম্ব নাই, আপনি ঝটিতি চলুন, নচেৎ সাক্ষাৎ হইবে না।”

রাজপুত্র কহিলেন, “এ সময়ে আমার সহিত সাক্ষাতের প্রয়োজন ?”

দূত কহিল, “কি জানি ? আমি বার্ত্তাবহ মাত্র।”

যুবরাজ দূতের সহিত অন্তঃপুরমধ্যে গমন করিলেন। তথায় গিয়া দেখেন যে, কতলু খাঁর জীবন-প্রদীপ সত্য সত্যই নির্ব্বাণ হইয়া আসিয়াছে, অন্ধকারের আর বিলম্ব নাই, চতুর্দ্দিকে ওসমান, আয়েষা, মুমূর্ষুর অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রগণ, পত্নী, উপপত্নী, দাসী, অমাত্যবর্গ প্রভৃতি বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। রোদনাদির কোলাহল পড়িয়াছে; প্রায় সকলেই উচ্চরবে কাঁদিতেছে; শিশুগণ না বুঝিয়া কাঁদিতেছে; আয়েষা চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে না। আয়েষার নয়ন-ধারায় মুখ প্লাবিত হইতেছে; নিঃশব্দে পিতার মস্তক অঙ্কে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। জগৎসিংহ দেখিলেন, সে মূর্ত্তি স্থির, গম্ভীর, নিস্পন্দ।

যুবরাজ প্রবেশ মাত্র খ্বাজা ইসা নামে অমাত্য তাঁহার কর ধরিয়া কতলু খাঁর নিকটে লইলেন; যেরূপ উচ্চস্বরে বধিরকে সম্ভাষণ করিতে হয়, সেইরূপ স্বরে কহিলেন, “যুবরাজ জগৎসিংহ আসিয়াছেন।”

কতলু খাঁ ক্ষীণস্বরে কহিলেন, “আমি শত্রু; মরি; —রাগ দ্বেষ ত্যাগ।”

জগৎসিংহ বুঝিয়া কহিলেন, “এ সময়ে ত্যাগ করিলাম।”

কতলু খাঁ পুনরপি সেইরূপ স্বরে কহিলেন, “যাচ্ঞা–স্বীকার।”

জগৎসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি স্বীকার করিব ?”

কতলু খাঁ পুনরপি কহিতে লাগিলেন, “বালক সব—যুদ্ধ—বড় তৃষা।”

আয়েষা মুখে সরবত সিঞ্চন করিলেন।

“যুদ্ধ—কাজ নাই—সন্ধি—”

কতলু খাঁ নীরব হইলেন। জগৎসিংহ কোন উত্তর করিলেন না। কতলু খাঁ তাঁহার মুখপানে উত্তর প্রতীক্ষায় চাহিয়া রহিলেন। উত্তর না পাইয়া কষ্টে কহিলেন, “অস্বীকার?”

যুবরাজ কহিলেন, “পাঠানেরা দিল্লীশ্বরের প্রভুত্ব স্বীকার করিলে, আমি সন্ধির জন্য অনুরোধ করিতে স্বীকার করিলাম।”

কতলু খাঁ পুনরপি অর্দ্ধস্ফুটশ্বাসে কহিলেন, উড়িষ্যা ?

রাজপুত্র বুঝিয়া কহিলেন, “যদি কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারি, তবে আপনার পুত্রেরা উড়িষ্যাচ্যুত হইবে না।”
কতলুর মৃত্যু-ক্লেশ-নিপীড়িত মুখকান্তি প্রদীপ্ত হইল।
মুমূর্ষ্যু কহিল, “আপনি—মুক্ত—জগদীশ্বর—মঙ্গল—” জগৎসিংহ চলিয়া যানম, আয়েষা মুখ অবনত করিয়া পিতাকে কি কহিয়া দিলেন। কতলু খাঁ খ্বাজা ইসার প্রতি চাহিয়া আবার প্রতিগমনকারী রাজপুত্রের দিকে চাহিলেন। খ্বাজা ইসা রাজপুত্রকে কহিলেন, “বুঝি আপনার সঙ্গে আরও কথা আছে।”
রাজপুত্র প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, কতলু খাঁ কহিলেন , “কাণ” ।
রাজপুত্র বুঝিলেন। মুমূর্ষুর অধিকতর নিকটে দাঁড়াইয়া মুখের নিকট কর্ণাবনত করিলেন। কতলু খাঁ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন, “বীর।—”
ক্ষণেক স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে বলিতে লাগিলেন, “বীরেন্দ্রসিংহ—তৃষা ।”
আয়েষা পুনরপি অধরে পেয় সিঞ্চন করিলেন ।
“বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা।
রাজপুত্রকে যেন বৃশ্চিক দংশন করিল; চমকিতের ন্যায় ঋজ্বায়ত হইয়া কিঞ্চিদ্দূরে দাঁড়াইলেন। কতলু খাঁ বলিতে লাগিলেন, “পিতৃহীনা— আমি পাপিষ্ঠ— উঃ তৃষা।”
আয়েষা পুনঃ পুনঃ পানীয়াভিসিঞ্চন করিতে লাগিলেন। কিন্তু আর বাক্যস্ফুরণ দুর্ঘট হইল। শ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে বলিতে লাগিলেন “ দারুণ জ্বালা—সাধ্বী, তুমি দেখিও”—
রাজপুত্র কহিলেন, “কি ”? কতলু খাঁর কর্ণে এই প্রশ্ন মেঘগর্জ্জনবৎ—বোধ হইল। কতলু খাঁ বলিতে লাগিলেন, “এই ক কন্যার—মত পবিত্রা।—তুমি! উঃ! বড় তৃষা— যাই যে— আয়েষা ।
আর কথা সরিল না; সাধ্যাতীত পরিশ্রম হইয়াছিল, শ্রমাতিরেক ফলে নির্জ্জীব মস্তক ভূমিতে গড়াইয়া পড়িল। কন্যার নাম মুখে থাকিতে থাকিতে নবাব কতলু খাঁর প্রাণবিয়োগ হইল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদঃ প্রতিযোগিতা

জগৎসিংহ কারামুক্ত হইয়া পিতৃশিবিরে গমনান্তর নিজ স্বীকারানুযায়ী মোগল পাঠানে সন্ধিসম্বন্ধ করাইলেন । পাঠানেরা দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিয়াও উৎকলাধিকারী হইয়া রহিলেন। সন্ধির বিস্তারিত বিবরণ ইতিবৃত্তে বর্ণনীয়। এ স্থলে অতি-বিস্তার নিষ্প্রয়োজন। সন্ধি সমাপনান্তে উভয় দল কিছু দিন পূর্ব্বাবস্থিতির স্থানে রহিলেন । নবপ্রীতিসম্বর্দ্ধনার্থে কতলু খাঁর পুত্রদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া প্রধান রাজমন্ত্রী খ্বাজা ইসা ও সেনাপতি ওসমান রাজা মানসিংহের শিবিরে গমন করিলেন ; সার্দ্ধ শত হস্তী আর অন্যান্য মহার্ঘ দ্রব্য উপঢৌকন দিয়া রাজার পরিতোষ জন্মাইলেন; রাজাও তাঁহাদিগের বহুবিধ সম্মান করিয়া সকলকে খেলোয়াৎ দিয়া বিদায় করিলেন।।
এইরূপ সন্ধিসম্বন্ধ সমাপন করিতে ও শিবির-ভঙ্গোদ্যোগ করিতে কিছু দিন গত হইল।
পরিশেষে রাজপুত সেনার পাটনায় যাত্রার সময় আগত হইলে, জগৎসিংহ এক দিবস অপরাহ্নে সহচর সমভিব্যাহারে পাঠান-দুর্গে ওসমান প্রভৃতির নিকট বিদায়

লইতে গমন করিলেন। কারাগারে সাক্ষাতের পর, ওসমান রাজপুত্রের প্রতি আর সৌহৃদ্যভাব প্রকাশ করেন নাই। অদ্য সামান্য কথাবার্ত্তা কহিয়া বিদায় দিলেন। জগৎসিংহ ওসমানের নিকট ক্ষুণ্নমনে বিদায় লইয়া খ্বাজা ইসার নিকট বিদায় লইতে গেলেন। তথা হইতে আয়েষার নিকট বিদায় লইবার অভিপ্রায়ে চলিলেন। একজন অন্তঃপুর-রক্ষী দ্বারা আয়েষার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন, আর রক্ষীকে কহিয়া দিলেন যে,"বলিও, নবাব সাহেবের লোকান্তর পরে আর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। এক্ষণে আমি পাটনায় চলিলাম, পূনর্ব্বার সাক্ষাতের সম্ভাবনা অতি বিরল; অতএব তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া যাইতে চাহি।"
খোজা কিয়ৎক্ষণ পরে প্রত্যাগমন করিয়া কহিল, "নবাবপুত্রী বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না; অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।"
রাজপুত্র সম্বর্দ্ধিত বিষাদে আত্মশিবিরাভিমুখ হইলেন। দুর্গদ্বারে দেখিলেন, ওসমান তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন।
রাজপুত্র ওসমানকে দেখিয়া পুনরপি অভিবাদন করিয়া চলিয়া যান, ওসমান পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন । রাজপুত্র কহিলেন,"সেনাপতি মহাশয়, আপনার যদি কোন আজ্ঞা থাকে প্রকাশ করুন, আমি প্রতিপালন করিয়া কৃতার্থ হই।"
ওসমান কহিলেন, আপনার সহিত কোন বিশেষ কথা আছে, এত সহচর সাক্ষাৎ তাহা বলিতে পারিব না, সহচরদিগকে অগ্রসর হইতে অনুমতি করুন, একাকী আমার সঙ্গে আসুন।"
রাজপুত্র বিনা সঙ্কোচে সহচরগণকে অগ্রসর হইতে বলিয়া দিয়া একা অশ্বারোহণে পাঠানের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন; ওসমানও অশ্ব আনাইয়া আরোহণ করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া ওসমান রাজপুত্র সঙ্গে এক নিবিড় শাল-বন-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বনের মধ্যস্থলে এক ভগ্ন অট্টালিকা ছিল, বোধ হয়, অতি পূর্ব্বকালে কোন রাজবিদ্রোহী এ স্থলে আসিয়া কাননাভ্যন্তরে লুক্কায়িত ছিল। শালবৃক্ষে ঘোটক বন্ধন করিয়া ওসমান রাজপুত্রকে সেই ভগ্ন অট্টালিকার মধ্যে লইয়া গেলেন। অট্টালিকা মনুষ্যশূন্য। মধ্যস্থলে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ; তাহার এক পার্শ্বে এক যাবনিক সমাধিখাত প্রস্তুত রহিয়াছে, অথচ শব নাই; অপর পার্শ্বে চিতাসজ্জা রহিয়াছে , অথচ কোন মৃতদেহ নাই।
প্রাঙ্গণমধ্যে আসিলে রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সকল কি?"
ওসমান কহিলেন, "এ সকল আমার আজ্ঞাক্রমে হইয়াছে; আজ যদি আমার মৃত্যু হয়, তবে মহাশয় আমাকে এই কবরমধ্যে সমাধিস্থ করিবেন, কেহ জানিবে না; যদি আপনি দেহত্যাগ করেন, তবে এই চিতায় ব্রাহ্মণ দ্বারা আপনার সৎকার করাইব , অপর কেহ জানিবে না।"
রাজপুত্র বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "এ সকল কথার তাৎপর্য্য কি?"
ওসমান কহিলেন, "আমরা পাঠান—অন্তঃকরণ প্রজ্বলিত হইলে উচিতানুচিত বিবেচনা করি না; এই পৃথিবীমধ্যে আয়েষার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী দুই ব্যক্তির স্থান হয় না, একজন এইখানে প্রাণত্যাগ করিব।"
"তখন রাজপুত্র আদ্যোপান্ত বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন, কহিলেন "আপনার কি অভিপ্রায় ?"
ওসমান কহিলেন, সশস্ত্র আছ, আমার সহিত যুদ্ধ কর। সাধ্য হয়, আমাকে বধ করিয়া আপনার পথ মুক্ত কর, নচেৎ আমার হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়া আমার পথ ছাড়িয়া যাও। "
এই বলিয়া ওসমান জগৎসিংহকে প্রত্যুত্তরের অবকাশ দিলেন না, অসিহস্তে তৎপ্রতি আক্রমণ করিলেন। রাজপুত্র অগত্যা আত্মরক্ষার্থ শীঘ্রহস্তে কোষ হইতে অসি বাহির করিয়া ওসমানের আঘাতের প্রতিঘাত করিতে লাগিলেন। ওসমান রাজপুত্রের প্রাণনাশে পুনঃ পুনঃ বিষমোদ্যম করিতে লাগিলেন; রাজপুত্র ভ্রমক্রমেও ওসমানকে আঘাতের চেষ্টা করিলেন না; কেবল আত্মরক্ষায় নিযুক্ত রহিলেন। উভয়েই শস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত, বহুক্ষণ যুদ্ধ হইলে, কেহ কাহাকেও পরাজিত করিতে

পারিলেন না। ফলতঃ যবনের অস্ত্রাঘাতে রাজপুত্রের শরীর ক্ষতবিক্ষত হইল; রুধিরে অঙ্গ প্লাবিত হইল; ওসমান প্রতি তিনি একবারও আঘাত করেন নাই, সুতরাং ওসমান অক্ষত। রক্তস্রাবে শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল দেখিয়া, আর এরূপ সংগ্রামে মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়া জগৎসিংহ কাতরস্বরে কহিলেন," ওসমান, ক্ষান্ত হও, আমি পরাভব স্বীকার করিলাম।"

ওসমান উচ্চ হাস্য করিয়া কহিলেন,"এ ত জানিতাম না যে, রাজপুত সেনাপতি মরিতে ভয় পায়; যুদ্ধ কর, আমি তোমায় বধ করিব, ক্ষমা করিব না। তুমি জীবিতে আয়েষাকে পাইব না।"

রাজপুত্র কহিলেন,"আমি আয়েষার অভিলাষী নহি।"

ওসমান অসি ঘূর্নিত করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, "তুমি আয়েষার অভিলাষী নও, আয়েষা তোমার অভিলাষী । যুদ্ধ কর, ক্ষমা নাই।"

রাজপুত্র অসি দূরে নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "আমি যুদ্ধ করিব না। তুমি অসময়ে আমার উপকার করিয়াছ ; আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব না।"

ওসমান সক্রোধে রাজপুত্রকে পদাঘাত করিলেন, কহিলেন , "যে সিপাহী যুদ্ধ করিতে ভয় পায়, তাহাকে এইরূপে যুদ্ধ করাই।

রাজকুমারের আর ধৈর্য্য রহিল না। শীঘ্রহস্তে ত্যক্ত প্রহরণ ভূমি হইতে উত্তোলন করিয়া শৃগালদংশিত সিংহবৎ প্রচণ্ড লম্ফ দিয়া রাজপুত্র যবনকে আক্রমণ করিলেন। সে দুর্দ্দম প্রহার যবন সহ্য করিতে পারিলেন না। রাজপুত্রের বিশাল শরীরাঘাতে ওসমান ভূমিশায়ী হইলেন । রাজপুত্র তাঁহার বক্ষোপরি আরোহণ করিয়া হস্ত হইতে অসি উন্মোচন করিয়া লইলেন, এবং নিজ করস্থ প্রহরণ তাঁহার গলদেশে স্থাপিত করিয়া কহিলেন, " কেমন, সমর-সাধ মিটিয়াছে ত ?"

"ওসমান কহিলেন, "জীবন থাকিতে নহে।"

রাজপুত্র কহিলেন, "এখনই ত জীবন শেষ করিতে পারি?

ওসমান কহিলেন, "কর, নচেৎ তোমার বধাভিলাষী শত্রু জীবিত থাকিবে।"

জগৎসিংহ কহিলেন, "থাকুক, রাজপুত তাহাতে ডরে না; তোমার জীবন শেষ করিতাম, কিন্তু তুমি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিলে, আমিও করিলাম।"

এই বলিয়া দুই চরণের সহিত ওসমানের দুই হস্ত বদ্ধ রাখিয়া, একে একে তাঁহার সকল অস্ত্র শরীর হইতে হরণ করিলেন। তখন তাঁহাকে মুক্ত করিয়া কহিলেন, "এক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে গৃহে যাও, তুমি যবন হইয়া রাজপুতের শরীরে পদাঘাত করিয়াছিলে, এই জন্য তোমার এ দশা করিলাম, নচেৎ রাজপুতেরা এত কৃতঘ্ন নহে যে, উপকারীর অঙ্গ স্পর্শ করে।"

ওসমান মুক্ত হইলে আর একটি কথা না কহিয়া অশ্বারোহণপূর্ব্বক একেবারে দুর্গাভিমুখে দ্রুতগমনে চলিলেন।

রাজপুত্র বস্ত্র দ্বারা প্রাঙ্গণস্থ কূপ হইতে জল আহরণ করিয়া গাত্র ধৌত করিলেন। গাত্র ধৌত করিয়া শালতরু হইতে অশ্ব মোচনপূর্ব্বক আরোহণ করিলেন। অশ্বারোহণ করিয়া দেখেন,অশ্বের বল্গায়, লতাগুল্মাদির দ্বারা একখানি লিপি বাঁধা রহিয়াছে। বল্গা হইতে পত্র মোচন করিয়া দেখিলেন যে, পত্রখানি মনুষ্যের কেশ দ্বারা বদ্ধ করা আছে, তাহার উপরিভাগে লেখা আছে যে " এই পত্র দুই দিবস মধ্যে খুলিবেন না, যদি খুলেন, তবে ইহার উদ্দেশ্য বিফল হইবে।"

রাজপুত্র ক্ষণেক চিন্তা করিয়া লেখকের অভিপ্রায়ানুসারে কার্য্য করাই স্থির করিলেন। পত্র কবচমধ্যে রাখিয়া অশ্বে কশাঘাত করিয়া শিবিরাভিমুখে চলিলেন।

রাজপুত্র শিবিরে উপনীত হইবার পরদিন দ্বিতীয় এক লিপি দূতহস্তে পাইলেন। এই লিপি আয়েষার প্রেরিত। কিন্তু তদ্‌বৃত্তান্ত পর-পরিচ্ছেদে বক্তব্য।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ ঃ আয়েষার পত্র

আয়েষা লেখনী হস্তে পত্র লিখিতে বসিয়াছেন। মুখকান্তি অত্যন্ত গম্ভীর, স্থির; জগৎ সিংহকে পত্র লিখিতেছেন। একখানা কাগজ লইয়া পত্র আরম্ভ করিলেন। প্রথমে লিখিলেন , "প্রাণাধিক," তখনই "প্রাণাধিক" শব্দ কাটিয়া দিয়া লিখিলেন, "রাজকুমার", "প্রাণাধিক" শব্দ কাটিয়া "রাজকুমার" লিখিতে আয়েষার অশ্রুধারা বিগলিত হইয়া পত্রে পড়িল। আয়েষা অমনি সে পত্র ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। পুনর্ব্বার অন্য কাগজে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু কয়েক ছত্র লেখা হইতে না হইতে আবার পত্র অশ্রুকলঙ্কিত হইল। আয়েষা সে লিপিও বিনষ্ট করিলেন। অন্য বারে অশ্রুচিহ্নশূন্য একখণ্ড লিপি সমাধা করিলেন। সমাধা করিয়া একবার পড়িতে লাগিলেন, পড়িতে নয়নবাষ্পে দৃষ্টিলোপ হইতে লাগিল। কোন মতে লিপি বদ্ধ করিয়া দূতহস্তে দিলেন। লিপি লইয়া দূত রাজপুত শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিল। আয়েষা একাকিনী পালঙ্ক—শয়নে রোদন করিতে লাগিলেন ।

জগৎসিংহ পত্র পাইয়া পড়িতে লাগিলেন।

"রাজকুমার!

আমি যে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করি নাই, সে আত্মধৈর্য্যের প্রতি অবিশ্বাসিনী বলিয়া নহে। মনে করিও না আয়েষা অধীরা। ওসমান নিজ হৃদয়মধ্যে অগ্নি জ্বালিত করিয়াছে, কি জানি আমি তোমার সাক্ষাৎলাভ করিলে, যদি সে ক্লেশ পায়, এই জন্যই তোমার সহিত সাক্ষাৎ করি নাই। সাক্ষাৎ না হইলে তুমি যে ক্লেশ পাইবে, সে ভরসাও করি নাই। নিজের ক্লেশ—সে সকল সুখ দুঃখ জগদীশ্বরচরণে সমর্পণ করিয়াছি। তোমাকে যদি সাক্ষাতে বিদায় দিতে হইত, তবে সে ক্লেশ অনায়াসে সহ্য করিতাম। তোমার সহিত যে সাক্ষাৎ হইল না, এ ক্লেশও পাষাণীর ন্যায় সহ্য করিতেছি।

তবে এ পত্র লিখি কেন ? এক ভিক্ষা আছে, সেই জন্যই এ পত্র লিখিলাম। যদি শুনিয়া থাক যে, আমি তোমাকে স্নেহ করি, তবে তাহা বিস্মৃত হও। এ দেহ বর্ত্তমানে এ কথা প্রকাশ করিব না সঙ্কল্প ছিল, বিধাতার ইচ্ছায় প্রকাশ হইয়াছে, এক্ষণে বিস্মৃত হও।

আমি তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী নহি। আমার যাহা দিবার তাহা দিয়াছি, তোমার নিকট প্রতিদান কিছু চাহি না। আমার স্নেহ এমন বদ্ধমূল যে, তুমি স্নেহ না করিলেও আমি সুখী; কিন্তু সে কথায় আর কাজ কি!

তোমাকে অসুখী দেখিয়াছিলাম। যদি কখন সুখী হও, আয়েষাকে স্মরণ করিয়া সংবাদ দিও। ইচ্ছা না হয়, সংবাদ দিও না। যদি কখন অন্তঃকরণে ক্লেশ পাও, তবে আয়েষাকে কি স্মরণ করিবে?

আমি যে তোমাকে পত্র লিখিলাম, কি যদি ভবিষ্যতে লিখি, তাহাতে লোকে নিন্দা করিবে। আমি নির্দ্দোষী , সুতরাং তাহাতে ক্ষতি বিবেচনা করিও না— যখন ইচ্ছা হইবে, পত্র লিখিও।

তুমি চলিলে, আপাততঃ এ দেশ ত্যাগ করিয়া চলিলে। এই পাঠানেরা শান্ত নহে। সুতরাং পুনর্ব্বার তোমার এ দেশে আসাই সম্ভব। কিন্তু আমার সহিত আর সন্দর্শন হইবে না। পুনঃ পুনঃ হৃদয়মধ্যে চিন্তা করিয়া ইহা স্থির করিয়াছি। রমণীহৃদয় যেরূপ দুর্দ্দমনীয়, তাহাতে অধিক সাহস অনুচিত।

আর একবার মাত্র তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব মানস আছে। যদি তুমি এ প্রদেশে বিবাহ কর, তবে আমায় সংবাদ দিও; আমি তোমার বিবাহকালে উপস্থিত থাকিয়া তোমার বিবাহ দিব। যিনি তোমার মহিষী হইবেন, তাহার জন্য কিছু সামান্য অলঙ্কার সংগ্রহ করিয়া রাখিলাম, যদি সময় পাই, স্বহস্তে পরাইয়া দিব।

আর এক প্রার্থনা। যখন আয়েষার মৃত্যুসংবাদ তোমার নিকট যাইবে, তখন একবার এ দেশে আসিও, তোমার নিমিত্ত সিন্দুকমধ্যে যাহা রহিল, তাহা আমার অনুরোধে গ্রহণ করিও ।

আর কি লিখিব? অনেক কথা লিখিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু নিষ্প্রয়োজন। জগদীশ্বর তোমাকে সুখী করিবেন, আয়েষার কথা মনে করিয়া কখনও দুঃখিত হইও না।

জগৎসিংহ পত্র পাঠ করিয়া বহুক্ষণ তাম্বুমধ্যে পত্রহস্তে পদচারণ করিতে লাগিলেন। পরে অকস্মাৎ শীঘ্রহস্তে একখানা কাগজ লইয়া নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়া দূতের হস্তে দিলেন।
“আয়েষা , তুমি রমণীরত্ন। জগতে মনঃপীড়াই বুঝি বিধাতার ইচ্ছা! আমি তোমার কোন প্রত্যুত্তর লিখিতে পারিলাম না। তোমার পত্রে আমি অত্যন্ত কাতর হইয়াছি। এ পত্রের যে উত্তর, তাহা এক্ষণে দিতে পারিলাম না। আমাকে ভুলিও না। যদি বাঁচিয়া থাকি, তবে এক বৎসর পরে ইহার উত্তর দিব।”
দূত এই প্রত্যুত্তর লইয়া আয়েষার নিকট প্রতিগমন করিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ ঃ দীপ নির্ব্বাণোন্মুখ

যে পর্য্যন্ত তিলোত্তমা আশমানির সঙ্গে আয়েষার নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসিয়াছিলেন, সেই পর্য্যন্ত আর কেহ তাঁহার কোন সংবাদ পায় নাই। তিলোত্তমা, বিমলা, আশমানি, অভিরাম স্বামী, কাহারও কোন উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই। যখন মোগলপাঠানে সন্ধিসম্বন্ধ হইল, তখন বীরেন্দ্রসিংহ আর তৎপরিজনের অশ্রুতপূর্ব্ব দুর্ঘটনা সকল স্মরণ করিয়া উভয় পক্ষই সম্মত হইলেন যে, বীরেন্দ্রের স্ত্রী কন্যার অনুসন্ধান করিয়া তাহাদিগকে গড় মান্দারণে পুনরবস্থাপিত করা যাইবে। সেই কারণেই, ওসমান, খ্বাজা ইসা, মানসিংহ প্রভৃতি সকলেই তাহাদিগকে বিশেষ অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু তিলোত্তমার আশমানির সঙ্গে আয়েষার নিকট হইতে আসা ব্যতীত আর কিছুই কেহ অবগত হইতে পারিলেন না। পরিশেষে মানসিংহ নিরাশ হইয়া একজন বিশ্বাসী অনুচরকে গড় মান্দারণে স্থাপন করিয়া এই আদেশ করিলেন যে, “তুমি এইখানে থাকিয়া মৃত জায়গীরদারের স্ত্রীকন্যার উদ্দেশ করিতে থাক; সন্ধান পাইলে তাহাদিগকে দুর্গে স্থাপনা করিয়া আমার নিকট যাইবে, আমি তোমাকে পুরস্কৃত করিব, এবং অন্য জায়গীর দিব।”
এইরূপ স্থির করিয়া মানসিংহ পাটনায় গমনোদ্যোগী হইলেন।
মৃত্যুকালে কতলু খাঁর মুখে যাহা শুনিয়াছিলেন, তচ্ছ্রবণে জগৎসিংহের হৃদয়মধ্যে কোন ভাবান্তর জন্মিয়াছিল কি না, তাহা কিছুই প্রকাশ পাইল না। জগৎসিংহ অর্থব্যয় এবং শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে যত্ন কেবল পূর্ব্ব সম্বন্ধের স্মৃতিজনিত, কি যে যে অপরাপর কারণে মানসিংহ প্রভৃতি সেইরূপ যত্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই সেই কারণসম্ভূত, কি পুনঃসঞ্চারিত প্রেমানুরোধে উৎপন্ন, তাহা কেহই বুঝিতে পারে নাই । যত্ন যে কারণেই হইয়া থাকুক, বিফল হইল।
মানসিংহের সেনাসকল শিবির ভঙ্গ করিতে লাগিল, পরদিন প্রভাতে “কুচ” করিবে। যাত্রার পূর্ব্বদিবসে অশ্ববল্গায় প্রাপ্ত লিপি পড়িবার সময় উপনীত হইল। রাজপুত্র কৌতূহলী হইয়া লিপি খুলিয়া পাঠ করিলেন। তাহাতে কেবল এইমাত্র লেখা আছে,
“যদি ধর্ম্মভয় থাকে, যদি ব্রহ্মশাপের ভয় থাকে, তবে পত্র পাঠমাত্র এই স্থানে একা আসিবে। ইতি— *অহং ব্রাহ্মণ।*”
রাজপুত্র লিপি পাঠে চমৎকৃত হইলেন। একবার মনে করিলেন, কোন শত্রুর চাতুরীও হইতে পারে, যাওয়া উচিত কি ? রাজপুতহৃদয়ে ব্রহ্মশাপের ভয় ভিন্ন অন্য ভয় প্রবল নহে; সুতরাং যাওয়াই স্থির হইল। অতএব নিজ অনুচরবর্গকে আদেশ করিলেন যে, যদি তিনি সৈন্যযাত্রার মধ্যে না আসিতে পারেন, তবে তাহারা তাঁহার প্রতীক্ষায় থাকিবে না; সৈন্য অগ্রগামী হয়, হানি নাই, পশ্চাৎ বর্দ্ধমানে কি রাজমহলে তিনি মিলিত হইতে পারিবেন। এইরূপ আদেশ করিয়া জগৎসিংহ একাকী শাল-বন অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পূর্ব্বকথিত ভগ্নাট্টালিকা-দ্বারে উপস্থিত হইয়া রাজপুত্র পূর্ব্ববৎ শালবৃক্ষে অশ্ব বন্ধন করিলেন। ইতস্ততঃ দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই। পরে অট্টালিকা মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখেন, প্রাঙ্গণে পূর্ব্ববৎ এক পার্শ্বে সমাধিমন্দির, এক পার্শ্বে চিতাসজ্জা রহিয়াছে; চিতাকাষ্ঠের উপর একজন ব্রাহ্মণই অধোমুখে বসিয়া আছেন। ব্রাহ্মণ অধোমুখে বসিয়া রোদন করিতেছেন।
রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়, আপনি আমাকে এখানে আসিতে আজ্ঞা করিয়াছেন?
ব্রাহ্মণ মুখ তুলিলেন; রাজপুত্র জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানিলেন, ইনি অভিরাম স্বামী।
রাজপুত্রের মনে একেবারে বিস্ময়, কৌতূহল, আহ্লাদ, এই তিনেরই আবির্ভাব হইল; প্রণাম করিয়া ব্যগ্রতার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "দর্শন জন্য যে কত উদ্যোগ পাইয়াছি, কি বলিব। এখানে অবস্থিতি কেন?
অভিরাম স্বামী চক্ষুঃমুছিয়া কহিলেন, "আপাতত ঃ এইখানেই বাস!"
স্বামীর উত্তর শুনিতে না শুনিতেই রাজপুত্র প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। আমাকে স্মরণ করিয়াছেন কি জন্য? রোদনই বা কেন ?
অভিরাম স্বামী কহিলেন, "যে কারণে রোদন করিতেছি, সেই কারণেই তোমাকে ডাকিয়াছি; তিলোত্তমার মৃত্যুকাল উপস্থিত।"
ধীরে ধীরে, মৃদু মৃদু, তিল তিল করিয়া, যোদ্ধৃপতি সেইখানে ভূতলে বসিয়া পড়িলেন। তখন আদ্যোপান্ত সকল কথা একে একে মনে পড়িতে লাগিল; একে একে অন্তঃকরণমধ্যে দারুন তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাত হইতে লাগিল। দেবালয়ে প্রথম সন্দর্শন, শৈলেশ্বর- সাক্ষাৎ প্রতিজ্ঞা কক্ষমধ্যে প্রথম পরিচয়ে উভয়ের প্রেমোত্থিত অশ্রুজল, সেই কাল-রাত্রির ঘটনা, তিলোত্তমার মুর্চ্ছাবস্থার মুখ, যবনাগারে তিলোত্তমার পীড়ন, কারাগারমধ্যে নিজ নির্দ্দয় ব্যবহার, পরে এক্ষণকার এই বনবাসে মৃত্যু, এই সকল একে একে রাজকুমারের হৃদয়ে আসিয়া ঝটিকা-প্রঘাতবৎ লাগিতে লাগিল। পূর্ব্ব হুতাশন শতগুণ প্রচণ্ড জ্বালার সহিত জ্বলিয়া উঠিল।
রাজপুত্র অনেকক্ষণ মৌন হইয়া বসিয়া রহিলেন। অভিরাম স্বামী বলিতে লাগিলেন, "যে দিন বিমলা যবন-বধ করিয়া বৈধব্যের প্রতিশোধ করিয়াছিল, সেই দিন অবধি আমি কন্যা দৌহিত্রী লইয়া যবন ভয়ে নানা স্থানে অজ্ঞাতে ভ্রমণ করিতেছিলাম, সেই দিন অবধি তিলোত্তমার রোগের সঞ্চার। যে কারণে রোগের সঞ্চার, তাহা তুমি বিশেষ অবগত আছ।"
জগৎসিংহের হৃদয়ে শেল বিঁধিল।
"সে অবধি তাহাকে নানা স্থানে রাখিয়া নানা মত চিকিৎসা করিয়াছি, নিজে যৌবনাবধি চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি, অনেক রোগের চিকিৎসা করিয়াছি; অন্যের অজ্ঞাত অনেক ঔষধ জানি। কিন্তু যে রোগ হৃদয়মধ্যে, চিকিৎসায় তাহার প্রতীকার নাই। এই স্থান অতি নির্জ্জন বলিয়া ইহারই মধ্যে এক নিভৃত অংশে আজ পাঁচ সাত দিন বসতি করিতেছি। দৈবযোগে তুমি এখানে আসিয়াছ দেখিয়া তোমার অশ্ববল্গায় পত্র বাঁধিয়া দিয়াছিলাম। পূর্ব্বাবধি অভিলাষ ছিল যে, তিলোত্তমাকে রক্ষা করিতে না পারিলে, তোমার সহিত আর একবার সাক্ষাৎ করাইয়া অন্তিম কালে তাহার অন্তঃকরণকে তৃপ্ত করিব। সেই জন্যই তোমাকে আসিতে লিখিয়াছি। তখনও তিলোত্তমার আরোগ্যের ভরসা দূর হয় নাই; কিন্তু বুঝিয়াছিলাম যে, দুই দিন মধ্যে কিছু উপশম না হইলে চরম কাল উপস্থিত হইবে। এই জন্য দুই দিন পরে পত্র পড়িবার পরামর্শ দিয়াছিলাম। এক্ষণে যে ভয় করিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিয়াছে। তিলোত্তমার জীবনের কোন আশা নাই। জীবনদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়াছে। "
এই বলিয়া অভিরাম স্বামী পুনর্ব্বার রোদন করিতে লাগিলেন। জগৎসিংহও রোদন করিতেছিলেন।
স্বামী পুনশ্চ কহিলেন, "অকস্মাৎ তোমার তিলোত্তমা সন্নিধানে যাওয়া হইবেক না; কি জানি, যদি এ অবস্থায় উল্লাসের আধিক্য সহ্য না হয়। আমি পূর্ব্বেই

বলিয়া রাখিয়াছি যে, তোমাকে আসিতে সংবাদ দিয়াছি, তোমার আসার সম্ভাবনা আছে। এই ক্ষণে আসার সংবাদ দিয়া আসি , পশ্চাৎ সাক্ষাৎ করিও।"

এই বলিয়া পরমহংস, যে দিকে ভগ্নাট্টালিকার অন্তঃপুর, সেই দিকে গমন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে পত্যাগমন করিয়া রাজপুত্রকে কহিলেন, "আইস।"

রাজপুত্র পরমহংসের সঙ্গে অন্তঃপুরাভিমুখে গমন করিলেন। দেখিলেন, একটি কক্ষ অভগ্ন আছে, তন্মধ্যে জীর্ণ ভগ্ন পালঙ্ক, তদুপরি ব্যাধিক্ষীণা, অথচ অনতিবিলুপ্তরূপরাশি তিলোত্তমা শয়নে রহিয়াছে; এ সময়েও পূর্ব্বলাবণ্যের-মৃদুলতর প্রভা পরিবেষ্টিত রহিয়াছে;—নির্ব্বাণোন্মুখ প্রভাততারার ন্যায় মনোমোহিনী হইয়া রহিয়াছে। নিকটে একটি বিধবা বসিয়া অঙ্গে হস্তমার্জ্জন করিতেছে; সে নিরাভরণা, মলিনা, দীনা বিমলা। রাজকুমার তাহাকে প্রথমে চিনিতে পারিলেন না, কিসেই বা চিনিবেন, যে স্থিরযৌবনা ছিল, সে এক্ষণে প্রাচীনা হইয়াছে।

যখন রাজপুত্র আসিয়া তিলোত্তমার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইলেন ,তখন তিলোত্তমা নয়ন মুদ্রিত করিয়া ছিলেন। অভিরাম স্বামী ডাকিয়া কহিলেন, "তিলোত্তমে ! রাজকুমার জগৎসিংহ আসিয়াছেন।"

তিলোত্তমা নয়ন উন্মীলিত করিয়া জগৎসিংহের প্রতি চাহিলেন; সে দৃষ্টি কোমল, কেবল স্নেহব্যঞ্জক; তিরস্কারণাভিলাষের চিহ্নমাত্র বর্জ্জিত। তিলোত্তমা চাহিবামাত্র দৃষ্টি বিনত করিলেন; দেখিতে দেখিতে লোচনে দর দর ধারা বহিতে লাগিল। রাজকুমার আর থাকিতে পারিলেন না; লজ্জা দূরে গেল; তিলোত্তমার পদপ্রান্তে বসিয়া নীরবে নয়নাসারে তাঁহার দেহলতা সিক্ত করিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ ঃ সফলে নিষ্ফল স্বপ্ন

পিতৃহীনা অনাথিনী, রুগ্না শয্যায়;—জগৎসিংহ তাঁহার শয্যাপার্শ্বে । দিন যায়, রাত্রি যায়, আর বার দিন আসে; আর বার দিন যায়,রাত্রি আসে! রাজপুত-কুল-গৌরব তাহার ভগ্ন পালঙ্কের পাশে বসিয়া শুশ্রূষা করিতেছেন; সেই দীনা, শব্দহীনা বিধবার অবিরল কার্য্যের সাহায্য করিতেছেন। আধিক্ষীণা দুঃখিনী তাঁহার পানে চাহে কি না-তার শিশিরনিপীড়িত পদ্মমুখে পূর্ব্বকালের সে হাসি আসে কি না, তাহাই দেখিবার আকাঙ্ক্ষায় তাহার মুখপানে চাহিয়া আছেন।

কোথায় শিবির ? কোথায় সেনা ?—শিবির ভঙ্গ করিয়া সেনা পাটনায় চলিয়া গিয়াছে! কোথায় অনুচর সব? দারুকেশ্বর-তীরে প্রভুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। কোথায় প্রভু ? প্রবলাতপ-বিশোষিত সুকুমার কুসুম-কলিকায় নয়নবারি সেচনে পুনরুৎফুল্ল করিতেছেন।

কুসুম-কলিকা ক্রমে পুনরুৎফুল্ল হইতে লাগিল। এ সংসারের প্রধান ঐন্দ্রজালিক স্নেহ! ব্যাধি-প্রতিকারে প্রধান ঔষধ প্রণয়। নহিলে হৃদয়-ব্যাধি কে উপশম করিতে পারে ?

যেমন নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ বিন্দু বিন্দু তৈলসঞ্চারে ধীরে ধীরে আবার হাসিয়া উঠে, যেমন নিদাঘশুষ্ক বল্লরী আষাঢ়ের নববারি সিঞ্চনে ধীরে ধীরে পুনর্ব্বার বিকশিত হয়; জগৎসিংহকে পাইয়া তিলোত্তমা তদ্রুপ দিনে দিনে পুনর্জ্জীবন পাইতে লাগিলেন।

ক্রমে সবলা হইয়া পালঙ্কোপরি বসিতে পারিলেন। বিমলার অবর্ত্তমানে দুজনে কাছে কাছে বসিয়া অনেক দিনের মনের কথা সকল বলিতে পারিলেন। কত কথা বলিলেন, মানসকৃত কত অপরাধ স্বীকার করিলেন, কত অন্যায় ভরসা মনোমধ্যে উদয় হইয়া মনোমধ্যেই নিবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা বলিলেন; জাগরণে কি নিদ্রায় কত মনোমোহন স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহা বলিলেন। রুগ্নশয্যায় শয়নে অচেতনে যে এক স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, একদিন তাহা বলিলেন—

যেন নববসন্তের শোভাপরিপূর্ণ এক ক্ষুদ্র পর্ব্বতোপরি তিনি জগৎসিংহের সহিত পুষ্পক্রীড়া করিতেছিলেন ; স্তূপে স্তূপে বসন্তকুসুম চয়ন করিয়া মালা গাঁথিলেন,

আপনি এক মালা কণ্ঠে পরিলেন,আর এক মালা জগৎসিংহের কণ্ঠে দিলেন; জগৎসিংহের কটিস্থ অসিস্পর্শে মালা ছিড়িয়া গেল। “আর তোমার কণ্ঠে মালা দিব না, চরণে নিগড় দিয়া বাঁধিব” এই বলিয়া যেন কুসুমের নিগড় রচনা করিলেন। নিগড় পরাইতে গেলেন, জগৎ সিংহ অমনই সরিয়া গেলেন। তিলোত্তমা পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন; জগৎসিংহ বেগে পর্ব্বত অবতরণ করিতে লাগিলেন; পথে এক ক্ষীণা নির্ঝরিণী ছিল, জগৎসিংহ লম্ফ দিয়া পার হইলেন; তিলোত্তমা স্ত্রীলোক—লম্ফে পার হইতে পারিলেন না, যেখানে নির্ঝরিণী সঙ্কীর্ণা হইয়াছে, সেখানে পার হইবেন, এই আশায়, নির্ঝরিণীর ধারে ধারে ছুটিয়া পর্ব্বত অবতরণ করিতে লাগিলেন! নির্ঝরিণী সঙ্কীর্ণা হওয়া দূরে থাকুক, যত যান, তত আয়তনে বাড়ে; নির্ঝরিণী ক্রমে ক্ষুদ্র নদী হইল; ক্ষুদ্র নদী ক্রমে বড় নদী হইল; আর জগৎসিংহকে দেখা যায় না; তীর অতি উচ্চ, অতি বন্ধুর, আর পাদচালন হয় না; তাহাতে আবার তিলোত্তমার চরণ-তলস্থ উপকূলের মৃত্তিকা খণ্ডে খণ্ডে খসিয়া গম্ভীর নাদে জলে পড়িতে লাগিল, নীচে প্রচণ্ড ঘূর্ণিত জলাবর্ত্ত, দেখিতে সাহস হয় না। তিলোত্তমা পর্ব্বতে পুনরারোহণ করিয়া নদীগ্রাস হইতে পলাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন; পথ বন্ধুর, চরণ চলে না; তিলোত্তমা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন;অকস্মাৎ কালমূর্ত্তি কতলু খাঁ পুনরুজ্জীবিত হইয়া তাঁহার পথরোধ করিল; কণ্ঠের পুষ্পমালা অমনই গুরুভার লৌহশৃঙ্খল হইল; কুসুমনিগড় হস্তচ্যুত হইয়া আত্মচরণে পড়িল; সে নিগড় অমনি লৌহনিগড় হইয়া বেড়িল; অকস্মাৎ অঙ্গ স্তম্ভিত হইল; তখন কতলু খাঁ তাঁহার গলদেশ ধরিয়া ঘূর্ণিত করিয়া নদী-তরঙ্গ- প্রবাহমধ্যে নিক্ষেপ করিল।

স্বপ্নের কথা সমাপন করিয়া তিলোত্তমা সজলচক্ষে কহিলেন, “যুবরাজ, আমার এ শুধু স্বপ্ন নহে; তোমার জন্য যে কুসুমনিগড় রচিয়াছিলাম, বুঝি তাহা সত্যই আত্মচরণে লৌহনিগড় হইয়া ধরিয়াছে। যে কুসুমমালা পরাইয়াছিলাম, তাহা অসির আঘাতে ছিড়িয়াছে।”

যুবরাজ তখন হাস্য করিয়া কটিস্থিত অসি তিলোত্তমার পদতলে রাখিলেন; কহিলেন, “তিলোত্তমা, তোমার সম্মুখে এই অসিশূন্য হইলাম, আবার মালা দিয়া দেখ, অসি তোমার সম্মুখে দ্বিখণ্ড করিয়া ভাঙ্গিতেছি।”

তিলোত্তমাকে নিরুত্তর দেখিয়া, রাজকুমার কহিলেন, “তিলোত্তমা, আমি কেবল রহস্য করিতেছি না।”

তিলোত্তমা লজ্জায় অধোমুখী হইয়া রহিলেন।

সেই দিন প্রদোষকালে অভিরাম স্বামী কক্ষান্তরে প্রদীপের আলোকে বসিয়া পুতি পড়িতেছিলেন; রাজপুত্র তথায় গিয়া সবিনয়ে কহিলেন, “মহাশয়, আমার এক নিবেদন, তিলোত্তমা এক্ষণে স্থানান্তর গমনের কষ্ট সহ্য করিতে পারিবেন, অতএব আর এ ভগ্ন গৃহে কষ্ট পাইবার প্রয়োজন কি ? কাল যদি মন্দ দিন না হয়, তবে গড় মান্দারণে লইয়া চলুন। আর যদি আপনার অনভিমত না হয়, তবে অম্বরের বংশে দৌহিত্রী সম্প্রদান করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।”

অভিরাম স্বামী পুতি ফেলিয়া উঠিয়া রাজপুত্রকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন, পুতির উপর যে পা দিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাহা জ্ঞান নাই।

যখন রাজপুত্র স্বামীর নিকট আইসেন, তখন ভাব বুঝিয়া বিমলা আর আশমানি শনৈঃ শনৈঃ রাজপুত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছিলেন; বাহিরে থাকিয়া সকল শুনিয়াছিলেন। রাজপুত্র বাহিরে আসিয়া দেখেন যে, বিমলার অকস্মাৎ পূর্ব্বভাবপ্রাপ্তি; অনবরত হাসিতেছেন, আর আশমানির চুল ছিঁড়িতেছেন ও কিল মারিতেছেন; আশমানি মারপিট তৃণজ্ঞান করিয়া বিমলার নিকট নৃত্যের পরীক্ষা দিতেছে। রাজকুমার এক পাশ দিয়া সরিয়া গেলেন।

দ্বাবিংশতিতম পরিচ্ছেদঃ সমাপ্তি

ফুল ফুটিল। অভিরাম স্বামী গড় মান্দারণে গমন করিয়া মহাসমারোহের সহিত দৌহিত্রীকে জগৎসিংহের পাণিগৃহীত্রী করিলেন।

উৎসবাদির জন্য জগৎসিংহ নিজ সহচরবর্গকে জাহানাবাদ হইতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়াছিলেন। তিলোত্তমার পিতৃবন্ধুও অনেকে আহ্বানপ্রাপ্ত হইয়া আনন্দকার্য্যে আসিয়া আমোদ আহ্লাদ করিলেন।

আয়েষার প্রার্থনামতে জগৎসিংহ তাঁহাকেও সংবাদ করিয়াছিলেন। আয়েষা নিজ কিশোর বয়স্ক সহোদরকে সঙ্গে লইয়া এবং আর আর পৌরবর্গে বেষ্টিত হইয়া আসিয়াছিলেন।

আয়েষা যবনী হইয়াও তিলোত্তমা আর জগৎসিংহের অধিক স্নেহবশতঃ সহচরীবর্গের সহিত দুর্গান্তঃপুরবাসিনী হইলেন। পাঠক মনে করিতে পারেন যে, আয়েষা তাপিতহৃদয়ে বিবাহের উৎসবে উৎসব করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ তাহা নহে। আয়েষা নিজ সহর্ষ চিত্তের প্রফুল্লতায় সকলকেই প্রফুল্ল করিতে লাগিলেন; প্রস্ফুট শারদ সরসীরুহের মন্দান্দোলন স্বরূপ সেই মৃদুমধুর হাসিতে সর্ব্বত্র শ্রীসম্পাদন করিতে লাগিলেন।

বিবাহকার্য্য নিশীথে সমাপ্ত হইল। আয়েষা তখন সহচরগণ সহিত প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্যোগ করিলেন; হাসিয়া বিমলার নিকট বিদায় লইলেন। বিমলা কিছুই জানেন না, হাসিয়া কহিলেন, "নবাবজাদী! আবার আপনার শুভকার্য্যে আমরা নিমন্ত্রিত হইব।"

বিমলার নিকট হইতে আসিয়া আয়েষা তিলোত্তমাকে ডাকিয়া এক নিভৃত কক্ষে আনিলেন। তিলোত্তমার কর ধারণ করিয়া কহিলেন, "ভগিনি! আমি চলিলাম। কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইতেছি, তুমি অক্ষয় সুখে কালযাপন কর।"

তিলোত্তমা কহিলেন, "আবার কত দিনে আপনার সাক্ষাৎ পাইব ?"

আয়েষা কহিলেন, "সাক্ষাতের ভরসা কিরূপে করিব ?" তিলোত্তমা বিষণ্ন হইলেন। উভয়ে নীরব হইয়া রহিলেন।

ক্ষণকাল পরে আয়েষা কহিলেন, "সাক্ষাৎ হউক বা না হউক, তুমি আয়েষাকে ভুলিয়া যাইবে না?"

তিলোত্তমা হাসিয়া কহিলেন, "আয়েষাকে ভুলিলে যুবরাজ আমার মুখ দেখিবেন না।"

আয়েষা গাম্ভীর্যসহকারে কহিলেন, "এ কথায় আমি সন্তুষ্ট হইলাম না। তুমি আমার কথা কখন যুবরাজের নিকট তুলিও না। এ কথা অঙ্গীকার কর।"

আয়েষা বুঝিয়াছিলেন যে, জগৎসিংহের জন্য আয়েষা যে এ জন্মের সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছেন, এ কথা জগৎসিংহের হৃদয়ে শেলস্বরূপ বিদ্ধ রহিয়াছে। আয়েষার প্রসঙ্গমাত্রও তাঁহার অনুতাপকর হইতে পারে।

তিলোত্তমা অঙ্গীকার করিলেন। আয়েষা কহিলেন, "অথচ বিস্মৃতও হইও না, স্মরণার্থ যে চিহ্ন দিই, তাহা ত্যাগ করিও না।"

এই বলিয়া আয়েষা দাসীকে ডাকিয়া আজ্ঞা দিলেন। আজ্ঞামত দাসী গজদন্তনির্ম্মিত পাত্রমধ্যস্থ রত্নালঙ্কার আনিয়া দিল। আয়েষা দাসীকে বিদায় দিয়া সেই সকল অলঙ্কার স্বহস্তে তিলোত্তমার অঙ্গে পরাইতে লাগিলেন।

তিলোত্তমা ধনাঢ্য ভূস্বামিকন্যা, তথাপি সে অলঙ্কাররাশির অদ্ভুত শিল্পরচনা এবং তন্মধ্যবর্ত্তী বহুমূল্য হীরকাদি রত্নরাজির অসাধারণ তীব্র দীপ্তি দেখিয়া চমৎকৃতা হইলেন। বস্তুতঃ আয়েষা পিতৃদত্ত নিজ অঙ্গভূষণরাশি নষ্ট করিয়া তিলোত্তমার জন্য অন্যজনদুর্লভ এই সকল রত্নভূষা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তিলোত্তমা তত্তাবতের গৌরব করিতে লাগিলেন। আয়েষা কহিলেন, "ভগিনি, এ সকলের প্রশংসা করিও না। তুমি আজ যে রত্ন হৃদয়ে ধারণ করিলে, এ সকল তাঁহার চরণরেণুর তুল্য নহে।" এই কথা বলিতে বলিতে আয়েষা কত ক্লেশে যে চক্ষুর জল সংবরণ করিলেন, তিলোত্তমা তাহা কিছুই জানিতে পারিলেন না।

অলঙ্কারসন্নিবেশ সমাধা হইলে, আয়েষা তিলোত্তমার দুইটি হস্ত ধরিয়া তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "এ সরল প্রেমপ্রতিম মুখ দেখিয়া ত বোধ হয়, প্রাণেশ্বর কখন মনঃপীড়া পাইবেন না। যদি বিধাতার অন্যরূপ ইচ্ছা না হইল, তবে তাঁহার চরণে এই ভিক্ষা যে, যেন ইহার দ্বারা

তাঁহার চিরসুখ সম্পাদন করেন।”

তিলোত্তমাকে কহিলেন, “তিলোত্তমা! আমি চলিলাম। তোমার স্বামী ব্যস্ত থাকিতে পারেন, তাঁহার নিকট বিদায় লইতে গিয়া কালহরণ করিব না। জগদীশ্বর তোমাদিগকে দীর্ঘায়ুঃ করিবেন। আমি যে রত্নগুলি দিলাম, অঙ্গে পরিও। আর আমার—তোমার সার রত্ন হৃদয়মধ্যে রাখিও।”

“তোমার সার রত্ন” বলিতে আয়েষার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। তিলোত্তমা দেখিলেন, আয়েষার নয়নপল্লব জলভারস্তম্ভিত হইয়া কাঁপিতেছে।

তিলোত্তমা সমদুঃখিনীর ন্যায় কহিলেন, “কাঁদিতেছ কেন?” অমনি আয়েষার নয়নবারিস্রোত দরদরিত হইয়া বহিতে লাগিল।

আয়েষা আর তিলার্দ্ধ অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতবেগে গৃহত্যাগ করিয়া গিয়া দোলারোহণ করিলেন।

আয়েষা যখন আপন আবাসগৃহে আসিয়া উপনীত হইলেন, তখনও রাত্রি আছে। আয়েষা বেশ ত্যাগ করিয়া, শীতল-পবন-পথ কক্ষবাতায়নে দাঁড়াইলেন। নিজ পরিত্যক্ত বসনাধিক কোমল নীলবর্ণ গগনমণ্ডল মধ্যে লক্ষ লক্ষ তারা জ্বলিতেছে; মৃদুপবনহিল্লোলে অন্ধকারস্থিত বৃক্ষ সকলের পত্র মুখরিত হইতেছে। দুর্গশিরে পেচক মৃদুগম্ভীর নিনাদ করিতেছে। সম্মুখে দুর্গপ্রাকার-মূলে যেখানে আয়েষা দাঁড়াইয়া আছেন, তাহারই নীচে, জলপরিপূর্ণ দুর্গপরিখা নীরবে আকাশপটপ্রতিবিম্ব ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

আয়েষা বাতায়নে বসিয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। অঙ্গুলি হইতে একটি অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিলেন। সে অঙ্গুরীয় গরলাধার। একবার মনে মনে করিতেছিলেন, “এই রস পান করিয়া এখনই সকল তৃষা নিবারণ করিতে পারি।” আবার ভাবিতেছিলেন, “এই কাজের জন্য কি বিধাতা আমাকে সংসারে পাঠাইয়াছিলেন ? যদি এ যন্ত্রণা সহিতে না পারিলাম, তবে নারী-জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম কেন? জগৎসিংহ শুনিয়াই বা কি বলিবেন ?”

আবার অঙ্গুরীয় অঙ্গুলিতে পরিলেন। আবার কি ভাবিয়া খুলিয়া লইলেন। ভাবিলেন, “এ লোভ সংবরণ করা রমণীর অসাধ্য; প্রলোভনকে দূর করাই ভাল।”

এই বলিয়া আয়েষা গরলাধার অঙ্গুরীয় দুর্গপরিখার জলে নিক্ষিপ্ত করিলেন।

ইন্দিরা

প্রথম পরিচ্ছেদ : আমি শ্বশুরবাড়ী যাইব

অনেক দিনের পর আমি শ্বশুরবাড়ী যাইতেছিলাম। আমি ঊনিশ বৎসরে পড়িয়াছিলাম, তথাপি এ পর্য্যন্ত শ্বশুরের ঘর করি নাই। তাহার কারণ, আমার পিতা ধনী, শ্বশুর দরিদ্র। বিবাহের কিছু দিন পরেই শ্বশুর আমাকে লইতে লোক পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু পিতা পাঠাইলেন না; বলিলেন—"বিহাইকে বলিও যে, আগে আমার জামাতা উপার্জ্জন করিতে শিখুক—তার পর বধূ লইয়া যাইবেন—এখন আমার মেয়ে লইয়া গিয়া খাওয়াইবেন কি?" "শুনিয়া আমার স্বামীর মনে বড় ঘৃণা জন্মিল—তাঁহার বয়স তখন কুড়ি বৎসর, তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, স্বয়ং অর্থোপার্জ্জন করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিলেন। এই ভাবিয়া তিনি পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিলেন। তখন রেইল হয় নাই—পশ্চিমের পথ অতি দুর্গম ছিল। তিনি পদব্রজে, বিনা অর্থে, বিনা সহায়ে, সেই পথ অতিবাহিত করিয়া, পাঞ্জাবে গিয়া উপস্থিত হইলেন। যে ইহা পারে, সে অর্থোপার্জ্জন করিতেও পারে। স্বামী অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন—বাড়ীতে টাকা পাঠাইতে লাগিলেন—কিন্তু সাত আট বৎসর বাড়ী আসিলেন না, বা আমার কোন সংবাদ লইলেন না। রাগে আমার শরীর গর গর করিত। কত টাকা চাই? পিতা-মাতার উপর বড় রাগ হইত—কেন পোড়া টাকা উপার্জ্জনের কথা তাঁহারা তুলিয়াছিলেন ? টাকা কি আমার সুখের চেয়ে বড়! আমার বাপের ঘরে অনেক টাকা—আমি টাকা লইয়া "ছিনিমিনি" খেলিতাম। মনে মনে করিতাম, একদিন টাকা পাতিয়া শুইয়া দেখিব—কি সুখ ? একদিন মাকে বলিলাম, "মা, টাকা পাতিয়া শুইব।" মা বলিলেন, "পাগলী কোথাকার!" মা কথাটা বুঝিলেন। কি কল কৌশল করিলেন বলিতে পার না, কিন্তু যে সময়ের ইতিহাস আরম্ভ করিতেছি, তাহার কিছু পূর্ব্বে আমার স্বামী বাড়ী আসিলেন। রব উঠিল যে, তিনি কমিসেরিয়েটের (কমিসেরিয়েট্ বটে ত ?) কর্ম্ম করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া আসিয়াছেন। আমার শ্বশুর আমার পিতাকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "আপনার আশীর্ব্বাদে উপেন্দ্র (আমার স্বামীর নাম উপেন্দ্র—নাম ধরিলাম, প্রাচীনারা মার্জ্জনা করিবেন, হাল আইনে তাঁহাকে "আমার উপেন্দ্র" বলিয়া ডাকাই সম্ভব)—বধূমাতাকে প্রতিপালন করিতে সক্ষম। পাল্কী বেহারা পাঠাইলাম, বধূমাতাকে এ বাটীতে পাঠাইয়া দিবেন। নচেৎ আজ্ঞা করিলে পুত্রের বিবাহের আবার সম্বন্ধ করিব।"

পিতা দেখিলেন, নূতন বড় মানুষ বটে। পাল্কীখানার ভিতরে কিংখাপ মোড়া, উপরে রূপার বিট বাঁটে রূপার হাঙ্গরের মুখ। দাসী মাগী যে, আসিয়াছিল, সে গরদ পরিয়া আসিয়াছে, গলায় বড় মোটা সোণার দানা। চারি জন কালো দাঁড়িওয়ালা ভোজপুরে পাল্কীর সঙ্গে আসিয়াছিল।

আমার পিতা হরমোহন দত্ত বুনিয়াদি বড়মানুষ, হাসিয়া বলিলেন, "মা ইন্দিরে! আর তোমাকে রাখিতে পারি না। এখন যাও, আবার শীঘ্র লইয়া আসিব। দেখ, আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ দেখিয়া হাসিও না।"

মনে মনে বাবার কথার উত্তর দিলাম। বলিলাম, "আমার প্রাণটা বুঝি আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ হইল; তুমি যেন বুঝিতে পারিয়া হাসিও না।"

আমার ছোট বহিন কামিনী বুঝি তা বুঝিতে পারিয়াছিল;—বলিল, "দিদি! আবার আসিবে কবে?" আমি তাহার গলা টিপিয়া ধরিলাম।

কামিনী বলিল, "দিদি, শ্বশুরবাড়ী কেমন, তাহা কিছু জানিস না?"

আমি বলিলাম, “জানি। সে নন্দন-বন, সেখানে রতিপতি পারিজাত ফুলের বাণ মারিয়া লোকের জন্ম সার্থক করে। সেখানে পা দিলেই স্ত্রীজাতি অপ্সরা হয়, পুরুষ ভেড়া হয়। সেখানে নিত্য কোকিল ডাকে, শীতকালে দক্ষিণে বাতাস বয়, অমাবস্যাতেও পূর্ণচন্দ্র উঠে।”
কামিনী হাসিয়া বলিল, “মরণ আর কি!”

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : শ্বশুরবাড়ী চলিলাম

ভগিনীর এই আশীর্ব্বাদ লইয়া আমি শ্বশুরবাড়ী যাইতেছিলাম। আবার শ্বশুরবাড়ী মনোহরপুর। আমার পিত্রালয় মহেশপুর। উভয় গ্রামের মধ্যে দশ ক্রোশ পথ, সুতরাং প্রাতে আহার করিয়া যাত্রা করিয়াছিলাম, পৌঁছিতে পাঁচ সাত দণ্ড রাত্রি হইবে জানিতাম।
তাই চক্ষে একটু একটু জল আসিয়াছিল। রাত্রিতে আমি ভাল করিয়া দেখিতে পাইব না, তিনি কেমন। রাত্রিতে ত তিনি ভাল করিয়া দেখিতে পাইবেন না, আমি কেমন। মা বহু যত্নে চুল বাঁধিয়া দিয়াছিলেন—দশ ক্রোশ পথ যাইতে যাইতে খোঁপা খসিয়া যাইবে, চুল সব স্থানচ্যুত হইয়া যাইবে। পাল্কীর ভিতর ঘামিয়া বিশ্রী হইয়া যাইব। তৃষ্ণায় মুখের তাম্বুলরাগ শুকাইয়া উঠিবে, শ্রান্তিতে শরীর হতশ্রী হইয়া যাইবে। তোমরা হাসিতেছ? আমার মাথার দিব্য হাসিও না, আমি ভরা যৌবনে প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাইতেছিলাম।
পথে কালাদীঘি নামে এক বৃহৎ দীর্ঘিকা আছে। তাহার জল প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ। পাড় পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ। তাহার ভিতর দিয়া পথ চারি পার্শ্বে বটগাছ। তাহার ছায়া শীতল, দীঘির জল নীল মেঘের মত, দৃশ্য অতি মনোহর। তথায় মনুষ্যের সমাগম বিরল। ঘাটের উপরে একখানি দোকান আছে মাত্র। নিকটে যে গ্রাম আছে, তাহারও নাম কালাদীঘি।
এই দীঘিতে লোকে একা আসিতে ভয় করিত। দস্যুতার ভয়ে এখানে দলবদ্ধ না হইয়া লোক আসিত না। এই জন্য লোকে “ডাকাতে কালা দীঘি” বলিত। দোকানদারকে লোকে দস্যুদিগের সহায় বলিত। আমার সে সকল ভয় ছিল না। আমার সঙ্গে অনেক লোক—ষোল জন বাহক, চারি জন দ্বারবান এবং অন্যান্য লোক ছিল।
যখন আমরা এইখানে পৌঁছিলাম, তখন বেলা আড়াই প্রহর। বাহকেরা বলিল যে, “আমরা কিছু জল-টল না খাইলে আর যাইতে পারি না।” দ্বারবানেরা বারণ করিল—বলিল, “এ স্থান ভাল নয়।” বাহকেরা উত্তর করিল, “আমরা এত লোক আছি—আমাদিগের ভয় কি?” আমার সঙ্গের লোকজন ততক্ষণ কেহই কিছুই খায় নাই। শেষে সকলেই বাহকদিগের মতে মত করিল।
দীঘির ঘাটে—বটতলায় আমার পাল্কী নামাইল। আমি হাড়ে জ্বলিয়া গেলাম। কোথায়, কেবল ঠাকুর দেবতার কাছে মানিতেছি, শীঘ্র পৌঁছি—কোথায় বেহারা পাল্কী নামাইয়া হাটু উঁচু করিয়া ময়লা গামছা ঘুরাইয়া বাতাস খাইতে লাগিল! কিন্তু ছি! স্ত্রীজাতি বড় আপনার বুঝে! আমি যাইতেছি কাঁধে, তাহারা কাঁধে আমাকে বহিতেছে; আমি যাইতেছি ভরা যৌবনে স্বামিসন্দর্শনে—তারা যাইতেছে খালি পেটে এক মুঠা ভাতের সন্ধানে; তারা একটু ময়লা গামছা ঘুরাইয়া বাতাস খাইতেছে বলিয়া কি আমার রাগ হইল! ধিক্ ভরা যৌবনে!
এই ভাবিতে ভাবিতে আমি ক্ষণেক পরে অনুভবে বুঝিলাম যে, লোকজন তফাৎ গিয়াছে। আমি তখন সাহস পাইয়া অল্প দ্বার খুলিয়া দীঘি দেখিতে লাগিলাম।

দেখিলাম, বাহকেরা সকলে দোকানের সম্মুখে এক বটবৃক্ষতলে বসিয়া জলপান খাইতেছে। সেই স্থান আমার নিকট হইতে প্রায় দেড় বিঘা। দেখিলাম যে, সম্মুখে অতি নিবিড় মেঘের ন্যায় বিশাল দীর্ঘিকা বিস্তৃত রহিয়াছে, চারি পার্শ্বে পর্ব্বতশ্রেণীবৎ উচ্চ অথচ সুকোমল শ্যামল তৃণাবরণশোভিত "পাহাড়,"—পাহাড় এবং জলের মধ্যে বিস্তৃত ভূমিতে দীর্ঘ বটবৃক্ষশ্রেণী; পাহাড়ে অনেক গোবৎস চরিতেছে—জলের উপর জলচর পক্ষিগণ ক্রীড়া করিতেছে—মৃদু পবনের মৃদু মৃদু তরঙ্গহিল্লোলে স্ফাটিক ভঙ্গ হইতেছে—ক্ষুদ্রোর্ম্মিপ্রতিঘাতে কদাচিৎ জলজ পুষ্পপত্র এবং শৈবাল দুলিতেছে। দেখিতে পাইলাম যে, আমার দ্বারবানেরা জলে নামিয়া স্নান করিতেছে—তাহাদের অঙ্গচালনে তাড়িত হইয়া শ্যামসলিলে শ্বেত মুক্তাহার বিক্ষিপ্ত হইতেছে।

আকাশ পানে চাহিয়া দেখিলাম, কি সুন্দর নীলিমা! কি সুন্দর শ্বেত মেগের স্তরপরম্পরের মূর্ত্তিবৈচিত্র্য—কিবা নভস্থলে উড্ডীন ক্ষুদ্র পক্ষী সকলের নীলিমামধ্যে বিকীর্ণ কৃষ্ণবিন্দুনিচয়তুল্য শোভা! মনে মনে হইল, এমন কোন বিদ্যা নাই কি, যাতে মানুষ পাখী হইতে পারে? পাখী হইতে পারিলে আমি এখনই উড়িয়া চিরবাঞ্ছিতের নিকট পৌঁছিতাম!

আবার সরোবর প্রতি চাহিয়া দেখিলাম—এবার একটু ভীত হইলাম, দেখিলাম যে, বাহকেরা ভিন্ন আমার সঙ্গের লোক সকলেই এককালে স্নানে নামিয়াছে। সঙ্গে দুই জন স্ত্রীলোক—একজন শ্বশুরবাড়ীর, একজন বাপের বাড়ীর, উভয়েই জলে। আমার মনে একটু ভয় হইল—কেহ নিকটে নাই—স্থান মন্দ, ভাল করে নাই। কি করি, আমি কুলবধূ, মুখ ফুটিয়া কাহাকে ডাকিতে পারিলাম না।

এমত সময়ে পাল্কীর অপর পার্শ্বে কি একটা শব্দ হইল। যেন উপরিস্থ বটবৃক্ষের শাখা হইতে কিছু গুরু পদার্থ পড়িল। আমি সে দিকের কপাট অল্প খুলিয়া দেখিলাম। দেখিলাম যে, একজন কৃষ্ণবর্ণ বিকটাকার মনুষ্য! ভয়ে দ্বার বন্ধ করিলাম; কিন্তু তখনই বুঝিলাম যে, এ সময়ে দ্বার খুলিয়া রাখাই ভাল। কিন্তু আমি পুনশ্চ দ্বার খুলিবার পূর্ব্বেই আর একজন মানুষ গাছের উপর হইতে লাফাইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে আর একজন, আবার একজন! এইরূপ চারি জন প্রায় এককালেই গাছ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পাল্কী কাঁধে করিয়া উঠাইল! উঠাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।

দেখিতে পাইয়া আমার দ্বারবানেরা "কোন্ হ্যায় রে!" রব তুলিয়া জল হইতে দৌড়িল।

তখন বুঝিলাম যে, আমি দস্যুহস্তে পড়িয়াছি। তখন আর লজ্জায় কি করে? পাল্কীর উভয় দ্বার মুক্ত করিলাম। আমি লাফাইয়া পড়িয়া পলাইব মনে করিলাম, কিন্তু দেখিলাম যে, আমার সঙ্গের সকল লোক অত্যন্ত কোলাহল করিয়া পাল্কীর পিছনে দৌড়াইল। অতএব ভরসা হইল। কিন্তু শীঘ্রই সে ভরসা দূর হইল। তখন নিকটস্থ অন্যান্য বৃক্ষ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বহুসংখ্যক দস্যু দেখা দিতে লাগিল। আমি বলিয়াছি, জলের ধারে বটবৃক্ষের শ্রেণী। সেই সকল বৃক্ষের নীচে দিয়া দস্যুরা পাল্কী লইয়া যাইতেছিল। সেই সকল বৃক্ষ হইতে মনুষ্য লাফাইয়া পড়িতে লাগিল। তাহাদের কাহারও হাতে বাঁশের লাঠি, কাহারও হাতে গাছের ডাল।

লোকসংখ্যা অধিক দেখিয়া আমার সঙ্গের লোকেরা পিছাইয়া পড়িতে লাগিল। তখন আমি নিতান্ত হতাশ্বাস হইয়া মনে করিলাম, লাফাইয়া পড়ি। কিন্তু বাহকেরা যেরূপ দ্রুতবেগে যাইতেছিল—তাহাতে পাল্কী হইতে নামিলে আঘাতপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিশেষতঃ একজন দস্যু আমাকে লাঠি দেখাইয়া বলিল যে, "নামিবি ত মাথা ভাঙ্গিয়া দিব।" সুতরাং আমি নিরস্ত হইলাম।

আমি দেখিতে লাগিলাম যে, একজন দ্বারবান অগ্রসর হইয়া আসিয়া পাল্কী ধরিল, তখন একজন দস্যু তাহাকে লাঠির আঘাত করিল। সে অচেতন হইয়া মৃত্তিকাতে পড়িল। তাহাতে আর উঠিতে দেখিলাম না। বোধহয়, সে আর উঠিল না।

ইহা দেখিয়া অবশিষ্ট রক্ষিগণ নিরস্ত হইল। বাহকেরা আমাকে নির্ব্বিঘ্নে লইয়া গেল। রাত্রি এক প্রহর পর্য্যন্ত তাহারা এইরূপ বহন করিয়া পরিশেষে পাল্কী নামাইল। দেখিলাম , যেখানে নামাইল, সে স্থান নিবিড় বন—অন্ধকার দস্যুরা একটা মশাল জ্বালিল। তখন আমাকে কহিল, "তোমার যাহা কিছু আছে দাও—নইলে প্রাণে মারিব।" আমার অলঙ্কার বস্ত্রাদি সকল দিলাম—অঙ্গের অলঙ্কারও খুলিয়া দিলাম। কেবল হাতের বালা খুলিয়া দিই নাই—তাহারা কাড়িয়া লইল। তাহারা একখানি মলিন, জীর্ণ বস্ত্র দিল, তাহা পরিয়া পরিধানের বহুমূল্য বস্ত্র ছাড়িয়া দিলাম। দস্যুরা আমার সর্ব্বস্ব লইয়া পাল্কী ভাঙ্গিয়া রূপা খুলিয়া লইল। পরিশেষে অগ্নি জ্বালিয়া ভগ্ন শিবিকা দাহ করিয়া দস্যুতার চিহ্নমাত্র লোপ করিল।

তখন তাহারাও চলিয়া যায়, সেই নিবিড় অরণ্যে অন্ধকার রাত্রিতে আমাকে বন্য পশুদিগের মুখে সমর্পণ করিয়া যায় দেখিয়া আমি কাঁদিয়া উঠিলাম। আমি কহিলাম, "তোমাদের পায়ে পড়ি, আমাকে সঙ্গে লইয়া চল।" দস্যুর সংসর্গও আমার স্পৃহণীয় হইল।

এই প্রাচীন দস্যু সকরুণ ভাবে বলিল, "বাছা, অমন রাঙ্গা মেয়ে আমরা কোথায় লইয়া যাইব? এ ডাকাতির এখনই সোহরৎ হইবে—তোমার মত রাঙ্গা মেয়ে আমাদের সঙ্গে দেখিলেই আমাদের ধরিবে।"

একজন যুবা দস্যু কহিল, "আমি ইহাকে লইয়া ফাটকে যাই, সেও ভাল, তবু ইহাকে ছাড়িতে পারি না।" সে আর যাহা বলিল, তাহা লিখিতে পারি না—এখন মনেও আনিতে পারি না। সেই প্রাচীন দস্যু ঐ দলের সর্দ্দার। যে যুবাকে লাঠি দেখাইয়া কহিল, "এই লাঠির বাড়িতে এইখানেই তোর মাথা ভাঙ্গিয়া রাখিয়া যাইব। ও সকল পাপ কি আমাদের সয়?" তাহারা চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার সুখ

এমনও কি কখনও হয়? এত বিপদ্ এত দুঃখ কাহারও কখনও ঘটিয়াছে ? কোথায় প্রথম স্বামিসন্দর্শনে যাইতেছিলাম—সর্ব্বাঙ্গে রত্নালঙ্কার পরিয়া, কত সাধে চুল বাঁধিয়া, সাধের সাজা পানে অকলুষিত ওষ্ঠাধর রঞ্জিত করিয়া, সুগন্ধে এই কৌমারপ্রফুল্ল দেহ আমোদিত করিয়া এই উনিশ বৎসর লইয়া প্রথম স্বামিসন্দর্শনে যাইতেছিলাম, কি বলিয়া এই অমূল্য রত্ন তাঁহার পাদপদ্মে উপহার দিব, তাই ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছিলাম;—অকস্মাৎ তাহাতে এ কি বজ্রাঘাত! সর্ব্বালঙ্কার কাড়িয়া লইয়াছে—লউক; জীর্ণ মলিন দুর্গন্ধ বস্ত্র পরাইয়াছে—পরাক্; বাঘ—ভালুকের মুখে সমর্পণ করিয়া গিয়াছে,—যাক্; ক্ষুধাতৃষ্ণায় প্রাণ যাইতেছে,— তা যাক্—প্রাণ আর চাহি না, এখন গেলেই ভাল; কিন্তু যদি প্রাণ না যায়, যদি বাঁচি, তবে কোথায় যাইব? আর ত তাঁকে দেখা হইল না—বাপ-মাকেও বুঝি দেখিতে পাইব না! কাঁদিলে ত কান্না ফুরায় না।

তাই কাঁদিব না বলিয়া স্থির করিতেছিলাম। চক্ষুর জল কিছুতেই থামিতেছিল না, তবু চেষ্টা করিতেছিলাম—এমন সময়ে দূরে কি একটা বিকট গর্জ্জন হইল। মনে করিলাম, বাঘ। মনে একটু আহ্লাদ হইল। বাঘে খাইলে সকল জ্বালা জুড়ায়। হাড় গোড় ভাঙ্গিয়া রক্ত শুষিয়া খাইবে, ভাবিলাম, তাও সহ্য করিব; শরীরের কষ্ট বৈ ত না। মরিতে পাইব, সেই পরম সুখ। অতএব কান্না বন্ধ করিয়া, একটু প্রফুল্ল হইয়া, স্থিরভাবে রহিলাম, বাঘের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। পাতার যত বার ঘস্ ঘস্ শব্দ হয়, তত বার মনে করি, ঐ সর্ব্বদুঃখহর প্রাণস্নিগ্ধকর বাঘ আসিতেছে। কিন্ত অনেক রাত্রি হইল, তবুও বাঘ আসিল না। হতাশ হইলাম। তখন মনে হইল—যেখানে বড় ঝোপ—জঙ্গল সেইখানে সাপ থাকিতে পারে। সাপের ঘাড়ে পা দিবার আশায় সেই জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিলাম, তাহার

ভিতরে কত বেড়াইলাম। হায়! মনুষ্য দেখিলে সকলেই পলায়—বনমধ্যে কত সর্, সর্, ঝট্, পট্ শব্দ শুনিলাম, কিন্তু সাপের ত পা পড়িল না; আমার পায়ে অনেক কাঁটা ফুটিল, অনেক বিছুটি লাগিল, কিন্তু কৈ? সাপে ত কামড়াইল না। আবার হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলাম, ক্ষুধা তৃষ্ণায় ক্লান্ত হইয়াছিলাম—আর বেড়াইতে পারিলাম না। একটা পরিস্কার স্থান দেখিয়া বসিলাম। সহসা সম্মুখে এক ভল্লুক উপস্থিত হইল—মনে করিলাম, ভালুকের হাতেই মরিব। ভালুকটাকে তাড়া করিয়া মারিতে গেলাম। কিন্তু হায়! ভালুকটা আমায় কিছু বলিল না। সে গিয়া এক বৃক্ষের উপর উঠিল। বৃক্ষের উপর হইতে কিছু পরে ঝন্ করিয়া সহস্র মক্ষিকার শব্দ হইল। বুঝিলাম, এই বৃক্ষে মৌচাক আছে, ভালুক জানিত; মধু লুটিবার লোভে আমাকে ত্যাগ করিল।
শেষ বাত্রিতে একটু নিদ্রা আসিল—বসিয়া বসিয়া গাছে হেলান দিয়া আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : এখন যাই কোথায় ?

যখন আমার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন কাক কোকিল ডাকিতেছে—বাঁশের পাতার ভিতর দিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা রৌদ্র আসিয়া পৃথিবীকে মণিমুক্তায় সাজাইয়াছে। আলোতে প্রথমেই দেখিলাম, আমার হাতে কিছু নাই, দস্যুরা প্রকোষ্ঠালঙ্কার সকল কাড়িয়া বিধবা সাজাইয়াছে। বাঁ হাতে এক টুক্‌রা লোহা আছে—কিন্তু দাহিন হাতে কিছু নাই। কাঁদিতে কাঁদিতে একটু লতা ছিঁড়িয়া দাহিন হাতে বাঁধিলাম।
তারপর চারি দিক্ দেখিতে দেখিতে, দেখিতে পাইলাম যে, আমি যেখানে বসিয়া ছিলাম, তাহার নিকট অনেকগুলি গাছের ডাল কাটা; কোন গাছ সমূলে ছিন্ন, কেবল শিকড় পড়িয়া আছে। ভাবিলাম, এখানে কাঠুরিয়ারা আসিয়া থাকে। তবে গ্রামে যাইবার পথ আছে। দিবার আলোক দেখিয়া আবার বাঁচিবার ইচ্ছা হইয়াছিল—আবার আশার উদয় হইয়াছিল;—ঊনিশ বৎসর বৈ ত বয়স নয়! সন্ধান করিতে করিতে একটা অতি অস্পষ্ট পথের রেখা দেখিতে পাইলাম। তাই ধরিয়া চলিলাম। যাইতে যাইতে পথের রেখা আরও স্পষ্ট হইল। ভরসা হইল গ্রাম পাইব।
তখন আর এক বিপদ্ মনে ইহল—গ্রামে যাওয়া হইবে না। যে ছেঁড়া মুড়া কাপড়টুকু ডাকাইতেরা আমাকে পরাইয়া দিয়া গিয়াছিল, তাহাতে কোন মতে কোমর হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত ঢাকা পড়ে—আমার বুকে কাপড় নাই। কেমন করিয়া লোকালয়ে কালামুখ দেখাইব? যাওয়া হইবে না— এইখানে মরিতে হইবে। ইহাই স্থির করিলাম।
কিন্তু পৃথিবীকে রবিরশ্মিপ্রভাসিত দেখিয়া, পক্ষিগণের কলকূজন শুনিয়া, লতায় লতায় পুষ্পরাশি দুলিতে দেখিয়া আবার বাঁচিবার ইচ্ছা প্রবল হইল। তখন গাছ হইতে কতকগুলো পাতা ছিঁড়িয়া ছোটা দিয়া গাঁথিয়া, তাহা কোমরে ও গলায় ছোটা দিয়া বাঁধিলাম এক রকম লজ্জা নিবারণ হইল, কিন্তু পাগলের মত দেখাইতে লাগিল। তখন সেই পথ ধরিয়া চলিলাম। যাইতে যাইতে গরুর ডাক শুনিতে পাইলাম। বুঝিলাম, গ্রাম নিকট।
কিন্তু আর ত চলিতে পারি না। কখনও চলা অভ্যাস নাই। তার পর সমস্ত রাত্রি জাগরণ, রাত্রির সেই অসহ্য মানসিক ও শারীরিক কষ্ট; ক্ষুধা তৃষ্ণা। আমি অবসন্ন হইয়া পথিপার্শ্বস্থ এক বৃক্ষতলে শুইয়া পড়িলাম। শুইবা মাত্র নিদ্রাভিভূত হইলাম।
নিদ্রায় স্বপ্ন দেখিলাম যে, মেঘের উপর বসিয়া ইন্দ্রালয়ে শ্বশুরবাড়ী গিয়াছি। স্বয়ং রতিপতি যেন আমার স্বামী—রতিদেবী আমার সপত্নী—পারিজাত লইয়া তাহার সঙ্গে কোন্দল করিতেছি। এমন সময়ে কাহারও স্পর্শে ঘুম ভাঙ্গিল। দেখিলাম, একজন যুবা পুরুষ, দেখিয়া বোধ হইল, ইতর অন্ত্যজ জাতীয়, কুলী

মজুরের মত, আমার হাত ধরিয়া টানিতেছে। সৌভাগ্যক্রমে একখানা কাঠ সেখানে পড়িয়াছিল। তাহা তুলিয়া লইয়া ঘুরাইয়া সেই পাপিষ্ঠের মাথায় মারিলাম। কোথায় জোর পাইলাম জানি না, সে ব্যক্তি মাথায় হাত দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইল।

কাঠখানা আর ফেলিলাম না; তাহার উপর ভর করিয়া চলিলাম। অনেক পথ হাঁটিয়া, একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের সাক্ষাৎ পাইলাম। সে একটা গাই তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছিল।

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, মহেশপুর কোথায়? মনোহরপুরই বা কোথায় ? প্রাচীনা বলিল, "মা, তুমি কে ? অমন সুন্দর মেয়ে কি পথে ঘাটে একা বেরুতে আছে ? আহা মরি, মরি, কি রূপ গা! তুমি আমার ঘরে আইস।" তাহার ঘরে গেলাম। সে আমাকে ক্ষুধাতুরা দেখিয়া গাইটি দুইয়া একটু দুধ খাইতে দিল। সে মহেশপুর চিনিত। তাহাকে আমি বলিলাম যে, তোমাকে টাকা দেওয়াইব—তুমি আমাকে সেখানে রাখিয়া আইস! তাহাতে সে কহিল যে, আমার ঘর সংসার ফেলিয়া যাইব কি প্রকারে? তখন সে যে পথ বলিয়া দিল, আমি সে পথে গেলাম। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পথ হাঁটিলাম—তাহাতে অত্যন্ত শ্রান্তি বোধ হইল। একজন পথিককে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হাঁ গা, মহেশপুর এখান হইতে কত দূর?" সে আমাকে দেখিয়া স্তম্ভিতের মত রহিল। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল, "তুমি কোথঅ হইতে আসিয়াছ ?" যে গ্রামে প্রাচীনা আমাকে পথ বলিয়া দিয়াছিল, আমি সেই গ্রামের নাম করিলাম। তাহাতে পথিক কহিল যে, "তুমি পথ ভুলিয়াছ, বরাবর উল্টা আসিয়াছ। মহেশপুর এখান হইতে একদিনের পথ।"

আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কোথায় যাইবে?" সে বলিল, "আমি এই নিকটে গৌরীগ্রামে যাইব।" আমি অগত্যা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম।

গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিয়া সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখানে কাহার বাড়ী যাইবে?"

আমি কহিলাম, "আমি এখানে কাহাকেও চিনি না। একটা গাছতলায় শয়ন করিয়া থাকিব।"

পথিক কহিল, "তুমি কি জাতি ?"

আমি কহিলাম,"আমি কায়স্থ ?"

সে কহিল, "আমি ব্রাহ্মণ। তুমি আমার সঙ্গে আইস। তোমার ময়লা মোটা কাপড় বটে, কিন্তু তুমি বড় ঘরের মেয়ে। ছোট ঘরে এমন রূপ হয় না।"

ছাই রূপ! ঐ রূপ রূপ শুনিয়া আমি জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছিলাম, কিন্তু এ ব্রাহ্মণ প্রাচীন, আমি তাঁহার সঙ্গে গেলাম।

আমি সে রাত্রে ব্রাহ্মণের গৃহে দুই দিনের পর একটু বিশ্রাম লাভ করিলাম। এই দয়ালু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যাজক, পৌরোহিত্য করেন। আমার বস্ত্রের অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তোমার কাপড়ের এমন দশা কেন? তোমার কাপড় কি কেহ কাড়িয়া লইয়াছে?" আমি বলিলাম, "আজ্ঞা হাঁ।" তিনি যজমানদিগের নিকট অনেক কাপড় পাইতেন—দুইখানা খাটো বহরের চৌড়া রাঙ্গাপেড়ে সাড়ী আমাকে পরিতে দিলেন। শাঁকার কড়ও তাঁর ঘরে ছিল, তাহাও চাহিয়া লইয়া পরিলাম।

এ সকল কার্য্য সমাধা করিলাম—অতি কষ্টে। শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। ব্রাহ্মণ ঠাকুরাণী দুটি ভাত দিলেন—খাইলাম। একটা মাদুর দিলেন, পাতিয়া শুইলাম। কিন্তু এত কষ্টেও ঘুমাইলাম না। আমি যে জন্মের মত গিয়াছি—আমার যে মরাই ভাল ছিল, কেবল তাহাই মনে পড়িতে লাগিল। ঘুম হইল না।

প্রভাতে একটু ঘুম আসিল। আবার একটা স্বপ্ন দেখিলাম। দেখলাম, সম্মুখে অন্ধকারময় যমমূর্ত্তি, বিকট দংষ্ট্রারাশি প্রকটিত করিয়া হাসিতেছে। আর ঘুমাইলাম

না। পরদিন প্রাতে উঠিয়া দেখিলাম যে, আমার অত্যন্ত গা বেদনা হইয়াছে। পা ফুলিয়া উঠিয়াছে, বসিবার শক্তি নাই।

যত দিন না গায়ের বেদনা আরাম হইল, তত দিন আমাকে কাজে কাজেই ব্রাহ্মণের গৃহে থাকিতে হইল। ব্রাহ্মণ ও তাঁহার গৃহিণী আমাকে যত্ন করিয়া রাখিলেন। কিন্তু মহেশপুর যাইবার কোন উপায় দেখিলাম না। কোন স্ত্রীলোকই পথ চিনিত না, অথবা যাইতে স্বীকার করিল না। পুরুষে অনেকেই স্বীকৃত হইল—কিন্তু তাহাদিগের সঙ্গে একাকিনী যাইতে ভয় করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণও নিষেধ করিলেন, বলিলেন, "উহাদিগের চরিত্র ভাল নহে, উহাদিগের সঙ্গে যাইও না। উহাদের কি মতলব বলা যায় না। আমি ভদ্রসন্তান হইয়া তোমার ন্যায় সুন্দরীকে পুরুষের সঙ্গে কোথাও পাঠাইতে পারি না।" সুতরাং আমি নিরস্ত হইলাম।

এক দিন শুনিলাম যে, ঐ গ্রামের কৃষ্ণদাস বসু নামক একজন ভদ্রলোক সপরিবারে কলিকাতায় যাইবেন। শুনিয়া আমি উত্তম সুযোগ বিবেচনা করিলাম। কলিকাতা হইতে আমার পিত্রালয় ও শ্বশুরালয় অনেক দূর বটে, কিন্তু সেখানে আমার জ্ঞাতি খুল্লতাত বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে বাস করিতেন। আমি ভাবিলাম যে, কলিকাতায় গেলে অবশ্য খুল্লতাতের সন্ধান পাইব। তিনি অবশ্য আমাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিবেন। না হয় আমার পিতাকে সংবাদ দিবেন।

আামি এই কথা ব্রাহ্মণকে জানাইলাম। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "এ উত্তম বিবেচনা করিয়াছ। কৃষ্ণদাস বাবু আমার যজমান। সঙ্গে করিয়া লইয়া বলিয়া দিয়া আসিব। তিনি প্রাচীন, আর বড় ভাল মানুষ।"

ব্রাহ্মণ আমাকে বৃষ্ণদাস বাবুর কাছে লইয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, "এটি ভদ্রলোকের কন্যা, বিপাকে পড়িয়া পথ হারাইয়া এ দেশে আসিয়া পড়িয়াছেন। আপনি যদি ইঁহাকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় লইয়া যান, তবে এ অনাথা আপন পিত্রালয়ে পঁহুছিতে পারে।" কৃষ্ণদাস বাবু সম্মত হইলেন। আমি তাঁহার অন্তঃপুরে গেলাম! পরদিন তাঁহার পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গে, বসু মহাশয়ের পরিবার কর্ত্তৃক অনাদৃত হইয়াও কলিকাতায় যাত্রা করিলাম। প্রথম দিন, চারি পাঁচ ক্রোশ হাঁটিয়া গঙ্গাতীরে আসিতে হইল। পরদিন নৌকায় উঠিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : বাজিয়ে যাব মল

আমি গঙ্গা কখনও দেখি নাই। এখন গঙ্গা দেখিয়া, আহ্লাদে প্রাণ ভরিয়া গেল। আমার এত দুঃখ, মুহূর্ত্ত জন্য সব ভুলিলাম। গঙ্গার প্রশস্ত হৃদয়! তাহাতে ছোট ছোট ঢেউ—ছোট ঢেউর উপর রৌদ্রের চিকিমিকি—যত দূর চক্ষু যায়, তত দূর জল জ্বলিতে জ্বলিতে ছুটিয়াছে—তীরে কুঞ্জের মত সাজান বৃক্ষের অনন্ত শ্রেণী; জলে কত রকমের কত নৌক; জলের উপর দাঁড়ের শব্দ, দাঁড়ি মাঝির শব্দ, জলের উপর কোলাহল, তীরে ঘাটে ঘাটে কোলাহল; কত রকমের লোক, কত রকমে স্নান করিতেছে। আবার কোথাও সাদা মেঘের মত অসীম সৈকত ভূমি—তাতে কত প্রকারের পক্ষী কত শব্দ করিতেছে। গঙ্গা যথার্থ পূণ্যময়ী। অতৃপ্ত নয়নে কয় দিন দেখিতে দেখিতে আসিলাম।

যে দিন কলিকাতায় পৌছিব, তাহার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে জোয়ার আসিল। নৌকা আর গেল না। একখানা ভদ্র গ্রামের একটা বাঁধা ঘাটের নিকট আমাদের নৌকা লাগাইয়া রাখিল। কত সুন্দর জিনিস দেকিলাম; জেলেরা মোচার খোলার মত ডিঙ্গীতে মাছ ধরিতেছে, দেখিলাম। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ঘাটের রাণায় বসিয়া শাস্ত্রীয় বিচার করিতেছেন, দেখিলাম। কত সুন্দরী, বেশভূষা করিয়া জল লইতে আসিল। কেহ জল ফেলে, কেহ কলসী পুরে, কেহ আবার ঢালে, আবার পুরে, আর হাসে, গল্প করে, আবার ফেলে, আবার কলসী ভরে। দেখিয়া আমার প্রাচীন গীতটি মনে পড়িল,

একা কাঁকে কুম্ভ করি,　　　　　　কলসীতে জল ভরি,
জলের ভিতরে শ্যামরায়!
কলসীতে দিতে ঢেউ,　　　　　　আর না দেখিলাম কেউ,
পুন কানু জলেতে লুকায়।

সেই দিন সেইখানে দুইটি মেয়ে দেখিয়াছিলাম, তাহাদের কখন ভুলিব না। মেয়ে দুইটির বয়স সাত আট বৎসর। দেখিতে বেশ, তবে পরম সুন্দরীও নয়। কিন্তু সাজিয়াছিল ভাল। কাণে দুল, হাতে আর গলায় একখানা গহনা। ফুল দিয়া খোঁপা বেড়িয়াছে। রঙ্গ্ করা, শিউলীফুলে ছোবান, দুইখানি কালপেড়ে কাপড় পরিয়াছে। পায়ে চারি গাছি করিয়া মল আছে। কাঁকালে ছোট ছোট দুইটি কলসী কাছে। তাহারা ঘাটের রাণায় নামিবার সময়ে জোয়ারের জলের একটা গান গায়িতে গায়িতে নামিল। গানটি মনে আছে, মিষ্ট লাগিয়াছিল, তাই এখানে লিখিলাম। একজন এক পদ গায়, আর একজন দ্বিতীয় পদ গায়। তাহাদের নাম শুনিলাম, অমলা আর নির্ম্মলা। প্রথমে গায়িল—

অমলা

ধানের ক্ষেতে,　　　　　　ঢেউ উঠেছে,
বাঁশ তলাতে জল।
আয় আয় সই,　　　　　　জল আনিগে,
জল আনিগে চল॥

নির্ম্মলা

ঘাটটি জুড়ে,　　　　　　গাছটি বেড়ে,
ফুটল ফুলের দল।
আয় আয় সই,　　　　　　জল আনিগে,
জল আনিগে চল॥

অমলা

বিনোদ বেশে　　　　　　মুচ্‌কে হেসে,
খুলব হাসির কল।
কলসী ধ’রে,　　　　　　গরব ক’রে
বাজিয়ে যাব মল।
আয় আয় সই,　　　　　　জল আনিগে,
জল আনিগে চল॥

নির্ম্মলা

গহনা গায়ে,　　　　　　আল্‌তা পায়ে,
কল্কাদার আঁচল।
টিমে চালে,　　　　　　তালে তালে,
বাজিয়ে যাব মল।

আয় আয় সই, জল আনিগে,
জল আনিগে চল ॥
অমলা
যত ছেলে, খেলা ফেলে,
ফিরচে দলে দল।
কত বুড়ী, জুজুবুড়ী
ধরবে কত জল,
আমরা মুচকে হেসে, বিনোদ বেশে
বাজিয়ে যাব মল!
আমরা বাজিয়ে যাব মল,
সই বাজিয়ে যাব মল ॥
দুই জনে
আয় আয় সই, জল আনিগে,
জল আনিগে চল।

বালিকাসিঞ্চিতরসে, এ জীবন কিছু শীতল হইল। আমি মনোযোগপূর্ব্বক এই গান শুনিতেছি, দেখিয়া বসুজ মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও ছাই গান আবার হাঁ করিয়া শুনচ কেন?" আমি বলিলাম, "ক্ষতি কি?"

বসুজপত্নী। ছুঁড়ীদের মরণ আর কি? মল বাজানর আবার গান!

আমি। ষোল বছরের মেয়ের মুখে ভাল শুনাইত না বটে, সাত বছরের মেয়ের মুখে বেশ শুনায়। জোয়ান মিন্‌সের হাতের চড় চাপড় জিনিস ভাল নহে বটে, কিন্তু তিন বছরের ছেলের হাতের চড় চাপড় বড় মিষ্ট।

বসুজপত্নী আর কিছু না বলিয়া, ভারি হইয়া বসিয়া রহিলেন। আমি ভাবিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, এ প্রভেদ কেন হয়? এক জিনিস দুই রকম লাগে কেন? যে দান দরিদ্রকে দিলে পূণ্য হয়, তাহা বড়মানুষকে দিলে খোষামোদ বলিয়া গণ্য হয় কেন? যে সত্য ধর্ম্মের প্রধান, অবস্থাবিশেষ তাহা আত্মশ্লাঘা বা পরনিন্দা পাপ হয় কেন? যে ক্ষমা পরমধর্ম্ম, দুষ্কৃতকারীর প্রতি প্রযুক্ত হইলে, তাহা মহাপাপ কেন? সত্য সত্যই কেহ স্ত্রীকে বনে দিয়া আসিলে লোকে তাহাকে মহাপাপী বলে; কিন্তু রামচন্দ্র সীতাকে বনে দিয়াছিলেন, তাঁহাকে কেহ মহাপাপী বলে না কেন?

ঠিক করিলাম, অবস্থাভেদে এ সকল হয়। কথাটা আমার মন রহিল। আমি ইহার পর এক দিন যে নির্লজ্জ কাজের কথা বলিব, তাহা এই কথা মনে করিয়াছিলাম। তাই এ গানটা এখানে লিখিলাম।

নৌকাপথে কলিকাতা আসিতে দূর হইতে কলিকাতা দেখিয়া, বিস্মিত ও ভীত হইলাম। অট্টালিকার পর অট্টালিকা, বাড়ীর গায়ে বাড়ী, বাড়ীর পিঠে বাড়ী, তার পিঠে বাড়ী, অট্টালিকার সমুদ্র;—তাহার অন্ত নাই, সংখ্যা নাই, সীমা নাই। জাহাজের মাস্তুলের অরণ্য দেখিয়া জ্ঞান বুদ্ধি বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। নৌকার অসংখ্য,

অনন্ত শ্রেণী দেখিয়া মনে হইল, এত নৌকা মানুষে গড়িল কি প্রকারে ?* নিকটে আসিয়া দেখিলাম, তীরবর্ত্তী রাজপথে গাড়ি পাল্কী পিঁপড়ের সারির মত চলিয়াছে—যাহারা হাঁটিয়া যাইতেছে, তাহাদের সংখ্যার ত কথাই নাই। তখন মনে হইল, ইহার ভিতর খুড়াকে খুঁজিয়া বাহির করিব কি প্রকারে? নদীসৈকতের বালুকারাশির ভিতর হইতে, চেনা বালুকাকণাটি খুঁজিয়া বাহির করিব কি প্রকারে?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : সুবো

কৃষ্ণদাস বাবু কলিকাতায় কালীঘাটে পূজা দিতে আসিয়াছিলেন। ভবানীপুরে বাসা করিলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার খুড়ার বাড়ী কোথায়? কলিকাতায় না ভবানীপুরে ?"

তাহা আমি জানিতাম না।

জিজ্ঞাসা করিলেন, "কলিকাতায় কোন্ জায়গায় তাঁহার বাসা ?"

তাহা আমি কিছুই জানিতাম না—আমি জানিতাম, যেমন মহেশপুর একখানি গণ্ডগ্রাম, কলিকাতা তেমনই একখানি গণ্ডগ্রাম মাত্র। একজন ভদ্রলোকের নাম করিলেই লোকে বলিয়া দিবে। এখন দেখিলাম যে, কলিকাতা অনন্ত অট্টালিকার সমুদ্রবিশেষ। আমার জ্ঞাতি খুড়াকে সন্ধান করিবার কোন উপায় দেখিলাম না। কৃষ্ণদাস বাবু আমার হইয়া অনেক সন্ধান করিলেন, কিন্তু কলিকাতায় একজন সামান্য গ্রাম্য লোকের ওরূপ সন্ধান করিলে কি হইবে ?

কৃষ্ণদাস বাবু কালীর পূজা দিয়া কাশী যাইবেন, কল্পনা ছিল। পূজা দেওয়া হইল, এক্ষণে সপরিবারে কাশী যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। আমি কাঁদিতে লাগিলাম। তাঁহার পত্নী কহিলেন, "তুমি আমার কথা শুন। এখন কাহারও বাড়ীতে দাসীপনা কর। আজ সুবী আসিবার কথা আছে, তাকে বলিয়া দিব, বাড়ীতে তোমায় চাকরাণী রাখিবে।"

আমি শুনিয়া আছড়াইয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলাম। "শেষে কি কপালে দাসীপনা ছিল!" আমার ঠোঁট কাটিয়া রক্ত পড়িতেছিল। কৃষ্ণদাস বাবুর দয়া হইল সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি বলিলেন, "আমি কি করিব?" সে কথা সত্য;—তিনি কি করিবেন? আমার কপাল!

আমি একটা ঘরের ভিতর গিয়া একটা কোণে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার অল্প পূর্ব্বে কৃষ্ণদাস বাবুর গিন্নী আমাকে ডাকিলেন। আমি বাহির হইয়া তাঁহার কাছে গেলাম। তিনি বলিলেন, "এই সুবো এয়েছে। তুমি যদি ওদের বাড়ী ঝি থাক, তবে বলিয়া দিই।"

ঝি থাকিব না, না খাইয়া মরিব, সে কথা ত স্থির করিয়াছি;— কিন্তু এখনকার সে কথা নহে—এখন একবার সুবোকে দেখিয়া লইলাম। "সুবো" শুনিয়া আমি ভাবিয়া রাখিয়াছিলাম যে "সাহেব সুবো" দরের একটা কি জিনিস—আমি তখন পাড়াগেঁয়ে মেয়ে। দেখিলাম, তা নয়—একটি স্ত্রীলোক—দেখিবার মত সামগ্রী। অনেক দিন এমন ভাল সামগ্রী কিছু দেখি নাই। মানুষটি আমারই বয়সী হইবে। রঙ্ আমা অপেক্ষা যে ফরসা তাও নয়। বেশভূষা এমন কিছু নয়, কাণে গোটাকতক মাকড়ি, হাতে বালা, গলায় চীক, একখানা কালপেড়ে কাপড় পরা। তাতেই দেখিবার সামগ্রী। এমন মুখ দেখি নাই। যেন পদ্মটি ফুটিয়া

আছে—চারি দিক্ হইতে সাপের মত কোঁকড়া চুলগুলা ফণা তুলিয়া পদ্মটা ঘেরিয়াছে। খুব বড় বড় চোখ—কখন স্থির, কখন হাসিতেছে। ঠোঁট দুইখানি পাতলা রাঙ্গা টুকটুকে ফুলের পাপড়ির মত উল্টান, মুখখানি ছোট, সবশুদ্ধ যেন একটি ফুটন্ত ফুল। গড়ন পিটন কি রকম, তাহা ধরিতে পারিলাম না। আমগাছের যে ডাল কচিয়া যায়, সে ডাল যেমন বাতাসে খেলে, সেই রকম তাহার সর্ব্বাঙ্গ খেলিতে লাগিল—যেমন নদীতে ঢেউ খেলে, তাহার শরীরে তেমনই কি একটা খেলিতে লাগিল—আমি কিছু ধরিতে পারিলাম না, তার মুখে কি একটা যেন মাখান ছিল, তাহাতে আমাকে যাদু করিয়া ফেলিল। পাঠককে স্মরণ করিয়া দিতে হইবে না যে, আমি পুরুষ মানুষ নহি—মেয়ে মানুষ—নিজেও এক দিন একটু সৌন্দর্য্যগর্ব্বিতা ছিলাম। সুবোর সঙ্গে একটি তিন বছরের ছেলে—সেটিও তেমনি একটি আধফুটন্ত ফুল। উঠিতেছে, পড়িতেছে, বসিতেছে, খেলিতেছে, হেলিতেছে, দুলিতেছে, নাচিতেছে, দৌড়াইতেছে, হাসিতেছে, বকিতেছে, মারিতেছে, সকলকে আদর করিতেছে।

আমি অনিমেষলোচনে সুবোকে ও তার ছেলেকে দেখিতেছি। দেখিয়া, কৃষ্ণদাস বাবুর গৃহিণী চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কথার উত্তর দাওনা যে—ভাব কি?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "উনি কে?"

গৃহিণী ঠাকুরাণী ধমকাইয়া বলিলেন, "তাও কি বলিয়া দিতে হইবে? ও সুবো, আর কে?

তখন সুবো একটু হাসিয়া বলিল, "তা মাসীমা, একটু বলিয়া দিতে হয় বৈ কি ? উনি নূতন লোক, আমায় ত চেনেন না।" এই বলিয়া সুবো আমার মুখপানে চাহিয়া বলিল, "আমার নাম সুভাষিণী গো—ইনি আমার মাসীমা, আমাকে ছেলেবেলা থেকে ওঁরা সুবো বলেন।"

তার পর কথার সূত্রটা গৃহিণী নিজ হস্তে তুলিয়া লইলেন। বলিলেন, "কলিকাতার রামরাম দত্তের ছেলের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছে। তারা বড় মানুষ। ছেলেবেলা থেকে শ্বশুরবাড়ীই থাকে—আমরা কখন দেখিতে পাই না। আমি কালীঘাটে এসেছি শুনেছি শুনে আমাকে একবার দেখা দিতে এসেছে। ওরা বড় মানুষ। বড় মানুষের বাড়ী তুমি কাজকর্ম্ম করিতে পারিবে ত?"

আমি হরমোহন দত্তের মেয়ে, টাকার গদিতে শুইতে চাহিয়াছিলাম—আমি বড় মানুষের বাড়ী কাজ করিতে পারিব ত? আমার চোখে জলও আসিল; মুখে হাসিও আসিল।

তাহা আর কেও দেখিল না—সুভাষিণী দেখিল। গৃহিণীকে বলিল, "আমি একটু আড়ালে সে সকল কথা ওঁকে বলি গে। যদি উনি রাজি হন, তবে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব।" এই বলিয়া সুভাষিণী আমার হাত ধরিয়া টানিয়া একটা ঘরের ভিতর লইয়া গেল। সেখানে কেহ ছিল না। কেবল ছেলেটি মার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইয়া গেল। একখানা তক্তপোষ পাতা ছিল সুভাষিণী তাহাতে বসিল—আমাকে হাত ধরিয়া টানিয়া বসাইল। বলিল, "আমার নাম না জিজ্ঞাসা করিতে বলিয়াছি। তোমার নাম কি ভাই?"

"ভাই!" যদি দাসীপনা করিতে পারি, তবে ইহার কাছে পারি, মনে মনে ইহা ভাবিয়াই উত্তর করিলাম, "আমার দুইটি নাম—একটি চলিত, একটি অপ্রচলিত। যেটি অপ্রচলিত তাহাই ইঁহাদিগকে বলিয়াছি; কাজেই আপনার কাছে এখন তাহাই বলিব। আমার নাম কুমুদিনী।"

ছেলে বলিল, "কুনুডিনী।"

সুভাষিণী বলিল, "আর নাম এখন নাই শুনিলাম, জাতি কায়স্থ বটে ?"

হাসিয়া বলিলাম, "আমরা কায়স্থ"।

সুভাষিণী বলিল, “কার মেয়ে, কার বউ, কোথায় বাড়ী, তাহা এখন জিজ্ঞাসা করিব না। এখন যাহা বলিব, তাহা শুন। তুমি বড় মানুষের মেয়ে, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি—তোমার হাতে গলায়, গহনার কালি আজিও রহিয়াছে। তোমাকে দাসীপনা করিতে বলিব না—তুমি কিছু কিছু রাঁধিতে জান না কি ?”

আমি বলিলাম, “জানি। রান্নায় আমি পিত্রালয়ে যশস্বিনী ছিলাম।”

সুভাষিণী বলিল, “আমাদের বাড়ীতে আমরা সকলেই রাঁধি। (মাঝখান থেকে ছেলে বলিল, “মা, আমি দাঁদি”) তবু, কলিকাতার রেওয়াজমত একটা পাচিকাও আছে। সে মাগীটা বাড়ী যাইবে। (ছেলে বলিল, “ত মা বালী দাই”) এখন মাকে বলিয়া তোমাকে তার জায়গায় রাখাইয়া দিব। তোমাকে রাধুঁনীর মত রাঁধিতে হইবে না। আমরা সকলেই রাঁধিব, তারই সঙ্গে তুমি দুই এক দিন রাঁধিবে। কেমন রাজি ?”

ছেলে বলিল, “আজি ? ও আজি ?”

মা বলিল, “তুই পাজি।”

ছেলে বলিল, “আমি বাবু, বাবা পাজি।”

“অমন কথা বলতে নেই বাবা!” এই কথা ছেলেকে বলিয়া আমার মুখ পানে চাহিয়া হাসিয়া সুভাষিণী বলিল, “নিত্যই বলে।” আমি বলিলাম, “আপনার কাছে আমি দাসীপনা করিতেও রাজি।”

“আপনি কেন বল ভাই? বল ত মাকে বলিও। সেই মাকে লইয়া একটু গোল আছে। তিনি একটু খিট্‌খিটে—তাঁকে বশ করিয়া লইতে হইবে। তা তুমি পারিবে—আমি মানুষ চিনি। কেমন রাজি ?”

আমি বলিলাম, “রাজি না হইয়া কি করি ? আমার আর উপায় নাই।” আমার চক্ষুতে আবার জল আসিল।

সে বলিল, “উপায় নাই কেন ? ওর ভাই, আমি আসল কথা ভুলিয়া গিয়াছি। আমি আসিতেছি।”

সুভাষিণী ভোঁ করিয়া ছুটিয়া মাসীর কাছে গেল—বলিল, “হাঁ গা, ইনি তোমাদের কে গা ?”

ঐটুকু পর্য্যন্ত আমি শুনিতে পাইলাম। তাঁর মাসী কি বলিলেন, তাহা শুনিতে পাইলাম না। বোধ হয়, তিনি যতটুকু জানিতেন, তাহাই বলিলেন। বলা বাহুল্য, তিনি কিছুই জানিতেন না; পুরোহিতের কাছে যতটুকু শুনিয়াছিলেন, ততটুকু পর্য্যন্ত। ছেলেটি এবার মার সঙ্গে যায় নাই—আমার হাত লইয়া খেলা করিতেছিল। আমি তাহার সঙ্গে কথা কহিতেছিলাম। সুভাষিণী ফিরিয়া আসিল।

ছেলে বলিল, “মা, আঙ্গা হাত দেখ্।”

সুভাষিণী হাসিয়া বলিল, “আমি তা অনেকক্ষণ দেখিয়াছি।” আমাকে বলিল, “চল গাড়ি তৈয়ার। না যাও, আমি ধরিয়া লইয়া যাইব। কিন্তু যে কথাটা বলিয়াছি—মাকে বশ করিতে হইবে।”

সুভাষিণী আমাকে টানিয়া লইয়া গিয়া গাড়িতে তুলিল। পুরোহিত মহাশয়ের দেওয়া রাঙ্গাপেড়ে কাপড় দুইখানির মধ্যে একখানি আমি পরিয়াছিলাম—আর একখানি দড়িতে শুকাইতেছিল—তাহা লইয়া যাইতে সময় দিল না। তাহার পরিবর্ত্তে আমি সুভাষিণীর পুত্রকে কোলে লইয়া মুখচুম্বন করিতে করিতে চলিলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : কালির বোতল

মা—সুভাষিণীর শাশুড়ী। তাঁহাকে বশ করিতে হইবে—সুতরাং গিয়াই তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইলাম, তার পর এক নজর দেখিয়া লইলাম, মানুষটা কি রকম। তিনি তখন ছাদের উপর অন্ধকারে, একটা পাটী পাতিয়া, তাকিয়া মাথায় দিয়া শুইয়া পড়িয়া আছেন, একটা ঝি পা টিপিয়া দিতেছে। আমার বোধ হইল, একটা লম্বা কালির বোতল গলায় গলায় কালি ভরা, পাটীর উপর কাত হইয়া পড়িয়া গিয়াছে। পাকা চুলগুলি বোতলটির টিনের ঢাকনির* মত শোভা পাইতেছে। অন্ধকারটা বাড়াইয়া তুলিয়াছে।

আমাকে দেখিয়া গৃহিণী ঠাকুরাণী বধূকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটি কে ?"

বধূ বলিল, "তুমি একটি রাঁধুনী খুঁজিতেছিলে, তাই একে নিয়ে এসেছি।"

গৃহিণী। কোথায় পেল ?

বধূ। মাসীমা দিয়াছেন।

গৃ। বামন না কায়েৎ ?

ব। কায়েৎ।

গৃ। আঃ, তোমার মাসীমার পোড়া কপাল! কায়েতের মেয়ে নিয়ে কি হবে? এক দিন বামনকে ভাত দিতে হলে কি দিব ?

ব। রোজ ত আর বামনকে ভাত দিতে হবে না—যে কয় দিন চলে চলুক—তার পর বামনী পেলে রাখা যাবে—তা বামনের মেয়ের ঠ্যাকার বড়—আমরা তাঁদের রান্নাঘরে গেলে হাঁড়িকুড়ি ফেলিয়া দেন—আবার পাতের প্রসাদ দিতে আসেন! কেন, আমরা কি মুচি ?

আমি মনে মনে সুভাষিণীকে ভূয়সী প্রশংসা করিলাম—কালিভরা লম্বা বোতলটাকে সে মুঠোর ভিতর আনিতে জানে দেখিলাম। গৃহিণী বলিলেন, "তা সত্যি বটে মা—ছোট লোকের এত অহঙ্কার সওয়া যায় না। তা এখন দিন কতক কায়েতের মেয়েই রেখে দেখি। মাইনে কত বলেছে ?"

ব। তা আমার সঙ্গে কোন কথা হয় নাই।

গৃ। হায় রে, কলিকালের মেয়ে! লোক রাখতে নিয়ে এসেছ, তার মাইনের কথা কও নাই ?

আমাকে গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি নেবে তুমি ?"

আমি বলিলাম,"যখন আপনাদের আশ্রয় নিতে এসেছি, তখন যা দিবেন তাই নিব।"

গৃ। তা বামনের মেয়েকে কিছু বেশী দিতে হয় বটে, কিন্তু তুমি কায়েতের মেয়ে—তোমায় তিন টাকা মাসে আর খোরাক পোষাক দিব।

আমার একটু আশ্রয় পাইলেই যথেষ্ট—সুতরাং তাহাতে সম্মত হইলাম। বলা বাহুল্য যে, মাহিয়ানা লইতে হইবে শুনিয়াই প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। আমি বলিলাম, "তাই দিবেন।"

মনে করিলাম, গোল মিটিল—কিন্তু তাহা নহে। লম্বা বোতলটায় কালি অনেক। তিনি বলিলেন, "তোমার বয়স কি গা? অন্ধকারে বয়স ঠাওর পাইতেছি

---

* উটয্রলফণ

না—কিন্তু গলাটা ছেলেমানুষের মত বোধ হইতেছে।”
আমি বলিলাম, “বয়স এই ঊনিশ কুড়ি।”
গৃহিণী। তবে বাছা, অন্যত্র কাজের চেষ্টা দেখ গিয়া যাও। আমি সমত্ত লোক রাখি না।
সুভাষিণী মাঝে হইতে বলিল, “কেন মা, সমত্ত লোক কি কাজ কর্ম্ম পারে না।”
গৃ। দূর বেটী, পাগলের মেয়ে। সমত্ত লোক কি লোক ভাল হয় ?
সু। সে কি মা! দেশশুদ্ধ সব সমত্ত লোক কি মন্দ?
গৃ। তা নাই হলো—তবে ছোট লোক, যারা খেটে খায় তারা কি ভাল ?
এবার কান্না রাখিতে পারিলাম না। কাঁদিয়া উঠিয়া গেলাম। কালির বোতলটা পুত্রবধূকে জিজ্ঞাসা করিল, “ছুঁড়ী চললো না কি ?”
সুভাষিণী বলিল, “বোধ হয়।”
গৃ। তা যাক গে।
সু । কিন্তু গৃহস্থ বাড়ী থেকে না খেয়ে যাবে ? উহাকে কিছু খাওয়াইয়া বিদায় করিতেছি।
এই বলিয়া সুভাষিণী আমার পিছু পিছু উঠিয়া আসিল। আমাকে ধরিয়া আপনার শয়নগৃহে লইয়া গেল। আমি বলিলাম, “আর আমায় ধরিয়া রাখিতেছ কেন ? পেটের দায়ে, কি প্রাণের দায়ে, আমি সব কথা শুনিবার জন্য থাকিতে পারিব না।”
সুভাষিণী বলিল, “থাকিয়া কাজ নাই। কিন্তু আমার অনুরোধে আজিকার রাত্রিটা থাক।”
কোথায় যাইব? কাজেই চক্ষু মুছিয়া সে রাত্রিটা থাকিতে সম্মত হইলাম। এ কথা ও কথার পর সুভাষিণী জিজ্ঞাসা করিল, “এখানে যদি না থাক, তবে যাবে কোথায় ?”
আমি বলিলাম “গঙ্গায়।”
এবার সুভাষিণীও একটু চক্ষু মুছিল। বলিল, “গঙ্গায় যাইতে হইবে না, আমি কি করি তা একটুখানি বসিয়া দেখ। গোলযোগ উপস্থিত করিও না—আমার কথা শুনিও।”
এই বলিয়া সুভাষিণী হারাণী বলিয়া ঝিতে ডাকিল। হারাণী সুভাষিণীর খাস্ ঝি। হারাণী আসিল। মোটা সোটা, কালো কুচ্‌কুচে চল্লিশ পার, হাসি মুখে ধরে না, সকলটাতেই হাসি। একটু তিরবিরে। সুভাষিণী বলিল, “একবার তাঁকে ডেকে পাঠা।”
হারাণী বলল, “এখন অসময়ে আসিবেন কি? আমি ডাকিয়া পাঠাই বা কি করিয়া ?”
সুভাষিণী ভ্রূভঙ্গ করিল, “যেমন করে পারিস্—ডাক গে যা।”
হারাণী হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। আমি সুভাষিণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “ডাকিতে পাঠাইলে কাকে? তোমার স্বামীকে ?”
সু। না ত কি পাড়ার মুদি মিন্‌সেকে এই রাত্রে ডাকিতে পাঠাইব ?
আমি বলিলাম, “বলি, আমায় উঠিয়া যাইতে হইবে কি না, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম।”

সুভাষিণী বলিল, "না। এইখানে বসিয়া থাক।"
সুভাষিণীর স্বামী আসিলেন। বেশ সুন্দর পুরুষ। তিনি আসিয়াই বলিলেন, "তলব কেন ?" তার পর আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "ইনি কে ?"
সুভাষিণী বলিল, "ওঁর জন্যই তোমাকে ডেকেছি। আমাদের রাঁধুনী বাড়ী যাবে, তাই ওঁকে তার জায়গায় রাখিবার জন্য আমি মাসীর কাছ হইতে এনেছি। কিন্তু মা ওঁকে রাখিতে চান না।"
তাঁর স্বামী বলিলেন, "কেন চান না ?"
সু। সমত্ত বয়স।
সুভার স্বামী একটু হাসিলেন। বলিলেন, "তা আমায় কি করিতে হইবে ?"
সু। ওঁকে রাখিয়া দিতে হবে।
স্বামী। কেন ?
সুভাষিণী, তাঁহার নিকট গিয়া, আমি না শুনিতে পাই, এমন স্বরে বলিলেন, "আমার হুকুম।"
কিন্তু আমি শুনিতে পাইলাম। তাঁর স্বামীও তেমনই স্বরে বলিলেন, "যে আজ্ঞা।"
সুভা। কখন পারিবে ?
স্বামী। খাওয়ার সময়।
তিনি গেলে আমি বলিলাম, "উনি যেন রাখাইলেন, কিন্তু এমন কটু কথা সয়ে আমি থাকি কি প্রকারে ?"
সুভাষিণী। সে পরের কথা পরে হবে। গঙ্গা ত আর এক দিন বুজিয়া যাইবে না।
রাত্রি নয়টার সময়, সুভাষিণীর স্বামী। (তাঁর নাম রমণ বাবু) আহার করিতে আসিলেন। তাঁর মা কাছে গিয়া বসিল। সুভাষিণী আমাকে টানিয়া লইয়া চলিল, বলিল, "কি হয় দেখি গে চল।"
আমরা আড়াল হইতে দেখিলাম, নানাবিধ ব্যঞ্জন রান্না হইয়াছে, কিন্তু রমণ বাবু একবার একটু করিয়া মুখে দিলেন, আর সরাইয়া রাখিলেন। কিছুই খাইলেন না। তাঁর মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছুই ত খেলি না বাবা!"
পুত্র বলিল, "ও রান্না ভূত প্রেতে খেতে পারে না। বামন ঠাকুরাণীর রান্না খেয়ে খেয়ে অরুচি জন্মে গেছে। মনে করেছি কাল থেকে পিসীমার বাড়ী গিয়ে খেয়ে আসব।"
তখন গৃহিণী ছোট হয়ে গেলেন। বলিলেন, "তা করতে হবে না, যাদু! আমি আর রাঁধুনী আনাইতেছি।"
বাবু হাত ধুইয়া উঠিয়া গেলেন। দেখিয়া সুভাষিণী বলিল, "আমাদের জন্য ভাই ওঁর খাওয়া হইল না। তা না হোক—কাজটা হইলে হয়।"
আমি অপ্রতিভ হইয়া কি বলিতেছিলাম, এমন সময়ে হারাণী আসিয়া সুভাষিণীকে বলিল, "তোমার শাশুড়ী ডাকিতেছেন।" এই বলিয়া সে খামকা আমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। আমি বুঝিয়াছিলাম, হাসি তাঁর রোগ, সুভাষিণী শাশুড়ীর কাছে গেল, আমি আড়াল হইতে শুনিতে লাগিলাম।
সুভাষিণীর শাশুড়ী বলিতে লাগিল, "সে কায়েৎ ছুঁড়ীটে চ'লে গেছে কি ?"

সুভা। না—তার এখনও খাওয়া হয় নাই বলিয়া, যাইতে দিই নাই।
গৃহিণী বলিলেন, "সে রাঁধে কেমন ?"
সুভা। তা জানি না।
গৃ। আজ না হয় সে নাই গেল। কাল তাকে দিয়া দুই একখানা রাঁধিয়ে দেখিতে হইবে।
সুভা। তবে তাকে রাখি গে।
এই বলিয়া সুভাষিণী আমার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই, তুমি রাঁধিতে জান ত ?"
আমি বলিলাম, "জানি। তা ত বলেছি।"
সুভা। ভাল রাঁধিতে পার ত ?
আমি। কাল খেয়ে দেখে বুঝিতে পারিবে।
সুভা। যদি অভ্যাস না থাকে তবে বল, আমি কাছে বসিয়া শিখিয়ে দিব।
আমি হাসিলাম। বলিলাম, "পরের কথা পরে হবে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ : বিবি পাণ্ডব

পরদিন রাঁধিলাম। সুভাষিণী দেখাইয়া দিতে আসিয়াছিল, আমি ইচ্ছা করিয়া সেই সময়ে লঙ্কা ফোড়ন দিলাম—সে কাশিতে কাশিতে উঠিয়া গেল, বলিল, "মরণ আর কি!"
রান্না হইলে বালকবালিকারা প্রথমে খাইল। সুভাষিণীর ছেলে অন্ন ব্যঞ্জন বড় খায় না, কিন্তু সুভাষিণীর পাঁচ বৎসরের একটি মেয়ে ছিল। সুভাষিণী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন রান্না হয়েছে, হেমা?"
সে বলিল, "বেশ! বেশ গো বেশ!" মেয়েটি বড় শ্লোক করিতে ভালবাসিত, সে আবার বলিল, "বেশ গো বেশ,

রাঁধ বেশ, বাঁধ কেশ,
বকুল ফুলের মালা।
রাঙ্গা সাড়ী, হাতে হাঁড়ী
রাঁধছে গোয়ালার বালা ॥
এমন সময়, বাজল বাঁশী,
কদম্বের তলে।
কাঁদিয়ে ছেলে রান্না ফেলে

রাঁধুনি ছোটে জলে ॥”

মা ধমকাইল, “নে শ্লোক রাখ্।” তখন মেয়ে চুপ করিল।

তার পর রমণ বাবু খাইতে বসিলেন। আড়াল হইতে দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, তিনি সমস্ত ব্যঞ্জনগুলি কুড়াইয়া খাইলেন। গৃহিণীর মুখে হাসি ধরে না।

রমণ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “আজ কে বেঁধেছে মা ?”

গৃহিণী বলিলেন, “একটি নূতন লোক আসিয়াছে।”

রমণ বাবু বলিলেন, “রাঁধে ভাল।” এই বলিয়া তিনি হাত ধুইয়া উঠিয়া গেলেন।

তার পর কর্ত্তা খাইতে বসিলেন। সেখানে আমি যাইতে পারিলাম না—গৃহিণীর আদেশমত বুড়া বামন ঠাকুরাণী কর্ত্তার ভাত লইয়া গেলেন। এখন বুঝিলাম, গৃহিণীর কোথায় ব্যথা কেন তিনি সমর্থবয়স্কা স্ত্রীলোক রাখিতে পারেন না। প্রতিজ্ঞা করিলাম, যতদিন এখানে থাকি, সে দিক্ মাড়াইব না।

আমি সময়ান্তরে লোকজনের কাছে সংবাদ লইয়াছিলাম, কর্ত্তার কেমন চরিত্র। সকলেই জানিত, তিনি অতি ভদ্র লোক—জিতেন্দ্রিয়। তবে কালির বোতলটায় গলায় গলায় কালি।

বামন ঠাকুরাণী ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, “কর্ত্তা রান্না খেয়ে কি বললেন?”

বামনী চটিয়া লাল; চেঁচাইয়া উঠিয়া বলিল, “ও গো, বেশ রেঁধেছ গো, বেশ রেঁধেছ। আমরাও রাঁধতে জানি; তা বুড়ো হলে কি আর দর হয়! এখন রাঁধিতে গেলে রূপ-যৌবন চাই।”

বুঝিলাম, কর্ত্তা খাইয়া ভাল বলিয়াছেন। কিন্তু বামনীকে নিয়া একটু রঙ্গ করিতে সাধ হইল। বলিলাম, “তা রূপ-যৌবন চাই বই কি বামন দিদি!—বুড়ীকে দেখিলে কার খেতে রোচে ?”

দাঁত বাহির করিয়া অতি কর্কশ কণ্ঠে বামনী বলিল, “তোমারই বুঝি রূপ-যৌবন থাকিবে ? মুখে পোকা পড়বে না ?”

এই বলিয়া রাগের মাথায় একটা হাঁড়ি চড়াইতে গিয়া পাচিকা দেবী হাঁড়িটা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। আমি বলিলাম, “দেখিলে, দিদি! রূপযৌবন না থাকিলে হাতের হাঁড়ি ফাটে।”

তখন ব্রাহ্মণী ঠাকুরাণী অর্দ্ধনগ্নাবস্থায় বেড়ী নিয়া আমাকে তাড়া করিয়া মারিতে আসিলেন। বয়োদোষে কাণে একটু খাট, বোধ হয়, আমার সকল কথা শুনিতে পান নাই। বড় কদর্য্য প্রত্যুত্তর করিলেন। আমরাও রঙ্গ চড়িল। আমি বলিলাম, “দিদি থামো। বেড়ী হাতে থাকিলেই ভাল।”

এই সময়ে সুভাষিণী সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। বামনী রাগে তাহাকে দেখিতে পাইল না। আমাকে আবার তাড়াইয়া আসিয়া বলিল, “হারামজাদী! যা মুখে আসে তাই বলিবি! বেড়ী আমার হাতে থাকিবে না ত কি পায়ে দেবে নাকি? আমি পাগল!”

তখন সুভাষিণী ভ্রূভঙ্গ করিয়া তাহাকে বলিল, “আমি লোক এনেছি, তুমি হারামজাদী বলবার কে? তুমি বেরোও আমার বাড়ী থেকে।”

তখন পাচিকা শশব্যস্তে বেড়ী ফেলিয়া দিয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, “ও মা সে কি কথা গো! আমি কখন্ হারামজাদী বল্লেম! এমন কথা আমি কখন মুখেও আনি নে। তোমরা আশ্চর্য্য করিলে মা!”

শুনিয়া সুভাষিণী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বামন ঠাকুরাণী তখন ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন—বলিলেন, “আমি যদি হারামজাদী বলে থাকি, তবে আমি যেন গোল্লায় যাই—”

(আমি বলিলাম, “বালাই! ষাট!”)

“আমি যেন যমের বাড়ী যাই—”

(আমি। সে কি দিদি; এত সকাল সকাল! ছি দিদি! আর দুদিন থাক না।)

“আমার যেন নরকেও ঠাঁই হয় না—”

এবার আমি বলিলাম, “ওটি বলিও না, দিদি! নরকের লোক যদি তোমার রান্না না খেলে, তবে নরক আবার কি?”

বুড়ী কাঁদিয়া সুভাষিণীর কাছে নালিশ করিল, “আমাকে যা মুখে আসিবে, তাই বলিবে, আর তুমি কিছু বলিবে না? আমি চল্লেম গিন্নীর কাছে।”

সুভা। বাছা, তা হলে আমাকেও বলিতে হইবে, তুমি এঁকে হারামজাদী বলেছ।

বুড়ী তখন গালে চড়াইতে আরম্ভ করিল, “আমি কখন্ হারামজাদী বল্লেম! (এক ঘা)—আমি কখন্ হারামজাদী বল্লেম!! (দুই ঘা)—আমি কখন্ হারামজাদী বল্লেম!!! (তিন ঘা)—ইতি সমাপ্ত।

তখন আমরা বড়ীকে কিছু মিষ্ট কথা বলিতে আরম্ভ করিলাম। প্রথমে আমি বলিলাম, “হাঁ গা বৌ ঠাকুরাণ—হারামজাদী বলতে তুমি কখন্ শুনিলে? উনি কখন্ এ কথা বললেন? কই আমি ত শুনি নাই।”

বুড়ী তখন বলিল, “এই শুনিলে বৌ দিদি! আমার মুখে কি অমন সব কথা বেরোয়!”

সুভাষিণী বলিল, “তা হবে—বাহিরে কে কাকে বলিতেছিল, সেই কথাটা আমার কাণে গিয়া থাকিবে। বামুন ঠাকুরাণী কি তেমন লোক! ওঁর রান্না কাল খেয়েছিলে ত? এ কলিকাতার ভিতর অমন কেউ রাঁধিতে পারে না।”

বামনী আমার দিকে চাহিয়া বলিল, “শুনলে গা?”

আমি বলিলাম, “তা ত সবাই বলে। আমি অমন রান্না কখনও খাই নাই।”

বুড়ী এক গাল হাসিয়া বলিল, “তা তোমরা বলবে বৈ কি মা! তোমরা হলে ভাল মানুষের মেয়ে, তোমরা ত রান্না চেন। আহা! এমন মেয়েকে কি আমি গালি দিতে পারি—এ কোন বড় ঘরের মেয়ে। তা তুমি দিদি ভেবো না, তোমাকে রান্না বান্না শিখিয়ে দিয়ে তবে যাব।”

বুড়ীর সঙ্গে এইরূপে আপোষ হইয়া গেল। আমি অনেক দিন ধরিয়া কেবল কাঁদিয়াছিলাম। অনেক দিনের পর আজ হাসিলাম। সে হাসি তামাসা দরিদ্রের নিধির মত, বড় মিষ্ট লাগিয়াছিল। তাই বুড়ীর কথাটা এত সবিস্তারে লিখিলাম। সেই হাসি আমি এ জন্মে ভুলিব না। আর কখন হাসিয়া তেমন সুখ পাইব না।

তার পর গৃহিণী আহারে বসিলেন। বসিয়া থাকিয়া যত্নপূর্ব্বক তাঁহাকে ব্যঞ্জনগুলি খাওয়াইলাম। মাগী গিলিল অনেক। শেষে বলিল, “রাঁধ ভাল ত গা! কোথায় রান্না শিখিলে?”

আমি বলিলাম, “বাপের বাড়ী।”

গৃহি। তোমার বাপের বাড়ী কোথায় গা?

আমি একটা মিছে কথা বলিলাম। গৃহিণী বলিলেন, “এ ত বড় মানুষের ঘরের মত রান্না। তোমার বাপ কি বড় মানুষ ছিলেন ?”
আমি। তা ছিলেন।
গৃহি। তবে তুমি রাঁধিতে এসেছ কেন ?
আমি। দুরবস্থায় পড়িয়াছি।
গৃহি। তা আমার কাছে থাক, বেশ থাকিবে। তুমি বড় মানুষের মেয়ে, আমার ঘরে তেমনই থাকিবে।
পরে সুভাষিণীকে ডাকিয়া বলিলেন, “বৌমা, দেখো গো, এঁকে যেন কেউ কড়া না বলে—আর তুমি ত বলবেই না, তুমি তেমন মানুষের মেয়ে নও।”
সুভাষিণীর ছেলে সেখানে বসিয়াছিল। ছেলে বলিল, “আমি কলা কতা বলব।”
আমি বলিলাম, “বল দেখি!”
সে বলিল, “কলা চাতু (চাটু) হাঁলি—আল্ কি মা ?”
সুভাষিণী বলিল, “আর তোর শাশুড়ী।”
ছেলে বলিল, “কৈ ছাছুলী ?”
সুভাষিণীর মেয়ে আমাকে দেখাইয়া বলিল, “এ তোর শাশুড়ী।”
তখন ছেলে বলিতে লাগিল, “কুনুডিনী ছাছুলী! কুনুডিনী ছাছুলী!”
সুভাষিণী আমার সঙ্গে একটা সম্বন্ধ পাতাইবার জন্য বেড়াইতেছিল। ছেলে-মেয়ের মুখের এই কথা শুনিয়া সে আমাকে বলিল, “তবে আজ হইতে তুমি আমার বেহাইন হইলে।”
তার পর সুভাষিণী খাইতে বসিল। আমি তারও কাছে খাওয়াইতে বসিলাম। খাইতে খাইতে সে জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার কয়টি বিয়ে, বেহান ?”
কথাটা বুঝিলাম। বলিলাম, “কেন, রান্নাটা দ্রৌপদীর মত লাগিল না কি ?”
সুভা। ও ইয়াস্! বিবি পাণ্ডব ফাষ্ট কেলাস বাবর্চি ছিল। এখন আমার শাশুড়ীকে বুঝিতে পারিলে ত?
আমি বলিলাম, “বড় নয়। কাঙ্গালের আর বড় মানুষের মেয়ের সঙ্গে সকলেই একটু প্রভেদ করে।”
সুভাষিণী হাসিয়া উঠিল। বলিল, “মরণ আর কি তোমার! এই বুঝি বুঝিয়াছ? তুমি বড় মানুষের মেয়ে ব’লে বুঝি তোমার আদর করেছেন ?”
আমি বলিলাম, “তবে কি ?”
সুভা। ওঁর ছেলে পেট ভরে খাবে, তাই তোমার এত আদর। এখন যদি তুমি একটু কোট কর, তবে তোমার মাহিনা ডবল হইয়া যায়।
আমি বলিলাম, “আমি মাহিনা চাই না। না লইলে যদি কোন গোলযোগ উপস্থিত হয়, এজন্য হাত পাতিয়া মাহিয়ানা লইব। লইয়া তোমার নিকট রাখিব, তুমি কাঙ্গাল গরীবকে দিও। আমি আশ্রয় পাইয়াছি, এই আমার যথেষ্ট।”

নবম পরিচ্ছেদ : পাকাচুলের সুখ দুঃখ

আমি আশ্রয় পাইলাম। আর একটি অমূল্য রত্ন পাইলাম—একটি হিতৈষিণী সখী। দেখিতে লাগিলাম যে, সুভাষিণী আমাকে আন্তরিক ভালবাসিতে লাগিল—আপনার ভগিনীর সঙ্গে যেমন ব্যবহার করিতে হয়, আমার সঙ্গে তেমনই ব্যবহার করিত। তাঁর শাসনে দাস-দাসীরাও আমাকে অমান্য করিত না। এদিকে রান্নাবান্না সম্বন্ধেও সুখ হইল। সেই বুড়ী ব্রাহ্মণঠাকুরাণী,—তাহার নাম সোণার মা—তিনি বাড়ী গেলেন না। মনে করিলেন, তিনি গেলে আর চাকরিটি পাইবেন না, আমি কায়েমী হইব। তিনি এই ভাবিয়া নানা ছুতা করিয়া বাড়ী গেলেন না। সুভাষিণীর সুপারিসে আমরা দুই জনেই রহিলাম। তিনি শাশুড়ীকে বুঝাইলেন যে, কুমুদিনী ভদ্রলোকের মেয়ে, একা সব রান্না পারিয়া উঠিবে না—আর সোণার মা বুড়া মানুষই বা কোথায় যায়? শাশুড়ী বলিল, "দুই জনকেই কি রাখিতে পারি? এত টাকা যোগায় কে ?"

বধূ বলিল, "তা এক জনকে রাখিতে হলে সোণার মাকে রাখিতে হয়। কুমু এত পারবে না।"

গৃহিণী বলিলেন, "না না। সোণার মার রান্না আমার ছেলে খেতে পারে না। তবে দুই জনই থাক্।"

আমার কষ্টনিবারণ জন্য সুভাষিণী এই কৌশলটুকু করিল। গিন্নী তার হাতে কলের পুতুল; কেন না, সে রমণের বৌ —রমণের বৌর কথা ঠেলে কার সাধ্য? তাতে আবার সুভাষিণীর বুদ্ধি যেমন প্রখরা, স্বভাবও তেমনই সুন্দর। এমন বন্ধু পাইয়া, আমার এ দুঃখের দিনে একটু সুখ হইল।

আমি মাছ মাংস রাঁধি, বা দুই একখানা ভাল ব্যঞ্জন রাঁধি—বাকি সময়টুকু সুভাষিণীর সঙ্গে গল্প করি—তার ছেলে-মেয়ের সঙ্গে গল্প করি; হলো বা স্বয়ং গৃহিণীর সঙ্গে একটু ইয়ারকি করি। কিন্তু শেষ কাজটায় একটা বড় গোলে পড়িয়া গেলাম। গৃহিণীর বিশ্বাস, তাঁর বয়স কাঁচা, কেবল, অদৃষ্টদোষে গাছকতক চুল পাকিয়াছে, তাহা তুলিয়া দিলেই তিনি আবার যুবতী হইতে পারেন। এই জন্য তিনি লোক পাইলেই এবং অবসর পাইলেই পাকা চুল তুলাইতে বসিতেন। এক দিন আমাকে এক কাজে বেগার ধরিলেন। আমি কিছু ক্ষিপ্রহস্ত শীঘ্র শীঘ্রই ভাদ্র মাসের উলু ক্ষেত সাফ করিতেছিলাম। দূর হইতে দেখিতে পাইয়া সুভাষিণী আমাকে অঙ্গুলির ইঙ্গিতে ডাকিল। আমি গৃহিণীর কাছ হইতে ছুটি লইয়া বধূর কাছে গেলাম। সুভাষিণী বলিল, "ও কি কাণ্ড! আমার শাশুড়ীকে নেড়া মুড়া করিয়া দিতেছ কেন?"

আমি বলিলাম, "ও পাপ একদিনে চুকানই ভাল।"

সুভা। তা হলে কি টেঁকতে পারবে ? যাবে কোথায় ?

আমি। আমার হাত থাকে না যে।

সুভা মরণ আর কি! দুই একগাছি তুলে চলে আসতে পার না!

আমি। তোমার শাশুড়ী যে ছাড়ে না।

সুভা। বল গে, যে কই পাকা চুল ত বেশী দেখিতে পাই না—এই ব'লে চ'লে এসো।

আমি হাসিয়া বলিলাম, "এমন দিনেডাকাতি কি করা যায়? লোকে বলবে কি? এ যে আমার কালাদীঘির ডাকাতি।"

সুভা। কালাদীঘির ডাকাতি কি?

সুভাষিণীর সঙ্গে কথা কহিতে আমি একটু আত্মবিস্মৃত হইতাম—হঠাৎ কালাদীঘির কথা অসাবধানে মুখে দিয়া বাহির হইয়াছিল। কথাটা চাপিয়া গেলাম। বলিলাম, “সে গল্প আর একদিন করিব।”

সুভা। আমি যা বলিলাম, তা একবার বলিয়াই দেখ না? আমার অনুরোধে।

হাসিতে হাসিতে আমি গিন্নীর কাছে গিয়া আবার পাকা চুল তুলিতে বসিলাম। দুই চারি গাছা তুলিয়া বলিলাম, “কৈ আর বড় পাকা দেখিতে পাই না। দুই এক গাছা রহিল, কাল তুলে দিব।”

মাগী এক গাল হাসিল। বলিল, “আবার বেটীরা বলে, সব চুলই পাকা।”

সে দিন আমার আদর বাড়িল। কিন্তু যাহাতে দিন দিন বসিয়া বসিয়া পাকা চুল তুলিতে না হয় সে ব্যবস্থা করিব মনে মনে স্থির করিলাম। বেতনের টাকা পাইয়াছিলাম, তাহা হইতে একটা টাকা হারাণীর হাতে দিলাম। বলিলাম, “একটা টাকার এক শিশি কলপ কারও হাত দিয়া কিনিয়া আনিয়া দে।” হারাণী হাসিয়া কুটপাট। হাসি থামিলে বলিল, “কলপ নিয়ে কি করবে গা ? কার চুলে দেবে ?”

আমি। বামন ঠাকুরাণীর।

এবার হারাণী হাসিতে হাসিতে বসিয়া বড়িল। এমন সময়ে বামন ঠাকুরাণী সেখানে আসিয়া পড়িল। তখন সে, হাসি থামাইবার জন্য মুখে কাপড় গুঁজিয়া দিতে লাগিল। কিছুতেই থামাইতে না পারিয়া সেখান হইতে পলাইয়া গেল। বামন ঠাকুরাণী বলিলেন, “ও অত হাসিতেছে কেন ?”

আমি বলিলাম, “ওর অন্য কাজ ত দেখি না। এখন আমি বলিয়াছিলাম, যে, বামন ঠাকুরাণীর চুলে কলপ দিয়া দিলে হয় না? তাই অমন করছিল।”

বামন ঠা। তা অত হাসি কিসের ? দিলেই বা ক্ষতি কি ? শোণের নুড়ি শোণের নুড়ি ব’লে ছেলেগুলা খেপায়, তা সে দায়ে ত বাঁচব!”

সুভাষিণীর মেয়ে হেমা অমনই আরম্ভ করিল,

“চলে বুড়ী, শোণের নূড়ী,
খোঁপায় ঘেঁটু ফুল।
হাতে নড়ি, গলায় দড়ী,
কাণে জোড়া দুল।”

হেমার ভাই বলিল, “জোলা দুম্!” তখন কাহারও উপর জোলা দুম্ পড়িবে আশঙ্কায় সুভাষিণী তাহাকে সরাইয়া লইয়া গেল।

বুঝিলাম, বামনীর কলপে বড় ইচ্ছা। বলিলাম, “আচ্ছা, আমি কলপ দিয়া দিব।”

বামনী বলিল, “আচ্ছা, তাই দিও। তুমি বেঁচে থাক, তোমার সোণার গহনা হোক। তুমি খুব রাঁধতে শেখ।”

হারাণী হাসে, কিন্তু কাজের লোক। শীঘ্র এক শিশি উত্তম কলপ আনিয়া দিল। আমি তাহা হাতে করিয়া গিন্নীর পাকা চুল তুলিতে গেলাম। গিন্নী জিজ্ঞাসা করিলেন, “হাতে কি ও ?”

আমি বলিলাম, “একটা আরক। এটা চুলে মাখাইলে সব পাকা চুল উঠিয়া আসে, কাঁচা চুল থাকে।”

গৃহিণী বলিলেন, “বটে, এমন আশ্চর্য্য আরক ত কখন শুনি নাই। ভাল, মাখাও দেখি। দেখিও কলপ দিও না যেন।”

আমি উত্তর করিয়া তাঁহার চুলে কলপ মাখাইয়া দিলাম। দিয়া, “পাকা চুল আর নাই, “বলিয়া চলিয়া গেলাম। নিয়মিত সময় উত্তীর্ণ হইলে তাঁহার সমস্ত চুলগুলি কাল হইয়া গেল। দুর্ভাগ্যবশতঃ হারাণী ঘরঝাঁট দিতে দিতে তাহা দেখিতে পাইল। তখন সে ঝাঁটা ফেলিয়া দিয়া, মুখে কাপড় গুঁজিয়া হাসিতে হাসিতে সদর-বাড়ী চলিয়া গেল। সেখানে “কি ঝি ? কি ঝি ?” এই রকম একটা গোলযোগ হইলে, সে আবার ভিতর বাড়ীতে আসিয়া মুখে কাপড় গুঁজিতে গুঁজিতে ছাদের উপর চলিয়া গেল। সেখানে সোণার মা চুল শুকাইতেছিল; সে জিজ্ঞাসা করিল, “কি হয়েছে?” হারাণী হাসির জ্বালায় কথা কহিতে পারিল না; কেবল হাত দিয়া মাথা দেখাইতে লাগিল। সোণার মা কিছু বুঝিতে না পারিয়া নীচে আসিয়া দেখিল যে, গৃহিণীর মাথার চুল সব কালো—সে ফুকুরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, “ও মা! এ কি হলো গো! তোমার মাথার সব চুল কালো হয়ে গেছে গো! ওমা কে না জানি তোমায় ওষুধ করিল!”

এমন সময় সুভাষিণী আসিয়া আমাকে পাকড়াইল—হাসিতে হাসিতে বলিল, “পোড়ারমুখী, ও করেছ কি, মার চুলে কলপ দিয়াছ?”

আমি হুঁ!

সুভা। তোমার মুখে আগুন। কি কাণ্ডখানা হয় দেখ!

আমি। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

এমন সময়ে গৃহিণী স্বয়ং আমাকে তলব করিলেন। বলিলেন, “হাঁ গা কুমো! তুমি কি আমার মাথায় কলপ দিয়াছ ?”

দেখিলাম, গৃহিণীর মুখখানা বেশ প্রসন্ন। আমি বলিলাম, “অমন কথা কে বল্লে মা!”

গৃ। এই যে সোণার মা বলছে!

আমি। সোণার মার কি? ও কলপ নয় মা, আমার ওষুধ।

গৃ। তা বেশ ওষুধ বাছা। আরসি একখানা আন দেখি।

একখানা আরসি আনিয়া দিলাম। দেখিয়া গৃহিণী বলিলেন, “ও মা, সব চুল কালো হয়ে গেছে! আঃ, আবাগের বেটী, লোকে এখনই বলবে কলপ দিয়েছে।”

গৃহিণীর মুখে হাসি ধরে না। সে দিন সন্ধ্যার পর আমার রান্নার সুখ্যাতি করিয়া আমার বেতন বাড়াইয়া দিলেন। আর বলিলেন, “বাছা! কেবল কাচের চুড়ি হাতে দিয়া বেড়াও, দেখিয়া কষ্ট হয়।” এই বলিয়া তিনি নিজের বহুকালপরিত্যক্ত এক জোড়া সোণার বালা আমায় বখশিস করিলেন। লইতে, আমার মাথা কাটা গেল—চোখের জল সামলাইতে পারিলাম না। কাজেই “লইব না” কথাটা বলিবার অবসর পাইলাম না।

একটু অবসর পাইয়া বুড়া বামন ঠাকুরাণী আমাকে ধরিল। বলিল, “ভাই, আর সে ওষুধ নেই কি ?”

আমি। কোন্ ওষুধ? বামনীকে তার স্বামী বশ করবার জন্যে যা দিয়েছিলেন?

বামনী। দূর হ! একেই বলে ছেলে বুদ্ধি। আমার কি সে সামগ্রী আছে ?

আমি। নেই? সে কি গো? একটাও না ?

বামনী। তোদের বুঝি পাঁচটা করে থাকে ?

আমি। ত নইলে আর অমন রাঁধি ? দ্রৌপদী না হ'লে ভাল রাঁধা যায়! গোটা পাঁচেক যোটাও না, রান্না খেয়ে লোকে অজ্ঞান হবে।

বামনী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। বলিল, “একটাই যোটে না ভাই—তার আবার পাঁচটা! মুসলমানের হয়, যত দোষ হিন্দুর মেয়ের! আর হবেই বা কিসে? এই ত

শোণের নুড়ী চল! তাই বলছিলাম, বলি সে ওষুধটা আর আছে, যাতে চুল কালো হয় ?”
আমি। তাই বল! আছে বৈ কি।
আমি তখন কলপের শিশি বামন ঠাকুরাণীকে দিয়া গেলাম। ব্রাহ্মণ ঠাকুরাণী, রাত্রিতে জলযোগান্তে শয়নকালে, অন্ধকারে, তাহা চুলে মাখাইয়াছিলেন; কতক চুলে লাগিয়াছিল, কতক চুলে লাগে নাই, কতক বা মুখে চোখে লাগিয়াছিল। সকাল বেলা যখন তিনি দর্শন দিলেন, তখন চুলগুলো পাঁচরঙ্গা বেড়ালের লোমের মত, কিছু সাদা, কিছু রাঙ্গা, কিছু কালো; আর মুখখানি কতক মুখপোড়া বাঁদরের মত, কতক মেনি বেড়ালেন মত। দেখিবা মাত্র পৌরবর্গ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। সে হাসি আর থামে না। যে যখন পাচিকাকে দেখে, সে তখনই হাসিয়া উঠে। হারাণী হাসিতে হাসিতে বেদম হইয়া সুভাষিণীর পায়ে আছড়াইয়া পড়িয়া, হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, “বৌঠাকুরাণী, আমাকে জবাব দাও, আমি এমন হাসির বাড়ীতে থাকিতে পারিব না—কোন্ দিন দম বন্ধ হইয়া মরিয়া যাইব।”
সুভাষিণীর মেয়েও বুড়ীকে জ্বালাইল, বলিল, “বুড়ি পিসী—সাজ সাজালে কে ?

যম বলেছে, সোণার চাঁদ
এস আমার ঘরে।
তাই ঘাটের সজ্জা সাজিয়ে দিলে
সিঁদুরে গোবরে।”

একদিন একটা বিড়াল হাঁড়ি হইতে মাছ খাইয়াছিল, তাহার মুখে কালি ঝুলি লাগিয়াছিল। সুভাষিণীর ছেলে তাহা দেখিয়াছিল। সে বুড়ীকে দেখিয়া বলিল, “মা! বুলি পিচী হাঁলি কেয়েসে।”
অথচ বামন ঠাকুরাণীর কাছে, আমার ইঙ্গিতমত, কথাটা কেহ ভাঙ্গিল না। তিনি অকাতরে সেই বানরমার্জ্জারবিমিশ্র কান্তি সকলের সম্মুখে বিকশিত করিতে লাগিলেন। হাসি দেখিয়া তিনি সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, “তোমরা কেন হাসচ গা ?”
সকলেই আমার ইঙ্গিতমত বলিল, “ঐ ছেলে কি বলছে শুনচো না? বলে, বুলী পিচী হাঁলি কেয়েসে। কাল রাতে কে তোমার হাঁড়িশালে হাঁড়ি খেয়ে গিয়েছে, তাই সবাই বলাবলি করচে, বলি সোণার মা কি বুড়া বয়সে এমন কাজ করবে ?”
বুড়ী তখন গালির ছড়া আরম্ভ করিল—“সর্ব্বনাশীরা! শতেকক্ষোয়ারীরা! আবাগীরা!”—ইত্যাদি ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক তাহাদিগকে এবং তাহাদিগের স্বামী পুত্রকে গ্রহণ করিবার জন্য যমকে অনেক বার তিনি আমন্ত্রণ করিলেন—কিন্তু যমরাজ সে বিষয়ে আপাততঃ কেন আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। ঠাকুরাণীর চেহারাখানা সেই রকম রহিল। তিনি সেই অবস্থায় রমণ বাবুকে অন্ন দিতে গেলেন। রমণ বাবু দেখিয়া হাসি চাপিতে গিয়া বিষম খাইলেন, আর তাঁহার খাওয়া হইল না। শুনিলাম, রামরাম দত্তকে অন্ন দিতে গেলে কর্ত্তা মহাশয় তাঁহাকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন।
শেষ দয়া করিয়া সুভাষিণী বুড়ীকে বলিয়া দিল, “আমার ঘরে বড় আয়না আছে। মুখ দেখ গিয়া।”
বুড়ী গিয়া মুখ দেখিল। তখন সে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল এবং আমাকে গালি পাড়িতে লাগিল। আমি বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে, আমি চুলে মাখাইতে বলিয়াছিলাম, মুখে মাখাইতে বলি নাই। বুড়ী তাহা বুঝিল না। আমার মুণ্ডভোজনের জন্য যম পুনঃ পুনঃ নিমন্ত্রিত হইতে লাগিলেন। শুনিয়া সুভাষিণীর মেয়ে

শ্লোক পড়িল—

“যে ডাকে যমে।
তার পরমাই কমে।
তার মুখে পড়ুক ছাই।
বুড়ী মরে যা না ভাই।”

শেষে আমার সেই তিন বৎসর বয়সের জামাতা, একখানা রাঁধিবার চেলা কাঠ লইয়া গিয়া বুড়ীর পিঠে বসাইয়া দিল। বলিল, “আমাল্ চাচুলী।” তখন বুড়ী আছাড়িয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। সে যত কাঁদে আমার জামাই তত হাততালি দিয়া নাচে, আর বলে, “আমাল্ চাচুলী, আমাল্ চাচুলী!” আমি গিয়া তাকে কোলে নিয়া, তার মুখচুম্বন করিলে তবে থামিল।

দশম পরিচ্ছেদ : আশার প্রদীপ

সেই দিন বৈকালে সুভাষিণী আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া নিভৃতে বসাইল। বলিল, “বেহান! তুমি সেই কালাদীঘির ডাকাতির গল্পটি বলিবে বলিয়াছিলে—আজিও বল নাই। আজ বল না— শুনি।”

আমি অনেকক্ষণ ভাবিলাম। শেষে বলিলাম, “সে আমারই হতভাগ্যের কথা! আমার বাপ বড় মানুষ, এ কথা বলিয়াছি। তোমার শ্বশুরও বড় মানুষ—কিন্তু তাঁহার তুলনায় কিছুই নহেন। আমার বাপ আজিও আছেন—তাঁহার সেই অতুল ঐশ্বর্য্য এখনও আছে, আজিও তাঁহার হাতীশালে হাতী বাঁধা। আমি যে রাঁধিয়া খাইতেছি, কালাদীঘির ডাকাতিই তাহার কারণ।”

এই পর্য্যন্ত বলিয়া দুই জনেই চুপ করিয়া রহিলাম। সুভাষিণী বলিল, “তোমার যদি বলিতে কষ্ট হয়, তবে নাই বলিলে। আমি না জানিয়াই শুনিতে চাহিয়াছিলাম।”

আমি বলিলাম, “সমস্তই বলিব। তুমি আমাকে যে স্নেহ কর, আমার যে উপকার করিয়াছ, তাহাতে তোমাকে বলিতে কোন কষ্ট নাই।”

আমি বাপের নাম বলিলাম না, বাপের বাড়ীর গ্রামের নাম বলিলাম না। স্বামীর বা শ্বশুরের নাম বলিলাম না। শ্বশুরবাড়ীর গ্রামের নাম বলিলাম না। আর সমস্ত বলিলাম, সুভাষিণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া পর্য্যন্ত বলিলাম। শুনিতে শুনিতে সুভাষিণী কাঁদিতে লাগিল। আমিও যে বলিতে বলিতে মধ্যে কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলাম, তাহা বলা বাহুল্য।

সে দিন এই পর্য্যন্ত। পরদিন সুভাষিণী আমাকে আবার নিভৃতে লইয়া গেল। বলিল, “বাপের নাম বলিতে হইবে।”

তাহা বলিলাম।

“তাঁর বাড়ী যে গ্রামে, তাহাও বলিতে হইবে।” তাও বলিলাম।

সু। ডাকঘরের নাম বল।

আ। ডাকঘর! ডাকঘরের নাম ডাকঘর।

সু। দূর পোড়ামুখী! যে গ্রামে ডাকঘর, তার নাম।

আমি। তা ত জানি না। ডাকঘরই জানি।

সু। বলি, যে গ্রামে তোমাদের বাড়ী, সেই গ্রামেই ডাকঘর আছে, না অন্য গ্রামে?

আমি। তা ত জানি না।

সুভাষিণী বিষণ্ন হইল। আর কিছু বিলল না। পরদিন সেইরূপ নিভৃতে বলিল, "তুমি বড় ঘরের মেয়ে, কত কাল আর রাঁধিয়া খাইবে? তুমি গেলে বড় কাঁদিব—কিন্তু আমার সুখের জন্য তোমার সুখের ক্ষতি করি, এমন পাপিষ্ঠা আমি নই। তাই আমরা পরামর্শ করিয়াছি—"

কথা শেষ না হইতে হইতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমরা কে কে?"

সু। আমি আর র—বাবু।

র-বাবু কি না রমণ বাবু। এইরূপে সুভাষিণী আমার স্বামীর নাম ধরিত। তখন সে বলিতে লাগিল, "পরামর্শ করিয়াছি যে, তোমার বাপকে পত্র লিখিব যে, তুমি এইখানে আছ, তাই কাল, ডাকঘরের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম।"

আমি। তবে সকল কথা তাঁহাকে বলিয়াছ?

সু। বলিয়াছি—দোষ কি?

আমি। দোষ কিছু না। তার পর?

সু। এখন মহেশপুরেই ডাকঘর আছে, বিবেচনা করিয়া পত্র লেখা হইল।

আমি। পত্র লেখা হইয়াছে না কি?

সু। হাঁ।

আমি আহ্লাদে আটখানা হইলাম। দিন গণিতে লাগিলাম, কত দিনে পত্রের উত্তর আসিবে। কিন্তু কোন উত্তর আসিল না। আমার কপাল পোড়া—মহেশপুরে কোন ডাকঘর ছিল না। তখন গ্রামে গ্রামে ডাকঘর হয় নাই। ভিন্ন গ্রামে ডাকঘর ছিল—আমি রাজার দুলালী—অত খবর রাখিতাম না। ডাকঘরের ঠিকানা না পাইয়া, কলিকাতার বড় ডাকঘরে রমণ বাবুর চিঠি খুলিয়া ফেরত পাঠাইয়া দিয়াছিল।

আমি আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু র-বাবু—নাছোড়। সুভাষিণী আসিয়া আমাকে বলিল, "এখন স্বামীর নাম বলিতে হইবে।"

আমি তখন লিখিতে শিখিয়াছিলাম। স্বামীর নাম লিখিয়া দিলাম। পরে জিজ্ঞাসা হইল, "শ্বশুরের নাম?"

তাও লিখিলাম।

"গ্রামের নাম?"

তাও বলিয়া দিলাম।

"ডাকঘরের নাম?"

বলিলাম, "তা কি জানি?"

শুনিলাম, রমণ বাবু সেখানেও পত্র লিখিলেন। কিন্তু কোন উত্তর আসিল না। বড় বিষণ্ন হইলাম। কিন্তু একটা কথা তখন মনে পড়িল, আমি আশায় বিহ্বল হইয়া পত্র লিখিতে বারণ করি নাই। এখন মনে পড়িল, ডাকাতে আমাকে কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে; আমার কি জাতি আছে? এই ভাবিয়া শ্বশুর স্বামী আমাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন সন্দেহ নাই। সে স্থলে, পত্র লেখা ভাল হয় নাই। এ কথা শুনিয়া সুভাষিণী চুপ করিয়া রহিল।
আমি এখন বুঝিলাম যে, আমার আর ভরসা নাই। আমি শয্যা লইলাম।

একাদশ পরিচ্ছেদ : একটা চোরা চাহনি

এক দিবস প্রাতে উঠিয়া দেখিলাম, কিছু ঘটার আয়োজন। রমণ বাবু উকীল। তাঁহার একজন বড় মোয়াক্কেল ছিল। দুই দিন ধরিয়া শুনিতেছিলাম, তিনি কলিকাতায় আসিয়াছেন। রমণ বাবু ও তাঁহার পিতা সর্ব্বদা তাঁহার বাড়ীতে যাতায়াত করিতেছিলেন। তাঁহার পিতা যাতায়াত করিয়াছিলেন, তাহার কারণ এই যে, তাঁহার সহিত কারবার—ঘটিত কিছু সম্বন্ধ ছিল। আজ শুনিলাম, তাঁহাকে মধ্যাহ্নে আহারের নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। তাই পাকশাকের কিছু বিশেষ আয়োজন হইতেছে।
রান্না ভাল চাই—অতএব পাকের ভারটা আমার উপর পড়িল। যত্ন করিয়া পাক করিলাম। আহারের স্থান অন্তঃপুরেই হইল। রামরাম বাবু, রমণ বাবু, ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তি আহারে বসিলেন। পরিবেশনের ভার বুড়ীর উপর—আমি বাহিরের লোককে কখন পরিবেশন করি না।
বুড়ী পরিবেশন করিতেছে—আমি রান্নাঘরে আছি—এমন সময়ে একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল। রমণ বাবু বুড়ীকে বড় ধমকাইতেছিলেন। সেই সময়ে এক জন রান্নাঘরের ঝি আসিয়া বলিল, "ইচ্ছে ক'রে লোককে অপ্রতিভ করা।"
জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হয়েছে ?"
ঝি বলিল, "বুড়ী দাদা বাবুর বাটিতে (বুড়া ঝি, দাদাবাবু বলিত)—বাটিতে ডাল দিতেছিল—তিনি তা দেখেও উঁহু! উঁহু! ক'রে হাত বাড়িয়ে দিলেন—সব ডাল হাতে পড়িয়া গেল।"
আমি এদিকে শুনিতেছিলাম, রমণ বাবু বামনীকে ধমকাইতেছিলেন, "পরিবেশন করতে জান না ত এসো কেন? আর কাকেও থাল দিতে পার নি?
রামরাম বাবু বলিলেন, "তোমার কর্ম্ম নয়! কুমোকে পাঠাইয়া দাও গিয়া।"
গৃহিণী সেখানে নাই, বারণ করে কে ? এদিকে খোদ কর্ত্তার হুকুম—অমান্যই বা করি কি প্রকারে ? গেলেই গিন্নী বড় রাগ করিবেন, তাও জানি। দুই চারি বার বুড়ীকে বুঝাইলাম—বলিলাম, "একটু সাবধান হ'য়ে দিও থুইও;—কিন্তু সে ভয়ে আর যাইতে স্বীকৃত হইল না। কাজেই, আমি হাত ধুইয়া, মুখ মুছিয়া, পরিষ্কার হইয়া, কাপড়খানা গুছাইয়া পরিয়া, একটু ঘোমটা টানিয়া পরিবেশন করিতে গেলাম। কে জানে যে এমন কাণ্ড বাধিবে ? আমি জানি যে, আমি বড় বুদ্ধিমতী—জানিতাম না যে, সুভাষিণী আমার এক হাটে বেচিতে পারে, আর এক হাটে কিনিতে পারে।
আমি অবগুণ্ঠনবতী, কিন্তু ঘোমটায় স্ত্রীলোকের স্বভাব ঢাকা পড়ে না। ঘোমটার ভিতর হইতে একবার নিমন্ত্রিত বাবুটিকে দেখিয়া লইলাম।
দেখিলাম, তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর বোধ হয়; তিনি গৌরবর্ণ এবং অত্যন্ত সুপুরুষ; তাঁহাকে দেখিয়াই রমণীমনোহর বলিয়া বোধ হইল। আমি বিদ্যুচ্চমকিতের

ন্যায় একটু অন্যমনস্ক হইলাম। মাংসের পাত্র লইয়া একটু দাঁড়াইয়া রহিলাম, আমি ঘোমটার ভিতর হইতে তাঁহাকে দেখিতেছিলাম, এমত সময়ে তিনি মুখ তুলিলেন—দেখিতে পাইলেন যে, আমি ঘোমটার ভিতর হইতে তাঁহার প্রতি চাহিয়া আছি। আমি ত জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি কোন প্রকার কুটিল কটাক্ষ করি নাই। তত পাপ এ হৃদয়ে ছিল না। তবে সাপও বুঝি, জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছা করিয়া ফণা ধরে না; ফণা ধরিবার সময় উপস্থিত হইলেই ফণা আপনি ফাঁপিয়া উঠে। সাপেরও পাপহৃদয় না হইতে পারে। বুঝি সেইরূপ কিছু ঘটিয়া থাকিবে। বুঝি তিনি একটা কুটিল কটাক্ষ দেখিয়া থাকিবেন। পুরুষ বলিয়া থাকেন যে, অন্ধকারে প্রদীপের মত, অবগুণ্ঠনমধ্যে রমণীর কটাক্ষ তীব্র দেখায়। বোধ হয়, ইনিও সেইরূপ দেখিয়া থাকিবেন। তিনি একটু মাত্র মৃদু হাসিয়া, মুখ নত করিলেন। সে হাসি কেবল আমিই দেখিতে পাইলাম। আমি সমুদয় মাংস তাঁহার পাতে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া আসিলাম।

আমি একটু লজ্জিতা, একটু অসুখী হইলাম। আমি সধবা হইয়াও জন্মবিধবা। বিবাহের সময়ে একবার মাত্র স্বামিদর্শন হইয়াছিল—সুতরাং যৌবনের প্রবৃত্তি সকল অপরিতৃপ্ত ছিল। এমন গভীর জলে ক্ষেপণীনিক্ষেপে বুঝি তরঙ্গ উঠিল ভাবিয়া বড় অপ্রফুল্ল হইলাম। মনে মনে নারীজন্মে সহস্র ধিক্কার দিলাম; মনে মনে আপনাকে সহস্র ধিক্কার দিলাম; মনের ভিতর মরিয়া গেলাম।

পাকশালায় ফিরিয়া আসিয়া আমার যেন মনে হইল, আমি ইঁহাকে পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছি। সন্দেহভঞ্জনার্থ আবার অন্তরাল হইতে ইঁহাকে দেখিতে গেলাম। বিশেষ করিয়া দেখিলাম। দেখিয়া মনে মনে বলিলাম, “চিনিয়াছি।”

এমন সময়ে রামরাম বাবু, আবার অন্যান্য খাদ্য লইয়া যাইতে ডাকিয়া বলিলেন। অনেক প্রকার মাংস পাক করিয়াছিলাম—লইয়া গেলাম। দেখিলাম, ইনি সেই কটাক্ষটি মনে করিয়া রাখিয়াছেন। রামরাম দত্তকে বলিলেন, “রামরাম বাবু, আপনার পাচিকাকে বলুন যে, পাক অতি পরিপাটি হইয়াছে।”

রামরাম ভিতরের কথা কিছু বুঝিলেন না, বলিলেন, “হাঁ, উনি রাঁধেন ভাল।”

আমি মনে মনে বলিলাম, “তোমার মাথামুণ্ড রাঁধি।”

নিমন্ত্রিত বাবু কহিলেন, “কিন্তু এ বড় আশ্চর্য্য যে, আপনার বাড়ীতে দুই একখানা ব্যঞ্জন আমাদের দেশের মত পাক হইয়াছে।”

আমি মনে মনে ভাবিলাম, “চিনিয়াছি।” বস্তুতঃ দুই একখানা ব্যঞ্জন আমাদের নিজদেশের প্রথামত পাক করিয়াছিলাম।

রামরাম বলিলেন, “তা হবে, ওঁর বাড়ী এ দেশে নয়।”

ইতি এবার যো পাইলেন, একবারে আমার মুখ পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, “তোমাদের বাড়ী কোথায় গা ?”

আমার প্রথম সমস্যা, কথা কই কি না কই। স্থির করিলাম, কথা কহিব।

দ্বিতীয় সমস্যা, সত্য বলিব, না মিথ্যা বলিব। স্থির করিলাম, মিথ্যা বলিব। কেন এরূপ স্থির করিলাম, তাহা যিনি স্ত্রীলোকের হৃদয়কে চাতুর্য্যপ্রিয়, বক্রপথগামী করিয়াছেন, তিনিই জানেন। আমি ভাবিলাম, আবশ্যক হয়, সত্য কথা বলা আমার হাতেই রহিল, এখন আর একটা কথা বলিয়া দেখি। এই ভাবিয়া আমি উত্তর করিলাম, “আমাদের বাড়ী কালদীঘি।”

তিনি চমকিয়া উঠিলেন। ক্ষণেক পরে মৃদুস্বরে কহিলেন, “কোন্ কালাদীঘি, ডাকাতে কালাদীঘি?”

আমি বলিলাম, “হাঁ।”

তিনি আর কিছু বলিলেন না।

আমি মাংসপাত্র হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। দাঁড়াইয়া থাকা আমার যে অকর্ত্তব্য, তাহা আমি ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। এইমাত্র যে আপনাকে সহস্র ধিক্কার দিয়াছিলাম, তাহা ভুলিয়া গেলাম। দেখিলাম যে, তিনি আর ভাল করিয়া আহার করিতেছেন না। তাহা দেখিয়া রামরাম দত্ত বলিলেন, "উপেন্দ্র বাবু, আহার করুন না।" ঐটি শুনিবার আমার বাকি ছিল। উপেন্দ্র বাবু! আমি নাম শুনিবার আগেই চিনিয়াছিলাম, ইনি আমার স্বামী।
আমি পাকশালায় গিয়া পাত্র ফেলিয়া একবার অনেক কালের পর আহ্লাদ করিতে বসিলাম। রামরাম দত্ত বলিলেন, "কি পড়িল?" আমি মাংসের পাত্রখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিলাম।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : হারাণীর হাসিবন্ধ

এখন হইতে এই ইতিবৃত্তমধ্যে পাঁচ শত বার আমার স্বামীর নাম করা আবশ্যক হইবে। এখন তোমরা পাঁচ জন রসিকা মেয়ে একত্র কমিটীতে বসিয়া পরামর্শ করিয়া বলিয়া দাও, আমি কোন্ শব্দ ব্যবহার করিয়া তাঁহার নাম করিব? পাঁচ শত বার "স্বামী" "স্বামী" করিয়া কাণ জ্বালাইয়া দিব ? না জামাই বারিকের দৃষ্টান্তানুসারে, স্বামীকে "উপেন্দ্র" বলিতে আরম্ভ করিব ? না, "প্রাণনাথ" "প্রাণকান্ত" "প্রাণেশ্বর" "প্রাণপতি" এবং "প্রাণাধিকে"র ছড়াছড়ি করিব? যিনি আমাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় সম্বোধনের পাত্র, যাঁহাকে পলকে পলকে ডাকিতে ইচ্ছা করে, তাঁহাকে যে কি বলিয়া ডাকিব, এমন কথা পোড়া দেশের ভাষায় নাই। আমার এক সখী, (দাসদাসীগণের অনুকরণ করিয়া) স্বামীকে "বাবু" বলিয়া ডাকিত—কিন্তু শুধু বাবু বলিতে তাহার মিষ্ট লাগিল না—সে মনোদুঃখে স্বামীকে শেষে "বাবুরাম" বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল। আমারও ইচ্ছা করিতেছে, আমি তাই করি।
মাংসপত্র ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া মনে মনে স্থির করিলাম, "যদি বিধাতা হারাধন মিলাইয়াছে—তবে ছাড়া হইবে না। বালিকার মত লজ্জা করিয়া সব নষ্ট না করি।"
এই ভাবিয়া আমি এমত স্থানে দাঁড়াইলাম যে, ভোজনস্থান হইতে বহির্ব্বাটীতে গমনকালে যে এদিক্ ওদিক্ চাহিতে চাহিতে যাইবে, সে দেখিতে পাইবে। আমি মনে মনে বলিলাম যে, "যদি ইনি এদিক্ ওদিক্ চাহিতে চাহিতে না যান, তবে আমি কুড়ি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পুরুষের চরিত্র কিছুই বুঝি নাই।" আমি স্পষ্ট কথা বলি, তোমরা আমাকে মার্জ্জনা করিও—আমি মাথার কাপড় বড় খাটো করিয়া দিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। এখন লিখিতে লজ্জা করিতেছে, কিন্তু তখন আমার কি দায়, তাহা মনে করিয়া দেখ।
অগ্রে অগ্রে রমণ বাবু গেলেন; তিনি চারি দিক্ চাহিতে চাহিতে গেলেন, যেন খবর লইতেছেন, কে কোথায় আছে। তারপর রামরাম দত্ত গেলেন—তিনি কোন দিকে চাহিলেন না। তার পর আমার স্বামী গেলেন—তাঁহার চক্ষু যেন চারি দিকে কাহার অনুসন্ধান করিতেছিল। আমি তাঁহার নয়নপথে পড়িলাম। তাঁহার চক্ষু আমারই অনুসন্ধান করিতেছিল, তাহা বিলক্ষণ জানিতাম। তিনি আমার প্রতি চাহিবামাত্র, আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক—কি বলিব, বলিতে লজ্জা করিতেছে—সর্পের যেমন চক্রবিস্তার স্বভাবসিদ্ধ, কটাক্ষও আমাদিগের তাই। যাঁহাকে আপনার স্বামী বলিয়া জানিয়াছিলাম, তাঁহার উপর একটু অধিক করিয়া বিষ ঢালিয়া না দিব কেন? বোধ হয়, "প্রাণনাথ" আহত হইয়া বাহিরে গেলেন।
আমি তখন হারাণীর শরণাগত হইব মনে করিলাম। নিভৃতে ডাকিবামাত্র সে হাসিতে হাসিতে আসিল। সে উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল, "পরিবেশনের সময় বামন

ঠাকুরাণীর নাকালটা দেখিয়াছিলে ?” উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সে আবার হাসির ফোয়ারা খুলিল।

আমি বলিলাম, “তা জানি, কিন্তু আমি তার জন্য তোকে ডাকি নাই। আমার জন্মের শোধ একবার উপকার কর্। ঐ বাবুটি কখন যাইবেন, আমাকে শীঘ্র খবর আনিয়া দে।”

হারাণী একেবারে হাসি বন্ধ করিল। এত হাসি, যেন ধুঁয়ার অন্ধকারে আগুন ঢাকা পড়িল। হারাণী গম্ভীরভাবে বলিল, “ছি! দিদি ঠাকুরুন্! তোমার এ রোগ আছে, তা জানিতাম না।”

আমি হাসিলাম। বলিলাম, “মানুষের সকল দিন সমান যায় না। এখন তুই গুরুমহাশয়গিরি রাখ্—আমার এ উপকার করবি কি না বল্।”

হারাণী বলিল, “কিছুতেই আমা হইতে এ কাজ হইবে না।”

আমি খালি হাতে হারাণীর কাছে আসি নাই। মাহিয়ানার টাকা ছিল; পাঁচটা তাহার হাতে দিলাম। বলিলাম, “আমার মথা খাস্, এ কাজ তোকে করিতেই হইবে।”

হারাণী টাকা কয়টা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেছিল, কিন্তু তাহা না দিয়া, নিকটে উনান নিকাইবার এক ঝুড়ি মাটি ছিল, তাহার উপর রাখিয়া দিল। বলিল—অতি গম্ভীরভাবে, আর হাসি নাই—“তোমার টাকা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেছিলাম, কিন্তু শব্দ হইলে একটা কেলেঙ্কারী হইবে, তাই আস্তে আস্তে রাখিলাম—কুড়াইয়া লও। আর এ সকল কথা মুখে এনো না।”

আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। হারাণী বিশ্বাসী, আর সকলে অবিশ্বাসী, আর কাহাকে ধরিব? আমার কান্নার প্রকৃত তাৎপর্য্য সে জানিত না। তথাপি তার দয়া হইল। সে বলিল, “কাঁদ কেন ? চেনা মানুষ না কি ?”

আমি একবার মনে করিলাম, হারাণীকে সব খুলিয়া বলি। তার পর ভাবিলাম, সে এত বিশ্বাস করিবে না, একটা বা গণ্ডগোল করিবে। ভাবিয়া চিন্তিয়া, স্থির করিলাম, সুভাষিণী ভিন্ন আমার গতি নাই। সেই আমার বুদ্ধি, সেই আমার রক্ষাকারিণী—তাহাকে সব খুলিয়া বলিয়া পরামর্শ করি গিয়া। হারাণীকে বলিলাম, “চেনা মানুষ বটে—বড় চেনা, সকল কথা শুনিলে তুই বিশ্বাস করিবি না, তাই তোকে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিলাম না। কিছু দোষ নাই।”

“কিছু দোষ নাই,” বলিয়া একটু ভাবিলাম। আমারই পক্ষে কিছু দোষ নাই, কিন্তু হারাণী পক্ষে ? দোষ আছে বটে। তবে তাকে কাদা মাখাই কেন ? তখন সেই “বাজিয়ে যাব মল” মনে পড়িল। কুতর্কে মনকে বুঝাইলাম। যাহার দুর্দ্দশা ঘটে, সে উদ্ধারের জন্য কুতর্ক অবলম্বন করে। আমি হারাণীকে আবার বুঝাইলাম, “কিছু দোষ নাই।”

হা। তোমাকে কি তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে হইবে ?

আমি। হাঁ।

হা। কখন ?

আমি। রাত্রে সবাই ঘুমাইলে।

হা। একা ?

আমি। একা।

হা। আমার বাপের সাধ্য নহে।
আমি। আর বৌ ঠাকুরাণী যদি হুকুম দেন?
হা। তুমি কি পাগল হয়েছ? তিনি কুলের কুলবধূ—সতী লক্ষ্মী, তিনি কি এ সব কাজে হাত দেন!
আমি। যদি বারণ না করেন, যাবি?
হারাণী। যাব। তাঁর হুকুমে না পারি কি?
আমি। যদি বারণ না করেন?
হারাণী। যাব, কিন্তু তোমার টাকা নিব না। তোমার টাকা তুমি নাও।
আমি। আচ্ছা, তোকে যেন সময়ে পাই।

আমি তখন চোখের জল মুছিয়া সুভাষিণীর সন্ধানে গেলাম। তাহাকে নিভৃতেই পাইলাম। আমাকে দেখিয়া সুভাষিণীর সেই সুন্দর মুখখানি, যেন সকালের পদ্মের মত, যেন সন্ধ্যাবেলার গন্ধরাজের মত আহ্লাদে ফুটিয়া উঠিল—সর্ব্বাঙ্গ, যেন সকালবেলার সর্ব্বত্র পুষ্পিত শেফালিকার মত, যেন চন্দ্রোদয়ে নগীস্রোতের মত, আনন্দে প্রফুল্ল হইল। হাসিয়া আমার কাণের কাছে মুখ আনিয়া সুভাষিণী জিজ্ঞসা করিল, "কেমন চিনিয়াছ ত?"

আমি আকাশ থেকে পড়িলাম। বলিলাম, "সে কি? তুমি কেমন করে জানলে?" সুভাষিণী মুখ চোখ ঘুরাইয়া বলিল, "আহাঃ তোমার সোণার চাঁদ বুঝি আপনি এসে ধরা দিয়েছে? আমরা যাই আকাশে ফাঁদ পাততে জানি, তাই তোমার আকাশের চাঁদ ধ'রে এনে দিয়েছি!"

আমি বলিলাম, "তোমরা কে? তুমি আর র-বাবু?"

সুভা। না ত আবার কে? তুমি, তেমার স্বামী শ্বশুরের আর তাঁদের গাঁয়ের নাম বলিয়া দিয়াছিলে, মনে আছে? তাই শুনিয়াই র-বাবু চিনিতে পারিলেন। তোমার উ-বাবুর একটা বড় মোকদ্দমা তাঁর হাতে ছিল—তারই ছল করিয়া তোমার উ-বাবুকে কলিকাতায় আসিতে লিখিলেন। তার পর নিমন্ত্রণ।
আমি। তারপর হাত পাতিয়া বুড়ীর দালটুকু নেওয়া।
সুভা। হাঁ, সেটাও আমাদের ষড়যন্ত্র।
আমি। তা, আমার পরিচয় কিছু দেওয়া হয়েছে কি?
সুভা। আ সর্ব্বনাশ! তা কি দেওয়া যায়? তোমাকে ডাকাতে কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল, তার পর কোথায় গিয়েছিলে, কি বৃত্তান্ত, তা কে জানে?' তোমার পরিচয় পেলে কি ঘরে নেবে? বলবে একটা গছিয়ে দিচ্ছে। র-বাবু বলেন, এখন তুমি নিজে যা করিতে পার।
আমি। আমি একবার কপাল ঠুলিয়া দেখিব—না হয় ডুবিয়া মরিব। কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা না হইলে, কি করিব?
সুভা। কখন্ দেখা করবে, কোথায় বা দেখা করবে?
আমি। তোমরা যদি এত করিয়াছ, তবে এ বিষয়েও একটু সাহায্য কর। তাঁর বাসায় গেলে দেখা হইবে না,—কেই বা আমাকে নিয়ে যাবে, কেইবা দেখা করাইবে? এইখানেই দেখা করিতে হইবে।
সুভা। কখন্?

আমি। রাত্রে, সবাই শুইলে।
সুভা। অভিসারিকে ?
আমি। তা বৈ আর গতি কি ? দোষই বা কি—স্বামী যে।
সুভা। না, দোষ নাই। কিন্তু তাহা হইলে তাঁকে রাত্রে আটকাইতে হয়। নিকটে তাঁর বাসা; তা ঘটিবে কি ? দেখি একবার র-বাবুর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে।
সুভাষিণী রমণ বাবুকে ডাকাইল। তাঁর সঙ্গে যে কথাবার্ত্তা হইল, তাহা আমাকে আসিয়া বলিল। বলিল, "র-বাবু যাহা পারেন তাহা এই :—তিনি এখন মোকদ্দমার কাগজপত্র দেখিবেন না—একটা ওজর করিয়া রাখিবেন। কাগজ দেখিবার জন্য সন্ধ্যার পর সময় অবধারণ করিবেন। সন্ধ্যার পর তোমার স্বামী আসিলে, কাগজপত্র দেখিবেন। কাগজপত্র দেখিতে দেখিতে একটু রাত্র করিবেন। রাত্র হইলে আহারের জন্য অনুরোধ করিবেন। কিন্তু তার পর তোমার বিদ্যায় যা থাকে, তা করিও। রাত্রে থাকিতে আমরা কি বলিয়া অনুরোধ করিব ?"
আমি বলিলাম, "সে অনুরোধ তোমাদের করিতে হইবে না। আমিই করিব। আমার অনুরোধ যাহাতে শুনেন, তাহা করিয়া রাখিয়াছি। দুই একটা চাহনি ছুঁড়িয়া মারিয়াছিলাম, তিনি তাহা ফিরাইয়া দিয়াছেন। লোক ভাল নহেন। এখন আমার অনুরোধ তাঁহার কাছে পাঠাই কি প্রকারে ? এক ছত্র লিখিয়া দিব। সেই কাগজটুকু কেহ তাঁর কাছে দিয়ে এলেই হয়।"
সুভা। কোন চাকরের হাতে পাঠাও না?
আমি। যদি জন্ম-জন্মান্তরেও স্বামী না পাই, তবুও পুরুষ মানুষকে এ কথা বলিতে পারি না।
সুভা। তা বটে। কোন ঝি ?
আমি। ঝি বিশ্বাসী কে? একটা গোলমাল বাধাইবে, তখন সব খোওয়াব।
সুভা। হারাণী বিশ্বাসী।
আমি। হারাণীকে বলিয়াছিলাম। বিশ্বাসী বলিয়া সে নারাজ। তবে তোমার একটু ইঙ্গিত পাইলে সে যাইতে পারে। কিন্তু তোমার এমন ইঙ্গিত করিতে কি বলিতে পারি ? মরি, ত আমি একাই মরিব।—পোড়া চোখে আবার জল আসিল।
সুভা। হারাণী আমার কথা কি বলিয়াছে ?
আমি। তুমি যদি বারণ না কর, তবে সে যাইতে পারে।
সুভাষিণী অনেকক্ষণ ভাবিল। বলিল, "সন্ধ্যার পর তাকে এই কথার জন্য আসিতে বলিও।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : আমাকে একজামিন দিতে হইল

সন্ধ্যার পর আমার স্বামী কাগজপত্র লইয়া রমণ বাবুর কাছে আসিলেন। সংবাদ পাইয়া, আমি আর একবার হারাণীর হাতে পায়ে ধরিলাম। হারাণী সেই কথাই বলে, "বৌদিদি যদি বারণ না করে, তবে পারি। তবে জানিব, এতে দোষ নেই।" আমি বলিলাম, "যাহা হয় কর্—আমার বড় জ্বালা।"

এই ইঙ্গিত পাইয়া হারাণী একটু হাসিতে হাসিতে সুভাষিণীর কাছে ছুটিল। আমি তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। দেখিলাম যে, সে হাসির ফোয়ারা খুলিয়া দিয়া আলু থালু কেশ বেশ সামলাইতে সামলাইতে, হাঁপাইতে হাঁপাইতে, ছুটিয়া আসিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি গো, এত হাসি কেন?"

হারাণী। দিদি, এমন জায়গায়ও মানুষকে পাঠায়? প্রাণটা গিয়াছিল আর কি!

আমি। কেন গো?

হারা। আমি জানি বৌদিদির ঘরে ঝাঁটা থাকে না, দরকারমত ঝাঁটা লইয়া গিয়া আমরা ঘর ঝাঁটাইয়া আসি। আজ দেখি যে, বৌদিদির হাতের কাছেই কে ঝাঁটা রাখিয়া আসিয়াছে। আমি যেমন গিয়া বলিলাম, "তা যাব কি?" অমনি বৌদিদি সেই ঝাঁটা লইয়া আমাকে তাড়াইয়া মারিতে আসিল। ভাগ্যিস্, পালাতে জানি, তাই পালিয়ে বাঁচলেম। নহিলে খেঙ্গরা খেয়ে প্রাণটা গিয়েছিল আর কি? তবু এক ঘা বুঝি পিঠে পড়েছে;—দেখ দেখি দাগ হয়েছে কি না?"

হারাণী হাসিতে হাসিতে আমাকে পিঠ দেখাইল। মিছে কথা—দাগ ছিল না। তখন সে বলিল, "এখন কি জরতে হবে বল—ক'রে আসি!"

আমি। ঝাঁটা খেয়ে যাবি?

হারাণী। ঝাঁটা মেরেছে —বারণ ত করে নি। আমি বলেছিলাম, বারণ না করে ত যাব।

আমি। ঝাঁটা কি বারণ না?

হারাণী। হা, দেখ দিদিমণি, বৌদিদি যখন ঝাঁটা তোলে, তখন তার ঠোঁটের কোণে একটু হাসি দেখেছিলাম। তা কি করতে হবে, বল।

আমি তখন এক টুকরা কাগজে লিখিলাম,

"আমি আপনাকে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছি। গ্রহণ করিবেন কি? যদি করেন, তবে আজ রাত্রিতে এই বাড়ীতে শয়ন করিবেন। ঘরের দ্বার যেন খোলা থাকে।

সেই পাচিকা।"

পত্র লিখিয়া, লজ্জায় ইচ্ছা করিতে লাগিল, পুকুরের জলে ডুবিয়া থাকি, কি অন্ধকারে লুকাইয়া থাকি। তা কি করিব? বিধাতা যেমন ভাগ্য দিয়াছেন! বুঝি আর কখন কোন কুলবতীর কপালে এমন দুর্দ্দশা ঘটে নাই।

কাগজটা মুড়িয়া সুড়িয়া হারাণীকে দিলাম। বলিলাম, "একটু সবুর।" সুভাষিণীকে বলিলাম, "একবার দাদা বাবুকে ডাকিয়া পাঠাও। যাহা হয়, একটা কথা বলিয়া বিদায় দিও।" সুভাষিণী তাই করিল। রমণ বাবু উঠিয়া আসিলে, হারাণীকে বলিলাম, "এখন যা।" হারাণী গেল, কিছু পরে কাগজটা ফেরত দিল। তার এক কোণে লেখা আছে, "আচ্ছা।" আমি তখন হারাণীকে বলিলাম, "যদি এত করিলি, তবে আর একটু করিতে হইবে। দুপুর রাত্রে আমাকে তাঁর শুইবার ঘরটা দেখাইয়া দিয়া আসিতে হইবে।"

হারাণী। আচ্ছা, কোন দোষ নাই ত?

আমি। কিছু না। উনি আর জন্মে আমার স্বামী ছিলেন।

হারাণী। আর জন্মে, কি এ জন্মে, ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।

আমি হাসিয়া বলিলাম, চুপ।"

হারাণী হাসিয়া বলিল, "যদি এ জন্মের হন, তবে আমি পাঁচ শত টাকা বখশিশ নিব, নহিলে আমার ঝাঁটার ঘা ভাল হইবে না।"

আমি তখন সুভাষিণীর কাছে গিয়া এ সকল সংবাদ দিলাম। সুভাষিণী শাশুড়ীকে বলিয়া আসিল, "আজ কুমুদিনীর অসুখ হইয়াছে; সে রাঁধিতে পারিবে না। সোণার মা'ই রাঁধুক।"

সোণার মা রাঁধিতে গেল—সুভাষিণী আমাকে লইয়া গিয়া ঘরে কবাট দিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কি, কয়েদ কেন?" সুভাষিণী বলিল, "তোমায় সাজাইব।"

তখন আমার মুখ পরিষ্কার করিয়া মুছাইয়া দিল। চুলে সুগন্ধ তৈল মাখাইয়া, যত্নে খোঁপা বাঁধিয়া দিল; বলিল, "এ খোঁপার হাজার টাকা মূল্য, সময় হইলে আমায় এ হাজার টাকা পাঠাইয়া দিস্।" তার পর আপনার একখানা পরিষ্কার, রমণীমনোহর বস্ত্র লইয়া জোর করিয়া পরাইতে লাগিল। সে যেরূপ টানাটানি করিল, বিবস্ত্রা হইবার ভয়ে আমি পরিতে বাধ্য হইলাম। তার পর আপনার অলঙ্কাররাশি আনিয়া পরাইতে আসিল। আমি বলিলাম, "এ আমি কিছুতেই পরিব না।"

তার জন্য অনেক বিবাদ বচসা হইল—আমি কোন মতেই পরিলাম না দেখিয়া সে বলিল, "তবে, আর এক সুট আনিয়া রাখিয়াছি, তাই পর।"

এই বলিয়া সুভাষিণী একটা ফুলের জার্ডিনিয়র হইতে বাহির করিয়া মল্লিকা ফুলের অফুল্ল কোরকের বালা পরাইল, তাহার তাবিজ, তাহারই বাজু, গলায় তারই দোনর মালা। তার পর এক জোড়া নূতন সোণার ইয়ার্‌রিং বাহির করিয়া বলিল, "এ আমি নিজের টাকায় র-বাবুকে দিয়া কিনিয়া আনাইয়াছি—তোমাকে দিবার জন্য। তুমি যেখানে যথন থাক, এ পরিলে আমাকে তুমি মনে করিবে। কি জানি ভাই, আজ বৈ তোমার সঙ্গে যদি দেখা না হয়—ভগবান্ তাই করুন—তাই তোমাকে আজ এ ইয়ার্‌রিং পরাইব। এতে আর না বলিও না।"

বলিতে বলিতে সুভাষিণী কাঁদিল। আমারও চক্ষে জল আসিল, আমি আর না বলিতে পারিলাম না। সুভাষিণী ইয়ার্‌রিং পরাইল।

সাজসজ্জা শেষ হইলে সুভাষিণীর ছেলেকে ঝি দিয়া গেল। ছেলেটিকে কোলে লইয়া তাহার সঙ্গে গল্প করিলাম। সে একটু গল্প শুনিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। তার পর মনে একটি দুঃখের কথা উদয় হইয়াছিল; তাও এ সুখের মাঝে সুভাষিণীকে না বলিয়া থাকিতে পারিল না। বলিলাম, "আমি আহ্লাদিত হইয়াছি, কিন্তু মনে মনে তাঁহাকে একটু নিন্দা করিতেছি। আমি চিনিয়াছি যে তিনি আমার স্বামী, এই জন্য আমি যাহা করিতেছি, তাহাতে আমার বিবেচনায়, দোষ নাই। কিন্তু তিনি যে আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন, এমন কোন মতেই সম্ভবে না। আমি তাঁহাকে বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থায় দেখিয়াছিলাম। এজন্য আমার প্রথমেই সন্দেহ হইয়াছিল। তিনি আমাকে একাদশ বৎসরের বালিকা দেখিয়াছিলেন মাত্র। তিনি আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন, এমন কোন লক্ষণও দেখি নাই। অতএব তিনি আমাকে পরস্ত্রী জানিয়া যে আমার প্রণয়াশায় লুব্ধ হইলেন, শুনিয়া মনে মনে বড় নিন্দা করিতেছি। কিন্তু তিনি স্বামী, আমি স্ত্রী,—তাঁহাকে মন্দ ভাবা আমার অকর্ত্তব্য বলিয়া সে কথার আর আলোচনা করিব না। মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম, যদি কখনও দিন পাই, তবে এ স্বভাব ত্যাগ করাইব।"

সুভাষিণী আমার কথা শুনিয়া বলিল, "তোর মত বাঁদর গাছে নেই, ওঁর যে স্ত্রী নেই।"

আমি। আমার কি স্বামী আছে নাকি?

সুভা। আ ম'লো! মেয়ে মানুষে পুরুষ মানুষে সমান! তুই কমিসেরিয়েটের কাজ ক'রে টাকা নিয়ে আয় না দেখি?

আমি। ওরা পেটে ছেলে ধরিয়া, প্রসব করিয়া, মানুষ করুক, আমি কমিসেরিয়েটে যাইব। যে যা পারে সে তা করে। পুরুষ মানুষের ইন্দ্রিয় দমন কি এতই শক্ত?

সুভা। আচ্ছা, আগে তোর ঘর হোক, তার পর তুই ঘরে আগুন দিস্। ও সব কথা রাখ্। কেমন ক'রে স্বামীর মন ভুলাবি, তার একজামিন দে দেখি? তা নইলে ত তোর গতি নেই।

আমি একটু ভাবিত হইয়া বলিলাম, "সে বিদ্যা কখনও শিখি নাই।"

সু। তবে আমার কাছে শেখ্। আমি এ শাস্ত্রে পণ্ডিত, তা জানিস্?

আমি। তা ত দেখিতে পাই।

সু। তবে শেখ্। তুই যেন পুরুষ মানুষ। আমি কেমন করিয়া তোর মন ভুলাই দেখ্।

এই বলিয়া পোড়ারমুখী, মাথায় একটু ঘোমটা টানিয়া, সযত্নে স্বহস্তে প্রস্তুত সুবাসিত একটি পান আনিয়া আমাকে খাইতে দিল। সে পান সে কেবল রমণ বাবুর জন্য রাখে, আর কাহাকেও দেয় না। এমন কি, আপনিও কখন খায় না। রমণ বাবুর আলবোলাটা সেখানে ছিল, তাহাতে কল্কে বসান; গুলেই ছাই ছিল মাত্র; তাই আমার সম্মুখে ধরিয়া দিয়া ফুঁ দিয়া ধরান, সুভাষিণী নাটিত করিল। তার পর, ফুল দিয়া সাজান তালবৃন্তখানি হাতে লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। হাতের বালাতে চুড়িতে বড় মিঠে মিঠে বাজিতে লাগিল।

আমি বলিলাম,"ভাই! এ ত দাসীপনা—দাসীপনায় আমার কতদূর বিদ্যা, তারই পরিচয় দিবার জন্য কি তাঁকে আজ ধরিয়া রাখিলাম?"

সুভাষিণী বলিল, "আমরা দাসী না ত কি?"

আমি বলিলাম, "যখন তাঁর ভালবাসা জন্মিবে, তখন দাসীপনা চলিবে। তখন পাখা করিব, পা টিপিব, পান সাজিয়া দিব, তামাকু ধরাইয়া দিব। এখনকার ওসব নয়।"

তখন সুভাষিণী হাসিতে হাসিতে আমার কাছে আসিয়া বসিল। আমার হাতখানা আপনার হাতের ভিতর তুলিয়া লইয়া মিঠে মিঠে গল্প করিতে লাগিল। প্রথম, প্রথম, হাসিতে হাসিতে, পান চিবাইতে চিবাইতে, কাণবালা দোলাইয়া সে যে সং সাজিয়াছিল, তারই অনুরূপ কথা কহিতে লাগিল। কথায় কথায় সে ভাব ভুলিয়া গেল। সখীভাবেই কথা কহিতে লাগিল। আমি যে চলিয়া যাইব, সে কথা পাড়িল। চক্ষুতে তার এক বিন্দু জল চক চক করিতে লাগিল। তখন তাহাকে প্রফুল্ল করিবার জন্য বলিলাম, "যা শিখাইলে, তা স্ত্রীলোকের অস্ত্র বটে, কিন্তু এখন উ-বাবুর উপর খাটিবে কি?"

সুভাষিণী তখন হাসিয়া বলিল, "তবে আমার ব্রহ্মাস্ত্র শিখে নে।"

এই বলিয়া, মাগী আমার গলা বেড়িয়া হাত দিয়া মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া, আমার মুখচুম্বন করিল। এক ফোঁটা চোখের জল, আমার গালে পড়িল।

ঢোক গিলিয়া আমার চোখের জল চাপিয়া, আমি বলিলাম, "এ যে ভাই সঙ্কল্প না হতে দক্ষিণা দেওয়া শিখাইতেছিস্।"

সুভাষিণী বলিল, "তোর তবে বিদ্যা হবেনা। তুই কি জানিস্,—একজামিন দে দেখি। এই আমি যেন উ-বাবু" এই বলিয়া সে সোফার উপর জমকাইয়া বসিয়া,—হাসি রাখিতে না পারিয়া, মুখে কাপড় গুঁজিতে লাগিল। হাসি থামিলে, একবার আমার মুখপানে খট্ মট্ করিয়া চাহিল—আবার তখনই হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল। সে হাসি থামিলে বলিল, "একজামিন দে।" তখন যে বিদ্যার পরিচয় পাঠক পশ্চাৎ পাইবেন, সুভাষিণীকেও তাহার কিছু পরিচয় দিলাম। সুভাষিণী আমাকে সোফা হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল—বলিল, "দূর হ পাপিষ্ঠা! তুই আস্ত কেউটে!"

আমি বলিলাম, “কেন ভাই ?”
সুভাষিণী বলিল, “ও হাসি চাহনিতে পুরুষ মানুষ টিকে ? মরিয়া ভূত হয়।”
আমি। তবে একজামিন পাস ?
সু। খুব পাস—কমিসেরিয়েটের এক-শ ঊনসত্তর পুরুষেও এমন হাসি চাহনি কখন দেখে নাই। মিন্‌সের মুণ্ডটা যদি ঘুরে যায়, ত একটু বাদামের তেল দিস্।
আমি। আচ্ছা। এখন সাড়া শব্দে বুঝিতে পারিতেছি বাবুদের খাওয়া হইয়া গেল। রমণ বাবুর ঘরে আসিবার সময় হইল, আমি এখন বিদায় হই। যা শিখাইয়াছিলে, তার মধ্যে একটা বড় মিষ্ট লাগিয়াছিল—সেই মুখচুম্বনটি। এসো আর একবার শিখি।
তখন সুভাষিণী আমার গলা ধরিল, আমি তার গলা ধরিলাম। গাঢ় আলিঙ্গনপূর্ব্বক পরস্পরে মুখচম্বন করিয়া গলা ধরাধরি করিয়া, দুই জনে অনেকক্ষণ কাঁদিলাম। এমন ভালবাসা কি আর হয় ? সুভাষিণীর মত আর কি কেহ ভালবাসিতে জানে ? মরিব, কিন্তু সুভাষিণীকে ভুলিব না।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ : আমার প্রাণত্যাগের প্রতিজ্ঞা

আমি হারাণীকে সর্তক করিয়া দিয়া আপনার শয়নগৃহে গেলাম। বাবুদের আহারাদি হইয়া গিয়াছে। এমন সময়ে একটা বড় গণ্ডগোল পড়িয়া গেল। কেহ ডাকে পাখা, কেহ ডাকে জল, কেহ ডাকে ঔষধ, কেহ ডাকে ডাক্তার। এইরূপ হুলস্থূল। হারাণী হাসিতে হাসিতে আসিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “এত গণ্ডগোল কিসের?”
হা। সেই বাবুটি মূর্চ্ছা গিয়াছিলেন।
আমি। তার পর ?
হা। এখন সামলেছেন।
আমি। তার পর ?
হা। এখন বড় অবসন্ন—বাসায় যাইতে পারিলেন না। এখানেই বড় বৈঠকখানায় পাশের ঘরে শুইলেন। বুঝিলাম, এ কৌশল। বলিলাম, “আলো সব নিবিলে, সবাই শুইলে আসিবে।”
হারাণী বলিল, “অসুখ যে গা।”
আমি বলিলাম, “অসুখ না তোর মুণ্ড। আর পাঁচ-শ খানা বিবির মুণ্ড, যদি দিন পাই।”
হারাণী হাসিতে হাসিতে গেল। পরে আলো সব নিবিলে, সবাই শুইলে, হারাণী আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া ঘর দেখাইয়া আসিল। আমি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, তিনি একাই শয়ন করিয়া আছেন। অবসন্ন কিছুই না; ঘরে দুইটা বড় বড় আলো জ্বলিতেছে, তিনি নিজের রূপরাশিতে সমস্ত আলো করিয়া আছেন। আমিও শরবিদ্ধ; আনন্দে শরীর আপ্লুত হইল।
যৌবন প্রাপ্তির পর আমার এই প্রথম স্বামিসম্ভাষণ। সে যে কি সুখ, তাহা কেমন করিয়া বলিব ? আমি অত্যন্ত মুখরা—কিন্তু যখন প্রথম তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে

গেলাম, কিছুতেই কথা ফুটিল না। কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতে লাগিল। সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। হৃদয়মধ্যে দুপ দুপ শব্দ হইতে লাগিল। রসনা শুকাইতে লাগিল। কথা আসিল না বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম।

সে অশ্রুজল তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, "কাঁদিলে কেন? আমি ত তোমাকে ডাকি নাই— তুমি আপনি আসিয়াছি—তবে কাঁদ কেন?"

এই নিদারুণ বাক্যে বড় মর্ম্মপীড়া হইল। তিনি যে আমাকে কুলটা মনে করিতেছেন—ইহাতে চক্ষুর প্রবাহ আরও বাড়িল। মনে করিলাম, এখন পরিচয় দিই—এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না, কিন্তু তখনই মনে হইল যে, পরিচয় দিলে যদি ইনি না বিশ্বাস করেন, যদি মনে করেন যে, "ইহার বাড়ী কালাদীঘি, অবশ্য আমার স্ত্রীহরণের বৃত্তান্ত শুনিয়াছে, এক্ষণে ঐশ্বর্য্যলোভে আমার স্ত্রী বলিয়া মিথ্যা পরিচয় দিতেছে"—তাহা হইলে কি প্রকারে ইঁহার বিশ্বাস জন্মাইব? সুতরাং পরিচয় দিলাম না। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চক্ষুর জল মুছিয়া, তাঁহার সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলাম। অন্যান্য কথার পরে তিনি বলিলেন, "কালাদীঘি তোমার বাড়ী শুনিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি। কালাদীঘিতে যে এমন সুন্দরী জন্মিয়াছে, তাহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না।"

তাঁর চক্ষের প্রতি আমি লক্ষ্য করিতেছিলাম, তিনি বড় বিস্ময়ের সহিত আমাকে দেখিতেছিলেন। তাঁর কথার উত্তরে আমি নেকী সাজিয়া বলিলাম, "আমি সুন্দরী না বান্দরী। আমাদের দেশের মধ্যে আপনার স্ত্রীরই সৌন্দর্য্যের গৌরব।" এই ছলক্রমে তাঁহার স্ত্রীর কথা পাড়িয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাঁহার কি কোন সন্ধান পাওয়া গিয়াছে?"

উত্তর। না—তুমি কত দিন দেশ হইতে আসিয়াছ?

আমি বলিলাম, "আমি সে সকল ব্যাপারের পরেই দেশ হইতে আসিয়াছি। তবে বোধ হয়, আপনি আবার বিবাহ করিয়াছেন।"

উত্তর। না।

বড় বড় কথায়, উত্তর দিবার তাঁহার অবসর দেখিলাম না। আমি উপযাচিকা, অভিসারিকা হইয়া আসিয়াছি,—আমাকে আদর করিবারও তাঁর অবসর নাই। তিনি সবিস্ময়ে আমার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। একবারমাত্র বলিলেন, "এমন রূপ ত মানুষের দেখি নাই।"

সপত্নী হয় নাই, শুনিয়া বড় আহ্লাদ হইল। বলিলাম, "আপনারা যেমন বড়লোক, এটি তেমনই বিবেচনার কাজ হইয়াছে। নহিলে যদি এর পর আপনার স্ত্রীকে পাওয়া যায়, তবে দুই সতীনে ঠেঙ্গাঠেঙ্গি বাধিবে।"

তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "সে ভয় নাই। সে স্ত্রীকে পাইলেও আমি আর গ্রহণ করিব, এমন বোধ হয় না। তাহার আর জাতি নাই বিবেচনা করিতে হইবে।"

আমার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। এত আশা ভরসা সব নষ্ঠ হইল। তবে আমার পরিচয় পাইলে, আমাকে আপন স্ত্রী বলিয়া চিনিলেও, আমাকে গ্রহণ করিবেন না! আমার এবারকার নারীজন্ম বৃথা হইল।

সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "যদি এখন তাঁহার দেখা পান, তবে কি করিবেন?"

তিনি অম্লানবদনে বলিলেন, "তাকে ত্যাগ করিব।"

কি নির্দ্দয়! আমি স্তম্ভিতা হইয়া রহিলাম। পৃথিবী আমার চক্ষে ঘুরিতে লাগিল।

সেই রাত্রিতে আমি স্বামিশয্যায় বসিয়া তাহার অনিন্দিত মোহনমূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে প্রতিজ্ঞা করিলাম, "ইনি আমায় স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিবেন, নচেৎ আমি প্রাণত্যাগ করিব।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ : কুলের বাহির

তখন সে চিন্তিত ভাব আমার দূর হইল। ইতিপূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, তিনি আমার বশীভূত হইয়াছেন। মনে মনে কহিলাম, যদি গণ্ডারের খড়্গ-প্রয়োগে পাপ না থাকে, যদি হস্তীর দন্ত-প্রয়োগে পাপ না থাকে, যদি ব্যাঘ্রের নখব্যবহারে পাপ না থাকে, যদি মহিষের শৃঙ্গাঘাতে পাপ না থাকে, তবে আমারও পাপ হইবে না। জগদীশ্বর আমাদিগকে যে সকল আয়ুধ দিয়াছেন, উভয়ের মঙ্গলার্থে তাহা প্রয়োগ করিব। যদি কখন "মল বাজিয়ে" যেতে হয়, তবে সে এখন। আমি তাঁহার নিকট হইতে দূরে আসিয়া বসিলাম। তাঁর সঙ্গে প্রফুল্ল হইয়া কথা কহিতে লাগিলাম। তিনি নিকটে আসিলেন, আমি তাঁহাকে কহিলাম, "আমার নিকটে আসিবেন না, আপনার একটি ভ্রম জন্মিয়াছে দেখিতেছি," [হাসিতে হাসিতে আমি এই কথা বলিলাম এবং বলিতে বলিতে কবরীমোচনপূর্ব্বক (সত্য কথা না বলিলে কে এ ইতিহাস বুঝিতে পারিবে ?) আবার বাঁধিতে বসিলাম,] "আপনার একটি ভ্রম জন্মিয়াছে। আমি কুলটা নহি। আপনার নিকটে দেশের সংবাদ শুনিব বলিয়াই আসিয়াছি। অসৎ অভিপ্রায় কিছুই নাই।"

বোধ হয়, তিনি এ কথা বিশ্বাস করিলেন না। অগ্রসর হইয়া বসিলেন। আমি তখন হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "তুমি কথা শুনিলে না, তবে আমি চলিলাম, তোমার সঙ্গে এই সাক্ষাৎ," এই বলিয়া আমি যেমন করিয়া চাহিতে হয়, তেমনি করিয়া চাহিতে, চাহিতে, আমার কুঞ্চিত, মসৃণ সুবাসিত অলকদামের প্রান্তভাগ, যেন অনবধানে তাঁহার গণ্ড স্পর্শ করাইয়া সন্ধ্যার বাতাসে বসন্তের লতার মত একটু হেলিয়া গাত্রোত্থান করিলাম।

আমি সত্য সত্যই গাত্রোত্থান করিলাম দেখিয়া তিনি ক্ষুণ্ন হইলেন, আসিয়া আমার হাত ধরিলেন। মল্লিকাকোরকের বালার উপর তাঁর হাত পড়িল। তিনি হাতখানা ধরিয়া রাখিয়া যেন বিস্মিতের মত হাতের পানে চাহিয়া রহিলেন। আমি বলিলাম, "দেখিতেছ কি ?" তিনি উত্তর করিলেন, "এ কি ফুল ? এ ফুল ত মানায় নাই। ফুলটার অপেক্ষা মানুষটা সুন্দর। মল্লিকা ফুলের চেয়ে মানুষ সুন্দর এই প্রথম দেখিলাম।" আমি রাগ করিয়া হাত ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম, কিন্তু হাসিলাম, বলিলাম, "তুমি ভাল মানুষ নও। আমাকে ছুঁইও না। আমাকে দুশ্চরিত্র মনে করিও না।"

এই বলিয়া আমি দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলাম। স্বামী—অদ্যাপি সে কথা মনে পড়িলে দুঃখ হয়—তিনি হাতযোড় করিয়া ডাকিলেন, "আমার কথা রাখ, যাইও না। আমি তোমার রূপ দেখিয়া পাগল হইয়াছি। এমন রূপ আমি কখন দেখি নাই। আর একটু দেখি। এমন আর কখন দেখিব না।" আমি আবার ফিরিলাম—কিন্তু বসিলাম না—বলিলাম, "প্রাণাধিক! আমি কোন্ ছার, আমি যে তোমা হেন রত্ন ত্যাগ করিয়া যাইতেছি, ইহাতেই আমার মনের দুঃখ বুঝিও। কিন্তু কি করিব ? ধর্ম্মই আমাদিগের একমাত্র প্রধান ধন—এক দিনের সুখের জন্য আমি ধর্ম্ম ত্যাগ করিব না। আমি না বুঝিয়া, না ভাবিয়া, আপনার কাছে আসিয়াছি। না বুঝিয়া, না ভাবিয়া, আপনাকে পত্র লিখিয়াছিলাম। কিন্তু আমি একেবারে অধঃপাতে যাই নাই। এখনও আমার রক্ষার পথ খোলা আছে। আমার ভাগ্য যে, সে কথা এখন আমার মনে পড়িল। আমি চলিলাম।"

তিনি বলিলেন, "তোমার ধর্ম্ম তুমি জান। আমায় এমন দশায় ফেলিয়াছ যে, আমার আর ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নাই। আমি শপথ করিতেছি, তুমি চিরকাল আমার হৃদয়েশ্বরী হইয়া থাকিবে। এক দিনের জন্য মনে করিও না।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "পুরুষের শপথে বিশ্বাস নাই। এক মুহূর্ত্তের সাক্ষাতে কি এত হয় ?" এই বলিয়া আবার চলিলাম—দ্বাপ পর্য্যন্ত আসিলাম। তখন আর

ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া তিনি দুই হস্তে আমার দুই চরণ ধরিয়া পথরোধ করিলেন। বলিলেন, "আমি যে এমন আর কখন দেখি নাই।" তাহার মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। তাঁহার দশা দেখিয়া আমার দুঃখও হইল। বলিলাম, "তবে তোমার বাসায় চল—এখানে থাকিলে তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া যাইবে।"
তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। তাঁহার বাসা সিমলায়, অল্প দূর। তাঁর গাড়িও হাজির ছিল, এবং দ্বারবানেরা নিদ্রিত। আমরা নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া গাড়িতে গিয়া উঠিলাম। তাঁর বাসায় গিয়া দেখিলাম, দুই মহল বাড়ী। একটি ঘরে আমি অগ্রে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়াই ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিলাম। স্বামী বাহিরে পড়িয়া রহিলেন।
তিনি বাহির হইতে কাতরোক্তি করিতে লাগিলেন। আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "আমি এখন তোমারই দাসী হইলাম। কিন্তু দেখি, তোমার প্রণয়ের বেগ কাল প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত থাকে না থাকে। যদি কালও এমনি ভালবাসা দেখিতে পাই, তখন তোমার সঙ্গে আবার আলাপ করিব। আজ এই পর্য্যন্ত।"
আমি দ্বার খুলিলাম না; অগত্য তিনি অন্যত্র গিয়া বিশ্রাম করিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের অসহ্য সন্তাপে, দারুণ তৃষাপীড়িত রোগীকে স্বচ্ছ শীতল জলাশয়তীরে বসাইয়া দিয়া, মুখ বাঁধিয়া দাও, যেন সে জল পান করিতে না পারে—বল দেখি, তার জলে ভালবাসা বাড়িবে কি না ?
অনেক বেলা হইলে দ্বার খুলিলাম, দেখিলাম, স্বামী দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আমি আপনার করে তাঁহার কর গ্রহণ করিয়া বলিলাম, "প্রাণনাথ, হয় আমাকে রামরাম দত্তের বাড়ী পাঠাইয়া দাও, নচেৎ অষ্টাহ আমার সঙ্গে আলাপ করিও না। এই অষ্টাহ তোমার পরীক্ষা।" তিনি অষ্টাহ পরীক্ষা স্বীকার করিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ : খুন করিয়া ফাঁসি গেলাম

পুরুষকে দগ্ধ করিবার যে কোন উপায় বিধাতা স্ত্রীলোককে দিয়াছেন, সেই সকল উপায় অবলম্বন করিয়া আমি অষ্টাহ স্বামীকে জ্বালাতন করিলাম। আমি স্ত্রীলোক—কেমন করিয়া মুখ ফুটিয়া সে সকল কথা বলিব। আমি যদি আগুন জ্বালিতে না জানিতাম, তবে গত রাত্রিতে এত জ্বলিত না। কিন্তু কি প্রকারে আগুন জ্বালিলাম—কি প্রকারে ফুৎকার দিলাম—কি প্রকারে স্বামীর হৃদয় দগ্ধ করিলাম, লজ্জায় তাহার কিছুই বলিতে পারি না। যদি আমার কোন পাঠিকা নরহত্যার ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং সফল হইয়া থাকেন, তবে তিনিই বুঝিবেন। যদি কোন পাঠক কখন এইরূপ নরঘাতিনীর হস্তে পড়িয়া থাকেন, তিনিই বুঝিবেন। বলিতে কি, স্ত্রীলোকই পৃথিবীর কণ্টক। আমাদের জাতি হইতে পৃথিবীর যত অনিষ্ট ঘটে, পুরুষ হইতে তত ঘটে না। সৌভাগ্য এই যে, এই নরঘাতিনী বিদ্যা সকল স্ত্রীলোকে জানে না, তাহা হইলে এত দিনে পৃথিবী নির্ম্মনুষ্য হইত।
এই অষ্টাহ আমি সর্ব্বদা স্বামীর কাছে কাছে থাকিতাম—আদর করিয়া কথা কহিতাম—নীরস কথা একটি কহিতাম না। হাসি, চাহনী, অঙ্গভঙ্গী,—সে সকল ত ইতর স্ত্রীলোকের অস্ত্র। আমি প্রথম দিনে আদর করিয়া কথা কহিলাম—দ্বিতীয় দিনে অনুরাগ লক্ষণ দেখাইলাম—তৃতীয় দিনে তাঁহার ঘরকরনার কাজ করিতে আরম্ভ করিলাম; যাহাতে তাঁহার আহারের পারিপাট্য, শয়নের পারিপাট্য, স্নানের পারিপাট্য হয়, সর্ব্বাংশে যাহাতে ভাল থাকেন, তাহাই করিতে আরম্ভ করিলাম—স্বহস্তে পাক করিতাম; খড়িকাটি পর্য্যন্ত স্বয়ং প্রস্তুত করিয়া রাখিতাম। তাঁর এতটুকু অসুখ দেখিলে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া সেবা করিতাম।
এখন যুক্তকরে আপনাদের নিকট নিবেদন যে, আপনারা না মনে করেন যে, এ সকলই কৃত্রিম। ইন্দিরার মনে এতটুকু গর্ব্ব আছে যে, কেবল ভরণপোষণের লোভে, অথবা স্বামীর ধনে ধনেশ্বরী হইব, এই লোভে, সে সকল করিতে পারে না। স্বামী পাইব এই লোভে, কৃত্রিম প্রণয় প্রকাশ করিতে পারিতাম না : ইন্দ্রের

ইন্দ্রাণী হইব, এমন লোভেও পারিতাম না। স্বামীকে মোহিত করিব বলিয়া হাসি চাহনির ঘটা ঘটাইতে পারি, কিন্তু স্বামীকে মোহিত করিব বলিয়া কৃত্রিম ভালবাসা ছড়াইতে পারি না। ভগবান্ সে মাটিতে ইন্দিরাকে গড়েন নাই। যে অভাগী এ কথাটা না বুঝিতে পারিবেন,—যে নারকিণী আমায় বলিবে, “হাসি চাহনির ফাঁদ পাতিতে পার, খোঁপা খুলিয়া আবার বাঁধিতে পার, কথার ছলে সুগন্ধি কুঞ্চিতালকগুলি হতভাগ্য মিন্‌সের গালে ঠেকাইয়া তাকে রোমাঞ্চিত করিতে পার—আর পার না তার পাখানি তুলিয়া লইয়া টিপিয়া দিতে, কিম্বা হুঁকার ছিলিমটায় ফুঁ দিতে!”—যে হতভাগী আমাকে এমন কথা বলিবে, সে পোড়ারমুখী আমার এই জীবনবৃত্তান্ত যেন পড়ে না।

তা, তোমরা পাঁচ রকমের পাঁচ জন মেয়ে আছ, পুরুষ পাঠকদিগের কথা আমি ধরি না—তাহারা এ শাস্ত্রের কথা কি বুঝিবে—তোমাদের আসল কথাটা বুঝাইয়া বলি। ইনি আমার স্বামী—পতিসেবাতেই আমার আনন্দ—তাই,—কৃত্রিম নহে—সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত, আমি তাহা করিতেছিলাম। মনে মনে করিতেছিলাম যে, যদি আমাকে গ্রহণ নাই করেন, তবে আমার পক্ষে পৃথিবীর যে সার সুখ,—যাহা আর কখনও ঘটে নাই, আর কখনও ঘটিতে নাও পারে, তাহা অন্ততঃ এই কয় দিনের জন্য প্রাণ ভরিয়া ভোগ করিয়া লই। তাই প্রাণ ভরিয়া পতিসেবা করিতেছিলাম। ইহাতে কি পরিমাণে সুখী হইতেছিলাম, তা তোমরা কেহ বুঝিবে, কেহ বুঝিবে না।

পুরুষ পাঠককে দয়া করিয়া কেবল হাসি চাহনির তত্ত্বটা বুঝাইব। যে বুদ্ধি কেবল কলেজের পরীক্ষা দিলেই সীমাপ্রান্তে পৌঁছে, ওকালতিতে দশ টাকা আনিতে পারিলেই বিশ্ববিজয়িনী প্রতিভা বলিয়া স্বীকৃত হয়, যাহার অভাবই রাজদ্বারে সন্মানিত, সে বুদ্ধির ভিতর পতিভক্তিতত্ত্ব প্রবেশ করান যাইতে পারে না। যাহারা বলে বিধবার বিবাহ দাও, ধেড়ে মেয়ে নহিলে বিবাহ দিও না, মেয়েকে পুরুষ মানুষের মত নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত কর, তাহারা পতিভক্তিতত্ত্ব বুঝিবে কি ? তবে হাসি চাহনির তত্ত্বটা যে দয়া করিয়া বুঝাইব বলিয়াছি, তার কারণ, সেটা বড় মোটা কথা। যেমন মাহুত অঙ্কুশের দ্বারা হাতীকে বশ করে, কোচমান্ ঘোড়াকে চাবুকের দ্বারা বশ করে, রাখাল গোরুকে পাঁচনবাড়ির দ্বারা বশ করে, ইংরেজ যেমন চোখ রাঙ্গাইয়া বাবুর দল বশ করে, আমরা তেমনই হাসি চাহনিতে তোমাদের বশ করি। আমাদিগের পতিভক্তি আমাদের গুণ; আমাদিগকে যে হাসি চাহনির কদর্য্য কলঙ্কে কলঙ্কিত হইতে হয়, সে তোমাদের দোষ।

তোমরা বলিবে, এ অত্যন্ত অহঙ্কারের কথা। তা বটে—আমরাও মাটির কলসী, ফুলের ঘায়ে ফাটিয়া যাই। আমার এ অহঙ্কারের ফল হাতে হাতে পাইতেছিলাম। যে ঠাকুরটির অঙ্গ নাই, অথচ ধনুর্ব্বাণ আছে,—মা বাপ, নাই* অথচ স্ত্রী আছে—ফুলের বাণ, অথচ তাহাতে পর্ব্বতও বিদীর্ণ হয়; সেই দেবতা স্ত্রীজাতির গর্ব্বখর্ব্বকারী। আমি আপনার হাসি চাহনির ফাঁদে পরকে ধরিতে গিয়া, পরকেও ধরিলাম, আপনিও ধরা পড়িলাম। আগুন ছড়াইতে গিয়া, পরকেও পোড়াইলাম, আপনিও পুড়িলাম। হোলির দিনে, আবীর খেলার মত, পরকে রাঙ্গা করিতে গিয়া, আপনি অনুরাগে রাঙ্গা হইয়া গেলাম। আমি খুন করিতে গিয়া, আপনি ফাঁসি গেলাম। বলিয়াছি, তাঁহার রূপ মনোহর রূপ—তাতে আবার জানিয়াছি, যাঁর এ রূপরাশি তিনি আমারই সামগ্রী;—

তাহারই সোহাগে আমি সোহাগিনী,
রূপসী তাহারই রূপে।

তার পর এই আগুনের ছড়াছড়ি! আমি হাসিতে জানি, হাসির কি উতোর নাই ? আমি চাহিতে জানি, চাহনির কি পাল্‌টা চাহনি নাই ? আমার অধরোষ্ঠ দূর

---

* আত্মযোনি।

হইতে চুম্বনাকাঙ্ক্ষায় ফুলিয়া থাকে, ফুলের কুঁড়ি পাপড়ি খুলিয়া ফুটিয়া থাকে, তাহার প্রফুল্লরক্তপুষ্পতুল্য কোমল অধরোষ্ঠ কি তেমনি করিয়া, ফুটিয়া উঠিয়া, পাপড়ি খুলিয়া আমার দিকে ফিরিতে জানে না ? আমি যদি তাঁর হাসিতে, তাঁর চাহনিতে, তাঁর চুম্বনাকাঙ্ক্ষায়, এতটুকু ইন্দ্রিয়াকাঙ্ক্ষার লক্ষণ দেখিতাম, তবে আমিই জয়ী হইতাম। তাহা নহে। সে হাসি, সে চাহনি, সে অধরোষ্ঠবিস্ফুরণে, কেবল স্নেহ—অপরিমিত ভালবাসা। কাজেই আমিই হারিলাম। হারিয়া স্বীকার করিলাম যে, ইহাই পৃথিবীর ষোল আনা সুখ। যে দেবতা, ইহার সঙ্গে দেহের সম্বন্ধ ঘটাইয়াছে, তাহার নিজের দেহ যে ছাই হইয়া গিয়াছে, খুব হইয়াছে।

পরীক্ষার কাল পূর্ণ হইয়া আসিল, কিন্তু আমি তাঁহার ভালবাসার এমনই অধীন হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম যে, পরীক্ষার কাল অতীত হইলে তিনি আমাকে মারিয়া তাড়াইয়া দিলেও যাইব না। পরিণামে যদি তিনি আমার পরিচয় পাইয়াও যদি আমাকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ না করেন, গণিকার মতও যদি তাঁহার কাছে থাকিতে হয়, তাহাও থাকিব, স্বামীকে পাইলে, লোকলজ্জাকে ভয় করিব না। কিন্তু যদি কপালে তাও না ঘটে, এই ভয়ে অবসর পাইলেই কাঁদিতে বসিতাম।

কিন্তু ইহাও বুঝিয়াছিলাম যে, প্রাণনাথের পক্ষচ্ছেদ হইয়াছে। আর উড়িবার শক্তি নাই। তাঁহার অনুরাগানলে অপরিমিত ঘৃতাহুতি পড়িতেছিল। তিনি এখন অনন্যকর্ম্মা হইয়া কেবল আমার মুখপানে চাহিয়া থাকিতেন। আমি গৃহকর্ম্ম করিতাম—তিনি বালকের মত আমার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেন। তাঁহার চিত্তের দুর্দ্দমনীয় বেগ প্রতি পদে দেখিতে পাইতাম, অথচ আমার ইঙ্গিত মাত্র স্থির হইতেন। কখন কখন আমার চরণস্পর্শ করিয়া রোদন করিতেন, বলিতেন, "আমি এ অষ্টাহ তোমার কথা পালন করিব—তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া যাইও না।" ফলে আমি দেখিলাম যে, আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিলে তাঁহার দশা বড় মন্দ হইবে।

পরীক্ষা ফাঁসিয়া গেল। অষ্টাহ অতীত হইলে, বিনা বাক্যব্যয়ে উভয়ে উভয়ের অধীন হইলাম। তিনি আমায় কুলটা বলিয়া জানিলেন। তাহাও সহ্য করিলাম। কিন্তু আমি যাই হই, হাতীর পায়ে শিকল পরাইয়াছি, ইহা বুঝিলাম।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ : ফাঁসির পর মোকদ্দমার তদারক

আমরা কলিকাতায় দিনকত সুখে—স্বচ্ছন্দে রহিলাম। তার পর দেখিলাম, স্বামী একদিন একখানা চিঠি হাতে করিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ ভাবে রহিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, "এত বিমর্ষ কেন ?"

তিনি বলিলেন, "বাড়ী হইতে চিঠি আসিয়াছে। বাড়ী যাইতে হইবে।"

আমি হঠাৎ বলিয়া ফেলিলাম, "আমি!" আমি দাঁড়াইয়াছিলাম—মাটিতে বসিয়া পড়িলাম। চক্ষু দিয়া দরবিগলিত ধারা পড়িতে লাগিল।

তিনি সস্নেহে হাত ধরিয়া আমায় তুলিয়া মুখচুম্বন করিয়া অশ্রুজল মুছাইয়া দিলেন। বলিলেন, "সেই কথাই আমিও ভাবিতেছিলাম। তোমায় ছাড়িয়া যাইতে পারিব না।"

আমি। সেখানে আমাকে কি বলিয়া পরিচিত করিবে ?—কি প্রকারে, কোথায় রাখিবে ?

তিনি। তাই ভাবিতেছি। সহর নহে যে, আর একটা জায়গায় রাখিব, কেহ বড় জানিতে পারিবে না। বাপ মার চক্ষের উপর, তোমায় কোথায় রাখিব ?

আমি। না গেলেই কি নয় ?

তিনি। না গেলেই নয়।

আমি। কত দিনে ফিরিবে? শীঘ্র ফের যদি, তবে আমাকে না হয়, এইখানেই রাখিয়া যাও।

তিনি। শীঘ্র ফিরতে পারিব, এমন ভরসা নাই। কলিকাতায় আমরা কালেভদ্রে আসি।

আমি। তুমি যাও—আমি তোমার জঞ্জাল হইব না। (বিস্তর কাঁদিতে কাঁদিতে এই কথা বলিলাম) আমার কপালে যা থাকে, তাই ঘটিবে।

তিনি। কিন্তু আমি যে তোমায় না দেখিলে পাগল হইব।

আমি। দেখ আমি ত তোমার বিবাহিতা স্ত্রী নহি—(স্বামী মহাশয় একটু নড়িয়া উঠিলেন)—তোমার উপর আমার কোন অধিকার নাই। আমাকে তুমি এ সময় বিদায়—

তিনি আমাকে আর কথা কহিতে দিলেন না। বলিলেন, "আজ আর এ কথায় কাজ নাই। আজ ভাবি। যা ভাবিয়া স্থির করিব, কাল বলিব।"

বৈকালে তিনি রমণ বাবুকে আসিতে লিখিলেন। লিখিলেন, "গোপনীয় কথা আছে। এখানে না আসিলে বলা হইবে না।"

রমণ বাবু আসিলেন। আমি কবাটের আড়াল হইতে শুনিতে লাগিলাম, কি কথা হয়। স্বামী বলিলেন, "আপনাদিগের সেই পাচিকাটি—যে অল্পবয়সী—তাহার নাম কি?"

রমণ। কুমুদিনী।

উপেন্দ্র। তাহার বাড়ী কোথায়?

রমণ। এখন বলিতে পারি না।

উ। সধবা না বিধবা?

র। সধবা।

উ। তার স্বামী কে জানেন?

র। জানি।

উ। কে?

র। এক্ষণে বলিবার আমার অধিকার নাই।

উ। কেন, কিছু গুপ্ত রহস্য আছে নাকি?

র। আছে।

উ। আপনারা উহাকে কোথায় পাইলেন?

র। আমার স্ত্রী তাহার মাসীর কাছে উহাকে পাইয়াছেন।

উ। যাক্—এ সব বাজে কথা। উহার চরিত্র কেমন?

র। অনিন্দনীয়। আমাদের বুড়ী রাধুঁনীটাকে বড় ক্ষেপাইত। তা ছাড়া একটি দোষও নাই।

উ। স্ত্রীলোকের চরিত্রদোষের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি।

র। এমন উৎকৃষ্ট চরিত্র দেখা যায় না।

উ। উহার বাড়ী কোথায়, কেন বলিতেছেন না ?

র। বলিবার অধিকার নাই।

উ। স্বামীর বাড়ী কোথায় ?

র। ঐ উত্তর।

উ। স্বামী জীবিত আছে ?

র। আছে।

উ। আপনি তাহাকে চেনেন ?

র। চিনি।

উ। ঐ স্ত্রীলোকটি এখন কোথায় ?

র। আপনার এই বাড়ীতে।

স্বামী মহাশয় চমকিয়া উঠিলেন। বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি প্রকারে জানিলেন ?"

র। আমার বলিবার অধিকার নাই। আপনার জেরা কি ফুরাইল ?

উ। ফুরাইল। কিন্তু আপনি ত জিজ্ঞাসা করিলেন না যে, আমি কেন আপনাকে এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলাম ?

র। দুই কারণে জিজ্ঞাসা করিলাম না। একটি এই যে, জিজ্ঞাসা করিলে, আপনি বলিবেন না। সত্য কি না?

উ। সত্য দ্বিতীয় কারণটি কি ?

র। আমি জানি, যে জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

উ। তাও জানেন ? কি বলুন দেখি ?

র। তা বলিব না।

উ। আচ্ছা, আপনি ত সব জানেন দেখিতেছি। বলুন দেখি, আমি যে অভিসন্ধি করিতেছি, তাহা ঘটিতে পারে কি না ?

র। খুব ঘটিতে পারে। আপনি কুমুদিনীকে জিজ্ঞাসা করিবেন।

উ। আর একটা কথা। আপনি কুমুদিনীর সম্বন্ধে যাহা জানেন, তাহা সব একটা কাগজে লিখিয়া দিয়া দস্তখত করিয়া দিতে পারেন ?

র। পারি—এক শর্ত্তে। আমি লিখিয়া পুলিন্দায় সীল করিয়া কুমুদিনীর কাছে দিয়া যাইব। আপনি এক্ষণে তাহা পড়িতে পারিবেন না। দেশে গিয়া পড়িবেন। রাজি ?

স্বামী মহাশয় অনেক ভাবিয়া বলিলেন, "রাজি, আমার অভিপ্রায়ের পোষাক হইবে ত ?"

র। হইবে।

অন্যান্য কথার পর রমণ বাবু উঠিয়া গেলেন। উ-বাবু আমার নিকট আসিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, " এ সব কথা হইতেছিল কেন ?"

তিনি বলিলেন, "সব শুনিয়াছ না কি ?"

আমি। হাঁ শুনিয়াছি। ভাবিতেছিলাম, আমি ত তোমায় খুন করিয়া, ফাঁসি দিয়াছি। ফাঁসির পর আর তদারক কেন ?

তিনি। এখনকার আইনে তা হইতে পারে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ : ভারি জুয়াচুরির বন্দোবস্ত

সে দিন, দিবারাত্রি, আমার স্বামী অন্যমনে ভাবিতে লাগিলেন। আমার সঙ্গে বড় কথাবার্ত্তা কহিলেন না—আমাকে দেখিলেই আমার মুখ পানে চাহিয়া থাকিতেন। তাঁহার অপেক্ষা আমার চিন্তার বিষয় বেশী; কিন্তু তাঁকে চিন্তিত দেখিয়া, আমার প্রাণের ভিতর বড় যন্ত্রণা হইতে লাগিল। আমি আপনার দুঃখ চাপিয়া রাখিয়া, তাঁহাকে প্রফুল্ল করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। নানা প্রকার গঠনের ফুলের মালা, ফুলের তোড়া, ফুলের জিনিসপত্র গড়িয়া উপহার দিলাম, পানগুলা নানা রকমের সাজিলাম, নানা রকমের সুখাদ্য প্রস্তুত করিলাম, আপনি কাঁদিতেছি, তবু নানা রসের রসভরা গল্পের অবতারণা করিলাম। আমার স্বামী বিষয়ী লোক—সর্ব্বাপেক্ষা বিষয়কর্ম্ম ভালবাসেন; তাহা বিচার করিয়া বিষয়কর্ম্মের কথা পাড়িলাম; আমি হরমোহন দত্তের কন্যা, বিষয়কর্ম্ম না বুঝিতাম, এমন নহে। কিছুতেই কিছু হইল না। আমার কান্নার উপর আরও কান্না বাড়িল।

পরদিন প্রাতে, স্নানাহ্নিকের পর জলযোগ করিয়া, তিনি আমাকে নিকটে বসাইয়া বলিলেন, "বোধ করি, যা জিজ্ঞাসা করিব, সকল কথার প্রকৃত উত্তর দিবে ?"

তখন রমণ বাবুকে জেরা করার কথাটা মনে পড়িল। বলিলাম, "যাহা বলিব, সত্যই বলিব। কিন্তু সকল কথার উত্তর না দিতে পারি।"

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার স্বামী জীবিত আছেন, শুনিলাম। তাঁর নাম ধাম প্রকাশ করিবে ?"

আমি। এখন না। দিন কত যাক্।

তিনি। তিনি এখন কোথায় আছেন বলিবে ?

আমি। এই কলিকাতায়।

তিনি। (একটু চমকিত হইয়া) তুমি কলিকাতায়, তোমার স্বামী কলিকাতায়, তবে তুমি তাঁর কাছে থাক না কেন ?

আমি। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় নাই।

পাঠক দেখিও, আসি সব সত্য বলিতেছি। আমার স্বামী এই উত্তর শুনিয়া বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "স্ত্রী পুরুষে পরিচয় নাই ? এ ত বড় আশ্চর্য্য কথা!"

আমি। সকলের কি থাকে ? তোমার কি আছে ?

একটু অপ্রতিভ হইয়া তিনি বলিলেন, "সে ত কতকগুলা দুর্দ্দৈবে ঘটিয়াছে।"

আমি। দুর্দ্দৈব সর্ব্বত্র আছে।
তিনি। যাক্—তিনি ভবিষ্যতে তোমার উপর কোন দাবি দাওয়া করিবার সম্ভাবনা আছে কি ?
আমি। সে আমার হাত। আমি যদি তাঁর কাছে আত্মপরিচয় দিই, তবে কি হয় বলা যায় না।
তিনি। তবে তোমাকে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলি, তুমি খুব বুদ্ধিমতী, তাহা বুঝিয়াছি। তুমি কি পরামর্শ দাও শুনি।
আমি। বল দেখি।
তিনি। আমাকে বাড়ী যাইতে হইবে।
আমি। বুঝিলাম।
তিনি। বাড়ী গেলে শীঘ্র ফিরিতে পারিব না।
আমি। তাও শুনিতেছি।
তিনি। তোমাকে ফেলিয়া যাইতেও পারিব না। তা হ'লে মরিয়া যাইব।
প্রাণ আমার কণ্ঠাগত, তবু আমি এক রাশি হাসি হাসিয়া বলিলাম, "পোড়া কপাল! ভাত ছড়াইলে কাকের অভাব কি ?"
তিনি। কোকিলের দুঃখ কাকে যায় না। আমি তোমাকে লইয়াই যাইব।
আমি। কোথায় রাখিবে ? কি পরিচয়ে রাখিবে ?
তিনি। একটা ভারি জুয়াচুরি করিব। তাই কাল সমস্ত দিন ভাবিয়াছি। তোমার সঙ্গে কথা কহি নাই।
আমি। বলিবে যে, এই ইন্দিরা—রামরাম দত্তের বাড়ীতে খুঁজিয়া পাইয়াছি।
তিনি। আ সর্ব্বনাশ! তুমি কে ?
স্বামী মহাশয়, নিস্পন্দ হইয়া, দুই চক্ষের তারা উপর দিকে তুলিয়া আমার মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন কি হইয়াছে ?"
তিনি। ইন্দিরা নাম জানিলে কি প্রকারে? আর আমার মনের গুপ্ত অভিপ্রায় বা জানিলে কি প্রকারে ? তুমি মানুষ, না কোন মায়াবিনী ?
আমি। সে পরিচয় পশ্চাৎ দিব। এখন আমি তোমাকে পাল্‌টা জেরা করিব, স্বরূপ উত্তর দাও।
তিনি। (সভয়ে) বল।
আমি। সেদিন তুমি আমাকে বলিয়াছিলে যে, তোমার স্ত্রীকে পাওয়া গেলেও তুমি গ্রহণ করিবে না; কেন না, তাহাকে ডাকাতে কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে; তোমার জাতি যাইবে। আমাকে ইন্দিরা বলিয়া ঘরে লইয়া গেলে সে ভয় নাই কেন ?
তিনি। সে ভয় নাই ? খুবই আছে। তবে তাহাতে আমার প্রাণের দায় ছিল না—এখন আমার প্রাণ যায়—জাতি বড়, না প্রাণ বড় ? আর সেটাও তেমন বিষম সঙ্গট নয়। ইন্দিরা যে জাতিভ্রষ্ট হইয়াছিল, এমন কথা কেহ বলে না। কালদীঘিতে যাহারা ডাকাতি করিয়াছিল, তাহারা ধরা পড়িয়াছে। তাহারা একবার করিয়াছে। একবারে বলিয়াছে, ইন্দিরার গহনাগাঁটি মাত্র কাড়িয়া লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। কেবল এখন সে কোথায় আছে, কি হইয়াছে, তাই কেহ জানে না; পাওয়া গেলে একটা কলঙ্গশূন্য বৃত্তান্ত অনায়াসেই তৈয়ার করিযা বলা যাইতে পারে। ভরসা করি, রমণ বাবু যাহা লিখিয়া দিবেন, তাহাতে তাহার পোষকতা

করিবে। তাতেও যদি কোন কথা উঠে, গ্রামে কিছু সামাজিক দিলেই গোল মিটিবে। আমাদের টাকা আছে—টাকায় সবাইকে বশীভূত করা যায়।

আমি। যদি সে আপত্তি কাটে, তবে আর আপত্তি কি?

তিনি। গোল তোমাকে লইয়া। তুমি জাল ইন্দিরা, যদি ধরা পড়?

আমি। তোমাদের বাড়ীতে আমাকেও কেহ চেনে না, আসল ইন্দিরাকেও কেহ চেনে না; কেন না, কেবল একবার বালিকাবয়সে তাহাকে তোমরা দেখিয়াছিলে, তবে ধরা পড়িব কেন?

তিনি। কথায়। নূতন লোক গিয়া জানা লোক সাজিলে সহজে কথায় ধরা পড়ে।

আমি। তুমি না হয়, আমাকে সব শিখাইয়া পড়াইয়া রাখিবে।

তিনি। তা ত মনে করিয়াছি। কিন্তু সব কথা ত শিখান যায় না। মনে কর, যদি যে কথা শিখাইতে মনে হয় নাই, এমন কথা পড়ে, তবে ধরা পড়িবে। মনে কর, যদি কখন আসল ইন্দিরা আসিয়া উপস্থিত হয়, উভয়ের মধ্যে বিচারকালে, পূর্ব্বকথা জিজ্ঞাসাবাদ হইলে তুমিই ধরা পড়িবে।

আমি একটু হাসিলাম। এমন অবস্থায় হাসিটা আপনি আসে। কিন্তু এখন আমার প্রকৃত পরিচয় দিবার সময় হয় নাই। আমি হাসিয়া বলিলাম, "আমায় কেহ ঠকাইতে পারে না। তুমি এইমাত্র আমায় জিজ্ঞাসা করিতেছিলে যে, আমি মানুষী কি মায়াবিনী। আমি মানুষী নহি, (তিনি শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন) আমি কি, তাহা পরি বলিব। এখন ইহাই বলিব যে, আমাকে কেহ ঠকাইতে পারে না।"

স্বামী মহাশয় স্তম্ভিত হইলেন। তিনি বুদ্ধিমান্ কর্ম্মঠ লোক। নহিলে এত অল্প দিনে এত টাকা রোজগার করিতে পারিতেন না। মানুষটা বাহিরে একটু নীরস,—কাঠ কাঠ রকম, পাঠক তাহা বুঝিয়া থাকিবেন—কিন্তু ভিতরে বড় মধুর, বড় কোমল, বড় স্নেহশালী;—কিন্তু রমণ বাবুর মত, এখনকার ছেলেদের মত, "উচ্চ শিক্ষায়" শিক্ষিত নহেন। তিনি ঠাকুর দেবতা খুব মানিতেন। নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া ভূত, প্রেত, ডাকিনী যোগিনী, যোগী মায়াবিনী প্রভৃতির গল্প শুনিয়াছিলেন। সে সকল একটু বিশ্বাস করিতেন। তিনি আমার দ্বারা যেরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার এই সময়ে স্মরণ হইল; যাহাকে আমার অসাধারণ বুদ্ধি বলিতেন, তাহাও স্মরণ হইল; যা বুঝিতে পারেন নাই, তাহাও স্মরণ হইল। অতএব আমি যে বলিলাম, আমি মানুষী নহি, তাহাতে তাঁহার একটু বিশ্বাস হইল। তিনি কিছু কাল স্তম্ভিত ও ভীত হইয়া রহিলেন। কিন্তু তার পর নিজ বুদ্ধিবলে, সে বিশ্বাসটুকু দূর করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি কেমন মায়াবিনী, আমি যা জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি?"

আমি। জিজ্ঞাসা কর।

তিনি। আমার স্ত্রীর নাম ইন্দিরা, জান। তার বাপের নাম কি?

আমি। হরমোহন দত্ত।

তিনি। তাঁর বাড়ী কোথায়?

আমি। মহেশপুর।

তিনি। তুমি কে !!!

আমি। তা ত বলিয়াছি যে, পরে বলিব। মানুষ নই।

তিনি। তুমি বলিয়াছিলে, তোমার বাপের বাড়ী কালাদীঘি। কালাদীঘির লোক, এ সকল জানিলে জানিতে পারে। এইবার বল—হরমোহন দত্তের বাড়ীর সদর দরওয়াজা কোন্ মুখ ?

আমি। দক্ষিণমুখ। একটা বড় ফটকে দুই পাশে দুইটা সিংহী।

তিনি। তাঁর কয় ছেলে ?

আমি। এক।

তিনি। নাম কি ?

আমি। বসন্তকুমার।

তিনি। তার কয় ভগিনী ?

আমি। আপনার বিবাহের সময় দুইটি ছিল।

তিনি। নাম কি ?

আমি। ইন্দিরা আর কামিনী।

তিনি। তাঁর বাড়ীর নিকট কোন পুকুর আছে ?

আমি। আছে। নাম দেবীদীঘি। তাতে খুব পদ্ম ফুটে।

তিনি। হাঁ, তা দেখিয়াছিলাম। তুমি কখন মহেশপুরে ছিলে ? তার বিচিত্র কি ? তাই এত জান। আর গোট কতক কথা বল দেখি। ইন্দিরার বিবাহে সম্প্রদান কোথায় হয় ?

আমি। পূজার দালানের উত্তরপশ্চিম কোণে।

তিনি। কে সম্প্রদান করে ?

আমি। ইন্দিরার খুড়া কৃষ্ণমোহর দত্ত।

তিনি। স্ত্রী আচারকালে এক জন আমার বড় জোরে কাণ মুলিয়া দিয়াছিল। তার নাম আমার মনে আছে। বল দেখি তার নাম ?

আমি। বিন্দু ঠাকুরাণী—বড় বড় চোখ, রাঙ্গা ঠোঁট। নাকে ফাঁদি নথ।

তিনি। ঠিক। বোধ হয়, তুমি বিবাহের দিন উপস্থিত ছিলে। তাদের কুটম্ব নও ত ?

আমি। কুটুম্বের মেয়ে, চাকরাণী, কি রাঁধুনীর মেয়ের জানা সম্ভব নয়, এমন দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা কর না।

তিনি। ইন্দিরার বিবাহ কবে হইয়াছিল ?

আমি।—সালে বৈশাখ মাসের ২৭ তারিখে শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশীতে।

তিনি চুপ করিয়া ভাবিলেন। তার পর বলিলেন, “আমায় অভয় দাও, আমি আর দুইটা কথা জিজ্ঞাসা করিব?”

আমি। অভয় দেতেছি। বল।

তিনি। বাসরঘরে সকলে উঠিয়া গেলে, আমি ইন্দিরাকে নির্জ্জনে একটি কথা বলিয়াছিলাম, সে তাহার উত্তর দিয়াছিল। কি কথা সে, বল দেখি ?

বলিতে আমার একটু বিলম্ব হইল। কারণ, সে কথাটা মনে করিতে আমার চক্ষে জল আসিতেছিল, আমি তাহা সামলাইতেছিলাম। তিনি বলিলেন, "এইবার বোধ হয় ঠকিলে! বাঁচিলাম—তুমি মায়াবিনী নয়।" আমি চক্ষের জল চক্ষের ভিতর ফেরত দিয়া বলিলাম, "তুমি ইন্দিরাকে জিজ্ঞাসা করিলে, "বল দেখি, আজ তোমার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ হইল ?" ইন্দিরা বলিল, 'আজ হইতে তুমি আমার দেবতা হইলে, আমি তোমার দাসী হইলাম।' এই ত গেল একটা প্রশ্ন। আর একটা কি ?"

তিনি। আর জিজ্ঞাসা করিতে ভয় করিতেছিল। আমি বুঝি বুদ্ধি হারাইলাম। তবু বল। ফুলশয্যার দিন ইন্দিরা তামাসা করিয়া আমাকে গালি দিয়াছিল, আমিও তার কিছু সাজা দিয়াছিলাম। বল দেখি, সে কথাগুলি কি ?

আমি। তুমি ইন্দিরার হাত এক হাতে ধরিয়া, আর হাত তার কাঁধে দিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, 'ইন্দিরে, বল দেখি, আমি তোমার কে ?' তাতে ইন্দিরা উত্তর করিয়াছিল, 'শুনিয়াছি, তুমি আমার ননদের বর।' তুমি দণ্ডস্বরূপ তার গালে একটা ঠোনা মারিয়া, তাকে একটু অপ্রতিভ দেখিয়া পরিশেষে মুখচুম্বন করিয়াছিলে। বলিতে বলিতে আমার শরীর অপূর্ব্ব আনন্দরসে আপ্লুত হইল—সেই আমার জবিনের প্রথম মুখচুম্বন। তার পর সুভাষিণীকৃত সেই সুধাবৃষ্টি। ইহার মধ্যে ঘোরতর অনাবৃষ্টি গিয়াছে। হৃদয় শুকাইয়া মাঠ ফাটা হইয়াছিল।

এই কথা ভাবিতেছিলাম, দেখিলাম, স্বামী ধীরে ধীরে বালিসের উপর মাথা রাখিয়া চক্ষু বুজিলেন। আমি বলিলাম, "আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবে ?"

তিনি বলিলেন, "না। হয় তুমি স্বয়ং ইন্দিরা, নয় কোন মায়াবিনী।"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ : বিদ্যাধরী

দেখিলাম, এক্ষণে অনায়াসে আত্মপরিচয় দিতে পারি। আমার স্বামীর নিজ মুখ হইতে আমার পরিচয় ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিতে, আমি পরিচয় দিব না, স্থির করিয়াছিলাম। তাই বলিলাম, "এখানে আত্মপরিচয় দিব। কামরূপে আমার অধিষ্ঠান। আমি আদ্যাশক্তির মহামন্দিরে তাঁহার পার্শ্বে থাকি। লোকে আমাদিগকে ডাকিনী বলে, কিন্তু আমরা ডাকিনী নই। আমরা বিদ্যাধরী। আমি মহামায়ার নিকট কোন অপরাধ করিয়াছিলাম, সেই জন্য অভিসম্পাতগ্রস্ত হইয়া এই মানবীরূপ ধারণ করিয়াছি। পাচিকাবৃত্তি এবং কুলটাবৃত্তিও ভগবতীর শাপের ভিতর। তাই এ সকলও অদৃষ্টে ঘটিয়াছে। এক্ষণে আমার শাপ হইতে মুক্ত হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমি জগন্মাতাকে স্তবে প্রসন্ন করিলে, তিনি আজ্ঞা করিয়াছেন যে মহাভৈরবীদর্শন করিবামাত্র আমি মুক্তিলাভ করিব।"

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কোথায় ?"

আমি বলিলাম, "মহাভৈরবীর মন্দির মহেশপুরে তোমার শ্বশুরবাড়ীর উত্তরে। সে তাঁদেরই ঠাকুরবাড়ী, বাড়ীর গায়ে, খিড়কি দিয়া যাতায়াতের পথ আছে। চল, মহেশপুরে যাই।"

তিনি ভাবিয়া বলিলেন, "তুমি বুঝি আমার ইন্দিরাই হইবে। কুমুদিনী যদি ইন্দিরা, তাহা হইলে কি সুখ! পৃথিবীতে তাহা হইলে আমার মত সুখী কে ?"

আমি। যেই হই, মহেশপুর গেলেই সব গোল মিটিবে।

তিনি। তবে চল, কাল এখান হইতে যাত্রা করি। আমি তোমাকে কালাদীঘি পার করিয়া দিয়া মহেশপুরে পাঠাইয়া দিয়া, নিজে আপাততঃ বাড়ী যাইব। দুই একদিন সেখানে থাকিয়া আমি মহেশপুর যাইব। যোড়হাতে তোমার কাছে এই ভিক্ষা করি যে, তুমি ইন্দিরাই হও, আর কুমুদিনীই হও, আর বিদ্যাধরী হও, আমাকে ত্যাগ করিও না।

আমি। না। আমার শাপান্ত হইলেও দেবীর কৃপায় আবার তোমায় পাইতে পারিব। তুমি আমার প্রাণাধিক প্রিয় বস্তু।

"এ কথাটা ত ডাকিনীর মত নহে।" এই বলিয়া তিনি সদরে গেলেন। সেখানে লোক আসিয়াছিল। লোক আর কেহ নহে, রমণ বাবু। রমণ বাবু, আমার স্বামীর সঙ্গে অন্তঃপুরে আসিয়া আমাকে সীল-করা পুলিন্দা দিয়া গেলেন। আমার স্বামীকে সে সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, আমাকেও সেই উপদেশ দিলেন। শেষ বলিলেন, "সুভাষিণীকে কি বলিব ?"

আমি বলিলাম, "বলিবেন, কাল আমি মহেশপুর যাইব। গেলেই আমি শাপ হইতে মুক্ত হইব।"

স্বামী বলিলেন, "আপনাদের এ সব জানা আছে না কি ?"

চতুর রমণ বাবু বলিলেন, "আমি সব জানি না, কিন্তু আমার স্ত্রী সুভাষিণী সব জানেন।"

বাহিরে আসিয়া স্বামী মহাশয় রমণ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ডাকিনী যোগিনী বিদ্যাধরী প্রভৃতি বিশ্বাস করেন ?"

রমণ বাবু রহস্যখানা কতক বুঝিয়াছিলেন, বলিলেন, "করি। সুভাষিণী বলেন, কুমুদিনী শাপগ্রস্ত বিদ্যাধরী।"

স্বামী বলিলেন, "কুমুদিনী কি ইন্দিরা, আপনার স্ত্রীকে ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন।"

রমণ বাবু আর দাঁড়াইলেন না। হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ : বিদ্যাধরীর অন্তর্দ্ধান

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইলে পর আমরা যথাকালে উভয় কলিকাতা হইতে যাত্রা করিলাম। তিনি আমাকে কালাদীঘি নামক সেই হতভাগ্য দীঘি পার করিয়া দিয়া নিজালয়ের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সঙ্গের লোকজন আমাকে মহেশপুর লইয়া গেল। গ্রামের বাহিরে বাহক ও রক্ষকদিগকে অবস্থিতি করিতে বলিয়া দিয়া আমি পদব্রজে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সম্মুখেই পিতাকে দেখিয়া প্রণাম করিলাম। তিনি আমাকে চিনিতে পারিয়া আহ্লাদে বিবশ হইলেন। সে সকল কথা এস্থানে বলিবার অবসর নাই।

আমি এত দিন কোথায় ছিলাম, কি প্রকারে আসিলাম—তাহা কিছুই বলিলাম না। পিতামাতা জিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম, "এর পরে বলিব।"

সময়ান্তরে স্থূল কথা তাঁহাদিগকে বলিলাম, কিন্তু সব কথা নহে। এতটুকু বুঝিতে দিলাম যে, পরিশেষে আমি স্বামীর নিকটেই ছিলাম এবং স্বামীর নিকট হইতেই আসিয়াছি। এবং তিনিও দুই একদিনের মধ্যে এখানে আসিবেন। সব কথা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কামিনীকে বলিলাম। কামিনী আমার অপেক্ষা দুই বৎসরের ছোট। বড় রঙ্গ ভালবাসে। সে বলিল, "দিদি! যখন মিত্রজা এত বড় গোবরগণেশ, তাকে নিয়া একটু রঙ্গ করিলে হয় না?" আমি বলিলাম, "আমারও সেই ইচ্ছা।" তখন দুই বহিনে পরামর্শ আঁটিলাম। সকলকে শিখাইয়া ঠিক করিলাম। বাপ-মাকেও একটু শিখাইতে হইল। কামিনী তাঁহাদিগকে বুঝাইল যে, প্রকাশ্যে গ্রহণ

করাটা এখনও হয় নাই। সেটা এইখানে হইবে। আমরাই তাহা করিয়া লইব। তবে আমি যে এখানে আসিয়াছি, এই কথাটা তাঁহারা, জামাতা আসিলে তাঁহার সাক্ষাতে প্রকাশ না করেন।

পরদিন, সে জামাতা আসিলেন। পিতা-মাতা তাঁহাকে যথেষ্ট আদর-অপেক্ষা করিলেন। আমি আসিয়াছি, এ কথা বাহিরে কাহারও মুখে তিনি শুনিলেন না। কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। যখন অন্তঃপুরে জলযোগ করিতে আসিলেন, তখন বড় বিষণ্ণবদন।

জলযোগের সময়, আমি সম্মুখে রহিলাম না। কামিনী বসিল, আর দুই চারি জন জ্ঞাতি ভগিনী ভাইজ বসিল। তখন সন্ধ্যাকাল উত্তীর্ণ হইয়াছে। কামিনী অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল; তিনি যেন কলে উত্তর দিতে লাগিলেন। আমি আড়ালে দাঁড়াইয়া সব শুনিতে দেখিতে লাগিলাম। পরিশেষে তিনি কামিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার দিদি কোথায়?"

কামিনী খুব একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কি জানি কোথায়? কালাদীঘিতে সেই যে সর্ব্বনাশটা হইয়া গেল, তার পর ত আর কোন খবর পাওয়া যায় নাই।"

তাঁর মুখখানা বড় লম্বা হইয়া গেল। কথা আর কহিতে পারেন না। বুঝি কুমুদিনীকে হারাইলাম, এ কথা মনে করিয়া থাকিবেন; কেন না, তাঁর চক্ষু দিয়া দরবিগলিত ধারা বহিতে লাগিল।

চক্ষের জল সামলাইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুমুদিনী বলিয়া, কোন স্ত্রীলোক আসিয়াছিল কি?"

কামিনী বলিল, "কুমুদিনী কি কে, তাহা বলিতে বলিতে পারি না, একটা স্ত্রীলোক পরশু দিন পাল্কী করিয়া আসিয়াছিল বটে। সে বরাবর মহাভৈরবীর মন্দিরে গিয়া উঠিয়া দেবীকে প্রণাম করিল। অমনিই একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার উপস্থিত হইল। হঠাৎ মেঘ অন্ধকার হইয়া ঝড়বৃষ্টি হইল। সেই স্ত্রীলোকটা সেই সময় ত্রিশূল হাতে করিয়া জ্বলিতে জ্বলিতে আকাশে উঠিয়া কোথায় চলিয়া গেল।"

প্রাণনাথ জলযোগ ত্যাগ করিলেন। হাত ধুইয়া মাথায় হাত দিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন; অনেকক্ষণের পর বলিলেন, "যে স্থান হইতে কুমুদিনী অর্ন্তদ্ধান করিয়াছে, তাহা দেখিতে পাই না?"

কামিনী বলিল, "পাও বৈ কি? অন্ধকার হয়েছে—আলো নিয়ে আসি।"

এই বলিয়া কামিনী আমাকে ইঙ্গিত করিয়া গেল—"আগে তুই যা। তার পর আলো নিয়ে উপেন্দ্র বাবুকে লইয়া যাইব।" আমি আগে মন্দিরে গিয়া বারেণ্ডায় বসিয়া রহিলাম।

সেইখানে আলো ধরিয়া (খিড়কী দিয়া পথ আছে বলিয়াছি) কামিনী আমার স্বামীকে আমার কাছে লইয়া আসিল। তিনি আসিয়া আমার পদপ্রান্তে আছাড়িয়া পড়িলেন। ডাকিলেন, "কুমুদিনী, কুমুদিনী! যদি আসিয়াছ— ত আর আমায় ত্যাগ করিও না।"

তিনি বার দুই চারি এই কথা বলার পর, কামিনী চটিয়া উঠিয়া বলিল, "আয় দিদি! উঠে আয়! ও মিন্‌সে কুমুদিনী চেনে, তোকে চেনে না।"

তিনি ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি! দিদি কে?"

কামিনী রাগ করিয়া বলিল, "আমার দিদি—ইন্দিরে। কখনও নাম শোন নি?"

এই বলিয়া দুষ্টা কামিনী আলোটা নিবাইয়া দিয়া আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া আসিল। আমরা খুব ছুটিয়া আসিলাম। তিনি একটু প্রকৃতিস্থ হইলেই

আমাদের পিছু পিছু ছুটিলেন। কিন্তু অন্ধকার—পথ অচেনা; একটা চৌকাট বাধিয়া একটা ছোট রকম আছাড় খাইলেন। আমরা নিকটেই ছিলাম, দুই জনে দুই দিক্ হইতে হাত ধরিয়া তুলিলাম। কামিনী চুপি চুপি বলিল, "আমরা বিদ্যাধরী—তোমার রক্ষার জন্য সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেছি।"
এই বলিয়া, তাঁকে টানিয়া আনিয়া আমার শয্যাগৃহে উপস্থিত করিলাম। সেখানে আলো ছিল। তিনি আমাদের দেখিয়া বলিলেন, "এ কি ? এ ত কামিনী, আর এ ত কুমুদিনী।" কামিনী রাগে দশখানা হইয়া বলিল, 'আঃ পোড়া কপাল! এই বুদ্ধিতে টাকা রোজগার করছে ? কোদাল পাড় নাকি ? এ কুমুদিনী না,—ইন্দিরে—ইন্দিরে!!! তোমার পরিবার! আপনার পরিবার চিনতে পার না ?"
তখন স্বামী মহাশয় আহ্লাদে অজ্ঞান হইয়া আমাকে কোলে টানিয়া লইতে গিয়া কামিনীকেই কোলে টানিয়া লইলেন। সে তাঁর গালে এক চড় মারিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।
সেদিনের আহ্লাদের কথা বলিয়া উঠিতে পারি না। বাড়ীতে খুব উৎসাহ বাধিল। সেই রাত্রে কামিনীতে আর উ-বাবুতে প্রায় এক শত বার বাগ্‌যুদ্ধ হইল। সকল বারই প্রাণনাথ হারিলেন।

একবিংশতিতম পরিচ্ছেদ : সেকালে যেমন ছিল

কালাদীঘির ডাকাইতির পর আমার অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছিল, স্বামী মহাশয় এক্ষণে আমার কাছে সব শুনিলেন। রমণ বাবু ও সুভাষিণী যেরূপ ষড়্‌যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া গিয়াছিল, তাহাও শুনিলেন। একটু রাগও করিলেন। বলিলেন, "আমাকে এত ঘুরাইবার ফিরাইবার প্রয়োজনটা কি ছিল ?" প্রয়োজনটা কি ছিল, তাহাও বুঝাইলাম। তিনি সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু কামিনী সন্তুষ্ট হইল না। কামিনী বলিল, "তোমায় ঘানিগাছে ঘুরায় নাই, অমনি ছাড়িয়াছে, এইটুকু দিদির দোষ। আবার আব্‌দার নিলেন কি না, গ্রহণ করব না! আরে মিন্‌সে, যখন আমাদের আল্‌তা-পরা শ্রীপাদপদ্মখানি ভিন্ন তোমার জেতের গতিমুক্তি নাই, তখন অত বড়াই কেন ?"
উ-বাবু এবার একটা উতোর মারিলেন, বলিলেন, "তখন চিনিতে পারি নে যে! তোমাদের কি চিনতে জোওয়ায় ?"
কামিনী বলিল, "তুমি যে চিনিবে, বিধাতা তা কপালে লিখেন নাই। যাত্রায় শোন নি ? বলে,

> ধবলী বলিল শ্যাম, কে চেনে তোমারে!
> চিনি শুধু কাঁচা ঘাস যমুনার ধারে ॥
> পদচিহ্ন খুঁজি তব, বংশী শুনে কাণে।
> ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ তায়, গোরু কি তা জানে ?

আমি আর হাসি রাখিতে পারিলাম না। উ-বাবু অপ্রতিভ হইয়া কামিনীকে বলিলেন, "যা ভাই, আর জ্বালাস্ নে! যাত্রা করলি, তার জন্য এই পানের খিলিটা প্যালা নিয়ে যা।"
কামিনী বলিল, "ও দিদি! মিত্রজার একটু বুদ্ধিও আছে দেখিতে পাই।"
আমি। কি বুদ্ধি দেখিলি ?

কামিনী। বাবু পানের ঠিলিটা রেখে খিলিটা দিয়েছেন, বুদ্ধি নয় ? তা তুই এক কাজ করিস; মধ্যে মধ্যে তোর পায়ে হাত দিতে দিস্,—তা হলে হাত দরাজ হবে।

আমি। আমি কি ওঁকে পায়ে হাত দিতে, দিতে পারি ? উনি হলেন আমার পতিদেবতা।

কামিনী। দেবতা কবে হলেন ? পতি যদি দেবতা, তবে এত দিন ত তোমার কাছে উনি উপদেবতাই ছিলেন।

আমি। দেবতা হয়েছেন, যবে ওঁর বিদ্যাধরী গিয়েছে।

কামিনী। আহা, বিদ্যাকে ধরি ধরি করেও ধরতে পারলেন না! তা দেখ মিত্র মহাশয়, তোমার যে বিদ্যা, তাহার সঙ্গে ধরাধরি না থাকিলেই ভাল। সে বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা।

আমি। কামিনী, তুই বাড়ালি। শেষ চুরি চামারি পর্য্যন্ত ঘাড়ে ফেলিতেছিস্ ?

কামিনী। অপরাধ আমার ? যখন মিত্র মহাশয় কমিসেরিয়েটের কাজ করেছেন, তখন চুরি ত করেছেন। আর চামারি;—তা যখন রসদ যুগিয়েছেন, তখন চামারিও করেছেন।

উ-বাবু বলিলেন, “বলুক গে ছেলেমানুষ। অমৃতং বালভাষিতং।”

কামিনী। কাজেই। তুমি যখন বিদ্যাধরী শাসিতং, তখন তোমার বুদ্ধি নাশিতং। আমি তবে আসিতং— মা ডাকিতং।

বাস্তবিক মা ডাকিতেছিলেন।

কামিনী মার কাছ হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, “জান, কেন মা ডাকিতং ? তোমরা আর দুদিন থাকিতং—যদি না থাকিতং, তবে জোর ক’রে রাখিতং।”

আমরা পরস্পরের মুখপানে চাহিলাম।

কামিনী বলিল, “কেন পরস্পর তাকিতং ?”

উ-বাবু বলিলেন, “ভাবিতং।”

কামিনী বলিল, “বাড়ী গিয়া ভাবিতং। এখন দুই দিন এখানে খাবিতং, দাবিতং, হাসিতং, খুসিতং খেলিতং, ধুলিতং হেলিতং দুলিতং নাচিতং গায়িতং—”

উ-বাবু বলিলেন, “কামিনী, তুই নাচবি ?”

কামিনী। দূর, আমি কেন ? আমি যে শিকল কিনে রেখেছি—তুমি নাচবে।

উ-বাবু। আমাকে ত আসা পর্য্যন্ত নাচাচ্চ; আর কত নাচাবে—আজ তুমি একটু নাচবে।

কামিনী। তা হলে থাকিবে ?

উ-বাবু। থাকিব।

কামিনীর নাচ দেখিবার প্রত্যাশায় নহে, আমার পিতা-মাতার অনুরোধে উ-বাবু আর এক দিন থাকিতে সম্মত হইলেন। সে দিনও বড় আনন্দ গেল। দলে দলে পাড়ার মেয়েরা আসিয়া, সন্ধ্যার পর আমার স্বামীকে ঘিরিয়া লইয়া মজলিস্ করিয়া বসিল। সেই প্রকাণ্ড পুরীর একটা কোণের ঘরে মেয়েদের মজলিস্ হইল। কত মেয়ে আসিল, তার সংখ্যা নাই। কত বড় বড় পটোল-চেরা ভ্রমর-তারা চোখ, সারি বাঁধিয়া, স্বচ্ছ সরোবরে সফরীর মত খেলিতে লাগিল; কত কালো

কালো কুণ্ডলীকরা ফণাধরা অলকারাশি বর্ষাকালে বনের লতার মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া, ফুলিয়া ফুলিয়া, দুলিয়া উঠিতে লাগিল,—যেন কালিয়দমনে কালনাগিনীর দল, বিত্রস্ত হইয়া যমুনার জলে ঘুরিতে ফিরিতেছে—কত কাণ, কাণবাল, চৌদান, মাকড়ি, ঝুমকা, ইয়ার্‌রিং, দুল—মেঘ-মধ্যে বিদ্যুতের মত, কত মেঘের কত চুলের রাশির ভিতর হইতে খেলিতে লাগিল,—কত রাঙ্গা ঠোঁটের ভিতর হইতে কত মুক্তাপংক্তির মত দন্তশ্রেণীতে কত সুগন্ধি-তাম্বুল চর্ব্বণে কত রকম অধর-লীলার তরঙ্গ উঠিতে লাগিল;—কত প্রৌঢ়ার ফাঁদিনথের ফাঁদে কন্দর্পঠাকুর ধরা পড়িয়া, তীরন্দাজিতে জবাব দিয়া নিস্কৃতি পাইলেন—কত অলঙ্কাররাশিভূষিত সুগোল বাহুর উৎক্ষেপনিক্ষেপে বায়ুসন্তাড়িত পুষ্পিত লতাপূর্ণ উদ্যানের মত সেই কক্ষ একটা অলৌকিক চঞ্চল শোভায় শোভিত হইতে লাগিল, রুণু রুণু ঝুনু ঝুনু শিঞ্জিতে ভ্রমরগুঞ্জন অনুকৃত হইতে লাগিল : কত চিকে চিক্ চিক্; হারে বাহার; চন্দ্রহারে চন্দ্রের হার; মলের ঝলমলে চরণ টল্‌মল্! কত বানারসী, বালুচরী, মৃজাপুরী, ঢাকাই, শান্তিপুরে, সিমলা, ফরাসডাঙ্গা,—চেলি, গরদ, সূতা,—রঙ্গকরা, রঙ্গভরা, ডুরে, ফুর্‌ফুরে, ঝুর্‌ঝুরে, বাঁদুরে—তাতে কারও ঘোমটা, কারও আড়ঘোমটা, কারও আধঘোমটা,—কারও কেবল কবরীপ্রান্তে মাত্র বসনসংস্পর্শ—কারও তাতেও ভুল। আমার প্রাণনাথ অনেক গোরার পল্টন ফতে করিয়া ঘরে টাকা লইয়া আসিয়াছেন—অনেক কর্ণেল, জান্‌রেলের বুদ্ধিভ্রংশ করিয়া, লাভের অংশ ঘরে লইয়া আসিয়াছেন—কিন্তু এই সুন্দরীর পল্টন দেখিয়া, তিনি বিশুষ্ক—বিত্রস্ত। তোপের আগুনের স্থানে নয়নবহ্নির স্ফূর্ত্তি-কামানের কালকরালকুণ্ডলীকৃত ধূমপুঞ্জের পরিবর্ত্তে এই কালকরালকুণ্ডলীকৃত কমনীয় কেশকাদম্বিনী, বেওনেটের ঠন্‌ঠনির পরিবর্ত্তে এই অলঙ্কারের রুণরুণি; জয়ঢাকের বাদ্যের পরিবর্ত্তে আলতা-পরা পায়ে মলের ঝুম্‌ঝমি! যে পুরুষ চিলিয়ানওয়ালা দেখিয়াছে—সেও হতাশ্বাস। এ ঘোর রণক্ষেত্রে তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য, তিনি আমাকে দ্বারদেশে দেখিতে পাইয়া ইঙ্গিতে ডাকিলেন—কিন্তু আমিও শিখ সেনাপতির মত, বিশ্বাসঘাতকতা করিলাম—এ রণে তাঁহার সাহায্য করিলাম না।

স্থূল কথা, এই সকল মজলিস্‌গুলায় অনেক নির্লজ্জ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে জানিতাম। তাই কামিনী আর আমি গেলাম না—বাহিরে রহিলাম। দ্বার হইতে মধ্যে মধ্যে উঁকি মারিতে লাগিলাম। যদি বল, যাহাতে নির্লজ্জ ব্যাপার ঘটে, তুমি তাহার বর্ণনায় কেন প্রবৃত্ত, তাহাতে আমার এই উত্তর এই যে, আমি হিন্দুর মেয়ে, আমার রুচিতে এই সকল বাপ্যার নির্লজ্জ ব্যাপার। কিন্তু এখনকার প্রচলিত রুচি ইংরেজি রুচি; ইংরেজি রুচির বিধানমতে বিচার করিলে ইহাতে নির্লজ্জ ব্যাপার কিছুই পাওয়া যাইবে না।

বলিয়াছি, আমি ও কামিনী দুই জনে একবার উঁকি মারিলাম। দেখি, পাড়ার যমুনাঠাকুরাণী সভাপত্নী হইয়া জমকাইয়া বসিয়া আছেন। তাঁর বয়স পঁয়তাল্লিশ ছাড়াইয়াছে; রঙটা মিঠে রকম কালো; চোখ দুইটা ছোট ছোট, কিন্তু একটু ঢুলু ঢুলু ঠোঁট দুইখানা পুরু, কিন্তু রসে ভরা ভরা। বস্ত্রালঙ্কারের বাহার—পায়ে আলতার বাহার কালোতে রাঙ্গা, যেন যমুনাতেই জবা,—মাথায় ছেঁড়া চুলের বাহার। শরীরের ব্যাস ও পরিধি অসাধারণ দেখিয়া, আমার স্বামী তাঁহাকে “নদীরূপা মহিষী” বলিয়া ব্যঙ্গ করিতেছেন। মথুরাবাসীরা যমুনা নদীকে কৃষ্ণের নদীরূপা মহিষী বলিয়া থাকে, সেই কথা লক্ষ্য করিয়া উ-বাবু এই রসিকতা করিলেন। এখন আমার যমুনা দিদি কখনও মথুরা যান নাই, এত খবরও জানেন না, এবং মহিষী শব্দের অর্থটা জানেন না। তিনি মহিষী অর্থে কেবল মাদি মহিষই বুঝিয়াছিলেন এবং সেই জন্তুর সহিত আপনার শরীরের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া রাগে গর গর করিতেছিলেন। প্রতিশোধার্থ তিনি আমার স্বামীর সম্মুখে আমাকে প্রকারান্তরে “গাই” বলিলেন, এমন সময় আমি দ্বার হইতে মুখ বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “যমুনা দিদি! কি গা ?”

যমুনা দিদি বললেন, “একটা গাই ভাই।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “গাই কেন গা ?”

কামিনী আমার পাশ হইতে বলিল, "ডেকে ডেকে যমুনা দিদির গলা কাঠ হইয়া গিয়াছে। একবার পিওবে।"
হাসির চোটে সভাপত্নী মহাশয়া নিবিয়া গেলেন, কামিনীর উপর গরম হইয়া বলিলেন, "একরত্তি মেয়ে, তুই সকল হাঁড়িতে কাটি দিস্ কেন্ লো কামিনী ?"
কামিনী বলিল, "আর ত কেউ তোমার ভুসি কলাই সিদ্ধ করতে জানে না।"
এই বলিয়া কামিনী পলাইল, আমি পলাইলাম। আবার একবার গিয়া উঁকি মারিলাম, দেখি, পাড়ার পিয়ারী ঠান্‌দিদি, জাতিতে বৈদ্য—বয়স পঞ্চষষ্টি বৎসর, তার মধ্যে পঞ্চবিংশতি বৎসর বৈধব্যে কাটিয়াছে—তিনি সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার পরিয়া ঘাঘরা পরিয়া রাধিকা সাজিয়া আসিয়াছেন। আমার স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া কৃষ্ণ কৈ ? কৃষ্ণ কৈ ? বলিয়া সেই কামিনীকুঞ্জবন পরিভ্রমণ করিতেছেন।
আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি খোঁজ ঠান্‌দিদি ?"
তিনি বলিলেন, "আমি কৃষ্ণকে খুঁজি।"
কামিনী বলিল, "গোয়ালবাড়ী যাও—এ কায়েতের বাড়ী।"
রসিকতাপ্রবীণা বলিল, "কায়েতের বাড়ীই আমার কৃষ্ণ মিলিবে।"
কামিনী বলিল, "ঠান্‌দিদি, সকল জাতেই জাত দিয়াছ নাকি ?"
এখন পিয়ারী ঠাকুরাণীর এককালে তেলি অপবাদ ছিল। এই কথায়, তিনি তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া কামিনীকে ব্যঙ্গচ্ছলে গালি পাড়িতে আরম্ভ করিলেন। আমি তাঁকে থামাইবার জন্য, যমুনা দিদিকে দেখাইয়া দিয়া বলিলাম, "রাগ কর কেন ? তোমার কৃষ্ণ ঐ যমুনায় ঝাঁপ দিয়াছেন। এসো—তোমায় আমায় পুলিনে দাঁড়াইয়া একটু কাঁদি।"
যমুনা ঠাকুরাণী "মহিষী" শব্দের অর্থবোধে যেমন পণ্ডিতা, "পুলিন" শব্দের অর্থবোধেও সেইরূপ। তিনি ভাবিলেন, আমি বুঝি কোন পুলিনবিহারীর কথার ইঙ্গিত করিয়া তাঁহার অকলঙ্কিত সতীত্বের—(অকলঙ্কিত তাঁহার রূপের প্রভাবে)—প্রতি কোন প্রকার ইঙ্গিত করিয়াছি।
তিনি সক্রোধে বলিলেন, "এর ভিতর পুলিন কে লো ?"
কাজেই আমারও একটু রঙ্গ চড়াইতে ইচ্ছা হইল। আমি বলিলাম, "যার গায়ে পড়িয়া যমুনা রাত্রিদিন তরঙ্গভঙ্গ করে, বৃন্দাবনে তাকে পুলিন বলে।"
আবার তরঙ্গভঙ্গে সর্ব্বনাশ করিল,—যমুনা দিদি ত কিছু বুঝিল না, রাগিয়া বলিল, "তোর তরঙ্গ ফরঙ্গকেও চিনি যে, তোর পুলিনকেও চিনি নে, তোর বেন্দাবনকে চিনি নে। তুই বুঝি ডাকাতের কাছে এত সব রঙ্গরসের নাম শিখে এসেছিস্ ?"
মজলিসের ভিতর রঙ্গময়ী বলিয়া আমার একজন সমবয়স্কা ছিল। সে বলিল, "অত ক্ষেপ কেন যমুনা দিদি! পুলিন বলে নদীর ধারের চড়াকে। তোমার দু ধারে কি চড়া আছে ?"
চঞ্চলা নামে যমুনা দিদির ভাইজ, ঘোমটা দিয়া পিছনে বসিয়াছিল, সে ঘোমটার ভিতর হইতে মৃদু মধুর স্বরে বলিল, "চড়া থাকিলেও বাঁচিতাম! একটা ফরসা কিছু দেখিতে পাইতাম। এখন কেবল কালো জলের কালিন্দী কল্ কল্ করিতেছে।"
কামিনী বলিল, "আমার যমুনা দিদিকে কেন তোরা অমন ক'রে চড়ার মাঝখানে ফেলে দিতেছিস্!"
চঞ্চলা বলিল, "বালাই! ষাট্! ঠাকুরঝিকে চড়ার মাঝখানে ফেলে দেবে কেন? ওঁর ভাইয়ের পায়ে ধ'রে বলব, যেন ঠাকুরঝিকে মেঠো শ্মশানে দেন।"

রঙ্গময়ী বলিল, “দুটোতে তফাৎ কি বৌ ?”

চঞ্চলা বলিল, “শ্মশানে শিয়াল কুকুরের উপকার;— চড়ায় গোরু মহিষ চরে—তাদের কি উপকার ?” মহিষ কথাটা বলিবার সময়ে, বৌ একবার ঘোমটা তুলিয়া ননদের উপর সহাস্যে কটাক্ষ করিল।

যমুনা বলিল, “নে আর এক-শ বার সেই কথা ভাল লাগে না। যাদের ভাল লাগে, তারাই এক-শ বার মোষ মোষ করুক গে।”

পিয়ারী ঠান্‌দিদি কথাটার বড় কাণ দেন নাই—তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “মোষের কথা কি গা ?”

কামিনী বলিল, “কোন্ দেশে তেলিদের বাড়ী মোষে ঘানি টানে, সেই কথা হ’চ্ছে।”

এই বলিয়া কামিনী পলাইল। বার বার সেই তেলি কথাটা মনে করিয়া দেওয়াটা ভাল হয় নাই—কিন্তু কামিনী কুচরিত্রা লোক দেখিতে পারিত না। পিয়ারী ঠান্‌দিদি, রাগে অন্ধকার দেখিয়া আর কথা না কহিয়া উ-বাবুর কাছে গিয়া বসিল। আমি তখন কামিনীকে ডাকিয়া বলিলাম, “কামিনী! দেখ্‌সে আয় লো! এইবার পিয়ারী কৃষ্ণ পেয়েছেন।”

কামিনী দূর হইতেই বলিল, “অনেক দিন সময় হয়েছে।”

তার পর একটা সোরগোল শুনিলাম। আমার স্বামীর আওয়াজ শুনিতে পাইলাম—তিনি একজনকে হিন্দিতে ধমকধামক করিতেছেন। আমরা দেখিতে গেলাম। দেখিলাম, এক জন দাড়িওয়ালা মোগল ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে; উ-বাবু তাহাকে তাড়াইবার জন্য ধমকধামক করিতেছেন, মোগল যাইতেছে না। কামিনী তখন দ্বার হইতে ডাকিয়া বলিল, “মিত্র মহাশয়! গায়ে কি জোর নেই ?”

মিত্র মহাশয় বলিলেন, “আছে বই কি ?”

কামিনী বলিল, “তবে মোগল মিন্‌সেকে গলা ধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া দাও না।”

এই বলিবা মাত্র মোগল ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। পলায়ন করিবার সময় আমি তাহার দাড়ি ধরিলাম— পরচুলা খসিয়া আসিল। মোগল বলিল, “মরণ আর কি! তা এ বোকাটি নিয়ে ঘর করিবি কি প্রকারে?” এই বলিয়া সে পলাইল। আমি দাড়িটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া যমুনা দিদিকে উপহার দিলাম। উ-বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “ব্যাপার কি?”

কামিনী বলিল, “ব্যাপার আর কি ? তুমিই দাড়িটা পরিয়া চারি পায়ে ঘাসবনে চরিতে আরম্ভ কর।”

উ-বাবু বলিলেন, “কেন, মোগল কি জাল ?”

কামিনী। কার সাধ্য এমন কথা বলে! শ্রীমতী অনঙ্গমোহিনী দাসী কি জাল মোগল হইতে পারে! আসল দিল্লীর আমদানি।

একটা ভারি হাসি পড়িয়া গেল। আমি একটু মনঃক্ষুণ্ন হইয়া চলিয়া আসিতেছিলাম, এমন সময়ে পাড়ার ব্রজসুন্দরী দাসী একখানি জীর্ণ বস্ত্র পরিয়া একটি ছেলে কোলে করিয়া উ-বাবুর কাছে গিয়া দুঃখের কান্না কাঁদিতে লাগিল। “আমি বড় গরীব; খেতে পাই না; ছেলেটি মানুষ করিতে পারি না।” উ-বাবু তাহাকে কিছু দিলেন। আমরা দুই জনে দ্বারের দুই পাশে। সে যখন দ্বার পার হয়, কামিনী তাহাকে বলিল, “ভাই ভিখারিণী! জান ত বড় মানুষের কাছে ভিক্ষা পাইলে দ্বারবান্‌দের কিছু ঘুস দিয়ে যেতে হয় ?”

ব্রজসুন্দরী বলিল, “দ্বারবান্ কে ?”

কামিনী। আমরা দুই জন।
ব্রজ। কত ভাগ চাও ?
কামিনী। পেয়েছ কি ?
ব্রজ। দশটি টাকা।
কা। তবে, আমাদের আট টাকা আট টাকা ষোল টাকা দিয়া যাও।
ব্রজ। লাভ মন্দ নয়!
কা। তা বড় মানুষের বাড়ীর ভিক্ষায় লাভালাভ ধরিতে গেলে চলিবে কেন ? সময়ে অসময়ে ঘর থেকেও কিছু দিতে হয়।
ব্রজসুন্দরী বড় মানুষের স্ত্রী। ধাঁ করিয়া ষোল টাকা বাহির করিয়া দিল। আমরা সেই ষোলটাকা যমুনা ঠাকুরাণীকে দিলাম, বলিলাম, "তোমরা এই টাকায় সন্দেশ খাইও।"
স্বামী বলিলেন, "ব্যাপার কি ?"
ততক্ষণে ব্রজসুন্দরী ছেলে পাঠাইয়া দিয়া, বানারসী পরিয়া আসিয়া বসিলেন। আবার একটা হাসির ঘটা পড়িয়া গেল।
উ-বাবু বলিলেন, "এ কি যাত্রা নাকি ?"
যমুনা বলিল, "তা না ত কি ? দেখিতেছ না, কাহারও কালিয়দমনের পালা, কারও কলঙ্কভঞ্জনের পালা, কারও মাথুর মিলন,—কারও শুধু পালাই পালাই পালা।"
উ-বাবু। শুধু পালাই পালাই পালা কার ?
যমুনা। কেন কামিনীর! কেবল পালাই পালাই তার পালা।
কামিনী কথায় সকলকে জ্বালাইতে লাগিল; পান, পুষ্প, আতর বিলাইয়া সকলকে তুষ্ট করিতেছিল। তখন সকলে মিলিয়া তাহাকে ধরিল, বলিল, "তুই যে বড় পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিস্ লা ?"
কামিনী বলিল, "পালাব না ত কি তোমাদের ভয় করি না কি ?"
মিত্র মহাশয় বলিলেন, "কামিনী! ভাই, তোমার সঙ্গে কি কথা ছিল ?"
কামিনী। কি কথা ছিল, মিত্র মহাশয় ?
উ-বাবু। তুমি নাচিবে।
কা। আমি ত নেচেছি।
উ। কখন নাচলে ?
কা। দুপুর বেলা।
উ। কোথায় নাচলি লো ?

কা। আমার ঘরের ভিতর, দোর বন্ধ ক’রে।

উ। কে দেখেছে ?

কা। কেউ না।

উ। তেমনতর ত কথা ছিল না।

কা। এমন কথাও ছিল না যে, তোমাদের সম্মুখে আসিয়া পেশওয়াজ পরিয়া নাচিব। নাচিব স্বীকার করিয়াছিলাম, তা নাচিয়াছি। আমার কথা রাখিয়াছি। তোমরা দেখিতে পাইলে না, তোমাদের অদৃষ্টের দোষ। এখন আমি যে শিকল কিনিয়া রাখিয়াছি, তার কি হবে ?

কামিনী যদি নাচের দায়ে এড়াইল, তবে আমার স্বামী গানের জন্য ধরা পড়িলেন। মসলিস্ হইতে হুকুম হইল। তোমাকে গায়িতে হইবে। তিনি পশ্চিমাঞ্চলে রীতিমত গীতবিদ্যা শিখিয়াছিলেন। তিনি সনদী খিয়াল গায়িলেন। শুনিয়া সে অপ্সরোমণ্ডলী হাসিল। ফরমায়েস করিল, “বদন অধিকারী, কি দাশু রায়।” তাতে উ-বাবু অপটু। সুতরাং অপ্সরোগণ সন্তুষ্ট হইল না।

এইরূপে দুই প্রহর রাত্রি কাটিল। এ পরিচ্ছেদটা না লিখিলেও পারিতাম। তবে এ দেশের গ্রাম্য স্ত্রীদিগের জীবনের এই ভাগটুকু এখন লোপ পাইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। লোপ পাইয়াছে, ভালই হইয়াছে; কেন না, ইহার সঙ্গে অশ্লীলতা, নির্লজ্জতা, কদাচিৎ বা দুর্নীতি, আসিয়া মিশিত। কিন্তু যাহা লোপ পাইয়াছে, তাহার একটা চিত্র দিবার বাসনায় এই পরিচ্ছেদটা লিখিলাম। তবে জানি না, অনেক স্থানে এ কুরীতি লোপ না পাইয়াও থাকিতে পারে। যদি তাহা হয়, তবে যাঁহারা জামাই দেখিতে পৌরস্ত্রীদিগকে যাইতে নিষেধ করেন না, তাঁহাদের চোখ কাণ ফুটাইয়া দেওয়া প্রয়োজনীয়। তাই ধরি মাছ, না ছুঁই পানি করিয়া তাঁহাদের ইঙ্গিত করিলাম।

দ্বাবিংশতিতম পরিচ্ছেদ : উপসংহার

আমি পরদিন স্বামীর সঙ্গে শিবিকারোহণে শ্বশুরবাড়ী গেলাম স্বামীর সঙ্গে যাইতেছি, সে একটা সুখ বটে, কিন্তু সে বার যে যাইতেছিলাম, সে আর এক প্রকারে সুখ। যাহা কখন পাই নাই, তাই পাইবার আশায় যাইতেছিলাম; এখন যাহা পাইয়াছিলাম, তাই আঁচলে বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছিলাম। একটা কবির কাব্য, অপরটা ধনীর ধন। ধনীর ধন কবির কাব্যের সমান কি ? যাহারা ধনোপার্জ্জন করিয়া বুড়া হইয়াছে, কাব্য হারাইয়াছে, তাহারও এ কথা বলে না। তাহারা বলে, ফুল যতক্ষণ গাছে ফুটে, ততক্ষণই সুন্দর; তুলিলে আর তেমন সুন্দর থাকে না। স্বপ্ন যেমন সুখের স্বপ্নের সফলতা কি তত সুখের হয় ? আকাশ যেমন বস্তুতঃ নীল নয়, আমরা নীল দেখি মাত্র, ধন তেমনই। ধন সুখের নয়, আমরা সুখের বলিয়া মনে করি। কাব্যই সুখ। কেন না, কাব্য আশা, ধন ভোগমাত্র। তাও সকলের কপালে নয়। অনেক ধনী লোক কেবল ধনাগারের প্রহরী মাত্র। আমার একজন কুটুম্ব বলেন, “ট্রেজুরি গার্ড।”

তবু সুখে সুখেই শ্বশুরবাড়ী চলিলাম। সেখানে, এবার নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিলাম। স্বামী মহাশয়, মাতাপিতার সমীপে সমস্ত কথা সবিশেষ নিবেদন করিলেন। রমণ বাবুর পুলিন্দা খোলা হইল। তাঁহার কথার সঙ্গে আমার সকল কথা মিলিল। আমার শ্বশুর শাশুড়ী সন্তুষ্ট হইলেন। সমাজের লোকেও সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া, কোন কথা তুলিল না।

আমি সকল ঘটনা বিবৃত করিয়া, সুভাষিণীকে পত্র লিখিলাম। সুভাষিণীর জন্য সর্ব্বদা আমার প্রাণ কাঁদিত। আমার স্বামী আমার অনুরোধে রমণ বাবুর নিকট হারাণীর জন্য পাঁচ শত টাকা পাঠাইয়া দিলেন। শীঘ্রই সুভাষিণীর উত্তর পাইলাম। উত্তর আনন্দ-পরিপূর্ণ। সুভাষিণী র-বাবুর হস্তাক্ষরে পত্র লিখিয়াছিল। কিন্তু কথাগুলো সুভাষিণীর নিজের, তাহা কথার রকমেই বুঝা গেল। সে সকলেরই সংবাদ লিখিয়াছিল। দুই একটা সংবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। সে লিখিতেছে,

“হারাণী প্রথমে কিছুতেই টাকা লইবে না। বলে, আমার লোভ বাড়িয়া যাইবে। এটা যেন ভাল কাজই করিয়াছিলাম, কিন্তু এ রকম কাজ ত মন্দই হয়। আমি যদি লোভে পড়িয়া মন্দেই রাজি হই ? আমি পোড়ারমুখীকে বুঝাইলাম যে, আমার ঝাঁটা না খাইলে কি তুই এ কাজ করিতিস্ ? সবার বেলাই কি তুই আমার হাতের ঝাঁটা খেতে পাবি ? মন্দ কাজের বেলা কি আমি তোকে তেমনই তোর সুধু মুখে ঝাঁটা খাওয়াইব ? দুটো গালাগালিও খাবি না কি ? ভাল কাজ করেছিলি, বখশিশ নে। এইরূপ অনেক বুঝান পড়ানতে সে টাকা নিয়াছে। এখন নানা রকম ব্রত নিয়ম করিবার ফর্দ্দ করিতেছে। যত দিন না তোমার এই সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল, তত দিন সে আর হাসে নাই, কিন্তু এখন তার হাসির জ্বালায় বাড়ীর লোক অস্থির হইয়াছে।”

পাচিকা ব্রাহ্মণ ঠাকুরাণীর সংবাদ সুভাষিণী এইরূপ লিখিল, “যে অবধি তুমি তোমার স্বামীর সঙ্গে গোপনে চলিয়া গিয়াছ, সে অবধি বুড়ি বড় আস্ফালন করিত, বলিত, ‘আমি বরাবর জানি, সে মানুষ ভাল নয়। তার রকম সকম ভাল নয়। কত বার বলেছি যে, এমন কুচরিত্র মানুষ তোমরা রেখ না। তা, কাঙ্গালের কথা কে গ্রাহ্য করে ? সবাই কুমুদিনী কুমুদিনী ক’রে অজ্ঞান।’ এমনই এমনই আরও কথা। তার পর যখন শুনিল যে, তুমি কাহারও সঙ্গে যাও নাই, আপনার স্বামীর সঙ্গে গিয়াছ, তুমি বড় মানুষের মেয়ে, বড় মানুষের বৌ—এখন আপনার ঘর বর পাইয়াছ, তখন বলিল, ‘আমি ত বরাবর বলচি মা যে, সে বড় ঘরের মেয়ে, ছোট ঘরে কি আর অমন স্বভাব চরিত্র হয়? যেমন রূপ, তেমন গুণ, যেন লক্ষ্মী! সে ভাল থাকুক মা! ভাল থাকুক! তা, হা দেখ বৌদিদি! আমাকে কিছু পাঠাইয়া দিতে বলো’।”

গৃহিণী সম্বন্ধে সুভাষিণী লিখিল, “তিনি তোমার এই সকল সংবাদ পাইয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু আমাকে ও র-বাবুকে কিছু ভর্ৎসনাও করিয়াছেন। বলিয়াছেন, ‘সে যে এত বড় ঘরের মেয়ে, তা তোরা আমাকে আগে বলিস্ নে কেন? আমি তাকে খুব যত্নে রাখিতাম।’ আর, তোমার স্বামীরও কিছু নিন্দা করিয়াছেন, বলিয়াছেন, ‘হোক্, তাঁর পরিবার, আমার অমন রাঁধুনীটা নিয়ে যাওয়া তার কিছু ভাল হয় নাই’।”

কর্ত্তা রামরাম দত্তের কথা সুভাষিণীর নিজ হাতের হিজিবিজি। কষ্টে পড়িলাম যে, কর্ত্তা গৃহিণীকে কৃত্রিম কোপের সহিত তিরস্কার করিয়া বলিয়াছেন, “তুমি ছল ছুতা করিয়া সুন্দর রাঁধুনবলা বাহুল্য যে, ব্রাহ্মণ ঠাকুরাণী ও অন্যান্য ভৃত্যবর্গের জন্য কিছু কিছু পাঠাইয়া দিলাম।

তারপর সুভাষিণীর সঙ্গে আর একবার মাত্র দেখা হইয়াছিল। তার কন্যার বিবাহের সময়ে বিশেষ অনুরোধে, স্বামী মহাশয় আমাকে লইয়া গিয়াছিলেন। সুভাষিণীর কন্যাকে অলঙ্কার দিয়া সাজাইলাম—গৃহিণীকে উপযুক্ত উপহার দিলাম—যে যাহার যোগ্য, তাহাকে সেইরূপ দান ও সম্ভাষণ করিলাম। কিন্তু দেখিলাম, গৃহিণী আমার প্রতি ও আমার স্বামীর প্রতি অপ্রসন্ন। তাঁর ছেলের ভাল খাওয়া হয় না, কথাটা আমায় অনেক বার শুনাইলেন। আমিও রমণ বাবুকে কিছু রাঁধিয়া খাওয়াইলাম। কিন্তু আর কখন গেলাম না। রাঁধিবার ভয়ে নয়; গৃহিণীর মনোদুঃখের ভয়ে।

গৃহিণী ও রামরাম দত্ত অনেক দিন হইল স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। কিন্তু আর যাওয়া ঘটে নাই। আমি সুভাষিণীকে ভুলি নাই। ইহজন্মে ভুলিব না। সুভাষিণীর মত এ সংসারে আর কিছু দেখিলাম না।

যুগলাঙ্গুরীয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

দুই জনে উদ্যানমধ্যে লতামণ্ডপতলে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তখন প্রাচীন নগর তাম্রলিপ্তের চরণ ধৌত করিয়া অনন্ত নীল সমুদ্র মৃদু মৃদু নিনাদ করিতেছিল।

তাম্রলিপ্ত নগরের প্রান্তভাগে, সমুদ্রতীরে এক বিচিত্র অট্টালিকা ছিল। তাহার নিকট একটি সুনির্ম্মিত বৃক্ষবাটিকা। বৃক্ষবাটিকার অধিকারী ধনদাস নামক একজন শ্রেষ্ঠী। শ্রেষ্ঠীর কন্যা হিরণ্ময়ী লতামণ্ডপে দাঁড়াইয়া এক যুবা পুরুষের সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন।

হিরণ্ময়ী বিবাহের বয়স অতিক্রম করিয়াছিলেন। তিনি ঈপ্সিত স্বামীর কামনায় একাদশ বৎসরে আরম্ভ করিয়া ক্রমাগত পঞ্চ বৎসর, এই সমুদ্রতীরবাসিনী সাগরেশ্বরী নাম্নী দেবীর পূজা করিয়াছিলেন, কিন্তু মনোরথ সফল হয় নাই। প্রাপ্তযৌবনা কুমারী কেন যে এই যুবার সঙ্গে একা কথা কহেন, তাহা সকলেই জানিত। হিরণ্ময়ী যখন চারি বৎসরের বালিকা, তখন এই যুবার বয়ঃক্রম আট বৎসর। ইঁহার পিতা শচীসুত শ্রেষ্ঠী ধনদাসের প্রতিবাসী, এজন্য উভয়ে একত্র বাল্যক্রীড়া করিতেন। হয় শচীসুতের গৃহে, নয় ধনদাসের গৃহে, সর্ব্বদা একত্র সহবাস করিতেন। এক্ষণে যুবতীর বয়স ষোড়শ, যুবার বয়স বিংশতি বৎসর, তথাপি উভয়ের সেই বালসখিত্ব সম্বন্ধই ছিল। একটু মাত্র বিঘ্ন ঘটিয়াছিল। যথাবিহিত কালে উভয়ের পিতা, এই যুবক যুবতীর পরস্পরের সঙ্গে বিবাহসম্বন্ধ করিয়াছিলেন। বিবাহের দিন স্থির পর্য্যন্ত হইয়াছিল। অকস্মাৎ হিরণ্ময়ীর পিতা বলিলেন, "আমি বিবাহ দিব না।" সেই অবধি হিরণ্ময়ী আর পুরন্দরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন না। অদ্য পুরন্দর অনেক বিনয় করিয়া, বিশেষ কথা আছে বলিয়া, তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। লতামণ্ডপতলে আসিয়া হিরণ্ময়ী কহিল, "আমাকে কেন ডাকিয়া আনিলে ? আমি এক্ষণে আর বালিকা নহি, এখন আর তোমার সঙ্গে এমত স্থানে একা সাক্ষাৎ করা ভাল দেখায় না। আর ডাকিলে আমি আসিব না।"

ষোল বৎসরের বালিকা বলিতেছে, "আমি আর বালিকা নহি" ইহা বড় মিষ্ট কথা। কিন্তু সে রস অনুভব করিবার লোক সেখানে কেহই ছিল না। পুরন্দরের বয়স বা মনের ভাব সেরূপ নহে।

পুরন্দর মণ্ডপবিলম্বিত লতা হইতে একটি পুষ্প ভাঙ্গিয়া লইয়া তাহা ছিন্ন করিতে করিতে বলিলেন, "আমি আর ডাকিব না। আমি দূর দেশে চলিলাম। তাই তোমাকে বলিয়া যাইতে আসিয়াছি।"

হি। দূরদেশে ? কোথায় ?

পু। সিংহলে।

হি। সিংহলে ? সে কি ? কেন সিংহলে যাইবে ?

পু। কেন যাইব ? আমরা শ্রেষ্ঠী—বাণিজ্যার্থ যাইব। বলিতে বলিতে পুরন্দরের চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল।

হিরণ্ময়ী বিমনা হইলেন। কোন কথা কহিলেন না, অনিমেষলোচনে সম্মুখবর্ত্তী সাগরতরঙ্গে সূর্য্যকিরণের ক্রীড়া দেখিতে লাগিলেন। প্রাতঃকাল, মৃদুপবন বহিতেছে,—মৃদুপবনোত্থিত অতুঙ্গ তরঙ্গে বালারুণরশ্মি আরোহণ করিয়া কাঁপিতেছে—সাগরজলে তাহার অনন্ত উজ্জ্বল রেখা প্রসারিত হইয়াছে—শ্যামাঙ্গীর অঙ্গে রজতালঙ্কারবৎ ফেননিচয় শোভিতেছে, তীরে জলচর পক্ষিকুল শ্বেতরেখা সাজাইয়া বেড়াইতেছে। হিরণ্ময়ী সব দেখিলেন,—নীলজল দেখিলেন, তরঙ্গশিরে ফেনমালা দেখিলেন, সূর্য্যরশ্মির ক্রীড়া দেখিলেন,—দূরবর্ত্তী অর্ণবপোত দেখিলেন, নীলাম্বরে কৃষ্ণবিন্দুবৎ একটি পক্ষী উড়িতেছে, তাহাও দেখিলেন। শেষে ভূতলশায়ী একটি শুষ্ক কুসুমের প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে কহিলেন, “তুমি কেন যাবে—অন্যান্য বার তোমার পিতা যাইয়া থাকেন।”

পুরন্দর বলিল, “আমার পিতা বৃদ্ধ হইতেছেন। আমার এখন অর্থোপার্জ্জনের সময় হইয়াছে। আমি পিতার অনুমতি পাইয়াছি।”

হিরণ্ময়ী লতামণ্ডপের কাষ্ঠে ললাট রক্ষা করিলেন। পুরন্দর দেখিলেন, তাঁহার ললাট কুঞ্চিত হইতেছে, অধর স্ফুরিত হইতেছে, নাসিকারন্ধ্র স্ফীত হইতেছে। দেখিলেন যে, হিরণ্ময়ী কাঁদিয়া ফেলিলেন।

পুরন্দর মুখ ফিরাইলেন। তিনিও একবার আকাশ, পৃথিবী, নগর, সমুদ্র সকল দেখিলেন, কিন্তু কিছুতেই রহিল না—চক্ষুর জল গণ্ড বহিয়া পড়িল। পুরন্দর চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, “এই কথা বলিবার জন্য আসিয়াছি। যে দিন তোমার পিতা বলিলেন, কিছুতেই আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিবেন না, সেই দিন হইতেই আমি সিংহলে যাইবার কল্পনা স্থির করিয়াছিলাম। ইচ্ছা আছে যে, সিংহল হইতে ফিরিব না। যদি কখন তোমায় ভুলিতে পারি, তবেই ফিরিব। আমি অধিক কথা বলিতে জানি না, তুমিও অধিক কথা বুঝিতে পারিবে না। ইহা বুঝিতে পারিবে যে, আমার পক্ষে জগৎসংসার এক দিকে, তুমি একদিকে হইলে, জগৎ তোমার তুল্য নহে।” এই বলিয়া পুরন্দর হঠাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া পাদচারণ করিয়া অন্য একটি বৃক্ষের পাতা ছিঁড়িলেন। অশ্রুবেগ কিঞ্চিৎ শমিত হইলে, ফিরিয়া আসিয়া আবার কহিলেন, “তুমি আমায় ভালবাস, তাহা জানি। কিন্তু যবে হউক, অন্যের পত্নী হইবে। অতএব তুমি আর আমায় মনে রাখিও না। তোমার সঙ্গে যেন এ জন্মে আমার আর সাক্ষাৎ না হয়।”

এই বলিয়া পুরন্দর বেগে প্রস্থান করিলেন। হিরণ্ময়ী বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রোদন সংবরণ করিয়া একবার ভাবিলেন, “আমি যদি আজি মরি, তবে কি পুরন্দর সিংহলে যাইতে পারে ? আমি কেন গলায় লতা বাঁধিয়া মরি না—কিম্বা সমুদ্রে ঝাঁপ দিই না ?” আবার ভাবিলেন, “আমি যদি মরিলাম, তবে পুরন্দর সিংহলে যাক না যাক, তাতে আমার কি ?” এই ভাবিয়া হিরণ্ময়ী আবার কাঁদিতে বসিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কেন যে ধনদাস বলিয়াছিলেন যে, “আমি পুরন্দরের সঙ্গে হিরণের বিবাহ দিব না” তাহা কেহ জানিত না। তিনি তাহা কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করেন নাই। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, “বিশেষ কারণ আছে।” হিরণ্ময়ীর অন্যান্য অনেক সম্বন্ধ আসিল—কিন্তু ধনদাস কোন সম্বন্ধেই সম্মত হইলেন না। বিবাহের কথামাত্রে কর্ণপাত করিতেন না। “কন্যা বড় হইল” বলিয়া গৃহিণী তিরস্কার করিতেন; ধনদাস শুনিতেন না। কেবল বলিতেন, “গুরুদেব আসুন—তিনি আসিলে এ কথা হইবে।”

পুরন্দর সিংহলে গেলেন। তাঁহার সিংহল যাত্রার পর দুই বৎসর এইরূপে গেল। পুরন্দর ফিরিলেন না। হিরণ্ময়ীর কোন সম্বন্ধ হইল না। হিরণ অষ্টাদশ বৎসরের হইয়া উদ্যানমধ্যস্থ নবপল্লবিত চূতবৃক্ষের ন্যায় ধনদাসের গৃহ শোভা করিতে লাগিল।

হিরণ্ময়ী ইহাতে দুঃখিত হয়েন নাই। বিবাহের কথা হইলে পুরন্দরকে মনে পড়িত; তাঁহার সেই ফুল্লকুসুমমালামণ্ডিত কুঞ্চিতকৃষ্ণকুন্তলাবলীবেষ্টিত সহাস্য মুখমণ্ডল মনে পড়িত; তাঁহার সেই দ্বিরদশুভ্র স্কন্ধদেশে স্বর্ণপুষ্পশোভিত নীল উত্তরীয় মনে পড়িত; পদ্মহস্তে হীরকাঙ্গুরীয়গুলি মনে পড়িত; হিরণ্ময়ী কাঁদিতেন। পিতার আজ্ঞা হইলে যাহাকে তাহাকে বিবাহ করিতে হইত। কিন্তু সে জীবন্মৃত্যুবৎ হইত। তবে তাঁহার বিবাহোদ্যোগে পিতাকে অপ্রবৃত্ত দেখিয়া, আহ্লাদিত হউন বা না হউন, বিস্মিতা হইতেন। লোকে এত বয়স অবধি কন্যা অবিবাহিতা রাখে না—রাখিলেও তাহার সম্বন্ধ করে। তাঁহার পিতা সে কথায় কর্ণ পর্য্যন্ত দেন না কেন ? এক দিন অকস্মাৎ এ বিষয়ের কিছু সন্ধান পাইলেন।

ধনদাস বাণিজ্যহেতু চীনদেশে নির্ম্মিত একটি বিচিত্র কৌটা পাইয়াছিলেন। কৌটা অতি বৃহৎ—ধনদাসের পত্নী তাহাতে অলঙ্কার রাখিতেন। ধনদাস কতকগুলিন নূতন অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া পত্নীকে উপহার দিলেন। শ্রেষ্ঠীপত্নী পুরাতন অলঙ্কারগুলিন কৌটাসমেত কন্যাকে দিলেন। অলঙ্কারগুলিন রাখা ঢাকা করিতে হিরণ্ময়ী দেখিলেন যে, তাহাতে একখানি ছিন্ন লিপির অর্দ্ধাবশেষ রহিয়াছে।

হিরণ্ময়ী পড়িতে জানিতেন। তাহাতে প্রথমেই নিজের নাম দেখিতে পাইয়া কৌতূহলাবিষ্ট হইলেন। পড়িয়া দেখিলেন যে, যে অর্দ্ধাংশ আছে, তাহাতে কোন অর্থবোধ হয় না। কে কাহাকে লিখিয়াছিল, তাহাও কিছুই বুঝা গেল না। কিন্তু তথাপি পড়িয়া হিরণ্ময়ীর মহাভীতিসঞ্চার হইল। ছিন্ন পত্রখণ্ড এইরূপ।

জ্যোতিষী গণনা করিয়া দেখিলা
হিরণ্ময়ী তুল্য সোণার পুত্তলি।
বাহ হইলে ভয়ানক বিপদ।
সর মুখ পরস্পরে।
হইতে পারে।

হিরণ্ময়ী কোন অজ্ঞাত বিপদ্ আশঙ্কা করিয়া অত্যন্ত ভীতা হইলেন। কাহাকে কিছু না বলিয়া পত্রখণ্ড তুলিয়া রাখিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দুই বৎসরের পর আরও এক বৎসর গেল। তথাপি পুরন্দরের সিংহল হইতে আসার কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। কিন্তু হিরণ্ময়ীর হৃদয়ে তাঁহার মূর্ত্তি পূর্ব্ববৎ উজ্জ্বল ছিল। তিনি মনে মনে বুঝিলেন যে, পুরন্দরও তাঁহাকে ভুলিতে পারেন নাই—নচেৎ এত দিন ফিরিতেন।

এইরূপে দুই আর একে তিন বৎসর গেলে, অকস্মাৎ এক দিন ধনদাস বলিলেন যে, "চল, সপরিবারে কাশী যাইব। গুরুদেবের নিকট হইতে তাঁহার শিষ্য আসিয়াছেন। গুরুদেব সেইখানে যাইতে অনুমতি করিয়াছেন। তথায় হিরণ্ময়ীর বিবাহ হইবে। সেইখানে তিনি পাত্র স্থির করিয়াছেন।"

ধনদাস, পত্নী ও কন্যাকে লইয়া কাশী যাত্রা করিলেন। উপযুক্ত কালে কাশীতে উপনীত হইলে পর, ধনদাসের গুরু আনন্দস্বামী আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। এবং বিবাহের দিন স্থির করিয়া যথাশাস্ত্র উদ্যোগ করিতে বলিয়া গেলেন।

বিবাহের যথাশাস্ত্র উদ্যোগ হইল, কিন্তু ঘটা কিছুই হইল না। ধনদাসের পরিবারস্থ ব্যক্তি ভিন্ন কেহই জানিতে পারিল না যে, বিবাহ উপস্থিত। কেবল শাস্ত্রীয় আচার সকল রক্ষা করা হইল মাত্র।

বিবাহের দিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল—এক প্রহর রাত্রে লগ্ন, তথাপি গৃহে যাহারা সচরাচর থাকে, তাহারা ভিন্ন আর কেহ নাই। প্রতিবাসীরাও কেহ উপস্থিত নাই। এ পর্য্যন্ত ধনদাস ভিন্ন গৃহস্থ কেহও জানে না যে, কে পাত্র—কোথাকার পাত্র। তবে সকলেই জানিত যে, যেখান আনন্দস্বামী বিবাহের সম্বন্ধ করিয়াছেন, সেখানে কখন অপাত্র স্থির করেন নাই। তিনি যে কেন পাত্রের পরিচয় ব্যক্ত করিলেন না, তাহা তিনিই জানেন—তাঁহার মনের কথা বুঝিবে কে ? একটি গৃহে পুরোহিত সম্প্রদানের উদ্যোগাদি করিয়া একাকী বসিয়া আছেন। বাহিরে ধনদাস একাকী বরের প্রতীক্ষা করিতেছেন। অন্তঃপুরে কন্যাসজ্জা করিয়া হিরণ্ময়ী বসিয়া আছেন—আর কোথাও কেহ নাই। হিরণ্ময়ী মনে মনে ভাবিতেছেন—"এ কি রহস্য! কিন্তু পুরন্দরের সঙ্গে যদি বিবাহ না হইল—তবে যে হয় তাহার সঙ্গে বিবাহ হউক—সে আমার স্বামী হইবে না।"

এমন সময়ে ধনদাস কন্যাকে ডাকিতে আসিলেন। কিন্তু তাঁহাকে সম্প্রদানের স্থানে লইয়া যাইবার পূর্ব্বে বস্ত্রের দ্বারা তাঁহার দুই চক্ষুঃ দৃঢ়তর বাঁধিলেন। হিরণ্ময়ী কহিলেন, "এ কি পিতা ?" ধনদাস কহিলেন, "গুরুদেবের আজ্ঞা। তুমিও আমার আজ্ঞামত কার্য্য কর। মন্ত্রগুলি মনে মনে বলিও।" শুনিয়া হিরণ্ময়ী কোন কথা কহিলেন না। ধনদাস দৃষ্টিহীনা কন্যার হস্ত ধরিয়া সম্প্রদানের স্থানে লইয়া গেলেন।

হিরণ্ময়ী তথায় উপনীত হইয়া যদি কিছু দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে দেখিতেন যে, পাত্রও তাঁহার ন্যায় আবৃতনয়ন। এইরূপে বিবাহ হইল। সেই স্থানে গুরু, পুরোহিত এবং কন্যাকর্ত্তা ভিন্ন আর কেহ ছিল না। বর কন্যা কেহ কাহাকে দেখিলেন না। শুভদৃষ্টি হইল না।

সম্প্রদানান্তে আনন্দস্বামী বরকন্যাকে কহিলেন যে, "তোমাদিগের বিবাহ হইল, কিন্তু তোমরা পরস্পরকে দেখিলে না। কন্যার কুমারী নাম ঘুচানই এই বিবাহের উদ্দেশ্য; ইহজন্মে কখন তোমাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হইবে কি না, বলিতে পারি না। যদি হয়, তবে কেহ কাহাকে চিনিতে পারিবে না। চিনিবার আমি একটি উপায় করিয়া দিতেছি। আমার হাতে দুইটি অঙ্গুরীয় আছে। দুইটি ঠিক এক প্রকার। অঙ্গরীয় যে প্রস্তরে নির্ম্মিত, তাহা প্রায় পাওয়া যায় না। এবং অঙ্গুরীয়ের ভিতরের পৃষ্ঠে একটি ময়ূর অঙ্কিত আছে। ইহার একটি বরকে, একটি কন্যাকে দিলাম। এরূপ অঙ্গুরীয় অন্য কেহ পাইবে না—বিশেষ এই ময়ূরের চিত্র অননুকরণীয়। ইহা আমার স্বহস্তখোদিত। যদি কন্যা কোন পুরুষের হস্তে এইরূপ অঙ্গুরীয় দেখেন, তবে জানিবেন যে, সেই পুরুষ তাঁহার স্বামী। যদি বর কখন কোন স্ত্রীলোকের হস্তে এইরূপ অঙ্গুরীয় দেখেন, তবে জানিবেন যে, তিনিই তাঁহার পত্নী। তোমরা কেহ এ অঙ্গুরীয় হারাইও না, বা কাহাকে দিও না, অন্নাভাব হইলেও বিক্রয় করিও না। কিন্তু ইহাও আজ্ঞা করিতেছি যে, অদ্য হইতে পঞ্চ বৎসরের মধ্যে কদাচ এই অঙ্গুরীয় পরিও না। অদ্য আষাঢ় মাসের শুক্লা পঞ্চমী, রাত্রি একাদশ দণ্ড হইয়াছে, ইহার পর পঞ্চম আষাঢ়ের শুক্লা পঞ্চমীর একাদশ দণ্ড রাত্রি পর্য্যন্ত অঙ্গুরীয় ব্যবহার নিষেধ করিলাম। আমার নিষেধ অবহেলা করিলে গুরুতর অমঙ্গল হইবে।"

এই বলিয়া আনন্দস্বামী বিদায় হইলেন। ধনদাস কন্যার চক্ষুর বন্ধন মোচন করিলেন। হিরণ্ময়ী চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন যে, গৃহমধ্যে কেবল পিতা ও পুরোহিত আছেন—তাঁহার স্বামী নাই। তাঁহার বিবাহরাত্রি একাই যাবন করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিবাহান্তে ধনদাস স্ত্রী ও কন্যাকে লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন। আরও চারি বৎসর অতিবাহিত হইল। পুরন্দর ফিরিয়া আসিলেন না—হিরণ্ময়ীর পক্ষে এখন ফিরিলেই কি, না ফিরিলেই কি ?

পুরন্দর যে এই সাত বৎসরে ফিরিল না, ইহা ভাবিয়া হিরণ্ময়ী দুঃখিতা হইলেন। মনে ভাবিলেন, "তিনি যে আজিও আমায় ভুলিতে পারেন নাই বলিয়া আসিলেন না, এমত কদাচ সম্ভবে না। তিনি জীবিত আছেন কি না সংশয়। তাঁহার দেখার আমি কামনা করি না, এখন আমি অন্যের স্ত্রী; কিন্তু আমার বাল্যকালের সুহৃৎ বাঁচিয়া থাকুন, এ কামনা কেন না করিব?"

ধনদাসেরও কোন কারণে না কোন কারণে চিন্তিত ভাব প্রকাশ হইতে লাগিল, ক্রমে চিন্তা গুরুত্বর হইয়া শেষে দারুণ রোগে পরিণত হইল। তাহাতে তাঁহার মৃত্যু হইল। ধনদাসের পত্নী অনুমৃতা হইলেন। হিরণ্ময়ীর আর কেহ ছিল না, এজন্য হিরণ্ময়ী মাতার চরণ ধারণ করিয়া অনেক রোদন করিয়া কহিলেন যে, তুমি মরিও না। কিন্তু শ্রেষ্ঠিপত্নী শুনিলেন না। তখন হিরণ্ময়ী পৃথিবীতে একাকিনী হইলেন।

মৃত্যুকালে হিরণ্ময়ীর মাতা তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলেন যে, "বাছা, তোমার কিসের ভাবনা ? তোমার একজন স্বামী অবশ্য আছেন। নিয়মিত কাল অতীত হইলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলেও হইতে পারে। না হয়, তুমিও নিতান্ত বালিকা নহ। বিশেষ পৃথিবীতে যে সহায় প্রধান—ধন—তাহা তোমার অতুল পরিমাণে রহিল।"

কিন্তু সে আশা বিফল হইল—ধনদাসের মৃত্যুর পর দেখা গেল যে, তিনি কিছুই রাখিয়া যান নাই। অলঙ্কার অট্টালিকা এবং গার্হস্থ্য সামগ্রী ভিন্ন আর কিছুই নাই। অনুসন্ধানে হিরণ্ময়ী জানিলেন যে, ধনদাস কয়েক বৎসর হইতে বাণিজ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া আসিতেছিলেন। তিনি তাহা কাহাকেও না বলিয়া শোধনের চেষ্টায় ছিলেন। ইহাই তাঁহার চিন্তার কারণ। শেষে শোধনও অসাধ্য হইল। ধনদাস মনের ক্লেশে পীড়িত হইয়া পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এই সকল সংবাদ শুনিয়া অপরাপর শ্রেষ্ঠীরা আসিয়া হিরণ্ময়ীকে কহিল যে, তোমার পিতা আমাদের ঋণগ্রস্ত হইয়া মরিয়াছেন। আমাদিগের ঋণ পরিশোধ কর। শ্রেষ্ঠিকন্যা অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, তাহাদের কথা যথার্থ। তখন হিরণ্ময়ী সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া তাহাদের ঋণ পরিশোধ করিলেন। বাসগৃহ পর্য্যন্ত বিক্রয় করিলেন।

এখন হিরণ্ময়ী অন্নবস্ত্রের দুঃখে দুঃখিনী হইয়া নগরপ্রান্তে এক কুটীরমধ্যে একা বাস করিতে লাগিলেন। কেবল মাত্র এক সহায় পরম হিতৈষী আনন্দস্বামী, কিন্তু তিনি তখন দূর দেশে ছিলেন। হিরণ্ময়ীর এমন একটি লোক ছিল না যে, আনন্দস্বামীর নিকট প্রেরণ করেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হিরণ্ময়ী যুবতী এবং সুন্দরী—একাকিনী এক গৃহে শয়ন করা ভাল নহে। আপদ্‌ও আছে—কলঙ্কও আছে। অমলা নাকে এক গোপকন্যা হিরণ্ময়ীর প্রতিবাসিনী ছিল! সে বিধবা—তাহার একটি কিশোরবয়স্ক পুত্র এবং কয়েকটি কন্যা। তাহার যৌবনকাল অতীত হইয়াছিল। সচ্চরিত্রা বলিয়া তাহার খ্যাতি ছিল। হিরণ্ময়ী রাত্রিতে আসিয়া তাহার গৃহে শয়ন করিতেন।

এক দিন হিরণ্ময়ী অমলার গৃহে শয়ন করিতে আসিলে পর, অমলা তাহাকে কহিল, "সংবাদ শুনিয়াছ, পুরন্দর শ্রেষ্ঠী নাকি আট বৎসরের পর নগরে ফিরিয়া আসিয়াছে।" শুনিয়া হিরণ্ময়ী মুখ ফিরাইলেন—চক্ষুর জল অমলা না দেখিতে পায়। পৃথিবীর সঙ্গে হিরণ্ময়ীর শেষ সম্বন্ধ ঘুচিল। পুরন্দর তাঁহাকে ভুলিয়া

গিয়াছে। নচেৎ ফিরিত না। পুরন্দর এক্ষণে মনে রাখুক বা ভুলুক, তাঁহার লাভ বা ক্ষতি কি? তথাপি যাহার স্নেহের কথা ভাবিয়া যাবজ্জীবন কাটাইয়াছেন, সে ভুলিয়াছে ভাবিতে হিরণ্ময়ীর মনে কষ্ট হইল। হিরণ্ময়ী একবার ভাবিলেন—"ভুলেন নাই—কত কাল আমার জন্য বিদেশে থাকিবেন? বিশেষ তাহাকে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে—আর দেশে না আসিলে চলিবে কেন?" আবার ভাবিলেন, "আমি কুলটা সন্দেহ নাই—নহিলে পুরন্দরের কথা মনে করি কেন?"

অমলা কহিল, "পুরন্দরকে কি তোমার মনে পড়িতেছে না? পুরন্দর শচীসুত শেঠির ছেলে।"

হি। চিনি।

অ। তা সে ফিরে এসেছে—কত নৌকা যে ধন এনেছে, তাহা গুণে সংখ্যা করা যায় না। এত ধন না কি এ তামলিপে কেহ কখন দেখে নাই।

হিরণ্ময়ীর হৃদয়ে রক্ত একটু খর বহিল। তাঁহার দারিদ্র্যদশা মনে পড়িল। পুর্ব্বসম্বন্ধও মনে পড়িল। দারিদ্র্যের জ্বালা বড় জ্বালা। তাহার পরিবর্ত্তে এই অতুল ধনরাশি হিরণ্ময়ীর হইতে পারিত, ইহা ভাবিয়া যাহার খর রক্ত না বহে, এমন স্ত্রীলোক অতি অল্প আছে। হিরণ্ময়ী ক্ষণেক কাল অন্যমনে থাকিয়া পরে অন্য প্রসঙ্গ তুলিল। শেষ শয়নকালে জিজ্ঞাসা করিল, "অমলে, সেই শ্রেষ্ঠিপুত্রের বিবাহ হইয়াছে?"

অমলা কহিল, "না, বিবাহ হয় নাই।"

হিরণ্ময়ীর ইন্দ্রিয় সকল অবশ হইল। সে রাত্রিতে আর কোন কথা হইল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরে এক দিন অমলা হাসিমুখে হিরণ্ময়ীর নিকটে আসিয়া মধুর ভর্ৎসনা করিয়া কহিল, "হাঁ গা বাছা, তোমার কি এমনই ধর্ম্ম?"

হিরণ্ময়ী কহিল, "কি করিয়াছি?"

অম। আমার কাছে এত দিন তা বলিতে নাই?

হি। কি বলি নাই?

অম। পুরন্দর শেঠির সঙ্গে তোমার এত আত্মীয়তা!

হিরণ্ময়ী ঈষল্লজ্জিতা হইলেন, বলিলেন, "তিনি বাল্যকালে আমার প্রতিবাসী ছিলেন—তার বলিব কি?"

অম। শুধু প্রতিবাসী? দেখ দেখি কি এনেছি!

এই বলিয়া অমলা একটি কৌটা বাহির করিল। কৌটা খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে অপূর্ব্বদর্শন, মহাপ্রভাযুক্ত মহামূল্য হীরার হার বাহির করিয়া হিরণ্ময়ীকে দেখাইল। শ্রেষ্ঠিকন্যা হীরা চিনিত—বিস্মিতা হইয়া কহিল, "এ যে মহামূল্য—এ কোথায় পাইলে?"

অম। ইহা তোমাকে পুরন্দর পাঠাইয়া দিয়াছে। তুমি আমার গৃহে থাক শুনিয়া আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া ইহা তোমাকে দিতে বলিয়াছে।

হিরণ্ময়ী ভাবিয়া দেখিল, এই হার গ্রহণ করিলে, চিরকালের জন্য দারিদ্র্য মোচন হয়। ধনদাসের আদরের কন্যা আর অন্নবস্ত্রের কষ্ট সহিতে পারিতেছিল না। অতএব হিরণ্ময়ী ক্ষণেক বিমনা হইল। পরে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "অমলা, তুমি বণিক্‌কে কহিও যে, আমি ইহা গ্রহণ করিব না।"

অমলা বিস্মিতা হইল। বলিল, "সে কি? তুমি কি পাগল, না আমার কথায় বিশ্বাস করিতেছ না?"

হি। আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করিতেছি—আর পাগলও নই। আমি উহা গ্রহণ করিব না।

অমলা অনেক তিরস্কার করিতে লাগিল। হিরণ্ময়ী কিছুতেই গ্রহণ করিলেন না। তখন অমলা হার লইয়া রাজা মদনদেবের নিকট গেল। রাজাকে প্রণাম করিয়া হার দিল। বলিল, “এ হার আপনাকে গ্রহণ করিতে হইবে। এ হার আপনারই যোগ্য।” রাজা হার লইয়া অমলাকে যথেষ্ট অর্থ দিলেন। হিরণ্ময়ী ইহার কিছুই জানিল না।

ইহার কিছু দিন পরে পুরন্দরের এক জন পরিচারিকা হিরণ্ময়ীর নিকটে আসিল। সে কহিল, “আমার প্রভু বলিয়া পাঠাইলেন যে, আপনি যে পর্ণকুটীরে বাস করেন ইহা তাঁহার সহ্য হয় না। আপনি তাঁহার বাল্যকালের সখী; আপনার গৃহ তাঁহার গৃহ একই। তিনি এমন বলেন না যে, আপনি তাঁহার গৃহে গিয়া বাস করুন। আপনার পিতৃগৃহ তিনি ধনদাসের মহাজনের নিকট ক্রয় করিয়াছেন। তাহা আপনাকে দান করিতেছেন। আপনি গিয়া সেইখানে বাস করুন, ইহাই তাঁহার ভিক্ষা।”

হিরণ্ময়ী দারিদ্র্যজন্য যত দুঃখভোগ করিতেছিলেন, তন্মধ্যে পিতৃভবন হইতে নির্ব্বাসনই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বোধ হইত। যেখানে বাল্যক্রীড়া করিয়াছিলেন, যেখানে পিতা মাতার সহবাস করিতেন, যেখানে তাঁহাদিগের মৃত্যু দেখিয়াছেন, সেখানে যে আর বাস করিতে পান না, এ কষ্ট গুরুতর বোধ হইত। সেই ভবনের কথায় তাঁহার চক্ষে জল আসিল। তিনি পরিচারিকাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, “এ দান আমার গ্রহণ করা উচিত নহে—কিন্তু আমি এ লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। তোমার প্রভুর সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল হউক!”

পরিচারিকা প্রণাম করিয়া বিদায় হইল। অমলা উপস্থিতা ছিল। হিরণ্ময়ী তাহাকে বলিলেন, “অমলা, তথায় আমার একা বাস করা যাইতে পারে না। তুমিও তথায় বাস করিবে চল।”

অমলা স্বীকৃতা হইল। উভয়ে গিয়া ধনদাসের গৃহে বাস করিতে লাগিলেন।

তথাপি অমলাকে সর্ব্বদা পুরন্দরের গৃহে যাইতে হিরণ্ময়ী এক দিন নিষেধ করিলেন। অমলা আর যাইত না।

পিতৃগৃহে গমনাবধি হিরণ্ময়ী একটা বিষয়ে বড় বিস্মিতা হইলেন। এক দিন অমলা কহিল, “তুমি সংসারনির্ব্বাহের জন্য ব্যস্ত হইও না, বা শারীরিক পরিশ্রম করিও না। রাজবাড়ী আমার কার্য্য হইয়াছে—আর এখন অর্থের অভাব নাই। অতএব আমি সংসার চলাইব—তুমি সংসারে কর্ত্রী হইয়া থাক।” হিরণ্ময়ী দেখিলেন, অমলার অর্থের বিলক্ষণ প্রাচুর্য্য। মনে মনে নানা প্রকার সন্দিহান হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিবাহের পর পঞ্চমাষাঢ়ের শুক্লা পঞ্চমী আসিয়া উপস্থিত হইল। হিরণ্ময়ী এ কথা স্মরণ করিয়া সন্ধ্যাকালে বিমনা হইয়া বসিয়াছিলেন। ভাবিতেছিলেন, “গুরুদেবের আজ্ঞানুসারে আমি কালি হইতে অঙ্গুরীয়টি পরিতে পারি। কিন্তু পরিব কি ? পরিয়া আমার কি লাভ ? হয়ত স্বামী পাইব, কিন্তু স্বামী পাইবার আমার বাসনা নাই। অথবা চিরকালের জন্য কেনই বা পরের মূর্ত্তি আঁকিয়া রাখি ? এ দুরন্ত হৃদয়কে শাসিত করাই উচিত। নহিলে ধর্ম্মে পতিত হইতেছি।”

এমন সময় অমলা বিস্ময়বিহ্বলা হইয়া আসিয়া কহিল, “কি সর্ব্বনাশ! আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। না জানি কি হইবে!”

হি। কি হইয়াছে ?

অ। রাজপুরী হইতে তোমার জন্য শিবিকা লইয়া দাস-দাসী আসিয়াছে। তোমাকে লইয়া যাইবে।

হি। তুমি পাগল হইয়াছ। আমাকে রাজবাড়ী হইতে লইতে আসিবে কেন ?

এমন সময়ে রাজদূতী আসিয়া প্রণাম করিল এবং কহিল যে, "রাজাধিরাজ পরম ভট্টারক শ্রীমদনদেবের আজ্ঞা যে, হিরণ্ময়ী এই মুহূর্ত্তেই শিবিকারোহণে রাজাবরোধে যাইবেন।"

হিরণ্ময়ী বিস্মিতা হইলেন। কিন্তু অস্বীকার করিতে পারিলেন না। রাজাজ্ঞা অলঙ্ঘ্য। বিশেষ রাজা মদনদেবের অবরোধে যাইতে কোন শঙ্কা নাই। রাজা পরম ধার্ম্মিক এবং জিতেন্দ্রিয় বলিয়া খ্যাত। তাঁহার প্রতাপে কোন রাজপুরুষও কোন স্ত্রীলোকের উপর কোন অত্যাচার করিতে পারে না।

হিরণ্ময়ী অমলাকে বলিলেন, "অমলে, আমি রাজদর্শনে যাইতে সম্মতা। তুমি সঙ্গে চল।"

অমলা স্বীকৃতা হইল।

তৎসমভিব্যাহারে শিবিকারোহণে হিরণ্ময়ী রাজাবরোধমধ্যে প্রবিষ্টা হইলেন। প্রতিহারী রাজাকে নিবেদন করিল যে, শ্রেষ্ঠিকন্যা আসিয়াছে। রাজাজ্ঞা পাইয়া প্রতিহারী একা হিরণ্ময়ীকে রাজসমক্ষে লইয়া আসিল। অমলা বাহিরে রহিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

হিরণ্ময়ী রাজাকে দেখিয়া বিস্মিতা হইলেন। রাজ দীর্ঘাকৃতি পুরুষ, কবাটবক্ষ; দীর্ঘহস্ত; অতি সুগঠিত আকৃতি; ললাট প্রশস্ত; বিস্ফারিত আয়ত চক্ষু; শান্ত মূর্ত্তি—এরূপ সুন্দর পুরুষ কদাচিৎ স্ত্রীলোকের নয়নপথে পড়ে। রাজাও শ্রেষ্ঠিকন্যাকে দেখিয়া জানিলেন যে, রাজাবরোধেও এরূপ সুন্দরী দুর্লভ।

রাজা কহিলেন, "তুমি হিরণ্ময়ী ?"

হিরণ্ময়ী কহিলেন, "আমি আপনার দাসী।"

রাজা কহিলেন, "কেন তোমাকে ডাকাইয়াছি, তাহা শুন। তোমার বিবাহের কথা মনে পড়ে।"

হি। পড়ে।

রাজা। সেই রাত্রে আনন্দস্বামী তোমাকে যে অঙ্গুরীয় দিয়াছিলেন, তাহা তোমার কাছে আছে ?

হি। মহারাজ! সে অঙ্গুরীয় আছে। কিন্তু সে সকল অতি গুহ্য বৃত্তান্ত, কি প্রকারে আপনি তাহা অবগত হইলেন?

রাজা তাহার কোন উত্তর না দিয়া কহিলেন, "সে অঙ্গুরীয় কোথায় আছে ? আমাকে দেখাও ?"

হিরণ্ময়ী কহিলেন, "উহা আমি গৃহে রাখিয়া আসিয়াছি। পঞ্চ বৎসর পরিপূর্ণ হইতে আরও কয়েক দণ্ড বিলম্ব আছে—অতএব তাহা পরিতে আনন্দস্বামীর যে নিষেধ ছিল—তাহা এখনও আছে।"

রাজা। ভালই—কিন্তু সেই অঙ্গুরীয়ের অনূরূপ দ্বিতীয় যে অঙ্গুরীয় তোমার স্বামীকে আনন্দস্বামী দিয়াছিলেন, তাহা দেখিলে চিনিতে পারিবে ?

হি। উভয় অঙ্গুরীয় একই রূপ; সুতরাং দেখিলে চিনিতে পারিব।

তখন প্রতিহারী রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া এক সুবর্ণের কৌটা আনিল। রাজ তাহার মধ্য হইতে একটি অঙ্গুরীয় লইয়া বলিলেন, "দেখ এই অঙ্গুরীয় কাহার ?"

হিরণ্ময়ী অঙ্গুরীয় প্রদীপালোকে বিলক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, “দেব! এই আমার স্বামীর অঙ্গুরীয় বটে, কিন্তু আপনি ইহা কোথায় পাইলেন ?” পরে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, “দেব! ইহাতে জানিলাম যে, আমি বিধবা হইয়াছি। স্বজনহীন মৃতের ধন আপনার হস্তগত হইয়াছে। নহিলে তিনি জীবিতাবস্থায় ইহা ত্যাগ করিবার সম্ভাবনা ছিল না।”

রাজা হাসিয়া কহিলেন, “আমার কথায় বিশ্বাস কর, তুমি বিধবা নহ।”

হি। তবে আমার স্বামী আমার অপেক্ষাও দরিদ্র। ধনলোভে ইহা বিক্রয় করিয়াছেন।

রা। তোমার স্বামী ধনী ব্যক্তি।

হি। তবে আপনি বলে ছলে কৌশলে তাঁহার নিকট ইহা অপহরণ করিয়াছেন।

রাজা এই দুঃসাহসিক কথা শুনিয়া বিস্মিতা হইলেন। বলিলেন, “তোমার বড় সাহস! রাজা মদনদেব চোর, ইহা আর কেহ বলে না।”

হি। নচেৎ আপনি এ অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলেন ?

রা। আনন্দস্বামী তোমার বিবাহের রাত্রে ইহা আমার অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিয়াছেন।

হিরণ্ময়ী তখন লজ্জায় অধোমুখী হইয়া কহিলেন, “আর্য্যপুত্র! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন—আমি চপলা, না জানিয়া কটু কথা বলিয়াছি।”

নবম পরিচ্ছেদ

হিরণ্ময়ী রাজমহিষী, ইহা শুনিয়া হিরণ্ময়ী অত্যন্ত বিস্মিতা হইলেন। কিন্তু কিছুমাত্র আহ্লাদিতা হইলেন না। বরং বিষণ্ন হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন যে, “আমি এত দিন পুরন্দরকে পাই নাই বটে, কিন্তু পরপত্নীত্বের যন্ত্রণাভোগ করি নাই। এক্ষণ হইতে আমার সে যন্ত্রণা আরম্ভ হইল। আর আমি হৃদয়মধ্যে পুরন্দরের পত্নী—কি প্রকারে অন্যানুরাগিণী হইয়া এই মহাত্মার গৃহ কলঙ্কিত করিব ?” হিরণ্ময়ী এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমত সময়ে রাজা বলিলেন, “হিরণ্ময়ী! তুমি আমার মহিষী বটে, কিন্তু তোমাকে গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে আমার কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা আছে। তুমি বিনা মূল্যে পুরন্দরের গৃহে বাস কর কেন ?

হিরণ্ময়ী অধোবদন হইলেন। রাজা পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার দাসী অমলা সর্ব্বদা পুরন্দরের গৃহে যাতায়াত করে কেন ?”

হিরণ্ময়ী আরও লজ্জাবতমুখী হইয়া রহিলেন, ভাবিতেছিলেন, “রাজা মদনদেব কি সর্ব্বজ্ঞ ?”

তখন রাজা কহিলেন, “আর একটা গুরুতর কথা আছে। তুমি পরনারী হইয়া পুরন্দরপ্রদত্ত হীরকহার গ্রহণ করিয়াছিলে কেন ?”

এবার হিরণ্ময়ী কথা কহিলেন। বলিলেন, “আর্য্যপুত্র জানিলাম আপনি সর্ব্বজ্ঞ নহেন। হীরকহার আমি ফিরাইয়া দিয়াছি।”

রাজা। তুমি সেই হার আমার নিকট বিক্রয় করিয়াছ। এই দেখ সেই হার।

এই বলিয়া রাজা কৌটার মধ্য হইতে হার বাহির করিয়া দেখাইলেন। হিরণ্ময়ী হীরকহার চিনিতে পারিয়া বিস্মিতা হইলেন। কহিলেন, “আর্য্যপুত্র, এ হার কি আমি স্বয়ং আসিয়া আপনার কাছে বিক্রয় করিয়াছি?”

রা। না, তোমার দাসী বা দূতী অমলা আসিয়া বিক্রয় করিয়াছে। তাহাকে ডাকাইব ?

হিরণ্ময়ীর অমর্ষান্বিত বদনমণ্ডলে একটু হাসি দেখা দিল। বলিলেন, “আর্য্যপুত্র! অপরাধ ক্ষমা করুন। অমলাকে ডাকাইতে হইবে না—আমি এ বিক্রয়

স্বীকার করিতেছি।”

এবার রাজা বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, “স্ত্রীলোকের চরিত্র অভাবনীয়। তুমি পরের পত্নী হইয়া পুরন্দরের নিকট কেন এ হার গ্রহণ করিলে ?”

হি। প্রণয়োপহার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।

রাজা আরও বিস্মিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, “সে কি ? কি প্রকারে প্রণয়োপহার ?”

হি। আমি কুলটা। মহারাজ! আমি আপনার গ্রহণের যোগ্য নহি। আমি প্রণাম করিতেছি, আমাকে বিদায় দিন। আমার সঙ্গে বিবাহ বিস্মৃত হউন।

হিরণ্ময়ী রাজাকে প্রণাম করিয়া গমনোদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে রাজার বিস্ময়বিকাশক মুখকান্তি অকস্মাৎ প্রফুল্ল হইল। তিনি উচ্চৈর্হাস্য করিয়া উঠিলেন। হিরণ্ময়ী ফিরিল।

রাজা কহিলেন, “হিরণ্ময়ি! তুমিই জিতিলে,—আমি হারিলাম। তুমি কুলটা নহ, আমিও তোমার স্বামী নহি। যাইও না।”

হি। মহারাজ! তবে এ কাণ্ডটা কি, আমাকে বুঝাইয়া বলুন। আমি অতি সামান্য স্ত্রী—আমার সঙ্গে আপনার তুল্য গম্ভীরপ্রকৃতি রাজাধিরাজের রহস্য সম্ভবে না।

রাজা হাস্যত্যাগ না করিয়া বলিলেন, “আমার ন্যায় রাজারই এরূপ রহস্য সম্ভবে! ছয় বৎসর হইল, তুমি একখানি পত্রার্দ্ধ অলঙ্কারমধ্যে পাইয়াছিলে ? তাহা কি আছে ?”

হি। মহারাজ! আপনি সর্ব্বজ্ঞই বটে। পত্রার্দ্ধ আমার গৃহে আছে।

রা। তুমি শিবিকারোহণে পুনশ্চ গৃহে গিয়া সেই পত্রার্দ্ধ লইয়া আইস। তুমি আসিলে আমি সকল কথা বলিব।

দশম পরিচ্ছেদ

হিরণ্ময়ী রাজার আজ্ঞায় শিবিকারোহণে স্বগৃহে-প্রত্যাগমন করিলেন, এবং তথা হইতে সেই পূর্ব্ববর্ণিত পত্রার্দ্ধ লইয়া পুনশ্চ রাজসন্নিধানে আসিলেন। রাজা সেই পত্রার্দ্ধ দেখিয়া, আর একখানি পত্রার্দ্ধ কৌটা হইতে বাহির করিয়া হিরণ্ময়ীকে দিলেন। বলিলেন, “উভয় অর্দ্ধকে মিলিত কর।” হিরণ্ময়ী উভয়ার্দ্ধ মিলিত করিয়া দেখিলেন, মিলিল। রাজা কহিলেন, “উভয়ার্দ্ধ একত্রিত করিয়া পাঠ কর।” তখন হিরণ্ময়ী নিম্নলিখিত মত পাঠ করিলেন।

“(জ্যোতিষী গণনা করিয়া দেখিলাম) যে, তুমি যে কল্পনা করিয়াছ, তাহা কর্ত্তব্য নহে। (হিরণ্ময়ী তুল্য সোণার পুত্তলিকে) কখন চিরবৈধব্যে নিক্ষিপ্ত করা যাইতে পারে না। (বিবাহ হইলে ভয়ানক বিপদ।), তাহার চিরবৈধব্য ঘটিবে গণনা দ্বারা জানিয়াছি। তবে পঞ্চ বৎসর (পর্য্যন্ত পরস্পরে) যদি দম্পত্তি মুখদর্শন না করে, তবে এই গ্রহ হইতে যাহাতে নিষ্কৃতি (হইতে পারে) তাহার বিধান আমি করিতে পারি।”

পাঠ সমাপন হইলে, রাজা কহিলেন, “এই লিপি আনন্দস্বামী তোমার পিতাকে লিখিয়াছিলেন।”

হি। তাহা এখন বুঝিতে পারিতেছি। কেন বা আমাদিগের বিবাহকালে নয়নাবৃত হইয়াছিল—কেনই বা গোপনে সেই অদ্ভুত বিবাহ হইয়াছিল—কেনই বা পঞ্চ বৎসর অঙ্গুরীয় ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু আর ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

রাজা। আর ত অবশ্য বুঝিয়াছ যে, এই পত্র পাইয়াই তোমার পিতা পুরন্দরের সহিত সম্বন্ধ রহিত করিলেন। পুরন্দর সেই দুঃখে সিংহলে গেল।

এ দিকে আনন্দস্বামী পাত্রানুসন্ধান করিয়া একটি পাত্র স্থির করিলেন। পাত্রের কোষ্ঠী গণনা করিয়া জানিলেন যে, পাত্রটির অশীতি বৎসর পরমায়। তবে অষ্টাবিংশতি বৎসর বয়স অতীত হইবার পূর্ব্বে মৃত্যুর এক সম্ভাবনা ছিল। গণিয়া দেখিলেন যে, ঐ বয়স অতীত হইবার পূর্ব্বে এবং বিবাহের পঞ্চবৎসরমধ্যে পত্নীশয্যায় শয়ন করিয়া তাঁহার প্রাণত্যাগ করিবার সম্ভাবনা। কিন্তু যদি কোন রূপে পঞ্চ বৎসর জীবিত থাকেন, তবে দীর্ঘজীবী হইবেন।

অতএব পাত্রের ত্রয়োবিংশতি বৎসর অতীত হইবার সময়ে বিবাহ দেওয়া স্থির করিলেন। কিন্তু এত দিন অতিবাহিত থাকিলে পাছে তুমি কোন প্রকার চঞ্চলা হও, বা গোপনে কাহাকে বিবাহ কর, এই জন্য তোমাকে ভয় দেখাইবার কারণে এই পত্রার্দ্ধ তোমার অলঙ্কারমধ্যে রাখিয়াছিলেন।

তৎপরে বিবাহ দিয়া পঞ্চ বৎসর সাক্ষাৎ না হয়, তাহার জন্য যে যে কৌশল করিয়াছিলেন, তাহা জ্ঞাত আছে। সেই জন্যই পরস্পরের পরিচয় মাত্র পাও নাই।

কিন্তু সম্প্রতি কয়েক মাস হইল বড় গোলযোগ হইয়া উঠিয়াছিল। কয়েক মাস হইল আনন্দস্বামী এ নগরে আসিয়া, তোমার দারিদ্র্য শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। তিনি তোমাকে দেখিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু সাক্ষাৎ করেন নাই। তিনি আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তোমার বিবাহ বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক কহিলেন। পরে কহিলেন, "আমি যদি জানিতে পারিতাম যে, হিরণ্ময়ী এরূপ দারিদ্র্যাবস্থায় আছে, তাহা হইলে আমি উহা মোচন করিতাম। এক্ষণে আপনি উহার প্রতীকার করিবেন। এ বিষয়ে আমাকেই আপনার ঋণী জানিবেন। আপনার ঋণ আমি পরিশোধ করিব। সম্প্রতি আমার আর একটি অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে। হিরণ্ময়ী স্বামী এই নগরে বাস করিতেছেন। উহাদের পরস্পর সাক্ষাৎ না হয়, ইহা আপনি দেখিবেন। এই বলিয়া তোমার স্বামীর পরিচয়ও আমার নিকটে দিলেন। সেই অবধি অমলা যে অর্থব্যয়ের দ্বারা তোমার দারিদ্র্যদুঃখ মোচন করিয়া আসিতেছে, তাহা আমা হইতে প্রাপ্ত। আমি তোমার পিতৃগৃহ ক্রয় করিয়া তোমাকে বাস করিতে দিয়াছিলাম। হার আমিই পাঠাইয়াছিলাম—সেও তোমার পরীক্ষার্থ।"

হি। তবে আপনি এ অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলেন? কেনই বা আমার নিকট স্বামীরূপে পরিচয় দিয়া, আমাকে প্রতারিত করিয়াছিলেন? পুরন্দরের গৃহে বাস করিতেছি বলিয়া কেনই বা অনুযোগ করিতেছিলেন?

রাজা। যে দণ্ডে আমি আনন্দস্বামীর অনুজ্ঞা পাইলাম, সেই দণ্ডেই আমি তোমার প্রহরায় লোক নিযুক্ত করিলাম। সেই দিনই অমলা দ্বারা তোমার নিকট হার পাঠাই। তার পর অদ্য পঞ্চম বৎসর পূর্ণ হইবে জানিয়া, তোমার স্বামীকে ডাকাইয়া কহিলাম, 'তোমার বিবাহবৃত্তান্ত আমি সমুদায় জানি। তোমার সেই অঙ্গুরীয়টি লইয়া একাদশ দণ্ড রাত্রের সময়ে আসিও। তোমার স্ত্রীর সহিত মিলন হইবে।' তিনি কহিলেন যে, 'মহারাজের আজ্ঞা শিরোধায্য কিন্তু বনিতার সহিত মিলনের আমার স্পৃহা নাই। না হইলেই ভাল হয়।' আমি কহিলাম, 'আমার আজ্ঞা।' তাহাতে তোমার স্বামী স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু কহিলেন যে, 'আমার সেই বনিতা সচ্চরিত্রা কি দুশ্চরিত্রা, তাহা আপনি জানেন। যদি দুশ্চরিত্রা স্ত্রী গ্রহণ করিতে আজ্ঞা করেন, তবে আপনাকে অধর্ম্ম স্পর্শিবে।' আমি উত্তর করিলাম, 'অঙ্গুরীয়টি দিয়া যাও। আমি তোমার স্ত্রীর চরিত্র পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করিতে বলিব।' তিনি কহিলেন, 'এ অঙ্গুরীয় অন্যকে বিশ্বাস করিয়া দিতাম না, কিন্তু আপনাকে অবিশ্বাস নাই।' আমি অঙ্গুরীয় লইয়া তোমার যে পরীক্ষা করিয়াছি, তাহাতে তুমি জয়ী হইয়াছ।

হি। পরীক্ষা ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

এমন সময়ে রাজপুরে মঙ্গলসূচক ঘোরতর বাদ্যোদাম হইয়া উঠিল। রাজা কহিলেন, "রাত্রি একাদশ দণ্ড অতীত হইল—পরীক্ষার কথা পশ্চাৎ বলিব। এক্ষণে তোমার স্বামী আসিয়াছেন; শুভলগ্নে তাঁহার সহিত শুভদৃষ্টি কর।"

তখন পশ্চাৎ হইতে সেই কক্ষের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। এক জন মহাকায় পুরুষ সেই দ্বারপথে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। রাজা কহিলেন, "হিরণ্ময়ি ইনিই

তোমার স্বামী।”

হিরণ্ময়ী চাহিয়া দেখিলেন—তাঁহার মাথা ঘুচিয়া গেল—জাগ্রৎ স্বপ্নের ভেদজ্ঞানশূন্যা হইলেন। দেখিলেন, পুরন্দর!

উভয়ে উভয়কে নিরীক্ষণ করিয়া স্তম্ভিত, উন্মত্তপ্রায় হইলেন। কেহই যেন কথা বিশ্বাস করিলেন না।

রাজা পুরন্দরকে কহিলেন, “সুহৃৎ হিরণ্ময়ী তোমার যোগ্যা পত্নী। আদরে গৃহে লইয়া যাও। ইনি অদ্যাপি তোমার প্রতি পূর্ব্ববৎ স্নেহময়ী। আমি দিবারাত্র ইঁহাকে প্রহরাতে রাখিয়াছিলাম, তাহাতে বিশেষ জানি যে, ইনি অনন্যানুরাগিণী, তোমার ইচ্ছাক্রমে উঁহার পরীক্ষা করিয়াছি, আমি উঁহার স্বামী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলাম, কিন্তু রাজ্যলোভেও হিরণ্ময়ী লুব্ধ হইয়া তোমাকে ভুলেন নাই। আপনাকে হিরণ্ময়ীর স্বামী বলিয়া পরিচিত করিয়া ইঙ্গিতে জানাইলাম যে, হিরণ্ময়ীকে তোমার প্রতি অসৎপ্রণয়াসক্ত বলিয়া সন্দেহ করি। যদি হিরণ্ময়ী তাহাতে দুঃখিতা হত, ‘আমি নির্দ্দোষী, আমাকে গ্রহণ করুন’ বলিয়া কাতর হইত, তাহা হইলে বুঝিতাম যে, হিরণ্ময়ী তোমাকে ভুলিয়াছে। কিন্তু হিরণ্ময়ী তাহা না করিয়া বলিল, ‘মহারাজ, আমি কুলটা, আমাকে ত্যাগ করুন।’ হিরণ্ময়ি! তোমার তখনকার মনের ভাব আমি সকলই বুঝিয়াছিলাম। তুমি অন্য স্বামীর সংসর্গ করিবে না বলিয়াই আপনাকে কুলটা বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলে। এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা সুখী হও।”

হি। মহারাজ! আমাকে আর একটি কথা বুঝাইয়া দিন। ইনি সিংহলে ছিলেন, কাশীতে আমার সঙ্গে পরিণয় হইল কি প্রকারে ? যদি ইনি সিংহল হইতে সে সময় আসিয়াছিলেন, তবে আমরা কেহ জানিলাম না কেন?

রাজ। আনন্দস্বামী এবং পুরন্দরের পিতায় পরামর্শ করিয়া সিংহলে লোক পাঠাইয়া ইঁহাকে সিংহল হইতে একেবারে কাশী লইয়া গিয়াছিলেন, পরে সেইখান হইতে ইনি পুনশ্চ সিংহল গিয়াছিলেন। তাম্রলিপ্তে আসেন নাই। এই জন্য তোমরা কেহ জানিতে পার নাই।

পুরন্দর কহিলেন, “মহারাজ! আপনি যেমন আমার চিরকালের মরোনথ পূর্ণ করিলেন, জগদীশ্বর এমনই আপনার সকল মনোরথ পূর্ণ করুন। অদ্য আমি যেমন সুখী হইলাম, এমন সুখী কেহ আপনার রাজ্যে কখন বাস করে নাই।”

কপালকুণ্ডলা

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ : সাগরসঙ্গমে

"Floating straight obedient to the stream."
Comedy of Errors.

প্রায় দুই শত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এক দিন মাঘ মাসের রাত্রিশেষে একখানি যাত্রীর নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল। পর্ত্তুগিস্ ও অন্যান্য নাবিকদস্যুদিগের ভয়ে যাত্রীর নৌকা দলবদ্ধ হইয়া যাতায়াত করাই তৎকালের প্রথা ছিল; কিন্তু এই নৌকারোহীরা সঙ্গিহীন। তাহার কারণ এই যে, রাত্রিশেষে ঘোরতর কুজ্ঝটিকা দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়াছিল; নাবিকেরা দিঙ্নিরূপণ করিতে না পারিয়া বহর হইতে দূরে পড়িয়াছিল। এক্ষণে কোন্ দিকে কোথায় যাইতেছে, তাহার কিছুই নিশ্চয়তা ছিল না। নৌকারোহিগণ অনেকেই নিদ্রা যাইতেছিলেন। একজন প্রাচীন এবং একজন যুবা পুরুষ, এই দুই জন মাত্র জাগ্রত অবস্থায় ছিলেন। প্রাচীন যুবকের সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। বারেক কথাবার্ত্তা স্থগিত করিয়া বৃদ্ধ নাবিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাঝি, আজ কত দূর যেতে পারবি?" মাঝি কিছু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "বলিতে পারিলাম না।"

বৃদ্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া মাঝিকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। যুবক কহিলেন, "মহাশয়, যাহা জগদীশ্বরের হাত, তাহা পণ্ডিতে বলিতে পারে না–ও মূর্খ কি প্রকারে বলিবে? আপনি ব্যস্ত হইবেন না।"

বৃদ্ধ উগ্রভাবে কহিলেন, "ব্যস্ত হব না? বল কি, বেটারা বিশ পঁচিশ বিঘার ধান কাটিয়া লইয়া গেল, ছেলেপিলে সম্বৎসর খাবে কি?"

এ সংবাদ তিনি সাগরে উপনীত হইলে পরে পশ্চাদাগত অন্য যাত্রীর মুখে পাইয়াছিলেন। যুবা কহিলেন, "আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, মহাশয়ের বাটীতে অভিভাবক আর কেহ নাই–মহাশয়ের আসা ভাল হয় নাই।"

প্রাচীন পূর্ব্ববৎ উগ্রভাবে কহিলেন, "আসব না? তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে। এখন পরকালের কর্ম্ম করিব না ত কবে করিব?"

যুবা কহিলেন, "যদি শাস্ত্র বুঝিয়া থাকি, তবে তীর্থদর্শনে যেরূপ পরকালের কর্ম্ম হয়, বাটী বসিয়াও সেরূপ হইতে পারে।

বৃদ্ধ কহিলেন, "তবে তুমি এলে কেন?"

যুবা উত্তর করিলেন, "আমি ত আগেই বলিয়াছি যে, সমুদ্র দেখিব বড় সাধ ছিল, সেই জন্যই আসিয়াছি।" পরে অপেক্ষাকৃত মৃদু স্বরে কহিতে লাগিলেন, "আহা! কি দেখিলাম! জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না।

দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী
তমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে–
র্দ্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা ॥"

বৃদ্ধের শ্রুতি কবিতার প্রতি ছিল না, নাবিকেরা পরস্পর যে কথোপকথন করিতেছিল, তাহাই একতানমনা হইয়া শুনিতেছিলেন।

একজন নাবিক অপরকে কহিতেছিল, "ও ভাই–এ ত বড় কাজটা খারাবি হলো–এখন কি বার-দরিয়ায় পড়লেম–কি কোন্ দেশে এলেম, তা যে বুঝিতে পারি না।"

বক্তার স্বর অত্যন্ত ভয়কাতর। বৃদ্ধ বুঝিলেন যে, কোন বিপদ্ আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হইয়াছে। সশঙ্কচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাঝি, কি হয়েছে?" মাঝি উত্তর করিল না। কিন্তু যুবক উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া বাহিরে আসিলেন। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে, প্রায় প্রভাত হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে অতি গাঢ় কুজ্‌ঝটিকায় ব্যাপ্ত হইয়াছে; আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র, উপকূল, কোন দিকে কিছুই দেখা যাইতেছে না। বুঝিলেন, নাবিকদের দিগ্‌ভ্রম হইয়াছে। এক্ষণে কোন্ দিকে যাইতেছে, তাহার নিশ্চয়তা পাইতেছে না–পাছে বাহির-সমুদ্রে পড়িয়া অকূলে মারা যায়, এই আশঙ্কায় ভীত হইয়াছে।

হিমনিবারণ জন্য সম্মুখে আবরণ দেওয়া ছিল, এজন্য নৌকার ভিতর হইতে আরোহীরা এ সকল বিষয় কিছুই জানিতে পারেন নাই। কিন্তু নব্য যাত্রী অবস্থা বুঝিতে পারিয়া বৃদ্ধকে সবিশেষ কহিলেন; তখন নৌকামধ্যে মহাকোলাহল পড়িয়া গেল। যে কয়েকটি স্ত্রীলোক নৌকামধ্যে ছিল তন্মধ্যে কেহ কেহ কথার শব্দে জাগিয়াছিল, শুনিবামাত্র তাহারা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। প্রাচীন কহিল, "কেনারায় পড়! কেনারায় পড়! কেনারায় পড়!"

নব্য ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "কেনারা কোথা, তাহা জানিতে পারিলে এত বিপদ্ হইবে কেন?"

ইহা শুনিয়া নৌকারোহীদিগের কোলাহল আরও বৃদ্ধি পাইল। নব্য যাত্রী কোন মতে তাহাদিগকে স্থির করিয়া নাবিকদিগকে কহিলেন, "আশঙ্কার বিষয় কিছু নাই, প্রভাত হইয়াছে–চারি পাঁচ দণ্ডের মধ্যে অবশ্য সূর্য্যোদয় হইবে। চারি পাঁচ দণ্ডের মধ্যে নৌকা কদাচ মারা যাইবে না। তোমরা এক্ষণে বাহন বন্ধ কর, স্রোতে নৌকা যথায় যায় যাক্; পশ্চাৎ রৌদ্র হইলে পরামর্শ করা যাইবে।"

নাবিকেরা এই পরামর্শে সম্মত হইয়া তদনুরূপ আচরণ করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নাবিকেরা নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। যাত্রীরা ভয়ে কণ্ঠাগত প্রাণ। বেশী বাতাস নাই। সুতরাং তাঁহারা তরঙ্গান্দোলনকম্প বড় জানিতে পারিলেন না। তথাপি সকলেই মৃত্যু নিকট নিশ্চিত করিলেন। পুরুষেরা নিঃশব্দে দুর্গানাম জপ করিতে লাগিলেন, স্ত্রীলোকেরা সুর তুলিয়া বিবিধ শব্দবিন্যাসে কাঁদিতে লাগিল। একটি স্ত্রীলোক গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জ্জন করিয়া আসিয়াছিল, ছেলে জলে দিয়া আর তুলিতে পারে নাই,–সেই কেবল কাঁদিল না।

প্রতীক্ষা করিতে করিতে অনুভবে বেলা প্রায় এক প্রহর হইল। এমত সময়ে অকস্মাৎ নাবিকেরা দরিয়ার পাঁচ পীরের নাম কীর্ত্তিত করিয়া মহাকোলাহল করিয়া উঠিল। যাত্রীরা সকলেই জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "কি! কি! মাঝি, কি হইয়াছে?" মাঝিরাও একবাক্যে কোলাহল করিয়া কহিতে লাগিল, "রোদ উঠেছে! রোদ উঠেছে! ঐ দেখ ডাঙা!" যাত্রীরা সকলেই ঔৎসুক্যসহকারে নৌকার বাহিরে আসিয়া কোথায় আসিয়াছেন, কি বৃত্তান্ত, দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন,

সূর্য্যপ্রকাশ হইয়াছে। কুজ্ঝটিকার অন্ধকাররাশি হইতে দিঙ্‌মণ্ডল একেবারে বিমুক্ত হইয়াছে। বেলা প্রায় প্রহরাতীত হইয়াছে। যে স্থানে নৌকা আসিয়াছে, সে প্রকৃত মহাসমুদ্র নহে, নদীর মোহানা মাত্র, কিন্তু তথায় নদীর যেরূপ বিস্তার, সেরূপ বিস্তার আর কোথাও নাই। নদীর এক কূল নৌকার অতি নিকটবর্ত্তী বটে,–এমন কি, পঞ্চাশৎ হস্তের মধ্যগত, কিন্তু অপর কূলের চিহ্ন দেখা যায় না। আর যে দিকেই দেখা যায়, অনন্ত জলরাশি চঞ্চল রবিরশ্মিমালাপ্রদীপ্ত হইয়া গগনপ্রান্তে গগনসহিত মিশিয়াছে। নিকটস্থ জল, সচরাচর সকর্দ্দম নদীজলবর্ণ; কিন্তু দূরস্থ বারিরাশি নীলপ্রভ। আরোহীরা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করিলেন যে, তাঁহারা মহাসমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছেন; তবে সৌভাগ্য এই যে, উপকূল নিকটে, আশঙ্কার বিষয় নাই। সূর্য্যপ্রতি দৃষ্টি করিয়া দিক্ নিরূপিত করিলেন। সম্মুখে যে উপকূল দেখিতেছিলেন, সে সহজেই সমুদ্রের পশ্চিম তট বলিয়া সিদ্ধান্ত হইল। তটমধ্যে নৌকার অনতিদূরে এক নদীর মুখ মন্দগামী কলধৌতপ্রবাহবৎ আসিয়া পড়িতেছিল। সঙ্গমস্থলের দক্ষিণ পার্শ্বে বৃহৎ সৈকতভূমিখণ্ডে নানাবিধ পক্ষিগণ অগণিত সংখ্যায় ক্রীড়া করিতেছিল। এই নদী এক্ষণে "রসুলপুরের নদী" নাম ধারণ করিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : উপকূলে

"Ingratitude! Thou marble-hearted friend!–"

King Lear.

আরোহীদিগের স্ফূর্ত্তিব্যঞ্জক কথা সমাপ্ত হইলে, নাবিকেরা প্রস্তাব করিল যে, জোয়ারের বিলম্ব আছে;–এই অবকাশে আরোহিগণ সম্মুখস্থ সৈকতে পাকাদি সমাপন করুন, পরে জলোচ্ছ্বাস আরম্ভেই স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিতে পারিবেন। আরোহিবর্গও এই পরামর্শে সম্মতি দিলেন। তখন নাবিকেরা তরি তীরলগ্ন করিলে আরোহিগণ অবতরণ করিয়া স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন।

স্নানাদির পর পাকের উদ্যোগে আর এক নূতন বিপত্তি উপস্থিত হইল–নৌকায় পাকের কাষ্ঠ নাই। ব্যাঘ্রভয়ে উপর হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আনিতে কেহই স্বীকৃত হইল না। পরিশেষে সকলের উপবাসের উপক্রম দেখিয়া প্রাচীন, প্রাগুক্ত যুবাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বাপু নবকুমার! তুমি ইহার উপায় না করিলে আমরা এতগুলি লোক মারা যাই।"

নবকুমার কিঞ্চিৎ কাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আচ্ছা যাইব; কুড়ালি দাও, আর দা লইয়া একজন আমার সঙ্গে আইস।"

কেহই নবকুমারের সহিত যাইতে চাহিল না।

"খাবার সময় বুঝা যাবে" এই বলিয়া নবকুমার কোমর বাঁধিয়া একাকী কুঠার হস্তে কাষ্ঠাহরণে চলিলেন।

তীরোপরি আরোহণ করিয়া নবকুমার দেখিলেন যে, যত দূর দৃষ্টি চলে, তত দূর মধ্যে কোথাও বসতির লক্ষণ কিছুই নাই। কেবল বন মাত্র। কিন্তু সে বন, দীর্ঘ বৃক্ষাবলীশোভিত বা নিবিড় বন নহে;–কেবল স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্ মণ্ডলাকারে কোন কোন ভূমিখণ্ড ব্যাপিয়াছে। নবকুমার তন্মধ্যে আহরণযোগ্য কাষ্ঠ দেখিতে পাইলেন না; সুতরাং উপযুক্ত বৃক্ষের অনুসন্ধানে নদীতট হইতে অধিক দূর গমন করিতে হইল। পরিশেষে ছেদনযোগ্য একটি বৃক্ষ পাইয়া তাহা হইতে প্রয়োজনীয় কাষ্ঠ সমাহরণ করিলেন। কাষ্ঠ বহন করিয়া আনা আর এক বিষম কঠিন ব্যাপার বোধ হইল। নবকুমার দরিদ্রের সন্তান ছিলেন না, এ সকল কর্ম্মে

অভ্যাস ছিল না; সম্যক্ বিবেচনা না করিয়া কাষ্ঠ আহরণে আসিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে কাষ্ঠভার বহন বড় ক্লেশকর হইল। যাহাই হউক, যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে অল্পে ক্ষান্ত হওয়া নবকুমারের স্বভাব ছিল না, এজন্য তিনি কোন মতে কাষ্ঠভার বহিয়া আনিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর বহেন, পরে ক্ষণেক বসিয়া বিশ্রাম করেন, আবার বহেন; এইরূপে আসিতে লাগিলেন।

এই হেতুবশতঃ নবকুমারের প্রত্যাগমনে বিলম্ব হইতে লাগিল। এদিকে সমভিব্যাহারিগণ তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইতে লাগিল; তাহাদিগের এইরূপ আশঙ্কা হইল যে, নবকুমারকে ব্যাঘ্রে হত্যা করিয়াছে। সম্ভাব্য কাল অতীত হইলে এইরূপই তাহাদিগের হৃদয়ে স্থির সিদ্ধান্ত হইল। অথচ কাহারও এমন সাহস হইল না যে, তীরে উঠিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহার অনুসন্ধান করে।

নৌকারোহিগণ এইরূপ কল্পনা করিতেছিল, ইত্যবসরে জলরাশিমধ্যে ভৈরব কল্লোল উত্থিত হইল। নাবিকেরা বুঝিল যে, জোয়ার আসিতেছে। নাবিকেরা বিশেষ জানিত যে, এ সকল স্থানে জলোচ্ছ্বাসকালে তটদেশে এরূপ প্রচণ্ড তরঙ্গাভিঘাত হয় যে, তখন নৌকাদি তীরবর্ত্তী থাকিলে তাহা খণ্ডখণ্ড হইয়া যায়। এজন্য তাহারা অতিব্যস্তে নৌকার বন্ধন মোচন করিয়া নদী-মধ্যবর্ত্তী হইতে লাগিল। নৌকা মুক্ত হইতে না হইতে সম্মুখস্থ সৈকতভূমি জলপ্লাবিত হইয়া গেল, যাত্রিগণ কেবল ত্রস্তে নৌকায় উঠিতে অবকাশ পাইয়াছিল, তণ্ডুলাদি যাহা যাহা চরে স্থিত হইয়াছিল, তৎসমুদায় ভাসিয়া গেল। দুর্ভাগ্যবশতঃ নাবিকেরা সুনিপুণ নহে; নৌকা সামলাইতে পারিল না; প্রবল জলপ্রবাহবেগে তরণী রসুলপুর নদীর মধ্যে লইয়া চলিল। একজন আরোহী কহিল, "নবকুমার রহিল যে?" একজন নাবিক কহিল, "আঃ, তোর নবকুমার কি আছে? তাকে শিয়ালে খাইয়াছে।"

জলবেগে নৌকা রসুলপুরের নদীর মধ্যে লইয়া যাইতেছে, প্রত্যাগমন করিতে বিস্তর ক্লেশ হইবে, এই জন্য নাবিকেরা প্রাণপণে তাহার বাহিরে আসিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। এমন কি, সেই মাঘ মাসে তাহাদিগের ললাটে স্বেদস্রুতি হইতে লাগিল। এইরূপ পরিশ্রম দ্বারা রসুলপুর নদীর ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে লাগিল বটে, কিন্তু নৌকা যেমন বাহিরে আসিল, অমনি তথাকার প্রবলতর স্রোতে উত্তরমুখী হইয়া তীরবৎ বেগে চলিল, নাবিকেরা তাহার তিলার্দ্ধ মাত্র সংযম করিতে পারিল না। নৌকা আর ফিরিল না।

যখন জলবেগ এমত মন্দীভূত হইয়া আসিল যে, নৌকার গতি সংযত করা যাইতে পারে, তখন যাত্রীরা রসুলপুরের মোহানা অতিক্রম করিয়া অনেক দূর আসিয়াছিলেন। এখন নবকুমারের জন্য প্রত্যাবর্ত্তন করা যাইবে কি না, এ বিষয়ের মীমাংসা আবশ্যক হইল। এই স্থানে বলা আবশ্যক যে, নবকুমারের সহযাত্রীরা তাঁহার প্রতিবেশী মাত্র, কেহই আত্মবন্ধু নহে। তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করা আর এক ভাঁটার কর্ম্ম। পরে রাত্রি আগত হইবে, আর রাত্রে নৌকা চালনা হইতে পারিবে না, অতএব পর দিনের জোয়ারের প্রতীক্ষা করিতে হইবে। এ কাল পর্য্যন্ত সকলকে অনাহারে থাকিতে হইবে। দুই দিন নিরাহারে সকলের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবেক। বিশেষ নাবিকেরা প্রতিগমন করিতে অসম্মত; তাহারা কথার বাধ্য নহে। তাহারা বলিতেছে যে, নবকুমারকে ব্যাঘ্রে হত্যা করিয়াছে। তাহাই সম্ভব। তবে এত ক্লেশ-স্বীকার কি জন্য?

এরূপ বিবেচনা করিয়া যাত্রীরা নবকুমার ব্যতীত স্বদেশে গমনই উচিত বিবেচনা করিলেন। নবকুমার সেই ভীষণ সমুদ্রতীরে বনবাসে বিসর্জ্জিত হইলেন।

ইহা শুনিয়া যদি কেহ প্রতিজ্ঞা করেন, কখনও পরের উপবাস নিবারণার্থ কাষ্ঠাহরণে যাইবেন না, তবে তিনি উপহাসাস্পদ। আত্মোপকারীকে বনবাসে বিসর্জ্জন করা যাহাদিগের প্রকৃতি, তাহারা চিরকাল আত্মোপকারীকে বনবাস দিবে–কিন্তু যত বার বনবাসিত করুক না কেন, পরের কাষ্ঠাহরণ করা যাহার স্বভাব, সে পুনর্ব্বার পরের কাষ্ঠাহরণে যাইবে। তুমি অধম–তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বিজনে

"—Like a veil,
Which if withdrawn, would but disclose the frown
Of one who hates us, so the night was shown
And grimly darkled o'er their faces pale
And hopeless eyes".
Don Juan.

যে স্থানে নবকুমারকে ত্যাগ করিয়া যাত্রীরা চলিয়া যান, তাহার অনতিদূরে দৌলতপুর ও দরিয়াপুর নামে দুই ক্ষুদ্র গ্রাম এক্ষণে দৃষ্ট হয়। পরন্তু যে সময়ের বর্ণনায় আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি, সে সময়ে তথায় মনুষ্যবসতির কোন চিহ্ন ছিল না; অরণ্যময় মাত্র। কিন্তু বাঙ্গালাদেশের অন্যত্র ভূমি যেরূপ সচরাচর, অনুদ্ঘাতিনী, এ প্রদেশে সেরূপ নহে। রসুলপুরের মুখ হইতে সুবর্ণরেখা পর্য্যন্ত অবাধে কয়েক যোজন পথ ব্যাপিত করিয়া এক বালুকাস্তূপশ্রেণী বিরাজিত আছে। আর কিছু উচ্চ হইলে ঐ বালুকাস্তূপশ্রেণীকে বালুকাময় ক্ষুদ্র পর্ব্বতশ্রেণী বলা যাইতে পারিত। এক্ষণে লোকে উহাকে বালিয়াড়ি বলে। ঐ সকল বালিয়াড়ির ধবল শিখরমালা মধ্যাহ্ন সূর্য্যকিরণে দূর হইতে অপূর্ব্ব প্রভাবিশিষ্ট দেখায়। উহার উপর উচ্চ বৃক্ষ জন্মে না। স্তূপতলে সামান্য ক্ষুদ্র বন জন্মিয়া থাকে, কিন্তু মধ্যদেশে বা শিরোভাগে প্রায়ই ছায়াশূন্য ধবলশোভা বিরাজ করিতে থাকে। অধোভাগমণ্ডনকারী বৃক্ষাদির মধ্যে, ঝাটী, বনঝাউ এবং বনপুষ্পই অধিক।

এইরূপ অপ্রফুল্লকর স্থানে নবকুমার সঙ্গিগণকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমে কাষ্ঠভার লইয়া নদী তীরে আসিয়া নৌকা দেখিলেন না; তখন তাঁহার অকস্মাৎ অত্যন্ত ভয়সঞ্চার হইল বটে, কিন্তু সঙ্গিগণ যে তাঁহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, এমত বোধ হইল না। বিবেচনা করিলেন, জলোচ্ছ্বাসে সৈকতভূমি প্লাবিত হওয়ায় তাঁহারা নিকটস্থ অন্য কোন স্থানে নৌকা রক্ষা করিয়াছেন, শীঘ্র তাঁহাকে সন্ধান করিয়া লইবেন। এই প্রত্যাশায় কিয়ৎক্ষণ তথায় বসিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু নৌকা আইল না। নৌকারোহীও কেহ দেখা দিল না। নবকুমার ক্ষুধায় অত্যন্ত পীড়িত হইলেন। আর প্রতীক্ষা করিতে না পারিয়া, নৌকার সন্ধানে নদীর তীরে তীরে ফিরিতে লাগিলেন। কোথাও নৌকার সন্ধান পাইলেন না; প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পূর্ব্বস্থানে আসিলেন। তখন পর্য্যন্ত নৌকা না দেখিয়া বিবেচনা করিলেন, জোয়ারের বেগে নৌকা ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে; এখন প্রতিকূল স্রোতে প্রত্যাগমন করিতে সঙ্গীদিগের কাজে কাজেই বিলম্ব হইতেছে। কিন্তু জোয়ারও শেষ হইল। তখন ভাবিলেন, প্রতিকূল স্রোতের বেগাধিক্যবশতঃ জোয়ারে নৌকা ফিরিয়া আসিতে পারে নাই; এক্ষণে ভাঁটায় অবশ্য ফিরিয়া আসিতেছে। কিন্তু ভাঁটাও ক্রমে অধিক হইল—ক্রমে ক্রমে বেলাবসান হইয়া আসিল; সূর্য্যাস্ত হইল। যদি নৌকা ফিরিয়া আসিবার হইত, তবে এতক্ষণ ফিরিয়া আসিত।

তখন নবকুমারের প্রতীতি হইল যে, হয় জলোচ্ছ্বাসসম্ভূত তরঙ্গে নৌকা জলমগ্ন হইয়াছে, নচেৎ সঙ্গিগণ তাঁহাকে এই বিজনে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে।

নবকুমার দেখিলেন যে, গ্রাম নাই, আশ্রয় নাই, লোক নাই, আহার্য্য নাই, পেয় নাই; নদীর জল অসহ্য লবণাত্মক; অথচ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল। দুরন্ত শীতনিবারণজন্য আশ্রয় নাই, গাত্রবস্ত্র পর্য্যন্ত নাই। এই তুষার-শীতল-বায়ু-সঞ্চারিত-নদী তীরে, হিমবর্ষী আকাশতলে, নিরাশ্রয়ে নিরাবরণে শয়ন করিয়া থাকিতে হইবেক। রাত্রিমধ্যে ব্যাঘ্র ভাল্লুকের সাক্ষাৎ পাইবার সম্ভাবনা। প্রাণনাশই নিশ্চিত।

মনের চাঞ্চল্যহেতু নবকুমার এক স্থানে অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তীর ত্যাগ করিয়া উপরে উঠিলেন। ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে অন্ধকার হইল। শিশিরাকাশে নক্ষত্রমণ্ডলী নীরবে ফুটিতে লাগিল, যেমন নবকুমারের স্বদেশে ফুটিতে থাকে, তেমনি ফুটিতে লাগিল। অন্ধকারে সর্বত্র জনহীন;–আকাশ, প্রান্তর, সমুদ্র, সর্ব্বত্র নীরব, কেবল অবিরল কল্লোলিত সমুদ্রগর্জন আর কদাচিৎ বন্য পশুর রব। তথাপি নবকুমার সেই অন্ধকারে, হিমবর্ষী আকাশতলে বালুকাস্তূপের চতুঃপার্শ্বে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কখনও উপত্যকায়, কখনও অধিত্যকায়, কখনও স্তূপতলে, কখনও স্তূপশিখরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে প্রতি পদে হিংস্র পশু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু এক স্থানে বসিয়া থাকিলেও সেই আশঙ্কা।

ভ্রমণ করিতে করিতে নবকুমারের শ্রম জন্মিল। সমস্ত দিন অনাহার; এজন্য অধিক অবসন্ন হইলেন। এক স্থানে বালিয়াড়ির পার্শ্বে পৃষ্ঠরক্ষা করিয়া বসিলেন। গৃহের সুখতপ্ত শয্যা মনে পড়িল। যখন শারীরিক ও মানসিক ক্লেশের অবসাদে চিন্তা উপস্থিত হয়, তখন কখনও কখনও নিদ্রা আসিয়া সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হয়। নবকুমার চিন্তা করিতে করিতে তন্দ্রাভিভূত হইলেন। বোধ হয় যদি এরূপ নিয়ম না থাকিত, তবে সাংসারিক ক্লেশের অপ্রতিহত বেগ সকলে সকল সময়ে সহ্য করিতে পারিত না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : স্তূপশিখরে

"—সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে,
ভীষণ-দর্শন মূর্ত্তি।"

মেঘনাদবধ

যখন নবকুমারের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন রজনী গভীরা। এখনও যে তাঁহাকে ব্যাঘ্রে হত্যা করে নাই, ইহা তাঁহার আশ্চর্য্য বোধ হইল। ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন, ব্যাঘ্র আসিতেছে কি না। অকস্মাৎ সম্মুখে, বহু দূরে একটা আলোক দেখিতে পাইলেন। পাছে ভ্রম জন্মিয়া থাকে, এজন্য নবকুমার মনোভিনিবেশপূর্ব্বক তৎপ্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। আলোকপরিধি ক্রমে বর্দ্ধিতায়তন এবং উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল–আগ্নেয় আলোক বলিয়া প্রতীতি জন্মাইল। প্রতীতিমাত্র নবকুমারের জীবনাশা পুনরুদ্দীপ্ত হইল। মনুষ্যসমাগম ব্যতীত এ আলোকের উৎপত্তি সম্ভব না, কেন না, এ দাবানলের সময় নহে। নবকুমার গাত্রোত্থান করিলেন। যথায় আলোক, সেই দিকে ধাবিত হইলেন। একবার মনে ভাবিলেন, "এ আলোক ভৌতিক?–হইতেও পারে; কিন্তু শঙ্কায় নিরস্ত থাকিলেই কোন্ জীবন রক্ষা হয়?" এই ভাবিয়া নির্ভীকচিত্তে আলোক লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। বৃক্ষ, লতা, বালুকাস্তূপ পদে পদে তাঁহার গতিরোধ করিতে লাগিল। বৃক্ষলতা দলিত করিয়া, বালুকাস্তূপ লঙ্ঘিত করিয়া নবকুমার চলিলেন। আলোকের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন যে, এক অত্যুচ্চ বালুকাস্তূপের শিরোভাগে অগ্নি জ্বলিতেছে, তৎপ্রভায় শিখরাসীন মনুষ্যমূর্ত্তি আকাশপটস্থ চিত্রের ন্যায় দেখা যাইতেছে। নবকুমার শিখরাসীন মনুষ্যের সমীপবর্ত্তী হইবেন স্থির সঙ্কল্প করিয়া অশিথিলীকৃত বেগে চলিলেন। পরিশেষে স্তূপারোহণ করিতে লাগিলেন। তখন কিঞ্চিৎ শঙ্কা হইতে লাগিল–তথাপি অকম্পিতপদে স্তূপারোহণ করিতে লাগিলেন। আসীন ব্যক্তির সম্মুখবর্ত্তী হইয়া যাহা যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার রোমাঞ্চ হইল। তিষ্ঠিবেন কি প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না।

শিখরাসীন মনুষ্য নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যান করিতেছিল–নবকুমারকে প্রথমে দেখিতে পাইল না। নবকুমার দেখিলেন, তাহার বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর

হইবে। পরিধানে কোন কর্পাসবস্ত্র আছে কি না, তাহা লক্ষ্য হইল না; কটিদেশ হইতে জানু পর্য্যন্ত শার্দ্দূলচর্ম্মে আবৃত। গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা; আয়ত মুখমণ্ডল শ্মশ্রুজটাপরিবেষ্টিত। সম্মুখে কাষ্ঠে অগ্নি জ্বলিতেছিল–সেই অগ্নির দীপ্তি লক্ষ্য করিয়া নবকুমার সে স্থলে আসিতে পারিয়াছিলেন। নবকুমার একটা বিকট দুর্গন্ধ পাইতে লাগিলেন; ইহার আসন প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার কারণ অনুভূত করিতে পারিলেন। জটাধারী এক ছিন্নশীর্ষ গলিত শবের উপর বসিয়া আছেন। আরও সভয়ে দেখিলেন যে, সম্মুখে নরকপাল রহিয়াছে, তন্মধ্যে রক্তবর্ণ দ্রব পদার্থ রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকে স্থানে স্থানে অস্থি পড়িয়া রহিয়াছে–এমন কি, যোগাসীনের কণ্ঠস্থ রুদ্রাক্ষমালা মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ড গ্রথিত রহিয়াছে। নবকুমার মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া রহিলেন। অগ্রসর হইবেন, কি স্থান ত্যাগ করিবেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি কাপালিকদিগের কথা শ্রুত ছিলেন। বুঝিলেন যে, এ ব্যক্তি কাপালিক।

যখন নবকুমার উপনীত হইয়াছিলেন, তখন কাপালিক মন্ত্রসাধনে বা জপে বা ধ্যানে মগ্ন ছিল, নবকুমারকে দেখিয়া ভ্রূক্ষেপও করিল না। অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল, "কস্ত্বং?" নবকুমার কহিলেন, "ব্রাহ্মণ।"

কাপালিক কহিল, "তিষ্ঠ।" এই কহিয়া পূর্ব্বকার্য্যে নিযুক্ত হইল। নবকুমার দাঁড়াইয়া রহিলেন।

এইরূপে প্রহরার্দ্ধ গত হইল। পরিশেষে কাপালিক গাত্রোত্থান করিয়া নবকুমারকে পূর্ব্ববৎ সংস্কৃতে কহিল, "মামনুসর।"

ইহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে যে, অন্য সময়ে নবকুমার কদাপি ইহার সঙ্গী হইতেন না। কিন্তু এক্ষণে ক্ষুধাতৃষ্ণায় প্রাণ কণ্ঠাগত। অতএব কহিলেন, "প্রভুর যেমত আজ্ঞা। কিন্তু আমি ক্ষুধাতৃষ্ণায় বড় কাতর। কোথায় গেলে আহার্য্য সামগ্রী পাইব অনুমতি করুন।"

কাপালিক কহিল, "ভৈরবীপ্রেরিতোহসি; মামনুসর; পরিতোষঃ তে ভবিষ্যতি।"

নবকুমার কাপালিকের অনুগামী হইলেন। উভয়ে অনেক পথ বাহিত করিলেন–পথিমধ্যে কেহ কোন কথা কহিল না। পরিশেষে এক পর্ণকুটীর প্রাপ্ত হইল–কাপালিক প্রথমে প্রবেশ করিয়া নবকুমারকে প্রবেশ করিতে অনুমতি করিল; এবং নবকুমারের অবোধগম্য কোন উপায়ে একখণ্ড কাষ্ঠে অগ্নি জ্বালিত করিল। নবকুমার তদালোকে দেখিলেন যে, ঐ কুটীর সর্ব্বাংশে কিয়াপাতায় রচিত। তন্মধ্যে কয়েকখানা ব্যাঘ্রচর্ম্ম আছে–এক কলস জল ও কিছু ফলমূল আছে।

কাপালিক অগ্নি জ্বালিত করিয়া কহিল, "ফলমূল যাহা আছে, আত্মসাৎ করিতে পার। পর্ণপাত্র রচনা করিয়া, কলসজল পান করিও। ব্যাঘ্রচর্ম্ম আছে, অভিরুচি হইলে শয়ন করিও। নির্ব্বিঘ্নে তিষ্ঠ–ব্যাঘ্রের ভয় করিও না। সময়ান্তরে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। যে পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ না হয়, সে পর্য্যন্ত এ কুটীর ত্যাগ করিও না।"

এই বলিয়া কাপালিক প্রস্থান করিল। নবকুমার সেই সামান্য ফলমূল আহার করিয়া এবং সেই ঈষত্তিক্ত জল পান করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। পরে ব্যাঘ্রচর্ম্মে শয়ন করিলেন, সমস্ত দিবসজনিত ক্লেশহেতু শীঘ্রই নিদ্রাভিভূত হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : সমুদ্রতটে

"—যোগপ্রভাবো ন চ লক্ষ্যতে তে।
বিভর্ষি চাকারমনির্ব্বৃতানাং মৃণালিনী হৈমমিবোপরাগম্ ॥"

রঘুবংশ

প্রাতে উঠিয়া নবকুমার সহজেই বাটী গমনের উপায় করিতে ব্যস্ত হইলেন; বিশেষ, এ কাপালিকের সান্নিধ্য কোনক্রমেই শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ হইল না। কিন্তু আপাততঃ এ পথহীন বনমধ্য হইতে কি প্রকারে নিষ্ক্রান্ত হইবেন? কি প্রকারেই বা পথ চিনিয়া বাটী যাইবেন? কাপালিক অবশ্য পথ জানে, জিজ্ঞাসিলে কি বলিয়া দিবে না? বিশেষ, যত দূর দেখা গিয়াছে, তত দূর কাপালিক তাঁহার প্রতি কোন শঙ্কাসূচক আচরণ করে নাই–কেনই বা তবে তিনি ভীত হন? এ দিকে কাপালিক তাঁহাকে পুনঃসাক্ষাৎ পর্য্যন্ত কুটীর ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছে, তাহার অবাধ্য হইলে বরং তাহার রোষোৎপত্তির সম্ভাবনা। নবকুমার শ্রুত ছিলেন যে, কাপালিকেরা মন্ত্রবলে অসাধ্যসাধনে সক্ষম–এ কারণে তাহার অবাধ্য হওয়া অনুচিত। ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া নবকুমার আপাততঃ কুটীরমধ্যে অবস্থান করাই স্থির করিলেন।

কিন্তু ক্রমে বেলা অপরাহ্ণ হইয়া আসিল, তথাপি কাপালিক প্রত্যাগমন করিল না। পূর্ব্বদিনের উপবাস, অদ্য এ পর্য্যন্ত অনশন, ইহাতে ক্ষুধা প্রবল হইয়া উঠিল। কুটীরমধ্যে যে অল্প পরিমাণ ফলমূল ছিল, তাহা পূর্ব্বরাত্রেই ভুক্ত হইয়াছিল–এক্ষণে কুটীর ত্যাগ করিয়া ফলমূলান্বেষণ না করিলে ক্ষুধায় প্রাণ যায়। অল্প বেলা থাকিতে ক্ষুধার পীড়নে নবকুমার ফলান্বেষণে বাহির হইলেন।

নবকুমার ফলান্বেষণে নিকটস্থ বালুকাস্তূপসকলের চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যে দুই একটা গাছ বালুকায় জন্মিয়া থাকে, তাহার ফলাস্বাদন করিয়া দেখিলেন যে, এক বৃক্ষের ফল বাদামের ন্যায় অতি সুস্বাদু। তদ্দ্বারা ক্ষুধানিবৃত্তি করিলেন।

কথিত বালুকাস্তূপশ্রেণী প্রস্থে অতি অল্প, অতএব নবকুমার অল্পকাল ভ্রমণ করিয়া তাহা পার হইলেন। তৎপরে বালুকাবিহীন নিবিড় বনমধ্যে পড়িলেন। যাঁহারা ক্ষণকালজন্য অপূর্ব্ব পরিচিত বনমধ্যে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, পথহীন বনমধ্যে ক্ষণমধ্যেই পথভ্রান্তি জন্মে। নবকুমারের তাহাই ঘটিল। কিছুদূর আসিয়া আশ্রম কোন্ পথে রাখিয়া আসিয়াছেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। গম্ভীর জলকল্লোল তাঁহার কর্ণপথে প্রবেশ করিল; তিনি বুঝিলেন যে, এ সাগরগর্জ্জন। ক্ষণকাল পরে অকস্মাৎ বনমধ্য হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলেন যে, সম্মুখেই সমুদ্র। অনন্তবিস্তার নীলাম্বুমণ্ডল সম্মুখে দেখিয়া উৎকটানন্দে হৃদয় পরিপ্লুত হইল। সিকতাময় তটে গিয়া উপবেশন করিলেন। ফেনিল, নীল, অনন্ত সমুদ্র! উভয় পার্শ্বে যত দূর চক্ষু যায় তত দূর পর্য্যন্ত তরঙ্গভঙ্গপ্রক্ষিপ্ত ফেনার রেখা; স্তূপীকৃত বিমল কুসুমদাম গ্রথিত মালার ন্যায় সে ধবল ফেনরেখা হেমকান্ত সৈকতে ন্যস্ত হইয়াছে; কাননকুন্তলা ধরণীর উপযুক্ত অলকাভরণ। নীলজলমণ্ডলমধ্যে সহস্র স্থানেও সফেন তরঙ্গভঙ্গ হইতেছিল। যদি কখন এমত প্রচণ্ড বায়ুবহন সম্ভব হয় যে, তাহার বেগে নক্ষত্রমালা সহস্রে সহস্রে স্থানচ্যুত হইয়া নীলাম্বরে আন্দোলিত হইতে থাকে, তবেই সে সাগরতরঙ্গক্ষেপের স্বরূপ দৃষ্ট হইতে পারে। এ সময়ে অস্তগামী দিনমণির মৃদুল কিরণে নীলজলের একাংশ দ্রবীভূত সুবর্ণের ন্যায় জ্বলিতেছিল। অতিদূরে কোন ইউরোপীয় বণিকজাতির সমুদ্রপোত শ্বেতপক্ষ বিস্তার করিয়া বৃহৎ পক্ষীর ন্যায় জলধিহৃদয়ে উড়িতেছিল।

কতক্ষণ যে নবকুমার তীরে বসিয়া অনন্যমনে জলধিশোভা দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, তদ্বিষয়ে তৎকালে তিনি পরিমাণ-বোধ-রহিত। পরে একেবারে প্রদোষতিমির আসিয়া কাল জলের উপর বসিল। তখন নবকুমারের চেতনা হইল যে, আশ্রম সন্ধান করিয়া লইতে হইবেক। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন কেন, তাহা বলিতে পারি না–তখন তাঁহার মনে কোন্ ভূতপূর্ব্ব সুখের উদয় হইতেছিল, তাহা কে বলিবে? গাত্রোত্থান করিয়া সমুদ্রের দিকে পশ্চাৎ ফিরিলেন। ফিরিবামাত্র দেখিলেন, অপূর্ব মূর্ত্তি! সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি! কেশভার–অবেণীসম্বদ্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুল্ফলম্বিত কেশভার; তদগ্রে দেহরত্ন; যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে। অলকাবলীর প্রাচুর্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতেছিল না–তথাপি মেঘবিচ্ছেদ নিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। বিশাল লোচনে কটাক্ষ অতি স্থির, অতি স্নিগ্ধ, অতি গম্ভীর, অথচ জ্যোতির্ম্ময়; সে কটাক্ষ, এই সাগরহৃদয়ে ক্রীড়াশীল চন্দ্রকিরণলেখার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি পাইতেছিল। কেশরাশিতে স্কন্ধদেশ ও বাহুযুগল

আচ্ছন্ন করিয়াছিল। স্কন্ধদেশ একেবারে অদৃশ্য; বাহুযুগলের বিমলশ্রী কিছু কিছু দেখা যাইতেছিল। রমণীদেহ একেবারে নিরাভরণ। মূর্ত্তিমধ্যে যে একটি মোহিনী শক্তি ছিল, তাহা বর্ণিতে পারা যায় না। অর্দ্ধচন্দ্রনিঃসৃত কৌমুদিবর্ণ; ঘনকৃষ্ণ চিকুরজাল; পরস্পরের সান্নিধ্যে কি বর্ণ, কি চিকুর, উভয়েরই যে শ্রী বিকশিত হইতেছিল, তাহা সেই গম্ভীরনাদী সাগরকূলে, সন্ধ্যালোকে না দেখিলে তাহার মোহিনী শক্তি অনুভূত হয় না।

নবকুমার অকস্মাৎ এইরূপ দুর্গমমধ্যে দৈবী মুর্ত্তি দেখিয়া নিস্পন্দশরীর হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বাক্‌শক্তি রহিত হইল;–স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। রমণীও স্পন্দহীন, অনিমেষলোচনে বিশাল চক্ষুর স্থিরদৃষ্টি নবকুমারের মুখে ন্যস্ত করিয়া রাখিলেন। উভয়মধ্যে প্রভেদ এই যে, নবকুমারের দৃষ্টি চমকিত লোকের দৃষ্টির ন্যায়, রমণীর দৃষ্টিতে সে লক্ষণ কিছুমাত্র নাই, কিন্তু তাহাতে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ হইতেছিল।

অনন্তর সমুদ্রের জনহীন তীরে, এইরূপে বহুক্ষণ দুই জনে চাহিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে তরুণীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল। তিনি অতি মৃদুস্বরে কহিলেন, "পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?"

এই কণ্ঠস্বরের সঙ্গে নবকুমারের হৃদয়বীণা বাজিয়া উঠিল। বিচিত্র হৃদয়যন্ত্রের তন্ত্রীচয় সময়ে সময়ে এরূপ লয়হীন হইয়া থাকে যে, যত যত্ন করা যায়, কিছুতেই পরস্পর মিলিত হয় না। কিন্তু একটি শব্দে, একটি রমণীকণ্ঠসম্ভূত স্বরে সংশোধিত হইয়া যায়। সকলই লয়বিশিষ্ট হয়। সংসারযাত্রা সেই অবধি সুখময় সঙ্গীতপ্রবাহ বলিয়া বোধ হয়। নবকুমারের কর্ণে সেইরূপ এ ধ্বনি বাজিল।

" পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?" এ ধ্বনি নবকুমারের কর্ণে প্রবেশ করিল। কি অর্থ, কি উত্তর করিতে হইবে, কিছুই মনে হইল না। ধ্বনি যেন হর্ষবিকম্পিত হইয়া বেড়াইতে লাগিল; যেন পবনে সেই ধ্বনি বহিল; বৃক্ষপত্রে মর্ম্মরিত হইতে লাগিল; সাগরনাদে যেন মন্দ্রীভূত হইতে লাগিল। সাগরবসনা পৃথিবী সুন্দরী; রমণী সুন্দরী; ধ্বনিও সুন্দর; হৃদয়তন্ত্রীমধ্যে সৌন্দর্য্যের লয় মিলিতে লাগিল।

রমণী কোন উত্তর না পাইয়া কহিলেন, "আইস।" এই বলিয়া তরুণী চলিল; পদক্ষেপ লক্ষ্য হয় না। বসন্তকালে মন্দানিল-সঞ্চালিত শুভ্র মেঘের ন্যায় ধীরে ধীরে, অলক্ষ্য পাদবিক্ষেপে চলিল; নবকুমার কলের পুত্তলীর ন্যায় সঙ্গে চলিলেন। এক স্থানে একটা ক্ষুদ্র বন পরিবেষ্টন করিতে হইবে, বনের অন্তরালে গেলে, আর সুন্দরীকে দেখিতে পাইলেন না। বনবেষ্টনের পর দেখেন যে, সম্মুখে কুটীর।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : কাপালিকসঙ্গে

" কথং নিগড়সংযতাসি। দ্রুতম্‌
নয়ামি ভবতীমিতঃ-"

রত্নাবলী

নবকুমার কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বারসংযোজনপূর্ব্বক করতলে মস্তক দিয়া বসিলেন। শীঘ্র আর মস্তকোত্তোলন করিলেন না।

"এ কি দেবী–মানুষী–না কাপালিকের মায়ামাত্র!" নবকুমার নিস্পন্দ হইয়া হৃদয়মধ্যে এই কথার আন্দোলন করিতে লাগিলেন। কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

অন্যমনস্ক ছিলেন বলিয়া, নবকুমার আর একটি ব্যাপার দেখিতে পান নাই। সেই কুটীরমধ্যে তাঁহার আগমন পূর্ব্বাবধি একখানি কাষ্ঠ জ্বলিতেছিল। পরে যখন অনেক রাত্রে স্মরণ হইল যে, সায়াহ্নকৃত্য অসমাপ্ত রহিয়াছে—তখন জলান্বেষণ অনুরোধে চিন্তা হইতে ক্ষান্ত হইয়া এ বিষয়ের অসম্ভাবিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন। শুধু আলো নহে, তণ্ডুলাদি পাকোপযোগী কিছু কিছু সামগ্রীও আছে। নবকুমার বিস্মিত হইলেন না—মনে করিলেন যে, এও কাপালিকের কর্ম্ম—এ স্থানে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে।

নবকুমার সায়ংকৃত্য সমাপনান্তে তণ্ডুলগুলি কুটীরমধ্যে প্রাপ্ত এক মৃৎপাত্রে সিদ্ধ করিয়া আত্মসাৎ করিলেন।

পরদিন প্রভাতে চর্ম্মশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াই সমুদ্রতীরাভিমুখে চলিলেন। পূর্ব্ব দিনের যাতায়াতের গুণে অদ্য অল্প কষ্টে পথ অনুভূত করিতে পারিলেন। তথায় প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন? পুর্বদৃষ্টা মায়াবিনী পুনর্ব্বার সে স্থলে যে আসিবেন—এমত আশা নবকুমারের হৃদয়ে কত দূর প্রবল হইয়াছিল বলিতে পারি না—কিন্তু সে স্থান তিনি ত্যাগ করিতে পারিলেন না। অনেক বেলাতেও তথায় কেহ আসিল না। তখন নবকুমার সে স্থানের চারিদিকে ভ্রমিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বৃথা অন্বেষণ মাত্র। মনুষ্যসমাগমের চিহ্নমাত্র দেখিতে পাইলেন না। পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিয়া সেই স্থানে উপবেশন করিলেন। সূর্য্য অস্তগত হইল; অন্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল; নবকুমার হতাশ হইয়া কুটীরে ফিরিয়া আসিলেন। সায়াহ্নকালে সমুদ্রতীর হইতে প্রত্যাগমন করিয়া নবকুমার দেখিলেন যে, কাপালিক কুটীরমধ্যে ধরাতলে উপবেশন করিয়া নিঃশব্দে আছে। নবকুমার প্রথমে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন; তাহাতে কাপালিক কোন উত্তর করিল না।

নবকুমার কহিলেন; "এ পর্যন্ত প্রভুর দর্শনে কি জন্য বঞ্চিত ছিলাম?" কাপালিক কহিল, "নিজ ব্রতে নিযুক্ত ছিলাম।"

নবকুমার গৃহগমনাভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। কহিলেন, "পথ অবগত নহি—পাথেয় নাই; যদ্বিহিতবিধান প্রভুর সাক্ষাৎ পাইলেই হইতে পারিবে, এই ভরসায় আছি।"

কাপালিক কেবলমাত্র কহিল, " আমার সঙ্গে আগমন কর।" এই বলিয়া উদাসীন গাত্রোত্থান করিলেন। বাটী যাইবার কোন সদুপায় হইতে পারিবে প্রত্যাশায় নবকুমারও তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন।

তখন সন্ধ্যালোক অন্তর্হিত হয় নাই—কাপালিক অগ্রে অগ্রে, নবকুমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিলেন। অকস্মাৎ নবকুমারের পৃষ্ঠদেশে কাহার কোমল করস্পর্শ হইল। পশ্চাৎ ফিরিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে স্পন্দহীন হইলেন। সেই আগুল্‌ফলম্বিত-নিবিড়কেশ-রাশি-ধারিণী বন্যদেবীমূর্ত্তি! পূর্ব্ববৎ নিঃশব্দ নিস্পন্দ। কোথা হইতে এই মূর্ত্তি অকস্মাৎ তাঁহার পশ্চাতে আসিল! নবকুমার দেখিলেন, রমণী মুখে অঙ্গুলী প্রদান করিয়া আছে। নবকুমার বুঝিলেন যে, রমণী বাক্যস্ফূর্ত্তি নিষেধ করিতেছে, নিষেধের বড় প্রয়োজন ছিল না। নবকুমার কি কথা কহিবেন? তিনি তথায় চমৎকৃত হইয়া দাঁড়াইলেন। কাপালিক এ সকল কিছুই দেখিতে পাইল না, অগ্রসর হইয়া চলিয়া গেল। তাহারা উদাসীনের শ্রবণাতিক্রান্ত হইলে রমণী মৃদুস্বরে কি কথা কহিল। নবকুমারের কর্ণে এই শব্দ প্রবেশ করিল,

"কোথা যাইতেছ? যাইও না। ফিরিয়া যাও—পলায়ন কর।"

এই কথা সমাপ্ত করিয়াই উক্তিকারিণী সরিয়া গেলেন, প্রত্যুত্তর শুনিবার জন্য তিষ্ঠিলেন না। নবকুমার কিয়ৎকাল অভিভূতের ন্যায় দাঁড়াইলেন; পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে ব্যগ্র হইলেন, কিন্তু রমণী কোন্ দিকে গেল, তাহার কিছুই স্থিরতা পাইলেন না। মনে করিতে লাগিলেন—"এ কাহার মায়া? না আমারই ভ্রম হইতেছে। যে কথা শুনিলাম—সে ত আশঙ্কাসূচক, কিন্তু কিসের আশঙ্কা? তান্ত্রিকেরা সকলই করিতে পারে। তবে কি পলাইব? পলাইব বা কেন? সে দিন যদি বাঁচিয়াছি, আজিও বাঁচিব। কাপালিকও মনুষ্য, আমিও মনুষ্য।"

নবকুমার এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, এমত সময়ে দেখিলেন, কাপালিক তাঁহাকে সঙ্গে না দেখিয়া প্রত্যাগমন করিতেছে। কাপালিক কহিল, "বিলম্ব করিতেছ কেন?"

কাপালিক পুনরাহ্বান করাতে বিনা বাক্যব্যয়ে নবকুমার তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন।

কিয়দ্দূর গমন করিয়া সম্মুখে এক মৃৎপ্রাচীরবিশিষ্ট কুটীর দেখিতে পাইলেন। তাহাকে কুটীরও বলা যাইতে পারে, ক্ষুদ্র গৃহও বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইহাতে আমাদিগের কোন প্রয়োজন নাই। ইহার পশ্চাতেই সিকতাময় সমুদ্রতীর। গৃহপার্শ্ব দিয়া কাপালিক নবকুমারকে সেই সৈকতে লইয়া চলিলেন; এমত সময় তীরের তুল্য বেগে পূর্ব্বদৃষ্টা রমণী তাঁহার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল; গমনকালে তাঁহার কর্ণে বলিয়া গেল, "এখনও পলাও। নরমাংস নহিলে তান্ত্রিকের পূজা হয় না, তুমি কি জান না?"

নবকুমারের কপালে স্বেদনির্গম হইতে লাগিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ যুবতীর এই কথা কাপালিকের কর্ণে গেল। সে কহিল, " কপালকুণ্ডলে!"

স্বর নবকুমারের কর্ণে মেঘগর্জ্জনবৎ ধ্বনিত হইল। কিন্তু কপালকুণ্ডলা কোন উত্তর দিল না।

কাপালিক নবকুমারের হস্ত ধারণ করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। মানুষঘাতী করস্পর্শে নবকুমারের শোণিত ধমনীমধ্যে শতগুণ বেগে প্রধাবিত হইল–লুপ্ত সাহস পুনর্ব্বার আসিল। কহিলেন, " হস্ত ত্যাগ করুন।"

কাপালিক উত্তর করিল না। নবকুমার পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমায় কোথায় লইয়া যাইতেছেন।"

কাপালিক কহিল, "পূজার স্থানে।"

নবকুমার কহিলেন, "কেন?"

কাপালিক কহিল, "বধার্থ।"

অতি তীব্রবেগে নবকুমার নিজ হস্ত টানিলেন। যে বলে তিনি হস্ত আকর্ষিত করিয়াছিলেন, তাহাতে সামান্য লোকে তাহার হাত ধরিয়া থাকিলে হস্তরক্ষা করা দূরে থাকুক–বেগে ভূপতিত হইত। কিন্তু কাপালিকের অঙ্গমাত্রও হেলিল না;–নবকুমারের প্রকোষ্ঠ তাহার হস্তমধ্যেই রহিল। নবকুমারে অস্থিগ্রন্থিসকল যেন ভগ্ন হইয়া গেল। নবকুমার দেখিলেন, বলে হইবে না। কৌশলের প্রয়োজন। "ভাল দেখা যাউক"–এইরূপ স্থির করিয়া নবকুমার কাপালিকের সঙ্গে চলিলেন।

সৈকতের মধ্যস্থানে নীত হইয়া নবকুমার দেখিলেন, পূর্ব্বদিনের ন্যায় তথায় বৃহৎ কাষ্ঠে অগ্নি জ্বলিতেছে। চতুঃপার্শ্বে তান্ত্রিক পূজার আয়োজন রহিয়াছে, তন্মধ্যে নরকপালপূর্ণ আসব রহিয়াছে–কিন্তু শব নাই। অনুমান করিলেন, তাঁহাকে শব হইতে হইবে।

কতকগুলি শুষ্ক, কঠিন লতাগুল্ম তথায় পূর্ব্ব হইতেই আহরিত ছিল। কাপালিক তদ্দ্বারা নবকুমারকে দৃঢ় বন্ধন করিতে আরম্ভ করিল। নবকুমার সাধ্যমত বল প্রকাশ করিলেন; কিন্তু বল প্রকাশ কিছুমাত্র ফলদায়ক হইল না। তাঁহার প্রতীতি হইল যে, এ বয়সেও কাপালিক মত্ত হস্তীর বল ধারণ করে। নবকুমারের বল প্রকাশ দেখিয়া কাপালিক কহিল,

"মূর্খ! কি জন্য বল প্রকাশ কর? তোমার জন্ম আজি সার্থক হইল। ভৈরবীর পূজায় তোমার এই মাংসপিণ্ড অর্পিত হইবেক, ইহার অধিক তোমার তুল্য লোকের আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে?"

কাপালিক নবকুমারকে দৃঢ় বন্ধন করিয়া সৈকতোপরি ফেলিয়া রাখিলেন। এবং বধের প্রাক্কালিক পূজাদি ক্রিয়ায় ব্যাপৃত হইলেন। ততক্ষণ নবকুমার বাঁধন ছিঁড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু শুষ্ক লতা অতি কঠিন–বন্ধন অতি দৃঢ়। মৃত্যু আসন্ন! নবকুমার ইষ্টদেবচরণে চিত্ত নিবিষ্ট করিলেন। একবার জন্মভূমি

মনে পড়িল, নিজ সুখের আলয় মনে পড়িল, একবার বহুদিন অন্তর্হিত জনক এবং জননীর মুখ মনে পড়িল, দুই এক বিন্দু অশ্রুজল সৈকত-বালুকায় শুষিয়া গেল। কাপালিক বলির প্রাক্কালিক ক্রিয়া সমাপনান্তে বধার্থ খড়্গ লইবার জন্য আসন ত্যাগ করিয়া উঠিল। কিন্তু যথায় খড়্গ রাখিয়াছিল, তথায় খড়্গ পাইল না। আশ্চর্য্য! কাপালিক কিছু বিস্মিত হইল। তাহার নিশ্চিত মনে হইতেছিল যে, অপরাহ্নে খড়্গ আনিয়া উপযুক্ত স্থানে রাখিয়াছিল এবং স্থানান্তরও করে নাই, তবে খড়্গ কোথায় গেল? কাপালিক ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিল। কোথাও পাইল না। তখন পূর্ব্বকথিত কুটীরাভিমুখ হইয়া কপালকুণ্ডলাকে ডাকিল, কিন্তু পুনঃ পুনঃ ডাকাতেও কপালকুণ্ডলা কোন উত্তর দিল না। তখন কাপালিকের চক্ষু লোহিত, ভ্রূযুগল আকুঞ্চিত হইল। দ্রুতপদবিক্ষেপে গৃহাভিমুখে চলিল; এই অবকাশে বন্ধনলতা ছিন্ন করিতে নবকুমার আর একবার যত্ন পাইলেন—কিন্তু সে যত্নও নিষ্ফল হইল।

এমত সময়ে নিকটে বালুকার উপর অতি কোমল পদধ্বনি হইল—এ পদধ্বনি কাপালিকের নহে। নবকুমার নয়ন ফিরাইয়া দেখিলেন, সেই মোহিনী—কপালকুণ্ডলা। তাঁহার করে খড়্গ দুলিতেছে।

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "চুপ! কথা কহিও না—খড়্গ আমারই কাছে—চুরি করিয়া রাখিয়াছি।"

এই বলিয়া কপালকুণ্ডলা অতি শীঘ্রহস্তে নবকুমারের লতাবন্ধন খড়্গ দ্বারা ছেদন করিতে লাগিলেন। নিমিষমধ্যে তাঁহাকে মুক্ত করিলেন। কহিলেন, "পলায়ন কর; আমার পশ্চাৎ আইস, পথ দেখাইয়া দিতেছি।"

এই বলিয়া কপালকুণ্ডলা তীরের ন্যায় বেগে পথ দেখাইয়া চলিলেন। নবকুমার লাফ দিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : অন্বেষণে

> "And the great lord of Luna
> Fell at that deadly stroke;
> As falls on mount Alvernus
> A thunder-smitten oak."
>
> *Lays of Ancient Rome.*

এদিকে কাপালিক গৃহমধ্যে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া না খড়্গ, না কপালকুণ্ডলাকে দেখিতে পাইয়া সন্দিগ্ধচিত্তে সৈকতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তথায় আসিয়া দেখিল যে, নবকুমার তথায় নাই। ইহাতে অত্যন্ত বিস্ময় জন্মিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই ছিন্ন লতাবন্ধনের উপর দৃষ্টি পড়িল। তখন স্বরূপ অনুভূত করিতে পারিয়া কাপালিক নবকুমারের অন্বেষণে ধাবিত হইল। কিন্তু বিজনমধ্যে পলাতকেরা কোন দিকে কোন পথে গিয়াছে তাহা স্থির করা দুঃসাধ্য। অন্ধকারবশতঃ কাহাকেও দৃষ্টিপথবর্ত্তী করিতে পারিল না। এজন্য বাক্যশব্দ লক্ষ্য করিয়া ক্ষণেক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। কিন্তু সকল সময়ে কণ্ঠধ্বনিও শুনিতে পাওয়া গেল না। অতএব বিশেষ করিয়া চারিদিকে পর্য্যবেক্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে এক উচ্চ বালিয়াড়ির শিখরে উঠিল। কাপালিক এক পার্শ্ব দিয়া উঠিল; তাহার অন্যতর পার্শ্বে বর্ষার জলপ্রবাহে স্তূপমূল ক্ষয়িত হইয়াছিল, তাহা সে জানিত না। শিখরে আরোহণ করিবামাত্র কাপালিকের শরীরভরে সেই পতনোন্মুখ স্তূপশিখর ভগ্ন হইয়া অতি ঘোর রবে ভূপতিত হইল। পতনকালে পর্ব্বতশিখরচ্যুত মহিষের ন্যায় কাপালিকও তৎসঙ্গে পড়িয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : আশ্রয়ে

"And that very night−
Shall Romeo bear thee to Mantua."

Romeo and Juliet .

সেই অমাবস্যার ঘোরান্ধকার যামিনীতে দুই জনে ঊর্দ্ধশ্বাসে বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বন্য পথ নবকুমারের অপরিজ্ঞাত; কেবল সহচারিণী ষোড়শীকে লক্ষ্য করিয়া তদ্বর্ত্মসম্বর্ত্তী হওয়া ব্যতীত তাঁহার অন্য উপায় নাই। মনে মনে ভাবিলেন, "এও কপালে ছিল!" নবকুমার জানিতেন না যে, বাঙ্গালী অবস্থার বশীভূত, অবস্থা বাঙ্গালীর বশীভূত হয় না। জানিলে এ দুঃখ করিতেন না। ক্রমে তাঁহারা পাদক্ষেপ মন্দ করিয়া চলিতে লাগিলেন। অন্ধকারে কিছুই লক্ষ্য হয় না; কেবল কখন কোথাও নক্ষত্রালোকে কোন বালুকাস্তূপের শুভ্র শিখর অস্পষ্ট দেখা যায় – কোথাও খদ্যোতমালাসংবৃত বৃক্ষের অবয়ব জ্ঞানগোচর হয়।

কপালকুণ্ডলা পথিককে সমভিব্যাহারে লইয়া, নিভৃত কাননাভ্যন্তরে উপনীত হইলেন। তখন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। সম্মুখে অন্ধকারে বনমধ্যে এক অত্যুচ্চ দেবালয়চূড়া লক্ষিত হইল; তন্নিকটে ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীরবেষ্টিত একটি গৃহও দেখা গেল। কপালকুণ্ডলা প্রাচীরদ্বারের নিকটস্থ হইয়া তাহাতে করাঘাত করিতে লাগিলেন; পুনঃ পুনঃ করাঘাত করাতে ভিতর হইতে এক ব্যক্তি কহিল, "কে-ও, কপালকুণ্ডলা বুঝি?" কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "দ্বার খোল।"

উত্তরকারী আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। যে ব্যক্তি দ্বার খুলিয়া দিল, সে ঐ দেবালয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতার সেবক বা অধিকারী; বয়সে পঞ্চাশৎ বৎসর অতিক্রম করিয়াছিল। কপালকুণ্ডলা তাঁহার বিরলকেশ মস্তক কর দ্বারা আকর্ষিত করিয়া আপন অধরের নিকট তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয় আনিলেন এবং দুই চারি কথায় নিজ সঙ্গীর অবস্থা বুঝাইয়া দিলেন। অধিকারী বহুক্ষণ পর্য্যন্ত করতললগ্নশীর্ষ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে কহিলেন, "এ বড় বিষম ব্যাপার। মহাপুরুষ মনে করিলে সকল করিতে পারেন। যাহা হউক, মায়ের প্রসাদে তোমার অমঙ্গল ঘটিবে না। সে ব্যক্তি কোথায়?"

কপালকুণ্ডলা "আইস" বলিয়া নবকুমারকে আহ্বান করিলেন। নবকুমার অন্তরালে দাঁড়াইয়াছিলেন, আহূত হইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অধিকারী তাঁহাকে কহিলেন, "আজি এইখানে লুকাইয়া থাক, কালি প্রত্যূষে তোমাকে মেদিনীপুরের পথে রাখিয়া আসিব।"

ক্রমে কথায় কথায় অধিকারী জানিতে পারিলেন যে, এ পর্য্যন্ত নবকুমারের আহারাদি হয় নাই। ইহাতে অধিকারী তাঁহার আহারের আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইল, নবকুমার আহারে নিতান্ত অস্বীকৃত হইয়া কেবলমাত্র বিশ্রামস্থানের প্রার্থনা জানাইলেন। অধিকারী নিজ রন্ধনশালায় নবকুমারের শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। নবকুমার শয়ন করিলে, কপালকুণ্ডলা সমুদ্রতীরে প্রত্যাগমন করিবার উদ্যোগ করিলেন। অধিকারী তাঁহার প্রতি সস্নেহ নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "যাইও না। ক্ষণেক দাঁড়াও, এক ভিক্ষা আছে।"

কপালকুণ্ডলা। কি?

অধিকারী। তোমাকে দেখিয়া পর্য্যন্ত মা বলিয়া থাকি; দেবীর পাদস্পর্শ করিয়া শপথ করিতে পারি যে, মাতার অধিক তোমাকে স্নেহ করি। আমার ভিক্ষা অবহেলা করিবে না?

কপা। করিব না।

অধি। আমার এই ভিক্ষা, তুমি আর সেখানে ফিরিয়া যাইও না।

কপা। কেন?

অধি। গেলে তোমার রক্ষা নাই।

কপা। তা ত জানি।

অধি। তবে আর জিজ্ঞাসা কর কেন?

কপা। না গিয়া কোথায় যাইব?

অধি। এই পথিকের সঙ্গে দেশান্তরে যাও।

কপালকুণ্ডলা নীরব হইয়া রহিলেন। অধিকারী কহিলেন, “মা, কি ভাবিতেছ?”

কপা। যখন তোমার শিষ্য আসিয়াছিল, তখন তুমি কহিয়াছিলে যে, যুবতীর এরূপ যুবাপুরুষের সহিত যাওয়া অনুচিত; এখন যাইতে বল কেন?

অধি। তখন তোমার জীবনের আশঙ্কা করি নাই, বিশেষ যে সদুপায়ের সম্ভাবনা ছিল না, এখন সে সদুপায় হইতে পারিবে। আইস, মায়ের অনুমতি লইয়া আসি।

এই বলিয়া অধিকারী দীপহস্তে দেবালয়ের দ্বারে গিয়া দ্বারোদ্‌ঘাটন করিলেন। কপালকুণ্ডলাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। মন্দিরমধ্যে মানবাকার পরিমিতা করাল কালীমূর্ত্তি সংস্থাপিত ছিল। উভয়ে ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। অধিকারী আচমন করিয়া পুষ্পপাত্র হইতে একটি অচ্ছিন্ন বিল্বপত্র লইয়া মন্ত্রপূত করিলেন এবং তাহা প্রতিমার পাদোপরি সংস্থাপিত করিয়া তৎপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণেক পরে অধিকারী কপালকুণ্ডলাকে কহিলেন,

“মা, দেখ, দেবী অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়াছেন; বিল্বপত্র পড়ে নাই, যে মানস করিয়া অর্ঘ্য দিয়াছিলাম, তাহাতে অবশ্য মঙ্গল। তুমি এই পথিকের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে গমন কর। কিন্তু আমি বিষয়ী লোকের রীতি চরিত্র জানি। তুমি যদি গলগ্রহ হইয়া ইহার সঙ্গে যাও, তবে এ ব্যক্তি অপরিচিত যুবতী সঙ্গে লইয়া লোকালয়ে লজ্জা পাইবে। তোমাকেও লোকে ঘৃণা করিবে।

তুমি বলিতেছ, এ ব্যক্তি ব্রাহ্মণসন্তান; গলাতেও যজ্ঞোপবীত দেখিতেছি। এ যদি তোমাকে বিবাহ করিয়া লইয়া যায়, তবে সকল মঙ্গল। নচেৎ আমিও তোমাকে ইহার সহিত যাইতে বলিতে পারি না।”

“বি-বা-হ!” এই কথাটি কপালকুণ্ডলা অতি ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিলেন। বলিতে লাগিলেন, “বিবাহের নাম ত তোমাদিগের মুখে শুনিয়া থাকি, কিন্তু কাহাকে বলে সবিশেষ জানি না। কি করিতে হইবে?”

অধিকারী ঈষন্মাত্র হাস্য করিয়া কহিলেন, “বিবাহ স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্ম্মের সোপান; এই জন্য স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী বলে; জগন্মাতাও শিবের বিবাহিতা।”

অধিকারী মনে করিলেন, সকলই বুঝাইলেন। কপালকুণ্ডলা মনে করিলেন, সকলই বুঝিলেন। বলিলেন,

“তাহাই হউক। কিন্তু তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে আমার মন সরিতেছে না। তিনি যে আমাকে এতদিন প্রতিপালন করিয়াছেন।”

অধি। কি জন্য প্রতিপালন করিয়াছেন, তাহা জান না।

এই বলিয়া অধিকারী তান্ত্রিক সাধনে স্ত্রীলোকের যে সম্বন্ধ, তাহা অস্পষ্ট রকম কপালকুণ্ডলাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কপালকুণ্ডলা তাহা কিছু বুঝিল না, কিন্তু তাহার বড় ভয় হইল। বলিল, “তবে বিবাহই হউক।”

এই বলিয়া উভয়ে মন্দির হইতে বহির্গত হইলেন। এক কক্ষমধ্যে কপালকুণ্ডলাকে বসাইয়া অধিকারী নবকুমারের শয্যাসন্নিধানে গিয়া তাঁহার শিওরে

বসিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয়! নিদ্রিত কি?”

নবকুমারের নিদ্রা যাইবার অবস্থা নহে ; নিজ দশা ভাবিতেছিলেন। বলিলেন, “আজ্ঞে না।”

অধিকারী কহিলেন, “মহাশয়! পরিচয়টা লইতে একবার আসিলাম, আপনি ব্রাহ্মণ?”

নব। আজ্ঞা হাঁ।

অধি। কোন্ শ্রেণী?

নব। রাঢ়ীয় শ্রেণী?

অধি। আমরাও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ—উৎকল ব্রাহ্মণ বিবেচনা করিবেন না। বংশে কুলাচার্য্য', তবে এক্ষণে মায়ের পদাশ্রয়ে আছি। মহাশয়ের নাম?

নব। নবকুমার শর্ম্মা।

অধি। নিবাস?

নব। সপ্তগ্রাম।

অধি। আপনারা কোন্ গাঁই?

নব। বন্দ্যঘটী।

অধি। কয় সংসার করিয়াছেন?

নব। এক সংসার মাত্র।

নবকুমার সকল কথা খুলিয়া বলিলেন না। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার এক সংসারও ছিল না। তিনি রামগোবিন্দ ঘোষালের কন্যা পদ্মাবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহের পর পদ্মাবতী কিছুদিন পিত্রালয়ে রহিলেন। মধ্যে মধ্যে শ্বশুরালয়ে যাতায়াত করিতেন। যখন তাঁহার বয়স ত্রয়োদশ বৎসর, তখন তাঁহার পিতা সপরিবারে পুরুষোত্তম দর্শনে গিয়াছিলেন। এই সময়ে পাঠানেরা আকবর কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ হইতে দূরীভূত হইয়া উড়িষ্যায় সদলে বসতি করিতেছিল। তাহাদিগের দমনের জন্য আকবর শাহ বিধিমতে যত্ন পাইতে লাগিলেন। যখন রামগোবিন্দ ঘোষাল উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাগমন করেন, তখন মোঘল-পাঠানের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। আগমনকালে তিনি পথিমধ্যে পাঠানসেনার হস্তে পতিত হয়েন। পাঠানেরা তৎকালে ভদ্রাভদ্র বিচারশূন্য, তাহারা নিরপরাধী পথিকের প্রতি অর্থের জন্য বলপ্রকাশের চেষ্টা করিতে লাগিল। রামগোবিন্দ কিছু উগ্রস্বভাব; পাঠানদিগকে কটু কহিতে লাগিলেন। ইহার ফল এই হইল যে, সপরিবারে অবরুদ্ধ হইলেন; পরিশেষে জাতীয় ধর্ম্ম বিসর্জনপূর্বক সপরিবারে মুসলমান হইয়া নিষ্কৃতি পাইলেন।

রামগোবিন্দ ঘোষাল সপরিবারে প্রাণ লইয়া বাটী আসিলেন বটে, কিন্তু মুসলমান বলিয়া আত্মীয় জনসমাজে এককালীন পরিত্যক্ত হইলেন। এ সময় নবকুমারের পিতা বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহাকে সুতরাং জাতিভ্রষ্ট বৈবাহিকের সহিত জাতিভ্রষ্টা পুত্রবধূকে ত্যাগ করিতে হইল। আর নবকুমারের সহিত তাঁহার স্ত্রীর সাক্ষাৎ হইল না।

স্বজনত্যক্ত ও সমাজচ্যুত হইয়া রামগোবিন্দ ঘোষাল অধিক দিন স্বদেশে বাস করিতে পারিলেন না। এই কারণেও বটে, এবং রাজপ্রাসাদে উচ্চপদস্থ হইবার আকাঙ্ক্ষায়ও বটে, তিনি সপরিবারে রাজধানী রাজমহলে গিয়া বসতি করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া তিনি সপরিবারে মহম্মদীয় নাম ধারণ করিয়াছিলেন। রাজমহলে যাওয়ার পরে শ্বশুরের বা বনিতার কি অবস্থা হইল, তাহা নবকুমারের জানিতে পারিবার কোন উপায় রহিল না এবং এ পর্য্যন্ত কখন

কিছু জানিতেও পারিলেন না। নবকুমার বিরাগবশতঃ আর দারপরিগ্রহ করিলেন না। এই জন্য বলিতেছি, নবকুমারের "এক সংসারও" নহে।

অধিকারী এ সকল বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন না। তিনি বিবেচনা করিলেন, "কুলীনের সন্তানের দুই সংসারে আপত্তি কি?" প্রকাশ্যে কহিলেন, "আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিলাম। এই যে কন্যা আপনার প্রাণরক্ষা করিয়াছে–এ পরহিতার্থ আত্মপ্রাণ নষ্ট করিয়াছে। যে মহাপুরুষের আশ্রয়ে ইহার বাস, তিনি অতি ভয়ঙ্করস্বভাব। তাঁহার নিকট প্রত্যাগমন করিলে, আপনার যে দশা ঘটিতেছিল, ইহার সেই দশা ঘটিবে। ইহার কোন উপায় বিবেচনা করিতে পারেন কি না?"

নবকুমার উঠিয়া বসিলেন। কহিলেন, "আমিও সেই আশঙ্কা করিতেছিলাম। আপনি সকল অবগত আছেন–ইহার উপায় করুন। আমার প্রাণদান করিলে যদি কোন প্রত্যুপকার হয়–তবে তাহাতেও প্রস্তুত আছি। আমি এমন সঙ্কল্প করিতেছি যে, আমি সেই নরঘাতকের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া আত্মসমর্পণ করি। তাহা হইলে ইহার রক্ষা হইবে।" অধিকারী হাস্য করিয়া কহিলেন, "তুমি বাতুল। হইাতে কি ফল দর্শিবে? তোমারও প্রাণসংহার হইবে–অথচ ইহার প্রতি মহাপুরুষের ক্রোধোপশম হইবে না। ইহার একমাত্র উপায় আছে।"

নব। সে কি উপায়?

অধি। আপনার সহিত ইহার পলায়ন। কিন্তু সে অতি দুর্ঘট। আমার এখানে থাকিলে দুই এক দিনের মধ্যে ধৃত হইবে। এ দেবালয়ে মহাপুরুষের সর্বদা যাতায়াত। সুতরাং কপালকুণ্ডলার অদৃষ্টে অশুভ দেখিতেছি।

নবকুমার আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার সহিত পলায়ন দুর্ঘট কেন?"

অধি। এ কাহার কন্যা,–কোন্ কুলে জন্ম, তাহা আপনি কিছুই জানেন না। কাহার পত্নী,–কি চরিত্রা, তাহা কিছুই জানেন না! আপনি ইহাকে কি সঙ্গিনী করিবেন? সঙ্গিনী করিয়া লইয়া গেলেও কি আপনি ইহাকে নিজ গৃহে স্থান দিবেন? আর যদি স্থান না দেন, তবে এ অনাথা কাথায় যাইবে?

নবকুমার ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিলেন," আমার প্রাণরক্ষয়িত্রীর জন্য কোন কার্য্য আমার অসাধ্য নহে। ইনি আমার আত্মপরিবারস্থা হইয়া থাকিবেন।"

অধি। ভাল। কিন্তু যখন আপনার আত্মীয়-স্বজন জিজ্ঞাসা করিবে যে, এ কাহার স্ত্রী, কি উত্তর দিবেন?

নবকুমার পুনর্ব্বার চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আপনিই ইহার পরিচয় আমাকে দিন। আমি সেই পরিচয় সকলকে দিব।"

অধি। ভাল। কিন্তু এই পক্ষান্তরের পথ যুবক যুবতী অনন্যসহায় হইয়া কি প্রকারে যাইবে? লোকে দেখিয়া শুনিয়া কি বলিবে? আত্মীয়-স্বজনের নিকট কি বুঝাইবে? আর আমিও এই কন্যাকে মা বলিয়াছি, আমিই বা কি প্রকারে ইহাকে অজ্ঞাতচরিত্র যুবার সহিত একাকী দূরদেশে পাঠাইয়া দিই?

ঘটকরাজ ঘটকালিতে মন্দ নহেন।

নবকুমার কহিলেন, "আপনি সঙ্গে আসুন।"

অধি। আমি সঙ্গে যাইব? ভবানীর পূজা কে করিবে?

নবকুমার ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন, 'তবে কি কোন উপায় করিতে পারেন না?"

অধি। একমাত্র উপায় হইতে পারে–সে আপনার ঔদার্য্যগুণের অপেক্ষা করে।

নব। সে কি? আমি কিসে অস্বীকৃত? কি উপায় বলুন?

অধি। শুনুন। ইনি ব্রাহ্মণকন্যা। ইহার বৃত্তান্ত আমি সবিশেষ অবগত আছি। ইনি বাল্যকালে দুরন্ত খ্রীষ্টিয়ান তস্কর কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া যানভঙ্গপ্রযুক্ত

তাহাদিগের দ্বারা কালে এ সমুদ্রতীরে ত্যক্ত হয়েন। সে সকল বৃত্তান্ত পশ্চাৎ ইহার নিকট আপনি সবিশেষ অবগত হইতে পারিবেন। কাপালিক ইহাকে প্রাপ্ত হইয়া আপন যোগসিদ্ধিমানসে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। অচিরাৎ আত্মপ্রয়োজন সিদ্ধ করিতেন। ইনি এ পর্য্যন্ত অনূঢ়া; ইহার চরিত্র পরম পবিত্র। আপনি ইহাকে বিবাহ করিয়া গৃহে লইয়া যান। কেহ কোন কথা বলিতে পারিবে না। আমি যথাশাস্ত্র বিবাহ দিব।

নবকুমার শয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অতি দ্রুতপাদবিক্ষেপে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কোন উত্তর করিলেন না। অধিকারী কিয়ৎক্ষণ পরে কহিলেন,

“আপনি এক্ষণে নিদ্রা যান। কল্য প্রত্যূষে আপনাকে আমি জাগরিত করিব। ইচ্ছা হয়, একাকী যাইবেন। আপনাকে মেদিনীপুরের পথে রাখিয়া আসিব।”

এই বলিয়া অধিকারী বিদায় লইলেন। গমনকালে মনে মনে কহিলেন, “রাঢ়দেশের ঘটকালি কি ভুলিয়া গিয়াছি না কি?”

নবম পরিচ্ছেদ : দেবনিকেতনে

“কণ্ব। অলং রুদিতেন; স্থিরা ভব, ইতঃ পন্থানমালোকয়।”

শকুন্তলা

প্রাতে অধিকারী নবকুমারের নিকট আসিলেন। দেখিলেন, এখনও নবকুমার শয়ন করেন নাই। জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখন কি কর্ত্তব্য?”

নবকুমার কহিলেন,“ আজি হইতে কপালকুণ্ডলা আমার ধর্ম্মপত্নী। ইহার জন্য সংসার ত্যাগ করিতে হয়, তাহাও করিব। কে কন্যা সম্প্রদান করিবে?”

ঘটকচূড়ামণির মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল। মনে মনে ভাবিলেন, “এত দিনে জগদম্বার কৃপায় আমার কপালিনীর বুঝি গতি হইল।” প্রকাশ্যে বলিলেন, “আমি সম্প্রদান করিব।” অধিকারী নিজ শয়নকক্ষমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। একটি খুঙ্গীর মধ্যে কয়েকখণ্ড অতি জীর্ণ তালপত্র ছিল। তাহাতে তাঁহার তিথি নক্ষত্রাদি নির্দ্দিষ্ট থাকিত। তৎসমুদায় সবিশেষ সমালোচনা করিয়া আসিয়া কহিলেন, “আজি যদিও বৈবাহিক দিন নহে–তথাচ বিবাহে কোন বিঘ্ন নাই। গোধূলিলগ্নে কন্যা সম্প্রদান করিব। তুমি অদ্য উপবাস করিয়া থাকিবে মাত্র। কৌলিক আচরণ সকল বাটী গিয়া করাইও। এক দিনের জন্য তোমাদিগকে লুকাইয়া রাখিতে পারি, এমন স্থান আছে। আজি যদি তিনি আসেন, তবে তোমাদিগের সন্ধান পাইবেন না। পরে বিবাহান্তে কালি প্রাতে সপত্নীক বাটী যাইও।”

নবকুমার ইহাতে সম্মত হইলেন। এ অবস্থায় যত দূর সম্ভব, তত দূর যথাশাস্ত্র কার্য্য হইল। গোধূলিলগ্নে নবকুমারের সহিত কাপালিকপালিতা সন্ন্যাসিনীর বিবাহ হইল।

কাপালিকের কোন সংবাদ নাই। পরদিন প্রত্যূষে তিন জনে যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। অধিকারী মেদিনীপুরের পথ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে রাখিয়া আসিবেন।

যাত্রাকালে কপালকুণ্ডলা কালীপ্রণামার্থ গেলেন। ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া পুষ্পপাত্র হইতে একটি অভিন্ন বিল্বপত্র প্রতিমার পাদোপরি স্থাপিত করিয়া তৎপ্রতি নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। পত্রটি পড়িয়া গেল।

কপালকুণ্ডলা নিতান্ত ভক্তিপরায়ণা। বিল্বদল প্রতিমাচরণচ্যুত হইল দেখিয়া ভীত হইলেন;–এবং অধিকারীকে সংবাদ দিলেন। অধিকারীও বিষণ্ন হইলেন।

কহিলেন,

"এখন নিরুপায়। এখন পতিমাত্র তোমার ধর্ম্ম। পতি শ্মশানে গেলে তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে যাইতে হইবে। অতএব নিঃশব্দে চল।"

সকলে নিঃশব্দে চলিলেন। অনেক বেলা হইলে মেদিনীপুরের পথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন অধিকারী বিদায় হইলেন। কপালকুণ্ডলা কাঁদিতে লাগিলেন। পৃথিবীতে যে জন তাঁহার একমাত্র সুহৃদ সে বিদায় হইতেছে।

অধিকারীও কাঁদিতে লাগিলেন। চক্ষের জল মুছাইয়া কপালকুণ্ডলার কানে কানে কহিলেন, " মা! তুই জানিস, পরমেশ্বরীর প্রসাদে তোর সন্তানের অর্থের অভাব নাই। হিজলীর ছোট বড় সকলেই তাঁহার পূজা দেয়। তোর কাপড়ে যাহা বাঁধিয়া দিয়াছি, তাহা তোর স্বামীর নিকট দিয়া তোকে পাল্কী করিয়া দিতে বলিস্।–সন্তান বলিয়া মনে করিস।"

অধিকারী এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গেলেন। কপালকুণ্ডলাও কাঁদিতে কাঁদিতে চলিলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ : রাজপথে

"—There—now lean on me:
Place your foot here—"

Manfred

নবকুমার মেদিনীপুরে আসিয়া অধিকারীর প্রদত্ত ধনবলে কপালকুণ্ডলার জন্য একজন দাসী, একজন রক্ষক ও শিবিকাবাহক নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে শিবিকারোহণে পাঠাইলেন। অর্থের অপ্রাচুর্য্য হেতু স্বয়ং পদব্রজে চলিলেন। নবকুমার পূর্ব্বদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত ছিলেন, মধ্যাহ্নভোজনের পর বাহকেরা তাঁহাকে অনেক পশ্চাৎ করিয়া গেল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। শীতকালের অনিবিড় মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়াছে। সন্ধ্যাও অতীত হইল। পৃথিবী অন্ধকারময়ী হইল। অল্প অল্প বৃষ্টিও পড়িতে লাগিল। নবকুমার কপালকুণ্ডলার সহিত একত্র হইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। মনে স্থির জ্ঞান ছিল যে, প্রথম সরাইতে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবেন, কিন্তু সরাইও আপাততঃ দেখা যায় না। প্রায় রাত্রি চারি ছয় দণ্ড হইল। নবকুমার দ্রুতপাদবিক্ষেপ করিতে করিতে চলিলেন। অকস্মাৎ কোন কঠিন দ্রব্যে তাঁহার চরণস্পর্শ হইল। পদভরে সে বস্তু খড় খড় মড় মড় শব্দে ভাঙ্গিয়া গেল। নবকুমার দাঁড়াইলেন; পুনর্ব্বার পদচালনা করিলেন, পুনর্ব্বার ঐরূপ হইল। পদস্পৃষ্ট বস্তু হস্তে করিয়া তুলিয়া লইলেন। দেখিলেন, ঐ বস্তু তক্তাভাঙ্গার মত।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলেও সচরাচর এমত অন্ধকার হয় না যে, অনাবৃত স্থানে স্থুল বস্তুর অবয়ব লক্ষ্য হয় না। সম্মুখে একটা বৃহৎ বস্তু পড়িয়া ছিল; নবকুমার অনুভব করিয়া দেখিলেন যে, সে ভগ্ন শিবিকা, অমনি তাঁহার হৃদয়ে কপালকুণ্ডলার বিপদ আশঙ্কা হইল। শিবিকার দিকে যাইতে আবার ভিন্নপ্রকার পদার্থে তাঁহার পাদস্পর্শ হইল। এ স্পর্শ কোমল মনুষ্যশরীর স্পর্শের ন্যায় বোধ হইল। বসিয়া হাত বুলাইয়া দেখিলেন, মনুষ্যশরীর বটে। স্পর্শ অত্যন্ত শীতল; তৎসঙ্গে দ্রব পদার্থের স্পর্শ অনুভূত হইল। নাড়ীতে হাত দিয়া দেখিলেন, স্পন্দ নাই, প্রাণবিয়োগ হইয়াছে। বিশেষ মনঃসংযোগ করিয়া দেখিলেন, যেন নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ

শুনা যাইতেছে। নিশ্বাস আছে, তবে নাড়ী নাই কেন? এ কি রোগী? নাসিকার নিকট হাত দিয়া দেখিলেন, নিশ্বাস বহিতেছে না। তবে শব্দ কেন? হয়ত কোন জীবিত ব্যক্তিও এখানে আছে, এই ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে কেহ জীবিত ব্যক্তি আছে?"

মৃদুস্বরে এক উত্তর হইল, "আছি।"

নবকুমার কহিলেন, "কে তুমি?"

উত্তর হইল, "তুমি কে?" নবকুমারের কর্ণে স্বর স্ত্রীকণ্ঠজাত বোধ হইল। ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কপালকুণ্ডলা না কি?"

স্ত্রীলোক কহিল, "কপালকুণ্ডলা কে, তা জানি না–আমি পথিক, আপাততঃ দস্যুহস্তে নিষ্কুণ্ডলা হইয়াছি।"

ব্যঙ্গ শুনিয়া নবকুমার ঈষৎ প্রসন্ন হইলেন। জিজ্ঞাসিলেন, "কি হইয়াছে?"

উত্তরকারিণী কহিলেন, "দস্যুতে আমার পাল্কী ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, আমার একজন বাহককে মারিয়া ফেলিয়াছে; আর সকলে পলাইয়া গিয়াছে। দস্যুরা আমার অঙ্গের অলঙ্কার সকল লইয়া আমাকে পাল্কীতে বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছে।"

নবকুমার অন্ধকারে অনুধাবন করিয়া দেখিলেন, যথার্থই একটি স্ত্রীলোক শিবিকাতে বস্ত্রদ্বারা দৃঢ় বন্ধনযুক্ত আছে। নবকুমার শীঘ্রহস্তে তাহার বন্ধন মোচন করিয়া কহিলেন, "তুমি উঠিতে পারিবে কি?" স্ত্রীলোক কহিল, "আমাকেও এক ঘা লাঠি লাগিয়াছিল; এজন্য পায়ে বেদনা আছে; কিন্তু বোধ হয়, অল্প সাহায্য করিলে উঠিতে পারিব।"

নবকুমার হাত বাড়াইয়া দিলেন। রমণী তৎসাহায্যে গাত্রোত্থান করিলেন। নবকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন," চলিতে পারিবে কি?"

স্ত্রীলোক উত্তর না করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার পশ্চাতে কেহ পথিক আসিতেছে দেখিয়াছেন?"

নবকুমার কহিলেন, "না।"

স্ত্রীলোক পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "চটি কত দূর?"

নবকুমার কহিলেন, "কত দূর বলিতে পারি না–কিন্তু বোধ হয় নিকট।"

স্ত্রীলোক কহিল, "অন্ধকারে একাকিনী মাঠে বসিয়া কি করিব, আপনার সঙ্গে চটি পর্য্যন্ত যাওয়াই উচিত। বোধ হয়, কোন কিছুর উপর ভর করিতে পারিলে; চলিতে পারিব।"

নবকুমার কহিলেন, "বিপৎকালে সঙ্কোচ মূঢ়ের কাজ। আমার কাঁধে ভর করিয়া চল।"

স্ত্রীলোকটি মূঢ়ের কার্য্য করিল না। নবকুমারের স্কন্ধেই ভর করিয়া চলিল।

যথার্থই চটি নিকটে ছিল। এ সকল কালে চটির নিকটেও দুষ্ক্রিয়া করিতে দস্যুরা সঙ্কোচ করিত না। অনধিক বিলম্বে নবকুমার সমভিব্যাহারিণীকে লইয়া তথায় উপনীত হইলেন।

নবকুমার দেখিলেন যে, ঐ চটিতেই কপালকুণ্ডলা অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার দাসদাসী তজ্জন্য একখানা ঘর নিযুক্ত করিয়াছিল। নবকুমার স্বীয় সঙ্গিনীর জন্য তৎপার্শ্ববর্ত্তী একখানা ঘর নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে তন্মধ্যে প্রবেশ করাইলেন। তাঁহার আজ্ঞামত গৃহস্বামীর বনিতা প্রদীপ জ্বালিয়া আনিল। যখন দীপরশ্মিস্রোতঃ তাঁহার সঙ্গিনীর শরীরে পড়িল, তখন নবকুমার দেখিলেন যে, ইনি অসামান্যা সুন্দরী। রূপরাশিতরঙ্গে, তাঁহার যৌবনশোভা শ্রাবণের নদীর ন্যায় উছলিয়া পড়িতেছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : পান্থনিবাসে

"কৈষা যোষিৎ প্রকৃতিচপলা"

উদ্ধবদূত

যদি এই রমণী নির্দ্দোষ সৌন্দর্য্যবিশিষ্টা হইতেন, তবে বলিতাম, "পুরুষ পাঠক! ইনি আপনার গৃহিণীর ন্যায় সুন্দরী। আর সুন্দরী পাঠকারিণি! ইনি আপনার দর্পণস্থ ছায়ার ন্যায় রূপবতী।" তাহা হইলে রূপবর্ণনার একশেষ হইত। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইনি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নহেন, সুতরাং নিরস্ত হইতে হইল।

ইনি যে নির্দ্দোষসুন্দরী নহেন, তাহা বলিবার কারণ এই যে, প্রথমতঃ ইহার শরীর মধ্যমাকৃতির অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ; দ্বিতীয়তঃ অধরৌষ্ঠ কিছু চাপা; তৃতীয়তঃ প্রকৃতপক্ষে ইনি গৌরাঙ্গী নহেন।

শরীর ঈষদ্দীর্ঘ বটে, কিন্তু হস্তপদ হৃদয়াদি সর্ব্বাঙ্গ সুগোল সম্পূর্ণীভূত। বর্ষাকালে বিটপীলতা যেমন আপন পত্ররাশির বাহুল্যে দলমল করে, ইহার শরীর তেমনি আপন পূর্ণতায় দলমল করিতেছিল; সুতরাং ঈষদ্দীর্ঘ দেহও পূর্ণতাহেতু অধিকতর শোভার কারণ হইয়াছিল। যাঁহাদিগকে প্রকৃতপক্ষে গৌরাঙ্গী বলি, তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও বর্ণ পূর্ণচন্দ্র কৌমুদীর ন্যায়, কাহারও কাহারও ঈষদারক্তবদনা ঊষার ন্যায়। ইহার বর্ণ এতদুভয়বর্জ্জিত, সুতরাং ইহাকে প্রকৃত গৌরাঙ্গী বলিলাম না বটে, কিন্তু মুগ্ধকরী শক্তিতে ইহার বর্ণও ন্যূন নহে। ইনি শ্যামবর্ণা। "শ্যামা মা"বা "শ্যামসুন্দর" যে শ্যামবর্ণের উদাহরণ, এ সে শ্যামবর্ণ নহে। তপ্ত কাঞ্চনের যে শ্যামবর্ণ, এ সেই শ্যাম। পূর্ণচন্দ্রকরলেখা, অথবা হেমাম্বুদকিরীটিনী ঊষা, যদি গৌরাঙ্গীদিগের বর্ণপ্রতিমা হয়, তবে বসন্তপ্রসূত নবচূতদলরাজির শোভা এই শ্যামার বর্ণের অনুরূপ বলা যাইতে পারে। পাঠক মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকে গৌরাঙ্গীর বর্ণের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, কিন্তু যদি কেহ এরূপ শ্যামার মন্ত্রে মুগ্ধ হয়েন, তবে তাঁহাকে বর্ণজ্ঞানশূন্য বলিতে পারিব না। এ কথায় যাঁহার বিরক্তি জন্মে, তিনি একবার নবচূতপল্লববিরাজী ভ্রমরশ্রেণীর তুল্য, সেই উজ্জ্বলশ্যামললাটবিলম্বী অলকাবলী মনে করুন; সেই সপ্তমীচন্দ্রাকৃতিললাটতলস্থ অলকস্পর্শী ভ্রূযুগ মনে করুন; সেই পক্বচূতোজ্জ্বল কপোলদেশ মনে করুন;' তন্মধ্যবর্ত্তী ঘোরারক্ত ক্ষুদ্র ওষ্ঠাধর মনে করুন, তাহা হইলে এই অপরিচিতা রমণীকে সুন্দরী প্রধানা বলিয়া অনুভব হইবে। চক্ষু দুইটি অতি বিশাল নহে, কিন্তু সুবঙ্কিম পল্লবরেখাবিশিষ্ট—আর অতিশয় উজ্জ্বল। তাহার কটাক্ষ স্থির, অথচ মর্ম্মভেদী। তোমার উপর দৃষ্টি পড়িলে তুমি তৎক্ষণাৎ অনুভূত কর যে, এ স্ত্রীলোক তোমার মন পর্য্যন্ত দেখিতেছে। দেখিতে দেখিতে যে মর্ম্মভেদী দৃষ্টির ভাবান্তর হয়; চক্ষু সুকোমল স্নেহময় রসে গলিয়া যায়। আবার কখনও বা তাহাতে কেবল সুখাবেশজনিত ক্লান্তি প্রকাশ মাত্র, যেন সে নয়ন মন্মথের স্বপ্নশয্যা। কখনও বা লালসাবিস্ফারিত, মদনরসে টলমলায়মান। আবার কখনও লোলাপাঙ্গে ক্রূর কটাক্ষ—যেন মেঘমধ্যে বিদ্যুদ্দাম। মুখকান্তিমধ্যে দুইটি অনির্ব্বচনীয় শোভা; প্রথম সর্ব্বত্রগামিনী বুদ্ধির প্রভাব, দ্বিতীয় আত্মগরিমা। তৎকারণে যখন তিনি মরালগ্রীবা বঙ্কিম করিয়া দাঁড়াইতেন, তখন সহজেই বোধ হইত, তিনি রমণীকুলরাজ্ঞী।

সুন্দরীর বয়ঃক্রম সপ্তবিংশতি বৎসর—ভাদ্র মাসের ভরা নদী। ভাদ্র মাসের নদীজলের ন্যায়, ইহার রূপরাশি টলটল করিতেছিল—উছলিয়া পড়িতেছিল। বর্ণাপেক্ষা, নয়নাপেক্ষা, সর্ব্বাপেক্ষা সেই সৌন্দর্য্যের পরিপ্লব মুগ্ধকর। পূর্ণযৌবনভরে সর্ব্বশরীর সতত ঈষচ্চঞ্চল; বিনা বায়ুতে শরতের নদী যেমন ঈষচ্চঞ্চল, তেমনি চঞ্চল, সে চাঞ্চল্য মুহুর্মুহুঃ নূতন নূতন শোভাবিকাশের কারণ। নবকুমার নিমেষশূন্যচক্ষে সেই নূতন নূতন শোভা দেখিতেছিলেন।

সুন্দরী, নবকুমারের চক্ষু নিমেষশূন্য দেখিয়া কহিলেন, “আপনি কি দেখিতেছেন, আমার রূপ?”

নবকুমার ভদ্রলোক; অপ্রতিভ হইয়া মুখাবনত করিলেন। নবকুমারকে নিরুত্তর দেখিয়া অপরিচিতা পুনরপি হাসিয়া কহিলেন,

“আপনি কখনও কি স্ত্রীলোক দেখেন নাই, না আপনি আমাকে বড় সুন্দরী মনে করিতেছেন?”

সহজে এ কথা কহিলে, তিরস্কারস্বরূপ বোধ হইত, কিন্তু রমণী যে হাসির সহিত বলিলেন, তাহাতে ব্যঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই বোধ হইল না। নবকুমার দেখিলেন, এ অতি মুখরা; মুখরার কথায় কেন না উত্তর করিবেন? কহিলেন,

“ আমি স্ত্রীলোক দেখিয়াছি; কিন্তু এরূপ সুন্দরী দেখি নাই।”

রমণী সগর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিলেন, “একটিও না?”

নবকুমারের হৃদয়ে কপালকুণ্ডলার রূপ জাগিতেছিল; তিনিও সগর্ব্বে উত্তর করিলেন, “একটিও না, এমত বলিতে পারি না।”

উত্তরকারিণী কহিলেন, “তবুও ভাল। সেটি কি আপনার গৃহিণী?”

নব। কেন ? গৃহিণী কেন মনে ভাবিতেছ?

স্ত্রী। বাঙ্গালীরা আপন গৃহিণীকে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী দেখে।

নব। আমি বাঙ্গালী; আপনিও তো বাঙ্গালীর ন্যায় কথা কহিতেছেন, আপনি তবে কোন্ দেশীয়?

যুবতী আপন পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, “অভাগিনী বাঙ্গালী নহে; পশ্চিমপ্রদেশীয়া মুসলমানী।” নবকুমার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন পরিচ্ছদ প্রদেশীয়া মুসলমানীর ন্যায় বটে। কিন্তু বাঙ্গালা ত ঠিক বাঙ্গালীর মতই বলিতেছে। ক্ষণপরে তরুণী বলিতে লাগিলেন,

“মহাশয় বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে আমার পরিচয় লইলেন;–আপন পরিচয় দিয়া চরিতার্থ করুন। যে গৃহে সেই অদ্বিতীয়া রূপসী গৃহিণী, সে গৃহ কোথায়?”

নবকুমার কহিলেন, “আমার নিবাস সপ্তগ্রাম।”

বিদেশিনী কোন উত্তর করিলেন না। সহসা তিনি মুখাবনত করিয়া, প্রদীপ উজ্জ্বল করিতে লাগিলেন।

ক্ষণেক পরে মুখ না তুলিয়া বলিলেন, “দাসীর নাম মতি। মহাশয়ের নাম কি শুনিতে পাই না?”

নবকুমার বলিলেন, “নবকুমার শর্ম্মা”।

প্রদীপ নিবিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : সুন্দরীসন্দর্শনে

“—ধর দেবি মোহন মূরতি
দেহ আজ্ঞা, সাজাই ও বরবপু আনি
নানা আভরণ!”

মেঘনাদবধ

নবকুমার গৃহস্বামীকে ডাকিয়া অন্য প্রদীপ আনিতে বলিলেন। অন্য প্রদীপ আনিবার পূর্ব্বে একটি দীর্ঘনিশ্বাস শব্দ শুনিতে পাইলেন। প্রদীপ আনিবার ক্ষণেক পরে ভৃত্যবেশী একজন মুসলমান আসিয়া উপস্থিত হইল। বিদেশিনী তাহাকে দেখিয়া কহিলেন,

"সে কি, তোমাদিগের এত বিলম্ব হইল কেন? আর সকলে কোথায়?"

ভৃত্য কহিল, "বাহকেরা সকল মাতোয়ারা হইয়াছিল, তাহাদের গুছাইয়া আনিতে আমরা পাল্কীর পশ্চাতে পড়িয়াছিলাম। পরে ভগ্ন শিবিকা দেখিয়া এবং আপনাকে না দেখিয়া আমরা একেবারে অজ্ঞান হইয়াছিলাম। কেহ কেহ সেই স্থানে আছে; কেহ কেহ অন্যান্য দিকে আপনার সন্ধানে গিয়াছে। আমি এদিকে সন্ধানে আসিয়াছি।"

মতি কহিলেন," তাহাদিগকে লইয়া আইস।"

নফর সেলাম করিয়া চলিয়া গেল, বিদেশিনী কিয়ৎকাল করলগ্নকপোলা হইয়া বসিয়া রহিলেন।

নবকুমার বিদায় চাহিলেন। তখন মতি স্বপ্নোত্থিতার ন্যায় গাত্রোত্থান করিয়া পূর্ব্ববৎভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোথায় অবস্থিতি করিবেন ?"

নব। ইহারই পরের ঘরে।

মতি। আপনার সে ঘরের কাছে একখানি পাল্কী দেখিলাম, আপনার কি কেহ সঙ্গী আছেন?

"আমার স্ত্রী সঙ্গে"।

মতিবিবি আবার ব্যঙ্গের অবকাশ পাইলেন। কহিলেন, "তিনিই কি অদ্বিতীয়া রূপসী?"

নব। দেখিলে বুঝিতে পারিবেন।

মতি। দেখা কি পাওয়া যায়?

নব। (চিন্তা করিয়া) ক্ষতি কি?

"তবে একটু অনুগ্রহ করুন। অদ্বিতীয়া রূপসীকে দেখিতে বড় কৌতূহল হইতেছে। আগরা গিয়া বলিতে চাহি, কিন্তু এখনই নহে–আপনি এখন যান। ক্ষণেক পরে আমি আপনাকে সংবাদ দিব।"

নবকুমার চলিয়া গেলেন। ক্ষণেক পরে অনেক লোকজন, দাসদাসী ও বাহক সিন্দুক ইত্যাদি লইয়া উপস্থিত হইল। একখানি শিবিকাও আসিল; তাহাতে একজন দাসী। পরে নবকুমারের নিকট সংবাদ আসিল," বিবি স্মরণ করিয়াছেন।"

নবকুমার মতিবিবির নিকট পুনরাগমন করিলেন। দেখিলেন, এবার আবার রূপান্তর। মতিবিবি, পূর্ব্বপরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া সুবর্ণমুক্তাদিশোভিত কারুকার্য্যযুক্ত বেশভুষা ধারণ করিয়াছেন; নিরলঙ্কার দেহ অলঙ্কারে খচিত করিয়াছেন। যেখানে যাহা ধরে–কুন্তলে, কবরীতে, কপালে, নয়নপার্শ্বে, কর্ণে, কণ্ঠে, হৃদয়ে, বাহুযুগে, সর্ব্বত্র সুবর্ণমধ্য হইতে হীরকাদি রত্ন ঝলসিতেছে। নবকুমারের চক্ষু অস্থির হইল। প্রভূতনক্ষত্রমালাভূষিত আকাশের ন্যায়, মধুরায়ত শরীর সহিত অলঙ্কারবাহুল্য সুসঙ্গত বোধ হইল, এবং তাহাতে আরও সৌন্দর্য্য প্রভা বর্দ্ধিত হইল। মতিবিবি নবকুমারকে কহিলেন,

"মহাশয় চলুন, আপনার পত্নীর নিকট পরিচিত হইয়া আসি।" নবকুমার বলিলেন, "সে জন্য অলঙ্কার পরিবার প্রয়োজন ছিল না। আমার পরিবারের কোন গহনাই নাই।"

মতিবিবি। গহনাগুলি না হয়, দেখাইবার জন্য পরিয়াছি। স্ত্রীলোকের গহনা থাকিলে, সে না দেখাইলে বাঁচে না। এখন, চলুন।

নবকুমার মতিবিবিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিলেন। যে দাসী শিবিকারোহণে আসিয়াছিল, সেও সঙ্গে চলিল। ইহার নাম পেষমন্।

কপালকুণ্ডলা দোকানঘরের আর্দ্র মৃত্তিকায় একাকিনী বসিয়া ছিলেন। একটি ক্ষীণালোক প্রদীপ জ্বলিতেছে মাত্র—অবদ্ধ নিবিড় কেশরাশি পশ্চাদ্ভাগ অন্ধকার করিয়া রহিয়াছিল। মতিবিবি প্রথম যখন তাঁহাকে দেখিলেন, তখন অধরপার্শ্বে ও নয়নপ্রান্তে ঈষৎ হাসি ব্যক্ত হইল। ভাল করিয়া দেখিবার জন্য প্রদীপটি তুলিয়া কপালকুণ্ডলার মুখের নিকট আনিলেন। তখন সে হাসি হাসি ভাব দূর হইল; মতির মুখ গম্ভীর হইল;—অনিমিষলোচনে দেখিতে লাগিলেন। কেহ কোন কথা কহেন না—মতি মুগ্ধা, কপালকুণ্ডলা কিছু বিস্মিতা।

ক্ষণেক পরে মতি আপন অঙ্গ হইতে অলঙ্কাররাশি মোচন করিতে লাগিলেন। মতি আত্মশরীর হইতে অলঙ্কাররাশি মুক্ত করিয়া একে একে কপালকুণ্ডলাকে পরাইতে লাগিলেন। কপালকুণ্ডলা কিছু বলিলেন না। নবকুমার কহিতে লাগিলেন, "ও কি হইতেছে?" মতি তাহার কোন উত্তর করিলেন না।

অলঙ্কারসমাবেশ সমাপ্ত হইলে, মতি নবকুমারকে কহিলেন, "আপনি সত্যই বলিয়াছিলেন। এ ফুল রাজোদ্যানেও ফুটে না। পরিতাপ এই যে, রাজধানীতে এ রূপরাশি দেখাইতে পারিলাম না। এ সকল অলঙ্কার এই অঙ্গেরই উপযুক্ত—এই জন্য পরাইলাম। আপনিও কখন কখন পরাইয়া মুখরা বিদেশিনীকে মনে কবিবেন।"

নবকুমার চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, "সে কি! এ যে বহুমূল্য অলঙ্কার। আমি এ সব লইব কেন?"

মতি কহিলেন, "ঈশ্বরপ্রসাদাৎ আমার আর আছে। আমি নিরাভরণা হইব না। ইহাকে পরাইয়া আমার যদি সুখবোধ হয়, আপনি কেন ব্যাঘাত করেন?"

মতিবিবি ইহা কহিয়া দাসীসঙ্গে চলিয়া গেলেন। বিরলে আসিলে পেষমন্ মতিবিবিকে জিজ্ঞাসা করিল,

"বিবিজান! এ ব্যক্তি কে ?"

যবনবালা উত্তর করিলেন," মেরা শৌহর।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : শিবিকারোহণে

"———খুলিনু সত্বরে,
কঙ্কণ, বলয়, হার, সীঁথি, কণ্ঠমালা,
কুণ্ডল, নূপুর কাঞ্চি।"

মেঘনাদবধ

গহনার দশা কি হইল, বলি শুন। মতিবিবি গহনা রাখিবার জন্য একটি রৌপ্যজড়িত হস্তিদন্তের কৌটা পাঠাইয়া দিলেন। দস্যুরা তাহার অল্প সামগ্রীই লইয়াছিল—নিকটে যাহা ছিল, তদ্ব্যতীত কিছুই পায় নাই।

নবকুমার দুই একখানি গহনা কপালকুণ্ডলার অঙ্গে রাখিয়া অধিকাংশ কৌটায় তুলিয়া রাখিলেন। পরদিন প্রভাতে মতিবিবি বর্দ্ধমানাভিমুখে, নবকুমার সপত্নীক সপ্তগ্রামাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে শিবিকাতে তুলিয়া দিয়া তাঁহার সঙ্গে গহনার কৌটা দিলেন। বাহকেরা সহজেই নবকুমারকে

পশ্চাৎ করিয়া চলিল। কপালকুণ্ডলা শিবিকাদ্বার খুলিয়া চারিদিক্ দেখিতে দেখিতে যাইতেছিলেন। একজন ভিক্ষুক তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া ভিক্ষা চাইতে চাইতে পাল্কীর সঙ্গে চলিল।

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "আমার ত কিছু নাই, তোমাকে কি দিব?"

ভিক্ষুক কপালকুণ্ডলার অঙ্গে যে দুই একখানা অলঙ্কার ছিল তৎপ্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া কহিল, "সে কি মা! তোমার গায়ে হীরা মুক্তা—তোমার কিছুই নাই?"

কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসা করিলেন, গহনা পাইলে তুমি সন্তুষ্ট হও?"

ভিক্ষুক কিছু বিস্মিত হইল। ভিক্ষুকের আশা অপরিমিত। ক্ষণমাত্র পরে কহিল, "হই বই কি?"

কপালকুণ্ডলা অকপটহৃদয়ে কৌটাসমেত সকল গহনাগুলি ভিক্ষুকের হস্তে দিলেন। অঙ্গের অলঙ্কারগুলিও খুলিয়া দিলেন।

ভিক্ষুক ক্ষণেক বিহ্বল হইয়া রহিল। দাসদাসী কিছুমাত্র জানিতে পারিল না। ভিক্ষুকের বিহ্বলভাব ক্ষণিকমাত্র। তখনই এদিক ওদিক চাহিয়া গহনা লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। কপালকুণ্ডলা ভাবিলেন, "ভিক্ষুক দৌড়িল কেন?"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : স্বদেশে

"শব্দাখ্যেয়ৎ যদপি কিল তে যঃ সখীনাং পুরস্তাৎ।
কর্ণে লোলঃ কথয়িতুমভূদাননস্পর্শলোভাৎ।।"

মেঘদূত

নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে লইয়া স্বদেশে উপনীত হইলেন। নবকুমার পিতৃহীন, তাঁহার বিধবা মাতা গৃহে ছিলেন, আর দুই ভগিনী ছিল। জ্যৈষ্ঠা বিধবা; তাহার সহিত পাঠক মহাশয়ের পরিচয় হইবে না। দ্বিতীয়া শ্যামাসুন্দরী সধবা হইয়াও বিধবা; কেন না, তিনি কুলীনপত্নী। তিনি দুই একবার আমাদের দেখা দিবেন।

অবস্থান্তরে নবকুমার অজ্ঞাতকুলশীলা তপস্বিনীকে বিবাহ করিয়া গৃহে আনায়, তাঁহার আত্মীয়-স্বজন কতদূর সন্তুষ্টি প্রকাশ করিতেন, তাহা আমরা বলিয়া উঠিতে পারিলাম না। প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়ে তাঁহাকে কোন ক্লেশ পাইতে হয় নাই। সকলেই তাঁহার প্রত্যাগমন পক্ষে নিরাশ্বাস হইয়াছিল। সহযাত্রীরা প্রত্যাগমন করিয়া রটনা করিয়াছিলেন যে, নবকুমারকে ব্যাঘ্রে হত্যা করিয়াছে। পাঠক মহাশয় মনে করিবেন যে, এই সত্যবাদীরা আত্মপ্রতীতি মতই কহিয়াছিলেন;—কিন্তু ইহা স্বীকার করিলে তাঁহাদিগের কল্পনাশক্তির অবমাননা করা হয়। প্রত্যাগত যাত্রীর মধ্যে অনেকে নিশ্চিত করিয়া কহিয়াছিলেন যে, নবকুমারকে ব্যাঘ্রমুখে পড়িতে তাঁহারা প্রত্যক্ষই দৃষ্টি করিয়াছিলেন। –কখনও কখনও ব্যাঘ্রটার পরিমাপ লইয়া তর্কবিতর্ক হইল; কেহ বলিলেন, "–ব্যাঘ্রটা আট হাত হইবেক–" কেহ বলিলেন "না, প্রায় চৌদ্দ হাত।" পূর্ব্বপরিচিত প্রাচীন যাত্রী কহিলেন, "যাহা হউক, আমি বড় রক্ষা পাইয়াছিলাম। ব্যাঘ্রটা আমাকে অগ্রে তাড়া করিয়াছিল, আমি, পলাইলাম; নবকুমার তত সাহসী পুরুষ নহে ; পলাইতে পারিল না।"

যখন এই সকল রটনা নবকুমারের মাতা প্রভৃতির কর্ণগোচর হইল, তখন পুরমধ্যে এমত ক্রন্দনধ্বনি উঠিল যে, কয়দিন তাহার ক্ষান্তি হইল না। একমাত্র

পুত্রের মৃত্যুসংবাদে নবকুমারের মাতা একবারে মৃতপ্রায় হইলেন। এমত সময়ে যখন নবকুমার সস্ত্রীক হইয়া বাটী আগমন করিলেন, তখন তাঁহাকে কে জিজ্ঞাসা করে যে, তোমার বধূ কোন জাতীয়া বা কাহার কন্যা? সকলেই আহ্লাদে অন্ধ হইল। নবকুমারের মাতা মহাসমাদরে বধূ বরণ করিয়া গৃহে লইলেন।

যখন নবকুমার দেখিলেন যে, কপালকুণ্ডলা তাঁহার গৃহমধ্যে সাদরে গৃহীত হইলেন, তখন তাঁহার আনন্দ-সাগর উছলিয়া উঠিল। অনাদরের ভয়ে তিনি কপালকুণ্ডলা লাভ করিয়াও কিছুমাত্র আহলাদ বা প্রণয়লক্ষণ প্রকাশ করেন নাই;—অথচ তাঁহার হৃদয়াকাশ কপালকুণ্ডলার মূর্ত্তিতেই ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছিল। এই আশঙ্কাতেই তিনি কপালকুণ্ডলার পাণিগ্রহণ প্রস্তাবে অকস্মাৎ সম্মত হয়েন নাই, এই আশঙ্কাতেই পাণিগ্রহণ করিয়াও গৃহগমন পর্য্যন্ত বারেকমাত্র কপালকুণ্ডলার সহিত প্রণয়সম্ভাষণ করেন নাই; পরিপ্লবোন্মুখ অনুরাগসিন্ধুতে বীচিমাত্র বিক্ষিপ্ত হইতে দেন নাই। কিন্তু সে আশঙ্কা দূর হইল; জলরাশির গতিমুখ হইতে বেগনিরোধকারী উপলমোচনে যেমন দুর্দ্দম স্রোতোবেগ জন্মে, সেইরূপ বেগে নবকুমারের প্রণয়সিন্ধু উছলিয়া উঠিল।

এই প্রেমাবির্ভাব সর্বদা কথায় ব্যক্ত হইত না, কিন্তু নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে দেখিলেই যেরূপ সজললোচনে তাঁহার প্রতি অনিমেষ চাহিয়া থাকিতেন, তাহতেই প্রকাশ পাইত; যেরূপ নিষ্প্রয়োজনে, প্রয়োজন কল্পনা করিয়া কপালকুণ্ডলার কাছে আসিতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত; যেরূপ বিনাপ্রসঙ্গে কপালকুণ্ডলার কাছে আসিতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত; যেরূপ বিনাপ্রসঙ্গে কপালকুণ্ডলার প্রসঙ্গ উত্থাপনের চেষ্টা পাইতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত; যেরূপ দিবানিশি কপালকুণ্ডলার সুখস্বচ্ছন্দতার অন্বেষণ করিতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত; সর্ব্বদা অন্যমনস্কতাসূচক পদবিক্ষেপেও প্রকাশ পাইত। তাঁহার প্রকৃতি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। যেখানে চাপল্য ছিল, সেখানে গাম্ভীর্য্য জন্মিল; যেখানে অপ্রসাদ ছিল, সেখানে প্রসন্নতা জন্মিল; নবকুমারের মুখ সর্ব্বদাই প্রফুল্ল। হৃদয় স্নেহের আধার হওয়াতে অপর সকলের প্রতি স্নেহের আধিক্য জন্মিল; বিরক্তিজনকের প্রতি বিরাগের লাঘব হইল; মনুষ্যমাত্র প্রেমের পাত্র হইল; পৃথিবী সৎকর্ম্মের জন্য মাত্র সৃষ্টা বোধ হইতে লাগিল; সকল সংসার সুন্দর বোধ হইতে লাগিল। প্রণয় এইরূপ! প্রণয় কর্কশকে মধুর করে, অসৎকে সৎ করে, অপুণ্যকে পুণ্যবান্ করে, অন্ধকারকে আলোকময় করে!

আর কপালকুণ্ডলা? তাহার কি ভাব! চল পাঠক তাহাকে দর্শন করি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : অবরোধে

"কিমিত্যপাস্যভরণানি যৌবনে
ধৃতং ত্বয়া বার্দ্ধকশোভি বল্কলম্।
বদ প্রদোষে স্ফুটচন্দ্রতারকা
বিভাবরী যদ্যরুণায় কল্পতে —"

কুমারসম্ভব

সকলেই অবগত আছেন যে, পূর্ব্বকালে সপ্তগ্রাম মহাসমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। এককালে যবদ্বীপ হইতে রোমক পর্য্যন্ত সর্ব্বদেশের বণিকেরা বাণিজ্যার্থ এই মহানগরে মিলিত হইত। কিন্তু বঙ্গীয় দশম একাদশ শতাব্দীতে সপ্তগ্রামের প্রাচীন সমৃদ্ধির লাঘব জন্মিয়াছিল। ইহার প্রধান কারণ এই যে, তন্নগরের প্রান্তভাগ

প্রক্ষালিত করিয়া যে স্রোতস্বতী বাহিত হইত, এক্ষণে তাহা সঙ্কীর্ণশরীরা হইয়া আসিতেছিল; সুতরাং বৃহদাকার জলযান সকল আর নগর পর্য্যন্ত আসিতে পারিত না। এ কারণ বাণিজ্যবাহুল্য ক্রমে লুপ্ত হইতে লাগিল। বাণিজ্যগৌরব নগরের বাণিজ্যনাশ হইলে সকলই যায়। সপ্তগ্রামের সকলই গেল। বঙ্গীয় একাদশ শতাব্দীতে হুগলি নূতন সৌষ্ঠবে তাহার প্রতিযোগী হইয়া উঠিতেছিল। তথায় পর্ত্তুগীসেরা বাণিজ্য আরম্ভ করিয়া সপ্তগ্রামের ধনলক্ষ্মীকে আকর্ষিতা করিতেছিলেন। কিন্তু তখনও সপ্তগ্রাম একবারে হতশ্রী হয় নাই। তথায় এ পর্য্যন্ত ফৌজদার প্রভৃতি প্রধান রাজপুরুষদিগের বাস ছিল; কিন্তু তখনও অনেকাংশ শ্রীভ্রষ্ট এবং বসতিহীন হইয়া পল্লীগ্রামের আকার ধারণ করিয়াছিল।

সপ্তগ্রামের এক নির্জ্জন ঔপনগরিক ভাগে নবকুমারের বাস। এক্ষণে সপ্তগ্রামের ভগ্নদশায় তথায় প্রায় মনুষ্যসমাগম ছিল না; রাজপথ সকল লতাগুল্মাদিতে পরিপূরিত হইয়াছিল। নবকুমারের বাটীর পশ্চাদ্ভাগেই এক বিস্তৃত নিবিড় বন। বাটীর সম্মুখে প্রায় ক্রোশার্দ্ধ দূরে একটি ক্ষুদ্র খাল বহিত; সেই খাল একটা ক্ষুদ্র প্রান্তর বেষ্টন করিয়া গৃহের পশ্চাদ্ভাগস্থ বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। গৃহটি ইষ্টকরচিত; দেশকাল বিবেচনা করিলে তাহাকে নিতান্ত সামান্য গৃহ বলা যাইতে পারিত না। দোতালা বটে, কিন্তু ভয়ানক উচ্চ নহে; এখন একতালায় সেরূপ উচ্চতা অনেক দেখা যায়।

এই গৃহের ছাদের উপর দুইটি নবীনবয়সী স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিক অবলোকন করিতেছিলেন। সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। চতুর্দ্দিকে যাহা দেখা যাইতেছিল, তাহা লোচনরঞ্জন বটে। নিকটে, একদিকে নিবিড় বন; তন্মধ্যে অসংখ্য পক্ষী কলরব করিতেছে। অন্যদিকে ক্ষুদ্র খাল, রূপার সূতার ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। দূরে মহানগরের অসংখ্য সৌধমালা, নববসন্তপবনস্পর্শলোলুপ নাগরিকগণে পরিপূরিত হইয়া শোভা করিতেছে। অন্যদিকে, অনেক দূরে নৌকাভরণা ভাগীরথীর বিশাল বক্ষে সন্ধ্যাতিমির ক্ষণে ক্ষণে গাঢ়তর হইতেছে।

যে নবীনাদ্বয় প্রাসাদোপরি দাঁড়াইয়া ছিলেন, তন্মধ্যে একজন চন্দ্ররশ্মিবর্ণাভা; অবিন্যস্ত কেশভার মধ্যে প্রায় অর্দ্ধলুক্কায়িতা। অপরা কৃষ্ণাঙ্গী; তিনি সুমুখী ষোড়শী, তাঁহার ক্ষুদ্র দেহ, মুখখানি ক্ষুদ্র, তাহার উপরার্দ্ধে চারিদিক দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঞ্চিত কুন্তলদাম বেড়িয়া পড়িয়াছে; যেন নীলোৎপলদলরাজি উৎপলমধ্যকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। নয়নযুগল বিস্ফারিত, কোমল-শ্বেতবর্ণ, সফরীসদৃশ; অঙ্গুলিগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, সঙ্গিনীর কেশতরঙ্গমধ্যে ন্যস্ত হইয়াছে। পাঠক মহাশয় বুঝিয়াছেন যে, চন্দ্ররশ্মিবর্ণশোভিনী কপালকুণ্ডলা; তাঁহাকে বলিয়া দিই, কৃষ্ণাঙ্গী, তাঁহার ননন্দা শ্যামাসুন্দরী ।

শ্যামাসুন্দরী ভ্রাতৃজায়াকে কখনও "বউ" কখনও আদর করিয়া "বন" কখনও "মৃণো" সম্বোধন করিতেছিলেন। কপালকুণ্ডলা নামটি বিকট বলিয়া, গৃহস্থেরা তাঁহার নাম মৃন্ময়ী রাখিয়াছিলেন এই জন্য; "মৃণো" সম্বোধন। আমরাও এখন কখন কখন ইহাকে মৃন্ময়ী বলিব।

শ্যামাসুন্দরী একটি শৈশবাভ্যস্ত কবিতা বলিতেছিলেন, যথা–

"বলে–পদ্মরাণি, বদনখানি, রেতে রাখে ঢেকে।
ফুটায় কলি, ছুটায় অলি, প্রাণপতিকে দেখে—
আবার–বনের লতা, ছড়িয়ে পাতা, গাছের দিকে ধায়।
নদীর জল, নামলে ঢল, সাগরেতে যায়—
ছি ছি–সরম টুটে, কুমুদ ফুটে, চাঁদের আলো পেলে।
বিয়ের কনে রাখতে নারি ফুলশয্যা গেলে—
মরি–এ কি জ্বালা, বিধির খেলা, হরিষে বিষাদ।

পরপরশে, সবাই রসে, ভাঙ্গে লাজের বাঁধ—”

“তুই কি লো একা তপস্বিনী থাকিবি?”

মৃন্ময়ী উত্তর করিল, “ কেন, কি তপস্যা করিতেছি?”

শ্যামাসুন্দরী দুই করে মৃন্ময়ীর কেশতরঙ্গমালা তুলিয়া কহিল, “ তোমার এ চুলের রাশি কি বাঁধিবে না?”

মৃন্ময়ী কেবল ঈষৎ হাসিয়া শ্যামাসুন্দরীর হাত হইতে কেশগুলি টানিয়া লইলেন।

শ্যামাসুন্দরী আবার কহিলেন, “ভাল, আমার সাধটি পুরাও। একবার আমাদের গৃহস্থের মেয়ের মত সাজ। কতদিন যোগিনী থাকিবে?”

মৃ। যখন এই ব্রাহ্মণসন্তানের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, তখন ত আমি যোগিনীই ছিলাম।

শ্যা। এখন থাকিতে পারিবে না।

মৃ। কেন থাকিব না?

শ্যা। কেন? দেখিবি? যোগ ভাঙ্গিব। পরশপাথর কাহাকে বলে জান?

মৃন্ময়ী কহিলেন, “না।”

শ্যা। পরশপাতরের স্পর্শে রাঙ্গও সোনা হয়।

মৃ। তাতে কি?

শ্যা। মেয়েমানুষেরও পরশপাতর আছে।

মৃ। সে কি?

শ্যা। পুরুষ। পুরুষের বাতাসে যোগিনীও গৃহিণী হইয়া যায়। তুই সেই পাতর ছুঁয়েছিস। দেখিবি,

“বাঁধাব চুলের রাশ, পরাব চিকন বাস,
খোঁপায় দোলাব তোর ফুল।
কপালে সীঁথির ধার, কাঁকালেতে চন্দ্রহার,
কানে তোর দিব যোড়া দুল—
কুঙ্কুম চন্দন চুয়া, বাটা ভরে পান গুয়া,
রাঙ্গামুখ রাঙ্গা হবে রাগে।
সোনার পুত্তুলি ছেলে,কোলে তোর দিব ফেলে,
দেখি ভাল লাগে কি না লাগে—”

মৃন্ময়ী কহিলেন, “ভাল বুঝিলাম। পরশপাতর যেন ছুঁয়েছি, সোনা হলেম। চুল বাঁধিলাম; ভাল কাপড় পরিলাম; খোঁপায় ফুল দিলাম; কাঁকালে চন্দ্রহার পরিলাম; কানে দুল দুলিল; চন্দন, কুঙ্কুম, চুয়া, পান, গুয়া, সোনার পুত্তলি পর্য্যন্ত হইল। মনে কর সকলই। তাহা হইলেই বা কি সুখ?”

শ্যা। বল দেখি ফুলটি ফুটিলে কি সুখ?

মৃ। লোকের দেখে সুখ, ফুলের কি?

শ্যামাসুন্দরীর মুখকান্তি গম্ভীর হইল; প্রভাতবাতাবহ নীলোৎপলবৎ বিস্ফারিত চক্ষু ঈষৎ দুলিল; বলিলেন, "ফুলের কি? তাহা ত বলিতে পারি না। কখনও ফুল হইয়া ফুটি নাই। কিন্তু যদি তোমার মত কলি হইতাম, তবে ফুটিয়া সুখ হইত।"

শ্যামাসুন্দরী তাঁহাকে নীরব দেখিয়া কহিলেন, "আচ্ছা–তাই যদি না হইল;–তবে শুনি দেখি, তোমার সুখ কি?"

মৃন্ময়ী কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, "বলিতে পারি না। বোধ করি, সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে।"

শ্যামাসুন্দরী কিছু বিস্মিতা হইলেন। তাঁহাদিগের যত্নে যে মৃন্ময়ী উপকৃতা হয়েন নাই, ইহাতে কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধা হইলেন, কিছু রুষ্টা হইলেন। কহিলেন, "এখন ফিরিয়া যাইবার উপায়?"

মৃ। উপায় নাই।

শ্যা। তবে করিবে কি?

মৃ। অধিকারী কহিতেন, "যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি।"

শ্যামাসুন্দরী মুখে কাপড় দিয়া হাসিয়া বলিলেন, " যে আজ্ঞা, ভট্টাচার্য্য মহাশয়! কি হইল?"

মৃন্ময়ী নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, " যাহা বিধাতা করাইবেন, তাহাই করিব। যাহা কপালে আছে তাহাই ঘটিবে।"

শ্যা। কেন, কপালে আর কি আছে? কপালে সুখ আছে। তুমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেল কেন?

মৃন্ময়ী কহিলেন, "শুন। যে দিন স্বামীর সহিত যাত্রা করি, যাত্রাকালে আমি ভবানীর পায়ে ত্রিপত্র দিতে গেলাম। আমি মার পাদপদ্মে ত্রিপত্র না দিয়া কোন কর্ম্ম করিতাম না। যদি কর্ম্মে শুভ হইবার হইত, তবে মা ত্রিপত্র ধারণ করিতেন; যদি অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিত, তবে ত্রিপত্র পড়িয়া যাইত। অপরিচিত ব্যক্তির সহিত অজ্ঞাত দেশে আসিতে শঙ্কা হইতে লাগিল; ভাল মন্দ জানিতে মার কাছে গেলাম। ত্রিপত্র মা ধারণ করিলেন না—অতএব কপালে কি আছে জানি না।"

মৃন্ময়ী নীরব হইলেন। শ্যামাসুন্দরী শিহরিয়া উঠিলেন।

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ : ভূতপূর্ব্বে

"কষ্টোহয়ং খলু ভৃত্যভাবঃ।"

রত্নাবলী

যখন নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে লইয়া চটি হইতে যাত্রা করেন, তখন মতিবিবি পথান্তরে বর্দ্ধমানাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যতক্ষণ মতিবিবি পথবাহন করেন, ততক্ষণ আমরা তাঁহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত কিছু বলি। মতির চরিত্র মহাদোষ কলুষিত, মহদ্‌গুণেও শোভিত। এরূপ চরিত্রের বিস্তারিত বৃত্তান্তে পাঠক মহাশয় অসন্তুষ্ট হইবেন না।

যখন ইহার পিতা মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বন করিলেন, তখন ইহার হিন্দু নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া লুৎফ-উন্নিসা নাম হইল। মতিবিবি কোন কালেও ইহার নাম নহে। তবে কখনও কখনও ছদ্মবেশে দেশবিদেশে ভ্রমণকালে ঐ নাম গ্রহণ করিতেন। ইহার পিতা ঢাকায় আসিয়া রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু তথায় অনেক নিজদেশীয় লোকের সমাগম। দেশীয় সমাজে সমাজচ্যুত হইয়া সকলের থাকিতে ভাল লাগে না। অতএব তিনি কিছু দিনে সুবাদারের নিকট প্রতিপত্তি লাভ করিয়া তাঁহার সুহৃদ অনেকানেক ওমরাহের নিকট পত্রসংগ্রহপূর্ব্বক সপরিবারে আগ্রায় আসিলেন। আকবরশাহের নিকট কাহারও গুণ অবিদিত থাকিত না; শীঘ্রই তিনি ইহার গুণগ্রহণ করিলেন। লুৎফ-উন্নিসার পিতা শীঘ্রই উচ্চপদস্থ হইয়া আগ্রার প্রধান ওমরাহ মধ্যে গণ্য হইলেন। এদিকে লুৎফ-উন্নিসা ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। আগ্রাতে আসিয়া তিনি পারসীক, সংস্কৃত, নৃত্য গীত, রসবাদ ইত্যাদিতে সুশিক্ষিতা হইলেন। রাজধানীর অসংখ্য রূপবতী গুণবতীদিগের মধ্যে অগ্রগণ্যা হইতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ বিদ্যাসম্বন্ধে তাঁহার যাদৃশ শিক্ষা হইয়াছিল, ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহার কিছুই হয় নাই। লুৎফ-উন্নিসার বয়স পূর্ণ হইলে প্রকাশ পাইতে লাগিল যে, তাঁহার মনোবৃত্তি সকল দুর্দ্দমবেগবতী। ইন্দ্রিয়দমনে কিছুমাত্র ক্ষমতাও নাই, ইচ্ছাও নাই। সদসতে সমান প্রবৃত্তি। এ কার্য্য সৎ, এ কার্য্য অসৎ, এমত বিচার করিয়া তিনি কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন না; যাহা ভাল লাগিত, তাহাই করিতেন। যখন সৎকর্ম্মে অন্তঃকরণ সুখী হইত, তখন সৎকর্ম্ম করিতেন; যখন অসৎকর্ম্মে অন্তঃকরণ সুখী হইত তখন অসৎকর্ম্ম করিতেন; যৌবনকালের মনোবৃত্তি দুর্দ্দম হইলে যে সকল দোষ জন্মে, তাহা লুৎফ-উন্নিসা সম্বন্ধে জন্মিল। তাঁহার পূর্ব্ব স্বামী বর্ত্তমান, ওমরাহেরা কেহ তাঁহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন না। তিনিও বড় বিবাহের অনুরাগিণী হইলেন না। মনে মনে ভাবিলেন, কুসুমে কুসুমে বিহারিণী ভ্রমরীর পক্ষচ্ছেদ কেন করাইব? প্রথমে কানাকানি, শেষে কালিমাময় কলঙ্ক রটিল। তাহার পিতা বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে আপন গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

লুৎফ-উন্নিসা গোপনে যাহাদিগকে কৃপা বিতরণ করিতেন, তন্মধ্যে যুবরাজ সেলিম একজন। একজন ওমরাহের কুলকলঙ্ক জন্মাইলে, পাছে আপন অপক্ষপাতী পিতার কোপানলে পড়িতে হয়, সেই আশঙ্কায় সেলিম এ পর্য্যন্ত লুৎফ-উন্নিসাকে আপন অবরোধবাসিনী করিতে পারেন নাই। এক্ষণে সুযোগ পাইলেন। রাজপুতপতি মানসিংহের ভগিনী, যুবরাজের প্রধানা মহিষী ছিলেন। যুবরাজ লুৎফ-উন্নিসাকে তাঁহার প্রধানা সহচরী করিলেন। লুৎফ-উন্নিসা প্রকাশ্যে বেগমের সখী, পরোক্ষে যুবরাজের অনুগ্রহভাগিনী হইলেন।

লুৎফ-উন্নিসার ন্যায় বুদ্ধিমতী মহিলা যে অল্প দিনেই রাজকুমারের হৃদয়াধিকার করিবেন, ইহা সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। সেলিমের চিত্তে তাঁহার প্রভুত্ব এরূপ প্রতিযোগিশূন্য হইয়া উঠিল যে, লুৎফ-উন্নিসা উপযুক্ত সময়ে তাঁহার পাটরাণী হইবেন, ইহা তাঁহার স্থির প্রতিজ্ঞা হইল। কেবল লুৎফ-উন্নিসার স্থির প্রতিজ্ঞা হইল, এমত নহে; রাজপুরবাসী সকলেরই উহা সম্ভব বোধ হইল। এইরূপ আশার স্বপ্নে লুৎফ-উন্নিসা জীবন বাহিত করিতেছিলেন, এমত সময়ে নিদ্রাভঙ্গ হইল। আকবরশাহের কোষাধ্যক্ষ (আকতিমাদ-উদ্দৌলা) খাজা আয়াসের কন্যা মেহের-উন্নিসা যবনকুলে প্রধানা সুন্দরী। একদিন কোষাধ্যক্ষ রাজকুমার সেলিম ও অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে আনিলেন। সেই দিন মেহের-উন্নিসার সহিত সেলিমের সাক্ষাৎ হইল এবং সেই দিন সেলিম মেহের-উন্নিসার নিকট চিত্ত রাখিয়া গেলেন। তাহার পর যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা ইতিহাসপাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। শের আফগান নামক একজন মহাবিক্রমশালী ওমরাহের সহিত কোষাধ্যক্ষের কন্যার সম্বন্ধ পূর্ব্বেই হইয়াছিল। সেলিম অনুরাগান্ধ হইয়া সেই সম্বন্ধ রহিত করিবার জন্য পিতার নিকট যাচমান হইলেন। কিন্তু

নিরপেক্ষ পিতার নিকট কেবল তিরস্কৃত হইলেন মাত্র। সুতরাং সেলিমকে আপাততঃ নিরস্ত হইতে হইল। আপাততঃ নিরস্ত হইলেন বটে, কিন্তু আশা ছাড়িলেন না। শের আফগানের সহিত মেহের-উন্নিসার বিবাহ হইল। কিন্তু সেলিমের চিত্তবৃত্তি সকল লুৎফ-উন্নিসার নখদর্পণে ছিল;—তিনি নিশ্চিত বুঝিয়াছিলেন যে, শের আফগানের সহস্র প্রাণ থাকিলেও তাঁহার নিস্তার নাই, আকবরশাহের মৃত্যু হইলেই তাঁহার প্রাণান্ত হইবে—মেহের-উন্নিসা সেলিমের মহিষী হইবেন। লুৎফ-উন্নিসা সিংহাসনের আশা ত্যাগ করিলেন।

মহম্মদীয় সম্রাট-কুলগৌরব আকবরের পরমায়ু শেষ হইয়া আসিল। যে প্রচণ্ড সূর্য্যের প্রভায় তুরকী হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত প্রদীপ্ত হইয়াছিল, সে সূর্য্য অস্তগামী হইল। এ সময়ে লুৎফ-উন্নিসা আত্মপ্রাধান্য রক্ষার জন্য এক দুঃসাহসিক সঙ্কল্প করিলেন।

রাজপুতপতি রাজা মানসিংহের ভগিনী সেলিমের প্রধানা মহিষী। খস্রু তাঁহার পুত্র। একদিন তাঁহার সহিত আকবরশাহের পীড়িত শরীর সম্বন্ধে লুৎফ-উন্নিসার কথোপকথন হইতেছিল; রাজপুতকন্যা এক্ষণে বাদশাহপত্নী হইবেন, এই কথার প্রসঙ্গ করিয়া লুৎফ-উন্নিসা তাঁহাকে অভিনন্দন করিতেছিলেন, প্রত্যুত্তরে খস্রুর জননী কহিলেন, "বাদশাহের মহিষী হইলে মনুষ্যজন্ম সার্থক বটে, কিন্তু যে বাদশাহ-জননী, সেই সর্ব্বোপরি।" উত্তর শুনিবামাত্র এক অপূর্ব্বচিন্তিত অভিসন্ধি লুৎফ-উন্নিসার হৃদয়ে উদয় হইল। তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন, "তাহাই হউক না কেন? সেও ত আপনার ইচ্ছাধীন।" বেগম কহিলেন, "সে কি?" চতুরা উত্তর করিলেন, "যুবরাজপুত্র খস্রুকে সিংহাসন দান করুন।"

বেগম কোন উত্তর করিলেন না। সে দিন এ প্রসঙ্গ পুনরুত্থাপিত হইল না, কিন্তু কেহ-ই এ কথা ভুলিলেন না। স্বামীর পরিবর্ত্তে পুত্র যে সিংহাসনারোহণ করেন, ইহা বেগমের অনভিমত নহে; মেহের-উন্নিসার প্রতি সেলিমের অনুরাগ লুৎফ-উন্নিসার যেরূপ হৃদয়শেল, বেগমেরও সেইরূপ। মানসিংহের ভগিনী আধুনিক তুর্কমান কন্যার যে আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া থাকিবেন, তাহা ভাল লাগিবে কেন? লুৎফ-উন্নিসারও এ সঙ্কল্পে উদ্যোগিনী হইবার গাঢ় তাৎপর্য্য ছিল। অন্য দিন পুনর্ব্বার এ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল্। উভয়ের মত স্থির হইল।

সেলিমকে ত্যাগ করিয়া খস্রুকে আকবরের সিংহাসনে স্থাপিত করা অসম্ভাবনীয় বোধ হইবার কোন কারণ ছিল না। এ কথা লুৎফ-উন্নিসা বেগমের বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করাইলেন। তিনি কহিলেন, "মোগলের সাম্রাজ্য রাজপুতের বাহুবলে স্থাপিত রহিয়াছে; সেই রাজপুতজাতির চূড়া রাজা মানসিংহ, তিনি খস্রুর মাতুল; আর মুসলমানদিগের প্রধান খাঁ আজিম, তিনি প্রধান রাজমন্ত্রী, তিনি খস্রুর শ্বশুর; ইহারা দুই জনে উদ্যোগী হইলে, কে ইহাদিগের অনুবর্ত্তী না হইবে? আর কাহার বলেই বা যুবরাজ সিংহাসন গ্রহণ করিবেন? রাজা মানসিংহকে এ কার্য্যে ব্রতী করা, আপনার ভার। খাঁ আজিম ও অন্যান্য মহম্মদীয় ওমরাহগণকে লিপ্ত করা আমার ভার। আপনার আশীর্ব্বাদে কৃতকার্য্য হইব, কিন্তু এক আশঙ্কা, পাছে সিংহাসন আরোহণ করিয়া খস্রু এ দুশ্চারিণীকে পুরবহিষ্কৃত করিয়া দেন।"

বেগম সহচরীর অভিপ্রায় বুঝিলেন। হাসিয়া কহিলেন, "তুমি আগ্রার যে ওমরাহের গৃহিণী হইতে চাও, সেই তোমার পাণিগ্রহণ করিবে। তোমার স্বামী পঞ্চ হাজারি মন্সবদার হইবেন।"

লুৎফ-উন্নিসা সন্তুষ্ট হইলেন। ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। যদি রাজপুরীমধ্যে সামান্য পুরস্ত্রী হইয়া থাকিতে হইল, তবে প্রতিপুষ্পবিহারিণী মধুকরীর পক্ষচ্ছেদন করিয়া কি সুখ হইল? যদি স্বাধীনতা ত্যাগ করিতে হইল, তবে বাল্যসখী মেহের-উন্নিসার দাসীত্বে কী সুখ? তাহার অপেক্ষা কোন প্রধান রাজপুরুষের সর্ব্বময়ী ঘরণী হওয়া গৌরবের বিষয়।

শুধু এই লোভে লুৎফ-উন্নিসা এ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন না। সেলিম যে তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া মেহের-উন্নিসার জন্য এত ব্যস্ত, ইহার প্রতিশোধও তাঁহার

উদ্দেশ্য।

খাঁ আজিম প্রভৃতি আগ্রা দিল্লীর ওমরাহেরা লুৎফ-উন্নিসার বিলক্ষণ বাধ্য ছিলেন। খাঁ আজিম যে জামাতার ইষ্টসাধনে উদ্যুক্ত হইবেন, ইহা বিচিত্র নহে। তিনি এবং আর আর ওমরাহগণ সম্মত হইলেন। খাঁ আজিম লুৎফ-উন্নিসাকে কহিলেন, "মনে কর, যদি কোন অসুযোগে আমরা কৃতকার্য্য না হই, তবে তোমার আমার রক্ষা নাই। অতএব প্রাণ বাঁচাইবার একটা পথ রাখা ভাল।"

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "আপনার কি পরামর্শ?" খাঁ আজিম কহিলেন, "উড়িষ্যা ভিন্ন অন্য আশ্রয় নাই। কেবল সেই স্থানে মোগলের শাসন তত প্রখর নহে। উড়িষ্যায় সৈন্য আমাদিগের হস্তগত থাকা আবশ্যক। তোমার ভ্রাতা উড়িষ্যায় মন্সবদার আছেন; আমি কল্য প্রচার করিব, তিনি যুদ্ধে আহত হইয়াছেন। তুমি তাঁহাকে দেখিবার ছলে কল্যই উড়িষ্যায় যাত্রা কর। তথায় যৎকর্ত্তব্য, তাহা সাধন করিয়া শীঘ্র প্রত্যাগমন কর।"

লুৎফ-উন্নিসা এ পরামর্শে সম্মত হইলেন। তিনি উড়িষ্যায় আসিয়া যখন প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তখন তাহার সহিত পাঠক মহাশয়ের সাক্ষাৎ হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : পথান্তরে

"যে মাটিতে পড়ে লোকে উঠে তাই ধ'রে।
বারেক নিরাশ হয়ে কে কোথায় মরে—
তুফানে পতিত কিন্তু ছাড়িব না হাল
আজিকে বিফল হলো, হতে পারে কাল।"

নবীন তপস্বিনী

যে দিন নবকুমারকে বিদায় করিয়া মতিবিবি বা লুৎফ-উন্নিসা বর্দ্ধমানাভিমুখে যাত্রা করিলেন, সে দিন তিনি বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত যাইতে পারিলেন না। অন্য চটিতে রহিলেন। সন্ধ্যার সময়ে পেষমনের সহিত একত্র বসিয়া কথোপকথন হইতেছিল, এমন কালে মতি সহসা পেষমন্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"পেষমন। আমার স্বামীকে কেমন দেখিলে?"

পেষমন্ কিছু বিস্মিত হইয়া কহিল, " কেমন আর দেখিব?" মতি কহিলেন, "সুন্দর পুরুষ বটে কি না?"

নবকুমারের প্রতি পেষমনের বিশেষ বিরাগ জন্মিয়াছিল। যে অলঙ্কারগুলি মতি কপালকুণ্ডলাকে দিয়াছিলেন, তৎপ্রতি পেষমনের বিশেষ লোভ ছিল; মনে মনে ভরসা ছিল, একদিন চাহিয়া লইবেন। সেই আশা নির্ম্মূল হইয়াছিল, সুতরাং কপালকুণ্ডলা এবং তাঁহার স্বামী, উভয়ের প্রতি তাঁহার দারুণ বিরক্তি। অতএব স্বামিনীর প্রশ্নে উত্তর করিলেন,

"দরিদ্র ব্রাহ্মণ আবার সুন্দর কুৎসিত কি?"

সহচরীর মনের ভাব বুঝিয়া মতি হাস্য করিয়া কহিলেন, "দরিদ্র ব্রাহ্মণ যদি ওমরাহ হয়, তবে সুন্দর পুরুষ হইবে কি না?"

পে। সে আবার কি?

মতি। কেন, তুমি জান না যে, বেগম স্বীকার করিয়াছেন যে, খস্রু বাদশাহ হইলে আমার স্বামী ওমরাহ হইবে?

পে। তা ত জানি। কিন্তু তোমার পূর্ব্বস্বামী ওমরাহ হইবেন কেন?

মতি। তবে আমার আর কোন্ স্বামী আছে?

পে। যিনি নূতন হইবেন।

মতি ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "আমার ন্যায় সতীর দুই স্বামী, বড় অন্যায় কথা–ও কে যাইতেছে?"

যাহাকে দেখিয়া মতি কহিলেন, "ও কে যাইতেছে?" পেষমন্ তাহাকে চিনিল; সে আগ্রানিবাসী, খাঁ আজিমের আশ্রিত ব্যক্তি। উভয়ে ব্যস্ত হইলেন। পেষমন্ তাহাকে ডাকিলেন। সে ব্যক্তি আসিয়া লুৎফ-উন্নিসাকে অভিবাদনপূর্ব্বক একখানি পত্র দান করিল; কহিল,

"পত্র লইয়া উড়িষ্যা যাইতেছিলাম। পত্র জরুরি।"

পত্র পড়িয়া মতিবিবির আশা ভরসা সকল অন্তর্হিত হইল। পত্রের মর্ম্ম এই, "আমাদিগের যত্ন বিফল হইয়াছে। মৃত্যুকালেও আকবর শাহ আপন বুদ্ধিবলে আমাদিগকে পরাভূত করিয়াছেন। তাঁহার পরলোকে গতি হইয়াছে। তাঁহার আজ্ঞাবলে, কুমার সেলিম এক্ষণে জাহাঁগীর শাহ হইয়াছেন। তুমি খস্রুর জন্য ব্যস্ত হইবে না। এই উপলক্ষে কেহ তোমার শত্রুতা সাধিতে না পারে, এমন চেষ্টার জন্য তুমি শীঘ্র আগ্রায় ফিরিয়া আসিবে।"

আকবরশাহ যে প্রকারে এ ষড়যন্ত্র নিষ্ফল করেন, তাহা ইতিহাসে বর্ণিত আছে; এ স্থলে সে বিবরণের আবশ্যকতা নাই।

পুরস্কারপূর্ব্বক দূতকে বিদায় করিয়া, মতি পেষমন্‌কে পত্র শুনাইলেন। পেষমন্ কহিল,

"এক্ষণে উপায়?"

মতি। এখন আর উপায় নাই।

পে। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) ভাল, ক্ষতিই কি? যেমন ছিলে, তেমনই থাকিবে। মোগল বাদশাহের পুরস্ত্রীমাত্রই অন্য রাজ্যের পাটরাণী অপেক্ষাও বড়।

মতি। (ঈষৎ হাসিয়া) তাহা আর হয় না। আর সে রাজপুরে থাকিতে পারিব না। শীঘ্রই মেহের-উন্নিসার সহিত জাহাঁগীরের বিবাহ হইবে। মেহের-উন্নিসাকে আমি কিশোর বয়োবধি ভাল জানি; এবার সে পুরবাসিনী হইলে সেই বাদশাহ হইবে; জাহাঁগীর বাদশাহ নামমাত্র থাকিবে। আমি যে তাহার সিংহাসনারোহণের পথরোধের চেষ্টা পাইয়াছিলাম, ইহা তাহার অবিদিত থাকিবে না। তখন আমার দশা কি হইবে?

পেষমন্ প্রায় রোদনোন্মুখী হইয়া কহিল, "তবে কি হইবে?"

মতি কহিলেন, "এক ভরসা আছে। মেহের-উন্নিসার চিত্ত জাহাঁগীরের প্রতি কিরূপ? তাহার যেরূপ দার্ঢ্য, তাহাতে যদি সে জাহাঁগীরের প্রতি অনুরাগিনী না হইয়া স্বামীর প্রতি যথার্থ স্নেহশালিনী হইয়া থাকে, তবে জাহাঁগীর শত শের আফগান বধ করিলেও মেহের-উন্নিসাকে পাইবেন না। আর যদি মেহের-উন্নিসা জাহাঙ্গীরের যথার্থ অভিলাষিণী হয়, তবে আর কোন ভরসা নাই।"

পে। মেহের-উন্নিসার মন কি প্রকারে জানিবে?

মতি হাসিয়া কহিলেন, "লুৎফ-উন্নিসার অসাধ্য কি? মেহের-উন্নিসা আমার বাল্যসখী,–কালি বর্দ্ধমানে গিয়া তাহার নিকট দুই দিন অবস্থিতি করিব।"

পে। যদি মেহের-উন্নিসা বাদশাহের অনুরাগিনী হন, তাহা হইলে কি করিবে?

ম। পিতা কহিয়া থাকেন, "ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে।"

উভয়ে ক্ষণেক নীরব হইয়া রহিলেন। ঈষৎ হাসিতে মতির ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত হইতে লাগিল। পেষমন্ জিজ্ঞাসা করিল, "হাসিতেছ কেন?"

মতি কহিলেন, "কোন নূতন ভাব উদয় হইতেছে।"

পে। কি নূতন ভাব?

মতি তাহা পেষমন্‌কে বলিলেন না। আমরাও তাহা পাঠককে বলিব না। পশ্চাৎ প্রকাশ পাইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : প্রতিযোগিনী-গৃহে

"শ্যামাদন্যো নহি নহি প্রাণনাথে মমাস্তি।"

উদ্ধবদূত

এ সময়ে শের আফগান বঙ্গদেশের সুবাদারের অধীনে বর্দ্ধমানের কর্ম্মাধ্যক্ষ হইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন।

মতিবিবি বর্দ্ধমানে আসিয়া শের আফগানের আলয়ে উপনীত হইলেন। শের আফগান সপরিবারে তাঁহাকে অত্যন্ত সমাদরে তথায় অবস্থিতি করাইলেন। যখন শের আফগান এবং তাঁহার স্ত্রী মেহের-উন্নিসা আগ্রায় অবস্থিতি করিতেন, তখন মতি তাঁহাদিগের নিকট বিশেষ পরিচিতা ছিলেন। মেহের-উন্নিসার সহিত তাঁহার বিশেষ প্রণয় ছিল। পরে উভয়েই দিল্লীর সাম্রাজ্যলাভের জন্য প্রতিযোগিনী হইয়াছিলেন। এক্ষণে একত্র হওয়ায় মেহের-উন্নিসা মনে ভাবিতেছেন, "ভারতবর্ষের কর্ত্তৃত্ব কাহার অদৃষ্টে বিধাতা লিখিয়াছেন? বিধাতাই জানেন, আর সেলিম জানেন, আর কেহ যদি জানে ত সে এই লুৎফ-উন্নিসা; দেখি, লুৎফ-উন্নিসা কি কিছু প্রকাশ করিবে না?" মতিবিবিরও মেহের-উন্নিসার মন জানিবার চেষ্টা।

মেহের-উন্নিসা তৎকালে ভারতবর্ষের মধ্যে প্রধানা রূপবতী এবং গুণবতী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাদৃশ রমণী ভূমণ্ডলে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সৌন্দর্য্যে ইতিহাসকীর্ত্তিতা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে তাঁহার প্রাধান্য ঐতিহাসিক মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। কোন প্রকার বিদ্যায় তাৎকালিক পুরুষদিগের মধ্যে বড় অনেকে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন না। নৃত্য-গীতে মেহের-উন্নিসা অদ্বিতীয়া; কবিতা-রচনায় বা চিত্রলিখনেও তিনি সকলের মন মুগ্ধ করিতেন। তাঁহার সরস কথা, তাঁহার সৌন্দর্য্য অপেক্ষাও মোহময়ী ছিল। মতিও এ সকল গুণে হীনা ছিলেন না। অদ্য এই দুই চমৎকারিণী পরস্পরের মন জানিতে উৎসুক হইলেন।

মেহের-উন্নিসা খাস কামরায় বসিয়া তসবীর লিখিতেছিলেন। মতি মেহের-উন্নিসার পৃষ্ঠের নিকট বসিয়া চিত্রলিখন দেখিতেছিলেন, এবং তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেছিলেন। মেহের-উন্নিসা জিজ্ঞাসা করিলেন, "চিত্র কেমন হইতেছে?" মতিবিবি উত্তর করিলেন, "তোমার চিত্র যেরূপ হইয়া থাকে, তাহাই হইতেছে। অন্য কেহ যে তোমার ন্যায় চিত্রনিপুণ নহে, ইহাই দুঃখের বিষয়।"

মেহে। তাই যদি হয় ত দুঃখের বিষয় কেন?

ম। অন্যের তোমার মত চিত্র-নৈপুণ্য থাকিলে তোমার এ মুখের আদর্শ রাখিতে পারিত।

মেহে। কবরের মাটিতে মুখের আদর্শ থাকিবে।

মেহের-উন্নিসা এই কথা কিছু গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিলেন।

ম। ভগিনি! আজ মনের স্ফূর্ত্তির এত অল্পতা কেন?

মেহে। স্ফূর্ত্তির অল্পতা কই? তবে যে তুমি আমাকে কাল প্রাতে ত্যাগ করিয়া যাইবে তাহাই বা কি প্রকারে ভুলিব? আর দুই দিন থাকিয়া তুমি কেনই বা চরিতার্থ না করিবে?

ম। সুখে কার অসাধ? সাধ্য হইলে আমি কেন যাইব? কিন্তু আমি পরের অধীন; কি প্রকারে থাকিব?

মেহে। আমার প্রতি তোমার ত ভালবাসা আর নাই, থাকিলে তুমি কোন মতে রহিয়া যাইতে। আসিয়াছ ত রহিতে পার না কেন?

ম। আমি ত সকল কথাই বলিয়াছি। আমার সহোদর মোগলসৈন্যে মন্সবদার—তিনি উড়িষ্যার পাঠানদিগের সহিত যুদ্ধে আহত হইয়া সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিলেন। আমি তাঁহারই বিপদসংবাদ পাইয়া বেগমের অনুমতি লইয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলাম। উড়িষ্যায় অনেক বিলম্ব করিয়াছি, এক্ষণে আর বিলম্ব করা উচিত নহে। তোমার সহিত অনেক দিন দেখা হয় নাই, এই জন্য দুই দিন রহিয়া গেলাম।

মেহে। বেগমের নিকট কোন্ দিন পৌঁছিবার কথা স্বীকার করিয়া আসিয়াছ?

মতি বুঝিলেন, মেহের-উন্নিসা ব্যঙ্গ করিতেছেন। মার্জ্জিত অথচ মর্ম্মভেদী ব্যঙ্গে মেহের-উন্নিসা যেরূপ নিপুণ, মতি সেরূপ নহেন। কিন্তু অপ্রতিভ হইবার লোকও নহেন। তিনি উত্তর করিলেন, “দিন নিশ্চিত করিয়া তিন মাসের পথ যাতায়াত করা কি সম্ভব? কিন্তু অনেক কাল বিলম্ব করিয়াছি; আরও বিলম্বে অসন্তোষের কারণ জন্মিতে পারে।”

মেহের-উন্নিসা নিজ ভুবনমোহন হাসি হাসিয়া কহিলেন, “কাহার অসন্তোষের আশঙ্কা করিতেছ? যুবরাজের, না তাঁহার মহিষীর?”

মতি কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, “এ লজ্জাহীনাকে কেন লজ্জা দিতে চাও? উভয়েরই অসন্তোষ হইতে পারে!”

মে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি,—তুমি স্বয়ং বেগম নাম ধারণ করিতেছ না কেন? শুনিয়াছিলাম, কুমার সেলিম তোমাকে বিবাহ করিয়া খাসবেগম করিবেন; তাহার কত দূর?

ম। আমি ত সহজেই পরাধীনা। যে কিছু স্বাধীনতা আছে, তাহা কেন নষ্ট করিব? বেগমের সহচারিণী বলিয়া অনায়াসে উড়িষ্যায় আসিতে পারিলাম, সেলিমের বেগম হইলে কি উড়িষ্যায় আসিতে পারিতাম?

মে। যে দিল্লীশ্বরের প্রধানা মহিষী হইবে, তাহার উড়িষ্যায় আসিবার প্রয়োজন?

ম। সেলিমের প্রধানা মহিষী হইব, এমন স্পর্দ্ধা কখনও করি না। এ হিন্দুস্থান দেশে কেবল মেহের-উন্নিসাই দিল্লীশ্বরের প্রাণেশ্বরী হইবার উপযুক্ত।

মেহের-উন্নিসা মুখ নত করিলেন। ক্ষণেক নিরুত্তর থাকিয়া কহিলেন, “ভগিনি! আমি এমত মনে করি না যে, তুমি আমাকে পীড়া দিবার জন্য এ কথা বলিলে, কি আমার মন জানিবার জন্য বলিলে। কিন্তু তোমার নিকট আমার এই ভিক্ষা, আমি যে শের আফগানের বনিতা, আমি যে কায়মনোবাক্যে শের আফগানের দাসী, তাহা তুমি বিস্মৃত হইয়া কথা কহিও না।”

লজ্জাহীনা মতি এ তিরস্কারে অপ্রতিভ হইলেন না; বরং আরও সুযোগ পাইলেন। কহিলেন, “তুমি যে পতিগতপ্রাণা, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। সেই জন্যই ছলক্রমে এ কথা তোমার সম্মুখে পাড়িতে সাহস করিয়াছি। সেলিম যে এ পর্য্যন্ত তোমার সৌন্দর্য্যের মোহ ভুলিতে পারেন নাই, এই কথা বলা আমার উদ্দেশ্য। সাবধান থাকিও।”

মে। এখন বুঝিলাম। কিন্তু কিসের আশঙ্কা?”

মতি কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, “ বৈধব্যের আশঙ্কা।”

এই কথা বলিয়া মতি মেহের-উন্নিসার মুখপানে তীক্ষ্নদৃষ্টি করিয়া রহিলেন, কিন্তু ভয় বা আহলাদের কোন চিহ্ন তথায় দেখিতে পাইলেন না। মেহের-উন্নিসা সদর্পে কহিলেন, “ “বৈধব্যের আশঙ্কা! শের আফগান আত্মরক্ষায় অক্ষম নহে। বিশেষ আকবর বাদশাহের রাজ্যমধ্যে তাঁহার পুত্রও বিনা দোষে পরপ্রাণ নষ্ট করিয়া নিস্তার পাইবেন না।”

ম। সত্য কথা, কিন্তু সম্প্রতিকার আগ্রার সংবাদ এই যে, আকবরশাহ গত হইয়াছেন। সেলিম সিংহাসনারূঢ় হইয়াছেন। দিল্লীশ্বরকে কে দমন করিবে?

মেহের-উন্নিসা আর কিছু শুনিলেন না। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া কাঁপিতে লাগিল। আবার মুখ নত করিলেন, লোচনযুগলে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। মতি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কাঁদ কেন?”

মেহের-উন্নিসা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, “সেলিম ভারতবর্ষের সিংহাসনে, আমি কোথায়?”

মতির মনস্কাম সিদ্ধ হইল। তিনি কহিলেন, “তুমি আজিও যুবরাজকে একেবারে বিস্মৃত হইতে পার নাই?”

মেহের-উন্নিসা গদ্‌গদস্বরে কহিলেন, “কাহাকে বিস্মৃত হইব? আত্মজীবন বিস্মৃত হইব, তথাপি যুবরাজকে বিস্মৃত হইতে পারিব না। কিন্তু শুন, ভগিনি! অকস্মাৎ মনের কবাট খুলিল; তুমি এ কথা শুনিলে; কিন্তু আমার শপথ, এ কথা যেন কর্ণান্তরে না যায়।”

মতি কহিল, “ভাল, তাহাই হইবে। কিন্তু যখন সেলিম শুনিবেন যে, আমি বর্দ্ধমানে আসিয়াছিলাম, তখন তিনি অবশ্য জিজ্ঞাসা করিবেন যে, মেহের-উন্নিসা আমার কথা কি বলিল? তখন আমি কি উত্তর করিব?”

মেহের-উন্নিসা কিছুক্ষণ ভাবিয়া কহিলেন, “এই কহিও যে, মেহের-উন্নিসা হৃদয়মধ্যে তাঁহার ধ্যান করিবে। প্রয়োজন হইলে তাঁহার জন্য আত্মপ্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিবে। কিন্তু কখনও আপন কুলমান সমর্পণ করিবে না। দাসীর স্বামী জীবিত থাকিতে সে কখনও দিল্লীশ্বরকে মুখ দেখাইবে না। আর যদি দিল্লীশ্বর কর্ত্তৃক তাহার স্বামীর প্রাণান্ত হয়, তবে স্বামিহন্তার সহিত ইহজন্মে তাহার মিলন হইবেক না।”

ইহা কহিয়া মেহের-উন্নিসা সে স্থান হইতে উঠিয়া গেলেন। মতিবিবি চমৎকৃত হইয়া রহিলেন। কিন্তু মতিবিবিরই জয় হইল। মেহের-উন্নিসার চিত্তের ভাব মতিবিবি জানিলেন; মতিবিবির আশা ভরসা মেহের-উন্নিসা কিছুই জানিতে পারিলেন না। যিনি পরে আত্মবুদ্ধি প্রভাবে দিল্লীশ্বরেরও ঈশ্বরী হইয়াছিলেন, তিনিও মতির নিকট পরাজিতা হইলেন। ইহার কারণ, মেহের-উন্নিসা প্রণয়শালিনী; মতিবিবি এ স্থলে কেবলমাত্র স্বার্থপরায়ণা।

মনুষ্যহৃদয়ের বিচিত্র গতি মতিবিবি বিলক্ষণ বুঝিতেন। মেহের-উন্নিসার কথা আলোচনা করিয়া তিনি যাহা সিদ্ধান্ত করিলেন, কালে তাহাই যথার্থীভূত হইল। তিনি বুঝিলেন যে, মেহের-উন্নিসা জাহাঁগীরের যথার্থ অনুরাগিণী; অতএব নারীদর্পে এখন যাহাই বলুন, পথ মুক্ত হইলে মনের গতি রোধ করিতে পারিবেন না। বাদশাহের মনস্কামনা অবশ্য সিদ্ধ করিবেন।

এ সিদ্ধান্তে মতির আশা ভরসা সকলই নির্ম্মূল হইল। কিন্তু তাহাতে কি মতি নিতান্তই দুঃখিত হইলেন? তাহা নহে। বরং ঈষৎ সুখানুভবও হইল। কেন যে এমন অসম্ভব চিত্তপ্রসাদ জন্মিল, তাহা মতি প্রথমে বুঝিতে পারিলেন না। তিনি আগ্রার পথে যাত্রা করিলেন। পথে কয়েক দিন গেল। সেই কয়েক দিনে আপন চিত্তভাব বুঝিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : রাজনিকেতনে

"পত্নীভাবে আর তুমি ভেবো না আমারে।"

বীরাঙ্গনা কাব্য

মতি আগ্রায় উপনীতা হইলেন। আর তাঁহাকে মতি বলিবার আবশ্যক করে না। কয়দিনে তাঁহার চিত্তবৃত্তিসকল একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

জাহাঁগীরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। জাহাঁগীর তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ সমাদর করিয়া, তাঁহার সহোদরের সংবাদ ও পথের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। লুৎফ-উন্নিসা যাহা মেহের-উন্নিসাকে বলিয়াছিলেন, তাহা সত্য হইল। অন্যান্য প্রসঙ্গের পর বর্দ্ধমানের কথা শুনিয়া, জাহাঁগীর জিজ্ঞাসা করিলেন,

"মেহের-উন্নিসার নিকট দুই দিন ছিলে বলিতেছ, মেহের-উন্নিসা আমার কথা কি বলিল?" লুৎফ-উন্নিসা অকপট হৃদয়ে মেহের-উন্নিসার অনুরাগের পরিচয় দিলেন। বাদশাহ শুনিয়া নীরবে রহিলেন, তাহার বিস্ফারিত লোচনে দুই এক বিন্দু অশ্রু বহিল।

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "জাহাঁপনা! দাসী শুভ সংবাদ দিয়াছে। দাসীর এখনও কোন পুরস্কারের আদেশ হয় নাই।"

বাদশাহ হাসিয়া কহিলেন, "বিবি! তোমার আকাঙ্ক্ষা অপরিমিত।"

লু। জাহাঁপনা! দাসীর কি দোষ?

বাদ। দিল্লীর বাদশাহকে তোমার গোলাম করিয়া দিয়াছি; আরও পুরস্কার চাহিতেছ?

লুৎফ-উন্নিসা হাসিয়া কহিলেন, "স্ত্রীলোকের অনেক সাধ।"

বাদ। আবার কি সাধ হইয়াছে?

লু। আগে রাজাজ্ঞা হউক যে, দাসীর আবেদন গ্রাহ্য হইবে।

বাদ। যদি রাজকার্য্যের বিঘ্ন না হয়।

লু। (হাসিয়া) একের জন্য দিল্লীশ্বরের কার্য্যের বিঘ্ন হয় না।

বাদ। তবে স্বীকৃত হইলাম; সাধটি কি শুনি।

লু। সাধ হইয়াছে, একটি বিবাহ করিব।

জাহাঁগীর উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "এ নূতনতর সাধ বটে। কোথাও সম্বন্ধের স্থিরতা হইয়াছে?"

লু। তা হইয়াছে। কেবল রাজাজ্ঞার অপেক্ষা। রাজার সম্মতি প্রকাশ না হইলে কোন সম্বন্ধ স্থির নহে।

বাদ। আমার সম্মতির প্রয়োজন কি? কাহাকে এ সুখের সাগরে ভাসাইবে অভিপ্রায় করিয়াছ?

লু। দাসী দিল্লীশ্বরের সেবা করিয়াছে বলিয়া দ্বিচারিণী নহে। দাসী আপন স্বামীকেই বিবাহ করিবার অনুমতি চাহিতেছে।

বাদ। বটে! এ পুরাতন নফরের দশা কি করিবে?

লু। দিল্লীশ্বরী মেহের-উন্নিসাকে দিয়া যাইব।

বাদ। দিল্লীশ্বরী মেহের-উন্নিসা কে?

লু। যিনি হইবেন।

জাহাঁগীর মনে ভাবিলেন যে, মেহের-উন্নিসা যে দিল্লীশ্বরী হইবেন, তাহা লুৎফ-উন্নিসা ধ্রুব জানিয়াছেন। তৎকারণে নিজ মনোভিলাস বিফল হইল বলিয়া রাজাবরোধ হইতে বিরাগে অবসর হইতে চাহিতেছেন।

এইরূপ বুঝিয়া জাহাঁগীর দুঃখিত হইয়া নীরবে রহিলেন। লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "মহারাজের কি এ সম্বন্ধে সম্মতি নাই?"

বাদ। আমার অসম্মতি নাই। কিন্তু স্বামীর সহিত আবার বিবাহের আবশ্যকতা কি?

লু। কপালক্রমে প্রথম বিবাহে স্বামী পত্নী বলিয়া গ্রহণ করিলেন না। এক্ষণে জাহাঁপনার দাসীকে ত্যাগ করিতে পারিবেন না।

বাদশাহ রহস্যে হাস্য করিয়া পরে গম্ভীর হইলেন। কহিলেন, "প্রেয়সি! তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই। তোমার যদি সেই প্রবৃত্তি হয়, তবে তদ্রূপই কর। কিন্তু আমাকে কেন ত্যাগ করিয়া যাইবে? এক আকাশে কি চন্দ্র সূর্য্য উভয়েই বিরাজ করেন না? এক বৃন্তে কি দুটি ফুল ফুটে না।"

লুৎফ-উন্নিসা বিস্ফারিতচক্ষে বাদশাহের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "ক্ষুদ্র ফুল ফুটিয়া থাকে, কিন্তু এক মৃণালে দুইটি কমল ফুটে না। আপনার রত্নসিংহাসনতলে কেন কণ্টক হইয়া থাকিব?"

লুৎফ-উন্নিসা আত্মমন্দিরে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার এইরূপ মনোবাঞ্ছা যে কেন জন্মিল, তাহা তিনি জাহাঁগীরের নিকট ব্যক্ত করেন নাই। অনুভবে যেরূপ বুঝা যাইতে পারে, জাহাঁগীর সেইরূপ বুঝিয়া ক্ষান্ত হইলেন। নিগূঢ় তত্ত্ব কিছুই জানিলেন না। লুৎফ-উন্নিসার হৃদয় পাষাণ। সেলিমের রমণীহৃদয়জিৎ রাজকান্তিও কখন তার মনঃ মুগ্ধ করে নাই। কিন্তু এইবার পাষাণমধ্যে কীট প্রবেশ করিয়াছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : আত্মমন্দিরে

"জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুননু শ্রুতিপথে পরশ না গেল —
কত মধুযামিনী রভসে গোঁয়ায়নু না বুঝনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ান না গেল —
যত যত রসিক জন রসে অনুগমন□ অনুভব কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতী কহে প্রাণ জুড়াইতে লাখে না মিলল এক —"

লুৎফ-উন্নিসা আলয়ে আসিয়া প্রফুল্লবদনে পেষমন্‌কে ডাকিয়া বেশভূষা পরিত্যাগ করিলেন। সুবর্ণ মুক্তাদি-খচিত বসন পরিত্যাগ করিয়া পেষমন্‌কে কহিলেন যে, "এই পোষাকটি তুমি লও।"

শুনিয়া পেষমন্ কিছু বিস্ময়াপন্ন হইলেন। পোশাকটি বহুমূল্যে সম্প্রতিমাত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। কহিলেন, "পোশাক আমায় কেন? আজিকার কি সংবাদ?"

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "শুভ সংবাদ বটে।"

পে। তা ত বুঝিতে পারিতেছি। মেহের-উন্নিসার ভয় কি ঘুচিয়াছে?

লু। ঘুচিয়াছে। এক্ষণে সে বিষয়ের কোন চিন্তা নাই।

পেষমন্ অত্যন্ত আহলাদ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "তবে এক্ষণে বেগমের দাসী হইলাম।"

লু। যদি তুমি বেগমের দাসী হইতে চাও, তবে আমি মেহের-উন্নিসাকে বলিয়া দিব।

পে। সে কি? আপনি কহিতেছেন যে, মেহের-উন্নিসার বাদশাহের বেগম হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

লু। আমি এমত কথা বলি নাই। আমি বলিয়াছি, সে বিষয়ে আমার কোন চিন্তা নাই।

পে। চিন্তা নাই কেন? আপনি আগ্রায় একমাত্র অধীশ্বরী না হইলে যে, সকলই বৃথা হইল।

লু। আগ্রার সহিত সম্পর্ক রাখিব না।

পে। সে কি? আমি যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আজিকার শুভ সংবাদটা তবে কি, বুঝাইয়া বলুন।

লু। শুভ সংবাদ এই যে, আমি এ জীবনের মত আগ্রা ত্যাগ করিয়া চলিলাম।

পে। কোথায় যাইবেন?

লু। বাঙ্গালায় গিয়া বাস করিব। পারি যদি, কোন ভদ্রলোকের গৃহিণী হইব।

পে। এরূপ ব্যঙ্গ নূতন বটে, কিন্তু শুনিলে প্রাণ শিহরিয়া উঠে।

লু। ব্যঙ্গ করিতেছি না। আমি সত্য সত্যই আগ্রা ত্যাগ করিয়া চলিলাম। বাদশাহের নিকট বিদায় লইয়া আসিয়াছি।

পে। এমন কুপ্রবৃত্তি আপনার জন্মিল?

লু। কুপ্রবৃত্তি নহে। অনেক দিন আগ্রায় বেড়াইলাম, কি ফললাভ হইল? সুখের তৃষা বাল্যাবধি বড়ই প্রবল ছিল। সেই তৃষার পরিতৃপ্তির জন্য বঙ্গদেশ ছাড়িয়া এ পর্য্যন্ত আসিলাম। এ রত্ন কিনিবার জন্য কি ধননা দিলাম? কোন্ দুষ্কর্ম্ম না করিয়াছি? আর যে যে উদ্দেশ্যে এতদূর করিলাম, তাহার কোনটাই বা হস্তগত হয় নাই? ঐশ্বর্য্য, সম্পদ্, ধন, গৌরব, প্রতিষ্ঠা সকলই ত প্রচুর পরিমাণে ভোগ করিলাম। এত করিয়াও কি হইল? আজ এইখানে বসিয়া সকল দিন মনে মনে গণিয়া বলিতে পারি যে, এক দিনের তরেও সুখী হই নাই, এক মুহূর্ত্ত জন্যও কখনও সুখভোগ করি নাই। কখনও পরিতৃপ্ত হই নাই। কেবল তৃষা বাড়ে মাত্র। চেষ্টা করিলে আরও সম্পদ্, আরও ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারি, কিন্তু কি জন্য? এ সকলে যদি সুখ থাকিত, তবে এত দিন এক দিনের তরেও সুখী হইতাম। এই সুখাকাঙ্ক্ষা পার্ব্বতী নির্ঝরিণীর ন্যায়,–প্রথমে নির্ম্মল, ক্ষীণ ধারা বিজন প্রদেশ হইতে বাহির হয়, আপন গর্ভে আপনি লুকাইয়া রহে, কেহ জানে না; আপনা

আপনি কল কল করে, কেহ শুনে না। ক্রমে যত যায়, তত দেহ বাড়ে, তত পঙ্কিল হয়। শুধু তাহাই নয়; কখনও আবার বায়ু বহে, তরঙ্গ হয়, মকর কুম্ভীরাদি বাস করে। আরও শরীর বাড়ে, জল আরও কর্দ্দমময় হয়, লবণময় হয়, অগণ্য সৈকত চর-মরুভূমি নদীহৃদয়ে বিরাজ করে, বেগ মন্দীভূত হইয়া যায়, তখন সেই সকর্দ্দম নদীশরীর অনন্ত সাগরে কোথায় লুকায়, কে বলিবে?

পে। আমি ইহার ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এ সবে তোমার সুখ হয় না কেন?

লু। কেন হয় না, তা এত দিনে বুঝিয়াছি। তিন বৎসর রাজপ্রাসাদের ছায়ায় বসিয়া যে সুখ না হইয়াছে, উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাগমনের পথে এক রাত্রে সে সুখ হইয়াছে। ইহাতেই বুঝিয়াছি।

পে। কি বুঝিয়াছ।

লু। আমি এত কাল হিন্দুদিগের দেবমূর্ত্তির মত ছিলাম। বাহিরে সুবর্ণ রত্নাদিতে খচিত; ভিতরে পাষাণ। ইন্দ্রিয়সুখান্বেষণে আগুনের মধ্যে বেড়াইয়াছি, কখনও আগুন স্পর্শ করি নাই। এখন একবার দেখি, যদি পাষাণমধ্যে খুঁজিয়া একটা রক্তশিরাবিশিষ্ট অন্তঃকরণ পাই।

পে। এও ত কিছু বুঝিতে পারিলাম না।

লু। আমি এই আগ্রায় কখনও কাহাকে ভালবাসিয়াছি?

পে। (চুপি চুপি) কাহাকেও না।

লু। তবে পাষাণী নই ত কি?

পে। তা এখন যদি ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়, তবে ভালবাস না কেন?

লু। মানস ত বটে। সেই জন্য আগ্রা ত্যাগ করিয়া যাইতেছি।

পে। তারই বা প্রয়োজন কি? আগ্রায় কি মানুষ নাই যে, চুয়াড়ের দেশে যাইবে? এখন যিনি তোমাকে ভালবাসেন, তাঁহাকেই কেন ভালবাস না? রূপে বল, ধনে বল, ঐশ্বর্য্যে বল, যাহাতে বল, দিল্লীর বাদশাহের বড় পৃথিবীতে কে আছে?

লু। আকাশে চন্দ্রসূর্য্য থাকিতে জল অধোগামী কেন?

পে। কেন?

লু। ললাটলিখন।

লুৎফ-উন্নিসা সকল কথা খুলিয়া বলিলেন না। পাষাণমধ্যে অগ্নি প্রবেশ করিয়াছিল। পাষাণ দ্রব হইতেছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : চরণতলে

“কায় মনঃ প্রাণ আমি সঁপিব তোমারে।
ভুঞ্জ আসি রাজভোগ দাসীর আলয়ে।।”

বীরাঙ্গনা কাব্য

ক্ষেত্রে বীজ রোপিত হইলে আপনিই অঙ্কুর হয়। যখন অঙ্কুর হয়, তখন কেহ জানিতে পারে না—কেহ দেখিতে পায় না। কিন্তু একবার বীজ রোপিত হইলে, রোপণকারী যথায় থাকুন না কেন, ক্রমে অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ মস্তক উন্নত করিতে থাকে। অদ্য বৃক্ষটি অঙ্গুলি পরিমেয় মাত্র, কেহ দেখিয়াও দেখিতে পায় না। ক্রমে তিল তিল বৃদ্ধি। ক্রমে বৃক্ষটি অৰ্দ্ধ হস্ত, এক হস্ত, দুই হস্ত পরিমিত হইল; তথাপি, যদি তাহাতে কাহারও স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা না রহিল, তবে কেহ দেখে না, দেখিয়াও দেখে না। দিন যায়, মাস যায়, বৎসর যায়, ক্রমে তাহার উপর চক্ষু পড়ে। আর অমনোযোগের কথা নাই,—ক্রমে বৃক্ষ বড় হয়, তাহার ছায়ায় অন্য বৃক্ষ নষ্ট করে,—চাহি কি, ক্ষেত্র অনন্যপাদপ হয়।

লুৎফ-উন্নিসার প্রণয় এইরূপ বাড়িয়াছিল। প্রথম একদিন অকস্মাৎ প্রণয়ভাজনের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তখন প্রণয়সঞ্চার বিশেষ জানিতে পারিলেন না। কিন্তু তখনই অঙ্কুর হইয়া রহিল। তাহার পর আর সাক্ষাৎ হইল না। কিন্তু অসাক্ষাতে পুনঃ পুনঃ সেই মুখমণ্ডল মনে পড়িতে লাগিল, স্মৃতিপটে সে মুখমণ্ডল চিত্রিত করা কতক কতক সুখকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বীজে অঙ্কুর জন্মিল। মূৰ্ত্তিপ্রতি অনুরাগ জন্মিল। চিত্তের ধৰ্ম্ম এই যে, যে মানসিক কৰ্ম্ম যত অধিক বার করা যায়, সে কৰ্ম্মে তত অধিক প্রবৃত্তি হয়; সে কৰ্ম্ম ক্রমে স্বভাবসিদ্ধ হয়। লুৎফ-উন্নিসা সেই মূৰ্ত্তি অহরহঃ মনে ভাবিতে লাগিলেন। দারুণ দর্শনাভিলাস জন্মিল; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সহজস্পৃহাপ্রবাহও দুর্নিবার্য্য হইয়া উঠিল। দিল্লীর সিংহাসনলালসাও তাঁহার নিকট লঘু হইল। সিংহাসন যেন মন্মথশরসম্ভূত অগ্নিরাশিবেষ্টিত বোধ হইতে লাগিল। রাজ্য, রাজধানী, রাজসিংহাসন, সকল বিসর্জ্জন দিয়া প্রিয়জন-সন্দর্শনে ধাবিত হইলেন, সে প্রিয়জন নবকুমার।

এই জন্যই লুৎফ-উন্নিসা মেহের-উন্নিসার আশানাশিনী কথা শুনিয়াও অসুখী হয়েন নাই; এই জন্যই আগ্রায় আসিয়া সম্পদ্‌রক্ষায় কোন যত্ন পাইলেন না; এই জন্যই জন্মের মত বাদশাহের নিকট বিদায় লইলেন।

লুৎফ-উন্নিসা সপ্তগ্রামে আসিলেন। রাজপথের অনতিদূরে নগরীর মধ্যে এক অট্টালিকায় আপন বাসস্থান করিলেন। রাজপথের পথিকেরা দেখিলেন, অকস্মাৎ এই অট্টালিকা সুবর্ণখচিতবসনভূষিত দাসদাসীতে পরিপূর্ণ হইয়াছে। ঘরে ঘরে হৰ্ম্ম্যসজ্জা অতি মনোহর। গন্ধদ্রব্য, গন্ধবারি, কুসুমদাম সৰ্ব্বত্র আমোদ করিতেছে। স্বর্ণ, রৌপ্য, গজদন্তাদিখচিত গৃহশোভার্থ নানা দ্রব্য সকল স্থানেই আলো করিতেছে। এইরূপ সজ্জীভূত এক কক্ষে লুৎফ-উন্নিসা অধোবদনে বসিয়া আছেন; পৃথগাসনে নবকুমার বসিয়া আছেন। সপ্তগ্রামে নবকুমারের সহিত লুৎফ-উন্নিসার আর দুই একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল; তাহাতে লুৎফ-উন্নিসার মনোরথ কত দূর সিদ্ধ হইয়াছিল, তাহা অদ্যকার কথায় প্রকাশ হইবে।

নবকুমার কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া কহিলেন, "তবে আমি এক্ষণে চলিলাম। তুমি আর আমাকে ডাকিও না।"

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "যাইও না। আর একটু থাক। আমার যাহা বক্তব্য, তাহা সমাপ্ত করি নাই।"

নবকুমার আরও ক্ষণেক প্রতীক্ষা করিলেন, কিন্তু লুৎফ-উন্নিসা কিছু বলিলেন না। ক্ষণেক পরে নবকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কি বলিবে?" লুৎফ-উন্নিসা কোন উত্তর করিলেন না—তিনি নীরবে রোদন করিতেছিলেন।

নবকুমার ইহা দেখিয়া গাত্রোত্থান করিলেন; লুৎফ-উন্নিসা তাঁহার বস্ত্রাগ্র ধৃত করিলেন। নবকুমার ঈষৎ বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "কি, বল না?"

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "তুমি কি চাও? পৃথিবীতে কিছু কি প্রার্থনীয় নাই? ধন, সম্পদ্‌, মান, প্রণয়,—রঙ্গ রহস্য পৃথিবীতে যাহাকে যাহাকে সুখ বলে, সকলই দিব; কিছুই তাহার প্রতিদান চাহি না; কেবল তোমার দাসী হইতে চাহি। তোমার যে পত্নী হইব, এ গৌরব চাহি না, কেবল দাসী!"

নবকুমার কহিলেন, "আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ইহজন্মে দরিদ্র ব্রাহ্মণই থাকিব। তোমার দত্ত ধনসম্পদ লইয়া যবনীজার হইতে পারিব না।"

যবনীজার! নবকুমার এ পর্য্যন্ত জানিতে পারেন নাই যে, এই রমণী তাঁহার পত্নী। লুৎফ-উন্নিসা অধোবদনে রহিলেন। নবকুমার তাঁহার হস্ত হইতে বস্ত্রাগ্রভাগ

মুক্ত করিলেন। লুৎফ-উন্নিসা আবার তাঁহার বস্ত্রাগ্র ধরিয়া কহিলেন,

“ভাল, সে যাউক। বিধাতার যদি সেই ইচ্ছা, তবে চিত্তবৃত্তিসকল অতল জলে ডুবাইব। আর কিছু চাহি না, এক একবার তুমি এই পথে যাইও; দাসী ভাবিয়া এক একবার দেখা দিও, কেবল চক্ষুঃপরিতৃপ্তি করিব।”

নব। তুমি যবনী–পরস্ত্রী–তোমার সহিত এরূপ আলাপেও দোষ। তোমার সহিত আর আমার সাক্ষাৎ হইবে না।

ক্ষণেক নীরব। লুৎফ-উন্নিসার হৃদয়ে ঝটিকা বহিতেছিল। প্রস্তরময়ী মূর্ত্তিবৎ নিস্পন্দ রহিলেন। নবকুমারের বস্ত্রাগ্রভাগ ত্যাগ করিলেন। কহিলেন, “যাও।”

নবকুমার চলিলেন। দুই চারি পদ চলিয়াছেন মাত্র, সহসা লুৎফ-উন্নিসা বাতোন্মূলিত পাদপের ন্যায় তাঁহার পদতলে পড়িলেন। বাহুতলায় চরণযুগল বদ্ধ করিয়া কাতরস্বরে কহিলেন,

“নির্দ্দয়! আমি তোমার জন্য আগ্রার সিংহাসন ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। তুমি আমায় ত্যাগ করিও না।”

নবকুমার কহিলেন, “তুমি আবার আগ্রাতে ফিরিয়া যাও, আমার আশা ত্যাগ কর।”

“এ জন্মে নহে।” লুৎফ-উন্নিসা তীরবৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া সদর্পে কহিলেন, “এ জন্মে তোমার আশা ছাড়িব না।” মস্তক উন্নত করিয়া, ঈষৎ বঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গি করিয়া, নবকুমারের মুখপ্রতি অনিমিষ আয়ত চক্ষু স্থাপিত করিয়া, রাজরাজমোহিনী দাঁড়াইলেন। যে অনবনমনীয় গর্ব্ব হৃদয়াগ্নিতে গলিয়া গিয়াছিল, আবার তাহার জ্যোতিঃ স্ফুরিল; যে অজেয় মানসিক শক্তি ভারতরাজ্য-শাসনকল্পনায় ভীত হয় নাই, সেই শক্তি আবার প্রণয়দুর্ব্বল দেহে সঞ্চারিত হইল। ললাটদেশে ধমনী সকল স্ফীত হইয়া রমণীয় রেখা দেখা দিল; জ্যোতির্ম্ময় চক্ষুঃ রবিকরমুখরিত সমুদ্রবারিবৎ ঝলসিতে লাগিল; নাসারন্ধ্র কাঁপিতে লাগিল। স্রোতোবিহারিণী রাজহংসী যেমন গতিবিরোধীর প্রতি গ্রীবাভঙ্গি করিয়া দাঁড়ায়, দলিতফণা ফণিনী যেমন ফণা তুলিয়া দাঁড়ায়, তেমনি উন্মাদিনী যবনী মস্তক তুলিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন, “এ জন্মে না। তুমি আমারই হইবে।”

সেই কুপিতফণিনী মূর্ত্তিপ্রতি নিরীক্ষণ করিতে করিতে নবকুমার ভীত হইলেন। লুৎফ-উন্নিসার অনির্বচনীয় দেহমহিমা এখন যেরূপ দেখিতে পাইলেন, সেরূপ আর কখনও দেখেন নাই। কিন্তু সে শ্রী বজ্রসূচক বিদ্যুতের ন্যায় মনোমোহিনী; দেখিয়া ভয় হইল। নবকুমার চলিয়া যান, তখন সহসা তাঁহার আর এক তেজোময়ী মূর্ত্তি মনে পড়িল। এক দিন নবকুমার তাঁহার প্রথমা পত্নী পদ্মাবতীর প্রতি বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে শয়নাগার হইতে বহিস্কৃতা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা তখন সদর্পে তাঁহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল; এমনই তাহার চক্ষুঃ প্রদীপ্ত হইয়াছিল; এমনই ললাটে রেখাবিকাশ হইয়াছিল; এমনই নাসারন্ধ্র কাঁপিয়াছিল; এমনই মস্তক হেলিয়াছিল। বহুকাল সে মূর্ত্তি মনে পড়ে নাই, এখন মনে পড়িল। অমনই সাদৃশ্য অনুভূত হইল। সংশয়াধীন হইয়া নবকুমার সঙ্কুচিত স্বরে, ধীরে ধীরে কহিলেন, “তুমি কে?”

যবনীর নয়নতারা আরও বিস্ফারিত হইল। কহিলেন, “আমি পদ্মাবতী।”

উত্তর প্রতীক্ষা না করিয়া লুৎফ-উন্নিসা স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। নবকুমারও অন্যমনে কিছু শঙ্কান্বিত হইয়া, আপন আলয়ে গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : উপনগরপ্রান্তে

”----I am settled, and bend up

Each corporal agent to this terrible feat."

Macbeth.

কক্ষান্তরে গিয়া লুৎফ-উন্নিসা দ্বার রুদ্ধ করিলেন। দুই দিন পর্য্যন্ত সেই কক্ষ হইতে নির্গত হইলেন না। এই দুই দিনে তিনি নিজ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিলেন। স্থির করিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। সূর্য্য অস্তাচলগামী। তখন লুৎফ-উন্নিসা পেষমনের সাহায্যে বেশভূষা করিতেছিলেন। আশ্চর্য্য বেশভূষা! রমণীবেশের কিছুমাত্র চিহ্ন নাই। যে বেশভূষা করিলেন, তাহা মুকুরে দেখিয়া পেষমনকে কহিলেন, "কেমন, পেষমন, আর আমাকে চেনা যায়?"

পেষমন্ কহিলেন, "কার সাধ্য?"

লু। তবে আমি চলিলাম। আমার সঙ্গে যেন কোন দাস-দাসী না যায়।

পেষমন্ কিছু সঙ্কুচিতচিত্তে কহিল, "যদি দাসী অপরাধ ক্ষমা করেন, তবে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি।" লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "কি?" পেষমন্ কহিল, "আপনার উদ্দেশ্য কি?"

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "আপাততঃ কপালকুণ্ডলার সহিত স্বামীর চিরবিচ্ছেদ। পরে তিনি আমার হইবেন।"

পে। বিবি! ভাল করিয়া বিবেচনা করুন; সে নিবিড় বন, রাত্রি আগত; আপনি একাকিনী।

লুৎফ-উন্নিসা এ কথার কোন উত্তর না করিয়া গৃহ হইতে বহির্গতা হইলেন। সপ্তগ্রামের যে জনহীন বনময় উপনগরপ্রান্তে নবকুমারের বসতি, সেই দিকে চলিলেন। তৎপ্রদেশে উপনীত হইতে রাত্রি হইয়া আসিল। নবকুমারের বাটীর অনতিদূরে এক নিবিড় বন আছে, পাঠক মহাশয়ের স্মরণ হইতে পারে। তাহারই প্রান্তভাগে উপনীত হইয়া এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। কিছু কাল বসিয়া যে দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ঘটনাক্রমে তাঁহার অননুভূতপূর্ব্ব সহায় উপস্থিত হইল।

লুৎফ-উন্নিসা যথায় বসিয়াছিলেন, তথা হইতে এক অনবরত সমানোচ্চারিত মনুষ্যকণ্ঠনির্গত শব্দ শুনিতে পাইলেন। উঠিয়া দাঁড়াইয়া চারি দিক্ চাহিয়া দেখিলেন যে, বনমধ্যে একটা আলো দেখা যাইতেছে। লুৎফ-উন্নিসা সাহসে পুরুষের অধিক; যথায় আলো জ্বলিতেছে, সেই স্থানে গেলেন। প্রথমে বৃক্ষান্তরাল হইতে দেখিলেন, ব্যাপার কি? দেখিলেন, যে, যে আলো জ্বলিতেছিল, সে হোমের আলো; যে শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলেন, সে মন্ত্রপাঠের শব্দ। মন্ত্রমধ্যে একটি শব্দ বুঝিতে পারিলেন, সে একটি নাম শুনিবামাত্র লুৎফ-উন্নিসা হোমকারীর নিকট গিয়া বসিলেন।

এক্ষণে তিনি তথায় বসিয়া থাকুন; পাঠক মহাশয় বহুকাল কপালকুণ্ডলার কোন সংবাদ পান নাই, সুতরাং কপালকুণ্ডলার সংবাদ আবশ্যক হইয়াছে।

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ : শয়নাগারে

"রাধিকার বেড়ী ভাঙ্গ, এ মম মিনতি।"

ব্রজাঙ্গনা কাব্য

লুৎফ-উন্নিসার আগ্রা গমন করিতে এবং তথা হইতে সপ্তগ্রাম আসিতে প্রায় এক বৎসর গত হইয়াছিল। কপালকুণ্ডলা এক বৎসরের অধিক কাল নবকুমারের গৃহিণী। যেদিন প্রদোষকালে লুৎফ-উন্নিসা কাননে, সেদিন কপালকুণ্ডলা অন্যমনে শয়নকক্ষে বসিয়া আছেন। পাঠক মহাশয় সমুদ্রতীরে আলুলায়িতকুন্তলা ভূষণহীনা যে কপালকুণ্ডলা দেখিয়াছেন, এ সে কপালকুণ্ডলা নহে। শ্যামাসুন্দরীর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হইয়াছে; স্পর্শমণির স্পর্শে যোগিনী গৃহিণী হইয়াছেন, এই ক্ষণে সেই অসংখ্য কৃষ্ণোজ্জ্বল ভুজঙ্গের ব্যূহতুল্য, আগুলফলম্বিত কেশরাশি পশ্চাদ্ভাগে স্থূলবেণীসম্বদ্ধ হইয়াছে। বেণীরচনায়ও শিল্পপারিপাট্য লক্ষিত হইতেছে, কেশবিন্যাসে অনেক সূক্ষ্ম কারুকার্য্য শ্যামাসুন্দরীর বিন্যাস-কৌশলের পরিচয় দিতেছে। কুসুমদামও পরিত্যক্ত হয় নাই, চতুস্পার্শ্বে কিরীটমণ্ডলস্বরূপ বেণী বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। কেশের যে ভাগ বেণীমধ্যে ন্যস্ত হয় নাই, তাহা যে মাথার উপরে সর্বত্র সমানোচ্চ হইয়া রহিয়াছে, এমত নহে। আকুঞ্চন প্রযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষ্ণতরঙ্গরেখায় শোভিত হইয়া রহিয়াছে। মুখমণ্ডল এখন আর কেশভারে অর্দ্ধলুক্কায়িত নহে; জ্যোতির্ম্ময় হইয়া শোভা পাইতেছে, কেবলমাত্র স্থানে স্থানে বন্ধনবিস্রংসী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অলকাগুচ্ছ তদুপরি স্বেদবিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। বর্ণ সেই অর্দ্ধপূর্ণশশাঙ্করশ্মিরুচির। এখন দুই কর্ণে হেমকর্ণভূষা দুলিতেছে; কণ্ঠে হিরণ্ময় কণ্ঠমালা দুলিতেছে। বর্ণের নিকট সে সকল ম্লান হয় নাই, অর্দ্ধচন্দ্রকৌমুদীবসনা ধরণীর অঙ্কে নৈশ কুসুমবৎ শোভা পাইতেছে। তাঁহার পরিধানে শুক্লাম্বর; সে শুক্লাম্বর অর্দ্ধচন্দ্রদীপ্ত আকাশমণ্ডলে অনিবিড় শুক্ল মেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

বর্ণ সেইরূপ চন্দ্রার্দ্ধকৌমুদীময় বটে, কিন্তু যেন পূর্ব্বাপেক্ষা ঈষৎ সমল, যেন আকাশপ্রান্তে কোথা কাল মেঘ দেখা দিয়াছে। কপালকুণ্ডলা একাকিনী বসিয়া ছিলেন না; সখী শ্যামাসুন্দরী নিকটে বসিয়া ছিলেন। তাঁহাদের উভয়ের পরস্পরের কথোপকথন হইতেছিল। তাহার কিয়দংশ পাঠক মহাশয়কে শুনিতে হইবে।

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "ঠাকুরজামাই আর কত দিন এখানে থাকিবেন?"

শ্যামা কহিলেন, "কালি বিকালে চলিয়া যাইবে। আহা! আজি রাত্রে যদি ঔষধটি তুলিয়া রাখিতাম, তবু তারে বশ করিয়া মনুষ্যজন্ম সার্থক করিতে পারিতাম। কালি রাত্রে বাহির হইয়াছিলাম বলিয়া নাথি ঝাঁটা খাইলাম, আর আজ বাহির হইব কি প্রকারে?"

ক। দিনে তুলিলে কেন হয় না?

শ্যা। দিনে তুলিলে ফল্‌বে কেন? ঠিক্ দুই প্রহর রাত্রে এলোচুলে তুলিতে হয়। তা ভাই, মনের সাধ মনেই রহিল।

ক। আচ্ছা, আমি ত আজ দিনে সে গাছ চিনে এসেছি, আর যে বনে হয়, তাও দেখে এসেছি। তোমাকে আজি আর যেতে হবে না, আমি একা গিয়া ঔষধ তুলিয়া আনিব।

শ্যা। একদিন যা হইয়াছে তা হইয়াছে। রাত্রে তুমি আর বাহির হইও না।

ক। সে জন্য তুমি কেন চিন্তা কর? শুনেছ ত, রাত্রে বেড়ান আমার ছেলেবেলা হইতে অভ্যাস। মনে ভেবে দেখ, যদি আমার সে অভ্যাস না থাকিত, তবে তোমার সঙ্গে আমার কখনও চাক্ষুষ হইত না।

শ্যা। সে ভয়ে বলি না। কিন্তু একা রাত্রে বনে বনে বেড়ান কি গৃহস্থের বউ-ঝির ভাল। দুই জনে গিয়াও এত তিরস্কার খাইলাম, তুমি একাকিনী গেলে কি রক্ষা থাকিবে?

ক। ক্ষতিই কি? তুমিও কি মনে করিয়াছ যে, আমি রাত্রে ঘরের বাহির হইলেই কুচরিত্রা হইব?

শ্যা। আমি তা মনে করি না। কিন্তু মন্দলোকে মন্দ বল্‌বে।

ক। বলুক, আমি তাতে মন্দ হব না।

শ্যা। তা ত হবে না—কিন্তু তোমাকে কেহ কিছু মন্দ বলিলে আমাদিগের অন্তঃকরণে ক্লেশ হবে।

ক। এমন অন্যায় ক্লেশ হইতে দিও না।

শ্যা। তাও আমি পারিব। কিন্তু দাদাকে কেন অসুখী করিবে?

কপালকুণ্ডলা শ্যামাসুন্দরীর প্রতি নিজ স্নিগ্ধোজ্জ্বল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। কহিলেন, "ইহাতে তিনি অসুখী হয়েন, আমি কি করিব? যদি জানিতাম যে, স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব, তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না।"

ইহার পর আর কথা শ্যামাসুন্দরী ভাল বুঝিলেন না। আত্মকর্ম্মে উঠিয়া গেলেন।

কপালকুণ্ডলা প্রয়োজনীয় গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। গৃহকার্য্য সমাধা করিয়া ওষধির অনুসন্ধানে গৃহ হইতে বহির্গতা হইলেন। তখন রাত্রি প্রহরাতীত হইয়াছিল। নিশা সজ্যোৎস্না। নবকুমার বহিঃপ্রকোষ্ঠে বসিয়াছিলেন, কপালকুণ্ডলা যে বাহির হইয়া যাইতেছেন, তাহা গবাক্ষপথে দেখিতে পাইলেন। তিনিও গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়া মৃন্ময়ীর হাত ধরিলেন। কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "কি?"

নবকুমার কহিলেন, "কোথা যাইতেছ?" নবকুমারের স্বরে তিরস্কারের সূচনামাত্র ছিল না।

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "শ্যামাসুন্দরী স্বামীকে বশ করিবার জন্য ঔষধ চাহে, আমি ঔষধের সন্ধানে যাইতেছি।"

নবকুমার পূর্ব্ববৎ কোমল স্বরে কহিলেন, "ভাল, কালি ত একবার গিয়াছিলে? আজি আবার কেন?"

ক। কালি খুঁজিয়া পাই নাই; আজি আবার খুঁজিব।

নবকুমার অতি মৃদুভাবে কহিলেন, "ভাল, দিনে খুঁজিলেও ত হয়?" নবকুমারের স্বর স্নেহপরিপূর্ণ।

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "দিবসে ও ঔষধ ফলে না।"

নব। কাজই কি তোমার ঔষধ তল্লাসে? আমাকে গাছের নাম বলিয়া দাও। আমি ওষধি তুলিয়া আনিয়া দিব।

ক। আমি গাছ দেখিলে চিনিতে পারি, কিন্তু নাম জানি না। আর তুমি তুলিলে ফলিবে না। স্ত্রীলোকে এলোচুলে তুলিতে হয়। তুমি পরের উপকারে বিঘ্ন করিও না।

কপালকুণ্ডলা এই কথা অপ্রসন্নতার সহিত বলিলেন। নবকুমার আর আপত্তি করিলেন না। বলিলেন, "চল, আমি তোমার সঙ্গে যাইব।"

কপালকুণ্ডলা গর্ব্বিতবচনে কহিলেন, "আইস, আমি অবিশ্বাসিনী কি না, স্বচক্ষে দেখিয়া যাও।"

নবকুমার আর কিছু বলিতে পারিলেন না। নিশ্বাসসহকারে কপালকুণ্ডলার হাত ছাড়িয়া দিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। কপালকুণ্ডলা একাকিনী বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : কাননতলে

"--Tender is the night.,
And haply the Queen moon is on her throne,

Clustered around by all her starry fays;
But here there is no light."

Keats.

সপ্তগ্রামের এই ভাগ যে বনময়, তাহা পূর্ব্বেই কতক কতক উল্লিখিত হইয়াছে। গ্রামের কিছু দূরে নিবিড় বন। কপালকুণ্ডলা একাকিনী এক সঙ্কীর্ণ বন্য পথে ওষধির সন্ধানে চলিলেন। যামিনী মধুরা, একান্ত শব্দমাত্রবিহীনা। মাধবী যামিনীর আকাশে স্নিগ্ধরশ্মিময় চন্দ্র নীরবে শ্বেত মেঘখণ্ড-সকল উত্তীর্ণ হইতেছে; পৃথিবীতলে বন্য বৃক্ষ, লতা-সকল তদ্রূপ নীরবে শীতল চন্দ্রকরে বিশ্রাম করিতেছে, নীরবে বৃক্ষপত্র-সকল সে কিরণের প্রতিঘাত করিতেছে। নীরবে লতাগুল্মমধ্যে শ্বেত কুসুমদল বিকশিত হইয়া রহিয়াছে। পশু পক্ষী নীরব। কেবল কদাচিৎ মাত্র ভগ্নবিশ্রাম কোন পক্ষীর পক্ষস্পন্দনশব্দ; কোথাও ক্বচিৎ শুষ্কপত্রপাতশব্দ; কোথাও তলস্থ শুষ্কপত্রমধ্যে উরগ জাতীয় জীবের ক্বচিৎ গতিজনিত শব্দ; ক্বচিৎ অতি দূরস্থ কুক্কুররব। এমত নহে যে, একেবারে বায়ু বহিতেছিল না; মধুমাসের দেহস্নিগ্ধকর বায়ু অতি মন্দ; একান্ত নিঃশব্দ বায়ু মাত্র; তাহাতে কেবলমাত্র বৃক্ষের সর্ব্বাগ্রভাগারূঢ় পত্রগুলি হেলিতেছিল; কেবলমাত্র আভূমিপ্রণত শ্যামা লতা দুলিতেছিল; কেবলমাত্র নীলাম্বরসঞ্চারী ক্ষুদ্র শ্বেতাম্বুদখণ্ডগুলি ধীরে ধীরে চলিতেছিল। কেবলমাত্র তদ্রূপ বায়ুসংসর্গে সম্ভুক্ত পূর্ব্বসুখের অস্পষ্ট স্মৃতি হৃদয়ে অল্প জাগরিত হইতেছিল।

কপালকুণ্ডলার সেইরূপ পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হইতেছিল; বালিয়াড়ির শিখরে যে সাগরবারিবিন্দুসংস্পৃষ্ট মলয়ানিল তাঁহার লম্বালকমণ্ডলমধ্যে ক্রীড়া করিত, তাহা মনে পড়িল; অমল নীলানন্ত গগনপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন; সেই অমল নীলানন্ত গগনরূপী সমুদ্র মনে পড়িল। কপালকুণ্ডলা পূর্ব্বস্মৃতি সমালোচনায় অন্যমনা হইয়া চলিলেন।

অন্যমনে যাইতে যাইতে কোথায় কি উদ্দেশ্যে যাইতেছিলেন, কপালকুণ্ডলা তাহা ভাবিলেন না। যে পথে যাইতেছিলেন, তাহা ক্রমে অগম্য হইয়া আসিল; বন নিবিড়তর হইল; মাথার উপর বৃক্ষশাখাবিন্যাসে চন্দ্রালোক প্রায় একেবারে রুদ্ধ হইয়া আসিল; ক্রমে আর পথ দেখা যায় না। পথের অলক্ষ্যতায় প্রথমে কপালকুণ্ডলা চিন্তামগ্নতা হইতে উত্থিত হইলেন। ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, এই নিবিড় বনমধ্যে আলো জ্বলিতেছে, লুৎফ-উন্নিসাও পূর্ব্বে এই আলো দেখিয়াছিলেন। কপালকুণ্ডলা পূর্ব্বাভ্যাসফলে এ সকল সময়ে ভয়হীনা, অথচ কৌতূহলময়ী। ধীরে ধীরে সেই দীপজ্যোতির অভিমুখে গেলেন। দেখিলেন, যথায় আলো জ্বলিতেছে, তথায় কেহ নাই। কিন্তু তাহার অনতিদূরে বননিবিড়তা হেতু দূর হইতে অদৃশ্য একটি ভগ্ন গৃহ আছে। গৃহটি ইষ্টকনির্ম্মিত, কিন্তু অতি ক্ষুদ্র, অতি সামান্য, তাহাতে একটিমাত্র ঘর। সেই ঘর হইতে মনুষ্যকথোপকথন শব্দ নির্গত হইতেছিল। কপালকুণ্ডলা নিঃশব্দপদক্ষেপে গৃহসন্নিধানে গেলেন। গৃহের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র বোধ হইল, দুই জন মনুষ্য সাবধানে কথোপকথন করিতেছে। প্রথমে কথোপকথন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। পরে ক্রমে চেষ্টাজনিত কর্ণের তীক্ষ্ণতা জন্মিলে নিম্নলিখিত মত কথা শুনিতে পাইলেন।

একজন কহিতেছে, "আমার অভীষ্ট মৃত্যু, ইহাতে তোমার অভিমত না হয়, আমি তোমায় সাহায্য করিব না; তুমিও আমার সহায়তা করিও না।"

অপর ব্যক্তি কহিল, "আমিও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নহি; কিন্তু যাবজ্জীবন জন্য ইহার নির্ব্বাসন হয়, তাহাতে আমি সম্মত আছি। কিন্তু হত্যার কোন উদ্যোগ আমা হইতে হইবে না; বরং তাহার প্রতিকূলতাচরণ করিব।"

প্রথমালাপকারী কহিল, "তুমি অতি অবোধ, অজ্ঞান। তোমায় কিছু জ্ঞানদান করিতেছি। মনঃসংযোগ করিয়া শ্রবণ কর। অতি গূঢ় বৃত্তান্ত বলিব; চতুর্দ্দিক একবার দেখিয়া আইস, যেন মনুষ্যশ্বাস শুনিতে পাইতেছি।"

বাস্তবিক কপালকুণ্ডলা কথোপকথন উত্তমরূপে শুনিবার জন্য কক্ষপ্রাচীরের অতি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এবং তাঁহার আগ্রহাতিশয় ও শঙ্কার কারণে ঘন ঘন গুরু শ্বাস বহিতেছিল।

সমভিব্যাহারীর কথায় গৃহমধ্যস্থ এক ব্যক্তি বাহিরে আসিলেন, এবং আসিয়াই কপালকুণ্ডলাকে দেখিতে পাইলেন। কপালকুণ্ডলাও পরিষ্কার চন্দ্রালোকে আগন্তুক পুরুষের অবয়ব সুস্পষ্ট দেখিলেন। দেখিয়া ভীতা হইবেন, কি প্রফুল্লিতা হইবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। দেখিলেন, আগন্তুক ব্রাহ্মণবেশী; সামান্য ধুতি পরা; গাত্র উত্তরীয়ে উত্তমরূপে আচ্ছাদিত। ব্রাহ্মণকুমার অতি কোমলবয়স্ক; মুখমণ্ডলে বয়শ্চিহ্ন কিছুমাত্র নাই। মুখখানি পরম সুন্দর, সুন্দরী রমণীমুখের ন্যায় সুন্দর, কিন্তু রমণীদুর্ল্লভ তেজোগর্ব্ববিশিষ্ট। তাঁহার কেশগুলি সচরাচর পুরুষদিগের কেশের ন্যায় ক্ষৌরকার্য্যাবশেষাত্মক মাত্র নহে, স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় অচ্ছিন্নাবস্থায় উত্তরীয় প্রচ্ছন্ন করিয়া পৃষ্ঠদেশে, অংসে, বাহুদেশে, কদাচিৎ বক্ষে সংসর্পিত হইয়া পড়িয়াছে। ললাট প্রশস্ত, ঈষৎ স্ফীত, মধ্যস্থলে একমাত্র শিরাপ্রকাশশোভিত। চক্ষু দু'টি বিদ্যুত্তেজঃপরিপূর্ণ। কোষশূন্য এক দীর্ঘ তরবারি হস্তে ছিল। কিন্তু এ রূপরাশিমধ্যে এক ভীষণ ভাব ব্যক্ত হইতেছিল। হেমকান্ত বর্ণে যেন কোন করাল কামনার ছায়া পড়িয়াছিল। অন্তস্তল পর্য্যন্ত অন্বেষণক্ষম কটাক্ষ দেখিয়া কপালকুণ্ডলার ভীতিসঞ্চার হইল।

উভয়ে উভয়ের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন। প্রথমে কপালকুণ্ডলা নয়নপল্লব নিক্ষিপ্ত করিলেন। কপালকুণ্ডলা নয়নপল্লব নিক্ষিপ্ত করাতে আগন্তুক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

যদি এক বৎসর পূর্ব্বে হিজলীর কিয়াবনে কপালকুণ্ডলার প্রতি এ প্রশ্ন হইত, তবে তিনি তৎক্ষণেই সঙ্গত উত্তর দিতেন। কিন্তু এখন কপালকুণ্ডলা কতক দূর গৃহরমণীর স্বভাবসম্পন্না হইয়াছিলেন, সুতরাং সহসা উত্তর করিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মণবেশী কপালকুণ্ডলাকে নিরুত্তর দেখিয়া গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিলেন, "কপালকুণ্ডলা! তুমি রাত্রে এ নিবিড় বনমধ্যে কি জন্য আসিয়াছ?"

অজ্ঞাত রাত্রিচর পুরুষের মুখে আপন নাম শুনিয়া কপালকুণ্ডলা অবাক্ হইলেন, কিছু ভীতাও হইলেন। সুতরাং সহসা কোন উত্তর তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল না।

ব্রাহ্মণবেশী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমাদিগের কথাবার্ত্তা শুনিয়াছ?"

সহসা কপালকুণ্ডলা বাক্‌শক্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। তিনি উত্তর না দিয়া কহিলেন, "আমিও তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি। এ কাননমধ্যে তোমরা দুই জনে এ নিশীথে কি কুপরামর্শ করিতেছিলে?"

ব্রাহ্মণবেশী কিছু কাল নিরুত্তরে চিন্তামগ্ন হইয়া রহিলেন। যেন কোন নূতন ইষ্টসিদ্ধির উপায় তাঁহার চিত্তমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি কপালকুণ্ডলার হস্তধারণ করিলেন এবং হস্ত ধরিয়া ভগ্ন গৃহ হইতে কিছু দূরে লইয়া যাইতে লাগিলেন। কপালকুণ্ডলা অতি ক্রোধে হস্ত মুক্ত করিয়া লইলেন। ব্রাহ্মণবেশী অতি মৃদুস্বরে কপালকুণ্ডলার কানের কাছে কহিলেন, "চিন্তা কি? আমি পুরুষ নহি।"

কপালকুণ্ডলা আরও চমৎকৃতা হইলেন। এ কথায় তাঁহার কতক বিশ্বাস হইল, সম্পূর্ণ বিশ্বাসও হইল না। তিনি ব্রাহ্মণবেশধারিণীর সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। ভগ্ন গৃহ হইতে অদৃশ্য স্থানে গিয়া ব্রাহ্মণবেশী কপালকুণ্ডলাকে কর্ণে কর্ণে কহিলেন, "আমরা যে কুপরামর্শ করিতেছিলাম, তাহা শুনিবে? সে তোমারই সম্বন্ধে।"

কপালকুণ্ডলার আগ্রহ অতিশয় বাড়িল। কহিলেন, "শুনিব।"

ছদ্মবেশিনী বলিলেন, "তবে যতক্ষণ না প্রত্যাগমন করি, ততক্ষণ এই স্থানে প্রতীক্ষা কর।"

এই বলিয়া ছদ্মবেশিনী ভগ্ন গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন; কপালকুণ্ডলা কীয়ৎক্ষণ তথায় বসিয়া রহিলেন। কিন্তু যাহা দেখিয়াছিলেন ও শুনিয়াছিলেন, তাহাতে

তাঁহার কিছু ভয় জন্মিয়াছিল। এক্ষণে একাকিনী অন্ধকারে বনমধ্যে বসিয়া থাকাতে উদ্বেগ বাড়িতে লাগিল। বিশেষ এই ছদ্মবেশী তাঁহাকে কি অভিপ্রায়ে তথায় বসাইয়া গেল, তাহা কে বলিতে পারে? হয়ত সুযোগ পাইয়া আপনার মন্দ অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্যই বসাইয়া রাখিয়া গিয়াছে। এদিকে ব্রাহ্মণবেশীর প্রত্যাগমনে অনেক বিলম্ব হইতে লাগিল। কপালকুণ্ডলা আর বসিতে পারিলেন না। উঠিয়া দ্রুত পাদবিক্ষেপে গৃহাভিমুখে চলিলেন।

তখন আকাশমণ্ডল ঘনঘটায় মসীময় হইয়া আসিতে লাগিল; কাননতলে যে সামান্য আলো ছিল, তাহাও অন্তর্হিত হইতে লাগিল। কপালকুণ্ডলা আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিতে পারিলেন না। শীঘ্রপদে কাননাভ্যন্তর হইতে বাহিরে আসিতে লাগিলেন। আসিবার সময়ে যেন পশ্চাদ্ভাগে অপর ব্যক্তির পদক্ষেপধ্বনি শুনিতে পাইলেন। কিন্তু মুখ ফিরাইয়া অন্ধকারে কিছু দেখিতে পাইলেন না। কপালকুণ্ডলা মনে করিলেন, ব্রাহ্মণবেশী তাঁহার পশ্চাৎ আসিতেছেন। বনত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববর্ণিত ক্ষুদ্র বনপথে আসিয়া বাহির হইলেন। তথায় তাদৃশ অন্ধকার নহে; দৃষ্টিপথে মনুষ্য থাকিলে দেখা যায়। কিন্তু কিছুই দেখা গেল না। অতএব দ্রুতপদে চলিলেন। কিন্তু আবার স্পষ্ট মনুষ্যগতিশব্দ শুনিতে পাইলেন। আকাশ নীল কাদম্বিনীতে ভীষণতর হইল। কপালকুণ্ডলা আরও দ্রুত চলিলেন। গৃহ অনতিদূরে, কিন্তু গৃহপ্রাপ্তি হইতে না হইতেই প্রচণ্ড ঝটিকাবৃষ্টি ভীষণরবে প্রঘোষিত হইল। কপালকুণ্ডলা দৌড়িলেন। পশ্চাতে যে আসিতেছিল, সেও যেন দৌড়িল, এমত শব্দ বোধ হইল। গৃহ দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইবার পূর্ব্বেই প্রচণ্ড ঝটিকাবৃষ্টি কপালকুণ্ডলার মস্তকের উপর দিয়া প্রবাহিত হইল। ঘন ঘন গম্ভীর মেঘশব্দ এবং অশনিসম্পাতশব্দ হইতে লাগিল। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। কপালকুণ্ডলা কোনক্রমে আত্মরক্ষা করিয়া গৃহে আসিলেন। প্রাঙ্গণভূমি পার হইয়া প্রকোষ্ঠমধ্যে উঠিলেন। দ্বার তাঁহার জন্য খোলা ছিল। দ্বার রুদ্ধ করিবার জন্য প্রাঙ্গণের দিকে সম্মুখ ফিরিলেন। বোধ হইল, যেন প্রাঙ্গণভূমিতে এক দীর্ঘাকার পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে। এই সময়ে একবার বিদ্যুৎ চমকিল। একবার বিদ্যুতেই তাহাকে চিনিতে পারিলেন। সে সাগরতীরপ্রবাসী সেই কাপালিক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : স্বপ্নে

"I had a dream, which was not all a dream."
Byron.

কপালকুণ্ডলা ধীরে ধীরে দ্বার রুদ্ধ করিলেন, ধীরে ধীরে শয়নাগারে আসিলেন, ধীরে ধীরে পালঙ্কে শয়ন করিলেন। মনুষ্যহৃদয় অনন্ত সমুদ্র, যখন তদুপরি ক্ষিপ্ত বায়ুগণ সমর করিতে থাকে, কে তাহার তরঙ্গমালা গণিতে পারে? কপালকুণ্ডলার হৃদয়সমুদ্রে যে তরঙ্গমালা উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল, কে তাহা গণিবে?

সে রাত্রে নবকুমার হৃদয়বেদনায় অন্তঃপুরে আইসেন নাই। শয়নাগারে একাকিনী কপালকুণ্ডলা শয়ন করিলেন, কিন্তু নিদ্রা আসিল না। প্রবলবায়ুতাড়িত বারিধারাপরিসিঞ্চিত জটাজুটবেষ্টিত সেই মুখমণ্ডল অন্ধকার মধ্যেও চতুর্দ্দিকে দেখিতে লাগিলেন। কপালকুণ্ডলা পূর্ব্ববৃত্তান্ত সকল আলোচনা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। কাপালিকের সহিত যেরূপ আচরণ করিয়া তিনি চলিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ হইতে লাগিল; কাপালিক নিবিড় বনমধ্যে যে সকল পৈশাচিক কার্য্য করিতেন, তাহা স্মরণ হইতে লাগিল; তৎকৃত ভৈরবীপূজা, নবকুমারের বন্ধন, এ সকল মনে পড়িতে লাগিল। কপালকুণ্ডলা শিহরিয়া উঠিলেন। অদ্যকার রাত্রের সকল ঘটনাও মনোমধ্যে আসিতে লাগিল। শ্যামার ওষধিকামনা, নবকুমারের নিষেধ, তাঁহার প্রতি কপালকুণ্ডলার তিরস্কার, তৎপরে অরণ্যের জ্যোৎস্নাময়ী শোভা, কাননতলে অন্ধকার, সেই অরণ্যমধ্যে যে সহচর পাইয়াছিলেন, তাহার ভীমকান্তগুণময় রূপ; সকলই মনে পড়িতে লাগিল।

পূর্ব্ব দিকে উষার মুকুটজ্যোতিঃ প্রকটিত হইল; তখন কপালকুণ্ডলার অল্প তন্দ্রা আসিল। সেই অপ্রগাঢ় নিদ্রায় কপালকুণ্ডলা স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। তিনি যেন সেই পূর্ব্বদৃষ্ট সাগরহৃদয়ে তরণী আরোহণ করিয়া যাইতেছিলেন। তরণী সুশোভিত; তাহাতে বসন্ত রঙ্গের পতাকা উড়িতেছে; নাবিকেরা ফুলের মালা গলায় দিয়া বাহিতেছে। রাধা শ্যামের অনন্ত প্রণয়গীত করিতেছে। পশ্চিমগগন হইতে সূর্য্য স্বর্ণধারা বৃষ্টি করিতেছে। স্বর্ণধারা পাইয়া সমুদ্র হাসিতেছে; আকাশমণ্ডলে মেঘগণ সেই স্বর্ণবৃষ্টিতে ছুটাছুটি করিয়া স্নান করিতেছে। অকস্মাৎ রাত্রি হইল, সূর্য্য কোথায় গেল। স্বর্ণমেঘসকল কোথায় গেল। নিবিড়নীল কাদম্বিনী আসিয়া আকাশ ব্যাপিয়া ফেলিল। আর সমুদ্রে দিক্ নিরূপণ হয় না। নাবিকেরা তরি ফিরাইল। কোন্ দিকে বাহিবে, স্থিরতা পায় না। তাহারা গীত বন্ধ করিল, গলার মালা সকল ছিঁড়িয়া ফেলিল; বসন্ত রঙ্গের পতাকা আপনি খসিয়া জলে পড়িয়া গেল। বাতাস উঠিল; বৃক্ষপ্রমাণ তরঙ্গ উঠিতে লাগিল; তরঙ্গমধ্য হইতে একজন জটাজূটধারী প্রকাণ্ডকায় পুরুষ আসিয়া কপালকুণ্ডলার নৌকা বাম হস্তে তুলিয়া সমুদ্রমধ্যে প্রেরণ করিতে উদ্যত হইল। এমত সময়ে সেই ভীমকান্তশ্রীময় ব্রাহ্মণবেশধারী আসিয়া তরি ধরিয়া রহিল। সে কপালকুণ্ডলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমায় রাখি, কি নিমগ্ন করি?" অকস্মাৎ কপালকুণ্ডলার মুখ হইতে বাহির হইল, "নিমগ্ন কর।" ব্রাহ্মণবেশী নৌকা ছাড়িয়া দিল। তখন নৌকাও শব্দময়ী হইল, কথা কহিয়া উঠিল। নৌকা কহিল, "আমি আর এ ভার বহিতে পারি না, আমি পাতালে প্রবেশ করি।" ইহা কহিয়া নৌকা তাহাকে জলে নিক্ষিপ্ত করিয়া পাতালে প্রবেশ করিল।

ঘর্ম্মাক্তকলেবরা হইয়া কপালকুণ্ডলা স্বপ্নোত্থিতা হইলে চক্ষুরুন্মীলন করিলেন; দেখিলেন, প্রভাত হইয়াছে–গবাক্ষ মুক্ত রহিয়াছে; তন্মধ্য দিয়া বসন্তবায়ুস্রোতঃ প্রবেশ করিতেছে; মন্দান্দোলিত বৃক্ষশাখায় পক্ষিগণ কূজন করিতেছে। সেই গবাক্ষের উপর কতকগুলি মনোহর বন্য লতা সুবাসিত কুসুমসহিত দুলিতেছে। কপালকুণ্ডলা নারীস্বভাববশতঃ লতাগুলি গুছাইয়া লইতে লাগিলেন। তাহা সুশৃঙ্খল করিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে তাহার মধ্য হইতে একখানি লিপি বাহির হইল। কপালকুণ্ডলা অধিকারীর ছাত্র; পড়িতে পারিতেন। নিম্নোক্ত মত পাঠ করিলেন।

"অদ্য সন্ধ্যার পর কল্য রাত্রের ব্রাহ্মণকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিবা। তোমর নিজ সম্পর্কীয় নিতান্ত প্রয়োজনীয় যে কথা শুনিতে চাহিয়াছিলে, তাহা শুনিবে।

অহং ব্রাহ্মণবেশী।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : কৃতসঙ্কেতে

"----I will have grounds
More relative than this."

Hamlet.

কপালকুণ্ডলা সেদিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অনন্যচিন্তা হইয়া কেবল ইহাই বিবেচনা করিতেছিলেন যে, ব্রাহ্মণবেশীর সহিত সাক্ষাৎ বিধেয় কি না। পতিব্রতা যুবতীর পক্ষে রাত্রিকালে নির্জ্জনে অপরিচিত পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ যে অবিধেয়, ইহা ভাবিয়া তাঁহার মনে সঙ্কোচ জন্মে নাই; তদ্বিষয়ে তাঁহার স্থির সিদ্ধান্তই ছিল যে, সাক্ষাতের উদ্দেশ্য দূষ্য না হইলে এমত সাক্ষাতে দোষ নাই–পুরুষে পুরুষে বা স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে যেরূপ সাক্ষাতের অধিকার, স্ত্রী পুরুষে সাক্ষাতের উভয়েরই সেইরূপ অধিকার উচিত বলিয়া তাঁহার বোধ ছিল; বিশেষ, ব্রাহ্মণবেশী পুরুষ কি না, তাহাতে সন্দেহ। সুতরাং সে সঙ্কোচ অনাবশ্যক, কিন্তু এ সাক্ষাতে মঙ্গল,

কি অমঙ্গল জন্মিবে, তাহাই অনিশ্চিত বলিয়া কপালকুণ্ডলা, এত দূর সঙ্কোচ করিতেছিলেন। প্রথমে ব্রাহ্মণবেশীর কথোপকথন, পরে কাপালিকের দর্শন, তৎপরে স্বপ্ন, এই সকল হেতুতে কপালকুণ্ডলার নিজ অমঙ্গল যে অদূরবর্ত্তী এমত সন্দেহ প্রবল হইয়াছিল। সেই অমঙ্গল যে কাপালিকের আগমনসহিত সম্বন্ধমিলিত, এমত সন্দেহও অমূলক বোধ হইল না। এই ব্রাহ্মণবেশীকে তাহারই সহচর বোধ হইতেছে—অতএব তাহার সহিত সাক্ষাতে এই আশঙ্কার বিষয়ীভূত অমঙ্গলে পতিতও হইতে পারেন। সে ত স্পষ্ট বলিয়াছে যে, কপালকুণ্ডলা সম্বন্ধেই পরামর্শ হইতেছিল। কিন্তু এমতও হইতে পারে যে, ইহা হইতে তন্নিরাকরণ-সূচনা হইবে। ব্রাহ্মণকুমার এক ব্যক্তির সহিত গোপনে পরামর্শ করিতেছিল, সে ব্যক্তিকে এই কাপালিক বলিয়া বোধ হয়। সেই কথোপকথনে কাহারও মৃত্যুর সঙ্কল্প প্রকাশ পাইতেছিল; নিতান্ত পক্ষে চিরনির্ব্বাসন। সে কাহার? ব্রাহ্মণবেশী ত স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, কপালকুণ্ডলা সম্বন্ধেই কুপরামর্শ হইতেছিল। তবে তাহারই মৃত্যু বা তাহারই চিরনির্ব্বাসন কল্পনা হইতেছিল। হইলই বা! তার পর স্বপ্ন,—সে স্বপ্নের তাৎপর্য্য কি? স্বপ্নে ব্রাহ্মণবেশী মহাবিপত্তিকালে আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন, কার্য্যও তাহাই ফলিতেছে। ব্রাহ্মণবেশী সকল কথা ব্যক্ত করিতে চাহিতেছেন। তিনি স্বপ্নে বলিয়াছেন, "নিমগ্ন কর।" কার্যেও কি সেইরূপ বলিবেন? না—না—ভক্তবৎসলা ভবানী অনুগ্রহ করিয়া স্বপ্নে তাঁহার রক্ষাহেতু উপদেশ দিয়াছেন, ব্রাহ্মণবেশী আসিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিতে চাহিয়াছেন; তাঁহার সাহায্য ত্যাগ করিলে নিমগ্ন হইবেন। অতএব কপালকুণ্ডলা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করাই স্থির করিলেন। বিজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতেন কি না, তাহাতে সন্দেহ; কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তির সিদ্ধান্তের সহিত আমাদিগের সংশ্রব নাই। কপালকুণ্ডলা বিশেষ বিজ্ঞ ছিলেন না—সুতরাং বিজ্ঞের ন্যায় সিদ্ধান্ত করলেন না। কৌতূহলপরবশ রমণীর ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন, ভীমকান্তরূপরাশি দর্শনলোলুপ যুবতীর ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন, নৈশবনভ্রমণবিলাসিনী সন্ন্যাসিপালিতার ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন, ভবানীভক্তিভাববিমোহিতার ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন, জ্বলন্ত বহ্নিশিখায় পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন।

সন্ধ্যার পরে গৃহকর্ম্ম কতক কতক সমাপন করিয়া কপালকুণ্ডলা পূর্ব্বমত বনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কপালকুণ্ডলা যাত্রাকালে শয়নাগারে প্রদীপটি উজ্জ্বল করিয়া গেলেন। তিনি যেমন কক্ষ হইতে বাহির হইলেন, অমনি গৃহের প্রদীপ নিবিয়া গেল।

যাত্রাকালে কপালকুণ্ডলা এক কথা বিস্মৃত হইলেন। ব্রাহ্মণবেশী কোন্ স্থানে সাক্ষাৎ করিতে লিখিয়াছিলেন? এই জন্য পুনর্ব্বার লিপিপাঠের আবশ্যক হইল। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যে স্থানে প্রাতে লিপি রাখিয়াছিলেন, সে স্থান অন্বেষণ করিলেন, সে স্থানে লিপি পাইলেন না। স্মরণ হইল যে, কেশবন্ধন সময়ে ঐ লিপি সঙ্গে রাখিবার জন্য কবরীমধ্যে বিন্যস্ত করিয়াছিলেন। অতএব কবরীমধ্যে অঙ্গুলি দিয়া সন্ধান করিলেন। অঙ্গুলিতে লিপি স্পর্শ না হওয়াতে কবরী আলুলায়িত করিলেন, তথাপি সে লিপি পাইলেন না। তখন গৃহের অন্যান্য স্থানে তত্ত্ব করিলেন। কোথাও না পাইয়া পরিশেষে পূর্ব্বসাক্ষাৎস্থানেই সাক্ষাৎ সম্ভব সিদ্ধান্ত করিয়া পুনর্যাত্রা করিলেন। অনবকাশপ্রযুক্ত সে বিশাল কেশরাশি পুনর্ব্বিন্যস্ত করিতে পারেন নাই, অতএব আজি কপালকুণ্ডলা অনূঢ়াকালের মত কেশমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী হইয়া চলিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : গৃহদ্বারে

"Stand you awhile apart,
Confine yourself but in a patient list."

Othello.

যখন সন্ধ্যার প্রাক্কালে কপালকুণ্ডলা গৃহকার্যে ব্যাপৃতা ছিলেন, তখন লিপি কবরী-বন্ধনচ্যুত হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গিয়াছিল। কপালকুণ্ডলা তাহা জানিতে পারেন নাই। নবকুমার তাহা দেখিয়াছিলেন। কবরী হইতে পত্র খসিয়া পড়িল দেখিয়া নবকুমার বিস্মিত হইলেন। কপালকুণ্ডলা কার্য্যান্তরে গেলে লিপি তুলিয়া বাহিরে গিয়া পাঠ করিলেন। সে লিপি পাঠ করিয়া একই সিদ্ধান্ত সম্ভবে। "যে কথা কাল শুনিতে চাহিয়াছিলে, সে কথা শুনিবে।" সে কি? প্রণয়-কথা? ব্রাহ্মণবেশী মৃন্ময়ীর উপপতি? যে ব্যক্তি পূর্ব্বরাত্রের বৃত্তান্ত অনবগত, তাহার পক্ষে দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত সম্ভবে না।

পতিব্রতা, স্বামীর সহগমনকালে, অথবা অন্য কারণে, যখন কেহ জীবিতে চিতারোহণ করিয়া চিতায় অগ্নি সংলগ্ন করে, তখন প্রথমে ধূমরাশি আসিয়া চতুর্দ্দিক বেষ্টন করে; দৃষ্টিলোপ করে; অন্ধকার করে; পরে ক্রমে কাষ্ঠরাশি জ্বলিতে আরম্ভ হইলে, প্রথমে নিম্ন হইতে সর্পজিহ্বার ন্যায় দুই একটি শিখা আসিয়া অঙ্গের স্থানে স্থানে দর্শন করে, পরে সশব্দে অগ্নিজ্বালা চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া বেষ্টন করিয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যাপিতে থাকে; শেষে প্রচণ্ড রবে অগ্নিরাশি গগনমণ্ডল জ্বালাময় করিয়া মস্তক অতিক্রমপূর্ব্বক ভস্মরাশি করিয়া ফেলে।

নবকুমারের লিপি পাঠ করিয়া সেইরূপ হইল। প্রথমে বুঝিতে পারিলেন না; পরে সংশয়, পরে নিশ্চয়তা, শেষে জ্বালা। মনুষ্যহৃদয় ক্লেশাধিক্য বা সুখাধিক্য একবারে গ্রহণ করিতে পারে না, ক্রমে ক্রমে গ্রহণ করে। নবকুমারকে প্রথমে ধূমরাশি বেষ্টন করিল; পরে বহ্নিশিখা হৃদয় তাপিত করিতে লাগিল; শেষে বহ্নিরাশিতে হৃদয় ভস্মীভূত হইতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বেই নবকুমার দেখিয়াছিলেন যে, কপালকুণ্ডলা কোন কোন বিষয়ে তাঁহার অবাধ্য হইয়াছেন। বিশেষ কপালকুণ্ডলা তাঁহার নিষেধ সত্ত্বেও যখন যেখানে ইচ্ছা, সেখানে একাকিনী যাইতেন; যাহার তাহার সহিত যথেচ্ছ আচরণ করিতেন; অধিকন্তু তাঁহার বাক্য হেলন করিয়া নিশীথে একাকিনী বনভ্রমণ করিতেন। আর কেহ ইহাতে সন্দিহান হইত, কিন্তু নবকুমারের হৃদয়ে কপালকুণ্ডলার প্রতি সন্দেহ উত্থাপিত হইলে চিরানিবার্য্য বৃশ্চিকদংশনবৎ হইবে জানিয়া, তিনি একদিনের তরে সন্দেহকে স্থান দান করেন নাই। অদ্যও সন্দেহকে স্থান দিতেন না, কিন্তু অদ্য সন্দেহ নহে, প্রতীতি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

যন্ত্রণার প্রথম বেগের শমতা হইলে নবকুমার নীরবে বসিয়া অনেকক্ষণ রোদন করিলেন। রোদন করিয়া কিছু সুস্থির হইলেন। তখন তিনি কিঙ্কর্ত্তব্য সম্বন্ধে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন। আজি তিনি কপালকুণ্ডলাকে কিছু বলিবেন না। কপালকুণ্ডলা যখন সন্ধ্যার সময় বনাভিমুখে যাত্রা করিবেন, তখন গোপনে তাঁহার অনুসরণ করিবেন, কপালকুণ্ডলার মহাপাপ প্রত্যক্ষীভূত করিবেন, তাহার পর এ জীবন বিসর্জ্জন করিবেন। কপালকুণ্ডলাকে কিছু বলিবেন না, আপনার প্রাণসংহার করিবেন। না করিয়া কি করিবেন?—এ জীবনের দুর্ব্বহ ভার বহিতে তাঁহার শক্তি হইবে না।

এই স্থির করিয়া কপালকুণ্ডলার বহির্গমন প্রতীক্ষায় তিনি খড়্কীদ্বারের প্রতি দৃষ্টি করিয়া রহিলেন। কপালকুণ্ডলা বহির্গতা হইয়া কিছু দূর গেলে নবকুমারও বহির্গত হইতেছিলেন; এমন সময়ে কপালকুণ্ডলা লিপির জন্য প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, দেখিয়া নবকুমারও সরিয়া গেলেন। শেষে কপালকুণ্ডলা পুনর্ব্বার বাহির হইয়া কিছুদূর গমন করিলে নবকুমার আবার তদনুগমনে বাহির হইতেছিলেন, এমত সময়ে দেখিলেন, দ্বারদেশ আবৃত করিয়া এক দীর্ঘাকার পুরুষ দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

কে সে ব্যক্তি, কেন দাঁড়াইয়া, জানিতে নবকুমারের কিছুমাত্র ইচ্ছা হইল না। তাহার প্রতি চাহিয়াও দেখিলেন না। কেবল কপালকুণ্ডলার প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য ব্যস্ত। অতএব পথমুক্তির জন্য আগন্তুকের বক্ষে হস্ত দিয়া তাড়িত করিলেন; কিন্তু তাহাকে সরাইতে পারিলেন না।

নবকুমার কহিল, "কে তুমি? দূর হও—আমার পথ ছাড়।"

আগন্তুক কহিল, "কে আমি, তুমি চেন না?"

শব্দ সমুদ্রনাদবৎ কর্ণে লাগিল। নবকুমার চাহিয়া দেখিলেন; দেখিলেন, সে পূর্ব্বপরিচিত জটাজুটধারী কাপালিক।

নবকুমার চমকিয়া উঠিলেন; কিন্তু ভীত হইলেন না। সহসা তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইল,—কহিলেন,

"কপালকুণ্ডলা কি তোমার সহিত সাক্ষাতে যাইতেছে?"

কাপালিক কহিল, " না!"

জ্বালিতমাত্র আশার প্রদীপ তখনই নির্ব্বাণ হওয়াতে নবকুমারের মুখ পূর্ব্ববৎ মেঘময় অন্ধকারাবিষ্ট হইল। কহিলেন, "তবে তুমি পথ মুক্ত কর।"

কাপালিক কহিল, "পথ মুক্ত করিতেছি, কিন্তু তোমার সহিত আমার কিছু কথা আছে—অগ্রে শ্রবণ কর।"

নবকুমার কহিলেন, "তোমার সহিত আমার কি কথা? তুমি আবার আমার প্রাণনাশের জন্য আসিয়াছ? প্রাণ গ্রহণ কর, আমি এবার কোন ব্যাঘাত করিব না। তুমি এক্ষণে অপেক্ষা কর, আমি আসিতেছি। কেন আমি দেবতুষ্টির জন্য শরীর না দিলাম? এক্ষণে তাহার ফলভোগ করিলাম। যে আমাকে রক্ষা করিয়াছিল, সেই আমাকে নষ্ট করিল। কাপালিক! আমাকে এবার অবিশ্বাস করিও না। আমি এখনই আসিয়া তোমাকে আত্মসমর্পণ করিব।"

কাপালিক কহিল, "আমি তোমার প্রাণবধার্থ আসি নাই। ভবানীর তাহা ইচ্ছা নহে। আমি যাহা করিতে আসিয়াছি, তাহা তোমার অনুমোদিত হইবে। বাটীর ভিতরে চল, আমি যাহা বলি, তাহা শ্রবণ কর।"

নবকুমার কহিলেন, "এক্ষণে নহে। সময়ান্তর তাহা শ্রবণ করিব, তুমি এখন অপেক্ষা কর; আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে—সাধন করিয়া আসিতেছি।"

কাপালিক কহিল, "বৎস! আমি সকলই অবগত আছি; তুমি সেই পাপিষ্ঠার অনুসরণ করিবে; সে যথায় যাইবে, আমি তাহা অবগত আছি। আমি তোমাকে সে স্থানে সমভিব্যাহার করিয়া লইয়া যাইব। যাহা দেখিতে চাহ, দেখাইব—এক্ষণে আমার কথা শ্রবণ কর। কোন ভয় করিও না।"

নবকুমার কহিলেন, " আর তোমাকে আমার কোন ভয় নাই। আইস।"

এই বলিয়া নবকুমার কাপালিককে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গিয়া আসন দিলেন এবং স্বয়ংও উপবেশন করিয়া বলিলেন, "বল।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : পুনরালাপে

"তদ্গচ্ছ সিদ্ধ্যৈ কুরু দেবকার্য্যম্।"

কুমারসম্ভব

কাপালিক আসন গ্রহণ করিয়া দুই বাহু নবকুমারকে দেখাইলেন। নবকুমার দেখিলেন, উভয় বাহু ভগ্ন।

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে যে, যে রাত্রে কপালকুণ্ডলার সহিত নবকুমার সমুদ্রতীর হইতে পলায়ন করেন, সেই রাত্রে তাঁহাদিগের অন্বেষণ করিতে করিতে কাপালিক বালিয়াড়ির শিখরচ্যুত হইয়া পড়িয়া যান। পতনকালে দুই হস্তে ভূমি ধারণ করিয়া শরীর রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; তাহাতে শরীর রক্ষা হইল বটে, কিন্তু দুইটি হস্ত ভাঙ্গিয়া গেল। কাপালিক এ সকল বৃত্তান্ত নবকুমারের নিকট বিবরিত করিয়া কহিলেন, "বাহুদ্বারা নিত্যক্রিয়া সকল নির্ব্বাহের কোন বিশেষ বিঘ্ন হয় না। কিন্তু ইহাতে আর কিছুমাত্র বল নাই। এমন কি, ইহার দ্বারা কাষ্ঠাহরণে কষ্ট হয়।"

পরে কহিতে লাগিলেন, “ভূপতিত হইয়াই যে আমি জানিতে পারিয়াছিলাম যে, আমার করদ্বয় ভগ্ন হইয়াছে, আর অঙ্গ অভগ্ন আছে, এমত নহে, আমি পতনমাত্র মূর্চ্ছিত হইয়াছিলাম। প্রথমে অবিচ্ছেদে অজ্ঞানাবস্থায় ছিলাম। পরে ক্ষণে সজ্ঞান, ক্ষণে অজ্ঞান রহিলাম। কয় দিন যে আমি এ অবস্থায় রহিলাম, তাহা বলিতে পারি না। বোধ হয়, দুই রাত্রি এক দিন হইবে। প্রভাতকালে আমার সংজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে পুনরাবির্ভূত হইল। তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই আমি এক স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। যেন ভবানী—” বলিতে বলিতে কাপালিকের শরীর রোমাঞ্চিত হইল। “যেন ভবানী আসিয়া আমার প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছেন। ভ্রূকুটি করিয়া আমায় তাড়না করিতেছেন; কহিতেছেন; ‘রে দুরাচার, তোরই চিত্তাশুদ্ধি হেতু আমার পূজার এ বিঘ্ন জন্মাইয়াছে। তুই এ পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়লালসায় বদ্ধ হইয়া এই কুমারীর শোণিতে এত দিন আমার পূজা করিস নাই। অতএব এই কুমারী হইতেই তোর পূর্ব্বকৃত্যফল বিনষ্ট হইল। আমি তোর নিকট আর কখনও পূজা গ্রহণ করিব না।’ তখন আমি রোদন করিয়া জননীর চরণে অবলুণ্ঠিত হইলে তিনি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, ‘ভদ্র! ইহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিব। সেই কপালকুণ্ডলাকে আমার নিকট বলি দিবে। যতদিন না পার, আমার পূজা করিও না।’

“কত দিনে বা কি প্রকারে আমি আরোগ্য প্রাপ্ত হইলাম, তাহা আমার বর্ণন করিবার প্রয়োজন নাই। কালে আরোগ্য পাইয়া দেবীর আজ্ঞা পালন করিবার চেষ্টা আরম্ভ করিলাম। দেখিলাম যে, এই বাহুদ্বয়ে শিশুর বলও নাই। বাহুবল ব্যতীত যত্ন সফল হইবার নহে। অতএব ইহাতে একজন সহকারী আবশ্যক হইল। কিন্তু মনুষ্যবর্গ ধর্ম্মে অল্পমতি—বিশেষ কলির প্রাবল্যে যবন রাজা, পাপাত্মক রাজশাসনের ভয়ে কেহই এমত কার্য্যে সহচর হয় না। বহু সন্ধানে আমি পাপীয়সীর আবাসস্থান জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু বাহুবলের অভাবহেতু ভবানীর আজ্ঞা পালন করিতে পারি নাই। কেবল মানসসিদ্ধির জন্য তন্ত্রের বিধানানুসারে ক্রিয়াকলাপ করিয়া থাকি মাত্র। কল্য রাত্রে নিকটস্থ বনে হোম করিতেছিলাম, স্বচক্ষে দেখিলাম, কপালকুণ্ডলার সহিত এক ব্রাহ্মণকুমারের মিলন হইল। অদ্যও সে তাহার সাক্ষাতে যাইতেছে। দেখিতে চাও, আমার সহিত আইস, দেখাইব।

“বৎস! কপালকুণ্ডলা বধযোগ্যা—আমি ভবানীর আজ্ঞাক্রমে তাহাকে বধ করিব। সেও তোমার নিকট বিশ্বাসঘাতিনী—তোমারও বধযোগ্যা; অতএব তুমি আমাকে সে সাহায্য প্রদান কর। এই অবিশ্বাসিনীকে ধৃত করিয়া আমার সহিত যজ্ঞস্থানে লইয়া চল। তথায় স্বহস্তে ইহাকে বলিদান কর। ইহাতে ঈশ্বরীর সমীপে যে অপরাধ করিয়াছ, তাহার মার্জ্জনা হইবে; পবিত্র কর্ম্মে অক্ষয় পুণ্যসঞ্চয় হইবে, বিশ্বাসঘাতিনীর দণ্ড হইবে; প্রতিশোধের চরম হইবে।”

কাপালিক বাক্য সমাপ্ত করিলেন। নবকুমার কিছুই উত্তর করিলেন না। কাপালিক তাঁহাকে নীরব দেখিয়া কহিলেন, “বৎস! এক্ষণে যাহা দেখাইব বলিয়াছিলাম, তাহা দেখিবে চল।”

নবকুমার ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইয়া কাপালিকের সঙ্গে চলিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : সপত্নীসম্ভাসে

"“Be at peace; it is your sister that addresses you. Riquite Lucretia's love,"

Lucretia.

কপালকুণ্ডলা গৃহ হইতে বহির্গতা হইয়া কাননাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। প্রথমে ভগ্ন গৃহমধ্যে গেলেন। তথায় ব্রাহ্মণকে দেখিলেন। যদি দিনমান হইত, তবে দেখিতে পাইতেন যে, তাঁহার মুখকান্তি অত্যন্ত মলিন হইয়াছে। ব্রাহ্মণবেশী কপালকুণ্ডলাকে কহিলেন যে, “এখানে কাপালিক আসিতে পারে, এখানে কোন কথা

অবিধি। স্থানান্তরে আইস।” বনমধ্যে একটি অল্পায়ত স্থান ছিল, তাহার চতুষ্পার্শ্বে বৃক্ষরাজি; মধ্যে পরিষ্কার; তথা হইতে একটি পথ বাহির হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণবেশী কপালকুণ্ডলাকে তথায় লইয়া গেলেন। উভয়ে উপবেশন করিলে ব্রাহ্মণবেশী কহিলেন,

“ প্রথমতঃ আত্মপরিচয় দিই। কত দূর আমার কথা বিশ্বাসযোগ্য, তাহা আপনি বিবেচনা করিয়া লইতে পারিবেন। যখন তুমি স্বামীর সঙ্গে হিজলী প্রদেশ হইতে আসিতেছিলে, তখন পথিমধ্যে রজনীযোগে এক যবনকন্যার সহিত সাক্ষাৎ হয়। তোমার কি তাহা মনে পড়ে?”

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, “যিনি আমাকে অলঙ্কার দিয়াছিলেন?”

ব্রাহ্মণবেশধারিণী কহিলেন, “আমি সেই।”

কপালকুণ্ডলা অত্যন্ত বিস্মিতা হইলেন। লুৎফ-উন্নিসা তাঁহার বিস্ময় দেখিয়া কহিলেন, “আরও বিস্ময়ের বিষয় আছে—আমি তোমার সপত্নী।”

কপালকুণ্ডলা চমৎকৃতা হইয়া কহিলেন, “সে কি?”

লুৎফ-উন্নিসা তখন আনুপূর্ব্বিক আত্মপরিচয় দিতে লাগিলেন। বিবাহ, জাতিভ্রংশ, স্বামী কর্ত্তৃক ত্যাগ, ঢাকা, আগ্রা, জাহাঁগীর, মেহের-উন্নিসা, আগ্রাত্যাগ, সপ্তগ্রামে বাস, নবকুমারের সহিত সাক্ষাৎ, নবকুমারের ব্যবহার, গত দিবস প্রদোষে ছদ্মবেশে কাননে আগমন, হোমকারীর সহিত সাক্ষাৎ, সকলই বলিলেন। এই সময় কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসা করিলেন,

“তুমি কি অভিপ্রায়ে আমাদিগের বাটীতে ছদ্মবেশে আসিতে বাসনা করিয়াছিলে?” লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, “তোমার সহিত স্বামীর চিরবিচ্ছেদ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে।”

কপালকুণ্ডলা চিন্তা করিতে লাগিলেন। কহিলেন, “তাহা কি প্রকারে সিদ্ধ করিতে?”

লুৎফ-উন্নিসা। আপাততঃ তোমার সতীত্বের প্রতি স্বামীর সংশয় জন্মাইয়া দিতাম। কিন্তু সে কথায় আর কাজ কি, সে পথ ত্যাগ করিয়াছি। এক্ষণে তুমি যদি আমার পরামর্শমতে কাজ কর, তবে তোমা হইতেই আমার কামনা সিদ্ধ হইবে—অথচ তোমার মঙ্গল সাধনা হইবে।

কপা। হোমকারীর মুখে তুমি কাহার নাম শুনিয়াছিলে?

লু। তোমারই নাম। তিনি তোমার মঙ্গল বা অমঙ্গল কামনায় হোম করেন, ইহা জানিবার জন্য প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট বসিলাম। যতক্ষণ না তাঁহার ক্রিয়া সম্পন্ন হইল, ততক্ষণ তথায় বসিয়া রহিলাম। হোমান্তে তোমার নামসংযুক্ত হোমের অভিপ্রায় ছলে জিজ্ঞাসা করিলাম। কিয়ৎক্ষণ তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়া জানিতে পারিলাম যে, তোমার অমঙ্গল সাধনই হোমের প্রয়োজন। আমারও সেই প্রয়োজন। ইহাও তাঁহাকে জানাইলাম। তৎক্ষণাৎ পরস্পরের সহায়তা করিতে বাধ্য হইলাম। বিশেষ পরামর্শ জন্য তিনি আমাকে ভগ্ন গৃহমধ্যে লইয়া গেলেন। তথায় আপন মনোগত ব্যক্ত করিলেন। তোমার মৃত্যুই তাঁহার অভীষ্ট। তাহাতে আমার কোন কষ্ট নাই। আমি ইহজন্মে কেবল পাপই করিয়াছি, কিন্তু পাপের পথে আমার এত দূর অধঃপাত হয় নাই যে, আমি নিরপরাধে বালিকার মৃত্যুসাধন করি। আমি তাহাতে সম্মতি দিলাম না। এই সময়ে তুমি তথায় উপস্থিত হইয়াছিলে। বোধ করি কিছু শুনিয়া থাকিবে।

কপা। আমি ঐরূপ বিতর্কই শুনিয়াছিলাম।

লু। সে ব্যক্তি আমাকে অবোধ অজ্ঞান বিবেচনা করিয়া কিছু উপদেশ দিতে চাহিল। শেষটা কি দাঁড়ায়, ইহা জানিয়া তোমায় উচিত সংবাদ দিব বলিয়া তোমাকে বনমধ্যে অন্তরালে রাখিয়া গেলাম।

কপা। তারপর আর ফিরিয়া আসিলে না কেন?

লু। তিনি অনেক কথা বলিলেন, বাহুল্যবৃত্তান্ত শুনিতে শুনিতে বিলম্ব হইল। তুমি সে ব্যক্তিকে বিশেষ জান। কে সে, অনুভব করিতে পারিতেছ?

কপা। আমার পূর্ব্বপালক কাপালিক।

লু। সেই বটে। কাপালিক প্রথমে তোমাকে সমুদ্রতীরে প্রাপ্তি, তথায় প্রতিপালন, নবকুমারের আগমন, তৎসহিত তোমার পলায়ন, এ সমুদয় পরিচয় দিলেন। তোমাদের পলায়নের পর যাহা যাহা হইয়াছিল, তাহাও বিবৃত করিলেন। সে সকল বৃত্তান্ত তুমি জান না। তাহা তোমার গোচরার্থ বিস্তারিত বলিতেছি।

এই বলিয়া লুৎফ-উন্নিসা কাপালিকের শিখরচ্যুতি, হস্তভঙ্গ, স্বপ্ন, সকল বলিলেন। স্বপ্ন শুনিয়া কপালকুণ্ডলা চমকিয়া, শিহরিয়া উঠিলেন—চিত্তমধ্যে বিদ্যুচ্চঞ্চলা হইলেন। লুৎফ-উন্নিসা বলিতে লাগিলেন,

"কাপালিকের দৃঢ়পতিজ্ঞা ভবানীর আজ্ঞা প্রতিপালন। বাহু বলহীন, এই জন্য পরের সাহায্য তাহার নিতান্ত প্রয়োজন। আমাকে ব্রাহ্মণতনয় বিবেচনা করিয়া সহায় করিবার প্রত্যাশায় সকল বৃত্তান্ত বলিল। আমি এ পর্য্যন্ত এ দুষ্কর্ম্মে স্বীকৃত হই নাই। এই দুর্ব্বৃত্ত চিত্তের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু ভরসা করি যে, কখনই স্বীকৃত হইব না। বরং এ সঙ্কল্পের প্রতিকূলতাচরণ করিব, এই অভিপ্রায়; সেই অভিপ্রায়েই আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। কিন্তু এ কার্য্য নিতান্ত অস্বার্থপর হইয়া করি নাই। তোমার প্রাণদান দিতেছি। তুমি আমার জন্য কিছু কর।"

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "কি করিব?"

লু। আমারও প্রাণদান দাও—স্বামী ত্যাগ কর।

কপালকুণ্ডলা অনেকক্ষণ কথা কহিলেন না। অনেকক্ষণের পর কহিলেন, "স্বামী ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইব?"

লু। বিদেশে—বহুদূরে—তোমাকে অট্টালিকা দিব—ধন দিব—দাস-দাসী দিব, রাণীর ন্যায় থাকিবে।

কপালকুণ্ডলা আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র মানসলোচনে দেখিলেন—কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইলেন না। অন্তঃকরণমধ্যে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন—তথায় ত নবকুমারকে দেখিতে পাইলেন না, তবে কেন লুৎফ-উন্নিসার সুখের পথ রোধ করিবেন? লুৎফ-উন্নিসাকে কহিলেন,

"তুমি আমার উপকার করিয়াছ কি না, তাহা আমি এখনও বুঝিতে পারিতেছি না। অট্টালিকা, ধন, সম্পত্তি, দাস-দাসীরও প্রয়োজন নাই। আমি তোমার সুখের পথ কেন রোধ করিব? তোমার মানস সিদ্ধ হউক—কালি হইতে বিঘ্নকারিণীর কোন সংবাদ পাইবে না। আমি বনচর ছিলাম, আবার বনচর হইব।"

লুৎফ-উন্নিসা চমৎকৃতা হইলেন, এরূপ আশু স্বীকারের কোন প্রতাশ্যা করেন নাই। মোহিত হইয়া কহিলেন, "ভগিনি! তুমি চিরায়ুষ্মতী হও, আমার জীবনদান করিলে। কিন্তু আমি তোমাকে অনাথা হইয়া যাইতে দিব না। কল্য প্রাতে তোমার নিকট আমার একজন বিশ্বাসযোগ্যা চতুরা দাসী পাঠাইব। তাহার সঙ্গে যাইও। বর্দ্ধমানে কোন অতিপ্রধানা স্ত্রীলোক আমার সুহৃৎ।—তিনি তোমার সকল প্রয়োজন সিদ্ধ করিবেন।"

লুৎফ-উন্নিসা এবং কপালকুণ্ডলা এরূপ মনঃসংযোগ করিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন যে, সম্মুখবিঘ্ন কিছুই দেখিতে পান নাই। যে বন্য পথ তাঁহাদিগের আশ্রয়স্থান হইতে বাহির হইয়াছিল, সে পথপ্রান্তে দাঁড়াইয়া কাপালিক ও নবকুমার তাঁহাদিগের প্রতি যে করাল দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, তাহা কিছুই দেখিতে পান নাই।

নবকুমার ও কাপালিক ইহাদিগের প্রতি দৃষ্টি করিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তত দূর হইতে তাহাদিগের কথোপকথনের মধ্যে কিছুই তদুভয়ের শ্রুতিগোচর হইল না। মনুষ্যের চক্ষু কর্ণ যদি সমদূরগামী হইত, তবে মনুষ্যের দুঃখস্রোত প্রশমিত কি বর্দ্ধিত হইত, তাহা কে বলিবে? সংসাররচনা অপূর্ব্ব কৌশলময়।

নবকুমার দেখিলেন, কপালকুণ্ডলা আলুলায়িতকুন্তলা। যখন কপালকুণ্ডলা তাঁহার হয় নাই, তখনই সে কুন্তল বাঁধিত না। আবার দেখিলেন যে, সেই কুন্তলরাশি আসিয়া ব্রাহ্মণকুমারের পৃষ্ঠদেশে পড়িয়া তাঁহার অংসসংবিলম্বী কেশদামের সহিত মিশিয়াছে। কপালকুণ্ডলার কেশরাশি ঈদৃশ আয়তনশালী, এবং লঘু স্বরে কথোপকথনের প্রয়োজনে উভয়ে এরূপ সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া বসিয়া ছিলেন যে, লুৎফ-উন্নিসার পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত কপালকুণ্ডলার কেশের সম্প্রসারণ হইয়াছিল। তাহা তাঁহারা দেখিতে পান নাই। দেখিয়া নবকুমার ধীরে ধীরে ভূতলে বসিয়া পড়িলেন।

কাপালিক ইহা দেখিয়া নিজে কটিবিলম্বী এক নারিকেলপাত্র বিমুক্ত করিয়া কহিল, "বৎস! বল হারাইতেছ, এই মহৌষধ পান কর, ইহা ভবানীর প্রসাদ। পান করিয়া বল পাইবে।"

কাপালিক নবকুমারের মুখের নিকট পাত্র ধরিল। তিনি অন্যমনে পান করিয়া দারুণ তৃষ্ণা নিবারণ করিলেন। নবকুমার জানিতেন না যে, এই সুস্বাদু পেয় কাপালিকের স্বহস্তপ্রস্তুত প্রচণ্ড তেজস্বিনী সুরা। পান করিবামাত্র সবল হইলেন।

এ দিকে লুৎফ-উন্নিসা পূর্ব্ববৎ মৃদুস্বরে কপালকুণ্ডলাকে কহিতে লাগিলেন,

"ভগিনি! তুমি যে কার্য্য করিলে, তাহার প্রতিশোধ করিবার আমার ক্ষমতা নাই; তবু যদি আমি চিরদিন তোমার মনে থাকি, সেও আমার সুখ। যে অলঙ্কারগুলি দিয়াছিলাম, তাহা শুনিয়াছি, তুমি দরিদ্রকে বিতরণ করিয়াছ। এক্ষণে নিকটে কিছুই নাই। কল্যকার অন্য প্রয়োজন ভাবিয়া কেশমধ্যে একটি অঙ্গুরীয় আনিয়াছিলাম, জগদীশ্বরের কৃপায় সে পাপ প্রয়োজন সিদ্ধির আবশ্যক হইল না। এই অঙ্গুরীয়টি তুমি রাখ। ইহার পরে অঙ্গুরীয় দেখিয়া যবনী ভগিনীকে মনে করিও। আজি যদি স্বামী জিজ্ঞাসা করেন, অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলে, কহিও, লুৎফ-উন্নিসা দিয়াছে।" ইহা কহিয়া লুৎফ-উন্নিসা আপন অঙ্গুলি হইতে বহুধনে ক্রীত এক অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিয়া কপালকুণ্ডলার হস্তে দিলেন। নবকুমার তাহাও দেখিতে পাইলেন; কাপালিক তাঁহাকে ধরিয়াছিলেন, আবার তাঁহাকে কম্পমান দেখিয়া পুনরপি মদিরা সেবন করাইলেন। মদিরা নবকুমারের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্রকৃতি সংহার করিতে লাগিল, স্নেহের অঙ্কুর পর্য্যন্ত উন্মূলিত করিতে লাগিল।

কপালকুণ্ডলা লুৎফ-উন্নিসার নিকট বিদায় হইয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন। তখন নবকুমার ও কাপালিক লুৎফ-উন্নিসার অদৃশ্য পথে কপালকুণ্ডলার অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : গৃহাভিমুখে

"No spectre greets me--no vain shadow this."

Wordsworth.

কপালকুণ্ডলা ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে চলিলেন। অতি ধীরে ধীরে মৃদু মৃদু চলিলেন। তাহার কারণ, তিনি অতি গভীর চিন্তামগ্ন হইয়া যাইতেছিলেন। লুৎফ-উন্নিসার সংবাদে কপালকুণ্ডলার একেবারে চিত্তভাব পরিবর্ত্তিত হইল; তিনি আত্মবিসর্জ্জনে প্রস্তুত হইলেন। আত্মবিসর্জ্জন কি জন্য? লুৎফ-উন্নিসার জন্য? তাহা

নহে।

কপালকুণ্ডলা অন্তঃকরণ সম্বন্ধে তান্ত্রিকের সন্তান; তান্ত্রিক যেরূপ কালিকাপ্রসাদাকাঙ্ক্ষায় পরপ্রাণ সংহারে সঙ্কোচশূন্য, কপালকুণ্ডলা সেই আকাঙ্ক্ষায় আত্মজীবন বিসর্জ্জন তদ্রূপ। কপালকুণ্ডলা যে কাপালিকের ন্যায় অনন্যচিত্ত হইয়া শক্তিপ্রসাদপ্রার্থিনী হইয়াছিলেন, তাহা নহে; তথাপি অহর্নিশ শক্তিভক্তি শ্রবণ, দর্শন ও সাধনে তাঁহার মনে কালিকানুরাগ বিশিষ্ট প্রকারে জন্মিয়াছিল। ভৈরবী যে সৃষ্টিশাসনকর্ত্রী মুক্তিদাত্রী, ইহা বিশেষ মতে প্রতীত হইয়াছিল। কালিকার পূজাভূমি যে নরশোণিতে প্লাবিত হয়, ইহা তাঁহার পরদুঃখদুঃখিত হৃদয়ে সহিত না, কিন্তু আর কোন কার্য্যে ভক্তি প্রদর্শনের ক্রটি ছিল না। এখন সেই বিশ্বশাসনকর্ত্রী, সুখদুঃখবিধায়িনী, কৈবল্যদায়িনী ভৈরবী স্বপ্নে তাঁহার জীবনসমর্পণ আদেশ করিয়াছেন। কেনই বা কপালকুণ্ডলা সে আদেশ পালন না করিবেন?

তুমি আমি প্রাণত্যাগ করিতে চাহি না। রাগ করিয়া যাহা বলি, এ সংসার সুখময়। সুখের প্রত্যাশাতেই বর্ত্তুলবৎ সংসারমধ্যে ঘুরিতেছি—দুঃখের প্রত্যাশায় নহে। কদাচিৎ যদি আত্মকর্ম্মদোষে সেই প্রত্যাশা সফলীকৃত না হয়, তবেই দুঃখ বলিয়া উচ্চ কলরব আরম্ভ করি। তবেই দুঃখ নিয়ম নহে, সিদ্ধান্ত হইল; নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। তোমার আমার সর্ব্বত্র সুখ। সেই সুখে আমরা সংসারমধ্যে বদ্ধমূল; ছাড়িতে চাহি না। কিন্তু এ সংসার-বন্ধনে প্রণয় প্রধান রজ্জু। কপালকুণ্ডলার সে বন্ধন ছিল না—কোন বন্ধনই ছিল না। তবে কপালকুণ্ডলাকে কে রাখে?

যাহার বন্ধন নাই, তাহারই অপ্রতিহত বেগ। গিরিশিখর হইতে নির্ঝরিণী নামিলে, কে তাহার গতি রোধ করে? একবার বায়ু তাড়িত হইলে কে তাহার সঞ্চার নিবারণ করে? কপালকুণ্ডলার চিত্ত চঞ্চল হইলে কে তাহার স্থিতিস্থাপন করিবে? নবীন করিকরভ মাতিলে কে তাহাকে শান্ত করিবে?

কপালকুণ্ডলা আপন চিত্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেনই বা এ শরীর জগদীশ্বরীর চরণে সমর্পণ না করিব? পঞ্চ ভূত লইয়া কি হইবে?" প্রশ্ন করিতেছিলেন, অথচ কোন নিশ্চিত উত্তর দিতে পারিতেছিলেন না। সংসারের অন্য কোন বন্ধন না থাকিলেও পঞ্চভূতের এক বন্ধন আছে।

কপালকুণ্ডলা অধোবদনে চলিতে লাগিলেন। যখন মনুষ্যহৃদয় কোন উৎকট ভাবে আচ্ছন্ন হয়, চিন্তার একাগ্রতায় বাহ্য সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য থাকে না, তখন অনৈসর্গিক পদার্থও প্রত্যক্ষীভূত বলিয়া বোধ হয়। কপালকুণ্ডলার সেই অবস্থা হইয়াছিল।

যেন ঊর্দ্ধ হইতে তাঁহার কর্ণকুহরে এই শব্দ প্রবেশ করিল, "বৎসে! আমি পথ দেখাইতেছি।" কপালকুণ্ডলা চকিতের ন্যায় ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিলেন। দেখিলেন, যেন আকাশমণ্ডলে নবনীরদনিন্দিত মূর্ত্তি! গলবিলম্বিত নরকপালমালা হইতে শোণিতস্রুতি হইতেছে; কটিমণ্ডল বেড়িয়া নরকররাজি দুলিতেছে—বাম করে নরকপাল—অঙ্গে রুধিরধারা, ললাটে বিষমোজ্জ্বলজ্বালাবিভাসিতলোচনপ্রান্তে বালশশী সুশোভিত! যেন ভৈরবী দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া কপালকুণ্ডলাকে ডাকিতেছেন।

কপালকুণ্ডলা ঊর্দ্ধমুখী হইয়া চলিলেন। সেই নবকাদম্বিনীসন্নিভ রূপ আকাশমার্গে তাঁহার আগে আগে চলিল। কখনও কপালমালিনীর অবয়ব মেঘে লুক্কায়িত হয়, কখনও নয়নপথে স্পষ্ট বিকশিত হয়। কপালকুণ্ডলা তাঁহার প্রতি চাহিয়া চলিলেন।

নবকুমার বা কাপালিক এ সব কিছুই দেখেন নাই। নবকুমার সুরাগরলপ্রজ্বলিতহৃদয়—কপালকুণ্ডলার ধীর পদক্ষেপ অসহিষ্ণু হইয়া সঙ্গীকে কহিলেন, "কাপালিক!"

কাপালিক কহিল, "কি?"

"পানীয়ং দেহি মে।"

কাপালিক পুনরপি তাঁহাকে সুরা পান করাইল।

নবকুমার কহিলেন, “আর বিলম্ব কি?”

কাপালিক উত্তর করিল, “আর বিলম্ব কি?

নবকুমার ভীমনাদে ডাকিলেন, “কপালকুণ্ডলে!”

কপালকুণ্ডলা শুনিয়া চমকিতা হইলেন। ইদানীন্তন কেহ তাঁহাকে কপালকুণ্ডলা বলিয়া ডাকিত না। তিনি মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলেন। নবকুমার ও কাপালিক তাঁহার সম্মুখে আসিলেন। কপালকুণ্ডলা প্রথমে তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিলেন না—কহিলেন,

“তোমরা কে? যমদূত?”

পরক্ষণেই চিনিতে পারিয়াই কহিলেন, “না না পিতা, তুমি কি আমায় বলি দিতে আসিয়াছ?”

নবকুমার দৃঢ়মুষ্টিতে কপালকুণ্ডলার হস্তধারণ করিলেন। কাপালিক করুণার্দ্র, মধুময় স্বরে কহিলেন,

“বৎসে! আমাদিগের সঙ্গে আইস।” এই বলিয়া কাপালিক শ্মশানাভিমুখে পথ দেখাইয়া চলিলেন।

কপালকুণ্ডলা আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; যথায় গগনবিহারিণী ভয়ঙ্করী দেখিয়াছিলেন, সেই দিকে চাহিলেন; দেখিলেন, রণরঙ্গিণী খল খল হাসিতেছে; এক দীর্ঘ ত্রিশূল করে ধরিয়া কাপালিকগত পথপ্রতি সঙ্কেত করিতেছে। কপালকুণ্ডলা অদৃষ্টবিমূঢ়ার ন্যায় বিনা বাক্যব্যয়ে কাপালিকের অনুসরণ করিলেন। নবকুমার পূর্ব্ববৎ দৃঢ়মুষ্টিতে তাঁহার হস্তধারণ করিয়া চলিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ : প্রেতভূমে

“বপুষা করণোজ্ঝিতেন সা নিপতন্তী পতিমপ্যপাতয়ৎ।
ননু তৈলনিষেকবিন্দুনা সহ দীপ্তার্চ্চিরুপৈতি মেদিনীম্– –*রঘুবংশ*

চন্দ্রমা অস্তমিত হইল। বিশ্বমণ্ডল অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইল। কাপালিক যথায় আপন পূজাস্থান সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তথায় কপালকুণ্ডলাকে লইয়া গেলেন। সে গঙ্গাতীরে এক বৃহৎ সৈকতভূমি। তাহারই সম্মুখে আরও বৃহত্তর দ্বিতীয় এক খণ্ড সিকতাময় স্থান। সেই সৈকতে শ্মশানভূমি। উভয় সৈকতমধ্যে জলোচ্ছ্বাসকালে অল্প জল থাকে, ভাঁটার সময়ে জল থাকে না। এক্ষণে জল ছিল না। শ্মশানভূমির যে মুখ গঙ্গাসম্মুখীন, সেই মুখ অত্যুচ্চ; জলে অবতরণ করিতে গেলে একেবারে উচ্চ হইতে অগাধ জলে পড়িতে হয়। তাহাতে আবার অবিরতবায়ুতাড়িত তরঙ্গাভিঘাতে উপকূলতল ক্ষয়িত হইয়াছিল; কখনও কখনও মৃত্তিকাখণ্ড স্থানচ্যুত হইয়া অগাধ জলে পড়িয়া যাইত। পূজাস্থানে দীপ নাই—কাষ্ঠখণ্ড মাত্রে অগ্নি জ্বলিতেছিল, তদালোকে অতি অস্পষ্টদৃষ্ট শ্মশানভূমি আরও ভীষণ দেখাইতেছিল। নিকটে পূজা, হোম, বলি প্রভৃতির সমগ্র আয়োজন ছিল। বিশাল তরঙ্গিণীহৃদয় অন্ধকারে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। চৈত্র মাসের বায়ু অপ্রতিহত বেগে গঙ্গাহৃদয়ে প্রবাবিত হইতেছিল; তাহার কারণে তরঙ্গাভিঘাতজনিত কলকল রব গগন ব্যাপ্ত করিতেছিল। শ্মশানভূমিতে শবভুক্ পশুগণ কর্ক্কশকণ্ঠে ক্বচিৎ ধ্বনি করিতেছিল।

কাপালিক নবকুমার ও কপালকুণ্ডলাকে উপযুক্ত স্থানে কুশাসনে উপবেশন করাইয়া তন্ত্রাদির বিধানানুসারে পূজারম্ভ করিলেন। উপযুক্ত সময়ে নবকুমারের প্রতি

আদেশ করিলেন যে, কপালকুণ্ডলাকে স্নান করাইয়া আন। নবকুমার কপালকুণ্ডলার হস্ত ধারণ করিয়া শ্মশান ভূমির উপর দিয়া স্নান করাইতে লইয়া চলিলেন। তাঁহাদিগের চরণে অস্থি ফুটিতে লাগিল। নবকুমারের পদের আঘাতে একটা জলপূর্ণ শ্মশান-কলস ভগ্ন হইয়া গেল। তাহার নিকটেই শব পড়িয়া ছিল—হতভাগার কেহ সৎকারও করে নাই। দুই জনেরই তাহাতে পদস্পর্শ হইল। কপালকুণ্ডলা তাহাকে বেড়িয়া গেলেন, নবকুমার তাহাকে চরণে দলিত করিয়া গেলেন। চতুর্দ্দিক বেড়িয়া শবমাংসভুক পশুসকল ফিরিতেছিল; মনুষ্য দুই জনের আগমনে উচ্চকণ্ঠে রব করিতে লাগিল, কেহ আক্রমণ করিতে আসিল কেহ বা পদশব্দ করিয়া চলিয়া গেল। কপালকুণ্ডলা দেখিলেন, নবকুমারের হস্ত কাঁপিতেছে; কপালকুণ্ডলা স্বয়ং নির্ভীক, নিষ্কম্প।

কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভয় পাইতেছ?"

নবকুমারের মদিরার মোহ ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল। অতি গম্ভীর স্বরে নবকুমার উত্তর করিলেন,

"ভয়ে, মৃন্ময়ি? তাহা নহে।"

কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কাঁপিতেছ কেন?"

এই প্রশ্ন কপালকুণ্ডলা যে স্বরে করিলেন, তাহা কেবল রমণীকণ্ঠেই সম্ভবে। যখন রমণী পরদুঃখে গলিয়া যায়, কেবল তখনই রমণীকণ্ঠে সে স্বর সম্ভবে। কে জানিত যে, আসন্ন কালে শ্মশানে আসিয়া কপালকুণ্ডলার কণ্ঠ হইতে এ স্বর নির্গত হইবে?

নবকুমার কহিলেন, "ভয় নহে। কাঁদিতে পারিতেছি না, এই ক্রোধে কাঁপিতেছি।"

কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসিলেন, "কাঁদিবে কেন?"

আবার সেই কণ্ঠ!

নবকুমার কহিলেন, "কাঁদিব কেন? তুমি কি জানিবে মৃন্ময়ি! তুমি ত কখন রূপ দেখিয়া উন্মত্ত হও নাই—" বলিতে বলিতে নবকুমারের কণ্ঠস্বর যাতনায় রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। "তুমি ত কখনও আপনার হৃৎপিণ্ড আপনি ছেদন করিয়া শ্মশানে ফেলিতে আইস নাই।" এই বলিয়া নবকুমার চীৎকার করিয়া রোদন করিতে করিতে কপালকুণ্ডলার পদতলে আছাড়িয়া পড়িলেন।

"মৃন্ময়ি!—কপালকুণ্ডলে! আমায় রক্ষা কর। এই তোমার পায়ে লুটাইতেছি—একবার বল যে, তুমি অবিশ্বাসিনী নও—একবার বল, আমি তোমায় হৃদয়ে তুলিয়া গৃহে লইয়া যাই।"

কপালকুণ্ডলা হাত ধরিয়া নবকুমারকে উঠাইলেন—মৃদু স্বরে কহিলেন, "তুমি ত জিজ্ঞাসা কর নাই!"

যখন এই কথা হইল, তখন উভয়ে একেবারে জলের ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; কপালকুণ্ডলা অগ্রে, নদীর দিকে পশ্চাৎ করিয়াছিলেন, তাঁহার পশ্চাতে এক পদ পরেই জল। এখন জলোচ্ছ্বাস আরম্ভ হইয়াছিল, কপালকুণ্ডলা একটা আড়রির উপর দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি উত্তর করিলেন, "তুমি ত জিজ্ঞাসা কর নাই!"

নবকুমার ক্ষিপ্তের ন্যায় কহিলেন, "চৈতন্য হারাইয়াছি, কি জিজ্ঞাসা করিব—বল—মৃন্ময়ি! বল— বল—বল—আমায় রাখ।—গৃহে চল।"

কপালকুণ্ডলা কহিলে, "যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, বলিব। আজি যাহাকে দেখিয়াছ,—সে পদ্মাবতী। আমি অবিশ্বাসিনী নহি। এ কথা স্বরূপ বলিলাম। কিন্তু আর আমি গৃহে যাইব না। ভবানীর চরণে দেহ বিসর্জ্জন করিতে আসিয়াছি—নিশ্চিত তাহা করিব। তুমি গৃহে যাও। আমি মরিব। আমার জন্য রোদন করিও না।"

"না—মৃন্ময়ি!—না!—" এইরূপ উচ্চ শব্দ করিয়া নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে বাহু প্রসারণ করিলেন। কপালকুণ্ডলাকে আর পাইলেন না।

চৈত্রবায়ুতাড়িত এক বিশাল তরঙ্গ আসিয়া, তীরে যথায় কপালকুণ্ডলা দাঁড়াইয়া, তথায় তটাধোভাগে প্রহত হইল; অমনি তটমৃত্তিকাখণ্ড কপালকুণ্ডলা সহিত ঘোর রবে নদীপ্রবাহমধ্যে ভগ্ন হইয়া পড়িল। নবকুমার তীরভঙ্গের শব্দ শুনিলেন, কপালকুণ্ডলা অন্তর্হিত হইল দেখিলেন। অমনি তৎপশ্চাৎ লম্ফ দিয়া জলে পড়িলেন। নবকুমার সন্তরণে নিতান্ত অক্ষম ছিলেন না। কিছুক্ষণ সাঁতার দিয়া কপালকুণ্ডলাকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে পাইলেন না, তিনিও উঠিলেন না।

সেই অনন্ত গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে, বসন্তবায়ুবিক্ষিপ্ত বীচিমালায় আন্দোলিত হইতে হইতে কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার কোথায় গেল?

কৃষ্ণকান্তের উইল

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

হরিদ্রাগ্রামে এক ঘর বড় জমীদার ছিলেন। জমীদার বাবুর নাম কৃষ্ণকান্ত রায়। কৃষ্ণকান্ত রায় বড় ধনী; তাঁহার জমীদারীর মুনাফা প্রায় দুই লক্ষ টাকা। এই বিষয়টা তাঁহার ও তাঁহার ভ্রাতা রামকান্ত রায়ের উপার্জ্জিত। উভয় ভ্রাতা একত্রিত হইয়া ধনোপার্জ্জন করেন। উভয় ভ্রাতার পরম সম্প্রীতি ছিল, একের মনে এমত সন্দেহ কস্মিন্ কালে জন্মে নাই যে, তিনি অপর কর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত হইবেন। জমীদারী সকলই জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণকান্তের নামে ক্রীত হইয়াছিল। উভয়ে একান্নভুক্ত ছিলেন। রামকান্ত রায়ের একটি পুত্র জন্মিয়াছিল–তাহার নাম গোবিন্দলাল। পুত্রটির জন্মাবধি, রামকান্ত রায়ের মনে মনে সংকল্প হইল যে, উভয়ের উপার্জ্জিত বিষয় একের নামে আছে, অতএব পুত্রের মঙ্গলার্থ তাহার বিহিত লেখাপড়া করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। কেন না, যদিও তাঁহার মনে নিশ্চিত ছিল যে, কৃষ্ণকান্ত কখনও প্রবঞ্চনা অথবা তাঁহার প্রতি অন্যায় আচরণ করার সম্ভাবনা নাই, তথাপি কৃষ্ণকান্তের পরলোকের পর তাঁহার পুত্রেরা কি করে, তাহার নিশ্চয়তা কি? কিন্তু লেখাপড়ার কথা সহজে বলিতে পারিলেন না–আজি বলিব, কালি বলিব, করিতে লাগিলেন। একদা প্রয়োজনবশতঃ তালুকে গেলে সেইখানে অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল।

যদি কৃষ্ণকান্ত এমত অভিলাষ করিতেন যে, ভ্রাতুষ্পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া সকল সম্পত্তি একা ভোগ করিবেন, তাহা হইলে তৎসাধন পক্ষে এখন আর কোন বিঘ্ন ছিল না। কিন্তু কৃষ্ণকান্তের এরূপ অসদভিসন্ধি ছিল না। তিনি গোবিন্দলালকে আপন সংসারে আপন পুত্রদিগের সহিত সমান ভাবে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন, এবং উইল করিয়া আপনাদিগের উপার্জ্জিত সম্পত্তির যে অর্দ্ধাংশ ন্যায়মত রামকান্ত রায়ের প্রাপ্য, তাহা গোবিন্দলালকে দিয়া যাইবার ইচ্ছা করিলেন।

কৃষ্ণকান্ত রায়ের দুই পুত্র, আর এক কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম হরলাল, কনিষ্ঠের নাম বিনোদলাল, কন্যার নাম শৈলবতী। কৃষ্ণকান্ত এইরূপ উইল করিলেন যে, তাঁহার পরলোকান্তে, গোবিন্দলাল আট আনা, হরলাল ও বিনোদলাল প্রত্যেকে তিন আনা, গৃহিণী এক আনা, আর শৈলবতী এক আনা সম্পত্তিতে অধিকারিণী হইবেন।

হরলাল বড় দুর্দ্দান্ত। পিতার অবাধ্য এবং দুর্ম্মুখ। বাঙ্গালির উইল প্রায় গোপনে থাকে না। উইলের কথা হরলাল জানিতে পারিল। হরলাল, দেখিয়া শুনিয়া

ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া পিতাকে কহিল, "এটা কি হইল? গোবিন্দলাল অর্দ্ধেক ভাগ পাইল, আর আমার তিন আনা।"

কৃষ্ণকান্ত কহিলেন, "ইহা ন্যায্য হইয়াছে। গোবিন্দলালের পিতার প্রাপ্য অর্দ্ধাংশ তাহাকে দিয়াছি।"

হর। গোবিন্দলালের পিতার প্রাপ্যটা কি? আমাদিগের পৈতৃক সম্পত্তি সে লইবার কে? আর মা বহিনকে আমরা প্রতিপালন করিব-তাহাদিগের বা এক এক আনা কেন? বরং তাহাদিগকে কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকারিণী বলিয়া লিখিয়া যান।

কৃষ্ণকান্ত কিছু রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "বাপু হরলাল! বিষয় আমার, তোমার নহে। আমার যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দিয়া যাইব।"

হর। আপনার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইয়াছে-আপনাকে যাহা ইচ্ছা, তাহা করিতে দিব না।

কৃষ্ণকান্ত ক্রোধে চক্ষু আরক্ত করিয়া কহিলেন, "হরলাল, তুমি যদি বালক হইতে, তবে আজি তোমাকে গুরু মহাশয় ডাকাইয়া বেত দিতাম।"

হর। আমি বাল্যকালে গুরু মহাশয়ের গোঁপ পুড়াইয়া দিয়াছিলাম, এক্ষণে এই উইলও সেইরূপ পুড়াইব।

কৃষ্ণকান্ত রায় আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। স্বহস্তে উইলখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। তৎপরিবর্ত্তে নূতন একখানি উইল লিখাইলেন। তাহাতে গোবিন্দলাল আট আনা, বিনোদলাল পাঁচ আনা, কর্ত্রী এক আনা, শৈলবতী এক আনা, আর হরলাল এক আনা মাত্র পাইলেন।

রাগ করিয়া হরলাল পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় গেলেন, তথা হইতে পিতাকে এক পত্র লিখিলেন। তাহার মর্ম্মার্থ এই-

"কলিকাতায় পণ্ডিতেরা মত করিয়াছেন যে, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত। আমি মানস করিয়াছি যে, একটি বিধবাবিবাহ করিব। আপনি যদ্যপি উইল পরিবর্ত্তন করিয়া আমাকে-আনা লিখিয়া দেন, আর সেই উইল শীঘ্র রেজিষ্টরি করেন, তবেই এই অভিলাষ ত্যাগ করিব, নচেৎ শীঘ্র একটি বিধবাবিবাহ করিব।"

হরলাল মনে করিয়াছিলেন যে, কৃষ্ণকান্ত ভয়ে ভীত হইয়া, উইল পরিবর্ত্তন করিয়া, হরলালকে অধিক বিষয় লিখিয়া দিবেন। কিন্তু কৃষ্ণকান্তের যে উত্তর পাইলেন, তাহাতে সে ভরসা রহিল না। কৃষ্ণকান্ত লিখিলেন,

"তুমি আমার ত্যাজ্য পুত্র। তোমার যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে বিবাহ করিতে পার। আমার যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে বিষয় দিব। তুমি এই বিবাহ করিলে আমি উইল বদলাইব বটে, কিন্তু তাহাতে তোমার অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট হইবে না।"

ইহার কিছু পরেই হরলাল সংবাদ পাঠাইলেন যে, তিনি বিধবাবিবাহ করিয়াছেন। কৃষ্ণকান্ত রায় আবার উইলখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। নূতন উইল করিবেন।

পাড়ায় ব্রহ্মানন্দ ঘোষ নামে একজন নিরীহ ভাল মানুষ লোক বাস করিতেন। কৃষ্ণকান্তকে জ্যেঠা মহাশয় বলিতেন। এবং তৎকর্ত্তৃক অনুগৃহীত এবং প্রতিপালিতও হইতেন।

ব্রহ্মানন্দের হস্তাক্ষর উত্তম। এ সকল লেখাপড়া তাহার দ্বারাই হইত। কৃষ্ণকান্ত সেই দিন ব্রহ্মানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন যে, "আহারাদির পর এখানে আসিও। নূতন উইল লিখিয়া দিতে হইবে।"

বিনোদলাল তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি কহিলেন, "আবার উইল বদলান হইবে কি অভিপ্রায়ে?"

কৃষ্ণকান্ত কহিলেন, "এবার তোমার জ্যেষ্ঠের ভাগে শূন্য পড়িবে।"

বিনোদ। ইহা ভাল হয় না। তিনিই যেন অপরাধী। কিন্তু তাঁহার একটি পুত্র আছে-সে শিশু, নিরপরাধী। তাহার উপায় কি হইবে?

কৃষ্ণ। তাহাকে এক পাই লিখিয়া দিব।

বিনোদ। এক পাই বখরায় কি হইবে?

কৃষ্ণ। আমার আয় দুই লক্ষ টাকা। তাহার এক পাই বখরায় তিন হাজার টাকার উপর হয়। তাহাতে একজন গৃহস্থের গ্রাসাচ্ছাদন অনায়াসে চলিতে পারে। ইহার অধিক দিব না।

বিনোদলাল অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু কর্ত্তা কোন মতে মতান্তর করিলেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ব্রহ্মানন্দ স্নানাহার করিয়া নিদ্রার উদ্যোগে ছিলেন এমত সময়ে বিস্ময়াপন্ন হইয়া দেখিলেন যে, হরলাল রায়। হরলাল আসিয়া তাহার শিওরে বসিলেন।

ব্রহ্মা। সে কি, বড় বাবু যে? কখন বাড়ী এলে?

হর। বাড়ী এখনও যাই নাই।

ব্র। একেবারে এইখানেই? কলিকাতা হইতে কতক্ষণ আসিতেছ?

হর। কলিকাতা হইতে দুই দিবস হইল আসিয়াছি। এই দুই দিন কোন স্থানে লুকাইয়া ছিলাম। আবার নাকি নূতন উইল হইবে?

ব্র। এই রকম ত শুনিতেছি।

হর। আমার ভাগে এবার শূন্য।

ব্র। কর্ত্তা এখন রাগ করে্য তাই বল্‌ছেন, কিন্তু সেটা থাকবে না।

হর। আজি বিকালে লেখাপড়া হবে? তুমি লিখিবে?

ব্র। তা কি করব ভাই! কর্ত্তা বলিলে ত "না" বলিতে পারি না।

হর। ভাল, তাতে তোমার দোষ কি? এখন কিছু রোজগার করিবে?

ব্র। কিলটে চড়টা? তা ভাই, মার না কেন?

হর। তা নয়; হাজার টাকা।

ব্র। বিধবা বিয়ে করে্য নাকি?

হর। তাই।

ব্র। বয়স গেছে।

হর। তবে আর একটি কাজ বলি। এখনই আরম্ভ কর। আগামী কিছু গ্রহণ কর। এই বলিয়া ব্রহ্মানন্দের হাতে হরলাল পাঁচ শত টাকার নোট দিলেন।

ব্রহ্মানন্দ নোট পাইয়া উলটিয়া পালটিয়া দেখিল। বলিল, "ইহা লইয়া আমি কি করিব?"

হর। পুঁজি করিও। দশ টাকা মতি গোয়ালিনীকে দিও।

ব্র। গোওয়ালা-ফোওয়ালার কোন এলাকা রাখি না। কিন্তু আমায় করিতে হইবে কি?

হর। দুইটি কলম কাট। দুইটি যেন ঠিক সমান হয়।

ব্র। আচ্ছা ভাই-যা বল, তাই শুনি।

এই বলিয়া ঘোষজ মহাশয় দুইটি নূতন কলম লইয়া ঠিক্ সমান করিয়া কাটিলেন। এবং লিখিয়া দেখিলেন যে, দুইটিরই লেখা একপ্রকার দেখিতে হয়।

তখন হরলাল বলিলেন, "ইহার একটি কলম বাক্সতে তুলিয়া রাখ। যখন উইল লিখিতে যাইবে, এই কলম লইয়া গিয়া ইহাতে উইল লিখিবে। দ্বিতীয় কলমটি লইয়া এখন একখানা লেখাপড়া করিতে হইবে। তোমার কাছে ভাল কালি আছে?"

ব্রহ্মানন্দ মসীপাত্র বাহির করিয়া লিখিয়া দেখাইলেন। হরলাল বলিতে লাগিল, "ভাল, এই কালি উইল লিখিতে লইয়া যাইও।"

ব্র। তোমাদিগের বাড়ীতে কি দোওয়াত কলম নাই যে, আমি ঘাড়ে করিয়া নিয়া যাব?

হর। আমার কোন উদ্দেশ্য আছে-নচেৎ তোমাকে এত টাকা দিলাম কেন?

ব্র। আমিও তাই ভাবিতেছি বটে-ভাল বলেছ ভাই রে!

হর। তুমি দোওয়াত কলম লইয়া গেলে কেহ ভাবিলেও ভাবিতে পারে, আজি এটা কেন? তুমি সরকারী কালি কলমকে গালি পাড়িও; তাহা হইলেই শোধরাইবে।

ব্র। তা সরকারী কালি কলমকে শুধু কেন? সরকারকে শুদ্ধ গালি পাড়িতে পারিব।

হর। তত আবশ্যক নাই। এক্ষণে আসল কর্ম্ম আরম্ভ কর।

তখন হরলাল দুইখানি জেনেরাল লেটর কাগজ ব্রহ্মানন্দের হাতে দিলেন। ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "এ যে সরকারী কাগজ দেখিতে পাই।"

"সরকারী নহে-কিন্তু উকীলের বাড়ীর লেখাপড়া এই কাগজে হইয়া থাকে। কর্ত্তাও এই কাগজে উইল লেখাইয়া থাকেন, জানি। এজন্যে এই কাগজ আমি সংগ্রহ করিয়াছি। যাহা বলি, তাহা এই কালি কলমে লেখ।"

ব্রহ্মানন্দ লিখিতে আরম্ভ করিল। হরলাল একখানি উইল লেখাইয়া দিলেন। তাহার মর্ম্মার্থ এই। কৃষ্ণকান্ত রায় উইল করিতেছেন। তাঁহার নামে যত সম্পত্তি আছে, তাহার বিভাগ কৃষ্ণকান্তের পরলোকান্তে এইরূপ হইবে। যথা, বিনোদলাল তিন আনা, গোবিন্দলাল এক পাই, গৃহিণী এক পাই, শৈলবতী এক পাই, হরলালের পুত্র এক পাই, হরলাল জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া অবশিষ্ট বারো আনা।

লেখা হইলে ব্রহ্মানন্দ কহিলেন, "এখন ত উইল লেখা হইল-দস্তখত করে কে?"

"আমি।" বলিয়া হরলাল ঐ উইলে কৃষ্ণকান্ত রায়ের এবং চারি জন সাক্ষীর দস্তখত করিয়া দিলেন।

ব্রহ্মানন্দ কহিলেন, "ভাল, এত জাল হইল।"

হর। এই সাঁচ্চা উইল হইল, বৈকালে যাহা লিখিবে, সেই জাল।

ব্রহ্ম। কিসে?

হর। তুমি যখন উইল লিখিতে যাইবে, তখন এই উইলখানি আপনার পিরানের পকেটে লুকাইয়া লইয়া যাইবে। সেখানে গিয়া এই কালি কলমে তাঁহাদের ইচ্ছামত উইল লিখিবে। কাগজ, কলম, কালি, লেখক একই; সুতরাং দুইখান উইলই দেখিতে একপ্রকার হইবে। পরে উইল পড়িয়া শুনান ও দস্তখত হইয়া গেলে শেষে তুমি স্বাক্ষর করিবার জন্য লইবে। সকলের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া দস্তখত করিবে। সেই অবকাশে উইলখানি বদলাইয়া লইবে। এইখানি কর্ত্তাকে দিয়া, কর্ত্তার উইলখানি আমাকে আনিয়া দিবে।

ব্রহ্মানন্দ ঘোষ ভাবিতে লাগিল। বলিল, "বলিলে কি হয়-বুদ্ধির খেলটা খেলোছ ভাল।"

হর। ভাবিতেছ কি?

ব্র। ইচ্ছা করে বটে, কিন্তু ভয় করে। তোমার টাকা ফিরাইয়া লও। আমি কিন্তু জালের মধ্যে থাকিব না।

"টাকা দাও।" বলিয়া হরলাল হাত পাতিল। ব্রহ্মানন্দ ঘোষ নোট ফিরাইয়া দিল। নোট লইয়া হরলাল উঠিয়া চলিয়া যাইতেছিল। ব্রহ্মানন্দ তখন আবার তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "বলি, ভায়া কি গেলে?"

"না" বলিয়া হরলাল ফিরিল।

ব্র। তুমি এখন পাঁচ শত টাকা দিলে। আর কি দিবে?

হর। তুমি সেই উইলখানি আনিয়া দিলে আর পাঁচ শত দিব।

ব্র। অনেকটা-টাকা-লোভ ছাড়া যায় না।

হর। তবে তুমি রাজি হইলে?

ব্র। রাজি না হইয়াই বা কি করি? কিন্তু বদল করি কি প্রকারে? দেখিতে পাইবে যে।

হর। কেন দেখিতে পাইবে? আমি তোমার সম্মুখে উইল বদল করিয়া লইতেছি, তুমি দেখ দেখি, টের পাও কি না।

হরলালের অন্য বিদ্যা থাকুক না থাকুক, হস্তকৌশল বিদ্যায় যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন উইলখানি পকেটে রাখিলেন, আর একখানি কাগজ হাতে লইয়া তাহাতে লিখিবার উপক্রম করিলেন। ইত্যবসরে হাতের কাগজ পকেটে, পকেটের কাগজ হাতে কি প্রকারে আসিল, ব্রহ্মানন্দ তাহা কিছুই লক্ষিত করিতে পারিলেন না। ব্রহ্মানন্দ হরলালের হস্তকৌশলের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হরলাল বলিলেন, "এই কৌশলটি তোমায় শিখাইয়া দিব।" এই বলিয়া হরলাল সেই অভ্যস্ত কৌশল ব্রহ্মানন্দকে অভ্যাস করাইতে লাগিলেন।

দুই তিন দণ্ডে ব্রহ্মানন্দের সেই কৌশলটি অভ্যস্ত হইল। তখন হরলাল কহিল যে, "আমি এক্ষণে চলিলাম। সন্ধ্যার পর বাকি টাকা লইয়া আসিব।" বলিয়া সে বিদায় হইল।

হরলাল চলিয়া গেলে ব্রহ্মানন্দের বিষম ভয়সঞ্চার হইল। তিনি দেখিলেন যে, তিনি যে কার্য্যে স্বীকৃত হইয়াছেন, তাহা রাজদ্বারে মহা দণ্ডার্হ অপরাধ-কি জানি, ভবিষ্যতে পাছে তাঁহাকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ হইতে হয়। আবার বদলের সময় যদি কেহ ধরিয়া ফেলে? তবে তিনি এ কার্য্য কেন করেন? না করিলে হস্তগত সহস্র মুদ্রা ত্যাগ করিতে হয়। তাহাও হয় না। প্রাণ থাকিতে নয়।

হায়! ফলাহার! কত দরিদ্র ব্রাহ্মণকে তুমি মর্ম্মান্তিক পীড়া দিয়াছ! এ দিকে সংক্রামক জ্বর, প্লীহায় উদর পরিপূর্ণ, তাহার উপর ফলাহার উপস্থিত! তখন কাংস্যপাত্র বা কদলীপত্রে সুশোভিত লুচি, সন্দেশ, মিহিদানা, সীতাভোগ প্রভৃতির অমলধবল শোভা সন্দর্শন করিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ কি করিবে? ত্যাগ করিবে, না আহার করিবে? আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, ব্রাহ্মণ ঠাকুর যদি সহস্র বৎসর সেই সজ্জিত পাত্রের নিকট বসিয়া তর্ক বিতর্ক করেন, তথাপি তিনি এ কূট প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারিবেন না-এবং মীমাংসা করিতে না পারিয়া-অন্য মনে পরদ্রব্যগুলি উদরসাৎ করিবেন।

ব্রহ্মানন্দ ঘোষ মহাশয়ের ঠিক তাই হইল। হরলালের এ টাকা হজম করা ভার-জেলখানার ভয় আছে; কিন্তু ত্যাগ করাও যায় না। লোভ বড়, কিন্তু বদহজমের ভয়ও বড়। ব্রহ্মানন্দ মীমাংসা করিতে পারিল না। মীমাংসা করিতে না পারিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণের মত উদরসাৎ করিবার দিকেই মন রাখিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পর ব্রহ্মানন্দ উইল লিখিয়া ফিরিয়া আসিলেন। দেখিলেন যে, হরলাল আসিয়া বসিয়া আছেন। হরলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হইল?”

ব্রহ্মানন্দ একটু কবিতাপ্রিয়। তিনি কষ্টে হাসিয়া বলিলেন,

“মনে করি চাঁদা ধরি হাতে দিই পেড়ে।
বাবলা গাছে হাত লেগে আঙ্গুল গেল ছিঁড়ে।”

হর। পার নাই নাকি?

ব্র। ভাই, কেমন বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল।

হর। পার নাই?

ব্র। না ভাই-এই ভাই, তোমার জাল উইল নাও। এই তোমার টাকা নাও।

এই বলিয়া ব্রহ্মানন্দ কৃত্রিম উইল ও বাক্স হইতে পাঁচ শত টাকার নোট বাহির করিয়া দিলেন। ক্রোধে এবং বিরক্তিতে হরলালের চক্ষু আরক্ত এবং অধর কম্পিত হইল। বলিলেন, “মূর্খ, অকর্ম্মা! স্ত্রীলোকের কাজটাও তোমা হইতে হইল না? আমি চলিলাম। কিন্তু দেখিও, যদি তোমা হইতে এই কথার বাষ্প মাত্র প্রকাশ পায়, তবে তোমার জীবন সংশয়।”

ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, “সে ভাবনা করিও না; কথা আমার নিকট হইতে প্রকাশ পাইবে না।”

সেখান হইতে উঠিয়া হরলাল ব্রহ্মানন্দের পাকশালায় গেলেন। হরলাল ঘরের ছেলে, সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে পারেন। পাকশালায় ব্রহ্মানন্দের ভ্রাতৃকন্যা রোহিণী রাঁধিতেছিল।

এই রোহিণীতে আমার বিশেষ কিছু প্রয়োজন আছে। অতএব তাহার রূপ গুণ কিছু বলিতে হয়, কিন্তু আজি কালি রূপ বর্ণনার বাজার নরম-আর গুণ বর্ণনার-হাল আইনে আপনার ভিন্ন পরের করিতে নাই। তবে ইহা বলিলে হয় যে, রোহিণীর যৌবন পরিপূর্ণ-রূপ উছলিয়া পড়িতেছিল-শরতের চন্দ্র ষোল কলায় পরিপূর্ণ। সে অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিল, কিন্তু বৈধব্যের অনুপযোগী অনেকগুলি দোষ তাহার ছিল। দোষ, সে কালা পেড়ে ধুতি পরিত, হাতে চুড়ি পরিত, পানও বুঝি খাইত। এ দিকে রন্ধনে সে দ্রৌপদীবিশেষ বলিলে হয়; ঝোল, অম্ল, চড়চড়ি, সড়সড়ি, ঘণ্ট, দালনা ইত্যাদিতে সিদ্ধহস্ত; আবার আলেপনা, খয়েরের গহনা, ফুলের খেলনা, সূচের কাজে তুলনারহিত। চুল বাঁধিতে, কন্যা সাজাইতে, পাড়ার একমাত্র অবলম্বন। তাহার আর কেহ সহায় ছিল না বলিয়া সে ব্রহ্মানন্দের বাটীতে থাকিত।

রোহিণী রূপসী ঠন্ ঠন্ করিয়া দালের হাঁড়িতে কাটি দিতেছিল, দূরে একটা বিড়াল থাবা পাতিয়া বসিয়া ছিল; পশুজাতি রমণীদিগের বিদ্যুদ্দাম কটাক্ষে শিহরে কি না, দেখিবার জন্য রোহিণী তাহার উপরে মধ্যে মধ্যে বিষপূর্ণ মধুর কটাক্ষ করিতেছিল; বিড়াল সে মধুর কটাক্ষকে ভর্জ্জিত মৎস্যাহারের নিমন্ত্রণ মনে করিয়া অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতেছিল, এমত সময়ে হরলাল বাবু জুতা সমেত মস্ মস্ করিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। বিড়াল, ভীত হইয়া, ভর্জ্জিত মৎস্যের লোভ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়নে তৎপর হইল; রোহিণী দালের কাটি ফেলিয়া দিয়া, হাত ধুইয়া, মাথায় কাপড় দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। নখে নখ খুঁটিয়া

জিজ্ঞাসা করিল, “বড় কাকা, কবে এলেন?”

হরলাল বলিল, “ কাল এসেছি। তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।”

রোহিণী শিহরিল; বলিল, “আজি এখানে খাবেন? সরু চালের ভাত চড়াব কি?”

হর। চড়াও, চড়াও। কিন্তু সে কথা নয়। তোমার এক দিনের কথা মনে পড়ে কি?

রোহিণী চুপ করিয়া মাটি পানে চাহিয়া রহিল। হরলাল বলিল, “সেই দিন, যে দিন তুমি গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতে, যাত্রীদিগের দলছাড়া হইয়া পিছাইয়া পড়িয়াছিলে? মনে পড়ে?”

রোহিণী। (বাঁ হাতের চারিটি আঙ্গুল দাইন হাতে ধরিয়া অধোবদনে) মনে পড়ে।

হর। যে দিন তুমি পথ হারাইয়া মাঠে পড়িয়াছিলে, মনে পড়ে?

রো। পড়ে।

হর। যে দিন মাঠে তোমার রাত্রি হইল, তুমি একা; জনকত বদমাস তোমার সঙ্গ নিল-মনে পড়ে?

রো। পড়ে।

হর। সে দিন কে তোমায় রক্ষা করিয়াছিল?

রো। তুমি। তুমি ঘোড়ার উপরে সেই মাঠ দিয়া কোথায় যাইতেছিলে-

হর। শালীর বাড়ী।

রো। তুমি দেখিতে পাইয়া আমায় রক্ষা করিলে-আমায় পাল্কি বেহারা করিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিলে। মনে পড়ে বই কি। সে ঋণ আমি কখনও পরিশোধ করিতে পারিব না।

হর। আজ সে ঋণ পরিশোধ করিতে পার-তার উপর আমায় জন্মের মত কিনিয়া রাখিতে পার, করিবে?

রো। কি বলুন-আমি প্রাণ দিয়াও আপনার উপকার করিব।

হর। কর না কর, এ কথা কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করিও না।

রো। প্রাণ থাকিতে নয়।

হর। দিব্য কর।

রোহিণী দিব্য করিল।

তখন হরলাল কৃষ্ণকান্তের আসল উইল ও জাল উইলের কথা বুঝাইয়া বলিল। শেষ বলিল, “সেই আসল উইল চুরি করিয়া, জাল উইল তাহার বদলে রাখিয়া আসিতে হইবে। আমাদের বাড়ীতে তোমার যাতায়াত আছে। তুমি বুদ্ধিমতী, তুমি অনায়াসে পার। আমার জন্য ইহা করিবে?”

রোহিণী শিহরিল। বলিল, “চুরি! আমাকে কাটিয়া ফেলিলেও আমি পারিব না।”

হর। স্ত্রীলোক এমন অসারই বটে-কথার রাশি মাত্র। এই বুঝি এ জন্মে তুমি আমার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে না!

রো। আর যা বলুন, সব পারিব। মরিতে বলেন, মরিব। কিন্তু এ বিশ্বাসঘাতকের কাজ পারিব না।

হরলাল কিছুতেই রোহিণীকে সম্মত করিতে না পারিয়া, সেই হাজার টাকার নোট রোহিণীর হাতে দিতে গেল। বলিল, "এই হাজার টাকা পুরস্কার আগাম নাও। এ কাজ তোমার করিতে হইবে।"

রোহিণী নোট লইল না। বলিল, "টাকার প্রত্যাশা করি না। কর্ত্তার সমস্ত বিষয় দিলেও পারিব না। করিবার হইত ত আপনার কথাতেই করিতাম।"

হরলাল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, বলিল, "মনে করিয়াছিলাম, রোহিণি, তুমি আমার হিতৈষী। পর কখনও আপন হয়? দেখ, আজ যদি আমার স্ত্রী থাকিত, আমি তোমার খোশামোদ করিতাম না। সেই আমার এ কাজ করিত।"

এবার রোহিণী একটু হাসিল। হরলাল জিজ্ঞাসা করিল, " হাসিলে যে?"

রো। আপনার স্ত্রীর নামে সেই বিধবাবিবাহের কথা মনে পড়িল। আপনি না কি বিধবা বিবাহ করিবেন?

হর। ইচ্ছা ত আছে–কিন্তু মনের মত বিধবা পাই কই?

রো। তা বিধবাই হৌক, সধবাই হৌক–বলি বিধবাই হৌক, কুমারীই হৌক–একটা বিবাহ করিয়া সংসারী হইলেই ভাল হয়। আমরা আত্মীয়স্বজন সকলেরই তা হলে আহ্লাদ হয়।

হর। দেখ রোহিণি, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত।

রো। তা ত এখন লোকে বলিতেছে।

হর। দেখ, তুমিও একটা বিবাহ করিতে পার–কেন করিবে না?

রোহিণী মাথার কাপড় একটু টানিয়া মুখ ফিরাইল। হরলাল বলিতে লাগিল, "দেখ, তোমাদের সঙ্গে আমাদের গ্রাম সুবাদ মাত্র–সম্পর্কে বাধে না।"

এবার রোহিণী লম্বা করিয়া মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া, উনুন গোড়ায় বসিয়া, দালে কাটি দিতে আরম্ভ করিল। দেখিয়া বিষণ্ন হইয়া হরলাল ফিরিয়া চলিল।

হরলাল দ্বার পর্য্যন্ত গেলে, রোহিণী বলিল, "কাগজখানা না হয় রাখিয়া যান, দেখি, কি করিতে পারি।"

হরলাল আহ্লাদিত হইয়া জাল উইল ও নোট রোহিণীর নিকটে রাখিল; দেখিয়া রোহিণী বলিল, "নোট না। শুধু উইলখানা রাখুন।"

হরলাল তখন জাল উইল রাখিয়া নোট লইয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঐ দিবস রাত্রি আটটার সময়ে কৃষ্ণকান্ত রায় আপন শয়নমন্দিরে পর্য্যঙ্কে বসিয়া, উপাধানে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া, সটকায় তামাক টানিতেছিলেন এবং সংসারে একমাত্র ঔষধ–মাদকমধ্যে শ্রেষ্ঠ–অহিফেন ওরফে আফিমের নেশায় মিঠে রকম ঝিমাইতেছিলেন। ঝিমাইতে ঝিমাইতে খেয়াল দেখিতেছিলেন, যেন উইলখানি হঠাৎ বিক্রয় কোবালা হইয়া গিয়াছে। যেন হরলাল তিন টাকা তের আনা দু কড়া দু ক্রান্তি মূল্যে তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি কিনিয়া লইয়াছে। আবার যেন কে বলিয়া দিল যে, না, এ দানপত্র নহে, এ তমসুক। তখনই যেন দেখিলেন যে, ব্রহ্মার বেটা বিষ্ণু আসিয়া বৃষভারূঢ় মহাদেবের কাছে এক কৌটা আফিম কর্জ্জ লইয়া, এই দলিল লিখিয়া দিয়া, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বন্ধক রাখিয়াছেন–মহাদেব গাঁজার ঝোঁকে ফোরক্লোজ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। এমত সময়ে, রোহিণী ধীরে ধীরে সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "ঠাকুরদাদা কি ঘুমাইয়াছ?"

কৃষ্ণকান্ত ঝিমাইতে ঝিমাইতে কহিলেন, "কে, নন্দী? ঠাকুরকে এই বেলা ফোরক্লোজ করিতে বল।"

রোহিণী বুঝিল যে, কৃষ্ণকান্তের আফিমের আমল হইয়াছে। হাসিয়া বলিল, "ঠাকুরদাদা, নন্দী কে?"

কৃষ্ণকান্ত ঘাড় না তুলিয়া বলিলেন, "হুম্, ঠিক বলেছ। বৃন্দাবনে গোয়ালাবাড়ী মাখন খেয়েছে-আজও তার কড়ি দেয় নাই।"

রোহিণী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। তখন কৃষ্ণকান্তের চমক হইল, মাথা তুলিয়া দেখিয়া বলিলেন, "কে ও, অশ্বিনী ভরণী কৃত্তিকা রোহিণী?"

রোহিণী উত্তর করিল, "মৃগশিরা আর্দ্রা পুনর্ব্বসু পুষ্যা।"

কৃষ্ণ। অশ্লেষা মঘা পূর্ব্বফাল্গুনী।

রো। ঠাকুরদাদা, আমি কি তোমার কাছে জ্যোতিষ শিখ্‌তে এয়েছি!

কৃষ্ণ। তাই ত! তবে কি মনে করিয়া? আফিঙ্গ চাই না ত?

রো। যে সামগ্রী প্রাণ ধরে্য দিতে পারবে না, তার জন্যে কি আমি এসেছি! আমাকে কাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন, তাই এসেছি।

কৃ। এই এই। তবে আফিঙ্গেরই জন্য!

রো। না, ঠাকুরদাদা, না। তোমার দিব্য, আফিঙ্গ চাই না। কাকা বল্‌লেন যে, যে উইল আজ লেখাপড়া হয়েছে, তাতে তোমার দস্তখত হয় নাই।

কৃষ্ণ। সে কি! আমার বেশ মনে পড়িতেছে যে, আমি দস্তখত করিয়াছি।

রো। না, কাকা কহিলেন যে, তাঁহার যেন স্মরণ হচ্ছে, তুমি তাতে দস্তখত কর নাই; ভাল, সন্দেহ রাখায় দরকার কি? তুমি কেন সেখানা খুলে একবার দেখ না।

কৃষ্ণ। বটে-তবে আলোটা ধর দেখি।

বলিয়া কৃষ্ণকান্ত উঠিয়া উপাধানের নিম্ন হইতে একটি চাবি লইলেন। রোহিণী নিকটস্থ দীপ হস্তে লইল। কৃষ্ণকান্ত প্রথমে একটি ক্ষুদ্র হাতবাক্স খুলিয়া একটি বিচিত্র চাবি লইয়া, পরে একটা চেষ্ট ড্রয়ারের একটি দেরাজ খুলিলেন এবং অনুসন্ধান করিয়া ঐ উইল বাহির করিলেন। পরে বাক্স হইতে চশমা বাহির করিয়া নাসিকার উপর সংস্থাপনের উদ্যোগ দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু চশমা লাগাইতে লাগাইতে দুই চারি বার আফিঙ্গের ঝিমকিনি আসিল-সুতরাং তাহাতে কিছুকাল বিলম্ব হইল। পরিশেষে চশমা সুস্থির হইলে কৃষ্ণকান্ত উইলে নেত্রপাত করিয়া দেখিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন, "রোহিণি, আমি কি বুড়া হইয়া বিহ্বল হইয়াছি? এই দেখ, আমার দস্তখত।"

রোহিণী বলিল, "বালাই, বুড়ো হবে কেন? আমাদের কেবল জোর করিয়া নাতিনী বল বই ত না। তা ভাল, আমি এখন যাই, কাকাকে বলি গিয়া।"

রোহিণী তখন কৃষ্ণকান্তের শয়নমন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

*　　*　　*

গভীর নিশাতে কৃষ্ণকান্ত নিদ্রা যাইতেছিলেন, অকস্মাৎ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলেন যে, তাঁহার শয়নগৃহে দীপ জ্বলিতেছে না। সচরাচর সমস্ত রাত্রি দীপ জ্বলিত, কিন্তু সে রাত্রে দীপ নির্ব্বাণ হইয়াছে দেখিলেন, নিদ্রাভঙ্গকালে এমতও শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল যে, যেন কে একটা চাবি কলে ফিরাইল। এমত বোধ হইল, যেন ঘরে কে মানুষ বেড়াইতেছে। মানুষ তাঁহার পর্য্যঙ্কের শিরোদেশ পর্য্যন্ত আসিল-তাঁহার বালিশে হাত দিল। কৃষ্ণকান্ত আফিঙ্গের নেশায় বিভোর; না নিদ্রিত, না জাগরিত, বড় কিছু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। ঘরে যে আলো নাই-তাহাও ঠিক বুঝেন নাই, কখন অর্দ্ধনিদ্রিত-কখন অর্দ্ধসচেতন-সচেতনেও চক্ষু খুলে না। একবার দৈবাৎ চক্ষু খুলিবায় কতকটা অন্ধকার বোধ হইল বটে, কিন্তু কৃষ্ণকান্ত তখন মনে

করিতেছিলেন যে, তিনি হরি ঘোষের মোকদ্দমায় জাল দলিল দাখিল করায়, জেলখানায় গিয়াছেন। জেলখানা ঘোরান্ধকার। কিছু পরে হঠাৎ যেন চাবি খোলার শব্দ অল্প কাণে গেল-এ কি জেলের চাবি পড়িল? হঠাৎ একটু চমক হইল। কৃষ্ণকান্ত সটকা হাতড়াইলেন, পাইলেন না-অভ্যাসবশতঃ ডাকিলেন, "হরি!"

কৃষ্ণকান্ত অন্তঃপুরে শয়ন করিতেন না-বহির্ব্বাটীতেও শয়ন করিতেন না। উভয়ের মধ্যে একটি ঘর ছিল। সেই ঘরে শয়ন করিতেন। সেখানে হরি নামক একজন খানসামা তাঁহার প্রহরী স্বরূপ শয়ন করিত। আর কেহ না। কৃষ্ণকান্ত তাহাকেই ডাকিলেন, "হরি!"

কৃষ্ণকান্ত বারেক মাত্র হরিকে ডাকিয়া, আবার আফিমে ভোর হইয়া ঝিমাইতে লাগিলেন। আসল উইল, তাঁহার গৃহ হইতে সেই অবসরে অন্তর্হিত হইল। জাল উইল তৎপরিবর্ত্তে স্থাপিত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রাতে রোহিণী আবার রাঁধিতে বসিয়াছে, আবার সেখানে হরলাল উঁকি মারিতেছে। ভাগ্যশঃ ব্রহ্মানন্দ বাড়ী ছিল না-নহিলে কি একটা মনে করিতে পারিত।

হরলাল ধীরে ধীরে রোহিণীর কাছে গেল-রোহিণী বড় চাহিয়া দেখে না। হরলাল বলিল, "চাহিয়া দেখ-হাঁড়ি ফাটিবে না।"

রোহিণী চাহিয়া দেখিয়া হাসিল। হরলাল বলিল, " কি করিয়াছ?"

রোহিণী অপহৃত উইল আনিয়া হরলালকে দেখিতে দিল। হরলাল পড়িয়া দেখিল-আসল উইল বটে। তখন সে দুষ্টের মুখে হাসি ধরে না। উইল হাতে করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি প্রকারে আনিলে?"

রোহিণী সে গল্প আরম্ভ করিল। প্রকৃত কিছুই বলিল না। একটি মিথ্যা উপন্যাস বলিতে লাগিল-বলিতে বলিতে সে হরলালের হাত হইতে উইলখানি লইয়া দেখাইল, কি প্রকারে কাগজখানা একটা কলমদানের ভিতর পড়িয়া ছিল। উইল চুরির কথা শেষ হইলে রোহিণী হঠাৎ উইলখানা হাতে করিয়া উঠিয়া গেল। যখন সে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার হাতে উইল নাই দেখিয়া হরলাল জিজ্ঞাসা করিল, "উইল কোথায় রাখিয়া আসিলে?"

রোহি। তুলিয়া রাখিয়া আসিয়াছি।

হর। আর তুলিয়া রাখিয়া কি হইবে? আমি এখনই যাইব।

রোহি। এখনই যাবে? এত তাড়াতাড়ি কেন?

হর। আমার থাকিবার যো নাই।

রোহি। তা যাও।

হর। উইল?

রো। আমার কাছে থাক্।

হর। সে কি? উইল আমায় দিবে না?

রো। তোমার কাছে থাকাও যে, আমার কাছে থাকাও সে।

হর। যদি আমাকে উইল দিবে না, তবে ইহা চুরি করিলে কেন?

রো। আপনারই জন্য। আপনারই জন্য ইহা রহিল। যখন আপনি বিধবাবিবাহ করিবেন, আপনার স্ত্রীকে এ উইল দিব। আপনি লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবেন।

হরলাল বুঝিল, বলিল, "তা হবে না-রোহিণি! টাকা যাহা চাও, দিব।"

রো। লক্ষ টাকা দিলেও নয়। যাহা দিবে বলিয়াছিলে, তাই চাই।

হর। তা হয় না। আমি জাল করি, চুরি করি, আপনারই হকের জন্য। তুমি চুরি করিয়াছ, কার হকের জন্য?

রোহিণীর মুখ শুখাইল। রোহিণী অধোবদনে রহিল। হরলাল বলিতে লাগিল, "আমি যাই হই-কৃষ্ণকান্ত রায়ের পুত্র। যে চুরি করিয়াছে, তাহাকে কখনও গৃহিণী করিতে পারিব না।"

রোহিণী সহসা দাঁড়াইয়া উঠিয়া, মাথার কাপড় উঁচু করিয়া তুলিয়া, হরলালের মুখপানে চাহিল; বলিল, " আমি চোর! তুমি সাধু! কে আমাকে চুরি করিতে বলিয়াছিল? কে আমাকে বড় লোভ দেখাইল? সরলা স্ত্রীলোক দেখিয়া কে প্রবঞ্চনা করিল? যে শঠতার চেয়ে আর শঠতা নাই, যে মিথ্যার চেয়ে আর মিথ্যা নাই, যা ইতরে বর্ব্বরে মুখে আনিতে পারে না, তুমি কৃষ্ণকান্ত রায়ের পুত্র হইয়া তাই করিলে? হায়! হায়! আমি তোমার অযোগ্য? তোমার মত নীচ শঠকে গ্রহণ করে, এমন হতভাগী কেহ নাই। তুমি যদি মেয়ে মানুষ হইতে, তোমাকে আজ, যা দিয়া ঘর ঝাঁট দিই, তাই দেখাইতাম। তুমি পুরুষ মানুষ, মানে মানে দূর হও।"

হরলাল বুঝিল, উপযুক্ত হইয়াছে। মানে মানে বিদায় হইল-যাইবার সময় একটু টিপি টিপি হাসিয়া গেল। রোহিণীও বুঝিল যে, উপযুক্ত হইয়াছে-উভয় পক্ষে। সেও খোঁপাটা একটু আঁটিয়া নিয়া রাঁধিতে বসিল। রাগে খোঁপাটা খুলিয়া গিয়াছিল। তার চোখে জল আসিতেছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

তুমি, বসন্তের কোকিল! প্রাণ ভরিয়া ডাক, তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই, কিন্তু তোমার প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ যে, সময় বুঝিয়া ডাকিবে। সময়ে, অসময়ে, সকল সময়ে ডাকাডাকি ভাল নহে। দেখ, আমি বহু সন্ধানে, লেখনী মসীপাত্র ইত্যাদির সাক্ষাৎ পাইয়া আরও অধিক অনুসন্ধানের পর মনের সাক্ষাৎ পাইয়া, কৃষ্ণকান্তের উইলের কথা ফাঁদিয়া লিখিতে বসিতেছিলাম, এমন সময়ে তুমি আকাশ হইতে ডাকিলে; "কুহু! কুহু! কুহু!" তুমি সুকণ্ঠ, আমি স্বীকার করি, কিন্তু সুকণ্ঠ বলিয়া কাহারও পিছু ডাকিবার অধিকার নাই। যাহা হউক, আমার পলিত কেশ, চলিত কলম, এ সব স্থানে তোমার ডাকাডাকিতে বড় আসে যায় না। কিন্তু দেখ, যখন নব্য বাবু টাকার জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া জমাখরচ লইয়া মাথা কুটাকুটি করিতেছেন, তখন তুমি হয়ত আপিসের ভগ্ন প্রাচীরের কাছ হইতে ডাকিলে, "কুহু-", বাবুর আর জমাখরচ মিলিল না। যখন বিরহসন্তপ্তা সুন্দরী, প্রায় সমস্ত দিনের পর অর্থাৎ বেলা নয়টার সময় দুটি ভাত মুখে দিতে বসিয়াছেন, কেবল ক্ষীরের বাটিটি কোলে টানিয়া লইয়াছেন মাত্র, অমনি তুমি ডাকিলে-"কুহু"-সুন্দরীর ক্ষীরের বাটি অমনি রহিল-হয়ত, তাহাতে অন্যমনে লুণ মাখিয়া খাইলেন। যাহা হউক, তোমার কুহুরবে কিছু যাদু আছে, নহিলে যখন তুমি বকুল গাছে বসিয়া ডাকিতেছিলে-আর বিধবা রোহিণী কলসীকক্ষে জল আনিতে যাইতেছিল-তখন-কিন্তু আগে জল আনিতে যাওয়ার পরিচয়টা দিই।

তা, কথাটা এই। ব্রহ্মানন্দ ঘোষ দুঃখী লোক-দাসী চাকরাণীর বড় ধার ধারে না। সেটা সুবিধা, কি কুবিধা, তা বলিতে পারি না-সুবিধা হউক, কুবিধা হউক, যাহার চাকরাণী নাই, তাহার ঘরে ঠকামি, মিথ্যা সংবাদ, কোন্দল, এবং ময়লা, এই চারিটি বস্তু নাই। চাকরাণী নামে দেবতা এই চারিটির সৃষ্টিকর্ত্তা। বিশেষ

যাহার অনেকগুলি চাকরাণী, তাহার বাড়ীতে নিত্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ-নিত্য রাবণবধ। কোন চাকরাণী ভীমরূপিণী, সর্ব্বদাই সম্মার্জ্জনীগদা হস্তে গৃহরণক্ষেত্রে ফিরিতেছেন; কেহ তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণতুল্য বীরগণকে ভর্ৎসনা করিতেছেন; কেহ কুম্ভকর্ণরূপিণী ছয় মাস করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন; নিদ্রান্তে সর্ব্বস্ব খাইতেছেন; কেহ সুগ্রীব; গ্রীবা হেলাইয়া কুম্ভকর্ণের বধের উদ্যোগ করিতেছেন। ইত্যাদি।

ব্রহ্মানন্দের সে সকল আপদ্ বালাই ছিল না, সুতরাং জল আনা, বাসন মাজাটা, রোহিণীর ঘাড়ে পড়িয়াছিল। বৈকালে, অন্যান্য কাজ শেষ হইলে, রোহিণী জল আনিতে যাইত। যে দিনের ঘটনা বিবৃত করিয়াছি, তাহার পরদিন নিয়মিত সময়ে রোহিণী কলসীকক্ষে জল আনিতে যাইতেছিল। বাবুদের একটা বড় পুকুর আছে-নাম বারুণী-জল তার বড় মিঠা-রোহিণী সেইখানে জল আনিতে যাইত। আজিও যাইতেছিল। রোহিণী একা জল আনিতে যায়-দল বাঁধিয়া যত হালকা মেয়ের সঙ্গে হালকা হাসি হাসিতে হাসিতে হালকা কলসীতে হালকা জল আনিতে যাওয়া, রোহিণীর অভ্যাস নহে। রোহিণীর কলসী ভারি, চাল-চলনও ভারি। তবে রোহিণী বিধবা। কিন্তু বিধবার মত কিছু রকম নাই। অধরে পানের রাগ, হাতে বালা, ফিতাপেড়ে ধুতি পরা, আর কাঁধের উপর চারুবিনির্ম্মিতা কাল ভুজঙ্গিনীতুল্যা কুণ্ডলীকৃতা লোলায়মানা মনোমোহিনী কবরী। পিতলের কলসী কক্ষে; চলনের দোলনে, ধীরে ধীরে সে কলসী নাচিতেছে-যেমন তরঙ্গে তরঙ্গে হংসী নাচে, সেইরূপ ধীরে ধীরে গা দোলাইয়া কলসী নাচিতেছে। চরণ দুইখানি আস্তে আস্তে, বৃক্ষচ্যুত পুষ্পের মত, মৃদু মৃদু মাটিতে পড়িতেছিল-অমনি সে রসের কলসী তালে তালে নাচিতেছিল। হেলিয়া দুলিয়া, পালভরা জাহাজের মত, ঠমকে ঠমকে, চমকে চমকে, রোহিণী সুন্দরী সরোবরপথ আলো করিয়া জল লইতে আসিতেছিল-এমন সময়ে বকুলের ডালে বসিয়া, বসন্তের কোকিল ডাকিল।

কুহুঃ কুহুঃ কুহুঃ! রোহিণী চারি দিক্ চাহিয়া দেখিল। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, রোহিণীর সেই ঊর্দ্ধবিক্ষিপ্ত স্পন্দিত বিলোল কটাক্ষ ডালে বসিয়া যদি সে কোকিল দেখিতে পাইত, তবে সে তখনই-ক্ষুদ্র পাখিজাতি-তখনই সে, সে শরে বিদ্ধ হইয়া, উলটি পালটি খাইয়া, পা গোটো করিয়া, ঝুপ করিয়া পড়িয়া যাইত। কিন্তু পাখীর অদৃষ্টে তাহা ছিল না-কার্য্যকারণের অনন্ত শ্রেণী-পরম্পরায় এটি গ্রন্থিবদ্ধ হয় নাই-অথবা পাখীর তত পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতি ছিল না। মূর্খ পাখী আবার ডাকিল-"কুহু! কুহু! কুহু!"

"দূর হ! কালামুখো!" বলিয়া রোহিণী চলিয়া গেল। চলিয়া গেল, কিন্তু কোকিলকে ভুলিল না। আমাদের দৃঢ়তর বিশ্বাস এই যে, কোকিল অসময়ে ডাকিয়াছিল। গরিব বিধবা যুবতী একা জল আনিতে যাইতেছিল, তখন ডাকাটা ভাল হয় নাই। কেন না, কোকিলের ডাক শুনিলে কতকগুলি বিশ্রী কথা মনে পড়ে। কি যেন হারাইয়াছি-যেন তাই হারাইবাতে জীবনসর্ব্বস্ব অসার হইয়া পড়িয়াছে-যেন তাহা আর পাইব না। যেন কি নাই, কেন যেন নাই, কি যেন হইল না, কি যেন পাইব না। কোথায় যেন রত্ন হারাইয়াছি-কে যেন কাঁদিতে ডাকিতেছে। যেন এ জীবন বৃথায় গেল-সুখের মাত্রা যেন পূরিল না-যেন এ সংসারের অনন্ত সৌন্দর্য্য কিছুই ভোগ করা হইল না।

আবার কুহুঃ, কুহুঃ, কুহুঃ। রোহিণী চাহিয়া দেখিল-সুনীল, নির্ম্মল অনন্ত গগন-নিঃশব্দ, অথচ সেই কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা। দেখিল-নবপ্রস্ফুটিত আম্রমুকুল-কাঞ্চনগৌর, স্তরে স্তরে স্তরে শ্যামল পত্রে বিমিশ্রিত, শীতল সুগন্ধপরিপূর্ণ, কেবল মধুমক্ষিকা বা ভ্রমরের গুনগুনে শব্দিত, অথচ সেই কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা। দেখিল-সরোবরতীরে গোবিন্দলালের পুষ্পোদ্যান, তাহাতে ফুল ফুটিয়াছে-ঝাঁকে ঝাঁকে, লাখে লাখে, স্তবকে স্তবকে, শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায়, যেখানে সেখানে, ফুল ফুটিয়াছে; কেহ শ্বেত, কেহ রক্ত, কেহ পীত, কেহ নীল, কেহ ক্ষুদ্র, কেহ বৃহৎ,-কোথাও মৌমাছি, কোথাও ভ্রমর-সেই কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা। বাতাসের সঙ্গে তার গন্ধ আসিতেছে-ঐ পঞ্চমের বাঁধা সুরে। আর সেই কুসুমিত কুঞ্জবনে, ছায়াতলে দাঁড়াইয়া-গোবিন্দলাল নিজে। তাঁহার অতি নিবিড়কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম চক্র ধরিয়া তাঁহার চম্পকরাজিনির্ম্মিত স্কন্ধোপরে পড়িয়াছে -কুসুমিতবৃক্ষাধিক সুন্দর সেই উন্নত দেহের উপর এক কুসুমিতা লতার

শাখা আসিয়া দুলিতেছে-কি সুর মিলিল! এও সেই কুহুরবের সঙ্গে পঞ্চমে বাঁধা। কোকিল আবার এক অশোকের উপর হইতে ডাকিল "কু উ।" তখন রোহিণী সরোবরসোপান অবতরণ করিতেছিল। রোহিণী সোপান অবতীর্ণ হইয়া, কলসী জলে ভাসাইয়া দিয়া কাঁদিতে বসিল।

কেন কাঁদিতে বসিল, তাহা আমি জানি না। আমি স্ত্রীলোকের মনের কথা কি প্রকারে বলিব? তবে আমার বড়ই সন্দেহ হয়, এ দুষ্ট কোকিল রোহিণীকে কাঁদাইয়াছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বারুণী পুষ্করিণী লইয়া আমি বড় গোলে পড়িলাম-আমি তাহা বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। পুষ্করিণীটি অতি বৃহৎ-নীল কাচের আয়নার মত ঘাসের ফ্রেমে আঁটা পড়িয়া আছে। সেই ঘাসের ফ্রেমের পরে আর একখানা ফ্রেম-বাগানের ফ্রেম-পুষ্করিণীর চারি পাশে বাবুদের বাগান-উদ্যানবৃক্ষের এবং উদ্যানপ্রাচীরের বিরাম নাই। সেই ফ্রেমখানা বড় জাঁকাল-লাল, কালা, সবুজ, গোলাপী, সাদা, জরদ, নানাবর্ণ ফুলে মিনে করা-নানা ফলের পাতর বসান। মাঝে মাঝে সাদা বৈঠকখানা বাড়ীগুলা এক একখানা বড় বড় হীরার মত অস্তগামী সূর্য্যের কিরণে জ্বলিতেছিল। আর মাথার উপর আকাশ-সেও সেই বাগান ফ্রেমে আঁটা, সেও একখানা নীল আয়না। আর সেই নীল আকাশ, আর সেই বাগানের ফ্রেম, আর সেই ঘাসের ফ্রেম, ফুল, ফল, গাছ, বাড়ী, সব সেই নীল জলের দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। মাঝে মাঝে সেই কোকিলটা ডাকিতেছিল। এ সকল এক রকম বুঝান যায়, কিন্তু সেই আকাশ, আর সেই কোকিলের ডাকের সঙ্গে রোহিণীর মনের কি সম্বন্ধ, সেইটি বুঝাইতে পারিতেছি না। তাই বলিতেছিলাম যে, এই বারুণী পুকুর লইয়া আমি বড় গোলে পড়িলাম।

আমিও গোলে পড়িলাম, আর গোবিন্দলালও বড় গোলে পড়িল। গোবিন্দলালও সেই কুসুমিতা লতার অন্তরাল হইতে দেখিতেছিলেন যে, রোহিণী আসিয়া ঘাটের রাণায় একা বসিয়া কাঁদিতেছে। গোবিন্দলাল বাবু মনে মনে সিদ্ধান্ত করিলেন, এ, পাড়ায় কোন মেয়ে ছেলের সঙ্গে কোন্দল করিয়া আসিয়া কাঁদিতেছে। আমরা গোবিন্দলালের সিদ্ধান্তে তত ভরাভর করি না। রোহিণী কাঁদিতে লাগিল।

রোহিণী কি ভাবিতেছিল, বলিতে পারি না। কিন্তু বোধ হয় ভাবিতেছিল যে, কি অপরাধে এ বালবৈধব্য আমার অদৃষ্টে ঘটিল? আমি অন্যের অপেক্ষা এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যে, আমি এ পৃথিবীর কোন সুখভোগ করিতে পাইলাম না। কোন্ দোষে আমাকে এ রূপ যৌবন থাকিতে কেবল শুষ্ক কাষ্ঠের মত ইহজীবন কাটাইতে হইল? যাহারা এ জীবনের সকল সুখে সুখী-মনে কর, ঐ গোবিন্দলাল বাবুর স্ত্রী-তাহারা আমার অপেক্ষা কোন্ গুণে গুণবতী-কোন্ পুণ্যফলে তাহাদের কপালে এ সুখ-আমার কপালে শূন্য? দূর হৌক-পরের সুখ দেখিয়া আমি কাতর নই-কিন্তু আমার সকল পথ বন্ধ কেন? আমার এ অসুখের জীবন রাখিয়া কি করি?

তা, আমরা ত বলিয়াছি, রোহিণী লোক ভাল নয়। দেখ, একটুতে কত হিংসা! রোহিণীর অনেক দোষ-তার কান্না দেখে কাঁদিতে ইচ্ছা করে কি? করে না। কিন্তু অত বিচারে কাজ নাই-পরের কান্না দেখিলেই কাঁদা ভাল। দেবতার মেঘ কণ্টকক্ষেত্র দেখিয়া বৃষ্টি সম্বরণ করে না।

তা তোমরা রোহিণীর জন্য একবার আহা বল। দেখ, এখনও রোহিণী, ঘাটে বসিয়া কপালে হাত দিয়া কাঁদিতেছে-শূন্য কলসী জলের উপর বাতাসে নাচিতেছে।

শেষে সূর্য্য অস্ত গেলেন; ক্রমে সরোবরের নীল জলে কালো ছায়া পড়িল-শেষে অন্ধকার হইয়া আসিল। পাখী সকল উড়িয়া গিয়া গাছে বসিতে লাগিল। গোরু সকল গৃহাভিমুখে ফিরিল। তখন চন্দ্র উঠিল। অন্ধকারের উপর মৃদু আলো ফুটিল। তখনও রোহিণী ঘাটে বসিয়া কাঁদিতেছে-তাহার কলসী তখনও জলে

ভাসিতেছে। তখন গোবিন্দলাল উদ্যান হইতে গৃহাভিমুখে চলিলেন-যাইবার সময়ে দেখিতে পাইলেন যে, তখনও রোহিণী ঘাটে বসিয়া আছে।

এতক্ষণ অবলা একা বসিয়া কাঁদিতেছে দেখিয়া, তাঁহার একটু দুঃখ উপস্থিত হইল। তখন তাঁহার মনে হইল যে, এ স্ত্রীলোক সচ্চরিত্রা হউক, দুশ্চরিত্রা হউক, এও সেই জগৎপিতার প্রেরিত সংসারপতঙ্গ-আমিও সেই তাঁহার প্রেরিত সংসারপতঙ্গ; অতএব এও আমার ভগিনী। যদি ইহার দুঃখ নিবারণ করিতে পারি-তবে কেন করিব না?

গোবিন্দলাল ধীরে ধীরে সোপানাবলী অবতরণ করিয়া রোহিণীর কাছে গিয়া, তাহার পার্শ্বে চম্পকনির্ম্মিত মূর্ত্তিবৎ সেই চম্পকবর্ণ চন্দ্রকিরণে দাঁড়াইলেন। রোহিণী দেখিয়া চমকিয়া উঠিল।

গোবিন্দলাল বলিলেন, "রোহিণি! তুমি এতক্ষণ একা বসিয়া কাঁদিতেছ কেন?"

রোহিণী উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু কথা কহিল না।

গোবিন্দলাল পুনরপি বলিলেন, "তোমার কিসের দুঃখ, আমায় কি বলিবে না? যদি আমি কোন উপকার করিতে পারি।"

যে রোহিণী হরলালের সম্মুখে মুখরার ন্যায় কথোপকথন করিয়াছিল-গোবিন্দলালের সম্মুখে সে রোহিণী একটি কথাও কহিতে পারিল না। কিছু বলিল না-গঠিত পুত্তলীর মত সেই সরোবরসোপানের শোভা বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। গোবিন্দলাল স্বচ্ছ সরোবরজলে সেই ভাস্করকীর্ত্তিকল্প মূর্ত্তির ছায়া দেখিলেন, পূর্ণচন্দ্রের ছায়া দেখিলেন এবং কুসুমিত কাঞ্চনাদি বৃক্ষের ছায়া দেখিলেন। সব সুন্দর-কেবল নির্দ্দয়তা অসুন্দর! সৃষ্টি করুণাময়ী-মনুষ্য অকরুণ। গোবিন্দলাল প্রকৃতির স্পষ্টাক্ষর পড়িলেন। রোহিণীকে আবার বলিলেন, "তোমার যদি কোন বিষয়ে কষ্ট থাকে, তবে আজি হউক, কালি হউক, আমাকে জানাইও। নিজে না বলিতে পার, তবে আমাদের বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগের দ্বারায় জানাইও।"

রোহিণী এবার কথা কহিল। বলিল, "এক দিন বলিব। আজ নহে। এক দিন তোমাকে আমার কথা শুনিতে হইবে।"

গোবিন্দলাল স্বীকৃত হইয়া, গৃহাভিমুখে গেলেন। রোহিণী জলে ঝাঁপ দিয়া কলসী ধরিয়া, তাহাতে জল পূরিল-কলসী তখন বক্-বক্-গল্ গল্ করিয়া বিস্তর আপত্তি করিল। আমি জানি, শূন্য কলসীতে জল পূরিতে গেলে কলসী, কি মৃৎকলসী, কি মনুষ্যকলসী, এইরূপ আপত্তি করিয়া থাকে-বড় গণ্ডগোল করে। পরে অন্তঃশূন্য কলসী, পূর্ণতোয় হইলে রোহিণী ঘাটে উঠিয়া আর্দ্রবস্ত্রে দেহ সুচারুরূপে সমাচ্ছাদিত করিয়া, ধীরে ধীরে ঘরে যাইতে লাগিল। তখন চলৎ ছলৎ ঠনাক্! ঝিনিক্ ঠিনিকি ঠিন! বলিয়া, কলসীতে আর কলসীর জলেতে আর রোহিণীর বালাতে কথোপকথন হইতে লাগিল। আর রোহিণীর মনও সেই কথোপকথনে আসিয়া যোগ দিল-

রোহিণীর মন বলিল-উইল চুরি করা কাজটা!

জল বলিল-ছলাৎ!

রোহিণীর মন-কাজটা ভাল হয় নাই।

বালা বলিল-ঠিন্ ঠিনা-না! তা ত না-

রোহিণীর মন-এখন উপায়?

কলসী-ঠনক্ ঢনক্ ঢন্-উপায় আমি,-দড়ি সহযোগে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রোহিণী সকাল সকাল পাককার্য্য সমাধা করিয়া, ব্রহ্মানন্দকে ভোজন করাইয়া, আপনি অনাহারে শয়নগৃহে দ্বার রুদ্ধ করিয়া গিয়া শয়ন করিল। নিদ্রার জন্য নহে-চিন্তার জন্য।

তুমি দার্শনিক এবং বিজ্ঞানবিদ্‌গণের মতামত ক্ষণকাল পরিত্যাগ করিয়া, আমার কাছে একটা মোটা কথা শুন। সুমতি নামে দেবকন্যা, এবং কুমতি নামে রাক্ষসী, এই দুই জন সর্ব্বদা মনুষ্যের হৃদয়ক্ষেত্রে বিচরণ করে; এবং সর্ব্বদা পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করে। যেমন দুইটা ব্যাঘ্রী, মৃত গাভী লইয়া পরস্পরে যুদ্ধ করে, যেমন দুই শৃগালী, মৃত নরদেহ লইয়া বিবাদ করে, ইহারা জীবন্ত মনুষ্য লইয়া সেইরূপ করে। আজি, এই বিজন শয়নাগারে, রোহিণীকে লইয়া সেই দুই জনে সেইরূপ ঘোর বিবাদ উপস্থিত করিয়াছিল।

সুমতি বলিতেছিল, “এমন লোকেরও সর্ব্বনাশ করিতে আছে?”

কুমতি। উইল ত হরলালকে দিই নাই। সর্ব্বনাশ কই করিয়াছি ?”

সু। কৃষ্ণকান্তের উইল কৃষ্ণকান্তকে ফিরাইয়া দাও।

কু। বাঃ, যখন কৃষ্ণকান্ত আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে, “এ উইল তুমি কোথায় পাইলে, আর আমার দেরাজে আর একখানা জাল উইলই বা কোথা হইতে আসিল,” তখন আমি কি বলিব? কি মজার কথা! কাকাতে আমাতে দুজনে থানায় যেতে বল না কি?

সু। তবে সকল কথা কেন গোবিন্দলালের কাছে খুলিয়া বলিয়া, তাঁহার পায়ে কাঁদিয়া পড় না? সে দয়ালু, অবশ্য তোমাকে রক্ষা করিবে।

কু। সেই কথা। কিন্তু গোবিন্দলালকে অবশ্য এ সকল কথা কৃষ্ণকান্তের কাছে জানাইতে হইবে, নইলে উইলের বদল ভাঙ্গিবে না। কৃষ্ণকান্ত যদি থানায় দেয়, তবে গোবিন্দলাল রাখিবে কি প্রকারে? বরং আর এক পরামর্শ আছে। এখন চুপ করিয়া থাক-আগে কৃষ্ণকান্ত মরুক, তার পর তোমার পরামর্শ মতে গোবিন্দলালের কাছে গিয়া তাঁহার পায়ে জড়াইয়া পড়িব। তখন তাঁহাকে উইল দিব।

সু। তখন বৃথা হইবে। যে উইল কৃষ্ণকান্তের ঘরে পাওয়া যাইবে, তাহাই সত্য বলিয়া গ্রাহ্য হইবে। গোবিন্দলাল সে উইল বাহির করিলে, জালের অপরাধগ্রস্ত হইতে পারে।

কু। তবে চুপ করিয়া থাক-যা হইয়াছে, তা হইয়াছে।

সুতরাং সুমতি চুপ করিল-তাহার পরাজয় হইল। তার পর দুই জনে সন্ধি করিয়া, সখ্যভাবে আর এক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। সেই বাপীতীরবিরাজিত, চন্দ্রালোকপ্রতিভাসিত, চম্পকদামবিনির্ম্মিত দেবমূর্ত্তি আনিয়া, রোহিণীর মানস চক্ষের অগ্রে ধরিল। রোহিণী দেখিতে লাগিল-দেখিতে, দেখিতে, দেখিতে, কাঁদিল। রোহিণী সে রাত্রে ঘুমাইল না।

নবম পরিচ্ছেদ

সেই অবধি নিত্য কলসী কক্ষে রোহিণী বারুণী পুষ্করিণীতে জল আনিতে যায়; নিত্য কোকিল ডাকে, নিত্য সেই গোবিন্দলালকে পুষ্পকাননমধ্যে দেখিতে পায়, নিত্য সুমতি কুমতিতে সন্ধিবিগ্রহ উভয়ই ঘটনা হয়। সুমতি কুমতির বিবাদ বিসংবাদ মনুষ্যের সহনীয়; কিন্তু সুমতি কুমতির সদ্ভাব অতিশয় বিপত্তিজনক।

তখন সুমতি কুমতির রূপ ধারণ করে, কুমতি সুমতির কাজ করে। তখন কে সুমতি, কে কুমতি, চিনিতে পারা যায় না। লোকে সুমতি বলিয়া কুমতির বশ হয়।

যাই হউক, কুমতি হউক, সুমতি হউক, গোবিন্দলালের রূপ রোহিণীর হৃদয়পটে দিন দিন গাঢ়তর বর্ণে অঙ্কিত করিতে লাগিল। অন্ধকার চিত্রপট-উজ্জ্বল চিত্র! দিন দিন চিত্র উজ্জ্বলতর, চিত্রপট গাঢ়তর অন্ধকার হইতে লাগিল। তখন সংসার তাহার চক্ষে-যাক্, পুরাতন কথা আমার তুলিয়া কাজ নাই। রোহিণী, সহসা গোবিন্দলালের প্রতি মনে মনে অতি গোপনে প্রণয়াসক্ত হইল। কুমতির পুনর্ব্বার জয় হইল।

কেন যে এত কালের পর, তাহার এ দুর্দ্দশা হইল, তাহা আমি বুঝিতে পারি না, এবং বুঝাইতেও পারি না। এই রোহিণী এই গোবিন্দলালকে বালককাল হইতে দেখিতেছে-কখনও তাহার প্রতি রোহিণীর চিত্ত আকৃষ্ট হয় নাই। আজি হঠাৎ কেন? জানি না। যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা তাহা বলিয়াছি। সেই দুষ্ট কোকিলের ডাকাডাকি, সেই বাপীতীরে রোদন, সেই কাল, সেই স্থান, সেই চিত্তভাব, তাহার পর গোবিন্দলালের অসময়ে করুণা-আবার গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর বিনাপরাধে অন্যায়াচরণ-এই সকল উপলক্ষে কিছু কাল ব্যাপিয়া গোবিন্দলাল রোহিণীর মনে স্থান পাইয়াছিল। তাহাতে কি হয় না হয়, তাহা আমি জানি না, যেমন ঘটিয়াছে, আমি তেমনি লিখিতেছি।

রোহিণী অতি বুদ্ধিমতী, একেবারেই বুঝিল যে, মরিবার কথা। যদি গোবিন্দলাল ঘুণাক্ষরে এ কথা জানিতে পারে, তবে কখনও তাহার ছায়া মাড়াইবে না। হয়ত গ্রামের বাহির করিয়া দিবে। কাহারও কাছে এ কথা বলিবার নহে। রোহিণী অতি যত্নে, মনের কথা মনে লুকাইয়া রাখিল।

কিন্তু যেমন লুক্কায়িত অগ্নি ভিতর হইতে দগ্ধ করিয়া আইসে, রোহিণীর চিত্তে তাহাই হইতে লাগিল। জীবনভার বহন করা, রোহিণীর পক্ষে কষ্টদায়ক হইল। রোহিণী মনে মনে রাত্রিদিন মৃত্যুকামনা করিতে লাগিল।

কত লোকে যে মনে মনে মৃত্যুকামনা করে, কে তাহার সংখ্যা রাখে? আমার বোধ হয়, যাহারা সুখী, যাহারা দুঃখী, তাহাদের মধ্যে অনেকেই কায়মনোবাক্যে মৃত্যুকামনা করে। এ পৃথিবীর সুখ সুখ নহে, সুখও দুঃখময়, কোন সুখেই সুখ নাই, কোন সুখই সম্পূর্ণ নহে, এই জন্য অনেক সুখী জনে মৃত্যুকামনা করে-আর দুঃখী, দুঃখের ভার আর বহিতে পারে না বলিয়া মৃত্যুকে ডাকে।

মৃত্যুকে ডাকে, কিন্তু কার কাছে মৃত্যু আসে? ডাকিলে মৃত্যু আসে না। যে সুখী, যে মরিতে চায় না, যে সুন্দর, যে যুবা, যে আশাপূর্ণ, যাহার চক্ষে পৃথিবী নন্দনকানন, মৃত্যু তাহারই কাছে আসে। রোহিণীর মত কাহারও কাছে আসে না। এ দিকে মনুষ্যের এমনি শক্তি অল্প যে, মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিতে পারে না। একটি ক্ষুদ্র সূচীবেধে, অর্দ্ধবিন্দু ঔষধ ভক্ষণে, এ নশ্বর জীবন বিনষ্ট হইতে পারে, এ চঞ্চল জলবিম্ব কালসাগরে মিলাইতে পারে-কিন্তু আন্তরিক মৃত্যুকামনা করিলেও প্রায় কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক সে সূচ ফুটায় না, সে অর্দ্ধবিন্দু ঔষধ পান করে না। কেহ কেহ তাহা পারে, কিন্তু রোহিণী সে দলের নহে-রোহিণী তাহা পারিল না।

কিন্তু এক বিষয়ে রোহিণী কৃতসংকল্প হইল-জাল উইল চালান হইবে না। ইহার এক সহজ উপায় ছিল-কৃষ্ণকান্তকে বলিলে, কি কাহারও দ্বারা বলাইলেই হইল যে, মহাশয়ের উইল চুরি গিয়াছে-দেরাজ খুলিয়া যে উইল আছে, তাহা পড়িয়া দেখুন। রোহিণী যে চুরি করিয়াছিল, ইহাও প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই-যেই চুরি করুক, কৃষ্ণকান্তের মনে একবার সন্দেহমাত্র জন্মিলে, তিনি সিন্দুক খুলিয়া উইল পড়িয়া দেখিবেন-তাহা হইলেই জাল উইল দেখিয়া নূতন উইল প্রস্তুত করিবেন। গোবিন্দলালের সম্পত্তি রক্ষা হইবে, অথচ কেহ জানিতে পারিবে না যে, কে উইল চুরি করিয়াছিল। কিন্তু ইহাতে এক বিপদ-কৃষ্ণকান্ত জাল উইল পড়িলেই জানিতে পারিবেন যে, ইহা ব্রহ্মানন্দের হাতের লেখা-তখন ব্রহ্মানন্দ মহা বিপদে পড়িবেন। অতএব দেরাজে যে জাল উইল আছে, ইহা কাহারও

সাক্ষাতে প্রকাশ করা যাইতে পারে না।

অতএব হরলালের লোভে রোহিণী, গোবিন্দলালের যে গুরুতর অনিষ্ট সিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তৎপ্রতিকারার্থ বিশেষ ব্যাকুলা হইয়াও সে খুল্লতাতের রক্ষানুরোধে কিছুই করিতে পারিল না। শেষ সিদ্ধান্ত করিল, যে প্রকারে প্রকৃত উইল চুরি করিয়া জাল উইল রাখিয়া আসিয়াছিল, সেই প্রকারে আবার প্রকৃত উইল রাখিয়া তৎপরিবর্ত্তে জাল উইল লইয়া আসিবে।

নিশীথকালে, রোহিণী সুন্দরী, প্রকৃত উইলখানি লইয়া সাহসে ভর করিয়া একাকিনী কৃষ্ণকান্ত রায়ের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। খড়্কীদ্বার রুদ্ধ; সদর ফটকে যথায় দ্বারবানেরা চারপাইয়ে উপবেশন করিয়া, অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে, অর্দ্ধরুদ্ধ কণ্ঠে, পিলু রাগিণীর পিতৃশ্রাদ্ধ করিতেছিলেন, রোহিণী সেইখানে উপস্থিত হইল। দ্বারবানেরা জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুই?" রোহিণী বলিল, "সখী।" সখী, বাটীর একজন যুবতী চাকরাণী, সুতরাং দ্বারবানেরা আর কিছু বলিল না। রোহিণী নির্ব্বিঘ্নে গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক, পূর্ব্বপরিচিত পথে কৃষ্ণকান্তের শয়নকক্ষে গেলেন–পুরী সুরক্ষিত বলিয়া কৃষ্ণকান্তের শয়নগৃহের দ্বার রুদ্ধ হইত না। প্রবেশকালে কাণ পাতিয়া রোহিণী শুনিল যে, অবাধে কৃষ্ণকান্তের নাসিকাগর্জ্জন হইতেছে। তখন ধীরে ধীরে বিনা শব্দে উইলচোর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া প্রথমেই দীপ নির্ব্বাপিত করিল। পরে পূর্ব্বমত, চাবি সংগ্রহ করিল। এবং পূর্ব্বমত, অন্ধকারে লক্ষ্য করিয়া, দেরাজ খুলিল।

রোহিণী অতিশয় সাবধান, হস্ত অতি কোমলগতি। তথাপি চাবি ফিরাইতে খট্ করিয়া একটু শব্দ হইল। সেই শব্দে কৃষ্ণকান্তের নিদ্রাভঙ্গ হইল।

কৃষ্ণকান্ত ঠিক বুঝিতে পারিলেন না যে, কি শব্দ হইল। কোন সাড়া দিলেন না–কাণ পাতিয়া রহিলেন।

রোহিণীও দেখিলেন যে, নাসিকাগর্জ্জনশব্দ বন্ধ হইয়াছে। রোহিণী বুঝিলেন, কৃষ্ণকান্তের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। রোহিণী নিঃশব্দে স্থির হইয়া রহিলেন।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "কে ও?" কেহ কোন উত্তর দিল না।

সে রোহিণী আর নাই। রোহিণী এখন শীর্ণা, ক্লিষ্টা, বিবশা–বোধ হয় একটু ভয় হইয়াছিল–একটু নিশ্বাসের শব্দ হইয়াছিল। নিশ্বাসের শব্দ কৃষ্ণকান্তের কাণে গেল।

কৃষ্ণকান্ত হরিকে বার কয় ডাকিলেন। রোহিণী মনে করিলে এই অবসরে পলাইতে পারিত, কিন্তু তাহা হইলে গোবিন্দলালের প্রতীকার হয় না। রোহিণী মনে মনে ভাবিল, "দুষ্কর্ম্মের জন্য সে দিন যে সাহস করিয়াছিলাম, আজ সৎকর্ম্মের জন্য তাহা করিতে পারি না কেন? ধরা পড়ি পড়িব।" রোহিণী পলাইল না।

কৃষ্ণকান্ত কয় বার হরিকে ডাকিয়া কোন উত্তর পাইলেন না। হরি স্থানান্তরে সুখানুসন্ধানে গমন করিয়াছিল–শীঘ্র আসিবে। তখন কৃষ্ণকান্ত উপাধানতল হইতে অগ্নিগর্ভ দীপশলাকা গ্রহণপূর্ব্বক সহসা আলোক উৎপাদন করিলেন। শলাকালোকে দেখিলেন, গৃহমধ্যে, দেরাজের কাছে, স্ত্রীলোক।

জ্বালিত শলাকাসংযোগে কৃষ্ণকান্ত বাতি জ্বালিলেন। স্ত্রীলোককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তুমি কে?"

রোহিণী কৃষ্ণকান্তের কাছে গেল। বলিল, "আমি রোহিণী"।

কৃষ্ণকান্ত বিস্মিত হইলেন, বলিলেন, "এত রাত্রে অন্ধকারে এখানে কি করিতেছিলে?"

রোহিণী বলিল, "চুরি করিতেছিলাম।"

কৃষ্ণ। রঙ্গ রহস্য রাখ। কেন এ অবস্থায় তোমাকে দেখিলাম বল। তুমি চুরি করিতে আসিয়াছ, এ কথা সহসা আমার বিশ্বাস হয় না, কিন্তু চোরের অবস্থাতেই তোমাকে দেখিতেছি।

রোহিণী বলিল, "তবে আমি যাহা করিতে আসিয়াছি, তাহা আপনার সম্মুখেই করি, দেখুন। পরে আমার প্রতি যেমন ব্যবহার উচিত হয়, করিবেন। আমি

ধরা পড়িয়াছি, পলাইতে পারিব না। পলাইব না।”

এই বলিয়া রোহিণী, দেরাজের কাছে প্রত্যাগমন করিয়া দেরাজ টানিয়া খুলিল। তাহার ভিতর হইতে জাল উইল বাহির করিয়া, প্রকৃত উইল সংস্থাপিত করিল। পরে জাল উইলখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ফাড়িয়া ফেলিল।

“হাঁ হাঁ, ও কি ফাড়? দেখি দেখি” বলিয়া কৃষ্ণকান্ত চীৎকার করিলেন। কিন্তু তিনি চীৎকার করিতে করিতে রোহিণী সেই খণ্ডে খণ্ডে বিচ্ছিন্ন উইল, অগ্নিমুখে সমর্পণ করিয়া ভস্মাবশেষ করিল।

কৃষ্ণকান্ত ক্রোধে লোচন আরক্ত করিয়া বলিলেন, “ও কি পোড়াইলি?”

রোহিণী। একখানি কৃত্রিম উইল।

কৃষ্ণকান্ত শিহরিয়া উঠিলেন, “উইল! উইল! আমার উইল কোথায়?”

রো। আপনার উইল দেরাজের ভিতর আছে, আপনি দেখুন না।

এই যুবতীর স্থিরতা, নিশ্চিন্ততা দেখিয়া কৃষ্ণকান্ত বিস্মিত হইতে লাগিলেন। ভাবিলেন, “কোন দেবতা ছলনা করিতে আসেন নাই ত?”

কৃষ্ণকান্ত তখন দেরাজ খুলিয়া দেখিলেন, একখানি উইল তন্মধ্যে আছে। সেখানি বাহির করিলেন, চশমা বাহির করিলেন; উইলখানি পড়িয়া দেখিয়া জানিলেন, তাঁহার প্রকৃত উইল বটে। বিস্মত হইয়া পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি পোড়াইলে কি?”

রো। একখানি জাল উইল।

কৃ। জাল উইল। জাল উইল কে করিল? তুমি তাহা কোথা পাইলে?

রো। কে করিল, তাহা বলিতে পারি না-উহা আমি এই দেরাজের মধ্যে পাইয়াছি।

কৃ। তুমি প্রকারে সন্ধান জানিলে যে, দেরাজের ভিতর কৃত্রিম উইল আছে?

রো। তাহা আমি বলিতে পারিব না।

কৃষ্ণকান্ত কিয়ৎকাল চিন্তা করিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন, “যদি আমি তোমার মত স্ত্রীলোকের ক্ষুদ্রবুদ্ধির ভিতর প্রবেশ করিতে না পারিব, তবে এ বিষয় সম্পত্তি এত কাল রক্ষা করিলাম কি প্রকারে? এ জাল উইল হরলালের তৈয়ারি। বোধ হয় তুমি তাহার কাছে টাকা খাইয়া জাল উইল রাখিয়া আসল উইল চুরি করিতে আসিয়াছিলে! তার পর ধরা পড়িয়া ভয়ে জাল উইলখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছ। ঠিক কথা কি না?”

রো। তাহা নহে।

কৃ। তাহা নহে? তবে কি?

রো। আমি কিছু বলিব না। আমি আপনার ঘরে চোরের মত প্রবেশ করিয়াছিলাম, আমাকে যাহা করিতে হয় করুন।

কৃ। তুমি মন্দ কর্ম্ম করিতে আসিয়াছিলে সন্দেহ নাই, নহিলে এ প্রকারে চোরের মত আসিবে কেন? তোমার উচিত দণ্ড অবশ্য করিব। তোমাকে পুলিসে দিব না, কিন্তু কাল তোমার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া গ্রামের বাহির করিয়া দিব। আজ তুমি কয়েদ থাক।

রোহিণী সে রাত্রে আবদ্ধ রহিল।

দশম পরিচ্ছেদ

সেই রাত্রের প্রভাতে শয্যাগৃহে মুক্ত বাতায়নপথে দাঁড়াইয়া, গোবিন্দলাল। ঠিক প্রভাত হয় নাই-কিছু বাকি আছে। এখনও গৃহপ্রাঙ্গণস্থ কামিনীকুঞ্জে, কোকিল প্রথম ডাক ডাকে নাই। কিন্তু দোয়েল গীত আরম্ভ করিয়াছে। ঊষার শীতল বাতাস উঠিয়াছে-গোবিন্দলাল বাতায়নপথ মুক্ত করিয়া, সেই উদ্যানস্থিত মল্লিকা গন্ধরাজ কুটজের পরিমলবাহী শীতল প্রভাতবায়ু সেবনজন্য তৎসমীপে দাঁড়াইলেন। অমনি তাঁহার পাশে আসিয়া একটি ক্ষুদ্রশরীরা বালিকা দাঁড়াইল।

গোবিন্দলাল বলিলেন, "আবার তুমি এখানে কেন?"

বালিকা বলিল, "তুমি এখানে কেন?" বলিতে হইবে না যে, এই বালিকা গোবিন্দলালের স্ত্রী।

গোবিন্দ। আমি একটু বাতাস খেতে এলেম, তাও কি তোমার সইল না?

বালিকা বলিল, "সবে কেন? এখনই আবার খাই খাই? ঘরের সামগ্রী খেয়ে মন ওঠে না, আবার মাঠে ঘাটে বাতাস খেতে উঁকি মারেন!"

গো। ঘরের সামগ্রী এত কি খাইলাম?

"কেন, এইমাত্র আমার কাছে গালি খাইয়াছ?"

গোবিন্দ। জান না, ভোমরা, গালি খাইলে যদি বাঙ্গালীর ছেলের পেট ভরিত, তাহা হইলে এ দেশের লোক এতদিনে সগোষ্ঠী বদ হজমে মরিয়া যাইত। ও সামগ্রীটি অতি সহজে বাঙ্গালা পেটে জীর্ণ হয়। তুমি আর একবার নথ নাড়ো, ভোমরা, আমি আর একবার দেখি।

গোবিন্দলালের পত্নীর যথার্থ নাম কৃষ্ণমোহিনী, কি কৃষ্ণকামিনী, কি অনঙ্গমঞ্জরী, কি এমনই একটা কি তাঁহার পিতা-মাতা রাখিয়াছিল, তাহা ইতিহাসে লেখে না। অব্যবহারে, সে নাম লোপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার আদরের নাম "ভ্রমর" বা "ভোমরা"। সার্থকতাবশতঃ সেই নামই প্রচলিত হইয়াছিল। ভোমরা কালো।

ভোমরা নথ নাড়ার পক্ষে বিশেষ আপত্তি জানাইবার জন্য নথ খুলিয়া, একটা হুকে রাখিয়া, গোবিন্দলালের নাক ধরিয়া নাড়িয়া দিল। পরে গোবিন্দলালের মুখপানে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল,-মনে মনে জ্ঞান, যেন বড় একটা কীর্ত্তি করিয়াছি। গোবিন্দলালও তাহার মুখপানে চাহিয়া অতৃপ্তলোচনে দৃষ্টি করিতেছিলেন। সেই সময়ে সূর্য্যোদয়সূচক প্রথম রশ্মিকিরীট পূর্ব্বগগনে দেখা দিল-তাহার মৃদুল জ্যোতিঃপুঞ্জ ভূমণ্ডলে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। নবীনালোক পূর্ব্বদিক্ হইতে আসিয়া পূর্ব্বমুখী ভ্রমরের মুখের উপর পড়িয়াছিল। সেই উজ্জ্বল, পরিষ্কার, কোমল, শ্যামচ্ছবি মুখকান্তির উপর কোমল প্রভাতালোক পড়িয়া তাহার বিস্ফারিত লীলাচঞ্চল চক্ষের উপর জ্বলিল, তাহার স্নিগ্ধোজ্জ্বল গণ্ডে প্রভাসিত হইল। হাসি-চাহনিতে, সেই আলোতে, গোবিন্দলালের আদরে আর প্রভাতের বাতাসে-মিলিয়া গেল।

এই সময়ে সুপ্তোত্থিতা চাকরাণী মহলে একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল। তৎপরে ঘর ঝাঁটান, জল ছড়ান, বাসন মাজা, ইত্যাদির একটা সপ্ সপ্ ছপ্ ছপ্ ঝন্ ঝন্ খ্‌ন খন্ শব্দ হইতেছিল, অকস্মাৎ সে শব্দ বন্ধ হইয়া, "ও মা, কি হবে!" "কি সর্ব্বনাশ!" "কি আস্পর্দ্ধা!" "কি সাহস!" মাঝে মাঝে হাসি টিট্‌কারি ইত্যাদি গোলযোগ উপস্থিত হইল। শুনিয়া ভ্রমর বাহিরে আসিল।

চাকরাণী সম্প্রদায় ভ্রমরকে বড় মানিত না, তাহার কতকগুলি কারণ ছিল। একে ভ্রমর ছেলে মানুষ, তাতে ভ্রমর স্বয়ং গৃহিণী নহেন, তাঁহার শাশুড়ী ননদ ছিল, তার পর আবার ভ্রমর নিজে হাসিতে যত পটু, শাসনে তত পটু ছিলেন না। ভ্রমরকে দেখিয়া চাকরাণীর দল বড় গোলযোগ বাড়াইল-

নং ১–আর শুনেছ বৌ ঠাকরুণ?

নং ২–এমন সর্ব্বনেশে কথা কেহ কখনও শুনে নাই।

নং ৩–কি সাহস! মাগীকে ঝাঁটাপেটা করে আস্‌বো এখন।

নং ৪–শুধু ঝাঁটা-বৌ ঠাকরুণ–বল, আমি তার নাক কেটে নিয়ে আসি।

নং ৫–কার পেটে কি আছে মা–তা কেমন করে জান্‌বো মা–

ভ্রমরা হাসিয়া বলিল, "আগে বল না কি হয়েছে, তার পর যার মনে যা থাকে করিস।" তখনই আবার পূর্ব্ববৎ গোলযোগ আরম্ভ হইল।

নং ১–বলিল–শোন নি! পাড়াশুদ্ধ গোলমাল হয়ে গেল যে–

নং ২–বলিল–বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা!

নং ৩–মাগীর ঝাঁটা দিয়ে বিষ ঝাড়িয়া দিই।

নং ৪–কি বল্‌ব বৌ ঠাকরুণ, বামন হয়ে চাঁদে হাত!

নং ৫–ভিজে বেরালকে চিন্‌তে জোগায় না। গলায় দড়ি! গলায় দড়ি!

ভ্রমর বলিলেন, "তোদের।"

চাকরাণীরা তখন একবাক্যে বলিতে লাগিল, "আমাদের কি দোষ! আমরা কি করিলাম! তা জানি গো জানি। যে যেখানে যা কর্‌বে, দোষ হবে আমাদের! আমাদের আর উপায় নাই বলিয়া গতর খাটিয়ে খেতে এসেছি।" এই বক্তৃতা সমাপন করিয়া, দুই এক জন চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। এক জনের মৃত পুত্রের শোক উছলিয়া উঠিল। ভ্রমর কাতর হইলেন–কিন্তু হাসিও সম্বরণ করিতে পারিলেন না। বলিলেন, "তোদের গলায় দড়ি এই জন্য যে, এখনও তোরা বলিতে পারিলি না যে, কথাটা কি! কি হয়েছে?"

তখন আবার চারি দিক্ হইতে চারি পাঁচ রকমের গলা ছুটিল। বহু কষ্টে, ভ্রমর, সেই অনন্ত বক্তৃতাপরম্পরা হইতে এই ভাবার্থ সঙ্কলন করিলেন যে, গত রাত্রে কর্ত্তা মহাশয়ের শয়নকক্ষে একটা চুরি হইয়াছে। কেহ বলিল, চুরি নহে, ডাকাতি, কেহ বলিল, সিঁদ, কেহ বলিল, না, কেবল জন চারি পাঁচ চোর আসিয়া লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ লইয়া গিয়াছে।

ভ্রমর বলিল, " তার পর? কোন্ মাগীর নাক কাটিতে চাহিতেছিলি?"

নং ১–রোহিণী ঠাকরুণের–আর কার?

নং ২–সেই আবাগীই ত সর্ব্বনাশের গোড়া।

নং ৩–সেই না কি ডাকাতের দল সঙ্গে করিয়া নিয়ে এসেছিল।

নং ৪–যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।

নং ৫–এখন মরুন জেল খেটে।

ভ্রমর জিজ্ঞাসা করিল, "রোহিণী যে চুরি করিতে আসিয়াছিল, তোরা কেমন করে জানলি?"

"কেন, সে যে ধরা পড়েছে। কাছারির গারদে কয়েদ আছে।"

ভ্রমর যাহা শুনিলেন, তাহা গিয়া গোবিন্দলালকে বলিলেন। গোবিন্দলাল ভাবিয়া ঘাড় নাড়িলেন।

ভ্র। ঘাড় নাড়িলে যে?

গো। আমার বিশ্বাস হইল না যে, রোহিণী চুরি করিতে আসিয়াছিল। তোমার বিশ্বাস হয়?

ভোমরা বলিল, "না।"

গো। কেন তোমার বিশ্বাস হয় না, আমায় বল দেখি? লোকে ত বলিতেছে।

ভ্র। তোমার কেন বিশ্বাস হয় না, আমায় বল দেখি?

গো। তা সময়ান্তরে বলিব। তোমার বিশ্বাস হইতেছে না কেন, আগে বল।

ভ্র। তুমি আগে বল।

গোবিন্দলাল হাসিল, বলিল,"তুমি আগে।"

ভ্র। কেন আগে বলিব?

গো। আমার শুনিতে সাধ হইয়াছে।

ভ্র। সত্য বলিব?

গো। সত্য বল।

ভ্রমর বলি বলি করিয়া বলিতে পারিল না। লজ্জাবনতমুখী হইয়া নীরবে রহিল। গোবিন্দলাল বুঝিলেন। আগেই বুঝিয়াছিলেন। আগেই বুঝিয়াছিলেন বলিয়া এত পীড়াপীড়ি করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। রোহিণী যে নিরপরাধিনী, ভ্রমরের তাহা দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল। আপনার অস্তিত্বে যত দূর বিশ্বাস, ভ্রমর উহার নির্দ্দোষিতায় তত দূর বিশ্বাসবতী। কিন্তু সে বিশ্বাসের অন্য কোনই কারণ ছিল না–কেবল গোবিন্দলাল বলিয়াছেন যে, "সে নির্দ্দোষী, আমার এইরূপ বিশ্বাস।" গোবিন্দলালের বিশ্বাসেই ভ্রমরের বিশ্বাস। গোবিন্দলাল তাহা বুঝিয়াছিলেন। ভ্রমরকে চিনিতেন। তাই সে কালো এত ভালবাসিতেন।

হাসিয়া গোবিন্দলাল বলিলেন, "আমি বলিব, কেন তুমি রোহিণীর দিকে?"

ভ্র। কেন?

গো। সে তোমায় কালো না বলিয়া উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলে।

ভ্রমর কোপকুটিল কটাক্ষ করিয়া বলিল, "যাও।"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "যাই।" এই বলিয়া গোবিন্দলাল চলিলেন।

ভ্রমর তাঁহার বসন ধরিল–"কোথা যাও?"

গো। কোথা যাই বল দেখি?

ভ্র। এবার বলিব?

গো। বল দেখি?

ভ্র। রোহিণীকে বাঁচাইতে।

"তাই।" বলিয়া গোবিন্দলাল ভোমরার মুখচুম্বন করিলেন। পরদুঃখকাতরের হৃদয় পরদুঃখকাতরে বুঝিল-তাই গোবিন্দলাল ভ্রমরের মুখচুম্বন করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

গোবিন্দলাল কৃষ্ণকান্ত রায়ের সদর কাছারিতে গিয়া দর্শন দিলেন।

কৃষ্ণকান্ত প্রাতঃকালেই কাছারিতে বসিয়াছিলেন। গদির উপর মস্‌নদ করিয়া বসিয়া, সোণার আলবোলায় অম্বুরি তামাকু চড়াইয়া, মর্ত্ত্যলোকে স্বর্গের অনুকরণ করিতেছিলেন। এক পাশে রাশি রাশি দপ্তরে বাঁধা চিঠা, খতিয়ান, দাখিলা, জমাওয়াশীল, থোকা, করচা, বাকি জায়, শেহা, রোকড়-আর এক পাশে নায়েব, গোমস্তা, কারকুন, মুহরি, তহশীলদার, আমীন, পাইক, প্রজা। সম্মুখে অধোবদনা অবগুণ্ঠনবতী রোহিণী।

গোবিন্দলাল আদরের ভ্রাতুষ্পুত্র। প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে, জ্যেঠা মহাশয়?"

তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া, রোহিণী অবগুণ্ঠন ঈষৎ মুক্ত করিয়া, তাঁহার প্রতি ক্ষণিক কটাক্ষ করিল। কৃষ্ণকান্ত তাঁহার কথায় কি উত্তর করিলেন, তৎপ্রতি গোবিন্দলাল বিশেষ মনোযোগ করিতে পারিলেন না; ভাবিলেন, সেই কটাক্ষের অর্থ কি। শেষ সিদ্ধান্ত করিলেন, "এ কাতর কটাক্ষের অর্থ, ভিক্ষা।"

কি ভিক্ষা? গোবিন্দলাল ভাবিলেন, আর্ত্তের ভিক্ষা আর কি? বিপদ্ হইতে উদ্ধার। সেই বাপীতীরে সোপানোপরে দাঁড়াইয়া যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাও তাঁহার এই সময়ে মনে পড়িল। গোবিন্দলাল রোহিণীকে বলিয়াছিলেন, "তোমার যদি কোন বিষয়ের কষ্ট থাকে, তবে আজি হউক, কালি হউক, আমাকে জানাইও।" আজি ত রোহিণীর কষ্ট বটে, বুঝি এই ইঙ্গিতে রোহিণী তাঁহাকে তাহা জানাইল।

গোবিন্দলাল মনে মনে ভাবিলেন, "তোমার মঙ্গল সাধি, ইহা আমার ইচ্ছা; কেন না, ইহলোকে তোমার সহায় কেহ নাই দেখিতেছি। কিন্তু তুমি যে লোকের হাতে পড়িয়াছ-তোমার রক্ষা সহজে নহে।" এই ভাবিয়া প্রকাশ্যে জ্যেষ্ঠতাতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে, জ্যেঠা মহাশয়?"

বৃদ্ধ কৃষ্ণকান্ত একবার সকল কথা আনুপূর্ব্বিক গোবিন্দলালকে বলিয়াছিলেন, কিন্তু গোবিন্দলাল রোহিণীর কটাক্ষের ব্যাখ্যায় ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, কাণে কিছুই শুনেন নাই। ভ্রাতুষ্পুত্র আবার জিজ্ঞাসা করিল, " কি হয়েছে, জ্যেঠা মহাশয়?" শুনিয়া বৃদ্ধ মনে মনে ভাবিল, "হয়েছে! ছেলেটা বুঝি মাগীর চাঁদপানা মুখখানা দেখে ভুলে গেল!" কৃষ্ণকান্ত আবার আনুপূর্ব্বিক গত রাত্রের বৃত্তান্ত গোবিন্দলালকে শুনাইলেন। সমাপন করিয়া বলিলেন, "এ সেই হরা পাজির কারসাজি। বোধ হইতেছে, এ মাগী তাহার কাছে টাকা খাইয়া, জাল উইল রাখিয়া, আসল উইল চুরি করিবার জন্য আসিয়াছিল। তার পর ধরা পড়িয়া ভয়ে জাল উইল ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে।"

গো। রোহিণী কি বলে?

কৃ। ও আর বলিবে কি? বলে, তা নয়।

গোবিন্দলাল রোহিণীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা নয় ত তবে কি রোহিণি?"

রোহিণী মুখ না তুলিয়া, গদগদ কণ্ঠে বলিল, "আমি আপনাদের হাতে পড়িয়াছি, যাহা করিবার হয় করুন। আমি আর কিছু বলিব না।"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "দেখিলে বদ্‌জাতি?"

গোবিন্দলাল মনে মনে ভাবিলেন, এ পৃথিবীতে সকলেই বদ্‌জাত নহে। ইহার ভিতর বদ্‌জাতি ছাড়া আর কিছু থাকিতে পারে। প্রকাশ্যে বলিলেন, "ইহার প্রতি কি হুকুম দিয়াছেন? একে কি থানায় পাঠাইবেন?"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, “আমার কাছে আবার থানা ফৌজদারি কি! আমিই থানা, আমিই মেজেষ্টর, আমিই জজ। বিশেষ এই ক্ষুদ্র স্ত্রীলোককে জেলে দিয়া আমার কি পৌরুষ বাড়িবে?”

গোবিন্দলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, “তবে কি করিবেন?”

কৃ। ইহার মাথা মুড়াইয়া, ঘোল ঢালিয়া, কুলার বাতাস দিয়া গ্রামের বাহির করিয়া দিব। আমার এলেকায় আর না আসিতে পারে।

গোবিন্দলাল আবার রোহিণীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি বল, রোহিণি?”

রোহিণী বলিল, “ক্ষতি কি!”

গোবিন্দলাল বিস্মিত হইলেন। কিঞ্চিৎ ভাবিয়া কৃষ্ণকান্তকে বলিলেন, “একটা নিবেদন আছে।”

কৃ। কি?

গো। ইহাকে একবার ছাড়িয়া দিন। আমি জামিন হইতেছি–বেলা দশটার সময়ে আনিয়া দিব।

কৃষ্ণকান্ত ভাবিলেন, “বুঝি যা ভেবেছি, তাই। বাবাজির কিছু গরজ দেখছি।” প্রকাশ্যে বলিলেন, “কোথায় যাইবে? কেন ছাড়িব?”

গোবিন্দলাল বলিলেন, “আসল কথা কি, জানা নিতান্ত কর্ত্তব্য। এত লোকের সাক্ষাতে আসল কথা এ প্রকাশ করিবে না। ইহাকে একবার অন্দরে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিব।”

কৃষ্ণকান্ত ভাবিলেন, “ওর গোষ্ঠীর মুণ্ডু কর্‌বে। এ কালের ছেলেপুলে বড় বেহায়া হয়ে উঠেছে। রহ ছুঁচো! আমিও তোর উপর এক চাল চালিব।” এই ভাবিয়া কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, “বেশ ত।” বলিয়া কৃষ্ণকান্ত একজন নগ্দীকে বলিলেন, “ও রে! একে সঙ্গে করিয়া, একজন চাকরাণী দিয়া, মেজ বৌমার কাছে পাঠিয়ে দে ত, দেখিস্, যেন পালায় না।”

নগ্দী রোহিণীকে লইয়া গেল। গোবিন্দলাল প্রস্থান করিলেন। কৃষ্ণকান্ত ভাবিলেন, “দুর্গা! দুর্গা! ছেলেগুলো হলো কি?”

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

গোবিন্দলাল অন্তঃপুরে আসিয়া দেখিলেন যে, ভ্রমর, রোহিণীকে লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ভাল কথা বলিবার ইচ্ছা, কিন্তু পাছে এ দায় সম্বন্ধে ভাল কথা বলিলেও রোহিণীর কান্না আসে, এ জন্য তাহাও বলিতে পারিতেছে না। গোবিন্দলাল আসিলেন দেখিয়া ভ্রমর যেন দায় হইতে উদ্ধার পাইল। শীঘ্রগতি দূরে গিয়া গোবিন্দলালকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিল। গোবিন্দলাল ভ্রমরের কাছে গেলেন। ভ্রমর গোবিন্দলালকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, “রোহিণী এখানে কেন?”

গোবিন্দলাল বলিলেন, “আমি গোপনে উহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিব। তাহার পর উহার কপালে যা থাকে, হবে।”

ভ্র। কি জিজ্ঞাসা করিবে?

গো। উহার মনের কথা। আমাকে উহার কাছে একা রাখিয়া যাইতে যদি তোমার ভয় হয়, তবে না হয়, আড়াল হইতে শুনিও।

ভোমরা বড় অপ্রতিভ হইল। লজ্জায় অধোমুখী হইয়া, ছুটিয়া সে অঞ্চল হইতে পলাইল। একেবারে পাকশালায় উপস্থিত হইয়া, পিছন হইতে পাচিকার চুল ধরিয়া টানিয়া বলিল, “রাধুনি ঠাকুরঝি! রাঁধ্‌তে রাঁধ্‌তে একটি রূপকথা বল না।”

এ দিকে গোবিন্দলাল, রোহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ বৃত্তান্ত আমাকে সকল বিশেষ করিয়া বলিবে কি?” বলিবার জন্য রোহিণীর বুক ফাটিয়া

যাইতেছিল-কিন্তু যে জাতি জীয়ন্তে জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিত, রোহিণীও সেই জাতীয়া-আর্য্যকন্যা। বলিল, “কর্ত্তার কাছে সবিশেষ শুনিয়াছেন ত!”

গো। কর্ত্তা বলেন, তুমি জাল উইল রাখিয়া, আসল উইল চুরি করিতে আসিয়াছিলে।

তাই কি?

রো। তা নয়।

গো। তবে কি?

রো। বলিয়া কি হইবে?

গো। তোমার ভাল হইতে পারে।

রো। আপনি বিশ্বাস করিলে ত?

গো। বিশ্বাসযোগ্য কথা হইলে কেন বিশ্বাস করিব না?

রো। বিশ্বাসযোগ্য কথা নহে।

গো। আমার কাছে কি বিশ্বাসযোগ্য, কি অবিশ্বাসযোগ্য, তাহা আমি জানি, তুমি জানিবে কি প্রকারে? আমি অবিশ্বাসযোগ্য কথাতেও কখনও কখনও বিশ্বাস করি।

রোহিণী মনে মনে বলিল, “নহিলে আমি তোমার জন্যে মরিতে বসিব কেন? যাই হৌক, আমি ত মরিতে বসিয়াছি, কিন্তু তোমায় একবার পরীক্ষা করিয়া মরিব।”প্রকাশ্যে বলিল, “সে আপনার মহিমা। কিন্তু আপনাকে এ দুঃখের কাহিনী বলিয়াই বা কি হইবে?”

গো। যদি আমি তোমার কোন উপকার করিতে পারি।

রো। কি উপকার করিবেন?

গোবিন্দলাল ভাবিলেন, “ইহার যোড়া নাই। যাই হউক, এ কাতরা-ইহাকে সহজে পরিত্যাগ করা নহে।” প্রকাশ্যে বলিলেন, “যদি পারি, কর্ত্তাকে অনুরোধ করিব। তিনি তোমায় ত্যাগ করিবেন।”

রো। আর যদি আপনি অনুরোধ না করেন, তবে তিনি আমায় কি করিবেন?

গো। শুনিয়াছ ত?

রো। আমার মাথা মুড়াইবেন, ঘোল ঢালিয়া দিবেন, দেশ হইতে বাহির করিয়া দিবেন। ইহার ভাল মন্দ কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।-এ কলঙ্কের পর, দেশ হইতে বাহির করিয়া দিলেই আমার উপকার। আমাকে তাড়াইয়া না দিলে, আমি আপনিই এ দেশ ত্যাগ করিয়া যাইব। আর এ দেশে মুখ দেখাইব কি প্রকারে? ঘোল ঢালা বড় গুরুতর দণ্ড নয়, ধুইলেই ঘোল যাইবে। বাকি এই কেশ-

এই বলিয়া রোহিণী একবার আপনার তরঙ্গক্ষুব্ধ কৃষ্ণতড়াগতুল্য কেশদাম প্রতি দৃষ্টি করিল-বলিতে লাগিল, “এই কেশ-আপনি কাঁচি আনিতে বলুন, আমি বৌ ঠাকুরুণের চুলের দড়ি বিনাইবার জন্য ইহার সকলগুলি কাটিয়া দিয়া যাইতেছি।”

গোবিন্দলাল ব্যথিত হইলেন। দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, “বুঝেছি রোহিণি। কলঙ্কই তোমার দণ্ড। সে দণ্ড হইতে রক্ষা না হইলে, অন্য দণ্ডে তোমার আপত্তি নাই।”

রোহিণী এবার কাঁদিল। হৃদয়মধ্যে গোবিন্দলালকে শত সহস্র ধন্যবাদ করিতে লাগিল। বলিল, “যদি বুঝিয়াছেন, তবে জিজ্ঞাসা করি, এ কলঙ্কদণ্ড হইতে কি আমায় রক্ষা করিতে পারিবেন?”

গোবিন্দলাল কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, “বলিতে পারি না। আসল কথা শুনিতে পাইলে, বলিতে পারি যে, পারিব কি না।”

রোহিণী বলিল, “কি জানিতে চাহেন, জিজ্ঞাসা করুন।”

গো। তুমি যাহা পোড়াইয়াছ, তাহা কি?

রো। জাল উইল।

গো। কোথায় পাইয়াছিলে?

রো। কর্ত্তার ঘরে, দেরাজে।

গো। জাল উইল সেখানে কি প্রকারে আসিল?

রো। আমিই রাখিয়া গিয়াছিলাম। যে দিন আসল উইল লেখাপড়া হয়, সেই দিন রাত্রে আসিয়া, আসল উইল চুরি করিয়া, জাল উইল রাখিয়া গিয়াছিলাম।

গো। কেন, তোমার কি প্রয়োজন?

রো। হরলাল বাবুর অনুরোধে।

গোবিন্দলাল বলিলেন, “তবে কাল রাত্রে আবার কি করিতে আসিয়াছিলে?”

রো। আসল উইল রাখিয়া, জাল উইল চুরি করিবার জন্য।

গো। কেন? জাল উইলে কি ছিল?

রো। বড় বাবুর বার আনা-আপনার এক পাই।

গো। কেন আবার উইল বদলাইতে আসিয়াছিলে? আমি ত কোন অনুরোধ করি নাই।

রোহিণী কাঁদিতে লাগিল। বহু কষ্টে রোদন সংবরণ করিয়া বলিল, “না-অনুরোধ করেন নাই-কিন্তু যাহা আমি ইহজন্মে কখনও পাই নাই-যাহা ইহজন্মে আর কখনও পাইব না-আপনি আমাকে তাহা দিয়াছিলেন।”

গো। কি সে রোহিণি?

রো। সেই বারুণী পুকুরের তীরে, মনে করুন।

গো। কি রোহিণি?

রো। কি? ইহজন্মে আমি বলিতে পারিব না-কি। আর কিছু বলিবেন না। এ রোগের চিকিৎসা নাই-আমার মুক্তি নাই। আমি বিষ পাইলে খাইতাম। কিন্তু সে আপনার বাড়ীতে নহে। আপনি আমার অন্য উপকার করিতে পারেন না-কিন্তু এক উপকার করিতে পারেন,-একবার ছাড়িয়া দিন, কাঁদিয়া আসি। তারপর যদি আমি বাঁচিয়া থাকি, তবে না হয়, আমার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া দেশছাড়া করিয়া দিবেন।

গোবিন্দলাল বুঝিলেন। দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায় রোহিণীর হৃদয় দেখিতে পাইলেন। বুঝিলেন, যে মন্ত্রে ভ্রমর মুগ্ধ, এ ভুজঙ্গীও সেই মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়াছে। তাঁহার আহ্লাদ হইল না-রাগও হইল না-সমুদ্রবৎ সে হৃদয়, তাহা উদ্বেলিত করিয়া দয়ার উচ্ছ্বাস উঠিল। বলিলেন, “রোহিণি, মৃত্যুই বোধ হয় তোমার ভাল,

কিন্তু মরণে কাজ নাই। সকলেই কাজ করিতে এ সংসারে আসিয়াছি। আপনার আপনার কাজ না করিয়া মরিব কেন?"

গোবিন্দলাল ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। রোহিণী বলিল, "বলুন না?"

গো। তোমাকে এ দেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে।

রো। কেন?

গো। তুমি আপনিই ত বলিয়াছিলে, তুমি এ দেশ ত্যাগ করিতে চাও।

রো। আমি বলিতেছিলাম লজ্জায়, আপনি বলেন কেন?

গো। তোমায় আমায় আর দেখা শুনা না হয়।

রোহিণী দেখিল, গোবিন্দলাল সব বুঝিয়াছেন। মনে মনে বড় অপ্রতিভ হইল-বড় সুখী হইল। তাহার সমস্ত যন্ত্রণা ভুলিয়া গেল। আবার তাহার বাঁচিতে সাধ হইল। আবার তাহার দেশে থাকিতে বাসনা জন্মিল। মনুষ্য বড়ই পরাধীন।

রোহিণী বলিল, "আমি এখনই যাইতে রাজি আছি। কিন্তু কোথায় যাইব?"

গো। কলিকাতায়। সেখানে আমি আমার এক জন বন্ধুকে পত্র দিতেছি। তিনি তোমাকে একখানি বাড়ী কিনিয়া দিবেন, তোমার টাকা লাগিবে না।

রো। আমার খুড়ার কি হইবে?

গো। তিনি তোমার সঙ্গে যাইবেন, নহিলে তোমাকে কলিকাতায় যাইতে বলিতাম না।

রো। সেখানে দিনপাত করিব কি প্রকারে?

গো। আমার বন্ধু তোমার খুড়ার একটি চাকরি করিয়া দিবেন।

রো। খুড়া দেশত্যাগে সম্মত হইবেন কেন?

গো। তুমি কি তাঁহাকে এই ব্যাপারের পর সম্মত করিতে পারিবে না?

রো। পারিব। কিন্তু আপনার জ্যেষ্ঠতাতকে সম্মত করিবে কে? তিনি আমাকে ছাড়িবেন কেন?

গো। আমি অনুরোধ করিব।

রো। তাহা হইলে আমার কলঙ্কের উপর কলঙ্ক। আপনারও কিছু কলঙ্ক।

গো। সত্য; তোমার জন্য, কর্ত্তার কাছে ভ্রমর অনুরোধ করিবে। তুমি এখন ভ্রমরের অনুসন্ধানে যাও। তাহাকে পাঠাইয়া দিয়া, আপনি এই বাড়ীতেই থাকিও। ডাকিলে যেন পাই।

রোহিণী সজলনয়নে গোবিন্দলালকে দেখিতে দেখিতে ভ্রমরের অনুসন্ধানে গেল। এইরূপে কলঙ্কে, বন্ধনে, রোহিণীর প্রথম প্রণয়সম্ভাষণ হইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ভ্রমর শ্বশুরকে কোন প্রকার অনুরোধ করিতে স্বীকৃত হইল না-বড় লজ্জা করে, ছি!

অগত্যা গোবিন্দলাল স্বয়ং কৃষ্ণকান্তের কাছে গেলেন। কৃষ্ণকান্ত তখন আহারান্তে পালঙ্কে অর্দ্ধশয়নাবস্থায়, আলবোলার নল হাতে করিয়া–সুষুপ্ত। এক দিকে তাঁহার নাসিকা নাদসুরে গমকে গমকে তানমূর্চ্ছনাদি সহিত নানাবিধ রাগরাগিণীর আলাপ করিতেছে–আর এক দিকে, তাঁহার মন, অহিফেনপ্রসাদাৎ ত্রিভুবনগামী অশ্বে আরূঢ় হইয়া নানা স্থান পর্য্যটন করিতেছে। রোহিণীর চাঁদপানা মুখখানা বুড়ারও মনের ভিতর ঢুকিয়াছিল বোধ হয়,–চাঁদ কোথায় উদয় না হয়?–নহিলে বুড়া আফিঙ্গের ঝোঁকে, ইন্দ্রাণীর স্কন্ধে সে মুখ বসাইবে কেন? কৃষ্ণকান্ত দেখিতেছেন যে, রোহিণী হঠাৎ ইন্দ্রের শচী হইয়া, মহাদেবের গোহাল হইতে ষাঁড় চুরি করিতে গিয়াছে। নন্দী ত্রিশূল হস্তে ষাঁড়ের জাব দিতে গিয়া তাহাকে ধরিয়াছে। দেখিতেছেন, নন্দী রোহিণীর আলুলায়িত কুন্তলদাম ধরিয়া টানাটানি লাগাইয়াছে, এবং ষড়াননের ময়ূর, সন্ধান পাইয়া, তাহার সেই আগুল্‌ফ-বিলম্বিত কুঞ্চিত কেশগুচ্ছকে স্ফীতফণা ফণিশ্রেণী ভ্রমে গিলিতে গিয়াছে–এমত সময়ে স্বয়ং ষড়ানন ময়ূরের দৌরাত্ম্য দেখিয়া নালিশ করিবার জন্য মহাদেবের কাছে উপস্থিত হইয়া ডাকিতেছেন, “জ্যেঠা মহাশয়!”

কৃষ্ণকান্ত বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছেন, “কার্ত্তিক মহাদেবকে কি সম্পর্কে জ্যেঠা মহাশয় বলিয়া ডাকিতেছেন?” এমত সময় কার্ত্তিক আবার ডাকিলেন, “জ্যেঠা মহাশয়!” কৃষ্ণকান্ত বড় বিরক্ত হইয়া, কার্ত্তিকের কাণ মলিয়া দিবার অভিপ্রায়ে হস্ত উত্তোলন করিলেন। অমনি কৃষ্ণকান্তের হস্তস্থিত আলবোলার নল হাত হইতে খসিয়া ঝনাৎ করিয়া পানের বাটার উপর পড়িয়া গেল, পানের বাটা ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ করিয়া পিকদানির উপর পড়িয়া গেল; এবং নল, বাটা, পিকদানি, সকলেই একত্রে সহগমন করিয়া ভূতলশায়ী হইল। সেই শব্দে কৃষ্ণকান্তের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি নয়নোন্মীলন করিয়া দেখেন যে, কার্ত্তিকেয় যথার্থই উপস্থিত। মূর্ত্তিমান্ স্কন্দবীরের ন্যায়, গোবিন্দলাল তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন–ডাকিতেছেন, “জ্যেঠা মহাশয়!” কৃষ্ণকান্ত শশব্যস্তে উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি বাবা গোবিন্দলাল?” গোবিন্দলালকে বুড়া বড় ভালবাসিত।

গোবিন্দলালও কিছু অপ্রতিভ হইলেন–বলিলেন, “আপনি নিদ্রা যান–আমি এমন কিছু কাজে আসি নাই।” এই বলিয়া, গোবিন্দলাল পিকদানিটি উঠাইয়া সোজা করিয়া রাখিয়া, পানবাটা উঠাইয়া যথাস্থানে রাখিয়া, নলটি কৃষ্ণকান্তের হাতে দিলেন। কিন্তু কৃষ্ণকান্ত শক্ত বুড়া–সহজে ভুলে না–মনে মনে বলিতে লাগিলেন, “কিছু না, এ ছুঁচো আবার সেই চাঁদমুখো মাগীর কথা বলিতে আসিয়াছে।” প্রকাশ্যে বলিলেন, “না। আমার ঘুম হইয়াছে–আর ঘুমাইব না।”

গোবিন্দলাল একটু গোলে পড়িলেন। রোহিণীর কথা কৃষ্ণকান্তের কাছে বলিতে প্রাতে তাঁহার কোন লজ্জা করে নাই–এখন একটু লজ্জা করিতে লাগিল–কথা বলি বলি করিয়া বলিতে পারিলেন না। রোহিণীর সঙ্গে বারুণী পুকুরের কথা হইয়াছিল বলিয়া কি এখন লজ্জা?

বুড়া রঙ্গ দেখিতে লাগিল। গোবিন্দলাল, কোন কথা পাড়িতেছে না দেখিয়া, আপনি জমীদারির কথা পাড়িল–জমীদারির কথার পর সাংসারিক কথা, সাংসারিক কথার পর মোকদ্দমার কথা, তথাপি রোহিণীর দিক্ দিয়াও গেল না। গোবিন্দলাল রোহিণীর কথা কিছুতেই পাড়িতে পারিলেন না। কৃষ্ণকান্ত মনে মনে ভারি হাসি হাসিতে লাগিলেন। বুড়া বড় দুষ্ট।

অগত্যা গোবিন্দলাল ফিরিয়া যাইতেছিলেন,–তখন কৃষ্ণকান্ত প্রিয়তম ভ্রাতুষ্পুত্রকে ডাকিয়া ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “সকাল বেলা যে মাগীকে তুমি জামিন হইয়া লইয়া গিয়াছিলে, সে মাগী কিছু স্বীকার করিয়াছে?”

তখন গোবিন্দলাল পথ পাইয়া যাহা যাহা রোহিণী বলিয়াছিল, সংক্ষেপে বলিলেন। বারুণী পুষ্করিণী ঘটিত সকল কথাগুলি গোপন করিলেন। শুনিয়া কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, “এখন তাহার প্রতি কিরূপ করা তোমার অভিপ্রায়?”

গোবিন্দলাল লজ্জিত হইয়া বলিলেন, “আপনার যে অভিপ্রায়, আমাদিগেরও সেই অভিপ্রায়।”

কৃষ্ণকান্ত মনে মনে হাসিয়া, মুখে কিছুমাত্র হাসির লক্ষণ না দেখাইয়া বলিলেন, “আমি উহার কথায় বিশ্বাস করি না। উহার মাথা মুড়াইয়া, ঘোল ঢালিয়া,

দেশের বাহির করিয়া দাও-কি বল?”

গোবিন্দলাল চুপ করিয়া রহিলেন। তখন দুষ্ট বুড়া বলিল, “আর তোমরা যদি এমনই বিবেচনা কর যে, উহার দোষ নাই-তবে ছাড়িয়া দাও।”

গোবিন্দলাল তখন নিশ্বাস ছাড়িয়া, বুড়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

রোহিণী, গোবিন্দলালের অনুমতিক্রমে খুড়ার সঙ্গে বিদেশ যাওয়ার বন্দোবস্ত করিতে আসিল। খুড়াকে কিছু না বলিয়া, ঘরের মধ্যস্থলে বসিয়া পড়িয়া, রোহিণী কাঁদিতে বসিল।

“এ হরিদ্রাগ্রাম ছাড়িয়া আমার যাওয়া হইবে না-না দেখিয়া মরিয়া যাইব। আমি কলিকাতায় গেলে, গোবিন্দলালকে ত দেখিতে পাইব না? আমি যাইব না। এই হরিদ্রাগ্রাম আমার স্বর্গ, এখানে গোবিন্দলালের মন্দির। এই হরিদ্রাগ্রামই আমার শ্মশান, এখানে আমি পুড়িয়া মরিব। শ্মশানে মরিতে পায় না, এমন কপালও আছে! আমি যদি এ হরিদ্রাগ্রাম ছাড়িয়া না যাই, ত আমার কে কি করিতে পারে? কৃষ্ণকান্ত রায় আমার মাথা মুড়াইয়া, ঘোল ঢালিয়া দেশছাড়া করিয়া দিবে? আমি আবার আসিব। গোবিন্দলাল রাগ করিবে? করে করুক,-তবু আমি তাহাকে দেখিব। আমার চক্ষু ত কাড়িয়া লইতে পারিবে না। আমি যাব না। কলিকাতায় যাব না-কোথাও যাব না। যাই ত যমের বাড়ী যাব। আর কোথাও না।”

এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া, কালামুখী রোহিণী উঠিয়া দ্বার খুলিয়া আবার-“পতঙ্গবদ্বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ”-সেই গোবিন্দলালের কাছে চলিল। মনে মনে বলিতে বলিতে চলিল,-“হে জগদীশ্বর, হে দীননাথ, হে দুঃখিজনের একমাত্র সহায়! আমি নিতান্ত দুঃখিনী, নিতান্ত দুঃখে পড়িয়াছি-আমায় রক্ষা কর-আমার হৃদয়ের এই অসহ্য প্রেমবহ্নি নিবাইয়া দাও-আর আমায় পোড়াইও না। আমি যাহাকে দেখিতে যাইতেছি-তাহাকে যত বার দেখিব, তত বার-আমার অসহ্য যন্ত্রণা-অনন্ত সুখ। আমি বিধবা-আমার ধর্ম্ম গেল-সুখ গেল-প্রাণ গেল-রহিল কি প্রভু? রাখিব কি প্রভু?-হে দেবতা! হে দুর্গা-হে কালি-হে জগন্নাথ-আমায় সুমতি দাও-আমার প্রাণ স্থির কর-আমি এই যন্ত্রণা আর সহিতে পারি না।”

তবু সেই স্ফীত, হৃত, অপরিমিত প্রেমপরিপূর্ণ হৃদয়-থামিল না। কখনও ভাবিল, গরল খাই; কখনও ভাবিল, গোবিন্দলালের পদপ্রান্তে পড়িয়া, অন্তঃকরণ মুক্ত করিয়া সকল কথা বলি; কখনও ভাবিল, পলাইয়া যাই; কখনও ভাবিল বারুণীতে ডুবে মরি; কখনও ভাবিল, ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া গোবিন্দলালকে কাড়িয়া লইয়া দেশান্তরে পলাইয়া যাই। রোহিণী কাঁদিতে কাঁদিতে গোবিন্দলালের কাছে পুনর্ব্বার উপস্থিত হইল।

গোবিন্দলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন? কলিকাতায় যাওয়া স্থির হইল ত?”

রো। না।

গো। সে কি? এইমাত্র আমার কাছে স্বীকার করিয়াছিলে?

রো। যাইতে পারিব না।

গো। বলিতে পারি না। জোর করিবার আমার কোনই অধিকার নাই-কিন্তু গেলে ভাল হইত।

রো। কিসে ভাল হইত?

গোবিন্দলাল অধোবদন হইলেন। স্পষ্ট করিয়া কোন কথা বলিবার তিনি কে?

রোহিণী তখন চক্ষের জল লুকাইয়া মুছিতে মুছিতে গৃহে ফিরিয়া গেল। গোবিন্দলাল নিতান্ত দুঃখিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। তখন ভোমরা নাচিতে নাচিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, "ভাব্‌ছ কি?"

গো। বল দেখি?

ভ্র। আমার কালো রূপ।

গো। ইঃ-

ভোমরা ঘোরতর কোপাবিষ্ট হইয়া বলিল, "সে কি? আমায় ভাব্‌ছ না? আমি ছাড়া পৃথিবীতে তোমার অন্য চিন্তা আছে?"

গো। আছে না ত কি? সর্ব্বে সর্ব্বময়ী আর কি! আমি অন্য মানুষ ভাবতেছি।

ভ্রমর তখন গোবিন্দলালের গলা জড়াইয়া ধরিয়া, মুখচুম্বন করিয়া, আদরে গলিয়া গিয়া, আধো আধো, মৃদু মৃদু হাসিমাখা স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "অন্য মানুষ-কাকে ভাব্‌ছ বল না?"

গো। কি হবে তোমায় বলিয়া?

ভ্র। বল না!

গো। তুমি রাগ করিবে।

ভ্র। করি কর্‌বো-বল না।

গো। যাও, দেখ গিয়া সকলের খাওয়া হলো কি না!

ভ্র। দেখ্‌বো এখন-বল না কে মানুষ?

গো। সিয়াকুল কাঁটা! রোহিণীকে ভাব্‌ছিলাম।

ভ্র। কেন রোহিণীকে ভাব্‌ছিলে?

গো। তা কি জানি?

ভ্র। জান-বল না।

গো। মানুষ কি মানুষকে ভাবে না?

ভ্র। না। যে যাকে ভালবাসে, সে তাকেই ভাবে, আমি তোমাকে ভাবি-তুমি আমাকে ভাব।

গো। তবে আমি রোহিণীকে ভালবাসি।

ভ্র। মিছে কথা-তুমি আমাকে ভালবাস-আর কাকেও তোমার ভালবাস্‌তে নাই-কেন রোহিণীকে ভাব্‌ছিলে বল না?

গো। বিধবাকে মাছ খাইতে আছে?

ভ্র। না।

গো। বিধবাকে মাছ খাইতে নাই, তবু তারিণীর মা মাছ খায় কেন?

ভ্র। তার পোড়ার মুখ, যা কর্‌তে নাই, তাই করে।

গো। আমারও পোড়ার মুখ, যা কর্‌তে নাই, তাই করি। রোহিণীকে ভালবাসি।

ধা করিয়া গোবিন্দলালের গালে ভোমরা এক ঠোনা মারিল। বড় রাগ করিয়া বলিল, "আমি শ্রীমতী ভোমরা দাসী–আমার সাক্ষাতে মিছে কথা?"

গোবিন্দলাল হারি মানিল। ভ্রমরের স্কন্ধে হস্ত আরোপিত করিয়া, প্রফুল্লনীলোৎপল-দলতুল্য মধুরিমাময় তাহার মুখমণ্ডল স্বকরপল্লবে গ্রহণ করিয়া, মৃদু মৃদু অথচ গম্ভীর, কাতর কণ্ঠে গোবিন্দলাল বলিল, "মিছে কথাই ভোমরা। আমি রোহিণীকে ভালবাসি না। রোহিণী আমায় ভালবাসে।"

তীব্র বেগে গোবিন্দলালের হাত হইতে মুখমণ্ডল মুক্ত করিয়া, ভোমরা দূরে গিয়া দাঁড়াইল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিতে লাগিল, "–আবাগী–পোড়ারমুখী–বাঁদরী মরুক! মরুক! মরুক! মরুক! মরুক!"

গোবিন্দলাল হাসিয়া বলিলেন, "এখনই এত গালি কেন? তোমার সাত রাজার ধন এক মাণিক এখনও ত কেড়ে নেয় নি।"

ভোমরা একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "দূর, তা কেন–তা কি পারে–তা মাগী তোমার সাক্ষাতে বলিল কেন?"

গো। ঠিক ভোমরা–বলা তাহার উচিত ছিল না–তাই ভাবিতেছিলাম। আমি তাহাকে বাস উঠাইয়া কলিকাতায় গিয়া বাস করিতে বসিয়াছিলাম–খরচ পর্য্যন্ত দিতে স্বীকার করিয়াছিলাম।

ভো। তার পর?

গো। তার পর, সে রাজি হইল না।

ভো। ভাল, আমি তাকে একটা পরামর্শ দিতে পারি?

গো। পার, কিন্তু আমি পরামর্শটা শুনিব।

ভো। শোন।

এই বলিয়া ভোমরা "ক্ষীরি! ক্ষীরি!" করিয়া এক জন চাকরাণীকে ডাকিল।

তখন ক্ষীরোদা–ওরফে ক্ষীরোদমণি–ওরফে ক্ষীরাব্ধিতনয়া–ওরফে শুধু ক্ষীরি আসিয়া দাঁড়াইল –মোটাসোটা গাটাগোটা–মল পায়ে–গোট পরা–হাসি চাহনিতে ভরা ভরা। ভোমরা বলিল "ক্ষীরি,–রোহিণী পোড়ারমুখীর কাছে এখনই একবার যাইতে পার্‌বি?"

ক্ষীরি বলিল, "পারব না কেন? কি বল্‌তে হবে?"

ভোমরা বলিল, "আমার নাম করিয়া বলিয়া আয় যে, তিনি বল্‌লেন, তুমি মর।"

"এই? যাই।" বলিয়া ক্ষীরোদা ওরফে ক্ষীরি–মল বাজাইয়া চলিল। গমনকালে ভোমরা বলিয়া দিল, "কি বলে, আমায় বলিয়া যাস্‌।"

"আচ্ছা।" বলিয়া ক্ষীরোদা গেল। অল্পকালমধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "বলিয়া আসিয়াছি।"

ভো। সে কি বলিল?

ক্ষীরি। সে বলিল, উপায় বলিয়া দিতে বলিও।

ভো। তবে আবার যা। বলিয়া আয় যে–বারুণী পুকুরে–সন্ধ্যাবেলা কলসী গলায় দিয়ে–বুঝেছিস্‌–?

ক্ষীরি। আচ্ছা।

ক্ষীরি আবার গেল। আবার আসিল। ভোমরা জিজ্ঞাসা করিল, "বারুণী পুকুরের কথা বলেছিস্?

ক্ষীরি। বলিয়াছি।

ভো। সে কি বলিল?

ক্ষীরি। বলিল যে "আচ্ছা।"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "ছি ভোমরা!"

ভোমরা বলিল, "ভাবিও না। সে মরিবে না। যে তোমায় দেখিয়া মজিয়াছে-সে কি মরিতে পারে?"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

দৈনিক কার্য্য সমস্ত সমাপ্ত করিয়া, প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে গোবিন্দলাল দিনান্তে বারুণীর তীরবর্ত্তী পুষ্পোদ্যানে গিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। গোবিন্দলালের পুষ্পোদ্যানভ্রমণ একটি প্রধান সুখ। সকল বৃক্ষের তলায় দুই চারিবার বেড়াইতেন। কিন্তু আমরা সকল বৃক্ষের কথা এখন বলিব না। বারুণীর কূলে, উদ্যানমধ্যে, এক উচ্চ প্রস্তরবেদিকা ছিল, বেদিকামধ্যে একটি শ্বেতপ্রস্তরখোদিত স্ত্রীপ্রতিমূর্ত্তি-স্ত্রীমূর্ত্তি অর্দ্ধাবৃতা, বিনতলোচনা-একটি ঘট হইতে আপন চরণদ্বয়ে যেন জল ঢালিতেছে,-তাহার চারি পার্শ্বে বেদিকার উপরে উজ্জ্বলবর্ণরঞ্জিত মৃন্ময় আধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সপুষ্প বৃক্ষ-জিরানিয়ম, ভর্বিনা, ইউফর্বিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, গোলাপ-নীচে, সেই বেদিকা বেষ্টন করিয়া, কামিনী, যূথিকা, মল্লিকা, গন্ধরাজ প্রভৃতি সুগন্ধি দেশী ফুলের সারি, গন্ধে গগন আমোদিত করিতেছে-তাহারই পরে বহুবিধ উজ্জ্বল নীল পীত রক্ত শ্বেত নানা বর্ণের দেশী বিলাতী নয়নরঞ্জনকারী পাতার গাছের শ্রেণী। সেইখানে গোবিন্দলাল বসিতে ভালবাসিতেন। জ্যোৎস্না রাত্রে কখনও কখনও ভ্রমরকে উদ্যানভ্রমণে আনিয়া সেইখানে বসাইতেন। ভ্রমর পাষাণময়ী স্ত্রীমূর্ত্তি অর্দ্ধাবৃতা দেখিয়া তাহাকে কালামুখী বলিয়া গালি দিত-কখনও কখনও আপনি অঞ্চল দিয়া তাহার অঙ্গ আবৃত করিয়া দিত-কখনও কখনও গৃহ হইতে উত্তম বস্ত্র সঙ্গে আনিয়া তাহাকে পরাইয়া দিয়া যাইত-কখনও কখনও তাহার হস্তস্থিত ঘট লইয়া টানাটানি বাধাইত।

সেইখানে আজি, গোবিন্দলাল সন্ধ্যাকালে বসিয়া, দর্পণানুরূপ বারুণীর জলশোভা দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে দেখিলেন, সেই পুষ্করিণীর সুপরিসর প্রস্তরনির্ম্মিত সোপানপরম্পরায় রোহিণী কলসীকক্ষে অবরোহণ করিতেছে। সব না হইলে চলে, জল না হইলে চলে না। এ দুঃখের দিনেও রোহিণী জল লইতে আসিয়াছে। রোহিণী জলে নামিয়া গাত্র মার্জ্জনা করিবার সম্ভাবনা-দৃষ্টিপথে তাঁহার থাকা অকর্ত্তব্য বলিয়া গোবিন্দলাল সে স্থান হইতে সরিয়া গেলেন।

অনেকক্ষণ গোবিন্দলাল এ দিক্ ও দিক্ বেড়াইলেন। শেষ মনে করিলেন, এতক্ষণ রোহিণী উঠিয়া গিয়াছে। এই ভাবিয়া আবার সেই বেদিকাতলে জলনিষেকনিরতা পাষাণসুন্দরীর পদপ্রান্তে আসিয়া বসিলেন। আবার সেই বারুণীর শোভা দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, রোহিণী বা কোন স্ত্রীলোক বা পুরুষ কোথাও কেহ নাই। কেহ কোথাও নাই-কিন্তু সে জলোপরে একটি কলসী ভাসিতেছে।

কার কলসী? হঠাৎ সন্দেহ উপস্থিত হইল-কেহ জল লইতে আসিয়া ডুবিয়া যায় নাই ত? রোহিণীই এইমাত্র জল লইতে আসিয়াছিল-তখন অকস্মাৎ পূর্ব্বাহ্নের কথা মনে পড়িল-মনে পড়িল যে, ভ্রমর রোহিণীকে বলিয়া পাঠাইয়াছিল যে, বারুণী পুকুরে-সন্ধ্যাবেলা-কলসী গলায় বেঁধে। মনে পড়িল যে, রোহিণী প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিল, "আচ্ছা।"

গোবিন্দলাল তৎক্ষণাৎ পুষ্করিণীর ঘাটে আসিলেন। সর্ব্বশেষ সোপানে দাঁড়াইয়া পুষ্করিণীর সর্ব্বত্র দেখিতে লাগিলেন। জল কাচতুল্য স্বচ্ছ। ঘাটের নীচে

জলতলস্থ ভূমি পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। দেখিলেন, স্বচ্ছ স্ফটিকমণ্ডিত হৈম প্রতিমার ন্যায় রোহিণী জলতলে শুইয়া আছে। অন্ধকার জলতল আলো করিয়াছে!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

গোবিন্দলাল তৎক্ষণাৎ জলে নামিয়া ডুব দিয়া, রোহিণীকে উঠাইয়া, সোপান উপরি শায়িত করিলেন। দেখিলেন, রোহিণী জীবিত আছে কিনা সন্দেহ; সে সংজ্ঞাহীন; নিশ্বাসপ্রশ্বাসরহিত।

উদ্যান হইতে গোবিন্দলাল একজন মালীকে ডাকিলেন। মালীর সাহায্যে রোহিণীকে বহন করিয়া উদ্যানস্থ প্রমোদগৃহে শুশ্রূষার জন্য লইয়া গেলেন। জীবনে হউক, মরণে হউক, রোহিণী শেষ গোবিন্দলালের গৃহে প্রবেশ করিল। ভ্রমর ভিন্ন আর কোন স্ত্রীলোক কখনও সে উদ্যানগৃহে প্রবেশ করে নাই।

বাত্যাবর্ষাবিধৌত চম্পকের মত, সেই মৃত নারীদেহ পালঙ্কে লম্বমান হইয়া প্রজ্বলিত দীপালোকে শোভা পাইতে লাগিল। বিশালদীর্ঘবিলম্বিত ঘোরকৃষ্ণ কেশরাশি জলে ঋজু-তাহা দিয়া জল ঝরিতেছে, মেঘে যেন জলবৃষ্টি করিতেছে। নয়ন মুদ্রিত; কিন্তু সেই মুদ্রিত পক্ষ্মের উপরে ভ্রূযুগ জলে ভিজিয়া আরও অধিক কৃষ্ণশোভায় শোভিত হইয়াছে। আর সেই ললাট-স্থির, বিস্তারিত, লজ্জাভয়বিহীন, কোন অব্যক্ত ভাববিশিষ্ট-গণ্ড এখনও উজ্জ্বল-অধর এখনও মধুময়, বান্ধুলীপুষ্পের লজ্জাস্থল। গোবিন্দলালের চক্ষে জল পড়িল। বলিলেন, "মরি মরি! কেন তোমায় বিধাতা এত রূপ দিয়া পাঠাইয়াছিলেন, দিয়াছিলেন ত সুখী করিলেন না কেন? এমন করিয়া তুমি চলিলে কেন?" এই সুন্দরীর আত্মঘাতের তিনি নিজেই যে মূল-এ কথা মনে করিয়া তাঁহার বুক ফাটিতে লাগিল।

যদি রোহিণীর জীবন থাকে, রোহিণীকে বাঁচাইতে হইবে। জলমগ্নকে কি প্রকারে বাঁচাইতে হয়, গোবিন্দলাল তাহা জানিতেন। উদরস্থ জল সহজেই বাহির করান যায়। দুই চারি বার রোহিণীকে উঠাইয়া, বসাইয়া, পাশ ফিরাইয়া, ঘুরাইয়া, জল উদ্গীর্ণ করাইলেন। কিন্তু তাহাতে নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিল না। সেইটি কঠিন কাজ।

গোবিন্দলাল জানিতেন, মুমূর্ষুর বাহুদ্বয় ধরিয়া উর্দ্ধোত্তোলন করিলে, অন্তরস্থ বায়ুকোষ স্ফীত হয়, সেই সময়ে রোগীর মুখে ফুৎকার দিতে হয়। পরে উত্তোলিত বাহুদ্বয়, ধীরে ধীরে নামাইতে হয়। নামাইলে বায়ুকোষ সঙ্কুচিত হয়; তখন সেই ফুৎকার-প্রেরিত বায়ু আপনিই নির্গত হইয়া আইসে। ইহাতে কৃত্রিম নিশ্বাস প্রশ্বাস বাহিত হয়। এইরূপ পুনঃ পুনঃ করিতে করিতে বায়ুকোষের কার্য্য স্বতঃ পুনরাগত হইতে থাকে; কৃত্রিম নিশ্বাস প্রশ্বাস বাহিত করাইতে করাইতে সহজ নিশ্বাস প্রশ্বাস আপনি উপস্থিত হয়। রোহিণীকে তাই করিতে হইবে। দুই হাতে দুইটি বাহু তুলিয়া ধরিয়া তাহার মুখে ফুৎকার দিতে হইবে, তাহার সেই পক্কবিম্ববিনিন্দিত, এখনও সুধাপরিপূর্ণ, মদনমদোন্মাদহলাহলকলসীতুল্য রাঙ্গা রাঙ্গা মধুর অধরে অধর দিয়া ফুৎকার দিতে হইবে! কি সর্ব্বনাশ! কে দিবে?

গোবিন্দলালের এক সহায়, উড়িয়া মালী। বাগানের অন্য চাকরেরা ইতিপূর্ব্বেই গৃহে গিয়াছিল। তিনি মালীকে বলিলেন, "আমি ইহার হাত দুইটি তুলে ধরি, তুই ইহার মুখে ফুঁ দে দেখি!"

মুখে ফুঁ! সর্ব্বনাশ! ঐ রাঙ্গা রাঙ্গা সুধামাখা অধরে, মালীর মুখের ফুঁ-"সেহি পারিব না মুনিমা!"

মালীকে মুনিব যদি শালগ্রামশিলা চর্ব্বণ করিতে বলিত, মালী মুনিবের খাতিরে করিলে করিতে পারিত, কিন্তু সেই চাঁদমুখের রাঙ্গা অধরে-সেই কট্‌কি মুখের ফুঁ! মালী ঘামিতে আরম্ভ করিল। স্পষ্ট বলিল, "মু সে পারিবি না অবধড়।"

মালী ঠিক বলিয়াছিল। মালী সেই দেবদুর্ল্লভ ওষ্ঠাধরে যদি একবার মুখ দিয়া ফুঁ দিত, তার পর যদি রোহিণী বাঁচিয়া উঠিয়া আবার সেই ঠোঁট ফুলাইয়া কলসীকক্ষে জল লইয়া, মালীর পানে চাহিয়া, ঘরে যাইত-তবে আর তাহাকে ফুলবাগানের কাজ করিতে হইত না। সে খোন্তা, খুরপো, নিড়িন, কাঁচি, কোদালি,

বারুণীর জলে ফেলিয়া দিয়া, এক দৌড়ে ভদরক পানে ছুটিত সন্দেহ নাই–বোধ হয় সুবর্ণরেখার নীল জলে ডুবিয়া মরিত। মালী অত ভাবিয়াছিল কি না বলিতে পারি না, কিন্তু মালী ফুঁ দিতে রাজি হইল না।

অগত্যা গোবিন্দলাল তাহাকে বলিলেন, "তবে তুই এইরূপ ইহার হাত দুইটি ধীরে ধীরে উঠাইতে থাক্–আমি ফুঁ দিই। তাহার পর ধীরে ধীরে হাত নামাইবি।" মালী তাহা স্বীকার করিল। সে হাত দুইটি ধরিয়া ধীরে ধীরে উঠাইল–গোবিন্দলাল তখন সেই ফুল্লরক্তকুসুমকান্তি অধরযুগলে ফুল্লরক্তকুসুমকান্তি অধরযুগল স্থাপিত করিয়া–রোহিণীর মুখে ফুৎকার দিলেন।

সেই সময়ে ভ্রমর, একটা লাঠি লইয়া, একটা বিড়াল মারিতে যাইতেছিল। বিড়াল মারিতে, লাঠি বিড়ালকে না লাগিয়া, ভ্রমরেরই কপালে লাগিল।

মালী রোহিণীর বাহুদ্বয় নামাইল। আবার উঠাইল। আবার গোবিন্দলাল ফুৎকার দিলেন। আবার সেইরূপ হইল। আবার সেইরূপ পুনঃ পুনঃ করিতে লাগিলেন। দুই তিন ঘণ্টা এইরূপ করিলেন। রোহিণীর নিশ্বাস বহিল। রোহিণী বাঁচিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

রোহিণীর নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিতে লাগিলে, গোবিন্দলাল তাহাকে ঔষধ পান করাইলেন। ঔষধ বলকারক–ক্রমে রোহিণীর বলসঞ্চার হইতে লাগিল। রোহিণী চাহিয়া দেখিল–সজ্জিত রম্য গৃহমধ্যে মন্দ মন্দ শীতল পবন বাতায়নপথে পরিভ্রমণ করিতেছে–এক দিকে স্ফাটিকাধারে স্নিগ্ধ প্রদীপ জ্বলিতেছে–আর এক দিকে হৃদয়াধারের জীবনপ্রদীপ জ্বলিতেছে। এদিকে রোহিণী, গোবিন্দলাল-হস্ত-প্রদত্ত মৃতসঞ্জীবনী সুরা পান করিয়া, মৃতসঞ্জীবিতা হইতে লাগিল–আর এক দিকে তাঁহার মৃতসঞ্জীবনী কথা শ্রবণপথে পান করিয়া মৃতসঞ্জীবিতা হইতে লাগিল। প্রথমে নিশ্বাস, পরে চৈতন্য, পরে দৃষ্টি, পরে স্মৃতি, শেষে বাক্য স্ফুরিত হইতে লাগিল। রোহিণী বলিল, "আমি মরিয়াছিলাম, আমাকে কে বাঁচাইল?"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "যেই বাঁচাক, তুমি যে রক্ষা পাইয়াছ এই যথেষ্ট।"

রোহিণী বলিল, "আমাকে কেন বাঁচাইলেন? আপনার সঙ্গে আমার এমন কি শত্রুতা যে মরণেও আপনি প্রতিবাদী?"

গো। তুমি মরিবে কেন?

রো। মরিবারও কি আমার অধিকার নাই?

গো। পাপে কাহারও অধিকার নাই। আত্মহত্যা পাপ।

রো। আমি পাপ পুণ্য জানি না–আমাকে কেহ শিখায় নাই। আমি পাপ পুণ্য মানি না–কোন্ পাপে আমার এই দণ্ড? পাপ না করিয়াও যদি এই দুঃখ, তবে পাপ করিলেই বা ইহার বেশী কি হইবে? আমি মরিব। এবার না হয়, তোমার চক্ষে পড়িয়াছিলাম বলিয়া তুমি রক্ষা করিয়াছ। ফিরে বার, যাহাতে তোমার চক্ষে না পড়ি, সে যত্ন করিব।

গোবিন্দলাল বড় কাতর হইলেন; বলিলেন, "তুমি কেন মরিবে?"

"চিরকাল ধরিয়া, দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, রাত্রিদিন মরার অপেক্ষা, একেবারে মরা ভাল।"

গো। কিসের এত যন্ত্রণা?

রো। রাত্রিদিন দারুণ তৃষা, হৃদয় পুড়িতেছে–সম্মুখেই শীতল জল, কিন্তু ইহজন্মে সে জল স্পর্শ করিতে পারিব না। আশাও নাই।

গোবিন্দলাল তখন বলিলেন যে, "আর এ সব কথায় কাজ নাই-চল তোমাকে গৃহে রাখিয়া আসি।"

রোহিণী বলিল, "না, আমি একাই যাইব।"

গোবিন্দলাল বুঝিলেন, আপত্তিটা কি। গোবিন্দলাল আর কিছু বলিলেন না। রোহিণী একাই গেল।

তখন গোবিন্দলাল, সেই বিজন কক্ষমধ্যে সহসা ভূপতিত হইয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মাটিতে মুখ লুকাইয়া, দরবিগলিত লোচনে ডাকিতে লাগিলেন, "হা নাথ! নাথ! তুমি আমায় এ বিপদে রক্ষা কর!-তুমি বল না দিলে, কাহার বলে আমি এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইব?-আমি মরিব-ভ্রমর মরিবে। তুমি এই চিত্তে বিরাজ করিও-আমি তোমার বলে আত্মজয় করিব।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

গোবিন্দলাল গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, ভ্রমর জিজ্ঞাসা করিল, "আজি এত রাত্রি পর্য্যন্ত বাগানে ছিলে কেন?"

গো। কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? আর কখনও কি থাকি না?

ভ্র। থাক-কিন্তু আজি তোমার মুখ দেখিয়া, তোমার কথার আওয়াজে বোধ হইতেছে, আজি কিছু হইয়াছে।

গো। কি হইয়াছে?

ভ্র। কি হইয়াছে, তাহা তুমি না বলিলে আমি কি প্রকারে বলিব? আমি কি সেখানে ছিলাম?

গো। কেন, সেটা মুখ দেখিয়া বলিতে পার না?

ভ্র। তামাসা রাখ। কথাটা ভাল কথা নহে, সেটা মুখ দেখিয়া বলিতে পারিতেছি।-আমায় বল, আমার প্রাণ বড় কাতর হইতেছে।

বলিতে বলিতে ভ্রমরের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। গোবিন্দলাল, ভ্রমরের চক্ষের জল মুছাইয়া, আদর করিয়া বলিলেন, "আর একদিন বলিব ভ্রমর-আজ নহে।"

ভ্র। আজ নহে কেন?

গো। তুমি এখন বালিকা, সে কথা বালিকার শুনিয়া কাজ নাই।

ভ্র। কাল কি আমি বুড়া হইব?

গো। কালও বলিব না-দুই বৎসর পরে বলিব। এখন আর জিজ্ঞাসা করিও না, ভ্রমর!

ভ্রমর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। বলিল, "তবে তাই-দুই বৎসর পরেই বলিও-আমার শুনিবার বড় সাধ ছিল-কিন্তু তুমি যদি বলিলে না-তবে আমি শুনিব কি প্রকারে? আমার বড় মন কেমন কেমন করিতেছে।"

কেমন একটা বড় ভারি দুঃখ ভোমরার মনের ভিতর অন্ধকার করিয়া উঠিতে লাগিল। যেমন বসন্তের আকাশ-বড় সুন্দর, বড় নীল, বড় উজ্জ্বল,-কোথাও কিছু নাই-অকস্মাৎ একখানা মেঘ উঠিয়া চারিদিক্ আঁধার করিয়া ফেলে-ভোমরার বোধ হইল, যেন তার বুকের ভিতর তেমনি একখানা মেঘ উঠিয়া, সহসা চারিদিক্ আঁধার করিয়া ফেলিল। ভ্রমরের চক্ষে জল আসিতে লাগিল। ভ্রমর মনে করিল, আমি অকারণে কাঁদিতেছি-আমি বড় দুষ্ট হইয়াছি-আমার স্বামী রাগ

করিবেন। অতএব ভ্রমর কাঁদিতে কাঁদিতে, বাহির হইয়া গিয়া, কোণে বসিয়া পা ছড়াইয়া অন্নদামঙ্গল পড়িতে বসিল। কি মাথা মুণ্ড পড়িল তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু বুকের ভিতর হইতে সে কালো মেঘখানা কিছুতেই নামিল না।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

গোবিন্দলাল বাবু জ্যেঠা মহাশয়ের সঙ্গে বৈষয়িক কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। কথোপকথনচ্ছলে কোন্ জমীদারির কিরূপ অবস্থা, তাহা সকল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকান্ত গোবিন্দলালের বিষয়ানুরাগ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তোমরা যদি একটু একটু দেখ শুন, তবে বড় ভাল হয়। দেখ, আমি আর কয় দিন? তোমরা এখন হইতে সব দেখিয়া শুনিয়া না রাখিলে, আমি মরিলে কিছু বুঝিতে পারিবে না। দেখ, আমি বুড়া হইয়াছি, আর কোথাও যাইতে পারি না। কিন্তু বিনা তদারকে মহাল সব খারাব হইয়া উঠিল।"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "আপনি পাঠাইলে আমি যাইতে পারি। আমারও ইচ্ছা, সকল মহালগুলি এক একবার দেখিয়া আসি।"

কৃষ্ণকান্ত আহ্লাদিত হইলেন। বলিলেন, "আমার তাহাতে বড় আহ্লাদ। আপাততঃ বন্দরখালিতে কিছু গোলমাল উপস্থিত। নায়েব বলিতেছে যে, প্রজারা ধর্ম্মঘট করিয়াছে, টাকা দেয় না; প্রজারা বলে, আমরা খাজনা দিতেছি, নায়েব উসুল দেয় না। তোমার যদি ইচ্ছা থাকে, তবে বল, আমি তোমাকে সেখানে পাঠাইবার উদ্যোগ করি।"

গোবিন্দলাল সম্মত হইলেন। তিনি এই জন্যই কৃষ্ণকান্তের কাছে আসিয়াছিলেন। তাঁহার এই পূর্ণ যৌবন, মনোবৃত্তি সকল উদ্বেলিত সাগরতরঙ্গতুল্য প্রবল, রূপতৃষ্ণা অত্যন্ত তীব্র। ভ্রমর হইতে সে তৃষ্ণা নিবারিত হয় নাই। নিদাঘের নীল মেঘমালার মত রোহিণীর রূপ, এই চাতকের লোচনপথে উদিত হইল–প্রথম বর্ষার মেঘদর্শনে চঞ্চলা ময়ূরীর মত গোবিন্দলালের মন, রোহিণীর রূপ দেখিয়া নাচিয়া উঠিল। গোবিন্দলাল তাহা বুঝিয়া মনে মনে শপথ করিয়া, স্থির করিলেন, মরিতে হয় মরিব, কিন্তু তথাপি ভ্রমরের কাছে অবিশ্বাসী বা কৃতঘ্ন হইব না। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে, বিষয়কর্ম্মে মনোভিনিবেশ করিয়া রোহিণীকে ভুলিব–স্থানান্তরে গেলে, নিশ্চিত ভুলিতে পারিব। এইরূপ মনে মনে সংকল্প করিয়া তিনি পিতৃব্যের কাছে গিয়া বিষয়ালোচনা করিতে বসিয়াছিলেন। বন্দরখালির কথা শুনিয়া, আগ্রহসহকারে তথায় গমনে সম্মত হইলেন।

ভ্রমর শুনিল, মেজ বাবু দেহাত যাইবেন। ভ্রমর ধরিল, আমিও যাইব। কাঁদাকাটি, হাঁটাহাঁটি পড়িয়া গেল। কিন্তু ভ্রমরের শাশুড়ী কিছুতেই যাইতে দিলেন না। তরণী সজ্জিত করিয়া ভৃত্যবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া ভ্রমরের মুখচুম্বন করিয়া, গোবিন্দলাল দশ দিনের পথ বন্দরখালি যাত্রা করিলেন।

ভ্রমর আগে মাটিতে পড়িয়া কাঁদিল। তার পর উঠিয়া, অন্নদামঙ্গল ছিঁড়িয়া ফেলিল, খাঁচার পাখী উড়াইয়া দিল, পুতুল সকল জলে ফেলিয়া দিল, টবের ফুলগাছ সকল কাটিয়া ফেলিল, আহারের অন্ন পাচিকার গায়ে ছড়াইয়া দিল, চাকরাণীর খোঁপা ধরিয়া ঘুরাইয়া ফেলিয়া দিল–ননদের সঙ্গে কোন্দল করিল–এইরূপ নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য করিয়া, শয়ন করিল। শুইয়া চাদর মুড়ি দিয়া আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিল। এ দিকে অনুকূল পবনে চালিত হইয়া, গোবিন্দলালের তরণী তরঙ্গিণী-তরঙ্গ বিভিন্ন করিয়া চলিল।

বিংশতিতম পরিচ্ছেদ

কিছু ভাল লাগে না–ভ্রমর একা। ভ্রমর শয্যা তুলিয়া ফেলিল–বড় নরম,–খাটের পাখা খুলিয়া ফেলিল–বাতাস বড় গরম; চাকরাণীদিগকে ফুল আনিতে বারণ করিল–ফুলে বড় পোকা। তাসখেলা বন্ধ করিল–সহচরীগণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, তাস খেলিলে শাশুড়ী রাগ করেন। সূচ, সূতা, উল, পেটার্ণ,–সব একে একে পাড়ার মেয়েদের বিলাইয়া দিল–জিজ্ঞাসা করিলে বলিল যে, বড় চোখ জ্বালা করে। বস্ত্র মলিন কেন, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, ধোপাকে গালি পাড়ে, অথচ ধৌত বস্ত্রে গৃহ পরিপূর্ণ। মাথায় চুলের সঙ্গে চিরুনির সম্পর্ক রহিত হইয়া আসিয়াছিল–উলুবনের খড়ের মত চুল বাতাসে দুলিত, জিজ্ঞাসা করিলে ভ্রমর হাসিয়া, চুলগুলি হাত দিয়া টানিয়া খোঁপায় গুঁজিত–ঐ পর্য্যন্ত। আহারাদির সময় ভ্রমর নিত্য বাহানা করিতে আরম্ভ করিল–"আমি খাইব না, আমার জ্বর হইয়াছে।" শাশুড়ী কবিরাজ দেখাইয়া, পাঁচন ও বড়ির ব্যবস্থা করিয়া, ক্ষীরোদার প্রতি ভার দিলেন যে, "বৌমাকে ঔষধগুলি খাওয়াইবি।" বৌমা ক্ষীরির হাত হইতে বড়ি পাঁচন কাড়িয়া লইয়া, জানেলা গলাইয়া ফেলিয়া দিল।

ক্রমে ক্রমে এতটা বাড়াবাড়ি ক্ষীরি চাকরাণীর চক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। ক্ষীরি বলিল, "ভাল, বউ ঠাকুরাণি, কার জন্য তুমি অমন কর? যাঁর জন্য তুমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলে, তিনি কি তোমার কথা এক দিনের জন্য ভাবেন? তুমি মর্‌তেছ কেঁদে কেটে, আর তিনি হয়ত হুঁকার নল মুখে দিয়া, চক্ষু বুজিয়া রোহিণী ঠাকুরাণীকে ধ্যান করিতেছেন।"

ভ্রমর ক্ষীরিকে ঠাস্ করিয়া এক চড় মারিল। ভ্রমরের হাত বিলক্ষণ চলিত। প্রায় কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, "তুই যা ইচ্ছা তাই বকিবি ত আমার কাছ থেকে উঠিয়া যা।"

ক্ষীরি বলিল, "তা চড় চাপড় মারিলেই কি লোকের মুখ চাপা থাকিবে? তুমি রাগ করিবে বলিয়া আমরা ভয়ে কিছু বলিব না। কিন্তু না বলিলেও বাঁচি না। পাঁচি চাঁড়ালনীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ দেখি,–সে দিন অত রাত্রে রোহিণী, বাবুর বাগান হইতে আসিতেছিল কি না?"

ক্ষীরোদার কপাল মন্দ, তাই এমন কথা সকাল বেলা ভ্রমরের কাছে বলিল। ভ্রমর উঠিয়া দাঁড়াইয়া ক্ষীরোদাকে চড়ের পর চড় মারিল, কিলের পর কিল মারিল, তাহাকে ঠেলা মারিয়া ফেলিয়া দিল, তাহার চুল ধরিয়া টানিল। শেষে আপনি কাঁদিতে লাগিল।

ক্ষীরোদা, মধ্যে মধ্যে ভ্রমরের কাছে চড়টা চাপড়টা খাইত, কখনও রাগ করিত না; কিন্তু আজি কিছু বাড়াবাড়ি, আজ একটু রাগিল। বলিল, "তা ঠাকুরুণ, আমাদের মারিলে ধরিলে কি হইবে–তোমারই জন্য আমরা বলি। তোমাদের কথা লইয়া লোকে একটা হৈ হৈ করে, আমরা তা সইতে পারি না। তা আমার কথা বিশ্বাস না হয়, তুমি পাঁচিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর।"

ভ্রমর, ক্রোধে, দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "তোর জিজ্ঞাসা করিতে হয়, তুই কর্‌গে–আমি কি তোদের মত ছুঁচো পাজী যে, আমার স্বামীর কথা পাঁচি চাঁড়ালনীকে জিজ্ঞাসা করিতে যাইব? তুই এত বড় কথা আমাকে বলিস্! ঠাকুরাণীকে বলিয়া আমি ঝাঁটা মেরে তোকে দূর করিয়া দিব। তুই আমার সম্মুখ হইতে দূর হইয়া যা।"

তখন সকাল বেলা উত্তম মধ্যম ভোজন করিয়া ক্ষীরোদা ওরফে ক্ষীরি চাকরাণী রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে চলিয়া গেল। এ দিকে ভ্রমর ঊর্দ্ধমুখে সজলনয়নে, যুক্তকরে, মনে মনে গোবিন্দলালকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, "হে গুরো! শিক্ষক, ধর্ম্মজ্ঞ, আমার একমাত্র সত্যস্বরূপ! তুমি কি সে দিন এই কথা আমার কাছে গোপন করিয়াছিলে!"

তার মনের ভিতর যে মন, হৃদয়ের যে লুক্কায়িত স্থান কেহ কখনও দেখিতে পায় না–যেখানে আত্মপ্রতারণা নাই, সেখান পর্য্যন্ত ভ্রমর দেখিলেন, স্বামীর প্রতি অবিশ্বাস নাই। অবিশ্বাস হয় না। ভ্রমর কেবল একবার মাত্র মনে ভাবিলেন যে, "তিনি অবিশ্বাসী হইলেই বা এমন দুঃখ কি? আমি মরিলেই সব ফুরাইবে।"

হিন্দুর মেয়ে, মরা বড় সহজ মনে করে।

একবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

এখন ক্ষীরি চাকরাণী মনে করিল যে, এ বড় কলিকাল-এক রত্তি মেয়েটা, আমার কথায় বিশ্বাস করে না। ক্ষীরোদার সরল অন্তঃকরণে ভ্রমরের উপর রাগ দ্বেষাদি কিছুই নাই, সে ভ্রমরের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী বটে, তাহার অমঙ্গল চাহে না; তবে ভ্রমর যে তাহার ঠকামি কাণে তুলিল না, সেটা অসহ্য। ক্ষীরোদা তখন, সুচিক্কণ দেহযষ্ঠি সংক্ষেপে তৈলনিষিক্ত করিয়া, রঙ্গকরা গামছাখানি কাঁধে ফেলিয়া, কলসীকক্ষে, বারুণীর ঘাটে স্নান করিতে চলিল।

হরমণি ঠাকুরাণী, বাবুদের বাড়ীর একজন পাচিকা, সেই সময় বারুণীর ঘাট হইতে স্নান করিয়া আসিতেছিল, প্রথমে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। হরমণিকে দেখিয়া ক্ষীরোদা আপনা আপনি বলিতে লাগিল, "বলে, যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর-আর বড়লোকের কাজ করা হল না-কখন কার মেজাজ কেমন থাকে, তার ঠিকানাই নাই।"

হরমণি, একটু কোন্দলের গন্ধ পাইয়া, দাহিন হাতের কাচা কাপড়খানি বাঁ হাতে রাখিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, "কি লো ক্ষীরোদা-আবার কি হয়েছে?"

ক্ষীরোদা তখন মনের বোঝা নামাইল। বলিল, "দেখ দেখি গা-পাড়ার কালামুখীরা বাবুর বাগানে বেড়াইতে যাবে-তা আমরা চাকর বাকর-আমরা কি তা মুনিবের কাছে বলিতে পারি না।"

হর। সে কি লো? পাড়ার মেয়ে আবার বাবুর বাগানে বেড়াইতে কে গেল?

ক্ষী। আর কে যায়? সেই কালামুখী রোহিণী।

হর। কি পোড়া কপাল! রোহিণীর আবার এমন দশা কত দিন? কোন্ বাবুর বাগানে রে ক্ষীরোদা?

ক্ষীরোদা মেজ বাবুর নাম করিল। তখন দুই জনে একটু চাওয়াচাওয়ি করিয়া, একটু রসের হাসি হাসিয়া, যে যে দিকে যাইবার, সে সেই দিকে গেল। কিছু দূর গিয়াই ক্ষীরোদার সঙ্গে পাড়ার রামের মার দেখা হইল। ক্ষীরোদা তাহাকেও হাসির ফাঁদে ধরিয়া ফেলিয়া, দাঁড় করাইয়া রোহিণীর দৌরাত্ম্যের কথার পরিচয় দিল। আবার দুজনে হাসি চাহনি ফেরাফিরি করিয়া অভীষ্ট পথে গেল।

এইরূপে, ক্ষীরোদা, পথে রামের মা, শ্যামের মা, হারী, তারী, পারী যাহার দেখা পাইল, তাহারই কাছে আপন মর্ম্মপীড়ার পরিচয় দিয়া, পরিশেষে সুস্থশরীরে প্রফুল্লহৃদয়ে বারুণীর স্ফাটিক বারিরাশিমধ্যে অবগাহন করিল। এ দিকে হরমণি, রামের মা, শ্যামের মা, হারী তারী, পারী যাহাকে যেখানে দেখিল, তাহাকে সেইখানে ধরিয়া শুনাইয়া দিল যে, রোহিণী হতভাগিনী মেজবাবুর বাগান বেড়াইতে গিয়াছিল। একে শূন্য দশ হইল, দশে শূন্য শত হইল, শতে শূন্য সহস্র হইল। যে সূর্য্যের নবীন কিরণ তেজস্বী না হইতে হইতেই, ক্ষীরি প্রথম ভ্রমরের সাক্ষাতে রোহিণীর কথা পাড়িয়াছিল, তাঁহার অস্তগমনের পূর্ব্বেই গৃহে গৃহে ঘোষিত হইল যে, রোহিণী গোবিন্দলালের অনুগৃহীতা। কেবল বাগানের কথা হইতে অপরিমেয় প্রণয়ের কথা, অপরিমেয় প্রণয়ের কথা হইতে অপরিমেয় অলঙ্কারের কথা, আর কত কথা উঠিল, তাহা আমি-হে রটনাকৌশলময়ী কলঙ্ককলিতকণ্ঠা কুলকামিনীগণ! তাহা আমি অধম সত্যশাসিত পুরুষ লেখক আপনাদিগের কাছে সবিস্তারে বলিয়া বাড়াবাড়ি করিতে চাহি না।

ক্রমে ভ্রমরের কাছে সংবাদ আসিতে লাগিল। প্রথমে বিনোদিনী আসিয়া বলিল, "সত্যি কি লা?" ভ্রমর, একটু শুষ্ক মুখে ভাঙ্গা ভাঙ্গা বুকে বলিল, "কি সত্য ঠাকুরঝি?" ঠাকুরঝি তখন ফুলধনুর মত দুইখানি ভ্রূ একটু জড়সড় করিয়া অপাঙ্গে একটু বৈদ্যুতী, প্রেরণ করিয়া ছেলেটিকে কোলে টানিয়া বসাইয়া, বলিল,

“বলি, রোহিণীর কথাটা?”

ভ্রমর, বিনোদিনীকে কিছু না বলিতে পারিয়া, তাহার ছেলেটিকে টানিয়া লইয়া, কোন বালিকাসুলভ কৌশলে, তাহাকে কাঁদাইল। বিনোদিনী বালককে স্তন্যপান করাইতে করাইতে স্বস্থানে চলিয়া গেল।

বিনোদিনীর পর সুরধুনী আসিয়া বলিলেন, “বলি মেজ বৌ, বলি বলেছিলুম, মেজ বাবুকে অষুধ কর। তুমি হাজার হৌক গৌরবর্ণ নও, পুরুষ মানুষের মন ত কেবল কথায় পাওয়া যায় না, একটু রূপ গুণ চাই। তা ভাই, রোহিণীর কি আক্কেল, কে জানে?”

ভ্রমর বলিল, “রোহিণীর আবার আক্কেল কি?”

সুরধুনী কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, “পোড়া কপাল! এত লোক শুনিয়াছে-কেবল তুই শুনিস্ নাই? মেজ বাবু যে রোহিণীকে সাত হাজার টাকার গহনা দিয়াছে।”

ভ্রমর হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া মনে মনে সুরধুনীকে যমের হাতে সমর্পণ করিল। প্রকাশ্যে একটা পুত্তলের মুণ্ড মোচড় দিয়া ভাঙ্গিয়া সুরধুনীকে বলিল, “তা আমি জানি। খাতা দেখিয়াছি। তোর নামে চৌদ্দ হাজার টাকার গহনা লেখা আছে।”

বিনোদিনী সুরধুনীর পর, রামী, বামী, শ্যামী, কামিনী, রমণী, শারদা, প্রমদা, সুখদা, বরদা, কমলা, বিমলা, শীতলা, নির্ম্মলা, মাধু, নিধু, বিধু, তারিণী, নিস্তারিণী, দিনতারিণী, ভবতারিণী, সুরবালা, গিরিবালা, ব্রজবালা, শৈলবালা প্রভৃতি অনেকে আসিয়া, একে একে, দুইয়ে দুইয়ে, তিনে তিনে, দুঃখিনী বিরহকাতরা বালিকাকে জানাইল যে, তোমার স্বামী রোহিণীর প্রণয়াসক্ত। কেহ যুবতী, কেহ প্রৌঢ়া, কেহ বর্ষীয়সী, কেহ বা বালিকা, সকলেই আসিয়া ভ্রমরাকে বলিল, “আশ্চর্য্য কি? মেজবাবুর রূপ দেখে কে না ভোলে? রোহিণীর রূপ দেখে তিনিই না ভুলিবেন কেন?” কেহ আদর করিয়া, কেহ চিড়াইয়া, কেহ রসে, কেহ রাগে, কেহ সুখে, কেহ দুঃখে, কেহ হেসে, কেহ কেঁদে, ভ্রমরকে জানাইল যে, ভ্রমর তোমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে।

গ্রামের মধ্যে ভ্রমর সুখী ছিল। তাহার সুখ দেখিয়া সকলেই হিংসায় মরিত−কালো কুৎসিতের এত সুখ-অনন্ত ঐশ্বর্য্য-দেবীদুর্ল্লভ স্বামী-লোকে কলঙ্কশূন্য যশ−অপরাজিতাতে পদ্মের আদর? আবার তার উপর মল্লিকার সৌরভ? গ্রামের লোকের এত সহিত না। তাই, পালে পালে, দলে দলে, কেহ ছেলে কোলে করিয়া, কেহ ভগিনী সঙ্গে করিয়া, কেহ কবরী বাঁধিয়া, কেহ কবরী বাঁধিতে বাঁধিতে, কেহ এলোচুলে সংবাদ দিতে আসিলেন, “ভ্রমর তোমার সুখ গিয়াছে।”−কাহারও মনে হইল না যে, ভ্রমর পতিবিরহবিধুরা, নিতান্ত দোষশূন্যা, দুঃখিনী বালিকা।

ভ্রমর আর সহ্য করিতে না পারিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া, হর্ম্যতলে শয়ন করিয়া, ধুল্যবলুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। মনে মনে বলিল, “হে সন্দেহভঞ্জন! হে প্রাণাধিক! তুমিই আমার সন্দেহ, তুমিই আমার বিশ্বাস! আজ কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব? আমার কি সন্দেহ হয়? কিন্তু সকলেই বলিতেছে। সত্য না হইলে, সকলে বলিবে কেন! তুমি এখানে নাই, আজি আমার সন্দেহভঞ্জন কে করিবে? আমার সন্দেহভঞ্জন হইল না−তবে মরি না কেন? এ সন্দেহ লইয়া কি বাঁচা যায়? আমি মরি না কেন? ফিরিয়া আসিয়া প্রাণেশ্বর! আমায় গালি দিও না যে, ভোমরা আমায় না বলিয়া মরিয়াছে।”

দ্বাবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

এখন, ভ্রমরেরও যে জ্বালা, রোহিণীরও সেই জ্বালা। কথা যদি রটিল, রোহিণীর কাণেই বা না উঠিবে কেন? রোহিণী শুনিল, গ্রামে রাষ্ট্র যে, গোবিন্দলাল তাহার গোলাম−সাত হাজার টাকার অলঙ্কার দিয়াছে। কথা যে কোথা হইতে রটিল, তাহা রোহিণী শুনে নাই−কে রটাইল, তাহার কোন তদন্ত করে নাই; একেবারে

সিদ্ধান্ত করিল যে, তবে ভ্রমরই রটাইয়াছে, নহিলে এত গায়ের জ্বালা কার? রোহিণী ভাবিল–ভ্রমর আমাকে বড় জ্বালাইল। সে দিন চোর অপবাদ, আজ আবার এই অপবাদ। এ দেশে আর আমি থাকিব না। কিন্তু যাইবার আগে একবার ভ্রমরকে হাড়ে হাড়ে জ্বালাইয়া যাইব।

রোহিণী না পারে এমন কাজই নাই, ইহা তাহার পূর্ব্বপরিচয়ে জানা গিয়াছে। রোহিণী কোন প্রতিবাসিনীর নিকট হইতে একখানি বানারসী সাড়ী ও এক সুট গিল্‌টির গহনা চাহিয়া আনিল। সন্ধ্যা হইলে, সেইগুলি পুঁটুলি বাঁধিয়া সঙ্গে লইয়া রায়দিগের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। যথায় ভ্রমর একাকিনী মৃৎশয্যায় শয়ন করিয়া, এক একবার কাঁদিতেছে, এক একবার চক্ষের জল মুছিয়া কড়ি পানে চাহিয়া ভাবিতেছে, তথায় রোহিণী গিয়া পুঁটুলি রাখিয়া উপবেশন করিল। ভ্রমর বিস্মিত হইল–রোহিণীকে দেখিয়া বিষের জ্বালায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। সহিতে না পারিয়া ভ্রমর বলিল, "তুমি সে দিন রাত্রে ঠাকুরের ঘরে চুরি করিতে আসিয়াছিলে? আজ রাত্রে কি আমার ঘরে সেই অভিপ্রায়ে আসিয়াছ না কি?"

রোহিণী মনে মনে বলিল যে, তোমার মুণ্ডপাত করিতে আসিয়াছি। প্রকাশ্যে বলিল, "এখন আর আমার চুরির প্রয়োজন নাই; আমি আর টাকার কাঙ্গাল নহি। মেজ বাবুর অনুগ্রহে, আমার আর খাইবার পরিবার দুঃখ নাই। তবে লোকে যতটা বলে, ততটা নহে।"

ভ্রমর বলিল, "তুমি এখান হইতে দূর হও।"

রোহিণী সে কথা কাণে না তুলিয়া বলিতে লাগিল, "লোকে যতটা বলে ততটা নহে। লোকে বলে, আমি সাত হাজার টাকার গহনা পাইয়াছি। মোটে তিন হাজার টাকার গহনা, আর এই সাড়ীখানি পাইয়াছি। তাই তোমায় দেখাইতে আসিয়াছি। সাত হাজার টাকা লোকে বলে কেন?"

এই বলিয়া রোহিণী পুঁটুলি খুলিয়া বানারসী সাড়ী ও গিল্‌টির গহনাগুলি ভ্রমরকে দেখাইল। ভ্রমর লাথি মারিয়া অলঙ্কারগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া দিল।

রোহিণী বলিল, "সোণায় পা দিতে নাই।" এই বলিয়া রোহিণী নিঃশব্দে গিল্‌টির অলঙ্কারগুলি একে একে কুড়াইয়া, আবার পুঁটুলি বাঁধিল। পুঁটুলি বাঁধিয়া, নিঃশব্দে সেখান হইতে বাহির হইয়া গেল।

আমাদের বড় দুঃখ রহিল। ভ্রমর ক্ষীরোদাকে পিটিয়া দিয়াছিল, কিন্তু রোহিণীকে একটি কিলও মারিল না, এই আমাদের আন্তরিক দুঃখ। আমাদের পাঠিকারা উপস্থিত থাকিলে, রোহিণীকে যে স্বহস্তে প্রহার করিতেন, তদ্‌বিষয়ে আমাদিগের কোন সংশয় নাই। স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলিতে নাই, এ কথা মানি। কিন্তু রাক্ষসী বা পিশাচীর গায়ে যে হাত তুলিতে নাই, এ কথা তত মানি না। তবে ভ্রমর যে রোহিণীকে কেন মারিল না, তাহা বুঝাইতে পারি। ভ্রমর ক্ষীরোদাকে ভালবাসিত, সেই জন্য তাহাকে মারপিট করিয়াছিল। রোহিণীকে ভালবাসিত না, এজন্য হাত উঠিল না। ছেলেয় ছেলেয় ঝগড়া করিলে জননী আপনার ছেলেটিকে মারে, পরের ছেলেটিকে মারে না।

ত্রয়োবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

সে রাত্রি প্রভাত না হইতেই ভ্রমর স্বামীকে পত্র লিখিতে বসিল। লেখাপড়া গোবিন্দলাল শিখাইয়াছিলেন, কিন্তু ভ্রমর লেখাপড়ায় তত মজবুত হইয়া উঠে নাই। ফুলটি পুতুলটি পাখীটি স্বামীটিতে ভ্রমরের মন, লেখাপড়া বা গৃহকর্ম্মে তত নহে। কাগজ লইয়া লিখিতে বসিলে, একবার মুছিত একবার কাটিত, একবার কাগজ বদলাইয়া আবার মুছিত, আবার কাটিত। শেষ ফেলিয়া রাখিত। দুই তিন দিনে একখানা পত্র শেষ হইত না, কিন্তু আজ সে সকল কিছু হইল না। তেড়া বাঁকা ছাঁদে, যাহা লেখনীর অগ্রে বাহির হইল, আজ তাহাই ভ্রমরের মঞ্জুর। "ম"গুলা "স"র মত হইল–"স"গুলা "ম"র মত হইল–"ধ"গুলা "ফ"র মত, "ফ"গুলা "থ"র মত, "থ"গুলা "খ"র মত, ইকারের স্থানে আকার–আকারের একেবারে লোপ, যুক্ত অক্ষরের স্থানে পৃথক্ পৃথক্ অক্ষর, কোন কোন অক্ষরের

লোপ,–ভ্রমর কিছু মানিল না। ভ্রমর আজি এক ঘণ্টার মধ্যে এক দীর্ঘ পত্র স্বামীকে লিখিয়া ফেলিল। কাটাকুটি যে ছিল না, এমত নহে। আমরা পত্রখানির কিছু পরিচয় দিতেছি।

ভ্রমর লিখেতেছে–

"সেবিকা শ্রী ভোমরা" (তারপর ভোমরা কাটিয়া ভ্রমরা করিল) "দাস্যা" (আগে দাম্মা, তাহা কাটিয়া দাস্য–তাহা কাটিয়া দাস্যো–দাস্যাঃ ঘটিয়া উঠে নাই) "প্রণামঃ" ("প্র" লিখিতে প্রথমে "স্র", তার পর "শ্র", শেষে "প্র") "নিবেদনঞ্চ" (প্রথম নিবেদঞ্চ, তার পর নিবেদনঞ্চ) "বিশেস্" (বিশেষঃ হইয়া উঠে নাই)।

এইরূপ পত্র লেখার প্রণালী। যাহা লিখিয়াছিল, তাহার বর্ণগুলি শুদ্ধ করিয়া, ভাষা একটুকু সংশোধন করিয়া নিম্নে লিখিতেছি।

"সে দিন রাত্রে বাগানে কেন তোমার দেরি হইয়াছিল, তাহা আমাকে ভাঙ্গিয়া বলিলে না। দুই বৎসর পরে বলিবে বলিয়াছিলে, কিন্তু আমি কপালের দোষে আগেই তাহা শুনিলাম। শুনিয়াছি কেন, দেখিয়াছি। তুমি রোহিণীকে যে বস্ত্রালঙ্কার দিয়াছ, তাহা সে স্বয়ং আমাকে দেখাইয়া গিয়াছে।

তুমি মনে জান বোধ হয় যে, তোমার প্রতি আমার ভক্তি অচলা–তোমার উপর আমার বিশ্বাস অনন্ত। আমিও তাহা জানিতাম। কিন্তু এখন বুঝিলাম যে, তাহা নহে। যত দিন তুমি ভক্তির যোগ্য, তত দিন আমারও ভক্তি; যত দিন তুমি বিশ্বাসী, তত দিন আমারও বিশ্বাস। এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই, বিশ্বাসও নাই। তোমার দর্শনে আমার আর সুখ নাই। তুমি যখন বাড়ী আসিবে, আমাকে অনুগ্রহ করিয়া খবর লিখিও–আমি কাঁদিয়া কাটিয়া যেমন করিয়া পারি, পিত্রালয়ে যাইব।"

গোবিন্দলাল যথাকালে সেই পত্র পাইলেন। তাঁহার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। কেবল হস্তাক্ষরে এবং বর্ণাশুদ্ধির প্রণালী দেখিয়াই তিনি বিশ্বাস করিলেন যে, এ ভ্রমরের লেখা। তথাপি মনে অনেক বার সন্দেহ করিলেন–ভ্রমর তাঁহাকে এমন পত্র লিখিতে পারে, তাহা তিনি কখনও বিশ্বাস করেন নাই।

সেই ডাকে আরও কয়খানি পত্র আসিয়াছিল। গোবিন্দলাল প্রথমেই ভ্রমরের পত্র খুলিয়াছিলেন; পড়িয়া স্তম্ভিতের ন্যায় অনেকক্ষণ নিশ্চেষ্ট রহিলেন; তার পর সে পত্রগুলি অন্যমনে পড়িতে আরম্ভ করিলেন। তন্মধ্যে ব্রহ্মানন্দ ঘোষের একখানি পত্র পাইলেন। কবিতাপ্রিয় ব্রহ্মানন্দ লিখিতেছেন–

"ভাই হে! রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়–উলু খড়ের প্রাণ যায়। তোমার উপর বৌমা সকল দৌরাত্ম্য করিতে পারেন। কিন্তু আমরা দুঃখী প্রাণী, আমাদিগের উপর এ দৌরাত্ম্য কেন? তিনি রাষ্ট্র করিয়াছেন যে, তুমি রোহিণীকে সাত হাজার টাকার অলঙ্কার দিয়াছ। আরও কত কদর্য্য কথা রটিয়াছে, তাহা তোমাকে লিখিতে লজ্জা করে।–যাহা হৌক,–তোমার কাছে আমার নালিশ–তুমি ইহার বিহিত করিবে। নহিলে আমি এখানকার বাস উঠাইব। ইতি।"

গোবিন্দলাল আবার বিস্মিত হইলেন।–ভ্রমর রটাইয়াছে? মর্ম্ম কিছুই না বুঝিতে পারিয়া গোবিন্দলাল সেই দিন আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, এখানকার জলবায়ু আমার সহ্য হইতেছে না।–আমি কালই বাটী যাইব। নৌকা প্রস্তুত কর।

পরদিন নৌকারোহণে, বিষণ্নমনে গোবিন্দলাল গৃহে যাত্রা করিলেন।

চতুর্ব্বিংশতিতম পরিচ্ছেদ

যাহাকে ভালবাস, তাহাকে নয়নের আড় করিও না। যদি প্রেমবন্ধন দৃঢ় রাখিবে, তবে সূতা ছোট করিও। বাঞ্ছিতকে চোখে চোখে রাখিও। অদর্শনে কত বিষময় ফল ফলে। যাহাকে বিদায় দিবার সময়ে কত কাঁদিয়াছ, মনে করিয়াছ, বুঝি তাহাকে ছাড়িয়া দিন কাটিবে না,–কয় বৎসর পর তাহার সহিত আবার যখন দেখা

হইয়াছে, তখন কেবল জিজ্ঞাসা করিয়াছ–"ভাল আছ ত?" হয়ত সে কথাও হয় নাই–কথাই হয় নাই–আন্তরিক বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। হয়ত রাগে, অভিমানে আর দেখাই হয় নাই। তত নাই হউক, একবার চক্ষের বাহির হইলেই, যা ছিল তা আর হয় না। যা যায়, তা আর আসে না। যা ভাঙ্গে, আর তা গড়ে না। মুক্তবেণীর পর যুক্তবেণী কোথায় দেখিয়াছ?

ভ্রমর গোবিন্দলালকে বিদেশ যাইতে দিয়া ভাল করেন নাই। এ সময়ে দুই জনে একত্রে থাকিলে, এ মনের মালিন্য বুঝি ঘটিত না। বাচনিক বিবাদে আসল কথা প্রকাশ পাইত। ভ্রমরের এত ভ্রম ঘটিত না। এত রাগ হইত না। রাগে এই সর্ব্বনাশ হইত না।

গোবিন্দলাল স্বদেশে যাত্রা করিলে, নায়েব কৃষ্ণকান্তের নিকট এক এত্তেলা পাঠাইল যে, মধ্যম বাবু অদ্য প্রাতে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। সে পত্র ডাকে আসিল। নৌকার অপেক্ষা ডাক আগে আসে। গোবিন্দলাল স্বদেশে পৌঁছিবার চারি পাঁচ দিন আগে, কৃষ্ণকান্তের নিকট নায়েবের পত্র পৌঁছিল। ভ্রমর শুনিলেন, স্বামী আসিতেছেন। ভ্রমর তখনই আবার পত্র লিখিতে বসিলেন। খান চারি পাঁচ কাগজ কালিতে পুরাইয়া, ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, ঘণ্টা দুই চারি মধ্যে একখানা পত্র লিখিয়া খাড়া করিলেন। এ পত্রে মাতাকে লিখিলেন যে, "আমার বড় পীড়া হইয়াছে। তোমরা যদি একবার আমাকে লইয়া যাও, তবে আরাম হইয়া আসিতে পারি। বিলম্ব করিও না, পীড়া বৃদ্ধি হইলে আর আরাম হইবে না। পার যদি, কালই লোক পাঠাইও। এখানে পীড়ার কথা বলিও না।" এই পত্র লিখিয়া গোপনে ক্ষীরি চাকরাণীর দ্বারা লোক ঠিক করিয়া, ভ্রমর তাহা পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিল।

যদি মা না হইয়া, আর কেহ হইত, তবে ভ্রমরের পত্র পড়িয়াই বুঝিতে পারিত যে, ইহার ভিতর কিছু জুয়াচুরি আছে। কিন্তু মা, সন্তানের পীড়ার কথা শুনিয়া একেবারে কাতরা হইয়া পড়িলেন। উদ্দেশে ভ্রমরের শাশুড়ীকে এক লক্ষ গালি দিয়া স্বামীকে কিছু গালি দিলেন, এবং কাঁদিয়া কাটিয়া স্থির করিলেন যে, আগামী কল্য বেহারা পালকি লইয়া চাকর চাকরাণী ভ্রমরকে আনিতে যাইবে। ভ্রমরের পিতা, কৃষ্ণকান্তকে পত্র লিখিলেন। কৌশল করিয়া, ভ্রমরের পীড়ার কোন কথা না লিখিয়া, লিখিলেন যে, "ভ্রমরের মাতা অত্যন্ত পীড়িতা হইয়াছেন–ভ্রমরকে একবার দেখিতে পাঠাইয়া দিবেন।" দাস-দাসীদিগকে সেই মত শিক্ষা দিলেন।

কৃষ্ণকান্ত বড় বিপদে পড়িলেন। এ দিকে গোবিন্দলাল আসিতেছে, এ সময়ে ভ্রমরকে পিত্রালয়ে পাঠান অকর্ত্তব্য। ওদিকে ভ্রমরের মাতা পীড়িতা, না পাঠাইলেও নয়। সাত পাঁচ ভাবিয়া, চারি দিনের কড়ারে ভ্রমরকে পাঠাইয়া দিলেন।

চারি দিনের দিন গোবিন্দলাল আসিয়া পৌঁছিলেন। শুনিলেন যে, ভ্রমর পিত্রালয়ে গিয়াছে, আজি তাঁহাকে আনিতে পালকি যাইবে। গোবিন্দলাল সকলই বুঝিতে পারিলেন। মনে মনে বড় অভিমান হইল। মনে মনে ভাবিলেন, "এত অবিশ্বাস! না বুঝিয়া, না জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল! আমি আর সে ভ্রমরের মুখ দেখিব না। যাহার ভ্রমর নাই, সে কি প্রাণধারণ করিতে পারে না?"

এই ভাবিয়া গোবিন্দলাল, ভ্রমরকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইতে মাতাকে নিষেধ করিলেন। কেন নিষেধ করিলেন, তাহা কিছুই প্রকাশ করিলেন না। তাঁহার সম্মতি পাইয়া, কৃষ্ণকান্ত বধূ আনিবার জন্য আর কোন উদ্যোগ করিলেন না।

পঞ্চবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

এইরূপে দুই চারি দিন গেল। ভ্রমরকে কেহ আনিল না, ভ্রমরও আসিল না। গোবিন্দলাল মনে করিলেন, ভ্রমরের বড় স্পর্দ্ধা হইয়াছে, তাহাকে একটু কাঁদাইব।

মনে করিলেন, ভ্রমর বড় অবিচার করিয়াছে, একটু কাঁদাইব। এক একবার শূন্য-গৃহ দেখিয়া আপনি একটু কাঁদিলেন। ভ্রমরের অবিশ্বাস মনে করিয়া এক একবার একটু কাঁদিলেন। ভ্রমরের সঙ্গে কলহ, এ কথা ভাবিয়া কান্না আসিল। আবার চোখের জল মুছিয়া, রাগ করিলেন। রাগ করিয়া ভ্রমরকে ভুলিবার চেষ্টা করিলেন। ভুলিবার সাধ্য কি? সুখ যায়, স্মৃতি যায় না। ক্ষত ভাল হয়, দাগ ভাল হয় না। মানুষ যায়, নাম থাকে।

শেষ দুর্ব্বুদ্ধি গোবিন্দলাল মনে করিলেন, ভ্রমরকে ভুলিবার উৎকৃষ্ট উপায়, রোহিণীর চিন্তা। রোহিণীর অলৌকিক রূপপ্রভা, একদিনও গোবিন্দলালের হৃদয় পরিত্যাগ করে নাই। গোবিন্দলাল জোর করিয়া তাহাকে স্থান দিতেন না, কিন্তু সে ছাড়িত না। উপন্যাসে শুনা যায়, কোন গৃহে ভূতের দৌরাত্ম্য হইয়াছে, ভূত দিবারাত্রি উঁকি ঝুঁকি মারে, কিন্তু ওঝা তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। রোহিণী প্রেতিনী তেমনি দিবারাত্রি গোবিন্দলালের হৃদয়মন্দিরে উঁকি ঝুঁকি মারে, গোবিন্দলাল তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। যেমন জলতলে চন্দ্রসূর্য্যের ছায়া আছে, চন্দ্র সূর্য্য নাই, তেমনি গোবিন্দলালের হৃদয়ে অহরহঃ রোহিণীর ছায়া আছে, রোহিণী নাই। গোবিন্দলাল ভাবিলেন, যদি ভ্রমরকে আপাততঃ ভুলিতে হইবে, তবে রোহিণীর কথাই ভাবি–নহিলে এ দুঃখ ভুলা যায় না। অনেক কুচিকিৎসক ক্ষুদ্র রোগের উপশম জন্য উৎকট বিষের প্রয়োগ করেন। গোবিন্দলালও ক্ষুদ্র রোগের উপশম জন্য উৎকট বিষের প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলেন। গোবিন্দলাল আপন ইচ্ছায় আপনি আপন অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

রোহিণীর কথা প্রথমে স্মৃতিমাত্র ছিল, পরে দুঃখে পরিণত হইল। দুঃখ হইতে বাসনায় পরিণত হইল। গোবিন্দলাল বারুণীতটে, পুষ্পবৃক্ষপরিবেষ্টিত মণ্ডপমধ্যে উপবেশন করিয়া সেই বাসনার জন্য অনুতাপ করিতেছিলেন। বর্ষাকাল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। বাদল হইয়াছে–বৃষ্টি কখনও কখনও জোরে আসিতেছে–কখনও মৃদু হইতেছে। কিন্তু বৃষ্টি ছাড়া নাই। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়। প্রায়াগতা যামিনীর অন্ধকার, তাহার উপর বাদলের অন্ধকার, বারুণীর ঘাট স্পষ্ট দেখা যায় না। গোবিন্দলাল অস্পষ্টরূপে দেখিলেন যে, একজন স্ত্রীলোক নামিতেছে। রোহিণীর সেই সোপানাবতরণ গোবিন্দলালের মনে হইল। বাদলে ঘাট বড় পিছল হইয়াছে–পাছে পিছলে পা পিছলাইয়া স্ত্রীলোকটি জলে পড়িয়া গিয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হয়, ভাবিয়া গোবিন্দলাল কিছু ব্যস্ত হইলেন। পুষ্পমণ্ডপ হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "কে গা তুমি, আজ ঘাটে নামিও না–বড় পিছল, পড়িয়া যাইবে।"

স্ত্রীলোকটি তাহার কথা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিল কি না বলিতে পারি না। বৃষ্টি পড়িতেছিল–বোধ হয় বৃষ্টির শব্দে সে ভাল করিয়া শুনিতে পায় নাই। সে কুক্ষিস্থ কলসী ঘাটে নামাইল। সোপান পুনরারোহণ করিল। ধীরে ধীরে গোবিন্দলালের পুষ্পোদ্যান অভিমুখে চলিল। উদ্যানদ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিল। গোবিন্দলালের কাছে, মণ্ডপতলে গিয়া দাঁড়াইল। গোবিন্দলাল দেখিলেন, সম্মুখে রোহিণী।

গোবিন্দলাল বলিলেন, "ভিজিতে ভিজিতে এখানে কেন রোহিণী?"

রো। আপনি কি আমাকে ডাকিলেন?

গো। ডাকি নাই। ঘাটে বড় পিছল, নামিতে বারণ করিতেছিলাম। দাঁড়াইয়া ভিজিতেছ কেন?

রোহিণী সাহস পাইয়া মণ্ডপমধ্যে উঠিল। গোবিন্দলাল বলিলেন, "লোকে দেখিলে কি বলিবে?"

রো। যা বলিবার তা বলিতেছে। সে কথা আপনার কাছে একদিন বলিব বলিয়া অনেক যত্ন করিতেছি।

গো। আমারও সে সম্বন্ধে কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করিবার আছে। কে এ কথা রটাইল? তোমরা ভ্রমরের দোষ দাও কেন?

রো। সকল বলিতেছি। কিন্তু এখানে দাঁড়াইয়া বলিব কি?

গো। না। আমার সঙ্গে আইস।

এই বলিয়া গোবিন্দলাল, রোহিণীকে ডাকিয়া বাগানের বৈঠকখানায় লইয়া গেলেন।

সেখানে উভয়ে যে কথোপকথন হইল, তাহার পরিচয় দিতে আমাদিগের প্রবৃত্তি হয় না। কেবল এই মাত্র বলিব যে, সে রাত্রে রোহিণী, গৃহে যাইবার পূর্ব্বে বুঝিয়া গেলেন যে, গোবিন্দলাল রোহিণীর রূপে মুগ্ধ।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

রূপে মুগ্ধ? কে কার নয়? আমি এই হরিত নীল চিত্রিত প্রজাপতিটির রূপে মুগ্ধ। তুমি কুসুমিত কামিনী-শাখার রূপে মুগ্ধ। তাতে দোষ কি? রূপ ত মোহের জন্যই হইয়াছিল।

গোবিন্দলাল প্রথমে এইরূপ ভাবিলেন। পাপের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়া, পুণ্যাত্মাও এইরূপ ভাবে। কিন্তু যেমন বাহ্য জগতে মাধ্যাকর্ষণে, তেমনি অন্তর্জগতে পাপের আকর্ষণে প্রতি পদে পতনশীলের গতি বর্দ্ধিত হয়। গোবিন্দলালের অধঃপতন বড় দ্রুত হইল-কেন না, রূপতৃষ্ণা অনেক দিন হইতে তাঁহার হৃদয় শুষ্ক করিয়া তুলিয়াছে। আমরা কেবল কাঁদিতে পারি, অধঃপতন বর্ণনা করিতে পারি না।

ক্রমে কৃষ্ণকান্তের কাণে রোহিণী ও গোবিন্দলালের নাম একত্রিত হইয়া উঠিল। কৃষ্ণকান্ত দুঃখিত হইলেন। গোবিন্দলালের চরিত্রে কিছুমাত্র কলঙ্ক ঘটিলে তাঁহার বড় কষ্ট। মনে মনে ইচ্ছা হইল, গোবিন্দলালকে কিছু অনুযোগ করিবেন। কিন্তু সম্প্রতি কিছু পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শয়নমন্দির ত্যাগ করিতে পারিতেন না। সেখানে গোবিন্দলাল তাঁহাকে প্রত্যহ দেখিতে আসিত, কিন্তু সর্ব্বদা তিনি সেবকগণপরিবেষ্টিত থাকিতেন, গোবিন্দলালকে সকলের সাক্ষাতে কিছু বলিতে পারিতেন না। কিন্তু পীড়া বড় বৃদ্ধি পাইল। হঠাৎ কৃষ্ণকান্তের মনে হইল যে, বুঝি চিত্রগুপ্তের হিসাব নিকাশ হইয়া আসিল-এ জীবনের সাগরসঙ্গম বুঝি সম্মুখে। আর বিলম্ব করিলে কথা বুঝি বলা হইবে না। এক দিন গোবিন্দলাল অনেক রাত্রে বাগান হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। সেই দিন কৃষ্ণকান্ত মনের কথা বলিবেন মনে করিলেন। গোবিন্দলাল দেখিতে আসিলেন। কৃষ্ণকান্ত পার্শ্ববর্ত্তিগণকে উঠিয়া যাইতে বলিলেন। পার্শ্ববর্ত্তিগণ সকলে উঠিয়া গেল। তখন গোবিন্দলাল কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আজ কেমন আছেন?" কৃষ্ণকান্ত ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "আজি বড় ভাল নই। তোমার এত রাত্রি হইল কেন?"

গোবিন্দলাল সে কথার কোন উত্তর না দিয়া, কৃষ্ণকান্তের প্রকোষ্ঠ হস্তমধ্যে লইয়া নাড়ী টিপিয়া দেখিলেন। অকস্মাৎ গোবিন্দলালের মুখ শুকাইয়া গেল। কৃষ্ণকান্তের জীবনপ্রবাহ অতি ধীরে, ধীরে, ধীরে বহিতেছে। গোবিন্দলাল কেবল বলিলেন, "আমি আসিতেছি। কৃষ্ণকান্তের শয়নগৃহ হইতে নির্গত হইয়া গোবিন্দলাল একেবারে স্বয়ং বৈদ্যের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বৈদ্য বিস্মিত হইল। গোবিন্দলাল বলিলেন, "মহাশয়, শীঘ্র ঔষধ লইয়া আসুন, জ্যেষ্ঠতাতের অবস্থা বড় ভাল বোধ হইতেছে না।" বৈদ্য শশব্যস্তে একরাশি বটিকা লইয়া তাঁহার সঙ্গে ছুটিলেন।-কৃষ্ণকান্তের গৃহে গোবিন্দলাল বৈদ্যসহিত উপস্থিত হইলেন, কৃষ্ণকান্ত কিছু ভীত হইলেন। কবিরাজ হাত দেখিলেন। কৃষ্ণকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, কিছু শঙ্কা হইতেছে কি?" বৈদ্য বলিলেন, "মনুষ্যশরীরে শঙ্কা কখন নাই?"

কৃষ্ণকান্ত বুঝিলেন, বলিলেন, "কতক্ষণ মিয়াদ?"

বৈদ্য বলিলেন, "ঔষধ খাওয়াইয়া পশ্চাৎ বলিতে পারিব।" বৈদ্য ঔষধ মাড়িয়া সেবন জন্য কৃষ্ণকান্তের নিকট উপস্থিত করিলেন। কৃষ্ণকান্ত ঔষধের খল হাতে লইয়া একবার মাথায় স্পর্শ করাইলেন। তাহার পর ঔষধটুকু সমুদয় পিকদানিতে নিক্ষিপ্ত করিলেন।

বৈদ্য বিষণ্ন হইল। কৃষ্ণকান্ত দেখিয়া বলিলেন, “বিষণ্ন হইবেন না। ঔষধ খাইয়া বাঁচিবার বয়স আমার নহে। ঔষধের অপেক্ষা হরিনামে আমার উপকার। তোমরা হরিনাম কর, আমি শুনি।”

কৃষ্ণকান্ত ভিন্ন কেহই হরিনাম করিল না, কিন্তু সকলেই স্তম্ভিত, ভীত, বিস্মিত হইল। কৃষ্ণকান্ত একাই ভয়শূন্য। কৃষ্ণকান্ত গোবিন্দলালকে বলিলেন, “আমার শিওরে দেরাজের চাবি আছে, বাহির কর।”

গোবিন্দলাল বালিসের নীচে হইতে চাবি লইলেন।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, “দেরাজ খুলিয়া আমার উইল বাহির কর।”

গোবিন্দলাল দেরাজ খুলিয়া উইল বাহির করিলেন।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, “আমার আমলা মুহুরি ও দশ জন গ্রামস্থ ভদ্রলোক ডাকাও।”

তখনই নায়েব মুহুরি গোমস্তা কারকুনে, চট্টোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্যে, ঘোষ বসু মিত্র দত্তে ঘর পুরিয়া গেল।

কৃষ্ণকান্ত একজন মুহুরিকে আজ্ঞা করিলেন, “আমার উইল পড়।”

মুহুরি পড়িয়া সমাপ্ত করিল।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, “ও উইল ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইবে। নূতন উইল লেখ।”

মুহুরি জিজ্ঞাসা করিল, “কিরূপ লিখিব?”

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, “যেমন আছে সব সেইরূপ, কেবল–”

“কেবল কি?”

“কেবল গোবিন্দলালের নাম কাটিয়া দিয়া, তাহার স্থানে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ ভ্রমরের নাম লেখ। ভ্রমরের অবর্ত্তমানাবস্থায় গোবিন্দলাল ঐ অর্দ্ধাংশ পাইবে লেখ।”

সকলে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। কেহ কোন কথা কহিল না। মুহুরি গোবিন্দলালের মুখপানে চাহিল। গোবিন্দলাল ইঙ্গিত করিলেন, লেখ।

মুহুরি লিখিতে আরম্ভ করিল। লেখা সমাপন হইলে কৃষ্ণকান্ত স্বাক্ষর করিলেন। সাক্ষিগণ স্বাক্ষর করিল। গোবিন্দলাল আপনি উপযাচক হইয়া, উইলখানি লইয়া তাহাতে সাক্ষী স্বরূপ স্বাক্ষর করিলেন।

উইলে গোবিন্দলালের এক কপর্দ্দকও নাই–ভ্রমরের অর্দ্ধাংশ।

সেই রাত্রে হরিনাম করিতে করিতে তুলসীতলায় কৃষ্ণকান্ত পরলোক গমন করিলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুসংবাদে দেশের লোক ক্ষোভ করিতে লাগিল। কেহ বলিল, একটা ইন্দ্রপাত হইয়াছে, কেহ বলিল, একটা দিক্‌পাল মরিয়াছে, কেহ বলিল, পর্ব্বতের চূড়া ভাঙ্গিয়াছে। কৃষ্ণকান্ত বিষয়ী লোক, কিন্তু খাঁটি লোক ছিলেন। এবং দরিদ্র ও ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে যথেষ্ট দান করিতেন। সুতরাং অনেকেই তাঁহার জন্য কাতর হইল।

সর্ব্বাপেক্ষা ভ্রমর। এখন কাজে কাজেই ভ্রমরকে আনিতে হইল। কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুর পর দিনেই গোবিন্দলালের মাতা উদ্যোগী হইয়া পুত্রবধূকে আনিতে পাঠাইলেন। ভ্রমর আসিয়া কৃষ্ণকান্তের জন্য কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

গোবিন্দলালের সঙ্গে ভ্রমরের প্রথম সাক্ষাতে, রোহিণীর কথা লইয়া কোন মহাপ্রলয় ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল কি না, তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু কৃষ্ণকান্তের শোকে সে সকল কথা এখন চাপা পড়িয়া গেল। ভ্রমরের সঙ্গে গোবিন্দলালের যখন প্রথম সাক্ষাৎ হইল, তখন ভ্রমর জ্যেষ্ঠ শ্বশুরের জন্য কাঁদিতেছে। গোবিন্দলালকে দেখিয়া আরও কাঁদিতে লাগিল। গোবিন্দলালও অশ্রুবর্ষণ করিলেন।

অতএব যে বড় হাঙ্গামার আশঙ্কা ছিল, সেটা গোলমালে মিটিয়া গেল। দুই জনেই তাহা বুঝিল। দুই জনেই মনে মনে স্থির করিল যে, যখন প্রথম দেখায় কোন কথাই হইল না, তবে আর গোলযোগ করিয়া কাজ নাই–গোলযোগের এ সময় নহে; মানে মানে কৃষ্ণকান্তের শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়া যাক্–তাহার পরে যাহার মনে যা থাকে, তাহা হইবে। তাই ভাবিয়া গোবিন্দলাল, একদা উপযুক্ত সময় বুঝিয়া ভ্রমরকে বলিয়া রাখিলেন, "ভ্রমর, তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটি কথা আছে। কথাগুলি বলিতে আমার বুক ফাটিয়া যাইবে। পিতৃশোকের অধিক যে শোক, আমি সেই শোকে এক্ষণে কাতর। এখন আমি সে সকল কথা তোমায় বলিতে পারি না; শ্রাদ্ধের পর যাহা বলিবার আছে, তাহা বলিব। ইহার মধ্যে সে সকল কথার কোন প্রসঙ্গে কাজ নাই।"

ভ্রমর, অতি কষ্টে নয়নাশ্রু সম্বরণ করিয়া বাল্যপরিচিত দেবতা, কালী, দুর্গা, শিব, হরি, স্মরণ করিয়া বলিল, "আমারও কিছু বলিবার আছে। তোমার যখন অবকাশ হইবে, জিজ্ঞাসা করিও।"

আর কোন কথা হইল না। দিন যেমন কাটিত, তেমনি কাটিতে লাগিল–দেখিতে, তেমনি দিন কাটিতে লাগিল; দাস দাসী, গৃহিণী, পৌরস্ত্রী, আত্মীয় স্বজন কেহ জানিতে পারিল না যে, আকাশে মেঘ উঠিয়াছে, কুসুমে কীট প্রবেশ করিয়াছে, এ চারু প্রেমপ্রতিমায় ঘুণ লাগিয়াছে। কিন্তু ঘুণ লাগিয়াছে ত সত্য। যাহা ছিল, তাহা আর নাই। যে হাসি ছিল, সে হাসি আর নাই। ভ্রমর কি হাসে না? গোবিন্দলাল কি হাসে না? হাসে, কিন্তু সে হাসি আর নাই। নয়নে নয়নে মিলিতে মিলিতে যে হাসি আপনি উছলিয়া উঠে, সে হাসি আর নাই; যে হাসি আধ হাসি আধ প্রীতি, সে হাসি আর নাই; যে হাসি অর্দ্ধেক বলে, সংসার সুখময়, অর্দ্ধেক বলে, সুখের আকাঙ্ক্ষা পূরিল না–সে হাসি আর নাই। সে চাহনি নাই–যে চাহনি দেখিয়া ভ্রমর ভাবিত, "এত রূপ!"–যে চাহনি দেখিয়া গোবিন্দলাল ভাবিত, "এত গুণ!" সে চাহনি আর নাই। যে চাহনিতে গোবিন্দলালের স্নেহপূর্ণ স্থিরদৃষ্টি প্রমত্ত চক্ষু দেখিয়া ভ্রমর ভাবিত, বুঝি এ সমুদ্র আমার ইহজীবনে আমি সাঁতার দিয়া পার হইতে পারিব না,–যে চাহনি দেখিয়া, গোবিন্দলাল ভাবিয়া ভাবিয়া, এ সংসার সকল ভুলিয়া যাইত, সে চাহনি আর নাই। সে সকল প্রিয় সম্বোধন আর নাই–সে "ভ্রমর", "ভোমরা", "ভোমর", "ভোম", "ভুমরি", "ভুমি", "ভুম", "ভোঁ ভোঁ"–সে সব নিত্য নূতন, নিত্য স্নেহপূর্ণ, রঙ্গপূর্ণ, সুখপূর্ণ সম্বোধন আর নাই। সে কালো, কালা, কালাচাঁদ, কেলেসোণা, কালোমাণিক, কালিন্দী, কালীয়ে–সে প্রিয়সম্বোধন আর নাই। সে ও, ওগো, ওহে, ওলো,–সে প্রিয়সম্বোধন আর নাই। সে মিছামিছি ডাকাডাকি আর নাই। সে মিছামিছি বকাবকি আর নাই। সে কথা কহার প্রণালী আর নাই। আগে কথা কুলাইত না–এখন তাহা খুঁজিয়া আনিতে হয়। যে কথা অর্দ্ধেক ভাষায়, অর্দ্ধেক নয়নে নয়নে, অধরে অধরে প্রকাশ পাইত, এখন সে কথা উঠিয়া গিয়াছে। যে কথা বলিবার প্রয়োজন নাই, কেবল উত্তরে কণ্ঠস্বর শুনিবার প্রয়োজন, এখন সে কথা উঠিয়া গিয়াছে। আগে যখন গোবিন্দলাল ভ্রমর একত্রিত থাকিত, তখন গোবিন্দলালকে ডাকিলে কেহ সহজে পাইত না–ভ্রমরকে ডাকিলে একেবারে পাইত না। এখন ডাকিতে হয় না–হয় "বড় গরমি", নয় "কে ডাকিতেছে", বলিয়া একজন উঠিয়া যায়। সে সুন্দর পূর্ণিমা মেঘে ঢাকিয়াছে। কার্ত্তিকী রাকায় গ্রহণ লাগিয়াছে। কে খাঁটি সোণায় দস্তার খাদ মিশাইয়াছে–কে সুরবাঁধা যন্ত্রের তার কাটিয়াছে।

আর সেই মধ্যাহ্নরবিকরপ্রফুল্ল, হৃদয়মধ্যে অন্ধকার হইয়াছে। গোবিন্দলাল সে অন্ধকারে আলো করিবার জন্য ভাবিত রোহিণী,–ভ্রমর সে ঘোর, মহাঘোর

অন্ধকারে, আলো করিবার জন্য ভাবিত–যম! নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, অগতির গতি, প্রেমশূন্যের প্রীতিস্থান তুমি, যম! চিত্ত বিনোদন, দুঃখবিনাশন, বিপদ্‌ভঞ্জন, দীনরঞ্জন তুমি যম! আশাশূন্যের আশা, ভালবাসাশূন্যের ভালবাসা, তুমি যম! ভ্রমরকে গ্রহণ কর, হে যম!

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

তার পর কৃষ্ণকান্ত রায়ের ভারি শ্রাদ্ধ হইয়া গেল। শত্রুপক্ষ বলিল যে, হাঁ ঘটা হইয়াছে বটে, পাঁচ সাত দশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। মিত্রপক্ষ বলিল, লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে। কৃষ্ণকান্তের উত্তরাধিকারিগণ মিত্রপক্ষের নিকট গোপনে বলিল, আন্দাজ পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। আমরা খাতা দেখিয়াছি। মোট ব্যয়, ৩২৩৫৬ ।/১২– ।

যাহা হউক, দিনকতক বড় হাঙ্গামা গেল। হরলাল শ্রাদ্ধাধিকারী, আসিয়া শ্রাদ্ধ করিল। দিনকতক মাছির ভনভনানিতে, তৈজসের ঝনঝনানিতে, কাঙ্গালির কোলাহলে, নৈয়ায়িকের বিচারে, গ্রামে কাণ পাতা গেল না। সন্দেশ মিঠাইয়ের আমদানি, কাঙ্গালির আমদানি, টিকি নামাবলীর আমদানি, কুটুম্বের কুটুম্ব, তস্য কুটুম্ব, তস্য কুটুম্বের আমদানি। ছেলেগুলা মিহিদানা, সীতাভোগ লইয়া ভাঁটা খেলাইতে আরম্ভ করিল; মাগীগুলা নারিকেল তৈল মহার্ঘ দেখিয়া, মাথায় লুচিভাজা ঘি মাখিতে আরম্ভ করিল; গুলির দোকান বন্ধ হইল, সব গুলিখোর ফলাহারে; মদের দোকান বন্ধ হইল, সব মাতাল, টিকি রাখিয়া নামাবলী কিনিয়া উপস্থিত পত্রে বিদায় লইতে গিয়াছে। চাল মহার্ঘ হইল, কেন না, কেবল অন্নব্যয় নয়, এত ময়দা খরচ যে, আর চালের গুঁড়িতে কুলান যায় না; এত ঘৃতের খরচ যে, রোগীরা আর কাষ্টর অয়েল পায় না; গোয়ালার কাছে ঘোল কিনিতে গেলে তাহারা বলিতে আরম্ভ করিল, আমার ঘোলটুকু ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে দই হইয়া গিয়াছে।

কোনমতে শ্রাদ্ধের গোল থামিল, শেষ উইল পড়ার যন্ত্রণা আরম্ভ হইল। উইল পড়িয়া হরলাল দেখিলেন, উইলে বিস্তর সাক্ষী–কোন গোল করিবার সম্ভাবনা নাই। হরলাল শ্রাদ্ধান্তে স্বস্থানে গমন করিলেন।

উইল পড়িয়া আসিয়া গোবিন্দলাল ভ্রমরকে বলিলেন, “উইলের কথা শুনিয়াছ?”

ভ্র। কি?

গো। তোমার অর্দ্ধাংশ।

ভ্র। আমার, না তোমার?

গো। এখন আমার তোমার একটু প্রভেদ হইয়াছে। আমার নয়, তোমার।

ভ্র। তাহা হইলেই তোমার।

গো। তোমার বিষয় আমি ভোগ করিব না।

ভ্রমরের বড়ই কান্না আসিল, কিন্তু ভ্রমর অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া রোদন সংবরণ করিয়া বলিল, “তবে কি করিবে?”

গো। যাহাতে দুই পয়সা উপার্জ্জন করিয়া দিনপাত করিতে পারি, তাহাই করিব।

ভ্র। সে কি?

গো। দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া চাকরির চেষ্টা করিব।

ভ্র। বিষয় আমার জ্যেষ্ঠ শ্বশুরের নহে, আমার শ্বশুরের। তুমিই তাঁহার উত্তরাধিকারী, আমি নহি। জ্যেঠার উইল করিবার কোন শক্তিই ছিল না। উইল অসিদ্ধ। আমার পিতা শ্রাদ্ধের সময়ে নিমন্ত্রণে আসিয়া এই কথা বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছেন। বিষয় তোমার, আমার নহে।

গো। আমার জ্যেষ্ঠতাত মিথ্যাবাদী ছিলেন না। বিষয় তোমার, আমার নহে। তিনি যখন তোমাকে লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন, তখন বিষয় তোমার, আমার নহে।

ভ্র। যদি সেই সন্দেহই থাকে, আমি না হয় তোমাকে লিখিয়া দিতেছি।

গো। তোমার দান গ্রহণ করিয়া জীবনধারণ করিতে হইবে?

ভ্র। তাহাতেই বা ক্ষতি কি? আমি তোমার দাসানুদাসী বই ত নই?

গো। আজি কালি ও কথা সাজে না, ভ্রমর।

ভ্র। কি করিয়াছি? আমি তোমা ভিন্ন এ জগৎসংসারে আর কিছু জানি না। আট বৎসরের সময়ে আমার বিবাহ হইয়াছে–আমি সতের বৎসরে পড়িয়াছি। আমি এ নয় বৎসর আর কিছু জানি না, কেবল তোমাকে জানি। আমি তোমার প্রতিপালিত, তোমার খেলিবার পুত্তুল আমার কি অপরাধ হইল?

গো। মনে করিয়া দেখ।

ভ্র। অসময়ে পিত্রালয়ে গিয়াছিলাম–ঘাট হইয়াছে, আমার শত-সহস্র অপরাধ হইয়াছে–আমায় ক্ষমা কর। আমি আর কিছু জানি না, কেবল তোমায় জানি, তাই রাগ করিয়াছিলাম।

গোবিন্দলাল কথা কহিল না। তাহার অগ্রে, আলুলায়িতকুন্তলা, অশ্রুবিপ্লুতা, বিবশা, কাতরা, মুগ্ধা, পদপ্রান্তে বিলুণ্ঠিতা সেই সপ্তদশবর্ষীয়া বনিতা। গোবিন্দলাল কথা কহিল না। গোবিন্দলাল তখন ভাবিতেছিল, "এ কালো! রোহিণী কত সুন্দরী! এর গুণ আছে, তার রূপ আছে। এত কাল গুণের সেবা করিয়াছি, এখন কিছু দিন রূপের সেবা করিব। –আমার এ অসার, এ আশাশূন্য, প্রয়োজনশূন্য জীবন ইচ্ছামত কাটাইব। মাটির ভাণ্ড যে দিন ইচ্ছা সেই দিন ভাঙ্গিয়া ফেলিব।"

ভ্রমর পায়ে ধরিয়া কাঁদিতেছে–ক্ষমা কর! আমি বালিকা!

যিনি অনন্ত সুখদুঃখের বিধাতা, অন্তর্যামী, কাতরের বন্ধু, অবশ্যই তিনি এ কথাগুলি শুনিলেন, কিন্তু গোবিন্দলাল তাহা শুনিল না। নীরব হইয়া রহিল। গোবিন্দলাল রোহিণীকে ভাবিতেছিল। তীব্রজ্যোতির্ম্ময়ী, অনন্তপ্রভাশালিনী প্রভাতশুক্রতারারূপিণী রূপতরঙ্গিণী চঞ্চলা রোহিণীকে ভাবিতেছিল।

ভ্রমর উত্তর না পাইয়া বলিল, "কি বল?"

গোবিন্দলাল বলিল, "আমি তোমায় পরিত্যাগ করিব।"

ভ্রমর পদত্যাগ করিল। উঠিল। বাহিরে যাইতেছিল। চৌকাঠ বাধিয়া পড়িয়া মূর্চ্ছিতা হইল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

"কি অপরাধ আমি করিয়াছি যে আমাকে ত্যাগ করিবে?"

এ কথা ভ্রমর গোবিন্দলালকে মুখে বলিতে পারিল না–কিন্তু এই ঘটনার পর পলে পলে, মনে মনে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, আমার কি অপরাধ?

গোবিন্দলালও মনে মনে অনুসন্ধান করিতে লাগিল যে, ভ্রমরের কি অপরাধ? ভ্রমরের যে বিশেষ গুরুতর অপরাধ হইয়াছে, তাহা গোবিন্দলালের মনে এক প্রকার স্থির হইয়াছে। কিন্তু অপরাধটা কি, তাহা তত ভাবিয়া দেখেন নাই। ভাবিয়া দেখিতে গেলে মনে হইত, ভ্রমর যে তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস করিয়াছিল, অবিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে এত কঠিন পত্র লিখিয়াছিল–একবার তাঁহাকে মুখে সত্য মিথ্যা জিজ্ঞাসা করিল না, এই তাহার অপরাধ। যার জন্য এত করি, সে এত সহজে আমাকে অবিশ্বাস করিয়াছে, এই তাহার অপরাধ। আমরা কুমতি সুমতির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। গোবিন্দলালের হৃদয়ে পাশাপাশি উপবেশন করিয়া, কুমতি সুমতি যে কথোপকথন করিতেছিল, তাহা সকলকে শুনাইব।

কুমতি বলিল, “ভ্রমরের প্রথম এইটি অপরাধ, এই অবিশ্বাস।”

সুমতি উত্তর করিল, “যে অবিশ্বাসের যোগ্য, তাহাকে অবিশ্বাস না করিবে কেন? তুমি রোহিণীর সঙ্গে এই আনন্দ উপভোগ করিতেছ, ভ্রমর সেটা সন্দেহ করিয়াছিল বলিয়াই তার এত দোষ?”

কুমতি। এখন যেন আমি অবিশ্বাসী হইয়াছি, কিন্তু যখন ভ্রমর অবিশ্বাস করিয়াছিল, তখন আমি নির্দ্দোষী।

সুমতি। দুদিন আগে পাছেতে বড় আসিয়া যায় না–দোষ ত করিয়াছ। যে দোষ করিতে সক্ষম, তাহাকে দোষী মনে করা কি এত গুরুতর অপরাধ?

কুমতি। ভ্রমর আমাকে দোষী মনে করিয়াছে বলিয়াই আমি দোষী হইয়াছি। সাধুকে চোর বলিতে বলিতে চোর হয়।

সুমতি। দোষটা যে চোর বলে তার! যে চুরি করে তার কিছু নয়!

কুমতি। তোর সঙ্গে ঝগড়ায় আমি পার্‌ব না। দেখ্ না, ভ্রমর আমার কেমন অপমানটা করিল? আমি বিদেশ থেকে আসছি শুনে বাপের বাড়ী চলিয়া গেল।

সুমতি। যদি সে যাহা ভাবিয়াছিল, তাহাতে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া থাকে, তবে সে সঙ্গত কাজই করিয়াছে। স্বামী পরদারনিরত হইলে নারীদেহ ধারণ করিয়া কে রাগ না করিবে?

কুমতি। সেই বিশ্বাসই তাহার ভ্রম–আর দোষ কি?

সুমতি। এ কথা কি তাহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছ?

কুমতি। না।

সুমতি। তুমি না জিজ্ঞাসা করিয়া রাগ করিতেছ, আর ভ্রমর নিতান্ত বালিকা, না জিজ্ঞাসা করিয়া রাগ করিয়াছিল বলিয়া এত হাঙ্গাম? সে সব কাজের কথা নহে–আসল রাগের কারণ কি বলিব?

কুমতি। কি বল না?

সুমতি। আসল কথা রোহিণী। রোহিণীতে প্রাণ পড়িয়াছে–তাই আর কালো ভোমরা ভাল লাগে না।

কুমতি। এত কাল ভোমরা ভাল লাগিল কিসে?

সুমতি। এত কাল রোহিণী জোটে নাই। এক দিনে কোন কিছু ঘটে না। সময়ে সকল উপস্থিত হয়। আজ রৌদ্রে ফাটিতেছে বলিয়া কাল দুর্দ্দিন হইবে না কেন? শুধু কি তাই–আরও আছে।

কুমতি। আর কি?

সুমতি। কৃষ্ণকান্তের উইল। বুড়া মনে মনে জানিত, ভ্রমরকে বিষয় দিয়া গেলে–বিষয় তোমারই রহিল। ইহাও জানিত যে, ভ্রমর এক মাসের মধ্যে

তোমাকে উহা লিখিয়া দিবে। কিন্তু আপাততঃ তোমাকে একটু কুপথগামী দেখিয়া তোমার চরিত্রশোধন জন্য তোমাকে ভ্রমরের আঁচলে বাঁধিয়া দিয়া গেল। তুমি অতটা না বুঝিয়া ভ্রমরের উপর রাগিয়া উঠিয়াছ।

কুমতি। তা সত্যই। আমি কি স্ত্রীর মাসহরা খাইব না কি?

সুমতি। তোমার বিষয়, তুমি কেন ভ্রমরের কাছে লিখিয়া লও না?

কুমতি। স্ত্রীর দানে দিনপাত করিব?

সুমতি। আরে বাপ রে! কি পুরুষসিংহ! তবে ভ্রমরের সঙ্গে মোকদ্দমা করিয়া ডিক্রী করিয়া লও না–তোমার পৈতৃক বিষয় বটে।

কুমতি। স্ত্রীর সঙ্গে মোকদ্দমা করিব?

সুমতি। তবে আর কি করিবে? গোল্লায় যাও।

কুমতি। সেই চেষ্টায় আছি।

সুমতি। রোহিণী–সঙ্গে যাবে কি?

তখন কুমতিতে সুমতিতে ভারি চুলোচুলি ঘুষোঘুষি আরম্ভ হইল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আমার এমন বিশ্বাস আছে যে, গোবিন্দলালের মাতা যদি পাকা গৃহিণী হইতেন, তবে ফুৎকার মাত্রে এ কাল মেঘ উড়িয়া যাইত। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বধূর সঙ্গে তাঁহার পুত্রের আন্তরিক বিচ্ছেদ হইয়াছে। স্ত্রীলোক ইহা সহজেই বুঝিতে পারে। যদি তিনি এই সময়ে সদুপদেশে, স্নেহবাক্যে এবং স্ত্রীবুদ্ধিসুলভ অন্যান্য সদুপায়ে তাহার প্রতিকার করিতে যত্ন করিতেন, তাহা হইলে বুঝি সুফল ফলাইতে পারিতেন। কিন্তু গোবিন্দলালের মাতা বড় পাকা গৃহিণী নহেন, বিশেষ পুত্রবধূ বিষয়ের অধিকারিণী হইয়াছে বলিয়া ভ্রমরের উপরে একটু বিদ্বেষাপন্নাও হইয়াছিলেন। যে স্নেহের বলে তিনি ভ্রমরের ইষ্টকামনা করিবেন, ভ্রমরের উপর তাঁহার সে স্নেহ ছিল না। পুত্র থাকিতে, পুত্রবধূর বিষয় হইল, ইহা তাঁহার অসহ্য হইল। তিনি একবারও অনুভব করিতে পারিলেন না যে, ভ্রমর গোবিন্দলাল অভিন্নসম্পত্তি জানিয়া, গোবিন্দলালের চরিত্রদোষসম্ভাবনা দেখিয়া, কৃষ্ণকান্ত রায় গোবিন্দলালের শাসন জন্য ভ্রমরকে বিষয় দিয়া গিয়াছিলেন। একবারও তিনি মনে ভাবিলেন না যে, কৃষ্ণকান্ত মুমূর্ষু অবস্থায় কতকটা লুপ্তবুদ্ধি হইয়া, কতকটা ভ্রান্তচিত্ত হইয়াই এ অবিধেয় কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন যে, পুত্রবধূর সংসারে তাঁহাকে কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকারিণী, এবং অন্নদাস পৌরবর্গের মধ্যে গণ্যা হইয়া ইহজীবন নির্ব্বাহ করিতে হইবে। অতএব সংসার ত্যাগ করাই ভাল, স্থির করিলেন। একে পতিহীনা, কিছু আত্মপরায়ণা, তিনি স্বামিবিয়োগকাল হইতেই কাশীযাত্রা কামনা করিতেন, কেবল স্ত্রীস্বভাবসুলভ পুত্রস্নেহবশতঃ এত দিন যাইতে পারেন নাই। এক্ষণে সে বাসনা আরও প্রবল হইল।

তিনি গোবিন্দলালকে বলিলেন, “কর্ত্তারা একে একে স্বর্গারোহণ করিলেন, এখন আমার সময় নিকট হইয়া আসিল। তুমি পুত্রের কাজ কর; এই সময় আমাকে কাশী পাঠাইয়া দাও।”

গোবিন্দলাল হঠাৎ এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। বলিলেন, “চল, আমি তোমাকে আপনি কাশী রাখিয়া আসিব।” দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সময়ে ভ্রমর একবার ইচ্ছা করিয়া পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন। কেহই তাঁহাকে নিষেধ করে নাই। অতএব ভ্রমরের অজ্ঞাতে গোবিন্দলাল কাশীযাত্রার সকল উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

নিজনামে কিছু সম্পত্তি ছিল–তাহা গোপনে বিক্রয় করিয়া অর্থসঞ্চয় করিলেন। কাঞ্চন হীরকাদি মূল্যবান্ বস্তু যাহা নিজের সম্পত্তি ছিল–তাহা বিক্রয় করিলেন। এইরূপে প্রায় লক্ষ টাকা সংগ্রহ হইল। গোবিন্দলাল ইহা দ্বারা ভবিষ্যতে দিনপাত করিবেন স্থির করিলেন।

তখন মাতৃসঙ্গে কাশীযাত্রার দিন স্থির করিয়া ভ্রমরকে আনিতে পাঠাইলেন। শাশুড়ী কাশীযাত্রা করিবেন শুনিয়া ভ্রমর তাড়াতাড়ি আসিল। আসিয়া শাশুড়ীর চরণ ধরিয়া অনেক বিনয় করিল; শাশুড়ীর পদপ্রান্তে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, "মা, আমি বালিকা–আমায় একা রাখিয়া যাইও না–আমি সংসারধর্ম্মের কি বুঝি? মা–সংসার সমুদ্র, আমাকে এ সমুদ্রে একা ভাসাইয়া যাইও না।" শাশুড়ী বলিলেন, "তোমার বড় ননদ রহিল। সেই তোমাকে আমার মত যত্ন করিবে–আর তুমিও গৃহিণী হইয়াছ।" ভ্রমর কিছুই বুঝিল না–কেবল কাঁদিতে লাগিল।

ভ্রমর দেখিল বড় বিপদ্ সম্মুখে। শাশুড়ী ত্যাগ করিয়া চলিলেন–আবার স্বামীও তাঁহাকে রাখিতে চলিলেন–তিনিও রাখিতে গিয়া বুঝি আর না আইসেন! ভ্রমর গোবিন্দলালের পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল–বলিল, "কত দিনে আসিবে বলিয়া যাও।"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "বলিতে পারি না। আসিতে বড় ইচ্ছা নাই।"

ভ্রমর পা ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া, মনে ভাবিল, "ভয় কি? বিষ খাইব।"

তার পরে স্থিরীকৃত যাত্রার দিবস আসিয়া উপস্থিত হইল। হরিদ্রাগ্রাম হইতে কিছুদূর শিবিকারোহণে গিয়া ট্রেণ পাইতে হইবে। শুভ যাত্রিক লগ্ন উপস্থিত–সকল প্রস্তুত। ভারে ভারে সিন্দুক, তোরঙ্গ, বাক্স, বেগ, গাঁটরি বাহকেরা বহিতে আরম্ভ করিল। দাস দাসী সুবিমল ধৌতবস্ত্র পরিয়া, কেশ রঞ্জিত করিয়া, দরওয়াজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া পান চিবাইতে লাগিল–তাহারা সঙ্গে যাইবে। দ্বারবানেরা ছিটের জামার বন্ধক আঁটিয়া লাঠি হাতে করিয়া, বাহকদিগের সঙ্গে বকাবকি আরম্ভ করিল। পাড়ার মেয়ে ছেলে দেখিবার জন্য ঝুঁকিল। গোবিন্দলালের মাতা গৃহদেবতাকে প্রণাম করিয়া, পৌরজন সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শিবিকারোহণ করিলেন; পৌরজন সকলেই কাঁদিতে লাগিল। তিনি শিবিকারোহণ করিয়া অগ্রসর হইলেন।

এ দিকে গোবিন্দলাল অন্যান্য পৌরস্ত্রীগণকে যথোচিত সম্বোধন করিয়া শয়নগৃহে রোরুদ্যমানা ভ্রমরের কাছে বিদায় হইতে গেলেন। ভ্রমরকে রোদনবিবশা দেখিয়া তিনি যাহা বলিতে আসিয়াছিলেন, তাহা বলিতে না পারিয়া, কেবল বলিলেন, "ভ্রমর! আমি মাকে রাখিতে চলিলাম।"

ভ্রমর চক্ষের জল মুছিয়া বলিল, "মা সেখানে বাস করিবেন। তুমি আসিবে না কি?"

কথা যখন ভ্রমর জিজ্ঞাসা করিল, তখন তাহার চক্ষের জল শুকাইয়া গিয়াছিল; তাহার স্বরের স্থৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, তাহার অধরে স্থির প্রতিজ্ঞা দেখিয়া গোবিন্দলাল কিছু বিস্মিত হইলেন। হঠাৎ উত্তর করিতে পারিলেন না। ভ্রমর স্বামীকে নীরব দেখিয়া পুনরপি বলিল, "দেখ, তুমিই আমাকে শিখাইয়াছ, সত্যই একমাত্র ধর্ম্ম, সত্যই একমাত্র সুখ। আজি আমাকে তুমি সত্য বলিও–আমি তোমার আশ্রিত বালিকা–আমায় আজি প্রবঞ্চনা করিও না–কবে আসিবে?"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "তবে সত্যই শোন। ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছা নাই।"

ভ্রমর। কেন ইচ্ছা নাই–তাহা বলিয়া যাইবে না কি?

গো। এখানে থাকিলে তোমার অন্নদাস হইয়া থাকিতে হইবে।

ভ্রমর। তাহাতেই বা ক্ষতি কি? আমি ত তোমার দাসানুদাসী।

গো। আমার দাসানুদাসী ভ্রমর, আমার প্রবাস হইতে আসার প্রতীক্ষায় জানেলায় বসিয়া থাকিবে। তেমন সময়ে সে পিত্রালয়ে গিয়া বসিয়া থাকে না।

ভ্রমর। তাহার জন্য কত পায়ে ধরিয়াছি–এক অপরাধ কি মার্জ্জনা হয় না!

গো। এখন সেরূপ শত অপরাধ হইবে। তুমি এখন বিষয়ের অধিকারিণী।

ভ্রমর। তা নয়। আমি এবার বাপের বাড়ী গিয়া, বাপের সাহায্যে যাহা করিয়াছি, তাহা দেখ।

এই বলিয়া ভ্রমর একখানা কাগজ দেখাইলেন। গোবিন্দলালের হাতে তাহা দিয়া বলিলেন, "পড়।"

গোবিন্দলাল পড়িয়া দেখিলেন-দানপত্র। ভ্রমর, উচিত মূল্যের ষ্টাম্পে, আপনার সমুদয় সম্পত্তি স্বামীকে দান করিতেছেন-তাহা রেজিষ্টারী হইয়াছে। গোবিন্দলাল পড়িয়া বলিলেন, "তোমার যোগ্য কাজ তুমি করিয়াছ। কিন্তু তোমায় আমায় কি সম্বন্ধ? আমি তোমায় অলঙ্কার দিব, তুমি পরিবে। তুমি বিষয় দান করিবে, আমি ভোগ করিব-এ সম্বন্ধ নহে।" এই বলিয়া গোবিন্দলাল বহুমূল্য দানপত্রখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

ভ্রমর বলিলেন, "পিতা বলিয়া দিয়াছেন, ইহা ছিঁড়িয়া ফেলা বৃথা। সরকারীতে ইহার নকল আছে।"

গো। থাকে থাক্। আমি চলিলাম।

ভ্র। কবে আসিবে?

গো। আসিব না।

ভ্র। কেন? আমি তোমার স্ত্রী, শিষ্যা, আশ্রিতা, প্রতিপালিতা-তোমার দাসানুদাসী-তোমার কথার ভিখারী-আসিবে না কেন?

গো। ইচ্ছা নাই।

ভ্র। ধর্ম্ম নাই কি?

গো। বুঝি আমার তাও নাই।

বড় কষ্টে ভ্রমর চক্ষের জল রোধ করিল। হুকুমে চক্ষের জল ফিরিল-ভ্রমর জোড়হাত করিয়া, অবিকম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "তবে যাও-পার, আসিও না। বিনাপরাধে আমাকে ত্যাগ করিতে চাও, কর।-কিন্তু মনে রাখিও, উপরে দেবতা আছেন। মনে রাখিও-এক দিন আমার জন্য তোমাকে কাঁদিতে হইবে। মনে রাখিও-এক দিন তুমি খুঁজিবে, এ পৃথিবীতে অকৃত্রিম আন্তরিক স্নেহ কোথায়?-দেবতা সাক্ষী! যদি আমি সতী হই, কায়মনোবাক্যে তোমার পায়ে আমার ভক্তি থাকে, তবে তোমায় আমায় আবার সাক্ষাৎ হইবে। আমি সেই আশায় প্রাণ রাখিব। এখন যাও, বলিতে ইচ্ছা হয়, বল যে, আর আসিব না। কিন্তু আমি বলিতেছি-আবার আসিবে-আবার ভ্রমর বলিয়া ডাকিবে-আবার আমার জন্য কাঁদিবে। যদি এ কথা নিষ্ফল হয়, তবে জানিও-দেবতা মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা, ভ্রমর অসতী! তুমি যাও! আমার দুঃখ নাই! তুমি আমারই-রোহিণীর নও।"

এই বলিয়া ভ্রমর, ভক্তিভাবে স্বামীর চরণে প্রণাম করিয়া গজেন্দ্রগমনে কক্ষান্তরে গমন করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

এই আখ্যায়িকা আরম্ভের কিছু পূর্ব্বে ভ্রমরের একটি পুত্র হইয়া সূতিকাগারেই নষ্ট হয়। ভ্রমর আজি কক্ষান্তরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া, সেই সাত দিনের ছেলের জন্য কাঁদিতে বসিল। মেঝের উপর পড়িয়া, ধূলায় লুটাইয়া অশমিত নিশ্বাসে পুত্রের জন্য কাঁদিতে লাগিল। "আমার ননীর পুত্তলী, আমার কাঙ্গালের সোণা, আজ তুমি কোথায়? আজি তুই থাকিলে আমায় কার সাধ্য ত্যাগ করে? আমার মায়া কাটাইলেন, তোর মায়া কে কাটাইত? আমি কুরূপা কুৎসিতা, তোকে কে কুৎসিত বলিত? তোর চেয়ে কে সুন্দর? একবার দেখা দে বাপ্-এই বিপদের সময় একবার কি দেখা দিতে পারিস্ না-মরিলে কি আর দেখা দেয় না?-"

ভ্রমর তখন যুক্তকরে, মনে মনে উর্দ্ধমুখে, অথচ অস্ফুট বাক্যে দেবতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, “কেহ আমাকে বলিয়া দাও-আমার কি দোষে, এই সতের বৎসর মাত্র বয়সে এমন অসম্ভব দুর্দ্দশা ঘটিল; আমার পুত্র মরিয়াছে-আমায় স্বামী ত্যাগ করিল-আমার সতের বৎসর মাত্র বয়স, আমি এই বয়সে স্বামীর ভালবাসা বিনা আর কিছু ভালবাসি নাই-আমার ইহলোকে আর কিছু কামনা নাই-আর কিছু কামনা করিতে শিখি নাই-আমি আজ এই সতের বৎসর বয়সে তাহাতে নিরাশ হইলাম কেন?”

ভ্রমর কাঁদিয়া কাটিয়া সিদ্ধান্ত করিল-দেবতারা নিতান্ত নিষ্ঠুর। যখন দেবতা নিষ্ঠুর, তখন মনুষ্য আর কি করিবে-কেবল কাঁদিবে। ভ্রমর কেবল কাঁদিতে লাগিল।

এ দিকে গোবিন্দলাল, ভ্রমরের নিকট হইতে বিদায় হইয়া ধীরে ধীরে বহির্ব্বাটীতে আসিলেন। আমরা সত্য কথা বলিব-গোবিন্দলাল চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে আসিলেন। বালিকার অতি সরল যে প্রীতি-অকৃত্রিম, উদ্বেলিত, কথায় কথায় ব্যক্ত, যাহার প্রবাহ দিনরাত্রি ছুটিতেছে-ভ্রমরের কাছে সেই অমূল্য প্রীতি পাইয়া গোবিন্দলাল সুখী হইয়াছিলেন, গোবিন্দলালের এখন তাহা মনে পড়িল। মনে পড়িল যে, যাহা ত্যাগ করিলেন, তাহা আর পৃথিবীতে পাইবেন না। ভাবিলেন, যাহা করিয়াছি, তাহা আর এখন ফিরে না-এখন ত যাই। এখন যাত্রা করিয়াছি, এখন যাই। বুঝি আর ফেরা হইবে না। যাহা হউক, যাত্রা করিয়াছি, এখন যাই।

সেই সময়ে যদি গোবিন্দলাল দুই পা ফিরিয়া গিয়া, ভ্রমরের রুদ্ধ দ্বার ঠেলিয়া একবার বলিতেন,-“ভ্রমর, আমি আবার আসিতেছি,” তবে সকল মিটিত। গোবিন্দলালের অনেক বার সে ইচ্ছা হইয়াছিল। ইচ্ছা হইলেও তাহা করিলেন না। ইচ্ছা হইলেও একটু লজ্জা করিল। ভাবিলেন, এত তাড়াতাড়ি কি? যখন মনে করিব, তখন ফিরিব। ভ্রমরের কাছে গোবিন্দলাল অপরাধী। আবার ভ্রমরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সাহস হইল না। যাহা হয় একটা স্থির করিবার বুদ্ধি হইল না। যে পথে যাইতেছেন, সেই পথে চলিলেন। তিনি চিন্তাকে বর্জ্জন করিয়া-বহির্ব্বাটীতে আসিয়া সজ্জিত অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক কশাঘাত করিলেন। পথে যাইতে যাইতে রোহিণীর রূপরাশি হৃদয়মধ্যে ফুটিয়া উঠিল।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ প্রথম বৎসর

হরিদ্রাগ্রামের বাড়ীতে সংবাদ আসিল,-গোবিন্দলাল, মাতা প্রভৃতি সঙ্গে, নির্ব্বিঘ্নে সুস্থ শরীরে কাশীধামে পৌঁছিয়াছেন। ভ্রমরের কাছে কোন পত্র আসিল না। অভিমানে ভ্রমরও পত্র লিখিল না। পত্রাদি আমলাবর্গের কাছে আসিতে লাগিল।

এক মাস গেল, দুই মাস গেল। পত্রাদি আসিতে লাগিল। শেষ এক দিন সংবাদ আসিল যে, গোবিন্দলাল কাশী হইতে বাটী যাত্রা করিয়াছেন।

ভ্রমর শুনিয়া বুঝিল যে, গোবিন্দলাল কেবল মাকে ভুলাইয়া, অন্যত্র গমন করিয়াছেন। বাড়ী আসিবেন এমন ভরসা হইল না।

এই সময়ে ভ্রমর গোপনে সর্ব্বদা রোহিণীর সংবাদ লইতে লাগিল। রোহিণী রাঁধে বাড়ে, খায়, গা ধোয়, জল আনে। আর কিছুই সংবাদ নাই। ক্রমে এক দিন সংবাদ আসিল, রোহিণী পীড়িতা। ঘরের ভিতর মুড়ি দিয়া পড়িয়া থাকে, বাহির হয় না। ব্রহ্মানন্দ আপনি রাঁধিয়া খায়।

তার পর একদিন সংবাদ আসিল যে, রোহিণী কিছু সারিয়াছে, কিন্তু পীড়ার মূল যায় নাই। শূলরোগ- চিকিৎসা নাই-রোহিণী আরোগ্য জন্য তারকেশ্বর হত্যা দিতে যাইবে। শেষ সংবাদ-রোহিণী হত্যা দিতে তারকেশ্বরে গিয়াছে। একাই গিয়াছে-কে সঙ্গে যাইবে?

এ দিকে তিন চারি মাস গেল-গোবিন্দলাল ফিরিয়া আসিল না। পাঁচ মাস ছয় মাস হইল, গোবিন্দলাল ফিরিল না। ভ্রমরের রোদনের শেষ নাই। কেবল মনে করিত, এখন কোথায় আছেন, কেমন আছেন-সংবাদ পাইলেই বাঁচি। এ সংবাদও পাই না কেন?

শেষ ননন্দাকে বলিয়া শাশুড়ীকে পত্র লিখাইল-আপনি মাতা, অবশ্য পুত্রের সংবাদ পান। শাশুড়ী লিখিলেন, তিনি গোবিন্দলালের সংবাদ পাইয়া থাকেন। গোবিন্দলাল প্রয়াগ, মথুরা, জয়পুর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়া আপাততঃ দিল্লী অবস্থিতি করিতেছেন। শীঘ্র সেখান হইতে স্থানান্তরে গমন করিবেন। কোথাও স্থায়ী হইতেছেন না।

এ দিকে রোহিণীও আর ফিরিল না। ভ্রমর ভাবিতে লাগিলেন, ভগবান্ জানেন, রোহিণী কোথায় গেল। আমার মনের সন্দেহ আমি পাপমুখে ব্যক্ত করিব না। ভ্রমর আর সহ্য করিতে পারিলেন না; কাঁদিতে কাঁদিতে ননন্দাকে বলিয়া শিবিকারোহণে পিত্রালয়ে গমন করিলেন।

সেখানে গিয়া গোবিন্দলালের কোন সংবাদ পাওয়া দুরূহ দেখিয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন, আসিয়া হরিদ্রাগ্রামেও স্বামীর কোন সংবাদ না পাইয়া, আবার শাশুড়ীকে পত্র লিখাইলেন। শাশুড়ী এবার লিখিলেন, "গোবিন্দলাল আর কোন সংবাদ দেয় না; এখন সে কোথায় আছে জানি না। কোনও সংবাদ পাই না।" এইরূপে প্রথম বৎসর কাটিয়া গেল। প্রথম বৎসরের শেষে ভ্রমর রুগ্নশয্যায় শয়ন করিলেন। অপরাজিতা ফুল শুকাইয়া উঠিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভ্রমর রুগ্নশয্যাশায়িনী শুনিয়া ভ্রমরের পিতা ভ্রমরকে দেখিতে আসিলেন। ভ্রমরের পিতার পরিচয় আমরা সবিশেষ দিই নাই-এখন দিব। তাঁহার পিতা মাধবীনাথ সরকারের বয়স এক চত্বারিংশৎ বৎসর। তিনি দেখিতে বড় সুপুরুষ। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে লোকমধ্যে বড় মতভেদ ছিল। অনেকে তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিত-অনেকে বলিত, তাঁহার মত দুষ্ট লোক আর নাই। তিনি যে চতুর, তাহা সকলেই স্বীকার করিত-এবং যে তাঁহার প্রশংসা করিত, সেও তাঁহাকে ভয় করিত।

মাধবীনাথ কন্যার দশা দেখিয়া, অনেক রোদন করিলেন। দেখিলেন-সেই শ্যামা সুন্দরী, যাহার সর্ব্বাবয়ব সুললিতগঠন ছিল-এক্ষণে বিশুষ্কবদন, শীর্ণশরীর, প্রকটকণ্ঠাস্থি, নিমগ্ননয়নেন্দীবর। ভ্রমরও অনেক কাঁদিল। শেষ উভয়ে রোদন সংবরণ করিলে পর ভ্রমর বলিল, "বাবা, আমার বোধ হয় আর দিন নাই। আমায় কিছু ধর্ম্ম কর্ম্ম করাও। আমি ছেলে মানুষ হলে কি হয়, আমার ত দিন ফুরাল। দিন ফুরাল ত আর বিলম্ব করিব কেন? আমার অনেক টাকা আছে, আমি ব্রত নিয়ম করিব। কে এ সকল করাইবে? বাবা, তুমি আমার ব্যবস্থা কর।"

মাধবীনাথ কোন উত্তর করিলেন না-যন্ত্রণা অসহ্য হইলে তিনি বহির্ব্বাটীতে আসিলেন। বহির্ব্বাটীতে অনেকক্ষণ বসিয়া রোদন করিলেন। কেবল রোদন নহে-সেই মর্ম্মভেদী দুঃখ মাধবীনাথের হৃদয়ে ঘোরতর ক্রোধে পরিণত হইল। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, "যে আমার কন্যার উপর এ অত্যাচার করিয়াছে-তাহার উপর তেমনই অত্যাচার করে, এমন কি জগতে কেহ নাই?" ভাবিতে ভাবিতে মাধবীনাথের হৃদয় কাতরতার পরিবর্ত্তে প্রদীপ্ত ক্রোধে পরিব্যাপ্ত হইল। মাধবীনাথ তখন রক্তোৎফুল্ললোচনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, "যে আমার ভ্রমরের এমন সর্ব্বনাশ করিয়াছে-আমি তাহার এমনই সর্ব্বনাশ করিব।"

তখন মাধবীনাথ কতক সুস্থির হইয়া অন্তঃপুরে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। কন্যার কাছে গিয়া বলিলেন, "মা, তুমি ব্রত নিয়ম করিবার কথা বলিতেছিলে, আমি

সেই কথাই ভাবিতেছিলাম। এখন তোমার শরীর বড় রুগ্ন; ব্রত নিয়ম করিতে গেলে অনেক উপবাস করিতে হয়; এখন তুমি উপবাস সহ্য করিতে পারিবে না। একটু শরীর সারুক-”

ভ্র। এ শরীর কি আর সারিবে?

মা। সারিবে মা-কি হইয়াছে? তোমার একটু এখানে চিকিৎসা হইতেছে না-কেমন করিয়াই বা হইবে? শ্বশুর নাই, শাশুড়ী নাই, কেহ কাছে নাই-কে চিকিৎসা করাইবে? তুমি এখন আমার সঙ্গে চল। আমি তোমাকে বাড়ী রাখিয়া চিকিৎসা করাইব। আমি এখন দুই দিন এখানে থাকিব-তাহার পরে তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া রাজগ্রামে যাইব।

রাজগ্রামে ভ্রমরের পিত্রালয়।

কন্যার নিকট হইতে বিদায় লইয়া মাধবীনাথ কন্যার কার্য্যকারকবর্গের নিকট গেলেন। দেওয়ানজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন, বাবুর কোন পত্রাদি আসিয়া থাকে?” দেওয়ানজী উত্তর করিল, “কিছু না।”

মাধবীনাথ। তিনি এখন কোথায় আছেন?

দেওয়ানজী। তাঁহার কোন সংবাদই আমরা কেহ বলিতে পারি না। তিনি কোন সংবাদই পাঠান না।

মা। কাহার কাছে এ সংবাদ পাইতে পারিব?

দে। তাহা জানিলে ত আমরা সংবাদ লইতাম। কাশীতে মা ঠাকুরাণীর কাছে সংবাদ জানিতে লোক পাঠাইয়াছিলাম-কিন্তু সেখানেও কোন সংবাদ আইসে না। বাবুর এক্ষণে অজ্ঞাতবাস।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মাধবীনাথ কন্যার দুর্দ্দশা দেখিয়া স্থির প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, ইহার প্রতীকার করিবেন। গোবিন্দলাল ও রোহিণী এই অনিষ্টের মূল। অতএব প্রথমেই সন্ধান কর্ত্তব্য, সেই পামর পামরী কোথায় আছে। নচেৎ দুষ্টের দণ্ড হইবে না-ভ্রমরও মরিবে।

তাহারা একেবারে লুকাইয়াছে। যে সকল সূত্রে তাহাদের ধরিবার সম্ভাবনা, সকলই অবচ্ছিন্ন করিয়াছে; পদচিহ্নমাত্র মুছিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু মাধবীনাথ বলিলেন যে, যদি আমি তাহাদের সন্ধান করিতে না পারি, তবে বৃথায় আমার পৌরুষের শ্লাঘা করি।

এইরূপ স্থির সংকল্প করিয়া মাধবীনাথ একাকী রায়দিগের বাড়ী হইতে বহির্গত হইলেন। হরিদ্রাগ্রামে একটি পোষ্ট আপিস ছিল; মাধবীনাথ বেত্রহস্তে, হেলিতে দুলিতে, পান চিবাইতে চিবাইতে, ধীরে ধীরে, নিরীহ ভালমানুষের মত, সেইখানে গিয়া দর্শন দিলেন।

ডাকঘরে, অন্ধকার চালাঘরের মধ্যে মাসিক পনর টাকা বেতনভোগী একটি ডিপুটি পোষ্ট মাষ্টার বিরাজ করিতেছিলেন। একটি আম্রকাষ্ঠের ভগ্ন টেবিলের উপরে কতকগুলি চিঠি, চিঠির ফাইল, চিঠির খাম, একখানি খুরিতে কতকটা জিউলির আটা, একটি নিক্তি, ডাকঘরের মোহর ইত্যাদি লইয়া, পোষ্ট মাষ্টার ওরফে পোষ্ট বাবু গম্ভীরভাবে, পিয়ন মহাশয়ের নিকট আপন প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছেন। ডিপুটি পোষ্ট মাষ্টার বাবু পান পনর টাকা, পিয়ন পায় সাত টাকা। সুতরাং পিয়ন মনে করে, সাত আনা আর পনর আনায় যে তফাৎ, বাবুর সঙ্গে আমার সঙ্গে তাহার অধিক তফাৎ নহে। কিন্তু বাবু মনে মনে জানেন যে, আমি

একটা ডিপুটি-ও বেটা পিয়াদা-আমি উহার হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা পুরুষ-উহাতে আমাতে জমীন আশমান্ ফারাক। সেই কথা সপ্রমাণ করিবার জন্য পোষ্ট মাষ্টার বাবু সর্ব্বদা সে গরীবকে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া থাকেন-সেও সাত আনার ওজনে উত্তর দিয়া থাকে। বাবু আপাততঃ চিঠি ওজন করিতেছিলেন, এবং পিয়াদাকে সঙ্গে সঙ্গে আশী আনার ওজনে ভর্ৎসনা করিতেছিলেন, এমত সময়ে প্রশান্তমূর্ত্তি সহাস্যবদন মাধবীনাথ বাবু সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভদ্রলোক দেখিয়া, পোষ্ট মাষ্টার বাবু আপাততঃ পিয়াদার সঙ্গে কচকচি বন্ধ করিয়া, হাঁ করিয়া, চাহিয়া রহিলেন। ভদ্রলোককে সমাদর করিতে হয়, এমন কতকটা তাঁহার মনে উদয় হইল-কিন্তু সমাদর কি প্রকারে করিতে হয়, তাহা তাঁহার শিক্ষার মধ্যে নহে-সুতরাং তাহা ঘটিয়া উঠিল না।

মাধবীনাথ দেখিলেন, একটা বানর। সহাস্যবদনে বলিলেন, "ব্রাহ্মণ?"

পোষ্ট মাষ্টার বলিলেন, "হাঁ-তু-তুমি-আপনি?"

মাধবীনাথ ঈষৎ হাস্য সংবরণ করিয়া অবনতশিরে যুক্তকরে ললাট স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "প্রাতঃপ্রণাম!"

তখন পোষ্ট মাষ্টার বাবু বলিলেন, "বসুন।"

মাধবীনাথ কিছু বিপদে পড়িলেন;-পোষ্ট বাবু ত বলিলেন, "বসুন", কিন্তু তিনি বসেন কোথা-বাবু খোদ এক অতি প্রাচীন ত্রিপাদমাত্রাবশিষ্ট চৌকিতে বসিয়া আছেন-তাহা ভিন্ন আর আসন কোথাও নাই। তখন সেই পোষ্ট মাষ্টার বাবুর সাত আনা, হরিদাস পিয়াদা-একটা ভাঙ্গা টুলের উপর হইতে রাশিখানি ছেঁড়া বহি নামাইয়া রাখিয়া মাধবীনাথকে বসিতে দিল। মাধবীনাথ বসিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "কি হে বাপু, কেমন আছ? তোমাকে দেখিয়াছি না?"

পিয়াদা। আজ্ঞা, আমি চিঠি বিলি করিয়া থাকি।

মাধবী। তাই চিনিতেছি। এক ছিলিম তামুক সাজ দেখি-

মাধবীনাথ গ্রামান্তরের লোক, তিনি কখনই হরিদাস বৈরাগী পিয়াদাকে দেখেন নাই এবং বৈরাগী বাবাজিও কখনও তাহাকে দেখেন নাই। বাবাজি মনে করিলেন-বাবুটা রকমসই বটে চাহিলে কোন্ না চারি গণ্ডা বখশিশ দিবে। এই ভাবিয়া হরিদাস হুঁকোর তল্লাসে ধাবিত হইলেন।

মাধবীনাথ আদৌ তামাকু খান না-কেবল হরিদাস বাবাজিকে বিদায় করিবার জন্য তামাকুর ফরমায়েস্ করিলেন।

পিয়াদা মহাশয় স্থানান্তরে গমন করিলেন, মাধবীনাথ পোষ্ট মাষ্টার বাবুকে বলিলেন, "আপনার কাছে একটা কথা জিজ্ঞাসা করার জন্য আসা হইয়াছে।"

পোষ্ট মাষ্টার বাবু মনে মনে একটু হাসিলেন। তিনি বঙ্গদেশীয়-নিবাস বিক্রমপুর। অন্য দিকে যেমন নির্ব্বোধ হউন না কেন-আপনার কাজ বুঝিতে সূচ্যগ্রবুদ্ধি। বুঝিলেন যে, বাবুটি কোন বিষয়ের সন্ধানে আসিয়াছেন। বলিলেন, "কি কথা মহাশয়?"

মাধ। ব্রহ্মানন্দকে আপনি চিনেন?

পোষ্ট। চিনি না-চিনি-ভাল চিনি না।

মাধবীনাথ বুঝিলেন, অবতার নিজমূর্ত্তি ধারণ করিবার উপক্রম করিতেছে। বলিলেন, "আপনার ডাকঘরে ব্রহ্মানন্দ ঘোষের নামে কোন পত্রাদি আসিয়া থাকে?"

পোষ্ট। আপনার সঙ্গে ব্রহ্মানন্দ ঘোষের আলাপ নাই?

মাধ। থাক বা না থাক, কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে আপনার কাছে আসিয়াছি।

পোষ্ট মাষ্টার বাবু তখন আপনার উচ্চ পদ এবং ডিপুটি অভিধান স্মরণপূর্ব্বক অতিশয় গম্ভীর হইয়া বসিলেন, এবং অল্প রুষ্টভাবে বলিলেন, "ডাকঘরের খবর

আমাদের বলিতে বারণ আছে।” ইহা বলিয়া পোষ্ট মাষ্টার নীরবে চিঠি ওজন করিতে লাগিলেন।

মাধবীনাথ মনে মনে হাসিতে লাগিলেন; প্রকাশ্যে বলিলেন, “ওহে বাপু, তুমি অমনি কথা কবে না, তা জানি। সে জন্য কিছু সঙ্গেও আনিয়াছি-কিছু দিয়া যাইব-এখন যা যা জিজ্ঞাসা করি, ঠিক ঠিক বল দেখি-”

তখন, পোষ্ট বাবু হর্ষোৎফুল্ল বদনে বলিলেন, “কি কন?”

মা। কই এই, ব্রহ্মানন্দের নামে কোন চিঠি-পত্র ডাকঘরে আসিয়া থাকে?

পো। আসে।

মা। কত দিন অন্তর?

পো। যে কথাটা বলিয়া দিলাম, তাহার এখনও টাকা পাই নাই। আগে তার টাকা বাহির করুন; তবে নূতন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন।

মাধবীনাথের ইচ্ছা ছিল, পোষ্ট মাষ্টারকে কিছু দিয়া যান। কিন্তু তাহার চরিত্রে বড় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন-বলিলেন, “বাপু, তুমি ত বিদেশী মানুষ দেখ্‌ছি-আমায় চেন কি?”

পোষ্ট মাষ্টার মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “না। তা আপনি যেই হউন না কেন-আমরা কি পোষ্ট আপিসের খবর যাকে তাকে বলি? কে তুমি?”

মা। আমার নাম মাধবীনাথ সরকার-বাড়ী রাজগ্রাম। আমার পাল্লায় কত লাঠিয়াল আছে খবর রাখ?

পোষ্ট বাবুর ভয় হইল-মাধবী বাবুর নাম ও দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ শুনিয়াছিলেন। পোষ্ট বাবু একটু চুপ করিলেন।

মাধবীনাথ বলিতে লাগিলেন, “আমি যাহা তোমায় জিজ্ঞাসা করি-সত্য সত্য জবাব দাও। কিছু তঞ্চক করিও না। করিলে তোমায় কিছু দিব না-এক পয়সাও নহে। কিন্তু যদি না বল, মিছা বল, তবে তোমার ঘরে আগুন দিব, তোমার ডাকঘর লুঠ করিব; আদালতে প্রমাণ করাইব যে, তুমি নিজে লোক দিয়া সরকারী টাকা অপহরণ করিয়াছ-কেমন, এখন বলিবে?”

পোষ্ট বাবু থরহরি কাঁপিতে লাগিলেন-বলিলেন, “আপনি রাগ করেন কেন? আমি ত আপনাকে চিনিতাম না, বাজে লোক মনে করিয়াই ওরূপ বলিয়াছিলাম-আপনি যখন আসিয়াছেন, তখন যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহা বলিব।”

মা। কত দিন অন্তর ব্রহ্মানন্দের চিঠি আসে?

পোষ্ট। প্রায় মাসে মাসে-ঠিক ঠাওর নাই।

মা। তবে রেজিষ্টরি হইয়াই চিঠি আসে?

পোষ্ট। হাঁ-প্রায় অনেক চিঠিই রেজিষ্টরি করা।

মা। কোন্ আপিস হইতে রেজিষ্টরি হইয়া আইসে?

পোষ্ট। মনে নাই।

মা। তোমার আপিসে একখানা করিয়া রসিদ থাকে না?

পোষ্ট মাষ্টার রসিদ খুঁজিয়া বাহির করিলেন। একখানা পড়িয়া বলিলেন, “প্রসাদপুর।”

“প্রসাদপুর কোন জেলা? তোমাদের লিষ্টে দেখ।”

পোষ্ট মাষ্টার কাঁপিতে কাঁপিতে ছাপান লিপ্তি দেখিয়া বলিল, “যশোর।”

মা। দেখ, তবে আর কোথা কোথা হইতে রেজিষ্টরি চিঠি উহার নামে আসিয়াছে। সব রসিদ দেখ।

পোষ্ট বাবু দেখিলেন, ইদানীন্তন যত পত্র আসিয়াছে, সকলই প্রসাদপুর হইতে। মাধবীনাথ পোষ্ট মাষ্টার বাবুর কম্পমান হস্তে একখানি দশ টাকার নোট দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। তখনও হরিদাস বাবাজির হুঁকা জুটিয়া উঠে নাই। মাধবীনাথ হরিদাসের জন্যও একটি টাকা রাখিয়া গেলেন। বলা বাহুল্য যে, পোষ্ট বাবু তাহা আত্মসাৎ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মাধবীনাথ হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া আসিলেন। মাধবীনাথ, গোবিন্দলাল ও রোহিণীর অধঃপতনকাহিনী সকলই লোকপরম্পরায় শুনিয়াছিলেন। তিনি মনে মনে স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, রোহিণী গোবিন্দলাল এক স্থানেই গোপনে বাস করিতেছে। ব্রহ্মানন্দের অবস্থাও তিনি সবিশেষ অবগত ছিলেন-জানিতেন যে, রোহিণী ভিন্ন তাঁহার আর কেহই নাই। অতএব যখন পোষ্ট আপিসে জানিলেন যে, ব্রহ্মানন্দের নামে মাসে মাসে রেজিষ্টরি হইয়া চিঠি আসিতেছে-তখন বুঝিলেন যে, হয় রোহিণী, নয় গোবিন্দলাল তাঁহাকে মাসে মাসে খরচ পাঠায়। প্রসাদপুর হইতে চিঠি আসে, অতএব উভয়েই প্রসাদপুরে কিম্বা তাহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে অবশ্য বাস করিতেছে, কিন্তু নিশ্চয়কে নিশ্চয়তর করিবার জন্য তিনি কন্যালয়ে প্রত্যাগমন করিয়াই ফাঁড়িতে একটি লোক পাঠাইলেন। সব্ ইন্‌স্পেক্টরকে লিখিয়া পাঠাইলেন, একটি কন্‌ষ্টেবল পাঠাইবেন, বোধ হয় কতকগুলি চোরা মাল ধরাইয়া দিতে পারিব।

সব্ ইন্‌স্পেক্টর, মাধবীনাথকে বিলক্ষণ জানিতেন-ভয়ও করিতেন-পত্রপ্রাপ্তি মাত্র নিদ্রাসিংহ কন্‌ষ্টেবলকে পাঠাইয়া দিলেন।

মাধবীনাথ নিদ্রাসিংহের হস্তে দুইটি টাকা দিয়া বলিলেন, “বাপু হে-হিন্দি মিন্দি কইও না-যা বলি, তাই কর। ঐ গাছতলায় গিয়া, লুকাইয়া থাক। কিন্তু এমন ভাবে গাছতলায় দাঁড়াইবে, যেন এখান হইতে তোমাকে দেখা যায়। আর কিছু করিতে হইবে না।” নিদ্রাসিংহ স্বীকৃত হইয়া বিদায় হইল। মাধবীনাথ তখন ব্রহ্মানন্দকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ব্রহ্মানন্দ আসিয়া নিকটে বসিল। তখন আর কেহ সেখানে ছিল না।

পরস্পরে স্বাগত জিজ্ঞাসার পর মাধবীনাথ বলিলেন, “মহাশয় আমার স্বর্গীয় বৈবাহিক মহাশয়ের বড় আত্মীয় ছিলেন। এখন তাঁহারা ত কেহ নাই-আমার জামাতাও বিদেশস্থ। আপনার কোন বিপদ্ আপদ্ পড়িলেই আমাদিগকেই দেখিতে হয়-তাই আপনাকে ডাকাইয়াছি।”

ব্রহ্মানন্দের মুখ শুকাইল। বলিল, “বিপদ্ কি মহাশয়?” মাধবীনাথ গম্ভীরভাবে বলিলেন, “আপনি কিছু বিপদ্‌গ্রস্ত বটে।”

ব্র। “কি বিপদ্ মহাশয়?”

মা। বিপদ্ সমূহ। পুলিসে কি প্রকারে নিশ্চয় জানিয়াছে যে, আপনার কাছে একখানা চোরা নোট আছে।

ব্রহ্মানন্দ আকাশ হইতে পড়িল। “সে কি! আমার কাছে চোরা নোট!”

মা। তোমার জানা, চোরা না হইতে পারে। অন্যে তোমাকে চোরা নোট দিয়াছে, তুমি না জানিয়া তুলিয়া রাখিয়াছ!

ব্র। সে কি মহাশয়! আমাকে নোট কে দিবে?

মাধবীনাথ তখন আওয়াজ ছোট করিয়া বলিলেন, “আমি সকলই জানিয়াছি-পুলিসেও জানিয়াছে! বাস্তবিক পুলিসের কাছেই এ সকল কথা শুনিয়াছি। চোরা নোট প্রসাদপুর হইতে আসিয়াছে। ঐ দেখ একজন পুলিসের কন্‌ষ্টেবল আসিয়া তোমার জন্য দাঁড়াইয়া আছে-আমি তাহাকে কিছু দিয়া আপাততঃ স্থগিত

রাখিয়াছি।”

মাধবীনাথ তখন বৃক্ষতলবিহারী রুলধারী গুম্ফশ্মশ্রু-শোভিত জলধরসন্নিভ কনষ্টেবলের কান্তমূর্ত্তি দর্শন করাইলেন।

ব্রহ্মানন্দ থর থর কাঁপিতে লাগিল। মাধবীনাথের পায়ে জড়াইয়া কাঁদিয়া বলিল, “আপনি রক্ষা করুন।”

মা। ভয় নাই। এবার প্রসাদপুর হইতে কোন্ কোন্ নম্বরের নোট পাইয়াছ, বল দেখি। পুলিসের লোক আমার কাছে নোটের নম্বর রাখিয়া গিয়াছে। যদি সে নম্বরের নোট না হয়, তবে ভয় কি? নম্বর বদলাইতে কতক্ষণ? এবারকার প্রসাদপুরের পত্রখানি লইয়া আইস দেখি-নোটের নম্বর দেখি।

ব্রহ্মানন্দ যায় কি প্রকারে? ভয় করে-কন্ষ্টেবল যে গাছতলায়।

মাধবীনাথ বলিলেন, “কোন ভয় নাই, আমি সঙ্গে লোক দিতেছি।” মাধবীনাথের আদেশ মত একজন দ্বারবান ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে গেল। ব্রহ্মানন্দ রোহিণীর পত্র লইয়া আসিলেন। সেই পত্রে, মাধবীনাথ যাহা যাহা খুঁজিতেছিলেন, সকলই পাইলেন।

পত্র পাঠ করিয়া ব্রহ্মানন্দকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, “এ নম্বরের নোট নহে। কোন ভয় নাই-তুমি ঘরে যাও। আমি কন্ষ্টেবলকে বিদায় করিয়া দিতেছি।”

ব্রহ্মানন্দ মৃতদেহে প্রাণ পাইল। ঊর্দ্ধশ্বাসে তথা হইতে পলায়ন করিল।

মাধবীনাথ কন্যাকে চিকিৎসার্থ স্বগৃহে লইয়া গেলেন। তাহার চিকিৎসার্থ উপযুক্ত চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া দিয়া, স্বয়ং কলিকাতায় চলিলেন। ভ্রমর অনেক আপত্তি করিল-মাধবীনাথ শুনিলেন না। শীঘ্রই আসিতেছি, এই বলিয়া কন্যাকে প্রবোধ দিয়া গেলেন।

কলিকাতায় নিশাকর দাস নামে মাধবীনাথের একজন বড় আত্মীয় ছিলেন। নিশাকর মাধবীনাথের অপেক্ষা আট দশ বৎসরের বয়ঃকনিষ্ঠ। নিশাকর কিছু করেন না-পৈতৃক বিষয় আছে-কেবল একটু একটু গীতবাদ্যের অনুশীলন করেন। নিষ্কর্ম্মা বলিয়া সর্ব্বদা পর্য্যটনে গমন করিয়া থাকেন। মাধবীনাথ তাঁহার কাছে আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। অন্যান্য কথার পর নিশাকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন হে, বেড়াইতে যাইবে?”

নিশা। কোথায়?

মা। যশোর।

নি। সেখানে কেন?

মা। নীলকুঠি কিন্‌ব।

নি। চল।

তখন বিহিত উদ্যোগ করিয়া দুই বন্ধু দুই এক দিনের মধ্যে যশোহরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেখান হইতে প্রসাদপুর যাইবেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দেখ, ধীরে ধীরে শীর্ণশরীরা চিত্রানদী বহিতেছে-তীরে অশ্বত্থ কদম্ব আম্র খর্জ্জুর প্রভৃতি অসংখ্য বৃক্ষশোভিত উপবনে কোকিল দয়েল পাপিয়া ডাকিতেছে। নিকটে গ্রাম নাই; প্রসাদপুর নামে একটি ক্ষুদ্র বাজার প্রায় এক ক্রোশ পথ দূর। এখানে মনুষ্যসমাগম নাই দেখিয়া, নিঃশঙ্কে পাপাচরণ করিবার স্থান বুঝিয়া, পূর্ব্বকালে এক নীলকর সাহেব এইখানে এক নীলকুঠি প্রস্তুত করিয়াছিল। এক্ষণে নীলকর এবং তাহার ঐশ্বর্য্য ধ্বংসপুরে প্রয়াণ করিয়াছে-তাহার আমীন তাগাদ্গীর নায়েব গোমস্তা সকলে উপযুক্ত স্থানে স্বকর্ম্মার্জ্জিত ফলভোগ করিতেছেন। একজন বাঙ্গালী সেই জনশূন্য প্রান্তরস্থিত রম্য অট্টালিকা ক্রয় করিয়া, তাহা সুসজ্জিত

করিয়াছিলেন। পুষ্পে, প্রস্তরপুত্তলে, আসনে, দর্পণে, চিত্রে, গৃহ বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার অভ্যন্তরে দ্বিতলস্থ বৃহৎ কক্ষমধ্যে আমরা প্রবেশ করি। কক্ষমধ্যে কতকগুলি রমণীয় চিত্র–কিন্তু কতকগুলি সুরুচিবিগর্হিত–অবর্ণনীয়। নির্ম্মল সুকোমল আসনোপরি উপবেশন করিয়া একজন শ্মশ্রুধারী মুসলমান একটা তম্বুরায় কাণ মুচড়াইতেছে–কাছে বসিয়া এক যুবতী ঠিং ঠিং করিয়া একটি তবলায় ঘা দিতেছে–সঙ্গে সঙ্গে হাতের স্বর্ণালঙ্কার ঝিন্ ঝিন্ করিয়া বাজিতেছে–পার্শ্বস্থ প্রাচীরবিলম্বী দুইখানি বৃহৎ দর্পণে উভয়ের ছায়াও ঐরূপ করিতেছিল। পাশের ঘরে বসিয়া, একজন যুবা পুরুষ নবেল পড়িতেছেন এবং মধ্যস্থ মুক্ত দ্বারপথে যুবতীর কার্য্য দেখিতেছেন।

তম্বুরার কাণ মুচড়াইতে মুচড়াইতে দাড়িধারী তাহার তারে অঙ্গুলি দিতেছিল। যখন তারের মেও মেও আর তবলার খ্যান্ খ্যান্ ওস্তাদজীর বিবেচনায় এক হইয়া মিলিল–তখন তিনি সেই গুম্ফ শ্মশ্রুর অন্ধকারমধ্য হইতে কতকগুলি তুষারধবল দন্ত বিনির্গত করিয়া, বৃষভদুর্লভ কণ্ঠস্বর বাহির করিতে আরম্ভ করিলেন। রব নির্গত করিতে করিতে সে তুষারধবল দন্তগুলি বহুবিধ খিচুনিতে পরিণত হইতে লাগিল; এবং ভ্রমরকৃষ্ণ শ্মশ্রুরাশি তাহার অনুবর্ত্তন করিয়া নানাপ্রকার রঙ্গ করিতে লাগিল। তখন যুবতী খিচুনিসন্তাড়িত হইয়া সেই বৃষভদুর্লভ রবের সঙ্গে আপনার কোমল কণ্ঠ মিশাইয়া গীত আরম্ভ করিল–তাহাতে সরু মোটা আওয়াজে, সোণালি রূপালি রকম একপ্রকার গীত হইতে লাগিল।

এইখানে যবনিকা পতন করিতে ইচ্ছা হয়। যাহা অপবিত্র, অদর্শনীয়, তাহা আমরা দেখাইব না–যাহা নিতান্ত না বলিলে নয়, তাহাই বলিব। কিন্তু তথাপি সেই অশোক বকুল কুটজ কুরুবক কুঞ্জমধ্যে ভ্রমরগুঞ্জন, কোকিলকূজন, সেই ক্ষুদ্রনদীতরঙ্গচালিত রাজহংসের কলনাদ, সেই যূথী জাতি মল্লিকা মধুমালতী প্রভৃতি কুসুমের সৌরভ, সেই গৃহমধ্যে নীলকাচপ্রবিষ্ট রৌদ্রের অপূর্ব্ব মাধুরী, সেই রজতস্ফটিকাদিনির্ম্মিত পুষ্পাধারে সুবিন্যস্ত কুসুমগুচ্ছের শোভা, সেই গৃহশোভাকারী দ্রব্যজাতের বিচিত্র উজ্জ্বল বর্ণ আর সেই গায়কের বিশুদ্ধস্বরসপ্তকের ভূয়সী সৃষ্টি, এই সকলের ক্ষণিক উল্লেখ করিলাম। কেন না, যে যুবক নিবিষ্টমনে যুবতীর চঞ্চল কটাক্ষ দৃষ্টি করিতেছে, তাহার হৃদয়ে ঐ কটাক্ষের মাধুর্য্যেই এই সকলের সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি হইতেছে।

এই যুবা গোবিন্দলাল–ঐ যুবতী রোহিণী। এই গৃহ গোবিন্দলাল ক্রয় করিয়াছেন। এইখানেই ইহারা স্থায়ী।

অকস্মাৎ রোহিণীর তব্‌লা বেসুরা বলিল। ওস্তাদজীর তম্বুরার তার ছিঁড়িল, তাঁর গলায় বিষম লাগিল–গীত বন্ধ হইল; গোবিন্দলালের হাতের নবেল পড়িয়া গেল। সেই সময় সেই প্রমোদগৃহের দ্বারে একজন অপরিচিত যুবা পুরুষ প্রবেশ করিল। আমরা তাহাকে চিনি–সে নিশাকর দাস।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দ্বিতল অট্টালিকার উপরতলে রোহিণীর বাস–তিনি হাপ পরদানসীন্। নিম্নতলে ভৃত্যগণ বাস করে। সে বিজনমধ্যে প্রায় কেহই কখনও গোবিন্দলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিত না–সুতরাং সেখানে বহির্ব্বাটীর প্রয়োজন ছিল না। যদি কালে ভদ্রে কোন দোকানদার বা অপর কেহ আসিত, উপরে বাবুর কাছে সংবাদ যাইত; বাবু নীচে আসিয়া তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন। অতএব বাবুর বসিবার জন্য নীচেও একটি ঘর ছিল।

নিম্নতলে দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়া নিশাকর দাস কহিলেন, "কে আছ গা এখানে?"

গোবিন্দলালের সোণা রূপো নামে দুই ভৃত্য ছিল। মনুষ্যের শব্দে দুই জনেই দ্বারের নিকট আসিয়া নিশাকরকে দেখিয়া বিস্মিত হইল। নিশাকরকে দেখিয়াই বিশেষ ভদ্রলোক বলিয়া বোধ হইল–নিশাকরও বেশভূষা সম্বন্ধে একটু জাঁক করিয়া গিয়াছেন। সেরূপ লোক কখনও সে চৌকাঠ মাড়ায় নাই–দেখিয়া ভৃত্যেরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল। সোণা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কাকে খুঁজেন?"

নিশা। তোমাদেরই। বাবুকে সংবাদ দাও যে, একটি ভদ্রলোক সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে।

সোণা। কি নাম বলিব?

নিশা। নামের প্রয়োজনই বা কি? একটি ভদ্রলোক বলিয়া বলিও।

এখন, চাকরেরা জানিত যে, কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে বাবু সাক্ষাৎ করেন না-সেরূপ স্বভাবই নয়। সুতরাং চাকরেরা সংবাদ দিতে বড় ইচ্ছুক ছিল না। সোণা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। রূপো বলিল, "আপনি অনর্থক আসিয়াছেন-বাবু কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করেন না।"

নিশা। তবে তোমরা থাক-আমি বিনা সংবাদেই উপরে যাইতেছি।

চাকরেরা ফাঁপরে পড়িল। বলিল, "না মহাশয়, আমাদের চাকরি যাবে।"

নিশাকর তখন একটি টাকা বাহির করিয়া বলিলেন, "যে সংবাদ করিবে, তাহার এই টাকা।"

সোণা ভাবিতে লাগিল-রূপো চিলের মত ছোঁ মারিয়া নিশাকরের হাত হইতে টাকা লইয়া উপরে সংবাদ দিতে গেল।

গৃহটি বেষ্টন করিয়া যে পুষ্পোদ্যান আছে, তাহা অতি মনোরম। নিশাকর সোণাকে বলিলেন, "আমি এ ফুলবাগানে বেড়াইতেছি-আপত্তি করিও না-যখন সংবাদ আসিবে, তখন আমাকে ঐখান হইতে ডাকিয়া আনিও।" এই বলিয়া নিশাকর সোণার হাতে আর একটি টাকা দিলেন।

রূপো যখন বাবুর কাছে গেল, তখন বাবু কোন কার্য্যবশতঃ অনবসর ছিলেন, ভৃত্য তাঁহাকে নিশাকরের সংবাদ কিছুই বলিতে পারিল না। এ দিকে উদ্যান ভ্রমণ করিতে করিতে নিশাকর একবার ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, এক পরমা সুন্দরী জানেলায় দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেখিতেছে।

রোহিণী নিশাকরকে দেখিয়া ভাবিতেছিল, "এ কে? দেখিয়াই বোধ হইতেছে যে, এ দেশের লোক নয়। বেশভূষা রকম সকম দেখিয়া বোঝা যাইতেছে যে, বড় মানুষ বটে। দেখিতেও সুপুরুষ-গোবিন্দলালের চেয়ে? না, তা নয়। গোবিন্দলালের রঙ ফরশা-কিন্তু এর মুখ চোখ ভাল। বিশেষ চোখ-আ মরি! কি চোখ! এ কোথা থেকে এলো? হলুদগাঁয়ের লোক ত নয়-সেখানকার সবাইকে চিনি। ওর সঙ্গে দুটো কথা কইতে পাই না? ক্ষতি কি-আমি ত কখনও গোবিন্দলালের কাছে বিশ্বাসঘাতিনী হইব না।"

রোহিণী এইরূপ ভাবিতেছিল, এমত সময়ে নিশাকর উন্নতমুখে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করাতে চারি চক্ষু সম্মিলিত হইল। চক্ষে চক্ষে কোন কথাবার্ত্তা হইল কি না, তাহা আমরা জানি না-জানিলেও বলিতে ইচ্ছা করি না-কিন্তু আমরা শুনিয়াছি, এমত কথাবার্ত্তা হইয়া থাকে।

এমত সময়ে রূপো বাবুর অবকাশ পাইয়া বাবুকে জানাইল যে, একটি ভদ্রলোক সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা হইতে আসিয়াছে?"

রূপো। তাহা জানি না।

বাবু। তা না জিজ্ঞাসা করে খবর দিতে আসিয়াছিস্ কেন?

রূপো দেখিল, বোকা বনিয়া যাই। উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে বলিল, "তা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, বাবুর কাছেই বলিব।"

বাবু বলিলেন, "তবে বল গিয়া, সাক্ষাৎ হইবে না।"

এদিকে নিশাকর বিলম্ব দেখিয়া সন্দেহ করিলেন যে, বুঝি গোবিন্দলাল সাক্ষাৎ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু দুষ্কৃতকারীর সঙ্গে ভদ্রতা কেনই করি? আমি কেন আপনিই উপরে চলিয়া যাই না?

এইরূপ বিবেচনা করিয়া ভৃত্যের পুনরাগমনের প্রতীক্ষা না করিয়াই নিশাকর গৃহমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সোণা রূপো কেহই নীচে নাই। তখন তিনি নিরুদ্বেগে সিঁড়িতে উঠিয়া, যেখানে গোবিন্দলাল, রোহিণী এবং দানেশ খাঁ গায়ক, সেইখানে উপস্থিত হইলেন। রূপো তাঁহাকে দেখিয়া দেখাইয়া দিল যে, এই বাবু সাক্ষাৎ করিতে চাহিতেছিলেন।

গোবিন্দলাল বড় রুষ্ট হইলেন। কিন্তু দেখিলেন, ভদ্রলোক। জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?"

নি। আমার নাম রাসবিহারী দে।

গো। নিবাস?

নি। বরাহনগর।

নিশাকর জাঁকিয়া বসিলেন। বুঝিয়াছিলেন যে, গোবিন্দলাল বসিতে বলিবেন না।

গো। আপনি কাকে খুঁজেন?

নি। আপনাকে।

গো। আপনি আমার ঘরের ভিতর জোর করিয়া প্রবেশ না করিয়া যদি একটু অপেক্ষা করিতেন, তবে চাকরের মুখে শুনিতেন যে, আমার সাক্ষাতের অবকাশ নাই।

নি। বিলক্ষণ অবকাশ দেখিতেছি। ধমকে চমকে উঠিয়া যাইব, যদি আমি সে প্রকৃতির লোক হইতাম, তবে আপনার কাছে আসিতাম না। যখন আমি আসিয়াছি, তখন আমার কথা কয়টা শুনিলেই আপদ্ চুকিয়া যায়।

গো। না শুনি, ইহাই আমার ইচ্ছা। তবে যদি দুই কথায় বলিয়া শেষ করিতে পারেন, তবে বলিয়া বিদায় গ্রহণ করুন।

নি। দুই কথাতেই বলিব। আপনার ভার্য্যা ভ্রমর দাসী তাঁহার বিষয়গুলি পত্তনি বিলি করিবেন।

দানেশ খাঁ গায়ক তখন তম্বুরায় নূতন তার চড়াইতেছিল। সে এক হাতে তার চড়াইতে লাগিল, এক হাতে আঙ্গুল ধরিয়া বলিল, "এক বাত হুয়া।"

নি। আমি তাহা পত্তনি লইব।

দানেশ আঙ্গুল গণিয়া বলিল, "দো বাত হুয়া।"

নি। আমি সে জন্য আপনাদিগের হরিদ্রাগ্রামের বাটীতে গিয়াছিলাম।

দানেশ খাঁ বলিল, "দো বাত ছোড়ুকে তিন বাত হুয়া।"

নি। ওস্তাদজী শুয়ার গুণচো না কি?

ওস্তাদজী চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া গোবিন্দলালকে বলিলেন, "বাবু সাহাব, ইয়ে বেতমিজ আদমিকো বিদা দিজিয়ে।"

কিন্তু বাবুসাহেব তখন অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন, কথা কহিলেন না।

নিশাকর বলিতে লাগিলেন, "আপনার ভার্য্যা আমাকে বিষয়গুলি পত্তনি দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, কিন্তু আপনার অনুমতিসাপেক্ষ। তিনি আপনার ঠিকানাও জানেন না; পত্রাদি লিখিতেও ইচ্ছুক নহেন। সুতরাং আপনার অভিপ্রায় জানিবার ভার আমার উপরেই পড়িল। আমি অনেক সন্ধানে আপনার ঠিকানা জানিয়া, আপনার অনুমতি লইতে আসিয়াছি।"

গোবিন্দলাল কোন উত্তর করিলেন না–বড় অন্যমনস্ক! অনেক দিনের পর ভ্রমরের কথা শুনিলেন–তাঁহার সেই ভ্রমর!! প্রায় দুই বৎসর হইল!

নিশাকর কতক কতক বুঝিলেন। পুনরপি বলিলেন, “আপনার যদি মত হয়, তবে এক ছত্র লিখিয়া দিন যে, আপনার কোন আপত্তি নাই। তাহা হইলেই আমি উঠিয়া যাই।”

গোবিন্দলাল কিছুই উত্তর করিলেন না। নিশাকর বুঝিলেন, আবার বলিতে হইল। আবার সকল কথাগুলি বুঝাইয়া বলিলেন। গোবিন্দলাল এবার চিত্ত সংযত করিয়া কথা সকল শুনিলেন। নিশাকরের সকল কথাই যে মিথ্যা, তাহা পাঠক বুঝিয়াছেন, কিন্তু গোবিন্দলাল তাহা কিছুই বুঝেন নাই। পূর্ব্বকার উগ্রভাব পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, “আমার অনুমতি লওয়া অনাবশ্যক। বিষয় আমার স্ত্রীর, আমার নহে, বোধ হয় তাহা জানেন। তাঁহার যাহাকে ইচ্ছা পত্তনি দিবেন, আমার বিধি নিষেধ নাই। আমি কিছু লিখিব না। বোধ হয় এখন আপনি আমাকে অব্যাহতি দিবেন।”

কাজে কাজেই নিশাকরকে উঠিতে হইল। তিনি নীচে নামিয়া গেলেন। নিশাকর গেলে, গোবিন্দলাল দানেশ খাঁকে বলিলেন, “কিছু গাও।”

দানেশ খাঁ প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া, আবার তম্বুরায় সুর বাঁধিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কি গাইব?”

“যা খুসি।” বলিয়া গোবিন্দলাল তবলা লইলেন। গোবিন্দলাল পূর্ব্বেই কিছু কিছু বাজাইতে জানিতেন, এক্ষণে উত্তম বাজাইতে শিখিয়াছিলেন; কিন্তু আজি দানেশ খাঁর সঙ্গে তাঁহার সঙ্গত হইল না, সকল তালই কাটিয়া যাইতে লাগিল। দানেশ খাঁ বিরক্ত হইয়া তম্বুরা ফেলিয়া গীত বন্ধ করিয়া বলিল, “আজ আমি ক্লান্ত হইয়াছি।” তখন গোবিন্দলাল একটা সেতার লইয়া বাজাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু গৎ সব ভুলিয়া যাইতে লাগিলেন। সেতার ফেলিয়া নবেল পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু যাহা পড়িতেছিলেন, তাহার অর্থবোধ হইল না। তখন বহি ফেলিয়া গোবিন্দলাল শয়নগৃহমধ্যে গেলেন। রোহিণীকে দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু সোণা চাকর নিকটে ছিল। দ্বার হইতে গোবিন্দলাল, সোণাকে বলিলেন, “আমি এখন একটু ঘুমাইব, আমি আপনি না উঠিলে আমাকে কেহ যেন উঠায় না।”

এই বলিয়া গোবিন্দলাল শয়নঘরের দ্বার রুদ্ধ করিলেন। তখন সন্ধ্যা প্রায় উত্তীর্ণ হয়।

দ্বার রুদ্ধ করিয়া গোবিন্দলাল ত ঘুমাইল না। খাটে বসিয়া, দুই হাত মুখে দিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

কেন যে কাঁদিল, তাহা জানি না। ভ্রমরের জন্য কাঁদিল, কি নিজের জন্য কাঁদিল, তা বলিতে পারি না। বোধ হয় দুইই।

আমরা ত কান্না বৈ গোবিন্দলালের অন্য উপায় দেখি না। ভ্রমরের জন্য কাঁদিবার পথ আছে, কিন্তু ভ্রমরের কাছে ফিরিয়া যাইবার আর উপায় নাই। হরিদ্রাগ্রামে আর মুখ দেখাইবার কথা নাই। হরিদ্রাগ্রামের পথে কাঁটা পড়িয়াছে। কান্না বৈ ত আর উপায় নাই!

সপ্তম পরিচ্ছেদ

যখন নিশাকর আসিয়া বড় হলে বসিল, রোহিণীকে সুতরাং পাশের কামরায় প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু নয়নের অন্তরাল হইল মাত্র–শ্রবণের নহে। কথোপকথন যাহা হইল–সকলই কাণ পাতিয়া শুনিল। বরং দ্বারের পরদাটি একটু সরাইয়া, নিশাকরকে দেখিতে লাগিল। নিশাকরও দেখিল যে, পরদার পাশ হইতে একটি পটোলচেরা চোখ তাঁকে দেখিতেছে।

রোহিণী শুনিল যে, নিশাকর অথবা রাসবিহারী হরিদ্রাগ্রাম হইতে আসিয়াছে। রূপো চাকরও রোহিণীর মত সকল কথা দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল। নিশাকর

উঠিয়া গেলেই রোহিণী পরদার পাশ হইতে মুখ বাহির করিয়া আঙ্গুলের ইশারায় রূপোকে ডাকিল। রূপো কাছে আসিলে, তাহাকে কাণে কাণে বলিল, "যা বলি তা পারবি? বাবুকে সকল কথা লুকাইতে হইবে। যাহা করিবি, তাহা যদি বাবু কিছু না জানিতে পারেন, তবে তোকে পাঁচ টাকা বখ্‌শিশ দিব।"

রূপো মনে ভাবিল–আজ না জানি উঠিয়া কার মুখ দেখিয়াছিলাম–আজ ত দেখ্‌চি টাকা রোজগারের দিন। গরিব মানুষের দুই পয়সা এলেই ভাল। প্রকাশ্যে বলিল, "যা বলিবেন, তাই পারিব। কি, আজ্ঞা করুন।"

রো। ঐ বাবুর সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া যা। উনি আমার বাপের বাড়ীর দেশ থেকে এসেছেন। সেখানকার কোন সংবাদ আমি কখনও পাই না–তার জন্য কত কাঁদি। যদি দেশ থেকে একটি লোক এসেছে, তাকে একবার আপনার জনের দুটো খবর জিজ্ঞাসা করবো। বাবু ত রেগে ওকে উঠিয়ে দিলেন। তুই গিয়ে তাকে বসা। এমন জায়গায় বসা, যেন বাবু নীচে গেলে না দেখতে পান। আর কেহ না দেখিতে পায়। আমি একটু নিরিবিলি পেলেই যাব। যদি বস্‌তে না চায়, তবে কাকুতি মিনতি করিস্‌!

রূপো বখ্‌শিশের গন্ধ পাইয়াছে–'যে আজ্ঞা' বলিয়া ছুটিল।

নিশাকর কি অভিপ্রায়ে গোবিন্দলালকে ছলিতে আসিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু তিনি নীচেয় আসিয়া যেরূপ আচরণ করিতেছিলেন, তাহা বুদ্ধিমানে দেখিলে তাঁহাকে বড় অবিশ্বাস করিত। তিনি গৃহপ্রবেশদ্বারের কবাট, খিল, কব্জা প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতেছিলেন। এমত সময়ে রূপো খানসামা আসিয়া উপস্থিত হইল।

রূপো বলিল, "তামাকু ইচ্ছা করিবেন কি?"

নিশা। বাবু ত দিলেন না, চাকরের কাছে খাব কি?

রূপো। আজ্ঞে তা নয়–একটা নিরিবিলি কথা আছে। একটু নিরিবিলিতে আসুন।

রূপো নিশাকরকে সঙ্গে করিয়া আপনার নির্জ্জন ঘরে লইয়া গেল। নিশাকরও বিনা ওজর আপত্তিতে গেলেন। সেখানে নিশাকরকে বসিতে দিয়া, যাহা যাহা রোহিণী বলিয়াছিল, রূপচাঁদ তাহা বলিল।

নিশাকর আকাশের চাঁদ হাত বাড়াইয়া পাইলেন। নিজ অভিপ্রায় সিদ্ধির অতি সহজ উপায় দেখিতে পাইলেন। বলিলেন, "বাপু, তোমার মনিব ত আমায় তাড়িয়ে দিয়েছেন, আমি তাঁর বাড়ীতে লুকাইয়া থাকি কি প্রকারে?"

রূপো। আজ্ঞে তিনি কিছু জানিতে পারিবেন না। এ ঘরে তিনি কখনও আসেন না।

নিশা। না আসুন, কিন্তু তোমার মা ঠাকুরাণী নীচে আসিবেন, তখন যদি তোমার বাবু ভাবেন, কোথায় গেল দেখি? যদি তাই ভাবিয়া পিছু পিছু আসেন, কি কোন রকমে যদি আমার কাছে তোমার মা ঠাকুরাণীকে দেখেন, তবে আমার দশাটা কি হবে বল দেখি?

রূপচাঁদ চুপ করিয়া রহিল। নিশাকর বলিতে লাগিলেন, "এই মাঠের মাঝখানে, ঘরে পূরিয়া আমাকে খুন করিয়া এই বাগানে পুঁতিয়া রাখিলেও আমার মা বল্‌তে নাই, বাপ বল্‌তেও নাই। তখন তুমিই আমাকে দু ঘা লাঠি মারিবে।–অতএব এমন কাজে আমি নই। তোমার মাকে বুঝাইয়া বলিও যে, আমি ইহা পারিব না। আর একটি কথা বলিও। তাঁহার খুড়া আমাকে কতকগুলি অতি ভারি কথা বলিতে বলিয়া দিয়াছিল। আমি তোমার মা ঠাকুরাণীকে সে কথা বলিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত ছিলাম। কিন্তু তোমার বাবু আমাকে তাড়াইয়া দিলেন। আমার বলা হইল না, আমি চলিলাম।"

রূপো দেখিল, পাঁচ টাকা হাতছাড়া হয়। বলিল, "আচ্ছা, তা এখানে না বসেন, বাহিরে একটু তফাতে বসিতে পারেন না?"

নিশা। আমিও সেই কথাই ভাবিতেছিলাম। আসিবার সময় তোমাদের কুঠির নিকটেই নদীর ধারে, একটা বাঁধা ঘাট, তাহার কাছে দুইটা বকুল গাছ দেখিয়া আসিয়াছি। চেন সে জায়গা?

রূপো। চিনি।

নিশা। আমি গিয়া সেইখানে বসিয়া থাকি। সন্ধ্যা হইয়াছে–রাত্রি হইলে, সেখানে বসিয়া থাকিলে বড় কেহ দেখিতে পাইবে না। তোমার মা ঠাকুরাণী যদি সেইখানে আসিতে পারেন, তবেই সকল সংবাদ পাইবেন। তেমন তেমন দেখিলে, আমি পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিতে পারিব। ঘরে পূরিয়া যে আমাকে কুক্কুর-মারা করিবে, আমি তাহাতে বড় রাজি নহি।

অগত্যা রূপো চাকর রোহিণীর কাছে গিয়া নিশাকর যেমন যেমন বলিল, তাহা নিবেদন করিল। এখন রোহিণীর মনের ভাব কি, তাহা আমরা বলিতে পারি না। যখন মানুষ নিজে নিজের মনের ভাব বুঝিতে পারে না–আমরা কেমন করিয়া বলিব যে, রোহিণীর মনের ভাব এই? রোহিণী যে ব্রহ্মানন্দকে এত ভালবাসিত যে, তাহার সংবাদ লইবার জন্য দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হইবে, এমন খবর আমরা রাখি না। বুঝি আরও কিছু ছিল। একটু তাকাতাকি, আঁচাআঁচি হইয়াছিল। রোহিণী দেখিয়াছিল যে, নিশাকর রূপবান্–পটলচেরা চোক। রোহিণী দেখিয়াছিল যে, মনুষ্যমধ্যে নিশাকর একজন মনুষ্যত্বে প্রধান। রোহিণীর মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প ছিল যে, আমি গোবিন্দলালের কাছে বিশ্বাসহন্ত্রী হইব না। কিন্তু বিশ্বাসহানি এক কথা–আর এ আর এক কথা। বুঝি সেই মহাপাপিষ্ঠা মনে করিয়াছিল, "অনবধান মৃগ পাইলে কোন্ ব্যাধ ব্যাধব্যবসায়ী হইয়া তাহাকে না শরবিদ্ধ করিবে?" ভাবিয়াছিল, নারী হইয়া জেয় পুরুষ দেখিলে কোন্ নারী না তাহাকে জয় করিতে কামনা করিবে? বাঘ গোরু মারে,–সকল গোরু খায় না। স্ত্রীলোক পুরুষকে জয় করে–কেবল জয়পতাকা উড়াইবার জন্য। অনেকে মাছ ধরে–কেবল মাছ ধরিবার জন্য, মাছ খায় না, বিলাইয়া দেয়–অনেকে পাখী মারে, কেবল মারিবার জন্য–মারিয়া ফেলিয়া দেয়। শিকার কেবল শিকারের জন্য–খাইবার জন্য নহে। জানি না, তাহাতে কি রস আছে। রোহিণী ভাবিয়া থাকিবে, যদি এই আয়তলোচন মৃগ এই প্রসাদপুর-কাননে আসিয়া পড়িয়াছে–তবে কেন না তাহাকে শরবিদ্ধ করিয়া ছাড়িয়া দিই। জানি না, এই পাপীয়সীর পাপচিত্তে কি উদয় হইয়াছিল–কিন্তু রোহিণী স্বীকৃত হইল যে, প্রদোষকালে অবকাশ পাইলেই, গোপনে চিত্রার বাঁধাঘাটে একাকিনী সে নিশাকরের নিকট গিয়া খুল্লতাতের সংবাদ শুনিবে।

রূপচাঁদ আসিয়া সে কথা নিশাকরের কাছে বলিল। নিশাকর শুনিয়া, ধীরে ধীরে আসিয়া হর্ষোৎফুল্ল মনে গাত্রোত্থান করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রূপো সরিয়া গেলে নিশাকর সোণাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা বাবুর কাছে কত দিন আছ?"

সোণা। এই–যত দিন এখানে এসেছেন তত দিন আছি।

নিশা। তবে অল্পদিনই? পাও কি?

সোণা। তিন টাকা মাহিয়ানা, খোরাক পোষাক।

নিশা। এত অল্প বেতনে তোমাদের মত খানসামার পোষায় কি?

কথাটা শুনিয়া সোণা খানসামা গলিয়া গেল। বলিল, "কি করি, এখানে আর কোথায় চাকরি যোটে?"

নিশা। চাকরির ভাবনা কি? আমাদের দেশে গেলে তোমাদের লুপে নেয়। পাঁচ, সাত, দশ টাকা অনায়াসেই মাসে পাও।

সোণা। অনুগ্রহ করিয়া যদি সঙ্গে লইয়া যান।

নিশা। নিয়ে যাব কি, অমন মুনিবের চাকরি ছাড়বে?

সোণা। মুনিব মন্দ নয়, কিন্তু মুনিব ঠাক্‌রুণ বড় হারামজাদা।

নিশা। হাতে হাতে তার প্রমাণ আমি পেয়েছি। আমার সঙ্গে তোমার যাওয়াই স্থির ত?

সোণা। স্থির বৈ কি।

নিশা। তবে যাবার সময় তোমার মুনিবের একটি উপকার করিয়া যাও। কিন্তু বড় সাবধানের কাজ। পার্‌বে কি?

সোণা। ভাল কাজ হয় ত পার্‌ব না কেন?

নিশা। তোমার মুনিবের পক্ষে ভাল, মুনিবনীর পক্ষে বড় মন্দ।

সোণা। তবে এখনই বলুন, বিলম্বে কাজ নাই। তাতে আমি বড় রাজি।

নিশা। ঠাক্‌রুণটি আমাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন, চিত্রার বাঁধাঘাটে বসিয়া থাকিতে, রাত্রে আমার সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করিবেন। বুঝেছ? আমিও স্বীকার হইয়াছি। আমার অভিপ্রায় যে, তোমার মুনিবের চোখ ফুটায়ে দিই। তুমি আস্তে আস্তে কথাটি তোমার মুনিবকে জানিয়ে আসিতে পার?

সোণা। এখনি–ও পাপ মলেই বাঁচি।

নিশা। এখন নয়, এখন আমি ঘাটে গিয়া বসিয়া থাকি। তুমি সতর্ক থেকো। যখন দেখ্‌বে, ঠাক্‌রুণটি ঘাটের দিকে চলিলেন, তখনি গিয়া তোমার মুনিবকে বলিয়া দিও। রূপো কিছু জানিতে না পারে। তার পর আমার সঙ্গে জুটো।

"যে আজ্ঞে" বলিয়া সোণা নিশাকরের পায়ের ধূলা গ্রহণ করিল। তখন নিশাকর হেলিতে দুলিতে গজেন্দ্রগমনে চিত্রাতীরশোভী সোপানাবলীর উপর গিয়া বসিলেন। অন্ধকার নক্ষত্রচ্ছায়াপ্রদীপ্ত চিত্রাবারি নীরবে চলিতেছে। চারি দিকে শৃগালকুক্কুরাদি বহুবিধ রব করিতেছে। কোথাও দূরবর্ত্তী নৌকার উপর বসিয়া ধীবর উচ্চৈঃস্বরে শ্যামাবিষয় গায়িতেছে। তদ্ভিন্ন সেই বিজন প্রান্তর মধ্যে কোন শব্দ শোনা যাইতেছে না। নিশাকর সেই গীত শুনিতেছেন এবং গোবিন্দলালের বাসগৃহের দ্বিতল কক্ষের বাতায়ননিঃসৃত উজ্জ্বল দীপালোক দর্শন করিতেছেন। এবং মনে মনে ভাবিতেছেন,"আমি কি নৃশংস! একজন স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য কত কৌশল করিতেছি! অথবা নৃশংসতাই বা কি? দুষ্টের দমন অবশ্যই কর্ত্তব্য। যখন বন্ধুর কন্যার জীবনরক্ষার্থ এ কার্য্য বন্ধুর নিকট স্বীকার করিয়াছি, তখন অবশ্য করিব। কিন্তু আমার মন ইহাতে প্রসন্ন নয়। রোহিণী পাপীয়সী, পাপের দণ্ড দিব; পাপস্রোতের রোধ করিব; ইহাতে অপ্রসাদই বা কেন? বলিতে পারি না, বোধ হয় সোজা পথে গেলে এত ভাবিতাম না। বাঁকা পথে গিয়াছি বলিয়াই এত সঙ্কোচ হইতেছে। আর পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার দিবার আমি কে? আমার পাপ পুণ্যের যিনি দণ্ড পুরস্কার করিবেন, রোহিণীরও তিনি বিচারকর্ত্তা। বলিতে পারি না, হয়ত তিনিই আমাকে এই কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছেন। কি জানি,

"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রাত্রি প্রহরাতীত হইল। তখন নিশাকর দেখিলেন, নিঃশব্দ পাদবিক্ষেপে রোহিণী আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। নিশ্চয়কে সুনিশ্চিত করিবার জন্য নিশাকর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে গা?"

রোহিণীও নিশ্চয়কে সুনিশ্চিত করিবার জন্য বলিল, “তুমি কে?”

নিশাকর বলিল, “আমি রাসবিহারী।”

রোহিণী বলিল, “আমি রোহিণী।”

নিশাকর। এত রাত্রি হলো কেন?

রোহিণী। একটু না দেখে শুনে ত আস্‌তে পারি নে। কি জানি কে কোথা দিয়ে দেখতে পাবে। তা তোমার বড় কষ্ট হয়েছে।

নিশা। কষ্ট হোক্ না হোক্ মনে মনে ভয় হইতেছিল যে, তুমি বুঝি ভুলিয়া গেলে।

রোহিণী। আমি যদি ভুলিবার লোক হইতাম, তা হলে, আমার দশা এমন হইবে কেন? একজনকে ভুলিতে না পারিয়া এদেশে আসিয়াছি; আর আজ তোমাকে না ভুলিতে পারিয়া এখানে আসিয়াছি।

এই কথা বলিতেছিল, এমত সময়ে কে আসিয়া পিছন হইতে রোহিণীর গলা টিপিয়া ধরিল। রোহিণী চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কে রে?”

গম্ভীর স্বরে কে উত্তর করিল, “তোমার যম।”

রোহিণী চিনিল যে গোবিন্দলাল। তখন আসন্ন বিপদ বুঝিয়া চারি দিক্ অন্ধকার দেখিয়া রোহিণী ভীতিবিকম্পিতস্বরে বলিল,“ছাড়! ছাড়! আমি মন্দ অভিপ্রায়ে আসি নাই। আমি যে জন্য আসিয়াছি, এই বাবুকে না হয় জিজ্ঞাসা কর।”

এই বলিয়া রোহিণী যেখানে নিশাকর বসিয়াছিল, সেই স্থান অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল। দেখিল, কেহ সেখানে নাই। নিশাকর গোবিন্দলালকে দেখিয়া পলকের মধ্যে কোথায় সরিয়া গিয়াছে। রোহিণী বিস্মিতা হইয়া বলিল, “কৈ, কেহ কোথাও নাই যে!”

গোবিন্দলাল বলিল, “এখানে কেহ নাই। আমার সঙ্গে ঘরে এস।”

রোহিণী বিষণ্ণচিত্তে ধীরে ধীরে গোবিন্দলালের সঙ্গে ঘরে ফিরিয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

গৃহে ফিরিয়া আসিয়া গোবিন্দলাল ভৃত্যবর্গকে নিষেধ করিলেন, “কেহ উপরে আসিও না।”

ওস্তাদজী বাসায় গিয়াছিল।

গোবিন্দলাল রোহিণীকে লইয়া নিভৃতে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। রোহিণী, সম্মুখে নদীস্রোতোবিকম্পিতা বেতসীর ন্যায় দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল। গোবিন্দলাল মৃদুস্বরে বলিল, “রোহিণি!”

রোহিণী বলিল, “কেন?”

গো। তোমার সঙ্গে গোটাকতক কথা আছে।

রো। কি?

গো। তুমি আমার কে?

রো। কেহ নহি, যত দিন পায়ে রাখেন তত দিন দাসী। নহিলে কেহ নই।

গো। পায়ে ছেড়ে তোমায় মাথায় রাখিয়াছিলাম। রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য্য, রাজার অধিক সম্পদ, অকলঙ্ক চরিত্র, অত্যাজ্য ধর্ম্ম, সব তোমার জন্য ত্যাগ করিয়াছি। তুমি কি রোহিণী, যে তোমার জন্য এ সকল পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইলাম? তুমি কি রোহিণী, যে তোমার জন্য ভ্রমর,-জগতে অতুল, চিন্তায় সুখ, সুখে অতৃপ্তি, দুঃখে অমৃত, যে ভ্রমর-তাহা পরিত্যাগ করিলাম?

এই বলিয়া গোবিন্দলাল আর দুঃখ ক্রোধের বেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া রোহিণীকে পদাঘাত করিলেন।

রোহিণী বসিয়া পড়িল। কিছু বলিল না, কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু চক্ষের জল গোবিন্দলাল দেখিতে পাইলেন না।

গোবিন্দলাল বলিলেন, “রোহিণি, দাঁড়াও।”

রোহিণী দাঁড়াইল।

গো। তুমি একবার মরিতে গিয়াছিলে। আবার মরিতে সাহস আছে কি?

রোহিণী তখন মরিবার ইচ্ছা করিতেছিল। অতি কাতর স্বরে বলিল, “এখন আর না মরিতে চাহিব কেন? কপালে যা ছিল, তা হলো।”

গো। তবে দাঁড়াও। নড়িও না।

রোহিণী দাঁড়াইয়া রহিল।

গোবিন্দলাল পিস্তলের বাক্স খুলিলেন, পিস্তল বাহির করিলেন। পিস্তল ভরা ছিল। ভরাই থাকিত।

পিস্তল আনিয়া রোহিণীর সম্মুখে ধরিয়া গোবিন্দলাল বলিলেন, “কেমন, মরিতে পারিবে?”

রোহিণী ভাবিতে লাগিল। যে দিন অনায়াসে, অক্লেশে, বারুণীর জলে ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিল, আজি সে দিন রোহিণী ভুলিল। সে দুঃখ নাই, সুতরাং সে সাহসও নাই। ভাবিল, “মরিব কেন? না হয় ইনি ত্যাগ করেন, করুন। ইঁহাকে কখনও ভুলিব না, কিন্তু তাই বলিয়া মরিব কেন? ইঁহাকে যে মনে ভাবিব, দুঃখের দশায় পড়িলে যে ইঁহাকে মনে করিব, এই প্রসাদপুরের সুখরাশি যে মনে করিব, সেও ত এক সুখ, সেও ত এক আশা। মরিব কেন?”

রোহিণী বলিল, “মরিব না, মারিও না। চরণে না রাখ, বিদায় দেও।”

গো। দিই।

এই বলিয়া গোবিন্দলাল পিস্তল উঠাইয়া রোহিণীর ললাটে লক্ষ্য করিলেন।

রোহিণী কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, “মারিও না! মারিও না! আমার নবীন বয়স, নূতন সুখ। আমি আর তোমায় দেখা দিব না, আর তোমার পথে আসিব না। এখনই যাইতেছি। আমায় মারিও না!”

গোবিন্দলালের পিস্তলে খট্ করিয়া শব্দ হইল। তার পর বড় শব্দ, তার পর সব অন্ধকার! রোহিণী গতপ্রাণা হইয়া ভূপতিতা হইল।

গোবিন্দলাল পিস্তল ভূমে নিক্ষেপ করিয়া অতি দ্রুতবেগে গৃহ হইতে নির্গত হইলেন।

পিস্তলের শব্দ শুনিয়া রূপা প্রভৃতি ভৃত্যবর্গ দেখিতে আসিল। দেখিল, বালকনখর-বিচ্ছিন্ন পদ্মিনীবৎ রোহিণীর মৃতদেহ ভূমে লুটাইতেছে। গোবিন্দলাল কোথাও নাই!

দশম পরিচ্ছেদঃ দ্বিতীয় বৎসর

সেই রাত্রেই চৌকিদার থানায় গিয়া সংবাদ দিল যে, প্রসাদপুরের কুঠিতে খুন হইয়াছে। সৌভাগ্যবশতঃ থানা সে স্থান হইতে ছয় ক্রোশ ব্যবধান। দারোগা আসিতে পরদিন বেলা প্রহরেক হইল। আসিয়া তিনি খুনের তদারকে প্রবৃত্ত হইলেন। রীতিমত সুরতহাল ও লাস তদারক করিয়া রিপোর্ট পাঠাইলেন। পরে রোহিণীর মৃতদেহ বান্ধিয়া ছাঁদিয়া গোরুর গাড়িতে বোঝাই দিয়া, চৌকিদারের সঙ্গে ডাক্তারখানায় পাঠাইলেন। পরে স্নান করিয়া আহারাদি করিলেন। তখন নিশ্চিন্ত হইয়া অপরাধীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। কোথায় অপরাধী? গোবিন্দলাল রোহিণীকে আহত করিয়াই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন, আর প্রবেশ করেন নাই। এক রাত্রি এক দিন অবকাশ পাইয়া গোবিন্দলাল কোথায় কত দূর গিয়াছেন, তাহা কে বলিতে পারে? কেহ তাঁহাকে দেখে নাই। কোন্ দিকে পলাইয়াছেন, কেহ জানে না। তাঁহার নাম পর্য্যন্ত কেহ জানিত না। গোবিন্দলাল প্রসাদপুরে কখনও নিজ নাম ধাম প্রকাশ করেন নাই; সেখানে চুনিলাল দত্ত নাম প্রচার করিয়াছিলেন। কোন্ দেশ থেকে আসিয়াছিলেন, তাহা ভৃত্যেরা পর্য্যন্তও জানিত না। দারোগা কিছুদিন ধরিয়া একে ওকে ধরিয়া জোবানবন্দী করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। গোবিন্দলালের কোন অনুসন্ধান করিয়া উঠিতে পারিলেন না। শেষে তিনি আসামী ফেরার বলিয়া এক খাতেমা রিপোর্ট দাখিল করিলেন।

তখন যশোহর হইতে ফিচেল খাঁ নামে একজন সুদক্ষ ডিটেক্‌টিব্ ইন্‌স্পেক্টর প্রেরিত হইল। ফিচেল খাঁর অনুসন্ধানপ্রণালী আমাদিগের সবিস্তারে বলিবার প্রয়োজন নাই। কতকগুলি চিঠিপত্র তিনি বাড়ী তল্লাসীতে পাইলেন। তদ্দ্বারা তিনি গোবিন্দলালের প্রকৃত নাম ধাম অবধারিত করিলেন। বলা বাহুল্য যে, তিনি কষ্ট স্বীকার করিয়া ছদ্মবেশে হরিদ্রাগ্রাম পর্য্যন্ত গমন করিলেন। কিন্তু গোবিন্দলাল হরিদ্রাগ্রামে যান নাই, সুতরাং ফিচেল খাঁ সেখানে গোবিন্দলালকে প্রাপ্ত না হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এ দিকে নিশাকর দাস সে করাল কালসমান রজনীতে বিপন্না রোহিণীকে পরিত্যাগ করিয়া প্রসাদপুরের বাজারে আপনার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে মাধবীনাথ তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মাধবীনাথ গোবিন্দলালের নিকট সুপরিচিত বলিয়া স্বয়ং তাঁহার নিকট গমন করেন নাই; এক্ষণে নিশাকর আসিয়া তাঁহাকে সবিশেষ বিজ্ঞাপিত করিলেন। শুনিয়া মাধবীনাথ বলিলেন, “কাজ ভাল হয় নাই। একটা খুনোখুনি হইতে পারে।” ইহার পরিণাম কি ঘটে, জানিবার জন্য উভয়ে প্রসাদপুরের বাজারে প্রচ্ছন্নভাবে অতি সাবধানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। প্রভাতেই শুনিলেন যে, চুনিলাল দত্ত আপন স্ত্রীকে খুন করিয়া পলাইয়াছে। তাঁহারা বিশেষ ভীত ও শোকাকুল হইলেন; ভয় গোবিন্দলালের জন্য; কিন্তু পরিশেষে দেখিলেন, দারোগা কিছু করিতে পারিলেন না। গোবিন্দলালের কোন অনুসন্ধান নাই। তখন তাঁহারা এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইয়া, তথাচ অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদঃ তৃতীয় বৎসর

ভ্রমর মরে নাই। কেন মরিল না, তাহা জানি না। এ সংসারে বিশেষ দুঃখ এই যে, মরিবার উপযুক্ত সময়ে কেহ মরে না। অসময়ে সবাই মরে। ভ্রমর যে মরিল না, বুঝি ইহাই তাহার কারণ। যাহাই হউক, ভ্রমর উৎকট রোগ হইতে কিয়দংশে মুক্তি পাইয়াছে। ভ্রমর আবার পিত্রালয়ে। মাধবীনাথ গোবিন্দলালের যে সংবাদ আনিয়াছিলেন, তাঁহার পত্নী অতি সঙ্গোপনে তাহা জ্যেষ্ঠা কন্যা ভ্রমরের ভগিনীর নিকট বলিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা অতি গোপনে তাহা ভ্রমরের নিকট বলিয়াছিল। এক্ষণে ভ্রমরের জ্যেষ্ঠা ভগিনী যামিনী বলিতেছিল, “এখন তিনি কেন হলুদগাঁয়ের বাড়ীতে আসিয়া বাস করুন না? তা হলে বোধ হয় কোন আপদ্ থাকিবে না।”

ভ্র। আপদ্ থাকিবে না কিসে?

যামিনী। তিনি প্রসাদপুরে নাম ভাঁড়াইয়া বাস করিতেন। তিনিই যে গোবিন্দলাল বাবু, তাহা ত কেহ জানে না।

ভ্রমর। শুন নাই কি যে, হলুদগাঁয়েও পুলিসের লোক তাঁহার সন্ধানে আসিয়াছিল? তবে আর জানে না কি প্রকারে?

যামিনী। তা না হয় জানিল।–তবু এখানে আসিয়া আপনার বিষয় দখল করিয়া বসিলে টাকা হাতে হইবে। বাবা বলেন, পুলিস টাকার বশ।

ভ্রমর কাঁদিতে লাগিল–বলিল, "সে পরামর্শ তাঁহাকে কে দেয়? কোথায় তাঁহার সাক্ষাৎ পাইব যে, সে পরামর্শ দিব। বাবা একবার তাঁর সন্ধান করিয়া ঠিকানা করিয়াছিলেন–আর একবার সন্ধান করিতে পারেন কি?

যামিনী। পুলিসের লোক কত সন্ধানী–তাহারাই অহরহ সন্ধান করিয়া যখন ঠিকানা পাইতেছে না, তখন বাবা কি প্রকারে সন্ধান পাইবেন? কিন্তু আমার বোধ হয়, গোবিন্দলাল বাবু আপনিই হলুদগাঁয়ে আসিয়া বসিবেন। প্রসাদপুরের সেই ঘটনার পরেই তিনি যদি হলুদগাঁয়ে দেখা দিতেন, তাহা হইলে তিনিই যে সেই প্রসাদপুরের বাবু, এ কথায় লোকের বড় বিশ্বাস হইত। এই জন্য বোধ হয়, এত দিন তিনি আইসেন নাই। এখন আসিবেন, এমন ভরসা করা যায়।

ভ্র। আমার কোন ভরসা নাই।

যা। যদি আসেন।

ভ্র। যদি এখানে আসিলে তাঁহার মঙ্গল হয়, তবে দেবতার কাছে আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তিনি আসুন। যদি না আসিলে তাঁহার মঙ্গল হয়, তবে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, আর ইহজন্মে তাঁহার হরিদ্রাগ্রামে না আসা হয়। যাহাতে তিনি নিরাপদ থাকেন, ঈশ্বর তাঁহাকে সেই মতি দিন।

যা। আমার বিবেচনায়, ভগিনি! তোমার সেইখানেই থাকা কর্ত্তব্য। কি জানি, তিনি কোন্ দিন অর্থের অভাবে আসিয়া উপস্থিত হয়েন? যদি আমলাকে অবিশ্বাস করিয়া তাহাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করেন? তোমাকে না দেখিলে তিনি ফিরিয়া যাইতে পারেন।

ভ্র। আমার এই রোগ। কবে মরি, কবে বাঁচি–আমি সেখানে কার আশ্রয়ে থাকিব?

যা। বল যদি, না হয়, আমরা কেহ গিয়া থাকিব–তথাপি তোমার সেখানেই থাকা কর্ত্তব্য।

ভ্রমর ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা, আমি হলুদগাঁয়ে যাইব। মাকে বলিও কালই আমাকে পাঠাইয়া দেন। এখন তোমাদের কাহাকে যাইতে হইবে না। কিন্তু আমার বিপদের দিন তোমরা দেখা দিও।"

যা। কি বিপদ্ ভ্রমর?

ভ্রমর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "যদি তিনি আসেন?"

যা। সে আবার বিপদ্ কি ভ্রমর? তোমার হারাধন ঘরে যদি আসে, তাহার চেয়ে–আহ্লাদের কথা আর কি আছে?

ভ্র। আহ্লাদ দিদি! আহ্লাদের কথা আমার আর কি আছে!

ভ্রমর আর কথা কহিল না। তাহার মনের কথা যামিনী কিছুই বুঝিল না। ভ্রমরের মর্ম্মান্তিক রোদন, যামিনী কিছুই বুঝিল না। ভ্রমর মানস চক্ষে, ধূমময় চিত্রবৎ, এ কাণ্ডের শেষ যাহা হইবে, তাহা দেখিতে পাইল। যামিনী কিছুই দেখিতে পাইল না। যামিনী বুঝিল না যে গোবিন্দলাল হত্যাকারী, ভ্রমর তাহা ভুলিতে পারিতেছে না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদঃ পঞ্চম বৎসর

ভ্রমর আবার শ্বশুরালয়ে গেল। যদি স্বামী আসে, নিত্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু স্বামী ত আসিল না। দিন গেল, মাস গেল–স্বামী ত আসিল না। কোন

সংবাদও আসিল না। এইরূপে তৃতীয় বৎসরও কাটিয়া গেল। গোবিন্দলাল আসিল না। তার পর চতুর্থ বৎসরও কাটিয়া গেল, গোবিন্দলাল আসিল না। এদিকে ভ্রমরেরও পীড়া বৃদ্ধি হইতে লাগিল। হাঁপানি কাশি রোগ-নিত্য শরীর ক্ষয়-যম অগ্রসর-বুঝি আর ইহজন্মে দেখা হইল না।

তার পর পঞ্চম বৎসর প্রবৃত্ত হইল। পঞ্চম বৎসরে একটা ভারি গোলযোগ উপস্থিত হইল। হরিদ্রাগ্রামে সংবাদ আসিল যে, গোবিন্দলাল ধরা পড়িয়াছে। সংবাদ আসিল যে, গোবিন্দলাল বৈরাগীর বেশে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেছিল-সেইখান হইতে পুলিস ধরিয়া যশোহরে আনিয়াছে। যশোহরে তাঁহার বিচার হইবে।

জনরবে এই সংবাদ ভ্রমর শুনিলেন। জনরবের সূত্র এই। গোবিন্দলাল, ভ্রমরের দেওয়ানজীকে পত্র লিখিয়াছিলেন যে, "আমি জেলে চলিলাম-আমার পৈতৃক বিষয় হইতে আমার রক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করা যদি তোমাদিগের অভিপ্রায়সম্মত হয়, তবে এই সময়। আমি তাহার যোগ্য নহি। আমার বাঁচিতে ইচ্ছা নাই। তবে ফাঁসি যাইতে না হয়, এই ভিক্ষা। জনরবে এ কথা বাড়ীতে জানাইও, আমি পত্র লিখিয়াছি, এ কথা প্রকাশ করিও না।" দেওয়ানজী পত্রের কথা প্রকাশ করিলেন না-জনরব বলিয়া অন্তঃপুরে সংবাদ পাঠাইলেন।

ভ্রমর শুনিয়াই পিতাকে আনিতে লোক পাঠাইলেন। শুনিবামাত্র মাধবীনাথ কন্যার নিকট আসিলেন। ভ্রমর, তাঁহাকে নোটে কাগজে পঞ্চাশ হাজার টাকা বাহির করিয়া দিয়া সজলনয়নে বলিলেন, "বাবা, এখন যা করিতে হয় কর।-দেখিও-আমি আত্মহত্যা না করি।"

মাধবীনাথও কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "মা! নিশ্চিন্ত থাকিও-আমি আজই যশোহরে যাত্রা করিলাম। কোন চিন্তা করিও না। গোবিন্দলাল যে খুন করিয়াছেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া যাইতেছি যে, তোমার আটচল্লিশ হাজার টাকা বাঁচাইয়া আনিব-আর আমার জামাইকে দেশে আনিব।"

মাধবীনাথ তখন যশোহরে যাত্রা করিলেন। শুনিলেন যে, প্রমাণের অবস্থা অতি ভয়ানক। ইন্‌স্পেক্টর ফিচেল খাঁ মোকদ্দমা তদারক করিয়া সাক্ষী চালান দিয়াছিলেন। তিনি রূপো সোণা প্রভৃতি যে সকল সাক্ষীরা প্রকৃত অবস্থা জানিত, তাহাদিগের কাহারও সন্ধান পান নাই। সোণা নিশাকরের কাছে ছিল-রূপা কোন্ দেশে গিয়াছিল, তাহা কেহ জানে না। প্রমাণের এইরূপ দুরবস্থা দেখিয়া নগদ কিছু দিয়া ফিচেল খাঁ তিনটি সাক্ষী তৈয়ার করিয়াছিল। সাক্ষীরা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে বলিল যে, আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে, গোবিন্দলাল ওরফে চুনিলাল স্বহস্তে পিস্তল মারিয়া রোহিণীকে খুন করিয়াছেন-আমরা তখন সেখানে গান শুনিতে গিয়াছিলাম। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আহেলা বিলাতী-সুশাসন জন্য সর্ব্বদা গবর্ণমেন্টের দ্বারা প্রশংসিত হইয়া থাকেন-তিনি এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া গোবিন্দলালকে সেশনের বিচারে অর্পণ করিলেন। যখন মাধবীনাথ যশোহরে পৌঁছিলেন, তখন গোবিন্দলাল জেলে পচিতেছিলেন। মাধবীনাথ পৌঁছিয়া, সবিশেষ বৃত্তান্ত শুনিয়া বিষণ্ন হইলেন।

তিনি সাক্ষীদিগের নাম ধাম সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগের বাড়ী গেলেন। তাহাদিগকে বলিলেন, "বাপু! ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে যা বলিয়াছ, তা বলিয়াছ। এখন জজ সাহেবের কাছে ভিন্ন প্রকার বলিতে হইবে। বলিতে হইবে যে, আমরা কিছু জানি না। এই পাঁচ পাঁচ শত টাকা নগদ লও। আসামী খালাস হইলে আর পাঁচ পাঁচ শত দিব।"

সাক্ষীরা বলিল, "খেলাপ হলফের দায়ে মারা যাইব যে।"

মাধবীনাথ বলিলেন, "ভয় নাই। আমি টাকা খরচ করিয়া সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণ করাইব যে, ফিচেল খাঁ তোমাদিগের মারপিট করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াইয়াছে।"

সাক্ষীরা চতুর্দ্দশ পুরুষ মধ্যে কখনও হাজার টাকা একত্রে দেখে নাই। তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল।

সেশনে বিচারের দিন উপস্থিত হইল। গোবিন্দলাল কাঠগড়ার ভিতর। প্রথম সাক্ষী উপস্থিত হইয়া হলফ পড়িল। উকীল সরকার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই গোবিন্দলাল ওরফে চুনিলালকে চেন?"

সাক্ষী। কই-না-মনে ত হয় না।

উকীল। কখনও দেখিয়াছ?

সাক্ষী। না।

উকীল। রোহিণীকে চিনিতে?

সাক্ষী। কোন্ রোহিণী?

উকীল। প্রসাদপুরের কুঠিতে যে ছিল?

সাক্ষী। আমার বাপের পুরুষে কখনও প্রসাদপুরের কুঠিতে যাই নাই।

উকীল। রোহিণী কি প্রকারে মরিয়াছে?

সাক্ষী। শুনিতেছি আত্মহত্যা হইয়াছে।

উকীল। খুনের বিষয় কিছু জান?

সাক্ষী। কিছু না।

উকীল তখন, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে যে জোবানবন্দী দিয়াছিল, তাহা পাঠ করিয়া সাক্ষীকে শুনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, তুমি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে এই সকল কথা বলিয়াছিলে?"

সাক্ষী। হাঁ, বলিয়াছিলাম।

উকীল। যদি কিছু জান না, তবে কেন বলিয়াছিলে?

সাক্ষী। মারের চোটে। ফিচেল খাঁ মারিয়া আমাদের শরীরে আর কিছু রাখে নাই।

এই বলিয়া সাক্ষী একটু কাঁদিল। দুই চারি দিন পূর্ব্বে সহোদর ভ্রাতার সঙ্গে জমী লইয়া কাজিয়া করিয়া মারামারি করিয়াছিল; তাহার দাগ ছিল। সাক্ষী অম্লানমুখে সেই দাগগুলি ফিচেল খাঁর মারপিটের দাগ বলিয়া জজ সাহেবকে দেখাইল।

উকীল সরকার অপ্রতিভ হইয়া দ্বিতীয় সাক্ষী ডাকিলেন। দ্বিতীয় সাক্ষীও ঐরূপ বলিল। যে পিঠে রাঙ্গচিত্রের আটা দিয়া ঘা করিয়া আসিয়াছিল-হাজার টাকার জন্য সব পারা যায়-তাহা জজ সাহেবকে দেখাইল।

তৃতীয় সাক্ষীও ঐরূপ গুজরাইল। তখন জজ সাহেব প্রমাণাভাব দেখিয়া আসামীকে খালাস দিলেন। এবং ফিচেল খাঁর প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া তাহার আচরণ সম্বন্ধে তদারক করিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে উপদেশ করিলেন।

বিচারকালে সাক্ষীদিগের এইরূপ সপক্ষতা দেখিয়া গোবিন্দলাল বিস্মিত হইতেছিলেন। পরে যখন ভিড়ের ভিতর মাধবীনাথকে দেখিলেন, তখনই সকল বুঝিতে পারিলেন। খালাস হইয়াও তাঁহাকে আর একবার জেলে যাইতে হইল-সেখানে জেলের পরওয়ানা পাইলে তবে ছাড়িবে। তিনি যখন জেলে ফিরিয়া যান,

তখন মাধবীনাথ তাঁহার নিকটস্থ হইয়া কাণে কাণে বলিলেন, "জেল হইতে খালাস পাইয়া, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও। আমার বাসা অমুক স্থানে।"

কিন্তু গোবিন্দলাল জেল হইতে খালাস পাইয়া, মাধবীনাথের কাছে গেলেন না। কোথায় গেলেন, কেহ জানিল না। মাধবীনাথ চারি পাঁচ দিন তাঁহার সন্ধান করিলেন। কোন সন্ধান পাইলেন না।

অগত্যা শেষে একাই হরিদ্রাগ্রামে প্রত্যাগমন করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদঃ ষষ্ঠ বৎসর

মাধবীনাথ আসিয়া ভ্রমরকে সংবাদ দিলেন, গোবিন্দলাল খালাস হইয়াছে, কিন্তু বাড়ী আসিল না, কোথায় চলিয়া গেল, সন্ধান পাওয়া গেল না। মাধবীনাথ সরিয়া গেলে ভ্রমর অনেক কাঁদিল, কিন্তু কি জন্য কাঁদিল, তাহা বলিতে পারি না।

এ দিকে গোবিন্দলাল খালাস পাইয়াই প্রসাদপুরে গেলেন। গিয়া দেখিলেন, প্রসাদপুরের গৃহে কিছু নাই, কেহ নাই। গিয়া শুনিলেন যে, অট্টালিকায় তাঁহার যে সকল দ্রব্যসামগ্রী ছিল, তাহা কতক পাঁচ জনে লুঠিয়া লইয়া গিয়াছিল–অবশিষ্ট লাওয়ারেশ বলিয়া বিক্রয় হইয়াছিল। কেবল বাড়ীটি পড়িয়া আছে–তাহারও কবাট চৌকাট পর্য্যন্ত বার ভূতে লইয়া গিয়াছে। প্রসাদপুরের বাজারে দুই এক দিন বাস করিয়া গোবিন্দলাল, বাড়ীর অবশিষ্ট ইট কাঠ জলের দামে এক ব্যক্তিকে বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু পাইলেন, তাহা লইয়া কলিকাতায় গেলেন।

কলিকাতায় অতি গোপনে সামান্য অবস্থায় গোবিন্দলাল দিনযাপন করিতে লাগিলেন। প্রসাদপুর হইতে অতি অল্প টাকাই আনিয়াছিলেন, তাহা এক বৎসরে ফুরাইয়া গেল। আর দিনপাতের সম্ভাবনা নাই। তখন, ছয় বৎসরের পর, গোবিন্দলাল মনে ভাবিলেন, ভ্রমরকে একখানি পত্র লিখিব।

গোবিন্দলাল কালি, কলম, কাগজ লইয়া ভ্রমরকে পত্র লিখিব বলিয়া বসিলেন। আমরা সত্য কথা বলিব–গোবিন্দলাল পত্র লিখিতে আরম্ভ করিতে গিয়া কাঁদিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে মনে পড়িল, ভ্রমর যে আজিও বাঁচিয়া আছে, তাহারই বা ঠিকানা কি? কাহাকে পত্র লিখিব? তার পর ভাবিলেন, একবার লিখিয়াই দেখি। না হয়, আমার পত্র ফিরিয়া আসিবে। তাহা হইলেই জানিব, যে ভ্রমর নাই।

কি লিখিব, এ কথা গোবিন্দলাল কতক্ষণ ভাবিলেন, তাহা বলা যায় না। তার পর, শেষ ভাবিলেন, যাহাকে বিনাদোষে জন্মের মত ত্যাগ করিয়াছি, তাহাকে যা হয়, তাই লিখিলেই বা অধিক কি ক্ষতি হইবে? গোবিন্দলাল লিখিলেন,

"ভ্রমর!

"ছয় বৎসরের পর, এ পামর আবার তোমায় পত্র লিখিতেছে। প্রবৃত্তি হয় পড়িও; না প্রবৃত্তি হয়, না পড়িয়াই ছিঁড়িয়া ফেলিও।

"আমার অদৃষ্টে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, বোধ হয় সকলই তুমি শুনিয়াছ। যদি বলি, সে আমার কর্ম্মফল, তুমি মনে করিতে পার, আমি তোমার মনরাখা কথা বলিতেছি। কেন না, আজি আমি তোমার কাছে ভিখারী।

"আমি এখন নিঃস্ব। তিন বৎসর ভিক্ষা করিয়া, দিনপাত করিয়াছি। তীর্থস্থানে ছিলাম, তীর্থস্থানে ভিক্ষা মিলিত। এখানে ভিক্ষা মিলে না–সুতরাং আমি অন্নাভাবে মারা যাইতেছি।

"আমার যাইবার এক স্থান ছিল–কাশীতে মাতৃক্রোড়ে। মার কাশীপ্রাপ্তি হইয়াছে–বোধ হয় তাহা তুমি জান। সুতরাং আমার আর স্থান নাই–অন্ন নাই।

"তাই, আমি মনে করিয়াছি, আবার হরিদ্রাগ্রামে এ কালামুখ দেখাইব–নহিলে খাইতে পাই না। যে তোমাকে বিনাপরাধে পরিত্যাগ করিয়া, পরদারনিরত

হইল, স্ত্রীহত্যা পর্য্যন্ত করিল, তাহার আবার লজ্জা কি? যে অন্নহীন, তাহার আবার লজ্জা কি? আমি এ কালামুখ দেখাইতে পারি, কিন্তু তুমি বিষয়াধিকারিণী–বাড়ী তোমার–আমি তোমার বৈরিতা করিয়াছি–আমায় তুমি স্থান দিবে কি?"

"পেটের দায়ে তোমার আশ্রয় চাহিতেছি–দিবে না কি?"

পত্র লিখিয়া সাত পাঁচ আবার ভাবিয়া গোবিন্দলাল পত্র ডাকে দিলেন। যথাকালে পত্র ভ্রমরের হস্তে পৌঁছিল।

পত্র পাইয়াই, ভ্রমর হস্তাক্ষর চিনিল। পত্র খুলিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে, ভ্রমর শয়নগৃহে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। তখন, ভ্রমর, বিরলে বসিয়া, নয়নের সহস্র ধারা মুছিতে মুছিতে, সেই পত্র পড়িল। একবার, দুইবার, শতবার, সহস্রবার পড়িল। সে দিন ভ্রমর আর দ্বার খুলিল না। যাহারা আহারের জন্য তাহাকে ডাকিতে আসিল, তাহাদিগকে বলিল, "আমার জ্বর হইয়াছে–আহার করিব না।" ভ্রমরের সর্ব্বদা জ্বর হয়; সকলে বিশ্বাস করিল।

পরদিন নিদ্রাশূন্য শয্যা হইতে যখন ভ্রমর গাত্রোত্থান করিলেন, তখন তাঁহার যথার্থই জ্বর হইয়াছে। কিন্তু তখন চিত্ত স্থির–বিকারশূন্য। পত্রের উত্তর যাহা লিখিবেন, তাহা পূর্ব্বেই স্থির হইয়াছিল। ভ্রমর তাহা সহস্র সহস্র বার ভাবিয়া স্থির করিয়াছিলেন, এখন আর ভাবিতে হইল না। পাঠ পর্য্যন্ত স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন।

"সেবিকা" পাঠ লিখিলেন না। কিন্তু স্বামী সকল অবস্থাতেই প্রণম্য; অতএব লিখিলেন,

"প্রণামা শতসহস্র নিবেদনঞ্চ বিশেষ"

তার পর লিখিলেন, "আপনার পত্র পাইয়াছি। বিষয় আপনার। আমার হইলেও আমি উহা দান করিয়াছি। যাইবার সময় আপনি সে দানপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন, স্মরণ থাকিতে পারে। কিন্তু রেজেষ্ট্রি অপিসে তাহার নকল আছে। আমি যে দান করিয়াছি, তাহা সিদ্ধ। তাহা এখনও বলবৎ।

"অতএব আপনি নির্ব্বিঘ্নে হরিদ্রাগ্রামে আসিয়া আপনার নিজসম্পত্তি দখল করিতে পারেন। বাড়ী আপনার।

"আর এই পাঁচ বৎসরে আমি অনেক টাকা জমাইয়াছি। তাহাও আপনার। আসিয়া গ্রহণ করিবেন।

"ঐ টাকার মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ আমি যাচ্ঞা করি। আট হাজার টাকা আমি উহা হইতে লইলাম। তিন হাজার টাকায় গঙ্গাতীরে আমার একটি বাড়ী প্রস্তুত করিব; পাঁচ হাজার টাকায় আমার জীবন নির্ব্বাহ হইবে।

"আপনার আসার জন্য সকল বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া আমি পিত্রালয়ে যাইব। যত দিন না আমার নূতন বাড়ী প্রস্তুত হয়, তত দিন আমি পিত্রালয়ে বাস করিব। আপনার সঙ্গে আমার ইহজন্মে আর সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে আমি সন্তুষ্ট,–আপনিও যে সন্তুষ্ট তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।

"আপনার দ্বিতীয় পত্রের প্রতীক্ষায় আমি রহিলাম।"

যথাকালে পত্র গোবিন্দলালের হস্তগত হইল–কি ভয়ানক পত্র! এতটুকু কোমলতাও নাই। গোবিন্দলালও লিখিয়াছিলেন, ছয় বৎসরের পর লিখিতেছি, কিন্তু ভ্রমরের পত্রে সে রকমের কথাও একটা নাই। সেই ভ্রমর!

গোবিন্দলাল পত্র পড়িয়া উত্তর লিখিলেন, "আমি হরিদ্রাগ্রামে যাইব না। যাহাতে এখানে আমার দিনপাত হয়, এইরূপ মাসিক ভিক্ষা আমাকে এইখানে পাঠাইয়া দিও।"

ভ্রমর উত্তর করিলেন, "মাস মাস আপনাকে পাঁচ শত টাকা পাঠাইব। আরও অধিক পাঠাইতে পারি, কিন্তু অধিক টাকা পাঠাইলে তাহা অপব্যয়িত হইবার সম্ভাবনা। আর আমার একটি নিবেদন–বৎসর বৎসর যে উপস্বত্ব জমিতেছে–আপনি এখানে আসিয়া ভোগ করিলে ভাল হয়। আমার জন্য দেশত্যাগ করিবেন

না-আমার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে।”

গোবিন্দলাল কলিকাতাতেই রহিলেন। উভয়েই বুঝিলেন, সেই ভাল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদঃ সপ্তম বৎসর

বাস্তবিক ভ্রমরের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছিল। অনেক দিন হইতে ভ্রমরের সাংঘাতিক পীড়া চিকিৎসায় উপশমিত ছিল। কিন্তু রোগ আর বড় চিকিৎসা মানিল না। এখন ভ্রমর দিন দিন ক্ষয় হইতে লাগিলেন। অগ্রহায়ণ মাসে ভ্রমর শয্যাশায়িনী হইলেন, আর শয্যাত্যাগ করিয়া উঠেন না। মাধবীনাথ স্বয়ং আসিয়া নিকটে থাকিয়া নিষ্ফল চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। যামিনী হরিদ্রাগ্রামের বাটীতে আসিয়া ভগিনীর শেষ শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

রোগ চিকিৎসা মানিল না। পৌষ মাস এইরূপে গেল। মাঘ মাসে ভ্রমর ঔষধ ব্যবহার পরিত্যাগ করিলেন। ঔষধসেবন এখন বৃথা। যামিনীকে বলিলেন, “আর ঔষধ খাওয়া হইবে না দিদি-সম্মুখে ফাল্গুন মাস-ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমার রাত্রে যেন মরি। দেখিস্ দিদি-যেন ফাল্গুনের পূর্ণিমার রাত্রি পলাইয়া যায় না। যদি দেখিস্ যে, পূর্ণিমার রাত্রি পার হই-তবে আমায় একটা অন্তরটিপনি দিতে ভুলিস্ না। রোগে হউক্, অন্তরটিপনিতে হউক্-ফাল্গুনের জ্যোৎস্নারাত্রে মরিতে হইবে। মনে থাকে যেন দিদি।”

যামিনী কাঁদিল, কিন্তু ভ্রমর আর ঔষধ খাইল না। ঔষধ খায় না, রোগের শান্তি নাই-কিন্তু ভ্রমর দিন দিন প্রফুল্লচিত্ত হইতে লাগিল।

এত দিনের পর ভ্রমর আবার হাসি তামাসা আরম্ভ করিল-ছয় বৎসরের পর এই প্রথম হাসি তামাসা। নিবিবার আগে প্রদীপ হাসিল।

যত দিন যাইতে লাগিল-অন্তিম কাল দিনে দিনে যত নিকট হইতে লাগিল-ভ্রমর তত স্থির, প্রফুল্ল, হাস্যমূর্ত্তি। শেষে সেই ভয়ঙ্কর শেষ দিন উপস্থিত হইল। ভ্রমর পৌরজনের চাঞ্চল্য এবং যামিনীর কান্না দেখিয়া বুঝিলেন, আজ বুঝি দিন ফুরাইল। শরীরের যন্ত্রণাও সেইরূপ অনুভূত করিলেন। তখন ভ্রমর যামিনীকে বলিলেন, “আজ শেষ দিন।”

যামিনী কাঁদিল। ভ্রমর বলিল, “দিদি-আজ শেষ দিন-আমার কিছু ভিক্ষা আছে-কথা রাখিও।”

যামিনী কাঁদিতে লাগিল-কথা কহিল না।

ভ্রমর বলিল, “আমার এক ভিক্ষা; আজ কাঁদিও না।-আমি মরিলে পর কাঁদিও-আমি বারণ করিতে আসিব না-কিন্তু আজ তোমাদের সঙ্গে যে কয়েকটা কথা কইতে পারি, নির্ব্বিঘ্নে কহিয়া মরিব, সাধ করিতেছে।”

যামিনী চক্ষের জল মুছিয়া কাছে বসিল-কিন্তু অবরুদ্ধ বাষ্পে আর কথা কহিতে পারিল না।

ভ্রমর বলিতে লাগিল, “আর একটি ভিক্ষা-তুমি ছাড়া আর কেহ এখানে না আসে। সময়ে সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব-কিন্তু এখন আর কেহ না আসে। তোমার সঙ্গে আর কথা কহিতে পাব না।”

যামিনী আর কতক্ষণ কান্না রাখিবে?

ক্রমে রাত্রি হইতে লাগিল। ভ্রমর জিজ্ঞাসা করিলেন, “দিদি, রাত্রি কি জ্যোৎস্না?”

যামিনী জানেলা খুলিয়া দেখিয়া বলিল, “দিব্য জ্যোৎস্না উঠিয়াছে।”

ভ্র। তবে জানেলাগুলি সব খুলিয়া দাও-আমি জ্যোৎস্না দেখিয়া মরি। দেখ দেখি, ঐ জানেলার নীচে যে ফুলবাগান, উহাতে ফুল ফুটিয়াছে কি না?

সেই জানেলায় দাঁড়াইয়া প্রভাতকালে ভ্রমর, গোবিন্দলালের সঙ্গে কথোপকথন করিতেন। আজি সাত বৎসর সে জানেলার দিকে যান নাই–সে জানেলা খোলেন নাই।

যামিনী কষ্টে সেই জানেলা খুলিয়া বলিল, "কই, এখানে ত ফুলবাগান নাই–এখানে কেবল খড়বন–আর দুই-একটা মরা মরা গাছ আছে–তাতে ফুল পাতা কিছুই নাই।"

ভ্রমর বলিল, "সাত বৎসর হইল, ওখানে ফুলবাগান ছিল। বে-মেরামতে গিয়াছে। আমি সাত বৎসর দেখি নাই।"

অনেকক্ষণ ভ্রমর নীরব হইয়া রহিলেন। তার পর ভ্রমর বলিলেন, "যেখান হইতে পার দিদি, আজ আমায় ফুল আনাইয়া দিতে হইবে। দেখিতেছ না, আজি আবার আমার ফুলশয্যা?"

যামিনীর আজ্ঞা পাইয়া দাস দাসী রাশীকৃত ফুল আনিয়া দিল। ভ্রমর বলিল, "ফুল আমার বিছানায় ছড়াইয়া দাও–আজ আমার ফুলশয্যা।"

যামিনী তাহাই করিল। তখন ভ্রমরের চক্ষু দিয়া জলধারা পড়িতে লাগিল। যামিনী বলিল, "কাঁদিতেছ কেন দিদি?"

ভ্রমর বলিল, "দিদি, একটি বড় দুঃখ রহিল। যে দিন তিনি আমায় ত্যাগ করিয়া কাশী যান, সেই দিন যোড়হাতে কাঁদিতে কাঁদিতে দেবতার কাছে ভিক্ষা চাহিয়াছিলাম, এক দিন যেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছিলাম, আমি যদি সতী হই, তবে আবার তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইবে। কই, আর ত দেখা হইল না। আজিকার দিন–মরিবার দিনে, দিদি, যদি একবার দেখিতে পাইতাম! এক দিনে, দিদি, সাত বৎসরের দুঃখ ভুলিতাম!"

যামিনী বলিল, "দেখিবে?" ভ্রমর যেন বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল–বলিল, "কার কথা বলিতেছ?"

যামিনী স্থিরভাবে বলিল, "গোবিন্দলালের কথা। তিনি এখানে আছেন–বাবা তোমার পীড়ার সংবাদ তাঁহাকে দিয়াছিলেন। শুনিয়া তোমাকে একবার দেখিবার জন্য তিনি আসিয়াছেন। আজ পৌঁছিয়াছেন। তোমার অবস্থা দেখিয়া ভয়ে এতক্ষণ তোমাকে বলিতে পারি নাই–তিনিও সাহস করিয়া আসিতে পারেন নাই।"

ভ্রমর কাঁদিয়া বলিল, "একবার দেখা দিদি! ইহজন্মে আর একবার দেখি! এই সময়ে আর একবার দেখা!"

যামিনী উঠিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে, নিঃশব্দপাদবিক্ষেপে গোবিন্দলাল–সাত বৎসরের পর নিজ শয্যাগৃহে প্রবশে করিলেন।

দুজনেই কাঁদিতেছিল। একজনও কথা কহিতে পারিল না।

ভ্রমর স্বামীকে কাছে আসিয়া বিছানায় বসিতে ইঙ্গিত করিল।–গোবিন্দলাল কাঁদিতে কাঁদিতে বিছানায় বসিল। ভ্রমর তাঁহাকে আরও কাছে আসিতে বলিল,–গোবিন্দলাল আরও কাছে গেল। তখন ভ্রমর আপন করতলের নিকট স্বামীর চরণ পাইয়া, সেই চরণযুগল স্পর্শ করিয়া পদরেণু লইয়া মাথায় দিল। বলিল, "আজ আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া, আশীর্ব্বাদ করিও জন্মান্তরে যেন সুখী হই।"

গোবিন্দলাল কোন কথা কহিতে পারিলেন না। ভ্রমরের হাত, আপন হাতে তুলিয়া লইলেন। সেইরূপ হাতে হাত রহিল। অনেকক্ষণ রহিল। ভ্রমর নিঃশব্দে প্রাণত্যাগ করিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ভ্রমর মরিয়া গেল। যথারীতি তাহার সৎকার হইল। সৎকার করিয়া আসিয়া গোবিন্দলাল গৃহে বসিলেন। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অবধি, তিনি কাহারও সহিত

কথা কহেন নাই।

আবার রজনী পোহাইল। ভ্রমরের মৃত্যুর পরদিন, যেমন সূর্য্য প্রত্যহ উঠিয়া থাকে, তেমনি উঠিল। গাছের পাতা ছায়ালোকে উজ্জ্বল হইল।-সরোবরের কৃষ্ণবারি ক্ষুদ্র বীচি বিক্ষেপ করিয়া জ্বলিতে লাগিল; আকাশের কালো মেঘ শাদা হইল-ভ্রমর যেন মরে নাই। গোবিন্দলাল বাহির হইলেন।

গোবিন্দলাল দুই জন স্ত্রীলোককে ভালবাসিয়াছিলেন-ভ্রমরকে আর রোহিণীকে। রোহিণী মরিল-ভ্রমর মরিল। রোহিণীর রূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন-যৌবনের অতৃপ্ত রূপতৃষ্ণা শান্ত করিতে পারেন নাই। ভ্রমরকে ত্যাগ করিয়া রোহিণীকে গ্রহণ করিলেন। রোহিণীকে গ্রহণ করিয়াই জানিয়াছিলেন যে, এ রোহিণী, ভ্রমর নহে-এ রূপতৃষ্ণা, এ স্নেহ নহে-এ ভোগ, এ সুখ নহে-এ মন্দারঘর্ষণপীড়িত বাসুকিনিশ্বাসনির্গত হলাহল, এ ধন্বন্তরিভাণ্ডনিঃসৃত সুধা নহে। বুঝিতে পারিলেন যে, এ হৃদয়সাগর, মন্থনের উপর মন্থন করিয়া যে হলাহল তুলিয়াছি, তাহা অপরিহার্য্য, অবশ্য পান করিতে হইবে-নীলকণ্ঠের ন্যায় গোবিন্দলাল সে বিষ পান করিলেন। নীলকণ্ঠের কণ্ঠস্থ বিষের মত, সে বিষ তাঁহার কণ্ঠে লাগিয়া রহিল। সে বিষ জীর্ণ হইবার নহে-সে বিষ উদ্গীর্ণ করিবার নহে। কিন্তু তখন সেই পূর্ব্বপরিজ্ঞাতস্বাদ বিশুদ্ধ ভ্রমরপ্রণয়সুধা-স্বর্গীয় গন্ধযুক্ত, চিত্তপুষ্টিকর, সর্ব্বরোগের ঔষধস্বরূপ, দিবারাত্রি স্মৃতিপথে জাগিতে লাগিল। যখন প্রসাদপুরে গোবিন্দলাল রোহিণীর সঙ্গীতস্রোতে ভাসমান, তখনই ভ্রমর তাঁহার চিত্তে প্রবলপ্রতাপযুক্তা অধীশ্বরী-ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে। তখন ভ্রমর অপ্রাপণীয়া, রোহিণী অত্যাজ্যা,-তবু ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে। তাই রোহিণী অত শীঘ্র মরিল। যদি কেহ সে কথা না বুঝিয়া থাকেন, তবে বৃথায় এ আখ্যায়িকা লিখিলাম।

যদি তখন গোবিন্দলাল, রোহিণীর যথাবিহিত ব্যবস্থা করিয়া স্নেহময়ী ভ্রমরের কাছে যুক্তকরে আসিয়া দাঁড়াইত, বলিত, "আমায় ক্ষমা কর-আমায় আবার হৃদয়প্রান্তে স্থান দাও।" যদি বলিত, "আমার এমন গুণ নাই, যাহাতে আমায় তুমি ক্ষমা করিতে পার, কিন্তু তোমার ত অনেক গুণ আছে, তুমি নিজগুণে আমায় ক্ষমা কর", বুঝি তাহা হইলে, ভ্রমর তাহাকে ক্ষমা করিত। কেন না, রমণী ক্ষমাময়ী, দয়াময়ী, স্নেহময়ী-রমণী ঈশ্বরের কীর্ত্তির চরমোৎকর্ষ, দেবতার ছায়া; পুরুষ দেবতার সৃষ্টিমাত্র। স্ত্রী আলোক; পুরুষ ছায়া। আলো কি ছায়া ত্যাগ করিতে পারিত?

গোবিন্দলাল তাহা পারিল না। কতকটা অহঙ্কার-পুরুষ অহঙ্কারে পরিপূর্ণ। কতকটা লজ্জা-দুষ্কৃতকারীর লজ্জাই দণ্ড। কতকটা ভয়-পাপ, সহজে পুণ্যের সম্মুখীন হইতে পারে না। ভ্রমরের কাছে আর মুখ দেখাইবার পথ নাই। গোবিন্দলাল আর অগ্রসর হইতে পারিল না। তাহার পর গোবিন্দলাল হত্যাকারী। তখন গোবিন্দলালের আশা ভরসা ফুরাইল। অন্ধকার আলোকের সম্মুখীন হইল না।

কিন্তু তবু, সেই পুনঃপ্রজ্বলিত, দুর্ব্বার, দাহকারী ভ্রমরদর্শনের লালসা বর্ষে বর্ষে, মাসে মাসে, দিনে দিনে, দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, গোবিন্দলালকে দাহ করিতে লাগিল। কে এমন পাইয়াছিল? কে এমন হারাইয়াছে? ভ্রমরও দুঃখ পাইয়াছিল, গোবিন্দলালও দুঃখ পাইয়াছিল। কিন্তু গোবিন্দলালের তুলনায় ভ্রমর সুখী। গোবিন্দলালের দুঃখ মনুষ্যদেহে অসহ্য।-ভ্রমরের সহায় ছিল-যম সহায়। গোবিন্দলালের সে সহায়ও নাই।

আবার রজনী পোহাইল-আবার সূর্য্যালোকে জগৎ হাসিল। গোবিন্দলাল গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।-রোহিণীকে গোবিন্দলাল স্বহস্তে বধ করিয়াছেন-ভ্রমরকেও প্রায় স্বহস্তে বধ করিয়াছেন। তাই ভাবিতে ভাবিতে বাহির হইলেন।

আমরা জানি না যে, সে রাত্রি গোবিন্দলাল কি প্রকারে কাটাইয়াছিলেন। বোধ হয় রাত্রি বড় ভয়ানক গিয়াছিল। দ্বার খুলিয়াই মাধবীনাথের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। মাধবীনাথ তাঁহাকে দেখিয়া, মুখপানে চাহিয়া রহিলেন-মুখে মনুষ্যের সাধ্যাতীত রোগের ছায়া।

মাধবীনাথ তাঁহার সঙ্গে কথা কহিলেন না-মাধবীনাথ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, ইহজন্মে আর গোবিন্দলালের সঙ্গে কথা কহিবেন না। বিনাবাক্যে

মাধবীনাথ চলিয়া গেলেন।

গোবিন্দলাল গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ভ্রমরের শয্যাগৃহতলস্থ সেই পুষ্পোদ্যানে গেলেন। যামিনী যথার্থই বলিয়াছেন, সেখানে আর পুষ্পোদ্যান নাই। সকলই ঘাস খড় ও জঙ্গলে পূরিয়া গিয়াছে-দুই একটি অমর পুষ্পবৃক্ষ সেই জঙ্গলের মধ্যে অর্দ্ধমৃতবৎ আছে-কিন্তু তাহাতে আর ফুল ফুটে না। গোবিন্দলাল অনেকক্ষণ সেই খড়বনের মধ্যে বেড়াইলেন। অনেক বেলা হইল-রৌদ্রের অত্যন্ত তেজঃ হইল-গোবিন্দলাল বেড়াইয়া বেড়াইয়া শ্রান্ত হইয়া শেষে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

তথা হইতে গোবিন্দলাল কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপ না করিয়া, কাহারও মুখপানে না চাহিয়া বারুণী পুষ্করিণী-তটে গেলেন। বেলা দেড় প্রহর হইয়াছে। তীব্র রৌদ্রের তেজে বারুণীর গভীর কৃষ্ণোজ্জ্বল বারিরাশি জ্বলিতেছিল-স্ত্রী পুরুষ বহুসংখ্যক লোক ঘাটে স্নান করিতেছিল-ছেলেরা কালো জলে স্ফাটিক চূর্ণ করিতে করিতে সাঁতার দিতেছিল। গোবিন্দলালের তত লোকসমাগম ভাল লাগিল না। ঘাট হইতে যেখানে বারুণীতীরে, তাঁহার সেই নানাপুষ্পরঞ্জিত নন্দনতুল্য পুষ্পোদ্যান ছিল, গোবিন্দলাল সেই দিকে গেলেন। প্রথমেই দেখিলেন, রেলিং ভাঙ্গিয়া গিয়াছে-সেই লৌহনির্ম্মিত বিচিত্র দ্বারের পরিবর্ত্তে কঞ্চির বেড়া। ভ্রমর গোবিন্দলালের জন্য সকল সম্পত্তি যত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু এ উদ্যানের প্রতি কিছুমাত্র যত্ন করেন নাই। একদিন যামিনী সে বাগানের কথা বলিয়াছিলেন-ভ্রমর বলিয়াছিল, “আমি যমের বাড়ী চলিলাম-আমার সে নন্দনকাননও ধ্বংস হউক। দিদি, পৃথিবীতে যা আমার স্বর্গ ছিল-তা আর কাহাকে দিয়া যাইব?”

গোবিন্দলাল দেখিলেন, ফটক নাই-রেলিং পড়িয়া গিয়াছে। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন-ফুলগাছ নাই-কেবল উলুবন, আর কচুগাছ, ঘেঁটু ফুলের গাছ, কালকাসন্দা গাছে বাগান পরিপূর্ণ। লতামণ্ডপ সকল ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে-প্রস্তরমূর্ত্তি সকল দুই তিন খণ্ডে বিভক্ত হইয়া ভূমে গড়াগড়ি যাইতেছে-তাহার উপর লতা সকল ব্যাপিয়াছে, কোনটা বা ভগ্নাবস্থায় দণ্ডায়মান আছে। প্রমোদভবনের ছাদ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; ঝিলমিল শার্সি কে ভাঙ্গিয়া লইয়া গিয়াছে-মর্ম্মরপ্রস্তর সকল কে হর্ম্ম্যতল হইতে খুলিয়া তুলিয়া লইয়া গিয়াছে-সে বাগানে আর ফুল ফুটে না-ফল ফলে না-বুঝি সুবাতাসও আর বয় না।

একটা ভগ্ন প্রস্তরমূর্ত্তির পদতলে গোবিন্দলাল বসিলেন। ক্রমে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইল, গোবিন্দলাল সেইখানে বসিয়া রহিলেন। প্রচণ্ড সূর্য্যতেজে তাঁহার মস্তক উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু গোবিন্দলাল কিছুই অনুভব করিলেন না। তাঁহার প্রাণ যায়। রাত্রি অবধি কেবল ভ্রমর ও রোহিণী ভাবিতেছিলেন। একবার ভ্রমর, তার পর রোহিণী, আবার ভ্রমর, আবার রোহিণী। ভাবিতে ভাবিতে চক্ষে ভ্রমরকে দেখিতে লাগিলেন, সম্মুখে রোহিণীকে দেখিতে লাগিলেন। জগৎ ভ্রমর-রোহিণীময় হইয়া উঠিল। সেই উদ্যানে বসিয়া প্রত্যেক বৃক্ষকে ভ্রমর বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল-প্রত্যেক বৃক্ষচ্ছায়ায় রোহিণী বসিয়া আছে দেখিতে লাগিলেন। এই ভ্রমর দাঁড়াইয়াছিল-আর নাই-এই রোহিণী আসিল, আবার কোথায় গেল? প্রতি শব্দে ভ্রমর বা রোহিণীর কণ্ঠ শুনিতে লাগিলেন। ঘাটে স্নানকারীরা কথা কহিতেছে, তাহাতে কখনও বোধ হইল ভ্রমর কথা কহিতেছে-কখনও বোধ হইতে লাগিল রোহিণী কথা কহিতেছে-কখনও বোধ হইল তাহারা দুই জনে কথোপকথন করিতেছে। শুষ্ক পত্র নড়িতেছে-বোধ হইল ভ্রমর আসিতেছে-বনমধ্যে বন্য কীটপতঙ্গ নড়িতেছে-বোধ হইল রোহিণী পলাইতেছে। বাতাসে শাখা দুলিতেছে-বোধ হইল ভ্রমর নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে-দয়েল ডাকিলে বোধ হইল রোহিণী গান করিতেছে। জগৎ ভ্রমর-রোহিণীময় হইল।

বেলা দুই প্রহর-আড়াই প্রহর হইল-গোবিন্দলাল সেইখানে-সেই ভগ্নপুত্তলপদতলে-সেই ভ্রমর-রোহিণীময় জগতে। বেলা তিন প্রহর, সার্দ্ধ তিন প্রহর হইল-অস্নাত অনাহারী গোবিন্দলাল সেইখানে, সেই ভ্রমর-রোহিণীময় জগতে-ভ্রমর-রোহিণীময় অনলকুণ্ডে। সন্ধ্যা হইল, তথাপি গোবিন্দলালের উত্থান নাই-চৈতন্য নাই। তাঁহার পৌরজনে তাঁহাকে সমস্ত দিন না দেখিয়া মনে করিয়াছিল, তিনি কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার অধিক সন্ধান করে নাই। সেইখানে সন্ধ্যা হইল। কাননে অন্ধকার হইল। আকাশে নক্ষত্র ফুটিল। পৃথিবী নীরব হইল। গোবিন্দলাল সেইখানে।

অকস্মাৎ সেই অন্ধকার, স্তব্ধ বিজন মধ্যে গোবিন্দলালের উন্মাদগ্রস্ত চিত্ত বিষম বিকার প্রাপ্ত হইল। তিনি স্পষ্টাক্ষরে রোহিণীর কণ্ঠস্বর শুনিলেন। রোহিণী উচ্চৈঃস্বরে যেন বলিতেছে,

"এইখানে!"

গোবিন্দলালের তখন আর স্মরণ ছিল না যে, রোহিণী মরিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এইখানে-কি?"

যেন শুনিলেন, রোহিণী বলিতেছে-

"এমনি সময়ে!"

গোবিন্দলাল কলে বলিলেন, "এইখানে, এমনি সময়ে, কি রোহিণি?"

মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত গোবিন্দলাল শুনিলেন, আবার রোহিণী উত্তর করিল, "এইখানে, এমনি সময়ে, ঐ জলে,

"আমি ডুবিয়াছিলাম!"

গোবিন্দলাল আপন মানসোদ্ভূত এই বাণী শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি ডুবিব?"

আবার ব্যাধিজনিত উত্তর শুনিতে পাইলেন, "হাঁ, আইস। ভ্রমর স্বর্গে বসিয়া বলিয়া পাঠাইতেছে, তাহার পুণ্যবলে আমাদিগকে উদ্ধার করিবে। **প্রায়শ্চিত্ত কর। মর।**"

গোবিন্দলাল চক্ষু বুজিলেন। তাঁহার শরীর অবসন্ন, বেপমান হইল। তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া সোপানশিলার উপরে পতিত হইলেন।

মুগ্ধাবস্থায়, মানস চক্ষে দেখিলেন, সহসা রোহিণীমূর্ত্তি অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। তখন দিগন্ত ক্রমশঃ প্রভাসিত করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী ভ্রমরমূর্ত্তি সম্মুখে উদিত হইল।

ভ্রমরমূর্ত্তি বলিল, "মরিবে কেন? মরিও না। আমাকে হারাইয়াছ, তাই মরিবে? আমার অপেক্ষাও প্রিয় কেহ আছেন। বাঁচিলে তাঁহাকে পাইবে।"

গোবিন্দলাল সে রাত্রে মূর্চ্ছিত অবস্থায় সেইখানে পড়িয়া রহিলেন। প্রভাতে সন্ধান পাইয়া তাঁহার লোকজন তাঁহাকে তুলিয়া গৃহে লইয়া গেল। তাঁহার দুরবস্থা দেখিয়া মাধবীনাথেরও দয়া হইল। সকলে মিলিয়া তাঁহার চিকিৎসা করাইলেন। দুই তিন মাসে গোবিন্দলাল প্রকৃতিস্থ হইলেন। সকলেই প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন যে, তিনি এক্ষণে গৃহে বাস করিবেন। কিন্তু গোবিন্দলাল তাহা করিলেন না। এক রাত্রি তিনি কাহাকে কিছু না বলিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। কেহ আর তাঁহার কোন সংবাদ পাইল না।

সাত বৎসরের পর, তাঁহার শ্রাদ্ধ হইল।

পরিশিষ্ট

গোবিন্দলালের সম্পত্তি তাঁহার ভাগিনেয় শচীকান্ত প্রাপ্ত হইল। শচীকান্ত বয়ঃপ্রাপ্ত।

শচীকান্ত প্রত্যহ সেই ভ্রষ্টশোভ কাননে-যেখানে আগে গোবিন্দলালের প্রমোদোদ্যান ছিল-এখন নিবিড় জঙ্গল-সেইখানে বেড়াইতে আসিত।

শচীকান্ত সেই দুঃখময়ী কাহিনী সবিস্তারে শুনিয়াছিল। প্রত্যহ সেইখানে বেড়াইতে আসিত, এবং সেইখানে বসিয়া সেই কথা ভাবিত। ভাবিয়া ভাবিয়া

আবার সেইখানে সে উদ্যান প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। আবার বিচিত্র রেলিং প্রস্তুত করিল–পুষ্করিণীতে নামিবার মনোহর কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত সোপানাবলী গঠিত করিল। আবার কেয়ারি করিয়া মনোহর বৃক্ষশ্রেণী সকল পুঁতিল। কিন্তু আর রঙ্গিল ফুলের গাছ বসাইল না। দেশী গাছের মধ্যে বকুল, কামিনী, বিদেশী গাছের মধ্যে সাইপ্রেস্ ও উইলো।–প্রমোদভবনের পরিবর্ত্তে একটি মন্দির প্রস্তুত করিল। মন্দিরমধ্যে কোন দেব-দেবী স্থাপন করিল না। বহুল অর্থব্যয় করিয়া ভ্রমরের একটি প্রতিমূর্ত্তি সুবর্ণে গঠিত করিয়া, সেই মন্দিরমধ্যে স্থাপন করিল। স্বর্ণপ্রতিমার পদতলে অক্ষর খোদিত করিয়া লিখিল,

"যে, সুখে দুঃখে, দোষে গুণে, ভ্রমরের সমান
হইবে, আমি তাহাকে এই স্বর্ণপ্রতিমা
দান করিব।"

* * *

ভ্রমরের মৃত্যুর বার বৎসর পরে সেই মন্দিরদ্বারে এক সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইল। শচীকান্ত সেইখানেই ছিলেন। সন্ন্যাসী তাঁহাকে বলিলেন, "এই মন্দিরে কি আছে দেখিব।"

শচীকান্ত দ্বার মোচন করিয়া সুবর্ণময়ী ভ্রমরমূর্ত্তি দেখাইলেন। সন্ন্যাসী বলিল, "এই ভ্রমর আমার ছিল। আমি গোবিন্দলাল রায়।"

শচীকান্ত বিস্মিত, স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। কিন্তু পরে বিস্ময় দূর হইল, তিনি গোবিন্দলালের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। পরে তাঁহাকে গৃহে লইবার জন্য যত্ন করিলেন। গোবিন্দলাল অস্বীকৃত হইলেন। বলিলেন, "আজ আমার দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাতবাস সম্পূর্ণ হইল। অজ্ঞাতবাস সমাপনপূর্ব্বক তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। এক্ষণে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করা হইল। এখন ফিরিয়া যাইব।"

শচীকান্ত যুক্তকরে বলিলেন, "বিষয় আপনার, আপনি উপভোগ করুন।"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "বিষয় সম্পত্তির অপেক্ষাও যাহা ধন, যাহা কুবেরেরও অপ্রাপ্য, তাহা আমি পাইয়াছি। এই ভ্রমরের অপেক্ষাও যাহা মধুর, ভ্রমরের অপেক্ষাও যাহা পবিত্র, তাহা পাইয়াছি। আমি শান্তি পাইয়াছি। বিষয়ে আমার কাজ নাই, তুমিই ইহা ভোগ করিতে থাক।"

শচীকান্ত বিনীতভাবে বলিলেন, "সন্ন্যাসে কি শান্তি পাওয়া যায়?"

গোবিন্দলাল উত্তর করিলেন, "কদাপি না। কেবল অজ্ঞাতবাসের জন্য আমার এ সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ। ভগবৎ-পাদপদ্মে মনঃস্থাপন ভিন্ন শান্তি পাইবার আর উপায় নাই। এখন তিনিই আমার সম্পত্তি–তিনিই আমার ভ্রমর–ভ্রমরাধিক ভ্রমর।"

এই বলিয়া গোবিন্দলাল চলিয়া গেলেন। আর কেহ তাঁহাকে হরিদ্রাগ্রামে দেখিতে পাইল না।

মৃণালিনী

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ আচার্য্য

একদিন প্রয়াগতীর্থে, গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে, অপূর্ব প্রাবৃট্দিনান্তশোভা প্রকটিত হইতেছিল। প্রাবৃট্কাল, কন্তিু মেঘ নাই, অথবা যে মেঘ আছে, তাহা স্বর্ণময় তরঙ্গমালাবৎ পশ্চিম গগনে বিরাজ করিতেছিল। সূর্য্যদেব অস্তে গমন করিয়াছিলেন। বর্ষার জলসঞ্চারে গঙ্গাযমুনা উভয়েই সম্পূর্ণশরীরা, যৌবনের পরিপূর্ণতায় উন্মাদিনী, যেন দুই ভগিনী ক্রীড়াচ্ছলে পরস্পর আলিঙ্গন করিতেছিল। চঞ্চল বসনাগ্রভাগবৎ তরঙ্গমালা পবনতাড়িত হইয়া কূলে প্রতিঘাত করিতেছিল।

একখানি ক্ষুদ্র তরুণীতে দুইজন মাত্র নাবিক। তরুণী অসঙ্গত সাহসে সেই দুর্দ্দমনীয় যমুনার স্রোতোবেগে আরোহণ করিয়া, প্রয়াগের ঘাটে আসিয়া লাগিল। একজন নৌকায় রহিল, একজন তীরে নামিল। যে নামিল, তাহার নবীন যৌবন, উন্নত বলিষ্ঠ দেহ, যোদ্ধৃবেশ। মস্তকে উষ্ণীষ, অঙ্গে কবচ, করে ধনুর্ব্বাণ, পৃষ্ঠে তূণীর চরণে অনুপদীনা। এই বীরাকার পুরুষ পরম সুন্দর। ঘাটের উপরে, সংসারবিরাগী পণ্যপ্রয়াসীদিগের কতকগুলি আশ্রম আছে। তন্মধ্যে একটি ক্ষুদ্র কুটীরে এই যুবা প্রবেশ করিলেন।

কুটীরমধ্যে এক ব্রাহ্মণ কুশাসনে উপবেশন করিয়া জপে নিযুক্ত ছিলেন; ব্রাহ্মণ অতি দীর্ঘাকার পুরুষ; শরীর শুষ্ক; আয়ত মুখমণ্ডলে শ্বেতশ্মশ্রু বিরাজিত; ললাট ও বিরলকেশ তালুদেশে অল্পমাত্র বিভূতিশোভা। ব্রাহ্মণের কান্তি গম্ভীর এবং কটাক্ষ কঠিন; দেখিলে তাঁহাকে নির্দ্দয় বা অভক্তিভাজন বলিয়া বোধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, অথচ শঙ্কা থাকিত। আগন্তুককে দেখিবামাত্র তাহার সে পুরুষভাব যেন দূর হইল, মুখের গাম্ভীর্য্যমধ্যে প্রসাদের সঞ্চার হইল। আগন্তুক ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। ব্রাহ্মণ আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "বৎস হেমচন্দ্র, আমি অনেক দিবসাবধি তোমার প্রতীক্ষা করিতেছি।"

হেমচন্দ্র বিনীতভাবে কহিলেন, "অপরাধ গ্রহণ করিবেন না, দিল্লীতে কার্য্য সিদ্ধ হয় নাই। পরন্তু যবন আমার পশ্চাদগামী হইয়াছিল; এইজন্য কিছু সতর্ক হইয়া আসিতে হইয়াছিল। তদ্ধেতু বিলম্ব হইয়াছে।"

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "দিল্লীর সংবাদ অমি সকল শুনিয়াছি। বখ্তিয়ার খিলিজিকে হাতীতে মারিত, ভালই হইত, দেবতার শত্রু পশু-হস্তে নিপাত হইত। তুমি কেন তার প্রাণ বাঁচাইতে গেলে।"

হেমচন্দ্র। তাহাকে স্বহস্তে যুদ্ধে মারিব বলিয়া। সে আমার পিতৃশত্রু, আমার পিতার রাজ্যচোর। আমারই সে বধ্য।

ব্রাহ্মণ। তবে তাহার উপর যে হাতী রাগিয়া আক্রমণ করিয়াছিল, তুমি বখ্তিয়ারকে না মারিয়া সে হাতীকে মারিলে কেন?

হেমচন্দ্র। আমি চোরের মত বিনা যুদ্ধে শত্রু মারিব? আমি মগধবিজেতাকে যুদ্ধে জয় করিয়া পিতার রাজ্য উদ্ধার করিব। নহিলে আমার মগধ-রাজপুত্র

নামে কলঙ্ক।

ব্রাহ্মণ কিঞ্চিৎ পরুষভাবে কহিলেন, "এ সকল ঘটনা ত অনেক দিন হইয়া গিয়াছে, ইহার পূর্ব্বে তোমার এখানে আসার সম্ভাবনা ছিল। তুমি কেন বিলম্ব করিলে? তুমি মথুরায় গিয়াছিলে?"

হেমচন্দ্র অধোবন হইলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, "বুঝিলাম তুমি মথুরায় গিয়াছিলে, আমার নিষেধ গ্রাহ্য কর নাই। যাহাকে দেখিতে মথুরায় গিয়াছিলে, তাহার কি সাক্ষাৎ পাইয়াছ?"

এবার হেমচন্দ্র রুক্ষভাবে কহিলেন, "সাক্ষাৎ যে পাইলাম না, সে আপনারই দয়া। মৃণালিনীকে আপনি কোথায় পাঠাইয়াছেন?"

মাধবাচার্য্য কহিলেন, "আমি যে কোথায় পাঠাইয়াছি, তাহা তুমি কি প্রকারে সিদ্ধান্ত করিলে?"

হে। মাধবাচার্য্য ভিন্ন এ মন্ত্রণা কাহার ? আমি মৃণালিনীর ধাত্রীর মুখে শুনিলাম যে, মৃণালিনী আমার আঙ্গটি দেখিয়া কোথায় গিয়াছে, আর তাহার উদ্দেশ নাই। আমার আঙ্গটি আপনি পাথেয় জন্য চাহিয়া লইয়াছিলেন। আঙ্গটির পরিবর্ত্তে অন্য রত্ন দিতে চাহিয়াছিলাম; কিন্তু আপনি লন নাই। তখনই আমি সন্দিহান হইয়াছিলাম, কিন্তু আপনাকে অদেয় আমার কিছুই নাই, এই জন্যই বিনা বিবাদে আঙ্গটি দিয়াছিলাম। কিন্তু আমার সে অসতর্কতার আপনিই সমুচিত প্রতিফল দিয়াছেন।

মাধবাচার্য্য কহিলেন, "যদি তাহাই হয়, আমার উপর রাগ করিও না। তুমি দেবকার্য্য না সাধিলে কে সাধিবে ? তুমি যবনকে না তাড়াইলে কে তাড়াইবে ? যবননিপাত তোমার একমাত্র ধ্যানস্বরূপ হওয়া উচিত। এখন মৃণালিনী তোমার মন অধিকার করিবে কেন ? একবার তুমি মৃণালিনীর আশায় মথুরায় বসিয়া ছিলে বলিয়া তোমার বাপের রাজ্য হারাইয়াছ; যবনাগমনকালে হেমচন্দ্র যদি মথুরায় না থাকিয়া মগধে থাকিত, তবে মগধজয় কেন হইবে ? আবার কি সেই মৃণালিনী-পাশে বদ্ধ হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবে ? মাধবাচার্য্যের জীবন থাকিতে তাহা হইবে না। সুতরাং যেখানে থাকিলে তুমি মৃণালিনীকে পাইবে না, আমি তাহাকে সেইখানে রাখিয়াছি।"

হে। আপনার দেবকার্য্য আপনি উদ্ধার করুন; আমি এই পর্য্যন্ত।

মা। তোমার দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিয়াছে। এই কি তোমার দেবভক্তি ? ভাল, তাহাই না হউক; দেবতারা আত্মকর্ম্ম সাধন জন্য তোমার ন্যায় মনুষ্যের সাহায্যের অপেক্ষা করেন না। কিন্তু তুমি কাপুরুষ যদি না হও, তবে তুমি কি প্রকারে শত্রুশাসন হইতে অবসর পাইতে চাও ? এই কি তোমার বীরগর্ব্ব ? এই কি তোমার শিক্ষা ? রাজবংশে জন্মিয়া কি প্রকারে আপনার রাজ্যোদ্ধারে বিমুখ হইতে চাহিতেছ ?

হে। রাজ্য—শিক্ষা—গর্ব্ব অতল জলে ডুবিয়া যাউক।

মা। নরাধম! তোমার জননী কেন তোমায় দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করিয়া যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিল ? কেনই বা দ্বাদশ বর্ষ দেবারাধনা ত্যাগ করিয়া এ পাষণ্ডকে সকল বিদ্যা শিখাইলাম ?

মাধবাচার্য্য অনেকক্ষণ নীরবে করলগ্নকপোল হইয়া রহিলেন। ক্রমে হেমচন্দ্রের অনিন্দ্য গৌর মুখকান্তি মধ্যাহ্ন-মরীচি-বিশোষিত স্থলপদ্মবৎ আরক্তবর্ণ হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু গর্ব্বাগ্নিগিরি-শিখর-তুল্য, তিনি স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরিশেষে মাধবাচার্য্য কহিলেন, "হেমচন্দ্র ধৈর্য্যাবলম্বন কর। মৃণালিনী কোথায়, তাহা বলিব— মৃণালিনীর সহিত তোমার বিবাহ দেওয়াইব। কিন্তু এক্ষণে আমার পরামর্শের অনুবর্ত্তী হও, আগে আপনার কাজ সাধন কর।"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "মৃণালিনী কোথায় না বলিলে, আমি যবনবধের জন্য অস্ত্র স্পর্শ করিব না।"

মাধবাচার্য্য কহিলেন, "আর যদি মৃণালিনী মরিয়া থাকে ?"

হেমচন্দ্রের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফূলিঙ্গ নির্গত হইল। তিনি কহিলেন, "তবে সে আপনারই কাজ।" মাধবাচার্য্য কহিলেন, "আমি স্বীকার করিতেছি, আমিই দেবকার্য্যের কণ্টককে বিনষ্ট করিয়াছি।"

হেমচন্দ্রের মুখাকন্তি বর্ষণোন্মুখ মেঘবৎ হইল। ত্রস্তহস্তে ধনুকে শরসংযোগ করিয়া কহিলেন, "যে মৃণালিনীর বধকর্ত্তা, সে আমার বধ্য। এই শরে গুরুহত্যা ব্রহ্মহত্যা উভয় দুষ্ক্রিয়া সাধন করিব।"

মাধবাচার্য্য হাস্য কহিলেন, কহিলেন, "গুরুহত্যায় ব্রহ্মহত্যায় তোমার যত আমোদ, স্ত্রী হত্যায় আমার তত নহে। এক্ষণে তোমাকে পাতকের ভাগী হইতে হইবে না। মৃণালিনী জীবিতা আছে। পার, তাহার সন্ধান করিয়া সাক্ষাৎ কর। এক্ষণে আমার আশ্রম হইতে স্থানান্তরে যাও। আশ্রম কলুষিত করিও না; অপাত্রে আমি কোন ভার দিই না।" এই বলিয়া মাধবাচার্য্য পূর্ব্ববৎ জপে নিযুক্ত হইলেন।

হেমচন্দ্র আশ্রম হইতে নির্গত হইলেন। ঘাটে আসিয়া ক্ষুদ্র তরণী আরোহণ করিলেন। যে দ্বিতীয় ব্যক্তি নৌকায় ছিল, তাহাকে বলিলেন, "দিগ্বিজয়! নৌকা ছাড়িয়া দাও।"

দিগ্বিজয় বলিল, "কোথায় যাইব ?' হেমচন্দ্র বলিলেন, "যেখানে ইচ্ছা— যমালয়।"

দিগ্বিজয় প্রভুর স্বভাব বুঝিত। অস্ফুটস্বরে কহিল, "সেটা অল্প পথ।" এই বলিয়া সে তরণী ছাড়িয়া দিয়া স্রোতের প্রতিকূলে বাহিতে লাগিল।

হেমচন্দ্র অনেকক্ষণ নীরবে থাকিয়া শেষে কহিলেন, "দূর হউক! ফিরিয়া চল।"

দিগ্বিজয় নৌকা ফিরাইয়া পুনরপি প্রয়াগের ঘাটে উপনীত হইল। হেমচন্দ্র লম্ফে তীরে অবতরণ করিয়া পুনর্ব্বার মাধবাচার্য্যের আশ্রমে গেলেন।

তাঁহাকে দেখিয়া মাধবাচার্য্য কহিলেন, "পুনর্ব্বার কেন আসিয়াছ ?"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই স্বীকার করিব। মৃণালিনী কোথায় আছে আজ্ঞা করুন।"

মা। তুমি সত্যবাদী—আমার আজ্ঞাপালন করিতে স্বীকার করিলে, ইহাতেই আমি সন্তুষ্ট হইলাম। গৌড়নগরে এক শিষ্যের বাটীতে মৃণালিনীকে রাখিয়াছি। তোমাকেও সেই প্রদেশে যাইতে হইবে। কিন্তু তুমি তাহার সাক্ষাৎ পাইবে না। শিষ্যের প্রতি আমার বিশেষ আজ্ঞা আছে যে, যত দিন মৃণালিনী তাঁহার গৃহে থাকিবে, তত দিন সে পুরুষান্তরের সাক্ষাৎ না পায়।

হে। সাক্ষাৎ না পাই , যাহা বলিলেন, ইহাতেই আমি চরিতার্থ হইলাম। এক্ষণে কি কার্য্য করিতে হইবে অনুমতি করুন।

মা। তুমি দিল্লী গিয়া যবনের মন্ত্রণা কি জানিয়া আসিয়াছ ?

হে। যবনেরা বঙ্গবিজয়ের উদ্যোগ করিতেছে। অতি ত্বরায় বখ্‌তিয়ার খিলিজি সেনা লইয়া, গৌড়ে যাত্রা করিবে।

মাধবাচার্য্যের মুখ হর্ষপ্রফুল্ল হইল। তিনি কহিলেন, 'এত দিনে বিধাতা বুঝি এ দেশের প্রতি সদয় হইলেন।"

হেমচন্দ্র একতানমনে মাধবাচার্য্যের প্রতি চাহিয়া তাঁহার কথার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মাধবাচার্য্য বলিতে লাগিলেন, "কয় মাস পর্য্যন্ত আমি কেবল গণনায় নিযুক্ত আছি, গণনায় যাহা ভবিষ্যৎ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহা ফলিবার উপক্রম হইয়াছে।"

হে। কি প্রকার ?

মা। গণিয়া দেখিলাম যে, যবনসাম্রাজ্য-ধ্বংস বঙ্গরাজ্য হইতে আরম্ভ হইবে।

হে। তাহা হইতে পারে। কিন্তু কতকালেই বা তাহা হইবে ? আর কাহা কর্তৃক ?

মা। তাহাও গণিয়া স্থির করিয়াছি। যখন পশ্চিমদেশীয় বণিক বঙ্গরাজ্যে অস্ত্রধারণ করিবে, তখন যবনবরাজ্য উৎপন্ন হইবেক।

হে। তবে আমার জয়লাভের কোথা সম্ভাবনা ? আমি ত বণিক্ নহি।

মা। তুমিই বণিক্। মথুরায় যখন তুমি মৃণালিনীর প্রয়াসে দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলে, তখন তুমি কি ছলনা করিয়া তথায় বাস করিতে ?

হে। আমি তখন বণিক্ বলিয়া মথুরায় পরিচিত ছিলাম বটে।

মা। সুতরাং তুমিই পশ্চিমদেশীয় বণিক্। গৌড়রাজ্যে গিয়া তুমি অস্ত্রধারণ করিলেই যবননিপাত হইবে। তুমি আমার নিকট প্রতিশ্রুত হও যে, কাল প্রাতেই গৌড়ে যাত্রা করিবে। যে পর্য্যন্ত সেখানে না যবনের সহিত যুদ্ধ কর, সে পর্য্যন্ত মৃণালিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিবে না।

হেমচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "তাহাই স্বীকার করিলাম। কিন্তু একা যুদ্ধ করিয়া কি করিব?"

মা। গৌড়েশ্বরের সেনা আছে।

হে। থাকিতে পারে—সে বিষয়েও কতক সন্দেহ; কিন্তু যদি থাকে, তবে তাহারা আমার অধীন হইবে কেন?

মা। তুমি আগে যাও। নবদ্বীপে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। সেইখানেই গিয়া ইহার বিহিত উদ্যোগ করা যাইবে। গৌড়েশ্বরের নিকট আমি পরিচিত আছি।

"যে আজ্ঞা" বলিয়া হেমচন্দ্র প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন। যতক্ষণ তাঁহার বীরমূর্ত্তি নয়নগোচর হইতে লাগিল, আচার্য্য ততক্ষণ তৎপ্রতি অনিমেষলোচনে চাহিয়া রহিলেন। আর যখন হেমচন্দ্র অদৃশ্য হইলেন, মাধবাচার্য্য মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "যাও, বৎস! প্রতি পদে বিজয় লাভ কর। যদি ব্রাহ্মণবংশে আমার জন্ম হয়, তবে তোমার পদে কুশাঙ্কুরও বিঁধিবে না। মৃণালিনী! মৃণালিনী পাখী আমি তোমারই জন্য পিঞ্জরে বাঁধিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু কি জানি, পাছে তুমি তাহার কলধ্বনিতে মুগ্ধ হইয়া বড় কাজ ভুলিয়া যাও, এইজন্য তোমার পরমমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণ তোমাকে কিছু দিনের জন্য মনঃপীড়া দিতেছে।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : পিঞ্জরের বিহঙ্গী

লক্ষ্মণাবতী-নিবাসী হৃষীকেশ সম্পন্ন বা দরিদ্র ব্রাহ্মণ নহেন। তাঁহার বাসগৃহের বিলক্ষণ সৌষ্ঠব ছিল। তাঁহার অন্তঃপুরমধ্যে যথায় দুইটি তরুণী কক্ষপ্রাচীরে আলেখ্য লিখিতেছিলেন, তথায় পাঠক মহাশয়কে দাঁড়াইতে হইবে। উভয় রমণীই আত্মকর্ম্মে সবিশেষ মনোভিনিবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তন্নিবন্ধন পরস্পরের সহিত কথোপকথনের কোন বিঘ্ন জন্মিতেছিল না। সেই কথোপকথনের মধ্যভাগ হইতে পাঠক মহাশয়কে শুনাইতে আরম্ভ করিব।

এক যুবতী অপরকে কহিলেন, "কেন, মৃণালিনী, কথার উত্তর দিস্ না কেন ? আমি সেই রাজপুত্রটির কথা শুনিতে ভালবাসি।"

"সই মণিমালিনি! তোমার সুখের কথা বল, আমি আনন্দে শুনিব।"

মণিমালিনী কহিল, "আমার সুখের কথা শুনিতে শুনিতে আমিই জ্বালাতন হইয়াছি, তোমাকে কি শুনাইব ?"

মৃ। তুমি শোন কার কাছে— তোমার স্বামীর কাছে ?

মণি। নহিলে আর কারও কাছে বড় শুনতে পাই না। এই পদ্মটি কেমন আঁকিলাম দেখ দেখি ?

মৃ। ভাল হইয়াও হয় নাই। জল হইতে পদ্ম অনেক ঊর্দ্ধে আছে, কিন্তু সরোবরে সেরূপ থাকে না; পদ্মের বোঁটা জলে লাগিয়া থাকে, চিত্রেও সেইরূপ হইবে। আর কয়েকটি পদ্মপত্র আঁক; নহিলে পদ্মের শোভা স্পষ্ট হয় না। আরও, পার যদি, উহার নিকট একটি রাজহাঁস আঁকিয়া দাও।

মণি। হাঁস এখানে কি করিবে?

মৃ। তোমার স্বামীর মত পদ্মের কাছে সুখের কথা কহিবে।

মণি। (হাসিয়া) দুই জনেই সুকণ্ঠ বটে। কিন্তু আমি হাঁস লিখিব না। আমি সুখের কথা শুনিয়া শুনিয়া জ্বালাতন হইয়াছি।

মৃ। তবে একটি খঞ্জন আঁক।

মণি। খঞ্জন আঁকিব না। খঞ্জন পাখা বাহির করিয়া উড়িয়া যাইবে। এ ত মৃণালিনী নহে যে, স্নেহ-শিকলে বাঁধিয়া রাখিব।

মৃ। খঞ্জন। যদি এমনই দুষ্ট হয়, তবে মৃণালিনীকে যেমন পিঞ্জরে পূরিয়াছ, খঞ্জনকেও সেইরূপ করিও।

ম। আমরা মৃণালিনীকে পিঞ্জরে পূরি নাই— সে আপনি আসিয়া পিঞ্জরে ঢুকিয়াছে।

মৃ। সে মাধবাচার্য্যের গুণ।

ম। সখি, তুমি কতবার বলিয়াছ যে, মাধবাচার্য্যের সেই নিষ্ঠুর কাজের কথা সবিশেষ বলিবে। কিন্তু কই, আজও বলিলে না। কেন তুমি মাধবাচার্য্যের কথায় পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া আসিলে?

মৃ। মাধবাচার্য্যের কথায় আসি নাই। মাধবাচার্য্যকে আমি চিনিতাম না। আমি ইচ্ছাপূর্ব্বকও এখানে আসি নাই। একদিন সন্ধ্যার পর, আমার দাসী আমাকে এই আঙ্গটি দিল; এবং বলিল যে, যিনি এই আঙ্গটি দিয়াছেন, তিনি ফুলবাগানে অপেক্ষা করিতেছেন। আমি দেখিলাম যে, উহা হেমচন্দ্রের সঙ্কেতের আঙ্গটি। তাঁহার সাক্ষাতের অভিলাষ থাকিলে তিনি এই আঙ্গটি পাঠাইয়া দিতেন। আমাদিগের বাটীর পিছনেই বাগান ছিল। যমুনা হইতে শীতল বাতাস সেই বাগানে নাচিয়া বেড়াইত। তথায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইত।

মণিমালিনী কহিলেন, 'ঐ কথাটি মনে পড়িলেও অমার বড় অসুখ হয়। তুমি কুমারী হইয়া কি প্রকারে পুরুষের সহিত গোপনে প্রণয় করিতে?"

মৃ। অসুখ কেন সখি— তিনি আমার স্বামী। তিনি ভিন্ন অন্য কেহ কখন আমার স্বামী হইবে না।

ম। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ত তিনি স্বামী হয়েন নাই। রাগ করিও না সখি! তোমাকে ভগিনীর ন্যায় ভালবাসি; এই জন্য বলিতেছি।

মৃণালিনী অধোবদনে রহিলেন। ক্ষণেক পরে চক্ষুর জল মুছিলেন। কহিলেন, "মণিমালিনি! এ বিদেশে আমার আত্মীয় কেহ নাই। আমাকে ভাল কথা বলে, এমন কেহ নাই। যাহারা আমাকে ভালবাসিত, তাহাদিগের সহিত যে, আর কখনও সাক্ষাৎ হইবে, সে ভরসাও করি না। কেবলমাত্র তুমি আমার সখী— তুমি আমাকে ভাল না বাসিলে কে আর ভালবাসিবে?

ম। আমি তোমাকে ভালবাসিব, বাসিয়াও থাকি, কিন্তু যখন ঐ কথাটি মনে পড়ে, তখন মনে করি—

মৃণালিনী পুনশ্চ নীরবে রোদন করিলেন। কহিলেন, "সখি, তোমার মুখে এ কথা আমার সহ্য হয় না। যদি তুমি আমার নিকটে শপথ কর যে, যাহা বলিব, তাহা এ সংসারে কাহারও নিকটে ব্যক্ত করিবে না, তবে তোমার নিকট সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি। তাহা হইলে তুমি আমাকে ভালবাসিবে।"

ম। আমি শপথ করিতেছি।

মৃ। তোমার চুলে দেবতার ফুল আছে। তাহা ছুঁয়ে শপথ কর।

মণিমালিনী তাই করিলেন।

তখন মৃণালিনী মণিমালিনীর কাণে যাহা কহিলেন, তাহার এক্ষণে বিস্তারিত ব্যাখার প্রয়োজন নাই। শ্রবণে মণিমালিনী পরম প্রীতি প্রকাশ করিলেন। গোপন কথা সমাপ্ত হইল।

মণিমালিনী কহিলেন, "তাহার পর, মাধবাচার্য্যের সঙ্গে তুমি কি প্রকারে আসিলে ? সে বৃত্তান্ত বলিতেছিলে বল।"

মৃণালিনী কহিলেন, "আমি হেমচন্দ্রের আঙ্গটি দেখিয়া তাঁকে দেখিবার ভরসায় বাগানে আসিলে দূতী কহিল যে, রাজপুত্র নৌকায় আছেন, নৌকা তীরে লাগিয়া রহিয়াছে। আমি অনেক দিন রাজপুত্রকে দেখি নাই। বড় ব্যগ্র হাইয়াছিলাম, তাই বিবেচনাশূন্য হইলাম। তীরে আসিয়া দেখিলাম যে, যথার্থই একখানি নৌকা লাগিয়া রহিয়াছে। তাহার বাহিরে এক জন পুরুষ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, মনে করিলাম যে, রাজপুত্র দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। আমি নৌকার নিকট আসিলাম। নৌকার উপর যিনি দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি আমার হাত ধরিয়া নৌকায় উঠাইলেন। অমনি নাবিকেরা নৌকা খুলিয়া দিল। কিন্তু আমি স্পর্শেই বুঝিলাম যে, এ ব্যক্তি হেমচন্দ্র নহে।"

মণি। আর অমনি তুমি চীৎকার করিলে ?

মৃ। চীৎকার করি নাই। একবার ইচ্ছা করিয়াছিল বটে; কিন্তু চীৎকার আসিল না।

মণি। আমি হইলে জলে ঝাঁপ দিতাম।

মৃ। হেমচন্দ্রকে না দেখিয়া কেন মরিব ?

মণি। তার পর কি হইল ?

মৃ। প্রথমেই সে ব্যক্তি আমাকে "মা" বলিয়া বলিল, "আমি তোমাকে মাতৃ-সম্বোধন করিতেছি—আমি তোমার পুত্র, কোন আশঙ্কা করিও না। আমার নাম মাধবাচার্য্য, আমি হেমচন্দ্রের গুরু। কেবল হেমচন্দ্রের গুরু এমত নহি; ভারতবর্ষের রাজগণের মধ্যে অনেকের সহিত আমার সেই সম্বন্ধ। আমি এখন কোন দৈবকার্য্যে নিযুক্ত আছি, তাহাতে হেমচন্দ্র আমার প্রধান সহায়; তুমি তাহার প্রধান বিঘ্ন।"

আমি বলিলাম, "আমি বিঘ্ন ?" মাধবাচার্য্য কহিলেন, "তুমিই বিঘ্ন। যবনদিগের জয় করা, হিন্দুরাজ্যের পুনরুদ্ধার করা, সুসাধ্য কর্ম্ম নহে; হেমচন্দ্র ব্যতীত কাহারও সাধ্য নহে; হেমচন্দ্রও অনন্যমনা না হইলে তাঁর দ্বারাও এ কাজ সিদ্ধ হইবে না। যত দিন তোমার সাক্ষাৎলাভ সুলভ থাকিবে, তত দিন হেমচন্দ্রের তুমি ভিন্ন অন্য ব্রত নাই— সুতরাং যবন মারে কে ?" আমি কহিলাম, "বুঝিলাম, প্রথমে আমাকে না মারিলে যবন মারা হইবে না। আপনার শিষ্য কি আপনার দ্বারা আঙ্গটি পাঠাইয়া দিয়া আমাকে মারিতে আজ্ঞা করিয়াছেন?"

মণি। এত কথা বুড়াকে বলিলে কি প্রকারে ?

মৃ। আমার বড় রাগ হইয়াছিল, বুড়ার কথায় আমার হাড় জ্বলিয়া গিয়াছিল, আর বিপৎকালে লজ্জা কি ? মাধবাচার্য্য আমাকে মুখরা মনে করিলেন, মৃদু হাসিলেন, কহিলেন, "আমি যে তোমাকে এইরূপ হস্তগত করিব, তাহা হেমচন্দ্র জানেন না।"

আমি মনে মনে কইলাম, তবে যাঁহার জন্য এ জীবন রাখিয়াছি, তাঁহার অনুমতি ব্যতীত সে জীবন ত্যাগ করিব না। মাধবাচার্য্য বলিতে লাগিলেন, "তোমাকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে না— কেবল আপাততঃ হেমচন্দ্রকে ত্যাগ করিতে হইবে। ইহাতে তাঁহার পরম মঙ্গল। যাহাতে তিনি রাজ্যেশ্বর হইয়া তোমাকে রাজমহিষী করিতে পারেন, তাহা কি তোমার কর্ত্তব্য নহে ? তোমার প্রণয়মন্ত্রে তিনি কাপুরুষ হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার সে ভাব দূর করা কি উচিত

নহে ?” আমি কহিলাম, “আমার সহিত সাক্ষাৎ যদি তাঁহার অনুচিত হয়, তবে তিনি কদাচ আমার সহিত আর সাক্ষাৎ করিবেন না।” মাধবাচার্য্য বলিলেন, “বালকে ভাবিয়া থাকে, বালক ও বুড়া উভয়েরই বিবেচনা শক্তি তুল্য; কিন্তু তাহা নহে। হেমচন্দ্রের অপেক্ষা আমাদিগের পরিণামদর্শিতা যে বেশী, তাহাতে সন্দেহ করিও না। আর তুমি সম্মত হও বা না হও, যাহা সঙ্কল্প করিয়াছি, তাহা করিব। আমি তোমাকে দেশান্তরে লইয়া যাইব। গৌড় দেশে অতি শান্তস্বভাব এক ব্রাহ্মণের বাটীতে তোমাকে রাখিয়া আসিব। তিনি তোমাকে আপন কন্যার ন্যায় যত্ন করিবেন। এক বৎসর পরে আমি তোমার পিতার নিকট তোমাকে আনিয়া দিব। আর সে সময়ে হেমচন্দ্র যে অবস্থায় থাকুন, তোমার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দেওয়াইব, ইহা সত্য করিলাম।” এই কথাতেই হউক, আর অগত্যাই হউক, আমি নিস্তব্ধ হইলাম। তাহার পর এইখানে আসিয়াছি ও কি ও সই ?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ভিখারিণী

সখীদ্বয় এই সকল কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, এমন সময়ে কোমলকণ্ঠনিঃসৃত মধুর সঙ্গীত তাঁহাদিগের কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল।

“মথুরাবাসিনী, মধুরহাসিনী,
শ্যামবিলাসিনি—রে!”

মৃণালিনী কহিলেন, “সই, কোথায় গান করিতেছে ?”

মণিমালিনী কহিলেন, “বাহির বাড়ীতে গায়িতেছে!”

গায়ক গায়িতে লাগিল।

“কহ লো নাগরি, গেহ পরিহরি,
কাহে বিবাসিনী—রে!”

মৃ। সখি! কে গায়িতেছে জান ?

মণি। কোন ভিখারিণী হইবে।

আবার গীত।

“বৃন্দাবনধন, গোপিনীমোহন,
কাঁহে তু তেয়াগী,—রে;
দেশ দেশ পর, সো শ্যামসুন্দর,
ফিরে ভুয়া লাগি—রে।”

মৃণালিনী বেগের সহিত কহিলেন, “সই! সই! উহাকে বাটীর ভিতর ডাকিয়া আন।” মণিমালিনী গায়িকাকে ডাকিতে গেলেন। ততক্ষণ সে গায়িতে লাগিল।

“বিকচ নলিনে, যমুনা-পুলিনে,
বহুত পিয়াসা—রে।

চন্দ্রমাশালিনী, যা মধুযামিনী,
না মিটল আশা—রে।
সা নিশা—সমরি—”

এমন সময় মণিমালিনী উহাকে ডাকিয়া বাটীর ভিতর আনিলেন।

সে অন্তঃপুরে আসিয়া পূর্ব্ববৎ গায়িতে লাগিল—

“সা নিশা সমরি, কহ লো সুন্দরি,
কাঁহা মিলে দেখা—রে।
শুনি যাওরে চলি, বাজয়ি মুরলী,
বনে বনে একা—রে।”

মৃণালিনী তাহাকে কহিলেন, “তোমার দিব্য গলা, তুমি গীতটি আবার গাও।”

গায়িকার বয়স ষোল বৎসর। ষোড়শী, খর্ব্বাকৃতা এবং কৃষ্ণাঙ্গী। সে প্রকৃত কৃষ্ণবর্ণা। তাই বলিয়া তাহার গায়ে ভ্রমর বসিলে যে দেখা যাইত না, অথবা কালি মাখিলে জল মাখিয়াছে বোধ হইত, কিংবা জল মাখিলে কালি বোধ হইত, এমত নহে। যেরূপ কৃষ্ণবর্ণ আপনার ঘরে থাকিলে শ্যামবর্ণ বলি, পরের ঘরে হইলে পাতুরে কালো বলি, ইহার সেইরূপ কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু বর্ণ যেমন হউক না কেন, ভিখারিণী কুরূপ নহে। তাহার অঙ্গ পরিষ্কার, সুমার্জ্জিত, চাক্‌চিক্যবিশিষ্ট; মুখখানি প্রফুল্ল, চক্ষু দুটি বড়, চঞ্চল, হাস্যময়; লোচনতারা নিবিড়কৃষ্ণ, একটি তারার পার্শ্বে একটি তিল। ওষ্ঠাধর ক্ষুদ্র, রক্তপ্রভ, তদন্তরে অতি পরিষ্কার, অমলশ্বেত, কুন্দকলিকাসন্নিভ দুই শ্রেণী দন্ত। কেশগুলি সূক্ষ্ম, গ্রীবার উপরে মোহিনী কবরী, তাহাতে যূথিকার মালা বেষ্টিত। যৌবনসঞ্চারে শরীরের গঠন সুন্দর হইয়াছিল, যেন কৃষ্ণপ্রস্তরে কোন শিল্পকার পুত্তল খোদিত করিয়াছিল। পরিচ্ছদ অতি সামান্য, কিন্তু পরিষ্কার— ধূলিকর্দ্দমপরিপূর্ণ নহে। অঙ্গ একেবারে নিরাভরণ নহে, অথচ অলঙ্কারগুলি ভিখারীর যোগ্য বটে। প্রকোষ্ঠে পিত্তলের বলয়, গলায় কাষ্ঠের মালা, নাসিকায় ক্ষুদ্র একটি তিলক, ভ্রূমধ্যে ক্ষুদ্র একটি চন্দনের টিপ। সে আজ্ঞামত পূর্ব্ববৎ গায়িতে লাগিল।

“মথুরাবাসিনি, মধুরহাসিনি, শ্যামবিলাসিনি—রে। *
কহ লো নাগরি, গেহ পরিহরি, কাহে বিবাসিনী—রে ॥
বৃন্দাবধন, গোপিনীমোহন, কাহে ভু তেয়াগী—রে।
দেশ দেশ পর, সো শ্যামসুন্দর, ফিরে তুয়া লাগি—রে ॥
বিকচ নলিনে, যমুনাপুলিনে, বহুত পিয়াসা—রে।
চন্দ্রমাশালিনী, যা মধুযামিনী, না মিটল আশা—রে ॥

সা নিশা সমরি, কহ লো সুন্দরী, কাঁহা মিলে দেখা—রে।
শুনি, যাওয়ে চলি, বাজয়ি মুরলী, বনে বনে একা—রে ॥"
গীত সমাপ্ত হইলে মৃণালিনী কহিলেন, "তুমি সুন্দর গাও। সই মণিমালিনী, ইহাকে কিছু দিলে ভাল হয়। একে কিছু দাও না ?"
মণিমালিনী পুরস্কার আনিতে গেলেন, ইত্যবসরে মৃণালিনী বালিকাকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুন, ভিখারিণি! তোমার নাম কি ?"
ভিখা। আমার নাম গিরিজায়া।
মৃণা। তোমার বাড়ী কোথায় ?
গি। এই নগরেই থাকি।
মৃ। তুমি কি গীত গাইয়া দিনপাত কর ?
গি। আর কিছুই ত জানি না।
মৃ। তুমি গীত সকল কোথায় পাও ?
গি। যেখানে যা পাই তাই শিখি।
মৃ। এ গীতটি কোথায় শিখিলে ?
গি। একটি বেণে আমাকে শিখাইয়াছে।
মৃ। সে বেণে কোথায় থাকে ?
গি। এই নগরেই আছে।
মৃণালিনীর মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল— প্রাতঃসূর্য্যকরস্পর্শে যেন পদ্ম ফুটিয়া উঠিল। কহিলেন, "বেণেতে বাণিজ্য করে— সে বণিক কিসের বাণিজ্য করে ?"
গি। সবার যে ব্যবসা, তারও সেই ব্যবসা।
মৃ। সে কিসের ব্যবসা ?
গি। কথার ব্যবসা।
মৃ। এ নূতন ব্যবসা বটে। তাহাতে লাভালাভ কিরূপ ?
গি। ইহাতে লাভের অংশ ভালবাসা, আলাভ কোন্দল।
মৃ। তুমিও ব্যবসায়ী বট। ইহার মহাজন কে ?
গি। যে মহাজন।
মৃ। তুমি ইহার কি ?
গি। নগ্‌দা মুটে।
মৃ। ভাল তোমার বোঝা নামাও। সামগ্রী কি আছে দেখি।
গি। এ সামগ্রী দেখে না; শুনে।

মৃ। ভাল—শুনি।

গিরিজায়া গাইতে লাগিল।

"যমুনার জলে মোর, কি নিধি মিলিল।

ঝাঁপ দিয়া পশি জলে, যতনে তুলিয়া গলে,

পরেছিনু কুতূহলে, যে রতনে।

নিদ্রার আবেগে মোরগৃহেতে পশিল চোর,

কণ্ঠের কাটিল ডোর মণি হরে নিল।'

মৃণালিনী, বাষ্পপীড়িতলোচনে, গদ্গদস্বরে, অথচ হাসিয়া কহিলেন, "এ কোন্ চোরের কথা ?"

গি। বেণে বলেছেন, চুরির ধন লইয়াই তাঁহার ব্যাপার।

মৃ। তাঁহাকে বলিও যে, চোরা ব্যাপারে সাধু লোকের প্রাণ বাঁচে না।

গি। বুঝি ব্যাপারিরও নয়।

মৃ। কেন, ব্যাপারির কি ?

গিরিজায়া গায়িল।

"ঘাট বাট তট মাঠ ফিরি ফিরনু বহু দেশ।

কাঁহা মেরে কান্ত বরণ, কাঁহা রাজবেশ ॥

হিয়া পর রোপনু পঙ্কজ, কৈনু যতন ভারি।

সোহি পঙ্কজ কাঁহা মোর, কাঁহা মৃণাল হামারি ॥"

মৃণালিনী সস্নেহে কোমল স্বরে কহিলেন, "মৃণাল কোথায় ? আমি সন্ধান বলিয়া দিতে পারি, তাহা মনে রাখিতে পারিবে ?"

গি। পারিব—কোথায় বল।

মৃণালিনী বলিলেন,

"কণ্টকে গঠিল বিধি, মৃণাল অধমে।

জলে তারে ডুবাইল পীড়িয়া মরমে ॥

রাজহংস দেখি এক নয়নরঞ্জন।

চরণ বেড়িয়া তারে, করিল বন্ধন ॥

বলে, হংসরাজ কোথা করিবে গমন।

হৃদয়কমলে মোর, তোমার আসন ॥

আসিয়া বসিল হংস হৃদয় কমলে।

কাঁপিল কন্টক সহ মৃণালিনী জলে ॥
হেনকালে কাল মেঘ উঠিল আকাশে।
উড়িল মরালরাজ, মানস বিলাসে ॥
ভাঙ্গিল হৃদয়পদ্ম তার বেগভরে।
ডুবিল অতল জলে, মৃণালিনী মরে ॥
কেমন গিরিজিয়া, গীত শিখিতে পারিবে ?”
গিরি। তা পারিব। চক্ষের জলটুকু শুদ্ধ শিখিব ?
মৃ। না। এ ব্যবসায়ে আমার লাভের মধ্যে ঐটুকু।

মৃণালিনী গিরিজায়াকে এই কবিতাগুলি অভ্যাস করাইতেছিলেন, এমন সময়ে মণিমালিনীর পদধ্বনি শুনিতে পাইলেন। মণিমালিনী তাঁহার স্নেহশালিনী সখী— সকলই জানিয়াছিলেন। তথাপি মণিমালিনী পিতৃপ্রতিজ্ঞাভঙ্গের সহায়তা করিবে, এরূপ তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল না। অতএব তিনি এ সকল কথা সখীর নিকট গোপনে যত্নবর্ত্তী হইয়া গিরিজায়াকে কহিলেন, “আজি আর কাজ নাই; বেণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও। তোমার বোঝা কাল আবার আনিও। যদি কিনিবার কোন সামগ্রী থাকে, তবে তাহা আমি কিনিব।”

গিরিজায়া বিদায় হইল। মৃণালিনী যে তাহাকে পারিতোষিক দিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন, তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

গিরিজায়া কতিপয় পদ গমন করিলে মণিমালিনী কিছু চাউল, একছড়া কলা, একখানি পুরাতন বস্ত্র, আর কিছু কড়ি আনিয়া গিরিজায়াকে দিলেন। আর মৃণালিনীও একখানি পুরাতন বস্ত্র দিতে গেলেন। দিবার সময়ে উহার কাণে কাণে কহিলেন, “আমার ধৈর্য্য হইতেছে না, কালি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিব না; তুমি আজ রাত্রে প্রহরেকের সময় আসিয়া এই গৃহের উত্তর দিকে প্রাচীরমূলে অবস্থিতি করিও; তথায় আমার সাক্ষাৎ পাইবে। তোমার বণিক্ যদি আসেন সঙ্গে আনিও।”

গিরিজায়া কহিল, “বুঝিয়াছি, আমি নিশ্চিত আসিব।”

মৃণালিনী মণিমালিনীর নিকট প্রত্যাগতা হইলে মণিমালিনী কহিলেন, “সই, ভিখারিণীকে কাণে কাণে কি বলিতেছিলে ?”

মৃণালিনী কহিলেন,
“কি বলিব সই—
সই মনের কথা সই, সই মনের কথা সই—
কাণে কাণে কি কথাটি ব’লে দিলি ওই ॥
সই ফিরে ক’না সই, সই ফিরে ক’না সই।
সই কথা কোস্, কথা কব, নইলে কারো নই।”

মণিমালিনী হাসিয়া কহিলেন, “হ’লি কি লো সই ?”

মৃণালিনী কহিলেন, “তোমারই সই।”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : দূতী

লক্ষ্মণাবতী নগরীর প্রদেশান্তরে সর্ব্বধন বণিকের বাটীতে হেমচন্দ্র অবস্থিতি করিতেছিলেন। বণিকের গৃহদ্বারে এক অশোকবৃক্ষ বিরাজ করিতেছিল; অপরাহ্নে হাতার তলে উপবেশন করিয়া, একটি কুসুমিত অশোকশাখা নিষ্প্রয়োজনে হেমচন্দ্র ছুরিকা দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিতেছিলেন, এবং মুহুর্মুহুঃ পথপ্রতি দৃষ্টি করিতেছিলেন, যেন কাহারও প্রতীক্ষা করিতেছেন। যাহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, সে আসিল না। ভৃত্য দিগ্বিজয় আসিল, হেমচন্দ্র দিগ্বিজয়কে কহিলেন, "দিগ্বিজয়, ভিখারিণী আজি এখনও আসিল না। আমি বড় ব্যস্ত হইয়াছি। তুমি একবার তাহার সন্ধানে যাও।"

"যে আজ্ঞে" বলিয়া দিগ্বিজয় গিরিজায়ার সন্ধানে চলিল। নগরীর রাজপথে গিরিজায়ার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল।

গিরিজায়া বলিল, "কেও দিগ্বিজয় ?" দিগ্বিজয় রাগ করিয়া কহিল, "আমার নাম দিগ্বিজয়।"

গি। ভাল দিগ্বিজয়— আজি কোন দিক্ জয় করিতে চলিয়াছ ?

দি।তোমার দিক।

গি। আমি কি একটা দিক্ ? তোমার দিগ্বিদিগ্জ্ঞান নাই।

দি। কেমন করিয়া থাকিবে— তুমি যে অন্ধকার। এখন চল, প্রভু তোমাকে ডাকিয়াছেন।

গি। কেন ?

দি। তোমার সঙ্গে বুঝি আমার বিবাহ দিবেন।

গি। কেন তোমার কি মুখ-অগ্নি করিবার আর লোক জুটিল না।

দি। না। সে কাজ তোমাকেই করিতে হইবে। এখন চল।

গি। পরের জন্যেই মলেম। তবে চল।

এই বলিয়া গিরিজায়া দিগ্বিজয়ের সঙ্গে চলিলেন। দিগ্বিজয় অশোকতলস্থ হেমচন্দ্রকে দেখাইয়া দিয়া অন্যত্র গমন করিল। হেমচন্দ্র অন্যমনে মৃদু মৃদু গাইতেছিলেন,

"বিকচ নলিনে, যমুনা-পুলিনে, বহুত পিয়াসা রে—"

গিরিজায়া পশ্চাৎ হইতে গায়িল—

"চন্দ্রমাশালিনী, যা মধুযামিনী, না মিটল আশা রে।"

গিরিজায়াকে দেখিয়া হেমচন্দ্রের মুখ প্রফুল্ল হইল। কহিলেন, "কে গিরিজায়া! আশা কি মিট্ল ?"

গি। কার আশা ? আপনার না আমার ?

হে। আমার আশা। তাহা হইলেই তোমার মিটিবে।

গি। আপনার আশা কি প্রকারে মিটিবে ? লোকে বলে রাজা রাজ্ড়ার আশা কিছুতেই মিটে না।

হে। আমার অতি সামান্য আশা।

গি। যদি কখন মৃণালিনীর সাক্ষাৎ পাই, তবে এ কথা তাঁহার নিকট বলিব।

হেমচন্দ্র বিষণ্ন হইলেন। কহিলেন, "তবে কি আজিও মৃণালিনীর সন্ধান পাও নাই ? আজি কোন্ পাড়ায় গীত গাইতে গিয়াছিলে ?"

গি। অনেক পাড়ায়— সে পরিচয় আপনার নিকট নিত্য নিত্য কি দিব ? অন্য কথা বলুন।

হেমচন্দ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "বুঝিলাম বিধাতা বিমুখ। ভাল পুনর্ব্বার কালি সন্ধানে যাইবে।"

গিরিজায়া তখন প্রণাম করিয়া কপট বিদায়ের উদ্যোগ করিল। গমনকালে হেমচন্দ্র তাহাকে কহিলেন, "গিরিজায়া, তুমি হাসিতেছ না, কিন্তু তোমার চক্ষু হাসিতেছে। আজি কি তোমার গান শুনিয়া কেহ কিছু বলিয়াছে?'

গি। কে কি বলিবে ? এক মাগী তাড়া করিয়া মারিতে আসিয়াছিল—বলে, মথুরাবাসিনীর জন্যে শ্যামসুন্দরের ত মাথাব্যথা পড়িয়াছে।

হেমচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অস্ফুটস্বরে, যেন আপনা আপনি কহিতে লাগিলেন, "এত যত্নেও যদি সন্ধান না পাইলাম, তবে আর বৃথা আশা— কেন মিছা কালক্ষেপ করিয়া অত্মকর্ম্ম নষ্ট করি;—গিরিজায়ে, কালি তোমাদিগের নগর হইতে বিদায় হইব।"

"তথাস্তু" বলিয়া গিরিজায়া মৃদু মৃদু গান করিতে লাগিল,—

"শুনি যাওয়ে চলি, বাজয়ি মুরলী, বনে বনে একা রে।"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "ও গান এই পর্য্যন্ত। অন্য গীত গাও।"

গিরিজায়া গাইল,

"যে ফুল ফুটিত সখি, গৃহতরুশাখে,
কেন রে পবনা, উড়ালি তাকে।"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "পবনে যে ফুল উড়ে, তাহার জন্য দুঃখ কি ? ভাল গীত গাও।" গিরিজায়া গায়িল,

"কণ্টকে গঠিল বিধি, মৃণাল অধমে।
জলে তারে ডুবাইল, পীড়িয়া মরমে ॥"

হেম। কি, কি ? মৃণাল কি ?

গি।

কণ্টকে গঠিল বিধি, মৃণাল অধমে।
জলে তারে ডুবাইল পীড়িয়া মরমে ॥
রাজহংস দেখি এক নয়নরঞ্জন।
চরণ বেড়িয়া তারে করিল বন্ধন ॥

না— অন্য গান গাই।

হে। না— না— না— এই গান— এই গান গাও। তুমি রাক্ষসী।

গি। বলে হংসরাজ কোথা করিবে গমন।

হৃদয়কমলে দিব তোমার আসন ॥
আসিয়া বসিল হংস হৃদয়কমলে।
কাঁপিল কণ্টকসহ মৃণালিনী জলে ॥

হে। গিরিজায়া! গিরি— এ গীত তোমাকে শিখাইল ?

গি। (সহাস্যে)।

হেন কালে কালমেঘ উঠিল আকাশে।
উড়িল মরালরাজ মানস বিলাসে ॥
ভাঙ্গিল হৃদয়পদ্ম তার বেগভরে।
ডুবিয়া অতল জলে মৃণালিনী মরে ॥

হেমচন্দ্র বাষ্পাকুললোচনে গদ্গদস্বরে গিরিজায়াকে কহিলেন, "এ আমারই মৃণালিনী। তুমি তাহাকে কোথায় দেখিলে ?"

গি। দেখিলাম সরোবরে, কাঁপিছে পবনভরে,
মৃণাল উপরে মৃণালিনী।

হে। এখন রূপক রাখ, আমার কথার উত্তর দাও— কোথায় মৃণালিনী ?

গি। এই নগরে।

হেমচন্দ্র রুষ্টভাবে কহিলেন, "তা ত আমি অনেক দিন জানি। এ নগরে কোন্ স্থানে ?'

গি। হৃষীকেশ শর্ম্মার বাড়ী।

হে। কি পাপ! সে কথা আমিই তোমাকে বলিয়া দিয়াছিলাম। এত দিন তা তাহার সন্ধান করিতে পার নাই, এখন কি সন্ধান করিয়াছ ?

গি। সন্ধান করিয়াছি।

হেমচন্দ্র দুই বিন্দু— দুই বিন্দু মাত্র অশ্রুমোচন করিলেন। পুনরপি কহিলেন, "সে এখান হইতে কত দূর?"

গি। অনেক দূর।

হে। এখান হইতে কোন্ দিকে যাইতে হয় ?

গি। এখান হইতে দক্ষিণ, তার পর পূর্ব্ব, তার পর উত্তর, তার পর পশ্চিম—

হেমচন্দ্র হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিলেন। কহিলেন, "এ সময়ে তামাশা রাখ— নহিলে মাথা ভাঙ্গিয়া ফেলিব।"

গি। শান্ত হউন। পথ বলিয়া দিলে কি আপনি চিনিতে পারিবেন ? যদি তা না পারিবেন, তবে জিজ্ঞাসার প্রয়োজন ? আজ্ঞা করিলে আমি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব।

মেঘমুক্ত সূর্য্যের ন্যায় হেমচন্দ্রের মুখ প্রফুল্ল হইল। তিনি কহিলেন, "তোমার সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হউক— মৃণালিনী কি বলিল ?"

গি। তা ত বলিয়াছি।—

"ডুবিয়া অতল জলে মৃণালিনী মরে।"

হে। মৃণালিনী কেমন আছে ?

গি। দেখিলাম শরীরে কোন পীড়া নাই।

হে। সুখে আছে কি ক্লেশে আছে— কি বুঝিলে ?

গি। শরীরে গহনা, পরণে ভাল কাপড়— হৃষীকেশ ব্রাহ্মণের কন্যার সই।

হে। তুমি অধঃপাতে যাও; মনের কথা কিছু বুঝিলে ?

গি। বর্ষাকালের পদ্মের মত; মুখখানি কেবল জলে ভাসিতেছে।

হে। পরগৃহে কি ভাবে আছে ?

গি। এই অশোক ফুলের স্তবকের মত। আপনার গৌরবে আপনি নম্র।

হে। গিরিজায়া! তুমি বয়সে বালিকা মাত্র। তোমার ন্যায় বালিকা আর দেখি নাই।

গি। মাথা ভাঙ্গিবার উপযুক্ত পাত্রও এমন আর দেখেন নাই।

হে। সে অপরাধ লইও না, মৃণালিনী আর কি বলিল ?

গি। যো দিন জানকী—

হে। আবার ?

গি। যো দিন জানকী, রঘুবীর নিরখি—

হেমচন্দ্র গিরিজায়ার কেশাকর্ষণ করিলেন। তখন সে কহিল, "ছাড়! ছাড়! বলি! বলি!"

"বল" বলিয়া হেমচন্দ্র কেশ ত্যাগ করিলেন।

তখন গিরিজায়া আদ্যোপান্ত মৃণালিনীর সহিত কথোপকথন বিবৃত করিল। পরে কহিল, "মহাশয়, আপনি যদি মৃণালিনীকে দেখিতে চান, তবে আমার সঙ্গে এক প্রহর রাত্রে যাত্রা করিবেন।"

গিরিজায়ার কথা সমাপ্ত হইলে, হেমচন্দ্র অনেকক্ষণ নিঃশব্দে অশোকতলে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে কিছুমাত্র না বলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এবং তথা হইতে একখানি পত্র আনিয়া গিরিজায়ার হস্তে দিলেন, এবং কহিলেন, "মৃণালিনীর সহিত সাক্ষাতে আমার এক্ষণে অধিকার নাই। তুমি রাত্রে কথামত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে এবং এই পত্র তাঁহাকে দিবে। কহিবে, দেবতা প্রসন্ন হইলে অবশ্য শীঘ্র বৎসরেক মধ্যে সাক্ষাৎ হইবে। মৃণালিনী কি বলেন, আজ রাত্রেই আমাকে বলিয়া যাইও।"

গিরিজায়া বিদায় হইলে, হেমচন্দ্র অনেকক্ষণ চিন্তিতান্তঃকরণে অশোকবৃক্ষতলে তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। ভুজোপরি মস্তক রক্ষা করিয়া, পৃথিবীর দিকে মুখ রাখিয়া, শয়ান রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে, সহসা তাঁহার পৃষ্ঠদেশে কঠিন করস্পর্শ হইল। মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, সম্মুখে মাধবাচার্য্য।

মাধবাচার্য্য কহিলেন, "বৎস! গাত্রোত্থান কর। আমি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছি— সন্তুষ্টও হইয়াছি। তুমি আমাকে দেখিয়া বিস্মিতের ন্যায় কেন চাহিয়া রহিয়াছ?"

হেমচন্দ্র কহিলেন, “আপনি এখানে কোথা হইতে আসিলেন?”

মাধবাচার্য্য এ কথায় কোন উত্তর না দিয়া কহিতে লাগিলেন, “তুমি এ পর্য্যন্ত নবদ্বীপে না গিয়া পথে বিলম্ব করিতেছ— ইহাতে তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছি। আর তুমি যে মৃণালিনীর সন্ধান পাইয়াও আত্মসত্য প্রতিপালনের জন্য তাঁহার সাক্ষাতের সুযোগ উপেক্ষা করিলে, এজন্য তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমাকে কোন তিরস্কার করিব না। কিন্তু এখানে তোমার আর বিলম্ব করা হইবে না। মৃণালিনীর প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা করা হইবে না। বেগবান্ হৃদয়কে বিশ্বাস নাই। আমি আজি নবদ্বীপে যাত্রা করিব। তোমাকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে— নৌকা প্রস্তুত আছে। অস্ত্রশস্ত্রাদি গৃহমধ্য হইতে লইয়া আইস। আমার সঙ্গে চল।”

হেমচন্দ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, “হানি নাই— আমি আশা ভরসা বিসর্জ্জন করিয়াছি। চলুন। কিন্তু আপনি— কামচর না অন্তর্যামী ?”

এই বলিয়া হেমচন্দ্র গৃহমধ্যে পুনঃপ্রবেশ পূর্ব্বক বণিকের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন; এবং আপনার সম্পত্তি এক জন বাহকের স্কন্ধে দিয়া আচার্য্যের অনুবর্ত্তী হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : লুব্ধ

মৃণালিনী বা গিরিজায়া এতন্মধ্যে কেহই আত্মপ্রতিশ্রুতি বিস্মৃতা হইলেন না। উভয়ে প্রহরেক রাত্রিতে হৃষীকেশের গৃহপার্শ্বে সংমিলিত হইলেন। মৃণালিনী গিরিজায়াকে দেখিবামাত্র কহিলেন, “কই হেমচন্দ্র কোথায় ?”

গিরিজায়া কহিল, “তিনি আইসেন নাই।”

“আইসেন নাই!” এই কথাটি মৃণালিনীর অন্তস্থল হইতে ধ্বনিত হইল। ক্ষণেক উভয়ে নীরব। তৎপরে মৃণালিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন আসিলেন না ?”

গি। তাহা আমি জানি না। এই পত্র দিয়াছেন।

এই বলিয়া গিরিজায়া তাঁহার হস্তে পত্র দিল। মৃণালিনী কহিলেন, “কি প্রকারেই বা পড়ি। গৃহে গিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া পড়িলে মণিমালিনী উঠিবে।”

গিরিজায়া কহিল, “অধীরা হইও না। আমি প্রদীপ, তেল, চক্মকি, সোলা সকলই আনিয়া রাখিয়াছি। এখনই আলো করিতেছি।”

গিরিজায়া শীঘ্রহস্তে অগ্নি উৎপাদন করিয়া প্রদীপ জ্বালিত করিল। অগ্নুৎপাদনশব্দ একজন গৃহবাসীর কর্ণে প্রবেশ করিল। দীপালোক সে দেখিতে পাইল।

গিরিজায়া দীপ জ্বালিত করিলে মৃণালিনী নিম্নলিখিত মত মনে মনে পাঠ করিলেন।

“মৃণালিনি! কি বলিয়া আমি তোমাকে পত্র লিখিব ? তুমি আমার জন্য দেশত্যাগিনী হইয়া পরগৃহে কষ্টে কালাতিপাত করিতেছ। যদি দৈবানুগ্রহে তোমার সন্ধান পাইয়াছি, তথাপি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম না। তুমি ইহাতে আমাকে অপ্রণয়ী মনে করিবে— অথবা অন্যা হইলে মনে করিত— তুমি করিবে না। আমি কোন বিশষ ব্রতে নিযুক্ত আছি— যদি তৎপ্রতি অবহেলা করি, তবে আমি কুলাঙ্গার। তৎসাধন জন্য আমি গুরুর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি যে, তোমার সহিত এ স্থানে সাক্ষাৎ করিব না। আমি নিশ্চিত জানি যে, আমি যে তোমার জন্য সত্যভঙ্গ করিব, তোমারও এমন সাধ নহে। অতএব এক বৎসর কোন ক্রমে দিন যাপন কর। পরে ঈশ্বর প্রসন্ন হয়েন, তবে অচিরাৎ তোমাকে রাজপুরবধূ করিয়া আত্মসুখ সম্পূর্ণ করিব। এই অল্পবয়স্কা প্রগল্‌ভবুদ্ধি বালিকাহস্তে উত্তর প্রেরণ করিও।”

মৃণালিনী পত্র পড়িয়া গিরিজায়াকে কহিলেন, “গিরিজায়া! আমার পাতা লেখনী কিছুই নাই যে উত্তর লিখি। তুমি মুখে আমার প্রত্যুত্তর লইয়া যাও। তুমি বিশ্বাসী, পুরস্কার স্বরূপ আমার অঙ্গের অলঙ্কার দিতেছি।”

গিরিজায়া কহিল, “উত্তর কাহার নিকট লইয়া যাইব ? তিনি আমাকে পত্র দিয়া বিদায় করিবার সময় বলিয়া দিয়াছিলেন যে, ‘আজ রাত্রেই আমাকে প্রত্যুত্তর আনিয়া দিও।” আমি স্বীকার করিয়াছিলাম। আসিবার সময় মনে করিলাম, হয়ত তোমার নিকট লিখিবার সামগ্রী কিছুই নাই; এজন্য সে সকল যোটপাট করিয়া আনিবার জন্য তাহার উদ্দেশ্যে গেলাম। তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলাম না। শুনিলাম তিনি সন্ধ্যাকালে নবদ্বীপ যাত্রা করিয়াছেন।”

মৃ। নবদ্বীপ ?

গি। নবদ্বীপ।

মৃ। সন্ধ্যাকালেই ?

গি। সন্ধ্যাকালেই। শুনিলাম তাঁহার গুরু আসিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন।

মৃ। মাধবাচার্য্য। মাধবাচার্য্যই আমার কাল।

পরে অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া মৃণালিনী কহিলেন, “গিরিজায়া, তুমি বিদায় হও। আর আমি ঘরের বাহিরে থাকিব না।”

গিরিজায়া কহিল, “আমি চলিলাম।” এই বলিয়া গিরিজায়া বিদায় হইল। তাহার মৃদু মৃদু গীতধ্বনি শুনিতে শুনিতে মৃণালিনী গৃহমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিলেন।

মৃণালিনী বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া যেমন দ্বার রুদ্ধ করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, অমনি পশ্চাৎ হইতে কে আসিয়া তাঁহার হাত ধরিল। মৃণালিনী চমকিয়া উঠিলেন। হস্তরোধকারী কহিল, “তবে সাধ্বি! এইবার জালে পড়িয়াছ। অনুগৃহীত ব্যক্তিটা কে শুনিতে পাই না ?”

মৃণালিনী তখন ক্রোধে কম্পিতা হইয়া কহিলেন, “ব্যোমকেশ! ব্রাহ্মণকুলে পাষণ্ড! হাত ছাড়।”

ব্যোমকেশ হৃষীকেশের পুত্র। এ ব্যক্তি ঘোর মূর্খ এবং দুশ্চরিত্র। সে মৃণালিনীর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়াছিল, এবং স্বাভিলাষ পূরণের অন্য কোন সম্ভাবনা না জানিয়া বলপ্রকাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। কিন্তু মৃণালিনী মণিমালিনীর সঙ্গ প্রায় ত্যাগ করিতেন না, এ জন্য ব্যোমকেশ এ পর্য্যন্ত অবসর প্রাপ্ত হয় নাই।

মৃণালিনীর ভর্ৎসনায় ব্যোমকেশ কহিল, “কেন হাত ছাড়িব ? হাতছাড়া কি করতে আছে ? ছাড়াছাড়িতে কাজ কি, ভাই ? একটা মনের দুঃখ বলি, আমি কি মনুষ্য নই ? যদি একের মনোরঞ্জন করিয়াছ, তবে অপরের পার না?”

মৃ। কুলাঙ্গার! যদি না ছাড়িবে, তবে এখনই ডাকিয়া গৃহস্থ সকলকে উঠাইব।

ব্যো। উঠাও। আমি কহিব অভিসারিকাকে ধরিয়াছি।

মৃ। তবে অধঃপাতে যাও। এই বলিয়া মৃণালিনী সবলে হস্তমোচন জন্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ব্যোমকেশ কহিল, “অধীর হইও না। আমার মনেরাথ পূর্ণ হইলেই আমি তোমায় ত্যাগ করিব। এখন তোমার সেই ভগিনী মণিমালিনী কোথায় ?”

মৃ। আমিই তোমার ভগিনী।

ব্যো। তুমি আমার সম্বন্ধীর ভগিনী— আমার ব্রাহ্মণীর ভেয়ের ভগিনী— আমার প্রাণাধিকা রাধিকা! সর্ব্বার্থসাধিকা!

এই বলিয়া ব্যোমকেশ মৃণালিনীকে হস্তদ্বারা আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিল। যখন মাধবাচার্য্য তাঁহাকে হরণ করিয়াছিল, তখন মৃণালিনী স্ত্রীস্বভাবসুলভ

চীৎকারে রতি দেখান নাই, এখনও শব্দ করিলেন না।

কিন্তু মৃণালিনী আর সহ্য করিতে পারিলেন না। মনে মনে লক্ষ ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া সবলে ব্যোমকেশকে পদাঘাত করিলেন। ব্যোমকেশ লাথি খাইয়া বলিল, “ভাল ভাল, ধন্য হইলাম! ও চরণস্পর্শে মোক্ষপদ পাইব। সুন্দরি! তুমি আমার দ্রৌপদী— আমি তোমার জয়দ্রথ।”

পশ্চাৎ হইতে কে বলিল, “আর আমি তোমার অর্জ্জুন।”

অকস্মাৎ ব্যোমকেশ কাতরস্বরে বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল, “রাক্ষসি! তোর দন্তে কি বিষ আছে?” এই বলিয়া ব্যোমকেশ মৃণালিনীর হস্ত ত্যাগ করিয়া আপন পৃষ্ঠে হস্তমার্জ্জন করিতে লাগিল। স্পর্শানুভবে জানিল যে পৃষ্ঠ দিয়া দরদরিত রুধির পড়িতেছে।

মৃণালিনী মুক্তহস্তা হইয়াও পলাইলেন না। তিনিও প্রথমে ব্যোমকেশের ন্যায় বিস্মিতা হইয়াছিলেন, কেন না, তিনি ত ব্যোমকেশকে দংশন করেন নাই। ভল্লুকোচিত কার্য্য তাঁহার করণীয় নহে। কিন্তু তখনই নক্ষত্রালোকে খর্ব্বাকৃতা বালিকামূর্ত্তি সম্মুখ হইতে অপসৃতা হইতেছে দেখিতে পাইলেন। গিরিজায়া তাঁহার বসনাকর্ষণ করিয়া মৃদুস্বরে “পলাইয়া আইস” বলিয়া স্বয়ং পলায়ন করিল।

পলায়ন মৃণালিনীর স্বভাবসঙ্গত নহে। তিনি পলায়ন করিলেন না। ব্যোমকেশ প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে এবং কাতরোক্তি করিতেছে দেখিয়া, তিনি গজেন্দ্রগমনে নিজ শয়নাগার অভিমুখে চলিলেন। কিন্তু তৎকালে ব্যোমকেশের আর্ত্তনাদে গৃহস্থ সকলেই জাগরিত হইয়াছিল। সম্মুখে হৃষীকেশ। হৃষীকেশ পুত্রকে শশব্যস্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হইয়াছে? কেন ষাঁড়ের মত চীৎকার করিতেছ?”

ব্যোমকেশ কহিল, “মৃণালিনী অভিসারে গমন করিয়াছিল, আমি তাহাকে ধৃত করিয়াছি বলিয়া সে আমার পৃষ্ঠে দংশন করিয়াছে।”

হৃষীকেশ পুত্রের কুরীতি কিছুই জানিতেন না। মৃণালিনীকে প্রাঙ্গণ হইতে উঠিতে দেখিয়া এ কথায় তাঁহার বিশ্বাস হইল। তৎকালে তিনি মৃণালিনীকে কিছুই বলিলেন না। নিঃশব্দে গজগামিনীর পশ্চাৎ তাঁহার শয়নাগারে আসিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : হৃষীকেশ

মৃণালিনীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শয়নাগারে আসিয়া হৃষীকেশ কহিলেন, “মৃণালিনী! তোমার এ কি চরিত্র?”

মৃ। আমার কি চরিত্র?

হৃ। তুমি কার মেয়ে, কি চরিত্র কিছুই জানি না, গুরুর অনুরোধে আমি তোমাকে গৃহে স্থান দিয়াছি। তুমি আমার মেয়ে মণিমালিনীর সঙ্গে এক বিছানায় শোও—তোমার কুলটাবৃত্তি কেন?

মৃ। আমার কুলটাবৃত্তি যে বলে সে মিথ্যাবাদী।

হৃষীকেশের ক্রোধে অধর কম্পিত হইল। কহিলেন, “কি পাপিয়সী! আমার অন্নে উদর পূরাবি, আর আমাকে দুর্ব্বাক্য বলিবি? তুই আমার গৃহ হইতে দূর হ। না হয় মাধবাচার্য্য রাগ করিবেন, তা বলিয়া এমন কালসাপ ঘরে রাখিতে পারিব না।”

মৃ। যে আজ্ঞা— কালি প্রাতে আর আমাকে দেখিতে পাইবেন না।

হৃষীকেশের বোধ ছিল যে, যে কালে তাঁহার গৃহবহিষ্কৃত হইলেই মৃণালিনী আশ্রয়হীনা হয়, সেকালে এমন উত্তর তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। কিন্তু মৃণালিনী নিরাশ্রয়ের আশঙ্কায় কিছুমাত্র ভীতা নহেন দেখিয়া মনে করিলেন যে, তিনি জারগৃহে স্থান পাইবার ভরসাতেই এরূপ উত্তর করিলেন। ইহাতে হৃষীকেশের কোপ

আরও বৃদ্ধি হইল। তিনি অধিকতর বেগে কহিলেন, “কালি প্রাতে! আজই দূর হও।”

মৃ। যে আজ্ঞা। আমি সখী মণিমালিনীর নিকট বিদায় হইয়া আজই দূর হইতেছি।

এই বলিয়া মৃণালিনী গাত্রোত্থান করিলেন।

হৃষীকেশ কহিলেন, “মণিমালিনীর সহিত কুলটার আলাপ কি ?”

এবার মৃণালিনীর চক্ষে জল আসিল। কহিলেন, “তাহাই হইবে। আমি কিছুই লইয়া আসি নাই; কিছুই লইয়া যাইব না। একবসনে চলিলাম। আপনাকে প্রণাম হই।”

এই বলিয়া দ্বিতীয় বাক্যব্যয় ব্যতীত মৃণালিনী শয়নাগার হইতে বহিষ্কৃতা হইয়া চলিলেন।

যেমন অন্যান্য গৃহবাসীরা ব্যোমকেশের আর্ত্তনাদে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়াছিলেন, মণিমালিনীও তদ্রূপ উঠিয়াছিলেন। মৃণালিনীর সঙ্গে সঙ্গে তাহার পিতা শয্যাগৃহ পর্য্যন্ত আসিলেন দেখিয়া তিনি এই অবসরে ভ্রাতার সহিত কথোপকথান করিতেছিলেন; এবং ভ্রাতার দুশ্চরিত্র বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতেছিলেন। যখন তিনি ভর্ৎসনা সমাপন করিয়া প্রত্যাগমন করেন, তখন প্রাঙ্গণভূমে দ্রুতপাদবিক্ষেপিণী মৃণালিনীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “সই, অমন করিয়া এত রাত্রে কোথায় যাইতেছ ?”

মৃণালিনী কহিলেন, “সখী, মণিমালিনী, তুমি চিরায়ুষ্মতী হও। আমার সহিত আলাপ করিও না— তোমার বাপ মানা করেছেন।”

মণি। সে কি মৃণালিনী! তুমি কাঁদিতেছ কেন ? সর্ব্বনাশ! বাবা কি বলিতে না জানি কি বলিয়াছেন! সখি, ফের। রাগ করিও না।

মণিমালিনী মৃণালিনীকে ফিরাইতে পারিলেন না। পর্ব্বতসানুবাহী শিলাখণ্ডের ন্যায় অভিমানিনী সাধ্বী চলিয়া গেলেন। তখন অতি ব্যস্তে মণিমালিনী পিতৃসন্নিধানে আসিলেন। মৃণালিনীও গৃহের বাহিরে আসিলেন।

বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, পূর্ব্বসঙ্কেত স্থানে গিরিজায়া দাঁড়াইয়া আছে। মৃণালিনী তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, “তুমি এখনও দাঁড়াইয়া কেন ?”

গি। আমি যে তোমাকে পলাইতে বলিয়া আসিলাম। তুমি আইস না আইস—দেখিয়া যাইবার জন্য দাঁড়াইয়া আছি।

মৃ। তুমি কি ব্রাহ্মণকে দংশন করিয়াছিলে ?

গি। তা ক্ষতি কি ? বামুন বৈ ত গরু নয় ?

মৃ। কিন্তু তুমি যে গান করিতে করিতে চলিয়া গেলে শুনিলাম ?

গি। তার পর তোমাদের কথাবার্ত্তার শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখিতে আসিয়াছিলাম। দেখে মনে হলো, মিন্সে আমাকে একদিন “কালা পিঁপ্ড়ে” বলে ঠাট্টা করেছিল। সে দিন হুল ফুটানটা বাকি ছিল। সুযোগ পেয়ে বামুনের ঋণ শোধ দিলাম। এখন তুমি কোথা যাইবে ?

মৃ। তোমার ঘরদ্বার আছে ?

গি। আছে। পাতার কুঁড়ে।

মৃ। সেখানে আর কে থাকে ?

গি। এক বুড়ী মাত্র। তাহাকে আয়ি বলি।

মৃ। চল তোমার ঘরে যাব।

গি। চল। তাই ভাবিতেছিলাম।

এই বলিয়া দুই জনে চলিল। যাইতে যাইতে গিরিজায়া কহিল, "কিন্তু সে ত কুঁড়ে সেখানে কয় দিন থাকিবে?"

মৃ। কালি প্রাতে অন্যত্র যাইব।

গি। কোথা ? মথুরায় ?

মৃ। মথুরায় আমার আর স্থান নাই।

গি। তবে কোথায় ?

মৃ। যমালয়।

এই কথার পর দুই জনে ক্ষণেক কাল চুপ করিয়া রহিল। তারপর মৃণালিনী বলিল, "এ কথা কি তোমার বিশ্বাস হয় ?"

গি। বিশ্বাস হইবে না কেন ? কিন্তু সে স্থান ত আছেই, যখন ইচ্ছা তখনই যাইতে পারিবে। এখন কেন আর এক স্থানে যাও না ?

মৃ। কোথা ?

গি। নবদ্বীপ।

মৃ। গিরিজায়া, তুমি ভিখারিণী বেশে কোন মায়াবিনী। তোমার নিকট কোন কথা গোপন করিব না। বিশেষ তুমি হিতৈষী। নবদ্বীপেই যাইব স্থির করিয়াছি।

গি। একা যাইবে ?

মৃ। সঙ্গী কোথায় পাইব ?

গি। (গায়িতে গায়িতে)

> "মেঘ দরশনে হায়, চাতকিনী ধায় রে।
> সঙ্গে যাবি কে কে তোরা আয় আয় আয় রে ॥
> মেঘেতে বিজলি হাসি, আমি বড় ভালবাসি,
> যে যাবি সে যাবি তোরা, গিরিজায়া যায় রে ॥"

মৃ। এ কি রহস্য, গিরিজায়া ?

গি। আমি যাব।

মৃ। সত্য সত্যই ?

গি। সত্য সত্যই যাব।

মৃ। কেন যাবে ?

গি। আমার সর্ব্বত্র সমান। রাজধানীতে ভিক্ষা বিস্তর।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ : গৌড়েশ্বর

অতি বিস্তীর্ণ সভামণ্ডপে নবদ্বীপোজ্জ্বলকারী রাজাধিরাজ গৌড়েশ্বর বিরাজ করিতেছেন। উচ্চ শ্বেত প্রস্তরের বেদির উপরে রত্নপ্রবালবিভূষিত সিংহাসনে, রত্নপ্রবালমণ্ডিত ছত্রতলে বর্ষীয়ান্ রাজা বসিয়া আছেন। শিরোপরি কনককিঙ্কিণী সংবেষ্টিত বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত শুভ্র চন্দ্রাতপ শোভা পাইতেছে। এক দিকে পৃথগাসনে হোমাবশেষবিভূষিত, অনিন্দ্যমূর্ত্তি ব্রাহ্মণমণ্ডলী সভাপণ্ডিতকে পরিবেষ্টন করিয়া বসিয়া আছেন। যে আসনে, এক দিন হলায়ুধ উপবেশন করিয়াছিলেন, সে আসনে এক্ষণে এক অপরিণামদর্শী চাটুকার অধিষ্ঠান করিতেছিলেন। অন্য দিকে মহামাত্য ধর্ম্মাধিকারকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া প্রধান রাজপুরুষেরা উপবেশন করিয়াছিলেন। মহাসামন্ত, মহাকুমারামাত্য, প্রমাত্য, ঔপরিক, দাসাপরাধিক, চৌরোদ্ধরণিক, শৌল্কিক, গৌল্মিকগণ, ক্যত্রপ, প্রান্তপালেরা, কোষ্ঠপালেরা, কাণ্ডরিকা, তদাযুক্তক, বিনিযুক্তক, প্রভৃতি সকলে উপবেশন করিতেছেন। মহাপ্রতীহার সশস্ত্র সভার অসাধারণতা রক্ষা করিতেছেন। স্তাবকেরা উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সর্ব্বজন হইতে পৃথগাসনে কুশাসনমাত্র গ্রহণ করিয়া পণ্ডিতবর মাধবাচার্য্য উপবেশন করিয়া আছেন।

রাজসভার নিয়মিত কার্য্যসকল সমাপ্ত হইলে, সভাভঙ্গের উদ্যোগ হইল। তখন মাধবাচার্য্য রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! ব্রাহ্মণের বাচালতা মার্জ্জনা করিবেন। আপনি রাজনীতিবিশারদ, এক্ষণে ভূমণ্ডলে যত রাজগণ আছেন সর্ব্বাপেক্ষা বহুদর্শী; প্রজাপালক; আপনিই আজন্ম রাজা। আপনার অবিদিত নাই যে, শত্রুদমন রাজার প্রধান কর্ম্ম। আপনি প্রবল শত্রুদমনের কি উপায় করিয়াছেন?"

রাজা কহিলেন, "কি আজ্ঞা করিতেছেন?" সকল কথা বর্ষীয়ান রাজার শ্রুতিসুলভ হয় নাই।

মাধবাচার্য্যের পুনরুক্তির প্রতীক্ষা না করিয়া ধর্ম্মাধিকার পশুপতি কহিলেন, "মহারাজাধিরাজ! মাধবাচার্য্য রাজসমীপে জিজ্ঞাসু হইয়াছেন যে, রাজশত্রুদমনের কি উপায় হইয়াছে। বঙ্গেশ্বরের কোন্ শত্রু এ পর্য্যন্ত দমিত হয় নাই, তাহা এখনও আচার্য্য ব্যক্ত করেন নাই। তিনি সবিশেষ বাচন করুন।"

মাধবাচার্য্য অল্প হাস্য করিয়া এবার অত্যুচ্চস্বরে কহিলেন, "মহারাজ, তুরকীয়েরা আর্য্যাবর্ত্ত প্রায় সমুদয় হস্তগত করিয়াছে। আপাততঃ তাহার মগধ জয় করিয়া গৌড়রাজ্য আক্রমণের উদ্যোগে আছে।"

এবার কথা রাজার কর্ণে প্রবেশলাভ করিল। তিনি কহিলেন, "তুরকীদিগের কথা বলিতেছেন? তুরকীয়েরা কি আসিয়াছে?"

মাধবাচার্য্য কহিলেন, "ঈশ্বর রক্ষা করিতেছেন; এখনও তাহারা এখানে আসে নাই। কিন্তু আসিলে আপনি কি প্রকারে তাহাদিগের নিবারণ করিবেন?"

রাজ কহিলেন,— "আমি কি করিব—আমি কি করিব? আমার এই প্রাচীন শরীর, আমার যুদ্ধের উদ্যোগ সম্ভবে না। আমার এক্ষণে গঙ্গালাভ হইলেই হয়। তুরকীয়েরা আসে আসুক।"

এবম্ভুত রাজবাক্য সমাপ্ত হইলে সভাস্থ সকলেই নীরব হইল। কেবল মহাসামন্তের কোষমধ্যস্থ অসি অকারণ ঈষৎ ঝনৎকার শব্দ হইল। অধিকাংশ শ্রোতাবর্গের মুখে কোন ভাবই ব্যক্ত হইল না। মাধবাচার্য্যের চক্ষু হইতে একবিন্দু অশ্রুপাত হইল।

সভাপণ্ডিত দামোদর প্রথমে কথা কহিলেন, "আচার্য্য, আপনি কি ক্ষুব্ধ হইলেন? যেরূপ রাজাজ্ঞা হইল, ইহা শাস্ত্রসঙ্গত। শাস্ত্রে ঋষিবাক্য প্রযুক্ত আছে যে,

তুরকীয়েরা এ দেশ অধিকার করিবে। শাস্ত্রে আছে অবশ্য ঘটিবে—কাহার সাধ্য নিবারণ করে ? তবে যুদ্ধোদ্যমে প্রয়োজন কি ?”

মাধবাচার্য্য কহিলেন, “ভাল সভাপণ্ডিত মহাশয়, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনি এতদুক্তি কোন্ শাস্ত্রে দেখিয়াছেন ?”

দামোদর কহিলেন, “বিষ্ণুপুরাণে আছে, যথা—”

মাধ। ‘যথা’ থাকুক—বিষ্ণুপুরাণ আনিতে অনুমতি করুন; দেখান এরূপ উক্তি কোথায় আছে ?

দামো। আমি কি এতই ভ্রান্ত হইলাম ? ভাল, স্মরণ করিয়া দেখুন দেখি, মনুতে এ কথা আছে কি না ?

মাধ। গৌড়েশ্বরের সভাপণ্ডিত মানবধর্ম্মশাস্ত্রেও কি পারদর্শী নহেন ?

দামো। কি জ্বালা! আপনি আমাকে বিহ্বল করিয়া তুলিলেন। আপনার সম্মুখে সরস্বতী বিমনা হয়েন, আমি কোন ছার! আপার সম্মুখে গ্রন্থের নাম স্মরণ হইবে না; কিন্তু কবিতাটা শ্রবণ করুণ।

মাধ। গৌড়েশ্বরের সভাপণ্ডিত যে অনুষ্টুপ্‌চ্ছন্দে একটি কবিতা রচনা করিয়া থাকিবেন, ইহা কিছুই অসম্ভব নহে। কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি—তুরকীজাতীয় কর্ত্তৃক গৌড়বিজয়বিষয়িণী কথা কোন শাস্ত্রে কোথাও নাই।

পশুপতি কহিলেন, “আপনি কি সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ?”

মাধবাচার্য্য কহিলেন, “আপনি যদি পারেন, তবে আমাকে অশাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া প্রতিপন্ন করুন।”

সভাপণ্ডিতের এক জন পারিষদ্ কহিলেন, “আমি করিব। আত্মশ্লাঘা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। যে আত্মশ্লাঘাপরবশ, সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে ?”

মাধবাচার্য্য কহিলেন, “মূর্খ তিন জন। যে আত্মরক্ষায় যত্নহীন, যে সেই যত্নহীনতার প্রতিপোষক, আর যে আত্মবুদ্ধির অতীত বিষয়ে বাক্যব্যয় করে, ইহারাই মূর্খ। আপনি ত্রিবিধ মূর্খ।”

সভাপণ্ডিতের একজন পারিষদ্ অধোবদনে উপবেশন করিলেন।

পশুপতি কহিলেন, “যবন আইসে, আমরা যুদ্ধ করিব।”

মাধবাচার্য্য কহিলেন, “সাধু! সাধু! আপনার যেরূপ যশঃ, সেইরূপ প্রস্তাব করিলেন। জগদীশ্বর আপনাকে কুশলী করুন! আমার কেবল এই জিজ্ঞাস্য, যে, যদি যুদ্ধই অভিপ্রায়, তবে তাহার কি উদ্যোগ হইয়াছে ?”

পশুপতি কহিলেন, “মন্ত্রণা গোপনেই বক্তব্য। এ সভাতলে প্রকাশ্য নহে। কিন্তু যে অশ্ব, পদাতি এবং নাবিকসেনা সংগৃহীত হইতেছে, কিছু দিন এই নগরী পর্য্যটন করিলে তাহা জানিতে পারিবেন।”

মা। কতক কতক জানিয়াছি।

প। তবে এ প্রস্তাব করিতেছেন কেন ?

মা। প্রস্তাবের তাৎপর্য্য এই যে, এক বীরপুরুষ এক্ষণে এখানে সমাগত হইয়াছেন। মগধের, যুবরাজ হেমচন্দ্রের বীর্য্যের খ্যাতি শুনিয়া থাকিবেন।

প। বিশেষ শুনিয়াছি। ইহাও শ্রুত আছি যে, তিনি মহাশয়ের শিষ্য। আপনি বলিতে পারিবেন যে, ঈদৃশ বীরপুরুষের বাহুরক্ষিত মগধরাজ্য শত্রুহস্তগত হইল কি প্রকারে।

মা। যবনবিপ্লবের কালে যুবরাজ প্রবাসে ছিলেন। এই মাত্র কারণ।

প। তিনি কি এক্ষণে নবদ্বীপে আগমন করিয়াছেন ?

মা আসিয়াছেন। রাজ্যাপহারক যবন এই দেশে আগমন করিতেছে শুনিয়া এই দেশে তাহাদিগের সহিত সংগ্রাম করিয়া দস্যুর দণ্ডবিধান করিবেন। গৌড়রাজ তাঁহার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিয়া উভয়ে শত্রু বিনাশের চেষ্টা করিলে উভয়ের মঙ্গল।

প। রাজবল্লভেরা অদ্যই তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইবে। তাঁহার নিবাসার্থ যথাযোগ্য বাসগৃহ নির্দ্দিষ্ট হইবে। সন্ধিনিবন্ধনের মন্ত্রণা যথাযোগ্য সময়ে স্থির হইবে ।

পরে রাজাজ্ঞায় সভাভঙ্গ হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : কুসুমনির্ম্মিতা

উপনগর প্রান্তে গঙ্গাতীরবর্ত্তী এক অট্টালিকা হেমচন্দ্রের বাসার্থে রাজপুরুষেরা নির্দ্দিষ্ট করিলেন। হেমচন্দ্র মাধবাচার্য্যের পরামর্শানুসারে সুরম্য অট্টালিকায় আবাস সংস্থাপিত করিলেন।

নবদ্বীপে জনার্দ্দন নামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি বয়োবাহুল্যপ্রযুক্ত এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের হানিপ্রযুক্ত সর্ব্বতোভাবে অসমর্থ। অথচ নিঃসহায়। তাঁহার সহধর্ম্মিনীও প্রাচীনা এবং শক্তিহীনা। কিছু দিন হইল, ইঁহাদিগের পর্ণকুটীর প্রবল বাত্যায় বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই অবধি ইঁহার আশ্রয়াভাবে এই বৃহৎ পুরীর এক পার্শ্বে রাজপুরুষদিগের অনুমতি লইয়া বাস করিতেছিলেন। এক্ষণে কোন রাজপুত্র আসিয়া তথায় বাস করিবেন শুনিয়া তাঁহারা পরাধিকার ত্যাগ করিয়া বাসান্তরের অন্বেষণে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন।

হেমচন্দ্র উহা শুনিয়া দুঃখিত হইলেন। বিবেচনা করিলেন যে, এই বৃহৎ ভবনে আমাদিগের উভয়েরই স্থান হইতে পারে। ব্রাহ্মণ কেন নিরাশ্রয় হইবেন ? হেমচন্দ্র দিগ্বিজয়কে আজ্ঞা করিলেন, "ব্রাহ্মণকে গৃহত্যাগ করিতে নিবারণ কর।" ভৃত্য ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, "এ কার্য্য ভৃত্য দ্বারা সম্ভবে না। ব্রাহ্মণঠাকুর আমার কথা কানে তুলেন না।"

ব্রাহ্মণ বস্তুতঃ অনেকেরই কথা কাণে তুলেন না—কেন না, তিনি বধির। হেমচন্দ্র ভাবিলেন, ব্রাহ্মণ অভিমান প্রযুক্ত ভৃত্যের আলাপ গ্রহণ করেন না। এজন্য স্বয়ং তৎসম্ভাষণে গেলেন। ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিলেন।

জনার্দ্দন আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে ?"

হে। আমি আপনার ভৃত্য।

জ। কি বলিলে—তোমার নাম রামকৃষ্ণ ?

হেমচন্দ্র অনুভব করিলেন, ব্রাহ্মণের শ্রবণশক্তি বড় প্রবল নহে। অতএব উচ্চতরস্বরে কহিলেন, "আমার নাম হেমচন্দ্র। আমি ব্রাহ্মণের দাস।"

জ। ভাল ভাল; প্রথমে ভাল শুনিতে পাই নাই, তোমার নাম হনূমান দাস।

হেমচন্দ্র মনে করিলেন, "নামের কথা দূর হউক। কার্য্যসাধন হইলেই হইল।" বলিলেন, "নবদ্বীপাধিপতির এই অট্টালিকা, তিনি ইহা আমার বাসের জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন। শুনিলাম আমার আসায় আপনি স্থান ত্যাগ করিতেছেন।"

জ। না, এখনও গঙ্গাস্নানে যাই নাই; এই স্নানের উদ্যোগ করিতেছি।

হে। (অত্যুচ্চৈঃস্বরে) স্নান যথাসময়ে করিবেন। এক্ষণে আমি এই অনুরোধ করিতে আসিয়াছি যে, আপনি এ গৃহ ছাড়িয়া যাইবেন না।

জ। গৃহে আহার করিব না ? তোমার বাটীতে কি ? আদ্য শ্রাদ্ধ ?

হে। ভাল; আহারাদির অভিলাষ করেন, তাহারও উদ্যোগ হইবে। এক্ষণে যেরূপ এ বাড়ীতে অবস্থিতি করিতেছেন, সেইরূপই করুন।

জ। ভাল ভাল; ব্রাহ্মণভোজন করাইলে দক্ষিণা ত আছেই। তা বলিতে হইবে না। তোমার বাড়ী কোথা ?

হেমচন্দ্র হতাশ্বাস হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে তাঁহার উত্তরীয় ধরিয়া টানিল। হেমচন্দ্র ফিরিয়া দেখিলেন। দেখিয়া প্রথম মুহূর্ত্তে তাঁহার বোধ হইল, সম্মুখে একখানি কুসুমনির্ম্মিত দেবীপ্রতিমা। দ্বিতীয় মুহূর্ত্তে দেখিলেন, প্রতিমা সজীব; তৃতীয় মুহূর্ত্তে দেখিলেন, প্রতিমা নহে, বিধাতার নির্ম্মাণকৌশলসীমা-রূপিণী বালিকা অথবা পূর্ণযৌবনা তরুণী।

বালিকা না তরুণী? ইহা হেমচন্দ্র তাহাকে দেখিয়া নিশ্চিত করিতে পারিলেন না। বীণানিন্দিতস্বরে সুন্দরী কহিলেন, ‘তুমি পিতামহকে কি বলিতেছিলে ? তোমার কথা উনি শুনিতে পাইবেন কেন ?”

হেমচন্দ্র কহিলেন, “তাহা ত পাইলেন না দেখিলাম। তুমি কে ?”

বালিকা বলিল, “আমি মনোরমা।”

হে। ইনি তোমার পিতামহ ?

মনো। তুমি পিতামহকে কি বলিতেছিলে ?

হে। শুনিলাম ইনি এ গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। আমি তাই নিবারণ করিতে আসিয়াছি।

ম। এ গৃহে এক রাজপুত্র আসিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে থাকিতে দিবেন কেন ?

হে। আমিই সেই রাজপুত্র। আমি তোমাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তোমরা এখানে থাক।

ম। কেন ?

এ ‘কেন’র উত্তর নাই। হেমচন্দ্র অন্য উত্তর না পাইয়া কহিলেন, “কেন ?” মনে কর, যদি তোমার ভাই আসিয়া এই গৃহে বাস করিত, সে কি তোমাদিগকে তাড়াইয়া দিত ?”

ম। তুমি কি আমার ভাই ?

হে। আজি হইতে তোমার ভাই হইলাম। এখন বুঝিলে ?

ম। বুঝিয়াছি। কিন্তু ভগিনী বলিয়া আমাকে কখন তিরস্কার করিবে না ত ?

হেমচন্দ্র মনোরমার কথার প্রণালীতে চমৎকৃত হইতে লাগিলেন। ভাবিলেন, “এ কি অলৌকিক সরলা বালিকা? না উন্মাদিনী ?” কহিলেন, “কেন তিরস্কার করিব ?”

ম। যদি আমি দোষ করি ?

হে। দোষ দেখিলে কে না তিরস্কার করে ?

মনোরমা ক্ষুণ্নভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, বলিলেন, "আমি কখন ভাই দেখি নাই; ভাইকে কি লজ্জা করিতে হয়?"
হে। না।
ম। তবে আমি তোমাকে লজ্জা করিব না—তুমি আমাকে লজ্জা করিবে ?
হেমচন্দ্র হাসিলেন—কহিলেন, "আমার বক্তব্য তোমার পিতামহকে জানাইতে পারিলাম না,—তাহার উপায় কি ?"
ম। আমি বলিতেছি।
এই বলিয়া মনোরমা মৃদু মৃদু স্বরে জনার্দ্দনের নিকট হেমচন্দ্রের অভিপ্রায় জানাইলেন।
হেমচন্দ্র দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে, মনোরমার সেই মৃদু কথা বধিরের বোধগম্য হইল।
ব্রাহ্মণ আনন্দিত হইয়া রাজপুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। এবং কহিলেন, "মনোরমা, ব্রাহ্মণীকে বল, রাজপুত্র তাঁহার নাতি হইলেন–আশীর্ব্বাদ করুন।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ স্বয়ং "ব্রাহ্মণী! ব্রাহ্মণী! বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণী তখন স্থানান্তরে গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা ছিলেন—ডাক শুনিতে পাইলেন না। ব্রাহ্মণ অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "ব্রাহ্মণীর ঐ বড় দোষ। কানে কম শোনেন।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : নৌকাযানে

হেমচন্দ্র ত উপবনগৃহে সংস্থাপিত হইলেন। আর মৃণালিনী ? নির্ব্বাসিতা, পরপীড়িতা, সহায়হীনা মৃণালিনী কোথায়?
সান্ধ্য গগনে রক্তিম মেঘমালা কাঞ্চনবর্ণ ত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল। রজনীদত্ত তিমিরাবরণে গঙ্গার বিশাল হৃদয় অস্পষ্টীকৃত হইল। সভামণ্ডলে পরিচারকহস্তজ্বালিত দীপমালার ন্যায়, অথবা প্রভাতে উদ্যানকুসুমসমূহের ন্যায়, আকাশে নক্ষত্রগণ ফুটিতে লাগিল। প্রায়ান্ধকার নদীহৃদয়ে নৈশ সমীরণ কিঞ্চিৎ খরতরবেগে বহিতে লাগিল। তাহাতে রমণীহৃদয়ে নায়কসংস্পর্শজনিত প্রকম্পের ন্যায়, নদীবক্ষে তরঙ্গ উত্থিত হইতে লাগিল। কূলে তরঙ্গাভিঘাতজনিত ফেনপুঞ্জে শ্বেতপুষ্পমালা গ্রথিত হইতে লাগিল। বহু লোকের কোলাহলের ন্যায় বীচিরব উত্থিত হইল। নাবিকেরা নৌকাসকল তীরলগ্ন করিয়া রাত্রির জন্য বিশ্রামের ব্যবস্থা করিতে লাগিল। তন্মধ্যে একখানি ছোট ডিঙ্গী অন্য নৌকা হইতে পৃথক এক খালের মুখে লাগিল। নাবিকেরা আহারাদির ব্যবস্থা করিতে লাগিল।
ক্ষুদ্র তরণীতে দুইটিমাত্র আরোহী। দুইটিই স্ত্রীলোক। পাঠককে বলিতে হইবে না, ইহারা মৃণালিনী আর গিরিজায়া।
গিরিজায়া মৃণালিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "আজিকার দিন কাটিল।"
মৃণালিনী কোন উত্তর করিল না।
গিরিজায়া পুনরপি কহিল, "কালিকার দিনও কাটিবে—পরদিনও কাটিবে—কেন কাটিবে না ?"
মৃণালিনী তথাপি কোন উত্তর করিলেন না; কেবলমাত্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।
গিরিজায়া কহিল, "ঠাকুরাণি! এ কি এ ? দিবানিশি চিন্তা করিয়া কি হইবে ? যদি আমাদিগের নদীয়া আসা কাজ ভাল না হইয়া থাকে, চল, এখনও ফিরিয়া যাই।"

মৃণালিনী এবার উত্তর করিলেন। বলিলেন, "কোথায় যাইবে?"

গি। চল, হৃষীকেশের বাড়ী যাই।

মৃ। বরং এই গঙ্গাজলে ডুবিয়া মরিব।

গি। চল, তবে মথুরায় যাই।

মৃ। আমি ত বলিয়াছি, তথায় আমার স্থান নাই। কুলটার ন্যায় রাত্রিকালে যে বাপের ঘর ছাড়িয়া আসিয়াছি, কি বলিয়া সে বাপের ঘরে আর মুখ দেখাইব?

গি। কিন্তু তুমি ত আপন ইচ্ছায় আইস নাই, মন্দ ভাবিয়াও আইস নাই। যাইতে ক্ষতি কি?

মৃ। সে কথা কে বিশ্বাস করিবে? যে বাপের ঘরে আদরের প্রতিমা ছিলাম, সে বাপের ঘরে ঘৃণিত হইয়াই বা কি প্রকারে থাকিব?

গিরিজায়া অন্ধকারে দেখিতে পাইল না যে, মৃণালিনীর চক্ষু হইতে বারিবিন্দুর পর বারিবিন্দু পড়িতে লাগিল। গিরিজায়া কহিল, "তবে কোথায় যাইবে?"

মৃ। যেখানে যাইতেছি।

গি। সে ত সুখের যাত্রা। তবে অন্যমন কেন? যাহাকে দেখিতে ভালবাসি, তাহাকে দেখিতে যাইতেছি, ইহার অপেক্ষা সুখ আর কি আছে?

মৃ। নদীয়ায় আমার সহিত হেমচন্দ্রের সাক্ষাৎ হইবে না।

গি। কেন? তিনি কি সেখানে নাই?

মৃ। সেইখানেই আছেন। কিন্তু তুমি ত জান যে, আমার সহিত এক বৎসর অসাক্ষাৎ তাঁহার ব্রত। আমি কি সে ব্রত ভঙ্গ করাইব?

গিরিজায়া নীরব হইয়া রহিল। মৃণালিনী আবার কহিলেন, "আর কি বলিয়াই বা তাঁহার নিকট দাঁড়াইব। আমি কি বলিব যে, হৃষীকেশের উপর রাগ করিয়া আসিয়াছি, না, বলিব যে, হৃষীকেষ আমাকে কুলটা বলিয়া বিদায় করিয়া দিয়াছে?"

গিরিজায়া ক্ষণেক নীরব থাকিয়া কহিল, "তবে কি নদীয়ায় তোমার সঙ্গে হেমচন্দ্রের সাক্ষাৎ হইবে না?"

মৃ। না।

গি। তবে যাইতেছ কেন?

মৃ। তিনি আমাকে দেখিতে পাইবেন না। কিন্তু আমি তাঁহাকে দেখিব। তাঁহাকে দেখিতেই যাইতেছি।

গিরিজায়ার মুখে হাসি ধরিল না। বলল, "তবে আমি গীত গাই,

চরণতলে দিনু হে শ্যাম পরাণ রতন।
দিব না তোমারে নাথ মিছার যৌবন ॥
এ রতন সমতুল, ইহা তুমি দিবে মূল,
দিবানিশি মোরে নাথ দিবে দরশন ॥

ঠাকুরাণি, "তুমি তাঁহাকে দেখিয়া ত জীবনধারণ করিবে। আমি তোমার দাসী হইয়াছি, আমার ত তাহাতে পেট ভরিবে না, আমি কি খেয়ে বাঁচিব?"

মৃ। আমি দুই একটি শিল্পকর্ম্ম জানি। মালা গাঁথিতে জানি, চিত্র করিতে জানি, কাপড়ের উপর ফুল তুলিতে জানি। তুমি বাজারে আমার শিল্পকর্ম্ম বিক্রয় করিয়া দিবে।

গিরি। আর আমি ঘরে ঘরে গীত গায়িব। "মৃণাল অধমে" গাইব কি ?
মৃণালিনী অর্দ্ধহাস্য, অর্দ্ধ সকোপ দৃষ্টিতে গিরিজায়ার প্রতি কটাক্ষ করিলেন।
গিরিজায়া কহিল, "অমন করিয়া চাহিলে আমি গীত গায়িব।" এই বলিয়া গায়িল,

"সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে।
কে আছে কাণ্ডারী হেন কে যাইবে সঙ্গে॥"

মৃণালিনী কহিল, "যদি এত ভয়, তবে একা এলে কেন ?"
গিরিজায়া কহিল, "আগে কি জানি।" বলিয়া গায়িতে লাগিল,

"ভাস্‌ল তরী সকাল বেলা, ভাবিলাম এ জলখেলা,
মধুর বহিবে বায়ু ভেসে যাব রঙ্গে।
এখন—গগনে গরজে ঘন, বহে খর সমীরণ,
কূল ত্যজি এলাম কেন, মরিতে আতঙ্কে।"

মৃণালিনী কহিল, "কূলে ফিরিয়া যাও না কেন ?"
গিরিজায়া গায়িতে লাগিল,

"মনে করি কূলে ফিরি বাহি তরী ধীরি ধীরি
কূলেতে কণ্টক-তরু বেষ্টিতে ভুজঙ্গে।"

মৃণালিনী কহিলেন, "তবে ডুবিয়া মর না কেন ?"
গিরিজায়া কহিল, "মরি তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু" বলিয়া আবার গায়িল,

"যাহারে কাণ্ডারী করি, সাজাইয়া দিনু তরী,
সে কভু না দিল পদ তরণীর অঙ্গে॥"

মৃণালিনী কহিলেন, "গিরিজায়া, এ কোন অপ্রেমিকের গান।"
গি। কেন ?
মৃ। আমি হইলে তরী ডুবাই।
গি। সাধ করিয়া ?
মৃ। সাধ করিয়া।
গি। তবে তুমি জলের ভিতর রত্ন দেখিয়াছ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : বাতায়নে

হেমচন্দ্র কিছু দিন উপবনগৃহে বাস করিলেন। জনার্দ্দনের সহিত প্রত্যহ সাক্ষাৎ হইত; কিন্তু ব্রাহ্মণের বধিরতাপ্রযুক্ত ইঙ্গিতে আলাপ হইত মাত্র। মনোরমার সহিতও সর্ব্বদা সাক্ষাৎ হইত, মনোরমা কখন তাঁহার সহিত উপযাচিকা হইয়া কথা কহিতেন, কখন বা বাক্যব্যয় না করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া যাইতেন। বস্তুতঃ মনোরমার প্রকৃতি তাঁহার পক্ষে অধিকতর বিস্ময়জনক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল প্রথমতঃ তাঁহার বয়ঃক্রম দুরনুমেয়, সহজে তাঁহাকে বালিকা বোধ হইত, কিন্তু কখন কখন মনোরমাকে অতিশয় গাম্ভীর্যশালিনী দেখিতেন। মনোরমা কি অদ্যাপি কুমারী ? হেমচন্দ্র এক দিন কথোপকথনচ্ছলে মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মনোরমা, তোমার শ্বশুরবাড়ী কোথা ?" মনোরমা কহিল, "বলিতে পারি না।" আর এক দিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মনোরমা, তুমি কয় বৎসরের হইয়াছ ?" মনোরমা তাহাতেও উত্তর দিয়াছিলেন, "বলিতে পারি না।"

মাধবাচার্য্য হেমচন্দ্রকে উপবনে স্থাপিত করিয়া দেশপর্য্যটনে যাত্রা করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, এ সময় গৌড়দেশীয় অধীন রাজগণ যাহাতে নবদ্বীপে সসৈন্য সমবেত হইয়া গৌড়েশ্বরের আনুকূল্য করেন, তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগকে প্রবৃত্তি দেন। হেমচন্দ্র নবদ্বীপে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিষ্কর্ম্মে দিনযাপন ক্লেশকর হইয়া উঠিল। হেমচন্দ্র বিরক্ত হইলেন। এক একবার মনে হইতে লাগিল যে, দিগ্বিজয়কে গৃহরক্ষায় রাখিয়া অশ্ব লইয়া একবার গৌড়ে গমন করেন। কিন্তু তথায় মৃণালিনীর সাক্ষাৎ লাভ করিলে তাঁহার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হইবে, বিনা সাক্ষাতে গৌড়যাত্রায় কি ফলোদয় হইবে ? এই সকল আলোচনায় যদিও গৌড়যাত্রায় হেমচন্দ্র নিরস্ত হইলেন, তথাপি অনুদিন মৃণালিনীচিন্তায় হৃদয় নিযুক্ত থাকিত। একদা প্রদোষকালে তিনি শয়নকক্ষে, পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করিয়া মৃণালিনীর চিন্তা করিতেছিলেন। চিন্তাতেও হৃদয় সুখলাভ করিতেছিল। মুক্ত বাতায়নপথে হেমচন্দ্র প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। নবীন শরদুদয়। রজনী চন্দ্রিকাশালিনী, আকাশ নির্ম্মল্ বিস্তৃত, নক্ষত্রখচিত্র, ক্বচিৎ স্তরপরম্পরাবিন্যস্ত শ্বেতাম্বুদমালায় বিভূষিত। বাতায়নপথে অদূরবর্ত্তিনী ভাগীরথীও দেখা যাইতেছিল; ভাগীরথী বিশালোরসী, বহুদূরবিসর্পিণী, চন্দ্রকর-প্রতিঘাতে উজ্জ্বলতরঙ্গিণী, দূরপ্রান্তে ধূমময়ী, নববারি-সমাগম-প্রহ্লাদিনী। নববারি-সমাগমজনিত কল্লোল হেমচন্দ্র শুনতে পাইতেছিলেন। বাতায়নপথে বায়ু প্রবেশ করিতেছিল। বায়ু গঙ্গাতরঙ্গে নিক্ষিপ্ত জলকণা-সংস্পর্শে শীতল, নিশাসমাগমে প্রফুল্ল বন্যকুসুমসংস্পর্শে সুগন্ধি; চন্দ্রকরপ্রতিঘাতী-শ্যামোজ্জ্বল বৃক্ষপত্র বিধূত করিয়া, নদীতীরবিরাজিত কাশকুসুম আন্দোলিত করিয়া, বায়ু বাতায়নপথে প্রবেশ করিতেছিল। হেমচন্দ্র বিশেষ প্রীতিলাভ করিলেন।

অকস্মাৎ বাতায়নপথ অন্ধকার হইল—চন্দ্রালোকের গতি রোধ হইল। হেমচন্দ্র বাতায়নসন্নিধি একটি মনুষ্যমুণ্ড দেখিতে পাইলেন। বাতায়ন, ভূমি হইতে কিছু উচ্চ—এজন্য কাহারও হস্তপদাদি কিছু দেখিতে পাইলেন না—কেবল একখানি মুখ দেখিলেন। মুখখানি অতি বিশালশ্মশ্রুসংযুক্ত, তাহার মস্তকে উষ্ণীষ। সেই উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে, বাতায়নের নিকটে, সম্মুখে, শ্মশ্রুসংযুক্ত উষ্ণীষধারী মনুষ্যমুণ্ড দেখিয়া, হেমচন্দ্র শয্যা হইতে লম্ফ দিয়া নিজ শাণিত অসি গ্রহণ করিলেন।

অসি গ্রহণ করিয়া হেমচন্দ্র চাহিয়া দেখিলেন যে, বাতায়নে আর মনুষমুণ্ড নাই।

হেমচন্দ্র অসিহস্তে দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। বাতায়নতলে আসিলেন। তথায় কেহ নাই।

গৃহের চতুঃপার্শ্বে, গঙ্গাতীরে, বনমধ্যে হেমচন্দ্র ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিলেন। কোথাও কাহাকে দেখিলেন না।

হেমচন্দ্র গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তখন রাজপুত্র পিতৃদত্ত যোদ্ধৃবেশে আপাদমস্তক আত্মশরীর মণ্ডিত করিলেন। অকালজলদোদয়বিমর্ষিত গগনমণ্ডলবৎ তাঁহার সুন্দর মুখকান্তি অন্ধকারময় হইল। তিনি একাকী সেই গম্ভীর নিশাতে শস্ত্রময় হইয়া যাত্রা করিলেন। বাতায়নপথে মনুষ্যমুণ্ড দেখিয়া তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, বঙ্গে তুরক আসিয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : বাপীকূলে

অকালজলদোদয়স্বরূপ ভীমমূর্ত্তি রাজপুত্র হেমচন্দ তুরকের অন্বেষণে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ব্যাঘ্র যেমন আহার্য্য দেখিবামাত্র বেগে ধাবিত হয়, হেমচন্দ্র তুরক দেখিবামাত্র সেইরূপ ধাবিত হইলেন। কিন্তু কোথায় তুরকের সাক্ষাৎ পাইবেন, তাহার স্থিরতা ছিল না।

হেমচন্দ্র একটিমাত্র তুরক দেখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, হয় তুরকসেনা নগরসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া লুক্কায়িত আছে, নতুবা এই ব্যক্তি তুরকসেনার পূর্ব্বচর। যদি তুরকসেনাই আসিয়া থাকে, তবে তৎসঙ্গে একাকী সংগ্রাম সম্ভবে না। কিন্তু যাহাই হউক, প্রকৃত অবস্থা কি, তাহার অনুসন্ধান না করিয়া হেমচন্দ্র কদাচ স্থির থাকিতে পারেন না। যে মহৎকার্য্য জন্য মৃণালিনীকে ত্যাগ করিয়াছেন, অদ্য রাত্রিতে নিদ্রাভিভূত হইয়া সে কর্ম্মে উপেক্ষা করিতে পারেন না। বিশেষ যবনবধে হেমচন্দ্রের আন্তরিক আনন্দ। উষ্ণীষধারী মুণ্ড দেখিয়া অবধি তাঁহার জিঘাংসা ভয়নাক প্রবল হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার স্থির হইবার সম্ভাবনা কি ? অতএব দ্রুতপদবিক্ষেপে হেমচন্দ্র রাজপথাভিমুখে চলিলেন।

উপবনগৃহ হইতে রাজপথ কিছু দূর। যে পথ বাহিত করিয়া উপবনগৃহ হইতে রাজপথে যাইতে হয়, সে বিরল-লোক-প্রবাহ গ্রাম্য পথ মাত্র। হেমচন্দ্র সেই পথে চলিলেন। সেই পথপার্শ্বে অতি বিস্তারিত, সুরম্য, সোপানাবলিশোভিত এক দীর্ঘিকা ছিল। দীর্ঘিকাপার্শ্বে অনেক বকুল, শাল, অশোক, চম্পক, কদম্ব, অশ্বত্থ, বট, আম্র, তিন্তিড়ী প্রভৃতি বৃক্ষ ছিল। বৃক্ষগুলি যে সুশৃঙ্খলরূপে শ্রেণীবিন্যস্ত ছিল, এমত নহে, বহুতর বৃক্ষ পরস্পর শাখায় শাখায় সম্বদ্ধ হইয়া বাপীতীরে ঘনান্ধকার করিয়া রহিত। দিবসেও তথায় অন্ধকার। কিম্বদন্তী ছিল যে, সেই সরোবরে ভূতযোনি বিহার করিত। এই সংস্কার প্রতিবাসীদিগের মন এরূপ দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছিল যে, সচরাচর তথায় কেহ যাইত না। যদি যাইত, তবে এককী কেহ যাইত না। নিশাকালে কদাপি কেহ যাইত না।

পৌরাণিক ধর্ম্মের একাধিপত্যকালে হেমচন্দ্রও ভূতযোনির অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রত্যয়শালী হইবেন, তাহার আর বিচিত্র কি ? কিন্তু প্রেতসম্বন্ধে প্রত্যয়শালী বলিয়া তিনি গন্তব্য পথে যাইতে সঙ্কোচ করেন, এরূপ ভীরুস্বভাব নহেন। অতএব তিনি নিঃসঙ্কোচ হইয়া বাপীপার্শ্ব দিয়া চলিলেন। নিঃসঙ্কোচ বটে, কিন্তু কৌতূহলশূন্য নহেন। বাপীর পার্শ্বে সর্ব্বত্র এবং তত্তীরপ্রতি অনিমেষলোচন নিক্ষিপ্ত করিতে করিতে চলিলেন। সোপানমার্গের নিকটবর্ত্তী হইলেন। সহসা চমকিত হইলেন। জনশ্রুতির প্রতি তাঁহার বিশ্বাস দৃঢ়ীকৃত হইল। দেখিলেন, চন্দ্রালোকে সর্ব্বাধঃস্থ সোপানে, জলে চরণ রক্ষা করিয়া শ্বেতবসনপরিধানা কে বসিয়া আছে। স্ত্রীমূর্ত্তি বলিয়া তাঁহার বোধ হইল। শ্বেতবসনা অবেণীসম্বদ্ধকুন্তলা; কেশজাল স্কন্ধ, পৃষ্ঠদেশ, বাহুযুগল, মুখমণ্ডল, হৃদয় সর্ব্বত্র আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। প্রেত বিবেচনা করিয়া হেমচন্দ্র নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু মনে ভাবিলেন, যদি মনুষ্য হয় ? এত রাত্রে কে এ স্থানে ? সে ত তুরককে দেখিলে দেখিয়া থাকিতে পারে ? এই সন্দেহে হেমচন্দ্র ফিরিলেন। নির্ভয়ে বাপীতীরারোহণ করিলেন, সোপানমার্গে ধীরে ধীরে অবতরণ করিতে লাগিলেন। প্রেতিনী তাঁহার আগমন জানিতে পারিয়াও সরিল না, পূর্ব্বমত রহিল। হেমচন্দ্র তাঁহার নিকটে আসিলেন। তখন সে উঠিয়া দাঁড়াইল। হেমচন্দ্রের দিকে ফিরিল; হস্তদ্বারা মুখাবরণকারী কেশদাম অপসৃত করিল। হেমচন্দ্র তাহার মুখ দেখিলেন। সে প্রেতিনী নহে, কিন্তু প্রেতিনী হইলে হেমচন্দ্র অধিকতর বিস্ময়াপন্ন হইতেন না। কহিলেন, "কে মনোরমা! তুমি এখানে ?"

মনোরমা কহিল, "আমি এখানে অনেকবার আসি—কিন্তু তুমি এখানে কেন ?"

হেম। আমার কর্ম্ম আছে।

মনো। এ রাত্রে কি কর্ম্ম ?

হেম। পশ্চাৎ বলিব; তুমি এ রাত্রে এখানে কেন ?

মনো। তোমার এ বেশ কেন ? হাতে শূল; কাঁকালে তরবারি; তরবারে এ কি জ্বলিতেছে ? এ কি হীরা ? মাথায় এ কি ? ইহাতে ঝক্‌মক্ করিয়া জ্বলিতেছে, এই বা কি ? এও কি হীরা ? এত হীরা পেল কোথা ?

হেম। আমার ছিল।

মনো। এ রাত্রে এত হীরা পরিয়া কোথায় যাইতেছ ? চোরে যে কাড়িয়া লইবে ?

হেম। আমার নিকট হইতে চোর কাড়িতে পারে না।

মনো। তা এত রাত্রে এত অলঙ্কারে প্রয়োজন কি ? তুমি কি বিবাহ করিতে যাইতেছ ?

হেম। তোমার কি বোধ হয়, মনোরমা ?

মনো। মানুষ মারিবার অস্ত্র লইয়া কেহ বিবাহ করিতে যায় না। তুমি যুদ্ধে যাইতেছ ।

হেম। কাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিব ? তুমিই বা এখানে কি করিতেছিলে ?

মনো। স্নান করিতেছিলাম। স্নান করিয়া বাতাসে চুল শুকাইতেছিলাম। এই দেখ, চুল এখনও ভিজা রহিয়াছে।

এই বলিয়া মনোরমা আর্দ্র কেশ হেমচন্দ্রের হস্ত স্পর্শ করাইলেন।

হেম। রাত্রে স্নান কেন ?

মনো। আমার গা জ্বালা করে।

হেম। গঙ্গাস্নান না করিয়া এখানে কেন ?

মনো। এখানকার জল বড় শীতল।

হেম। তুমি সর্ব্বদা এখানে আইস ?

মনো। আসি।

হেম। আমি তোমার সম্বন্ধ করিতেছি—তোমার বিবাহ হইবে। বিবাহ হইলে এরূপ কি প্রকারে আসিবে?

মনো। আগে বিবাহ হউক।

হেমচন্দ্র হাসিয়া কহিলেন, “তোমার লজ্জা নাই—তুমি কালামুখী।”

মনো। তিরস্কার কর কেন ? তুমি যে বলিয়াছিলে, তিরস্কার করিবে না।

হেম। সে অপরাধ লইও না। এখান দিয়া কাহাকেও যাইতে দেখিয়াছ ?

মনো। দেখিয়াছি।

হেম। তাহার কি বেশ ?

মনো। তুরকের বেশ।

হেমচন্দ্র অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন; বলিলেন, “সে কি ? তুমি তুরক চিনিলে কি প্রকারে ?”

মনো। আমি পূর্ব্বে তুরক দেখিয়াছি।

হেম। সে কি ? কোথায় দেখিলে ?

মনো। যেখানে দেখি না—তুমি কি সেই তুরকের অনুসরণ করিবে ?

হেম। করিব—সে কোন্ পথে গেল ?

মনো। কেন ?

হেম। তাহাকে বধ করিব।

মনো। মানুষ মেরে কি হবে ?

হেম। তুরক আমার পরম শত্রু।

মনো। তবে একটি মারিয়া কি তৃপ্তি লাভ করিবে ?

হেম। আমি যত তুরক দেখিতে পাইব, তত মারিব।

মনো। পারিবে ?

হেম। পারিব।

মনোরমা বলিল, “তবে সাবধানে আমার সঙ্গে আইস।”

হেমচন্দ্র ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। যবনযুদ্ধে এই বালিকা পথপ্রদর্শিনী!

মনোরমা তাঁহার মানসিক ভাব বুঝিলেন; বলিলেন, “আমকে বালিকা ভাবিয়া অবিশ্বাস করিতেছ ?” হেমচন্দ্র মনোরমার প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। বিস্ময়াপন্ন হইয়া ভাবিলেন—মনোরমা কি মানুষী ?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : পশুপতি

গৌড়দেশের ধর্ম্মাধিকার পশুপতি অসাধারণ ব্যক্তি; তিনি দ্বিতীয় গৌড়েশ্বর। রাজা বৃদ্ধ, বার্দ্ধক্যের ধর্ম্মানুসারে পরমতাবলম্বী এবং রাজকার্য্যে অযত্নবান হইয়াছিলেন, সুতরাং প্রধানামাত্য, ধর্ম্মাধিকারের হস্তেই গৌড়রাজ্যের প্রকৃত ভার অর্পিত হইয়াছিল। এবং সম্পদে অথবা ঐশ্বর্য্যে পশুপতি গৌড়েশ্বরের সমকক্ষ ব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছিলেন।

পশুপতির বয়ঃক্রম পঞ্চত্রিংশৎ বৎসর হইবে। তিনি দেখিতে অতি সুপুরুষ। তাঁহার শরীর দীর্ঘ, বক্ষ বিশাল, সর্ব্বাঙ্গ অস্থিমাংসের উপযুক্ত সংযোগে সুন্দর। তাঁহার বর্ণ তপ্ত কাঞ্চনসন্নিভ; ললাট অতি বিস্তৃত, মানসিক শক্তির মন্দিরস্বরূপ। নাসিকা দীর্ঘ এবং উন্নত, চক্ষু ক্ষুদ্র, কিন্তু অসাধারণ ঔজ্জ্বল-সম্পন্ন। মুখকান্তি জ্ঞানগাম্ভীর্য্যব্যঞ্জক এবং অনুদিন বিষয়ানুষ্ঠানজনিত চিন্তার গুণে কিছু পরুষভাবপ্রকাশক। তাহা হইলে কি হয়, রাজসভাতলে তাঁহার ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুরুষ আর কেহই ছিল না। লোকে বলিত, গৌড়দেশে তাদৃশ পণ্ডিত এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিও কেহ ছিল না।

পশুপতি জাতিতে ব্রাহ্মণ, কিন্তু তাঁহার জন্মভূমি কোথা, তাহা কেহ বিশেষ জ্ঞাত ছিল না। কথিত ছিল যে, তাঁহার পিতা শাস্ত্রব্যবসায়ী দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন।

পশুপতি কেবল আপন বুদ্ধিবিদ্যার প্রভাবে গৌড়রাজ্যের প্রধান পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

পশুপতি যৌবনকালে কাশীধামে পিতার নিকট থাকিয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতেন। তথায় কেশব নামে এক বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। হৈমবতী নামে কেশবের এক অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা ছিল। তাহার সহিত পশুপতির পরিণয় হয়। কিন্তু অদৃষ্টবশতঃ বিবাহের রাত্রেই কেশব, সম্প্রদানের পর, কন্যা লইয়া অদৃশ হইল। আর তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। সেই পর্য্যন্ত পশুপতি পত্নীসহবাসে বঞ্চিত ছিলেন। কারণবশতঃ একাল পর্য্যন্ত দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করেন নাই। তিনি এক্ষণে রাজপ্রসাদতুল্য উচ্চ অট্টালিকায় বাস করিতেন, কিন্তু বামানয়ননিঃসৃত জ্যোতির অভাবে সেই উচ্চ অট্টালিকা আজি অন্ধকারময়।

আজি রাত্রে সেই উচ্চ অট্টালিকার এক নিভৃত কক্ষে পশুপতি একাকী দীপালোকে বসিয়া আছেন। এই কক্ষের পশ্চাতেই আম্রকানন। আম্রকাননে নিষ্ক্রান্ত হইবার জন্য একটি গুপ্তদ্বার আছে। সেই দ্বারে আসিয়া নিশীথকালে, মৃদু মৃদু কে আঘাত করিল। গৃহাভ্যন্তর হইতে পশুপতি দ্বার উদ্ঘাটিত করিলেন। এই ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করিল। সে মুসলমান। হেমচন্দ্র তাহাকেই বাতায়নপথে দেখিয়াছিলেন। পশুপতি, তখন তাহাকে পৃথগাসনে উপবেশন করিতে বলিয়া বিশ্বাসজনক অভিজ্ঞান দেখিতে চাহিলেন। মুসলমান অভিজ্ঞান দৃষ্ট করাইলেন।

পশুপতি সংস্কৃতে কহিলেন, "বুঝিলাম আপনি তুরকসেনাপতির বিশ্বাসপাত্র। সুতরাং আমারও বিশ্বাসপাত্র। আপনারই নাম মহম্মদ আলি ? এক্ষণে সেনাপতির অভিপ্রায় প্রকাশ করুন।"

যবন সংস্কৃতে উত্তর দিলেন, কিন্তু তাঁহার সংস্কৃতের তিন ভাগ ফারসী, আর অবশিষ্ট চতুর্থ ভাগ যেরূপ সংস্কৃত, তাহা ভারতবর্ষে কখন ব্যবহৃত হয় নাই। তাহা মহম্মদ আলিরই সৃষ্ট সংস্কৃত। পশুপতি বহুকষ্টে তাহার অর্থবোধ করিলেন। পাঠক মহাশয়ের সে কষ্ঠভোগের প্রয়োজন নাই, আমরা তাঁহার সুবোধার্থ সে নূতন সংস্কৃত অনুবাদ করিয়া দিতেছি।

যবন কহিল, "খিলিজি সাহেবের অভিপ্রায় আপনি অবগত আছেন। বিনা যুদ্ধে গৌড়বিজয় করিবেন—তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছে। কি হইলে আপনি এ রাজ্য তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবেন ?"

পশুপতি কহিলেন, "আমি এ রাজ্য তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিব কি না, তাহা অনিশ্চিত। স্বদেশবৈরিতা মহাপাপ। আমি এ কর্ম্ম কেন করিব ?"

য। উত্তম। আমি চলিলাম। কিন্তু আপনি তবে কেন খিলিজির নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছেন ?

প। তাঁহার যুদ্ধের সাধ কতদূর পর্য্যন্ত, তাহা জানিবার জন্য।

য। তাহা আমি আপনাকে জানাইয়া যাই। যুদ্ধেই তাঁহার আনন্দ।

প। মনুষ্যযুদ্ধে, পশুযুদ্ধে চ ? হস্তিযুদ্ধে কেমন আনন্দ ?

মহম্মদ আলি সকোপে কহিলেন, "গৌড়ে যুদ্ধের অভিপ্রায়ে আসা। পশুযুদ্ধেই আসা। বুঝিলাম, ব্যঙ্গ করিবার জন্যই আপনি সেনাপতিকে লোক পাঠাইতে বলিয়াছিলেন। আমরা যুদ্ধ জানি, ব্যঙ্গ জানি না। যাহা জানি, তাহা করিব।"

এই বলিয়া মহম্মদ আলি গমনোদ্যোগী হইল। পশুপতি কহিলেন, "ক্ষণেক অপেক্ষা করুন আর কিছু শুনিয়া যান। আমি যবনহস্তে এ রাজ্য সমর্পণ করিতে অসম্মত নহি; অক্ষমও নহি। আমিই গৌড়ের রাজা, সেনারাজা নামমাত্র। কিন্তু সমুচিত মূল্য না পাইলে আপন রাজ্য কেন আপনাদিগকে দিব ?"

মুহম্মদ আলি কহিলেন, "আপনি কি চাহেন ?"

প। খিলিজি কি দিবেন ?

য। আপনার যাহা আছে, তাহা সকলই থাকিবে—আপনার জীবন, ঐশ্বর্য্য, পদ সকলই থাকিবে। এই মাত্র।

প। তবে আমি পাইলাম কি ? এ সকলই ত আমার আছে—কি লোভে আমি এ গুরুতর পাপানুষ্ঠান করিব ?

য। আমাদের আনুকূল্য না করিলে কিছুই থাকিবে না; যুদ্ধ করিলে, আপনার ঐশ্বর্য্য, পদ, জীবন পর্য্যন্ত অপহৃত হইবে।

প। তাহা যুদ্ধ শেষ না হইলে বলা যায় না। আমরা যুদ্ধ করিতে একেবারে অনিচ্ছুক বিবেচনা করিবেন না। বিশেষ মগধে বিদ্রোহের উদ্যোগ হইতেছে, তাহাও অবগত আছি। তাহার নিবারণ জন্য এক্ষণে খিলিজি ব্যস্ত, গৌড়জয় চেষ্টা আপাততঃ কিছু দিন তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হইবে, তাহাও অবগত আছি। আমার প্রার্থিত পুরস্কার না দেন না দিবেন; কিন্তু যুদ্ধ করাই যদি স্থির হয়, তবে আমাদিগের এই উত্তম সময়। যখন বিহারে বিদ্রোহিসেনা সজ্জিত হইবে, গৌড়েশ্বরের সেনাও সাজিবে।

ম। ক্ষতি কি ? পিঁপড়ের কামড়ের উপর মশা কামড়াইলে হাতী মরে না। কিন্তু আপনার প্রার্থিত পুরস্কার কি, তাহা শুনিয়া যাইতে বাসনা করি।

প। শুনুন। আমিই এক্ষণে প্রকৃত গৌড়ের ঈশ্বর, কিন্তু লোকে আমাকে গৌড়েশ্বর বলে না। আমি স্বনামে রাজা হইতে বাসনা করি। সেনবংশ লোপ হইয়া পশুপতি গৌড়াধিপতি হউক।

ম। তাহাতে আমাদিগের কি উপকার করিলেন ? আমাদিগকে কি দিবেন ?

প। রাজকর মাত্র। মুসলমানের অধীনে করপ্রদ মাত্র রাজা হইব।

ম। ভাল; আপনি যদি প্রকৃত গৌড়েশ্বর, রাজা যদি আপনার এরূপ করতলস্থ, তবে আমাদিগের সহিত আপনার কথাবার্ত্তার আবশ্যক কি ? আমাদিগের সাহায্যের প্রয়োজন কি ? আমাদিগকে কর দিবেন কেন ?

প। তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিব। ইহাতে কপটতা করিব না। প্রথমতঃ সেনরাজ আমার প্রভু; বয়সে বৃদ্ধ, আমাকে স্নেহ করেন। স্ববলে যদি আমি তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করি—তবে অত্যন্ত লোকনিন্দা। আপনারা কিছুমাত্র যুদ্ধোদ্যম দেখাইয়া, আমার আনুকূল্যে বিনা যুদ্ধে রাজধানী প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া আমাকে তদুপরি স্থাপিত করিলে সে নিন্দা হইবে না। দ্বিতীয়তঃ রাজ্য অনধিকারীর অধিকারগত হইলেই বিদ্রোহের সম্ভাবনা, আপনাদিগের সাহায্যে সে বিদ্রোহ সহজেই নিবারণ করিতে পারিব। তৃতীয়তঃ আমি স্বয়ং রাজা ইহলে এক্ষণে সেনরাজার সহিত আপনাদিগের যে সম্বন্ধ, আমার সঙ্গেও সেই সম্বন্ধ থাকিবে। আমাদিগের সহিত যুদ্ধের সম্ভাবনা থাকিবে। যুদ্ধে আমি প্রস্তুত আছি—কিন্তু জয় পরাজয় উভয়েরই সম্ভাবনা। জয় হইলে আমার নূতন কিছু লাভ হইবে না। কিন্তু পরাজয়ে সর্ব্বস্বহানি। কিন্তু আপনাদিগের সহিত সন্ধি করিয়া রাজ্য গ্রহণ করিলে সে আশঙ্কা থাকিবে না। বিশেষতঃ সর্ব্বদা যুদ্ধোদ্যত থাকিতে হইলে নূতন রাজ্য সুশাসিত হয় না।

ম। আপনি রাজীনীতিজ্ঞের ন্যায় বিবেচনা করিয়াছেন। আপনার কথায় আমার সম্পূর্ণ প্রত্যয় জন্মিল আমিও এইরূপ স্পষ্ট করিয়া খিলিজি সাহেবের অভিপ্রায় ব্যক্ত করি। তিনি এক্ষণে অনেক চিন্তায় ব্যস্ত আছেন যথার্থ, কিন্তু হিন্দুস্থানে যবনরাজ একেশ্বর হইবেন, অন্য রাজার নামমাত্র আমরা রাখিব না। কিন্তু আপনাকে গৌড়ে শাসনকর্ত্তা করিব। যেমন দিল্লীতে মহম্মদ ঘোরির প্রতিনিধি কুতবউদ্দীন, যেমন পূর্ব্বদেশে কুতবউদ্দীনের প্রতিনিধি বখ্‌তিয়ার খিলিজি, তেমনই গৌড়ে আপনি বখ্‌তিয়ারের প্রতিনিধি হইবেন। আপনি ইহাতে স্বীকৃত আছেন কি না ?

পশুপতি কহিলেন, "আমি ইহাতে সম্মত হইলাম।"

ম। ভাল; কিন্তু আমার আর এক কথা জিজ্ঞাসা আছে। আপনি যাহা অঙ্গীকার করিতেছেন, তাহা সাধন করিতে আপনার ক্ষমতা কি ?

প। আমার অনুমতি ব্যতীত একটি পদাতিকও যুদ্ধ করিবে না। রাজকোষ আমার অনুচরের হস্তে। আমার আদেশ ব্যতীত যুদ্ধের উদ্যোগে একটি কড়াও খরচ হইবে না। পাঁচ জন অনুচর লইয়া খিলিজিকে রাজপুরে প্রবেশ করিতে বলিও; কেহ জিজ্ঞাসা করিবে না, "কে তোমরা ?"

ম। আরও এক কথা বাকি আছে। এই দেশে যবনের পরম শত্রু হেমচন্দ্র বাস করিতেছে। আজ রাত্রেই তাহার মুণ্ড যবন-শিবিরে প্রেরণ করিতে হইবে।

প। আপনারা আসিয়াই তাহা ছেদন করিবেন—আমি শরণাগত-হত্যা-পাপ কেন স্বীকার করিব ?

ম। আমাদিগের হইতে হইবে না। যবন–সমাগম শুনিবা মাত্র সে ব্যক্তি নগর ত্যাগ করিয়া পলাইবে। আজি সে নিশ্চিন্ত আছে। আজি লোক পাঠাইয়া তাহাকে বধ করুন।

প। ভাল, ইহাও স্বীকার করিলাম।

ম। আমরা সন্তুষ্ট হইলাম। আমি আপনার উত্তর লইয়া চলিলাম।

প। যে আজ্ঞা। আর একটা কথা জিজ্ঞাসা আছে।

ম। কি, আজ্ঞা করুন।

প। আমি ত রাজ্য আপনাদিগের হাতে দিব। পরে যদি আপনারা আমাকে বহিষ্কৃত করেন ?

ম। আমরা আপনার কথায় নির্ভর করিয়া অল্পমাত্র সেনা লইয়া দূত পরিচয়ে পুরপ্রবেশ করিব। তাহাতে যদি আমরা স্বীকার মত কর্ম্ম না করি, আপনি সহজেই আমাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন।

প। আর যদি আপনারা অল্প সেনা লইয়া না আইসেন ?

ম। তবে যুদ্ধ করিবেন।

এই বলিয়া মহম্মদ আলি বিদায় হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : চৌরোদ্ধরণিক

মহম্মদ আলি বাহির হইল দৃষ্টিপথাতীত হইলে, অন্য এক জন গুপ্তদ্বার-নিকটে আসিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "প্রবেশ করিব ?"

পশুপতি কহিলেন, "কর।"

এক জন চৌরোদ্ধরণিক প্রবেশ করিল। সে প্রণত হইলে পশুপতি আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন শান্তশীল! মঙ্গল সংবাদ ত ?"

চৌরোদ্ধরণিক কহিল, "আপনি একে একে প্রশ্ন করুন—আমি ক্রমে সকল সংবাদ নিবেদন করিতেছি।"

পশু। যবনদিগের অবস্থিতি স্থানে গিয়াছিলে ?

শান্ত। সেখানে কেহ যাইতে পারে না।

পশু। কেন ?

শান্ত। অতি নিবিড় বন, দুর্ভেদ্য।

পশু। কুঠারহস্তে বৃক্ষচ্ছেদন করিতে করিতে গেলে না কেন ?

শান্ত। ব্যাঘ্র ভল্লুকের দৌরাত্ম্য।

পশু। সশস্ত্রে গেলে না কেন ?

শান্ত। যে সকল কাঠুরিয়ারা ব্যাঘ্র ভল্লুক বধ করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারা সকলেই যবন-হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছে—কেহই ফেরিয়া আইসে নাই।

পশু। তুমিও না হয় না আসিতে ?

শান্ত। তাহা হইলে কে আসিয়া আপনাকে সংবাদ দিত ?

পশুপতি হাসিয়া কহিলেন, "তুমিই আসিতে।"

শান্তশীল প্রণাম করিয়া কহিল, "আমিই সংবাদ দিতে আসিয়াছি।"

পশুপতি আনন্দিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি প্রকারে গেলে ?"

শান্ত। প্রথমে উষ্ণীষ অস্ত্র ও তুরকী বেশ সংগ্রহ করিলাম। তাহা বাঁধিয়া পৃষ্ঠে সংস্থাপিত করিলাম। তার উপর কাঠুরিয়াদিগের সঙ্গে বন-পথে পবেশ করিলাম। পরে যখন যবনেরা কাঠুরিয়াদিগকে দেখিতে পাইয়া তাহাদিগকে মারিতে প্রবৃত্ত হইল—তখন আমি অপসৃত হইয়া বৃক্ষান্তরালে বেশপরিবর্ত্তন করিলাম। পরে মুসলমান হইয়া যবনশিবিরে সর্ব্বত্র বেড়াইলাম।

পশু। প্রশংসনীয় বটে। যবন-সৈন্য কত দেখিলে ?

শান্ত। সে বৃহৎ অরণ্যে যত ধরে। বোধ হয়, পঁচিশ হাজার হইবে।

পশুপতি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে কহিলেন, "তাহাদিগের কথাবার্ত্তা কি শুনিলে?"

শান্ত। বিস্তর শুনিলাম—কিন্তু তাহার কিছুই আপনার নিকট নিবেদন করিতে পারিলাম না।

পশু। কেন ?

শান্ত। যবনিকা ভাষায় পণ্ডিত নহি।

পশুপতি হাস্য করিলেন। শান্তশীল তখন কহিলেন, "মহম্মদ আলি এখানে যে আসিয়াছিলেন, তাহাতে বিপদ্ আশঙ্কা করিতেছি।"

শান্ত। তিনি অলক্ষিত হইয়া আসিতে পারেন নাই। তাঁহার আগমন কেহ কেহ জানিতে পারিয়াছে।

পশুপতি অত্যন্ত শঙ্কান্বিত হইয়া কহিলেন, "কিসে জানিলে ?"

শান্তশীল কহিলেন, "আমি শ্রীচরণ দর্শনে আসিবার সময় দেখিলাম যে, বৃক্ষতলে এক ব্যক্তি লুক্কায়িত হইল। তাহার যুদ্ধের সাজ। তাহার সঙ্গে কথোপকথনে বুঝিলাম যে, সে মহম্মদ আলিকে এ পুরীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে, অন্ধকারে, তাহাকে চিনিতে পারিলাম না।"

পশু। তার পর ?

শান্ত। তার পর দাস তাহাকে চিত্রগৃহে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়া আসিয়াছে।

পশুপতি চৌরোদ্ধরণিককে সাধুবাদ করিতে লাগিলেন; এবং কহিলেন, "কাল প্রাতে উঠিয়া সে ব্যক্তির প্রতি বিহিত করা যাইবেক। আজি রাত্রিতে সে

কারারুদ্ধই থাক্। এক্ষণে তোমাকে অন্য এক কার্য্য সাধন করিতে হইবে। যবন-সেনাপতির ইচ্ছা, অদ্য রাত্রিতে তিনি মগধরাজপুত্রের ছিন্ন মস্তক দর্শন করেন। তাহা এখনই সংগ্রহ করিবে।”

শান্ত। কার্য্য নিতান্ত সহজ নহে। রাজপুত্র পিঁপড়ে মাছি নন।

পশু। আমি তোমাকে একা যুদ্ধে যাইতে বলিতেছি না কতকগুলি লোক লইয়া তাঁহার বাড়ী আক্রমণ করিবে।

শান্ত। লোকে কি বলিবে ?

পশু। লোকে বলিবে, দস্যুতে তাঁহাকে মারিয়া গিয়াছে।

শান্ত। যে আজ্ঞা, আমি চলিলাম।

পশুপতি শান্তশীলকে পুরস্কার দিয়া বিদায় করিলেন। পরে গৃহাভ্যন্তরে যথা বিচিত্র সূক্ষ্ম কারুকার্য্য-খচিত মন্দিরে অষ্টভুজা মূর্ত্তি স্থাপিত আছে, তথায় গমন করিয়া প্রতিমাগ্রে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। গাত্রোত্থান করিয়া যুক্তকরে ভক্তিভাবে ইষ্টদেবীর স্তুতি করিয়া কহিলেন, “জননী! বিশ্বপালিনি! আমি অকূল সাগরে ঝাঁপ দিলাম—দেখিও মা! আমায় উদ্ধার করিও। আমি জননীস্বরূপা জন্মভূমি কখন দেবদ্বেষী যবনকে বিক্রয় করিব না। কেবলমাত্র এই আমার পাপাভিসন্ধি যে, অক্ষম প্রাচীন রাজার স্থানে আমি রাজা হইব। যেমন কণ্টকের দ্বারা কণ্টক উদ্ধার করিয়া পরে উভয় কণ্টককে দূরে ফেলিয়া দেয়, তেমনি যবন-সহায়তায় রাজ্যলাভ করিয়া রাজ্য-সহায়তায় যবনকে নিপাত করিব। ইহাতে পাপ কি মা ? যদি ইহাতে পাপ হয়, যাবজ্জীবন প্রজার সুখানুষ্ঠান করিয়া সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। জগৎপ্রসবিনি! প্রসন্ন হইয়া আমার কামনা সিদ্ধ কর।”

এই বলিয়া পশুপতি পুনরপি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন—শয্যাগৃহে যাইবার জন্য ফিরিয়া দেখিলেন—অপূর্ব্বদর্শন—।

সম্মুখে দ্বারদেশ ব্যপ্ত করিয়া, জীবনময়ী প্রতিমারূপিণী তরুণী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

পশুপতি প্রথমে চমকিত হইলেন—শিহরিয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই উচ্ছ্বাসোন্মুখ সমুদ্রবারিবৎ আনন্দে স্ফীত হইলেন।

তরুণী বাণীনিন্দিত স্বরে কহিলেন, “পশুপতি!”

পশুপতি দেখিলেন-মনোরমা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : মোহিনী

সেই রত্নপ্রদীপদীপ্ত দেবীমন্দিরে, চন্দ্রালোকবিভাসিত দ্বারদেশে, মনোরমাকে দেখিয়া, পশুপতির হৃদয় উচ্ছ্বাসোন্মুখ সমুদ্রের ন্যায় স্ফীত হইয়া উঠিল। মনোরমা নিতান্ত খর্ব্বাকৃতা নহে, তবে তাঁহাকে বালিকা বলিয়া বোধ হইত, তাহার হেতু এই যে, মুখকান্তি অনির্ব্বচনীয় কোমল, অনির্ব্বচনীয় মধুর, নিতান্ত বালিকা বয়সের ঔদার্য্যবিশিষ্ট; সুতরাং হেমচন্দ্র যে তাঁহার পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রম অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা অন্যায় হয় নাই। মনোরমার বয়ঃক্রম যথার্থ পঞ্চদশ, কি ষোড়শ, কি তদধিক, কি তন্ন্যুন, তাহা ইতিহাসে লেখে না, পাঠক মহাশয় স্বয়ং সিদ্ধান্ত করিবেন।

মনোরমার বয়স যতই হউক না কেন, তাঁহার রূপরাশি অতুল—চক্ষুতে ধরে না। বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে, সর্ব্বকালে সে রূপরাশি দুর্লভ। একে বর্ণ সোণার চাঁপা, তাহাতে ভুজঙ্গ-শিশুশ্রেণীর ন্যায় কুঞ্চিত অলকশ্রেণী মুখখানি বেড়িয়া থাকে; এক্ষণে বাপীজলসিঞ্চনে সে কেশ ঋজু হইয়াছে; অর্দ্ধচন্দ্রাকৃত নির্ম্মল ললাট, ভ্রমর-ভর-স্পন্দিত নীলপুষ্পতুল্য কৃষ্ণতার, চঞ্চল, লোচনযুগল; মুহুর্মুহুঃ আকুঞ্চন-বিস্ফারণ-প্রবৃত্ত রন্ধ্রযুক্ত সুগঠন নাসা; অধরৌষ্ঠ যেন প্রাতঃশিশিরে সিক্ত

প্রাতঃসূর্য্যের কিরণে প্রোদ্ভিন্ন রক্তকুসুমাবলীর স্তরযুগল তুল্য; কপোল যেন চন্দ্রকরোজ্জ্বল, নিতান্ত স্থির, গঙ্গাম্বুবিস্তারবৎ প্রসন্ন; শাবকহিংসাশঙ্কায় উত্তেজিতা হংসীর ন্যায় গ্রীবা—বেণী বাঁধিলেও সে গ্রীবার উপরে অবদ্ধ ক্ষুদ্র কুঞ্চিত কেশসকল আসিয়া কেলি করে। দ্বিরদ-রদ যদি কুসুমকোমল হইত, কিম্বা চম্পক যদি গঠনোপযোগী কাঠিন্য পাইত, কিম্বা চন্দ্রকিরণ যদি শরীরবিশিষ্ট হইত, তবে তাহাতে সে বাহুযুগল গড়িতে পারা যাইত,—সে হৃদয় কেবল সেই হৃদয়েই গড়া যাইতে পারিত। এ সকলই অন্য সুন্দরীর আছে। মনোরমার রূপরাশি অতুল কেবল তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন সৌকুমার্য্যের জন্য। তাঁহার বদন সুকুমার; অধর, ভ্রূযুগ, ললাট সুকুমার; সুকুমার কপোল; সুকুমার কেশ। অলকাবলী যে ভুজঙ্গশিশুরূপী সেও সুকুমার ভুজঙ্গশিশু। গ্রীবায়, গ্রীবাভঙ্গিতে, সৌকুমার্য্য; বাহুতে, বাহুর প্রক্ষেপে, সৌকুমার্য্য; হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে সেই সৌকুমার্য্য, সুকুমার চরণ, চরণবিন্যাস সুকুমার। গমন সুকুমার, বসন্তবায়ুসঞ্চালিত কুসুমিত লতার মন্দান্দোলন তুল্য; বচন সুকুমার, নিশীথসময়ে জলরাশিপার হইতে সমাগত বিরহ-সঙ্গীত তুল্য; কটাক্ষ সুকুমার, ক্ষণমাত্র জন্য মেঘমালামুক্ত সুধাংশুর কিরণসম্পাত তুল্য; আর ঐ যে মনোরমা দেবীগৃহদ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছেন,—পশুপতির মুখাবলোকন জন্য উন্নতমুখী, নয়নতারা ঊর্দ্ধস্থাপনস্পন্দিত, আর বাপীজলার্দ্র অবদ্ধ কেশরাশির কিয়দংশ এক হস্তে ধরিয়া এক চরণ ইষন্মাত্র অগ্রবর্ত্তী করিয়া, যে ভঙ্গীতে মনোরমা দাঁড়াইয়া আছে, ও ভঙ্গীও সুকুমার; নবীন সূর্য্যোদয়ে সদ্যঃপ্রফুল্লদলমালাময়ী নলিনীর প্রসন্ন ব্রীড়াতুল্য সুকুমার। সেই মাধুর্য্যময় দেহের উপর দেবীপার্শ্বস্থিত রত্নদীপের আলোকে পতিত হইল। পশুপতি অতৃপ্তনয়নে দেখিতে লাগিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ : মোহিতা

পশুপতি অতৃপ্তনয়নে দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে মনোরমার সৌন্দর্য্য-সাগরের এক অপূর্ব্ব মহিমা দেখিতে পাইলেন। যেমন সূর্য্যের প্রখর করমালায় হাস্যময় অম্বুরাশি মেঘসঞ্চারে ক্রমে ক্রমে গম্ভীর কৃষ্ণকান্তি প্রাপ্ত হয়, তেমনই পশুপাতি দেখিতে দেখিতে মনোরমার সৌকুমার্য্যময় মুখমণ্ডল গম্ভীর হইতে লাগিল। আর সে বালিকাসুলভ ঔদার্য্যব্যঞ্জক ভাব রহিল না। অপূর্ব্ব তেজোভিব্যক্তির সহিত প্রগল্‌ভ বয়সেরও দুর্লভ গাম্ভীর্য্য তাহাতে বিরাজ করিতে লাগিল। সরলতাকে ঢাকিয়া প্রতিভা উদিত হইল। পশুপতি কহিলেন, "মনোরমা, এত রাত্রিতে কেন আসিয়াছ ?—এ কি ? আজ তোমার এ ভাব কেন ?"

মনোরমা উত্তর করিলেন, "আমার কি ভাব দেখিলে ?"

প। তোমার দুই মূর্ত্তি—এক মূর্ত্তি আনন্দময়ী, সরলা বালিকা—সে মূর্ত্তিতে কেন আসিলে না?—সেইরূপে আমার হৃদয় শীতল হয়। আর তোমার এই মূর্ত্তি গম্ভীরা তেজস্বিনী প্রতিভাময়ী প্রখরবুদ্ধিশালিনী—এ মূর্ত্তি দেখিলে আমি ভীত হই। তখন বুঝিতে পারি যে, তুমি কেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছ। আজি তুমি এ মূর্ত্তিতে অমাাকে ভয় দেখাইতে কেন আসিয়াছ ?

ম। পশুপতি, তুমি এত রাত্রি জাগরণ করিয়া কি করিতেছ ?

প। আমি রাজকার্য্যে ব্যস্ত ছিলাম—কিন্তু তুমি—

ম। পশুপতি, আবার ? রাজকার্য্যে না নিজকার্য্যে ?

প। নিজকার্য্যই বল। রাজকার্য্যেই হউক, আর নিজকার্য্যেই হউক, আমি কবে না ব্যস্ত থাকি? তুমি আজি জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন ?

ম। আমি সকল শুনিয়াছি।

প। কি শুনিয়াছ ?

ম। যবনের সঙ্গে পশুপতির মন্ত্রণা—শান্তশীলের সঙ্গে মন্ত্রণা—দ্বারের পার্শ্বে থাকিয়া সকল শুনিয়াছি।

পশুপতির মুখমণ্ডল যেন মেঘান্ধকারে ব্যপ্ত হইল। তিনি বহুক্ষণ চিন্তামগ্ন থাকিয়া কহিলেন, "ভালই হইয়াছে। সকল কথাই আমি তোমাকে বলিতাম— না হয় তুমি আগে শুনিয়াছ। তুমি কোন্ কথা না জান ?"

ম। পশুপতি, তুমি আমাকে ত্যাগ করিলে ?

প। কেন, মনোরমা ? তোমার জন্যই আমি এ মন্ত্রণা করিয়াছি। আমি এক্ষণে রাজভৃত্য, ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারি না। এখন বিধবাবিবাহ করিলে জনসমাজে পরিত্যক্ত হইব; কিন্তু যখন আমি স্বয়ং রাজা হইব, তখন কে আমায় ত্যাগ করিবে ? যেমন বল্লালসেন কৌলীন্যের নূতন পদ্ধতি প্রচলিত করিয়াছিলেন, আমি সেইরূপ বিধবা-পরিণয়ের নূতন পদ্ধতি প্রচলিত করিব।

মনোরমা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "পশুপতি, সে সকল আমার স্বপ্ন মাত্র। তুমি রাজা হইলে, আমার সে স্বপ্ন ভঙ্গ হইবে। আমি কখনও তোমার মহিষী হইব না।"

প। কেন মনোরমা ?

ম। কেন ? তুমি রাজ্যভার গ্রহণ করিলে আর কি আমায় ভালবাসিবে ? রাজ্যই তোমার হৃদয়ে প্রধান স্থান পাইবে!—তখন আমার প্রতি তোমার অনাদর হইবে। তুমি যদি ভাল না বাসিলে—তবে আমি কেন তোমার পত্নীত্ব-শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িব ?

প। এ কথাকে কেন মনে স্থান দিতেছ ? আগে তুমি—পরে রাজ্য। আমার চিরকাল এইরূপ থাকিবে।

ম। রাজা হইয়া যদি তাহা কর, রাজ্য অপেক্ষা মহিষী যদি অধিক ভালবাস, তবে তুমি রাজ্য করিতে পারিবে না। তুমি রাজ্যচ্যুত হইবে। স্ত্রৈণ-রাজার রাজ্য থাকে না।

পশুপতি প্রশংসমান লোচনে মনোরমার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন; কহিলেন, "যাহার বামে এমন সরস্বতী, তাহার আশঙ্কা কি ? না হয়, তাহাই হউক। তোমার জন্য রাজ্য ত্যাগ করিব।"

মা। তবে রাজ্য গ্রহণ করিতেছ কেন ? ত্যাগের জন্য গ্রহণে ফল কি ?

প। তোমার পাণিগ্রহণ।

ম। সে আশা ত্যাগ কর। তুমি রাজ্যলাভ করিলে আমি কখনও তোমার পত্নী হইব না।

প। কেন, মনোরমা! আমি কি অপরাধ করিলাম ?

ম। তুমি বিশ্বাসঘাতক—আমি বিশ্বাসঘাতককে কি প্রকারে ভক্তি করিব ? কি প্রকারে বিশ্বাসঘাতককে ভালবাসিব ?

প। কেন, আমি কিসে বিশ্বাসঘাতক হইলাম ?

মা। তোমার প্রতিপালক প্রভুকে রাজ্যচ্যুত করিবার কল্পনা করিতেছ; শরণাগত রাজপুত্রকে মারিবার কল্পনা করিতেছ; ইহা কি বিশ্বাসঘাতকের কর্ম্ম নয় ? যে প্রভুর নিকট বিশ্বাস নষ্ট করিল, সে স্ত্রীর নিকট অবিশ্বাসী না হইবে কেন ?

পশুপতি নীরব হইয়া রহিলেন। মনোরমা পুনরপি বলিতে লাগিলেন, "পশুপতি, আমি মিনতি করিতেছি, এই দুর্ব্বুদ্ধি ত্যাগ কর।"

পশুপতি পূর্ব্ববৎ অধোবদনে রহিলেন। তাঁহার রাজ্যাকাঙ্ক্ষা এবং মনোরমাকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা উভয়ই গুরুতর। কিন্তু রাজ্যলাভের যত্ন করিলে মনোরমার প্রণয় হারাইতে হয়। সেও অত্যাজ্য। উভয় সঙ্কটে তাঁহার চিত্তমধ্যে গুরুতর চাঞ্চল্য জন্মিল। তাঁহার মতির স্থিরতা দূর হইতে লাগিল। "যদি মনোরমাকে পাই, ভিক্ষাও ভাল, রাজ্যে কাজ কি ?" এইরূপ পুনঃ পুনঃ মনে ইচ্ছা হইতে লাগিল। কিন্তু তখনই আবার ভাবিতে লাগিলেন, "কিন্তু তাহা হইলে লোকনিন্দা, জনসমাজে কলঙ্ক, জাতিনাশ হইবে; সকলের ঘৃণিত হইব। তাহা কি প্রকারে সহিব ?" পশুপতি নীরবে রহিলেন; কোন উত্তর দিতে পারিলেন না।

মনোরমা উত্তর না পাইয়া কহিতে লাগিল, "শুন পশুপতি, তুমি আমার কথায় উত্তর দিলে না। আমি চলিলাম। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে ইহজন্মে আমার সাক্ষাৎ হইবে না।"

এই বলিয়া মনোরমা পশ্চাৎ ফিরিল। পশুপতি রোদন করিয়া উঠিলেন।

অমনই মনোরমা আবার ফিরিল। আসিয়া, পশুপতির হস্তধারণ করিল। পশুপতি তাঁহার মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, তেজোগর্ব্ববিশিষ্টা, কুঞ্চিতভ্রূবীচিবিক্ষেপকারিণী সরস্বতী মূর্ত্তি আর নাই; সে প্রতিভা দেবী অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন; কুসুমসুকুমারী বালিকা তাঁহার হস্তধারণ করিয়া তাঁহার সঙ্গে রোদন করিতেছে।

মনোরমা কহিলেন, "পশুপতি, কাঁদিতেছ কেন ?"

পশুপতি চক্ষুর জল মুছিয়া কহিলেন, "তোমার কথায়।"

ম। কেন, আমি কি বলিয়াছি ?

প। তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছিলে।

ম। আর আমি এমন করিব না।

প। তুমি আমার রাজমহিষী হইবে ?

ম। হইব।

পশুপতির আনন্দসাগর উছলিয়া উঠিল। উভয়ে অশ্রুপূর্ণ লোচনে উভয়ের মুখপ্রতি চাহিয়া উপবেশন করিয়া রহিলেন। সহসা মনোরমা পক্ষিণীর ন্যায় গাত্রোত্থান করিয়া চলিয়া গেলেন।

দশম পরিচ্ছেদ : ফাঁদ

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, বাপীতীর হইতে হেমচন্দ্র মনোরমার অনুবর্ত্তী হইয়া যবন-সন্ধানে আসিতেছিলেন। মনোরমা ধর্ম্মাধিকারের গৃহ কিছু দূরে থাকিতে হেমচন্দ্রকে কহিলেন, "সম্মুখে এই অট্টালিকা দেখিতেছ ?"

হেম। দেখিতেছি।

মনো। ঐখানে যবন প্রবেশ করিয়াছে।

হেম। কেন ?

এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া মনোরমা কহিলেন, “তুমি এইখানে গাছের আড়ালে থাক। যবনকে এই স্থান দিয়া যাইতে হইবে।”

হেম। তুমি কোথায় যাইবে ?

মনো। আমিও এই বাড়ীতে যাইব।

হেমচন্দ্র স্বীকৃত হইলেন। মনোরমার আচরণ দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন। তাহার পরামর্শানুসারে পথিপার্শ্বে বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত হইয়া রহিলেন। মনোরমা গুপ্তপথে অলক্ষ্যে গৃহমধ্যে পবেশ করিলেন।

এই সময়ে শান্তশীল পশুপতির গৃহে আসিতেছিল। সে দেখিল যে, এক ব্যক্তি বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত হইল। শান্তশীল সন্দেহপ্রযুক্ত সেই বৃক্ষতলে গেল। তথায় হেমচন্দ্রকে দেখিয়া প্রথমে চৌর অনুমানে কহিল, “কে তুমি? এখানে কি করিতেছ ?” পরে তৎক্ষণে হেমচন্দ্রের বহুমূল্যের অলঙ্কারশোভিত যোদ্ধৃবেশ দেখিয়া কহিল, “আপনি কে ?”

হেমচন্দ্র কহিলেন, “আমি যে হই না কেন ?”

শা। আপনি এখানে কি করিতেছেন ?

হেম। আমি এখানে যবনানুসন্ধান করিতেছি।

শান্তশীল চমকিত হইয়া কহিল, “যবন কোথায় ?”

হে। এই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

শান্তশীল ভীত ব্যক্তির ন্যায় স্বরে কহিল, “এ গৃহে কেন ?”

হে। তাহা আমি জানি না।

শা। এ গৃহ কাহার ?

হেম। তাহা জানি না।

শা। তবে আপনি কি প্রকারে জানিলেন যে, এই গৃহে যবন প্রবেশ করিয়াছে ?

হেম। এই গৃহ আমার। যদি যবন ইহাতে প্রবেশ করিয়া থাকে, তবে কোন অনিষ্টকামনা করিয়া গিয়াছে, সন্দেহ নাই। আপনি যোদ্ধা এবং যবনবিদ্বেষী দেখিতেছি। যদি ইচ্ছা থাকে, তবে আমার সঙ্গে আসুন—উভয়ে চোরকে ধৃত করিব।

হেমচন্দ্র সম্মত হইয়া শান্তশীলের সঙ্গে চলিলেন। শান্তশীল সিংহদ্বার দিয়া পশুপতির গৃহে হেমচন্দ্রকে লইয়া প্রবেশ করিলেন এবং এক কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, “এই গৃহমধ্যে আমার সুবর্ণ রত্নাদি সকল আছে, আপনি ইহার প্রহরায় অবস্থিতি করুন! আমি ততক্ষণ সন্ধান করিয়া আসি, কোন্ স্থানে যবন লুক্কায়িত আছে।”

এই কথা বলিয়াই শান্তশীল সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এবং হেমচন্দ্র কোন উত্তর দিতে না দিতেই বাহির দিকে কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিলেন। হেমচন্দ্র ফাঁদে পড়িয়া বন্দী হইয়া রহিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ : মুক্ত

মনোরমা পশুপতির নিকট বিদায় হইয়াই দ্রুতপদে চিত্রগৃহে আসিল। পশুপতির সহিত শান্তশীলের কথোপকথন সময়ে শুনিয়াছিল যে, ঐ ঘরে হেমচন্দ্র রুদ্ধ হইয়াছিলেন। আসিয়াই চিত্রগৃহের দ্বারোন্মোচন করিল। হেমচন্দ্রকে কহিল, "হেমচন্দ্র, বাহির হইয়া যাও।"

হেমচন্দ্র গৃহের বাহিরে আসিলেন। মনোরমা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিল। তখন হেমচন্দ্র মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি রুদ্ধ হইয়াছিলাম কেন?"

ম। তাহা পরে বলিব।

হে। যে ব্যক্তি আমাকে রুদ্ধ করিয়াছিল, সে কে?

ম। শান্তশীল।

হে। শান্তশীল কে?

ম। চৌরোদ্ধরণিক।

হে। এই কি তাহার বাড়ী?

ম। না।

হে। এ কাহার বাড়ী?

ম। পরে বলিব।

হে। যবন কোথায় গেল?

ম। শিবিরে গিয়াছে।

হে। শিবির! কত যবন আসিয়াছে?

ম। পঁচিশ হাজার।

হে। কোথায় তাহাদের শিবির?

ম। মহাবনে।

হে। মহাবন কোথায়?

এই নগরের উত্তরে কিছু দূরে।

হেমচন্দ্র করলগ্নকপোল হইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

মনোরমা কহিল, "ভাবিতেছ কেন? তুমি কি তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে?"

হে। পঁচিশ হাজারের সঙ্গে একের যুদ্ধ সম্ভবে?

ম। তবে কি করিবে—ঘরে ফিরিয়া যাইবে?

হে। এখন ঘরে যাব না।

ম। কোথা যাবে?

হে। মহাবনে।

ম। যুদ্ধ করিবে না, তবে মহাবনে যাইবে কেন ?

হে। যবনদিগকে দেখিতে।

ম। যুদ্ধ করিবে না, তবে দেখিয়া কি হইবে ?

হে। দেখিলে জানিতে পারিব, কি উপায়ে তাহাদিগকে মারিতে পারিব।

মনোরমা চমকিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "বিশ হাজার মানুষ মারিবে ? কি সর্ব্বনাশ! ছি! ছি!"

হে। মনোরমা, তুমি এ সকল সংবাদ কোথায় পাইলে ?

ম। আরও সংবাদ আছে। আজি রাত্রিতে তোমাকে মারিবার জন্য তোমার ঘরে দস্যু আসিবে। আজি ঘরে যাইও না।

এই বলিয়া মনোরমা ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : অতিথি-সৎকার

হেমচন্দ্র গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া এক সুন্দর অশ্ব সজ্জিত করিয়া তদুপরি আরোহণ করিলেন; এবং অশ্বে কশাঘাত করিয়া মহাবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নগর পার হইলেন; তৎপরে প্রান্তর। প্রান্তরেরও কিয়দংশ পার হইলেন, এমন সময়ে অকস্মাৎ স্কন্ধদেশে গুরুতর বেদনা পাইলেন। দেখিলেন, স্কন্ধে একটি তীর বিদ্ধ হইয়াছে। পশ্চাতে অশ্বের পদধ্বনি শ্রুত হইল। ফিরিয়া দেখিলেন, তিন জন অশ্বারোহী আসিতেছে।

হেমচন্দ্র ঘোটকের মুখ ফিরাইয়া তাহাদিগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ফিরিবামাত্র দেখিলেন, প্রত্যেক অশ্বারোহী তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া এক এক শরসন্ধান করিল। হেমচন্দ্র বিচিত্র শিক্ষাকৌশলে করস্থ শূলান্দোলন দ্বারা তীরত্রয়ের আঘাত এককালে নিবারণ করিলেন।

অশ্বারোহিগণ পুনর্ব্বার একেবারে শরসংযোগ করিল। এবং তাহা নিবারিত হইতে না হইতেই পুনর্ব্বার শরত্রয় ত্যাগ করিল।

এইরূপ অবিরতহস্তে হেমচন্দ্রের উপর বাণক্ষেপ করিতে লাগিল। হেমচন্দ্র তখন বিচিত্র রত্নাদিমণ্ডিত চর্ম্ম হস্তে লইলেন, এবং তৎসঞ্চালন দ্বারা অবলীলাক্রমে সেই শরজালবর্ষণ নিরাকরণ করিতে লাগিলেন; কদাচিৎ দুই এক শর অশ্বশরীরে বিদ্ধ হইল মাত্র। স্বয়ং অক্ষত রহিলেন।

বিস্মিত হইয়া অশ্বারোহিত্রয় নিরস্ত হইল। পরস্পরে কি পরামর্শ করিতে লাগিল। হেমচন্দ্র সেই অবকাশে একজনের প্রতি এক শরত্যাগ করিলেন। সে অব্যর্থ সন্ধান। শর একজন অশ্বারোহীর ললাটমধ্যে বিদ্ধ হইল। সে অমনি অশ্বপৃষ্ঠচ্যুত হইয়া ধরাতলশায়িত হইল।

তৎক্ষণাৎ অপর দুই জনে অশ্বে কশাঘাত করিয়া, শূলযুগল প্রণত করিয়া হেমচন্দ্রের প্রতি ধাবমান হইল। এবং শূলক্ষেপযোগ্য নৈকট্য প্রাপ্ত হইলে শূলক্ষেপ করিল। যদি তাহারা হেমচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া শূল ত্যাগ করিত, তবে হেমচন্দ্রের বিচিত্র শিক্ষায় তাহা নিবারিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তাহা না করিয়া আক্রমণকারীরা হেমচন্দ্রের অশ্বপ্রতি লক্ষ্য করিয়া শূলত্যাগ করিয়াছিল। তত দূর অধঃপর্য্যন্ত হস্তসঞ্চালনে হেমচন্দ্রের বিলম্ব হইল। একের শূল নিবারিত হইল, অপরের নিবারিত হইল না। শূল অশ্বের গ্রীবাতলে বিদ্ধ হইল। সেই আঘাত প্রাপ্তিমাত্র সে রমণীয় ঘোটক মুমূর্ষ হইয়া ভূতলে পড়িল।

সুশিক্ষিতের ন্যায় হেমচন্দ্র পতনশীল অশ্ব হইতে লম্ফ দিয়া ভূতলে দাঁড়াইলেন। এবং পলকমধ্যে নিজ করস্থ করাল শূল উন্নত করিয়া কহিলেন, "আমার পিতৃদত্ত শূল শত্রুরক্ত পান না করিয়া কখন ফেরে নাই।" তাঁহার এই কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে তদগ্রে বিদ্ধ হইয়া দ্বিতীয় অশ্বারোহী ভূতলে পতিত হইল।

ইহা দেখিয়া তৃতীয় অশ্বারোহী অশ্বের মুখ ফিরাইয়া বেগে পলায়ন করিল। সেই শান্তশীল।

হেমচন্দ্র তখন অবকাশ পাইয়া নিজ স্কন্ধবিদ্ধ তীর মোচন করিলেন। তীর কিছু অধিক মাংসভেদ করিয়াছিল—মোচন মাত্র অতিশয় শোণিতশ্রুতি হইতে লাগিল। হেমচন্দ্র নিজ বস্ত্র দ্বারা তাহার নিবারণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহা নিষ্ফল হইল। ক্রমে হেমচন্দ্র রক্তক্ষতি হেতু দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন। তখন বুঝিলেন যে, যবন-শিবিরে গমনের অদ্য আর কোন সম্ভাবনা নাই। অশ্ব হত হইয়াছে—নিজবল হত হইতেছে। অতএব অপ্রসন্ন মনে, ধীরে ধীরে নগরাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

হেমচন্দ্র প্রান্তর পার হইলেন। তখন শরীর নিতান্ত অবশ হইয়া আসিল— শোণিতস্রোতে সর্ব্বাঙ্গ আর্দ্র হইল; গতিশক্তি রহিত হইয়া আসিতে লাগিল। কষ্টে নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আর যাইতে পারেন না। এক কুটীরের নিকট বটবৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। তখন রজনী প্রভাত হইয়াছে। রাত্রিজাগরণ—সমস্ত রাত্রির পরিশ্রম—রক্তস্রাবে বলহানি—এই সকল কারণে হেমচন্দ্রের চক্ষুতে পৃথিবী ঘুরিতে লাগিল। তিনি বৃক্ষমূলে পৃষ্ঠ রক্ষা করিলেন। চক্ষু মুদ্রিত হইল—নিদ্রা প্রবল হইল—চেতনা অপহৃত হইল। নিদ্রাবেশে স্বপ্নে যেন শুনিলেন, কে গায়িতেছে,

“কণ্টকে গঠিল বিধি মৃণাল অধমে।”

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ : “উনি তোমার কে ?”

যে কুটীরের নিকটস্থ বৃক্ষতলে বসিয়া হেমচন্দ্র বিশ্রাম করিতেছিলেন, সেই কুটীরমধ্যে এক পাটনী বাস করিত। কুটীরমধ্যে তিনটি ঘর। এক ঘরে পাটনীর পাকাদি সমাপন হইত। অপর ঘরে পাটনীর পত্নী শিশুসন্তান সকল লইয়া শয়ন করিত। তৃতীয় ঘরে পাটনীর যুবতী কন্যা রত্নময়ী আর অপর দুইটি স্ত্রীলোক শয়ন করিয়াছিল সেই দুইটি স্ত্রীলোক পাঠক মহাশয়ের নিকট পরিচিতা; মৃণালিনী আর গিরিজায়া নবদ্বীপে অন্যত্র আশ্রয় না পাইয়া এই স্থানে আশ্রয় লইয়াছিলেন।

একে একে তিনটি স্ত্রীলোক প্রভাতে জাগরিতা হইল। প্রথমে রত্নময়ী জাগিল। গিরিজায়াকে সম্বোধন করিয়া কহিল, “সই?”

গি। কি সই ?

র। তুমি কোথায় সই ?

গি। বিছানাসই।

র। উঠ না সই।

গি। না সই।

র। গায়ে জল দিব সই।

গি। জলসই ? ভাল সই, তাও সই।

র। নহিলে ছাড়ি কই।

গি। ছাড়িবে কেন সই ? তুমি আমার প্রাণের সই—তোমার মত আছে কই ? তুমি পারঘাটার রসমই—তোমায় না কইলে আর কারে কই ?

র। কথায় সই তুমি চিরজই; আমি তোমার কাছে বোবা হই, আর মিলাইতে পারি কই ?

গি। আরও মিল চাই ?

র। তোমার মুখে ছাই, আর মিলে কাজ নাই, আমি কাজে যাই।

এই বলিয়া রত্নময়ী গৃহকর্ম্মে গেল। মৃণালিনী এ পর্য্যন্ত কোন কথা কহেন নাই। এখন গিরিজায়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "ঠাকুরাণি, জাগিয়াছ ?"

মৃণালিনী কহিলেন, "জাগিয়াই আছি। জাগিয়াই থাকি।"

গি। কি ভাবিতেছিলে ?

মৃ। যাহা ভাবি।

গিরিজায়া তখন গম্ভীরভাবে কহিল, কি করিব ? আমার দোষ নাই। আমি শুনিয়াছি, তিনি এই নগর মধ্যে আছেন; এ পর্য্যন্ত সন্ধান পাই নাই। কিন্তু আমরা সবে দুই তিন দিন আসিয়াছি। শীঘ্র সন্ধান করিব।"

মৃ। গিরিজায়া, যদি এ নগরে সন্ধান না পাই? তবে যে এই পাটনীর গৃহে মৃত্যু পর্য্যন্ত বাস করিতে হইবে। আমার যে যাইবার স্থান নাই।

মৃণালিনী উপাধানে মুখ লুকাইলেন। গিরিজায়ারও গণ্ডে নীরবস্রুত অশ্রু বহিতে লাগিল।

এমন সময়ে রত্নময়ী শশব্যস্ত গৃহমধ্যে আসিয়া কহিল, "সই ! সই! দেখিয়া যাও। আমাদিগের বটতলায় কে ঘুমাইতেছে। আশ্চর্য্য পুরুষ!"

গিরিজায়া কুটীরদ্বারে দেখিতে আসিল। মৃণালিনীও কুটীরদ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া দেখিলেন। উভয়েই দৃষ্টিমাত্র চিনিল।

সাগর একেবারে উছলিয়া উঠিল। মৃণালিনী গিরিজায়াকে আলিঙ্গন করিলেন। গিরিজায়া গায়িল,

"কণ্টকে গঠিল বিধি মৃণাল অধমে।"

সেই ধ্বনি স্বপ্নবৎ হেমচন্দ্রের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। মৃণালিনী গিরিজায়ার কণ্ঠকণ্ডূয়ন দেখিয়া কহিলেন, "চুপ রাক্ষসী, আমাদিগকে দেখা দেওয়া হইবে না, ঐ উনি জাগরিত হইতেছেন। এই অন্তরাল হইতে দেখ, উনি কি করেন। উনি যেখানে যান, অদৃশ্যভাবে দূরে থাকিয়া উহার সঙ্গে যাও। —এ কি! উঁহার অঙ্গ রক্তময় দেখিতেছি কেন ? চল, তবে আমিও সঙ্গে চলিলাম।"

হেমচন্দ্রের ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল। প্রাতঃকাল উপস্থিত দেখিয়া তিনি শূলদণ্ডে ভর করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন, এবং ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে চলিলেন।

হেমচন্দ্র কিয়দ্দূর গেলে, মৃণালিনী আর গিরিজায়া তাঁহার অনুসরণার্থ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তখন রত্নময়ী জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরাণি, উনি তোমার কে ?"

মৃণালিনী কহিলেন, "দেবতা জানেন।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : প্রতিজ্ঞা—পর্ব্বতো বহ্নিমান্

বিশ্রাম করিয়া হেমচন্দ্র কিঞ্চিৎ সবল হইয়াছিলেন, । শোণিতস্রাবও কতক মন্দীভূত হইয়াছিল। শূলে ভর করিয়া হেমচন্দ্র স্বচ্ছন্দে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

গৃহে আসিয়া দেখিলেন, মনোরমা দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছেন।

মৃণালিনী ও গিরিজায়া অন্তরালে থাকিয়া মনোরমাকে দেখিলেন।

মনোরমা চিত্রার্পিত পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। দেখিয়া মৃণালিনী মনে মনে ভাবিলেন, "আমার প্রভু যদি রূপে বশীভূত হয়েন, তবে আমার সুখের নিশি প্রভাত হইয়াছে।" গিরিজায়া ভাবিল, "রাজপুত্র যদি রূপে মুগ্ধ হয়েন, তবে আমার ঠাকুরাণীর কপাল ভাঙ্গিয়াছে।"

হেমচন্দ্র মনোরমার নিকট আসিয়া কহিলেন, "মনোরমা— এমন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছ কেন ?"

মনোরমা কোন কথা কহিলেন না। হেমচন্দ্র পুনরপি ডাকিলেন, "মনোরমা!"

তথাপি উত্তর নাই; হেমচন্দ্র দেখিলেন, আকাশমার্গে তাঁহার স্থিরদৃষ্টি স্থাপিত হইয়াছে।

হেমচন্দ্র পুনরায় বলিলেন, "মনোরমা, কি হইয়াছে ?"

তখন মনোরমা ধীরে ধীরে আকাশ হইতে চক্ষু ফিরাইয়া হেমচন্দ্রের মুখমণ্ডলে স্থাপিত করিল। এবং কিয়ৎকাল অনিমেষলোচনে তৎপ্রতি চাহিয়া রহিল। পরে হেমচন্দ্রের রুধিরাক্ত পরিচ্ছদে দৃষ্টিপাত হইল। তখন মনোরমা বিস্মিত হইয়া কহিল, "এ কি হেমচন্দ্র! রক্ত কেন ? তোমার মুখ শুষ্ক; তুমি কি আহত হইয়াছ ?"

হেমচন্দ্র অঙ্গুলি দ্বারা স্কন্ধের ক্ষত দেখাইয়া দিলেন।

মনোরমা তখন হেমচন্দ্রের হস্ত ধারণ করিয়া গৃহমধ্যে পালঙ্কোপরি লইয়া গেল। এবং পলকমধ্যে বারিপূর্ণ ভৃঙ্গার আনীত করিয়া, একে একে হেমচন্দ্রের গাত্রবসন পরিত্যক্ত করাইয়া অঙ্গের রুধির সকল ধৌত করিল এবং গোজাতিপ্রলোভন নবদুর্ব্বাদল ভূমি হইতে ছিন্ন করিয়া আপন কুন্দনিন্দিত দন্তে চর্ব্বিত করিল। পরে তাহা ক্ষতমুখে প্রয়োগ করিয়া উপবীতাকারে বস্ত্র দ্বারা বাঁধিল। তখন কহিল, "হেমচন্দ্র! আর কি করিব ? তুমি সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়াছ, নিদ্রা যাইবে ?"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "নিদ্রাভাবে নিতান্ত কাতর হইতেছি।"

মৃণালিনী মনোরমার কার্য্য দেখিয়া চিন্তিতান্তঃকরণে গিরিজায়াকে কহিলেন, "এ কে গিরিজায়া ?"

গি। নাম শুনিলাম মনোরমা।

মৃ। এ কি হেমচন্দ্রের মনোরমা ?

গি। তুমি কি বিবেচনা করিতেছ ?

মৃ। আমি ভাবিতেছি, মনোরমাই ভাগ্যবতী। আমি হেমচন্দ্রের সেবা করিতে পারিলাম না, সে করিল। যে কার্য্যের জন্য আমার অন্তঃকরণ দগ্ধ হইতেছিল—মনোরমা সে কার্য্য সম্পন্ন করিল— দেবতারা উহাকে আয়ুষ্মতী করুন। গিরিজায়া, আমি গৃহে চলিলাম, আমার থাকা উচিত নহে। তুমি এই পল্লীতে থাক, হেমচন্দ্র কেমন থাকেন, সংবাদ লইয়া যাইও। মনোরমা যেই হউক, হেমচন্দ্র আমারই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : হেতু–ধূমাৎ

মনোরমা এবং হেমচন্দ্র গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে মৃণালিনীকে বিদায় দিয়া গিরিজায়া উপবনগৃহে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। যেখানে যেখানে বাতায়ন-পথ মুক্ত দেখিলেন, সেইখানে সাবধানে মুখ উন্নত করিয়া গৃহমধ্যে দৃষ্টিপাত করিলেন। এক কক্ষে হেমচন্দ্রকে শয়ানাবস্থায় দেখিতে পাইলেন; দেখিলেন, তাঁহার শয্যোপরি মনোরমা বসিয়া আছে। গিরিজায়া সেই বাতায়নতলে উপবেশন করিলেন। পূর্ব্বরাত্রে সেই বাতায়ন-পথে যবন হেমচন্দ্রকে দেখা দিয়াছিল।

বাতায়ন-তলে উপবেশনে গিরিজায়ার অভিপ্রায় এই ছিল যে, হেমচন্দ্র মনোরমায় কি কথোপকথন হয়, তাহা বিরলে থাকিয়া শ্রবণ করে। কিন্তু হেমচন্দ্র নিদ্রাগত, কোন কথোপকথনই ত হয় না। একাকী নীরবে সেই বাতায়ন-তলে বসিয়া গিরিজায়ার বড়ই কষ্ট হইল। কথা কহিতে পায় না, হাসিতে পায় না, ব্যঙ্গ করিতে পায় না, বড়ই কষ্ট—স্ত্রীরসনা কণ্ডূয়িত হইয়া উঠিল, মনে মনে ভাবিতে লাগিল—সেই পাপিষ্ঠ দিগ্বিজয়ই বা কোথায়? তাহাকে পাইলেও ত মুখ খুলিয়া বাঁচি। কিন্তু দিগ্বিজয় গৃহমধ্যে প্রভুর কার্য্যে নিযুক্ত ছিল—তাহারও সাক্ষাৎ পাইল না। তখন অন্য পাত্রাভাবে গিরিজায়া আপনার সহিত মনে মনে কথোপকথন আরম্ভ করিল। সে কথোপকথন শুনিতে পাঠক মহাশয়ের কৌতূহল জন্মিয়া থাকিলে, প্রশ্নোত্তরচ্ছলে তাহা জানাইতে পারি। গিরিজায়াই প্রশ্নকর্ত্রী, গিরিজায়াই উত্তরদাত্রী।

প্র। এলো, তুই বসিয়া কে লো?

উ। গিরিজায়া লো।

প্র। এখানে কেন লো?

উ। মৃণালিনীর জন্য লো।

প্র। মৃণালিনী তোর কে?

উ। কেউ না।

প্র। তবে তার জন্যে তোর এত মাথা ব্যথা কেন?

উ। আমার আর কাজ কি? বেড়াইয়া বেড়াইয়া কি করিব?

প্র। মৃণালিনীর জন্যে এখানে কেন?

উ। এখানে তা একটি শিকলীকাটা পাখী আছে।

প্র। পাখী ধরিয়া নিয়ে যাবি না কি?

উ। শিকলী কেটে থাকে ত ধরিয়া কি করিব? ধরিবই বা কিরূপে?

প্র। তবে বসিয়া কেন?

উ। দেখি, শিকল কেটেছে কি না।

প্র। কেটেছে না কেটেছে, জেনে কি হইবে?

উ। পাখীটির জন্যে মৃণালিনী প্রতিরাত্রে কত লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে—আজি না জানি কতই কাঁদ্‌বে, যদি ভাল সংবাদ লইয়া যাই, তবে অনেক রক্ষা হইবে।

প্র। আর যদি শিকল কেটে থাকে?

উ। মৃণালিনীকে বলিব যে, পাখী হাতছাড়া হয়েছে—রাধাকৃষ্ণ নাম শুনিবে ত আবার বনের পাখী ধরিয়া আন। পড়া পাখীর আশা ছাড়। পিঁজরা খালি

রাখিও না।

প্র। মর্ ভিখারীর মেয়ে! তুই আপনার মনের মত কথা বলিলি! মৃণালিনী যদি রাগ করিয়া পিঁজরা ভাঙ্গিয়া ফেলে ?

উ। ঠিক্ বলেছিস্ সই! তা সে পারে। বলা হবে না।

প্র। তবে এখানে বসিয়া রৌদ্রে পুড়িয়া মরিস্ কেন ?

উ। বড় মাথা ধরিয়াছে, তাই। এই যে মেয়েটা ঘরের ভিতর বসিয়া আছে—এ মেয়েটা বোবা—নহিলে এখনও কথা কয় না কেন ? মেয়েমানুষের মুখ এখনও বন্ধ ?

ক্ষণেক পরে গিরিজায়ার মনস্কাম সিদ্ধ হইল। হেমচন্দ্রের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন মনোরমা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, তোমার ঘুম হইয়াছে ?

হে। বেশ ঘুম হয়েছে।

ম। এখন বল, কি প্রকারে আঘাত পাইলে ?

তখন হেমচন্দ্র রাত্রির ঘটনা সংক্ষেপে বিবৃত করিলেন। শুনিয়া মনোরমা চিন্তা করিতে লাগিল।

হেমচন্দ্র কহিলেন, "তোমার জিজ্ঞাস্য শেষ হইল। এখন আমার কথার উত্তর দাও। কালি রাত্রিতে তুমি আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া গেলে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সকল বল।"

মনোরমা মৃদু মৃদু অস্ফুটস্বরে কি বলিল, গিরিজায়া তাহা শুনিতে পাইল না। বুঝিল, চুপি চুপি কি কথা হইল।

গিরিজায়া আর কোন কথা শুনিতে না পাইয়া গাত্রোত্থান করিল। তখন পুনর্ব্বার প্রশ্নোত্তরমালা মনোমধ্যে গ্রথিত হইতে লাগিল।

প্র। কি বুঝিলে ?

উ। কয়েকটি লক্ষণ মাত্র।

প্র। কি কি লক্ষণ ?

গিরিজায়া অঙ্গুলিতে গণিতে লাগিল, এক—মেয়েটি আশ্চর্য্য সুন্দরী; আগুনের কাছে ঘি কি গাঢ় থাকে ? দুই—মনোরমা ত হেমচন্দ্রকে ভালবাসে, নহিলে এত যত্ন করিল কেন ? তিন—একত্রে বাস। চারি—একত্রে রাত বেড়ান। পাঁচ—চুপি চুপি কথা।

প্র। মনোরমা ভালবাসে; হেমচন্দ্রের কি ?

উ। বাতাস না থাকিলে কি জলে ঢেউ হয় ? আমাকে যদি কেহ ভালবাসে; আমি তাহাকে ভালবাসিব সন্দেহ নাই।

প্র। কিন্তু মৃণালিনীরও তা হেমচন্দ্রকে ভালবাসে। তবে ত হেমচন্দ্র মৃণালিনীকে ভালবাসিবেই।

উ। যথার্থ। কিন্তু মৃণালিনী অনুপস্থিত, মনোরমা উপস্থিত।

এই ভাবিয়া গিরিজায়া ধীরে ধীরে গৃহের দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইল। তথায় একটি গীত আরম্ভ করিয়া কহিলেন, "ভিক্ষা দাও গো।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : উপনয়—বহ্নিব্যাপ্যো ধূমবান্

গিরিজায়া গীত গায়িল,

“কাহে সই জীয়ত মরত কি বিধান ?
ব্রজকি কিশোর সই, কাঁহা গেল ভাগই,
ব্রজজন টুটায়ল পরাণ।”

সঙ্গীতধ্বনি হেমচন্দ্রের কর্ণে প্রবেশ করিল। স্বপ্নশ্রুত শব্দের ন্যায় কর্ণে প্রবেশ করিল। গিরিজায়া আবার গায়িল,

ব্রজকি কিশোর সই, কাঁহা গেল ভাগই,
ব্রজবধূ টুটায়ল পরাণ।”

হেমচন্দ্র উন্মুখ হইয়া শুনিতে লাগিলেন।

গিরিজায়া আবার গায়িল,

“মিলি গেই নাগরী, ভুলি গেই মাধব,
রূপবিহীন গোপকুঙারী।
কো জানে পিয় সই, রসময় প্রেমিক,
হেন বঁধূ রূপকি ভিখারী ॥”

হেমচন্দ্র কহিলেন, “এ কি! মনোরমা, এ যে গিরিজায়ার স্বর! আমি চলিলাম।” এই বলিয়া লম্ফ দিয়া হেমচন্দ্র শয্যা হইতে অবতরণ করিলেন। গিরিজায়া গায়িতে লাগিল,

“আগে নাহি বুঝনু, রূপ দেখি ভুলনু,
হৃদি বৈনু চরণ যুগল।
যমুনা-সলিলে সই, অব তনু ডারব,
আন সখি ভখিব গরল ॥”

হেমচন্দ্র গিরিজায়ার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ব্যস্ত স্বরে কহিলেন, “গিরিজায়া! এ কি, গিরিজায়া! এখানে ? তুমি এখানে কেন ? তুমি এ দেশে কবে আসিলে ?”

গিরিজায়া কহিল, “আমি এখানে অনেক দিন আসিয়াছি।” এই বলিয়া আবার গায়িতে লাগিল,

“কিবা কাননবল্লরী, গল বেঢ়ি বাঁধই,
নবীন তমালে দিব ফাঁস।”

হেমচন্দ্র কহিলেন “তুমি এ দেশে কেন এলে ?”

গিরিজায়া কহিল, “ভিক্ষা আমার উপজীবিকা। রাজধানীতে অধিক ভিক্ষা পাইব বলিয়া আসিয়াছি—

কিবা কাননবল্লবী, গল বেঢ়ি বাঁধই,

নবীন তমালে দিব ফাঁস।”

হেমচন্দ্র গীতে কর্ণপাত না করিয়া কহিলেন, “মৃণালিনী কেমন আছে; দেখিয়া আসিয়াছ? গিরিজায়া গায়িতে লাগিল,

“নহে—শ্যাম শ্যাম শ্যাম শ্যাম, শ্যাম নাম জপয়ি,
ছার তনু করব বিনাশ।”

হেমচন্দ্র কহিলেন, “তোমার গীত রাখ। আমার কথার উত্তর দাও। মৃণালিনী কেমন আছে, দেখিয়া আসিয়াছ?”

গিরিজায়া কহিল, “মৃণালিনীকে আমি দেখিয়া আসি নাই। এ গীত আপনার ভাল না লাগে, অন্য গীত গায়িতেছি—

“এ জনমের সঙ্গে কি সই জনমের সাধ ফুরাইবে।
কিবা জন্ম জন্মান্তরে, এ সাধ মোর পূরাইবে ॥”

হেমচন্দ্র কহিলেন, “গিরিজায়া, তোমাকে মিনতি করিতেছি—গান রাখ, মৃণালিনীর সংবাদ বল।”

গি। কি বলিব?

হে। মৃণালিনীকে কেন দেখিয়া আইস নাই?

গি। গৌড়নগরে তিনি নাই।

হে। কেন? কোথায় গিয়াছেন?

গি। মথুরায়।

হে। মথুরায়? মথুরায় কাহার সঙ্গে গেলেন? কি প্রকারে গেলেন? কেন গেলেন?

গি। তাঁহার পিতা কি প্রকারে সন্ধান পাইয়া লোক পাঠাইয়া লইয়া গিয়াছেন। বুঝি তাঁহার বিবাহ উপস্থিত। বুঝি বিবাহ দিতে লইয়া গিয়াছেন।

হে। কি? কি করিতে?

গি। মৃণালিনীর বিবাহ দিতে তাঁহার পিতা তাঁহাকে লইয়া গিয়াছেন।

হেমচন্দ্র মুখ ফিরাইলেন। গিরিজায়া সে মুখ দেখিতে পাইল না; আর যে হেমচন্দ্রের স্কন্ধস্থ ক্ষতমুখ ছুটিয়া বন্ধনবস্ত্র রক্তে প্লাবিত হইতেছিল, তাঁহাও দেখিতে পাইল না। সে পূর্ব্বমত গায়িল,

“বিধি তোরে সাধি শুন, জন্ম যদি দিবে পুন,
আমারে আবার যেন, রমণী জনম দিবে।
লাজ ভয় তেয়াগিব, এ সাধ মোর পুরাইব,
সাগর ছেঁচে রতন নিব, কণ্ঠে রাখ্‌ব নিশি দিবে ॥”

হেমচন্দ্র মুখ ফিরাইলেন। বলিলেন, “গিরিজায়া, তোমার সংবাদ শুভ। উত্তর হইয়াছে।”

এই বলিয়া হেমচন্দ্র গৃহমধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। গিরিজায়ার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। গিরিজায়া মনে করিয়াছিল, মিছা করিয়া মৃণালিনীর

বিবাহের কথা বলিয়া সে হেমচন্দ্রের পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। মনে করিয়াছিল যে, মৃণালিনীর বিবাহ উপস্থিত শুনিয়া হেমচন্দ্র বড় কাতর হইবে, বড় রাগ করিবে। কৈ, তা ত কিছুই হইল না। তখন গিরিজায়া কপালে করাঘাত করিয়া ভাবিল, "হায় কি করিলাম! কেন অনর্থক এ মিথ্যা রটনা করিলাম। হেমচন্দ্র ত সুখী হইল দেখিতেছি—বলিয়া গেল—সংবাদ শুভ। এখন ঠাকুরাণীর দশা কি হইবে ?" হেমচন্দ্র যে কেন গিরিজায়াকে বলিলেন, "তোমার সংবাদ শুভ, তাহা, গিরিজায়া ভিখারিণী বৈ ত নয়—কি বুঝিবে ? যে ক্রোধভরে হেমচন্দ্র, এই মৃণালিনীর জন্য গুরুদেবের প্রতি শরসন্ধানে উদ্যত হইয়াছিলেন, সেই দুর্জ্জয় ক্রোধ হৃদয়মধ্যে সমুদিত হইল। অভিমানাধিক্যে, দুর্দ্দম ক্রোধাবেগে, হেমচন্দ্র গিরিজায়াকে বলিলেন, "তোমার সংবাদ শুভ।"

গিরিজায়া তাহা বুঝিতে পারিল না। মনে করিল, এই ষষ্ঠ লক্ষণ। কেহ তাহাকে ভিক্ষা দিল না; সেও ভিক্ষার প্রতীক্ষা করিল না। "শিকলী কাটিয়াছে" সিদ্ধান্ত করিয়া গৃহাভিমুখে চলিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : আর একটি সংবাদ

সেই দিন মাধবাচার্য্যের পর্য্যটন সমাপ্ত হইল। তিনি নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। তথায় প্রিয় শিষ্য হেমচন্দ্রকে দর্শনদান করিয়া চরিতার্থ করিলেন। এবং আশীর্ব্বাদ, আলিঙ্গন, কুশলপ্রশ্নাদির পরে বিরলে উভয়ের উদ্দেশ্য সাধনের কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

আপন ভ্রমণবৃত্তান্ত সবিস্তারে বিবৃত করিয়া মাধবাচার্য্য কহিলেন, "এত শ্রম করিয়া কতক দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি। এতদ্দেশে অধীন রাজগণের মধ্যে অনেকেই রণক্ষেত্রে সসৈন্যে সেন রাজার সহায়তা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। অচিরাৎ সকলে আসিয়া নবদ্বীপে সমবেত হইবেন।"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "তাহারা অদ্যই এ স্থলে না আসিলে সকলই বিফল হইবে। যবনসেনা আসিয়াছে, মহাবনে অবস্থিতি করিতেছে। আজি কালি নগর আক্রমণ করিবে।"

মাধবাচার্য্য শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "গৌড়েশ্বরের পক্ষ হইতে কি উদ্যম হইয়াছে ?"

হে। কিছুই না। বোধ হয় রাজসন্নিধানে এ সংবাদ পর্য্যন্ত প্রচার হয় নাই। আমি দৈবাৎ কালি এ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি।

মা। এ বিষয় তুমি রাজগোচর করিযা সৎপরামর্শ দাও নাই কেন ?

হে। সংবাদপ্রাপ্তির পরেই পথিমধ্যে দস্যু কর্ত্তৃক আহত হইয়া রাজপথে পড়িয়াছিলাম। এই মাত্র গৃহে আসিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতেছি। বলহানিপ্রযুক্ত রাজসমক্ষে যাইতে পারি নাই। এখনই যাইতেছি।

মা। তুমি এখন বিশ্রাম কর। আমি রাজার নিকট যাইতেছি। পশ্চাৎ যেরূপ হয় তোমাকে জানাইব।

এই বলিয়া মাধবাচার্য্য গাত্রোত্থান করিলেন।

তখন হেমচন্দ্র বলিলেন, "প্রভু! আপনি গৌড় পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন শুনিলাম—"

মাধবাচার্য্য অভিপ্রায় বুঝিয়া কহিলেন, "গিয়াছিলাম। তুমি মৃণালিনীর সংবাদ কামনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছ ? মৃণালিনী তথায় নাই।"

হে। কোথায়া গিয়াছে ?

মা। তাহা আমি অবগত নহি, কেহ সংবাদ দিতে পারিল না।

হে। কেন গিয়াছে ?

মা। বৎস! সে সকল পরিচয় যুদ্ধান্তে দিব।

হেমচন্দ্র ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন, "স্বরূপ বৃত্তান্ত আমাকে জানাইলে, আমি যে মর্ম্মপীড়ায় কাতর হইব, সে আশঙ্কা করিবেন না। আমিও কিয়দংশ শ্রবণ করিয়াছি। যাহা অবগত আছেন, তাহা নিঃসঙ্কোচে আমার নিকট প্রকাশ করুন।"

মাধবাচার্য্য গৌড়নগরে গমন করিলে হৃষীকেশ তাঁহাকে আপন জ্ঞানমত মৃণালিনীর বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিয়াছিলেন। তাহাই প্রকৃত বৃত্তান্ত বলিয়া মাধবাচার্য্যেরও বোধ হইয়াছিল; মাধবাচার্য্য কস্মিন্ কালে স্ত্রীজাতির অনুরাগী নহেন—সুতরাং স্ত্রীচরিত্র বুঝিতেন না। এক্ষণে হেমচন্দ্রের কথা শুনিয়া তাঁহার বোধ হইল যে, হেমচন্দ্র সেই বৃত্তান্তই কতক কতক শ্রবণ করিযা মৃণালিনীর কামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন—অতএব কোন নূতন মনঃপীড়ার সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া, পুনর্ব্বার আসনগ্রহণপূর্ব্বক হৃষীকেশের কথিত বিবরণ হেমচন্দ্রকে শুনাইতে লাগিলেন।

হেমচন্দ্র অধোমুখে করতলোপরি ভ্রূকুটিকুটিল ললাট সংস্থাপিত করিয়া নিঃশব্দে সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। মাধবাচার্য্যের কথা সমাপ্ত হইলেও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না। সেই অবস্থাতেই রহিলেন। মাধবাচার্য্য ডাকিলেন, "হেমচন্দ্র!" কোন উত্তর পাইলেন না। পুনরপি ডাকিলেন, "হেমচন্দ্র!" তথাপি নিরুত্তর।

তখন মাধবাচার্য্য গাত্রোত্থান করিয়া হেমচন্দ্রের হস্ত ধারণ করিলেন; অতি কোমল, স্নেহময় স্বরে কহিলেন, "বৎস! তাত! মুখ তোল, আমার সঙ্গে কথা কও!"

হেমচন্দ্র মুখ তুলিলেন। মুখ দেখিয়া মাধবাচার্য্যও ভীত হইলেন। মাধবাচার্য্য কহিলেন, "আমার সহিত আলাপ কর। ক্রোধ হইয়া থাকে, তাহা ব্যক্ত কর।"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "কাহার কথায় বিশ্বাস করিব ? হৃষীকেশ একরূপ কহিয়াছে। ভিখারিণী আর এক প্রকার বলিল।"

মাধবাচার্য্য কহিলেন, "ভিখারিণী কে? সে কি বলিয়াছে ?"

হেমচন্দ্র অতি সংক্ষেপে উত্তর দিলেন।

মাধবাচার্য্য সঙ্কুচিত স্বরে কহিলেন, "হৃষীকেশেরই কথা মিথ্যা বোধ হয়।"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "হৃষীকেশের প্রত্যক্ষ।"

তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পিতৃদত্ত শূল হস্তে লইলেন। কম্পিত কলেবরে গৃহমধ্যে নিঃশব্দে পাদচরণ করিতে লাগিলেন।

আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভাবিতেছ ?"

হেমচন্দ্র করস্থ শূল দেখাইয়া কহিলেন, "মৃণালিনীকে এই শূলে বিদ্ধ করিব।"

মাধবাচার্য্য তাঁহার মুখকান্তি দেখিয়া ভীত হইয়া অপসৃত হইলেন।

প্রাতে মৃণালিনী বলিয়া গিয়াছিলেন, "হেমচন্দ্র আমারই।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : "আমি ত উন্মাদিনী"

অপরাহ্ণে মাধবাচার্য্য প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি সংবাদ আনিলেন যে, ধর্ম্মাধিকার প্রকাশ করিয়াছেন, যবনসেনা আসিয়াছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বজিত রাজ্যে বিদ্রোহের সম্ভাবনা শুনিয়া যবনসেনাপতি সন্ধিসংস্থাপনে ইচ্ছুক হইয়াছেন। আগামী কল্য তাঁহারা দূত প্রেরণ করিবেন। দূতের আগমন অপেক্ষা করিয়া কোন যুদ্ধোদ্যম হইতেছে না। এই সংবাদ দিয়া মাধবাচার্য্য কহিলেন, এই কুলাঙ্গার রাজা ধর্ম্মাধিকারের বুদ্ধিতে নষ্ট হইবে।"

কথা হেমচন্দ্রের কর্ণে প্রবেশলাভ করিল কি না সন্দেহ। তাঁহাকে বিমনা দেখিয়া মাধবাচার্য্য বিদায় হইলেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে মনোরমা হেমচন্দ্রের গৃহে প্রবেশ করিল। হেমচন্দ্রকে দেখিয়া মনোরমা কহিল, "ভাই! আজ তুমি অমন কেন ?"

হেম। কেমন আমি ?

মনো। তোমার মুখখানা শ্রাবণের আকাশের মত অন্ধকার; ভাদ্র মাসের গঙ্গার মত রাগে ভরা; অত ভ্রূকুটি করিতেছ কেন ? চক্ষের পলক নাই কেন—আর দেখি—তাই ত, চোখে জল; তুমি কেঁদেছ ?

হেমচন্দ্র মনোরমার মুখপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন; আবার চক্ষু অবনত করিলেন; পুনর্ব্বার উন্নত গবাক্ষপথে দৃষ্টি করিলেন, আবার মনোরমার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। মনোরমা বুঝিল যে, দৃষ্টির এইরূপ গতির কোন উদ্দেশ্য নাই। যখন কথা কণ্ঠাগত, অথচ বলিবার নহে, তখনই দৃষ্টি এইরূপ হয়। মনোরমা কহিল, "হেমচন্দ্র, তুমি কেন কাতর হইয়াছ ? কি হইয়াছে ?" হেমচন্দ্র কহিলেন, "কিছু না।"

মনোরমা প্রথমে কিছু বলিল না—পরে আপনা আপনি মৃদু মৃদু কথা কহিতে লাগিল, "কিছু না—বলিবে না! ছি! ছি! বুকের ভিতর বিছা পুষিবে!" বলিতে বলিতে মনোরমার চক্ষু দিয়া এক বিন্দু বারি বহিল;—পরে অকস্মাৎ হেমচন্দ্রের মুখপ্রতি চাহিয়া কহিল, "আমাকে বলিবে না কেন ? আমি যে তোমার ভগিনী।"

মনোরমার মুখের ভাবে, শান্তদৃষ্টিতে এত যত্ন, এত মৃদুতা, এত সহৃদয়তা প্রকাশ পাইল যে, হেমচন্দ্রের অন্তঃকরণ দ্রবীভূত হইল। তিনি কহিলেন, "আমার যে যন্ত্রণা, তাহা ভগিনীর নিকট কথনীর নহে।"

মনোরমা কহিল, "তবে আমি ভগিনী নহি।"

হেমচন্দ্র কিছুতেই উত্তর করিলেন না। তথাপি প্রত্যাশাপন্ন হইয়া মনোরমা তাঁহার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল। কহিল, "আমি তোমার কেহ নহি।"

হেম। আমার দুঃখ ভগিনীর অশ্রাব্য—অপরেরও অশ্রাব্য।

হেমচন্দ্রের কণ্ঠস্বর করুণাময়—নিতান্ত আধিব্যক্তিপরিপূর্ণ; তাহা মনোরমার প্রাণের ভিতর গিয়া বাজিল। তখনই যে স্বর পরিবর্তন হইল, নয়নে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল—অধর দংশন করিয়া হেমচন্দ্র কহিলেন, "আমার দুঃখ কি? দুঃখ কিছুই না। আমি মণি ভ্রমে কালসাপ কণ্ঠে ধরিয়াছিলাম এখন তাহা ফেলিয়া দিয়াছি।"

মনোরমা আবার পূর্ব্ববৎ হেমচন্দ্রের প্রতি অনিমেষলোচনে চাহিয়া রহিল। ক্রমে তাহার মুখমণ্ডলে অতি মধুর, অতি সকরুণ হাস্য প্রকটিত হইল। বালিকা প্রগল্‌ভতাপ্রাপ্ত হইল। সূর্য্যরশ্মির অপেক্ষা যে রশ্মি সমুজ্জ্বল, তাহার কিরীট পরিয়া প্রতিভাদেবী দেখা দিলেন। মনোরমা কহিল, "বুঝিয়াছি। তুমি না বুঝিয়া ভালবাস, তাহার পরিণাম ঘটিয়াছে।"

হেম। ভালবাসিতাম।

হেমচন্দ্র বর্ত্তমানের পরিবর্ত্তে অতীতকাল ব্যবহার করিলেন। অমনি নীরবে নিঃস্রুত অশ্রুজলে তাঁহার মুখমণ্ডল ভাসিয়া গেল।

মনোরমা বিরক্ত হইল। বলিল, "ছি! ছি! প্রতারণা! যে পরকে প্রতারণা করে, সে বঞ্চক মাত্র। যে আত্মপ্রতারণা করে, তাহার সর্ব্বনাশ ঘটে।" মনোরমা

বিরক্তিবশতঃ আপন অলকদাম চম্পকাঙ্গুলিতে জড়িত করিয়া টানিতে লাগিল।

হেমচন্দ্র বিস্মিত হইলেন, কহিলেন, "কি প্রতারণা করিলাম ?"

মনোরমা কহিল, "ভালবাসিতাম কি ? তুমি ভালবাস। নহিলে কাঁদিলে কেন ? কি ? আজি তোমার স্নেহের পাত্র অপরাধী হইয়াছে বলিয়া তোমার ভালবাসা গিয়াছে ? কে তোমায় এমন প্রবোধ দিয়াছে ?" বলিতে বলিতে মনোরমার প্রৌঢ়ভাবাপন্ন মুখকান্তি সহসা প্রফুল্ল পদ্মবৎ অধিকতর ভাবব্যঞ্জক হইতে লাগিল; চক্ষু অধিক জ্যোতিঃস্ফুরৎ হইতে লাগিল, কণ্ঠস্বর অধিকতর পরিস্ফুট, আগ্রহকম্পিত হইতে লাগিল; বলিতে লাগিল, !এ কেবল বীরদম্ভকারী পুরুষদের দর্প মাত্র। অহঙ্কার করিয়া আগুন নিবান যায় ? তুমি বালির বাঁধ দিয়া এই কলপরিপ্লাবনী গঙ্গার বেগ রোধ করিতে পারিবে, তথাপি তুমি প্রণয়িনীকে পাপিষ্ঠা মনে করিয়া কখনও প্রণয়ের বেগ রোধ করিতে পারিবে না। হা কৃষ্ণ! মানুষ সকলেই প্রতারক!"

হেমচন্দ্র বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন, "আমি ইহাকে এক দিন বালিকা মনে করিয়াছিলাম!"

মনোরমা কহিতে লাগিল, "তুমি পুরাণ শুনিয়াছ ? আমি পণ্ডিতের নিকট তাহার গূঢ়ার্থ সহিত শুনিয়াছি। লেখা আছে, ভগীরথ গঙ্গা আনিয়াছিলেন; এক দাম্ভিক মত্ত হস্তী তাহার বেগ সংবরণ করিতে গিয়া ভাসিয়া গিয়াছিল। ইহার অর্থ কি ? গঙ্গা প্রেমপ্রবাহস্বরূপ; ইহা জগদীশ্বর-পদ্ম-নিঃসৃত, ইহা জগতে পবিত্র,—যে ইহাতে অবগাহন করে, সেই পুণ্যময় হয়। ইনি মৃত্যুঞ্জয়-জটা-বিহারিণী; যে মৃত্যুকে জয় করিতে পারে, সেও প্রণয়কে মস্তকে ধারণ করে। আমি যেমন শুনিয়াছি, ঠিক সেইরূপ বলিতেছি। দাম্ভিক হস্তী দম্ভের অবতারস্বরূপ। সে প্রণয়বেগে ভাসিয়া যায়। প্রণয় প্রথমে একমাত্র পথ অবলম্বন করিয়া উপযুক্ত সময়ে শতমুখী হয়; প্রণয় স্বভাবসিদ্ধ হইলে, শত পাত্রে ন্যাস্ত হয়— পরিশেষে সাগরসঙ্গমে লয়প্রাপ্ত হয়—সংসারস্থ সর্ব্বজীবে বিলীন হয়।"

হে। তোমার উপদেষ্টা কি বলিয়াছেন, প্রণয়ের পাত্রাপাত্র নাই ? পাপাসক্তকে কি ভালবাসিতে হইবে ?

ম। পাপাসক্তকে ভালবাসিতে হইবে। প্রণয়ের পাত্রাপাত্র নাই। সকলকেই ভালবাসিবে, প্রণয় জন্মিলেই তাহাকে যত্নে স্থান দিবে; কেন না, প্রণয় অমূল্য। ভাই, যে ভাল, তাকে কে না ভালবাসে ? যে মন্দ তাকে যে আপনা ভুলিয়া ভালবাসে, আমি তাকে বড় ভালবাসি। কিন্তু আমি ত উন্মাদিনী।

হেমচন্দ্র বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "মনোরমা, এ সকল তোমায় কে শিখাইল ? তোমার উপদেষ্টা অলৌকিক ব্যক্তি।"

মনোরমা মুখাবনত করিয়া কহিলেন, "তিনি সর্ব্বজ্ঞানী, কিন্তু—"

হে। কিন্তু কি ?

ম। তিনি অগ্নিস্বরূপ—আলো করেন, কিন্তু দগ্ধও করেন।

মনোরমা ক্ষণেক মুখাবনত করিয়া নীরব হইয়া রহিল।

হেমচন্দ্র বলিলেন, "মনোরমা, তোমার মুখ দেখিয়া, আর তোমার কথা শুনিয়া, আমার বোধ হইতেছে, তুমি ভালবাসিয়াছ। বোধ হয়, যাঁহাকে তুমি অগ্নির সহিত তুলনা করিলে, তিনিই তোমার প্রণয়াধিকারী।"

মনোরমা পূর্ব্বমত নীরব রহিল। হেমচন্দ্র পুনরপি বলিতে লাগিলেন, "যদি ইহা সত্য হয়, তবে আমার একটি কথা শুন। স্ত্রীলোকের সতীত্বের অধিক আর ধর্ম্ম নাই; যে স্ত্রীর সতীত্ব নাই, সে শূকরীর অপেক্ষাও অধম। সতীত্বের হানি কেবল কার্য্যেই ঘটে, এমন নহে; স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের চিন্তামাত্রও সতীত্বের বিঘ্ন। তুমি বিধবা, যদি স্বামী ভিন্ন অপরকে মনেও ভাব, তবে তুমি ইহলোকে পরলোকে স্ত্রীজাতির অধম হইয়া থাকিবে। অতএব সাবধান হও। যদি কাহারও প্রতি চিত্ত নিবিষ্ট থাকে, তবে তাহাকে বিস্মৃত হও।"

মনোরমা উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল; পরে মুখে অঞ্চল দিয়া হাসিতে লাগিল, হাসি বন্ধ হয় না। হেমচন্দ্র কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন হইলেন, কহিলেন, "হাসিতেছ কেন ?"

মনোরমা কহিলেন, "ভাই, এই গঙ্গাতীরে গিয়া দাঁড়াও; গঙ্গাকে ডাকিয়া কহ, গঙ্গে, তুমি পর্ব্বতে ফিরে যাও।"

হে। কেন ?

ম। স্মৃতি কি আপন ইচ্ছাধীন ? রাজপুত্র, কালসর্পকে মনে করিয়া কি সুখ ? কিন্তু তথাপি তুমি তাহাকে ভুলিতেছ না কেন ?

হে। তাহার দংশনের জ্বালায়।

ম। আর সে যদি দংশন না করিত ? তবে কি তাহাকে ভুলিতে ?

হেমচন্দ্র উত্তর করিলেন না। মনোরমা বলিতে লাগিল, "তোমার ফুলের মালা কালসাপ হইয়াছে, তবু তুমি ভুলিতে পারিতেছ না; আমি, আমি ত পাগল—আমি আমার পুষ্পহার কেন ছিঁড়িব ?"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "তুমি এক প্রকার অন্যায় বলিতেছ না। বিস্মৃতি স্বেচ্ছাধীন ক্রিয়া নহে; লোক আত্মগরিমায় অন্ধ হইয়া পরের প্রতি যে সকল উপদেশ করে, তন্মধ্যে 'বিস্মৃত হও' এই উপদেশের অপেক্ষা হাস্যস্পদ আর কিছুই নাই। কেহ তাহাকে বলে না, অর্থচিন্তা ছাড়; যশের ইচ্ছা ছাড়; জ্ঞানচিন্তা ছাড়; ক্ষুধানিবারণেচ্ছা ত্যাগ কর; তৃষ্ণানিবারণেচ্ছা ত্যাগ কর; নিদ্রা ছাড়; তবে কেন বলিবে, ভালবাসা ছাড় ? ভালবাসা কি এ সকল অপেক্ষা ছোট ? এ সকল অপেক্ষা প্রণয় ন্যূন নহে—কিন্তু ধর্ম্মের অপেক্ষা ন্যূন বটে। ধর্ম্মের জন্য প্রেমকে সংহার করিবে। স্ত্রীর পরম ধর্ম্ম সতীত্ব। সেই জন্য বলিতেছি, যদি পার, প্রেম সংহার কর।"

ম। আমি অবলা; জ্ঞানহীনা; বিবশা; আমি ধর্ম্মাধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা জানি না। আমি এইমাত্র জানি, ধর্ম্ম ভিন্ন প্রেম জন্মে না।

হে। সাবধান মনোরমা! বাসনা হইতে ভ্রান্তি জন্মে; ভ্রান্তি ইহতে অধর্ম্ম জন্মে। তোমার ভ্রান্তি পর্য্যন্ত হইয়াছে। তুমি বিবেচনা করিয়া বল দেখি, তুমি যদি ধর্ম্মে একের পত্নী, মনে অন্যের পত্নী হইলে, তবে তুমি দ্বিচারিণী হইলে কি না ?

গৃহমধ্যে হেমচন্দ্রের অসিচর্ম্ম ঝুলিতেছিল; মনোরমা চর্ম্ম হস্তে লইয়া কহিল, "ভাই, হেমচন্দ্র, তোমার এ ঢাল কিসের চামড়া ?"

হেমচন্দ্র হাস্য করিলেন। মনোরমার মুখপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন, বালিকা!

সপ্তম পরিচ্ছেদ : গিরিজায়ার সংবাদ

গিরিজায়া যখন পাটনীর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তখন প্রাণান্তে হেমচন্দ্রের নবানুরাগের কথা মৃণালিনীর সাক্ষাতে ব্যক্ত করিবে না স্থির করিয়াছিল। মৃণালিনী তাহার আগমন প্রতীক্ষায় পিঞ্জরে বদ্ধ বিহঙ্গীর ন্যায় চঞ্চলা হইয়া রহিয়াছিলেন; গিরিজায়াকে দেখিবামাত্র কহিলেন, "বল গিরিজায়া, কি দেখিলে ? হেমচন্দ্র কেমন আছেন ?"

গিরিজায়া কহিল, "ভাল আছেন।"

মৃ। কেন, অমন করিয়া বলিলে কেন ? তোমার কথায় উৎসাহ নাই কেন ? যেন দুঃখিত হইয়া বলিতেছ; কেন ?

গি। সে কি?

মৃ। গিরিজায়া, আমাকে প্রতারণা করিও না; হেমচন্দ্র কি ভাল হয়েন নাই? তাহা ইহলে আমাকে স্পষ্ট করিয়া বল। সন্দেহের অপেক্ষা প্রতীতি ভাল।

গিরিজায়া এবার সহাস্যে কহিল, "তুমি কেন অনর্থক ব্যস্ত হও? আমি নিশ্চিত বলিতেছি, তাঁহার শরীরে কিছুই ক্লেশ নাই। তিনি উঠিয়া বেড়াইতেছেন।"

মৃণালিনী ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিলেন, "মনোরমার সহিত তাঁহার কোন কথাবার্ত্তা শুনিলে?"

গি। শুনিলাম?

মৃ। কি শুনিলে?

গিরিজায়া তখন হেমচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, তাহা কহিলেন। কেবল হেমচন্দ্রের সঙ্গে যে মনোরমা নিশা পর্য্যটন করিয়াছিলেন ও কাণে কাণে কথা বলিয়াছিলেন, এই দুইটি বিষয় গোপন করিলেন। মৃণালিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি হেমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছ?"

গিরিজায়া কিছু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "করিয়াছি।"

মৃ। তিনি কি কহিলেন?

গি। তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

মৃ। তুমি কি বলিলে?

গি। আমি বলিলাম, তুমি ভাল আছ।

মৃ। আমি এখানে আসিয়াছি, তাহা বলিয়াছ?

গি। না।

মৃ। গিরিজায়া, তুমি ইতস্ততঃ করিয়া উত্তর দিতেছ, তোমার মুখ শুক্ন। তুমি আমার মুখপানে চাহিতে পারিতেছ না। আমি নিশ্চিত বুঝিতেছি, তুমি কোন অমঙ্গল সংবাদ আমার নিকট লুকাইতেছ। আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। যাহা থাকে অদৃষ্টে, আমি স্বয়ং হেমচন্দ্রকে দেখিতে যাইব। পার, আমার সঙ্গে আইস, নচেৎ আমি একাকিনী যাইব।

এই বলিয়া মৃণালিনী অবগুণ্ঠনে মুখাবৃত করিয়া বেগে রাজপথ অতিবাহন করিয়া চলিলেন।

গিরিজায়া তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিতা হইল। কিছু দূর আসিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া কহিল, "ঠাকুরাণি, ফের; আমি যাহা লুকাইয়াছি, তাহা প্রকাশ করিতেছি।"

মৃণালিনী গিরিজায়ার সঙ্গে সঙ্গে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তখন গিরিজায়া যাহা যাহা গোপন করিয়াছিল তাহা সবিস্তারে প্রকাশিত করিল।

গিরিজায়া হেমচন্দ্রকে ঠকাইয়াছিল; কিন্তু মৃণালিনীকে ঠকাইতে পারিল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : মৃণালিনীর লিপি

মৃণালিনী কহিলেন, "গিরিজায়া, তিনি রাগ করিয়া বলিয়া থাকিবেন, 'উত্তম হইয়াছে'; ইহা শুনিয়া তিনি কেনই বা রাগ না করিবেন?"

গিরিজায়ারও তখন সংশয় জন্মিল। সে কহিল, "ইহা সম্ভব বটে।"

তখন মৃণালিনী কহিলেন, “তুমি এ কথা বলিয়া ভাল কর নাই। এর বিহিত করা উচিত; তুমি আহারাদি করিতে যাও। আমি ততক্ষণ একখানি পত্র লিখিয়া রাখিব। তুমি খাইবার পর, সেইখানি লইয়া তাঁহার নিকট যাইবে।”

গিরিজায়া স্বীকৃতা হইয়া সত্বরে আহারাদির জন্য গমন করিল। মৃণালিনী সংক্ষেপে পত্র লিখিলেন।

লিখিলেন।

“গিরিজায়া মিথ্যাবাদিনী। যে কারণে সে তোমার নিকট মৎসম্বন্ধে মিথ্যা বলিয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে, সে স্বয়ং বিস্তারিত করিয়া কহিবে। আমি মথুরায় যাই নাই। যে রাত্রিতে তোমার অঙ্গুরীয় দেখিয়া যমুনাতটে আসিয়াছিলাম, সেই রাত্রি অবধি আমার পক্ষে মথুরার পথ রুদ্ধ হইয়াছে। আমি মথুরায় না গিয়া তোমাকে দেখতে নবদ্বীপে আসিয়াছি। নবদ্বীপে আসিয়াও যে এ পর্য্যন্ত তোমার সহিত সাক্ষাৎ করি নাই, তাহার এক কারণ এই, আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তোমার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হইবে। আমার অভিলাষ, তোমাকে দেখিব, তৎসিদ্ধিপক্ষে তোমাকে দেখা দেওয়ার আবশ্যক কি?”

গিরিজায়া এই লিপি লইয়া পুনরপি হেমচন্দ্রের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। সন্ধ্যাকালে, মনোরমার সহিত কথোপকথন সমাপ্তির পরে, হেমচন্দ্র গঙ্গাদর্শনে যাইতেছিলেন, পথে গিরিজায়ার সহিত সাক্ষাৎ হইল। গিরিজায়া তাহার হস্তে লিপি দিল।

হেমচন্দ্র কহিলেন, “তুমি আবার কেন?”

গি। পত্র লইয়া আসিয়াছি।

হে। পত্র কাহার?

গি। মৃণালিনীর পত্র।

হেমচন্দ্র বিস্মিত হইলেন, “এ পত্র কি প্রকারে তোমার নিকট আসিল?”

গি। মৃণালিনী নবদ্বীপে আছেন। আমি মুথরার কথা আপনার নিকট মিথ্যা বলিয়াছি।

হে। এই পত্র তাঁহার?

গি। হাঁ, তাহার স্বহস্তলিখিত।

হেমচন্দ্র লিপিখানি না পড়িয়া তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিন্ন ভিন্ন করিলেন। ছিন্নখণ্ড সকল বনমধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া কহিলেন, “তুমি যে মিথ্যাবাদিনী, তাহা আমি ইতিপূর্ব্বেই শুনিতে পাইয়াছি। তুমি যে দুষ্টার পত্র লইয়া আসিয়াছ, সে যে বিবাহ করিতে যায় নাই, হৃষীকেশ তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে, তাহা আমি ইতিপূর্ব্বেই শুনিয়াছি। আমি কুলটার পত্র পড়িব না। তুই আমার সম্মুখ হইতে দূর হ।”

গিরিজায়া চমৎকৃত হইয়া নিরুত্তরে হেমচন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া রহিল।

হেমচন্দ্র পথিপার্শ্বস্থ এক ক্ষুদ্র-বৃক্ষের শাখা ভগ্ন করিয়া হস্তে লইয়া কহিলেন, “দূর হ, নচেৎ বেত্রাঘাত করিব।”

গিরিজায়ার আর সহ্য হইল না। ধীরে ধীরে বলিল, “বীর পুরুষ বটে! এই রকম বীরত্ব প্রকাশ করিতে বুঝি নদীয়ায় এসেছ? কিছু প্রয়োজন ছিল না—এ বীরত্ব মগধে বসিয়াও দেখাইতে পারিতে। মুসলমানের জুতা বহিতে, আর গরীবদুঃখীর মেয়ে দেখিলে বেত মারিতে।”

হেমচন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া বেত ফেলিয়া দিলেন। কিন্তু গিরিজায়ার রাগ গেল না। বলিল, “তুমি মৃণালিনীকে বিবাহ করিবে? মৃণালিনী দূরে থাক, তুমি আমারও যোগ্য নও।”

এই বলিয়া গিরিজায়া, সদর্পে গজেন্দ্রগমনে চলিয়া গেল। হেমচন্দ্র ভিখারিণীর গর্ব্ব দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন।

গিরিজায়া প্রত্যাগত্যা হইয়া হেমচন্দ্রের আচরণ মৃণালিনীর নিকট সবিশেষ বিবৃত করিল। এবার কিছু লুকাইল না। মৃণালিনী শুনিয়া কোন উত্তর করিলেন না। রোদনও করিলেন না। যেরূপ অবস্থায় শ্রবণ করিতেছিলেন সেইরূপ অবস্থাতেই রহিলেন। দেখিয়া গিরিজায়া শঙ্কান্বিত হইল—তখন মৃণালিনীর কথোপকথনের সময় নহে বুঝিয়া তথা হইতে সরিয়া গেল।

পাটনীর গৃহের অনতিদূরে যে এক সোপানবিশিষ্ট পুষ্করিণী ছিল, তথায় গিয়া গিরিজায়া সোপানোপরি উপবেশন করিল। শারদীয়া পূর্ণিমার প্রদীপ্ত কৌমুদিতে পুষ্করিণীর স্বচ্ছ নীলাম্বু অধিকতর নীলোজ্জ্বল হইয়া প্রভাসিত হইতেছিল। তদুপরি স্পন্দনরহিত কুসুমশ্রেণী অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত হইয়া নীল জলে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল; চারি দিকে বৃক্ষমালা নিঃশব্দে পরস্পরাশ্লিষ্ট হইয়া আকাশের সীমা নির্দ্দেশ করিতেছিল; ক্বচিৎ দুই একটি দীর্ঘ শাখা ঊর্দ্ধোত্থিত হইয়া আকাশপটে চিত্রিত হইয়া রহিয়াছিল। তলস্থ অন্ধকারপুঞ্জমধ্য হইতে নবস্ফুটকুসুমসৌরভ আসিতেছিল। গিরিজায়া সোপানোপরি উপবেশন করিল।

গিরিজায়া প্রথমে ধীরে ধীরে, মৃদু মৃদু গীত আরম্ভ করিল—যেন নবশিক্ষিতা বিহঙ্গী প্রথমোদ্যমে স্পষ্ট গান করিতে পারিতেছে না। ক্রমে তাহার স্বর স্পষ্টতালাভ করিতে লাগিল—ক্রমে ক্রমে উচ্চতর হইতে লাগিল, শেষে সেই সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ তানলয়বিশিষ্ট কমনীয় কণ্ঠধ্বনি, পুষ্করিণী, উপবন, আকাশ বিপ্লুত করিয়া স্বর্গচ্যুত স্বরসতিত্তঙ্গস্বরূপ মৃণালিনীর কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। গিরিজায়া গায়িল;-

“পরাণ না গেলো।
যো দিন পেখনু সই যমুনাকি তীরে,
গায়ত নাচত সুন্দর ধীরে ধীরে,
ওঁহি পর পিয় সই, কাহে কালো নীরে,
জীবন না গেলো ?
ফিরি ঘন আয়নু, না কহনু বোলি,
তিতায়নু আঁখিনীরে আপনা আঁচোলি,
রোই রোই পিয় সই কাহে লো পরাণি,
তইখন না গেলো ?
শুননু শ্রবণ-পথে মধুর বাজে,
রাধে রাধে রাধে রাধে বিপিন মাঝে;
যব শুনন্ লাগি সই, সো মধুর বোলি,
জীবন না গেলো ?
ধায়নু পিয় সই , সোহি উপকূলে,
লুটায়নু কাঁদি সই শ্যামপদমূলে,
সোহি পদমূলে রই, কাহে লো হামারি,

মরণ না ভেল ?”

গিরিজায়া গায়িতে গায়িতে দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে চন্দ্রের কিরণোপরি মনুষ্যের ছায়া পড়িয়াছে। ফিরিয়া দেখিলেন, মৃণালিনী দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার মুখপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন, মৃণালিনী কাঁদিতেছেন।

গিরিজায়া দেখিয়া হর্ষান্বিত হইলেন,—তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, যখন মৃণালিনীর চক্ষুতে জল আসিয়াছে—তখন তাঁহার ক্লেশের কিছু শমতা হইয়াছে। ইহা সকলে বুঝে না—মনে করে, “কই, ইহার চক্ষুতে ত জল দেখিলাম না, তবে ইহার কিসের দুঃখ ?” যদি ইহা সকলে বুঝিত, সংসারের কত মর্ম্মপীড়াই না জানি নিবারণ হইত।

কিয়ৎক্ষণ উভয়েই নীরব হইয়া রহিল। মৃণালিনী কিছু বলিতে পারেন না; গিরিজায়াও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারে না। পরে মৃণালিনী কহিলেন, “গিরিজায়া, আর একবার তোমাকে যাইতে হইবে।”

গি। আবার সে পাষণ্ডের নিকট যাইব কেন ?

মৃ। পাষণ্ড বলিও না। হেমচন্দ্র ভ্রান্ত হইয়া থাকিবেন—এ সংসারের অভ্রান্ত কে ? কিন্তু হেমচন্দ্র পাষণ্ড নহেন। আমি স্বয়ং তাহার নিকট এখনই যাইব—তুমি সঙ্গে চল। তুমি আমকে ভগিনীর অধিক স্নেহ কর—তুমি আমার জন্য না করিয়াছ কি ? তুমি কখনও আমাকে অকারণে মনঃপীড়া দিবে না—কখনও আমার নিকট এ সকল কথা মিথ্যা করিয়া বলিবে না, ইহা আমি নিশ্চিত জানি। কিন্তু তাই বলিয়া, আমার হেমচন্দ্র আমাকে বিনাপরাধে ত্যাগ করিলেন, ইহা তাঁহার মুখে না শুনিয়া কি প্রকারে অন্তঃকরণকে স্থির করিতে পারি ? যদি তাঁহার নিজ মুখে শুনি যে, তিনি মৃণালিনীকে কুলটা ভাবিয়া ত্যাগ করিলেন, তবে এ প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারিব।

গি। প্রাণবিসর্জ্জন! সে কি মৃণালিনী ?

মৃণালিনী কোন উত্তর করিলেন না। গিরিজায়ার স্কন্ধে বাহুস্থাপন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। গিরিজায়াও রোদন করিল।

নবম পরিচ্ছেদ : অমৃতে গরল–গরলামৃত

হেমচন্দ্র, আচার্য্যের কথায় বিশ্বাস করিয়া মৃণালিনীকে দুশ্চরিত্রা বিবেচনা করিয়াছিলেন; মৃণালিনীর পত্র পাঠ না করিয়া তাহা ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছিলেন, তাঁহার দূতীকে বেত্রাঘাত করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা বলিয়া তিনি মৃণালিনীকে ভালবাসিতেন না, তাহা নহে। মৃণালিনীর জন্য তিনি রাজ্যত্যাগ করিয়া মথুরাবাসী হইয়াছিলেন। এই মৃণালিনীর জন্য গুরুর প্রতি শরসন্ধান করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, মৃণালিনীর জন্য গৌড়ে নিজ ব্রত বিস্মৃত হইয়া ভিখারিণীর তোষামোদ করিয়াছিলেন। আর এখন ? এখন হেমচন্দ্র মাধবাচার্য্যকে শূল দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, “মৃণালিনীকে এই শূলে বিদ্ধ করিব!” কিন্তু তাই বলিয়া কি, এখন তাঁহার স্নেহ একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইহাছিল ? স্নেহ কি একদিনে ধ্বংস হইয়া থাকে ? বহুদিন অবধি পার্ব্বতীয় বারি পৃথিবী-হৃদয়ে বিচরণ করিয়া আপন গতিপথ নিখাত করে, একদিনের সূর্য্যোত্তাপে কি সে নদী শুকায় ? জলের যে পথ নিখাত হইয়াছে, জল সেই পথেই যাইবে, সে পথ রোধ কর, পৃথিবী ভাসিয়া যাইবে। হেমচন্দ্র সেই রাত্রিতে নিজ শয়নকক্ষে শয্যোপরি শয়ন করিয়া সেই মুক্ত বাতায়নসন্নিধানে মস্তক রাখিয়া, বাতায়ন-পথে দৃষ্টি করিতেছিলেন—তিনি কে

নৈশ শোভা দৃষ্টি করিতেছিলেন ? যদি তাঁহাকে সে সময় কেহ জিজ্ঞাসা করিত যে, রাত্রি সজ্যোৎস্না কি অন্ধকার, তাহা তিনি তখন সহসা বলিতে পারিতেন না। তাঁহার হৃদয়মধ্যে যে রজনীর উদয় হইয়াছিল, তিনি কেবল তাহাই দেখিতেছিলেন। সে রাত্রি ত তখনও সজ্যোৎস্না! নহিলে তাঁহার উপাধান আর্দ্র কেন ? কেবল মেঘোদয় মাত্র। যাহার হৃদয়-আকাশে অন্ধকার বিরাজ করে, সে রোদন করে না।

যে কখনও রোদন করে নাই, সে মনুষ্যমধ্যে অধম। তাহাকে কখনও বিশ্বাস করিও না। নিশ্চিত জানিও, সে পৃথিবীর সুখ কখনও ভোগ করে নাই— পরের সুখও কখনও তাহার সহ্য হয় না। এমন হইতে পারে যে, কোন আত্মচিত্তবিজয়ী মহাত্মা বিনা বাষ্পমোচনে গুরুতর মনঃপীড়া সকল সহ্য করিতেছেন, এবং করিয়া থাকেন; কিন্তু তিনি যদি কস্মিন্ কালে, এক দিন বিরলে একবিন্দু অশ্রুজলে পৃথিবী সিক্ত না করিয়া থাকেন, তবে তিনি চিত্তজয়ী মহাত্মা হইলে হইতে পারেন, কিন্তু আমি বরং চোরের সহিত প্রণয় করিব, তথাপি তাঁহার সঙ্গে নহে।

হেমচন্দ্র রোদন করিতেছিলেন,—যাহাকে পাপিষ্ঠা, মনে স্থান দিবার অযোগ্যা বলিয়া জানিয়াছিলেন, তাহার জন্য রোদন করিতেছিলেন। মৃণালিনীর কি তিনি দোষ আলোচনা করিতেছিলেন ? তাহা করিতেছিলেন বটে, কিন্তু কেবল তাহাই নহে। এক একবার মৃণালিনীর প্রেমপরিপূর্ণ, মুখমণ্ডল, প্রেমপরিপূর্ণ কথা, প্রেমপরিপূর্ণ কার্য্য সকল মনে করিতেছিলেন। সেই মৃণালিনী কি অবিশ্বাসিনী ? একদিন মথুরায় হেমচন্দ্র মৃণালিনীর নিকট একখানি লিপি প্রেরণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন, উপযুক্ত বাহক পাইলেন না; কিন্তু মৃণালিনীকে গবাক্ষপথে দেখিতে পাইলেন। তখন হেমচন্দ্র একটি আম্রফলের উপর আবশ্যক কথা লিখিয়া মৃণালিনীর ক্রোড় লক্ষ্য করিয়া বাতায়নপথে প্রেরণ করিলেন; আম্র ধরিবার জন্য মৃণালিনী কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া আসাতে আম্র মৃণালিনীর ক্রোড়ে না পড়িয়া তাঁহার কর্ণে লাগিল, অমনি তদাঘাতে কর্ণবিলম্বী রত্নকুণ্ডল কর্ণ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া কাটিয়া পড়িল; কর্ণস্রুত রুধিরে মৃণালিনীর গ্রীবা ভাসিয়া গেল। মৃণালিনী ভ্রূক্ষেপও করিলেন না; কর্ণে হস্তও দিলেন না; হাসিয়া আম্র তুলিয়া লিপি পাঠপূর্ব্বক, তখনই তৎপৃষ্ঠে প্রত্যুত্তর লিখিয়া আম্র প্রতিপ্রেরণ করিলেন। এবং যতক্ষণ হেমচন্দ্র দৃষ্টিপথে রহিলেন, ততক্ষণ বাতায়নে থাকিয়া হাস্যমুখে দেখিতে লাগিলেন। হেমচন্দ্রের তাহা মনে পড়িল। সেই মৃণালিনী কি অবিশ্বাসিনী ? ইহা সম্ভব নহে। আর একদিন মৃণালিনীকে বৃশ্চিক দংশন করিয়াছিল। তাহার যন্ত্রণায় মৃণালিনী মুমূর্ষুবৎ কাতর হইয়াছিলেন। তাঁহার একজন পরিচারিকা তাহার উত্তম ঔষধ জানিত; তৎপ্রয়োগ মাত্র যন্ত্রণা একেবারে শীতল হয়; দাসী শীঘ্র ঔষধ আনিতে গেল। ইত্যবসরে হেমচন্দ্রের দূতী গিয়া কহিল যে, হেমচন্দ্র উপবনে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন। মূহূর্ত্তমধ্যে ঔষধ আসিত, কিন্তু মৃণালিনী তাহার অপেক্ষা করেন নাই; অমনি সেই মরণাধিক যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া উপবনে উপস্থিত হইলেন। আর ঔষধ প্রয়োগ হইল না। হেমচন্দ্রের তাহা স্মরণ হইল। সেই মৃণালিনী ব্রাহ্মণকুলকলঙ্ক ব্যোমকেশের জন্য হেমচন্দ্রের কাছে অবিশ্বাসিনী হইবে ? না, তা কখনই হইতে পারে না। আর একদিন হেমচন্দ্র মথুরা হইতে গুরুদর্শনে যাইতেছিলেন; মথুরা হইতে এক প্রহরের পথ আসিয়া হেমচন্দ্রের পীড়া হইল। তিনি এক পান্থনিবাসে পড়িয়া রহিলেন; কোন প্রকারে এ সংবাদ অন্তঃপুরে মৃণালিনীর কর্ণে প্রবেশ করিল। মৃণালিনী সেই রাত্রিতে এক ধাত্রীমাত্র সঙ্গে লইয়া রাত্রিকালে সেই এক যোজন পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া হেমচন্দ্রকে দেখিতে আসিলেন। যখন মৃণালিনী পান্থনিবাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি পথশ্রান্তিতে প্রায় নির্জ্জীব; চরণ ক্ষতবিক্ষ,—রুধির বহিতেছিল। সেই রাত্রিতেই মৃণালিনী পিতার ভয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। গৃহে আসিয়া তিনি স্বয়ং পীড়িতা হইলেন। হেমচন্দ্রের তাহাও মনে পড়িল। সেই মৃণালিনী নরাধম ব্যোমকেশের জন্য তাঁহাকে ত্যাগ করিবে ? সে কি অবিশ্বাসিনী হইতে পারে ? যে এমন কথায় বিশ্বাস করে, সেই অবিশ্বাসী—সে নরাধম, সে গণ্ডমূর্খ। হেমচন্দ্র শতবার ভাবিতেছিলেন, "কেন আমি মৃণালিনীর পত্র পড়িলাম না ? নবদ্বীপে কেন আসিয়াছে, তাহাই বা কেন জানিলাম না ?" পত্রখণ্ডগুলি যে বনে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন, তাহা যদি সেখানে পাওয়া যায়, তবে তাহা যুক্ত করিয়া যতদূর পারেন, ততদূর মর্ম্মাবগত হইবেন, এইরূপ প্রত্যাশা করিয়া একবার সেই বন পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন; কিন্তু সেখানে বনতলস্থ অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পায়েন নাই। বায়ু

লিপিখণ্ডসকল উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। যদি তখন আপন দক্ষিণ বাহু ছেদন করিয়া দিলে হেমচন্দ্র সেই লিপিখণ্ডগুলি পাইতেন, তবে হেমচন্দ্র তাহাও দিতেন।

আবার ভাবিতেছিলেন, "আচার্য্য কেন মিথ্যা কথা বলিবেন ? আচার্য্য অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ—কখনও মিথ্যা বলিবেন না। বিশেষ আমাকে পুত্রাধিক স্নেহ করেন—জানেন, এ সংবাদে আমার মরণাধিক যন্ত্রণা হইবে, কেন আমাকে তিনি মিথ্যা কথা বলিয়া এত যন্ত্রণা দিবেন ? আর তিনিও স্বেচ্ছাক্রমে এ কথা বলেন নাই। আমি সদর্পে তাঁহার নিকট কথা বাহির করিয়া লইলাম—যখন আমি বলিলাম যে, আমি সকলই অবগত আছি—তখনই তিনি কথা বলিলেন। মিথ্যা বলিবার উদ্দেশ্য থাকিলে, বলিতে অনিচ্ছুক হইবেন কেন ? তবে হইতে পারে, হৃষীকেশ তাঁহার নিকট মিথ্যা বলিয়া থাকিবে। কিন্তু হৃষীকেশই বা অকারণে গুরুর নিকট মিথ্যা বলিবে কেন ? আর মৃণালিনীই বা তাহার গৃহ ত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে আসিবে কেন ?"

যখন এইরূপ ভাবেন, তখন হেমচন্দ্রের মুখ কালিমাময় হয়, ললাট ঘর্ম্মসিক্ত হয়; তিনি শয়ন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসেন; দন্তে অধর দংশন করেন, লোচন আরক্ত এবং বিস্ফারিত হয়; শূলধারণ জন্য হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হয়। আবার মৃণালিনীর প্রেমময় মুখমণ্ডল মনে পড়ে। অমনি ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় শয্যায় পতিত হয়েন; উপাধানে মুখ লুক্কায়িত করিয়া শিশুর ন্যায় রোদন করেন। হেমচন্দ্র ঐরূপ রোদন করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার শয়নগৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। গিরিজায়া প্রবেশ করিল।

হেমচন্দ্র প্রথমে মনে করিলেন, মনোরমা। তখনই দেখিলেন, সে কুসুমময়ী মূর্ত্তি নহে। পরে চিনিলেন যে, গিরিজায়া। প্রথমে বিস্মিত, পরে আহ্লাদিত, শেষে কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। বলিলেন, "তুমি আবার কেন?"

গিরিজায়া কহিল, "আমি মৃণালিনীর দাসী। মৃণালিনীকে আপনি ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু আপনি মৃণালিনীর ত্যাজ্য নহেন। সুতরাং আমাকে আবার আসিতে হইয়াছে। আমাকে বেত্রাঘাত করিতে সাধ থাকে, করুন। ঠাকুরাণীর জন্য এবার তাহা সহিব, স্থির সঙ্কল্প করিয়াছি।"

এ তিরস্কারে হেমচন্দ্র অত্যন্ত অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, "তোমার কোন শঙ্কা নাই। স্ত্রীলোককে আমি মারিব না। তুমি কেন আসিয়াছ ? মৃণালিনী কোথায় ? বৈকালে তুমি বলিয়াছিলে, তিনি নবদ্বীপে আসিয়াছেন; নবদ্বীপে আসিয়াছেন কেন ? আমি তাঁহার পত্র না পড়িয়া ভাল করি নাই।"

গি। মৃণালিনী নবদ্বীপে আপনাকে দেখিতে আসিয়াছেন।

হেমচন্দ্রের শরীর কণ্টকিত হইল। এই মৃণালিনীকে কুলটা বলিয়া অবমানিত করিয়াছেন ? তিনি পুনরপি গিরিজায়াকে কহিলেন, "মৃণালিনী কোথায় আছেন ?"

গি। তিনি আপনার নিকট জন্মের শোধ বিদায় লইতে আসিয়াছেন। সরোবরতীরে দাঁড়াইয়া আছেন। আপনি আসুন।

এই বলিয়া গিরিজায়া চলিয়া গেল। হেমচন্দ্র তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন।

গিরিজায়া বাপীতীরে, যথায় মৃণালিনী সোপানোপরি বসিয়া ছিলেন, তথায় উপনীত হইল। হেমচন্দ্রও তথায় আসিলেন। গিরিজায়া কহিল, "ঠাকুরাণী! উঠ। রাজপুত্র আসিয়াছেন।"

মৃণালিনী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। উভয়ে উভয়ের মুখ নিরীক্ষণ করিলেন। মৃণালিনীর দৃষ্টিলোপ হইল; অশ্রুজলে চক্ষু পূরিয়া গেল। অবলম্বনশাখা ছিন্ন হইলে যেমন শাখাবিলম্বিনী লতা ভূতলে পড়িয়া যায়, মৃণালিনী সেইরূপ হেমচন্দ্রের পদমূলে পতিত হইলেন। গিরিজায়া অন্তরে গেল।

দশম পরিচ্ছেদ : এত দিনের পর !

হেমচন্দ্র মৃণালিনীকে হস্তে ধরিয়া তুলিলেন। উভয়ে উভয়ের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইলেন।

এত কাল পরে দুই জনের সাক্ষাৎ হইল। যে দিন প্রদোষকালে, যমুনার উপকূলে নৈদাঘানিলসন্তাড়িত বকুলমূলে দাঁড়াইয়া, নীলাম্বুময়ীর চঞ্চল-তরঙ্গ-শিরে নক্ষত্ররশ্মির প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করিতে করিতে উভয়ে উভয়ের নিকট সজলনয়নে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার পর এই সাক্ষাৎ হইল। নিদাঘের পর বর্ষা গিয়াছে, বর্ষার পর শরৎ যায়, কিন্তু ইঁহাদিগের হৃদয়মধ্যে যে কত দিন গিয়াছে, তাহা কি ঋতুগণনায় গণিত হইতে পারে?

সেই নিশীথ সময়ে স্বচ্ছসলিলা বাপীতীরে, দুই জনে পরস্পর সন্মুখীন হইয়া দাঁড়াইলেন। চারি দিকে সেই নিবিড় বন, ঘনবিন্যস্ত লতাস্রগ্‌বিশোভী বিশাল বিটপীসকল দৃষ্টিপথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল; সন্মুখে নীলনীরদখণ্ডবৎ দীর্ঘিকা শৈবাল-কুমুদ-কহ্লার সহিত বিস্তৃত রহিয়াছিল। মাথার উপরে চন্দ্রনক্ষত্রজলদ সহিত আকাশ আলোকে হাসিতেছিল। চন্দ্রালোক- আকাশে, বৃক্ষশিরে, লতাপল্লবে, বাপীসোপানে, নীলজলে—সর্ব্বত্র হাসিতেছিল। প্রকৃতি স্পন্দহীনা, ধৈর্য্যময়ী। সেই ধৈর্য্যময়ী প্রকৃতির প্রাসাদমধ্যে মৃণালিনী হেমচন্দ্র মুখে মুখে দাঁড়াইলেন।

ভাষায় কি শব্দ ছিল না? তাঁহাদিগের মনে কি বলিবার কথা ছিল না? যদি মনে বলিবার কথা ছিল, ভাষায় শব্দ ছিল, তবে কেন ইহারা কথা কহে না? তখন চক্ষুর দেখাতেই মন উন্মত্ত—কথা কহিবে কি প্রকারে? এ সময় কেবলমাত্র প্রণয়ীর নিকটে অবস্থিতিতে এত সুখ যে, হৃদয়মধ্যে অন্য সুখের স্থান থাকে না। যে সে সুখভোগ করিতে থাকে, সে আর কথার সুখ বাসনা করে না।

সে সময়ে এত কথা বলিবার থাকে যে, কোন্ কথা আগে বলিব, তাহা কেহ স্থির করিতে পারে না।

মনুষ্যভাষায় এমন কোন্ শব্দ আছে যে, সে সময়ে প্রযুক্ত হইতে পারে?

তাঁহারা পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। হেমচন্দ্র মৃণালিনীর সেই প্রেমময় মুখ আবার দেখিলেন—হৃষীকেশবাক্যে প্রত্যয় দূর হইতে লাগিল। সে গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে ত পবিত্রতা লেখা আছে। হেমচন্দ্র তাঁহার লোচনপ্রতি চাহিয়া রহিলেন; সেই অপূর্ব্ব আয়তনশালী, ইন্দীবর-নিন্দী, আন্তঃকরণের দর্পণরূপ চক্ষুপ্রতি চাহিয়া রহিলেন—তাহা হইতে কেবল প্রেমাশ্রু বহিতেছে!—সে চক্ষু যাহার, সে কি অবিশ্বাসিনী!

হেমচন্দ্র প্রথমে কথা কহিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "মৃণালিনী! কেমন আছ?"

মৃণালিনী উত্তর করিতে পারিলেন না। এখনও তাঁহার চিত্ত শান্ত হয় নাই; উত্তরের উপক্রম করিলেন, কিন্তু আবার চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল। কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, কথা সরিল না।

হেমচন্দ্র আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কেন আসিয়াছ?"

মৃণালিনী তথাপি উত্তর করিতে পারিলেন না। হেমচন্দ্র তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া সোপানোপরি বসাইলেন, স্বয়ং নিকটে বসিলেন, মৃণালিনীর যে কিছু চিত্তের স্থিরতা ছিল, এই আদরে তাহার লোপ হইল। ক্রমে ক্রমে তাঁহার মস্তক আপনি আসিয়া হেমচন্দ্রের স্কন্ধে স্থাপিত হইল, মৃণালিনী তাহা জানিয়াও জানিতে পারিলেন না। মৃণালিনী আবার রোদন করিলেন—তাঁহার অশ্রুজলে হেমচন্দ্রের স্কন্ধ, বক্ষঃ প্লাবিত হইল। এ সংসারে মৃণালিনী যত সুখ অনুভূত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কোন সুখই এই রোদনের তুল্য নহে।

হেমচন্দ্র আবার কথা কহিলেন, "মৃণালিনী! আমি তোমার নিকট গুরুতর অপরাধ করিয়াছি। সে অপরাধ আমার ক্ষমা করিও। আমি তোমার নামে কলঙ্ক রটনা শুনিয়া তাহা বিশ্বাস করিয়াছিলাম। বিশ্বাস করিবার কতক কারণও ঘটিয়াছিল—তাহা তুমি দূর করিতে পারিবে। যাহা আমি জিজ্ঞাসা করি, তাহার পরিষ্কার উত্তর দাও।"

মৃণালিনী হেমচন্দ্রের স্কন্ধ হইতে মস্তক না তুলিয়া কহিলেন, “কি?”

হেমচন্দ্র বলিলেন, “তুমি হৃষীকেশের গৃহ ত্যাগ করিলে কেন ?”

ঐ নাম শ্রবণমাত্র কুপিতা ফণিনীর ন্যায় মৃণালিনী মাথা তুলিল। কহিল, “হৃষীকেশ আমাকে গৃহ ইহতে বিদায় করিয়া দিয়াছে।”

হেমচন্দ্র ব্যথিত হইলেন—অল্প সন্দিহান হইলেন—কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলেন। সেই অবকাশে মৃণালিনী পুনরপি হেমচন্দ্রের স্কন্ধে মস্তক রাখিলেন। সে সুখাসনে শিরোরক্ষা এত সুখ যে, মৃণালিনী তাহাতে বঞ্চিত হইয়া থাকিতে পারিলেন না।

হেমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন তোমাকে হৃষীকেশ গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিল ?”

মৃণালিনী হেমচন্দ্রের হৃদয়মধ্যে মুখ লুকাইলেন। অতি মৃদুরবে কহিলেন, “তোমাকে কি বলিব ? হৃষিকেশ আমকে কুলটা বলিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে।”

শ্রুতমাত্র তীরের ন্যায় হেমচন্দ্র দাঁড়াইয়া উঠিলেন। মৃণালিনীর মস্তক তাঁহার বক্ষশ্চ্যুত হইয়া সোপানে আহত হইল।

“পাপীয়সি—নিজমুখে স্বীকৃতা হইলি!” এই কথা দন্তমধ্য হইতে ব্যক্ত করিয়া হেমচন্দ্র বেগে প্রস্থান করিলেন। পথে গিরিজায়াকে দেখিলেন; গিরিজায়া তাঁহার সজলজলদভীম মূর্ত্তি দেখিয়া চমকিয়া দাঁড়াইল। লিখিতে লজ্জা করিতেছে—কিন্তু না লিখিলে নয়-হেমচন্দ্র পদাঘাতে গিরিজায়াকে পথ হইতে অপসৃতা করিলেন। বলিলেন, “তুমি যাহার দূতী, তাহাকে পদাঘাত করিলে আমার চরণ কলঙ্কিত হইত।” এই বলিয়া হেমচন্দ্র চলিয়া গেলেন।

যাহার ধৈর্য্য নাই, যে ক্রোধের জন্মমাত্র অন্ধ হয়, সে সংসারের সকল সুখে বঞ্চিত। কবি কল্পনা করিয়াছেন যে, কেবল অধৈর্য্য মাত্র দোষে বীরশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্যের নিপাত হইয়াছিল। “অশ্বত্থামাঃ হতঃ” এই শব্দ শুনিয়া তিনি ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করিলেন। প্রশ্নান্তর দ্বারা সবিশেষ তত্ত্ব লইলেন না। হেমচন্দ্রের কেবল অধৈর্য্য নহে—অধৈর্য্য, অভিমান, ক্রোধ।

শীতল সমীরণময়ী ঊষার পিঙ্গল মূর্তি বাপীতীর-বনে উদয় হইল। তখনও মৃণালিনী আহত মস্তক ধারণ করিয়া সোপানে বসিয়া আছেন। গিরিজায়া জিজ্ঞাসা করিল, “ঠাকুরাণী, আঘাত কি গুরুতর বোধ হইতেছে?”

মৃণালিনী কহিলেন, “কিসের আঘাত ?”

গি। মাথায়।

মৃ। মাথায় আঘাত ? আমার মনে হয় না।

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ : ঊর্ণনাভ

যতক্ষণ মৃণালিনীর সুখের তারা ডুবিতেছিল, ততক্ষণ গৌড়দেশের সৌভাগ্যশশীও সেই পথে যাইতেছিল। যে ব্যক্তি রাখিলে গৌড় রাখিতে পারিত, সে ঊর্ণনাভের ন্যায় বিরলে বসিয়া অভাগা জন্মভূমিকে বদ্ধ করিবার জন্য জাল পাতিতেছিল। নিশীথ সময়ে নিভৃতে বসিয়া ধর্ম্মাধিকার পশুপতি, নিজ দক্ষিণহস্তস্বরূপ

শান্তশীলকে ভর্ৎসনা করিতেছিলেন, “শান্তশীল!” প্রাতে যে সংবাদ দিয়াছ, তাহা কেবল তোমার অদক্ষতার পরিচয় মাত্র। তোমার প্রতি আর কোন ভার দিবার ইচ্ছা নাই।”

শান্তশীল কহিল, “যাহা অসাধ্য, তাহা পারি নাই। অন্য কার্য্যে পরিচয় গ্রহণ করুন।”

প। সৈনিকদিগকে কি উপদেশ দেওয়া হইতেছে ?

শা। এই যে, আমাদিগের আজ্ঞা না পাইলে কেহ না সাজে।

প। প্রান্তপাল ও কোষ্ঠপালদিগকে কি উপদেশ দেওয়া হইয়াছে ?

শা। এই বলিয়া দিয়াছি যে, অচিরাৎ যবন-সম্রাটের নিকট হইতে কর লইয়া কয় জন যবন দূতস্বরূপ আসিতেছে, তাহাদিগের গতিরোধ না করে।

প। দামোদর শর্ম্মা উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিয়াছেন কি না ?

শা। তিনি বড় চতুরের ন্যায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন।

প। সে কি প্রকার ?

শা। তিনি একখানি পুরাতন গ্রন্থের একখানি পত্র পরিবর্ত্তন করিয়া তাহাতে আপনার রচিত কবিতাগুলি বসাইয়াছিলেন। তাহা লইয়া অদ্য প্রাহ্নে রাজাকে শ্রবণ করাইয়াছেন এবং মাধবাচার্য্যের অনেক নিন্দা করিয়াছেন।

প। কবিতায় ভবিষ্যৎ গৌড়বিজেতার রূপবর্ণনা সবিস্তারে লিখিত আছে। সে বিষয়ে মহারাজ কোন অনুসন্ধান করিয়াছিলেন ?

শা। করিয়াছিলেন। মদনসেন সম্প্রতি কাশীধাম হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, এ সংবাদ মহারাজ অবগত আছেন। মহারাজ কবিতায় ভবিষ্যৎ গৌড়জেতার অবয়ব বর্ণনা শুনিয়া তাঁহাকে ডাকিতে পাঠাইলেন। মদনসেন উপস্থিত হইলে মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন, তুমি মগধে যবন-রাজ-প্রতিনিধিকে দেখিয়া আসিয়াছ ?” সে কহিল, “আসিয়াছি।” “মহারাজ তখন আজ্ঞা করিলেন, “সে দেখিতে কি প্রকার, বিবৃত কর।” তখন মদনসেন বখ্তিয়ার খিলিজির যথার্থ যে রূপ দেখিয়াছেন, তাহাই বিবৃত করিলেন। কবিতাতে সেইরূপ বর্ণিত ছিল। সুতরাং গৌড়জয় ও তাঁহার রাজ্যনাশ নিশ্চিত বলিয়া বুঝিলেন।

প। তাহার পর ?

শা। রাজা তখন রোদন করিতে লাগিলেন। কহিলেন, “আমি এ বৃদ্ধ বয়সে কি করিব ? সপরিবারে যবনহস্তে প্রাণে নষ্ট হইব দেখিতেছি।” তখন দামোদর শিক্ষামত কহিলেন, “মহারাজা! ইহার সদুপায় এই যে, অবসর থাকিতে থাকিতে আপনি সপরিবারে তীর্থযাত্রা করুন। ধর্ম্মাধিকারের প্রতি রাজকার্য্যের ভার দিয়া যাউন। তাহা হইলে আপনার শরীর রক্ষা হইবে। পরে শাস্ত্র মিথ্যা হয়, রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন।” রাজা এ পরামর্শে সন্তুষ্ট হইয়া নৌকাসজ্জা করিতে আদেশ করিয়াছেন। অচিরাৎ সপরিবারে তীর্থযাত্রা করিবেন।

প। দামোদর সাধু। তুমিও সাধু। এখন আমার মনস্কামনা সিদ্ধির সম্ভাবনা দেখিতেছি। নিতান্ত পক্ষে স্বাধীন রাজা না হই, যবন-রাজ-প্রতিনিধি হইব। কার্য্যসিদ্ধি হইলে, তোমাদিগকে সাধ্যমত পুরস্কৃত করিতে ক্রুটি করিব না, তাহা ত জান। এক্ষণে বিদায় ও। কাল প্রাতেই যেন তীর্থযাত্রার জন্য নৌকা প্রস্তুত থাকে।

শান্তশীল বিদায় হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বিনা সূতার হার

পশুপতি উচ্চ অট্টালিকায় বহু ভৃত্য সমভিব্যাহারে বাস করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার পুরী কানন হইতেও অন্ধকার। গৃহ যাহাতে আলো হয়, স্ত্রী পুত্র পরিবার— এ সকল ই তাঁহার গৃহে ছিল না।

অদ্য শান্তশীলের সহিত কথোপকথনের পর, পশুপতির সেই সকল কথা মনে পড়িল। মনে ভাবিলেন, “এত কালের পর বুঝি এ অন্ধকার পুরী আলো হইল—যদি জগদম্বা অনুকূলা হয়েন, তবে মনোরমা এ অন্ধকার ঘুচাইবে।”

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে পশুপতি, শয়নের পূর্ব্বে অষ্টভুজাকে নিয়মিত প্রণাম-বন্দনাদির জন্য দেবীমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, তথায় মনোরমা বসিয়া আছে।

পশুপতি কহিলেন, “মনোরমা, কখন আসিলে ?”

মনোরমা পূজাবশিষ্ট পুষ্পগুলি লইয়া বিনাসূত্রে মালা গাঁথিতেছিল। কথার কোন উত্তর দিল না। পশুপতি কহিলেন, “আমার সঙ্গে কথা কও। যতক্ষণ তুমি থাক, ততক্ষণ সকল যন্ত্রণা বিস্মৃত হই।”

মনোরমা মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল। পশুপতির মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল, ক্ষণেক পরে কহিল, “আমি তোমাকে কি বলিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা আমার মনে হইতেছে না।”

পশুপতি কহিলেন, “তুমি মনে কর। আমি অপেক্ষা করিতেছি।”

পশুপতি বসিয়া রহিলেন, মনোরমা মালা গাঁথিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে পশুপতি কহিলেন, “আমারও কিছু বলিবার আছে, মনোযোগ দিয়া শুন। আমি এ বয়স পর্য্যন্ত কেবল বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছি—বিষয়ালোচনা করিয়াছি, অর্থোপার্জ্জন করিয়াছি। সংসারধর্ম্ম করি নাই। যাহাতে অনুরাগ, তাহাই করিয়াছি, দারপরিগ্রহ অনুরাগ নাই, এজন্য তাহা করি নাই। কিন্তু যে পর্য্যন্ত তুমি আমার নয়নপথে আসিয়াছ, সেই পর্য্যন্ত মনোরমা লাভ আমার একামাত্র ধ্যান হইয়াছে। সেই লাভের জন্য এই নিদারুণ ব্রতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি জগদীশ্বরী অনুগ্রহ করেন, তবে দুই চারি দিনের দিনের মধ্যে রাজ্যলাভ করিব এবং তোমাকে বিবাহ করিব। ইহাতে তুমি বিধবা বলিয়া যে বিঘ্ন, শাস্ত্রীয় প্রমাণের দ্বারা আমি তাহার খণ্ডন করিতে পারিব। কিন্তু তাহাতে দ্বিতীয় বিঘ্ন এই যে, তুমি কুলীনকন্যা, জনার্দ্দন শর্ম্মা কুলীনশ্রেষ্ঠ, আমি শ্রোত্রিয়।”

মনোরমা এ সকল কথায় কর্ণপাত করিতেছিল কি না সন্দেহ। পশুপতি দেখিলেন যে, মনোরমা চিত্ত হারাইয়াছে। পশুপতি, সরলা অবিকৃতা বালিকা মনোরমাকে ভালবাসিতেন,—প্রৌঢ়া তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালীনী মনোরমাকে ভয় করিতেন। কিন্তু অদ্য ভাবান্তরে সন্তুষ্ট হইলেন না। তথাপি পুনরুদ্যম করিয়া পশুপতি কহিলেন, “কিন্তু কুলরীতি ত শাস্ত্রমূলক নহে, কুলনাশে ধর্ম্মনাশ বা জাতিভ্রংশ হয় না। তাঁহার অজ্ঞাতে যদি তোমাকে বিবাহ করিতে পারি, তবে ক্ষতি কি ? তুমি সম্মত হইলেই, তাহা পারি। পরে তোমার পিতামহ জানিতে পারিলে বিবাহ ত ফিরিবে না।”

মনোরমা কোন উত্তর করিল না। সে সকল শ্রবণ করিয়াছিল কি না সন্দেহ। একটি কৃষ্ণবর্ণ মার্জ্জার তাহার নিকটে আসিয়া বসিয়াছিল, সে সেই বিনাসূত্রের মালা তাহার গলদেশে পরাইতেছিল। পরাইতে মালা খুলিয়া গেল। মনোরমা তখন আপন মস্তক হইতে কেশগুচ্ছ ছিন্ন করিয়া, তৎসূত্রে আবার মালা গাঁথিতে লাগিল।

পশুপতি উত্তর না পাইয়া নিঃশব্দে মালাকুসুমমধ্যে মনোরমার অনুপস অঙ্গুলির গতি মুগ্ধলোচনে দেখিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বিহঙ্গী পিঞ্জরে

পশুপতি মনোরমার বুদ্ধিপ্রদীপ জ্বালিবার অনেক যত্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু ফলোৎপত্তি কঠিন হইল। পরিশেষে বলিলেন, "মনোরমা, রাত্রি অধিক হইয়াছে। আমি শয়নে যাই।"

মনোরমা অম্লানবদনে কহিলেন, "যাও।"

পশুপতি শয়নে গেলেন না। বসিয়া মালা গাঁথা দেখিতে লাগিলেন। আবার উপায়ন্তর স্বরূপ, ভয়সূচক চিন্তার আবির্ভাবে কার্য্য সিদ্ধ হইবেক ভাবিয়া, মনোরমাকে ভীতা করিবার জন্য পশুপতি কহিলেন, "মনোরমা, যদি ইতিমধ্যে যবন আইসে, তবে তুমি কোথায় যাইবে ?'

মনোরমা মালা হইতে মুখ না তুলিয়া কহিল, "বাটীতে থাকিব।"

পশুপতি কহিলেন, "বাটীতে তোমাকে কে রক্ষা করিবে?"

মনোরমা পূর্ব্ববৎ অন্য মনে কহিল, "জানি না; নিরুপায়।"

পশুপতি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমাকে কি বলিতে মন্দিরে আসিয়াছ ?"

ম। দেবতা প্রণাম করিতে।

পশুপতি বিরক্ত হইলেন। কহিলেন, "তোমাকে মিনতি করিতেছি, মনোরমা, এইবার যাহা বলিতেছি, তাহা মনোযোগ দিয়া শুন—তুমি আজিও বল, আমাকে বিবাহ করিবে কি না ?"

মনোরমার মালা গাঁথা সম্পন্ন হইয়াছিল—সে তাহা একটা কৃষ্ণবর্ণ মার্জ্জারের গলায় পরাইতেছিল। পশুপতির কথা কর্ণে গেল না। মার্জ্জার মালা পরিধানে বিশেষ অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছিল—যতবার মনোরমা মালা তাহার গলায় দিতেছিল, ততবার সে মালার ভিতর হইতে মস্তক বাহির করিয়া লইতেছিল—মনোরমা কুন্দনিন্দিত দন্তে অধর দংশন করিয়া ঈষৎ হাসিতেছিল, আর আবার মালা তাহার গলায় দিতেছিল। পশুপতি অধিকতর বিরক্ত হইয়া বিড়ালকে এক চপেটাঘাত করিলেন—বিড়াল ঊর্দ্ধলাঙ্গুল হইয়া দূরে পলায়ন করিল। মনোরমা সেইরূপ দংশিতাধরে হাসিতে হাসিতে করস্থ মালা পশুপতিরই মস্তকে পরাইয়া দিল।

মার্জ্জার-প্রসাদ মস্তকে পাইয়া রাজপ্রসাদভোগী ধর্ম্মাধিকার হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন। অল্পে ক্রোধ হইল—কিন্তু দংশিতাধরা হাস্যময়ীর তৎকালীন অনুপম রূপমাধুরী দেখিয়া তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া গেল। তিনি মনোরমাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহু প্রসারণ করিলেন—অমনি মনোরমা লম্ফ দিয়া দূরে দাঁড়াইল—পথিমধ্যে উন্নতফণা কালসর্প দেখিয়া পথিক যেমন দূরে দাঁড়ায়, সেইরূপ দাঁড়াইল।

পশুপতি অপ্রতিভ হইলেন; ক্ষণেক মনোরমার মুখপ্রতি চাহিতে পারিলেন না—পরে চাহিয়া দেখিলেন—মনোরমা প্রৌঢ়বয়ঃপ্রফুল্লমুখী মহিমাময়ী সুন্দরী।

পশুপতি কহিলেন, "মনোরমা, দোষ ভাবিও না। তুমি আমার পত্নী—আমাকে বিবাহ কর।" মনোরমা পশুপতির মুখপ্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়া কহিল, "পশুপতি! কেশবের কন্যা কোথায় ?"

পশুপতি কহিলেন, “কেশবের মেয়ে কোথায় জানি না—জানিতেও চাহি না। তুমি আমার একমাত্র পত্নী।”

ম। আমি জানি কেশবের মেয়ে কোথায়—বলিব ?

পশুপতি অবাক হইয়া মনোরমার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। মনোরমা বলিতে লাগিল, ‘একজন জ্যোতির্ব্বিদ্ গণনা করিয়া বলিয়াছিল যে, কেশবের মেয়ে অল্পবয়সে বিধবা হইয়া স্বামীর অনুমৃতা হইবে। কেশব এই কথায় অল্পকালে মেয়েকে হারাইবার ভয়ে বড়ই দুঃখিত হইয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মনাশের ভয়ে মেয়েকে পাত্রস্থ করিলেন, কিন্তু বিধিলিপি খণ্ডাইবার ভরসায় বিবাহের রাত্রিতেই মেয়ে লইয়া প্রয়াগে পলায়ন করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই ছিল যে, তাঁহার মেয়ে স্বামীর মৃত্যুসংবাদ কস্মিন কালে না পাইতে পারেন। দৈবাধীন কিছুকাল পরে, প্রয়াগে কেশবের মৃত্যু হইল। তাঁহার মেয়ে পূর্ব্বেই মাতৃহীনা হইয়াছিল—এখন মৃত্যুকালে কেশব হৈমবতীকে আচার্য্যের হাতে সমর্পণ করিয়া গেলেন। মৃত্যুকালে কেশব আচার্য্যকে এই কথা বলিয়া গেলেন, এই অনাথা মেয়েটিকে আপনার গৃহে রাখিয়া প্রতিপালন করিবেন। ইহার স্বামী পশুপতি—কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদেরা বলিয়া গিয়াছেন যে, ইনি অল্পবয়সে স্বামীর অনুমৃতা হইবেন। অতএব, আপনি আমার নিকট স্বীকার করুন যে, এই মেয়েকে কখনও বলিবেন না যে, পশুপতি ইহার স্বামী। অথবা পশুপতিকে কখনও জানাইবেন না যে, ইনি তাঁহার স্ত্রী।

“আচার্য্য সেইরূপ অঙ্গীকার করিলেন। সেই পর্য্যন্ত তিনি তাহাকে পরিবারস্থ করিয়া, প্রতিপালন করিয়া, তোমার সঙ্গে বিবাহের কথা লুকাইয়াছেন।”

প। এখন সে কন্যা কোথায় ?

ম। আমিই কেশবের মেয়ে—জনার্দ্দন শর্ম্মা তাঁহার আচার্য্য।

পশুপতি চিত্ত হারাইলেন; তাঁহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল। তিনি বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া প্রতিমাসমীপে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। পরে গাত্রোত্থান করিয়া মনোরমাকে বক্ষে ধারণ করিতে গেলেন। মনোরমা পূর্ব্ববৎ সরিয়া দাঁড়াইল। কহিল, “এখন নয়—আরও কথা আছে।”

প। মনোরমা—রাক্ষসী! এতদিন কেন আমাকে এ অন্ধকারে রাখিয়াছিলে ?

ম। কেন! তুমি কি আমার কথায় বিশ্বাস করিতে ?

প। মনোরমা, তোমার কথায় কবে আমি অবিশ্বাস করিয়াছি ? আর যদিই আমার অপ্রত্যয় জন্মিত, তবে আমি জনার্দ্দন শর্ম্মাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিতাম।

ম। জনার্দ্দন কি তাহা প্রকাশ করিতেন ? তিনি শিষ্যের নিকট সত্যে বদ্ধ আছেন।

প। তবে তোমার কাছে প্রকাশ করিলেন কেন ?

ম। তিনি আমার নিকট প্রকাশ করেন নাই। একদিন গোপনে ব্রাহ্মণীর নিকট প্রকাশ করিতছিলেন আমি দৈবাৎ গোপনে শুনিয়াছিলাম। আরও আমি বিধবা বলিয়া পরিচিতা। তুমি আমার কথায় প্রত্যয় করিলে লোকে প্রত্যয় করিবে কেন ? তুমি লোকের কাছে নিন্দনীয় না হইয়া কি প্রকারে আমাকে গ্রহণ করিতে ?

প। আমি সকল লোককে একত্র করিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিতাম।

ম। ভাল, তাহাই হউক,—জ্যোতির্ব্বিদের গণনা ?

প। আমি গ্রহশান্তি করাইতাম। ভাল, যাহা হইবার, তাহা হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে যদি আমি রত্ন পাইয়াছি, তবে আর তাহা গলা হইতে নামাইব না। তুমি আর আমার ঘর ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না।

মনোরমা কহিলে, “এ ঘর ছাড়িতে হইবে। পশুপতি! আমি যাহা আজি বলিতে আসিয়াছিলাম, তাহা বলি শুন। এ ঘর ছাড়। তোমার রাজ্যলাভের দূরাশা ছাড়। প্রভুর অহিত চেষ্টা ছাড়। এ দেশ ছাড়িয়া চল, আমরা কাশীধামে যাত্রা করি। সেইখানে আমি তোমার চরণসেবা করিয়া জন্ম সার্থক করিব। যে দিন

আমাদিগের আয়ুঃশেষ হইবে, একত্রে পরমধামে যাত্রা করিব। যদি ইহা স্বীকার কর—আমার ভক্তি অচলা থাকিবে। নহিলে—”

প। নহিলে কি ?

মনোরমা তখন উন্নতমুখে, সবাষ্পলোচনে, দেবীপ্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, যুক্তকরে গদ্গদকণ্ঠে কহিল, “নহিলে দেবীসমক্ষে শপথ করিতেছি, তোমায় আমায় এই সাক্ষাৎ, এ জন্মে আর সাক্ষাৎ হইবে না।”

পশুপতিও দেবীর সমক্ষে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, “মনোরমা—আমিও শপথ করিতেছি, আমার জীবন থাকিতে তুমি আমার বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না। মনোরমা, আমি যে পথে পদার্পণ করিয়াছি, সে পথ হইতে ফিরিবার উপায় থাকিলে আমি ফিরিতাম—তোমাকে লইয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়া কাশীযাত্রা করিতাম। কিন্তু অনেক দূর গিয়াছি, আর ফিরিবার উপায় নাই—যে গ্রন্থি বাঁধিয়াছি তাহা আর খুলিতে পারি না—স্রোতে ভেলা ভাসাইয়া আর ফিরাইতে পারি না। যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়াছে। তাহা বলিয়া কি আমার পরমসুখে আমি বঞ্চিত হইব ? তুমি আমার স্ত্রী, আমার কপালে যাই থাকুক, আমি তোমাকে গৃহিণী করিব। তুমি ক্ষণেক অপেক্ষা কর—আমি শীঘ্র আসিতেছি।” এই বলিয়া পশুপতি মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। মনোরমার চিত্তে সংশয় জন্মিল। সে চিন্তিতান্তঃকরণে কিয়ৎক্ষণ মন্দিরমধ্যে দাঁড়াইয়া রহিল। আর একবার পশুপতির নিকট বিদায় না লইয়া যাইতে পারিল না।

অল্পকাল পরেই পশুপতি ফিরিয়া আসিলেন। বলিলেন, “প্রাণাধিকে! আজি আর তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিব না। আমি সকল দ্বার রুদ্ধ করিয়া আসিয়াছি।”

মনোরমা বিহঙ্গী পিঞ্জরে বদ্ধ হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ যবনদূত–যমদূত বা

বেলা প্রহরেকের সময় নগরবাসীরা বিস্মিতলোচনে দেখিল, কো অপরিচিতজাতীয় সপ্তদশ অশ্বারোহী পুরুষ রাজপথ অতিবাহিত করিয়া রাজভবনাভিমুখে যাইতেছে। তাহাদিগের আকারেঙ্গিত দেখিয়া নবদ্বীপবাসীরা ধন্যবাদ করিতে লাগিল। তাহাদিগের শরীর আয়ত, দীর্ঘ অথচ পুষ্ট; তাহাদিগের বর্ণ তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ; তাহাদিগের মুখমণ্ডল বিস্তৃত, ঘনকৃষ্ণশ্মশ্রুরাজিবিভূষিত; নয়ন প্রশস্ত, জ্বালাবিশিষ্ট। তাহাদিগের পরিচ্ছদ অনর্থক চাক্চিক্যবিবর্জ্জিত; তাহাদিগের যোদ্ধৃবেশ; সর্ব্বাঙ্গে প্রহরণজালমণ্ডিত, লোচনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। আর যে সকল সিন্ধুপার-জাত অশ্বপৃষ্ঠে তাহারা আরোহণ করিয়া যাইতেছিল, তাহারাই বা কি মনোরহ! পর্ব্বতশিলাখণ্ডের ন্যায় বৃহদাকার, বিমার্জ্জিতদেহ, বক্রগ্রীব, বল্গা-রোধ -অসহিষ্ণু তেজোগর্ব্বে নৃত্যশীল! আরোহীরা কিবা তচ্চালনা-কৌশলী—অবলীলাক্রমে সেই রুদ্ধবায়ুতুল্য তেজঃপ্রখর অশ্ব সকল দমিত করিতেছে। দেখিয়া গৌড়বাসীরা বহুতর প্রশংসা করিল।

সপ্তদশ অশ্বারোহী দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় অধরৌষ্ঠ সংশ্লিষ্ট করিয়া নীরবে রাজপুরাভিমুখে চলিল। কৌতূহলবশতঃ কোন নগরবাসী কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, সমভিব্যাহারী একজন ভাষাজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া দিতে লাগিল, “ইহারা যবন রাজার দূত।” এই বলিয়া ইহারা প্রান্তপাল ও কোষ্ঠপালদিগের নিকট পরিচয় দিয়াছিল—এবং পশুপতির আজ্ঞাক্রমে সেই পরিচয়ে নির্ব্বিঘ্নে নগরমধ্যে প্রবেশ লাভ করিল।

সপ্তদশ অশ্বারোহী রাজদ্বারে উপনীত হইল। বৃদ্ধ রাজার শৈথিল্যে আর পশুপতির কৌশলে রাজপুরী প্রায় রক্ষকহীন। রাজসভা ভঙ্গ হইয়াছিল—পুরীমধ্যে কেবল পৌরজন ছিল মাত্র—অল্পসংখ্যক দৌবারিক দ্বার রক্ষা করিতেছিল। একজন দৌবারিক জিজ্ঞাসা করিল, “তোমরা কি জন্য আসিয়াছ ?”

যবনেরা উত্তর করিল, "আমরা যবন-রাজপ্রতিনিধির দূত; গৌড়রাজের সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

দৌবারিক কহিল, "মহারাজধিরাজ গৌড়েশ্বর এক্ষণে অন্তঃপুরে গমন করিয়াছেন—এখন সাক্ষাৎ হইবে না।"

যবনেরা নিষেধ না শুনিয়া মুক্ত দ্বারপথে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। সর্ব্বাগ্রে একজন খর্ব্বকায় দীর্ঘবাহু, কুরূপ যবন। দুর্ভাগ্যবশতঃ দৌবারিক তাহার গতিরোধজন্য শূলহস্তে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। কহিল, "ফের—নচেৎ এখনই মারিব।"

"আপনিই তবে মর!" এই বলিয়া ক্ষুদ্রাকার যবন দৌবারিককে নিজকরস্থ তরবারে ছিন্ন করিল। দৌবারিক প্রাণত্যাগ করিল। তখন আপন সঙ্গীদিগের মুখাবলোকন করিয়া ক্ষুদ্রকায় যবন কহিল, "এক্ষণে আপন আপন কার্য্য কর।" অমনি বাক্যহীন ষোড়শ অশ্বারোহীদিগের মধ্য হইতে ভীষণ জয়ধ্বনি সমুত্থিত হইল। তখন সেই ষোড়শ যবনের কটিবন্ধ হইতে ষোড়শ অসিফলক নিষ্কোষিত হইল এবং অশনিসম্পাতসদৃশ তাহারা দৌবারিকদিগকে আক্রমণ করিল। দৌবারিকেরা রণসজ্জায় ছিল না—অকস্মাৎ নিরুদ্যোগে আক্রান্ত হইয়া আত্মরক্ষার কোন চেষ্টা করিতে পারিল না—মুহূর্ত্তমধ্যে সকলেই নিহত হইল।

ক্ষুদ্রাকার যবন কহিল, "যেখানে যাহাকে পাও বধ কর। পুরী অরক্ষিতা—বৃদ্ধ রাজাকে বধ কর।"

তখন যবনেরা পুরমধ্যে তাড়িতের ন্যায় প্রবেশ করিয়া। বালবৃদ্ধবনিতা পৌরজন যেখানে যাহাকে দেখিল, তাহার অসি দ্বারা ছিন্নমস্তক, অথবা শূলাগ্রে বিদ্ধ করিল।

পৌরজন তুমুল আর্ত্তনাদ করিয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। সেই ঘোর আর্ত্তনাদ, অন্তঃপুরে যথা বৃদ্ধ রাজা ভোজন করিতেছিল, তথা প্রবেশ করিল। তাঁহার মুখ শুকাইল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ঘটিয়াছে—যবন আসিয়াছে?"

পলায়নতৎপর পৌরজনেরা কহিল, "যবন সকলকে বধ করিয়া আপনাকে বধ করিতে আসিতেছে।"

কবলিত অন্নগ্রাস রাজার মুখ হইতে পড়িয়া গেল। তাঁহার শুষ্কশরীর জলস্রোতঃপ্রহত বেতসের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। নিকটে রাজমহিষী ছিলেন—রাজা ভোজনপাত্রের উপর পড়িয়া যান দেখিয়া, মহিষী তাঁহার হস্ত ধরিলেন; কহিলেন, "চিন্তা নাই—আপনি উঠুন।" এই বলিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া তুলিলেন। রাজা কলের পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

মহিষী কহিলেন, "চিন্তা কি? নৌকায় সকল দ্রব্য গিয়াছে, চলুন, আমরা খিড়কী দ্বার দিয়া সোণারগাঁ যাত্রা করি।"

এই বলিয়া মহিষী রাজার অধৌত হস্ত ধারণ করিয়া খিড়কিদ্বারপথে সুবর্ণগ্রাম যাত্রা করিলেন। সেই রাজকুলকলঙ্ক, অসমর্থ রাজার সঙ্গে গৌড়রাজ্যের রাজলক্ষ্মীও যাত্রা করিলেন।

ষোড়শ সহচর লইয়া মর্কটাকার বখ্‌তিয়ার খিলিজি গৌড়েশ্বরের রাজপুরী অধিকার করিল।

ষষ্টি বৎসর পরে যবন-ইতিহাসবেত্তা মিন্‌হাজ্‌উদ্দীন এইরূপ লিখিয়াছিলেন। ইহার কতদূর সত্য, কতদূর মিথ্যা, তাহা কে জানে? যখন মনুষ্যের লিখিত চিত্রে সিংহ পরাজিত, মনুষ্য সিংহের অপমানকর্ত্তা স্বরূপ চিত্রিত হইয়াছিল, তখন সিংহের হস্তে চিত্রফলক দিলে কিরূপ চিত্র লিখিত হইত? মনুষ্য মূষিকতুল্য প্রতীয়মান হইত সন্দেহ নাই। মন্দভাগিনী বঙ্গভূমি সহজেই দুর্ব্বলা, আবার তাহাতে শত্রুহস্তে চিত্রফলক!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : জাল ছিঁড়িল

গৌড়েশ্বরপুরে অধিষ্ঠিত হইয়াই বখ্‌তিয়ার খিলিজি ধর্ম্মাধিকারের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। ধর্ম্মাধিকারের সহিত সাক্ষাতের অভিলাষ জানাইলেন। তাঁহার

সহিত যবনের সন্ধি নিবন্ধন হইয়াছিল, তাহার ফলোৎপাদনের সময় উপস্থিত!

পশুপতি ইষ্টদেবীকে প্রণাম করিয়া, কুপিতা মনোরমার নিকট বিদায় লইয়া, কদাচিৎ উল্লসিত—কদাচিৎ শঙ্কিত চিত্তে যবনসমীপে উপস্থিত হইলেন। বখ্‌তিয়ার খিলিজি গাত্রোত্থান করিয়া সাদরে তাহার অভিবাদন করিলেন এবং কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। পশুপতি রাজভৃত্যবর্গের রক্তনদীতে চরণ প্রক্ষালন করিয়া আসিয়াছেন, সহসা কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। বখ্‌তিয়ার খিলিজি তাঁহার চিত্তের ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, “পণ্ডিতবর! রাজসিংহাসন আরোহণের পথ কুসুমাবৃত নহে। এ পথে চলিতে গেলে, বন্ধুবর্গের অস্থিমুণ্ড সর্ব্বদা পদে বিদ্ধ হয়।”

পশুপতি কহিলেন, “সত্য। কিন্তু যাহারা বিরোধী, তাহাদিগেরই বধ আবশ্যক। ইহারা নির্ব্বিরোধী।”

বখ্‌তিয়ার কহিলেন, “আপনি কি শোণিতপ্রবাহ দেখিয়া, নিজ অঙ্গীকার স্মরণে অসুখী হইতেছেন?”

পশুপতি কহিলেন, “যাহা স্বীকার করিয়াছি, তাহা অবশ্য করিব। মহাশয়ও যে তদ্রূপ করিবেন, তাহাতে আমার কোন সংশয় নাই।”

বখ্। কিছুমাত্র সংশয় নাই। কেবলমাত্র আমাদিগের এক যাঞ্ঞা আছে।

প। আজ্ঞা করুন।

ব। কুতব্‌উদ্দীন গৌড়-শাসনভার আপনার প্রতি অর্পণ করিলেন। আজ হইতে আপনি বঙ্গে রাজপ্রতিনিধি হইলেন। কিন্তু যবন-সম্রাটের সঙ্কল্প এই যে, ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বী ব্যতীত কেহ তাঁহার রাজকার্য্যে সংলিপ্ত হইতে পারিবে না। আপনাকে ইস্‌লামধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হইবে।

পশুপতির মুখ শুকাইল। তিনি কহিলেন, “সন্ধির সময় এরূপ কেন কথা হয় নাই।”

ব। যদি না হইয়া থাকে, তবে সেটা ভ্রান্তিমাত্র। আর এ কথা উত্থাপিত না হইলেও আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যক্তি দ্বারা অনায়াসেই অনুমিত হইয়া থাকিবে। কেন না, এমন কখনও সম্ভব না যে, মুসলমানেরা বাঙ্গালা জয় করিয়াই আবার হিন্দুকে রাজ্য দিবে।

প। আমি বুদ্ধিমান বলিয়া আপনার নিকট পরিচিত হইতে পারিলাম না।

ব। না বুঝিয়া থাকেন, এখন বুঝিলেন; আপনি যবনধর্ম্ম অবলম্বনে স্থিরসঙ্কল্প হউন।

প। (সদর্পে) আমি স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছি যে, যবন-সম্রাটের সাম্রাজ্যের জন্যও সনাতনধর্ম্ম ছাড়িয়া নরকগামী হইব না।

ব। ইহা আপনার ভ্রম। যাহাকে সনাতন ধর্ম্ম বলিতেছেন, সে ভূতের পূজা মাত্র। কোরাণ-উক্ত ধর্ম্মই সত্য ধর্ম্ম। মহম্মদ ভজিয়া ইহকাল পরকালে মঙ্গলসাধন করুন।

পশুপতি যবনের শঠতা বুঝিলেন। তাহার অভিপ্রায় এই মাত্র যে, কার্য্যসিদ্ধি করিয়া নিবদ্ধ সন্ধি ছলক্রমে ভঙ্গ করিবে। আরও বুঝিলেন, ছলক্রমে না পারিলে, বলক্রমে করিবে। অতএব কপটের সহিত কাপট্য অবলম্বন না করিয়া দর্প করিয়া ভাল করেন নাই। তিনি ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিলেন, “যে আজ্ঞা। আমি আজ্ঞানুবর্ত্তী হইব।”

বখ্‌তিয়ার তাঁহার মনের ভাব বুঝিলেন। বখ্‌তিয়ার যদি পশুপতির অপেক্ষা চতুর না হইতেন, তবে এত সহজে গৌড়জয় করিতে পারিতেন না। বঙ্গভূমির অদৃষ্টলিপি এই যে, এ ভূমি যুদ্ধে জিত হইবে না; চাতুর্য্যেই ইহার জয়। চতুর ক্লাইব সাহেব ইহার দ্বিতীয় পরিচয়স্থান।

বখ্‌তিয়ার কহিলেন, “ভাল, ভাল। আজ আমাদিগের শুভ দিন। এরূপ কার্য্যে বিলম্বের প্রায়োজন নাই। আমাদিগের পুরোহিত উপস্থিত, এখনই আপনাকে ইস্‌লামের ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবেন।”

পশুপতি দেখিলেন, সর্ব্বনাশ! বলিলেন, "একবার মাত্র অবকাশ দিউন, পরিবারগণকে লইয়া আসি, সপরিবারে একেবারে দীক্ষিত হইব।"

বখ্‌তিয়ার কহিলেন, "আমি তাঁহাদিগকে আনিতে লোক পাঠাইতেছি। আপনি এই প্রহরীর সঙ্গে গিয়া বিশ্রাম করুন।"

প্রহরী আসিয়া পশুপতিকে ধরিল। পশুপতি ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "সে কি? আমি কি বন্দী হইলাম ?"

বখ্‌তিয়ার কহিলেন, "আপাততঃ তাহাই বটে!"

পশুপতি রাজপুরীমধ্যে নিরুদ্ধ হইলেন। ঊর্ণনাভের জাল ছিঁড়িল—সে জালে কেবল স্বয়ং জড়িত হইল।

আমরা পাঠক মহাশয়ের নিকট পশুপতিকে বুদ্ধিমান্ বলিয়া পরিচিত করিয়াছি। পাঠক মহাশয় বলিলেন, যে ব্যক্তি শত্রুকে এতদূর বিশ্বাস করিল, সহায়হীন হইয়া তাহাদিগের অধিকৃত পুরীমধ্যে প্রবেশ করিল, তাহার চতুরতা কোথায় ? কিন্তু বিশ্বাস না করিয়া কি করেন। এ বিশ্বাস না করিলে যুদ্ধ করিতে হয়। ঊর্ণনাভ জাল পাতে, যুদ্ধ করে না।

সেই দিন রাত্রিকাল মহাবন হইতে বিংশতি সহস্র যবন আসিয়া নবদ্বীপ প্লাবিত করিল। নবদ্বীপ-জয় সম্পন্ন হইল। যে সূর্য্য সেই দিন অস্তে গিয়াছে, আর তাহার উদয় হইল না। আর কি উদয় হইবে না ? উদয় অস্ত উভয়ই ত স্বাভাবিক নিয়ম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : পিঞ্জর ভাঙ্গিল

যতক্ষণ পশুপতি গৃহে ছিলেন, ততক্ষণ তিন মনোরমাকে নয়নে নয়নে রাখিয়াছিলেন। যখন তিনি যবনদর্শনে গেলেন, তখন তিনি গৃহের সকল দ্বার রুদ্ধ করিয়া শান্তশীলকে গৃহরক্ষায় রাখিয়া গেলেন।

পশুপতি যাইবামাত্র, মনোরমা পলায়নের উদ্যোগ করিতে লাগিল। গৃহের কক্ষে কক্ষে অনুসন্ধান করিতে লাগিল। পলায়নে উপযুক্ত কোন পথ মুক্ত দেখিল না। অতি ঊর্দ্ধে কতকগুলি গবাক্ষ ছিল; কিন্তু তাহা দুরারোহণীয়; তাহার মধ্য দিয়া মনুষ্যশরীর নির্গত হইবার সম্ভাবনা ছিল না; আর তাহা ভূমি হইতে এত উচ্চ যে তথা হইতে লম্ফ দিয়া ভূমিতে পড়িলে অস্থি চূর্ণ হইবার সম্ভাবনা। মনোরমা উন্মাদিনী; সেই গবাক্ষপথেই নিষ্ক্রান্ত হইবার মানস করিল।

অতএব পশুপতি যাইবার ক্ষণকাল পরেই, মনোরমা পশুপতির শয্যাগৃহে পালঙ্কের উপর আরোহণ করিল। পালঙ্ক হইতে গবাক্ষারোহণ সুলভ হইল। পালঙ্ক হইতে গবাক্ষ অবলম্বন করিয়া, মনোরমা গবাক্ষরন্ধ্র দিয়া প্রথমে দুই হস্ত, পশ্চাৎ মস্তক, পরে বক্ষ পর্য্যন্ত বাহির করিয়া দিল। গবাক্ষনিকটে উদ্যানস্থ একটি আম্রবৃক্ষের ক্ষুদ্র শাখা দেখিল মনোরমা তাহা ধারণ করিল; এবং তখন পশ্চাদ্ভাগ গবাক্ষ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া, শাখাবলম্বনে ঝুলিতে লাগিল। কোমল শাখা তাহার ভরে নমিত হইল; তখন ভূমি তাহার চরণ হইতে অনতিদূরবর্ত্তী হইল। মনোরমা শাখা ত্যাগ করিয়া অবলীলাক্রমে ভূতলে পড়িল এবং তিলমাত্র অপেক্ষা না করিয়া জনার্দ্দনের গৃহাভিমুখে চলিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : যবনবিপ্লব

সেই নিশীথে নবদ্বীপ নগর বিজয়োন্মত্ত যবনসেনার নিষ্পীড়নে বাত্যাসন্তাড়িত তরঙ্গোৎক্ষেপী সাগর সদৃশ চঞ্চল হইয়া উঠিল। রাজপথ, ভূরি ভূরি অশ্বরোহিগণে, ভূরি ভূরি পদাতিদলে, ভূরি ভূরি খড়্গী, ধানুকী, শূলিসমূহসমারোহে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সেনাবলহীন রাজধানীর নাগরিকেরা ভীত হইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল;

দ্বার রুদ্ধ করিয়া সভয়ে ইষ্টনাম জপ করিতে লাগিল।

যবনেরা রাজপথে যে দুই-একজন হতভাগ্য আশ্রয়হীন ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হইল, তাহাদিগকে শূলবিদ্ধ করিয়া রুদ্ধদ্বার ভবন সকল আক্রমণ করিতে লাগিল। কোথায়ও বা দ্বার ভগ্ন করিয়া, কোথায়ও বা প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া, কোথায়ও বা শঠতাপূর্ব্বক ভীত গৃহস্থকে জীবনাশা দিয়া গৃহপ্রবেশ করিতে লাগিল। গৃহপ্রবেশ করিয়া, গহস্থের সর্ব্বস্বাপহরণ, পশ্চাৎ স্ত্রীপুরুষ, বৃদ্ধ, বনিতা, বালক সকলেরই শিরশ্ছেদ, ইহাই নিয়মপূর্ব্বক করিতে লাগিল। কেবল যুবতীর পক্ষে দ্বিতীয় নিয়ম।

শোণিতে গৃহস্থের গৃহ সকল প্লাবিত হইতে লাগিল। শোণিতে রাজপথ পঙ্কিল হইল। শোণিতে যবনসেনা রক্তচিত্রময় হইল। অপহৃত দ্রব্যজাতের ভারে অশ্বের পৃষ্ঠ এবং মনুষ্যের স্কন্ধ পীড়িত হইতে লাগিল। শূলাগ্রে বিদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণের মুণ্ড সকল ভীষণভাব ব্যক্ত করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত অশ্বের গলদেশে দুলিতে লাগিল। সিংহাসনস্থ শালগ্রামশিলা সকল যবন-পদাঘাতে গড়াইতে লাগিল।

ভয়ানক শব্দে নৈশাকাশ পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। অশ্বের পদধ্বনি, সৈনিকের কোলাহল, হস্তীর বৃংহিত, যবনের জয়শব্দ, তদুপরি পীড়িতের আর্ত্তনাদ। মাতার রোদন, শিশুর রোদন; বৃদ্ধের করুণাকাঙ্ক্ষা, যুবতীর কণ্ঠবিদার।

যে বীরপুরুষকে মাধবাচার্য্য এত যত্নে যবনদমনার্থ নবদ্বীপে লইয়া আসিয়াছিলেন, এ সময়ে তিনি কোথা ?

এই ভয়ানক যবনপ্রলয়কালে, হেমচন্দ্র রণোন্মুখ নহেন। একাকী রণোন্মুখ হইয়া কি করিবেন ?

হেমচন্দ্র তখন আপন গৃহের শয়নমন্দিরে শয্যোপরি শয়ন করিয়া ছিলেন। নগরাক্রমণের কোলাহল তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি দিগ্বিজয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের শব্দ ?"

দিগ্বিজয় কহিল, "যবনসেনা নগর আক্রমণ করিয়াছে।"

হেমচন্দ্র চমৎকৃত হইলেন। তিনি এ পর্য্যন্ত বখ্তিয়ারকর্ত্তৃক রাজপুরাধিকার এবং রাজার পলায়নের বৃত্তান্ত শুনেন নাই। দিগ্বিজয় তদ্বিশেষ হেমচন্দ্রকে শুনাইল।

হেমচন্দ্র কহিলেন, "নাগরিকেরা কি করিতেছে ?"

দি। যে পারিতেছে পলায়ন করিতেছে, যে না পারিতেছে সে প্রাণ হারাইতেছে।

হে। আমার অশ্বসজ্জা কর।

দিগ্বিজয় বিস্মিত হইল, জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইবেন ?"

হে। নগরে।

দি। একাকী ?

হেমচন্দ্র ভ্রূকুটি করিলেন। ভ্রূকুটি দেখিয়া দিগ্বিজয় ভীত হইয়া অশ্বসজ্জা করিতে গেল।

হেমচন্দ্র তখন মহামূল্য রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া সুন্দর অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন এবং ভীষণ শূলহস্তে নির্ঝরিণীপ্রেরিত জলবিম্ববৎ সেই অসীম যবন-সেনা-সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন।

হেমচন্দ্র দেখিলেন, যবনসেনা যুদ্ধ করিতেছে না, কেবল অপহরণ করিতেছে। যুদ্ধজন্য কেহই তাহাদিগের সম্মুখীন হইয় নাই, সুতরাং যুদ্ধে তাহাদিগেরও মন

ছিল না। যাহাদিগের অপহরণ করিতেছিল, তাহাদিগকেই অপহরণকালে বিনা যুদ্ধে মারিতেছিল। সুতরাং যবনেরা দলবদ্ধ হইয়া হেমচন্দ্রকে নষ্ট করিবার কোন উদ্যোগ করিল না। যে কোন যবন তৎকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাঁহার সহিত একা যুদ্ধোদ্যম করিল, সে তৎক্ষণাৎ মরিল।

হেমচন্দ্র বিরক্ত হইলেন। তিনি যুদ্ধাকাঙ্ক্ষায় আসিয়াছিলেন, কিন্তু যবনেরা পূর্ব্বেই বিজয়লাভ করিয়াছে, অর্থসংগ্রহ ত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিত রীতিমত যুদ্ধ করিল না। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, "একটি একটি করিয়া গাছের পাতা ছিঁড়িয়া কে অরণ্যকে নিষ্পত্র করিতে পারে? একটি একটি যবন মারিয়া কি করিব? যবন যুদ্ধ করিতেছে না—যবনবধেই বা কি সুখ? বরং গৃহীদের রক্ষার সাহায্যে মন দেওয়া ভাল।" হেমচন্দ্র তাহাই করিতে লাগিলেন, কিন্তু বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। দুইজন যবন তাঁহার সহিত যুদ্ধ করে, অপর যবনে সেই অবসরে গৃহস্থদিগের সর্ব্বস্বান্ত করিয়া চলিয়া যায়। যাহাই হউক, হেমচন্দ্র যথাসাধ্য পীড়িতের উপকার করিতে লাগিলেন। পথপার্শ্বে এক কুটীরমধ্য হইতে হেমচন্দ্র আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিলেন। যবনকর্ত্তৃক আক্রান্ত ব্যাক্তির আর্ত্তনাদ বিবেচনা করিয়া হেমচন্দ্র গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দেখিলেন, গৃহমধ্যে যবন নাই। কিন্তু গৃহমধ্যে যবনদৌরাত্ম্যের চিহ্ন সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। দ্রব্যাদি প্রায় কিছুই নাই, যাহা আছে তাহার ভগ্নাবস্থা; আর এক ব্রাহ্মণ আহত অবস্থায় ভূমে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। সে এ প্রকার গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে যে, মৃত্যু আসন্ন। হেমচন্দ্রকে দেখিয়া সে যবনভ্রমে কহিতে লাগিল, "আইস—প্রহার কর—শীঘ্র মরিব—মার—আমার মাথা লইয়া সেই রাক্ষসীকে দিও—আঃ—প্রাণ যায়—জল! জল! কে জল দিবে!"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "তোমার ঘরে জল আছে?"

ব্রাহ্মণ কাতরোক্তিতে কহিতে লাগিল, "জানি না-মনে হয় না—জল! জল! পিশাচী!—সেই পিশাচীর জন্য প্রাণ গেল!"

হেমচন্দ্র কুটীরমধ্যে অন্বেষণ করিয়া দেখিলেন, এক কলসে জল আছে। পাত্রাভাবে পত্রপুটে তাহা জলদান করিলেন। ব্রাহ্মণ কহিল, "না! না! জল খাইব না! যবনের জল খাইব না।" হেমচন্দ্র কহিলেন, "আমি যবন নহি, আমি হিন্দু, আমার হাতে জল পান করিতে পার। আমার কথায় বুঝিতে পারিতেছ না?"

ব্রাহ্মণ জল পান করিল। হেমচন্দ্র কহিলেন, "তোমার আর কি উপকার করিব?"

ব্রাহ্মণ কহিল, "আর কি করিবে? আর কি? আমি মরি! মরি! যে মরে তাহার কি করিবে?"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "তোমার কেহ আছে? তাহাকে তোমার নিকট রাখিয়া যাইব?"

ব্রাহ্মণ কহিল, "আর কে—কে আছে? ঢের আছে। তার মধ্যে সেই রাক্ষাসী! সেই রাক্ষাসী—তাহাকে—বলিও—বলিও আমার অপ—অপরাধের প্রতিশোধ হইয়াছে।"

হেমচন্দ্র। কে সে? কাহাকে বলিব?

ব্রাহ্মণ কহিতে লাগিল, "কে সে পিশাচী! পিশাচী চেন না? পিশাচী মৃণালিনী—মৃণালিনী! মৃণালিনী—পিশাচী।"

ব্রাহ্মণ অধিকতর আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। হেমচন্দ্র মৃণালিনীর নাম শুনিয়া চমকিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "মৃণালিনী তোমার কে হয়?"

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "মৃণালিনী কে হয়? কেহ না—আমার যম।"

হেমচন্দ্র। মৃণালিনী তোমার কি করিয়াছে?

ব্রাহ্মণ। কি করিয়াছে?—কিছু না—আমি—আমি তার দুর্দ্দশা করিয়াছি, তাহার প্রতিশোধ হইল—

হেমচন্দ্র। কি দুর্দ্দশা করিয়াছ?

ব্রাহ্মণ। আর কথা কহিতে পারি না, জল দাও।

হেমচন্দ্র পুনর্ব্বার তাহাকে জলপান করাইলেন। ব্রাহ্মণ জলপান করিয়া স্থির হইলে হেমচন্দ্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি ?"

ব্রা। ব্যোমকেশ।

হেমচন্দ্র চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। দন্তে অধর দংশন করিলেন। করস্থ শূল দৃঢ়তর মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধরিলেন। আবার তখনই শান্ত হইয়া কহিলেন, "তোমার নিবাস কোথা?"

বরা। গৌড়—গৌড় জান না ? মৃণালিনী আমাদের বাড়িতে থাকিত।

হে। তার পর ?

ব্রা। তার পর—তার আর কি ? তার পর আমার এই দশা—মৃণালিনী পাপিষ্ঠা; বড় নির্দ্দয়—আমার প্রতি ফিরিয়াও চাহিল না। রাগ করিয়া আমার পিতার নিকট আমি তাহার নামে মিছা কলঙ্ক রটাইলাম। পিতা তাহাকে বিনাদোষে তাড়াইয়া দিলেন। রাক্ষসী—রাক্ষসী আমাদের ছেড়ে গেল।

হে। তবে তুমি তাহাকে গালি দিতেছ কেন ?

ব্রা। কেন ?—কেন ? গালি—গালি দিই? মৃণালিনী আমাকে ফিরিয়া দেখিত না—আমি—আমি তাহাকে দেখিয়া জীবন—জীবন ধারণ করিতাম। সে চলিয়া আসিল, সেই—সেই অবধি আমার সর্ব্বস্ব ত্যাগ, তাহার জন্য কোন্ দেশে—কোন্ দেশে না গিয়াছি—কোথায় পিশাচীর সন্ধান না করিয়াছি ? গিরিজায়া—ভিখারীর মেয়ে—তার আয়ি বলিয়া দিল—নবদ্বীপে আসিয়াছে—নবদ্বীপে আসিলাম, সন্ধান নাই। যবন—যবন-হস্তে মরিলাম, রাক্ষসীর জন্য মরিলাম—দেখা হইলে বলিও—আমার পাপের ফল ফলিল।

আর ব্যোমকেশের কথা সরিল না। সে পরিশ্রমে একেবারে নির্জ্জীব হইয়া পড়িল। নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ নিবিল! ক্ষণপরে বিকট মুখভঙ্গী করিয়া ব্যোমকেশ প্রাণত্যাগ করিল।

হেমচন্দ্র আর দাঁড়াইলেন না। আর যবন বধ করিলেন না—কোন মতে পথ ধরিয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : মৃণালিনীর সুখ কি ?

যেখানে হেমচন্দ্র তাঁহাকে সোপানপ্রস্তরাঘাতে ব্যথিত করিয়া গিয়াছিলেন—মৃণালিনী এখনও সেইখানে। পৃথিবীতে যাইবার আর স্থান ছিল না—সর্ব্বত্র সমান হইয়াছিল। নিশা প্রভাত হইল, গিরিজিয়া যত কিছু বলিলেন—মৃণালিনী কোন উত্তর দিলেন না, অধোবদনে বসিয়া রহিলেন। স্নানাহারের সময় উপস্থিত হইল—গিরিজায়া তাঁহাকে জলে নামইয়া স্নান করাইল। স্নান করিয়া মৃণালিনী আর্দ্রবসনে সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন। গিরিজায়া স্বয়ং ক্ষুধাতুরা হইল—কিন্তু গিরিজায়া মৃণালিনকে উঠাইতে পারিল না—সাহস করিয়া বার বার বলিতেও পারিল না। সুতরাং নিকটস্থ বন হইতে কিঞ্চিৎ ফলমূল সংগ্রহ করিয়া ভোজন জন্য মৃণালিনীকে দিল। মৃণালিনী তাহা স্পর্শ করিলেন মাত্র। প্রসাদ গিরিজায়া ভোজন করিল—ক্ষুধার অনুরোধে মৃণালিনীকে ত্যাগ করিল না।

এইরূপে পূর্ব্বাচলের সূর্য্য মধ্যাকাশে, মধ্যাকাশের সূর্য্য পশ্চিমে গেলেন। সন্ধ্যা হইল। গিরিজায়া দেখিলেন যে, তখনও মৃণালিনী গৃহে প্রত্যাগমন করিবার লক্ষণ প্রকাশ করিতেছেন না। গিরিজায়া বিশেষ চঞ্চলা হইলেন। পূর্ব্বরাত্রে জাগরণ গিয়াছে—এ রাত্রেও জাগরণের আকার। গিরিজায়া কিছু বলিল

না—বৃক্ষপল্লব সংগ্রহ করিয়া সোপানোপরি আপন শয্যা রচনা করিল। মৃণালিনী তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া কহিলেন, "তুমি ঘরে গিয়া শোও।"

গিরিজায়া মৃণালিনীর কথা শুনিয়া আনন্দিত হইল। বলিল, "একত্র যাইব।"

মৃণালিনী বলিলেন, "আমি যাইতেছি।"

গি। আমি ততক্ষণ অপেক্ষা করিব। ভিখারিণী দুই দণ্ড পাতা পাতিয়া শুইলে ক্ষতি কি? কিন্তু সাহস পাই ত বলি—রাজপুত্রের সহিত এ জন্মের মত সম্বন্ধ ঘুচিল—তবে আর কার্ত্তিকের হিমে আমরা কষ্ট পাই কেন?

মৃ। গিরিজায়া—হেমচন্দ্রের সহিত এ জন্মে সম্বন্ধ ঘুচিবে না। আমি কালিও হেমচন্দ্রের দাসী ছিলাম—আজিও তাঁহার দাসী।

গিরিজায়ার বড় রাগ হইল—সে উঠিয়া বসিল। বলিল, "কি ঠাকুরাণী! তুমি এখনও বল—তুমি সেই পাষণ্ডের দাসী! তুমি যদি তাঁহার দাসী—তবে আমি চলিলাম—আমার এখানে আর প্রয়োজন নাই।"

মৃ। গিরিজায়া—যদি হেমচন্দ্র তোমাকে পীড়ন করিয়া থাকেন, তুমি স্থানান্তরে তাঁর নিন্দা করিও। হেমচন্দ্র আমার প্রতি কোন অত্যাচার করেন নাই—আমি কেন তাঁহার নিন্দা সহিব? তিনি রাজপুত্র—আমার স্বামী; তাহাকে পাষণ্ড বলিও না।

গিরিজায়া আরও রাগ করিল। বহুযত্নরচিত পর্ণশয্যা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল। কহিল, "পাষণ্ড বলিব না?—একবার বলিব?" (বলিয়াই কতকগুলি শয্যাবিন্যাসের পল্লব সদর্পে জলে ফেলিয়া দিল) "একবার বলিব?—দশবার বলিব" (আবার পল্লব নিক্ষেপ)—"শতবার বলিব"(পল্লব নিক্ষেপ)—"হাজারবার বলিব।" এইরূপে সকল পল্লব জলে গেল। গিরিজায়া বলিতে লাগিল, "পাষণ্ড বলিব না? কি দোষে তোমাকে তিনি এত তিরস্কার করিলেন?"

মৃ। সে আমারই দোষ—আমি গুছাইয়া সকল কথা তাঁহাকে বলিতে পারি নাই—কি বলিতে বলিলাম।

গি। ঠাকুরাণী! আপনার কপাল টিপিয়া দেখ।

মৃণালিনী ললাট স্পর্শ করিলেন।

গি। কি দেখিলে?

মৃ। বেদনা।

গি। কেন হইলে?

মৃ। মনে নাই।

গি। তুমি হেমচন্দ্রের অঙ্গে মাথা রাখিয়াছিলে—তিনি ফেলিয়া দিয়া গিয়াছেন। পাতরে পড়িয়া তোমার মাথায় লাগিয়াছে।

মৃণালিনী ক্ষণেক চিন্তা করিয়া দেখিলেন—কিছু মনে পড়িল না। বলিলেন, "মনে হয় না; বোধ হয়, আমি আপনি পড়িয়া গিয়া থাকিব।"

গিরিজায়া বিস্মিতা হইল। বলিল, "ঠাকুরাণী! এ সংসারে আপনি সুখী।"

মৃ। কেন?

গি। আপনি রাগ করেন না।

মৃ। আমিই সুখী—কিন্তু তাহার জন্য নহে।

গি। তবে কিসে ?

মৃ। হেমচন্দ্রের সাক্ষাৎ পাইয়াছি।

নবম পরিচ্ছেদ : স্বপ্ন

গিরিজায়া কহিল, “গৃহে চল।” মৃণালিনী বলিলেন, “নগরে এ কিসের গোলযোগ?” তখন যবনসেনা নগর মন্থন করিতেছিল।

তুমুল কোলাহল শুনিয়া উভয়ের শঙ্কা হইল। গিরিজায়া বলিল, “চল, এই বেলা সতর্ক হইয়া যাই।” কিন্তু দুই জনে রাজপথের নিকট পর্য্যন্ত গিয়া দেখিলেন, গমনের কোন উপায়ই নাই। অগত্যা প্রত্যাগমন করিয়া সরোবর-সোপানে বসিলেন। গিরিজায়া বলিল, “যদি এখানে উহারা আইসে ?”

মৃণালিনী নীরবে রহিলেন। গিরিজায়া আপনিই বলিল, “বনের ছায়ামধ্যে এমন লুকাইব—কেহ দেখিতে পাইবে না।”

উভয়ে আসিয়া সোপানোপরি উপবেশন করিয়া রহিলেন।

মৃণালিনী ম্লানবদনে গিরিজায়াকে কহিলেন, “গিরিজায়া, বুঝি আমার যথার্থই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল।”

গি। সে কি!

মৃ। এই এক অশ্বারোহী গমন করিল; ইনি হেমচন্দ্র। সখি—নগরে ঘোর যুদ্ধ হইতেছে; যদি নিঃসহাসে প্রভু সে যুদ্ধে গিয়া থাকেন—না জানি কি বিপদে পড়িবেন।

গিরিজায়া কোন উত্তর করিতে পারিল না। তাহার নিন্দ্রা আসিতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মৃণালিনী দেখিলেন যে, গিরিজায়া ঘুমাইতেছে।

মৃণালিনীও, একে আহারনিদ্রাভাবে দুর্ব্বলা—তাহাতে সমস্ত রাত্রিদিন মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন, সুতরাং নিদ্রা ব্যতীত আর শরীর বহে না—তাঁহারও তন্দ্রা আসিল। নিদ্রায় তিনি স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন যে, হেমচন্দ্র একাকী সর্ব্বসমরে বিজয়ী হইয়াছেন। মৃণালিনী যেন বিজয়ী বীরকে দেখিতে রাজপথে দাঁড়াইয়াছিলেন। রাজপথে হেমচন্দ্রের অগ্রে, পশ্চাৎ, কত হস্তী, অশ্ব, পদাতি যাইতেছে। মৃণালিনীকে যেন সেই সেনাতরঙ্গ ফেলিয়া দিয়া চরণদলিত করিয়া চলিয়া গেল—তখন হেমচন্দ্র নিজ সৈন্ধবী তুরঙ্গী হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহাকে হস্ত ধরিয়া উঠাইলেন। তিনি যেন হেমচন্দ্রকে বলিলেন, “প্রভু! অনেক যন্ত্রণা পাইয়াছি; দাসীকে আর ত্যাগ করিও না।” হেমচন্দ্র যেন বলিলেন, “আর কখনও তোমায় ত্যাগ করিব না।” সেই কণ্ঠস্বর যেন—

তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, “আর কখনও তোমায় ত্যাগ করিব না।” জাগ্রতেও এই কথা শুনিলেন। চক্ষু উন্মীলন করিলেন—কি দেখিলেন ? যাহা দেখিলেন, তাহা বিশ্বাস হইল না। আবার দেখিলেন, সত্য! হেমচন্দ্র সম্মুখে!—হেমচন্দ্র বলিতেছেন—“আর একবার ক্ষমা কর—আর কখনও তোমায় ত্যাগ করিব না।”

নিরভিমানিনী, নিলর্জ্জা মৃণালিনী আবার তাঁহার কণ্ঠলগ্না হইয়া স্কন্ধে মস্তক রক্ষা করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ : প্রেম–নানা প্রকার

আনন্দাশ্রুপ্লাবিত-বদনা, মৃণালিনীকে হেমচন্দ্র হস্তে ধরিয়া উপবন-গৃহাভিমুখে লইয়া চলিলেন। হেমচন্দ্র মৃণালিনীকে একবার অপমানিতা, তিরস্কৃতা, ব্যথিতা করিয়া ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, আবার আপনি আসিয়াই তাঁহাকে হৃদয় গ্রহণ করিলেন,—ইহা দেখিয়া গিরিজায়া বিস্মিতা হইল, কিন্তু মৃণালিনী একটি কথাও

জিজ্ঞাসা করিলেন না, একটি কথাও কহিলেন না। আনন্দপরিপ্লববিবশা হইয়া বসনে অশ্রুস্রুতি আবৃত করিয়া চলিলেন। গিরিজায়াকে ডাকিতে হইল না—সে স্বয়ং অন্তরে থাকিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

উপবনবাটিকায় মৃণালিনী আসিলে, তখন উভয়ে বহুদিনের হৃদয়ের কথা সকল ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। তখন হেমচন্দ্র, যে যে ঘটনায় মৃণালিনীকে প্রতি তাঁহার চিত্তের বিরাগ হইয়াছিল আর যে যে কারণে সেই বিরাগের ধ্বংস হইয়াছিল, তাহা বলিলেন। তখন মৃণালিনী যে প্রকারে হৃষীকেশের গৃহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, যে প্রকারে নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন, সেই সকল বলিলেন। তখন উভয়েই হৃদয়ের পূর্ব্বোদিত কত ভাব পরস্পরের নিকট ব্যক্ত করিতে লাগিলেন তখন উভয়েই কত ভবিষ্যৎসম্বন্ধে কল্পনা করিতে লাগিলেন; তখন কতই নূতন নূতন প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইতে লাগিলেন। তখন উভয়ে নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন কত কথাই অতি প্রয়োজনীয় কথার ন্যায় আগ্রহ সহকারে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। তখন কতবার উভয়ে মোক্ষানুখ অশ্রুজল কষ্টে নিবারিত করিলেন। তখন কতবার উভয়ের মুখপ্রতি চাহিয়া অনর্থক মধুর হাসি হাসিলেন; সে হাসির অর্থ "আমি এখন কত সুখী!" পরে যখন প্রভাতোদয়সূচক পক্ষিগণ রব করিয়া উঠিল, তখন কতবার উভয়েই বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন যে, আজি এখনই রাত্রি পোহাইল কেন?—আর সেই নগরমধ্যে যবনবিপ্লবের যে কোলাহল উচ্ছ্বসিত সমুদ্রের বীচি-রববৎ উঠিতেছিল—আজ হৃদয়সাগরের তরঙ্গরবে সে রব ডুবিয়া গেল।

উপবন-গৃহে আর এক স্থানে আর একটি কাণ্ড হইয়াছিল। দিগ্বিজয় প্রভুর আজ্ঞামত রাত্রি জাগরণ করিয়া গৃহরক্ষা করিতেছিল, মৃণালিনীকে লইয়া যখন হেমচন্দ্র আইসেন, তখন সে দেখিয়া চিনিল। মৃণালিনী তাহার নিকট অপরিচিতা ছিলেন না—যে কারণে পরিচিতা ছিলেন, তাহা ক্রমে প্রকাশ পাইতেছে। মৃণালিনীকে দেখিয়া দিগ্বিজয় কিছু বিস্মিত হইল, কিন্তু জিজ্ঞাসা সম্ভাবনা নাই, কি করে? ক্ষণেক পরে গিরিজায়াও আসিল দেখিয়া দিগ্বিজয় মনে ভাবিল, "বুঝিয়াছি—ইহারা দুই জন গৌড় হইতে আমাদিগের দুই জনকে দেখিতে আসিয়াছে। ঠাকুরাণী যুবরাজকে দেখিতে আসিয়াছেন, আর এটা আমাকে দেখিতে আসিয়াছে সন্দেহ নাই।" এই ভাবিয়া দিগ্বিজয় একবার আপনার গোঁপদাড়ি চুমরিয়া লইল, এবং ভাবিল, "না হবে কেন?" আবার ভাবিল, "এটা কিন্তু বড়ই নষ্ট—এক দিনের তরে কই আমাকে ভাল কথা বলে নাই—কেবল আমাকে গালিই দেয়—তবে ও আমাকে দেখিতে আসিবে, তাহার সম্ভাবনা কি? যাহা হউক, একটা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। রাত্রি ত শেষ হইল—প্রভুও ফিরিয়া আসিয়াছেন; এখন আমি পাশ কাটিয়া একটুকু শুই। দেখি, পিয়ারী আমাকে খুঁজিয়া নেয় কি না?" ইহা ভাবিয়া দিগ্বিজয় এক নিভৃত স্থানে গিয়া শয়ন করিল। গিরিজায়া তাহা দেখিল।

গিরিজায়া তখন মনে মনে বলিতে লাগিল, "আমি ত মৃণালিনীর দাসী—মৃণালিনী এ গৃহের কর্ত্রী হইলেন অথবা হইবেন—তবে ত বাড়ীর গৃহকর্ম্ম করিবার অধিকার আমারই।"

এইরূপ মনকে প্রবোধ দিয়া গিরিজায়া একগাছা ঝাঁটা সংগ্রহ করিল এবং যে ঘরে দিগ্বিজয় শয়ন করিয়া আছে, সেই ঘরে প্রবেশ করিল। দিগ্বিজয় চক্ষু বুজিয়া আছে, পদধ্বনিতে বুঝিল যে, গিরিজায়া আসিল—মনে বড় আনন্দ হইল—তবে ত গিরিজায়া তাহাকে ভালবাসে। দেখি, গিরিজায়া কি বলে? এই ভাবিয়া দিগ্বিজয় চক্ষু বুঁজিয়াই রহিল। অকস্মাৎ তাহার পৃষ্ঠে দুম্ দাম্ করিয়া ঝাঁটার ঘা পড়িতে লাগিল। গিরিজায়া গলা ছাড়িয়া বলিতে লাগিল, "আঃ মলো, ঘরগুলায় ময়লা জমিয়া রহিয়াছে দেখ—এ কি? এক মিন্সে! চোর না কি? মলো মিন্সে, রাজার ঘরে চুরি!" এই বলিয়া আবার সম্মার্জ্জনীর আঘাত। দিগ্বিজয়ের পিট ফাটিয়া গেল।

"ও গিরিজায়া, আমি! আমি!"

"আমি! আরে তুই বলিয়াই ত খাঙ্গরা দিয়া বিছাইয়া দিতেছি।" এই বলিবার পর আবার বিরাশী সিক্কা ওজনে ঝাঁটা পড়িতে লাগিল।

“দোহাই! দোহাই! গিরিজায়া আমি দিগ্বিজয়!”

“আবার চুরি করিতে এসে—আমি দিগ্বিজয়! দিগ্বিজয় কে রে মিন্সে!” ঝাঁটার বেগ আর থামে না।

দিগ্বিজয় এবার সকাতরে কহিল, “গিরিজায়া, আমাকে ভুলিয়া গেলে ?”

গিরিজায়া বলিল, “তোর আমার সঙ্গে কোন্ পুরুষে আলাপ রে মিন্সে ?”

দিগ্বিজয় দেখিল নিস্তার নাই—রণে ভঙ্গ দেওয়াই পরামর্শ। দিগ্বিজয় তখন অনুপায় দেখিয়া ঊৰ্দ্ধশ্বাসে গৃহ হইতে পলায়ন করিল। গিরিজায়া সম্মার্জনী হস্তে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ : পূৰ্ব্ব পরিচয়

প্রভাতে হেমচন্দ্র মাধবাচার্য্যের অনুসন্ধানে যাত্রা করিলেন। গিরিজায়া আসিয়া মৃণালিনীর নিকট বসিল।

গিরিজায়া মৃণালিনীর দুঃখের ভাগিনী হইয়াছিল, সহৃদয় হইয়া দুঃখের সময় দুঃখের কাহিনী সকল শুনিয়াছিল। আজি সুখের দিন সে কেন সুখের ভাগিনী না হইবে ? আজি সেইরূপ সহৃদয়তার সহিত সুখের কথা কেন না শুনিবে ? গিরিজায়া ভিখারিণী, মৃণালিনী মহাধনীর কন্যা—উভয়ে এতদূর সামাজিক প্রভেদ। কিন্তু দুঃখের দিনে গিরিজায়া মৃণালিনীর একমাত্র সুহৃৎ, সে সময়ে ভিখারিণী আর রাজপুরবধূতে প্রভেদ থাকে না; আজি সেই বলে গিরিজায়া মৃণালিনীর হৃদয়ের সুখের অংশাধিকারিণী হইল।

যে আলাপ হইতেছিল, তাহাতে গিরিজায়া বিস্মিত ও প্রীত হইতেছিল। সে মৃণালিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, “তা এত দিন এমন কথা কর নাই কি জন্য ?”

মৃ। এত দিন রাজপুত্রের নিষেধ ছিল, এজন্য প্রকাশ করি নাই। এক্ষণে তিনি প্রকাশের অনুমতি করিয়াছেন, এজন্য প্রকাশ করিতেছি।

গি। ঠাকুরাণী! সকল কথা বল না? আমার শুনিয়া বড় তৃপ্তি হবে।

তখন মৃণালিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন, “আমার পিতা একজন বৌদ্ধমতাবলম্বী শ্রেষ্ঠী। তিনি অত্যন্ত ধনী ও মথুরারাজের প্রিয়পাত্র ছিলেন—মথুরায় রাজকন্যার সহিত আমার সখিত্ব ছিল।

আমি একদিন মথুরার রাজকন্যার সঙ্গে নৌকায় যমুনার জলবিহারে গিয়াছিলাম। তথায় অকস্মাৎ প্রবল ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায়, নৌকা জলমধ্যে ডুবিল। রাজকন্যা প্রভৃতি অনেকেই রক্ষক ও নাবিকদের হাতে রক্ষা পাইলেন। আমি ভাসিয়া গেলাম। দৈবযোগে এক রাজপুত্র সেই সময়ে নৌকায় বেড়াইতেছিলেন। তাঁহাকে তখন চিনিতাম না—তিনিই হেমচন্দ্র। তিনিও বাতাসের ভয়ে নৌকা তীরে লইতেছিলেন। জলমধ্যে আমার চুল দেখিতে পাইয়া স্বয়ং জলে পড়িয়া আমাকে উঠাইলেন। আমি তখন অজ্ঞান! হেমচন্দ্র আমার পরিচয় জানিতেন না। তিনি তখন তীর্থদর্শনে মথুরায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার বাসায় আমায় লইযা গিয়া শুশ্রূষা করিলেন। আমি জ্ঞান পাইলে তিনি আমার পরিচয় লইয়া আমাকে আমার বাপের বাড়ী পাঠাইবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু তিন দিবস পৰ্য্যন্ত ঝড়বৃষ্টি থামিল না। এরূপ দুৰ্দ্দিন হইল যে, কেহ বাড়ির বাহির হইতে পারে না। সুতরাং তিন দিন আমাদিগের উভয়কে এক বাড়িতে থাকিতে হইল। উভয়ে উভয়ের পরিচয় পাইলাম। কেবল কুল-পরিচয় নহে—উভয়ের অন্তঃকরণের পরিচয় পাইলাম। তখন আমার বয়স পনের বৎসর মাত্র। কিন্তু সেই বয়সেই আমি তাঁহার দাসী হইলাম। সে কোমল বয়সে সকল বুঝিতাম না। হেমচন্দ্রকে দেবতার ন্যায় দেখিতে লাগিলাম। তিনি যাহা বলিতেন, তাহা পুরাণ বলিয়া বোধ

হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন, “বিবাহ কর।” সুতরাং আমারও বোধ হইল, ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য। চতুর্থ দিবসে, দুর্যোগের উপশম দেখিয়া উপবাস করিলাম; দিগ্বিজয় উদ্যোগ করিয়া দিল। তীর্থপর্য্যটনে রাজপুত্রের কুলপুরোহিত সঙ্গে ছিলেন, তিনি আমাদিগের বিবাহ দিলেন।”

গি। কন্যা সম্প্রদান করিল কে?

মৃ। অরুন্ধতী নামে আমার এক প্রাচীন কুটুম্ব ছিলেন। তিনি সম্বন্ধে মার ভগিনী হইতেন। আমাকে বালককাল হইতে লালনপালন করিয়াছিলেন। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন; আমার সকল দৌরাত্ম্য সহ্য করিতেন। আমি তাঁহার নাম করিলাম। দিগ্বিজয় কোন ছলে পুরমধ্যে তাঁহাকে সংবাদ পাঠাইয়া দিয়া ছলক্রমে হেমচন্দ্রের গৃহে তাঁহাকে ডাকিয়া আনিল। অরুন্ধতী মনে জানিতেন, আমি যমুনায় ডুবিয়া মরিয়াছি। তিনি আমাকে জীবিত দেখিয়া এতই আহ্লাদিত হইলেন যে, আর কোন কথাতেই অসন্তুষ্ট হইলেন না। আমি যাহা বলিলাম, তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। তিনিই কন্যা সম্প্রদান করিলেন। বিবাহের পর মাসীর সঙ্গে বাপের বাড়ি গেলাম। সকল সত্য বলিয়া কেবল বিবাহের কথা লুকাইলাম। আমি, হেমচন্দ্র দিগ্বিজয়, কুলপুরোহিত আর অরুন্ধতী মাসী ভিন্ন এ বিবাহ আর কেহ জানিত না। অদ্য তুমি জানিলে।

গি। মাধবাচার্য্য জানেন না?

মৃ। না, তিনি জানিলে সর্ব্বনাশ হইত। মগধরাজ তাহা হইলে অবশ্য শুনিতেন। আমার বাপ বৌদ্ধ, মগধরাজ বৌদ্ধের বিষম শত্রু।

গি। ভাল, তোমার বাপ যদি তোমাকে এ পর্য্যন্ত কুমারী বলিয়া জানিতেন, তবে এত বয়সেও তোমার বিবাহ দেন নাই কেন?

মৃ। বাপের দোষ নাই। তিনি অনেক যত্ন করিয়াছেন, কিন্তু বৌদ্ধ সুপাত্র পাওয়া সুকঠিন; কেন না, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রায় লোপ হইয়াছে। পিতা বৌদ্ধ জামাতা চাহেন, অথচ সুপাত্রও চাহেন। এরূপ একটি পাওয়া গিয়াছিল, সে আমার বিবাহের পর। বিবাহের দিন স্থির হইয়া সকল উদ্যোগও হইয়াছিল। কিন্তু আমি সেই সময়ে জ্বর করিয়া বসিলাম। পাত্র অন্যত্র বিবাহ করিল।

গি। ইচ্ছাপূর্ব্বক জ্বর করিয়াছিলে?

মৃ। হাঁ, ইচ্ছাপূর্ব্বক। আমাদিগের উদ্যানে একটি কূয়া আছে, তাহার জল কেহ স্পর্শ করে না। তাহার পানে বা স্নানে নিশ্চিত জ্বর। আমি রাত্রিতে গোপনে সেই জলে স্নান করিয়াছিলাম।

গি। আবার সম্বন্ধ হইলে, সেইরূপ করিতে?

মৃ। সন্দেহ কি? নচেৎ হেমচন্দ্রের নিকট পলাইয়া যাইতাম।

গি। মথুরা হইতে মগধ এক মাসের পথ। স্ত্রীলোক হইয়া কাহার সহায়ে পলাইতে?

মৃ। আমার সহিত সাক্ষাতের জন্য হেমচন্দ্র মথুরায় এক দোকান করিয়া আপনি তথায় রত্নদাস বণিক্ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। বৎসরে একবার করিয়া তথায় বাণিজ্য করিতে আসিতেন। যখন তিনি তথায় না থাকিতেন, তখন দিগ্বিজয় তথায় তাঁহার দোকান রাখিত। দিগ্বিজয়ের প্রতি আদেশ ছিল যে, যখন আমি যেরূপ আজ্ঞা করিব, সে তখনই সেরূপ করিবে। সুতরাং আমি নিঃসহায় ছিলাম না।

কথা সমাপ্ত হইলে গিরিজায়া বলিল, “ঠাকুরাণী! আমি একটি বড় গুরুতর অপরাধ করিয়াছি। আমাকে মার্জ্জনা করিতে হইবে। আমি তাহার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে স্বীকৃত আছি।”

মৃ। কি এমন গুরুতর কাজ করিলে?

গি। দিগ্বিজয়টা তোমার হিতকারী, তাহা আমি জানিতাম না, আমি জানিতাম, ওটা অতি অপদার্থ। এজন্য আমি প্রভাতে তাহাকে ভালরূপে ঘা কত ঝাঁটা দিয়াছি। তা ভাল করি নাই।

মৃণালিনী হাসিয়া বলিলেন, "তা কি প্রায়শ্চিত্ত করিবে ?"

গি। ভিখারীর মেয়ের কি বিবাহ হয় ?

মৃ। (হাসিয়া) করিলেই হয়।

গি। তবে আমি সে অপদার্থটাকে বিবাহ করিব—আর কি করি ?

মৃণালিনী আবার হাসিয়া বলিলেন, "তবে আজি তোমার গায়ে হলুদ দিব।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : পরামর্শ

হেমচন্দ্র মাধবাচার্য্যের বসতিস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, আচার্য্য জপে নিযুক্ত আছেন। হেমচন্দ্র প্রণাম করিয়া কহিলেন, "আমাদিগের সকল যত্ন বিফল হইল। এখন ভৃত্যের প্রতি আর কি আদেশ করেন ? যবন গৌড় অধিকার করিয়াছে। বুঝি, এ ভারতভূমির অদৃষ্টে যবনের দাসত্ব বিধিলিপি! নচেৎ বিনা বিবাদে যবনেরা গৌড়জয় করিল কি প্রকারে ? যদি এখন এই দেহ পতন করিলে, এক দিনের তরেও জন্মভূমি দস্যুর হাত হইতে মুক্ত হয়, তবে এই ক্ষণে তাহা করিতে প্রস্তুত আছি। সেই অভিপ্রায়ে রাত্রিতে যুদ্ধের আশায় নগরমধ্যে অগ্রসর হইয়াছিলাম—কিন্তু যুদ্ধ ত দেখিলাম না। কেবল দেখিলাম যে, এক পক্ষ আক্রমণ করিতেছে—অপর পক্ষ পলাইতছে।"

মাধবাচার্য্য কহিলেন, "বৎস! দুঃখিত হইও না। দৈবনির্দ্দেশ কখনও বিফল হইবার নহে। আমি যখন গণনা করিয়াছি যে, যবন পরাভূত হইবে, তখন নিশ্চয়ই জানিও, তাহারা পরাভূত হইবে। যবনেরা নবদ্বীপ অধিকার করিয়াছে বটে, কিন্তি নবদ্বীপ ত গৌড় নহে। প্রধান রাজা সিংহাসন ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। কিন্তু এই গৌড় রাজ্যে অনেক করপ্রদ রাজা আছেন; তাঁহারা ত এখনও বিজিত হয়েন নাই। কে জানে যে, সকল রাজা একত্র হইয়া প্রাণপণ করিলে, যবন বিজিত না হইবে ?"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "তাহার অল্পই সম্ভাবনা।"

মাধবাচার্য্য কহিলেন, "জ্যোতিষীর গণনা মিথ্যা হইবার নহে, অবশ্য সফল হইবে। তবে আমার এক ভ্রম হইয়া থাকিবে। পূর্ব্বদেশে যবন পরাভূত হইবে—ইহাতে আমরা নবদ্বীপেই যবন জয় করিবার প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। কিন্তু গৌড়রাজ্য ত প্রকৃত পূর্ব্ব নহে—কামরূপই পূর্ব্ব। বোধ হয়, তথায়ই আমাদিগের আশা ফলবতী হইবে।"

হে। কিন্তু এক্ষণে ত যবনের কামরূপ যাওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখি না।

মা। এই যবনেরা ক্ষণকাল স্থির নহে। গৌড়ে ইহারা সুস্থির হইলেই কামরূপ আক্রমণ করিবে।

হে। তাহাও মানিলাম। এবং ইহারা যে কামরূপ আক্রমণ করিলে পরাজিত হইবে, তাহাও মানিলাম। কিন্তু তাহা হইলে আমার পিতৃরাজ্য উদ্ধারের কি সদুপায় হইল ?

মা। এই যবনেরা এ পর্য্যন্ত পুনঃপুনঃ জয়লাভ করিয়া অজেয় বলিয়া রাজগণমধ্যে প্রতিপন্ন হইয়িয়াছে। ভয়ে কেহ তাহাদের বিরোধী হইতে চাহে না। তাহারা একবার মাত্র পরাজিত হইলে, তাহাদিগের সে মহিমা আর থাকিবে না। তখন ভারতবর্ষীয় তাবৎ আর্য্যবংশীয় রাজারা ধৃতাস্ত্র হইয়া উঠিবেন। সকলে এক হইয়া অস্ত্রধারণ করিলে যবনেরা কত দিন তিষ্ঠিবে ?

হে। গুরুদেব! আপনি আশামাত্রেই আশ্রয় লইতেছেন; আমিও তাহাই করিলাম। এক্ষণে আমি কি করিব—আজ্ঞা করুন।

মা। আমিও তাহাই চিন্তা করিতেছিলাম। এ নগরমধ্যে তোমার আর অবস্থিতি করা অকর্ত্তব্য; কেন না, যবনেরা তোমার মৃত্যুসাধন সঙ্কল্প করিয়াছে। আমার আজ্ঞা—তুমি অদ্যই এ নগর ত্যাগ করিবে।

হে। কোথায় যাইব ?

মা। আমার সঙ্গে কামরূপ চল।

হেমচন্দ্র অধোবদন হইয়া, অপ্রতিভ হইয়া, মৃদু মৃদু কহিলেন, "মৃণালিনীকে কোথায় রাখিয়া যাইবেন ?"

মাধ্যবাচার্য্য বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "সে কি! আমি ভাবিতেছিলাম যে, তুমি কালিকার কথায় মৃণালিনীকে চিত্ত হইতে দূর করিয়াছিলে ?"

হেমচন্দ্র পূর্ব্বের ন্যায় মৃদুভাবে বলিলেন, "মৃণালিনী অত্যাজ্য। তিনি আমার পরিণীতা স্ত্রী।"

মাধবাচার্য্য চমৎকৃত হইলেন। রুষ্ট হইলেন। ক্ষোভ করিয়া কহিলেন, "আমি ইহার কিছু জানিলাম না?"

হেমচন্দ্র তখন আদ্যোপান্ত তাঁহার বিবাহের বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। শুনিয়া মাধবাচার্য্য কিছুক্ষণ মৌনী হইয়া রহিলেন। কহিলেন, "যে স্ত্রী অসদাচারিণী, সে ত শাস্ত্রানুসারে ত্যাজ্য। মৃণালিনীর চরিত্রসম্বন্ধে যে সংশয়, তাহা কাল প্রকাশ করিয়াছি।"

তখন হেমচন্দ্র ব্যোমকেশের বৃত্তান্ত সকল প্রকাশ করিয়া বলিলেন। শুনিয়া মাধবাচার্য্য আনন্দ প্রকাশ করিলেন। কহিলেন, "বৎস! বড় প্রীত হইলাম। তোমার প্রিয়তমা এবঞ্চ গুণবতী ভার্য্যাকে তোমার নিকট হইতে বিযুক্ত করিয়া তোমাকে অনেক ক্লেশ দিয়াছি। এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমরা দীর্ঘজীবী হইয়া বহুকাল একত্র ধর্ম্মাচরণ কর। যদি তুমি এক্ষণে সস্ত্রীক হইয়াছ, তবে তোমাকে আর আমি আমার সঙ্গে কামরূপ যাইতে অনুরোধ করি না। আমি অগ্রে যাইতেছি। যখন সময় বুঝিবেন, তখন তোমার নিকট কামরূপাধিপতি দূত প্রেরণ করিবেন। এক্ষণে তুমি বধূকে লইয়া মথুরায় গিয়া বাস কর—অথবা অন্য অভিপ্রেত স্থানে বাস করিও।"

এইরূপ কথোপকথনের পর, হেমচন্দ্র মাধবাচার্য্যের নিকট বিদায় হইলেন। মাধবাচার্য্য আশীর্ব্বাদ, আলিঙ্গন করিয়া সাশ্রুলোচনে তাঁহাকে বিদায় করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : মহম্মদ আলির প্রায়শ্চিত্ত

যে রাত্রে রাজধানী যবন-সেনা-বিপ্লবে পীড়িতা হইতেছিল, সেই রাত্রে পশুপতি একাকী কারাগারে অবরুদ্ধ ছিলেন। নিশাবশেষে সেনা-বিপ্লব সমাপ্ত হইয়া গেল। মহম্মদ আলি তখন তাঁহার সম্ভাষণে আসিলেন। পশুপতি কহিলেন, "যবন!—প্রিয়-সম্ভাষণে আর আবশ্যকতা নাই। একবার তোমারই প্রিয়সম্ভাষণে বিশ্বাস করিয়া এই অবস্থাপন্ন হইয়াছি। বিধর্ম্মী যবনকে বিশ্বাস করিবার যে ফল, তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন আমি মৃত্যু শ্রেয় বিবেচনা করিয়া অন্য ভরসা ত্যাগ করিয়াছি। তোমাদিগের কোন প্রিয়সম্ভাষণ শুনিব না।"

মহম্মদ আলি কহিল, “আমি প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করি—প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে আসিয়াছি। আপনাকে যবনবেশ পরিধান করিতে হইবে।”

পশুপতি কহিলেন, “সে বিষয়ে চিত্ত স্থির করুন। আমি এক্ষণে মৃত্যু স্থির করিয়াছি। প্রাণত্যাগ করিতে স্বীকৃত আছি—কিন্তু যবনধর্ম্ম অবলম্বন করিব না।”

ম। আপনাকে এক্ষণে যবনধর্ম্ম অবলম্বন করিতে বলিতেছি না। কেবল রাজপ্রতিনিধির তৃপ্তির জন্য যবনের পোশাক পরিধান করিতে বলিতেছি।

প। ব্রাহ্মণ হইয়া কি জন্য ম্লেচ্ছের বেশ পরিব ?

ম। আপনি ইচ্ছাপূর্ব্বক না পারিলে, আপনাকে বলপূর্ব্বক পরাইব। অস্বীকারে লাভের ভাগ অপমান।

পশুপতি উত্তর করিলেন না। মহম্মদ আলি স্বহস্তে তাঁহাকে যবনবেশ পরাইলেন। কহিলেন, “আমার সঙ্গে আসুন।”

প। কোথায় যাইব ?

ম। আপনি বন্দী—জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি ?

মহম্মদ আলি তাঁহার সিংহদ্বারে লইয়া চলিলেন। যে ব্যক্তি পশুপতির রক্ষায় নিযুক্ত ছিল, সেও সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

দ্বারে প্রহরিগণের জিজ্ঞাসামতে মহম্মদ আলি আপন পরিচয় দিলেন; এক সঙ্কেত করিলেন। প্রহরিগণ তাঁহাদিগকে যাইতে দিল। সিংহদ্বার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তিন জনে কিছু দূর রাজপথ অতিবাহিত করিলেন। তখন যবনসেনা নগরমন্থন সমাপন করিয়া বিশ্রাম করিতেছিল; সুতরাং রাজপথে আর উপদ্রব ছিল না। মহম্মদ আলি কহিলেন, “ধর্ম্মাধিকার! আপনি আমাকে বিনা দোষে তিরস্কার করিয়াছেন। বখ্‌তিয়ার খিলিজির এরূপ অভিপ্রায় আমি কিছুই অবগত ছিলাম না। তাহা হইলে আমি কদাচ প্রবঞ্চকের বার্ত্তাবহ হইয়া আপনার নিকট যাইতাম না। যাহা হউক, আপনি আমার কথায় প্রত্যয় করিয়া এরূপ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছেন, ইহার যথাসাধ্য প্রায়শ্চিত্ত করিলাম। গঙ্গাতীরে নৌকা প্রস্তুত আছে— আপনি যথেচ্ছ স্থানে প্রস্থান করুন। আমি এইখান হইতে বিদায় হই।”

পশুপতি বিস্ময়াপন্ন হইয়া অবাক হইয়া রহিলেন। মহম্মদ আলি পুনরপি কহিতে লাগিলেন, “আপনি এই রাত্রিমধ্যে এ নগরী ত্যাগ করিবেন। নচেৎ কাল প্রাতে যবনের সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইলে প্রমাদ ঘটিবে। খিলিজির আজ্ঞার বিপরীত আচরণ করিলাম—ইহার সাক্ষী এই প্রহরী। সুতরাং আত্মরক্ষার জন্য ইহাকেও দেশান্তরিত করিলাম। ইহাকেও আপনার নৌকায় লইয়া যাইবেন।”

এই বলিয়া মহম্মদ আলি বিদায় হইলেন। পশুপতি কিয়ৎকাল বিস্ময়াপন্ন হইয়া থাকিয়া গঙ্গাতীরমুখে চলিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ : ধাতুমূর্ত্তির বিসর্জ্জন

মহম্মদ আলির নিকট বিদায় হইয়া, রাজপথ অতিবাহিত করিয়া পশুপতি ধীরে ধীরে চলিলেন। ধীরে ধীরে চলিলেন—যবনের কারাগার হইতে বিমুক্ত হইয়াও দ্রুতপদক্ষেপণে তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মিল না। রাজপথে যাহা দেখিলেন, তাহাতে আপনার মনোমধ্যে আপনি মরিলেন। তাঁহার প্রতি পদে মৃত নাগরিকের দেহ চরণে বাজিত লাগিল; প্রতি পদে শোণিতসিক্ত কর্দ্দমে চরণ আর্দ্র হইতে লাগিল। পথের দুই পার্শ্বে গৃহাবলী জনশূন্য—বহুগৃহ ভস্মীভূত; কোথাও বা তপ্ত অঙ্গার এখনও জ্বলিতেছিল। গৃহান্তরে দ্বার ভগ্ন—গবাক্ষ ভগ্ন—প্রকোষ্ঠ ভগ্ন—তদুপরি মৃতদেহ! এখনও কোন হতভাগ্য মরণ-যন্ত্রণায় অমানুষিক কাতরস্বরে শব্দ করিতেছিল। এ সকলের মূল তিনিই। দারুণ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি এই রাজধানীকে শ্মশানভূমি করিয়াছেন। পশুপতি মনে মনে স্বীকার করিলেন যে, তিনি প্রাণদণ্ডের

যোগ্য পাত্র বটে—কেন মহম্মদ আলিকে কলঙ্কিত করিয়া কারাগার হইতে পলায়ন করিলেন ? যবন তাঁহাকে ধৃত করুক—অভিপ্রেত শাস্তি প্রদান করুক—মনে করিলেন ফিরিয়া যাইবেন। মনে মনে তখন ইষ্টদেবীকে স্মরণ করিলেন—কিন্তু কি কামনা করিবেন ? কামনার বিষয় আর কিছুই নাই। আকাশ প্রতি চাহিলেন। গগনের নক্ষত্র-চন্দ্র-গ্রহমণ্ডলীবিভূষিত সহাস্য পবিত্র শোভা তাঁহার চক্ষে সহিল না—তীব্র জ্যোতিঃসম্প্রীড়িতের ন্যায় চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। সহসা অনৈসর্গিক ভয় আসিয়া তাঁহার হৃদয় আচ্ছন্ন করিল—অকারণ ভয়ে তিনি আর পদক্ষেপ করিতে পারিলেন না। সহসা বলহীন হইলেন। বিশ্রাম করিবার জন্য পথিমধ্যে উপবেশন করিতে গিয়া দেখিলেন—এক শবাসনে উপবেশন করিতেছিলেন। শবনিস্রুত রক্ত তাঁহার বসনে এবং অঙ্গে লাগিল। তিনি কণ্টকিতকলেবরে পুনরুত্থাণ করিলেন। আর দাঁড়াইলেন না—দ্রুতপদে চলিলেন। সহসা আর এক কথা মনে পড়িলে—তাঁহার নিজবাটী ? তাহা কি যবনহস্তে রক্ষা পাইয়াছে ? আর সে বাটীতে যে কুসুমময়ী প্রাণ-পুত্তলিকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার কি হইয়াছে ? মনোরমার কি দশা হইয়াছে ? তাঁহার প্রাণাধিক্য, তাঁহাকে পাপপথ হইতে পুনঃ পুনঃ নিবারণ করিয়াছিল, সেও বুঝি তাঁহার পাপসাগরের তরঙ্গে ডুবিয়াছে। এ যবনসেনাপ্রবাহে সে কুসুমকলিকা না জানি কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে!

পশুপতি উন্মত্তের ন্যায় আপন ভবনাভিমুখে ছুটিলেন। আপনার ভবনসম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, যাহা ভায়িয়াছিলেন, তাহাই ঘটিয়াছে—জ্বলন্ত পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহার উচ্চচূড় অট্টালিকা অগ্নিময় হইয়িা জ্বলিতেছে।

দৃষ্টিমাত্র হতভাগ্য পশুপতির প্রতীতি হইল যে, যবনেরা তাঁহার পৌরজন সহ মনোরমাকে বধ করিয়া গৃহে অগ্নি দিয়া গিয়াছে। মনোরমা যে পলায়ন করিয়াছিল, তাহা তিনি কিছু জানিতে পারেন নাই।

নিকটে কেহই ছিল না যে, তাঁহাকে এ সংবাদ প্রদান করে। আপন বিকল চিত্তের সিদ্ধান্তই তিনি গ্রহণ করিলেন। হলাহল-কলস পরিপূর্ণ হইল—হৃদয়ের শেষ তন্ত্রী ছিঁড়িল। তিনি কিয়ৎক্ষণ বিস্ফারিত নয়নে দহ্যমান অট্টালিকা প্রতি চাহিয়া রহিলেন—মরণোন্মুখ পতঙ্গবৎ অল্পক্ষণ বিকলশরীরে একস্থানে অবস্থিত করিলেন—শেষে মহাবেগে সেই অনলতরঙ্গমধ্যে ঝাঁপ দিলেন। সঙ্গের প্রহরী চমকিত হইয়া রহিল।

মহাবেগে পশুপতি জ্বলন্ত দ্বারপথে পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। চরণ দগ্ধ হইল—অঙ্গ দগ্ধ হইল—কিন্তু পশুপতি ফিরিলেন না। অগ্নিকুণ্ড অতিক্রম করিয়া আপন শয়নকক্ষে গমন করিলেন—কাহাকেও দেখিলেন না। দগ্ধশরীরে কক্ষে কক্ষে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তরমধ্যে যে দুরন্ত অগ্নি জ্বলিতেছিল—তাহাতে তিনি বাহ্য দাহযন্ত্রণা অনুভূত করিতে পারিলেন না।

ক্ষণে ক্ষণে গৃহের নূতন নূতন খণ্ড সকল অগ্নিকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতেছিল। আক্রান্ত প্রকোষ্ঠ বিষম শিখা আকাশপথে উত্থাপিত করিয়া ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতেছিল। ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার দগ্ধ গৃহাংশ সকল অশনিসম্পাতশব্দে ভূতলে পড়িয়া যাইতেছিলে। ধূমে, ধূলিতে, তৎসঙ্গে লক্ষ লক্ষ অগ্নিস্ফুলিঙ্গে আকাশ অদৃশ্য হইতে লাগিল।

দাবানলসংবেষ্টিত আরণ্য গজের ন্যায় পশুপতি অগ্নিমধ্যে ইতস্ততঃ দাসদাসী স্বজন ও মনোরমার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কাহারও কোন চিহ্ন পাইলেন না—হতাশ হইলেন। তখন দেবীর মন্দির প্রতি তাঁহার দৃষ্টিপাত হইল। দেখিলেন, দেবী অষ্টভূজার মন্দির অগ্নিকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া জ্বলিতেছে। পশুপতি পতঙ্গবৎ তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, অনলমণ্ডলমধ্যে অদগ্ধা স্বর্ণপ্রতিমা বিরাজ করিতেছে। পশুপতি উন্মত্তের ন্যায় কহিলেন, "মা! জগদম্বে! আর তোমাকে জগদম্বা বলিব না। আর তোমার পূজা করিব না। তোমাকে প্রণামও করিব না। আশৈশব আমি কায়মনোবাক্যে তোমার সেবা করিলাম—এই পদধ্যান ইহজন্মে সার করিয়াছিলাম—এখন, মা, এক দিনের পাপে সর্ব্বস্ব হারাইলাম। তবে কি জন্য তোমাকে পূজা করিয়াছিলাম ? কেনই বা তুমি আমার পাপমতি অপনীত না করিলে ?"

মন্দিরদহন অগ্নি অধিকতর প্রবল হইয়া গর্জ্জিয়া উঠিল। পশুপতি তথাপি প্রতিমা সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ঐ দেখ! ধাতুমূর্ত্তি!—তুমি ধাতুমূর্ত্তি মাত্র, দেবী নহ—ঐ দেখ অগ্নি গর্জ্জিতেছে! যে পথে আমার প্রাণাধিকা গিয়াছে—সেই পথে অগ্নি তোমাকেও প্রেরণা করিবে। কিন্তু আমি অগ্নিকে এ কীর্ত্তি রাখিতে দিব না—আমি তোমাকে স্থাপনা করিয়াছিলাম—আমিই তোমাকে বিসর্জ্জন করিব। চল! ইষ্টদেবি তোমাকে গঙ্গার জলে বিসর্জ্জন করিব।"

এই বলিয়া পশুপতি প্রতিমা উত্তোলন আকাঙ্ক্ষায় উভয় হস্তে তাহা ধারণ করিলেন। সেই সময়ে আবার অগ্নি গর্জ্জিয়া উঠিল। তখনই পর্ব্বতবিদারানুরূপ প্রবল শব্দ হইল,—দগ্ধ মন্দির, আকাশপথে ধূলিধূমভস্ম সহিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গরাশি প্রেরণ করিয়া, চূর্ণ হইয়া পড়িয়া গেল। তন্মধ্যে প্রতিমা সহিত পশুপতির সজীবন সমাধি হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ : অন্তিমকালে

পশুপতি স্বয়ং অষ্টভুজার অর্চ্চনা করিতেন বটে—কিন্তু তথাপি তাঁহার নিত্যসেবার জন্য দুর্গাদাস নামে এক জন ব্রাহ্মণ নিযুক্ত ছিলেন। নগরবিপ্লবের পর দিবস দুর্গাদাস শ্রুত হইলেন যে, পশুপতির গৃহ ভস্মীভূত হইয়া ভূমিসাৎ হইয়াছে। তখন ব্রাহ্মণ অষ্টভুজার মূর্ত্তি ভস্ম হইতে উদ্ধার করিয়া আপন গৃহে স্থাপন করবার সঙ্কল্প করিলেন। যবনেরা নগর লুঠ করিয়া তৃপ্ত হইলে, বখ্‌তিয়ার খিলিজি অনর্থক নগরবাসীদিগের পীড়ন নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং এক্ষণে সাহস করিয়া বাঙ্গালীরা রাজপথে বাহির হইতেছিল। ইহা দেখিয়া দুর্গাদাস অপরাহ্নে অষ্টভুজার উদ্ধারে পশুপতির ভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পশুপতির ভবনে গমন করিয়া, যথায় দেবীর মন্দির ছিল, সেই প্রদেশে গেলেন। দেখিলেন, অনেক ইষ্টকরাশি স্থানান্তরিত না করিলে দেবীর প্রতিমা বহিষ্কৃত করিতে পারা যায় না। ইহা দেখিয়া দুর্গাদাস আপন পুত্রকে ডাকিয়া আনিলেন। ইষ্টক সকল অর্দ্ধ দ্রবীভূত হইয়া পরস্পর লিপ্ত হইয়াছিল—এবং এখন পর্য্যন্ত সন্তপ্ত ছিল। পিতাপুত্রে এক দীর্ঘিকা হইতে জল বহন করিয়া তপ্ত ইষ্টক সকল শীতল করিলেন, এবং বহুকষ্টে তন্মধ্য হইতে অষ্টভুজার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ইষ্টকরাশি স্থানান্তরিত হইলে তন্মধ্য হইতে দেবীর প্রতিমা আবিষ্কৃতা হইল। কিন্তু প্রতিমার পাদমূলে— এ কি ? সভয়ে পিতাপুত্র নিরীক্ষণ করিলেন যে, মনুষ্যের মৃতদেহ রহিয়াছে! তখন উভয় মৃতদেহ উত্তোলন করিয়া দেখিলেন যে, পশুপতির দেহ।

বিস্ময়সূচক বাক্যের পর দুর্গাদাস কহিলেন, "যে প্রকারেই প্রভুর এ দশা হইয়া থাকুক, ব্রাহ্মণের এবঞ্চ প্রতিপালিতের কার্য্য আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। গঙ্গাতীরে এই দেহ লইয়া আমরা প্রভুর সৎকার করি চল।"

এই বলিয়া দুই জনে প্রভুর দেহ বহন করিয়া গঙ্গাতীরে লইয়া গেলেন। তথায় পুত্রকে শবরক্ষায় নিযুক্ত করিয়া দুর্গাদাস নগরে কাষ্ঠাদি সৎকারের উপযোগী সামগ্রীর অনুসন্ধানে গমন করিলেন। এবং যথাসাধ্য সুগন্ধি কাষ্ঠ ও অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া গঙ্গাতীরে প্রত্যাগমন করিলেন।

তখন দুর্গাদাস পুত্রের আনুকূল্যে যথাশাস্ত্র দাহের পূর্ব্বগামী ক্রিয়া সকল সমাপন করিয়া সুগন্ধি কাষ্ঠে চিতা রচনা করিলেন। এবং তদুপরি পশুপতির মৃতদেহ স্থাপন করিয়া অগ্নিপ্রদান করিতে গেলেন।

কিন্তু অকস্মাৎ শ্মশানভূমিতে এ কাহার আবির্ভাব হইল ? ব্রাহ্মণদ্বয় বিস্মিতলোচনে দেখিলেন যে, এক মলিনবসনা, রুক্ষকেশী, আলুলায়িতকুন্তলা, ভস্মধূলিসংসর্গে বিবর্ণা, উন্মাদিনী আসিয়া শ্মশানভূমিতে অবতরণ করিতেছে। রমণী ব্রাহ্মণদিগের নিকটবর্ত্তিনী হইলেন।

দুর্গাদাস সভয়চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে ?"

রমণী কহিলেন, "তোমরা কাহার সৎকার করিতেছ?"

দুর্গাদাস কহিলেন, "মৃত ধর্ম্মাধিকার পশুপতির।"

রমণী কহিলেন, "পশুপতির কি প্রকারে মৃত্যু হইল ?"

দুর্গাদাস কহিলেন, "প্রাতে নগরে জনরব শুনিয়াছিলাম যে, তিনি যবকর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হইয়া কোন সুযোগে রাত্রিকালে পলায়ন করিয়াছিলেন। অদ্য তাঁহার অট্টালিকা ভস্মসাৎ হইয়াছে দেখিয়া, ভস্মমধ্য হইতে অষ্টভুজার প্রতিমা উদ্ধারমানসে গিয়াছিলাম। তথায় গিয়া প্রভুর মৃতদেহ পাইলাম।"

রমণী কোন উত্তর করিলেন না। গঙ্গাতীরে, সৈকতের উপর উপবেশন করিলেন। বহুক্ষণ নীরবে থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে?" দুর্গাদাস কহিলেন, "আমরা ব্রাহ্মণ; ধর্ম্মাধিকারের অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছিলাম। আপনি কে ?"

তরুণী কহিলেন, "আমি তাঁহার পত্নী।"

দুর্গাদাস কহিলেন, "তাঁহার পত্নী বহুকাল নিরুদ্দিষ্টা! আপনি কি প্রকারে তাঁহার পত্নী ?"

যুবতী কহিলেন, "আমি সেই নিরুদ্দিষ্টা কেশবকন্যা। অনুমরণভয়ে পিতা আমাকে এতকাল লুক্কায়িত রাখিয়াছিলেন। আমি আজ কালপূর্ণে বিধিলিপি পূরাইবার জন্য আসিয়াছি।"

শুনিয়া পিতাপুত্রে শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহাদিগকে নিরুত্তর দেখিয়া বিধবা বলিতে লাগিলেন, "এখন স্ত্রীজাতির কর্ত্তব্য কাজ করিব। তোমরা উদ্যোগ কর।"

দুর্গাদাস তরুণীর অভিপ্রায় বুঝিলেন; পুত্রের মুখে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বল?"

পুত্র কিছু উত্তর করিল না। দুর্গাদাস তখন তরুণীকে কহিলেন, "মা, তুমি বালিকা—এ কঠিন কার্য্যে কেন প্রস্তুত হইতেছ ?"

তরুণী ভ্রূভঙ্গী করিয়া কহিলেন, "ব্রাহ্মণ হইয়া অধর্ম্মে প্রবৃত্তি দিতেছ কেন ?— ইহার উদ্যোগ কর।"

তখন ব্রাহ্মণ আয়োজন জন্য নগরে পুনর্ব্বার চলিলেন। গমনকালে বিধবা দুর্গাদাসকে কহিলেন, "তুমি নগরে যাইতেছ। নগরপ্রান্তে রাজার উপবনবাটিকায় হেমচন্দ্র নামে বিদেশী রাজপুত্র বাস করেন। তাঁহাকে বলিও, মনোরমা গঙ্গাতীরে চিতারোহণ করিতেছে—তিনি আসিয়া একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাউন, তাঁহার নিকটে ইহলোকে মনোরমার এই মাত্র ভিক্ষা।"

হেমচন্দ্র যখন ব্রাহ্মণমুখে শুলিলেন যে, মনোরমা পশুপতির পত্নীপরিচয়ে তাঁহার অনুমৃতা হইতেছেন, তখন তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। দুর্গাদাসের সামভিব্যাহারে গঙ্গাতীরে আসিলেন। তথায় মনোরমার অতি মলিনা, উন্মাদিনী মূর্ত্তি, তাঁহার স্থিরগম্ভীর, এখনও অনিন্দ্যসুন্দর মুখকান্তি দেখিয়া তাঁহার চক্ষুর জল আপনি বহিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "মনোরমা! ভগিনী! এ কি এ ?"

তখন মনোরমা, জ্যোৎস্নাপ্রদীপ্ত সরোবরতুল্য স্থির মূর্ত্তিতে মৃদুগম্ভীরস্বরে কহিলেন, "ভাই, যে জন্য আমার জীবন, তাহা আজি চরম সীমা প্রাপ্ত হইয়াছে। আজ আমি আমার স্বামীর সঙ্গে গমন করিব।"

মনোরমা সংক্ষেপে অন্যের শ্রবণাতীত স্বরে হেমচন্দ্রের নিকট পূর্ব্বকথার পরিচয় দিয়া বলিলেন, "আমার স্বামী অপরিমিত ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আমি এক্ষণে সে ধনের অধিকারিণী। আমি তাহা তোমাকে দান করিতেছি। তুমি তাহা গ্রহণ করিও। নচেৎ পাপিষ্ঠা যবনে তাহা ভোগ করিবে। তাহার অল্পভাগ ব্যয় করিয়া জনার্দ্দন শর্ম্মাকে কাশীধামে স্থাপন করিবে। জনার্দ্দনকে অধিক ধন দিও না। তাহা হইলে যবনে কাড়িয়া লইবে। আমার দাহের পর, তুমি আমার স্বামীর গৃহে গিয়া অর্থের সন্ধান করিও। আমি যে স্থান বলিয়া দিতেছি, সেই স্থান খুঁড়িলেই তাহা পাইবে। আমি ভিন্ন সে স্থান আর কেহই জানে না।" এই বলিয়া মনোরমা যথা অর্থ আছে, তাহা বলিয়া দিলেন।

তখন মনোরমা আবার হেমচন্দ্রের নিকট বিদায় হইলেন। জনার্দ্দনকে ও তাঁহার পত্নীকে উদ্দেশ্য প্রণাম করিয়া হেমচন্দ্রের দ্বারা তাঁহাদিগের নিকট কত স্নেহসূচক কথা বলিয়া পাঠাইলেন।

পরে ব্রাহ্মণেরা মনোরমাকে যথাশাস্ত্র এই ভীষণ ব্রতে ব্রতী করাইলেন। এবং শাস্ত্রীয় আচারান্তে, মনোরমা ব্রাহ্মণের আনীত নূতন বস্ত্র পরিধান করিলেন। নব বস্ত্র পরিধান করিয়া, দিব্য পুষ্পমালা কণ্ঠে পরিয়া, পশুপতির প্রজ্বলিত চিতা প্রদক্ষিণপূর্ব্বক, তদুপরি আরোহণ করিলেন। এবং সহাস্য আননে সেই প্রজ্বলিত হুতাশনরাশির মধ্যে উপবেশন করিয়া নিদাঘসন্তপ্ত কুসুমকলিকার ন্যায় অনলতাপে প্রাণত্যাগ করিলেন।

পরিশিষ্ট

হেমচন্দ্র মনোরমার দত্ত ধন উদ্ধার করিয়া তাহার কিয়দংশ জনার্দ্দনকে দিয়া তাঁহাকে কাশী প্রেরণ করিলেন। অবশিষ্ট ধন গ্রহণ করা কর্ত্তব্য কি না, তাহা মাধবাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন। মাধবাচার্য্য বলিলেন, "এই ধনের বলে পশুপতির বিনাশকারী বখ্‌তিয়ার খিলিজিকে প্রতিফল দেওয়া কর্ত্তব্য; এবং তদভিপ্রায়ে ইহা গ্রহণও উচিত। দক্ষিণে, সমুদ্রের উপকূলে অনেক প্রদেশ জনহীন হইয়া পড়িয়া আছে। আমার পরামর্শ যে, তুমি এই ধনের দ্বারা তথায় নূতন রাজ্য সংস্থাপন কর, এবং তথায় যবনদমনোপযোগী সেনা সৃজন কর। তৎসাহায্যে পশুপতির শত্রুর নিপাতসিদ্ধ করিও।"

এই পরামর্শ করিয়া মাধবাচার্য্য সেই রাত্রিতেই হেমচন্দ্রকে নবদ্বীপ হইতে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করাইলেন। পশুপতির ধনরাশি তিনি গোপনে সঙ্গে লইলেন। মৃণালিনী, গিরিজায়া এবং দিগ্বিজয় তাঁহার সঙ্গে গেলেন। মাধবাচার্য্যও হেমচন্দ্রকে নূতন রাজ্যে স্থাপিত করিবার জন্য তাঁহার সঙ্গে গেলেন। রাজ্যসংস্থাপন অতি সহজ কাজ হইয়া উঠিল; কেন না, যবনদিগের ধর্ম্মদ্বেষিতায় পীড়িত এবং তাঁহাদিগের ভয়ে ভীত হইয়া অনেকেই তাঁহাদিগের অধিকৃত রাজ্য ত্যাগ করিয়া হেমচন্দ্রের নবস্থাপিত রাজ্যে বাস করিতে লাগিল।

মাধবাচার্য্যের পরামর্শেও অনেক প্রধান ধনী ব্যক্তি তথায় আশ্রয় লইল। এই রূপে অতি শীঘ্র ক্ষুদ্র রাজ্যটি সৌষ্ঠবান্বিত হইয়া উঠিল। ক্রমে ক্রমে সেনা সংগ্রহ হইতে লাগিল। অচিরাৎ রমণীয় রাজপুরী নির্ম্মিত হইল। মৃণালিনী তন্মধ্যে মহিষী হইয়া সে পুরী আলো করিলেন।

গিরিজায়ার সহিত দিগ্বিজয়ের পরিণয় হইল। গিরিজায়া মৃণালিনীর পরিচর্য্যায় নিযুক্তা রহিলেন, দিগ্বিজয় হেমচন্দ্রের কার্য্য পূর্ব্ববৎ নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কথিত আছে যে, বিবাহ অবধি এমন দিনই ছিল না, যে দিন গিরিজায়া এক আধ ঘা ঝাঁটার আঘাতে দিগ্বিজয়ের শরীর পবিত্র করিয়া না দিত। ইহাতে যে দিগ্বিজয় বড়ই দুঃখিত ছিলেন, এমন নহে। বরং একদিন কোন দৈবকারণবশতঃ গিরিজায়া ঝাঁটা মারিতে ভুলিয়াছিলেন, ইহাতে দিগ্বিজয় বিষণ্ন বদনে গিরিজায়াকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "গিরি, আজ তুমি আমার উপর রাগ করিয়াছ না কি ?" বস্তুতঃ ইহারা যাবজ্জীবন পরমসুখে কালাতিপাত করিয়াছিল।

হেমচন্দ্রকে নূতন রাজ্যে স্থাপন করিয়া মাধবাচার্য্য কামরূপে গমন করিলেন। সেই সময়ে হেমচন্দ্র দক্ষিণ হইতে মুসলমানের প্রতিকূলতা করিতে লাগিলেন। বখ্‌তিয়ার খিলিজি পরাভূত হইয়া কামরূপ হইতে দূরীকৃত হইলেন। এবং প্রত্যাগমনকালে অপমানে ও কষ্টে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল। কিন্তু সে সকল ঘটনার বর্ণনা করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে।

রত্নময়ী এক সম্পন্ন পাটনীকে বিবাহ করিয়া হেমচন্দ্রের নূতন রাজ্যে বাস করিল। তথায় মৃণালিনীর অনুগ্রহ তাহার স্বামীর বিশেষ সৌষ্ঠব হইল। গিরিজায়া ও রত্নময়ী চিরকাল "সই" "সই" রহিল।

মৃণালিনী মাধবাচার্য্যের দ্বারা হৃষীকেশকে অনুরোধ করাইয়া মণিমালিনীকে আপন রাজধানীতে আনাইলেন। মণিমালিনী রাজপুরীমধ্যে মৃণালিনীর সখীর স্বরূপ বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বামী রাজবাটীর পৌরোহিত্যে নিযুক্ত হইলেন।

শান্তশীল যখন দেখিল যে, হিন্দুর আর রাজ্য পাইবার সম্ভাবনা নাই, তখন সে আপন চতুরতা ও কর্ম্মদক্ষতা দেখাইয়া যবনদিগের প্রিয়পাত্র হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। হিন্দুদিগের প্রতি অত্যাচার ও বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা শীঘ্র সে মনস্কাম করিয়া অভীষ্ট রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইল।

রাধারাণী

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাধারাণী নামে এক বালিকা মাহেশে রথ দেখিতে গিয়াছিল। বালিকার বয়স একাদশ পরিপূর্ণ হয় নাই। তাহাদিগের অবস্থা পূর্ব্বে ভাল ছিল—বড়মানুষের মেয়ে। কিন্তু তাহার পিতা নাই; তাহার মাতার সঙ্গে একজন জ্ঞাতির একটি মোকদ্দমা হয়; সর্ব্বস্ব লইয়া মোকদ্দমা; মোকদ্দমাটি বিধবা হাইকোর্টে হারিল। সে হারিবামাত্র, ডিক্রীদার জ্ঞাতি ডিক্রী জারি করিয়া ভদ্রাসন হইতে উহাদিগকে বাহির করিয়া দিল। প্রায় দশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি; ডিক্রীদার সকলই লইল। খরচা ও ওয়াশিলাত দিতে নগদ যাহা ছিল, তাহাও গেল; রাধারাণীর মাতা, অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়া, প্রিবিকৌন্সিলে একটি আপীল করিল। কিন্তু আর আহারের সংস্থান রহিল না। বিধবা একটা কুটীরে আশ্রয় করিয়া কোন প্রকারে শারীরিক পরিশ্রম করিয়া দিনপাত করিতে লাগিল। রাধারাণীর বিবাহ দিতে পারিল না।
কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রথের পূর্ব্বে রাধারাণীর মা ঘোরতর পীড়িতা হইল—যে কায়িক পরিশ্রমে দিনপাত হইত, তাহা বন্ধ হইল। সুতরাং আর আহার চলে না। মাতা রুগ্না, এ জন্য কাজে কাজেই তাহার উপবাস; রাধারাণীর জুটিল না বলিয়া উপবাস। রথের দিন তাহার মা একটু বিশেষ হইল, পথ্যের প্রয়োজন হইল, কিন্তু পথ্য কোথা ? কি দিবে ?

রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে কতকগুলি বনফুল তুলিয়া তাহার মালা গাঁথিল। মনে করিল যে, এই মালা রথের হাটে বিক্রয় করিয়া দুই একটি পয়সা পাইব, তাহাতেই মার পথ্য হইবে।

কিন্তু রথের টান অর্দ্ধেক হইতে না হইতেই বড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বৃষ্টি দেখিয়া লোক সকল ভাঙ্গিয়া গেল। মালা কেহ কিনিল না। রাধারাণী মনে করিল যে, আমি একটু না হয় ভিজিলাম—বৃষ্টি থামিলেই আবার লোক জমিবে। কিন্তু বৃষ্টি আর থামিল না। লোক আর জমিল না। সন্ধ্যা হইল—রাত্রি হইল—বড় অন্ধকার হইল—অগত্যা রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিল।

অন্ধকার—পথ কর্দ্দমময়, পিচ্ছিল—কিছুই দেখা যায় না। তাহাতে মুষলধারে শ্রাবণের ধারা বর্ষিতেছিল। মাতার অন্নাভাব মনে করিয়া তদপেক্ষাও রাধারাণীর চক্ষুঃ বারি বর্ষণ করিতেছিল। রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে আছাড় খাইতেছিল—কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিতেছিল। আবার কাঁদিতে কাঁদিতে আছাড় খাইতেছিল। দুই গণ্ডবিলম্বী ঘন কৃষ্ণ অলকাবলী বহিয়া, কবরী বহিয়া, বৃষ্টির জল পড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। তথাপি রাধারাণী সেই এক পয়সার বনফুলের মালা বুকে করিয়া রাখিয়াছিল—ফেলে নাই।

এমত সময়ে অন্ধকারে অকস্মাৎ কে আসিয়া রাধারাণীর ঘাড়ের উপর পড়িল। রাধারাণী এতক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কাঁদে নাই—এক্ষণে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিল। যে ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল, সে বলিল, “কে গা তুমি কাঁদ ?”

পুরুষ মানুষের গলা–কিন্তু কণ্ঠস্বর শুনিয়া রাধারাণীর রোদন বন্ধ হইল। রাধারাণীর চেনা লোক নহে–কিন্তু বড় দয়ালু লোকের কথা–রাধারাণীর ক্ষুদ্র বুদ্ধিটুকুতে ইহা বুঝিতে পারিল। রাধারাণী রোদন বন্ধ করিয়া বলিল, "আমি দুঃখিলোকের মেয়ে। আমার কেহ নাই–কেবল মা আছে ?"

সে পুরুষ বলিল, "তুমি কোথা গিয়াছিলে ?"

রাধা। আমি রথ দেখিতে গিয়াছিলাম। বাড়ী যাইব। অন্ধকারে, বৃষ্টিতে পথ পাইতেছি না।

পুরুষ বলিল, "তোমার বাড়ী কোথায় ?"

রাধারাণী বলিল, "শ্রীরামপুর।"

সে ব্যক্তি বলিল, "আমার সঙ্গে আইস–আমিও শ্রীরামপুর যাইব। চল, কোন্ পাড়ায় তোমার বাড়ী–তাহা আমাকে বলিয়া দিও–আমি তোমাকে বাড়ী রাখিয়া আসিতেছি। বড় পিছল, তুমি আমার হাত ধর, নহিলে পড়িয়া যাইবে।"

এইরূপে সে ব্যক্তি রাধারাণীকে লইয়া চলিল। অন্ধকারে সে রাধারাণীর বয়স অনুমান করিতে পারে নাই, কিন্তু কথার স্বরে বুঝিয়াছিল যে, রাধারাণী বড় বালিকা। এখন রাধারাণী তাহার হাত ধরায় হস্তস্পর্শে জানিল, রাধারাণী বড় বালিকা। তখন সে জিজ্ঞাসা করিল যে, "তোমার বয়স কত ?"

রাধা। দশ এগার বছর–

"তোমার নাম কি ?"

রাধা। রাধারাণী।

"হাঁ রাধারাণি! তুমি ছেলেমানুষ, একেলা রথ দেখিতে গিয়াছিলে কেন ?"

তখন সে কথায় কথায়, মিষ্ট মিষ্ট কথাগুলি বলিয়া, সেই এক পয়সার বনফুলের মালার সকল কথাই বাহির করিয়া লইল। শুনিল যে, মাতার পথ্যের জন্য বালিকা এই মালা গাঁথিয়া রথহাটে বেচিতে গিয়াছিল–রথ দেখিতে যায় নাই–সে মালাও বিক্রয় হয় নাই–এক্ষণেও বালিকার হৃদয়মধ্যে লুক্কায়িত আছে। তখন সে বলিল, "আমি একছড়া মালা খুঁজিতেছিলাম। আমাদের বাড়ীতে ঠাকুর আছেন, তাঁহাকে পরাইব। রথের হাট শীঘ্র ভাঙ্গিয়া গেল–আমি তাই মালা কিনিতে পারি নাই। তুমি মালা বেচ ত আমি কিনি।"

রাধারাণীর আনন্দ হইল, কিন্তু মনে ভাবিল যে, আমাকে যে এত যত্ন করিয়া হাত ধরিয়া, এ অন্ধকারে বাড়ী লইয়া যাইতেছে, তাহার কাছে দাম লইব কি প্রকারে? তা নহিলে, আমার মা খেতে পাবে না। তা নিই।

এই ভাবিয়া রাধারাণী, মালা সমভিব্যাহারীকে দিল। সমভিব্যাহারী বলিল, "ইহার দাম চারি পয়সা–এই লও"। সমভিব্যাহারী এই বলিয়া মূল্য দিল। রাধারাণী বলিল, "এ কি পয়সা? এ যে বড় বড় ঠেক্‌চে।"

"ডবল পয়সা–দেখিতেছ না দুইটা বই দিই নাই।"

রাধা। তা এ যে অন্ধকারেও চক্‌চক্ কর্‌চে। তুমি ভুলে টাক দাও নাই ত ?

"না। নূতন কলের পয়সা, তাই চক্‌চক্ কর্‌চে।"

রাধা। তা, আচ্ছা, ঘরে গিয়ে প্রদীপ জ্বেলে যদি দেখি যে, পয়সা নয়, তখন ফিরাইয়া দিব। তোমাকে সেখানে একটু দাঁড়াইতে হইবে।

কিছু পরে তাহারা রাধারাণীর মার কুটীরদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে গিয়া, রাধারাণী বলিল, "তুমি ঘরে আসিয়া দাঁড়াও, আমরা আলো জ্বালিয়া দেখি, টাকা কি পয়সা।"

সঙ্গী বলিল, "আমি বাহিরে দাঁড়াইয়া আছি। তুমি আগে ভিজা কাপড় ছাড়–তারপর প্রদীপ জ্বালিও।"

রাধারাণী বলিল, "আমার আর কাপড় নাই–একখানি ছিল, তাহা কাচিতে দিয়াছি। তা, আমি ভিজা কাপড়ে সর্ব্বদা থাকি, আমার ব্যামো হয় না। আঁচলটা নিঙড়ে পরিব এখন। তুমি দাঁড়াও, আমি আলো জ্বালি।"

"আচ্ছা।"

ঘরে তৈল ছিল না, সুতরাং চালের খড় পাড়িয়া চক্‌মকি ঠুকিয়া, আগুন জ্বালিতে হইল। আগুন জ্বালিতে কাজে কাজেই একটু বিলম্ব হইল। আলো জ্বালিয়া রাধারাণী দেখিল, টাকা বটে, পয়সা নহে।

তখন রাধারাণী বাহিরে আসিয়া আলো ধরিয়া তল্লাস করিয়া দেখিল যে, যে টাকা দিয়াছে, সে নাই–চলিয়া গিয়াছে।

রাধারাণী তখন বিষণ্নবদনে সকল কথা তাহার মাকে বলিয়া, মুখপানে চাহিয়া রহিল–সকাতরে বলিল–"মা! এখন কি হবে?"

মা বলিল, "কি হবে বাছা! সে কি আর না জেনে টাকা দিয়েছে? সে দাতা, আমাদের দুঃখ শুনিয়া দান করিয়াছে–আমরাও ভিখারী হইয়াছি, দান গ্রহণ করিয়া খরচ করি।"

তাহারা এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, এমত সময়ে কে আসিয়া তাহাদের কুটীরের আগড় ঠেলিয়া বড় সোরগোল উপস্থিত করিল। রাধারাণী দ্বার খুলিয়া দিল–মনে করিয়াছিল যে, সেই তিনিই বুঝি আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন। পোড়া কপাল! তিনি কেন? পোড়ামুখো, কাপুড়ে মিন্‌সে!

রাধারাণীর মার কুটীর বাজারের অনতিদূরে। তাহাদের কুটীরের নিকটেই পদ্মলোচন শাহার কাপড়ের দোকান। পদ্মলোচন খোদ,–পোড়ারমুখো কাপুড়ে মিন্‌সে–একজোড়া নূতন কুঞ্জদার শান্তিপুরে কাপড় হাতে করিয়া আনিয়াছিল, এখন দ্বার খোলা পাইয়া তাহা রাধারাণীকে দিল। বলিল, "রাধারাণীর এই কাপড়।"

রাধারাণী বলিল, "ওমা! আমার কিসের কাপড়!"

পদ্মলোচন–সে বাস্তবিক পোড়ারমুখো কি না, তাহা আমরা সবিশেষ জানি না–রাধারাণীর কথা শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইল; বলিল, "কেন, এই যে এক বাবু এখনই আমাকে নগদ দাম দিয়া বলিয়া গেল যে, এই কাপড় এখনই ঐ রাধারাণীকে দিয়া এস।"

রাধারাণী তখন বলিল, "ওমা সেই গো! সেই। তিনিই কাপড় কিনে পাঠিয়ে দিয়েছেন। হাঁ গা পদ্মলোচন?"–

রাধারাণীর পিতার সময় হইতে পদ্মলোচন ইঁহাদের কাছে সুপরিচিত–অনেক বারই ইঁহাদিগের নিকট যখন সুদিন ছিল, তখন চারি টাকার কাপড়ে শপথ করিয়া আট টাকা সাড়ে বারো আনা, আর দুই আনা মুনাফা লইতেন।

"হাঁ পদ্মলোচন–বলি সে বাবুটিকে চেন?"

পদ্মলোচন বলিল, "তোমরা চেন না?"

রাধা। না।

পদ্ম। আমি বলি তোমাদের কুটুম্ব। আমি চিনি না।
যাহা হৌক, পদ্মলোচন চারি টাকার কাপড় আবার মায় মুনাফা আট টাকা সাড়ে চৌদ্দ আনায় বিক্রয় করিয়াছিলেন, আর অধিক কথা কহিবার প্রয়োজন নাই বিবেচনা করিয়া, প্রসন্নমনে দোকানে ফিরিয়া গেলেন।
এ দিকে রাধারাণী, প্রাপ্ত টাকা ভাঙ্গাইয়া মার পথ্যের উদ্যোগের জন্য বাজারে গেল। বাজার করিয়া, তৈল আনিয়া প্রদীপ জ্বালিল। মার জন্য যৎকিঞ্চিৎ রন্ধন করিল। স্থান পরিষ্কার করিয়া মাকে অন্ন দিবে, এই অভিপ্রায়ে ঘর ঝাঁটাইতে লাগিল। ঝাঁটাইতে একখানা কাগজ কুড়াইয়া পাইল–হাতে করিয়া তুলিল–"এ কি মা!"
মা দেখিয়া বলিলেন, "একখানা নোট।"
রাধারাণী বলিল, "তবে তিনি ফেলিয়া গিয়াছেন।"
মা বলিলেন, "হাঁ! তোমাকে দিয়া গিয়াছেন। দেখ, তোমার নাম লেখা আছে।"
রাধারাণী বড়ঘরের মেয়ে, একটু অক্ষরপরিচয় ছিল। সে পড়িয়া দেখিল, তাই বটে। লেখা আছে।
রাধারাণী বলিল, "হাঁ মা, এমন লোক কে মা!"
মা বলিলেন, "তাহার নামও নোটে লেখা আছে। পাছে কেহ চোরা নোট বলে, এই জন্য নাম লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাম রুক্মিণীকুমার রায়।"
পরদিন মাতায় কন্যায়, রুক্মিণীকুমার রায়ের অনেক সন্ধান করিল। কিন্তু শ্রীরামপুরে বা নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে রুক্মিণীকুমার রায় কেহ আছে, এমত কোন সন্ধান পাইল না। নোটখানি তাহারা ভাঙ্গাইল না–তুলিয়া রাখিল–তাহারা দরিদ্র, কিন্তু লোভী নহে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাধারাণীর মাতা পথ্য করিলেন বটে, কিন্তু সে রোগ হইতে মুক্তি পাওয়া, তাঁহার অদৃষ্টে ছিল না। তিনি অতিশয় ধনী ছিলেন, এখন অতি দুঃখিনী হইয়াছিলেন, এই শারীরিক এবং মানসিক দ্বিবিধ কষ্ট, তাঁহার সহ্য হইল না। রোগ ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া, তাঁহার শেষ কাল উপস্থিত হইল।
এমত সময়ে বিলাত হইতে সংবাদ আসিল যে, প্রিবি কৌন্সিলের আপীল তাঁহার পক্ষে নিষ্পত্তি পাইয়াছে; তিনি আপন সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন, ওয়াশিলাতের টাকা ফেরত পাইবেন এবং তিনি আদালতের খরচা পাইবেন। কামাখ্যানাথ বাবু তাঁহার পক্ষে হাইকোর্টের উকীল ছিলেন, তিনি স্বয়ং এই সংবাদ লইয়া রাধারাণীর মাতার কুটীরে উপস্থিত হইলেন। সুসংবাদ শুনিয়া, রুগ্নার অবিরল নয়নাশ্রু পড়িতে লাগিল।
তিনি নয়নাশ্রু সংবরণ করিয়া কামাখ্যা বাবুকে বলিলেন, "যে প্রদীপ নিবিয়াছে, তাহাতে তেল দিলে কি হইবে? আপনার এ সুসংবাদেও আমার আর প্রাণরক্ষা হইবে না। আমার আয়ুঃশেষ হইয়াছে। তবে আমার এই সুখ যে, রাধারাণী আর অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবে না। তাই বা কে জানে ? সে বালিকা, তাহার এ সম্পত্তি কে রক্ষা করিবে ? কেবল আপনিই ভরসা। আপনি আমার এই অন্তিম কালে আমারে একটি ভিক্ষা দিউন–নহিলে আর কাহার কাছে চাহিব।"
কামাখ্যা বাবু অতি ভদ্রলোক এবং তিনি রাধারাণীর পিতার বন্ধু ছিলেন। রাধারাণীর মাতা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলে, তিনি রাধারাণীর মাতাকে বলিয়াছিলেন যে, যত দিন

না আপীল নিষ্পত্তি পায়, অন্ততঃ তত দিন তোমরা আসিয়া আমার গৃহে অবস্থান কর, আমি আপনার মাতার মত তোমাকে রাখিব। রাধারাণীর মাতা তাহাতে অস্বীকৃতা হইয়াছিলেন। পরিশেষে কামাখ্যা বাবু কিছু কিছু মাসিক সাহায্য করিতে চাহিলেন। "আমার এখনও কিছু হাতে আছে–আবশ্যক হইলে চাহিয়া লইব।" এইরূপ মিথ্যা কথা বলিয়া রাধারাণীর মাতা সে সাহায্য গ্রহণে অস্বীকৃতা হইয়াছিলেন। রুক্মিণীকুমারের দান গ্রহণ তাঁহাদিগের প্রথম ও শেষ দান গ্রহণ। কামাখ্যা বাবু এতদিন বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহারা এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন। দশা দেখিয়া কামাখ্যা বাবু অত্যন্ত কাতর হইলেন। আবার রাধারাণীর মাতা, যুক্তকরে তাঁহার কাছে ভিক্ষা চাহিতেছেন, দেখিয়া আরও কাতর হইলেন; বলিলেন, "আপনি আজ্ঞা করুন, আমি কি করিব? আপনার যাহা প্রয়োজনীয়, আমি তাহাই করিব।"

রাধারাণীর মাতা বলিলেন, "আমি চলিলাম, কিন্তু রাধারাণী রহিল। এক্ষণে আদালত হইতে আমার শ্বশুরের যথার্থ উইল সিদ্ধ হইয়াছে; অতএব রাধারাণী একা সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইবে। আপনি তাহাকে দেখিবেন, আপনার কন্যার ন্যায় তাহাকে রক্ষা করিবেন, এই আমার ভিক্ষা। আপনি এই কথা স্বীকার করিলেই আমি সুখে মরিতে পারি।"

কামাখ্যা বাবু বলিলেন, "আমি আপনার নিকট শপথ করিতেছি, আমি রাধারাণীকে আপন কন্যার অধিক যত্ন করিব। আমি কায়মনোবাক্যে এ কথা কহিলাম, আপনি বিশ্বাস করুন।"

যিনি মুমূর্ষু, তিনি কামাখ্যা বাবুর চক্ষের জল দেখিয়া, তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিলেন। তাঁহার সেই শীর্ণ শুষ্ক অধরে একটু আহ্লাদের হাসি দেখা দিল। হাসি দেখিয়া কামাখ্যা বাবু বুঝিলেন, ইনি আর বাঁচিবেন না।

কামাখ্যা বাবু তাঁহাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন যে, এক্ষণে আমার গৃহে চলুন–পরে ভদ্রাসন দখল হইলে আসিবেন। রাধারাণীর মাতার যে অহঙ্কার, সে দারিদ্র্যজনিত–এজন্য দারিদ্রাবস্থায় তাঁহার গৃহে যাইতে চাহেন নাই। এক্ষণে আর দারিদ্র নাই, সুতরাং আর সে অহঙ্কারও নাই। এক্ষণে তিনি যাইতে সম্মত হইলেন। কামাখ্যা বাবু, রাধারাণী ও তাহার মাতাকে সযত্নে নিজালয়ে লইয়া গেলেন।

তিনি রীতিমত পীড়িতার চিকিৎসা করাইলেন। কিন্তু তাঁহার জীবন রক্ষা হইল না, অল্পদিনেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

উপযুক্ত সময়ে কামাখ্যা বাবু রাধারাণীকে তাহার সম্পত্তিতে দখল দেওয়াইলেন। কিন্তু রাধারাণী বালিকা বলিয়া তাহাকে নিজ বাটীতে একা থাকিতে দিলেন না, আপন গৃহেই রাখিলেন।

কালেক্টর সাহেব, রাধারাণীর সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনে আনিবার জন্য যত্ন পাইলেন, কিন্তু কামাখ্যা বাবু বিবেচনা করিলেন, আমি আমি রাধারাণীর জন্য যতদূর করিব, সরকারি কর্ম্মচারীগণ ততদূর করিবে না। কামাখ্যা বাবুর কৌশলে কালেক্টর সাহেব নিরস্ত হইলেন। কামাখ্যা বাবু স্বয়ং রাধারাণীর সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন।

বাকি রাধারাণীর বিবাহ। কিন্তু কামাখ্যা বাবু নব্যতন্ত্রের লোক–বাল্যবিবাহে তাঁহার দ্বেষ ছিল। তিনি বিবেচনা করিলেন যে, রাধারাণীর বিবাহ তাড়াতাড়ি না দিলে, জাতি গেল মনে করে, এমত কেহ তাহার নাই। অতএব যবে রাধারাণী, স্বয়ং বিবেচনা করিয়া বিবাহে ইচ্ছুক হইবে, তবে তাহার বিবাহ দিব। এখন সে লেখাপড়া শিখুক।

এই ভাবিয়া কামাখ্যা বাবু রাধারাণীর বিবাহের কোন উদ্যোগ না করিয়া তাহাকে উত্তমরূপে সুশিক্ষিত করাইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পাঁচ বৎসর গেল–রাধারাণী পরম সুন্দরী ষোড়শবর্ষীয়া কুমারী। কিন্তু সে অন্তঃপুরমধ্যে বাস করে, তাহার সে রূপরাশি কেহ দেখিতে পায় না। এক্ষণে রাধারাণীর সম্বন্ধ করিবার সময় উপস্থিত হইল। কামাখ্যা বাবুর ইচ্ছা রাধারাণীর মনের কথা বুঝিয়া তাহার সম্বন্ধ করেন। তত্ত্ব জানিবার জন্য আপনার কন্যা বসন্তকুমারীকে ডাকিলেন।

বসন্তের সঙ্গে রাধারাণীর সখিত্ব। উভয়ে সমবয়স্কা। এবং উভয়ে অত্যন্ত প্রণয়। কামাখ্যা বাবু বসন্তকে আপনার মনোগত কথা বুঝাইয়া বলিলেন।

বসন্ত সলজ্জভাবে, অথচ অল্প হাসিতে হাসিতে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "রুক্মিণীকুমার রায় কেহ আছে?"

কামাখ্যা বাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "না। তা ত জানি না। কেন ?"

বসন্ত বলিল, "রাধারাণী রুক্মিণীকুমার ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ করিবে না।"

কামাখ্যা। সে কি ? রাধারাণীর সঙ্গে অন্য ব্যক্তির পরিচয় কি প্রকারে হইল ?

বসন্ত অবনতমুখে অল্প হাসিল। সে রথের রাত্রির বিবরণ সবিস্তারে রাধারাণীর কাছে শুনিয়াছিল, পিতার সাক্ষাতে সকল বিবৃত করিল। শুনিয়া কামাখ্যা বাবু রুক্মিণীকুমারের প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "রাধারাণীকে বুঝাইয়া বলিও, রাধারাণী একটি মহাভ্রমে পড়িয়াছে। বিবাহ কৃতজ্ঞতা অনুসারে কর্ত্তব্য নহে। রুক্মিণীকুমারের নিকট রাধারাণীর কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত; যদি সময় ঘটে, তবে অবশ্য প্রত্যুপকার করিতে হইবে। কিন্তু বিবাহে রুক্মিণীকুমারের কোন দাবি দাওয়া নাই। তাতে আবার সে কি জাতি, কত বয়স, তাহা কেহ জানে না। তাহার পরিবার সন্তানাদি থাকিবারই সম্ভাবনা; রুক্মিণীকুমারের বিবাহ করিবারই বা সম্ভাবনা কি ?

বসন্ত বলিল, "সম্ভাবনা কিছুই নাই, তাহাও রাধারাণী বিলক্ষণ বুঝিয়াছে। কিন্তু সেই রাত্রি অবধি, রুক্মিণীকুমারের একটি মানসিক প্রতিমা গড়িয়া আপনার মনে তাহা স্থাপিত করিয়াছে। যেমন দেবতাকে লোকে পূজা করে, রাধারাণী সেই প্রতিমা তেমনি করিয়া, প্রত্যহ মনে মনে পূজা করে। এই পাঁচ বৎসর রাধারাণী আমাদিগের বাড়ী আসিয়াছে, এই পাঁচ বৎসরে এমন দিন প্রায় যায় নাই, যেদিন রাধারাণী রুক্মিণীকুমারের কথা আমার সাক্ষাতে একবারও বলে নাই। আর কেহ রাধারাণীকে বিবাহ করিলে, তাহার স্বামী সুখী হইবে না।"

কামাখ্যা বাবু মনে বলিলেন, "বাতিক। ইহার একটু চিকিৎসা আবশ্যক। কিন্তু প্রথম চিকিৎসা বোধ হয়, রুক্মিণীকুমারের সন্ধান করা।"

কামাখ্যা বাবু রুক্মিণীকুমারের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। স্বযং কলিকাতায় তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বন্ধুবর্গকেও সেই সন্ধানে নিযুক্ত করিলেন। দেশে দেশে আপনার মোয়াক্কেলগণকে পত্র লিখিলেন। প্রতি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলেন। সে বিজ্ঞাপন এইরূপ–

'বাবু রুক্মিণীকুমার রায়, নিম্ন স্বাক্ষরকারী ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন–বিশেষ প্রয়োজন আছে। ইহাতে রুক্মিণী বাবুর সন্তোষের ব্যতীত অসন্তোষের কারণ উপস্থিত হইবে না।

শ্রী ইত্যাদি–"

কিন্তু কিছুতেই রুক্মিণীকুমারের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। দিন গেল, মাস গেল, বৎসর গেল, তথাপি কৈ, রুক্মিণীকুমার ত আসিল না।

ইহার পর রাধারাণীর আর একটি ঘোরতর বিপদ্ উপস্থিত হইল–কামাখ্যা বাবুর লোকান্তরগতি হইল। রাধারাণী ইহাতে অত্যন্ত শোকাতুরা হইলেন, দ্বিতীয় বার পিতৃহীনা হইলেন মনে করিলেন। কামাখ্যা বাবুর শ্রাদ্ধাদির পর রাধারাণী আপন বাটীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন এবং নিজ সম্পত্তির তত্ত্বাবধান স্বয়ং করিতে লাগিলেন। কামাখ্যা বাবুর বিচক্ষণতা হেতু রাধারাণীর সম্পত্তি বিস্তর বাড়িয়াছিল।

বিষয় হস্তে লইয়াই রাধারাণী প্রথমেই দুই লক্ষ মুদ্রা গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করিলেন। তৎসঙ্গে এই প্রার্থনা করিলেন যে, এই অর্থে তাঁহার নিজ গ্রামে একটি অনাথনিবাস স্থাপিত হউক। তাহার নাম হউক–"রুক্মিণীকুমারের প্রাসাদ।"

গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ প্রস্তাবিত নাম শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন, কিন্তু তাহাতে কে কথা কহিবে? অনাথনিবাস সংস্থাপিত হইল। রাধারাণীর মাতা দরিদ্রাবস্থায় নিজ গ্রাম ত্যাগ করিয়া শ্রীরামপুরে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; কেন না, যে গ্রামে যে ধনী ছিল, সে সহসা দরিদ্র হইলে, সে গ্রামে তাহার বাস করা কষ্টকর হয়। তাঁহাদিগের নিজ গ্রাম শ্রীরামপুর হইতে কিঞ্চিৎ দূর–আমরা সে গ্রামকে রাজপুর বলিব। এক্ষণে রাধারাণী রাজপুরেই বাস করিতেন। অনাথনির্বাসও রাধারাণীর বাড়ীর সম্মুখে, রাজপুরে সংস্থাপিত হইল। নানা দেশ হইতে দীন দুঃখী অনাথ আসিয়া বাস করিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দুই এক বৎসর পরে একজন ভদ্রলোক সেই অনাথনিবাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বয়স ৩৫/৩৬ বৎসর। অবস্থা দেখিয়া, অতি ধীর, গম্ভীর এবং অর্থশালী লোক বোধ হয়। তিনি সেই "রুক্মিণীকুমারের প্রাসাদের" দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রক্ষকগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কাহার বাড়ী?"

তাহারা বলিল, "এ কাহারও বাড়ী নহে, এখানে দুঃখী অনাথ লোক থাকে। ইহাকে 'রুক্মিণীকুমারের প্রাসাদ' বলে।"

আগন্তুক বলিলেন, "আমি ইহার ভিতরে দিয়া দেখিতে পারি?"

রক্ষকগণ বলিল, "দীন দুঃখী লোকেও ইহার ভিতর অনায়াসে যাইতেছে– আপনাকে নিষেধ কি?"

দর্শক ভিতরে গিয়া সব দেখিয়া, প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বলিলেন, "বন্দবস্ত দেখিয়া আমার বড় আহ্লাদ হইয়াছে। কে এই অন্নসত্র দিয়াছে? রুক্মিণীকুমার কি তাঁহার নাম?"

রক্ষকেরা বলিল, "একজন স্ত্রীলোক এই অন্নসত্র দিয়াছেন।"

দর্শক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে ইহাকে রুক্মিণীকুমারের প্রাসাদ বলে কেন?"

রক্ষকেরা বলিল, "তাহা আমরা কেহ জানি না।"

'রুক্মিণীকুমার কার নাম?"

"কাহারও নয়।"

"যিনি অন্নসত্র দিয়াছেন, তাঁহার নিবাস কোথায় ?"
রক্ষকেরা সম্মুখে অতি বৃহৎ অট্টালিকা দেখাইয়া দিল।
আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "তোমরা যাঁহার বাড়ী দেখাইয়া দিলে, তিনি পুরুষ মানুষের সাক্ষাতে বাহির হইয়া থাকেন ? রাগ করিও না, এখন অনেক বড় মানুষের মেয়ে মেম লোকের মত বাহিরে বাহির হইয়া থাকে, এই জন্যই জিজ্ঞাসা করিতেছি।"
রক্ষকেরা উত্তর করিল–"ইনি সেরূপ চরিত্রের নন। পুরুষের সমক্ষে বাহির হন না।"
প্রশ্নকর্ত্তা ধীরে ধীরে রাধারাণীর অট্টালিকার অভিমুখে গিয়া, তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যিনি আসিয়াছিলেন, তাঁহার পরিচ্ছদ সচরাচর বাঙ্গালী ভদ্রলোকের মত; বিশেষ পারিপাট্য, অথবা পারিপাট্যের বিশেষ অভাবও কিছু ছিল না, কিন্তু তাঁহার অঙ্গুলিতে একটি হীরকাঙ্গুরীয় ছিল; তাহা দেখিয়া, রাধারাণীর কর্ম্মকারগণ অবাক্ হইয়া তৎপ্রতি চাহিয়া রহিল। এত বড় হীরা তাহারা কখন অঙ্গুরীয়ে দেখে নাই। তাঁহার সঙ্গে কেহ লোক ছিল না, এজন্য তাহারা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না যে, কে ইনি ? মনে করিল, বাবু স্বয়ং পরিচয় দিবেন। কিন্তু বাবু কোন পরিচয় দিলেন না। তিনি রাধারাণীর দেওয়ানজির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিলেন। বলিলেন, "এই পত্র আপনার মুনিবের কাছে পাঠাইয়া দিয়া, আমাকে উত্তর আনিয়া দিন।"
দেওয়ানজি বলিলেন, "আমার মুনিব স্ত্রীলোক, আবার অল্পবয়স্কা। এজন্য তিনি নিয়ম করিয়াছেন যে, কোন অপরিচিত লোকে পত্র আনিলে আমরা তাহা না পড়িয়া তাঁহার কাছে পাঠাইব না।"
আগন্তুক বলিল, "আপনি পড়ুন।"
দেওয়ানজি পত্র পড়িলেন–
"প্রিয় ভগিনি!
এ ব্যক্তি পুরুষ হইলেও ইহার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিও–ভয় করিও না। যেমত যেমত ঘটে, আমাকে লিখিও। –শ্রীমতী বসন্তকুমারী।"
কামাখ্যা বাবুর কন্যার স্বাক্ষর দেখিয়া, কেহ আর কিছু বলিল না। পত্র অন্তঃপুরে গেল। অন্তঃপুর হইতে পরিচারিকা, পত্রবাহক বাবুকে লইতে আসিল। আর কেহ সঙ্গে যাইতে পাইল না–হুকুম নাই।
পরিচারিকা, বাবুকে লইয়া এক সুসজ্জিত গৃহে বসাইলেন। রাধারাণীর অন্তঃপুরে সেই প্রথম পুরুষ মানুষ প্রবেশ করিল। দেখিয়া একজন পরিচারিকা রাধারাণীকে ডাকিতে গেল, আর একজন অন্তরালে থাকিয়া আগন্তুককে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দেখিল যে, তাঁহার বর্ণটুকু গৌর, স্ফুটিত মল্লিকারাশির মত গৌর; তাঁহার শরীর দীর্ঘ, ঈষৎ স্থূল, কপাল দীর্ঘ, অতি সূক্ষ্ম পরিষ্কার ঘনকৃষ্ণ সুরঞ্জিত কেশজালে মণ্ডিত; চক্ষু বৃহৎ, কটাক্ষ স্থির, ভ্রূযুগ সূক্ষ্ম, ঘন, দূরায়ত এবং

নিবিড় কৃষ্ণ; নাসিকা দীর্ঘ এবং উন্নত; ওষ্ঠাধর রক্তবর্ণ, ক্ষুদ্র এবং কোমল; গ্রীবা দীর্ঘ অথচ মাংসল; অন্যান্য অঙ্গ বস্ত্রে আচ্ছাদিত, কেবল অঙ্গুলিগুলি দেখা যাইতেছে, সেগুলি শুভ্র, সুগঠিত, এবং একটি বৃহদাকার হীরকে রঞ্জিত।

রাধারাণী সেই স্থানে আসিয়া পরিচারিকাকে বিদায় করিয়া দিলেন। রাধারাণী আসিবামাত্র দর্শকের বোধ হইল যে, সেই কক্ষমধ্যে এক অভিনব সূর্য্যোদয় হইল—রূপের আলোকে তাঁহার মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

আগন্তুকের উচিত, প্রথম কথা কহা—কেন না, তিনি পুরুষ এবং বয়োজ্যেষ্ঠ—কিন্তু তিনি সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। রাধারাণী একটু অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আপনি এরূপ গোপনে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের অভিলাষ করিয়াছেন কেন ? আমি স্ত্রীলোক, কেবল বসন্তের অনুরোধেই আমি ইহা স্বীকার করিয়াছি।"

আগন্তুক বলিল, "আমি আপনার সঙ্গে এরূপ সাক্ষাতের অভিলাষী হইয়াছি, ঠিক তা নহে।"

রাধারাণী অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, "তা নয়, বটে। তবে বসন্ত কি জন্য এরূপ অনুরোধ করিয়াছেন, তাহা কিছু লেখেন নাই। বোধ হয়, আপনি জানেন।"

আগন্তুক একখানি অতি পুরাতন সংবাদপত্র বাহির করিয়া তাহা রাধারাণীকে দেখাইলেন। রাধারাণী পড়িলেন; কামাখ্যা বাবুর স্বাক্ষরিত রুক্মিণীকুমার সম্বন্ধে সেই বিজ্ঞাপন। রাধারাণী দাঁড়াইয়াছিলেন—দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নারিকেলপত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন। আগন্তুকের দেবতুল্য গঠন দেখিয়া মনে ভাবিলেন, ইনিই আমার সেই রুক্মিণীকুমার। আর থাকিতে পারিলেন না—জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন, "আপনার নাম কি রুক্মিণীকুমার বাবু ?"

আগন্তুক বলিলেন, "না।" "না" শব্দ শুনিয়াই রাধারাণী ধীরে ধীরে আসন গ্রহণ করিলেন। আর দাঁড়াইতে পারিলেন না—তাঁহার বুক যেন ভাঙ্গিয়া গেল।

আগন্তুক বলিলেন, "না। আমি যদি রুক্মিণীকুমার হইতাম, তাহা হইলে, কামাখ্যা বাবু এ বিজ্ঞাপন দিতেন না। কেন না, তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। কিন্তু যখন এই বিজ্ঞাপন বাহির হয়, তখনি আমি ইহা দেখিয়া তুলিয়া রাখিয়াছিলাম।"

রাধারাণী বলিল, "যদি আপনার সঙ্গে এই বিজ্ঞাপনের কোন নম্বন্ধ নাই, তবে আপনি ইহা তুলিয়া রাখিয়াছিলেন কেন ?"

উত্তরকারী বলিলেন, "একটি কৌতুকের জন্য। আজি আট দশ বৎসর হইল, আমি যেখানে সেখানে বেড়াইতম—কিন্তু লোকলজ্জাভয়ে আপনার নামটা গোপন করিয়া কাল্পনিক নাম ব্যবহার করিতাম। কাল্পনিক নাম রুক্মিণীকুমার। আপনি অত বিমনা হইতেছেন কেন ?"

রাধারাণী একটু স্থির হইলেন—আগন্তুক বলিতে লাগিলেন—"যথার্থ রুক্মিণীকুমার নাম ধরে, এমন কাহাকেও চিনি না। যদি কেহ আমারই তল্লাস করিয়া থাকে—তাহা সম্ভব নহে—তথাপি কি জানি—সাত পাঁচ ভাবিয়া বিজ্ঞাপনটি তুলিয়া রাখিলাম—কিন্তু কামাখ্যা বাবুর কাছে আসিতে সাহস হইল না।"

"পরে?"

"পরে কামাখ্যা বাবুর শ্রাদ্ধে তাঁহার পুত্রগণ আমাকে নিমন্ত্রণ করিল, কিন্তু আমি কার্য্যগতিকে আসিতে পারি নাই। সম্প্রতি সেই ত্রুটির ক্ষমাপ্রার্থনার জন্য তাঁহার পুত্রদিগের নিকট আসিলাম। কৌতুকবশতঃ বিজ্ঞাপন সঙ্গে আনিয়াছিলাম। প্রসঙ্গক্রমে উহার কথা উত্থাপন করিয়া কামাখ্যা বাবুর জ্যেষ্ঠপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এ বিজ্ঞাপন কেন দেওয়া হইয়াছিল ? কামাখ্যা বাবুর পুত্র বলিলেন যে, রাধারাণীর অনুরোধে। আমিও এক রাধারাণীকে চিনিতাম—এক বালিকা—আমি একদিন দেখিয়া তাহাকে আর ভূলিতে পারিলাম না। সে মাতার পথ্যের জন্য, আপনি অনাহারে থাকিয়া বনফুলের মালা গাঁথিয়া—সেই অন্ধকার বৃষ্টিতে—" বক্তা আর কথা কহিতে পারিলে না—তাঁহার চক্ষু জলে পুরিয়া গেল। রাধারাণীরও চক্ষু জলে ভাসিতে লাগিল। চক্ষু মুছিয়া রাধারাণী বলিল, "ইতর লোকের কথায়

এখন প্রয়োজন কি ? আপনার কথা বলুন।”

আগন্তুক উত্তর করিলেন, “রাধারাণী ইতর লোক নহে। যদি সংসারে কেহ দেবকন্যা থাকে, তবে সেই রাধারাণী। যদি কাহাকে পবিত্র, সরলচিত্ত, এ সংসারে আমি দেখিয়া থাকি, তবে সেই রাধারাণী–যদি কাহারও কথায় অমৃত থাকে, তবে সেই রাধারাণী–যথার্থ অমৃত! বর্ণে বর্ণে অপ্সরার বীণা বাজে, যেন কথা কহিতে বাধ বাধ করে অথচ সকল কথা পরিষ্কার, সুমধুর,–অতি সরল! আমি এমন কণ্ঠ কখন শুনি নাই–এমন কথা কখনও শুনি নাই!”

রুক্মিণীকুমার–এক্ষণে ইঁহাকে রুক্মিণীকুমারই বলা হউক–ঐ সঙ্গে মনে মনে বলিলেন, “আবার আজ বুঝি তেমনি কথা শুনিতেছি!”

রুক্মিণীকুমার মনে মনে ভাবিতেছিলেন, আজি এত দিন হইল, সেই বালিকার কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিলাম, ঠিক আজিও সে কণ্ঠ আমার মনের ভিতর জাগিতেছে! যেন কাল শুনিয়াছি। অথচ আজি এই সুন্দরীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমার সেই রাধারাণীকেই বা মনে পড়ে কেন ? এই কি সেই ? আমি মূর্খ! কোথায় সেই দীনদুঃখিনী, কুটীরবাসিনী ভিখারিণী–আর কোথায় এই উচ্চপ্রাসাদবিহারিণী ইন্দ্রাণী! আমি সে রাধারাণীকে অন্ধকারে ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই, সুতরাং জানি না যে, সে সুন্দরী, কি কুৎসিতা, কিন্তু এই শচীনিন্দিতা রূপসীর শতাংশের একাংশ রূপও যদি তাহার থাকে, তাহা হইলে সেও লোকমনোমোহিনী বটে!

এ দিকে রাধারাণী, অতৃপ্তশ্রবণে রুক্মিণীকুমারের মধুর বচনগুলি শুনিতেছিলেন–মনে মনে ভাবিতেছিলেন, তুমি যাহা পাপিষ্ঠা রাধারাণীকে বলিতেছ, কেবল তোমাকেই সেই কথাগুলি বলা যায়! তুমি আজ আট বৎসরের পর রাধারাণীকে ছলিবার জন্য কোন্ নন্দনকানন ছাড়িয়া পৃথিবীতে নামিলে ? এত দিনে কি আমার হৃদয়ের পূজায় প্রীত হইয়াছ ? তুমি কি অন্তর্যামী ? নহিলে আমি লুকাইয়া লুকাইয়া, হৃদয়ের ভিতরে লুকাইয়া তোমাকে যে পূজা করি, তাহা কি প্রকারে জানিলে ?

এই প্রথম, দুই জনে স্পষ্ট দিবসালোকে, পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। দুই জনে, দুই জনের মুখপানে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন, আর এমন আছে কি ? এই সসাগরা, নদনদীচিত্রিতা, জীবসঙ্কুলা পৃথিবীতলে এমন তেজোময়, এমন মধুর এমন সুখময়, এমন চঞ্চল অথচ স্থির, এমন সহাস্য অথচ গভীর, এমন প্রফুল্ল অথচ ব্রীড়াময়, এমন আর আছে কি ? চিরপরিচিত অথচ অত্যন্ত অভিনব, মুহূর্ত্তে মুহূর্তে অভিনব মধুরিমাময়, আত্মীয় অথচ অত্যন্ত পর, চিরস্মৃত অথচ অদৃষ্টপূর্ব্ব–কখন দেখি নাই, আর এমন দেখিব না, এমন আর আছে কি ?

রাধারাণী বলিল,–বড় কষ্টে বলিতে হইল, কেন না, চক্ষের জল থামে না, আবার সেই চক্ষের জলের উপর কোথা হইতে পোড়া হাসি আসিয়া পড়ে– রাধারাণী বলিল, “তা, আপনি এতক্ষণ কেবল সেই ভিখারিণীর কথাই বলিলেন, আমাকে যে কেন দর্শন দিয়াছেন, তা ত এখনও বলেন নাই।”

হাঁ গা, এমন করিয়া কি কথা কহা যায় গা? যাহার গলা ধরিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছে; প্রাণেশ্বর; দুঃখিনীর সর্ব্বস্ব! চিরবাঞ্ছিত! বলিয়া যাহাকে ডাকিতে ইচ্ছা করিতেছে; আবার যাকে সেই সঙ্গে “হাঁ গা, সেই রাধারাণী পোড়ারমুখী তোমার কে হয় গা” বলিয়া তামাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছে–তার সঙ্গে আপনি, মশাই, দর্শন দিয়াছেন, এই সকল কথা নিয়ে কি কথা কহা যায় গা ? তোমরা পাঁচ জন রসিকা, প্রেমিকা, বাক্‌চতুরা, বয়োধিকা ইত্যাদি ইত্যাদি আছ, তোমরা পাঁচ জন বল দেখি, ছেলেমানুষ রাধারাণী কেমন করে এমন করে কথা কয় গা ?

রাধারাণী মনে মনে একটু পরিতাপ করিল; কেন না, কথাটা একটু ভর্ৎসনার মত হইল। রুক্মিণীকুমার একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,–“তাই বলিতেছিলাম। আমি সেই রাধারাণীকে চিনিতাম–রাধারাণীকে মনে পড়িল, একটু–এতটুকু–অন্ধকার রাত্রে জোনাকির ন্যায়–একটু আশা হইল যে, যদি এই রাধারাণী আমার সেই রাধারাণী হয়!”

“তোমার রাধারাণী।” রাধারাণী ছল করিয়া ধরিয়া চুপি চুপি এই কথাটি বলিয়া, মুখ নত করিয়া ঈষৎ ঈষৎ হাসিল। হাঁ গা, না হেসে কি থাকা যায় গা ? তোমরা আমার রাধারাণীর নিন্দা করিও না।
রুক্মিণীকুমারাও মনে মনে ছল ধরিল–এ তুমি বলে কেন ? কে এ ? প্রকাশ্যে বলিল, “আমারই রাধারাণী। আমি একরাত্রি মাত্র তাহাতে দেখিয়া–দেখিয়াছিই বা কেমন করিয়া বলি–এই আট বৎসরেও তাহাকে ভুলি নাই। আমার রাধারাণী।”
রাধারাণী বলিল, “হোক আপনারই রাধারাণী।”
রুক্মিণী বলিতে লাগিলেন, “সেই ক্ষুদ্র আশায় আমি কামাখ্যা বাবুর জ্যৈষ্ঠ পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাধারাণী কে? কামাখ্যা বাবুর পুত্র সবিস্তারে পরিচয় দিতে বোধ হয় অনিচ্ছুক ছিলেন; কেবল বলিলেন, ‘আমাদিগের কোন আত্মীয়ার কন্যা।’ যেখানে তাঁহাকে অনিচ্ছুক দেখিলাম, সেখানে আর অধিক পীড়াপীড়ি করিলাম না, কেবল জিজ্ঞাসা করিলাম রাধারাণী কেন রুক্মিণীকুমারের সন্ধান করিয়াছিলেন, শুনিতে পাই কি ? যদি প্রয়োজন হয় ত বোধ করি, আমি কিছু সন্ধান দিতে পারি। আমি এই কথা বলিলে, তিনি বলিলেন, ‘কেন রাধারাণী রুক্মিণীকুমারকে খুঁজিয়াছিলেন, তাহা আমি সবিশেষ জানি না; আমার পিতৃঠাকুর জানিতেন; বোধ করি, আমার ভগিনীও জানিতে পারেন। যেখানে আপনি সন্ধান দিতে পারেন বলিতেছেন, সেখানে আমার ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতে হইতেছে।’ এই বলিয়া তিনি উঠিলেন। প্রত্যাগমন করিয়া তিনি আমাকে যে পত্র দিলেন, সে পত্র আপনাকে দিয়াছি। তিনি আমাকে সেই পত্র দিয়া বলিলেন, আমার ভগিনী সবিশেষ কিছু ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বলিলেন না, কেবল এই পত্র দিলেন, আর বলিলেন যে, এই পত্র লইয়া তাঁহাকে স্বয়ং রাজপুরে যাইতে বলুন। রাজপুরে যিনি অন্নসত্র দিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে বলিবেন। আমি সেই পত্র লইয়া আপনার কাছে আসিয়াছি। কোন অপরাধ করিয়াছি কি ?”
রাধারাণী বলিল, “জানি না। বোধ হয় যে, আপনি মহাভ্রমে পতিত হইয়া এখানে আসিয়াছেন। আপনার রাধারাণী কে, তাহা আমি চিনি না, বলিতে পারিতেছি না। সে রাধারাণীর কথা কি, শুনিলে বলিতে পারি, আমা হইতে তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যাইবে কি না।”
রুক্মিণী সেই রথের কথা সবিস্তারে বলিলেন, কেবল নিজদত্ত অর্থ বস্ত্রের কথা কিছু বলিলেন না। রাধারাণী বলিলেন, “স্পষ্ট কথা মার্জ্জনা করিবেন। আপনাকে রাধারাণীর কোন কথা বলিতে সাহস হয় না; কেন না, আপনাকে দয়ালূ লোক বোধ হইতেছে না। যদি আপনি সেরূপ দয়ার্দ্রচিত্ত হইতেন, তাহা হইলে আপনি যে ভিখারী বালিকার কথা বলিলেন, তাহাকে অমন দুর্দ্দশাপন্ন দেখিয়া অবশ্য তার কিছু আনুকূল্য করিতেন। কই, আনুকূল্য করার কথা ত কিছু আপনি বলিলেন না ?’
রুক্মিণীকুমার বলিলেন, “আনুকূল্য বিশেষ কিছুই করিতে পারি নাই। আমি সে দিন নৌকাপথে রথ দেখিতে আসিয়াছিলাম–পাছে কেহ জানিতে পারে, এই জন্য ছদ্মবেশে রুক্মিণীকুমার রায় পরিচয়ে লুকাইয়া আসিয়াছিলাম–অপরাহ্নে ঝড় বৃষ্টি হওয়ায় বোটে থাকিতে সাহস না করিয়া একা তটে উঠিয়া আসিয়াছিলাম। সঙ্গে যাহা অল্প ছিল, তাহা রাধারাণীকেই দিয়াছিলাম; কিন্তু সে অতি সামান্য। পরদিন প্রাতে আসিয়া উহাদিগের বিশেষ সংবাদ লইব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু সেই রাত্রে আমার পিতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া তখনই আমাকে কাশী যাইতে হইল। পিতা অনেক দিন রুগ্ন হইয়া রহিলেন, কাশী হইতে প্রত্যাগমণ করিতে আমার বৎসরাধিক বিলম্ব হইল। বৎসর পরে আমি ফিরিয়া আসিয়া আবার সেই কুটীরের সন্ধান করিলাম–কিন্তু তাহাদিগকে আর সেখানে দেখিলাম না।”
রা। একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছে। বোধ হয়, সে রথের দিন নিরাশ্রয়ে, বৃষ্টি বাদলে, আপনাকে সেই কুটীরেই আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। আপনি কতক্ষণ সেখানে অবস্থিতি করিলেন ?”

রু। অধিকক্ষণ নহে। আমি যাহা রাধারাণীর হাতে দিয়াছিলাম, তাহা দেখিবার জন্য রাধারাণী আলো জ্বালিতে গেল–আমি সেই অবসরে তাহার বস্ত্র কিনিতে চলিয়া আসিলাম।

রাধা। আর কি দিয়া আসিলেন?

রু। আর কি দিব? একখানি ক্ষুদ্র নোট ছিল, তাহা কুটীরে রাখিয়া আসিলাম।

রা। নোটখানি ওরূপে দেওয়া বিবেচনাসিদ্ধ হয় নাই–তাহারা মনে করিতে পারে, আপনি নোটখানি হারাইয়া গিয়াছেন।

রু। না, আমি পেন্‌সিলে লেখিয়া দিয়াছিলাম, "রাধারাণীর জন্য।" তাহাতে নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলাম, "রুক্মিণীকুমার রায়।" যদি সেই রুক্মিণীকুমারকে সেই রাধারাণী অন্বেষণ করিয়া থাকে, এই ভরসায় বিজ্ঞাপনটি তুলিয়া রাখিয়াছিলাম।

রাধা। তাই বলিতেছিলাম, আপনাকে দয়ার্দ্রচিত্ত বলিয়া বোধ হয় না। যে রাধারাণী আপনার শ্রীচরণ দর্শন জন্য–এইটুকু বলিতেই–আ ছি ছি রাধারাণী! ফুলের কুঁড়ির ভিতর যেমন বৃষ্টির জল ভরা থাকে, ফুলটি নীচু করিলেই ঝরঝর করিয়া পড়িয়া যায়, রাধারাণী মুখ নত করিয়া এইটুকু বলিতেই, তাহার চোখের জল ঝরঝর করিয়া পড়িতে লাগিল। অমনই যে দিকে রুক্মিণীকুমার ছিলেন, সেই দিকের মাথার কাপড়টা বেশী করিয়া টানিয়া দিয়া সে ঘর হইতে রাধারাণী বাহির হইয়া গেল। রুক্মিণীকুমার বোধ হয়, চক্ষের জলটুকু দেখিতে পান নাই, কি পাইয়াই থাকিবেন, বলা যায় না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বাহিরে আসিয়া, মুখে চক্ষে জল দিয়া অশ্রুচিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া রাধারাণী ভাবিতে লাগিল। ভাবিল, "ইনিই ত রুক্মিণীকুমার। আমিও সেই রাধারাণী। দুই জনে দুই জনের জন্য মন তুলিয়া রাখিয়াছি। এখন উপায়? আমি যে রাধারাণী, তা উঁহাকে বিশ্বাস করাইতে পারি–তার পর? উনি কি জাতি, তা কে জানে। জাতিটা এখনই জানিতে পারা যায়। কিন্তু উনি যদি আমার জাতি না হন। তবে ধর্ম্মবন্ধন ঘটিবে না, চিরন্তনের যে বন্ধন, তাহা ঘটিবে না। প্রাণের বন্ধন ঘটিবে না। তবে আর উঁহার সঙ্গে কথায় কাজ কি? না হয় এ জন্মটা রুক্মিণীকুমার নাম জপ করিয়া কাটাইব। এত দিন সেই জপ করিয়া কাটাইয়াছি, জোয়ারের প্রথম বেগটা কাটিয়া গিয়াছে–বাকি কাল কাটিবে না কি?"

এই ভাবিতে ভাবিতে রাধারাণীর আবার নাকের পাটা ফাঁপিয়া উঠিল, ঠোঁট দুখানা ফুলিয়া উঠিল–আবার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। আবার সে জল দিয়া মুখ চোখ ধুইয়া টোয়ালিয়া দিয়া মুছিয়া ঠিক হইয়া আসিল। রাধারাণী আবার ভাবিতে লাগিল–"আচ্ছা! যদি আমার জাতিই হন, তা হলেই বা ভরসা কি? উনি ত দেখিতেছি বয়ঃপ্রাপ্ত–কুমার, এমন সম্ভাবনা কি? তা হলেনই বা বিবাহিত? না! না! তা হবে না। নাম জপ করিয়া মরি, সে অনেক ভাল–সতীন সহিতে পারিব না।"

"তবে এখন কর্ত্তব্য কি? জাতির কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়াই কি হইবে? তবে রাধারাণীর পরিচয়টা দিই। আর উনি কে, তাহা জানিয়া লই; কেন না, রুক্মিণীকুমার ত ওঁর নাম নয়–তা ত শুনিলাম। যে নাম জপ করিয়া মরিতে হইবে, তা শুনিয়া লই। তার পর বিদায় দিয়া কাঁদিতে বসি। আ পোড়ারমুখী বসন্ত! না বুঝিয়া, না জানিয়া এ সামগ্রী কেন পাঠাইলি? জানিস্ না কি, এ জীবনসমুদ্র অমন করিযা মন্থন করিতে গেলে, কাহারও কপালে অমৃত, কাহারও কপালে

গরল উঠে!”

“আচ্ছা! পরিচয়টা ত দিই।” এই ভাবিয়া রাধারাণী, যাহা প্রাণের অধিক যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছিল, তাহা বাহির করিয়া আনিল। সে সেই নোটখানি। বলিয়াছি, রাধারাণী তাহা তুলিয়া রাখিয়াছিল। রাধারাণী তাহা আঁচলে বাঁধিল। বাঁধিতে বাঁধিতে ভাবিতে লাগিল–

“আচ্ছা, যদি মনের বাসনা পূরিবার মতনই হয়? তবে শেষ কথাটা কে বলিবে?” এই ভাবিয়া রাধারাণী আপনা আপনি হাসিয়া কুটপাট হইল। “আ, ছি–ছি–ছি! তা ত আমি পারিব না। বসন্তকে যদি আনাইতাম! ভাল, উঁহাকে এখন দুদিন বসাইয়া রাখিয়া বসন্তকে আনাইতে পারিব না? উনি না হয় সে দুই দিন আমার লাইব্রেরী হইতে বহি পড়ুন না! পড়া শুনা করেন না কি? ওঁরই জন্য ত লাইব্রেরী করিয়া রাখিয়াছি। তা যদি দুই দিন থাকিতে রাজি না হন? উঁহার যদি কাজ থাকে? তবে কি হবে? ওঁতে আমাতেই সে কথাটা কি হবে? ক্ষতি কি, ইংরেজের মেয়ের কি হয়? আমাদের দেশে তাতে নিন্দা আছে, তা আমি দেশের লোকের নিন্দার ভয়ে কোন্ কাজটাই করি? এই যে ঊনিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত আমি বিয়ে কর্‌লেম না, এতে কে না জি বলে? আমি ত বুড়া বয়স পর্য্যন্ত কুমারী;–তা এ কাজটাও না হয় ইংরেজের মেয়ের মত হইল।”

তার পর রাধারাণী বিষণ্ন মনে ভাবিল, “তা যেন হলো; তাতেও বড় গোল! মমবাতিতে গড়া মেয়েদের মাঝখানে প্রথাটা এই যে, পুরুষ মানুষেই কথাটা পাড়িবে। ইনি যদি কথাটা না পাড়েন? না পাড়েন, তবে–তবে হে ভগবান্! বলিয়া দাও, কি করিব! লজ্জাও তুমি গড়িয়াছ–যে আগুনে আমি পুড়িতেছি, তাহাও তুমি গড়িয়াছ! এ আগুনে সে লজ্জা কি পুড়িবে না? তুমি এই সহায়হীনা, অনাথাকে দয়া করিয়া, পবিত্রতার আবরণে আমাকে আবৃত করিয়া লজ্জার আবরণ কাড়িয়া লও। তোমার কৃপায় যেন আমি এক দণ্ডের জন্য মুখরা হই!”

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভগবান্ বুঝি, সে কথাও শুনিলেন। বিশুদ্ধচিত্তে যাহা বলিবে, তাহাই বুঝি তিনি শুনেন। রাধারাণী মৃদু হাসি হাসিতে হাসিতে, গজেন্দ্রগমনে রুক্মিণীকুমারের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রুক্মিণীকুমার তখন বলিলেন, “আপনি আমাকে বিদায় দিয়াও যান নাই, আমি যে কথা জানিবার জন্য আসিয়াছি, তাহাও জানিতে পারি নাই। তাই এখনও যাই নাই।”

রাধা। আপনি রাধারাণীর জন্য আসিয়াছেন, তাহা আমারও মনে আছে। এ বাড়ীতে একজন রাধারাণী আছে, সত্য বটে। সে আপনার নিকট পরিচিত হইবে কি না, সেই কথাটা ঠিক করিতে গিয়াছিলাম।

রু। তার পর?

রাধারাণী তখন অল্প একটু হাসিয়া, একবার আপনার পার দিকে চাহিয়া, আপনার হাতের অলঙ্কার খুঁটিয়া, সেই ঘরে বসান একটা প্রস্তরনির্ম্মিত ধমঠণ প্রতিকৃতি পানে চাহিয়া রুক্মিণীকুমারের পানে না চাহিয়া বলিল–“আপনি বলিয়াছেন, রুক্মিণীকুমার আপনার যথার্থ নাম নহে। রাধারাণীর যে আরাধ্য দেবতা, তাহার নাম পর্য্যন্ত এখনও সে শুনিতে পায় নাই।”

রুক্মিণীকুমার বলিলেন, “আরাধ্য দেবতা! কে বলিল?”

রাধারাণী কথাটা অনবধানে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, এখন সামলাইতে গিয়া বলিয়া ফেলিলেন, “নাম ঐরূপে জিজ্ঞাসা করিতে হয়।”
কি বোকা মেয়ে।
রুক্মিণীকুমার বলিলেন, “আমার নাম দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়।”
রাধারাণী গুপ্তভাবে দুই হাত যুক্ত করিয়া মনে মনে ডাকিল, “জয় জগদীশ্বর! তোমার কৃপা অনন্ত।” প্রকাশ্যে বলিল, “রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণের নাম শুনিয়াছি।”
দেবেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, “অমন সকলেই রাজা কব্‌লায়। আমাকে যে কুমার বলে, সে যথেষ্ট সম্মান করে।”
রা। এক্ষণে আমার সাহস বাড়িল জানিলাম যে, আপনি আমায় স্বজাতি। এখন স্পর্দ্ধা হইতেছে, আজি আপনাকে আমার আতিথ্য স্বীকার করাই।
দেবেন্দ্র। সে কথা পরে হবে। রাধারাণী কৈ?
রা। ভোজনের পর সে কথা বলিব।
দে। মনে দুঃখ থাকিলে ভোজনে তৃপ্তি হয় না।
রা। রাধারাণীর জন্য এত দুঃখ? কেন?
দে। তা জানি না, বড় দুঃখ–আট বৎসরের দুঃখ, তাই জানি!
রা। হঠাৎ রাধারাণীর পরিচয় দিতে আমার কিছু সঙ্কোচ হইতেছে। আপনি রাধারাণীকে পাইলে কি করিবেন?
দে। কি আর করিব? একবার দেখিব।
রা। একবার দেখিবার জন্য এই আট বৎসর এত কাতর?
দে। রকম রকমের মানুষ থাকে।
রা। আচ্ছা, আমি ভোজনের পরে আপনাকে আপনার রাধারাণী দেখাইব। ঐ বড় আয়না দেখিতেছেন; উহার ভিতর দেখাইব। চাক্ষুষ দেখিতে পাইবেন না।
দে। চাক্ষুস সাক্ষাতেই বা কি আপত্তি? আমি যে আট বৎসর কাতর!
ভিতরে ভিতরে দুই জনে দুই জনকে বুঝিতেছেন কি না জানি না, কিন্তু কথাবর্ত্তা এইরূপ হইতে লাগিল। রাধারাণী বলিতে লাগিল, “সে কথাটায় তত বিশ্বাস হয় না। আপনি আট বৎসর পূর্ব্বে তাহাকে দেখিয়াছিলেন, তখন তাহার বয়স কত?”
দে। এগার হইবে।
রা। এগার বৎসরের বালিকার উপর এত অনুরাগ?
দে। হয় না কি?
রা। কখনও শুনি নাই।
দে। তবে মনে করুন কৌতূহল!
রা। সে আবার কি?
দে। শুধুই দেখিবার ইচ্ছা।

রা। তা, দেখাইব, ঐ বড় আয়নার ভিতর। আপনি বাহিরে থাকিবেন।

দে। কেন, সম্মুখ সাক্ষাতে আপত্তি কি ?

রা। সে কুলের কুলবতী।

দে। আপনিও ত তাই।

রা। আমার কিছু বিষয় আছে। নিজে তাহার তত্ত্বাবধান করি। সুতরাং সকলের সমুখেই আমাকে বাহির হইতে হয়। আমি কাহারও অধীন নই। সে তাহার স্বামীর অধীন, স্বামীর অনুমতি ব্যতীত–

দে। স্বামী ?

রা। হাঁ! আশ্চর্য্য হইলেন যে ?

দে। বিবাহিতা !

রা। হিন্দুর মেয়ে–উনিশ বৎসর বয়স–বিবাহিতা নহে ?

দেবেন্দ্রনারায়ণ অনেকক্ষণ মাথায় হাত দিয়া রহিলেন। রাধারাণী বলিলেন, "কেন, আপনি কি তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন ?"

দে। মানুষ কি না ইচ্ছা করে ?

রা। এরূপ ইচ্ছা রাণীজি জানিতে পারিয়াছেন কি ?

দে। রাণীজি কেহ ইহার ভিতর নাই। রাধারাণী-সাক্ষাতের অনেক পুর্ব্বেই আমার পত্নী বিয়োগ হইয়াছে।

রাধারাণী আবার যুক্তকরে ডাকিল, "জয় জগদীশ্বর! আর ক্ষণকাল যেন আমার এমনই সাহস থাকে।" প্রকাশ্যে বলিল, "তা শুনিলেন ত, রাধারাণী পরস্ত্রী। এখনও কি তাহার দর্শন অভিলাষ করেন ?"

দে। করি বৈ কি।

রা। সে কথাটা কি আপনার যোগ্য ?

দে। রাধারাণী আমার সন্ধান করিয়াছিল কেন, তাহা এখনও আমার জানা হয় নাই।

রা। আপনি রাধারাণীকে যাহা দিয়াছিলেন, তাহা পরিশোধ করিবে বলিয়া। আপনি শোধ লইবেন কি ?

দেবেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "যা দিয়াছি, তাহা পাইলে লইতে পারি।"

রা। কি কি দিয়াছেন ?

দে। একখানা নোট।

রা। এই নিন।

বলিয়া রাধারাণী আঁচল হইতে সেই নোটখানি খুলিয়া দেবেন্দ্রনারায়ণের হাতে দিলেন। দেবেন্দ্রনারায়ণ দেখিলেন, তাঁহার হাতে লেখা রাধারাণীর নাম সে নোটে আছে। দেখিয়া বলিলেন, "এ নোট কি রাধারাণীর স্বামী কখনও দেখিয়াছেন ?"

রা। রাধারাণী কুমারী। স্বামীর কথাটা আপনাকে মিথ্যা বলিয়াছিলাম।
দে। তা, সব ত শোধ হইলে না।
রা। আর কি বাকি ?
দে। দুইটা টাকা, আর কাপড়।
রা। সব ঋণ যদি এখন পরিশোধ হয়, তবে আপনি আহার না করিয়া চলিয়া যাইবেন। পাওয়া বুঝিয়া পাইলে কোন্ মহাজন বসে ? ঋণের সে অংশ ভোজনের পর রাধারাণী পরিশোধ করিবে।
দে। আমার যে এখনও অনেক পাওনা বাকি।
রা। আবার কি ?
দে। রাধারাণীকে মনঃপ্রাণ দিয়াছি–তা ত পাই নাই।
রা। অনেক দিন পাইয়াছেন। রাধারাণীর মনঃপ্রাণ আপনি অনেক দিন লইয়াছেন–তা সে দেনাটা শোধ-বোধ গিয়াছে।
দে। সুদ কিছু পাই না ?
রা। পাইবেন বৈ কি।
দে। কি পাইব ?
রা। শুভ লগ্নে সুতহিবুক যোগে এই অধম নারীদেহ আপনাকে দিয়া, রাধারাণী ঋণ হইতে মুক্ত হইবে। এই বলিয়া রাধারাণী ঘর হইতে বাহির গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রাধারাণীর আজ্ঞা পাইয়া, দেওয়ানজি আসিয়া রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণকে বহির্ব্বাটীতে লইয়া গিয়া যথেষ্ট সমাদর করিলেন। যথাবিহিত সময়ে রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ ভোজন করিলেন। রাধারাণী স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইলেন। ভোজনান্তে রাধারাণী বলিলেন, “আপনার নগদ দুইটা টাকা ও কাপড় এখনও ধারি। কাপড় পরিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি; টাকা খরচ করিয়াছি। তাহা আর ফেরত দিবার যো নাই। তাহার বদলে যাহা আপনার জন্য রাখিয়াছি, তাহা গ্রহণ করুন।”
এই বলিয়া রাধারাণী বহুমূল্য হীরকহার বাহির করিয়া দেবেন্দ্রের গলায় পরাইয়া দিতে গেলেন। দেবেন্দ্রনারায়ণ নিষেধ করিয়া বলিলেন, “যদি ঐরূপে দেনা পরিশোধ করিবে, তবে তোমার গলায় যে ছড়া আছে, তাহাই লইব।”
রাধারাণী হাসিতে হাসিতে আপনার গলায় হার খুলিয়া দেবেন্দ্রনারায়ণের গলায় পরাইল। তখন দেবেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, “সব শোধ হইল–কিন্তু আমি একটু ঋণী রহিলাম।”
রাধা। কিসে ?
দে। সেই দুই পয়সার ফুলের মালার মূল্য ত ফেরত পাইলাম। তবে এখন মালা ফেরত দিতে আমি বাধ্য।

রাধারাণী হাসিল।
দেবেন্দ্রনারায়ণ ইচ্ছাপূর্ব্বক মুক্তাহার পরিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা রাধারাণীর কণ্ঠে পরাইয়া দিয়া বলিলেন, "এই ফেরত দিলাম।"
এমন সময়ে পোঁ করিয়া শাঁক বাজিল।
রাধারাণী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "শাঁক বাজাইল কে ?"
তাঁহার একজন দাসী, চিত্রা, উত্তর করিল, "আজ্ঞে, আমি।"
রাধারাণী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বাজাইলি ?"
চিত্রা বলিল, "কিছু পাইব বলিয়া।"
বলা বাহুল্য যে, চিত্রা পুরস্কৃত হইল। কিন্তু তাহার কথাটা মিথ্যা। রাধারাণী তাহাকে শিখাইয়া পড়াইয়া দ্বারের নিকট বসাইয়া আসিয়াছিল।
তার পরে দুই জনে বিরলে বসিয়া মনের কথা হইল। রাধারাণী দেবেন্দ্রনারায়ণের বিস্ময় দূর করিবার জন্য, সেই রথের দিনের সাক্ষাতের পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার পিতামহের বিষয়সম্পত্তির কথা, পিতামহের উইল লইয়া মোকদ্দমার কথা, তজ্জন্য রাধারাণীর মার দৈন্যের কথা, মার মৃত্যুর কথা, কামাখ্যা বাবুর আশ্রয়ের কথা, প্রিবি কৌন্সিলের ডিক্রীর কথা, কামাখ্যা বাবুর মৃত্যুর কথা, সব বলিল। বসন্তের কথা বলিল, আপনার বিজ্ঞাপনের কথা বলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে হাসিতে হাসিতে, বৃষ্টি বিদ্যুতে, চাতকী চিরসঞ্চিত প্রণয়সম্ভাষণপিপাসা পরিতৃপ্ত করিল। নিদাঘসন্তপ্ত পর্ব্বত যেমন বর্ষার বারিধারা পাইয়া শীতল হয়, দেবেন্দ্রনারায়ণও তেমনি শীতল হইলেন।
তিনি রাধারাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ত কেহ নাই। কিন্তু এ বাড়ী বড় জনাকীর্ণ দেখিতেছি।"
রাধারাণী বলিল, "দুঃখের দিনে আমার কেহ ছিল না। এখন আমার অনেক আত্মীয় কুটম্ব জুটিয়াছে। আমি এ অল্প বয়সে একা থাকিতে পারি না, এজন্য যত্ন করিয়া তাহাদিগকে স্থান দিয়া রাখিয়াছি।"
দে। তাঁহাদের মধ্যে এমন সম্বন্ধবিশিষ্ট কেহ আছে যে, তোমাকে এই দীন দরিদ্রকে দান করিতে পারে?
রা। তাও আছে।
দে। তবে তিনি কেন সেই শুভলগ্নযুক্ত সুতহিবুক যোগটা খুঁজুন না ?
রা। বোধ করি, এতক্ষণ সে কাজটা হইয়া গেল। তোমার সঙ্গে রাধারাণীর এরূপ সাক্ষাৎ অন্য কোন কারণে হইতে পারে না, এ পুরীতে সকলেই জানে। সংবাদ লইব কি ?
দে। বিলম্বে কাজ কি ?
রাধারাণী ডাকিল, "চিত্রে!" চিত্রা আসিল। রাধারাণী জিজ্ঞাসা করিল, "দিন টিন কিছু হইল কি ?"
চিত্রা বলিল, "হাঁ, দেওয়ানজি মহাশয় পুরোহিত মহাশয়কে ডাকাইয়াছিলেন। পুরোহিত পর দিন বিবাহের উত্তম দিন বলিয়া গিয়াছেন। দেওয়ানজি মহাশয় সমস্ত উদ্যোগ করিতেছেন।"
তখন বসন্ত আসিল, কামাখ্যা বাবুর পুত্রেরা এবং পরিবারবর্গ সকলেই আসিল, আর যত বসন্তের কোকিল, সময়ের বন্ধু, যে যেখানে ছিল, সকলেই আসিল।

দেবেন্দ্রনারায়ণের বন্ধু ও অনুচর-বর্গ সকলেই আসিল।

বসন্ত আসিলে রাধারাণী বলিল, "তোমার কি আক্কেল ভাই বসন্ত ?" বসন্ত বলিল, "কি আক্কেল ভাই রাধারাণী ?"

রা। যাকে তাকে তুমি পত্র দিয়া পাঠাইয়া দাও কেন ?

বসন্ত। কেন, লোকটা কি করেছে বল দেখি ?

রাধারাণী তখন সকল বলিল। বসন্ত বলিল, "রাগের কথা ত বটে। সুদ শুদ্ধ দেনা পাওয়া বুঝিয়া নেয়, এমন মহাজনকে যে বাড়ী চিনাইয়া দেয়, তার উপর রাগের কথাটা বটে।"

রাধারাণী বলিল, "তাই আজ আমি তোর গলায় দড়ি দিব!"

এই বলিয়া রাধারাণী যে হীরকহার রুক্মিণীকুমারকে পরাইতে গিয়াছিলেন, তাহা আনিয়া বসন্তের গলায় পরাইয়া দিলেন।

তার পর শুভ লগ্নে শুভ বিবাহ হইয়া গেল।

রজনী

প্রথম খণ্ড

রজনীর কথা

প্রথম পরিচ্ছেদ

তোমাদের সুখদুঃখে আমার সুখদুঃখ পরিমিত হইতে পারে না। তোমরা আর আমি ভিন্নপ্রকৃতি। আমার সুখে তোমরা সুখী হইতে পারিবে না–আমার দুঃখ তোমরা বুঝিবে না–আমি একটি ক্ষুদ্র যূথিকার গন্ধে সুখী হইব; আর ষোলকলা শশী আমার লোচনাগ্রে সহস্র নক্ষত্রমণ্ডলমধ্যস্থ হইয়া বিকসিত হইলেও আমি সুখী হইব না–আমার উপাখ্যান কি তোমরা মন দিয়া শুনিবে? আমি জন্মান্ধ।

কি প্রকারে বুঝিবে? তোমাদের জীবন দৃষ্টিময়–আমার জীবন অন্ধকার–দুঃখ এই, আমি ইহা অন্ধকার বলিয়া জানি না। আমার এ রুদ্ধ নয়নে, তাই আলো! না জানি তোমাদের আলো কেমন!

তাই বলিয়া কি আমার সুখ নাই ? তাহা নহে। সুখ দুঃখ তোমার আমার প্রায় সমান। তুমি রূপ দেখিয়া সুখী, আমি শব্দ শুনিয়াই সুখী। দেখ, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যূথিকাসকলের বৃন্তগুলি কত সূক্ষ্ম, আর আমার এই করস্থ সূচিকাগ্রভাগ আরও কত সূক্ষ্ম! আমি এই সূচিকাগ্রে সেই ক্ষুদ্র পুষ্পবৃন্ত সকল বিদ্ধ করিয়া মালা গাঁথি–আশৈশব মালাই গাঁথিয়াছি–কেহ কখন আমার গাঁথা মালা পরিয়া বলে নাই যে, কাণায় মালা গাঁথিয়াছে।

আমি মালাই গাঁথিতাম। বালিগঞ্জের প্রান্তভাগে আমার পিতার একখানি পুষ্পোদ্যান জমা ছিল–তাহাই তাঁহার উপজীবিকা ছিল। ফাল্গুন মাস হইতে যত দিন ফুল ফুটিত, তত দিন পর্য্যন্ত পিতা প্রত্যহ তথা হইতে পুষ্পচয়ন করিয়া আনিয়া দিতেন, আমি মালা গাঁথিয়া দিতাম। পিতা তাহা লইয়া মহানগরীর পথে পথে বিক্রয় করিতেন। মাতা গৃহকর্ম্ম করিতেন। অবকাশমতে পিতামাতা উভয়েই আমার মালা গাঁথার সহায়তা করিতেন।

ফুলের স্পর্শ বড় সুন্দর–পরিতে বুঝি বড় সুন্দর হইবে–ঘ্রাণে পরম সুন্দর বটে। কিন্তু ফুল গাঁথিয়া দিন চলে না। অন্নের বৃক্ষের ফুল নাই। সুতরাং পিতা নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন। মৃজাপুরে একখানি সামান্য খাপরেলের ঘরে বাস করিতেন। তাহারই এক প্রান্তে, ফুল বিছাইয়া, ফুল স্তূপাকৃত করিয়া, ফুল ছড়াইয়া, আমি ফুল গাঁথিতাম। পিতা বাহির হইয়া গেলে গান গাইতাম–

আমার এত সাধের প্রভাতে সই, ফুটলো নাকো কলি–

ও হরি–এখনও আমার বলা হয় নাই, আমি পুরুষ কি মেয়ে! তবে, এতক্ষণে যিনি না বুঝিয়াছেন, তাঁহাকে না বলাই ভাল। আমি এখন বলিব না।

পুরুষই হই, মেয়েই হই, অন্ধের বিবাহের বড় গোল। কাণা বলিয়া আমার বিবাহ হইল না। সেটা দুর্ভাগ্য, কি সৌভাগ্য, যে চোখের মাথা না খাইয়াছে, সেই বুঝিবে। অনেক, অপাঙ্গ-রঙ্গরঙ্গিণী, আমার চিরকৌমার্য্যের কথা শুনিয়া বলিয়া গিয়াছে, "আহা, আমিও যদি কাণা হইতাম!"

বিবাহ না হউক–তাতে আমার দুঃখ ছিল না। আমি স্বয়ম্বরা হইয়াছিলাম। একদিন পিতার কাছে কলিকাতার বর্ণনা শুনিতেছিলাম। শুনিলাম, মনুমেণ্ট বড় ভারি ব্যাপার। অতি উঁচু, অটল, অচল, ঝড়ে ভাঙ্গে না, গলায় চেন–একা একাই বাবু। মনে মনে মনুমেণ্টকে বিবাহ করিলাম। আমার স্বামীর চেয়ে বড় কে? আমি মনুমেণ্টমনিষী।

কেবল একটা বিবাহ নহে। যখন মনুমেণ্টকে বিবাহ করি, তখন আমার বয়স পনের বৎসর। সতের বৎসর বয়সে, বলিতে লজ্জা করে, সধবাবস্থাতেই–আর একটা বিবাহ ঘটিয়া গেল। আমাদের বাড়ীর কাছে, কালীচরণ বসু নামে একজন কায়স্থ ছিল। চীনাবাজারে তাহার একখানি খেলানার দোকান ছিল। সে কায়স্থ–আমরা কায়স্থ–এজন্য একটু আত্মীয়তা হইয়াছিল। কালীবসুর একটি চারি বৎসরের শিশুপুত্র ছিল। তাহার নাম বামাচরণ। বামাচরণ সর্ব্বদা আমাদের বাড়ীতে আসিত। একদিন একটা বর বাজনা বাজাইয়া মন্দগামী ঝড়ের মত আমাদিগের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যায়। দেখিয়া বামাচরণ জিজ্ঞাসা করিল, "ও কেও?"

আমি বলিলাম, "ও বর।" বামাচরণ তখন কান্না আরম্ভ করিল–"আমি বল হব।"

তাহাকে কিছুতেই থামাইতে না পারিয়া বলিলাম। "কাঁদিস না–তুই আমার বর।" এই বলিয়া একটা সন্দেশ তাহার হাতে দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেমন, তুই আমার বর হবি?" শিশু সন্দেশ হাতে পাইয়া, রোদন সম্বরণ করিয়া বলিল, "হব।"

সন্দেশ সমাপ্ত হইলে, বালক ক্ষণেক কাল পরে বলিল, "হাঁ গা, বলে কি কলে গা?" বোধ হয়, তাহার ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, বরে বুঝি কেবল সন্দেশই খায়। যদি তা হয়, তবে সে আর একটা আরম্ভ করিতে প্রস্তুত। ভাব বুঝিয়া আমি বলিলাম, "বরে ফুলগুলি গুছিয়ে দেয়।" বামাচরণ স্বামীর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুঝিয়া লইয়া, ফুলগুলি আমার হাতে গুছাইয়া তুলিয়া দিতে লাগিল। সেই অবধি আমি তাহাকে বর বলি–সে আমাকে ফুল গুছাইয়া দেয়।

আমার এই দুই বিবাহ–এখন এ কালের জটিলা কুটিলাদিগকে আমার জিজ্ঞাস্য–আমি সতী বলাইতে পারি কি?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বড়বাড়ীতে ফুল যোগান বড় দায়। সে কালের মালিনী মাসী রাজবাটীতে ফুল যোগাইয়া মশানে গিয়াছিল। ফুলের মধু খেলে বিদ্যাসুন্দর, কিল খেলে হীরা মালিনী–কেন না, সে বড়বাড়ীতে ফুল যোগাইত। সুন্দরের সেই রামরাজ্য হইল–কিন্তু মালিনীর কিল আর ফিরিল না।

বাবা ত "বেলফুল" হাঁকিয়া, রসিক মহলে ফুল বেচিতেন, মা দুই একটা অরসিক মহলে ফুল নিত্য যোগাইতেন। তাহার মধ্যে রামসদয় মিত্রের বাড়ীই প্রধান। রামসদয় মিত্রের সাড়ে চারিটা ঘোড়া ছিল। –(নাতিদের একটা পণি, আর আদত চারিটা) সাড়ে চারিটা ঘোড়া–আর দেড়খানা গৃহিণী। একজন আদত–একজন চিররুগ্না এবং প্রাচীনা। তাঁহার নাম ভুবনেশ্বরী–কিন্তু তাঁর গলার সাঁই সাঁই শব্দ শুনিয়া রামমণি ভিন্ন অন্য নাম আমার মনে আসিত না!

আর যিনি পুরা একখানি গৃহিণী, তাঁহার নাম লবঙ্গলতা। লবঙ্গলতা লোকে বলিত, কিন্তু তাঁহার পিতা নাম রাখিয়াছিলেন ললিতালবঙ্গলতা, এবং রামসদয় বাবু আদর করিয়া বলিতেন–ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে। রামসদয় বাবু প্রাচীন, বয়ঃক্রম ৬৩ বৎসর ললিতলবঙ্গলতা নবীনা, বয়স ১৯

বৎসর, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী—আদরের আদরিণী, গৌরবের গৌরবিণী, মানের মানিনী, নয়নের মণি, ষোলআনা গৃহিণী। তিনি রামসদয়ের সিন্দুকের চাবি, বিছানার চাদর, পানের চূণ, গেলাসের জল। তিনি রামসদয়ের জ্বরে কুইনাইন, কাসিতে ইপিকা, বাতে ফ্লানেল এবং আরোগ্যে সুরুয়া।

নয়ন নাই—ললিতা-লবঙ্গ-লতাকে কখন দেখিতে পাইলাম না—কিন্তু শুনিয়াছি, তিনি রূপসী। রূপ যাউক, গুণ শুনিয়াছি। লবঙ্গ বাস্তবিক গুণবতী। গৃহকার্য্যে নিপুণা, দানে মুক্তহস্তা, হৃদয়ে সরলা, কেবল বাক্যে বিষময়ী। লবঙ্গলতার অশেষ গুণের মধ্যে, একটি এই যে, তিনি বাস্তবিক পিতামহের তুল্য সেই স্বামীকে ভালবাসিতেন—কোন নবীনা নবীন স্বামীকে সেরূপ ভালবাসেন কি না সন্দেহ। ভালবাসিতেন বলিয়া, তাঁহাকে নবীন সাজাইতেন—সে সজ্জার রস কাহাকে বলি ? আপন হস্তে নিত্য শুভ্র কেশে কলপ মাখাইয়া কেশগুলি রঞ্জিত করিতেন। যদি রামসদয় লজ্জার অনুরোধে কোন দিন মলমলের ধুতি পরিত, স্বহস্তে তাহা ত্যাগ করাইয়া কোকিলপেড়ে, ফিতেপেড়ে, কল্কাপেড়ে পরাইয়া দিতেন—মলমলের ধুতিখানি তৎক্ষণাৎ বিধবা দরিদ্রগণকে বিতরণ করিতেন। রামসদয় প্রাচীন বয়সে, আতরের শিশি দেখিলে ভয়ে পলাইত—লবঙ্গলতা, তাহার নিদ্রিতাবস্থায় সর্ব্বাঙ্গে আতর মাখাইয়া দিতেন। রামসদয়ের চশমাগুলি লবঙ্গ প্রায় চুরি করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিত, সোণাটুকু লইয়া, যাহার কন্যার বিবাহের সম্ভাবনা, তাহাকে দিত। রামসদয়ের নাক ডাকিলে, লবঙ্গ ছয়গাছা মল বাহির করিয়া, পরিয়া ঘরময় ঝম্‌ঝম্ করিয়া, রামসদয়ের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিত।

লবঙ্গলতা আমাদের ফুল কিনিত—চারি আনার ফুল লইয়া দুই টাকা মূল্য দিত। তাহার কারণ, আমি কাণা। মালা পাইলে, লবঙ্গ গালি দিত, বলিত, এমন কদর্য্য মালা আমাকে দিস কেন ? কিন্তু মূল্য দিবার সময় ডবল পয়সার সঙ্গে ভুল করিয়া টাকা দিত। ফিরাইয়া দিতে গেলে বলিত—ও আমার টাকা নয়—দুই বার বলিতে গেলে গালি দিয়া তাড়াইয়া দিত। তাহার দানের কথা মুখে আনিলে মারিতে আসিত। বাস্তবিক, রামসদয় বাবুর ঘর না থাকিলে, আমাদিগের দিনপাত হইত না; তবে যাহা রয় সয়, তাই ভাল বলিয়া, মাতা, লবঙ্গের কাছে অধিক লইতেন না। দিনপাত হইলেই আমরা সন্তুষ্ট থাকিতাম। লবঙ্গলতা আমাদিগের নিকট রাশি রাশি ফুল কিনিয়া রামসদয়কে সাজাইত। সাজাইয়া বলিত—দেখ, রতিপতি। রামসদয় বলিত—দেখ, সাক্ষাৎ—অঞ্জনানন্দন। সেই প্রাচীনে নবীনে মনের মিল ছিল—দর্পণের মত দুই জনে দুই জনের মন দেখিতে পাইত। তাহাদের প্রেমের পদ্ধতিটা এইরূপ—

রামসদয় বলিত, "ললিতলবঙ্গলতাপরিশী—?"

লবঙ্গ। আজ্ঞে ঠাকুরদাদামহাশয়, দাসী হাজির।

রাম। আমি যদি মরি ?

লব। "আমি তোমার বিষয় খাইব।" লবঙ্গ মনে মনে বলিত, "আমি বিষ খাইব।" রামসদয় তাহা মনে মনে জানিত।

লবঙ্গ এত টাকা দিত, তবে বড়বাড়ীতে ফুল যোগান দুঃখ কেন ? শুন।

একদিন মার জ্বর। অন্তঃপুরে বাবা যাইতে পারিবেন না—তবে আমি বৈ আর কে লবঙ্গলতাকে ফুল দিতে যাইবে? আমি লবঙ্গের জন্য ফুল লইয়া চলিলাম। অন্ধ হই, যাই হই—কলিকাতার রাস্তা সকল আমার নখদর্পণে ছিল। বেত্রহস্তে সর্ব্বত্র যাইতে পারিতাম, কখন গাড়ি ঘোড়ার সম্মুখে পড়ি নাই। অনেক বার পদচারীর ঘাড়ে পড়িয়াছি বটে—তাহার কারণ, কেহ কেহ অন্ধ যুবতী দেখিয়া সাড়া দেয় না, বরং বলে, "আ মলো! দেখতে পাস্‌নে ? কাণা না কি ?" আমি ভাবিতাম, "উভয়তঃ।"

ফুল লইয়া গিয়া লবঙ্গের কাছে গেলাম। দেখিয়া লবঙ্গ বলিলেন, "কি লো কাণী—আবার ফুল লইয়া মর্‌তে এয়েছিস্ কেন?" কাণী বলিলে আমার হাড় জ্বলিয়া যাইত—আমি কি কদর্য্য উত্তর দিতে যাইতেছিলাম, এমত সময়ে সেখানে হঠাৎ কাহার পদধ্বনি শুনিলাম—কে আসিল। সে আসিল—বলিল, "এ কে ছোট

মা ?”

ছোট মা! তবে রামসদয়ের পুত্র। রামসদয়ের কোন্ পুত্র ? বড় পুত্রের কণ্ঠ একদিন শুনিয়াছিলাম–সে এমন অমৃতময় নহে–এমন করিয়া কর্ণবিবর ভরিয়া, সুখ ঢালিয়া দেয় নাই। বুঝিলাম, এ ছোট বাবু।

ছোট মা বলিলেন, এবার বড় মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, “ও কাণা ফুলওয়ালী।”

“ফুলওয়ালী! আমি বলি বা কোন ভদ্রলোকের মেয়ে।”

লবঙ্গ বলিলেন, “কেন গা, ফুলওয়ালী হইলে কি ভদ্রলোকের মেয়ে হয় না ?”

ছোট বাবু অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, “হবে না কেন ? এটি ত ভদ্রলোকের মেয়ের মতই বোধ হইতেছে। তা ওটি কাণা হইল কিসে ?”

লবঙ্গ। ও জন্মান্ধ।

ছোট বাবু। দেখি ?

ছোট বাবুর বড় বিদ্যার গৌরব ছিল। তিনি অন্যান্য বিদ্যাও যেরূপ যত্নের সহিত শিক্ষা করিয়াছিলেন, অর্থের প্রত্যাশী না হইয়া চিকিৎসাশাস্ত্রেও সেইরূপ যত্ন করিয়াছিলেন। লোকে রাষ্ট্র করিত যে, শচীন্দ্র বাবু (ছোট বাবু) কেবল দরিদ্রগণের বিনামূল্যে চিকিৎসা করিবার জন্য চিকিৎসা শিখিতেছিলেন। “দেখি” বলিয়া আমাকে বলিলেন, “একবার দাঁড়াও ত গা!”

আমি জড়সড় হইয়া দাঁড়াইলাম।

ছোট বাবু বলিলেন, “আমার দিকে চাও”।

চাব কি ছাই!

“আমার দিকে চোখ ফিরাও!”

কাণা চোখে শব্দভেদী বাণ মরিলাম। ছোট বাবুর মনের মত হইল না। তিনি আমার দাড়ি ধরিয়া, মুখ ফিরাইলেন।

ডাক্তারির কপালে আগুন জ্বেলে দিই। সেই চিবুকস্পর্শে আমি মরিলাম!

সেই স্পর্শ পুষ্পময়। সেই স্পর্শে যূথী, জাতি, মল্লিকা, শেফালিকা, কামিনী, গোলাপ, সেঁউতি–সব ফুলের ঘ্রাণ পাইলাম। বোধ হইল, আমার আশে পাশে ফুল, আমার মাথায় ফুল, আমার পায়ে ফুল, আমার পরণে ফুল, আমার বুকের ভিতর ফুলের রাশি। আ মরি মরি! কোন্ বিধাতা এ কুসুমময় স্পর্শ গড়িয়াছিল! বলিয়াছি ত কাণার সুখ দুঃখ তোমরা বুঝিবে না। আ মরি মরি–সে নবনীত–সুকুমার–পুষ্পগন্ধময় বীণাধ্বনিবৎ স্পর্শ! বীণাধ্বনিবৎ স্পর্শ, যার চোখ আছে, সে বুঝিবে কি প্রকারে? আমার সুখ দুঃখ আমাতেই থাকুক। যখন সেই স্পর্শ মনে পড়িত, তখন কত বীণাধ্বনি কর্ণে শুনিতাম, তাহা তুমি, বিলোলকটাক্ষকুশলিনি! কি বুঝিবে ?

ছোট বাবু বলিলেন, “না এ কাণা সারিবার নয়।”

আমার ত সেই জন্য ঘুম হইতেছিল না।

লবঙ্গ বলিল, “তা না সারুক, টাকা খরচ করিলে কাণার কি বিয়ে হয় না ?

ছোট বাবু। কেন, এর কি বিবাহ হয় নাই ?

লবঙ্গ। না। টাকা খরচ করিলে হয়?

ছোট বাবু। আপনি কি ইহার বিবাহ জন্য টাকা দিবেন?

লবঙ্গ রাগিল। বলিল, "এমন ছেলেও দেখি নাই! আমার কি টাকা রাখিবার জায়গা নাই? বিয়ে কি হয়, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি। মেয়ে মানুষ, সকল কথা ত জানি না। বিবাহ কি হয়?"

ছোট বাবু ছোট মাকে চিনিতেন। হাসিয়া বলিলেন, "তা মা, তুমি টাকা রেখ, আমি সম্বন্ধ করিব।"

মনে মনে ললিতলবঙ্গলতার মুণ্ডপাত করিতে করিতে আমি সে স্থান হইতে পলাইলাম।

তাই বলিতেছিলাম বড় মানুষের বাড়ী ফুল যোগান বড় দায়।

বহুমূর্ত্তিময়ি বসুন্ধরে! তুমি দেখিতে কেমন? তুমি যে অসংখ্যা, অচিন্তনীয় শক্তি ধর, অনন্ত বৈচিত্র্যবিশিষ্ট জড় পদার্থসকল হৃদয়ে ধারণ কর, সে সব দেখিতে কেমন? যাকে যাকে লোকে সুন্দর বলে, সে সব দেখিতে কেমন? তোমার হৃদয়ে যে অসংখ্য, বহুপ্রকৃতিবিশিষ্ট জন্তুগণ বিচরণ করে, তারা সব দেখিতে কেমন? বল মা, তোমার হৃদয়ের সারভূত, পুরুষ জাতি দেখিতে কেমন? দেখাও মা, তাহার মধ্যে, যাহার করস্পর্শে এত সুখ, সে দেখিতে কেমন? দেখা মা, দেখিতে কেমন দেখায়? দেখা কি? দেখা কেমন? দেখিলে কিরূপ সুখ হয়? এক মুহূর্ত্তজন্য এই সুখময় স্পর্শ দেখিতে পাই না? দেখা মা! বাহিরের চক্ষু নিমীলিত থাকে থাকুক মা! আমার হৃদয়ের মধ্যে চক্ষু ফুটাইয়া দে, আমি একবার অন্তরের ভিতর অন্তর লুকাইয়া, মনের সাধে রূপ দেখে, নারীজন্ম সার্থক করি। সবাই দেখে–আমি দেখিব না কেন? বুঝি কীটপতঙ্গ অবধি দেখে–আমি কি অপরাধে দেখিতে পাই না? শুধু দেখা–কারও ক্ষতি নাই, কারও কষ্ট নাই, কারও পাপ নাই, সবাই অবহেলা দেখে–কি দোষে আমি কখনও দেখিব না?

না! না! অদৃষ্টে নাই। হৃদয়মধ্যে খুঁজিলাম। শুধু শব্দ স্পর্শ গন্ধ। আর কিছু পাইলাম না।

আমার অন্তর বিদীর্ণ করিয়া ধ্বনি উঠিতে লাগিল, কে দেখাবি দেখা গো–আমায় রূপ দেখা! বুঝিল না! কেহই অন্ধের দুঃখ বুঝিল না!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সেই অবধি আমি প্রায় প্রত্যহ রামসদয় মিত্রের বাড়ী ফুল বেচিতে যাইতাম। কিন্তু কেন, তাহা জানি না। যাহার নয়ন নাই, তাহার এ যত্ন কেন? সে দেখিতে পাইবে না–কেবল কথার শব্দ শুনিবার ভরসা মাত্র। কেন শচীন্দ্র বাবু আমার কাছে আসিয়া কথা কহিবেন? তিনি থাকেন সদরে–আমি যাই অন্তঃপুরে। যদি তাহার স্ত্রী থাকিত, তবেও বা কখন আসিতেন। কিন্তু বৎসরেক পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছিল–আর বিবাহ করেন নাই। অতএব সে ভরসাও নাই। কদাচিৎ কোন প্রয়োজনে মাতাদিগের নিকটে আসিতেন। আমি যে সময়ে ফুল লইয়া যাইব, তিনিও ঠিক সেই সময়ে আসিবেন, তাহারই বা সম্ভাবনা কি? অতএব যে এক শব্দ শুনিবার মাত্র আশা, তাহাও বড় সফল হইত না। তথাপি অন্ধ প্রত্যহ ফুল লইয়া যাইত। কোন্ দুরাশায় তাহা জানি না। নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিবার সময় প্রত্যহ ভাবিতাম, আমি কেন আসি? প্রত্যহ মনে করিতাম, আর আসিব না। প্রত্যহই সে কল্পনা বৃথা হইত। প্রত্যহই আবার যাইতাম। যেন কে চুল ধরিয়া লইয়া যাইত। আবার নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতাম, আবার প্রতিজ্ঞা করিতাম, যাইব না–আবার যাইতাম। এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল।

মনে মনে আলোচনা করিতাম, কেন যাই? শুনিয়াছি, স্ত্রীজাতি পুরুষের রূপে মুগ্ধ হইয়া ভালবাসে। আমি কাণা, তাহার রূপ দেখিয়াছি? তবে কেন যাই?

কথা শুনিব বলিয়া ? কখন কেহ শুনিয়াছে যে, কোন রমণী শুধু কথা শুনিয়া উন্মাদিনী হইয়াছে ? আমিই কি তাই হইয়াছি ? তাও কি সম্ভব ? যদি তাই হয়, তবে বাদ্য শুনিবার জন্য, বাদকের বাড়ী যাই না কেন ? সেতার, সারেঙ্গ, এসরাজ, বেহালার অপেক্ষা কি শচীন্দ্র সুকণ্ঠ ? সে কথা মিথ্যা।

তবে কি সেই স্পর্শ ? আমি যে কুসুমরাশি রাত্রি দিবা লইয়া আছি, কখন পাতিয়া শুইতেছি, কখন বুকে চাপাইতেছি–ইহার অপেক্ষা তাহার স্পর্শ কোমল ? তা ত নয়। তবে কি ? এই কাণাকে কে বুঝাইবে ? তবে কি?

তোমরা বুঝ না, বুঝাইব কি ? তোমাদের চক্ষু আছে, রূপ চেন, রূপই বুঝ। আমি জানি, রূপ দ্রষ্টার মানসিক বিকার মাত্র–শব্দও মানসিক বিকার। রূপ রূপবানে নাই, রূপ দর্শকের মনে–নহিলে একজনকে সকলেই সমান রূপবান দেখে না কেন ? একজনে সকলেই আসক্ত হয় না কেন ? সেইরূপ শব্দও তোমার মনে। রূপ দর্শকের একটি মনের সুখ মাত্র, শব্দও শ্রোতার একটি মনের সুখ মাত্র, স্পর্শও স্পর্শকের মনের সুখ মাত্র। যদি আমার রূপসুখের পথ গন্ধ বন্ধ থাকে, তবে শব্দ স্পর্শ গন্ধ কেন রূপসুখের ন্যায় মনোমধ্যে সর্ব্বময় না হইবে?

শুষ্ক ভূমিতে বৃষ্টি পড়িলে কেন না সে উৎপাদিনী হইবে ? শুষ্ক কাষ্ঠে অগ্নি সংলগ্ন হইলে কেন না সে জ্বলিবে ? রূপে হোক, শব্দে হোক, স্পর্শে হোক, শূন্য রমণীহৃদয়ে সুপুরুষসংস্পর্শ হইলে কেন প্রেম না জন্মিবে ? দেখ, অন্ধকারেও ফুল ফুটে, মেঘে ঢাকিলেও চাঁদ গগনে বিহার করে, জনশূন্য অরণ্যেও কোকিল ডাকে, যে সাগরগর্ভে মনুষ্য কখন যাইবে না, সেখানেও রত্ন প্রভাসিত হয়, অন্ধের হৃদয়েও প্রেম জন্মে, আমার নয়ন বিরুদ্ধ বলিয়া হৃদয় কেন প্রস্ফুটিত হইবে না ?

হইবে না কেন, কিন্তু সে কেবল আমার যন্ত্রণার জন্য। বোবার কবিত্ব, কেবল তাহার যন্ত্রণার জন্য। বধিরের সঙ্গীতানুরাগ যদি হয়, কেবল তাহার যন্ত্রণার জন্য, আপনার গীত আপনি শুনিতে পায় না। আমার হৃদয়ে প্রণয়সঞ্চার তেমনই যন্ত্রণার জন্য। পরের রূপ দেখিব কি–আমি আপনার কখন আপনি দেখিলাম না। রূপ! রূপ! আমার কি রূপ! এই ভূমণ্ডলে রজনীনামে ক্ষুদ্র বিন্দু কেমন দেখায় ? আমাকে দেখিলে, কখনও কি কাহার আবার ফিরিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয় নাই ? এমন নীচাশয়, ক্ষুদ্র কেহ কি জগতে নাই যে, আমাকে সুন্দর দেখে ? নয়ন না থাকিলে নারী সুন্দর হয় না–আমার নয়ন নাই–কিন্তু তবে কারিগরে পাথর খোদিয়া চক্ষুঃশূন্য মূর্ত্তি গড়ে কেন ? আমি কি কেবল সেইরূপ পাষাণী মাত্র ? তবে বিধাতা এ পাষাণমধ্যে এ সুখদুঃখসমাকুল প্রণয়লালসাপরবশ হৃদয় কেন পুরিল ? পাষাণের দুঃখ পাইয়াছি, পাষাণের সুখ পাইলাম না কেন ? এ সংসারে এ তারতম্য কেন ? অনন্ত দুষ্কৃতিকারীও চক্ষে দেখে, আমি জন্মপূর্ব্বেই কোন্ দোষ করিয়াছিলাম যে, আমি চক্ষে দেখিতে পাইব না? এ সংসারে বিধাতা নাই, বিধান নাই, পাপপুণ্যের দণ্ড পুরস্কার নাই–আমি মরিব।

আমার এই জীবনে বহু বৎসর গিয়াছে–বহু বৎসর আসিতেও পারে! বৎসরে বৎসরে বহু দিবস–দিবসে দিবসে বহু দণ্ড–দণ্ডে দণ্ডে বহু মুহূর্ত্ত–তাহার মধ্যে এক মুহূর্ত্ত জন্য, এক পলক জন্য, আমার কি চক্ষু ফুটিবে না ? এক মুহূর্ত্ত জন্য, চক্ষু মেলিতে পারিলে দেখিয়া লই, এই শব্দস্পর্শময় বিশ্বসংসার কি–আমি কি–শচীন্দ্র কি ?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আমি প্রত্যহই ফুল লইয়া যাইতাম, ছোট বাবুর কথার শব্দশ্রবণ প্রায় ঘটিত না–কিন্তু কদাচিৎ দুই এক দিন ঘটিত। সে আহ্লাদের কথা বলিতে পারি না। আমার বোধ হইত, বর্ষার জলভরা মেঘ যখন ডাকিয়া বর্ষে, তখন মেঘের বুঝি সেইরূপ আহ্লাদ হয়; আমারও সেইরূপ ডাকিতে ইচ্ছা করিত। আমি প্রত্যহ মনে করিতাম, আমি ছোট বাবুকে কতকগুলি বাছা ফুলের তোড়া বাঁধিয়া দিয়া আসিব–কিন্তু তাহা একদিনও পারিলাম না। একে লজ্জা করিত–আবার মনে

ভাবিতাম, ফুল দিলে তিনি দাম দিতে চাহিবেন–কি বলিয়া না লইব ? মনের দুঃখে ঘরে আসিয়া ফুল লইয়া ছোট বাবুকেই গড়িতাম। কি গড়িতাম, তাহা জানি না–কখন দেখি নাই।

এদিকে আমার যাতায়াত একটি অচিন্তনীয় ফল ফলিতেছিল–আমি তাহার কিছুই জানিতাম না। পিতা-মাতার কথোপকথনে তাহা প্রথম জানিতে পারিলাম। একদিন সন্ধ্যার পর, আমি মালা গাঁথিতে গাঁথিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। কি একটা শব্দে নিদ্রা ভাঙ্গিল। জাগ্রত হইলে কর্ণে পিতা-মাতার কথোপকথনের শব্দ প্রবেশ করিল। বোধ হয়, প্রদীপ নিবিয়া গিয়া থাকিবে; কেন না, পিতা-মাতা আমার নিদ্রাভঙ্গ জানিতে পারিলেন, এমত বোধ হইল না। আমিও আমার নাম শুনিয়া কোন সাড়াশব্দ করিলাম না। শুনিলাম, মা বলিতেছেন, "তবে এক প্রকার স্থিরই হইয়াছে ?"

পিতা উত্তর করিলেন, "স্থির বৈ কি ? অমন বড় মানুষ লোক, কথা দিলে কি আর নড়চড় আছে ? আর আমার মেয়ের দোষের মধ্যে অন্ধ, নহিলে অমন মেয়ে লোকে তপস্যা করিয়া পায় না।"

মা। তা, পরে এত করবে কেন ?

পিতা। তুমি বুঝিতে পার না যে, ওরা আমাদের মত টাকার কাঙ্গাল নয়–হাজার দুহাজার টাকা ওরা টাকার মধ্যে ধরে না। যে দিন রজনীর সাক্ষাতে রামসদয় বাবুর স্ত্রী বিবাহের কথা প্রথম পাড়িলেন, সেই দিন হইতে রজনী তাঁহার কাছে প্রত্যহ যাতায়াত আরম্ভ করিল। তিনি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "টাকায় কি কাণার বিয়ে হয় ?" ইহাতে অবশ্য মেয়ের মনে আশা ভরসা হইতে পারে যে, বুঝি ইনি দয়াবতী হইয়া টাকা খরচ করিয়া আমার বিবাহ দিবেন সেই দিন হইতে রজনী নিত্য যায় আসে। সেই দিন হইতে নিত্য যাতায়াত দেখিয়া লবঙ্গ বুঝিলেন যে, মেয়েটি বিবাহের জন্য বড় কাতর হয়েছে–না হবে কেন, বয়স ত হয়েছে! তাতে আবার ছোট বাবু টাকা দিয়া হরনাথ বসুকে রাজি করিয়াছেন। গোপালও রাজি হইয়াছে।

হরনাথ বসু রামসদয় বাবুর বাড়ীর সরকার। গোপাল তাহার পুত্র। গোপালের কথা কিছু কিছু জানিতাম। গোপালের বয়স ত্রিশ বৎসর–একটি বিবাহ আছে, কিন্তু সন্তানাদি হয় নাই। গৃহধর্ম্মার্থে তাহার গৃহিণী আছে–সন্তানার্থ অন্ধ পত্নীতে তাহার আপত্তি নাই। বিশেষ লবঙ্গ তাহাকে টাকা দিবে। পিতা-মাতার কথায় বুঝিলাম, গোপালের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে–টাকায় লোভে সে কুড়ি বৎসরের মেয়েও বিবাহ করিতে প্রস্তুত। টাকার জাতি কিনিবে। পিতা-মাতা মনে করিলেন, এ জন্মের মত অন্ধ কন্যা উদ্ধার প্রাপ্ত হইল। তাঁহারা আহ্লাদ করিতে লাগিলেন। আমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

তার পরদিন স্থির করিলাম, আর আমি লবঙ্গের কাছে যাইব না–মনে মনে তাহাকে শত বার পোড়ারমুখী বলিয়া গালি দিলাম। লজ্জায় মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। রাগে লবঙ্গকে মারিতে ইচ্ছা করিতে উদ্যত ? ভাবিলাম, যদি সে বড় মানুষ বলিয়া অত্যাচার করিয়াই সুখী হয়, তবে জন্মান্ধ দুঃখিনী ভিন্ন, আর কি অত্যাচার করিবার পাত্র পাইল না ? মনে করিলাম–না, আর একদিন যাইব, তাহাকে এমনই করিয়া তিরস্কার করিয়া আসিব–তার পর আর যাইব না–আর ফুল বেচিব না–আর তাহার টাকা লইব না–মা যদি তাহাকে ফুল দিয়া মূল্য লইয়া আসেন, তবে তাহার টাকার অন্ন ভোজন করিব না–না খাইয়া মরিতে হয়–সেও ভাল। ভাবিলাম, বলিব, বড় মানুষ হইলেই কি পরপীড়ন করিতে হয় ? বলিব, আমি অন্ধ–অন্ধ বলিয়া কি দয়া হয় না ? বলিব, পৃথিবীতে যাহার কোন সুখ নাই, তাহাকে বিনাপরাধে কষ্ট দিয়া তোমার কি সুখ ? যত ভাবি, এই এই বলিব, তত আপনার চক্ষের জলে আপনি ভাসি। মনে ভয় হইতে লাগিল, পাছে বলিবার সময় কথাগুলি ভুলিয়া যাই।

যথাসময়ে আবার রামসদয় বাবুর বাড়ী চলিলাম। ফুল লইয়া যাইব না মনে করিয়াছিলাম–কিন্তু শুধু হাতে যাইতে লজ্জা করিতে লাগিল–কি বলিয়া গিয়া বসিব। পূর্ব্বমত কিছু ফুল লইলাম। কিন্তু আজি মাকে লুকাইয়া গেলাম।

ফুল দিলাম–তিরস্কার করিব বলিয়া লবঙ্গের কাছে বসিলাম। কি বলিয়া প্রসঙ্গ উত্থাপন করিব ? হরি! হরি! কি বলিয়া আরম্ভ করিব ? গোড়ার কথা কোন্‌টা ? যখন চারি দিকে আগুন জ্বলিতেছে–আগে কোন্ দিক্ নিবাইব? কিছু বলা হইল না! কথা পাড়িতেই পারিলাম না। কান্না আসিতে লাগিল।

ভাগ্যক্রমে লবঙ্গ আপনিই প্রসঙ্গ তুলিল, "কাণি–তোর বিয়ে হবে।"

আমি জ্বলিয়া উঠিলাম। বলিলাম, "ছাই হবে।"

লবঙ্গ বলিল, "কেন, ছোট বাবু বিবাহ দেওয়াইবেন–হবে না কেন ?"

আরও জ্বলিলাম। বলিলাম, "কেন, আমি তোমাদের কাছে কি দোষ করেছি ?"

লবঙ্গও রাগিল। বলিল, "আঃ মলো! তোর কি বিয়ের মন নাই কি ?"

আমি মাথা নাড়িয়া বলিলাম, "না।"

লবঙ্গ আরও রাগিল, বলিল, "পাপিষ্ঠা কোথাকার! বিয়ে করবিনে কেন ?"

আমি বলিলাম, "খুসি।"

লবঙ্গের মনে বোধ হয়, সন্দেহ হইল–আমি ভ্রষ্টা–নহিলে বিবাহে অসম্মত কেন ? সে বড় রাগ করিয়া বলিল, "আঃ মলো! বের বলিতেছি–নহিলে খেঙ্‌রা মারিয়া বিদায় করিব।"

আমি উঠিলাম–আমার দুই অন্ধ চক্ষে জল পড়িতেছিল–তাহা লবঙ্গকে দেখাইলাম না–ফিরিলাম। গৃহে যাইতেছিলাম, সিঁড়িতে আসিয়া একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলাম,–কই, তিরস্কারের কথা কিছুই ত বলা হয় নাই–অকস্মাৎ কাহার পদশব্দ শুনিলাম। অন্ধের শ্রবণশক্তি অনৈসর্গিক প্রখরতা প্রাপ্ত হয়–আমি দুই এক বার সেই পদশব্দ শুনিয়াই চিনিয়াছিলাম, কাহার পদবিক্ষেপের এ শব্দ। আমি সিঁড়িতে বসিলাম। ছোট বাবু আমার নিকটে আসিলে, আমাকে দেখিয়া দাঁড়াইলেন। বোধ হয়, আমার চক্ষের জল দেখিতে পাইয়াছিলেন,–জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে, রজনি!"

সকল ভুলিয়া গেলাম! রাগ ভুলিলাম। অপমান ভুলিলাম, দুঃখ ভুলিলাম।–কাণে বাজিতে লাগিল–"কে, রজনি!" আমি উত্তর করিলাম না–মনে করিলাম, আর দুই এক বার জিজ্ঞাসা করুন–আমি শুনিয়া কাণ জুড়াই।

ছোট বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "রজনি! কাঁদিতেছে কেন ?"

আমার অন্তর আনন্দে ভরিতে লাগিল–চক্ষের জল আরও উছলিতে লাগিল। আমি কথা কহিলাম না–আরও জিজ্ঞাসা করুন। মনে করিলাম, আমি কি ভাগ্যবতী! বিধাতা আমায় কাণা করিয়াছেন, কালা করেন নাই।

তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন কাঁদিতেছ ? কেহ কিছু বলিয়াছে ?"

আমি সে বার উত্তর করিলাম–তাঁহার সঙ্গে কথোপকথনের সুখ, যদি জন্মে একবার ঘটিতেছে–তবে ত্যাগ করি কেন ? আমি বলিলাম, "ছোট মা তিরস্কার করিয়াছেন।"

ছোট বাবু হাসিলেন–বলিলেন, "ছোট মার কথা ধরিও না–তাঁর মুখ ঐ রকম–কিন্তু মনে রাগ করেন না। তুমি আমার সঙ্গে এস–এখনই তিনি আবার ভাল কথা বলিবেন।"

তাঁহার সঙ্গে কেন না যাইব ? তিনি ডাকিলে কি আর রাগ থাকে ? আমি উঠিলাম–তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। তিনি সিঁড়িতে উঠিতে লাগিলেন–আমি পশ্চাৎ

পশ্চাৎ উঠিতেছিলাম। তিনি বলিলেন, “তুমি দেখিতে পাও না–সিঁড়িতে উঠ কিরূপে? না পার, আমি হাত ধরিয়া লইয়া যাইতেছি।”

আমার গা কাঁপিয়া উঠিল–সর্ব্বশরীরে রোমাঞ্চ হইল–তিনি আমার হাত ধরিবেন! ধরুন্ না–লোকে নিন্দা করে করুক–আমার নারীজন্ম সার্থক হউক! আমি পরের সাহায্য ব্যতীত কলিকাতার গলি গলি বেড়াইতে পারি, কিন্তু ছোট বাবুকে নিষেধ করিলাম না। ছোট বাবু–বলিব কি? কি বলিয়া বলিব–উপযুক্ত কথা পাই না–ছোট বাবু হাত ধরিলেন।

যেন একটি প্রভাতপ্রফুল্ল পদ্ম দলগুলির দ্বারা আমার প্রকোষ্ঠ বেড়িয়া ধরিল–যেন গোলাবের মালা গাঁথিয়া কে আমার হাতে বেড়িয়া দিল! আমার আর কিছু মনে নাই। বুঝি সেই সময় ইচ্ছা হইয়াছিল–এখন মরি না কেন? বুঝি তখন গলিয়া জল হইয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিল–বুঝি ইচ্ছা করিয়াছিল, শচীন্দ্র আর আমি, দুইটি ফুল হইয়া এইরূপ সংস্পৃষ্ট হইয়া কোন বন্য বৃক্ষে গিয়া এক বোঁটায় ঝুলিয়া থাকি। আর কি মনে হইয়াছিল–তাহা মনে নাই। যখন সিঁড়ির উপরে উঠিয়া ছোট বাবু হাত ছাড়িয়া দিলেন–তখন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলাম–এ সংসার আবার মনে পড়িল–সেই সঙ্গে মনে পড়িল–“কি করিলে প্রাণেশ্বর! না বুঝিয়া কি করিলে! তুমি আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছ। এখন তুমি আমার গ্রহণ কর না কর–তুমি আমায় স্বামী–আমি তোমার পত্নী–ইহজন্মে অন্ধ ফুলওয়ালীর আর কেহ স্বামী হইবে না।”

সেই সময় কি পোড়া লোকের চোখ পড়িল? বুঝি তাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ছোট বাবু ছোট মার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “রজনীকে কি বলিয়াছ গা? সে কাঁদিতেছে।” ছোট মা আমার চক্ষে জল দেখিয়া অপ্রতিভ হইলেন,–আমাকে ভাল কথা বলিয়া কাছে বসাইলেন–বয়োজ্যেষ্ঠ সপত্নীপুত্রের কাছে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিতে পারিলেন না। ছোট বাবু মাকে প্রসন্ন দেখিয়া নিজ প্রয়োজনে বড় মার কাছে চলিয়া গেলেন। আমিও বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

এ দিকে গোপাল বাবুর সঙ্গে আমার বিবাহের উদ্যোগ হইতে লাগিল। দিন স্থির হইল। আমি কি করিব? ফুল গাঁথা বন্ধ করিয়া, দিবারাত্র কিসে এ বিবাহ বন্ধ করিব–সেই চিন্তা করিতে লাগিলাম। এ বিবাহে মাতার আনন্দ, পিতার উৎসাহ, লবঙ্গলতার যত্ন, ছোট বাবু ঘটক–এই কথাটি সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টদায়ক–ছোট বাবু ঘটক! আমি একা অন্ধ কি প্রকারে ইহার প্রতিবন্ধকতা করিব? কোন উপায় দেখিতে পাইলাম না। মালা গাঁথা বন্ধ হইল। মাতাপিতা মনে করিলেন, বিবাহের আনন্দে আমি বিহ্বল হইয়া মালা গাঁথা ত্যাগ করিয়াছি।

ঈশ্বর আমাকে এক সহায় আনিয়া দিলেন। বলিয়াছি গোপাল বসুর বিবাহ ছিল–তাঁহার পত্নীর নাম চাঁপা–বাপ রেখেছিল চম্পকলতা। চাঁপাই কেবল এ বিবাহে অসম্মত। চাঁপা একটু শক্ত মেয়ে। যাহাতে ঘরে সপত্নী না হয়–তাহার চেষ্টার কিছু ত্রুটি করিল না।

হীরালাল নামে চাঁপার এক ভাই ছিল–চাঁপার অপেক্ষা দেড় বৎসরের ছোট। হীরালাল মদ খায়–তাহাও অল্প মাত্রায় নহে। শুনিয়াছি, গাঁজাও টানে। তাহার পিতা তাহাকে লেখাপড়া শিখান নাই–কোন প্রকারে সে হস্তাক্ষরটি প্রস্তুত করিয়াছিল মাত্র, তথাপি রামসদয় বাবু তাহাকে কোথা কেরানিগিরি করিয়া দিয়াছিলেন। মাতলামির দোষে সে চাকরিটি গেল। হরনাথ বসু তাহার দমে ভুলিয়া, লাভের আশায় তাহাকে দোকান করিয়া দিলেন। দোকানে লাভ দূরে থাক, দেনা পড়িল–দোকান উঠিয়া গেল। তার পর কোন গ্রামে, বার টাকা বেতনে হীরালাল মাষ্টার হইয়া গেল। সে গ্রামে মদ পাওয়া যায় না বলিয়া হীরালাল পলাইয়া আসিল। তার পর সে একখানা খবরের কাগজ করিল। দিনকতক তাহাতে খুব লাভ হইল, বড় পসার জাঁকিল–কিন্তু অশ্লীলতা দোষে পুলিসে টানাটানি

আরম্ভ করিল—ভয়ে হীরালাল কাগজ ফেলিয়া রুপোষ হইল। কিছু দিন পরে হীরালাল আবার হঠাৎ ভাসিয়া উঠিয়া ছোট বাবুর মোসায়েবি করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু ছোট বাবুর কাছে মদের চাল নাই, দেখিয়া আপনা আপনি সরিল। অনন্যোপায় হইয়া নাটক লিখিতে আরম্ভ করিল। নাটক একখানিও বিক্রয় হইল না। তবে ছাপাখানার দেনা শোধিতে হয় না বলিয়া সে যাত্রা রক্ষা পাইল। এক্ষণে এ ভবসংসারে আর কূল কিনারা না দেখিয়া—হীরালাল চাঁপাদিদির আঁচল ধরিয়া বসিয়া রহিল।

চাঁপা হীরালালকে স্বকার্যোদ্ধার জন্য নিয়োজিত করিল। হীরালাল ভগিনীর কাছে সবিশেষ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "টাকার কথা সত্য ত ? যেই কাণীকে বিবাহ্ করিবে, সেই টাকা পাইবে ?"

চাঁপা সে বিষয়ে সন্দেহভঞ্জন করিল। হীরালালের টাকার বড় দরকার। সে তখনই আমার পিতৃভবনে আসিয়া দর্শন দিল। পিতা তখন বাড়ী ছিলেন। আমি তখন সেখানে ছিলাম না। আমি নিকটস্থ অন্য ঘরে ছিলাম—অপরিচিত পুরুষে পিতার সঙ্গে কথা কহিতেছে, কণ্ঠস্বরে জানিতে পারিয়া, কাণ পাতিয়া কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলাম। হীরালালের কি কর্কশ কদর্য্য স্বর!

হীরালাল বলিতেছে, "সতীনের উপর কেন মেয়ে দিবে ?"

পিতা দুঃখিতভাবে বলিলেন, "কি করি! না দিল ত বিয়ে হয় না—এত কাল ত হলো না!"

হীরালাল। কেন, তোমার মেয়ের বিবাহের ভাবনা কি ?"

পিতা হাসিলেন, বলিলেন, "আমি গরিব—ফুল বেচিয়া খাই—আমার মেয়ে কে বিবাহ করিবে ? তাতে আবার কাণা মেয়ে, আবার বয়সও ঢের হয়েছে।"

হীরা। "কেন, পাত্রের অভাব কি ? আমায় বলিলে আমি বিয়ে করি। এখন বয়ঃস্থা মেয়ে ত লোকে চায়। আমি যখন স্তুশ্চুভিশ্চাশাৎ পত্রিকার এডিটার ছিলাম, তখন আমি মেয়ে বড় করিয়া বিবাহ দিবার জন্য কত আর্টিকেল লিখেছি—পড়িয়া আকাশের মেঘ ডেকে উঠেছিল। বাল্যবিবাহ! ছি! ছি! মেয়ে ত বড় করিয়াই বিবাহ দিবে। এসো! আমাকে দেশের উন্নতির একজাম্পল সেট্ করিতে দাও—আমিই এ মেয়ে বিয়ে করিব।

আমরা তখন হীরালালের চরিত্রের কথা সবিশেষ শুনি নাই—পশ্চাৎ শুনিয়াছি। পিতা ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। এত বড় পণ্ডিত জামাই হাতাছাড়া হয় ভাবিয়া শেষ একটু দুঃখিত হইলেন; শেষ বলিলেন, "এখন কথা ধার্য্য হইয়া গিয়াছে—এখন আর নড়চড় হয় না। বিশেষ এ বিবাহের কর্ত্তা শচীন্দ্র বাবু। তাঁহারাই বিবাহ্ দিতেছেন। তাঁহারা যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। তাঁহারাই গোপাল বাবুর সঙ্গে সম্বন্ধ করিয়াছেন।

হীরা। তাদের মতলব তুমি কি বুঝিবে ? বড়মানুষের চরিত্রের অন্ত পাওয়া ভার। তাঁদের বড় বিশ্বাস করিও না।

এই বলিয়া হীরালাল চুপি চুপি কি বলিল, তাহা শুনিতে পাইলাম না। পিতা বলিলেন, "সে কি ? না—আমার কাণা মেয়ে।"

হীরালাল তৎকালে ভগ্নমনোরথ হইয়া ঘরের এ দিক্ সে দিক্ দেখিতে লাগিল। চারি দিক্ দেখিয়া বলিল, "তোমার ঘরে মদ নাই, বটে হে?" পিতা বিস্মিত হইলেন বলিলেন, "মদ কি জন্য রাখিব!"

হীরালাল মদ নাই জানিয়া, বিজ্ঞের নায় বলিল, "সাবধান করিয়া দিবার জন্য বল্‌ছিলাম। এখন ভদ্রলোকের সঙ্গে কুটুম্বিতা করিতে চলিলে, ওগুলো যেন না থাকে।"

কথাটা পিতার বড় ভাল লাগিল না। তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। হীরালাল না বিবাহে না মদে, কোন দিকেই দেশের উন্নতির একজাম্পল সেট্ করিতে না পারিয়া, ক্ষুণ্নমনে বিদায় হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিবাহের দিন অতি নিকট হইল—আর একদিনমাত্র বিলম্ব আছে। উপায় নাই! নিষ্কৃতি নাই! চারি দিক্ হইতে উচ্ছ্বসিত বারিরাশি গর্জ্জিয়া আসিতেছে—নিশ্চিত ডুবিব।

তখন লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া, মাতার পায়ে আছড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলাম। যোড়হাত করিয়া বলিলাম—“আমার বিবাহ দিও না—আমি আইবুড় থাকিব।”

মা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন?” কেন? তাহার উত্তর দিতে পারিলাম না। কেবল যোড়হাত করিতে লাগিলাম, কেবল কাঁদিতে লাগিলাম। মাতা বিরক্ত হইলেন,—রাগিয়া উঠিলেন; গালি দিলেন। শেষ পিতাকে বলিয়া দিলেন। পিতাও গালি দিয়া মারিতে আসিলেন। আর কিছু বলিতে পারিলাম না।

উপায় নাই! নিষ্কৃতি নাই! ডুবিলাম।

সেই দিন বৈকালে গৃহে কেবল আমি একা ছিলাম—পিতা বিবাহের খরচসংগ্রহে গিয়াছিলেন—মাতা দ্রব্যসামগ্রী কিনিতে গিয়াছিলেন। এ সব যে সময়ে হয়, সে সময়ে আমি দ্বার দিয়া থাকিতাম, না হয় বামাচরণ আমার কাছে বসিয়া থাকিত। বামাচরণ এ দিন বসিয়া ছিল। একজন কে দ্বার ঠেলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। চেনা পায়ের শব্দ নহে। জিজ্ঞাসা করিলাম, “কে গা ?”

উত্তর। “তোমার যম।”

কথা কোপযুক্ত বটে, কিন্তু স্বর স্ত্রীলোকের। ভয় পাইলাম না। হাসিয়া বলিলাম—“আমার যম কি আছে ? তবে এত দিন কোথা ছিলে ?”

স্ত্রীলোকটির রাগশান্তি হইল না। “এখন জান্‌বি! বড় বিয়ের সাধ! পোড়ারমুখী; আবাগী!” ইত্যাদি গালির ছড়া আরম্ভ হইল। গালি সমাপ্তে সেই মধুরভাষিণী বলিলেন, “হা দেখ, কাণি, যদি আমার স্বামীর সঙ্গে তোর বিয়ে হয়, তবে যে দিন তুই ঘর করিতে যাইবি, সেই দিন তোকে বিষ খাওয়াইয়া মারিব।”

বুঝিলাম, চাঁপা খোদ। আদর করিয়া বসিতে বলিলাম—বলিলাম, “শুন—তোমার সঙ্গে কথা আছে।” এত গালির উত্তরে সাদর সম্ভাষণ দেখিয়া, চাঁপা একটু শীতল হইয়া বসিল।

আমি বলিলাম, “শুন, এ বিবাহে তুমি যেমন বিরক্ত, আমিও তেমনি। আমার এ বিবাহ যাহাতে না হয়, আমি তাহাই করিতে রাজি আছি। কিসে বিবাহ বন্ধ হয়, তাহার উপায় বলিতে পার ?”

চাঁপা বিস্মিত হইল। বলিল, “তা তোমার বাপ মাকে বল না কেন ?”

আমি বলিলাম, “হাজার বার বলিয়াছি। কিছু হয় নাই।”

চাঁপা। বাবুদের বাড়ী গিয়া তাঁদের হাতে পায়ে ধর না কেন ?

আমি। তাতেও কিছু হয় নাই।

চাঁপা একটু ভাবিয়া বলিল, “তবে এক কাজ করিবি ?”

আমি। কি ?

চাঁপা। দুদিন লুকাইয়া থাকিবি ?

আমি। কোথায় লুকাইব ? আমার স্থান কোথায় আছে ?

চাঁপা আবার একটু ভাবিল। বলিল, "আমার বাপের বাড়ী গিয়া থাকিবি ?"

ভাবিলাম, মন্দ কি ? আর ত উদ্ধারের কোন উপায় দেখি না। বলিলাম, "আমি কাণা, নূতন স্থানে আমাকে কে পথ চিনাইয়া লইয়া যাইবে ? তাহারাই বা স্থান দিবে কেন ?"

চাঁপা আমার সর্ব্বনাশিনী কুপ্রবৃত্তি মূর্ত্তিমতী হইয়া আসিয়াছিল; সে বলিল, "তোর তা ভাবিতে হইবে না। সে সব বন্দোবস্ত আমি করিব। আমি সঙ্গে লোক দিব, আমি তাদের বলিয়া পাঠাইব। তুই যাস্ ত বল্?"

মজ্জনোন্মুখের সমীপবর্ত্তী কাষ্ঠফলকবৎ এই প্রবৃত্তি আমার চক্ষে একমাত্র রক্ষার উপায় বলিয়া বোধ হইল। আমি সম্মত হইলাম।

চাঁপা বলিল, "আচ্ছা, তবে ঠিক থাকিস্। রাত্রে সবাই ঘুমাইলে আমি আসিয়া দ্বারে টোকা মারিব; বাহির হইয়া আসিস্।"

আমি সম্মত হইলাম।

★ ★ ★

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে দ্বারে ঠক্‌ঠক্ করিয়া অল্প শব্দ হইল। আমি জাগ্রত ছিলাম। দ্বিতীয় বস্ত্র মাত্র লইয়া, আমি দ্বারোদ্ঘাটনপূর্ব্বক বাহির হইলাম। বুঝিলাম, চাঁপা দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সঙ্গে চলিলাম। একবার ভাবিলাম না–একবার বুঝিলাম না যে, কি দুষ্কর্ম্ম করিতেছি। পিতা মাতার জন্য মন কাতর হইল বটে, কিন্তু তখন মনে মনে বিশ্বাস ছিল যে, অল্প দিনের জন্য যাইতেছি। বিবাহের কথা নিবৃত্তি পাইলেই আবার আসিব।

আমি চাঁপার গৃহে–আমার শ্বশুরবাড়ী ? উপস্থিত হইলে চাঁপা আমায় সদ্যই লোক সঙ্গে দিয়া বিদায় করিল। পাছে তাহার স্বামী জানিতে পারে, এই ভয়ে বড় তাড়াতাড়ি করিল–যে লোক সঙ্গে দিল, তাহার সঙ্গে যাওয়ার পক্ষে আমার বিশেষ আপত্তি–কিন্তু চাঁপা এমনই তাড়াতাড়ি করিল যে, আমার আপত্তি ভাসিয়া গেল। মনে কর, কাহাকে আমার সঙ্গে দিল ? হীরালালকে।

হীরালালের মন্দ চরিত্রের কথা তখন আমি কিছুই জানিতাম না। সে জন্য আপত্তি করি নাই। সে যুবা পুরুষ–আমি যুবতী–তাহার সঙ্গে কি প্রকারে একা যাইব ? এই আপত্তি। কিন্তু তখন আমার কথা কে শুনে ? আমি অন্ধ, পথ অপরিচিত, রাত্রে আসিয়াছি–সুতরাং পথে যে শব্দঘটিত চিহ্ন চিনিয়া রাখিয়া আসিয়া থাকি, সে সকল কিছু শুনিতে পাই নাই–অতএব বিনা সহায়ে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে পারিলাম না–বাড়ী ফিরিয়া গেলেও সেই পাপ বিবাহ! অগত্যা হীরালালের সঙ্গে যাইতে হইল। তখন মনে হইল–আর কেহ অন্ধের সহায় থাক না থাক–মাথার উপর দেবতা আছেন; তাঁহারা কখনও লবঙ্গলতার ন্যায় পীড়িতকে পীড়ন করিবেন না; তাঁহাদের দয়া আছে, শক্তি আছে, অবশ্য দয়া করিয়া আমাকে রক্ষা করিবেন–নহিলে দয়া কার জন্য ?

তখন জানিতাম না যে, ঐশিক নিয়ম বিচিত্র–মনুষ্যের বুদ্ধির অতীত–আমরা যাহাকে দয়া বলি, ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানের কাছে তাহা দয়া নহে–আমরা যাহাকে পীড়ন বলি–ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানের কাছে তাহা পীড়ন নহে। তখন জানিতাম না যে, এই সংসারের অনন্ত চক্র দয়া-দাক্ষিণ্যশূন্য, সে চক্র নিয়মিত পথে অনতিক্ষুণ্ন রেখায় অহরহ চলিতেছে, তাহার দারুণ বেগের পথে যে পড়িবে–অন্ধ হউক, খঞ্জ, হউক আর্ত্ত হউক, সেই পিষিয়া মরিবে। আমি অন্ধ নিঃসহায় বলিয়া, অনন্ত সংসারচক্র পথ ছাড়িয়া চলিবে কেন ?

হীরালালের সঙ্গে প্রশস্ত রাজপথে বাহির হইলাম–তাহার পদশব্দ অনুসরণ করিয়া চলিলাম–কোথাকার ঘড়িতে একটা বাজিল। পথে কেহ নাই–কোথাও শব্দ

নাই–দুই একখানা গাড়ির শব্দ–দুই একজন সুরাপহৃতবুদ্ধি কামিনীর অসম্বন্ধ গীতিশব্দ! আমি হীরালালকে সহসা জিজ্ঞাসা করিলাম–"হীরালাল বাবু, আপনার গায়ে জোর কেমন ?"

হীরালাল একটু বিস্মিত হইল–বলিল, "কেন ?"

আমি বলিলাম, "জিজ্ঞাসা করি।"

হীরালাল বলিল, "তা মন্দ নয়।"

আমি। "তোমার হাতে কিসের লাঠি ?"

হীরা। তালের।

আমি। ভাঙ্গিতে পার ?

হীরা সাধ্য কি ?

আমি। আমার হাতে দাও দেখি।

হীরালাল আমার হাতে লাঠি দিল। আমি তাহা ভাঙ্গিয়া দ্বিখণ্ড করিলাম। হীরালাল আমার বল দেখিয়া বিস্মিত হইল। আমি আধখানা তাহাকে দিয়া, আধখানা আপনি রাখিলাম। তাহার লাঠি ভাঙ্গিয়া দিলাম দেখিয়া হীরালাল রাগ করিল। আমি বলিলাম–"আমি এখন নিশ্চিন্ত হইলাম–রাগ করিও না। তুমি আমার বল দেখিলে–আমার হাতে এই আধখানা লাাঠি দেখিলে–তোমার ইচ্ছা থাকিলেও তুমি আমার উপর, কোন অত্যাচার করিতে সাহস করিবে না।"

হীরালাল চুপ করিয়া রহিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

হীরালাল, জগন্নাথের ঘাটে গিয়া নৌকা করিল। রাত্রিকালে দক্ষিণা বাতাসে পাল দিল। সে বলিল, তাহাদের পিত্রালয় হুগলী। আমি তাহা জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

পথে হীরালাল বলিল, "গোলাপের সঙ্গে তোমার বিবাহ ত হইবে না–আমায় বিবাহ কর।" আমি বলিলাম "না।" হীরালাল বিচার আরম্ভ করিল। তাহার যত্ন যে, বিচারের দ্বারা প্রতিপন্ন করে যে, তাহার নায় সৎপাত্র পৃথিবীতে দুর্লভ; আমার ন্যায় কুপাত্রীও পৃথিবীতে দুর্লভ। আমি উভয়ই স্বীকার করিলাম–তথাপি বলিলাম যে, "না, তোমাকে বিবাহ করিব না।"

তখন হীরালাল বড় ক্রুদ্ধ হইল। বলিল, "কাণাকে কে বিবাহ করিতে চাহে?" এই বলিয়া নীরব হইল। উভয়ে নীরব রহিলাম–এইরূপ রাত্রি কাটিতে লাগিল।

তাহার পরে, শেষ রাত্রে হীরালাল অকস্মাৎ মাঝিদিগকে বলিল, "এইখানে ভিড়ো।" মাঝিরা নৌকা লাগাইল–নৌকাতলে ভূমি স্পর্শের শব্দ শুনিলাম। হীরালাল আমাকে বলিল, "নাম–আসিয়াছি।"–সে আমার হাত ধরিয়া নামাইল। আমি কূলে দাঁড়াইলাম।

তাহার পর শব্দ শুনিলাম, যেন হীরালাল আবার নৌকায় উঠিল। মাঝিদিগকে বলিল, "দে, নৌকা খুলিয়া দে।" আমি বলিলাম, "সে কি ? আমাকে

নামাইয়া দিয়া নৌকা খুলিয়া দাও কেন ?”

হীরালাল বলিল, “আপনার পথ আপনি দেখ।” মাঝিরা নৌকা খুলিতে লাগিল–দাঁড়ের শব্দ শুনিলাম। আমি তখন কাতর হইয়া বলিলাম, “তোমার পায়ে পড়ি! আমি অন্ধ–যদি একান্তই আমাকে ফেলিয়া যাইবে, তবে কাহারও বাড়ি পর্যন্ত আমাকে রাখিয়া যাও। আমি ত এখানে কখনও আসি নাই–এখানকার পথ চিনিব কি প্রকারে?”

হীরালাল বলিল, “আমাকে বিবাহ করিতে সম্মত আছ ?”

আমার কান্না আসিল। ক্ষণেক রোদন করিলাম। রাগে হীরালালকে বলিলাম, “তুমি যাও। তোমার কাছে কোন উপকারও পাইতে নাই–রাত্রি প্রভাত হইলে তোমার অপেক্ষা দয়ালু শত শত লোকের সাক্ষাৎ পাইব। তাহারা অন্ধের প্রতি তোমার অপেক্ষা দয়া করিবে।”

হী। দেখা পেলে তো? এ যে চড়া! চারি দিকে জল। আমাকে বিবাহ করিবে ?

হীরালালের নৌকা তখন কিছু বাহিরে গিয়াছিল। শ্রবণশক্তি আমার জীবনাবলম্বন–শ্রবণই আমার চক্ষের কাজ করে। কেহ কথা কহিলে–কত দূরে, কোন্ দিকে কথা কহিতেছে, তাহা অনুভব করিতে পারি। হীরালাল কোন্ দিকে, কত দূরে থাকিয়া কথা কহিল, তাহা মনে মনে অনুভব করিয়া, জলে নামিয়া সেই দিকে ছুটিলাম–ইচ্ছা, নৌকা ধরিব। গলাজল অবধি নামিলাম। নৌকা পাইলাম না। নৌকা আরও বেশী জলে। নৌকা ধরিতে গেলে ডুবিয়া মরিব।

তালের লাঠি তখনও হাতে ছিল। আবার ঠিক করিয়া শব্দানুভব করিয়া বুঝিলাম, হীরালাল এই দিকে, এত দূর হইতে কথা কহিতেছে। পিছু হটিয়া কোমর জলে উঠিয়া, শব্দের স্থানানুভব করিয়া, সবলে সেই তালের লাঠি নিক্ষেপ করিলাম।

চীৎকার করিয়া হীরালাল নৌকার উপর পড়িয়া গেল। “খুন হইয়াছে, খুন হইয়াছে।” বলিয়া মাঝিরা নৌকা খুলিয়া দিল। বাস্তবিক–সেই পাপিষ্ঠ খুন হয় নাই। তখনও তাহার মধুর কণ্ঠে শুনিতে পাইলাম–নৌকা বাহিয়া চলিল–সে উচ্চৈঃস্বরে আমাকে গালি দিতে দিতে চলিল–অতি কদর্য্য অশ্রাব্য ভাষায় পবিত্রা গঙ্গা কলুষিত করিতে করিতে চলিল। আমি স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম যে, সে শাসাইতে লাগিল যে, আবার খবরের কাগজ করিয়া আমার নামে আর্টিকেল লিখিবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সেই জনহীনা রাত্রিতে, আমি অন্ধ যুবতী, একা সেই দ্বীপে দাঁড়াইয়া গঙ্গার কল কল জলকল্লোল শুনিতে লাগিলাম।

হায়, মানুষের জীবন! কি অসার তুই! কেন আসিস্–কেন থাকিস্–কেন যাস্ ? এ দুঃখময় জীবন কেন ? ভাবিলে জ্ঞান থাকে না। শচীন্দ্র বাবু, একদিন তাঁহার মাতাকে বুঝাইতেছিলেন, সকলই নিয়মাধীন। মানুষের এই জীবন কি কেবল সেই নিয়মের ফল ? যে নিয়মে ফুল ফুটে, মেঘ ছুটে, চাঁদ উঠে,–যে নিয়মে জলবুদ্‌বুদ্ ভাসে, হাসে, মিলায়, যে নিয়মে ধূলা উড়ে, তৃণ পুড়ে, পাতা খসে, সেই নিয়মেই কি এই সুখদুঃখময় মনুষ্যজীবন আবদ্ধ, সম্পূর্ণ, বিলীন হয় ? যে নিয়মের অধীন হইয়া ঐ নদীগর্ভস্থ কুম্ভীর শিকারের সন্ধান করিতেছে–যে নিয়মের অধীন হইয়া এই চরে ক্ষুদ্র কীটসকল অন্য কীটের সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে, সেই নিয়মের অধীন হইয়া আমি শচীন্দ্রের জন্য প্রাণত্যাগ করিতে বসিয়াছি ? ধিক্ প্রাণত্যাগে! ধিক্ প্রণয়ে! ধিক্ মনুষ্যজীবনে! কেন এই গঙ্গাজলে ইহা পরিত্যাগ করি না ?

জীবন অসার–সুখ নাই বলিয়া অসার, তাহা নহে। শিমুলগাছে শিমুলফুলই ফুটিবে; তাহা বলিয়া তাহাকে অসার বলিব না। দুঃখময় জীবনে দুঃখ আছে

বলিয়া তাহাকে অসার বলিব না। কিন্তু অসার বলি এই জন্য যে, দুঃখই দুঃখের পরিণাম–তাহার পর আবার কিছু নাই। আমার মর্ম্মের দুঃখ, আমি একা ভোগ করিলাম, আর কেহ জানিল না–আর কেহ বুঝিল না–দুঃখ প্রকাশের ভাষা নাই বলিয়া তাহা বলিতে পারিলাম না; শ্রোতা নাই বলিয়া তাহা শুনাইতে পারিলাম না–সহৃদয় বোদ্ধা নাই বলিয়া তাহা বুঝাইতে পারিলাম না। একটি শিমুলবৃক্ষ হইতে সহস্র শিমুলবৃক্ষ হইতে পারিবে, কিন্তু তোমার দুঃখে আর কয় জনের দুঃখ হইবে। পরের অন্তঃকরণমধ্যে পর প্রবেশ করিতে পারে, এমন কয় জন পর পৃথিবীতে জন্মিয়াছে? পৃথিবীতে কে এমন জন্মিয়াছে যে, অন্ধ পুষ্পনারীর দুঃখ বুঝিবে? কে এমন জন্মিয়াছে যে, এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে, প্রতি কথায়, প্রতি শব্দে, প্রতি বর্ণে, কত সুখদুঃখের তরঙ্গ উঠে, তাহা বুঝিতে পাারে? সুখ দুঃখ? হাঁ, সুখও আছে। যখন চৈত্র মাসে, ফুলের বোঝার সঙ্গে সঙ্গে মৌমাছি ছুটিয়া আমাদের গৃহমধ্যে প্রবেশ করিত, তখন সে শব্দের সঙ্গে আমার কত সুখ উছলিত, কে বুঝিত? যখন গীতিব্যবসায়িনীর অট্টালিকা হইতে বাদ্যনিক্কণ, সান্ধ্য সমীরণে কর্ণে আসিত, তখন আমার সুখ কে বুঝিয়াছে? যখন বামাচরণের আধ আধ কথা ফুটিয়াছিল–জল বলিতে "ত" বলিত, কাপড় বলিতে "খাব" বলিত, রজনী বলিতে "জুঞ্জি" বলিত, তখন আমার মনে কত সুখ উছলিত, তাহা কে বুঝিয়াছিল? আমার দুঃখই বা কে বুঝিবে? অন্ধের রূপোন্মাদ কে বুঝিবে? না দেখায় যে দুঃখ, তাহা কে বুঝিবে? বুঝিলেও বুঝিতে পারে, কিন্তু দুঃখ যে কখন প্রকাশ করিতে পারিলাম না, এ দুঃখ কে বুঝিবে? পৃথিবীতে যে দুঃখের ভাষা নাই, এ দুঃখ কে বুঝিবে? ছোট মুখে বড় কথা তোমরা ভালবাস না, ছোট ভাষায় বড় দুঃখ কি প্রকাশ করা যায়? এমনই দুঃখ যে, আমার যে কি দুঃখ, তাহাতে হৃদয় ধ্বংস হইলেও, সকলটা আপনি মনে ভাবিয়া আনিতে পারি না।

মনুষ্যভাষাতে তেমন কথা নাই–মনুষ্যের তেমন চিন্তাশক্তি নাই। দুঃখ ভোগ করি–কিন্তু দুঃখটা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আমার কি দুঃখ? কি তাহা জানি না, কিন্তু হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে। সর্ব্বদা দেখিতে পাইবে যে, তোমার দেহ শীর্ণ হইতেছে, বল অপহৃত হইতেছে, কিন্তু তোমার শারীরিক রোগ কি, তাহা জানিতে পারিতেছ না। তেমনি অনেক সময় দেখিবে যে, দুঃখে তোমার বক্ষ বিদীর্ণ হইতেছে, প্রাণ বাহির করিয়া দিয়া, শূন্যমার্গে পাঠাইতে ইচ্ছা করিতেছে–কিন্তু কি দুঃখ, তাহা আপনি বুঝিতে পারিতেছ না। আপনি বুঝিতে পারিতেছ না–পরে বুঝিবে কি? ইহা কি সামান্য দুঃখ? সাধ ভরিয়া বলি, জীবন অসার!

যে জীবন এমন দুঃখময়, তাহার রক্ষার জন্য এত ভয় পাইতেছিলাম কেন? আমি কেন ইহা ত্যাগ করি না? এই ত কলনাদিনী গঙ্গার তরঙ্গমধ্যে দাঁড়াইয়া আছি–আর দুই পা অগ্রসর হইলেই মরিতে পারি। না মরি কেন? এ জীবন রাখিয়া কি হইবে? মরিব!

আমি কেন জন্মিলাম? কেন অন্ধ হইলাম? জন্মিলাম ত শচীন্দ্রের যোগ্য হইয়া জন্মিলাম না কেন? শচীন্দ্রের যোগ্য না হইলাম, তবে শচীন্দ্রকে ভালবাসিলাম কেন? ভালবাসিলাম, তবে তাঁহার কাছে রহিতে পারিলাম না কেন? কিসের জন্য শচীন্দ্রকে ভাবিয়া, গৃহত্যাগ করিতে হইল? নিঃসহায় অন্ধ, গঙ্গার চরে মরিতে আসিলাম কেন? কেন বানের মুখে কুটার মত, সংসারস্রোতে, অজ্ঞাত পথে ভাসিয়া চলিলাম? এ সংসারে অনেক দুঃখী আছে, আমি সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখী কেন? এ সকল কাহার খেলা? দেবতার? জীবের এত কষ্টে দেবতার কি সুখ? কষ্ট দিবার জন্য সৃষ্টি করিয়া কি সুখ? মূর্ত্তিমতী নির্দ্দয়তাকে কেন দেবতা বলিব? কেন নিষ্ঠুরতার পূজা করিব? মানুষের এত ভয়ানক দুঃখ কখন দেবকৃত নহে–তাহা হইলে দেবতা রাক্ষসের অপেক্ষা সহস্রগুণে নিকৃষ্ট। তবে কি আমার কর্ম্মফল? কোন্ পাপে আমি জন্মান্ধ?

দুই এক পা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম–মরিব! গঙ্গায় তরঙ্গরব কাণে বাজিতে লাগিল–বুঝি মরা হইল না–আমি মিষ্ট শব্দ বড় ভালবাসি! না, মরিব। চিবুক ডুবিল! অধর ডুবিল! আর একটু মাত্র। নাসিকা ডুবিল! চক্ষু ডুবিল! আমি ডুবিলাম!

ডুবিলাম, কিন্তু মরিলাম না। কিন্তু এ যন্ত্রণাময় জীবনচরিত আর বলিতে সাধ করে না। আর একজন বলিবে।

আমি সেই প্রভাতবায়ুতাড়িত গঙ্গাজলপ্রবাহমধ্যে নিমগ্ন হইয়া ভাসিতে ভাসিতে চলিলাম। ক্রমে শ্বাস নিশ্চেষ্ট, চেতনা বিনষ্ট হইয়া আসিল।

দ্বিতীয় খণ্ড

অমরনাথের কথা

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমার এই অসার জীবনের ক্ষুদ্র কাহিনী লিখিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এ সংসারসাগরে, কোন্ চরে লাগিয়া আমার এই নৌকা ভাঙ্গিয়াছে, তাহা এই বিশ্বচিত্রে আমি আঁকিয়া রাখিব; দেখিয়া নবীন নাবিকেরা সতর্ক হইতে পারিবে।

আমার নিবাস–অথবা পিত্রালয় শান্তিপুর–আমার বর্ত্তমান বাসস্থানের কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। আমি সৎকায়স্থকুলোদ্ভূত, কিন্তু আমার পিতৃকুলে একটি গুরুতর কলঙ্ক ঘটিয়াছিল। আমার খুল্লতাতপত্নী কুলত্যাগিনী হইয়াছিলেন। আমার পিতার ভূসম্পত্তি যাহা ছিল–তদ্দ্বারা অন্য উপায় অবলম্বন না করিয়াও সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা যায়। লোকে তাঁহাকে ধনী বলিয়া গণনা করিত। তিনি আমার শিক্ষার্থ অনেক ধন ব্যয় করিয়াছিলেন। আমিও কিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিখিয়াছিলাম–কিন্তু সে কথায় কাজ নাই। সর্পের মণি থাকে; আমারও বিদ্যা ছিল।

আমার বিবাহযোগ্য বয়স উপস্থিত হইলে আমার অনেক সম্বন্ধ আসিল–কিন্তু কোন সম্বন্ধই পিতার মনোমত হইল না। তাঁহার ইচ্ছা, কন্যা পরম সুন্দরী হইবে, কন্যার পিতা পরম ধনী হইবে এবং কৌলীন্যের নিয়ম সকল বজায় থাকিবে। কিন্তু এরূপ কোন সম্বন্ধ উপস্থিত হইল না। আসল কথা, আমাদিগের কুলকলঙ্ক শুনিয়া কোন বড় লোক আমাকে কন্যাদান করিতে ইচ্ছুক হয়েন নাই। এইরূপ সম্বন্ধ করিতে করিতে আমার পিতার পরলোকপ্রাপ্তি হইল।

পরিশেষে পিতার স্বর্গারোহণের পর আমার এক পিসী এক সম্বন্ধ উপস্থিত করিলেন। গঙ্গাপার, কালিকাপুর নামে এক গ্রাম ছিল। এই ইতিহাসে ভবানীনগর নামে অন্য গ্রামের নাম উত্থাপিত হইবে; এই কালিকাপুর সেই ভবানীনগরের নিকটস্থ গ্রাম। আমার পিসীর শ্বশুরালয় সেই কালিকাপুরে। সেইখানে লবঙ্গ নামে কোন ভদ্রলোকের কন্যার সঙ্গে পিসী আমার সম্বন্ধ উপস্থিত করিলেন।

সম্বন্ধের পূর্ব্বে আমি লবঙ্গকে সর্ব্বদাই দেখিতে পাইতাম। আমার পিসীর বাড়িতে আমি মধ্যে মধ্যে যাইতাম। লবঙ্গকে পিসীর বাড়িতেও দেখিতাম–তাহার পিত্রালয়েও দেখিতাম। মধ্যে মধ্যে লবঙ্গকে শিশুরোধ হইতে "ক"য়ে করাত, "খ"য়ে খরা শিখাইতাম। যখন তাহার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ হইল, তখন হইতে সে আমার কাছে আর আসিত না। কিন্তু সেই সময়ে আমিও তাহারে দেখিবার জন্য অধিকতর উৎসুক হইয়া উঠিলাম। তখন লবঙ্গের বিবাহের বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ হইয়াছিল–লবঙ্গ কলিকা ফোট ফোট হইয়াছিল। চক্ষের চাহনি চঞ্চল অথচ ভীত হইয়া আসিয়াছিল–উচ্চ হাস্য মৃদু এবং ব্রীড়াযুক্ত হইয়া উঠিয়াছিল–দ্রুত গতি মন্থর হইয়া আসিতেছিল। আমি মনে করিতাম, এমন সৌন্দর্য্য কখন দেখি নাই–এ সৌন্দর্য্য যুবতীর অদৃষ্টে কখন ঘটে না। বস্তুতঃ অতীতশৈশব অথচ অপ্রাপ্তযৌবনার সৌন্দর্য্য এবং অস্ফুটবাক্ শিশুর সৌন্দর্য্য, ইহাই মনোহর–যৌবনের সৌন্দর্য্য তাদৃশ নহে। যৌবনে বসনভূষণের ঘটা, হাসি চাহনির ঘটা,–বেণীর দোলনি, বাহুর বলনি, গ্রীবার হেলনি, কথার ছলনি–যুবতীর রূপের বিকাশ একপ্রকার দোকানদারি। আর আমরা যে চক্ষে সে সৌন্দর্য্য দেখি, তাহাও বিকৃত। যে

সৌন্দর্য্যের উপভোগে ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত চিত্তভাবের সংস্পর্শ মাত্র নাই, সেই সৌন্দর্য্যই সৌন্দর্য্য।

এই সময়ে আমাদের কুলকলঙ্ক কন্যাকর্ত্তার কর্ণে প্রবেশ করিল–সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল। আমার হৃদয়পতত্রী সবে এই লবঙ্গলতায় বসিতেছিল–এমত সময় ভবানীনগরের রামসদয় মিত্র আসিয়া লবঙ্গলতা ছিঁড়িয়া লইয়া গেল। তাহার সঙ্গে লবঙ্গলতার বিবাহ হইল। লবঙ্গলাভে নিরাশ হইয়া আমি বড় ক্ষুণ্ন হইলাম।

ইহার কয় বৎসর পরে এমন একটি ঘটনা ঘটিল যে, তাহা আমি বলিতে পারিতেছি না। পশ্চাৎ বলিব কি না, তাহাও স্থির করিতে পারিতেছি না। সেই অবধি আমি গৃহত্যাগ করিলাম। সেই পর্য্যন্ত নানা দেশে ভ্রমণ করিয়াই বেড়াই। কোথাও স্থায়ী হইতে পারি নাই।

কোথাও স্থায়ী হই নাই, কিন্তু মনে করিলেই স্থায়ী হইতে পারিতাম। মনে করিলে কুলীন ব্রাহ্মণের অপেক্ষা অধিক বিবাহ করিতে পারিতাম। আমার সব ছিল–ধন, সম্পদ, বয়স, বিদ্যা, বাহুবল–কিছুরই অভাব ছিল না; অদৃষ্টদোষে, একদিনের দুর্ব্বুদ্ধিদোষে, সকল ত্যাগ করিয়া, আমি এই সুখময় গৃহ–এই উদ্যানতুল্য পুষ্পময় সংসার ত্যাগ করিয়া, বাত্যাতাড়িত পতঙ্গের মত দেশে দেশে বেড়াইলাম। আমি মনে করিলে আমার সেই জন্মভূমিতে রম্য গৃহ রম্য সজ্জায় সাজাইয়া, রঙ্গের পবনে সুখের নিশান উড়াইয়া দিয়া, হাসির বাণে দুঃখরাক্ষসকে বধ করিতে পারিতাম। কিন্তু–

এখন তাই ভাবি, কেন করিলাম না। সুখ দুঃখের বিধান পরের হাতে, কিন্তু মন ত আমার। তরঙ্গ নৌকা ডুবিল বলিয়া, কেন ডুবিয়া রহিলাম–সাঁতার দিয়া ত কূল পাওয়া যায়। আর দুঃখ–দুঃখ কি ? মনের অবস্থা, সে ত নিজের আয়ত্ত। সুখ দুঃখ পরের হাত, না আমার নিজের হাত ? পর কেবল বহির্জগতের কর্ত্তা–অন্তর্জগতে আমি একা কর্ত্তা। আমার রাজ্য লইয়া আমি সুখী হইতে পারি না কেন ? জড়জগৎ জগৎ, অন্তর্জগৎ কি জগৎ নয় ? আপনার মন লইয়া কি থাকা যায় না ? তোমার বাহ্য জগতে কয়টি সামগ্রী আছে, আমার অন্তরে কি বা নাই ? আমার অন্তরে যাহা আছে, তাহা তোমার বাহ্য জগৎ দেখাইবে, সাধ্য কি ? যে কুসুম এ মৃত্তিকায় ফুটে, যে বায়ু এ আকাশে বয়, যে চাঁদ এ গগনে উঠে, যে সাগর এ অন্ধকারে আপনি মাতে, তোমার বাহ্য জগতে তেমন কোথায় ?

তবে কেন, সেই নিশীথকালে, সুষুপ্তা সুন্দরীর সৌন্দর্য্যপ্রভা–দূর হৌক! একদিন নিশীথকালে–এই অসীম পৃথিবী সহসা আমার চক্ষে শুষ্ক বদরীর মত ক্ষুদ্র হইয়া গেল–আমি লুকাইবার স্থান পাইলাম না। দেশে দেশে ফিরিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কালের শীতল প্রলেপে সেই হৃদয়ক্ষত ক্রমে পুরিয়া উঠিতে লাগিল।

কাশীধামে গোবিন্দকান্ত দত্ত নামে কোন সচ্চরিত্র, অতি প্রাচীন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে আমার আলাপ হইল। ইনি বহুকাল হইতে কাশীবাস করিয়া আছেন।

একদা তাঁহার সঙ্গে কথোপকথনকালে পুলিসের অত্যাচারের কথা প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপিত হইল। অনেকে পুলিসের অত্যাচারঘটিত অনেকগুলিন গল্প বলিলেন–দুই একটা বা সত্য, দুই একটা বক্তাদিগের কপোলকল্পিত। গোবিন্দকান্ত বাবু একটি গল্প বলিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এই।

"হরেকৃষ্ণ দাস নামে আমাদিগের গ্রামে একঘর দরিদ্র কায়স্থ ছিল। তাহার একটি কন্যা ভিন্ন অন্য সন্তান ছিল না। তাহার গৃহিণীর মৃত্যু হইয়াছিল, এবং সে নিজেও রুগ্ন। এজন্য সে কন্যাটি আপন শ্যালীপতিকে প্রতিপালন করিতে দিয়াছিল। তাহার কন্যাটির কতকগুলিন স্বর্ণালঙ্কার ছিল। লোভবশতঃ তাহা সে শ্যালীপতিকে দেয় নাই। কিন্তু যখন মৃত্যু উপস্থিত দেখিল, তখন সেই অলঙ্কারগুলি সে আমাকে ডাকিয়া আমার কাছে রাখিল–বলিল যে, 'আমার কন্যার জ্ঞান হইলে তাহাকে দিবেন–এখন দিলে রাজচন্দ্র ইহা আত্মসাৎ করিবে। আমি স্বীকৃত হইলাম। পরে হরেকৃষ্ণের মৃত্যু হইলে সে লাওয়ারেশ মরিয়াছে বলিয়া, নন্দী

ভৃঙ্গী সঙ্গে দেবাদিদেব মহাদেব দারোগা মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরেকৃষ্ণের ঘটী বাটী পাতর টুকনি লাওয়ারেশ মাল বলিয়া হস্তগত করিলেন। কেহ কেহ বলিল যে, হরেকৃষ্ণ লাওয়ারেশ নহে–কলিকাতায় তাহার কন্যা আছে। দারোগা মহাশয় তাহাকে কটু বলিয়া, আজ্ঞা করিলেন, "ওয়ারেশ থাকে, হুজুরে হাজির হইবে।' তখন আমার দুই একজন শত্রু সুযোগ মনে করিয়া বলিয়া দিল যে, গোবিন্দ দত্তের কাছে ইহার স্বর্ণালঙ্কার আছে। আমাকে তলব হইল। আমি তখন দেবাদিদেবের কাছে আসিয়া যুক্তকরে দাঁড়াইলাম। কিছু গালি খাইলাম। আসামীর শ্রেণীতে চালান হইবার গতিক দেখিলাম। বলিব কি ? ঘুষাঘুষির উদ্যোগ দেখিয়া অলঙ্কারগুলি সকল দারোগা মহাশয়ের পাদপদ্মে ঢালিয়া দিলাম, তাহার উপর পঞ্চাশ টাকা নগদ দিয়া নিষ্কৃতি পাইলাম।

"বলাবাহুল্য যে, দারোগা মহাশয় অলঙ্কারগুলি আপন কন্যার ব্যবহারার্থ নিজালয়ে প্রেরণ করিলেন। সাহেবের কাছে তিনি রিপোর্ট করিলেন যে, 'হরেকৃষ্ণ দাসের এক লোটা আর এক দেরকো ভিন্ন অন্য কোন সম্পত্তিই নাই; এবং সে লাওয়ারেশা ফৌত করিয়াছে, তাহার কেহ নাই'।"

হরেকৃষ্ণ দাসের নাম শুনিয়াছিলাম। আমি গোবিন্দ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "ঐ হরেকৃষ্ণ দাসের এক ভাইয়ের নাম মনোহর দাস না ?"

গোবিন্দকান্ত বাবু বলিলেন, "হাঁ। আপনি কি প্রকারে জানিলেন ?"

আমি বিশেষ কিছু বলিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, "হরেকৃষ্ণের শ্যালীপতির নাম কি ?"

গোবিন্দ বাবু বলিলেন, "রাজচন্দ্র দাস।"

আমি। তাহার বাড়ি কোথায় ?

গোবিন্দ বাবু বলিলেন, "কলিকাতায়। কিন্তু কোন্, স্থানে তাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে কন্যাটির নাম কি জানেন ?"

গোবিন্দ বাবু বলিলেন, "হরেকৃষ্ণ তাহার নাম রজনী রাখিয়াছিলেন।"

ইহার অল্প দিন পরেই আমি কাশী পরিত্যাগ করিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথমে আমাকে বুঝিতে হইতেছে, আমি কি খুঁজি। চিত্ত আমার দুঃখময়, এ সংসার আমার পক্ষে অন্ধকার। আজি আমার মৃত্যু হইলে, আমি কাল চাহি না। যদি দুঃখ নিবারণ করিতে না পারিলাম, তবে পুরুষত্ব কি ? কিন্তু ব্যাধির শান্তি করিতে গেলে আগে ব্যাধির নির্ণয় চাহি। দুঃখ নিবারণের আগে আমার দুঃখ কি, তাহা নিরূপণের আবশ্যক।

দুঃখ কি ? অভাব। সকল দুঃখই অভাব। রোগ দুঃখ; কারণ, রোগ স্বাস্থ্যের অভাব। অভাবমাত্রই দুঃখ নহে, তাহা জানি। রোগের অভাব দুঃখ নহে। অভাববিশেষই দুঃখ।

আমার কিসের অভাব ? আমি চাই কি ? মনুষ্যই চায় কি ? ধন ? আমার যথেষ্ট আছে।

যশঃ ? পৃথিবীতে এমন কেহ নাই, যাহার যশ নাই। যে পাকা জুয়াচোর, তাহারও বুদ্ধি সম্বন্ধে যশ আছে। আমি একজন কশাইয়ের যশ শুনিয়াছি–মাংস সম্বন্ধে সে কাহাকেও প্রবঞ্চনা করিত না সে কখন মেষমাংস বলিয়া কাহাকেও কুক্কুরমাংস দেয় নাই। যশ সকলেরই আছে। আবার কাহারও যশ সম্পূর্ণ নহে। বেকনের ঘুষখোর অপবাদ–সক্রেতিস্ অপযশহেতু বধদণ্ডার্হ হইয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির দ্রোণবধে মিথ্যাবাদী–অর্জ্জুন বভ্রুবাহন কর্ত্তৃক পরাভুত। কাইসরকে যে

বিথীনিয়ার রাণী বলিত, সে কথা অদ্যাপি প্রচলিত;–সেক্সপিয়রকে বল্‌টের ভাঁড় বলিয়াছেন। যশ চাহি না।

যশ সাধারণ লোকের মুখে। সাধারণ লোক কোন বিষয়েই বিচারক নহে–কেন না, সাধারণ লোক মূর্খ এবং স্থূলবুদ্ধি। মূর্খ স্থূলবুদ্ধির কাছে যশস্বী হইয়া আমার কি সুখ হইবে ? আমি যশ চাহি না।

মান ? সংসারে এমন লোক কে আছে যে, সে মানিলে সুখী হই ? যে দুই চারি জন আছে, তাহাদিগের কাছে আমার মান আছে। অন্যের কাছে মান–অপমান মাত্র। রাজদরবারে মান–সে কেবল দাসত্বের প্রাধান্যচিহ্ন বলিয়া আমি অগ্রাহ্য করি। আমি মান চাহি না। মান চাহি কেবল আপনার কাছে।

রূপ ? কতটুকু চাই ? কিছু চাই। লোকে দেখিয়া, না নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে। আমাকে দেখিয়া কেহ নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে না। রূপ যাহা আছে, তাহাই আমার যথেষ্ট।

স্বাস্থ্য ? আমার স্বাস্থ্য অদ্যাপি অনন্ত।

বল ? লইয়া কি করিব ? প্রহারের জন্য বল আবশ্যক। আমি কাহাকেও প্রহার করিতে চাহি না।

বুদ্ধি ? এ সংসারে কেহ কখন বুদ্ধির অভাব আছে মনে করে নাই–আমিও করি না। সকলেই আপনাকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলিয়া জানে, আমিও জানি।

বিদ্যা ? ইহার অভাব স্বীকার করি, কিন্তু কেহ কখন বিদ্যার অভাবে আপনাকে অসুখী মনে করে নাই। আমিও করি না।

ধর্ম্ম ? লোকে বলে, ধর্ম্মের অভাব পরকালের দুঃখের কারণ, ইহকালের নহে। লোকের চরিত্রে দেখিতে পাই, অধর্ম্মের অভাবেই দুঃখ। জানি আমি, সে মিথ্যা। কিন্তু জানিয়াও ধর্ম্মকামনা করি না। আমার সে দুঃখ নহে।

প্রণয় ? স্নেহ ? ভালবাসা ? আমি জানি, ইহার অভাবই সুখ–ভালবাসাই দুঃখ। সাক্ষী লবঙ্গলতা।

তবে আমার দুঃখ কিসের ? আমার অভাব কিসের ? আমার কিসের কামনা যে, তাহা লাভে সফল হইয়া দুঃখ নিবারণ করিব ? আমার কাম্য বস্তু কি ?

বুঝিয়াছি। আমার কাম্য বস্তুর অভাবই আমার দুঃখ। আমি বুঝিয়াছি যে, সকলই অসার। তাই আমার কেবল দুঃখ সার।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কিছু কাম্য কি খুঁজিয়া পাই না ? এই অনন্ত সংসার, অসংখ্য রত্নরাজিময়, ইহাতে আমার প্রার্থনার কি কিছু নাই ? যে সংসারে এক একটি দুরবেক্ষণীয় ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ অনন্ত কৌশলের স্থান, অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার, যে জগতে পথিস্থ বালুকার এক এক কণা, অনন্তরত্নপ্রভব নগাধিরাজের ভগ্নাংশ, সে জগতে কি আমার কাম্য বস্তু কিছু নাই। দেখ, আমি কোন্ ছার!

টিণ্ডল, হক্‌সলী, ডার্বিন, এবং লায়ল এক আসনে বসিয়া যাবজ্জীবনে ঐ ক্ষুদ্র নীহারবিন্দুর, ঐ বালুকাকণার বা ঐ শিয়ালকাঁটাফুলটির গুণ বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারেন না–তবু আমার কাম্য বস্তু নাই ? আমি কি ?

দেখ, এই পৃথিবীতে কত কোটি মনুষ্য আছে, তাহা কেহ গণিয়া সংখ্যা করে নাই। বহু কোটি মনুষ্য সন্দেহ নাই–উহার এক একটি মনুষ্য অসংখ্য গুণের আধার। সকলেই ভক্তি, প্রীতি, দয়া, ধর্ম্মাদির আধার–সকলেই পূজ্য, সকলেই অনুসরণীয়। আমার কাম্য কি কেহ নাই ? আমি কি ?

আমার এই বাঞ্ছনীয় পদার্থ ছিল–আজিও আছে। কিন্তু সে বাসনা পূর্ণ হইবার নহে। পূর্ণ হইবার নহে বলিয়া তাহা হৃদয় হইতে অনেক দিন হইল উন্মূলিত করিয়াছি। আর পুনরুজ্জীবিত করিতে চাহি না। অন্য কোন বাঞ্ছনীয় কি সংসারে নাই ?

তাই খুঁজি। কি করিব ?

কয় বৎসর হইতে আমি আপনা আপনি এই প্রশ্ন করিতেছিলাম, উত্তর দিতে পারিতেছিলাম না। যে দুই একজন বন্ধুবান্ধব আছেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, তোমার আপনার কাজ না থাকে, পরের কাজ কর। লোকের যথাসাধ্য উপকার কর।

সে ত প্রাচীন কথা। লোকের উপকার কিসে হয় ? রামের মার ছেলের জ্বর হইয়াছে, নাড়ী টিপিয়া একটু কুইনাইন দাও। রঘো পাগলের গাত্রবস্ত্র নাই, কম্বল কিনিয়া দাও। সস্তার মা বিধবা, মাসিক দাও। সুন্দর নাপিতের ছেলে ইস্কুলে পড়িতে পায় না–তাহার বেতনের আনুকূল্য কর। এই কি পরের উপকার ?

মানিলাম, এই পরের উপকার। কিন্তু এ সকলে কতক্ষণ যায় ? কতটুকু সময় কাটে ? কতটুকু পরিশ্রম হয় ? মানসিক শক্তিসকল কতখানি উত্তেজিত হয় ? আমি এমত বলি না যে, ঐ সকল কার্য্য আমার যথাসাধ্য আমি করিয়া থাকি; কিন্তু যতটুকু করি, তাহাতে আমার বোধ হয় না যে, ইহাতে আমার অভাব পূরণ হইবে। আমার যোগ্য কাজ আমি খুঁজি, যাহাতে আমার মন মজিবে, তাই খুঁজি।

আর এক প্রকারের লোকের উপকারের ঢং উঠিয়াছে। তাহার এক কথায় নাম দিতে হইলে বলিতে হয় “বকাবকি লেখালেখি।” সোসাইটি, ক্লাব, এসোসিয়েশন, সভা, সমাজ, বক্তৃতা, রিজলিউশ্যন, আবেদন, নিবেদন, সমবেদন,–আমি তাহাতে নহি। আমি একদা কোন বন্ধুকে একটি মহাসভার ঐরূপ একখানি আবেদন পড়িতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে, কি পড়িতেছ ? তিনি বলিলেন, “এমন কিছু না, কেবল কাণা ফকির ভিক মাঙ্গে।” এ সকল আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাই–কেবল “কাণা ফকির ভিক মাঙ্গে রে বাবা।”

এই রোগের আর এক প্রকার বিকার আছে। বিধবার বিবাহ দাও, কুলীন ব্রাহ্মণের বিবাহ বন্ধ কর, অল্প বয়সে বিবাহ বন্ধ কর, জাতি উঠাইয়া দেও, স্ত্রীলোকগণ এক্ষণে গোরুর মত গোহালে বাঁধা থাকে–দড়ি খুলিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও, চরিয়া খাক্। আমার গোরু নাই, পরের গোহালের সঙ্গেও আমার বিশেষ সম্বন্ধ নাই। জাতি উঠাইতে আমি বড় রাজি নহি, আমি তত দূর আজিও সুশিক্ষিত হই নাই। আমি এখনও আমার ঝাড়ুদারের সঙ্গে একত্রে বসিয়া খাইতে অনিচ্ছুক, তাহার কন্যা বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক, এবং যে গালি শিরোমণি মহাশয় দিলে নিঃশব্দে সহিব, ঝাড়ুদারের কাছে তাহা সহিতে অনিচ্ছুক। সুতরাং আমার জাতি থাকুক। বিধবা বিবাহ করে করুক, ছেলে পুলেরা আইবুড়ো থাকে থাকুক, কুলীন ব্রাহ্মণ এক পত্নীর যন্ত্রণায় খুশী হয় হউক, আমার আপত্তি নাই; কিন্তু তাহার পোষকতায় লোকের কি হিত হইবে, তাহা আমার বুদ্ধির অতীত।

সুতরাং এ বঙ্গসমাজে আমার কোন কার্য্য নাই। এখানে আমি কেহ নহি–আমি কোথাও নহি। আমি, আমি, এই পর্য্যন্ত; আর কিছু নহি। আমার সেই দুঃখ। আর কিছু দুঃখ–নাই লবঙ্গলতার হস্তলিপি ভুলিয়া যাইতেছি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আমার এইরূপ মনের অবস্থা, আমি এমত সময়ে–কাশীধামে গোবিন্দ দত্তের কাছে রজনীর নাম শুনিলাম। মনে হইল, ঈশ্বর আমাকে, বুঝি একটি গুরুতর কার্য্যের ভার দিলেন। এ সংসারে আমি একটি কার্য্য পাইলাম। রজনীর যথার্থ উপকার চেষ্টা করিলে করা যায়। আমার ত কোন কাজ নাই–এই কাজ কেন করি না। ইহা কি আমার যোগ্য কাজ নহে ?

এখানে শচীন্দ্রের বংশাবলীর পরিচয় কিছু দিতে হইল। শচীন্দ্রনাথের পিতার নাম রামসদয় মিত্র; পিতামহের নাম বাঞ্ছারাম মিত্র; প্রপিতামহের নাম

কেবলরাম মিত্র। তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষের বাস কলিকাতায় নহে–তাঁহার পিতা প্রথমে কলিকাতায় বাস করেন। তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষের বাস ভবানীনগর গ্রামে। তাঁহার প্রপিতামহ দরিদ্র নিঃস্ব ব্যক্তি ছিলেন। পিতামহ, বুদ্ধিবলে ধনসঞ্চয় করিয়া তাঁহাদিগের ভোগ্য ভূসম্পত্তি সকল ক্রয় করিয়াছিলেন।

বাঞ্ছারামের এক পরম বন্ধু ছিলেন, নাম মনোহর দাস। বাঞ্ছারাম মনোহর দাসের সাহায্যেই এই বিভবের অধিপতি হইয়াছিলেন। মনোহর, প্রাণপাত করিয়া তাঁহার কার্য্য করিতেন, নিজে কখন ধনসঞ্চয় করিতেন না। বাঞ্ছারাম তাঁহার এই সকল গুণে অত্যন্ত বাধ্য ছিলেন। মনোহরকে সহোদরের ন্যায় ভালবাসিতেন; এবং মনোহর বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় তাঁহাকে মান্য করিতেন। তাঁহার পিতার সঙ্গে পিতামহের তাদৃশ সম্প্রীতি ছিল না। বোধ হয়, উভয় পক্ষেরই কিছু কিছু দোষ ছিল।

একদা রামসদয়ের সঙ্গে মনোহর দাসের ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। মনোহর দাস বাঞ্ছারামকে বলিলেন যে, রামসদয় তাঁহাকে কোন বিষয়ে সহনাতীত অপমান করিয়াছেন। অপমানের কথা বাঞ্ছারামকে বলিয়া, মনোহর তাঁহার কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে ভবানীনগর হইতে উঠিয়া গেলেন। বাঞ্ছারাম মনোহরকে অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন; মনোহর কিছুই শুনিলেন না। উঠিয়া কোন্ দেশে গিয়া বাস করিলেন, তাহাও কাহাকে জানাইলেন না।

বাঞ্ছারাম রামসদয়ের প্রতি যত স্নেহ করুন বা না করুন, মনোহরকে ততোধিক স্নেহ করিতেন। সুতরাং রামসদয়ের উপর তাঁহার ক্রোধ অপরিসীম হইল। বাঞ্ছারাম অত্যন্ত কটূক্তি করিয়া গালি দিলেন, রামসদয়ও সকল কথা নিঃশব্দে সহ্য করিলেন না।

পিতা পুত্রের বিবাদের ফল এই দাঁড়াইল যে, বাঞ্ছারাম পুত্রকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। পুত্রও গৃহত্যাগ করিয়া, শপথ করিলেন, আর কখনও পিতৃভবনে মুখ দেখাইবেন না। বাঞ্ছারাম রাগ করিয়া এক উইল করিলেন। উইলে লিখিত হইল যে, বাঞ্ছারাম মিত্রের সম্পত্তিতে তস্য পুত্র রামসদয় মিত্র কখন অধিকারী হইবেন না। বাঞ্ছারাম মিত্রের অবর্ত্তমানে মনোহর দাস, মনোহর দাসের অভাবে মনোহরের উত্তরাধিকারিগণ অধিকারী হইবেন; তদভাবে রামসদয়ের পুত্রপৌত্রাদি যথাক্রমে, কিন্তু রামসদয় নহে।

রামসদয় গৃহত্যাগ করিয়া প্রথমা স্ত্রীকে লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। ঐ স্ত্রীর কিছু পিতৃদত্ত অর্থ ছিল। তদবলম্বনে, এবং একজন সজ্জন বণিক্ সাহেবের আনুকূল্যে তিনি বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলেন। লক্ষ্মী সুপ্রসন্না হইলেন; সংসার প্রতিপালনের জন্য তাঁহাকে কোন কষ্ট পাইতে হইল না।

যদি কষ্ট পাইতে হইত, তাহা হইলে বোধ হয়, বাঞ্ছারাম সদয় হইতেন। পুত্রের সুখের অবস্থা শুনিয়া, বৃদ্ধের যে স্নেহাবশেষ ছিল, তাহাও নিবিয়া গেল। পুত্র অভিমানপ্রযুক্ত, পিতা না ডাকিলে, আর যাইব না, ইহা স্থির করিয়া, আর পিতার কোন সম্বাদ লইলেন না। অভক্তি এবং তাচ্ছল্যবশতঃ পুত্র এরূপ করিতেছে বিবেচনা করিয়া, বাঞ্ছারাম তাঁহাকেও আর ডাকিলেন না।

সুতরাং কাহারও রাগ পড়িল না; উইলও অপরিবর্ত্তিত রহিল। এমত কালে হঠাৎ বাঞ্ছারামের স্বর্গপ্রাপ্তি হইল।

রামসদয় শোকাকুল হইলেন; তাঁহার পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎলাভ করিয়া যথাকর্ত্তব্য করেন নাই, এই দুঃখে অনেক দিন ধরিয়া রোদন করিলেন। তিনি আর ভবানীনগর গেলেন না, কলিকাতাতেই পিতৃকৃত্য সম্পন্ন করিলেন। কেন না, এক্ষণে ঐ বাটী মনোহর দাসের হইল।

এদিকে মনোহর দাসের কোন সম্বাদ নাই। পশ্চাৎ জানিতে পারা গেল যে, বাঞ্ছারামের জীবিতাবস্থাতেও মনোহরের কেহ কোন সম্বাদ পায় নাই। মনোহর দাস ভবানীনগর হইতে যে গিয়াছিল, সেই গিয়াছিল; কোথায় গেল, বাঞ্ছারাম তাহার অনেক সন্ধান করিলেন; কিছুতেই কোন সম্বাদ পাইলেন না। তখন তিনি উইলের এক ক্রোড়পত্র সৃজন করিলেন। তাহাতে বিষ্ণুরাম সরকার নামক একজন কলিকাতানিবাসী আত্মীয় কুটুম্বকে উইলের এক্‌জিকিউটর নিযুক্ত করিলেন। তাহাতে কথা রহিল যে, তিনি সযত্নে মনোহর দাসের অনুসন্ধান করিবেন। পশ্চাৎ ফলানুসারে সম্পত্তি যাহার প্রাপ্য, তাহাকে দিবেন।

বিষ্ণুরাম বাবু অতি বিচক্ষণ, নিরপেক্ষ, এবং কর্ম্মঠ ব্যক্তি। তিনি বাঞ্ছারামের মৃত্যু পরেই মনোহর দাসের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অনেক পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া যাহা বাঞ্ছারাম কর্ত্তৃক অনুসন্ধান হয় নাই, তাহার নিগূঢ় কথা পরিজ্ঞাত হইলেন। স্থূল বৃত্তান্তে অনুসন্ধানে এই জানা গেল যে, মনোহর ভবানীনগর হইতে পলাইয়া কিছু কাল সপরিবারে ঢাকা অঞ্চলে গিয়া বাস করেন। পরে সেখানে জীবিকানির্ব্বাহের জন্য কিছু কষ্ট হওয়াতে, কলিকাতায় নৌকাযোগে আসিতেছিলেন, পথিমধ্যে বাত্যায় পতিত হইয়া সপরিবারের জলমগ্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার আর উত্তরাধিকারী ছিল, এমন সন্ধান পাইলেন না।

বিষ্ণুরাম বাবু এ সকল কথার অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া রামসদয়কে দেখাইলেন। তখন বাঞ্ছারামের ভূসম্পত্তি শচীন্দ্রদিগের দুই ভ্রাতার হইল; এবং বিষ্ণুরাম বাবুও তাহা তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

এক্ষণে এই রজনী যদি জীবিত থাকে, তবে যে সম্পত্তি রামসদয় মিত্র ভোগ করিতেছে, তাহা রজনীর। রজনী হয়ত নিতান্ত দরিদ্রাবস্থাপনা। সন্ধান করিয়া দেখা যাউক। আমার কোন কাজ নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বাঙ্গালায় আসার পর একদা কোন গ্রাম্য কুটুম্বের বাড়ি নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম। প্রাতঃকালে গ্রাম পর্য্যটনে গিয়াছিলাম। এক স্থানে অতি মনোহর নিভৃত জঙ্গল ; দয়েল সপ্ত স্বর মিলাইয়া আশ্চর্য্য ঐক্যতানবাদ্য বাজাইতেছে; চারি দিকে বৃক্ষরাজি; ঘনবিন্যস্ত, কোমল শ্যাম পল্লবদলে আচ্ছন্ন; পাতায় পাতায় ঠেসাঠেসি মিশামিশি, শ্যাম রূপের রাশি রাশি; কোথাও কলিকা, কোথাও স্ফুটিত পুষ্প, কোথাও অপক্ক, কোথাও সুপক্ক ফল। সেই বনমধ্যে আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলাম। বনাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, একজন বিকটমূর্ত্তি পুরুষ এক যুবতীকে বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিতেছে।

দেখিবামাত্র, বুঝিলাম, পুরুষ অতি নীচজাতীয় পাষণ্ড—বোধ হয় ডোম কি সিউলি—কোমরে দা। গঠন অত্যন্ত বলবানের মত।

ধীরে ধীরে তাহার পশ্চাদ্ভাগে গেলাম। গিয়া তাহার কক্ষাল হইতে দাখানি টানিয়া লইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত করিলাম! দুষ্ট তখন যুবতীকে ছাড়িয়া দিল—আমার সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল। আমাকে গালি দিল। তাহার দৃষ্টি দেখিয়া আমার শঙ্কা হইল।

বুঝিলাম, এ স্থলে বিলম্ব অকর্ত্তব্য। একেবারে তাহার গলদেশে হস্তার্পণ করিলাম। ছাড়াইয়া সেও আমাকে ধরিল। আমিও তাহাকে পুনর্ব্বার ধরিলাম। তাহার বল অধিক। কিন্তু আমি ভীত হই নাই—বা অস্থির হই নাই। অবকাশ পাইয়া আমি যুবতীকে বলিলাম যে, "তুমি এই সময় পলাও—আমি ইহার উপযুক্ত দণ্ড দিতেছি।"

যুবতী বলিল,—"কোথায় পালাইব ? আমি যে, অন্ধ! এখানকার পথ চিনি না।"

অন্ধ! আমার বল বাড়িল। আমি রজনী নামে একটি অন্ধ কন্যাকে খুঁজিতেছিলাম।

দেখিলাম, সেই বলবান্ পুরুষ আমাকে প্রহার করিতে পারিতেছে না বটে, কিন্তু আমাকে বলপূর্ব্বক টানিয়া লইয়া যাইতেছে। তাহার অভিপ্রায় বুঝিলাম, যে দিকে আমি দা ফেলিয়া দিয়াছিলাম, সেই দিকে সে আমাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। আমি তখন দুষ্টকে ছাড়িয়া দিয়া, অগ্রে গিয়া দা কুড়াইয়া লইলাম। সে এক বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিয়া লইয়া, তাহা ফিরাইয়া আমার হস্তে প্রহার করিল, আমার হস্ত হইতে দা পড়িয়া গেল। সে দা তুলিয়া লইয়া, আমাকে তিন চারি স্থানে আঘাত করিয়া পলাইয়া গেল।

আমি গুরুতর পীড়াপ্রাপ্ত হইয়াছিলাম। বহু কষ্টে আমি কুটুম্বের গৃহাভিমুখে চলিলাম। অন্ধ যুবতী আমার পদশব্দানুসরণ করিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল। কিছু দূর গিয়া আর আমি চলিতে পারিলাম না। পথিক লোকে আমাকে ধরিয়া আমার কুটুম্বের বাড়ীতে রাখিয়া আসিল।

সেই স্থানে আমি কিছু কাল শয্যাগত রহিলাম–অন্য আশ্রয়াভাবেও বটে, এবং আমার দশা কি হয়, তাহা না জানিয়া কোথায় যাইতে পারে না, সে জন্যও বটে, অন্ধ যুবতীও সেইখানে রহিল।

বহু দিনে, বহু কষ্টে, আমি আরোগ্যলাভ করিলাম।

মেয়েটি অন্ধ দেখিয়া অবধিই আমার সন্দেহ হইয়াছিল। যে দিন প্রথম আমার বাক্‌শক্তি হইল, সে আমার রুগ্নশয্যাপার্শ্বে আসিল, সেই দিনই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার নাম কি গা ?"

"রজনী।"

আমি চমকিয়া উঠিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি রাজচন্দ্র দাসের কন্যা ?"

রজনীও বিস্মিতা হইল। বলিল, "আপনি বাবাকে কি চেনেন ?"

আমি স্পষ্টতঃ কোন উত্তর দিলাম না।

আমি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিলে, রজনীকে কলিকাতায় লইয়া গেলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কলিকাতায় গমনকালে আমি একা রজনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলাম না। কুটুম্বগৃহ হইতে তিনকড়ি নামে একজন প্রাচীনা পরিচারিকা সমভিব্যাহারে লইয়া গেলাম। এ সতর্কতা রজনীর মন প্রসন্ন করিবার জন্য। গমনকালে রজনীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "রজনী–তোমাদের বাড়ি কলিকাতায়–কিন্তু তুমি এখানে আসিলে কি প্রকারে ?"

রজনী বলিল, "আমাকে কি সকল কথা বলিতে হইবে ?"

আমি বলিলাম, "তোমার যদি ইচ্ছা না হয়, তবে বলিও না।"

বস্তুতঃ এই অন্ধ স্ত্রীলোকের বুদ্ধি, বিবেচনা এবং সরলতায় আমি বিশেষ প্রীত হইয়াছিলাম। তাহাকে কোন প্রকার ক্লেশ দিবার আমার ইচ্ছা ছিল না। রজনী বলিল, "যদি অনুমতি করিলেন, তবে কতক কথা গোপন রাখিব। গোপাল বাবু বলিয়া আমার একজন প্রতিবাসী আছেন। তাঁহার স্ত্রী চাঁপা। চাঁপার সঙ্গে আমার হঠাৎ পরিচয় হইয়াছিল। তাহার বাপের বাড়ী হুগলী। সে আমাকে বলিল, 'আমার বাপের বাড়ি যাইবে?' আমি রাজি হইলাম। সে আমাকে একদিন সঙ্গে করিয়া গোপাল বাবুর বাড়ীতে লইয়া আসিল। কিন্তু তাহার বাপের বাড়ী আমাকে পাঠাইবার সময় আপনি আমার সঙ্গে আসিল না। তাহার ভাই হীরালালকে আমার সঙ্গে দিল। হীরালালও নৌকা করিয়া আমায় হুগলী লইয়া চলিল।"

আমি এইখানে বুঝিতে পারিলাম যে, রজনী হীরালাল সম্বন্ধে কথা গোপন করিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি তাহার সঙ্গে গেলে ?"

রজনী বলিল, "ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু যাইতে হইল। কেন যাইতে হইল, তাহা বলিতে পারিব না। পথিমধ্যে হীরালাল আমার উপর অত্যাচার করিতে লাগিল। আমি তাহার বাধ্য নহি দেখিয়া, সে আমাকে বিনাশ করিবার জন্য, গঙ্গার এক চরে নামাইয়া দিয়া নৌকা লইয়া চলিয়া গেল।"

রজনী চুপ করিল—আমি হীরালালকে ছদ্মবেশী রাক্ষস মনে করিয়া, মনে মনে তাহার রূপ ধ্যান করিতে লাগিলাম—তার পর রজনী বলিতে লাগিল, “সে চলিয়া গেলে আমি ডুবিয়া মরিব বলিয়া জলে ডুবিলাম।”

আমি বলিলাম, “কেন ? তুমি কি হীরালালকে এত ভালবাসিতে ?”

রজনী ভ্রূকুটী করিল। বলিল, “তিলার্দ্ধ না। আমি পৃথিবীতে কাহারও উপর এত বিরক্ত নহি।”

“তবে ডুবিয়া মরিতে গেলে কেন ?”

“আমার যে দুঃখ, তাহা আপনাকে বলিতে পারি না।”

“আচ্ছা। বলিয়া যাও।”

“আমি জলে ডুবিয়া ভাসিয়া উঠিলাম। একখানা গহনার নৌকা যাইতেছিল। সেই নৌকার লোক আমাকে ভাসিতে দেখিয়া উঠাইল। যে গ্রামে আপনার সহিত সাক্ষাৎ, সেইখানে একজন আরোহী নামিল। সে নামিবার সময়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, ‘তুমি কোথায় নামিবে ?’ আমি বলিলাম, ‘আমাকে যেখানে নামাইয়া দিবে, আমি সেইখানে নামিব।’ তখন সে জিজ্ঞাসা করিল, ‘তোমার বাড়ি কোথায় ?’ আমি বলিলাম, ‘কলিকাতায়।’ সে বলিল, ‘আমি কালি আবার কলিকাতায় যাইব। তুমি আজ আমার সঙ্গে আইস। আজি আমার বাড়ি থাকিবে। কালি তোমাকে কলিকাতায় রাখিয়া আসিব।’ আমি আনন্দিত হইয়া তাহার সঙ্গে উঠিলাম। সে আমাকে সঙ্গে লইয়া চলিল। তার পর আপনি সব জানেন।”

আমি বলিলাম, “আমি যাহার হাত হইতে তোমাকে মুক্ত করিয়াছিলাম, সে কি সেই ?”

“সে সেই।”

আমি রজনীকে কলিকাতায় আনিয়া, তাহার কথিত স্থানে অন্বেষণ করিয়া, রাজচন্দ্র দাসের বাড়ী পাইলাম। সেইখানে রজনীকে লইয়া গেলাম।

রাজচন্দ্র কন্যা পাইয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিল। তাহার স্ত্রী অনেক রোদন করিল। উহারা আমার কাছে রজনীর বৃত্তান্ত সবিশেষ শুনিয়া বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল।

পরে রাজচন্দ্রকে আমি নিভৃতে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “তোমার কন্যা গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিল কেন জান ?”

রাজচন্দ্র বলিল, “না। আমি তাহা সর্ব্বদাই ভাবি, কিন্তু কিছুই ঠিকানা করিতে পারি নাই।”

আমি বলিলাম, “রজনী জলে ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিল কি দুঃখে জান ?”

রাজচন্দ্র বিস্মিত হইল। বলিল, “রজনীর এমন কি দুঃখ, কিছুই ত ভাবিয়া পাই না। সে অন্ধ, এটি বড় দুঃখ বটে, কিন্তু তার জন্য এত দিনের পর ডুবিয়া মরিতে যাইবে কেন ? তবে, এত বড় মেয়ে, আজিও তাহার বিবাহ হয় নাই। কিন্তু তাহার জন্যও নয়। তাহার ত সম্বন্ধ করিয়া বিবাহ দিতেছিলাম। বিবাহের আগের রাত্রেই পলাইয়াছিল।”

আমি নূতন কথা পাইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, “সে পলাইয়াছিল ?”

রাজ। হাঁ।

আমি। তোমাদিগকে না বলিয়া ?

রাজ। কাহাকেও না বলিয়া।

আমি। কাহার সহিত সম্বন্ধ করিয়াছিলে ?

রাজ। গোপাল বাবুর সঙ্গে।

আমি। কে গোপাল বাবু ? চাঁপার স্বামী ?

রাজ। আপনি সবই ত জানেন। সেই বটে।

আমি একটু আলো দেখিলাম। তবে চাঁপা সপত্নীযন্ত্রণাভয়ে রজনীকে প্রবঞ্চনা করিয়া ভ্রাতৃসঙ্গে হুগলী পাঠাইয়াছিল। বোধ হয়, তাহারই পরামর্শে হীরালাল উহার বিনাশে উদ্যোগ পাইয়াছিল।

সে কথা কিছু না বলিয়া রাজচন্দ্রকে বলিলাম, “আমি সবই জানি। আমি আরও যাহা জানি, তোমায় বলিতেছি। তুমি কিছু লুকাইও না।”

রাজ। কি–আজ্ঞা করুন।

আমি। রজনী তোমার কন্যা নহে।

রাজচন্দ্র বিস্মিত হইল। বলিল, “সে কি! আমার মেয়ে নয় ত কাহার ?”

“হরেকৃষ্ণ দাসের।”

রাজচন্দ্র কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। শেষে বলিল, “আপনি কে, তাহা জানি না। কিন্তু আপনার পায়ে পড়ি, এ কথা রজনীকে বলিবেন না।”

আমি। এখন বলিব না। কিন্তু বলিতে হইবে। আমি যাহা জিজ্ঞাসা করি, তাহার সত্য উত্তর দাও। যখন হরেকৃষ্ণ মরিয়া যায়, তখন রজনীর কিছু অলঙ্কার ছিল ?

রাজচন্দ্র ভীত হইল। বলিল, “আমি ত তাহার অলঙ্কারের কথা কিছু জানি না। অলঙ্কার কিছুই পাই নাই।”

আমি। হরেকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তুমি তাহার ত্যক্ত সম্পত্তির সন্ধানে সে দেশে আর গিয়াছিলে ?

রাজ। হাঁ, গিয়াছিলাম। গিয়া শুনিলাম, হরেকৃষ্ণের যাহা কিছু ছিল তাহা পুলিসে লইয়া গিয়াছে।

আমি। তাহাতে তুমি কি করিলে ?

রাজ। আমি আর কি করিব ? আমি পুলিসকে বড় ভয় করি, রজনীর বালাচুরি মোকদ্দমায় বড় ভুগিয়াছিলাম। আমি পুলিসের নাম শুনিয়া আর কিছু বলিলাম না।

আমি। রজনীর বালাচুরি মোকদ্দমা কিরূপ ?

রাজ। রজনীর অন্নপ্রাশনের সময় তাহার বালা চুরি গিয়াছিল। চোর ধরা পড়িয়াছিল। বর্দ্ধমানে তাহার মোকদ্দমা হইয়াছিল। এই কলিকাতা হইতে বর্দ্ধমানে আমাকে সাক্ষ্য দিতে যাইতে হইয়াছিল। বড় ভুগিয়াছিলাম।

আমি পথ দেখিতে পাইলাম।

তৃতীয় খণ্ড

শচীন্দ্র বক্তা

প্রথম পরিচ্ছেদ

এ ভার আমার প্রতি হইয়াছে–রজনীর জীবনচরিত্রের এ অংশ আমাকে লিখিতে হইবে। লিখিব।

আমি রজনীর বিবাহের সকল উদ্যোগ করিয়াছিলাম–বিবাহের দিন প্রাতে শুনিলাম যে, রজনী পলাইয়াছে, তাহাকে আর পাওয়া যায় না। তাহার অনেক অনুসন্ধান করিলাম, পাইলাম না। কেহ বলিল, সে ভ্রষ্টা। আমি বিশ্বাস করিলাম না। আমি তাহাকে অনেক বার দেখিয়াছিলাম–শপথ করিতে পারি, সে কখন ভ্রষ্টা হইতে পারে না। তবে ইহা হইতে পারে যে, সে কুমারী, কৌমার্য্যাবস্থাতেই কাহারও প্রণয়াসক্ত হইয়া বিবাহাশঙ্কায় গৃহত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু ইহাতেও দুইটি আপত্তি; প্রথম, সে অন্ধ, সে কি প্রকারে সাহস করিয়া আশ্রয় ত্যাগ করিয়া যাইবে ? দ্বিতীয়তঃ, যে অন্ধ, সে কি প্রণয়াসক্ত হইতে পারে ? মনে করিলাম, কদাচ না। কেহ হাসিও না, আমার মত গণ্ডমুর্খ অনেক আছে। আমরা খান দুই তিন বহি পড়িয়া, মনে করি, জগতের চেতনাচেতনের গূঢ়াদপি গূঢ় তত্ত্ব সকলই নখদর্পণ করিয়া ফেলিয়াছি, যাহা আমাদের বুদ্ধিতে ধরে না, তাহা বিশ্বাস করি না। ঈশ্বর মানি না, কেন না, আমাদের ক্ষুদ্র বিচারশক্তিতে যে বৃহত্তত্ত্বের মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারি না। অন্ধের রূপোন্মাদ কি প্রকারে বুঝিব ?

সন্ধান করিতে করিতে জানিলাম যে, যে রাত্রি হইতে রজনী অদৃশ্য হইয়াছে, সেই রাত্রি হইতে হীরালালও অদৃশ্য হইয়াছে। সকলে বলিতে লাগিল, হীরালালের সঙ্গে সে কুলত্যাগ করিয়া গিয়াছে। অগত্যা আমি এই সিদ্ধান্ত করিলাম যে, হীরালাল রজনীকে ফাঁকি দিয়া লইয়া গিয়াছে। রজনী পরমা সুন্দরী; কাণা হউক, এমন লোক নাই, যে তাহার রূপে মুগ্ধ হইবে না। হীরালাল তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া, তাহাকে বঞ্চনা করিয়া লইয়া গিয়াছে। অন্ধকে বঞ্চনা করা বড় সুসাধ্য।

কিছুদিন পরে হীরালাল দেখা দিল। আমি তাহাকে বলিলাম, "তুমি রজনীর সম্বাদ জান ?"–সে বলিল, "না।"

কি করিব। নালিশ, ফরিয়াদ হইতে পারে না। আমার জ্যেষ্ঠকে বলিলাম। জ্যেষ্ঠ বলিলেন, "রাস্কালকে মার।" কিন্তু মারিয়া কি হইবে ? আমি সম্বাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিতে আরম্ভ করিলাম। যে রজনীর সন্ধান দিবে, তাহাকে অর্থ পুরস্কার দিব, ঘোষণা করিলাম। কিছু ফল ফলিল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রজনী জন্মান্ধ, কিন্তু তাহার চক্ষু দেখিলে অন্ধ বলিয়া বোধ হয় না। চক্ষে দেখিতে কোন দোষ নাই। চক্ষু বৃহৎ, সুনীল, ভ্রমরকৃষ্ণতারাবিশিষ্ট। অতি সুন্দর চক্ষু–কিন্তু কটাক্ষ নাই। চাক্ষুষ স্নায়ুর দোষে অন্ধ। স্নায়ুর নিশ্চেষ্টতাবশতঃ রেটিনাস্থিত প্রতিবিম্ব মস্তিষ্কে গৃহীত হয় না। রজনী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী; বর্ণ উদ্ভেদ-প্রমুখ নিতান্ত নবীন কদলীপত্রের ন্যায় গৌর, গঠন বর্ষাজলপূর্ণ তরঙ্গিণীর ন্যায় সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত; মুখকান্তি গম্ভীর; গতি, অঙ্গভঙ্গী সকল মৃদু, স্থির এবং অন্ধতাবশতঃ সর্ব্বদা সঙ্কোচজ্ঞাপক; হাস্য দুঃখময়। সচরাচর এই স্থিরপ্রকৃতি সুন্দর শরীরে সেই কটাক্ষহীন দৃষ্টি দেখিয়া কোন ভাস্কর্য্যপটু শিল্পকরের যত্ননির্ম্মিত প্রস্তরময়ী স্ত্রীমূর্ত্তি বলিয়া বোধ হইত।

রজনীকে প্রথম দেখিয়াই আমার বিশ্বাস হইয়াছিল যে, এই সৌন্দর্য্য অনিন্দনীয় হইলেও মুগ্ধকর নহে। রজনী রূপবতী, কিন্তু তাহার রূপ দেখিয়া কেহ কখন

পাগল হইবে না। তাহার চক্ষের সে মোহিনী গতি নাই। সৌন্দর্য্য দেখিয়া লোকে প্রশংসা করিবে; বোধ হয় সে মূর্ত্তি সহজে ভুলিবেও না; কেন না, সে স্থির, গম্ভীর কান্তির একটু অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি আছে। কিন্তু সেই আকর্ষণ অন্যবিধ; ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। যাহাকে "পঞ্চবাণ" বলে, রজনীর রূপের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। নাই কি ?

সে যাহাই হউক—আমি মধ্যে মধ্যে চিন্তা করিতাম—রজনীর দশা কি হইবে ? সে ইতর লোকের কন্যা, কিন্তু তাহাকে দেখিয়াই বোধ হয় যে, সে ইতর প্রকৃতিবিশিষ্ট নহে। ইতর লোক ভিন্ন, তাহার অন্যত্র বিবাহের সম্ভাবনা নাই। ইতর লোকের সঙ্গেও এত কালে বিবাহ ঘটে নাই। দরিদ্রের ভার্য্যা-গৃহকর্ম্মের জন্য, যে ভার্য্যার অন্ধতানিবন্ধন, গৃহকর্ম্মের সাহায্য হইবে না—তাহাকে কোন্ দরিদ্র বিবাহ করিবে ? কিন্তু ইতর লোক ভিন্ন এই ইতরবৃত্তিপরায়ণ কায়স্থের কন্যা কে বিবাহ করিবে ? তাহাতে আবার এ অন্ধ। এরূপ স্বামীর সহবাসে রজনীর দুঃখ ভিন্ন সুখের সম্ভাবনা নাই। দুশ্ছেদ্য কণ্টক-কানন মধ্যে যত্নপালনীয় উদ্যানপুষ্পের জন্মের নায়, এই রজনীর পুষ্পবিক্রেতার গৃহে জন্ম ঘটিয়াছে। কণ্টকাবৃত হইয়াই ইহাকে মরিতে হইবে। তবে আমি গোপালের সঙ্গে ইহার বিবাহ দিবার জন্য এত ব্যস্ত কেন ? ঠিক জানি না। তবে ছোট মার দৌরাত্ম্য বড়; তাঁহারই উত্তেজনাতে ইহার বিবাহ দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আর বলিতে কি, যাহাকে স্বয়ং বিবাহ করিতে না পারি, তাহার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করে।

এ কথা শুনিয়া অনেক সুন্দরী মধুর হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তোমার মনে মনে রজনীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা আছে কি ? না, সে ইচ্ছা নাই। রজনী সুন্দরী হইলেও অন্ধ; রজনী পুষ্পবিক্রেতার কন্যা এবং রজনী অশিক্ষিতা। রজনীকে আমি বিবাহ করিতে পারি না; ইচ্ছাও নাই। আমার বিবাহে অনিচ্ছাও নাই। তবে মনোমত কন্যা পাই না। আমি যাহাকে বিবাহ করিব, সে রজনীর মত সুন্দরী হইবে, অথচ বিদ্যুৎকটাক্ষবর্ষিণী হইবে; বংশমর্য্যাদায় শাহ আলমের বা মল্হররাও হুল্কারের প্রপরাপসং* -পৌত্রী হইবে, বিদ্যায় লীলাবতী, বা শাপভ্রষ্টা সরস্বতী হইবে; এবং পতিভক্তিতে সাবিত্রী হইবে; চরিত্রে লক্ষ্মী, রন্ধনে দ্রৌপদী, আদরে সত্যভামা এবং গৃহকর্ম্মে গদার মা। আমি পান খাইবার সময়ে পানের লবঙ্গ খুলিয়া দিবে, তামাকু খাইবার সময়ে হুঁকায় কলিকা আছে কি না, বলিয়া দিবে, আহারের সময়ে মাছের কাঁটা বাছিয়া দিবে, এবং স্নানের পর গা মুছিয়াছি কি না, তদারক করিবে। আমি চা খাইবার সময়ে, দোয়াতের ভিতরে চামচে পুরিয়া চার অনুসন্ধান না করি, এবং কালির অনুসন্ধানে চার পাত্রমধ্যে কলম না দিই, তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকিবে; পিক্দানিতে টাকা রাখিয়া বাক্সের ভিতর ছেপ না ফেলি, তাহার খবরদারি করিবে। বন্ধুকে পত্র লিখিয়া আপনার নামে শিরোনামা দিলে, সংশোধন করাইয়া লইবে, পয়সা দিতে টাকা দিতেছি কি না, খবর লইবে, নোটের পিঠে দোকানের চিঠি কাটিতেছি কি না দেখিবে, এবং তামাসা করিবার সময়ে বিয়ানের নামের পরিবর্ত্তে ভক্তিমতী প্রতিবাসিনীর নাম করিলে, ভুল সংশোধন করিয়া লইবে। ঔষধ খাইতে ফুলেল তৈল না খাই, চাকরাণীর নাম করিয়া ডাকিতে, হৌসের সাহেবের মেমের নাম না ধরি, এ সকল বিষয়ে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবে। এমত কন্যা পাই, তবে বিবাহ করি। আপনারা যে ইনি ওঁকে টিপিয়া হাসিতেছেন, আপনাদের মধ্যে যদি কেহ অবিবাহিতা এবং এই সকল গুণে গুণবতী থাকেন, তবে বলুন, আমি পুরোহিত ডাকি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শেষে রাজচন্দ্র দাসের কাছে শুনিতে পাইলাম যে, রজনীকে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু রাজচন্দ্র দাস এ বিষয়ে আমাদিগের সঙ্গে বড় চমৎকার ব্যবহার করিতে

---

* প্রপরাপসং=প্র পরা অপ সং

লাগিল। রজনীকে কোথায় পাওয়া গেল, কি প্রকারে পাওয়া গেল, তাহা কিছুই বলিল না। আমরা অনেক জিজ্ঞাসা করিলাম, কিছুতেই কোন কথা বাহির করিতে পারিলাম না। সে কেনই বা গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, তাহাও জিজ্ঞাসাবাদ করিলাম, তাহাও বলিল না। তাহার স্ত্রীও ঐরূপ–ছোট মা, সূচীর ন্যায় লোকের মনের ভিতর প্রবেশ করেন, কিন্তু তাহার কাছ হইতে কোন কথাই বাহির করিতে পারিলেন না। রজনী স্বয়ং আর আমাদের বাড়ীতে আসিত না। কেন আসিত না, তাহাও কিছু জানিতে পারিলাম না। শেষে রাজচন্দ্র ও তাহার স্ত্রীও আমাদিগের বাড়ী আসা পরিত্যাগ করিল। ছোট মা কিছু দুঃখিত হইয়া তাহাদিগের অনুসন্ধানে লোক পাঠাইলেন। লোক ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে, উহারা সপরিবারে অন্যত্র উঠিয়া গিয়াছে, সাবেক বাড়ীতে আর নাই। কোথায় গিয়াছে, তাহার কোন ঠিকানা করিতে পারিলাম না।

ইহার এক মাস পরে, একজন ভদ্রলোক আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তিনি আসিয়াই, আপনি আত্মপরিচয় দিলেন। "আমার নিবাস কলিকাতায় নহে। আমার নাম অমরনাথ ঘোষ, আমার নিবাস শান্তিপুর।"

তখন আমি তাঁহার সঙ্গে কথোপকথনে নিযুক্ত হইলাম। কি জন্য তিনি আসিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। তিনিও প্রথমে কিছু বলিলেন না। সুতরাং সামাজিক ও রাজকীয় বিষয়ঘটিত নানা কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। দেখিলাম, তিনি কথাবার্ত্তায় অত্যন্ত বিচক্ষণ। তাঁহার বুদ্ধি মার্জ্জিত, শিক্ষা সম্পূর্ণ, এবং চিন্তা বহুদূরগামিনী। কথাবার্ত্তায় একটু অবসর পাইয়া, তিনি আমার টেবিলের উপর স্থিত "সেক্ষপিয়র গেলেরির" পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। ততক্ষণ আমি অমরনাথকে দেখিয়া লইতে লাগিলাম। অমরনাথ দেখিতে সুপুরুষ; গৌরবর্ণ কিঞ্চিৎ খর্ব্ব, স্থূলও নহে, শীর্ণও নহে; বড় বড় চক্ষু, কেশগুলি সূক্ষ্ম, কুঞ্চিত, যত্নরঞ্জিত। বেশভূষার পারিপাট্যের বাড়াবাড়ি নাই, কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বটে। তাঁহার কথা কহিবার ভঙ্গী অতি মনোহর; কণ্ঠ অতি সুমধুর। দেখিয়া বুঝিলাম, লোক অতি সুচতুর।

সেক্ষপিয়র গেলেরির পাতা উল্টান শেষ হইলে অমরনাথ নিজ প্রয়োজনের কথা কিছু না বলিয়া, ঐ পুস্তকস্থিত চিত্রসকলের সমালোচনা আরম্ভ করিলেন। আমাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, যাহা বাক্য এবং কার্য্যদ্বারা চিত্রিত হইয়াছে, তাহা চিত্রফলকে চিত্রিত করিতে চেষ্টা পাওয়া ধৃষ্টতার কাজ। সে চিত্র কখনই সম্পূর্ণ হইতে পারে না; এবং এ সকল চিত্রও সম্পূর্ণ নহে, ডেস্‌ডিমনার চিত্র দেখাইয়া কহিলেন, আপনি এই চিত্র ধৈর্য্য, মাধুর্য্য, নম্রতা পাইতেছেন, কিন্তু ধৈর্য্যের সহিত সে সাহস কৈ? নম্রতার সঙ্গে সে সতীত্বের অহঙ্কার কই? জুলিয়েটের মূর্ত্তি দেখাইয়া কহিলেন, এ নবযুবতীর মূর্ত্তি বটে, কিন্তু ইহাতে জুলিয়েটের নবযৌবনের অদমনীয় চাঞ্চল্য কই?

অমরনাথ এইরূপ কত বলিতে লাগিলেন। সেক্ষপিয়রের নায়িকাগণ হইতে শকুন্তলা, সীতা কাদম্বরী, বাসবদত্তা, রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি আসিয়া পড়িল। অমরনাথ একে একে তাঁহাদিগের চরিত্রের বিশ্লেষণ করিলেন। প্রাচীন সাহিত্যের কথায় ক্রমে প্রাচীন ইতিহাসের কথা আসিয়া পড়িল, তৎপ্রসঙ্গে তাসিতস, প্লুটার্ক, থুকিদিদিস প্রভৃতির অপূর্ব্ব সমালোচনার অবতারণা হইল। প্রাচীন ইতিবৃত্ত-লেখকদিগের মত লইয়া অমরনাথ কোমৎের ত্রৈকালিক উন্নতিসম্বন্ধীয় মতের সমর্থন করিলেন। কোম্‌ৎ হইতে তাঁহার সমালোচক মিল ও হক্‌স্‌লীর কথা আসিল। হক্‌স্‌লী হইতে ওয়েন ও ডারুইন, ডারুইন হইতে বুকনেয়র সোপেনহয়র প্রভৃতির সমালোচনা আসিল। অমরনাথ অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যস্রোতঃ আমার কর্ণরন্ধ্রে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। আমি মুগ্ধ হইয়া আসল কথা ভুলিয়া গেলাম।

বেলা গেল দেখিয়া, অমরনাথ বলিলেন, "মহাশয়কে আর বিরক্ত করিব না। যে জন্য আসিয়াছিলাম, তাহা এখনও বলা হয় নাই। রাজচন্দ্র দাস যে আপনাদিগকে ফুল বেচিত, তাহার একটি কন্যা আছে?"

আমি বলিলাম, “আছে বোধ হয়।”

অমরনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “বোধ হয় নয়, সে আছে। আমি তাহাকে বিবাহ করিব স্থির করিয়াছি।”

আমি অবাক হইলাম। অমরনাথ বলিতে লাগিলেন, “আমি রাজচন্দ্রের নিকটে এই কথা বলিতেই গিয়াছিলাম। তাহাকে বলা হইয়াছে। এক্ষণে আপনাদিগের সঙ্গে একটা কথা আছে। যে কথা বলিব, তাহা মহাশয়ের পিতার কাছে বলাই আমার উচিত; কেন না, তিনি কর্ত্তা। কিন্তু আমি যাহা বলিব, তাহাতে আপনাদিগের রাগ করিবার কথা। আপনি সর্ব্বাপেক্ষা স্থিরস্বভাব এবং ধর্ম্মজ্ঞ, এজন্য আপনাকেই বলিতেছি।”

আমি বলিলাম, “কি কথা মহাশয় ?”

অমর। রজনীর কিছু বিষয় আছে।

আমি। সে কি ? সে যে রাজচন্দ্রের কন্যা।

অমর। রাজচন্দ্রের পালিত কন্যা মাত্র।

আমি। তবে সে কাহার কন্যা ? কোথায় বিষয় পাইল ? এ কথা আমরা এতদিন শুনিলাম না কেন ?

অমর। আপনারা যে সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন, ইহাই রজনীর। রজনী মনোহর দাসের ভ্রাতুষ্কন্যা।

একবার, প্রথমে চমকিয়া উঠিলাম। তার পর বুঝিলাম যে, কোন জালসাজ জুয়াচোরের হাতে পড়িয়াছি। প্রকাশ্যে উচ্চৈঃহাস্য করিয়া বলিলাম, “মহাশয়কে নিষ্কর্ম্মা লোক বলিয়া বোধ হইতেছে। আমার অনেক কর্ম্ম আছে। এক্ষণে আপনার সঙ্গে রহস্যের আমার অবসর নাই। আপনি গৃহে গমন করুন।”

অমরনাথ বলিল, “তবে উকীলের মুখে সম্বাদ শুনিবেন।”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এদিকে বিষ্ণুরাম বাবু সম্বাদ পাঠাইয়া দিলেন যে, মনোহর, দাসের উত্তরাধিকারী উপস্থিত হইয়াছে–বিষয় ছাড়িয়া দিতে হইবে। অমরনাথ তবে জুয়াচোর জালসাজ নহে ?

কে উত্তরাধিকারী, তাহা বিষ্ণুরাম বাবু প্রথমে কিছু বলেন নাই। কিন্তু অমরনাথের কথা স্মরণ হইল। বুঝি রজনীই উত্তরাধিকারিণী। যে ব্যক্তি দাবিদার, সে যে মনোহর দাসের যথার্থ উত্তরাধিকারী, তদ্বিষয়ে নিশ্চয়তা আছে কি না, ইহা জানিবার জন্য বিষ্ণুরাম বাবুর কাছে গেলাম। আমি বলিলাম, “মহাশয়, পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, মনোহর দাস সপরিবারে জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। তাহার প্রমাণও আছে। তবে তাহার আবার ওয়ারিশ আসিল কোথা হইতে ?”

বিষ্ণুরাম বাবু বলিলেন, “হরেকৃষ্ণ দাস নামে তাহার এক ভাই ছিল, জানেন বোধ হয়।”

আমি। তা ত জানি। কিন্তু সেও ত মরিয়াছে।

বিষ্ণু। বটে, কিন্তু মনোহরের পর মরিয়াছে। সুতরাং সে বিষয়ের অধিকারী হইয়া মরিয়াছে।

আমি। তা হৌক, কিন্তু হরেকৃষ্ণেরও ত এক্ষণে কেহ নাই ?

বিষ্ণু। পূর্ব্বে তাহাই মনে করিয়া আপনাদিগকে বিষয় ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে জানিতেছি যে, তাহার এক কন্যা আছে।

আমি। তবে এত দিন সে কন্যার কোন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় নাই কেন?

বিষ্ণু। হরেকৃষ্ণের স্ত্রী তাহার পূর্ব্বে মরে; স্ত্রীর মৃত্যুর পরে শিশুকন্যাকে পালন করিতে অক্ষম হইয়া হরেকৃষ্ণ কন্যাটিকে তাহার শ্যালীকে দান করে। তাহার শ্যালী ঐ কন্যাটিকে আত্মকন্যাবৎ প্রতিপালন করে, এবং আপনার বলিয়া পরিচয় দেয়। হরেকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তি লাওয়ারেশ বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকর্ত্তৃক গৃহীত হওয়ায় প্রমাণ পাইয়া, আমি হরেকৃষ্ণকে লাওয়ারেশ মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে হরেকৃষ্ণের একজন প্রতিবাসী আমার নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহার কন্যার কথা প্রকাশ করিয়াছে। আমি তাহার প্রদত্ত সন্ধানের অনুসরণ করিয়া জানিয়াছি যে, তাহার কন্যা আছে বটে।

আমি বলিলাম, "যে হয় একটা মেয়ে ধরিয়া হরেকৃষ্ণ দাসের কন্যা বলিয়া ধূর্ত্ত লোক উপস্থিত করিতে পারে। কিন্তু সে যে যথার্থ হরেকৃষ্ণ দাসের কন্যা, তাহার কিছু প্রমাণ আছে কি?"

"আছে।" বলিয়া বিষ্ণুরাম বাবু আমাকে একটা কাগজ দেখিতে দিলেন, বলিলেন, "এ বিষয়ে যে যে প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা উহাতে ইয়াদ দাস্ত করিয়া রাখিয়াছি।"

আমি ঐ কাগজ লইয়া পড়িতে লাগিলাম। তাহাতে পাইলাম যে, হরেকৃষ্ণ দাসের শ্যালীপতি রাজচন্দ্র দাস এবং হরেকৃষ্ণের কন্যার নাম রজনী।

প্রমাণ যাহা দেখিলাম, তাহা ভয়ানক বটে। আমরা এত দিন অন্ধ রজনীর ধনে ধনী হইয়া তাহাকে দরিদ্র বলিয়া ঘৃণা করিতেছিলাম।

বিষ্ণুরাম একটি জোবানবন্দীর জাবেতা নকল আমার হাতে দিয়া বলিলেন, এক্ষণে দেখুন, এই জোবানবন্দী কাহার?"

আমি পড়িয়া দেখিলাম যে, জোবানবন্দীর বক্তা হরেকৃষ্ণ দাস। ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে তিনি এক বালাচুরির মোকদ্দমায় এই জোবানবন্দী দিতেছেন। জোবানবন্দীতে পিতার নাম ও বাসস্থান লেখা থাকে; তাহাও পড়িয়া দেখিলাম। তাহা মনোহর দাসের পিতার নাম ও বাসস্থানের সঙ্গে মিলিল। বিষ্ণুরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "মনোহর দাসের ভাই হরেকৃষ্ণের এই জোবানবন্দী বলিয়া আপনার বোধ হইতেছে কি না?"

আমি। বোধ হইতেছে।

বিষ্ণু। যদি সংশয় থাকে, তবে এখনই তাহা ভঞ্জন হইবে। পড়িয়া যাউন।

পড়িতে লাগিলাম যে, সে বলিতেছে, "আমার ছয় মাসের একটি কন্যা আছে। এক সপ্তাহ হইল, তাহার অন্নপ্রাশন দিয়াছি। অন্নপ্রাশনের দিন বৈকালে তাহার বালা চুরি গিয়াছে।"

এই পর্য্যন্ত পড়িয়া দেখিলে, বিষ্ণুরাম বলিলেন, "দেখুন কত দিনের জোবানবন্দী?"

জোবানবন্দীর তারিখ দেখিলাম, জোবানবন্দী ঊনিশ বৎসরের।

বিষ্ণুরাম বলিলেন, "ঐ কন্যার বয়স এক্ষণে হিসাব কত হয়?"

আমি। ঊনিশ বৎসর কয় মাস—প্রায় কুড়ি।

বিষ্ণু। রজনীর বয়স কত অনুমান করেন?

আমি। প্রায় কুড়ি।

বিষ্ণু। পড়িয়া যাউন; হরেকৃষ্ণ কিছু পরে বালিকার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

আমি পড়িতে লাগিলাম। দেখিলাম যে, এক স্থানে হরেকৃষ্ণ পুনঃপ্রাপ্ত বালা দেখিয়া বলিতেছেন, "এই বালা আমার কন্যা রজনীর বালা বটে।"

আর বড় সংশয়ের কথা রহিল না—তথাপি পড়িতে লাগিলাম—প্রতিবাদীর মোক্তার হরেকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুমি দরিদ্র লোক। তোমার কন্যাকে সোণার বালা দিলে কি প্রকারে?" হরেকৃষ্ণ উত্তর দিতেছে, "আমি গরীব, কিন্তু আমার ভাই, মনোহর দাস দশ টাকা উপার্জ্জন করেন। তিনি আমার মেয়েকে সোণার গহনাগুলি দিয়াছেন।"

তবে যে এই হরেকৃষ্ণ দাস আমাদিগের মনোহর দাসের ভাই, তদ্বিষয়ে আর সংশয়ের স্থান রহিল না।

পরে মোক্তার আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তোমার ভাই তোমার পরিবার বা তোমার আর কাহাকে কখন অলঙ্কার দিয়াছে?"

উত্তর। না।

পুনশ্চ প্রশ্ন। সংসার খরচ দেয়?

উত্তর। না।

প্রশ্ন। তবে তোমার কন্যাকে অন্নপ্রাশনে সোণার গহনা দিবার কারণ কি?

উত্তর। আমার এই মেয়েটি জন্মান্ধ। সে জন্য আমার স্ত্রী সর্ব্বদা কাঁদিয়া থাকে। আমার ভাই ও ভাইজ তাহাতে দুঃখিত হইয়া, আমাদিগের মনোদুঃখ যদি কিছু নিবারণ হয়, এই ভাবিয়া অন্নপ্রাশনের সময় মেয়েটিকে এই গহনাগুলি দিয়াছিলেন।

জন্মান্ধ! তবে যে সে এই রজনী, তদ্বিষয়ে আর সংশয় কি?

আমি হতাশ হইয়া জোবানবন্দী রাখিয়া দিলাম। বলিলাম, "আমার আর বড় সন্দেহ নাই।"

বিষ্ণুরাম বলিলেন, "অত অল্প প্রমাণে আপনাকে সন্তুষ্ট হইতে বলি না। আর একটা জোবানবন্দীর নকল দেখুন।"

দ্বিতীয় জোবানবন্দীও দেখিলাম যে, উহাও ঐ কথিত বালাচুরির মোকদ্দমায় গৃহীত হইয়াছিল। এই জোবানবন্দীতে বক্তা রাজচন্দ্র দাস। তিনি একমাত্র কুটম্ব বলিয়া ঐ অন্নপ্রাশনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি হরেকৃষ্ণের শ্যালীপতি বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেছেন এবং চুরির বিষয় সকল সপ্রমাণ করিতেছেন।

বিষ্ণুরাম বলিলেন, "উপস্থিত রাজচন্দ্র দাস সেই রাজচন্দ্র দাস। সংশয় থাকে, ডাকিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন।"

আমি বলিলাম, "নিষ্প্রয়োজন।"

বিষ্ণুরাম আরও কতকগুলি দলিল দেখাইলেন, সে সকলের বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলিতে গেলে, সকলের ভাল লাগিবে না। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই রজনী দাসী যে হরেকৃষ্ণ দাসের কন্যা, তদ্বিষয়ে আমার সংশয় রহিল না। তখন দেখিলাম, বৃদ্ধ পিতা মাতা লইয়া অন্নের জন্য কাতর হইয়া বেড়াইব!

বিষ্ণুরামকে বলিলাম, "মোকদ্দমা করা বৃথা। বিষয় রজনী দাসীর, তাঁহার বিষয় তাঁহাকে ছাড়িয়া দিব। তবে আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর এ বিষয়ে আমার সঙ্গে তুল্যাধিকারী। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করার অপেক্ষা রহিল মাত্র।"

আমি একবার আদালতে গিয়া, আসল জোবানবন্দী দেখিয়া আসিলাম। এখন পুরাণ নথি ছিঁড়িয়া ফেলে, তখন রাখিত। আসল দেখিয়া জানিলাম যে, নকলে কোন কৃত্রিমতা নাই।

বিষয় রজনীকে ছাড়িয়া দিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রজনীকে বিষয় ছাড়িয়া দিলাম, কিন্তু কেহ ত সে বিষয় দখল করিল না।

রাজচন্দ্র দাস একদিন দেখা করিতে আসিল। তাহার মুখে শুনিলাম, সে শিমলায় একটি বাড়ী কিনিয়া সেইখানে রজনীকে লইয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিলাম টাকা, কোথায় পাইলে ? রাজচন্দ্র বলিল, অমরনাথ কর্জ্জ দিয়াছেন, পশ্চাৎ বিষয় হইতে শোধ হইবে। জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তবে তোমরা বিষয় দখল লইতেছ না কেন ? তাহাতে সে বলিল, সে সকল কথা অমরনাথ বাবু জানেন। অমরনাথ বাবু কি রজনীকে বিবাহ করিয়াছেন ? তাহাতে রাজচন্দ্র বলিল, না। পরে রাজচন্দ্রের সঙ্গে কথোপকথন করিতে করিতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "রাজচন্দ্র তোমায় এত দিন দেখি নাই কেন ?"

রাজচন্দ্র বলিল, "একটু গা ঢাকা হইয়াছিলাম।"

আমি। কার কি চুরি করিয়াছ যে, গা ঢাকা হইয়াছিলে ?

রাজ। চুরি করিব কার ? তবে অমরনাথ বাবু বলিয়াছিলেন যে, এখন বিষয় লইয়া গোলযোগ হইতেছে, এখন একটু আড়াল হওয়াই ভাল। মানুষের চক্ষুলজ্জা আছে ত ?

আমি। অর্থাৎ পাছে আমরা কিছু ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করি। অমরনাথ বাবু বিজ্ঞ লোক দেখিতেছি। তা যা হৌক, এখন যে বড় দেখা দিলে ?

রাজ। আপনার ঠাকুর আমাকে ডাকাইয়াছেন।

আমি। আমার ঠাকুর ? তিনি তোমার সন্ধান পাইলেন কি প্রকারে ?

রাজ। খুঁজিয়া খুঁজিয়া।

আমি। এত খোঁজাখুঁজি কেন ? তোমায় বিষয় ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিবার জন্য নয় ত ?

রাজ। না–না–তা কেন–তা কেন ? আর একটা কথার জন্য। এখন রজনীর কিছু বিষয় হইয়াছে শুনিয়া অনেক সম্বন্ধ আসিতেছে। তা কোথায় সম্বন্ধ করি–তাই আপনাদের জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি।

আমি। কেন, অমরনাথ বাবুর সঙ্গে ত সম্বন্ধ হইতেছিল ? তিনি এত করিয়া রজনীর বিষয় উদ্ধার করিলেন, তাঁকে ছাড়িয়া কাহাকে বিবাহ দিবে ?

রাজ। যদি তাঁর অপেক্ষা ভাল পাত্র পাই ?

আমি। অমরনাথের অপেক্ষা ভাল পাত্র কোথায় পাইবে ?

রাজ। মনে করুন, আপনি যেমন, এমনই পাত্র যদি পাই ?

আমি একটু চমকিলাম। বলিলাম, "তাহা হইলে অমরনাথের অপেক্ষা ভাল পাত্র হইল না। কিন্তু ছেঁদো কথা ছাড়িয়া দেও–তুমি কি আমার সঙ্গে রজনীর সম্বন্ধ করিতে আসিয়াছ ?"

রাজচন্দ্র একটু কুণ্ঠিত হইল। বলিল, "হাঁ তাই বটে। এ সম্বন্ধ করিতেই কর্ত্তা আমাকে ডাকাইয়াছিলেন।"

শুনিয়া আকাশ হইতে পড়িলাম। সম্মুখে, দারিদ্র্যরাক্ষসকে দেখিয়া, ভীত হইয়া, পিতা যে এই সম্বন্ধ করিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম–রজনীকে আমি বিবাহ করিলে ঘরের বিষয় ঘরে থাকিবে। আমাকে অন্ধ পুষ্পনারীর কাছে বিক্রয় করিয়া, পিতা বিক্রয়মূল্যস্বরূপ হৃত সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন। শুনিয়া হাড় জ্বালিয়া গেল।

রাজচন্দ্রকে বলিলাম, "তুমি এখন যাও। কর্ত্তার সঙ্গে আমার সে কথা হইবে।"

আমার রাগ দেখিয়া, রাজচন্দ্র পিতার কাছে গেল। সে কি বলিল, বলিতে পারি না। পিতা তাঁহাকে বিদায় দিয়া আমাকে ডাকাইলেন।

তিনি আমাকে নানা প্রকারে অনুরোধ করিলেন,–রজনীকে বিবাহ করিতেই হইবে। নহিলে সপরিবারে মারা যাইব–খাইব কি? তাঁহার দুঃখ ও কাতরতা দেখিয়া আমার দুঃখ হইল না। বড় রাগ হইল। আমি রাগ করিয়া চলিয়া গেলাম।

পিতার কাছ হইতে গিয়া, আমার মার হাতে পড়িলাম। পিতার কাছ রাগ করিলাম, কিন্তু মার কাছে রাগ করিতে পারিলাম না–তাঁহার চক্ষের জল অসহ্য হইল। সেখান হইতে পলাইলাম। কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা স্থির রহিল–যে রজনীকে দয়া করিয়া গোপালের সঙ্গে বিবাহিত করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলাম–আজি তাহার টাকার লোভে তাহাকে স্বয়ং বিবাহ করিব?

বিপদে পড়িয়া মনে করিলাম, ছোট মার সাহায্য লইব। গৃহের মধ্যে ছোট মাই বুদ্ধিমতী। ছোট মার কাছে গেলাম।

"ছোট মা, আমাকে কি রজনীকে বিবাহ করিতে হইবে? আমি কি অপরাধ করিয়াছি?"

ছোট মা চুপ করিয়া রহিলেন।

আমি। তুমিও কি ঐ পরামর্শে?

ছোট মা। বাছা, রজনী ত সৎকায়স্থের মেয়ে?

আমি। হইলই বা?

ছোট মা। আমি জানি, সে সচ্চরিত্রা।

আমি। তাহও স্বীকার করি।

ছোট মা। সে পরম সুন্দরী।

আমি। পদ্মচক্ষু!

ছোট মা। বাবা–যদি পদ্মচক্ষুই খোঁজ, তবে তোমার আর একটা বিবাহ করিতে কতক্ষণ?

আমি। সে কি মা! রজনীর টাকার জন্য রজনীকে বিবাহ করিয়া, তার বিষয় লইয়া, তার পর তাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া আর একজনকে বিবাহ করা, কেমন কাজটা হইবে?

ছোট মা। ঠেলিয়া ফেলিবে কেন? তোমার বড় মা কি ঠেলা আছেন?

এ কথার উত্তর ছোট মার কাছে করিতে পারা যায় না। তিনি আমার পিতার দ্বিতীয় পক্ষের বনিতা, বহুবিবাহের দোষের কথা তাঁহার সাক্ষাতে কি প্রকারে বলিব! সে কথা না বলিয়া বলিলাম, "আমি এ বিবাহ করিব না–তুমি আমার রক্ষা কর। তুমি সব পার।"

ছোট মা। আমি না বুঝি, এমন নহে। কিন্তু বিবাহ না করিলে, আমরা সপরিবারে অন্নাভাবে মারা যাইব। আমি সকল কষ্ট সহ্য করিতে পারি, কিন্তু তোমাদিগের অন্নকষ্ট আমি চক্ষে দেখিতে পারিব না। তোমার সহস্র বৎসর পরমায়ু হউক, তুমি ইহাতে অমত করিও না।

আমি। টাকাই কি এত বড়?

ছোট মা। তোমার আমার কাছে নহে। কিন্তু যাহারা তোমার আমার সর্ব্বস্ব, তাঁহাদের কাছে বটে। সুতরাং তোমার আমার কাছেও বটে! দেখ, তোমার জন্য আমরা তিন জনে প্রাণ দিতেও পারি। তুমি আমাদিগের জন্য একটি অন্ধ কন্যা বিবাহ করিতে পারিবে না?

বিচারে ছোট মার কাছে হারিলাম। হারিলে রাগ বাড়ে। আমার রাগ বাড়িল। আর মনে মনে বিশ্বাস ছিল যে, টাকার জন্য রজনীকে বিবাহ করা বড় অন্যায়। অতএব আমি দম্ভ করিয়া বলিলাম, "তোমরা যাহাই বল না কেন, আমি এ বিবাহ করিব না।"

ছোট মাও দম্ভ করিয়া বলিলেন, "তুমিও যাই বল না কেন, আমি যদি কায়েতের মেয়ে হই, তবে তোমার এ বিবাহ দিবই দিব।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "তবে বোধ হয়, তুমি গোয়ালার মেয়ে। আমায় এ বিবাহ দিতে পারিবে না।"

ছোট মা বলিলেন, "না বাবা, আমি কায়েতের মেয়ে।"

ছোট মা বড় দুষ্ট। আমাকে বাবা বলিয়া গালি ফিরাইয়া দিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আমাদিগের বাড়ীতে এক সন্ন্যাসী আসিয়া মধ্যে মধ্যে থাকিত। কেহ সন্ন্যাসী বলিত, কেহ ব্রহ্মচারী, কেহ দণ্ডী, কেহ অবধূত। পরিধানে গৈরিক বাস, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা, মস্তকে রুক্ষ কেশ, জটা নহে, রক্তচন্দনের ছোট রকমের ফোঁটা। বড় একটা ধূলাকাদার ঘটা নাই–সন্ন্যাসী জাতির মধ্যে ইনি একটু বাবু। খড়ম চন্দ্রকাষ্ঠের, তাহাতে হাতীর দাঁতের বৌল। তিনি যাই হউন, বালকেরা তাঁহাকে সন্ন্যাসী মহাশয় বলিয়া আমিও তাঁহাকে তাহাই বলিব।

পিতা কোথা হইতে তাঁহাকে লইয়া আসিয়াছিলেন। অনুভবে বুঝিলাম, পিতার মনে মনে বিশ্বাস ছিল, সন্ন্যাসী নানাবিধ ঔষধ জানে এবং তান্ত্রিক যাগযজ্ঞে সুদক্ষ। বিমাতা বন্ধ্যা।

পিতার অনুকম্পায় সন্ন্যাসী উপরের নিকট বৈঠকখানা আসিয়া দখল করিয়াছিল। ইহা আমার একটু বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছিল। আবার সন্ধ্যাকালে সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া সারঙ্গ রাগিণীতে আর্য্যাচ্ছন্দে স্তোত্র পাঠ করিত। ভণ্ডামী আর আমার সহ্য হইল না। আমি তাহার অর্দ্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা করিবার জন্য তাহার নিকটে গেলাম। বলিলাম, "সন্ন্যাসী ঠাকুর, ছাদের উপর মাথা মুণ্ড কি বকিতেছিলে?"

সন্ন্যাসী হিন্দুস্থানী, কিন্তু আমাদিগের সঙ্গে যে ভাষায় কথা কহিত, তাহার চৌদ্দ আনা নির্ভাঁজ সংস্কৃত, এক আনা হিন্দি, এক আনা বাঙ্গালা। আমি বাঙ্গালাই রাখিলাম। সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন, "কেন, কি বকি, আপনি কি জানেন না?"

আমি বলিলাম, "বেদমন্ত্র?"

স। হইলে হইতে পারে।

আমি। পড়িয়া কি হয়?

স। কিছু না।

উত্তরটুকু সন্ন্যাসীর জিত–আমি এটুকু প্রত্যাশা করি নাই। তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে পড়েন কেন?"

স। কেন, শুনিতে কি কষ্টকর?

আমি। না, শুনিতে মন্দ নয়, বিশেষ আপনি সুকণ্ঠ। তবে যদি কিছু ফল নাই, তবে পড়েন কেন?"

স। যেখানে ইহাতে কাহারও কোন অনিষ্ট নাই, সেখানে পড়ায় ক্ষতি কি?

আমি জারি করিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু দেখিলাম যে, একটু হটিয়াছি–সুতরাং আমাকে চাপিয়া ধরিতে হইল। বলিলাম, "ক্ষতি নাই, কিন্তু নিষ্ফলে কেহ কোন কাজ করে না–যদি বেদগান নিষ্ফল, তবে আপনি বেদগান করেন কেন ?"

স। আপনিও ত পণ্ডিত, আপনিই বলুন দেখি, বৃক্ষের উপর কোকিল গান করে কেন ?

ফাঁপরে পড়িলাম। ইহার দুইটি উত্তর আছে, এক–"ইহাতেই কোকিলের সুখ"–দ্বিতীয়, "স্ত্রীকোকিলকে মোহিত করিবার জন্য।" কোন্‌টি বলি? প্রথমটি আগে বলিলাম, "গাইয়াই কোকিলের সুখ।"

স। গাইয়াই আমার সুখ।

আমি। তবে টপ্পা, খিয়াল প্রভৃতি থাকিতে বেদগান করেন কেন ?

স। কোন কথাগুলি সুখকর–সামান্য গণিকাগণের কদর্য্য চরিত্রের গুণগান সুখকর, না দেবতাদিগের অসীম মহিমাগান সুখকর ?

হারিয়া, দ্বিতীয় উত্তরে গেলাম। "কোকিল গায়, কোকিলপত্নীকে মোহিত করিবার জন্য, মোহনার্থ যে শারীরিক স্ফূর্ত্তি, তাহাতে জীবের সুখ। কণ্ঠস্বরের স্ফূর্ত্তি সেই শারীরিক স্ফূর্ত্তির অন্তর্গত। আপনি কাহাকে মুগ্ধ করিতে চাহেন ?"

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "আমার আপনার মনকে। মন আত্মার অনুরাগী নহে। আত্মার হিতকারী নহে। তাহাকে বশীভূত করিবার জন্য গাই।"

আমি। আপনারা দার্শনিক, মন এবং আত্মা পৃথক্ বলিয়া মানেন। কিন্তু মন একটি পৃথক্ আত্মা একটি পৃথক্ পদার্থ, ইহা মানিতে পারি না। মনেরই ক্রিয়া দেখিতে পাই–ইচ্ছা, প্রবৃত্ত্যাদি আমার মনে। সুখ আমার মনে, দুঃখ আমার মনে। তবে আবার মনের অতিরিক্ত আত্মা, কেন মানিব ? যাহার ক্রিয়া দেখি, তাহাকেই মানিব। যাহার কোন চিহ্ন দেখি না, তাহাকে মানিব কেন ?

স। তবে বল না কেন, মন ও শরীর এক। শরীর ও মনের প্রভেদ কেন মানিব ? যে কিছু কার্য্য করিতেছ, সকলই শরীরের কার্য্য–কোন্‌টি মনের কার্য্য ?

আমি। চিন্তা প্রবৃত্তি ভোগাদি।

স। কিসে জানিলে, সে সকল শারীরিক ক্রিয়া নহে ?

আমি। তাহাও সত্য বটে। মন শরীরের ক্রিয়া* মাত্র।

স। ভাল, ভাল। তবে আর একটু এসো। বল না কেন যে, শরীরও পঞ্চভূতের ক্রিয়া মাত্র ? শুনিয়াছি, তোমরা পঞ্চভূত মান না–তোমরা বহুভূতবাদী, তাই হউক; বল না কেন, যে, ক্ষিত্যাদি বা অন্য ভূতগণ শরীররূপ ধারণ করিয়া সকলই করিতেছে? এই যে তুমি আমার সঙ্গে কথা কহিতেছ–আমি বলি যে, কেবল ক্ষিত্যাদি আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া শব্দ করিতেছে, শচীন্দ্রনাথ নহে। মন ও শরীরাদির কল্পনার প্রয়োজন কি ? ক্ষিত্যাদি ভিন্ন শচীন্দ্রনাথের অস্তিত্ব মানি না।

হারিয়া, ভক্তিভাবে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া গেলাম। কিন্তু সেই অবধি সন্ন্যাসীর সঙ্গে একটু সম্প্রীতি ছিল। সর্ব্বদা তাঁহার কাছে আসিয়া বসিতাম; এবং শাস্ত্রীয় আলাপ করিতাম। দেখিলাম, সন্ন্যাসীর অনেক প্রকার ভণ্ডামী আছে। সন্ন্যাসী ঔষধ বিলায়, সন্ন্যাসী হাত দেখিয়া গণিয়া ভবিষ্যৎ বলে, সন্ন্যাসী যাগ হোমাদিও মধ্যে মধ্যে করিয়া থাকে–নল চালে, চোর বলিয়া দেয়, আরও কত ভণ্ডামী করে। একদিন আমার অসহ্য হইয়া উঠিল। একদিন আমি তাহাকে বলিলাম, "আপনি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত; আপনার এ সকল ভণ্ডামী কেন ?"

---

* Function of the brain.

স। কোন্‌টা ভণ্ডামী ?

আমি। এই নলচালা, হাতগণা প্রভৃতি।

স। কতকগুলো অনিশ্চিত বটে, কিন্তু তথাপি কর্ত্তব্য।

আমি। যাহা অনিশ্চিত জানিতেছেন, তদ্দ্বারা লোককে প্রতারণা কেন করেন ?

স। তোমরা মড়া কাট কেন ?

আমি। শিক্ষার্থ।

স। যাহারা শিক্ষিত, তাহারা কাটে কেন ?

আমি। তত্ত্বানুসন্ধান জন্য।

স। আমরাও তত্ত্বানুসন্ধান জন্য এ সকল করিয়া থাকি। শুনিয়াছি, বিলাতী পণ্ডিতের মধ্যে অনেকে বলেন, লোকের মাথার গঠন দেখিয়া তাহার চরিত্রের কথা বলা যায়। যদি মাথার গঠনে চরিত্র বলা যায়, তবে হাতের রেখা দেখিয়াই বা কেন না বলা যাইবে ? ইহা মানি যে, হাতের রেখা দেখিয়া, কেহ এ পর্য্যন্ত ঠিক বলিতে পারে নাই। ইহার কারণ এই হইতে পারে যে, ইহার প্রকৃত সঙ্কেত অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই, কিন্তু ক্রমে ক্রমে হাত দেখিতে দেখিতে প্রকৃত সঙ্কেত পাওয়া যাইতে পারে। এজন্য হাত পাইলেই দেখি।

আমি। আর নলচালা ?

স। তোমরা লৌহের তারে পৃথিবীময় লিপি চালাইতে পার, আমরা কি নলটি চালাইতে পারি না ? তোমাদের একটি ভ্রম আছে, তোমরা মনে কর যে, যাহা ইংরেজরা জানে, তাহাই সত্য, যাহা ইংরেজ জানে না, তাহা অসত্য, তাহা মনুষ্যজ্ঞানের অতীত, তাহা অসাধ্য। বস্তুতঃ তাহা নহে। জ্ঞান অনন্ত। কিছু তুমি জান, কিছু আমি জানি, কিছু অন্যে জানে, কিন্তু কেহই বলিতে পারে না যে, আমি সব জানি–আর কেহ আমার জ্ঞানের অতিরিক্ত কিছু জানে না। কিছু ইংরেজ জানে, কিছু আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা জানিতেন। ইংরেজরা যাহা জানে, ঋষিরা তাহা জানিতেন না, ঋষিরা যাহা জানিতেন, ইংরেজেরা এ পর্য্যন্ত তাহা জানিতে পারে নাই।

সেই সকল আর্য্যবিদ্যা প্রায় লুপ্ত হইয়াছে; আমরা কেহ কেহ দুই একটি বিদ্যা জানি। যত্নে গোপন রাখি-কাহাকেও শিখাই না।

আমি হাসিলাম। সন্ন্যাসী বলিলেন, "তুমি বিশ্বাস করিতেছ না ? কিছু প্রত্যক্ষ দেখিতে চাও ?"

আমি বলিলাম, "দেখিলে বুঝিতে পারি।"

সন্ন্যাসী বলিল, "পশ্চাৎ দেখাইব। এক্ষণে তোমার সঙ্গে আমার একটি বিশেষ কথা আছে। আমার সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া, তোমার পিতা আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন যে, তোমাকে বিবাহে প্রবৃত্তি দিই।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "প্রবৃত্তি দিতে হইবে না। আমি বিবাহে প্রস্তুত–কিন্তু–"

স। কিন্তু কি ?

আমি। কন্যা কই ? এক কাণা কন্যা আছে, তাহাকে বিবাহ করিব না।

স। এ বাঙ্গালাদেশে কি তোমার যোগ্যা কন্যা নাই ?

আমি। হাজার হাজার আছে, কিন্তু বাছিয়া লইব কি প্রকারে? এই শত সহস্র কন্যার মধ্যে কে আমাকে চিরকাল ভালবাসিবে, তাহা কি প্রকারে বুঝিব?

স। আমার একটি বিদ্যা আছে। যদি পৃথিবীতে এমত কেহ থাকে যে, তোমাকে মর্ম্মান্তিক ভালবাসে, তবে তাহাকে স্বপ্নে দেখাইতে পারি। কিন্তু যে তোমাকে এখন ভালবাসে না, ভবিষ্যতে বাসিতে পারে, তাহা আমার বিদ্যার অতীত।

আমি। এ বিদ্যা বড় আবশ্যক বিদ্যা নহে। যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহাকে প্রায় প্রণয়শালী বলিয়া জানে।

স। কে বলিল? অজ্ঞাত প্রণয়ই পৃথিবীকে অধিক। তোমাকে কেহ ভালবাসে? তুমি কি তাহাকে জান?

আমি। আত্মীয় স্বজন ভিন্ন কেহ যে আমাকে বিশেষ ভালবাসে, এমত জানি না।

স। তুমি আমাদের বিদ্যা কিছু প্রত্যক্ষ করিতে চাহিতেছিলে, আজ এইটি প্রত্যক্ষ কর।

আমি। ক্ষতি কি?

স। তবে শয়নকালে আমাকে শয্যাগৃহে ডাকিও।

আমার শয্যাগৃহ বহির্ব্বাটীতে। আমি শয়নকালে সন্ন্যাসীকে ডাকাইলাম। সন্ন্যাসী আসিয়া আমাকে শয়ন করিতে বলিলেন। আমি শয়ন করিলে, তিনি বলিলেন, "যতক্ষণ আমি এখানে থাকিব, চক্ষু চাহিও না। আমি গেলে যদি জাগ্রত থাক, চাহিও।" সুতরাং আমি চক্ষু মুদিয়া রহিলাম–সন্ন্যাসী কি কৌশল করিল, কিছুই জানিতে পারিলাম না। সন্ন্যাসী যাইবার পূর্ব্বেই আমি নিদ্রাভিভূত হইলাম।

সন্ন্যাসী বলিয়াছিল, পৃথিবীমধ্যে যে নায়িকা আমাকে মর্ম্মান্তিক ভালবাসে, অদ্য তাহাকেই আমি স্বপ্নে দেখিব। স্বপ্ন দেখিলাম বটে। কলকল গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে সৈকতভূমি; তাহার প্রান্তভাগে অর্দ্ধজলমগ্না–কে?

রজনী

★ ★ ★

পরদিন প্রভাতে সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলে?"

আমি। কাণা ফুলওয়ালী।

স। কাণা?

আমি। জন্মান্ধ।

স। আশ্চর্য্য! কিন্তু যেই হউক, তাহার অধিক পৃথিবীতে আর কেহ তোমাকে ভালবাসে না। আমি নীরব হইয়া রহিলাম।

চতুর্থ খণ্ড

সকলের কথা

প্রথম পরিচ্ছেদ : লবঙ্গলতার কথা

বড় গোল বাধিল। আমি ত সন্ন্যাসী ঠাকুরের হাতে পায়ে ধরিয়া, কাঁদিয়া, কাঁটিয়া, শচীন্দ্রকে রজনীর বশীভূত করিবার উপায় করিতেছি। সন্ন্যাসী তন্ত্রসিদ্ধ; জগদম্বার কৃপায় যাহা মনে করেন, তাই করিতে পারেন। মিত্র মহাশয় ষষ্টি বৎসর বয়সে যে, এ পামরীর এত বশীভূত, তাহা আমার গুণে, কি সন্ন্যাসী ঠাকুরের গুণে, তাহা বলিয়া উঠা ভার; আমিও কায়মনোবাক্যে পতিপদসেবার ক্রুটি করি না, ব্রহ্মচারীও আমার জন্য যাগ, যজ্ঞ, তন্ত্র, মন্ত্র প্রয়োগে ক্রুটি করেন না। যাহার জন্য যাহা তিনি করিয়াছেন, তাহা ফলিয়াছে। কামারবউর পিতলের টুক্‌নী সোণা করিয়া দিয়াছিলেন–উনি না পারেন কি ? উহার মন্ত্রৌষধির গুণে শচীন্দ্র যে রজনীকে ভালবাসিবে–রজনীকে বিবাহ করিতে চাহিবে, তাহাতে আমার কোন সন্দেহই নাই, কিন্তু তবু গোল বাধিয়াছে। গোলযোগ অমরনাথ বাধাইয়াছে। এখন শুনিতেছি অমরনাথের সঙ্গেই রজনীর বিবাহ স্থির হইয়াছে।

রজনীর মাসী মাসুয়া, রাজচন্দ্র এবং তাহার স্ত্রী, আমাদিগের দিকে। তাহার কারণ, কর্ত্তা বলিয়াছেন, বিবাহ যদি হয় তবে তোমাদিগকে ঘটকবিদায়স্বরূপ কিছু দিব। কথাটা ঘটকবিদায়, কিন্তু আঁচটা দু হাজার দশ হাজার। কিন্তু তাহারা আমাদিগের দিকে হইলেও কিছু হইতেছে না। অমরনাথ ছাড়িতেছে না। সে নিশ্চয় রজনীকে বিবাহ করিবে, জিদ করিতেছে।

ভাল, অমরনাথ কে ? মেয়ের বিবাহ দিবার কর্ত্তা হইল, তাহার মাসুয়া মাসী–বাপ মা বলাই উচিত–রাজচন্দ্র ও তাহার স্ত্রী, তাহারা যদি আমাদিগের দিকে, তবে অমরনাথের জিদে কি আসিয়া যায় ? সে তাহাদিগকে বিষয় দেওয়াইয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার মেহনতানা দুই চারি হাজার ধরিয়া দিলেই হইবে। আমার ছেলের বৌ করিব বলিয়া আমি যে কন্যার সম্বন্ধ করিতেছি, অমরনাথ কি না তাহাকে বিবাহ করিতে চায় ? অমরনাথের এ বড় স্পর্দ্ধা! আমি একবার অমরনাথকে কিছু শিক্ষা দিয়াছি–আর একবার না হয় কিছু দিব। আমি যদি কায়েতের মেয়ে হই, তবে অমরনাথের নিকট হইতে এই রজনীকে কাড়িয়া লইয়া আমার ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিব।

আমি অমরনাথের সকল গুণ জানি। অমরনাথ অত্যন্ত ধূর্ত্ত–তাহার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে বড় সতর্ক হইয়া কাজ করিতে হয়। আমি সতর্ক হইয়াই কার্য্য আরম্ভ করিলাম।

প্রথম রাজচন্দ্র দাসের স্ত্রীকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। সে আসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম, “কেন গা ?”

মালী বৌ–রাজচন্দ্রের স্ত্রীকে আমরা আজিও মালী বৌ বলিতাম, রাগ না হইলে বরং বলিতাম না, রাগ হইলেই মালী বৌ বলিতাম–মালী বৌ বলিল, “কি গা ?”

আমি। মেয়ের বিয়ে নাকি অমর বাবুর সঙ্গে দিবে ?

মালী বৌ। সেই কথাই ত এখন হচ্চে।

আমি। কেন হচ্চে ? আমাদের সঙ্গে কি কথা হইয়াছিল ?

মালী বৌ। কি করিব মা–আমি মেয়ে মানুষ, অত কি জানি ?

মাগীর মোটা বুদ্ধি দেখিয়া আমার বড় রাগ হইল–আমি বলিলাম, “সে কি মালী বৌ ? মেয়ে মানুষে জানে না ত কি পুরুষ মানুষে জানে ? পুরুষ মানুষ আবার সংসার ধর্ম্ম কুটুম্ব কুটুম্বিতার কি জানে ? পুরুষ মানুষ মাথায় মোট করিয়া টাকা বহিয়া আনিয়া দিবে এই পর্য্যন্ত–পুরুষ মানুষ আবার কর্ত্তা না কি ?”

বোধ হয়, মাগীর মোটাবুদ্ধিতে আমার কথাগুলো অসঙ্গত বোধ হইল–সে একটু হাসিল। আমি বলিলাম, "তোমার স্বামীর কি মত–অমরনাথের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দেন ?"

মালী বৌ বলিল, "তার মত নয়–তবে অমরনাথ বাবু হইতেই রজনী বিষয় পাইয়াছে–তাঁর বাধ্য হইতেই হয়।"

আমি। তবে অমরনাথ বাবুকে বল গিয়া, বিষয় রজনী এখনও পায় নাই। বিষয় আমাদের; বিষয় আমরা ছাড়িব না। পার, তোমরা বিষয় মোকদ্দমা করিয়া লও গিয়া।

মালী বৌ। সে কথা আগে বলিলেই হইত। এত দিনে মোকদ্দমা উপস্থিত হইত।

আমি। মোকদ্দমা করা মুখের কথা নহে। টাকার শ্রাদ্ধ। রাজচন্দ্র দাস ফুল বেচিয়া কত টাকা করিয়াছে?

মালী বৌ রাগে গর গর করিতে লাগিল। সত্য বলিতেছি, আমার কিছুই রাগ হয় নাই। মালী বৌ একটু রাগ সামলাইয়া বলিল, "অমর বাবু আমার জামাই হইলেই বিষয় অমর বাবুর হইবে। তিনি টাকা দিয়া মোকদ্দমা করিতে পারেন, তাঁহার এমন শক্তি আছে।"

এই বলিয়া মালী বৌ উঠিয়া যায়, আমি তাহার আঁচল ধরিয়া বসাইলাম। মালী বৌ হাসিয়া বসিল। আমি বলিলাম, "অমর বাবু মোকদ্দমা করিয়া বিষয় লইলে তোমার কি উপকার ?"

মালী বৌ। আমার মেয়ের সুখ হবে।

আমি। আর আমার ছেলের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে হলে বুঝি বড় দুঃখ হবে ?

মালী বৌ। তা কেন ? তবে যেখানে থাকে, আমার মেয়ে সুখী হইলেই হইল।

আমি। তোমাদের নিজের কিছু সুখ চাহি না ?

মালী বৌ। আমাদের আবার কি সুখ ? মেয়ের সুখেই আমাদের সুখ।

আমি। ঘটকালীটা ?

মালী বৌ মুখ মুচকিয়া হাসিল। বলিল, "আসল কথা বলিব মা ঠাকুরাণি ? এখানে বিয়ের মেয়ের মত নাই।"

আমি। সে কি ? কি বলে ?

মালী বৌ। এখনকার কথা হইলেই বলে, কাণার আবার বিয়ের কাজ কি ?

আমি। আর অমরনাথের সঙ্গে বিয়ের কথা হইলে ?

মালী বৌ। বলে, ওঁ হতে আমাদের সব। উনি যা বলিবেন, তাই করিতে হইবে।

আমি। তা বিয়ের কন্যার আবার মতামত কি ? মা বাপের মতামত হইলেই হইল।

মালী বৌ। রজনী ত ক্ষুদে মেয়ে নয়, আর আমার পেরে সন্তানও নয়। আর বিষয় তার, আমাদের নয়। সে আমাদের হাঁকাইয়া দিলে আমরা কি করিতে পারি ? বরং তার মত রাখিয়াই আমাদের এখন চলিতে হইতেছে।

আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম–"রজনীর সঙ্গে অমরনাথের দেখা শুনা হয় কি ?"

মালী বৌ। না। অমর বাবু দেখা করেন না।

আমি। আমার সঙ্গে রজনীর একবার দেখা হয় না কি ?

মালী বৌ। আমারও তাই ইচ্ছা। আপনি যদি তাহাকে বুঝাইয়া পড়াইয়া তাহার মত করাইতে পারেন। আপনাকে রজনী বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করে।

আমি। ত চেষ্টা করিয়া দেখিব। কিন্তু রজনীর দেখা পাই কি প্রকারে ? কাল তাহাকে এ বাড়ীতে একবার পাঠাইয়া দিতে পার ?

মালী বৌ। তার আটক কি ? সে ত এই বাড়ীতেই খাইয়া মানুষ। কিন্তু যার বিয়ের সম্বন্ধ হইতেছে, তাহাকে কি শ্বশুরবাড়ীতে অমন অদিনে অক্ষণে বিয়ের আগে আসিতে আছে।

মর মাগী! আবার কাচ! কি করি, আমি অন্য উপায় না দেখিয়া বলিলাম, "আচ্ছা, রজনী না আসিতে পারে, আমি একবার তোমাদের বাড়ী যাইতে পারি কি ?"

মালী বৌ। সে কি! আমাদের কি এমন ভাগ্য হইবে যে, আপনার পায়ের ধূলা আমাদের বাড়ীতে পড়িবে ?

আমি। কুটুম্বিতা হইলে আমার কেন, অনেকেরই পড়িবে। তুমি আমাকে আজ নিমন্ত্রণ করিয়া যাও।

মালী বৌ। তা আমাদের বাড়ীতে আপনাকে পাঠাইতে কর্ত্তার মত হইবে কেন ?

আমি। পুরুষ মানুষের আবার মতামত কি ? মেয়ে মানুষের যে মত, পুরুষ মানুষের সেই মত।

মালী বৌ যোড়হাত করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া হাসিতে হাসিতে বিদায় গ্রহণ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : অমরনাথের কথা

রজনীর সম্পত্তির উদ্ধার জন্য আমার এত কষ্ট সফল হইয়াছে, মিত্রেরাও নির্ব্বিবাদে বিষয় ছাড়িয়া দিয়াছে, তথাপি বিষয়ে দখল লওয়া হয় নাই, ইহা শুনিয়া অনেকে চমৎকৃত হইতে পারেন। তাহাতে আমিও কিছু বিস্মিত। বিষয় আমার নহে, আমি দখল লইবার কেহ নহি। বিষয় রজনীর, সে দখল না লইলে কে কি করিতে পারে ? কিন্তু রজনী কিছুতেই বিষয়ে দখল হইতে সম্মত নহে। বলে–আজ নহে–আর দুই দিন যাক–পশ্চাৎ দখল লইবেন ইত্যাদি। দখল না লউক–কিন্তু দরিদ্রকন্যার ঐশ্বর্য্যে অত অনাস্থা কেন, আমি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। রাজচন্দ্র এবং রাজচন্দ্রের স্ত্রীও এ বিষয়ে রজনীকে অনুরোধ করিয়াছে, কিন্তু রজনী বিষয় সম্প্রতি দখল লইতে চায় না। ইহার মর্ম্ম কি ? কাহার জন্য এত পরিশ্রম করিলাম ?

ইহার যা হয়, একটা চূড়ান্ত স্থির করিবার জন্য আমি রজনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। রজনীর সঙ্গে আমার বিবাহের কথা উত্থাপিত হওয়া অবধি আমি আর রজনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে বড় যাইতাম না–কেন না, এখন আমাকে দেখিলে রজনী কিছু লজ্জিতা হইত। কিন্তু আজ না গেল নয় বলিয়া রজনীর কাছে গেলাম। সে বাড়ীতে আমার অবারিত দ্বার। আমি রজনীর সন্ধানে তাহার ঘরে গিয়া তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। ফিরিয়া আসিতেছি, এমত সময়ে দেখিতে পাইলাম, রজনী আর একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে উপরে উঠিতেছে। সে স্ত্রীলোককে দেখিয়াই চিনিলাম–অনেক দিন দেখি নাই, কিন্তু দেখিয়াই চিনিলাম যে, ঐ গজেন্দ্রগামিনী ললিতলবঙ্গলতা!

রজনী ইচ্ছাপূর্ব্বক জীর্ণ বস্ত্র পরিয়াছিল, লজ্জায় সে লবঙ্গলতার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহিতেছিল না। লবঙ্গলতা হাসিতে উছলিয়া পড়িতেছিল–রাগ বা বিদ্বেষের কিছুমাত্র লক্ষণ দেখা গেল না।

সে হাসি অনেক দিন শুনি নাই। সে হাসি তেমনই ছিল–পূর্ণিমার সমুদ্রে ক্ষুদ্র তরঙ্গের তুল্য, সপুষ্প বসন্তলতার আন্দোলন তুল্য–তাহা হইতে সুখ, ভাঙ্গিয়া

ভাঙ্গিয়া, ঝরিয়া পড়িতেছিল।

আমি অবাক্ হইয়া নিষ্পন্দশরীরে, সশঙ্কচিত্তে, এই বিচিত্রচরিত্রা রমণীর মানসিক শক্তির আলোচনা করিতেছিলাম। ললিতলবঙ্গলতা কিছুতেই টলে না। লবঙ্গলতা মহান্ ঐশ্বর্য্য হইতে দারিদ্র্যে পড়িয়াছে—তবু সেই সুখময় হাসি; যে রজনী হইতে এই ঘোর বিপদ্ ঘটিয়াছে, তাহারই গৃহে উঠিতেছে, তাহার সঙ্গে আলাপ করিতেছে, তবু সেই সুখময় হাসি। আমি সম্মুখে—তবু সেই সুখময় হাসি! অথচ আমি জানি, লবঙ্গ কোন কথাই ভুলে নাই।

আমি সরিয়া পার্শ্বের ঘরে গেলাম। লবঙ্গলতা প্রথমে সেই ঘরে প্রবেশ করিল—নিঃশঙ্কচিত্তে, আজ্ঞাদায়িনী রাজরাজেশ্বরীর ন্যায় রজনীকে বলিল, "রজনী—তুই এখন আর কোথাও যা! তোর বরের সঙ্গে আমার গোপনে কিছু কথা আছে। ভয় নাই! তোর বর সুন্দর হলেও আমার বৃদ্ধ স্বামীর অপেক্ষা সুন্দর নহে।" রজনী অপ্রতিভ হইয়া, কি ভাবিতে ভাবিতে সরিয়া গেল।

ললিতলবঙ্গলতা, ভ্রূকুটি কুটিল করিয়া সেই মধুর হাসি হাসিয়া, ইন্দ্রাণীর মত আমার সম্মুখে দাঁড়াইল। একবার বৈ কেহ অমরনাথকে আত্মবিস্মৃত দেখে নাই। আবার আত্মবিস্মৃত হইলাম। সেবারও ললিতলবঙ্গলতা—এবার ললিতলবঙ্গলতা।

লবঙ্গ হাসিয়া বলিল, "আমার মুখপানে চাহিয়া কি দেখিতেছ? তোমার অর্জ্জিত ঐশ্বর্য্য কাড়িয়া লইতে আসিয়াছি কি না? মনে করিলে তাহা পারি।"

আমি বলিলাম, "তুমি সব পার, কিন্তু ঐটি পার না। পারিলে কখন রজনীকে বিষয় দিয়া, এখন স্বহস্তে রাঁধিয়া সতীনকে খাওয়াইবার বন্দোবস্ত করিতে না।"

লবঙ্গ উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিল, "ওটা বুঝি বড় গায়ে লাগিবে মনে করেছ? সতীনকে রাঁধিয়া দিতে হয়, বড় দুঃখের কথা বটে; কিন্তু একটা পাহারাওয়ালাকে ডাকিয়া তোমাকে ধরাইয়া দিলে, এখনই আবার পাঁচটা রাঁধুনি রাখিতে পারি।"

আমি বলিলাম, "বিষয় রজনীর; আমাকে ধরাইয়া দিলে কি হইবে? যাহার বিষয়, সে ভোগ করিতে থাকিবে।"

লবঙ্গ। তুমি কস্মিন্ কালে স্ত্রীলোক চিনিলে না। যাহাকে ভালবাসে, তাহাকে রক্ষার জন্য রজনী এখনই বিষয় ছাড়িয়া দিবে।

আমি। অর্থাৎ আমার রক্ষার জন্য বিষয়টা তোমার ঘুষ দিবে।

লবঙ্গ। তাই।

আমি। তবে এত দিন সে ঘুষ চাও নাই, আমাদিগের বিবাহ হয় নাই বলিয়া। বিবাহ হইলেই সে ঘুষ চাহিবে।

লবঙ্গ। তোমার মত ছোটলোক বুঝিবে কি প্রকারে? চোরেরা বুঝিতে পারে না যে, পরের দ্রব্য অস্পৃশ্য। রজনীর সম্পত্তি রাখিতে পারিলেও আমি রাখিব কেন?

আমি বলিলাম, "তুমি যদি এমন না হবে, তবে আমার সে মরণকুবুদ্ধি ঘটিবে কেন? যদি আমার এত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়াছ, এত অনুগ্রহ করিয়াছ, তবে আর একটি ভিক্ষা আছে। যাহা জান, তাহা যদি অন্যের কাছে না বলিয়াছ, তবে রজনীর কাছেও বলিও না।"

দর্পিতা লবঙ্গলতা ভ্রূভঙ্গী করিল—কি সুন্দর ভ্রূভঙ্গী! বলিল, "আমি কি ঠক! যে তোমার স্ত্রী হইবে, তাহার কাছে তোমার নামে ঠকাম করিবার জন্য কি আমি তাহার বাড়ীতে আসিয়াছি?"

এই বলিয়া লবঙ্গলতা হাসিল। তাহার হাসির মর্ম্ম আমি কিছু কখন বুঝিতে পারি না। লবঙ্গ বিলক্ষণ রাগিয়া উঠিয়াছিল—কিন্তু হাসিতে সব রাগ ভাসিয়া গেল। যেন জলের উপর হইতে মেঘের ছায়া সরিয়া গেল, তাহার উপর মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। আমি লবঙ্গলতার মর্ম্ম কখন বুঝিতে পারিলাম না।

হাসিয়া লবঙ্গ বলিল, "তবে আমি রজনীর কাছে যাই?"

"যাও।"

ললিতলবঙ্গলতা, ললিত লবঙ্গলতার মত দুলিতে দুলিতে চলিল। ক্ষণেক পরে আমাকে ডাকিয়া পাঠাইল। গিয়া দেখিলাম, লবঙ্গলতা দাঁড়াইয়া আছে। রজনী তাহার পায়ে হাত দিয়া কাঁদিতেছে। আমি গেলে লবঙ্গলতা বলিল, "শুন, তোমার ভবিষ্যৎ ভার্য্যা কি বলিতেছে! তোমার সম্মুখে নহিলে এমন কথা আমি কাণে শুনিব না।"

আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি ?"

লবঙ্গলতা রজনীকে বলিল, "বল। তোমার বর আসিয়াছেন–"

রজনী সকাতরে অশ্রুপূর্ণলোচনে ললিতলবঙ্গলতার চরণস্পর্শ করিয়া বলিল, "আমার এক ভিক্ষা, আমার যে, কিছু সম্পত্তি আছে, এই বাবুর যত্নে আমার যে সম্পত্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, আমি লেখাপড়া করিয়া আপনাকে দান করিব, আপনি গ্রহণ করিবেন না কি ?"

আহ্লাদে আমার সর্ব্বান্তঃকরণ প্লাবিত হইল–আমি রজনীর জন্য যে যত্ন করিয়াছিলাম–যে ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলাম–তাহা সার্থক বোধ হইল। আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম, এখন আরও পরিষ্কার বুঝিলাম যে, রমণীকুলে, অন্ধ রজনী অদ্বিতীয় রত্ন! লবঙ্গলতার প্রোজ্জ্বল জ্যোতিও তাহার কাছে ম্লান হইল। আমি ইতিপূর্ব্বেই রজনীর অন্ধ নয়নে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম–আজি তাহার কাছে বিনামূল্যে বিক্রীত হইলাম। এই অমূল্য রত্নে আমার অন্ধকারপুরী প্রভাসিত করিয়া, এ জীবন সুখে কাটাইব। বিধাতা আমার কি সেদিন করিবেন না!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : লবঙ্গলতার কথা

আমি মনে করিয়াছিলাম, রজনীর এই বিস্ময়কর কথা শুনিয়া অমরনাথ আগুনে সেঁকা কলাপাতার মত শুকাইয়া উঠিবে। কই, তাহা ত কিছুই দেখিলাম না। তাহার মুখ না শুকাইয়া বরং প্রফুল্ল হইল। বিস্মিত হতবুদ্ধি, যা হইবার, তাহা আমিই হইলাম।

আমি প্রথম তামাসা মনে করিলাম, কিন্তু রজনীর কাতরতা অশ্রুপাত এবং দার্ঢ্য দেখিয়া আমার নিশ্চয় প্রতীতি জন্মিল যে, রজনী আন্তরিক বলিতেছে। আমি বলিলাম, "রজনি! কায়েতের কুলে তুমিই ধন্য! তোমার মত কেহ নাই। কিন্তু আমি তোমার দান গ্রহণ করিব না।"

রজনী বলিল, "না গ্রহণ করেন, আমি ইহা বিলাইয়া দিব।"

আমি। অমরনাথ বাবুকে ?

রজনী। আপনি উঁহাকে সবিশেষ চিনেন না; আমি দিলেও উনি লইবেন না। লইবার অন্য লোক আছে।

আমি। অমরনাথ বাবু কি বল ?

অমর। আমার সঙ্গে কোন কথা হইতেছে না, আমি কি বলিব ?

আমি বড় ফাঁপরে পড়িলাম; রজনী যে বিষয় ছাড়িয়া দিতেছে, তাহাতে বিস্মিত; আবার অমরনাথ যে বিষয় উদ্ধারের জন্য এত করিযাছিল, যাহার লোভে রজনীকে বিবাহ করিবার জন্য উদ্যোগ করিতেছে, সে বিষয় হাতছাড়া হইতেছে, দেখিয়াও সে প্রফুল্ল। কাণ্ডখানা কি ?

আমি অমরনাথকে বলিলাম যে, যদি স্থানান্তরে যাও, তবে আমি রজনীর সঙ্গে সকল কথা মুখ ফুটিয়া কই। অমরনাথ অমনি সরিয়া গেল। আমি তখন

রজনীকে বলিলাম, “সত্য সত্যই কি তুমি বিষয় বিলাইয়া দিবে ?”

“সত্য সত্য। আমি গঙ্গাজল নিয়া শপথ করিয়া বলিতেছি।”

আমি। আমি তোমার দান লই, তুমি যদি আমার কিছু দান লও।

রজনী। অনেক লইয়াছি।

আমি। আরও কিছু লইতে হইবে।

রজনী। একখানি প্রসাদি কাপড় দিবেন।

আমি। তা না। আমি যা দিই, তাই নিতে হইবে।

রজনী। কি দিবেন ?

আমি। শচীন্দ্র বলিয়া আমার একটি পুত্র আছে। আমি তোমাকে শচীন্দ্র দান করিব। স্বামিস্বরূপ তুমি তাহাকে গ্রহণ করিবে। তুমি যদি তাহাকে গ্রহণ কর, তবেই আমি তোমার বিষয় গ্রহণ করিব।

রজনী দাঁড়াইয়াছিল, ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িয়া, অন্ধ নয়ন মুদিল। তারপর তাহার মুদিত নয়ন হইতে অবিরল জলধারা পড়িতে লাগিল–চক্ষের জল আর ফুরায় না। আমি বিষম বিপদে পড়িলাম। রজনী কথা কহে না–কেবল কাঁদে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “কি রজনী! অত কাঁদ কেন ?”

রজনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, “সে দিন গঙ্গার জলে আমি ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিলাম–ডুবিয়াছিলাম, লোকে ধরিয়া তুলিল। সে শচীন্দ্রের জন্য। তুমি যদি বলিতে, তুমি অন্ধ, তোমার চক্ষু ফুটাইয়া দিব–আমি তাহা চাহিতাম না–আমি শচীন্দ্র চাহিতাম। শচীন্দ্রের অপেক্ষা এ জগতে আর কিছুই নাই–আমার প্রাণ তাঁহার কাছে, দেবতার কাছে ফুলের কলিমাত্র–শ্রীচরণে স্থান পাইলেই সার্থক। অন্ধের দুঃখের কথা শুনিবে কি ?”

আমি রজনীর কাতরতা দেখিয়া কাতর হইয়া বলিলাম, “শুনিব।”

তখন রজনী কাঁদিতে কাঁদিতে হৃদয় খুলিয়া আমার কাছে সকল কথা বলিল। শচীন্দ্রের কণ্ঠ, শচীন্দ্রের স্পর্শ, অন্ধের রূপোন্মাদ! তাহার পলায়ন, নিমজ্জন, উদ্ধার সকল বলিল। বলিয়া বলিল, “ঠাকুরাণি, তোমাদের চক্ষু আছে–চক্ষু থাকিলে এত ভালবাসা বাসিতে পারে কি ?”

মনে মনে বলিলাম, “কাণি! তুই ভালবাসার কি জানিস্! তুমি লবঙ্গলতার অপেক্ষা সহস্রগুণে সুখী।” প্রকাশ্যে বলিলাম, “না, রজনি, আমার বুড়া স্বামী–আমি অত শত জানি না। তুমি শচীন্দ্রকে তবে বিবাহ করিবে, ইহা স্থির?”

রজনী বলিল, “না।”

আমি। সে কি ? তবে এত কথা কি বলিতেছিলে–এত কাঁদিলে কেন ?

রজনী। আমার সে সুখ কপালে নাই বলিয়াই এত কাঁদিলাম।

আমি। সে কি ? আমি বিবাহ দিব।

রজনী। দিতে পারিবেন না। অমরনাথ হইতে আমার সর্ব্বস্ব। অমরনাথ আমার বিষয় উদ্ধারের জন্য যাহা করিয়াছেন, পরের জন্য পরে কি তত করে ? তাও ধরি না, তিনি আপনার প্রাণ দিয়া আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন।

রজনী সে বৃত্তান্ত বলিল। পরে কহিল, “যাঁহার কাছে আমি এত ঋণী, তিনি আমার যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। তিনি যখন অনুগ্রহ করিয়া আমাকে দাসী

করিতে চাহিয়াছেন, তখন আমি তাঁহারই দাসী হইব, আর কাহারও নহে।”

হরি! হরি! কেন বাছাকে সন্ন্যাসী দিয়া ঔষধ করিলাম! বিবাহ ব্যতীতও বিষয় থাকে–রজনী ত এখনই বিষয় দিতে চাহিতেছে। কিন্তু ছি! রজনীর দান লইব ? ভিক্ষা মাগিয়া খাইব–সেও ভাল। আমি বলিয়াছি–আমি যদি এই বিবাহ না দিই ত আমি কায়েতের মেয়ে নই। আমি এ বিবাহ দিবই দিব। আমি রজনীকে বলিলাম, “তবে আমি তোমার দান লইব না। তুমি যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে দান করিও।” আমি উঠিলাম।

রজনী বলিল, “আর একবার বসুন। আমি অমরনাথ বাবুর দ্বারা একবার অনুরোধ করাইব। তাঁহাকে ডাকিতেছি।”

অমরনাথের সঙ্গে আর একবার সাক্ষাৎ আমারও ইচ্ছা। আমি আবার বসিলাম। রজনী অমরনাথকে ডাকিল।

অমরনাথ আসিলে, আমি রজনীকে বলিলাম, “অমরনাথ বাবু এ বিষয়ে যদি অনুরোধ করিতে চাহেন, তবে সকল কথা কি তোমার সাক্ষাতে খুলিয়া বলিতে পারিবেন? আপনার প্রশংসা আপনি দাঁড়াইয়া শুনিও না।”

রজনী সরিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : লবঙ্গলতার কথা

আমি অমরনাথকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “তুমি কি রজনীকে বিবাহ করিবে ?”

অ। করিব–স্থির।

আমি। এখনও স্থির ? রজনীর বিষয় ত রজনী আমাকে দিতেছে।

অ। আমি রজনীকে বিবাহ করিব–বিষয় বিবাহ করিব না।

আমি। বিষয়ের জন্যই ত রজনীকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলে ?

অ। স্ত্রীলোকের মন এমনই কদর্য্য।

আমি। আমাদের উপর এত অভক্তি কত দিন ?

অ। অভক্তি নাই–তাহা হইলে বিবাহ করিতে চাহিতাম না।

আমি। কিন্তু বাছিয়া বাছিয়া অন্ধ কন্যাতে এত অনুরাগ কেন ? তাই বিষয়ের কথা বলিতেছিলাম।

অম। তুমি বৃদ্ধতে এত অনুরক্ত কেন ? বিষয়ের জন্য কি ?

আমি। কাহারও সাক্ষাতে তাহার স্বামীকে বুড়া বলিতে নাই। আমার সঙ্গে রাগারাগি কেন ? তুমি কি মুখরা স্ত্রীলোকের মুখকে ভয় কর না।

(কিন্তু রাগারাগি আমার আন্তরিক বাসনা)

অমরনাথ বলিল, “ভয় করি বই কি ? রাগের কথা কিছু বলি নাই। তুমি মিত্রজাকে ভালবাস, আমিও রজনীকে তেমনি ভালবাসি।”

আমি। কটাক্ষের গুণে নাকি ?

অম। না। কটাক্ষ নাই বলিয়া। তুমিও কাণা হইলে আরও সুন্দর হইত।

আমি। সে কথা মিত্রজাকে জিজ্ঞাসা করিব, তোমাকে নহে। সম্প্রতি তুমিও যেমন রজনীকে ভালবাস, আমিও রজনীকে তেমনি ভালবাসি।

অম। তুমিও রজনীকে বিবাহ করিতে চাও নাকি?

আমি। প্রায়। আমি নিজে তাহাকে বিবাহ না করি, তাহার ভাল বিবাহ দিতে চাই। তোমার সঙ্গে তাহার বিবাহ দিতে হইতে দিব না।

অম। আমি সুপাত্র। রজনীর এরূপ আর জুটিতেছে না।

আমি। তুমি কুপাত্র। আমি সুপাত্র জোটাইয়া দিব।

অম। আমি কুপাত্র কিসে?

আমি। কামিজটা খুলিয়া পিঠ বাহির কর দেখি?

অমরনাথের মুখ শুকাইয়া কালো হইয়া গেল। অতি দুঃখিতভাবে বলিল, "ছি! লবঙ্গ!"

আমার দুঃখ হইল, কিন্তু দুঃখ দেখিয়া ভুলিলাম না। বলিলাম, "একটি গল্প বলিব শুনিবে?"

আমি কথা চাপা দিতেছি মনে করিয়া অমরনাথ বলিল, "শুনিব।"

আমি তখন বলিতে লাগিলাম, "প্রথম যৌবনকালে লোকে আমাকে রূপবতী বলিত—"

অ। এটা যদি গল্প, তবে সত্য কোন্ কথা?

আমি। পরে শোন। সেই রূপ দেখিয়া এক চোর মুগ্ধ হইয়া, আমার পিত্রালয়ে, যে ঘরে আমি এক পরিচারিকা সঙ্গে শয়ন করিয়াছিলাম, সেই ঘরে সিঁধ দিল।

এই কথা বলিতে আরম্ভ করায়, অমরনাথ গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া উঠিল। বলিল, "ক্ষমা কর।"

আমি বলিতে লাগিলাম, "সেই চোর সিঁধপথে আমার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। ঘরে আলো জ্বলিতেছিল—আমি চোরকে চিনিলাম। ভীতা হইয়া পরিচারিকাকে উঠাইলাম। সে চোরকে চিনিত না। আমি তখন অগত্যা, চোরকে আদর করিয়া আশ্বস্ত করিয়া পালঙ্কে বসাইলাম।"

অমর। ক্ষমা কর, সে ত সকলই জানি।

আমি। তবু একবার স্মরণ করিয়া দেওয়া ভাল। ক্ষণেক পরে, চোরের অলক্ষ্যে আমার সঙ্কেতানুসারে পরিচারিকা বাহিরে গিয়া দ্বারবান্‌কে ডাকিয়া লইয়া সিঁধমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। আমিও সময় বুঝিয়া, বাহিরে প্রয়োজন ছলনা করিয়া নির্গত হইয়া, বাহির হইতে একমাত্র দ্বারের শৃঙ্খল বদ্ধ করিলাম। মন্দ করিয়াছিলাম?

অমরনাথ বলিল, "এ সকল কথা কেন?"

আমি। পরে চোর নির্গত হইল কি প্রকারে বল দেখি? ডাকিয়া পাড়ার লোক জমা করিলাম। বড় বড় বলবান আসিয়া চোরকে ধরিল। চোর লজ্জায় মুখে কাপড় দিয়া রহিল। আমি দয়া করিয়া তাহার মুখের কাপড় খুলাইলাম না, কিন্তু স্বহস্তে লোহার শলা তপ্ত করিয়া তাহার পিঠে লিখিয়াছিলাম।

"চোর!"

অমরবাবু, অতি গ্রীষ্মেও কি আপনি গায়ের জামা খুলিয়া শয়ন করেন না?

অ। না।

আমি। লবঙ্গলতার হস্তাক্ষর মুছিবার নহে। আমি রজনীকে ডাকিয়া এই গল্প শুনাইয়া যাই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শুনাইব না। তুমি রজনীর যোগ্য নহে, রজনীকে বিবাহ করিতে চেষ্টা পাইও না। যদি ক্ষান্ত না হও, তবে সুতরাং শুনাইতে বাধ্য হইব।

অমরনাথ কিছুক্ষণ ভাবিল। পরে দুঃখিতভাবে বলিল, "শুনাইতে হয় শুনাইও। তুমি শুনাও বা না শুনাও, আমি স্বয়ং আজি তাহাকে সকল শুনাইব। আমার দোষ গুণ সকল শুনিয়া রজনী আমাকে গ্রহণ করিতে হয়, গ্রহণ করিবে; না করিতে হয়, না করিবে। আমি তাহাকে প্রবঞ্চনা করিব না।"

আমি হারিয়া, মনে মনে অমরনাথকে শত শত ধন্যবাদ করিতে করিতে, হর্ষবিষাদে ঘরে ফিরিয়া আসিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : শচীন্দ্রনাথের কথা

ঐশ্বর্য্য হারাইয়া, কিছু দিন পরে আমি পীড়িত হইলাম। ঐশ্বর্য্য হইতে দারিদ্র্যে পতনের আশঙ্কায় মনে কোন বিকার উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া, কি কিজন্য এই পড়ার উৎপত্তি, তাহা আমি বলিবার কোন চেষ্টা পাইব না। কেবল পীড়ার লক্ষণ বলিব।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে রৌদ্রের তাপ অপনীত হইলে পর, প্রাসাদের উপর বসিয়া অধ্যয়ন করিতেছিলাম। সমস্ত দিবস অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। জগতের দুরূহ গূঢ় তত্ত্বসকলের আলোচনা করিতেছিলাম। কিছুরই মর্ম্ম বুঝিতে পারি না, কিন্তু কিছুতেই আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি পায় না। যত পড়ি, তত পড়িতে সাধ করে। শেষ শ্রান্তি বোধ হইল। পুস্তক বন্ধ করিয়া হস্তে লইয়া, চিন্তা করিতে লাগিলাম। একটু নিদ্রা আসিল—অথচ নিদ্রা নহে। সে মোহ, নিদ্রার ন্যায় সুখকর বা তৃপ্তিজনক নহে। ক্লান্ত হস্ত হইতে পুস্তক খসিয়া পড়িল। চক্ষু চাহিয়া আছি—বাহ্য বস্তু সকলই দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু কি দেখিতেছি, তাহা বলিতে পারি না। অকস্মাৎ সেইখানে প্রভাতবীচিবিক্ষেপচপলা কলকলনাদিনী নদী বিস্তৃতা দেখিলাম—যেন তথা ঊষার উজ্জ্বল বর্ণে পূর্ব্বদিকে প্রভাসিত হইতেছে—দেখি, সেই গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে সৈকতমূলে রজনী! রজনী জলে নামিতেছে। ধীরে, ধীরে, ধীরে! অন্ধ! অথচ কুঞ্চিত ভ্রূ; বিকলা অথচ স্থিরা; সেই প্রভাতশান্তিশীতলা ভাগীরথীর ন্যায় গম্ভীরা, ধীরা, সেই ভাগীরথীর ন্যায় অন্তরে দুর্জ্জয় বেগশালিনী! ধীরে, ধীরে, ধীরে,—জলে নামিতেছে। দেখিলাম কি সুন্দর! রজনী কি সুন্দরী! বৃক্ষ হইতে নবমঞ্জুরীর সুগন্ধের ন্যায়, দূরশ্রুত সঙ্গীতের শেষভাগের ন্যায়, রজনী জলে, ধীরে—ধীরে—ধীরে নামিতেছে! ধীরে রজনী! ধীরে! আমি দেখি তোমায়। তখন অনাদর করিয়া দেখি নাই, এখন একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লই। ধীরে, রজনি ধীরে!

আমার মূর্চ্ছা হইল। মূর্চ্ছার লক্ষণ সকল আমি অবগত নহি। যাহা পশ্চাৎ শুনিয়াছি। তাহা বলিয়া কোন ফল নাই। আমি যখন পুনর্ব্বার চেতনাপ্রাপ্ত হইলাম, তখন রাত্রিকাল—আমার নিকট অনেক লোক। কিন্তু আমি সে সকল কিছুই দেখিলাম না। আমি দেখিলাম—কেবল সেই মৃদুনাদিনী গঙ্গা, আর সেই মৃদুগামিনী রজনী, ধীরে, ধীরে, ধীরে জলে নামিতেছে। চক্ষু মুদিলাম, তবু দেখিলাম, সেই গঙ্গা, আর সেই রজনী। আবার চাহিলাম, আবার দেখিলাম সেই গঙ্গা আর সেই রজনী! দিগন্তরে চাহিলাম—আবার সেই রজনী, ধীরে, ধীরে, ধীরে, জলে নামিতেছে। ঊর্দ্ধে চাহিলাম—ঊর্দ্ধেও আকাশবিহারিণী গঙ্গা ধীরে ধীরে, ধীরে বহিতেছে; আর আকাশবিহারিণী রজনী ধীরে, ধীরে, ধীরে নামিতেছে। অন্য দিকে মন ফিরাইলাম; তথাপি সেই গঙ্গা আর সেই রজনী। আমি নিরস্ত হইলাম। চিকিৎসকেরা আমার চিকিৎসা করিতে লাগিল।

অনেক দিন ধরিয়া আমার এই চিকিৎসা হইতে লাগিল, কিন্তু আমার নয়নাগ্র হইতে রজনীরূপ তিলেক জন্য অন্তর্হিত হইল না। আমি জানি না, আমার কি রোগ বলিয়া চিকিৎসকেরা চিকিৎসা করিতেছিল। আমার নয়নাগ্রে যে রূপ অহরহঃ নাচিতেছিল, তাহার কথা কাহাকেও বলি নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : শচীন্দ্রের কথা

ওহে ধীরে, রজনি ধীরে! ধীরে, ধীরে, আমার এই হৃদয়মন্দিরে প্রবেশ কর! এত দ্রুতগামিনী কেন ? তুমি অন্ধ, পথ চেন না, ধীরে, রজনি ধীরে! ক্ষুদ্রা এই পুরী, আঁধার, আঁধার, আঁধার! চিরান্ধাকর! দীপশলাকার ন্যায় ইহাতে প্রবেশ করিয়া আলো কর;–দীপশলাকার ন্যায় আপনি পুড়িবে, কিন্তু এ আঁধার পুরী আলো করিবে।

ওহে ধীরে, রজনি ধীরে! এ পুরী আলো কর, কিন্তু দাহ কর কেন ? কে জানে যে, শীতল প্রস্তরেও দাহ করিবে–তোমায় ত পাষাণগঠিতা, পাষাণময়ী জানিতাম, কে জানে যে, পাষাণেও দাহ করিবে ? অথবা কে জানে, পাষাণেও লৌহের সংঘর্ষণেই অগ্ন্যুৎপাত হয়। তোমার প্রস্তরধবল, প্রস্তরস্নিগ্ধদর্শন, প্রস্তরগঠিতবৎ মূর্ত্তি যত দেখি, ততই দেখিতে ইচ্ছা হয়। অনুদিন, পলকে পলকে, দেখিয়াও মনে হয়, দেখিলাম কই ? আবার দেখি। আবার দেখি, কিন্তু দেখিয়া ত সাধ মিটিল না।

পীড়িতাবস্থায় আমি প্রায় কাহারও সঙ্গে কথা কহিতাম না। কেহ কথা কহিতে আসিলে ভাল লাগিত না। রজনীর কথা মুখে আনিতাম না–কিন্তু প্রলাপকালে কি বলিতাম না বলিতাম, তাহা স্মরণ করিয়া বলিতে পারি না। প্রলাপ সচরাচরই ঘটিত।

শয্যা প্রায় ত্যাগ করিতাম না। শুইয়া শুইয়া কত কি দেখিতাম, তাহা বলিতে পারি না। কখন দেখিতাম, সমরক্ষেত্রে যবননিপাত হইতেছে–রক্তে নদী বহিতেছে; কখন দেখিতাম, সুবর্ণপ্রান্তরে হীরকবৃক্ষে স্তবকে স্তবকে নক্ষত্র ফুটিয়া আছে। কখন দেখিতাম, আকাশমার্গে, অষ্টশশিসমন্বিত শনৈশ্চর মহাগ্রহ চতুশ্চন্দ্রবাহী বৃহস্পতির উপর মহাবেগে পতিত হইল–গ্রহ উপগ্রহ সকল খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল–আঘাতোৎপন্ন বহ্নিতে সে সকল জ্বলিয়া উঠিয়া, দহ্যমানাবস্থাতে মহাবেগে বিশ্বমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে প্রধাবিত হইতেছে। কখন দেখিতাম, এই জগৎ, জ্যোতির্ম্ময় কান্তরূপধর দেবযোনির মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ; তাহারা অবিরত অম্বরপথ প্রভাসিত করিয়া বিচরণ করিতেছে; তাহাদিগের অঙ্গের সৌরভে আমার নাসারন্ধ্র পরিপূর্ণ হইতেছে। কিন্তু যাহাই দেখি না–সকলের মধ্যস্থলে রজনীর সেই প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি দেখিতে পাইতাম। হায় রজনি! পাথরে এত আগুন!

ধীরে, রজনি, ধীরে! ধীরে, ধীরে, রজনি, ঐ অন্ধ নয়ন উন্মীলিত কর। দেখ, আমায় দেখ, আমি তোমায় দেখি! ঐ দেখিতেছি–তোমার নয়নপদ্ম ক্রমে প্রস্ফুটিত হইতেছে–ক্রমে, ক্রমে, ক্রমে, ধীরে, ধীরে, ধীরে,ধীরে, নয়নরাজীব ফুটিতেছে! এ সংসারে কাহার না নয়ন আছে ? গো, মেষ, কুক্কুর, মার্জ্জার ইহাদিগেরও নয়ন আছে–তোমার নাই ? নাই, নাই, তবে আমারও নাই! আমিও আর চক্ষু চাহিব না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : লবঙ্গলতার কথা

আমি জানিতাম, শচীন্দ্র একটা কাণ্ড করিবে–ছেলে বয়সে অত ভাবিতে আছে ? দিদি ত একবার ফিরে চেয়েও দেখেন না–আমি বলিলে বিমাতা বলিয়া আমার কথা গ্রাহ্য করে না। ও সব ছেলেকে আঁটিয়া উঠা ভার। এখন দায় দেখিতেছি আমার। ডাক্তার বৈদ্য কিছু করিতে পারিল না–পারিবেও না। তারা রোগই নির্ণয় করিতে জানে না। রোগ হলো মনে–হাত দেখিলে, চোখ দেখিলে, জিব দেখিলে তাহা কি বুঝিবে ? যদি তারা আমার মত আড়ালে লুকাইয়া বসিয়া আড়ি পেতে ছেলের কাণ্ড দেখত, তবে একদিন রোগের ঠিকানা করিলে করিতে পারিত।

কথাটা কি ? "ধীরে, রজনি!" ছেলে ত একেলা থাকিলেই এই কথাই বলে। সন্ন্যাসী ঠাকুরের ঔষধে কি এই ফল ফলিল ? আমার মাথা খাইতে কেন

আমি এমন কাজ করিলাম ? ভাল, রজনীকে একবার রোগীর কাছে বসাইয়া রাখিলে হয় না ? কই, আমি রজনীর বাড়ী গিয়াছিলাম, সে ত সেই অবধি আমার বাড়ী একবারও আসে নাই! ডাকিয়া পাঠাইলে না আসিয়া থাকিতে পারিবে না। এই ভাবিয়া আমি রজনীর গৃহে লোক পাঠাইলাম–বলিয়া পাঠাইলাম যে, আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, একবার আসিতে বলিও।

মনে করিলাম, আগে একবার শচীন্দ্রের কাছে রজনীর কথা পাড়িয়া দেখি। তাহা হইলে বুঝিতে পারিব, রজনীর সঙ্গে শচীন্দ্রের পীড়ার কোন সম্বন্ধ আছে কি না ?

অতএব প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার জন্য শচীন্দ্রের কাছে গিয়া বসিলাম। এ কথা ও কথার পর রজনীর প্রসঙ্গ ছলে পাড়িলাম। আর কেহ সেখানে ছিল না। রজনীর নাম শুনিবামাত্র বাছা অমনি, চমকিত হংসীর ন্যায় গ্রীবা তুলিয়া আমার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল। আমি যত রজনীর কথা বলিতে লাগিলাম, শচীন্দ্র কিছুই উত্তর করিল না, কিন্তু ব্যাকুলিত চক্ষে আমার প্রতি চাহিয়া রহিল। ছেলে বড় অস্থির হইয়া উঠিল–এটা পাড়ে, সেটা ভাঙ্গে, এইরূপ আরম্ভ করিল। আমি পরিশেষে রজনীকে তিরস্কার করিতে লাগিলাম; সে অত্যন্ত ধনলুব্ধা, আমাদিগের পূর্ব্বকৃত উপকার কিছুমাত্র-স্মরণ করিল না। এইরূপ কথাবার্ত্তা শুনিয়া শচীন্দ্র অপ্রসন্ন ভাবাপন্ন হইলেন, এমন আমার বোধ হইল, কিন্তু কথায় কিছু প্রকাশ পাইল না।

নিশ্চয় বুঝিলাম, এটি সন্ন্যাসীর কীর্ত্তি। তিনি এক্ষণে স্থানান্তরে গিয়াছিলেন, অল্পদিনে আসিবার কথা ছিল। তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। কিন্তু তাহাও মনে ভাবিতে লাগিলাম যে, তিনিই বা কি করিবেন ? আমি নির্ব্বোধ দুরাকাঙ্ক্ষাপরবশ স্ত্রীলোক–ধনের লোভে অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া আপনিই এই বিপত্তি উপস্থিত করিয়াছি! তখন মনে জানিতাম যে, রজনীকে নিশ্চয়ই পুত্রবধূ করিব। তখন কে জানে যে, কাণা ফুলওয়ালীও দুর্লভ হইবে ? কে জানে যে, সন্ন্যাসীর মন্ত্রৌষধে হিতে বিপরীত হইবে ? স্ত্রীলোকের বুদ্ধি অতি ক্ষুদ্র, তাহা জানিতাম না; আপনার বুদ্ধির অহঙ্কারে মজিলাম। আমার এমন বুদ্ধি হইবার আগে, আমি মরিলাম না কেন ? এখন ইচ্ছা হইতেছে মরি, কিন্তু শচীন্দ্রবাবুর আরোগ্য না দেখিয়া মরিতে পারিতেছি না।

কিছু দিন পরে কোথা হইতে সেই পূর্ব্বপরিচিত সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন, তিনি শচীন্দ্রের পীড়া শুনিয়া দেখিতে আসিয়াছেন। কে তাঁহাকে শচীন্দ্রের পীড়ার সংবাদ দিল, তাহা কিছু বলিবেন না।

শচীন্দ্রের পীড়ার বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শুনিলেন। পরে শচীন্দ্রের কাছে বসিয়া নানাপ্রকার কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তৎপরে প্রণাম করিবার জন্য আমি তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। প্রণাম করিয়া, মঙ্গল জিজ্ঞাসার পর বলিলাম, "মহাশয় সর্ব্বজ্ঞ; না জানেন, এমন তত্ত্বই নাই। শচীন্দ্রের কি রোগ, আপনি অবশ্য জানেন।"

তিনি বলিলেন, "উহা বায়ুরোগ। অতি দুশ্চিকিৎস্য।"

আমি বলিলাম, "তবে শচীন্দ্র সর্ব্বদা রজনীর নাম করে কেন ?"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "তুমি বালিকা, বুঝিবে কি?" (কি সর্ব্বনাশ, আমি বালিকা। আমি শচীর মা!) "এই রোগের এক গতি এই যে, হৃদয়স্থ লুক্কায়িত এবং অপরিচিত ভাব বা প্রবৃত্তি সকল প্রকাশিত হইয়া পড়ে, এবং অত্যন্ত বলবান হইয়া উঠে। শচীন্দ্র কদাচিৎ আমাদিগের দৈববিদ্যা সকলের পরীক্ষার্থী হইলে, আমি কোন তান্ত্রিক অনুষ্ঠান করিলাম, তাহাতে যে তাঁহাকে আন্তরিক ভালবাসে, তিনি তাহাকে স্বপ্নে দেখিবেন। শচীন্দ্র রাত্রিযোগে রজনীকে স্বপ্নে দেখিলেন। স্বাভাবিক নিয়ম এই যে, যে আমাদিগকে ভালবাসে বুঝিতে পারি, আমরা তাহার প্রতি অনুরক্ত হই। অতএব সেই রাত্রে শচীন্দ্রের মনে রজনীর প্রতি অনুরাগের বীজ গোপনে সমারোপিত হইল। কিন্তু রজনী অন্ধ, এবং ইতর লোকের কন্যা, ইত্যাদি কারণে সে অনুরাগ পরিস্ফুট হইতে পারে নাই। অনুরাগের লক্ষণ স্বহৃদয়ে কিছু

দেখিতে পাইলেও শচীন্দ্র তৎপ্রতি বিশ্বাস করেন নাই। ক্রমে ঘোরতর দারিদ্র্যদুঃখের আশঙ্কা তোমাদিগকে পীড়িত করিতে লাগিল। সর্ব্বাপেক্ষা শচীন্দ্রই তাহাতে গুরুতর ব্যথা পাইলেন। অন্যমনে, দারিদ্র্যদুঃখ ভুলিবার জন্য শচীন্দ্র অধ্যয়নে মন দিলেন। অনন্যমনা হইয়া বিদ্যালোচনা করিতে লাগিলেন। সেই বিদ্যালোচনার আধিক্য হেতু, চিত্ত উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। তাহাতেই এই মানসিক রোগের সৃষ্টি। সেই মানসিক রোগকে অবলম্বন করিয়া রজনীর প্রতি সেই বিলুপ্তপ্রায় অনুরাগ পুনঃপ্রস্ফুটিত হইল। এখন আর শচীন্দ্রের সে মানসিক শক্তি ছিল না যে, তদ্দ্বারা তিনি সেই অবিহিত অনুরাগকে প্রশমিত করেন। বিশেষ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই সকল মানসিক পীড়ার কারণ যে যে গুপ্ত মানসিক ভাব বিকশিত হয়, তাহা অপ্রকৃত হইয়া উঠে। তখন তাহা বিকারের স্বরূপ প্রতীয়মান হয়। শচীন্দ্রের সেইরূপ এ বিকার।”

আমি তখন কাতর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে, “ইহার প্রতিকারের কি উপায় হইবে?”

সন্ন্যাসী বলিলেন, “আমি ডাক্তারি শাস্ত্রের কিছুই জানি না। ডাক্তারদিগের দ্বারা এ রাগ উপশম হইতে পারে কি না, তাহা বিশেষ বলিতে পারি না। কিন্তু ডাক্তারেরা কখন এ সকল রোগের প্রতীকার করিয়াছেন, এমন আমি শুনি নাই।”

আমি বলিলাম যে, “অনেক ডাক্তার দেখান হইয়াছে, কোন উপকার হয় নাই।”

স। সচরাচর বৈদ্যচিকিৎসকের দ্বারাও কোনও উপকার হইবে না।

আমি। তবে কি কোন উপায় নাই?

স। যদি বল, তবে আমি ঔষধ দিই।

আমি। আপনার ঔষধের অপেক্ষা কাহার ঔষধ? আপনিই আমাদের রক্ষাকর্ত্তা। আপনিই ঔষধ দিন।

স। তুমি বাড়ীর গৃহিণী। তুমি বলিলেই ঔষধ দিতে পারি। শচীন্দ্রও তোমার বাধ্য। তুমি বলিলেই আমার ঔষধ সেবন করিবে। কিন্তু কেবল ঔষধ আরোগ্য হইবে না। মানসিক পীড়ার মানসিক চিকিৎসা চাই। রজনীকে চাই।

আমি। রজনী আসিবে। ডাকিয়া পাঠাইয়াছি।

স। কিন্তু রজনীর আগমনে ভাল হইবে, কি মন্দ হইবে, তাহাও বিবেচ্য। এমত হইতে পারে যে, রজনীর প্রতি এই অপ্রকৃত অনুরাগ, রুগ্নাবস্থায় দেখা সাক্ষাৎ হইলে বদ্ধমূল হইয়া স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইবে। যদি রজনীর সঙ্গে বিবাহ না হয়, তবে রজনী না আসাই ভাল।

আমি। রজনীর আসা ভালা হউক, মন্দ হউক, তাহা বিচার করিবার আর সময় নাই। ঐ দেখুন, রজনী আসিতেছে।

সেই সময়ে একজন পরিচারিকা সঙ্গে রজনী আসিয়া উপস্থিত হইল। অমরনাথও শচীন্দ্রের পীড়া শুনিয়া স্বয়ং শচীন্দ্রকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। এবং রজনীকে সঙ্গে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিলেন। আপনি বহির্ব্বাটীতে থাকিয়া, পরিচারিকার সঙ্গে তাহাকে অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

পঞ্চম খণ্ড

অমরনাথের কথা

প্রথম পরিচ্ছেদ

এই অন্ধ পুষ্পনারী কি মোহিনী জানে, তাহা বলিতে পারি না। চক্ষে কটাক্ষ নাই, অথচ আমার মত সন্ন্যাসীকেও মোহিত করিল। আমি মনে করিয়াছিলাম, লবঙ্গলতার পর আর কখন কাহাকে ভালবাসিব না। মনুষ্যের সকলই অনর্থক দম্ভ! অন্য দূরে থাক, সহজেই এই অন্ধ পুষ্পনারী কর্ত্তৃক মোহিত হইলাম।

মনে করিয়াছিলাম–এ জীবন অমাবস্যার রাত্রির স্বরূপ–অন্ধকারেই কাটিবে–সহসা চন্দ্রোদয় হইল! মনে করিয়াছিলাম–এ জীবনসিন্ধু সাঁতারিয়াই আমাকে পার হইতে হইবে–সহসা সম্মুখে সুবর্ণসেতু দেখিলাম। মনে করিয়াছিলাম, এ মরুভূমি চিরকাল এমনই দগ্ধক্ষেত্র থাকিবে, রজনী সহসা সেখানে নন্দনকানন আনিয়া বসাইল! আমার এ সুখের আর সীমা নাই। চিরকাল যে অন্ধকার গুহামধ্যে বাস করিয়াছে, সহসা সে যদি এই সূর্য্যকিরণসমুজ্জ্বল তরুপল্লবকুসুমসুশোভিত মনুষ্যলোকে স্থাপিত হয়, তাহার যে আনন্দ, আমার সেই আনন্দ! যে চিরকাল পরাধীন পরপীড়িত দাসানুদাস ছিল, সে যদি হঠাৎ সর্ব্বেশ্বর সার্ব্বভৌম হয়, তাহার যে আনন্দ, আমার সেই আনন্দ! রজনীর মত যে জন্মান্ধ, হঠাৎ তাহার চক্ষু ফুটিলে যে আনন্দ, রজনীকে ভালবাসিয়া আমার সেই আনন্দ!

কিন্তু এ আনন্দে পরিণামে কি হইবে, তাহা বলিতে পারি না। আমি চোর! আমার পিঠে, আগুনের অক্ষরে লেখা আছে যে, আমি চোর! যে দিন রজনী সেই অক্ষরে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, এ কিসের দাগ–আমি তাহাকে কি বলিব! বলিব কি যে, ও কিছু নহে ? সে অন্ধ, কিছু জানিতে পারিবে না। কিন্তু যাহাকে অবলম্বন করিয়া আমি সংসারে সুখী হইতে চাহিতেছি–তাহাকে আবার প্রতারণা করিব! যে পারে, সে করুক, আমি যখন পারিয়াছি, তখন ইহার অপেক্ষাও গুরুতর দুষ্কার্য্য করিয়াছি–করিয়া ফলভোগ করিয়াছি–আর কেন ? আমি লবঙ্গলতার কাছে বলিয়াছিলাম, সকল কথা রজনীকে বলিব, কিন্তু বলিতে মুখ ফুটে নাই। এখন বলিব।

যে দিন রজনী শচীন্দ্রকে দেখিয়া আসিয়াছিল, সেই দিন অপরাহ্নে আমি রজনীকে এই কথা বলিতে গেলাম। গিয়া দেখিলাম যে, রজনী একা বসিয়া কাঁদিতেছে। আমি তখন তাহাকে কিছু না বলিয়া রজনীর মাসীকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, রজনী কাঁদিতেছে কেন ? তাহার মাসী বলিল যে, কি জানি ? মিত্রদিগের বাড়ী হইতে আসিয়া অবধি রজনী কাঁদিতেছে। আমি স্বয়ং শচীন্দ্রের নিকট যাই নাই–আমার প্রতি শচীন্দ্র বিরক্ত, যদি আমাকে দেখিয়া তাহার পীড়াবৃদ্ধি হয়, এই আশঙ্কায় যাই নাই–সুতরাং সেখানে কি হইয়াছিল, তাহা জানিতাম না। রজনীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন কাঁদিতেছ ?" রজনী চক্ষু মুছিয়া চুপ করিয়া রহিল।

আমি বড় কাতর হইলাম। বলিলাম, "দেখ রজনি, তোমার যাহা কিছু দুঃখ তাহা জানিতে পারিলে আমি প্রাণপাত করিয়া তাহা নিবারণ করিব–তুমি কি দুঃখে কাঁদিতেছ, আমায় বলিবে না ?"

রজনী আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিল। বহু কষ্টে আবার রোদন সম্বরণ করিয়া বলিল, "আপনি এত অনুগ্রহ করেন, কিন্তু আমি তাহার যোগ্য নহি।"

আমি। সে কি রজনী। আমি মনে জানি, আমি তোমার যোগ্য নহি। আমি তোমাকে সেই কথাই বলিতে আসিয়াছি।

রজনী। আমি আপনার অনুগৃহীত দাসী, আমাকে অমন কথা কেন বলেন ?

আমি। শুন রজনি। আমি তোমাকে বিবাহ করিয়া ইহজন্মে সুখে কাটাইব, এই আমার একান্ত ভরসা। এ আশা আমার ভগ্ন হইলে, বুঝি আমি মরিব। কিন্তু সে আশাতেও যে বিঘ্ন তাহা তোমাকে বলিতে আসিয়াছি। শুনিয়া উত্তর দিও, না শুনিয়া উত্তর দিও না। প্রথমযৌবনে একদিন আমি রূপান্ধ হইয়া উন্মত্ত

হইয়াছিলাম–জ্ঞান হারাইয়া চোরের কাজ করিয়াছিলাম। অঙ্গে আজিও তাহার চিহ্ন আছে। সেই কথাই তোমাকে বলিতে আসিয়াছি।

তখন ধীরে ধীরে, নিতান্ত ধৈর্য্যমাত্র সহায় করিয়া, সেই অকথনীয় কথা রজনীকে বলিলাম। রজনী অন্ধ, তাই বলিতে পারিলাম। চক্ষে চক্ষে সন্দর্শন হইলে বলিতে পারিতাম না।

রজনী নীরব হইয়া রহিল। আমি তখন বলিলাম, "রজনি! রূপোন্মাদে উন্মত্ত হইয়া প্রথমযৌবনে একদিন এই অজ্ঞানের কার্য্য করিয়াছিলাম। আর কখন কোন অপরাধ করি নাই। চিরজীবন সেই একদিনের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি। আমাকে কি তুমি গ্রহণ করিবে?"

রজনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আপনি যদি চিরকাল দস্যুবৃত্তি করিয়া থাকেন–আপনি যদি সহস্র ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, স্ত্রীহত্যা করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও আপনি আমার কাছে দেবতা। আপনি আমাকে চরণে স্থান দিলেই আমি আপনার দাসী হইব। কিন্তু আমি আপনার যোগ্য নহি। সেই কথাটি আপনার শুনিতে বাকি আছে।"

আমি। সে কি রজনি?

রজনী। আমার এই পাপ মন পরের কাছে বিক্রীত।

আমি চমকিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে কি রজনি?"

রজনী বলিল, "আমি স্ত্রীলোক–আপনার কাছে ইহার অধিক আর কি প্রকারে বলিব? কিন্তু লবঙ্গ ঠাকুরাণী সকল জানেন। যদি আপনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তবে সকল শুনিতে পাইবেন। বলিবেন, আমি সকল কথা বলিতে বলিয়াছি।"

আমি তখনই মিত্রদিগের গৃহে গেলাম। যে প্রকারে লবঙ্গের সাক্ষাৎ পাইলাম, তাহা লিখিয়া ক্ষুদ্র বিষয়ে কালক্ষেপ করিব না। দেখিলাম, লবঙ্গলতা ধূলাবলুণ্ঠিতা হইয়া শচীন্দ্রের জন্য কাঁদিতেছে। যাইবামাত্র লবঙ্গলতা আমার পা জড়াইয়া আরও কাঁদিতে লাগিল–বলিল, "ক্ষমা কর! অমরনাথ, ক্ষমা কর! তোমার উপর আমি এত অত্যাচার করিয়াছিলাম বলিয়া বিধাতা আমাকে দণ্ডিত করিতেছেন। আমার গর্ভজ পুত্রের অধিক প্রিয় পুত্র শচীন্দ্র বুঝি আমারই দোষে প্রাণ হারায়! আমি বিষ খাইয়া মরিব! আজি তোমার সম্মুখে বিষ খাইয়া মরিব।"

আমার বুক ভাঙ্গিয়া গেল। রজনী কাঁদিতেছে, লবঙ্গ কাঁদিতেছে। ইহারা স্ত্রীলোক, চক্ষের জল ফেলে; আমার চক্ষের জল পড়িতেছিল না–কিন্তু রজনীর কথায় আমার হৃদয়ের ভিতর হইতে রোদনধ্বনি উঠিতেছিল। লবঙ্গ কাঁদিতেছে, আমি কাঁদিতেছি–আর শচীন্দ্রের এই দশা! কে বলে সংসার সুখের? সংসার অন্ধকার!

আপনার দুঃখ রাখিয়া আগে লবঙ্গের দুঃখের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। লবঙ্গ তখন কাঁদিতে কাঁদিতে শচীন্দ্রের পীড়ার বৃত্তান্ত সমুদয় বলিল। সন্ন্যাসীর বিদ্যা পরীক্ষা হইতে রুগ্নশয্যায় রজনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত লবঙ্গ সকল বলিল।

তার পর রজনীর কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। বলিলাম, "রজনী সকল কথা বলিতে বলিয়াছে–বল।" লবঙ্গ তখন, রজনীর কাছে যাহা যাহা শুনিয়াছিল, অকপটে সকল বলিল।

রজনী শচীন্দ্রের, শচীন্দ্র রজনীর; মাঝখানে আমি কে?

এবার বস্ত্রে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আমি ঘরে ফিরিয়া আসিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এ ভবের হাট হইতে আমার দোকানপাট উঠাইতে হইল। আমার অদৃষ্টে সুখ বিধাতা লিখেন নাই—পরের সুখ কাড়িয়া লইব কেন ? শচীন্দ্রের রজনী শচীন্দ্রকে দিয়া আমি এ সংসার ত্যাগ করিব। এ হাট ভাঙ্গিব, এ হৃদয়কে শাসিত করিব—যিনি সুখদুঃখের অতীত, তাঁহারই চরণে সকল সমর্পণ করিব।

প্রভো, তোমায় অনেক সন্ধান করিয়াছি, কই তুমি ? দর্শনে বিজ্ঞানে তুমি নাই। জ্ঞানীর জ্ঞানে, ধ্যানীর ধ্যানে তুমি নাই। তুমি অপ্রমেয়, এজন্য তোমার পক্ষে প্রমাণ নাই। এই স্ফুটিতোন্মুখ হৃদ্‌পদ্মই তোমার প্রমাণ—ইহাতে তুমি আরোহণ কর। আমি অন্ধ পুষ্পনারীকে পরিত্যাগ করিয়া, তোমার ছায়া সেখানে স্থাপন করি।

তুমি নাই ? না থাক, তোমার নামে আমি সকল উৎসর্গ করিব। অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং তস্মৈ নমঃ বলিয়া এ কলঙ্কলাঞ্ছিত দেহ উৎসর্গ করিব। তুমি যাহা দিয়াছ, তুমি কি তাহা লইবে না ? তুমি লইবে, নহিলে এ কলঙ্কের ভার আর কে পবিত্র করিবে ?

প্রভো! আপনার কাছে একটা নিবেদন আছে। এ দেহ কলঙ্কিত করাইল কে, তুমি, না আমি ? আমি যে অসৎ অসার, দোষ আমার, না তোমার ? আমার এ মনিহারির দোকান সাজাইল কে, তুমি, না আমি ? যাহা তুমি সাজাইয়াছ, তাহা তোমাকেই দিব। আমি এ ব্যবসা আর রাখিব না।

সুখ! তোমাকে সর্ব্বত্র খুঁজিলাম—পাইলাম না। সুখ নাই—তবে আশায় কাজ কি ? যে দেশে অগ্নি নাই, সে দেশে ইন্ধন আহরণ করিয়া কি হইবে ?

প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সব বিসর্জ্জন দিব।

★ ★ ★

আমি পরদিন শচীন্দ্রকে দেখিতে গেলাম। দেখিলাম, শচীন্দ্র অধিকতর স্থির, অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল। তাঁহার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথোপকথন করিতে লাগিলাম। বুঝিলাম, আমার উপর যে বিরক্তি, শচীন্দ্রের মন হইতে তাহা যায় নাই।

পরদিন পুনরপি তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। প্রত্যহই তাঁহাকে দেখিতে যাইতে লাগিলাম। শচীন্দ্রের দুর্ব্বলতা ও ক্লিষ্টভাব কমিল না, কিন্তু ক্রমে স্থৈর্য্য জন্মিতে লাগিল। প্রলাপ দূর হইল। ক্রমে শচীন্দ্র প্রকৃতিস্থ হইলেন।

রজনীর কথা একদিনও শচীন্দ্রের মুখে শুনি নাই। কিন্তু ইহা দেখিয়াছি যে, যে দিন হইতে রজনী আসিয়াছিল, সেই দিন হইতে তাঁহার পীড়া উপশমিত হইয়া আসিতেছিল।

একদিন, যখন আর কেহ শচীন্দ্রের কাছে ছিল না, তখন আমি ধীরে ধীরে বিনা আড়ম্বরে রজনীর কথা পাড়িলাম। ক্রমে তাহার অন্ধতার কথা পাড়িলাম, অন্ধের দুঃখের কথা বলিতে লাগিলাম, এই জগৎসংসারশোভা দর্শনে সে যে বঞ্চিত,—প্রিয়জনদর্শনসুখে সে যে আজন্মমৃত্যুপর্য্যন্ত বঞ্চিত, এই সকল কথা তাঁহার সাক্ষাতে বলিতে লাগিলাম। দেখিলাম, শচীন্দ্র মুখ ফিরাইলেন, তাঁহার চক্ষু জলপূর্ণ হইল।

অনুরাগ বটে।

তখন বলিলাম, "আপনি রজনীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। আমি সেই জন্যই একটি কথার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে চাই। রজনী এক বিধাতাকর্ত্তৃক পীড়িতা, আবার আমাকর্ত্তৃক আরও গুরুত্বর পীড়িতা হইয়াছে।"

শচীন্দ্র আমার প্রতি বিকট কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন।

আমি বলিলাম, "আপনি যদি সমুদয় মনোযোগপূর্ব্বক শুনেন, তবেই আমি বলিতে প্রবৃত্ত হই।"

শচীন্দ্র বলিলেন, “বলুন।”

আমি বলিলাম, “আমি অত্যন্ত লোভী এবং স্বার্থপর। আমি তাহার চরিত্রে মোহিত হইয়া, তাহাকে বিবাহ করিতে উদ্যোগী হইয়াছি। সে আমার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ ছিল, সেই জন্য আমার অভিপ্রায়ে সম্মত হইয়াছে।”

শচীন্দ্র বলিলেন, “মহাশয়, এ সকল কথা আমাকে বলিতেছেন কেন ?”

আমি বলিলাম, “আমি ভাবিয়া দেখিলাম, আমি সন্ন্যাসী, আমি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াই; অন্ধ রজনী কি প্রকারে আমার সঙ্গে দেশে দেশে বেড়াইবে ? আমি এখন ভাবিতেছি, অন্য কোন ভদ্রলোক তাহাকে বিবাহ করে, তবে সুখের হয়। আমি তাহাকে অন্য পাত্রস্থ করিতে চাই। যদি কেহ আপনার সন্ধানে থাকে, সেই জন্য আপনাকে এত কথা বলিতেছি।”

শচীন্দ্র একটু বেগের সহিত বলিল, “রজনীর পাত্রের অভাব নাই।”

আমি বুঝিলাম, রজনীর বরপাত্র কে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন আবার মিত্রদিগের আলয়ে গিয়া দেখা দিলাম। লবঙ্গলতাকে বলিয়া পাঠাইলাম যে, আমি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যাইব। এক্ষণে সম্প্রতি প্রত্যাগমন করিব না–তিনি আমার শিষ্যা, আমি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিব।

লবঙ্গলতা আমার সহিত পুনশ্চ সাক্ষাৎ করিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “আমি কালি যাহা শচীন্দ্রকে বলিয়া গিয়াছি, তাহা শুনিয়াছ কি ?”

ল। শুনিয়াছি। তুমি অদ্বিতীয়। আমাকে ক্ষমা করিও; আমি তোমার গুণ জানিতাম না।

আমি নীরব হইয়া রহিলাম। তখন অবসর পাইয়া লবঙ্গলতা জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা করিয়াছ কেন ? তুমি নাকি কলিকাতা হইতে উঠিয়া যাইতেছ ?”

অ। যাইব।

ল। কেন ?

অ। যাইব না কেন ? আমাকে যাইতে বারণ করিবার ত কেহ নাই।

ল। যদি আমি বারণ করি ?

অ। আমি তোমার কে যে, বারণ করিবে ?

ল। তুমি আমার কে ? তা ত জানি না। এ পৃথিবীতে তুমি আমার কেহ নও। কিন্তু যদি লোকান্তর থাকে–

লবঙ্গলতা আর কিছু বলিল না। আমি ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া বলিলাম, “যদি লোকান্তর থাকে, তবে ?”

লবঙ্গলতা বলিল, “আমি স্ত্রীলোক–সহজে দুর্ব্বলা। আমার কত বল, দেখিয়া তোমার কি হইবে ? আমি ইহাই বলিতে পারি, আমি তোমার পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।”

আমি বড় বিচলিত হইলাম, বলিলাম, "আমি সে কথায় বিশ্বাস করি। কিন্তু একটি কথা আমি কখন বুঝিতে পারিলাম না। তুমি যদি আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তবে আমার গায়ে চিরদিনের জন্য এ কলঙ্ক লিখিয়া দিলে কেন ? এ যে মুছিলে যায় না–কখন মুছিলে যাইবে না।"

লবঙ্গ অধোবদন রহিল। ক্ষণেক ভাবিল। বলিল, "তুমি কুকাজ করিয়াছিলে, আমিও বালিকাবুদ্ধিতেই কুকাজ করিয়াছিলাম। যাহার যে দণ্ড, বিধাতা তাহার বিচার করিবেন,–আমি বিচারের কে ? এখন সে অনুতাপ আমার–কিন্তু সে সকল কথা না বলাই ভাল। তুমি আমার সে অপরাধ ক্ষমা করিবে ?"

আমি। তুমি না বলিতেই আমি ক্ষমা করিয়াছি। ক্ষমাই বা কি ? উচিত দণ্ড করিয়াছিলে–তোমার অপরাধ নাই। আমি আর আসিব না–আর কখন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে না। কিন্তু যদি তুমি কখন ইহার পরে শোন যে, অমরনাথ কুচরিত্র নহে, তবে তুমি আমার প্রতি একটু–অণুমাত্র–স্নেহ করিবে ?

ল। তোমাকে স্নেহ করিলে আমি ধর্ম্মে পতিত হইব।

আমি। না, আমি সে স্নেহের ভিখারী আর নহি। তোমার এই সমুদ্রতুল্য হৃদয়ে কি আমার জন্য এতটুকু স্থান নাই ?

ল। না–যে আমার স্বামী না হইয়া একবার আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়াছিল, তিনি স্বয়ং মহাদেব হইলেও তাঁহার জন্য আমার হৃদয়ে এতটুকু স্থান নাই। লোকে পাখী পুষিলে যে স্নেহ করে, ইহলোকে তোমার প্রতি আমার সে স্নেহও কখন হইবে না।

আবার "ইহলোক।" যাক–আমি লবঙ্গের কথা বুঝিলাম কি না, বলিতে পারি না; কিন্তু লবঙ্গ আমার কথা বুঝিল না। কিন্তু দেখিলাম, লবঙ্গ ঈষৎ কাঁদিতেছে।

আমি বলিলাম, "আমার যাহা বলিবার অবশিষ্ট আছে, তাহা বলিয়া যাই। আমার কিছু ভূসম্পত্তি আছে, আমার তাহাতে প্রয়োজন নাই। তাহা আমি দান করিয়া যাইতেছি।"

ল। কাহাকে ?

আমি। যে রজনীকে বিবাহ করিবে, তাহাকে।

ল। তোমার সমুদয় স্থাবর সম্পত্তি ?

আমি। হাঁ। তুমি এই দানপত্র এক্ষণে তোমার কাছে অতি গোপনে রাখিবে। যত দিন না রজনীর বিবাহ হয়, তত দিন ইহার কথা প্রকাশ করিও না। বিবাহ হইয়া গেলে, রজনীর স্বামীকে দানপত্র দিও।

এই কথা বলিয়া, ললিতলবঙ্গলতার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, দানপত্র আমি তাহার নিকট ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলাম। আমি সকল বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া আসিয়াছিলাম–আমি আর বাড়ী গেলাম না। একেবারে ষ্টেশনে গিয়া বাষ্পীয় শকটারোহণে কাশ্মীর যাত্রা করিলাম।

দোকানপাট উঠিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইহার দুই বৎসর পরে, একদা ভ্রমণ করিতে করিতে আমি ভবানীনগর গেলাম। শুনিলাম যে, মিত্রবংশীয় কেহ তথায় আসিয়া বাস করিতেছেন। কৌতূহলপ্রযুক্ত আমি দেখিতে গেলাম। দ্বারদেশে শচীন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল।

শচীন্দ্র আমাকে চিনিতে পারিয়া, নমস্কার আলিঙ্গনপূর্ব্বক আমার হস্ত ধারণ করিয়া লইয়া উত্তমাসনে বসাইলেন। অনেকক্ষণ তাঁহার সঙ্গে নানাবিধ

কথোপকথন হইল। তাঁহার নিকট শুনিলাম যে, তিনি রজনীকে বিবাহ করিয়াছেন। কিন্তু রজনী ফুলওয়ালী ছিল, পাছে কলিকাতায় ইহাতে লোকে ঘৃণা করে, এই ভাবিয়া তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া ভবানীনগরে বাস করিতেছেন। তাঁহার পিতা ও ভ্রাতা কলিকাতাতেই বাস করিতেছেন।

আমার নিজসম্পত্তি প্রতিগ্রহণ করিবার জন্য শচীন্দ্র বিস্তর অনুরোধ করিলেন। কিন্তু বলা বাহুল্য যে, আমি তাহাতে স্বীকৃত হইলাম না। শেষে শচীন্দ্র রজনীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমারও সে ইচ্ছা ছিল। শচীন্দ্র আমাকে অন্তঃপুরে রজনীর নিকটে লইয়া গেলেন।

রজনীর নিকট গেলে, সে আমাকে প্রণামপূর্ব্বক পদধূলি গ্রহণ করিল। আমি দেখিলাম যে ধূলিগ্রহণকালে, পাদস্পর্শ জন্য, অন্ধগণের স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী সে ইতস্ততঃ হস্তসঞ্চালন করিল না, এককালেই আমার পাদস্পর্শ করিল। কিছু বিস্মিত হইলাম।

সে আমাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু মুখ অবনত করিয়া রহিল। আমার বিস্ময় বাড়িল। অন্ধদিগের লজ্জা চক্ষুর্গত নহে। চক্ষে চক্ষে মিলনজনিত যে লজ্জা, তাহা তাহাদিগের ঘটিতে পারে না বলিয়া, তাহারা দৃষ্টি লুকাইবার জন্য মুখ নত করে না। একটা কি কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, রজনী মুখ তুলিয়া আবার নত করিল, দেখিলাম–নিশ্চিত দেখিলাম–সে চক্ষে কটাক্ষ!

জন্মান্ধ রজনী কি এখন তবে দেখিতে পায়? আমি শচীন্দ্রকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলাম, এমত সময়ে শচীন্দ্র আমাকে বসিবার আসন দিবার জন্য রজনীকে আজ্ঞা করিলেন। রজনী একখানা কার্পেট লইয়া পাতিতেছিল–যেখানে পাতিতেছিল, সেখানে অল্প এক বিন্দু জল পড়িয়াছিল; রজনী আসন রাখিয়া অগ্রে অঞ্চলের দ্বারা জল মুছিয়া লইয়া আসন পাতিল। আমি বিলক্ষণ দেখিলাম যে, রজনী সেই জল স্পর্শ না করিয়াই আসন পাতা বন্ধ করিয়া জল মুছিয়া লইয়াছিল। অতএব স্পর্শের দ্বারা কখনই সে জানিতে পারে নাই যে, সেখানে জল আছে। অবশ্য সে জল দেখিতে পাইয়াছিল।

আমি আর থাকিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম রজনি, "এখন তুমি কি দেখিতে পাও?"

রজনী মুখ নত করিয়া, ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "হাঁ।"

আমি বিস্মিত হইয়া শচীন্দ্রের মুখপানে চাহিলাম। শচীন্দ্র বলিলেন, "আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু ঈশ্বরকৃপায় না হইতে পারে, এমন কি আছে?" আমাদিগের ভারতবর্ষে চিকিৎসাসম্বন্ধে কতকগুলি অতি আশ্চর্য্য প্রকরণ ছিল–সে সকল তত্ত্ব ইউরোপীয়েরা বহুকাল পরিশ্রম করিলেও আবিষ্কৃত করিতে পারিবেন না। চিকিৎসাবিদ্যায় কেন, সকল বিদ্যাতেই এইরূপ। কিন্তু সে সকল এক্ষণে লোপ পাইয়াছে, কেবল দুই একজন সন্ন্যাসী উদাসীন প্রভৃতির কাছে সে সকল লুপ্ত বিদ্যার কিয়দংশ অতি গুহ্যভাবে অবস্থিতি করিতেছে। আমাদিগের বাড়ীতে একজন সন্ন্যাসী কখন কখন যাতায়াত করিয়া থাকেন, তিনি আমাকে ভালবাসিতেন। তিনি যখন শুনিলেন, আমি রজনীকে বিবাহ করিব, তখন বলিলেন, "শুভদৃষ্টি হইবে কি প্রকারে? কন্যা যে অন্ধ।" আমি রহস্য করিয়া বলিলাম, 'আপনি অন্ধত্ব আরোগ্য করুন।' তিনি বলিলেন, 'করিব–এক মাসে।' ঔষধ দিয়া, তিনি এক মাসে রজনীর চক্ষে দৃষ্টি সৃজন করিলেন।"

আমি আরও বিস্মিত হইলাম; বলিলাম, "না দেখিলে, আমি ইহা বিশ্বাস করিতাম না। ইউরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্রানুসারে ইহা অসাধ্য।"

এই কথা হইতেছিল, এমত সময়ে এক বৎসরের একটি শিশু টলিতে টলিতে, চলিতে চলিতে, পড়িতে পড়িতে, উঠিতে উঠিতে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। শিশু আসিয়া, রজনীর পায়ের কাছে দুই একটা আছাড় খাইয়া, তাহার বস্ত্রের একাংশ ধৃত করিয়া টানাটানি করিয়া উঠিয়া, রজনীর হাঁটু ধরিয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া, উচ্চহাসি হাসিয়া উঠিল। তাহার পরে, ক্ষণেক আমার মুখপানে চাহিয়া হস্তোত্তোলন করিয়া আমাকে বলিল, "দা!" (যা!)

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে এটি?"

শচীন্দ্র বলিলেন, "আমার ছেলে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “ইহার নাম কি রাখিয়াছেন ?”
শচীন্দ্র বলিলেন, “অমরপ্রসাদ।”
আমি আর সেখানে দাঁড়াইলাম না।

রাজসিংহ

প্রথম খণ্ড

চিত্রে চরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ : তসবিরওয়ালী

রাজস্থানের পার্ব্বত্যপ্রদেশে রূপনগর নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। রাজ্য ক্ষুদ্র হউক, বৃহৎ হউক, তার একটা রাজা থাকিবে। রূপনগরেরও রাজা ছিল। কিন্তু রাজ্য ক্ষুদ্র হইলে রাজার নামটি বৃহৎ হওয়ার আপত্তি নাই–রূপনগরের রাজার নাম বিক্রমসিংহ। বিক্রমসিংহের আরও সবিশেষ পরিচয় পশ্চাৎ দিতে হইবে।

সম্প্রতি তাঁহার অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিতে আমাদিগের ইচ্ছা। ক্ষুদ্র রাজ্য; ক্ষুদ্র রাজধানী; ক্ষুদ্র পুরী। তন্মধ্যে একটি ঘর বড় সুশোভিত। গালিচার অনুকরণে শ্বেতকৃষ্ণপ্রস্তররঞ্জিত হর্ম্ম্যতল; শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত নানা বর্ণের রত্নরাজিতে রঞ্জিত কক্ষপ্রাচীর; তখন তাজমহল ও ময়ূরতক্তের অনুকরণই প্রসিদ্ধ, সেই অনুকরণে ঘরের দেওয়ালে সাদা পাথরের অসম্ভব পক্ষী সকল, অসম্ভব রকমে অসম্ভব লতার উপর বসিয়া, অসম্ভব জাতির ফুলের উপর পুচ্ছ রাখিয়া, অসম্ভব জাতীয় ফল ভোজন করিতেছে। বড় পুরু গালিচা পাতা, তাহার উপর এক পাল স্ত্রীলোক, দশ জন কি পনর জন। নানা রঙের বস্ত্রের বাহার; নানাবিধ রত্নের অলঙ্কারের বাহার; নানাবিধ উজ্জ্বল কোমল বর্ণের কমনীয় দেহরাজি,–কেহ মল্লিকাবর্ণ, কেহ পদ্মরক্ত, কেহ চম্পকাঙ্গী, কেহ নবদূর্ব্বাদলশ্যামা,–খনিজ রত্নরাশিকে উপহসিত করিতেছে। কেহ তাম্বূল চর্ব্বণ করিতেছে, কেহ আলবোলাতে তামাকু টানিতেছে–কেহ বা নাকের বড় বড় মতিদার নথ দুলাইয়া ভীমসিংহের পদ্মিনী রাণীর উপাখ্যান বলিতেছেন, কেহ বা কাণের হীরকজড়িত কর্ণভূষা দুলাইয়া পরনিন্দায় মজলিস জাঁকাইতেছেন। অধিকাংশই যুবতী; হাসি টিটকারির কিছু ঘটা পড়িয়া গিয়াছে–একটু রঙ্গ জমিয়া গিয়াছে।

যুবতীগণের হাসিবার কারণ, এক প্রাচীনা, কতকগুলি চিত্র বেচিতে আসিয়া তাঁহাদিগের হাতে পড়িয়াছিল। হস্তিদন্তনির্ম্মিত ফলকে লিখিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপূর্ব্ব চিত্রগুলি; প্রাচীনা বিক্রয়াভিলাষে এক একখানি চিত্র বস্ত্রাবরণমধ্য হইতে বাহির করিতেছিল; যুবতীগণ চিত্রিত ব্যক্তির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছিল।

প্রাচীনা প্রথম চিত্রখানি বাহির করিলে, এক কামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "এ কাহার তসবির আয়ি ?"

প্রাচীনা বলিল, "এ শাহজাঁদা বাদশাহের তসবির।"

যুবতী বলিল, "দূর মাগি, এ দাড়ি যে আমি চিনি। এ আমার ঠাকুর দাদার দাড়ি।"

আর একজন বলিল, "সে কি লো ? ঠাকুর দাদার নাম দিয়া ঢাকিস্ কেন? ও যে তোর বরের দাড়ি।" পরে আর সকলের দিকে ফিরিয়া রসবতী বলল, "ঐ দাড়িতে একদিন একটা বিছা লুকাইয়াছিল– সই আমার ঝাড়ু দিয়া সেই বিছাটা মারিল।"

তখন হাসির বড় একটা গোল পড়িয়া গেল। চিত্রবিক্রেত্রী তখন আর একখানা ছবি দেখাইল। বলিল, "এখানা জাহাঁগীর বাদশাহের ছবি।"

দেখিয়া রসিকা যুবতী বলিল, "ইহার দাম কত?"

প্রাচীনা বড় দাম হাঁকিল।

রসিকা পুনরপি জিজ্ঞাসা করিল, "এ ত গেল ছবির দাম। আসল মানুষটা নুরজাঁহা বেগম কতকে কিনিয়াছিল?"

তখন প্রাচীনাও একটু রসিকতা করিল; বলিল, "বিনামূল্যে।"

রসিকা বলিল, "যদি আসলটার এই দশা, তবে নকলটা ঘরের কড়ি কিছু দিয়া আমাদিগকে দিয়া যাও।"

আবার একটা হাসির রোল পড়িয়া গেল। প্রাচীনা বিরক্ত হইয়া চিত্রগুলি ঢাকিল। বলিল, "হাসিতে মা, তসবির কেনা যায় না। রাজকুমারী আসুন, তবে আমি তসবির দেখাইব। আর তাঁরই জন্য এ সকল আনিয়াছি।"

তখন সাত জন সাত দিক্ হইতে বলিল, "ওগো, আমি রাজকুমারী! ও আয়ি বুড়ী, আমি রাজকুমারী।" বৃদ্ধা ফাঁপরে পড়িয়া চারি দিকে চাহিতে লাগিল, আবার আর একটা হাসির গোল পড়িয়া গেল।

অকস্মাৎ হাসির ধুম কম পড়িয়া গেল–গোলমাল একটু থামিল–কেবল তাকাতাকি, আঁচাআঁচি এবং বৃষ্টির পর মন্দ বিদ্যুতের মত ওষ্ঠপ্রান্তে একটু ভাঙ্গা ভাঙ্গা হাসি। চিত্রস্বামিনী ইহার কারণ সন্ধান করিবার জন্য পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁহার পিছনে কে একখানি দেবীপ্রতিমা দাঁড় করাইয়া গিয়াছে।

বৃদ্ধা অনিমেষলোচনে সেই সর্ব্বশোভাময়ী ধবলপ্রস্তরনির্ম্মিতপ্রায় প্রতিমা পানে চাহিয়া রহিল–কি সুন্দর! বুড়ী বয়োদোষে একটু চোখে খাট, তত পরিষ্কার দেখিতে পায় না–তাহা না হইলে দেখিতে পাইত যে, এ ত প্রস্তরের বর্ণ নহে; নির্জ্জীবের এমন সুন্দর বর্ণ হয় না। পাথর দূরে থাকুক, কুসুমেও এ চারুবর্ণ পাওয়া যায় না। দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধা দেখিল যে, প্রতিমা মৃদু মৃদু হাসিতেছে। পুতুল কি হাসে! বুড়ী তখন মনে মনে ভাবিতে লাগিল, এ বুঝি পুতুল নয়–ঐ অতিদীর্ঘ কৃষ্ণতার, চঞ্চল, সজল, বৃহচ্চক্ষুর্দ্বয় তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে।

বুড়ী অবাক্ হইল–এর ওর তার মুখপানে চাহিতে লাগিল–কিছু ভাবিয়া ঠিক পাইল না। বিকলচিত্ত রসিকা রমণীমণ্ডলীর মুখপানে চাহিয়া বৃদ্ধা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "হাঁ গা, তোমরা বল না গা?"

এক সুন্দরী হাসি রাখিতে পারিল না–রসের উৎস উছলিয়া উঠিল–হাসির ফোয়ারার মুখ আপনি ছুটিয়া গেল–যুবতী হাসিতে হাসিতে লুটাইয়া পড়িল। সে হাসি দেখিয়া বিস্ময়বিহ্বলা বৃদ্ধা কাঁদিয়া ফেলিল।

তখন সেই প্রতিমা কথা কহিল। অতি মধুরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আয়ি, কাঁদিস্ কেন গো?"

তখন বুড়ী বুঝিল যে, এটা গড়া পুতুল নহে। আদত মানুষ–রাজমহিষী বা রাজকুমারী হইবে। বুড়ী তখন সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল। এ প্রণাম রাজকুলকে নহে–এ প্রণাম সৌন্দর্য্যকে। বুড়ী যে সৌন্দর্য্য দেখিল, তাহা দেখিয়া প্রণত হইতে হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : চিত্রদলন

এই ভুবনমোহিনী সুন্দরী, যারে দেখিয়া চিত্রবিক্রেত্রী প্রণত হইল, রূপনগরের রাজার কন্যা চঞ্চলকুমারী। যাহারা এতক্ষণ বৃদ্ধাকে লইয়া রঙ্গ করিতেছিল, তাহারা তাঁহার সখীজন এবং দাসী। চঞ্চলকুমারী সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া, সেই রঙ্গ দেখিয়া নীরবে হাস্য করিতেছিলেন। এক্ষণে প্রাচীনাকে মধুরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে গা?"

সখীগণ পরিচয় দিতে ব্যস্ত হইল। "উনি তসবির বেচিতে আসিয়াছেন।"

চঞ্চলকুমারী বলিল, "তা তোমরা এত হাসিতেছিলে কেন?"

কেহ কেহ কিছু কিছু অপ্রতিভ হইল। যিনি সহচরীকে ঝাড়ুদারি রসিকতাটা করিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "আমাদের দোষ কি? আয়ি বুড়ী যত সেকেলে বাদশাহের তসবির আনিয়া দেখাইতেছিল–তাই আমরা হাসিতেছিলাম–আমাদের রাজা রাজড়ার ঘরে শাহজাঁদা বাদশাহ, কি জাহাঁগীর বাদশাহর তসবির কি নাই?"

বৃদ্ধ কহিল, "থাক্‌বে না কেন মা? একখানা থাকিলে কি আর একখানা নিতে নাই? আপনারা নিবেন না, তবে আমরা কাঙ্গাল গরীব প্রতিপালন হইব কি প্রকারে?"

রাজকুমারী তখন প্রাচীনার তসবির সকল দেখিতে চাহিলেন। প্রাচীনা একে একে তসবিরগুলি রাজকুমারীকে দেখাইতে লাগিল। আক্‌বর বাদশাহ, জাহাঁগীর, শাহজহাঁ, নুরজহাঁ, নুরমহালের চিত্র দেখাইল। রাজকুমারী হাসিয়া হাসিয়া সকলগুলি ফিরাইয়া দিলেন– বলিলেন, "ইহারা আমাদের কুটুম্ব, ঘরে ঢের তসবির আছে। হিন্দুরাজার তসবির আছে?"

"অভাব কি?" বলিয়া প্রাচীনা, রাজা মানসিংহ, রাজা বীরবল, রাজা জয়সিংহ প্রভৃতির চিত্র দেখাইল। রাজপুত্রী তাহাও ফিরাইয়া দিলেন, বলিলেন, "এও লইব না। এ সকল হিন্দু নয়, ইহারা মুসলমানের চাকর।"

প্রাচীনা তখন হাসিয়া বলিল, "মা, কে কার চাকর, তা আমি ত জানি না। আমার যা আছে, দেখাই, পসন্দ করিয়া লও।"

প্রাচীনা চিত্র দেখাইতে লাগিল। রাজকুমারী পসন্দ করিয়া রাণা প্রতাপ, রাণা অমরসিংহ, রাণা কর্ণ, যশোবন্ত সিংহ প্রভৃতি কয়খানি চিত্র ক্রয় করিলেন। একখানি বৃদ্ধা ঢাকিয়া রাখিল, দেখাইল না।

রাজকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওখানি ঢাকিয়া রাখিলে যে?" বৃদ্ধা কথা কহে না। রাজকুমারী পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন।

বৃদ্ধা ভীতা হইয়া করযোড়ে কহিল, "আমার অপরাধ লইবেন না–অসাবধানে ঘটিয়াছে–অন্য তসবিরের সঙ্গে আসিয়াছে।"

রাজকুমারী বলিলেন, "অত ভয় পাইতেছ কেন? এমন কাহার তসবির যে, দেখাইতে ভয় পাইতেছ?"

বুড়ী। দেখিয়া কাজ নাই। আপনার ঘরের দুশমনের ছবি।

রাজকুমারী। কার তসবির?

বুড়ী (সভয়ে) রাণা রাজসিংহের।

রাজকুমারী হাসিয়া বলিলেন, "বীরপুরুষ স্ত্রীজাতির কখনও শত্রু নহে। আমি ও তসবির লইব।"

তখন বৃদ্ধা রাজসিংহের চিত্র তাঁহার হস্তে দিল। চিত্র হাতে লইয়া রাজকুমারী অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; দেখিতে দেখিতে তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইল; লোচন বিস্ফারিত হইল। একজন সখী, তাঁহার ভাব দেখিয়া চিত্র দেখিতে চাহিল–রাজকুমারী তাহার হস্তে চিত্র দিয়া বলিলেন, "দেখ।

দেখিবার যোগ্য বটে।”

সখীগণের হাতে হাতে সে চিত্র ফিরিতে লাগিল। রাজসিংহ যুবা পুরুষ নহে–তথাপি তাঁহার চিত্র দেখিয়া সকলে প্রশংসা করিতে লাগিল।

বৃদ্ধা সুযোগ পাইয়া এই চিত্রখানিতে দ্বিগুণ মুনাফা করিল। তার পর লোভ পাইয়া বলিল, “ঠাকুরাণি! যদি বীরের তসবির লইতে হয়, তবে আর একখানি দিতেছি। ইহার মত পৃথিবীতে বীর কে?”

এই বলিয়া বৃদ্ধা আর একখানি চিত্র বাহির করিয়া রাজপুত্রীর হাতে দিল।

রাজকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ কাহার চেহারা?”

বৃদ্ধা। বাদশাহ আলম্গীরের।

রাজকুমারী। কিনিব।

এই বলিয়া একজন পরিচারিকাকে রাজপুত্রী ক্রীত চিত্রগুলির মূল্য আনিয়া বৃদ্ধাকে বিদায় করিয়া দিতে বলিলেন। পরিচারিকা মূল্য আনিতে গেল, ইত্যবসরে রাজপুত্রী সখীগণকে বলিলেন, “এসো, একটু আমোদ করা যাক্!”

রঙ্গপ্রিয় বয়স্যাগণ বলিল, “কি আমোদ বল! বল!”

রাজপুত্রী বলিলেন, “আমি এই আলম্গীর বাদশাহের চিত্রখানি মাটিতে রাখিতেছি। সবাই উহার মুখে এক একটি বাঁ পায়ের নাতি মার। কার নাতিতে উহার নাক ভাঙ্গে দেখি!”

ভয়ে সখীগণের মুখ শুকাইয়া গেল। একজন বলিল, “অমন কথা মুখে আনিও না, কুমারীজী! কাক পক্ষীতে শুনিলেও, রূপনগরের গড়ের একখানি পাতর থাকিবে না।

হাসিয়া রাজপুত্রী চিত্রখানি মাটিতে রাখিলেন, “কে নাতি মারিবি মার!”

কেহ অগ্রসর হইল না। নির্ম্মল নাম্নী একজন বয়স্যা আসিয়া রাজকুমারীর মুখ টিপিয়া ধরিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, “অমন কথা আর বলিও না।”

চঞ্চলকুমারী ধীরে ধীরে অলঙ্কারশোভিত বাম চরণখানি ঔরঙ্গজেবের চিত্রের উপরে সংস্থাপিত করিলেন–চিত্রের শোভা বুঝি বাড়িয়া গেল। চঞ্চলকুমারী একটু হেলিলেন–মড় মড় শব্দ হইল–ঔরঙ্গজেব বাদশাহের প্রতিমূর্ত্তি রাজপুতকুমারীর চরণতলে ভাঙ্গিয়া গেল।

“কি সর্ব্বনাশ! কি করিলে!” বলিয়া সখীগণ শিহরিল।

রাজপুতকুমারী হাসিয়া বলিলেন, “যেমন ছেলেরা পুতুল খেলিয়া সংসারের সাধ মিটায়, আমি তেমনই মোগল বাদশাহের মুখে নাতি মারার সাধ মিটাইলাম।” তার পর নির্ম্মলের মুখ চাহিয়া বলিলেন, “সখি নির্ম্মল! ছেলেদের সাধ মিটে; সময়ে তাহাদের সত্যের ঘর সংসার হয়। আমার কি সাধ মিটিবে না? আমি কি কখন জীবন্ত ঔরঙ্গজেবের মুখে এইরূপ–”

নির্ম্মল, রাজকুমারীর মুখ চাপিয়া ধরিলেন, কথাটা সমাপ্ত হইল না–কিন্তু সকলেই তাহার অর্থ বুঝিল। প্রাচীনার হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল–এমন প্রাণসংহারক কথাবার্ত্তা যেখানে হয়, সেখান হইতে কতক্ষণে নিষ্কৃতি পাইবে! এই সময়ে তাহার বিক্রীত তসবিরের মূল্য আসিয়া পৌঁছিল। প্রাপ্তিমাত্র প্রাচীনা ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

সে ঘরের বাহিরে আসিলে, নির্ম্মল তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া আসিল। আসিয়া তাহার হাতে একটি আশরফি দিয়া বলিল, “আয়ি বুড়ী, দেখিও, যাহা

শুনিলে, কাহারও সাক্ষাতে মুখে আনিও না। রাজকুমারীর মুখের আটক নাই—এখনও উঁহার ছেলে বয়স।”

বুড়ী আশরফটি লইয়া বলিল, “তা এ কি আর বল্‌তে হয় মা! আমি তোমাদের দাসী—আমি কি আর এ সকল কথা মুখে আনি?”

নির্ম্মল সন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : চিত্রবিচারণ

পরদিন চঞ্চলকুমারী ক্রীত চিত্রগুলি একা বসিয়া মনোযোগের সহিত দেখিতেছিলেন। নির্ম্মলকুমারী আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া চঞ্চল বলিল, “নির্ম্মল! ইহার মধ্যে কাহাকেও তোমার বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে?”

নির্ম্মল বলিল, “যাহাকে আমার বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার চিত্র ত তুমি পা দিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ।”

চঞ্চল। ঔরঙ্গজেবকে!

নির্ম্মল। আশ্চর্য্য হইলে যে?

চঞ্চল। বদ্‌জাতের ধাড়ি যে? অমন পাষণ্ড যে আর পৃথিবীতে জন্মে নাই!

নির্ম্মল। বদ্‌জাতকে বশ করিতেই আমার আনন্দ। তোমার মনে নাই, আমি বাঘ পুষিতাম? আমি একদিন না একদিন ঔরঙ্গজেবকে বিবাহ করিব ইচ্ছা আছে।

চঞ্চল। মুসলমান যে?

নির্ম্মল। আমার হাতে পড়িলে ঔরঙ্গজেবও হিন্দু হবে।

চঞ্চল। তুমি মর।

নির্ম্মল। কিছুমাত্র আপত্তি নাই—কিন্তু ঐ একখানা কার ছবি তুমি পাঁচ বার করিয়া দেখিতেছ, সে খবরটা লইয়া তবে মরিব।

চঞ্চলকুমারী তখন আর পাঁচখানা চিত্রের মধ্যে ক্ষিপ্রহস্তে করস্থ চিত্রখানি মিশাইয়া দিয়া বলিল, “কোন্ ছবি আবার পাঁচ বার করিয়া দেখিতেছিলাম? মানুষে মানুষের একটা কলঙ্ক দিতে পারিলেই কি হয়? কোন্ ছবিখানা পাঁচ বার করিয়া দেখিতেছিলাম?”

নির্ম্মল হাসিয়া বলিল, “একখানা তসবির দেখিতেছিলে, তার আর কলঙ্ক কি? রাজকুমারী, তুমি রাগ করিলে বলিয়া আমার কাছে ধরা পড়িলে। কার এমন কপাল প্রসন্ন, তসবিরগুলা দেখিলে আমি খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি।”

চঞ্চলকুমারী। আকব্বর শাহের।

নির্ম্মল। আকব্বরের নামে রাজপুতনী ঝাড়ু মারে। তা ত নহেই।

এই বলিয়া নির্ম্মলকুমারী তসবিরের গোছা হাতে লইয়া খুঁজিতে লাগিল। বলিল, “তুমি যেখানি দেখিতেছিলে, তাহার উল্‌টা পিঠে একটা কালো দাগ আছে দেখিয়াছি।” সেই চিহ্ন ধরিয়া, নির্ম্মলকুমারী একখানা ছবি বাহির করিয়া চঞ্চলকুমারীর হাতে দিল, বলিল, “এইখানি।”

চঞ্চলকুমারী রাগ করিয়া ছবিখানা ফেলিয়া দিল। বলিল, “তোর আর কিছু কাজ নেই, তাই তুই লোককে জ্বালাতন করিতে আরম্ভ করেছিস্। তুই দূর হ।”

নির্ম্মল। “দূর হব না। তা, রাজকুণ্ডার! এ বুড়ার ছবিতে দেখিবার তুমি এত কি পেয়েছ?

চঞ্চল। বুড়ো! তোর কি চোখ গিয়েছে না কি?

নির্ম্মল চঞ্চলকে জ্বালাইতেছিল, চঞ্চলের রাগ দেখিয়া টিপি টিপি হাসিতে লাগিল। নির্ম্মল বড় সুন্দরী, মধুর সরস হাসিতে তাহার সৌন্দর্য্য বড় খুলিল। নির্ম্মল হাসিয়া বলিল, “তা ছবিতে বুড়া না দেখাক–লোকে বলে, মহারাণা রাজসিংহের বয়স অনেক হয়েছে। তাঁর দুই পুত্র উপযুক্ত হইয়াছে।”

চঞ্চল। ও কি রাজসিংহের ছবি? তা অত কে জানে সখি?

নির্ম্মল। কাল কিনেছ–আজ কিছু জান না সখি? তা মানুষটার বয়সও হয়েছে, এমন যে খুব সুপুরুষ, তাও নয়। তবে দেখিতেছিলে কি?

চঞ্চল।

গৌরা সম্‌ঝে ভসমভার,
পিয়ারী সম্‌ঝে কালা।
শচী সম্‌ঝে সহস্রলোচন,
বীর সম্‌ঝে বীরবালা ॥
গঙ্গাগর্জ্জন শম্ভুজটপর,
ধরণী বৈঠত বাসুকীফণ্‌মে।
পবন হোয়ত আগুন-সখা,
বীর ভজত যুবতী মন্‌মে ॥

নির্ম্মল। এখন, তুমি দেখিতেছি, আপনি মরিবার জন্য ফাঁদ পাতিলে। রাজসিংহকে ভজিলে, রাজসিংহকে কি কখন পাইতে পারিবে?

চঞ্চল। পাইবার জন্য কি ভজে? তুমি কি পাইবার জন্য ঔরঙ্গজেব বাদশাহকে ভজিয়াছ?

নির্ম্মল। আমি ঔরঙ্গজেবকে ভজিয়াছি, যেমন বেড়াল ইন্দুর ভজে। আমি যদি ঔরঙ্গজেবকে না পাই, তা নয় আমার বেড়ালখেলাটা এ জন্মের মত রহিয়া গেল। তোমারও কি তাই?

চঞ্চল। আমারও না হয়, সংসারের খেলাটা এ জন্মের মত রহিয়া গেল।

নির্ম্মল। বল কি রাজকুণ্ডার? ছবি দেখিয়া কি এত হয়?

চঞ্চল। কিসে কি হয়, তা তুমি আমি কি জানি? কি হইয়াছে, তাই কি জানি?

আমরাও তাই বলি। চঞ্চলকুমারীর কি হইয়াছে, তা ত বলিতে পারি না। শুধু ছবি দেখিয়া কি হয়, তা ত জানি না। অনুরাগ ত মানুষে মানুষে–ছবিতে মানুষে হইতে পারে কি? পারে, যদি তুমি ছবিছাড়াটুকু আপনি ধ্যান করিয়া লইতে পার। পারে, যদি আগে হইতে মনে মনে তুমি কিছু গড়িয়া রাখিয়া থাক, তার পর ছবিখানাকে (বা স্বপ্নটাকে) সেই মনগড়া জিনিসের ছবি বা স্বপ্ন মনে কর। চঞ্চলকুমারীর কি তাই কিছু হইয়াছিল? তা আঠার বছরের মেয়ের মন আমি কেমন করিয়া বুঝিব বা বুঝাইব?

চঞ্চলকুমারীর মন যাই হোক্, মনের আগুনে এখন ফুঁ দিয়া সে ভাল করে নাই। কেন না, সম্মুখে বড় বিপদ্। কিন্তু সে সকল বিপদের কথা বলিতে আমাদের এখনও অনেক বিলম্ব আছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : বুড়ী বড় সতর্ক

যে বুড়ী ছবি বেচিয়াছিল, সে ফিরিয়া বাড়ী আসিল। তাহার বাড়ী আগ্রা। সে চিত্রগুলি দেশে বিদেশে বিক্রয় করে। বুড়ী রূপনগর হইতে আগ্রা গেল। সেখানে গিয়া দেখিল, তাহার পুত্র আসিয়াছে। তাহার পুত্র দিল্লীতে দোকান করে।

কুক্ষণে বুড়ী রূপনগরে চিত্র বিক্রয় করিতে গিয়াছিল। চঞ্চলকুমারীর সাহসের কাণ্ড যাহা দেখিয়া আসিয়াছিল, তাহা কাহারও কাছে বলিতে না পাইয়া, বুড়ীর মন অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। যদি নির্ম্মলকুমারী তাহাকে পুরস্কার দিয়া কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া না দিত, তবে বোধ হয়, বুড়ীর মন এত ব্যস্ত না হইলেও হইতে পারিত। কিন্তু যখন সে কথা প্রকাশ করিবার জন্য বিশেষ নিষেধ হইয়াছে, তখন বুড়ীর মন কাজে কাজেই কথাটি বলিবার জন্য বড়ই আকুল হইয়া উঠিল। বুড়ী কি করে, একে সত্য করিয়া আসিয়াছে, তাহাতে হাত পাতিয়া মোহর লইয়া নিমক খাইয়াছে, কথা প্রকাশ পাইলেও দুরন্ত বাদশাহের হস্তে চঞ্চলকুমারীর বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহাও বুঝিতেছে। হঠাৎ কথা কাহারও সাক্ষাতে বলিতে পারিল না। কিন্তু বুড়ীর আর দিবসে আহার হয় না–রাত্রিতে নিদ্রা হয় না। শেষ আপনা আপনি শপথ করিল যে, এ কথা কাহারও সাক্ষাতে বলিব না। তাহার পরেই তাহার পুত্র আহার করিতে বসিল–বুড়ী ছেলের সান্‌কির উপর একটু রসাল কাবাব তুলিয়া দিয়া বলিল, “খা! বাবাজান! খা খা লেও। য়ৈসা কাবাব রূপনগরসে আনেকে বক্‌ত এক রোজ বানা থা–ঔর কভী নেহিন্, বনা।”

ছেলে খাইতে খাইতে বলিল, “আম্মাজী! রূপনগরকা যো কেস্‌সা আপ্ ফরমায়েঙ্গে বোলী থী।”

মা বলিল, “চুপ্! বহ বাত্ মুহ্‌মে মৎ লও বাপ্‌জান্! মেয়্‌নে কিয়া বোলী থী? খেয়াল্‌মে বোলী থী শায়েদ্!”

বুড়ী এখন ভুলিয়া গিয়াছিল যে, পূর্ব্বে এক সময়ে চঞ্চলকুমারীর কথাটা তাহার উদরমধ্যে অত্যন্ত দংশন আরম্ভ করায়, তিনি পুত্রের সাক্ষাতে একটু উঃ আঃ করিয়াছিলেন। এবারকার উত্তর শুনিয়া ছেলে বলিল, “চুপ রহেঙ্গে কাহে মাজী? য়ৈসা কিয়া বাত্ হোগী?”

মা। শুন্‌নেকা মাফিক বাত্ নেহিন্, বাপ্‌জান্!

ছেলে। তব্ রহনে দিজিয়ে।

মা। ঔর কুছ্ নেহিন্, রূপনগরওয়ালী কুমারীন্‌কি বাত্।

ছেলে। বহ কুমারীন্ বড়া খুব সুরত? য়েহ য়ৈসা পুষিদা বাত্?

মা। সো নেহিন্–বাঁদীকি বড় দেমাগ। ইয়া আল্লা! মেয়নে কিয়া বোল্ চুকা!

ছেলে। কাঁহা রূপনগর গড়, কাঁহা ওঁহাকা রাজকুমারীন্‌কি দেমাগ–ইয়ে বাত্ আপ্‌কা বোলনাই কিয়া জরুর্–হামারা শুননাই কিয়া জরুর্?

মা। স্রেফ দেমাগ বাপ্‌জান্! লৌণ্ডীনে বাদ্‌শাহে আলম্‌কো নেহিন্ মান্‌তী!

ছেলে। বাদ্‌শাহে আলম্‌কো গালি দিই হোগী?

মা। গালি–বাপ্‌জান! উস্‌সে ভী জবর কুছ!

ছেলে। উস্‌সে ভী জবর! কিয়া হো সক্‌তা? বাদ্‌শাহ আলম্‌কো ঔর মার সক্‌তা নাই!

মা। উস্‌সে ভী জবর!

ছেলে। মার্ সে ভী জবর?
মা। বাপ্‌জান্–ঔর পুছিও মৎ–মেয়্‌নে উস্‌কী নিমক্ খাইন্।
ছেলে। নিমক্ খায়ে হো! কিস্‌তরে মা?
মা। আশরফি দিন্।
ছেলে। কাহে মাজী?
মা। উস্‌কী গুণাহ্‌কে বাত কিসিকা পাস্ বোল্‌না মনাসেব নেহিন্, এস্ লিয়ে।
ছেলে। আচ্ছা বাত হৈ। মুঝ্‌কো একঠো আশরফি বখ্‌শিশ ফর্‌মাইয়ে।
মা। কাহে রে বেটা?
ছেলে। নেহিন্, ত মুঝ্‌কো বোল দিজিয়ে বাত্‌ঠো কিয়া হৈ?
মা। বাত্ ঔর কিয়া, বাদশাহকা তসবির–তোবা! তোবা! বাত্‌ঠো আব্‌হী নিক্‌লী থী।
ছেলে। তসবির ভাঙ্গ্‌ডালা?
মা। আরে বেটা, লাথ্‌সে ভাঙ্গ্‌ডালা! তোবা! মেয়নে নিমকহারামী কর্ চুকা!
ছেলে। নিমকহারামী কিয়া হৈ ইস্‌মে,–তোম্ মা, মেয়্‌নে বেটা! হামরা বোল্‌নেসে নিমকহারামী কিয়া হৈ?
মা। দেখিও বাপ্‌জান্। কিস্‌ইকো বলিও মৎ।
ছেলে। আপ্ খাতেরজমা রহিয়ে–কিস্‌ইকো পাস্ নেহিন্ বোলেঙ্গে।
তখন বুড়ী বিলক্ষণ রসরঞ্জিত করিয়া চিত্রদলনের ব্যাপারটা সমস্ত বলিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : দরিয়া বিবি

বুড়ীর পুত্রের নাম খিজির সেখ। সে তসবির আঁকিত। দিল্লীতে তাহার দোকান। মার কাছে দুই দিন থাকিয়া, সে দিল্লী গেল। দিল্লীতে তাহার এক বিবি ছিল। সেই দোকানেই থাকিত। বিবির নাম ফতেমা। খিজির, মার কাছে রূপনগরের কথা যাহা শুনিয়াছিল, তাহা সমস্তই ফতেমার কাছে বলিল। সমস্ত কথা বলিয়া, খিজির ফতেমাকে বলিল যে, "তুমি এখনই দরিয়া বিবির কাছ যাও। এই সংবাদ বেগম সাহেবাকে বেচিয়া আসিতে বলিও। কিছু পাওয়া যাইবে।"

দরিয়া বিবি পাশের বাড়ীতেই বাস করে। ঘরের পিছন দিয়া যাওয়া যায়। অতএব ফতেমা বিবি, বেপরদা না হইয়াও, দরিয়া বিবির গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

খিজির বা ফতেমার বিশেষ পরিচয় দিবার প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু দরিয়া বিবির বিশেষ পরিচয় চাহি। দরিয়া বিবির আসল নাম, দরীর-উন্নীসা কি এমনই একটা কিছু, কিন্তু সে নাম ধরিয়া কেহ ডাকিত না–দরিয়া বিবি বলিয়াই ডাকিত। তার বাপ মা ছিল না, কেবল জ্যেষ্ঠা ভগিনী আর একটা বুড়ী ফুফু, কি খালা, কি এমনই একটা কি ছিল। বাড়ীতে পুরুষমানুষ কেহ বাস করিত না। দরিয়া বিবির বয়স সতের বৎসরের বেশী নহে–তাহাতে আবার কিছু খর্ব্বাকার, পনের বছরের বেশী দেখাইত না। দরিয়া বিবি বড় সুন্দরী, ফুটন্ত ফুলের মত, সর্ব্বদা প্রফুল্ল।

দরিয়া বিবির ভগিনী অতি উত্তম সুর্‌মা ও আতর প্রস্তুত করিতে পারিত। তাহাই বিক্রয় করিয়া তাহাদের দিনপাত হইত। আপনারা এক্কা বা দোলা করিয়া বড়মানুষের বাড়ী গিয়া বেচিয়া আসিত। দুঃখী মানুষ, রাত্রি হইলে পদব্রজেও যাইত। বাদশাহের অন্তঃপুরে কাহারও যাইবার অধিকার ছিল না–বাহিরের স্ত্রীলোকেরও না– কিন্তু দরিয়া বিবির সেখানে যাইবারও উপায় ছিল। তাহা পরে বলিতেছি।

ফতেমা আসিয়া দরিয়া বিবিকে চঞ্চলকুমারীর সংবাদ বলিল, "এবং বলিয়া দিল যে, ঐ সংবাদ বিক্রয় করিয়া অর্থ আনিতে হইবে।

দরিয়া বিবি বলিল, "রঙ্‌মহালের ভিতর প্রবেশ করিতে হইবে–পরওয়ানাখানা কোথায়?"

ফতেমা বলিল, "তোমারই কাছে আছে।" দরিয়া বিবি তখন পেটারা খুলিয়া একখানা কাগজ বাহির করিল। তাহা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া বলিল, "এইখানা বটে!"

দরিয়া বিবি তখন কিছু সুর্‌মা লইয়া ও পরওয়ানা লইয়া বাহির হইল।

দ্বিতীয় খণ্ড

নন্দনে নরক

প্রথম পরিচ্ছেদ : অদৃষ্টগণনা

জ্যোৎস্নালোকে, শ্বেত-সৈকত পুলিনমধ্যবাহিনী নীলসলিলা যমুনার উপকূলে নগরীগণপ্রধানা মহানগরী দিল্লী, প্রদীপ্ত মণিখণ্ডবৎ জ্বলিতেছে– সহস্র সহস্র মর্ম্মরাদিপ্রস্তরনির্ম্মিত মিনার গম্বুজ বুরুজ ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া চন্দ্রালোকের রশ্মিরাশি প্রতিফলিত করিতেছে। অতিদূরে কুতবমিনারের বৃহচ্চূড়া, ধূমময় উচ্চস্তম্ভবৎ দেখা যাইতেছিল, নিকটে জুম্মা মসজিদের চারি মিনার নীলাকাশ ভেদ করিয়া চন্দ্রলোকে উঠিয়াছে। রাজপথে রাজপথে পণ্যবীথিকা; বিপণিতে শত শত দীপমালা, পুষ্পবিক্রেতার পুষ্পরাশির গন্ধ, নাগরিকজনপরিহিত পুষ্পরাজির গন্ধ, আতর গোলাপের সুগন্ধ, গৃহে গৃহে সঙ্গীতধ্বনি, বহুজাতীয় বাদ্যের নিক্কণ, নাগরীগণের কখন উচ্চ, কখন মধুর হাসি, অলঙ্কারশিঞ্জিত,– এই সমস্ত একত্রিত হইয়া, নরকে নন্দনকাননের ছায়ার ন্যায় অদ্ভুত প্রকার মোহ জন্মাইতেছে। ফুলের ছড়াছড়ি, আতরগোলাপের ছড়াছড়ি,-নর্ত্তকীর নূপুরনিক্কণ, গায়িকার কণ্ঠে সপ্তসুরের আরোহণ অবরোহণ, বাদ্যের ঘটা, কমনীয়কামিনীকরতলকলিত তালের চটচটা; মদ্যের প্রবাহ, বিলোল কটাক্ষবহ্নিপ্রবাহ; খিচুড়ি পোলাওয়ের রাশি রাশি; বিকট, কপট, মধুর, চতুর, চতুর্ব্বিধ হাসি; পথে পথে অশ্বের পদধ্বনি, দোলার বাহকের বীভৎস ধ্বনি; হস্তীর গলঘণ্টার ধ্বনি, এক্কার ঝন্‌ঝনি– শকটের ঘ্যান্‌ঘ্যানানি।

নগরের মধ্যে বড় গুলজার চাঁদনী চৌক। সেখানে রাজপুত বা তুর্কী অশ্বারূঢ় হইয়া স্থানে স্থানে পাহারা দিতেছে। জগতে যাহা কিছু মূল্যবান, তাহা দোকান সকলে থরে থরে সাজান আছে। কোথাও নর্ত্তকী রাস্তায় লোক জমাইয়া, সারঙ্গের সুরে নাচিতেছে গায়িতেছে; কোথাও বাজিকর বাজি করিতেছে, প্রত্যেকের নিকট শত শত দর্শক ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেছে। সকলের অপেক্ষা জনতা "জ্যোতিষী"দিগের কাছে। মোগল বাদশাহদিগের সময়ে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের যেরূপ আদর ছিল, এমন বোধ হয়, আর কখনও হয় নাই। হিন্দু-মুসলমানে তাঁহাদের তুল্য আদর করিতেন। মোগল বাদশাহেরা জ্যোতিষশাস্ত্রের অতিশয়

বশীভূত ছিলেন; তাঁহাদিগের গণনা না জানিয়া অনেক সময়ে অতি গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। যে সকল ঘটনা এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার কিছু পরে ঔরঙ্গজেবের কনিষ্ঠ পুত্র আকব্বর রাজবিদ্রোহী হইয়াছিলেন। পঞ্চাশ হাজার রাজপুত সেনা তাঁহার সহায় ছিল; ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে অল্প সেনাই ছিল, কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদের গণনার উপর নির্ভর করিয়া আকব্বর সৈন্যযাত্রায় বিলম্ব করিলেন, ইতিমধ্যে ঔরঙ্গজেব কৌশল করিয়া তাঁহার চেষ্টা নিষ্ফল করিলেন।

দিল্লীর চাঁদনী চৌকে, জ্যোতিষিগণ রাজপথে আসন পাতিয়া, পুথি পাঁজি লইয়া, মাথায় উষ্ণীষ বাঁধিয়া বসিয়া আছেন– শত শত স্ত্রীপুরুষ আপন আপন অদৃষ্ট গণাইবার জন্য তাঁহাদের কাছে গিয়া বসিয়া আছে; পরদানশীন বিবিরাও মুড়িসুড়ি দিয়া যাইতে সঙ্কোচ করেন নাই। একজন জ্যোতিষীর আসনের চারি পাশে বড় জনতা। তাহার বাহিরে একজন অবগুণ্ঠনবতী যুবতী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জ্যোতিষীর কাছে যাইবার ইচ্ছা, কিন্তু সাহস করিয়া জনতা ঠেলিয়া প্রবেশ করিতে পারিতেছে না–ইতস্ততঃ দেখিতেছে। এমন সময়ে সেই স্থান দিয়া, একজন অশ্বারোহী পুরুষ যাইতেছিল।

অশ্বারোহী যুবা পুরুষ। দেখিয়া আহেলে বিলায়ত মোগল বলিয়া বোধ হয়। তিনি অত্যন্ত সুশ্রী, মোগলদের ভিতরও এরূপ সুশ্রী পুরুষ দুর্লভ। তাঁহার বেশভূষার অতিশয় পারিপাট্য। দেখিয়া একজন বিশেষ সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়া বোধ হয়। অশ্বও সম্ভ্রান্তবংশীয়।

জনতার জন্য অশ্বারোহী অতি মন্দভাবে অশ্বচালনা করিতেছিলেন। যে যুবতী ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতেছিল, সে তাঁহাকে দেখিতে পাইল। দেখিয়াই, নিকটে আসিয়া ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া থামাইল। বলিল, "খাঁ সাহেব– মবারক সাহেব– মবারক!"

মবারক– অশ্বারোহীর ঐ নাম–জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি?"

যুবতী বলিল, "ইয়া আল্লা! আর কি চিনিতেও পার না?"

মবারক বলিল, "দরিয়া?"

দরিয়া বলিল, "জী।"

মবা। তুমি এখানে কেন?

দরিয়া। কেন, আমি ত সকল জায়গায় যাই। তোমার ত নিষেধ নাই। তুমি বারণ কর কি?

মবা। আমি কেন বারণ করিব? তুমি আমার কে?

তারপর মৃদুতর স্বরে মবারক বলিল, "কিছু চাই কি?"

দরিয়া কাণে আঙ্গুল দিয়া বলিল, "তোবা! তোমার টাকা আমার হারাম! আমরা আতর করিতে জানি।"

মবা। তবে আমাকে পাকড়া করিলে কেন?

দরিয়া। নাম, তবে বলিব।

মবারক ঘোড়া হইতে নামিল। বলিল, "এখন বল।"

দরিয়া বলিল, "এই ভিড়ের ভিতর একজন জ্যোতিষী বসিয়া আছেন। ইনি নূতন আসিয়াছেন। ইঁহার মত জ্যোতির্ব্বিদ কখন নাকি আসে নাই। ইঁহার কাছে তোমাকে তোমার কেস্‌মৎ গণাইতে হইবে।"

মবা। আমার কেস্‌মৎ জানিয়া তোমার কি হইবে? তোমার গণাও।

দরিয়া। আমার কেস্‌মৎ আমি জানিতে চাহি না। না গণাইয়াই তাহা জানিতে পারিয়াছি। তোমার কেস্‌মৎ জানাই আমার দরকার।

এই বলিয়া দরিয়া, মবারকের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিল। মবারক বলিল, “আমার ঘোড়া ধরে কে?”

গোটাকতক ছেলে রাজপথে দাঁড়াইয়া লাড্ডু খাইতেছিল। মবারক বলিল, “তোমরা কেহ এক লহমা আমার ঘোড়াটা ধরিয়া রাখ। আমি আসিয়া, তোমাদের আরও লাড্ডু দিব।”

এই বলিবামাত্র দুই তিনটা ছেলে আসিয়া ঘোড়া ধরিল। একটা প্রায় নগ্ন–সে ঘোড়ার উপর চড়িয়া বসিল। মবারক তাহাকে মারিতে গেলেন। কিন্তু তাহার প্রয়োজন হইল না–ঘোড়া একবার পিছনের পা উঁচু করিয়া তাহাকে ফেলিয়া দিল। তাহাকে ভূমিশয্যাগত দেখিয়া, অপর বালকেরা তাহার হাতের লাড্ডু কাড়িয়া লইয়া ভোজন করিল। তখন মবারক নিশ্চিন্ত হইয়া অদৃষ্ট গণাইতে গেলেন।

মবারককে দেখিয়া অপর লোক সকল পথ ছাড়িয়া দিল। দরিয়া বিবি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গেল। জ্যোতিষীর কাছে মবারক হাত পাতিয়া দিলেন। জ্যোতিষী অনেক দেখিয়া শুনিয়া বলিল, “আপনি গিয়া বিবাহ করুন।” পশ্চাৎ হইতে, ভিড়ের ভিতর লুকাইয়া দরিয়া বিবি বলিল, “করিয়াছে।”

জ্যোতিষী বলিল, “কে ও কথা বলিল?”

মবারক বলিলেন, “ও একটা পাগলী। আপনি বলিতে পারেন, আমার কি রকম বিবাহ হইবে?”

জ্যোতিষী বলিল, “আপনি কোন রাজপুত্রীকে বিবাহ করুন।”

মবারক বলিল, “তাহা হইলে কি হইবে?

জ্যোতিষী উত্তর করিল, “তাহা হইলে, আপনার খুব পদবৃদ্ধি হইবে।”

ভিড়ের ভিতর হইতে দরিয়া বিবি বলিল, “আর মৃত্যু।”

জ্যোতিষী বলিল, “কে ও?”

মবা। সেই পাগলী।

জ্যোতিষী। পাগলী নয়। ও বোধ হয় মনুষ্য নয়। আমি আর আপনার হাত দেখিব না।

মবারক কিছু বুঝিতে পারিলেন না। জ্যোতিষীকে কিছু দিয়া, ভিড়ের ভিতর দরিয়ার অন্বেষণ করিলেন। কিছুতেই আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। তখন কিছু বিষণ্নভাবে, অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক, দুর্গাভিমুখে চলিলেন। বলা বাহুল্য, বালকেরা কিছু লাড্ডু পাইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : জেব-উন্নিসা

দরিয়ার সংবাদবিক্রয়ের কি হইল? সংবাদবিক্রয় আবার কি? কাহাকেই বা বিক্রয় করিবে? সে কথাটা বুঝাইবার জন্য, মোগলসম্রাটের অবরোধের কিছু পরিচয় দিতে হইবে।

ভারতবর্ষীয় মহিলারা রাজ্যশাসনে সুদক্ষ বলিয়া বিখ্যাত। পশ্চিমে, কদাচিৎ একটা জেনোবিয়া, ইসাবেলা, এলিজাবেথ ও ক্যাথারাইন পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতবর্ষের অনেক রাজকুলজারাই রাজ্যশাসনে সুদক্ষ। মোগলসম্রাট্‌দিগের কন্যাগণ এ বিষয়ে বড় বিখ্যাত। কিন্তু যে পরিমাণে তাহারা রাজনীতিবিশারদ, সেই পরিমাণে তাহারা ইন্দ্রিয়পরবশ ও ভোগবিলাসপরায়ণ ছিল। ঔরঙ্গজেবের দুই ভগিনী, জাঁহানারা ও রৌশন্বারা। জাঁহানারা শাহজাঁহার বাদশাহীর প্রধান সহায়। শাহজাঁহা তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত কোন রাজকার্য্য করিতেন না; তাঁহার পরামর্শের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্যে সফল ও যশস্বী হইতেন। তিনি পিতার বিশেষ হিতৈষিণী

ছিলেন। কিন্তু তিনি যে পরিমাণে এ সকল গুণবিশিষ্টা ছিলেন, ততোধিক পরিমাণে ইন্দ্রিয়পরায়ণা ছিলেন। ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির জন্য অসংখ্য লোক তাঁহার অনুগৃহীত পাত্র ছিল। সেই সকল লোকের মধ্যে ইউরোপীয় পর্য্যটকেরা এমন ব্যক্তির নাম করেন যে, তাহা লিখিয়া লেখনী কলুষিত করিতে পারিলাম না।

রৌশন্বারা পিতৃদ্বেষিণী, ঔরঙ্গজেবের পক্ষপাতিনী ছিলেন। তিনিও জাঁহানারার মত রাজনীতিবিশারদ এবং সুদক্ষ ছিলেন, এবং ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে জাঁহানারার ন্যায় বিচারশূন্য, বাধাশূন্য, এবং তৃপ্তিশূন্য ছিলেন। যখন পিতাকে পদচ্যুত ও অবরুদ্ধ করিয়া, তাঁহার রাজ্য অপহরণে ঔরঙ্গজেব প্রবৃত্ত, তখন রৌশন্বারা তাঁহার প্রধান সহায়। ঔরঙ্গজেবও রৌশন্বারার বড় বাধ্য ছিলেন। ঔরঙ্গজেবের বাদশাহীতে রৌশন্বারা দ্বিতীয় বাদশাহ ছিলেন।

কিন্তু রৌশন্বারার দুরদৃষ্টক্রমে তাঁহার একজন মহাশক্তিশালিনী প্রতিদ্বন্দ্বিনী তাঁহার বিরুদ্ধে মাথা তুলিল। ঔরঙ্গজেবের তিন কন্যা। কনিষ্ঠা দুটির সঙ্গে বন্দী ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়ের তিনি বিবাহ দিলেন। জ্যৈষ্ঠা জেব-উন্নিসা* বিবাহ করিলেন না। পিতৃস্বসাদিগের ন্যায় বসন্তের ভ্রমরের মত পুষ্পে পুষ্পে মধুপান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

পিসী ভাইঝি উভয়ে অনেক স্থলেই, মদনমন্দিরে প্রতিযোগিনী হইয়া দাঁড়াইতেন। সুতরাং ভাইঝি পিসীকে বিনষ্ট করিবার সঙ্কল্প করিলেন। পিসীর মহিমা তিনি পিতৃসমীপে বিবৃত করিতে লাগিলেন। ফল এই দাঁড়াইল যে, রৌশন্বারা পৃথিবী হইতে অদৃশ্য হইলেন, জেব-উন্নিসা তাঁহার পদমর্য্যাদা ও তাঁহার পদানতগণকে পাইলেন।

পদমর্য্যাদার কথা বলিলাম, তাহার একটু তাৎপর্য্য আছে। বাদশাহের অন্তঃপুরে খোজা ভিন্ন কোন পুরুষ প্রবেশ করিত না, অন্ততঃ করিবার নিয়ম ছিল না। অন্তঃপুরে পাহারার কাজের জন্য একটা স্ত্রীসেনা নিযুক্ত ছিল। যেমন হিন্দুরাজগণ যবনীগণকে প্রতিহারে নিযুক্ত করিতেন, মোগল বাদশাহেরাও তাই করিতেন। তাতারজাতীয়া সুন্দরীগণ মোগলসম্রাটের অবরোধে প্রহরিণী ছিলেন। এই স্ত্রীসৈন্যের একজন নায়িকা ছিলেন; তিনি সেনাপতির স্থানীয়া। তাঁহার পদ উচ্চপদ বলিয়া গণ্য, এবং বেতন ও সম্মান তদনুযায়ী। এই পদে রৌশন্বারা নিযুক্ত ছিলেন। তিনি সহসা অপার্থিব অন্ধকারে অন্তর্হিত হইলে জেব-উন্নিসা তাঁহার পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। যিনি এই পদে নিযুক্ত হইতেন, তিনি রাজান্তঃপুরের সর্ববিষয়ের কর্ত্রী হইতেন। সুতরাং জেব-উন্নিসা রঙ্‌মহালের= সর্ব্বকর্ত্রী ছিলেন। সকলেই তাঁহার অধীন; প্রতিহারিগণ, খোজারা, বাঁদীরা, দৌবারিকগণ, বাহকগণ, পাচকগণ, সকলেই তাঁহার অধীন। অতএব তিনি যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে মহাল মধ্যে আসিতে দিতে পারিতেন।

দুই শ্রেণীর লোক, তাঁহার কৃপায় অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিত; এক প্রণয়ভাজন ব্যক্তিগণ—অপর, যাহারা তাঁহার কাছে সংবাদ বেচিত।

বলিয়াছি, জেব-উন্নিসা একজন প্রধান politician, মোগলসাম্রাজ্যরূপ জাহাজের হাল, এক প্রকার তাঁর হাতে। তিনি মোগলসাম্রাজ্যের "নিয়ামক নক্ষত্র" বলিয়াও বর্ণিত হইয়াছেন। জানা আছে, "politician" সম্প্রদায়ের একটা বড় প্রয়োজন—সংবাদ। কোথায় কি হইতেছে, গোপনে সব জানা চাই। দুর্ম্মুখের মুনিব রামচন্দ্র হইতে বিস্‌মার্ক পর্য্যন্ত সকলেই ইহার প্রমাণ। জেব-উন্নিসা এ কথাটা বিলক্ষণ বুঝিতেন। চারি দিক্ হইতে তিনি সংবাদ সংগ্রহ করিতেন। সংবাদ সংগ্রহের জন্য তাঁর কতকগুলি লোক নিযুক্ত ছিল। তার মধ্যে তসবিরওয়ালা খিজির একজন। তার মা নানা দেশে তসবির বেচিতে যাইত। খিজির তাহার নিকট হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিতেন। দরিয়া বিবির ভগিনীও আতর ও সুর্‌মা বিক্রয়ের উপলক্ষে দিল্লীর ভিতর ভ্রমণ করিয়া অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিত। এই সকল

---

* মুসলমান ইতিহাসে ইনি জেব-উন্নিসা বা জয়েব্-উন্নিসা নামে পরিচিতা। পাদ্রি কক্র বলেন, ইঁহার নাম ফখর-উন্নিসা ।

= বাদশাহের অন্তঃপুরকে রঙ্‌মহাল বা মহাল বলিত।

সংবাদ দরিয়া জেব-উন্নিসার কাছে দিয়া আসিত। জেব-উন্নিসা প্রতি বার কিছু কিছু পুরস্কার দিতেন। ইহাই সংবাদবিক্রয়। সংবাদবিক্রয়ার্থ দরিয়া মহাল মধ্যে প্রবেশ করিতে বাধা না পান, তজ্জন্য জেব-উন্নিসা তাঁহাকে একটা পরওয়ানা দিয়াছিলেন। পরওয়ানার মর্ম্ম এই, "দরিয়া বিবি সুর্‌মা বিক্রয়ের জন্য রঙ্‌মহালে প্রবেশ করিতে পারে।"

কিন্তু দরিয়া বিবি রঙ্‌মহাল প্রবেশকালে হঠাৎ বিঘ্ন প্রাপ্ত হইল। দেখিল—মবারক খাঁ রঙ্‌মহাল মধ্যে প্রবেশ করিল। দরিয়া তখন প্রবেশ করিল না—একটু বিলম্ব করিয়া প্রবেশ করিল।

দরিয়া প্রবেশ করিয়া দেখিল, যেখানে জেব-উন্নিসার বিলাসগৃহ, মবারক সেইখানে গেল। দরিয়া একটা বৃক্ষবাটিকার ছায়ার মধ্যে লুকাইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ঐশ্বর্য্য-নরক

দিল্লী মহানগরীর সারভূত দিল্লীর দুর্গ; দুর্গের সারভূত রাজপ্রাসাদমালা। এই রাজপ্রসাদমালার ভিতর, অল্প ভূমিমধ্যে যত ধনরাশি, রত্নরাশি, রূপরাশি এবং পাপরাশি ছিল, সমস্ত ভারতবর্ষে তাহা ছিল না। রাজপ্রাসাদমালার সারভূত অন্তঃপুর বা রঙ্‌মহাল। ইহা কুবের ও কন্দর্পের রাজ্য,—চন্দ্র সূর্য্য তথায় প্রবেশ করে না; যম গোপনে ভিন্ন তথায় যান না; বায়ুরও গতিরোধ। তথায় গৃহসকল বিচিত্র; গৃহসজ্জা বিচিত্র; অন্তঃপুরবাসিনী সকল বিচিত্র। এমন রত্নখচিত, ধবলপ্রস্তরনির্ম্মিত কক্ষরাজি কোথাও নাই; এমন নন্দনকাননিন্দিনী উদ্যানমালা আর কোথাও নাই—এমন উর্ব্বশী মেনকা রম্ভার গর্ব্বখর্ব্বকারিণী সুন্দরীর সারি আর কোথাও নাই, এত ভোগবিলাস জগতে আর কোথাও নাই। এত মহাপাপ আর কোথাও নাই।

ইহার মধ্যে জেব-উন্নিসার বিলাসগৃহ আমাদের উদ্দেশ্য।

অতি মনোহর বিলাসগৃহ। শ্বেতকৃষ্ণ প্রস্তরের হর্ম্ম্যতল। শ্বেতমর্ম্মরনির্ম্মিত কক্ষপ্রাচীর; পাথরে রত্নের লতা, রত্নের পাতা, রত্নের ফুল, রত্নের ফল, রত্নের পাখী, রত্নের ভ্রমর। কিয়দ্দূর উর্দ্ধে সর্ব্বত্র দর্পণমণ্ডিত। তাহার ধারে ধারে সোণার কামদার বীট। উর্দ্ধে রূপার তারের চন্দ্রাতপ, তাহাতে মতির ছোট ঝালর; এবং সদ্যোনিচিত পুষ্পরাশির বড় ঝালর। হর্ম্ম্যতলে নববর্ষাসমাগমোদ্গত কোমল তৃণরাজি অপেক্ষাও সুকোমল গালিচা পাতা; তাহার উপর গজদন্তনির্ম্মিত রত্নালঙ্কৃত পালঙ্ক। তাহার উপর জরির কামদার বিছানায় জরির কামদার মখমলের বালিশ। শয্যার উপর বিবিধ পাত্রে রাশি রাশি সুগন্ধি পুষ্প, পাত্রে পাত্রে আতর গোলাপ; সুগন্ধি যত্নপ্রস্তুত তাম্বূলের রাশি। আর পৃথক্ সুবর্ণপাত্রে সুপেয় মদ্য। সকলের মধ্যে, পুষ্পরাশিকে, রত্নরাশিকে ম্লান করিয়া, প্রৌঢ়া সুন্দরী জেব-উন্নিসা, পানপাত্র-হস্তে বাতায়নপথে, নিশীথ নক্ষত্রশোভা নিরীক্ষণ করিতে করিতে, মৃদু পবনে পুষ্পমণ্ডিত মস্তক শীতল করিতেছিলেন, এমন সময়ে মবারক খাঁ তথায় উপস্থিত।

মবারক জেব-উন্নিসার নিকট গিয়া বসিলেন, এবং তাম্বূলাদি প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া চরিতার্থ হইলেন।

জেব-উন্নিসা বলিল, "না খুঁজিতে যে আসে, সেই ভালবাসে।"

মবারক বলিল, "না ডাকিতে আসিয়াছি, বেআদবি হইয়াছে। কিন্তু ভিক্ষুক, না ডাকিতেই আসিয়া থাকে।"

জেব-উন্নিসা। তোমার কি ভিক্ষা প্রাণাধিক!

মবারক। ভিক্ষা এই যে, যেন মোল্লার হুকুমে ঐ শব্দে আমার অধিকার হয়।

জেব-উন্নিসা হাসিয়া বলিল, “ঐ সেই পুরাতন কথা! বাদশাহজাদীরা কখন বিবাহ করে?”

মবা। তোমার কনিষ্ঠা ভগিনীগণ ত বিবাহ করিয়াছে।

জেব। তাহারা শাহজাদা বিবাহ করিয়াছে। বাদশাহজাদীরা শাহজাদা ভিন্ন বিবাহ করে না। বাদশাহজাদীরা দুইশতী মন্‌সবদারকে কি বিবাহ করিতে পারে?

মবা। তুমি মালেকে মুলুক। তুমি বাদশাহকে যাহা বলিবে, তিনি তাহাই করিবেন, ইহা সর্ব্বলোকে জানে।

জেব। যাহা অনুচিত, তাহাতে আমি বাদশাহকে অনুরোধ করিব না।

মবা। আর এই কি উচিত, শাহজাদী?

জেব। এই কি?

মবা। এই মহাপাপ।

জেব। কে মহাপাপ করিতেছে?

মবারক মাথা হেঁট করিল। শেষ বলিল, “তুমি কি বুঝিতেছ না?”

জেব-উন্নীসা। যদি ইহা পাপ বলিয়া বোধ হয়, আর আসিও না।

মবারক সকাতরে বলিল, “আমার যদি সে সাধ্য থাকিত, তবে আমি আর আসিতাম না। কিন্তু আমি ঐ রূপরাশিতে বিক্রীত।”

জেব। যদি বিক্রীত–যদি তুমি আমার কেনা–তবে যা বলি, তাই কর। চুপ করিয়া থাক।

মবা। যদি আমি একাই এ পাপের দায়ী হইতাম, না হয় চুপ করিয়া থাকিতাম। কিন্তু আমি তোমাকে আপনার অধিক ভালবাসি।

জেব-উন্নিসা উচ্চ হাসি হাসিল। বলিল, “বাদশাহজাদীর পাপ!”

মবারক বলিল, “পাপপুণ্য আল্লার হুকুম।”

জেব। আল্লা এ সকল হুকুম ছোটলোকের জন্য করিয়াছেন–কাফেরের জন্য। আমি কি হিন্দুদের বামুনের মেয়ে, না রাজপুতের মেয়ে যে, এক স্বামী করিয়া, চিরকাল দাসীত্ব করিয়া, শেষ আগুনে পুড়িয়া মরিব? আল্লা যদি আমার জন্য সেই বিধি করিতেন, তবে আমাকে কখনও বাদশাহজাদী করিতেন না।

মবারক একেবারে আকাশ হইতে পড়িল–এরূপ কদর্য্য কথা সে কখনও শুনে নাই। সেই পাপস্রোতোময়ী দিল্লীতেও কখনও শুনে নাই। অন্য কেহ এ কথা তাহার সম্মুখে বলিলে, সে বলিত, “তুমি বজ্রাহত হইয়া মর।” কিন্তু জেব-উন্নিসার রূপের সমুদ্রে সে ডুবিয়া গিয়াছিল–তাহার আর দিগ্বিদিক্ জ্ঞান ছিল না। সে কেবল বিস্মিত হইয়া রহিল।

জেব-উন্নিসা বলিতে লাগিল, “ও কথা যাক্। অন্য কথা আছে। ও কথা যেন আর কখনও না শুনি। শুনি যদি–”

মবারক। আমাকে ভয় দেখাইবার কি প্রয়োজন? আমি জানি, তুমি যাহার উপর অপ্রসন্ন হইবে, এক দণ্ড তাহার কাঁধে মাথা থাকিবে না। কিন্তু ইহাও বোধ হয় তুমি জান যে, মবারক মৃত্যুকে ভয় করে না।

জেব-উন্নিসা। মরণের অপেক্ষা আর কি দণ্ড নাই?

মবা। আছে– তোমার বিচ্ছেদ।

জেব-উন্নিসা। বার বার অসঙ্গত কথা বলিলে তাহাই ঘটিতে পারে।

মবারক বুঝিলেন যে, একটা ঘটিলে দুইটাই ঘটিবে। তিনি যদি পাপিষ্ঠা বলিয়া জেব-উন্নিসাকে পরিত্যাগ করেন, তবে তাঁহাকে নিশ্চিত নিহত হইতে হইবে। জেব-উন্নিসা মোগল রাজ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা। খোদ ঔরঙ্গজেব তাঁহার আজ্ঞাকারী। কিন্তু সেজন্য মবারক দুঃখিত নহেন। তাঁহার দুঃখ এই যে, তিনি বাদশাহজাদীর রূপে মুগ্ধ, তাহাকে পরিত্যাগ করিবার কিছুমাত্র সাধ্য নাই; এই পাপপঙ্ক হইতে উদ্ধৃত হইবার তাঁহার শক্তি নাই।

অতএব মবারক বিনীত ভাবে বলিল, "আপনি ইচ্ছাক্রমে যতটুকু দয়া করিবেন, তাহাতেই আমার জীবন পবিত্র। আমি যে আরও দুরাকাঙ্ক্ষা রাখি,–তাহা দরিদ্রের ধর্ম্ম বলিয়া জানিবেন। কোন্ দরিদ্র না দুনিয়ার বাদশাহী কামনা করে?"

তখন প্রসন্ন হইয়া শাহজাদী মবারককে আসব পুরস্কার করিলেন। মধুর প্রণয়সম্ভাষণের পর তাহাকে আতর ও পান দিয়া বিদায় করিলেন।

মবারক রঙ্মহাল হইতে নির্গত হইবার পূর্ব্বেই, দরিয়া বিবি আসিয়া তাহাকে ধৃত করিল। অন্যের অশ্রাব্য স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন, রাজপুত্রীর সঙ্গে বিবাহ স্থির হইল?"

মবারক বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কে?"

দরিয়া। সেই দরিয়া।

মবা। দুশমন! সয়তান! তুই এখানে কেন?

দরিয়া। জান না, আমি সংবাদ বেচি?

মবারক শিহরিল। দরিয়া বিবি বলিল, "রাজপুত্রীর সঙ্গে বিবাহ কি হইবে?"

মবা। রাজপুত্রী কে?

দরিয়া। শাহজাদী জেব-উন্নিসা বেগম সাহেবা। শাহজাদী কি রাজপুত্রী নহে?

মবা। আমি তোকে এইখানে খুন করিব।

দরিয়া। তবে আমি হাল্লা করি।

মবা। আচ্ছা, না হয়, খুন নাই করিলাম। তুই কার কাছে খবর বেচিতে আসিয়াছিস বল্।

দরিয়া। বলিব বলিয়াই দাঁড়াইয়া আছি। হজ্‌রৎ জেব-উন্নিসা বেগমের কাছে।

মবা। কি খবর বেচিবি?

দরিয়া। যে আজ তুমি বাজারে জ্যোতিষীর কাছে, আপনার কিসমত জানিতে গিয়াছিলে। তাতে জ্যোতিষী তোমাকে শাহজাদী বিবাহ করিতে বলিয়াছে। তাহা হইলে তোমার তরক্কী হইবে।

মবা। দরিয়া বিবি! আমি তোমার কি অপরাধ করিয়াছি যে, তুমি আমার উপর এই দৌরাত্ম্য করিতে প্রস্তুত?

দরিয়া। কি করিয়াছ? তুমি আমার কি না করিয়াছ? তুমি যাহা করিয়াছ, তার অপেক্ষা স্ত্রীলোকের অনিষ্ট কি আছে?

মবা। কেন পিয়ারি! আমার মত কত আছে।

দরিয়া। এমন পাপিষ্ঠ আর নাই।

মবা। আমি পাপিষ্ঠ নই। কিন্তু এখানে দাঁড়াইয়া এত কথা চলিতে পারে না। স্থানান্তরে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও। আমি সব বুঝাইয়া দিব।

এই বলিয়া মবারক আবার জেব-উন্নিসার কাছে ফিরিয়া গেল। জেব-উন্নিসাকে বলিল, "আমি পুনর্ব্বার আসিয়াছি, এ বেআদবি মাফ্ করিতে হইতেছে। বলিতে আসিয়াছি যে, দরিয়া বিবি হাজির আছে—এখনই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে। সে পাগল। সে আপনার কাছে, আমার কোন নিন্দাবাদ করিলে আমার উত্তর না লইয়া আমার প্রতি আপনি কোপ করিবেন না।"

জেব-উন্নিসা বলিলেন, "তোমার উপর কোপ করিবার আমার সাধ্য নাই। যদি তোমার উপর কখন রাগ করি, তবে আমিই দুঃখ পাইব। তোমার নিন্দা আমি কাণে শুনি না।"

"এ দাসের উপর এইরূপ অনুগ্রহ চিরকাল রাখিবেন" এই বলিয়া মবারক পুনর্ব্বার বিদায় গ্রহণ করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : সংবাদবিক্রয়

যে তাতারী যুবতী, অসিচর্ম্ম হস্তে লইয়া, জেব-উন্নিসার গৃহের দ্বারে প্রহরায় নিযুক্ত, সে দরিয়াকে দেখিয়া বলিল, "এত রাত্রে কেন?"

দরিয়া বিবি বলিল, "তা কি পাহারাওয়ালীকে বলিব? তুই খবর দে।"

তাতারী বলিল, "তুই বেরো—আমি খবর দিব না।"

দরিয়া বলিল, "রাগ কর কেন, দোস্ত? তোমার নজরের লজ্জতেই কাবুল পঞ্জাব ফতে হয়, তার উপর আবার, হাতে ঢাল তরবার—তুমি রাগিলে কি আর চলে?—এই আমার পরওয়ানা দেখ—আর এত্তেলা কর।"

প্রহরিণী, রক্তাধরে একটু মধুর হাসি হাসিয়া বলিল, "তোমাকেও চিনি, তোমার পরওয়ানাও চিনি। তা এত রাত্রিতে কি আর হজরৎ বেগম সাহেবা সুর্‌মা কিনিবে? তুমি কাল সকালে এসো। এখন খসম থাকে, খসমের কাছে যাও—আর না থাকে যদি—"

দরিয়া। তুই জাহান্নামে যা। তোর ঢাল তরবার জাহান্নামে যাক্—তোর ওড়ুনা পায়জামা জাহান্নামে যাক্—তুই কি মনে করিস্, আমি রাত দুপুরের কাজ না থাকিলে, রাত দুপুরে এয়েছি?

তখন তাতারী চুপি চুপি বলিল, "হজরৎ বেগম সাহেবা এস্ বক্ত কুচ মজেমে হোয়েঙ্গী।"

দরিয়া বলিল, "আরে বাঁদী, তা কি আমি জানি না? তুই মজা করিবি? হাঁ কর্।"

তখন দরিয়া, ওড়নার ভিতর হইতে এক শিশি সরাব বাহির করিল। প্রহরিণী হাঁ করিল—দরিয়া শিশি ভোর তার মুখে ঢালিয়া দিল—তাতারী শুষ্ক নদীর মত, এক নিশ্বাসে তাহা শুষিয়া লইল। বলিল, "বিস্‌মেল্লা! তৌফা সরবৎ! আচ্ছা, তুমি খাড়া থাক, আমি এত্তেলা করিতেছি।"

প্রহরিণী কক্ষের ভিতর গিয়া দেখিল, জেব-উন্নিসা হাসিতে হাসিতে ফুলের একটা কুকুর গড়িতেছেন,—মবারকের মত তার মুখটা হইয়াছে—আর বাদশাহদিগের সেরপেঁচ কলগার মত তার লেজটা হইয়াছে। জেব-উন্নিসা প্রহরিণীকে দেখিয়া বলিল, "নাচ্‌নেওয়ালী লোগ্‌কো বোলাও।"

রঙ্‌মহালের সকল বেগমদিগের আমোদের জন্য এক এক সম্প্রদায় নর্ত্তকী নিযুক্ত ছিল। ঘরে ঘরে নৃত্যগীত হইত। জেব-উন্নিসার প্রমোদার্থ একদল নর্ত্তকী ছিল।

প্রহরিণী পুনশ্চ কর্ণিশ করিয়া বলিল, "যো হুকুম। দরিয়া বিবি হাজির, আমি তাড়াইয়া দিয়াছিলাম—মানা শুনিতেছে না।"

জেব। কিছু বখ্‌শিশও দিয়াছে?

প্রহরিণী সুন্দরী লজ্জিতা হইয়া ওড়ুনায় আকর্ণ মুখ ঢাকিল। তখন জেব-উন্নিসা বলিল, “আচ্ছা, নাচ্‌নেওয়ালী থাক্–দরিয়াকে পাঠাইয়া দে।”

দরিয়া আসিয়া কুর্নিশ করিল। তার পর ফুলের কুকুরটি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দেখিয়া বেগম সাহেবা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন হয়েছে দরিয়া?”

দরিয়া ফের কুর্ণিশ করিয়া বলিল, “ঠিক মন্‌সবদার মবারক খাঁ সাহেবের মত হইয়াছে।”

জেব। ঠিক! তুই নিবি?

দরিয়া। কোন্‌টা দিবেন? কুকুরটা, না মানুষটা?

জেব-উন্নিসা ভ্রূভঙ্গ করিল। পরে রাগ সামলাইয়া হাসিয়া বলিল, “যেটা তোর খুসী।”

দরিয়া। তবে কুকুরটা হজরৎ বেগম সাহেবার থাক্–আমি মানুষটা নিব।

জেব। কুকুরটা এখন হাতে আছে–মানুষটা এখন হাতে নাই। এখন কুকুরটাই নে।

এই বলিয়া জেব-উন্নিসা আসবসেবনপ্রফুল্লচিত্তে যে ফুলে কুকুর গড়িয়াছিল, সেই ফুলগুলা দরিয়াকে ফেলিয়া দিতে লাগিলেন। দরিয়া তাহা কুড়াইয়া লইয়া ওড়ুনায় তুলিল–নহিলে বেআদবি হইবে। তার পর সে বলিল, “আমি হুজুরের কৃপায় কুকুর মানুষ দুই পাইলাম।”

জেব। কিসে?

দ। মানুষটা আমার।

জেব। কিসে?

দ। আমার সঙ্গে সাদি হয়েছে।

জেব। নেকাল হিঁয়াসে।

জেব-উন্নিসা কতকগুলা ফুল ফেলিয়া সবলে দরিয়াকে প্রহার করিল।

দরিয়া জোড়হাত করিয়া বলিল, “মোল্লা গোওয়া সব জীবিত আছে। না হয় তাহাদের জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান।”

জেব-উন্নিসা ভ্রূভঙ্গ করিয়া বলিল, “আমার হুকুমে তাহারা শূলে যাইবে।”

দরিয়া কাঁপিল। এই ব্যাঘ্রীতুল্যা মোগল-কুমারীরা সব পারে, তা সে জানিত। বলিল, “শাহজাদী! আমি দুঃখী মানুষ, খবর বেচিতে আসিয়াছি– আমার সে সব কথার প্রয়োজন নাই।”

জেব। কি খবর– বল্।

দরিয়া। দুইটা আছে। একটা এই মবারক খাঁ সম্বন্ধে। আজ্ঞা না পাইলে বলিতে সাহস হয় না।

জেব। বল্।

দরিয়া। ইনি আজ রাত্রে চৌকে গণেশ জ্যোতিষীর কাছে আপনার কিসমত গণাইতে গিয়াছিলেন।

জেব। জ্যোতিষী কি বলিল?

দরিয়া। শাহজাদী বিবাহ কর। তাহা হইলে তোমার তরক্কী হইবে।

জেব। মিছা কথা। মন্‌সবদার কখন্ জ্যোতিষীর কাছে গেল?

দরিয়া। এখানে আসিবার আগেই।

জেব। কে এখানে আসিয়াছিল?

দরিয়া একটু ভয় খাইল। কিন্তু তখনই আবার সাহস করিয়া তস্‌লীম দিয়া বলিল, "মবারক খাঁ সাহেব।"

জেব। তুই কেমন করিয়া জানিলি?

দরিয়া। আমি আসিতে দেখিয়াছি।

জেব। যে এ সকল কথা বলে, আমি তাহাকে শূলে দিই।

দরিয়া শিহরিল। বলিল, "বেগম সাহেবার হুজুরে ভিন্ন এ সকল কথা আমি মুখে আনি না।"

জেব। আনিলে, জল্লাদের হাতে তোমার জিব কাটাইয়া ফেলিব। তোর দোস্‌রা খবর কি বল্?

দরিয়া। দোস্‌রা খবর রূপনগরের।

দরিয়া তখন চঞ্চলকুমারীর তসবির ভাঙ্গার কাহিনীটা আদ্যোপান্ত শুনাইল। শুনিয়া জেব-উন্নিসা বলিলেন, "এ খবর আচ্ছা। কিছু বখ্‌শিশ পাইবি।"

তখন রঙমহালের খাজনাখানার উপর বখ্‌শিশের পরওয়ানা হইল। পাইয়া দরিয়া পলাইল।

তাতারী প্রতিহারী তাহাকে ধরিল। তরবারিখানা দরিয়ার কাঁধের উপর রাখিয়া বলিল, "পালাও কোথা সখি?"

দ। কাজ হইয়াছে—ঘরে যাইব।

প্রতিহারী। টাকা পাইয়াছ—আমায় কিছু দিবে না?

দ। আমার টাকার বড় দরকার, একটা গীত শুনাইয়া যাই। সারেঙ্গ আন।

প্রতিহারীর সারেঙ্গ ছিল—মধ্যে মধ্যে বাজাইত। রঙ্‌মহালে গীতবাদ্যের বড় ধূম। সকল বেগমের এক এক সম্প্রদায় নর্ত্তকী ছিল; যে অপরিণীতা গণিকাদিগের ছিল না, তাহারা আপনা আপনি যে কার্য্য সম্পন্ন করিত। রঙমহালে রাত্রিতে সুর লাগিয়াই ছিল। দরিয়া তাতারীর সারেঙ্গ লইয়া গান করিতে বসিল। সে অতিশয় সুকণ্ঠ; সঙ্গীতে বড় পটু। অতি মধুর গায়িল। জেব-উন্নিসা ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "কে গায়?"

প্রতিহারী বলিল, "দরিয়া বিবি।"

হুকুম হইল, "উহাকে পাঠাইয়া দাও।"

দরিয়া আবার জেব-উন্নিসার নিকট গিয়া কুর্ণিশ করিল। জেব-উন্নিসা বলিলেন, "গা। ঐ বীণ আছে।"

বীণ লইয়া দরিয়া গায়িল। গায়িল অতি মধুর। শাহজাদী অনেক অপ্সরোনিন্দিত, সঙ্গীতবিদ্যাপটু, গায়ক-গায়িকার গান শুনিয়াছিলেন, কিন্তু এমন গান কখন শুনেন নাই। দরিয়ার গীত সমাপ্ত হইলে, জেব-উন্নিসা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি মবারকের কাছে কখন গায়িয়াছিলে?"

দরিয়া। আমার এই গীত শুনিয়াই তিনি আমাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

জেব-উন্নিসা একটা ফুলের তোররা ফেলিয়া দরিয়াকে এমন জোরে মারিলেন যে, দরিয়ার কর্ণভূষায় লাগিয়া, কাণ কাটিয়া রক্ত পড়িল। তখন জেব-উন্নিসা তাহাকে আরও কিছু অর্থ দিয়া বিদায় করিলেন। বলিলেন, "আর আসিস্ না।"

দরিয়া তস্‌লীম দিয়া বিদায় হইল। মনে মনে বলিল, “আবার আসিব–আবার জ্বালাইব–আবার মার খাইব–আবার টাকা নিব। তোমার সর্ব্বনাশ করিব।”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : উদিপুরী বেগম

ঔরঙ্গজেব জগৎপ্রথিত বাদশাহ। তিনি জগৎপ্রথিত সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। নিজেও বুদ্ধিমান, কর্ম্মদক্ষ, পরিশ্রমী এবং অন্যান্য রাজগুণে গুণবান্ ছিলেন। এই সকল অসাধারণ গুণ থাকিতেও সেই জগৎপ্রথিতনামা রাজাধিরাজ, আপনার জগৎপ্রথিত সাম্রাজ্য একপ্রকার ধ্বংস করিয়া মানবলীলা সংবরণ করিলেন।

ইহার একমাত্র কারণ, ঔরঙ্গজেব মহাপাপিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার ন্যায় ধূর্ত্ত, কপটাচারী, পাপে সঙ্কোচশূন্য, স্বার্থপর, পরপীড়ক, প্রজাপীড়ক দুই একজন মাত্র পাওয়া যায়। এই কপটাচারী সম্রাট জিতেন্দ্রিয়তার ভাণ করিতেন–কিন্তু অন্তঃপুর অসংখ্য সুন্দরীরাজিতে মধুমক্ষিকা পরিপূর্ণ মধুচক্রের ন্যায় দিবারাত্র আনন্দধ্বনিতে ধ্বনিত হইত।

তাঁহার মহিষীও অসংখ্য–আর সরার বিধানের সঙ্গে সম্বন্ধশূন্যা বেতনভোগিনী বিলাসিনীও অসংখ্য। এই পাপিষ্ঠাদিগের সঙ্গে এই গ্রন্থের সম্বন্ধ বড় অল্প। কিন্তু কোন কোন মহিষীর সঙ্গে এই উপাখ্যানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

মোগল বাদশাহেরা যাঁহাকে প্রথম বিবাহ করিতেন, তিনিই প্রধানা মহিষী হইতেন। হিন্দুদ্বেষী ঔরঙ্গজেবের দুর্ভাগ্যক্রমে একজন হিন্দুকন্যা তাঁহার প্রধানা মহিষী। আকব্বর বাদশাহ রাজপুত রাজগণের কন্যা বিবাহ করার কথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। সেই নিয়ম অনুসারে, সকল বাদশাহেরই হিন্দুমহিষী ছিল। ঔরঙ্গজেবের প্রধানা মহিষী যোধপুরী বেগম।

যোধপুরী বেগম প্রধানা মহিষী হইলেও প্রেয়সী মহিষী ছিলেন না। যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রেয়সী, সে একজন খ্রিষ্টিয়ানী; উদিপুরী নামে ইতিহাসে পরিচিতা। উদয়পুরের সঙ্গে ইঁহার কোন সম্বন্ধ ছিল বলিয়া ইঁহার নাম উদিপুরী নহে। আসিয়া খণ্ডের দূরপশ্চিমপ্রান্তস্থিত যে জর্জ্জিয়া এখন রুষিয়া রাজ্যভুক্ত, তাহাই ইঁহার জন্মভূমি। বাল্যকালে একজন দাসব্যবসায়ী ইঁহাকে বিক্রয়ার্থে ভারতবর্ষে আনে, ঔরঙ্গজেবের অগ্রজ দারা ইঁহাকে ক্রয় করেন। বালিকা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে অদ্বিতীয় রূপলাবণ্যবতী হইয়া উঠিল। তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া দারা তাহার অত্যন্ত বশীভূত হইলেন। বলিয়াছি, উদিপুরী মুসলমান ছিল না, খ্রিষ্টিয়ান। প্রবাদ আছে যে, দারাও শেষে খ্রিষ্টিয়ান হইয়াছিলেন।

দারাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, তবে ঔরঙ্গজেব সিংহাসনে বসিতে পাইয়াছিলেন। দারাকে পরাস্ত করিয়া, ঔরঙ্গজেব প্রথমে তাহাকে বন্দী করিয়া, পরে বধ করেন। দারাকে বধ করিয়া নরাধম ঔরঙ্গজেব এক আশ্চর্য্য প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিল। উড়িয়াদিগের কলঙ্ক আছে যে, বড় ভাই মরিলে ছোট ভাই বিধবা ভ্রাতৃজায়াকে বিবাহ করিয়া তাহার শোকাপনোদন করে। এই শ্রেণীর একজন উড়িয়াকে আমি একদা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, “তোমরা এমন দুষ্কর্ম্ম কেন কর?” সে ঝটিতি উত্তর করিল, “আজ্ঞে, ঘরের বৌ কি পরকে দিব?” ভারতেশ্বর ঔরঙ্গজেবও বোধ হয়, সেইরূপ বিচার করিলেন। তিনি কোরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিলেন যে, ইস্‌লাম ধর্ম্মানুসারে তিনি অগ্রজপত্নী বিবাহ করিতে বাধ্য। অতএব দারার দুইটি প্রধানা মহিষীকে স্বীয় অর্দ্ধাঙ্গের ভাগিনী হইতে আহূত করিলেন। একটি রাজপুতকন্যা; আর একজন এই উদিপুরী মহাশয়া। রাজপুতকন্যা এই আজ্ঞা পাইয়া যাহা করিল, হিন্দুকন্যা; মাত্রেই সেই অবস্থায় তাহা করিবে, কিন্তু আর কোন জাতীয়া কন্যা তাহা পারিবে না;–সে বিষ খাইয়া মরিল। খ্রিষ্টিয়ানীটা সানন্দে ঔরঙ্গজেবের কণ্ঠলগ্না হইল। ইতিহাস এই গণিকার নাম কীর্ত্তিত করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছেন, আর যে ধর্ম্মরক্ষার জন্য বিষ পান করিল, তাহার নাম লিখিতে ঘৃণা বোধ করিয়াছেন। ইতিহাসের মূল্য এই।

উদিপুরীর যেমন অতুল্য রূপ, তেমনি অতুল্য মদ্যাসক্তি। দিল্লীর বাদশাহেরা মুসলমান হইয়াও অত্যন্ত মদ্যাসক্ত ছিলেন। তাঁহাদিগের পৌরবর্গ এ বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টান্তানুগামী হইতেন। রঙ্মহালেও এ রঙ্গের ছড়াছড়ি! এই নরকমধ্যেও উদিপুরী নাম জাহির করিয়া তুলিয়াছিল।

জেব-উন্নিসা হঠাৎ উদিপুরীর শয়নগৃহে প্রবেশ করিতে পারিল না। কেন না, ভারতেশ্বরের প্রিয়তমা মহিষী মদ্যপানে প্রায় বিলুপ্তচেতনা; বসনভূষণ কিছু বিপর্য্যস্ত, বাঁদীরা সজ্জা পুনর্ব্বিন্যস্ত করিল, ডাকিয়া সচেতন ও সাবধান করিয়া দিল। জেব-উন্নিসা আসিয়া দেখিল, উদিপুরীর বাম হাতে সট্‌কা, নয়ন অর্দ্ধনিমীলিত, অধরবান্ধুলীর উপর মাছি উড়িতেছে; ঝটিকাবিভিন্ন ভূপতিত বৃষ্টিনিষিক্ত পুষ্পরাশির মত উদিপুরী বিছানায় পড়িয়া আছে।

জেব-উন্নিসা আসিয়া কুর্ণিশ করিয়া বলিল, “মা! আপনার মেজাজ উত্তম ত?”

উদিপুরী অর্দ্ধজাগ্রতের স্বরে, রসনার জড়তার সহিত বলিল, “এত রাত্রে কেন?”

জে। একটা বড় খবর আছে।

উ। কি? মারহাট্টা ডাকু মরেছে?

জে। তারও অপেক্ষা খোশ খবর।

এই বলিয়া জেব-উন্নিসা গুছাইয়া বাড়াইয়া রঙ ঢালিয়া চঞ্চলকুমারীর সেই তসবির ভাঙ্গার গল্পটা করিলেন। উদিপুরী জিজ্ঞাসা করিল, “এ আর খোশ খবর কি?”

জেব-উন্নিসা বলিল, “এই মহিষের মত বাঁদীগুলা হজরতের তামাকু সাজে, আমি তাহা দেখিতে পারি না। রূপনগরের সেই সুন্দরী রাজকুমারী আসিয়া হজরতের তামাকু সাজিবে বাদশাহের কাছে এই ভিক্ষা চাহিও।”

উদিপুরী না বুঝিয়া, নেশার ঝোঁকে বলিল, “বহুত আচ্ছা।”

ইহার কিছু পরে রাজকার্য্যপরিশ্রমক্লান্ত বাদশাহ শ্রমাপনয়ন জন্য উদিপুরীর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। উদিপুরী নেশার ঝোঁকে চঞ্চলকুমারীর কথা, জেব-উন্নিসার কাছে যেমন শুনিয়াছিল, তেমনই বলিল। “সে আসিয়া আমার তামাকু সাজিবে,” এ প্রার্থনাও জানাইল। বলিবামাত্র ঔরঙ্গজেব শপথ করিয়া স্বীকার করিলেন। কেন না, ক্রোধে অস্থির হইয়াছিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : যোধপুরী বেগম

পরদিন রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইল। রূপনগরের ক্ষুদ্র রাজার উপর এক আদেশপত্র জারি হইল। যে অদ্বিতীয় কুটিলতা-ভয়ে জয়সিংহ ও যশোবন্ত সিংহ প্রভৃতি সেনাপতিগণ ও আজিম শাহ প্রভৃতি শাহজাদাগণ সর্ব্বদা শশব্যস্ত–যে অভেদ্য কুটিলতাজালে বদ্ধ হইয়া চতুরাগ্রগণ্য শিবজীও দিল্লীতে কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন–এই আজ্ঞাপত্র সেই কুটিলতাপ্রসূত। তাহাতে লিখিত হইল যে, “বাদশাহ রূপনগরের রাজকুমারীর অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যবৃত্তান্ত শ্রবণে মুগ্ধ হইয়াছেন। আর রূপনগরের রাওসাহেবের সৎস্বভাব ও রাজভক্তিতে বাদশাহ প্রীত হইয়াছেন। অতএব বাদশাহ রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার সেই রাজভক্তি পুরস্কৃত করিতে ইচ্ছা করেন। রাজকন্যাকে দিল্লীতে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতে থাকুন; শীঘ্র রাজসৈন্য আসিয়া কন্যাকে দিল্লীতে লইয়া যাইবে।”

এই সংবাদ রূপনগরে আসিবামাত্র মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। রূপনগরে আর আনন্দের সীমা রহিল না। যোধপুর, অম্বর প্রভৃতি বড় বড় রাজপুত রাজগণ মোগল বাদশাহকে কন্যা দান করা অতি গুরুতর সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া বিবেচনা করিতেন। সে স্থলে রূপনগরের ক্ষুদ্রজীবী রাজার অদৃষ্টে এই শুভ ফল বড়ই

আনন্দের বিষয় বলিয়া সিদ্ধ হইল। বাদশাহের বাদশাহ–যাঁহার সমকক্ষ মনুষ্যলোকে কেহ নাই–তিনি জামাতা হইবেন,–চঞ্চলকুমারী পৃথিবীশ্বরী হইবেন–ইহার অপেক্ষা আর সৌভাগ্যের বিষয় কি আছে? রাজা, রাজরাণী, পৌরজন, রূপনগরের প্রজাবর্গ আনন্দে মাতিয়া উঠিল। রাণী দেবমন্দিরে পূজা পাঠাইয়া দিলেন; রাজা এই সুযোগে কোন ভূম্যধিকারীর কোন্ কোন্ গ্রাম কাড়িয়া লইবেন, তাহার ফর্দ্দ করিতে লাগিলেন।

কেবল চঞ্চলকুমারীর সখীজন নিরানন্দ। তাহারা জানিত যে, এ সম্বন্ধে মোগলদ্বেষিণী চঞ্চলকুমারীর সুখ নাই।

সংবাদটা অবশ্য দিল্লীতেও প্রচার হইল। বাদশাহী রঙ্‌মহালে প্রচারিত হইল। যোধপুরী বেগম শুনিয়া বড় নিরানন্দ হইলেন। তিনি হিন্দুর মেয়ে, মুসলমানের ঘরে পড়িয়া ভারতেশ্বরী হইয়াও তাঁহার সুখ ছিল না। তিনি ঔরঙ্গজেবের পুরীমধ্যেও আপনার হিন্দুয়ানী রাখিতেন। হিন্দু পরিচারিকা দ্বারা তিনি সেবিতা হইতেন; হিন্দুর পাক ভিন্ন ভোজন করিতেন না–এমন কি, ঔরঙ্গজেবের পুরীমধ্যে হিন্দু দেবতার মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পূজা করিতেন। বিখ্যাত দেবদ্বেষী ঔরঙ্গজেব যে এতটা সহ্য করিতেন, ইহাতেই বুঝা যায় যে, ঔরঙ্গজেব তাঁহাকেও একটু অনুগ্রহ করিতেন।

যোধপুরী বেগম এ সংবাদ শুনিলেন। বাদশাহের সাক্ষাৎ পাইলে, বিনীতভাবে বলিলেন, “জাঁহাপনা! যাঁহার আজ্ঞায় প্রতিদিন রাজরাজেশ্বরগণ রাজ্যচ্যুত হইতেছে–এক সামান্য বালিকা কি তাঁহার ক্রোধের যোগ্য?”

রাজেন্দ্র হাসিলেন–কিন্তু কিছু বলিলেন না। সেখানে কিছুই হইল না।

তখন যোধপুর-রাজকন্যা মনে মনে বলিলেন, “হে ভগবান! আমাকে বিধবা কর! এ রাক্ষস আর অধিক দিন বাঁচিলে হিন্দুনাম লোপ হইবে।”

দেবী নামে তাঁহার একজন পরিচারিকা ছিল। সে যোধপুর হইতে তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল, কিন্তু অনেক দিন দেশছাড়া, এখন অধিক বয়সে, আর সে মুসলমানের পুরীর মধ্যে থাকিতে চাহে না। অনেক দিন হইতে সে বিদায় চাহিতেছিল, কিন্তু সে বড় বিশ্বাসী বলিয়া যোধপুরী তাহাকে ছাড়েন নাই। যোধপুরী আজ তাহাকে নিভৃতে লইয়া গিয়া বলিলেন, “তুমি অনেক দিন হইতে যাইতে চাহিতেছ, আজ তোমাকে ছাড়িয়া দিব। কিন্তু তোমাকে আমার একটি কাজ করিতে হইবে। কাজটি বড় শক্ত, বড় পরিশ্রমের কাজ, বড় সাহসের কাজ, আর বড় বিশ্বাসের কাজ। তাহার খরচ-পত্র দিব, বখ্‌শিশ দিব, আর-চিরকালের জন্য মুক্তি দিব। করিবে?”

দেবী বলিল, “আজ্ঞা করুন।”

যোধপুরী বলিলেন, “রূপনগরের রাজকুমারীর সংবাদ শুনিয়াছ। তাঁর কাছে যাইতে হইবে। চিঠি পত্র দিব না, যাহা বলিবে, আমার নাম করিয়া বলিবে, আর আমার এই পাঞ্জা দেখাইবে, তিনি বিশ্বাস করিবেন। ঘোড়ায় চড়িতে পার, ঘোড়ায় যাইবে। ঘোড়া কিনিবার খরচ দিতেছি।”

দেবী। কি বলিতে হইবে?

বেগম। রাজকুমারীকে বলিবে, হিন্দুর কন্যা হইয়া মুসলমানের ঘরে না আসেন। আমরা আসিয়া, নিত্য মরণ কামনা করিতেছি। বলিবে যে, তসবির ভাঙ্গার কথাটা বাদশাহ শুনিয়াছেন, তাঁকে সাজা দিবার জন্যই আনিতেছেন। প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, রূপনগরওয়ালীকে দিয়া উদিপুরীর তামাকু সাজাইবেন। বলিও, বরং বিষ খাইও, তথাপি দিল্লীতে আসিও না।

“আরও বলিও, ভয় নাই। দিল্লীর সিংহাসন টলিতেছে। দক্ষিণে মারহাট্টা মোগলের হাড় ভাঙ্গিয়া দিতেছে। রাজপুতেরা একত্রিত হইতেছে। জেজিয়ার জ্বালায় সমস্ত রাজপুতানা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। রাজপুতানায় গোহত্যা হইতেছে। কোন্ রাজপুত ইঁহা সহিবে? সব রাজপুত একত্রিত হইতেছে। উদয়পুরের রাণা, বীরপুরুষ। মোগল তাতারের মধ্যে তাঁর মত কেহ নাই। তিনি যদি রাজপুতগণের অধিনায়ক হইয়া অস্ত্রধারণ করেন–যদি এক দিকে শিবজী, আর এক দিকে

রাজসিংহ অস্ত্র ধরেন, তবে দিল্লীর সিংহাসন কয় দিন টিকিবে?”

দেবী। এমন কথা বলিও না, মা! দিল্লীর তক্ত, তোমার ছেলের জন্য আছে। আপনার ছেলের সিংহাসন ভাঙ্গিবার পরামর্শ আপনি দিতেছ?

বেগম। আমি এমন ভরসা করি না যে, আমার ছেলে এ তক্তে বসিবে। যত দিন রাক্ষসী জেব-উন্নিসা আর ডাকিনী উদিপুরী বাঁচিবে, তত দিন সে ভরসা করি না। একবার সে ভরসা করিয়া, রৌশন্বারার কাছে বড় মার খাইয়াছিলাম।* আজিও মুখে চোখে সে দাগ জখমের চিহ্ন আছে।

এইটুকু বলিয়া যোধপুরকুমারী একটু কাঁদিলেন। তার পর বলিলেন, “সে সব কথায় কাজ নাই। তুমি আমার সকল মতলব বুঝিবে না—বুঝিয়াই বা কি হইবে? যাহা বলি, তাই করিও।”

রাজকুমারীকে রাজসিংহের শরণ লইতে বলিও। রাজসিংহ রাজকুমারীকে প্রত্যাখ্যান করিবেন না। বলিও, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে, তিনি রাণার মহিষী হউন। মহিষী হইলে যেন প্রতিজ্ঞা করেন যে, উদিপুরী তাঁর তামাকু সাজিবে—রৌশন্বারা তাঁকে পাখার বাতাস করিবে।

দেবী। এও কি হয় মা?

বেগম। সে কথার বিচার তুমি করিও না। আমি যা বলিলাম, তা পারিবে কি না?

দেবী। আমি সব পারি।

বেগম তখন দেবীকে প্রয়োজনীয় অর্থ ও পুরস্কার এবং পাঞ্জা দিয়া বিদায় করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : খোদা শাহজাদী গড়েন কেন?

আবার জেব-উন্নিসার বিলাসমন্দিরে মবারক রাত্রিকালে উপস্থিত। এবার মবারক, গালিচার উপর, জানু পাতিয়া উপবিষ্ট—যুক্তকর, ঊর্দ্ধমুখ। জেব-উন্নিসা সই রত্নখচিত পালঙ্কে; মুক্তাপ্রবালের ঝালরযুক্ত শয্যায় জরির কামদার বালিশের উপর হেলিয়া, সুবর্ণের আলবোলায়, রত্নখচিত নলে, তামাকু সেবন করিতেছিল। পাশ্চাত্য মহাত্মগণের কৃপায়, তামাকু তখন ভারতবর্ষে আসিয়াছে।

জেব-উন্নিসা বলিতেছেন, “সব ঠিক বলিবে?”

মবারক যুক্তকরে বলিল, “আজ্ঞা করিলেই বলিব।”

জেব। তুমি দরিয়াকে বিবাহ করিয়াছ?

মবা। যখন স্বদেশে থাকিতাম, তখন করিয়াছিলাম।

জেব। তাই অনুগ্রহ করিয়া আমাকে নেকা করিতে চাহিয়াছিলে?

মবা। আমি অনেক দিন হইল, উহাকে তাল্লাক্ দিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি।

জেব। কেন পরিত্যাগ করিয়াছ?

মবা। সে পাগল। অবশ্য তাহা আপনি বুঝিয়া থাকিবেন।

---

* কথাটা ঐতিহাসিক। রৌশন্বারা যোধপুরীর নাকমুখ ছিঁড়িয়া দিয়াছিল।

জেব। পাগল বলিয়া ত আমার কখনও বোধ হয় নাই।

মবা। সে আপনার কার্য্যসিদ্ধির জন্য হুজুরে হাজির হয়। কাজের সময়ে আমিও তাহাকে কখন পাগল দেখি নাই। কিন্তু অন্য সময়ে সে পাগল। আপনি তাহাকে খান্‌খা কোন দিন আনাইয়া দেখিবেন।

জেব। তুমি তাহাকে পাঠাইয়া দিতে পারিবে? বলিও যে, আমার কিছু ভাল সুর্‌মার প্রয়োজন আছে।

মবা। আমি কাল প্রভাতে এখান হইতে দূরদেশে কিছু দিনের জন্য যাইব।

জেব। দূরদেশে যাইবে? কৈ, সে কথা ত আমাকে কিছু বল নাই!

মবা। আজ সে কথা নিবেদন করিব ইচ্ছা ছিল।

জেব। কোথায় যাইবে?

মবা। রাজপুতানায় রূপনগর নামে গড় আছে। সেখানকার রাও সাহেবের কন্যাকে মহিষী করিবার অভিপ্রায় শাহান্ শাহের মর্‌জি মবারকে হইয়াছে। কাল তাঁহাকে আনিবার জন্য রূপনগরে ফৌজ যাইবে। আমাকে ফৌজের সঙ্গে যাইতে হইবে।

জেব। সে বিষয়ে আমার কিছু বলিবার আছে। কিন্তু আগে আর একটা কথার উত্তর দাও। তুমি গণেশ জ্যোতিষীর কাছে ভাগ্য গণাইতে গিয়াছিলে?

মবা। গিয়াছিলাম।

জেব। কেন গিয়াছিলে?

মবা। সবাই যায়, এই জন্য গিয়াছিলাম; এ কথা বলিলেই সঙ্গত উত্তর হয়; কিন্তু তা ছাড়া আরও কারণ ছিল। দরিয়া আমাকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া গিয়াছিল।

জেব। হুঁ।

এই বলিয়া জেব-উন্নিসা কিছুকাল পুষ্পরাশি লইয়া ক্রীড়া করিল। তার পর বলিল, “তুমি গেলে কেন?”

মবারক ঘটনাটা যথাযথ বিবৃত করিলেন। জেব-উন্নিসা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “জ্যোতিষী কি বলিয়াছিল যে, তুমি শাহজাদী বিবাহ কর, তাহা হইলে তোমার শ্রীবৃদ্ধি হইবে?”

মবা। হিন্দুরা শাহজাদী বলে না। জ্যোতিষী, রাজপুত্রী বলিয়াছিল।

জেব। শাহজাদী কি রাজপুত্রী নয়?

মবা। নয় কেন?

জেব। তাই কি তুমি সে দিন বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলে?

মবা। আমি কেবল ধর্ম্ম ভাবিয়া সে কথা বলিয়াছিলাম। আপনার স্মরণ থাকিতে পারে, আমি গণনার পূর্ব্বে হইতে এ কথা বলিতেছি।

জেব। কৈ, আমার ত স্মরণ হয় না। তা যাক–সে সকল কথাতে আর কাজ নাই। তোমাকে এত কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাতে তুমি গোসা করিও না। তোমার গোসায় আমার বড় দুঃখ হইবে। তুমি আমার প্রাণাধিক,–তোমাকে যতক্ষণ দেখি, ততক্ষণ আমি সুখে থাকি। তুমি পালঙ্কের উপর আসিয়া বসো–আমি তোমাকে আতর মাখাই।

জেব উন্নিসা তখন মবারককে পালঙ্কের উপর বসাইয়া স্বহস্তে আতর মাখাইতে লাগিল। তার পর বলিল, "এখন সেই রূপনগরের কথাটা বলিব। জানি না, রূপনগরীর পিতা তাহাকে ছাড়িয়া দিবে কি না। ছাড়িয়া না দেয়, তবে কাড়িয়া লইয়া আসিবে।"

মবারক বলিল, "এরূপ আদেশ ত বাদশাহের নিকট আমরা পাই নাই।"

জেব। এ স্থলে আমাকেই না হয় বাদশাহ মনে করিলে? যদি বাদশাহের এরূপ অভিপ্রায় না হইবে, তবে ফৌজ যাইতেছে কেন?

মবা। পথের বিঘ্ননিবারণের জন্য।

জেব। আলম্‌গীর বাদশাহের ফৌজ যে কাজে যাইবে, সে কাজে তাহারা নিষ্ফল হইবে? তোমরা যে প্রকারে পার, রূপনগরীকে লইয়া আসিবে। বাদশাহ যদি তাহাতে নাখোশ হন, তবে আমি আছি।

মবা। আমার পক্ষে সেই হুকুমই যথেষ্ট। তবে, আপনার এরূপ অভিপ্রায় কেন হইতেছে, জানিতে পারিলে আমার বাহুতে আরও বল হয়।

জেব-উন্নিসা বলিল, "সেই কথাটাই আমি বলিতে চাহিতেছিলাম। এই রূপনগরওয়ালীকে আমার কৌশলেই তলব হইয়াছে।"

মবা। মতলব কি?

জেব। মতলব এই যে, উদিপুরীর রূপের বড়াই আর সহ্য হয় না। শুনিলাম, রূপনগরওয়ালী আরও খুব্‌সুরৎ। যদি হয়, তবে উদিপুরীর বদলে সেই বাদশাহের উপর প্রভুত্ব করিবে। আমি তাহাকে আনিতেছি, ইহা জানিলে, রূপনগরওয়ালী আমার বশীভূত থাকিবে। তা হ'লেই আমার একাধিপত্যের যে একটু কণ্টক আছে, তাহা দূর হইবে। তা, তুমি যাইতেছ, ভালই হইতেছে। যদি দেখ যে, সে উদিপুরী অপেক্ষা সুন্দরী–

মবা। আমি হজরৎ বেগম সাহেবাকে কখনও দেখি নাই।

জেব। দেখ ত দেখাইতে পারি–এই পর্‌দার আড়ালে লুকাইতে হইবে।

মবা। ছি!

জেব-উন্নিসা হাসিয়া উঠিল, বলিল, "দিল্লীতে তোমার মত কয়টা বানর আছে? তা যাক্–আমি তোমায় যা বলি, শুন। উদিপুরী না দেখ, আমি তাহার তসবির দেখাইতেছি। কিন্তু রূপনগরীকে দেখিও। যদি তাহাকে উদিপুরীর অপেক্ষা সুন্দরী দেখ, তবে তাহাকে জানাইবে যে, আমারই অনুগ্রহে সে বাদশাহের বেগম হইতেছে। আর যদি দেখ, সেটা দেখিতে তেমন নয়–"

জেব-উন্নিসা একটু ভাবিল। মবারক জিজ্ঞাসা করিল, "যদি দেখি, দেখিতে ভাল নহে, তবে কি করিব?"

জেব। তুমি বড় বিবাহ ভালবাস; তুমি আপনি বিবাহ করিও। বাদশাহ যাহাতে অনুমতি দেন, তাহা আমি করিব।

মবা। অধমের প্রতি কি আপনার একটু ভালবাসাও নাই?

জেব। বাদশাহজাদীদের আবার ভালবাসা!

মবা। আল্লা তবে বাদশাহজাদীদিগকে কি জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন?

জেব। সুখের জন্য! ভালবাসা দুঃখ মাত্র।

মবারক আর শুনিতে ইচ্ছা করিল না। কথা চাপা দিয়া কহিল, "যিনি বাদশাহের বেগম হইবেন, তাঁহাকে আমি দেখিব কি প্রকারে?"

জেব। কোন কল-কৌশলে।

মবা। শুনিলে বাদশাহ কি বলিবেন?

জেব। সে দায় দোষ আমার।

মবা। আপনি যা বলিবেন, তাই করিব। কিন্তু এ গরীবকে একটু ভালবাসিতে হইবে।

জেব। বলিলাম না যে, তুমি আমার প্রাণাধিক।

মবা। ভালবাসিয়া বলিয়াছেন কি?

জেব। বলিয়াছি, ভালবাসা গরীব দুঃখীর দুঃখ। শাহজাদীরা সে দুঃখ স্বীকার করে না। মর্ম্মাহত হইয়া মবারক বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

তৃতীয় খণ্ড

বিবাহে বিকল্প

প্রথম পরিচ্ছেদ : বক ও হংসীর কথা

নির্ম্মল, ধীরে ধীরে রাজকুমারীর কাছে গিয়া বসিলেন। দেখিলেন, রাজকুমারী একা বসিয়া কাঁদিতেছেন। সে দিন যে চিত্রগুলি ক্রীত হইয়াছিল, তাহার একখানি রাজকুমারীর হাতে দেখিলেন। নির্ম্মলকে দেখিয়া চঞ্চল চিত্রখানি উল্টাইয়া রাখিলেন–কাহার চিত্র, নির্ম্মলের তাহা বুঝিতে বাকি রহিল না। নির্ম্মল কাছে গিয়া বসিয়া বলিল, “এখন উপায়?”

চঞ্চল। উপায় যাই হউক–আমি মোগলের দাসী কখনই হইব না।

নির্ম্মল। তোমার অমত, তা ত জানি, কিন্তু আলম্‌গীর বাদশাহের হুকুম, রাজার কি সাধ্য যে, অন্যথা করেন? উপায় নাই, সখি!–সুতরাং তোমাকে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। আর স্বীকার করা ত সৌভাগ্যের বিষয়। যোধপুর বল, অম্বর বল; রাজা, বাদশাহ, ওমরাহ, নবাব, সুবা যাহা বল, পৃথিবীতে এত বড় লোক কে আছে যে, তাহার কন্যা দিল্লীর তক্তে বসিতে বাসনা করে না? পৃথিবীশ্বরী হইতে তোমার এত অসাধ কেন?

চঞ্চল রাগ করিয়া বলিল, “তুই এখান হইতে উঠিয়া যা।”

নির্ম্মল দেখিল, ও পথে কিছু হইবে না। তবে আর কোন পথে রাজকুমারীর কিছু উপকার যদি করিতে পারে, তাহার সন্ধান করিতে লাগিল। বলিল, “আমি যেন উঠিয়া গেলাম–কিন্তু যাঁহার দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছি, আমাকে তাঁহার হিত খুঁজিতে হয়। তুমি যদি দিল্লী না যাও, তবে তোমার বাপের দশা কি হইবে, তাহা কি একবার ভাবিয়াছ?”

চঞ্চল। ভাবিয়াছি। আমি যদি না যাই, তবে আমার পিতার কাঁধে মাথা থাকিবে না–রূপনগরের গড়ের একখানি পাতর থাকিবে না। তা ভাবিয়াছি–আমি পিতৃহত্যা করিব না। বাদশাহের ফৌজ আসিলেই আমি তাহাদিগের সঙ্গে দিল্লী যাত্রা করিব। ইহা স্থির করিয়াছি।

নির্ম্মল প্রসন্ন হইল। বলিল, “আমিও সেই পরামর্শই দিতেছিলাম।”

রাজকুমারী আবার ভ্রূভঙ্গী করিলেন—বলিলেন, “তুই কি মনে করেছিস্ যে, আমি দিল্লীতে গিয়া মুসলমান বানরের শয্যায় শয়ন করিব? হংসী কি বকের সেবা করে?”

নির্ম্মল কিছুই বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তবে কি করিবে?”

চঞ্চলকুমারী হস্তের একটি অঙ্গুরীয় নির্ম্মলকে দেখাইল; বলিল, “দিল্লীর পথে বিষ খাইব।” নির্ম্মল জানিত, ঐ অঙ্গুরীয়তে বিষ আছে।

নির্ম্মল বলিল, “আর কি কোন উপায় নাই?”

চঞ্চল বলিল, “আর উপায় কি সখি? কে এমন বীর পৃথিবীতে আছে যে, আমায় উদ্ধার করিয়া দিল্লীশ্বরের সহিত শত্রুতা করিবে? রাজপুতানার কুলাঙ্গার সকলই মোগলের দাস—আর কি সংগ্রাম আছে, না প্রতাপ আছে?”

নির্ম্মল। কি বল রাজকুমারি! সংগ্রাম, কি প্রতাপ যদি থাকিত, তবে তাহারাই বা তোমার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়া দিল্লীর বাদশাহের সঙ্গে বিবাদ করিবে কেন? পরের জন্য কেহ সহজে সর্ব্বস্ব পণ করে না। প্রতাপ নাই, সংগ্রাম নাই, রাজসিংহ আছে—কিন্তু তোমার জন্য রাজসিংহ সর্ব্বস্ব পণ করিবে কেন? বিশেষ তুমি মাড়বারের ঘরাণা।

চঞ্চল। সে কি? বাহুতে বল থাকিলে কোন্ রাজপুত শরণাগতকে রক্ষা করে নাই? আমি তাই ভাবিতেছিলাম নির্ম্মল! আমি এ বিপদে সেই সংগ্রাম, প্রতাপের বংশতিলকেরই শরণ লইব—তিনি কি আমায় রক্ষা করিবেন না?

বলিতে বলিতে চঞ্চলদেবী ঢাকা ছবিখানি উল্টাইলেন—নির্ম্মল দেখিল, সে রাজসিংহের মূর্ত্তি। চিত্র দেখিয়া রাজকুমারী বলিতে লাগিলেন, “দেখ সখি, এ রাজকান্তি দেখিয়া তোমার কি বিশ্বাস হয় না যে, ইনি অগতির গতি, অনাথার রক্ষক? আমি যদি ইঁহার শরণ লই, ইনি কি রক্ষা করিবেন না?

নির্ম্মলকুমারী অতি স্থিরবুদ্ধিশালিনী—চঞ্চলের সহোদরাধিকা। নির্ম্মল অনেক ভাবিল। শেষে চঞ্চলের প্রতি স্থিরদৃষ্টি করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “রাজকুমারী! যে বীর তোমাকে এ বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবে, তাহাকে তুমি কি দিবে?”

রাজকুমারী বুঝিলেন। কাতর অথচ অবিকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, “কি দিব সখি! আমার কি আর দিবার আছে? আমি যে অবলা!”

নির্ম্মল। তোমার তুমিই আছ।

চঞ্চল অপ্রতিভ হইয়া বলিল, “দূর হ!”

নির্ম্মল। তা রাজার ঘরে এমন হইয়া থাকে। তুমি যদি রুক্মিণী হইতে পার, যদুপতি আসিয়া অবশ্য উদ্ধার করিতে পারেন।

চঞ্চলকুমারী মুখাবনত করিল। যেমন সূর্য্যোদয়কালে মেঘমালার উপর আলোর তরঙ্গের পর উজ্জ্বলতর তরঙ্গ আসিয়া পলকে পলকে নূতন সৌন্দর্য্য উন্মেষিত করে, চঞ্চলকুমারীর মুখে তেমনই পলকে পলকে সুখের, লজ্জার, সৌন্দর্য্যের নবনবোন্মেষ হইতে লাগিল। বলিল, “তাঁহাকে পাইব, আমি কি এমন ভাগ্য করিয়াছি? আমি বিকাইতে চাহিলে তিনি কি কিনিবেন?”

নির্ম্মল। সে কথার বিচারক তিনি—আমরা নই। রাজসিংহের বাহুতে শুনিয়াছি, বল আছে; তাঁর কাছে কি দূত পাঠান যায় না? গোপনে—কেহ না জানিতে পারে, এরূপ দূত কি তাঁহার কাছে যায় না?

চঞ্চল ভাবিল। বলিল, “তুমি আমার গুরুদেবকে ডাকিতে পাঠাও। আমায় আর কে তেমন ভালবাসে? কিন্তু তাঁহাকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিয়া আমার কাছে আনিও। সকল কথা বলিতে আমার লজ্জা করিবে।”

এমন সময়ে সখীজন সংবাদ লইয়া আসিল যে, একজন মতিওয়ালী মতি বেচিতে আসিয়াছে। রাজকুমারী বলিলেন, “এখন আমার মতি কিনিবার সময় নহে। ফিরাইয়া দাও।” পুরবাসিনী বলিল, “আমরা ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু সে কিছুতেই ফিরিল না। বোধ হইল যেন, তার কি বিশেষ দরকার আছে?” তখন অগত্যা চঞ্চলকুমারী তাহাকে ডাকিলেন।

মতিওয়ালী আসিয়া কতকগুলি ঝুটা মতি দেখাইল। রাজকুমারী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “এই ঝুটা মতি দেখাইবার জন্য তুমি এত জিদ করিতেছিলে?”

মতিওয়ালী বলিল, “না। আমার আরও দেখাইবার জিনিস আছে। কিন্তু তাহা আপনি একটু পুষিদা না হইলে দেখাইতে পারি না।”

চঞ্চলকুমারী বলিল, “আমি একা তোমার সঙ্গে কথা কহিতে পারিব না; কিন্তু একজন সখী থাকিবে। নির্ম্মল থাক, আর সকলে বাহিরে যাও।”

তখন আর সকলে বাহিরে গেল। দেবী–সে মতিওয়ালী দেবী ভিন্ন আর কেহ নয়–যোধপুরী বেগমের পাঞ্জা দেখাইল। দেখিয়া, পড়িয়া চঞ্চলকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ পাঞ্জা তুমি কোথায় পাইলে?”

দেবী। যোধপুরী বেগম আমাকে দিয়াছেন।

চঞ্চল। তুমি তাঁর কে?

দেবী। আমি তাঁর বাঁদী।

চঞ্চল। কেনই বা এ পাঞ্জা লইয়া এখানে আসিয়াছ?

দেবী তখন সকল কথা বুঝাইয়া বলিল। শুনিয়া নির্ম্মল ও চঞ্চল পরস্পরের মুখপানে চাহিতে লাগিলেন।

চঞ্চল, দেবীকে পুরস্কৃত করিয়া বিদায় দিলেন।

দেবী যাইবার সময়ে যোধপুরীর পাঞ্জাখানি লইয়া গেল না। ইচ্ছাপূর্ব্বক রাখিয়া গেল। মনে করিল, “কোথায় ফেলিয়া দিব,–কে কুড়াইয়া নিবে?” এই ভাবিয়া দেবী চঞ্চলকুমারীর নিকট পাঞ্জা ফেলিয়া গেল। সে গেলে পর চঞ্চলকুমারী বলিলেন, “নির্ম্মল! উহাকে ডাক; সে পাঞ্জাখানা ফেলিয়া গিয়াছে।”

নির্ম্মল। ফেলিয়া যায় নাই–বোধ হইল যেন, ইচ্ছাপূর্ব্বক রাখিয়া গিয়াছে।

চঞ্চল। আমি নিয়া কি করিব?

নির্ম্মল। এখন রাখ, কোন সময়ে না কোন সময়ে যোধপুরীকে ফেরৎ দিতে পারিবে।

চঞ্চল। তা যাই হোক, বেগমের কথায় আমার বড় সাহস বাড়িল। আমরা দুইটি বালিকায় কি পরামর্শ করিতেছিলাম–তা ভাল, কি মন্দ–ঘটিবে কি না ঘটিবে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলাম না। এখন সাহস হইয়াছে। রাজসিংহের আশ্রয় গ্রহণ করাই ভাল।

নির্ম্মল। সে ত অনেক কাল জানি।

এই বলিয়া নির্ম্মল হাসিল। চঞ্চলও মাথা হেঁট করিয়া হাসিল।

নির্ম্মল উঠিয়া গেল। কিন্তু তাহার মনে কিছুমাত্র ভরসা হইল না। সে কাঁদিতে কাঁদিতে গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : অনন্ত মিশ্র

অনন্ত মিশ্র, চঞ্চলকুমারীর পিতৃকুলপুরোহিত। কন্যানির্ব্বিশেষে, চঞ্চলকুমারীকে ভালবাসিতেন। তিনি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত। সকলে তাঁহাকে ভক্তি করিত।

চঞ্চলের নাম করিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইবামাত্র তিনি অন্তঃপুরে আসিলেন—কুলপুরোহিতের অবারিতদ্বার। পথিমধ্যে নির্ম্মল তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিল এবং সকল কথা বুঝাইয়া দিয়া ছাড়িয়া দিল।

বিভূতিচন্দনবিভূষিত, প্রশস্তললাট, দীর্ঘকায়, রুদ্রাক্ষশোভিত, হাস্যবদন, সেই ব্রাহ্মণ চঞ্চলকুমারীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নির্ম্মল দেখিয়াছিল যে, চঞ্চল কাঁদিতেছে, কিন্তু আর কাহারও কাছে চঞ্চল কাঁদিবার মেয়ে নহে। গুরুদেব দেখিলেন, চঞ্চল স্থিরমূর্ত্তি। বলিলেন, "মা লক্ষ্মী,— আমাকে স্মরণ করিয়াছ কেন?"

চঞ্চল। আমাকে বাঁচাইবার জন্য। আর কেহ নাই যে, আমায় বাঁচায়।

অনন্ত মিশ্র হাসিয়া বলিলেন, "বুঝেছি, রুক্মিণীর বিয়ে, তাই পুরোহিত বুড়াকেই দ্বারকায় যেতে হবে। তা দেখ দেখি মা, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে কিছু আছে কি না—পথখরচটা জুটিলেই আমি উদয়পুরে যাত্রা করিব।"

চঞ্চল একটি জরির থলি বাহির করিয়া দিল। তাহাতে আশরফি ভরা। পুরোহিত পাঁচটি আশরফি লইয়া অবশিষ্ট ফিরাইয়া দিলেন—বলিলেন, "পথে অন্নই খাইতে হইবে—আশরফি খাইতে পারিব না। একটি কথা বলি, পারিবে কি?"

চঞ্চল বলিলেন, "আমাকে আগুনে ঝাঁপ দিতে বলিলেও, আমি এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য তাও পারি। কি আজ্ঞা করুন।"

মিশ্র। রাণা রাজসিংহকে একখানি পত্র লিখিয়া দিতে পারিবে?

চঞ্চল ভাবিল। বলিল, "আমি বালিকা—পুরস্ত্রী; তাঁহার কাছে অপরিচিতা—কি প্রকারে পত্র লিখি? কিন্তু আমি তাঁহার কাছে যে ভিক্ষা চাহিতেছি, তাহাতে লজ্জারই বা স্থান কই? লিখিব।"

মিশ্র। আমি লিখাইয়া দিব, না আপনি লিখিবে?

চঞ্চল। আপনি বলিয়া দিন।

নির্ম্মল সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিল, "তা হইবে না। এ বামুনে বুদ্ধির কাজ নয়—এ মেয়েলি বুদ্ধির কাজ। আমরা পত্র লিখিব। আপনি প্রস্তুত হইয়া আসুন।"

মিশ্র ঠাকুর চলিয়া গেলেন, কিন্তু গৃহে গেলেন না। রাজা বিক্রমসিংহের নিকট দর্শন দিলেন। বলিলেন, "আমি দেশ পর্যটনে গমন করিব, মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছি।" কি জন্য কোথায় যাইবেন, রাজা তাহা জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ তাহা কিছু প্রকাশ করিয়া বলিলেন না। তথাপি তিনি যে উদয়পুর পর্য্যন্ত যাইবেন, তাহা স্বীকার করিলেন এবং রাণার নিকট পরিচিত হইবার জন্য একখানি লিপির জন্য প্রার্থিত হইলেন। রাজাও পত্র দিলেন।

অনন্ত মিশ্র রাজার নিকট হইতে পত্র সংগ্রহ করিয়া চঞ্চলকুমারীর নিকট পুনরাগমন করিলেন। ততক্ষণ চঞ্চল ও নির্ম্মল দুই জনে দুই বুদ্ধি একত্র করিয়া একখানি পত্র সমাপন করিয়াছিল। পত্র শেষ করিয়া রাজনন্দিনী একটি কৌটা হইতে অপূর্ব্ব শোভাবিশিষ্ট মুকুতাবলয় বাহির করিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে দিয়া বলিলেন, "রাণা পত্র পড়িলে, আমার প্রতিনিধিস্বরূপ আপনি এই রাখি বাঁধিয়া দিবেন। রাজপুতকুলের যিনি চূড়া, তিনি কখন রাজপুতকন্যার প্রেরিত রাখি অগ্রাহ্য করিবেন না।"

মিশ্র ঠাকুর স্বীকৃত হইলেন। রাজকুমারী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : মিশ্র ঠাকুরের নারায়ণস্মরণ

পরিধেয় বস্ত্র, ছত্র, যষ্ঠি, চন্দনকাষ্ঠ প্রভৃতি নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং একমাত্র ভৃত্য সঙ্গে লইয়া, অনন্ত মিশ্র গৃহিণীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া উদয়পুর যাত্রা করিলেন। গৃহিণী বড় পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিল, "কেন যাইবে?" মিশ্র ঠাকুর বলিলেন, "রাণার কাছে কিছু বৃত্তি পাইব।" গৃহিণী তৎক্ষণাৎ শান্ত হইলেন, বিরহযন্ত্রণা আর তাঁহাকে দাহ করিতে পারিল না, অর্থলাভের আশাস্বরূপ শীতলবারিপ্রবাহে সে প্রচণ্ড বিচ্ছেদবহ্নি বার কত ফোঁস ফোঁস করিয়া নিবিয়া গেল। মিশ্র ঠাকুর ভৃত্য সঙ্গে যাত্রা করিলেন। তিনি মনে করিলে অনেক লোক সঙ্গে লইতে পারিতেন, কিন্তু অধিক লোক থাকিলে কাণাকাণি হয় এজন্য লইলেন না।

পথ অতি দুর্গম–বিশেষ পার্ব্বত্য পথ বন্ধুর, এবং অনেক স্থানে আশ্রয়শূন্য। একাহারী ব্রাহ্মণ যে দিন যেখানে আশ্রয় পাইতেন, সে দিন সেখানে আতিথ্য স্বীকার করিতেন; দিনমানে পথ অতিবাহন করিতেন। পথে কিছু দস্যুভয় ছিল–ব্রাহ্মণের নিকট রত্নবলয় আছে বলিয়া ব্রাহ্মণ কদাপি একাকী পথ চলিতেন না। সঙ্গী জুটিলে চলিতেন। সঙ্গী ছাড়া হইলেই আশ্রয় খুঁজিতেন। একদিন রাত্রে এক দেবালয়ে আতিথ্য স্বীকার করিয়া, পরদিন প্রভাতে গমনকালে, তাঁহাকে সঙ্গী খুঁজিতে হইল না। চারি জন বণিক্ ঐ দেবালয়ের অতিথিশালায় শয়ন করিয়াছিল, প্রভাতে উঠিয়া তাহারাও পার্ব্বত্যপথে আরোহণ করিল। ব্রাহ্মণকে দেখিয়া উহারা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথা যাইবে?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি উদয়পুর যাইব।" বণিকেরা বলিল, "আমরাও উদয়পুর যাইব। ভাল হইয়াছে, একত্রে যাই চলুন।" ব্রাহ্মণ আনন্দিত হইয়া তাহাদিগের সঙ্গী হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "উদয়পুর আর কত দূর?" বণিকেরা বলিল, "নিকট। আজ সন্ধ্যার মধ্যে উদয়পুর পৌঁছিতে পারিব। এ সকল স্থান রাণার রাজ্য।"

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে তাহারা চলিতেছিল। পার্ব্বত্য পথ, অতিশয় দুরারোহণীয় এবং দূরবরোহণীয়, সচরাচর বসতিশূন্য। কিন্তু এই দুর্গম পথ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল–এখন সমতল ভূমিতে অবরোহণ করিতে হইবে। পথিকেরা এক অনির্ব্বচনীয় শোভাময় অধিত্যকায় প্রবেশ করিল। দুই পার্শ্বে অনতি-উচ্চ পর্ব্বতদ্বয়, হরিত-বৃক্ষাদিশোভিত হইয়া আকাশে মাথা তুলিয়াছে, উভয়ের মধ্যে কলনাদিনী ক্ষুদ্রা প্রবাহিণী নীলকাচপ্রতিম সফেন জলপ্রবাহে উপলদল ধৌত করিয়া বনানীর অভিমুখে চলিতেছে। তটিনীর ধার দিয়া মনুষ্যগম্য পথের রেখা পড়িয়াছে। সেখানে নামিলে, আর কোন দিক্ হইতে কেহ পথিককে দেখিতে পায় না; কেবল পর্ব্বতদ্বয়ের উপর হইতে দেখা যায়।

সেই নিভৃত স্থানে অবরোহণ করিয়া, একজন বণিক, ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার ঠাঁই টাকা-কড়ি কি আছে?"

ব্রাহ্মণ প্রশ্ন শুনিয়া চমকিত ও ভীত হইলেন। ভাবিলেন, বুঝি এখানে দস্যুর বিশেষ ভয়, তাই সতর্ক করিবার জন্য বণিকেরা জিজ্ঞাসা করিতেছে। দুর্ব্বলের অবলম্বন মিথ্যা কথা। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, আমার কাছে কি থাকিবে?"

বণিক্ বলিল, "যাহা কিছু থাকে, আমাদের নিকট দাও। নহিলে এখানে রাখিতে পারিবে না।"

ব্রাহ্মণ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। একবার মনে করিলেন, রত্নবলয় রক্ষার্থ বণিক্‌দিগকে দিই; আবার ভাবিলেন, ইহারা অপরিচিত, ইহাদিগকেই বা বিশ্বাস কি? এই ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিয়া বাহ্মণ পূর্ব্ববৎ বলিলেন, "আমি ভিক্ষুক, আমার কাছে কি থাকিবে?"

বিপৎকালে যে ইতস্ততঃ করে, সেই মারা যায়। ব্রাহ্মণকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া ছদ্মবেশী বণিকেরা বুঝিল যে, অবশ্য বাহ্মণের কাছে বিশেষ কিছু আছে। একজন তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণের ঘাড় ধরিয়া ফেলিয়া দিয়া তাঁহার বুকে হাঁটু দিয়া বসিল–এবং তাঁহার মুখে হাত দিয়া চাপিয়া ধরিল। মিশ্র ঠাকুরের ভৃত্যটি তৎক্ষণাৎ কোন্ দিকে পলায়ন করিল, কেহ দেখিতে পাইল না। মিশ্র ঠাকুর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে না পারিয়া নারায়ণ স্মরণ করিতে লাগিলেন। আর একজন তাঁহার গাঁটরি

কাড়িয়া লইয়া খুলিয়া দেখিতে লাগিল। তাহার ভিতর হইতে চঞ্চলকুমারী প্রেরিত বলয়, দুইখানি পত্র, এবং আশরফি পাওয়া গেল। দস্যু তাহা হস্তগত করিয়া সঙ্গীকে বলিল, "আর ব্রহ্মহত্যা করিয়া কাজ নাই। উহার যাহা ছিল, তাহা পাইয়াছি। এখন উহাকে ছাড়িয়া দে।"

আর একজন দস্যু বলিল, "ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না। ব্রাহ্মণ তাহা হইলে এখনই একটা গোলযোগ করিবে। আজকাল রাণা রাজসিংহের বড় দৌরাত্ম্য–তাঁহার শাসনে বীরপুরুষ আর অন্ন করিয়া খাইতে পারে না। উহাকে এই গাছে বাঁধিয়া রাখিয়া যাই।"

এই বলিয়া দস্যুগণ মিশ্র ঠাকুরের হস্ত পদ এবং মুখ তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রে দৃঢ়তর বাঁধিয়া, পর্ব্বতের সানুদেশস্থিত একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষের কাণ্ডের সহিত বাঁধিল। পরে চঞ্চলকুমারীদত্ত রত্নবলয় ও পত্র প্রভৃতি লইয়া ক্ষুদ্র নদীর তীরবর্ত্তী পথ অবলম্বন করিয়া পর্ব্বতান্তরালে অদৃশ্য হইল। সেই সময়ে পর্ব্বতের উপরে দাঁড়াইয়া একজন অশ্বারোহী তাহাদিগকে দেখিল। তাহারা, অশ্বারোহীকে দেখিতে পাইল না, পলায়নে ব্যস্ত।

দস্যুগণ পার্ব্বতীয়া প্রবাহিণীর তটবর্ত্তী বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া অতি দুর্গম ও মনুষ্যসমাগমশূন্য পথে চলিল। এইরূপ কিছু দূর গিয়া, এক নিভৃত গুহামধ্যে প্রবেশ করিল।

গুহার ভিতর খাদ্যদ্রব্য, শয্যা, পাকের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল প্রস্তুত ছিল। দেখিয়া বোধ হয়, দস্যুগণ কখন কখন এই গুহামধ্যে লুকাইয়া বাস করে। এমন কি, কলসীপূর্ণ জল পর্য্যন্ত ছিল। দস্যুগণ সেইখানে উপস্থিত হইয়া তামাকু সাজিয়া খাইতে লাগিল এবং একজন পাকের উদ্যোগ করিতে লাগিল। একজন বলিল, "মাণিকলাল, রসুই পরে হইবে। প্রথমে মালের কি ব্যবস্থা হইবে, তাহার মীমাংসা করা যাউক।"

মাণিকলাল বলিল, "মালের কথাই আগে হউক।"

তখন আশরফি কয়টি কাটিয়া চারি ভাগ করিল। এক একজন এক এক ভাগ লইল। রত্নবলয় বিক্রয় না হইলে ভাগ হইতে পারে না–তাহা সম্প্রতি অবিভক্ত রহিল। পত্র দুইখানি কি করা যাইবে, তাহার মীমাংসা হইতে লাগিল। দলপতি বলিলেন, "কাগজে আর কি হইবে–উহা পোড়াইয়া ফেল।" এই বলিয়া পত্র দুইখানি সেই মাণিকলালকে অগ্নিদেবকে সমর্পণ করিবার জন্য দিল।

মাণিকলাল কিছু কিছু লিখিতে পড়িতে জানিত। সে পত্র দুইখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়া আনন্দিত হইল। বলিল, "এ পত্র নষ্ট করা হইবে না। ইহাতে রোজগার হইতে পারে।"

"কি? কি?" বলিয়া আর তিন জন গোলযোগ করিয়া উঠিল। মাণিকলাল তখন চঞ্চলকুমারীর পত্রের বৃত্তান্ত তাহাদিগকে সবিস্তারে বুঝাইয়া দিল। শুনিয়া চৌরেরা বড় আনন্দিত হইল।

মাণিকলাল বলিল, "দেখ, এই পত্র রাণাকে দিলে কিছু পুরস্কার পাইব।"

দলপতি বলিল, "নির্ব্বোধ! রাণা যখন জিজ্ঞাসা করিবে, তোমরা এ পত্র কোথায় পাইলে, তখন কি উত্তর দিবে? তখন কি বলিবে যে, আমরা রাহাজানি করিয়া পাইয়াছি? রাণার কাছে পুরস্কারের মধ্যে প্রাণদণ্ড হইবে। তাহা নহে–এ পত্র লইয়া গিয়া বাদশাহকে দিব–বাদশাহের কাছে এরূপ সন্ধান দিতে পারিলে অনেক পুরস্কার পাওয়া যায়, আমি জানি। আর ইহাতে–"

দলপতি কথা সমাপ্ত করিতে অবকাশ পাইল না। কথা মুখে থাকিতে থাকিতে তাহার মস্তক স্কন্ধ হইতে বিচ্যুতি হইয়া ভূতলে পড়িল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : মাণিকলাল

অশ্বারোহী পর্ব্বতের উপর হইতে দেখিল, চারি জনে একজনকে বাঁধিয়া রাখিয়া চলিয়া গেল। আগে কি হইয়াছে, তাহা সে দেখে নাই, তখন সে পৌঁছে নাই। অশ্বারোহী নিঃশব্দে লক্ষ্য করিতে লাগিল, উহারা কোন্ পথে যায়। তাহারা যখন নদীর বাঁক ফিরিয়া পর্ব্বতান্তরালে অদৃশ্য হইল, তখন অশ্বারোহী অশ্ব হইতে নামিল। পরে অশ্বের গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল, "বিজয়! এখানে থাকিও–আমি আসিতেছি–কোন শব্দ করিও না।" অশ্ব স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার আরোহী পাদচারে অতি দ্রুতবেগে পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিলেন। পর্ব্বত যে বড় উচ্চ নহে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

অশ্বারোহী পদব্রজে মিশ্র ঠাকুরের কাছে আসিয়া তাঁহাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিলেন। মুক্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে, অল্প কথায় বলুন।" মিশ্র বলিলেন, "চারি জনের সঙ্গে আমি একত্র আসিতেছিলাম। তাহাদের চিনি না–পথের আলাপ; তাহারা বলে, 'আমরা বণিক্।' এইখানে আসিয়া তাহারা মারিয়া ধরিয়া আমার যাহা কিছু ছিল, কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে।"

প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কি লইয়া গিয়াছে?"

ব্রাহ্মণ বলিল, "একগাছি মুক্তার বালা, কয়টি আশরফি, দুইখানি পত্র।"

প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন, "আপনি এইখানে থাকুন। উহারা কোন্ দিকে গেল, আমি দেখিয়া আসি।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আপনি যাইবেন কি প্রকারে? তাহারা চারি জন, আপনি একা।"

আগন্তুক বলিল, "দেখিতেছেন না, আমি রাজপুত সৈনিক।"

অনন্ত মিশ্র দেখিলেন, এই ব্যক্তি যুদ্ধব্যবসায়ী বটে। তাহার কোমরে তরবারি এবং পিস্তল, এবং হস্তে বর্শা। তিনি ভয়ে আর কথা কহিলেন না।

রাজপুত, যে পথে দস্যুগণকে যাইতে দেখিয়াছিলেন, সেই পথে, অতি সাবধানে তাহাদিগের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বনমধ্যে আসিয়া আর পথ পাইলেন না, অথবা দস্যুদিগের কোন নিদর্শন পাইলেন না।

তখন রাজপুত আবার পর্ব্বতের শিখরদেশে আরোহণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিতে করিতে দেখিলেন যে, দূরে বনের ভিতর প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, চারি জনে যাইতেছে। সেইখানে কিছুক্ষণ অবস্থিতি করিয়া দেখিতে লাগিলেন, ইহারা কোথায় যায়। দেখিলেন, কিছু পরে উহারা একটা পাহাড়ের তলদেশে গেল, তাহার পর উহাদের আর দেখা গেল না। তখন রাজপুত সিদ্ধান্ত করিলেন যে, উহারা হয় ঐখানে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে–বৃক্ষাদির জন্য দেখা যাইতেছে না; নয়, ঐ পর্ব্বততলে গুহা আছে, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

রাজপুত, বৃক্ষাদি চিহ্ন দ্বারা সেই স্থানে যাইবার পথ বিলক্ষণ করিয়া নিরূপণ করিলেন। পরে অবতরণ করিয়া বনমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সেই সকল চিহ্নলক্ষিত পথে চলিলেন। এইরূপে বিবিধ কৌশলে তিনি পূর্ব্বলক্ষিত স্থানে আসিয়া দেখিলেন, পর্ব্বততলে একটি গুহা আছে। গুহামধ্যে মনুষ্যের কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইলেন।

এই পর্য্যন্ত আসিয়া রাজপুত কিছু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। উহারা চারি জন– তিনি একা; এক্ষণে গুহামধ্যে প্রবেশ করা উচিত কি না? যদি গুহাদ্বার রোধ করিয়া উহারা চারি জনে তাঁহার সঙ্গে সংগ্রাম করে, তবে তাঁহার বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এ কথা রাজপুতের মনে বড় অধিকক্ষণ স্থান পাইল না–মৃত্যুভয় আবার ভয় কি? মৃত্যুভয়ে রাজপুত কোন কার্য্য হইতে বিরত হয় না। কিন্তু দ্বিতীয় কথা এই যে, তিনি গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেই তাঁহার হস্তে দুই একজন অবশ্য মরিবে, যদি উহারা সেই দস্যুদল না হয়? তবে নিরপরাধীর হত্যা হইবে।

এই ভাবিয়া রাজপুত সন্দেহভঞ্জনার্থ অতি ধীরে ধীরে গুহাদ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়া অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তিগণের কথাবার্ত্তা কর্ণপাত করিয়া শুনিতে

লাগিলেন। দস্যুরা তখন অপহৃত সম্পত্তির বিভাগের কথা কহিতেছিল। শুনিয়া রাজপুতের নিশ্চয় প্রতীতি হইল যে, উহারা দস্যু বটে। রাজপুত তখন গুহামধ্যে প্রবেশ করাই স্থির করিলেন।

ধীরে ধীরে বর্শা বনমধ্যে লুকাইলেন। পরে অসি নিষ্কাষিত করিয়া দক্ষিণ হস্তে দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিলেন। বাম হস্তে পিস্তল লইলেন। দস্যুরা যখন চঞ্চলকুমারীর পত্র পাইয়া অর্থলাভের আকাঙ্ক্ষায় বিমুগ্ধ হইয়া অন্যমনস্ক ছিল, সেই সময়ে রাজপুত অতি সাবধানে পাদবিক্ষেপ করিতে করিতে গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন। দলপতি গুহাদ্বারের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিয়াছিল। প্রবেশ করিয়া রাজপুত দৃঢ়মুষ্টিধৃত তরবারি দলপতির মস্তকে আঘাত করিলেন। তাঁহার হস্তে এত বল যে, এক আঘাতেই মস্তক দ্বিখণ্ড হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

সেই মুহূর্ত্তেই দ্বিতীয় একজন দস্যু, যে দলপতির কাছে বসিয়াছিল, তাহার দিকে ফিরিয়া রাজপুত তাহার মস্তকে এরূপ কঠিন পদাঘাত করিলেন যে, সে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িল। রাজপুত, অন্য দুই জনের উপর দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন যে, একজন গুহাপ্রান্তে থাকিয়া তাঁহাকে প্রহার করিবার জন্য এক খণ্ড বৃহৎ প্রস্তর তুলিতেছে। রাজপুত তাহাকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল উঠাইলেন; সে আহত হইয়া ভূতলে পড়িয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। অবশিষ্ট মাণিকলাল, বেগতিক দেখিয়া, গুহাদ্বারপথে বেগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। রাজপুতও বেগে তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এই সময়ে, রাজপুত যে বর্শা বনমধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা মাণিকলালের পায়ে ঠেকিল। মাণিকলাল, তৎক্ষণাৎ তাহা তুলিয়া লইয়া দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিয়া রাজপুতের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "মহারাজ! আমি আপনাকে চিনি। ক্ষান্ত হউন, নহিলে এই বর্শায় বিদ্ধ করিব।"

রাজপুত হাসিয়া বলিলেন, "তুমি যদি আমাকে বর্শা মারিতে পারিতে, তাহা হইলে আমি উহা বাম হস্তে ধরিতাম। কিন্তু তুমি উহা মারিতে পারিবে না–এই দেখ।" এই কথা বলিতে না বলিতে রাজপুত তাঁহার হাতের খালি পিস্তল দস্যুর দক্ষিণ হস্তের মুষ্টি লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া মারিলেন। দারুণ প্রহারে তাহার হাতের বর্শা খসিয়া পড়িল। রাজপুত তাহা তুলিয়া লইয়া মাণিকলালের চুল ধরিলেন, এবং অসি উত্তোলন করিয়া তাহার মস্তকচ্ছেদনে উদ্যত হইলেন।

মাণিকলাল তখন কাতরস্বরে বলিল, "মহারাজাধিরাজ! আমার জীবনদান করুন–রক্ষা করুন–আমি শরণাগত!"

রাজপুত তাহার কেশ ত্যাগ করিলেন, তরবারি নামাইলেন–বলিলেন, "তুই মরিতে এত ভীত কেন?"

মাণিকলাল বলিল, "আমি মরিতে ভীত নহি। কিন্তু আমার একটি সাত বৎসরের কন্যা আছে; সে মাতৃহীন, তাহার আর কেহ নাই–কেবল আমি। আমি প্রাতে তাহাকে আহার করাইয়া বাহির হইয়াছি, আবার সন্ধ্যাকালে গিয়া আহার দিব, তবে সে খাইবে; আমি তাহাকে রাখিয়া মরিতে পারিতেছি না। আমি মরিলে সে মরিবে। আমাকে মারিতে হয়, আগে তাহাকে মারুন!"

দস্যু কাঁদিতে লাগিল, পরে চক্ষুর জল মুছিয়া বলিতে লাগিল, "মহারাজাধিরাজ! আমি আপনার পাদস্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, আর কখনও দস্যুতা করিব না। চিরকাল আপনার দাসত্ব করিব। আর যদি জীবন থাকে, একদিন না একদিন এ ক্ষুদ্র ভৃত্য হইতে উপকার হইবে।"

রাজপুত বলিলেন, "তুমি আমাকে চেন?"

দস্যু বলিল, "মহারাণা, রাজসিংহকে কে না চিনে?"

তখন রাজসিংহ বলিলেন, "আমি তোমার জীবন দান করিলাম। কিন্তু তুমি ব্রাহ্মণের ব্রহ্মস্ব হরণ করিয়াছ, আমি যদি তোমাকে কোন প্রকার দণ্ড না দিই, তবে আমি রাজধর্ম্মে পতিত হইব।"

মাণিকলাল বিনীতভাবে বলিল, "মহারাজাধিরাজ! এ পাপে আমি নূতন ব্রতী। অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রতি লঘু দণ্ডেরই বিধান করুন। আমি আপনার

সম্মুখেই শাস্তি লইতেছি।”

এই বলিয়া দস্যু কটিদেশ হইতে ক্ষুদ্র ছুরিকা নির্গত করিয়া, অবলীলাক্রমে আপনার তর্জ্জনী অঙ্গুলি ছেদন করিতে উদ্যত হইল। ছুরিতে মাংস কাটিয়া, অস্থি কাটিল না। তখন মাণিকলাল এক শিলাখণ্ডের উপর হস্ত রাখিয়া, ঐ অঙ্গুলির উপর ছুরিকা বসাইয়া, আর একখণ্ড প্রস্তরের দ্বারা তাহাতে ঘা মারিল। আঙ্গুল কাটিয়া মাটিতে পড়িল। দস্যু বলিল, “মহারাজ! এই দণ্ড মঞ্জুর করুন।”

রাজসিংহ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, দস্যু ভ্রূক্ষেপও করিতেছে না। বলিলেন, “ইহাই যথেষ্ট। তোমার নাম কি?”

দস্যু বলিল, “এ অধমের নাম মাণিকলাল সিংহ। আমি রাজপুতকুলের কলঙ্ক।”

রাজসিংহ বলিলেন, “মাণিকলাল, আজি হইতে তুমি আমার কার্য্যে নিযুক্ত হইলে, এক্ষণে তুমি অশ্বারোহী সৈন্যভুক্ত হইলে–তোমার কন্যা লইয়া উদয়পুরে যাও; তোমাকে ভূমি দিব, বাস করিও।

মাণিকলাল তখন রাণার পদধূলি গ্রহণ করিল এবং রাণাকে ক্ষণকাল অবস্থিতি করাইয়া গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া তথা হইতে অপহৃত মুক্তাবলয়, পত্র দুইখানি এবং আশরফি চারি ভাগ আনিয়া দিল। বলিল, “ব্রাহ্মণের যাহা আমরা কাড়িয়া লইয়াছিলাম, তাহা শ্রীচরণে অর্পণ করিতেছি। পত্র দুইখানি আপনারই জন্য। দাস যে উহা পাঠ করিয়াছে, সে অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।”

রাণা পত্র হস্তে লইয়া দেখিলেন, তাঁহারই নামাঙ্কিত শিরোনামা। বলিলেন, “মাণিকলাল–পত্র পড়িবার এ স্থান নহে। আমার সঙ্গে আইস–তোমরা পথ জান, পথ দেখাও।”

মাণিকলাল পথ দেখাইয়া চলিল। রাণা দেখিলেন যে, দস্যু একবারও তাহার ক্ষত ও আহত হস্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে না বা তৎসম্বন্ধে একটি কথাও বলিতেছে না–বা একবার মুখ বিকৃত করিতেছে না। রাণা শীঘ্রই বন হইতে বেগবতী ক্ষীণা তটিনীতীরে এক সুরম্য নিভৃত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : চঞ্চলকুমারীর পত্র

তথায়, উপলঘাতিনী কলনাদিনী তটিনীরব সঙ্গে সুমন্দ মধুর বায়ু এবং স্বরলহরীবিকীর্ণকারী কুঞ্জবিহঙ্গমগণধ্বনি মিশাইতেছে। তথায় স্তবকে স্তবকে বন্য কুসুম সকল প্রস্ফুটিত হইয়া, পার্ব্বতীয় বৃক্ষরাজি আলোকময় করিতেছে। তথায়, রূপ উছলিতেছে, শব্দ তরঙ্গায়িত হইতেছে, গন্ধ মাতিয়া উঠিতেছে, এবং মন প্রকৃতির বশীভূত হইতেছে। এইখানে রাজসিংহ এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের উপর উপবেশন করিয়া পত্র দুইখানি পড়িতে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রথম রাজা বিক্রমসিংহের পত্র পড়িলেন। পড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন–মনে করিলেন, ব্রাহ্মণকে কিছু দিলেই পত্রের উদ্দেশ্য সফল হইবে। তার পর চঞ্চলকুমারীর পত্র পড়িতে লাগিলেন। পত্র এইরূপ;–

“রাজন্–আপনি রাজপুত-কুলের চূড়া–হিন্দুর শিরোভূষণ। আমি অপরিচিতা হীনমতি বালিকা–নিতান্ত বিপন্না না হইলে কখনই আপনাকে পত্র লিখিতে সাহস করিতাম না। নিতান্ত বিপন্না বুঝিয়াই আমার এ দুঃসাহস মার্জ্জনা করিবেন।

“যিনি এই পত্র লইয়া যাইতেছেন, তিনি আমার গুরুদেব। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবেন–আমি রাজপুতকন্যা। রূপনগর অতি ক্ষুদ্র রাজ্য–তথাপি বিক্রমসিংহ সোলাঙ্কি রাজপুত–রাজকন্যা বলিয়া আমি মধ্যদেশাধিপতির কাছে গণ্য না হই–রাজপুতকন্যা বলিয়া দয়ার পাত্রী। কেন না, আপনি রাজপুতপতি–রাজপুতকুলতিলক।

"অনুগ্রহ করিয়া আমার বিপদ্ শ্রবণ করুন। আমার দুরদৃষ্টক্রমে, দিল্লীর বাদশাহ আমার পাণিগ্রহণ করিতে মানস করিয়াছেন। অনতিবিলম্বে তাঁহার সৈন্য, আমাকে দিল্লী লইয়া যাইবার জন্য আসিবে। আমি রাজপুতকন্যা, ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভবা–কি প্রকারে তাহাদের দাসী হইব? রাজহংসী হইয়া কেমন করিয়া বকসহচরী হইব? হিমালয়নন্দিনী হইয়া কি প্রকারে পঙ্কিল তড়াগে মিশিব? রাজকুমারী হইয়া কি প্রকারে তুরকী বর্ব্বরের আজ্ঞাকারিণী হইব? আমি স্থির করিয়াছি, এ বিবাহের অগ্রে বিষভোজনে প্রাণত্যাগ করিব।

"মহারাজাধিরাজ! আমাকে অহঙ্কৃতা মনে করিবেন না। আমি জানি যে, আমি ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারীর কন্যা–যোধপুর, অম্বর প্রভৃতি দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী রাজাধিরাজগণও দিল্লীর বাদশাহকে কন্যাদান করা কলঙ্ক মনে করেন না–কলঙ্ক মনে করা দূরে থাক, বরং গৌরব মনে করেন। আমি সে সব ঘরের কাছে কোন্ ছার? আমার এ অহঙ্কার কেন, এ কথা আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। কিন্তু মহারাজ! সূর্য্যদেব অস্ত গেলে খদ্যোত কি জ্বলে না? শিশিরভরে নলিনী মুদ্রিত হইলে, ক্ষুদ্র কুন্দকুসুম কি বিকশিত হয় না? যোধপুর অম্বর কুলধ্বংস করিলে রূপনগরে কি কুলরক্ষা হইতে পারে না? মহারাজ, ভাটমুখে শুনিয়াছি যে, বনবাসী রাণা প্রতাপের সহিত মহারাজ মানসিংহ ভোজন করিতে আসিলে, মহারাণা ভোজন করেন নাই; বলিয়াছিলেন, "যে তুর্ককে ভগিনী দিয়াছে, তাহার সহিত ভোজন করিব না।" সেই মহাবীরের বংশধরকে কি আমায় বুঝাইতে হইবে যে, এই সম্বন্ধ রাজপুতকুলকামিনীর পক্ষে ইহলোকে পরলোকে ঘৃণাস্পদ? মহারাজ! আজিও আপনার বংশে তুর্ক বিবাহ করিতে পারিল না কেন? আপনারা বীর্য্যবান মহাবলপরাক্রান্ত বংশ বটে, কিন্তু তাই বলিয়া নহে। মহাবলপরাক্রান্ত রুমের বাদশাহ কিংবা পারস্যের শাহ দিল্লীর বাদশাহকে কন্যাদান গৌরব মনে করেন। তবে উদয়পুরেশ্বর কেবল তাহাকে কন্যাদান করেন না কেন? তিনি রাজপুত বলিয়া। আমিও সেই রাজপুত। মহারাজ! প্রাণত্যাগ করিব, তবু কুল রাখিব প্রতিজ্ঞা করিয়াছি।

"প্রয়োজন হইলে প্রাণবিসর্জ্জন করিব, প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; কিন্তু তথাপি এই অষ্টাদশ বৎসর বয়সে, এই অভিনব জীবন রাখিতে বাসনা হয়। কিন্তু কে এ বিপদে এ জীবন রক্ষা করিবে? আমার পিতার ত কথাই নাই, তাঁহার এমন কি সাধ্য যে, আলম্‌গীরের সঙ্গে বিবাদ করেন? আর যত রাজপুত রাজা ছোট হউন, বড় হউন, সকলেই বাদশাহের ভৃত্য–সকলেই বাদশাহের ভয়ে কম্পিতকলেবর। কেবল আপনি–রাজপুতকুলের একা প্রদীপ–কেবল আপনিই স্বাধীন–কেবল উদয়পুরেশ্বরই বাদশাহের সমকক্ষ। হিন্দুকুলে আর কেহ নাই যে,–এই বিপন্না বালিকাকে রক্ষা করে–আমি আপনার শরণ লইলাম–আপনি কি আমাকে রক্ষা করিবেন না?

"কত বড় গুরুতর কার্য্যে আমি আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, তাহা আমি না জানি, এমত নহে, আমি কেবল বালিকাবুদ্ধির বশীভূতা হইয়া লিখিতেছি, এমত নহে। দিল্লীশ্বরের সহিত বিবাদ সহজ নহে জানি। এ পৃথিবীতে আর কেহই নাই যে, তাহার সঙ্গে বিবাদ করিয়া তিষ্ঠিতে পারে। কিন্তু মহারাজ! মনে করিয়া দেখুন, মহারাণা সংগ্রামসিংহ বাবরশাহকে প্রায় রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন। মহারাণা প্রতাপসিংহ আকবরশাহকেও মধ্যদেশ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। আপনি সেই সিংহাসনে আসীন–আপনি সেই সংগ্রামের, সেই প্রতাপের বংশধর–আপনি কি তাঁহাদিগের অপেক্ষা হীনবল? শুনিয়াছি না কি, মহারাষ্ট্রে এক পার্ব্বতীয় দস্যু আলম্‌গীরকে পরাভূত করিয়াছে–সে আলম্‌গীর কি রাজস্থানের রাজেন্দ্রের কাছে গণ্য?

"আপনি বলিতে পারেন, 'আমার বাহুতে বল আছে–কিন্তু থাকিলেও আমি তোমার জন্য কেন এত কষ্ট করিব? আমি কেন অপরিচিতা মুখরা কামিনীর জন্য প্রাণিহত্যা করিব?–ভীষণ সমরে অবতীর্ণ হইব?' মহারাজ! সর্ব্বস্ব পণ করিয়া শরণাগতকে রক্ষা করা কি রাজধর্ম্ম নহে? সর্ব্বস্ব পণ করিয়া কুলকামিনীর রক্ষা কি রাজপুতের ধর্ম্ম নহে?

এই পর্য্যন্ত পত্রখানি রাজকন্যার হাতের লেখা। বাকি যেটুকু, সেটুকু তাঁহার হাতের নহে। নির্ম্মলকুমারী লিখিয়া দিয়াছিল; রাজকন্যা তাহা জানিতেন কি না,

আমরা বলিতে পারি না। সে কথা এই–

“মহারাজ! আর একটি কথা বলিতে লজ্জা করে, কিন্তু না বলিলেও নহে। আমি এই বিপদে পড়িয়া পণ করিয়াছি যে, যে বীর আমাকে মোগলহস্ত হইতে রক্ষা করিবেন, তিনি যদি রাজপুত হয়েন, আর যদি আমাকে যথাশাস্ত্র গ্রহণ করেন, তবে আমি তাঁহার দাসী হইব। হে বীরশ্রেষ্ঠ! যুদ্ধে স্ত্রীলাভ বীরের ধর্ম্ম। সমগ্র ক্ষত্রকুলের সহিত যুদ্ধ করিয়া, পাণ্ডব দ্রোপদীলাভ করিয়াছিলেন। কাশীরাজ্যে সমবেত রাজমণ্ডলীসমক্ষে আপন বীর্য্য প্রকাশ করিয়া ভীষ্মদেব রাজকন্যাগণকে লইয়া আসিয়াছিলেন। হে রাজন্! রুক্মিণীর বিবাহ মনে পড়ে না? আপনি এই পৃথিবীতে আজিও অদ্বিতীয় বীর–আপনি কি বীরধর্ম্মে পরাঙ্মুখ হইবেন?

“তবে, আমি যে আপনার মহিষী হইবার কামনা করি, ইহা দুরাকাঙ্ক্ষা বটে। যদি আমি আপনার গ্রহণযোগ্য না হই, তাহা হইলে আপনার সঙ্গে অন্যবিধ সম্বন্ধ স্থাপন করিবারও কি ভরসা করিতে পারি না? অন্ততঃ যাহাতে সেরূপ অনুগ্রহও আমার অপ্রাপ্য না হয়, এই অভিপ্রায় করিয়া গুরুদেবহস্তে রাখির বন্ধন পাঠাইলাম। তিনি রাখি বাঁধিয়া দিবেন–তার পর আপনার রাজধর্ম্ম আপনার হাতে। আমার প্রাণ আমার হাতে। যদি দিল্লী যাইতে হয়, দিল্লীর পথে বিষভোজন করিব।”

পত্র পাঠ করিয়া রাজসিংহ কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন হইলেন, পরে মাথা তুলিয়া মাণিকলালকে বলিলেন, “মাণিকলাল, এ পত্রের কথা তুমি ছাড়া আর কে জানে?”

মাণিক। যাহারা জানিত, মহারাজ গুহামধ্যে তাহাদিগকে বধ করিয়া আসিয়াছেন।

রাজা। উত্তম। তুমি গৃহে যাও। উদয়পুরে আসিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও। এ পত্রের কথা কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করিও না।

এই বলিয়া রাজসিংহ, নিকটে যে কয়টি স্বর্ণমুদ্রা ছিল, তাহা মাণিকলালকে দিলেন। মাণিকলাল প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : মাতাজীকি জয়!

রাণা অনন্ত মিশ্রকে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে বলিয়া গিয়াছিলেন, অনন্ত মিশ্রও তাঁহার অপেক্ষা করিতেছিলেন–কিন্তু তাঁহার চিত্ত স্থির ছিল না। অশ্বারোহীর যোদ্ধৃবেশ এবং তীব্রদৃষ্টিতে তিনি কিছু কাতর হইয়াছিলেন। একবার ঘোরতর বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া, ভাগ্যক্রমে প্রাণে রক্ষা পাইয়াছেন–কিন্তু আর সব হারাইয়াছেন–চঞ্চলকুমারীর আশা-ভরসা হারাইয়াছেন–আর কি বলিয়া তাঁহার কাছে মুখ দেখাইবেন? ব্রাহ্মণ এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে দেখিলেন, পর্ব্বতের উপরে দুই তিন জন লোক দাঁড়াইয়া কি পরামর্শ করিতেছে। ব্রাহ্মণ ভীত হইলেন; মনে করিলেন, আবার নূতন দস্যুসম্প্রদায় আসিয়া উপস্থিত হইল নাকি? সে বার–নিকটে যাহা হয় কিছু ছিল, তাহা পাইয়া দস্যুরা তাঁহার প্রাণবধে বিরত হইয়াছিল–এবার যদি ইহারা তাঁহাকে ধরে, তবে কি দিয়া প্রাণ রাখিবেন? এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমত সময়ে দেখিলেন যে, পর্ব্বতারূঢ় ব্যক্তিরা হস্ত প্রসারণ করিয়া তাঁহাকে দেখাইতেছে এবং পরস্পর কি বলিতেছে। ইহা দেখিবামাত্র, ব্রাহ্মণের যে কিছু সাহস ছিল, তাহা গেল–ব্রাহ্মণ পলায়নের উদ্যোগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সেই সময়ে পর্ব্বতবিহারীদিগের মধ্যে একজন পর্ব্বত অবতরণ করিতে আরম্ভ করিল–দেখিয়া ব্রাহ্মণ ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

তখন “ধর্ ধর্” করিয়া তিন চারি জন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল–ব্রাহ্মণও ছুটিলেন–অজ্ঞান, মুক্তকচ্ছ, তথাপি “নারায়ণ নারায়ণ” স্মরণ করিতে করিতে ব্রাহ্মণ তীরবৎ বেগে পলাইলেন। যাহারা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে শেষে আর না দেখিতে পাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল।

তাহারা অপর কেহই নহে–মহারাণার ভৃত্যবর্গ। মহারাণার সহিত এ স্থলে কি প্রকারে আমাদিগের সাক্ষাৎ হইল, তাহা এক্ষণে বুঝাইতে হইতেছে। রাজপুতগণের শিকারে বড় আনন্দ। অদ্য মহারাণা শত অশ্বারোহী এবং ভৃত্যগণ সমভিব্যাহারে মৃগয়ায় বাহির হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা শিকারে প্রতিনিবৃত্ত

হইয়া উদয়পুরাভিমুখে যাইতেছিলেন। রাজসিংহ সর্ব্বদা প্রহরিগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া রাজা হইয়া থাকিতে ভালবাসিতেন না। কখন কখন অনুচরবর্গকে দূরে রাখিয়া একাকী অশ্বারোহণ করিয়া ছদ্মবেশে প্রজাদিগের অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া বেড়াইতেন। সেই জন্য তাঁহার রাজ্যে প্রজা অত্যন্ত সুখী হইয়া উঠিয়াছিল; স্বচক্ষে সকল দেখিতেন, স্বহস্তে সকল দুঃখ নিবারণ করিতেন।

অদ্য মৃগয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে তিনি অনুচরবর্গকে পশ্চাতে আসিতে বলিয়া দিয়া, বিজয়নামা দ্রুতগামী অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, একাকী অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই অবস্থায় অনন্ত মিশ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইলে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা কথিত হইয়াছে। রাজা দস্যুকৃত অত্যাচার শুনিয়া স্বহস্তে ব্রহ্মস্ব উদ্ধারের জন্য ছুটিয়াছিলেন। যাহা দুঃসাধ্য এবং বিপৎপূর্ণ, তাহাতেই তাঁহার আমোদ ছিল।

এ দিকে অনেক বেলা হইল দেখিয়া কতিপয় রাজভৃত্য দ্রুতপদে তাঁহার অনুসন্ধানে চলিল। নীচে অবতরণকালে দেখিল, রাণার অশ্ব দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—ইহাতে তাহারা বিস্মিত এবং চিন্তিত হইল। আশঙ্কা করিল যে, রাণার কোন বিপদ্ ঘটিয়াছে। নিম্নে শিলাখণ্ডোপরি অনন্ত ঠাকুর বসিয়া আছেন দেখিয়া তাহারা বিবেচনা করিল যে, এই ব্যক্তি অবশ্য কিছু জানিবে। সেই জন্য তাহারা হস্তপ্রসারণ করিয়া সে দিকে দেখাইয়া দিতেছিল, তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার জন্য তাহারা নামিতেছিল, এমন সময়ে ঠাকুরজী নারায়ণ স্মরণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। তখন তাহারা ভাবিল, তবে এই ব্যক্তি অপরাধী। এই ভাবিয়া তাহারা পশ্চাৎ ধাবিত হইল। ব্রাহ্মণ এক গহ্বরমধ্যে লুকাইয়া প্রাণরক্ষা করিল।

এ দিকে মহারাণা চঞ্চলকুমারীর পত্রপাঠ সমাপ্ত ও মাণিকলালকে বিদায় করিয়া অনন্ত মিশ্রের তল্লাসে গেলেন। দেখিলেন, সেখানে ব্রাহ্মণ নাই—তৎপরিবর্তে তাঁহার ভৃত্যবর্গ এবং তাঁহার সমভিব্যাহারী অশ্বারোহীগণ আসিয়া অধিত্যকার তলদেশ ব্যাপ্ত করিয়াছে। রাণাকে দেখিতে পাইয়া সকলে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। বিজয়, প্রভুকে দেখিতে পাইয়া, তিন লম্ফে অবতরণ করিয়া তাঁহার কাছে দাঁড়াইল। রাণা তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। তাঁহার বস্ত্র রুধিরাক্ত দেখিয়া সকলেই বুঝিল যে, একটা কিছু ক্ষুদ্র ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু রাজপুতগণের ইহা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার—কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিল না।

রাণা কহিলেন, “এইখানে এক ব্রাহ্মণ বসিয়াছিল; সে কোথায় গেল—কেহ দেখিয়াছিলে?”

যাহারা উহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছিল, তাহারা বলিল, “মহারাজ, সে ব্যক্তি পলাইয়াছে।”

রাণা। শীঘ্র তাহার সন্ধান করিয়া লইয়া আইস।

ভৃত্যগণ তখন সবিশেষ কথা বুঝিয়া নিবেদন করিল যে, “আমরা অনেক সন্ধান করিয়াছি, কিন্তু পাই নাই।”

অশ্বারোহীগণ মধ্যে রাণার পুত্রদ্বয়, তাঁহার জ্ঞাতি ও অমাত্যবর্গ প্রভৃতি ছিল। রাজা পুত্রদ্বয় ও অমাত্যবর্গকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া কথাবার্ত্তা বলিলেন। পরে ফিরিয়া আসিয়া আর সকলকে বলিলেন, “প্রিয়জনবর্গ! আজি অধিক বেলা হইয়াছে; তোমাদিগের সকলের ক্ষুধাতৃষ্ণা পাইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু আজ উদয়পুরে গিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণ করা আমাদিগের অদৃষ্টে নাই। এই পার্ব্বত্য পথে আবার আমাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। একটি ক্ষুদ্র লড়াই জুটিয়াছে—লড়াইয়ে যাহার সাধ থাকে, আমার সঙ্গে আইস—আমি, এই পর্ব্বত পুনরারোহণ করিব। যাহার সাধ না থাকে, উদয়পুরে ফিরিয়া যাও।”

এই বলিয়া রাণা পর্ব্বত আরোহণে প্রবৃত্ত হইলেন। অমনি “জয় মহারাণাকি জয়! জয় মাতাজীকি জয়!” বলিয়া সেই শত অশ্বারোহী তাঁহার পশ্চাতে পর্ব্বত আরোহণে প্রবৃত্ত হইল। উপরে, উঠিয়া “হর! হর!” শব্দে, রূপনগরের পথে ধাবিত হইল। অশ্বক্ষুরের আঘাতে অধিত্যকায় ঘোরতর প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : নিরাশা

এদিকে অনন্ত মিশ্র রূপনগর হইতে যাত্রা করার পরেই রূপনগরে মহাধুম পড়িয়াছিল। মোগল বাদশাহের দুই সহস্র অশ্বারোহী সেনা রূপনগরের গড়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা চঞ্চলকুমারীকে লইতে আসিয়াছে।

নির্ম্মলের মুখ শুকাইল; দ্রুতবেগে সে চঞ্চলকুমারীর কাছে গিয়া বলিল, "কি হইবে সখি?"

চঞ্চলকুমারী মৃদু হাসি হাসিয়া বলিলেন, "কিসের কি হইবে?"

নির্ম্মল। তোমাকে ত লইতে আসিয়াছে। কিন্তু এই ত ঠাকুরজী উদয়পুরে গিয়াছেন–এখনও তাঁর পৌঁছিবার বিলম্ব আছে। রাজসিংহের উত্তর আসিতে না আসিতেই তোমায় লইয়া যাইবে–কি হইবে সখি?

চঞ্চল। তার আর উপায় নাই–কেবল আমার সেই শেষ উপায় আছে। দিল্লীর পথে বিষভোজনে প্রাণত্যাগ–সে বিষয়ে আমি চিত্ত স্থির করিয়াছি। সুতরাং আমার আর উদ্বেগ নাই। একবার কেবল আমি পিতাকে অনুরোধ করিব–যদি মোগলসেনাপতি সাত দিনের অবসর দেন।

চঞ্চলকুমারী সময়মত পিতৃপদে নিবেদন করিলেন যে, "আমি জন্মের মত রূপনগর হইতে চলিলাম। আমি আর কখন যে আপনাদিগের শ্রীচরণ দর্শন করিতে পাইব, আর কখন যে বাল্যসখীগণের সঙ্গে আমোদ করিতে পাইব, এমত সম্ভাবনা নাই। আমি আর সাত দিনের অবসর ভিক্ষা করি–সাত দিন মোগলসেনা এইখানে অবস্থিতি করুক। আর সাত দিন আমি আপনাদিগকে দেখিয়া শুনিয়া জন্মের মত বিদায় হইব।"

রাজা একটু কাঁদিলেন। বলিলেন, "দেখি, সেনাপতিকে অনুরোধ করিব, কিন্তু তিনি অপেক্ষা করিবেন কি না, বলিতে পারি না।"

রাজা অঙ্গীকার মত মোগলসেনাপতির কাছে নিবেদন জানাইলেন। সেনাপতি ভাবিয়া দেখিলেন, বাদশাহ কোন সময় নিরূপিত করিয়া দেন নাই–বলিয়া দেন নাই যে, এত দিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু সাত দিন বিলম্ব করিতে তাঁহার সাহস হইল না; ভবিষ্যৎ বেগমের অনুরোধ একেবারে অগ্রাহ্য করিতেও পারিলেন না। আর পাঁচ দিন অবস্থিতি করিতে স্বীকৃত হইলেন। চঞ্চলকুমারীর বড় একটা ভরসা জন্মিল না।

এদিকে উদয়পুর হইতে কোন সংবাদ আসিল না–মিশ্র ঠাকুর ফিরিলেন না। তখন চঞ্চলকুমারী ঊর্দ্ধমুখে, যুক্তকরে বলিল, "হে অনাথনাথ দেবাদিদেব! অবলাকে বধ করিও না।"

রজনীতে নির্ম্মল আসিয়া তাঁহার কাছে শয়ন করিল। সমস্ত রাত্রি দুই জনে দুই জনকে বক্ষে রাখিয়া রোদন করিয়া কাটাইল। নির্ম্মল বলিল, "আমি তোমার সঙ্গে যাইব।" কয় দিন ধরিয়া সে এই কথায় বলিতেছিল। চঞ্চল বলিল, "তুমি আমার সঙ্গে কোথায় যাইবে? আমি মরিতে যাইতেছি।" নির্ম্মল বলিল, "আমিও মরিব। তুমি আমায় ফেলিয়া গেলেই কি আমি বাঁচিব?" চঞ্চল বলিল, "ছি! অমন কথা বলিও না–আমার দুঃখের উপর কেন দুঃখ বাড়াও?" নির্ম্মল বলিল, "তুমি আমাকে লইয়া যাও বা না যাও, আমি নিশ্চয় তোমার সঙ্গে যাইব–কেহ রাখিতে পারিবে না।"

দুই জনে কাঁদিয়া রাত্রি কাটাইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : মেহেরজান

যে কয় দিন, মোগল সৈনিকেরা রূপনগরে শিবির সংস্থাপন করিয়া রহিলেন, সে কয় দিন বড় আমোদ প্রমোদে কাটিল। মোগল সৈন্যের সঙ্গে সঙ্গে নর্ত্তকীর দল ছুটিত; যখন যুদ্ধ না হইত, তখন তাম্বুর ভিতর নাচ-গানের ধুম পড়িত। সৈনিকদিগের রূপনগরে আসা কেবল আনন্দ করিতে আসা। সুতরাং রাত্রিতে তাম্বুতে

নৃত্য গীতের বড় ধুম।

নর্ত্তকীদিগের মধ্যে সহসা একজনের নাম অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করিল, দিল্লীতে কেহ কখন মেহেরজানের নাম শুনে নাই–কিন্তু যাহাদের নাম প্রসিদ্ধ, তাহারাও রূপনগরে আসিয়া মেহেরজানের তুল্য যশস্বিনী হইতে পারিল না। মেহেরজান আবার নর্ত্তকী হইয়াও সচ্চরিত্রা, এজন্য সে আরও যশস্বিনী হইল।

মোগল সেনাপতি সৈয়দ হাসান আলি তাহার সঙ্গীত শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু মেহেরজান প্রথমে স্বীকৃত হইল না। বলিল, "আমি অনেক লোকের সাক্ষাতে নৃত্যগীত করিতে পারি না।" সৈয়দ হাসান আলি স্বীকার করিলেন যে, বন্ধুবর্গ কেহ উপস্থিত থাকিবে না। নর্ত্তকী আসিয়া তাঁহাকে নৃত্যগীত শুনাইল। তিনি অতিশয় প্রীত হইয়া নর্ত্তকীকে অর্থ দিয়া পুরস্কৃত করিলেন। কিন্তু নর্ত্তকী তাহা লইল না। বলিল, "আমি অর্থ চাহি না। যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমি যে পুরস্কার চাই, তাহাই দিবেন, নহিলে কোন পুরস্কার চাহি না।"

সৈয়দ হাসান আলি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি পুরস্কার চাও?"

মেহেরজান বলিল, "আমি আপনার অশ্বারোহিসৈন্যভুক্ত হইবার ইচ্ছা করি।"

হাসান আলি অবাক্–হতবুদ্ধি হইয়া মেহেরজানের সুন্দর সহাস্য মুখখানির প্রতি চাহিয়া রহিলেন। মেহেরজান তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া বলিল, "আমি ঘোড়া, হাতিয়ার, পোষাকের দাম দিব।"

হাসান আলি বলিল, "স্ত্রীলোক অশ্বারোহী সৈনিক?"

মেহেরজান বলিল, "ক্ষতি কি? যুদ্ধ ত হইবে না। যুদ্ধ হইলেও পলাইব না।"

হাসান আলি। লোকে কি বলিবে?

মেহেরজান। আপনি আর আমি জানিলাম, আর কেহ জানিবে না।

হাসান আলি। তুমি এ কামনা কেন কর?

মেহেরজান। যে জন্যই হৌক–বাদশাহের ইহাতে ক্ষতি নাই।

হাসান আলী প্রথমে কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। কিন্তু মেহেরজানও কিছুতেই ছাড়িল না। শেষে হাসান আলি স্বীকৃত হইল। মেহেরজানের প্রার্থনা মঞ্জুর হইল।

মেহেরজান, সেই দরিয়া বিবি।

নবম পরিচ্ছেদ : প্রভুভক্তি

এই সময়ে, একবার মাণিকলালের কথা পাড়িতে হইল। মাণিকলাল রাণার নিকট হইতে বিদায় লইয়া প্রথমে আবার সেই পর্ব্বতগুহায় ফিরিয়া গেল। আর সে দস্যুতা করিবে, এমন বাসনা ছিল না; কিন্তু পূর্ব্ববন্ধুগণ মরিল, কি বাঁচিল, তাহা দেখিবে না কেন? যদি কেহ একেবারে না মরিয়া থাকে, তবে তাহার শুশ্রূষা করিয়া বাঁচাইতে হইবে। এই সকল ভাবিতে ভাবিতে মাণিকলাল গুহাপ্রবেশ করিল।

দেখিল, দুই জন মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। যে কেবল মূর্চ্ছিত হইয়াছিল, সে সংজ্ঞালাভ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। মাণিকলাল তখন বিষণ্ণচিত্তে বন হইতে এক রাশি কাঠ ভাঙ্গিয়া আনিল–তদ্দ্বারা দুইটি চিতা রচনা করিয়া, দুইটি মৃতদেহ তদুপরি স্থাপন করিল। গুহা হইতে প্রস্তর ও লৌহ বাহির করিয়া

অগ্ন্যুৎপাদনপূর্ব্বক চিতায় আগুন দিল। এইরূপ সঙ্গীদিগের অন্তিম কার্য্য করিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। পরে মনে করিল যে, যে ব্রাহ্মণকে পীড়ন করিয়াছিলাম, তাহার কি অবস্থা হইয়াছে, দেখিয়া আসি। যেখানে অনন্ত মিশ্রকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, সেখানে আসিয়া দেখিল যে, সেখানে ব্রাহ্মণ নাই। দেখিল, স্বচ্ছসলিলা পার্ব্বত্য নদীর জল একটু সমল হইয়াছে—এবং অনেক স্থানে বৃক্ষশাখা, লতা, গুল্ম, তৃণাদি ছিন্নভিন্ন হইয়াছে। এই সকল চিহ্নে মাণিকলাল মনে করিল যে, এখানে বোধ হয়, অনেক লোক আসিয়াছিল। তার পর দেখিল, পাহাড়ের প্রস্তরময় অঙ্গেও কতকগুলি অশ্বের পদচিহ্ন লক্ষ্য করা যায়—বিশেষ অশ্বের ক্ষুরে যেখানে লতাগুল্ম কাটিয়া গিয়াছে, সেখানে অর্দ্ধগোলাকৃত চিহ্নসকল স্পষ্ট। মাণিকলাল মনোযোগপূর্ব্বক বহুক্ষণ ধরিয়া নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিল যে, এখানে অনেকগুলি অশ্বারোহী আসিয়াছিল।

চতুর মাণিকলাল তাহার পর দেখিতে লাগিল, অশ্বারোহীগণ কোন্ দিক্ হইতে আসিয়াছে—কোন্ দিকে গিয়াছে। দেখিল, কতকগুলি চিহ্নের সম্মুখ দক্ষিণে—কতকগুলির সম্মুখ উত্তরে। কতক দূর মাত্র দক্ষিণে গিয়া চিহ্নসকল আবার উত্তরমুখ হইয়াছে। ইহাতে বুঝিল, অশ্বারোহিগণ উত্তর হইতে এই পর্য্যন্ত আসিয়া, আবার উত্তরাংশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে।

এই সকল সিদ্ধান্ত করিয়া মাণিকলাল গৃহে গেল। সে স্থান হইতে মাণিকলালের গৃহ দুই তিন ক্রোশ। তথায় রন্ধন করিয়া আহারাদি সমাপনান্তে, কন্যাটিকে ক্রোড়ে লইল। তখন মাণিকলাল ঘরে চাবি দিয়া কন্যা ক্রোড়ে নিষ্ক্রান্ত হইল।

মাণিকলালের কেহ ছিল না—কেবল এক পিসীর ননদের জায়ের খুল্লতাতপুত্রী ছিল। সৌজন্যবশতঃই হউক, আর আত্মীয়তার সাধ মিটাইবার জন্যই হউক—মাণিকলাল তাহাকে পিসী বলিয়া ডাকিত।

মাণিকলাল কন্যা লইয়া সেই পিসীর বাড়ী গেল। ডাকিল, “পিসী গা?”

পিসী বলিল, “কি বাছা মাণিকলাল! কি মনে করিয়া?”

মাণিকলাল বলিল, “আমার এই মেয়েটি রাখিতে পার পিসী?”

পিসী। কতক্ষণের জন্য।

মাণিক। এই দুমাস ছমাসের জন্য?

পিসী। সে কি বাছা! আমি গরীব মানুষ—মেয়েকে খাওয়াব কোথা হইতে?

মাণিক। কেন পিসী মা, তুমি কিসের গরীব? তুমি কি নাতনীকে দুমাস খাওয়াতে পার না?

পিসী। সে কি কথা? দুমাস একটা মেয়ে পুষিতে যে এক মোহর পড়ে।

মাণিক। আচ্ছা, আমি সে এক মোহর দিতেছি—তুমি মেয়েটিকে দুমাস রাখ। আমি উদয়পুরে যাইব—সেখানে আমি রাজসরকারে বড় চাকরি পাইয়াছি।

এই বলিয়া মাণিকলাল, রাণার প্রদত্ত আশরফির মধ্যে একটা পিসীর সম্মুখে ফেলিয়া দিল এবং কন্যাকে তাঁহার কাছে ছাড়িয়া দিয়া বলিল, “যা! তোর দিদির কোলে গিয়া বস্।”

পিসীঠাকুরাণী কিছু লোভে পড়িলেন। মনে বিলক্ষণ জানিতেন যে, এক মোহরে ঐ শিশুর এক বৎসর গ্রাসাচ্ছাদন চলিতে পারে—মাণিকলাল কেবল দুই মাসের করার করিতেছে, অতএব কিছু লাভের সম্ভাবনা। তারপর, মাণিক রাজদরবারে চাকরি স্বীকার করিয়াছে—চাহি কি, বড়মানুষ হইতে পারে, তা হইলে কি পিসীকে কখন কিছু দিবে না? মানুষটা হাতে থাকা ভাল।

পিসী তখন মোহরটি কুড়াইয়া লইয়া বলিল, "তার আশ্চর্য্য কি বাছা—তোমার মেয়ে মানুষ করিব, সে কি বড় ভারি কাজ? তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আয় রে জান্ আয়!" বলিয়া পিসী কন্যাকে কোলে তুলিয়া লইল।

কন্যা সম্বন্ধে এইরূপ বন্দোবস্ত হইলে মাণিকলাল নিশ্চিন্তচিত্তে গ্রাম হইতে নির্গত হইল। কাহাকে কিছু না বলিয়া রূপনগরে যাইবার পার্ব্বত্য পথে আরোহণ করিল।

মাণিকলাল এইরূপ বিচার করিতেছিল—"ঐ অধিত্যকায় অনেকগুলি অশ্বারোহী আসিয়াছিল কেন? ঐখানে রাণাও একাকী ভ্রমিতেছিলেন—কিন্তু উদয়পুর হইতে এত দূর রাণা একাকী আসিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব উহারা রাণার সমভিব্যাহারী অশ্বারোহী। তার পর দেখা গেল, উহারা উত্তর হইতে আসিয়াছে—উদয়পুর অভিমুখে যাইতেছিল—বোধ হয়, রাণা মৃগয়া বা বনবিহারে গিয়া থাকিবেন—উদয়পুর ফিরিয়া যাইতেছিলেন। তার পর দেখিলাম, উহারা উদয়পুরে যায় নাই। উত্তরমুখেই ফিরিয়াছে কেন? উত্তরে ত রূপনগর বটে। বোধ হয়, চঞ্চলকুমারীর পত্র পাইয়া রাণা অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে তাহার নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছেন। তাহা যদি না গিয়া থাকেন, তবে তাঁহার রাজপুতপতি নাম মিথ্যা। আমি তাঁহার ভৃত্য—আমি তাঁহার কাছে যাইব—কিন্তু তাঁহারা অশ্বারোহণে গিয়াছেন—আমার পদব্রজে যাইতে অনেক বিলম্ব হইবে। তবে এক ভরসা, পার্ব্বত্য পথে অশ্ব তত দ্রুত যায় না এবং মাণিকলাল পদব্রজে বড় দ্রুতগামী।" মাণিকলাল দিবারাত্র পথ চলিতে লাগিল। যথাকালে সে রূপনগরে পৌঁছিল। পৌঁছিয়া দেখিল যে, রূপনগরে দুই সহস্র মোগল অশ্বারোহী আসিয়া শিবির করিয়াছে, কিন্তু রাজপুত সেনার কোন চিহ্ন দেখা যায় না। আরও শুনিল, পরদিন প্রভাতে মোগলেরা রাজকুমারীকে লইয়া যাইবে।

মাণিকলাল বুদ্ধিতে একটি ক্ষুদ্র সেনাপতি। রাজপুতগণের কোন সন্ধান না পাইয়া, কিছুই দুঃখিত হইল না মনে মনে বলিল, মোগল পারিবে না—কিন্তু আমি প্রভুর সন্ধান করিয়া লইব।

একজন নাগরিককে মাণিক বলিল, "আমাকে দিল্লী যাইবার পথ দেখাইয়া দিতে পার? আমি কিছু বখ্‌শিশ দিব।" নাগরিক সম্মত হইয়া, কিছু দূর অগ্রসর হইয়া তাহাকে পথ দেখাইয়া দিল। মাণিকলাল তাহাকে পুরস্কৃত করিয়া বিদায় করিল। পরে দিল্লীর পথে, চারি দিক্ ভাল করিয়া দেখিতে দেখিতে চলিল। মাণিকলাল স্থির করিয়াছিল যে, রাজপুত অশ্বারোহিগণ অবশ্য দিল্লীর পথে কোথাও লুকাইয়া আছে। প্রথমতঃ কিছু দূর পর্য্যন্ত মাণিকলাল রাজপুতসেনার কোন চিহ্ন পাইল না। পরে এক স্থানে দেখিল, পথ অতি সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিল। দুই পার্শ্বে দুইটি পাহাড় উঠিয়া, প্রায় অর্দ্ধক্রোশ সমান্তরাল হইয়া চলিয়াছে—মধ্যে কেবল সঙ্কীর্ণ পথ। দক্ষিণ দিকের পর্ব্বত অতি উচ্চ—এবং দুরারোহণীয়—তাহার শিখরদেশ প্রায় পথের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। বাম দিকে পর্ব্বত, অতি ধীরে ধীরে উঠিয়াছে। আরোহণের সুবিধা, এবং পর্ব্বতও অনুচ্চ। একস্থানে ঐ বাম দিকে একটি রন্ধ্র বাহির হইয়াছে, তাহা দিয়া একটু সূক্ষ্ম পথ আছে।

নাপোলিয়ন্ প্রভৃতি অনেক দস্যু সুদক্ষ সেনাপতি ছিলেন। রাজা হইলে লোকে আর দস্যু বলে না। মাণিকলাল রাজা নহে—সুতরাং আমরা তাহাকে দস্যু বলিতে বাধ্য। কিন্তু রাজদস্যুদিগের ন্যায় এই ক্ষুদ্র দস্যুরও সেনাপতির চক্ষু ছিল। পর্ব্বতনিরুদ্ধ সঙ্কীর্ণ পথ দেখিয়া সে মনে করিল, রাণা যদি আসিয়া থাকেন, তবে এইখানেই আছেন। যখন মোগল সৈন্য এই সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া যাইবে—এই পর্ব্বতশিখর হইতে রাজপুত অশ্ব বজ্রের ন্যায় তাহাদিগের মস্তকে পড়িতে পারিবে। দক্ষিণ দিকের পর্ব্বত দুরারোহণীয়; অশ্বারোহিগণের আরোহণ ও অবতরণের অনুপযুক্ত, অতএব সেখানে রাজপুতসেনা থাকিবে না—কিন্তু বামের পর্ব্বত হইতে তাহাদিগের অবতরণের বড় সুখ। মাণিকলাল তদুপরি আরোহণ করিল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে।

উঠিয়া কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাইল না। মনে করিল খুঁজিয়া দেখি, কিন্তু আবার ভাবিল, রাজা ভিন্ন আর কোন রাজপুত আমাকে চিনে না; আমাকে মোগলের চর বলিয়া হঠাৎ কোন অদৃশ্য রাজপুত মারিয়া ফেলিতে পারে। এই ভাবিয়া সে আর অগ্রসর না হইয়া, সেই স্থানে দাঁড়াইয়া বলিল, "মহারাণার জয়

হউক।”

এই শব্দ উচ্চারিত হইবা মাত্র চারি পাঁচ জন শস্ত্রধারী রাজপুত অদৃশ্য স্থান হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দাঁড়াইল এবং তরবারি হস্তে মাণিকলালকে কাটিতে আসিতে উদ্যত হইল।

একজন বলিল, “মারিও না।” মাণিকলাল দেখিল, স্বয়ং রাণা।

রাণা বলিলেন, “মারিও না। এ আমাদিগের স্বজন।” যোদ্ধৃগণ তখনই আবার লুক্কায়িত হইল।

রাণা মাণিককে নিকটে আসিতে বলিলেন, সে নিকটে আসিল। এক নিভৃত স্থলে তাহাকে বসতি বলিয়া স্বয়ং সেইখানে বসিলেন। রাজা তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি এখানে কেন আসিয়াছ?”

মাণিকলাল বলিল, “প্রভু যেখানে, ভৃত্য সেইখানে যাইবে। বিশেষ যখন আপনি এরূপ বিপজ্জনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন যদি ভৃত্য কোনও কার্য্যে লাগে, এই ভরসায় আসিয়াছে। মোগলেরা দুই সহস্র –মহারাজের সঙ্গে এক শত। আমি কি প্রকারে নিশ্চিন্ত থাকিব? আপনি আমাকে জীবন দান করিয়াছেন–একদিনেই কি তাহা ভুলিব?”

রাণা জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমি যে এখানে আসিয়াছি, তুমি কি প্রকারে জানিলে?”

মাণিকলাল তখন আদ্যোপান্ত সকল বলিল। শুনিয়া রাণা সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন, “আসিয়াছ, ভালই করিয়াছ–আমি তোমার মত সুচতুর লোক একজন খুঁজিতেছিলাম। আমি যাহা বলি–পারিবে?”

মাণিকলাল বলিল, “মনুষ্যের যাহা সাধ্য, তাহা করিব।”

রাণা বলিলেন, “আমরা এক শত যোদ্ধা মাত্র; মোগলের সঙ্গে দুই হাজার–আমরা রণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু জয়ী হইতে পারিব না। যুদ্ধ করিয়া রাজকন্যার উদ্ধার করিতে পারিব না। রাজকন্যাকে আগে বাঁচাইয়া, পরে যুদ্ধ করিতে হইবে। রাজকন্যা যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিলে তিনি আহত হইতে পারেন। তাঁহার রক্ষা প্রথমে চাই।”

মাণিকলাল বলিল, “আমি ক্ষুদ্র জীব, আমি সে সকল কি প্রকারে বুঝিব, আমাকে কি করিতে হইবে, তাহাই আজ্ঞা করুন।”

রাণা বলিলেন, “তোমাকে মোগল অশ্বারোহীর বেশ ধরিয়া কল্য মোগলসেনার সঙ্গে আসিতে হইবে। রাজকুমারীর শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে থাকিতে হইবে। এবং যাহা যাহা বলিতেছি, তাহা করিতে হইবে।” রাণা তাহাকে সবিস্তার উপদেশ দিলেন। মাণিকলাল শুনিয়া বলিল, “মহারাজের জয় হউক! আমি কার্য্য সিদ্ধ করিব। আমাকে অনুগ্রহ করিয়া একটি ঘোড়া বখ্‌শিশ করুন।”

রাণা। আমরা এক শত যোদ্ধা, এক শত ঘোড়া। আর ঘোড়া নাই যে, তোমায় দিই। অন্য কাহারও ঘোড়া দিতে পারিব না, আমার ঘোড়া লইতে পার।

মাণিক। তাহা প্রাণ থাকিতে লইব না। আমাকে প্রয়োজনীয় হাতিয়ার দিন।

রাণা। কোথা পাইব? যাহা আছে, তাহাতে আমাদের কুলায় না। কাহাকে নিরস্ত্র করিয়া তোমাকে হাতিয়ার দিব? আমার হাতিয়ার লইতে পার।

মাণিক। তাহা হইতে পারে না। আমাকে পোষাক দিতে আজ্ঞা হউক।

রাণা। এখানে যাহা পরিয়া আসিয়াছি, তাহা ভিন্ন আর পোষাক নাই। আমি কিছুই দিব না।

মাণিক। মহারাজ! তবে অনুমতি দিউন, আমি যে প্রকারে হউক, এ সকল সংগ্রহ করিয়া লই।

রাণা হাসিলেন। বলিলেন, "চুরি করিবে?"

মাণিকলাল জিহ্বা কাটিল। বলিল, "আমি শপথ করিয়াছি যে, আর সে কার্য্য করিব না।"

রাণা। তবে কি করিবে?

মাণিক। ঠকাইয়া লইব।

রাণা হাসিলেন। বলিলেন, "যুদ্ধকালে সকলেই চোর–সকলেই বঞ্চক। আমিও বাদশাহের বেগম চুরি করিতে আসিয়াছি–চোরের মত লুকাইয়া আছি। তুমি যে প্রকারে পার, এ সকল সংগ্রহ করিও।"

মাণিকলাল প্রফুল্লচিত্তে প্রণাম করিয়া বিদায় লইল।

দশম পরিচ্ছেদ : রসিকা পানওয়ালী

মাণিকলাল তখনই রূপগনগরে ফিরিয়া আসিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। রূপনগরের বাজারে গিয়া মাণিকলাল দেখিল যে, বাজার অত্যন্ত শোভাময়! দোকানের শত শত প্রদীপের শোভায় বাজার আলোকময় হইয়াছে–নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য উজ্জ্বলবর্ণে রসনা আকুল করিতেছে–পুষ্প, পুষ্পমালা থরে থরে নয়ন রঞ্জিত, এবং ঘ্রাণে মন মুগ্ধ করিতেছে। মাণিকের উদ্দেশ্য–অশ্ব ও অস্ত্র সংগ্রহ করা, কিন্তু তাই বলিয়া আপন উদরকে বঞ্চনা করা মাণিকলালের অভিপ্রায় ছিল না। মাণিক গিয়া কিছু মিঠাই কিনিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। সের পাঁচ ছয় ভোজন করিয়া মাণিক দেড় সের জল খাইল এবং দোকানদারকে উচিত মূল্য দান করিয়া, তাম্বুলান্বেষণে গেল।

দেখিল, একটা পানের দোকানে বড় জাঁক। দেখিল, দোকানে বহুসংখ্যক দীপ বিচিত্র ফানুষমধ্য হইতে স্নিগ্ধ জ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছে। দেওয়ালে নানা বর্ণের কাগজ মোড়া–নানা প্রকার বাহারের ছবি লট্‌কান–তবে চিত্রগুলি একটু বেশী মাত্রায় রঙ্গদার, আধুনিক ভাষায় Obscene প্রাচীন ভাষায় "আদিরসাশ্রিত"। মধ্যস্থানে কোমল গালিচায় বসিয়া– দোকানের অধিকারিণী তাম্বুলবিক্রেয়ী–বয়সে ত্রিশের উপর, কিন্তু কুরূপা নহে। বর্ণ গৌর, চক্ষু বড় বড়, চাহনি বড় চঞ্চল, হাসি বড় রঙ্গদার–সে হাসি অনিন্দ্য দন্তশ্রেণীমধ্যে সর্ব্বদাই খেলিতেছে–হাসির সঙ্গে সর্ব্বালঙ্কার দুলিতেছে–অলঙ্কার কতক রূপা, কতক সোণা–কিন্তু সুগঠন ও সুশোভন। মাণিকলাল, দেখিয়া শুনিয়া, পান চাহিল।

পানওয়ালী স্বয়ং পান বেচে না–সম্মুখে একজন দাসী পান সাজিতেছে এবং বেচিতেছে–পানওয়ালী কেবল পয়সা কুড়াইতেছে–এবং মিষ্ট হাসিতেছে।

দাসী একজন পান সাজিয়া দিল। মাণিকলাল ডবল দাম দিল। আবার পান চাহিল। যতক্ষণ পান সাজা হইতেছিল, ততক্ষণ মাণিক পানওয়ালীর সঙ্গে হাসিয়া হাসিয়া দুই একটা মিষ্ট কথা কহিতে লাগিল; পানওয়ালীর রূপের প্রশংসা করিলে পাছে সে কিছু মন্দ ভাবে, এজন্য প্রথমে তাহার দোকানসজ্জা ও অলঙ্কারগুলির প্রশংসা করিতে লাগিল। পানওয়ালীও একটু ভিজিল। পানওয়ালী মিঠে পানের সঙ্গে মিঠে কথা বেচিতে আরম্ভ করিল। মাণিকলাল তখন দোকানে উঠিয়া বসিয়া, পান চিবাইতে চিবাইতে পানওয়ালীর হুকা কাড়িয়া লইয়া, টানিতে আরম্ভ করিল। এ দিকে মাণিকলাল পান খাইয়া দোকানের মসলা ফুরাইয়া দিল। দাসী মসলা আনিতে অন্য দোকানে গেল। সেই অবসরে মাণিকলাল পানওয়ালীকে বলিল, "মহারাজিয়া! তুমি বড় চতুরা। আমি একটি চতুরা স্ত্রীলোক খুঁজিতেছিলাম; আমার একটি দুশমন আছে–তাহাকে একটু জব্দ করিব ইচ্ছা। কি করিতে হইবে, তাহা তোমাকে বুঝাইয়া বলিতেছি। তুমি যদি আমার

সহায়তা কর, তবে এক আশরফি পুরস্কার করিব।”

পান। কি করিতে হইবে?

মাণিক চুপিচুপি কি বলিল। পানওয়ালী বড় রঙ্গপ্রিয়া–তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল। বলিল, “আশরফির প্রয়োজন নাই–রঙ্গই আমার পুরস্কার।”

মাণিকলাল তখন দোয়াত, কলম, কাগজ চাহিল। দাসী তাহা নিকটস্থ বেনিয়ার দোকান হইতে আনিয়া দিল। মাণিক পানওয়ালীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এই পত্র লিখিল, “হে প্রাণনাথ! তুমি যখন নগরভ্রমণে আসিয়াছিলে, আমি তোমাকে দেখিয়া অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তোমার একবার দেখা না পাইলে আমার প্রাণ যাইবে। শুনিতেছি, তোমরা কাল চলিয়া যাইবে–অতএব আজ একবার অবশ্য অবশ্য আমায় দেখা দিবে। নহিলে আমি গলায় ছুরি দিব। যে পত্র লইয়া যাইতেছে–তাহার সঙ্গে আসিও–সে পথ দেখাইয়া লইয়া আসিবে।”

পথ লেখা হইলে মাণিকলাল শিরোনামা দিল, “মুহম্মদ খাঁ।”

পানওয়ালী জিজ্ঞাসা করিল, “কে ও ব্যক্তি?”

মা। একজন মোগল সওয়ার।

বাস্তবিক, মাণিকলাল মোগলদিগের মধ্যে একজনকেও চিনিত না। কাহারও নাম জানে না। সে মনে ভাবিল, দুই হাজার মোগলের মধ্যে অবশ্য একজন মহম্মদ আছেই আছে–আর সকল মোগলই “খাঁ।” অতএব সাহস করিয়া “মহম্মদ খাঁ” লিখিল; লেখা হইলে মাণিকলাল বলিল, “তাহাকে এইখানে আনিব?”

পানওয়ালী বলিল, “এ ঘরে হইবে না। আর একটা ঘর ভাড়া লইতে হইবে।”

তখনই দুই জনে বাজারে গিয়া আর একটা ঘর লইল। পানওয়ালী মোগলের অভ্যর্থনাজন্য তাহা সজ্জিতকরণে প্রস্তুত হইল–মাণিকলাল পত্র লইয়া মুসলমানশিবিরে উপস্থিত হইল। শিবিরমধ্যে মহাগোলযোগ–কোন শৃঙ্খলা নাই–নিয়ম নাই। তাহার ভিতরে বাজার বসিয়া গিয়াছে। রঙ্গ তামাসা রোশনাইয়ের ধুম লাগিয়াছে। মাণিকলাল মোগল দেখিলেই জিজ্ঞাসা করে, “মহম্মদ খাঁ কে মহাশয়? তাঁহার নামে পত্র আছে।” কেহ উত্তর দেয় না–কেহ গালি দেয়;–কেহ বলে চিনি না–” কেহ বলে খুঁজিয়া লও। শেষ একজন মোগল বলিল “মহম্মদ খাঁকে চিনি না। কিন্তু আমার নাম নুর মহম্মদ খাঁ। পত্র দেখি, দেখিলে বুঝিতে পারিব, পত্র আমার কি না।”

মাণিকলাল সানন্দচিত্তে তাহার হস্তে পত্র দিল–মনে জানে, মোগল যেই হউক, ফাঁদে পড়িবে। মোগলও ভাবিল–পত্র যারই হউক, আমি কেন এই সুবিধাতে বিবিটাকে দেখিয়া আসি না। প্রকাশ্যে বলিল, “হাঁ, পত্র আমারই বটে। চল, আমি তোমার সঙ্গে যাইতেছি।” এই বলিয়া মোগল তাম্বুমধ্যে প্রবেশ করিয়া চুল আঁচড়াইয়া গন্ধদ্রব্য মাখিয়া পোষাক পরিয়া বাহির হইল। বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “ওরে ভৃত্য, সে স্থান কত দূর?”

মাণিকলাল যোড়হাত করিয়া বলিল, “হুজুর, অনেক দূর! ঘোড়ায় গেলে ভাল হইত।”

“বহুত আচ্ছা” বলিয়া খাঁ সাহেব ঘোড়া বাহির করিয়া চড়িতে যান, এমন সময় মাণিকলাল আবার যোড়হাত করিয়া বলিল, “হুজুর! বড় ঘরের কথা–হাতিয়ারবন্দ হইয়া গেলেই ভাল হয়।”

নূতন নাগর ভাবিলেন, সে ভাল কথা–জঙ্গী জোয়ান আমি; হাতিয়ার ছাড়া কেন যাইব? তখন অঙ্গে হাতিয়ার বাঁধিয়া তিনি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন।

নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইয়া মাণিকলাল বলিল, “এই স্থানে উতারিতে হইবে। আমি আপনার ঘোড়া ধরিতেছি, আপনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করুন।”

খাঁ সাহেব নামিলেন–মাণিকলাল ঘোড়া ধরিয়া রহিল। খাঁ বাহাদুর সশস্ত্রে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছিলেন, পরে মনে পড়িল যে, হাতিয়ারবন্দ হইয়া

রমণীসম্ভাষণে যাওয়া বড় ভাল দেখায় না। ফিরিয়া আসিয়া মাণিকলালের কাছে অস্ত্রগুলিও রাখিয়া গেলেন। মাণিকলালের আরও সুবিধা হইল।

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া খাঁ সাহেব দেখিলেন যে, তক্তাপোশের উপর উত্তম শয্যা; তাহার উপর সুন্দরী বসিয়া আছে–আতর গোলাবের সৌগন্ধে ঘর আমোদিত হইয়াছে, চারি দিকে ফুল বিকীর্ণ হইয়াছে, এবং সম্মুখে আলবোলায় সুগন্ধি তামাকু প্রস্তুত আছে। খাঁ সাহেব, জুতা খুলিয়া, তক্তাপোশে বসিলেন, বিবিকে মিষ্টবচনে সম্ভাষণ করিলেন–পরে পোষাকটি খুলিয়া রাখিয়া, ফুলের পাখা হাতে লইয়া বাতাস খাইতে আরম্ভ করিলেন এবং আলবোলার নল মুখে পুরিয়া সুখের আবেশে টান দিতে লাগিলেন। বিবিও তাঁহাকে দুই চারিটা গাঢ় প্রণয়ের কথা বলিয়া একেবারে মোহিত করিল।

তামাকু ধরিতে না ধরিতে মাণিকলাল আসিয়া দ্বারে ঘা মারিল। বিবি বলিল, “কে ও?”

মাণিক বিকৃতস্বরে বলিল, “আমি।”

তখন চতুরা রমণী অতি ভীতকণ্ঠে খাঁ সাহেবকে বলিল, “সর্ব্বনাশ হইয়াছে–আমার স্বামী আসিয়াছেন–মনে করিয়াছিলাম, তিনি আজ আর আসিবেন না। তুমি এই তক্তাপোশের নীচে একবার লুকাও। আমি উঁহাকে বিদায় করিয়া দিতেছি।”

মোগল বলিল, “সে কি? মরদ হইয়া ভয়ে লুকাইব; যে হয় আসুক না; এখনই কোতল করিব।”

পানওয়ালী জিব কাটিয়া বলিল, “সে কি? সর্ব্বনাশ! আমার স্বামীকে মারিয়া ফেলিয়া আমার অন্নবস্ত্রের পথ বন্ধ করিবে? এই কি তোমাকে ভালবাসার ফল? শীঘ্র তক্তাপোশের নীচে যাও। আমি এখনই উঁহাকে বিদায় করিয়া দিতেছি।”

এদিকে মাণিকলাল পুনঃ পুনঃ দ্বারে করাঘাত করিতেছিল, অগত্যা খাঁ সাহেব তক্তাপোশের নীচে গেলেন। মোটা শরীর বড় সহজে প্রবেশ করে না, ছাল চামড়া দুই এক জায়গায় ছিঁড়িয়া গেল–কি করে–প্রেমের জন্য অনেক সহিতে হয়। সে স্থূল মাংসপিণ্ড তক্তাপোশতলে বিন্যস্ত হইলে পর পানওয়ালী আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলে পানওয়ালী পূর্ব্বশিক্ষামত বলিল, “তুমি আবার এলে যে? আজ আর আসিবে না বলিয়াছিলে যে?”

মাণিকলাল পূর্ব্বমত বিকৃতস্বরে বলিল, “চাবিটা ফেলিয়া গিয়াছি।”

পানওয়ালী চাবি খোঁজার ছল করিয়া, খাঁ সাহেবের পরিত্যক্ত পোষাকটি হস্তে লইল। পোষাক লইয়া দুই জনে বাহিরে চলিয়া আসিয়া, শিকল টানিয়া বাহির হইতে চাবি দিল। খাঁ সাহেব তখন তক্তাপোশের নীচে মূষিকদিগের দংশনযন্ত্রণা সহ্য করিতেছিলেন।

তাঁহাকে গৃহপিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া, মাণিকলাল তাঁহার পোষাক পরিল। পরে তাঁহার হাতিয়ারে হাতিয়ারবন্দ হইয়া তাঁহার অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মুসলমানশিবিরে তাঁহার স্থান লইতে চলিল।

চতুর্থ খণ্ড

রন্ধ্রে যুদ্ধ

প্রথম পরিচ্ছেদ : চঞ্চলের বিদায়

প্রভাতে মোগল সৈন্য সাজিল। রূপনগরের গড়ের সিংহদ্বার হইতে, উষ্ণীয়কবচশোভিত, গুম্ফশ্মশ্রুসমন্বিত, অস্ত্রসজ্জাভীষণ অশ্বারোহিদল সারি দিল। পাঁচ পাঁচ জন অশ্বারোহীর এক এক সারি, সারির পিছু সারি, তার পর আবার সারি, সারি সারি সারি অশ্বারোহীর সারি চলিতেছে; ভ্রমরশ্রেণীসমাকুল ফুল্লকমলতুল্য তাহাদের বদনমণ্ডল সকল শোভিতেছিল। তাহাদের অশ্বশ্রেণী গ্রীবাভঙ্গে সুন্দর, বল্গারোধে অধীর, মন্দগমনে ক্রীড়াশীল; অশ্বশ্রেণী শরীরভরে হেলিতেছে, দুলিতেছে এবং নাচিয়া নাচিয়া চলিবার উপক্রম করিতেছে।

চঞ্চলকুমারী প্রভাতে উঠিয়া স্নান করিয়া রত্নালঙ্কারে ভূষিতা হইলেন। নির্ম্মল অলঙ্কার পরাইল; চঞ্চল বলিল, “ফুলের মালা পরাও সখি–আমি চিতারোহণে যাইতেছি।” প্রবলবেগে প্রবহমান অশ্রুজল চক্ষুঃমধ্যে ফেরৎ পাঠাইয়া নির্ম্মল বলিল, “রত্নালঙ্কার পরাই সখি, তুমি উদয়পুরেশ্বরী হইতে যাইতেছ।” চঞ্চল বলল, “পরাও! পরাও! নির্ম্মল! কুৎসিত হইয়া কেন মরিব? রাজার মেয়ে আমি; রাজার মেয়ের মত সুন্দর হইয়া মরিব। সৌন্দর্য্যের মত কোন্ রাজ্য? রাজত্ব কি বিনা সৌন্দর্য্যে শোভা পায়? পরা।” নির্ম্মল অলঙ্কার পরাইল; সে কুসুমিত-তরুবিনিন্দিত কান্তি দেখিয়া কাঁদিল। কিছু বলিল না। চঞ্চল তখন নির্ম্মলের গলা ধরিয়া কাঁদিল।

চঞ্চল তার পর বলিল, “নির্ম্মল! আর তোমায় দেখিব না! কেন বিধাতা এমন বিড়ম্বনা করিলেন! দেখ, ক্ষুদ্র কাটার গাছ যেখানে জন্মে, সেইখানে থাকে; আমি কেন রূপনগরে থাকিতে পাইলাম না!”

নির্ম্মল বলিল, “আমায় আবার দেখিবে। তুমি যেখানে থাক, আমার সঙ্গে আবার দেখা হইবে। আমায় না দেখিলে তোমার মরা হইবে না; তোমায় না দেখিলে আমার মরা হইবে না।”

চঞ্চল। আমি দিল্লীর পথে মরিব।

নির্ম্মল। দিল্লীর পথে তবে আমায় দেখিবে।

চঞ্চল। সে কি নির্ম্মল? কি প্রকারে তুমি যাইবে?

নির্ম্মল কিছু বলিল না, চঞ্চলের গলা ধরিয়া কাঁদিল।

চঞ্চলকুমারী বেশভূষা সমাপন করিয়া মহাদেবের মন্দিরে গেলেন। নিত্যব্রত শিবপূজা ভক্তিভাবে করিলেন। পূজান্তে বলিলেন, “দেবদেব মহাদেব! মরিতে চলিলাম। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, বালিকার মরণে তোমার এত তুষ্টি কেন? প্রভু! আমি বাঁচিলে কি তোমার সৃষ্টি চলিত না? যদি এতই ছিল, কেন আমাকে রাজার মেয়ে করিয়া সংসারে পাঠাইয়াছিলে?”

মহাদেবের বন্দনা করিয়া চঞ্চলকুমারী মাতৃচরণ বন্দনা করিতে গেলেন। মাতাকে প্রণাম করিয়া চঞ্চল কতই কাঁদিল। পিতার চরণে গিয়া প্রণাম করিল। পিতাকে প্রণাম করিয়া চঞ্চল কতই কাঁদিল! তার পর একে একে সখীজনের কাছে, চঞ্চল বিদায় গ্রহণ করিল। সকলে কাঁদিয়া গণ্ডগোল করিল। চঞ্চল কাহাকে অলঙ্কার, কাহাকে খেলনা, কাহাকে অর্থ দিয়া পুরস্কৃত করিলেন। কাহাকে বলিলেন, “কাঁদিও না–আমি আবার আসিব।” কাহাকে বলিলেন, “কাঁদিও না–দেখিতেছ না, আমি পৃথিবীশ্বরী হইতে যাইতেছি।” কাহাকেও বলিলেন, “কাঁদিও না–কাঁদিলে যদি দুঃখ যাইত, তবে আমি কাঁদিয়া রূপনগরের পাহাড় ভাসাইতাম।”

সকলের কাছে বিদায় গ্রহণ করিয়া, চঞ্চলকুমারী দোলারোহণে চলিলেন। এক সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য দোলার অগ্রে স্থাপিত হইয়াছে; এক সহস্র পশ্চাতে। রজতমণ্ডিত রত্নখচিত সে শিবিকা, বিচিত্র সুবর্ণ-খচিত বস্ত্রে আবৃত হইয়াছে; আসাসোঁটা লইয়া চোপদার বাগ্‌জালে গ্রাম্য দর্শককবর্গকে আনন্দিত করিতেছে।

চঞ্চলকুমারী শিবিকায় আরোহণ করিলে দুর্গমধ্য হইতে শঙ্খ নিনাদিত হইল; কুসুম ও লাজাবলীতে শিবিকা পরিপূর্ণ হইল; সেনাপতি চলিবার আজ্ঞা দিলেন; তখন অকস্মাৎ মুক্তপথ তড়াগের জলের ন্যায় সেই অশ্বারোহিশ্রেণী প্রবাহিত হইল। বল্গা দংশিত করিয়া, নাচিতে নাচিতে অশ্বশ্রেণী চলিল–অশ্বারোহীদিগের অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা বাজিল।

অশ্বারোহিগণ প্রভাতবায়ুপ্রফুল্ল হইয়া কেহ কেহ গান করিতেছিল। শিবিকার পশ্চাতেই যে অশ্বারোহিগণ ছিল, তাহার মধ্যে অগ্রবর্ত্তী একজন গায়িতেছিল–

“শরম্ ভরম্‌সে পিয়ারী,
সোমরত বংশীধারী,
ঝুরত লোচনসে বারি।
ন সম্‌ঝে গোপকুমারী,
যেহিন্ বৈঠত মুরারি,
বিহারত রাহ তুমারি ॥”

রাজকুমারীর কর্ণে সে গীত প্রবেশ করিল। তিনি ভাবিলেন, “হায়! যদি সওয়ারের গীত সত্য হইত!” রাজকুমারী তখন রাজসিংহকে ভাবিতেছিলেন। তিনি জানিতেন না যে, আঙ্গুল-কাটা মাণিকলাল তাঁহার পশ্চাতে এই গীত গায়িতেছিল। মাণিকলাল, যত্ন করিয়া শিবিকার পশ্চাতে স্থান গ্রহণ করিয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : নির্ম্মলকুমারীর অগাধ জলে ঝাঁপ

এদিকে নির্ম্মলকুমারীর বড় গোলমাল বাধিল। চঞ্চল ত রত্নখচিত শিবিকারোহণে চলিয়া গেল–আগে পিছে দুই সহস্র কুমারপ্রতিম অশ্বারোহী আল্লার মহিমার শব্দে রূপনগরের পাহাড় ধ্বনিত করিয়া চলিল। কিন্তু নির্ম্মলের কান্না ত থামে না। একা–একা–একা–শত পৌরজনের মধ্যে চঞ্চল অভাবে নির্ম্মল বড়ই একা। নির্ম্মল উচ্চ গৃহচূড়ার উপর উঠিয়া দেখিতে লাগিল–দেখিতে লাগিল, পাদক্রোশ-পরিমিত অজগর সর্পের ন্যায় সেই অশ্বারোহী সৈনিকশ্রেণী পার্ব্বত্য পথে বিসর্পিত হইয়া উঠিতেছে, নামিতেছে–প্রভাতসূর্য্যকিরণে তাহাদিগের উর্দ্ধোত্থিত উজ্জ্বল বর্শাফলক সকল জ্বলিতেছে। কতক্ষণ নির্ম্মল চাহিয়া রহিল। চক্ষু জ্বালা করিতে লাগিল। তখন নির্ম্মল চক্ষু মুছিয়া, ছাদের উপর হইতে নামিল। নির্ম্মল একটা কিছু ভাবিয়া ছাদের উপর হইতে নামিয়াছিল। নামিয়া প্রথমে অলঙ্কার সকল খুলিয়া কোথায় লুকাইয়া রাখিল, কেহ দেখিতে পাইল না। সঞ্চিত অর্থমধ্যে কতিপয় মুদ্রা নির্ম্মল গোপনে সংগ্রহ করিল। কেবল তাহাই লইয়া নির্ম্মল একাকিনী রাজপুরী হইতে নিষ্ক্রান্তা হইল। পরে দৃঢ়পদে অশ্বারোহী সেনা যে পথে গিয়াছে, সেই পথে একাকিনী তাহাদের অনুবর্ত্তিনী হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : রণপণ্ডিত মবারক

বৃহৎ অজগর সর্পের ন্যায় ফিরিতে ফিরিতে, ঘুরিতে ঘুরিতে সেই অশ্বারোহী সেনা পার্ব্বত্য পথে চলিল। যে রন্ধ্রপথের পার্শ্বস্থ পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিয়া মাণিকলাল রাজসিংহের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিয়াছিল, বিবরে প্রবিশ্যমান মহোরগের ন্যায় সেই অশ্বারোহিশ্রেণী সেই রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিল। অশ্বসকলের অসংখ্য পদবিক্ষেপধ্বনি পর্ব্বতের গায়ে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। এমন কি, সেই স্থির শব্দহীন বিজন প্রদেশে অশ্বারোহীদিগের অস্ত্রের মৃদু শব্দ একত্র সমুত্থিত হইয়া রোমহর্ষণ প্রতিধ্বনির উৎপত্তির কারণ হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে অশ্বগণের হ্রেষারব–আর সৈনিকের ডাক-হাঁক। পর্ব্বততলে যে সকল লতা-গুল্ম

ছিল–শব্দাঘাতে তাহার পাতা সকল কাঁপিতে লাগিল। ক্ষুদ্র বন্য পশু পক্ষী কীট যাহারা সে বিজন প্রদেশে নির্ভয়ে বাস করিত, তাহারা সকলে দ্রুত পলায়ন করিল। এইরূপে সমুদয় অশ্বারোহীর সারি সেই রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিল। তখন হঠাৎ গুম্ করিয়া একটা বিকট শব্দ হইল। যেখানে শব্দ হইল, সে প্রদেশের অশ্বারোহীরা ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। দেখিল, পর্ব্বতশিখরদেশ হইতে বৃহৎ শিলাখণ্ড পর্ব্বতচ্যুত হইয়া সৈন্যমধ্যে পড়িয়াছে। চাপে একজন অশ্বারোহী মরিয়াছে, আর একজন আহত হইয়াছে।

দেখিতে দেখিতে, ব্যাপার কি, তাহা কেহ বুঝিতে না বুঝিতে আবার সৈন্যমধ্যে শিলাখণ্ড পড়িল–এক, দুই, তিন, চারি, ক্রমে দশ, পঁচিশ–তখনই একেবারে শত শত ছোট বড় শিলাবৃষ্টি হইতে লাগিল–বহুসংখ্যক অশ্ব ও অশ্বারোহী কেহ হত, কেহ আহত হইয়া, পথের উপর পড়িয়া সঙ্কীর্ণ পথ একেবারে রুদ্ধ করিয়া ফেলিল। অশ্ব সকল আরোহী লইয়া পলায়নের জন্য বেগবান্ হইল–কিন্তু অগ্রে পশ্চাতে পথ সৈনিকের ঠেলাঠেলিতে অবরুদ্ধ–অশ্বের উপর অশ্ব, আরোহীর উপর আরোহী চাপিয়া পড়িতে লাগিল–সৈনিকেরা পরস্পর অস্ত্রাঘাত করিয়া পথ করিতে লাগিল–শৃঙ্খলা একেবারে ভগ্ন হইয়া গেল, সৈন্যমধ্যে মহা কোলাহল পড়িয়া গেল।

"কাহার লোগ্ হুঁসিয়ার! বাঁ রাস্তা!" মাণিকলাল হাঁকিল। যেখানে রাজকুমারী শিবিকায়, এবং পশ্চাতে মাণিকলাল, তাহার সম্মুখেই এই গোলযোগ উপস্থিত। বাহকেরা আপনাদের প্রাণ লইয়া ব্যতিব্যস্ত–অশ্ব সকল পাছু হঁটিয়া তাহাদের উপর চাপিয়া পড়িতেছে। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, এই পার্ব্বত্য পথের বাম দিক্ দিয়া একটি অতি সঙ্কীর্ণ রন্ধ্রপথ বাহির হইয়া গিয়াছে। তাহাতে একেবারে একটিমাত্র অশ্বারোহী প্রবেশ করিতে পারে। তাহারই কাছে যখন সেনামধ্যস্থিত শিবিকা পৌঁছিয়াছিল, তখনই এই হুলস্থূল উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাই রাজসিংহের বন্দোবস্ত। সুশিক্ষিত মাণিকলাল প্রাণভয়ে ভীত বাহকদিগকে ঐ পথ দেখাইয়া দিল। মাণিকলালের কথা শুনিবামাত্র বাহকেরা আপনাদিগের ও রাজকুমারীর প্রাণরক্ষার্থ ঝটিতি শিবিকা লইয়া সে পথে প্রবেশ করিল।

সঙ্গে সঙ্গে অশ্ব লইয়া মাণিকলালও তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। নিকটস্থ সৈনিকেরা দেখিল যে, প্রাণ বাঁচাইবার এই এক পথ; তখন আর একজন অশ্বারোহী মাণিকলালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই পথে প্রবেশ করিতে গেল। সেই সময়ে উপর হইতে একটা অতি বৃহৎ শিলাখণ্ড গড়াইতে গড়াইতে, শব্দে পার্ব্বত্য প্রদেশ কাঁপাইতে কাঁপাইতে, আসিয়া সেই রন্ধ্রমুখে পড়িয়া স্থিতিলাভ করিল। তাহার চাপে দ্বিতীয় অশ্বারোহী অশ্বসমেত চূর্ণ হইয়া গেল। রন্ধ্রমুখ একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। আর কেহ সে পথে প্রবেশ করিতে পারিল না। একা মাণিকলাল শিবিকাসঙ্গে যথেপ্সিত পথে চলিল।

সেনাপতি হাসান আলি খাঁ মন্‌সবদার, তখন সৈন্যের সর্ব্বপশ্চাতে ছিলেন। প্রবেশপথমুখে স্বয়ং দাঁড়াইয়া সঙ্কীর্ণ দ্বারে সেনার প্রবেশের তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। পরে সমুদয় সেনা প্রবিষ্ট হইলে স্বয়ং ধীরে ধীরে সর্ব্বপশ্চাতে আসিতেছিলেন। দেখিলেন, সহসা সৈনিকশ্রেণী মহা গোলযোগ করিয়া পিছু হটিতেছে। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কেহ কিছু ভাল বুঝাইয়া বলিতে পারে না। তখন সৈনিকগণকে ভর্ৎসনা করিয়া ফিরাইতে লাগিলেন–এবং স্বয়ং সর্ব্বগামী হইয়া ব্যাপার কি, দেখিতে চলিলেন।

কিন্তু ততক্ষণ সেনা থাকে না। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, এই পর্ব্বতের দক্ষিণ-পার্শ্বস্থ পর্ব্বত অতি উচ্চ এবং দুরারোহণীয়–তাহার শিখরদেশ প্রায় পথের উপর ঝুলিয়া পড়িয়া পথ অন্ধকার করিয়াছে। রাজপুতেরা তাহার প্রদেশান্তরে অনুসন্ধান করিয়া পথ বাহির করিয়া, পঞ্চাশ জন তাহার উপর উঠিয়া অদৃশ্যভাবে অবস্থান করিতেছিল। এক এক জন অপরের চল্লিশ পঞ্চাশ হাত দূরে স্থান গ্রহণ করিয়া, সমস্ত রাত্রি ধরিয়া শিলাখণ্ড সংগ্রহ করিয়া, আপন আপন সম্মুখে একটি ঢিপি সাজাইয়া রাখিয়াছিল। এক্ষণে পলকে পলকে পঞ্চাশ জন পঞ্চাশ খণ্ড শিলা নিম্নস্থ অশ্বারোহীদিগের উপর বৃষ্টি করিতেছিল। এক একবার পঞ্চাশটি অশ্ব বা আরোহী আহত বা নিহত হইতেছিল। কে মারিতেছিল, তাহা তাহারা দেখিতে পায় না। দেখিতে পাইলেও দুরারোহণীয় পর্ব্বতশিখরস্থ শত্রুগণের প্রতি

কোনরূপেই আঘাত সম্ভব নহে—অতএব মোগলেরা পলায়ন ভিন্ন অন্য কোন চেষ্টাই করিতেছিল না। যে সহস্রসংখ্যক অশ্বারোহী শিবিকার অগ্রভাগে ছিল, তাহার মধ্যে হত ও আহতের অবশিষ্ট পলায়নপূর্ব্বক রন্ধ্রমুখে নির্গত হইয়া প্রাণরক্ষা করিল।

পঞ্চাশ জন রাজপুত দক্ষিণ পার্শ্বের উচ্চ পর্বত হইতে শিলাবৃষ্টি করিতেছিল—আর পঞ্চাশ জন স্বয়ং রাজসিংহের সহিত বাম দিকের অনুচ্চ পর্ব্বতশিখরে লুক্কায়িত ছিল, তাহারা এতক্ষণ কিছুই করিতেছিল না। কিন্তু এক্ষণে তাহাদের কার্য্য করিবার সময় উপস্থিত হইল। যেখানে শিলাবৃষ্টিনিবন্ধন ঘোরতর বিপত্তি, সেখানে মবারক অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি প্রথমে সৈন্যগণকে সুশৃঙ্খলের সহিত পার্ব্বত্য পথ হইতে বহিষ্কৃত করিবার যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন, ক্ষুদ্রতর রন্ধ্রপথে রাজকুমারীর শিবিকা চলিয়া গেল, একজনমাত্র অশ্বারোহী তাহার সঙ্গে গেল, অমনি অর্গলের ন্যায় বৃহৎ শিলাখণ্ড সেপথ বন্ধ করিল—তখন তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, এ ব্যাপারে আর কিছুই নহে—কোন দুরাত্মা রাজকুমারীকে অপহরণ করিবার মানসে এই উদ্যম করিয়াছে। তখন তিনি ডাকিয়া নিকটস্থ সৈনিকদিগকে বলিলেন—“প্রাণ যায়, সেও স্বীকার! শত সওয়ার দোলার পিছু পিছু যাও। ঘোড়া ছাড়িয়া পাঁওদলে, এই পাথর টপকাইয়া যাও—চল, আমি যাইতেছি।” মবারক অগ্রে ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পথরোধক শিলাখণ্ডের উপর উঠিলেন। এবং তাহার উপর হইতে লাফাইয়া নীচে পড়িলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া শত সওয়ার তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সেই রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিল।

রাজসিংহ পর্ব্বতশিখর হইতে এ সকল দেখিতে লাগিলেন। যতক্ষণ মোগলেরা ক্ষুদ্র পথে একে একে প্রবেশ করিতেছিল, ততক্ষণ কাহাকেও কিছু বলিলেন না। পরে তাহারা রন্ধ্রপথমধ্যে নিবদ্ধ হইলে, পঞ্চাশৎ অশ্বারোহী রাজপুত লইয়া বজ্রের ন্যায় ঊর্দ্ধ হইতে তাহাদের উপর পড়িয়া, তাহাদের নিহত করিতে লাগিলেন। সহসা উপর হইতে আক্রান্ত হইয়া মোগলেরা বিশৃঙ্খল হইয়া গেল। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ এই ভয়ঙ্কর রণে প্রাণত্যাগ করিল। উপর হইতে ছুটিয়া আসিয়া অশ্ব সহিত মোগল সওয়ারগণের উপর পড়িল—নীচে যাহারা ছিল, তাহারা চাপেই মরিল। পাঁচ সাত দশ জন মাত্র এড়াইল। মবারক তাহাদের লইয়া ফিরিলেন। রাজপুতেরা তাহাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল না।

মবারকের সঙ্গে মোগল সওয়ারের বেশধারী মাণিকলালও বাহির হইয়া আসিল। আসিয়াই একজন মৃত সওয়ারের অশ্বে আরোহণ করিয়া, সেই শৃঙ্খলাশূন্য মোগলসেনার মধ্যে কোথায় লুকাইল, কেহ তাহা দেখিতে পাইল না।

যে মুখে মোগলেরা সেই পার্ব্বত্য পথে প্রবেশ করিয়াছিল, মাণিকলাল সেই পথে নির্গত হইল। যাহারা তাহাকে দেখিল, তাহারা ভাবিল, সে পলাইতেছে। মাণিকলাল গলি হইতে বাহির হইয়া, তীরবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া রূপনগরের গড়ের দিকে চলিল।

মবারক প্রস্তরখণ্ড পুনরুল্লঙ্ঘন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া, আজ্ঞা দিলেন, “এই পাহাড়ে চড়িতে কষ্ট নাই; সকলেই ঘোড়া লইয়া এই পাহাড়ের উপর উঠ। দস্যু অল্পসংখ্যক। তাহাদের সমূলে নিপাত করিব।” তখন পাঁচ শত মোগলসেনা, “দীন্! দীন্!” শব্দ করিয়া অশ্ব সহিত বাম দিকের সেই পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিতে লাগিল। মবারক অধিনায়ক। মোগলদিগের সঙ্গে দুইটা তোপ ছিল। একটা ঠেলিয়া তুলিয়া পাহাড়ে উঠাইতে লাগিল। আর একটা ছোট তোপ—সেটাকে মোগলেরা টানিয়া, শিকলে বাঁধিয়া, হাতী লাগাইয়া, যে বৃহৎ শিলাখণ্ডের দ্বারা পার্ব্বত্য রন্ধ্র বন্ধ হইয়াছিল, তাহার উপর উঠাইয়া স্থাপিত করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : জয়শীলা চঞ্চলকুমারী

তখন “দীন্! দীন্!” শব্দে পঞ্চশত অশ্বারোহী কালান্তক যমের ন্যায় পর্ব্বতে আরোহণ করিল। পর্ব্বত অনুচ্চ, ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে—শিখরদেশে উঠিতে

তাহাদের বড় কালবিলম্ব হইল না। কিন্তু পর্ব্বতশিখরে উঠিয়া দেখিল যে, কেহ ত পর্ব্বতোপরি নাই। যে রন্ধ্রপথমধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি নিজে পরাভূত হইয়া ফিরিয়া আসিতেছিলেন, এখন মবারক বুঝিলেন যে, সমুদয় দস্যু–মবারকের বিবেচনায় তাহারা রাজপুত দস্যু ভিন্ন আর কিছুই নহে–সেই রন্ধ্রপথে আছে। তাহার দ্বিতীয় মুখ রোধ করিয়া, তাহাদিগের বিনাশ-সাধন করিবেন, মবারক এইরূপ মনে মনে স্থির করিলেন। হাসান আলি অপর মুখে কামান পাতিয়া বসিয়া আছেন, এই ভাবিয়া, তিনি সেই রন্ধ্রের ধারে ধারে সৈন্য লইয়া চলিলেন। ক্রমে পথ প্রশস্ত হইয়া আসিল; তখন মবারক পাহাড়ের ধারে আসিয়া দেখিলেন–চল্লিশ জনের অনধিক রাজপুত, শিবিকাসঙ্গে রুধিরাক্ত কলেবরে সেই পথে চলিতেছে। মবারক বুঝিলেন যে, অবশ্য ইহারা নির্গমপথ জানে; ইহাদের উপর দৃষ্টি রাখিয়া ধীরে ধীরে চলিলে, রন্ধ্রদ্বারে উপস্থিত হইব। তাহা হইলে যেরূপ পথে রাজপুতেরা পর্ব্বত হইতে নামিয়াছিল, সেইরূপ অন্য পথ দেখিতে পাইব। রাজপুতেরা যে আগে উপরে ছিল, পরে নামিয়াছে, তাহার সহস্র চিহ্ন দেখা যাইতেছিল। মবারক রাজপুতদিগের উপর দৃষ্টি রাখিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। কিছু পরে দেখিলেন, পাহাড় ঢালু হইয়া আসিতেছে, সম্মুখে নির্গমের পথ। মবারক অশ্ব সকল তীরবেগে চালাইয়া পর্ব্বততলে নামিয়া রন্ধ্রমুখ বন্ধ করিলেন। রাজপুতেরা রন্ধ্রের বাঁক ফিরিয়া যাইতেছিল–সুতরাং তাহারা আগে রন্ধ্রমুখে পৌঁছিতে পারিল না। মোগলেরা পথরোধ করিয়া রন্ধ্রমুখে কামান বসাইল; এবং আগতপ্রায় রাজপুতগণকে উপহাস করিবার জন্য তাহার বজ্রনাদ একবার শুনাইল–"দীন্! দীন্!" শব্দের সঙ্গে পর্ব্বতে সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইল। শুনিয়া উত্তরস্বরূপ রন্ধ্রের অপর মুখে হাসান আলিও কামানের আওয়াজ করিলেন; আবার পর্ব্বতে পর্ব্বতে প্রতিধ্বনি বিকট ডাক ডাকিল। রাজপুতগণ শিহরিল তাহাদের কামান ছিল না।

রাজসিংহ দেখিলেন, আর কোন মতেই রক্ষা নাই। তাঁহার সৈন্যের বিশগুণ সেনা, পথের দুই মুখ বন্ধ করিয়াছে–পথান্তর নাই–কেবল যমমন্দিরের পথ খোলা। রাজসিংহ স্থির করিলেন, সেই পথে যাইবেন। তখন সৈনিকগণকে একত্রিত করিয়া বলিতে লাগিলেন–"ভাই বন্ধু, যে কেহ সঙ্গে থাক, আজি সরলান্তঃকরণে আমি তোমাদের কাছে ক্ষমা চাহিতেছি। আমারই দোষে এ বিপদ্ ঘটিয়াছে–পর্ব্বত হইতে নামিয়াই এ দোষ করিয়াছি। এখন এই গলির দুই মুখ বন্ধ–দুই মুখেই কামান শুনিতেছি! দুই মুখে আমাদের বিশগুণ মোগল দাঁড়াইয়া আছে–সন্দেহ নাই। অতএব আমাদিগের বাঁচিবার ভরসা নাই। নাই–তাহাতেই বা ক্ষতি কি? রাজপুত হইয়া কে মরিতে কাতর? সকলেই মরিব–একজনও বাঁচিব না–কিন্তু মারিয়া মরিব। যে মরিবার আগে দুইজন মোগল না মারিয়া মরিবে–সে রাজপুত নহে। রাজপুতেরা শুন–এ পথে ঘোড়া ছুটে না–সবাই ঘোড়া ছাড়িয়া দাও। এসো, আমরা তরবারি হাতে লাফাইয়া গিয়া তোপের উপর পড়ি। তোপ ত আমাদেরই হইবে–তার পর দেখা যাইবে, কত মোগল মারিয়া মরিতে পারি।"

তখন রাজপুতগণ, অশ্ব হইতে লাফাইয়া পড়িয়া, একত্র অসি নিষ্কোষিত করিয়া "মহারাণাকি জয়" বলিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মুখকান্তি দেখিয়া রাজসিংহ বুঝিলেন যে, প্রাণরক্ষা না হউক–একটি রাজপুতও হটিবে না। সন্তুষ্টচিত্তে রাণা আজ্ঞা দিলেন, "দুই দুই করিয়া সারি দাও।" অশ্বপৃষ্ঠে সবে একে একে যাইতেছিল–পদব্রজে দুইয়ে দুইয়ে রাজপুত চলিল–রাণা সর্ব্বাগ্রে চলিলেন। আজ আসন্নমৃত্যু দেখিয়া তিনি প্রফুল্লচিত্ত।

এমন সময়ে সহসা পর্ব্বতরন্ধ্র কম্পিত করিয়া পর্ব্বতে প্রতিধ্বনি তুলিয়া, রাজপুতসেনা শব্দ করিল, "মাতাজীকি জয়! কালীমায়ীকি জয়!"

অত্যন্ত হর্ষসূচক ঘোর রব শুনিয়া রাজসিংহ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, ব্যাপার কি? দেখিলেন, দুই পার্শ্বে রাজপুতসেনা সারি দিয়াছে–মধ্যে বিশাললোচনা সহাস্যবদনা কোন দেবী আসিতেছেন। হয় কোন দেবী মনুষ্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন–নয় কোন মানবীকে বিধাতা দেবীর মূর্ত্তিতে গঠিয়াছেন–রাজপুতেরা মনে করিল চিতোরাধিষ্ঠাত্রী, রাজপুতকুলরক্ষিণী ভগবতী এ সঙ্কটে রাজপুতকে রক্ষা করিতে স্বয়ং রণে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাই তাহারা জয়ধ্বনি করিতেছিল।

রাজসিংহ দেখিলেন–এ ত মানবী, কিন্তু সামান্য মানবী নহে। ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ দোলা কোথায়?"

একজন পিছু হইতে বলিল, "দোলা এই দিকে আছে।"

রাণা বলিলেন, "দেখ, দোলা খালি কি না?"

সৈনিক বলিল, "দোলা খালি। কুমারীজী মহারাজের সামনে।"

চঞ্চলকুমারী তখন রাজসিংহকে প্রণাম করিলেন। রাণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজকুমারি আপনি এখানে কেন?"

চঞ্চল বলিলেন, "মহারাজ! আপনাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছি। প্রণাম করিয়াছি–এখন একটি ভিক্ষা চাহি। আমি মুখরা–স্ত্রীলোকের শোভা যে লজ্জা, তাহা আমাতে নাই, ক্ষমা করিবেন। ভিক্ষা যাহা চাহি–তাহাতে নিরাশ করিবেন না।"

চঞ্চলকুমারী হাস্য ত্যাগ করিয়া, যোড়হাত করিয়া কাতর স্বরে এই কথা বলিলেন। রাজসিংহ বলিলেন, "তোমারই জন্য এত দূর আসিয়াছি–তোমাকে অদেয় কিছুই নাই–কি চাও, রূপনগরের কন্যে?"

চঞ্চলকুমারী আবার যোড়হাত করিয়া বলিল, "আমি চঞ্চলমতি বালিকা বলিয়া আপনাকে আসিতে লিখিয়াছিলাম, কিন্তু আমি নিজের মন আপনি বুঝিতে পারি নাই। আমি এখন মোগলসম্রাটের ঐশ্বর্য্যের কথা শুনিয়া বড় মুগ্ধ হইয়াছি। আপনি অনুমতি করুন–আমি দিল্লী যাইব।"

রাজসিংহ বিস্মিত ও প্রীত হইলেন। বলিলেন, "তোমার দিল্লী যাইতে হয় যাও–আমার আপত্তি নাই–কিন্তু আপাততঃ তুমি যাইতে পাইবে না। যদি এখন তোমাকে ছাড়িয়া দিই, মোগল মনে করিবে যে, প্রাণভয়ে ভীত হইয়া তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম। আগে যুদ্ধ শেষ হউক–তার পর তুমি যাইও। আর তোমার মনের কথা যে বুঝি নাই, তাহা মনে করিও না। আমি জীবিত থাকিতে তোমাকে দিল্লী যাইতে হইবে না। যোওয়ান্ সব–আগে চল।"

তখন চঞ্চলকুমারী মৃদু হাসিয়া মর্ম্মভেদী মৃদু কটাক্ষ করিয়া, দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলিস্থিত হীরকাঙ্গুরীয় বাম হস্তের অঙ্গুলিদ্বয়ের দ্বারা ফিরাইয়া রাজসিংহকে দেখাইতে দেখাইতে বলিলেন, "মহারাজ! এই আঙ্গটিতে বিষ আছে। দিল্লীতে না যাইতে দিলে, আমি বিষ খাইব।"

রাজসিংহ তখন হাসিলেন–বলিলেন, "অনেকক্ষণ বুঝিয়াছি রাজকুমারী–রমণীকুলে তুমি ধন্য। কিন্তু তুমি যাহা ভাবিতেছ, তাহা হইবে না। আজ রাজপুতের বাঁচা হইবে না; আজ রাজপুতকে মরিতেই হইবে–নহিলে রাজপুতনামে বড় কলঙ্ক হইবে। আমরা যতক্ষণ না মরি–ততক্ষণ তুমি বন্দী। আমরা মরিলে তুমি যেখানে ইচ্ছা, সেইখানে যাইও।

চঞ্চলকুমারী হাসিল–অতিশয় প্রণয়প্রফুল্ল, ভক্তিপ্রণোদিত, সাক্ষাৎ মহাদেবের অনিবার্য্য এক কটাক্ষবাণ রাজসিংহের উপর ত্যাগ করিল। মনে মনে বলিতে লাগিল, "বীরচূড়ামণি! আজি হইতে আমি তোমার দাসী হইলাম! যদি তোমার দাসী না হই–তবে চঞ্চল কখনই প্রাণ রাখিবে না।" প্রকাশ্যে বলিল, "মহারাজ! দিল্লীশ্বর যাহাকে মহিষী করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, সে কাহারও বন্দী নহে। এই আমি মোগল সৈন্যসম্মুখে চলিলাম–কাহার সাধ্য রাখে দেখি?"

এই বলিয়া চঞ্চলকুমারী–জীবন্ত দেবীমূর্ত্তি, রাজসিংহকে পাশ করিয়া রন্ধ্রমুখে চলিল। তাঁহাকে স্পর্শ করে কাহার সাধ্য? এজন্য কেহ তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিল না। হাসিতে হাসিতে, হেলিতে দুলিতে, সেই স্বর্ণমুক্তাময়ী প্রতিমা রন্ধ্রমুখে চলিয়া গেল।

একাকিনী চঞ্চলকুমারী সেই প্রজ্জ্বলিত বহ্নিতুল্য রুষ্ট, সশস্ত্র পঞ্চ শত মোগল অশ্বারোহীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। যেখানে সেই পথরোধকারী কামান–মনুষ্যনির্ম্মিত বজ্র, অগ্নি উদ্গীর্ণ করিবার জন্য হাঁ করিয়া আছে–তাহার সম্মুখে, রত্নমণ্ডিতা লোকাতীতা সুন্দরী দাঁড়াইল। দেখিয়া বিস্মিত মোগলসেনা মনে করিল–পর্ব্বতনিবাসিনী পরী আসিয়াছে।

মনুষ্যভাষায় কথা কহিয়া চঞ্চলকুমারী সে ভ্রম ভাঙ্গিল।–বলিল, "এ সেনার সেনাপতি কে?"

মবারক স্বয়ং রন্ধ্রমুখে রাজপুতগণের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন–তিনি বলিলেন, "ইহারা এখন অধমের অধীন। আপনি কে?"

চঞ্চলকুমারী বলিলেন, “আমি সামান্যা স্ত্রী। আপনার কাছে কিছু ভিক্ষা আছে–যদি অন্তরালে শুনেন, তবেই বলিতে পারি।”

মবারক বলিলেন, “তবে রন্ধ্রমধ্যে আগু হউন।” চঞ্চলকুমারী রন্ধ্রমধ্যে অগ্রসর হইলেন–মবারক পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন।

যেখানে কথা অন্যে শুনিতে পায় না, এমন স্থানে আসিয়া চঞ্চলকুমারী বলিতে লাগিলেন, “আমি রূপনগরের রাজকন্যা। বাদশাহ আমাকে বিবাহ করিবার অভিলাষে আমাকে লইতে এই সেনা পাঠাইয়াছেন–এ কথা বিশ্বাস করেন কি?”

মবারক। আপনাকে দেখিয়াই সে বিশ্বাস হয়।

চঞ্চল। আমি মোগলকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক–ধর্ম্মে পতিত হইব মনে করি। কিন্তু পিতা ক্ষীণবল–তিনি আমাকে আপনাদিগের সঙ্গে পাঠাইয়াছেন।–তাঁহা হইতে কোন ভরসা নাই বলিয়া আমি রাজসিংহের কাছে দূত প্রেরণ করিয়াছিলাম–আমার কপালক্রমে তিনি পঞ্চাশ জন মাত্র সিপাহী লইয়া আসিয়াছেন–তাঁহাদের বলবীর্য্য ত দেখিলেন?

মবারক চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, “সে কি–পঞ্চাশ জন সিপাহী এত মোগল মারিল?”

চঞ্চল। বিচিত্র নহে–হলদীঘাটে ঐ রকম কি একটা হইয়াছিল শুনিয়াছি। কিন্তু সে যাহাই হউক–রাজসিংহ এক্ষণে আপনার নিকট পরাস্ত। তাঁহাকে পরাস্ত দেখিয়াই আমি আসিয়া ধরা দিতেছি। আমাকে দিল্লী লইয়া চলুন–যুদ্ধে আর প্রয়োজন নাই।

মবারক বলিল, “বুঝিয়াছি, নিজের সুখ ত্যাগ করিয়া আপনি রাজপুতের প্রাণরক্ষা করিতে চাহেন। তাঁহাদেরও কি সেই ইচ্ছা?”

চ। সেও কি সম্ভবে? আমাকে আপনারা লইয়া চলিলেও তাহারা যুদ্ধ ছাড়িবে না। আমার অনুরোধ, আমার সঙ্গে একমত হইয়া আপনি তাহাদের প্রাণরক্ষা করুন।

ম। তাহা পারি। কিন্তু দস্যুর দণ্ড অবশ্য দিতে হইবে। আমি তাঁহাদের বন্দী করিব।

চ। সব পারিবেন–সেটি পারিবেন না। তাঁহাদিগকে প্রাণে মারিতে পারিবেন, কিন্তু বাঁধিতে পারিবেন না। তাঁহারা সকলেই মরিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছেন–মরিবেন।

ম। তাহা বিশ্বাস করি। কিন্তু আপনি দিল্লী যাইবেন, ইহা স্থির?

চ। আপনাদিগের সঙ্গে আপাততঃ যাওয়াই স্থির। দিল্লী পর্য্যন্ত পৌঁছিব কি না, সন্দেহ।

ম। সে কি?

চ। আপনারা যুদ্ধ করিয়া মরিতে জানেন, আমরা স্ত্রীলোক, আমরা কি শুধু শুধু মরিতে জানি না?

ম। আমাদের শত্রু আছে, তাই মরি। ভুবনে কি আপনার শত্রু আছে?

চ। আমি নিজে–

ম। আমাদের শত্রুর অনেক প্রকার অস্ত্র আছে– আপনার?

চ। বিষ।

ম। কোথায় আছে?

বলিয়া মবারক চঞ্চলকুমারীর মুখপানে চাহিলেন। বুঝি অন্য কেহ হইলে তাহার মনে হইত, নয়ন ছাড়া আর কোথাও বিষ আছে কি? কিন্তু মবারক সে

ইতরপ্রকৃতির মনুষ্য ছিলেন না। তিনি রাজসিংহের ন্যায় যথার্থ বীরপুরুষ। তিনি বলিলেন, “মা, আত্মঘাতিনী কেন হইবেন? আপনি যদি যাইতে না চাহেন, তবে আমাদের সাধ্য কি, আপনাকে লইয়া যাই? স্বয়ং দিল্লীশ্বর উপস্থিত থাকিলেও আপনার উপর বল প্রকাশ করিতে পারিতেন না–আমরা কোন ছার? আপনি নিশ্চিত থাকুন–কিন্তু এ রাজপুতেরা বাদশাহের সেনা আক্রমণ করিয়াছে–আমি মোগলসেনাপতি হইয়া কি প্রকারে উহাদের ক্ষমা করি?”

চ। ক্ষমা করিয়া কাজ নাই–যুদ্ধ করুন।

এই সময়ে রাজপুতগণ লইয়া রাজসিংহ সেইখানে উপস্থিত হইলেন–তখন চঞ্চলকুমারী বলিতে লাগিলেন, যুদ্ধ করুন–রাজপুতের মেয়েরাও মরিতে জানে।”

মোগলসেনাপতির সঙ্গে লজ্জাহীনা চঞ্চল কি কথা কহিতেছে, শুনিবার জন্য রাজসিংহ এই সময়ে চঞ্চলের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। চঞ্চল তখন তাঁহার কাছে হাত পাতিয়া হাসিয়া বলিলেন, “মহারাজাধিরাজ! আপনার কোমরে যে তরবারি দুলিতেছে, রাজপ্রসাদস্বরূপ দাসীকে উহা দিতে আজ্ঞা হউক!”

রাজসিংহ হাসিয়া বলিলেন, “বুঝিয়াছি, তুমি সত্য সত্যই ভৈরবী।” এই বলিয়া রাজসিংহ কটি হইতে অসি নির্ম্মুক্ত করিয়া চঞ্চলকুমারীর হাতে দিলেন।

দেখিয়া মোগল ঈষৎ হাসিল। চঞ্চলকুমারীর কথার কোন উত্তর করিল না। কেবল রাজসিংহের মুখপানে চাহিয়া বলিল, “উদয়পুরের বীরেরা কত দিন হইতে স্ত্রীলোকের বাহুবলে রক্ষিত?”

রাজসিংহের দীপ্ত চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। তিনি বলিলেন, “যত দিন হইতে মোগল বাদশাহ অবলাদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন, তত দিন হইতে রাজপুত কন্যাদিগের বাহুতে বল হইয়াছে।” তখন রাজসিংহ সিংহের ন্যায় গ্রীবাভঙ্গের সহিত, স্বজনবর্গের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “রাজপুতেরা বাগ্‌যুদ্ধে অপটু। ক্ষুদ্র সৈনিকদিগের সঙ্গে বাগ্‌যুদ্ধের আমার সময়ও নাই। বৃথা কালহরণে প্রয়োজন নাই–পিপীলিকার মত এই মোগলদিগকে মারিয়া ফেল?”

এতক্ষণ বর্ষণোন্মুখ মেঘের ন্যায় উভয় সৈন্য স্তম্ভিত হইয়াছিল–প্রভুর আজ্ঞা ব্যতিত কেহই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছিল না। এক্ষণে রাণার আজ্ঞা পাইয়া, “মাতাজীকি জয়!” শব্দে রাজপুতেরা জলপ্রবাহবৎ মোগল সেনার উপরে পড়িল। এদিকে মবারকের আজ্ঞা পাইয়া, মোগলেরা “আল্লা–হো–আকবর্!” শব্দ করিয়া তাহাদের প্রতিরোধ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু সহসা উভয় সেনাই নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইল। সেই রণক্ষেত্রে উভয় সেনার মধ্যে অসি উত্তোলন করিয়া–স্থিরমূর্ত্তি চঞ্চলকুমারী দাঁড়াইয়া–সরিতেছে না।

চঞ্চলকুমারী উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, “যতক্ষণ না এক পক্ষ নিবৃত্ত হয়–ততক্ষণ আমি এখান হইতে নড়িব না। অগ্রে আমাকে না মারিয়া কেহ অস্ত্রচালনা করিতে পারিবে না।”

রাজসিংহ রুষ্ট হইয়া বলিলেন, “তোমার এ অকর্ত্তব্য। স্বহস্তে তুমি রাজপুতকুলে কলঙ্ক লেপিতেছ কেন? লোকে বলিবে, আজ স্ত্রীলোকের সাহায্যে রাজসিংহ প্রাণরক্ষা করিল।”

চ। মহারাজ! আপনাকে মরিতে কে নিষেধ করিতেছে? আমি কেবল আগে মরিতে চাহিতেছি। যে অনর্থের মূল–তাহার আগে মরিবার অধিকার আছে।

চঞ্চল নড়িল না–মোগলেরা বন্দুক উঠাইয়াছিল–নামাইল। মবারক চঞ্চলকুমারীর কার্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তখন উভয় সেনাসমক্ষে মবারক ডাকিয়া বলিলেন, “মোগল বাদশাহ স্ত্রীলোকের সহিত যুদ্ধ করেন না–অতএব বলি, আমরা এই সুন্দরীর নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া যাই। রাণা রাজসিংহের সঙ্গে যুদ্ধে জয় পরাজয়ের মীমাংসা, ভরসা করি, ক্ষেত্রান্তরে হইবে। আমি রাণাকে অনুরোধ করিয়া যাইতেছি যে, সে বার যেন স্ত্রীলোক সঙ্গে করিয়া না আইসেন।”

চঞ্চলকুমারী মবারকের জন্য চিন্তিত হইলেন। মবারক তখন তাঁহার নিকটে অশ্বে আরোহণ করিতেছেন মাত্র। চঞ্চলকুমারী তাঁহাকে বলিলেন, "সাহেব! আমাকে ফেলিয়া যাইতেছেন কেন? আমাকে লইয়া যাইবার জন্য আপনাদের দিল্লীশ্বর পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমাকে যদি লইয়া না যান, তবে বাদশাহ কি বলিবেন?"

মবারক বলিলেন, "বাদশাহের বড় আর একজন আছেন। উত্তর তাঁহার কাছে দিব।"

চঞ্চল। সে ত পরলোকে, কিন্তু ইহলোকে?

মবারক। মবারক আলি, ইহলোকে কাহাকেও ভয় করে না। ঈশ্বর আপনাকে কুশলে রাখুন—আমি বিদায় হইলাম।

এই বলিয়া মবারক অশ্বে আরোহণ করিলেন। তাঁহার সৈন্যকে ফিরিতে আদেশ করিতেছিলেন, এমন সময়ে পশ্চাতে একেবারে সহস্র বন্দুকের শব্দ শুনিতে পাইলেন। একেবারে শত মোগল যোদ্ধা ধরাশায়ী হইল। মবারক দেখিলেন, ঘোর বিপদ্!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : হরণ ও অপহরণে দক্ষ মাণিকলাল

মাণিকলাল পার্ব্বত্য পথ হইতে নির্গত হইয়াই ঘোড়া ছুটাইয়া একেবারে রূপনগরের গড়ে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। রূপনগরের রাজার কিছু সিপাহী ছিল, তাহারা বেতনভোগী চাকর নহে; জমী করিত; ডাক-হাঁক করিলে ঢাল, খাঁড়া, লাঠি, সোঁটা লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইত; এবং সকলেরই এক একটি ঘোড়া ছিল। মোগলসেনা আসিলে রূপনগরের রাজা তাহাদিগকে ডাক-হাঁক করিয়াছিলেন। প্রকাশ্যে তাহাদিগকে ডাকিবার কারণ, মোগলসৈন্যর সম্মান ও খবরদারিতে তাহাদিগকে নিযুক্ত করা। গোপন অভিপ্রায়—যদি মোগলসেনা হঠাৎ কোন উপদ্রব উপস্থিত করে, তবে তাহার নিবারণ। ডাকিবামাত্র রাজপুতেরা ঢাল, খাঁড়া, ঘোড়া লইয়া গড়ে উপস্থিত হইল—রাজা তাহাদিগকে অস্ত্রাগার হইতে অস্ত্র দিয়া সাজাইলেন। তাহারা নানাবিধ পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিয়া মোগলসৈনিকদিগের সহিত হাস্য পরিহাস ও রঙ্গরসে কয় দিবস কাটাইল। তাহার পর ঐ দিবস প্রভাতে মোগলসেনা শিবির ভঙ্গ করিয়া রাজকুমারীকে লইয়া যাওয়াতে, রূপনগরের সৈনিকেরাও গৃহে প্রত্যাগমন করিতে আজ্ঞা পাইল। তখন তাহারা অশ্ব সজ্জিত করিল এবং অস্ত্র সকল রাজার অস্ত্রাগারে ফিরাইয়া দিবার জন্য লইয়া আসিল। রাজা স্বয়ং তাহাদিগকে একত্রিত করিয়া স্নেহসূচক বাক্যে বিদায় দিতেছিলেন, এমত সময়ে আঙ্গুলকাটা মাণিকলাল ঘর্ম্মাক্তকলেবরে অশ্ব সহিত সেখানে উপস্থিত হইলেন।

মাণিকলালের সেই মোগলসৈনিকের বেশ। একজন মোগলসৈনিক অতিব্যস্ত হইয়া গড়ে ফিরিয়া আসিয়াছে, দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলে, "কি সংবাদ?"

মাণিকলাল অভিবাদন করিয়া বলিল, "মহারাজ, বড় গণ্ডগোল বাঁধিয়াছে, পাঁচ হাজার দস্যু আসিয়া রাজকুমারীকে ঘিরিয়াছে। জুনাব্ হাসান আলি খাঁ বাহাদুর, আমাকে আপনার নিকট পাঠাইলেন—তিনি প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছেন, কিন্তু আর কিছু সৈন্য ব্যতীত রক্ষা পাইতে পারিবেন না। আপনার নিকট সৈন্য সাহায্য চাহিয়াছেন।"

রাজা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "সৌভাগ্যক্রমে আমার সৈন্য সজ্জিতই আছে।" সৈনিকগণকে বলিলেন, "তোমাদের ঘোড়া তৈয়ার, হাতিয়ার হাতে তোমরা সওয়ার হইয়া এখনই যুদ্ধে চল। আমি স্বয়ং তোমাদিগকে লইয়া যাইতেছি।"

মাণিকলাল বলিল, "যদি এ দাসের অপরাধ মাপ হয়, তবে আমি নিবেদন করি যে, ইহাদিগকে লইয়া আমি অগ্রসর হই। মহারাজ আর কিছু সেনা সংগ্রহ

করিয়া লইয়া আসুন। দস্যুরা সংখ্যায় প্রায় পাঁচ হাজার। আরও কিছু সেনাবল ব্যতীত মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।”

স্থূলবুদ্ধি রাজা তাহাতেই সম্মত হইলেন। সহস্র সৈনিক লইয়া মাণিকলাল অগ্রসর হইল; রাজা আরও সৈন্যসংগ্রহের চেষ্টায় গড়ে রহিলেন। মাণিক সেই রূপনগরের সেনা লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে চলিল।

পথে যাইতে যাইতে মাণিকলাল একটি ছোট রকম লাভ করিল। পথের ধারে একটি বৃক্ষের ছায়ায় একটি স্ত্রীলোক পড়িয়া আছে—বোধ হয় যেন পীড়িতা। অশ্বারোহী সৈন্য প্রধাবিত দেখিয়া সে উঠিয়া বসিল—দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল—বোধ হয় পলাইবার ইচ্ছা, কিন্তু পারিল না। বল নাই, ইহা দেখিয়া মাণিকলাল ঘোড়া হইতে নামিয়া তাহার নিকটে গেল। গিয়া দেখিল, স্ত্রীলোকটি অতিশয় সুন্দরী। জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কে গা, এখানে এ প্রকারে পড়িয়া আছ?”

যুবতী জিজ্ঞাসা করিল, “আপনারা কাহার ফৌজ?”

মাণিকলাল বলিল, “আমি রাণা রাজসিংহের ভৃত্য।”

যুবতী বলিল, “আমি রূপনগরের রাজকুমারীর দাসী।”

মাণিক। তবে এখানে এ অবস্থায় কেন?

যুবতী। রাজকুমারীকে দিল্লী লইয়া যাইতেছে। আমি সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে রাজি হয়েন নাই। ফেলিয়া আসিয়াছেন। আমি তাই হাঁটিয়া তাঁহার কাছে যাইতেছিলাম।

মাণিকলাল বলিল, “তাই পথশ্রান্ত হইয়া পড়িয়া আছ?”

নির্ম্মলকুমারী বলিল, “অনেক পথ হাঁটিয়াছি—আর পারিতেছি না।”

পথ এমন বেশী নয়—তবে নির্ম্মল কখনও পথ হাঁটে না, তার পক্ষে অনেক বটে।

মাণিক। তবে এখন কি করিবে?

নির্ম্মল। কি করিব—এইখানে মরিব।

মাণিক। ছি! মরিবে কেন? রাজকুমারীর কাছে চল না কেন?

নির্ম্মল। যাইব কি প্রকারে? হাঁটিতে পারিতেছি না, দেখিতেছ না?

মাণিক। কেন, ঘোড়ায় চল না?

নির্ম্মল হাসিয়া বলিল, “ঘোড়ায়?”

মাণিক। ঘোড়ায়। ক্ষতি কি?

নির্ম্মল। আমি কি সওয়ার?

মাণিক। হও না।

নির্ম্মল। আপত্তি নাই। তবে একটা প্রতিবন্ধক আছে—ঘোড়ায় চড়িতে জানি না।

মাণিক। তার জন্য কি আটকায়? আমার ঘোড়ায় চড় না?

নির্ম্মল। তোমার ঘোড়া কলের? না মাটির?

মাণিক। আমি ধরিয়া থাকিব।

নির্ম্মল, লজ্জারহিতা হইয়া রসিকতা করিতেছিল–এবার মুখ ফিরাইল। তার পর ভ্রূকুটি করিল; রাগ করিয়া বলিল, "আপনি আপনার কাজে যান, আমি আমার গাছতলায় পড়িয়া থাকি। রাজকুমারীর সঙ্গে সাক্ষাতে আমার কাজ নাই।"

মাণিকলাল দেখিল, মেয়েটি বড় সুন্দরী। লোভ সামলাইতে পারিল না। বলিল, "হাঁ গা! তোমার বিবাহ হইয়াছে?"

রহস্যপরায়ণা নির্ম্মল মাণিকলালের রকম দেখিয়া হাসিল, বলিল, "না।"

মাণিক। তুমি কি জাতি?

নির্ম্মল। আমি রাজপুতের মেয়ে।

মাণিক। আমিও রাজপুতের ছেলে। আমারও স্ত্রী নাই। আমার একটি ছোট মেয়ে আছে, তার একটি মা খুঁজি। তুমি তার মা হইবে? আমায় বিবাহ করিবে? তা হইলে আমার সঙ্গে একত্র ঘোড়ায় চড়ায় কোন আপত্তি হয় না।

নির্ম্মল। শপথ কর।

মাণিক। কি শপথ করিব?

নির্ম্মল। তরবার ছুঁইয়া শপথ কর যে, আমাকে বিবাহ করিবে।

মাণিকলাল তরবারি স্পর্শ করিয়া শপথ করিল যে, "যদি আজিকার যুদ্ধে বাঁচি, তবে তোমাকে বিবাহ করিব।"

নির্ম্মল বলিল, "তবে চল, ঘোড়ায় চড়ি।"

মাণিকলাল তখন সহর্ষচিত্তে নির্ম্মলকে অশ্বপৃষ্ঠে উঠাইয়া, সাবধানে তাহাকে ধরিয়া অশ্বচালনা করিতে লাগিল।

বোধ হয়, কোর্টশিপ্‌টা পাঠকের বড় ভাল লাগিল না। আমি কি করিব? ভালবাসাবাসির কথা একটাও নাই –বহুকালসঞ্চিত প্রণয়ের কথা কিছু নাই–"হে প্রাণ! হে প্রাণাধিক!" সে সব কিছুই নাই–ধিক্!"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : ফলভোগী রাণা

যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী এক নিভৃত স্থানে নির্ম্মলকে নামাইয়া দিয়া, তাহাকে সেইখানে বসিয়া থাকিতে উপদেশ দিয়া, মাণিকলাল যেখানে রাজসিংহের সঙ্গে মবারকের যুদ্ধ হইতেছিল, একেবারে সেইখানে, মবারকের পশ্চাতে উপস্থিত হইল।

মাণিকলাল দেখিয়া যায় নাই যে, তৎপ্রদেশে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু রন্ধ্রপথে রাজসিংহ প্রবেশ করিয়াছেন; হঠাৎ তাহার শঙ্কা হইয়াছিল যে, মোগলেরা রন্ধ্রের এই মুখ বন্ধ করিয়া রাজসিংহকে বিনষ্ট করিবে। সেই জন্যই সে রূপনগরে সৈন্য সংগ্রহার্থে গিয়াছিল, এবং সেই জন্য সে প্রথমেই এই দিকে রূপনগরের সেনা লইয়া উপস্থিত হইল। আসিয়াই বুঝিল যে, রাজপুতগণের নাভিশ্বাস উপস্থিত বলিলেই হয়–মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই। তখন মাণিকলাল মবারকের সেনার প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া বলিল, "ঐ সকল দস্যু! উহাদিগকে মারিয়া ফেল।"

সৈনিকেরা কেহ কেহ বলিল, "উহারা যে মুসলমান!"

মাণিকলাল বলিল, "মুসলমান কি লুঠেরা হয় না? হিন্দুই কি যত দুষ্ক্রিয়াকারী? মার।"

মাণিকলালের আজ্ঞায় একেবারে হাজার বন্দুকের শব্দ হইল।

মবারক ফিরিয়া দেখিলেন, কোথা হইতে সহস্র অশ্বারোহী আসিয়া তাঁহাকে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিতেছে। মোগলেরা ভীত হইয়া আর যুদ্ধ করিল না। যে যে দিকে পারিল, সে সেই দিকে পলায়ন করিল। মবারক রাখিতে পারিলেন না। তখন রাজপুতেরা "মাতাজীকি জয়!" বলিয়া তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইল।

মবারকের সেনা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পর্ব্বতারোহণ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল, রূপনগরের সেনা তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া পর্ব্বতারোহণ করিতে লাগিল। মবারক সেনা ফিরাইতে গিয়া, সহসা অশ্বসমেত অদৃশ্য হইলেন।

এই অবসরে মাণিকলাল বিস্মিত রাজসিংহের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিলেন, রাণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি এ কাণ্ড মাণিকলাল? কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি কিছু জান?"

মাণিকলাল হাসিয়া বলিল, "জানি। যখন আমি দেখিলাম যে, মহারাজ রন্ধ্রপথে নামিয়াছেন, তখন বুঝিলাম যে, সর্ব্বনাশ হইয়াছে। প্রভুর রক্ষার্থ আমাকে আবার একটি নূতন জুয়াচুরী করিতে হইয়াছে।"

এই বলিয়া মাণিকলাল যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সংক্ষেপে রাণাকে শুনাইল। আপ্যায়িত হইয়া রাণা মাণিকলালকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "মাণিকলাল! তুমি যথার্থ প্রভুভক্ত। তুমি যে কার্য্য করিয়াছ, যদি কখন উদয়পুর ফিরিয়া যাই, তবে তাহার পুরস্কার করিব। কিন্তু তুমি আমাকে বড় সাধে বঞ্চিত করিলে। আজ মুসলমানকে দেখাইতাম যে, রাজপুত কেমন করিয়া মরে!"

মাণিকলাল বলিল, "মহারাজ! মোগলকে সে শিক্ষা দিবার জন্য মহারাজের অনেক ভৃত্য আছে। সেটা রাজকার্য্যের মধ্যে গণনীয় নহে। এখন উদয়পুরের পথ খোলসা। রাজধানী ত্যাগ করিয়া পর্ব্বতে পর্ব্বতে পরিভ্রমণ করা কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে রাজকুমারীকে লইয়া স্বদেশে যাত্রা করুন।"

রাজসিংহ বলিলেন, "আমার কতকগুলি সঙ্গী এখন এ দিকের পাহাড়ের উপরে আছে–তাহাদের নামাইয়া লইয়া যাইতে হইবে।"

মাণিকলাল বলিল, "আমি তাহাদিগকে লইয়া যাইব। আপনি অগ্রসর হউন। পথে আমাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে।"

রাণা সম্মত হইয়া, চঞ্চলকুমারীর সহিত উদয়পুরাভিমুখী যাত্রা করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : স্নেহশালিনী পিসী

রাণাকে বিদায় দিয়া, মাণিকলাল রূপনগরের সেনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পর্ব্বতারোহণ করিল। পলায়নপরায়ণ মোগলসেনা তৎকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া যে যেখানে পাইল, পলায়ন করিল। তখন মাণিকলাল রূপনগরের সৈনিকদিগকে বলিলেন, "শত্রুদল পলায়ন করিয়াছে–আর কেন বৃথা পরিশ্রম করিতেছ? কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে, রূপনগরে ফিরিয়া যাও।" সৈনিকেরাও দেখিল–তাও বটে, সম্মুখশত্রু আর কেহ নাই। মাণিকলাল যে একটা কারসাজি করিয়াছে, ইহাও তাহারা বুঝিতে পারিল। হঠাৎ যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার আর উপায় নাই দেখিয়া, তাহারা লুঠপাটে প্রবৃত্ত হইল। এবং যথেষ্ট ধনসম্পত্তি অপহরণ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে হাসিতে হাসিতে, বাদশাহের জয়ধ্বনি তুলিয়া রণজয়গর্ব্বে গৃহাভিমুখে ফিরিল। দণ্ডকাল মধ্যে পার্ব্বত্য পথ জনশূন্য হইল–কেবল হত ও আহত মনুষ্য ও অশ্ব সকল পড়িয়া রহিল। দেখিয়া, উচ্চ পর্ব্বতের উপরে প্রস্তরসঞ্চালনে যে সকল রাজপুত নিযুক্ত ছিল, তাহারা নামিল। এবং কোথাও কাহাকেও না দেখিয়া, রাণা অবশিষ্ট সৈন্য সহিত অবশ্য উদয়পুর যাত্রা করিয়াছেন বিবেচনা করিয়া, তাহারাও তাঁহার সন্ধানে সেই পথে চলিল। পথিমধ্যে রাজসিংহের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সকলে একত্রে উদয়পুরে চলিলেন।

সকলে জুটিল–কেবল মাণিকলাল নহে। মাণিকলাল, নির্ম্মলকে লইয়া বিব্রত। সকলকে গুছাইয়া পাঠাইয়া দিয়া, নির্ম্মলের কাছে আসিয়া জুটিল। তাহাকে কিছু ভোজন করাইয়া, গ্রাম হইতে বাহক ও দোলা লইয়া আসিল। দোলায় নির্ম্মলকে তুলিয়া, যে পথে রাণা গিয়াছেন, সে পথে না গিয়া ভিন্ন পথে চলিল–বমাল সমেত ধরা পড়ে, এমন ইচ্ছা রাখে না।

মাণিকলাল নির্ম্মলকে লইয়া পিসীর বাড়ী উপস্থিত হইল। পিসীমাকে ডাকিয়া বলিল, “পিসীমা, একটা বউ এনেছি।” বধূ দেখিয়া পিসীমা কিছু বিষণ্ন হইলেন–মনে করিলেন–লাভের যে আশা করিয়াছিলাম, বধূ বুঝি তাহার ব্যাঘাত করিবে। কি করে, দুইটা আশরফি নগদ লইয়াছে–একদিন অন্ন না দিয়া বধূকে তাড়াইয়া দিতে পারিবে না। সুতরাং বলিল, “বেশ বউ।”

মাণিকলাল বলিল, “পিসী বহুর সঙ্গে আমার আজিও বিবাহ হয় নাই।”

পিসীমা বুঝিলেন, তবে এটা উপপত্নী। যো পাইয়া বলিলেন, “তবে আমার বাড়ীতে–”

মাণিকলাল। তার ভাবনা কি? বিয়ে দাও না? আজই বিবাহ হউক।

নির্ম্মল লজ্জায় অধোবদন হইল।

পিসীমা আবার যো পাইলেন; বলিলেন, “সে ত সুখের কথা–তোমার বিবাহ দিব না ত কার বিবাহ দিব? তা বিবাহের ত কিছু খরচ চাই?”

মাণিকলাল বলিল, “তার ভাবনা কি?”

পাঠকের জানা থাকিতে পারে, যুদ্ধ হইলেই লুঠ হয়। মাণিকলাল যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আসিবার সময় নিহত মোগল সওয়ারদিগের বস্ত্রমধ্যে অনুসন্ধান করিয়া কিছু সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল–ঝনাৎ করিয়া পিসীর কাছে গোটাকত আশরফি ফেলিয়া দিলেন, পিসীমা আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া তাহা কুড়াইয়া লইয়া পেটারায় তুলিয়া রাখিয়া বিবাহের উদ্যোগ করিতে বাহির হইলেন। বিবাহের উদ্যোগের মধ্যে ফুল চন্দন ও পুরোহিত সংগ্রহ, সুতরাং আশরফিগুলি পিসীমাকে পেটারা হইতে আর বাহির করিতে হইল না। মাণিকলালের লাভের মধ্যে তিনি যথাশাস্ত্র নির্ম্মলকুমারীর স্বামী হইলেন। বলা বাহুল্য যে, মাণিকলাল রাণার সৈনিকদিগের মধ্যে বিশেষ উচ্চ পদ লাভ করিলেন, এবং নিজগুণে সর্ব্বত্র সম্মান প্রাপ্ত হইলেন।

পঞ্চম খণ্ড

অগ্নির আয়োজন

প্রথম পরিচ্ছেদ : শাহজাদী অপেক্ষা দুঃখী ভাল

বলিয়াছি, মবারক রণভূমিতে পর্ব্বতের সানুদেশে সহসা অদৃশ্য হইলেন। অদৃশ্য হইবার কারণ, তিনি যে পথে অশ্বারোহণে সৈন্য লইয়া যাইতেছিলেন, তাহার মধ্যে একটা কূপ ছিল। কেহ পর্ব্বতোপরি বাস করিবার অভিপ্রায়ে জলের জন্য এই কূপটি খনন করিয়াছিল। এক্ষণে চারি পাশের জঙ্গল কূপের মুখে পড়িয়া কূপটি আচ্ছাদন করিয়াছিল। মবারক তাহা না দেখিতে পাইয়া উপর দিয়া ঘোড়া চালাইলেন। ঘোড়া সমেত তাহার ভিতর পড়িয়া গিয়া অদৃশ্য হইলেন। তাহার

ভিতর জল ছিল না। কিন্তু পতনের আঘাতেই ঘোড়াটি মরিয়া গেল। মবারক পতনকালে সতর্ক হইয়াছিলেন, তিনি বড় বেশী আঘাত পাইলেন না। কিন্তু কূপ হইতে উঠিবার কোন উপায় দেখিলেন না। যদি কেহ শব্দ শুনিয়া তাঁহার উদ্ধার করে, এজন্য ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন। কিন্তু যুদ্ধের কোলাহলে তিনি কোন উত্তর শুনিতে পাইলেন না। কেবল একবার যেন, দূর হইতে কে বলিল, "স্থির হইয়া থাক– তুলিব।" সেটাও সন্দেহ মাত্র।

যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে, রণক্ষেত্রে নিঃশব্দ হইলে, কেহ যেন কূপের উপর হইতে বলিল, "বাঁচিয়া আছ?"

মবারক উত্তর করিল, "আছি। তুমি কে?"

সে বলিল, "আমি যেই হই, বড় জখম হইয়াছ কি?"

"সামান্য।"

"আমি একটা কাঠে, দুই চারিখানা কাপড় বাঁধিয়া লম্বা দড়ির মত করিয়াছি। পাকাইয়া মজবুত করিয়াছি। তাহা কুয়ার ভিতর ফেলিয়া দিতেছি। দুই হাতে কাঠের দুই দিক্ ধর–আমি টানিয়া তুলিতেছি।"

মবারক বিস্মিত হইয়া বলিল, "এ যে স্ত্রীলোকের স্বর! কে তুমি?"

স্ত্রীলোক বলিল, "এ গলা কি চেন না?"

মবা। চিনিতেছি। দরিয়া এখানে কোথা হইতে?

দরিয়া বলিল, "তোমারই জন্য। এখন তুলিতেছি– উঠ।"

এই বলিয়া দরিয়া কাপড়ের কাছিতে বাঁধা কাঠখানা কূপের ভিতর ফেলিয়া দিল। তরবারি দিয়া কূপের মুখের জঙ্গল কাটিয়া সাফ করিয়া দিল। মবারক কাঠের দুই দিক্ ধরিল। দরিয়া তখন টানিয়া তুলিতে লাগিল। জোরে কুলায় না। কান্না আসিতে লাগিল। তখন দরিয়া একটা বৃক্ষের বিনত শাখার উপর বস্ত্ররজ্জু স্থাপন করিয়া, শুইয়া পড়িয়া টানিতে লাগিল। মবারক উঠিল। দরিয়াকে দেখিয়া মবারক বিস্মিত হইল। বলিল, "এ কি? এ বেশ কেন?"

দরিয়া বলিল, "আমি বাদশাহী সওয়ার।"

মবা। কেন?

দরি। তোমারই জন্য।

মবা। কেন?

দরি। নহিলে তোমাকে আজ বাঁচাইত কে?

মবা। সেই জন্য কি দিল্লী হইতে এখানে আসিয়াছ? সেই জন্য কি সওয়ার সাজিয়াছ? এ যে রক্ত দেখিতেছি! তুমি যে জখম হইয়াছ! কেন এ করিলে?

দরি। তোমার জন্য করিয়াছি। না করিলে, তুমি বাঁচিতে কি? শাহজাদী কেমন ভালবাসে?

মবারক ম্লানমুখে, ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল, "শাহজাদীরা ভালবাসে না।"

দরিয়া বলিল, "আমরা দুঃখী,–আমরা ভালবাসি। এখন বসো। আমি তোমার জন্য দোলা স্থির করিয়া রাখিয়াছি। লইয়া আসিতেছি। তোমার চোট লাগিয়াছে–ঘোড়ায় চড়া সৎপরামর্শ হইবে না।"

যে সকল দোলা মোগল সেনার সঙ্গে ছিল, যুদ্ধে ভীত হইয়া তাহার বাহকেরা কতকগুলি লইয়া পলায়ন করিয়াছিল। দরিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে মবারককে কূপমগ্ন

হইতে দেখিয়া, প্রথমেই দোলার সন্ধানে গিয়াছিল। পলাতক বাহকদিগকে সন্ধান করিয়া, দুইখানা দোলা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। তার পর এখন, সেই দোলা ডাকিয়া আনিল। একখানায় আহত মবারককে তুলিল, একখানায় স্বয়ং উঠিল। তখন মবারককে লইয়া দরিয়া দিল্লীর পথে চলিল। দোলায় উঠিবার সময় মবারক দরিয়ার মুখচুম্বন করিয়া বলিল, "আর কখনও তোমায় ত্যাগ করিব না।"

উপযুক্ত স্থানে উপস্থিত হইয়া, দরিয়া মবারকের শুশ্রূষা করিল। দরিয়ার চিকিৎসাতেই মবারক আরোগ্য লাভ করিল।

দিল্লীতে পৌঁছিলে, মবারক দরিয়ার হাত ধরিয়া আপন গৃহে লইয়া গেল। দিন কত ইহাতে উভয়ে বড় সুখী হইল। তার পর ইহার যে ফল উপস্থিত হইল, তাহা ভয়ানক। দরিয়ার পক্ষে ভয়ানক, মবারকের পক্ষে ভয়ানক, জেব্-উন্নিসার পক্ষে ভয়ানক, ঔরঙ্গজেবের পক্ষে ভয়ানক। সে অপূর্ব্ব রহস্য আমি পশ্চাৎ বলিব। এক্ষণে চঞ্চলকুমারীর কথা কিছু বলা আবশ্যক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : রাজসিংহের পরাভব

রাজসিংহ উদয়পুরে আসিলেন বলিয়াছি। চঞ্চলকুমারীর উদ্ধারের জন্য যুদ্ধ, এজন্য চঞ্চলকুমারীকেও উদয়পুরে লইয়া আসিয়া রাজাবরোধে সংস্থাপিত করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে উদয়পুরে রাখিবেন, কি রূপনগরে তাঁহার পিতার নিকট পাঠাইয়া দিবেন, ইহার মীমাংসা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইল। তিনি যত দিন ইহার সুমীমাংসা করিতে না পারিলেন, ততদিন চঞ্চলকুমারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন না।

এ দিকে চঞ্চলকুমারী রাজার ভাবগতিক দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন, "রাজা যে আমাকে বিবাহ করিয়া গ্রহণ করিবেন, এমন ত ভাবগতিক কিছুই দেখিতেছি না। যদি না করেন, তবে কেন আমি উহার অন্তপুরে বাস করিব? যাবই বা কোথায়?"

রাজসিংহ কিছু মীমাংসা করিতে না পারিয়া, কতিপয় দিন পরে, চঞ্চলকুমারীর মনের ভাব জানিবার জন্য তাঁহার কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। যাইবার সময়ে, যে পত্রখানি চঞ্চলকুমারী অনন্ত মিশ্রের হাতে পাঠাইয়াছিলেন, যাহা রাজসিংহ মাণিকলালের নিকট পাইয়াছিলেন, তাহা লইয়া গেলেন।

রাণা আসন গ্রহণ করিলে, চঞ্চলকুমারী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, সলজ্জ এবং বিনীতভাবে এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। লোকমনোমোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া রাজা একটু মুগ্ধ হইলেন। কিন্তু তখনই মোহ পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "রাজকুমারি! এক্ষণে তোমার কি অভিপ্রায়, তাহা জানিবার জন্য আমি আসিয়াছি। তোমার পিত্রালয়ে যাইবার অভিলাষ, না এইখানে থাকিতেই প্রবৃত্তি?"

শুনিয়া চঞ্চলকুমারীর হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি কথা কহিতে পারিলেন না–নীরবে রহিলেন।

তখন রাণা চঞ্চলকুমারীর পত্রখানি বাহির করিয়া চঞ্চলকুমারীকে দেখাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ তোমার পত্র বটে?"

চঞ্চল বলিল, "আজ্ঞা হাঁ।"

রাণা। কিন্তু সবটুকু এক হাতের লেখা নহে। দুই হাতের লেখা দেখিতেছি। তোমার নিজের হাতের কোন অংশ আছে কি?

চঞ্চল। প্রথম ভাগটা আমার হাতের লেখা।

রাণা। তবে শেষ ভাগটা অন্যের লেখা?

পাঠকের স্মরণ থাকিবে যে, এই শেষ অংশেই বিবাহের প্রস্তাবটা ছিল। চঞ্চলকুমারী উত্তর করিলেন, "আমার হাতের নহে।"

রাজসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু তোমার সম্মতিক্রমেই ইহা লিখিত হইয়াছিল?"

প্রশ্নটা অতি নির্দ্দয়। কিন্তু চঞ্চলকুমারী আপনার উন্নত স্বভাবের উপযুক্ত উত্তর করিলেন। বলিলেন, "মহারাজ! ক্ষত্রিয় রাজগণ বিবাহার্থেই কন্যাহরণ করিতে পারেন। অন্য কোন কারণে কন্যাহরণ মহাপাপ। মহাপাপ করিতে আপনাকে অনুরোধ করিব কি প্রকারে?"

রাণা। আমি তোমাকে হরণ করি নাই। তোমার জাতিকূল রক্ষার্থ তোমাকে মুসলমানের হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছি। এক্ষণে তোমাকে তোমার পিতার নিকট প্রতিপ্রেরণ করাই রাজধর্ম্ম।

চঞ্চলকুমারী কয়টা কথা কহিয়া যুবতীসুলভ লজ্জাকে বশে আনিয়াছিল। এক্ষণে মুখ তুলিয়া, রাজসিংহের প্রতি চাহিয়া বলিল, "মহারাজ! আপনার রাজধর্ম্ম আপনি জানেন। আমার ধর্ম্মও আমি জানি। আমি জানি যে, যখন আমি আপনার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, তখন আমি ধর্ম্মতঃ আপনার মহিষী। আপনি গ্রহণ করুন বা না করুন, ধর্ম্মতঃ আমি আর কাহাকেও বরণ করিতে পারিব না। যখন ধর্ম্মতঃ আপনি আমার স্বামী, তখন আপনার আজ্ঞা মাত্র শিরোধার্য্য। আপনি যদি আমাকে রূপনগরে ফিরিয়া যাইতে বলেন, তবে অবশ্য আমি যাইব। সেখানে গেলে পিতা আমাকে পুনর্ব্বার বাদশাহের নিকট পাঠাইতে বাধ্য হইবেন। কেন না, আমাকে রক্ষা করিবার তাঁহার সাধ্য নাই। যদি তাহাই অভিপ্রেত, তাহা হইলে রণক্ষেত্রে যখন আমি বলিয়াছিলাম যে, 'মহারাজ! আমি দিল্লী যাইব'—তখন কেন যাইতে দিলেন না?"

রাজসিংহ। সে আমার আপনার মানরক্ষার্থ।

চঞ্চল। তার পর এখন, যে আপনার শরণ লইয়াছে, তাহাকে আবার দিল্লী যাইতে দিবেন কি?

রাজ। তাও হইতে পারে না। তবে, তুমি এইখানেই থাক।

চঞ্চল। অতিথিস্বরূপ থাকিব? না দাসী হইয়া? রূপনগরের রাজকন্যা এখানে মহিষী ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না।

রাজ। তোমার মত লোকমনোমোহিনী সুন্দরী যে রাজার মহিষী, সকলেই তাঁহাকে ভাগ্যবান্ বলিবে। তুমি এমন অদ্বিতীয়া রূপবতী বলিয়াই তোমাকে মহিষী করিতে আমি সঙ্কুচিত হইতেছি। শুনিয়াছি যে, শাস্ত্রে আছে, রূপবতী ভার্য্যা শত্রুস্বরূপ—

"ঋণকারী পিতা শত্রুর্মাতা চ ব্যভিচারিণী।
ভার্য্যা রূপবতী শত্রুঃ পুত্রঃ শত্রুরপণ্ডিতঃ ॥"

চঞ্চলকুমারী একটু হাসিয়া বলিল, "বালিকার বাচালতা মার্জ্জনা করিবেন—উদয়পুরের রাজমহিষীগণ সকলেই কি কুরূপা?"

রাজসিংহ বলিলেন, "তোমার মত কেহই সুরূপা নহে।"

চঞ্চলকুমারী বলিল, "আমার বিনীত নিবেদন, কথাটা মহিষীদিগের কাছে বলিবেন না। মহারাণা রাজসিংহেরও ভয়ের স্থান থাকিতে পারে।"

রাজসিংহ উচ্চহাস্য করিলেন। চঞ্চলকুমারী এতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিল—এখন চাপিয়া বসিল, মনে মনে বলিল, "আর ইনি আমার কাছে মহারাণা নহেন, ইনি এখন আমার বর।"

আসন গ্রহণ করিয়া চঞ্চলকুমারী বলিল, "মহারাজ! বিনা আজ্ঞায় আমি যে মহারাজের সম্মুখে আসন গ্রহণ করিলাম, সে অপরাধ মার্জ্জনা করিতে হইতেছে—কেন না, আমি আপনার নিকট জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষায় বসিলাম—শিষ্যের আসনে অধিকার আছে। মহারাজ! রূপবতী ভার্য্যা শত্রু কি প্রকারে, তাহা আমি এখনও বুঝিতে পারি নাই।"

রাজসিংহ। তাহা সহজে বুঝান যায়। ভার্য্যা রূপবতী হইলে, তাহার জন্য বিবাদ বিসংবাদ উপস্থিত হয়। এই দেখ, তুমি এখনও আমার ভার্য্যা হও নাই, তথাপি তোমার জন্য ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে আমার বিবাদ বাধিয়াছে। আমাদের বংশের মহারাণী পদ্মিনীর কথা শুনিয়াছ ত?"

চঞ্চল। ঋষিবাক্যে আমার বড় শ্রদ্ধা হইল না। সুন্দরী মহিষী না থাকিলে রাজারা কি বিবাদ হইতে মুক্তি পান? আর এ পামরীর জন্য মহারাজ কেন এ কথা তুলেন? আমি সুরূপা হই, কুরূপা হই, আমার জন্য যে বিবাদ বাধিবার, তাহা ত বাধিয়াছে।

রাজসিংহ। আরও কথা আছে। রূপবতী ভার্য্যাতে পুরুষ অত্যন্ত আসক্ত হয়। ইহা রাজার পক্ষে অত্যন্ত নিন্দনীয়। কেন না, তাহাতে রাজকার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে।

চঞ্চল। রাজারা বহুশত মহিষী কর্ত্তৃক পরিবৃত থাকিয়াও রাজকার্য্যে অমনোযোগী হয়েন না। আমার ন্যায় বালিকার প্রণয়ে মহারাণা রাজসিংহের রাজকার্য্যে বিরাগ জন্মিবে, ইহা অতি অশ্রদ্ধার কথা।

রাজসিংহ। কথা তত অশ্রদ্ধেয় নহে। শাস্ত্রে বলে, "বৃদ্ধস্য তরুণী বিষম্।"

চঞ্চল। মহারাজ কি বৃদ্ধ?

রাজ। যুবা নহি।

চঞ্চল। যাহার বাহুতে বল আছে, রাজপুতকন্যার কাছে সেই যুবা। দুর্ব্বল যুবাকে রাজপুতকন্যাগণ বৃদ্ধের মধ্যে গণ্য করেন।

রাজ। আমি সুরূপ নহি।

চঞ্চল। কীর্ত্তিই রাজাদিগের রূপ।

রাজ। রূপবান, বলবান, যুবা রাজপুত্রের অভাব নাই।

চঞ্চল। আমি আপনাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছি। অন্যের পত্নী হইলে দ্বিচারিণী হইব। আমি অত্যন্ত নির্লজ্জের মত কথা বলিতেছি। কিন্তু মনে করিয়া দেখিবেন, দুষ্মন্ত কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে, শকুন্তলা লজ্জা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আমারও আজ প্রায় সেই দশা। আপনি আমায় পরিত্যাগ করিলে আমি রাজসমন্দরে* ডুবিয়া মরিব।

রাজসিংহ বাকযুদ্ধে এইরূপ পরাভব প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন, "তুমিই আমার উপযুক্ত মহিষী। তবে তুমি কেবল বিপদে পড়িয়া আমাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলে; এক্ষণে আমার হাত হইতে উদ্ধারের ইচ্ছা রাখ কি না, আমার এই বয়সে তুমি আমাতে অনুরাগিণী হইতে পারিবে কি না, আমার মনে এই সকল সংশয় ছিল। সে সকল সংশয় আজিকার কথাবার্ত্তায় দূর হইয়াছে। তুমি আমার মহিষী হইবে। তবে একটা কথার অপেক্ষা করিতে চাই। তোমার পিতার মত হইবে কি? তাঁহার অমতে আমি বিবাহ করিতে চাহি না। তাহার কারণ, যদিও তোমার পিতার ক্ষুদ্র রাজ্য এবং তাঁহার সৈন্য অল্প, কিন্তু বিক্রম সোলাঙ্কি যে একজন বীরপুরুষ এবং উপযুক্ত সেনানায়ক, ইহা প্রসিদ্ধ। মোগলের সঙ্গে আমার যুদ্ধ বাধিবেই বাধিবে। বাধিলে, তাঁহার সাহায্য আমার পক্ষে বিশেষ মঙ্গলজনক হইবে। তাঁহার অনুমতি লইয়া বিবাহ না করিলে তিনি কখনও আমার সহায় হইবেন না। বরং তাঁর অমতে বিবাহ করিলে তিনি মোগলের সহায় এবং আমার শত্রু হইতে পারেন। তাহা বাঞ্ছনীয় নহে, অতএব আমার ইচ্ছা, তাঁহাকে পত্র লিখিয়া, তাঁহার সম্মতি আনাইয়া তোমাকে বিবাহ করি। তিনি সম্মত হইবেন কি?

চঞ্চল। না হইবার ত কোন কারণ দেখি না। আমার ইচ্ছা, পিতা-মাতার আশীর্ব্বাদ লইয়াই আপনার চরণসেবাব্রত গ্রহণ করি। লোক পাঠান আমারও

---

* রাজসিংহের নির্ম্মিত সরোবর।

ইচ্ছা।

তখন রাজসিংহ একখানি সবিনয় পত্র লিখিয়া, বিক্রম সোলাঙ্কির নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। চঞ্চলকুমারীও মাতার আশীর্ব্বাদ কামনা করিয়া একখানা পত্র লিখিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : অগ্নি জ্বালিবার প্রয়োজন

রূপনগরের অধিপতির উত্তর, উপযুক্ত সময়ে পৌঁছিল। উত্তর বড় ভয়ানক। তাহার মর্ম্ম এই–রাজসিংহকে তিনি লিখিতেছেন, "আপনি রাজপুতানার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। রাজপুতানার মুকুটস্বরূপ। এক্ষণে আপনি রাজপুতের নামে কলঙ্ক দিতে প্রস্তুত। আপনি বলপূর্ব্বক আমার অপমান করিয়া, আমার কন্যাকে হরণ করিয়াছেন। আমার কন্যা পৃথিবীশ্বরী হইত, আপনি তাহাতে বাদ সাধিয়াছেন। আপনারও শত্রুতা করা আমার কর্ত্তব্য। আমার সম্মতিক্রমে আপনি আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

"আপনি বলিতে পারেন, সেকালে ক্ষত্রিয়বীরেরা কন্যা হরণ করিয়া বিবাহ করিতেন। ভীষ্ম, অর্জ্জুন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কন্যাহরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আপনার সে বলবীর্য্য কই? আপনার বাহুতে যদি বল আছে, তবে হিন্দুস্থানে মোগল বাদশাহ কেন? শৃগাল হইয়া সিংহের অনুকরণ করা কর্ত্তব্য নহে। আমিও রাজপুত, মুসলমানকে কন্যা দান করিলে আমার গৌরব বৃদ্ধি পাইবে না জানি। কিন্তু না দিলে মোগল রূপনগরের পাহাড়ের একখানি পাথরও রাখিবে না। যদি আমি আপনি আত্মরক্ষা করিতে পারিতাম, কি কেহ আমাকে রক্ষা করিবে জানিতাম, তবে আমিও ইহাতে সম্মত হইতাম না। যখন জানিব যে, আপনার সে ক্ষমতা আছে, তখন না হয় আপনাকে কন্যাদান করিব।

"সত্য বটে, পূর্ব্বকালে ক্ষত্রিয় রাজগণ কন্যাহরণ করিয়া বিবাহ করিতেন, কিন্তু এমন চাতুরী মিথ্যা প্রবঞ্চনা কেহই করিতেন না। আপনি আমার কাছে লোক পাঠাইয়া মিথ্যা কথা বলিয়া, আমার সেনা লইয়া গিয়া আমারই কন্যা হরণ করিলেন;–নচেৎ আপনার সাধ্য হয় নাই। ইহাতে আমার কতটা অনিষ্ট সাধিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন। মোগল বাদশাহ মনে করিবেন, যখন আমার সৈন্য যুদ্ধ করিয়াছে, তখন আমারই কুচক্রে আমার কন্যা অপহৃত হইয়াছে। অতএব নিশ্চয়ই আগে রূপনগর ধ্বংস করিয়া, তবে আপনার দণ্ডবিধান করিবেন। আমিও যুদ্ধ করিতে জানি, কিন্তু মোগলের লক্ষ লক্ষ ফৌজের কাছে কার সাধ্য অগ্রসর হয়? এই জন্য প্রায় সকল রাজপুত তাঁহার পদানত হইয়া আছে–আমি কোন্ ছার?

"জানি না, এখন তাঁহার কাছে সত্য কথা বলিয়া নিষ্কৃতি পাইব কি না। কিন্তু আপনি যদি আমার কন্যা বিবাহ করেন, তাঁহাকে সে কন্যা দিবার আর যদি পথ না থাকে, তবে আমার বা আমার কন্যার নিষ্কৃতির আর কোন উপায় থাকিবে না।

"আপনি আমার কন্যা বিবাহ করিবেন না। করিলে আপনাদিগকে আমার শাপগ্রস্ত হইতে হইবে। আমি শাপ দিতেছি যে, তাহা হইলে আমার কন্যা বিধবা, সহগমনে বঞ্চিতা, মৃতপ্রজা এবং চিরদুঃখিনী হইবে। এবং আপনার রাজধানী শৃগাল-কুকুরের বাসভূমি হইবে।"

বিক্রম সোলাঙ্কি এই ভীষণ অভিসম্পাতের পর নীচে এক ছত্র লিখিয়া দিলেন, "যদি আপনাকে কখনও উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিবার কারণ পাই, তবে ইচ্ছাপূর্ব্বক আমি আপনাকে কন্যা দান করিব।"

চঞ্চলকুমারীর মাতা পত্রের কোন উত্তর দিলেন না। তাঁহার পিতার পত্র রাজসিংহ চঞ্চলকুমারীকে পড়িয়া শুনাইলেন। চঞ্চলকুমারী চারি দিক্ অন্ধকার

দেখিল।

চঞ্চলকুমারী অনেকক্ষণ নীরব হইয়া থাকিলে, রাণা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এক্ষণে কি করিব? পরিণয় বিধেয় কি না?"

চঞ্চলকুমারী–চক্ষের এক বিন্দু, বিন্দুমাত্র জল মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "বাপের এ অভিসম্পাত মাথায় করিয়া কোন্ কন্যা বিবাহ করিতে সাহস করিবে?

রাণা। তবে যদি পিতৃগৃহে ফিরিয়া যাইবার অভিপ্রায় কর, তবে পাঠাইতে পারি।

চঞ্চল। কাজেই তাই। কিন্তু পিতৃগৃহে যাওয়াও যা, দিল্লী যাওয়াও তাই। তাহার অপেক্ষা বিষপান কিসে মন্দ?

রাণা। আমার এক পরামর্শ শুন। তুমিই আমার যোগ্য মহিষী, আমি সহসা তোমাকে ত্যাগ করিতে পারিতেছি না। কিন্তু তোমার পিতার আশীর্ব্বাদ ব্যতীতও তোমাকে বিবাহ করিব না। সে আশীর্ব্বাদের ভরসা আমি একেবারে ত্যাগ করিতেছি না। মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ নিশ্চিত। একলিঙ্গ* আমার সহায়। আমি সে যুদ্ধে হয় মরিব, নয় মোগলকে পরাজিত করিব।

চঞ্চল। আমার স্থির বিশ্বাস, মোগল আপনার নিকট পরাজিত হইবে।

রাণা। সে অতিশয় দুঃসাধ্য কাজ। যদি সফল হই, তবে নিশ্চিত তোমার পিতার আশীর্ব্বাদ পাইব।

চঞ্চল। তত দিন?

রাণা। তত দিন তুমি আমার অন্তঃপুরে থাক। মহিষীদিগের ন্যায় তোমার পৃথক্ রেউলা= হইবে। মহিষীদিগের ন্যায় তোমারও দাসদাসী পরিচর্য্যার ব্যবস্থা করিব। আমি প্রচার করিব যে, অল্পদিনের মধ্যে তুমি আমার মহিষী হইবে। এবং সেই বিবেচনায় সকলেই তোমাকে মহিষীদিগের ন্যায় মহারাণী বলিয়া সম্বোধন করিবে। কেবল যত দিন না তোমার সঙ্গে আমার যথাশাস্ত্র বিবাহ হয়, তত দিন আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব না। কি বল?

চঞ্চলকুমারী বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, "ইহার অপেক্ষা সুব্যবস্থা এক্ষণে আর কিছু হইতে পারে না।" কাজেই সম্মত হইলেন। রাজসিংহও যেরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, সেইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : অগ্নি জ্বালিবার আরও প্রয়োজন

মাণিকলালের কাছে নির্ম্মল শুনিল যে, চঞ্চলকুমারী রাজমহিষী হইলেন। কিন্তু কবে বিবাহ হইল, বিবাহ হইয়াছে কি না, তাহা মাণিকলাল কিছুই বলিতে পারিল না। নির্ম্মল তখন স্বয়ং চঞ্চলকুমারীকে দেখিতে আসিলেন।

অনেক দিনের পর নির্ম্মলকে দেখিয়া চঞ্চলকুমারী অত্যন্ত আনন্দিতা হইলেন। সে দিন নির্ম্মলকে যাইতে দিলেন না। রূপনগর পরিত্যাগ করার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা পরস্পর পরস্পরের কাছে সবিস্তারে বলিলেন। নির্ম্মলের সুখ শুনিয়া চঞ্চলকুমারী আহ্লাদিতা হইলেন। সুখ–কেন না, মাণিকলাল রাণার কাছে অনেক পুরস্কার পাইয়াছিলেন–অনেক টাকা হইয়াছে; তার পর, মাণিকলাল রাণার অনুগ্রহে সৈন্যমধ্যে অতি উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; এবং রাজসম্মানে গৌরবান্বিত হইয়াছেন; নির্ম্মলের উচ্চ অট্টালিকা, ধন, দৌলত, দাস দাসী সব হইয়াছে, এবং মাণিকলাল তাঁহার কেনা গোলাম হইয়াছে। পক্ষান্তরে, নির্ম্মল,

---

* রাণাদিগের কুলদেবতা–মহাদেব।

= অবরোধ।

চঞ্চলকুমারীর দুঃখ শুনিয়া অতিশয় মর্ম্মাহত হইল। এবং চঞ্চলকুমারীর পিতামাতা, রাজসিংহ এবং চঞ্চলকুমারীর উপর অতিশয় বিরক্ত হইল। চঞ্চলকুমারীকে সে মহারাণী বলিয়া ডাকিতে অস্বীকৃত হইল–এবং মহারাণার সাক্ষাৎ পাইলে, তাঁহাকে দুই কথা শুনাইয়া দিবে, প্রতিজ্ঞা করিল। চঞ্চলকুমারী বলিল, "সে সকল কথা এখন থাক্। আমার সঙ্গে আমার একটি চেনা লোক নাই। আত্মীয় স্বজন কেহ নাই। আমি এ অবস্থায় এখানে থাকিতে পারি না। যদি ভগবান্ তোমাকে মিলাইয়াছেন, তবে আমি তোমাকে ছাড়িব না। তোমাকে আমার কাছে থাকিতে হইবে।"

শুনিয়া, প্রথমে নির্ম্মলের বোধ হইল, যেন বুকের উপর পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িল। এই সে সবে স্বামী পাইয়াছে–নূতন প্রণয়, নূতন সুখ, এ সব ছাড়িয়া কি চঞ্চলকুমারীর কাছে আসিয়া থাকা যায়? নির্ম্মলকুমারী হঠাৎ সম্মত হইতে পারিল না–কোন মিছা ওজর করিল না–কিন্তু আসল কথা ভাঙ্গিয়াও বলিতে পারিল না। বলিল, "ও বেলা বলিব।"

চঞ্চলকুমারীর চক্ষে একটু জল আসিল; মনে মনে বলিল, "নির্ম্মলও আমায় ত্যাগ করিল! হে ভগবান! তুমি যেন আমায় ত্যাগ করিও না।" তার পর চঞ্চলকুমারী একটু হাসিল, বলিল, "নির্ম্মল, তুমি আমার জন্য একা পদব্রজে রূপনগর হইতে চলিয়া আসিয়া মরিতে বসিয়াছিলে! আর আজ! আজ তুমি স্বামী পাইয়াছ!"

নির্ম্মল অধোবদন হইল। আপনাকে শত ধিক্কার দিল; বলিল, "আমি ও বেলা আসিব, যাহাকে মালিক করিয়াছি, তাহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। আর একটা মেয়ে ঘাড়ে পড়িয়াছে, তাহার একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

চঞ্চল। মেয়ে না হয়, এখানে আনিলে?

নির্ম্মল। সে খ্যান্ খ্যান্ প্যান্ প্যান্ এখানে কাজ নাই। একটা পাতান রকম পিসী আছে–সেটাকে ডাকিয়া বাড়ীতে বসাইয়া আসিব।

এই সকল পরামর্শের পর নির্ম্মলকুমারী বিদায় লইল। গৃহে গিয়া মাণিকলালকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল। মাণিকলালও নির্ম্মলকে বিদায় দিতে বড় কষ্ট বোধ করিল। কিন্তু সে নিতান্ত প্রভুভক্ত, আপত্তি করিল না। পিসীমা আসিয়া কন্যাটির ভার লইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : সে প্রয়োজন কি?

নির্ম্মল শিবিকারোহণে দাস দাসী সঙ্গে লইয়া রাণার অন্তঃপুরাভিমুখে চলিতেছেন। পথিমধ্যে বড় চক বা চৌক। তাহার একটা বাড়ীতে বড় লোকের ভিড়। নির্ম্মলের দোলা বহুমূল্য বস্ত্রে আবৃত ছিল। কিন্তু জনমর্দ্দের শব্দে তিনি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, আবরণ উদ্ঘাটিত করিয়া দেখিলেন। একজন পরিচারিকাকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি এ?" শুনিলেন, একজন বিখ্যাত "জ্যোতিষী," এই বাড়ীতে থাকে। সহস্র সহস্র লোক তাহার কাছে প্রত্যহ গণনা করাইতে আসে। যাহারা গণাইতে আসিয়াছে, তাহারাই ভিড় করিয়াছে, নির্ম্মল আরও শুনিলেন, এই জ্যোতিষী সকল প্রকার প্রশ্ন গণিতে পারে। এবং যাহাকে যাহা বলিয়া দিয়াছে, তাহা ঠিক ফলিয়াছে। নির্ম্মল তখন দাসীদিগকে বলিলেন, "সঙ্গের পাইকদিগকে বল, লোক সকল সরাইয়া দেয়। আমি ভিতরে গিয়া গণনা করাইব। কিন্তু আমার পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই।"

পাইকদিগের বল্লমের গুঁতায় লোক সকল সরিল–নির্ম্মলের শিবিকা জ্যোতিষীর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। যে গণাইতে বসিয়াছিল–সে উঠিয়া গেলে নির্ম্মল গিয়া প্রশ্নকর্ত্তার আসনে বসিল। জ্যোতিষীকে প্রণাম করিয়া কিঞ্চিৎ দর্শনী অগ্রিম দিল। জ্যোতিষী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তুমি কি গণাইবে?"

নির্ম্মল বলিল, "আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিব, তাহা গণিয়া বলিয়া দিন।"

জ্যোতিষী। প্রশ্ন। ভাল, বল।

নির্ম্মল বলিল, "আমার এক প্রিয়সখী আছেন।"

জ্যোতিষী একটু কি লিখিল। বলিল, "তার পর?"

নির্ম্মল বলিল, "তিনি অবিবাহিতা।"

জ্যোতিষী আবার লিখিল। বলিল, "তার পর?"

নির্ম্মল। তাঁর কবে বিবাহ হইবে?

জ্যোতিষী আবার লিখিল। পরে খড়ি পাতিতে লাগিল। লগ্নসারণী দেখিল। শঙ্কুপট্ট দেখিল। নির্ম্মলকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। অনেক অঙ্ক কষিল। অনেক পুথি খুলিয়া পড়িল। শেষে নির্ম্মলের দিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়িল।

নির্ম্মল বলিল, "বিবাহ হইবে না?"

জ্যোতিষী। প্রায় সেইরূপ উত্তর শাস্ত্রে লেখে।

নির্ম্মল। প্রায় কেন?

জ্যোতিষী। যদি সসাগরা পৃথিবীপতির মহিষী আসিয়া কখন তোমার সখীর পরিচর্য্যা করে, তখন বিবাহ হইবে। নহিলে হইবে না। তাহা অসম্ভব বলিয়াই বলিতেছি, বিবাহ হইবে না।

অসম্ভব বটে!" বলিয়া নির্ম্মল জ্যোতিষীকে আরও কিছু দিয়া চলিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : আগুন জ্বালিবার প্রস্তাব

চঞ্চলকুমারীর হরণে ভারতবর্ষে যে আগুন জ্বলিল, তাহাতে হয় মোগল সাম্রাজ্য, নয় রাজপুতানা ধ্বংস প্রাপ্ত হইত। কেবল মহারাণা রাজসিংহের দয়া-দাক্ষিণ্যের জন্য এতটা হইতে পারে নাই। সেই আশ্চর্য্য ঘটনাপরম্পরা বিবৃত করা, উপন্যাস গ্রন্থের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। তবে কিছু কিছু না বলিলেও এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট বুঝা যাইবে না।

রূপনগরের রাজকুমারীর হরণ-সংবাদ দিল্লীতে আসিয়া পৌঁছিল। দিল্লীতে অত্যন্ত কোলাহল পড়িয়া গেল। বাদশাহ রাগে স্বসৈন্যের নেতৃগণের মধ্যে কাহাকে পদচ্যুত, কাহাকে আবদ্ধ, কাহাকে বা নিহত করিলেন। কিন্তু যাহারা প্রধান অপরাধী–চঞ্চলকুমারী এবং রাজসিংহ–তাঁহাদের তত শীঘ্র দণ্ডিত করা দুঃসাধ্য। কেন না, যদিও মেবার ক্ষুদ্র রাজ্য, তথাপি বড় "কঠিন ঠাঁই।" চারি দিকে দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতমালার প্রাচীর, রাজপুতেরা সকলেই বীরপুরুষ, এবং রাজসিংহ হিন্দুবীরচূড়ামণি। এ অবস্থায় রাজপুত কি করিতে পারে, তাহা প্রতাপসিংহ, আকব্বর শাহকেও শিখাইয়াছিল। দুনিয়ার বাদশাহকে কিল খাইয়া কিছু দিনের জন্য কিল চুরি করিতে হইল।

কিন্তু ঔরঙ্গজেব কাহারও উপর রাগ সহ্য করিবার লোক নহে। হিন্দুর অনিষ্ট করিতে তাঁহার জন্ম, হিন্দুর অপরাধ বিশেষ অসহ্য। একে হিন্দু মারহাট্টা পুনঃ পুনঃ অপমান করিয়াছে, আবার রাজপুত অপমান করিল। মারহাট্টার বড় কিছু করিতে পারেন নাই, রাজপুতের হঠাৎ কিছু করিতে পারিতেছেন না। অথচ বিষ

উদ্গীরণ করিতে হইবে। অতএব রাজসিংহের অপরাধে সমস্ত হিন্দুজাতির পীড়নই অভিপ্রেত করিলেন।

আমরা এখন ইন্‌কম্ টেক্‌শকে অসহ্য মনে করি, তাহার অধিক অসহ্য একটা "টেক্‌শ" মুসলমানি আমলে ছিল। তাহার অধিক অসহ্য—কেন না, এই "টেক্‌শ" মুসলমানকে দিতে হইত না; কেবল হিন্দুকেই দিতে হইত। ইহার নাম জেজেয়া। পরম রাজনীতিজ্ঞ আকব্বর বাদশাহ, ইহার অনিষ্টকারিতা বুঝিয়া, ইহা উঠাইয়া দিয়াছিলেন। সেই অবধি উহা বন্ধ ছিল। এক্ষণে হিন্দুদ্বেষী ঔরঙ্গজেব তাহা পুনর্ব্বার স্থাপন করিয়া হিন্দুর যন্ত্রণা বাড়াইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইতিপূর্ব্বেই বাদশাহ, জেজেয়ার পুনরাবির্ভাবের আজ্ঞা প্রচারিত করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ হইল। হিন্দুরা ভীত, অত্যাচারগ্রস্ত, মর্ম্মপীড়িত হইল। যুক্তকরে সহস্র সহস্র হিন্দু বাদশাহের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিল, কিন্তু ঔরঙ্গজেবের ক্ষমা ছিল না। শুক্রবারে যখন বাদশাহ মসজিদে ঈশ্বরকে ডাকিতে যান, তখন লক্ষ লক্ষ হিন্দু সমবেত হইয়া তাঁহার নিকট রোদন করিতে লাগিল। দুনিয়ার বাদশাহ দ্বিতীয় হিরণ্যকশিপুর মত আজ্ঞা দিলেন, "হস্তীগুলা পদতলে ইহাদিগকে দলিত করুক।" সেই বিষম জনমর্দ্দ হস্তিপদতলে দলিত হইয়া নিবারিত হইল।

ঔরঙ্গজেবের অধীন ভারতবর্ষ জেজেয়া দিল। ব্রহ্মপুত্র হইতে সিন্ধুতীর পর্য্যন্ত হিন্দুর দেবপ্রতিমা, চূর্ণীকৃত, বহুকালের গগনস্পর্শী দেবমন্দির সকল ভগ্ন ও বিলুপ্ত হইতে লাগিল, তাহার স্থানে মুসলমানের মসজিদ প্রস্তুত হইতে লাগিল। কাশীতে বিশ্বেশ্বরের মন্দির গেল; মথুরায় কেশবের মন্দির গেল; বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর যাহা কিছু স্থাপত্যকীর্ত্তি ছিল চিরকালের জন্য তাহা অন্তর্হিত হইল।

ঔরঙ্গজেব এক্ষণে আজ্ঞা দিলেন যে, রাজপুতানার রাজপুতেরাও জেজেয়া দিবে। রাজপুতানার প্রজা তাঁহার প্রজা নহে, তথাপি হিন্দু বলিয়া তাহাদের উপর এ দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হইল। রাজপুতেরা প্রথমে অস্বীকৃত হইল; কিন্তু উদয়পুর ভিন্ন আর সর্ব্বত্র রাজপুতানা কর্ণধারবিহীন নৌকার ন্যায় অচল। জয়পুরের জয়সিংহ—যাঁহার বাহুবল মোগল সাম্রাজ্যের একটি প্রধান অবলম্বন ছিল, তিনি এক্ষণে গতাসু;—বিশ্বাসঘাতক বন্ধুহন্তা ঔরঙ্গজেবের কৌশলে বিষপ্রয়োগ দ্বারা তাঁহার মৃত্যু সাধিত হইয়াছিল। তাঁহার বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র দিল্লীতে আবদ্ধ। সুতরাং জয়পুর জেজেয়া দিল।

যোধপুরের যশোবন্ত সিংহও লোকান্তরগত। তাঁহার রাণী এখন রাজপ্রতিনিধি। স্ত্রীলোক হইয়াও তিনি বাদশাহের কর্ম্মচারীদিগকে হাঁকাইয়া দিলেন। ঔরঙ্গজেব তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। স্ত্রীলোক যুদ্ধের ধমকে ভয় পাইলেন। রাণী জেজেয়া দিলেন না, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে রাজ্যের কিয়দংশ ছাড়িয়া দিলেন।

রাজসিংহ জেজেয়া দিলেন না। কিছুতেই দিবেন না; সর্ব্বস্ব পণ করিলেন। জেজেয়া সম্বন্ধে ঔরঙ্গজেবকে একখানি পত্র লিখিলেন। রাজপুতানার ইতিহাসবেত্তা সেই পত্রসম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "The Rana remonstrated by letter, in the name of the nation of which he was the head, in a style of such uncompromising dignity, such lofty yet temperate resolve, so much of soul-stirring rebuke mingled with a boundless and tolerating benevolence, such elevating excess of the Divinity with such pure philanthropy, that it may challenge competition with any epistolary production of any age, clime or condition." *পত্রখানি বাদশাহের ক্রোধানলে ঘৃতাহুতি দিল।

বাদশাহ রাজসিংহের উপর আজ্ঞা প্রচার করিলেন, জেজেয়া ত দিতে হইবেই, তাহা ছাড়া রাজ্যে গোহত্যা করিতে দিতে হইবে, এবং দেবালয় সকল ভাঙ্গিতে হইবে। রাজসিংহ যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

---

* Tod's Rajasthan—Vol. 1, page 381.

ঔরঙ্গজেবও যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এরূপ ভয়ানক যুদ্ধের উদ্যোগ করিলেন যে, তিনি কখন এমন আর করেন নাই। চীনের সম্রাট, কি পারস্যের রাজা তাঁহার প্রতিদ্বন্দী হইলে যে উদ্যোগ করিতেন না, এই ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজার বিরুদ্ধে সেই উদ্যোগ করিলেন। অর্দ্ধেক আসিয়ার অধিপতি সের (Xerxes) যেমন ক্ষুদ্র গ্রীসরাজ্য জয় করিবার জন্য আয়োজন করিয়াছিলেন, সপ্তদশ শতাব্দীর সের, ক্ষুদ্র রাজা রাণা রাজসিংহকে পরাজয় করিবার জন্য সেইরূপ উদ্যোগ করিয়াছিলেন। এই দুইটি ঘটনা পরস্পর তুলনীয়, ইহার তৃতীয় তুলনা আর নাই। আমরা গ্রীক ইতিহাস মুখস্থ করিয়া মরি—রাজসিংহের ইতিহাসের কিছুই জানি না। আধুনিক শিক্ষার সুফল!

ষষ্ঠ খণ্ড

অগ্নির উৎপাদন

প্রথম পরিচ্ছেদ : অরণিকাষ্ঠ—উর্ব্বশী

রাজসিংহ যে তীব্রঘাতী পত্র ঔরঙ্গজেবকে লিখিয়াছিলেন, তৎপ্রেরণ হইতে এই অগ্ন্যুৎপাদন খণ্ড আরম্ভ করিতে হইবে। সেই পত্র ঔরঙ্গজেবের কাছে কে লইয়া যাইবে, তাহার মীমাংসা কঠিন হইল। কেন না, যদিও দূত অবধ্য, তথাপি পাপে কুণ্ঠাশূন্য ঔরঙ্গজেব অনেক দূত বধ করিয়াছিলেন, ইহা প্রসিদ্ধ। অতএব প্রাণের শঙ্কা রাখে, অন্ততঃ এমন সুচতুর নয় যে, আপনার প্রাণ বাঁচাইতে পারে, এমন লোককে পাঠাইতে রাজসিংহ ইচ্ছুক হইলেন না। তখন মাণিকলাল আসিয়া প্রার্থনা করিল যে, আমাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করা হউক। রাজসিংহ উপযুক্ত পাত্র পাইয়া তাহাকেই এই কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

এ সংবাদ শুনিয়া চঞ্চলকুমারী, নির্ম্মলকুমারীকে ডাকিলেন। বলিলেন, "তুমিও কেন তোমার স্বামীর সঙ্গে যাও না?"

নির্ম্মল বিস্মিত হইয়া বলিল, "কোথা যাব? দিল্লী? কেন?"

চঞ্চল। একবার বাদশাহের রঙ্‌মহালটা বেড়াইয়া আসিবে।

নির্ম্মল। শুনিয়াছি, সে না কি নরক।

চঞ্চল। নরকে কি কখন তোমায় যাইতে হইবে না? তুমি গরিব বেচারা মাণিকলালের উপর যে দৌরাত্ম্য কর, তাহাতে তোমার নরক হইতে নিস্তার নাই।

নির্ম্মল। কেন, সুন্দর দেখে বিয়ে করেছিল কেন?

চঞ্চল। সে বুঝি তোমায় গাছতলায় মরিয়া পড়িয়া থাকিতে সাধিয়াছিল?

নির্ম্মল। আমি ত আর তাকে ডাকি নাই। এখন সে ভূতের বোঝা বহিয়া দিল্লী গিয়া কি করিব বলিয়া দাও।

চঞ্চল। উদিপুরীকে নিমন্ত্রণপত্র দিয়া আসিতে হইবে।

নির্ম্মল। কিসের?

চঞ্চল। তামাকু সাজার।

নির্ম্মল। বটে, কথাটা মনে ছিল না। পৃথিবীশ্বরী তোমার পরিচর্য্যা না করিলে, তোমারও ভূতের বোঝা মিলিবে না।

চঞ্চল। দূর হ পাপিষ্ঠা! আমিই এখন ভূতের বোঝা। হয়, বাদশাহের বেগম আমার দাসী হইবে–নহিলে আমাকে বিষ খাইতে হইবে। গণকের ত এই গণনা।

নির্ম্মল। তা, পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলেই কি বেগম আসিবে?

চঞ্চল। না। আমার উদ্দেশ্য বিবাদ বাধান। আমার বিশ্বাস, বিবাদ বাধিলেই মহারাণার জয় হইবে। আর বেগম বাঁদী হইবে। আর উদ্দেশ্য, তুমি বেগমদিগকে চিনিয়া আসিবে।

নির্ম্মল। তা কি প্রকারে এ কাজ পারিব, বলিয়া দাও।

চঞ্চল। আমি বলিয়া দিতেছি। তুমি জান যে, যোধুপুরী বেগমের পাঞ্জাটা আমার কাছে আছে। সেই পাঞ্জা তুমি লইয়া যাও। তাহার গুণে তুমি রঙ্‌মহালে প্রবেশ করিতে পারিবে। এবং তাহার গুণে তুমি যোধপুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারিবে। তাঁহাকে সবিশেষ বৃত্তান্ত বলিবে। আমি উদিপুরীর নামে যে পত্র দিতেছি, তাহা তাঁহাকে দেখাইবে। তিনি ঐ পত্র কোন প্রকারে, উদিপুরীর কাছে পাঠাইয়া দিবেন। যেখানে নিজের বুদ্ধিতে কুলাইবে না, সেখানে স্বামীর বুদ্ধি হইতে কিছু ধার লইও।

নির্ম্মল। ইঃ! আমি যাই মেয়ে, তাই তার সংসার চলে।

হাসিতে হাসিতে নির্ম্মলও পত্র লইয়া চলিয়া গেল। এবং যথাকালে স্বামীর সঙ্গে, উপযুক্ত লোকজন সমভিব্যাহারে দিল্লীযাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : অরণিকাষ্ঠ–পুরুরবা

উদ্যোগ মাণিকলালেরই বেশী। তাহার একটা নমুনা সে একদিন নির্ম্মলকুমারীকে দেখাইল। নির্ম্মল সবিস্ময়ে দেখিল, তাহার একটা আঙ্গুলের স্থানে আবার নূতন আঙ্গুল হইয়াছে। সে মাণিকলালকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ আবার কি?"

মাণিকলাল বলিল, "গড়াইয়াছি।"

নির্ম্মল। কিসে?

মাণিক। হাতীর দাঁতে। কল কব্জা বেমালুম লাগাইয়াছি, তাহার উপর ছাগলের পাতলা চামড়া মুড়িয়া আমার গায়ের মত রঙ করাইয়াছি। ইচ্ছানুসারে খোলা যায়, পরা যায়।

নির্ম্মল। এর দরকার?

মাণিক। দিল্লীতে জানিতে পারিবে। দিল্লীতে ছদ্মবেশের দরকার হইতে পারে। আঙ্গুলকাটার ছদ্মবেশ চলে না। কিন্তু দুই রকম হইলে খুব চলে।

নির্ম্মল হাসিল। তার পর মাণিকলাল একটি পিঞ্জরমধ্যে একটা পোষা পায়রা লইল। এই পারাবতটি অতিশয় সুশিক্ষিত। দৌত্যকার্য্যে সুনিপুণ। যাঁহারা আধুনিক ইউরোপীয় যুদ্ধে 'Carrier-pigeon' গুলির গুণ অবগত আছেন, তাঁহারা ইহা বুঝিতে পারিবেন। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে এই জাতীয় শিক্ষিত পারাবতের ব্যবহার চলিত ছিল। পারাবতের গুণ মাণিকলাল সবিশেষ নির্ম্মলকুমারীকে বুঝাইয়া দিলেন।

রীতি ছিল যে, দিল্লীর বাদশাহের নিকট দূত পাঠাইতে হইলে, কিছু উপঢৌকন সঙ্গে পাঠাইতে হয়। ইংলণ্ড, পর্ত্তুগাল প্রভৃতির রাজারাও তাহা পাঠাইতেন। রাজসিংহও কিছু দ্রব্যসামগ্রী মাণিকলালের সঙ্গে পাঠাইলেন। তবে অপ্রণয়ের দৌত্য, বেশী সামগ্রী পাঠাইলেন না।

অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত, মণিরত্নখচিত কারুকার্য্যযুক্ত কতকগুলি সামগ্রী পাঠাইলেন। মাণিকলাল তাহা পৃথক বাহনে বোঝাই করিয়া লইলেন।

অবধারিত দিবসে রাণার আজ্ঞালিপি ও পত্র লইয়া, নির্ম্মলকুমারী সমভিব্যাহারে দাস দাসী, লোকজন, হাতী ঘোড়া, উট বলদ, শকট, এক্কা, দোলা, রেশালা প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া বড় ঘটার সহিত মাণিকলাল যাত্রা করিলেন। যাইতে অনেক দিন লাগিল। দিল্লীর কয় ক্রোশ মাত্র বাকি থাকিতে, মাণিকলাল তাম্বু ফেলিয়া নির্ম্মলকুমারীকে ও অন্যান্য লোকজনকে তথায় রাখিয়া, একজন মাত্র বিশ্বাসী লোক সঙ্গে লইয়া দিল্লী চলিল। আর সেই পাথরের সামগ্রীগুলিও সঙ্গে লইল। গড়া আঙ্গুল খুলিয়া নির্ম্মলকুমারীর কাছে রাখিয়া গেল। বলিল, "কাল আসিব।"

নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি?"

মাণিকলাল একখানা পাথরের জিনিস নির্ম্মলকে দেখাইয়া, তাহাতে একটি ক্ষুদ্র চিহ্ন দেখাই। বলিল, "সকলগুলিতেই এইরূপ চিহ্ন দিয়াছি।"

নির্ম্মল। কেন?

মাণিক। দিল্লীতে তোমাতে আমাতে ছাড়াছাড়ি অবশ্য হইবে। তারপর যদি মোগলের প্রতিবন্ধকতায়, পরস্পরের সন্ধান না পাই, তাহা হইলে, তুমি পাথরের জিনিস কিনিতে বাজারে পাঠাইও। যে দোকানের জিনিসে তুমি এই চিহ্ন দেখিবে, সেই দোকানে আমার সন্ধান করিও।

এইরূপ পরামর্শ আঁটিয়া মাণিকলাল বিশ্বাসী লোকটি ও প্রস্তরনির্ম্মিত দ্রব্যগুলি লইয়া দিল্লী গেল। সেখানে গিয়া, একখানা ঘর ভাড়া লইয়া, পাথরের দোকান সাজাইয়া, ঐ সমভিব্যাহারী লোকটিকে দোকানদার সাজাইয়া, শিবিরে ফিরিয়া আসিল।

পরে সমস্ত ফৌজ ও রেশালা এবং নির্ম্মলকুমারীকে লইয়া পুনর্ব্বার দিল্লী গেল। এবং সেখানে যথারীতি শিবির সংস্থাপিত করিয়া বাদশাহের নিকট সংবাদ পাঠাইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : অগ্নিচয়ন

অপরাহ্নে ঔরঙ্গজেব দরবারে আসীন হইলে, মাণিকলাল সেখানে গিয়া হাজির হইলেন। দিল্লীর বাদশাহের আমখাস অনেক গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, এখানে তাহার বিস্তারিত বর্ণনা আমার অভিপ্রেত নহে। মাণিকলাল প্রথম সোপানাবলী আরোহণ করিয়া একবার কুর্ণিশ করিলেন। তার পর উঠিতে হইল। একপদ উঠিয়া আবার কুর্ণিশ—আবার একপদ উঠিয়া আবার কুর্ণিশ। এইরূপ তিনবার উঠিয়া তক্তে তাউস সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। মাণিকলাল অভিবাদন করিয়া রাজসিংহপ্রেরিত সামান্য উপহার বাদশাহের সম্মুখে অর্পিত করিলেন। নজরের অনর্ঘ্যতা দেখিয়া ওরঙ্গজেব রুষ্ট হইলেন, কিন্তু মুখে কিছু বলিলেন না। প্রেরিত দ্রব্যের মধ্যে দুইখানি তরবারি ছিল; একখানি কোষে আবৃত, আর একখানি নিষ্কোষ। ঔরঙ্গজেব নিষ্কোষ অসি গ্রহণ করিয়া আর সব উপহার পরিত্যাগ করিলেন।

মাণিকলাল রাজসিংহের পত্র দিলেন। পত্রার্থ অবগত হইয়া ঔরঙ্গজেব ক্রোধে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি ক্রুদ্ধ হইলে সচরাচর বাহিরে কোপ প্রকাশ করিতেন না। তখন মাণিকলালকে বিশেষ সমাদরের সহিত জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। তাঁহাকে উত্তম বাসস্থান দিবার জন্য বখ্‌শীকে আদেশ করিলেন। এবং

আগামীকল্য মহারাণার পত্রের উত্তর দিবেন বলিয়া মাণিকলালকে বিদায় করিলেন।

তখনই দরবার বরখাস্ত হইল। দরবার হইতে উঠিয়া আসিয়াই ঔরঙ্গজেব মাণিকলালের বধের আজ্ঞা করিলেন; বধের আজ্ঞা হইল, কিন্তু যাহারা মাণিকলালকে বধ করিবে, তাহারা মাণিকলালকে খুঁজিয়া পাইল না। যাহাদিগের প্রতি মাণিকলালের সমাদরের আদেশ হইয়াছিল, তাহারাও খুঁজিয়া পাইল না। দিল্লীর সর্ব্বত্র খুঁজিল কোথাও মাণিকলালকে পাওয়া গেল না। তাহার বধের আজ্ঞা প্রচার হইবার আগেই মাণিকলাল সরিয়া পড়িয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, যখন মাণিকলালের জন্য এত খোঁজ তল্লাস হইতেছিল, তখন সে আপনার পাথরের দোকানে ছদ্মবেশে সওদাগরি করিতেছিল। আহদীরা মাণিকলালকে না পাইয়া, তাঁহার শিবিরে যাহাকে যাহাকে পাইল, তাহাকে তাহাকে ধরিয়া কোতোয়ালের নিকট লইয়া গেল। তাহার মধ্যে নির্ম্মলকুমারীকেও ধরিয়া লইয়া গেল।

কোতোয়াল, অপর লোকদিগের কাছে কিছু সন্ধান পাইলেন না। ভয়প্রদর্শন ও মারপিটেও কিছুই হইল না। তাহারা কোন সন্ধান জানে না, কি প্রকারে বলিবে?

কোতোয়াল শেষ নির্ম্মলকুমারীকে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন—পরদানশীন বলিয়া তাঁহাকে এতক্ষণ তফাৎ রাখা হইয়াছিল। কোতোয়াল এখন নির্ম্মলকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সে উত্তর করিল, “রাণার এল্‌চিকে আমি চিনি না।”

কোতোয়াল। তাহার নাম মাণিকলাল সিংহ।

নির্ম্মল। মাণিকলাল সিংহকে আমি চিনি না।

কো। তুমি রাণার এল্‌চির সঙ্গে উদয়পুর হইতে আস নাই?

নি। উদয়পুর আমি কখন দেখিও নাই।

কো। তবে তুমি কে?

নি। আমি জনাব যোধপুরী বেগমের হিন্দু বাঁদী।

কো। জুনাব যোধপুরী বেগমের বাঁদীরা মহালের বাহিরে আসে না।

নি। আমিও কখন আসি নাই। এইবার হিন্দু এল্‌চি আসিয়াছে শুনিয়া বেগম সাহেবা আমাকে তাহার তাম্বুতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

কো। সে কি? কেন?

নি। কিষণজীর চরণামৃতের জন্য। তাহা সকল রাজপুত রাখিয়া থাকে।

কো। তোমাকে ত একা দেখিতেছি। তুমি মহালের বাহিরেই বা আসিলে কি প্রকারে?

নি। ইহার বলে।

এই বলিয়া নির্ম্মলকুমারী যোধপুরী বেগমের পাঞ্জা বস্ত্রমধ্য হইতে বাহির করিয়া দেখাইল। দেখিয়া কোতোয়াল তিন সেলাম করিল। নির্ম্মলকে বলিল, “তুমি যাও। তোমাকে কেহ আর কিছু বলিবে না।”

নির্ম্মল তখন বলিল, “কোতোয়াল সাহেব! আর একটু মেহেরবানি করিতে হইবে। আমি কখন মহালের বাহির হই নাই। আজ বড় ধর-পাকড় দেখিয়া আমার বড় ভয় হইয়াছে। আপনি যদি দয়া করিয়া একটা আহদী, কি পাইক সঙ্গে দেন, যে আমাকে মহাল পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া আসে, তাহা হইলে বড় ভাল হয়।”

কোতোয়াল তখনই একজন অস্ত্রধারী রাজপুরুষকে উপযুক্ত উপদেশ দিয়া নির্ম্মলকে বাদশাহের অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিলেন। বাদশাহের প্রধানা মহিষীর পাঞ্জা দেখিয়া খোজারা কেহ কিছু আপত্তি করিল না। নির্ম্মলকুমারী একটু চাতুরীর সহিত জিজ্ঞাসাবাদ করিতে করিতে যোধপুরী বেগমের সন্ধান পাইল। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সেই পাঞ্জা দেখাইল। দেখিবামাত্র সতর্ক হইয়া, রাজমহিষী তাহাকে নিভৃতে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। বলিলেন, "তুমি এ পাঞ্জা কোথায় পাইলে?"

নির্ম্মলকুমারী বলিল, "আমি সমস্ত কথা সবিস্তার বলিতেছি।"

নির্ম্মলকুমারী প্রথমে আপনার পরিচয় দিল। তার পর দেবীর রূপনগরে যাওয়ার কথা, সে যাহা বলিয়াছিল, সে কথা, পাঞ্জা দেওয়ার কথা, তার পর চঞ্চল ও নির্ম্মলের যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বলিল। মাণিকলালের পরিচয় দিল। মাণিকলালের সঙ্গে যে নির্ম্মল আসিয়াছিল, চঞ্চলকুমারীর পত্র লইয়া আসিয়াছিল, তাহা বলিল। পরে দিল্লীতে আসিয়া যে প্রকার বিপদে পড়িয়াছিল, তাহা বলিল; যে প্রকারে উদ্ধার পাইয়া, যে কৌশলে মহাল মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা বলিল। পরে চঞ্চলকুমারী উদিপুরীর জন্য যে পত্র দিয়াছিলেন, তাহা দিল। শেষ বলিল, "এই পত্র কি প্রকারে উদিপুরী বেগমের কাছে পৌঁছাইতে পারিব, সেই উপদেশ পাইবার জন্যই আপনার কাছে আসিয়াছি।"

রাজমহিষী বলিলেন, "তাহার কৌশল আছে। জেব-উন্নিসা বেগমের হুকুমের সাপেক্ষ। তাহা এখন চাহিতে গেলে গোলযোগ হইবে, রাত্রে যখন এই পাপিষ্ঠারা শরাব খাইয়া বিহ্বল হইবে, তখন সে উপায় হইবে। এখন তুমি আমার হিন্দু বাঁদীদিগের মধ্যে থাক। হিন্দুর অন্নজল খাইতে পাইবে।"

নির্ম্মলকুমারী সম্মত হইলেন। বেগম সেইরূপ আজ্ঞা প্রচার করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : সমিধসংগ্র–উদিপুরী

রাত্রি একটু বেশী হইলে যোধপুরী বেগম নির্ম্মলকে উপযুক্ত উপদেশ দিয়া, একজন তুর্কী (তাতারী) প্রহরিণী সঙ্গে দিয়া জেব-উন্নিসার কাছে পাঠাইয়া দিলেন। নির্ম্মল জেব-উন্নিসার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া আতর-গোলাপের, পুষ্পরাশির, এবং তামাকুর সদ্‌গন্ধে বিমুগ্ধ হইল। নানাবিধ রত্নরাজিখচিত হর্ম্যতল, শয্যাভরণ, এবং গৃহাভরণ দেখিয়া বিস্মিত হইল। সর্ব্বাপেক্ষা জেব-উন্নিসার বিচিত্র, রত্নপুষ্পমিশ্রিত অলঙ্কারপ্রভায়, চন্দ্রসূর্য্যতুল্য উজ্জ্বল সৌন্দর্য্যপ্রভায় চমকিত হইল। এই সকলে সজ্জিতা পাপিষ্ঠা জেব-উন্নিসাকে দেবলোকবাসিনী অপ্সরা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

কিন্তু অপ্সরার তখন চক্ষু ঢুলু ঢুলু; মুখ রক্তবর্ণ; চিত্ত বিভ্রান্ত; দ্রাক্ষাসুধার তখন পূর্ণাধিকার। নির্ম্মলকুমারী তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলে, তিনি জড়িত রসনায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুই?"

নির্ম্মলকুমারী বলিল, "আমি উদয়পুরের রাজমহিষীর দূতী।"

জেব। মোগল বাদশাহের তক্তে তাউস লইয়া যাইতে আসিয়াছিস?

নির্ম্মল। না। চিঠি লইয়া আসিয়াছি।

জেব। চিঠি কি হইবে? পুড়াইয়া রোশনাই করিবি?

নির্ম্মল। না। উদিপুরী বেগম সাহেবাকে দিব।

জেব। সে বাঁচিয়া আছে, না মরিয়া গিয়াছে?

নির্ম্মল। বোধ হয়, বাঁচিয়া আছেন।

জেব। না। সে মরিয়া গিয়াছে। এ দাসীটাকে কেহ তাহার কাছে লইয়া যা।

জেব-উন্নিসার উন্মত্ত প্রলাপবাক্যের উদ্দেশ্য যে, ইহাকে যমের বাড়ী পাঠাইয়া দাও। কিন্তু তাতারী প্রহরিণী তাহা বুঝিল না। সাদা অর্থ বুঝিয়া নির্ম্মলকুমারীকে উদিপুরী বেগমের কাছে লইয়া গেল।

সেখানে নির্ম্মল দেখিল, উদিপুরীর চক্ষু উজ্জ্বল, হাস্য উচ্চ, মেজাজ বড় প্রফুল্ল। নির্ম্মল খুব একটা বড় সেলাম করিল। উদিপুরী জিজ্ঞাসা করিল, "কে আপনি?"

নির্ম্মল উত্তর করিল, "আমি উদয়পুরের রাজমহিষীর দূতী। চিঠি লইয়া আসিয়াছি।"

উদিপুরী বলিল, "না। না। তুমি ফার্সী মুলুকের বাদশাহ। মোগল বাদশাহের হাত হইতে আমাকে কাড়িয়া লইতে আসিয়াছ।"

নির্ম্মলকুমারী হাসি সামলাইয়া চঞ্চলের পত্রখানি উদিপুরীর হাতে দিল। উদিপুরী তাহা পড়িবার ভাণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "কি লিখেতেছে? লিখিতেছে, অয় নাজ্‌নী! পিয়ারী মেরে! তোমার সুরৎ ও দৌলত শুনিয়া আমি একেবারেই বেহোস্ ও দেওয়ানা হইয়াছি। তুমি শীঘ্র আসিয়া আমার কলিজা ঠাণ্ডা করিবে।' আচ্ছা, তা করিব। হুজুরের সঙ্গে আল্‌বৎ যাইব। আপনি একটু অপেক্ষা করুন—আমি একটু শরাব খাইয়া লই। আপনি একটু শরাব মোলাহেজা করিবেন? আচ্ছা শরাব! ফেরেঙ্গের এল্‌চি ইহা নজর দিয়াছে। এমন শরাব আপনার মুলুকেও পয়দা হয় না।"

উদিপুরী পিয়ালা মুখে তুলিলেন, সেই অবসরে নির্ম্মলকুমারী বহির্গত হইয়া যোধপুরী বেগমের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং যোধপুরীর জিজ্ঞাসামত যেমন যেমন ঘটিয়াছিল, তাহা বলিল। শুনিয়া যোধপুরী বেগম হাসিয়া বলিল, "কাল পত্রখানা ঠিক হইয়া পড়িবে। তুমি এই বেলা পলায়ন কর। নচেৎ কাল একটা গণ্ডগোল হইতে পারে। আমি তোমার সঙ্গে একজন বিশ্বাসী খোজা দিতেছি। সে তোমাকে মহালের বাহির করিয়া তোমার স্বামীর শিবিরে পৌঁছাইয়া দিবে। সেখানে যদি তোমার আত্মীয় স্বজন কাহাকেও পাও, তার সঙ্গে আজই দিল্লীর বাহিরে চলিয়া যাইও। যদি শিবিরে কাহাকেও না পাও, তবে ইহার সঙ্গে দিল্লীর বাহিরে যাইও। তোমার স্বামী বোধ হয়, দিল্লী ছাড়াইয়া কোথাও তোমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। পথে তাঁহার সঙ্গে যদি সাক্ষাৎ না হয়, তাহা হইলে এই খোজাই তোমাকে উদয়পুর পর্য্যন্ত রাখিয়া আসিবে। খরচপত্র তোমার কাছে না থাকে, তবে তাহাও আমি দিতেছি। কিন্তু সাবধান! আমি ধরা না পড়ি।"

নির্ম্মল বলিল, "হজরৎ সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি রাজপুতের মেয়ে।"

তখন যোধপুরী বনাসী নামে তাঁহার বিশ্বাসী খোজাকে ডাকাইয়া যাহা করিতে হইবে, তাহা বুঝাইয়া বলিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখনই যাইতে পারিবে ত?"

বনাসী বলিল, "তা পারিব। কিন্তু বেগম সাহেবার দস্তখতি একখানা পরওয়ানা না পাইলে এত করিতে সাহস হইতেছে না।"

যোধপুরী তখন বলিলেন, "যেরূপ পরওয়ানা চাহি, লিখাইয়া আন, আমি বেগম সাহেবার দস্তখত করাইতেছি।"

খোজা পরওয়ানা লিখাইয়া আনিল। তাহা সেই তাতারী প্রহরিণীর হাতে দিয়া রাজমহিষী বলিলেন, "ইহাতে বেগম সাহেবার দস্তখত করাইয়া আন।"

প্রহরিণী জিজ্ঞাসা করিল, "যদি জিজ্ঞাসা করে, কিসের পরওয়ানা?"

যোধপুরী বলিলেন, “বলিও, ‘আমার কোতলের পরওয়ানা।’ কিন্তু কালি কলম লইয়া যাইও। আর পাঞ্জা ছেপ্‌ত করিতে ভুলিও না।”

প্রহরিণী কালি কলম সহিত পরওয়ানা লইয়া গিয়া জেব-উন্নিসার কাছে ধরিল। জেব-উন্নিসা পূর্ব্বভাবাপন্ন, জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিসের পরওয়ানা?”

প্রহরিণী বলিল,“আমার কোতলের পরওয়ানা।”

জেব। কি চুরি করেছিস?

প্রহরিণী। হজরৎ উদিপুরী-বেগমের পেশওয়াজ।

জেব। আচ্ছা করেছিস–কোতলের পর পরিস্‌।

এই বলিয়া বেগম সাহেবা পরওয়ানা দস্তখত করিয়া দিলেন। প্রহরিণী মোহর ছেপ্‌ত করিয়া লইয়া, যোধপুরী বেগমকে আনিয়া দিল। বনাসী সেই পরওয়ানা এবং নির্ম্মলকে লইয়া যোধপুরী মহাল হইতে যাত্রা করিল। নির্ম্মলকুমারী অতি প্রফুল্লমনে খোজার সঙ্গে চলিলেন।

কিন্তু সহসা সে প্রফুল্লতা দূর হইল–রঙমহালের ফটকের নিকট আসিয়া খোজা ভীত, স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। বলিল, “কি বিপদ! পালাও! পালাও! এই বলিয়া খোজা ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : সমিধসংগ্রহ–স্বয়ং যম

নির্ম্মল বুঝিল না যে, কেন পলাইতে হইবে। এদিক্‌ ওদিক্‌ নিরীক্ষণ করিল–পলাইবার কারণ কিছুই দেখিতে পাইল না। কেবল দেখিল, ফটকের নিকট, পরিণতবয়স্ক, শুভ্রবেশ একজন লোক দাঁড়াইয়া আছে। মনে করিল, এটা কি ভূত প্রেত যে, তাই ভয় পাইয়া খোজা পলাইল? নির্ম্মল নিজে ভূতের ভয়ে তেমন কাতর নহে। এ জন্য সে না পলাইয়া ইতস্ততঃ করিতেছিল–ইতিমধ্যে সেই শুভ্রবেশ পুরুষ আসিয়া, নির্ম্মলের নিকট দাঁড়াইল। নির্ম্মলকে দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কে?”

নির্ম্মল বলিল, “আমি যে হই না কেন?”

শুভ্রবেশী পুরুষ জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কোথা যাইতেছিলে?”

নির্ম্মল। বাহিরে।

পুরুষ। কেন?

নি। আমার দরকার আছে।

পু। দরকার ভিন্ন কেহ কিছু করে না, তাহা আমার জানা আছে। কি দরকার?

নি। আমি বলিব না।

পু। তোমার সঙ্গে কে আসিতেছিল?

নি। আমি বলিব না।

পু। তুমি হিন্দুর মেয়ে দেখিতেছি। কি জাতি?

নি। রাজপুত।

পু। তুমি কি যোধপুরী বেগমের কাছে থাক?

নির্ম্মল দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিল, যোধপুরী বেগমের নাম কাহারও সাক্ষাতে করিবে না–কি জানি, যদি তাঁহার কোনরূপ অনিষ্ট ঘটে। অতএব বলিল, "আমি এখানে থাকি না। আজ আসিয়াছি।"

সে পুরুষ জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা হইতে আসিয়াছ?"

নির্ম্মল মনে ভাবিল, মিথ্যা কথা কেন বলিব? এ ব্যক্তি আমার কি করিবে? কার ভয়ে রাজপুতের মেয়ে মিথ্যা বলিবে? অতএব উত্তর করিল, "আমি উদয়পুর হইতে আসিয়াছি।"

তখন সে পুরুষ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন আসিয়াছ?"

নির্ম্মল ভাবিল, ইহাকে বা এত পরিচয় কেন দিব? বলিল, "আপনাকে অত পরিচয় দিয়া কি হইবে। এত জিজ্ঞাসাবাদ না করিয়া আপনি যদি আমাকে ফটক পার করিয়া দেন, তাহা হইলে বিশেষ উপকৃত হইব।"

পুরুষ উত্তর করিল, "তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া উত্তরে যদি সন্তুষ্ট হই, তবে তোমাকে ফটক পার করিয়া দিতে পারি।"

নির্ম্মল। আপনি কে, তাহা না জানিলে আমি সকল কথা আপনাকে বলিব না।

পুরুষ উত্তর করিল, "আমি আলম্‌গীর বাদশাহ।"

তখন সেই তসবির, যাহা চঞ্চলকুমারী পদাঘাতে ভাঙ্গিয়াছিল, নির্ম্মলকুমারীর মনে উদয় হইল। নির্ম্মল একটু জিব কাটিয়া মনে মনে বলিল, "হাঁ, সেই ত বটে!"

তখন নির্ম্মলকুমারী ভূমি স্পর্শ করিয়া বাদশাহকে রীতিমত সেলাম করিল। যুক্তকরে বলিল, "হুকুম ফরমাউন্।"

বাদশাহ বলিলেন, "এখানে কাহার কাছে আসিয়াছিলে?"

নির্ম্মল। হজরৎ বাদশাহ বেগম উদিপুরী সাহেবার কাছে।

বাদশাহ। কি বলিলে? উদয়পুর হইতে উদিপুরীর কাছে? কেন?

নি। পত্র ছিল।

বা। কাহার পত্র?

নি। মহারাণার রাজমহিষীর।

বাদ। কৈ সে পত্র?

নি। হজরৎ বেগম সাহেবাকে তাহা দিয়াছি।

বাদশাহ বড় বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "আমার সঙ্গে এসো।"

নির্ম্মলকে সঙ্গে লইয়া বাদশাহ উদিপুরীর মন্দিরে গমন করিলেন। দ্বারে নির্ম্মলকে দাঁড় করাইয়া তাতারী প্রহরিণীদিগকে বলিলেন, "ইহাকে ছাড়িও না।" নিজে উদিপুরীর শয্যাগৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, উদিপুরী ঘোর নিদ্রাভিভূত। তাহার বিছানায় পত্রখানা পড়িয়া আছে। ঔরঙ্গজেব তাহা লইয়া পাঠ

করিলেন। পত্রখানা, তখনকার রীতিমত ফার্সীতে লেখা।

পত্র পাঠ করিয়া, নিদাঘসন্ধ্যাকাদম্বিনী তুল্য ভীষণ কান্তি লইয়া ঔরঙ্গজেব বাহিরে আসিলেন। নির্ম্মলকে বলিলেন, "তুই কি প্রকারে এই মহাল মধ্যে প্রবেশ করিলি?"

নির্ম্মল যুক্তকরে বলিল, "বাঁদীর অপরাধ মার্জ্জনা হউক্–আমি এ কথার উত্তর দিব না।"

ঔরঙ্গজেব বিস্মিত হইলেন, বলিলেন, "কি এত হেমাকৎ? আমি দুনিয়ার বাদশাহ–আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুই উত্তর দিবি না?"

নির্ম্মল করযোড়ে বলিল, "দুনিয়া হুজুরের। কিন্তু রসনা আমার। আমি যাহা না বলিব, দুনিয়ার বাদশাহ তাহা কিছুতেই বলাইতে পারিবেন না।"

ঔরঙ্গ। তা না পারি, যে রসনার বড়াই করিতেছ, তা এখনই তাতারী প্রহরিণীর হাতে কাটিয়া ফেলিয়া কুকুরকে খাওয়াইতে পারি।

নির্ম্মল। দিল্লীশ্বরের মর্জি! কিন্তু তাহা হইলে, যে সংবাদ আপনি খুঁজিতেছেন, তা প্রকাশের পথ চিরকালের জন্য বন্ধ হইবে।

ঔরঙ্গ। সেই জন্য তোমার জিভ রাখিলাম। তোমার প্রতি এই হুকুম দিতেছি যে, আগুন জ্বালিয়া তোমাকে কাপড়ে মুড়িয়া, একটু একটু করিয়া তাতারীরা পোড়াইতে থাকুক। আমার কথায় যাহা বলিবে না, আগুনের জ্বালায় তাহা বলিবে।

নির্ম্মলকুমারী হাসিল। বলিল, "হিন্দুর মেয়ে আগুনে পুড়িয়া মরিতে ভয় করে না। হিন্দুস্থানের বাদশাহ কি কখনও শুনেন নাই যে, হিন্দুর মেয়ে, হাসিতে হাসিতে স্বামীর সঙ্গে জ্বলন্ত চিতায় চড়িয়া পুড়িয়া মরে? আপনি যে মরণের ভয় দেখাইতেছেন, আমার মা মাতামহী প্রভৃতি পুরুষানুক্রমে সেই আগুনেই মরিয়াছেন। আমিও কামনা করি, যেন ঈশ্বরের কৃপায় আমিও স্বামীর পাশে স্থান পাইয়া আগুনেই জীবন্ত পুড়িয়া মরি।"

বাদশাহ মনে মনে বলিলেন, "বাহবা! বাহবা!" প্রকাশ্যে বলিলেন, "সে কথার মীমাংসা পরে করিব। আপাততঃ তুমি এই মহালের একটা কামরার ভিতর চাবিবন্ধ থাক। ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হইলে কিছু খাইতে পাইবে না। তবে যখন নিতান্ত প্রাণ যায় বিবেচনা করিবে, তখন কবাটে ঘা মারিও, প্রহরীরা দ্বার খুলিয়া দিয়া আমার কাছে লইয়া যাইবে। তখন আমার নিকট সকল উত্তর দিলে পান আহার করিতে পাইবে।"

নির্ম্মল। শাহান্-শাহ! আপনি কখনও কি শুনেন নাই যে, হিন্দু স্ত্রীলোকেরা ব্রত নিয়ম করে? ব্রত নিয়ম জন্য এক দিন, দুই দিন, তিন দিন নিরম্বু উপবাস করে? শুনেন নাই, শর্‌ণা ধর্‌ণার জন্য অনিয়মিতকাল উপবাস করে? শুনেন নাই, তারা কখন কখন উপবাস করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করে? জাঁহাপনা, এ দাসীও তা পারে। ইচ্ছা হয়, আমার মৃত্যু পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

ঔরঙ্গজেব দেখিলেন, এ মেয়েকে ভয় দেখাইয়া কিছু হইবে না। মারিয়া ফেলিলেও কিছু হইবে না। পীড়ন করিলে কি হয় বলা যায় না। কিন্তু তার পূর্ব্বে একবার প্রলোভনের শক্তিটা পরীক্ষা করা ভাল। অতএব বলিলেন, "ভাল, নাই তোমাকে পীড়ন করিলাম। তোমাকে ধন দৌলত দিয়া বিদায় করিব। তুমি এ সকল কথা আমার নিকট যথার্থ প্রকাশ কর।"

নি। রাজপুতকন্যা যেমন মৃত্যুকে ঘৃণা করে, ধন দৌলতকেও তেমনই। সামান্যা স্ত্রীলোক আমি–নিজগুণে আমাকে বিদায় দিন।

ঔরঙ্গ। দিল্লীর বাদশাহের অদেয় কিছু নাই। তাঁহার কাছে প্রার্থনীয় তোমার কি কিছুই নাই?

নি। আছে। নির্ব্বিঘ্নে বিদায়।

ঔরঙ্গ। কেবল সেইটি এখন পাইতেছ না। তা ছাড়া আর জগতে তোমার প্রার্থনা করিবার, কি ভয় করিবার কিছু নাই?

নি। প্রার্থনার আছে বৈ কি? কিন্তু দিল্লীর বাদশাহের রত্নাগারে সে রত্ন নাই।

ঔরঙ্গ। এমন কি সামগ্রী?

নি। আমরা হিন্দু, আমরা জগতে কেবল ধর্ম্মকেই ভয় করি, ধর্ম্মই কামনা করি। দিল্লীর বাদশাহ ম্লেচ্ছ, আর দিল্লীর বাদশাহ ঐশ্বর্য্যশালী। দিল্লীর বাদশাহের সাধ্য কি যে, আমার কাম্য বস্তু দিতে পারেন, কি লইতে পারেন?

দিল্লীশ্বর নির্ম্মলকুমারীর সাহস ও চতুরতা দেখিয়া, ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু এই কটূক্তিতে পুনর্ব্বার ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "বটে! বটে! ঐ কথাটা ভুলিয়া গিয়াছিলাম।" তখন তিনি একজন তাতারীকে আদেশ করিলেন, "যা বাবুর্চ্চি মহল হইতে কিছু গোমাংস আনিয়া, দুই তিন জনে ধরিয়া ইহার মুখ গুঁজিয়া দে।"

নির্ম্মল তাহাতেও টলিল না। বলিল, "জানি, আপনাদিগের সে বিদ্যা আছে। সে বিদ্যার জোরেই এই সোণার হিন্দুস্থান কাড়িয়া লইয়াছেন। জানি, গোরুর পাল সম্মুখে রাখিয়া লড়াই করিয়া মুসলমান হিন্দুকে পরাস্ত করিয়াছে– নহিলে রাজপুতের বাহুবলের কাছে মুসলমানের বাহুবল, সমুদ্রের কাছে গোষ্পদ। কিন্তু আবার একটা কথা আপনাকে মনে করিয়া দিতে হইল। শুনেন নাই কি যে, রাজপুতের মেয়ে বিষ না লইয়া এক পা চলে না? আমার নিকটে এমন তীব্র বিষ আছে যে, আপনার ভৃত্যগণ গোমাংস লইয়া এ ঘরে পা দেওয়ার পরেও যদি তাহা আমি মুখে দিই, তবে জীবন্তে আর আমার মুখে কেহ গোমাংস দিতে পারিবে না। জাঁহাপনা! আপনার বড় ভাই দারা শেকোকে বধ করিয়া তাহার দুইটা কবিলা কাড়িয়া আনিতে গিয়াছিলেন–পারিয়াছিলেন কি?–অধম খ্রিষ্টিয়ানীটা আসিয়াছিল জানি, রাজপুতানী দিল্লীর বাদশাহের মুখে সাত পয়জার মারিয়া স্বর্গে চলিয়া যায় নাই কি? আমিও এখনই তোমার মুখে সাত পয়জার মারিয়া স্বর্গে চলিয়া যাইব।"

বাদশাহ বাক্যশূন্য। যিনি পৃথিবীপতি বলিয়া খ্যাত, পৃথিবীময় যাঁহার গৌরব ঘোষিত, যিনি সমস্ত ভারতবর্ষের ত্রাস, তিনি আজ এই অনাথা, নিঃসহায় অবলার নিকট অপমানিত–পরাস্ত। ঔরঙ্গজেব পরাজয় স্বীকার করিলেন। মনে মনে বলিলেন, "এ অমূল্য রত্ন, ইহাকে নষ্ট করা হইবে না। আমি ইহাকে বশীভূত করিব।" প্রকাশ্যে অতি মধুরস্বরে বলিলেন, "তোমার নাম কি, পিয়ারী?"

নির্ম্মলকুমারী হাসিয়া বলিল, "ও কি জাঁহাপনা! আরও রাজপুত-মহিষীতে সাধ আছে না কি? তা সে সাধও পরিত্যাগ করিতে হইতেছে। আমি বিবাহিতা, আমার হিন্দু স্বামী জীবিত আছেন।"

ঔ। সে কথা এখন থাক। এখন তুমি কিছু দিন আমার এই রঙমহাল মধ্যে বাস কর। এ হুকুম বোধ করি তুমি অমান্য করিবে না?

নি। কেন আমাকে আটক করিতেছেন?

ঔ। তুমি এখন দেশে গেলে, আমার বিস্তর নিন্দা করিবে। যাহাতে তুমি আমার প্রশংসা করিতে পার, এক্ষণে তোমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করিব। পরে তোমাকে ছাড়িয়া দিব।

নি। যদি আপনি না ছাড়েন, তবে আমার যাইবার সাধ্য নাই। কিন্তু আপনি কয়েকটি কথা প্রতিশ্রুত হইলেই আমি দিন কতক থাকিতে পারি।

ঔ। কি কি কথা?

নি। হিন্দুর অন্নজল ভিন্ন আমি স্পর্শ করিব না।

ঔ। তাহা স্বীকার করিলাম।

নি। কোন মুসলমান আমাকে স্পর্শ করিবে না।

ঔ। তাহাও স্বীকার করিলাম।

নি। আমি কোন রাজপুত বেগমের নিকটে থাকিব।

ঔ। তাহাও হইবে। আমি তোমাকে যোধপুরী বেগমের নিকট রাখিয়া দিব।

নির্ম্মলকুমারীর জন্য বাদশাহ সেইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : পুনশ্চ সমিধসংগ্রহের জন্য

পরদিন ঔরঙ্গজেব, জেব-উন্নিসা ও নির্ম্মলকুমারীকে সঙ্গে লইয়া রঙ্মহাল মধ্যে তদারক করিলেন, কে ইহাকে অন্তঃপুর-মধ্যে আসিতে দিয়াছে। অন্তঃপুরবাসী সমস্ত খোজা, তাতারী, বাঁদীদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। যাহারা নির্ম্মলকে আসিতে দিয়াছিল, তাহারা তাহাকে চিনিল। কিন্তু একটা গর্হিত কাজ হইয়াছে বুঝিয়া কেহই অপরাধ স্বীকার করিল না। ঔরঙ্গজেব বা জেব-উন্নিসা কোন সন্ধানই পাইলেন না।

তখন ঔরঙ্গজেব ও জেব-উন্নিসা অপর পৌরবর্গকে এইরূপ আদেশ করিলেন যে, "ইহাকে আসিতে দেওয়ায় তত ক্ষতি হয় নাই, কিন্তু ইহাকে কেহ আমাদের হুকুম ব্যতীত বাহির হইতে দিও না। তবে ইহাকে কেহ কোন প্রকার পীড়ন বা অপমান করিও না। বেগমদিগের মত ইহাকে মান্য করিবে। এ যোধপুরী বেগমের হিন্দু বাঁদীদিগের পাক ও জল খাইবে, মুসলমান ইহাকে ছুঁইবে না।"

তখন নির্ম্মলকুমারীকে সকলে সেলাম করিল। জেব-উন্নিসা তাঁহাকে আদর করিয়া ডাকিয়া লইয়া আপন মন্দিরে বসাইলেন এবং নানাবিধ আলাপ করিলেন। নির্ম্মলের কাছে ভিতরের কথা কিছু পাইলেন না।

সেই দিন অপরাহ্ণে একজন তাতারী প্রহরিণী আসিয়া যোধপুরী বেগমকে সংবাদ দিল যে, একজন সওদাগর পাথরের জিনিস লইয়া দুর্গমধ্যে বেচিতে আসিয়াছে। কতকগুলা সে মহাল মধ্যে পাঠাইয়া দিয়াছে। জিনিসগুলো ভাল নহে—কোন বেগমই তাহা পসন্দ করিলেন না। আপনি কিছু লইবেন কি?

মাণিকলাল বাছিয়া বাছিয়া মন্দ জিনিস আনিয়াছিল—যে-সে বেগম যেন পসন্দ করিয়া কিনিয়া না রাখে। যখন প্রহরিণী এই কথা বলিল, তখন নির্ম্মলকুমারী যোধপুরীর নিকটে ছিল। সে যোধপুরীকে একটু চক্ষুর ইঙ্গিত করিয়া বলিল, "আমি নিব।"

পূর্ব্বরাত্রিতে নির্ম্মলকুমারীর সঙ্গে যেরূপ বাদশাহের সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হইয়াছিল, নির্ম্মল সকলই তাহা যোধপুরী বেগমের কাছে বলিয়াছিল। যোধপুরী শুনিয়া নির্ম্মলের অনেক প্রশংসা ও নির্ম্মলকে অনেক আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বহু যত্ন করিতেছিলেন। এক্ষণে নির্ম্মলের অভিপ্রায় বুঝিয়া পাথরের দ্রব্য আনাইতে হুকুম দিলেন।

প্রহরিণী বাহিরে গেলে নির্ম্মল সংক্ষেপে যোধপুরীকে মাণিকলালের সঙ্কেতকৌশল বুঝাইয়া দিল। যোধপুরী তখন বলিলেন, তবে তুমি ততক্ষণ তোমার স্বামীকে একখানা পত্র লেখ। আমি পাথরের জিনিস পসন্দ করি। এই সুযোগে তাঁহাকে তোমার সংবাদ দিতে হইবে।" উপযুক্ত সময়ে সেই প্রস্তরনির্ম্মিত দ্রব্যগুলি আসিয়া উপস্থিত হইল।

নির্ম্মল দেখিল যে, সকল দ্রব্যেই মাণিকলালের চিহ্ন আছে। দেখিয়া নির্ম্মল পত্র লিখিতে বসিল। যতক্ষণ না নির্ম্মলের পত্র লেখা হইল, ততক্ষণ যোধপুরী পসন্দ করিতে লাগিলেন। দ্রব্যজাতের মধ্যে প্রস্তরনির্ম্মিত মূল্যবান রত্নরাজির কারুকার্য্যবিশিষ্ট একটা কৌটা ছিল। তাহাতে জড়াইয়া চাবি তালা বন্ধ করিবার জন্য একটা সুবর্ণনির্ম্মিত শৃঙ্খল ছিল। নির্ম্মলের পত্র লেখা হইলে যোধপুরী অন্যের অলক্ষে সেই পত্র ঐ কৌটার মধ্যে রাখিয়া চাবি বন্ধ করিলেন।

যোধপুরী সকল দ্রব্য পসন্দ করিয়া রাখিলেন, কেবল সেই কৌটাটি না পসন্দ করিয়া ফেরৎ দিলেন। ফেরৎ দিবার সময়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক চাবিটা ফেরৎ দিতে ভুলিয়া গেলেন।

ছদ্মবেশী সওদাগর মাণিকলাল, কেবল কৌটা ফেরৎ আসিল, তাহার চাবি আসিল না, দেখিয়া প্রত্যাশাপন্ন হইল। সে টাকা কড়ি সব বুঝিয়া লইয়া কৌটা লইয়া দোকানে গেল। সেখানে নির্জ্জনে কৌটার ভিতরে নির্ম্মলকুমারীর পত্র পাইল।

পত্রে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহা সবিস্তারে জানিবার, পাঠকের প্রয়োজন নাই। স্থূল কথা যাহা, তাহা পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন। আনুষঙ্গিক কথা পরে বুঝিতে পারিবেন। পত্র পাইয়া, নির্ম্মল সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া মাণিকলাল স্বদেশযাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই দিনেই দোকান পাট উঠাইলে পাছে কেহ সন্দেহ করে, এজন্য দিনকতক বিলম্ব করা স্থির করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : সমিধসংগ্রহ–জেব-উন্নিসা

এখন একবার নির্ম্মলকুমারীকে ছাড়িয়া মোগলবীর মবারকের সংবাদ লইতে হইবে। বলিয়াছি, যাহারা রূপনগর হইতে পুরাঙ্মুখ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল, ঔরঙ্গজেব তাহাদিগের মধ্যে কাহাকে বা পদচ্যুত, কাহাকে বা দণ্ডিত করিয়াছিলেন। কিন্তু মবারক সে শ্রেণীভুক্ত হয়েন নাই। ঔরঙ্গজেব সকলের নিকট তাঁহার বীরত্বের কথা শুনিয়া তাঁহাকে বহাল রাখিয়াছিলেন।

জেব-উন্নিসাও সে সুখ্যাতি শুনিলেন। মনে করিলেন যে, মবারক নিজে উপযাচক হইয়া তাঁহার নিকট হাজির হইয়া সকল পরিচয় দিবে কিন্তু মবারক আসিল না।

মবারক দরিয়াকে নিজালয়ে লইয়া আসিয়াছিল। তাহার খোজা বাঁদী নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিল। তাহাকে এল্‌বাস পোষাক দিয়া সাজাইয়াছিল। যথাসাধ্য অলঙ্কারে ভূষিত করিয়াছিল। মবারক পবিত্রা, পরিণীতা পত্নী লইয়া ঘরকন্যা সাজাইতেছিল।

মবারক স্বেচ্ছাক্রমে আসিল না দেখিয়া জেব-উন্নিসা বিশ্বাসী খোজা আসীরদ্দীনের দ্বারা তাহাকে ডাকাইলেন। তথাপি মবারক আসিল না। জেব-উন্নিসার বড় রাগ হইল। বড় হেমাকৎ–বাদশাহজাদী মেহেরবানী ফরমাইয়া ইয়াদ্ করিতেছেন–তবু নফর হাজির হয় না–বড় গোস্তাকী।

দিন কতক জেব-উন্নিসা রাগের উপর রহিলেন–মনে মনে বলিলেন, "আমার ত সকলই সমান।" কিন্তু জেব-উন্নিসা তখনও জানিতেন না যে, বাদশাহজাদীরও ভুল হয় যে, খোদা বাদশাহজাদীকে ও চাষার মেয়েকে এক ছাঁচেই ঢালিয়াছেন;–ধন দৌলত, তক্তে তাউস সকলই কর্ম্মভোগ মাত্র, আর কোন প্রভেদ নাই।

সব সমান হয় না, জেব-উন্নিসারও সব সমান নয়। কিছু দিন রাগের উপর থাকিয়া, জেব-উন্নিসা মবারকের জন্য একটু কাতর হইলেন। মান খোওয়াইয়া–শাহজাদীর মান, নায়িকার মান, দুই খোওয়াইয়া, আবার সেই মবারককে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মবারক বলিল, "আমার বহুৎ তস্‌লিমাৎ, শাহজাদীর অপেক্ষা আমার নিকট বেশ্‌কিম্মৎ আর দুনিয়ার কিছুই নাই। কেবল এক আছে। খোদা আছেন, "দীন্" আছে। গুনাহ্‌গারী আর আমা হইতে হইবে না। আমি আর মহালের ভিতর যাইব না–আমি দরিয়াকে ঘরে আনিয়াছি।"

উত্তর শুনিয়া জেব-উন্নিসা রাগে ফুলিয়া আটখানা হইল এবং মবারকের ও দরিয়ার নিপাতসাধন জন্য কৃতসঙ্কল্প হইল। ইহা বাদশাহী দস্তুর।

মহালমধ্যে নির্ম্মলকুমারীর অবস্থানে, জেব-উন্নিসার এ অভিপ্রায় সাধনের কিছু সুবিধা ঘটিল। নির্ম্মলকুমারী, ঔরঙ্গজেবের নিকট ক্রমশঃ আদরের বস্তু হইয়া উঠিলেন। ইহার মধ্যে কন্দর্প ঠাকুরের কোন কারসাজি ছিল না; কাজটা শয়তানের। ঔরঙ্গজেব প্রত্যহ অবসর মত, সুখের ও আয়েশের সময়ে, "রূপনগরী নাজ্‌নীকে" ডাকিয়া কথোপকথন করিতেন। কথোপকথনের প্রধান উদ্দেশ্য, রাজসিংহের রাজকীয় অবস্থাঘটিত সংবাদ লওয়া। তবে চতুরচূড়ামণি ঔরঙ্গজেব এমন ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেন যে, হঠাৎ কেহ বুঝিতে না পারে যে, তিনি যুদ্ধকালে ব্যবহার্য্য সংবাদ সংগ্রহ করিতেছেন। কিন্তু নির্ম্মলও চতুরতায় ফেলা যায় না, সে সকল কথারই অভিপ্রায় বুঝিত এবং সকল প্রয়োজনীয় কথার মিথ্যা উত্তর দিত।

অতএব ঔরঙ্গজেব তাহার কথাবার্ত্তায় সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হইতেন না। তিনি মনে মনে এইরূপ বিচার করিলেন,–"মেবার আমি সৈন্যের সাগরে ডুবাইয়া দিব, তাহাতে সন্দেহই করি না–রাজসিংহের রাজ্য থাকিবে না। কিন্তু তাহাতেই আমার মান বজায় হইবে না। তাহার রূপনগরী রাণীকে না কাড়িয়া আনিতে পারিলে আমার মান বজায় হইবে না। কিন্তু রাজ্য পাইলেই যে আমি রাজমহিষীকে পাইব, এমন ভরসা করা যায় না। কেন না, রাজপুতের মেয়ে, কথায় কথায় চিতায় উঠিয়া পুড়িয়া মরে, কথায় কথায় বিষ খায়। আমার হাতে পড়িবার আগে সে শয়তানী প্রাণত্যাগ করিবে। কিন্তু এই বাঁদীটাকে যদি হস্তগত করিতে পারি–বশীভূত করিতে পারি–তবে ইহা দ্বারা তাহাকে ভুলাইয়া আনিতে পারিব না? এ বাঁদীটা কি বশীভূত হইবে না? আমি দিল্লীর বাদশাহ, আমি একটা বাঁদীকে বশীভূত করিতে পারিব না? না পারি, তবে আমার বাদশাহী নামোনাসেফ্।"

তার পর বাদশাহের ইঙ্গিতে জেব-উন্নিসা নির্ম্মলকুমারীকে রত্নালঙ্কারে ভূষিত করিলেন। তাঁর বেশভূষা, এল্‌বাস পোষাক, বেগমদিগের সঙ্গে সমান হইল। নির্ম্মল যাহা বলিতেন, তাহা হইত; যাহা চাহিতেন, তাহা পাইতেন। কেবল বাহির হইতে পাইতেন না।

এ সব কথা লইয়া যোধপুরীর সঙ্গে নির্ম্মলের আন্দোলন হইত। একদা হাসিয়া নির্ম্মল, যোধপুরীকে বলিল,–

সোনে কি পিঁজিরা, সোনে কি চিড়িয়া,
সোনে কি জিঞ্জির পয়ের মে,
সোনে কি চানা, সোনে কি দানা,
মট্টি কেঁও সেরেফ খয়ের মে।

যোধপুরী জিজ্ঞাসা করিল, "তুই নিস্ কেন?"

নির্ম্মল বলিল, "উদয়পুরে গিয়া দেখাইব যে, মোগল বাদশাহকে ঠকাইয়া আনিয়াছি।"

জেব-উন্নিসা ঔরঙ্গজেবের দাহিন হাত। ঔরঙ্গজেবের আদেশ পাইয়া, জেব-উন্নিসা নির্ম্মলকে লইয়া পড়িলেন। আসল কাজটা শাহজাদীর হাতে রহিল–বাদশাহ নিজে মধুর আলাপের ভারটুকু আপন হাতে রাখিলেন। নির্ম্মলের সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতা করিতেন, কিন্তু তাহাও একটু বাদশাহী রকমের মাজাঘষা থাকিত–নির্ম্মল রাগ করিতে পারিত না, কেবল উত্তর করিত, তাও মেয়েলী রকম মাজাঘষা, তবে রূপনগরের পাহাড়ের কর্কশতাশূন্য নহে। এখনকার ইংরেজী রুচির সঙ্গে ঠিক মিলিবে না বলিয়া সেই বাদশাহী রুচির উদাহরণ দিতে পারিলাম না।

জেব-উন্নিসার কাছে নির্ম্মলের যাহা বলিবার আপত্তি নাই, তাহা সে অকপটে বলিয়াছিল। অন্যান্য কথার মধ্যে রূপনগরের যুদ্ধটা কি প্রকারে হইয়াছিল, সে কথাও পাড়িয়াছিল। নির্ম্মল যুদ্ধের প্রথম ভাগে কিছুই দেখে নাই, কিন্তু চঞ্চলকুমারীর কাছে সে সকল কথা শুনিয়াছিল। যেমন শুনিয়াছিল, জেব-উন্নিসাকে তেমনই শুনাইল। মবারক যে মোগল সৈন্যকে ডাকিয়া, চঞ্চলকুমারীর কাছে পরাভব স্বীকার করিয়া, রণজয় ত্যাগ করিতে বলিয়াছিল, তাহা বলিল; চঞ্চলকুমারী

যে রাজপুতগণের রক্ষার্থ ইচ্ছাপূর্ব্বক দিল্লীতে আসিতে চাহিয়াছিল, তাহাও বলিল; বিষ খাইবার ভরসার কথাও বলিল; মবারক যে চঞ্চলকুমারীকে লইয়া আসিল না, তাহাও বলিল।

শুনিয়া জেব-উন্নিসা মনে মনে বলিলেন, "মবারক সাহেব! এই অস্ত্রে তোমার কাঁধ হইতে মাথা নামাইব।" উপযুক্ত অবসর পাইলে, জেব-উন্নিসা ঔরঙ্গজেবকে যুদ্ধের সেই ইতিহাস শুনাইলেন।

ঔরঙ্গজেব শুনিয়া বলিলেন, "যদি সে নফর এমন বিশ্বাসঘাতক হয়, তবে আজি সে জাহান্নামে যাইবে।" ঔরঙ্গজেব কাণ্ডটা না বুঝিলেন, তাহা নহে। জেব-উন্নিসার কুচরিত্রের কথা তিনি সর্ব্বদাই শুনিতে পাইতেন। কতকগুলি লোক আছে, এদেশের লোকে তাহাদের বর্ণনার সময় বলে, "ইহারা কুকুর মারে, কিন্তু হাঁড়ি ফেলে না।" মোগল বাদশাহেরা সেই সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। তাঁহারা কন্যা বা ভগিনীর দুশ্চরিত্র জানিতে পারিলে কন্যা কি ভগিনীকে কিছু বলিতেন না, কিন্তু যে ব্যক্তি কন্যা বা ভগিনীর অনুগৃহীত, তাহার ঠিকানা পাইলে কোন ছলে কৌশলে তাহার নিপাত সাধন করিতেন। ঔরঙ্গজেব অনেক দিন হইতে মবারককে জেব-উন্নিসার প্রীতিভাজন বলিয়া সন্দেহ করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। এখন কন্যার কথায় ঠিক বুঝিলেন, বুঝি কলহ ঘটিয়াছে, তাই বাদশাহজাদী, যে পিপীলিকা তাঁহাকে দংশন করিয়াছে, তাহাকে টিপিয়া মারিতে চাহিতেছেন। ঔরঙ্গজেব তাহাতে খুব সম্মত। কিন্তু একবার নির্ম্মলের নিজমুখে এ সকল কথা বাদশাহের শুনা কর্ত্তব্য বোধে, তিনি নির্ম্মলকে ডাকাইলেন। ভিতরের কথা নির্ম্মল কিছু জানে না বা বুঝিল না, সকল কথাই ঠিক বলিল।

যথাবিহীত সময়ে বখ্‌শীকে তলব করিয়া, বাদশাহ মবারকের সম্বন্ধে আজ্ঞাপ্রচার করিলেন। বখ্‌শীর আজ্ঞা পাইয়া আট জন আহদী গিয়া মবারককে ধরিয়া আনিয়া বখ্‌শীর নিকট হাজির করিল। মবারক হাসিতে হাসিতে বখ্‌শীর নিকট উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, বখ্‌শীর সম্মুখে দুইটি লৌহপিঞ্জর। তন্মধ্যে এক একটি বিষধর সর্প গর্জ্জন করিতেছে।

এখনকার দিনে যে রাজদণ্ডে প্রাণ হারায়, তাহাকে ফাঁসী যাইতে হয়, অন্য প্রকার রাজকীয় বধোপায় প্রচলিত নাই। মোগলদিগের রাজ্যে এরূপ অনেক প্রকার বধোপায় প্রচলিত ছিল। কাহারও মস্তকচ্ছেদ হইত; কেহ শূলে যাইত; কেহ হস্তিপদতলে নিক্ষিপ্ত হইত; কেহ বা বিষধর সর্পের দংশনে প্রাণত্যাগ করিত। যাহাকে গোপনে বধ করিতে হইবে, তাহার প্রতি বিষপ্রয়োগ হইত।

মবারক সহাস্যবদনে বখ্‌শীর কাছে উপস্থিত হইয়া এবং দুই পাশে দুইটি বিষধর সর্পের পিঞ্জর দেখিয়া পূর্ব্ববৎ হাসিয়া বলিল, "কি? আমায় যাইতে হইবে?"

বখ্‌শী বিষণ্ণভাবে বলিল, "বাদশাহের হুকুম!"

মবারক জিজ্ঞাসা করিল, "কেন এ হুকুম হইল, কিছু প্রকাশ পাইয়াছে কি?"

বখ্‌শী। না—আপনি কিছু জানেন না?

মবারক। এক রকম—আন্দাজী আন্দাজী। বিলম্বে কাজ কি?

বখ্‌শী। কিছু না।

তখন মবারক জুতা খুলিয়া একটা পিঞ্জরের উপর পা দিলেন। সর্প গর্জ্জাইয়া আসিয়া পিঁজরার ছিদ্রমধ্য হইতে দংশন করিল।

দংশনজ্বালায় মবারক একটু মুখ বিকৃত করিলেন। বখ্‌শীকে বলিলেন, "সাহেব! যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, মবারক কেন মরিল, তখন মেহেরবানি করিয়া

বলিবেন, শাহজাদী আলম্, জেব-উন্নিসা বেগম সাহেবার ইচ্ছা।”

বখশী সভয়ে, অতি কাতরভাবে বলিলেন, “চুপ! চুপ! এটাও।”

যদি একটা সাপের বিষ না থাকে, এজন্য দুইটা সর্পের দ্বারা হন্য ব্যক্তিকে দংশন করান রীতি ছিল। মবারক তাহা জানিতেন। তিনি দ্বিতীয় পিঞ্জরের উপর পা রাখিলেন, দ্বিতীয় মহাসর্পও তাঁহাকে দংশন করিয়া তীক্ষ্ণ বিষ ঢালিয়া দিল।

মবারক তখন বিষের জ্বালায় জর্জ্জরীভূত ও নীলকান্তি হইয়া, ভূমে জানু পাতিয়া বসিয়া যুক্তকরে ডাকিতে লাগিল, “আল্লা আক্‌বর! যদি কখনও তোমার দয়া পাইবার যোগ্য কার্য্য করিয়া থাকি, তবে এই সময়ে দয়া কর।”

এইরূপে জগদীশ্বরের ধ্যান করিতে করিতে, তীব্র সর্পবিষে জর্জ্জরীভূত হইয়া, মোগলবীর মবারক আলি প্রাণত্যাগ করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : সব সমান

রঙ্‌মহালে সকল সংবাদই আসে–সকল সংবাদই জেব-উন্নিসা নিয়া থাকেন–তিনি নাএবে বাদশাহ। মবারকের বধসংবাদও আসিয়া পৌঁছিল।

জেব-উন্নিসা প্রত্যাশা করিয়াছিলেন যে, তিনি এই সংবাদে অত্যন্ত সুখী হইবেন। সহসা দেখিলেন যে, ঠিক বিপরীত ঘটিল। সংবাদ আসিবামাত্র সহসা তাঁহার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল–এ শুকনা মাটিতে কখনও জল উঠে নাই। দেখিলেন, কেবল তাই নহে, গণ্ড বাহিয়া ধারায় ধারায় সে জল গড়াইতে লাগিল। শেষ দেখিলেন, চীৎকার করিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছে। জেব-উন্নিসা দ্বার রুদ্ধ করিয়া হস্তিদন্তনির্ম্মিত রত্নখচিত পালঙ্কে শয়ন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

কৈ শাহজাদী? হস্তিদন্তনির্ম্মিত রত্নদণ্ডভূষিত পালঙ্কে শুইলেও ত চক্ষুর জল থামে না! তুমি যদি বাহিরে গিয়া দিল্লীর সহরতলীর ভগ্ন কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিতে, তাহা হইলে দেখিতে পাইতে, কত লোক ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়া কত হাসিতেছে। তোমার মত কান্না কেহই কাঁদিতেছে না।

জেব-উন্নিসার প্রথমে কিছু বোধ হইল যে, তাঁহার আপনার সুখের হানি তিনি আপনিই করিয়াছেন। ক্রমশঃ বোধ হইল যে, সব সমান নহে–বাদশাহজাদীরাও ভালবাসে; জানিয়া হউক, না জানিয়া হউক, নারীদেহ ধারণ করিলেই ঐ পাপকে হৃদয়ে আশ্রয় দিতে হয়। জেব-উন্নিসা আপনা আপনি জিজ্ঞাসা করিল, “আমি, তাকে এত ভালবাসিতাম, সে কথা এত দিন জানিতে পারি নাই কেন? কেহ তাহাকে বলিয়া দিল না যে, ঐশ্বর্য্যমদে তুমি অন্ধ হইয়াছিলে, রূপের গর্ব্বে তুমি অন্ধ হইয়াছিলে, ইন্দ্রিয়ের দাসী হইয়া তুমি ভালবাসাকে চিনিতে পার নাই। তোমার উপযুক্ত দণ্ড হইয়াছে–কেহ যেন তোমাকে দয়া না করে।

কেহ বলিয়া না দিক–তার নিজের মনে এ সকল কথা কিছু কিছু আপনা আপনি উদয় হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে এমনও মনে হইল, ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝি আছে। যদি থাকে, তবে বড় অধর্ম্মের কাজ হইয়াছে। শেষ ভয় হইল, ধর্ম্মাধর্ম্মের পুরস্কার দণ্ড যদি থাকে? তাহার পাপের যদি দণ্ডদাতা কেহ থাকেন? তিনি বাদশাহজাদী বলিয়া জেব-উন্নিসাকে মার্জ্জনা করিবেন কি? সম্ভব নয়। জেব-উন্নিসার মনে ভয়ও হইল।

দুঃখে, শোকে, ভয়ে জেব-উন্নিসা দ্বার খুলিয়া তাহার বিশ্বাসী খোজা আসিরদ্দীনকে ডাকাইল। সে আসিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “সাপের বিষে মানুষ মরিলে তার কি চিকিৎসা আছে?”

আসিরদ্দীন বলিল, “মরিলে আবার চিকিৎসা কি?”

জেব। কখনও শুন নাই?

আসি। হাতেম মাল এমনই একটা চিকিৎসা করিয়াছিল, কাণে শুনিয়াছি, চক্ষে দেখি নাই। জেব-উন্নিসা একটু হাঁপ ছাড়িল। বলিল, "হাতেম মালকে চেন?"

আসি। চিনি।

জেব। সে কোথায় থাকে?

আসি। দিল্লীতে থাকে।

জেব। বাড়ী চেন?

আসি। চিনি।

জেব। এখন সেখানে যাইতে পারিবে?

আসি। হুকুম দিলেই পারি।

জেব। আজ মবারক আলি (একটু গলা কাঁপিল) সর্পাঘাতে মরিয়াছে জান?

আসি। জানি।

জেব। কোথায় তাহাকে গোর দিয়াছে, জান?

আসি। দেখি নাই, কিন্তু যে গোরস্থানে গোর দিবে, তাহা আমি জানি। নূতন গোর, ঠিকানা করিয়া লইতে পারিব।

জেব। আমি তোমাকে দুই শত আশরফি দিতেছি। এক শ হাতেম মালকে দিবে, এক শ আপনি লইবে। মবারক আলির গোর খুঁড়িয়া মোরদা বাহির করিয়া, চিকিৎসা করিয়া তাহাকে বাঁচাইবে, যদি বাঁচে, তাহাকে আমার কাছে লইয়া আসিবে। এখনই যাও।

আশরফি লইয়া খোজা আসিরদ্দীন তখনই বিদায় হইল।

নবম পরিচ্ছেদ : সমিধ-সংগ্রহ–দরিয়া

আর একবার রঙ্‌মহালে পাথরের দ্রব্য বেচিয়া, মাণিকলাল নির্ম্মলকুমারীর খবর লইল। এবারও সেই পাথরের কৌটা চাবি বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল। চাবি খুলিয়া, নির্ম্মল পাইল–সেই দৌত্য পারাবত। নির্ম্মল সেটিকে রাখিল। পত্রের দ্বারা পূর্ব্বমত সংবাদ পাঠাইল। লিখিল, "সব মঙ্গল। তুমি এখন যাও, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি বাদশাহের সঙ্গে যাইব।"

মাণিকলাল তখন দোকানপাট উঠাইয়া উদয়পুর যাত্রা করিল। রাত্রি প্রভাত হইবার তখন অল্প বিলম্ব আছে। দিল্লীর অনেক "দর্‌ওয়াজা।" পাছে কেহ কিছু সন্দেহ করে, এজন্য মাণিকলাল আজমীর দর্‌ওয়াজায় না গিয়া, অন্য দর্‌ওয়াজায় চলিল। পথিপার্শ্বে একটা সামান্য গোরস্থান আছে। একটা গোরের নিকট দুইটা লোক দাঁড়াইয়া আছে। মাণিকলালকে এবং তাহার সমভিব্যাহারীদিগকে দেখিয়া, সেই দুইটা মানুষ দৌড়াইয়া পলাইল। মাণিকলাল তখন ঘোড়া হইতে নামিয়া নিকটে গিয়া দেখিল। দেখিল যে, গোরের মাটি উঠাইয়া, উহারা মৃতদেহ বাহির করিয়াছে। মাণিকলাল, সেই মৃতদেহ খুব যত্নের সহিত, উদয়োন্মুখ ঊষার আলোকে পর্য্যবেক্ষণ করিল। তার পর কি বুঝিয়া ঐ দেহ আপনার অশ্বের উপর তুলিয়া বাঁধিয়া কাপড় ঢাকা দিয়া আপনি পদব্রজে চলিল।

মাণিকলাল দিল্লীর দর্‌ওয়াজার বাহিরে গেল। কিছু পরে সূর্য্যোদয় হইল, তখন মাণিকলাল ঐ মৃতদেহ ঘোড়া হইতে নামাইয়া, জঙ্গলের ছায়ায় লইয়া গিয়া

রাখিল। এবং আপনার পেঁটরা হইতে একটা ঔষধের বড়ি বাহির করিয়া, তাহা কোন অনুপান দিয়া মাড়িল। তার পর ছুরি দিয়া মৃতদেহটা স্থানে স্থানে একটু একটু চিরিয়া, ছিদ্রমধ্যে সেই ঔষধ প্রবেশ করাইয়া দিল। এবং জিবে ও চক্ষুতে কিছু কিছু মাখাইয়া দিল। দুই দণ্ড পরে আবার ঐরূপ করিল। এইরূপ তিন বার ঔষধ প্রয়োগ করিলে মৃত ব্যক্তি নিশ্বাস ফেলিল। চারি বারে সে চক্ষু চাহিল ও তাহার চৈতন্য হইল। পাঁচ বারে সে উঠিয়া বসিয়া কথা কহিল।

মাণিকলাল একটু দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়াছিল। তাহা মবারককে পান করাইল। মবারক ক্রমশঃ দুগ্ধ পান করিয়া সবল হইলে, সকল কথা তাহার স্মরণ হইল। তিনি মাণিকলালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আমাকে বাঁচাইল? আপনি?"

মাণিকলাল বলিল, "হাঁ।"

মবারক বলিল, "কেন বাঁচাইলেন? আপনাকে আমি চিনিয়াছি। আপনার সঙ্গে রূপনগরের পাহাড়ে যুদ্ধ করিয়াছি। আপনি আমায় পরাভব করিয়াছিলেন।"

মাণিক। আমিও আপনাকে চিনিয়াছি। আপনিই মহারাণাকে পরাজয় করেন। আপনার এ অবস্থা কেন ঘটিল?

মবরাক। এখন বলিবার কথা নহে। সময়ান্তরে বলিব। আপনি কোথায় যাইতেছেন–উদয়পুরে?

মাণিক। হাঁ।

মবা। আমাকে সঙ্গে লইবেন? দিল্লীতে আমার ফিরিবার যো নাই, তা বুঝিতেছেন বোধ হয়। আমি রাজদণ্ডে দণ্ডিত।

মাণিক। সঙ্গে লইয়া যাইতে পারি। কিন্তু আপনি এখন বড় দুর্ব্বল।

মবা। সন্ধ্যা লাগায়েৎ শক্তি পাইতে পারি। ততক্ষণ বিলম্ব করিতে পারিবেন কি?

মাণিক। করিব।

মবারককে আরও কিছু দুগ্ধাদি খাওয়াইল। গ্রাম হইতে মাণিকলাল একটা টাটু কিনিয়া আনিল। তাহার উপর মবারককে চড়াইয়া উদয়পুর যাত্রা করিল।

পথে যাইতে যাইতে ঘোড়া পাশাপাশি করিয়া, নির্জ্জনে মবারক জেব-উন্নিসার সকল কথা মাণিকলালকে বলিল। মাণিকলাল বুঝিল যে, জেব-উন্নিসার কোপানলে মবারক ভস্মীভূত হইয়াছে।

এদিকে আসিরদ্দীন ফিরিয়া আসিয়া জেব-উন্নিসাকে জানাইল যে, কিছুতেই বাঁচান গেল না। জেব-উন্নিসা আতরমাখা রুমালখানি চক্ষুতে দিয়াছিল, এখন পাথরে লুটাইয়া পড়িয়া, চাষার মেয়ের মত মাথা কুটিতে লাগিল।

যে দুঃখ কাহারও কাছে প্রকাশ করিবার নয়, তাহা সহ্য করা বড়ই কষ্ট। বাদশাহজাদীর সেই দুঃখ হইল। জেব-উন্নিসা ভাবিল, "যদি চাষার মেয়ে হইতাম!"

এই সময়ে কক্ষদ্বারে বড় গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। কেহ কক্ষপ্রবেশ করিবার জন্য জিদ্ করিতেছে–প্রতিহারী তাহাকে আসিতে দিতেছে না। জেব-উন্নিসা যেন দরিয়ার গলা শুনিলেন। প্রতিহারী তাহাকে আটক করিয়া রাখিতে পারিল না। দরিয়া প্রতিহারীকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার হাতে তরবারি ছিল। সে জেব-উন্নিসাকে কাটিবার জন্য তরবারি উঠাইল। কিন্তু সহসা তরবারি ফেলিয়া দিয়া জেব-উন্নিসার সম্মুখে নৃত্য আরম্ভ করিল। বলিল, "বহুৎ আচ্ছা,–চোখে জল!" এই বলিয়া উচ্চস্বরে হাসিতে লাগিল। জেব-উন্নিসা প্রতিহারীকে ডাকিয়া উহাকে ধৃত করিতে আজ্ঞা দিলেন। প্রতিহারী তাহাকে ধরিতে পারিল না। সে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। প্রতিহারী তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া তাহার বস্ত্র ধরিল। দরিয়া বস্ত্র খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া নগ্নাবস্থায় পলায়ন করিল। সে তখন ঘোর উন্মাদগ্রস্ত। মবারকের মৃত্যুসংবাদ সে শুনিয়াছিল।

সপ্তম খণ্ড

অগ্নি জ্বলিল

প্রথম পরিচ্ছেদ : দ্বিতীয় Xerxes–দ্বিতীয় Plataes

রাজসিংহের রাজ্য ধ্বংস করিবার জন্য ঔরঙ্গজেবের যাত্রা করিতে যে বিলম্ব হইল, তাহার কারণ, তাঁহার সেনোদ্যোগ অতি ভয়ঙ্কর। দুর্য্যোধন ও যুধিষ্ঠিরের ন্যায় তিনি ব্রহ্মপুত্র পার হইতে বাহ্লীক পর্য্যন্ত, কাশ্মীর হইতে কেরল ও পাণ্ড্য পর্য্যন্ত, যেখানে যত সেনা ছিল, সব এই মহাযুদ্ধে আহূত করিলেন। দক্ষিণাপথের মহাসৈন্য, গোলকুণ্ডা বিজয়পুর মহারাষ্ট্রের সমরের অবিশ্রান্ত বজ্রাঘাতে, দ্বিতীয় বৃত্রাসুরের ন্যায় যাহার পৃষ্ঠ অশনিদুর্ভেদ্য হইয়াছিল–তাহা লইয়া বাদশাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ আলম, দক্ষিণ হইতে উদয়পুর ভাসাইতে আসিলেন। অন্য পুত্র আজম শাহ–বাঙ্গালার রাজপ্রতিনিধি, পূর্ব্বভারতবর্ষের মহতী চমূ লইয়া মেবারের পর্ব্বতমালার দ্বারে উপস্থিত হইলেন। পশ্চিমে মুলতান হইতে পাঞ্জাব কাবুল কাশ্মীরের অজেয় যোদ্ধৃবর্গ লইয়া, অপর পুত্র আকব্বর শাহ আসিয়া, সেনাসাগরের অনন্ত স্রোতে আপনার সেনাসাগর মিশাইলেন। উত্তরে স্বয়ং শাহান শাহ বাদশাহ দিল্লী হইতে অপরাজেয় বাদশাহী সেনা লইয়া উদয়পুরের নাম পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত করিবার জন্য মেবারে দর্শন দিলেন। সাগরমধ্যস্থ উন্নত পর্ব্বতশিখরসদৃশ সেই অনন্ত মোগল সেনাসাগরমধ্যে উদয়পুর শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তসর্পশ্রেণীপরিবেষ্টিত গরুড়, যতটুকু শত্রুভীত হওয়ার সম্ভবানা, রাজসিংহ এই সাগরসদৃশ মোগলসেনা দেখিয়া ততটুকুই ভীত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষে এরূপ সেনোদ্যোগ কুরুক্ষেত্রের পর হইয়াছিল কি না, বলা যায় না। যে সেনা চীন, পারস্য বা রুষ জয়ের জন্যও আবশ্যক হয় না–ক্ষুদ্র উদয়পুর জয়ের জন্য ঔরঙ্গজেব বাদশাহ, তাহা রাজপুতানায় আনিয়া উপস্থিত করিলেন। একবার মাত্র পৃথিবীতে এরূপ ঘটনা হইয়াছিল। যখন পারস্য পৃথিবীর মধ্যে বড় রাজ্য ছিল, তখন তদধিপতি সের (Xerxes) পঞ্চাশ লক্ষ লোক লইয়া গ্রীস নামা ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড জয় করিতে গিয়াছিলেন। থার্ম্মপলিতে Leonidas, সালামিসে Themistocles এবং প্লাতীয়ায় Pausanias তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া, তাঁহাকে দূর করিয়া দিল–শৃগাল কুক্কুরের মত সের পলাইয়া আসিলেন। সেইরূপ ঘটনা পৃথিবীতলে এই দ্বিতীয়বার মাত্র ঘটিয়াছিল। বহু লক্ষ সেনা লইয়া ভারতপতি–সেরের অপেক্ষাও দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী রাজা–রাজপুতানার একটু ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড জয় করিতে গিয়াছিলেন–রাজসিংহ তাঁহাকে কি করিলেন, তাহা বলিতেছি।

যুদ্ধবিদ্যা, ইউরোপীয় বিদ্যা। আসিয়া খণ্ডে, ভারতবর্ষে ইহার বিকাশ কোন কালে নাই। যে পুরাণেতিহাসবর্ণিত আর্য্যবীরগণের এত খ্যাতি শুনি, তাহাদের কৌশল কেবল তীরন্দাজী ও লাঠিয়ালিতে। ইতিহাসলেখক ব্রাহ্মণেরা যুদ্ধবিদ্যা কি, তাহা বুঝিতেন না বলিয়াই হৌক, আর যুদ্ধবিদ্যা বস্তুতঃ প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে ছিল না বলিয়াই হৌক, রামচন্দ্র অর্জ্জুনাদির সেনাপতিত্বের কোন পরিচয় পাই না। অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য, শকাদিত্য, শিলাদিত্য–কাহারও সেনাপতিত্বের কোন পরিচয় পাই না। যাঁহারা ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন, মহম্মদ কাসিম, গজনবী মহম্মদ, শাহাবুদ্দীন, আলাউদ্দীন, বাবর, তৈমুর, নাদের, শের–কাহারও সেনাপতিত্বের কোন পরিচয় পাই না। বোধ হয়, মুসলমান লেখকেরাও ইহা বুঝিতেন না। আকব্বরের সময় হইতে এই সেনাপতিত্বের কতক কতক পরিচয় পাওয়া যায়। আকব্বর, শিবজী, আহাম্মদ আবদালী, হৈদর আলি, হরিসিং প্রভৃতিতে সেনাপতিত্বের লক্ষণ, রণপাণ্ডিত্যের লক্ষণ দেখা যায়।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে যত রণপণ্ডিতের কথা আছে, রাজসিংহ কাহারও অপেক্ষা ন্যূন নহেন। ইউরোপেও এরূপ রণপণ্ডিত অতি অল্পই জন্মিয়াছিল। অল্প সেনার সাহায্যে এরূপ মহৎ কার্য্য ওলন্দাজ বীর মুকাখ্য উইলিয়মের পর পৃথিবীতে আর কেহ করে নাই।

সে অপূর্ব্ব সেনাপতিত্বের পরিচয় দিবার এ স্থল নহে। সংক্ষেপে বলিব।

চতুর্ভাগে বিভক্ত ঔরঙ্গজেবের মহতী সেনা সমাগতা হইলে, রণপণ্ডিতের যাহা কর্ত্তব্য, রাজসিংহ প্রথমেই তাহা করিলেন। পর্ব্বতমালার বাহিরে, রাজ্যের যে অংশ সমতল, তাহা ছাড়িয়া দিয়া, পর্ব্বতোপরি-আরোহণ করিয়া সেনা সংস্থাপিত করিলেন। তিনি নিজ সৈন্য তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন। এক ভাগ, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়সিংহের কর্তৃত্বাধীনে পর্ব্বতশিখরে সংস্থাপিত করিলেন। দ্বিতীয় ভাগ, দ্বিতীয় পুত্র ভীমসিংহের অধীনে পশ্চিমে সংস্থাপিত করিলেন; সে দিকের পথ খোলা থাকে, অন্যান্য রাজপুতগণ সেই পথে প্রবেশ করিয়া সাহায্য করেন, ইহাও অভিপ্রেত। নিজে তৃতীয় ভাগ লইয়া পূর্ব্বদিকে নয়ন নামে গিরিসঙ্কটমধ্যে উপবিষ্ট হইলেন।

আজম শাহ সৈন্য লইয়া যেখানে উপস্থিত হইলেন, সেখানে ত পর্ব্বতমালায় তাঁহার গতিরোধ হইল। আরোহণ করিবার সাধ্য নাই; উপর হইতে গোলা ও শিলাবৃষ্টি হয়। ক্রিয়াবাড়ীর দ্বার বন্ধ হইলে, কুকুর যেমন রুদ্ধ দ্বার ঠেলাঠেলি করে, কিছু করিতে পারে না, তিনি সেইরূপ পার্ব্বত্য দ্বার ঠেলাঠেলি করিতে লাগিলেন—ঢুকিতে পাইলেন না।

ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে আজমীরে আকব্বরের মিলন হইল। পিতাপুত্র সৈন্য মিলাইয়া পর্ব্বতমালার মধ্যে যেখানে তিনটি পথ খোলা, সে দিকে আসিলেন। এই তিনটি পথ, গিরিসঙ্কট। একটির নাম দোবারি; আর একটি দয়েলবাবা; আর একটি পূর্ব্বকথিত নয়ন। দোবারিতে পৌঁছিলে পর, ঔরঙ্গজেব, আকব্বরকে ঐ পথে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য লইয়া আগে আগে যাইতে অনুমতি করিয়া উদয়সাগর নামে বিখ্যাত সরোবরতীরে শিবির সংস্থানপূর্ব্বক স্বয়ং কিঞ্চিৎ বিশ্রাম লাভের চেষ্টা করিলেন।

শাহজাদা আকব্বর, পার্ব্বত্য পথে উদয়পুরে প্রবেশ করিতে চলিলেন। জনপ্রাণী তাঁহার গতিরোধ করিল না। রাজপ্রাসাদমালা, উপবনশ্রেণী, সরোবর, তন্মধ্যস্থ উপদ্বীপ সকল দেখিলেন, কিন্তু মনুষ্য মাত্র দেখিতে পাইলেন না। সমস্ত নীরব। আকব্বর তখন শিবির সংস্থাপন করিলেন; মনে করিলেন যে, তাঁহার ফৌজের ভয়ে দেশের লোক পলাইয়াছে। মোগলশিবিরে আমোদ প্রমোদ হইতে লাগিল। কেহ ভোজনে, কেহ খেলায়, কেহ নেমাজে রত। এমন সময়ে সুপ্ত পথিকের উপর যেমন বাঘ লাফাইয়া পড়ে, কুমার জয়সিংহ তেমনই শাহজাদা আকব্বরের উপর লাফাইয়া পড়িলেন। বাঘ প্রায় সমস্ত মোগলকে দুংষ্ট্রামধ্যে পুরিল—প্রায় কেহ বাঁচিল না। পঞ্চাশ সহস্র মোগলের মধ্যে অল্পই ফিরিল। শাহাজাদা গুজরাট অভিমুখে পলাইলেন।

মাজুম শাহ, যাঁহার নামান্তর শাহ আলম, তিনি দাক্ষিণাত্য হইতে সৈন্যরাশি লইয়া, আহম্মদাবাদ ঘুরিয়া, পর্ব্বতমালার পশ্চিম প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই পথ, গণরাও নামক পার্ব্বত্য পথ। তিনি সেই পথ উত্তীর্ণ হইয়া কাঁকরলির সমীপবর্ত্তী সরোবর ও রাজপ্রাসাদমালার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, আর পথ নাই। পথ করিয়া অগ্রসর হইতেও পারেন না। তাহা হইলে রাজপুতেরা তাঁহার পশ্চাতের পথ বন্ধ করিবে—রসদ আনিবার আর উপায় থাকিবে না—না খাইয়া মরিবেন। যাঁহারা যথার্থ সেনাপতি, তাঁহারা জানেন যে, হাতে মারিলে যুদ্ধ হয় না—পেটে মারিতে হয়। যাঁহারা যথার্থ সেনাপতি, তাঁহারা জানেন যে, পেট চলিবার উপায় বজায় রাখিয়া—হাত চালান চাই। শিখেরা আজিও রোদন করিয়া বলে, শিখ সেনাপতিরা শিখসেনার রসদ বন্ধ করিল বলিয়া শিখ পরাজিত হইল। সার বার্টল্ ফ্রিয়র একদা বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালী যুদ্ধ করিতে জানে না বলিয়া ঘৃণা করিও না—বাঙ্গালী একদিনে সমস্ত খাদ্য লুকাইতে পারে। শাহ আলম যুদ্ধ বুঝিতেন, সুতরাং আর অগ্রসর হইলেন না।

রাজসিংহের সেনাসংস্থাপনের গুণে (এইটিই সেনাপতির প্রধান কার্য্য) বাঙ্গালার সেনা ও দাক্ষিণাত্যের সেনা, বৃষ্টিকালে কপিদলের মত–কেবল জড়সড় হইয়া বসিয়া রহিল। মূলতানের সেনা ছিন্নভিন্ন হইয়া ঝড়ের মুখে ধূলার মত কোথায় উড়িয়া গেল। বাকি খোদ বাদশাহ–দুনিয়াবাজ বাদশাহ আলম্‌গীর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : নয়নবহ্নিও বুঝি জ্বলিয়াছিল

শাহজাদা আকব্বর শাহকে আগে পাঠাইয়া, খোদ বাদশাহ উদয়সাগরতীরে শিবির ফেলিয়াছেন। পাশ্চাত্য পরিব্রাজক, মোগলদিগের দিল্লী দেখিয়া বলিয়াছিলেন, দিল্লী একটি বৃহৎ শিবির মাত্র। পক্ষান্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে মোগল বাদশাহদিগের শিবির একটি দিল্লী নগরী। নগরের যেমন চক, তেমনই বড় বড় চক সাজাইয়া তাম্বু পাতা হইত। এমন অসংখ্য চত্বরশ্রেণীতে একটি বস্ত্রনির্ম্মিতা মহানগরীর সৃষ্টি হইত। সকলের মধ্যে বাদশাহের তাম্বুর চক। দিল্লীতে যেমন মহার্ঘ হর্ম্ম্যশ্রেণীমধ্যে বাদশাহ বাস করিতেন, তেমনই মহার্ঘ হর্ম্ম্যশ্রেণীমধ্যে এখানেও বাস করিতেন; তেমনই দরবার, আমখাস, গোসলখানা,* রঙ্‌মহাল। এই সকল বাদশাহী তাম্বু কেবল বস্ত্রনির্ম্মিত নহে। ইহার লৌহ পিত্তলের সজ্জা ছিল–এবং ইহাতে দ্বিতল ত্রিতল কক্ষও থাকিত। সম্মুখে দিল্লীর দুর্গের ফটকের ন্যায় বড় ফটক। বাদশাহী তাম্বু সকলের বস্ত্রনির্ম্মিত প্রাচীর বা পট পাদক্রোশ দীর্ঘ, সমস্তই চারু কারুকার্য্যখচিত পট্টবস্ত্রনির্ম্মিত। যেমন দুর্গপ্রাচীরে বুরুজ গম্বুজ প্রভৃতি থাকিত, ইহাতে তাহা ছিল। পিত্তলের স্তম্ভের দ্বারা এই প্রাচীর রক্ষিত হইত। কক্ষসকলের বাহিরে উজ্জ্বল রক্তিম পটের শোভা। ভিতরে সমস্ত দেয়াল "ছবি" মোড়া। ছবি, আমরা এখন যাহাকে বলি তাই, অর্থাৎ কাচের পরকলার ভিতর চিত্র। দরবার তাম্বুতে শিরোপরে সুবর্ণখচিত চন্দ্রাতপ–নিম্নে বিচিত্র গালিচা, মধ্যে রত্নমণ্ডিত রাজসিংহাসন। চারি দিকে অস্ত্রধারিণী তাতারসুন্দরীগণের প্রহরা।

রাজপ্রাসাদাবলীর পরে আমীর ওমরাহদিগের পটমণ্ডপরাজির শোভা। এমন শোভা অনেক ক্রোশ ব্যাপিয়া। কোন পটনির্ম্মিত অট্টালিকা রক্তবর্ণ, কোনটি পীতবর্ণ, কোনটি শ্বেত, কোনটি হরিৎকপিশ, কোনটি নীল, সকলের সুবর্ণকলস চন্দ্রসূর্য্যের কিরণে ঝলসিতে থাকে। তীরে, এই সকলের চারিদিকে, দিল্লীর চকের ন্যায় বিচিত্র পণ্যবীথিকা–বাজারের পর বাজার। সহসা বাদশাহের শুভাগমনে উদয়সাগরতীরে এই রমণীয় মহানগরীর সৃষ্টি হইল। দেখিয়া লোক বিস্ময়াপন্ন হইল।

বাদশাহ যখন শিবিরে আসিতেন, তখন অন্তঃপুরবাসিনী সকলেই সঙ্গে আসিত। বেগমেরা সকলেই আসিত। এবারও আসিয়াছিল। যোধপুরী, উদিপুরী, জেব-উন্নিসা সকলেই আসিয়াছিল। যোধপুরীর সঙ্গে নির্ম্মলকুমারীও আসিয়াছিল। দিল্লীর রঙ্‌মহালে যেমন তাহাদের পৃথক পৃথক মন্দির ছিল, শিবিরের রঙ্‌মহালেও তেমনই তাহাদের পৃথক পৃথক মন্দির ছিল।

এই সুখের শিবিরে, ঔরঙ্গজেব রাত্রিকালে যোধপুরীর মহালে আসিয়া সুখে কথোপকথন করিতেছেন। নির্ম্মলকুমারীও সেখানে উপস্থিত।

"ইমলি বেগম!" বলিয়া বাদশাহ নির্ম্মলকে ডাকিলেন। নির্ম্মলকে তিনি ইতিপূর্ব্বে "নিমলি বেগম" বলিতেন, কিন্তু বাক্যের যন্ত্রণা ভুগিয়া এক্ষণে "ইমলি বেগম" বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বাদশাহ নির্ম্মলকে বলিলেন, "ইমলি বেগম! তুমি আমার, না রাজপুতের?" নির্ম্মল যুক্তকরে বলিল, "দুনিয়ার বাদশাহ দুনিয়ার বিচার করিতেছেন, এ কথারও তিনি বিচার করুন।"

ঔরঙ্গ। আমার বিচারে এই হইতেছে যে, তুমি রাজপুতের কন্যা, রাজপুত তোমার স্বামী, তুমি রাজপুতমহিষীর সখী–তুমি রাজপুতেরই।

---

* যাহাকে মোগল বাদশাহেরা গোসলখানা বলিতেন, তাহাতে, আধুনিক বৈঠকখানার মত কার্য্য হইত। সেইটি আয়েশেরাস্থান

নির্ম্মল। জাঁহাপনা! বিচার কি ঠিক হইল? আমি রাজপুতের কন্যা বটে, কিন্তু হজরৎ যোধপুরীও তাই। আপনার পিতামহী ও প্রপিতামহীও তাই—তাঁহারা মোগল বাদশাহের হিতাকাঙ্ক্ষিণী ছিলেন না কি?

ঔরঙ্গ। ইহারা মোগল বাদশাহের বেগম, তুমি রাজপুতের স্ত্রী।

নির্ম্মল। (হাসিয়া) আমি শাহান্‌শাহ, আলম্‌গীর বাদশাহের ইম্‌লি বেগম।

ঔরঙ্গ। তুমি রূপনগরীর সখী।

নির্ম্মল। যোধপুরীরও তাই।

ঔরঙ্গ। তবে তুমি আমার?

নির্ম্মল। আপনি যেমন বিবেচনা করেন।

ঔ। আমি তোমাকে একটি কার্য্যে নিযুক্ত করিতে চাই। তাহাতে আমার উপকার আছে, রাজসিংহের অনিষ্ট আছে। এমন কার্য্যে তোমাকে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করি, তুমি তাহা করিবে?

নি। কি কার্য্য, তাহা না জানিলে আমি বলিতে পারি না। আমি কোন দেবতা ব্রাহ্মণের অনিষ্ট করিতে পারিব না।

ঔ। আমি তোমাকে সে সব কিছু করিতে বলিব না। আমি উদয়পুর নগর দখল করিব—রাজসিংহের রাজপুরী দখল করিব, সে সকল বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু রাজপুরী দখল হইলে পর রূপনগরীকে হস্তগত করিতে পারিব কি না সন্দেহ। তুমি সেই বিষয়ে সহায়তা করিবে।

নি। আমি আপনার নিকট গঙ্গাজী যমুনাজীর শপথ করিতেছি যে, আপনি যদি উদয়পুরের রাজপুরী দখল করেন, তবে আমি চঞ্চলকুমারীকে আনিয়া আপনার হস্তে সমর্পণ করিব।

ঔ। সে কথা বিশ্বাস করি; কেন না, তুমি নিশ্চয় জান যে, যে আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করে, তাহাকে টুকরা টুকরা কাটিয়া কুকুরকে খাওয়াইতে পারি।

নি। পারেন কি না, সে বিষয়ে বিচার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি আপনাকে প্রবঞ্চনা করিব না। তবে আপনি পুরী অধিকার করার পর তাহাকে আমি জীবিত পাইব কি না সন্দেহ। রাজপুতমহিষীদিগের রীতি এই যে, শত্রুর হাতে পড়িবার আগে চিতায় পুড়িয়া পুড়িয়া মরে। তাহাকে জীবিত পাইব না বলিয়াই এ কথা স্বীকার করিতেছি। নহিলে আমা হইতে চঞ্চলকুমারীর কোন অনিষ্ট ঘটিবে না।

ঔ। ইহাতে অনিষ্ট কি? সে ত বাদশাহের বেগম হইবে।

নির্ম্মল উত্তর করিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে খোজা আসিয়া নিবেদন করিল, "পেশকার দরবারে হাজির, জরুরি আর্‌জি পেশ করিবে। হজরৎ শাহজাদা আকব্বর শাহের সংবাদ আসিয়াছে।"

ঔরঙ্গজেব অতিশয় ব্যস্ত হইয়া দরবারে গেলেন। পেশকার আরজি পেশ করিল। ঔরঙ্গজেব শুনিলেন, আকব্বরের পঞ্চাশ হাজার মোগল সেনা ছিন্নভিন্ন হইয়া প্রায় নিঃশেষে নিহত হইয়াছে। হতাবশিষ্ট কোথায় পলায়ন করিয়াছে, কেহ জানে না।

ঔরঙ্গজেব তখনই শিবির ভঙ্গ করিতে আজ্ঞা দিলেন।

আকব্বরের সংবাদ রঙ্‌মহালেও পৌঁছিল। শুনিয়া নির্ম্মলকুমারী পেশোয়াজ পরিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া যোধপুরী বেগমের নিকট রূপনগরী নাচের মহলা দিল।

বেশভূষা পরিত্যাগ করিয়া নির্ম্মলকুমারী ভাল মানুষ হইয়া বসিলে বাদশাহ তাহাকে তলব করিলেন। নির্ম্মল হাজির হইলে বাদশাহ বলিলেন, "আমরা তাম্বু

ভাঙ্গিতেছি–লড়াইয়ে যাইব–তুমি কি এখন উদয়পুর যাইতে চাও?”

নি। না, এক্ষণে আমি ফৌজের সঙ্গে যাইব। যাইতে যাইতে যেখানে সুবিধা বুঝিব সেইখানে হইতে চলিয়া যাইব।

ঔরঙ্গজেব একটু দুঃখিতভাবে বলিলেন, “কেন যাইবে?”

নির্ম্মল বলিল, “শাহান্‌শাহের হুকুম।”

ঔরঙ্গজেব প্রফুল্লভাবে বলিলেন, “আমি যদি যাইতে না দিই, তুমি কি চিরদিন আমার রঙ্‌মহালে থাকিতে সম্মত হইবে?”

নির্ম্মলকুমারী যুক্তকরে বলিল, “আমার স্বামী আছেন।”

ঔরঙ্গজেব একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, “যদি তুমি ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ কর–যদি সে স্বামী ত্যাগ কর–তবে উদিপুরী অপেক্ষা তোমাকে গৌরবে রাখিব।”

নির্ম্মল একটু হাসিয়া, অথচ সসম্ভ্রমে বলিল, “তাহা হইবে না, জাঁহাপনা!”

ঔ। কেন হইবে না? কত রাজপুতরাজকন্যা ত মোগলের ঘরে আসিয়াছে।

নি। তাহারা কেহ স্বামী ত্যাগ করিয়া আসে নাই।

ঔ। যদি তোমার স্বামী না থাকিত, তাহা হইলে আসিতে?

নি। এ কথা কেন?

ঔ। কেন, তাহা বলিতে আমার লজ্জা করে, আমি তেমন কথা কখনও কাহাকেও বলি নাই। আমি প্রাচীন হইয়াছি, কিন্তু কখন কাহাকেও ভালবাসি নাই। এ জন্মে কেবল তোমাকেই ভালবাসিয়াছি। তাই, তুমি যদি বল যে, তোমার স্বামী না থাকিলে তুমি আমার বেগম হইতে, তাহা হইলে এ স্নেহশূন্য হৃদয়–পোড়া পাহাড়ের মত হৃদয়–একটু স্নিগ্ধ হয়।

নির্ম্মল ঔরঙ্গজেবের কথায় বিশ্বাস করিল–কেন না, ঔরঙ্গজেবের কণ্ঠের স্বর বিশ্বাসের যোগ্য বলিয়া বোধ হইল। নির্ম্মল ঔরঙ্গজেবের জন্য কিছু দুঃখিত হইয়া বলিল, “জাঁহাপনা, এ বাঁদী এমন কি কাজ করিয়াছে যে, সে আপনার ভালবাসার যোগ্য হয়?”

ঔ। তাহা বলিতে পারি না। তুমি সুন্দরী বটে, কিন্তু সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইবার বয়স আমার আর নাই। আর তুমি সুন্দরী হইলেও উদিপুরী অপেক্ষা নও। বোধ করি, আমি তোমার কাছে ভিন্ন আর কোথাও সত্য কথা কখন পাই নাই, সেই জন্য। বোধ করি, তোমার বুদ্ধি, চতুরতা, আর সাহস দেখিয়া তোমাকেই আমার উপযুক্ত মহিষী বলিয়া বিশ্বাস হইয়াছে। যাই হৌক, আলম্‌গীর বাদশাহ তোমার ভিন্ন আর কাহারও কখন বশীভূত হয় নাই। আর কাহারও চক্ষুর কটাক্ষে মোহিত হয় নাই।

নি। শাহান্‌শাহ! আমাকে একদা রূপনগরের রাজকন্যা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, “তুমি কাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা কর? আমি বলিয়াছিলাম, আলম্‌গীর বাদশাহকে। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন?” আমি তাঁহাকে বুঝাইলাম যে, আমি বাল্যকালে বাঘ পুষিয়াছিলাম, বাঘকে বশ করাইতে আমার আনন্দ ছিল। বাদশাহকে বশ করিতে পারিলে আমার সেই আনন্দ হইবে। আমার ভাগ্যবশতঃই অবিবাহিত অবস্থায় আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। আমি যে দীন দরিদ্রকে স্বামীত্বে বরণ করিয়াছি, তাহাতেই আমি সুখী। এক্ষণে আমায় বিদায় দিন।

ঔরঙ্গজেব দুঃখিত হইয়া বলিলেন, “দুনিয়ার বাদশাহ হইলেও কেহ সুখী হয় না–কাহারও সাধ মিটে না। এ পৃথিবীতে আমি কেবল তোমায় ভালবাসিয়াছি–কিন্তু তোমাকে পাইলাম না। তোমায় ভালবাসিয়াছি, অতএব তোমায় আটকাইব না–ছাড়িয়া দিব। তুমি যাহাতে সুখী হও, তাহাই করিব।

যাহাতে তোমার দুঃখ হয়, তাহা করিব না। তুমি যাও। আমাকে স্বরণ রাখিও। যদি কখনও আমা হইতে তোমার কোন উপকার হয়, আমাকে জানাইও। আমি তাহা করিব।"

নির্ম্মল কুর্ণিশ করিল। বলিল, "আমার একটি মাত্র ভিক্ষা রহিল। যখন উভয় পক্ষের মঙ্গলার্থ সন্ধি করিতে আমি আপনাকে অনুরোধ করিব, তখন আমার কথায় কর্ণপাত করিবেন।"

ঔরঙ্গজেব বলিল, "সে কথার বিচার সেই সময়ে হইবে।"

তখন নির্ম্মল ঔরঙ্গজেবকে তাহার কপোত দেখাইল। বলিল, "এই শিক্ষিত পায়রা আপনি রাখিবেন। যখন এ দাসীকে আপনি স্মরণ করিবেন, এই পায়রাটি আপনি ছাড়িয়া দিবেন। ইহা দ্বারা আমার নিবেদন আপনাকে জানাইব। আমি এক্ষণে সৈন্যের সঙ্গে রহিলাম। যখন আমার বিদায় লইবার সময় হইবে, বেগম সাহেবা যেন আমাকে বিদায় দেন, এই অনুমতি তাঁর প্রতি থাক।"

তখন ঔরঙ্গজেব সৈন্য চালনার ব্যবস্থা করিতে নিযুক্ত হইলেন।

কিন্তু তাঁহার মনে বড় বিষাদ উপস্থিত হইল। নির্ম্মলের মত কথোপকথনে সাহস, বাকচাতুর্য্য এবং স্পষ্টবক্তৃত্ব মোগল বাদশাহ আর কোথাও দেখেন নাই। যদি কোন রাজা–শিবজী বা রাজসিংহ, যদি কোন সেনাপতি–দিলীর কি তয়বার, যদি কোন শাহজাদা–আজিম কি আকব্বর, এরূপ সাহসে এরূপ স্পষ্ট কথা বলিত, ঔরঙ্গজেব তাহা সহ্য করিতেন না। কিন্তু রূপবতী যুবতী সহায়হীনা নির্ম্মলের কাছে তাহা মিষ্ট লাগিত। বুড়ার উপর যতটুকু কন্দর্পের অত্যাচার হইতে পারে, বোধ হয় তাহা হইয়াছিল। ঔরঙ্গজেব প্রেমান্ধের মত বিচ্ছেদে শোকে শোকাকুল না হইয়া একটু বিষণ্ন হইলেন মাত্র। ঔরঙ্গজেব মার্ক আন্তনি বা অগ্নিবর্ণ ছিলেন না, কিন্তু মনুষ্য কখন পাষাণও হয় না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বাদশাহ বহ্নিচক্রে

প্রভাতে বাদশাহী সেনা কুচ করিতে আরম্ভ করিল। সর্ব্বাগ্রে পথপরিষ্কারক সৈন্য পথ পরিষ্কারের জন্য সশস্ত্রে ধাবিত। তাহাদের অস্ত্র, কোদালি, কুড়ালি, দা ও কাটারি। তাহারা সম্মুখের গাছ সকল কাটিয়া, সরাইয়া খানা পয়গার বুজাইয়া, মাটি চাঁচিয়া, বাদশাহী সেনার জন্য প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিল। সেই প্রশস্ত পথে কামানের শ্রেণী, শকটের উপর আরূঢ় হইয়া ঘড়ু ঘড়ু হড়ু হড়ু করিয়া চলিল,–সঙ্গে গোলন্দাজ সেনা। অসংখ্য গোলন্দাজি গাড়ির ঘড়ু ঘড়ু শব্দে কর্ণ বধির,–তাহার চক্রসহস্র হইতে বিঘূর্ণিত ঊর্দ্ধোত্থিত ধূলিজালে নয়ন অন্ধ; কালান্তক যমের ন্যায় ব্যাদিতাস্য কামানসকলের আকার দেখিয়া হৃদয় কম্পিত। এই গোলন্দাজ সেনার পশ্চাৎ রাজকোষাগার। বাদশাহী কোষাগার সঙ্গে সঙ্গে চলিত; দিল্লীতে কাহাকেও বিশ্বাস করিয়া ঔরঙ্গজেব ধনরাশি রাখিয়া যাইতে পারিতেন না; ঔরঙ্গজেবের সাম্রাজ্যশাসনে মূলমন্ত্র সর্ব্বজনে অবিশ্বাস। ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, এইবার দিল্লী হইতে যাত্রা করিয়া ঔরঙ্গজেব আর কখন দিল্লী ফিরিলেন না। শতাব্দীর একপাদ শিবিরে শিবিরে ফিরিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রাণত্যাগ করিলেন।

অনন্ত ধনরত্নরাজিপরিপূর্ণ গজাদিবাহিত রাজকোষের পর, বাদশাহী দফ্‌তরখানা চলিল। থাকে থাকে থাকে, গাড়ি, হাতী, উটের উপর সাজান খাতাপত্র বহিজাত; সারির পর সারি, শ্রেণীর পর শ্রেণী; অসংখ্য, অনন্ত চলিতে লাগিল। তার পর গঙ্গাজলবাহী উটের শ্রেণী। গঙ্গাজলের মত সুপেয় কোন নদীর জল নহে; তাই বাদশাহদিগের সঙ্গে অর্দ্ধেক গঙ্গার জল চলিত। জলের পর আহার্য্য–আটা, ঘৃত, চাউল, মশলা, শর্করা, নানাবিধ পক্ষী, চতুষ্পদ–প্রস্তুত, অপ্রস্তুত, পক্ব, অপক্ব, ভক্ষ্য চলিত। তার সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র বাবুর্চি। তৎপশ্চাৎ তোষাখানা–এল্‌বাস পোষাকের, জেওরাতের হুড়াহুড়ি ছড়াছড়ি; তার পর অগণনীয়

অশ্বারোহী মোগল সেনা।

এই গেল সৈন্যের প্রথম ভাগ। দ্বিতীয় ভাগে বাদশাহ খোদ। আগে আগে অসংখ্য উষ্ট্রশ্রেণীর উপর জ্বলন্ত বহ্নিবাহী বৃহৎ কটাহসকলে, ধূনা, গুগ্‌গুল, চন্দন, মৃগনাভি প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য। সুগন্ধে ক্রোশ ব্যাপিয়া পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ আমোদিত। তৎপশ্চাৎ বাদশাহী খাস আহদী সেনা, দোষশূন্য রমণীয় অশ্বরাজির উপর আরূঢ়, দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিতেছে। মধ্যে বাদশাহ নিজে মণিরত্নকিঙ্কিণীজালাদি শোভায় উজ্জ্বল উচ্চৈঃশ্রবা তুল্য অশ্বের উপর আরুঢ়–শিরোপরি বিখ্যাত শ্বেতছত্র। তার পর সৈন্যের সার, দিল্লীর সার, বাদশাহীর সার, ঔরঙ্গজেবের অবরোধবাসিনী সুন্দরীসম্প্রদায়। কেহ বা ঐরাবততুল্য গজপৃষ্ঠে, সুবর্ণনির্ম্মিত কারুকার্য্যবিশিষ্ট মখ্‌মলে মোড়া, মুক্তাঝালরভূষিত, অতি সূক্ষ্ম লূতাতন্তুতুল্য রেশমী বস্ত্রে আবৃত, হাওদার ভিতরে, অতি ক্ষীণমেঘাবৃত উজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্রতুল্য জ্বলিতেছে–রত্নমালাজড়িত কালভুজঙ্গীতুল্য, বেণী পৃষ্ঠে দুলিতেছে –কুঞ্চতার বৃহক্ষুর মধ্যে কালাগ্নিতুল্য কটাক্ষ খেলিতেছে; উপরে কালো ভ্রূযুগ, নীচে সুর্‌মার রেখা, তাহার মধ্যে সেই বিদ্যুদ্দামবিস্ফুরণে, সমস্ত সৈন্য বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিতেছে; মধুর তাম্বূলারক্ত অধরে মাধুর্য্যময়ী সুন্দরীকুল মধুর মধুর হাসিতেছে। এমন এক জন নয়, দুই জন নয়,–হাতীর গায়ে হাতী, হাতীর পিছু হাতী, তার পিছু হাতী। সকলের উপরেই তেমনই হাওদা, সকল হাওদার ভিতর তেমনই সুন্দরী, সকল সুন্দরীর নয়নেই মেঘযুগলমধ্যস্থ বিদ্যুদ্দামের ক্রীড়া! কালো পৃথিবী আলো হইয়া গেল। কেহ বা কদাচিৎ দোলায় চলিল–দোলার বাহিরে কিংখাপ, ভিতরে জরদোজী কামদার মখমল, উপরে মুক্তার ঝালর, রূপার দাণ্ডা, সোণার হাঙ্গর–তাহার ভিতরে রত্নমণ্ডিতা সুন্দরী। যোধপুরী ও নির্ম্মলকুমারী, উদিপুরী ও জেব-উন্নিসা, ইহারা গজপৃষ্ঠে। উদিপুরী হাস্যময়ী। যোধপুরী অপ্রসন্না। নির্ম্মলকুমারী রহস্যময়ী। জেব-উন্নিসা, গ্রীষ্মকালে উন্মূলিতা লতার মত ছিন্নবিচ্ছিন্ন, পরিশুষ্ক, শীর্ণ, মৃতকল্প। জেব-উন্নিসা ভাবিতেছে, "এ হাতিয়ার লহরীমাঝে আমার ডুবিয়া মরিবার কি উপায় নাই?"

এই মনোমোহিনী বাহিনীর পশ্চাৎ কুটুম্বিনী ও দাসীবৃন্দ। সকলেই অশ্বারূঢ়া, লম্বিতবেণী, রক্তাধরা, বিদ্যুৎকটাক্ষা; অলঙ্কারশিঞ্জিতে ঘোড়া সকল নাচিয়া উঠিতেছে। এই অশ্বারোহিণী বাহিনীও অতিশয় লোকমনোমোহিনী। ইহাদের পশ্চাতে আবার গোলন্দাজ সেনা–কিন্তু ইহাদের কামান অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বাদশাহ বুঝি স্থির করিয়াছিলেন, কামিনীর কমনীয় কটাক্ষের পর আর বড় কামানের প্রয়োজন নাই।

তৃতীয় ভাগে পদাতি সৈন্য। তৎপশ্চাৎ দাস দাসী, মুটে মজুর, নর্ত্তকী প্রভৃতি বাজে লোক, খালি ঘোড়া, তাম্বুর রাশি এবং মোট ঘাট।

যেমন ঘোরনাদে গ্রাম প্রদেশ ভাসাইয়া–তিমি মকর আবর্ত্তাদিতে ভয়ঙ্করী, বর্ষাবিপ্লাবিতা স্রোতস্বতী, ক্ষুদ্র সৈকত ডুবাইতে যায়, তেমনই মহাকোলাহলে মহাবেগে এই পরিমাণরহিতা অসংখ্যেয়া, বিস্ময়াকরী মোগলবাহিনী রাজসিংহের রাজ্য ডুবাইতে চলিল।

কিন্তু হঠাৎ একটা প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইল। যে পথে আকব্বর সৈন্য লইয়া গিয়াছিলেন, ঔরঙ্গজেবও সেই পথে সৈন্য লইয়া যাইতেছিলেন। অভিপ্রায় এই যে, আকব্বর শাহের সৈন্যের সঙ্গে নিজ সৈন্য মিলিত করিবেন। মধ্যে যদি কুমার জয়সিংহের সৈন্য পান, তবে তাঁহাকে মাঝে ফেলিয়া টিপিয়া মারিবেন, পরে দুই জনে উদয়পুর প্রবেশ করিয়া রাজ্য ধ্বংস করিবেন। কিন্তু পার্ব্বত্য পথে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে সবিস্ময়ে দেখিলেন যে, রাজসিংহ ঊর্দ্ধে পর্ব্বতের উপত্যকায় তাঁহার পথের পার্শ্বে সৈন্য লইয়া বসিয়া আছেন। রাজসিংহ নয়ননামা গিরিসঙ্কটে পার্ব্বত্য পথ রোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু অতি দ্রুতগামী দূতমুখে আকব্বরের সংবাদ শুনিয়া, রণপাণ্ডিত্যের অদ্ভুত প্রতিভার বিকাশ করিয়া আমিষলোলুপ শ্যেনপক্ষীর মত দ্রুতবেগে সেনা সহিত পূর্ব্বপরিচিত পার্ব্বত্যপথ অতিক্রম করিয়া এই গরিসানুদেশে সসৈন্য উপবিষ্ট হইয়াছিলেন।

মোগল দেখিল, রাজসিংহের এই অদ্ভুত রণপাণ্ডিত্যে তাহাদিগের সর্ব্বনাশ উপস্থিত। কেন না, মোগলেরা যে পথে যাইতেছিল, সে পথে আর চলিলে রাজসিংহকে পার্শ্বে রাখিয়া যাইতে হয়। শত্রুসৈন্যকে পার্শ্বে রাখিয়া যাওয়ার অপেক্ষা বিপদ্ অল্পই আছে। পার্শ্ব হইতে যে আক্রমণ করে, তাহাকে রণে বিমুখ

করা যায় না, সেই জয়ী হইয়া বিপক্ষকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলে। সালামাঙ্কা ও ঔস্তরলিজে ইহাই ঘটিয়াছিল। ঔরঙ্গজেবও এ স্বতঃসিদ্ধ রণতত্ত্ব জানিতেন। তিনি ইহাও জানিতেন যে, পার্শ্বস্থিত, শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করা যায় বটে, কিন্তু তাই করিতে গেলে নিজ সৈন্যকে ফিরাইয়া শত্রুর সম্মুখবর্ত্তী করিতে হয়। এই পার্ব্বত্য পথে তাদৃশ মহতী সেনা ফিরাইবার ঘুরাইবার স্থান নাই, এবং সময়ও পাওয়া যাইবে না। কেন না, সেনার মুখ ফিরাইতে না ফিরাইতে রাজসিংহ পর্ব্বত হইতে অবতরণপূর্ব্বক তাঁহার সেনা দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া, এক এক খণ্ড পৃথক করিয়া বিনষ্ট করিতে পারেন। এরূপ যুদ্ধে সাহস করা অকর্ত্তব্য। তার পর এমন হইতে পারে, রাজসিংহ যুদ্ধ না করিতেও পারেন। নির্ব্বিঘ্নে ঔরঙ্গজেবকে যাইতে দিতেও পারেন। তাহা হইলে আরও বিপদ্। তাহা হইলে ঔরঙ্গজেব চলিয়া গেলে রাজসিংহ পর্ব্বতাবতরণ করিয়া ঔরঙ্গজেবের পশ্চাদগামী হইবেন। হইলে, তিনি যে মোগলের পশ্চাদ্বর্ত্তী মাল, আসবাব লুঠপাট ও সেনাধ্বংস করিবেন, সেও ক্ষুদ্র কথা। আসল কথা, রসদের পথ বন্ধ হইবে। সম্মুখে কুমার জয়সিংহের সেনা। রাজসিংহের সেনা ও জয়সিংহের সেনা উভয়ের মধ্যে পড়িয়া, ফাঁদের ভিতর প্রবিষ্ট মূষিকের মত, দিল্লীর বাদশাহ সসৈন্য নিহত হইবেন।

ফলে দিল্লীশ্বরের অবস্থা জালনিবদ্ধ রোহিতের মত—কোন মতেই নিস্তার নাই। তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন, কিন্তু তাহা হইলে রাজসিংহ তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবেন। তিনি উদয়পুরের রাজ্য অতল জলে ডুবাইতে আসিয়াছিলেন—সে কথা দূরে থাকুক, এখন উদয়পুরের রাজা, তাঁহার পশ্চাৎ করতালি দিতে দিতে ছুটিবে— পৃথিবী হাসিবে। মোগল বাদশাহের অপরিমিত গৌরবের পক্ষে ইহার অপেক্ষা অবনতি আর কি হইতে পারে? ঔরঙ্গজেব ভাবিলেন—সিংহ হইয়া মূষিকের ভয়ে পলাইব? কিছুতেই পলায়নের কথাকে মনে স্থান দিলেন না।

তখন আর কি হইতে পারে? এক মাত্র ভরসা—উদয়পুরের যাইবার যদি অন্য কোন পথ থাকে। ঔরঙ্গজেবের আদেশে চারি দিকে অশ্বারোহী পদাতি অন্য পথের সন্ধানে ছুটিল। ঔরঙ্গজেব নির্ম্মলকুমারীকেও জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল। নির্ম্মলকুমারী বলিল, “আমি পরদানশীন স্ত্রীলোক—পথের কথা আমি কি জানি?” কিন্তু অল্পকাল মধ্যে সংবাদ আসিল যে, উদয়পুরে যাইবার আর একটা পথ আছে। একজন মোগল সওদাগরের সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়াছে, সে পথ দেখাইয়া দিবে। একজন মন্‌সবদার সে পথ দেখিয়া আসিয়াছে। সে একটি পার্ব্বত্য রন্ধ্রপথ; অতিশয় সঙ্কীর্ণ। কিন্তু পথটা সোজা পথ, শীঘ্র বাহির হওয়া যাইবে। সে দিকে কোন রাজপুত দেখা যাইতেছে না। যে মোগল সংবাদ দিয়াছে, সে বলিতেছে যে, সে দিকে কোন রাজপুত সেনা নাই।

ঔরঙ্গজেব ভাবিলেন। বলিলেন, “নাই, কিন্তু লুকাইয়া থাকিতে পারে।”

যে মনসবদার পথ দেখিয়া আসিয়াছিল—বখ্‌ত খাঁ—সে বলিল যে, “যে মোগল আমাকে প্রথমেই এই পথের সন্ধান দেয়, তাহাকে আমি পর্ব্বতের উপরে পাঠাইয়া দিয়াছি। সে যদি রাজপুত সেনা দেখিতে পায়, তবে আমাকে সঙ্কেত করিবে।”

ঔরঙ্গজেব জিজ্ঞাসা করিলেন, “সে কি আমার সিপাহী?”

বখ্‌ত খাঁ। না, সে একজন সওদাগর। উদয়পুরে শাল বেচিতে গিয়াছিল। এখন শিবিরে বেচিতে আসিয়াছিল।

ঔরঙ্গ। ভাল, সেই পথেই তবে ফৌজ লইয়া যাও।

তখন বাদশাহী হুকুমে, ফৌজ ফিরিল। ফিরিল—কেন না, কিছু পথ ফিরিয়া আসিয়া তবে রন্ধপথে প্রবেশ করিতে হয়। ইহাতেও বিশেষ বিপদ—তবে জালনিবদ্ধ বৃহৎ রোহিত আর কোন্ দিকে যায়? যেরূপ পারম্পর্য্যের সহিত মোগলসেনা আসিয়াছিল—তাহা আর রক্ষিত হইতে পারিল না। যে ভাগ আগে ছিল, তাহা পিছে পড়িল; যাহা পিছনে ছিল, তাহা আগে চলিল। সেনার তৃতীয় ভাগ আগে আগে চলিল। বাদশাহ হুকুম দিলেন যে, তাম্বু ও মোট ঘাট ও বাজে লোক সকল এক্ষণে উদয়সাগরের পথে যাক্—পরে সেনার পশ্চাতে তাহারা আসিবে। তাহাই হইল। ঔরঙ্গজেব নিজে, পদাতি ও ছোট কামান ও গোলন্দাজ সেনা লইয়া

রন্ধ্রপথে চলিলেন। আগে আগে বখ্‌ত খাঁ।

দেখিয়া, রাজসিংহ, সিংহের মত লাফ দিয়া, পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া মোগল সেনার মধ্যে পড়িলেন। অমনই মোগল সেনা দ্বিখণ্ড হইয়া গেল—ছুরিকাঘাতে যেন ফুলের মালা কাটিয়া গেল। এক ভাগ ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে রন্ধ্রমধ্যে প্রবিষ্ট; আর এক ভাগ, এখন পূর্ব্বপথে, কিন্তু রাজসিংহের সম্মুখে।

মোগলের বিপদের উপর বিপদ এই যে, যেখানে হাতী, ঘোড়া, দোলার উপর বাদশাহের পৌরাঙ্গনাগণ, ঠিক সেইখানে, পৌরাঙ্গনাদিগের সম্মুখে, রাজসিংহ সসৈন্যে অবতীর্ণ হইলেন। দেখিয়া, যেমন চিল পড়িলে চড়াইয়ের দল কিল কিল করিয়া উঠে, এই সসৈন্য গরুড়কে দেখিয়া রাজাবরোধের কালভুজঙ্গীর দল তেমনই আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। এখানে যুদ্ধের নামমাত্র হইল না। যে সকল আহদীয়ান্‌ তাঁহাদের প্রহরায় নিযুক্ত ছিল—তাহারা কেহই অস্ত্রসঞ্চালন করিতে পারিল না—পাছে বেগমেরা আহত হয়েন। রাজপুতেরা বিনা যুদ্ধে আহদীদিগকে বন্দী করিল। সমস্ত্র মহিষীগণ এবং তাঁহাদিগের অসংখ্য অশ্বারোহিণী অনুচরীবর্গ, বিনা যুদ্ধে রাজসিংহের বন্দিনী হইলেন।

মাণিকলাল রাজসিংহের নিকটে নিকটে থাকেন—তিনি রাজসিংহের অতিশয় প্রিয়। মাণিকলাল আসিয়া যুক্তকরে নিবেদন করিলেন, "মহারাজাধিরাজ! এখন এই মার্জ্জারী সম্প্রদায় লইয়া কি করা যায়? আজ্ঞা হয় ত উদর পুরিয়া দধিদুগ্ধ ভোজনের জন্য ইহাদের উদয়পুরে পাঠাইয়া দিই।"

রাজসিংহ হাসিয়া বলিলেন, "এত দই দুধ উদয়পুরে নাই। শুনিয়াছি, দিল্লীর মার্জ্জারীদের পেট মোটা। কেবল উদিপুরীকে মহিষী চঞ্চলকুমারীর কাছে পাঠাইয়া দাও। তিনি ইহার জন্য আমাকে বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। আর সব ঔরঙ্গজেবের ধন ঔরঙ্গজেবকে ফিরাইয়া দাও।"

মাণিকলাল জোড়হাতে বলিল, "লুঠের সামগ্রী সৈনিকেরা কিছু কিছু পাইয়া থাকে।"

রাজসিংহ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তোমার কাহাকেও প্রয়োজন থাকে, গ্রহণ করিতে পার। কিন্তু মুসলমানী, হিন্দুর অস্পর্শীয়া।"

মাণিক। উহারা নাচিতে গায়িতে জানে।

রাজ। নাচ গানে মন দিলে, রাজপুত কি আর তোমাদিগের মত বীরপনা দেখাইতে পারিবে? সব ছাড়িয়া দাও। উদিপুরীকে কেবল উদয়পুরে পাঠাইয়া দাও।

মাণিক। এ সমুদ্রমধ্যে সে রত্ন কোথায় খুঁজিয়া পাইব? আমার ত চেনা নাই। যদি আজ্ঞা হয়, তবে হনুমানের মত, এ গন্ধমাদন লইয়া গিয়া মহিষীর কাছে উপস্থিত করি। তিনি বাছিয়া লইবেন। যাহাকে রাখিতে হয়, রাখিবেন, বাকিগুলা ছাড়িয়া দিবেন। তাহারা উদয়পুরের বাজারে সুর্‌মা মিশি বেচিয়া দিনপাত করিবে।

এমন সময়ে মহাগজপৃষ্ঠ হইতে নির্ম্মলকুমারী রাজসিংহ ও মাণিকলাল উভয়কে দেখিতে পাইল। করযুগল উত্তোলন করিয়া সে উভয়কে প্রণাম করিল। দেখিয়া রাজসিংহ মাণিকলালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও আবার কোন্‌ বেগম? হিন্দু বোধ হইতেছে—সেলাম না করিয়া, আমাদের প্রণাম করিল।"

মাণিকলাল দেখিয়া উচ্চহাস্য করিলেন। বলিলেন, "মহারাজ! ও একটা বাঁদী—ওটা বেগম হইল কি প্রকারে? উহাকে ধরিয়া আনিতে হইবে।"

এই বলিয়া মাণিকলাল হুকুম দিয়া, নির্ম্মলকুমারীকে হাতীর উপর হইতে নামাইয়া আপনার নিকট আনাইল। নির্ম্মল কথা না কহিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল। মাণিকলাল জিজ্ঞাসা করিল, "এ আবার কি? তুমি বেগম হইলে কবে?"

নির্ম্মল, মুখ চোখ ঘুরাইয়া বলিল, "ময়্‌নে হজরৎ ইম্‌লি বেগম। তস্‌লিম দে।"

মাণিকলাল। তা না হয় দিতেছি—বেগম ত তুমি নও জানি; তোমার বাপ দাদাও কখনও বেগম হয় নাই—কিন্তু এ বেশ কেন?

নির্ম্মল। পহেলা মেরা হুকুম তামিল কর্‌—বাজে বাত আব্‌হি রাখ্‌।

মাণিকলাল। সীতারাম! বেগম সাহেবার ধমক দেখ!

নির্ম্মল। হামারি হুকুম যেহি হৈ কি হজরৎ উদিপুরী বেগম সাহেবা সামনেকা পঞ্জকলস্‌দার হাওদাওয়ালে হাতিপর তশরিফ রাখ্‌তী হেঁই। উন্‌কো হামারা হুজুম মে হাজির কর্‌।

বলিতে বিলম্ব সহিল না–মাণিকলাল তখনই উদিপুরীকে হাতী হইতে নামাইতে বলিল। উদিপুরী অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নামিল। মাণিকলাল একখানা দোলা খালি করিয়া, সে দোলা উদিপুরীর হাতীর কাছে পাঠাইয়া দিয়া, দোলায় চড়াইয়া উদিপুরীকে লইয়া আসিল। তার পর মাণিকলাল, নির্ম্মলকুমারীকে কাণে কাণে বলিল, “জী হাম্‌লী বেগম সাহেবা! আর একটা কথা–”

নির্ম্মল। চুপ্‌ রহ, বেতমিজ! মেরে নাম হজরৎ ইম্‌লি বেগম।

মাণিক। আচ্ছা, যে বেগমই হও না কেন, জেব-উন্নিসা বেগমকে চেন?

নির্ম্মল। জানতে নেহিন? বহু হামারি বেটী লাগ্‌তী হৈ। দেখ, আগাড়ী সোনেকা তিন কলস যো হাওদে পর জলুষ দেতা হ্যায়, বস্‌পর জেব-উন্নিসা বৈঠী হৈ।

মাণিকলাল তাঁহাকেও হাতী হইতে নামাইয়া দোলায় তুলিয়া লইয়া আসিলেন।

সেই সময়ে আবার কোন মহিষী হাওদার জরির পরদা টানিয়া মুখ বাহির করিয়া, নির্ম্মলকুমারীকে ডাকিল। মাণিকলাল নির্ম্মলকে জিজ্ঞাসা করিল, “আবার তোমাকে কে ডাকিতেছে না?”

নির্ম্মল দেখিয়া বলিল, “হাঁ। যোধপুরী বেগম। কিন্তু উঁহাকে এখানে আনা হইবে না। আমাকে হাতীর উপর চড়াইয়া উঁহার কাছে লইয়া চল। শুনিয়া আসি।”

মাণিকলাল তাহাই করিল। নির্ম্মলকুমারী যোধপুরীর হাতীর উপর উঠিয়া তাঁহার ইন্দ্রাসনতুল্য হাওদার ভিতরে প্রবেশ করিল। যোধপুরী বলিলেন, “আমাকে তোমাদের সঙ্গে লইয়া চল।”

নির্ম্মল। কেন মা?

যোধপুরী। কেন, তা ত কতবার বলিয়াছি। আমি এ ম্লেচ্ছপুরীতে, এ মহাপাপের ভিতর আর থাকিতে পারি না।

নির্ম্মল। তাহা হইবে না। তোমার যাওয়া হইবে না। আজ যদি মোগল সাম্রাজ্য টিকে, তবে তোমার ছেলে দিল্লীর বাদশাহ হইবে। আমরা সেই চেষ্টা করিব। তাঁর রাজত্বে আমরা সুখে থাকিব।

যোধপুরী। অমন কথা মুখে আনিও না,বাছা! বাদশাহ শুনিলে, আমার ছেলে এক দিনও বাঁচিবে না। বিষপ্রয়োগে তাহার প্রাণ যাইবে।

নির্ম্মল। এখনকার কথা বলিতেছি না। যাহা শাহজাদার হক্‌ কালে তিনি পাইবেন। আপনি আমাকে আর কোন আজ্ঞা করিবেন না। আপনি যদি আমার সঙ্গে এখন যান, আপনার পুত্রের অনিষ্ট হইতে পারে।

যোধপুরী ভাবিয়া বলিল, “সে কথা সত্য। তোমার কথাই শুনিলাম। আমি যাইব না। তুমি যাও।”

নির্ম্মলকুমারী তখন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

উদিপুরী এবং জেব-উন্নিসা উপযুক্ত সৈন্যে বেষ্টিতা হইয়া নির্ম্মলকুমারীর সহিত উদয়পুরে চঞ্চলকুমারীর নিকট প্রেরিতা হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : অগ্নিচক্র বড় ভীষণ হইল

তখন রাজসিংহ আর সকল পৌরাঙ্গনাগণকে–গজারূঢ়া, শিবিকারূঢ়া এবং অশ্বারূঢ়া–সকলকেই, ঔরঙ্গজেবকে যে রন্ধ্রপথে প্রবেশ করাইয়াছিলেন, সেই পথে প্রবেশ করিতে দিলেন। তাহারা প্রবেশ করিলে পর, উভয় সেনা নিস্তব্ধ হইল। ঔরঙ্গজেবের অবশিষ্ট সেনা অগ্রসর হইতে পারিতেছে না–কেন না, রাজসিংহ পথ বন্ধ করিয়া বসিয়াছেন। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের সাগরতুল্য অশ্বারোহী সেনা যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিল। তাহারা ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া রাজপুতের সম্মুখীন হইল। তখন রাজসিংহ একটু হঠিয়া গিয়া তাহাদের পথ ছাড়িয়া দিলেন–তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন না। তাহারা "দীন দীন" শব্দ করিতে করিতে বাদশাহের আজ্ঞানুসারে, বাদশাহ যে সংকীর্ণ রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই পথে প্রবেশ করিল। রাজসিংহ আবার আগু হইলেন।

তার পর বাদশাহী তোষাখানা আসিয়া উপস্থিত হইল। রক্ষক নাই বলিলেই হয়, রাজপুতেরা তাহা লুঠিয়া লইল। তার পর খাদ্যদ্রব্য। যাহা হিন্দুর ব্যবহার্য্য, তাহা রাজসিংহের রসদের সামিল হইল। যাহা হিন্দুর অব্যবহার্য্য, তাহা ডোম দোসাদে লইয়া গিয়া কতক খাইল, কতক পর্ব্বতে ছড়াইল–শৃগাল-কুক্কুর এবং বন্য পশুতে খাইল। রাজপুতেরা দফ্‌তরখানা হাতীর উপর হইতে নামাইল–কতক বা পুড়াইয়া দিল, কতক বা ছাড়িয়া দিল। তার পর মালখানা; তাহাতে যে ধনরত্নরাশি আছে, পৃথিবীতে এমন আর কোথাও নাই–জানিয়া রাজপুত সেনাপতিগণ লোভে উন্মত্ত হইল। তাহার পশ্চাতে বড় গোলন্দাজ সেনা। রাজসিংহ আপন সেনা সংযত করিলেন। বলিলেন, "তোমরা ব্যস্ত হইও না। ও সব তোমাদেরই। আজ ছাড়িয়া দাও। আজ এখন যুদ্ধের সময় নহে।" রাজসিংহ নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। ঔরঙ্গজেবের সমস্ত সেনা রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিল।

তার পর মাণিকলালকে বিরলে লইয়া গিয়া বলিলেন, "আমি সেই মোগলের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। এতটা সুবিধা হইবে, আমি মনে করি নাই। আমি যাহা অভিপ্রেত করিয়াছিলাম, তাহাতে যুদ্ধ করিয়া মোগলকে বিনষ্ট করিতে হইত। এক্ষণে বিনা যুদ্ধেই মোগলকে বিনষ্ট করিতে পারিব। মবারককে আমার নিকট লইয়া আসিবে। আমি তাহাকে সমাদর করিব।"

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, মবারক মাণিকলালের হাতে জীবন পাইয়া তাহার সঙ্গে উদয়পুর আসিয়াছিলেন। রাজসিংহ তাহার বীরত্ব অবগত ছিলেন, অতএব তাহাকে নিজসেনা মধ্যে উপযুক্ত পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু মোগল বলিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন না। তাহাতে মবারক কিছু দুঃখিত ছিল। আজ সেই দুঃখে গুরুতর কার্য্যের ভার লইয়াছিল। সে গুরুতর কার্য্য যে সুসম্পন্ন হইয়াছে, তাহা পাঠক দেখিয়াছেন। পাঠক বুঝিয়া থাকিবেন যে, মবারকই ছদ্মবেশী মোগল সওদাগর।

মাণিকলাল আজ্ঞা পাইয়া মবারককে লইয়া আসিলেন। রাজসিংহ মবারকের অনেক প্রশংসা করিলেন। বলিলেন, "তুমি এই সাহস ও চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়া, মোগল সওদাগর সাজিয়া, মোগল সেনা রন্ধ্রপথে না লইয়া গেলে অনেক প্রাণিহত্যা হইত। তোমাকে কেহ চিনিতে পারিলে তোমারও মহাবিপদ উপস্থিত হইত।"

মবারক বলিল, "মহারাজ! যে ব্যক্তি সকলের সমক্ষে মরিয়াছে, যাহাকে সকলের সমক্ষে গোর দিয়াছে, তাহাকে কেহ চিনিতে পারিলেও চেনে না–মনে করে, ভ্রম হইতেছে। আমি এই সাহসেই গিয়াছিলাম।"

রাজসিংহ বলিলেন, "এক্ষণে যদি আমার কার্য্য সিদ্ধ না হয়, তবে সে আমার দোষ। তুমি যে পুরস্কার চাহিবে, আমি তাহাই তোমাকে দিব।"

মবারক কহিল, "মহারাজ! বে-আদবী মাফ হৌক! আমি মোগল হইয়া মোগলের রাজ্য ধ্বংসের উপায় করিয়া দিয়াছি। আমি মুসলমান হইয়া হিন্দুরাজ্য

স্থাপনের কার্য্য করিয়াছি। আমি সত্যবাদী হইয়া মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিয়াছি। আমি বাদশাহের নেমক খাইয়া নেমকহারামী করিয়াছি। আমি মৃত্যুযন্ত্রণার অধিক কষ্ট পাইতেছি। আমার আর কোন পুরস্কারে সাধ নাই। আমি কেবল এক পুরস্কার আপনার নিকট ভিক্ষা করি। আমাকে তোপের মুখে রাখিয়া উড়াইয়া দিবার আদেশ করুন। আমার আর বাঁচিবার ইচ্ছা নাই।"

রাজসিংহ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "যদি এ কাজে তোমার এতই কষ্ট, তবে এমন কাজ কেন করিলে? আমাকে জানইলে না কেন? আমি অন্য লোক নিযুক্ত করিতাম। আমি কাহাকেও এত দূর মনঃপীড়া দিতে চাহি না।"

মবারক, মাণিকলালকে দেখাইয়া দিয়া বলিল, "এ মহাত্মা আমার জীবন দান করিয়াছিলেন। ইঁহার নিতান্ত অনুরোধ যে, আমি এই কার্য্য সিদ্ধ করি। আমি নহিলেও এ কাজ সিদ্ধ হইত না; কেন না, মোগল ভিন্ন হিন্দুকে মোগলেরা বিশ্বাস করিত না। আমি ইহা অস্বীকার করিলে অকৃতজ্ঞতা পাপে পড়িতাম। তাই এ কাজ করিয়াছি। এক্ষণে এ প্রাণ আর রক্ষা করিব না স্থির করিয়াছি। আমাকে তোপের মুখে উড়াইয়া দিতে আদেশ করুন। অথবা আমাকে বাঁধিয়া বাদশাহের নিকটে পাঠাইয়া দিন, অথবা অনুমতি দিন যে, আমি যে প্রকারে পারি, মোগল সেনামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করি।"

রাজসিংহ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন, "কাল তোমাকে আমি মোগল সেনায় প্রবেশের অনুমতি দিব। আর একদিন মাত্র থাক। আমার কেবল এক্ষণে একটা কথা জিজ্ঞাস্য আছে। ঔরঙ্গজেব তোমাকে বধ করিয়াছিলেন কেন?"

মবারক। তাহা মহারাজের সাক্ষাৎ বক্তব্য নহে।

রাজসিংহ। মাণিকলালের সাক্ষাৎ ?

মবারক। বলিয়াছি।

রাজসিংহ। আর একদিন অপেক্ষা কর।

এই বলিয়া রাজসিংহ মবারককে বিদায় দিলেন।

তার পর, মাণিকলাল মবারককে নিভৃতে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাহেব! যদি আপনার মরিবার ইচ্ছা, তবে শাহজাদীকে ধরিতে আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন কেন?"

মবারক বলিল, "ভুল! সিংহজী ভুল! আমি আর শাহজাদী লইয়া কি করিব? মনে করিয়াছিলাম বটে যে, যে শয়তানী আমার ভালবাসার বিনিময়ে আমাকে কালসাপের বিষদন্তে সমর্পণ করিয়া মারিয়াছিল, তাহাকে তাহার কর্ম্মের প্রতিফল দিব। কিন্তু মানুষ যাহা আজ চাহে, কাল তাহার ইচ্ছা থাকে না। আমি এখন মরিব নিশ্চয় করিয়াছি—এখন আর শাহজাদী প্রতিফল পাইল না পাইল, তাহাতে আমর কি? আমি আর কিছুই দেখিতে আসিব না।"

মাণিকলাল। জেব-উন্নিসাকে রাখিতে যদি আপনি অনুমতি না করেন, তবে আমি বাদশাহের নিকট কিছু ঘুষ লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিই।

মবারক। আর একবার তাহাকে আমার দেখিতে ইচ্ছা আছে। একবার জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা আছে যে, জগতে ধর্ম্মাধর্ম্মে তাহার কিছু বিশ্বাস আছে কি না? একবার শুনিবার ইচ্ছা আছে যে, সে আমায় দেখিয়া কি বলে? একবার জানিবার ইচ্ছা আছে যে, আমাকে দেখিয়া সে কি করে?

মাণিকলাল। তবে আপনি এখনও তাহার প্রতি অনুরক্ত?

মবারক। কিছুমাত্র না। একবার দেখিব মাত্র। আপনার কাছে এই পর্য্যন্ত ভিক্ষা।

অষ্টম খণ্ড

আগুনে কে কে পুড়িল?

প্রথম পরিচ্ছেদ : বাদশাহের দাহনারম্ভ

এদিকে বাদশাহ বড় গোলযোগে পড়িলেন। তাঁহার সমস্ত সেনা রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিবার অল্প পরেই দিবাবসান হইল। কিন্তু রন্ধ্রের অপর মুখের কেহই পৌঁছিল না। অপর মুখের কোন সংবাদ নাই। সন্ধ্যার পরেই সেই সঙ্কীর্ণ রন্ধ্রপথে অতিশয় গাঢ় অন্ধকার হইল। সমস্ত সেনার পথ আলোকযুক্ত হয়, এমন রোশনাইয়ের সরঞ্জাম সঙ্গে কিছুই নাই। বাদশাহের ও বেগমদিগের নিকট রোশনাই হইল–কিন্তু আর সমস্ত সেনাই গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন। তাহাতে আবার বন্ধুর পার্ব্বত্য তলভূমি, বিকীর্ণ উপলখণ্ডে ভীষণ হইয়া আছে। ঘোড়া সকল টক্কর খাইতে লাগিল। কত ঘোড়া আরোহীসমেত পড়িয়া গেল; অপর অশ্বের পাদদলনে পিষ্ট হইয়া অশ্ব ও আরোহী উভয়ে আহত বা নিহত হইল। কত হাতীর পায়ে বড় বড় শিলাখণ্ড ফুটিতে লাগিল–হস্তিগণ দুর্দ্দমনীয় হইয়া ইতস্ততঃ ফিরিতে লাগিল। অশ্বারোহিণী স্ত্রীগণ, ভূপতিতা হইয়া অশ্বপদে, হস্তিপদে দলিত হইয়া, আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। দোলার বাহকদিগের চরণ সকল ক্ষতবিক্ষত হইয়া রুধিরে পরিপ্লুত হইতে লাগিল। পদাতিক সেনা আর চলিতে পারে না–পদস্খলনে এবং উপলাঘাতে অত্যন্ত পীড়িত হইল। তখন ঔরঙ্গজেব রাত্রিতে সেনার গতি বন্ধ করিয়া শিবির সংস্থাপন করিতে অনুমতি করিলেন।

কিন্তু তাম্বু ফেলিবার স্থান নাই। অতি কষ্টে বাদশাহ ও বেগমদিগের তাম্বুর স্থান হইল। আর কাহারও হইল না। যে যেখানে ছিল, সে সেইখানে রহিল। অশ্বারোহী অশ্বপৃষ্ঠে–গজারোহী গজপৃষ্ঠে–পদাতিক চরণে ভর করিয়া রহিল। কেহ বা কষ্টে পর্ব্বতসানুদেশে একটু স্থান করিয়া, তাহাতে পা ঝুলাইয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু সানুদেশ দুরারোহণীয়,–এমন খাড়া যে, উঠা যায় না। অধিকাংশ লোকই এরূপ বিশ্রামের স্থান পাইল না।

তার পর বিপদের উপর বিপদ–খাদ্যের অত্যন্ত অভাব। সঙ্গে যাহা ছিল, তাহা ত রাজপুতেরা লুঠিয়া লইয়াছে। যে রন্ধ্রপথে সেনা উপস্থিত–সেখানে অন্য খাদ্যের কথা দূরে থাক, ঘোড়ার ঘাস পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর কেহ কিছু খাইতে পাইল না, বাদশাহ কি বেগমেরাও নয়। ক্ষুধায়, নিদ্রার অভাবে সকলে মৃতপ্রায় হইল। মোগল সেনা বড় গোলযোগে পড়িল।

এ দিকে বাদশাহ উদিপুরী এবং জেব-উন্নিসার হরণ-সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। ক্রোধে অগ্নিতুল্য জ্বলিয়া উঠিলেন। একা সমস্ত সৈনিকদিগকে নিহত করা যায় না, নহিলে ঔরঙ্গজেব তাহা করিতেন। বিবরে নিরুদ্ধ সিংহ, সিংহীকে পিঞ্জারবদ্ধ দেখিলে যেরূপ গর্জ্জন করে, ঔরঙ্গজেব সেইরূপ গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

গভীর রাত্রে সেনার কোলাহল কিছু নিবৃত্ত হইলে, অনেকে শুনিল, অতি দূরে অনেক পাহাড়ের উপর যেন বহুসংখ্যক বৃক্ষ উন্মূলিত হইতেছে। কিছু বুঝিতে না পারিয়া অথবা ভৌতিক শব্দ মনে করিয়া, সকলে চুপ করিয়া রহিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : দাহনে বাদশাহের বড় জ্বালা

রাত্রি প্রভাতে ঔরঙ্গজেব সৈন্যচালনার আদেশ করিলেন। সেই বৃহতী সেনা,–তোপ লইয়া চতুরঙ্গিণী–অতি দ্রুতপদে রন্ধ্রমুখের উদ্দেশে চলিল। ক্ষুৎপিপাসায় সকলেই অত্যন্ত ক্লিষ্ট–বাহির হইলে তবে পানাহারের ভরসা–সকলে শ্রেণীভঙ্গ করিয়া ছুটিল। ঔরঙ্গজেব নিজে উদিপুরী ও জেব-উন্নিসাকে মুক্ত করিয়া উদয়পুর নিঃশেষে ভস্ম করিবার জন্য আপনার ক্রোধাগ্নিতে আপনি দগ্ধ হইতেছিলেন–তিনি আর কিছুমাত্র ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলেন না। বড় ছুটাছুটি করিয়া মোগল সেনা রন্ধ্রমুখে উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়া দেখিল, মোগলের সর্ব্বনাশ ঘটিবার উপক্রম হইয়া আছে। রন্ধ্রমুখ বন্ধ! রাত্রিতে রাজপুতেরা সংখ্যাতীত মহামহীরুহ সকল ছেদন করিয়া পর্ব্বতশিখর হইতে রন্ধ্রমুখে ফেলিয়া দিয়াছে–পর্ব্বতাকার সপল্লব ছিন্ন বৃক্ষরাশি রন্ধ্রমুখ একেবারে বন্ধ করিয়াছে; হস্তী অশ্ব পদাতিক দূরে থাক, শৃগাল–কুক্কুরেরও যাতায়াতের পথ নাই।

মোগল সেনামধ্যে ঘোরতর আর্ত্তনাদ উঠিল–স্ত্রীগণের রোদনধ্বনি শুনিয়া, ঔরঙ্গজেবের পাষাণনির্ম্মিত হৃদয়ও কম্পিত হইল।

সৈন্যের পথপরিষ্কারক সম্প্রদায় অগ্রে থাকে, কিন্তু এই সৈন্যকে বিপরীত গতিতে রন্ধ্রে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল বলিয়া তাহারা পশ্চাতে ছিল। ঔরঙ্গজেব প্রথমতঃ তাহাদিগকে সম্মুখে আনিবার জন্য আজ্ঞা প্রচার করিলেন। কিন্তু তাহাদের আসা কালবিলম্বের কথা। তাহাদের অপেক্ষা করিতে গেলে হয় ত সে দিনও উপবাসে কাটিবে। অতএব ঔরঙ্গজেব হুকুম দিলেন যে, পদাতিক সৈন্য, এবং অন্য যে পারে, বহু লোকে একত্র হইয়া, গাছের প্রাচীরের উপর চড়িয়া, গাছ সকল ঠেলিয়া পাশে ফেলিয়া দেয়, এবং এই পরিশ্রমের সাহায্য জন্য হস্তীসকলকে নিযুক্ত করিলেন। অতএব সহস্র সহস্র পদাতিক এবং শত শত হস্তী বৃক্ষপ্রাকার ভগ্ন করিতে ছুটিল। কিন্তু যখন এ সকল, বৃক্ষপ্রাকারমূলে সমবেত হইল, তখন অমনই গিরিশিখর হইতে, যেমন ফাল্গুনের বাত্যায় শিলাবৃষ্টি হয়, তেমনই বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের অবিশ্রান্ত ধারা পড়িতে লাগিল। পদাতিক সকলের মধ্যে কাহারও হস্ত, কাহারও পদ, কাহারও মস্তক, কাহারও কক্ষ, কাহারও বক্ষ চুর্ণীকৃত হইল–কাহারও বা সমস্ত শরীর কর্দ্দমপিণ্ডবৎ হইয়া গেল। হস্তীসকলের মধ্যে কাহারও কুম্ভ, কাহারও দম্ভ, কাহারও মেরুদণ্ড, কাহারও পঞ্জর ভগ্ন হইয়া গেল; হস্তী সকল বিকট চীৎকার করিতে করিতে, পদাতিক সৈন্য পদতলে বিদলিত করিতে করিতে পলায়ন করিল, তদ্দ্বারা ঔরঙ্গজেবের সমস্ত সেনা বিত্রস্ত ও বিধ্বস্ত হইয়া উঠিল। সকলে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া সভয়ে দেখিল, পর্ব্বতের শিরোদেশে সহস্র সহস্র রাজপুত পদাতিক পিপীলিকার মত শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আছে। যাহারা প্রস্তরখণ্ডের আঘাতে আহত বা নিহত না হইল, রাজপুতগণের বন্দুকের গুলিতে তাহারা মরিল। ঔরঙ্গজেবের সৈনিকেরা বৃক্ষপ্রাকারমূলে ক্ষণমাত্র তিষ্ঠিতে পারিল না।

শুনিয়া ওরঙ্গজেব সৈন্যাধ্যক্ষগণকে তিরস্কৃত করিয়া পুনর্ব্বার বৃক্ষপ্রাচীরভঙ্গের উদ্যম করিতে আদেশ করিলেন। তখন "দীন্ দীন" শব্দ করিয়া মোগল সেনা আবার ছুটিল–আবার রাজপুতসেনাকৃত গুলির বৃষ্টি এবং শিলাবৃষ্টিতে বাত্যা সমীপে ইক্ষুক্ষেত্রের ইক্ষুর মত ভূমিশায়ী হইল। এইরূপ পুনঃ পুনঃ উদ্যম করিয়া মোগল সেনা দুর্গপ্রাকার ভগ্ন করিতে পারিল না।

তখন ঔরঙ্গজেব হতাশ হইয়া, সেই বৃহতী সেনাকে রন্ধ্রপথে ফিরিতে আদেশ করিলেন। রন্ধ্রের যে মুখে সেনা প্রবেশ করিয়াছিল, সেই মুখে বাহির হইতে হইবে। সমস্ত সেনা ক্ষুৎপিপাসায় ও পরিশ্রমে অবসন্ন, ঔরঙ্গজেবও তাঁহার জন্মে এই প্রথম ক্ষুৎপিপাসায় অধীর; বেগমরাও তাই। কিন্তু আর উপায়ন্তর নাই–পর্ব্বতের সানুদেশ আরোহণ করা যায় না; কেন না, পাহাড় সোজা উঠিয়াছে। কাজেই ফিরিতে হইল।

ফিরিয়া আসিয়া অপরাহ্নে, যে মুখে ঔরঙ্গজেব সসৈন্য রন্ধ্রমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, পুনশ্চ রন্ধ্রের সেই মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, সেখানেও প্রত্যক্ষমূর্ত্তি মৃত্যু, তাঁহাকে সসৈন্যে গ্রাস করিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। রন্ধ্রের সে মুখও, সেইরূপ অলঙ্ঘ্য পর্ব্বতপ্রমাণ বৃক্ষপ্রাকারে বন্ধ; নির্গমের উপায় নাই। পর্ব্বতোপরি রাজপুতসেনা পূর্ব্ববৎ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

কিন্তু নির্গত না হইলে ত নিশ্চিত সসৈন্য মৃত্যু। অতএব সমস্ত মোগল সেনাপতিকে ডাকিয়া ঔরঙ্গজেব স্তুতি মিনতি, উৎসাহবাক্য এবং ভয়প্রদর্শনের দ্বারা

পথ মুক্ত করিবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পতন করিতে স্বীকৃত করাইলেন। সেনাপতিগণ সেনা লইয়া পুনশ্চ বৃক্ষপ্রাকার আক্রমণ করিলেন। এবার একটু সুবিধাও ছিল–পথপরিষ্কারক সেনাও উপস্থিত ছিল। মোগলেরা মরণ তৃণজ্ঞান করিয়া বৃক্ষরাজি ছিন্ন ও আকৃষ্ট করিতে লাগিল। কিন্তু সে ক্ষণমাত্র। পর্ব্বতশিখর হইতে যে লৌহ ও পাষাণবৃষ্টি হইতেছিল–ভাদ্রের বর্ষায় যেমন ধান্যক্ষেত্র ডুবিয়া যায়, মোগল সেনা তাহাতে তেমনই ডুবিয়া গেল।

তার পর বিপদের উপর বিপদ্, সম্মুখস্থ পর্ব্বতসানুদেশে রাজসিংহের শিবির। তিনি দূর হইতে মোগল সেনার প্রত্যাবর্ত্তন জানিতে পারিয়া, তোপ সাজাইয়া সম্মুখে প্রেরণ করিলেন।

রাজসিংহের কামান ডাকিল। বৃক্ষপ্রাকার লঙ্ঘিত করিয়া রাজসিংহের গোলা ছুটিল–হস্তী, অশ্ব, পত্তি, সেনাপতি সব চূর্ণ হইয়া গেল। মোগল সেনা রন্ধ্রমধ্যে হটিয়া গিয়া, ক্রূর সর্প যেমন অগ্নিভয়ে কুণ্ডলী করিয়া বিবরে লুকায়, মোগল সেনা রন্ধ্রবিবরে সেইরূপ লুকাইল। শাহান্‌শাহ বাদশাহ, হীরকমণ্ডিত শ্বেত উষ্ণীষ মস্তক হইতে খুলিয়া দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া, জানু পাতিয়া, পর্ব্বতের কাঁকর তুলিয়া আপনার মাথায় দিলেন। দিল্লীর বাদশাহ রাজপুত ভুঁইঞার নিকট সসৈন্য পিঞ্জরাবদ্ধ মূষিক। একটা মূষিকের আহার পাইলেও আপাততঃ তাঁর প্রাণরক্ষা হইতে পারে।

তখন ভারতপতি ক্ষুদ্রা রাজপুতকুলবালাকে উদ্ধারকারিণী মনে করিয়া তাহার পারাবত উড়াইয়া দিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : উদিপুরীর দাহনারম্ভ

নির্ম্মলকুমারী, উদিপুরী বেগম ও জেব-উন্নিসা বেগমকে উপযুক্ত স্থানে রাখিয়া, মহারাণী চঞ্চলকুমারীর নিকট গিয়া প্রণাম করিলেন। এবং আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ তাঁহার নিকট নিবেদন করিলেন। সকল কথা সবিশেষ শুনিয়া চঞ্চলকুমারী আগে উদিপুরীকে ডাকাইলেন। উদিপুরী আসিলে তাঁহাকে পৃথক আসনে বসিতে দিলেন; এবং তাঁহাকে সম্মান করিবার জন্য আপনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। উদিপুরী অত্যন্ত বিষণ্ন ও বিনীতভাবে চঞ্চলকুমারীর নিকট আসিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে চঞ্চলকুমারীর সৌজন্য দেখিয়া মনে করিলেন, ক্ষুদ্রপ্রাণ হিন্দু ভয়েই এত সৌজন্য করিতেছে। তখন ম্লেচ্ছকন্যা বলিল, “তোমরা মোগলের নিকট মৃত্যু বাসনা করিতেছ কেন?”

চঞ্চলকুমারী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “আমরা তাঁহার নিকট মৃত্যু কামনা করি নাই। তিনি যদি সে সামগ্রী আমাদিগকে দিতে পারেন, সেই আশায় আসিয়াছেন। তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, আমরা হিন্দু; যবনের দান গ্রহণ করি না।”

উদিপুরী ঘৃণার সহিত বলিল, “উদয়পুরের ভুঁইঞারা পুরুষানুক্রমে মুসলমানের কাছে এ দান স্বীকার করিয়াছেন। সুলতান্ আলাউদ্দীনের কথা ছাড়িয়া দিই; মোগল বাদশাহ আকব্বর শাহ, এবং তাঁহার পৌত্রের নিকটও রাণা রাজসিংহের পূর্ব্বপুরুষেরা এ দান স্বীকার করিয়াছেন।”

চঞ্চল। বেগম সাহেব! আপনি ভুলিয়া যাইতেছেন, সে আমরা দান বলিয়া স্বীকার করি নাই; ঋণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। আকব্বর বাদশাহের ঋণ, প্রতাপসিংহ নিজে পরিশোধ করিয়া গিয়াছেন। আপনার শ্বশুরের ঋণ এক্ষণে আমরা পরিশোধে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তাহার প্রথম কিস্তি লইবার জন্য আপনাকে ডাকিয়াছি। আমার তামাকু নিবিয়া গিয়াছে। অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে তামাকুটা সাজিয়া দিন।

চঞ্চলকুমারী প্রথমে বেগমের প্রতি যেরূপ সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, বেগম যদি তাহার উপযোগী ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলে বোধ করি, তাঁহাকে এ অপমানে পড়িতে হইত না। কিন্তু তিনি পুরুষবাক্যে তেজস্বিনী চঞ্চলকুমারীর গর্ব্ব উদ্রিক্ত করিয়াছেন–কাজেই এখন ফলভোগ করিতে হইল। তামাকু সাজার কথায়, সেই তামাকু সাজার নিমন্ত্রণপত্রখানা মনে পড়িল। উদিপুরীর সর্ব্বশরীরে স্বেদোদ্গম হইতে লাগিল। তথাপি অভ্যস্ত গর্ব্বকে হৃদয়ে পুনঃ স্থাপন করিয়া

কহিলেন, “বাদশাহের বেগমে তামাকু সাজে না।”

চঞ্চলকুমারী। যখন তুমি বাদশাহের বেগম ছিলে, তখন তামাকু সাজিতে না। এখন তুমি আমার বাঁদী। তামাকু সাজিবে। আমার হুকুম।

উদিপুরী কাঁদিয়া ফেলিল–দুঃখে নহে; রাগে। বলিল, “তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা যে, আলম্‌গীর বাদশাহের বেগমকে তামাকু সাজিতে বল?”

চঞ্চল। আমার ভরসা আছে, কাল আলম্‌গীর বাদশাহ স্বয়ং এখানে আসিয়া মহারাণার তামাকু সাজিবেন। তাঁহার যদি সে বিদ্যা না থাকে, তবে তুমি তাঁহাকে কাল শিখাইয়া দিবে। আজ আপনি শিখিয়া রাখ।

চঞ্চলকুমারী তখন পরিচারিকাকে আজ্ঞা দিলেন, “ইহা দ্বারা তামাকু সাজাইয়া লও।”

উদিপুরী উঠে না।

তখন পরিচারিকা বলিল, “ছিলিম উঠাও।”

উদিপুরী তথাপি উঠিল না। তখন পরিচারিকা তাহার হাত ধরিয়া তুলিতে আসিল। অপমানভয়ে, কম্পিতহৃদয়ে শাহন্‌শাহের প্রেয়সী মহিষী ছিলিম তুলিতে গেলেন। তখন ছিলিম পর্য্যন্ত পৌঁছিলেন না। আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া, এক পা বাড়াইতে না বাড়াইতে থর থর করিয়া কাঁপিয়া প্রস্তরনির্ম্মিত হর্ম্ম্যতলে পড়িয়া গেলেন। পরিচারিকা ধরিয়া ফেলিল–আঘাত লাগিল না। উদিপুরী হর্ম্ম্যতলে শয়ন করিয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন।

তখন চঞ্চলকুমারীর আজ্ঞামত, যে মহার্ঘ পালঙ্কে তাঁহার জন্য মহার্ঘ শয্যা রচিত হইয়াছিল, তথায় তিনি পরিচারিকাগণের দ্বারা বাহিত ও নীত হইলেন। সেখানে পৌরাঙ্গনাগণ তাঁহার যথাবিহীত শুশ্রূষা করিল। অল্প সময়েই তাঁহার চৈতন্য লাভ হইল। চঞ্চলকুমারী আজ্ঞা দিলেন যে, আর কেহ কোন প্রকারে বেগমের অসম্মান না করে। আহারাদি, শয়ন ও পরিচর্য্যা সম্বন্ধে চঞ্চলকুমারীর নিজের যেরূপ বন্দোবস্ত, বেগম সম্বন্ধে ততোধিক যাহাতে হয় তাহা করিতে চঞ্চলকুমারী নির্ম্মলকুমারীকে আদেশ করিলেন।

নির্ম্মল বলিল, “তাহা সবই হইবে। কিন্তু তাহাতে ইঁহার পরিতৃপ্তি হইবে না।”

চঞ্চল। কেন, আর কি চাই?

নির্ম্মল। তাহা রাজপুরীতে অপ্রাপ্য।

চঞ্চল। শরাব? যখন তাহা চাহিবে, তখন একটু গোময় দিও।

উদিপুরী পরিচর্য্যায় সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু রাত্রিকালে উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে, উদিপুরী নির্ম্মলকুমারীকে ডাকাইয়া মিনতি করিয়া বলিলেন, “ইম্‌লি বেগম–থোড়া শরাব হুকুম কি জিয়ে।”

নির্ম্মল “দিতেছি” বলিয়া রাজবৈদ্যকে গোপনে সংবাদ পাঠাইলেন। রাজবৈদ্য এক বিন্দু ঔষধ পাঠাইয়া দিলেন, এবং উপদেশ দিলেন যে, শরবৎ প্রস্তুত করিয়া এই ঔষধবিন্দু তাহাতে মিশাইয়া শরাব বলিয়া পান করিতে দিবে। নির্ম্মল তাহাই করাইলেন। উদিপুরী তাহা পান করিয়া, অতিশয় প্রীত হইলেন। বলিলেন, “অতি উৎকৃষ্ট মদ্য।” এবং অল্পকাল মধ্যেই নেশায় অভিভূত হইয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : জেব-উন্নিসার দাহনারম্ভ

জেব-উন্নিসা একা বসিয়া আছেন। দুই একজন পরিচারিকা তাঁহার তত্ত্বাবধান করিতেছে। নির্ম্মলকুমারীও দুই একবার তাঁহার খবর লইতেছেন। ক্রমশঃ জেব-

উন্নিসা উদিপুরীর বিভ্রাটবার্ত্তা শুনিলেন। শুনিয়া তিনি নিজের জন্য চিন্তিত হইলেন।

পরিশেষে তাঁহাকেও নির্ম্মলকুমারী চঞ্চলকুমারীর নিকট লইয়া গেলেন। তিনি না বিনীত, না গর্ব্বিত ভাবে চঞ্চলকুমারীর নিকট উপস্থিত হইলেন। মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন, আমি যে আলম্‌গীর বাদশাহের কন্যা, তাহা কিছুতেই ভুলিব না।

চঞ্চলকুমারী অতিশয় সমাদরের সহিত তাঁহাকে উপযুক্ত পৃথক আসনে বসাইলেন এবং নানাবিধ আলাপ করিলেন। জেব-উন্নিসাও সৌজন্যের সহিত কথার উত্তর করিলেন। পরস্পরে বিদ্বেষ ভাব জন্মে, এমন কথা কেহই কিছুই বলিলেন না। পরিশেষে চঞ্চলকুমারী তাঁহার উপযুক্ত পরিচর্য্যার আদেশ দিলেন। এবং জেব-উন্নিসাকে আতর ও পান দিলেন।

কিন্তু জেব-উন্নিসা, না উঠিয়া বলিলেন, "মহারাণি! আমাকে কেন এখানে আনা হইয়াছে, আমি কিছু শুনিতে পাই কি?"

চঞ্চল। সে কথা আপনাকে বলা হয় নাই। না বলিলেও চলে। কোন দৈবজ্ঞের আদেশমত আপনাকে আনা হইয়াছে। আপনি অদ্য একা শয়ন করিবেন। দ্বার খুলিয়া রাখিবেন। প্রহরিণীগণ অলক্ষ্যে প্রহরা দিবে, আপনার কোন অনিষ্ট ঘটিবে না। দৈবজ্ঞ বলিয়াছেন, আপনি আজ রাত্রে কোন স্বপ্ন দেখিবেন। যদি স্বপ্ন দেখেন, তবে আমাকে কাল তাহা বলিবেন, ইহা আপনার নিকট প্রার্থনা।

শুনিয়া চিন্তিতভাবে জেব-উন্নিসা চঞ্চলকুমারীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। নির্ম্মলকুমারীর যত্নে তাঁহার আহার ও শয্যার পারিপাট্য যেমন দিল্লীর রঙ্‌মহালে ঘটিত, তেমনই ঘটিল। তিনি শয়ন করিলেন, কিন্তু নিদ্রা যাইলেন না। চঞ্চলকুমারীর আজ্ঞামত দ্বার খুলিয়া রাখিয়া একাই শয়ন করিলেন; কেন না, অবাধ্য হইলে যদি চঞ্চলকুমারী, উদিপুরীর দশার মত তাঁহারও কোন দুর্দ্দশা ঘটান, সে ভয়ও ছিল। কিন্তু একা সমস্ত রাত্রি দ্বার খুলিয়া রাখাতেও অত্যন্ত শঙ্কা উপস্থিত হইল। মনে ভাবিলেন যে, ইহাই সম্ভব যে, গোপনে আমার উপর কোন অত্যাচার হইবে, এই জন্য এমন বন্দোবস্ত হইয়াছে। অতএব স্থির করিলেন, নিদ্রা যাইবেন না, সতর্ক থাকিবেন।

কিন্তু দিবসে অনেক কষ্ট গিয়াছিল, এজন্য নিদ্রা যাইব না, জেব-উন্নিসা এরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেও, তন্দ্রা আসিয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে অধিকার করিতে লাগিল। যে নিদ্রা যাইব না প্রতিজ্ঞা করে, তন্দ্রা আসিলেও মধ্যে মধ্যে নিদ্রা ভঙ্গ হয়; তন্দ্রাভিভূত হইলেও একটু বোধ থাকে যে, আমার ঘুমান হইবে না। জেব-উন্নিসা মধ্যে মধ্যে এইরূপ তন্দ্রাভিভূত হইতেছিলেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে চমকে চমকে ঘুম ভাঙ্গিতেছিল। ঘুম ভাঙ্গিলেই আপনার অবস্থা মনে পড়িতেছিল। কোথায় দিল্লীর বাদশাহজাদী, কোথায় উদয়পুরের বন্দিনী! কোথায় মোগল বাদশাহীর রঙ্গভূমির প্রধানা অভিনেত্রী, মোগল বাদশাহীর আকাশের পূর্ণচন্দ্র, তক্তে তাউসের সর্ব্বোজ্জ্বল রত্ন, কাবুল হইতে বিজয়পুর গোলকুণ্ডা যাঁহার বাহুবলে শাসিত, তাঁহার দক্ষিণ বাহু,—আর কোথায় আজ গিরিগুহানিহিত উদয়পুরের কোটরে মূষিকবৎ পিঞ্জরাবদ্ধা, রূপনগরের ভুঁইঞার মেয়ের বন্দিনী, হিন্দুর ঘরে অস্পর্শীয়া শূকরী, হিন্দুপরিচারিকামণ্ডলীর চরণকলঙ্ককারী কীট! মরণ কি ইহার অপেক্ষা ভাল নহে? ভাল বৈ কি? যে মরণ তিনি প্রাণাধিক প্রিয় মবারককে দিয়াছেন, সে ভাল না ত কি? যা মবারককে দিয়াছেন, তাহা অমূল্য—নিজে কি তিনি সেই মরণের যোগ্য? হায় মবারক! মবারক! মবারক! তোমার অমোঘ বীরত্ব কি সামান্য ভুজঙ্গগরলকে জয় করিতে পারিল না? সে অনিন্দনীয় মনোহর মূর্ত্তিও কি সাপের বিষে নীল হইয়া গেল! এখন উদয়পুরে কি এমন সাপ পাওয়া যায় না যে, এই কালভুজঙ্গীকে দংশন করে? মানুষী কালভুজঙ্গী কি ফণিনী কালভুজঙ্গীর দংশনে মরিবে না! হায় মবারক! মবারক! মবারক! তুমি একবার সশরীর দেখা দিয়া কালভুজঙ্গী দিয়া আমায় একবার দংশন করাও; আমি মরি কি না দেখ।

ঠিক এই কথা ভাবিয়া যেন মবারককে সশরীর দর্শন করিবার মানসেই জেব-উন্নিসা নয়ন উন্মীলিত করিলেন। দেখিলেন, সম্মুখে সশরীর মবারক! জেব-উন্নিসা চীৎকার করিয়া, চক্ষু পুনর্নিমীলিত করিয়া অজ্ঞান হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : অগ্নিতে ইন্ধনক্ষেপ–জ্বালা বাড়িল

পরদিন যখন জেব-উন্নিসা শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিলেন, তখন আর তাঁহাকে চেনা যায় না। একে ত পূর্ব্বেই মূর্ত্তি শীর্ণা বিবর্ণা, কাদম্বিনীচ্ছায়াপ্রচ্ছন্নাবৎ হইয়াছিল–আজ আরও যেন কি হইয়াছে, বোধ হইতে লাগিল। সমস্ত দিনরাত্র আগুনের তাপের নিকট বসিয়া থাকিলে মানুষে যেমন হয়, চিতারোহণ করিয়া, না পুড়িয়া কেবল ধূম ও তাপে অর্দ্ধদগ্ধা হইয়া চিতা হইতে নামিলে যেমন হয়, জেব-উন্নিসাকে আজ তেমনই দেখাইতেছিল। জেব-উন্নিসা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পুড়িতেছিল।

বেশভূষা না করিলে নয়; জেব-উন্নিসা অত্যন্ত অনিচ্ছায় বেশভূষা করিয়া, নিয়ম ও অনুরোধ রক্ষার্থ জলযোগ করিল। তার পর প্রথমে উদিপুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেল। দেখিল, উদিপুরী একা বসিয়া আছে–সম্মুখে কুমারী মেরীর প্রতিমূর্ত্তি এবং একটি যিশুর ক্রুস। অনেক দিন উদিপুরী যিশুকে এবং তাঁহার মাতাকে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। আজ দুর্দ্দিনে তাঁহাদের মনে পড়িয়াছিল। খ্রিষ্টিয়ানির চিহ্নস্বরূপ এই দুইটি সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত; বৃষ্টির দিনে দুঃখীর পুরাণ ছাতির মত, আজ তাহা বাহির হইয়াছিল। জেব-উন্নিসা দেখিলেন, উদিপুরীর চক্ষে অবিরল অশ্রুধারা ঝরিতেছে; বিন্দুর পশ্চাৎ বিন্দু, বিন্দুর পশ্চাৎ বিন্দু, নিঃশব্দে দুগ্ধালক্তকনিন্দী গণ্ড বাহিয়া ঝরিতেছে। জেব-উন্নিসা উদিপুরীকে এত সুন্দর কখনও দেখেন নাই। সে স্বভাবতঃ পরম সুন্দরী–কিন্তু গর্ব্বে, ভোগবিলাসে, ঈর্ষ্যাদির জ্বালায়, সর্ব্বদাই সে অতুল সৌন্দর্য্য একটু বিকৃত হইয়া থাকিত। আজ অশ্রুস্রোতে সে বিকৃতি ধুইয়া গিয়াছিল–অপূর্ব্ব রূপরাশির পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল।

উদিপুরী জেব-উন্নিসাকে দেখিয়া আপনার দুঃখের কথা বলিতেছিলেন। বলিলেন, "আমি বাঁদী ছিলাম–বাঁদীর দরে বিক্রীত হইয়াছিলাম–কেন বাঁদীই রহিলাম না! কেন আমার কপালে ঐশ্বর্য্য ঘটিয়াছিল!–"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া উদিপুরী, জেব-উন্নিসার মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার কি হইয়াছিল? কাফের তোমার উপরও কি অত্যাচার করিয়াছে?"

জেব-উন্নিসা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কাফেরের সাধ্য কি? আল্লা করিয়াছেন।"

উদিপুরী। সকলই তিনি করেন, কিন্তু কি ঘটিয়াছে, শুনিতে পাই না?

জেব। এখন সে কথা মুখে আনিতে পারিব না। মৃত্যুকালে বলিয়া যাইব।

উদি। যাই হৌক, ঈশ্বর যেন রাজপুতের এ স্পর্দ্ধার দণ্ড করেন।

জেব। রাজপুতের ইহাতে কোন দোষ নাই।

এই কথা বলিয়া জেব-উন্নিসা নীরব হইয়া রহিল। উদিপুরীও কিছু বলিল না। পরিশেষে চঞ্চলকুমারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য জেব-উন্নিসা উদিপুরীর নিকট বিদায় চাহিল।

উদিপুরী বলিল, "কেন, তোমাকে কি ডাকিয়াছে?"

জেব। না।

উদি। তবে উপযাচক হইয়া তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না। তুমি বাদশাহের কন্যা।

জেব। আমার নিজের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

উদি। সাক্ষাৎ কর ত জিজ্ঞাসা করিও যে, কত আশরফি পাইলে এই গাঁওয়ারেরা আমাদিগকে ছাড়িয়া দিবে?

"করিব।" বলিয়া জেব-উন্নিসা বিদায় লইলেন। পরে চঞ্চলকুমারীর অনুমতি লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। চঞ্চলকুমারী তাঁহাকে পূর্ব্বদিনের মত সম্মান করিলেন; এবং রীতিমত স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন। শেষ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, উত্তম নিদ্রা হইয়াছিল ত?"

জেব। না। আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা পালন করিতে গিয়া ভয়ে ঘুমাই নাই।

চঞ্চল। তবে কিছু স্বপ্নে দেখেন নাই?

জেব। স্বপ্ন দেখি নাই। কিন্তু প্রত্যক্ষ কিছু দেখিয়াছি।

চঞ্চল। ভাল, না মন্দ?

জেব। ভাল, না মন্দ, তাহা বলিতে পারি না–ভাল ত নহেই। কিন্তু সে বিষয়ে আপনার কাছে আমার ভিক্ষা আছে।

চঞ্চল। বলুন।

জেব। আর তাহা দেখিতে পাই কি?

চঞ্চল। দৈবজ্ঞকে জিজ্ঞাসা না করিলে বলিতে পারি না। আমি পাঁচ সাত দিন পরে, দৈবজ্ঞের কাছে লোক পাঠাইব।

জেব। আজ পাঠান যায় না?

চঞ্চল। এত কি ত্বরা বাদশাহজাদী?

জেব। এত ত্বরা, যদি আপনি এই মুহূর্ত্তে তাহা দেখাইতে পারেন, তবে আমি আপনার বাঁদী হইয়া থাকিতেই চাহিব।

চঞ্চল। বিস্ময়কর কথা শাহজাদী! এমন কি সামগ্রী?

জেব-উন্নিসা উত্তর করিল না। তাহা চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। দেখিয়া চঞ্চলকুমারী দয়া করিল না। বলিল, "আপনি পাঁচ সাত দিন অপেক্ষা করুন, বিবেচনা করিব।"

তখন জেব-উন্নিসা, হিন্দু মুসলমানের প্রভেদ ভুলিয়া গেল। যেখানে তাহার যাইতে নাই, সেখানে গেল। যে শয্যার উপর চঞ্চলকুমারী বসিয়া, তাহার উপর গিয়া দাঁড়াইল। তার পর ছিন্ন লতার মত সহসা চঞ্চলকুমারীর চরণে পড়িয়া গিয়া, চঞ্চলকুমারীর পায়ের উপর মুখ রাখিয়া, পদ্মের উপর পদ্মখানি উল্টাইয়া দিয়া, অশ্রুশিশিরে তাহা নিষিক্ত করিল। বলিল, "আমার প্রাণ রক্ষা কর! নহিলে আজ মরিব।"

চঞ্চলকুমারী তাহাকে ধরিয়া উঠাইয়া বসাইলেন–তিনিও হিন্দু মুসলমান মনে রাখিলেন না। তিনি বলিলেন, "শাহজাদী! আপনি যেমন কাল রাত্রিতে দ্বার খুলিয়া শুইয়াছিলেন, আজিও তাই করিবেন। নিশ্চিত আপনার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে।"

এই বলিয়া তিনি জেব-উন্নিসাকে বিদায় দিলেন।

এ দিকে উদিপুরী জেব-উন্নিসার প্রতীক্ষা করিতেছিল। কিন্তু জেব-উন্নিসা তাহার সহিত আর সাক্ষাৎ করিল না। নিরাশ হইয়া উদিপুরী স্বয়ং চঞ্চলকুমারীর কাছে যাইবার অনুমতি চাহিলেন।

সাক্ষাৎ হইলে উদিপুরী চঞ্চলকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কত আশরফি পাইলে চঞ্চলকুমারী তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে পারেন।" চঞ্চলকুমারী বলিলেন, "যদি বাদশাহ ভারতবর্ষের সকল মসজিদ–মায় দিল্লীর জুম্মা মসজিদ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারেন, আর ময়ূরতক্ত এখানে বহিয়া দিয়া যাইতে পারেন, আর বৎসর বৎসর আমাদিগকে রাজকর দিতে স্বীকৃত হয়েন, তবে তোমাদের ছাড়িয়া দিতে পারি।"

উদিপুরী ক্রোধে অধীর হইল। বলিল, “গাঁওয়ার ভুঁইএঁার ঘরে এত স্পর্দ্ধা আশ্চর্য্য বটে!”

এই বলিয়া উদিপুরী উঠিয়া চলিয়া যায়। চঞ্চলকুমারী হাসিয়া বলিল, “বিনা হুকুমে যাও কোথায়? তুমি গাঁওয়ার ভুঁইয়ারাণীর বাঁদী, তাহা মনে নাই?” পরে একজন পরিচারিকাকে আদেশ করিলেন, “আমার এই নূতন বাঁদীকে আর আর মহিষীদিগের নিকট লইয়া গিয়া দেখাইয়া আসিও। পরিচয় দিও, ইনি দারাসেকোর খরিদা বাঁদী।”

উদিপুরী কাঁদিতে কাঁদিতে পরিচারিকার সঙ্গে চলিল। পরিচারিকা রাজসিংহের আর আর মহিষীদিগের নিকট, ঔরঙ্গজেবের প্রেয়সী মহিষীকে দেখাইয়া আনিল।

নির্ম্মল আসিয়া চঞ্চলকে বলিল, “মহারাণি! আসল কথাটা ভুলিতেছ? কি জন্য উদিপুরীকে ধরিয়া আনিয়াছি? জ্যোতিষীর গণনা মনে নাই?”

চঞ্চলকুমারী হাসিয়া বলিল, “সে কথা ভুলি নাই। তবে সে দিন বেগম বড় কাতর হইয়া পড়িল বলিয়া আর পীড়ন করিতে পারিলাম না। কিন্তু বেগম আপনা হইতেই আমার দয়াটুকু শুকাইয়া তুলিতেছে।”

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : শাহজাদী ভস্ম হইল

অর্দ্ধ রাত্রি অতীত; সকলে নিঃশব্দে নিদ্রিত। জেব-উন্নিসা বাদশাহ-দুহিতা সুখশয্যায় অশ্রুমোচনে বিবশা, কদাচিৎ দাবাগ্নিপরিবেষ্টিত ব্যাঘ্রীর মত কোপতীব্রা। কিন্তু তখনই যেন বা শরবিদ্ধা হরিণীর মত কাতরা। রাত্রিটা ভাল নহে; মধ্যে মধ্যে গভীর হুঙ্কারের সহিত প্রবল বায়ু বহিতেছে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বাতায়নপথলক্ষ্য গিরিশিখরমালায় প্রগাঢ় অন্ধকার–কেবল যথায় রাজপুতের শিবির, তথায় বসন্তকাননে কুসুমরাজি তুল্য, সমুদ্রে ফেননিচয় তুল্য এবং কামিনীকমনীয় দেহে রত্নরাশি তুল্য, এক স্থানে বহুসংখ্যক দীপ জ্বলিতেছে–আর সর্ব্বত্র নিঃশব্দ, প্রগাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন, কদাচিৎ সিপাহীর হস্তমুক্ত বন্দুকের প্রতিধ্বনিতে ভীষণ। কখনও বা মেঘের “অদ্রিগ্রহণগুরুগর্জ্জিত”,–কখন বা একমাত্র কামানের, শৃঙ্গে শৃঙ্গে প্রতিধ্বনিত তুমুল কোলাহল। রাজপুরীর অশ্বশালায় ভীত অশ্বের হ্রেষা; রাজপুরীর উদ্যানে ভীত হরিণীর কাতরোক্তি। সেই ভয়ঙ্করী নিশীথিনীর সকল শব্দ শুনিতে শুনিতে বিষণ্নমনে জেব-উন্নিসা ভাবিতেছিল, “ঐ যে কামান ডাকিল, বোধ হয় মোগলের কামান–নহিলে কামান অমন ডাকিতে জানে না। আমার পিতার তোপ ডাকিল–এমন শত শত তোপ আমার বাপের আছে–একটাও কি আমার হৃদয়ের জন্য নহে? কি করিলে এই তোপের মুখে বুক পাতিয়া দিয়া, তোপের আগুনে সকল জ্বালা জুড়াই? কাল সৈন্যমধ্যে গজপৃষ্ঠে চড়িয়া লক্ষ সৈন্যের শ্রেণী দেখিয়াছিলাম, লক্ষ অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা শুনিয়াছিলাম–তার একখানিতে আমার সব জ্বালা ফুরাইতে পারে; কৈ, সে চেষ্টা ত করি নাই? হাতীর উপর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া, হাতীর পায়ের তলে পিষিয়া মরিতে পারিতাম,–কৈ? সে চেষ্টাও ত করি নাই। কেন করি নাই? মরিবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু মরিবার উদ্যোগ করি নাই কেন? এখনও ত অঙ্গে অনেক হীরা আছে, গুঁড়াইয়া খাইয়া মরি না কেন? আমার মনের আর সে শক্তি নাই যে, উদ্যোগ করিয়া মরি।”

এমন সময়ে বেগবান্ বায়ু, মুক্তদ্বার কক্ষমধ্যে, অতি বেগে প্রবেশ করিয়া সমস্ত বাতি নিবাইয়া দিল। অন্ধকারে জেব-উন্নিসার মনে একটু ভয়ের সঞ্চার হইল। জেব-উন্নিসা ভাবিতে লাগিল, “ভয় কেন? এই ত মরণ কামনা করিতেছিলাম! যে মরিতে চাহে, তার আবার কিসের ভয়? ভয়? কাল মরা মানুষ দেখিয়াছি, আজও বাঁচিয়া আছি। বুঝি যেখানে মরা মানুষ থাকে, সেইখানে যাইব, ইহা নিশ্চিত; তবে ভয় কিসের? তবে বেহেস্ত আমার কপালে নাই–বুঝি

জাহান্নায় যাইতে হইবে, তাই এত ভয়! তা, এত দিন এ সকল কথা কিছুই বিশ্বাস করি নাই। জাহান্নাও মানি নাই, বেহেস্তও মানি নাই; খোদাও জানিতাম না, দীন্‌ও জানিতাম না। কেবল ভোগবিলাসই জানিতাম। আল্লা রহিম! তুমি কেন ঐশ্বর্য্য দিয়াছিলে? ঐশ্বর্য্যেই আমার জীবন বিষময় হইল। তোমায় আমি তাই চিনিলাম না। ঐশ্বর্য্যে সুখ নাই, তাহা আমি জানিতাম না, কিন্তু তুমি ত জান! জানিয়া শুনিয়া নির্দ্দয় হইয়া কেন এ দুঃখ দিলে? আমার মত ঐশ্বর্য্য কাহার কপালে ঘটিয়াছে? আমার মত দুঃখী কে?

শয্যায় পিপীলিকা, কি অন্য একটা কীট ছিল–রত্নশয্যাতেও কীটের সমাগমের নিষেধ নাই–কীট জেব-উন্নিসাকে দংশন করিল। যে কোমলাঙ্গে পুষ্পধন্বাও শরাঘাতের সময়ে মৃদুহস্তে বাণক্ষেপ করেন, তাহাতে কীট অবলীলাক্রমে দংশন করিয়া রক্ত বাহির করিল। জেব-উন্নিসা জ্বালায় একটু কাতর হইল। তখন জেব-উন্নিসা মনে মনে একটু হাসিল। ভাবিল, "পিপীলিকার দংশনে আমি কাতর! এই অনন্ত দুঃখের সময়েও কাতর! আপনি পিপীলিকাদংশন সহ্য করিতে পারিতেছি না, আর অবলীলাক্রমে আমি, যে আমার প্রাণাধিক প্রিয়, তাহাকে ভুজঙ্গমদংশনে প্রেরণ করিলাম। এমন কেহ নাই কি যে, আমাকে তেমনই বিষধর সাপ আনিয়া দেয়! হয় সাপ, নয় মবারক!"

প্রায় সকলেরই ইহা ঘটে যে, অধিক মানসিক যন্ত্রণায় সময়, অধিক ক্ষণ ধরিয়া একা, মর্ম্মভেদী চিন্তায় নিমগ্ন হইলে মনের কোন কোন কথা মুখে ব্যক্ত হয়। জেব-উন্নিসার শেষ কথা কয়টি সেইরূপ মুখে ব্যক্ত হইল। তিনি সেই অন্ধকার নিশীথে, গাঢ়ান্ধকার কক্ষমধ্যে হইতে সেই বায়ুর হুঙ্কার ভেদ করিয়া যেন কাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "হয় সাপ! নয় মবারক!" কেহ সেই অন্ধকারে উত্তর করিল, "মবারককে পাইলে তুমি কি মরিবে না?"

"এ কি এ?" বলিয়া জেব-উন্নিসা উপাধান ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিল। যেমন গীতধ্বনি শুনিয়া হরিণী উন্নমিতাননে উঠিয়া বসে; তেমনই করিয়া জেব-উন্নিসা উঠিয়া বসিল। বলিল, "এ কি এ? এ কি শুনিলাম! কার এ আওয়াজ?"

উত্তর হইল, "কার?"

জেব-উন্নিসা বলিল, "কার! যে বেহেস্তে গিয়াছে, তারও কি কণ্ঠস্বর আছে! সে কি ছায়া মাত্র নহে? তুমি কি প্রকারে বেহেস্ত হইতে আসিতেছ, যাইতেছ, মবারক? তুমি কাল দেখা দিয়াছিলে, আজ তোমার কথা শুনিলাম–তুমি মৃত, না জীবিত? আসিরদ্দীন কি আমার কাছে মিথ্যা কথা বলিয়াছিল? তুমি জীবিত হও, মৃত হও, তুমি আমার কাছে–আমার এই পালঙ্কে মুহূর্ত জন্য বসিতে পার না? তুমি যদি ছায়া মাত্রই হও, তবু আমার ভয় নাই। একবার বসো।"

উত্তর, "কেন?"

জেব-উন্নিসা সকাতরে বলিল, "আমি কিছু বলিব। আমি যাহা কখন বলি নাই, তাহা বলিব।"

মবারক–(বলিতে হইবে না যে, মবারক সশরীর উপস্থিত) তখন অন্ধকারে, জেব-উন্নিসার পার্শ্বে পালঙ্কের উপর বসিল। জেব-উন্নিসার বাহুতে তাহার বাহু স্পর্শ হইল,–জেব-উন্নিসার শরীর হর্ষকণ্টকিত, আহ্লাদে পরিপ্লুত হইল;–অন্ধকারে মুক্তার সারি গণ্ড দিয়া বহিল। জেব-উন্নিসা আদরে মবারকের হাত আপনার হাতের উপর তুলিয়া লইল। বলিল, "ছায়া নও প্রাণনাথ! আমায় তুমি যা বলিয়া ভুলাও, আমি ভুলিব না। আমি তোমার; আবার তোমায় ছাড়িব না।" তখন জেব-উন্নিসা সহসা পালঙ্ক হইতে নামিয়া, মবারকের পায়ের উপর পড়িল; বলিল, "আমায় ক্ষমা কর! আমি ঐশ্বর্য্যের গৌরবে পাগল হইয়াছিলাম। আমি আজ শপথ করিয়া ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিলাম – তুমি যদি আমায় ক্ষমা কর, আমি আর দিল্লী ফিরিয়া যাইব না। বল তুমি জীবিত!"

মবারক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "আমি জীবিত। একজন রাজপুত আমাকে কবর হইতে তুলিয়া চিকিৎসা করিয়া প্রাণদান দিয়াছিল, তাহারই সঙ্গে আমি এখানে আসিয়াছি।"

জেব-উন্নিসা পা ছাড়িল না। তাহার চক্ষুর জলে মবারকের পা ভিজিয়া গেল। মবারক তাহার হাত ধরিয়া উঠাইতে গেল। কিন্তু জেব-উন্নিসা উঠিল না; বলিল, "আমায় দয়া কর, আমায় ক্ষমা কর।"

মবারক বলিল, "তোমায় ক্ষমা করিয়াছি। না করিলে, তোমার কাছে আসিতাম না।"

জেব-উন্নিসা বলিল, "যদি আসিয়াছ, যদি ক্ষমা করিয়াছ, তবে আমায় গ্রহণ কর। গ্রহণ করিয়া, ইচ্ছা হয় আমাকে সাপের মুখে সমর্পণ কর, না ইচ্ছা হয়, যাহা বল, তাহাই করিব। আমায় আর ত্যাগ করিও না। আমি তোমার নিকট শপথ করিতেছি যে, আর দিল্লী যাইতে চাহিব না; আলম্‌গীর বাদশাহের রঙ্‌মহালে আর প্রবেশ করিব না। আমি শাহজাদা বিবাহ করিতে চাহি না। আমি তোমার সঙ্গে যাইব।"

মবারক সব ভুলিয়া গেল–সর্পদংশনজ্বালা ভুলিয়া গেল– আপনার মরিবার ইচ্ছা ভুলিয়া গেল–দরিয়াকে ভুলিয়া গেল। জেব-উন্নিসার প্রীতিশূন্য অসহ্য বাক্য ভুলিয়া গেল। কেবল জেব-উন্নিসার অতুল রূপরাশি তাহার নয়নে লাগিয়া রহিল; জেব-উন্নিসার প্রেমপরিপূর্ণ কাতরোক্তি তাহার কর্ণমধ্যে ভ্রমিতে লাগিল; শাহজাদীর দর্প চূর্ণিত দেখিয়া তাহার মন গলিয়া গেল। তখন মবারক জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি এখন এই গরিবকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে সম্মত?"

জেব-উন্নিসা যুক্তকরে সজলনয়নে বলিল, "এত ভাগ্য কি আমার হইবে?"

বাদশাহজাদী আর বাদশাহজাদী নহে, মানুষী মাত্র। মবারক বলিল, "তবে নির্ভয়ে, নিঃসঙ্কোচে, আমার সঙ্গে আইস।"

আলো জ্বালিবার সামগ্রী তাঁহার সঙ্গে ছিল। মবারক আলো জ্বালিয়া ফানুসের ভিতর রাখিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার কথামত জেব-উন্নিসা বেশভূষা করিলেন। তাহা সমাপন হইলে, মবারক তাঁহার হাত ধরিয়া লইয়া কক্ষের বাহিরে গেলেন। তথা প্রহরিণীগণ নিযুক্ত ছিল। তাহারা মবারকের ইঙ্গিতে দুই জনে মবারক ও জেব-উন্নিসার সঙ্গে চলিল। মবারক যাইতে যাইতে জেব-উন্নিসাকে বুঝাইলেন যে, রাজাবরোধ মধ্যে পুরুষের আসিবার উপায় নাই। বিশেষ মুসলমানের ত কথাই নাই। এই জন্য তিনি রাত্রিতে আসিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাও মহারাণীর বিশেষ অনুগ্রহেই পারিয়াছেন, এবং তাই এই প্রহরিণীদিগের সাহায্য পাইয়াছেন। সিংহদ্বার পর্য্যন্ত তাঁহাদের হাঁটিয়া যাইতে হইবে। বাহিরে মবারকের ঘোড়া এবং জেব-উন্নিসার জন্য দোলা প্রস্তুত আছে।

প্রহরিণীদিগের সাহায্যে সিংহদ্বারের বাহির হইয়া, তাঁহারা উভয়ে স্ব স্ব স্থানে আরোহণ করিলেন। উদয়পুরেও দুই চারি জন মুসলমান সওদাগরী ইত্যাদি উপলক্ষে বাস করিত। তাহারা রাণার অনুমতি লইয়া নগরপ্রান্তে একটি ক্ষুদ্র মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। মবারক জেব-উন্নিসাকে সেই মসজিদে লইয়া গেলেন। সেখানে একজন মোল্লা ও উকীল ও গোওয়া উপস্থিত ছিল। তাহাদের সাহায্যে মবারক ও জেব-উন্নিসার সরা মত পরিণয় সম্পাদিত হইল।

তখন মবারক বলিলেন, "এখন তোমাকে যেখান হইতে লইয়া আসিয়াছি, সেইখানে রাখিয়া আসিতে হইবে। কেন না, এখনও তুমি মহারাণার বন্দী। কিন্তু ভরসা করি, তুমি শীঘ্র মুক্তি পাইবে।"

এই বলিয়া মবারক জেব-উন্নিসাকে পুনর্ব্বার তাঁহার শয্যাগৃহে রাখিয়া গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : দগ্ধ বাদশাহের জলভিক্ষা

পরদিন পূর্ব্বাহ্নকালে চঞ্চলকুমারীর নিকট জেব-উন্নিসা বসিয়া প্রফুল্লবদনে কথোপকথনে প্রবৃত্ত। দুই দিনের রাত্রিজাগরণে শরীর ম্লান–দুশ্চিন্তার দীর্ঘকাল ভোগে বিশীর্ণ। যে জেব-উন্নিসা রত্নরাশি, পুষ্পরাশিতে মণ্ডিত হইয়া সীস্ মহলের দর্পণে দর্পণে আপনার প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া হাসিত, এ সে জেব-উন্নিসা নহে। যে জানিত

যে, বাদশাহজাদীর জন্ম কেবল ভোগবিলাসের জন্য, এ সে বাদশাহজাদী নহে। জেব-উন্নিসা বুঝিয়াছে যে, বাদশাহজাদীও নারী, বাদশাহজাদীর হৃদয়ও নারীর হৃদয়; স্নেহশূন্য নারীহৃদয়, জলশূন্য নদী মাত্র—কেবল বালুকাময় অথবা জলশূন্য তড়াগের মত—কেবল পঙ্কময়।

জেব-উন্নিসা এক্ষণে অকপটে গর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া, বিনীতভাবে চঞ্চলকুমারীর নিকট গত রাত্রির ঘটনা সকল বিবৃত করিতেছিলেন। চঞ্চলকুমারী সকলই জানিত। সকল বলিয়া, জেব-উন্নিসা যুক্তকরে চঞ্চলকুমারীকে বলিলেন, "মহারাণি! আমায় আর বন্দী রাখিয়া আপনার কি ফল? আমি যে আলমগীর বাদশাহের কন্যা, তাহা আমি ভুলিয়াছি। আপনি তাঁহার কাছে পাঠাইলেও আমার আর যাইতে ইচ্ছা নাই। গেলেও বোধ করি, আমার প্রাণরক্ষার সম্ভাবনা নাই। অতএব আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমি আপনার স্বামীর সঙ্গে তাঁহার স্বদেশ তুর্কস্থানে চলিয়া যাই।"

শুনিয়া চঞ্চলকুমারী বলিলেন, "এ সকল কথার উত্তর দিবার সাধ্য আমার নাই। কর্ত্তা মহারাণা স্বয়ং। তিনি আপনাকে আমার কাছে রাখিতে পাঠাইয়াছেন, আমি আপনাকে রাখিতেছি। তবে এই যে ঘটনাটা ঘটিয়া গেল, ইহার জন্য মহারাণার সেনাপতি মাণিকলাল সিংহ দায়ী। আমি মাণিকলালের নিকট বিশেষ বাধিত, তাই তাঁহার কথায় এতটা করিয়াছি। কিন্তু ছাড়িয়া দিবার কোন উপদেশ পাই নাই। অতএব সে বিষয়ে কোন অঙ্গীকার করিতে পারিতেছি না।"

জেব-উন্নিসা বিষণ্নভাবে বলিল, "মহারাণাকে আমার এ ভিক্ষা আপনি কি জানাইতে পারেন না? তাঁহার শিবির এমন অধিক দূরে ত নহে। কাল রাত্রে পর্ব্বতের উপর তাঁহার শিবিরের আলো দেখিতে পাইয়াছিলাম?"

চঞ্চলকুমারী বলিলেন, "পাহাড় যত নিকট দেখায়, তত নিকট নয়। আমরা পাহাড়ে দেশে বাস করি, তাই জানি। আপনিও কাশ্মীর গিয়াছিলেন, এ কথা আপনার স্মরণ হইতে পারে। তা যাই হোক, লোক পাঠান কষ্টসাধ্য নহে। তবে, রাণা যে এ কথায় সম্মত হইবেন, এমন ভরসা করি না। যদি এমন সম্ভব হইত যে, উদয়পুরের ক্ষুদ্র সেনা মোগল রাজ্য এই এক যুদ্ধে একেবারে ধ্বংস করিতে পারিত, যদি বাদশাহের সঙ্গে আমাদের আর সন্ধিস্থাপনের সম্ভাবনা না থাকিত, তবে অবশ্য তিনি আপনাকে স্বামীর সঙ্গে যাইতে অনুমতি দিতে পারিতেন। কিন্তু যখন সন্ধি অবশ্য এক দিন না এক দিন করিতে হইবে, তখন আপনাদিগকেও বাদশাহের নিকট অবশ্য ফেরৎ দিতে হইবে।"

জেব। তাহা হইলে, আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুমুখে পাঠাইবেন। এ বিবাহের কথা জানিতে পারিলে, বাদশাহ আমাকে বিষভোজন করাইবেন। আর আমার স্বামীর ত কথাই নাই। তিনি আর কখনও দিল্লী যাইতে পাইবেন না। গেলে মৃত্যু নিশ্চিত। এ বিবাহে কোন্ অভীষ্ট সিদ্ধ হইল, মহারাণি?

চঞ্চল। যাহাতে কোন উৎপাত না ঘটে, এমন উপায় করা যাইতে পারে, বোধ হয়।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, এমন সময়ে নির্ম্মলকুমারী সেখানে কিছু ব্যস্তভাবে আসিয়া উপস্থিত হইল। নির্ম্মল, চঞ্চলকে প্রণাম করার পর, জেব-উন্নিসাকে অভিবাদন করিলেন। জেব-উন্নিসাও তাঁহাকে প্রত্যভিবাদন করিলেন। তার পর চঞ্চল জিজ্ঞাসা করিলেন, "নির্ম্মল, এত ব্যস্তভাবে কেন?"

নির্ম্মল। বিশেষ সংবাদ আছে।

তখন জেব-উন্নিসা উঠিয়া গেলেন। চঞ্চল জিজ্ঞাসা করিলেন, "যুদ্ধের সংবাদ না কি?"

নির্ম্মল। আজ্ঞা হাঁ।

চঞ্চল। তা ত লোকপরম্পরায় শুনিয়াছি। ইন্দুর গর্ত্তের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। মহারাণা গর্ত্তের মুখ বুজাইয়া দিয়াছেন। শুনিয়াছি, ইন্দুর না কি গর্ত্তের ভিতর মরিয়া পচিয়া থাকিবার মত হইয়াছে।

নি। তার পর, আর একটা কথা আছে। ইন্দুর বড় ক্ষুধার্ত্ত। আমার সেই পায়রাটি আজ ফিরিয়া আসিয়াছে। বাদশাহ ছাড়িয়া দিয়াছেন—তাহার পায়ে

একখানি রোক্‌কা বাঁধিয়া দিয়াছেন।

চ। রোক্‌কা দেখিয়াছ?

নি। দেখিয়াছি।

চ। কাহার বরাবর?

নি। ইম্‌লি বেগম।

চ। কি লিখিয়াছে?

নির্ম্মল পত্রখানি বাহির করিয়া কিয়দংশ এইরূপ পড়িয়া শুনাইলেন–

"আমি তোমায় যেরূপ স্নেহ করিতাম, কোন মনুষ্যকে কখনও এমন স্নেহ করি নাই। তুমিও আমার অনুগত হইয়াছিলে। আজ পৃথিবীশ্বর দুর্দ্দশাপন্ন–লোকের মুখে শুনিয়া থাকিবে। অনাহারে মরিতেছি। দিল্লীর বাদশাহ আজ এক টুকরা রুটির ভিখারী। কোন উপকার করিতে পার না কি? সাধ্য থাকে, করিও। এখনকার উপকার কখনও ভুলিব না।"

শুনিয়া চঞ্চলকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি উপকার করিবে?"

নির্ম্মল বলিলেন, "তাহা বলিতে পারি না। আর কিছু না পারি, বাদশাহের জন্য আর যোধপুরী বেগমের জন্য কিছু খাদ্য পাঠাইয়া দিব।"

চ। কি রকমে? সেখানে ত মনুষ্য সমাগমের পথ নাই।

নি। তাহা এখন বলিতে পারি না। আমায় একবার শিবিরে যাইতে অনুমতি দিন। কি করিতে পারি, দেখিয়া আসি।

চঞ্চলকুমারী অনুমতি দিলেন। নির্ম্মলকুমারী গজপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, রক্ষিবর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া, শিবিরে স্বামিসন্দর্শনে গেলেন। যাইবামাত্র মাণিকলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। মাণিকলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "যুদ্ধের অভিপ্রায়ে না কি?"

নি। কাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিব? তুমি কি আমার যুদ্ধের যোগ্য?

মাণিক। তা ত নই। কিন্তু আলম্‌গীর বাদশাহ?

নি। আমি তাঁর ইম্‌লি বেগম–তার সঙ্গে কি যুদ্ধের সম্বন্ধ? আমি তাঁর উদ্ধারের জন্য আসিয়াছি। আমি যাহা আজ্ঞা করি, তাহা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর।

তার পর মাণিকলালে ও নির্ম্মলকুমারীতে কি কথোপকথন হইল, তাহা আমরা জানি না। অনেক কথা হইল, ইহাই জানি।

মাণিকলাল নির্ম্মলকুমারীকে উদয়পুরে প্রতিপ্রেরণ করিয়া, রাজসিংহের সাক্ষাৎকার লাভের অভিপ্রায়ে রাণার তাম্বুতে গেলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : অগ্নিনির্ব্বাণের পরামর্শ

মহারাণার সাক্ষাৎ পাইয়া, প্রণাম করিয়া মাণিকলাল যুক্তকরে নিবেদন করিলেন, "যদি এ দাসকে অন্য কোন যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠান মহারাজের অভিপ্রায় হয়, তবে বড় অনুগৃহীত হইব।"

রাণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, এখানে কি হইয়াছে?"

মাণিকলাল উত্তর করিল, "এখানে ত কোন কাজ নাই। কাজের মধ্যে ক্ষুধার্ত্ত মোগলদিগের শুল্ক মুখ দেখা ও আর্ত্তনাদ শুনা। তাহা কখনও কখনও পর্ব্বতের

উপর গাছে চড়িয়া দেখিয়া আসিতেছি। কিন্তু সে কাজ, যে সে পারিবে। আমি ভাবিতেছি কি যে, এতগুলা মানুষ, হাতী, ঘোড়া, উট, এই রন্ধ্রে পচিয়া মরিয়া থাকিবে,–দুর্গন্ধে উদয়পুরেও কেহ বাঁচিবে না–বড় মড়ক উপস্থিত হইবে।”

রাণা বলিলেন, “অতএব তোমার বিবেচনা এই, মোগল সেনাকে অনাহারে মারিয়া ফেলা অকর্ত্তব্য?”

মাণিক। বোধ হয়। যুদ্ধে লক্ষ জনকে মারিলেও দেখিয়া দুঃখ হয় না। বসিয়া বসিয়া অনাহারে একজন লোকও মরিলে দুঃখ হয়।

রাণা। তবে উহাদিগের সম্বন্ধে কি করা যায়?

মাণিক। মহারাজ! আমার এত বুদ্ধি নাই যে, আমি এমন বিষয়ে পরামর্শ দিই। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে সন্ধিস্থাপনের এই উত্তম সময়। জঠরাগ্নির দাহের সময়ে মোগল যেমন নরম হইবে, ভরা পেটে তেমন হইবে না। আমার বোধ হয়, রাজমন্ত্রিগণ ও সেনাপতিগণকে ডাকিয়া পরামর্শ করিয়া এ বিষয়ের একটা মীমাংসা করা ভাল।

রাজসিংহ এ প্রস্তাবে সম্মত ও স্বীকৃত হইলেন। উপবাসে এত মানুষ মারাও তাঁহার ইচ্ছা নহে। হিন্দু, ক্ষুধার্ত্তের অন্ন যোগান পরমধর্ম্ম বলিয়া জানে। অতএব হিন্দু, শত্রুকেও সহজে উপবাসে মারিতে চাহে না।

সন্ধ্যার পর শিবিরে রাজসভা সমবেত হইল। তথা প্রদান সেনাপতিগণ, প্রধান রাজমন্ত্রিগণ উপস্থিত হইলেন। রাজমন্ত্রিগণের মধ্যে প্রধান দয়াল সাহা। তিনিও উপস্থিত ছিলেন। মাণিকলালও ছিল।

রাজসিংহ বিচার্য্য বিষয়টা সকলকে বুঝাইয়া দিয়া, সভাসদ্‌গণের মত জিজ্ঞাসা করিলেন। অনেকেই বলিলেন, “মোগল ঐখানে ক্ষুধা তৃষ্ণায় মরিয়া পচিয়া থাকুক–ঔরঙ্গজেবের বেটাকে ধরিয়া আনিয়া উহাদের গোর দেওয়াইব। না হয়, দোসাদের দল আনিয়া মাটি চাপা দেওয়াইব। মোগল হইতে বার বার রাজপুতের যে অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে, কাহারও ইচ্ছা হইবে না যে, মোগলকে হাতে পাইয়া ছাড়া যায়।”

ইহার উত্তরে মহারাণা বলিলেন, “না হয় স্বীকার করিলাম যে, এই মোগলদিগকে এইখানে শুকাইয়া মারিয়া মাটি চাপা দেওয়া গেল। কিন্তু ঔরঙ্গজেব আর ঔরঙ্গজেবের উপস্থিত সৈন্যগণ মরিলেই মোগল নিঃশেষ হইল না। ঔরঙ্গজেব মরিলে শাহ আলম বাদশাহ হইবে। শাহ আলমের সঙ্গে দাক্ষিণাত্য-বিজয়ী মহাসৈন্য পর্ব্বতের অপর পারে সশস্ত্রে উপস্থিত আছে। আর দুইটা মোগলসেনা আর দুই দিকে বসিয়া আছে। আমরা কি এই সকলগুলিকে নিঃশেষে ধ্বংস করিতে পারিব? যদি না পারি, তবে অবশ্য একদিন সন্ধিস্থাপন করিতে হইবে। যদি সন্ধি করিতে হয়, তবে এমন সুসময় আর কবে হইবে? এখন ঔরঙ্গজেবের প্রাণ কণ্ঠাগত–এখন তাহার কাছে যাহা চাহিব, তাহাই পাইব। সময়ান্তরে কি তেমন পাইব?”

দয়াল সাহা বলিলেন, “নাই পাইলাম। তবু এই মহাপাপিষ্ঠ পৃথিবীর কণ্টকস্বরূপ ঔরঙ্গজেবকে বধ করিলেই পৃথিবীকে পুনরুদ্ধার করা হইবে। এমন পুণ্য আর কোন কার্য্যে নাই, মহারাজ মতান্তর করিবেন না।”

রাজসিংহ বলিলেন, “সকল মোগল বাদশাহই দেখিলাম–পৃথিবীর কণ্টক। ঔরঙ্গজেব শাহজাঁহার অপেক্ষাও কি নরাধম? খস্রু হইতে আমাদের যত অমঙ্গল ঘটিয়াছে, ঔরঙ্গজেব হইতে কি তত হইয়াছে? শাহ আলম যে পিতৃপিতামহ হইতেও দুরাচার না হইবে, তাহার স্থিরতা কি? আর তোমরা যদি এমন ভরসাই কর–যে ভরসা আমিও না করি, তা নয়–যে এই চারিটি মোগল সেনাই আমরা পরাজিত করিতে পারিব, তবে ভাবিয়া দেখ, কত অসংখ্য মনুষ্যহত্যার পর সে আশা ফলে পরিণত হইবে। কত অসংখ্য রাজপুত বিনষ্ট হইবে। অবশিষ্ট থাকিবে কয় জন? আমরা অল্পসংখ্যক; মুসলমান বহুসংখ্যক। আমরা সংখ্যায় কমিয়া গেলে, আবার যদি মোগল আসে, তবে কার বাহুবলে তাদের আবার তাড়াইব?”

দয়াল সাহা বলিল, “মহারাজ! সমস্ত রাজপুতানা একত্রিত হইলে মোগলকে সিন্ধু পার করিয়া রাখিয়া আসিতে কতক্ষণ লাগে?”

রাজসিংহ বলিলেন, “সে কথা সত্য। কিন্তু তাহা কখনও হইয়াছে কি? এখনও ত সে চেষ্টা করিতেছি–ঘটিতেছে কি? তবে সে ভরসা কি প্রকারে করিব?”

দয়াল সাহা বলিলেন, “সন্ধি হইলেও ঔরঙ্গজেব সন্ধি রক্ষা করিবে, এমন ভরসা করি না। অমন মিথ্যাবাদী, ভণ্ড কখনও জন্মগ্রহণ করে নাই। মুক্তি পাইলেই, সে সন্ধিপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, যা করিতেছিল, তাহাই করিবে।”

রাজসিংহ বলিলেন, “তাহা ভাবিলে কখনই সন্ধি করা হয় না। তাই কি মত?”

এইরূপ অনেক বিচার হইল। পরিশেষে সকলেই রাণার কথার যথার্থ্য স্বীকার করিলেন। সন্ধিস্থাপনের কথাই স্থির হইল।

তখন কেহ আপত্তি করিল, “ঔরঙ্গজেব ত কই, সন্ধির চেষ্টায় দূত পাঠান নাই। তাঁর গরজ, না আমাদের গরজ?”

তাহাতে রাজসিংহ উত্তর করিলেন, “দূত আসিবে কি প্রকারে? সে রন্ধ্রপথের ভিতর হইতে একটি পিঁপ্ড়া উপরে আসিবার পথ রাখি নাই।”

দয়াল সাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, “তবে আমাদেরই বা দূত যাইবে কি প্রকারে? সেবার ঔরঙ্গজেব আমাদিগের দূতকে বধ করিবার আজ্ঞা দিয়াছিল, এবার যে সে আজ্ঞা দিবে না, তার ঠিকানা কি?”

রাজসিংহ বলিলেন, “এবার যে বধ করিবে না, তাহা স্থির। কেন না, এখন কপট সন্ধিতেও তাহার মঙ্গল। তবে দূত সেখানে যাইবে কি প্রকারে, তাহা গোলযোগ আছে বটে?”

তখন মাণিকলাল নিবেদন করিল, “সে ভার আমার উপর অর্পিত হউক। আমি মহারাণার পত্র ঔরঙ্গজেবের নিকট পৌঁছাইয়া দিব, এবং উত্তর আনিয়া দিব।”

সকলেই সে কথায় বিশ্বাস করিল; কেন না, সকলেই জানিত, কৌশলে ও সাহসে মাণিকলাল অদ্বিতীয়। অতএব পত্র লিখিবার হুকুম হইল। দয়াল সাহা পত্র প্রস্তুত করাইলেন। তাহার মর্ম্ম এই যে–বাদশাহ, সমস্ত সৈন্য মেবার হইতে উঠাইয়া লইয়া যাইবেন। মেবারে গোহত্যা ও দেবালয়ভঙ্গ নিবারণ করিবেন, এবং জেজেয়ার কোন দাবি করিবেন না। তাহা হইলে রাজসিংহ পথ মুক্ত করিয়া দিবেন, নিরুদ্বেগে বাদশাহকে যাইতে দিবেন।

পত্র সভাসদ সকলকে শুনান হইল। শুনিয়া মাণিকলাল বলিল, “বাদশাহের স্ত্রী কন্যা আমাদিগের নিকট বন্দী আছে। তাহারা থাকিবে?”

বলিবামাত্র সভামধ্যে একটা হাসির ঘটা পড়িয়া গেল। সকলে একবাক্যে বলিল, “ছাড়া হইবে না।” কেহ বলিল, থাক্। উহারা মহারাণার আঙ্গিনা ঝাঁটাইবে।” কেহ বলিল, “উহাদের ঢাকায় পাঠাইয়া দাও। হিন্দু হইয়া, বৈষ্ণবী সাজিয়া, হরিনাম করিবে।” কেহ বলিল, “উহাদের মূল্যস্বরূপ এক এক ক্রোর টাকা বাদশাহ দিবেন।” ইত্যাদি নানা প্রকার প্রস্তাব হইল। মহারাণা বলিলেন, “দুইটা মুসলমান বাঁদীর জন্য সন্ধি ত্যাগ করা হইবে না। সে দুইটাকে ফিরাইয়া দিব, লিখিয়া দাও।”

সেইরূপ লেখা হইল। পত্রখানি মাণিকলালের জিম্মা হইল। তখন সভাভঙ্গ হইল।

নবম পরিচ্ছেদ : অগ্নিতে জলসেক

সভাভঙ্গ হইল, তবু মাণিকলাল গেল না। সকলেই চলিয়া গেল, মাণিকলাল গোপনে মহারাণাকে জানাইল, “মবারকের বখ্‌শিশের কথাটা এই সময়ে

মহারাজকে স্মরণ করিয়া দিতে হয়।”

রাজসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, “সে কি চায়?”

মাণিক। বাদশাহের যে কন্যা আমাদিগের কাছে বন্দী আছে, তাহাকেই চায়।

রাজসিংহ। তাহাকে যদি বাদশাহের নিকট ফেরৎ না পাঠাই, তবে বোধ করি, সন্ধি হইবে না। আর স্ত্রীলোকের উপর কি প্রকারে আমি পীড়ন করিব?

মাণিক। পীড়ন করিতে হইবে না। শাহজাদীর সঙ্গে মবারকের গত রাত্রে সাদী হইয়াছে।

রাজসিংহ। সেই কথা শাহজাদী বাদশাহকে বলিলেই বোধ হয়, সব গোল মিটিবে।

মাণিক। এক রকম–কেন না, দুই জনেরই মাথা কাটা যাইবে।

রাজসিংহ। কেন?

মাণিক। শাহজাদীদের শাহজাদা ভিন্ন বিবাহ নাই। এই শাহজাদী একজন ক্ষুদ্র সৈনিককে বিবাহ করিয়া দিল্লীর বাদশাহের কুলের কলঙ্ক করিয়াছে। বিশেষ বাদশাহকে না জানাইয়া এ বিবাহ করিয়াছে, এজন্য তাহাকে দিল্লীর রঙ্‌মহালের প্রথানুসারে বিষ খাইতে হইবে। আর মবারক সাপের বিষে যখন মরেন নাই, তখন তাঁহাকে হাতীর পায়ে, কি শূলে যাইতে হইবে। যদি যে অপরাধও মার্জ্জনা হয়, তবে তিনি মহারাজের যে উপকার করিয়াছেন, তাহার জন্য বাদশাহের কাছে শূলে যাইবার যোগ্য। জানিতে পারিলে বাদশাহ তাঁহাকে শূলে দিবে। তাহা ছাড়া তিনি বিনানুমতিতে শাহজাদী বিবাহ করিয়াছেন, সে জন্যও শূলে যাইতে বাধ্য।

রাজসিংহ। আমি ইহার কিছু প্রতিকার করিতে পারি কি?

মাণিক। ঔরঙ্গজেব, কন্যা জামাতাকে মার্জ্জনা না করিলে আপনি সন্ধি করিবেন না, এই নিয়ম করিতে পারেন।

রাজসিংহ বলিলেন, “তাহা আমি করিতে স্বীকৃত হইতেছি। উহাদের জন্য আমি একখানি পৃথক পত্র বাদশাহকে লিখিতেছি। তাহাও তুমি ঐ সঙ্গে লইয়া যাও। ঔরঙ্গজেব কন্যাকে মার্জ্জনা করিতে পারেন। কিন্তু মবারককে মার্জ্জনা করিতে তিনি আপাততঃ স্বীকৃত হইলেও, তাহাকে যে তিনি নিষ্কৃতি দিবেন, এমন আমার ভরসা হয় না। যাই হউক, মবারক যদি ইহাতে সন্তুষ্ট হয়, তবে আমি ইহা করিতে প্রস্তুত আছি।”

এই বলিয়া রাজসিংহ একখানি পৃথক্ পত্র স্বহস্তে লিখিয়া মাণিকলালকে দিলেন। মাণিকলাল পত্র দুইখানি লইয়া সেই রাত্রিতে উদয়পুর চলিল।

উদয়পুরে গিয়া মাণিকলাল প্রথম নির্ম্মলকুমারীকে এই সকল সংবাদ দিলেন। নির্ম্মল সন্তুষ্ট হইল। সেও একখানি পত্র বাদশাহকে এই মর্ম্মে লিখিল–

“শাহান্‌শাহ!

বাঁদীর অসংখ্য কুর্ণিশ। হুজুর যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন, বাঁদী তাহা সম্পন্ন করিয়াছে। এক্ষণে হুজুরের সম্মতি পাইলেই হয়। আমার শেষ ভিক্ষাটা স্মরণ রাখিবেন। সন্ধি করিবেন।”

সে পত্রও নির্ম্মল মাণিকলালকে দিল। তার পর নির্ম্মল, জেব-উন্নিসাকে সকল কথা জানাইল, তিনিও তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন। এ দিকে মাণিকলাল মবারককে সকল কথা জানাইলেন। মবারক কিছু বলিল না। মাণিকলাল তাহাকে সতর্ক করিবার জন্য বলিল, “সাহেব! বাদশাহের নিকট ফিরিয়া গেলে, তিনি যে আপনাকে যথার্থ মার্জ্জনা করিবেন, এমন ভরসা আমি করি না।”

মবারক বলিল, “নাই করুন।”

পরদিন প্রাতে মাণিকলাল নির্ম্মলকুমারীর পায়রা চাহিয়া লইয়া গিয়া, পত্রগুলি কাটিয়া ছোট করিয়া তাহার পায়ে বাঁধিয়া দিল। পায়রা ছাড়িয়া দিবামাত্র সে আকাশে উঠিল। পায়ের ভরে বড় পীড়িত। তথাপি কোন মতে উড়িয়া যেখানে ঔরঙ্গজেব উর্দ্ধমুখে আকাশ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, সেইখানে বাদশাহের কাছে পত্র পৌঁছাইয়া দিল।

দশম পরিচ্ছেদ : অগ্নিনির্ব্বাণকালে উদিপুরী ভস্ম

কপোত শীঘ্রই ঔরঙ্গজেবের উত্তর লইয়া আসিল। রাজসিংহ যাহা যাহা চাহিয়াছিলেন, ঔরঙ্গজেব সকলেতেই সম্মত হইলেন।”কেবল একটা গোলযোগ করিলেন, লিখিলেন, “চঞ্চলকুমারীকে দিতে হইবে।” রাজসিংহ বলিলেন, “তদপেক্ষা আপনাকে ঐখানে সসৈন্যে কবর দেওয়া আমার মনোমত।” কাজেই ঔরঙ্গজেবকে সে বাসনা ছাড়িতে হইল। তিনি সন্ধিতে সম্মত হইয়া মুন্‌শীর দ্বারা সেই মর্ম্মে সন্ধিপত্র লেখাইয়া আপনার পাঞ্জা অঙ্কিত করিয়া, স্বহস্তে তাহাতে “মঞ্জুর” লিখিয়া দিলেন। জেব-উন্নিসা ও মবারক সম্বন্ধে একখানি পৃথক পত্রে তাঁহাদিগকে মার্জ্জনা করিতে স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু একটি সর্ত্ত এই করিলেন যে, এ বিবাহের কথা কাহারও সাক্ষাতে কখন প্রকাশ করিবে না। সেই সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিলেন যে, কন্যা যাহাতে স্বামিসন্দর্শনে বঞ্চিত না হয়েন, সে উপায়ও বাদশাহ করিবেন।

রাজসিংহ সন্ধিপত্র পাইয়া মোগল সেনা মুক্তি দিবার আজ্ঞা প্রচার করিলেন। রাজপুতেরা হাতী লাগাইয়া গাছ সকল টানিয়া বাহির করিল। মোগলেরা হঠাৎ আহার্য্য কোথায় পাইবে, এই জন্য রাজসিংহ দয়া করিয়া বহুতর হাতীর পিঠে বোঝাই দিয়া, অনেক আহার্য্য বস্তু উপঢৌকন প্রেরণ করিলেন। এবং শেষে উদিপুরী, জেব-উন্নিসা ও মবারককে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিবার জন্য উদয়পুরে আদেশ পাঠাইলেন। তখন নির্ম্মল চঞ্চলকে ইঙ্গিত করিয়া কাণে কাণে বলিল, “বেগম, তোমার দাসীপনা করিল কৈ?” এই বলিয়া নির্ম্মল উদিপুরীকে বলিল, “আমি যে নিমন্ত্রণ করিতে দিল্লী গিয়াছিলাম, সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিলেন না?”

উদিপুরী বলিল, “তোমার জিব আমি টুকরা টুকরা করিয়া কাটিব। তোমাদের সাধ্য কি যে, আমাকে দিয়া তামাকু সাজাও? তোমাদের মত ক্ষুদ্র লোকের সাধ্য কি যে, বাদশাহের বেগম আটক রাখ? কেমন, এখন ছাড়িতে হইল ত? কিন্তু যে অপমান করিয়াছ, তাহার প্রতিফল দিব। উদয়পুরে চিহ্ন মাত্র রাখিব না।”

তখন চঞ্চলকুমারী স্থিরভাবে বলিলেন, “শুনিয়াছি, মহারাণা বাদশাহকে দয়া করিয়া তোমাদের ছাড়িয়া দিয়াছেন। আপনি তাঁহার জন্য একটা মিষ্টি কথাও বলিতে জানেন না। অতএব আপনাকে ছাড়া হইবে না। আপনি বাঁদী মহলে গিয়া আমার জন্য তামাকু প্রস্তুত করিয়া আনুন।”

জেব-উন্নিসা বলিল, “সে কি মহারাণি! আপনি এত নির্দ্দয়?”

চঞ্চলকুমারী বলিল, “আপনি যাইতে পারেন—কেহ বিঘ্ন করিবে না। ইহাকে আমি এক্ষণে যাইতে দিতেছি না।”

জেব-উন্নিসা অনেক অনুনয় করিল, শেষ উদিপুরীও কিছু বিনীতভাব অবলম্বন করিল। কিন্তু চঞ্চলকুমারী বড় শক্ত। দয়া করিয়া কেবল এইটুকু বলিলেন, “আমার জন্য একবার তামাকু প্রস্তুত করুক, তবে যাইতে পারিবে।”

তখন উদিপুরী বলিল, “তামাকু প্রস্তুত করিতে আমি জানি না।”

চঞ্চলকুমারী বলিল, “বাঁদীরা দেখাইয়া দিবে।”

অগত্যা উদিপুরী স্বীকৃত হইল। বাঁদীরা দেখাইয়া দিল। উদিপুরী চঞ্চলকুমারীর জন্য তামাকু সাজিল।

তখন চঞ্চলকুমারী সেলাম করিয়া তাহাদের বিদায় করিলেন। বলিলেন, “এখানে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, সমস্তই আপনি বাদশাহকে জানাইবেন, এবং তাঁহাকে স্মরণ করিয়া দিবেন যে, আমিই তসবিরে নাথি মারিয়া নাক ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলাম। আরও বলিলেন, পুনশ্চ যদি তিনি কোন হিন্দুবালার অপমানের ইচ্ছা করেন,

তাহা হইলে আমি কেবল তসবিরে পদাঘাত করিয়া সন্তুষ্ট হইব না।”

তখন উদিপুরী নিদাঘের মেঘের মত সজলকান্তি হইয়া বিদায় লইল।

মহিষী, কন্যা ও খাদ্য পাইয়া ঔরঙ্গজেব বেত্রাহত কুক্কুরের মত বদনে লাঙ্গুল নিহিত করিয়া রাজসিংহের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ : অগ্নিকাণ্ডে তৃষিতা চাতকী

বেগমদিগকে বিদায় দিয়া চঞ্চলকুমারী আবার অন্ধকার দেখিল। মোগল ত পরাভূত হইল, বাদশাহের বেগম তাহার পরিচর্য্যা করিল, কিন্তু কৈ, রাণা ত কিছু বলেন না। চঞ্চলকুমারী কাঁদিতেছে দেখিয়া নির্ম্মল আসিয়া কাছে বসিল। মনের কথা বুঝিল। নির্ম্মল বলিল, “মহারাণাকে কেন কথাটা স্মরণ করিয়া দাও না?”

চঞ্চল বলিল, “তুমি কি ক্ষেপিয়াছ? স্ত্রীলোক হইয়া বার বার এই কথা কি বলা যায়?”

নির্ম্মল। তবে রূপনগরে, তোমার পিতাকে কেন আসিতে লেখ না?

চঞ্চল। কেন? সেই পত্রের উত্তরের পর আবার পত্র লিখিব?

নির্ম্মল। বাপের উপর রাগ অভিমান কি?

চঞ্চল। রাগ অভিমান নয়। কিন্তু একবার লিখিয়া–সে আমারি লেখা–যে অভিসম্পাত প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা মনে হইলে এখনও বুক কাঁপে, আর কি লিখিতে সাহস হয়?

নির্ম্মল। সে ত বিবাহের জন্য লিখিয়াছিলে?

চঞ্চল। এবার কিসের জন্য লিখিব?

নির্ম্মল। যদি মহারাণা কোন কথা না পাড়িলেন–তবে বোধ করি, পিত্রালয়ে গিয়া বাস করাই ভাল,–ঔরঙ্গজেব এ দিকে আর ঘেঁষিবে না। সেই জন্য পত্র লিখিতে বলিতেছিলাম। পিত্রালয় ভিন্ন আর উপায় কি?

চঞ্চল কি উত্তর করিতে যাইতেছিল। উত্তর মুখ দিয়া বাহির হইল না–চঞ্চল কাঁদিয়া ফেলিল। নির্ম্মলও কথাটা বলিয়াই অপ্রতিভ হইয়াছিল।

চঞ্চল, চক্ষুর জল মুছিয়া লজ্জায় একটু হাসিল। নির্ম্মলও হাসিল। তখন নির্ম্মল হাসিয়া বলিল, “আমি দিল্লীর বাদশাহের কাছে কখন অপ্রতিভ হই নাই–তোমার কাছে অপ্রতিভ হইলাম–ইহা দিল্লীর বাদশাহের পক্ষে বড় লজ্জার কথা। ইম্‌লি বেগমেরও কিছু লজ্জার কথা। তা, তুমি একবার ইম্‌লি বেগমের মুন্‌শীআনা দেখ। দোয়াত কলম লইয়া লিখিতে আরম্ভ কর–আমি বলিয়া যাইতেছি।”

চঞ্চল জিজ্ঞাসা করিল, “কাহাকে লিখিব–মাকে, না বাপকে?”

নির্ম্মল বলিল, “বাপকে।”

চঞ্চল পাঠ লিখিলে, নির্ম্মল বলিয়া যাইতে লাগিল, “এখন মোগল বাদশাহ মহারাণার হস্তে–”

“বাদশাহ” পর্য্যন্ত লিখিয়া চঞ্চলকুমারী বলিল, “মহারাণার হস্তে” লিখিব না–“রাজপুতের হস্তে” লিখিব। নির্ম্মলকুমারী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, “তা লেখ।” তার পর নির্ম্মলের কথন মতে চঞ্চল লিখিতে লাগিল–

“হস্তে পরাভব প্রাপ্ত হইয়া রাজপুতানা হইতে তাড়িত হইয়াছেন। এক্ষণে আর তাঁহার আমাদিগের উপর বলপ্রকাশ করিবার সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে আপনার

সন্তানের প্রতি আপনার কি আজ্ঞা? আমি আপনারই অধীন–"

পরে নির্ম্মল বলিল, "মহারাণার অধীন নই।"

চঞ্চল বলিল, "দূর হ পাপিষ্ঠা।" সে কথা লিখিল না। নির্ম্মল বলিল, "তবে লেখ, আর কাহারও অধীন নই।" অগত্য চঞ্চল তাহাই লিখিল।

এইরূপ পত্র লিখিত হইলে, নির্ম্মল বলিল, "এখন রূপনগর পাঠাইয়া দাও।" পত্র রূপনগরে প্রেরিত হইল। উত্তরে রূপনগরের রাও লিখিলেন, "আমি দুই হাজার ফৌজ লইয়া উদয়পুর যাইতেছি। ঘাট খুলিয়া রাখিতে রাণাকে বলিবে।"

এই আশ্চর্য উত্তরের অর্থ কি, তাহা চঞ্চল ও নির্ম্মল কিছুই স্থির করিতে পারিল না। পরিশেষে তাহারা বিচার স্থির করিল যে, যখন ফৌজের কথা আছে, তখন রাণাকে, অবগত করা আবশ্যক। নির্ম্মলকুমারী মাণিকলালের নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দিল।

রাণাও সেইরূপ গোলযোগে পড়িয়াছিলেন। চঞ্চলকুমারীকে ভুলেন নাই। তিনি বিক্রম সোলাঙ্কিকে পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রের মর্ম্ম, চঞ্চলকুমারীর বিবাহের কথা। বিক্রম সিংহ কন্যাকে শাপ দিয়াছিলেন, রাণা তাহা স্মরণ করাইয়া দিলেন। আর তিনি যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, তিনি যখন রাজসিংহকে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিবেন, তখন তাঁহাকে আশীর্ব্বাদের সহিত কন্যা সম্প্রদান করিবেন, তাহাও স্মরণ করাইলেন। রাণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন আপনার কিরূপ অভিপ্রায়?"

এই উত্তরে বিক্রম সিংহ লিখিলেন, "আমি দুই হাজার অশ্বারোহী লইয়া আপনার নিকট যাইতেছি। ঘাট ছাড়িয়া দিবেন।"

রাজসিংহ, চঞ্চলকুমারীর মত, সমস্যা বুঝিতে পারিলেন না। ভাবিলেন, "দুই হাজার মাত্র অশ্বারোহী লইয়া বিক্রম আমার কি করিবে? আমি সতর্ক আছি।" অতএব তিনি বিক্রমকে ঘাট ছাড়িয়া দিবার আদেশ প্রচার করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : অগ্নি পুনর্জ্বালিত

উদয়সাগরের তীরে ফিরিয়া আসিয়া, ঔরঙ্গজেব তথায় শিবির স্থাপন ও রাত্রি যাপন করিলেন। সৈনিক ও বাহনগণ খাইয়া বাঁচিল। তখন সিপাহী মহালে গান, গল্প এবং নানাবিধ রসিকতা আরম্ভ হইল। একজন মোগল বলিল, "হিন্দুর রাজ্যে আসিয়াছি বলিয়া আমরা একাদশীর উপবাস করিয়াছিলাম।" শুনিয়া একজন মোগলানী বলিল, "বাঁচিয়া, আছ, তবু ভাল। আমরা মনে করিয়াছিলাম, তোমরা নাই–তাই আমরাও একাদশী করিয়াছিলাম।" একজন গায়িকা কতকগুলি সৌখীন মোগলদিগের সম্মুখে গীত করিতেছিল; গায়িতে গায়িতে তাহার তাল কাটিয়া গেল। একজন শ্রোতা জিজ্ঞাসা করিল, "বিবিজান! এ কি হইল? তাল কাটিল যে?" গায়িকা বলিল, "আপনাদের যে বীরপনা দেখিলাম, তাহাতে আর হিন্দুস্থানে থাকিতে সাহস হয় না। উড়িষ্যায় যাইব মনে করিয়াছি–তাই তাল কাটিতে শিখিতেছি।" কেহ বা উদিপুরীর হরণবৃত্তান্ত লইয়া দুঃখ করিতে লাগিল–কোন খয়েরখাঁ হিন্দুসৈনিক রাবণকৃত সীতাহরণের সহিত তাহার তুলনা করিল– কেহ তাহার উত্তরে বলিল, "বাদশাহ এত বানর সঙ্গে আনিয়াছিল, তবু এ সীতার উদ্ধার হইল না কেন?" কেহ বলিল, "আমরা সিপাহী–কাঠুরিয়া নহি, গাছ কাটা বিদ্যা আমাদের নাই, তাই হারিলাম।" কেহ উত্তরে বলিল, "তোমাদের ধানটাকা পর্য্যন্ত বিদ্যা, তা গাছ কাটিবে কি?" এইরূপ রঙ্গ রহস্য চলিতে লাগিল।

এ দিকে বাদশাহ শিবিরের রঙ্‌মহালে প্রবেশ করিলে জেব-উন্নিসা তাঁহার নিকট যুক্তকরে দাঁড়াইল। বাদশাহ জেব-উন্নিসাকে বলিলেন, "তুমি যাহা করিয়াছ,

তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক কর নাই, বুঝিতে পারিতেছি। এজন্য তোমাকে মার্জ্জনা করিলাম। কিন্তু সাবধান! বিবাহের কথা প্রকাশ না পায়।”

তারপর উদিপুরী বেগমের সঙ্গে বাদশাহ সাক্ষাৎ করিলেন। উদিপুরী তাঁহার অপমানের কথা আদ্যোপান্ত সমস্ত বলিল। দশটা বাড়াইয়া বলিল, ইহা বলা বাহুল্য। ঔরঙ্গজেব শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও বিমর্ষ হইলেন।

পরদিন দরবারে বসিয়া, আমদরবার খুলিবার আগে, নিভৃতে মবারককে ডাকিয়া বাদশাহ বলিলেন, “এক্ষণে তোমার সকল অপরাধ আমি মার্জ্জনা করিলাম। কেন না, তুমি আমার জামাতা। আমার জামাতাকে নীচ পদে নিযুক্ত রাখিতে পারি না। অতএব তোমাকে দুই হাজারের মন্‌সবদার করিলাম। পরওয়ানা আজি বাহির হইবে। কিন্তু এক্ষণে তোমার এখানে থাকা হইতে পারিতেছে না। কারণ, শাহজাদা আকব্বর, পর্ব্বত মধ্যে আমার ন্যায় জালে পড়িয়াছেন। তাঁহার উদ্ধারের জন্য দিলীর খাঁ সেনা লইয়া অগ্রসর হইতেছেন। সেখানে তোমার ন্যায় যোদ্ধার সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন। তুমি অদ্যই যাত্রা কর।”

মবারক এ সকল কথায় আহ্লাদিত হইলেন না; কেন না, জানিতেন, ঔরঙ্গজেবের আদর শুভকর নহে। কিন্তু মনে যাহা স্থির করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়া দুঃখিতও হইলেন না। অতি বিনীত ভাবে বাদশাহের নিকট বিদায় লইয়া দিলীর খাঁর শিবিরে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

তার পর ঔরঙ্গজেব একজন বিশ্বাসী দূতের দ্বারা দিলীর খাঁর নিকট এক লিপি প্রেরণ করিলেন। পত্রের মর্ম্ম এই যে, মবারক খাঁকে দুইহাজারি মন্‌সবদার করিয়া তোমার নিকট পাঠাইয়াছি। সে যেন একদিনও জীবিত না থাকে। যুদ্ধে মরে ভালই—নহিলে অন্য প্রকারে যেন মরে। দিলীর মবারককে চিনিতেন না। বাদশাহের আজ্ঞা অবশ্য পালনীয় বলিয়া স্থির করিলেন।

তার পর ঔরঙ্গজেব আমদরবারে বসিয়া আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, “আমরা কাঠুরিয়ার ফাঁদে পড়িয়াই সন্ধিস্থাপন করিয়াছি। সে সন্ধি রক্ষণীয় নহে। ক্ষুদ্র একজন ভুঁইঞা রাজার সঙ্গে বাদশাহের আবার সন্ধি কি? আমি সন্ধিপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি। বিশেষ, সে রূপনগরের কুঙারীকে ফেরৎ পাঠায় নাই। রূপনগরীকে তাহার পিতা আমাকে দিয়াছে। অতএব রাজসিংহের তাহাতে অধিকার নাই। তাহাকে ফিরাইয়া না দিলে, আমি রাজসিংহকে ক্ষমা করিতে পারি না। অতএব যুদ্ধ যেমন চলিতেছিল, তেমনই চলিবে। রাণার রাজ্যমধ্যে গোরু দেখিলে, মুসলমান তাহা মারিয়া ফেলিবে। দেবালয় দেখিলেই তাহা ভগ্ন করিবে। জেজেয়া সর্ব্বত্রই আদায় হইবে।”

এই সকল হুকুম জারি হইল। এদিকে দিলীর খাঁ দাইসুরীর পথ দিয়া মাড়বার হইতে উদয়পুরে প্রবেশের চেষ্টায় আসিতেছেন শুনিয়া রাজসিংহ, ঔরঙ্গজেবের কাছে লোক পাঠাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সন্ধির পর আবার যুদ্ধ কেন? ঔরঙ্গজেব বলিলেন, “ভুঁইঞার সঙ্গে বাদশাহের সন্ধি? বাদশাহের রূপনগরী বেগম ফেরৎ না পাঠাইলে বাদশাহ তোমাকে ক্ষমা করিবেন না।” শুনিয়া, রাজসিংহ হাসিয়া বলিলেন, “আমি এখনও জীবিত আছি।” রূপনগরের রাজকুমারীর অপহরণটা ঔরঙ্গজেবের শেল সমান বিঁধিতেছিল। তিনি রাজসিংহের নিকট অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই বিবেচনা করিয়া, রূপনগরের “রাও সাহেবকে” এক পর্‌ওয়ানা দিলেন, তাহাতে লিখিলেন, “তোমার কন্যা এখনও আমার নিকট উপস্থিত হয় নাই। শীঘ্র তাহাকে উপস্থিত করিবে—নহিলে রূপনগরের গড়ের চিহ্ন রাখিব না।” ঔরঙ্গজেবের ভরসা যে, পিতা জিদ্ করিলে চঞ্চলকুমারী তাঁহার নিকটে আসিতে সম্মত হইতে পারে। পরওয়ানা পাইয়া বিক্রমসিংহ উত্তর লিখিল, “আমি শীঘ্র দুই হাজার অশ্বারোহী সেনা লইয়া আপনার হুজুরে হাজির হইব।”

ঔরঙ্গজেব ভাবিলেন, “সেনা কেন?” মনকে এইরূপ বুঝাইলেন যে, তাঁহার সাহায্যার্থ বিক্রমসিংহ সেনা লইয়া আসিতেছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : মবারকের দাহনারম্ভ

সৌন্দর্য্যের কি মহিমা! মবারক জেব-উন্নিসাকে দেখিয়া আবার সব ভুলিয়া গেল। গর্ব্বিতা, স্নেহাভাবদর্পে প্রফুল্লা জেব-উন্নিসাকে দেখিলে আর তেমন হইত কি না, বলা যায় না, কিন্তু সেই জেব-উন্নিসা এখন বিনীতা, দর্পশূন্য, স্নেহশালিনী, অশ্রুময়ী। মবারকের পূর্ব্বানুরাগ সম্পূর্ণরূপে ফিরিয়া আসিল। দরিয়া, দরিয়ায় ভাসিয়া গেল। মনুষ্য স্ত্রীজাতির প্রেমে অন্ধ হইলে, আর তাহার হিতাহিত ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান থাকে না। তাহার মত বিশ্বাসঘাতক, পাপিষ্ঠ আর নাই।

সহস্র দীপের রশ্মিপ্রতিবিম্বসমন্বিত, উদয়সাগরের অন্ধকার জলের চতুঃপার্শ্বে পর্ব্বতমালা নিরীক্ষণ করিতে করিতে, পটমণ্ডপের দুর্গমধ্যে ইন্দ্রভুবন তুল্য কক্ষে বসিয়া মবারক জেব-উন্নিসার হাত, আপন হাতের ভিতর তুলিয়া লইল। মবারক বড় দুঃখের সহিত বলিল, "তোমাকে আবার পাইয়াছি, কিন্তু দুঃখ এই যে, এই সুখ দশ দিন ভোগ করিতে পারিলাম না।"

জেব-উন্নিসা। কেন? কে বাধা দিবে? বাদশাহ?

মবারক। সে সন্দেহও আছে। কিন্তু বাদশাহের কথা এখন বলিতেছি না। আমি কাল যুদ্ধে যাইব। যুদ্ধে মরণ জীবন দুই আছে। কিন্তু আমার পক্ষে মরণ নিশ্চয়। আমি রাজপুতদিগের যুদ্ধের যে সুবন্দোবস্ত দেখিয়াছি, তাহাতে আমি নিশ্চিত জানি যে, পার্ব্বত্য যুদ্ধে আমরা তাহাদিগকে পরাভব করিতে পারিব না। আমি একবার হারিয়া আসিয়াছি, আর একবার হারিয়া আসিতে পারিব না। আমাকে যুদ্ধে মরিতে হইবে।

জেব-উন্নিসা সজল নয়নে বলিল, "ঈশ্বর অবশ্য করিবেন যে, তুমি যুদ্ধে জয়ী হইয়া আসিবে। তুমি আমার কাছে না আসিলে আমি মরিব।"

উভয়ে চক্ষুর জল ফেলিল। তখন মবারক ভাবিল, "মরিব, না মরিব না?" অনেক ভাবিল। সম্মুখে সেই নক্ষত্রখচিতগগনস্পর্শী পর্ব্বতমালাপরিবেষ্টিত অন্ধকার উদয়সাগরের জল—তাহাতে দীপমালাপ্রভাসিত পট-নির্ম্মিতা মহানগরীর মনোমোহিনী ছায়া—দূরে পর্ব্বতের চূড়ার উপর চূড়া—তার উপর চূড়া—বড় অন্ধকার। দুই জনে বড় অন্ধকারই দেখিল।

সহসা জেব-উন্নিসা বলিল, "এই অন্ধকারে, শিবিরের প্রাচীরের তলায়, কে লুকাইল? তোমার জন্য আমার মন সর্ব্বদা সশঙ্কিত।

"দেখিয়া আসি," বলিয়া মবারক ছুটিয়া দুর্গপ্রাকারতলে গেলেন। দেখিলেন, একজন যথার্থই লুকাইয়া শুইয়া আছে বটে। মবারক তাহাকে ধৃত করিলেন। হাত ধরিয়া তুলিলেন। যে লুকাইয়াছিল, সে দাঁড়াইয়া উঠিল। অন্ধকারে মবারক কিছু ঠাওর পাইলেন না। তাহাকে টানিয়া দুর্গমধ্যে দীপালোকের নিকট আনিলেন। দেখিলেন যে, একটা স্ত্রীলোক। সে মুখে কাপড় দিয়া মুখ ঢাকিয়া রহিল—মুখ খুলিল না। মবারক তাহাকে একজন প্রতিহারীর জিম্মায় রাখিয়া, স্বয়ং জেব-উন্নিসার নিকট গিয়া সবিস্তার নিবেদন করিলেন। জেব-উন্নিসা কৌতূহলবশতঃ তাহাকে কক্ষমধ্যে আনিতে অনুমতি দিলেন। মবারক তাহাকে কক্ষমধ্যে লইয়া আসিলেন।

জেব-উন্নিসা বলিল, "তুমি কে? কেন লুকাইয়াছিলে? মুখের কাপড় খোল।"

সে স্ত্রীলোক তখন মুখের কাপড় খুলিল। দুই জনে সবিস্ময়ে দেখিল—দরিয়া বিবি!

বড় সুখের সময়ে, সহসা বিনা মেঘে সম্মুখে বজ্রপতন দেখিলে, যেমন বিহ্বল হইতে হয়, জেব-উন্নিসা ও মবারক সেইরূপ হইল। তিনি জনের কেহ কোন কথা কহিল না।

অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মবারক বলিল, "ইয়া আল্লা! আমাকে মরিতেই হইবে।"

জেব-উন্নিসা তখন অতি কাতরকণ্ঠে বলিল, "তবে আমাকেও।"

দরিয়া বলিল,"তোমরা কে?"

মবারক তাহাকে বলিল, “আমার সঙ্গে আইস।”

তখন মবারক অতি দীনভাবে জেব-উন্নিসার নিকট বিদায় লইল।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ : অগ্নির নূতন স্ফুলিঙ্গ

রাজসিংহ রাজনীতিতে ও যুদ্ধনীতিতে অদ্বিতীয় পণ্ডিত। মোগল যতক্ষণ না সমস্ত সৈন্য লইয়া রাণার রাজ্য ছাড়িয়া অধিক দূর যায়, ততক্ষণ শিবির ভঙ্গ করেন নাই বা স্বীয় সেনার কোন অংশ স্থানবিচ্যুত করেন নাই। তিনি শিবিরেই রহিয়াছেন, এমন সময়ে সংবাদ আসিল যে, বিক্রমসিংহ রূপনগর হইতে দুই সহস্র সেনা লইয়া আসিতেছেন। রাজসিংহ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

একজন অশ্বারোহী অগ্রবর্ত্তী হইয়া আসিয়া দূতস্বরূপ, রাজসিংহের দর্শন পাইবার কামনা জানাইল। রাজসিংহের অনুমতি পাইয়া প্রতিহারী তাহাকে লইয়া আসিল। সে রাজসিংহেক প্রণাম করিয়া জানাইল যে, রূপনগরাধিপতি বিক্রম সোলাঙ্কি মহারাণার দর্শন মানসে সসৈন্যে আসিয়াছেন।

রাজসিংহ বলিলেন, “যদি শিবিরের ভিতরে আসিয়া সাক্ষাৎ করিতে চাহেন, তবে একা আসিতে বলিবে। যদি সসৈন্যে সাক্ষাৎ করিতে চাহেন, তবে শিবিরের বাহিরে থাকিতে বলিবে। আমি সসৈন্যে যাইতেছি।”

বিক্রম সোলাঙ্কি একা শিবিরমধ্যে আসিয়া সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলেন। তিনি আসিলে রাজসিংহ তাঁহাকে সাদরে আসন প্রদান করিলেন। বিক্রমসিংহ, রাণাকে কিছু নজর দিলেন। উদয়পুরের রাণা রাজপুতকুলের প্রধান,–এ জন্য এ নজর প্রাপ্য। কিন্তু রাজসিংহ ঐ নজর না গ্রহন করিয়া বলিলেন, “আপনার কাছে এ নজর, মোগল বাদশাহেরেই প্রাপ্য।”

বিক্রমসিংহ বলিলেন, “মহারাণা রাজসিংহ জীবিত থাকিতে, ভরসা করি, আর কোন রাজপুত মোগল বাদশাহকে নজর দিবে না। মহারাজ! আমাকে মার্জ্জনা করিতে হইবে। আমি না জানিয়াই তেমন পত্রখানা লিখিয়াছিলাম। আপনি মোগলকে যেরূপ শাসিত করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, সমস্ত রাজপুত মিলিত হইয়া আপনার অধীনে কার্য্য করিলে মোগল সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ হইবে। আমার পত্রের শেষ ভাগ স্মরণ করিবেন। আমি আপনাকে কেবল নজর দিতে আসি নাই। আমি আরও দুইটি সামগ্রী আপনাকে দিতে আসিয়াছি। এক আমার এই দুই সহস্র অশ্বারোহী; দ্বিতীয় আমার নিজের এই তরবারি;–আজিও এ বাহুতে কিছু বল আছে; আমাকে যে কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন, শরীর পতন করিয়াও সে কার্য্য সম্পন্ন করিব।”

রাজসিংহ অত্যন্ত প্রফুল্ল হইলেন। আপনার আন্তরিক আনন্দ বিক্রমসিংহকে জানাইলেন। বলিলেন, “আজ আপনি সোলাঙ্কির মত কথা বলিয়াছেন। দুষ্ট মোগল, আমার হাতে নিপাত যাইতেছিল, সন্ধি করিয়া উদ্ধার পাইল। উদ্ধার পাইয়া বলে, সন্ধি করি নাই। আবার যুদ্ধ করিতেছে। দিলীর খাঁ সৈন্য লইয়া শাহজাদা আকব্বরের উদ্ধারের জন্য যাইতেছে। আপনি অতি সুসময়ে আসিয়াছেন। দিলীর খাঁকে পথিমধ্যে নিকাশ করিতে হইবে– সে গিয়া আকব্বরের সঙ্গে যুক্ত হইলে কুমার জয়সিংহের বিপদ্ ঘটিবে। তজ্জন্য আমি গোপীনাথ রাঠোরকে পাঠাইতেছিলাম। কিন্তু তাঁহার সেনা অতি অল্প। আমার নিজ সেনা হইতে কিছু তাঁহার সঙ্গে দিব–মাণিকলাল সিংহ নামে আমার একজন সুদক্ষ সেনাপতি আছে–সে তাহা লইয়া যাইবে। কিন্তু ঔরঙ্গজেব নিকটে, আমি নিজে এ স্থান ছাড়িয়া যাইতে পারিতেছি না, অথবা অধিক সৈন্য মাণিকলালের সঙ্গে দিতে পারিতেছি না। আমার ইচ্ছা, আপনিও আপনার অশ্বারোহী সেনা লইয়া সেই যুদ্ধে যান। আপনারা তিন জনে মিলিত হইয়া দিলীর খাঁকে পথিমধ্যে সসৈন্যে সংহার করুন।”

বিক্রমসিংহ আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, “আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।”

এই বলিয়া বিক্রম সোলাঙ্কি যুদ্ধে যাইবার উদ্যোগার্থে বিদায় হইলেন। চঞ্চলকুমারীর কথা কিছু হইল না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ : মবারক ও দরিয়া ভস্মীভূত

গোপীনাথ রাঠোর, বিক্রম সোলাঙ্কি, এবং মাণিকলাল দিলীর খাঁর ধ্বংসাকাঙ্ক্ষায় চলিলেন। যে পথে দিলীর খাঁ আসিতেছেন, সেই পথে তিন স্থানে তিন জন লুক্কায়িত রহিলেন। কিন্তু পরস্পরের অনতিদূরেই রহিলেন। বিক্রম সোলাঙ্কি অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া আসিয়াছিলেন, কাজেই তিনি উচ্চ সানুদেশে থাকিতে পারিলেন না। তিনি পর্ব্বতবাসী হইলেও তাঁহাকে অশ্ব রাখিতে হইত; তাহার কারণ, তদ্ব্যতীত নিম্নভূমিনিবাসী শত্রু ও দস্যুর পশ্চাদ্ধাবিত হইতে পরিতেন না। আর এমন সকল ক্ষুদ্র রাজগণ, রাত্রিকালে সুযোগ পাইলে, নিজে নিজেও এক আধটা ডাকাতি–অর্থাৎ এক রাত্রিতে দশ পাঁচখানা গ্রাম লুণ্ঠন না করিতেন, এমন নহে। পর্ব্বতের উপর তাঁহার সৈনিকেরা অশ্ব ছাড়িয়া পদাতিকের কাজ করিত। এক্ষণে মোগলের পশ্চাদনুসরণ করিতে হইবে বলিয়া, বিক্রমসিংহ অশ্ব লইয়া আসিয়াছিলেন। পার্ব্বত্য যুদ্ধে তাহাতে অসুবিধা হইল। অতএব তিনি পর্ব্বতে না উঠিয়া অপেক্ষাকৃত সমতলভূমির অন্বেষণ করিলেন। মনোমত সেরূপ কিছু ভূমি পাইলেন। তাহার সম্মুখে কিছু বনজঙ্গল আছে। জঙ্গলের পশ্চাৎ তাঁহার অশ্বারোহীগণকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। তিনি সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী হইয়া রহিলেন। তৎপরে মাণিকলাল রাজসিংহর পদাতিকগণ লইয়া লুক্কায়িত হইল। সর্ব্বশেষে গোপীনাথ রাঠোর রহিলেন।

দিলীর খাঁ আকব্বরের দুর্দ্দশা স্মরণ করিয়া, একটু সতর্কভাবে আসিতেছিল–অগ্রে অগ্রে অশ্বারোহী পাঠাইয়া সন্ধান লইতেছিলেন যে, রাজপুত কোথাও লুকাইয়া আছে কি না। অতএব বিক্রম সোলাঙ্কির অশ্বারোহিগণের সন্ধান, তাঁহাকে সহজে মিলিল। তিনি তখন কতকগুলি সৈন্য, অশ্বারোহীদিগকে তাড়াইয়া দিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। বিক্রম সোলাঙ্কি অন্যান্য বিষয়ে বড় স্থূলবুদ্ধি, কিন্তু যুদ্ধকালে অতিশয় ধূর্ত্ত এবং রণপণ্ডিত–অনেক সময়ে ধূর্ত্ততাই রণপাণ্ডিত্য–তিনি মোগল সেনার সঙ্গে অতি সামান্য যুদ্ধ করিয়া সরিয়া পড়িলেন–দিলীর খাঁর মুণ্ডপাত করিবার জন্য।

দিলীর মাণিকলালকে অতিক্রম করিয়া চলিলেন, মাণিকলাল যে পার্শ্বে লুক্কায়িত আছে, তাহা তিনিও জানিতে পারিলেন না–মাণিকলালও কোন সাড়াশব্দ করিল না। সোলাঙ্কিকে তাড়াইয়া দিলীর বিবেচনা করিয়াছিলেন, সব রাজপুতই হঠিয়াছে–অতএব আর পূর্ব্ববৎ অবধানের সহিত চলিতেছিলেন না। মাণিকলাল বুঝিল, এ উপযুক্ত সময় নহে–সেও স্থির রহিল।

পরে, যথায় গোপীনাথ রাঠোর লুক্কায়িত, তাহারই নিকট দিলীর উপস্থিত। সেখানে পর্ব্বতমধ্যস্থ পথ অতি সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। সেইখানে সেনার মুখ উপস্থিত হইলে, গোপীনাথ রাঠোর লাফ দিয়া তাহার উপর পড়িয়া, বাঘ যেমন পথিকের সম্মুখে থাবা পাতিয়া বসে, সেইরূপ সসৈন্যে বসিলেন।

দিলীর, মবারককে আজ্ঞা করিলেন, “সম্মুখবর্ত্তী সেনা লইয়া ইহাদিগকে তাড়াইয়া দাও।” মবারক অগ্রসর হইলেন। কিন্তু গোপীনাথ রাঠোরকে তাড়াইবার তার সাধ্য কি? সঙ্কীর্ণ পথে অল্প মোগলই দাঁড়াইতে পারিল। যেমন গর্ত্ত হইতে পিপীলিকা বাহির হইবার সময়ে, বালকে একটি একটি করিয়া টিপিয়া মারে, তেমনই রাজপুতেরা মোগলদিগকে সঙ্কীর্ণ পথে টিপিয়া মারিতে লাগিল। এ দিকে দিলীর, সম্মুখে পথ না পাইয়া, সেনা লইয়া নিশ্চল হইয়া মধ্যপথে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মাণিকলাল বুঝিল, এই উপযুক্ত সময়। সে সসৈন্যে পর্ব্বতাবতরণ করিয়া বজ্রের ন্যায় দিলীরের উপর পড়িল। দিলীর খাঁর সেনা প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধ করিতে

লাগিল। কিন্তু এই সময়ে বিক্রম সোলাঙ্কি সেই দুই হাজার অশ্বারোহী লইয়া হঠাৎ দিলীরের সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগে উপস্থিত হইলেন। তখন তিন দিকে আক্রান্ত হইয়া মোগল সেনা আর এক দণ্ড তিষ্ঠিল না। যে পারিল, সে পলাইয়া বাঁচিল। অধিকাংশই পলাইবার পথ পাইল না–কৃষকের অস্ত্রের নিকট ধান্যের ন্যায় ছিন্ন হইয়া রণক্ষেত্রে নিপতিত হইল।

কেবল গোপীনাথ রাঠোরের সম্মুখে, কয়জন মোগল যোদ্ধা কিছুতেই হঠিল না–মৃত্যুকে তৃণজ্ঞান করিয়া যুদ্ধ করিতেছিল। তাহারা মোগলসেনার সার–বাছা বাছা লোক। মবারক তাহাদের নেতা। কিন্তু তাহারাও আর টিকে না। পলকে পলকে এক একজন বহুসংখ্যক রাজপুতের আক্রমণে নিপাত যাইতেছিল। শেষ দুই চারি জন মাত্র অবশিষ্ট ছিল।

দূর হইতে ইহা দেখিতে পাইয়া মাণিকলাল সেখানে শীঘ্র উপস্থিত হইলেন। রাজপুতদিগকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, “ইহাদিগকে মারিও না। ইহারা বীরপুরুষ। ইহাদিগকে ছাড়িয়া দাও।”

রাজপুতেরা মুহূর্ত্ত জন্য নিরস্ত হইল। তখন মাণিকলাল বলিল, “তোমরা চলিয়া যাও। তোমাদের ছাড়িয়া দিলাম। আমার অনুরোধে তোমাদের কেহ কিছু বলিবে না।”

একজন মোগল বলিল, “আমরা যুদ্ধে কখন পিছন ফিরি নাই। আজও ফিরিব না।” সেই কয়জন মোগল আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তখন মাণিকলাল মবারককে ডাকিয়া বলিলেন, “খাঁ সাহেব! আর যুদ্ধ করিয়া কি করিবে?”

মবারক বলিল, “মরিব।”

মাণিক। কেন মরিবে?

মবা। আপনি কি জানেন না যে, মৃত্যু ভিন্ন আমার অন্য গতি নাই?

মাণিক। তবে বিবাহ করিলেন কেন?

মবা। মরিবার জন্য।

এই সময়ে একটা বন্দুকের শব্দ পর্ব্বতে পর্ব্বতে প্রতিধ্বনিত হইল প্রতিধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিতে না করিতে মবারক মস্তকে বিদ্ধ হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন। মাণিকলাল দেখিলেন, মবারক জীবনশূন্য। মাথায় গুলি বিঁধিয়াছে। মাণিকলাল চাহিয়া দেখিলেন, পর্ব্বতের সানুদেশে একজন স্ত্রীলোক বন্দুক হাতে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার বন্দুকের মুখনিঃসৃত ধূম দেখা গেল। বলা বাহুল্য, সে উন্মাদিনী দরিয়া!

মাণিকলাল স্ত্রীলোককে ধরিতে আজ্ঞা দিলেন। সে হাসিতে হাসিতে পলাইয়া গেল। সেই অবধি দরিয়া বিবিকে পৃথিবীতে আর কেহ কখন দেখে নাই।

যুদ্ধের পর জেব-উন্নিসা শুনিল, মবারক যুদ্ধে মরিয়াছে। তখন সে বেশভূষা দূরে নিক্ষেপ করিল, উদয়সাগরের প্রস্তরকঠিন ভূমির উপর পড়িয়া কাঁদিল–

বসুধালিঙ্গনধূসরস্তনী
বিললাপ বিকীর্ণমূর্দ্ধজা।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ : পূর্ণাহুতি–ইষ্টলাভ

যুদ্ধান্তে জয়শ্রী বহন করিয়া বিক্রম সোলাঙ্কি রাজসিংহের শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন। রাজসিংহ তাঁহাকে সাদরে আলিঙ্গন করিলেন। বিক্রম সোলাঙ্কি বলিলেন, "একটা কথা বাকি আছে। আমার সেই কন্যাটা। কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিয়া আপনাকে সেই কন্যা সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। গ্রহণ করিবেন কি?"

রাজসিংহ বলিলেন, "তবে উদয়পুরে চলুন।"

বিক্রম সোলাঙ্কি সেই দুই সহস্র ফৌজ লইয়া উদয়পুরে গেলেন।

বলা বাহুল, সেই রাত্রেই রাজসিংহ চঞ্চলকুমারীর পাণিগ্রহণ করিলেন। তার পর যা ঘটিল, তাহাতে ইতিহাসবেত্তারই অধিকার, উপন্যাসলেখকের সে সব কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। আবার স্বয়ং ঔরঙ্গজেব রাজসিংহের সর্ব্বনাশ করিতে প্রস্তুত হইলেন। আজিম আসিয়া ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল। রাজসিংহ বিখ্যাত মাড়বারী দুর্গাদাসের সঙ্গে মিলিত হইয়া, ঔরঙ্গজেবকে আক্রমণ করিলেন। ঔরঙ্গজেব পুনশ্চ পরাজিত ও অপমানিত হইয়া, বেত্রাহত কুক্কুরের ন্যায় পলায়ন করিলেন। রাজপুতেরা তাঁহার সর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইল। ঔরঙ্গজেবের বিস্তর সেনা মরিল।

ঔরঙ্গজেব ও আজিম ভয়ে পলাইয়া রাণাদিগের পরিত্যক্ত রাজধানী চিতোরে গিয়া আশ্রয় লইলেন। কিন্তু সেখানেও রক্ষা নাই। সুবলদাস নামা একজন রাজপুত সেনাপতি পশ্চাতে গিয়া চিতোর ও আজমীরের মধ্যে সেনা স্থাপন করিলেন। আবার আহার বন্ধের ভয়। অতএব খাঁ রহিলাকে বার হাজার ফৌজের সহিত সুবলদাসের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পাঠাইয়া দিয়া ঔরঙ্গজেব স্বয়ং আজমীরে পলায়ন করিলেন। আর কখনও উদয়পুরমুখো হইলেন না। সে সাধ তাঁহার জন্মের মত ফুরাইল।

এ দিকে সুবলদাস, খাঁ রহিলাকে উত্তম মধ্যম দিয়া দূরীকৃত করিলেন। পরাভূত হইয়া খাঁ রহিলাও আজমীরে প্রস্থান করিলেন। দিগন্তরে রাজসিংহের দ্বিতীয় পুত্র, কুমার ভীমসিংহ গুজরাট অঞ্চলে মোগলের অধিকার প্রবেশ করিয়া সমস্ত নগর, গ্রাম, এমনকি, মোগল সুবাদারের রাজধানীও লুঠপাট করিলেন। অনেক স্থান অধিকার করিয়া সৌরাষ্ট্র পর্য্যন্ত রাজসিংহের অধিকার স্থাপন করিতেছিলেন, কিন্তু পীড়িত প্রজারা আসিয়া রাজসিংহকে জানাইল। করুণহৃদয় রাজসিংহ তাহাদিগের দুঃখে দুঃখিত হইয়া ভীমসিংহকে ফিরাইয়া আনিলেন। দয়ার অনুরোধে হিন্দুসাম্রাজ্য পুনঃস্থাপিত করিলেন না।

কিন্তু রাজমন্ত্রী দয়াল সাহ সে প্রকৃতির লোক নহেন। তিনিও যুদ্ধে প্রবৃত্ত। মালবে মুসলমানের সর্ব্বনাশ করিতে লাগিলেন। ঔরঙ্গজেব হিন্দুধর্ম্মের উপর অনেক অত্যাচার করিয়াছিল। প্রতিশোধের স্বরূপে ইনি কাজিদিগের মস্তক মুণ্ডন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে লাগিলেন। কোরাণ দেখিলেই কুয়ায় ফেলিয়া দিতে লাগিলেন।

দয়াল সাহ, কুমার জয়সিংহের সৈন্যের সঙ্গে আপনার সৈন্য মিলাইলে, তাঁহারা শাহজাদা আজিমকে পাকড়া করিয়া চিতোরের নিকট যুদ্ধ করিলেন। আজিমও হতসৈন্য ও পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন।

চারি বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ হইল পদে পদে মোগলেরা পরাজিত হইল। শেষে ঔরঙ্গজেব সত্য সত্যই সন্ধি করিলেন। রাণা যাহা যাহা চাহিয়াছিলেন, ঔরঙ্গজেব সবই স্বীকার করিলেন। আরও কিছু বেশীও স্বীকার করিতে হইল। মোগল এমন শিক্ষা আর কখনও পায় নাই।

উপসংহার

গ্রন্থকারের নিবেদন

গ্রন্থকারের বিনীত নিবেদন এই যে, কোন পাঠক না মনে করেন যে, হিন্দু মুসলমানের কোন প্রকার তারতম্য নির্দ্দেশ করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। হিন্দু হইলেই ভাল হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না, অথবা হিন্দু হইলেই মন্দ হয় না, মুসলমান হইলেই ভাল হয় না। ভাল মন্দ উভয়ের মধ্যে তুল্যরূপেই আছে। বরং ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, যখন মুসলমান এক শতাব্দী ভারতবর্ষের প্রভু ছিল, তখন রাজকীয় গুণে মুসলমান সমসাময়িক হিন্দুদিগের অপেক্ষা অবশ্য শ্রেষ্ঠ ছিল। কিন্তু ইহাও সত্য নহে যে, সকল মুসলমান রাজা সকল হিন্দু রাজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অনেক স্থলে মুসলমানই হিন্দু অপেক্ষা রাজকীয় গুণে শ্রেষ্ঠ। অনেক স্থলে হিন্দু রাজা মুসলমান অপেক্ষা রাজকীয় গুণে শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণের সহিত যাহার ধর্ম্ম আছে–হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক, সেই শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণ থাকিতেও যাহার ধর্ম্ম নাই–হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক–সেই নিকৃষ্ট। ঔরঙ্গজেব ধর্ম্মশূন্য, তাই তাঁহার সময় হইতে মোগলসাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হইল। রাজসিংহ ধার্ম্মিক, এজন্য তিনি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি হইয়া মোগল বাদশাহকে অপমানিত এবং পরাস্ত করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য। রাজা যেরূপ হয়েন, রাজানুচর এবং রাজপৌরজন প্রভৃতিও সেইরূপ হয়। উদিপুরী ও চঞ্চলকুমারী তুলনায়, জেব-উন্নিসা ও নির্ম্মলকুমারীর তুলনায়, মাণিকলাল ও মবারকের তুলনায় ইহা জানিতে পারা যায়। এই জন্য এ সকল কল্পনা।

ঔরঙ্গজেবের উত্তম ঐতিহাসিক তুলনার স্থল স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপ। উভয়েই প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের অধিপতি; উভয়েই ঐশ্বর্য্যে, সেনাবলে, গৌরবে আর সকল রাজগণের অপেক্ষা অনেক উচ্চ। উভয়েই শ্রমশীলতা, সতর্কতা প্রভৃতি রাজকীয় গুণে বিভূষিত ছিলেন। কিন্তু উভয়েই নিষ্ঠুর, কপটাচারী, ক্রুর, দাম্ভিক, আত্মমাত্রহিতৈষী এবং প্রজাপীড়ক। এজন্য উভয়েই আপন আপন সাম্রাজ্য-ধ্বংসের বীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন। উভয়েই ক্ষুদ্র শত্রু দ্বারা পরাজিত ও অপমানিত হইয়াছিলেন–ফিলিপ ইংরেজ (তখন ক্ষুদ্রজাতি) ও ওলন্দাজের দ্বারা, ঔরঙ্গজেব মারহাট্টা ও রাজপুতের দ্বারা। মারহাট্টা শিবজী ও ইংলণ্ডের তৎকালিন নেত্রী এলিজাবেথ পরস্পর তুলনীয়। কিন্তু তদপেক্ষা ওলন্দাজ উইলিয়ম ও রাজপুত রাজসিংহ বিশেষ প্রকারে তুলনীয়। উভয়ের কীর্ত্তি ইতিহাসে অতুল। উইলিয়ম ইউরোপে, দেশহিতৈষী ধর্ম্মাত্মা বীরপুরুষের অগ্রগণ্য বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন–এ দেশে ইতিহাস নাই, কাজেই রাজসিংহকে কেহ চেনে না।

সীতারাম

প্রথম খণ্ড

দিবা–গৃহিণী

প্রথম পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বকালে, পূর্ব্ববাঙ্গালায় ভূষণা নামে এক নগরী ছিল। এখন উহার নাম “ভূষ্‌নো”। যখন কলিকাতা নামে ক্ষুদ্র গ্রামের কুটীরবাসীরা বাঘের ভয়ে রাত্রি বাহির হইতে পারিত না, তখন সেই ভূষণায় একজন ফৌজদার বাস করিতেন। ফৌজদারেরা স্থানীয় গবর্ণর ছিলেন; এখনকার স্থানীয় গবর্ণর অপেক্ষা তাঁদের বেতন অনেক বেশী ছিল। সুতরাং ভূষণা স্থানীয় রাজধানী ছিল।

আজি হইতে প্রায় এক শত আশী বৎসর পূর্ব্বে এক দিন রাত্রিশেষে ভূষণা নগরের একটি সরু গলির ভিতর, পথের উপর একজন মুসলমান ফকির শুইয়াছিলেন। ফকির, আড় হইয়া একেবারে পথ বন্ধ করিয়া শুইয়া আছেন। এমন সময়ে সেখানে একজন পথিক আসিয়া উপস্থিত হইল। পথিক বড় দ্রুত আসিতেছিল, কিন্তু ফকির পথ বন্ধ করিয়া শুইয়া আছে দেখিয়া, ক্ষুণ্ন হইয়া দাঁড়াইল।

পথিক হিন্দু। জাতিতে উত্তরারাঢ়ী কায়স্থ। তাহার নাম গঙ্গারাম দাস! বয়সে নবীন। গঙ্গারাম বড় বিপন্ন। বাড়ীতে মাতা মরে, অন্তিম কাল উপস্থিত। তাই তাড়াতাড়ি কবিরাজ ডাকিতে যাইতেছিল। এখন সম্মুখে পথ বন্ধ।

সে কালে মুসলমান ফকিরেরা বড় মান্য ছিল। খোদ আকবর শাহ ইসলাম ধর্ম্মে অনাস্থাযুক্ত হইয়াও একজন ফকিরের আজ্ঞাকারী ছিলেন। হিন্দুরা ফকিরদিগকে সম্মান করিত, যাহারা মানিত না, তাহারা ভয় করিত। গঙ্গারাম সহসা ফকিরকে লঙ্ঘন করিতে যাইতে সাহস করিল না। বলিল, “সেলাম শাহ সাহেব। আমাকে একটু পথ দিন।”

শাহ সাহেব নড়িলেন না, কোন উত্তরও করিলেন না।–গঙ্গারাম জোড়হাত করিল, বলিল, “আল্লা তোমার উপর প্রসন্ন হইবেন, আমার বড় বিপদ্! আমায় একটু পথ দাও।”

শাহ সাহেব নড়িলেন না। গঙ্গারাম জোড়হাত করিয়া অনেক অনুনয় বিনয় এবং কাতরোক্তি করিল, ফকির কিছুতেই নড়িলেন না, কথাও কহিলেন না।

অগত্যা গঙ্গারাম তাহাকে লঙ্ঘন করিয়া গেল। লঙ্ঘন করিবার সময় গঙ্গারামের পা ফকিরের গায়ে ঠেকিয়াছিল; বোধ হয়, সেটুকু ফকিরের নষ্টামি। গঙ্গারাম বড় ব্যস্ত, কিছু না বলিয়া করিবাজের বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। ফকিরও গাত্রোত্থান করিলেন–সে কাজির বাড়ীর দিকে চলিয়া গেলেন।

গঙ্গারাম কবিরাজের সাক্ষাৎ পাইয়া, তাহাকে আপনার বাড়ীতে ডাকিয়া আনিল; কবিরাজ তার মাকে দেখিল, নাড়ী টিপিল, বচন আওড়াইল, ঔষধের কথা দুই চারি বার বলিল, শেষে তুলসীতলা ব্যবস্থা করিল। তুলসীতলায় হরিনাম করিতে করিতে গঙ্গারামের মা পরলোক লাভ করিলেন। তখন গঙ্গারাম মার সৎকারের জন্য পাড়া-প্রতিবাসীদিগকে ডাকিতে গেল। পাঁচ জন স্বজাতি জুটিয়া যথাবিধি গঙ্গারামের মার সৎকার করিল।

সৎকার করিয়া অপরাহ্নে শ্রীনাম্নী ভগিনী এবং প্রতিবাসিগণ সঙ্গে গঙ্গারাম বাটী ফিরিয়া আসিতেছিল, এমন সময়ে দুই জন পাইক, ঢাল-সড়কি-বাঁধা–আসিয়া গঙ্গারামকে ধরিল। পাইকেরা জাতিতে ডোম, গঙ্গারাম তাহাদের স্পর্শে বিষণ্ন হইল। সভয়ে দেখিল, পাইকদিগের সঙ্গে সেই শাহ সাহেব। গঙ্গারাম জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা যাইতে হইবে? কেন ধর? –আমি কি করিয়াছি?"

শাহ সাহেব বলিলেন, "কাফের! বদ্‌বখ্‌ত্‌! বেত্‌জিম্‌! চল্‌!"

পাইকেরা বলিল, "চল্‌।"

একজন পাইক ধাক্কা মারিয়া গঙ্গারামকে ফেলিয়া দিল। আর একজন তাহাকে দুই চারিটা লাথি মারিল। একজন গঙ্গারামকে বাঁধিতে লাগিল, আর একজন তাহার ভগিনীকে ধরিতে গেল। সে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। যে প্রতিবাসীরা সঙ্গে ছিল, তাহারা কে কোথা পলাইল, কেহ দেখিতে পাইল না। পাইকেরা গঙ্গারামকে বাঁধিয়া মারিতে মারিতে কাজির কাছে লইয়া গেল। ফকির মহাশয় দাড়ি নাড়িতে নাড়িতে হিন্দুদিগের দুর্নীতি সম্বন্ধে অতি দুর্ব্বোধ্য ফারসী ও আরবী শব্দ সকল সংযুক্ত নানাবিধ বক্তৃতা করিতে করিতে সঙ্গে গেলেন।

গঙ্গারাম কাজি সাহেবের কাজে আনীত হইলে, তাহার বিচার আরম্ভ হইল। ফরিয়াদী শাহ সাহেব– সাক্ষীও শাহ সাহেব এবং বিচারকর্ত্তাও শাহ সাহেব। কাজি মহাশয় তাঁহাকে আসন ছাড়িয়া দিয়া দাঁড়াইলেন, এবং ফকিরের বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে, কোরাণ ও নিজের চশমা এবং শাহ সাহেবের দীর্ঘবিলম্বিত শুভ্র শ্মশ্রুর সম্যক্‌ সমালোচনা করিয়া, পরিশেষে আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, ইহাকে জীয়ন্ত পুঁতিয়া ফেল। যে যে হুকুম শুনিল, সকলেই শিহরিয়া উঠিল। গঙ্গারাম বলিল, "যা হইবার তা ত হইল, তবে আর মনের আক্ষেপ রাখি কেন?"

এই বলিয়া গঙ্গারাম শাহ সাহেবের মুখে এক লাথি মারিল। তোবা তোবা বলিতে বলিতে শাহ সাহেব মুখে হাত দিয়া ধরাশায়ী হইলেন। এ বয়সে তাঁর যে দুই চারিটা দাঁত অবশিষ্ট ছিল, গঙ্গারামের পাদস্পর্শে তাহার মধ্যে অনেকগুলিই মুক্তিলাভ করিল। তখন হামরাহি পাইকেরা ছুটিয়া আসিয়া গঙ্গারামকে ধরিল এবং কাজি সাহেবের আজ্ঞানুসারে তাহার হাতে হাতকড়ি ও পায়ে বেড়ি দিল এবং যে সকল কথার অর্থ হয় না, এরূপ শব্দ প্রয়োগপূর্ব্বক তাহাকে গালি দিতে দিতে এবং ঘুষি, কিল ও লাথি মারিতে মারিতে কারাগারে লইয়া গেল। সে দিন সন্ধ্যা ইহয়াছিল; সে দিন আর কিছু হয় না–পরদিন তাহার জীয়ন্তে কবর হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যেখানে গাছতলায় পড়িয়া এলোচুলে মাটিতে লুটাইয়া গঙ্গারামের ভগিনী কাঁদিতেছিল, সেইখানে এ সংবাদ পৌঁছিল। ভগিনী শুনিল, ভাইয়ের কাল জীয়ন্তে কবর

হইবে। তখন সে উঠিয়া বসিয়া চক্ষু মুছিয়া এলোচুল বাঁধিল।

গঙ্গারামের ভগিনী শ্রীর বয়স পঁচিশ বৎসর হইতে পারে। সে গঙ্গরামের অনুজা।

সংসারে গঙ্গারাম, গঙ্গরামের মা এবং শ্রী ভিন্ন কেহই ছিল না। গঙ্গারামের মা ইদানীং অতিশয় রুগ্না হইয়াছিলেন, সুতরাং শ্রীই ঘরের গৃহিণী ছিল। শ্রী সধবা বটে, কিন্তু অদৃষ্টক্রমে স্বামিসহবাসে বঞ্চিতা।

ঘরে একটি শালগ্রাম ছিল,–এতটুকু ক্ষুদ্র একখানি নৈবেদ্য দিয়া প্রত্যহ তাহার একটু পূজা হইত। শ্রী ও শ্রীর মা জানিত যে, ইনিই সাক্ষাৎ নারায়ণ। শ্রী চুল জড়াইয়া সেই শালগ্রামের ঘরের দ্বারের বাহিরে থাকিয়া মনে মনে অসংখ্য প্রণাম করিল। পরে হাত জোড় করিয়া বলিতে লাগিল, "হে নারায়ণ! হে পরমেশ্বর! যে দীনবন্ধু! হে অনাথনাথ! আমি আজ যে দুঃসাহসের কাজ করিব, তুমি ইহাতে সহায় হইও। আমি স্ত্রীলোক–পাপিষ্ঠা। আমা হইতে কি হইবে! তুমি দেখিও ঠাকুর!"

এই বলিয়া সেখান হইতে শ্রী অপসৃতা হইয়া বাটীর বাহিরে গেল। পাঁচকড়ির মা নামে তাহার এক বর্ষীয়সী প্রতিবাসিনী ছিল। ঐ প্রতিবাসিনীর সঙ্গে ইহাদিগের বিলক্ষণ আত্মীয়তা ছিল, সে শ্রীর মার অনেক কাজকর্ম্ম করিয়া দিত। এক্ষণে তাহার নিকটে গিয়া শ্রী চুপি চুপি কি বলিল। পরে দুই জনে রাজপথে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, অন্ধকারে গলি ঘুঁজি পার হইয়া অনেক পথ হাঁটিল। সে দেশে কোঠা ঘর তত বেশী নয়, কিন্তু এখনকার অপেক্ষা তখন কোঠাঘর অধিক ছিল, মধ্যে মধ্যে একটি একটি বড় বড় অট্টালিকাও পাওয়া যাইত। ঐ দুই জন স্ত্রীলোক আসিয়া, এমনই একটা বড় অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইল। বাড়ীর সম্মুখে দীঘি, দীঘিতে বাঁধা ঘাট। বাঁধা ঘাটের উপর কতকগুলা দ্বারবান্ বসিয়া, কেহ সিদ্ধি ঘুঁটিতেছিল, কেহ টপ্পা গাইতেছিল, কেহ স্বদেশের প্রসঙ্গে চিত্ত সমর্পণ করিতেছিল। তাহাদেরই মধ্যে এক জনকে ডাকিয়া পাঁচকড়ির মা বলিল, "পাঁড়ে ঠাকুর! ভাণ্ডারীকে ডেকে দাও না?" দ্বারবান্ বলিল, "হাম্ পাঁড়ে নেহি, হাম্ মিশর হোতে হেঁ।"

পাঁচকড়ির মা। তা আমি জানি না, বাছা! পাঁড়ে কিসের বামুন? মিশর যেমন বামুন!

তখন মিশ্রদেব প্রসন্ন হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোম্ ভাণ্ডারী লেকে কেয়া করোগে?"

পাঁচকড়ির মা । কি আর করিব? আমার ঘরে কতকগুলো নাউ কুম্ড়া তরকারি হয়েছে, তাই বলে যাব যে, কাল গিয়ে যেন কেটে নিয়ে আসে।

দ্বারবান্। আচ্ছা, সো হাম্, বোলেঙ্গে। তোম্ ঘর্‌মে যাও।

পাঁচকড়ির মা। ঠাকুর, তুমি বলিলে কি আর সে ঠিকানা পাবে কার ঘরে তরকারি হয়েছে?

দ্বারবান্। আচ্ছা। তোমারি নাম বোল্‌কে যাও।

পাঁচকড়ির মা। যা আবাগির বেটা! তোকে একটা নাউ দিতাম, তা তোর কপালে হলো না।

দ্বারবান্। আচ্ছা, তোম্ খাড়ি রহো। আম্ ভাণ্ডারীকো বোলাতে হেঁ।

তখন মিশ্রঠাকুর গুন্ গুন্ করিয়া পিলু ভাঁজিতে ভাঁজিতে অট্টালিকামধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং অচিরাৎ জীবন ভাণ্ডারীকে সংবাদ দিলেন যে, "এক্‌ঠো তরকারিওয়ালি আয়ি হৈ। মুঝ্‌কো কুছ্ মেলেগা, তোম্‌কো ভি কুছ্ মেল সক্‌তা হায়। তোম্ জল্‌দী আও।"

জীবন ভাণ্ডারীর বয়স কিছু বেশী, কতকগুলো চাবি ঘুনসিতে ঝোলান। মুখ বড় রুক্ষ। কিঞ্চিৎ লাভের প্রত্যাশা পাইয়া সে শীঘ্র বাহির হইয়া আসিল। দেখিল, দুইটি স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিল, "কে ডেকেছ গা?"

পাঁচকড়ির মা বলিল, "এই আমার ঘরে কিছু তরকারি হয়েছে, তাই ডেকেছি। কিছু বা তুমি নিও, কিছু বা দরওয়ান্‌জীকে দিও, আর কিছু বা সরকারীতে দিও।"

জীবন ভাণ্ডারী। তা তোর বাড়ী কোথা বলে যা, কাল যাব।

পাঁচকড়ির মা। আর একটি দুঃখী অনাথ মেয়ে এয়েছে, ও কি বল্‌বে, একবার শোন।

শ্রী গলা পর্য্যন্ত ঘোমটা টানিয়া প্রাচীরে মিশিয়া এক পাশে দাঁড়াইয়াছিল। জীবন ভাণ্ডারী তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রুক্ষভাবে বলিল, 'ও ভিক্ষে শিক্ষের কথা আমি হুজুরে কিছু বলিতে পারিব না।" পাঁচকড়ির মা তখন অস্ফুট স্বরে ভাণ্ডারী মহাশয়কে বলিল, "ভিক্ষে যদি কিছু পায় তবে অর্দ্ধেক তোমার।"

ভাণ্ডারী মহাশয় তখন প্রসন্নবদনে বলিলেন, "কি বল মা?" ভিখারীর পক্ষে ভাণ্ডারীর প্রভুর দ্বার অবারিত। শ্রী ভিক্ষার অভিপ্রয় জানাইল, সুতরাং ভাণ্ডারী মহাশয় তাহাকে মুনিবের কাছে লইয়া যাইতে বাধ্য হইলেন।

ভাণ্ডারী শ্রীকে পৌঁছাইয়া দিয়া প্রভুর আজ্ঞামত চলিয়া গেল।

শ্রী আসিয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইল। অবগুণ্ঠনবতী, বেপমানা। গৃহকর্ত্তা বলিলেন, "তুমি কে?"

শ্রী বলিল, "আমি শ্রী।"

"শ্রী! তুমি তবে কি আমাকে চেন না? না চিনিয়া আমার কাছে আসিয়াছ? আমি সীতারাম রায়।"

তখন শ্রী মুখের ঘোম্‌টা তুলিল। সীতারাম দেখিলেন, অশ্রুপূর্ণ, বর্ষাবারি-নিষিক্ত পদ্মের ন্যায়, অনিন্দ্যসুন্দরমুখী। বলিলেন, "তুমি শ্রী! এত সুন্দরী!"

শ্রী বলিল, "আমি বড় দুঃখী। তোমার ব্যঙ্গের যোগ্য নহি।" শ্রী কাঁদিতে লাগিল।

সীতারাম বলিলেন, "এত দিনের পর কেন আসিয়াছ? আসিয়াছ ত অত কাঁদিতেছ কেন?"

শ্রী তবু কাঁদে– কথা কহে না। সীতারাম বলিল, "নিকটে এসো।"

তখন শ্রী অতি মৃদুস্বরে বলিল, "আমি বিছানা মাড়াইব না–আমার অশৌচ।"

সীতা। সে কি?

গদ্‌গদস্বরে অশ্রুপূর্ণলোচনে শ্রী বলিতে লাগিল, "আজ আমার মা মরিয়াছেন।"

সীতারাম। সেই বিপদে পড়িয়া কি তুমি আজ আমার কাছে আসিয়াছ?

শ্রী। না– আমার মার কাজ আমিই যথাসাধ্য করিব। সে জন্য তোমায় দুঃখ দিব না। কিন্তু আমার আজ ভারি বিপদ্!

সীতা। আর কি বিপদ্!

শ্রী। আমার ভাই যায়। কাজি সাহেব তাহার জীয়ন্তে কবরের হুকুম দিয়াছেন। সে এখন হাবুজখানায় আছে। সীতা। সে কি? কি করেছে?

তখন শ্রী যাহা যাহা শুনিয়াছিল এবং যাহা যাহা দেখিয়াছিল, তাহা মৃদুস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে আদ্যোপান্ত বলিল। শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সীতারাম বলিলেন, "এখন উপায়?"

শ্রী। এখন উপায় তুমি। তাই এত বৎসরের পর এসেছি।

সীতারাম। আমি কি করিব?

শ্রী। তুমি কি করিবে? তবে কে করিবে? আমি জানি, তুমি সব পার।

সীতা। দিল্লীর বাদশাহের চাকর এই কাজি। দিল্লীর বাদশাহের সঙ্গে বিরোধ করে কার সাধ্য?

শ্রী বলিল, "তবে কি কোন উপায় নাই?"

সীতারাম অনেক ভাবিয়া বলিলেন, "উপায় আছে। তোমার ভাইকে বাঁচাইতে পারি। কিন্তু আমি মরিব।"

শ্রী। দেখ, দেবতা আছেন, ধর্ম্ম আছেন, নারায়ণ আছেন। কিছুই মিথ্যা নয়। তুমি দীন দঃখীকে বাঁচাইলে তোমার কখনও অমঙ্গল হইবে না। হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে?

সীতারাম অনেকক্ষণ ভাবিল। পরে বলিল, "তুমি সত্যই বলিয়াছ, হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে? আমি তোমার কাছে স্বীকার করিলাম, গঙ্গারামের জন্য আমি যথাসাধ্য করিব।"

তখন প্রীতমনে ঘোম্‌টা টানিয়া শ্রী প্রস্থান করিল।

সীতারাম দ্বার অর্গলবব্দ করিয়া ভৃত্যকে আদেশ করিলেন, "আমি যতক্ষণ না দ্বার খুলি ততক্ষণ আমাকে কেহ না ডাকে।" মনে মনে একবার আবার ভাবিলেন, "শ্রী এমন শ্রী! তা ত জানি না। আগে শ্রীর কাজ করিব, তার পর অন্য কথা।" ভাবিলেন, "হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে?"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সীতারামের এক গুরুদেব ছিলেন। তিনি ভট্টাচার্য্য অধ্যাপক গোছ মানুষ, তসর নামাবলী পরা, মাথাটি যত্নপূর্ব্বক কেশশূন্য করিয়াছেন, অবশিষ্ট আছে– কেবল এক "রেফ।" কেশাভাবে চন্দনের যথেষ্ট ঘটা,– খুব লম্বা ফোঁটা, আর আর বামুনগিরির সমান সব আছে। তাঁহার নাম চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার। তিনি সীতারামের নিতান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। সীতারাম যখন যেখানে বাস করিতেন, চন্দ্রচূড়ও তখন সেইখানে বাস করিতেন। সম্প্রতি ভূষণায় বাস করিতেছিলেন। আমরা আজিকার দিনেও এমন দুই একজন অধ্যাপক দেখিয়াছি যে, টোলে ব্যাকরণ সাহিত্য পড়াইতে যেমন পটু, অশাসিত তালুকে দাঙ্গা করিতেও তেমনি মজবুত। চন্দ্রচূড় সেই শ্রেণীর লোক।

কিছুক্ষণ পরে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সীতারাম গুরুদেবের নিকেতনে উপস্থিত ইহলেন। চন্দ্রচূড়ের সঙ্গে নিভৃতে সীতারামের অনেক কথা হইল। কি কি কথা হইল, তাহা আমাদের সবিস্তারে লিখিবার প্রয়োজন নাই। কথাবার্ত্তার ফল এই হইল যে, সীতারাম ও চন্দ্রচূড় উভয়ে সেই রাত্রিতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সহরের অনেক লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন, এবং সীতারাম রাত্রিশেষে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া আপনার পরিবারবর্গ একজন আত্মীয় লোকের সঙ্গে মধুমতীপারে পাঠাইয়া দিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এক খুব বড় ফর্‌দা জায়গায়, সহরের বাহিরে, গঙ্গারাম দাসের কবর প্রস্তুত হইয়াছিল। নন্দী সেখানে আসিবার আগেই লোক আসিতে আরম্ভ হইল। অতি প্রত্যূষে,–তখনও–গাছের আশ্রয় হইতে অন্ধকার সরিয়া যায় না–অন্ধকারের আশ্রয় হইতে নক্ষত্র সব সরিয়া যায় নাই, এমন সময়ে দলে দলে পালে পালে জীবন্ত

মানুষের কবর দেখিতে লোক আসিতে লাগিল। একটা মানুষ মরা, জীবিতের পক্ষে একটা পর্ব্বের সমান। যখন সূর্য্যোদয় হইল, তখন মাঠ প্রায় পুরিয়া গিয়াছে, অথচ নগরের সকল গলি, পথ, রাস্তা হইতে পিপীলিকাশ্রেণীর মত মনুষ্য বাহির হইতেছে। শেষ সে বিস্তৃত স্থানেও স্থানাভাব হইয়া উঠিল। দর্শকেরা গাছে উঠিয়া কোথাও হনুমানের মতন আসীন–যেন লাঙ্গুলাভাবে কিঞ্চিৎ বিরস;–কোথাও বাদুড়ের মত দুল্যমান, দিনোদয়ে যেন কিঞ্চিৎ সরস। পশ্চাতে, নগরের যে কয়টা কোঠাবাড়ী দেখা যাইতেছিল, তাহার ছাদ মানুষে ভরিয়া গিয়াছে, আর স্থান নাই। কাঁচা ঘরই বেশী, তাহাতেও মই লাগাইয়া, মইয়ে পা রাখিয়া, অনেকে চালে বসিয়া দেখিতেছি। মাঠের ভিতর কেবল কালো মাথার সমুদ্র–ঠেসাঠেসি, মিশামিশি। কেবল মানুষ আসিতেছে, জমাট বাঁধিতেছে, সরিতেছে, ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে, আবার মিশিতেছে। কোলাহর অতিশয় ভয়ানক। বন্দী এখনও আসিল না দেখিয়া দর্শকেরা অতিশয় অধীর হইয়া উঠিল। চীৎকার, গণ্ডগোল, বকাবকি, মারামারি আরম্ভ করিল। হিন্দু মুসলমানকে গালি দিতে লাগিল, মুসলমান হিন্দুকে গালি দিতে লাগিল। কেহ বলে, "আল্লাহ!" কেহ বলে, "হরিবোল!" কেহ বলে, "আজ হবে না, ফিরে যাই!" কেহ বলে, "ঐ এয়েছে দেখ্।" যাহারা বৃক্ষারূঢ়, তাহারা কার্য্যাভাবে গাছের পাতা, ফুল, এবং ছোট ছোট ডাল ভাঙ্গিয়া নিম্নচারীদিগের মাথার উপর ফেলিতে লাগিল। কেহ কেহ তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া নিষ্ঠীবন প্রক্ষেপ করিতে লাগিল। এই সকল কারণে, যেখানে যেখানে বৃক্ষ, সেইখানে সেইখানে তলচারি এবং শাখাবিহারীদিগের ভীষণ কোন্দল উপস্থিত হইতে লাগিল। কেবল একটি গাছের তলায় সেরূপ গোলযোগ নাই। সে বৃক্ষের তলে বড় লোক দাঁড়ায় নাই। সমুদ্রমধ্যে ক্ষুদ্র দ্বীপের মত তাহা প্রায় জনশূন্য। দুই চারি জন লোক সেখানে আছে বটে, কিন্তু তাহারা কোন গোলযোগ করিতেছে না; নিঃশব্দ। কেবল অন্য কোন লোক সে বৃক্ষতলে দাঁড়াইতে আসিলে, তাহারা উহাদিগকে গলা টিপিয়া বাহির করিয়া দিতেছে। তাহাদিগকে বড় বড় যোয়ান ও হাতে বড় বড় লাঠি দেখিয়া সকলে নিঃশব্দে সরিয়া যাইতেছে। সেই বৃক্ষের শিকড়ের উপর দাঁড়াইয়া কেবল এক জন স্ত্রীলোক বৃক্ষকাণ্ড অবলম্বন করিয়া ঊর্দ্ধমুখে বৃক্ষারূঢ় কোন ব্যক্তির সঙ্গে কথা কহিতেছে। তাহার চোখ-মুখ ফুলিয়াছে; বেশভূষা বড় আলুথালু–যেন সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়াছে। কিন্তু এখন আর কাঁদিতেছে না। যে বৃক্ষারূঢ়, তাহাকে ঐ স্ত্রীলোক বলিতেছে, "ঠাকুর! এখন কিছু দেখা যায় না!"

বৃক্ষারূঢ় ব্যক্তি উপর হইতে বলিল, "না।"

"তবে বোধ হয়, নারায়ণ রক্ষা করিলেন।"

পাঠক বুঝিয়া থাকিবেন যে, এই স্ত্রীলোক শ্রী। বৃক্ষোপরি স্বয়ং চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার। বৃক্ষশাখা ঠিক তাঁর উপযুক্ত নহে, কিন্তু তর্কালঙ্কার মনে করিতেছিলেন, "আমি ধর্ম্মাচরণনিযুক্ত; ধর্ম্মের জন্য সকলই কর্ত্তব্য।"

শ্রীর কথার উত্তরে চন্দ্রচূড় বলিলেন, "নারায়ণ অবশ্য রক্ষা করিবেন। আমার সে ভরসা আছে। তুমি উতলা হইও না। কিন্তু এখনও রক্ষার উপায় নাই বোধ হইতেছে। কতকগুলা লাল পাগড়ি আসিতেছে, দেখিতে পাইতেছি।"

শ্রী। কিসের লাল পাগড়ি?

চন্দ্রচূড়। বোধ হয় ফৌজদারি সিপাহী।

বাস্তবিক দুই শত ফৌজদারী সিপাহী সশস্ত্র শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গঙ্গারামকে ঘেরিয়া লইয়া আসিতেছিল। দেখিয়া সেই অসংখ্য জনতা একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। যেমন যেমন দেখিতে লাগিলেন, চন্দ্রচূড় সেইরূপ শ্রীকে বলিতে লাগিলেন। শ্রী জিজ্ঞাসা করিল, "কত সিপাহী?"

চন্দ্র। দুই শত হইবে।

শ্রী। আমরা দীন দুঃখী–নিঃসহায়। আমাদের মারিবার জন্য এত সিপাহী কেন?

চন্দ্র। বোধ হয় বহু লোকের সমাগম হইয়াছে শুনিয়া সতর্ক হইয়া ফৌজদার এত সিপাহী পাঠাইয়াছেন।

শ্রী। তার পর কি হইতেছে?

চন্দ্র। সিপাহীরা আসিয়া, শ্রেণী বাঁধিয়া, প্রস্তুত কবরের নিকট দাঁড়াইল। মধ্যে গঙ্গারাম। পিছনে খোদ কাজি, আর সেই ফকির।

শ্রী। দাদা কি করিতেছেন?

চন্দ্র। পাপিষ্ঠেরা তার হাতে হাতকড়ি, পায়ে বেড়ি দিয়াছে।

শ্রী। কাঁদিতেছেন কি?

চন্দ্র। না নিঃশব্দ—নিস্তব্ধ। মূর্ত্তি বড় গম্ভীর, বড় সুন্দর।

শ্রী। আমি একবার দেখিতে পাই না? জন্মের শোধ দেখিব।

চন্দ্র। দেখিবার সুবিধা আছে। তুমি এই নীচের ডালে উঠিতে পার?

শ্রী। আমি স্ত্রীলোক, গাছে উঠিতে জানি না।

চন্দ্র। এ কি লজ্জার সময় মা?

শিকড় হইতে হাত দুই উঁচুতে একটি সরল ডাল ছিল। সে ডালটি উঁচু হইয়া না উঠিয়া, সোজা হইয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল। হাতখানিক গিয়া, ঐ ডাল দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। সেই দুই ডালের উপর দুইটি পা দিয়া, নিকটস্থ আর একটি ডাল ধরিয়া দাঁড়াইবার বড় সুবিধা। চন্দ্রচূড় শ্রীকে ইহা দেখাইয়া দিলেন। শ্রী লজ্জা ত্যাগ করিয়া উঠিবার চেষ্ট করিল—শ্মশানে লজ্জা থাকে না।

প্রথম দুই একবার চেষ্টা করিয়া উঠিতে পারিল না—কাঁদিতে লাগিল। তার পর, কি কৌশলে কে জানে, শ্রী ত জানে না—সে সেই নিম্ন শাখায় উঠিয়া, সেই জোড়া ডালে যুগল চরণ রাখিয়া, আর একটি ডাল ধরিয়া দাঁড়াইল।

তাতে বড় গোলযোগ উপস্থিত হইল। যেখান শ্রী দাঁড়াইয়াছিল, সেখানে সম্মুখদিকে পাতার আবরণ ছিল না—শ্রী সেই অসংখ্য জনতার সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া দাঁড়াইল। সকলে দেখিল, সহসা অতুলনীয়, রূপবতী বৃক্ষের ডাল ধরিয়া, শ্যামল পত্ররাশিমধ্যে বিরাজ করিতেছে। প্রতিমার ঠাটের মত, চারি দিকে বৃক্ষশাখা, বৃক্ষপত্র ঘেরিয়া রহিয়াছে; চুলের উপর পাতা পড়িয়াছে, স্থূল বাহুর উপর পাতা পড়িয়াছে; বক্ষঃস্থ কেশদাম কতক মাত্র ঢাকিয়া পাতা পড়িয়াছে, একটি ডাল আসিয়া পা দুখানি ঢাকিয়া ফেলিয়াছে; কেহ দেখিতে পাইতেছে না, এ মূর্ত্তিমতী বনদেবী কিসের উপর দাঁড়াইয়াছে। দেখিয়া নিকটস্থ জনতা বাত্যাতাড়িত সাগরবৎ, সহসা সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

শ্রী তাহা কিছুই জানিতে পারিল না। আপনার অবস্থান প্রতি তাহার কিছুমাত্র মনোযোগ ছিল না। অনিমেষলোচনে গঙ্গারামের পানে চাহিয়া দেখিতেছিল, দুই চক্ষু দিয়া অবিরল জলধারা পড়িতেছিল। এমন সময়ে শাখান্তর হইতে চন্দ্রচূড় ডাকিয়া বলিলেন, "এ দিকে দেখ! এ দিকে দেখ! ঘোড়ার উপর কে আসিতেছে?"

শ্রী দিগন্তরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, ঘোড়ার উপর কে আসিতেছে। যোদ্ধৃবেশ, অথচ নিরস্ত্র। অশ্বী বড় তেজস্বিনী, কিন্তু লোকের ভিড় ঠেলিয়া আগুইতে পারিতেছে না। অশ্বী নাচিতেছে, দুলিতেছে, গ্রীবা বাঁকাইতেছে, কিন্তু তবু বড় আগু হইতে পারিতেছে না। শ্রী চিনিলেন, অশ্বপৃষ্ঠে সীতারাম।

এ দিকে গঙ্গারামকে সিপাহীরা কবরে ফেলিতেছিল। সেই সময়ে দুই হাত তুলিয়া সীতারাম নিষেধ করিলেন। সিপাহীরা নিরস্ত হইল। শাহ সাহেব

বলিলেন, “কিয়া দেখ্‌তে, হো! কাফেরকো মাট্টি দেও।”

কাজি সাহেব ভাবিলেন। কাজি সাহেবের সে সময়ে সেখানে আসিবার কোন প্রয়োজন ছিল না, কেবল জনতা শুনিয়া শখ করিয়া আসিয়াছিলেন। যখন আসিয়াছিলেন, তখন তিনিই কর্ত্তা। তিনি বলিলেন, “সীতারাম যখন বারণ করিতেছে, তখন কিছু কারণ আছে। সীতারাম আসা পর্য্যন্ত বিলম্ব কর।”

শাহ সাহেব অসন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু অগত্যা সীতারাম পৌঁছান পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল। গঙ্গারামের মনে একটু আশার সঞ্চার হইল।

সীতারাম কাজি সাহেবের নিকট পৌঁছিলেন। অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক প্রণতমস্তকে শাহ সাহেবকে বিনয়পূর্ব্বক অভিবাদন করিলেন। তৎপরে কাজি সাহেবকে তদ্রূপ করিলেন। কাজি সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন, রায় সাহেব! আপনার মেজাজ সরীফ্‌।”

সীতারাম। আলহম্‌-দল্‌-ইল্লা। মেজাজে মবারকের সংবাদ পাইলেই এ ক্ষুদ্র প্রাণী চরিতার্থ হয়।

কাজি। খোদা নফরকে যেমন রাখিয়াছেন। এখন এই উমর, বাল সফেদ, কাজা পৌঁছিলেই হয়। দৌলতখানার কুশল সংবাদ ত?

সীতা। হুজুরের এক্‌বালে গরিবখানার অমঙ্গলের সম্ভাবনা কি?

কাজি। এখন এখানে কি মনে করিয়া?

সীতা। এই গঙ্গারাম–বদ্‌বখ্‌ত্‌–বেত্‌মিজ্‌ যাই হোক, আমার স্বজাতি। তাই দুঃখে পড়িয়া হুজুরে হাজির হইয়াছি, জান বখ্‌শিশ ফরমায়েশ্‌ করুন।

কাজি। সে কি? তাও কি হয়?

সীতা। মেহেরবান ও কদরদান সব পারে।

কাজি। খোদা মালেক। আমা হইতে এ বিষয়ের কিছু হইবে না।

সীতা। হাজার আসরফি জরমানা দিবে। জান বখ্‌শিশ ফরমায়েশ করুন।

কাজি সাহেব ফকিরের মুখপানে চাহিলেন। ফকির ঘাড় নাড়িল। কাজি বলিলেন, “সে সব কিছু হইবে না। কবরমে কাফেরকো ডারো।”

সীতা। দুই হাজার আসরফি দিব। আমি জোড় হাত করিতেছি, গ্রহণ করুন। আমার খাতির!

কাজি ফকিরের মুখপানে চাহির, ফকির নিষেধ করিল, সে কথাও উড়িয়া গেল। শেষ সীতারাম চারি হাজার আসরফি স্বীকার করিল। তাও না। পাঁচ হাজার–তাও না। আট হাজার–দশ হাজার, তাও না; সীতারামের আর নাই। শেষ সীতারাম জানু পাতিয়া করজোড় করিয়া অতি কাতরস্বরে বলিলেন, “আমার আর নাই। তবে, আর অন্য যা কিছু আছে, তাও দিতেছি। আমার তালুক মুলুক, জমি জেওয়াত, বিষয়-আশয় সর্ব্বস্ব দিতেছি। সব গ্রহণ করুন। উহাকে ছাড়িয়া দিন।

কাজি সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, “ও তোমার এমন কে যে, উহার জন্য সর্ব্বস্ব দিতেছ?”

সীতা। ও আমার যেই হৌক, আমি উহার প্রাণদানে স্বীকৃত–আমি সর্ব্বস্ব দিয়া উহার প্রাণ রাখিব। এই আমাদের হিন্দু ধর্ম।

কাজি। হিন্দুধর্ম্ম যাহাই হৌক, মুসলমানের ধর্ম্ম তাহার বড়। এ ব্যক্তি মুসলমান ফকিরের অপমান করিয়াছে, উহার প্রাণ লইব– তাহাতে সন্দেহ নাই। কাফেরের প্রাণ ভিন্ন ইহার আর অন্য দণ্ড নাই।

তখন সীতারাম জানু পাতিয়া কাজি সাহেবের আলখাল্লার প্রান্তভাগ ধরিয়া, বাষ্পগদ্গদস্বরে বলিতে লাগিলেন, “কাফেরের প্রাণ? আমিও কাফের। আমার প্রাণ লইলে এ প্রায়শ্চিত্ত হয় না? আমি এই কবরে নামিতেছি–আমাকে মাটি চাপা দিউন–আমি হরিনাম করিতে করিতে বৈকুণ্ঠে যাইব–আমার প্রাণ লইয়া এই

দুঃখীর প্রাণদান করুন। দোহাই তোমার কাজি সাহেব! তোমার যে আল্লা, আমারও সেই বৈকুণ্ঠেশ্বর! ধর্ম্মাচরণ করিও। আমি প্রাণ দিতেছি– বিনিময়ে এই ক্ষুদ্র ব্যক্তির প্রাণদান কর।"

কথাটা নিকটস্থ হিন্দু দর্শকেরা শুনিতে পাইয়া হরিধ্বনি দিয়া উঠিল। করতালি দিয়া বলিতে লাগিল, "ধন্য রায়জী! ধন্য রায় মহাশয়! জয় কাজি সাহেবকা! গরিবকে ছাড়িয়া দেও।"

যাহারা কথা কিছুই শুনিতে পায় নাই, তাহারাও হরিধ্বনি শুনিয়া হরিধ্বনি দিতে লাগিল। তুমুল কোলাহল পড়িয়া গেল। কাজি সাহেবও বিস্মিত হইয়া সীতারামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি বলিতেছেন, রায় মহাশয়! এ আপনার কে যে, ইহার জন্য আপনার প্রাণ দিতে চাহিতেছেন?"

সীতা। এ আমার ভ্রাতার অপেক্ষা, পুত্রের অপেক্ষাও আত্মীয়; কেন না, আমার শরণাগত। হিন্দুশাস্ত্রের বিধি এই যে, সর্ব্বস্ব দিয়া, প্রাণ দিয়া শরণাগতকে রক্ষা করিবে। রাজা ঔশীনর, আপনার শরীরের সকল মাংস কাটিয়া দিয়া একটি পায়রাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। অতএব আমাকে গ্রহণ করুন–ইহাকে ছাড়ুন।

কাজি সাহেব সীতারামের উপর কিছু প্রসন্ন হইলেন। শাহ সাহেবকে অন্তরালে লইয়া চুপি চুপি কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। বলিলেন, "এ ব্যক্তি দশ হাজার আসরফি দিতে চাহিতেছে। নিলে সরকারী তহবিলের কিছু সুসার হইবে। দশ হাজার আসরফি লইয়া, এই হতভাগ্যকে ছাড়িয়া দিলে হয় না?"

শাহ সাহেব বলিলেন, "আমার ইচ্ছা, দুইটাকেই এক কবরে পুঁতি। আপনি কি বলেন?"

কাজি। তোবা! আমি তাহা পারিব না। সীতারাম কোন অপরাধ করে নাই–বিশেষ এ ব্যক্তি মান্য, গণ্য ও সচ্চরিত্র। তা হইবে না।

এতক্ষণ গঙ্গারাম কোন কথা কহে নাই, মনে জানিত যে, তাহার নিষ্কৃতি নাই। কিন্তু শাহ সাহেবের সঙ্গে কাজি সাহেবের নিভৃতে কথা হইতেছে দেখিয়া সে জোড় হাত করিয়া কাজি সাহেবকে বলিল, "হুজুরের মর্‌জি মবারকে কি হয় বলিতে পারি না, কিন্তু এ গরিবের প্রাণ রক্ষা সম্বন্ধে গরিবেরও একটা কথা শুনিতে হয়। একের অপরাধে অন্যের প্রাণ লইবেন, এ কোন্ সরায় আছে? সীতারামের প্রাণ লইয়া, আমায় প্রাণদান দিবেন–আমি এমন প্রাণদান লইব না। এই হাতকড়ি মাথায় মারিয়া আপনার মাথা ফাটাইব।"

তখন ভিড়ের ভিতর হইতে কে ডাকিয়া বলিল, "হাতকড়ি মাথায় মারিয়াই মর। মুসলমানের হাত এড়াইবে।"

বক্তা, স্বয়ং চন্দ্রচূড় ঠাকুর। তিনি আর গাছে নাই। একজন জমাদার শুনিয়া বলিল, "পাকড়ো বস্কো।" কিন্তু চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কারকে পাক্‌ড়ান বড় শক্ত কথা। সে কাজ হইল না।"

এ দিকে হাতকড়ি মাথায় মারার কথা শুনিয়া ফকির মহাশয়ের কিছু ভয় হইল, পাছে জীবন্ত মানুষ পোঁতার সুখে তিনি বঞ্চিত হন। কাজি সাহেবকে বলিলেন, "এখন আর উহার হাতকড়িতে প্রয়োজন কি? হাতকড়ি খসাইতে বলুন।"

কাজি সাহেব সেইরূপ হুকুম দিলেন। কামার আসিয়া গঙ্গারামের হাত মুক্ত করিল। কামার সেখানে উপস্থিত থাকিবার প্রয়োজন ছিল না, তবে সরকারী বেড়ি হাতকড়ি সব তাহার জিম্মা, সেই উপলক্ষে সে আসিয়াছিল। তাহার ভিতর কিছু গোপন কথাও ছিল। রাত্রিশেষে কর্ম্মকার মহাশয় চন্দ্রচূড় ঠাকুরের কিছু টাকা খাইয়াছিলেন।

তখন ফকির বলিল, "আর বিলম্ব কেন ? উহাকে গাড়িয়া ফেলিতে হুকুম দিন।"

শুনিয়া কামার বলিল, "বেড়ি পায়ে থাকিবে কি? সরকারী বেড়ি নোক্‌সান হইবে কেন? এখন ভাল লোহা বড় পাওয়া না। আর বদমায়েসেরও এত হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছে যে, আমি আর বেড়ি যোগাইতে পারিতেছি না।" শুনিয়া কাজি সাহেব বেড়ি খুলিতে হুকুম দিলেন। বেড়ি খোলা হইল।

শৃঙ্খল-মুক্ত হইয়া গঙ্গারাম দাঁড়াইয়া একবার এদিক্ ওদিক্ দেখিল। তার পর গঙ্গারাম এক অদ্ভুত কাজ করিল। নিকটে সীতারাম ছিলেন; ঘোড়ার চাবুক তাঁহার হাতে ছিল। সহসা তাঁহার হাত হইতে সেই চাবুক কাড়িয়া লইয়া গঙ্গারাম এক লম্ফে সীতারামের শূন্য অশ্বের উপর উঠিয়া অশ্বকে দারুণ আঘাত করিল। তেজস্বী অশ্ব আঘাতে ক্ষিপ্ত হইয়া এক লম্ফে কবরের খাদ পার হইয়া সিপাহীদিগের উপর দিয়া চলিয়া গিয়া জনতার ভিতর প্রবেশ করিল।

যতক্ষণে একবার বিদ্যুৎ চমকে, ততক্ষণে এই কাজ সম্পন্ন হইল। দেখিয়া, সেই লোকারণ্যমধ্যে তুমুল হরিধ্বনি পড়িয়া গেল। সিপাহীরা "পাক্ড়ো পাক্ড়ো" বলিয়া পিছু পিছু ছুটিল। কিন্তু তাহাতে একটা ভারী গোলযোগ উপস্থিত হইল। বেগবান্ অশ্বের সম্মুখ ইহতে লোকে ভয়ে সরিয়া যাইতে লাগিল, গঙ্গারাম পথ পাইতে লাগিল, কিন্তু সিপাহীরা পথ পাইল না। তাহাদের সম্মুখে লোক জমাট বাঁধিয়া দাঁড়াইল। তখন তাহারা হাতিয়ার চালাইয়া পথ করিবার উদ্যোগ করিল।

সেই সময়ে তাহারা সবিস্ময়ে দেখিল যে, কালান্তক যমের ন্যায় কতকগুলি বলিষ্ঠ অস্ত্রধারী পুরুষ, একে এসে, ভিড়ের ভিতর হইতে আসিয়া সারি দিয়া তাহাদের সম্মুখে পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। তখন আরও সিপাহী আসিল। দেখিয়া আরও ঢাল-সড়কিওয়ালা হিন্দু আসিয়া তাহাদের পথ রোধ করিল। তখন দুই দলে ভারী দাঙ্গা উপস্থিত হইল।

দেখিয়া, সক্রোধে কাজি সাহেব সীতারামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি ব্যাপার?"

সীতা। আমি ত কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।

কাজি। বুঝিতে পারিতেছ না? আমি বুঝিতে পারিতেছি, এ তোমারই খেলা।

সীতা। তাহা হইলে আপনার কাছে নিরস্ত্র হইয়া মৃত্যুভিক্ষা চাহিতে আসিতাম না।

কাজি। আমি এখন তোমার সে প্রার্থনা মঞ্জুর করিব। এ কবরে তোমাকেই পুঁতিব।

এই বলিয়া কাজি সাহেব কামারকে হুকুম দিলেন, "ইহারই হাতে পায়ে এ হাতকড়ি, বেড়ি লাগাও।" দ্বিতীয় ব্যক্তিকে তিনি ফৌজদারের নিকট পাঠাইলেন–ফৌজদার সাহেব যাহাতে আরও সিপাহী লইয়া স্বয়ং আইসেন, এমন প্রার্থনা জানায়। ফৌজদারের নিকট লোক গেল। কামার আসিয়া সীতারামকে ধরিল। সেই বৃক্ষারূঢ়া বনদেবী শ্রী তাহা দেখিল।

এ দিকে গঙ্গারাম কষ্টে অথচ নির্ব্বিঘ্নে অশ্ব লইয়া লোকারণ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কষ্টে–কেন না, আসিতে আসিতে দেখিলেন যে, সেই জনতামধ্যে একটা ভারী গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। কোলাহল ভয়ানক হইল, লোকসকল সম্মুখে ছুটিতে লাগিল। তাঁহার অশ্ব এই সকলে অতিশয় ভীত হইয়া দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল। অশ্বারোহণের কৌশল গঙ্গারাম তেমন জানিতেন না; ঘোড়া সামলাইতেই তাঁহাকে এত ব্যতিব্যস্ত হইতে হইল যে, তিনি আর কোন দিকে চাহিয়া দেখিতে পারিলেন না যে, কোথায় কি হইতেছে। কেবল "মার! মার!" একটা শব্দ কাণে গেল।

লোকারণ্য হইতে কোন মতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গঙ্গারাম অশ্বকে ছাড়িয়া দিয়া, এক বটবৃক্ষে আরোহণ করিলেন, দেখিবেন–কি হইতেছেন। দেখিলেন, ভারী গোলযোগ। সেই মহতী জনতা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এক দিকে সব মুসলমান–আর এক দিকে সব হিন্দু। মুসলমানদিগের অগ্রভাবে কতকগুলি সিপাহী, হিন্দুদিগের অগ্রভাগে কতকগুলি ঢাল-সড়কিওয়ালা। হিন্দুরা বাছা বাছা জোয়ান, আর সংখ্যাতে বেশী। মুসলমানেরা তাহাদিগের কাছে হঠিতেছে। অনেকে পলাইতেছে। হিন্দুরা "মার মার" শব্দে পাশ্চাদ্বারিত হইতেছে।

এই মার্ মার্ শব্দে আকাশ, প্রান্তর, কানন প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। যে লড়াই করিতেছে, সেও মার্ মার্ শব্দ করিতেছে, যে লড়াই না করিতেছে, সেও মার্

মার্ শব্দ করিতেছে। মার্ মার্ শব্দে হিন্দুরা চারি দিক্ হইতে চারি দিকে ছুটিতেছে। আবার গঙ্গারাম সবিস্ময়ে শুনিলেন, যাহারা এই মার্ মার্ শব্দ করিতেছে, তাহারা মধ্যে মধ্যে বলিতেছে, "জয় চণ্ডিকে! মা চণ্ডী এয়েছেন! চণ্ডীর হুকুম, মার্! মার্! মার! জয় চণ্ডীকে!" গঙ্গারাম ভাবিলেন, "এ কি এ!" তখন দেখিতে দেখিতে গঙ্গারাম দেখিলেন মহামহীরুহের শ্যামল-পল্লবরাশি-মণ্ডিতা চণ্ডীমূর্ত্তি, দুই শাখায় দুই চরণ স্থাপন করিয়া, বাম হস্তে এক কোমল শাখা ধরিয়া, দক্ষিণ হস্তে অঞ্চল ঘুরাইতে ঘুরাইতে ডাকিতেছে, "মার্! মার্! শত্রু মার্!"–অঞ্চল ঘুরিতেছে, অনাবৃত আলুলায়িত কেশদাম বায়ুভরে উড়িতেছে–দৃপ্ত পদভরে যুগল শাখা দুলিতেছে, উঠিতেছে, নামিতেছে,–সঙ্গে সঙ্গে সেই মধুরিমাময় দেহ উঠিতেছে, নামিতেছে–যেন সিংহবাহিনী সিংহপৃষ্ঠে দাঁড়াইয়া রণরঙ্গে নাচিতেছে। যেন মা অসুর-বধে মত্ত হইয়া ডাকিতেছেন, "মার্! মার্! শত্রু মার্!" শ্রীর আর লজ্জা নাই, জ্ঞান নাই, ভয় নাই, বিরাম নাই–কেবল ডাকিতেছে–"মার্,–শত্রু মার্! দেবতার শত্রু, মানুষের শত্রু, হিন্দুর শত্রু–আমার শত্রু–মার্! শত্রু মার!" উত্থিত বাহু, কি সুন্দর বাহু! স্ফুরিত অধর, বিস্ফারিত নাসা, বিদ্যুন্ময় কটাক্ষ, স্বেদাক্ত ললাটে স্বেদবিজড়িত চূর্ণকুন্তলের শোভা! সকল হিন্দু সেই দিকে চাহিতেছে, আর "জয় মা চণ্ডিকে!" বলিয়া রণে ছুটিতেছে। গঙ্গারাম প্রথমে মনে করিতেছেন যে, যথার্থই চণ্ডী অবতীর্ণা–তার পর সবিস্ময়ে, সভয়ে চিনিলেন, শ্রী!

এই চণ্ডীর উৎসাহে হিন্দুর রণজয় হইল। চণ্ডীর বলে বলবান্ হিন্দুর বেগ মুসলমানেরা সহ্য করিতে পারিল না। চীৎকার করিতে করিতে পলাইতে লাগিল। অল্পকালমধ্যে রণক্ষেত্র মুসলমানশূন্য হইল। গঙ্গারাম তখন দেখিলেন, একজন ভাবী লম্বা জোয়ান সীতারামকে কাঁধে করিয়া লইয়া, আর সকলে তাঁহাকে ঘেরিয়া, সেই চণ্ডীর দিকে লইয়া চলিল। আরও দেখিলেন, পশ্চাৎ আর একজন সড়কিওয়ালা শাহ্ সাহেবের কাটামুণ্ড সড়কিতে বিঁধিয়া উঁচু করিয়া সঙ্গে সঙ্গে লইয়া যাইতেছে। এই সময়ে শ্রী সহসা বৃক্ষচ্যুতা হইয়া ভূতলে পড়িয়া মূর্চ্ছিতপ্রায় হইল। গঙ্গারামও তখন বৃক্ষ হইতে নামিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এমন সময় একটা গোল উঠিল যে, কামান, বন্দুক, গোলা গুলি লইয়া, সসৈন্য ফৌজদার বিদ্রোহীদিগের দমনার্থ আসিতেছেন। গোলা গুলির কাছে ঢাল সড়কী কি করিবে? বলা বাহুল্য যে, নিমেষমধ্যে সেই জোয়ানের দল অদৃশ্য হইল। যে নিরস্ত্র বীরপুরুষেরা তাঁহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া লড়াই ফতে করিতেছি বলিয়া কোলাহল করিতেছিলেন, তাঁহারা বলিলেন, "আমরা ত বারণ করিয়াছিলাম।" এই বলিয়া আর পশ্চাদ্দৃষ্ট না করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন। যাহারা দাঙ্গার কোন সংস্রবে ছিল না, তাহারা 'চোরা গোরুর অপরাধে কপিলার বন্ধন' সম্ভাবনা দেখিয়া সীতারাম গঙ্গারামকে নানাবিধ গালিগালাজ করিয়া আর্ত্তনাদপূর্ব্বক পলাইতে লাগিল। অতি অল্পকালমধ্যে সেই লোকরণ্য অন্তর্হিত হইল প্রান্তর যেমন জনশূন্য ছিল, তেমনই জনশূন্য হইল। লোকজনের মধ্যে কেবল সেই বৃক্ষতলে চন্দ্রচূড়, সীতারাম, গঙ্গারাম, আর মূর্চ্ছিতা, ভূতলস্থা শ্রী।

সীতারাম গঙ্গারামকে বলিলেন, "তুমি যে আমার ঘোড়া চুরি করিয়া পলাইয়াছিলেন, সে ঘোড়া কি করিলে? বেচিয়া খাইয়াছ?"

গঙ্গারাম। হাসিয়া বলিল, "আজ্ঞে না। ঘোড়া মাঠে ছাড়িয়া দিয়াছি–ধরিয়া দিতেছি।"

সীতা। ধরিয়া, তাহার উপর আর একবার চড়িয়া পলায়ন কর।

গঙ্গা। আপনাদের ছাড়িয়া?

সীতা। তোমার ভগিনীর জন্য ভাবিও না।

গঙ্গা। আপনাকে ত্যাগ করিয়া আমি যাইব না।

সীতা। তুমি বড় নদী পার হইয়া যাও। শ্যামপুর চেন ত?

গঙ্গা। তা চিনি না?

সীতা। সেইখানে অতি দ্রুতগতি যাও। সেইখানে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে; নচেৎ তোমার নিস্তার নাই।

গঙ্গা। আমি আপনাকে ত্যাগ করিয়া যাইব না।

সীতারাম ভ্রূকুটি করিলেন।

গঙ্গারাম সীতারামের ভ্রূকুটি দেখিয়া নিস্তব্ধ হইল; এবং সীতারাম কিছু ধমক চমক করায় ভীত হইয়া অশ্বের সন্ধানে গেল।

চন্দ্রচূড় ঠাকুর সীতারামের ইঙ্গিত পাইয়া তাহার অনুবর্ত্তী হইলেন। শ্রী এদিকে চেতনাযুক্ত হইয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া মাথার ঘোমটা টানিয়া দিল। তার পর এদিকে ওদিকে চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সীতারাম বলিলেন, 'শ্রী, তুমি এখন কোথায় যাইবে?"

শ্রী। আমার স্থান কোথায়?

সীতা। কেন, তোমার মার বাড়ী?

শ্রী। সেখানে কে আছে?—এখন সেখানে আমাকে কে রক্ষা করিবে?

সীতা। তবে তুমি কোথায় যাইতে ইচ্ছা কর?

শ্রী। কোথাও নয়।

সীতা। এইখানে থাকিবে? এ যে মাঠ। এখানে তোমার মঙ্গল নাই।

শ্রী। কেন, এখানে আমার কে কি করিবে?

সীতা। তুমি হাঙ্গামায় ছিলে—ফৌজদার তোমায় ফাঁসি দিতে পারে, মারিয়া ফেলিতে পারে বা সেই রকম আর কোন সাজা দিতে পারে।

শ্রী। ভাল।

সীতা। আমি শ্যামপুরে যাইতেছি। তোমার ভাইও সেইখানে যাইবে। সেখানে তাহার ঘর দ্বার হইবার সম্ভাবনা। তুমি সেইখানে যাও। সেখানে বা যেখানে তোমার অভিলাষ, সেইখানে বাস করিও।

শ্রী। সেখানে কার সঙ্গে যাইব?

সীতা। আমি কোন লোক তোমার সঙ্গে দিব।

শ্রী। এমন লোক কাহাকে সঙ্গে দিবে যে, দুরন্ত সিপাহীদিগের হাত হইতে আমাকে রক্ষা করিবে?

সীতারাম কিছুক্ষণ ভাবিলেন; বলিলেন, "চল, আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছি।"

শ্রী সহসা উঠিয়া বসিল। উন্মুখী হইয়া স্থিরনেত্রে সীতারামের মুখপানে কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া রহিল। শেষে বলিল, "এত দিন পরে, এ কথা কেন?

সীতা। সে কথা বুঝান বড় দায়। নাই বুঝিলে।

শ্রী। না বুঝিলে আমি তোমার সঙ্গে যাইব না। যখন তুমি ত্যাগ করিয়াছ, তখন আর আমি তোমার সঙ্গে যাইব কেন? যাইব বই কি? কিন্তু তুমি দয়া করিয়া আমাকে কেবল প্রাণে বাঁচাইবার জন্য যে, এক দিন আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইবে, আমি সে দয়া চাহি না। আমি তোমার বিবাহিতা স্ত্রী, তোমার সর্ব্বস্বের অধিকারিণী,–আমি তোমার শুধু দয়া লইব কেন? যাহার আর কিছুতেই অধিকার নাই, সেই দয়া চায়। না প্রভু, তুমি যাও,–আমি যাইব না। এত কাল তোমা বিনা যদি আমার কাটিয়াছে, তবে আজিও কাটিবে।

সীতা। এসো, কথাটা আমি বুঝাইয়া দিব।

শ্রী। কি বুঝাইবে? আমি তোমার সহধর্ম্মিণী, সকলের আগে। তোমার আর দুই স্ত্রী আছে, কিন্তু আমি সহধর্ম্মিণী–আমি কুলটাও নই, জাতিভ্রষ্টাও নই। অথচ বিনাপরাধে বিবাহের কয় দিন পরে হইতে তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়াছ। কখনও বল নাই যে, কি অপরাধে ত্যাগ করিয়াছ। জিজ্ঞাসা করিয়াও জানিতে পারি নাই। অনেক দিন মনে করিয়াছি, তোমার এই অপরাধে আমি প্রাণত্যাগ করিব; তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমি করিয়া তোমাকে পাপ হইতে মুক্ত করিব। সে পরিচয় তোমার কাছে আজ না পাইলে, আমি এখান হইতে যাইব না।

সীতা। সে কথা সব বলিব। কিন্তু একটা কথা আমার কাছে আগে স্বীকার কর–কথাগুলি শুনিয়া তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া যাইবে না।

শ্রী। আমি তোমায় ত্যাগ করিব?

সীতা। স্বীকার কর, করিবে না।

শ্রী। এমন কি কথা, তবে না শুনিয়া আগে স্বীকার করি, কি প্রকার?

সীতা। দেখ, সিপাহীদিগের বন্দুকের শব্দ শোনা যাইতেছে। যাহারা পলাইতেছে, সিপাহীরা তাহাদের পাছু ছুটিয়াছে। এই বেলা যদি আইস, এখনও বোধ হয়, তোমাকে নগরের বাহিরে লইয়া যাইতে পারি। আর মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিলে উভয়ে নষ্ট হইব।

তখন শ্রী উঠিয়া সীতারামের সঙ্গে চলিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সীতারাম নির্ব্বিঘ্নে নগর পার হইয়া নদীকূলে পঁহুছিলেন। পলায়নের অনেক বিঘ্ন। কাজেই বিলম্ব ঘটিয়াছিল। এক্ষণে রাত্রি হইয়াছে। সীতারাম নক্ষত্রালোকে, নদীসৈকতে বসিয়া, শ্রীকে নিকটে বসিতে আদেশ করিলেন। শ্রী বসিলেন; তিনি বলিতে লাগিলেন, “এখন যাহা শুনিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে, তাহা শোন। না শুনিলেই ভাল হইত।

তোমার সঙ্গে আমার বিবাহের যখন কথাবার্ত্তা স্থির হয়, তখন আমার পিতা তোমার কোষ্ঠী দেখিতে চাহিয়াছিলেন মনে আছে? তোমার কোষ্ঠী ছিল না, কাজেই আমার পিতা তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ দিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু তুমি বড় সুন্দরী বলিয়া আমার মা জিদ করিয়া তোমার সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিলেন। বিবাহের মাসেক পরে আমাদের বাড়ীতে একজন বিখ্যাত দৈবজ্ঞ আসিল। সে আমাদের সকলের কোষ্ঠী দেখিল। তাহার নৈপুণ্যে আমার পিতৃঠাকুর বড় আপ্যায়িত হইলেন। সে ব্যক্তি নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার করিতে জানিত। পিতৃঠাকুর তাহাকে তোমার কোষ্ঠী প্রস্তুত করণে নিযুক্ত করিলেন।

দৈবজ্ঞ কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া আনিল। পড়িয়া পিতৃঠাকুরকে শুনাইল; সেই দিন ইহতে তুমি পরিত্যাজ্যা হইলে।”

শ্রী। কেন?

সীতা। তোমার কোষ্ঠীতে বলবান্ চন্দ্র স্বক্ষেত্রে অর্থাৎ কর্কট রাশিতে থাকিয়া শনির ত্রিংশাংশগত হইয়াছিল।

শ্রী। তাহা হইলে কি হয়?

সীতা। যাহার এরূপ হয়, সে স্ত্রী প্রিয়-প্রাণহন্ত্রী হয়।"* অর্থাৎ আপনার প্রিয়জনকে বধ করে। স্ত্রীলোকের "প্রিয়" বলিলে স্বামীই বুঝায়। পতিবধ তোমার কোষ্ঠীর ফল বলিয়া তুমি পরিত্যাজ্যা হইয়াছ।

বলিয়া সীতারাম কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তার পর বলিতে লাগিলেন, "দৈবজ্ঞ পিতাকে বলিলেন, 'আপনি এই পুত্রবধূটিকে পরিত্যাগ করুন, এবং পুত্রের দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের ব্যবস্থা করুন। কারণ, দেখুন, যদিও স্ত্রীজাতির সাধারণতঃ পতিই প্রিয়, কিন্তু যে পতি স্ত্রীর অপ্রিয় হয়, সেখানে এই ফল পতির প্রতি না ঘটিয়া অন্য প্রিয়জনের প্রতি ঘটিবে। স্ত্রীপুরুষে দেখা সাক্ষাৎ না থাকলে, পতি স্ত্রীর প্রিয় হইবে না; এবং পতি প্রিয় না হইলে, তাহার পতিবধের সম্ভাবনা নাই। অতএব যাহাতে আপনার পুত্রবধূর সঙ্গে আপনার পুত্রের কখনো সহবাস না হয় বা প্রীতি না জন্মে, সেই ব্যবস্থা করুন।' পিতৃদেব এই পরামর্শ উত্তম বিবেচনা করিয়া সেই দিনই তোমাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। এবং আমাকে আজ্ঞা করিলেন যে, আমি তোমাকে গ্রহণ বা তোমার সঙ্গে সহবাস না করি। এই কারণে তুমি আমার কাছে সেই অবধি পরিত্যক্ত।"

শ্রী দাঁড়াইয়া উঠিল। কি বলিতে যাইতেছিল, সীতারাম তাহাকে ধরিয়া বসাইলেন, বলিলেন, "আমার কথা বাকি আছে। যখন পিতা বর্ত্তমান ছিলেন—আমি তাঁহার অধীন ছিলাম—তিনি যা করাইতেন, তাই হইত।"

শ্রী। এখন তিনি স্বর্গে গিয়াছেন বলিয়া কি তুমি আর তাঁহার অধীন নও?

সীতা। পিতার আজ্ঞা সকল সময়েই পালনীয়—তিনি, যখন আছেন, তখনও পালনীয়—তিনি যখন স্বর্গে, তখনও পালনীয়। কিন্তু পিতা যদি অধর্ম্ম করিতে বলেন, তবে তাহা কি পালনীয়? পিতা মাতা বা গুরুর আজ্ঞাতেও অধর্ম্ম করা যায় না—কেন না, যিনি পিতা মাতার পিতা মাতা এবং গুরুর গুরু, অধর্ম্ম করিলে তাঁহার বিধি লঙ্ঘন করা হয়। বিনাপরাধে স্ত্রী ত্যাগ ঘোরতর অধর্ম্ম—অতএব আমি পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিয়া অধর্ম্ম করিতেছি—শীঘ্রই আমি তোমাকে এ কথা জানাইতাম, কিন্তু—

শ্রী আবার দাঁড়াইয়া উঠিল। বলিল, "আমাকে পরিত্যাগ করিয়াও যে তুমি আমাকে এত দয়া করিয়াছ, আমার ভাইয়ের প্রাণভিক্ষা দিয়াছ, ইহা তোমার অশেষ গুণ। আর কখনও আমি তোমাকে মুখ দেখাইব না বা তুমি কখনও আমার নামও শুনিবে না। গণকঠাকুর যাই বলুন, স্বামী ভিন্ন স্ত্রীলোকের আর কেহই প্রিয় নহে। সহবাস থাকুক বা না থাকুক, স্বামীই স্ত্রীর প্রিয়। তুমি আমার চিরপ্রিয়—এ কথা লুকান আমার আর উচিত নহে। আমি এখন হইতে তোমার শত যোজন তফাতে থাকিব।"

এই বলিয়া, শ্রী ফিরিয়া না চাহিয়া, সেখান হইতে চলিয়া গেল। অন্ধকারে সে কোথায় মিশাইল, সীতারাম আর দেখিতে পাইলেন না।

---

* চন্দ্রাগারে খাগ্নিভাবে কুজস্য স্বেচ্ছাবৃত্তির্জ্ঞস্য শিল্পে প্রবীণা।
বাচাং পত্যুঃ সদ্গুণা ভার্গবস্য সাধ্বী মন্দস্য প্রিয়প্রাণহন্ত্রী ॥
ইতি জাতকাভরণে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

তা, কথাটা কি আজ সীতারামের নূতন মনে হইল? না। কাল শ্রীকে দেখিয়া মনে হইয়াছিল। কাল কি প্রথম মনে হইল? হাঁ, তা বৈ কি। সীতারামের সঙ্গে স্ত্রীর কতটুকু পরিচয়? বিবাহের পর কয় দিন দেখা–সে দেখাই নয়–শ্রী তখন বড় বালিকা। তার পর সীতারাম ক্রমশঃ দুই বিবাহ করিয়াছিলেন। তপ্তকাঞ্চনশ্যামাঙ্গী নন্দাকে বিবাহ করিয়াও বুঝি শ্রীর খেদ মিটে নাই–তাই তাঁর পিতা আমার হিমরাশিপ্রতিফলিত-কৌমুদী-রূপিণী রমার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। আজ একজন বসন্তনিকুঞ্জপ্রহ্লাদিনী অপূর্ণা কল্লোলিনী; আর একজন বর্ষাবারিরাশিপ্রমথিতা পরিপূর্ণা স্রোতস্বতী। দুই স্রোতে শ্রী ভাসিয়া গেল। তার পর আর শ্রীর কোন খবরই নাই।

স্বীকার করি, তবু শ্রীকে মনে করা সীতারামের উচিত ছিল। কিন্তু এমন অনেক উচিত কাজ আছে যে, কাহারও মনে হয় না। মনে হইবার একটা কারণ না ঘটিলে, মনে হয় না। যাহার নিত্য টাকা আসে, সে কবে কোথায় সিকিটা আধুলিটা হারাইয়াছে, তার তা বড় মনে পড়ে না। যার এক দিকে নন্দা আর দিকে রমা, তবে কোথাকার শ্রীকে কেন মনে পড়িবে? যার একদিকে গঙ্গা, এক দিকে যমুনা, তার কবে কোথায় বালির মধ্যে সরস্বতী শুকাইয়া লুকাইয়া আছে, তা কি মনে পড়ে? যার এক দিকে চিত্রা, আর এক দিকে চন্দ্র, তার কবে কোথাকার নিবান বাতির আলো কি মনে পড়ে? রমা সুখ, নন্দা সম্প্‌দ, শ্রী বিপদ্–যার এক দিকে সুখ, আর এক দিকে সম্পদ্, তার কি বিপদ্‌কে মনে পড়ে?

তবে সে দিন রাত্রিতে শ্রীর চাঁদপানা মুখখানা, ঢল ঢল ছল ছল জলভরা বলহারা চোখ দুটো, বড় গোল করিয়া গিয়াছে। রূপের মোহ? আ ছি! ছি! তা না! তবে তার রূপেতে, তার দুঃখেতে, আর সীতারামের স্বকৃত অপরাধে, এই তিনটায় মিশিয়া গোলযোগ বাধাইয়াছিল। তা যা হউক–তার একটা বুঝাপড়া হইতে পারিত; ধীরে সুস্থে, সময় বুঝিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝিয়া, গুরু পুরোহিত ডাকিয়া, পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘনের একটা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়া, যা হয় না হয় হইত।–কিন্তু সেই সিংহবাহিনী মূর্ত্তি! আ মরি মরি–এমন কি আর হয়!

তবে সীতারামের হইয়া এ কথাটাও আমার বলা কর্ত্তব্য যে, কেবল সেই সিংহবাহিনী মূর্ত্তি স্মরণ করিয়াই সীতারাম, পত্নীত্যাগের অধার্ম্মিকতা হৃদয়ঙ্গম করেন নাই। পূর্ব্বরাত্রিতে যখনই প্রথম শ্রীকে দেখিয়াছিলেন, তখনই মনে হইয়াছিল যে, আমি পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিতে গিয়া পাপাচরণ করিতেছি। মনে করিয়াছিলেন যে, আগে শ্রীর ভাইয়ের জীবন রক্ষা করিয়া, নন্দা রমাকে পূর্ব্বেই শান্তভাবাবলম্বন করাইয়া, চন্দ্রচূড় ঠাকুরের সঙ্গে একটু বিচার করিয়া, যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিবেন। কিন্তু পরদিনের ঘটনার স্রোতে সে সব অভিসন্ধি ভাসিয়া গেল। উচ্ছ্বসিত অনুরাগের তরঙ্গে বালির বাঁধ সব ভাঙ্গিয়া গেল। নন্দা, রমা চন্দ্রচূড়, সব দূরে থাক–এখন কৈ শ্রী!

শ্রী সহসা নৈশ অন্ধকারে অদৃশ্য হইলে সীতারামের মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়িল।

সীতারাম গাত্রোত্থান করিয়া, যে দিকে শ্রী বনমধ্যে অন্তর্হিতা হইয়াছিল, সেই দিকে দ্রুতবেগে ধাবিত হইলেন। কিন্ত অন্ধকারে কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। বনের ভিতর তাল তাল অন্ধকার বাঁধিয়া আছে, কোথায় শাখাচ্ছেদ জন্য বা বৃক্ষবিশেষের শাখার উজ্জ্বল বর্ণ জন্য, যেন সাদা বোধ হয়, সীতারাম সেই দিকে দৌড়িয়া যান–কিন্তু শ্রীকে পান না। তখন শ্রীর নাম ধরিয়া সীতারাম তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। নদীর উপকূলবর্ত্তী বৃক্ষরাজিতে শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল–বোধ হইল যেন, সে উত্তর দিল। শব্দ লক্ষ্য করিয়া সীতারাম সেই দিকে যান্–আবার শ্রী বলিয়া ডাকেন, আবার অন্য দিকে প্রতিধ্বনি হয়–আবার সীতারাম সেই দিকে ছুটেন–কই, শ্রী কোথাও নাই! হায় শ্রী! হায় শ্রী! হায় শ্রী! করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইল–শ্রী মিলিল না।

কই, যাকে ডাকি, তা ত পাই না। যা খুঁজি, তা ত পাই না। যা পাইয়াছিলাম, হেলায় হারাইয়াছি, তা ত আর পাই না। রত্ন হারায়, কিন্তু হারাইলে আর পাওয়া যায় না কেন? সময়ে খুঁজিলে হয়ত পাইতাম–এখন আর খুঁজিয়া পাই না। মনে হয়, বুঝি চক্ষু গিয়াছে, বুঝি পৃথিবী বড় অন্ধকার হইয়াছে, বুঝি খুঁজিতে জানি না। তা কি করিব,–আরও খুঁজি। যাহাকে ইহজগতে খুঁজিয়া পাইলাম না, ইহজীবনে সেই প্রিয়। এই নিশা প্রভাতকালে শ্রী, সীতারামের হৃদয়ে প্রিয়ার উপর বড় প্রিয়া, হৃদয়ের অধিকারিণী। শ্রীর অনুপম রূপমাধুরী, তাঁহার হৃদয়ে তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। শ্রীর গুণ এখন তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক হইতে লাগিল। যে বৃক্ষারূঢ়া মহিষমর্দ্দিনী অঞ্চলসঙ্কেতে সৈন্যসঞ্চালন করিয়া রণজয় করিয়াছিল, যদি সেই শ্রী সহায় হয়, তবে সীতারাম কি না করিতে পারেন?

সহসা সীতারামের মনে এক ভরসা হইল। শ্রীর ভাই গঙ্গারামকে শ্যামপুরে তিনি যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন, গঙ্গারাম অবশ্য শ্যামপুরে গিয়াছে। সীতারাম তখন দ্রুতবেগে শ্যামপুরের অভিমুখে চলিলেন। শ্যামপুরে পৌঁছিয়া দেখিলেন যে, গঙ্গারাম তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছে। প্রথমেই সীতারাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গঙ্গারাম! তোমার ভগিনী কোথায়? গঙ্গারাম বিস্মিত হইয়া উত্তর করিল, "আমি কি জানি!"

সীতারাম বিষণ্ন হইয়া বলিলেন, "সব গোল হইয়াছে। সে এখানে আসে নাই?"

গঙ্গা। না।

সীতা। তুমি এইক্ষণেই তাহার সন্ধানে যাও। সন্ধানের শেষ না করিয়া ফিরিও না। আমি এইখানেই আছি। তুমি সাহস করিয়া সকল স্থানে যাইতে না পার, লোক নিযুক্ত করিও। সে জন্য টাকাকড়ি যাহা আবশ্যক হয়, আমি দিতেছি।

গঙ্গারাম প্রয়োজনীয় অর্থ লইয়া ভগিনীর সন্ধানে গেল। বহু যত্নপূর্ব্বক, এক সপ্তাহ তাঁহার সন্ধান করিল কোন সন্ধান পাইল না। নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া আসিয়া সীতারামের নিকট সবিশেষ নিবেদিত হইল।

নবম পরিচ্ছেদ

মধুমতী নদীর তীরে শ্যামপুর নামক গ্রাম, সীতারামের পৈতৃক সম্পত্তি। সীতারাম সেইখানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভূষণায় যে হাঙ্গামা উপস্থিত হইয়াছিল, ইহা যে সীতারামের কার্য্য, তাহা বলা বাহুল্য। ভূষণা নগরে সীতারামের অনুগত, বাধ্য প্রজা বা খাদক বিস্তর লোক ছিল। সীতারাম তাহাদের সঙ্গে রাত্রিতে সাক্ষাৎ করিয়া এই হাঙ্গামার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তবে সীতারামের এমন ইচ্ছা ছিল যে, যদি বিনা বিবাদে গঙ্গারামের উদ্ধার হয়, তবে আর তাহার প্রয়োজন নাই। তবে বিবাদ হয়, মন্দ নয়;–মুসলমানের দৌরাত্ম্য বড় বেশী হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু দমন হওয়া ভাল। চন্দ্রচূড় ঠাকুরের মনটা সে বিষয়ে আরও পরিষ্কার–মুসলমানের অত্যাচার এত বেশী হইয়াছে যে, গোটাকতক নেড়া মাথা লাঠির ঘায়ে না ভাঙ্গিলেই নয়। তাই সীতারামের অভিপ্রায়ের অপেক্ষা না করিয়াই চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার দাঙ্গা আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রাদ্ধটা বেশী গড়াইয়াছিল–ফকিরের প্রাণবধ এমন গুরুতর ব্যাপার যে, সীতারাম ভীত হইয়া কিছুকালের জন্য ভূষণা ত্যাগ করাই স্থির করিলেন। যাহারা সে দিনের হাঙ্গামায় লিপ্ত ছিল, তাহারা সকলেও আপনাদিগকে অপরাধী জানিয়া, এবং কোন দিন না কোন দিন ফৌজদার কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইবার আশঙ্কায় বাস ত্যাগ করিয়া, শ্যামপুরে সীতারামের আশ্রয়ে ঘর দ্বার বাঁধিতে লাগিল। সীতারামের প্রজা, অনুচরবর্গ এবং খাদক যে, যেখানে ছিল, তাহারাও সীতারাম কর্তৃক আহূত হইয়া আসিয়া শ্যামপুরে বাস করিল। এইরূপে ক্ষুদ্র গ্রাম শ্যামপুর সহসা বহুজনাকীর্ণ হইয়া বৃহৎ নগরে পরিণত হইল।

তখন সীতারাম নগরনির্ম্মাণে মনোযোগ দিলেন। যেখানে বহুজন-সমাগম, সেইখানেই ব্যবসায়ীরা আসিয়া উপস্থিত হয়; এই জন্য ভূষণা এবং অন্যান্য নগর

হইতে দোকানদার, শিল্পী, আড়দ্দার, মহাজন এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীরা আসিয়া শ্যামপুরে অধিষ্ঠান করিল। সীতারামও তাহাদিগকে যত্ন করিয়া বসাইতে লাগিলেন। এইরূপে সেই নূতন নগর, হাট, বাজার, গঞ্জ, গোলা, বন্দরে পরিপূর্ণ হইল। সীতারামের পূর্ব্বপুরুষের সংগৃহীত অর্থ ছিল, ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। তাহা ব্যয় করিয়া তিনি নূতন নগর সুশোভিত করিতে লাগিলেন। বিশেষ এখন প্রজাবাহুল্য ঘটাতে, তাঁহার বিশেষ আয়বৃদ্ধি হইয়াছিল। আবার এক্ষণে জনরব উঠিল যে, সীতারাম হিন্দুরাজধানী স্থাপন করিতেছেন; ইহা শুনিয়া, দেশে বিদেশে যেখানে মুসলমানপীড়িত, রাজভয়ে ভীত বা ধর্ম্মরক্ষার্থে হিন্দুরাজ্যে বাসের ইচ্ছুক, তাহারা সকলে দলে দলে আসিয়া সীতারামের অধিকারে বাস করিতে লাগলি। অতএব সীতারামের ধনাগম সম্যক্ প্রকারে বৃদ্ধি, পাইতে লাগিল। তিনি রাজপ্রসাদতুল্য আপন বাসভবন, উচ্চ দেবমন্দির, স্থানে স্থানে সোপানাবলীশোভিত সরোবর, এবং রাজবর্ত্ম সকল নির্ম্মাণ করিয়া নূতন নগরী অত্যন্ত সুশোভিতা ও সমৃদ্ধিশালিনী করিলেন। প্রজাগণও হিন্দুরাজ্যের সংস্থাপন জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাকে ধন দান করিতে লাগিল। যাহার ধন নাই, সে শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা নগরনির্ম্মাণ ও রাজ্যরক্ষার সহায়তা করিতে লাগিল।

সীতারামের কর্ম্মঠতা এবং প্রজাবর্গের হিন্দুরাজ্য স্থাপনের উৎসাহে অতি অল্পদিনেই এই সকল ব্যাপার সুসম্পন্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি রাজা নাম গ্রহণ করিলেন না; কেন না, দিল্লীর বাদশাহ তাঁহাকে রাজা না করিলে, তিনি যদি রাজোপাধি গ্রহণ করেন, তবে মুসলমানেরা তাঁহাকে বিদ্রোহী বিবেচনা করিয়া তাঁহার উচ্ছেদের চেষ্টা করিবে, ইহা তিনি জানিতেন। এ পর্য্যন্ত তিনি বিদ্রোহিতার কোন কার্য্য করেন নাই। গঙ্গারামের উদ্ধারের জন্য যে হাঙ্গামা হইয়াছিল, তাহাতে তিনি প্রকাশ্যে অস্ত্রধারী বা উৎসাহী ছিলেন বলিয়া ফৌজদারের জানিবার কোন কারণ উপস্থিত হয় নাই। কাজেই তাঁহাকে বিদ্রোহী বিবেচনা করার কোন কারণ ছিল না। যখন তিনি রাজা নাম এখনও গ্রহণ করেন নাই; বরং দিল্লীশ্বরকে সম্রাট্ স্বীকার করিয়া জমিদারীর খাজনা পূর্ব্বমত রাজ-কোষাগারে পৌঁছিয়া দিতে লাগিলেন, এবং সর্ব্বপ্রকারে মুসলমানের সঙ্গে সদ্ভাব রাখিতে লাগিলেন; আর নূতন নগরীর নাম “মহম্মদপুর” রাখিয়া, হিন্দু ও মুসলমান প্রজার প্রতি তুল্য ব্যবহার করিতে লাগিলেন, তখন মুসলমানের অপ্রীতিভাজন হইবার আর কোন কারণ রহিল না।

তথাপি, তাঁহার প্রজাবৃদ্ধি, ক্ষমতাবৃদ্ধি, প্রতাপ, খ্যাতি এবং সমৃদ্ধি শুনিয়া ফৌজদার তোরাব খাঁ উদ্বিগ্নচিত্ত হইলেন। মনে মেনে স্থির করিলেন, একটা কোন ছল পাইলেই মহম্মদপুর লুঠপাট করিয়া সীতারামকে বিনষ্ট করিবেন। ছল ছুতারই বা অভাব কি? তোরাব খাঁ সীতারামকে আজ্ঞা করিয়া পাঠাইলেন যে, তোমার জমিদারীতে অনেকগুলি বিদ্রোহী ও পলাতক বদমাস বাস করিতেছে, ধরিয়া পাঠাইয়া দিবা। সীতারাম উত্তর করিলেন যে, অপরাধীদিগের নাম পাঠাইয়া দিলে তিনি তাহাদিগকে ধরিয়া পাঠাইয়া দিবেন। ফৌজদার পলাতক প্রজাদিগের নামের একটি তালিকা পাঠাইয়া দিলেন। শুনিয়া পলাতক প্রজারা সকলেই নাম বদলাইয়া বসিল। সীতারাম কাহারও নামের সহিত তালিকার মিল না দেখিয়া, লিখিয়া পাঠাইলেন যে, ফর্দ্দের লিখিত নাম কোন প্রজা স্বীকার করে না।

এইরূপে বাগ্‌বিতণ্ডা চলিতে লাগিল। উভয়ে উভয়ের মনের ভাব বুঝিলেন। তোরাব খাঁ, সীতারামের ধ্বংসের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। সীতারামও আত্মরক্ষার্থ মহম্মদপুরের চারি পার্শ্বে দুর্ল্লঙ্ঘ্য গড় প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। প্রজাদিগকে অস্ত্রবিদ্যা ও যুদ্ধরীতি শিখাইতে লাগিলেন, এবং সুন্দরবন-পথে গোপনে অস্ত্র সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

এই সকল কার্য্যে সীতারাম তিন জন উপযুক্ত সহায় পাইয়াছিলেন। এই তিন জন সহায় ছিল বলিয়া এই গুরুত্বর কার্য্য এত শীঘ্র এবং সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইয়াছিল। প্রথম সহায় চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার , দ্বিতীয়ের নাম মৃন্ময়, তৃতীয় গঙ্গারাম। বুদ্ধিতে চান্দ্রচূড়, বলে ও সাহসে মৃন্ময় এবং ক্ষিপ্রকারিতায় গঙ্গারাম। গঙ্গারাম সীতারামের একান্ত অনুগত ও কার্য্যকারী হইয়া মহম্মদপুরে বাস করিতেছিল। এই সময়ে চাঁদ শাহনামে এক জন মুসলমান ফকির, সীতারামের সভায় যাতায়াত আরম্ভ করিল। ফকির বিজ্ঞ, পণ্ডিত, নিরীহ এবং হিন্দু মুসলমানে সমদর্শী। তাঁহার সহিত সীতারামের বিশেষ সম্প্রীতি হইল। তাঁহারই পরামর্শমতে,

নবাবকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য সীতারাম রাজধানীর নাম রাখিলেন, “মহম্মদপুর”

ফকির আসে যায়। জিজ্ঞাসামতে সৎপরামর্শ দেয়। কেহ বিবাদের কথা তুলিলে তাহাকে ক্ষান্ত করে। অতএব আপাততঃ সকল বিষয় সুচারুমতে নির্ব্বাহ হইতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ

সীতারামের যেমন তিন জন সহায় ছিল, তেমনই তাঁহার এই মহৎ কার্য্যে একজন পরম শত্রু ছিল। শত্রু–তাঁহার কনিষ্ঠা পত্নী রমা।

রমা বড় ছোট মেয়েটি, জলে ধোয়া যুঁইফুলের মত বড় কোমলপ্রকৃতি। তাহার পক্ষে, এই জগতের যাহা কিছু সকলই দুর্জ্ঞেয় বিষম পদার্থ–সকলই তাহার কাছে ভয়ের বিষয়। বিবাদে রমার বড় ভয়। সীতারামের সাহসকে ও বীর্য্যকে রমার বড় ভয়। বিশেষ মুসলমান রাজ্য, তাহাদের সঙ্গে বিবাদে রমার বড় ভয়। তার উপর আবার রমা ভীষণ স্বপ্ন দেখিলেন। স্বপ্ন দেখিলেন যে, মুসলমানেরা যুদ্ধে জয়ী হইয়া তাঁহাকে এবং সীতারামকে ধরিয়া প্রহার করিতেছে। এখন রমা সেই অসংখ্য মুসলমানের দন্তশ্রেণী-প্রভাসিত বিশাল শ্মশ্রুল বদনমণ্ডল রাত্রিদিন চক্ষুতে দেখিতে লাগিল। তাহাদের বিকট চীৎকার রাত্রিদিন কাণে শুনিতে লাগিল। রমা সীতারামকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিল যে, ফৌজদারের পায়ে গিয়া কাঁদিয়া পড়–মুসলমান দয়া করিয়া ক্ষমা করিবে। সীতারাম সে কথায় কাণ দিলে না–রমাও আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিল। সীতারাম বুঝাইলেন যে, তিনি মুসলমানের কাছে কোন অপরাধ করেন নাই–রমা তত বুঝিতে পারিল না। শ্রাবণ মাসের মত, রাত্রিদিন রমার চক্ষুতে জলধারা বহিতে লাগিল। বিরক্ত হইয়া সীতারাম আর তত রমার দিকে আসিতেন না। কাজেই জ্যেষ্ঠা। (শ্রীকে গণিয়া মধ্যমা) পত্নী নন্দার একাদশে বৃহস্পতি লাগিয়া গেল।

দেখিয়া, বালিকাবুদ্ধি রমা আরও পাকা রকম বুঝিল যে, মুসলমানের সঙ্গে এই বিবাদে, তাঁহার ক্রমে সর্ব্বনাশ হইবে। অতএব রমা উঠিয়া পড়িয়া সীতারামের পিছনে লাগিল। কাঁদাকাটি, হাতে ধরা, পায় পড়া, মাথা খোঁড়ার জ্বালায় রমা যে অঞ্চলে থাকিত, সীতারাম আর সে প্রদেশ মাড়াইতেন না। তখন রমা, যে পথে তিনি নন্দার কাছে যাইতেন, সেই পথে লুকাইয়া থাকিত; সুবিধা পাইলে সহসা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইত; তার পর–সেই কাঁদাকাটি, হাতে ধরা, পায়ে পড়া, মাথা খোঁড়া–ঘ্যান্ ঘ্যান্ প্যান্ প্যান্–কখনও মুষলের ধার, কখনও ইল্‌সে গুড়ুনি, কখনও কালবৈশাখী, কখনও কার্ত্তিকে ঝড়। ধুয়োটা সেই এক–মুসলমানের পায়ে কাঁদিয়া গিয়া পড়–নহিলে কি বিপদ্ ঘটিবে! সীতারামের হাড় জ্বালাতন হইয়া উঠিল।

তার পর যখন রমা দেখিল, মহম্মদপুর ভূষণার অপেক্ষা জনাকীর্ণা রাজধানী হইয়া উঠিল, তাঁহার গড়খাই, প্রাচীর, পরিখা, তাহার উপর কামান সাজান, সেলেখানা গোলাগুলি কামান বন্দুক নানা অস্ত্রে পরিপূর্ণ, দলে দলে সিপাহী কাওয়াজ করিতেছে, তখন রমা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া, বিছানা লইল। যখন একবার পূজাহ্নিকের জন্য শয্যা হইতে উঠিত, তখন রমা ইষ্টদেবের নিকট সত্য যুক্তকরে প্রার্থনা করিত–“হে ঠাকুর! মহম্মদপুর ছারেখারে যাক্–আমরা আবার মুসলমানের অনুগত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে দিনপাত করি। এ মহাভয় হইতে আমাদের উদ্ধার কর।” সীতারাম সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তাঁহার সম্মুখেই রমা দেবতার কাছে সেই কামনা করিত।

বলা বাহুল্য, রমার এই বিরক্তিকর আচরণে সে সীতারামের চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিল। তখন সীতারাম মনে মনে বলিতেন, “হায়! এ দিনে যদি শ্রী আমার সহায় হইত!” শ্রী রাত্রিদিন তাঁহার মনে জাগিতেছিল। শ্রীর স্মরণপটস্থা মূর্ত্তির কাছে নন্দাও নয়, রমাও নয়। কিন্তু মনের কথা জানিতে পারিলে রমা, কি নন্দা পাছে মনে ব্যাথা পায়, এজন্য সীতারাম কখন শ্রীর নাম মুখে আনিতেন না। তবে রমার জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া এক দিন তিনি বলিয়াছেন, “হায়! শ্রীকে ত্যাগ

করিয়া কি রমাকে পাইলাম।”

রমা চক্ষু মুছিয়া বলিল, “তা শ্রীকে গ্রহণ কর না কেন? কে তোমায় নিষেধ করে?”

সীতারাম দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, “শ্রীকে এখন আর কোথায় পাইব!” কথাটা রমার হাড়ে হাড়ে লাগিল। রমার অপরাধ যাই হৌক, স্বামী পুত্রের প্রতি অতিশয় স্নেহই তাহার মূল। পাছে তাহাদের কোন বিপদ্ ঘটে, এই চিন্তাতেই সে এত ব্যাকুল। সীতারাম তাহা না বুঝিতেন, এমন নহে। বুঝিয়াও রমার প্রতি প্রসন্ন থাকিতে পারিলেন না—বড় ঘ্যান্ ঘ্যান্ প্যান্ প্যান্—বড় কাজের বিঘ্ন—বড় যন্ত্রণা। স্ত্রীপুরুষে পরস্পর ভালবাসাই দাম্পত্য সুখ নহে, একাভিসন্ধি—সহৃদয়তা—ইহাই দাম্পত্য সুখ! রমা বুঝিল, বিনাপরাধে আমি স্বামীর স্নেহ হারাইয়াছি। সীতারাম ভাবিল, “গুরুদেব! রমার ভালবাসা হইতে আমায় উদ্ধার কর।”

রমার দোষে, সীতারামের হৃদয়স্থিত সেই চিত্রপট দিন দিন আরও উজ্জ্বল প্রভাবিশিষ্ট হইতে লাগিল। সীতারাম মনে করিয়াছিলেন, রাজ্যসংস্থাপন ভিন্ন আর কিছুকেই তিনি মনে স্থান দিবেন না—কিন্তু এখন শ্রী আসিয়া ক্রমে ক্রমে সেই সিংহাসনের আধখান জুড়িয়া বসিল। সীতারাম মনে করিলেন, আমি শ্রীর কাছে যে পাপ করিয়াছি, রমার কাছে তাহার দণ্ড পাইতেছি। ইহার অন্য প্রায়শ্চিত্ত চাই।

কিন্তু এ মন্দিরে এ প্রতিমা স্থাপনে যে রমাই একা ব্রতী, এমন নহে। নন্দাও তাহার সহায়, কিন্তু আর এক রকমে। মুসলমান হইতে নন্দার কোন ভয় নাই। যখন সীতারামের সাহস আছে, তখন নন্দার সে কথার আন্দোলনে প্রয়োজন নাই। নন্দা বিবেচনা করিত, সে কথার ভাল মন্দের বিচারক আমার স্বামী—তিনি যদি ভাল বুঝেন, তবে আমার সে ভাবনায় কাজ কি? তাই নন্দা সে সকল কথাকে মনে স্থান না দিয়া, প্রাণপাত করিয়া পতিপদসেবায় নিযুক্তা। মাতার মত স্নেহ, কন্যার মত ভক্তি, দাসীর মত সেবা, সীতারাম সকলই নন্দার কাছে পাইতেছিলেন। কিন্তু সহধর্ম্মিনী কই? যে তাঁহার উচ্চ আশায় আশাবতী, হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার ভগিনী, কঠিন কার্য্যের সহায়, সঙ্কটে মন্ত্রী, বিপদে সাহসদায়িনী, জয়ে আনন্দময়ী, সে কই? বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী ভাল, কিন্তু সমরে সিংহবাহিনী কই? তাই নন্দার ভালবাসায়, সীতারামের পদে পদে শ্রীকে মনে পড়িত, পদে পদে সেই সংক্ষুব্ধসৈন্য-সঞ্চালিনীকে মনে পড়িত। “মার! মার! শত্রু মার! দেশের শত্রু, হিন্দুর শত্রু, আমার শত্রু মার!”—সেই কথা মনে পড়িত। সীতারাম তাই মনে মনে সেই মহিমাময়ী সিংহবাহিনী মূর্ত্তি পূজা করিতে লাগিলেন।

প্রেম কি, তাহা আমি জানি না। দেখিল আর মজিল, আর কিছু মানিল না, কই এমন দাবানল ত সংসারে দেখিতে পাই না। প্রেমের কথা পুস্তকে পড়িয়া থাকি বটে, কিন্তু সংসারে “ভালবাসা”, স্নেহ ভিন্ন প্রেমের মত কোন সামগ্রী দেখিতে পাই নাই, সুতরাং তাহার বর্ণনা করিতে পারিলাম না। প্রেম, যাহা পুস্তকে বর্ণিত, তাহা আকাশকুসুমের মত কোন একটা সামগ্রী হইতে পারে, যুবক-যুবতীগণের মনোরঞ্জন জন্য কবিগণ কর্ত্তৃক সৃষ্টি হইয়াছে বোধ হয়। তবে একটা কথা স্বীকার করিতে হয়। ভালবাসা বা স্নেহ, যাহা সংসারে এত আদরের, তাহা পুরাতনেরই প্রাপ্য, নূতনের প্রতি জন্মে না। যাহার সংসর্গে অনেক কাল কাটাইয়াছি, বিপদে, সম্পদে, সুদিন, দুর্দ্দিনে যাহার গুণ বুঝিয়াছি, সুখ দুঃখের বন্ধনে যাহার সঙ্গে বদ্ধ হইয়াছি, ভালবাসা বা স্নেহ তাহারই প্রতি জন্মে। কিন্তু নূতন আর একটা সামগ্রী পাইয়া থাকে। নূতন বলিয়াই তাহার একটা আদর আছে। কিন্তু তাহা ছাড়া আরও আছে। তাহার গুণ জানি না, কিন্তু চিহ্ন দেখিয়া অনুমান করিয়া লইতে পারি। যাহা পরীক্ষিত, তাহা সীমাবদ্ধ; যাহা অপরীক্ষিত, কেবল অনুমিত, তাহার সীমা দেওয়া না দেওয়া মনের অবস্থার উপর নির্ভর করে। তাই নূতনের গুণ অনেক সময়ে অসীম বলিয়া বোধ হয়। তাই সে নূতনের জন্য বাসনা দুর্দ্দমনীয় হইয়া পড়ে। যদি ইহাকে প্রেম বল, তবে সংসারে প্রেম আছে। সে প্রেম বড় উন্মাদকর বটে। নূতনেরই তাহা প্রাপ্য। তাহার টানে পুরাতন অনেক সময়ে ভাসিয়া যায়। শ্রী সীতারামের পক্ষে নূতন। শ্রীর প্রতি সেই উন্মাদকর প্রেম সীতারামের চিত্ত অধিকৃত করিল। তাহার স্রোতে, নন্দা রমা ভাসিয়া গেল।

হায় নূতন! তুমিই কি সুন্দর? না, সেই পুরাতনই সুন্দর। তবে, তুমি সুন্দর! তুমি অনন্তের অংশ। অনন্তের একটুখানিমাত্র আমরা জানি। সেই একটুখানি আমাদের কাছে পুরাতন; অনন্তের আর সব আমাদের কাছে নূতন। অনন্তের যাহা অজ্ঞাত, তাহাও অনন্ত। নূতন, তুমি অনন্তেরই অংশ। তাই তুমি এত উন্মাদকর। শ্রী, আজ সীতারামের কাছে– অনন্তের অংশ।

হায়! তোমার আমার কি নূতন মিলিবে না? তোমার আমার কি শ্রী মিলিবে না? যে দিন সব পুরাতন ছাড়িয়া যাইব, সেই দিন সব নূতন পাইব, অনন্তের সম্মুখে মুখামুখী হইয়া দাঁড়াইব। নয়ন মুদিলে শ্রী মিলিবে। তত দিন এসো, আমরা বুক বাঁধিয়া, হরিনাম করি। হরিনামে অনন্ত মিলে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

"এই ত বৈতরণী! পার হইলে না কি সকল জ্বালা জুড়ায়! আমার জ্বালা জুড়াইবে কি?"

খরবাহিনী বৈতরণীসৈকতে দাঁড়াইয়া একাকিনী শ্রী এই কথা বলিতেছিল। পশ্চাৎ অতি দূরে নীলমেঘের মত নীলগিরির* শিখরপুঞ্জ দেখা যাইতেছিল; সম্মুখে নীলসলিলবাহিনী বক্রগামিনী তটিনী রজতপ্রস্তরবৎ বিস্তৃত সৈকতমধ্যে বাহিতা হইতেছিল; পারে কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত সোপানাবলীর উপর সপ্ত মাতৃকার মণ্ডপ শোভা পাইতেছিল; তন্মধ্যে আসীনা সপ্ত মাতৃকার প্রস্তরময়ী মূর্ত্তিও কিছু কিছু দেখা যাইতেছিল; রাজ্ঞীশোভাসমন্বিতা ইন্দ্রাণী, মধুররূপিণী বৈষ্ণবী, কৌমারী, ব্রহ্মাণী, সাক্ষাৎ বীভৎসরসরূপধারিণী যমপ্রসূতি ছায়া, নানালঙ্কারভূষিতা বিপুলোরুকরচরণোরসী কম্বুকণ্ঠান্দোলিতরত্নহারা লম্বোদরা চীনাম্বরা বরাহবদনা বারাহী, বিশুষ্কাস্থিচর্ম্মমাত্রাবশেষা পলিতকেশা নগ্নবেশা চণ্ডমুণ্ডধারিণী ভীষণা চামুণ্ডা, রাশি রাশি কুসুম চন্দন বিল্বপত্রে প্রপীড়িতা হইয়া বিরাজ করিতেছে। তৎপশ্চাৎ বিষ্ণুমণ্ডপের উচ্চ চূড়া নীলাকাশে চিত্রিত; তৎপরে নীলপ্রস্তরের উচ্চস্তম্ভোপরি আকাশমার্গে খগপতি গরুড় সমাসীন।* অতি দূরে উদয়গিরির ও লতিতগিরির বিশাল নীল কলেবর আকাশপ্রান্তে শয়ান।ঞ্জ এই সকলের প্রতি শ্রী চাহিয়া দেখিল; বলিল, "হায়! এই ত বৈতরণী! পার হইলে আমার জ্বালা জুড়াইবে কি?"

"এ সে বৈতরণী নহে–

যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী–

আগে যমদ্বারে উপস্থিত হও–তবে সে বৈতরণী দেখিবে।"

পিছন হইতে শ্রীর কথার কেহ এই উত্তর দিল। শ্রী ফিরিয়া দেখিল, এক সন্ন্যাসিনী।

শ্রী বলিল, "ওমা! সেই সন্ন্যাসিনী! তা, মা, যমদ্বার বৈতরণীর এ পারে, না ও পারে?"

সন্ন্যাসিনী হাসিল, বলিল, "বৈতরণী পার হইয়া যমপুরে পৌঁছিতে হয়। কেন মা, এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে? তুমি এ পারেই কি যমযন্ত্রণা ভোগ করিতেছ?"

শ্রী। যন্ত্রণা বোধ হয় দুই পারেই আছে।

সন্ন্যাসিনী। না, মা, যন্ত্রণা সব এই পারেই। ও পারে যে যন্ত্রণার কথা শুনিতে পাও, সে আমরা এই পার হইতে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাই। আমাদের এ

---

* বালেশ্বর জেলার উত্তরভাগস্থিত কতকগুলি পর্ব্বতকে নীলগিরি বলে। তাহাই কোন কোন স্থানে বৈতরণীতীর হইতে দেখা যায়।

* এই গুরুড়স্তম্ভ দেখিতে অতি চমৎকার।

ঞ্জ পুরুষোত্তম যাইবার আধুনিক যে রাজপথ, এই সকল পর্ব্বত, তাহার বামে থাকে। নিকট নহে।

জন্মের সঞ্চিত পাপগুলি আমরা গাঁটরি বাঁধিয়া, বৈতরণীর সেই ক্ষেয়ারীর ক্ষেয়ায় বোঝাই দিয়া, বিনা কড়িতে পার করিয়া লইয়া যাই। পরে যমালয়ে গিয়া গাঁটরি খুলিয়া ধীরে সুস্থে সেই ঐশ্বর্য্য একা একা ভোগ করি।

শ্রী। তা, মা, বোঝাটা এ পারে রাখিয়া যাইবার উপায় আছে কি? থাকে ত আমায় বলিয়া দাও, আমি শীঘ্র শীঘ্র উহার বিলি করিয়া বেলায় বেলায় পার হইয়া চলিয়া যাই, রাত করিবার দরকার দেখি না–

সন্ন্যাসিনী। এত তাড়াতাড়ি কেন মা? এখনও তোমার সকাল বেলা।

শ্রী। বেলা হ'লে বাতাস উঠিবে।

সন্ন্যাসিনীর আজিও তুফানের বেলা হয় নাই–বয়সটা কাঁচা রকমের। তাই শ্রী এই রকমের কথা কহিতে সাহস করিতেছিল। সন্ন্যাসিনীও সেই রকম উত্তর দিল, "তুফানের ভয় কর মা! কেন, তোমার কি তেমন পাকা মাঝি নাই?"

শ্রী। পাকা মাঝি আছে, কিন্তু তাঁর নৌকায় উঠিলাম না। কেন তাঁর নৌকা ভারি করিব?

সন্ন্যাসিনী। তাই কি খুঁজিয়া খুঁজিয়া বৈতরণী-তীরে আসিয়া বসিয়া আছ?

শ্রী। আরও পাকা মাঝির সন্ধানে যাইতেছি। শুনিয়াছি, শ্রীক্ষেত্রে যিনি বিরাজ করেন, তিনিই না কি পারের কাণ্ডারী।

সন্ন্যাসিনী। আমিও সেই কাণ্ডারী খুঁজিতে যাইতেছি। চল না, দুই জনে একত্রে যাই। কিন্তু আজ তুমি একা কেন? সে দিন সুবর্ণরেখাতীরে তোমাকে দেখিয়াছিলাম, তখন তোমার সঙ্গে অনেক লোক ছিল–আজ একা কেন?

শ্রী। আমার কেহ নাই। অর্থাৎ আমার অনেক আছে, কিন্তু আমি ইচ্ছাক্রমে সর্ব্বত্যাগী। আমি এক যাত্রীর দলে জুটিয়া শ্রীক্ষেত্রে যাইতেছিলাম, কিন্তু যে যাত্রাওয়ালার (পাণ্ডা) সঙ্গে আমরা যাইতেছিলাম, তিনি আমার প্রতি কিছু কৃপাদৃষ্টি করার লক্ষণ দেখিলাম। কিছু দৌরাত্ম্যের সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া কালি রাত্রিতে যাত্রীর দল হইতে সরিয়া পড়িয়াছিলাম।

সন্ন্যাসিনী। এখন?

শ্রী। এখন, বৈতরণী-তীরে আসিয়া ভাবিতেছি, দুই বার পারে কাজ নাই। একবারই ভাল জল যথেষ্ট আছে।

সন্ন্যাসিনী। সে কথাটা না হয়, তোমায় আমায় দুই দিন বিচার করিয়া দেখা যাইবে। তার পর বিচারে যাহা স্থির হয়, তাহাই করিও। বৈতরণী ত তোমার ভয়ে পলাইবে না! কেমন? আমার সঙ্গে আসিবে কি?

শ্রীর মন টলিল। শ্রীর এক পয়সা পুঁজি নাই। দল ছাড়িয়া আসিয়া অবধি আহার হয় নাই; শ্রী দেখিতেছিল, ভিক্ষা এবং মৃত্যু এই দুই ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এই সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে যেন উপায়ান্তর হইতে পারে বোধ হইল, কিন্তু তাহাতেও সন্দেহ উপস্থিত হইল। জিজ্ঞাসা করিল, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব মা? তুমি দিনপাত কর কিসে?"

সন্ন্যাসিনী। ভিক্ষায়।

শ্রী। আমি তাহা পারিব না–বৈতরণী তাহার অপেক্ষা সহজ বোধ হইতেছিল।

সন্ন্যাসিনী। তাহা তোমায় করিতে হইবে না– আমি তোমার হইয়া ভিক্ষা করিব।

শ্রী। বাছা, তোমার এই বয়স–তুমি আমার অপেক্ষা ছোট বৈ বড় হইবে না। তোমার এই রূপের রাশি–

সন্ন্যাসিনী অতিশয় সুন্দরী—বুঝি শ্রীর অপেক্ষাও সুন্দরী। কিন্তু রূপ ঢাকিবার জন্য আচ্ছা করিয়া বিভূতি মাখিয়াছিল। তাহাতে হিতে বিপরীত হইয়াছিল—ঘসা ফানুষের ভিতর আলোর মত রূপের আগুন আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

শ্রীর কথার উত্তরে সন্ন্যাসিনী বলিল, "আমরা উদাসীন, সংসারত্যাগী, আমাদের কিছুতেই কোন ভয় নাই। ধর্ম্ম আমাদের রক্ষা করেন।"

শ্রী। তা যেন হইল। তুমি সন্ন্যাসিনী বলিয়া নির্ভয়। কিন্তু আমি বেলপাতের পোকার মত, তোমার সঙ্গে বেড়াইব কি প্রকারে? তুমিই বা লোকের কাছে এ পোকার কি পরিচয় দিবে? বলিবে কি যে, উড়িয়া আসিয়া গায়ে পড়িয়াছে?

সন্ন্যাসিনী হাসিল—ফুল্লাধরে মধুর হাসিতে বিদ্যুদ্দীপ্ত মেঘাবৃত আকাশের ন্যায়, সেই ভস্মাবৃত রূপমাধুরী প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

সন্ন্যাসিনী বলিল, "তুমিও কেন বাছা এই বেশ গ্রহণ কর না?"

শ্রী শিহরিয়া উঠিল,—বলিল, "সে কি? আমি সন্ন্যাসিনী হইবার কে?"

সন্ন্যাসিনী। আমি তাহা হইতে বলিতেছি না। তুমি যখন সর্ব্বত্যাগী হইয়াছ বলিতেছ, তখন তোমার চিত্তে যদি পাপ না থাকে, তবে হইলেই বা দোষ কি? কিন্তু এখন সে কথা থাক—এখন তা বলিতেছি না। এখন এই বেশ ছদ্মবেশস্বরূপ গ্রহণ কর না—তাতে দোষ কি?

শ্রী। মাথা মুড়াইতে হইবে? আমি সধবা।

সন্ন্যাসিনী। আমি মাথা মুড়াই নাই দেখিতেছ।

শ্রী। জটা ধারণ করিয়াছ?

সন্নাসিনী। না, তাও করি নাই। তবে চুলগুলোতে কখনও তেল দিই না, ছাই মাখিয়া রাখি, তাই কিছু জট পড়িয়া থাকিবে।

শ্রী। চুলগুলি যেরূপ কুণ্ডলী করিয়া ফণা ধরিয়া আছে, আমার ইচ্ছা করিতেছে, একবার তেল দিয়া আঁচড়াইয়া বাঁধিয়া দিই।

সন্ন্যা। জন্মান্তরে হইবে,— যদি মানবদেহ পাই। এখন তোমায় সন্ন্যাসিনী সাজাইব কি?

শ্রী। কেবল চুলে ছাই মাখিলেই কি সাজ হইবে?

সন্ন্যা। না—গৈরিক, রুদ্রাক্ষ বিভূতি, সব আমার এই রাঙ্গা ঝুলিতে আছে। সব দিব।

শ্রী কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া সম্মত হইল। তখন নিভৃত এক বৃক্ষতলে বসিয়া সেই রূপসী সন্ন্যাসিনী সাজাইল। কেশদামে ভস্ম মাখাইল, অঙ্গে গৈরিক পরাইল, কণ্ঠে ও বাহুতে রুদ্রাক্ষ পরাইল, সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি লেপন করিল, পরে রঙ্গের দিকে মন দিয়া শ্রীর কপালে একটি চন্দনের টিপ দিয়া দিল। তখন ভুবনবিজয়ীভিলাষী মধুমন্মথের ন্যায় দুই জনে যাত্রা করিয়া, বৈতরণী পার হইয়া, সে দিন এক দেবমন্দিরের অতিথিশালায় রাত্রি যাপন করিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রাতে উঠিয়া, খরস্রোতা* জলে যথাবিধি স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া শ্রী ও সন্ন্যাসিনী, বিভূতি রুদ্রাক্ষাদি-শোভিত হইয়া পুনরপি "সঞ্চারিণী দীপশিখা"দ্বয়ের ন্যায় শ্রীক্ষেত্রের পথ আলো করিয়া চলিল। তৎপ্রদেশবাসীরা সর্ব্বদাই নানাবিধ যাত্রীকে সেই পথে যাতায়াত করিতে দেখে, কোন প্রকার যাত্রী

---

* নদীর নাম।

দেখিয়া বিস্মিত হয় না, কিন্তু আজ ইহাদিগকে দেখিয়া তাহারাও বিস্মিত হইল। কেহ বলিল, "কি পরি মাইকিনিয়া মানে যাউছন্তি পারা?" কেহ বলিল, "সে মানে দ্যাবতা হ্যাব।" কেই আসিয়া প্রণাম করিল; কেহ ধন দৌলত বর মাগিল একজন পণ্ডিত তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া বলিল, "কিছু বলিও না; ইঁহার বোধ হয় রুক্মিণী সত্যভামা স্বশরীরে স্বামিদর্শনে যাইতেছেন।" অপরে মনে করিল যে, রুক্মিণী সত্যভামা শ্রীক্ষেত্রেই আছেন, তাঁহাদিগের গমন সম্ভব নহে; অতএব নিশ্চয়ই ইঁহারা শ্রীরাধিকা এবং চন্দ্রাবলী, গোপকন্যা বলিয়া পদব্রজে যাইতেছেন। এই সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইলে, এক দুষ্টা স্ত্রী বলিল, "হউ হউ! যা! যা! সেঠিরে তা ভৌউড়ি* অছি, তুমানঙ্কো মারি পকাইব।"

এ দিকে শ্রীরাধিকা চন্দ্রাবলী আপন মনে কথোপকথন করিতে করিতে যাইতেছিল। সন্ন্যাসিনী বিরাগিণী প্রব্রজিতা, অনেক দিন হইতে তাহার সুহৃদ্ কেহ নাই; আর এক জন সমবয়স্কা প্রব্রজিতাকে পাইয়া তাহার চিত্ত একটু প্রফুল্ল হইয়াছিল। এখনও তার জীবনস্রোতঃ কিছুই শুকায় নাই। বরং শ্রীর শুকাইয়াছিল; কেন না, শ্রী দুঃখ কি, তাহা জানিয়াছিল, সন্ন্যাসী বৈরাগীর দুঃখ নাই। কথাবার্ত্তা যাহা হইতেছিল, তাহার মধ্যে গোটা দুই কথা কেবল পাঠককে শুনান আবশ্যক।

সন্ন্যাসিনী। তুমি বলিতেছ, তোমার স্বামী আছেন। তিনি তোমাকে লইয়া ঘর সংসার করিতেও ইচ্ছুক। তাতে তুমি গৃহত্যাগিনী হইয়াছ কেন, তাও তোমায় জিজ্ঞাসা করি না। কেন না, তোমার ঘরের কথা আমার জানিয়া কি হইবে? তবে এটা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি যে, কখনও ঘরে ফিরিয়া যাইবার তোমার ইচ্ছা আছে কি না?

শ্রী। তুমি হাত দেখিতে জান?

সন্ন্যা। না হাত দেখিয়া কি তাহা জানিতে হইবে?

শ্রী। না। তাহা হইলে আমি তোমাকে হাত দেখাইয়া, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া, সে বিষয় স্থির করিতাম।

সন্ন্যা। আমি হাত দেখিতে জানি না। কিন্তু তোমাকে এমন লোকের কাছে লইয়া যাইতে পারি যে, তিনি এ বিদ্যায় ও আর সকল বিদ্যাতেই অভ্রান্ত।

শ্রী। কোথায় তিনি?

সন্ন্যা। ললিতগিরিতে হস্তিগুম্ফায় এক যোগী বাস করেন। আমি তাঁহার কথা বলিতেছি।

শ্রী। ললিতগিরি কোথায়?

সন্ন্যা। আমরা চেষ্টা করিলে আজ সন্ধ্যায় পর পৌঁছিতে পারি।

শ্রী। তবে চল।

তখন দুই জনে দ্রুতগতি চলিতে লাগিল। জ্যোতির্ব্বিদ্ দেখিলে বলিত, আজ বৃহস্পতি শুক্র উভয় গ্রহ যুক্ত হইয়া শীঘ্রগামী হইয়াছে।ঞ্জ

---

* সুভদ্রা।

ঞ্জ হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্রে Accelerated Motion কে শীঘ্রগতি বলে। দুইটি গ্রহকে পৃথিবী হইতে যখন এক রাশিস্থিত দেখা যায়, তখন তাহাদিগকে যুক্ত বলা যায়।

ত্রয়োদশী পরিচ্ছেদ

এক পারে উদয়গিরি, অপর পারে ললিতগিরি, মধ্যে স্বচ্ছসলিলা কল্লোলিনী বিরূপা নদী, নীলবারিরাশি লইয়া সমুদ্রাভিমুখে চলিয়াছে।ঞ্জ গিরিশিখরদ্বয়ে আরোহণ করিলে নিম্নে সহস্র সহস্র তালবৃক্ষ শোভিত, ধান্য বা হরিৎক্ষেত্রে চিত্রিত, পৃথ্বী অতিশয় মনোমোহিনী দেখা যায়–শিশু যেমন মার কোলে উঠিলে মাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দেখে, মনুষ্য পর্ব্বতারোহণ করিয়া পৃথিবী দর্শন করিলে সেইরূপ দেখে। উদয়গিরি (বর্ত্তমান অল্‌তিগিরি) বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ, কিন্তু ললিতগিরি (বর্ত্তমান নাল্‌তিগিরি) বৃক্ষশূন্য প্রস্তরময়। এককালে ইহার শিখর ও সানুদেশ অট্টালিকা স্তূপ এবং বৌদ্ধ মন্দিরাদিতে শোভিত ছিল। এখন শোভার মধ্যে শিখরদেশে চন্দনবৃক্ষ, আর মৃত্তিকাপ্রোথিত ভগ্নগৃহবিশিষ্ট প্রস্তর, ইষ্টক বা মনোমুগ্ধকর প্রস্তরগঠিত মূর্ত্তিরাশি। তাহার দুই চারিটা কলিকাতার বড় বড় ইমারতের ভিতর থাকিলে কলিকাতার শোভা হইত। হায়! এখন কি না হিন্দুকে ইণ্ডাষ্ট্রিয়ল্ স্কুলে পুতুল গড়া শিখিতে হয়! কুমারসম্ভব ছাড়িয়া সুইন্‌বর্ণ পড়ি, গীতা ছাড়িয়া মিল্ পড়ি, আর উড়িষ্যার প্রস্তর শিল্প ছাড়িয়া সাহেবদের চীনের পুতুল হাঁ করিয়া দেখি। আরও কি কপালে আছে বলিতে পারি না।

আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাই লিখিতেছি। সেই ললিতগিরি আমার চিরকাল মনে থাকিবে। চারি দিকে–যোজনের পর যোজন ব্যাপিয়া–হরিদ্বর্ণ ধান্যক্ষেত্র,–মাতা বসুমতীর অঙ্গে বহুযোজন-বিস্তৃতা পীতাম্বরী শাটী! তাহার উপর মাতার অলঙ্কার স্বরূপ, তালবৃক্ষশ্রেণী–সহস্র সহস্র, তার পর সহস্র সহস্র তালবৃক্ষ; সরল, সুপত্র, শোভাময়! মধ্যে নীলসলিলা, বিরূপা, নীল পীত পুষ্পময় হরিৎক্ষেত্র মধ্য দিয়া বহিতেছে–সুকোমল গালিচার উপর কে নদী আঁকিয়া দিয়াছে। তা হোক–চারি পাশে মৃত মহাত্মাদের মহীয়সী কীর্ত্তি। পাথর এমন করিয়া যে পালিশ করিয়াছিল, সে কি এই আমাদের মত হিন্দু? এমন করিয়া বিনা বন্ধনে যে গাঁথিয়াছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু? আর এই প্রস্তরমূর্ত্তি সকল যে খোদিয়াছিল–এই দিব্য পুষ্পমাল্যভরণভূষিত বিকম্পিতচেলাঞ্চলপ্রবৃদ্ধসৌন্দর্য্য, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরগঠন, পৌরুষের সহিত লাবণ্যের মূর্ত্তিমান্ সম্মিলনস্বরূপ পুরুষমূর্ত্তি, যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? এই কোপপ্রেমগর্ব্বসৌভাগ্যস্ফুরিতাধরা, চীনাম্বরা, তরলিতরত্নহারা, পীবরযৌবনভারাবনতদেহা–

তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ–

এই সকল স্ত্রীমূর্ত্তি যারা গড়িয়াছে, তারা কি হিন্দু? তখন হিন্দুকে মনে পড়িল। তখন মনে পড়িল, উপনিষদ্, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, শুকুন্তলা, পাণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, বৈশেষিক, এ সকলই হিন্দুর কীর্ত্তি–এ পুতুল কোন্ ছার! তখন মনে করিলাম, হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি।

সেই ললিতগিরির পদতলে বিরূপা-তীরে গিরির শরীরমধ্যে, হস্তিগুম্ফা নামে এক গুহা ছিল। গুহা বলিয়া, আবার ছিল বলিতেছি কেন? পর্ব্বতের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কি আবার লোপ পায়? কাল বিগুণ হইলে সবই লোপ পায়। গুহাও আর নাই। ছাদ পড়িয়া গিয়াছে, স্তম্ভ সকল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে,–তলদেশে ঘাস গজাইতেছে। সর্ব্বস্ব লোপ পাইয়াছে, গুহাটার জন্য দুঃখে কাজ কি?

কিন্তু গুহা বড় সুন্দর ছিল। পর্ব্বতাঙ্গ হইতে খোদিত স্তম্ভপ্রাকার প্রভৃতি বড় রমণীয় ছিল। চারি দিকে অপূর্ব্ব প্রস্তরে খোদিত নরমূর্ত্তি সকল শোভা করিত। তাহারই দুই চারিটি অজিও আছে। কিন্তু ছাতা পড়িয়াছে, রঙ্গ জ্বলিয়া গিয়াছে, কাহারও নাক ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও হাত ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও পা ভাঙ্গিয়াছে।

ঞ্জ এখন বিরূপা অতিশয় বিরূপা। এখন তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। ইংরেজের প্রতাপে বৈতরণী স্বয়ং বাঁধা– বিরূপাই বা কে– আর কেই বা কে?

পুতুলগুলাও আধুনিক হিন্দুর মত অঙ্গহীন হইয়া আছে।

কিন্তু গুহার এ দশা আজকাল হইয়াছে। আমি যখনকার কথা বলিতেছি, তখন এমন ছিল না–গুহা সম্পূর্ণ ছিল। তাহার ভিতর পরম যোগী মহাত্ম গঙ্গাধর স্বামী বাস করিতেন।

যথাকালে সন্ন্যাসিনী শ্রীকে সমভিব্যাহারে লইয়া তথা উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, গঙ্গাধর স্বামী তখন ধ্যানে নিমগ্ন। অতএব কিছু না বলিয়া, তাঁহারা সে রাত্রি গুহাপ্রান্তে শয়ন করিয়া যাপন করিলেন।

প্রত্যূষে ধ্যান ভঙ্গ হইলে, গঙ্গাধর স্বামী গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বিরূপায় স্নান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলেন। পরে তিনি প্রত্যাগত হইলে সন্ন্যাসিনী প্রণতা হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল; শ্রীও তাহাই করিল।

গঙ্গাধর স্বামী শ্রীর সঙ্গে তখন কোন কথা কহিলেন না, বা তৎসম্বন্ধে সন্ন্যাসিনীকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না; তিনি কেবল সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্য–সকল কথাই সংস্কৃত ভাষায় হইল। শ্রী তাহার এক বর্ণ বুঝিল না। যে কয়টা কথা পাঠকের জানিবার প্রয়োজন, তাহা বাঙ্গালায় বলিতেছি।

স্বামী। এ স্ত্রী কে?

সন্ন্যাসিনী। পথিক।

স্বামী। এখানে কেন?

সন্ন্যা। ভবিষ্যৎ লইয়া গোলে পড়িয়াছে। আপনাকে কর দেখাইবার জন্য আসিয়াছে। উহার প্রতি ধর্ম্মানুমত আদেশ করুন।

শ্রী তখন নিকটে আসিয়া আবার প্রণাম করিল। স্বামী তাহার মুখপানে চাহিয়া দেখিয়া হিন্দীতে বলিলেন, "তোমার কর্কট রাশি।"*

শ্রী নীরব।

"তোমার পুষ্যা নক্ষত্রস্থিত চন্দ্রে জন্ম।"

শ্রী নীরব।

"গুহার বাহিরে আইস–হাত দেখিব।"

তখন শ্রীকে বাহিরে আনিয়া, তাহার বাম হস্তের রেখা সকল স্বামী নিরীক্ষণ করিলেন। খড়ি পাতিয়া জন্মশক, দিন, বার, তিথি, দণ্ড, পল, সকল নিরূপণ করিলেন। পরে জন্মকুণ্ডলী অঙ্কিত করিয়া, গুহাস্থিত তালপত্রলিখিত প্রাচীন পঞ্জিকা দেখিয়া দ্বাদশ ভাবে গ্রহগণের যথাযথ সমাবেশ করিলেন। পরে শ্রীকে বলিলেন, "তোমার লগ্নে স্বক্ষেত্রস্থ পূর্ণচন্দ্র এবং সপ্তমে বুধ বৃহস্পতি শুক্র তিনটি শুভগ্রহ আছেন। তুমি সন্ন্যাসিনী কেন মা? তুমি যে রাজমহিষী।"ঞ্জ

শ্রী। শুনিয়াছি, আমার স্বামী রাজা হইয়াছেন। আমি তাহা দেখি নাই।

---

* পরকনকশরীরো দেবনম্রপ্রকাশ্যো।
ভবতি বিপুলবক্ষাঃ কর্কটো যস্য রাশিঃ।–কোষ্ঠীপ্রদীপে।
এইরূপ লক্ষণাদি দেখিয়া জ্যোতির্ব্বিদেরা রাশি ও নক্ষত্র নির্ণয় করেন।

ঞ্জ জায়াস্থে চ শুভত্রয়ে প্রণয়িনী রাজ্ঞী ভবেদ্ভূপতেঃ।

স্বামী। তুমি তাহা দেখিবে না বটে। এই সপ্তমস্থ বৃহস্পতি নীচস্থ, এবং শুভগ্রহত্রয় পাপগ্রহের ক্ষেত্রেঞ্জঞ্জ পাপদৃষ্ট হইয়া আছেন। তোমার অদৃষ্টে রাজ্যভোগ নাই।

শ্রী তা কিছুই বুঝে না, চুপ করিয়া রহিল। আরও একটু দেখিয়া স্বামীকে বলিল, "আর কিছু দুর্ভাগ্য দেখিতেছেন?"

স্বামী। চন্দ্র শনির ত্রিংশাংশগত।

শ্রী। তাহাতে কি হয়?

স্বামী। তুমি তোমার প্রিয়জনের প্রাণহন্ত্রী হইবে।

শ্রী আর বসিল না– উঠিয়া চলিল। স্বামী তাহাকে ইঙ্গিত করিয়া ফিরাইলেন। বলিলেন, "তিষ্ঠ। তোমার অদৃষ্টে এক পরম পুণ্য আছে। তাহার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। সময় উপস্থিত হইলে স্বামিসন্দর্শনে গমন করিও।"

শ্রী। কবে সে সময় উপস্থিত হইবে?

স্বামী। এখন তাহা বলিতে পারিতেছি না। অনেক গণনার প্রয়োজন। সে সময়ও নিকট নহে। তুমি কোথা যাইতেছ?

শ্রী। পুরুষোত্তমদর্শনে যাইব, মনে করিয়াছি।

স্বামী। যাও। সময়ান্তরে, আগামী বৎসরে, তুমি আমার নিকট আসিও। সময় নির্দ্দেশ করিয়া বলিব।

তখন স্বামী সন্ন্যাসিনীকেও বলিলেন, "তুমিও আসিও।"

তখন গঙ্গাধর স্বামী বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। সন্ন্যাসিনীদ্বয় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া গুহা হইতে বহির্গত হইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

আবার এই যুগল সন্ন্যাসিনীমূর্ত্তি উড়িষ্যার রাজপথ আলো করিয়া পুরুষোত্তমাভিমুখে চলিল। উড়িয়ারা পথে সারি দিয়া দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া দেখিতে লাগিল। কেহ আসিয়া তাহাদের পায়ের কাছে লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িয়া বলিল, "মো মুণ্ডেরে চরড় দিবারে হউ।" কেহ কেহ বলিল, "টিকে ঠিয়া হৈকিরি ম দুঃখ শুনিবারে হউ।" সকলকে যথাসম্ভব উত্তরে প্রফুল্ল করিয়া সুন্দরীদ্বয় চলিল।

চঞ্চলগামিনী শ্রীকে একটু স্থির করিবার জন্য সন্ন্যাসিনী বলিল, "ধীরে যা গো বহিন্! একটু ধীরে যা। ছুটিলে কি অদৃষ্ট ছাড়াইয়া যাইতে পারিবি?"

স্নেহসম্বোধনে শ্রীর প্রাণ একটু জুড়াইল। দুই দিন সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে থাকিয়া শ্রী তাহাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই দুই দিন, মা! বাছা! বলিয়া কথা হইতেছিল,–কেন না, সন্ন্যাসিনী শ্রীর পূজনীয়া। সন্ন্যাসিনী সে সম্বোধন ছাড়িয়া বহিন্ সম্বোধন করায় শ্রী বুঝিল যে, সেও ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছে। শ্রী ধীরে চলিল।

সন্ন্যাসিনী বলিতে লাগিল, "আর মা বাছা সম্বোধন তোমার সঙ্গে পোষায় না–আমাদের দুজনেরই সমান বয়স, আমরা দুই জনে ভগিনী।"

শ্রী। তুমিও কি আমার মত দুঃখে সংসার ত্যাগ করিয়াছ?

ঞ্জঞ্জ মকরে।

সন্ন্যাসিনী। আমার সুখ দুঃখ নাই। তেমন অদৃষ্ট নয়। তোমার দুঃখের কথা শুনিব। সে এখনকার কথা নয়। তোমার নাম এখনও পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করা হয় নাই–কি বলিয়া তোমায় ডাকিব?

শ্রী। আমার নাম শ্রী। তোমায় কি বলিয়া ডাকিব?

সন্ন্যাসিনী। আমার নাম জয়ন্তী। আমাকে তুমি নাম ধরিয়াই ডাকিও। এখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, স্বামী যাহা বলিলেন, তাহা শুনিলে? এখন বোধ হয় তোমার আর ঘরে ফিরিবার ইচ্ছা নাই। দিন কাটাইবারও অন্য উপায় নাই। দিন কাটাইবে কি প্রকারে, কখনও কি ভাবিয়াছ?

শ্রী। না। ভাবি নাই। কিন্তু এত দিন ত কাটিয়া গেল।

জয়ন্তী। কিরূপে কাটিল?

শ্রী। বড় কষ্টে–পৃথিবীতে এমন দুঃখ বুঝি আর নাই।

জয়ন্তী। ইহার এক উপায় আছে–আর কিছুতে মন দাও।

শ্রী। কিসে মন দিব?

জয়ন্তী। এত বড় জগৎ–কিছুই কি মন দিবার নাই?

শ্রী। পাপে?

জয়ন্তী। না। পুণ্যে।

শ্রী। স্ত্রীলোকের একমাত্র পুণ্য স্বামিসেবা। যখন তাই ছাড়িয়া আসিয়াছি–তখন আমার আবার পুণ্য কি আছে?

জয়ন্তী। স্বামীর এক জন স্বামী আছেন।

শ্রী। তিনি স্বামীর স্বামী–আমার নন। আমার স্বামীই আমার স্বামী–আর কেহ নহে।

জয়ন্তী। যিনি তোমার স্বামীর স্বামী, তিনি তোমারও স্বামী–কেন না, তিনি সকলের স্বামী।

শ্রী। আমি ঈশ্বরও জানি না–স্বামীই জানি।

জয়ন্তী। জানিবে? জানিলে এত দুঃখ থাকিবে না।

শ্রী। না। স্বামী ছাড়িয়া আমি ঈশ্বরও চাহি না। আমার স্বামীকে আমি ত্যাগ করিয়াছি বলিয়া আমার যে দুঃখ, আর ঈশ্বর পাইলে আমার যে সুখ, ইহার মধ্যে আমার স্বামিবিরহদুঃখই আমি ভালবাসি।

জয়ন্তী। যদি এত ভালবাসিয়াছিলে–তবে ত্যাগ করিলে কেন?

শ্রী। আমার কোষ্ঠীর ফল শুনিলে না? কোষ্ঠীর ফল শুনিয়াছিলাম।

জয়ন্তী। এত ভালবাসিয়াছিলে কিসে?

শ্রী তখন সংক্ষেপে আপনার পূর্ব্ববিবরণ সকল বলিল। শুনিয়া জয়ন্তীর চক্ষু একটু ছল ছল করিল। জয়ন্তী বলিল, “তোমার সঙ্গে তাঁর ত দেখা-সাক্ষাৎ নাই বলিলেও হয়–এত ভালবাসিলে কিসে?”

শ্রী। তুমি ঈশ্বর ভালবাস–কয় দিন ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে?

জয়ন্তী। আমি ঈশ্বরকে রাত্রি দিন মনে মনে ভাবি।

শ্রী। যে দিন বালিকা বয়সে তিনি আমায় ত্যাগ করিয়াছিলেন, সে দিন হইতে আমিও তাঁহাকে রাত্রি দিন ভাবিয়াছিলাম।

জয়ন্তী শুনিয়া রোমাঞ্চকলেবর হইয়া উঠিল। শ্রী বলিতে লাগিল, “যদি একত্র ঘর সংসার করিতাম, তাহা হইলে বুঝি এমনটা ঘটিত না। মানুষ মাত্রেরই দোষ গুণ আছে। তাঁরও দোষ থাকিতে পারে। না থাকিলেও আমার দোষে আমি তাঁর দোষ দেখিতাম। কখন না কখন, কথান্তর, মন ভার, অকৌশল ঘটিত। তা হইলে, এ আগুন এত জ্বলিত না। কেবল মনে মনে দেবতা গড়িয়া তাঁকে আমি এত বৎসর পূজা করিয়াছি। চন্দন ঘষিয়া, দেয়ালে লেপন করিয়া মনে করিয়াছি, তাঁর অঙ্গে মাখাইলাম। বাগানে বাগানে ফুল চুরি করিয়া তুলিয়া, দিনভোর কাজকর্ম্ম ফেলিয়া অনেক পরিশ্রমে মনের মত মালা গাঁথিয়া, ফুলভরা গাছের ডালে ঝুলাইয়া মনে করিয়াছি, তাঁর গলায় দিলাম। অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া ভাল খাবার সামগ্রী কিনিয়া পরিপাটি করিয়া রন্ধন করিয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দিয়া মনে করিয়াছি, তাঁকে খাইতে দিলাম। ঠাকুরপ্রণাম করিতে গিয়া কখনও মনে হয় নাই যে, ঠাকুরপ্রণাম করিতেছি–মাথার কাছে তাঁরই পাদপদ্ম দেখিয়াছি। তার পর জয়ন্তী–তাঁকে ছাড়িয়া আসিয়াছি। তিনি ডাকিলেন, তবু ছাড়িয়া আসিয়াছি।”

শ্রী আর কথা কহিতে পারিল না। মুখে অঞ্চল চাপিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিল।

জয়ন্তীর চক্ষু ছল ছল করিল। এমন সন্ন্যাসিনী কি সন্নাসিনী?

দ্বিতীয় খণ্ড

সন্ধ্যা-জয়ন্তী

প্রথম পরিচ্ছেদ

সীতারাম প্রথমাবধিই শ্রীর বহুবিধ অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। মাসের পর মাস গেল, বৎসরের পর বৎসর গেল। এই কয় বৎসর সীতারাম ক্রমশঃ শ্রীর অনুসন্ধান করিতেছিলেন। তীর্থে তীর্থে নগরে নগরে তাহার সন্ধানে লোক পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু কোন ফল দর্শে নাই। অন্য লোকে শ্রীকে চিনে না বলিয়া সন্ধান হইতেছে না, এই শঙ্কায় গঙ্গারামকেও কিছু দিনের জন্য রাজকর্ম্ম হইতে অবসৃত করিয়া এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। গঙ্গারামও বহু দেশ পর্য্যটন করিয়া শেষে নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল।

শেষে সীতারাম স্থির করিলেন যে, আর শ্রীকে মনে স্থান দিবেন না। রাজ্যস্থাপনেই চিত্তনিবেশ করিবেন। তিনি এ পর্য্যন্ত প্রকৃত রাজা হয়েন নাই; কেন না, দিল্লীর সম্রাট্ তাঁহাকে সনন্দ দেন নাই। তার সনন্দ পাইবার অভিলাষ হইল। সেই অভিপ্রায়ে তিনি অচিরে দিল্লী যাত্রা করিবেন, ইহা স্থির করিলেন।

কিন্ত সময়টা বড় মন্দ উপস্থিত হইল। কেন না, হিন্দুর হিন্দুয়ানি বড় মাথা তুলিয়া উঠিতেছিল, মুসলমানের তাহা অসহ্য হইয়া উঠিল। নিজ মহম্মদপুর উচ্চচূড় দেবালয় সকলে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। নিকটে গ্রামে গ্রামে নগরে নগলে গৃহে গৃহে দেবালয় প্রতিষ্ঠা, দৈবোৎসব, নৃত্য গীত, হরিসংকীর্ত্তনে দেশ চঞ্চল হইয়া

উঠিল। আবার এই সময়ে, মহাপাপিষ্ঠ, মনুষ্যাধম মুর্‌শিদ্ কুলি খাঁ* মুরশিদাবাদের মসনদে আরূঢ় থাকায়, সুবে বাঙ্গালার আর সকল প্রদেশে হিন্দুর উপর অতিশয় অত্যাচার হইতে লাগিল–বোধ হয়, ইতিহাসে তেমন অত্যাচার আর কোথাও লিখে না। মুর্‌শিদ্ কুলি খাঁ শুনিলেন, সর্ব্বত্র হিন্দু ধূল্যবলুণ্ঠিত, কেবল এইখানে তাহাদের বড় প্রশ্রয়। তখন তিনি তোরাব্ খাঁর প্রতি আদেশ পাঠাইলেন–“সীতারামকে বিনাশ কর।”

অতএব ভূষণায় সীতারামের ধ্বংসের উদ্যোগ হইতে লাগিল। তবে, ‘উদ্যোগ কর’ বলিবামাত্র উদ্যোগটা হইয়া উঠিল না। কেন না, মুর্‌শিদ্ কুলি খাঁ সীতারামের বধের জন্য হুকুম পাঠাইয়াছিলেন, ফৌজ পাঠান নাই। ইহাতে তিনি তোরাবের প্রতি কোন অবিচার করেন নাই, মুসলমানের পক্ষে তাঁহার অবিচার ছিল না। তখনকার সাধারণ নিয়ম এই ছিল যে–সাধারণ ‘শান্তিরক্ষার’ কার্য্য ফৌজদারেরা নিজ ব্যয়ে করিবেন,–বিশেষ কারণ ব্যতীত নবাবের সৈন্য ফৌজদারের সাহায্যে আসিত না। এক জন জমিদারকে শাসিত করা, সাধারণ শান্তিরক্ষার কার্য্যের মধ্যে গণ্য–তাই নবাব কোন সিপাহী পাঠাইলেন না। এ দিকে ফৌজদার হিসাব করিয়া দেখিলেন যে, যখন শুনা যাইতেছে যে, সীতারাম রায়, আপনার এলাকার সমস্ত বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষদিগকে অস্ত্রবিদ্যা শিখাইয়াছে, তখন ফৌজদারের যে কয় শত সিপাহী আছে, তাহা লইয়া মহম্মদপুর আক্রমণ করিতে যাওয়া বিধেয় হয় না। অতএব ফৌজদারের প্রথম কার্য্য সিপাহী-সংখ্যা বৃদ্ধি করা। সেটা দুই এক দিনে হয় না। বিশেষ তিনি পশ্চিমে মুসলমান–দেশী লোকের যুদ্ধ করিবার শাক্তির উপর তাঁহার কিছু মাত্র বিশ্বাস ছিল না। অতএব মুরশিদাবাদ বা বেহার বা পশ্চিমাঞ্চল ইহতে সুশিক্ষিত পাঠান আনাইতে নিযুক্ত হইলেন। বিশেষতঃ তিনি শুনিয়াছিলেন যে, সীতারামও অনেক শিক্ষিত রাজপুত ও ভোজপুরী (বেহারবাসী) আপনার সৈন্যমধ্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন। কাজেই তদুপযোগী সৈন্য সংগ্রহ না করিয়া সীতারামকে ধ্বংস করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছেন। কাজেই তদুপযোগী সৈন্য সংগ্রহ না করিয়া সীতারামকে ধ্বংস করিবার জন্য যাত্রা করিতে পারিলেন না। তাহাতে একটু কালবিলম্ব হইল। তত দিন যেমন চলিতেছিল, তেমনই চলিতে লাগিল।

তোরাব্ খাঁ বড় গোপনে গোপনে এই সকল উদ্যোগ করিতেছিলেন। সীতারাম অগ্রে যাহাতে কিছুই না জানিতে পারে, হঠাৎ গিয়া তাহার উপর ফৌজ লইয়া পড়েন, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। কিন্তু সীতারাম সমুদয়ই জানিতেন। চতুর চন্দ্রচূড় জানিতেন। গুপ্তচর ভিন্ন রাজ্য নাই–রামচন্দ্রেরও দুর্ম্মুখ ছিল। চন্দ্রচূড়ের গুপ্তচর ভূষণার ভিতরেও ছিল। অতএব সীতারামকে রাজধানী সহিত ধ্বংস করিবার আজ্ঞা যে মুরশিদাবাদ হইতে আসিয়াছে, এবং তজ্জন্য বাছা বাছা সিপাহী সংগ্রহ হইতেছে, ইহা চন্দ্রচূড় জানিলেন।

ইহার সকল উদ্যোগ করিয়া সীতারাম কিছু অর্থ এবং রক্ষকবর্গ সঙ্গে লইয়া দিল্লী যাত্রা করিলেন। গমনকালে সীতারাম রাজ্যরক্ষার ভার চন্দ্রচূড়, মৃন্ময় ও গঙ্গারামের উপর দিয়া গেলেন। মন্ত্রণা ও কোষাগারের ভার চন্দ্রচূড়ের উপর, সৈন্যের অধিকার মৃন্ময়কে, নগররক্ষার ভার গঙ্গারামকে, এবং অন্তঃপুরের ভার নন্দাকে দিয়া গেলেন। কাঁদাকাটির ভয়ে সীতারাম রমাকে বলিয়া গেলেন না। সুতরাং রমা কাঁদিয়া দেশ ভাসাইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কান্নাকাটি একটু থামিলে, রমা একটু ভাবিয়া দেখিল। তাহার বুদ্ধিতে এই উদয় হইল যে, এ সময়ে সীতারাম দিল্লী গিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। যদি এ সময়

* ইংরেজ ইতিহাসবেত্তৃগণের পক্ষপাত এবং কতকটা অজ্ঞতা নিবন্ধন সেরাজউদ্দৌলা ঘৃণিত, এবং মুরশিদ্ কুলি খাঁ প্রশংসিত। মুরশিদের তুলনায় সেরাজউদ্দৌল্লা দেবতাবিশেষ ছিলেন।

মুসলমান আসিয়া সকলকে মারিয়া ফেলে, তাহা হইলেও সীতারাম বাঁচিয়ে গেলেন। অতএব রমার যেটা প্রধান ভয়, সেটা দূর হইল। রমা নিজে মরে, তাহাতে রমার তেমন কিছু আসিয়া যায় না। হয় ত তাহারা বর্শা দিয়া খোঁচাইয়া রমাকে মারিয়া ফেলিবে নয় ত তরবারি দিয়া টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলিবে, নয় ত বন্দুক দিয়া গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিবে, নয় ত খোঁপা ধরিয়া ছাদের উপর হইতে ফেলিয়া দিবে। তা যা করে, করুক, রমার তাতে তত ক্ষতি নাই, সীতারাম ত নির্ব্বিঘ্নে দিল্লীতে বসিয়া থাকিবেন্য। তা, সে এক রকম ভালই হইয়াছে। তবে কি না, রমা তাঁকে আর এখন দেখিতে পাইবে না, তা না পাইল, আর জন্মে দেখিবে। কই, মহম্মদপুরেও ত এখন আর বড় দেখাশুনা হইত না। তা দেখা না হউক, সীতারাম ভাল থাকিলেই হইল।

যদি এক বৎসর আগে হইত, তবে এতটুকু ভাবিয়াই রমা ক্ষান্ত হইত; কিন্তু বিধাতা তার কপালে শান্তি লিখেন নাই। এক বৎসর হইল, রমার একটি ছেলে হইয়াছে। সীতারাম যে আর তাহাকে দেখিতে পারিতেন না, ছেলের মুখ দেখিয়া রমা তাহা একরকম সহিতে পারিয়াছিল। রমা আগে সীতারামের ভাবনা ভাবিল–ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইল। তার পর আপনার ভাবনা ভাবিল–ভাবিয়া মরিতে প্রস্তুত হইল। তার পর ছেলের ভাবনা ভাবিল–ছেলের কি হইবে? "আমি যদি মরি, আমায় যদি মারিয়া ফেলে, তবে আমার ছেলেকে কে মানুষ করিবে? তা ছেলে না হয় দিদিকে দিয়া যাইব। কিন্তু সতীনের হাতে ছেলে দিয়া যাওয়া যায় না; সৎমায় কি সতীনপোকে যত্ন করে? ভাল কথা, আমাকেই যদি মুসলমানে মারিয়া ফেলে, তা আমার সতীনকেই কি রাখিবে? সেও ত আর পীর নয়। তা, আমিও মরিব, আমার সতীনও মরিবে। তা ছেলে কাকে দিয়া যাব?"

ভাবিতে ভাবিতে অকস্মাৎ রমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। একটা ভয়ানক কথা মনে পড়িল, মুসলমানে ছেলেই কি রাখিবে? সব্বনাশ! রমা এতক্ষণে কি ভাবিতেছিল? মুসলমানেরা ডাকাত, চুয়াড়, গোরু খায়, শক্র–তাহারা ছেলেই কি রাখিবে? সর্ব্বনাশের কথা! কেন সীতারাম দিল্লী গেলেন! রমা এ কথা কাকে জিজ্ঞাসা করে? কিন্তু মনের মধ্যে এ সন্দেহ লইয়াও ত শরীর বহা যায় না। রমা আর ভাবিতে চিন্তিতে পারিল না। অগত্য নন্দার কাছে জিজ্ঞাসা করিতে গেল।

গিয়া বলিল, "দিদি, আমার বড় ভয় করিতেছে–রাজা এখন কেন দিল্লী গেলেন?"

নন্দা বলিল, "রাজার কাজ রাজাই বুঝেন–আমরা কি বুঝিব বহিন!"

রমা। তা এখন যদি মুসলমান আসে, তা কে পুরী রক্ষা করিবে?

নন্দা। বিধাতা করিবেন। তিনি না রাখিলে কে রাখিবে?

রমা। ত মুসলমান কি সকলকেই মারিয়া ফেলে?

নন্দা। যে শক্র, সে কি আর দয়া করে?

রমা। তা, না হয় আমাদেরই মারিয়া ফেলিবে– ছেলেপিলের উপর দয়া করিবে না কি?

নন্দা। ও সকল কথা কেন মুখে আন, দিদি? বিধাতা যা কপালে লিখেছেন, তা অবশ্য ঘটিবে। কপালে মঙ্গল লিখিয়া থাকেন, মঙ্গলই হইবে। আমরা ত তাঁর পায়ে কোন অপরাধ করি নাই–আমাদের কেন মন্দ হইবে? কেন তুমি ভাবিয়া সারা হও! আয়, পাশা খেলিবি? তোর নথের নূতন নোলক জিতিয়া নিই আয়।

এই বলিয়া নন্দা, রমাকে আনমনা করিবার জন্য পাশা পাড়িল। রমা অগত্যা এক বাজি খেলিল, কিন্তু খেলায় তার মন গেল না। নন্দা ইচ্ছাপূর্ব্বক বাজি হারিল–রমার নাকের নোলক বাঁচিয়া গেল। কিন্তু রমা আর খেলিল না–এক বাজি উঠিলেই রমাও উঠিয়া গেল।

রমা নন্দার কাছে আপন জিজ্ঞাস্য কথার উত্তর পায় নাই–তাই সে খিলিতে পারে নাই। কতক্ষণে সে আর এক জনকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিবে, সেই ভাবনাই ভাবিতেছিল। রমা আপনার মহলে ফিরিয়া আসিয়াই আপনার একজন বর্ষীয়সী ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গা–মুসলমানেরা কি ছেলে মারে?"

বর্ষীয়সী বলিল, "তারা কাকে না মারে? তারা গোরু খায়, নেমাজ করে, তারা ছেলে মারে না ত কি?"

রমার বুকের ভিতর ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল। রমা তখন যাহাকে পাইল, তাহাকেই সেই কথা জিজ্ঞাসা করিল, পুরবাসিনী আবালবৃদ্ধা সকলকেই জিজ্ঞাসা করিল। সকলেই মুসলমানভায়ে ভীত, কেহই মুসলমানকে ভাল চক্ষুতে দেখে না–সকলেই প্রায় বর্ষীয়সীর মত উত্তর দিল। তখন রমা সর্ব্বনাশ উপস্থিত মনে করিয়া, বিছানায়া আসিয়া শুইয়া পড়িয়া, ছেলে কোলে লইয়া কাঁদিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এ দিকে তোরাব্ খাঁ সংবাদ পাইলেন যে, সীতারাম মহম্মদপুরে নাই, দিল্লী যাত্রা করিয়াছেন। তিনি ভাবিলেন, এই শুভ সময়, এই সময় মহম্মদপুর পোড়াইয়া ছারখার করাই ভাল। তখন তিনি সসৈন্যে মহম্মদপুর যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

সে সংবাদও মহম্মদপুরে পৌঁছিল। নগরে একটা ভারি হুলস্থূল পড়িয়া গেল। গৃহস্থেরা যে যেখানে পাইল, পলাইতে লাগিল। কেহ মাসীর বাড়ী, কেহ পিসীর বাড়ী, কেহ খুড়ার বাড়ী, কেহ মামার বাড়ী, কেহ শ্বশুরবাড়ী, কেহ জামাইবাড়ী, কেহ বেহাইবাড়ী, বোনাইবাড়ী, সপরিবারে, ঘটি বটি, সিন্দুক, পেটারা, তক্তপোষ সমেত গিয়া দাখিল হইল। দোকানদার দোকান লইয়া পলাইতে লাগিল, মহাজন গোলা বেচিয়া পলাইতে লাগিল, আড়তদার আড়ত বেচিয়া পলাইল, শিল্পকর যন্ত্র তন্ত্র মাথায় করিয়া পলাইল। বড় হুলস্থূল পড়িয়া গেল।

নগররক্ষক গঙ্গারাম দাস, চন্দ্রচূড়ের নিকট মন্ত্রণার জন্য আসিলেন। বলিলেন, "এখন ঠাকুর কি করিতে বলে? সহর ত ভাঙ্গিয়া যায়?"

চন্দ্রচূড় বলিলেন, "স্ত্রীলোক বালক বৃদ্ধ যে পলায় পলাক, নিষেধ করিও না। বরং তাহাতে প্রয়োজন আছে। ঈশ্বর না করুন, কিন্তু তোরাব্ খাঁ আসিয়া যদি গড় ঘেরাও করে, তবে গড়ে যত খাইবার লোক কম থাকে, ততই ভাল, তা হলে দুই মাস ছয় মাস চালাইতে পারিব। কিন্তু যাহারা যুদ্ধ শিখিয়াছে, তাহাদের এক জনকেও যাইতে দিবে না, যে যাইবে, তাহাকে গুলি করিবার হুকুম দিবে। অস্ত্র শস্ত্র একখানিও শহরের বাহিরে লইয়া যাইতে দিবে না। আর খাবার সামগ্রী এক মুঠাও বাহিরে লইয়া যাইতে দিবে না।"

সেনাপতি মৃন্ময় রায় আসিয়া চন্দ্রচূড় ঠাকুরকে মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলেন, "এখানে পড়িয়া মার খাইব কেন? যদি তোরাব্ খাঁ আসিতেছে, তবে সৈন্য লইয়া অর্দ্ধেক পথে গিয়া তাহাকে মারিয়া আসি না কেন?"

চন্দ্রচূড় বলিলেন, "এই প্রবলা নদীর সাহায্য কেন ছাড়িবে? যদি অর্দ্ধপথে তুমি হার, তবে আর আমাদের দাঁড়াইবার উপায় থাকিবে না; কিন্তু তুমি যদি এই নদীর এ পারে কামান সাজাইয়া দাঁড়াও, কার সাধ্য এ নদী পার হয়? এ হাঁটিয়া পার হইবার নদী নয়। সংবাদ রাখ, কোথায় নদী পার হইবে। সেইখানে সৈন্য লইয়া যাও, তাহা হইলে মুসলমান এ পারে আসিতে পারিবে না। সব প্রস্তুত রাখ, কিন্তু আমায় না বলিয়া যাত্রা করিও না।"

চন্দ্রচূড় গুপ্তচরের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। গুপ্তচর ফিরিলেই তিনি সংবাদ পাইবেন, কখন কোন্ পথে তোরাব্ খাঁর সৈন্য যাত্রা করিবে; তখন ব্যবস্থা করিবেন।

এ দিকে অন্তঃপুরে সংবাদ পৌঁছিল যে, তোরাব্ খাঁ সসৈন্য মহম্মদপুর লুঠিতে আসিতেছে। বহির্ব্বাটীর অপেক্ষা অন্তঃপুরে সংবাদটা কিছু বাড়িয়া যাওয়াই

রীতি। বাহিরে, "আসিতেছে" অর্থে বুঝিল, আসিবার উদ্যোগ করিতেছে। ভিতর মহলে, "আসিতেছে" অর্থে বুঝিল, "প্রায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে।" তখন সে অন্তঃপুরমধ্যে কাঁদাকাটার ভারি ধুম পড়িয়া গেল। নন্দার বড় কাজ বাড়িয়া গেল–কয়জনকে একা বুঝাইবে, কয়জনকে থামাইবে! বিশেষ রমাকে লইয়াই নন্দাকে বড় ব্যস্ত হইতে হইল–কেন না, রমা ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা যাইতে লাগিল। নন্দা মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "সতীন মরিয়া গেলেই বাঁচি"–কিন্তু প্রভু যখন আমাকে অন্তঃপুরের ভার দিয়া গিয়াছেন, তখন আমাকে আপনার প্রাণ দিয়াও সতীনকে বাঁচাইতে হইবে।" তাই নন্দা সকল কাজ ফেলিয়া রমার সেবা করিতে লাগিল।

এদিকে পৌরস্ত্রীগণ নন্দাকে পরামর্শ দিতে লাগিল–"মা! তুমি এক কাজ কর–সকলের প্রাণ বাঁচাও। এই পুরী মুসলমানকে বিনা যুদ্ধে সমর্পণ কর–সকলের প্রাণ ভিক্ষা মাঙ্গিয়া লও। আমরা বাঙ্গালী মানুষ, আমাদের লড়াই ঝগড়া কাজ কি মা! প্রাণ বাঁচিলে আবার সব হবে। সকলের প্রাণ তোমার হাতে–মা, তোমার মঙ্গল হোক–আমাদের কথা শোন।"

নন্দা তাহাদিগকে বুঝাইলেন। বলিলেন, "ভয় কি মা! পুরুষ মানুষের চেয়ে তোমরা কি বেশী বুঝ? তাঁরা যখন বলিতেছেন ভয় নাই, তখন ভয় কেন? তাঁদের কি আপনার প্রাণে দরদ নাই–না আমাদের প্রাণে দরদ নাই?"

এই সকল কথার পর রমা বড় মূর্চ্ছা গেল না। উঠিয়া বসিল। কি কথা ভাবিয়া মনে সাহস পাইয়াছিল, তাহা পরে বলিতেছি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গঙ্গারাম নগররক্ষক। এ সময়ে রাত্রিতে নগর পরিভ্রমণে তিনি বিশেষ মনোযোগী। যে দিনের কথা বলিলাম, সেই রাত্রিতে, তিনি নগরের অবস্থা জানিবার জন্য, পদব্রজে, সামান্য বেশে, গোপনে, একা নগর পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। রাত্রি তৃতীয় প্রহরে, ক্লান্ত হইয়া তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিবার বাসনায় গৃহাভিমুখী হইতেছিলেন, এমন সময়ে কে আসিয়া পশ্চাৎ হইতে তাঁহার কাপড় ধরিয়া টানিল।

গঙ্গারাম পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, একজন স্ত্রীলোক। রাত্রি অন্ধকার, রাজপথে আর কেহ নাই–কেবল একাকিনী সেই স্ত্রীলোক। অন্ধকারে স্ত্রীলোকের আকার, স্ত্রীলোকের বেশ, ইহা জানা গেল–কিন্তু আর কিছুই বুঝা গেল না। গঙ্গারাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

স্ত্রীলোক বলিল, "আমি যে হই, তাতে আপনার কিছু প্রয়োজন নাই। আমাকে বরং জিজ্ঞাসা করুন যে আমি কি চাই।"

কথার স্বরে বোধ হইল যে, এই স্ত্রীলোকের বয়স বড় বেশী নয়। তবে কথাগুলো জোর জোর বটে। গঙ্গারাম বলিলেন, "সে কথা পরে হইবে। আগে বল দেখি, তুমি স্ত্রীলোক, এত রাত্রে একাকিনী রাজপথে কেন বেড়াইতেছ? আজকাল কিরূপ সময় পড়িয়াছে– তাহা কি জান না?"

স্ত্রীলোক বলিল, "এত রাত্রে একাকিনী আমি এই রাজপথে আর কিছু করিতেছি না–কেবল আপনারই সন্ধান করিতেছি।"

গঙ্গারাম। মিছা কথা। প্রথমতঃ তুমি চেনই না যে, আমি কে?

স্ত্রীলোক। আমি চিনে যে, আপনি দাস মহাশয়। নগররক্ষক।

গঙ্গারাম। ভাল চেন, দেখিতেছি। কিন্তু আমাকে এখানে পাইবার সম্ভাবনা, ইহা তুমি জানিবার সম্ভাবনা নাই; কেন না, আমিই জানিতাম না যে আমি এখন এ পথে আসিব।

স্ত্রীলোক। আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া আপনাকে গলিতে গলিতে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। আপনার বাড়ীতেও সন্ধান লইয়াছি।

গঙ্গারাম। কেন?

স্ত্রীলোক। সেই কথাই আপনার আগে জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল। আপনি একা দুঃসাহসিক কাজ করিতে পারিবেন?

গঙ্গা। কি?

স্ত্রীলোক। আমি আপনাাকে যেখানে লইয়া যাইব, সেইখানে যাইতে পারিবেন?

গঙ্গা। কোথায় যাইতে হইবে?

স্ত্রীলোক। তাহা আমি আপনাকে বলিব না। আপনি তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন না। সাহস হয় কি?

গঙ্গা। আচ্ছা, তা না বল, আর দুই একটা কথা বল। তোমার নাম কি? তুমি কে? কি কর? আমাকেই বা কি করিতে হইবে?

স্ত্রীলোক। আমার নাম মুরলা, ইহা ছাড়া আর কিছুই বলিব না। আপনি আসিতে সাহস না করেন, আসিবেন না। কিন্তু যদি এই সাহস না থাকে, তবে মুসলমানের হাত হইতে নগর রক্ষা করিবেন কি প্রকারে? আমি স্ত্রীলোক যেখানে যাইতে পারি, আপনি নগররক্ষক হইয়া সেখানে এত কথা নহিলে যাইতে পারিবেন না?

কাজেই গঙ্গারামকে মুরলার সঙ্গে যাইতে হইল। মুরলা আগে আগে চলিল, গঙ্গারাম পাছু পাছু। কিছু দূর গিয়া গঙ্গারাম দেখিলেন, সম্মুখে উচ্চ অট্টালিকা। চিনিয়া বলিলেন, “এ যে রাজবাড়ী যাইতেছ?”

মুরলা। তাতে দোষ কি?

গঙ্গারাম। সিং-দরজা দিয়া গেলে দোষ ছিল না। এ যে খিড়কি। অন্তঃপুরে যাইতে হইবে না কি?

মুরলা। সাহস হয় না?

গঙ্গা।–না। আমার সে সাহস হয় না, এ আমার প্রভুর অন্তঃপুর। বিনা হুকুমে যাইতে পারি না।

মুরলা। কার হুকুম চাই?

গঙ্গা। রাজার হুকুম।

মুরলা। তিনি ত দেশে নাই। রাণীর হুকুম হইলে চলিবে?

গঙ্গা। চলিবে।

মুরলা। আসুন, আমি রাণীর হুকুম আপনাকে শুনাইব।

গঙ্গা। কিন্তু পাহারাওয়ালা তোমাকে যাইতে দিবে?

মুরলা। দিবে।

গঙ্গা। কিন্তু আমাকে না চিনিলে ছাড়িয়া দিবে না। এ অবস্থায় পরিচয় দিবার আমার ইচ্ছা নাই।

মুরলা। পরিচয় দিবারও প্রয়োজন নাই। আমি আপনাকে লইয়া যাইতেছি।

দ্বারে প্রহরী দণ্ডায়মান। মুরলা তাহার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কেমন পাঁড়ে ঠাকুর, দ্বার খোলা রাখিয়াছ ত?”

পাঁড়ে ঠাকুর বলিলেন, “হাঁ রাখিয়েসে। এ কোন্?”

প্রহরী গঙ্গারামের প্রতি দৃষ্টি করিয়া এই কথা বলিল। মুরলা বলিল, "এ আমার ভাই।"

পাঁড়ে। মরদ্ যাতে পার্‌বে না। হুকুম নেহি।

মুরলা তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিল, "ইঃ, কার হুকুম রে? তোর আবার কার হুকুম চাই? আমার হুকুম ছাড়া তুই কার হুকুম খুঁজিস্?" খ্যাংরা মেরে দাড়ি মুড়িয়ে দেব জানিস্ না?"

প্রহরী জড়সড় হইল, আর কিছু বলিল না। মুরলা গঙ্গারামকে লইয়া নির্ব্বিঘ্নে অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিল। এবং অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দোতালায় উঠিল। সে একটি কুঠারি দেখাইয়া দিয়া বলিল, "ইহার ভিতর প্রবেশ করুন। আমি নিকটেই রহিলাম, কিন্তু ভিতরে যাইব না।"

গঙ্গারাম কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া কুঠারির ভিতর প্রবেশ করিলেন। মহামূল্য দ্রব্যাদিতে সুসজ্জিত গৃহ, রজতপালঙ্কে বসিয়া একটি স্ত্রীলোক–উজ্জ্বল দীপাবলীর স্নিগ্ধ রশ্মি তাহার মুখের উপর পড়িয়াছে, সে অধোবদনে চিন্তা করিতেছে। আর কেহ নাই। গঙ্গারাম মনে করিলেন, এমন সুন্দরী পৃথিবীতে আর জন্মে নাই। সে রমা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গঙ্গারাম কখনও সীতারামের অন্তঃপুরে আসে নাই, নন্দা কি রমাকে কখনও দেখে নাই। কিন্তু মহামূল্য গৃহসজ্জা দেখিয়া বুঝিল যে, ইনি একজন রাণী হইবেন। রাণীদিগের মধ্যে নন্দার অপেক্ষা রমারই সৌন্দর্য্যের খ্যাতিটা বেশী ছিল–এ জন্য গঙ্গারাম সিদ্ধান্ত করিল যে, ইনি কনিষ্ঠ মহিষী রমা। অতএব জিজ্ঞাসা করিলে, "মহারাণী কি আমাকে তলব করিয়াছেন?"

রমা উঠিয়া গঙ্গারামকে প্রণাম করিল। বলিল, "আপনি আমার দাদা হন–জ্যেষ্ঠ ভাই, আপনার পক্ষে শ্রীও যেমন, আমিও তাই। অতএব আপনাকে যে এমন সময়ে ডাকাইয়াছি, তাহাতে দোষ ধরিবেন না।"

গঙ্গা। আমাকে যখন আজ্ঞা করিবেন, তখনই আসিতে পারি–আপনিই কর্ত্রী–

রমা। মুরলা বলিল যে, প্রকাশ্যে আপনি আসিতে সাহস করিবেন না। সে আরও বলে–পোড়ারমুখী কত কি বলে, তা আমি কি বল্‌ব? তা, দাদা মহাশয়! আমি বড় ভীত হইয়াই এমন সাহসের কাজ করিয়াছি। তুমি আমায় রক্ষা কর।

বলিতে বলিতে রমা কাঁদিয়া ফেলিল। সে কান্না দেখিয়া গঙ্গারাম কাতর হইল। বলিল, "কি হইয়াছে? কি করিতে হইবে?"

রমা। কি হইয়াছে? কেন, তুমি কি জান না যে, মুসলমান মহম্মদপুর লুঠিতে আসিতেছে–আমাদের সব খুন করিয়া, সহর পোড়াইয়া দিয়া চলিয়া যাইবে?

গঙ্গ। কে তোমাকে ভয় দেখাইয়াছে? মুসলমান আসিয়া সহর পোড়াইয়া দিয়া যাইবে, তবে আমরা কি জন্য? আমরা তবে তোমার অন্ন খাই কেন?

রমা। তোমরা পুরুষ মানুষ, তোমাদের সাহস বড়–তোমরা অত বোঝ না। যদি তোমরা না রাখিতে পার, তখন কি হবে?

রমা। আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

গঙ্গা। সাধ্যানুসারে আপনাদের রক্ষা করিব, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

রমা। তা ত করবে–কিন্তু যদি না পারিলে?

গঙ্গা। না পারি মরিব।

রমা। তা করিও না। আমার কথা শোন। আজ সকলে বড় রাণীকে বলিতেছিল, মুসলমানকে আদর করিয়া ডাকিয়া, সহর তাদের সঁপিয়া দাও– আপনাদের সকলের প্রাণভিক্ষা মাঙিয়া লও। বড় রাণী সে কথায় বড় কাণ দিলেন না–তাঁর বুদ্ধিশুদ্ধি বড় ভাল নয়। আমি তাই তোমায় ডাকিয়াছি। তা কি হয় না?

গঙ্গা। আমাকে কি করিতে বলেন?

রমা। এই আমার গহনাপাতি আছে, সব নাও। আর আমাকে টাকা কড়ি যা আছে, সব না হয় দিতেছি, সব নাও। তুমি কাহাকে কিছু না বলিয়া মুসলমানের কাছে যাও। বল গিয়া যে আমরা রাজ্য ছাড়িয়া দিতেছি, নগর তোমাদের ছাড়িয়া দিতেছি, তোমরা কাহাকে প্রাণে মারিবে না, কেবল এইটি স্বীকার কর। যদি তাহারা রাজী হয়, তবে নগর তোমার হাতে–তুমি তাদের গোপনে এনে কেল্লায় তাদের দখল দিও। সকল বাঁচিয়া যাইবে।

গঙ্গারাম শিহরিয়া উঠিল–বলিল, “মহারাণী! আমার সাক্ষাতে যা বল্লেন বল্লেন–আর কখনও কাহারও সাক্ষাতে এমন কথা মুখে আনিবেন না। আমি প্রাণে মরিলেও এ কাজ আমা হইতে হইবে না। যদি এমন কাজ আর কেহ করে, আমি স্বহস্তে তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিব।”

রমার শেষ আশা ভরসা ফরসা হইল। রমা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, “তবে আমার বাছার দশা কি হইবে?” গঙ্গারাম ভীত হইয়া বলিল, “চুপ করুন! যদি আপনার কান্না শুনিয়া কেহ এখানে আসে, তবে আমাদের দুই জনেরই পক্ষে অমঙ্গল। আপনার ছেলের জন্যই আপনি এত ভীত হইয়াছেন, আমি সে বিষয়ে কোন উপায় করিব। আপনি স্থানান্তরে যাইতে রাজি আছেন?”

রমা। যদি আমায় বাপের বাড়ী রাখিয়া আসিতে পার, তবে যাইতে পারি। তা বড় রাণীই বা যাইতে দিবেন কেন? ঠাকুর মহাশয় বা যাইতে দিবেন কেন?

গঙ্গা। তবে লুকাইয়া লইয়া যাইতে হইবে। এক্ষণে তাহার কোন প্রয়োজন নাই। যদি তেমন বিপদ্ দেখি, আমি আসিয়া আপনাদিগকে লইয়া গিয়া রাখিয়া আসিব।

রমা। আমি কি প্রকারে সংবাদ পাইব?

গঙ্গা। মুরলার দ্বারা সংবাদ লইবেন। কিন্তু মুরলা যেন অতি গোপনে আমার নিকট যায়।

রমা নিশ্বাস ছাড়িয়া, কাঁপিয়া বলিল, “তুমি আমায় প্রাণ দান করিলে, আমি চিরকাল তোমার দাসী হইয়া থাকিব। দেবতারা তোমার মঙ্গল করুন।”

এই বলিয়া রমা গঙ্গারামকে বিদায় দিল। মুরলা গঙ্গারামকে বাহিরে রাখিয়া আসিল।

কাহারও মনে কিছু ময়লা নাই। তথাপি একটা গুরুতর দোষের কাজ হইয়া গেল। রমা ও গঙ্গারাম উভয়ে তাহা মনে বুঝিল। গঙ্গারাম ভাবিল, “আমার দোষ কি?” রমা বলিল, “এ না করিয়া কি করি–প্রাণ যায় যে।” কেবল মুরলা সন্তুষ্ট।

গঙ্গারামের যদি তেমন চক্ষু থাকিত, তবে গঙ্গারাম ইহার ভিতর আর একজন লুকাইয়া আছে দেখিতে পাইতেন। সে মনুষ্য নহে–দেখিতেন–

> * দক্ষিণাপাঙ্গনিবিষ্টমুষ্টিং নতাংসমাকুঞ্চিত সব্যপাদম্।
> *** চক্রীকৃতচারুচাপং প্রহর্ত্তুমভ্যুদ্যতমাত্মযোনিম্ ॥

এ দিকে বাদীর মনেও যা, বিধির মনেও তা। চন্দ্রচূড় ঠাকুর তোরাব্ খাঁর কাছে, এই বলিয়া গুপ্তচর পাঠাইলেন যে, “আমরা এ রাজ্য মায় কেল্লা সেলেখানা আপনাদিগকে বিক্রয় করিব–কত টাকা দিবেন? যুদ্ধে কাজ কি–টাকা দিয়া নিন না?”

চন্দচূড় মৃন্ময়কে ও গঙ্গারামকে এ কথা জালাইলেন। মৃন্ময় ক্রুদ্ধ হইয়া চোখ ঘুরাইয়া বলিল, “কি! এত বড় কথা?”

চন্দ্রচূড় বলিলেন, “দূর মুর্খ! কিছু বুদ্ধি নাই কি? দরদস্তুর করিতে করিতে এখন দুই মাস কাটাইতে পারিব। তত দিনে রাজা আসিয়া পড়িবেন।”

গঙ্গারামের মনে কি হইল বলিতে পারি না। সে কিছুই বলিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

তা সে দিন গঙ্গারামের কোন কাজ করা হইল না। রমার মুখখানি বড় সুন্দর! কি সুন্দর আলোই তার উপর পড়িয়াছিল। সেই কথা ভাবিতেই গঙ্গারামের দিন গেল। বাতির আলো বলিয়াই কি অমন দেখাইল? তা হলে মানুষ রাত্রিদিন বাতির আলো জ্বালিয়া বসিয়া থাকে না কেন? কি মিস্‌মিসে কোঁকড়া কোঁকড়া চুলের গোছা! কি ফলান রঙ্! কি ভ্রূ! কি চোখ! কি ঠোঁট–যেমন রাঙা, তেমনই পাতলা! কি গড়ন! তা কোন্‌টাই বা গঙ্গারাম ভাবিবে? সবই যেন দেবীদূর্ল্লভ! গঙ্গারাম ভাবিল, "মানুষ যে এমন সুন্দর হয়, তা জানতেম না! একবার যে দেখিলাম, আমার যেন জন্ম সার্থক হইল। আমি তাই ভাবিয়া যে কয় বৎসর বাঁচিব, সুখে কাটাইতে পারিব।"

তা কি পারা যায় রে মূর্খ! একবার দেখিয়া, অমন হইলে, আর একবার দেখিতে ইচ্ছা করে। দুপুর বেলা গঙ্গারাম ভাবিতেছিল, "একবার যে দেখিয়াছি, আমি তাই ভাবিয়া যে কয় বৎসর বাঁচি, সেই কয় বৎসর সুখে কাটাইতে পারিব।"–কিন্তু সন্ধ্যা বেলা ভাবিল, "আর একবার কি দেখিতে পাই না?" রাত্রি দুই চারি দণ্ডের সময়ে গঙ্গারাম ভাবিল, "আজ আবার মুরলা আসে না!" রাত্রি প্রহারকের সময়ে মুরলা তাঁহাকে নিভৃত স্থানে গিরেফ্‌তার করিল।

গঙ্গারাম জিজ্ঞাসা করিল, "কি খবর?"

মুরলা। তোমার খবর কি?

গঙ্গা। কিসের খবর চাও?

মুরলা। বাপের বাড়ী যাওয়ার।

গঙ্গা। আবশ্যক হইবে না বোধ হয়। রাজ্য রক্ষা হইবে।

মুরলা। কিসে জানিলে?

গঙ্গা। তা কি তোমায় বল যায়?

মুরলা। তবে আমি এই কথা বলি গে?

গঙ্গা। বল গে?

মুরলা। যদি আমাকে আবার পাঠান?

গঙ্গা। কাল যেখানে আমাকে ধরিয়াছিলে, সেইখানে আমাকে পাইবে।

মুরলা চলিয়া গিয়া, রাজ্ঞীসমীপে সংবাদ নিবেদন করিল। গঙ্গারাম কিছুই খুলিয়া বলেন নাই, সুতরাং রামও কিছু বুঝিতে পারিল না। না বুঝিতে পারিয়া আবার ব্যস্ত হইল। আবার মুরলা গঙ্গারামকে ধরিয়া লইয়া তৃতীয় প্রহর রাত্রে রমার ঘরে আনিয়া উপস্থিত করিল। সেই পাহারাওয়ালারা সেইখানে ছিল, আবার গঙ্গারাম মুরলার ভাই বলিয়া পার হইলেন।

গঙ্গারাম রমার কাছে আসিয়া মাথা মুণ্ড কি বলিল, তাহা গঙ্গারাম নিজেই কিছু বুঝিতে পারিল না, রমা ত নয়ই। আসল কথা, গঙ্গারামের মাথা মুণ্ড তখন কিছুই ছিল না, সেই ধনুর্দ্ধর ঠাকুর ফুলের বাণ মারিয়া তাহা উড়াইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। কেবল তাহার চক্ষু দুইটি ছিল, প্রাণপাত করিয়া গঙ্গারাম দেখিয়া

লইল, কাণ ভরিয়া কথা শুনিয়া লইল, কিন্তু তৃপ্তি হইল না।

গঙ্গারামের এতটুকু মাত্র চৈতন্য ছিল যে, চন্দ্রচূড় ঠাকুরের কলকৌশল রমার সাক্ষাতে কিছুই সে প্রকাশ করিল না। বস্তুতঃ কোন কথা প্রকাশ করিতে সে আসে নাই, কেবল দেখিতে আসিয়াছিল। তাই দেখিয়া, দক্ষিণাস্বরূপ আপনার চিত্ত রামকে দিয়া চলিয়া গেল। আবার মুরলা তাহাকে বাহির করিয়া দিয়া আসিল। গমনকালে মুরলা গঙ্গারামকে বলিল, "আবার আসিবে?"

গঙ্গা। কেন আসিব?

মুরলা বলিল, "আসিবে বোধ হইতেছে।"

গঙ্গারাম চোখ বুজিয়া পিছল পথে পা দিয়াছে–কিছু বলিল না।

এ দিকে চন্দ্রচূড়ের কথায় তোরাব্ খাঁ উত্তর পাঠাইলেন, "যদি অল্প স্বল্প টাকা দিলে মুলুক ছাড়িয়া দাও, তবে টাকা দিতে রাজি আছি। কিন্তু সীতারামকে ধরিয়া দিতে হইবে।"

চন্দ্রচূড় উত্তার পাঠাইলেন, "সীতারামকে ধরাইয়া দিব, কিন্তু অল্প টাকায় হইবে না।"

তোরাব্ খাঁ বলিয়া পাঠাইলেন, "কত টাকা চাও?" চন্দ্রচূড় একটা চড়া দর হাঁকিলেন; তোরাব্ খাঁ একটা নরম দর দিয়া পাঠাইলেন। তার পর চন্দ্রচূড় কিছু নামিলেন, তোরাব্ খাঁ তদুত্তরে কিছু উঠিলেন। চন্দ্রচূড় এইরূপে মুসলমানকে ভুলাইয়া রাখিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কালামুখী মুরলা যা বলিল, তাই হইল। গঙ্গারাম আবার রমার কাছে গেল। তার কারণ, গঙ্গারাম না গিয়া আর থাকিতে পারিবে না। রমা আর ডাকে নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে মুরলাকে গঙ্গারামের কাছে সংবাদ লইতে পাঠাইত; কিন্তু গঙ্গারাম মুরলার কাছে কোন কথাই বলিত না, বলিত, "তোমাদের বিশ্বাস করিয়া এ সকল গোপন কথা কি বলা যায়? আমি একদিন নিজে গিয়া বলিয়া আসিব।" কাজেই রমা আবার গঙ্গারামকে ডাকিয়া পাঠাইল–মুসলমান কবে আসিবে, সে বিষয়ে খবর না জানিলে রমার প্রাণ বাঁচে না–যদি হঠাৎ একদিন দুপুর বেলা খাওয়া দাওয়ার সময় আসিয়া পড়ে?

কাজেই গঙ্গারাম আবার আসিল। এবার গঙ্গারাম সাহস দিল না–বরং একটু ভয় দেখাইয়া গেল। যাহাতে আবার ডাক পড়ে, তার পথ করিয়া গেল। রমাকে আপনার প্রাণের কথা বলে, গঙ্গারামের সে সাহস হয় না–সরলা রমা তার মনের সে কথা অণুমাত্র বুঝিতে পারে না। তা, প্রেমসম্ভাষণের ভরসায় গঙ্গারামের যাতায়াতের চেষ্টা নয়। গঙ্গারাম জানিত, সে পথ বন্ধ। তবু শুধু দেখিয়া, কেবল কথাবার্ত্তা কহিয়াই এত আনন্দ!

একে ভালবাসা বলে না–তাহা হইলে গঙ্গারাম কখন রমাকে ভয় দেখাইয়া, যাহাতে তাহার যন্ত্রণা বাড়ে, তাহা করিয়া যাইতে পারিত না। এ একটা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট চিত্তবৃত্তি–যাহার হৃদয়ে প্রবেশ করে, তার সর্ব্বনাশ করিয়া ছাড়ে। এই গ্রন্থে তাহার প্রমাণ আছে।

ভয় দেখাইয়া গঙ্গারাম চলিয়া গেল। রমা তখন বাপের বাড়ী যাইতে চাহিল, কিন্তু গঙ্গারাম, আজ কালি নহে বলিয়া চলিয়া গেল। কাজেই আজ কাল বাদে রমা আবার গঙ্গারামকে ডাকাইল। আবার গঙ্গারাম আসিল। এই রকম চলিল।

একেবারে "ধরি মাছ, না ছুঁই পানি" চলে না। রমার সঙ্গে লোকালয়ে যদি গঙ্গারামের পঞ্চাশ বার সাক্ষাৎ হইত, তাহা হইলে কিছু দোষ হইত না; কেন না,

রমার মন বড় পরিষ্কার, পবিত্র। কিন্তু এমন ভয়ে ভয়ে, অতি গোপনে, রাত্রি তৃতীয় প্রহরে সাক্ষাৎটা ভাল নহে। আর কিছু হউক না হউক, একটু বেশী আদর, একটু বেশী খোলা কথা, কথাবার্ত্তায় একটু বেশী অসাবধানতা, একটু বেশী মনের মিল হইয়া পড়ে। তাহা হইল না যে এমন নহে। রমা তাহা আগে বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু মুরলার একটা কথা দৈববাণীর মত তাহার কাণে লাগিল। একদিন মুরলার সঙ্গে পাঁড়ে ঠাকুরের সে বিষয়ে কিছু কথা হইল। পাঁড়ে ঠাকুর বলিলেন, "তোমার ভাই হামেশা রাত্‌কো ভিতর্‌মে যায়া আয়া করতাহৈ কাহেকো?"

মু। তোর কিরে বিট্‌লে? খ্যাংরার ভয় নেই?

পাঁড়ে। ভয় ত হৈ, লেকেন্ জান্‌কাভী ডর হৈ।

মু। তোর আবার আরও জান্ আছে না কি? আমিই ত তোর জান্!

পাঁড়ে। তোম্ ছাড়ুনেসে মরেঙ্গে নেহি, লেকেন্ জান্ ছোড়ুনেসে সব আঁধিয়ায়ারা লাগেগী। তোমারা ভাইকো হম্ ঔর্ ছোড়েঙ্গে নেহি।

মু। তা না ছোড়িস্ আমি তোকে ছোড়ঙ্গে। কেমন কি বলিস্?

পাঁড়ে। দেখো, বহ আদমি তোমারা ভাই নেহি, কোই বড়ে আদমী হোগা, বস্কা হিঁয়া কিয়া কাম্ হাম্‌কো কুছ মালুম নেহি, মালুম হোনেভি কুছ জরুর নেহি। কিয়া জানে, বহ অন্দরকা খবরদারিকে লিয়ে আতা যাতা হৈ। তৌ ভী, যব্ পুষিদা হোকে আতে যাতে তব্ হম্ লোগ্‌কো কুছ মিল্‌ন চাহিয়ে। তোম্‌কো কুছ মিলা হোগা—আধা হাম্‌কো দে দেও, হম্ নেহি কুছ বোলেঙ্গে।

মু। সে আমায় কিছু দেয় নাই। পাইলে দিব।

পাঁড়ে। আদা কর্‌কে লেও।

মুরলা ভাবিল, এ সৎপরামর্শ। রাণীর কাছে গহনাখানা কাপড়খানা মুরলার পাওয়া হইয়াছে, কিন্তু গঙ্গারামের কাছে কিছু হয় নাই। অতএব বুদ্ধি খাটাইয়া পাঁড়েজিকে বলিল, "আচ্ছা, এবার যে দিন আসিবে, তুমি ছাড়িও না। আমি বললেও ছাড়িও না। তা হলে কিছু আদায় হইবে।"

তার পর যে রাত্রিতে গঙ্গারাম পুরপ্রবেশার্থ আসিল, পাঁড়েজী ছাড়িলেন না। মুরলা অনেক বকিল ঝকিল, শেষ অনুনয় বিনয় করিল, কিছুতেই না। গঙ্গারাম পরামর্শ করিলেন, পাঁড়ের কাছে প্রকাশ হইবেন, নগররক্ষক জানিতে পারিলে, পাঁড়ে আর আপত্তি করিবে না। মুরলা বলিল, "আপত্তি করিবে না, কিন্তু লোকের কাছে গল্প করিবে। এ আমার ভাই যায় আসে, গল্প করিলে যা দোষ, আমার ঘাড়ের উপর দিয়া যাইবে।" কথা যথার্থ বলিয়া গঙ্গারাম স্বীকার করিলেন। তার পর গঙ্গারাম মনে করিলেন, "এটাকে এইখানে মারিয়া ফেলিয়া দিয়া যাই।" কিন্তু তাতে আরও গোল। হয় ত একেবারে এ পথ বন্ধ হইয়া যাইবে। সুতরাং নিরস্ত হইলেন। পাঁড়ে কিছুতেই ছাড়িল না, সুতরাং সে রাত্রিতে ঘরে ফিরিয়া যাইতে হইল।

মুরলা একা ফিরিয়া আসিলে রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কি কাজ আসিবেন না?"

মু। তিনি আসিয়াছিলেন—পাহারওয়ালা ছাড়িল না।

রাণী। রোজ ছাড়ে, আজ ছাড়িল না কেন?

মু। তার মনে একটা সন্দেহ হইয়াছে।

রাণী। কি সন্দেহ?

মু। আপনার শুনিয়া কাজ কি? সে সকল আপনার সাক্ষাতে আমরা মুখে আনিতে পারি না, তাহাকে কিছু দিয়া বশীভূত করিলে ভাল হয়।

যে অপবিত্র, সে পবিত্রকেও আপনার মত বিবেচনা করিয়া কাজ করে, বুঝিতে পারে না যে, পবিত্র মানুষ আছে, সুতরাং তাহার কার্য্য ধ্বংস হয়। মুরলার কথা শুনিয়া রমার গা দিয়া ঘাম বাহির হইতে লাগিল। রমা ঘামিয়া, কাঁপিয়া, বসিয়া পড়িল। বসিয়া শুইয়া পড়িল। শুইয়া চক্ষু বুজিয়া অজ্ঞান হইল। এমন কথা, রমার মনে এক দিনও হয় নাই। আর কেহ হইলে মনে আসিত, কিন্তু রমা এমনই ভয়বিহ্বলা হইয়া গিয়াছিল যে, সে দিক্‌টা একেবারে নজর করিয়া দেখে নাই। এখন বজ্রাঘাতের মত কথাটা বুকের উপর পড়িল। দেখিল, ভিতরে যাই থাক, বাহিরে কথাটা ঠিক। মনে ভাবিয়া দেখিল, বড় অপরাধ হইয়াছে। রমার স্থূল বুদ্ধি, তবু স্ত্রীলোকের, বিশেষতঃ হিন্দুর মেয়ের একটা বুদ্ধি আছে, যাহা একবার উদয় হইলে, এ সকল কথা বড় পরিষ্কার হইয়া থাকে। যত কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, রমা মনে করিয়া দেখিল—বুঝিল, বড় অপরাধ হইয়াছে। তখন রমা মনে ভাবিল, বিষ খাইব, কি গলায় ছুরি দিব। ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিল, গলায় ছুরি দেওয়াই উচিত, তাহা হইলে সব পাপ চুকিয়া যায়, মুসলমানের ভয়ও ঘুচিয়া যায়, কিন্তু ছেলের কি হইবে? রমা শেষ স্থির করিল, রাজা আসিলে গলায় ছুরি দেওয়া যাইবে, তিনি আসিয়া ছেলের বন্দোবস্ত যা হয় করিবেন—তত দিন মুসলমানের হাতে যদি বাঁচি। মুসলমানের হাতে ত বাঁচিব না নিশ্চিত, তবু গঙ্গারামকে আর ডাকিব না, কি লোক পাঠাইব না। তা রমা আর গঙ্গারামের কাছে লোক পাঠাইল না, কি মুরলাকে যাইতে দিল না।

মুরলা আর আসে না, রমা আর ডাকে না, গঙ্গারাম অস্থির হইল। আহার নিদ্রা বন্ধ হইল। গঙ্গারাম মুরলার সন্ধানে ফিরিতে লাগিল। কিন্তু মুরলা রাজবাটীর পরিচারিকা—রাস্তাঘাটে সচরাচর বাহির হয় না, কেবল মহিষীর হুকুমে গঙ্গারামের সন্ধানে বাহির হইয়াছিল। গঙ্গারাম মুরলার কোন সন্ধান পাইলেন না। শেষ নিজে এক দূতী খাড়া করিয়া মুরলার কাছে পাঠাইলেন—তাকে ডাকিতে। রমার কাছে পাঠাইতে সাহস হয় না।

মুরলা আসিল—জিজ্ঞাসা করিল, "ডাকিয়াছ কেন?"

গঙ্গারাম। আর খবর নাও না কেন?

মুরলা। জিজ্ঞাসা করিলে খবর দাও কই? আমাদের ত তোমার বিশ্বাস হয় না?

গঙ্গা। তা ভাল, আমি গিয়াও না হয় বলিয়া আসিতে পারি।

মুরলা। তাতে, যে ফল নৈবিদ্যিতে দেয় তার আটটি।

গঙ্গা। সে আবার কি?

মুরলা। ছোট রাণী আরাম হইয়াছেন।

গঙ্গা। কি হইয়াছিল যে আরাম হইয়াছেন?

মুরলা। তুমি আর জান না কি হইয়াছিল?

গঙ্গা। না।

মুরলা। দেখ নাই, বাতিকের ব্যামো?

গঙ্গা। সে কি?

মুরলা। নহিলে তুমি অন্দরমহলে ঢুকিতে পাও?

গঙ্গা। কেন, আমি কি?

মুরলা। তুমি কি সেখানকার যোগ্য?

গঙ্গা। আমি তবে কোথাকার যোগ্য?

মু। এই ছেঁড়া আঁচলের। বাপের বাড়ী লইয়া যাইতে হয় ত আমাকে লইয়া চল। অনেক দিন বাপ মা দেখি নাই।

এই বলিয়া মুরলা হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। গঙ্গারাম বুঝিলেন, এ দিকে কোন ভরসা নাই। ভরসা নাই, এ কথা কি কখন মন বুঝে? যতক্ষণ পাপ করিবার শক্তি থাকে, ততক্ষণ যার মন পাপে রত হইয়াছে, তার ভরসা থাকে। "পৃথিবীতে যত পাপ থাকে, সব আমি করিব, তবু আমি রমাকে ছাড়িব না।" এই সঙ্কল্প করিয়া কৃতঘ্ন গঙ্গারাম, ভীষণমূর্ত্তি হইয়া আপনার গৃহে প্রত্যাগমন করিল। সেই রাত্রিতে ভাবিয়া ভাবিয়া গঙ্গারাম রমা ও সীতারামের সর্ব্বনাশের উপায় চিন্তা করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অনেক দিন পরে, শ্রী ও জয়ন্তী বিরূপাতীরে, ললিতগিরির উপত্যকায় আসিয়াছে। মহাপুরুষ আসিতে বলিয়াছিলেন, পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে। তাই, দুই জনে আসিয়া উপস্থিত।

মহাপুরুষ কেবল জয়ন্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন–শ্রীর সঙ্গে নহে। জয়ন্তী একা হস্তিগুম্ফামধ্যে প্রবেশ করিল,–শ্রী ততক্ষণে বিরূপাতীরে বেড়াইতে লাগিল। পরে, শিখরদেশে আরোহণ করিয়া, চন্দনবৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া, নিম্নে ভূতলস্থ নদীতীরের এক তালবনের অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিতে লাগিল। পরে জয়ন্তী ফিরিয়া আসিল।

মহাপুরুষ কি আদেশ করিলেন, জয়ন্তীকে না জিজ্ঞাসা করিয়া শ্রী বলিল, "কি মিষ্ট পাখীর শব্দ! কাণ ভরিয়া গেল!"

জয়ন্তী। স্বামীর কণ্ঠস্বরের তুল্য কি?

শ্রী। এই নদীর তর তর গদ গদ শব্দের তুল্য।

জয়ন্তী। স্বামীর কণ্ঠস্বরের তুল্য কি?

শ্রী। অনেক দিন স্বামীর কণ্ঠ শুনি নাই–বড় আর মনে নাই।

হায়! সীতারাম!

জয়ন্তী তাহা জানিত, মনে করাইবার জন্য সে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। জয়ন্তী বলিল, "এখন শুনিলে আর তেমন ভাল লাগিবে না কি?"

শ্রী চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া, জয়ন্তীর পানে চাহিয়া শ্রী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, ঠাকুর কি আমাকে পতিসন্দর্শনে যাইতে অনুমতি করিয়াছেন?"

জয়ন্তী। তোমাকে ত যাইতেই হইবে–আমাকেও তোমার সঙ্গে যাইতে বলিয়াছেন।

শ্রী। কেন?

জয়ন্তী। তিনি বলেন, শুভ হইবে।

শ্রী। এখন আর আমার তাহাতে শুভাশুভ, সুখ দুঃখ কি ভগিনি?

জয়ন্তী। বুঝিতে পারিলে না কি শ্রী? তোমায় আজিও কি এত বুঝাইতে হইবে?

শ্রী। না—বুঝি নাই।

জয়ন্তী। তোমার শুভাশুভ উদ্দিষ্ট হইলে, ঠাকুর তোমাকে কোন আদেশ করিতেন না—আপনার স্বার্থ খুঁজিতে তিনি কাহাকেও আদেশ করেন না। হইাতে তোমার শুভাশুভ কিছুই নাই।

শ্রী। বুঝিয়াছি—আমি এখন গেলে আমার স্বামীর শুভ হইবার সম্ভাবনা?

জয়ন্তী। তিনি কিছুই স্পষ্ট বলেন না—অত ভাঙ্গিয়াও বলেন না, আমাদিগের সঙ্গে বেশী কথা কহিতে চাহেন না। তবে তাঁহার কথার এইমাত্র তাৎপর্য্য হইতে পারে, ইহা আমি বুঝি। আর তুমিও আমার কাছে এত দিন যাহা শুনিলে শিখিলে, তাহাতে তুমিও বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ।

শ্রী। তুমি যাইবে কেন?

জয়ন্তী। তাহা আমাকে কিছুই বলেন নাই। তিনি আজ্ঞা করিয়াছেন, তাই আমি যাইব। না যাইব কেন? তুমি যাইবে?

শ্রী। তাই ভাবিতেছি।

জয়ন্তী। ভাবিতেছ কেন? এই প্রিয়প্রাণহন্ত্রী কথাটা মনে পড়িয়াছে বলিয়া কি?

শ্রী। না। এখন আর তাহাতে ভীত নই।

জয়ন্তী। কেন ভীত নও আমাকে বুঝাও। তা বুঝিয়া তোমার সঙ্গে যাওয়া আমি স্থির করিব।

শ্রী। কে কাকে মারে বহিন্? মারিবার কর্ত্তা একজন—যে মরিবে, তিনি তাহাকে মারিয়া রাখিয়াছেন। সকলেই মরে। আমার হাতে হউক, পরের হাতে হউক, তিনি এক দিন মৃত্যুকে পাইবেন। আমি কখন ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাকে হত্যা করিব না, ইহা বলাই বাহুল্য; তবে যিনি সর্ব্বকর্ত্তা, তিনি যদি ঠিক করিয়া থাকেন যে, আমারই হাতে তাঁহার সংসারযন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি ঘটিবে, তবে কাহার সাধ্য অন্যথা করে? আমি বনে বনেই বেড়াই, আর সমুদ্রপারেই যাই, তাঁহার আজ্ঞার বশীভূত হইতেই হইবে। আপনি সাবধান হইয়া ধর্ম্মমত আচরণ করিব—তাহাতে তাঁহার বিপদ ঘটে, আমার তাহাতে সুখ দুঃখ কিছুই নাই।

হো হো সীতারাম! "কাহার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছ!

জয়ন্তী মনে মনে বড় খুসী হইল। জয়ন্তী জিজ্ঞাসা করিল, "তবে ভাবিতেছ কেন?"

শ্রী। ভাবিতেছি, গেলে যদি তিনি আর না ছাড়িয়া দেন?

জয়ন্তী। যদি কোষ্ঠীর ভয় আর নাই, তবে ছাড়িয়া নাই দিলেন? তুমিই আসিবে কেন?

শ্রী। আমি কি আর রাজার বামে বসিবার যোগ্য?

জয়ন্তী। এক হাজার বার। যখন তোমাকে সুবর্ণরেখার ধারে, কি বৈতরণীতীরে প্রথম দেখিয়াছিলাম, তাহার অপেক্ষা তোমার রূপ কত গুণে আড়িয়াছে, তাহা তুমি কিছুই জান না।

শ্রী। ছি!

জয়ন্তী। গুণ কত গুণে বাড়িয়াছে, তাও কি জান না? কোন্ রাজমহিষী গুণে তোমার তুল্যা?

শ্রী। আমার কথা বুঝিলে কই? কই, তোমার আমার মনের মধ্যে বাঁধা রাস্তা বাঁধিয়াছ কই? আমি কি তাহা বলিতেছিলাম? বলিতেছিলাম যে, যে শ্রীকে ফিরাইবার জন্য তিনি ডাকাডাকি করিয়াছিলেন, সে শ্রী আর নাই—তোমার হাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। এখন আছে কেবল তোমার শিষ্যা। তোমার শিষ্যাকে

নিয়া মহারাজাধিরাজ সীতারাম রায় সুখী হইবেন কি? না তোমার শিষ্যাই মহারাজাধিরাজ লইয়া সুখী হইবে? রাজরাণীগিরি চাকরি তোমার শিষ্যার যোগ্য নহে।

জয়ন্তী। আমার শিষ্যার আবার সুখ দুঃখ কি? (পরে সহাস্যে) ধিক্ এমন শিষ্যায়!

শ্রী। আমার সুখ দুঃখ নাই, কিন্তু তাঁহার আছে। যখন দেখিবেন, তাঁহার শ্রী মরিয়া গিয়াছে, তাহার দেহ লইয়া একজন সন্ন্যাসিনী প্রবঞ্চনা করিয়া বেড়াইতেছে, তখন কি তাঁর দুঃখ হইবে না?

জয়ন্তী। হইতে পারে, না হইতে পারে। সে সকল কথার বিচারে কোন প্রয়োজন নাই। যে অনন্তসুন্দর কৃষ্ণপাদপদ্মে মন স্থির করিয়াছে, তাহা ছাড়া আর কিছুই তাহার চিত্তে যেন স্থান না পায়–তাহা হইলে সকল দিকেই ঠিক কাজ হইবে; এক্ষণে চল, তোমার স্বামীর হউক, কি যাহারই হউক, যখন শুভ সাধন করিতে হইবে, তখন এখনই যাত্রা করি।

যতক্ষণ এই কথোপকথন হইতেছিল, ততক্ষণ জয়ন্তীর হাতে দুইটা ত্রিশূল ছিল। শ্রী জিজ্ঞাসা করিল, "ত্রিশূল কেন?"

"মহাপুরুষ আমাদিগকে ভৈরবীবেশে যাইতে বলিয়া দিয়াছেন। এই দুইটি ত্রিশূল দিয়াছেন। বোধ হয়, ত্রিশূল মন্ত্রপূত।"*

তখন দুই জনে ভৈরবীবেশ গ্রহণ করিল এবং উভয়ে পর্ব্বত অবরোহণ করিয়া, বিরূপাতীরবর্ত্তী পথে গঙ্গাভিমুখে চলিল। পথপার্শ্ববর্ত্তী বন হইতে বন্য পুষ্প চয়ন করিয়া উভয়ে তাহার দল কেশর রেণু প্রভৃতি তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিতে করিতে এবং পুষ্পনির্ম্মাতার অনন্ত কৌশলের অনন্ত মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিল। সীতারামের নাম আর কেহ একবারও মুখে আনিল না। এ পোড়ারমুখীদিগকে জগদীশ্বর কেন রূপ যৌবন দিয়াছিলেন তাহা তিনিই জানেন। আর যে গণ্ডমুর্খ সীতারাম, শ্রী! শ্রী! করিয়া পাতি পাতি করিল, সেই বলিতে পারে। পাঠক বোধ হয়, দুইটাকেই ডাকিনীশ্রেণী মধ্যে গণ্য করিবেন। তাহাতে গ্রন্থকারের সম্পূর্ণ মত আছে।

নবম পরিচ্ছেদ

বন্দে আলি নামে ভূষণার একজন ছোট মুসলমান, একজন বড় মুসলমানের কবিলাকে বাহির করিয়া তাহাকে নেকা করিয়াছিল। খসম গিয়া বলপূর্ব্বক অপহৃতা সীতার উদ্ধারের উদ্যোগী হইল; দোস্ত বিবি লইয়া মহম্মদপুর পলায়ন করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিল। গঙ্গারামের নিকট সে পূর্ব্ব হইতে পরিচিত ছিল। তাঁহার অনুগ্রহে সে সীতারামের নাগরিক সৈন্যমধ্যে সিপাহী হইল। গঙ্গারাম তাহাকে বড় বিশ্বাস করিতেন। তিনি এক্ষণে গোপনে তাহাকে তোরাব্ খাঁর নিকট পাঠাইলেন। বলিয়া পাঠাইলেন, "চন্দ্রচূড় ঠাকুর বঞ্চক। চন্দ্রচূড় যে বলিতেছেন যে, টাকা দিলে আমি মহম্মদপুর ফৌজদারের হস্তে দিব, সে কেবল প্রবঞ্চনাবাক্য। প্রবঞ্চনার দ্বারা কাল হরণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। যাহাতে সীতারাম আসিয়া পৌঁছে, তিনি তাহাই করিতেছেন। নগরও তাঁহার হাতে নয়। তিনি মনে করিলেও নগর ফৌজদারকে দিতে পারেন না। নগর আমার হাতে। আমি না দিলে নগর কেহ পাইবে না, সীতারামও না। আমি ফৌজদারকে নগর ছাড়িয়া দিতে পারি। কিন্তু তাহার কথাবার্ত্তা আমি ফৌজদার সাহেবের সহিত স্বয়ং কহিতে ইচ্ছা করি–নহিলে হইবে না। কিন্তু আমি ত ফেরারী আসামী–প্রাণভয়ে যাইতে সাহস করি না। ফৌজদার সাহেব অভয় দিলে যাইতে পারি।"

---

* আধুনিক ভাষায় "Magnetized".

গঙ্গারামের সৌভাগ্যক্রমে বন্দেআলির ভগিনী এক্ষণে তোরাব্ খাঁর একজন মতাহিয়া বেগম। সুতরাং ফৌজদারের সঙ্গে সাক্ষাৎলাভ বন্দেআলির পক্ষে কঠিন হইল না। কথাবার্ত্তা ঠিক হইল। গঙ্গারাম অভয় পাইলেন।

তোরাব্ স্বহস্তে গঙ্গারামকে এই পত্র লিখিলেন, "তোমার সকল কসুর মাফ করা গেল। কাল রাত্রিকালে হুজুরে হাজির হইবে।"

বন্দেআলী ভূষণা হইতে ফিরিল। যে নৌকায় সে পার হইল, সেই নৌকায় চাঁদশাহ ফকির–সেও পার হইতেছিল। ফকির বন্দেআলির সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল। "কোথায় গিয়াছিলে?" জিজ্ঞাসা করায় বন্দেআলি বলিল, "ভূষণায় গিয়াছিলাম।" ফকির ভূষণার খবর জিজ্ঞাসা করিল। বন্দেআলি ফৌজদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছে, সুতরাং একটু উঁচু মেজাজে ছিল। ভূষণার খবর বলিতে একেবারে কোতোয়াল, বখশী, মুনশী, কারকুন, পেশকার, লাগায়েৎ খোদ ফৌজদারের খবর বলিয়া ফেলিল। ফকির বিস্মিত হইল। ফকির সীতারামের হিতাকাঙ্ক্ষী। সে মনে মনে স্থির করিল, "আমাকে একটু সন্ধানে থাকিতে হইবে।"

দশম পরিচ্ছেদ

গঙ্গারাম ফৌজদারের সঙ্গে নিভৃতে সাক্ষাৎ করিলেন। ফৌজদার তাঁহাকে কোন প্রকার ভয় দেখাইল না। কাজের কথা সব ঠিক হইল। ফৌজদারের সৈন্য মহম্মদপুরের দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইলে, গঙ্গারাম দুর্গদ্বার খুলিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু ফৌজদার বলিলেন, "দুর্গদ্বারে পৌঁছিলে ত তুমি আমাদের দুর্গদ্বার খুলিয়া দিবে। এখন মৃন্ময়ের তাঁবে অনেক সিপাহী আছে। পথিমধ্যে, বিশেষ পারের সময়ে, তাহারা যুদ্ধ করিবে, ইহাই সম্ভব। যুদ্ধে জয় পরাজয় আছে। যদি যুদ্ধে আমাদের জয় হয়, তবে তোমার সাহায্য ব্যতীতও আমরা দুর্গ অধিকার করিতে পারি। যদি পরাজয় হয়, তবে তোমার সাহায্যে আমাদের কোন উপকার হইবে না। তার কি পরামর্শ করিয়াছ?"

গঙ্গা। ভূষণা হইতে মহম্মদপুর যাইবার দুই পথ আছে। এক উত্তর পথ, এক দক্ষিণ পথে। দক্ষিণ পথে, দূরে নদী পার হইতে হয়–উত্তর পথে কিল্লার সম্মুখেই পার হইতে হয়। আপনি মহম্মদপুর আক্রমণ করিতে দক্ষিণ পথে সেনা লইয়া যাইবেন। মৃন্ময় তাহা বিশ্বাস করিবে; কেন না, কিল্লার সম্মুখে নদীপার কঠিন বা অসম্ভব। অতএব সেও সৈন্য লইয়া দক্ষিণ পথে আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইবে। আপনি সেই সময়ে উত্তর পথে সৈন্য লইয়া কিল্লার সম্মুখে নদী পার হইবে। তখন দুর্গে সৈন্য থাকিবে না বা অল্পই থাকিবে। অতএব আপনি অনায়াসে নদী পার হইয়া খোলা পথে দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিতে পারিবেন।

ফৌজদার। কিন্তু যদি মৃন্ময় দক্ষিণ পথে যাইতে যাইতে শুনিতে পায় যে, আমরা উত্তর পথে সৈন্য লইয়া যাইতেছি, তবে সে পথ হইতে ফিরিতে পারে।

গঙ্গারাম। আপনি অর্দ্ধেক সৈন্য দক্ষিণ পথে, অর্দ্ধেক সৈন্য উত্তর পথে পাঠাইবেন। উত্তর পথে যে সৈন্য পাঠাইবেন, পূর্ব্বে যেন কেহ তাহা না জানিতে পারে। ঐ সৈন্য রাত্রিতে রওয়ানা করিয়া নদীতীর হইতে কিছু দূরে বনজঙ্গল মধ্যে লুকাইয়া রাখিলে ভাল হয়। তার পর মৃন্ময় ফৌজ লইয়া কিছু দূর গেলে পর নদী পার হইলেই নির্ব্বিঘ্ন হইবেন। মৃন্ময়ের সৈন্যও উত্তর দক্ষিণ দুই পথের সৈন্যের মাঝখানে পড়িয়া নষ্ট হইবে।

ফৌজদার পরামর্শ শুনিয়া সন্তুষ্ট ও সম্মত হইলেন। বলিলেন, "উত্তম। তুমি আমাদিগের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বটে। কোন পুরস্কারের লোভেতেই এরূপ করিতেছ সন্দেহ নাই। কি পুরস্কার তোমার বাঞ্ছিত?"

গঙ্গারাম অভীষ্ট পুরস্কার চাহিলেন–বলা বাহুল্য সে পুরস্কার রমা।

সন্তুষ্ট হইয়া গঙ্গারাম বিদায় হইল। এবং সেই রাত্রিতেই মহম্মদপুর ফিরিয়া আসিল।

গঙ্গারাম জানিত না যে, চাঁদশাহ ফকির তাহার অনুবর্ত্তী হইয়াছিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পর গুপ্তচর আসিয়া চন্দ্রচূড়কে সংবাদ দিল যে, ফৌজদারী সৈন্য দক্ষিণ পথে মহম্মদপুর আক্রমণে আসিতেছে।

চন্দ্রচূড় তখন মৃন্ময় ও গঙ্গারামকে ডাকাইয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। পরামর্শ এই স্থির হইল যে, মৃন্ময় সৈন্য লইয়া সেই রাত্রিতে দক্ষিণ পথে যাত্রা করিবেন–যাহাতে যবনসেনা নদী পার হইতে না পারে, এমন ব্যবস্থা করিবেন।

এ দিকে রণসজ্জার ধূম পড়িয়া গেল। মৃন্ময় পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন, তিনি সৈন্য লইয়া রাত্রিতেই দক্ষিণ পথে যাত্রা করিলেন। গড় রক্ষার্থ অল্প মাত্র সিপাহী রাখিয়া গেলেন। তাহারা গঙ্গারামের আজ্ঞাধীনে রহিল।

এই সকল গোলমালের সময়ে পাঠকের কি গরিব রমাকে মনে পড়ে? সকলের কাছে মুসলমানের সৈন্যাগমনবার্ত্তা যেমন পৌঁছিল, রমার কাছেও সেইরূপ পৌঁছিল। মুরলা বলিল, “মহারাণী, এখন বাপের বাড়ী যাওয়ার উদ্যোগ কর।”

রমা বলিল, “মরিতে হয় এইখানেই মরিব। কলঙ্কের পথে যাইব না। কিন্তু তুমি একবার গঙ্গারামের কাছে যাও। আমি মরি, এইখানেই মরিব, কিন্তু আমার ছেলেকে রক্ষা করিতে তিনি স্বীকৃত আছেন, তাহা স্মরণ করিয়া দিও। সময়ে আসিয়া যেন রক্ষা করেন। আমার সঙ্গে কিছুতেই আর সাক্ষাৎ হইবে না, তাহাও বলিও।”

রমা মনস্থির করিবার জন্য নন্দার কাছে গিয়া বসিয়া রহিল। পুরীমধ্যে কেহই সে রাত্রিতে ঘুমাইল না।

মুরলা আজ্ঞা পাইয়া গঙ্গারামের কাছে চলিল। গঙ্গারাম নিশীথকালে গৃহমধ্যে একাকী বসিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। রত্ন আশায় সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে তিনি প্রবৃত্ত–সাঁতার দিয়া আবার কূল পাইবেন কি? গঙ্গারাম সাহসে ভর করিয়াও এ কথার কিছু মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। যে ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু স্থির করিতে না পারে, তাহার শেষ ভরসা জগদীশ্বর। সে বলে, “জগদীশ্বর যা করেন।” কিন্তু গঙ্গারাম তাহাও বলিতে পারিতেছিলেন না–যে পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত সে জানে যে, জগদীশ্বর তার বিরুদ্ধ–জগতের বন্ধু তাহার শত্রু। অতএব গঙ্গারাম বড় বিষণ্ন হইয়া চিন্তামগ্ন ছিলেন।

এমন সময়ে মুরলা আসিয়া দেখা দিল। রমার প্রেরিত সংবাদ তাঁহাকে বলিল।

গঙ্গারাম বলিল, “বলেন ত এখন গিয়া ছেলে নিয়া আসি।”

মুরলা। তাহা হইবে না। যখন মুসলমান পুরীতে প্রবেশ করিবে, আপনি তখন গিয়া রক্ষা করিবেন, ইহাই রাণীর অভিপ্রায়।

গঙ্গা। তখন কি হইবে, কে বলিতে পারে? যদি রক্ষার অভিপ্রায় থাকে, তবে এই বেলা বালকটিকে আমাকে দিন।

মুরলা। আমি তাহাকে লইয়া আসিব?

গঙ্গা। না আমার অনেক কথা আছে।

মুরলা। আচ্ছা–পৌষ মাসে।

এই বলিয়া, মুরলা হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। কিন্তু গঙ্গারামের গৃহ হইতে বাহির হইয়া রাজপথে উঠিতে না উঠিতে মুরলার সে হাসি হঠাৎ নিবিয়া গেল–ভয়ে মুখ কালি হইয়া উঠিল। দেখিল, সম্মুখে রাজপথে, প্রভাতশুক্রতারাবৎ সমুজ্জ্বলা ত্রিশূলধারিণী যুগল ভৈরবীমূর্ত্তি! মুরলা তাহাদিগকে শঙ্করীর

অনুচারিণী ভাবিয়া ভূমিতে পড়িয়া প্রণাম করিয়া, জোড়হাত করিয়া দাঁড়াইল।

একজন ভৈরবী বলিল, “তুই কে?”

মুরলা কাতরস্বরে বলিল, “আমি মুরলা।”

ভৈরবী। মুরলা কে?

মুরলা। আমি ছোট রাণীর দাসী।

ভৈরবী। নগরপালের ঘরে এত রাত্তিতে কি করিতে আসিয়াছিলি?

মুরলা। মহারাণী পাঠাইয়াছিলেন।

ভৈরবী। সম্মুখে এই দেবমন্দির দেখিতেছিস?

মুরলা। আজ্ঞা হাঁ।

ভৈরবী। আমাদের সঙ্গে উহার উপরে আয়।

মুরলা। যে আজ্ঞা।

তখন দুই জনে, মুরলাকে দুই ত্রিশূলাগ্রমধ্যবর্ত্তিনী করিয়া মন্দিরমধ্যে লইয়া গেলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কারের সে রাত্রিতে নিদ্রা নাই। কিন্তু সমস্ত রাত্রি নগর পরিভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছেন যে, নগর রক্ষার কোন উদ্যোগই নাই। গঙ্গারামকে সে কথা বলায়, গঙ্গারাম তাঁহাকে কড়া কড়া বলিয়া হাঁকাইয়া দিয়াছিল। তখন তিনি অতিশয় অনুতপ্তচিত্তে কুশাসনে বসিয়া সর্ব্বরক্ষাকর্ত্তা বিপত্তিভঞ্জন মধুসূদনকে চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময়ে চাঁদশাহ ফকির আসিয়া গঙ্গারামের ভূষণাগমন বৃত্তান্ত তাঁহাকে জানাইল। শুনিয়া চন্দ্রচূড় শিহরিয়া উঠিলেন। একবার মনে করিতেছিলেন যে, জনকত সিপাহী লইয়া গঙ্গারামকে ধরিয়া আবদ্ধ করিয়া, নগর রক্ষার ভার অন্য লোককে দিবেন, কিন্তু ইহাও ভাবিলেন যে, সিপাহীরা তাঁহার বাধ্য নহে, গঙ্গারামের বাধ্য। অতএব সে সকল উদ্যম সফল হইবে না। মৃন্ময় থাকিলে কোন গোল উপস্থিত হইত না, সিপাহীরা মৃন্ময়ের আজ্ঞাকারী। মৃন্ময়কে বাহিরে পাঠাইয়া তিনি এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত করিয়াছেন। ইহা বুঝিতে পারিয়াই তিনি এত অনুতাপপীড়িত হইয়া নিশ্চেষ্টবৎ কেবল অসুরনিসূদন হরির চিন্তা করিতেছিলেন। তখন সহসা সম্মুখে প্রফুল্লকান্তি ত্রিশূলধারিণী ভৈরবীকে দেখিলেন।

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা, তুমি কে?”

ভৈরবী বলিল, “বাবা! শত্রু নিকটে, এ পুরীর রক্ষার কোন উদ্যোগ নাই কেন? তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি।”

মুরালার সঙ্গে কথা কহিয়াছিল ও চন্দ্রচূড়ের সঙ্গে কথা কহিতেছে, জয়ন্তী।

প্রশ্ন শুনিয়া চন্দ্রচূড় আরও বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা, তুমি কি এই নগরের রাজলক্ষ্মী?”

জয়ন্তী। আমি যে হই, আমার কথার উত্তর দাও। নহিলে মঙ্গল হইবে না।

চন্দ্র। মা! আমার সাধ্য আর কিছু নাই। রাজা নগররক্ষকের উপর নগর রক্ষার ভার দিয়াছিলেন, নগররক্ষক নগর রক্ষা করিতেছে না। সৈন্য আমার বশ

নহে। আমি কি করিব, আজ্ঞা করুন।

জয়ন্তী। নগররক্ষকের সংবাদ আপনি কিছু জানেন? কোন প্রকার অবিশ্বাসিতা শুনেন নাই?

চন্দ্র। শুনিয়াছি। তিনি তোরাব্ খাঁর নিকট গিয়াছিলেন। বোধ হয়, তাঁহাকে নগর সমর্পণ করিবেন। আমার দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ আমি তাহার কোন উপায় করি নাই। মা! বোধ করিতেছি, আপনি এই নগরীর রাজলক্ষ্মী। দয়া করিয়া দাসকে ভৈরবীবেশে দর্শন দিয়াছেন। মা! আপনি অপরিম্লানতেজস্বিনী হইয়া আপনার এই পুরী রক্ষা করুন।

এই বলিয়া চন্দ্রচূড় কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিভাবে জয়ন্তীকে প্রণাম করিলেন।

"তবে, আমিই এই পুরী রক্ষা করিব।" এই বলিয়া জয়ন্তী প্রস্থান করিল। চন্দ্রচূড়ের মনে ভরসা হইল।

জয়ন্তীরও আশার অতিরিক্ত ফললাভ হইয়াছিল। শ্রী বাহিরে ছিল। তাহাকে সঙ্গে লইয়া জয়ন্তী গঙ্গারামের গৃহাভিমুখে চলিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মুরলা চলিয়া গেলে, গঙ্গারাম চারি দিকে আরও অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। যাহারা জন্য তিনি এই বিপদ্‌সাগরে ঝাঁপ দিতেছেন, সে ত তাঁহার অনুরাগিণী নয়। তিনি চক্ষু বুঝিয়া সমুদ্রমধ্যে ঝাঁপ দিতেছেন, সমুদ্রতলে রত্ন মিলিবে কি? না, ডুবিয়া মরাই সার হইবে? আঁধার! চারিদিকে আঁধার! এখন কে তাঁকে উদ্ধার করিবে?

সহসা গঙ্গারামের শরীর রোমাঞ্চিত হইল। দেখিলেন, দ্বারদেশে প্রভাতনক্ষত্রোজ্জ্বলরূপিণী ত্রিশূলধারিণী ভৈরবীমূর্ত্তি। অঙ্গপ্রভায় গৃহস্থিত প্রদীপের জ্যোতি ম্লান হইয়া গেল। সাক্ষাৎ ভবানী ভূতলে অবতীর্ণা মনে করিয়া, গঙ্গারামও মুরলার ন্যায় প্রণত হইয়া জোড়হাত করিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "মা, দাসের প্রতি কি আজ্ঞা?"

জয়ন্তী। বলিল, "বাছা! তোমার কাছে কিছু ভিক্ষার জন্য আসিয়াছি।"

ভৈরবীর কথা শুনিয়া গঙ্গারাম বলিল, "মা! আপনি যাহা চাহিবেন, তাহাই দিব। আজ্ঞা করুন।"

জয়ন্তী। আমাকে এক গাড়ি গোলা বারুদ দাও। আর একজন ভাল গোলন্দাজ দাও।

গঙ্গারাম ইতস্ততঃ করিতে লাগিল–কে এ? জিজ্ঞাসা করিল, "মা! আপনি গোলা বারুদ লইয়া কি করিবেন?"

জয়ন্তী। দেবতার কাজ।

গঙ্গারামের মনে বড় সন্দেয় হইল। এ যদি কোন দেবী হইবে, তবে গোলা গুলি ইহার প্রয়োজন হইবে কেন? যদি মানুষী হয়, তবে ইহাকে গোলা গুলি দিব কেন? কাহার চর তা কি জানি? এই ভাবিয়া গঙ্গারাম জিজ্ঞাসা করিল, "মা তুমি কে?"

জয়ন্তী। আমি যে হই, রমা ও মুরলা ঘটিত সংবাদ আমি সব জানি। তাছাড়া তোমার ভূষণাগমন-সংবাদ ও সেখানকার কথাবার্ত্তার সংবাদ আমি জানি। আমি যাহা চাহিতেছি, তাহা এই মুহূর্ত্তে আমাকে দাও, নচেৎ এই ত্রিশূলাঘাতে তোমাকে বধ করিব।

এই বলিয়া সেই তেজস্বিনী ভৈরবী উজ্জ্বল ত্রিশূল উত্থিত করিয়া আন্দোলিত করিল।

গঙ্গারাম একেবারে নিবিয়া গেল। "আসুন দিতেছি।" বলিয়া ভৈরবীকে সঙ্গে করিয়া অস্ত্রাগারে গেল। জয়ন্তী। যাহা যাহা চাহিল, সকলই দিল, এবং পিয়ারীলাল নামে একজন গোলন্দাজকে সঙ্গে দিল। জয়ন্তীকে বিদায় দিয়া গঙ্গারাম দুর্গদ্বার বন্ধ রাখিতে আজ্ঞা দিলেন। যেন তাঁহার বিনানুমতিতে কেহ যাইতে

আসিতে না পারে।

জয়ন্তী ও শ্রী গোলা বারুদ লইয়া, গড়ের বাহির হইয়া, যেখানে রাজবাড়ীর ঘাট সেইখানে উপস্থিত হইল। দেখিল, এক উন্নতবপু সুন্দরকান্তি পুরুষ তথা বসিয়া আছেন।

দুই জন ভৈরবীর মধ্যে একজন ভৈরবী বারুদ, গোলার গাড়ি ও গোলন্দাজকে সঙ্গে লইয়া কিছু দূরে গিয়া দাঁড়াইল, আর একজন সেই কান্তিমান পুরুষের নিকট গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?"

সে বলিল, "আমি যে হই না। তুমি কে?"

জয়ন্তী বলিল, "যদি তুমি বীরপুরুষ হও, এই গোলা গুলি আনিয়া দিতেছি—এই পুরী রক্ষা কর।"

সে পুরুষ বিস্মিত হইল, দেবতাভ্রমে জয়ন্তীকে প্রণাম করিল। কিছুক্ষণ ভাবিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। বলিল, "তাতেই বা কি?"

জয়ন্তী। তুমি কি চাও?

পুরুষ। যা চাই, পুরী রক্ষা করিলে তা পাইব?

জয়ন্তী। পাইবে।

এই বলিয়া জয়ন্তী সহসা অদৃশ্য হইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

বলিয়াছি, চন্দ্রচূড় ঠাকুরের সে রাত্রিতে ঘুম হইল না। অতি প্রত্যূষে তিনি রাজপ্রসাদের উচ্চ চূড়ে উঠিয়া চারি দিক নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। দেখিলেন, নদীর অপর পারে, ঠিক তাঁহার সম্মুখে, বহু সংখ্যক নৌকা একত্র হইয়াছে। তীরে অনেক লোকও আছে বোধ হইতেছে, কিন্তু তখনও তেমন ফর্সা হয় নাই, বোঝা গেল না যে, তাহারা কি প্রকারের লোক। তখন তিনি গঙ্গারামকে ডাকিতে পাঠাইলেন।

গঙ্গারাম আসিয়া সেই অট্টালিকাশিখরদেশে উপস্থিত হইল। চন্দ্রচূড় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও পারে অত নৌকা কেন?"

গঙ্গারাম নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "কি জানি?"

চন্দ্র দেখ, তীরে বিস্তর লোক। এত নৌকা, এত লোক কেন?

গঙ্গারাম। বলিতে ত পারি না।

কথা কহিতে কহিতে বেশ আলো হইল। তখন বোধ হইল, ঐ সকল লোক সৈনিক! চন্দ্রচূড় তখন বলিলেন, "গঙ্গারাম! সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আমাদের চর আমাদের প্রতারণা করিয়াছে। অথবা সেই প্রতারিত হইয়াছে। আমার দক্ষিণ পথে সৈন্য পাঠাইলাম, কিন্তু ফৌজদারের সেনা এই পথে আসিয়াছে। সর্ব্বনাশ হইল। এখন রক্ষা করে কে?"

গঙ্গা। কেন, আমি আছি কি করিতে?

চন্দ্র। তুমি এই কয় জন মাত্র দুর্গরক্ষক লইয়া এই অসংখ্য সেনার কি করিবে? আর তুমিও দুর্গরক্ষার কোন উদ্যোগ করিতেছ না। কাল বলিয়াছিলাম বলিয়া আমাকে কড়া কড়া শুনাইয়াছিলে। এখন কে দায় ভার ঘাড়ে করে?

গঙ্গা। অত ভয় পাইবেন না। ও পারে যে ফৌজ দেখিতেছেন, তাহার অসংখ্য নয়। এই কয়খানা নৌকায় কয় জন সিপাহী পার হইতে পারে? আমি তীরে গিয়া ফৌজ লইয়া দাঁড়াইতেছি। উহার যেমন তীরে আসিবে, অমনি উহাদিগকে টিপিয়া মারিব।

গঙ্গারামের অভিপ্রায়, সেনা লইয়া বাহির হইবেন, কিন্তু এখন নয়, আগে ফৌজদারের সেনা নির্ব্বিঘ্নে পার হউক। তার পর তিনি সেনা লইয়া দুর্গদ্বার খুলিয়া বাহির হইবেন, মুক্ত দ্বার পাইয়া মুসলমানেরা নির্ব্বিঘ্নে গড়ের ভিতর প্রবেশ করিবে। তিনি কোন আপত্তি করিবেন না। কাল যে মূর্ত্তিটা দেখিয়াছিলেন, সেটা কি বিভীষিকা! কৈ, তার আর কিছু প্রকাশ নাই।

চন্দ্রচূড় সব বুঝিলেন। তথাপি বলিলেন, “তবে শীঘ্র যাও। সেনা লইয়া বাহির হও। বিলম্ব করিও না। নৌকা সকল সিপাহী বোঝাই লইয়া ছাড়িতেছে।”

গঙ্গারাম তখন তাড়াতাড়ি ছাদের উপর হইতে নামিল। চন্দ্রচূড় সভয়ে দেখিতে লাগিলেন যে, প্রায় পঞ্চাশখানা নৌকায় পাঁচ ছয় শত মুসলমান সিপাহী এক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যাত্রা করিল। তিনি অতিশয় অস্থির হইয়া দেখিতে লাগিলেন, কতক্ষণে গঙ্গারাম সিপাহী লইয়া বাহির হয়। সিপাহী সকল সাজিতেছে, ফিরিতেছে, ঘুরিতেছে, সারি দিতেছে–কিন্তু বাহির হইতেছে না। চন্দ্রচূড় তখন ভাবিলেন, “হায়! হায়! কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি–কেন গঙ্গারামকে বিশ্বাস করিয়াছিলাম! এখন সর্ব্বনাশ হইল। কৈ, সেই জ্যোতির্ম্ময়ী রাজলক্ষ্মীই বা কৈ? তিনিও কি ছলনা করিলেন?” চন্দ্রচূড় গঙ্গারামের সন্ধানে আসিবার অভিপ্রায়ে সৌধ হইতে অবতরণ করিবার উপক্রম করিতেছিলেন, এমন সময়ে গুড়ুম করিয়া এক কামানের আওয়াজ হইল। মুসলমানের নৌকাশ্রেণী হইতে আওয়াজ হইল, এমন বোধ হইল না। তাহাদের সঙ্গে কামান আছে, এমন বোধ হইতেছিল না। চন্দ্রচূড় নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, মুসলমানের কোন নৌকায় কামানের ধূঁয়া দেখা যায় না। চন্দ্রচূড় সবিস্ময়ে দেখিলেন, যেমন কামানের শব্দ হইল, অমনি মুসলমানদিগের একখানি নৌকা জলমগ্ন হইল; আরোহী সিপাহীরা সন্তরণ করিয়া অন্য নৌকায় উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

“তবে কি এ আমাদের তোপ!”

এই ভাবিয়া চন্দ্রচূড় নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, একটি সিপাহীও গড় হইতে বাহির হয় নাই। দুর্গপ্রাকারে, যেখানে তোপ সকল সাজান আছে, সেখানে একটি মনুষ্যও নাই। তবে এ তোপ ছাড়িল কে?

কোনও দিকে ধূম দেখা যায় কি না, ইহা লক্ষ্য করিবার জন্য চন্দ্রচূড় চারি দিকে চাহিতে লাগিলেন–দেখিলেন, গড়ের সম্মুখে যেখানে রাজবাটীর ঘাট, সেইখান হইতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, ধূমরাশি আকাশমার্গে উঠিয়া পবন-পথে চলিয়া যাইতেছে।

তখন চন্দ্রচূড়ের স্মরণ হইল যে, ঘাটের উপরে, গাছের তলায় একটা তোপ আছে। কোন শত্রুর নৌকা আসিয়া ঘাটে না লাগিতে পারে, এ জন্য সীতারাম সেখানে একটা কামান রাখিয়াছিলেন–কেহ এখন সেই কামান ব্যবহার করিতেছে, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু সে কে? গঙ্গারামের একটি সিপাহীও বাহির হয় নাই –এখনও ফটক বন্ধ। মৃন্ময়ের সিপাহীরা অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে। মৃন্ময় যে কোন সিপাহী ঐ কামানের জন্য রাখিয়া যাইবেন, ইহা অসম্ভব; কেন না, দুর্গরক্ষার ভার গঙ্গারামের উপর আছে। কোন বাজে লোক আসিয়া কামান ছাড়িল–ইহাও অসম্ভব; কেন না, বাজে লোকে গোলা বারুদ কোথা পাইবে? আর এরূপ অব্যর্থ সন্ধান–বাজে লোকের হইতে পারে না–শিক্ষিত গোলন্দাজের। কার এ কাজ? চন্দ্রচূড় এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে আবার সেই কামান বজ্রনাদে চতুর্দ্দিক শব্দিত করিল–আবার ধূমরাশি আকাশে উঠিয়া নদীর উপরিস্থ বায়ুস্তরে গগন বিচরণ করিতে লাগিল–আবার মুসলমান সিপাহী পরিপূর্ণ আর একখানি নৌকা জলমগ্ন হইল।

“ধন্য! ধন্য!” বলিয়া চন্দ্রচূড় করতালি দিতে লাগিলেন। নিশ্চিত এই সেই মহাদেবী! বুঝি কালিকা সদয় হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। জয় লক্ষ্মীনারায়ণজী!

জয় কালী! জয় পুররাজলক্ষ্মী! তখন চন্দ্রচূড় সভয়ে দেখিলেন যে, যে সকল নৌকা অগ্রবর্ত্তী হইয়াছিল–অর্থাৎ যে সকল নৌকার সিপাহীদের গুলি তীর পর্য্যন্ত পৌঁছিবার সম্ভাবনা, তাহার তীর লক্ষ্য করিয়া বন্দুক চালাইতে লাগিল। ধূমে সহসা নদীবক্ষ অন্ধকার হইয়া উঠিল–শব্দে কাণ পাতা যায় না। চন্দ্রচূড় ভাবিলেন, “যদি আমাদের রক্ষক দেবতা হয়েন–তবে এ গুলিবৃষ্টি তাঁহার কি করিবে? আর যদি মনুষ্য হয়েন, তবে আমাদের জীবন এই পর্য্যন্ত–এ লোহাবৃষ্টিতে কোন মনুষ্যই টিকিবে না।”

কিন্তু আবার সেই কামান ডাকিল–আবার দশ দিক কাঁপিয়া উঠিল–ধূমের চক্রে চক্রে ধূমাকার বাড়িয়া গেল। আবার সসৈন্য নৌকা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ডুবিয়া গেল।

তখন এক দিকে–এক কামান–আর এক দিকে শত শত মুসলমান সেনায় তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল। শব্দে আর কাণ পাতা যায় না। উপর্য্যুপরি গম্ভীর, তীব্র, ভীষণ, মুহুর্ম্মুহুঃ ইন্দ্রহস্তপরিত্যক্ত বজ্রের মত, সেই কামান ডাকিতে লাগিল–প্রশস্ত নদীবক্ষ এমন ধূমাচ্ছন্ন হইল যে, চন্দ্রচূড় সেই উচ্চ সৌধ হইতে উত্তালতরঙ্গসংক্ষুব্ধ ধূমসমুদ্র ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাইলেন না। কেবল সেই তীব্রনাদী বজ্রনাদে বুঝিতে পারিলেন যে, এখনও হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী দেবী জীবিতা আছেন। চন্দ্রচূড় তীব্রদৃষ্টিতে ধূমসমুদ্রের বিচ্ছেদ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন–এই আশ্চর্য্য সমরের ফল কি হইল–দেখিবেন।

ক্রমে শব্দ কম পড়িয়া আসিল–একটু বাতাস উঠিয়া ধূঁয়া উড়াইয়া লইয়া গেল–তখন চন্দ্রচূড় সেই জলময় রণক্ষেত্র পরিষ্কার দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন যে, ছিন্ন নিমগ্ন, নৌকা সকল স্রোতে উলটি পালটি করিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। মৃত ও জীবিত সিপাহীর দেহ নদীস্রোত ঝটিকাশান্তির পর পল্লবকুসুমাকীর্ণ উদ্যানবৎ দৃষ্ট হইতেছে–কাহারও অস্ত্র, কাহারও বস্ত্র, কাহারও বাদ্য, কাহারও উষ্ণীষ, কাহারও দেহ ভাসিয়া যাইতেছে–কেহ সাঁতার দিয়া পলাইতেছে–কাহাকেও কুম্ভীরে গ্রাস করিতেছে। যে কয়খানা নৌকা ডোবে নাই–সে কয়খানা, নাবিকেরা প্রাণপাত করিয়া বাহিয়া সিপাহী লইয়া অপর পারে পলায়ন করিয়াছে। একমাত্র বজ্রের প্রহারে আহতা আসুরী সেনার ন্যায় মুসলমান সেনা রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইল।

দেখিয়া চন্দ্রচূড় হাতজোড় করিয়া ঊর্দ্ধমুখে, গদ্গদকণ্ঠে, সজলনয়নে বলিলেন, “জয় জগদীশ্বর! জয় দৈত্যদমন, ভক্ততারণ, ধর্ম্মরক্ষণ হরি! আজ বড় দয়া করিলে! আজ তুমি স্বয়ং সশরীরে যুদ্ধ করিয়াছ, নহিলে এই পুররাজলক্ষ্মী স্বয়ং যুদ্ধ করিয়াছেন, নহিলে তোমার দাসানুদাস সীতারাম আসিয়াছে। তোমার সেই ভক্ত ভিন্ন এ যুদ্ধ মনুষ্যের সাধ্য নহে।”

তখন চন্দ্রচূড়, প্রাসাদশিখর হইতে অবতরণ করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কামানের বন্দুকের হুড়ুমুড়ু দুড়ুমুড়ু শুনিয়া গঙ্গারাম মনে ভাবিল–এ আবার কি? লড়াই কে করে? সেই ডাকিনী নয় ত? তিনি কি দেবতা? গঙ্গারাম এক জন জমাদ্দারকে দেখিতে পাঠাইলেন। জমাদ্দার নিষ্ক্রান্ত হইল। সে দিন, সেই প্রথম ফটক খোলা হইল।

জমাদ্দার ফিরিয়া গিয়া নিবেদন করিল, “মুসলমান লড়াই করিতেছে।”

গঙ্গারাম বিরক্ত হইয়া বলিল, “তা ত জানি। কার সঙ্গে মুসলমান লড়াই করিতেছে।”

জমাদ্দার বলিল, “কারও সঙ্গে নহে।”

গঙ্গারাম হাসিল, “তাও কি হয় মূর্খ! তোপ কার?”

জমাদ্দার। হুজুর, তোপ কারও না।

গঙ্গারাম বড় রাগিল। বলিল, “তোপের আওয়াজ শুনিতেছিস না?”

জমাদ্দার। তা শুনিতেছি।

গঙ্গারাম। তবে? সে তোপ কে দাগিতেছে?

জমা। তাহা দেখিতে পাই নাই।

গঙ্গা। চোখ কোথা ছিল?

জমা। সঙ্গে।

গঙ্গা। তবে তোপ দেখিতে পাও নাই কেন?

জমা। তোপ দেখিয়াছি–ঘাটের তোপ।

গঙ্গা। বটে! কে আওয়াজ করিতেছে?

জমা। গাছের ডাল।

গঙ্গা। তুই কি ক্ষেপিয়াছিস? গাছের ডালে তোপ দাগে?

জমা। সেখানে আর কাহাকে দেখিতে পাইলাম না–কেবল কতকগুলা গাছের ডাল তোপ ঢাকিয়া নুঙিয়া পড়িয়া আছে দেখিলাম।

গঙ্গা। তবে কেহ ডাল নোঙাইয়া বাঁধিয়া তাহার আশ্রয়ে তোপ দাগিতেছে। সে বুদ্ধিমান সন্দেহ নাই। সিপাহীরা তাহাকে লক্ষ্য করিতে পারিবে না, কিন্তু সে পাতার আড়াল হইতে তাহাদের লক্ষ্য করিবে। ডালের ভিতর কে আছে, তা দেখে এলি না কেন?

জমা। সেখানে কি যাওয়া যায়?

গঙ্গা। কেন?

জমা। সেখানে বৃষ্টির ধারার মত গুলি পড়িতেছে।

গঙ্গা। গুলিতে এত ভয় ত এ কাজে এসেছিলি কেন?

তখন গঙ্গারাম অনুচরকে হুকুম দিল যে, জমাদ্দারের পাগড়ি পোষাক কাপড় সব কাড়িয়া লয়। যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখিয়া মৃন্ময় বাছা বাছা জনকত হিন্দুস্থানীকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং দুর্গরক্ষার জন্য তাহাদের রাখিয়া গিয়াছিলেন। গঙ্গারাম তাহাদিগের মধ্যে চারি জনকে আদেশ করিল, “যেখানে ঘাটের উপর তোপ আছে, সেইখানে যাও। যে কামান ছাড়িতেছে, তাহাকে ধরিয়া আন।”

সেই চারি জন সিপাহী যখন তোপের কাছে আসিল, তখন যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, হতাবশিষ্ট মুসলমানেরা বাহিয়া পলাইয়া যাইতেছে। সিপাহীরা গাছের ডালের ভিতর গিয়া দেখিল–তোপের কাছে এক জন মানুষ মরিয়া পড়িয়া আছে–আর এক জন জীবিত, পলিতা হাতে করিয়া বসিয়া আছে। সে খুব জোওয়ান, ধুতি মালকোঁচা মারা, মাথায় মুখে গালচাল্লা বাঁধা, সর্ব্বাঙ্গে বারুদে আর ছাইয়ে কালো হইয়া আছে। চারি জন আসিয়া তাহাকে ধরিল। বলিল, “তোম্, কোন্ হো রে?”

সে বলিল, “কেন বাপু!”

"তোম্ কাহে হিঁয়া বৈঠ্ বৈঠ্‌কে তোপ ছোড়ুতে হো?"

"কেন বাপু, তাতে কি দোষ হয়েছে? মুসলমানের সঙ্গে তোমরা মিলেছ?"

"আরে মুসলমান আনেসে হমলোক আভি হাঁকায় দেতে–তোম্ কাহেকো দিক্ কিয়ে হো? চল্ হুজুরমে যানে হোগা।"

"কার কাছে যাব?"

"কোতোয়াল সাহেবকি হুকুমসে তোম্‌কো উন্‌কা পাশ লে যাঙ্গে।"

"আচ্ছা যাই। আগে নেড়েরা বিদায় হোক। যতক্ষণ ওদের মধ্যে এক জনকে ও পারে দেখা যাইবে, ততক্ষণ তোরা কি, তোদের কোতোয়াল এলে উঠিব না। ততক্ষণ দেখ দেখি, যে মানুষটা মরিয়া আছে, ও কে চিনিতে পারিস্ কি না?"

সিপাহীরা দেখিয়া বলিল, "হাঁ, হামলোক ত ইস্কো পহচান্‌তে হেঁ। য়ে ত হামারা গোলন্দাজ পিয়ারীলাল হৈঁ–য়ে কাঁহাসে আয়া?"

"তবে আগে ওকে ভিতর নিয়ে যা–আমি যাচ্ছি।"

সিপাহীরা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, "য়ে আদমি ত অচ্ছা বোল্‌তা হৈ। যো তোপ্‌কা পাশ রহেগা, ওসিকো লে যানেকো হুকুম হৈ। এই মুরদার তোপ্‌কা পাশ হৈ–উস্‌কো আলবৎ লে যানে হোগা।"

কিন্তু মড়া–হিন্দু সিপাহীরা ছুঁইবে না। তখন পরামর্শ করিয়া একজন সিপাহী ডোম ডাকিতে গেল–আর তিন জন তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

এ দিকে কালি বারুদ মাখা পুরুষ, ক্রমে ক্রমে দেখিলেন যে, মুসলমান সিপাহীরা সব তীরে গিয়া উঠিল। তখন তিনি সিপাহীদিগকে বলিলেন, "চল বাবা, তোমাদের কোতোয়াল সাহেবকে সেলাম করি গিয়া চল।" সিপাহীরা সে ব্যক্তিকে ধরিয়া লইয়া চলিল।

সেই সমবেত সজ্জিত দুর্গরক্ষক সৈন্যমণ্ডলীমধ্যে যেখানে ভীত নাগরিকগণ পিপীলিকা শ্রেণীবৎ সারি দিয়া দাঁড়াইয়া আছে–সেইখানে সিপাহীরা সেই কালিমাখা বারুদমাখা পুরুষকে আনিয়া খাড়া করিল।

তখন সহসা জয়ধ্বনিতে আকাশ পুরিয়া উঠিল। সেই সমবেত সৈনিক ও নাগরিকমণ্ডলী, একেবারে সহস্র কণ্ঠে গর্জ্জন করিল, "জয় মহারাজের জয়।"

"জয় মহারাজাধিরাজকি জয়।"

"জয় শ্রীসীতারামরায় রাজা বাহাদুরকি জয়।"

"জয় লক্ষ্মীনারায়ণজীকি জয়।"

চন্দ্রচূড় দ্রুত আসিয়া সেই বারুদমাখা মহাপুরুষকে আলিঙ্গন করিলেন; বারুদমাখা পুরুষও তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। চন্দ্রচূড় বলিলেন, "সময় দেখিয়া আমি জানিয়াছি, তুমি আসিয়াছ। মনুষ্যলোকে তুমি ভিন্ন এ অব্যর্থ সন্ধান আর কাহারও নাই। এখন অন্য কথার আগে গঙ্গারামকে বাঁধিয়া আনিতে আজ্ঞা দাও।"

সীতারাম সেই আজ্ঞা দিলেন। গঙ্গারাম সীতারামকে দেখিয়া সরিয়া পড়িতেছিল, কিন্তু শীঘ্র ধৃত হইয়া সীতারামের আজ্ঞাক্রমে কারাবদ্ধ হইল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সীতারাম, তখন সিপাহীদিগকে দুর্গপ্রাকারস্থিত তোপ সকলের নিকট, এবং অন্যান্য উপযুক্ত স্থানে অবস্থিত করিয়া, এবং মৃন্ময়ের সম্বন্ধে সংবাদ আনিবার জন্য

লোক পাঠাইয়া, স্বয়ং স্নানাহ্নিকে গমন করিলেন। স্নানাহ্নিকের পর, চন্দ্রচূড় ঠাকুরের সঙ্গে নিভৃতে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। চন্দ্রচূড় বলিলেন, "মহারাজ! আপনি কখন আসিয়াছেন, আমরা কিছুই জানিতে পারি নাই। একাই বা কেন আসিলেন? আপনার অনুচরবর্গই বা কোথায়? পথে কোন বিপদ ঘটে নাই ত?"

সীতা। সঙ্গীদিগকে পথে রাখিয়া আমি একা আগে আসিয়াছি। আমার অবর্ত্তমানে নগরের কিরূপ অবস্থা, তাহা জানিবার জন্য ছদ্মবেশে একা রাত্রিকালে আসিয়াছিলাম। দেখিলাম, নগর সম্পূর্ণরূপে অরক্ষিত। কেন, তাহা এখন কতক কতক বুঝিয়াছি। পরে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে গিয়া দেখিলাম, ফটক বন্ধ। দুর্গে প্রবেশ না করিয়া, প্রভাত নিকট দেখিয়া নদীতীরে গিয়া দেখিলাম, মুসলমান সেনা নৌকায় পার হইতেছে। দুর্গরক্ষকেরা রক্ষার কোন উদ্যোগই করিতেছে না দেখিয়া, আপনার যাহা সাধ্য, তাহা করিলাম।

চন্দ্র। যাহা করিয়াছেন, তাহা আপনারই সাধ্য, অপরের নহে। এত গোলা বারুদ পাইলেন কোথা?

সীতা। এক দেবী সহায় হইয়া আমাকে গোলা বারুদ এবং গোলন্দাজ আনিয়া দিয়াছিলেন।

চন্দ্র। দেবী? আমিও তাঁহার দর্শন পাইয়াছিলাম। তিনি এই পুরীর রাজলক্ষ্মী। তিনি কোথায় গেলেন?

সীতা। তিনি আমাকে গোলা বারুদ এবং গোলন্দাজ দিয়া অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন। এক্ষণে এ কয় মাসের সংবাদ আমাকে বলুন।

তখন চন্দ্রচূড় সকল বৃত্তান্ত, যতদূর তিনি জানিতেন, আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলেন। শেষে বলিলেন, "এক্ষণে যে জন্য দিল্লী গিয়াছিলেন, তাহার সুসিদ্ধির সংবাদ বলুন।"

সীতা। কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে। বাদশাহের আমি কোন উপকার করিতে পারিয়াছিলাম। তাহাতে তিনি আমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া দ্বাদশ ভৌমিকের উপর আধিপত্য প্রদান করিয়া মহারাজাধিরাজ নাম দিয়া সনন্দ দিয়াছেন। এক্ষণে বড় দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, ফৌজদারের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। কেন না, ফৌজদার সুবাদারের অধীন, এবং সুবাদার বাদশাহের অধীন। অতএব ফৌজদারের সঙ্গে বিরোধ করিলে, বাদশাহের সঙ্গেই বিরোধ করা হইল। যিনি আমাকে এতদূর অনুগৃহীত করিয়াছেন, তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা নিতান্ত কৃতঘ্নের কাজ। আত্মরক্ষা সকলেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য ভিন্ন ফৌজদারের সঙ্গে যুদ্ধ করা আমার অকর্ত্তব্য। অতএব এ বিরোধ আমার বড় দুরদৃষ্ট বিবেচনা করি।

চন্দ্র। ইহা আমাদিগের শুভাদৃষ্ট–হিন্দু মাত্রেরই শুভাদৃষ্ট; কেন না, আপনি মুসলমানের প্রতি সম্প্রীত হইলে, মুসলমান হইতে হিন্দুকে রক্ষা করিবে কে? হিন্দুধর্ম্ম আর দাঁড়াইবে কোথায়? ইহা আপনারও শুভাদৃষ্ট; কেন না, যে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিবে, সেই মনুষ্যমধ্যে কৃতী ও সৌভাগ্যশালী।

সীতা। মৃন্ময়ের সংবাদ না পাইলে, কি কর্ত্তব্য, কিছুই বলা যায় না।

সন্ধ্যার পর মৃন্ময়ের সংবাদ আসিল। পীর বক্‌স্ খাঁ নামে ফৌজদারী সেনাপতি অর্দ্ধেক ফৌজদারী সৈন্য লইয়া আসিতেছিলেন, অর্দ্ধেক পথে মৃন্ময়ের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ ও যুদ্ধ হয়। মৃন্ময়ের অসাধারণ সাহস ও কৌশলে তিনি সসৈন্যে পরাজিত ও নিহত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে শয়ন করেন। বিজয়ী মৃন্ময় সসৈন্যে ফিরিয়া আসিতেছেন।

শুনিয়া চন্দ্রচূড় সীতারামকে বলিলেন, "মহারাজ! আর দেখেন কি? এই সময়ে বিজয়ী সেনা লইয়া নদী পার হইয়া গিয়া ভূষণা দখল করুন।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

জয়ন্তী বলিল, "শ্রী! আর দেখ কি? এক্ষণে স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর।"

শ্রী। সেই জন্যই কি আসিয়াছি?

জয়ন্তী। যত প্রকার মনুষ্য আছে, রাজর্ষিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। রাজাকে রাজর্ষি কর না কেন?

শ্রী। আমার কি সাধ্য?

জয়ন্তী। আমি বুঝি যে, তোমা হইতেই এ মহৎ কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে। অতএব যাও, শীঘ্র গিয়া রাজা সীতারামকে প্রণাম কর।

শ্রী। জয়ন্তি! সোলা জলে ভাসে বটে, কিন্তু খাটো দড়িতে পাথরে বাঁধিয়া দিলে সোলাও ডুবিয়া যায়। আবার কি ডুবিয়া মরিব?

জয়ন্তী। কৌশল জানিলে মরিতে হয় না। ডুবুরিরা সমুদ্রে ডুব দেয়–কিন্তু মরে না, রত্ন তুলিয়া আনে।

শ্রী। আমার সে সাধ্য আছে, আমার এমন ভরসা হইতেছে না। অতএব এক্ষণে আমি রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব না। কিছু দিন না হয় এইখানে থাকিয়া আপনার মন বুঝিয়া দেখি, যদি দেখি, আমার চিত্ত এখন অবশ, তবে সাক্ষাৎ না করিয়াই এ দেশ ত্যাগ করিয়া যাইব স্থির করিয়াছি।

অতএব, শ্রী রাজাকে সহসা দর্শন দিল না।

তৃতীয় খণ্ড

রাত্রি–ডাকিনী

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভূষণা দখল হইল। সীতারামের জয় হইল। তোরাব্ খাঁ মৃন্ময়ের হাতে মারা পড়িলেন। সে সকল ঐতিহাসিক কথা। কাজেই আমাদের কাছে ছোট কথা। আমরা তাহার বিস্তারিত বর্ণনায় কালক্ষেপ করিতে পারি না। উপন্যাসলেখক অন্তর্ব্বিষয়ের প্রকটনে যত্নবান্ হইবেন–ইতিবৃত্তের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখা নিষ্প্রয়োজন।

ভূষণা অধিকৃত হইল। বাদশাহী সনদের বলে এবং নিজ বাহুবলে সীতারাম বাঙ্গালার দ্বাদশ ভৌমিকের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া মহারাজা উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক প্রচণ্ড প্রতাপে শাসন আরম্ভ করিলেন।

শাসন সম্বন্ধে আগেই গঙ্গারামের দণ্ডের কথাটা উঠিল। তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণের অভাব ছিল না। পতিপ্রাণা অপরাধিনী রমাই সমস্ত বৃত্তান্ত অকপটে সীতারামের নিকট প্রকাশ করিল। বাকি যেটুকু, সেটুকু মুরলা ও চাঁদশাহ ফকির সকলই প্রকাশ করিল। কেবল গঙ্গারামকে জিজ্ঞাসা করা বাকি–এমন সময়ে এ কথা লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইল।

কথাগুলা রমা, অন্তঃপুরে বসিয়া সীতারামের কাছে, চক্ষুর জলে ভাসিতে ভাসিতে বলিল। সীতারাম তাহার এক বর্ণ অবিশ্বাস করিলেন না। বুঝিলেন, সরলা রমা নিরপরাধিনী, অপরাধের মধ্যে কেবল পুত্রস্নেহ। কিন্তু সাধারণ পুরবাসী লোক তাহা ভাবিল না। গঙ্গারাম কয়েদ হইল কেন? এই কথাটা লইয়া সহরে বড় আন্দোলন পড়িয়া গেল। কতক মুরলার দোষে, কতক সেই পাহারাওয়ালা পাঁড়ে ঠাকুরের গল্পের জাঁকে; রমার নামটা সেই সঙ্গে লোকে মিলাইতে লাগিল। কেহ বলিল যে, গঙ্গারাম মোগলকে রাজ্য বেচিতে বসিয়াছিল; কেহ বলিল যে, সে ছোট রাণীর মহলে গিরেপ্তার হইয়াছিল। কেহ বলিল, দুই কথাই সত্য, আর রাজ্য

বেচার পরামর্শে ছোট রাণীও ছিলেন। রাজার কাণে এত কথা উঠে না, কিন্তু রাণীর কাণে উঠে—মেয়েমহলে এ রকম কথাগুলা সহজে প্রচার পায়—শাখা প্রশাখা সমেত। দুই রাণীর কাণেই কথা উঠিল। রমা শুনিয়া শয্যা লইল, কাঁদিয়া বালিশ ভাসাইল, শেষ গলায় দড়ি দিয়া, কি জলে ডুবিয়া মরা ঠিক করিল। নন্দা শুনিয়া বুদ্ধিমতীর মত কাজ করিল।

নন্দা খুঁজিয়া খুঁজিয়া রমা যেখানে বালিশে মুখ ঝাঁপিয়া কাঁদিতেছে, আর পুকুরে ডুবিয়া মরা সোজা, কি গলায় দড়ি দিয়া মরা সোজা, ইহার যতদূর সাধ্য মীমাংসা করিতেছে, সেইখানে গিয়া তাহাকে ধরিল। বলিল, "দেখিতেছি, তুমিও ছাই কথা শুনিয়াছ।" রমা কেবল ঘাড় নাড়িল—অর্থাৎ "শুনিয়াছি।" চক্ষুর জল বড় বেশী ছুটিল।

নন্দা তাহার চক্ষুর জল মুছাইয়া, সস্নেহবচনে বলিল, "কাঁদিলে কলঙ্ক যাবে না, দিদি! না কাঁদিয়া, যাতে এ কলঙ্ক মুছিয়া তুলিতে পারি, তাই করিতে হইবে। পারিস্ ত উঠিয়া বসিয়া, ধীরে সুস্থে আমাকে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বল দেখি। এখন আমাকে সতীন ভাবিস্ না—কালি চূণ তোর গালে পড়ুক না পড়ুক, রাজারই বড় মাথা হেঁট হয়েছে। তিনি তোরও প্রভু—আমারও প্রভু, এ লজ্জা আমার চেয়ে তোর যে বেশী, তা মনে করিস্ না। আর মহারাজা আমাকে অন্তঃপুরের ভার দিয়া গিয়াছিলেন,—তাঁর কাণে এ কথা উঠিলে আমি কি জবাব দিব?"

রমা বলিল, "যাহা যাহা হইয়াছিল, আমি তাঁহাকে বলিয়াছি; তিনি আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন। আমার ত কোন দোষ নাই।"

নন্দা। তা বলিতে হইবে না—তোর যে কোন দোষ নাই, সে কথা আমায় বলিয়া কেন দুঃখ পাস্? তবে কি হইয়াছিল, তা আমাকে বলিস্ না বলিস্—

রমা। বলিব না কেন? আমি এ কথা সকলকেই বলিতে পারি।

এই বীলয়া রাম চক্ষুর জল সামলাইয়া, উঠিয়া বসিয়া, সকল কথা যথার্থরূপে নন্দাকে বলিল। নন্দার সে কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল। নন্দা বলিল, "যদি ঘুণাক্ষরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া এ কাজ করিতে দিদি, তবে কি এত কাণ্ড হইতে পায়? তা যাক্—যা হয়ে গিয়েছে, তার জন্য তিরস্কার করিয়া এখন আর কি হইবে? এখন যাহাতে আবার মানসম্ভ্রম বজায় হয়, তাই করিতে হইবে।"

রমা। যদি তা না কর দিদি, তবে তোমায় নিশ্চিত বলিতেছি, আমি জলে ডুবিয়া মরিব, কি গলায় দড়ি দিয়া মরিব। আমি ত রাজার মহিষী—এমন কাঙ্গাল গরিব ভিখারীর মেয়ে কে আছে যে, অপবাদ হইলে আর প্রাণ রাখিতে চায়?

নন্দা। মরিতে হইব না, দিদি! কিন্তু একটা খুব সাহসের কাজ করিতে পারিস্? বোধহয়, তা হলে কাহারও মনে আর কোন সন্দেহ থাকিবে না।

রমা। এমন কাজ নাই যে, এর জন্য আমি করিতে পারি না। কি করিতে হইবে?

নন্দা। তুমি যে রকম করিয়া আমার কাছে সকল কথা ভাঙ্গিয়া চূরিয়া বলিলে, এই রকম করিয়া তুমি যার সাক্ষাতে ভাঙ্গিয়া চূরিয়া বলিবে, সেই তোমার কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিবে, ইহা আমার নিশ্চিত বিবেচনা হয়। যদি রাজধানীর লোক সকলে তোমার মুখে এ কথা শুনে, তবে আর এ কলঙ্ক থাকে না।

রমা। তা, কি প্রকারে হইবে?

নন্দা। আমি মহারাজকে বলিয়া দরবার করাইব। তিনি ঘোষণা দিয়া সমস্ত নগরবাসীকে সেই দরবারে উপস্থিত করিবেন; সেখানে গঙ্গারামের সাক্ষাৎকারে, সমস্ত নগরবাসীর সাক্ষাৎকারে তুমি এই কাথগুলি বলিবে। আমরা রাজমহিষী, সূর্য্যও আমাদিগকে দেখিতে পান না। এই সমস্ত নগরবাসীর সম্মুখে বাহির হইয়া, মুক্তকণ্ঠে তুমি এই সকল কথা কি বলিতে পারিবে? পার ত সব কলঙ্ক হইতে আমরা মুক্ত হই।

রমা। তখন সিংহীর মত গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল, "তুমি সমস্ত নগরবাসী কি বলিতেছ দিদি! সমস্ত জগতের লোক জমা কর, আমি জগতের লোকের সম্মুখে

মুক্তকণ্ঠে এ কথা বলিব।”

নন্দা। পারিবি?

রমা। পারিব—নহিলে মরিব।

নন্দা। আচ্ছা, তবে আমি গিয়া মহারাজকে বলিয়া দরবারের বন্দোবস্ত করাই। তুই আর কাঁদিস না।

নন্দা উঠিয়া গেল। রমাও শয্যা ত্যাগ করিয়া চোখের জল মুছিয়া, পুত্রকে কোলে লইয়া মুখচুম্বন করিল। এতক্ষণ তাহাও করে নাই।

নন্দা রাজাকে সংবাদ দিয়া অন্তঃপুরে আনাইল। যে কুরব উঠিয়াছে, সকলেই যাহা বলিতেছে, তাহা রাজাকে শুনাইল। তার পর রমার সঙ্গে নন্দার যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা সকলই অবিকল তাঁহাকে বলিল। তার পর বলিল, “আমরা দুই জনে গলায় কাপড় দিয়া তোমার পায়ে লুটাইয়া (বলিবার সময়ে নন্দা গলায় কাপড় দিয়া জানু পাতিয়া বসিয়া, দুই হাতে দুই পা চাপিয়া ধরিল) বলিতেছি যে, এখন তুমি আমাদের মান রাখ, এ কলঙ্ক হইতে উদ্ধার কর, নহিলে আমরা দুই জনেই আত্মহত্যা করিয়া মরিব।”

সীতারাম বড় বিষণ্নভাবে—কলঙ্কের জন্যও বটে, নন্দার প্রস্তাবের জন্যও বটে—বলিলেন, “রাজার মহিষী—আমি কি প্রকারে দরবারে বাহির করিব? কি প্রকারে আপনার মহিষীকে সামান্য কুলটার ন্যায় বিচারালয়ে খাড়া করিয়া দিব?”

নন্দা। তুমি যেমন বুঝিবে, আমরা। কিন্তু তেমন বুঝিব না; কিন্তু সে বেশী লজ্জা, না রাজমহিষীর কুলটা অপবাদে বেশী লজ্জা?

সীতা। এরূপ মিথ্যা অপবাদ রাজার ঘরে, সীতা হইতে চলিয়া আসিতেছে। প্রথামত কাজ করিতে হইলে এত কাণ্ড না করিয়া সীতার ন্যায় রমাকে আমার ত্যাগ করাই শ্রেয়। তাহা হইলে আর কোন কথা থাকে না।

নন্দা। মহারাজা! নিরপরাধিনীকে ত্যাগ করিবে, তবু তার বিচার করিবে না? এই কি তোমার রাজধর্ম্ম? রামচন্দ্র করিয়াছিলেন বলিয়া কি তুমিও করিবে? যিনি পূর্ণ ব্রহ্ম, তাঁর আর ত্যাগই কি, গ্রহণই বা কি? তোমার কি তা সাজে মহারাজ?

সীতা। এই সমস্ত প্রজা, শত্রু মিত্র ইতর ভদ্র লোকের সাক্ষাতে আপনার মহিষীকে কুলটার ন্যায় খাড়া করিয়া দিতে আমার বুক কি ভাঙ্গিয়া যাইবে না? আমি ত পাষাণ নহি।

নন্দা। মহারাজ! যখন পঞ্চাশ হাজার লোক সামনে, শ্রী গাছের ডালে চড়িয়া নাচিয়াছিল, তখন কি তোমার বুক দশ হাত হইয়াছিল?

সীতারাম নন্দার প্রতি ক্রূর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। বলিলেন, “তা হয়েছিল, নন্দা! আবার তেমন হইল না, সেই দুঃখই আমার বেশী।”

ইট্‌টি মারিয়া পাটখেল খাইয়া, নন্দা জোড়হাতে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। জোড় হাত করিয়া নন্দা জিতিয়া গেল। সীতারাম শেষে দরবারে সম্মত হইলেন। বুঝিলেন, ইহা না করিলে রমাকে ত্যাগ করিতে হয়। অথচ রমা নিরপরাধিনী, কাজেই দরবার ভিন্ন আর কর্ত্তব্য নাই।

বিষণ্নভাবে রাজা, চন্দ্রচূড়ের নিকটে আসিয়া দরবারের কর্ত্তব্যতা নিবেদিত হইলেন। ব্রাহ্মণ ঠাকুরের আব্‌রু পরদার উপর ততটা শ্রদ্ধা হইল না। তিনি সাধুবাদ করিয়া সম্মত হইলেন। তাঁর কেবল ভয়, রমা কথা কহিতে পারিবে না। সীতারামেরও সে ভয় ছিল। সে যদি না পারে, তবে সকল দিক্ যাইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তখন সীতারাম ঘোষণা করিলেন যে, আমদরবারে গঙ্গারামের বিচার হইবে। রাজার আজ্ঞানুসারে সমস্ত নগরবাসী উপস্থিত হইয়া বিচার দর্শন করিবে। আজ্ঞা পাইয়া অবধারিত দিবসে, সহস্র সহস্র প্রজাবৃন্দ আসিয়া দরবার পরিপূর্ণ করিল। দিল্লীর অনুকরণে সীতারামও এক "দরবারে আম" প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আজিকার দিন তাহা রাজকর্ম্মচারীদিগের যত্নে সুসজ্জিত হইয়াছিল। দিল্লীর মত তাহার রূপার চাঁদোয়া, মতির ঝালর ছিল না; কিন্তু তথাপি চন্দ্রাতপ পট্টবস্ত্রনির্ম্মিত, তাহাতে জরির কাজ। স্তম্ভ সকল সেইরূপ কারুকার্য্যখচিত, পট্টবস্ত্রে আবৃত। নানাচিত্রবর্ণরঞ্জিত কোমল গালিচায় সভামণ্ডপ শোভিত, তাহার চারি পার্শ্বে বিচিত্রপরিচ্ছদধারী সৈনিকগণ সশস্ত্র শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান। বাহিরে অশ্বারূঢ় রক্ষিবর্গ শান্তি রক্ষা করিতেছে। সভামণ্ডপমধ্যে শ্বেতমর্ম্মরনির্ম্মিত উচ্চ বেদীর উপর সীতারামের জন্য স্বর্ণখচিত, রৌপ্যনির্ম্মিত, মুক্তাঝালরশোভিত সিংহাসন রক্ষিত হইয়াছে।

ক্রমে ক্রমে দুর্গ লোকারণ্য হইয়া উঠিল। সভামণ্ডপমধ্যে কেবল উচ্চ শ্রেণীর লোকেরাই স্থান পাইল। নিম্ন শ্রেণীর লোকে সহস্রে সহস্রে সভামণ্ডপ পরিবেষ্টিত করিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।

বাতায়ন হইতে এই মহাসমারোহ দেখিতে পাইয়া মহারাজ্ঞী নন্দা দেবী রমাকে ডাকিয়া আনিয়া এই ব্যাপার দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, এই সমারোহের মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া বলিতে পারিবে? সাহস হইতেছে ত?"

রমা। যদি আমার স্বামিপদে ভক্তি থাকে, তবে নিশ্চয় পারিব।

নন্দা। আমরা কেহ সঙ্গে যাইব? বল, ত আমি যাই।

রমা। তুমিও কেন আমার সঙ্গে এ অসম্ভ্রমের সমুদ্রে ঝাঁপ দিবে? কাহাকে যাইতে হইবে না। কেবল একটা কাজ করিও। যখন আমার কথা কহিবার সময় হইবে, তখন যেন আমার ছেলেকে কেহ লইয়া গিয়া আমার নিকট দাঁড়ায়। তাহার মুখ দেখিলে আমার সাহস হইবে।

নন্দা স্বীকৃত হইয়া বলিল, "এখন সভামধ্যে যাইতে হইবে, একটু কাপড় চোপড় দুরস্ত করিয়া নাও। এই বেলা প্রস্তুত হও।"

রমা স্বীকৃত হইয়া আপনার মহলে গেল। সেখানে ঘর রুদ্ধ করিয়া মাটিতে পড়িয়া যুক্ত করে ডাকিতে লাগিল, "জয় লক্ষ্মীনারায়ণ! জয় জগদীশ্বর! আজিকার দিনে আমার যাহা বলিবার, তাহা বলিয়া, আমি যদি তার পর জন্মের মত বোবা হই, তাহাও আমি তোমার কাছে ভিক্ষা করি। আজিকার দিন সভামধ্যে আপনার কথা বলিয়া, আর কখনও এই জন্মে কথা না কই, তাও তোমার কাছে ভিক্ষা করি। আজিকার দিন মুখ রাখিও। তার পর মরণে আমার কোন দুঃখ থাকিবে না।"

তার পর বেশ পরিবর্ত্তনের কথাটা মনে পড়িল। রমা ধাত্রীদিগের একখানা সামান্য বস্ত্র চাহিয়া লইয়া, তাই পরিয়া সভামণ্ডপে যাইতে প্রস্তুত হইল। নন্দা দেখিয়া বলিল, "এ কি এ?"

রমা বলিল, "আজ আমার সাজিবার দিন নয়। বিধাতা যদি আবার কখন সাজিবার দিন দেন, তবে আবার সাজিব। নহিলে এই সাজাই শেষ। এই বেশেই সভায় যাইব।"

নন্দা বুঝিল, ইহা উপযুক্ত। আর কোন আপত্তি করিল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যথাকালে, মহারাজ সীতারাম রায় সভাস্থলে সিংহাসনে গিয়া বসিলেন। নকিব স্তুতিবাদ করিল, কিন্তু গীত-বাদ্য সে দিন নিষেধ ছিল।

তখন শৃঙ্খলাবদ্ধ গঙ্গারাম সম্মুখে আনীত হইল। তাহাকে দেখিবার জন্য বাহিরে দণ্ডায়মান জনসমূহ বিচলিত ও উন্মুখ হইয়া উঠিল। শান্তি রক্ষকেরা তাহাদিগকে শান্ত করিল।

রাজা তখন গঙ্গারামকে গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "গঙ্গারাম! তুমি আমার কুটুম্ব, আত্মীয়, প্রজা এবং বেতনভোগী। আমি তোমাকে বিশেষ স্নেহ ও অনুগ্রহ করিতাম, তুমি বড় বিশ্বাসের পাত্র ছিলে, ইহা সকলেই জানে। একবার আমি তোমার প্রাণও রক্ষা করিয়াছি। তার পর, তুমি বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিলে কেন? তুমি রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।"

গঙ্গারাম বিনীতভাবে বলিল, "কোন শত্রুতে আপনার কাছে আমার মিথ্যাপবাদ দিয়াছে। আমি কোন বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করি নাই। মহারাজ স্বয়ং আমার বিচার করিতেছেন—ভরসা করি, ধর্ম্মশাস্ত্রসম্মত প্রমাণ না পাইলে আমার কোন দণ্ড করিবেন না।"

রাজা। তাহাই হইবে। ধর্ম্মশাস্ত্রসম্মত যে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা শুন, আর যথাসাধ্য উত্তর দাও।

এই বলিয়া রাজা চন্দ্রচূড়কে অনুমতি করিলেন যে, "আপনি যাহা জানেন, তাহা ব্যক্ত করুন।"

তখন চন্দ্রচূড় যাহা জানিতেন, তাহা সবিস্তারে সভামধ্যে বিবৃত করিলেন। তাহাতে সভাস্থ সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইল যে, যে দিন মুসলমান, দুর্গ আক্রমণ করিবার জন্য নদী পার হইতেছিল, সে দিন চন্দ্রচূড়ের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও গঙ্গারাম দুর্গরক্ষার কোন চেষ্টা করেন নাই। চন্দ্রচূড়ের কথা সমাপ্ত হইলে, রাজা গঙ্গারামকে আজ্ঞা করিলেন, "নরাধম! ইহার কি উত্তর দাও।"

গঙ্গারাম যুক্তকরে বলিল, "ইনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, ইনি যুদ্ধের কি জানেন? মুসলমান এ পারে আসেও নাই, দুর্গ আক্রমণও করে নাই। যদি তাহা করিত, আর আমি তাহাদের না হঠাইতাম, তবে ঠাকুর মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা শিরোধার্য্য হইত। মহারাজ! দুর্গমধ্যে আমিও বাস করি। দুর্গের বিনাশে আমার কি লাভ?"

রাজা। কি লাভ, তাহা আর এক জনের নিকট শুন।

এই বলিয়া রাজা চাঁদশাহ ফকিরকে আজ্ঞা করিলেন, "আপনি যাহা জানেন তাহা বলুন।"

চঁদশাহ তখন দুর্গ আক্রমণের পূর্ব্ব রাত্রিতে তোরাব্ খাঁর নিকট গঙ্গারামের গমনবৃত্তান্ত যাহা জানিতেন, তাহা বলিলেন। রাজা তখন গঙ্গারামকে আজ্ঞা করিলেন, "ইহার কি উত্তর দাও?"

গঙ্গারাম বলিল, "আমি সে রাত্রে তোরাব্ খাঁর নিকঠ গিয়াছিলাম বটে। বিশ্বাসঘাতক সাজিয়া, কুপথে আনিয়া, তাহাকে গড়ের নীচে আনিয়া টিপিয়া মারিব—আমার এই অভিপ্রায় ছিল।"

রাজা। সে জন্য তোরাব্ খাঁর কাছে কিছু পুরস্কার প্রার্থনা করিয়াছিলে?

গঙ্গারাম। নহিলে তাঁহার বিশ্বাস জন্মিবে কেন?

রাজা। কি পুরস্কার চাহিয়াছিলে?

গঙ্গারাম। অর্দ্ধেক রাজ্য।

রাজা। আর কিছু?

গঙ্গা। আর কিছু না।

তখন রাজা চাঁদশাহ ফকিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি সে কথা কিছু জানেন?"

চাঁদশাহ। জানি।

রাজা। কি প্রকারে জানিলেন?

চাঁদ। আমি মুসলমান ফকির, তোরাব্ খাঁর কাছে যাতায়াত করিতাম। তিনিও আমাকে বিশেষ আদর করিতেন। আমি কখন তাঁহার কথা মহারাজের কাছে বলিতাম না, অথবা মহারাজের কথা তাঁহার কাছে বলিতাম না। এজন্য কোন পক্ষ বলিয়া গণ্য নহি। এখন তিনি গত হইয়াছেন, এখন ভিন্ন কথা। যে দিন তিনি মহারাজের হাতে ফতে হইয়া মধুমতীর তীর হইতে প্রস্থান করে, সেই দিন তাঁহার সঙ্গে পথিমধ্যে আমার দেখা হইয়াছিল। তখন গঙ্গারামের বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। গঙ্গারাম তাঁহাকে প্রতারণা করিয়াছে, এই বিবেচনায় তিনি আপনা হইতেই সে সকল কথা আমায় বলিয়াছিলেন। গঙ্গারাম অর্দ্ধেক রাজ্য পুরস্কারস্বরূপ চাহিয়াছিল বটে, কিন্তু আরও কিছু চাহিয়াছিল। তবে সে কথা হুজুরে নিবেদন করিতে বড় ভয় পাই–অভয় ভিন্ন বলিতে পারি না।

রাজা। নির্ভয়ে বলুন।

চাঁদ। দ্বিতীয় পুরস্কার মহারাজের কনিষ্ঠা মহিষী।

দর্শকমণ্ডলী সমুদ্রবৎ গর্জ্জিয়া উঠিল–গঙ্গারামকে নানাবিধ গালি পাড়িতে লাগিল। শান্তিরক্ষকেরা শান্তি রক্ষা করিল। গঙ্গারাম বলিল, "মহারাজ! এ অতি অসম্ভব কথা! আমার নিজের পরিবার আছে–মহারাজের অবিদিত নাই। আর আমি নগররক্ষক–স্ত্রীলোকে আমার রুচি থাকিলে, আমার দুষ্প্রাপ্য বড় অল্প। আমি মহারাজের কনিষ্ঠা মহিষীকে কখনও দেখি নাই–কি জন্য তাঁহাকে কামনা করিব?"

রাজা। তবে তুমি কুকুরের মত রাত্রে লুকাইয়া আমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে কেন?

গঙ্গারাম। কখনও না।

তখন সেই পাঁড়েঠাকুর পাহারাওয়ালাকে তলব হইল। পাঁড়েঠাকুর দাড়ি নাড়িয়া বলিলেন যে, গঙ্গারাম প্রত্যহ গভীর রাত্রিতে মুরলার সঙ্গে তাহার ভাই পরিচয়ে অন্তঃপুরে যাতায়াত করিত।

শুনিয়া গঙ্গারাম বলিল, "মহারাজ! ইহা সম্ভব নহে। মুরলার ভাইকেই বা ঐ ব্যক্তি পথ ছাড়িয়া দিবে কেন?"

তখন পাঁড়েঠাকুর উত্তর করিলেন যে, তিনি গঙ্গারামকে বিলক্ষণ চিনিতেন; তবে কোতোয়ালকে তিনি রোখেন কি প্রকারে? এজন্য চিনিয়াও চিনিতেন না।

গঙ্গারাম দেখিল, ক্রমে গতিক মন্দ হইয়া আসিল। এক ভরসা মনে এই উদয় হইল, মুরলা নিজে কখনও এ সকল কথা প্রকাশ করিবে না–কেন না, তাহা হইলে সেও দণ্ডনীয়–তার কি আপনার প্রাণের ভয় নাই? তখন গঙ্গারাম বলিল, "মুরলাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা হউক–কথা সকলই মিথ্যা প্রকাশ পাইবে।"

বেচারা জানিত না যে, মুরলাকে মহারাজ্ঞী শ্রীমতী নন্দা ঠাকুরাণী পূর্ব্বেই হাত করিয়া রাখিয়াছিলেন। নন্দা, মুরলাকে বুঝাইয়াছিল যে, "মহারাজা স্ত্রীহত্যা করেন না–তোর মরিবার ভয় নাই। স্ত্রীলোককে শারীরিক কোন রকম সাজা দেন না। অতএব বড় সাজার তোর ভয় নাই। কিন্তু সাজা তোর হইবেই হইবে। তবে, তুই যদি সত্য কথা বলিস–তোর সাজা বড় কম হবে।" মুরলাও তাহা বুঝিয়াছিল, সুতরাং সব কথা ঠিক বলিল–কিছুই ছাড়িল না।

মুরলার কথা গঙ্গারামের মাথায় বজ্রাঘাতের মত পড়িল। তথাপি সে আশা ছাড়িল না। বলিল, "মহারাজ! এ স্ত্রীলোক অতি কুচরিত্রা। অমি নগরমধ্যে ইহাকে অনেক বার ধরিয়াছি, এবং কিছু শাসনও করিতে হইয়াছিল। বোধ হয় সেই রাগে এ সকল কথা বলিতেছে।"

রাজা। তবে কার কথা বিশ্বাস করিব, গঙ্গারাম? খোদ মহারাণীর কথা বিশ্বাসযোগ্য কি?

গঙ্গারাম যেন হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইল। তাহার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, রমা কখনও এ সভামধ্যে আসিবে না বা এ সভায় এ সকল কথা বলিতে পারিবে না। গঙ্গারাম বলিল, "অবশ্য বিশ্বাসযোগ্য। তাঁর কথায় যদি আমি দোষী হই, আমাকে সমুচিত দণ্ড দিবেন।"

রাজা অন্তঃপুরে অভিমুখে দৃষ্টি করিলেন। তখন গঙ্গারাম সবিস্ময়ে দেখিল, অতি ধীরে ধীরে সশঙ্কিত শিশুর মত, এক মলিনবেশধারিণী অবগুণ্ঠনবতী রমণী সভামধ্যে আসিতেছে। যে রূপ, গঙ্গারামের হাড়ে হাড়ে আঁকা, তাহা দেখিয়াই চিনিল। গঙ্গারাম বড় শঙ্কিত হইল। দর্শকমণ্ডলীমধ্যে মহা কোলাহল পড়িয়া গেল। শান্তিরক্ষকেরা তাহাদের থামাইল।

রমা আসিয়া আগে রাজাকে, পরে গুরু চন্দ্রচূড়কে দূর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া, অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া সর্ব্বসমক্ষে দাঁড়াইল–মলিন বেশেও রূপরাশি উছলিয়া পড়িতে লাগিল। চন্দ্রচূড় দেখিল, রাজা কথা কহিতে পারিতেছেন, না–অধোবদনে আছেন। তখন চন্দ্রচূড় রমাকে বলিলেন, "মহারাণী! এই গঙ্গারামের বিচার হইতেছে। এ ব্যক্তি কখন আপনার অন্তঃপুরে গিয়াছিল কি না, গিয়া থাকে, তবে কেন গিয়াছিল, আপনার সঙ্গে কি কি কথা হইয়াছিল, সব স্বরূপ বলুন। রাজার আজ্ঞা, আর আমি তোমার গুরু, আমারও আজ্ঞা, সকল কথা সত্য বলিবে।"

রমা। গ্রীবা উন্নত করিয়া গুরুকে বলিল, "রাজার রাণীতে কখনও মিথ্যা বলে না। আমরা যদি মিথ্যাবাদিনী হইতাম, তবে এই সিংহাসন এত দিন ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া যাইত।"

দর্শকমণ্ডলী বাহির হইতে জয়ধ্বনি দিল–"জয় মহারাণীজিকী!"

রমা সাহস পাইয়া বলিতে লাগিল, "বলিব কি গুরুদেব! আমি রাজার মহিষী–রাজার ভৃত্য, আমার ভৃত্য–আমি কি আজ্ঞা করিব–রাজার ভৃত্য তা কেন পালন করিবে না? আমি রাজকার্য্যের জন্য কোতোয়ালকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলাম–কোতোয়াল আসিয়া আজ্ঞা শুনিয়া গিয়াছিল–তার আর বিচারই বা কেন, আমি বলিবই বা কি?"

কথা শুনিয়া দর্শকমণ্ডলী এবার আর জয়ধ্বনি করিল না–অনেক বিঘণ্ন হইল–অনেকে বলিল, "কবুল।" চন্দ্রচূড় বলিলেন, "এমন কি রাজকার্য্য মা! যে রাত্রিতে কোতোয়ালকে ডাকিতে হয়?"

রমা তখন বলিল, "তবে সকল কথা শুনুন।" এই বলিয়া রমা দেখিল, পুত্র কোথা? পুত্র সুসজ্জিত হইয়া ধাত্রীক্রোড়ে। মুখ দেখিয়া সাহস পাইল! তখন রমা সবিশেষ বলিতে আরম্ভ করিল।

প্রথমে অতি ধীরে ধীরে, অতি দূরাগত সঙ্গীতের মত রমা বলিতে লাগিলসকলে শুনিতে পাইল না। বাহিরের দশর্কমণ্ডলী বলিতে লাগিল, "মা! আমরা শুনিতে পাইতেছি না–শুনিব।" রমা আরও একটু স্পষ্ট বলিতে লাগিল। ক্রমে আরও স্পষ্ট–আরও স্পষ্ট। তার পর যখন পুত্রের বিপদ্ শঙ্কায় এই সাহসের কাজ করিয়াছিল, এই কথা বুঝাইতে লাগিল–যখন একবার একবার সেই চাঁদমুখ দেখিতে লাগিল, আর অশ্রুপরিপ্লুত হইয়া, মাতৃস্নেহের উচ্ছ্বাসের উপর উচ্ছ্বাস, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলিতে লাগিল–তখন পরিষ্কার স্বর্গীয়, অপ্সরোনিন্দিত তিন গ্রাম সংমিলিত মনোমুগ্ধকর সঙ্গীতের মত শ্রোতৃগণের কর্ণে সেই মুগ্ধকর বাক্য বাজিতে লাগিল। সকলে মুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল। তার পর সহসা রমা, ধাত্রীক্রোড় হইতে শিশুকে কাড়িয়া লইয়া, সীতারামের পদতলে তাহাকে ফেলিয়া দিল, যুক্তকরে বলিতে লাগিল, "মহারাজ! আপনার আরও সন্তান আছে–আমার আর নাই। মহারাজ! আপনার রাজ্য আছে–আমার রাজ্য এই শিশু। মহারাজ! তোমার ধর্ম্ম আছে, কর্ম্ম আছে, যশ আছে, স্বর্গ আছে–আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছি, আমার ধর্ম্ম এই, কর্ম্ম এই, যশ এই, স্বর্গ এই–মহারাজ! অপরাধিনী হইয়া

থাকি, তবে দণ্ড করুন—” শুনিয়া দশর্কমণ্ডলী অশ্রুপূর্ণ হইয়া পুনঃ পুনঃ জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। কিন্তু লোক ভাল মন্দ দুই রকমই আছে—অনেকেই জয়ধ্বনি করিতে লাগিল—কিন্তু আবার অনেকেই তাহাতে যোগ দিল না। জয়ধ্বনি ফুরাইলে তাহারা কেহ অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিল, “আমার ত এ কথায় বিশ্বাস হয় না।” কোন বর্ষীয়সী বলিল, “পোড়া কপাল! রাত্রে মানুষ ডাকিয়া নিয়া গিয়াছেন—উনি আবার সীত!” কেহ বলিল, “রাজা “রাজা এ কথায় ভুলেন ভুলুন—আমরা এ কথায় ভুলিব না।” কেহ বলিল, “রাণী হইয়া যদি উনি এই কাজ করিবেন, তবে আমার গরিব দুঃখী কি না করিব?”

এ সকল কথা সীতারামের কাণে গেল। তখন রাজা রমাকে বলিলেন, “প্রজাবর্গ সকলে ত তোমার কথা বিশ্বাস করিতেছে না।”

রমা কিছুক্ষণ মুখ অবনত করিয়া রহিল। চক্ষুতে প্রবল বারিধারা বহিল—তার পর রমা সামলাইল। তখন মুখ তুলিয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, “যখন লোকের বিশ্বাস হইবে না, তখন আমার একমাত্র গতি—আপনার রাজপুরীর কলঙ্কস্বরূপ এ জীবন আর রাখিতে পারিব না। আপনি চিতা প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা দিন—আমি সকলের সম্মুখেই পুড়িয়া মরি। দুঃখ তাহাতে কিছু নাই। লোকে আমাকে কলঙ্কিনী বলিল—মরিলেই সে দুঃখ গেল। কিন্তু এক নিবেদন মহারাজ! আপনিও কি আমাকে অবিশ্বাসিনী ভাবিতেছেন? তাহা হইলে বুঝি—(আবার রমার চক্ষুতে জলের ধারা ছুটিল,)—বুঝি আমার পুড়িয়া মরাও বৃথা হইবে। তুমি যদি এই লোকসমারোহের সম্মুখে বল যে, আমার প্রতি তোমার অবিশ্বাস নাই—তাহা হইলে আমি সেই চিতাই স্বর্গ মনে করিব। মহারাজ! পরলোকের উদ্ধারকর্ত্তা, ভূদের তুল্য আমার গুরুদেব এই সম্মুখে। আমি তাঁহার সম্মুখে, ইষ্টদেবকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, আমি অবিশ্বাসিনী নহি। যিনি গুরুর অপেক্ষাও আমার পূজ্য, যিনি মনুষ্য হইয়াও দেবতার অপেক্ষা আমার পূজ্য, সেই পতিদেবতা, আপনি স্বয়ং আমার সম্মুখে—আমি পতিদেবতাকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, আমি অবিশ্বাসিনী নহি। মহারাজ! এই নারীদেহ ধারণ করিয়া যে কিছু দেবসেবা, ব্রাহ্মণসেবা, দান ব্রত নিয়ম করিয়াছি, যদি আমি বিশ্বাসঘাতিনী হইয়া থাকি, তবে সে সকলেরই ফলে যেন বঞ্চিত হই। পতিসেবার অপেক্ষা স্ত্রীলোকের আর পুণ্য নাই, কায়মনোবাক্যে আমি যে আপনার চরণসেবা করিয়াছি, তাহা আপনিই জানেন,—আমি যদি অবিশ্বাসিনী হইয়া থাকি, তবে আমি যেন সে পুণ্যফলে বঞ্চিত হই। আমি ইহজীবনে যে কিছু আশা, যে কিছু ভরসা, যে কিছু কামনা, যে কিছু মানস করিয়াছি—আমি যদি অবিশ্বাসিনী হইয়া থাকি, সকলই যেন নিষ্ফল হয়। মহারাজ! নারীজন্মে স্বামিসন্দর্শনের তুল্য পুণ্যও নাই, সুখও নাই—যদি আমি অবিশ্বাসিনী হইয়া থাকি, যেন ইহজন্মে আমি সে সুখে চিরবঞ্চিত হই। যে পুত্রের জন্য আমি এই কলঙ্ক রটাইয়াছি—যাহার তুলনায় জগতে আমার আর কিছুই নাই—যদি আমি অবিশ্বাসিনী হই, আমি যেন সেই পুত্রমুখদর্শনে চিরবঞ্চিত হই। মহারাজ! আর কি বলিব—যদি আমি অবিশ্বাসিনী হইয়া থাকি, তবে জন্মে জন্মে যেন নারীজন্ম গ্রহণ করিয়া, জন্মে জন্মে স্বামিপুত্রের মুখদর্শনে চিরবঞ্চিত হই।”

রমা আর বলিতে পারিল না—ছিন্ন লতার মত সভাতলে পড়িয়া গিয়া মূর্চ্ছিতা হইল—ধাত্রীগণে ধরাধরি করিয়া অন্তঃপুরে বহিয়া লইয়া গেল। ধাত্রীক্রোড়স্থ শিশু মার সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিতে কাঁদিতে গেল; সভাতলস্থ সকলে অশ্রুমোচন করিল। গঙ্গারামের করচরণস্থিত শৃঙ্খলে ঝঞ্ঝনা বাজিয়া উঠিল। দর্শকমণ্ডলী বাত্যাপীড়িত সমুদ্রের ন্যায় চঞ্চল হইয়া মহান্ কোলাহল সমুত্থিত করিল—রক্ষিবর্গ কিছুই নিবারণ করিতে পারিল না।

তখন “গঙ্গারাম কি বলে?” “গঙ্গারাম কি এ কথা মিছা বলে?” “গঙ্গারাম যদি মিছা বলে, তবে আইস, আমরা সকলে মিলিয়া গঙ্গারামকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলি।” এইরূপ রব চারি দিক হইতে উঠিতে লাগিল। গঙ্গারাম দেখিল, এই সময়ে লোকের মন ফিরাইতে না পারিলে, তাহার আর রক্ষা নাই। গঙ্গারাম বুদ্ধিমান, বুঝিয়াছিল যে, প্রজাবর্গ যেমন নিষ্পত্তি করিবে, রাজাও সেই মত করিবেন। তখন সে রাজাকে সম্বোধন করিয়া লোকের মনভুলান কথা বলিতে আরম্ভ করিল, “মহারাজ! কথাটা এই যে, স্ত্রীলোকের কথায় বিশ্বাস করিবেন না—না আমার কথায় বিশ্বাস করিবেন? প্রভু! আপনার এই রাজ্য কি স্ত্রীলোক সংস্থাপিত করিয়াছে—না আমার ন্যায় রাজভৃত্যদিগের বাহুবলে স্থাপিত হইয়াছে? মহারাজ! সকল স্ত্রীলোকেই বিপথগামিনী হইতে পারে, রাজরাণীরাও বিপথগামিনী হইয়া

থাকেন, রাজরাণী বিপথগামিনী হইলে রাজার কর্ত্তব্য যে, তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। বিশ্বাসী ভৃত্য কখনও বিপথগামী হয় না; তবে স্ত্রীলোকে আপনার দোষ ক্ষালন জন্য ভৃত্যের ঘাড়ে চাপ দিতে পারে। এই মহারাণী রাত্রিতে কাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আমাকে দোষী করিতেছেন, তাহার স্থিরতা– মহারাজ, রক্ষা কর! রক্ষা কর!"

কথা কহিতে কহিতে গঙ্গারাম কথা সমাপ্ত না করিয়া,–অতিশয় ভীত হইয়া, "মহারাজ, রক্ষা কর! রক্ষা কর!" এই শব্দ করিয়া স্তম্ভিত বিহ্বলের মত হইয়া নীরব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সকলে দেখিল, গঙ্গারাম থরথর কাঁপিতেছে। তখন সমস্ত জনমণ্ডলী সবিস্ময়ে সভয়ে চাহিয়া দেখিল–অপূর্ব্বমূর্ত্তি! জটাজুটবিলম্বিনী, গৈরিকধারিণী, জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি, সাক্ষাৎ সিংহবাহিনী দুর্গা তুল্য, ত্রিশূল হস্তে, গঙ্গারামকে ত্রিশূলাগ্রভাগে লক্ষ্য করিয়া, প্রখরগমনে তাহার অভিমুখে সভামণ্ডপ পার হইয়া আসিতেছে। দেখিবামাত্র সেই সাগরবৎ সংক্ষুব্ধ জনমণ্ডলী একেবারে নিস্তব্ধ হইল। গঙ্গারাম একদিন রাত্রিতে সে মূর্ত্তি দেখিয়াছিল–আবার এই বিপৎকালে, যখন মিথ্যা প্রবঞ্চনার দ্বারা নিরপরাধিনী রমার সর্ব্বনাশ করিতে সে উদ্যত, সেই সময়ে সেই মূর্ত্তি দেখিয়া, চণ্ডী তাহাকে বধ করিতে আসিতেছেন বিবেচনা করিয়া, ভয়ে, কতর হইয়া "রক্ষা কর! রক্ষা কর! শব্দ করিয়া উঠিল। এ দিকে রাজা, ও দিকে চন্দ্রচূড় সেই রাত্রিদৃষ্ট দেবীতুল্য মূর্ত্তি দেখিয়া চিনিলেন, এবং নগরের রাজলক্ষ্মী মনে করিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিলেন। তখন সভাস্থ সকলেই গাত্রোত্থান করিল।

জয়ন্তী কোন দিকে দৃষ্টি না করিয়া, খরপদে গঙ্গারামের নিকট আসিয়া, গঙ্গারামের বক্ষে সেই মন্ত্রপূত ত্রিশূলাগ্রভাগ স্থাপন করিল। কথার মধ্যে কেবল বলিল, "এখন বল।"

ত্রিশূল গঙ্গারামের গাত্র স্পর্শ করিল মাত্র, তথাপি গঙ্গারামের শরীর হঠাৎ অবসন্ন হইয়া আসিল, গঙ্গারাম মনে করিল, আর একটি মিথ্যা বলিলেই এই ত্রিশূল আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইবে। গঙ্গারাম তখন সভয়ে, বিনীতভাবে, সত্য বৃত্তান্ত সভাসমক্ষে বলিতে আরম্ভ করিল। যতক্ষণ না তাহার কথা সমাপ্তা হইল, ততক্ষণ জয়ন্তী তাহার হৃদয় ত্রিশূলাগ্রভাগের দ্বারা স্পর্শ করিয়া রহিল। গঙ্গারাম তখন রমার নির্দ্দোষিত, আপনার মোহ, লোভ, ফৌজদারের সহিত সাক্ষাৎ, কথোপকথন এবং বিশ্বাসঘাতকতার চেষ্টা সমুদয় সবিস্তারে কহিল।

জয়ন্তী তখন ত্রিশূল লইয়া খরপদে চলিয়া গেল। গমনকালে সভাস্থ সকলেই নতশিরে সেই দেবীতুল্য মূর্ত্তিকে প্রণাম করিল। সকলেই ব্যস্ত হইয়া পথ ছাড়িয়া দিল। কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে বা তাহার অনুসরণ করিতে সাহস পাইল না। সে কোন্ দিকে কোথায় চলিয়া গেল কেহ সন্ধান করিল না।

জয়ন্তী চলিয়া গেলে রাজা গঙ্গারামকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এখন তুমি আপন মুখে সকল অপরাধ স্বীকৃত হইলে। এরূপ কৃতঘ্নের মৃত্যু ভিন্ন অন্য দণ্ড উপযুক্ত নহে। অতএব তুমি রাজদণ্ডে প্রাণত্যাগ করিতে প্রস্তুত হও।"

গঙ্গারাম দ্বিরুক্তি করিল না। প্রহরীরা তাহাকে লইয়া গেল। বধদণ্ডের আজ্ঞা শুনিয়া সকল লোক স্তম্ভিত হইয়াছিল। কেহ কিছু বলিল না। নীরবে সকলে আপনার ঘরে ফিরিয়া গেল। গৃহে গিয়া সকলেই রমাকে "সাক্ষাৎ লক্ষ্মী" বলিয়া প্রশংসা করিল। রমার আর কোন কলঙ্ক রহিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাজা মুরলাকে মাথা মুড়াইয়া, ঘোল ঢালিয়া, নগরের বাহির করিয়া দিবার আদেশ করিলেন। সে হুকুম তখনই তামিল হইল। মুরলার নির্গমনকালে এক পাল ছেলে, এবং অন্যান্য রসিক লোক দল বাঁধিয়া করতালি দিতে দিতে এবং গীত গায়িতে গায়িতে চলিল।

গঙ্গারামের ন্যায় কৃতঘ্নের পক্ষে, শূলদণ্ড ভিন্ন অন্য দণ্ড তখনকার রাজনীতিতে ব্যবস্থিত ছিল না। অতএব তাহার প্রতি সেই আজ্ঞাই হইল। কিন্তু গঙ্গারামের

মৃত্যু আপাততঃ দিনকতক স্থগিত রাখিতে হইল। কেন না, সম্মুখে রাজার অভিষেক উপস্থিত। সীতারাম নিজ বাহুবলে হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিয়া রাজা হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অভিষেক হয় নাই। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে তাহা হওয়া উচিত। চন্দ্রচূড় ঠাকুর এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিলে, সীতারাম তাহাতে সম্মত হইয়াছিলেন। তিনি বিবেচনা করিলেন, এরূপ একটা মহোৎসবের দ্বারা প্রজাবর্গ পরিতুষ্ট হইলে তাহাদের রাজভক্তি বৃদ্ধি পাইতে পারে। অতএব বিশেষ সমারোহের সহিত অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন করিবার কল্পনা হইতেছিল। নন্দা এবং চন্দ্রচূড়, উভয়েই এক্ষণে সীতারামকে অনুরোধ করিলেন যে, এখন একটা মাঙ্গলিক ক্রিয়া উপস্থিত, এখন গঙ্গারামের বধরূপ অশুভ কর্ম্মটা করা বিধেয় নহে; তাহাতে অমঙ্গলও যদি না হয়, লোকের আনন্দেরও লাঘব হইতে পারে। এ কথায় রাজা সম্মত হইলেন। ভিতরের আসল কথা এই যে, গঙ্গারামকে শূলে দিতে সীতারামের আন্তরিক ইচ্ছা নহে, তবে রাজধর্ম্ম পালন এবং রাজ্য শাসন জন্যই অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া তাহা স্থির করিয়াছিলেন। ইচ্ছা ছিল না, তাহার কারণ–গঙ্গারাম শ্রীর ভাই। শ্রীকে সীতারাম ভুলেন নাই, তবে এত দিন ধরিয়া তাহাকে খুঁজিয়া না পাইয়া, নিরাশ হইয়া বিষয়কর্ম্মে চিত্তনিবেশ করিয়া শ্রীকে ভুলিবেন, ইহা স্থির করিয়াছিলেন। অতএব আবার রাজ্যের উপর তিনি মন স্থির করিতেছিলেন। সেই জন্যই দিল্লীতে গিয়া বাদশাহের দরবারে হাজির হইয়াছিলেন। এবং বাদশাহকে সন্তুষ্ট করিয়া সনদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেই জন্য উৎসাহ সহকারে সংগ্রাম করিয়া ভূষণা অধিকার করিয়াছিলেন, এবং দক্ষিণ বাঙ্গালায় এক্ষণে একাধিপত্য প্রচার করিতেছিলেন। কিন্তু শ্রী এখনও হৃদয়ের সম্পূর্ণ অধিকারিণী। অতএব গঙ্গারামের শূলে যাওয়া এখন স্থগিত রহিল।

এদিকে অভিষেকের বড় ধূম পড়িয়া গেল। অত্যন্ত সমারোহ–অত্যন্ত গোলযোগ, দেশ বিদেশ হইতে লোক আসিয়া নগর পরিপূর্ণ করিল–রাজা, রাজপুরুষ, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, অধ্যাপক, দৈবজ্ঞ, ইতর, ভদ্র, আহূত, অনাহূত, রবাহূত, ভিক্ষুক, সন্ন্যাসী, সাধু, অসাধুতে নগরে আর স্থান হয় না। এই অসংখ্য জনমণ্ডলের কর্ম্মের মধ্যে প্রতিনিয়ত আহার। ভক্ষ্য ভোজ্য লুচি সন্দেশ দধির ছড়াছড়িতে সহরে এক হাঁটু কাদা হইয়া উঠিল, পাতা কাটার জ্বালায় সীতারামের রাজ্যের সব কলাগাছ নিষ্পত্র হইল, ভাঙ্গা ভাঁড় ও ছেঁড়া কলাপাতে গড়খাই ও মধুমতী বুজিয়া উঠিবার গোছ হইয়া উঠিল। অহরহ বাদ্য ও নৃত্য গীতের দৌরাত্ম্যে ছেলেদের পর্য্যন্ত মাথা গরম হইয়া উঠিল।

এই অভিষেকের মধ্যে একটা ব্যাপার দান। সীতারাম অভিষেকের দিনে সমস্ত দিবস, কখনও স্বহস্তে, কখনও আপন কর্ত্তৃত্বাধীনে ভৃত্যহস্তে, সুবর্ণ, রজত, তৈজস এবং বস্ত্রদান করিতে লাগিলেন। এত লোক আসিয়াছিল যে, সমস্ত দিনে দান ফুরাইল না। অর্দ্ধরাত্র পর্য্যন্ত এইরূপ দান করিয়া সীতারাম আর পারিয়া উঠিলেন না। অবশিষ্ট লোকের বিদায় জন্য রাজপুরুষদিগের উপর ভার দিয়া অন্তঃপুরে বিশ্রামার্থ চলিলেন। যাইতে সভয়ে, সবিস্ময়ে অন্তঃপুরদ্বারে দেখিলেন যে, সেই ত্রিশূলধারিণী সুবর্ণময়ী রাজলক্ষ্মীমূর্ত্তি।

রাজা ভক্তিভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মা! আপনি কে, আমাকে দয়া করিয়া বলুন।"

জয়ন্তী বলিল, "মহারাজ! আমি ভিখারিণী। আপনার নিকট ভিক্ষার্থ আসিয়াছি।"

রাজা। মা! কেন আমায় ছলনা করেন? আপনি দেবী, আমি চিনিয়াছি। আপনি সাক্ষাৎ কমলা–আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

জয়ন্তী। মহারাজ! আমি সামান্য মানুষী। নহিলে আপনার নিকট ভিক্ষার্থ আসিতাম না। শুনিলাম, আজ যে যাহা চাহিতেছে, আপনি তাহাকে তাই দিতেছেন। আমার আশা বড়, কিন্তু যার এমন দান, তার কাছে আশা নিষ্ফলা হইবে না মনে করিয়া আসিয়াছি।

রাজা বলিলেন, "মা, আপনাকে অদেয় আমার কিছুই নাই। আপনি একবার আমার রাজ্য রক্ষা করিয়াছেন, দ্বিতীয় বারে আমার কুলমর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন, আপনি দেবীই হউন, আর মানবীই হউন–আপনাকে সকলই আমার দেয়। কি বস্তু কামনা করেন, আজ্ঞা করুন, আমি এখনই আনিয়া উপস্থিত করিতেছি।"

জয়ন্তী। মহারাজ! গঙ্গারামের বধদণ্ডের বিধান হইয়াছে। কিন্তু এখনও সে মরে নাই। আমি তার জীবন ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি।

রাজা। আপনি!

জয়ন্তী। কেন মহারাজ? অসম্ভাবনা কি?

রাজা। গঙ্গারাম কীটাণুকীট—আপনার তার প্রতি দয়া কিসে হইল?

জয়ন্তী। আমরা ভিখারী—আমাদের কাছে সবাই সমান।

রাজা। কিন্তু আপনিই ত তাহাকে ত্রিশূল বিঁধিয়া মারিতে চাহিয়াছিলেন—আপনা হইতেই দুই বার তাহার অসদভিসন্ধি ধরা পড়িয়াছে। বলিতে কি, আপনি মহারাণীর প্রতি দয়াবতী না হইলে সে সত্য স্বীকার করিত না, তাহার বধদণ্ড হইত না। এখন তাহার অন্যথা করিতে চান কেন?

জয়ন্তী। মহারাজ! আমা হইতে ইহা ঘটিয়াছে বলিয়াই তাহার প্রাণভিক্ষা চাহিতেছি। ধর্ম্মের উদ্ধার জন্য ত্রিশূলাঘাতে অধর্ম্মাচারীর প্রাণবিনাশেও দোষ বিবেচনা করি না, কিন্তু ধর্ম্মের এখন রক্ষা হইয়াছে, এখন প্রাণিহত্যা-পাপ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি। গঙ্গারামের জীবন আমাকে ভিক্ষা দিন।

রাজা। আপনাকে অদেয় কিছুই নাই। আপনি যাহা চাহিলেন, তাহা দিলাম। গঙ্গারাম এখনই মুক্ত হইবে। কিন্তু মা! তোমাকে ভিক্ষা দিই, আমি তাহার যোগ্য নহি। আমি তোমায় ভিক্ষা দিব না। গঙ্গারামের জীবন তোমাকে বেচিব—মূল্য দিয়া কিনিতে হইবে।

জয়ন্তী। (ঈষৎ হাস্যের সহিত) কি মূল্য মহারাজ! রাজভাণ্ডারে এমন কোন্ ধনের অভাব যে, ভিখারিণী তাহা দিতে পারিবে?

রাজা। রাজভাণ্ডারে নাই—রাজার জীবন। আপনি সেই মধুমতীতীরে ঘাটের উপর কামানের নিকট দাঁড়াইয়া স্বীকার করিয়াছিলেন যে, আমি যাহা খুঁজি, তাহা পাইব। সে অমূল্য সামগ্রী আমাকে দিন—সেই মূল্যে আজ গঙ্গারামের জীবন আপনার নিকট বেচিব।

জয়ন্তী। কি সে অমূল্য সামগ্রী মহারাজ? আপনি রাজ্য পাইয়াছেন।

রাজা। যাহার জন্য রাজ্য ত্যাগ করিতে পারি, তাই চাহিতেছি।

জয়ন্তী। সে কি মহারাজ?

রাজা। শ্রী নামে আমার প্রথমা মহিষী আমার জীবনস্বরূপ । আমি দেবী, সব দিতে পারেন। আমার জীবন আমায় দিয়া, সেই মূল্যে গঙ্গারামের জীবন কিনিয়া লউন।

জয়ন্তী। সে কি মহারাজ! আপনার ন্যায় ধর্ম্মাত্মা রাজাধিরাজের জীবনের সঙ্গে সেই নরাধম পাপাত্মার জীবনের কি বিনিময় হয়? মহারাজ! কাণা কড়ির বিনিময়ে রত্নাকর।

রাজা। মা! জননী যত দেন, ছেলে কি মাকে কখনও তত দিতে পারে!

জয়ন্তী। মহারাজ! আপনি আজ অন্তঃপুরে দ্বার সকল মুক্ত রাখিবেন; আর অন্তঃপুরের প্রহরীদিগকে আজ্ঞা দিবেন, ত্রিশূল দেখিলে যেন পথ ছাড়িয়া দেয়। আপনার শয্যাগৃহে আজ রাত্রিতেই মূল্য পৌঁছিবে। গঙ্গারামের মুক্তির হুকুম হৌক।

রাজা হর্ষে অভিভূত হইয়া বলিলেন, "গঙ্গারামের এখনই মুক্তি দিতেছি।" এই বলিয়া অনুচরবর্গকে সেইরূপ আজ্ঞা দিলেন।

জয়ন্তী বলিলেন, "আমি এই অনুচরদিগের সঙ্গে গঙ্গারামের কারাগারে যাইতে পারি কি?"

রাজা। আপনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, কিছুতেই আপনার নিষেধ নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অন্ধকারে কূপের ন্যায় নিম্ন, আর্দ্র, বায়ুশূন্য কারাগৃহমধ্যে গঙ্গারাম শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া একা পড়িয়া আছে। সেই নিশীথকালেও তাহার নিদ্রা নাই—যে পর্য্যন্ত সে শুনিয়াছে যে, তাহাকে শূলে যাইতে হইবে, সেই পর্য্যন্ত আর সে ঘুমায় নাই—আহার নিদ্রা সকলই বন্ধ। এক দণ্ডে মরা যায়, মৃত্যু তত বড় কঠিন দণ্ড নহে; কিন্তু কারাগৃহে একাকী পড়িয়া দিবারাত্র সম্মুখেই মৃত্যুদণ্ড, ইতি ভাবনা করার অপেক্ষা গুরুতর দণ্ড আর কিছুই নাই। গঙ্গারাম পলকে শূলে যাইতেছিল। দণ্ডের আর তাহার কিছু অধিক বাকি নাই। ভাবিয়া ভাবিয়া, চিত্তবৃত্তি সকল প্রায় নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। মন অন্ধকারে ডুবিয়া রহিয়াছিল—ক্লেশ অনুভব করিবার শক্তি পর্য্যন্ত যেন তিরোহিত হইয়াছিল। মনের মধ্যে কেবল দুটি ভাব এখনও জাগরিত ছিল—ভৈরবীকে ভয়, আর রমার উপর রাগ। ভয়ের অপেক্ষা, এই রাগই প্রবল! গঙ্গারাম, আর রমার প্রতি আসক্ত নহে, এখন রমার তেমন আন্তরিক শত্রু আর কেহ নহে।

গঙ্গারাম এখন রমাকে সম্মুখে পাইলে নখে বিদীর্ণ করিতে প্রস্তুত। গঙ্গারামের যখন কিছু চিন্তাশক্তি হইল, তখন কি উপায়ে মরিবার সময়ে রমার সর্ব্বনাশ করিয়া মরিতে পারিবে, গঙ্গারাম তাহাই ভাবিতেছিল। শূলতলে দাঁড়াইয়া রমার সম্বন্ধে কি অশ্লীল অপবাদ দিয়া যাইবে, গঙ্গারাম তাহাই কখন কখন ভাবিত। অন্য সময়ে জড়পিণ্ডের মত স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়া থাকিত। কেবল মধ্যে মধ্যে বাহিরে অভিষেকের উৎসবের মহৎ কোলাহল শুনিত। যে পাচক ব্রাহ্মণ প্রত্যহ তাহার নুন ভাত লইয়া আসিত, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া গঙ্গারাম উৎসবের বৃত্তান্ত শুনিয়াছিল। শুনিল যে, রাজ্যের সমস্ত লোক অতি বৃহৎ উৎসবে নিমগ্ন—কেবল সেই একা অন্ধকারে আর্দ্র ভূমিতে মূষিকদষ্ট হইয়া, কীটপতঙ্গপীড়িত হইয়া, শৃঙ্খলভার বহন করিতেছে। মনে মনে বলিতে লাগিল, রমার কবে এই রকম স্থান মিলিবে!

যেমন অন্ধকারে বিদ্যুৎ জ্বলে, তেমনি গঙ্গারামের একটা কথা মনে পড়িত, যদি শ্রী বাঁচিয়া থাকিত! শ্রী একবার প্রাণভিক্ষা করিয়া লইয়াছিল, আবার ভিক্ষা চাহিলে কি ভিক্ষা পাইত না! আমি যত পাপী হই না কেন, শ্রী কখনও আমাকে পরিত্যাগ করিত না। এমন ভগিনীও মরিল!

দুই প্রহর রাত্রিতে ঝঞ্ঝনা বাজাইয়া কারাগৃহের বাহিরের শিকল খুলিল। গঙ্গারামের প্রাণ শুকাইল—এত রাত্রিতে কেন শিকল খুলিতেছে! আরও কিছু নূতন বিপদ্ আছে না কি?

অগ্রে রাজপুরুষেরা প্রদীপ লইয়া প্রবেশ করিল। গঙ্গারাম স্তম্ভিত হইয়া তাহাদের প্রতি চাহিয়া রহিল। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। তাহার পর জয়ন্তীকে দেখিল—উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল, "রক্ষা কর! রক্ষা কর! আমি কি করিয়াছি?"

জয়ন্তী বলিল, "বাছা! কি করিয়াছ তাহা জান। কিন্তু তুমি রক্ষা পাইবে। শ্রীকে মনে আছে কি?"

গঙ্গা। শ্রী! যদি শ্রী বাঁচিয়া থাকিত!

জয়ন্তী। শ্রী বাঁচিয়া আছে। আর অনুরোধে আমি মহারাজের কাছে তোমার জীবন ভিক্ষা চাহিয়াছিলাম। ভিক্ষা পাইয়াছি। তোমাকে মুক্ত করিতে আসিয়াছি। পলাও গঙ্গারাম! কাল প্রভাতে এ রাজ্যে আর মুখ দেখাইও না। দেখাইলে আর তোমাকে বাঁচাইতে পারিব না।

গঙ্গারাম বুঝিতে পারিল কি না, সন্দেহ। বিশ্বাস করিল না, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু দেখিল যে, রাজপুরুষেরা বেড়ি খুলিতে লাগিল। গঙ্গারাম নীরবে দেখিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিল, "মা! রক্ষা করিলে কি?"

জয়ন্তী বলিলেন, "বেড়ি খুলিয়াছে। চলিয়া যাও।"

গঙ্গারাম ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। সেই রাত্রিতেই নগর ত্যাগ করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গঙ্গারামের মুক্তির আজ্ঞা প্রচার করিয়া, জয়ন্তীর আজ্ঞা মত দ্বার মুক্ত রাখিবার অনুমতি প্রচার করিয়া, রাজা শয্যাগৃহে আসিয়া পর্য্যঙ্কে শয়ন করিলেন। নন্দা তখনই আসিয়া পদসেবায় নিযুক্ত হইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, “রমা কেমন আছে?”

রমার পীড়া। সে কথা পরে বলিব। নন্দা উত্তর করিল, “কই–কিছু বিশেষ হইতে ত দেখিলাম না।”

রাজ। আমি এত রাত্রিতে তাহাকে দেখিতে যাইতে পারিতেছি না, বড় ক্লান্ত আছি; তুমি আমার স্থলাভিষিক্ত হইয়া যাও–তাহাকে আমি যেমন যত্ন করিতাম, তেমনি যত্ন করিও; আর আমি যে জন্য যাইতে পারিলাম না, তাহা বলিও।

কথাটা শুনিয়া পাঠক সীতারামকে ধিক্কার দিবেন কিন্তু সে সীতারাম আর নাই। যে সীতারাম হিন্দুসাম্রাজ্য সংস্থাপনের জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিলেন, সে সীতারাম রাজ্যপালন ত্যাগ করিয়া কেবল শ্রীকে খুঁজিয়া বেড়াইল। যে সীতারাম আপনার প্রাণ দিয়া শরণাগত বলিয়া গঙ্গারামের প্রাণরক্ষা করিতে গিয়াছিলেন–সেই সীতারাম রাজা হইয়া, রাজদণ্ডপ্রণেতা হইয়া, শ্রীর লোভে গঙ্গারামকে ছাড়িয়া দিল। যে লোকবৎসল ছিল, সে এখন আত্মবৎসল হইতেছে।

নন্দা বুঝিল, প্রভু আজ একা থাকিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। নন্দা আর কথা না কহিয়া চলিয়া গেল। সীতারাম তখন পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া শ্রীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সীতারাম সমস্ত দিন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত ছিলেন। অন্য দিন হইলে পড়িতেন আর নিদ্রায় অভিভূত হইতেন। কিন্তু আজ স্বতন্ত্র কথা–যাহার জন্য রাজ্যসুখ বা রাজ্যভার ত্যাগ করিয়া এত কাল ধরিয়া দেশে দেশে নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়াছেন, যাহার চিন্তা অগ্নিস্বরূপ দিবারাত্র হৃদয় দাহ করিতেছিল, তাহার সাক্ষাৎলাভ হইবে। সীতারাম জাগিয়া রহিলেন।

কিন্তু নিদ্রাদেবীও ভুবন-বিজয়িনী। যে যতই বিপদাপন্ন ইউক না কেন, এক সময়ে না এক সময়ে তাহারও নিদ্রা আসে। সীতারাম বিপদাপন্ন নহেন, সুখের আশায় নিমগ্ন, সীতারামের একবার তন্দ্রা আসিল কিন্তু মনের ততটা চাঞ্চল্য থাকিলে তন্দ্রাও বেশীক্ষণ থাকে না। ক্ষণকাল মধ্যেই সীতারামের নিদ্রা ভঙ্গ হইল–চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে গৈরিকবস্ত্র রুদ্রাক্ষভূষিতা মুক্ত-কুন্তলা কমনীয়া মূর্ত্তি!

সীতারাম প্রথমে জয়ন্তী মনে করিয়া অতি ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কই? শ্রী কই?” কিন্তু তখনই দেখিলেন জয়ন্তী নহে, শ্রী।

তখন চিনিয়া, “শ্রী! শ্রী! ও শ্রী! আমার শ্রী!” বলিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিতে ডাকিতে রাজা গাত্রোত্থান করিয়া বাহু প্রসারণ করিলেন। কিন্তু কেমন মাথা ঘুরিয়া গেল–চক্ষু বুজিয়া রাজা আবার শুইয়া পড়িলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে আপনিই মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল।

তখন সীতারাম, ঊর্দ্ধমুখে, স্পন্দিততারলোচনে, অতৃপ্তদৃষ্টিতে শ্রীর পানে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। কোন কথা নাই–যেন বা নয়নের তৃপ্তি না হইলে কথার স্ফূর্ত্তি সম্ভাবিত হইতেছে না। দেখিতে দেখিতে, দেখিতে দেখিতে–যেন তাঁহার আনন্দ-প্রফুল্ল মুখমণ্ডল, আর তত প্রফুল্ল রহিল না–একটা নিশ্বাস পড়িল। রাজা, আমার শ্রী বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, বুঝি দেখিলেন, আমার শ্রী নহে। বুঝি দেখিলেন যে, স্থিরমূর্ত্তি, অবিচলিতধৈর্য্যসম্পন্না, অশ্রুবিন্দুমাত্রশূন্যা, উদ্ভাসিতরূপরশ্মিমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী, মহামহিমাময়ী, এ যে দেবীপ্রতিমা! বুঝি এ শ্রী নহে!

হায়! মূঢ় সীতারাম মহিষী খুঁজিতেছিল–দেবী লইয়া কি করিবে!

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রাজার কথা শ্রী সব শুনিল, শ্রীর কথা রাজা সব শুনিলেন। যেমন করিয়া, সর্ব্বত্যাগী হইয়া সীতারাম শ্রীর জন্য পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, সীতারাম তাহা বলিলেন। শ্রী আপনার কথাও কতক কতক বলিল, সকল বলিল না।

তার পর, শ্রী জিজ্ঞাসা করিল, "এখন আমাকে কি করিতে হইবে?"

প্রশ্ন শুনিয়া সীতারামের নয়নে জল আসিল। চিরজীবনের পর স্বামীকে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল কি না, "এখন আমাকে কি করিতে হইবে?" সীতারামের মনে হইল, উত্তর করেন, "কড়িকাঠে দড়ি ঝুলাইয়া দিবে, আমি গলায় দিব।"

তাহা না বলিয়া সীতারাম বলিলেন, "আমি আজ পাঁচ বৎসর ধরিয়া আমার মহিষী খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। এখন তুমি আমার মহিষী হইয়া রাজপুরী আলো করিবে।"

শ্রী। মহারাজা! নন্দার প্রশংসা বিস্তর শুনিয়াছি। তোমার সৌভাগ্য যে, তুমি তেমন মহিষী পাইয়াছ। অন্য মহিষীর কামনা করিও না।

সীতা। তুমি জ্যেষ্ঠা। নন্দা যেমন হোক, তোমার পদ তুমি গ্রহণ করিবে না কেন?

শ্রী। যে দিন তোমার মহিষী হইতে পারিলে আমি বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীও হইতে চাহিতাম না, আমার সে দিন গিয়াছে।

সীতারাম। সে কি? কেন গিয়াছে? কিসে গিয়াছে?

শ্রী। আমি সন্ন্যাসিনী; সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছি।

সীতারাম। পতিযুক্তার সন্ন্যাসে অধিকার নাই। পতিসেবাই তোমার ধর্ম্ম।

শ্রী। যে সব কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে, তাহার পতিসেবাও ধর্ম্ম নহে; দেবসেবাও তাহার ধর্ম্ম নহে।

সীতা। সর্ব্ব কর্ম্ম কেহ ত্যাগ করিতে পারে না; তুমিও পার নাই। গঙ্গারামের জীবন রক্ষা করিয়া কি তুমি কর্ম্ম করিলে না? আমাকে দেখা দিয়া তুমি কি কর্ম্ম করিলে না?

শ্রী। করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে আমার সন্ন্যাসধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইয়াছে, একবার ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছি বলিয়া এখন চিরকাল ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে বল?

সীতা। স্বামিসহবাস স্ত্রীজাতির পক্ষে ধর্ম্মভ্রংশ, এমন কুশিক্ষা তোমায় কে দিল? যেই দিক, ইহার উপায় আমার হাতে আছে। আমি তোমার স্বামী, তোমার উপর আমার অধিকার আছে। সেই অধিকার বলে, আমি তোমাকে আর যাইতে দিব না।

শ্রী। তুমি স্বামী, আর তুমি রাজা। তা ছাড়া তুমি উপকারী, আমি উপকৃত। অতএব তুমি যাইতে না দিলে আমি যাইতে পারিব না।

সীতা। আমি স্বামী, আমি রাজা, আর আমি উপকারী, তাই আমি যাইতে না দিলে তুমি যাইতে পারিবে না। বলিতেছ না কেন, আমি তোমায় ভালবাসি, তাই আমি ছাড়িয়া না দিলে তুমি যাইতে পারিবে না? স্নেহের সোণার শিকল কাটিবে কি প্রকারে?

শ্রী। মহারাজ! সে ভ্রমটা এখন গিয়াছে। এখন বুঝিয়াছি, যে ভালবাসে, ভালবাসায় তাহার ধর্ম্ম এবং সুখ আছে। কিন্তু যে ভালবাসা পায়, তাহার তাতে কি? তুমি মাটির ঠাকুর গড়িয়া, তাহাতে পুষ্পচন্দন দাও, তাহাতে তোমার ধর্ম্ম আছে, সুখও আছে, কিন্তু তাহাতে মাটির পুতুলের কি?

সীতা। কি ভয়ানক কথা!

শ্রী। ভয়ানক নহে—অমৃতময় কথা। ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন। ঈশ্বরে প্রীতিই জীবের সুখ বা ধর্ম্ম। তাই সর্ব্বভূতকে ভালবাসিবে। কিন্তু ঈশ্বর নির্ব্বিকার, তাঁর সুখ দুঃখ নাই। ঈশ্বরের অংশস্বরূপ যে আত্মা জীবে আছেন, তাঁহারও তাই। ঈশ্বরে অর্পিত যে প্রীতি, তাহাতে তাঁহার সুখ দুঃখ নাই। তবে যে, কেহ ভালবাসিলে আমরা সুখী হই, সে কেবল মায়ার বিক্ষেপ।

সীতা। শ্রী! দেখিতেছি কেন ভণ্ড সন্ন্যাসীর হাতে পড়িয়া তুমি স্ত্রীবুদ্ধিবশতঃ কতকগুলা বাজে কথা কণ্ঠস্থ করিয়াছ। ও সকল স্ত্রীলোকের পক্ষে ভাল নহে। ভাল যা, তা বলিতেছি, শুন। আমি তোমার স্বামী, আমার সহবাসই তোমার ধর্ম্ম; তোমার ধর্ম্মান্তর নাই। আমি রাজা, সকলেরই ধর্ম্মরক্ষা আমার কর্ম্ম; এবং স্বামীরও কর্ত্তব্য কর্ম্ম যে, স্ত্রীকে ধর্ম্মানুবর্ত্তিনী করে। অতএব তোমার ধর্ম্মে আমি তোমাকে প্রবৃত্ত করিব। তোমাকে যাইতে দিব না।

শ্রী। তা বলিয়াছি, তুমি স্বামী, তুমি রাজা, তুমি উপকারী। তোমার আজ্ঞা শিরোধার্য্য, কেবল আমার এইটুকু বলিয়া রাখ যে, আমা হইতে তুমি সুখী হইবে না।

সীতা। তোমাকে দেখিলেই আমি সুখী হইব।

শ্রী। আর এক ভিক্ষা এই, যদি আমাকে গৃহে থাকিতে হইল, তবে আমাকে এই রাজপুরীমধ্যে স্থান না দিয়া, আমাকে একটু পৃথক কুটীর তৈয়ার করিয়া দিবেন। আমি সন্ন্যাসিনী, রাজপুরীর ভিতর আমিও সুখী হইব না, লোকেও আপনাকে উপহাস করিবে।

সীতা। আর কুটীরে রাজমহিষীকে রাখিলে লোকে উপহাস করিবে না কি?

শ্রী। রাজমহিষী বলিয়া কেহ নাই জানিল।

সীতা। আমার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হইবে না কি?

শ্রী। সে আপনার অভিরুচি।

সীতা। তোমার সঙ্গে আমি দেখাশুনা করিব, অথচ তুমি রাজমহিষী নও; লোকে তোমাকে কি বলিবে জান?

শ্রী। জানি বৈ কি! লোকে আমাকে রাজার উপপত্নী বিবেচনা করিবে। মহারাজ! আমি সন্ন্যাসিনী— আমার মান অপমান কিছুই নাই। বলে বলুক না। আমার মান অপমান আপনারই হাতে।

সীতা। সে কি রকম?

শ্রী। আমি তোমার সহধর্ম্মিণী—আমার সঙ্গে ধর্ম্মাচরণ ভিন্ন অধর্ম্মাচরণ করিও না। ধর্ম্মার্থে ভিন্ন যে ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি, তাহা অধর্ম্ম। ইন্দ্রিয়তৃপ্তি পশুবৃত্তি। পশুবৃত্তির জন্য বিবাহের ব্যবস্থা দেবতা করেন নাই। পশুদিগের বিবাহ নাই। কেবল ধর্ম্মার্থেই বিবাহ। রাজর্ষিগণ কখনও বিশুদ্ধচিত্ত না হইয়া সহধর্ম্মিণীসহবাস করিতেন না। ইন্দ্রিয়বশ্যতা মাত্রই পাপ। আপনি যখন নিষ্পাপ হইয়া, শুদ্ধচিত্তে আমার সঙ্গে আলাপ করিতে পারিবেন, তখন আমি এই গৈরিক বস্ত্র ছাড়িব। যত দিন আমি এ গেরুয়া না ছাড়িব, ততদিন মহারাজ! তোমাকে পৃথক আসনে বসিতে হইবে।

সীতা। আমি তোমার প্রভু, আমার কথাই চলিবে।

শ্রী। একবার চলিতে পারে, কেন না, তুমি বলবান। কিন্তু আমারও এক বল আছে। আমি বনবাসিনী, বনে আমরা অনেক প্রকার বিপদে পড়ি। এমন বিপদ ঘটিতে পারে যে, তাহা হইতে উদ্ধার নাই। সে সময়ে আপনার রক্ষার জন্য আমরা সঙ্গে একটু বিষ রাখি। আমার নিকট বিষ আছে—আবশ্যক হইলে খাইব।

হায়! এ শ্রী ত সীতারামের শ্রী নয়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সীতারাম তাহা বুঝিয়াও বুঝিলেন না। মন কিছুতেই বুঝিল না। যাহার ভালবাসার জিনিস মরিয়া যায়, সেও মৃতদেহের কাছে বসিয়া থাকে, কিছুক্ষণ বিশ্বাস করে না যে, আর নিশ্বাস নাই। পাগল লিয়রের মত দর্পণ খুঁজিয়া বেড়ায়, দর্পণে নিশ্বাসের দাগ ধরে কি না। সীতারাম এত বৎসর ধরিয়া, মনোমধ্যে একটা শ্রীমূর্ত্তি গড়িয়া তাহার আরাধনা করিয়াছিল। বাহিরে শ্রী যাই হৌক, ভিতরের শ্রী তেমনিই আছে। বাহিরের শ্রীকেই ত সীতারাম হৃদয়ে বসাইয়া রাখিয়াছিলেন, সেই বাহিরের শ্রী ত বাহিরেই আছে, তবে সে হৃদয়ের শ্রী হইতে ভিন্ন কিসে? ভিন্ন বলিয়া সীতারাম বারেক মাত্রও ভাবিতে পারিলেন না। লোকের বিশ্বাস আর সব যাই হৌক, লোকে মনে করে, মানুষ যা তাই থাকে। মানুষ যে কত বার মরে, তাহা আমরা বুঝি না। এক দেহেই কত বার যে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করে, তাহা মনেও করি না। সীতারাম বুঝিল না যে, শ্রী মরিয়াছে, আর একটা শ্রী সেই দেহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। মনে করিল যে, আমার শ্রী আমার শ্রীই আছে। তাই শ্রীর চড়া চড়া কথাগুলা কাণে তুলিল না। তুলিবারও বড় শক্তি ছিল না। শ্রীকে ছাড়িলে সব ছাড়িতে হয়।

তা, শ্রী কিছুতেই রাজপুরীমধ্যে থাকিতে রাজি হইল না। তখন সীতারাম "চিত্তবিশ্রাম" নামে ক্ষুদ্র অথচ মনোরম প্রমোদভবন শ্রীর নিবাসার্থ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। শ্রী তাহাতে বাঘছাল পাতিয়া বসিল। রাজা প্রত্যহ তাহার সাক্ষাৎ জন্য যাইতেন। পৃথক্ আসনে বসিয়া তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়া ফিরিয়া আসিতেন। ইহাতে রাজার পক্ষে বড় বিষময় ফল ফলিল।

আলাপটা কিরকম হইল মনে কর? রাজা বলিতেন ভালবাসার কথা, শ্রীর জন্য তিনি এত দিন যে দুঃখ পাইয়াছেন তাহার কথা, শ্রী ভিন্ন জীবনে তাঁহার আর কিছুই নাই, সেই কথা। কত দেশে কত লোক পাঠাইয়াছেন, কত দেশে নিজে কত খুঁজিয়াছেন, সেই কথা। শ্রী বলিত, কত পর্ব্বতের কথা, কত অরণ্যের কথা, কত বন্য পশু পক্ষী ফল-মূলের কথা, কত যতি পরমহংস ব্রহ্মচারীর কথা, কত ধর্ম্ম অধর্ম্ম কথা, কর্ম্ম অকর্ম্মের কত পৌরাণিক উপন্যাসের কথা, কত দেশবিদেশী রাজার কথা, কত দেশাচার লোকাচারের কথা।

শুনিতে শুনিতে, সেই পৃথক আসনে বসিয়াও রাজার বড় বিপদ হইল! কথাগুলি বড় মনোমোহনী। যে বলে, সে আরও মনোমোহিনী। আগুন ত জ্বলিয়াই ছিল, এবার ঘর পুড়িল। শ্রী ত চিরকালই মনোমোহিনী। যে শ্রী বৃক্ষবিটপে দাঁড়াইয়া আঁচল হেলাইয়া রণজয় করিয়াছিল, রূপে এ শ্রী তাহার অপেক্ষা অনেক গুণে রূপসী। শরীরের স্বাস্থ্য এবং মনের বিশুদ্ধি হইতেই রূপের বৃদ্ধি জন্মে;—শ্রীর শরীরের স্বাস্থ্য, এবং মনের বিশুদ্ধি শতগুণে বাড়িয়াছিল; তাই রূপও শতগুণে বাড়িয়াছিল। সদ্যঃপ্রস্ফুটিত প্রাতঃপুষ্পের যেমন পূর্ণ স্বাস্থ্য—কোথাও অপুষ্ট নয়, কোথাও অঙ্গহীন নয়, কোথাও বিবর্ণ নয়, কোথাও বিশুষ্ক নয়—সর্ব্বত্র মসৃণ, সম্পূর্ণ, শীতল, সুবর্ণ—শ্রীর তেমনই স্বাস্থ্য;—শরীর সম্পূর্ণ, সেই জন্য শ্রী প্রকৃতির মূর্ত্তিমতী শোভা। তার পর চিত্ত প্রশান্ত, ইন্দিয়ক্ষোভশূন্য, চিন্তাশূন্য, বাসনাশূন্য, ভক্তিময়, প্রীতিময়, দয়াময়,—কাজেই সেই সৌন্দর্য্যের বিকার নাই, কোথাও একটা দুঃখের রেখা নাই, একটু মাত্র ইন্দ্রিয়ভোগের ছায়া নাই, কোথাও চিন্তার চিহ্ন নাই, সর্ব্বত্র সুমধুর, সহাস্য, সুখময়—এ ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তির কাছে সে সিংহবাহিনী মূর্ত্তি কোথায় দাঁড়ায়! তাহার পর সেই মনোমোহিনী কথা—নানা দেশের, নানা বিষয়ের, নানাবিধ অশ্রুতপূর্ব্ব কথা, কখনও কৌতূহলের উদ্দীপক, কখনও মনোরঞ্জন, কখনও জ্ঞানগর্ভ—এই দুই মোহ একত্রে মিশিলে কোন্ অসিদ্ধ ব্যক্তির রক্ষা আছে? সীতারামের অনেক দিন ত আগুন জ্বলিয়াছিল, এখন ঘর পুড়িতে লাগিল। শ্রী হইতে সীতারামের সর্ব্বনাশ হইল।

প্রথমে সীতারাম প্রত্যহ সায়াহ্নকালে চিত্তবিশ্রামে আসিতেন, প্রহরেক কথাবার্ত্তা কহিয়া চলিয়া যাইতেন। তার পর ক্রমশঃ রাত্রি বেশী হইত লাগিল। পৃথক্ আসন হউক, রাজা ক্ষুধা ও নিদ্রায় পীড়িত না হইঁলে সেখান হইতে ফিরিতেন না। ইহাতে কিছু কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। সুতরাং সীতারাম, চিত্তবিশ্রামেই

নিজের সায়াহ্ন আহার, এবং রাত্রিতে শয়নের ব্যবস্থা করিলেন। সে আহার বা শয়ন পৃথক্ গৃহে; শ্রীর বাঘছালের নিকটে ঘেঁষিতে পারিতেন না। ইহাতেও সাধ মিটিল না। প্রাতে রাজবাড়ী ফিরিয়া যাইতে দিন দিন বেলা হইতে লাগিল। শ্রীর ক্ষণেক প্রাতেও কথাবার্ত্তা না কহিয়া যাইতে পারিতেন না। যখন বড় বেলা হইতে লাগিল, তখন আবার মাধ্যাহ্নিক আহারটাও চিত্তবিশ্রামেই হইতে লাগিল। রাজা আহারান্তে একটু নিদ্রা দিয়া, বৈকালে একবার রাজকার্য্যের জন্য রাজবাড়ী যাইতেন। তার পর কোন দিন যাইতেন, কোন দিন বা কথায় কথায় যাওয়া ঘটিয়া উঠিত না। শেষ এমন হইয়া উঠিল যে, যখন যাইতেন, তখনই একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিয়া আসিতেন, চিত্তবিশ্রাম ছাড়িয়া তিষ্ঠিতেন না। চিত্তবিশ্রামেই রাজ্য বাস করিতে লাগিলেন, কখন কখন রাজভবনে বেড়াইতে যাইতেন।

এ দিকে চিত্তবিশ্রামে কাহারও কোন কার্য্যের জন্য আসিবার হুকুম ছিল না। চিত্তবিশ্রামের অন্তঃপুরে কীটপতঙ্গও প্রবেশ করিতে পারিত না। কাজেই রাজকার্য্যের সঙ্গে রাজার সম্বন্ধ প্রায় ঘুচিয়া উঠিল।

নবম পরিচ্ছেদ

রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ, দুই জন নিরীহ গৃহস্থ লোক, মহম্মদপুরে বাস করে। রামচাঁদের চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া, প্রদোষকালে, নিভৃতে তামাকুর সাহায্যে দুই জন কথোপকথন করিতেছিল। কিয়দংশ পাঠককে শুনিতে হইবে।

রামচাঁদ। ভাল, ভায়া, বলিতে পার, চিত্তবিশ্রামের আসল ব্যাপারটা কি?

শ্যামচাঁদ। কি জান, দাদা, ও সব রাজা-রাজড়ার হয়েই থাকে। আমাদের গৃহস্থ ঘরে কারই বা ছাড়া–তার আর রাজা-রাজড়ার কথায় কাজ কি? তবে আমাদের মহারাজকে ভাল বল্‌তে হবে–মাত্রায় বড় কম। মোটে এই এ একটি।

রাম। হাঁ, তা ত বটেই। তবে কি জান, আমাদের মহারাজা না কি সে রকম নয়, পরম ধার্ম্মিক, তাই কথাটি জিজ্ঞাসা করি। বলি, এত কাল ত এ সব ছিল না।

শ্যাম। রাজাও আর সে রকম নাই, লোকে ত বলে। কি জান, মানুষ চিরকাল এক রকম থাকে না। ঐশ্বর্য্য সম্পদ বাড়িলে, মনটাও কিছু এদিক্ ওদিক্ হয়! আগে আমরা রামরাজ্যে বাস করতাম–ভুষণা দখল হয়ে অবধি কি আর তাই আছে?

রাম। তা বটে। তা আমার যেন বোধ হয় যে, চিত্তবিশ্রামের কাণ্ডটা হয়ে অবধিই যেন বাড়াবাড়ি ঘটেছে। তা মহারাজকে এমন বশ করাও সহজ ব্যাপার নয়। মাগীও ত সামান্যা নয়–কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসিল?

শ্যাম। শুনেছি, সেটা না কি একটা ভৈরবী। কেউ কেউ বলে, সেটা ডাকিনী। ডাকিনীরা নানা মায়া জানে, মায়াতে ভৈরবী বেশ ধ'রে বেড়ায়। আবার কেউ বলে, তার একটা জোড়া আছে, সেটা উড়ে উড়ে বেড়ায়, তাকে বড় কেউ দেখিতে পায় না।

রাম। তবে ত বড় সর্ব্বনাশ! রাজা পড়িল ডাকিনীর হাতে। এ রাজ্যের কি আর মঙ্গল আছে?

শ্যাম। গতিকে ত বোধ হয় না। রাজা ত আর কাজ কর্ম্ম দেখেন না। যা করেন তর্কালঙ্কার ঠাকুর। তা তিনি লড়াই ঝগড়ার কি জানেন! এ দিকে না কি নবাবি ফৌজ শীঘ্র আসিবে।

রাম। আসে, মৃন্ময় আছে।

শ্যাম। তুমিও যেমন দাদা! পরের কি কাজ! যার কর্ম্ম তার সাজে, অন্য লোকের লাঠি বাজে। এই ত দেখলে, গঙ্গারাম দাস কি কর্‌লে? আবার কে জানে, মৃন্ময় বা কি করবে? সে যদি মুসলমানের সঙ্গে মিশে যায়, তবে আমরা দাঁড়াই কোথা? গোষ্ঠী শুদ্ধ জবাই হব দেখতে পাচ্চি।

রাম। তা বটে। তাই একে একে সব সরিতে আরম্ভ করেছে বটে! সে দিন তিলক ঘোষেরা উঠে যশোর গেল, তখন বুঝিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম যে, কেন যাও? বলে, এখানে জিনিসপত্র মাগ্যি। এখনই তা আরও কয় ঘর আমাদের পাড়া হইয়া উঠিয়া গিয়াছে।

শ্যাম। তা দাদা, তোমার কাছে বল্‌চি, প্রকাশ করিও না, আমিও শিগ্‌গির সরবো।

রামচাঁদ। বটে! তা আমিই পড়ে জবাই হই কেন? তবে কি জান, এই সব বাড়ি ঘর দ্বার খরচ পত্র করে করা গেছে, এখন ফেলে ঝেলে যাওয়া গরিব মানুষের বড় দায়।

শ্যামচাঁদ। তা কি করবে, প্রাণটা আগে, না বাড়ী ঘর আগে? ভাল, রাজ্য বজায় থাকে, আবার আসা যাবে। ঘর দ্বার ত পালাবে না।

দশম পরিচ্ছেদ

শ্রী। মহারাজা! তুমি ত সর্ব্বদাই চিত্তবিশ্রামে। রাজ্য করে কে?

সীতা। তুমিই আমার রাজ্য। তোমাতে যত সুখ, রাজ্যে কি তত সুখ!

শ্রী। ছি! ছি! মহারাজ! এই জন্য কি হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে! আমার কাছে হিন্দুসাম্রাজ্য খাটো হইয়া গেল, ধর্ম্ম গেল, আমিই সব হইলাম! এই কি রাজা সীতারাম রায়?

সীতা। রাজ্য ত সংস্থাপিত হইয়াছে।

শ্রী। টিকিবে কি?

সীতা। ভাঙ্গে কার সাধ্য?

শ্রী। তুমিইও ভাঙ্গিতেছ। রাজার রাজ্য, আর বিধবার ব্রহ্মচর্য্য সমান। যত্নে রক্ষা না করিলে থাকে না।

সীতা। কৈ, অরক্ষাও ত হইতেছে না।

শ্রী। তুমি কি রাজ্য রক্ষা কর? তোমাকে ত আমার কাছেই দেখি।

সীতা। আমি রাজকর্ম্ম না দেখি, তা নয়। প্রায় প্রত্যহই রাজপুরীতে গিয়া থাকি। আমি এক দণ্ড দেখিলে যা হইবে, অন্যের সমস্ত দিনে তত হইবে না। তা ছাড়া, তর্কালঙ্কার ঠাকুর আছেন, মৃন্ময় আছে, তাঁহারা সকল কর্ম্মে পটু। তাঁহারা থাকিতে কিছু না দেখিলেও চলে।

শ্রী। একবার ত তাঁহারা থাকিতে রাজ্য যাইতেছিল। দৈবাৎ তুমি সে রাত্রে না পৌঁছিলে, রাজ্য থাকিত না। আবার কেন কেবল তাঁহাদের উপর নির্ভর করিতেছ?

সীতা। আমি ত আছি। কোথাও যাই নাই। আবার বিপদ্ পড়ে, রক্ষা করিব।

শ্রী। যতক্ষণ এই বিশ্বাস থাকিবে, ততক্ষণ তুমি কোন যত্নই করিবে না। যত্ন ভিন্ন কোন কাজই সফল হয় না।

সী। যত্নের ত্রুটি কি দেখিলে?

শ্রী। আমি স্ত্রীজাতি, সন্ন্যাসী, আমি রাজকার্য্য কি বুঝি যে, সে কথার উত্তর দিতে পারি! তবে একটা বিষয়ে মনে বড় শঙ্কা হয়। মুরশিদাবাদের সংবাদ পাইতেছেন কি? তোরাব্ খাঁ গেল, ভূষণা গেল, বারো ভুঁইঞা গেল, নবাব কি চুপ করিয়া আছে?

সী। সে ভাবনা করিও না। মুরশিদ কুলি যতক্ষণ মাল খাজনা ঠিক কিস্তি কিস্তি পাইবে, ততক্ষণ কিছু বলিবে না।

শ্রী। পাইতেছে কি?

সীতা। হাঁ, পাঠাইবার বন্দোবস্ত আছে বটে–তবে এবার দেওয়া যায় নাই, অনেক খরচ পত্র হইয়াছে।

শ্রী। তবে সে চুপ করিয়া আছে কি?

সীতারাম মাথা হেঁট করিয়া কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। পরে বলিলেন। পরে বলিলেন, "সে কি করিবে, কি করিতেছে, তাহার কিছু সংবাদ পাই নাই।"

শ্রী। মহারাজ! চিত্তবিশ্রামে থাক বলিয়া কি সংবাদ লইতে ভুলিয়া গিয়াছ?

সীতারাম চিন্তামগ্ন হইয়া বলিলেন, "বোধ হয় তাই। শ্রী! তোমার মুখ দেখিলে আমি সব ভুলিয়া যাই।"

শ্রী। তবে আমার এক ভিক্ষা আছে। এ পোড়ার মুখ আবার লুকাইতে হইবে। নহিলে সীতারাম রায়ের নামে কলঙ্ক হইবে; ধর্ম্মরাজ্য ছারেখারে যাইবে। আমায় হুকুম দাও, আমি বনে যাই।

সীতা। যা হয় হোক, আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি। হয় তোমায় ছাড়িতে হইবে, নয় রাজ্য ছাড়িতে হইবে। আমি রাজ্য ছাড়িব, তোমায় ছাড়িব না।

শ্রী। তবে তাহাই করুন। রাজ্য কোন উপযুক্ত লোকের হাতে দিন। তার পর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া আমার সঙ্গে বনে চলুন।

সীতারাম চিন্তামগ্ন হইয়া রহিলেন। রাজার তখন ভোগলালসা অত্যন্ত প্রবলা। আগে হইলে সীতারাম রাজ্য ত্যাগ করিতে পারিতেন। এখন সে সীতারাম নাই; রাজ্যভোগে সীতারামের চিত্ত সমল হইয়াছে। সীতারাম রাজ্য ত্যাগ করিতে পারিলেন না।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সেই যে সভাতলে রমা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল, সখীরা ধরাধরি করিয়া আনিয়া শুয়াইল, সেই অবধি রমা আর উঠে নাই। প্রাণপণ করিয়া আপনার সতী নাম রক্ষা করিয়াছিল। মান রক্ষা হইল, কিন্তু প্রাণ বুঝি গেল।

এখন রোগ পুরাতন হইয়াছে। কিন্তু গোড়া থেকে বলি। রাজার রাণীর চিকিৎসার অভাব হয় নাই। প্রথম হইতেই কবিরাজ যাতায়াত করিতে লাগিল। অনেকগুলা কবিরাজ রাজবাড়ীতে চাকরি করে, তত কর্ম্ম নাই, সচরাচর ভৃত্যবর্গকে মসলা খাওয়াইয়া, একং পরিচারিকাকে পোষ্টাই দিয়া কালাতিপাত করে; এক্ষণে ছোট রাণীকে রোগী পাইয়া কবিরাজ মহাশয়েরা হঠাৎ বড়লোক হইয়া বসিলেন, তখন রোগ নির্ণয় লইয়া মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। মূর্চ্ছা, বায়ু, অম্লপিত্ত, হৃদ্রোগ ইত্যাদি নানাবিধ রোগের লক্ষণ শুনিতে শুনিতে রাজপুরুষেরা জ্বালাতন হইয়া উঠিল। কেহ নিদানের দোহাই দেন, কেহ বাগ্‌ভটের, কেহ চরকসংহিতার বচন আওড়ান, কেহ সুশ্রুতের টীকা ঝাড়েন। রোগ অনির্ণীত রহিল।

কবিরাজ মহাশয়েরা, কেবল বচন ঝাড়িয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন, এমন নিন্দা আমরা করি না। তাঁহারা নানাপ্রকার ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। কেহ বটিকা, কেহ গুঁড়া, কেহ ঘৃত, কেহ তৈল; কেহ বলিলেন, ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইবে, কেহ বলিলেন, আমার কাছে যাহা প্রস্তুত আছে, তেমন আর হইবে না। যাই হউক,

রাজার বাড়ী, রাণীর রোগ, ঔষধের প্রয়োজন থাক, না থাক, নূতন প্রস্তুত হইবে না, এমন হইতে পারে না। হইলে দশ জনে দুটাকা দুসিকা উপার্জ্জন করিতে পারে, অতএব ঔষধ প্রস্তুতের ধূম পড়িয়া গেল। কেথাও হামানদিস্তায় মূল পিষ্ট হইতেছে, কোথাও ঢেঁকিতে ছাল কুটিতেছে, কোথাও হাঁড়িতে কিছু সিদ্ধ হইতেছে, কোথাও খুলিতে তৈলে মূর্চ্ছনা পড়িতেছে। রাজবাড়ীর এক জন পরিচারিকা এক দিন দেখিয়া বলিল, "রাণী হইয়া রোগ হয়, সেও ভাল।"

যার জন্য ঔষুধের এত ধূম, তার সঙ্গে ঔষধের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বড় অল্প। কবিরাজ মহাশয়েরা ঔষধ যোগাইতেন না, তা নয়। সে গুণে তাঁহাদের কিছুমাত্র ত্রুটি ছিল না। তবে রমার দোষে সে যত্ন বৃথা হইল–রমা ঔষধ খাইত না। মুরলার বদলে, যমুনানাম্নী একজন পরিচারিকা, রাণীর প্রধানা দাসী হইয়াছিল। যমুনাকে একটু প্রাচীন দেখিয়া নন্দা তাহাকে এই পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। আমরা এমন বলিতে পারি না যে, যমুনা আপনাকে প্রাচীনা বলিয়া স্বীকার করিত; শুনিয়াছি, কোন ভৃত্যবিশেষের এ বিষয়ে সম্পূর্ণ মতান্তর ছিল; তথাপি স্থুল কথা এই যে, যমুনা একটু প্রাচীন চালে চলিত, রমাকে বিলক্ষণ যত্ন করিত, রোগিণীর সেবায় কোন প্রকার ত্রুটি না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগিনী ছিল। রমার জন্য কবিরাজেরা যে ঔষধ দিয়া যাইত, তাহা তাহারই হাতে পড়িত; সেবন করাইবার ভার তাহার উপর। কিন্তু সেবন করান তাহার সাধ্যাতীত; রমা কিছুতেই ঔষধ খাইত না।

এ দিকে রোগের কোন উপশম নাই, ক্রমেই বৃদ্ধি, রমা আর মাথা তুলিতে পারে না। দেখিয়া শুনিয়া যমুনা স্থির করিল যে, সে সকল কথা বড় রাণীকে গিয়া জানাইবে। অতএব রমাকে বলিল, "আমি বড় মহারাণীর কাছে চলিলাম; ঔষধ তিনি নিজে আসিয়া খাওয়াইবেন।"

রমা বলিল, "বাছা! মৃত্যুকালে আর কেন জ্বালাতন করিস্। বরং তোর সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করি।"

যমুনা জিজ্ঞসা করিন, "কি বন্দোবস্ত মা?"

রমা। তোমার এই ঔষধগুলি আমারে বেচিবে? আমি এক এক টাকা দিয়া এক একটা বড়ি কিনিতে রাজি আছি।

যমুনা। সে আবার কি মা! তোমার ঔষধ তোমায় বেচিব কি?

রমা। টাকা নিয়া তুমি যদি আমায় বড়ি বেচ, তা হলে তোমার আর তাতে কোন অধিকার থাকিবে না। চাই আমি খাই, চাই না খাই, তুমি আর কথা কহিতে পাবে না।

যমুনা কিছুক্ষণ ভাবিল। সে বুদ্ধিমতী, মনে মনে বিচার করিল যে, এ ত মরিবেই, তবে আমি টাকাগুলা ছাড়ি কেন? প্রকাশ্যে বলিল, "তা মা, তুমি যদি খাও, ত টাকা দিয়াই নাও, আর অমনিই নাও, নাও না কেন! আর যদি না খাও ত আমার কাছে ঔষধ প'ড়ে থেকেই কি ফল?"

অতএব চুক্তি ঠিক হইল। যমুনা টাকা লইয়া ঔষধ রমাকে বেচিল। রমা ঔষধের কতকগুলা পিকদানিতে ফেলিয়া দিল, কতক বালিশের নীচে গুঁজিল। উঠিতে পারে না যে, অন্যত্র রাখিবে।

এদিকে ক্রমশঃ শরীরধ্বংসের লক্ষণ সকল দেখা দিতে লাগিল। নন্দা প্রত্যই রমাকে দেখিতে আসে, দুই এক দণ্ড বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিয়া যায়। নন্দা দেখিল যে, মৃত্যুর ছায়া পড়িয়াছে; যাহার ছায়া, সে নিকটেই। নন্দা ভাবিল, "হায়! রাজাবাড়ীর কবিরাজগুলোকেও কি ডাকিনীতে পেয়েছে!" নন্দা একেবারে কবিরাজের দলকে ডাকিয়া পাঠাইল। সকলে নন্দা অন্তরালে থাকিয়া তাহাদিগকে উত্তম মধ্যম রকম ভর্ৎসনা করিল। বলিল, "যদি রোগ ভাল করিতে পার না, তবে মাসিক লও কেন?"

একজন প্রাচীন কবিরাজ বলিল, "মা! কবিরাজে ঔষধ দিতে পারে, পরমায়ু দিতে পারে না।"

নন্দা বলিল, "তবে আমাদের ঔষধেও কাজ নাই, কবিরাজেও কাজ নাই। তোমরা আপনার আপনার দেশে যাও।"

কবিরাজমণ্ডলী বড় ক্ষুণ্ন হইল। প্রাচীন কবিরাজটি বড় বিজ্ঞ। তিনি বলিলেন, "মা! আমাদের অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ, তাই এমন ঘটিয়াছে। নহিলে, আমি যে ঔষধ দিয়াছি, তাহা সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি। আমি এখনও আপনার নিকট স্বীকার করিতেছি যে, তিন দিনের মধ্যে আরাম করিব, যদি একটা বিষয়ে আপনি অভয় দেন।"

নন্দা জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাই?"

কবিরাজ বলিল, "আমি নিজে বসিয়া থাকিয়া ঔষধ খাওয়াইয়া আসিব।" বুড়ার বিশ্বাস, "বেটি ঔষধ খায় না; আমার ঔষধ খাইলে কি রোগী মরে!"

নন্দা স্বীকৃত হইয়া কবিরাজদিগকে বিদায় দিল। পরে রমার কাছে আসিয়া সব বলিল। রমা অল্প হাসিল, বেশী হাসিবার শক্তিও নাই, মুখে স্থানও নাই; মুখ বড় ছোট হইয়া গিয়াছে।

নন্দা জিজ্ঞাসা করিল, "হাসিলি যে?"

রমা আবার তেমনি হাসি হাসিয়া বলিল, "ঔষধ খাব না।"

নন্দা। ছি দিদি! যদি এত ঔষধ খেলে, ত আর তিনটা দিন খেতে কি?

রমা। আমি ঔষধ খাই নাই।

নন্দা চমকিয়া উঠিল,—বলিল, "সে কি? মোটে না?"

রমা। সব বালিশের নীচে আছে।

নন্দা বালিশ উল্টাইয়া দেখিল, সব আছে বটে। তখন নন্দা বলিল, "কেন বহিন্—এখন আর আত্মঘাতিনী হইবে কেন? পাপ ত মিটিয়াছে।"

রমা। তা নয়—ঔষধ খাব।

নন্দা। আর কবে খাবি?

রমা। যবে রাজা আমাকে দেখিতে আসিবেন।

ঝর ঝর করিয়া রমার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। নন্দারও চক্ষে জল আসিল। আর এখন সীতারাম রমাকে দেখিতে আসেন না। সীতারাম চিত্তবিশ্রামে থাকেন। নন্দা চোখের জল মুছিয়া বলিল, "এবার এলেই তোমাকে দেখিতে আসিবেন।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

"এবার এলেই তোমাকে দেখিতে আসিবেন," এই কথা বলিয়া নন্দা রমাকে আশ্বাস দিয়া আসিয়াছিল। সেই আশ্বাসে রমা কোন রকমে বাঁচিয়াছিল—কিন্তু আর বুঝি বাঁচে না। নন্দা তাহাকে যে আশ্বাসবাক্য দিয়া আসিয়াছে, নন্দাও তাহা জপমালা করিয়াছিল, কিন্তু রাজাকে ধরিতে পারিতেছিল না। যদি কখনও ধরে, তবে "আজ না—কাল" করিয়া রাজা প্রস্থান করেন। নন্দা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, কিছুতেই সে সীতারামের উপর রাগ করিবে না। ভাবিল, রাজাকে ত ডাকিনীতে পেয়েছে সত্য, কিন্তু তাই বলে আমায় যেন ভূতে না পায়। আমার ঘাড়ে রাগ ভূত চাপিলে—এ সংসার এখন আর রাখিবে কে? তাই নন্দা সীতারামের উপর রাগ করিল না—আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম প্রাণপাত করিয়া করিতে লাগিল। কিন্তু ডাকিনীটার উপর রাগ বড় বেশী। ডাকিনী যে শ্রী তাহা নন্দা জানিত না;

সীতারাম ভিন্ন কেহই জানিত না। নন্দা অনেকবার সন্ধান জানিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিল, কিন্তু সীতারামের আজ্ঞা ভিন্ন চিত্তবিশ্রামে মক্ষিকা প্রবেশ করিতে পারিত না, সুতরাং কিছু হইল না। তবে জনপ্রবাদ এই যে, ডাকিনীটা দিবসে পরমসুন্দরী মানবী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গৃহধর্ম্ম করে, রাত্রিতে শৃগালীরূপ ধারণ করিয়া শ্মশানে শ্মশানে বিচরণপূর্ব্বক নরমাংস ভক্ষণ করে। অতিশয় ভীতা হইয়া নন্দা, চন্দ্রচূড় ঠাকুরকে সবিশেষ নিবেদন করিল। চন্দ্রচূড় উত্তম তন্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণ সংগ্রহ করিয়া রাজার উদ্ধারার্থ তান্ত্রিক যজ্ঞ সকল সম্পাদন করাইলেন, কিন্তু কিছুতেই ডাকিনীর ধ্বংস হইল না। পরিশেষে এক জন সুদক্ষ তান্ত্রিক বলিলেন, "মনুষ্য হইতে ইহার কিছু উপায় হইবে না। ইনি সামান্য নহেন। ইনি কৈলাসনিবাসিনী সাক্ষাৎ ভবানীর সহচরী, ইঁহার নাম বিশালক্ষী। ইনি রুদ্রের শাপে কিছুকালের জন্য মর্ত্যলোকে মনুষ্যসহবাসার্থ আসিয়াছেন। শাপান্ত হইলে আপনিই যাইবেন।" শুনিয়া চন্দ্রচূড় ও নন্দা নিরস্ত ও চিন্তামগ্ন হইয়া রহিলেন। তবু নন্দা মনে মনে ভাবিত, "ভবানীর সহচরী হউক, আর যেই হউক, আমি একবার তাকে পাইলে নখে মাথা চিরি।"

তাই, নন্দার সীতারামের উপর কোন রাগ নাই। সীতারামও রাজধানীতে আসিলে নন্দার সঙ্গে কখন কখন সাক্ষাৎ করিতেন; এই সকল সময়ে, নন্দা রমার কথা সীতারামকে জানাইত–বলিত, "সে বড় 'কাতর'–তুমি গিয়া একবার দেখিয়া এসো।" সীতারাম যাচ্ছি যাব করিয়া যান নাই। আজ নন্দা জোর করিয়া ধরিয়া বসিল–বলিল, "আজ দেখিতে যাও–নহিলে এ জন্মে আর দেখা হবে না।"

কাজেই সীতারাম রমাকে দেখিতে গেলেন। সীতারামকে দেখিয়া রমা বড় কাঁদিল। সীতারামকে কোন তিরস্কার করিল না। কিছুই বলিতে পারিল না। সীতারামের মনে কিছু অনুতাপ জন্মিল কি না, জানি না। সীতারাম স্নেহসূচক সম্বোধন করিয়া রোগমুক্তির ভরসা দিতে লাগিলেন। ক্রমে রমা প্রফুল্ল হইল, মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। কিন্তু কি হাসি! হাসি দেখিয়া সীতারামের শঙ্কা হইল যে, আর অধিক বিলম্ব নাই।

সীতারাম পালঙ্কের উপর উঠিয়া বসিয়াছিলেন। সেইখানে রমার পুত্র আসিল। আবার রমার চক্ষুতে জল আসিল–কিছুক্ষণ অবাধে জল শুষ্ক গণ্ড বাহিয়া পড়িতে লাগিল। ছেলেও মার কান্না দেখিয়া কাঁদিতেছিল। রমা ইঙ্গিতে অস্ফুটস্বরে সীতারামকে বলিল, "ওকে একবার কোলে নাও।" সীতারাম অগত্যা পুত্রকে কোলে লইলেন। তখন রমা, সকাতরে ক্ষীণকণ্ঠে রুদ্ধশ্বাসে বলিতে লাগিল, "মার দোষে ছেলেকে ত্যাগ করিও না। এই তোমার কাছে আমার শেষ ভিক্ষা। বড় রাণীর হাতে ওকে সমর্পণ করিয়া যাব মনে করিছিলাম–কিন্তু তা না করিয়া তোমারই হাতে সমর্পণ করিলাম। কথা রাখিবে কি?"

সীতারাম কলের পুতুলের মত স্বীকার হইলেন। রমা তখন সীতারামকে আরও নিকটে আসিয়া বসিতে ইঙ্গিত করিল। সীতারাম সরিয়া বসিলে, রমা তাঁর পায়ে হাত দিয়া, পায়ের ধূলা লইয়া আপনার মাথায় দিল। বলিল, "এ জন্মের মত বিদায় হইলাম। আশীর্ব্বাদ করিও, জন্মান্তরে যেন তোমাকেই পাই।"

তার পর বাক্য বন্ধ হইল। শ্বাস বড় জোরে জোরে পড়িতে লাগিল। চক্ষুর জ্যোতি গেল। মুখের উপর কালো ছায়া আরও কালো হইতে লাগিল। শেষে সব অন্ধকার হইল। সব জ্বালা জুড়াইল। রমা চলিয়া গেল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

যে দিন রমা মরিল, সে দিন সীতারাম আর চিত্তবিশ্রামে গেলেন না। এখনও তত দূর হই নাই। যখন সীতারাম রাজা না হইয়াছিলেন, যখন আবার শ্রীকে না দেখিয়াছিলেন, তখন সীতারাম রমাকে বড় ভালবাসিতেন–নন্দার অপেক্ষাও ভালবাসিতেন। সে ভালবাসা গিয়াছিল। কিসে গেল, সীতারাম তাহার চিন্তা কখনও করেন নাই। আজ একটু ভাবিলেন। ভাবিয়া দেখিলেন–রমার দোষ বড় বেশী নয়,–দোষ তাঁর নিজের। মনে মনে আপনার উপর বড় অসন্তুষ্ট হইলেন।

কাজেই মেজাজ খারাপ হইয়া উঠিল। চিত্ত প্রফুল্ল করিবার জন্য শ্রীর কাছে যাইতে প্রবৃত্তি হইল না; কেন না, শ্রীর সঙ্গে এই আত্মগ্লানির বড় নিকট সম্বন্ধ;

রমার প্রতি তাঁহার নিষ্ঠুরাচরণের কারণেই শ্রী। শ্রীর কাছে গেলে আগুন আরও বাড়িবে। তাই শ্রীর কাছে না গিয়া রাজা নন্দার কাছে গেলেন। কিন্তু নন্দা সে দিন একটা ভুল করিল। নন্দা বড় চটিয়াছিল। ডাকিনীই হউক, আর মানুষীই হউক, কোন পাপিষ্ঠার জন্য যে রাজা নন্দাকে অবহেলা করিতেন, নন্দা তাহাতে আপনার মনকে রাগিতে দেয় নাই। কিন্তু রমাকে এত অবহেলা করায়, রমা যে মরিল তাহাতে রাজার উপর নন্দার রাগ হইল; কেন না, আপনার অপমানও তাহার সঙ্গে মিশিল। রাগটা এত বেশী হইল যে, অনেক চেষ্টা করিয়াও নন্দা সকলটুকু লুকাইতে পারিল না।

রমার প্রসঙ্গ উঠিলে, নন্দা বলিল, "মহারাজ! তুমিই রমার মৃত্যুর কারণ।"

নন্দা এইটুকু মাত্র রাগ প্রকাশ করিল, আর কিছুই না। কিন্তু তাহাতেই আগুন জ্বলিল; কেন না, ইন্ধন প্রস্তুত। একে ত আত্মগ্লানিতে সীতারামের মেজাজ খারাব হইয়াছিল–কোন মতে আপনার নিকটে আপনার সাফাই করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহার উপর নন্দার এই উচিত তিরস্কার শেলের মত বিঁধিল। "মহারাজ! তুমিই রমার মৃত্যুর কারণ।" শুনিয়া রাজা গর্জ্জিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "ঠিক কথা। আমিই তোমাদের মৃত্যুর কারণ। আমি প্রাণপাত করিয়া, আপনার রক্তে পৃথিবী ভাসাইয়া তোমাদিগকে রাজরাণী করিয়াছি–কাজেই এখন বল্‌বে বৈ কি, আমিই তোমাদের মৃত্যুর কারণ। যখন রমা গঙ্গারামকে ডাকিয়া আমার মৃত্যুর কারণ হইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কৈ তখন ত কেহ কিছু বল নাই?"

এই বলিয়া রাজা রাগ করিয়া বহির্ব্বাটীতে গেলেন। সেখানে চন্দ্রচূড় ঠাকুর, রাজাকে রমার জন্য শোকাকুল বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য নানা প্রকার আলাপ করিতে লাগিলেন। রাজার মেজাজ তপ্ত তেলের মত ফুটিতেছিল, রাজা তাঁহার কথায় বড় উত্তর করিলেন না। চন্দ্রচূড় ঠাকুরও একটা ভুল করিলেন। তিনি মনে করিলেন, রমার মৃত্যুর জন্য রাজার অনুতাপ হইয়াছে, এ সময়ে চেষ্টা করিলে যদি ডাকিনী হইতে মন ফিরে, তবে সে চেষ্টা করা উচিত। তাই চন্দ্রচূড় ঠাকুর ভূমিকা করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, "মহারাজ! আপনি যদি ছোট রাণীর প্রতি আর একটু মনোযোগী হইতেন, তা হইলে তিনি আরোগ্য লাভ করিতে পারিতেন।"

জ্বলন্ত আগুন এ ফুৎকারে আরও জ্বলিয়া উঠিল। রাজা বলিলেন, "আপনারও কি বিশ্বাস যে, আমিই ছোট রাণীর মৃত্যুর কারণ?"

চন্দ্রচূড়ের সেই বিশ্বাস বটে। তিনি মনে করিলেন, "এ কথা রাজাকে স্পষ্ট করিয়া বলাই উচিত। আপনার দোষ না দেখিলে, কাহারও চরিত্র শোধন হয় না। আমি ইঁহার গুরু ও মন্ত্রী, আমি যদি বলিতে সাহস না করিব, তবে কে বলিবে?" অতএব চন্দ্রচূড় বলিলেন, "তাহা এক রকম বলা যাইতে পারে।"

রাজা। পারে বটে। বলুন। কেবল বিবেচনা করুন, আমি যদি লোকের মৃত্যুকামনা, করিতাম, তাহা হইলে এই রাজ্যে এক জনও এত দিন টিকিত না।

চন্দ্র। আমি বলিতেছি না যে, আপনি কাহারও মৃত্যুকামনা করেন। কিন্তু আপনি মৃত্যুকামনা না করিলেও, যে আপনার রক্ষণীয়, তাহাকে আপনি যত্ন ও রক্ষা না করিলে, কাজেই তাহার মৃত্যু উপস্থিত হইবে। কেবল ছোট রাণী কেন, আপনার তত্ত্বাবধানের অভাবে বুঝি সমস্ত রাজ্য যায়। কথাটা আপনাকে বলিবার জন্য কয় দিন হইতে আমি চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু আপনার অবসর অভাবে, তাহা বলিতে পারি নাই।

রাজা মনে মনে বলিলেন, "সকল বেটাই বলে–তত্ত্বাবধানের অভাব–বেটারা করে কি?" প্রকাশ্যে বলিলেন, "তত্ত্বাবধানের অভাব–আপনারা করেন কি?"

চন্দ্র। যা করিতে পারি–সব করি। তবে আমরা রাজা নহি। যেটা রাজার হুকুম নহিলে সিদ্ধ হয় না, সেইটুকুই পারি না। আমার ভিক্ষা, কাল প্রাতে একবার দরবারে বসেন, আমি আপনাকে সবিশেষ অবগত করি, কাগজপত্র দেখাই; আপনি রাজাজ্ঞা প্রচার করিবেন।

রাজা মনে মনে বলিলেন, "তোমার গুরুগিরির কিছু বাড়াবাড়ি হইয়াছে–আমারও ইচ্ছা, তোমায় কিছু শিখাই।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "বিবেচনা করা যাইবে?"

চন্দ্রচূড়ের তিরস্কারে রাজার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতেছিল, কেবল গুরু বলিয়া সীতারামও তাঁহাকে বেশী কিছু বলিতে পারেন নাই। কিন্তু রাগে সে রাত্রি নিদ্রা গেলেন না। চন্দ্রচূড়কে কিসে শিক্ষা দিবেন, সেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রভাতে উঠিয়াই প্রাতঃকৃত্য সমস্ত সমাপন করিয়া দরবারে বসিলেন। চন্দ্রচূড় খাতাপত্রের রাশি আনিয়া উপস্থিত করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

যে কথাটা চন্দ্রচূড় রাজাকে জানাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহা এই। যত বড় রাজ্য হউক না কেন, আর যত বড় রাজা হউক না কেন, টাকা নইলে কোন রাজ্যই চলে না। আমার একালে দেখিতে পাই, যেমন তোমার আমার সংসার টাকা নহিলে চলে না—তেমনই ইংরেজের এত বড় রাজ্যও টাকা নহিলে চলে না। টাকার অভাবে তেমনই রোমক সাম্রাজ্য লোপ পাইল—প্রাচীন সভ্যতা অন্ধকারে মিশাইল। সীতারামের সহসা টাকার অভাব হইল।

সীতারামের টাকার অভাব হওয়া অনুচিত; কেন না, সীতারামের আয় অনেক গুণ বাড়িয়াছিল। ভূষণার ফৌজদারীর এলাকা তাঁহার করতলস্থ হইয়াছিল—বারো ভুঁইঞা তাঁহার বশে আসিয়াছিল। তচ্ছাসিত প্রদেশ সম্বন্ধে দিল্লীর বাদশাহের প্রাপ্য যে, কর, সীতারামের উপর তাহার আদায়ের ভার হইয়াছিল। সীতারাম এ পর্য্যন্ত তাহার এক কড়াও মুরশিদাবাদে পাঠান নাই—যাহা আদায় করিয়াছিলেন, তাহা নিজে ভোগ করিতেছিলেন। তবে টাকার অকুলান কেন?

লোকের আয় বাড়িলেই অকুলান হইয়া উঠে। কেন না, খরচ বাড়ে। ভূষণা বশে আনিতে কিছু খরচ হইয়াছিল— বারো ভুঁইঞাকে বশে আনিতে কিছু খরচ হইয়াছিল। এখন অনেক ফৌজ রাখিতে হইত—কেন না, কখন কে বিদ্রোহী হয়, কখন কি আক্রমণ করে—সে জন্যও ব্যয় হইতেছিল। অভিষেকেও কিছু ব্যয় হইয়াছিল। অতএব যেমন আয়, তেমনই ব্যয় বটে।

কিন্তু যেমন আয়, তেমনই ব্যয় হইলে অকুলান হয় না। অকুলানের আসল কারণ চুরি। রাজা এখন আর বড় কিছু দেখেন না—চিত্ত বিশ্রামেই দিনপাত করেন। কাজেই রাজপুরুষেরা রাজভাণ্ডারের টাকা লইয়া যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই করে,—কে নিষেধ করে? চন্দ্রচূড় ঠাকুর নিষেধ করেন, কিন্তু তাঁহার নিষেধ কেহ মানে না। চন্দ্রচূড় জনকত বড় বড় রাজকর্ম্মচারীর চুরি ধরিলেন,—মনে করিলেন, এবার যে দিন রাজা দরবারে বসিবেন, সেই দিন খাতাপত্র সকল তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া দিবেন। কিন্তু রাজা কিছুতেই ধরা দেন না, "কাজে যা থাকে, মহাশয়, করুন"—বলিয়া কোন মতে পাশ কাটাইয়া চিত্তবিশ্রামে পলায়ন করেন। চন্দ্রচূড় হতাশ হইয়া শেষে নিজেই কয় জনের বর্‌তরফের হুকুম জারি করিলেন। তাহারা তাঁহাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিল—বলিল, "ঠাকুর! যখন স্মৃতির ব্যবস্থা প্রয়োজন হইবে, তখন আপনার কথা শুনিব। রাজার সহি মোহরের পরওয়ানা দেখান, নহিলে ঘরে গিয়া সন্ধ্যা আহ্নিক করুন।"

রাজার সহি মোহর পাওয়া কিছু শক্ত কথা নহে। এখন রাজার কাছে যা হয় একখানা কাগজ ধরিয়া দিলেই তিনি সহি দেন—পড়িবার অবকাশ হয় না—চিত্তবিশ্রামে যাইতে হইবে। অতএব চন্দ্রচূড় এই অপরাধীদিগের বর্‌তরফি পরওয়ানাতে রাজার সহি করাইয়া লইলেন। রাজা না পড়িয়াই সহি দিলেন।

কিন্তু তাহাতে চন্দ্রচূড়ের কার্য্যসিদ্ধি হইল না। প্রদান অপরাধী খাতাঞ্জি দরবারে উপস্থিত ছিল, সে দেখিল যে, রাজা না পড়িয়াই সহি দিলেন। রাজা চলিয়া গেলে, সে বলিল, "ও হুকুম মানি না। ও তোমার হুকুম—রাজার নয়। রাজা কাগজ পড়িয়াও দেখেন নাই। যখন রাজা স্বয়ং বিচার করিয়া আমাদিগকে বর্‌তরফ করিবেন, তখন আমরা যাইব,—এখন নহে।" কেহই গেল না। খুব চুরি করিতে লাগিল। ধনাগার তাহাদের হাতে, সুতরাং চন্দ্রচূড় কিছু করিতে পারিলেন না।

তাই আজ চন্দ্রচূড় রাজাকে পাকড়াও করিয়াছিলেন। রাজা দরবারে বসিলে, অপরাধীদিগের সমক্ষেই চন্দ্রচূড় কাগজপত্র সকল রাজাকে বুঝাইতে লাগিলেন। রাজা একে সমস্ত জগতের উপর রাগিয়াছিলেন, তাহাতে আবার চুরির বাহুল্য দেখিয়া ক্রোধে অত্যন্ত বিকৃতচিত্ত হইয়া উঠিলেন। রাজাজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, অপরাধী সকলেই শূলে যাইবে।

হুকুম শুনিয়া আম দরবার শিহরিয়া উঠিল। চন্দ্রচূড় যেন বজ্রাহত হইলেন। বলিলেন, “সে কি মহারাজ! লঘু পাপে এত গুরু দণ্ড?”

রাজা ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন, “লঘু পাপ কি? চোরের শূলই ব্যবস্থা।”

চন্দ্র। ইহার মধ্যে কয় জন ব্রাহ্মণ আছে। ব্রাহ্মহত্যা করিবেন কি প্রকারে?

রাজা। ব্রাহ্মণদিগের নাক কান কাটিয়া, কপালে তপ্ত লোহার দ্বারা “চোর” লিখিয়া ছাড়িয়া দিবে। আর সকলে শূলে যাইবে।

এই হুকুম জারি করিয়া রাজা চিত্তবিশ্রামে চলিয়া গেলেন। হুকুম মত অপরাধীদিগের দণ্ড হইল। নগরে হাহাকার পড়িয়া গেল। অনেক রাজকর্ম্মচারী কর্ম্ম ছাড়িয়া পলাইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

চুরি বন্ধ হইল, কিন্তু টাকার তবু কুলান হয় না। রাজ্যের অবস্থা রাজাকে বলা নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু রাজাকে পাওয়া ভার, পাইলেও কথা হয় না। চন্দ্রচূড় সন্ধানে সন্ধানে ফিরিয়া আবার একদিন রাজাকে ধরিলেন,—বলিলেন, “মহারাজ! একবার এ কথায় কর্ণপাত না করিলে রাজ্য থাকে না।”

রাজা। থাকে থাকে, যায় যায়। ভাল শুনিতেছি, বলুন কি হয়েছে?

চন্দ্র। সিপাহী সব দলে দলে ছাড়িয়া চলিতেছে।

রাজা। কেন?

চন্দ্র। বেতন পায় না।

রাজা। কেন পায় না?

চন্দ্র। টাকা নাই।

রাজা। এখনও কি চুরি চলিতেছে না কি?

চন্দ্র। না, চুরি বন্ধ হইয়াছে। কিন্তু তাতে কি হইবে? সে টাকা চোরের পেটে গিয়েছে, তা ত আর ফেরে নাই।

রাজা। কেন, আদায় তহসিল হইতেছে না?

চন্দ্র। এক পয়সাও না।

রাজা। কারণ কি?

চন্দ্র। যাহাদের প্রতি আদায়ের ভার, তাহারা কেহ বলে, “আদায় করিয়া শেষ তহবিল গরমিল হইলে শূলে যাব না কি?”

রাজা। তাহাদের বর্‌তরফ করুন।

চন্দ্র। নূতন লোক পাইব কোথায়? আর কেবল নূতন লোকের দ্বারায় কি আদায় তহসিলের কাজ হয়?

রাজা। তবে তাহাদিগকে কয়েদ করুন।

চন্দ্র। সর্ব্বনাশ! তবে আদায় তহসিল করিবে কে?

রাজা। পনের দিনের মধ্যে যে বাকি বকেয়া সব আদায় না করিবে, তাহাকে কয়েদ করিব।

চন্দ্র। সকল তহসিলদারেরও দোষ নাই। দেনেওয়ালারা অনেক দিতেছে না।

রাজা। কেন দেয় না?

চন্দ্র। বলে, "মুসলমানের রাজ্য হইলে দিব। এখন দিয়া কি দোকর দিব?"

রাজা। যে টাকা না দিবে, যাহার বাকি পড়িবে, তাহাকেও কয়েদ করিতে হইবে।

চন্দ্রচূড় হাঁ করিয়া রহিলেন। শেষ বলিলেন, "মহারাজ, কারাগারে এত স্থান কোথা?"

রাজা! বড় বড় চালা তুলিয়া দিবেন।

এই বলিয়া বাকিদার ও তহসিলদার, উভয়ের কয়েদের হুকুমে স্বাক্ষর করিয়া রাজা চিত্তবিশ্রামে প্রস্থান করিলেন। চন্দ্রচূড় মনে মনে শপথ করিলেন, আর কখনও রাজাকে রাজকার্য্যের কোন কথা জানাইবেন না।

এই হুকুমে দেশে ভারি হাহাকার পড়িয়া গেল। কারাগার সকল ভরিয়া গেল–চন্দ্রচূড় চালা তুলিয়া কুলাইতে পারিলেন না। বাকিদার, তহসিলদার, উভয়ের দেশ ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল। যে বাকিদার নয়, সেও সঙ্গে সঙ্গে পলাইতে লাগিল।

তাই বলিতেছিলাম যে, আগে আগুন ত জ্বলিয়াই ছিল, এখন ঘর পুড়িল; যদি শ্রী না আসিত, তবে সীতারামের এতটা অবনতি হইত কি না জানি না; কেন না, সীতারাম ত মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, রাজ্যশাসনে মন দিয়া শ্রীকে ভুলিবেন–সে কথা যথাস্থানে বলিয়াছি। অসময়ে আসিয়া শ্রী দেখা দিল, সে অভিপ্রায় বালির বাঁধের মত আসক্তির বেগে ভাসিয়া গেল। রাজ্যে মন দিলেই যে সব আপদ্ ঘুচিত, তাহা নাই বলিলাম, কিন্তু শ্রী যদি আসিয়াছিল, তবে সে যদি নন্দার মত রাজপুরীমধ্যে মহিষী হইয়া থাকিয়া, নন্দার মত রাজার রাজধর্ম্মের সহায়তা করিত, তাহা হইলেও সীতারামের এতটা অবনতি হইত না বোধ হয়; কেন না, কেবল ঐশ্বর্য্যমদে যে অবনতিটুকু হইতেছিল, শ্রী ও নন্দার সাহায্যে সেটুকুরও কিছু খর্ব্বতা হইত। তা শ্রী, যদি রাজপুরীতে মহিষী না থাকিয়া, চিত্তবিশ্রামে আসিয়া উপপত্নীর মত রহিল, তবে সন্ন্যাসীর মত না থাকিয়া, সেই মত থাকিলেই এতটা প্রমাদ ঘটিত না। আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইলে তাহার মোহিনী শক্তির অনেক লাঘব হইত। কিছু দিনের পর রাজার চৈতন্য হইতে পারিত। তা, যদি শ্রী সন্ন্যাসিনী হইয়াই রহিল, তবে সোজা রকম সন্ন্যাসিনী হইলেও এ বিপদ্ হইত না। কিন্তু এই ইন্দ্রাণীর মত সন্ন্যাসিনী বাঘছালে বসিয়া বাক্যে মধুবৃষ্টি করিতে থাকিবে, আর সীতারাম কুকুরের মত তফাতে বসিয়া মুখপানে চাহিয়া থাকিবে–অথচ সে সীতারামের স্ত্রী! পাঁচ বৎসর ধরিয়া সীতারাম তাহার জন্য প্রায় প্রাণপাত করিয়াছিলেন! এ দুঃখের কি আর তুলনা হয়! ইহাতেই সীতারামের সর্ব্বনাশ ঘটিল। আগে আগুন লাগিয়াছিল মাত্র,–এখন ঘর পুড়িল! সীতারাম আর সহ্য করিতে না পারিয়া, মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, শ্রীর উপর বলপ্রয়োগ করিবেন।

তবে যাকে ভালবাসে, তাহার উপর বলপ্রয়োগ বড় পামরেও পারে না। শ্রীর উপর রাজার যে ভালবাসা, তাহা এখন কাজেও ইন্দ্রিয়বশ্যতায় আসিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ভালবাসা এখনও যায় নাই। তাই বলপ্রয়োগে ইচ্ছুক হইয়াও সীতারাম তাহা করিতেছিলেন না। বলপ্রয়োগ করিব কি না, এ কথার মীমাংসা করিতে সীতারামের প্রাণ বাহির হইতেছিল। যত দিন না সীতারাম একটু এদিক্ ওদিক্ স্থির করিতে পারিলেন, তত দিন সীতারাম এক প্রকার জ্ঞানশূন্যাবস্থায়

ছিলেন। সেই ভয়ানক সময়ের বুদ্ধিবিপর্য্যয়ে রাজপুরুষেরা শূলে গেল, আদায় তহসিলের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীরা কারাগারে গেল, বাকিদারেরা আবদ্ধ হইল, প্রজা সব পলাইল, রাজ্য ছারখারে যাইতে লাগিল।

শেষ সীতারাম স্থির করিলেন, শ্রীর প্রতি বলপ্রয়োগই করিবেন। কথাটা মনোমধ্যে স্থির হইয়া কার্য্যে পরিণত হইতে না হইতেই অকস্মাৎ এক গোলযোগ উপস্থিত হইল। চন্দ্রচূড় ঠাকুর রাজাকে আর একদিন পাকড়া করিয়া বলিলেন, "মহারাজ! তীর্থপর্য্যটনে যাইব ইচ্ছা করিয়াছি। আপনি অনুমতি করিলেই যাই।"

কথাটা রাজার মাথায় যেন বজ্রাঘাতের মত পড়িল। চন্দ্রচূড় গেলে নিশ্চয়ই শ্রীকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, নয় রাজ্য পরিত্যাগ করিতে হইবে। অতএব রাজা চন্দ্রচূড় ঠাকুরকে তীর্থযাত্রা হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এখন চন্দ্রচূড় ঠাকুরের স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, এ পাপ রাজ্যে আর বাস করিবেন না, এই পাপিষ্ঠ রাজার কর্ম্ম আর করিবেন না। অতএব তিনি সহজে সম্মত হইলেন না। অনেক কথাবার্ত্তা হইল। চন্দ্রচূড় অনেক তিরস্কার করিলেন। রাজাও অনেক উত্তর প্রত্যুত্তর করিলেন। শেষে চন্দ্রচূড় থাকিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু কথায় কথায় অনেক রাত্রি হইল। কাজেই রাজা সে দিন চিত্তবিশ্রামে গেলেন না। এদিকে চিত্তবিশ্রামে সেই রাত্রে একটা কাণ্ড উপস্থিত হইল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সেই দিন দৈবগতিকে চিত্তবিশ্রামের দ্বারদেশে একজন ভৈরবী আসিয়া দর্শন দিল। এখন চিত্তবিশ্রাম ক্ষুদ্র প্রমোদগৃহ হইলেও রাজগৃহ; জনকত দ্বারবানও দ্বারদেশে আছে। ভৈরবী দ্বারবানদিগের নিকট পথ ভিক্ষা করিল।

দ্বারবানেরা বলিল, "এ রাজবাড়ী—এখানে একটি রাণী থাকেন। কাহারও যাইবার হুকুম নাই।" বলা বাহুল্য যে, রাজাদিগের উপরাণীরও ভৃত্যদিগের নিকট রাণী নাম পাইয়া থাকে।

ভৈরবী বলিল, "আমার তাহা জানা আছে। রাজাও আমায় জানেন। আমায় যাইবার নিষেধ নাই। তোমরা গিয়া রাজাকে জানাও।"

দ্বারবানেরা বলিল, "রাজা এখন এখানে নাই— রাজধানী গিয়াছেন।"

ভৈরবী। তবে যে রাণী এখানে থাকেন, তাঁহাকেই জানাও। তাঁর হুকুমে হইবে না?

দ্বারবানেরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করিল। চিত্তবিশ্রামের অন্তঃপুরে কখনও কেহ প্রবেশ করিতে পায় নাই—রাজার বিশেষ নিষেধ। রাণীরও নিষেধ। রাজার অবর্ত্তমানে দুই এক জন স্ত্রীলোক (নন্দার প্রেরিত) অন্তঃপুরে যাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু রাণীকে সংবাদ দেওয়াতে তিনি কাহাকেও আসিতে দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তবে আবার রাণীকে খবর দেওয়া যাইবে কি? তবে এ ভৈরবীটার মূর্ত্তি দেখিয়া ইহাকে মনুষ্য বলিয়া বোধ হয় না—তাড়াইয়া দিলেও যদি কোন গোলযোগ ঘটে!

দ্বারবানেরা সাত পাঁচ ভাবিয়া পরিচারিকার দ্বারা অন্তঃপুরে সংবাদ পাঠাইল। ভৈরবী আসিতেছে শুনিয়া শ্রী তখনই আসিবার অনুমতি দিল। জয়ন্তী অন্তঃপুরে গেল।

দেখিয়া শ্রী বলিল, "আসিয়াছ ভাল হইয়াছে। আমার এমন সময় উপস্থিত হইয়াছে যে, তোমার পরামর্শ নহিলে চলিতেছে না।"

জয়ন্তী বলিল, "আমি ত এই সময়ে তোমার সংবাদ লইতে আসিব বলিয়া গিয়াছিলাম। এখন সংবাদ কি, বল। নগরে শুনিলাম, রাজ্যের নাকি বড় গোলযোগ। আর তুমিই নাকি তার কারণ? টোলে টোলে শুনিয়া আসিলাম, ছাত্রেরা সব রঘুর ঊনবিংশের শ্লোক আওড়াইতেছে। ব্যাপারটা কি?"

শ্রী বলিল, “তাই তোমায় খুঁজিতেছিলাম।” শ্রী তখন আদ্যোপান্ত সকল বলিল। জয়ন্তী বলিল, “তবে তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম করিতেছে না কেন?”

শ্রী। সেটা ত বুঝিতে পারিতেছি না।

জয়ন্তী। রাজধানীতে যাও। রাজপুরীমধ্যে মহিষী হইয়া বাস কর। সেখানে রাজার প্রধান মন্ত্রী হইয়া তাঁহাকে স্বধর্ম্মে রাখ। এ তোমারই কাজ।

শ্রী। তা ত জানি না। মহিষীর ধর্ম্ম ত শিখি নাই। সন্ন্যাসিনীর ধর্ম্ম শিখাইয়াছ, তাই শিখিয়াছি। যাহা জানি না, যাহা পারি না, সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সব গোল করিব। সন্ন্যাসিনী মহিষী হইলে কি মঙ্গল হইবে?

জয়ন্তী ভাবিল। বলিল, “তা আমি বলিতে পারি না। তোমা হইতে যে ধর্ম্ম পালন হইবে না, বোধ হইতেছে–তাহা হইবার সম্ভাবনা থাকিলে কি এতদূর হয়?”

শ্রী। বুঝি সে একদিন ছিল। যে দিন আঁচল দোলাইয়া মুসলমান সেনা ধ্বংস করিয়া ছিলাম–সে দিন থাকিলে বুঝি হইত। কিন্তু অদৃষ্ট সে পথে গেল না, সে শিক্ষা হইল না। অদৃষ্ট গেল ঠিক উল্‌টা পথে–বসবাসে–সন্ন্যাসে গেল। কে জানে আবার অদৃষ্ট ফিরিবে?

জ। এখন উপায়?

শ্রী। পলায়ন ভিন্ন ত আর উপায় দেখি না। কেবল রাজার জন্য বা রাজ্যের জন্য বলি না। আমার আপনার জন্যও বলিতেছি। রাজাকে রাত্রি দিন দেখিতে দেখিতে অনেক সময়ে মনে হয়, আমি গৃহিণী, উঁহার ধর্ম্মপত্নী।

জ। তা ত বটেই।

শ্রী। তাতে পুরাণ কথা মনে আসে; আবার কি ভালবাসার ফাঁদে পড়িব? তাই, আগেই বলিয়াছিলাম, রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করাই ভাল। শত্রু, রাজা লইয়া বার জন।

জ। আর এগার জন আপনার শরীরে? ভারি ত সন্ন্যাস সাধিয়াছ, দেখিতেছি! যাহা জগদীশ্বরে সমর্পণ করিয়াছিলে, তাহা আবার কাড়িয়া লইয়াছ, দেখিতেছি! আবার আপনার ভাবনাও ভাবিতে শিখিয়াছ, দেখিতেছি! একে কি বলে সন্ন্যাস?

শ্রী। তাই বলিতেছিলাম, পলায়নই বিধি কি না?

জ। বিধি বটে।

শ্রী। রাজা বলেন, আমি পলাইলে তিনি আত্মঘাতী হইবেন।

জ। পুরুষ মানুষের মেয়ে ভুলান কথা! পুষ্পশরাহতের প্রলাপ!

শ্রী। সে ভয় নাই?

জ। থাকিলে তোমার কি? রাজা বাঁচিল মরিল, তাতে তোমার কি?তোমার স্বামী বলিয়া কি তোমার এত ব্যথা? এই কি সন্ন্যাস?

শ্রী। তা হোক না হোক–রাজা মরিলেই কোন্ সর্ব্বভূতের হিতসাধন হইল?

জ। রাজা মরিবে না, ভয় নাই। ছেলে খেলানা হারাইলে কাঁদে, মরে না। তুমি ঈশ্বরে কর্ম্মসংন্যাস করিয়া যাহাতে সংযতচিত্ত হইতে পারে, তাই কর।

শ্রী। তা হইলে এখান হইতে প্রস্থান করিতে হয়।

জ। এখনই।

শ্রী। কি প্রকারে যাই? দ্বারবানেরা ছাড়িবে কেন?

জ। তোমার সে গৈরিক, রুদ্রাক্ষ, ত্রিশূল সবই আছে দেখিতেছি। ভৈরবীবেশে পলাও, দ্বারবানেরা কিছু বলিবে না।

শ্রী। মনে করিবে, তুমি যাইতেছ? তার পর তুমি যাইবে কি প্রকারে?

জয়ন্তী হাসিয়া বলিল, "এ কি আমার সৌভাগ্য! এত কালের পর আমার জন্য ভাবিবার একটা লোক হইয়াছে! আমি নাই যাইতে পারিলাম, তাতে ক্ষতি কি দিদি?"

শ্রী। রাজার হাতে পড়িবে–কি জানি, রাজা যদি তোমার উপর ক্রুদ্ধ হন!

জ। হইলে আমার কি করিবেন? রাজার এমন কোন ক্ষমতা আছে কি যে, সন্ন্যাসিনীর অনিষ্ট করিতে পারে?

জয়ন্তীর উপর শ্রীর অনন্ত বিশ্বাস। সুতরাং শ্রী আর বাদানুবাদ না করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার সঙ্গে কোথায় সাক্ষাৎ হইবে?"

জ। তুমি বরাবর–গ্রামে যাও। সেখানে রাজার পুরোহিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও। তোমার ত্রিশূল আমাকে দাও, আমার ত্রিশূল তুমি নাও। সে গ্রামের রাজার পুরোহিত আমার মন্ত্রশিষ্য। তিনি আমার চিহ্নিত ত্রিশূল দেখিলে তুমি যা বলিবে, তাই করিবেন। তাঁকে বলিও, তোমাকে অতি গোপনীয় স্থানে লুকাইয়া রাখেন। কেন না, তোমার জন্য বিস্তর খোঁজ তল্লাশ হইবে। তিনি তোমাকে রাজপুরীমধ্যে লুকাইয়া রাখিবেন। সেইখানে তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইবে।

তখন শ্রী জয়ন্তীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া আবার বনবাসে নিষ্ক্রান্ত হইল। দ্বারবানেরা কিছু বলিল না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

রামচাঁদ। ভয়ানক ব্যাপার! লোক অস্থির হ'য়ে উঠলো।

শ্যামচাঁদ। তাই ত দাদা। আর তিলার্দ্ধ এ রাজ্যে থাকা নয়।

রামচাঁদ। তা তুমি ত আজ কত দিন ধ'রে যাই যাই ক'চ্ছো–যাও নি যে?

শ্যামচাঁদ। যাওয়ারই মধ্যে, মেয়ে ছেলে সব নলডাঙ্গা পাঠিয়ে দিয়েছি। তবে আমার কিছু লহনা পড়ে রয়েছে, সেগুলা যতদূর হয়, আদায় ওসুল ক'রে নিয়ে যাই। আর আদায় ওসুল বা করবো কার কাছে–দেনেওয়ালারাও সব ফেরার হয়েছে।

রামচাঁদ। আচ্ছা, এ আবার নূতন ব্যাপার কি? কেন এত হাঙ্গামা, তা কিছু জান? শুনেছি না কি, হাবুজখানায় আর কয়েদী ধরে না, নূতন চালাগুলাতেও ধরে না, এখন না কি গোহালের গোরু বাহির করিয়া কয়েদী রাখছে?

শ্যামচাঁদ। ব্যাপারটা কি জান না? সেই ডাকিনীটা পালিয়েছে।

রাম। তা শুনেছি। আচ্ছা, সে ডাকিনীটা ত এত যাগ যজ্ঞে কিছুতেই গেল না–এখন আপনি পালাল যে?

শ্যাম। আপনি কি আর গিয়েছে? (চুপি চুপি) বলতে গায়ে কাঁটা দেয়। সে নাকি দেবতার তাড়নায় গিয়েছে।

রাম। সে কি?

শ্যাম। এই নগরে এক দেবী অধিষ্ঠান করেন শুন নি? তিনি কখন কখন দেখা দেন–অনেকেই তাঁকে দেখেছে। কেন, যে দিন ছোট রাণীর পরীক্ষা হয়, সে

দিন তুমি ছিলে না?

রমা। হাঁ! হাঁ! সেই তিনিই! আচ্ছা, বল দেখি তিনি কে?

শ্যাম। তা তিনি কি কারও কাছে আপনার পরিচয় দিতে গিয়েছেন! তবে পাঁচ জন লোকে পাঁচ রকম বলচে।

রাম। কি বলে?

শ্যাম। কেউ বলে, তিনি এই পুরীর রাজলক্ষ্মী; কেউ বলে, তিনি স্বয়ং লক্ষ্মীনারায়ণজিউর মন্দির হইতে কখরও কখনও রূপ ধারণ ক'রে বা'র হন, লোকে এমন দেখেছে। কেউ বলে, তিনি স্বয়ং দশভুজা; দশভুজার মন্দিরে গিয়া অন্তর্দ্ধান হ'তে তাঁকে না কি দেখেছে?

রাম। তাই হবে। নইলে তিনি ভৈরবীবেশ ধারণ করবেন কেন? সে সভায় ত তিনি ভৈরবীবেশে অধিষ্ঠান করেছিলেন?

শ্যাম। তা যিনিই হ'ন, আমাদের অনেক ভাগ্য যে, আমরা তাঁকে সে দিন দর্শন করেছিলাম। কিন্তু রাজার এমনই মতিচ্ছন্ন ধরেছে যে—

রাম। হাঁ—তার পর ডাকিনীটা গেল কি ক'রে শুনি।

শ্যাম। সেই দেবী, ডাকিনী হ'তে রাজ্যের অমঙ্গল হচ্ছে দেখে, এক দিন ভৈরবীবেশে ত্রিশূল ধারণ ক'রে তাকে বধ করতে গেলেন।

রাম। ইঃ! তার পর?

শ্যাম। তার পর আর কি? মার রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি দেখে, সেটা তালগাছপ্রমাণ বিকটাকার মূর্ত্তি ধারণ ক'রে ঘোর গর্জ্জন করতে করতে কোথায় যে আকাশপথে উড়ে গেল, কেউ আর দেখতে পেলে না।

রাম। কে বললে?

শ্যাম। বললে আর কে? যারা দেখেছে, তারাই বলেছে। রাজা এমনই সেই ডাকিনীর মায়ার বদ্ধ যে, সেটা গেছে ব'লে চিত্তবিশ্রামের যত দ্বারবান দাস দাসী, সবাইকে ধরে এনে কয়েদ করেছেন। তারাই এই সব কথা প্রকাশ করেছে। তারা বলে, "মহারাজ! আমাদের অপরাধ কি? দেবতার কাছে আমরা কি করব?"

রমা। গল্প কথা নয় ত?

শ্যাম। এ কি আর গল্প কথা!

রাম। কি জানি। হয় ত ডাকিনীটা মড়া ফড়া খাবার জন্য রাত্রিতে কোথা বেরিয়ে গিয়েছিল, আর আসে নি। এখন রাজার পীড়াপীড়িতে তারা আপনার বাঁচন জন্য একটা রচে মচে বলচে।

শ্যাম। এ কি আর রচা কথা? তারা দেখেছে যে, সেটার এমন এমন মূলোর মত দাঁত, শোণের মত চুল, বারকোশের মত চোখ, একটা আস্ত কুমীরের মত জিব, দুটো জালার মত দুটো স্তন, মেঘগর্জ্জনের মত নিশ্বাস, আর ডাকেতে একেবারে মেদিনী বিদীর্ণ!

রাম। সর্ব্বনাশ! এ ত বড় অদ্ভুত ব্যাপার। রাজার মতিচ্ছন্ন ধরেছে বলছিলে কি?

শ্যাম। তাই বল্‌চি শোন না। এই ত গেল নিরপরাধী বেচারাদের নাহক কয়েদ। তার পর, সেই ডাকিনীটাকে খুঁজে ধরে আনবার জন্য রাজা ত দিক্‌বিদিকে কত লোকই পাঠাচ্চেন। এখন সে আপনার স্বস্থানে চলে গেছে, মনুষ্যের সাধ্য কি, তাকে সন্ধান করে ধ'রে আনে। কেউ তা পারচে না—সবাই এসে জোড় হাত করে এত্তেলা করছে যে, সন্ধান করতে পারলে না।

রাম। তাতে রাজা কি বলেন?

শ্যাম। এখন যাই কেউ ফিরে এসে বলচে যে, সন্ধান পেলে না, অমনই রাজা তাকে কয়েদে পাঠাচ্চেন। এই করে ত হাবুজখানা পরিপূর্ণ। এ দিকে রাজপুরুষদের এমনই ভয় লেগেছে যে, বাড়ী, ঘর, দ্বার, স্ত্রী, পুত্র, ছেড়ে পালাচ্চে। দেখাদেখি নগরের প্রজা দোকানদারও সব পালাচ্চে।

রাম। তা, দেবী কি করেন? তিনি কটাক্ষ করিলেই ত এই সকল নিরপরাধী লোক রক্ষা পায়।

শ্যাম। তিনি সাক্ষাৎ ভগবতী! তিনি এই সকল ব্যাপার দেখিয়া ভৈরবীবেশে রাজাকে দর্শন দিয়া বলিলেন, "রাজা! নিরপরাধীর পীড়ন করিও না। নিরপরাধীর পীড়ন করিলে, রাজার রাজ্য থাকে না। এদের কোন দোষ নাই। আমিই সেটাকে তাড়াইয়াছি–কেন না, সেটা হ'তে তোমার রাজ্যের অমঙ্গল হতেছিল। দোষ হয়ে থাকে, আমারই হয়েছে। দণ্ড করিতে হয়, ওদের ছেড়ে দিয়ে আমারই দণ্ড কর।

রমা। তার পর?

শ্যাম। তাই বলছিলাম, রাজার বড় মতিচ্ছন্ন ধরেছে। সেটা পলানো অবধি রাজার মেজাজ এমন গরম যে, কাক পক্ষী কাছে যেতে পাচ্চে না। তর্কালঙ্কার ঠাকুর কাছে গিয়েছিলেন, বড় রাণী কাছে গিয়েছিলেন, গাল খেয়ে পালিয়ে এলেন।

রাম। সে কি! শুরুকে গালিগালাজ? নির্ব্বংশ হবেন যে!

শ্যাম। তার কি আর কথা আছে? তার পর শোন না। গরম মেজাজের প্রথম মোহড়াতেই সেই দেবতা গিয়া দর্শন দিয়া ঐ কথা বললেন। বলতেই রাজা চক্ষু আরক্ত করিয়া তাঁকে স্বহস্তে প্রহার করিতেই উদ্যত। তা না ক'রে, যা করেছে, সে ত আরও ভয়ানক!

রাম। কি করেছে?

শ্যাম। ঠাকুরাণীকে কয়েদ করেছে। আর হুকুম দিয়েছে যে, তিন দিন মধ্যে ডাকিনীকে যদি না পাওয়া যায়, তবে সমস্ত রাজ্যের লোকের সম্মুখে (সেই দেবীকে) উলঙ্গ করে চাঁড়ালের দ্বারা বেত মারিবে।

রাম। হো! হো! হোহো! দেবতার আবার কি করবে! রাজা কি পাগল হয়েছে! তা, মা কি কয়েদ গিয়েছেন না কি? তাঁকে কয়েদ করে কার বাপের সাধ্য?

শ্যাম। দেবচরিত্র কার সাধ্য বুঝে! রাজার না কি রাজ্যভোগের নির্দ্দিষ্ট কাল ফুরিয়েছে, তাই মা ছল ধরিয়া, এখন স্বধামে গমনের চেষ্টায় আছেন। রাজা কয়েদের হুকুম দিলেন, মা স্বচ্ছন্দে গজেন্দ্রগমনে কারাগারমধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলেন। শুনিতে পাই, রাত্রে কারাগারে মহাকোলাহল উপস্থিত হয়। যত দেবতারা আসিয়া স্তব পাঠ করেন–ঋষিরা আসিয়া বেদ পাঠ, মন্ত্র পাঠ করেন। পাহারাওয়ালারা বাহির হইতে শুনিতে পায়, কিন্তু দ্বার খুলিলেই সব অন্তর্দ্ধান হয়। (বলা বাহুল্য যে, জয়ন্তী নিজেই রাত্রিকালে ঈশ্বরস্তোত্র পাঠ করেন। পাহারাওয়ালারা তাহাই শুনিতে পায়।)

রাম। তার পর?

শ্যাম। তার পর এখন আজ সে তিন দিন পুরিল। রাজা ঢেঁট্‌রা দিয়েছেন যে, কাল এক মাগী চোরকে বেইজ্জৎ করিয়া বেত মারা যাইবে, যাহার ইচ্ছা হয়, দেখিতে আসিতে পারে। শুন নাই?

রাম। কি দুর্ব্বুদ্ধি! তর্কালঙ্কার ঠাকুরই বা কিছু বলেন না কেন? বড় রাণী বা কিছু বলেন না কেন? দুটো গালাগালির ভয়ে কি তাঁরা আর কাছে আসিতে পারেন না?

শ্যাম। তাঁরা না কি অনেক বলেছেন। রাজা বলেন, ভাল, দেবতাই যদি হয়, তবে আপনার রক্ষা আপনিই করিবে, তোমাদের কথা কবার প্রয়োজন কি? আর যদি মানুষ হয়, তবে আমি রাজা, চোরের দণ্ড আমি দিব, তোমাদের কথা কবার প্রয়োজন কি?

রাম। তা এক রকম বলেছে মন্দ নয়–ঠিক কথাই ত। তা ব্যাপারটা কি হয়, কাল দেখতে যেতে হবে। তুমি যাবে?

শ্যাম। যাব বৈ কি! সবাই যাবে। এমন কাণ্ড কে না দেখ্‌তে যাবে?

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

আজ জয়ন্তীর বেত্রাঘাত হইবে। রাজ্যে ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে যে, তাহাকে বিবস্ত্রা করিয়া বেত্রাঘাত করা হইবে। প্রভাত হইতে লোক আসিতে আরম্ভ করিল। বেলা অল্প হইতেই দুর্গ পরিপূর্ণ হইল, আর লোক ধরে না। ক্রমে ঠেসাঠেসি ঘেঁসাঘেঁসি পেষাপেষি মিশামিশি হইতে লাগিল। এই দুর্গমধ্যে আর এক দিন এমনই লোকারণ্য হইয়াছিল–সে দিন রমার বিচার। আজ জয়ন্তীর দণ্ড। বিচার অপেক্ষা দণ্ড দেখিতে লোক বেশী আসিল। নন্দা বাতায়ন হইতে দেখিলেন, কালো চুল মাথার তরঙ্গ ভিন্ন আর কিছু দেখা যায় না; কদাচিৎ কোন স্ত্রীলোকের মাথায় আঁচল বা কোন পুরুষের মাথায় চাদর জড়ান, সেই কৃষ্ণসাগরে ফেনরাশির ন্যায় ভাসিতেছে। সেই রমার পরীক্ষা নন্দার মনে পড়িল, কিন্তু মনে পড়িল যে, সে দিন দেখিয়াছিলেন যে, সেই জনার্ণব বড় চঞ্চল, সংক্ষুব্ধ, যেন বাত্যাতাড়িত; রাজপুরুষেরা কষ্টে শান্তি রক্ষা করিয়াছিল;–আজ সকলেই নিস্তব্ধ। সকলেরই মনে রাজ্যের অমঙ্গল আশঙ্কা বড় জাগরূক। সকলেই মনে মনে ভয় পাইতেছিল। আজ এই লোকারণ্য সিংহব্যাঘ্রবিমর্দ্দিত মহারণ্য অপেক্ষাও ভয়ানক দেখাইতেছিল।

সেই বৃহৎ দুর্গপ্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে এক উচ্চ মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তদুপরি এক কৃষ্ণকায় বলিষ্ঠগঠন বিকটদর্শন চণ্ডাল, মূর্ত্তিমান্ অন্ধকারের ন্যায় দীর্ঘ বেত্র হস্তে লইয়া দণ্ডায়মান আছে। জয়ন্তীকে তদুপরি আরোহণ করাইয়া সর্ব্বসমক্ষে বিবস্ত্রা করিয়া সেই চণ্ডাল বেত্রাঘাত করিবে, ইহাই রাজাজ্ঞা।

জয়ন্তীকে এখনও সেখানে আনা হয় নাই। রাজা এখনও আসেন নাই–আসিলে তবে তাহাকে আনা হইবে। মঞ্চের সম্মুখে রাজার জন্য সিংহাসন রক্ষিত হইয়াছে। তাহা বেষ্টন করিয়া চোপদার ও সিপাহীগণ দাঁড়াইয়া আছে। অমাত্যবর্গ আজ সকলেই অনুপস্থিত। এমন কুকাণ্ড দেখিতে আসিতে কাহারও প্রবৃত্তি হয় নাই। রাজাও কাহাকে ডাকেন নাই।

কতক্ষণে রাজা আসিবেন, কতক্ষণে সেই দণ্ডনীয় দেবী বা মানবী আসিবে, কতক্ষণে কি হইবে, সেই জন্য প্রত্যাশাপন্ন হইয়া লোকারণ্য ঊর্দ্ধ্বমুখ হইয়াছিল। এমন সময়ে হঠাৎ নকিব ফুকরাইল; স্তাবকেরা স্তুতিবাদ করিল। দর্শকেরা জানিল, রাজা আসিতেছেন।

রাজার আজ বেশভূষার কিছুমাত্র পরিপাট্য নাই–বৈশাখের দিনান্তকালের মেঘের মত রাজা আজ ভয়ঙ্করমূর্ত্তি! আয়ত চক্ষু রক্তবর্ণ–বিশাল বক্ষ মধ্যে মধ্যে স্ফীত ও উচ্ছ্বসিত হইতেছে। বর্ষণোন্মুখ জলধরের উন্নমনের ন্যায় রাজা আসিয়া সিংহাসনের উপর বসিলেন। কেহ বলিল না, "মহারাজাধিরাজকি জয়!"

তখন সেই লোকারণ্য ঊর্দ্ধ্বমুখ হইয়া ইতস্ততঃ দেখিতে লাগিল–দেখিলে, সেই সময়ে প্রহরিগণ জয়ন্তীকে লইয়া মঞ্চোপরি আরোহণ করিতেছে। প্রহরীরা তাহাকে মঞ্চোপরি স্থাপিত করিয়া চলিয়া গেল। কোন প্রাসাদশিখরোপরি উদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় জয়ন্তীর অতুলনীয় রূপরাশি সেই মঞ্চোপরি উদিত হইল। তখন সেই সহস্র সহস্র দর্শক ঊর্দ্ধ্বমুখে, উৎক্ষিপ্তলোচনে গৈরিকবসনাবৃতা মঞ্চস্থা অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সেই উন্নত, সম্পূর্ণায়ত, ললিত মধুর অথচ উজ্জ্বল জ্যোতির্বিশিষ্ট দেহ; তাহার দেবোপম স্থৈর্য্য –দেবদুর্ল্লভ শান্তি; সকলে বিমুগ্ধ হইয়া দেখিতে লাগিল। দেখিল, জয়ন্তীর নবরবিকরপ্রোদ্ভিন্ন পদ্মবৎ অপূর্ব্ব প্রফুল্ল মুখ; এখনও অধরভরা মৃদু মৃদু মধুর স্নিগ্ধ বিনম্র হাস্য–সর্ব্ববিপৎসংহারিণী শক্তির পরিচয়স্বরূপ সেই স্নিগ্ধ মধুর মন্দহাস্য! দেখিয়া, অনেকে দেবতা জ্ঞানে যুক্তকরে প্রণাম করিল। যখন কতকগুলি লোক দেখিল, আর কতকগুলি লোক জয়ন্তীকে প্রণাম করিতেছে–তখন তাহাদের মনে সেই ভক্তিভাব

প্রবেশ করিল। তখন তাহারা “জয়! মায়িকি জয়!” “জয় লছ্‌মী মায়িকি জয়!” ইত্যাদি ঘোর রবে জয়ধ্বনি করিল। কিন্তু জয়ধ্বনি ক্রমে ক্রমে প্রাঙ্গণের এক ভাগ হইতে অপর ভাগে, এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে গিরিশ্রেণীস্থিত বজ্রনাদের মত প্রক্ষিপ্ত ও প্রবাহিত হইতে লাগিল। শেষ সেই সমবেত লোকসমারোহ এককণ্ঠ হইয়া তুমুল জয়শব্দ করিল। পুরী কম্পিতা হইল। চণ্ডালের হস্ত হইতে বেত্র খসিয়া পড়িল। জয়ন্তী মনে মনে ডাকিতে লাগিল, “জয় জগদীশ্বর! তোমারই জয়! তুমি আপনি এই লোকারণ্য, আপনিই এক লোকের কণ্ঠে থাকিয়া, আপনার জয়বাদ আপনিই দিতেছ! জয় জগন্নাথ! তোমারই জয়! আমি কে?”

ক্রুদ্ধ রাজা তখন অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া মেঘগম্ভীরস্বরে চণ্ডালকে আজ্ঞা করিলেন, “কাপড় কাড়িয়া নিয়া বেত লাগা!”

এই সময়ে চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার সহসা রাজসমীপে আসিয়া রাজার দুইটি হাত ধরিলেন। বলিলেন, “মহারাজ! রক্ষা কর! আমি আর কখনও ভিক্ষা চাহিব না, এইবার আমায় এই ভিক্ষা দাও–ইঁহাকে ছাড়িয়া দাও।”

রাজা। (ব্যঙ্গের সহিত) কেন–দেবতার এমন সাধ্য নাই যে, আপনি ছাড়াইয়া যায়! বেটী জুয়াচোরের উচিত শাসন হইতেছে।

চন্দ্র। দেবতা না হইলে–স্ত্রীলোক বটে।

রাজা। স্ত্রীলোকেরও রাজা দণ্ড করিতে পারেন।

চন্দ্র। এই জয়ধ্বনি শুনিতেছেন? এই জয়ধ্বনিতে আপনার রাজার নাম ডুবিয়া যাইতেছে।

রাজা। ঠাকুর! আপনার কাজে যাও। পুঁথি পাঁজি নাই কি?

চন্দ্রচূড় চলিয়া গেলেন। তখন চণ্ডাল পুনরপি রাজাজ্ঞা পাইয়া আবার বেত উঠাইয়া লইল–বেত উঁচু করিল–জয়ন্তীর মুখ প্রতি চাহিয়া দেখিল; বেত নামাইয়া–রাজার পানে চাহিল–আবার জয়ন্তীর পানে চাহিল–শেষ বেত আছড়িয়া ফেলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

“কি!” বলিয়া রাজা বজ্রের ন্যায় শব্দ করিলেন।

চণ্ডাল বলিল, “মহারাজ! আমা হইতে হইবে না।”

রাজা বলিলেন, “তোমাকে শূলে যাইতে হইবে।”

চণ্ডাল। জোড়হাত করিয়া বলিল, “মহারাজের হুকুমে তা পারিব। এ পারিব না।”

তখন রাজা অনুচরবর্গকে আদেশ করিলেন, “চণ্ডালকে ধরিয়া লইয়া গিয়া কয়েদ কর।”

রক্ষিবর্গ চণ্ডালকে ধরিবার জন্য মঞ্চের উপর আরোহণ করিতে উদ্যত দেখিয়া, জয়ন্তী সীতারামকে বলিলেন, “এ ব্যক্তিকে পীড়ন করিবেন না, আপনার যে আজ্ঞা, আমি নিজেই পালন করিতেছি–চণ্ডাল বা জল্লাদের প্রয়োজন নাই।” তথাপি রক্ষিবর্গ চণ্ডালকে ধরিতে আসিতেছে দেখিয়া, জয়ন্তী তাহাকে বলিল, “বাছা! তুমি আমার জন্য কেন দুঃখ পাইবে? আমি সন্ন্যাসিনী, আমার কিছুতেই সুখ দুঃখ নাই; বেতে আমার কি হইবে? আর বিবস্ত্র–সন্ন্যাসীর পক্ষে সবস্ত্র বিবস্ত্র সমান। কেন দুঃখ পাও–বেত তোল।”

চণ্ডাল বেত উঠাইল না। জয়ন্তী তখন চণ্ডালকে বলিল, “বাছা! স্ত্রীলোকের কথা বলিয়া বিশ্বাস করিলে না–এই তার প্রমাণ দেখ।” এই বলিয়া জয়ন্তী আপনি বেত উঠাইয়া লইয়া, দক্ষিণ হস্তে দৃঢ়মুষ্টিতে তাহা ধরিল। পরে সেই জনসমারোহ সমক্ষে, আপনার প্রফুল্লপদ্মসন্নিভ রক্তপ্রভ ক্ষুদ্র করপল্লব পাতিয়া, সবলে তাহাতে বেত্রাঘাত করিল। বেত মাংস কাটিয়া লইয়া উঠিল–হাতে রক্তের স্রোত বহিল। জয়ন্তীর গৈরিক বস্ত্র এবং মঞ্চতল তাহাতে প্লাবিত হইল। দেখিয়া লোকে হাহাকার করিতে লাগিল।

জয়ন্তী মৃদু হাসিয়া চণ্ডালকে বলিল, "দেখিলে বাছা! সন্ন্যাসিনীকে কি লাগে? তোমার ভয় কি?"

চণ্ডাল একবার রুধিরাক্ত ক্ষত পানে চাহিল—একবার জয়ন্তীর সহাস্য প্রফুল্লমুখ পানে চাহিয়া দেখিল—দেখিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া, অতি ত্রস্তভাবে মঞ্চসোপান অবরোহণ করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। লোকারণ্যমধ্যে সে কোথায় লুকাইল, কেহ দেখিতে পাইল না।

রাজা তখন অনুচরবর্গকে আজ্ঞা করিলেন, "দোস্‌রা লোক লইয়া আইস—মুসলমান।"

অনুচরবর্গ, কালান্তক যমের সদৃশ এক জন কসাইকে লইয়া আসিল। সে মহম্মদপুরে গোরু কাটিতে পারিত না—কিন্তু নগরপ্রান্তে বক্‌রি মেড়া কাটিয়া বেচিত। সে ব্যক্তি অতিশয় বলবান ও কদাকার। সে রাজাজ্ঞা পাইয়া মঞ্চের উপর উঠিয়া, বেত হাতে লইয়া জয়ন্তীর সম্মুখে দাঁড়াইল। বেত উঁচু করিয়া কসাই জয়ন্তীকে বলিল, "কাপ্‌ড়া উতার—তেরি গোশ্‌ৎ টুক্‌রা টুক্‌রা করকে হাম দোকানমে বেচেঙ্গে।"

জয়ন্তী তখন অপরিম্লান মুখে, জনসমারোহকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "রাজাজ্ঞায় এই মঞ্চের উপর বিবস্ত্র হইব। তোমাদের মধ্যে যে সতীপুত্র হইবে, সেই আপনার মাতাকে স্মরণ করিয়া ক্ষণকালের জন্য এখন চক্ষু আবৃত করুক। যাহার কন্যা আছে, সেই আপনার কন্যাকে মনে করিয়া, আমাকে সেই কন্যা ভাবিয়া চক্ষু আবৃত করুক। যে হিন্দু, যাহার দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি আছে, সেই চক্ষু আবৃত করুক। যাহার মাতা অসতী, সে বেশ্যার গর্ভে জন্মিয়াছে, সে যাহা ইচ্ছা করুক, তাহার কাছে আমার লজ্জা নাই, আমি তাহাদের মনুষ্যের মধ্যে গণ্য করি না।"

লোকে এই কথা শুনিয়া চক্ষু বুজিল, কি না, বুজিল, জয়ন্তী তাহা আর চাহিয়া দেখিল না। মন তখন খুব উঁচু সুরে বাঁধা আছে—জয়ন্তী তখন জগদীশ্বর ভিন্ন আর কাহাকে দেখিতে পাইতেছে না। জয়ন্তী কেবল রাজার দিকে ফিরিয়া বলিল, "তোমার আজ্ঞায় আমি বিবস্ত্র হইব। কিন্তু তুমি চাহিয়া দেখিও না। তুমি রাজ্যেশ্বর; তোমায় পশুবৃত দেখিলে প্রজারা কি না করিবে? মহারাজ, আমি বনবাসিনী, বনে থাকিতে গেলে অনেক সময়ে বিবস্ত্র হইতে হয়। একদা আমি বাঘের মুখে পড়িয়াছিলাম—বাঘের মুখ হইতে আপনার শরীর রক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম, কিন্তু বস্ত্র রক্ষা করিতে পারি নাই। তোমাকেও আমি, তোমার আচরণ দেখিয়া সেইরূপ বন্য পশু মনে করিতেছি, অতএব তোমার কাছে আমার লজ্জা হইতেছে না। কিন্তু তোমার লজ্জা হওয়া উচিত—কেন না, তুমি রাজা এবং গৃহী, তোমার মহিষী আছেন, চক্ষু বুজ।"

বৃথা বলা! তখন মহাক্রোধান্ধকারে রাজা একেবারে অন্ধ হইয়াছেন। জয়ন্তীর কথার কোন উত্তর না দিয়া কসাইকে বলিলেন, "জবরদস্তী কাপ্‌ড়া উতার লেও।"

তখন জয়ন্তী আর বৃথা কথা না কহিয়া, জানু পাতিয়া মঞ্চের উপর বসিল। জয়ন্তীর আপনার কাছে আপনি ঠকিয়াছে,—এখন বুঝি জয়ন্তীর চোখে জল আসে। জয়ন্তী মনে করিয়াছিল, "যখন পৃথিবীর সকল সুখদুঃখ জলাঞ্জলি দিয়াছি, যখন আর আমার সুখও নাই, দুঃখ নাই, তখন আমার আবার লজ্জা কি? ইন্দিয়ের সঙ্গে আমার মনের যখন কোন সম্বন্ধ নাই, তখন আমার আর বিবস্ত্র আর সবস্ত্র কি? পাপই লজ্জা, আবার কিসে লজ্জা করিব? জগদীশ্বরের নিকট ভিন্ন, সুখদুঃখের অধীন মনুষ্যের কাছে লজ্জা কি? আমি কেন এই সভামধ্যে বিবস্ত্র হইতে পারিব না?" তাই জয়ন্তী এতক্ষণ আপনাকে বিপন্নই মনে করে নাই—বেত্রাঘাতটা ত গণ্যের মধ্যে নহে। কিন্তু এখন যখন বিবস্ত্র হইবার সময় উপস্থিত হইল—তখন কোথা হইতে এই পাপ লজ্জা আসিয়া সেই ইন্দ্রিয়বিজয়িনী সুখদুঃখবর্জ্জিতা জয়ন্তীকেও অভিভূত করিল। তাই নারীজন্মকে ধিক্কার দিয়া জয়ন্তী মঞ্চতলে জানু পাতিয়া বসিল। তখন যুক্তকরে, পবিত্রচিত্তে জয়ন্তী আত্মাকে সমাহিত করিয়া মনে মনে ডাকিতে লাগিল, "দীনবন্ধু! আজ রক্ষা কর! মনে করিয়াছিলাম, বুঝি এ পৃথিবীর সকল সুখদুঃখে জলাঞ্জলি দিয়াছি, কিন্তু হে দর্পকারী! আমার দর্প চূর্ণ হইয়াছে, আমায় আজ রক্ষা কর! নারীদেহ কেন দিয়াছিলে, প্রভু! সব সুখদুঃখ বিসর্জ্জন করা যায়, কিন্তু নারীদেহ থাকিতে লজ্জা

বিসর্জন করা যায় না। তাই আজ কাতরে ডাকিতেছি, জগন্নাথ! আজ রক্ষা কর।"

যতক্ষণ জয়ন্তী জগদীশ্বরকে ডাকিতেছিল, ততক্ষণ কসাই তাহার অঞ্চল ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছিল। দেখিয়া সমস্ত জনমণ্ডলী এককণ্ঠে হাহাকার শব্দ করিতে লাগিল–বলিতে লাগিল, "মহারাজ! এই পাপে তোমার সর্ব্বনাশ হইবে–তোমার রাজ্য গেল।" রাজা কর্ণপাত করিলেন না। নিরুপায় জয়ন্তী আপনার অঞ্চল ধরিয়া টানাটানি করিতেছিল, ছাড়িতেছিল না। তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছিল। শ্রী থাকিলে বড় বিস্মিতা হইত–জয়ন্তীর চক্ষুতে আর কখনও কেহ জল দেখে নাই। জয়ন্তী রুধিরাক্ত ক্ষত হস্তে আপনার অঞ্চল ধরিয়া ডাকিতেছিল, "জগন্নাথ! রক্ষা কর।"

বুঝি জগন্নাথ সে কথা শুনিলেন। সেই অসংখ্য জনসমূহ হাহাকার করিতে করিতে সহসা আবার জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। "রাণীজিকি জয়! মহারাণীকি জয়! দেবীকি জয়!" এই সময়ে অধোমুখী জয়ন্তীর কর্ণে অলঙ্কারশিঞ্জিত প্রবেশ করিল। তখন জয়ন্তী মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, সমস্ত পৌরস্ত্রী সঙ্গে করিয়া মহারাণী নন্দা মঞ্চোপরি আরোহণ করিতেছেন। জয়ন্তী উঠিয়া দাঁড়াইল।

সেই সমস্ত পৌরস্ত্রী জয়ন্তীকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। মহারাণী নিজে জয়ন্তীকে আড়াল করিয়া, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। দর্শকো সকলে করতালি দিয়া হরিবোল দিতে লাগিল। কসাই জয়ন্তীর হাত ছাড়িয়া দিল, কিন্তু মঞ্চ হইতে নামিল না।

রাজা অত্যন্ত বিস্মিত ও রুষ্ট হইয়া অতি পুরুষভাবে নন্দাকে বলিলেন, "এ কি এ মহারাণী!"

নন্দা বলিলেন, "মহারাজ! আমি পতিপুত্রবতী। আমি জীবিত থাকিতে তোমাকে কখনও এ পাপ করিতে দিব না। তাহা হইলে আমার কেহ থাকিবে না।"

রাজা পূর্ব্ববৎ ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, "তোমার ঠাঁই অন্তঃপুরে, এখানে নয়। অন্তঃপুরে যাও।"

নন্দা সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিল, "মহারাজ! আমি যে মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়াছি, এই কসাইটা সেই মঞ্চে দাঁড়াইয়া থাকে কোন্ সাহসে? উহাকে নামিতে আজ্ঞা দিন।"

রাজা কথা কহিলেন না। তখন নন্দা উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "এই রাজপুরীমধ্যে আমার কি এমন কেহ নাই যে, এটাকে নামাইয়া দেয়?"

তখন সহস্র দর্শক এককালে "মার ! মার!" শব্দ করিয়া কসাইয়ের প্রতি ধাবমান হইল। সে লম্ফ দিয়া মঞ্চ হইতে পড়িয়া পলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু দর্শকগণ তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া, মারিতে মারিতে দূর্গের বাহিরে লইয়া গেল। পরে অনেক লাঞ্ছনা করিয়া, প্রাণ মাত্র রাখিয়া ছাড়িয়া দিল।

নন্দা জয়ন্তীকে বলিল, "মা! দয়া করিয়া অভয় দাও। মা! আমার বড় ভয় হইতেছে, পাছে কোন দেবতা ছলনা করিতে আসিয়া থাকেন। মা! অপরাধ লইও না। একবার অন্তঃপুরে পায়ের ধুলা দিবে চল, আমি তোমার পূজা করিব।"

তখন রাণী পৌরস্ত্রীগণ সমভিব্যাহারে জয়ন্তীকে ঘেরিয়া অন্তঃপুরে লইয়া চলিলেন। রাজা কিছু করিতে না পারিয়া সিংহাসন হইতে উঠিয়া গেলেন। তখন মহাকোলাহলপূর্ব্বক, এবং নন্দাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে দর্শকমণ্ডলী দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

অন্তঃপুরে গিয়া জয়ন্তী ক্ষণকালও অবস্থিতি করিল না। নন্দা অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া, স্বহস্তে গঙ্গাজলে জয়ন্তীর পা ধুয়াইয়া, সিংহাসনে বসাইতে গেলেন। কিন্তু জয়ন্তী হাসিয়া উড়াইয়া দিল। বলিল, "মা! আমি কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমাদের মঙ্গল হউক। ক্ষণমাত্র জন্য মনে করিও না যে, আমি কোন প্রকার রাগ বা দুঃখ করিয়াছি। ঈশ্বর না করুন, কিন্তু যদি কখনও তোমার বিপদ্ পড়ে, জানিতে পারিলে আমি আসিয়া আমার যথাসাধ্য উপকার করিব। কিন্তু রাজপুরীমধ্যে সন্ন্যাসিনীর ঠাঁই নাই। অতএব আমি চলিলাম।" নন্দা এবং পৌরবর্গ জয়ন্তীর পদধূলি লইয়া তাঁহাকে বিদায় করিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

রাজবাড়ীর অন্তঃপুরের কথা বাহিরে যায় বটে, কিন্তু কখনও ঠিক ঠিক যায় না। স্ত্রীলোকের মুখে মুখে যে কথাটা চলিয়া চলিয়া রটিতে থাকে, সেটা কাজেই মুখে মুখে বড় বাড়িয়া যায়। বিশেষ যেখানে একটুখানি বিস্ময়ের গন্ধ থাকে, সেখানে বড় বাড়িয়া যায়। জয়ন্তী সম্বন্ধে অতিপ্রকৃত রটনা পূর্ব্বে যথেষ্টই ছিল, নাগরিকদিগের কথাবার্ত্তায় আমরা দেখিয়াছি। এখন জয়ন্তী রাজপুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়াই বাহির হইয়া চলিয়া গিয়াছিল, এই সোজা কথাটা যেরূপে, বাহিরে রটিল, তাহাতে লোকে বুঝিল যে, দেবী অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিয়াই অন্তর্দ্ধান হইলেন, আর কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

কাজেই লোকের দৃঢ় প্রত্যয় হইল যে, তিনি নগরের অধিষ্ঠাত্রী এবং রক্ষাকর্ত্রী দেবতা, রাজাকে ছলনা করিয়া, এক্ষণে ছল পাইয়া রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। অতএব রাজ্য আর থাকিবে না। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে জনরব উঠিল য, মুরশিদাবাদ হইতে নবাবী ফৌজ আসিতেছে। কাজেই রাজ্যধ্বংস যে অতি নিকট, সে বিষয়ে আর বড় বেশী লোকের সন্দেহ রহিল না। তখন নগরমধ্যে বোচ্‌কা বাঁধিবার বড় ধূম পড়িয়া গেল। অনেকেই নগর ত্যাগ করিয়া চলিল।

সীতারাম এ সকলের কোন সংবাদ না রাখিয়া চিত্তবিশ্রামে গিয়া একাকী বাস করিতে লাগিলেন। এখন তাঁহার চিত্তে ক্রোধই প্রবল—সে ক্রোধ সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বগ্রাসক। অন্যকে ছাড়িয়া ক্রোধ শ্রীর উপরেই অধিক প্রবল হইল।

উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে সীতারাম কতকগুলি নীচব্যবসায়ী নীচাশয় অনুচরবর্গকে আদেশ করিলেন, "রাজ্যে যেখানে যেখানে যে সুন্দরী স্ত্রী আছে, আমার জন্য চিত্তবিশ্রামে লইয়া আইস।" তখন দলে দলে সেই পামরেরা চারি দিকে ছুটিল। যে অর্থের বশীভূতা, তাহাকে অর্থ দিয়া লইয়া আসিল। যে সাধ্বী তাহাকে বলপূর্ব্বক আনিতে লাগিল। রাজ্যে হাহাকারের উপর আবার হাহাকার পড়িয়া গেল।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া চন্দ্রচূড় ঠাকুর এবার কাহাকে কিছু না বলিয়া তল্পি বাঁধিয়া মুটের মাথায় দিয়া তীর্থযাত্রা করিলেন। ইহজীবনে আর মহম্মদপুরে ফিরিলেন না।

পথে যাইতে যাইতে চাঁদশাহ ফকিরের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ফকির জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরজি, কোথায় যাইতেছেন?"

চন্দ্র। কাশী।—আপনি কোথায় যাইতেছেন?

ফকির। মোক্কা।

চন্দ্র। তীর্থযাত্রায়?

ফকির। যে দেশে হিন্দু আছে, সে দেশে আর থাকিব না। এই কথা সীতারাম শিখাইয়াছে।

বিংশ পরিচ্ছেদ

জয়ন্তী প্রসন্নমনে মহম্মদপুর হইতে নির্গত হইল। দুঃখ কিছুই নাই—মনে বড় সুখ। পথে চলিতে চলিতে মনে মনে ডাকিতে লাগিল—"জয় জগন্নাথ! তোমার দয়া অনন্ত। তোমার মহিমার পার নাই! তোমাকে যে না জানে, যে না ভাবে, সেই ভাবে বিপদ্! বিপদ্ কাহাকে বলে প্রভু? তাহা বলিতে পারি না; তুমি যাহাতে আমাকে ফেলিয়াছিলে, তাহা পরম সম্পদ্! আমি এত দিন এমন করিয়া বুঝিতে পাই নাই যে, আমি ধর্ম্মভ্রষ্টা; কেন না, আমি বৃথা গর্ব্বে গর্ব্বিতা, বৃথা অভিমানে অভিমানিনী, অহঙ্কারবিমূঢ়া। অর্জ্জুন ডাকিয়াছিলেন, আমিও ডাকিতেছি প্রভু, শিখাও প্রভু! শাসন কর!

যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেহং সাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।”

জয়ন্তী, জগদীশ্বরকে সম্মুখে রাখিয়া, তাঁর সঙ্গে কথোপকথন করিতে শিখিয়াছিল। মনের সকল কথা খুলিয়া বিশ্বপতির নিকট বলিতে শিখিয়াছিল। বালিকা যেমন মা-বাপের নিকট আবদার করে, জয়ন্তীও তেমনই সেই পরম পিতা-মাতার নিকট আবদার করিতে শিখিয়াছিল। এখন জয়ন্তী একটা আবদার হইল। আবদার, সীতারামের জন্য। সীতারামের যে মতি গতি, সীতারাম ত উৎসন্ন যায়, বিলম্ব নাই। তার কি রক্ষা নাই? অনন্ত দয়ার আধারে তাহার জন্য কি একটু দয়া নাই? জয়ন্তী তাই ভাবিতেছিল। ভাবিতেছিল, “আমি জানি, ডাকিলে তিনি অবশ্য শুনেন। সীতারাম ডাকে না–ডাকিতে ভুলিয়া গিয়াছে–নহিলে এমন করিয়া ডুবিবে কেন? জানি, পাপীর দণ্ডই এই যে, সে দয়ারামকে ডাকিতে ভুলিয়া যায়। তাই সীতারাম তাঁকে ডাকিতে ভুলিয়া গিয়াছে, আর ডাকে না। তা, সে না ডাকুক, আমি তার হইয়া জগদীশ্বরকে ডাকিলে তিনি কি শুনিবেন না? আমি যদি বাপের কাছে আবদার করি যে, এই পাপিষ্ঠ সীতারামকে পাপ হইতে মোচন কর, তবে কি তিনি শুনিবেন না? জয় জগন্নাথ! তোমার নামের জয়! সীতারামকে উদ্ধার করিতে হইবে।”

তার পর জয়ন্তী ভাবিল যে, “যে নিশ্চেষ্ট, তাহার ডাক ভগবান্ শুনেন না। আমি যদি নিজে সীতারামের উদ্ধারের জন্য কোন চেষ্টা না করি, তবে ভগবান্ কেন আমার কথায় কর্ণপাত করিবেন? দেখি, কি করা যায়। আমি শ্রীকে চাই। শ্রী পলাইয়া ভাল করে নাই। অথবা পলাইলেও কি হইত বলা যায় না। আমার কি সাধ্য যে, ভগবন্নির্দ্দিষ্ট কার্য্যকারণপরম্পরা বুঝিয়া উঠে।”

জয়ন্তী তখন শ্রীর কাছে চলিল। যথাকালে শ্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। জয়ন্তী শ্রীর কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত সবিশেষ বলিল। শ্রী বিষণ্ণ হইয়া বলিল, “রাজার অধঃপতন নিকট। তাঁহার উদ্ধারের কি কোন উপায় নাই?”

জয়ন্তী। উপায় ভগবান্। ভগবানকে তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। ভগবানকে যে দিন আবার তাঁর মনে হইবে, সেই দিন তাঁহার আবার উন্নতি আরম্ভ হইবে।

শ্রী। তাহার উপায় কি? আমি যখন তাঁহার কাছে ছিলাম, তখন সর্ব্বদা ভগবৎপ্রসঙ্গই তাঁর কাছে কহিতাম। তিনি মনোযোগ দিয়া শুনিতেন।

জয়ন্তী। তোমার মুখের কথা, তাই মনোযোগ দিতেন। তোমার মুখপানে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিতেন, তোমার রূপে ও কণ্ঠে মুগ্ধ হইয়া থাকিতেন, ভগবৎপ্রসঙ্গ তাঁর কাণে প্রবেশ করিত না। তিনি কোন দিন তোমার এ সকল কথার কিছু উত্তর করিয়াছিলেন কি? কোন দিন কোন তত্ত্বের মীমাংসা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কি? হরিনামে কোন দিন উৎসাহ দেখিয়াছিলে কি?

শ্রী। না। তা বড় লক্ষ্য করি নাই।

জয়ন্তী। তবে সে মনোযোগ তোমার লাবণ্যের প্রতি–ভগবৎপ্রসঙ্গে নয়।

শ্রী। তবে, এখন কি কর্ত্তব্য?

জ। তুমি করিবে কি? তুমি ত বলিয়াছ যে, তুমি সন্ন্যাসিনী, তোমার কর্ম্ম নাই?

শ্রী। যেমন শিখাইয়াছ।

জ। আমি কি তাই শিখাইয়াছিলাম? আমি কি শিখাই নাই যে, অনুষ্ঠেয় যে কর্ম্ম, অনাসক্ত হইয়া ফলত্যাগপূর্ব্বক তাহার নিয়ত অনুষ্ঠান করিলেই কর্ম্মত্যাগ

হইল, নচেৎ হইল না?* স্বামিসেবা কি তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম নহে?

শ্রী। তবে আমাকে পলাইতে পরামর্শ দিয়াছিলে কেন?

জ। তুমি যে বলিলে, তোমার শত্রু, রাজা নিয়া বার জন। যদি ইন্দ্রিয়গণ তোমার বশ্য নয়, তবে তোমার স্বামিসেবা সকাম হইয়া পড়িবে। অনাসক্তি ভিন্ন কর্ম্মানুষ্ঠানে কর্ম্মত্যাগ ঘটে না। তাই তোমাকে পলাইতে বলিয়াছিলাম। যার যে ভার সয় না, তাকে সে ভার দিই না। "পদং সইতে ভ্রমরস্য পেলবং' ইত্যাদি উপমা মনে আছে ত?

শ্রী বড় লজ্জিতা হইল। ভাবিয়া বলিল, "কাল ইহার উত্তর দিব।"

সে দিন আর সে কথা হইল না। শ্রী সে দিন জয়ন্তীর সঙ্গে বড় দেখা সাক্ষাৎ করিল না। পরে জয়ন্তী তাহাকে ধরিল। বলিল, "আমার কথার কি উত্তর সন্ন্যাসিনী?"

শ্রী বলিল, "আমায় আর একবার পরীক্ষা কর।"

জয়ন্তী বলিল, "এ কথা ভাল। তবে মহম্মদপুর চল। তোমার আমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম কি, পথে তাহার পরামর্শ করিতে করিতে যাইব।"

দুই জনে তখন পুনর্ব্বার মহম্মদপুর অভিমুখে যাত্রা করিল।

একবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

গঙ্গারাম গেল, রমা গেল, শ্রী গেল, জয়ন্তী গেল, চন্দ্রচূড় গেল, চাঁদশাহ গেল। তবে সীতারামের চৈতন্য নাই।

বাকি মৃন্ময় আর নন্দা। নন্দা এবার বড় রাগিল— আর পতিভক্তিতে রাগ থামে না। কিন্তু নন্দার আর সহায় নাই। এক মৃন্ময় মাত্র সহায় আছে। অতএব নন্দা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য এক দিন প্রাতে মৃন্ময়কেই ডাকিতে পাঠাইল। সে ডাক মৃন্ময়ের নিকট পৌঁছিল না। মৃন্ময় আর নাই। সেই দিন প্রাতে মৃন্ময়ের মৃত্যু হইয়াছিল।

প্রাতে উঠিয়াই মৃন্ময় সংবাদ শুনিলেন যে, মুসলমান সেনা মহম্মদপুর আক্রমণে আসিতেছে—আগতপ্রায় —প্রায় গড়ে পৌঁছিল। বজ্রাঘাতের ন্যায় এ সংবাদ মৃন্ময়ের কর্ণে প্রবেশ করিল। মৃন্ময়ের যুদ্ধের কোন উদ্যোগই নাই। এখন আর চন্দ্রচূড়ের সে গুপ্তচর নাই যে, পূর্ব্বাহ্নে সংবাদ দিবে। সংবাদ পাইবামাত্র মৃন্ময় সবিশেষ জানিবার জন্য স্বয়ং অশ্বারোহণ করিয়া যাত্রা করিলেন। কিছু দূর গিয়া মুসলমান সেনার সম্মুখে পড়িলেন। তিনি পলাইতে জানিতেন না, সুতরাং তাহাদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নিহত হইলেন।

মুসলমান সেনা আসিয়া সীতারামের দুর্গ বেষ্টন করিল—নগর ভাঙ্গিয়া অবশিষ্ট নাগরিকেরা পলাইয়া গেল। চিত্তবিশ্রামে যেখানে সুন্দরীমণ্ডলীপরিবেষ্টিত সীতারাম লীলায় উন্মত্ত, সেইখানে সীতারামের কাছে সংবাদ পৌঁছিল যে, "মৃন্ময় মরিয়াছে মুসলমান সেনা আসিয়া দুর্গ ঘেরিয়াছে।" সীতারাম মনে মনে বলিলেন, "তবে আজ শেষ। ভোগবিলাসের শেষ; রাজ্যের শেষ; জীবনের শেষ।" তখন রাজা রমণীমণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

---

* কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেহর্জ্জুন।

সঙ্গং ত্যক্তা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ॥ —গীতা, ১৮।৯

বিলাসিনীরা বলিল, “মহারাজ! কোথা যান? আমাদের ফেলিয়া কোথা যান?”

সীতারাম চোপদারকে আজ্ঞা করিলেন, “ইহাদের বেত মারিয়া তাড়াইয়া দাও।”

স্ত্রীলোকেরা খিল্ খিল করিয়া হাসিয়া হরিবোল দিয়া উঠিল। তাহাদিগের থামাইয়া ভানুমতী নামে তাহাদিগের মধ্যস্থ এক সুন্দরী রাজার সম্মুখীন হইয়া বলিল, “মহারাজ! আজ জানিলে বোধ হয় যে, সত্যই ধর্ম্ম আছে। আমরা কুলকন্যা, আমাদের কুলনাশ, ধর্ম্মনাশ করিয়াছ, মনে করিয়াছ কি, তার প্রতিফল নাই? আমাদের কাহারও মা কাঁদিতেছে, কাহারও বাপ কাঁদিতেছে, কাহারও স্বামী কাঁদিতেছে, কাহারও শিশুসন্তান কাঁদিতেছে–মনে করিয়াছিলে কি, সে কান্না জগদীশ্বর শুনিতে পান না? মহারাজ, নগরে না, বনে যাও, লোকালয়ে আর মুখ দেখাও না; কিন্তু মনে রাখিও যে,ধর্ম্ম আছে।

রাজা এ কথার উত্তর না করিয়া, ঘোড়ায় চড়িয়া বায়ুবেগে অশ্ব সঞ্চালিত করিয়া দুর্গদ্বারে চলিলেন। যুবতীগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। কেহ বলিল, “আয় ভাই, রাজার রাজধানী লুঠি গিয়া চল। সীতারাম রায়ের সর্ব্বনাশ দেখি গিয়া চল।” কেহ বলিল, “সীতারাম আল্লা ভজিবে, আমরা সঙ্গে সঙ্গে ভজি গে চল।” সে সকল কথা রাজার কাণে গেল না। ভানুমতীর কথায় রাজার কাণ ভারিয়াছিল। রাজা এখন স্বীকার করিলেন, “ধর্ম্ম আছে।”

রাজা গিয়া দেখিলেন, মুসলমান সেনা এখনও গড় ঘেরে নাই–সবে আসিতেছে মাত্র–তাহাদের অগ্রবর্ত্তী ধুলি, পতাকা ও অশ্বারোহী সকল নানা দিকে ধাবমান হইয়া আপন আপন নির্দ্দিষ্ট স্থান গ্রহণ করিতেছে; এবং প্রধানাংশ দুর্গদ্বার সম্মুখে আসিতেছে। সীতারাম দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন।

তখন রাজা চারি দিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, প্রায় সিপাহী নাই। বলা বাহুল্য যে, তাহারা অনেক দিন বেতন না পাইয়া ইতিপূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছিল। যে কয় জন বাকী ছিল, তাহারা মৃন্ময়ের মৃত্যু ও মুসলমানের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। তবে দুই চারি জন ব্রাহ্মণ বা রাজপুত অত্যন্ত প্রভুভক্ত, একবার নুন খাইলে আর ভুলিতে পারে না, তাহারাই আছে। গণিয়া গাঁথিয়া তাহারা প্রায় পঞ্চাশ জন হইবে। রাজা মনে মনে কহিলেন, “অনেক পাপ করিয়াছি। ইহাদের প্রাণ দান করিব। ধর্ম্ম আছে।”

রাজা দেখিলেন, রাজকর্ম্মচারীরা কেহই নাই। সকলেই আপন আপন ধন প্রাণ লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। ভৃত্যবর্গ কেহ নাই। দুই একজন অতি পুরাতন দাস দাসী প্রভুর সঙ্গে একত্রে প্রাণপরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সাশ্রুলোচনে অবস্থিতি করিতেছে।

রাজা তখন অন্তঃপুরে গিয়া দেখিলেন, জ্ঞাতি, কুটুম্ব, আত্মীয় স্বজন যে যে পুরীমধ্যে বাস করিত, সকলেই যথাকালে আপন আপন প্রাণ লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। সেই বৃহৎ রাজভবন আজ অরণ্যতুল্য, জনশূন্য, নিঃশব্দ, অন্ধকার। রাজার চক্ষুতে জল আসিল।

রাজা মনে জানিতেন, নন্দা কখনও যাইবে না, তাহার যাইবারও স্থান নাই। তিনি চক্ষু মুছিতে মুছিতে নন্দার সন্ধানে চলিলেন। তখন গুড়ুম্ গুড়ুম্ করিয়া মুসলমানের কামান ডাকিতে লাগিল–তাহারা আসিয়া গড় ঘেরিয়াম প্রাচীর ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতেছে। মহা কোলাহল, অন্তঃপুর হইতে শুনা যাইতে লাগিল।

রাজা নন্দার ভবনে গিয়া দেখিলেন, নন্দা ধূলায় পড়িয়া শুইয়া আছে, চারিপাশে তাহার পুত্রকন্যা এবং রমার পুত্র বসিয়া কাঁদিতেছে। রাজাকে দেখিয়া নন্দা বলিল, “হায় মহারাজ! এ কি করিলে!”

রাজা বলিলেন, “যাহা অদৃষ্টে ছিল, তাহাই করিয়াছি। আমি প্রথমে পতিঘাতিনী বিবাহ করিয়াছিলাম, তাহার কুহকে পড়িয়া এই মৃত্যুবুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে–”

নন্দা। সে কি মহারাজ? শ্রী?

রাজা। শ্রীর কথাই বলিতেছি।

নন্দা। যাহাকে আমরা ডাকিনী বলিয়া জানিতাম, সে শ্রী? এত দিন বল নাই কেন, মহারাজ? নন্দার মুখ সেই আসন্ন মৃত্যুকালেও প্রফুল্ল হইল।

রাজা। বলিয়াই কি হইবে? ডাকিনীই হউক, শ্রীই হউক, ফল একই হইয়াছে। মৃত্যু উপস্থিত।

নন্দা । মহারাজ। শরীরধারণে মৃত্যু আছেই। সে জন্য দুঃখ করি না। তবে তুমি লক্ষ যোদ্ধার নায়ক হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে মরিবে, আমি তোমার অনুগামিনী হইব–তাহা অদৃষ্টে ঘটিল না কেন?

রাজা। লক্ষ যোদ্ধা আমার নাই, এক শত যোদ্ধাও নাই। কিন্তু আমি যুদ্ধে মরিব, তাহা কেহ নিবারণ করিতে পারিবে না। আমি এখনই ফটক খুলিয়া মুসলমান সেনামধ্যে একাই প্রবেশ করিব। তোমাকে বলিতে ও হাতিয়ার লইতে আসিয়াছি।

নন্দার চক্ষুতে বড় ভারি বেগে স্রোত বহিতে লাগিল; কিন্তু নন্দা তাহা মুছিল। বলিল, “মহারাজ! আমি যদি ইহাতে নিষেধ করি, তবে আমি তোমার দাসী হইবার যোগ্য নহি। তুমি যে প্রকৃতিস্থ হইয়াছ, ইহাই আমার বহু ভাগ্য–আর যদি দু’দিন আগে ইহতে! তুমিও মরিবে মহারাজ! আমিও মরিব–তোমার অনুগমন করিব। কিন্তু ভাবিতেছি–এই অপোগণ্ডগুলির কি হইবে! ইহারা যে মুসলমানের হাতে পড়িবে।”

এবার নন্দা কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল।

রাজা বলিলেন, “তাই তোমার মরা হইবে না। ইহাদিগের জন্য তোমাকে থাকিকে হইবে।”

নন্দা। আমি থাকিলেই বা উহারা বাঁচিবে কি প্রকারে?

রাজা। নন্দা! এত লোক পলাইল–তুমি পলাইলে না কেন? তাহা হইলে ইহার রক্ষা পাইত।

নন্দা। তোমার মহিষী হইয়া আমি কার সঙ্গে পলাইব মহারাজ! তোমার পুত্রকন্যা আমি তোমাকে না বলিয়া কাহার হাতে দিব? পুত্র বল, কন্যা বল, সকলই ধর্ম্মের জন্য। আমার ধর্ম্ম তুমি। আমি তোমাকে ফেলিয়া পুত্রকন্যা লইয়া কোথায় যাইব?

রাজা। কিন্তু এখন উপায়?

নন্দা। এখন আর উপায় নাই। অনাথা দেখিয়া মুসলমান যদি দয়া করে। না করে, জগদীশ্বর যাহা করিবেন, তাহাই করিব। মহারাজ, রাজার ঔরসে ইহাদের জন্ম। রাজকুলের সম্পদ্ বিপদ্ উভয়েই আছে–তজ্জন্য আমার তেমন চিন্তা নাই। পাছে তোমায় কেহ কাপুরুষ বলে, আমার সেই বড় ভাবনা।

রাজা। তবে বিধাতা যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। ইহজন্মে তোমাদের সঙ্গে এই দেখা।

এই বলিয়া আর কোন কথা না কহিয়া, রাজা সজ্জার্থ অস্ত্রগৃহে গেলেন। নন্দা বালক-বালিকাদের সঙ্গে লইয়া রাজার সঙ্গে অস্ত্রগৃহে গেলেন। রাজা রণসজ্জায় আপনাকে বিভূষিত করিতে লাগিলেন, নন্দা বালকবালিকাগুলি লইয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে দেখিতে লাগিল।

যোদ্ধৃবেশে পরিধান করিয়া, সর্ব্বাঙ্গে অস্ত্র বাঁধিয়া, সীতারাম আবার সীতারামের মত শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি তখন বীরদর্পে, মৃত্যুকামনায়, একাকী দুর্গদ্বারাভিমুখে চলিলেন। নন্দা আবার মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

একাকী দুর্গদ্বারে যাইতে দেখিলেন যে, যে বেদীতে জয়ন্তীকে বেত্রাঘাতের জন্য আরূঢ় করিয়াছিলেন, সেই বেদীতে দুই জন কে বসিয়া রহিয়াছে। সেই মৃত্যুকামী যোদ্ধারও হৃদয়ে ভয়সঞ্চার হইল। শশব্যস্তে নিকটে আসিয়া দেখিলেন–ত্রিশূল হস্তে, গৈরিকভস্মরুদ্রাক্ষবিভূষিতা, জয়ন্তীই পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছে। তাহার পাশে, সেইরূপ ভৈরবীবেশে শ্রী।

রাজা তাহাদিগকে সেই বিষম সময়ে, তাঁহার আসন্নকালে, সেই বেশে সেই স্থানে সমাসীনা দেখিয়া কিছু ভীত হইলেন। বলিলেন, “তোমরা আমার এই

আসন্নকালে এখানে আসিয়া কেন বসিয়া আছ? তোমাদের এখনও কি মনস্কামনা সিদ্ধ হয় নাই?”

জয়ন্তী ঈষৎ হাসিল। রাজা দেখিলেন, শ্রী গদ্গদকণ্ঠ, সজললোচন—কথা কহিবে ইচ্ছা করিতেছে, কিন্তু কথা কহিতে পারিতেছে না। রাজা তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। শ্রী কিছু বলিল না।

রাজা তখন বলিলেন, “শ্রী! তোমারই অদৃষ্ট ফলিয়াছে। তুমিই আমার মৃত্যুর কারণ। তোমাকে প্রিয়প্রাণহন্ত্রী বলিয়া আগে ত্যাগ করিয়া ভালই করিয়াছিলাম। এখন অদৃষ্ট ফলিয়াছে—আর কেন আসিয়াছ?”

শ্রী। আমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম আছে—তাহা করিতে আসিয়াছি। আজ তোমার মৃত্যু উপস্থিত, আমি তোমার সঙ্গে মরিতে আসিয়াছি।

রাজা। সন্ন্যাসীই কি অনুমৃতা হয়?

শ্রী। সন্ন্যাসীই হউক, আর গৃহীই হউক, মরিবার অধিকার সকলেরই আছে।

শ্রী। সন্ন্যাসীর কর্ম্ম নাই। তুমি কর্ম্মত্যাগ করিয়াছ—তুমি আমার সঙ্গে মরিবে কেন? আমার সঙ্গে নন্দা যাইবে, প্রস্তুত হইয়াছে। তুমি সন্ন্যাসধর্ম্ম পালন কর।

শ্রী। মহারাজ! যদি এত কাল আমার উপর রাগ করেন নাই, তবে আজ আর রাগ করিবেন না। আমি আপনার কাছে যে অপরাধ করিয়াছি—তা এই আপনার আর আমার আসন্ন মৃত্যুকালে বুঝিয়াছি। এই আপনার পায়ে মাথা দিয়া—

এই বলিয়া শ্রী মঞ্চ হইতে নামিয়া, সীতারামের চরণের উপর পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, “এই তোমার পায়ে হাত দিয়া বলিতেছি—আমি আর সন্ন্যাসিনী নই। আমার অপরাধ ক্ষমা করিবে? আমায় আবার গ্রহণ করিবে?”

সী। তোমায় ত বড় আদরেই গ্রহণ করিয়াছিলাম—এখন আর ত গ্রহণের সময় নাই।

শ্রী সময় আছে—আমার মরিবার সময় যথেষ্ট আছে।

সী। তুমিই আমার মহিষী।

শ্রী রাজার পদধূলি গ্রহণ করিল। জয়ন্তী বলিল, “আমি ভিখারিণী, আশীর্ব্বাদ করিতেছি—আজ হইতে অনন্তকাল আপনারা উভয়ে জয়যুক্ত হইবেন।”

সী। মা! তোমার নিকট আমি বড় অপরাধী। তুমি যে আজ আমার দুর্দ্দশা দেখিতে আসিয়াছ, তাহা মনে করি না, তোমার আশীর্ব্বাদেই বুঝিতেছি, তুমি যথার্থ দেবী। এখন আমায় বল, তোমার কাছে কি প্রায়শ্চিত্ত করিলে তুমি প্রসন্ন হও? ঐ শোন! মুসলমানের কামান! আমি ঐ কামানের মুখে এখনই এই দেহ সমর্পণ করিব। কি করিলে তুমি প্রসন্ন হও, তা এই সময়ে বল।

জয়ন্তী। আর একদিন তুমি একাই দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলে।

রাজা। আজ তাহা হয় না। জলে আর তটে অনেক প্রভেদ। পৃথিবীতে এমন মনুষ্য নাই, যে আজ একা দুর্গ রক্ষা করিতে পারে।

জয়ন্তী। তোমার ত এখনও পঞ্চাশ জন সিপাসী আছে।

রাজা। ঐ কোলাহল শুনিতেছ? ঐ সেনা সকলের, এই পঞ্চাশ জনে কি করিবে? আমার আপনার প্রাণ আমি যখন ইচ্ছা, যেমন করিয়া, ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে পারি। কিন্তু বিনাপরাধে উহাদিগকে হত্যা করি কেন? পঞ্চাশ জন লইয়া এ যুদ্ধে মৃত্যু ভিন্ন অন্য কোন ফল নাই।

শ্রী। মহারাজ! আমি বা নন্দা মরিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু নন্দা রমার কতকগুলি পুত্রকন্যা আছে, তাহাদের রক্ষার কিছু উপায় হয় না?

সীতারামের চক্ষুতে জলধারা ছুটিল। বলিলেন, “নিরুপায়! উপায় কি করিবে?”

জয়ন্তী বলিল, "মহারাজ! নিরুপায়ের এক উপায় আছে–আপনি কি তাহা জানেন না? জানেন বৈ কি। জানিতেন, জানিয়া ঐশ্বর্য্যমদে ভুলিয়া গিয়াছিলেন–এখন কি সেই নিরুপায়ের উপায় অগতির গতিকে মনে পড়ে না?"

সীতারাম মুখ নত করিলেন। তখন অনেক দিনের পর, সেই নিরুপায়ের উপায়, অগতির গতিকে মনে পড়িল। কাল কাদম্বিনী বাতাসে উড়িয়া গেল–হৃদয়মধ্যে অল্পে অল্পে, ক্রমে ক্রমে, সূর্য্যরশ্মি বিকসিত হইতে লাগিল–চিন্তা করিতে করিতে অনন্তব্রহ্মাণ্ডপ্রকাশক সেই মহাজ্যোতিঃ প্রভাসিত হইল। তখন সীতারাম মনে মনে ডাকিতে লাগিলেন, "নাথ! দীননাথ! অনাথনাথ! নিরুপায়ের উপায়! অগতির গতি! পূণ্যময়ের আশ্রয়! পাপিষ্ঠের পরিত্রাণ! আমি পাপিষ্ঠ বলিয়া আমায় কি দয়া করিবে না?"

সীতারাম অন্যমনা হইয়া ঈশ্বরচিন্তা করিতেছেন দেখিয়া শ্রীকে জয়ন্তী ইঙ্গিত করিল। তখন সহসা দুই জনে সেই মঞ্চের উপর জানু পাতিয়া বসিয়া, দুই হাত যুক্ত করিয়া ঊর্দ্ধনেত্র হইয়া ডাকিতে লাগিল–গগনবিহারী গগনবিদারী কলবিহঙ্গনিন্দী কণ্ঠে, সেই মহাদুর্গের চারি দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া ডাকিতে লাগিল,–

"ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরং চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥"

দুর্গের বাহিরে সেই সাগরগর্জ্জনবৎ মুসলমান সেনার কোলাহল; প্রাচীর ভেদার্থ প্রক্ষিপ্ত কামানের ভীষণ নিনাদ মাঠে মাঠে, জঙ্গলে জঙ্গলে, নদীর বাঁকে, বাঁকে, প্রতিধ্বনিত হইতেছে;–দুর্গমধ্যে জনশূন্য, সেই প্রতিধ্বনিত কোলাহল ভিন্ন অন্য শব্দশূন্য–তাহার মধ্যে সেই সাক্ষাৎ জ্ঞান ও ভক্তিরূপিণী জয়ন্তী ও শ্রীর সপ্তসুরসংবাদিনী অতুলিতকণ্ঠনিঃসৃত মহাগীতি আকাশ বিদীর্ণ করিয়া, সীতারামের শরীর রোমাঞ্চিত করিয়া, ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল।

"নমো নমস্তেহস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমস্তে।
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব ॥"

শুনিতে শুনিতে সীতারাম বিমুগ্ধ হইলেন,–আসন্ন বিপদ্ ভুলিয়া গেলেন, যুক্তকরে ঊর্দ্ধমুখে বিহ্বল হইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন,–তাহার চিত্ত আবার বিশুদ্ধ হইল। জয়ন্তী ও শ্রী সেই আকাশবিপ্লাবী কণ্ঠে আবার হরিনাম করিতে লাগিল, হরি! হরি! হরি! হরি হে! হরি! হরি! হরি! হরি হে!

এমন সময়ে দুর্গমধ্যে মহা কোলাহল হইতে লাগিল–শব্দ শুনা গেল–"জয় মহারাজকি জয়! জয়! সীতারামকি জয়!"

দ্বাবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

পাঠককে বলিতে হইব না যে, দুর্গমধ্যেই সিপাহীরা বাস করিত। ইহাও বলা গিয়াছে যে, সিপাহী সকলই দুর্গ ছাড়িয়া পলাইয়াছে, কেবল জন পঞ্চাশ নিতান্ত

প্রভুভক্ত ব্রাহ্মণ ও রাজপুত পলায় নাই। তাহারা বাছা বাছা লোক–বাছা বাছা লোক নহিলে এমন সময়ে বিনা বেতনে কেবল প্রাণ দিবার জন্য পড়িয়া থাকে না। এখন তাহারা বড় অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। এ দিকে মুসলমান সেনা আসিয়া পড়িয়াছে, মহা কোলাহল করিতেছে, কামানের ডাকে মেদিনী কাঁপাইতেছে–গোলার আঘাতে দুর্গপ্রাচীর ফাটাইতেছে–তবু ইহাদিগকে সাজিতে কেহ হুকুম দেয় না! রাজা নিজে আসিয়া সব দেখিয়া গেলেন। কৈ? তাহাদের ত সাজিতে হুকুম দিলেন না! তাহারা কেবল প্রাণ দিবার জন্য পড়িয়া আছে, অন্য পুরস্কার কামনা করে না, কিন্তু তাও ত ঘটিয়া উঠে না–কেহ ত বলে না, "আইস! আমার জন্য মর!" তখন তাহারা বড় অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল।

তখন তাহারা সকলে মিলিয়া এক বৈঠক করিল। রঘুবীর মিশ্র তাহার মধ্যে প্রাচীন এবং উচ্চপদস্থ–রঘুবীর তাহাদিগকে বুঝাইতে লাগিল। বলিল, "ভাই সব! ঘরের ভিতর মুসলমান আসিয়া খোঁচাইয়া মারিবে, সেই কি ভাল হইবে? আইস, মরিতে হয় ত মরদের মত মরি! চল, সাজিয়া গিয়া লড়াই করি। কেহ হুকুম দেয় নাই–নাই দিক! মরিবার আবার হুকুম হাকাম কি? মহারাজের নিমক্ খাইয়াছি, মহারাজের জন্য লড়াই করিব–তা হুকুম না পাইলে কি সময়ে তাঁর জন্য হাতিয়ার ধরিব না? চল, হুকুম হোক্ না হোক্ আমরা গিয়া লড়াই করি!"

এ কথায় সকলেই সম্মত হইল। তবে গয়াদীন পাঁড়ে প্রশ্ন তুলিল যে, "লড়াই করিব কি প্রকার? এখন দুর্গরক্ষার উপায় একমাত্র কামান। কিন্তু গোলন্দাজ ফৌজ ত সব পলাইয়াছে। আমরা ত কামানের কাজ তেমন জানি না। আমাদের কি রকম লড়াই করা উচিত?"

তখন এ বিষয়ের বিচার আরম্ভ হইল। তাহাতে দুর্ম্মদ সিংহ জমাদ্দার বলিল, "অত বিচারে কাজ কি? হাতিয়ার আছে, ঘোড়া আছে, রাজাও গড়ে আছে। চল, আমরা হাতিয়ার বাঁধিয়া, ঘোড়ার সওয়ার হইয়া রাজার কাছে গিয়া হুকুম লই। মহারাজ যাহা বলিবেন, তাহাই করা যাইবে।"

এই প্রস্তাব অতি উত্তম বলিয়া স্বীকার করিয়া সকলেই অনুমোদন করিল। অতি ত্বরা করিয়া সকলে রণসজ্জা করিল–আপন আপন অশ্ব সকল সুসজ্জিত করিল। তখন সকলে সজ্জীভূত ও অশ্বারূঢ় হইয়া আস্ফালনপূর্ব্বক, অস্ত্রে অস্ত্রে ঝঞ্ঝনা শব্দ উঠাইয়া উচ্চৈঃস্বরে ঢাকিল, "জয় মহারাজকি জয়! জয় রাজা সীতারামকি জয়?"

সেই জয়ধ্বনি সীতারামের কাণে প্রবেশ করিয়াছিল।

ত্রয়োবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

যোদ্ধৃগণ জয়ধ্বনি করিতে করিতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, যথায় মঞ্চপার্শ্বে সীতারাম, জয়ন্তী ও শ্রীর মহাগীতি শুনিতেছিলেন, সেইখানে আসিয়া জয়ধ্বনি করিল।

রঘুবীর মিশ্র জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজের কি হুকুম? আজ্ঞা পাইলে আমরা এই কয় জন নেড়া মুণ্ডকে হাঁকাইয়া দিই।"

সীতারাম বলিলেন, "তোমরা কিয়ৎক্ষণ এইখানে অপেক্ষা কর। আমি আসিতেছি।"

এই বলিয়া রাজা অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সিপাহীরা ততক্ষণ নিবিষ্টমনা হইয়া অবিচলিতচিত্ত এবং অস্খলিতপ্রারম্ভ হইয়া সেই সন্ন্যাসিনীদ্বয়ের স্বর্গীয় গান শুনিতে লাগিল।

যথকালে রাজা এক দোলা সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুর হইতে নির্গতে হইলেন। রাজভৃত্যেরা সব ফলাইয়াছিল বলিয়াছি। কিন্তু দুই চারি জন প্রাচীন পুরাতন ভৃত্য পলায় নাই, তাহা বলিয়াছি। তাহারাই দোলা বহিয়া আনিতেছিল। দোলার ভিতরে নন্দা এবং বালকবালিকাগণ।

রাজা সিপাহীদিগের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সাজাইয়া অতি প্রাচীন প্রথানুসারে একটি অতি ক্ষুদ্র সূচীব্যূহ রচনা করিলেন।

রন্ধ্রমধ্যে নন্দার শিবিকা রক্ষা করিয়া স্বয়ং সূচীমুখে অশ্বারোহণে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন তিনি জয়ন্তী ও শ্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা বাহিরে কেন? সূচীর রন্ধ্রমধ্যে প্রবেশ কর।"

জয়ন্তী ও শ্রী হাসিল। বলিল, "আমরা সন্ন্যাসিনী, জীবন মৃত্যুতে প্রভেদ দেখি না।"

তখন সীতারাম আর কিছু না বলিয়া, "জয় জগদীশ্বর! জয় লছমীনারায়ণজী!" বলিয়া দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সেই ক্ষুদ্র সূচীব্যূহ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল! তখন সেই সন্ন্যাসিনীরা অবলীলাক্রমে তাঁহার অশ্বের সম্মুখে আসিয়া ত্রিশূলদ্বয় উন্নত করিয়া–

জয় শিব শঙ্কর! ত্রিপুরনিধনকর!
রণে ভয়ঙ্কর! জয় জয় রে!
চক্রগদাধর! কৃষ্ণ পীতাম্বর!
জয় জয় হরি হর! জয় জয় রে!

ইত্যাকার জয়ধ্বনি করিতে করিতে অগ্রে অগ্রে চলিল। সবিস্ময়ে রাজা বলিলেন, "সে কি? এখনই পিষিয়া মরিবে যে!"

শ্রী বলিল, "মহারাজ! রাজাদিগের অপেক্ষা সন্ন্যাসীদিগের মরণে ভয় কি বেশী?" কিন্তু জয়ন্তী কিছু বলিল না। জয়ন্তী আর দর্প করে না। রাজাও, এই স্ত্রীলোকেরা কথার বাধ্য নহে বুঝিয়া আর কিছু বলিলেন না।

তার পর দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া রাজা স্বহস্তে তাহার চাবি খুলিয়া অর্গল মোচন করিলেন। লোহার শিকল সকলে মহা ঝঞ্ঝনা বাজিল–সিংহদ্বারের উচ্চ গম্বুজের ভিতরে তাহার ঘোরতর প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল–সেই অশ্বগণের পদধ্বনিও প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তখন যবন-সেনাসাগরের তরঙ্গাভিঘাতে সেই দুশ্চালনীয় লৌহনির্ম্মিত বৃহৎ কবাট আপনি উদ্ঘাটিত হইল–উন্মুক্ত দ্বারপথ দেখিয়া সূচীব্যূহস্থিত রণবাজিগণ নৃত্য করিতে লাগিল।

এদিকে যেমন বাঁধ ভাঙ্গিলে বন্যার জল পার্ব্বত্য জলপ্রপাতের মত ভীষণ বেগে প্রবাহিত হয়, মুসলমান সেনা দুর্গদ্বার মুক্ত পাইয়া তেমনই বেগে ছুটিল। কিন্তু সম্মুখেই জয়ন্তী ও শ্রীকে দেখিয়া সেই সেনা-তরঙ্গ,–সহসা মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের মত যেন নিশ্চল হইল। যেমন বিশ্বমোহিনী দেবীমূর্ত্তি তেমনই অদ্ভুত বেশ, তেমনই অদ্ভুদ, অশ্রুতপূর্ব্ব সাহস, তেমনই সর্ব্বজনমনোমুগ্ধকারী সেই জয়গীতি! –মুসলমান সেনা তাহাদিগকে পুররক্ষাকারিণী দেবী মনে করিয়া সভয়ে পথ ছাড়িয়া দিল। তাহারা ত্রিশূল-ফলকের দ্বারা পথ পরিষ্কার করিয়া, যবন সেনা ভেদ করিয়া চলিল। সেই ত্রিশূলমুক্ত পথে সীতারামের সূচীব্যূহ অবলীলাক্রমে মুসলমান সেনা ভেদ করিয়া চলিল। এখন সীতারামে অন্তঃকরণে জগদীশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই। এখন কেবল ইচ্ছা, জগদীশ্বর স্মরণ করিয়া তাঁহার নির্দেশবর্ত্তী হইয়া মরিবেন। তাই সীতারাম চিন্তাশূন্য, অবিচলিত, কার্য্যে অভ্রান্ত, প্রফুল্লচিত্ত, হাস্যবদন। সীতারাম ভৈরবীমুখে হরিনাম শুনিয়া, শ্রীহরি স্মরণ করিয়া আত্মজয়ী হইয়াছেন, এখন তাঁর কাছে মুসলমান কোন্ ছার!

তাঁর প্রফুল্ল কান্তি এবং সামান্য অথচ জয়শালিনী সেনা দেখিয়া মুসলমান সেনা "মার! মার!" শব্দে গর্জ্জিয়া উঠিল। স্ত্রীলোক দুই জনকে কেহ কিছু বলিল না–সকলেই পথ ছাড়িয়া দিল। কিন্তু সীতারাম ও তাঁহার সিপাহীগণকে চারিদিক হইতে আক্রমণ করিতে লাগিল। কিন্তু সীতারামের সৈনিকেরা তাঁহার আজ্ঞানুসারে, কোথাও তিলার্দ্ধ দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিল না–কেবল অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিল। অনেকে মুসলমানের আঘাতে আহত হইল–অনেকে নিহত হইয়া ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেল, অমনই আর একজন পশ্চাৎ হইতে তাহার স্থান গ্রহণ করিতে লাগিল। এইরূপে সীতারামের সূচীব্যূহ অভগ্ন থাকিয়া ক্রমশঃ মুসলমান সেনার মধ্যস্থল ভেদ করিয়া চলিল, সম্মুখে জয়ন্তী ও শ্রী পথ করিয়া চলিল। সিপাহীদিগের উপর যে আক্রমণ হইতে লাগিল, তাহা ভয়ানক; কিন্তু সীতারামের

দৃষ্টান্তে, উৎসাহবাক্যে, অধ্যবসায় এবং শিক্ষার প্রভাবে তাহারা সকল বিঘ্ন জয় করিয়া চলিল। পার্শ্বে দৃষ্টি না করিয়া, যে সম্মুখে গতিরোধ করে, তাহাকেই আহত, নিহত, অশ্বচরণবিদলিত করিয়া সম্মুখে তাহারা অগ্রসর হইতে লাগিল।

এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া, মুসলমান সেনাপতি সীতারামের গতিরোধ করার জন্য একটা কামান সূচীব্যূহের সম্মুখ দিকে পাঠাইলেন। ইতিপূর্ব্বেই মুসলমানেরা দুর্গপ্রাচীর ভগ্ন করিবার জন্য কামান সকল তদুপযুক্ত স্থানে পাতিয়াছিল, এজন্য সূচীব্যূহের সম্মুখে হঠাৎ কামান আনিয়া উপস্থিত করিতে পারে নাই। এক্ষণে, রাজা রাণী পলাইতেছে জানিতে পারিয়া, বহু কষ্টে ও যত্নে একটা কামান তুলিয়া লইয়া সেনাপতি সূচীব্যূহের সম্মুখে পাঠাইলেন। নিজে সে দিকে যাইতে পারিলেন না; কেন না, দুর্গদ্বার মুক্ত পাইয়া অধিকাংশ সৈন্য লুঠের লোভে সেই দিকে যাইতেছে। সুতরাং তাঁহাকে সেই দিকে যাইতে হইল–সুবাদারের প্রাপ্য রাজভাণ্ডার পাঁচ জনে লুঠিয়া না আত্মসাৎ করে। কামান আসিয়া সীতারামের সূচীব্যূহের সম্মুখে পৌঁছিল। দেখিয়া, সীতারামের পক্ষের সকলে প্রমাদ গণিল। কিন্তু শ্রী প্রমাদ গণিল না। শ্রী জয়ন্তী দুই জনে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া কামানের সম্মুখে আসিল। শ্রী, জয়ন্তীর মুখ চাহিয়া হাসিয়া, কামানের মুখে আপনার বক্ষ স্থাপন করিয়া, চারিদিক্ চাহিয়া ঈষৎ মৃদু প্রফুল্ল জয়সূচক হাসি হাসিল। জয়ন্তীও শ্রীর মুখ পানে চাহিয়া, তার পর গোলন্দাজের মুখ পানে চাহিদা, সেইরূপ হাসি হাসিল–দুই জনে যেন বলাবলি করিল–"তোপ জিতিয়া লইয়াছি।" দেখিয়া শুনিয়া, গোলন্দাজ হাতের পলিতা ফেলিয়া দিয়া বিনীতভাবে তোপ হইতে তফাতে দাঁড়াইল। সেই অবসরে সীতারাম লাফ দিয়া আসিয়া তাহাকে কাটিয়া ফেলিবার জন্য তরবারি উঠাইলেন। জয়ন্তী অমনি চীৎকার করিল, "কি কর! কি কর! মহারাজ রক্ষা কর! শত্রুকে আবার রক্ষা কি?" বলিয়া সীতারাম সেই উত্থিত তরবারির আঘাতে গোলন্দাজের মাথা কাটিয়া ফেলিয়া তোপ দখল করিয়া লইলেন। দখল করিয়াই ক্ষিপ্রহস্ত, অদ্বিতীয় শিক্ষায় শিক্ষিত সীতারাম, সেই তোপ ফিলাইয়া আপনার সূচীব্যূহের জন্য পথ সাফ করিতে লাগিলেন। সীতারামের হাতে তোপ প্রলয়কালের মেঘের মত বিরামশূন্য গভীর গর্জ্জন আরম্ভ করিল। তদ্বর্ষিত অনন্ত লৌহপিণ্ডশ্রেণীর আঘাতে মুসলমান সেনা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া সম্মুখ ছাড়িয়া চারি দিকে পলাইতে লাগিল। সূচীব্যূহের পথ সাফ! তখন সীতারাম অনায়াসে নিজ মহিষী ও পুত্র কন্যা ও হতাবিশিষ্ট সিপাহীগণ লইয়া মুসলমানকটক কাটিয়া বৈরিশূন্য স্থানে উত্তীর্ণ হইলেন। মুসলমানেরা দুর্গ লুঠিতে লাগিল।

এইরূপে সীতারামের রাজ্যধ্বংস হইল।

চতুর্ব্বিংশতিতম পরিচ্ছেদ

শ্রী সন্ধ্যার পর জয়ন্তীকে নিভৃতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "জয়ন্তী! সেই গোলন্দাজ কে?

জয়ন্তী। যাহাকে মহারাজ কাটিয়া ফেলিয়াছেন?

শ্রী। হাঁ, তুমি মহারাজকে কাটিতে নিষেধ করিয়াছিলে কেন?

জয়ন্তী। সন্ন্যাসিনীর জানিয়া কি হইবে?

শ্রী। না হয় একটু চোখের জল পড়িবে! তাহাতে সন্ন্যাসধর্ম্ম ভ্রষ্ট হয় না।

জয়ন্তী। চোখের জলই বা কেন পড়িবে?

শ্রী। জীবন্তে আমি চিনিতে পারি নাই। কিন্তু তোমার নিষেধবাক্য শুনিয়া আমি মরা মুখখানা একটু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়াছিলাম। আমার একটা সন্দেহ হইতেছে। সে ব্যক্তি যেই হউক, আমিই তার মৃত্যুর কারণ। আমি তোপের মুখে বুক না দিলে সে অবশ্য তোপ দাগিত। তাহা হইলে মহারাজা নিশ্চিত বিনষ্ট

হইতেন, গোলন্দাজকে তখন আর কে মারিত?

জয়ন্তী। সে মরিয়াছে, মহারাজা বাঁচিয়াছেন, সে তোমার উপযুক্ত কাজই হইয়াছে–তবে আর কথায় কাজ কি?

শ্রী। তবু মনের সন্দেহটা ভাঙ্গিয়া রাখিতে হইবে।

জয়ন্তী। সন্ন্যাসিনীর এ উৎকণ্ঠা কেন?

শ্রী। সন্ন্যাসিনীই হউক, যেই হউক, মানুষ মানুষই চিরকাল থাকিবে। আমি তোমাকে দেবী বলিয়াই জানি, কিন্তু যখন তুমিও লোকালয়ে লৌকিক লজ্জায় অভিভূত হইয়াছিলে, তখন আমার সন্ন্যাসবিভ্রংশের কথা কেন বল?

জয়ন্তী। তবে চল, সন্দেহ মিটাইয়া আসি। আমি সে স্থানে একটা চিহ্ন রাখিয়া আসিয়াছি–রাত্রেও সে স্থানের ঠিক পাইব। কিন্তু আলো লইয়া যাইতে হইবে।

এই বলিয়া দুই জনে খড়ের মশাল তৈয়ার করিয়া তাহ জ্বালিয়া রণক্ষেত্র দেখিতে চলিল। চিহ্ন ধরিয়া জয়ন্তী অভীপ্সিত স্থানে পৌঁছিল। সেখানে মশালের আলো ধরিয়া তল্লাশ করিতে করিতে সেই গোলন্দাজের মৃতদেহ পাওয়া গেল। দেখিয়া শ্রীর সন্দেহ ভাঙ্গিল না। তখন জয়ন্তী সেই শবের রাশীকৃত পাকা চুল ধরিয়া টানিল–পরচুলা খসিয়া আসিল; শ্বেত শ্মশ্রু ধরিয়া টানিল–পরচুলা খসিয়া আসিল। তখন আর শ্রীর সন্দেহ রহিল না–গঙ্গারাম বেট।

শ্রীর চক্ষু দিয়া অবিরল জলধারা পড়িতে লাগিল। জয়ন্তী বলিল, "বহিন্ যদি, এ শোকে কাতর হইবে, তবে কেন সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলে?"

শ্রী বলিল, "মহারাজ আমাকে বৃথা ভর্ৎসনা করিয়াছেন। আমি তাঁহার প্রাণহন্ত্রী হই নাই–আপনার সহোদরেরেই প্রাণঘাতিনী হইয়াছি। বিধিলিপি এত দিনে ফলিল।"

জয়ন্তী। বিধাতা কাহার দ্বারা কাহার দণ্ড করেন, তাহা বলা যায় না। তোমা হইতেই গঙ্গারাম দুই বার জীবন লাভ করিয়াছিল, আবার তোমা হইতেই ইহার বিনাশ হইল। যাই হউক, গঙ্গারাম পাপ করিয়াছিল, আবার পাপ করিতে আসিয়াছিল, বোধ হয়, রমার মৃত্যু হইয়াছে, তাহ জানে না, ছদ্মবেশে ছলনা দ্বারা তাহাকে লাভ করিবার জন্যই মুসলমান সেনার গোলন্দাজ হইয়া আসিয়াছিল। কেন না, রমা তাহাকে চিনিতে পারিলে কখনই তাহার সঙ্গে যাইবে না মনে করিয়া থাকিবে। বোধ হয়, শিবিকাতে রমা ছিল মনে করিয়া, তোপ লইয়া পথ রোধ করিয়াছিল। যাই হৌক, উহার জন্য বৃথা রোদন না করিয়া, উহার দাহ করা যাক আইস।

তখন দুই জনে ধরাধরি করিয়া গঙ্গারামের শব উপযুক্ত স্থানে লইয়া গিয়া দাহ করিল।

জয়ন্তী ও শ্রী আর সীতারামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল না। সেই রাত্রিতে তাহারা কোথায় অন্ধকারে মিশিয়া গেল, কেহ জানিল না।

পরিশিষ্ট

আমাদের পূর্ব্বপরিচিত বন্ধুদ্বয় রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ ইতিপূর্ব্বেই পলাইয়া নলডাঙ্গায় বাস করিতেছিলেন। সেখানে একখানি আটচালায় বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন।

রামচাঁদ। কেমন হে ভায়া! মহম্মদপুরের খবরটা শুনেছ ?

শ্যামচাঁদ। আজ্ঞে হাঁ–সে ত জানাই ছিল। গড় টর সব মুসলমানে দখন করে লুঠপাট করে নিয়েছে ।

রাম। রাজা রাণীর কি হ'লো, কিছু ঠিক খবর রাখ?

শ্যাম। শোনা যাচ্চে, তাঁদের না কি বেঁধে মুরশিদাবাদ চালান দিয়েছে। সেখানে না কি তাঁদের শূলে দিয়েছে।

রাম। আমিও শুনেছি তাই বটে, তবে কি না শুনতে পাই যে, তাঁরা পথে বিষ খেয়ে মরেছেন। তার পর মড়া দুটো নিয়ে গিয়ে বেটারা শূলে চড়িয়ে দিয়েছে।

শ্যাম। কত লোকেই কত রকম বলে! আবার কেউ কেউ বলে, রাজা রাণী না কি ধরা পড়ে নাই—সেই দেবতা এসে তাঁদের বার করে নিয়ে গিয়েছেন। তার পর নেড়ে বেটারা জাল রাজা রাণী সাজিয়ে মুরশিদাবাদে নিয়ে শূলে দিয়েছে।

রাম। তুমিও যেমন! ও সব হিন্দুদের রচা কথা, উপন্যাস মাত্র।

শ্যাম। তা এটা উপন্যাস, না ওটা উপন্যাস, তার ঠিক কি? ওটা না হয় মুসলমানের রচা । তা যাক্ গিয়ে—আমরা আদার ব্যাপারী—জাহাজের খবরে কাজ কি? আপনার আপনার প্রাণ নিয়ে যে বেঁচে এয়েছি, এই ঢের। এখন তামাকটা ঢেলে সাজ দেখি।

রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ তামাক ঢালিয়া সাজিয়া খাইতে থাকুক। আমরা ততক্ষণ গ্রন্থ সমাপন করি।

—